মাঘ ১৪০৮ ১ম সংখ্যা

উদ্বোধন



মাঘ ১৪০৮ ১ম সংখ্যা



"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

আনন্দবাজার পত্রিকা

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১



শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম

পোঃ কালাডি, জেলা ঃ এর্নাকুলাম, কেরালা, পিন ঃ ৬৮৩৫৭৪
দূরভাষ ঃ (০৪৮৪) ৪৬২৩৪৫/৪৬১০৭১ এবং ৪৬৩১৪১ (বিদ্যালয়)
ই. মেল ঃ **srka-adv@eth.net** এবং **srka-adv@netkracker.com**

সেবাব্রতের আহ্বান

একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

বন্ধু এবং শুভার্থীগণ,

আপনারা নিশ্চয়ই অবহিত আছেন যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে চরিত্রগঠনের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিগণের ভাবধারার বিকাশ ঘটিয়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্রেম ও শ্রদ্ধা, গ্রহণ ও সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে এক নব্য সমাজধারা প্রবর্তন করে যে ব্যাপক আন্দোলনের সূচনা করেছে, তার অন্তর্নিহিত সার্বজনীনতা, আধুনিকতা এবং সমন্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আজ এই আন্দোলন একটি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ভাবরূপে স্বীকৃতিলাভ করেছে।

শিক্ষার মাধ্যমে এই মানবিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শগুলিকে মানুষের কাছে অতি সহজে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশে, প্রায় শতবর্ষ পূর্বে রামকৃষ্ণ মিশন এই জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। গত ৬৫ বছর ব্যাপী শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জনহিতকর নানা কাজে মূল্যবান অবদানের জন্য কেরালা প্রদেশের কালাডিতে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্রটির, বোধকরি, আজ আর নতুন করে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। আদি শঙ্করাচার্যের পবিত্র জন্মস্থানে অবস্থিত এই শাখাকেন্দ্রটি বর্তমান পরিকাঠামোর মধ্যেই একটি নতুন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

অতএব, আমরা সমাজসচেতন এবং লোকহিতকর সকল বন্ধু, সাহায্যকারী এবং শুভার্থীদের কাছে এই মহৎ কাজের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িতে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাতে বাধ্য হচ্ছি। এককালীন, মাসিক ভিত্তিতে অথবা 'স্পনসর' রূপে যেকোন আর্থিক সাহায্য সরাসরি আশ্রমের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই সাহায্য সকলের মধ্যে এক সুসম্পর্ক গড়ে তুলবে এবং এই মহৎ কাজে যৌথ উদ্যোগের অংশীদার হতে পারার জন্য সমাজের কাছে সকলে ধন্যবাদার্হ হবেন সেবিষয়ে সন্দেহ নেই।

আনুমানিক ব্যয়ের তালিকা

(১)	উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য নতুন বাড়ি নির্মাণ	৭৫ লক্ষ টাকা
(২)	পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানের জন্য পরীক্ষাগার নির্মাণ	১৫ লক্ষ টাকা
(৩)	অফিস এবং শ্রেণীকক্ষের জন্য আসবাবপত্র ইত্যাদি	৫ লক্ষ টাকা
(৪)	লাইব্রেরীর জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি	৫ লক্ষ টাকা
(৫)	বিদ্যালয়ের কাজের জন্য একটি গাড়ি ক্রয়	৫ লক্ষ টাকা
	মোট	**১০৫ লক্ষ টাকা**

সকল দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।
আপনার আন্তরিক সাহায্য প্রার্থনা করি।

আপনাদের শ্রীরামকৃষ্ণের
স্বামী পুরন্দরানন্দ
অধ্যক্ষ



জরুরী বিজ্ঞপ্তি

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালীর ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া চাই। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে 'উদ্বোধন' বাঙালী সংস্কৃতিচেতনায় আজ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

'উদ্বোধন' ঃ গ্রাহকভুক্তি, নবীকরণ ❑ ১০৪তম বর্ষ

২০০২ খ্রীস্টাব্দ ● ১৪০৮-১৪০৯ বঙ্গাব্দ

নবীকরণ ঃ **২০০২ (মাঘ ১৪০৮—পৌষ ১৪০৯) সালের জন্য আপনি নবীকরণ করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন।**

গ্রাহকভুক্তি ঃ বিগত তিন বছর আমরা গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত রাখতে পেরেছি, কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও আগামী বছর (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০২ খ্রীস্টাব্দ) থেকে 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকমূল্য সামান্য বৃদ্ধি করতেই হচ্ছে। এজন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫্ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ৯৫্ টাকা। বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র ঃ ৮০০্ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০্ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০্ টাকা।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০০্ টাকা এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০্ টাকা (এক বা ন্যূনতম ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ৫০০্ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি ঃ M.O. অথবা A/c Payee Bank Draft বা Postal Order **"Udbodhan Office"**—এই নামে পাঠাতে পারেন। **নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড** ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। পত্রোত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন গ্রাহক হতে চাই'** খামের ওপর লিখে দেবেন।

চেক গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে।

M.O. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই সুবিধাজনক।

❑ **কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।**

❑ **যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩**
ফোন ঃ ৫৫৪-২২৪৮, ৫৫৪-২৪০৩ ● e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com

উদ্বোধন
॥১০৪॥
মাঘ ১৪০৮
জানুয়ারি ২০০২

দিব্য বাণী

সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়া বোধ হইতেছে। মহাদুঃখ অবসানপ্রায় প্রতীত হইতেছে। মহানিদ্রায় নিদ্রিত শব যেন জাগ্রত হইতেছে। ইতিহাসের কথা দূরে থাকুক, কিংবদন্তি পর্যন্ত যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকার ভেদ করিতে অসমর্থ, সেখান হইতে এক অপূর্ব বাণী যেন শ্রুতিগোচর হইতেছে। জ্ঞান, ভক্তি, কর্মের অনন্ত হিমালয়-স্বরূপ আমাদের মাতৃভূমি ভারতের প্রতি শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন ঐ বাণী মৃদু অথচ দৃঢ় অভ্রান্ত ভাষায় কোন্ অপূর্ব রাজ্যের সংবাদ বহন করিয়া আনিতেছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই যেন উহা স্পষ্টতর, গভীরতর হইতেছে। যেন হিমালয়ের প্রাণপ্রদ বায়ুস্পর্শে মৃতদেহের শিথিলপ্রায় অস্থিমাংসে পর্যন্ত প্রাণসঞ্চার হইতেছে—নিদ্রিত শব জাগিয়া উঠিতেছে; তাহার জড়তা ক্রমশ দূর হইতেছে। অন্ধ যে, সে দেখিতেছে না; বিকৃতমস্তিষ্ক যে, সে বুঝিতেছে না—আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এখন ইঁহার গতিরোধে সমর্থ নহে, ইনি আর নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃশক্তিই এখন আর ইঁহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না, যেন কুম্ভকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙিতেছে।



স্বামী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দো জয়তি



"আমি হই বিকাশ আবার।
মম শক্তি প্রথম বিকার,
আদি বাণী প্রণব ওঙ্কার
বাজে মহাশূন্যপথে,
অনন্ত আকাশ শোনে মহানাদধ্বনি,
ত্যজে নিদ্রা কারণমণ্ডলী—
পায় নব প্রাণ অনন্ত অনন্ত পরমাণু...।"
('গাই গীত শুনাতে তোমায়'—স্বামী বিবেকানন্দ)

এটি স্বামীজীর প্রাণের কথা। যদিও পূর্বাপর প্রসঙ্গ মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে উপরি উক্ত পঙ্‌ক্তি কয়টি বেদান্তের তত্ত্বকেই অভিব্যক্ত করিয়াছে; তথাপি যদি একটু 'ভিন্ন দৃষ্টিকোণ' হইতে দেখা যায়, মনে হইবে যেন আজকের এই অস্থির রক্তাক্ত পৃথিবীতে দিশাহারা মানুষের জন্য স্বামীজী মহান আশার বাণী শুনাইতেছেন। স্বামীজীকে আজ আমাদের প্রয়োজন। ভীষণভাবেই প্রয়োজন। দুই শতাব্দীর এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া সমগ্র পৃথিবী আজ যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। সভ্যতার গতি কোন্ পথে চলিয়াছে সঠিক নির্ধারণ করিবার উপায় নাই। একদিকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, মানব ক্লোনিং, অপরদিকে মধ্যযুগীয় মৌলবাদ। একদিকে বিশ্বভ্রাতৃত্ব, আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য প্রভৃতি লইয়া সুন্দর বক্তৃতাবলী, অপরদিকে ভোগবাদসর্বস্ব জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে হিংসা, স্বার্থপরতা, পাশবিকতার প্রাদুর্ভাব। কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া আমাদের আলোচনার সীমারেখা নির্ধারণ করা যাইতেই পারে। কিন্তু আমরা সমাজ-বহির্ভূত ভাবিয়া নিজেদের উদাসীনবৎ প্রতিপন্ন করিতে চাহিলে তাহাতে কৃতিত্ব কিছু থাকে না। সমাজকে বাদ দিয়া, মানুষকে বাদ দিয়া, ভারতবর্ষকে বাদ দিয়া বিবেকানন্দের অনুধ্যান করিতে চাহি না বলিয়াই 'ভিন্ন দৃষ্টিকোণ'-এর প্রসঙ্গ আসিয়াছে।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মূল সুর স্বামীজী স্বয়ং বাঁধিয়া গেলেন —"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"। নিজের মুক্তি-সাধন এবং জগতের হিতসাধনই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একেবারে গোড়ার কথা। একদা স্বামীজী বলিয়াছিলেন: "শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিজের মুক্তিসাধন করা ও জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণ-সাধনে শিক্ষিত হওয়ার জন্য এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল।" অতএব বিবেকানন্দের দিব্য জন্ম-কর্ম তাঁহার নিজের স্বার্থে কখনো নহে, পরন্তু জগদ্বাসীর চরমতম কল্যাণার্থেই সর্বদা নিয়োজিত—একথা দ্বিতীয়বার উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। তাঁহার নিজের ভাষায়—"I am a voice without a form."—আমি অশরীরী বাণী। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে একদিন বলিয়াছিলেন: "আমরণ কাজ করে যাও—আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি আর আমার শরীর চলে গেলেও আমার শক্তি তোমাদের সঙ্গে কাজ করবে।" উপরে উদ্ধৃত কবিতাংশে যেন সেই কথাই স্বামীজী সুললিত ছন্দে অভিব্যক্ত করিতেছেন, যে-শক্তির বিকাশে এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইল (প্রণব ওঙ্কারের মাধ্যমে) সেই মহাশক্তির পুনঃপ্রকাশ জগৎ অচিরেই লক্ষ্য করিবে। ঐ শুনা যাইতেছে সেই মহাশূন্যপথে অনন্ত নির্ঘোষ। পৃথিবী হইতে সমস্ত জটিলতা, পঙ্কিলতা, কদর্যতা এবং অমঙ্গল ঘুচাইতে মহানাদধ্বনি অনন্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করিতেছে। 'ত্যজে নিদ্রা কারণমণ্ডলী'। যেন অদ্যাবধি ভারতবর্ষের জাতীয় সমষ্টি কুণ্ডলিনীশক্তি নিদ্রিত রহিয়াছিল। আজ ধীরে ধীরে সেই 'কারণমণ্ডলী' নিদ্রাভঙ্গে জাগিয়া উঠিতেছে। জাতীয় শরীর ও মনকে পরিচালনকারী সেই মহাশক্তির উত্থানে ভারতবর্ষে অনন্ত অনন্ত পরমাণু যেন

প্রাণ পাইতেছে। পরমাণু অর্থ মনুষ্য। আনাচে কানাচে অনাদরে যাহারা সমাজের অন্ধকার কক্ষে এযাবৎ অবহেলিত ছিল, তাহারাও জাগিতেছে। ভারতবর্ষে অনন্ত মানুষের প্রাণে বিবেকানন্দ-বিদ্যুদ্বাহী মহাশক্তি অনু-সঞ্চারিত হইতেছে। পুরুষ-মহিলা, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের মধ্যে নবপ্রাণ সঞ্চারে উল্লাসের সৃষ্টি হইতেছে! এক বিশাল অজানা আবেগে সমগ্র জাতি আন্দোলিত হইয়া ক্রমশ চক্ষু মেলিয়া দেখিতেছে, বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে আজকের এই আক্রান্ত ভারতবর্ষের এই মুহূর্তে কী করণীয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি বলিয়াছিলেন, বর্তমান সভ্যতা শুরু হইয়াছিল পাশ্চাত্য ভাবধারার মধ্য দিয়া। কিন্তু এই সভ্যতার পরিসমাপ্তি হওয়া চাই ভারতীয় সভ্যতায়, নতুবা পৃথিবী ধ্বংসের পথে আগাইয়া যাইবে। টয়েনবির মতে, পরিণামে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিন্তাপ্রবাহই জগৎকে রক্ষা করিতে পারে। কী সাঙ্ঘাতিক কথা!

ভারতবর্ষেরও জগৎকে কিছু দিবার আছে। ভারতবর্ষ ভিখারি নহে। আমরা কোমল। আমাদের ধর্মীয় আভরণের কোমলত্ব অন্য জাতিকে সহজে আমাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করিবার সুযোগ দিয়াছে। কিন্তু তাহাদের কাঠিন্যই পরবর্তী কালে সর্বক্ষেত্রে তাহাদের বিনাশের কারণ হইয়াছে। পাঁচহাজার বৎসর ধরিয়া সনাতন ধর্ম জগতে বাঁচিয়া রহিয়াছে। অন্যান্য বহু ধর্মই নিজেদের আগ্রাসী মনোভাব বর্জন করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে রঙ্গমঞ্চ হইতে বিদায় লইয়াছে। সনাতন বেদান্তধর্মের জয়ধ্বজা আজও পর্যন্ত অমলিন উড়িতেছে পত্‌পত্‌ করিয়া! বিগত অর্ধ শতাব্দীতে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হইতে জটিলতর হইয়াছে। ফলে এখন হিন্দুধর্মকে আলাদা করিয়া চিহ্নিত করিবার প্রবণতা যেমন একদিকে বৃদ্ধি পাইতেছে, অপরদিকে তেমনি সারা ভারতবর্ষে ধর্মীয় তথা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের ধারণা যেন আমূল পরিবর্তিত হইতে চলিয়াছে। এই অবস্থায় বিজ্ঞানের প্রসারে পৃথিবীর ক্ষুদ্রায়ণ এবং পাশ্চাত্য সমাজ হইতে উদ্ভূত বস্তুবাদী চিন্তাধারায় ভারতবর্ষের মানুষ কি ক্রমশ বহির্মুখী হইয়া অধ্যাত্ম-জীবনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে? দেখিয়া মনে হয় স্বার্থপরতা, হীনবুদ্ধি, হিংসা, লোভ, যথেচ্ছ ইন্দ্রিয়চারিতাই মানুষের মধ্যে প্রবল হইয়া পূর্বতন সমস্ত মূল্যবোধকে নির্মূল করিতে চাহিতেছে। অথচ স্বামীজী বলিলেন ঃ "যদি জাতীয় জীবনকে অব্যাহত রাখিতে চাও, তবে তোমাদিগকে এই ধর্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে।... ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নহে—চৈতন্যের শক্তিতে।" কিন্তু এখন ব্যবহারিক জীবনে সেই লক্ষণ যথার্থরূপে বাস্তবায়িত হইতেছে না। সেজন্য স্বামীজী ওজস্বী কণ্ঠে বলিলেন ঃ "Flood the country with spirituality." দেশকে আধ্যাত্মিকতায় প্লাবিত কর। এইখানেই মনে প্রশ্ন জাগিতেছে, যাহা শুনিতেছি এবং যাহা দেখিতেছি তাহার মধ্যে মিল নাই কেন?

আশঙ্কা হইতেছে ইহা চর্বিত-চর্বন কিনা। কারণ, এই ধরনের আলোচনা পূর্বে বহুবার হইয়াছে। 'বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা', 'নব্যবেদান্ত ও হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান', 'পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বনাম সনাতন ধর্ম'—ইত্যাদি বহু আলোচনা বারংবার হইয়াছে, হইতেছে। এরূপ করিবার প্রয়োজন আছে যথেষ্ট। কিন্তু একটি বিষয়ে তেমনভাবে আলোচনা হয় নাই। উহা 'বিবেকানন্দ তত্ত্ব'। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—"কেশব (কেশবচন্দ্র সেন) একটা শক্তিতে জগৎ মাতিয়েছে, নরেনের মধ্যে অমন আঠারোটা শক্তি রয়েছে।" জড়শক্তি তো নহে, উহা চৈতন্যের শক্তি। বিবেকানন্দের মধ্যে অন্তর্নিহিত ঐ শক্তির ক্রিয়াশীলতা, ক্রিয়াপদ্ধতি, তাঁহার অনন্ত লোককল্যাণ-চিকীর্ষারূপ 'আদি বাসনা'রই বিচিত্র প্রতিকাশ 'দেশপ্রেমিক বিবেকানন্দ', 'সংগঠক বিবেকানন্দ', 'কবি-গায়ক-শিল্পী বিবেকানন্দ' অথবা 'হিন্দুধর্মের প্রবক্তা ও রক্ষাকর্তা বিবেকানন্দ'। একটি শাশ্বত, চিরন্তন, সার্বভৌমিক মহান তত্ত্বের প্রতীক ঐ বিবেকানন্দ-মূর্তি এবং ঐ মূর্তিই আজ ক্রমশ আমাদের সমস্ত অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতীক হইয়া উঠিতেছে। অব্যর্থভাবেই। হয়তো আমাদের অজান্তে। ইহা অন্ধ ভক্তির প্রাবল্যে কিংবা তীব্র আবেগের তাড়নায় বলিতেছি তাহা নহে। বিবেকানন্দকে বিবেকানন্দরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই।

একদিন স্বীয় গুরুভ্রাতাকে স্বামীজী স্বয়ং বলিয়াছিলেন ঃ "যে আমার মতলব অনুসারে কাজ করতে চায়—তারই কথা শুনব। আমি... কারুর দাস নই—শুধু যে নিজের ভক্তি মুক্তি গ্রাহ্য না করে পরের সেবা করতে প্রস্তুত, তারই দাস।" কী তাঁহার সেই 'মতলব', যাহার অনুসরণে তিনি দাস্য স্বীকার করিবেন? এই ভাবের সম্যক্ ধারণা করা ও তাহা বিস্তারিত বর্ণনা করিবার সাধ্য আমার নাই। অতএব নিজস্ব সীমিত দৃষ্টিকোণ হইতে সামান্য কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াই নিবৃত্ত হইব। যথা ঃ

"তোমরা ভুল করিয়া যাহাকে মানুষ বলিয়া আখ্যা দাও আমি সেই ঈশ্বরের পূজা করি।"—স্বামী বিবেকানন্দ

মানুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি আমূল পরিবর্তন করিবার কথা প্রথম স্বামীজীই বলিলেন। এত স্পষ্ট করিয়া এই কথা তাঁহার পূর্ববর্তী কোন আচার্য বলেন নাই।

"ভারতবর্ষে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য—নীচশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বিদ্যা ও ধর্মের বিতরণ। অন্নের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ধর্ম হওয়া অসম্ভব। অতএব তাহাদের নিমিত্ত অন্নাগমের নূতন উপায় প্রদর্শন করা সর্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রথম কর্তব্য।"—স্বামী বিবেকানন্দ

একটি অসাধারণ নির্দেশ। স্বামীজীর পূর্বে একথা আর কাহারো মুখে ভারতবর্ষ শুনে নাই। আজও পর্যন্ত আমরা এই ব্যাপারে সাফল্যলাভ করিতে পারিলাম না—ইহাই এদেশের দুর্ভাগ্য। স্বামীজী বলিলেন না *শিক্ষা ও অন্ন* বিতরণের কথা। বলিলেন *শিক্ষা ও ধর্ম* বিতরণের কথা। কিন্তু 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'। সুতরাং অন্নের সংস্থান করা, নিজের পায়ে দাঁড়াইবার প্রশিক্ষণ দেওয়া সর্বাপেক্ষা প্রথম কর্তব্য। কিন্তু কখনো ধর্মকে ভুলিয়া নহে। উদরপূর্তি এবং ধর্মাচরণ একইসঙ্গে করা চাই। আজ গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া বিশ্বে চিহ্নিত হইয়াছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পক্ষে যদিও নিজেদের ইসলামিক রাষ্ট্র বলিয়া চিহ্নিত করিবার সুযোগ মিলিয়াছিল, ভারতবর্ষের পক্ষে সেই ধরনের কোন অবকাশ নাই, প্রয়োজনও সম্ভবত নাই। কিন্তু ব্যক্তিগত এবং ব্যষ্টিগতভাবে মানুষ কখনো ধর্মনিরপেক্ষ হইতে পারে না। সে নাস্তিক হইতে পারে। বেদান্তধর্মে নাস্তিকতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা সমার্থক নহে। অগ্নি যেমন তাহার দাহিকাশক্তিকে অস্বীকার করিতে পারে না, তেমনি মানুষ কখনো তাহার 'মানবধর্ম'কে অস্বীকার করিতে পারে না। অপরপক্ষে জাতীয় স্তরে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র অর্থ নাস্তিকতা বা সকল ধর্মকে বর্জন করা নহে। বরং সকল ধর্মের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করিয়া সব ধর্মের প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধাবান হওয়া এবং দেশের নাগরিকদের এইভাবে শিক্ষিত করিয়া তোলা 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্রের কাম্য।

"চরিত্রবল না হইলে মনুষ্য কোন কার্যেই সক্ষম হয় না। এই চরিত্রবলহীনতাই আমাদের কার্য-পরিণতা-বুদ্ধির অভাবের একমাত্র কারণ।"—স্বামী বিবেকানন্দ

পরাধীন ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়াইয়া আজ হইতে একশত বৎসর পূর্বে স্বামীজী যে **কার্য-পরিণতা-বুদ্ধির (practical wisdom)** উল্লেখ করিলেন, আজ বিশ্বব্যাপী ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিঙের ইহাই মূল কথা। অজস্র ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট হইতে অসংখ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক প্রতি বৎসর পাশ করিয়া সমাজে প্রত্যাবৃত্ত এবং প্রবিষ্ট (absorbed) হইতেছে। অথচ সারাদেশব্যাপী চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা (মিসম্যানেজমেন্ট) প্রমাণ করে, চরিত্র-বলহীনতাই আমাদের জাতির প্রধানতম দোষ।

"ধর্মের মধ্য দিয়া না যাইলে ভারতবর্ষে কোন ভাব চলে না। এইজন্য অর্থ, বিদ্যা, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি সমস্তই ধর্ম মধ্য দিয়া চালাইতে হইবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকতা-সর্বস্ব কোন ধর্মের কথা স্বামীজী এখানে বলেন নাই। আরো মনে রাখা দরকার, অন্তরের তীব্র *মানবকল্যাণচিকীর্ষার* প্রেরণায় স্বামীজী উপরি উক্ত মন্তব্যসকল করিতেছেন; কোনরূপ স্বার্থচিন্তায় অথবা রাজনৈতিক মুনাফা লাভ করিবার জন্য নহে। যে-ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন ঃ "Religion is the manifestation of the Divinity already in Man."—সেই ধর্মের কথা হইতেছে। সেই ধর্মে কোন সাম্প্রদায়িকতা নাই, কোন সঙ্কীর্ণতা নাই, কোন অনুদারতা নাই। সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাস্তবে প্রয়োগের সময়ে কতটা গুরুত্ব হিন্দুধর্মকে, কতটা গুরুত্ব ইসলামকে অথবা খ্রিস্টানকে দিতে হইবে, সেই অনুপাত দেশপ্রেমিক, বিদ্বান, দূরদর্শী, চরিত্রবলসম্পন্ন রাষ্ট্রনেতাগণ স্থির করিবেন। স্বামীজী কেবল তাত্ত্বিক পরিমাপটুকুই উল্লেখ করিয়া গেলেন।

"জাতিবিভাগেই আমাদের সমাজ গঠিত। সকল সমাজই এই প্রকারে গঠিত। তবে আমাদের সমাজে [ভারতবর্ষে] ও অন্যান্য সমাজে কিছু প্রভেদ আছে।

"... সমাজে যাহাকে সমাজনীতি বা politics বলে, তাহা কেবল ... ভোগতারতম্য সমুত্থিত অধিকারপ্রাপ্ত ও অধিকারনিরাকৃত জাতিসমূহের সংগ্রামের নাম।

"এই অধিকার তারতম্যের মহাসংগ্রামে পরাস্ত হইয়া ভারতবর্ষ গতপ্রাণপ্রায় পতিত হইয়াছে। অতএব বাহ্যজাতির সহিত সাম্যস্থাপন অতি দূরের কথা, যতদিন এ ভারত নিজগৃহে সাম্যস্থাপন করিতে না পারিবে, ততদিন তাহার পুনরুজ্জীবনীশক্তি লাভের আশা নাই।

"অর্থাৎ সারকথা এই যে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি জাতিবিভাগ কোন দোষের নহে; কিন্তু ভোগাধিকারতারতম্যই মহা অনর্থের কারণ হইয়া উঠিয়াছে।... আমাদের দেশে

সম্প্রতি যত জাতি আছে তদপেক্ষা যদি লক্ষাধিক জাতি হয়, তবে কল্যাণ বই অকল্যাণ নাই। কারণ, যে-দেশে জাতির সংখ্যা যত অধিক, সে-দেশে শিল্পাদি ব্যবসায়ের সংখ্যা ততই অধিক; কিন্তু মৃত্যুর ছায়ারূপ ভোগতারতম্যরূপ জাতির বিপক্ষেই সংগ্রাম চলিতেছে। যে-জাতি এ সংগ্রামে যত পরাজিত তাহার দুর্দশা ততই অধিক। এ সংগ্রামে যে-জাতি যে-পরিমাণে জয়লাভ করিতেছেন, সেই জাতি সে-পরিমাণে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছেন।"—স্বামী বিবেকানন্দ

অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষা, স্পষ্ট ভাব। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তবে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি জাতি প্রসঙ্গে দু-এক কথা মাত্র বলিব। যদি কেহ 'বর্ণাশ্রম ধর্ম'কে নিন্দা করিয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র জাতি বিভাজন সমাজ হইতে উৎপাটিত করিতে চাহেন, তিনি অচিরেই দেখিবেন, অপরদিক হইতে উহারই সমান্তরাল 'জেনারেল কাস্ট', 'সিডিউল্ড কাস্ট', 'সিডিউল্ড ট্রাইব', 'ও বি সি', 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়', 'অমুক ইউনিয়ন', 'তমুক রাজনৈতিক পার্টি' প্রভৃতি জাতি অপ্রতিরোধ্যভাবেই তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে এবং স্বামীজী-নির্দেশিত ভোগাধিকার-তারতম্যের কারণে পরস্পর তীব্র কলহে প্রবৃত্ত হইতেছে। একটি '**ইউনিয়ন**' গঠিত হইবার অর্থ আর কিছুই নহে, সমাজে একটি নূতন জাতির সৃষ্টি হইল। বস্তুত, অপব্যাখ্যার কারণেই চতুর্বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) প্রগতির পরিপন্থী বলিয়া প্রতীত হয়। যথার্থ অর্থ বুঝিয়া উহার প্রয়োগ করিতে পারিলে আজ আমাদের দেশ বিশ্বের শীর্ষে অবস্থান করিত।

"পুরুষানুক্রমে উদ্দেশ্যের ঐকতানতা (Continuance of Policy) মহৎ কার্য সাধনের ও উত্তরোত্তর শক্তি সঞ্চয়ের একমাত্র কারণ।"—স্বামী বিবেকানন্দ

এই উক্তির গভীর তাৎপর্য আমরা ক্রমশ উপলব্ধি করিতেছি। সরকার ঘন ঘন ভাঙিতেছে, আবার গড়িতেছে। আমরা দেখিতে পাই, এক সরকারের নীতি পরবর্তী সরকার পরিবর্তন করিয়া দেন। ফলে যেটুকু অগ্রগতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে হইয়াছিল তাহা প্রায়ই বিফল হয়। স্বামীজীর কথা মনে রাখিলে দেশের অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন উপায় কী? স্বামীজী বলিলেন ঃ

"এই ভারতবর্ষকে প্রথমত আর্যভাবাপন্ন করিলে, আর্যাধিকার দিলে, আর্যজাতির ধর্মগ্রন্থে ও সাধনে সকলকে সমভাবে আহ্বান করিলে এই মহাবিপদ হইতে আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারিব।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

আর্যভাব কোন একটি সঙ্কীর্ণ ভাব নহে। গোটা জাতিকে মুক্তির দিঙ্‌নির্দেশ করিতে পারে এমনি একটি ভাব এই আর্যভাব। সমগ্র দেশকে এই ব্যাপারে সচেতন হইতে হইবে, নতুবা কোন একটি বিশেষ গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দলের সামর্থ্য নাই যে জাতিকে এই আর্যাধিকার দান করিবে। আর্যাধিকার আমাদের জন্মগত অধিকার। ইহাও সুনিশ্চিত যে, এই আর্যাধিকার কেহই আমাদের কৃষ্টি হইতে ছিনিয়া লইতে পারিবে না। আর্যভাবের অধিকতর উৎকর্ষ সাধনের জন্য স্বামীজী একটি পত্রে নির্দেশ দিয়াছিলেন—

"আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম রূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা।"

তত্ত্ব থাকিলে তাহার প্রয়োগ আছে। 'বিবেকানন্দ তত্ত্ব'-এর প্রায়োগিক দিকটি আমাদেরই নির্ধারণ করিতে হইবে। নেতাজী প্রমুখ শত শত ভারতপ্রেমিকের অনুপ্রেরণার উৎস ছিল এই 'বিবেকানন্দ তত্ত্ব'-এর অনুচিন্তন। যে বিপুল 'আধ্যাত্মিক' শক্তি লইয়া নরেন্দ্রনাথ ক্রমশ 'বিবেকানন্দ'-এ পরিণত হইলেন এবং বজ্রবাঁটুলের ন্যায় ভারতের সমাজে পতিত হইলেন, তাহার অভিঘাত 'বিবেকানন্দ তত্ত্ব'-এর অপর দিক। দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত অসংখ্য দুঃসংবাদের মধ্যেও যখন উপলব্ধি হয়, ভারতবর্ষ ক্রমশ এই 'বিবেকানন্দ তত্ত্ব'কে আত্মীকরণের পথে চলিয়াছে, সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞান্তে, তখন মন হর্ষান্বিত হইয়া উঠে। 'পায় নব প্রাণ অনন্ত অনন্ত পরমাণু'।

ঠিক একশত বৎসর পূর্বে ১৯০২ সালের ৪ জুলাই স্বামীজী বেলুড় মঠে তাঁহার স্থূলশরীর ত্যাগ করিয়াও আজও পর্যন্ত অশরীরী শক্তিরূপে মানুষের প্রেরণার উৎসস্থল হইয়া আছেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকা একশত তিন বৎসর অতিক্রম করিল। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীশরীর এই 'উদ্বোধন'-এর সেবাব্রত জাতীয় স্তরে বিপুল অভিঘাত আনিবে—ইহা স্বামীজী জানিতেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের এই প্রেক্ষাপটে স্বামীজীর আত্মত্যাগের প্রতিদানে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ, দায়বদ্ধ। প্রাচ্য বেদান্তধর্ম ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের সমন্বয়ে এক নূতন সভ্যতার ভগীরথ হইয়া 'স্বামীজীর ভারত'-এর উত্থান প্রত্যক্ষ করিতে অধীর আগ্রহে আমরা অপেক্ষা করিতেছি। বি বে কা ন ন্দো জ য় তি।❑

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে যেসকল তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ১৩৫৯ সালে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনর্মুদ্রিত করা হলো। আশা করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।—সম্পাদক

দি ইণ্ডিয়ান মিরর, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৭

দি ব্রাহ্মসমাজ—সমাজের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মাঝে মাঝে যাঁর সাক্ষাৎ হয়, সেই অদ্ভুত ধরনের হিন্দু ভক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসের আমাদের সমাজের প্রতি সহানুভূতি আছে। তাঁর শরীর দুর্বল হওয়ায় এবং তাঁর অন্তঃকরণ ধর্মীয় প্রবল অনুভূতির চাপ সহ্য করতে অক্ষম হওয়ায় তিনি কখনো অজ্ঞান হয়ে যান। কখনো বা মূর্ছিত হয়ে পড়েন। *(ইংরেজী থেকে অনূদিত)*

সুলভ সমাচার, ১৭ ডিসেম্বর ১৮৮১

সাপ্তাহিক সংবাদ।—দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসকে কলিকাতার ভদ্রলোকেরা ক্রমেই চিনিতেছেন। তাঁহারা কেহ কেহ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটীতে আনিতেছেন এবং আত্মীয় বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার জীবন্ত ধর্মকথা ও কীর্তনাদি শুনাইয়া সুখী করিতেছেন। উক্ত মহাত্মা দ্বারা কলিকাতার হিন্দুসমাজে ধর্মভাব জাগ্রত হইতেছে।

পরিচারিকা, আগস্ট ১৮৮৬

দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস।... ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন অকুল সংসারার্ণবে ঈদৃশ সাধু-জীবন আলোকস্তম্ভস্বরূপ। এরূপ জীবন্ত পুরুষকে দেখিলে আশা হয়, ভয় ভাবনা চলিয়া যায়। আমরা অনেক যোগী ঋষির চরিত্র, বুদ্ধ চৈতন্য নানক প্রভৃতি মহাপুরুষের বৃত্তান্ত কেবল পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু রামকৃষ্ণকে আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি ও অনেকদিন তাঁহার সহবাস লাভ করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছি এবং অনেক শিক্ষালাভ করিয়াছি। তাঁহার বাক্যে এমন মধুরতা ও চরিত্রে স্বর্গীয় আকর্ষণ ছিল যে, তাঁহার নিকট বসিলে আর কাহারো উঠিতে ইচ্ছা হইত না। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য নানা দূরদেশ হইতে স্ত্রী-পুরুষ আগমন করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহার নিকট লোকের ভীড় হইত। তিনি বিনয়ীর চূড়ান্ত ছিলেন। কাহারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে সর্বাগ্রে তাহাকে নমস্কার করিতেন।... এম. এ., বি. এ. উপাধিধারী অনেক সুশিক্ষিত যুবক তাঁহার পদানত হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

তিনি বহুকাল লোকের নিকট একপ্রকার অপরিচিত ছিলেন। কলিকাতার প্রান্তস্থ দক্ষিণেশ্বর গ্রামেই নির্জনে স্থিতি করিতেন, আপনার ভাবে আপনি মত্ত থাকিতেন, রাজধানীর লোকেরা তাঁহার সমাচার বড় রাখিত না। আচার্য কেশবচন্দ্র সেন লোকসমাজে তাঁহাকে প্রকাশিত করেন। আচার্য তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিলেন ও তাঁহার প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইলেন, রামকৃষ্ণও কেশবচন্দ্রের প্রতি একান্ত অনুরাগী হইয়া পড়িলেন।... ইঁহারা মিলিয়া নানাপ্রকার গভীর কথা বলিতেন, ঈশ্বরপ্রসঙ্গে মত্ততা এবং ভাবে ঢলাঢলি ও গলাগলি হইত। আচার্যদেব পরমহংসদেবের মাহাত্ম্য পত্রিকায় ও পুস্তকে লিখিয়া প্রচার করেন, সেই হইতেই সর্বত্র তিনি পরিচিত হন। ১৪/১৫ বৎসর পূর্বে বেলঘরিয়ার উদ্যানে আচার্যদেবের সঙ্গে পরমহংসদেবের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তদবধি উভয়ের পরস্পর গাঢ় যোগ হইয়া উঠে, উভয়ে পরস্পর সাধুগুণ আদানপ্রদান করেন। আচার্য পরমহংসের জীবনে, পরমহংসও আচার্যের জীবনে বিশেষ উপকৃত হন। ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের মাতৃভাব বিশেষরূপে পরমহংসের জীবনের প্রভাবেই সঞ্চারিত হয়।...

ধর্মতত্ত্ব, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬

আচার্যের স্বর্গারোহণের সংবাদ শুনিয়া পরমহংস অত্যন্ত শোকাকুল হন, তিনি বলেন: "কেশব চলে যাওয়াতে আমার জীবনের অর্ধেক চলে গিয়েছে। কেশব প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের ন্যায় ছিলেন, শত সহস্র লোক তাঁহার আশ্রয় পেয়ে শীতল হতো, সেরূপ বৃক্ষ আর কোথায়? আমরা সুপারিগাছ তালগাছের মতো, শীতল ছায়াদানে একটি লোককেও তৃপ্ত করিতে পারি না।" কিছুদিন হইল, আচার্যদেবের একখানা ছবি পরমহংসদেবের গৃহে তাঁহার একজন শিষ্য টাঙাইতে গিয়াছিল, তিনি সেই ছবি দেখিয়া কাঁদিয়া ওঠেন এবং বলেন: "এ ছবি আমার কাছে রেখ না, ছবিতে কেশবচন্দ্রকে দেখতে আমার প্রাণ ফেটে যায়।" আচার্যমাতা ও আচার্যপত্নী এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান করুণাচন্দ্র ও দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান নির্মলচন্দ্র একদিন পীড়িতাবস্থায় পরমহংসদেবকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহাদের প্রতি অনেক আদরযত্ন প্রকাশ করিলেন, করুণাচন্দ্র ও নির্মলচন্দ্রকে আপনার পার্শ্বে বসাইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক স্নেহমাখা কথা বলিয়াছিলেন। তিনি আচার্যজননীকে মা ডাকিতেন ও তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন।

পরমহংসদেবের বিনয় অতি চমৎকার ছিল, কাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে পূর্বেই তিনি নমস্কার করিতেন। তাঁহার উক্তিসকল মুদ্রিত হইয়া প্রচার হয়, সংবাদপত্রাদিতে তাঁহার বিষয় কিছু লেখা হয়, তাঁহার ফটোগ্রাফ তোলা হয়—তিনি এরূপ ইচ্ছা করিতেন না। সমাধির অবস্থায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য না হইলে তাঁহার ফটোগ্রাফ তোলা যাইতে পারিত না। সমাধিকালে তিনি অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পড়িতেন না, লম্ফঝম্প করিয়া পার্শ্বস্থ লোকদিগের প্রতি কোনরূপ উৎপাত করিতেন না। উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান হইয়া স্পন্দহীন স্থিরভাবে থাকিতেন। ঈদৃশ সাধুপুরুষ ঈশ্বরের কৃপার জ্বলন্ত নিদর্শন, ঘোর তিমিরাবৃত দুস্তর ভবার্ণবে নিমগ্নপ্রায় জীবনতরী পথিকের পক্ষে আশাজনক আলোকস্তম্ভস্বরূপ। [ক্রমশ]

সঙ্কলন ও অনুবাদ ❑ জলধিকুমার সরকার

সম্পাদনা ❑ স্বামী সর্বগানন্দ



স্বামী বিবেকানন্দের তিনটি পত্র

মিসেস জর্জ ডব্লু হেলকে লিখিত

॥১॥

ডেট্রয়েট
১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪

মা,

পরশু রাত একটায় নিরাপদে এসে পৌঁছেছি। তুষারঝঞ্ঝায় পথ বন্ধ হওয়ায় ট্রেন সাত ঘণ্টা বিলম্বে এসেছে। যাই হোক, ঐ দৃশ্যের অভিনবত্ব আমি উপভোগ করেছি; অনেক লোক বরফ কেটে কেটে পরিষ্কার করে যাচ্ছে, আর দুটো ইঞ্জিন ক্রমাগত টানাটানি করছে। এসব আমার কাছে ছিল এক নতুন দৃশ্য।

এখানে আমার জন্য স্টেশনে অপেক্ষারত কনিষ্ঠতম মিস্টার ব্যাগলির (পল এফ. ব্যাগলি) সাক্ষাৎ পেলাম এবং অধিক রাত হয়ে যাওয়ায় মিসেস ব্যাগলি[১] শুয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু মেয়েরা আমার জন্য বসে ছিল।

তাঁরা খুব ধনী, সদয় ও আতিথ্যপরায়ণ। মিসেস ব্যাগলি ভারত সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহান্বিত। মেয়েরা খুবই ভাল, শিক্ষিতা ও সুন্দরী। জ্যেষ্ঠাটি একটি ক্লাবে আমার জন্য মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেছিল, যেখানে শহরের কয়েকজন অত্যুত্তম ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। গত সন্ধ্যায় এই গৃহে একটি অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হয়েছিল। আজ আমি প্রথমবারের জন্য বক্তৃতা করতে যাচ্ছি। মিসেস ব্যাগলি একজন অতি চমৎকার ও সহৃদয়া মহিলা। আশা করি ভাষণগুলি তাঁকে আনন্দ দেবে।

আপনাদের সকলের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

আপনার আজ্ঞানুবর্তী
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—আমি স্লেটনকে[২] যে-চিঠিতে লিখেছিলাম যে আমি থাকতে পারছি না, তাঁর কাছ থেকে সেই চিঠির উত্তর পেয়েছি। তিনি আমাকে ভরসা দিচ্ছেন। আপনার পরামর্শ কি? [নরসিংহাচার্যের][৩] চিঠিখানি আরেকটি খামে পুরে পাঠাচ্ছি।

আপনার
বি

---

১ মিসেস জন জাডসন ব্যাগলি ডেট্রয়েট নিবাসী প্রৌঢ়া মহিলা। স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর শিকাগো-বক্তৃতার পর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর গৃহে স্বামীজী কখনো কখনো থাকতেন। মিসেস ব্যাগলি মাঝেমধ্যে ডেট্রয়েটের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করে স্বামীজীর সংবর্ধনার আয়োজন করতেন।

২ শিকাগোর স্লেটন লাইসিয়াম লেকচার ব্যুরোর সঙ্গে স্বামীজী একদা চুক্তিবদ্ধ হয়ে কিছু বক্তৃতা প্রদান করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ঐ 'ব্যুরো' তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে বুঝতে পেরে তিনি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

৩ মাদ্রাজের নরসিংহাচার্য শিকাগো ধর্মমহাসভায় অন্যতম বক্তা ছিলেন।

।।২।।

ডেট্রয়েট
২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪

মা,

এখানে আমার বক্তৃতাগুলি শেষ হয়েছে। আমি এখানে কয়েকজন অতি উত্তম বন্ধু লাভ করেছি। তাঁদের মধ্যে আছেন বিগত বিশ্বমেলার সভাপতি মিস্টার পামার। স্লেটন-কারবার সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। এই লোকটির সঙ্গে যোগ দিয়ে আমার অন্তত ৫,০০০ ডলার ক্ষতি হয়েছে। আশা করি আপনারা সবাই ভাল আছেন। মিসেস ব্যাগলি ও তাঁর মেয়েরা আমার প্রতি খুবই সদয়। আমি এখানে স্বতন্ত্রভাবে কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়ার ইচ্ছা রাখি, তারপর যাব আডায় এবং আবার ফিরে যাব শিকাগোয়। আজ সকালে এখানে তুষারপাত হচ্ছে। এখানে এঁরা সবাই খুব চমৎকার লোক এবং বিভিন্ন ক্লাবগুলি আমার সম্পর্কে অশেষ আগ্রহ বোধ করছে।

এই অবিরত অভ্যর্থনা ও ভোজের আসরগুলি নেহাতই ক্লান্তিকর এবং তাদের বীভৎস সব ভোজের আয়োজন—একশ ভোজকে সংশ্লিষ্ট করে একটিতে অঙ্গীভূত এবং যখন পুরুষদের ক্লাবে যাই তখন কেন কি জানি, ভোজ্য পদগুলির মাঝখানে ধূমপান এবং তারপর আবার নতুন করে শুরু! আমি মনে করেছিলাম যে, কেবল চীনারাই থেকে থেকে ধূমপানের বিরতি দিয়ে অর্ধদিবস ধরে ভোজনপর্ব চালায়!!

যাহোক, তাঁরা অত্যন্ত ভদ্রপ্রকৃতির মানুষ এবং বিস্ময়ের কথা এই যে, এপিসকোপাল চার্চের একজন যাজক ও একজন ইহুদি রাব্বি[৪] (শাস্ত্রব্যাখ্যাতা) আমার সম্পর্কে গভীর আগ্রহ পোষণ করেন এবং আমার উচ্চপ্রশংসা করেন। এবার যে-ব্যক্তিটি এখানে বক্তৃতাগুলির ব্যবস্থা করেছিলেন, তিনি অন্ততপক্ষে ১,০০০ ডলার পেয়েছেন। সর্বত্রই এইরূপ এবং এই হলো আমার জন্য স্লেটনের করণীয় কর্তব্য। এর পরিবর্তে সেই মিথ্যাচারী মানুষটি আমাকে প্রায়শই বলেছেন যে, তাঁর সর্বত্র এজেন্ট আছে এবং আমার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া ও অন্য সবকিছুই করবেন। তিনি যা করেছেন এই হলো তার নমুনা। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমি স্বদেশে চলে যাচ্ছি। আমার প্রতি আমেরিকার মানুষদের প্রীতি দেখে বুঝতে পারছি যে, এই সময়ের মধ্যে প্রভূত অর্থ লাভ করতে পারতাম। কিন্তু জিমি মিলস্ ও স্লেটনকে প্রভুই পাঠিয়েছিলেন সে-পথের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে। তাঁর পন্থা দুর্জ্ঞেয়।

যাহোক, এটি হলো একটি গূঢ় সত্য। সভাপতি পামার শিকাগোতে গিয়েছেন এই মিথ্যাচারী স্লেটনের হাত থেকে আমাকে মুক্ত করতে। প্রার্থনা করুন তিনি যেন সফলকাম হন। এখানকার অনেক বিচারক আমার চুক্তিপত্র দেখেছেন এবং তাঁরা বলেছেন যে, এটি একটি কলঙ্ককর জালিয়াতি এবং যেকোন মুহূর্তেই বাতিল করা চলে। কিন্তু আমি একজন সন্ন্যাসী, আত্মপক্ষ সমর্থন আমার কাজ নয়। সুতরাং আমার পক্ষে বরং শ্রেয়তর হবে সমস্ত ব্যাপারটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভারতে চলে যাওয়া।

হ্যারিয়েটদের, মেরী, ইসাবেল, মাদার টেম্পল, মিস্টার ম্যাথুজ, ফাদার পোপ এবং আপনাদের সকলকে আমার ভালবাসা।

আপনার আজ্ঞানুবর্তী
বিবেকানন্দ

---

৪ রাব্বি গ্রসম্যান একজন শাস্ত্রব্যাখ্যাতা, যিনি স্বামীজীর গুণগ্রাহী ছিলেন।

।।৩।।

ডেট্রয়েট
২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪

মা,

পূর্বব্যবস্থামতো ২০০ ডলার পেয়েছি। স্বতন্ত্রভাবে বক্তৃতা করার জন্য ১৭৫ ও ১১৭ ডলার এবং জনৈক ভদ্রমহিলার কাছ থেকে অনুদান হিসাবে ১০০ ডলার পেয়েছি।

এই টাকাটা আগামী কাল মিসেস ব্যাগলি আপনার কাছে চেক-এ পাঠিয়ে দেবেন। আজ ব্যাঙ্কগুলি বন্ধ থাকায় আমাদের পক্ষে এটা করা সম্ভব হয়নি।

আগামী কাল ওহিওর আডাতে বক্তৃতা করতে যাচ্ছি। জানি না আডা থেকে আমার শিকাগোতে যাওয়া হবে কিনা। যাহোক, দয়া করে স্লেটনকে বাকি টাকা সম্পর্কে কিছু জানাবেন না, কারণ তার কাছ থেকে আমি নিজেকে সরিয়ে নিতে যাচ্ছি।

আপনার আজ্ঞানুবর্তী
বিবেকানন্দ

স্মরণে মননে বিবেকানন্দ*

স্বামী ভূতেশানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনকে পণ্ডিতেরা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে নানা গবেষণা করছেন এবং করতে গিয়ে তাঁরা বুঝতে পারছেন যে, তাঁর ব্যক্তিত্বে কতরকম বৈচিত্র্য ছিল। সাধারণ মানুষও ঐসব গবেষণায় উৎসাহিত হচ্ছে। এসব দেখে মনে হচ্ছে যে, এতদিন আমরা এই চরিত্রটিকে সাধারণভাবে দেখতাম, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তাঁর বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য ধীরে ধীরে উপলব্ধ হচ্ছে। তবু মনে হয় এখনো তাঁর চরিত্রের অনালোকিত দিক অনেক আছে। বিচিত্র সেই ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে মনে হয় আমাদের শক্তি অনেক সীমিত। শুধু তাই নয়, বিষয়টির বিভিন্নতা, বিশালতা এবং গভীরতা এত বেশি যে, সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। সাধারণ বুদ্ধি সেই ব্যক্তিত্বের সকল দিককে উদ্ঘাটন করবে, তাঁর তত্ত্বের গহনে প্রবেশ করবে—এ সম্ভব নয়। তবু তাঁর সম্বন্ধে যত আলোচনা হবে, যত বিভিন্ন দিক দিয়ে আমরা তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করব, ততই আমাদের ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের কল্যাণ হবে—এবিষয়ে সন্দেহ নেই।



ঠাকুর বলতেন : "দেখিলাম, কেশব যেরূপ একটা শক্তির বিশেষ উৎকর্ষে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে, নরেন্দ্রের ভিতর ঐরূপ আঠারটা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান!" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১ম পাদ) তাঁর কথায় কোন অস্পষ্টতা ছিল না। তবে 'আঠারটি শক্তি' কি কি তা তিনি বিশদ করে বলেননি। এনিয়ে হয়তো অনেক মতভেদও থাকবে। সেইজন্য এইদিক দিয়ে কোন চেষ্টা এখনো পর্যন্ত কেউ করেননি। আমাদেরও সামর্থ্য নেই। তাঁর জীবনের নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে, গবেষকরা তাঁদের বুদ্ধি এবং স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সেসব আলোচনা করছেন। আরো কত আলোচনা হবে। আমরা যারা তাঁকে ভালবাসি, তাদের এতে আনন্দ হবে। কিন্তু আমাদের শক্তি সীমিত বলে সেই আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারব না। তাতে ক্ষতি নেই, যতটুকু পারি তাঁর সম্বন্ধে জানা এবং জীবনে তা অনুসরণ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে, আর এতেই আমাদের জীবনের সার্থকতা।

স্বামী বিবেকানন্দকে চিনিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং কিছুটা তখনকার মানুষও। তাঁদের সাহায্য ছাড়া আমরা বিবেকানন্দের মাহাত্ম্য বুঝতে পারি না। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের জন্য এতই আকুল হতেন যে বলতেন : "নরেন্দ্রের জন্য প্রাণের ভিতরটা যেন গামছা নিংড়াবার মতো জোরে মোচড় দিচ্ছে।" কিংবা "এত কাঁদলাম, কিন্তু নরেন্দ্র তো এল না; তাকে একবার দেখবার জন্য প্রাণে বিষম যন্ত্রণা হচ্ছে, বুকের ভিতরটায় যেন মোচড় দিচ্ছে।" (ঐ, ৫ম অধ্যায়) কখনো বলছেন, বুকের ভিতর বিড়ালে আঁচড়ানোর মতো অনুভূতি হচ্ছে। আমাদের ঐরকম আকুলতা হওয়া সম্ভব নয় এবং ঐ দৃষ্টিও আমাদের নেই, যার দ্বারা সেই বিবেকানন্দকে আমরা বুঝতে পারি। তাঁর গুরুভাইদের থেকে আরম্ভ করে বিচারশীল পণ্ডিতেরা—সকলেই যুক্তিবিচার ও মননশীলতার দ্বারা তাঁর জীবনের যে বিশ্লেষণ করেছেন এবং করছেন তা দেখে আমরা আশ্চর্যান্বিত হই, আনন্দিত হই। আমরা ভাবি, স্বামীজীর ভিতর এত আছে!

নিজের সম্বন্ধে স্বামীজীর একটি মূল্যায়ন আছে। তিনি বলেছেন : "যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকত তবে বুঝতে পারত, বিবেকানন্দ কি করে গেল।" (যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৩য় ভাগ, ৫ম সং, পৃঃ ৩৭৪) তাঁর ব্যক্তিত্বের যথার্থ মূল্যায়ন এর চেয়ে বেশি আর কি হতে পারে? তাঁকে পূর্ণভাবে জানতে হলে আরেকজন বিবেকানন্দের দরকার। আমরা তা নই, তাই আমাদের সামান্য বুদ্ধি দিয়ে তাঁর যে-বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে, অন্তরকে আলোড়িত করে—সেগুলিই আমরা ভাবব। আর আমাদের জীবনে সেই ভাবনার প্রতিফলন ঘটাতে যদি চেষ্টা করি, তবেই আমাদের জীবনের সার্থকতা।

স্বামীজীর জীবনকাহিনী আমরা সকলেই মোটামুটি জানি। শৈশব থেকেই তিনি এক দুর্দান্ত বালক। তাঁর সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, এ ছেলে ধ্যানসিদ্ধ। আবার সে চাকরির জন্য দৌড়াদৌড়ি করছে। কথায় তাঁর সঙ্গে কারো এঁটে ওঠার উপায় নেই, কচ্‌কচ্ করে সবার যুক্তি কেটে দিচ্ছে। অনেক সময় ঠাকুরের সঙ্গেও নরেন্দ্রনাথ তর্ক করতেন। তিনি অবশ্য তাতে বিরক্ত হতেন না, হাসতেন, আনন্দ করতেন। যেমন দেখা যায় ওস্তাদ পালোয়ানরা সাকরেদদের শেখানোর সময় এক-একসময় হার মানে। কারণ, তাতে সাকরেদদের confidence আসে, আত্মবিশ্বাস হয়। ঠাকুর নরেনের যুক্তির অজস্র প্রশংসা করেছেন, আবার কখনো কখনো দরকার হলে একটু রাশ টেনেও দিয়েছেন।

* এই আলোচনাটি দুর্গাপদ ঘোষ প্রমুখ নিবেদিত 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

সন্তানদের তৈরি করার ব্যাপারে ঠাকুরের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, বিশেষ ধারা ছিল। তিনি প্রত্যেককে তাঁদের নিজের নিজের ভাবে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দিতেন, আবার কোথাও কিছু ত্রুটি দূর করার দরকার হলে সেও করতেন। তবে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তা করলেও কোথাও যে কঠোর হতেন না এমন নয়। এই নরেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সপ্রেম ব্যবহারের ভিতরেও দেখতে পাই যে, মাঝে মাঝে তিনি একটি কঠোরতার আবরণ টেনে এনে শিক্ষকের আসনে বসছেন, দরকার হলে ভর্ৎসনা করছেন। আবার কখনো তাঁকে স্নেহের প্রলেপ দিচ্ছেন। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে এসবই তাঁর বিচিত্র ব্যবহার।

কতরকমেই তিনি তাঁর নরেন্দ্রের বর্ণনা করছেন, যেন কিছুতেই তাঁর তৃপ্তি হচ্ছে না! বলছেন ঃ "নরেন্দ্র শুদ্ধসত্ত্বগুণী; আমি দেখিয়াছি সে অখণ্ডের ঘরের চারিজনের একজন এবং সপ্তর্ষির একজন; তাহার কত গুণ তাহার ইয়ত্তা হয় না।" ('লীলাপ্রসঙ্গ', ২য় ভাগ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১ম পাদ) আবার কখনো বলছেন ঃ "নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর—নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা। ও আমার শ্বশুরঘর। পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল। নরেন্দ্র জালা। ডোবা পুষ্করিণীর মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি। নরেন্দ্র রাঙাচক্ষু রুই। বড় ফুটোওলা বাঁশ।" তাঁর রূপ-গুণ বর্ণনাতে ঠাকুরের যেন কিছুতেই তৃপ্তি হচ্ছে না! নরেন্দ্রনাথের মধ্যে তিনি কি দেখলেন? নরেন্দ্রনাথ নিজেই এমন কথা শুনে বিস্মিত হতেন। ঠাকুরের কথাগুলি তাঁর এত অতিশয়োক্তির মতো লাগত যে, তিনি প্রকৃতিস্থ কিনা—এমন সন্দেহও নরেন্দ্র প্রকাশ করেছেন। ঠাকুর তাঁকে বলছেন ঃ "জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীর ধারণ করিয়াছ।" (ঐ, ৩য় অধ্যায়) নরেন্দ্র ভাবলেন ঃ "এ তো একেবারে উন্মাদ—না হইলে বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র আমি, আমাকে এইসব কথা বলে!" (ঐ)

আরো কতরকমের ব্যবহার ঠাকুর করেছেন! নরেন্দ্রনাথ তাতে রীতিমত শঙ্কিত; ভাবছেন, মাথার বিকৃতি নয় তো? কিন্তু বিচার করে দেখে তিনি ঠাকুরের ব্যবহারে বিকৃতির কোন চিহ্ন পাননি। কাজেই মস্তিষ্কের বিকার বলেও তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করতে পারছেন না। ভাবছেন, তাহলে ঠাকুর হয়তো তাঁর দৃষ্টি দিয়ে কি যেন দেখছেন। তবুও মানতে চাননি তিনি। একদিন তিনি ঠাকুরকে বললেন ঃ "পুরাণে আছে, ভরত রাজা 'হরিণ' ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুর পরে হরিণ হইয়াছিল, একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আপনার আমার বিষয়ে অত চিন্তা করার পরিণাম ভাবিয়া সতর্ক হওয়া উচিত।" (ঐ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১ম পাদ) শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তা করলেন, অন্যে যে যাই বলুক, কিন্তু নরেন তো সাধারণ মানুষ নয়; সে যখন এমন কথা বলল, তখন তো চিন্তার কথা। ঠাকুরের মনে কোন সংশয় বা সন্দেহ উঠলেই তার অবসান করার একটি উপায় ছিল জগন্মাতার কাছে জিজ্ঞাসা করা। ঠাকুর এবারও নরেন্দ্রের কথা শুনে মা কালীকে জানাতে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে হাসতে হাসতে ফিরে এসে বললেন ঃ "যা শালা, আমি তোর কথা শুনব না; মা বললেন—'তুই ওকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস, তাই ভালবাসিস, যেদিন ওর (নরেন্দ্রের) ভিতর নারায়ণকে না দেখতে পাবি, সেদিন ওর মুখ দেখতেও পারবি না।'" (ঐ) সুতরাং ঠাকুর নরেনকে নারায়ণ বলে, সপ্তর্ষির এক ঋষি বলে, অখণ্ডের ঘর বলে জানতেন। এসবই তাঁর দিব্যদৃষ্টিপ্রসূত অনুভব।

কতভাবেই না নরেন্দ্রকে তিনি পরীক্ষা করেছেন! তাঁর কথাবার্তা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। কোথাও খুশি হয়েছেন, কোথাও বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু দেখেছেন, তাঁর নরেন্দ্র অনুপম। তাই অত আনন্দ। আনন্দের কারণ, তিনি দেখেছেন যে, যে-কারণে তাঁর অবতারত্ব গ্রহণ—তাঁর সেই ভাবকে জগতে প্রবাহিত করার পক্ষে এমন অপূর্ব যন্ত্র আর নেই। ঠাকুরের কাছে নরেন্দ্র যে আদর পেয়েছেন তার তুলনা হয় না। নরেন্দ্র বহুবার শতমুখে তা স্বীকার করেছেন। তিনি বলছেন ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ আমাকে যেমন অকৃপণ ভালবেসেছেন, যে অগাধ বিশ্বাস আমার ওপর রেখেছেন সেরকম কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এই যে নরেন্দ্রের প্রতি তাঁর অসীম স্নেহ-ভালবাসা—এ কেবল নরেন্দ্রনাথ এক অসাধারণ আধার বলেই নয়, জগন্মাতার যে-কাজ করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁরই শক্তিরূপে স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন—সেই কাজের, সেই আদর্শের এমন সুযোগ্য ধারক এবং বাহকও আর হবে না।

শৈশব থেকেই নরেন্দ্রনাথের জীবনে দেখা যায় যে, তিনি স্বতঃস্ফূর্ত নেতা। কি খেলাধুলায়, কি পড়াশুনায় কিংবা যেকোন সাংগঠনিক কাজে তিনিই প্রধান। সর্বত্র তাঁর জন্য যেন শীর্ষস্থানই নির্দিষ্ট ছিল। এ নেতৃত্ব কোন ঔদ্ধত্যবশত নয়, এটি তাঁর ভিতর থেকেই স্ফুরিত। তাঁর ভিতরে এই শক্তির প্রকাশ বাল্যেও ছিল, বয়স যত বেড়েছে ততই তার বিকাশ ঘটেছে। তারপর তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস। কেউ কিছু বললেই সব বিশ্বাস করতেন। একজন বলল, হনুমান কলাবাগানে থাকেন, তাই তিনি কলাবাগানে রাত কাটালেন হনুমানকে দেখবার জন্য। এরকম বিশ্বাস! তাঁর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো—ত্যাগ। ত্যাগই ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। বাল্যকালে প্রথমে রামসীতার পূজা করতেন। তারপর একদিন বাড়ির সহিসের কাছে শুনলেন, বিয়ে করা খুব খারাপ। তখন রামসীতার যুগলমূর্তি ভেঙে ফেলে মায়ের কথায় শিবপূজা আরম্ভ করলেন। এটি ছেলেমানুষী মনে হবে, হয়তো খানিকটা তাই। কিন্তু তাঁর ভিতরে যে-আদর্শটি সুপ্ত ছিল, একটু একটু করে তা যেন জেগে উঠছে। তারই পূর্বাভাস এটি। ত্যাগের আদর্শ যেখানে পরিস্ফুট নয়, সেখানে তিনি মাথা নত করেননি। হনুমান তাঁর আদর্শস্থানীয় ছিলেন, নিজেকে তিনি হনুমানের মতো বলে মনে করতেন। বলতেন ঃ "রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্", "দাসস্য দাসঃ"। রাম-দাস হনুমানের মতো আমরা রামকৃষ্ণের দাস, তাঁর নামে সব করতে পারি। আর বলতেন যে, ঘরে ঘরে এখন মহাবীরের পূজা অর্থাৎ হনুমানজীর পূজার প্রবর্তন করতে হবে। কারণ, রামনাম সর্বশক্তিমান বলে হনুমানের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। ভারী সুন্দর এই দাস্যভাবটি! আবার শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সখ্যভাব, মধুরভাব—কোন্ ভাব না ছিল? যেমন ঠাকুর নিজে ছিলেন সর্বভাবময়, তেমনি তাঁর আদরের সন্তান স্বামী বিবেকানন্দও সর্বভাবময়।

আমরা তাঁকে সাধারণ দৃষ্টিতে মহাজ্ঞানী, মহাতার্কিক হিসাবে দেখি। প্রথম যৌবনে কখনো তাঁকে অত্যন্ত সংশয়গ্রস্ত বলেও মনে হয়। কখনো বা তাঁকে দাম্ভিক বলে মনে হয়, যেন সকলের ওপর প্রভুত্ব করতে চান। এভাবে দেখা আমাদের খণ্ডিত অনুভবেরই ফল। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে দেখতে পাই, তিনি ভগবান সম্পর্কে আমাদের বিচার করতে, আলোচনা করতে বলেছেন—তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর কাছে মাথা নত করতে বলেননি। বলেছেন ঃ তোমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতার ওপরে বিশ্বাস আছে অথচ নিজের ওপরে বিশ্বাস নেই, তাহলে তোমাদের কোন উন্নতি হবে না। অত দেবদেবীর কাছে মাথা নিচু করে করে মাথাটা একেবারে নেমে গেছে। মাথাটাকে উঁচু কর এবং নিজের ভিতরে যে শক্তি আছে তাতে বিশ্বাস কর, তাকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা কর। স্বামীজী ভক্তির আতিশয্যকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। তাতে অনেকে মনে করেন যে, তিনি ভক্তিপথের পথিক ছিলেন না, ভক্তিভাবকে তিনি বেশি গুরুত্ব দিতেন না, তাঁর জ্ঞানপ্রবণ মনে জ্ঞানের ভাবই বেশি প্রকট ছিল। কিন্তু যদি কেউ তাঁর জ্ঞানের আবরণ ভেদ করে তাঁর অন্তরকে দেখতে পারত তাহলে দেখত, সেখানে কি অপূর্ব ভক্তিভাব বিকশিত! ওপরে তাঁর জ্ঞানের একটা কঠিন বহিরাবরণ ছিল মাত্র।

জ্ঞান বা ভক্তি কোন্‌টি তাঁর মধ্যে প্রধান—আমরা বুঝতে পারি না। জ্ঞানের আবরণটি দেখে আমরা তাঁকে জ্ঞানী বলি, ভক্তের পর্যায়ে ফেলি না; তবে তিনি শুষ্ক জ্ঞানী ছিলেন না। বিচারকে তিনি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সেই বিচারের মূলে যে-তত্ত্ব, তাকে অস্বীকার করে নয়। নেতিবাচক বিচার নয়। তত্ত্ব অন্বেষণের জন্য বিচারকে গীতায় 'বাদ' বলা হয়েছে। স্বামীজী সেই 'বাদ'-এর অনুসরণ করেছেন। চোখ বুজে গরুর লেজ ধরে বৈকুণ্ঠে যাওয়ার মতো বিচারহীন বিশ্বাসকে তিনি উপহাস করেছেন। এটি শিখিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলেছিলেন ঃ আমি বলছি বলেই তা মেনে নেবে না। তা যাচিয়ে বাজিয়ে নেবে। যুক্তিযুক্ত মনে হলে গ্রহণ করবে, না হলে নয়। একজন নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন ঃ কথাটা উনি বলছেন মেনে নাও না। ঠাকুর তীব্র ভর্ৎসনা করে বলেছেন ঃ মেনে নেওয়া কি? প্রত্যেকটি কথা যাচিয়ে বাজিয়ে নেবে।

স্বামীজী এই কথাটি একেবারে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি কম যাচিয়ে বাজিয়ে নেননি। বলেছেন ঃ আমার মতো গুরুর সঙ্গে লড়াই বোধহয় আর কোন শিষ্য করেনি। তাঁর সঙ্গে সংগ্রাম করেছি এবং পরিণামে হয়তো হার মেনেছি, কিন্তু সংগ্রাম করতে ছাড়িনি। অর্থাৎ এককথায় বশ্যতা স্বীকার করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। ঐ ধাতুতেই তিনি তৈরি ছিলেন না। সবসময় লড়াই করে তাঁর গুরুর প্রত্যেকটি যুক্তির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করেছেন। এইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর অনুভব অপরের চেয়েও এত গভীর। আমরা অনেক সময় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শুনে গিয়েছি এবং শুনেছি যে, সেসব বিশ্বাস করতে হয়। কিন্তু স্বামীজী সেই ধাতুর ছিলেন না। তিনি ঠাকুরকে বারে বারে পরীক্ষা করেছেন, যা আমাদের দৃষ্টিতে গুরুভক্তির পক্ষে হানিকর।

ঠাকুর কাঞ্চন স্পর্শ করতে পারতেন না, স্বামীজী ঠাকুরের বিছানার নিচে টাকা লুকিয়ে রেখে পরখ করেছেন সত্যিই ঠাকুরের কোন প্রতিক্রিয়া হয় কিনা। ঠাকুর জানতেন না, কিন্তু সেই বিছানা স্পর্শ করেই তিনি বিছে কামড়ালে যেমন হয় তেমনি ছট্‌ফট্ করে উঠলেন। তখন দেখা গেল, ভিতরে টাকা আছে। ঠাকুর একবার একজায়গায় জল খেতে চাইলে একজন জল এনে দিয়েছে। সেই জল তিনি খেতে পারলেন না। তাঁর ভক্তেরা জানতেন, অশুচি কোন ব্যক্তি তাঁর খাদ্য স্পর্শ করলে তিনি তা গ্রহণ করতে পারতেন না। কিন্তু যে-ব্যক্তি জল আনলেন তাকে দেখলে মনে হয়, তিনি পরম ধার্মিক। স্বামীজীর মনে সন্দেহ হলো, তিনি ঘটনাটির সত্যতা যাচাই করার জন্য খবর নিয়ে দেখলেন, লোকটি যদিও বাহ্যত খুব ধার্মিক চিহ্নধারী, কিন্তু তার চরিত্র ভাল নয়। ঠাকুর ঠিক ধরেছেন।

স্বামীজী বলেছেন ঃ আমরা ধর্মজীবনে অনেকসময় স্পর্শদোষের ওপর খুব জোর দিই। কিন্তু কেন দিই তা বুঝি না, কেন এটি হানিকর তাও জানি না। একমাত্র ঠাকুরকেই দেখেছি তিনি এটি বুঝতেন, জানতেন। আমাদের কেবল ছুঁতমার্গ। স্বামীজী ঠাকুরকে পরীক্ষা করে দেখেছেন, তাই মানতেন। বুঝেছেন, যে-ব্যক্তির জীবন শুদ্ধ নয়, তার ছোঁয়াও অশুদ্ধ হয় এবং ঠাকুরের মতো শুদ্ধ দেহমন তা গ্রহণ করতে পারে না। সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা বিচার করা অসম্ভব। স্বামীজী ঠাকুরের প্রত্যেকটি আচরণ ও বাণী কত গভীরভাবে অনুধাবন করে তবে তার তত্ত্ব উদ্ঘাটন করেছেন।

স্বামীজী একদিন তাঁর এক বন্ধু হরমোহন মিত্রকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ "ঠাকুরের এক-একটি কথা অবলম্বন করিয়া ঝুড়ি-ঝুড়ি দর্শনগ্রন্থ লেখা যাইতে পারে।" একথা শুনে বন্ধুটি বললেন ঃ "বটে! আমরা তো ঠাকুরের কথার অত গভীর ভাব বুঝতে পারি না। তাঁর কোন একটি কথা ঐভাবে আমাকে বুঝিয়ে বলবে?" (ঐ, ১ম ভাগ, গুরুভাগ-পূর্বার্ধ, ১ম অধ্যায়) স্বামীজী তখন বন্ধুর কথামত ঠাকুরের 'হাতি-নারায়ণ ও মাহুত-নারায়ণ'-এর গল্পটির তাৎপর্য দীর্ঘক্ষণ ধরে বোঝাতে লাগলেন। তখন বন্ধুটি বললেন ঃ এর ভিতরে যে এত আছে তা তো আমি জানতাম না। কথা সকলেই শোনে, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কজন বোঝে? স্বামীজী ঠাকুরের প্রত্যেকটি কথা খুব গভীরভাবে অনুধাবন করতেন এবং যখন প্রয়োজন হয়েছে সেগুলি ব্যাখ্যা করেছেন।

স্বামীজীর বক্তৃতাগুলি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁর প্রত্যেকটি কথা ঠাকুরের কোন না কোন উক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ঠাকুরের কথাগুলি হচ্ছে সূত্র, স্বামীজী সেগুলিকে বিস্তারিত করে ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি অকপটভাবে তা স্বীকার করে বলেছেন ঃ "যদি কায়মনোবাক্যে আমি কোন সৎকার্য করিয়া থাকি, যদি আমার মুখ হইতে এমন কোন কথা বাহির হইয়া থাকে, যাহা দ্বারা জগতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার কোন গৌরব নাই, তাহা তাঁহারই। কিন্তু যদি আমার জিহ্বা কখনো অভিশাপ বর্ষণ করিয়া থাকে, যদি আমার মুখ হইতে কখনো কাহারো প্রতি ঘৃণাসূচক বাক্য বাহির হইয়া

থাকে তবে তাহা আমার, তাঁহার নহে। যাহা কিছু দুর্বল, যাহা কিছু দোষযুক্ত সবই আমার। যাহা কিছু জীবনপ্রদ, যাহা কিছু বলপ্রদ, যাহা কিছু পবিত্র, সকলই তাঁহার প্রেরণা, তাঁহারই বাণী এবং তিনি স্বয়ং।" (কলকাতা অভিনন্দনের উত্তর, 'বাণী ও রচনা', ৫ম খণ্ড) কথাগুলি স্বামীজী কেবল গুরুভক্তির আতিশয্যবশত বলেননি, এটি তাঁর অন্তরের কথা। যত দিন যাচ্ছে, যত আমরা এবিষয়টির ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করছি তত বুঝতে পারছি যে, সত্যি ঠাকুরের প্রতিটি কথার কী অসাধারণ তাৎপর্য স্বামীজী সুন্দর করে সাধারণের উপযোগী করে উদ্ঘাটিত করেছেন! আর তাঁর ব্যবহারেও দেখতে পাই তিনি রামকৃষ্ণময়। এ কেবল কল্পনা নয়, ঠাকুরই বলেছেন : আমি তোর ভিতর ঢুকে যাব। স্বামীজী বলছেন : "Ho ho, that old man is entering me!"—দেখ, দেখ, এই বুড়ো আমার ভিতরে প্রবেশ করছে। ঠাকুর বললেন : ইংরেজীতে বলছিস, আমি বুঝি না। আমি পড়্‌পড়্ করে তোর ভিতরে ঢুকে যাব। কারণ, স্বামীজী যে তাঁর যন্ত্র!

শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন জগন্মাতার স্বরূপ, স্বামীজীও ঠিক সেইরকম শ্রীরামকৃষ্ণের নবীন সংস্করণ, যাঁকে আমরা অপেক্ষাকৃত সহজে ধারণা করতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণকে বোঝা, তাঁর গভীরতা অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু স্বামীজী অনেকটা আমাদের বুদ্ধিগম্য, যাঁর সাহায্যে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপের খানিকটা ধারণা করতে পারি। তবে আগেই বলেছি, শ্রীরামকৃষ্ণকে যেমন আমরা বুঝতে পারি না, স্বামীজীকেও তেমনি সবটা বুঝতে পারি না। তাই তো তিনি বলেছেন : "যদি আরেকটা বিবেকানন্দ থাকত তবে বুঝতে পারত এই বিবেকানন্দ কি করে গেল।"

স্বামীজীকে অনেক সময় আমরা দেশনেতা, ভারতের নেতা বলে মনে করি। কিন্তু তিনি শুধু ভারতের নেতা নন, তিনি জগতের নেতা। জগতের চিন্তাধারাকে তিনি তাঁর জীবনের ভিতর দিয়ে একটা নতুন রূপ দিয়েছেন। হয়তো তা বোঝার সময় এখনো হয়নি। ক্রমশ প্রকাশ হবে। তবে এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, স্বামীজীর সময় থেকে জগতে একটা নতুন ভাবের আলোড়ন শুরু হয়েছে। স্বামীজী আংশিকভাবে নিজেকে প্রকাশ করলেন শিকাগোতে। বাকি জীবন ধরে এই প্রকাশের কাজ চলল এবং আজও তা শেষ হয়নি, সূক্ষ্মদেহে সে-কাজ এখনো চলছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন নিত্য তাঁর ভিতর দিয়ে কাজ করে চলেছেন।

স্বামীজীর জীবন যে নিজের জন্য নয়, অপরের জন্য উৎসর্গীকৃত তা বোঝা যায় একটি ঘটনা থেকে। স্বামীজী সমাধিতে ডুবে থাকতে চেয়েছিলেন। ঠাকুরকে সে-ইচ্ছার কথা জানিয়ে তিনি বললেন : "আমার ইচ্ছা হয়, শুকদেবের মতো পাঁচ-ছয়দিন ক্রমাগত একেবারে সমাধিতে ডুবে থাকি, তারপর শুধু শরীররক্ষার জন্য খানিকটা নিচে নেমে এসে আবার সমাধিতে চলে যাই।" ঠাকুর সে-কথা শুনে তাঁকে ভর্ৎসনা করে বললেন : "ছি ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা। আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস! এ তো অতি তুচ্ছ হীন কথা! নারে, এত ছোট নজর করিসনি।" (যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ১৭৯)

কে বলেছিলেন? শ্রীরামকৃষ্ণ। যিনি সমাধিতে আচ্ছন্ন হতে হতে বলছেন : "মা, ভাল হব—বেহুঁশ করিস নে—সাধুর সঙ্গে সচ্চিদানন্দের কথা কব! মা, সচ্চিদানন্দের কথা নিয়ে বিলাস করব।" আবার বলছেন : "ও মা! ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহুঁশ করে রাখিস নে! ব্রহ্মজ্ঞান চাই না মা! আমি আনন্দ করব। বিলাস করব।" ('কথামৃত', ৪।৯।১) তিনি সমাধিতে ডুবে থাকতে আসেননি। যে-সমাধির জন্য, ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য জন্ম-জন্মান্তর ধরে মুনি-ঋষিরা তপস্যা করছেন—সেই সমাধিসুখকে পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ উপেক্ষা করছেন ভক্তদের কল্যাণের জন্য। তাঁর যোগ্য সন্তান স্বামীজী পরে বলেছেন : "মনে হয় এই জগতের দুঃখ দূর করতে আমার যদি হাজারও জন্ম নিতে হয়, তাও নেব। তাতে যদি কারো এতটুকু দুঃখ দূর হয় তো তা করব। মনে হয়, খালি নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? সকলকে সঙ্গে নিয়ে ঐ পথে যেতে হবে।" (স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, ৯ম পরিচ্ছেদ) তিনি মুক্তি চাইছেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের নিষেধ—কাজেই সেদিক বন্ধ। ঠাকুর যখন বললেন : "তোকে কাজ করতে হবে।" স্বামীজী উত্তর দিলেন : "আমি ওসব পারব না।" ঠাকুর তখন জোর দিয়ে বললেন : "তোর হাড় করবে।" (যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৯৪) স্বামীজীকে নির্বিকল্প সমাধির উপলব্ধি দিয়ে তিনি বলেছেন : "চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে কাজ করতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে তখন আবার চাবি খুলব।" (ঐ) স্বামীজী কখনো কখনো আক্ষেপ করে বলেছেন : ঠাকুরের যিনি মা কালী, সেই মা কালী ঘাড়ে ধরে এমন ঘোরাচ্ছে যে কিছুতেই আমার এর থেকে নিষ্কৃতি নেই। ভেবেছিলাম সমাধিতে থাকব হিমালয়ের গুহাতে, সেখান থেকে আমায় টেনে এনেছেন। কারণ, স্বামীজীর জীবন আত্মসুখের জন্য নয়, সমাধিসুখের জন্য নয়; সেই জীবন জগৎকল্যাণে নিবেদিত। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সেইভাবে তৈরি করেছেন আর জগন্মাতার কাজে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে দিয়েছেন। অতএব, তাঁর জীবন অন্য খাতে প্রবাহিত হওয়া অসম্ভব।

জীবনের প্রথম থেকে আরম্ভ করে শেষপর্যন্ত দেখা যায় যে, বিধবা মা, ভাই-বোনের প্রতিও স্বামীজীর বৈরাগী মন উদাসীন ছিল না। তিনি তাঁদের কথা ভেবেছেন, ভাইদের গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন, মায়ের যাতে কষ্ট না হয় তার জন্য অর্থের সংস্থান করেছেন। অথচ তিনি ত্যাগিশ্রেষ্ঠ, সাংসারিক দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। আমরা মনে করি সেই ঘটনাটি—ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন : সংসারের দুঃখ যাতে দূর হয় তার জন্য জগন্মাতার কাছে বর চেয়ে নে। ঠাকুরের কথায় বর চাইতে গিয়ে তিনি জগন্মাতার সাক্ষাৎ সান্নিধ্য উপলব্ধি করলেন। কিন্তু চাইলেন কি? জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য। অথচ সংসারের দুঃখ দূর করার প্রার্থনা নিয়েই তো গিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু মায়ের কাছে গিয়ে সেসব ভুলে গেলেন। ঠাকুর তিনবার তাঁকে পাঠালেন, তিনবারই এক অবস্থা। ঠাকুর বললেন : যা তোর কপালে সংসারের সুখভোগ নেই তা আর কি হবে! তবে তোর মা এবং

ভাই-বোনদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না। স্বামীজী তার বেশি চানওনি। কিন্তু মায়ের অভাব-দুঃখ তাঁর হৃদয়ে বেদনার সৃষ্টি করেছিল। তার কারণ, তাঁর হৃদয় কাউকেই দূরে রাখেনি। কি আত্মীয়-পরিজন, কি পাড়া-প্রতিবেশী, কি জগৎ-সংসার—তাঁর হৃদয় কারো দুঃখ-দুর্দশায় যে উদাসীন ছিল না, এটা বিশেষ করে জানবার।

আরেকদিনের ঘটনা। স্বামীজী তাঁর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে বেদান্তের চর্চা করছেন। এমন সময় গিরিশচন্দ্র ঘোষ সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে পরিহাস করে স্বামীজী বললেন : "কি জি. সি., এসব তো কিছু পড়লে না, কেবল কেষ্ট-বিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে!" (স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, ৯ম পরিচ্ছেদ) একথা শুনে গিরিশবাবু বললেন : "হ্যাঁ হে নরেন, একটা কথা বলি। বেদবেদান্ত তো ঢের পড়লে, কিন্তু এই যে দেশে ঘোর হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, মহাপাতকাদি চোখের সামনে দিনরাত ঘুরছে, এর উপায় তোমার বেদে কিছু বলেছে? ঐ অমুকের বাড়ির গিন্নি, এককালে যার বাড়িতে রোজ পঞ্চাশখানি পাতা পড়ত, সে আজ তিনদিন হাঁড়ি চাপায়নি; ঐ অমুকের বাড়ির কুলস্ত্রীকে গুণ্ডাগুলো অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে; ঐ অমুকের বাড়িতে ভ্রূণহত্যা হয়েছে, অমুক জোচ্চুরি করে বিধবার সর্বস্ব হরণ করেছে—এসকল রহিত করবার কোন উপায় তোমার বেদে আছে কি?" গিরিশবাবু এইভাবে ক্রমাগত মানুষের দুঃখ-অসহায়তার এক-একটি করুণ চিত্র সম্মুখে তুলে ধরছেন। আর স্বামীজীর হৃদয় বেদনায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। তিনি অশ্রু সংবরণ করতে না পেরে সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন। তখন গিরিশবাবু শরচ্চন্দ্রকে বললেন : "দেখলি বাঙাল, কত বড় প্রাণ! তোর স্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে মানি না; কিন্তু ঐ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্য মানি।" জগতের দুঃখ তাঁর প্রাণে এমনভাবেই আঘাত করেছে। 'জগৎ মিথ্যা' বলে তিনি কখনো বেদান্তবাদী সাধুর মতো সমাহিত হয়ে থাকতে পারেননি।

তিনি সেরকম বেদান্তবাদী ছিলেনও না। বস্তুত, বেদান্ত জগৎকে বাদ দিয়ে নয়, জগৎকে নিয়েই। আচার্য শঙ্কর "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা"—কেবল এইটুকু বলেননি; বলেছেন, এই জগৎ সেই ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি—"জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ"। বোধহয় স্বামীজীর পূর্বে বেদান্তের এমন সুষ্ঠু ব্যবহারিক প্রয়োগ আমাদের দেশে হয়নি, জগতে তো নয়ই। জগৎকল্যাণের জন্য এত ব্যাপকভাবে এই তত্ত্বটিকে প্রয়োগ করা, যাকে 'Practical Vedanta' বলা হয়েছে—এটি স্বামীজীর মতো সুন্দর করে কেউ কখনো বুঝেছেন কিনা সন্দেহ। শাস্ত্রে নানা স্থানে সিদ্ধান্ত দেওয়া আছে—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৩।১৪।১)—সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়। তিনিই এই সমস্ত হয়েছেন। তিনিই কার্য, তিনিই কারণ, তিনি সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত। এসব সিদ্ধান্তের কথা কিন্তু পুঁথিতেই থেকে গিয়েছে—যে-পুঁথির পাতা পোকায় কাটছে, কিন্তু জীবনে তার প্রয়োগ হচ্ছে না। এই কারণে স্বামীজী ভারতের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করে বলেছেন যে, জগতে অতুলনীয় ঋষিদের সেই সিদ্ধান্ত ভারতেরই একান্ত। কিন্তু এইসব সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করার ক্ষমতাও বোধহয় ভারতের মতো আর কোন দেশের নেই! সত্যকে ব্যবহারিক প্রয়োগ করলে তার কতদূর সম্ভাবনা রয়েছে সেবিষয়ে আমরা কখনো খতিয়ে দেখিনি বা প্রয়োগও করিনি। জগৎকল্যাণের একমাত্র সূত্র এখানেই রয়েছে। এই একাত্মবোধ হলো সমস্ত জগৎ যে একই আত্মার অভিব্যক্তি, সেটি উপলব্ধি করা। 'আমি সর্বভূতে, সর্বভূত আমাতে'—এই সিদ্ধান্তকে কেবল পারমার্থিক তত্ত্বরূপে নয়, তাকে ব্যবহারিক-ভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা ইতিপূর্বে কখনো হয়নি।

আমরা সেই গল্প শুনি—ব্রহ্ম সম্পর্কে বিচারসভায় একজন পণ্ডিত বলছেন যে, ব্রহ্মই সব হয়েছেন। তারপর তিনি ট্রেনে যাচ্ছিলেন, তখন এক ধোপা কাপড়ের বোঝা মাথায় নিয়ে কামরায় উঠছিল। পণ্ডিত তাকে তুচ্ছজ্ঞান করে বললেন : এই ধোপা, এখান থেকে সরে যা। একজন বলল : আপনি তো এইমাত্র বলছিলেন, 'সব ব্রহ্ম'। পণ্ডিত বললেন : আরে বোকা। ও তো বলেছিলাম পারমার্থিক কথা, এ তো ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বলছি। স্বামীজী বলছেন, যেদিন থেকে আমাদের দেশে এই পারমার্থিক ও ব্যবহারিকের প্রভেদ সৃষ্টি করা হলো, সেদিন থেকে দেশের সর্বনাশ হলো। স্বামীজী যেভাবে বৈদান্তিক সিদ্ধান্তকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে শিখিয়েছেন, আগে আর কখনো এত নিপুণ কুশলতায় ব্যাপক ও সুন্দরভাবে তা হয়েছে বলে আমরা জানি না। ঠাকুরের কথার সূত্র থেকেই তিনি এই ভাবটি পেয়েছেন—একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে।

এপ্রসঙ্গে স্মরণীয় 'জীবে দয়া' কথাটি উচ্চারণ করতে গিয়ে ঠাকুরের সেই আপত্তি—"জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা। কীটাণুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা!" ('লীলাপ্রসঙ্গ', ২য় ভাগ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, ৯ম অধ্যায়) উপস্থিত ভক্তবৃন্দ কেউ সেকথার মর্মার্থ অনুধাবন করতে না পারলেও ঠাকুরের যন্ত্র স্বামীজী ঠিক তার গূঢ়ার্থ সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ঙ্গম করে বলেছিলেন : "কী অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম! শুষ্ক, কঠোর ও নির্মম বলিয়া প্রসিদ্ধ বেদান্তজ্ঞানকে ভক্তির সহিত সম্মিলিত করিয়া কি সহজ, সরস ও মধুর আলোকই প্রদর্শন করিলেন!... ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল—বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়।... ভগবান যদি কখনো দিন দেন তো আজি যাহা শুনিলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করিব—পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।" (ঐ)

ঠাকুরের ভাব হচ্ছে সর্বভূতে তিনি আছেন—এই বোধে সর্বজীবের সেবা করা। তিনি আরো বলেছেন : "প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয় আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না? তিনিই মানুষ হয়ে লীলা করছেন।" ('কথামৃত', ২।২২।৩) স্বামীজী ঠাকুরের কথা অনুসরণ করেছেন। আমাদেরও বলেছেন, মানুষের ভিতর তাঁর পূজা হলো শ্রেষ্ঠ পূজা। স্বামীজীর এই বাণী শাস্ত্রেরই কথা, কিন্তু যুক্তির সাহায্যে তার প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ আর কখনো হয়নি। 'ভাগবত'-এ আছে—

"সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।।" (১১।২।৪৫)
—শ্রেষ্ঠ ভক্ত যে, সে সর্বভূতে সেই ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত দেখে, সর্বভূতকে ভগবানে প্রতিষ্ঠিত দেখে, আত্মাকে সর্বভূতে প্রতিষ্ঠিত দেখে এবং সর্বভূতে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত দেখে।

এই দিক দিয়ে দেখলে স্বামীজী কি শ্রেষ্ঠ ভক্ত নন? ঠাকুর বলছেন ঃ জ্ঞানীর মুখ শুষ্ক হয়। নরেনের মুখ দেখ—ভক্তের মুখ, শুষ্ক নয়। ঠাকুর নিজে মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছেন ঃ "মা, আমাকে শুকনো সাধু করিসনি, রসেবশে রাখিস।" ('লীলাপ্রসঙ্গ', ১ম ভাগ, গুরুভাব, প্রথমার্ধ, ২য় অধ্যায়) কাজেই তিনি তাঁর সন্তানকে শুষ্ক করেননি, প্রেমরসে পরিপূর্ণ করেছেন—যে প্রেমধারা সর্বত্র প্রবাহিত। স্বামীজী ঠাকুর সম্পর্কে যে বলেছেন "আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ", তেমন আমরাও স্বামীজী সম্বন্ধে একথা বলতে পারি—আচণ্ডাল সকলের জন্যই তাঁর প্রেম প্রবাহিত হয়েছিল। হয়তো চণ্ডাল প্রভৃতির প্রতি তাঁর একটু বেশিই পক্ষপাতিত্ব ছিল। কারণ, তাদের দুঃখ-কষ্ট বেশি। তারা অবহেলিত, উপেক্ষিত। এই কারণে স্বামীজী তাদের জন্য বেশি বেদনা অনুভব করেছেন।

কাজেই আমাদের দেশের, আমাদের জাতির উত্থানের জন্য স্বামীজী বলেছেন ঃ "মনে রাখিবে—দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতির জীবন।... জাতির অদৃষ্ট নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার ওপর। তাহাদিগকে উন্নত করিতে পার?" ('বাণী ও রচনা', ৭ম খণ্ড) আরো বলেছেন, ঃ "হে যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরিব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। ... তোমরা সারাজীবন এই ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর—যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।" (ঐ, ৫ম খণ্ড) তিনি বুঝেছিলেন, যারা অবহেলিত তাদের উন্নত করতে হবে। না হলে দেশ কখনো উঠবে না। স্বামীজীর এসব কথার প্রতিধ্বনি এখনো আমরা কিছু মানুষের কথায় পাচ্ছি। কিন্তু সেসব কথা মুখের কথা মাত্র হবে, যদি স্বামীজীর মতো হৃদয়ের যোগ তাতে না থাকে। ঐরকম প্রবল ব্যক্তিত্ব, ঐরকম কোমল হৃদয় যদি থাকে তাহলেই দেশের নেতারা দেশকে আবার উঁচুতে তুলবেন। ভারত আবার উঠবে—স্বামীজী একথা বিশেষ করে বলেছেন। বলেছেন ঃ সমস্ত জগতের প্রয়োজন ভারতের কল্যাণ। কেন? কারণ, ভারত যদি আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে সমস্ত জগৎ আবার তার লক্ষ্য সম্বন্ধে অবহিত হতে পারবে। স্বামীজী বারবার বলছেন, সমস্ত জগৎ চেয়ে আছে ভারতের দিকে। ভারতে যে জ্ঞানসম্পদ রয়েছে, যে অমূল্য তত্ত্ব রয়েছে তা জগতের প্রয়োজন।

কিন্তু যারা সেই তত্ত্বের অধিকারী তারাই এখন আত্মবিস্মৃত। তাদেরই আগে সেই ভুলে যাওয়া তত্ত্বকে আবার আপন করতে হবে এবং তখনি তারা জগতে এই তত্ত্ব দেওয়ার উপযুক্ত হবে। স্বামীজী বারবার বলেছেন যে, ভারত এখনো টিকে আছে, তার কারণ এই অপূর্ব সম্পদ সে যক্ষের ধনের মতো আগলে রেখেছে। তবে এখনো তাকে নিজস্ব করতে পারছে না, ভুলে গিয়েছে। যেমন উপনিষদ্ বলেছেন, মাটির নিচে ধনরত্ন প্রোথিত রয়েছে, তার ওপর দিয়ে লোক যাতায়াত করছে অথচ তার সম্বন্ধে জ্ঞান নেই। আমাদেরও ঠিক সেইরকম। যে অমূল্য রত্ন ঋষিরা আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন, সেই সম্বন্ধে আমরা জানি না। স্বামীজী বলছেন, এই আত্মবিদ্যাকে তোমরা তোমাদের জীবনে জাগ্রত কর। এই আত্মতত্ত্বে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত কর। তাহলে তোমাদের কল্যাণ এবং তোমাদের ভিতর দিয়ে সমগ্র জগতের কল্যাণ।

স্বামীজীর জীবন ও বাণীর সব দিক নিয়ে আলোচনা করার পরিসর এখানে নেই, সামর্থ্যও নেই। শুধু এইটুকু বলছি যে, স্বামীজীর আশীর্বাদে আমরা যেন এই আত্মবিদ্যা সম্বন্ধে অবহিত হই এবং নিজেদের জীবনকে সেইভাবে ভাবিত করে তাঁর প্রদর্শিত জগৎকল্যাণকার্যে আত্মনিয়োগ করি। এর জন্য তাঁর কাছে আমরা আন্তরিক প্রার্থনা জানাচ্ছি।* ❑

---

* গত ৫ জুলাই ১৯৮৮ গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে প্রদত্ত পূজনীয় মহারাজজীর ভাষণের সম্পাদিত অনুলিপি।

অনুষ্ঠান-সূচী ঃ ফাল্গুন ১৪০৮

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য ঃ
স্বামী ব্রহ্মানন্দ
মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া
১ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার
(১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২)
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ
মাঘ শুক্লা চতুর্থী
৩ ফাল্গুন, শনিবার
(১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০২)
স্বামী অদ্ভুতানন্দ
মাঘ পূর্ণিমা
১৪ ফাল্গুন, বুধবার
(২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২)

পূজাতিথি-কৃত্য ঃ
শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা
মাঘ শুক্লা পঞ্চমী
৪ ফাল্গুন, রবিবার
(১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২)
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি
মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী
২৭ ফাল্গুন, মঙ্গলবার
(১২ মার্চ ২০০২)

একাদশী-তিথি ঃ
১০, ২৪ ফাল্গুন
শনিবার, শনিবার
(২৩ ফেব্রুয়ারি, ৯ মার্চ ২০০২)

পাতঞ্জল-যোগসূত্র

ব্যাখ্যাতা ঃ স্বামী প্রেমেশানন্দ

অনুলিখন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ
সম্পাদনা ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

বিভূতিপাদ

বাহিরের সকল কাজ স্থূলদেহ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, ইহার মধ্যে ইন্দ্রিয় ও প্রাণের ক্রিয়াই প্রধান। ভিতরের কাজ সূক্ষ্মদেহ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। আমরা যখন চিন্তাভাবনা করি, তখন মনকে ক্রিয়াশীল দেখিয়া থাকি। মনের পিছনে থাকে বুদ্ধি এবং পূর্বসংস্কার, বুদ্ধির পিছনে অহঙ্কার। এই চারিটি জিনিস মিলিত না হইলে কোন চিন্তা হইতে পারে না। অহংতত্ত্বের প্রয়োজনে (অর্থাৎ 'আমি'-র ভোগের জন্য) সব চিন্তা হয়। বুদ্ধিতত্ত্ব সকল চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। বুদ্ধির সঙ্গে সহকারী থাকে পূর্বসংস্কার, স্মৃতি বা চিত্ত। মনস্তত্ত্ব চিন্তাকার্যকে পূর্বোক্ত তিনজনের সহায়তায় সম্পন্ন করে। আমরা সেইজন্য যোগশাস্ত্রে যেখানে 'চিত্ত' শব্দ উল্লিখিত আছে, সেখানে 'মন' শব্দ প্রয়োগ করিতেছি। ঋষি পতঞ্জলি এই চারটিকেই 'চিত্ত' নামে অভিহিত করিয়াছেন। স্বামীজী উহাকে বলিতেন—'Mind-stuff', অর্থাৎ মন যেসব সহকারীর সহায়তায় কর্ম সম্পাদন করে, তাহারা মনের সহকারী মাত্র।

সাধনার মাধ্যমে তন্ময়ভাবে ঈশ্বরের ধ্যান করিলে সাধক বিভূতি লাভ করেন। তাহাতে প্রকৃতি বশীভূত হন এবং অণিমাদি বিভূতি আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। প্রকৃতিকে অধীনের আনয়নের প্রধান উপায় যোগ। সেই যোগের প্রসঙ্গ প্রথম পাদে অর্থাৎ 'সমাধিপাদ'-এ আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদ বা 'সাধনপাদ'-এ যোগের সাধন প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। এখন সাধনের ফল 'বিভূতি' প্রসঙ্গ বর্তমান পাদ বা 'বিভূতিপাদ'-এ আলোচিত হইবে।

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।।১।।

চিত্তকে কোন বিশেষ বস্তুতে সংলগ্ন রাখার নাম 'ধারণা'।

মন্তব্য ঃ প্রত্যাহারের সাহায্যে মনকে সমস্ত বিষয় হইতে গুটাইয়া আনিয়া কোন এক বস্তুতে স্থির করিয়া ধরিয়া রাখার নাম 'ধারণা'। পূর্বে যেসকল সাধনার কথা বলা হইয়াছে তাহা ধারণাদি সাধনার প্রস্তুতি। যোগের আরম্ভ ধারণা হইতে। যেমন আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তিতে মন স্থির করিতে চাই। শরীর-মনকে সবল ও সুস্থির রাখিয়া তাঁহার চিত্রের দিকে তাকাইতে তাকাইতে স্মৃতিতে ঠিক ফটোগ্রাফের মতো একটি ছায়া পড়ে। অনেকদিন চেষ্টা করিতে করিতে ঐ ছায়াটি যখন স্পষ্ট হইয়া উঠে, তখন বোধ করি যেন ঠাকুরের মূর্তিখানি দেখিতেছি। ইহাই 'ধারণা'।

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।।২।।

সেই বস্তুবিষয়ক জ্ঞান সর্বদা একইভাবে প্রবাহিত হইলে তাহাকে 'ধ্যান' বলে।

মন্তব্য ঃ এই ধারণাকে অবলম্বন করিয়া অনেকক্ষণ স্থিরভাবে 'আমি ঠাকুরের মূর্তি দেখিতেছি'—এইরূপ চিন্তা করিতে পারিলে তাহাকে 'ধ্যান' বলে।

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।।৩।।

ধ্যানের দ্বারা বাহ্য উপাধি পরিত্যাগপূর্বক কেবলমাত্র অর্থ প্রকাশিত হইলে তাহাকে 'সমাধি' বলে।

মন্তব্য ঃ অবশেষে যখন ঠাকুরের মূর্তি এরূপ স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইব যে, আমার সকল চিন্তা যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, আমি যে ধ্যান করিতেছি তাহা আমি বোধ করিতেছি না, আমার সামনে যেন ঠাকুর বসিয়া আছেন, আমি যেন ঠাকুরকে সত্য সত্যই প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই অবস্থার নাম 'সমাধি'।

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ।।৪।।

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই তিনটি ক্রমান্বয়ে একই বস্তুর উপর প্রযুক্ত হইলে তাহাকে বলে 'সংযম'।

মন্তব্য ঃ ধারণা ও ধ্যান সমাধির প্রথম দুইটি স্তর। মন সমাধিস্তরে উঠিয়া গেলে আমাদের সূক্ষ্মশরীরের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ হয়। 'সম্' অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে 'যম' অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ। এই সাধনা তিনটিকে 'সংযম' বলা হয়। কারণ ইহার দ্বারা মন বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে আনা যায়।

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ।।৫।।

সংযমের দ্বারা যোগীর চিত্তে জ্ঞানালোক প্রকাশিত হয়।

মন্তব্য ঃ মন সর্বতোভাবে সমাহিত হইলে জ্ঞানের কোন বাধা থাকে না, যাহা জানিতে ইচ্ছা হয় তাহাই জানা যায়। এই সমাহিত মনের দ্বারাই ঋষিরা ধর্মতত্ত্ব জানিতেন। এমনকি আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও কেউ কেউ সমাহিত মনের সাহায্যে বাহ্যজগতের অনেক তত্ত্ব জানিয়াছেন। এই সমাহিত মনের দ্বারা সৃষ্টির অন্তর্গত সবকিছুই জানা যায়। পরবর্তী সূত্রসমূহে এই কথাগুলি স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে।

তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ।।৬।।

এই সংযম ক্রমান্বয়ে অভ্যাস করা উচিত।

মন্তব্য : নিম্নভূমি হইতে জ্ঞানলাভ করিতে করিতে মন উচ্চস্তরে উঠিতে পারে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে উঠাইবার চেষ্টা না করিয়া সহসা কোন সূক্ষ্মবিষয়ে মনকে সমাহিত করিবার চেষ্টা করিলে সেই বিষয়ে জ্ঞানলাভ সম্ভব হয় না।

ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্বেভ্যঃ।।৭।।

পূর্ববর্ণিত সাধনসমূহ অপেক্ষা এই তিনটি সাধন অন্তরঙ্গ।

তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজস্য।।৮।।

কিন্তু এই সংযমও নির্বীজ সমাধির ক্ষেত্রে বহিরঙ্গ।

মন্তব্য : যোগের আটটি অঙ্গের মধ্যে প্রথম পাঁচটি প্রস্তুতি মাত্র। চিত্তবৃত্তি নিরোধের প্রকৃত সাধনা—ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। সেইজন্য ইহাদিগকে সমাধিলাভের 'অন্তরঙ্গ সাধন' বলা হয়। এই সমাধির সাহায্যে মনকে উর্ধ্ব হইতে উর্ধ্বে তুলিতে তুলিতে যখন শুদ্ধ মন প্রকৃতির রাজ্য পার হইয়া নির্গুণ ব্রহ্মের অনুভূতিলাভ (নির্বীজ সমাধি) করে, তখন যোগী দেখেন—মন-বুদ্ধির সঙ্গে আমার কোনকালেই কোন সম্পর্ক ছিল না। আমি ভ্রমবশত নিজেকে মন-বুদ্ধি বলিয়া বোধ করিতাম। এই মন-বুদ্ধির সাহায্যে সমাধিতে উঠিয়া আমি স্ব-স্বরূপের নাগাল পাইয়াছি। আমার এখন আর কিছু করিবার নাই। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—যাহা সূক্ষ্মদেহের ক্রিয়ামাত্র, তাহার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই। তাই তাহা এখন বহিরঙ্গ অর্থাৎ নিতান্ত পর।

ব্যুত্থান-নিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ।
নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ।।৯।।

যখন মনের চাঞ্চল্যনাশ হয় এবং নিরোধসংস্কার উৎপন্ন হয় তখন চিত্ত নিরোধ-পরিণাম প্রাপ্ত হয়।

তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ।।১০।।

অভ্যাসের দ্বারা ইহা স্থিরতা লাভ করে।

মন্তব্য : লক্ষ লক্ষ বৎসর বহির্জগতে ঘুরিয়া অবিরাম ঝড়-ঝাপটা খাইতে খাইতে একটু বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। তাহার পর অনেক মেহনত করিলে মন সমাহিত হয়। সমাহিত হওয়াও মনের শেষ কাজ নয়, ইহা অধ্যাত্মসাধনার আদিকাণ্ড। ইহার পরেও দীর্ঘকাল মনকে সমাহিত রাখিয়া চলিতে হইবে। তাহা না হইলে কৈবল্যপ্রাপ্তি সম্ভব হয় না।

সর্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ।।১১।।

যখন মনের নানাপ্রকার বিষয় গ্রহণের চেষ্টা দূরীভূত হয় এবং কেবল একটি বিষয়ে মন একাগ্র হয় তখন চিত্তের সমাধি-পরিণাম হয়।

শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ।।১২।।

যখন মন অতীত ও বর্তমান উভয় অবস্থাকে একই সময়ে গ্রহণ করিতে পারে তখন চিত্তের একাগ্রতা-পরিণাম হয়।

মন্তব্য : পূর্বোক্ত সমাধি হইলে মনকে বহির্বিষয় হইতে টানিয়া আনিয়া একটি বিষয়ে নিযুক্ত রাখিবার ক্ষমতা হয়। এইরূপে দীর্ঘকাল অভ্যাস করিতে করিতে মন স্থিরভাবে থাকিতে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু একবার সমাধিস্থ হইয়া মনকে মাঝে মাঝে ছাড়িয়া দিলে আবার সেই সমাধি অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হয়। অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে সমাধি অভ্যাস করিতে হইবে এবং সমাধিকে বারবার অভ্যাস করিয়া instinct বা সংস্কারে পরিণত করিতে হইবে।

মন একবার সমাহিত হইলে পূর্বের বহুদিকে চলিবার অভ্যাস দূর হয় এবং স্থির হইয়া এক বিষয়ে যুক্ত থাকিতে ভালবাসে।

পূর্ণ একাগ্রতার লক্ষণ এই যে, যখন মন সমাহিত থাকে তখন কালের জ্ঞান লোপ হয়। সাধারণ লোকেরও মন সমাহিত হইলে কালের জ্ঞান কম হইতে দেখা যায়। উপন্যাস পড়িতে পড়িতে রাত্রি কাটিয়া যায়, কিছুই টের পাওয়া যায় না।

একটি বস্তুই বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া জগৎ-রূপে প্রতীয়মান হয়। এক-কে বহুরূপে দেখিবার বাসনায় আমরা মনুষ্যজীবন ধারণ করি। তাহাতে জগতের তত্ত্ব বুঝি না, কেবল জগতের সুখদায়কত্ব এবং সঙ্গে সঙ্গে দুঃখদায়কত্ব-টুকুই অনুভব করিয়া থাকি। এই সুখ-দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায়—দৃশ্যজগতের প্রত্যক্ (substratum) প্রদেশে অবস্থিত একত্বের সন্ধান পাইলে ভোগলালসার নিবৃত্তি হয়। একটি সুন্দরী নারী নানাপ্রকার নৃত্য করিতেছিল। যাহারা তাহাকে দেখিতেছিল, নারীটির সঙ্গে তাহাদের কোন পরিচয়ই ছিল না। সে যখন নৃত্য সমাপ্ত করিয়া স্থির হইয়া বসিল তখন তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া জনৈক দর্শক জানিলেন যে, নারীটি তাঁহারই পরমাত্মীয়া। ইহা জানামাত্র তাঁহার কামলালসা নিবৃত্ত হইল। নর্তকীর অঙ্গ-সঞ্চালনের মাধুর্যে তাহার সম্পর্কে যে ভোগলালসা জাগিয়াছিল তাহা নিবৃত্ত হইল।

সমাধি বা যোগ ও সাধনের দ্বারা যখন মন ইন্দ্রিয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া আত্মসংস্থ হয় তখন প্রকৃতির মূলতত্ত্বগুলি জানিবার ফলে রূপরসাদির লালসা নিবৃত্ত হয় এবং এই জ্ঞান হয় যে, বাহ্যজগৎ ও আমার apparent self (দেহ-মন-বুদ্ধি) একই বস্তু। ইহাতে ভোগ্য ভোক্তৃত্বভাব নাই। ইহা জানিতে পারিলে জ্ঞানলাভের পথে সমস্ত বিঘ্ন দূর হয়। ইহাই সমাধিলাভের উদ্দেশ্য। মন সমাহিত করিবার শক্তি হইলে ক্রমে ক্রমে চিদাকাশের সব তত্ত্ব জানিতে পারা যায় এবং তাহার ফলে বৈরাগ্য হয় এবং অনাত্মবস্তুর ওপর আকর্ষণ দূর হইয়া যায়। সুতরাং আত্মজ্ঞানলাভের একমাত্র সাধন—একাগ্রতা। [ক্রমশ] (দশ)



মাঘ ১৩০৮
জানুয়ারি ১৯০২

ডিগ্‌বী ও শ্রীরামকৃষ্ণ

আজকাল অনেক ইউরোপীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক আধ্যাত্মিকতা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছেন। সম্প্রতি পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর ভারতহিতৈষী ডিগ্‌বী মহোদয় 'সমৃদ্ধ ব্রিটিশশাসনাধীন ভারত' (Prosperous British India) নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি সরকারী কাগজপত্র দ্বারা ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ব্রিটিশশাসনে ভারতের অনেক উপকার হইয়াছে বটে, কিন্তু কতকগুলি অনিষ্টও ঘটিয়াছে।... ইঁহার পুস্তক হইতে কতকাংশের অনুবাদ দেওয়া গেল। ইহাতেই পাঠকগণ বুঝিবেন, ভারতের উপর ইঁহার কতদূর সহানুভূতি এবং ভারতীয় মহাপুরুষগণের, বিশেষতঃ, শ্রীরামকৃষ্ণের উপর ইঁহার কতদূর শ্রদ্ধা। ইনি বলেন, "উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়িলে জষ্টিস্ রাণাডে সমুদয় জগতের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিতেন। কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়েই ভারত আত্মসম্মান বজায় রাখিয়াছে। কেবল পরলোকগত ভারতীয় ধর্ম্মবীরগণের নাম করিতে গেলে রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন ও রামকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করিতে পারা যায়। ইঁহারা সকলেই বাঙ্গালী। ইঁহারা সমগ্র জগতে পরিচিত এবং জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচার্য্যগণের মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু সমগ্র জগতের তুলনায় বোধ হয় যেখানে আধ্যাত্মিকতা অধিক, সেই দেশের কোটি কোটি অধিবাসিগণের ভিতর ইঁহারা ত মুষ্টিমেয়। ভারতকে এই বিষয়ে অথবা অন্য বিষয়ে তাঁহার শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার সুযোগ মোটেই দেওয়া হয় নাই। ইউরোপ যখন মার্টিন লুথারকে প্রসব করিল, তখন সমগ্র জগতের লোক তাঁহাকে একজন ধর্ম্মসংস্কারক বলিয়া জানিতে পারিল। ঠিক সেই সময়েই ভারতও তাঁহার ধর্ম্মবীর প্রসব করিলেন। (সমগ্র জগতে তাঁহাকে ভালরূপ না জানিলেও) শত শত লোকে তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। গত শতাব্দীতে যেসকল মনস্বী জন্মগ্রহণ করিয়া ইংরাজজাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বোধ হয় রবার্ট ব্রাউনিং ও জন রস্কিনকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়। কিন্তু তাঁহারাও বঙ্গদেশের সেই নিরক্ষর রামকৃষ্ণের তুলনায় কেবল অন্ধকারে হাতড়াইয়াছেন মাত্র। তিনি, আমরা যাহাকে শিক্ষা বলি, তাহার কিছুই পান নাই অথচ এমন গভীর তত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন যাহা বর্ত্তমান যুগের কেহই দিতে পারেন নাই এবং সংসারক্লিষ্ট মর্ত্ত্যজীবের নিকট ব্রহ্মকে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুবিবাহ ও সার এড্‌উইন আর্ণল্ড

সার এড্‌উইন আর্ণল্ডের নাম এদেশের অনেকের নিকট পরিচিত। তাঁহার ইংরাজী কবিতায় লিখিত বুদ্ধদেবচরিত, ভগবদ্গীতা, কঠোপনিষদের নচিকেতার উপাখ্যান প্রভৃতি দ্বারা তিনি যে ভারতীয় ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও সহানুভূতিসম্পন্ন, তাহা অনেকেই বোধ হয় জানিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি 'ডেলি টেলিগ্রাফ' পত্রে 'ভারতে বিবাহ' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতেও তাঁহার ভারতীয় সমাজের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশিত হইয়াছে।

বিলাতের প্রিভি কৌন্সিলে কোন হিন্দু বিধবার স্বত্বাধিকার লইয়া যে আপীল হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুবিবাহের অনেক তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা পাশ্চাত্য জাতির চক্ষে সচরাচর পড়ে না। আর্ণল্ড বিবাহ ও অন্যান্য বিষয়ক কতকগুলি হিন্দু প্রথার উল্লেখ করিয়া পরিশেষে কতকগুলি বিষয়ে যে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বড় সারগর্ভ।

ইনি বলেন, "হিন্দুদের বর সচরাচর কন্যাকে দেখিয়া পছন্দ করিয়া বিবাহ করে না। তাহাদের পিতামাতা বা অন্যান্য অভিভাবকের অনুমোদনে এবং ঘটকের সহায়তায় ইহা সম্পাদিত হয়।" আশ্চর্য্যের বিষয়, এই প্রথা তাহাদের খুব উপযোগীই হইয়া থাকে। আমার বোধ হয়, কেহ কেহ বলিবেন, আমাদের পাশ্চাত্য স্বাধীন নির্বাচনপ্রথা হইতে ইহা অধিকতর উপযোগী। আমি নিজে বিশ্বাস করি যে, ইহা সাহসপূর্বক বলা যাইতে পারে এবং তালিকা দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, পাশ্চাত্যদেশ হইতে প্রাচ্যদেশে সুখী দম্পতির সংখ্যা অধিক। পাশ্চাত্য প্রথার বিবাহে যেসকল বিসদৃশ ভ্রান্তি, হঠাৎ নির্ব্বাচন ও তজ্জনিত প্রবল নৈরাশ্য দেখা যায়, প্রাচ্যপ্রথার বিবাহে সংসারাভিজ্ঞ সুচতুর ব্যক্তিগণের সাবধান নির্ব্বাচনে তাহা ঘটিতে পারে না। প্রেমের তরুণ স্বপ্নে যে বিচার অসম্ভব, তাঁহারা [অভিভাবকগণ] সেই বিষয়বুদ্ধি পরিচালনা করিয়া, অবস্থার উপযোগী যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। হিন্দুরা বিবাহবন্ধনকে একটা তুচ্ছ বিষয় বিবেচনা করেন বলিয়া যে এরূপ করেন তাহা নহে। বিবাহবন্ধনের পবিত্রতা ও উহার গভীর অর্থের দিকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহারা এইরূপ করিয়া থাকেন।... বিবাহিতা হইবামাত্রই সেই কন্যার ভার তাহার স্বামীর পরিবারবর্গ লইয়া থাকেন। এই কারণেই ভারতে স্ত্রীজাতীয় ভিক্ষুক নাই বলিলেই চলে।"....

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : স্বামী সর্বগানন্দ

'মানবধর্ম'ই মনুসংহিতার প্রতিপাদ্য*

সুবলচন্দ্র মণ্ডল

ধর্ম সম্পর্কিত আলোচনায় ধর্মের দুটি প্রধান স্তর প্রথমেই চিহ্নিত করে নেওয়া আবশ্যক; একটি অলৌকিক, অপরটি লৌকিক। এই দুই স্তরের সম্পর্ক দুধ আর তার সরের সম্পর্কের মতো; দুইটি স্তর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

অলৌকিক স্তরে ধর্মের উদাহরণ আমরা দেখি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং অনুরূপ স্তরের সাধকদের মধ্যে। অতিলৌকিক স্তরে পৌঁছালেও এঁরা লোকসাধারণের থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন নন, প্রকৃতপক্ষে এঁরাই সাধারণ লৌকিক জীবনের পথপ্রদর্শক।

মানুষের জীবন আজ সর্বত্র সমস্যাসঙ্কুল। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, বৃহত্তর সামাজিক—সর্বস্তরেই। এইসব সমস্যার মূলে কোন ক্ষেত্রে ধর্মহীনতা, কোন ক্ষেত্রে ধর্ম-বিরোধিতা, কোন ক্ষেত্রে ধর্মান্ধতা দেখা যাচ্ছে। এজন্য ঐসব সমস্যা সমাধানের পথ একমাত্র যথার্থ ধর্মাচরণেই আছে। এই বড় মাপের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে একটু দীর্ঘ ভূমিকার প্রয়োজন।

আমরা পুরনো ঘর-বাড়ি, ভাঙা রাস্তাঘাট, মজা পুকুর, খাল ইত্যাদির সংস্কার করি; নানা সামাজিক রীতিনীতিরও সংস্কার করা হয়। সেইরকম হিন্দুদের দশবিধ সংস্কারের বিধান আছে। এইসব ক্ষেত্রে 'সংস্কার' শব্দের মূল ভাব একটিই, তা হলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে তার মানোন্নয়ন ঘটানো। 'সংস্কৃতি' শব্দটি এই মূল ভাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

'সংস্কৃতি' শব্দটি আমরা কেবল মানুষ সম্পর্কেই প্রয়োগ করি। মানুষের বহুমুখী জীবনধারা ও কর্মকাণ্ডের উৎকর্ষ এবং তার প্রকাশকে বোঝাতেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম, সাহিত্য, চারু এবং কারুশিল্প ইত্যাদি সংস্কৃতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ। এই প্রবন্ধে সংস্কৃতির একটি মাত্র রূপ—লৌকিক স্তরে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

মানুষ মূলত অন্যান্য প্রাণীরই সগোত্র। জন্ম, পুষ্টি, বৃদ্ধি, শ্বসন, রেচন, প্রজনন, মৃত্যু ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য অন্যান্য প্রাণীরও যেমন, মানুষেরও তেমনি। আবেগের ক্ষেত্রে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে বহু ক্ষেত্রে সমতা আছে, কিন্তু অন্যান্য প্রাণীর থেকে মানুষের পার্থক্যও বিরাট। এই পার্থক্যের ভিত্তি প্রধানত দুটি বিষয়ে—একটি হলো অধ্যাত্মচেতনায় সম্পৃক্ত মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির অনন্যসাধারণ বিকাশ এবং অপরটি তার সমাজবদ্ধতা। সমাজবদ্ধতা মানুষের জীবনে এমন কতকগুলি বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে যা অন্য কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে আবশ্যিক নয়। ধর্ম সম্পর্কে আলোচনায় এই বিশেষ মানবিক পরিস্থিতি মনে রাখা প্রয়োজন।

সমাজবদ্ধতার অনুষঙ্গ হিসাবেই মানুষের জৈবধর্মের ওপর আরোপিত হয়েছে সামাজিক দায়বদ্ধতা। ধর্ম মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে এই সূত্রেই।

'ধর্ম' শব্দের মূল অর্থ স্বভাবগত গুণ বা বৈশিষ্ট্য। তবে সামাজিক সম্পর্কসূত্রে এর আরেক অর্থ হয় 'অবশ্যপালনীয়' কর্তব্য। সুশৃঙ্খল সমাজে সুস্থভাবে শান্তিতে জীবনযাপনের জন্য মানুষের যে-গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যিক, তা-ই সাধারণ মানবধর্ম। সমাজে বিশেষ অবস্থানের কারণে সাধারণ মানব-ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয় কর্মক্ষেত্র অনুযায়ী বিশেষ ধর্ম। এই দ্বিবিধ ধর্ম-সমন্বয়ের ভিত্তিতেই সমাজ টিকে থাকে ও বিকশিত হয়।

যুগে যুগে দেশে দেশে জ্ঞানসমৃদ্ধ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা মানুষের এই বাঞ্ছিত গুণ ও কর্তব্যগুলি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন এবং সেগুলি অধিগত করে জীবনচর্যার অঙ্গীভূত করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। এইভাবেই রূপ নিয়েছে ধর্ম ও আনুষঙ্গিক আচার-অনুষ্ঠান। এই প্রসঙ্গে এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বিজ্ঞানে যেমন পর্যবেক্ষণ ও সাধারণীকরণের মাধ্যমে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্য আবিষ্কার করা হয়, ধর্মনির্ণয়ের ক্ষেত্রেও ঐ একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। তবে এই উভয় ক্ষেত্রের মধ্যে পার্থক্যও বিরাট। বিজ্ঞানে যেকোন অনুসন্ধান কোন এক সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে সীমিত রাখা হয়; কিন্তু ধর্মের স্বরূপ নির্ণয়ে প্রকৃতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান—এই সমস্ত ক্ষেত্রই অনুসন্ধানের বিষয়ীভূত। কাজেই নির্দ্বিধায় বলা যায়, ধর্ম অতি-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত এক মহাপ্রযুক্তি, যার লক্ষ্যই হলো মানুষের মহৎ কল্যাণসাধন।

ধর্মের ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনায় সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হলো সমাজবদ্ধতাকে, কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে নয়। কারণ, মানবধর্মের (আধুনিক সাধারণ ভাষায় 'হিন্দুধর্মের') প্রথম সুসংহত প্রবক্তা মনু শ্রেষ্ঠ মানুষের সাধারণ ধর্মের যে দশটি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন তার সবকয়টিই মানুষের ব্যক্তিজীবন এবং সমাজজীবন সম্পর্কিত। তাছাড়া সমাজবহির্ভূত মানুষের অস্তিত্বই অসম্ভব। খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, সংস্কৃতি—এই সবকিছুর জন্যই মানুষ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে, স্বদেশের এবং বিদেশের, বর্তমানের এবং অতীতের অসংখ্য মানুষের কৃতির ওপর নির্ভরশীল।

মানুষের ধর্ম সম্বন্ধে মনুর বক্তব্য হলো ঃ

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।।"

(মনুসংহিতা, ৬।৯২)

অর্থাৎ ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ—এই দশটি ধর্মের লক্ষণ।

'ধৃতি' শব্দের আভিধানিক অর্থ একাধিক; সেগুলির মধ্যে 'সন্তোষ', 'চিত্তস্থিরতা' এবং 'ধৈর্য' আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। ধৃতিমান ব্যক্তির মানসিক এবং সাধারণভাবে দৈহিক শক্তি সংরক্ষিত হয় এবং শান্তমনে গভীর চিন্তা করা, জ্ঞানার্জন

---

* এই নিবন্ধটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

করা ও জটিল সমস্যার যথাযথ সমাধান নির্ণয় সহজ হয়; এরূপ ব্যক্তির পারিবারিক জীবন শান্তিপূর্ণ হয় এবং তাঁর পক্ষে সামাজিক স্তরেও সুসম্পর্ক স্থাপনের পথ সুগম হয়। বিপরীতপক্ষে, ধৃতির অভাবে মানুষের চিত্তচাঞ্চল্য, উদ্বেগ, মানসিক ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি দেখা দেয়। এইভাবে মানসিক এবং দৈহিক শক্তির অপচয়ের ফলে দৌর্বল্য দেখা দেয়, গভীর চিন্তা এবং জ্ঞানলাভ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়; সত্যাসত্য, শুভাশুভ নির্ণয় এবং কোন জটিল সমস্যা সমাধান কঠিন হয়। এরূপ মানসিক অবস্থা বিরূপ স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, যা আবার দেহের অনাল গ্রন্থিসমূহের (endocrine glands-এর) স্বাভাবিক ক্রিয়া ব্যাহত করে। এইসবের সামগ্রিক ফল হয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বাস্থ্যহানি; এই কারণে বহু রোগীকে চিকিৎসকেরা নিরুদ্বেগ থাকার পরামর্শ দেন। আবার চিত্তস্থিরতার অভাব অন্যের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে—তা পারিবারিক স্তরেই হোক কিংবা বৃহত্তর সামাজিক স্তরেই হোক—তিক্ততা সৃষ্টির কারণ হতে পারে, নানামাত্রায় দ্বন্দ্ব ও সঙ্ঘাতের সৃষ্টি হতে পারে। এইভাবে ধৃতির অভাবে মানুষের জীবনই দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। (এখানে ধৃতির অভাবজনিত পরিণতির সংক্ষিপ্ত সঙ্কেতমাত্র দেওয়া হলো। উৎসাহী পাঠক এসম্বন্ধে বিশদভাবে জানতে চাইলে 'Encyclopaedia Britannica' গ্রন্থে 'anxiety' সম্পর্কিত আলোচনা পড়ে নিতে পারেন।)

গীতায় ধৃতিমান ব্যক্তিকে 'ক্ষমী' বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। এথেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ধৃতির সঙ্গে ক্ষমার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। কোন দোষী বা অপরাধী ব্যক্তিকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত থাকার মনোবৃত্তিই ক্ষমা। চাণক্যের ভাষায়—"শক্তীনাং ভূষণং ক্ষমা"। অর্থাৎ ক্ষমা শক্তিমানের অলঙ্কার বা ভূষণ। দয়া বা করুণা ক্ষমার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই থাকে। এছাড়া শ্রদ্ধা কিংবা ভক্তির মনোভাবও থাকতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"—এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে ক্ষমার সঙ্গে ভক্তির উপস্থিতি স্পষ্ট হয়ে যায়। সামাজিক জীবনে ক্ষমার প্রয়োজন স্বাভাবিক কারণেই এসে যায়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নানা বিষয়ে —যেমন জ্ঞানের বিস্তৃতিতে, বোধের গভীরতায়, প্রজ্ঞার মাত্রায়, বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতায়—বিরাট পার্থক্য থাকে। এর ফলে একের কাজ বা কথা অন্যের কাছে অন্যায়, অসঙ্গত, এমনকি অপরাধও মনে হতে পারে। আবার এরূপ মনে হওয়াটাও অনেকক্ষেত্রে ভুল হতে পারে। এই কারণে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাতের ঘটনা ঘটে। এতে ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজেই সামাজিক সুস্থিতি এবং মানবিক প্রগতির প্রয়োজনে ক্ষমা একটি অতি প্রয়োজনীয় গুণ হিসাবে গণ্য।

'দম' শব্দের অর্থ হলো অসঙ্গত কাজ থেকে নিজেকে সংযত রাখা। এর মূলে আছে মানসিক প্রক্রিয়া। কোন কাজে উদ্যোগী হওয়ার মনোভাব হলো প্রবৃত্তি, আর কোন কাজ থেকে বিরত থাকার মনোভাব হলো নিবৃত্তি। মনকে সংযত রাখলেই শুভকর্মে প্রবৃত্তি এবং অশুভ কর্মে নিবৃত্তি আসে। কাজেই মানুষ 'দম' গুণের অধিকারী হলে সমাজ সুখ-শান্তিতে পূর্ণ হতে পারে।

'অস্তেয়' শব্দের অর্থ অচৌর্য, অর্থাৎ চুরি করা থেকে বিরত থাকা। অনেকে প্রশ্ন তোলেন—'চুরি' শব্দের সঠিক তাৎপর্য কী? এই প্রশ্নের উত্তর ঈশ উপনিষদের প্রথম শ্লোকে পাওয়া যায়—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।" মানুষ অন্যান্য জীবের মতো প্রকৃতিরই একটি অংশমাত্র। সুতরাং মানুষের জীবনধারণ প্রাকৃতিক বিধান অনুসারীই হতে হবে। মানুষ-সহ সব জীবেরই জীবনধারণের উপযোগী বস্তু প্রকৃতিই সরবরাহ করে। সুতরাং প্রকৃতিদত্ত ভোগ্যবস্তুতে সকলেরই সমান অধিকার এবং প্রকৃতি অনুযায়ী জীবনধারণই বিজ্ঞানসম্মত। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' কথাটির মর্মার্থ হলো—ভোগ করতে চাইলে তা ত্যাগের মাধ্যমে করা চাই। এটিই অস্তেয়। প্রকৃতির মনুষ্যেতর অংশে এই বিধানই প্রচলিত। বস্তুত, প্রকৃতির যে-অংশে কোন বিশেষ জীবের জীবনধারণের উপযোগী উপাদান থাকে না, সেখানে ঐ জীবও দেখা যায় না। যেমন মরুভূমিতে গবাদি পশুপালন কিংবা মাছের চাষ হয় না। মানুষ তার উন্নত বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে প্রকৃতির বিধানানুসারী জীবনযাত্রা-প্রণালী উদ্ভাবন ও অনুসরণ করে শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, ভোগবাদের মোহে আচ্ছন্ন কিছু বিকৃতবুদ্ধি মানুষ প্রকৃতির বিরোধিতা করে সমাজে এমন বৈষম্য সৃষ্টি করছে যার ফলে সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজ প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই বঞ্চনাই হলো চুরি। "মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্" বাক্যে এই চুরিই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কেউ কেউ নিজের অধিক যোগ্যতার ভিত্তিতে অধিক ভোগ্যবস্তু দাবি করেন। এর মূলে আছে ভ্রান্ত ধারণা এবং লোভ। আইনস্টাইন যত বড় বিজ্ঞানীই হোন না কেন, সাধারণ নিরক্ষর কৃষকের উৎপাদিত খাদ্য খেয়েই তাঁকে বেঁচে থাকতে হয়েছিল; ঐ খাদ্য ছাড়া তাঁর কোন যোগ্যতাই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার উপযুক্ত ছিল না। আবার কৃষককেও কৃষিকাজে ব্যবহৃত এবং সাধারণভাবে জীবনধারণের জন্য অন্য বহু মানুষের উৎপাদিত নানা বস্তুর ওপর নির্ভর করতে হয়। এথেকেই বোঝা যাচ্ছে—যেকোন উৎপাদিত ভোগ্যবস্তু সমগ্র সমাজের যৌথ সম্পদ। তাই নীতিগতভাবে সমাজের সমস্ত সম্পদে সকলের অধিকার স্বীকার করতেই হবে। অস্তেয় এই সত্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু সমাজে বহু ক্ষেত্রেই স্বল্প কিছুসংখ্যক মানুষ নানা কৌশলে তাদের ন্যায্য প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশি সামাজিক সম্পদ আত্মসাৎ করে। এর ফলে অন্য বহুসংখ্যক মানুষ জীবনধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান থেকে বঞ্চিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই বঞ্চিত মানুষেরা সমাজের প্রতি কোন মমত্ববোধ কিংবা দায়বদ্ধতা অনুভব করে না; বরং তারা তাদের বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নানা সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়, কখনো বা বিচ্ছিন্নতাবাদী হয়ে

যায়। আবার অনেকেই দেশের ও সমাজের শত্রুদের আহ্বান করে আনে। এইভাবে কিছু লোকের অজ্ঞতাপ্রসূত স্বার্থপরতা সমাজে সঙ্কট সৃষ্টি করে সমগ্র সমাজকে এবং নিজেদেরও বিপন্ন করে তোলে।

স্তেয়ভাবাপন্ন ভোগবাদী মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে আরো একভাবে সঙ্কট আসে। সম্পদ সংগ্রহ, তার সংরক্ষণ ও ব্যবহার সংক্রান্ত নানা চিন্তা ও দুশ্চিন্তায় তার চিত্তস্থিরতা বিঘ্নিত হয় এবং তার স্বাভাবিক পরিণতি—আগেই আলোচিত হয়েছে—তাকে ভুগতে হয়। এইসব থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় অস্তেয় মানুষের জীবনে কত গুরুত্বপূর্ণ।

'শৌচ' হলো দেহ ও মনের শুচিতা বা পরিচ্ছন্নতা। মানুষের প্রথম কর্তব্যই হলো সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকা। তাই মহাকবি কালিদাস বলেছেনঃ "শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।" মানুষের দেহ এবং মন পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমেই সব কাজ করে। মন আবার দেহেই আশ্রিত। তাই অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত মানুষকে বলেন এটি 'body-mind complex'—দেহ ও মনের যৌগ। কাজেই মনের ন্যায় দেহ সব কর্মেরই ভিত্তিস্বরূপ। শৌচ মানুষের অস্তিত্বরক্ষায় একান্ত অপরিহার্য।

ওপরে আলোচিত গুণগুলির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবেই জড়িয়ে রয়েছে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। মানুষের মনের সঙ্গে বহির্জগতের সংযোগ ঘটে তার চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা এবং ত্বক—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। এই ইন্দ্রিয়গুলিই বিভিন্ন বস্তুর প্রতি মনকে আকৃষ্ট করে। এই আকর্ষণের ক্ষমতা জীবনধারণের জন্য যতখানি প্রয়োজন—সেই সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা কর্তব্য। সীমা ছাড়িয়ে গেলে তা কেবল মানসিক স্থৈর্যই বিপর্যস্ত করে না, নানাভাবে দৈহিক ক্ষতিরও কারণ হতে পারে এবং বৃহত্তর সমাজেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। এইজন্য ইন্দ্রিয়গুলির ওপর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। এইরূপ নিয়ন্ত্রণই হলো ইন্দ্রিয়নিগ্রহ।

'ধী' শব্দের অর্থ বুদ্ধি বা মেধা। আলোচ্য প্রসঙ্গে এই শব্দের তাৎপর্য—বুদ্ধি বা মেধার যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে ঐ শক্তিকে শাণিত করে তোলা। জন্মগতভাবে যেকোন মানুষের বুদ্ধির মাত্রা নির্দিষ্ট থাকে, কিন্তু যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে তাকে পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত করা যেতে পারে, অন্যথায় তা অপরিণত থেকে যায়। বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যেই মানুষ জ্ঞান অর্জন করে, তাকে স্মৃতিতে ধরে রাখে, প্রয়োজনে তা স্মরণ করে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তার প্রয়োগও করতে পারে। লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগের অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো যুক্তির মাধ্যমে সত্যের আবিষ্কার, শুভ-অশুভের পার্থক্য নির্ধারণ এবং জীবনের সমস্যা সমাধানের পথনির্দেশ করা। আবার ধীশক্তি মানুষকে অমূর্ত ভাবের চিন্তায় পারদর্শী করে তার সভ্যতার অগ্রগতি সুনিশ্চিত করে এবং মানুষকে বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধতর করে তোলে। তাই এই শক্তি মানবজীবনের ভিত্তিস্বরূপ।

'বিদ্যা' বা জ্ঞান ছাড়া মানুষ চক্ষুষ্মান নয়, বরং অন্ধ হয়ে থাকে। জ্ঞানই মানুষকে তার নিজের স্বরূপ, তার সঙ্গে তার অদূর এবং সুদূরের পরিবেশকে বুঝতে সাহায্য করে এবং *তাকে শ্রেয়ের পথ দেখিয়ে দেয়। মানব-সংস্কৃতির অগ্রগতির* ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে মানুষের বিচিত্র জ্ঞানসম্ভারের ক্রমসমৃদ্ধির ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। তাই বিদ্যাহীন জীবন মানুষের পক্ষে এক দুর্বহ বিড়ম্বনা।

'সত্য'ই বিশ্বের একমাত্র স্থায়ী তত্ত্ব। সত্যের আরেক নাম 'ঋত', যার প্রভাবে বিশ্বের সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হয়। পরিবেশ এবং পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে সত্যের অনুসন্ধানে মানুষ সৃষ্টি ও সমৃদ্ধ করে চলেছে তার দর্শন ও বিজ্ঞান। যেকোন মানবিক ব্যবস্থা যখন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনি তা স্থায়ী হয় এবং মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হয়। অসত্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ক্ষণস্থায়ী ও শ্রেয়বিরোধী হওয়ায় তা মানুষের দুঃখের কারণ হয়। মানবজাতির ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে সত্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার দীর্ঘস্থায়িত্বের ও অসত্যের ক্ষণস্থায়িত্বের বহু প্রমাণ পাওয়া যাবে।

'অক্রোধ' বা ক্রোধশূন্যতা মানবসমাজের অস্তিত্বরক্ষার জন্যই প্রয়োজন। ক্রোধ একটি ধ্বংসাত্মক আবেগ। গীতায় এর ভয়াবহ পরিণতির সুন্দর বিশ্লেষণ দেখা যায়ঃ

"ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।।"

(২।৬৩)

অর্থাৎ ক্রোধ থেকে কর্তব্য-অকর্তব্যরূপ বিবেকনাশ এবং বিবেকনাশ থেকে শাস্ত্র* ও আচার্যের উপদেশজনিত সংস্কারের স্মৃতিবিলোপ, স্মৃতিবিভ্রম থেকে পুরুষের সদসদ্ বিচারবুদ্ধি বিনষ্ট হয় এবং বিচারবুদ্ধি বিনষ্ট হলে মানুষ পুরুষার্থের অযোগ্য হয়। সংক্ষেপে বলা যায়—ক্রোধের বশীভূত মানুষ পশুতুল্য ("ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ"—হিতোপদেশ) হয়ে যায়। তাই মানুষের পক্ষে উপযুক্ত কোন কাজই ক্রোধান্ধ ব্যক্তির দ্বারা সম্ভব হয় না।

অতএব নির্দ্বিধায় এই অনুসিদ্ধান্তগুলি করা যেতে পারেঃ মনুসংহিতায় নির্দেশিত এই ধর্ম সম্পূর্ণভাবেই প্রকৃতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত, এই ধর্মে কোন অলৌকিকতার স্থান নেই। এই ধর্ম কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়বিশেষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা নয় বরং বৃহত্তর মানবজাতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই ধর্মের লক্ষ্য সমগ্র মানবজাতির সার্বিক কল্যাণসাধন। এই ধর্মই বর্তমানে অতি প্রচলিত সরকারি অভিধা 'অসাম্প্রদায়িক' (secular) শব্দটির যথার্থ ব্যাখ্যা।

আজ পৃথিবীর জনসমাজকে একবার মুক্তদৃষ্টিতে দেখলেই আমরা বুঝতে পারব যে, মানবধর্মহীনতার কারণেই মানুষের জীবন আজ সমস্যাসঙ্কুল, যেন মনুষ্যদেহধারী পশুদের হিংস্র দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাতে ভয়ঙ্কর অরণ্যবিশেষ। ❑

---

* বর্তমানে এইসঙ্গে সরকার প্রবর্তিত বিধি-বিধানও যোগ করতে হবে।

জ্যোতির্লিঙ্গ মহাকাল

স্বামী অচ্যুতানন্দ



ইতিপূর্বে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে বিশ্বনাথ, কেদারনাথ, সোমনাথ, নাগেশ্বর, ত্র্যম্বকেশ্বর, ঘৃষ্ণেশ্বর এবং ভীমাশঙ্কর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবারের আলোচনায় জ্যোতির্লিঙ্গ মহাকাল।—লেখক

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চিঃ অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতে মোক্ষদায়িকাঃ।।"
ভারতের সাতটি মোক্ষদাত্রী তীর্থের অন্যতম অবন্তিকা ক্ষেত্র বা উজ্জয়িনী। হায়দ্রাবাদ থেকে ব্যাঙ্গালোর-জয়পুর এক্সপ্রেসে উজ্জয়িনী স্টেশনে এসে নামলাম রাত্রি এগারোটা নাগাদ। সেখান থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত এক প্রাইভেট আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দজীর সঙ্গে তাঁর আশ্রমে এসে পৌঁছালাম। রাত তখন বারোটা।

এই অবন্তিকা ভারতের অন্যতম বিখ্যাত তীর্থস্থান। পুরাণের পাতায় কত তার কথা! ইতিহাস-কাব্য-সাহিত্য কত জায়গায় ছড়িয়ে আছে অবন্তিকা উজ্জয়িনীর উজ্জ্বল চিত্র! আমার আবাল্য স্বপ্নলালিত সেই মহাকালতীর্থ উজ্জয়িনীতে আমি অবশেষে জীবনসায়াহ্নে আসতে পেরেছি! কথা হয়েছে, আগামী কাল সকালেই মহাকালকে দর্শন করতে যাওয়া হবে এবং তারপর উজ্জয়িনীর অন্য সব তীর্থ দর্শন হবে। উজ্জয়িনীর কত নাম—অবন্তিকা, অমরাবতী, কুশস্থলী, ভোগবতী, হিরণ্যবতী, কনকশৃঙ্গা, কুমদবতী, বিশালা, অবন্তী ইত্যাদি। 'উজ্জয়িনী' নাম হওয়ার কারণ—পৌরাণিক মতে ত্রিপুরাসুর দৈত্যকে বধ করার জন্য স্বয়ং মহাদেব এখানকার মহাকাল অরণ্যে রক্তদন্তিকা চণ্ডীদেবীর আরাধনা করে পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন, আর সেই মহাপাশুপাত অস্ত্রেই ত্রিপুরাসুরকে তিনি বধ করেন। প্রবল শত্রুকে 'উজ্জিত' অর্থাৎ পরাজিত করার জন্য এই স্থানের নাম হয় 'উজ্জয়িনী'। আর এই স্থানের নাম 'অবন্তিকা' হওয়ার কারণ—এই পবিত্র নগরী দেবতা, তীর্থ, ওষধি, বীজ ও প্রাণীদের 'অবন' অর্থাৎ রক্ষা করেন।

সম্রাট বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার অন্যতম বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির এই স্থানকে 'নাভিতীর্থ' বলেছেন। কালের হিসাব (সময়ের হিসাব) অনুযায়ী এই স্থানকে 'মধ্যবিন্দু' ধরা হয়। এই স্থানটিকে ধরিত্রীপুত্র মঙ্গলগ্রহের জন্মস্থানও বলা হয়। কালের হিসাব হয় বলেই এখানকার অধিপতি 'মহাকাল'। আদি ব্রহ্মপুরাণে এই তীর্থকে পৃথিবীর সর্বোত্তম নগরী বলা হয়েছে, আর এখানকার পবিত্রসলিলা শিপ্রা বা ক্ষিপ্রা নদীর প্রশংসা করা হয়েছে বারবার। প্রাচীনকালে এখানে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজত্ব করেছেন। অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে, এই মহাকালপুরী ভুক্তি-মুক্তিদাত্রী। গরুড়পুরাণে একে পৃথিবীর সাতটি মোক্ষক্ষেত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। শিবপুরাণ ও লিঙ্গপুরাণে মহাকালকে মর্তলোকের স্বামী বলা হয়েছে। "আকাশে তারকং লিঙ্গং পাতালে হাটকেশ্বরম্/ মৃত্যুর্লোকে মহাকালং লিঙ্গরূপো নমোস্তুতে।।" বাল্মিকী রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের সীতার খোঁজ করার প্রসঙ্গে অবন্তিকার উল্লেখ আছে। মহাভারতেও আছে, অবন্তী রাজ্যের দুই নরেশ বিন্দ আর অনুবিন্দ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেন। পথে আসতে দূর থেকে শিপ্রা নদীকে দেখেছি। এখানে শিপ্রাকে গঙ্গার মতোই পবিত্র নদী বলে মান্য করা হয়।

ঐতিহাসিক যুগে বুদ্ধের সময় এই অবন্তীতে চণ্ডপ্রদ্যোৎ নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তখন অবন্তী, কোশল, মগধ ও বৎস—এই চারটি রাজ্য উত্তর ভারতে প্রধান ছিল। ঐ রাজার মেয়ে বাসবদত্তা এবং বৎসরাজপুত্র উদয়নের জীবন নিয়ে রচিত হয়েছে বিখ্যাত সংস্কৃত সাহিত্য 'স্বপ্ন বাসবদত্তা'।

মগধসম্রাট বিন্দুসারের আমলে উজ্জয়িনী এক ঐশ্বর্যশালী নগরী ছিল। তার ছেলে অশোক যুবরাজ অবস্থায় এগার বছর এই উজ্জয়িনীতেই শাসক ছিলেন। এখানেই তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রার জন্ম হয়।

তারও আগে সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৫৭ সালে সম্রাট বিক্রমাদিত্য শকদের পরাজিত করে 'শকারি' উপাধি পান। তিনিও এই উজ্জয়িনীর মহাপরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁর আমলে এখানকার সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও নানাবিধ

ক্ষেত্রে অভ্যুদয় হয়েছিল। সেই সময়েই তাঁর সভায় বিখ্যাত 'নবরত্ন'-এর সমাবেশ হয়েছিল। সাহিত্য, কলা, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, অঙ্কশাস্ত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় এঁদের প্রতিভা ছিল অতুলনীয়। বিক্রমাদিত্যের ন্যায়প্রিয়তা, বীরত্ব, ঈশ্বরানুরাগ ও সাধনা বহুজনবিশ্রুত। তাঁর 'বত্রিশ সিংহাসন' ও 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' জনশ্রুতির এক রত্নভাণ্ডার। আগামী কাল সেই বত্রিশ সিংহাসন আমরা দেখতে যাব।

মালব্য-নরেশ গন্ধর্ব সেনের বড় ছেলে ভর্তৃহরিকে সিংহাসনে বসিয়ে দেহত্যাগ করলে ভর্তৃহরি তাঁর রাজধানী উজ্জয়িনীতে উঠিয়ে নিয়ে আসেন আর অত্যধিক ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে ওঠেন। তাঁরই ছোট ভাই ছিলেন বিক্রমাদিত্য। বিক্রমাদিত্য দাদাকে অনেক বুঝিয়েও ব্যর্থ হন এবং মনের দুঃখে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দূরে চলে যান। তিনি ছিলেন তন্ত্রসাধক। এখানকার বিখ্যাত হরসিদ্ধি মন্দিরই ছিল তাঁর সাধনক্ষেত্র। অত্যন্ত বিশ্বাসী ছোটভাই বিক্রমাদিত্য রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়াতে রাজা ভর্তৃহরি মনে দুঃখ পান। তখন ভোগে বিতৃষ্ণা আসে, পূর্বজন্মের শুভ সংস্কারের ফলে তিনি সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। তখন মন্ত্রীরা ছোটভাই বিক্রমাদিত্যকে খুঁজে নিয়ে এসে রাজসিংহাসনে বসান। আর ভর্তৃহরি শিপ্রা নদীর তীরে এক গুহায় কঠোর তপস্যা শুরু করেন। আজও উজ্জয়িনী নগরীর প্রান্তে সেই গুহা 'ভর্তৃহরি গুহা' নামে বিখ্যাত।

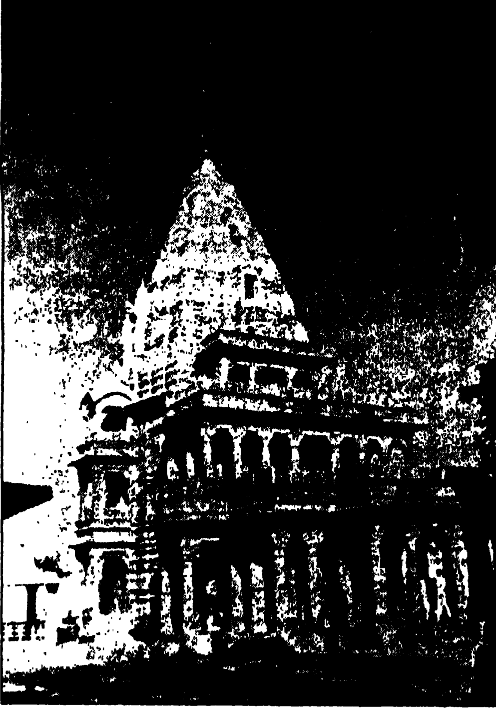
এর পর গুপ্তযুগ। সেই আমলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, যিনি 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি নিয়েছিলেন, তিনি অযোধ্যা থেকে এসে ৩৯৫ খ্রিস্টাব্দে উজ্জয়িনীতে রাজধানী স্থাপন করেন। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এঁরই আমলে ভারতে এসেছিলেন। তিনি উজ্জয়িনীও দেখেছিলেন। বিক্রমাদিত্যের গৌরবমহিমা তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে নানাভাবে উল্লেখ করেছেন। এই আমলে রাজার নীতিপরায়ণতা সর্বোচ্চ সীমায় উঠেছিল। সেইজন্য পণ্ডিতেরা কেউ কেউ অনুমান করেন, ইনিই হয়তো উজ্জয়িনীর সেই বিখ্যাত 'বিক্রমাদিত্য'।

প্রভাকর বর্ধনের ছোট ছেলে হর্ষবর্ধন এখানে ৬০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এঁর আমলে আরেকজন চৈনিক অভিযাত্রী এসেছিলেন ভারতে। তিনি হিউ-য়েন-সাঙ। তাঁর বিবরণীতে দেখা যায়, সেইসময় অবন্তীর ক্ষেত্রফল ছিল ১২০০ বর্গমাইল। আর তার মধ্যে উজ্জয়িনী শহর ছিল ৬ বর্গমাইল। তখন এখানে ১০টি বৌদ্ধবিহারে প্রায় ৩০০ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করতেন। অন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মঠও ছিল ১০টি, যেখানে অনেক বেশি সাধু বাস করতেন। এই নগরীর মানুষ অত্যন্ত ভদ্র ও মৃদুভাষী ছিলেন। ব্যবসায়ে তাঁরা ছিলেন খুব দক্ষ। বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ—সবদিক দিয়ে এটি ছিল ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। হর্ষবর্ধনের ত্যাগ ও শাসন-কুশলতার কথাও তিনি বলে গেছেন। এরপরে এই রাজ্যের অধিকার নিয়ে প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট বংশের সঙ্ঘর্ষের পরে পারমার বংশ এখানে আধিপত্য করে। তাদের শেষ সময়ে দেবপালের আমলে ১২৩৫ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম দিল্লির শাসনকর্তা দাসবংশীয় সামসুদ্দীন ইলতুতমিস উজ্জয়িনীতে প্রথম আক্রমণ ও লুঠতরাজ চালায়। এখান থেকে তিনি বহু ধনরত্ন, বিক্রমাদিত্যের সোনার মূর্তি এবং মহাকাল মন্দিরের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করে নিয়ে যান। পারমার বংশের শেষ রাজা শিলাদিত্য মাণ্ডুর সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে বন্দী হন। সেইসঙ্গে উজ্জয়িনীও মুসলমানদের হস্তগত হয়।

শুরু হয় উজ্জয়িনীর দুর্দশার কাল। তবে আকবরের আমলে এর কিছু পরিবর্তন হয়। তিনিই প্রথম উজ্জয়িনী নগর রক্ষার জন্য এর চারধারে বিশাল প্রাচীর তুলে দেন আর তাতে চারটি দরজা করে দেন। এর মধ্যে 'কালীয়দহ' এবং 'সতী' দরজা এখনো আছে। সতী দরজার মাথায় একটি পুরনো লিপি আজও দেখা যায়। মোগল সাম্রাজ্যের শেষদিকে উজ্জয়িনীতে মারাঠাদের আক্রমণ শুরু হয়। পেশোয়াররা নিজেদের সর্দার সিন্ধিয়াদের এই স্থানটি জায়গির দেন। সেই থেকে উজ্জয়িনী গোয়ালিয়রের প্রসিদ্ধ সিন্ধিয়া বংশের হাতে আসে। ফলে উজ্জয়িনীতে আবার নতুন করে সবকিছু গড়ে উঠতে থাকে, একে একে মন্দিরগুলির সংস্কার হয়, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে, শিল্পক্ষেত্রেও পুনা ও কাঙরা শিল্পের সংমিশ্রণে নতুন শিল্পধারার প্রভাব পড়তে থাকে, যা আজও এখানকার রামজনার্দন মন্দির, কালভৈরব, তিলকেশ্বর ও সন্দীপনী আশ্রমে নানা ফ্রেস্কো দেওয়ালচিত্রে দেখা যায়। স্থানীয় অনেক প্রাচীন বাড়ির দেওয়ালে ও কাঠের নকসার মধ্যেও সেই শিল্পকলার ছাপ দেখা যায়। অতীত ঐতিহ্য ও মাহাত্ম্যে উজ্জয়িনী ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয়। সেকারণে এখানে আসার একটা আলাদা উদ্দেশ্য ছিল আমার।

যাই হোক, স্থানীয় আশ্রমাধ্যক্ষ ভাস্করানন্দজী জানালেন, সকাল আটটার সময় গাড়ি আসবে। প্রথমে মহাকাল দর্শন করে পরে অন্য সব তীর্থ দর্শন হবে। গাড়ি এলে একটি ছাত্র, আমি এবং আশ্রমের জনৈক অন্তেবাসী মহাকালের নাম স্মরণ করে যাত্রা করলাম।

অল্প সময়ের মধ্যেই গাড়ি মন্দিরের বাইরে বড় রাস্তার ধারে দাঁড়াল। আমরা মন্দির-চত্বরে প্রবেশ করলাম। ডানদিকের রেলিং-ঘেরা অংশ দিয়ে চলে যাচ্ছে দর্শনার্থীদের বিশাল লাইন। আমরা কিছু ফুল-মালা-বেলপাতা ইত্যাদি পূজার উপকরণ কিনে নিয়ে ডানদিকের লাইনে না গিয়ে



মহাকাল-মন্দির

বাঁদিকে মাটির নিচে মূলমন্দিরে নামার সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালাম। সামনেই পুলিস ও মন্দিরের শৃঙ্খলারক্ষীরা আমাদের আটকে দিল। তারা জানাল, এখন পূজারীরা মহাকালের নিত্যপূজা অভিষেক করছেন। এখন এই দিক দিয়ে কেউ ভিতরে যেতে পারবে না। তখন আমি রক্ষীদের খুব বিনীতভাবে বললামঃ "অনেকদূর থেকে এসেছি মহাকালকে দর্শন করতে। আবার কবে আসা হবে জানি না। দয়া করে আমাকে ভিতরে যেতে দেবেন?" কি জানি কি হলো! পুলিসদের মধ্যে বয়স্ক একজন হঠাৎ হাতজোড় করে আমার হাত ধরে বলল: "ঠিক্ হ্যায় বাবা, আপ্ অন্দর যাইয়ে। লেকিন ইন লোগো কো উধার সে যানা পড়েগা।"

পূজার সামগ্রী নিয়ে আমি ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে ভূগর্ভস্থ মন্দিরে নামতে লাগলাম। কিছুটা সিঁড়ি ভাঙার পর খানিকটা চাতাল, তারপরে আরো সিঁড়ি ভেঙে একেবারে নিচে নামলাম। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। শ্বেতপাথরের সিঁড়ি, চারিদিক শ্বেতপাথরে বাঁধানো। একেবারে দূর থেকেই মহাকাল দর্শন হলো। দক্ষিণমুখী বড় দরজা। তার সামনে ছোট নন্দীমূর্তি উত্তরমুখে, চারিদিকে বৈদ্যুতিক বাতির আলো। দরজার একপাশ দিয়ে বাইরের সেই দর্শনার্থীরা হাতজোড় করে দর্শন করেই চলে যাচ্ছে। দরজার সামনে দাঁড়ানো বা পূজা দেওয়া এখন নিষেধ। দরজার দুপাশে পুলিস। মূল গর্ভগৃহে রুপোর নকশা করা বিরাট দরজার সামনে দাঁড়াতে পূজারী আমাকে ভিতরে ঢোকার পথ করে দিলেন। আমি একেবারে সোজা মহাকাল লিঙ্গের সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম। তখন গর্ভমন্দিরে বাইরের কোন লোক নেই, শুধু এগারজন ব্রাহ্মণ খালি গায়ে কোমরে উত্তরীয় বেঁধে চারিদিক ঘিরে সমস্বরে 'রুদ্রী' পাঠ করছেন আর মূল পূজারী লিঙ্গের বাঁদিকে একটা উঁচু আসনে বসে ঘটিতে করে দুধ দিয়ে মহাকালকে স্নান করাচ্ছেন। আমাকে তাঁর পাশেই বসতে দেখে তিনি ইশারায় আমাকে পূজার দ্রব্যাদি ওরই মধ্যে নিবেদন করার অনুমতি দিলেন। "তৎ পুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্র প্রচোদয়াৎ ওঁ" মন্ত্রে গঙ্গাজল দিয়ে দুধের ধারার ওপরই মহাকালকে স্নান করালাম। বিল্বপত্র, ফুলের মালা ও ধূপ নিবেদন করে প্রণাম করলাম—"অবন্তিকায়াং বিহিতাবতারং মুক্তিপ্রদানায় চ সজ্জনানাম্। অকালমৃত্যোপরিরক্ষণার্থং বন্দে মহাকালং মহাসুরেশম্।।"

দেখলাম, মহাকাল বেশ বড় কালোপাথরের দক্ষিণমুখী স্বয়ম্ভু লিঙ্গ, যা সচরাচর দেখা যায় না। তান্ত্রিকদের সাধনক্ষেত্র এটি, তাই শিব এখানে দক্ষিণামূর্তি। গৌরীপট্ট বিশাল, রুপো দিয়ে বাঁধানো। তারও বাইরে রুপোর সুন্দর জালিকাটা একহাত উঁচু নকসা-করা রেলিং। লিঙ্গের পূর্বপ্রান্তে রুপোর বিরাট ত্রিশূল ও ডমরু। মন্দিরের উত্তর দেওয়ালের কুলঙ্গিতে ছোট শ্বেতপাথরের পার্বতী, পশ্চিম দেওয়ালের কুলঙ্গিতে সিদ্ধিদাতা গণপতি ও পূর্ব দেওয়ালের কুলঙ্গিতে ষড়ানন কার্তিকেয়ের মূর্তি। সপরিবার মহাকালের পূজাই এখানে হয়। শিবের একপাশে দুটি অখণ্ডজ্যোতি



মহাকাল

প্রদীপ জ্বলছে দিবারাত্র। একটি তেলের, অন্যটি ঘিয়ের। পাশে রুপোর সাপের বিরাট ফণা।

বাইরে বেরিয়ে এসে গেলাম নিকটস্থ কুণ্ডকোটিতীর্থে জলস্পর্শ করতে। মহাকাল দর্শনের পর এই জল স্পর্শ করলে নাকি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। সেখান থেকে গেলাম গর্ভগৃহের ঠিক ওপরে মন্দিরের শিব দর্শন করতে। অতি সুন্দর চারতলা পাথরের মন্দির। ধাপে ধাপে চূড়া উঠে গিয়েছে তিনতলা পর্যন্ত, সামনে ব্যালকনির মতো। একতলায় গর্ভমন্দিরে পাথরের ছোট লিঙ্গনাথ ওঙ্কারেশ্বর। সেখানে গিয়ে তাঁকে প্রণাম ও স্পর্শ করে বেরিয়ে এসে দ্বিতলের শিব নাগচন্দ্রেশ্বরের উদ্দেশেও প্রণাম জানালাম। এই মন্দির সাধারণের জন্য বন্ধ থাকে। বছরের একদিন নাগপঞ্চমীতে এটি সর্বসাধারণের জন্য খোলা হয়।

এখান থেকে বেরিয়ে বিরাট চত্বরে গণপতি, রামদরবার ও অবন্তীদেবীকে দর্শন করে ফিরে এসে গাড়িতে বসলাম। এবারে একে একে অন্য তীর্থ দর্শন হবে। গাড়িতেই সঙ্গী ভক্তটি মহাকাল-মাহাত্ম্য শোনাতে লাগলেন। একদা অবন্তীনগরে ধার্মিক ও পণ্ডিত 'বেদপ্রিয়' নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি নিত্য মাটির শিবলিঙ্গ গড়িয়ে পরম ভক্তিভরে পূজা করতেন। তাঁর চারটি পুত্র ছিল—দেবপ্রিয়, প্রিয়মেধা, সুকৃত ও সুব্রত। এরাও পিতারই মতো ধর্মপ্রাণ ও শিবভক্ত ছিল। তাঁদের ভক্তি ও পুণ্যবলে সেই নগরী "ব্রহ্মতেজোময়ী অভবৎ"। সেইসময় রত্নমাল পর্বতে 'দূষণ' নামে এক অত্যাচারী রাক্ষস ছিল। ধর্মদ্বেষী সেই রাক্ষস ব্রহ্মার তপস্যা করে অসীম শক্তিধর হয়ে সর্বত্র ব্রাহ্মণদের পূজা ও যাগযজ্ঞ নাশ, সতীর ধর্মনাশ ও বেদোক্ত ধর্মের লোপ করার চেষ্টায় যথেচ্ছা ঘুরে বেড়াত। এইভাবে সে একদিন অবন্তী নগরীতে এসে সেখানকার ব্রাহ্মণদের বলল: "যদি বাঁচতে চাও তাহলে এই শিবপূজা, যাগযজ্ঞ সব ছেড়ে দাও। আমার কথা শোন, এতে সুখভোগী হবে, নচেৎ তোমরা আমার বধ্য হবে।" ব্রাহ্মণেরা চিন্তিত হলেও জানতেন, তাঁদের এই বিপদে রক্ষাকর্তা মহাদেব নিশ্চয়ই এসে অসুরনাশ করবেন। তাঁরা প্রার্থনা করতে লাগলেন—"শিব রক্ষাং করোত্বদ্য নান্যথা শরণং শিবাৎ। ইতি স্থৈর্যাং সমাস্থায় পূজান্তে পার্থিবস্য চ।।" দৈত্য ব্রাহ্মণদের এই নির্ভীক আচরণ দেখে তরবারি হাতে ছুটে এলো তাঁদের হত্যা করতে। ব্রাহ্মণরা তখন মাটির শিবলিঙ্গ পূজা করছিলেন। ঠিক সেই সময়ে সেখানে মাটিতে একটা বিকট শব্দ হয়ে মস্ত বড় গর্ত হয়ে গেল, আর সেই গর্ত থেকে মহাকাল আবির্ভূত হলেন। তিনি হুঙ্কার দিয়ে বললেন: "মা হি যাস্ত ব্রাহ্মণানাং সমীপং দূরতো ব্রজ/ ইত্যুক্ত্বা হুঙ্কৃতেনৈব ভস্মাসাৎ কৃতবান্ তদা।"—ওরে অসুর, ব্রাহ্মণদের কাছে যাস না, দূরে চলে যা। এই বলে এক হুঙ্কারে মহাকাল দূষণাসুরকে ভস্মীভূত করলেন। তখন দেবতা ও ধর্মাত্মা ভক্তেরা আনন্দে মহাকালের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন: "হে দেবাদিদেব! আপনি সকলের মুক্তিদান ও কল্যাণের জন্য এইখানেই অধিষ্ঠিত হন।" শিবও 'তথাস্তু' বললেন আর সেই গর্তমধ্যে সকলের মুক্তিদানের জন্য বিরাজ করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণেরা মহাকালের দর্শন ও স্পর্শ পেয়ে মুক্ত হয়ে একক্রোশের মধ্যে লিঙ্গরূপে বিরাজ করতে লাগলেন, আর সেই গহ্বরের মধ্যে মহাকাল দিব্য জ্যোতির্ময় মূর্তিতে বিরাট লিঙ্গাকারে অধিষ্ঠিত হলেন। আজও তাই মহাকাল লিঙ্গ মাটির নিচে ভূগহ্বরে বিরাজিত। আর সেই লিঙ্গরূপী ব্রাহ্মণেরা উজ্জয়িনীর একক্রোশের মধ্যে বহু শিবলিঙ্গ-রূপে ছড়িয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে চুরাশিটি বিখ্যাত। স্কন্দপুরাণে এইসব নামের উল্লেখ আছে। এছাড়া এখানে ছয় গণেশ, চব্বিশ দেবী, চার হনুমান ও অষ্টভৈরব আছেন। এই মন্দির মুসলমান আমলে ধ্বংস হয়। মহাকাল লিঙ্গকে তুলে নিয়ে কুণ্ডকোটিতীর্থের জলে ফেলে দেয় তারা। মুসলমান আমলের পরে সবদার রানীজী সিন্ধে ১৭৩৫ খ্রিস্টাব্দে রামচাঁদ বাবা সাহেবের সাহায্যে ঐ মসজিদ ভেঙে নতুন মন্দির তৈরি করেন এবং কোটিতীর্থের কুণ্ড থেকে শিবলিঙ্গ উদ্ধার করে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ২১৯২৩

তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমাদের গাড়ি এসে পৌঁছল এখানকার বিখ্যাত দেবীপীঠ—একান্ন শক্তিপীঠের অন্যতম হরসিদ্ধি মন্দিরে। এখানে দেবীর কনুই পড়েছিল। আমরা সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরচত্বরে প্রবেশ করলাম। ছোট গর্ভমন্দিরে দেবীর সিঁদুরলিপ্ত শিলাময়ী মূর্তি। তাতে চোখমুখ করা আছে। শোনা যায়, ঐ শিলাতে একটি যন্ত্র ও তাতে কিছু মন্ত্র লেখা আছে। এখানেই রাজা বিক্রমাদিত্য তন্ত্রমতে ঘোর তপস্যা করে নিজের মাথা ১১ বার কেটে মায়ের চরণে অর্পণ করেছিলেন। মায়ের কৃপায় তাঁর মাথা জোড়া লেগে যায় ও তিনি বেতালসিদ্ধ হন। এখানে দেবী মহাদেবের ইচ্ছায় চণ্ড ও প্রচণ্ড দুই অসুরকে বধ করেছিলেন। তাই মহাদেবের ইচ্ছায় তাঁর নাম হয় 'হরসিদ্ধি চণ্ডী'। এটি একটি সিদ্ধপীঠ। এখানে দেবী অন্নপূর্ণার মূর্তিও আছে। প্রবাদ, এই দেবীর আদিস্থান দ্বারকার ১২ কিলোমিটার দূরে সমুদ্রের খাঁড়িতে। দেবীর মন্দিরের সামনে একটি বিরাট দীপস্তম্ভ। এখানে বিশেষ পর্বে ৭২৬টি প্রদীপ জ্বালানো হয়। আমরা মাকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলাম।

এরপরে বড় গণেশের মন্দির। সিন্দূরচর্চিত বিরাট গণেশমূর্তি, দুপাশে তাঁর দুই পত্নী ঋদ্ধি ও সিদ্ধি দেবী করজোড়ে দাঁড়িয়ে। আরেকটি ঘরে অপূর্ব সুন্দর পঞ্চমুখী হনুমান। সেখানে তাঁদের প্রণাম জানিয়ে রাস্তায় নেমে সামান্য এগিয়েই বাঁদিকে রাজা বিক্রমাদিত্যের মন্দিরে গেলাম।



হরসিদ্ধি চণ্ডী

এখানে সিংহাসনে বসা বিক্রমাদিত্যের মূর্তিটি বেশ রাজকীয়। তাঁর চারপাশে, ওপরে ও নিচে বত্রিশটি পুতুল সাজানো। এটাই নাকি 'বত্রিশ সিংহাসন'! তাঁকে প্রণাম করে এবার রওনা হলাম শিপ্রানদীর ঘাটে। ঢালু রাস্তা দিয়ে এসে পৌঁছালাম শিপ্রার বিখ্যাত রামঘাটে। এই নদীর খ্যাতি অবন্তীমাহাত্ম্যে সুন্দরভাবে বর্ণিত। বলা হয়েছে—"নাস্তি বৎস মহীপৃষ্ঠে ক্ষিপ্রায়া সদৃশী নদী।/ যস্যাস্তীরে ক্ষণাৎমুক্তিঃ কিঞ্চিৎ আসেবিতেন বৈ।।"—ধরাপৃষ্ঠে ক্ষিপ্রার সমান পুণ্যবতী নদী আর নেই। এই পবিত্র তীরে কিছুক্ষণ থাকলে ও জলস্পর্শ করলে মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। প্রবাদ, বিষ্ণুর আঙুল কেটে গেলে তার শোণিতধারা থেকে এই নদীর সৃষ্টি। এর স্পর্শে মানুষের মুক্তি তাড়াতাড়ি বা ক্ষিপ্র হয়। তাই এঁর নাম 'ক্ষিপ্রা' বা 'শিপ্রা'।

এবারে আমাদের লক্ষ্য গড়কালিকা। বেশ কিছুটা রাস্তা গ্রাম্য পরিবেশের মধ্য দিয়ে শহর ছাড়িয়ে দুই কিলোমিটার দূরে আমরা এসে পৌঁছালাম একটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের পাশে সুন্দর এক মন্দিরের সামনে। দেবীর মন্দিরের সামনে বাহন সিংহের মূর্তি, ডানদিকে গর্ভমন্দিরে মায়ের বিগ্রহ। শুধুমাত্র সিঁদুরচর্চিত লোলজিহ্বা নিয়ে মায়ের বিশাল মুখখানি দৃশ্যমান, তাতে ত্রিনয়ন, মাথায় মুকুট। বেদির ওপর শুধুমাত্র মুখখানিই দেখা যায়। প্রবাদ, মহাকবি কালিদাস এখানেই দেবীর আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করে কবিখ্যাতি লাভ করেন। দেবীর দুপাশে মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর বিগ্রহ। মন্দিরের পিছনে গণেশ ও সামনে প্রাচীন হনুমানের মূর্তি। মন্দিরের কিছু দূর দিয়ে শিপ্রা নদী বয়ে যাচ্ছে। শোনা যায়, প্রাচীন অবন্তিকা পুরী এখানেই ছিল। এখনো চারিদিকে বহু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। গড়ের চিহ্নও আছে। সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থেকে এই গড় খুঁড়তে খুঁড়তে অনেক প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এখানকার একটি শিলালিপিতে লেখা আছে—সম্রাট হর্ষবর্ধন এই মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করেন।

মা কালীকে প্রণাম জানিয়ে আমরা এবার চললাম একেবারে নির্জন কাঁচারাস্তা ধরে নদীর পাড়ের দিকে। কিছুদূর গিয়ে বেশ কিছুটা সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে একটি পাথরবাঁধানো ঘেরা জায়গায় পৌঁছালাম। চত্বরে প্রবেশ করে দেখলাম, এটি কয়েকটি গুহার সমষ্টি। এটিই রাজা ভর্তৃহরির গুহা। শোনা যায়, এই গুহা বৌদ্ধ শ্রমণদের সমসাময়িক। একটি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ—মাত্র হাত দেড়েক চওড়া এবং প্রায়



বত্রিশ সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা বিক্রমাদিত্যের মূর্তি

কুঁজো হয়ে চলার মতো গহ্বর দিয়ে গুহায় প্রবেশ করতে হয়। গুহার ভিতরে গিয়ে একটু সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায়। সেখানে রাজা ভর্তৃহরির কালোপাথরের ছোট মূর্তি। তার সামনে ধুনি জ্বলছে, পাশে একটি ত্রিশূল। শোনা যায়, এই গুহার মধ্যে আরো গুপ্ত গুহা আছে, যা দিয়ে আগে অনেকদূর যাওয়া যেত। এই গুহায় নাথসম্প্রদায়ের গোরখনাথ ও গোপীচন্দ্রের মূর্তি আছে। রাজা ভর্তৃহরি ভোগবিলাস ত্যাগ করে কিভাবে কঠোর তপস্যায় আত্মদর্শন করেছিলেন, তা ভেবে শ্রদ্ধায় মাথা এমনিই নত হয়।

এরপর গেলাম সন্দীপনী মুনির আশ্রমে। এখানে কৃষ্ণ ও বলরাম আসেন শিক্ষাগ্রহণ করতে। শহর থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে সুন্দর গাছপালায় ঘেরা এই তপোবন। এখানে একটি বহু প্রাচীন শিবলিঙ্গ ও আরো প্রাচীন শিববাহন নন্দীর মূর্তি আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের মতে, এই দুটি বিগ্রহ উজ্জয়িনীর বহু প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষী। সামনেই একটি আধুনিক নাটমণ্ডপের মতো, সেখানে বৈষ্ণবসাধক বল্লভাচার্যের আশ্রম। এঁরা বলেন 'বৈঠক'। সেখানে একটি মন্দিরে কৃষ্ণ, বলরাম ও সুদামার পাথরের বালকবিদ্যার্থী মূর্তি রয়েছে। সন্দীপন মুনির মূর্তিও আছে। একটু দূরে একটি কুণ্ড। প্রবাদ, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্লেটে লেখার পরে ঐ কুণ্ডের জলে স্লেট ধুতেন, আর গুরু সন্দীপনের ইচ্ছায় বালক কৃষ্ণ ঐ কুণ্ডেই গোমতী নদীর আবির্ভাব ঘটান—গুরুদেব যাতে নিত্যই এই কুণ্ডে গোমতী-স্নান করতে পারেন। সেই কুণ্ডটি আজ বাঁধানো বেশ বড় পুকুরের মতো। নিচ পর্যন্ত ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে। তবে জলের রং সবুজ।

সন্দীপনী মুনির আশ্রম থেকে এবারে এলাম শিপ্রা নদীর ধারে প্রাচীন কালভৈরব মন্দিরে। শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে গ্রামের মধ্যে মন্দিরে বেশ প্রাচীন পাথরের তোরণ। প্রাচীরের গায়েও পাথরের মূর্তি খোদাই করা। প্রাচীনত্বের ছাপ এর সর্বাঙ্গে। এই মন্দির তান্ত্রিক অঘোরপন্থী সাধুদের সাধনার স্থান। গর্ভমন্দিরে বিরাট কালভৈরবের সিন্দূরলিপ্ত একখানি মুণ্ড মাত্র। তাতে রয়েছে দুটি অক্ষিগোলক। তার মধ্যে কোন পাথরজাতীয় কিছু আছে, আলো পড়লে জ্বলে। তৃতীয় নেত্রটি রুপোর। শরীরের নিম্নাংশ কালো কাপড়ে ঢাকা। মাথায় মুকুট, গলায় মালা। বিশেষত্ব হলো—ঐ মুখমণ্ডলের ঠোঁটদুটি ঈষৎ ফাঁক এবং অধরোষ্ঠ রক্তবর্ণ। এই ভৈরবের পূজায় তন্ত্রমতে 'কারণ' নিবেদন করা হয়। পূজাপদ্ধতিও পুরো তান্ত্রিক।

এবারে ফিরতি পথে বহু প্রাচীন 'সিদ্ধবট' বা 'সিদ্ধনাথ' দর্শন করলাম। যেমন প্রয়াগে 'অক্ষয়বট', এখানেও তেমনি এই সিদ্ধবট বহু প্রাচীন। মোগল যুগে এই গাছ কেটে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারপরে তার থেকেই আবার নতুন গাছ বেরোয়। এই গাছের তলায় অনেকে শ্রাদ্ধাদি কর্ম করে।

বাজারের কাছেই ২৪টি থামের ওপর একটি তোরণ দেখা গেল, দ্বারের দুই পাশে মহালয়া ও মহামায়ার মূর্তি আছে। প্রাচীন এই দ্বারকে এখানে 'চব্বিশ খাম্বা' বলে। এবারে আশ্রমের দিকে রওনা হলাম।

পরদিন ভোরে স্নান করে খালি গায়ে আবার মহাকাল মন্দিরে এলাম। যখন গর্ভমন্দিরে ঢুকলাম, তার সামান্য আগে মহাকালের মহাস্নান আরম্ভ হয়েছে। মহাস্নান এগিয়ে চলে যথাবিধি—পঞ্চামৃত আলাদা আলাদা করে স্নান করানো হলো বৈদিক মন্ত্রে। তারপরে গঙ্গা-শিপ্রা জলে স্নান ও চন্দনাদি সুগন্ধ লেপন। এরপর হলুদ, বিভূতি ও কুঙ্কুম দিয়ে শিবের দক্ষিণ গাত্রে খুব সুন্দর করে এক পূজারি চোখ-মুখ-গোঁফ আঁকলেন। তারপর লিঙ্গের মাথায় বিরাট রৌপ্যনির্মিত সাপের ফণা বসিয়ে দেওয়া হলো। পাশে রাখা হলো রুপোর ত্রিশূল ও ডমরু। এরপর শুরু হলো আরতি। পঞ্চপ্রদীপ, পঞ্চকর্পূর, দীপ, শঙ্খ, বস্ত্র, পুষ্প ও চামর দিয়ে প্রায় একঘণ্টা ধরে আরতি চলল। সারাক্ষণই নানা বাদ্যযন্ত্র ও তালে তালে মন্ত্রপাঠ চলছিল।

আরতি শেষ হওয়ার সময়ে একবার সবাইকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হলো, অন্য সাধুদেরও চলে যেতে হলো। কিন্তু আমি থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম। এইসময় গর্ভমন্দিরের সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হলো। আরতি থেমে গেল। এবার এলেন স্থানীয় জুনা আখড়ার এক নবীন সন্ন্যাসী। এটিই এই উষা আরতির প্রধান অঙ্গ। তাঁর হাতে একটা বড় রক্তবস্ত্রের পুঁটলি। সেই পুঁটলিটি দুহাতে ধরে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে তিনি শিবের চারপাশে ঘোরাতে লাগলেন। আর শিবের সর্বাঙ্গ ঢেকে যেতে লাগল ভস্মে। এটি চিতাভস্ম। এই আরতির নাম ভস্মারতি। পৃথিবীর আর কোথাও চিতাভস্ম দিয়ে এইভাবে আরতি হয় না। একমাত্র তন্ত্রসিদ্ধপীঠ মহাকালেই শেষরাত্রে চিতাভস্ম দিয়ে আরতি হয়। এসময় মন্দিরে কোন মহিলা বা জামা-প্যান্ট পরা লোকের প্রবেশ নিষেধ। এ এক অপূর্ব আরতি, অদ্ভুত পরিবেশ! প্রায় দু-আড়াই ঘণ্টা ধরে এই আরতি ও ভস্মারতি চলল। শেষ হতে আবার আলো জ্বলে উঠল।

এবার পূজারির কাছ থেকে একটু ভস্ম-চন্দন চেয়ে নিলাম এবং মহাকালকে স্পর্শ করে জীবন সার্থক করা এক পুণ্যস্মৃতি নিয়ে আশ্রমে ফিরে চললাম। মনে পড়ল একটি হিন্দি দোঁহা—

"অকালমৃত্যু যো মরে, যো কার্য করে চণ্ডালকা।
কাল উস্‌কা ক্যা করে যো ভক্ত হো মহাকাল কা।।" ❑

স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি

শান্তি সিংহ

গভীর বেদনা আর নিরুদ্ধ অভিমানে তোমার মনে জেগেছিল
জাতীয় অর্ণবপোত উপমা
সেই অভিমান আজ হিমালয়ের মতন বিশাল-প্রবল
তা থেকে হাজার হাজার ধারায় ছুটে যায় ভালবাসার নদী!

আমাদের নিজেদের দোষেই জাতীয় চেতনার অটুট জাহাজে
একটা-দুটো নয়, হাজার ছিদ্র
সমস্যার গহিন সাগরে জাহাজ ডুবছে, কিভাবে নিস্তার পাওয়া যায়
তার কথা না ভেবে
আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের দোষ বিচার করছি, বর্ষণ করছি অজস্র কটূক্তি!

একদা তুমিই বলেছিলে—আমাদেরই তো ঐ ছিদ্র বন্ধ করতে হবে,
এস সানন্দে, হৃদয়ের রক্ত দিয়ে আমরা এই কাজ সম্পন্ন করি,
আর যদি আমরা না পারি, এস আমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হই।
আমরা আমাদের বুদ্ধি খাটিয়ে ঐ ছিদ্র বন্ধ করব
কিন্তু কখনোই এর নিন্দা করব না।

জলভরা শ্রাবণের মেঘের মতন গভীর ভালবাসায় তুমিই তো বলেছিলে—
আমি তোমাদের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত।
যদি না শোন, এমনকি আমাকে যদি ভারতভূমি থেকে
পদাঘাত করে বের করে দাও
তবুও আমি তোমাদের কাছে ফিরে আসব।
ফিরে এসে বলব—আমরা সকলে ডুবতে বসেছি
সেইজন্যই আমি তোমাদের মধ্যে এসেছি।
আর যদি আমাদের ডুবতেই হয়, আমরা সকলে একসঙ্গেই যেন ডুবি;
কিন্তু কারো প্রতি কোন কটূক্তি, কোন অভিশাপ
যেন আমাদের মুখ থেকে বর্ষিত না হয়।

তোমার বিশাল হৃদয়ে বুদ্ধ-চৈতন্য আর শ্রীরামকৃষ্ণের করুণা
দিগ্‌ভ্রান্ত মানুষদের বাঁচার পথ দেখায়
এই দ্বন্দ্বমুখর বিচিত্র জগতে ভাবসমন্বয়ের অনন্ত প্রেমপাথারই তোমার উৎস!

তোমাকে তাই

রামকৃষ্ণ দাশ

বিশ্বচরাচর কুয়াশায় আজ আচ্ছন্ন
দিগন্তে আজ রক্তের হোলিখেলা
লালে লাল চারিদিক
তোমাকে তাই, ওগো চাই
আমরা যে চাই।
তরুণ রক্তে বিপ্লব আজ নেই
বিচ্ছিন্নতা? পাশাখেলা যেন,
ছেলের রক্তে মায়ের বিকিকিনি
তোমাকে তাই, ওগো চাই
আমরা যে চাই!
বিসুভিয়াসের শীর্ষে দাঁড়িয়ে
রয়েছি আমরা
এক এক করে শুধু প্রহর গণছি;
তোমাকে ভাবছি, তোমাকে জানছি—
তোমাকে তাই, ওগো চাই
আমরা যে চাই!

প্রার্থনা

শিউলি সেনগুপ্ত

পর্দাটা সরিয়ে দাও প্রভু,
আবরণ তুলে নাও।
অন্ধকারে হাঁটছি পথে,
আলোটা জ্বালিয়ে দাও।

কখন আমি বুঝব, প্রভু,
সব যে তোমারি হাতে।
একলা কভু চলি না আমি,
তুমি আছ সাথে।

তোমার অসীম কৃপা ছাড়া
নেই কোন উপায়।
আমার চোখটা দাও না খুলে
যাতে তোমায় দেখতে পাই।

তুমিই আমার বন্ধু, প্রভু,
তুমিই আমার নাথ।
এস কাছে, পাশে দাঁড়াও,
ধর আমার হাত।



প্রাণের ঠাকুর

দীপান্বিতা মিত্র

চর্মচক্ষে দেখিনি তোমায়,
দেখেছি মানসচক্ষে।
মুরতি তব অঙ্কিত করি,
রেখেছি হৃদয়কক্ষে।

এ ভবসাগর অনন্ত অপার
দুখের পারাবার,
হে শরণালয়, তোমা বিনা
কেমনে হই পার?



৫

হে বীর

বিভাস রায়

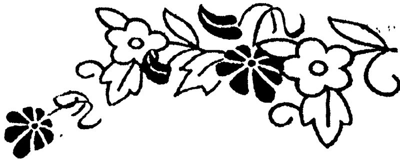
কে তুমি ফিরিছ দুয়ারে দুয়ারে নবীন বারতা নিয়া,
অনন্ত নীল অম্বরসম মুক্ত উদার হিয়া।
প্রেমের বারিধি উছলে সেথা ত্যাগের অগ্নি জ্বলে,
সাহস বীর্য গর্জিছে সেথা শত সিংহের বলে।
শত আগ্নেয়গিরি চাপা আছে রাঙা গেরুয়ার নিচে,
মহারুদ্রের ভৈরব নাচ শান্ত আঁখির পিছে।
অন্যায় আর অবিচার মাঝে ধরা পাছে পড়ে ধরা,
হিমশৈলের মতো ভীমবেগে নেমে এলে তাই ত্বরা।
সত্য ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক, হে কলির ব্যাসঋষি;
ত্যাগ ও প্রেমের মহান মন্ত্রে জাগাইলে দশদিশি।
চরম ত্যাগের শ্রেষ্ঠ পথিক বুদ্ধদেবেরে জানি,
আজন্ম ত্যাগী বিবেকের কাছে গিয়েছেন হার মানি।
জ্ঞানে শঙ্কর, প্রেমে খ্রিস্টের সম পর্যায়ে উঠি
জ্ঞানসূর্যের আলোকে প্রেমের পদ্ম উঠালে ফুটি।
বিশ্বভ্রাতৃত্ব-প্রেমের যে-জ্ঞান মহম্মদের মাঝে
নিয়েছিল ঠাঁই—তোমার হৃদয়ে আজ দেখি তাই রাজে।
ধ্রুবতারাসম জ্বলে ওঠ পুনঃ পথের দিশারী হয়ে,
জড় জাতি যেন চলে চেতনায় তব মহাব্রত লয়ে।
সারা পৃথিবীর মহাবিস্ময়, ভারতের গৌরব;
পূতপবিত্র চরিত্র তব, সুমধুর সৌরভ।
হে মহান যোগি! বীর সন্ন্যাসি! জয়ি' লোভ-মোহমদে
প্রণাম, প্রণাম, অযুত প্রণাম তোমার পদ্মপদে।



অচেনা কান্না

জয়দীপ ঘোষ

স্বপ্নে দেখলাম তোমাকে হঠাৎ;
চেনা গেরুয়া পোশাকে নয় মোটেই,
বরং সবুজ, সদ্য বৃষ্টিভেজা কচি ঘাসের মতো।
বুকের বাঁদিকটা ভেজা লাল—
রক্ত নাকি? চোখে শিশিরকে লজ্জা দেওয়া
দুফোঁটা জল, কেন বল তো?
আর হাতে ওগুলো কি? খাতা... কলম...
'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার'... কিংবা
'জানি জানি এ পানীয় কালকূট ঘোর...'
লেখা হচ্ছে একের পর এক;
নীল বা কালো কালিতে কি লেখা যায়
এমন লাইন? বাঁদিকের ভেজা লালে ডুবিয়ে লেখা,
তারপর লেখা ছেড়ে উঠে দাঁড়ানো
একলা... আর তখনি দেখলাম
পূর্ণিমার চাঁদ তোমায় স্নান করাল জ্যোৎস্নায়,
আকাশের সবকটা তারা মাথায় পরাল মুকুট, আর
পৃথিবী তার সমস্ত বুকটা চিতিয়ে
মেলে ধরল তোমার পায়ের তলায়।
শুধু আমারই কিছু দেওয়ার নেই
শুধু আমিই নির্বাক্ নিঃস্ব রিক্ত, কেবল
সকালে উঠে চোখের কোণ আর
বালিশ ভিজে একাকার—এইটুকুই।
কান্নায় এত শান্তি লুকনো থাকে... উফ্!
চোখের জলেও এত ফুল ফোটে!! বল তো তুমি।



অযান্ত্রিক

দীপঙ্কর বিশ্বাস



তোমার কথা সত্যি সবই, তোমার কথাই ঠিক
তাই না জেনে আমরা আজও হচ্ছি দিশ্বিদিক্।
তুমি শুধু সন্ন্যাসী নও, তুমি মানব-বীর
তুমি শেখাও নির্ভিকতা, রাখতে উঁচু শির।
তুমি শেখাও ধর্ম শুধু কৃচ্ছ্রসাধন নয়
জীবসেবাতেই শিবের সেবা, ধর্মে তাতেই জয়।
অন্ধ যারা মাতোয়ারা অলীক স্বপন পরে,
তোমার প্রভু মিশে আছেন মেথর মুচির ঘরে।

দেশটা যখন ডুবুডুবু গহিন অন্ধকারে
সূর্য হয়ে তুমি তখন জাগিয়েছিলে তারে।
পরকে আপন করতে শেখাও অহং-এর বিলয়ে
বিশ্ব তোমায় চিনেছে তাই অনন্ত বিস্ময়ে।
অন্ধ মোহের আবর্জনা জ্বালাও জ্ঞানানলে
তাই তো তোমার দুচোখ জুড়ে দৃপ্ত শপথ জ্বলে।
দূরের থেকে তোমায় শুধু মুগ্ধ প্রণাম নয়
গড়তে হবে নতুন ভারত প্রদীপ্ত দুর্জয়।

অলংকরণ : [illegible] ঘোষ

শতাব্দীর গোড়ায় ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সালতামামি

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

"দুর্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না, আমাদিগকে সবল মস্তিষ্ক হইতে হইবে। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরো নিকটবর্তী হইবে।"—এই চিরস্মরণীয় বাণীর উদ্গাতা স্বামী বিবেকানন্দ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির মতো ক্রীড়াক্ষেত্রেও আমাদের উজ্জ্বলতর সত্যালোকের পথপ্রদর্শক। নিজে সমস্তরকম খেলাধূলা ও শরীরচর্চা করেছেন, পরাধীন দেশের মানুষকে উদ্দীপ্ত করেছেন শরীরচর্চার মাধ্যমে শক্তিশালী জাতি গঠনের ক্ষেত্রে। আধুনিক অলিম্পিকের সূচনাকালের অব্যবহিত পরেই স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন। মানবসভ্যতার উন্নতি ও বিকাশে অলিম্পিক আদর্শের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনেরও অবদান অনস্বীকার্য। খেলাধূলার মাধ্যমে বিশ্বমৈত্রী, ঐক্য, সংহতি ও মানবতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করে প্রতিটি মানুষের জীবনসত্যের সঙ্গে শাশ্বত সত্যের আত্মিক বন্ধন তৈরি করাই অলিম্পিকের চিরন্তন লক্ষ্য। তাই ভোগসর্বস্ব, সন্ত্রাসবাদ ও জাতিগত বৈরিতায় দীর্ণ এই পৃথিবীতে খেলাধূলাই আনতে পারে সৌভ্রাতৃত্বের বাতাবরণ। আলোচ্য নিবন্ধে গত একবছরে আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার পটভূমিকায় ভারতবর্ষের ভূমিকা নিয়ে পর্যালোচনা তাই স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্যের দায়বদ্ধতাস্বরূপ।

সিডনি অলিম্পিকে ভারতের ব্যর্থতা নতুন শতাব্দী ও সহস্রাব্দের সূচনাপর্বে অবশ্যই এক বড় ধাক্কা। কিন্তু তার পরই বিশ্বনাথন আনন্দের হাত ধরে দাবার রাজসিংহাসনে উঠে আসে ভারত। যে-খেলাটির জন্ম ভারতবর্ষে, সেই খেলাটিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন একজন ভারতীয়—এব্যাপারটা আমাদের জাতীয় জীবনে অবশ্যই এক তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা। এবারও বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে 'ভিশি' আনন্দ সেমিফাইনালে উঠেছিলেন। আনন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবর্তী পর্বে উঠে এসেছে আরো বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান খুদে দাবাড়ু, যারা ইতিমধ্যেই বিশ্বদাবায় ভারতের জয়পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে। পেণ্টাইয়া হরিকৃষ্ণ জুনিয়র বিশ্বখেতাব ও কমনওয়েলথ খেতাব পরপর জিতে আনন্দের যোগ্য উত্তরসুরি হিসাবে নিজেকে তুলে ধরেছে। অন্যদিকে কোনেরু হাম্পিও বালিকা বিভাগে অনুরূপ কীর্তির অধিকারিণী। এবছর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ছয় ভারতীয় দাবাড়ু মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে—এই ঘটনাটাও ভারতীয় দাবার উজ্জ্বল গৌরবগরিমার যথার্থ প্রতিফলন। তুরস্কের ইস্তাম্বুলে গত দাবা অলিম্পিয়াডে এঁরাই ভারতকে তুলে নিয়ে এসেছেন সপ্তম স্থানে।

ভারতের জুনিয়ার হকি দল সম্প্রতি বিশ্ব জুনিয়ার হকিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেশবাসীকে নতুন করে স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছে। সিনিয়র দলের ধারাবাহিক ব্যর্থতা ভুলিয়ে দিয়েছে এইসব জুনিয়ার ছেলেরা। চারবছর আগে লণ্ডনের অনতিদূরে মিল্টন কেইন্সে রানার্স হওয়ার পর এবছর অস্ট্রেলিয়ার হোবার্টে ফাইনালে আর ভুল করেনি কোচ রাজিন্দর সিংহের ছেলেরা। ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে প্রথম থেকেই চেপে ধরে ৬-১ গোলের বিশাল ব্যবধানে জয় তুলে নেয় ভারতের তরুণ তুর্কিরা। গ্রুপ লিগে একমাত্র অস্ট্রেলিয়া ছাড়া আর কোন দলই ভারতীয়দের গতিরোধ করতে পারেনি। দীপক ঠক্কর টুর্ণামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছে, পেনাল্টি কর্ণার কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে আশাতীত দক্ষতা দেখিয়েছে ডিফেণ্ডার যুগরাজ সিংহ। আসন্ন সিনিয়র বিশ্বকাপে এরাই ভারতের আশা-ভরসা। গতবছর জুনিয়ার হকি খেলোয়াড়দের এই কীর্তি এককথায় ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্রে সর্বোত্তম ঘটনা। অবশ্য এপ্রিলে সিনিয়ার টিমও ঢাকায় এক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়েছিল। সম্প্রতি তারা চ্যাম্পিয়ন্স চ্যালেঞ্জারেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

প্রকাশ পাড়ুকোনের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে পুল্লেলা গোপীচাঁদ গতবছর ব্যাডমিণ্টন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান অল ইংল্যাণ্ড খেতাব জিতেছেন। পরপর অলিম্পিক ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদ্বয়কে হারিয়ে গোপীচাঁদ বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর এই খেতাব জয় কোনমতেই 'ফ্লুক' বা অঘটন নয়। অল ইংল্যাণ্ড খেতাব জয় তাঁর ধারাবাহিক উন্নতির রেখাচিত্র ধরে উঠে আসা এক স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি। গোপীর পর অভিনশ্যাম গুপ্তও ভারতের মর্যাদা বাড়িয়েছেন ফরাসি ওপেন জিতে।

টেনিসে লিয়েণ্ডার পেজ ও মহেশ ভূপতি জুটির কাছে অবশ্য আরেকটু বেশিই প্রত্যাশা ছিল। সিডনি অলিম্পিকের ঠিক আগে তাঁদের ভাঙা সম্পর্ক জোড়া লাগে। অলিম্পিকে ব্যর্থ হলেও ভাবা হয়েছিল, দীর্ঘদিন একসঙ্গে খেলার

অভিজ্ঞতা ও একাধিক বড় মাপের আন্তর্জাতিক সাফল্য তাঁদের পকেটস্থ থাকায় ২০০১-এ আবার গ্রাণ্ড স্লামে ১৯৯৯-এর গৌরবময় অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি হবে। বাস্তবে কিন্তু ফরাসি ওপেন ছাড়া বাকি তিনটি গ্রাণ্ড স্লামে চূড়ান্ত ব্যর্থ তাঁরা। '৯৯-এ দুটি গ্রাণ্ড স্লামে চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছাড়াও বাকি দুটিতেও ফাইনালে উঠেছিলেন তাঁরা। গতবছর অবশ্য গোটা তিনেক এ. টি. পি. খেতাব জিতেছেন লি-হেশ জুটি। এর মধ্যে একটি ছিল সুপার নাইন সিরিজের মাস্টার্স খেতাব। যাই হোক, বছরটি তাঁরা শেষ করেছেন বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে তিন নম্বর স্থানে থেকে।

শুটিংয়ে ইউরোপ মাতিয়ে এসেছেন ১৮ বছরের 'টিন এজার' অভিনব বিন্দ্রা। স্পেনের মাদ্রিদে বিশ্ব শুটিংয়ে এই বালকবীরের পারফরমেন্স দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত ইউরোপের উন্নাসিক শুটিং বিশেষজ্ঞরা। ১০ মিটার এয়ার রাইফেল বিভাগে বিশ্বরেকর্ডও গড়ে ফেলেছেন অভিনব, যা ভারতের শুটিং ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। যশপাল রানা, মানসের সিংহরা পারেননি, অভিনব বিন্দ্রা কি বহু প্রতীক্ষিত অলিম্পিকের সোনাটি আনতে পারবেন? যোগ্যতা, ক্ষমতা যদি মাপকাঠি হয়, তবে আশাবাদী না হওয়ার কোন কারণ নেই।

অ্যাথলেটিক্সে অবশ্য আশাব্যঞ্জক কিছু দেখা যাচ্ছে না। সিডনী অলিম্পিকের ট্র্যাকের পথ ধরে কেরলকন্যা বীনামল গত বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সেও তাঁর নিজের ইভেন্টে সেমিফাইনালে উঠেছিলেন। ব্যাস, ঐ পর্যন্তই! সার্বিকভাবে আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্সে ভারতের ছেলেমেয়েরা ক্রমেই পিছু হটছেন। সাঁতার, জিমন্যাস্টিক্সের অবস্থাও কহতব্য নয়। তবে প্রতিযোগিতামূলক সাঁতারে কিছু করে দেখাতে না পারলেও দূরপাল্লার সাঁতারে কিন্তু ভারতীয় সাঁতারুরা তাদের সুমহান ঐতিহ্যের গৌরবগাথা ধরে রাখতে পেরেছেন। এপ্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় প্রতিবন্ধী সাঁতারু মাসুদুর রহমান বৈদ্যের কথা। ১৯৯৭-এ ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে তিনি বিশ্বে শোরগোল তুলেছিলেন। গত বছর অতিক্রম করে এলেন জিব্রালটার প্রণালী। স্পেন ও মরক্কোর মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী এই জিব্রালটার প্রণালী হিংস্র সামুদ্রিক প্রাণীতে পূর্ণ এক বিপজ্জনক চ্যানেল। মাসুদুর কিন্তু তাঁর শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে, হিংস্র সামুদ্রিক প্রাণীর আক্রমণ উপেক্ষা করে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। অসাধারণ কৃতিত্ব! একজন প্রতিবন্ধী সাঁতারুর পক্ষে এ এক অনন্যসাধারণ কীর্তি। তবে সামুদ্রিক ঝড় না উঠলে চারঘণ্টার কম সময়ে জিব্রালটার প্রণালী সাঁতরে বিশ্বরেকর্ডও করে ফেলতে পারতেন তিনি।

মাসুদুরের কীর্তির আগের বছর বাংলার আরেক গৌরব বুলা চৌধুরী জিব্রালটার প্রণালী অতিক্রম করেন। দুবার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার পর বুলার জিব্রালটার প্রণালী জয় করা বাঙালী নারী তথা জাতীয় ক্রীড়াজগতে এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত। মিহির সেনের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে সপ্তসিন্ধু জয় করাই বুলার উদ্দেশ্য। জাতীয় সাঁতারে একদা অপ্রতিদ্বন্দ্বী বুলা আন্তর্জাতিক মিটের ব্যর্থতা সত্ত্বেও ভেঙে পড়েননি। যে-বয়সে প্রতিটি ভারতীয় নারী ঘর-সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, সেই বয়সে বুলা চলেছেন অতিমাত্রিক সব অ্যাডভেঞ্চারে!

সিডনি অলিম্পিকে গোটা ভারতবর্ষের ব্যর্থতা ও হতাশার কালো অন্ধকারের মধ্যে শিবরাত্রির সলতে হয়ে জ্বলে উঠেছিলেন কর্ণম মালেশ্বরী। প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসাবে মালেশ্বরী ভারোত্তোলনে ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে এসেছিলেন দেশের জন্য। তাঁর সুযোগ্য সতীর্থা কুঞ্জরানী দেবী অলিম্পিক পদক না জিতলেও বিশ্বপর্যায়ে অন্যান্য সাফল্যের নিরিখে গত বছর আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলন সংস্থার বিচারে শতাব্দীর সেরা মহিলা ভারোত্তোলকদের মধ্যে নিজের নামটি সযত্নে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছেন।

সম্প্রতি যোগাসনে চমকপ্রদ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বাঙালী ছেলে গোপাল দাস। সাম্প্রতিক বিশ্ব যোগাসন প্রতিযোগিতায় গোপাল অনুপম দেহসৌষ্ঠবের ব্যঞ্জনাদীপ্ত কলাকৌশল প্রদর্শন করে ভারতীয় যোগাসনের সুমহান ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন।

স্বদেশে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ঐতিহাসিক সিরিজ জয় অবশ্য সাফল্যের মানদণ্ডে সিন্ধুতে বিন্দুর মতো। তবে ভারতের টেস্ট ক্রিকেটের সত্তর বছরের ইতিহাসে এ-দুটি সিরিজ জয় অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। ফুটবলে অবশ্য সেটুকুও সান্ত্বনা পাওয়ার মতো কোন ঘটনা নেই। প্রি-ওয়ার্ল্ড কাপে সংযুক্ত আরব আমীরশাহীকে ঘরের মাঠে হারিয়েও দ্বিতীয় রাউণ্ডে উঠতে ব্যর্থ ভারত। ইংল্যাণ্ড সফর, মারডেকাতেও হতাশাব্যঞ্জক অধ্যায়ের নিরন্তর যতিচিহ্ন।

তবে মাঠের খেলার বাইরে সামাজিক কর্মকাণ্ডে কিন্তু একজন ভারতীয়ের সাংগঠনিক দক্ষতা ও উৎকর্ষের চূড়ান্ত স্বীকৃতি দেখতে পাচ্ছে ভারতবাসী। প্রাক্তন টেনিস তারকা বিজয় অমৃতরাজ এই মুহূর্তে রাষ্ট্রসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক শান্তিদূত হিসাবে দেশে দেশে শান্তির আবহে ঐক্য ও সম্প্রীতির জন্য ঘুরছেন। এপর্যন্ত বিশ্বের ছয় কৃতী ও স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিজয় অমৃতরাজ যে যথার্থই একজন আন্তর্জাতিক ভারতীয়, তা তাঁর এই পদপ্রাপ্তিতেই প্রমাণিত সত্য। ❑

পরাধীন ভারতে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন বিবেকানন্দ

তুষারকান্তি ঘোষ



উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বের কথা। রাজনৈতিক সংগঠনের ক্ষেত্র তখন প্রস্তুত। সঙ্ঘর্ষ শুরু হয়েছে। বিপ্লবী সত্তা তখনো তীব্রভাবে জাগেনি। সমাজ স্থবির। পরাধীন জাতি আত্মবিস্মৃত, আত্ম-অসচেতন। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ভারতের ক্ষুদ্র কুটির পর্যন্ত এঁকে চলেছে মৃত্যুর বিভীষিকাময় আলপনা। নিয়মতান্ত্রিক বেড়াজালে রাজনৈতিক কার্যকলাপরূপী দেশপ্রেমের স্রোতস্বিনী প্রায় সুপ্ত। এই সময়েই চেতনার চাবুক নিয়ে ভারতের মাটিতে বিবেকানন্দের আবির্ভাব। তেজোদীপ্ত এই সন্ন্যাসীর দুটি রূপ—বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে তিনি বলেছেন ঃ "I have message to the West." ভারতবর্ষ এখনো শিক্ষাগুরু। ভারতের অপমানে আহত সন্ন্যাসী বিদেশকে কষাঘাত করেছেন, আর দেশের মানুষকে কষাঘাত করেছেন দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে। নতুনভাবে জাতিকে এক চৈতন্যময় সত্তায় জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরই চেতনায় ভারত এই শতাব্দীতে প্রথম শিখেছে জেগে ওঠার মানসব্রত।

বিবেকানন্দ যখন তারুণ্যের প্রখর তাপে উজ্জ্বল, তখনি আশ্রয় পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহচ্ছায়ায়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীর ভাষায়—"দক্ষিণেশ্বরের এই অলোকসামান্য সাধকের সান্নিধ্যে থেকেও দীর্ঘ ছয় বছর বিবেকানন্দ তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অটুট রাখার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু একটু একটু করে ভেঙে গিয়েছিল তাঁর সমস্ত প্রতিরোধ। অবশেষে আত্মসমর্পণের মধ্যেই বিবেকানন্দ লাভ করলেন পরম প্রশান্তি।"[১] শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে এক বিশাল দায়িত্ব দিয়েছিলেন—বিচার, বিবেক ও আদর্শের মাধ্যমে নরের মধ্যে নারায়ণকে জাগ্রত করার। কিন্তু তাঁর দেহত্যাগের পর বিবেকানন্দ দেখলেন, আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষে নিপীড়িত, নির্যাতিত, পরাধীনতার গ্লানিতে পিষ্ট, মৃত্যু-বেদনায় কাতর জীবের মধ্যেই বিরাজ করছেন তাঁর উপাস্য শিব। বিচলিত বিবেকানন্দ ঝলসে উঠলেন। এরপর শুরু হয়েছিল তাঁর বিশাল কর্মযজ্ঞ।

স্বদেশী আন্দোলন শুরু হওয়ার কিছু পূর্বে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন। দেশের দুঃখ-দুর্দশায় যিনি তীব্রভাবে কাতর হয়ে পড়তেন—সেই বিবেকানন্দ বঙ্গভঙ্গের সময় বেঁচে থাকলে হয়তো স্বদেশবাসীকে পথনির্দেশ অথবা নেতৃত্বদান করতেন। এমন মন্তব্য অনেক বিপ্লবী ও দেশনেতা করেছেন। উনবিংশ শতকে এদেশে যে জাতীয়তাবাদ উদ্দীপ্ত হয়েছিল, তাতে বিবেকানন্দের প্রভাব ছিল তীব্র। পরাধীন নির্জীব দেশ-বাসীকে দেখে মাঝে মাঝে তিনি হতাশও হয়ে পড়তেন।

পরিব্রাজক জীবনে বহু মানুষের সংস্পর্শে তিনি আসেন। তিনি তাঁর মনের ভাবনা ও অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে সিস্টার ক্রিস্টিনকে বলেছেন ঃ "বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করার জন্য আমি ভারতীয় নৃপতিদের নিয়ে একটি শক্তিজোট তৈরি করতে চেয়েছিলাম। সেইজন্যই আমি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত দেশের সর্বত্রই ঘুরে বেড়িয়েছি। সেইজন্যই আমি বন্দুকনির্মাতা স্যার হিরাম ম্যাক্সিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম। কিন্তু দেশের কাছ থেকে আমি কোন সাড়া পাইনি। দেশটা মৃত।"[২]

তবু ভারতবর্ষ বিবেকানন্দের কাছে ছিল প্রাণের মুক্তিতীর্থ। ভারত ছিল তাঁর সাধনার দেবী। বিশ্বের দরবারে তাঁর ভারতবর্ষকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার জন্য তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তিনি সমগ্র বিশ্বে ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা এবং সনাতন হিন্দুধর্মের প্রভাববিস্তারের মাধ্যমে দেশের মৃতপ্রায় জনমনকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। মানবেন্দ্রনাথ রায় বিবেকানন্দের এই ভাবনাকে ব্যক্ত করে বলেছেন ঃ "His nationalism was spiritual imperialism. He called on young India to believe in the spiritual mission of India... on which subsequently built the orthodox nationalism of the declassed young intellectuals, organised into secret societies advocating violence and terrorism for the overthrow of British rule."[৩]

সমকালীন শিক্ষিত যুবসমাজ এই আধ্যাত্মিক বিজয়ে উদ্বেল হয়ে ওঠেন। বিবেকানন্দের বজ্রনির্ঘোষ তাঁদের হৃদয়ে সাড়া জাগায়। ভারতের সকল দুঃখের প্রধান কারণ-রূপে তাঁরা বিদেশী শাসনকেই চিহ্নিত করেছিল। বিবেকানন্দের

অগ্নিবাণীর স্পর্শে তাঁদের মনে জেগে ওঠে এক তীব্র স্বাজাত্যাভিমান। ভারতের নৈরাজ্যবাদ ও সমাজের ক্ষণ-ভঙ্গুর রূপ দেখে তাঁরা ব্যথিত হন। এইজন্যই তাঁরা পরবর্তী আন্দোলন ও রাজনৈতিক অভ্যুত্থানে বিবেকানন্দের বাণীতে খুঁজে পেয়েছিলেন পথনির্দেশ। বিবেকানন্দের আদর্শগত ভাবভূমি থেকে বিপ্লবীরা প্রেরণা পেয়েছিলেন এবং এই ভাবভূমি থেকেই জন্ম নিয়েছিল বিপ্লববাদ। স্বদেশী যুগেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

বিবেকানন্দের তিরোধান ঘটে ৪ জুলাই ১৯০২—একশ বছর আগে। তার পরের বছর থেকেই বাংলার প্রান্তর উজ্জীবিত ও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে। তাঁর বিশ্বজয়ী প্রভাব তখনো জনমানসে প্রদীপ্ত শিখার মতো প্রোজ্জ্বল। দেশের নেতৃবৃন্দ ও যুবসম্প্রদায় তাঁর রচিত 'বর্তমান ভারত' ও 'পত্রাবলী'র মধ্যে প্রেরণার উৎস খুঁজে পায়।

স্বাধীনতা বা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা হলো জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা। বিবেকানন্দ এই মুক্তির উপাসক ছিলেন। তিনি কেবলমাত্র অতীন্দ্রিয় মোক্ষ বা মায়ার বন্ধনমোচনই চাননি, মানুষের বৈষয়িক মুক্তিও তিনি চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন ঃ "স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম শর্ত। যেমন মানুষের চিন্তা করার ও কথা বলার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তেমনি তার আহার, পোশাক, বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। তবে এই স্বাধীনতা যেন অপর কারো অনিষ্ট না করে।"[৪] আবার অন্যত্র বলেছেন ঃ "সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ। যেসকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফূর্তির ব্যাঘাত করে, তা অকল্যাণকর। যাতে তার শীঘ্র নাশ হয় তাই করা উচিত। যেসকল নিয়মের দ্বারা জীবকুল স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয় তার সহায়তা করা উচিত।"[৫]

কিন্তু তিনি জানতেন, পরাধীন জাতির পক্ষে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব নয়। তাই ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষকে বলেছিলেন ঃ "India should be freed politically first."[৬] হৃদয়ে ছিল তাঁর পরাধীন মাতৃভূমির জন্য এক তীব্র বেদনাবোধ। তাই ভারতবর্ষ ছিল তাঁর "Queen of adoration"। নিবেদিতার ভাষায়—"India was his daydream, India was his nightmare."[৭] ভারত ছিল তাঁর একান্ত সাধনার দেবী। নিবেদিতা স্বামীজী সম্পর্কে বলেছেন ঃ "জন্মপ্রেমিক তিনি—তাঁর প্রেমপাত্রী তাঁর মাতৃভূমি।"

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ভারতীয় অনুভূতিতে যে দ্বান্দ্বিক বিবর্তনবাদ ঘটেছে, স্বামীজী তা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি 'বর্তমান ভারত'-এ লিখেছেন ঃ "একদিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বলসঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে; অপরদিকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া ক্ষীণ অথচ মর্মভেদী স্বরে পূর্বদেবদিগের আর্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল। নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গি অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সেই দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া ব্রত-উপবাস, সীতা-সাবিত্রী, তপোবন-জটাবন্ধল, কাষায়-কৌপীন, সমাধি-আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে। একদিকে পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্য সমাজের কঠোর আত্মবলিদান। এ বিষম সঙ্ঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে—তাহাতে বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাষ্ট্রনীতি। ভারতের উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ। বর্তমান ভারত একবার যেন বুঝিতেছে, বৃথা ভবিষ্যৎ অধ্যাত্মকল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহলোকের সর্বনাশ করিতেছি; আবার মন্ত্রবৎ শুনিতেছে—'ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ। কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ'।"[৮]

'বর্তমান ভারত' প্রথম প্রকাশিত হয় 'উদ্বোধন' পত্রিকায়। পরে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩১২ সালে অর্থাৎ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে। তখন বাংলার সর্বত্র স্বাদেশিকতার ঢেউ। সেই দুর্বার বাংলার কাছে 'বর্তমান ভারত' প্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়। এই গ্রন্থে বিবেকানন্দ দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন পাশ্চাত্য মোহ বিসর্জন করে স্বাদেশিক ভাবাপন্ন হতে। তিনি লিখলেন ঃ "যখন ভারতবাসীকে ইউরোপীয় বেশভূষামণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত!! চতুর্দশশত বর্ষ যাবৎ হিন্দু রক্তে পরিপালিত পারসি এক্ষণে আর 'নেটিভ' নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণম্মন্যের ব্রহ্মণ্যগৌরবের নিকটে মহারথী কুলীন ব্রাহ্মণের বংশমর্যাদা বিলীন হইয়া যায়। আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচ জাতি—উহারা অনার্য জাতি!! উহারা আর আমাদের নহে!!"[৯]

এই ভারতবাসীকে তিনি পরানুকরণবাদের মোহ থেকে বেরিয়ে আসার অমোঘ মন্ত্র শোনালেন, দাসসুলভ দুর্বলতা ত্যাগ করার আহ্বান জানালেন। তিনিই দেশবাসীকে শোনালেন ঃ "তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি-প্রদত্ত।" এই বাণী মুক্তিপাগল দামাল ছেলেদের মনের মধ্যে এক তীব্র প্রেরণার সৃষ্টি করল।

১৯০৫-এ (১ মাঘ ১৩১২) 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হলো বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক'। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউয়ে আরেক তীব্র তরঙ্গের আবির্ভাব। স্বামী সারদানন্দ এর 'পরিচয়' মুখবন্ধে দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন ঃ "বুদ্ধিমান বিদেশী তাঁহার (বিবেকানন্দের) উপদেশ কার্যে

পরিণত বলপুষ্ট হইতে চলিল, হে স্বদেশী, তুমিও কি এইবার তোমারই জন্য বহু শ্রমে সমাহৃত সারগর্ভ সত্যগুলি হৃদয়ে ধারণ এবং কার্যে পরিণত করিয়া সফলকাম হইবে?"

'পরিব্রাজক'-এ বিবেকানন্দ এক নতুন ভারতের সন্ধান দিলেন—"এরা সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখভোগ করেছে, তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারে, আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না।"[১০] ভারতের যুবসমাজ স্বদেশী আন্দোলনে বিবেকানন্দের এই বাণীতে তাদের চলার পাথেয় পেয়েছিল।

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ 'সন্ন্যাসী একা যাত্রী'-রূপে ভারতের মুক্তির উৎস খুঁজতেই ১৮৯৩-এ আমেরিকা গেলেন এবং সেখানে তাঁর বিশ্বজয়ীর সম্মানলাভ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে গতিময় করে তুলল। ভারতবাসী ফিরে পেল আত্মপ্রত্যয়, হীনম্মন্যতা দূর করে অভিষিক্ত হলো বীর্যবত্তার আসনে। বহু বছরের প্রচেষ্টা, যা কোন রাজনৈতিক নেতা বা রাজনৈতিক দল কিংবা কোন সঙ্ঘের মঠপ্রাঙ্গণ থেকে সম্ভব হয়নি, বিবেকানন্দের প্রচেষ্টায় তা সম্ভব হলো। ১৮৯৫-এর ১ সেপ্টেম্বর 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লিখল: "He has done much more to elevate our nation in the estimation of the people of the west than what has hitherto been done by all our political leaders together."

আমেরিকা থেকে ফিরে এসে স্বামীজী বললেন—'জাগরণ চাই'। তিনি জাতিকে শোনালেন: "আগামী পঞ্চাশ বছর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হোন, অন্যান্য অকেজো দেবতাকে এই কয়েক বছর ভুললে কোন ক্ষতি নেই।"[১১] সত্যদ্রষ্টা ঋষির এই বাক্য মিথ্যা হয়নি। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে ১৮৯৭-এ তিনি এই উক্তি করেছিলেন। পঞ্চাশ বছর পরে অর্থাৎ ১৯৪৭-এ ভারত স্বাধীন হয়ে যায়।

বিবেকানন্দের 'পত্রাবলী' প্রকাশিত হতেই ভারতবর্ষ বিবেকানন্দের সত্তাকে খুঁজে পায়। তাঁর জীবনের প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তের অভিব্যক্তি পত্রাবলীতে বিধৃত। কী বিষময় জীবনযন্ত্রণা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে! নিজে ব্যক্তিগত সমস্যায় পড়েও তিনি অপরকে পত্রের মাধ্যমে সজাগ রেখেছেন। ভারতের মানুষকে পত্রের মধ্য দিয়ে সচকিত করেছেন। কখনো নির্দেশ দিয়েছেন, কখনো কষাঘাত করেছেন। পত্রগুলি কোন ব্যক্তিবিশেষকে প্রেরণ করা হলেও তার মধ্য থেকে সার্বজনীন সত্য উদ্ভাসিত হয়ে বিবেকানন্দের মনোভাবনাকে প্রকাশ করেছে। পরম উৎসাহ ও প্রেরণাপ্রদানকারী এই পত্রাবলী জাতীয় আন্দোলন তথা বিপ্লবী আন্দোলনের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছিল।

আলস্যজর্জরিত ভারতের বুকে কর্মপ্রবাহ আনতে চেয়েছিলেন স্বামীজী। আলাসিঙ্গাকে লিখিত পত্রে তিনি বলেছেন: "ভারতমাতা অন্তত সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো মানুষ চাই, পশু নয়। প্রভু তোমাদের বাঁধাধরা সভ্যতা ভাঙবার জন্য ইংরেজ গভর্ণমেন্টকে প্রেরণ করেছেন আর মাদ্রাজের লোকেরা ইংরেজদের ভারতে বসাবার প্রধান সহায় হয়। এখন জিজ্ঞাসা করি, সমাজের এই নতুন অবস্থা আনবার জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রাণপণ যত্ন করবে, মাদ্রাজ এমন কতকগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে কি প্রস্তুত—যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্ত মুখে অন্নদান করবে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে আর তোমাদের পূর্বপুরুষদের অত্যাচারে যারা পশু পদবীতে উপনীত হয়েছে তাদের মানুষ করার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে।"[১২] তিনি আরো বলেছেন: "আমি এই যুবকদলকে সঙ্ঘবদ্ধ করতেই জন্মগ্রহণ করেছি। আর শুধু এরাই নয়, ভারতের নগরে নগরে আরো শত শত যুবক আমার সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। এরা দুর্দমনীয় তরঙ্গাকারে ভারতভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হবে—এবং যারা সর্বাপেক্ষা দীনহীন ও পদদলিত—তাদের দ্বারে দ্বারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নীতি, ধর্ম ও শিক্ষা বহন করে নিয়ে যাবে—এই আমার আকাঙ্ক্ষা ও ব্রত। এ আমি সাধন করব এবং মৃত্যুকে বরণ করব।"[১৩] স্বামীজীর এই চেতনার বাণী যুবসমাজ গ্রহণ করেছিল। স্বামীজীর সাথে যুবসমাজও অনুভব করেছিল: "আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করে জাগ্রত হচ্ছেন। কোন বহিঃশক্তি এখন আর একে দমন করে রাখতে পারবে না।"[১৪]

স্বামীজীর দেহাবসানের পর দেশবাসী প্রত্যক্ষ করল, হাজার হাজার যুবক তাঁর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে জাতীয়তাবোধের ভূমিতে প্রাণ বিসর্জনের জন্য এগিয়ে এল। বিপ্লববাদের অভ্যুত্থানে যারা অংশীদার, তাদের জীবনে সাধনার বস্তু হলো 'অভীঃ' মন্ত্র। তাই যেন "Swami Vivekananda appeared to be more a political prophet than a religious leader."[১৫] বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণ করার পর বেলুড়ে এসে বললেন: "Bomb is what India needs today."[১৬] ১৯০২-এ দেহত্যাগের পর তাঁর এই উক্তি সত্যে পরিণত হয়েছিল। বিপ্লবীদের জীবনের ওপর তাঁর প্রভাব ছিল তীব্র। প্রখ্যাত বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেছেন: "Directly or indirectly the influence of Swamiji was great. As we could not get revolutionary literature within our reach, we read the letters of Swamiji, the dialogue between Master and Disciple by Sarat Chandra Chakraborty and Vivekananda's lectures contained in 'From

Columbo to Almora'. These books used to kindle fire in our hearts. The debt to that patriot saint is irredeemable."[১৭]

একবার স্বামীজী সখারাম গণেশ দেউস্করকে বলেছিলেন ঃ "The country has become a powder magazine. A little spark may ignite it."[১৮] স্বদেশী ও বিপ্লবী আন্দোলনে স্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার সজাগ ছিল। কারণ, বিবেকানন্দের সাহিত্য পাওয়া যেত বিপ্লবীদের আস্তানায়। জেমস ক্যাম্পবেল কার সম্পাদিত 'Political Troubles in India, 1907-17' পুস্তকের বিভিন্ন গোপন রিপোর্টে জানা গিয়েছে বিপ্লবী আন্দোলনের ওপর স্বামীজীর প্রভাবের কথা।

স্বামীজী সম্পর্কে ইংরেজ সরকার প্রথম থেকেই সন্দিগ্ধ ছিল। ১৮৯৯ সালের ৩০ অক্টোবর স্বামীজী মেরী হেলকে যে-চিঠিটি লেখেন তাতে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে তাঁর মনোভাব প্রকাশিত—"ভারতবর্ষে কয়েক বছর ধরে চলছে ত্রাসের রাজত্ব। ব্রিটিশ সৈন্য আমাদের পুরুষদের খুন করেছে, মেয়েদের মর্যাদা নষ্ট করেছে, বিনিময়ে আমাদেরই পয়সায় জাহাজে চড়ে দেশে ফিরেছে পেনসন ভোগ করতে।"

শঙ্করীপ্রসাদ বসু ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থ থেকে একটি তথ্য পরিবেশন করে বলেছেন ঃ "লিজেল রেঁম আমাকে (ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত) বলেছেন, স্বামীজী মিস ম্যাকলাউডের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনবার মতলব করেছিলেন—একথা ম্যাকলাউড স্বয়ং তাঁকে বলেছিলেন। ম্যাকলাউড নিবেদিতার প্রচুর চিঠি লিজেল রেঁমকে দিয়েছিলেন, কিন্তু অনেক চিঠি বা চিঠির অংশ রেঁমর সামনে বসেই তিনি ছিঁড়েছিলেন 'Too political, too personal' বলে।"[১৯]

স্বামীজীর ইংরেজ-বিরোধিতার জন্য তাঁকে ছদ্মবেশী কংগ্রেসওয়ালা বলেও প্রচারের চেষ্টা হয়। দেশে ফেরার পর স্বামীজীর ওপর রাজনৈতিক অভিসন্ধি আরোপ করে তাঁর পিছনে গোয়েন্দা লাগানো হয়। স্বামীজী নিজেও জানতেন যে, তাঁকে ইংরেজ সরকার নজরে রেখেছে। ১৯০১ সালে ম্যাকলাউডকে এক চিঠিতে লিখছেন ঃ "মিসেস লেগেটের শেষ যে-চিঠিখানি এসেছে, তার খামটাকে নির্লজ্জভাবে ছিঁড়েছে। ভারতের ডাকবিভাগ আমার চিঠিগুলো একটু ভদ্রভাবে খোলার চেষ্টা করে না।"

ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে আন্দোলনের প্রতিভূ হিসাবে স্বামীজীকেই সন্দেহ করত। শিশির কর লিখেছেন ঃ "স্বামীজীর মৃত্যুর পরও তাঁর সম্পর্কে, তাঁর লেখা সম্পর্কে, তাঁর প্রতিটি সংস্থা সম্পর্কে রাজশক্তির বিরূপতা কমেনি, বরং দেশ যতই মুক্তিসংগ্রামে সক্রিয় হয়ে উঠেছে ততই তা বেড়েছে। ব্রিটিশ সরকার বুঝেছিল, এদেশে মুক্তি আন্দোলনে বিপুল প্রেরণা যোগাচ্ছে স্বামীজীর জীবনী ও বাণী। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যে-বিশ্লেষণ, তার বারুদ স্বামীজী। একজন পদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষ একথা লিখেছেন। তিনি আটক বিপ্লবীদের কাছ থেকে জেনেছিলেন, কে এইসব মুক্তি যোদ্ধাদের প্রেরণা দিচ্ছেন।"[২০]

Earl Ronaldsay তাঁর 'The Heart of Aryavarta'-তে এক বিপ্লবীর সঙ্গে মেশার কথা লিখেছেন ঃ "Suspecting nothing, I began to have closer intimacy with him and to have religious discourses with him at times. Gradually he began to insert ideas of anarchism into my religiously deposed mind, saying that religion and politics are inseparable and that our paramount duty should be to do to the people of the country. The writer then tells how he was given another book to read entitled 'Patravali' by Vivekananda, and how he learnt from it what self sacrifice the author had made for the good of the country."

স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি তরুণদের আকৃষ্ট করার পিছনে ছিল বিবেকানন্দের আদর্শবোধ। তাঁর এই প্রভাবের কথা 'Sedition Committee'-র রিপোর্টে রয়েছে ঃ "Vivekananda died in 1902, but his writings and teachings survived him, have been popularised by the Ramkrishna Mission and have deeply impressed many educated Hindus. From much evidence before us it is aparent that his influence was perverted by Barindra and his followers in order to create an atmosphere suitable for the executions of their project."[২১] ইংরেজ সরকার বিপ্লবীদের বিভিন্ন ডেরায় হামলা করে বিবেকানন্দ-সাহিত্য আটক করত। এমন এক সময় এসেছিল, ইংরেজ গোয়েন্দারা বিবেকানন্দের পত্রাবলী বাজেয়াপ্ত করার প্রস্তাব করে।

"In the middle of 1915 Government of Bengal proposed to take action against the printer and publisher of 'Patravali' part I, 4th Edition of Swami Vivekananda for contravening Sec 4(c) of Press Act, 1910. Accordingly a copy of English translation of the alleged objectionable passages of the book was sent to Sri S. R. Das standing counsel for legal opinion. Sri Das after going through the whole book, gave a seven pages opinion in which he said, 'I am strongly of opinion after going through the whole book that it does not contravene sec 4(c) of the Act I of 1910).

"On receipt of the said opinion and on the ground that the author of the book is dead, the Government dropped the matter."[২২]

স্বামীজীর প্রবন্ধ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হলে তাও ইংরেজ সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়ে।

"During his life time Swamiji published a fortnightly journal from Belur Headquarter of Ramkrishna Mission called 'Udbodhan'. Of its issues, which was subsequently considered highly objectionable as it appeared from a report Dt. December 1907. Swamiji wrote, 'You have all been hypnotised, your ruler tell you that you are low, subjected and week and what you believe to be true. I am made of earth of this country but I have not learnt to think of myself like that, so those people who used to look down upon us, by God's will, are respecting me like God. Peping can not lead into salvation, what is wanted is a keen aged sword and a war to death."[২৩]

বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোধা কালীচরণ ঘোষ বলেছেন ঃ "স্বামীজীর 'ভাববার কথা' ইংরেজদের কোপ-দৃষ্টিতে পড়ে। পুলিস ঐ বই বহু জায়গা থেকে বাজেয়াপ্ত করে।" তিনি আরো লিখছেন ঃ "এই নিষিদ্ধ পুস্তিকা সম্বন্ধে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। সকল ক্ষেত্রেই যে গ্রন্থকার, প্রকাশক, প্রেসের মালিকদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা করা হয়েছে তা নয়, কেবলমাত্র সরকারি গেজেটে ছাপিয়ে এদের প্রচার বন্ধ করা হয়েছে, তারপর পুলিস দেখতে পেলেই বাজেয়াপ্ত করেছে, মালিক ধরে টানাটনি করেছে, আর যাদের ওপর রাজনৈতিক কারণে সন্দেহ পোষণ করত বা কোন ঘটনা সম্পর্কে খানাতল্লাশি করতে যেত, সেখানে এইসকল সাহিত্য সন্দেহভাজন ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা গাঢ়তর করেছে এবং তদনুপাতে তাদের অপরাধের গুরুত্ব সপ্রমাণিত করার চেষ্টা হয়েছে। কোন একটা ছেলে পাড়ায় 'স্বদেশী' করে, সুতরাং হয়তো গুপ্তচরের পরামর্শে পুলিস তার গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল। খাতায় নামও উঠে গেল। তারপর পুলিস তার বাড়ি তল্লাশি করল, অন্য কিছু অর্থাৎ বোমা, বন্দুক, রিভলবার, তরোয়াল, রামদা, ছোরা, গুপ্তি, সড়কি—এমনকি একগাছি লাঠি না পেলেও যদি 'গীতা', 'আনন্দমঠ', স্বামীজীর 'ভাববার কথা', গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদৌল্লা', দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপ' প্রভৃতি কিছু পেয়ে থাকে তাহলে অন্ততপক্ষে থানায় টেনে নিয়ে হয়তো দু-চারটে গোঁত্তা, রদ্দা, ঘুষি, চড় দিয়ে এবং কুটুম্ব সম্পর্কিত মিষ্ট বচন আউড়ে থানার গারদে আটক করে রেখেছে, 'সদর' থেকে 'টিকটিকি' পুলিস এসে পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্বানুসন্ধান এবং প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তারপর হয়তো ছেড়ে দিয়েছে, আর নয়তো বিনা বিচারে বন্দী করে জীবনের বহু অমূল্য সময় নষ্ট করে দিয়েছে।"[২৪]

ভারতবর্ষে দেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটাতে বিবেকানন্দ 'উদ্বোধন' প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বহু প্রবন্ধ নিয়ে বাংলার সরকারের রাষ্ট্রনৈতিক দপ্তরে বহু ফাইল জমা ছিল। সরকারি অফিসারদের বিরূপ মন্তব্য সেইসব ফাইলে লেখা আছে। 'উদ্বোধন' পত্রিকার সূত্র ধরে রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কেও তাদের সন্দেহ ঘনীভূত হয়। একটি গোয়েন্দা রিপোর্টে লিখিত আছে— "Ramkrishna Mission itself had been used in the past as a revolutionary agency under the guise of religion and philanthrophy and the greatest danger in the present time lies in the unaffilated Ashrama which had grown up like mushroom in affected areas in East Bengal.

"Vivekananda commanded to go out and preach the gospel of Ramkrishna and found branch Ashramas throughout India. This command had been taken up by the revolutionaries of Bengal to such a good effect, that inspite of best intentions, the Belur Math were unable to control them."[২৫]

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রভাব সম্পর্কে গোয়েন্দা দপ্তর আরো লিখেছে ঃ "There are indications that the Mission and its followers were connected with the revolutionary upheaval in India which has convulsed the student community in Bengal and extended its influence in Punjab and Native States."[২৬]

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সম্পর্কেও ইংরেজদের সন্দেহ ছিল— "After the death of Swamiji in 1902 Swami Brahmananda became the president and head of the Ramkrishna Mission all over India and outside.

"These missionaries are suspected of preaching Swaraj and Brahmananda alias Rakhal ghose has been described as leader of these men."[২৭]

বিবেকানন্দ জাতীয় আন্দোলনের মনীষাদের নিকট ছিলেন প্রেরণার আলোকস্তম্ভস্বরূপ। কোন মহাপুরুষ দেহাবসানের পর রেখে যান এক বিশাল প্রভাব। একে ইংরেজীতে 'Cast of Shadow' বলে। বিবেকানন্দের ছায়া নয়—মৃত্যুর পর তাঁর বাণী, তাঁর নির্মিত প্রতিষ্ঠান ও আরব্ধ পত্রিকা জীবন্ত বিগ্রহরূপে পূজিত হয়েছে জাতীয়তাবাদী

আন্দোলনের সাধকদের কাছে। রোমাঁ রোলাঁ যথার্থই মন্তব্য করেছেন : "Vivekananda's new Vedantism spread like burning alcohol in the veins of the intoxicated nation."[২৮] ❑

সূত্র

(১) ভারতের মুক্তিসংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃঃ ৩২
(২) 'স্বামী বিবেকানন্দ'—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, কলকাতা, ১৩৬৪, পৃঃ ৩
(৩) India in Transition—Manabendra Nath Roy, Calcutta, 1922, p. 193
(৪) দ্রঃ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১৩৮৪, পৃঃ ৪০
(৫) ঐ, ৮ম খণ্ড, ১৩৮৪, পৃঃ ২৪
(৬) Swami Vivekananda : Patriot Prophet—Bhupendra Nath Datta, Calcutta, 1954, p. 334
(৭) চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃঃ ৯৪৮
(৮) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯৮৩, পৃঃ ২৪৬
(৯) ঐ, পৃঃ ২৪৮-২৪৯
(১০) ঐ, পৃঃ ৮২
(১১) দ্রঃ ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৯
(১২) দ্রঃ ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৬৯
(১৩) দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩৯৫
(১৪) দ্রঃ ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮
(১৫) Swami Vivekananda : Patriot Prophet, p. 325
(১৬) Ibid., p. 132
(১৭) Ibid., p. 133
(১৮) Ibid., 'Forward', pp. XXII
(১৯) বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৩
(২০) ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাঙলা বই, ১৯৮৮, পৃঃ ৯২
(২১) Sedetion Committee's Report, 1918, p. 23
(২২) Home (Pol.) (Conf.) File SL 100 FN—1068/12, 1912, Bengal Govt.
(২৩) Ibid.
(২৪) জাগরণ ও বিস্ফোরণ, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৭৯, পৃঃ ২৪৪
(২৫) Home (Pol.) (Conf.) File SL—182 FN 6/15, 1915, Bengal Govt.
(২৬) Home (Pol.) (Conf.) File SL—182 FN 6/16, 1915, Bengal Govt.
(২৭) Home (Pol.) (Conf.) File 82 Bengal S. O. 9.1.09 ext. Bengal, Augt. 1909, S. B. FN VII of 1909.
(২৮) Militant Nationalism—Biman Bihari Majumder, Calcutta, 1966, p. 62

শব্দচেতনা ৭

স্বামীজীর জীবনের নানান ঘটনা ও তাঁর বাণীকে ভিত্তি করে তৈরি বিশেষ শব্দছক

১		২			৩				৪
৫			৬	৭		৮			
		৯							
							১০		
১১									
			১২		১৩	১৪			
১৫					১৬			১৭	
				১৮			১৯		
২০							২১		

সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম দশজনের নাম পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

পাশাপাশি : (১) স্বামীজীর বিখ্যাত বক্তৃতা 'আমার সমরনীতি' এখানেই প্রদত্ত। (৩) "—— ভবে আসামাত্র হলো" গানটি জীবনের শেষসময়ে গেয়েছিলেন স্বামীজী। (৫) "অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার ——, তোমার ভাই।" (৬) স্বামীজীর বিখ্যাত কবিতা "নাচুক তাহাতে ——"। (৮) "—— ঋতপথে তুমি রামকৃষ্ণে"। (৯) "জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে ——"। (১০) স্বামীজীর মতে, অন্যের —— করে বড় হওয়া যায় না। (১১) স্বামীজী নিবেদিতাকে এক পত্রে লিখেছিলেন : "আমার মধ্যে যে —— জ্বলছে, তা জ্বলে উঠুক তোমার মধ্যে।" (১৩) "এসো ভুবন —— নারায়ণ।" (১৫) স্বামীজীর কাছে আগত এক বিপ্লবী। (১৬) যে বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক স্বামীজীকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁর নামের প্রথমাংশ। (১৭) "অলক্ষণ অতর্ক্য জগৎ, নাহি থাকে —— শশী তারা।" (২০) স্বামীজীর ভারতভ্রমণকালে আলোয়ারের রাজা। (২১) "ত্যাগ-ভোগ বুদ্ধির ——।"

ওপর-নিচ : (১) স্বামীজী সম্বন্ধে নিবেদিতা-রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ। (২) "নিখিল ভুবন ——প্রেমভঙ্গপ্ররোহাঃ।" (৩) "সকলের আত্মা —— বিদ্যমান।" (৪) গুডউইনের মৃত্যুতে স্বামীজীর রচিত কবিতার বঙ্গানুবাদ। (৬) স্বামীজী বলতেন : "রামকে পেলাম না বলে ——-এর সঙ্গে থাকব?" (৭) "চূর্ণ হোক স্বার্থসাধ ——।" (৮) ভারত-পরিক্রমাকালে বৃন্দাবনে স্বামীজী এঁর দর্শন পেয়েছিলেন। (৯) "—— তোমার সুবিস্তৃত ঘাস।" (১০) "নত —— নিযুক্তং নীলকণ্ঠং নমামঃ।" (১২) "তস্মাৎ ত্বমেব শরণম্ —— দীনবন্ধো।" (১৩) "পরপীড়নই ——।" (১৪) "নায়মাত্মা —— হীনেন লভ্যঃ।" (১৮) রোমাঁ রোলাঁ বলেছিলেন, স্বামীজীর কণ্ঠস্বর ছিল চীনা ——-এর মতো। (১৯) কাশীপুরে নরেন্দ্রনাথ নির্বিকল্প সমাধি লাভ করার পর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন : "—— কিন্তু আমার হাতে রইল।"

সূত্র : তন্বীতনু পানি

ব্যাকুলতাই ইষ্টলাভের উপায়

স্বামী শ্রীনিবাসানন্দ

উন্মুক্ত প্রান্তর, বিস্তীর্ণ গোচারণভূমি, পাখনামেলা ময়ূরের চিত্তহরণকারী নৃত্য, ভৃঙ্গগুঞ্জরিত কুঞ্জ, শস্যশ্যামলিমায় ভরা এই সেই বৃন্দাবন। যেখানে বৃন্দাবন-বিহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবিলাস। বৃন্দাবনের একদিকে প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্য এবং কাঁসর-ঘণ্টা নিনাদিত দেবালয়নিচয়, অন্যদিকে শ্যামচিন্তনে শ্যামবর্ণা যমুনার নীরব প্রবাহণ—যেন কি এক অপূর্ব ঐকতানের সৃষ্টি করেছে! এই অনাবিল শান্ত আধ্যাত্মিক পরিবেশে কোন্ সাধকের না মন শান্ত হয়! তাই স্বাভাবিকভাবেই এখানে স্বীয় অভিষ্টলাভের উদ্দেশে ছুটে ছুটে আসেন সাধক ও সন্ন্যাসীর দল।

গোপালভাবে ভাবিত এক যুবক সাধক বহুদিন বহু তীর্থ ঘুরে অবশেষে হাজির হলেন এই পুণ্যতীর্থ বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনের মাধুর্যময় সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে ইষ্টলাভের জন্য হৃষ্টচিত্তে তিনি মনোনিবেশ করেন সাধনায়। অযাচিতভাবে যে যা দেয়, তাতেই তিনি করেন উদরপূরণ। দিনের পর দিন তিনি মগ্ন হতে থাকেন সাধন-ভজনে। ইষ্টদর্শনের জন্য করতে থাকেন আন্তরিক জপধ্যান ও আকুল প্রার্থনা। ক্রমে তিনি ভগবদ্ভাবে বিভোর হয়ে যান। ভুলে যান পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কথা, ভুলে যান আহার-নিদ্রার কথা। এইভাবে তন্ময় হয়ে তিনি ইষ্টের চিন্তা করতে থাকেন।

সেদিন তিনি অনাহারে আছেন। দিনের কাজ শেষ করে দিননাথ অস্তাচলে গেছেন। আগতপ্রায় সন্ধ্যা। সহসা এক দিব্যসুন্দর বালক মাথায় একটি ভাণ্ড নিয়ে উপস্থিত। ধ্যানস্থ সাধুকে ডাকতে থাকে বালক: "ও গোঁসাইজি, ও গোঁসাইজি!" বালকের সুমধুর স্বরে সাড়া না দিয়ে পারলেন না সাধক। চোখ মেলে চেয়ে দেখেন অনিন্দ্যসুন্দর এক দিব্য বালক। সুমিষ্ট হেসে বালক সাধকের কাছে এগিয়ে এসে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলে: "আহা! মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে! সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি বোধহয়। নাও, নাও—এই দুধটুকু খেয়ে নাও।" বলেই দুগ্ধভাণ্ডটি এগিয়ে দেয় বালক।

সাধক এতক্ষণ ভুলে গিয়েছিলেন ভিক্ষার কথা, ভুলেছিলেন ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা। এখন বালকের সুধামাখা কথায় প্রচণ্ড ক্ষুধাবোধ করতে থাকেন। বালকের মনভোলানো রূপ, মমতামাখা কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে যান সাধক। তাই জিজ্ঞাসা করেন: "কে গো তুমি?" সহজ কণ্ঠে বালক উত্তর দেয়—"আমি রাখাল বালক—ব্রজের রাখাল গো! জান, ব্রজবাসীরা আমায় খুব ভালবাসে। তারাই তোমার কথা আমায় বলেছে। তাই তো তোমায় দেখতে এলাম। যাকগে, তুমি শিগগির এই দুধটুকু খেয়ে নাও। আমি এখনি এসে পাত্রটা নিয়ে যাব কিন্তু।"—বলতে বলতে চঞ্চল বালক চটুল গতিতে চলে গেল।

বালকের মনোহর দিব্যকান্তি ও প্রাণজুড়ানো কথা ভাবতে ভাবতে ভক্ত সাধক ভাববিহ্বল হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। রাত্রি প্রায় শেষ। শেষরাত্রে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তিনি স্বপ্নে দেখলেন বালগোপালরূপী সেই নয়নাভিরাম বালককে। অদ্ভুত তার আবেদন! অনুনয় করে বলতে থাকে: "এখানে মানসগঙ্গা নামে যে সরোবর আছে, তারই তীরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে এককোণে আমি মাটিচাপা পড়ে আছি। আর কতকাল এভাবে পড়ে থাকব? দেহ যে মাটি হয়ে যায়! তুমি কি শিগগির আমায় উদ্ধার করবে না?" এই কথা বলেই বালক অদৃশ্য হয়ে যায়।

স্বপ্নের বিস্ময়কর বালকের কথা ভাবতে ভাবতে ভোর শেষ হয়ে যায়। সকাল হতেই সাধক বিস্ময়ে ও আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর সন্ধানে বের হলেন। স্বপ্নদৃষ্ট স্থানে গোপালমূর্তি উদ্ধারে খোঁড়াখুঁড়ি চলল। বহুক্ষণ ধরে খোঁড়াখুঁড়িতে বহু পরিশ্রম হলো। কিন্তু সবই ব্যর্থ! কোথাও কিছু নেই! লোকজন সব রেগে অস্থির। বলতে লাগল: "সাধুবাবার সব বুজরুকি।" ক্রোধান্বিত হয়ে তারা নিজেদের ঘরে ফিরে চলল। এদিকে সাধক মহা অপ্রস্তুত। কাতরপ্রাণে তিনি প্রার্থনা করতে থাকেন: "প্রভু, তুমি কি আমাকে মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়েছ?" আবার পূর্ণ বিশ্বাসে বলতে থাকেন: "না না, তা হতে পারে না কখনো—তুমি সত্যস্বরূপ।" এরূপ দৃঢ় প্রত্যয়ে আর্ত সাধক আর্তি জানাল ইষ্টের কাছে। এমন সময়ে হঠাৎ ধ্বনিত হলো শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি।

অবশেষে ভগবান ভক্তের প্রার্থনায় সাড়া দিলেন। তখন প্রত্যাবর্তনরত লোকগুলিকে তিনি ব্যাকুলভাবে অনুনয়-বিনয় করে ফিরিয়ে আনলেন এবং সেই ধ্বনি অনুসরণ করে পুনরায় খননকার্য শুরু করালেন। অচিরেই আবিষ্কৃত হলো বালগোপাল মূর্তি। ভক্তিমান সাধক তখন ভক্তিতে গদগদ হয়ে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করতে করতে কালগ্রাসে পতিত মূর্তিকে কোলে তুলে নিলেন।

এই গোপালমূর্তি একদা বৃন্দাবনের 'সুন্দর মন্দির'-এ ভক্তিপূত পূজা গ্রহণ করতেন। তৎকালীন গোঁড়া মুসলমানদের অত্যাচারে পীড়িত হয়ে পূজারি এইভাবে মাটির নিচে জঙ্গলের মধ্যে তাঁকে লুকিয়ে রাখেন। সে-পূজকের আর প্রত্যাবর্তন ঘটেনি।

যাহোক, ভক্তের ভগবান যুবক ভক্তের ভক্তিতে ধরা দিয়ে ধরণীতে পূজা গ্রহণ করতে লাগলেন। কিন্তু ভক্ত তো নিঃস্ব! কী ঐশ্বর্য দিয়ে পূজা করবেন ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন গোপালকে! থাকেন তো তিনি লতাপাতায় বানানো এক ক্ষুদ্র ঝুপড়িতে! কিন্তু তাহলেও সাধক সেই ঝুপড়ির কক্ষটি অতি সুন্দরভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে প্রাণঢালা ভক্তিতে 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্' দিয়ে পূজা করতে লাগলেন। জীবন্ত দেবতার জাগ্রত রূপ দর্শনের জন্য বহু দূর-দূরান্তর থেকে দলে দলে ভক্ত আসতে লাগল। স্থানটি ক্রমে যেন এক পুণ্যতীর্থে পরিণত হলো। ক্রমে প্রয়োজন দেখা দিল একটি মন্দির-নির্মাণের। কিন্তু অর্থ বা সামর্থ্য তাঁর তো কিছুই নেই! তাই তিনি প্রার্থনা জানান ইষ্টদেব গোপালের কাছে। গোপালের ইচ্ছায় হঠাৎ একদিন এক ধনী ব্যবসায়ী ভক্ত ঐ বিগ্রহ দর্শনে এলেন। অপরূপ রূপসম্পন্ন বিগ্রহ দর্শনে তিনি আনন্দিত ও অভিভূত হয়ে গেলেন। তাঁর তখন প্রবল বাসনা জাগল একটা সুরম্য মন্দির নির্মাণের। তখনি তিনি সেখানে গোপাল বিগ্রহের এক অনুপম মন্দির নির্মাণ করিয়ে দিলেন। যথাসময়ে বিশেষ পূজাদি-সহকারে প্রতিষ্ঠিত হলো গোপাল বিগ্রহের।

কাহিনীটি পাঠ করে পাঠকের মনে হবে এটি গল্পকথা, কিন্তু এটি সত্য ঘটনা। ঘটেছিল বৃন্দাবনের এক প্রত্যন্ত প্রদেশে। এখনো মূর্তির বিদ্যমানতা এবং সাধকের যথার্থতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বিগ্রহ এখন 'শ্রীনাথ' বা 'গোবর্ধন নাথ' বা 'গিরিধারী' নামে পরিচিত। এই যুবক ভক্ত হলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক শ্রীমৎ স্বামী মাধবেন্দ্র পুরী। ঈশ্বর পুরী, অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দ গোস্বামী ছিলেন তাঁর মন্ত্রশিষ্য। এই গোপালমূর্তি এখন আর বৃন্দাবনে নেই। পাঠানদের অত্যাচারের ভয়ে গোপালমূর্তিকে স্থানান্তরিত করে বৃন্দাবনের অনতিদূরে গাঁঠুলী গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। কথিত আছে, শ্রীচৈতন্যদেব এই গোপালমূর্তির কথা তাঁর গুরুদেব ঈশ্বর পুরীর কাছ থেকে শুনে দর্শনার্থে বৃন্দাবনে যান। কিন্তু সেখানে দর্শন না পেয়ে তিনি ধ্যানে বুঝলেন গাঁঠুলী গ্রামে ঐ বিগ্রহ অবস্থান করছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি সেখানে গিয়ে গোপাল বিগ্রহের দর্শনে তৃপ্ত হন। তারপর আওরঙ্গজেবের অত্যাচারে গোপালজীকে রাজপুতনার উদয়পুরে নিয়ে যাওয়া হয়। এখনও সেখানে কারুকার্যমণ্ডিত এক বিশাল মন্দিরে অবস্থান করে বালগোপালজী ভক্তের ভক্তিপূত পূজা গ্রহণ করছেন। ❑



সহৃদয় জনসাধারণের প্রতি আবেদন

সহৃদয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ অর্থানুকূল্যে আমাদের ভগ্নপ্রায় স্কুলগৃহটি পুনর্নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাঁদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।

আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি।

১।	১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ	:	১,২০,০০০ টাকা
২।	দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ	:	৫,০০,০০০ টাকা
৩।	পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার	:	৫,০০,০০০ টাকা
৪।	আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প	:	১০,০০,০০০ টাকা
৫।	একখানা অ্যাম্বুল্যান্স (Ambulance)	:	৫,০০,০০০ টাকা
			২৬,২০,০০০ টাকা

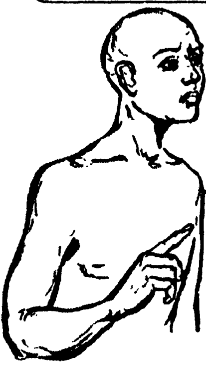
A/c Payee চেক/ড্রাফ্ট 'Ramakrishna Mission Ashrama, Ramharipur'—এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফ্ট পাঠাবার ঠিকানা—সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা—বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ : এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন নং ৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি

স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
রামহরিপুর, জেলা : বাঁকুড়া

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে মানলে ব্রহ্মের শক্তিকেও মানতে হবে। কিন্তু শঙ্করাচার্য নির্গুণ নিরাকার একরস ব্রহ্ম মানেন, কিন্তু ব্রহ্মের শক্তিকে মানেন না। অথচ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সবই তো শক্তির সাহায্যেই হয়।

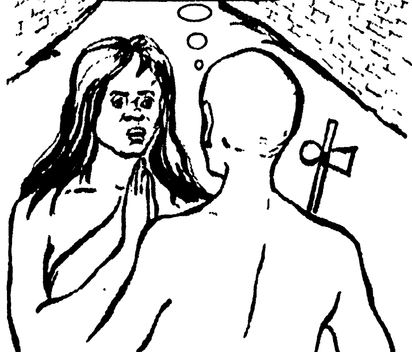








চিত্ররূপ ঃ দেবাশিস বসু



উনবিংশ শতাব্দীর বারাণসীতে জাপানী পর্যটক*

স্বামী মেধসানন্দ

ভারতের প্রতিবেশী নেপাল একটি প্রাচীন হিন্দু রাষ্ট্র। এখানকার বহুপূজিত দেবতা হলেন মহাদেব। স্বভাবতই মহাদেবের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কযুক্ত হিন্দুদের অন্যতম তীর্থস্থান বারাণসী নেপালীদের কাছেও একটি আকর্ষণীয় তীর্থভূমি। তাই নেপালীদের মধ্যে কেউ কেউ শুধু তীর্থযাত্রার উদ্দেশে এখানে এলেও বারাণসীকেই তাঁরা তাঁদের বাসস্থান করেছেন এবং এর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করেছেন।

অপরদিকে দেখতে পাই, উনবিংশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীরা বার্মা, তিব্বত এবং সম্ভবত সিংহল থেকে বারাণসী শহরে এসেছিলেন। কারণ, বারাণসী ও এর অনতিদূরে সারনাথ—এই দুই শহরই ভগবান বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত। দুর্ভাগ্যবশত সেইসব তীর্থযাত্রীদের সম্বন্ধে আমরা এখনো কোন বিবরণ পাই না।

যদিও খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে জাপানে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন হয় এবং ক্রমে এটি অন্যতম বৃহৎ বৌদ্ধ রাষ্ট্র হিসাবেই পরিণতি লাভ করে, কিন্তু জাপান থেকে কোন তীর্থযাত্রী বা পর্যটক সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বারাণসীতে আসেননি। প্রথম পর্যটক তো দূরের কথা, গোড়ার দিকের কোন জাপানী পর্যটক সম্বন্ধে নির্দিষ্ট তথ্যও পাওয়া যায়নি।

বহুকাল বাইরের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পর *মেইজির পুনরুজ্জীবন* জাপানের কাছে বহির্বিশ্বের ও এর আধুনিকীকরণের দ্বার উন্মুক্ত করে। এই প্রেক্ষাপটেই জাপানী বৌদ্ধদের শিন সম্প্রদায়ের প্রধান 'ওবো-সান' বা সন্ন্যাসী মিয়োনোর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রেভারেণ্ড তাকুয়ু উমেগামি ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে এক বিদেশ সফরে বের হন এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন।[১] এই বিদেশ-ভ্রমণে তাঁর সঙ্গী ছিলেন শিন সম্প্রদায়েরই আরেক বৌদ্ধসন্ন্যাসী রেভারেণ্ড মোকুরাই শিমাজি।[২] তাঁদের এই সফরের উদ্দেশ্যই ছিল বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে নিজেদের পরিচয় করানো এবং অন্যান্য ধর্মের এক তুলনামূলক গবেষণা করা। উমেগামি পরের বছরই জাপান ফিরে গেলেও শিমাজি তুরস্ক, মিশর, জেরুজালেমও ভ্রমণ করলেন এবং সবশেষে ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত হলেন। জেনিচিরো ফুকুচি, যাঁর সঙ্গে শিমাজির আলাপ হয় ইউরোপে, *শিমাজির সঙ্গী হলেন ভারতভ্রমণে।*[৩]

বোম্বাইতে অবতরণের পর তাঁরা পবিত্র বৌদ্ধ তীর্থদর্শনে বের হন। শিমাজি তাঁর ভ্রমণপঞ্জীতে উল্লেখ করেছেন যে, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুন তাঁরা এলাহাবাদে পৌঁছান এবং ট্রেনে করেই পাটনার উদ্দেশে রওনা হন।[৪] সেসময় এলাহাবাদ থেকে পাটনা যাওয়ার পথেই বারাণসী পড়ত। এটা খুব স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত যে, একজন ধার্মিক বৌদ্ধ, বিশেষত যিনি সুদূর জাপান থেকে এদেশে এসেছেন, তিনি বারাণসী ও সারনাথ দর্শন করে যাবেন। কিন্তু পূজ্যপাদ শিমাজি তাঁর ভ্রমণপঞ্জিকায় এরকম কোন তীর্থযাত্রার উল্লেখ করেননি। তাই তাঁদের বারাণসী দর্শনের ব্যাপারে সংশয় থেকেই যায়। খুব সম্ভবত শিমাজি ও ফুকুচি বারাণসীতে যেতে পারেননি, কারণ তাঁরা ট্রেনে করে ভ্রমণ করছিলেন এবং সেসময় এলাহাবাদ থেকে পাটনা ভায়া বারাণসী সরাসরি কোন ট্রেনপথের অস্তিত্ব ছিল না।[৫]

বারাণসীতে প্রথম লিপিবদ্ধ জাপানী পর্যটক হলেন একজন বৌদ্ধ ওবো-সান দোরিয়ু কিতাবাতাকে এবং তাঁর সঙ্গী ইউজি কুরোসাকি।[৬] পূজ্যপাদ কিতাবাতাকে প্রথমে ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করে সেখানকার ধর্মীয় আবহ প্রত্যক্ষ করেন। পরে ভারতবর্ষে আসেন শুধুমাত্র ভগবান বুদ্ধের পবিত্র স্মৃতিসৌধ দর্শনের উদ্দেশে। সেটা ছিল ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ। এই সময়ই কিতাবাতাকে এবং কুরসাকি বারাণসী ভ্রমণ করেন।

প্রভু দোরিয়ু কিতাবাতাকের ভারতভ্রমণ কাহিনী 'কিতাবাতাকে দোরিয়ু শি ইণ্ডো কিকো'-তে তাঁর বারাণসীতে ঝটিকা সফরের সামান্যই উল্লেখ রয়েছে। তাঁর জাপান প্রত্যাবর্তনের কয়েক মাস পরে ১৮৮৪-র ৩১ মে ভারতভ্রমণের ওপর তাঁর দেওয়া এক বক্তৃতা থেকেই আমরা ঐ সফরের কিছু বিবরণী পাই।[৭] কিতাবাতাকের সেই বক্তৃতার কিছু অংশের অনুবাদ নিচে উদ্ধৃত হলো :

"(বোম্বাই থেকে) আমি এলাহাবাদ হয়ে বারাণসী পৌঁছালাম।... বারাণসীর জনসংখ্যা প্রায় ২,৮০,০০০।... ওখানে একটি স্বর্ণমন্দির আছে। সে-মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৮ জো (২৬.৫১ গজ), পরিধি ৪.৫ জো (১৪.৯১ গজ)। এর নামেরও সার্থকতা আছে। কারণ, স্বর্ণমন্দিরের ছাদটা স্বর্ণপাত দিয়েই মোড়া... স্বর্ণমন্দিরের সামনে থেকে আমি একটা জপমালা কিনেছি। ওটা এখন ব্যবহার করছি।... এখানে ভগবান বুদ্ধের স্মৃতিসৌধ কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে কেউ কিছু বলতে পারল না।

* এই বছর বইমেলায় প্রকাশিতব্য স্বামী মেধসানন্দের 'Varanasi at the Crossroads' গ্রন্থের অংশবিশেষ।—সম্পাদক

"এরপর নদীর (গঙ্গা) তীরে জয়পুরের রাজা জয়সিংহ প্রতিষ্ঠিত মানমন্দিরে গেলাম। একটি যন্ত্র ছিল ধ্রুবতারা দেখার।... আরেকটি ছিল সূর্যঘড়ি। এখানে আবার আমি বুদ্ধদেবের স্মৃতিসৌধের খোঁজ করলাম। কেউ একজন বলল, ওটা নাকি গয়াতে। এই তথ্য শুনে আমি অতিশয় আনন্দিত হলাম।... আর কোন কিছু না ভেবে আমি তৎক্ষণাৎ গয়ার দিকে রওনা দিলাম।..."



বুনিয়ু নানজো

পরবর্তী পঞ্জীকৃত জাপানী পর্যটক হলেন বুনিয়ু নানজো। তিনি ছিলেন একজন শিন সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধ ওবো-সান এবং বৌদ্ধ থিয়োলজি (সৃষ্টিতত্ত্ব) ও সংস্কৃতের পণ্ডিত।[৮] তিনি ১৮৭৬ থেকে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অক্সফোর্ডে সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্রাদি পড়েছেন। বুনিয়ু নানজোর সৌভাগ্য, তিনি সেসময় বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। নানজো নাকি অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে যুগ্মভাবে সংস্কৃত থেকে অনেক শাস্ত্র ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন।[৯]

এদিকে ভারতে নানজো মোগলসরাই থেকে ট্রেনে করে বারাণসী পৌঁছান ১৮৮৭-র ২৫ ফেব্রুয়ারি।[১০] যে কয়েক ঘণ্টা সময় তিনি ওখানে ছিলেন, তার মধ্যে একজন গাইড নিয়ে সারনাথ পরিদর্শন করেন। কিন্তু ঐ শহরে সম্ভাব্য প্রথম জাপানী পর্যটক নানজোর দুর্ভাগ্য, তখন সারনাথ শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এরপর তিনি সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করেন। তিনি সেখানে অক্সফোর্ডের এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়ে নিশ্চয়ই খুব আনন্দ পেয়েছিলেন। তাঁর নাম সিফনাল (?), যাঁকে নানজো কলেজের 'কোচো' বা অধ্যক্ষ বলে অভিহিত করেছেন।[১১] সবশেষে তিনি নৌকায় গঙ্গাবক্ষ থেকে শহরের বিস্তীর্ণ নদীতীর ও গঙ্গার ঘাটে ঘাটে বহু ধর্মপ্রাণ মানুষের পূজা-উপাসনাদি দেখেছিলেন।

এছাড়াও সম্ভবত আরো অপঞ্জীকৃত এবং অজানা জাপানী পর্যটক বারাণসীতে এসেছিলেন। তার সংখ্যা অবশ্য বিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত নগণ্যই ছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে অবশ্য অবস্থার নাটকীয় পরিবর্তন হয়েছে। জাপানী পর্যটকের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। প্রতিবছরই শয়ে শয়ে জাপানী পর্যটক বারাণসী ও সারনাথে তীর্থদর্শন ও বহির্দৃশ্য দর্শনে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা দূর করতেও আসছেন। ❑

তথ্যসূচী

(১) Shimaji Mokurai Roshi (The Great Reverend Mokurai Shimaji): Introduction (Short Biography), Heiwa Shoin, Tokyo, 1909, p. 10

(২) Ibid.

(৩) Ibid., Shimaji Mokurai Zenshu (The Complete Works of Mokurai Shimaji), Vol. 5, Honganji Shuppan, Kyoto, 1978, p. 94. জেনিচিরো ফুকুচি (১৮৪১-১৯০৬) অনেকগুলি ইউরোপীয় ভাষা জানতেন এবং একটি জাপানী জার্ণালের অধিকর্তা ছিলেন। পরে তিনি কাবুকি-জা (জাপানের ঐতিহ্যবাহী থিয়েটার) প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর ম্যানেজার ও নাট্যকার হিসাবে কাজ করেন। তিনি জাপানের সংসদের সদস্যও হন। [দ্রঃ Nihon Jinmei Daijiten (Who is Who in Japan), pp. 317-318]

(৪) Shimaji Mokurai Zenshu, Vol. 5, pp. 101-103

(৫) যে-ট্রেনে শিমাজি ও ফুকুচি এলাহাবাদ থেকে পাটনা যাচ্ছিলেন, সেটি বারাণসী না হয়ে ভিন্নপথে মির্জাপুর এবং মোগলসরাই হয়ে যেত। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গঙ্গার ওপর রেলব্রিজ না থাকায় কোন ট্রেন গঙ্গা পার হতে পারত না। অন্য রুটে এলাহাবাদ থেকে পাটনা যেতে হলে বারাণসী পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে নৌকায় গঙ্গা পেরিয়ে অপর তীর থেকে আবার ট্রেনে চাপতে হতো। সেক্ষেত্রে সরাসরি ওপার থেকে ট্রেন পাওয়া যেত, না মোগলসরাই থেকে ট্রেন ধরতে হতো, তা বলা কঠিন।

(৬) ইউজি কুরসাকি ইংল্যাণ্ডে আইন পড়েছিলেন। [দ্রঃ Shichibei—Kitabatake Doryu Shi Indo Kiko, p. 2]

(৭) Shichibei Nishimura—Kitabatake Doryu shi Indo Kiko, Kyoto, 1884, p. 3; Yujun Mori. ed., Indo Kiko Shakuson Bukyo Setsuwa Hikki (Doryu Kitabatake's speech on the state of Buddhist monuments in India), Osaka, 1884, pp. 1-2, 9-11, 22

(৮) Nihon Jinmei Daijiten (Who is Who in Japan), Heibon-sha, Tokyo, 1979, p. 677; Nihon Bukkyo Jinmei Jiten (Who is Who in the Buddhist World of Japan), Hozokan, Kyoto, 1992, p. 600

(৯) Ibid.

(১০) Bunyu Nanjo—Indo Kiko, Kyoto, 1887, pp. 1-3, 30-34

(১১) Ibid. ১৯৮২ সালে প্রকাশিত সংস্কৃত কলেজ পত্রিকা অনুযায়ী ড. জি. থিবাউট ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন।

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'



স্বামী বিবেকানন্দের রচনা পাঠের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা

স্বামী বিবেকানন্দের রচনা মানুষকে সর্বার্থসার্থক এবং সর্বতো সাফল্যমণ্ডিত, আদর্শ, চরিত্রবান, কৃতী, সত্যিকারের শিক্ষিত মনুষ্যত্বগুণসম্পন্ন মানবে পরিণত করতে বা উত্তরণ ঘটাতে সাহায্য করে। 'মানুষ' অর্থাৎ যার 'মান' এবং 'হুঁশ' আছে, সেই একাধারে মানুষ। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন, অধিক মস্তিষ্কশক্তিপ্রসূত, প্রাণিকুলে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সভ্যতা, দর্শন প্রভৃতি অন্তর্মননজাত গুণাবলীর অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগ।

আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ বহু প্রাচীন দেশ; শুধু তাই নয়, ভারতবাসী হিসাবে আমরা প্রত্যেকে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করতে পারি এই ভেবে যে, ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সামাজিকতার ধারক ও বাহক, বলতে গেলে প্রাণকেন্দ্র হলো ভারতবর্ষ। যে-সংস্কৃতি, যে-রুচি, যে-সভ্যতা, ধর্মের যে-শিক্ষা সারা পৃথিবীতে বহু বিদগ্ধজনের কাছে প্রবলভাবে আদৃত, ভাবলে দুঃখবোধ হয় যে, বর্তমান যুগে সেই শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ধর্মের কেন্দ্রভূমি এই ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, রুচি, সমাজ-চেতনা—যা সত্যিকারের ধর্ম ও শিক্ষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি-ভাবে যুক্ত, তা একেবারেই অনাদৃত ও অবহেলিত। বরং পাশ্চাত্যের কুভাবগুলির অন্ধ অনুকরণে কিছু মানুষ আজ পথভ্রষ্ট। হয়তো তারা বাহ্যত উচ্চশিক্ষিতও বটে!

আসল কথা, সত্যিকারের সুষ্ঠু চিন্তা করার শক্তি, উপলব্ধি করার ক্ষমতা মানুষ যেন ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে! সেইজন্যই বিশেষভাবে মনে হয়, শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তক পাঠ করলেই চিন্তাধারা বা সত্যিকারের শিক্ষার সুষ্ঠু বিকাশ ঘটবে না, যদি না শৈশব থেকেই মানুষ স্বামী বিবেকানন্দের রচনা পাঠ না করে। এতে ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য, যা চিরস্থায়ী এবং সমগ্র মানবজাতির পক্ষে সর্বতোভাবে হিতকর—তার সঙ্গে সম্যক্ পরিচিত হলে মানুষের অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত হবে, না হলে শিক্ষার উৎকর্ষতাই হারিয়ে যাবে।

স্বামী বিবেকানন্দের 'বাণী ও রচনা' পড়লে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র সম্বন্ধে মানুষের ধারণা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সাবলীল হবে—এটা বলা বাহুল্য। তাই মনে হয়, ছোট-বড়, শিশু-বৃদ্ধ, তথাকথিত শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ যেন স্বামী বিবেকানন্দের রচনা অবশ্য পাঠ করে। বিশেষ করে সুকুমারমতি ছাত্রছাত্রীদের বিবেকানন্দের রচনা অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত। তাতে তারা জানবে সত্যিকারের ধর্ম কি, সত্যিকারের শিক্ষার উন্মেষ বলতে কি বোঝায়, শ্রদ্ধা কি, দেশ কি, দেশের ঐতিহ্য কি, জীবন কি, জীবনের উদ্দেশ্য কি, মন কি, মনের সংস্কারসাধন কেন ও কিভাবে করতে হয় ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়।

বস্তুত, প্রকৃত 'শিক্ষা' অর্জন করতে গেলে স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' ভিন্ন গতি নেই। তাঁর রচনা নিষ্ঠা ও ভালবাসার সঙ্গে পাঠ করলে বাস্তবিকই মনের সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা, মলিনতা, অশিক্ষা, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের আঁধার দূরীভূত হয়ে মনের সার্বিক বিকাশ হয়। মানুষ 'মানুষ' হয়ে ওঠে।

শর্মিলা রায়
কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫

প্রসঙ্গ 'উদ্বোধন'

'উদ্বোধন' পত্রিকা পড়ে আমাদের পরিবারের সকলে উপকৃত হয়েছেন। স্বামী অচ্যুতানন্দের 'প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ' পড়ে অনেক কিছু জানতে পারলাম এবং বুঝতে পারলাম, আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমরা কত প্রজন্ম ধরে অজ্ঞ। এইভাবে 'উদ্বোধন' পত্রিকা আমাদের অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করুক। 'সুস্বাস্থ্য' বিভাগও আমাদের নানাবিধ প্রয়োজন মেটায়। এই বিভাগে আমাদের জানা শরীর পরিচর্যা সম্বন্ধে কিছু জানাই—মহিলারা যাঁরা সারাদিন গৃহকার্যে ব্যস্ত থাকেন, তাঁরা সাধারণত অনেকেই পায়ে হাজা, ফাটা, কড়া পড়ে যাওয়া ইত্যাদিতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অসুস্থতার উপশম আছে। স্নান করার পর ত্বক যখন জলের সংস্পর্শে মোলায়েম হয়ে যায় তখন অল্প একটু 'ঘি' হাজা, ফাটা ও কড়ার ওপরে মালিশ করলে পা সেরে ওঠে। এই উপশমে কেউ উপকৃত হলে নিজেদের সৌভাগ্যবতী জানব।

রীতা দাশ ও অনেকে
বিশাখাপত্তনম, অন্ধ্রপ্রদেশ

'কথামৃত'-এ বিভাষিত শ্রীরামকৃষ্ণ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

ক্যালেণ্ডারটা একবার দেখি। ১৮৮২ সাল। অক্টোবর মাসের ১৬ তারিখ। বৃষ্টিবাদলা যা হওয়ার হয়ে গেছে। মৌসুমী মেঘ সাগরে ফিরে গেছে। আকাশ বৃষ্টিধোয়া নীল। মাঝে মাঝে উত্তর থেকে ভেসে ভেসে আসছে বৃষ্টিহীন সৌখিন সাদা সাদা মেঘ। কোনটা রাজহাঁস, কোনটা শুঁড়তোলা শ্বেতহস্তী। প্রকৃতি শরতের বেশ পরেছেন। রোদের জরি বসানো নীল শাড়ির আঁচল উড়ছে। শিশিরের নোলক ঝুলছে নাকে।

আর তিনদিন পরেই দুর্গাপুজো। সরকার এগারো দিন ছুটি ঘোষণা করেছেন। শীত উঁকি মারছে গাছের আড়াল থেকে। পাতাঝরার কাল। প্রথমে রিক্ত হবে, তারপরে আসবে সবুজের পূর্ণতা। ডালে ডালে কচি কিশলয়ের হুটোপাটি। মাস্টারমশাইয়ের হাত ধরে এই তীর্থে অনেকক্ষণ এসেছি। ভক্তদের বিরামহীন সঙ্গীত এইবার থেমেছে। গঙ্গায় কি জোয়ার আসে? এ যে আনন্দের প্লাবন! কেন এত আনন্দ! আজ যে নরেন্দ্রনাথ এসেছেন! দেবতার মতো সুন্দর এক যুবক। কী অদ্ভুত দুটি চোখ! একেই কি বলে পদ্মপলাশলোচন? রেশমের পোশাক পরিয়ে মাথায় মুকুট চাপিয়ে দিলেই মনে হবে মহারাজাধিরাজ। মাস্টারমশাই সব জানেন। কলকাতায় সিমুলিয়া বলে একটি পাড়া আছে। সেই পাড়ার একটি রাস্তার নাম গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট। সেই রাস্তায় বিশাল একটি বাড়ি আছে। বাড়িটির নাম 'দত্তবাড়ি'। দেউড়িতে দ্বারবান। মাথায় পাগড়ি, হাতে মোটা লাঠি। ভিতরে দাসদাসী, লোকজন, কলকোলাহল। বাইরের অফিসঘরে মক্কেল-মুহুরি। বন্ধু-বান্ধবদের যাওয়া-আসা। কর্মমুখর, উৎসবমুখর একটি চকমেলানো বাড়ি।

'দত্ত পরিবারের ইতিহাস? সময়ের পথ ধরে পিছিয়ে যাই অতীতে। ঐ দেখি, রামমোহন দত্ত। সুপ্রিম কোর্টের একজন নামী আইনজীবী। প্রচুর আয়। দত্ত পরিবারের 'ফাউণ্ডার'। বাড়ি, গাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি, পসার-প্রতিপত্তি। পুত্র দুর্গাচরণ। যেমন সংস্কৃত-জ্ঞান, সেইরকম পারসি। সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। দুর্গাচরণও আইন ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন, প্রচুর উপার্জন। হঠাৎ সন্ন্যাসী হয়ে অজ্ঞাতবাসে চলে গেলেন। তাঁর বয়স তখন মাত্র পঁচিশ। স্ত্রী আর একমাত্র পুত্রের দায়িত্ব আত্মীয়-স্বজনের হাতে দিয়ে গেলেন। এই পুত্রটির নাম 'বিশ্বনাথ'।

দুর্গাচরণ পাঁচ-ছয় বছর ধরে সারা ভারত ঘুরলেন, তীর্থ থেকে তীর্থে। শেষে স্থিত হলেন কাশীধামে। যখন রেল ছিল না, তখন কাশীধামে যাওয়া খুব সহজ ছিল না। হয় পদব্রজে, না হয় জলপথে নৌকাযোগে। দুর্গাচরণের স্ত্রী ও তাঁর অষ্টমবর্ষীয় শিশুপুত্র বিশ্বনাথ এইসময়ে কাশীযাত্রা করলেন জলপথে। স্রোতের বিপরীতে নৌকা চলেছে কখনো পালের বাতাসে, কখনো দাঁড়ে। শিশু বিশ্বনাথ নৌকার পাটাতনে খেলায় মত্ত। দুপাশে গঙ্গা ছুটছে তরতর করে। হঠাৎ বিশ্বনাথ জলে পড়ে গেলেন। ছেলেকে হাবুডুবু খেতে দেখে জননী ঝাঁপ মারলেন জলে। সাঁতার জানেন না। ঝপ্ করে ছেলের একটি হাত ধরে দুজনেই তলিয়ে যেতে লাগলেন। বাঁচার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় জীবনরক্ষা হলো। নৌকার মাঝিমাল্লারাই উদ্ধার করলেন। বিশ্বনাথ বিশ্বনাথ-দর্শনে যাচ্ছেন, বিশ্বনাথ আসবেন। না বাঁচালে চলবে? ক্ষুদিরামকে গদাধর ধরলেন। কামারপুকুরে গদাধর নামলেন। বিশ্বনাথকে চুলের মুঠি ধরে তুললেন বিশ্বনাথ, নরেন্দ্রনাথ হয়ে সিমুলিয়ায় প্রকাশিত হবেন বলে। নৌকার পাটাতনে জননী আর সন্তানকে যখন তোলা হলো, তখন দেখা গেল মা তাঁর ছেলের একটি হাত বজ্রমুষ্টিতে ধরে আছেন। হাতে লাল দাগ বসে গেছে। সেই দাগ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছিল। মায়ের পরানো রক্তবালা।

বিশ্বনাথ-জননী কাশীর গঙ্গার ঘাটে দিবাবসানে বসে থাকেন। একা উদাসী। স্বামীকে কিছুতেই ভুলতে পারেন না। দেবালয়ে, দেবালয়ে ঘুরে বেড়ান। সেদিন প্রবল বৃষ্টি। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের সামনে পিছল পাথুরে পথে তিনি পড়ে গেলেন। দূর থেকে এক সাধু দেখেছেন। "মাঈ গির্ গিয়া" বলে ছুটে এসে হাত ধরে যাঁকে তুললেন, তিনি তাঁর স্ত্রী। প্রথমে চিনতে পারেননি। মূর্ছিতা রমণীকে বহন করে মন্দিরের সোপানে শোয়ালেন। পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকানো মাত্রই সাধু দুর্গাচরণ শিউরে উঠলেন। বিশ্বনাথ-জননী মৃদু হাসলেন। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে একবার দেখা তাহলে হলো সাধু! বিশ্বেশ্বরের কৃপায়।

"মায়া, মায়া, মায়া হ্যায়। ভাগি চল, ভাগ্ যাও, ভাগ্ যাও।" সাধু দুর্গাচরণ ছিটকে সরে গেলেন। দ্রুত মিশে

গেলেন তীর্থযাত্রীদের ভিড়ে। আর দেখা গেল না তাঁকে। বিশ্বনাথ-জননীও কম যান না! সাধুকে সংসারে টেনে আনার জন্য তিনি ব্যাকুল হলেন না। ক্ষণিকের জন্য একবার দেখা হলো। এই তো যথেষ্ট! তুমি চলে যাও তোমার পথে, আমি চলে যাই আমার পথে। পিতা সন্তানকে ত্যাগ করতে পারে, মা কি পারে! জল থেকে টেনে তুলেছি। তুমি ফেলে গেছ, আমি তুলে নিয়েছি।

মেধাবী বিশ্বনাথ সকলকে ছাপিয়ে গেলেন। যেতেই হবে। পিতা যাঁর সন্ন্যাসী, মাতা শক্তিরূপিণী। এর বারো বছর পরে সন্ন্যাসি-সমাজের প্রথা অনুসারে দুর্গাচরণ জন্মভূমি দর্শনে এলেন। প্রথমে উঠলেন এক বন্ধুর বাড়িতে। বারণ করা সত্ত্বেও দত্তবাড়িতে পৌঁছে গেল সে-খবর। সবাই পাকড়াও করে নিয়ে গেলেন। সাধু এসেছেন শুনে বিশ্বনাথ উঠানে বেরিয়ে এসেছেন। এতদিন পরে দেখা, সাধু কিন্তু পুত্রকে কোলে তুলে নিলেন না। হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন মাত্র। বিশ্বনাথ-জননী ছুটে এলেন না। আসা যায় না বলে। মায়া চলে গেছেন মায়ালোক ছেড়ে। পড়ে আছে সামান্য কয়েক বছরের বেঁচে থাকার স্মৃতি। সাধু দুর্গাচরণ সেই যে চলে গেলেন, আর এলেন না, কখনো না।

দুর্গাচরণকে সংসারে ঢোকাবার চেষ্টা করেছিলেন আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবেরা। একটি ঘরে আটকে রেখেছিলেন, যেন খাঁচার পাখি। ঘরের একটি কোণে তিনদিন চোখ বুজিয়ে বসে রইলেন, জড়বৎ। কোন খাদ্য গ্রহণ করলেন না। অনশনে প্রাণত্যাগ করবেন। সবাই ভয় পেলেন। খুলে দেওয়া দরজা। পরের দিন দেখা গেল, তিনি চলে গেছেন। ঘর খালি। তাঁর তিনদিনের তপস্যার বীজটি সেই ঘরে পড়ে রইল, যার নাম বৈরাগ্য, মুক্তি। গেরুয়ার রঙ। এক-পুরুষ পরেই আসছেন তিনি। বীরেশ্বর।

দুর্গাচরণের পুত্র বিশ্বনাথ হয়ে উঠলেন অসামান্য এক পুরুষ। হাইকোর্টের নামকরা অ্যাটর্নি। কলকাতার বাইরেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। প্রখর বুদ্ধি, মেধা। শুধু ব্যবহারশাস্ত্র নয়, ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্বেও তাঁর অসীম জ্ঞান। বিভিন্ন ভাষা জানতেন, আর ভালবাসতেন গান। দারুণ ভাল রাঁধতে পারতেন। রোজ একবার রান্নাঘর পরিদর্শনে যেতেন। কোন না কোন অভিনব একটি পদ নিজে রাঁধতেন। প্রিয়জনদের খাওয়ানোতেই তাঁর আনন্দ।

তিনি এই আদর্শে বিশ্বাস করতেন—সংসারে যদি থাকতে হয়, তাহলে ভালভাবে থাক। পুরোদস্তুর সংসার কর। প্রাণ ঢেলে কর। সব সাধ মিটিয়ে নাও। সব আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি কর। তারপর ছাড়তে হয় ছাড়। আগে ভোগ তারপর যোগ। অর্থ উপার্জন কর। সঞ্চয় কার জন্য, কিসের জন্য? আন, ঢাল, খাও। যতদিন টাকা আছে, সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাও। নিজে খাও, পরকে খাওয়াও, রাজার হালে চল। আধা-সংসারী, আধা-সন্ন্যাসী —এ আবার কি!

বিশ্বনাথ দত্ত। কলকাতার এক মহান পুরুষ। দীনের বন্ধু, আশ্রিতের পিতা। ভ্রমণবিলাসী। আজ কলকাতায়, তো কাল লখনৌ। বেশ কিছুদিন ঐ নবাবী শহরে থেকে তিনি মুসলমান আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতির অনুরাগী হয়েছিলেন। পরিবারে প্রতিদিন পোলাও খাওয়ার প্রথা তারই ফল।

ইতিহাস তখন নানা ঘটনায় ব্যস্ত। সময় উথাল-পাথাল। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ। ভারতের প্রথম রক্তাক্ত স্বাধীনতা আন্দোলন। একবছর ধরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল বিস্ফোরক হয়ে উঠল। ১৮৫৮ সালে অবদমিত। ইংল্যাণ্ডের সিদ্ধান্তে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অবলুপ্ত। এই কোম্পানি একশ বছর ধরে এই ভূখণ্ড শাসন করে গেল। শাসন নয়, শোষণ। এই কোম্পানির শেষ গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং হলেন ব্রিটিশ শাসনের প্রথম ভাইসরয়। কলকাতায় ইংরেজ শাসনের চাকা গড়গড়িয়ে গড়াচ্ছে। চারিদিকে বড় বড় জমিদার। ধনী ব্যবসায়ী। বিলাস, বঞ্চনা, দারিদ্র্যের সহাবস্থান। ইংরেজের সঙ্গে গা ঘষাঘষি করে বাঙালি বেনিয়ান ও মুতসুদ্দিদের দারুণ বোলবোলা। ঝাঁক ঝাঁক পায়রার মতো টাকা উড়ছে। দোল, দুর্গোৎসব, চড়ক, জেলেপাড়ার সং। বনিতা, বারবনিতা। বহুবিবাহ, নারীনির্যাতন। পঙ্ক এবং পঙ্কজ।

গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটে এক মায়ের তপস্যা। বিশ্বনাথ-পত্নী মাতা ভুবনেশ্বরী। বিশ্বনাথ, বিশ্বেশ্বর, তুমি সন্তান হয়ে এস—ভারতসন্তান। সময় দ্রুত এগচ্ছে ১৮৬৩ সালের দিকে। আসবেন, তিনি আসবেন। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্—সে বেশ। তিনি ভারতটাকে উল্টেপাল্টে দেখবেন। মানুষের জীবনে জীবনে দুঃখের অক্ষর পড়বেন। নতুন অস্ত্রে মুক্তির অন্বেষণ।

রাত হয়ে গেল যে! দক্ষিণেশ্বরের ঘড়িতে এখন রাত আটটা। শ্রীরামকৃষ্ণ একাকী প্রেমোন্মত্ত হয়ে বারান্দায় পায়চারি করছেন। উত্তরের লম্বা বারান্দা। এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছেন, ওদিক থেকে এদিকে আসছেন।

আর ঐ সেই সাধনার ফল—নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

নরেন্দ্রনাথ আজ রাতে ঠাকুরের কাছে থাকবেন। কী আনন্দ! কী আনন্দ!

নহবতে মা রয়েছেন। ভক্তদের জন্য রান্নায় ব্যস্ত। চুপি, চুপি দেখি। ও বাবা! চমৎকার রুটি, চাপ চাপ ছোলার ডাল। তরকারি। কী অপূর্ব সুবাস! [ক্রমশ] (পাঁচ)

জীবসৃষ্টির বিবর্তন ও তার পরিণতি

কানাইলাল মুখোপাধ্যায়

ভুবন সৃষ্টিতে যে বিবর্তনক্রমের জন্যই বিচিত্র জীবজন্তু ও মানুষের সৃষ্টি, তা প্রজ্ঞাবন্ত ঋষি এবং আধুনিক বিজ্ঞানী উভয়েই একমত হয়েছেন, যদিও তাঁদের পথ ও পন্থা দুয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ।

পরমজ্ঞানী দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেছেন ঃ "Man is a rational, social and spiritual animal." অর্থাৎ মানুষ যুক্তিবাদী, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু জন্তু। বিদ্বজ্জন এই অবমাননাব্যঞ্জক বক্তব্যকে মেনেও নিল! মানুষ যে পশু নয়, পশুর থেকে পৃথক—এই ধারণাই তো ছিল। পাশ্চাত্য জগতে উনবিংশ শতাব্দীতে এই নবজ্ঞানোদয় হলো যে, মানুষ একরকমের জন্তুও বটে, তবে শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন। তবুও অনেকেরই এই কথাটা পছন্দ হলো না।

জীববিজ্ঞানী ডারউইন সারাজীবন নানারকম জন্তুর আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করেই এই কথা বলেছিলেন যে মানবের মধ্যে ঐ পূর্বোক্ত গুণগুলি অর্থাৎ যুক্তিনির্ভরতা, সামাজিকতা ও আধ্যাত্মিকতা নিয়ে যে গর্ববোধ করা হয় তা জীবের মধ্যেও আছে। সবগুলি সব জীবের মধ্যে নেই বটে, কিন্তু অনেকের মধ্যে যে আছে তা অস্বীকার করা যায় না। তাই ডারউইনের বক্তব্য হলো, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মনের নব নব সংযোজন, সংবর্ধন করে নিম্নতম জীব থেকে ক্রমে বিবর্তিত হয়ে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। আজ পর্যন্ত সৃষ্ট জন্তুরই শ্রেষ্ঠ সংস্করণ হলো মানুষ-জীব। এটা উনি লিখেছেন তাঁর 'Descent of Man' গ্রন্থে সৃষ্টির বিবর্তনবাদ বা ক্রমবিকাশবাদ সূত্রে।

একেবারে ধূলি, জল থেকে ক্রমে ক্রমে কীটপতঙ্গ, পাদপ, জীব সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই প্রসার্যমাণ বিবর্তন-ক্রমেই হয়েছে বানর এবং তারও পরে মানুষ। প্রাণের সূচনা একেবারে জল, বায়ু থেকে? এটা তো বিশ্বাস করা শক্ত। ওগুলি তো অচেতন জড়, আর জীব তো সচেতন। বিজ্ঞান উত্তর দিল—দুয়েরই মূলে আছে বিভিন্ন অঙ্গে কোষের উপাদানে অণু, পরমাণু। ওদেরও প্রেম, ভালবাসা, ঘৃণা আছে, যেগুলিকে চেতনশক্তির উপাদান বলা যায় নাকি? এরাই সকলে বিভিন্ন সংখ্যায় সন্নিবিষ্ট থাকলেও প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন সমাহারে অণু এবং পরে বৃহৎ কোষ গঠিত হয়। তাতেই হয় জীবজন্তুর হাড়, মাংস, শিরা-সম্বলিত দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। এই যে হয়, এটা কি অণু-পরমাণুর চেতনশক্তির জন্য নয়? তাই জড় অপেক্ষা জীবকে আধার হিসাবে আরো প্রসার্য চেতনসম্পন্ন বলে মনে হয়। সেইজন্যই স্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক হ্যাকেল বলেন ঃ "Without the assumption of an atomic soul the commonest and the most general phenomenon of chemistry are inexplicable. Pleasure and pain, desire and aversion, attraction and repulsion... and dissection of a chemical compound can be explained only by attributing to them sensation and will." রসায়ন বিজ্ঞানে যে পরমাণু থেকে অণু গঠন, অন্য অণুর সঙ্গে সংযোজন, কখনো আবার পরিবর্জনও যে হয় তা তাদের চিৎ-শক্তি ও ইচ্ছানুসারেই হয়। পরম বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বার্গসঁও বললেন, জীবের মধ্যে যে অখণ্ড প্রাণশক্তি (Life of Elan Vital) আছে, তার প্রেরণাই দেহেন্দ্রিয়ের ক্রমপরিবর্তন ঘটায়। তবে এই শক্তি জড়েও আছে, তবে তা নিরুদ্ধ। তাহলে কি সিদ্ধান্ত করা যায় না যে এক ব্রহ্মই আছেন, তিনিই বহুরূপে আপনাকে প্রকাশ করছেন?

পাশ্চাত্য মনীষীরা যথা হার্বার্ট স্পেনসার বললেন ঃ "The power that manifest itself in consciousness is but a differently conditioned form of the power which manifest itself beyond consciousness." অর্থাৎ যে-শক্তি চৈতন্যশক্তিরূপে বিকশিত হয়, তা জড়বস্তুর মধ্যকার অচেতন শক্তিরই রূপান্তর।

তবু তর্ক স্বাভাবিক কারণেই উঠল, নিম্নতর কোন জীবের সামাজিকতা, সঙ্ঘবদ্ধতা প্রভৃতি গুণগুলি যে আছে তা দেখান। উত্তর হলো—পিপীলিকা, মৌমাছি, উইপোকা যে দলবদ্ধ হয়ে চলাফেরা করে খাদ্যসংগ্রহ করে, তা কি তাদের সামাজিকতাবোধের প্রমাণ নয়? Rationality বা বুদ্ধিনির্ভরতা আছে বলেই তো এটা সম্ভব নয় কি? তার্কিক বললেন, তাদের কি মানুষের মতো স্মৃতিশক্তি, সাহস, শিল্পসৃষ্টির প্রতিভা আছে? উত্তর—আছে। ওদেরও মস্তিষ্ক যে আছে তার প্রমাণ হলো কোথায় খাদ্যসম্ভার আছে এক জীব সেই সন্ধান পেয়ে অন্যদের ডেকে নিয়ে যায়। ওদের তাহলে মানুষের মতো ভাষাও আছে মানতে হবে! সে-ভাষা অবশ্য 'আকারৈঃ ইঙ্গিতৈঃ গত্যা চেষ্টয়া ভাষণম্।' মা শিম্পাঞ্জি লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে ক্রীড়ারত বাচ্চাদের পাহারা দেয়, বেলের মতো শক্ত ফল কুড়িয়ে নিয়ে এসে একটা পাথরখণ্ড দিয়ে তাকে ভাঙে, পাথরের টুকরো পুড়িয়ে অন্য পাথরে ঘষে ঘষে ছুঁচলো করে অস্ত্র বানায় শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য। পাখির বাসা-নির্মাণে সতর্কতা বিচারের নিদর্শন। বাবুই পাখির বাসা বা মৌমাছির

মৌচাকে তাদের শিল্পরুচি, সৌন্দর্য, অনুভূতি কি প্রকট নয়? পায়রা, বুলবুলিদের প্রেম অভিসার তো আকচার দেখা যায়। বর্ষার মেঘ দেখে ময়ূরের পেখম তুলে নাচ তো ভোলার নয়। তাহলে নৃত্য-গীত, প্রেম, অভিসার মানুষের মতো ওদেরও আছে। শেষ তর্ক—মানুষের মতো ওদের অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কোন প্রমাণ নেই। সেটা কিরকম? ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, ঘৃণা, দেবদেবী, ঈশ্বরকল্পনা—এসব তো মনের বাইরের অনুভূতি, ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি। ডারউইন বললেন, তাও জীবের মধ্যে দেখা যায়, তবে খোলা মনে তা দেখতে হবে, বুঝতে হবে। একটা কুকুর যে তার প্রভুকে ঈশ্বরের মতোই মনে করে, তার স্বভাব অতিক্রম করে তাঁর আজ্ঞা পালন করে, তা কি ভক্তি ও ভালবাসার নিদর্শন নয়? সার্কাসের শিক্ষিত জন্তু-জানোয়ারগুলিকেও কি দেখা যায় না যে, তারা তাদের স্বভাব বর্জন করতে পেরেছে?

মানুষের মধ্যে এই অতীন্দ্রিয় মনন ক্ষমতার প্রসারতা অনেক বেশি। এর পরেও বিরুদ্ধবাদীরা বললেন যে, আমাদের দেহযন্ত্রের মতো ওদেরও দেহযন্ত্র খাদ্য হজম করায়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ায়, দেখায়, শোনায়, হৃৎপিণ্ড দেহে রক্তসঞ্চালন করায়। মস্তিষ্ক আছে তাই বুদ্ধিও আছে, স্মৃতিশক্তিও আছে। তবু জীবজন্তু থেকে মানুষ আলাদা এই জন্য যে, জীবের মস্তিষ্ক বিবর্তিত হতে হতেই তা আরো প্রভাবশালী হয়েছে। জীবজন্তুর মস্তিষ্কে যে বিচারবুদ্ধি আছে তা স্বভাব অনুসারে অর্থাৎ জীবনের প্রয়োজনেই তাকে কাজ করতে নির্দেশ দেয়। মানুষের মস্তিষ্ক স্বভাব অনুসারে যেমন তাকে গর্হিত কর্ম করতে নির্দেশ দিতে পারে, ওদের তা নেই। এইখানেই জীবজন্তু থেকে মানুষের বিশেষ পার্থক্য। মানুষের বিচারক্ষেত্র অর্থাৎ উচিত-অনুচিত, সঙ্গত-অসঙ্গত বোধ দুইই আছে। এর কারণ তো তিনটি গুণ—সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক। এরাই বিভিন্ন মানুষে বিভিন্ন গুণপ্রভাবের সঞ্চার করায়। এর কারণ বাইবেলও দেখিয়েছে। ভগবান আদম ও ইভকে স্বর্গীয় উদ্যানে এনে বললেন, এই উদ্যানে সব গাছের ফল স্বাস্থ্যকর নয়। বাছাবাছি করে খেও। মানবদম্পতি ভাল গাছের ফল খেয়ে ভাবল, ঐ নিষিদ্ধ ফল কেমন দেখি না একবার! এইটি পশুর ক্ষেত্রে হয় না। প্রাচ্য শাস্ত্র তো বলেছে মানুষের মানসিক দুর্বলতা—"জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানামি ধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।" এই হলো পৃথক জন্তু-মানুষ। তাই জ্ঞানে-বিজ্ঞানে কালক্রমে উন্নত হতে থাকলেও তার প্রয়োগে মানুষ সমাজ ও জগতের কল্যাণ হচ্ছে কিনা তা দেখছে না সবসময়ে। অকল্যাণ হবে দেখেও সে সেই জ্ঞানের দুষ্ট প্রয়োগে নিবৃত্ত হতে পারছে না। পশু এমন করে না। এইখানেই মানুষ জন্তুর থেকে পৃথক।

ডারউইন এবং তাঁর সঙ্গী জীববিজ্ঞানীদের মতে শেষ-পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে বানর, ওরাংওটাং—এরা কাছাকাছি, তবে শিম্পাঞ্জিই মানুষের নিকটতম পূর্ব জীব। তিনি অবশ্য পুরোপুরি বিবর্তনের ক্রমপর্যায়ের দৃশ্যগ্রাহ্য পার্থিব নিদর্শন দখাতে পারেননি। তবে বিজ্ঞানী হাক্সলি শিম্পাঞ্জি ও মানুষের দেহ, অস্থিখাঁচা ও মস্তিষ্কের গঠন বিচার করে বললেন, এদের দুয়ের ভিতর এত মিল যে, ডারউইনের বক্তব্যকে অস্বীকার করা যায় না যে শিম্পাঞ্জির পরেই বিবর্তিত জীব মানুষ। (দ্রঃ Evidences as to man's place in nature—Thomas Henry Huxley, London & Edinburg Williams & Norgate, 1863, pp. 69-70) আরেকজন বিজ্ঞানী দুয়ের দেহে ডি. এন. এ. নামক ক্ষুদ্র অণু গুণলেন এবং বললেন যে, ০.৬% অণুসংখ্যার তফাত অর্থাৎ ৯৯.৪% দুই দেহেই সমান। (দ্রঃ Journal of Molecular Evolution 30, 1990, pp. 202-236)


মানুষের পূর্বপুরুষ হোমো হ্যাবিলিসের খুলি, প্রায় দু লক্ষ বছর আগেকার

বিবর্তিত হতে হতেই যে জীব মানুষ হয়েছে তার কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল, তবে এই বিবর্তন কি মানুষেই থেমে গেল? এর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন প্রাচ্য মনীষীরা তাঁদের দশাবতারকে দিয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন কল্পের শ্রেষ্ঠ জীব মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ এবং কল্কির কথা বলে। ঐসকল মনীষীরা বলেছেন যে, অজ্ঞেয় এক পরম শক্তিধরের ইচ্ছায় প্রকৃতিতে এই সৃষ্টিক্রম হচ্ছে। তাহলে প্রশ্ন হলো, সৃষ্টিতে এই বিবর্তন কি মানুষেই শেষ? এরও উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ঐ প্রাচ্য মনীষীরা। বলেছেন যে, এর পরের পর্যায় অতিমানব সত্তা। এই বিজ্ঞানসন্ধিগ্ধ যুগেই একথা বলছেন শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণও তো বলেছেন, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ভগবানলাভ। পৌরাণিক পুরুষদের কথা ছেড়ে দিলাম, যিশুখ্রিস্ট, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ—এঁরা কি সেই অতিমানব নন? মানবকুলও বিবর্তনক্রমেই জন্মজন্মান্তরে যে অতিমানব হবে তা সুস্পষ্ট। উপনিষদ্ তো বলেইছেন—"তৎ ত্বম্ অসি।" যিশুখ্রিস্টের কথা—"Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect." অর্থাৎ তোমার স্বর্গের পিতার মতো দেহে, মনে, প্রাণে, শুদ্ধ, শান্ত সর্বাঙ্গসুন্দর হও। বিবর্তন প্রক্রিয়াও একথা বলছে। ❑

বিকল্প চিকিৎসা



ঔষধী গাছপালা
এস. কে. জৈন
অনুবাদঃ প্রভাত মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক ঃ
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া
এ-৫ গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি-১১০০১৬
পৃষ্ঠা ঃ ১২+১৭৮
মূল্য ঃ ৩৯ টাকা

একশ আটাত্তর পৃষ্ঠার গ্রন্থ **'ঔষধী গাছপালা'**য় লেখক ছাব্বিশটি ঔষধি উদ্ভিদের পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন ঔষধি গাছগাছড়ার বর্ণনা, প্রাপ্তিস্থান, ঔষধিগুণ, তাদের বৈজ্ঞানিক নাম, আঞ্চলিক পরিচিতি চিত্রসহ উপস্থিত করা হয়েছে। বর্ণনার ধারা সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল। তবু একটি অংশের অনুপস্থিতির জন্য পাঠকের প্রত্যাশা অপূর্ণ থাকবে। তা হলো ঔষধি উদ্ভিদগুলির কার্যকরী রাসায়নিক পদার্থের নাম। উদ্ভিদ নামে ক্রিয়া করে না। ক্রিয়া করে তাদের আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক উপাদানগুলি (উপক্ষার, টারপিন, অ্যালক্যালয়েড, রেসিন প্রভৃতি জৈবরাসায়নিক উপাদান)—যেগুলির অনুল্লেখ এই গ্রন্থে অনুভূত হয়। তবু এই উদ্যোগ স্মরণীয়। উদ্ভিদ-প্রকৃতির নিখুঁত বর্ণনা, কয়েকটি উদ্ভিদের সুন্দর রেখচিত্রের উপস্থাপন এবং কতিপয় উদ্ভিদের রঙীন আলোকচিত্র গ্রন্থের সৌষ্ঠব ও সমৃদ্ধির বিশেষ শর্ত। যখন বিদেশী ব্যবসায়ীদের তৎপরতায় এদেশের ভেষজ সম্পদ লুণ্ঠিত হচ্ছে, দেশীয় জনগণের উদাসীনতায় বহু ভেষজ উদ্ভিদ বিলুপ্ত হতে চলেছে, তখন এই উদ্যোগ লেখকের সামাজিক দায়বদ্ধতাকে স্মরণ করায়। এমন বহু গ্রন্থই আজ অপেক্ষিত। ভেষজ বিজ্ঞান ভারতের নিজস্ব সম্পদ। অথর্ব বেদ-এ এর ব্যাপক পরিচিতি আছে। ভেষজ উদ্ভিদসমূহের আঞ্চলিক নামের ভিন্নতা তার জনপ্রিয়তার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এই গ্রন্থ সেই সমস্যা উত্তরণে বিশেষ সহায়ক। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, পাশ্চাত্যের শিক্ষিত সমাজ ভেষজ উদ্ভিদের নবমূল্যায়ন হাজির করতে যখন তৎপর, তখন আমাদের শৈথিল্য ভাঙানোর এই উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। তবে উদ্যোগটি আরো প্রায়োগিকতায় রঞ্জিত হতো যদি উল্লিখিত ঔষধিসমূহের প্রজনন ও প্রতিপালনের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ এর সঙ্গে সংযোজিত হতো। পরবর্তী সংস্করণ হয়তো এই চাহিদা পূরণ করবে, কারণ গ্রন্থে লেখক কেবল তথ্য সরবরাহেই ক্ষান্ত থাকেননি, ঔষধি উদ্ভিদগুলিকে দেশব্যাপী জনমানসের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্যোগ নিয়েছেন। সময়ানুগ এই প্রয়াসের ব্যাপক প্রচার অবশ্যই কাম্য। ❑

মতবিনিময়ের পত্রসঙ্কলন

গান্ধী-সুভাষ সংঘাত

গান্ধী-সুভাষ সংঘাত
সঙ্কলন ঃ
বিজয়কুমার নাগ
প্রকাশক ঃ
জয়শ্রী প্রকাশন
২০এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড
কলকাতা-৭০০ ০২৬
পৃষ্ঠা ঃ ২+১০৪
মূল্য ঃ ২০ টাকা

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনের পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হওয়া এবং ঐ পদ থেকে পদত্যাগ করার অন্তর্বর্তী গান্ধী-সুভাষ দ্বন্দ্বের পত্রলিপিই হলো বিজয়কুমার নাগ সঙ্কলিত **'গান্ধী-সুভাষ সংঘাত'** গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই ১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ সাল অবধি আলাপচারিতার ৩৭টি তারবার্তা (গান্ধীজী প্রেরিত ১৬টি, সুভাষচন্দ্র প্রেরিত ১৮টি এবং অন্যান্য ২টি) এবং ১৬টি পত্র (সুভাষচন্দ্র প্রেরিত ১১টি পত্র এবং গান্ধীজী প্রেরিত ৫টি পত্র) এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে পুনর্নির্বাচিত হলে কংগ্রেস দলে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের

মধ্যে চূড়ান্ত ব্যবধান দেখা দেয়। সেই ব্যবধানের জেরই হলো সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস ত্যাগ ও ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠন। এই ঐতিহাসিক বিচ্ছেদ সুভাষচন্দ্রের জীবনের এক ঐতিহাসিক ঘটনা। বিচ্ছেদের কারণ এই গ্রন্থে বিবৃত নয় (যদিও অস্পষ্ট ইঙ্গিত অতিসংক্ষেপে ভূমিকায় আছে) এবং সমকালীন পরিস্থিতির কোন রূপরেখাও এই গ্রন্থে নেই (তারও সংক্ষিপ্ত সংযোজন আবশ্যিক ছিল)। যাই হোক গ্রন্থে উপস্থিত তারবার্তা ও পত্রগুলিও যথেষ্ট মূল্যবান অন্তত সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীজীর চরিত্রচিত্রণে।

এই গ্রন্থে একটি ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের কিছু প্রামাণিক তথ্য সঙ্কলিত হয়েছে, যা দুই বিশেষ ব্যক্তিত্বের সমকালীন মানসিকতাকে শনাক্ত করার সুযোগ দেয়। ঘটনাক্রমে দ্বিতীয়বার (১৯৩৯ সালে) কংগ্রেসের সভাপতি-পদে নির্বাচিত হয়েও পরে ঐ পদ থেকে সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করেন। এজাতীয় সঙ্কটমুহূর্তে মানসিক চাপ সহ্য করেও সুভাষচন্দ্র দলীয় সংহতি অটুট রাখার জন্য কংগ্রেস দল নিয়ন্ত্রণে গান্ধীজীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা প্রার্থনা করেছেন ঃ “(এমত পরিস্থিতিতে) আপনার অগ্রসর হইয়া আসিয়া ওয়ার্কিং কমিটির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ করা উচিত এবং ইহার ফলে বহু বাধা দূর হইবে ও বহু বিঘ্নের অবসান ঘটিবে।” (পৃঃ ৫৭) এজাতীয় আবেদনের প্রত্যুত্তরে গান্ধীজীর নির্ঘোষ ঃ “তুমি যে মতামত প্রকাশ করিয়াছ সেগুলি অন্যদের ও আমারও মতামতের এত সম্পূর্ণ বিরোধী যে, আমি তাহার মধ্যে সেতুরচনার কোন সম্ভাবনা দেখি না।” (পৃঃ ২৭) পরবর্তী চিঠিতে গান্ধীজী জানালেন ঃ “আমাদের মধ্যে একজন অন্যজনের মত গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন নৌকাতেই চলিতে হইবে, যদিও নৌকা দুইটির লক্ষ্য এক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু শুধু মনেই হয়।” (পৃঃ ৭১)

এই সঙ্কলন যেমন সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবাবেগ ও গান্ধীজীর পরিপক্ব পদক্ষেপকে প্রকাশ করে, তেমনি সুভাষচন্দ্রের অনমনীয় পৌরুষ, আগ্নেয় দেশপ্রেম ও বিনম্র শ্রদ্ধাও ব্যক্ত করে; অথচ বিপরীত প্রান্তে ক্ষমার মূর্তি বলে চিহ্নিত গান্ধীজীকে এখানে যেন মমতাহীন, একদেশদর্শী ও রুক্ষ বলেই মনে হয়।

বস্তুত, সংক্ষিপ্ত কলেবরে হলেও সঙ্ঘাতকালীন দুই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের মানসিকতার এক বাণীচিত্র-রূপে এই সঙ্কলন যেমন ইতিহাসের উজ্জ্বল উদ্ধার, তেমনি আগামী প্রজন্মের কাছে শিক্ষণীয় অধ্যায় হিসাবে বিচার্য হতে পারে। ❑

—তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাপ্তি সংবাদ

● **কথাপ্রসঙ্গে (২য় ও ৩য় খণ্ড)—স্বামী নিঃসঙ্গানন্দ।** প্রকাশক ঃ সারদা আশ্রম সমিতির পক্ষে কানাইলাল সরকার, প্রযত্নে—সারদা আশ্রম সুভাষপল্লী, সারদা লেন, বর্ধমান-১ এবং ১৬ আর. বি. ঘোষ রোড, খোসবাগান, বর্ধমান-১। পৃষ্ঠা ঃ ২য় খণ্ড—১০+১৭৭+৮ এবং ৩য় খণ্ড—১০+১৬৪+৩২। মূল্য ঃ প্রতি খণ্ড ৫৫ টাকা।

● **আশ্রয়—স্বামী সত্যঘনানন্দ।** প্রকাশক ঃ প্রতিমা হালদার, শ্রীমা সারদা প্রকাশনী, নীলাচল, পি-২৯ কালিন্দী, কলকাতা-৭০০০০৪। পৃষ্ঠা ঃ ৮০। মূল্য ঃ ৪০ টাকা।

● **আনন্দ রূপম্ অমৃতম্—অনিলকুমার বিশ্বাস।** প্রকাশিকা ঃ নন্দিতা বিশ্বাস ও মণিমঞ্জুষা বিশ্বাস। পৃষ্ঠা ঃ ১০+২৯১। মূল্য ঃ ২০০ টাকা।

● **রত্নাকর নয় শূন্য কখন—অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।** প্রকাশক ঃ সুপ্রকাশ, স্বাতী রাহা, বিশ্বম্ভর রায় রোড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। পৃষ্ঠা ঃ ১২০। মূল্য ঃ ৫০ টাকা।

● **শ্রীগীতা জ্ঞানসূর্য্যালোক (১ম খণ্ড)—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।** প্রকাশিকা ঃ বাসন্তী চক্রবর্তী, 'অলোকানন্দা', ফ্ল্যাট—২এ, ২ হালতু মেন রোড, কলকাতা-৭০০০৭৮। পৃষ্ঠা ঃ ১৮+৭০। মূল্য ঃ ১৮ টাকা।

● **দেহেশো—ডাঃ রমেশচন্দ্র বেরা।** প্রকাশক ঃ আবদুল মান্নান, মেছেদা, মেদিনীপুর-৭২১১৩৭। পৃষ্ঠা ঃ ১৬+১৪৪। মূল্য ঃ ৩০ টাকা।

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ৬

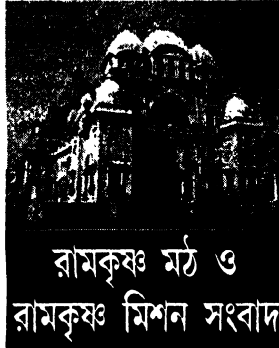
পাশাপাশি ঃ (১) রামেশ্বর, (৩) সশক্তিক, (৬) মায়া, (৭) কৃপা, (৯) অবনী, (১০) রাখাল, (১৪) মাতৃ, (১৫) মন, (১৭) জপমালা, (১৮) পঞ্চতপা।

ওপর-নিচ ঃ (১) রামচন্দ্র, (২) রঙ্গ, (৩) সদয়া, (৪) কর্মপাশ, (৫) স্নেহবতী, (৬) মাকু, (৮) ভিখারিনী, (১১) রামানুজ, (১২) মীন, (১৩) ছাইচাপা, (১৫) মঙ্গলা, (১৬) জপ।

রামকৃষ্ণ মিশনের ৯২তম বার্ষিক সাধারণসভা

গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০১ বিকাল সাড়ে তিনটায় বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের ৯২তম বার্ষিক সাধারণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সঙ্ঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। সভায় বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করা হয়। ২০০০-২০০১ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো—ভারতে বেলগাঁও (কর্ণাটক), বিজয়ওয়াড়া (অন্ধ্রপ্রদেশ) ও জম্মুতে এবং অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে নতুন শাখাকেন্দ্রের উদ্বোধন; দিল্লি কেন্দ্রের মাধ্যমে একটি Phaco Emulsification Unit শুরু; হায়দ্রাবাদ কেন্দ্রে Vivekananda Institute of Human Excellence-এর উদ্বোধন এবং হুগলী জেলার ময়াল-ইছাপুর কেন্দ্রে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন হয়েছে।

গত আর্থিক বছরে সারা ভারতে ত্রাণ ও পুনর্বাসনে ৬ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় এবং ১,৭০০ গ্রামের ১২ লক্ষ মানুষ উপকৃত হন। ওড়িশার পুনর্বাসন কর্মসূচী সমাপ্ত-প্রায়। সেখানে ৩০৩টি বাড়ি ও ৩টি বিদ্যালয় তথা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। গুজরাটে ব্যাপকতর কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি এবং দুঃস্থদের আর্থিক সাহায্যের খাতে ২ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। মিশনের ৯টি হাসপাতাল ও ১০৭টি স্থায়ী/ভ্রাম্যমাণ ডিসপেন্সারির মাধ্যমে প্রায় ৫৭ লক্ষ রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে। এই খাতে ব্যয় হয়েছে ২৬ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মোট ১ লক্ষ ১২ হাজার ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করেছে। তার মধ্যে ছাত্রী ৩৩ হাজার। শিক্ষাখাতে মোট খরচ হয়েছে ৭৪ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। গ্রামীণ ও উপজাতি উন্নয়নমূলক কর্মখাতে ব্যয় হয়েছে ৯ কোটি ১১ লক্ষ টাকা।



উৎসব-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ মঠ, কাশীপুর (কলকাতা-৭০০ ০০২)ঃ গত ১লা জানুয়ারি ২০০২ প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'কল্পতরু উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিনব্যাপী এই উৎসবে বৈদিক প্রার্থনা, ভক্তিগীতি, রামায়ণ গান, ভজন, পাঠ প্রভৃতি এবং ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন মঠের সন্ন্যাসিগণ ও বিখ্যাত শিল্পীরা। কালীকীর্তন পরিবেশন করেন আন্দুল কালীকীর্তন সমিতি। এছাড়া পরিবেশিত হয় ভোলানাথ সর্দার ও সম্প্রদায়ের পদাবলী কীর্তন এবং হাওড়া সমাজের 'নদের নিমাই' যাত্রাপালা। 'শিবতাণ্ডব নৃত্য' ও বৃন্দবাদন পরিবেশন করেন যথাক্রমে হায়দ্রাবাদের কালাকৃষ্ণ সম্প্রদায় এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের দৃষ্টিহীন ছাত্ররা। তিনদিনের বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ, স্বামী সুহিতানন্দজী ও স্বামী দেবরাজানন্দজী। ভাষণ দান করেন স্বামী প্রভানন্দজী, স্বামী নিখিলাত্মানন্দজী, স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী, ডঃ তাপস বসু, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। উৎসবে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়েছিল। সমাগত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

'কল্পতরু উৎসব' রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভক্তবৃন্দের কাছে বিশেষ তাৎপর্যবহ। ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি এই উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ 'কল্পতরু' হয়েছিলেন। এপ্রসঙ্গে স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ বলেছেনঃ "কেবলমাত্র আজকের দিনে তিনি 'কল্পতরু' হয়েছিলেন, তা কেন? তিনি সদাই কল্পতরু। তিনি নিত্যই কত জীবকে কতভাবে কৃপা করতেন। হ্যাঁ, কাশীপুরের বাগানে এই দিনে তিনি একসঙ্গে অনেক ভক্তকে কৃপা করেছিলেন। সে-হিসাবে আজকের দিনের একটা বিশেষত্ব আছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্যামপুকুর থেকে ১৮৮৫ সালের ১১ ডিসেম্বর কাশীপুর উদ্যানবাটীতে নিয়ে আসা হয়। কোলাহলপূর্ণ ধুলো-ধোঁয়াযুক্ত শ্যামপুকুরবাটী অপেক্ষা কাশীপুর উদ্যানবাটী ছিল শান্ত, কোলাহলরহিত, ধোঁয়ামুক্ত। এখানে কয়েক-দিন বাসের পর ঠাকুরের মন বেশ আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া ডাঃ রাজেন্দ্রবাবু প্রদত্ত হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেয়ে তিনি বেশ কয়েকদিন ধরে সুস্থবোধ করছিলেন। সেজন্য তিনি একদিন উদ্যানের আরামপ্রদ ঝলমলে রোদে বেড়াবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেই ইচ্ছানুসারে তিনি রামলালদাদার (ঠাকুরের ভাইপো) সঙ্গে ওপর থেকে নেমে বাগানে বেড়াতে গেলেন। পরবর্তী কালে এই ঘটনার স্মৃতিচারণ করে লাটু মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দজী) বলেছিলেনঃ "একদিন (১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি) তিনি রামলালদাদার সঙ্গে উপর থেকে নেমে বাগানে বেড়াতে গেলেন। নিচে তখন গিরিশবাবু, রামবাবু, অতুলবাবু, অক্ষয় মাস্টার, হরিশভাই—ইনারা সব ছিলেন। হামি আর শরোটভাই তখন উপরে তাঁর বালিশ, বিছানা, লেপ, তোষক সব রোদে দিচ্ছিলুম। শুনেছি, তিনি সকল ভক্তকে 'তোমাদের চৈতন্য হোক' বলে আশীর্বাদ করেছিলেন, আর তাদের ছুঁয়ে দিয়েছিলেন।" এরপর একজন ভক্ত তাঁকে প্রশ্ন করলেনঃ "মহারাজ, শুনেছি সেদিন তিনি নাকি 'কল্পতরু' হয়ে যে যা চাইছিল, তাকে তাই আশীর্বাদ করেছিলেন?" উত্তরে লাটু মহারাজ বলেনঃ "তিনি তো আশীর্বাদ দিয়ে হামাদের ভরপুর কোরে দিয়েছিলেন। আবার কি চাইব তাঁর কাছে?"

১৯২৪ সালের ১লা জানুয়ারি বৃহস্পতিবার 'কল্পতরু' উৎসবের তাৎপর্য বিষয়ে স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ বলেনঃ "যে-শক্তির প্রভাবে এ-বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, ঠাকুর সেই ব্রহ্মশক্তিকে জাগরিত করেছেন। জগতের কল্যাণের জন্য তিনি যে কী করে গেছেন—জগৎ ক্রমে তা বুঝবে। আহা! আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, ঐ সাক্ষাৎস্বরূপের সঙ্গে ছিলাম—তাঁর

দর্শন, স্পর্শন ও সেবাদি করতে পেরেছিলাম! তাঁর স্পর্শে আমাদের জীবনও ধন্য হয়ে গেছে। তাঁকে স্পর্শ করার সৌভাগ্য যাদের হয়নি অথচ তাঁর ভাব আশ্রয় করে নিজেদের জীবন গঠন করছে, তাঁকেই জীবনের আদর্শ করছে—তারাও ধন্য হয়ে যাবে। সর্বভাবময় প্রভু—তিনি ত্রিলোকেশ্বর, অহেতুক কৃপাসিন্ধু, বাঞ্ছাকল্পতরু। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এ চতুর্বর্গের যে যা প্রার্থনা করবে তাঁর কাছে আন্তরিকভাবে, তিনি তাকে তাই দেবেন। তিনি যে কৃপাসিন্ধু ছিলেন, তা সেদিনের ঘটনায় ভক্তেরা বিশেষ করে বুঝতে পেরেছিলেন।"

একজন ভক্ত তাঁকে প্রশ্ন করলেন: "মহারাজ, আপনি কি সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন?" উত্তরে মহারাজ বলেন: "না। আমি কেন, ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে কেহই সেসময় তথায় উপস্থিত ছিলেন না। ঠাকুরের তখন খুব অসুখ। আর আমাদের প্রাণে তখন তীব্র বৈরাগ্য। দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁর সেবার জন্য আমরা পালা করে থাকতুম। ভক্তেরা সকলে দিনের বেলায় সময়সুবিধামতো আসতেন, ঔষধপথ্যাদি ও খরচপত্রের সব ব্যবস্থা করতেন; তাঁর সেবার সম্পূর্ণ ভারই ছিল আমাদের উপর। আর তাঁর সেবার সঙ্গে চলছিল খুব সাধন-ভজন। ঠাকুরও সেবিষয়ে আমাদের খুব উৎসাহ দিতেন। রাত্রে স্বামীজী ধুনি জ্বালিয়ে আমাদের নিয়ে ধ্যানজপ করতেন। ঠাকুরের সেবা আর ধ্যানজপাদিতে সারারাত খুবই আনন্দে কেটে যেত।"

"রাত জাগা হতো বলে দুপুরবেলা খাওয়ার পরে আমরা প্রায় সকলেই খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিতুম। সেদিন নিচে হলঘরের পাশের ঘরে আমরা ঘুমুচ্ছিলাম। সেদিনই বিকেলবেলা ঠাকুর একটু বাগানে বেড়াবার জন্য প্রথম নিচে নামেন। ছুটির দিন বলে অনেক ভক্তই সেসময় বাগানে উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুরকে নিচে নামতে দেখে ভক্তেরাও আনন্দে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগলেন। ধীরে ধীরে ঠাকুর বাগানের ফটকের দিকে যাচ্ছিলেন—এমন সময় গিরিশবাবু ঠাকুরের চরণতলে পতিত হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে করজোড়ে তাঁকে স্তব করতে লাগলেন এবং ঠাকুরের ভাবাবেশ দেখে ভক্তেরা 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ' বলে উচ্চধ্বনি করে ঠাকুরকে বারংবার প্রণাম করতে লাগলেন। তখন তিনি কৃপাদৃষ্টিতে ভক্তদের দিকে তাকিয়ে বললেন—'কি আর বলব! তোমাদের সকলের চৈতন্য হোক।'

"ঐ অবস্থায় একে একে প্রায় সকলকেই 'চৈতন্য হোক' বলে স্পর্শ করে সকলের চৈতন্য করে দিলেন। সেই দিব্যস্পর্শে কেউ ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন, কেউ আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন, কেউ কাঁদতে লাগলেন, কেউ বা উন্মত্তের ন্যায় জয়ধ্বনি করতে লাগলেন। সেই গোলমালে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। আমরা ছুটে এসে দেখি যে, ভক্তেরা সকলে ঠাকুরকে ঘিরে উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করছেন; আর তিনি মধুর হাসিমুখে সস্নেহে ভক্তদের দিকে তাকিয়ে আছেন।"

অতীতের কাশীপুর উদ্যানবাটীর অবস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিষয়ে জানা যায়—কলকাতার উত্তরে বাগবাজার থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে বরানগর বাজারের কাছাকাছি কাশীপুর উদ্যানবাটী অবস্থিত। উদ্যানটি নাতিদীর্ঘ হলেও বেশ রমণীয়। আয়তনে প্রায় ১৪ বিঘা হবে। রানী কাত্যায়নীর জামাতা গোপালচন্দ্র ঘোষ ছিলেন উদ্যানবাটীর স্বত্বাধিকারী। ঠাকুরের জন্য ভক্তগণ তাঁর কাছ থেকে ৮০ টাকায় ৯ মাসের জন্য বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিলেন। ভাড়ার অঙ্গীকারপত্রে সই করে শ্রীরামকৃষ্ণের 'রসদদার' সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মাসে মাসে ঐ ভাড়া মিটিয়ে দিতেন। বাগানের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর ছিল; এখনো তা আছে। বাগানের উত্তরসীমার প্রায় মাঝখানে ৩।৪টি ছোট ছোট ঘর—রন্ধন ও ভাঁড়ারের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ঐ ঘরগুলির সামনে দ্বিতল বসতবাটী। তার নিচে ৪টি ও ওপরে ২টি ঘর ছিল। এর উত্তরে পাশাপাশি ২টি ছোট ঘর ছিল। তার মধ্যে একটি ঘর ছিল শ্রীমা সারদাদেবীর জন্য নির্দিষ্ট। দ্বিতলে একটি বড় ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর থাকতেন। এর দক্ষিণে ছিল প্রাচীরবেষ্টিত ছোট ছাদ। এখানে ঠাকুর কখনো কখনো বেড়াতেন। শ্রীশ্রীমায়ের ঘরের ওপরে একটা ছোট ঘর ছিল। সেখানে ঠাকুর স্নান করতেন এবং ২।১ জন সেবক রাত্রিবাস করতেন। বাগানের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি ডোবা ও পুকুর ছিল। পুকুরের পশ্চিমপাড়ে একটা খেজুর গাছ ছিল। ঐ খেজুরের জিরেন রস নিরঞ্জনানন্দজী প্রমুখ ঠাকুরের সন্তানগণ খেতে গেলে এক বিরাট কালকেউটের দংশন থেকে ঠাকুর তাঁদের রক্ষা করেছিলেন।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহাবসানের পর কাশীপুর উদ্যানবাটী ছেড়ে দেওয়ার কথা গৃহী ভক্তেরা বলেন। কারণ, ৩১ আগস্ট পর্যন্ত ভাড়ার মেয়াদ ছিল। শ্রীশ্রীমায়ের কথা ভেবে স্বামীজী প্রমুখ ত্যাগী সন্তানগণ চেয়েছিলেন আরো কিছুদিন তিনি সেখানে থাকুন। কিন্তু তাঁদের তো তখন অর্থ বা সামর্থ্য কিছুই ছিল না; তাই তাঁদের সে-ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। সেজন্য হৃদয়ে গভীর দুঃখ গোপন রেখে তাঁদের চলতে হয়েছিল। অবশেষে ঠাকুরের কৃপায় এবং স্বামীজীর স্বপ্নের কাশীপুর উদ্যানবাটীর অর্ধেক পরিমাণ জমি ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে বেলুড় মঠ ক্রয় করে। বাকি অর্ধ-পরিমাণ জমি ক্রীত হয় ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে। কাশীপুরে এই সময়ের পর থেকেই 'কল্পতরু উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাভূমি কাশীপুর উদ্যানবাটী ভক্তদের কাছে একটা স্মৃতিপূত পরম তীর্থস্থান।

দেহত্যাগ

স্বামী সুলভানন্দজী (ধীরেন মহারাজ) হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গত ৫ নভেম্বর ২০০১ দুপুর ২টা ২০ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। দেহান্তকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি গত কয়েকবছর ধরে উচ্চ রক্তচাপ ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করে ১৯৪২ সালে বেলুড় মঠে যোগদান করেন। ১৯৫২ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। তিনি দীর্ঘ ২৭ বছর বেলুড় মঠের পূজারি ছিলেন। বৃন্দাবন ও ভুবনেশ্বর মঠেও তিনি পূজারির দায়িত্বে ছিলেন। স্নেহপ্রবণতা ও কর্মে সুশৃঙ্খলতা তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন : গত ২৪ ডিসেম্বর ২০০১ শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালন করা হয়।

ঐদিন (২৪ ডিসেম্বর ২০০১) যীশুখ্রীস্টের জন্মের প্রাক্‌সন্ধ্যাও পালন করা হয়। 'সারদানন্দ হল'-এ বাইবেল থেকে পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে।❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সেবা সংসদ, কলকাতা-৭০০ ০৮১ : গত ১১ নভেম্বর ২০০১ সারাদিনব্যাপী এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভক্তিগীতি, পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের অঙ্গ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন নীলাদ্রি দে। ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন বারাসত রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী মুক্তিকামানন্দজী। 'শ্রীশ্রীমা ও গার্হস্থ্যধর্ম' বিষয়ে আলোচনা করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দজী এবং স্বামীজীর ওপর বক্তব্য রাখেন সোমনাথ বাগচী। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। এই উপলক্ষ্যে দরিদ্র মানুষের মধ্যে কম্বল এবং স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও নিবেদিতা সম্পর্কিত পুস্তিকা বিতরণ করা হয়। এছাড়া বেলুড় মঠের ত্রাণ তহবিলে ১,৫০১ টাকা এবং বারাসত মঠের দাতব্য চিকিসালয়ের জন্য ১,৫০১ টাকা প্রদান করা হয়।

পুইনান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ, হুগলী : গত ১১ নভেম্বর ২০০১ সঙ্ঘের উদ্যোগে একটি ভক্তসম্মেলন আয়োজিত হয় নবগ্রাম সঙ্ঘে। গুরুবন্দনা, ভক্তিগীতি, 'গীতা', 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ এবং 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা ছিল সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ। ভক্তিগীতি পরিবেশন এবং ধর্মপ্রসঙ্গ করেন স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী। সম্মেলনে প্রায় ১,০০০ ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

কোন্নগর উত্তরণ, হুগলী : গত ১১ নভেম্বর ২০০১ সংস্থার ১৭তম বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করা হয় কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ে। বক্তৃতা, সঙ্গীত, নাটক ও ধর্মসভা ছিল উৎসবের অঙ্গ। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন প্রব্রাজিকা সোমপ্রাণা ও প্রণবেশ চক্রবর্তী। সভাশেষে ১১৫ জন ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়।

আরামবাগ জগৎপতি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, হুগলী : গত ১১ ও ১২ নভেম্বর ২০০১ সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়। উৎসবে প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, 'গীতা', 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রসাদ পান ৫,০০০ ভক্ত। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী এবং ভাষণ দেন প্রণবেশ চক্রবর্তী, সুধাংশু বিশ্বাস, অমরেন্দ্রনাথ আদক প্রমুখ। সন্ধ্যারতির পর 'শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্কীর্তন' পরিবেশিত হয়। পরদিন আয়োজিত হয় ক্যুইজ, বক্তৃতা ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। সন্ধ্যায় বাউলগান পরিবেশন করেন গোলাম আলি ও সম্প্রদায়।

শ্যামপুকুরবাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্ঘ, কলকাতা-৭০০ ০০৪ : গত ১৪ নভেম্বর ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের 'বরাভয় লীলা' উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও 'কথামৃত' পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। পূজা করেন ব্রহ্মচারী পরমেশচৈতন্য। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অরুণকৃষ্ণ ঘোষ ও সম্প্রদায়। 'কথামৃত' পাঠ করেন কেয়া ঘোষ। অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু সন্ন্যাসী ও ভক্ত অংশগ্রহণ করেন।

বিলাসিপাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ধুবড়ি, অসম : গত ২৪ নভেম্বর ২০০১ সেবাশ্রমে বিশেষ পূজার মাধ্যমে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রায় ১,২০০ ভক্ত প্রসাদ পান এবং ৫০ জন দরিদ্র মানুষকে কম্বল ও ২ জনকে ধুতি প্রদান করা হয়।

বি. গার্ডেন শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, হাওড়া : গত ২৪ নভেম্বর ২০০১ বিশেষ পূজার মাধ্যমে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে পরিবেশিত হয় মাতৃসঙ্গীত এবং প্রকাশিত হয় 'শরণ্যে' স্মরণিকা। এদিন প্রায় ২,২০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

তিনসুকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, অসম : গত ২৪ নভেম্বর ২০০১ মহাসমারোহে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন দুপুরে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। এই উপলক্ষ্যে পরিবেশিত হয় ভক্তিমূলক সঙ্গীত এবং আয়োজিত হয় 'আরতি' প্রতিযোগিতা। ধর্মপ্রসঙ্গে আলোচনা করেন নরোত্তমনগর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী ঈশাত্মানন্দজী।

পুতুণ্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, শক্তিগড়, বর্ধমান : গত ২৪ নভেম্বর ২০০১ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, কুমারীপূজা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন দুপুরে ১০ জন সন্ন্যাসী ও ৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ঘাটাল, মেদিনীপুর : গত ২৫ নভেম্বর ২০০১ সারাদিন ধরে এক ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বৈদিক শান্তিমন্ত্র পাঠ, ভক্তিগীতি, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল সম্মেলনের অঙ্গ। 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন তমলুক রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। 'মায়ের কথা' থেকে পাঠ করেন মৃদুলা দত্ত এবং 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' থেকে পাঠ করেন ডাঃ সুকুমার গোস্বামী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সারদা সঙ্ঘের সদস্যাবৃন্দ। এছাড়া 'উদ্বোধন' পত্রিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন বাদলচন্দ্র গুছাইত এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রশস্তি পাঠ করেন উমাশঙ্কর রায়। স্বাগত-ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন

যথাক্রমে সেবাশ্রমের সম্পাদক অজিতকুমার সাঁতরা ও অধ্যাপক কমলকুমার মান্না। সম্মেলনে প্রায় ৩৫০ জন ভক্ত যোগদান করেছিলেন।

ভগিনী নিবেদিতা সেবাকেন্দ্র, ডানকুনি, হুগলী : গত ২৫ নভেম্বর ২০০১ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগিনী নিবেদিতার জন্মদিন পালন করা হয়। সূচনায় বেদ ও স্তব পাঠ করেন কাকলি ঘোষ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী ক্ষেমানন্দজী এবং রেশমী বসু, জয়া বসুরায় প্রমুখ। ভগিনী নিবেদিতার জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী সুমঙ্গলানন্দজী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল ভক্ত ও দরিদ্র বালক-বালিকাকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাক্তন ছাত্র সংসদ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৩৬ : গত ২৫ নভেম্বর ২০০১ ফ্রি হার্ট চেক-আপ শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের পূর্তমন্ত্রী অমর চৌধুরী। অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কোম্পানির সহকারী ম্যানেজার ও ডাইরেক্টর এস. কে. দেভৌমিক এবং গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার ডাইরেক্টর অরিজিৎ চৌধুরী। এদিন ১১২ জনের হার্ট পরীক্ষা করা হয়।

বেলপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র, অযোধ্যা, হাওড়া : গত ৩০ নভেম্বর ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় একটি বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয়ে। আলোচ্য বিষয় ছিল—'স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম' ও 'স্বামীজীকে আমাদের প্রয়োজন কেন'। আলোচনা করেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী, স্বামী স্বাগতানন্দজী ও অধ্যাপক সঞ্জীবকুমার দাস। আলোচনাশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পাঠচক্রের সম্পাদক কাজল বৈতালিক। সম্মেলনে ৬০০ যুবক ও যুবতী অংশগ্রহণ করেছিল। অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিনিধিকে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর একটি করে ছবি ও 'সবার স্বামীজী' পুস্তিকা প্রদান করা হয়।

কোন্নগর শ্রীরামকৃষ্ণ মননসভা, হুগলী : গত ২ ডিসেম্বর ২০০১ প্রতিবছরের ন্যায় গোপীনাথ জীউর মন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভপদার্পণ উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় 'কোন্নগরে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ পদার্পণ ও রাসলীলা' বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী। এছাড়া ভক্তিগীতি, স্তব ও ভজন পরিবেশিত হয়। পরিবেশন করেন ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। উপস্থিত সকল ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

ফুলিয়া বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল, নদীয়া : গত ২ ডিসেম্বর ২০০১ বার্ষিক যুবশিক্ষণের আয়োজন করা হয় স্থানীয় ফুলিয়া শিক্ষানিকেতনে। সারাদিনব্যাপী শিবিরের আলোচ্য বিষয় ছিল 'স্বামীজীর মনুষ্যত্ব উন্মেষক ও চরিত্রগঠনকারী শিক্ষা'। আলোচনা করেন বঙ্কিমনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সুরেশানন্দজী, বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, নিতাই কর্মকার ও অলোক দাস। বিভিন্ন সময়ে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশ্বনাথ ঘোষাল ও শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়। স্বাগত-ভাষণ ও সমাপ্তি-ভাষণ দেন যথাক্রমে মিঠুন বসাক ও রঞ্জন বসাক। শিবিরে ২৫০ জন শিক্ষার্থী যোগদান করেছিল। যোগদানকারী প্রত্যেক প্রতিনিধিকে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর একটি করে ছবি প্রদান করা হয়।

রাণাঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা স্মরণ সঙ্ঘ, নদীয়া : গত ২ ডিসেম্বর বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও আলোচনাসভার মাধ্যমে সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। আলোচনা করেন স্বামী ব্রহ্মাপদানন্দজী ও স্বামী সুরেশানন্দজী।

সোমসার শ্রীরামকৃষ্ণ সেবামন্দির, বাঁকুড়া : গত ৪ ডিসেম্বর ২০০১ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজীর জন্মশতবার্ষিকী ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা ছিল উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। ভাষণ দান করেন রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী তত্ত্বস্থানন্দজী ও জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী অমেয়ানন্দজী। দুপুরে উপস্থিত কয়েক হাজার ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় যাত্রাপালা অভিনীত হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা ইন্দুবালা ব্যানার্জী গত ১ নভেম্বর ২০০১ আসানসোলের বাসভবনে পরলোকগমন করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। তিনি আসানসোল সারদা সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন এবং বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। 'উদ্বোধন'-এর তিনি ছিলেন আজীবন সদস্যা।

'উদ্বোধন'-এর দীর্ঘদিনের গ্রাহক মাধবচন্দ্র দাস গত ৭ নভেম্বর ২০০১ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তিনি কৌতলা রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়ের পর্যায়ক্রমে সদস্য, সম্পাদক ও সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সদাচার ও সরলতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ডঃ বিমলেন্দু সেন গত ১১ নভেম্বর ২০০১, ৭০ বছর বয়সে লণ্ডনে পরলোকগমন করেন। তিনি শিবপুর বি. ই. কলেজের অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্সের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। পরে জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ, পশ্চিমবঙ্গ কারিগরী শিক্ষার অধিকর্তা ও বি. ই. (ডিমড্ ইউনিভার্সিটি) কলেজের অধিকর্তা হন। এছাড়া আই. টি. সি. টি. ই.-র পূর্বাঞ্চল শাখার প্রধান ছিলেন। বি. ই. কলেজের সামনে স্বামীজীর মর্মরমূর্তি স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা ছিল তাঁর। তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু গঠনমূলক কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ❑

ঈশ্বরে অনুরাগ হলে সমস্ত বিশ্বকেই আপন বোধ হয়। কারণ, সবই তাঁর সৃষ্টি।

স্বামী বিবেকানন্দ



রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ স্মৃতি মন্দির

খেতড়ি, রাজস্থান, জেলা—ঝুনঝুনু, পিন-৩৩৩৫০৩ • এস.টি.ডি.—০১৫৯, ফোন নং—৭৩৩৪৩১২

একটি আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ স্মৃতি মন্দির, খেতড়ি ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দের কাছে সুপরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দ বিভিন্ন সময়ে তিনবার এখানে এসেছিলেন। রাজা অজিত সিং তাঁর প্রিয় শিষ্য ছিলেন। এখান থেকেই স্বামীজী ১০ মে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো ধর্মমহাসভার উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন।

খেতড়ির শেষ রাজা সর্দার সিং এই বাড়িটি রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করেন। স্বামীজীর স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়ি প্রায় দেড়শ বছরের পুরনো। আয়তন প্রায় ৬০,০০০ বর্গফুটের মতো। বহু মেরামতের প্রয়োজন এই বাড়ির।

এই আশ্রমে শিশুদের জন্য একটি স্কুল, সাধারণের জন্য একটি লাইব্রেরি, একটি মেটারনিটি হোম, একটি হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় ও মেয়েদের জন্য পাঁচটি সেলাই শিক্ষণকেন্দ্র আছে। বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে গরিবদের সাহায্য ও ত্রাণকাজ করা হয়।

এই মহান কাজের জন্য সকল মানুষের কাছে, অনুরাগী ও ভক্তবৃন্দের কাছে আর্থিক সহযোগিতার জন্য আবেদন জানাই। পঞ্চাশ হাজার টাকা ও তার বেশি দান দিলে ফলক লাগানোর ব্যবস্থা থাকবে। বিদেশের দান গ্রহণ করা হয়।

যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী আয়করমুক্ত। চেক বা ড্রাফটে টাকা পাঠালে **'Ramakrishna Mission, Khetri'**—এই নামে পাঠাবেন।

আমাদের আর্থিক প্রয়োজন ঃ

স্মৃতিমন্দির মেরামতের জন্য	২০ লাখ টাকা
দাতব্য চিকিৎসার জন্য (স্থায়ী তহবিল)	১০ লাখ টাকা
সারদা শিশুবিহারের জন্য (স্থায়ী তহবিল)	১০ লাখ টাকা
সেলাই শিক্ষণকেন্দ্রগুলির জন্য (স্থায়ী তহবিল)	৫ লাখ টাকা

বিনীত
স্বামী মুক্তাত্মানন্দ
সম্পাদক

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

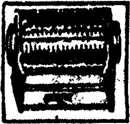
তাঁর নামবীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ













ভগবান যদিও সর্বত্র আছেন বটে কিন্তু তাঁকে আমরা জানতে পারি কেবল মানবচরিত্রের মধ্য দিয়ে।

স্বামী বিবেকানন্দ

নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের ওপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

✽

হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

✽

মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকেই আছে, তার বিকাশই ধর্ম।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **পঙ্কজিনী** দে ৮৭ বছর বয়সে শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামীজীর নাম উচ্চারণ করতে করতে ১৪।১১।২০০১ বুধবার সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিনিটে সজ্ঞানে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তাঁর স্বামী ৺সুরেশচন্দ্র দে স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ও 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক ছিলেন। তিনি ১৯৪১ সালে ৩৯ বছর বয়সে যখন ছোট ছোট ছেলেমেয়ে রেখে মারা যান, তখন তাঁর স্ত্রীর বয়স মাত্র ২৬। বিধবা স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ি চলে আসতে বাধ্য হন। ৮।১০ বছর সেখানে থেকে দুই ভাইয়ের কলকাতায় চাকুরির সূত্রে ছেলেমেয়েদের নিয়ে কলকাতায় ভাইদের কাছে চলে আসেন। দেশে বাপের বাড়ি ও কলকাতায় ভাইদের সঙ্গে থাকাকালীন যে কঠোর সংগ্রাম পঙ্কজিনী দেবীকে করতে হয়েছে, তা তিনি তাঁর নিজের সাধারণ জ্ঞান দিয়ে লেখা 'আমার স্মৃতিকথা' বইতে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। কলকাতায় এসে পঙ্কজিনী দেবী মালদার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের তৎকালীন অধ্যক্ষ ও তাঁর স্বামী সুরেশচন্দ্রের বাল্যবন্ধু স্বামী পরশিবানন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা করলে তিনি যে কতভাবে তাঁকে সাহায্য করেছেন ও মনে সাহস জুগিয়েছেন, তা তাঁর বইতে উল্লেখ করে স্বামী পরশিবানন্দ মহারাজের পুণ্য স্মৃতিতে বইখানা উৎসর্গ করেছেন।

কলকাতা, ফোন ঃ ৪৮৪-২৬৯৫ — শুভ্রা কর

যে-মানুষে একটি বড় গুণ আছে, যেমন সঙ্গীতবিদ্যা, তাতে ঈশ্বরের শক্তি আছে বিশেষরূপে!

শ্রীরামকৃষ্ণ



জেলাভিত্তিক 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ২

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

জেলা : হাওড়া

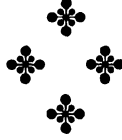
- **রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম** ❑ বেলুড় মঠ
- **রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম**
  ৪ নম্বর পাড়া লেন, পিন-৭১১ ১০১
- **সাঁত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**
  নর্থ বাকসাড়া, পোঃ জগাছা, পিন-৭১১ ৩১১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ**
  গ্রাম+পোঃ মোল্লাহাট
  থানা : শ্যামপুর, পিন-৭১১ ৩১৪
- **মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয়**
  গ্রাম+পোঃ মাকড়দহ, পিন-৭১১ ৪০৯
- **নির্মল ঘোষ**, ৬ রায় জে. এন. রায়বাহাদুর রোড
  বাদামতলা, বালী-৭১১ ২০১, ফোন : ৬৫৪-৪০৪৫
- **বালী গ্রামাঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**
  রবীন্দ্র পল্লী (সাঁপুইপাড়া)
  পোঃ সাঁপুইপাড়া (বালী), পিন-৭১১ ২২৭
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ সঙ্ঘ**
  ঘোষপাড়া বাজার, বালী, ফোন : ৬৭১-০৫৭৯
- **বালী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**
  অরুণাভ সরণি, পোঃ ঘোষপাড়া, বালী
- **সারদা বুক এজেন্সি**
  ১৫/৬ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন
  কদমতলা, পিন-৭১১ ১০১
- **শুকদেব সাঁতরা** ❑ গ্রাম : উত্তর পীরপুর
  পোঃ বানীবন, ভায়া : উলুবেড়িয়া, পিন-৭১১ ৩১৬
- **পাণিত্রাস বিবেকানন্দ সেবা সমিতি**
  গ্রাম+পোঃ পাণিত্রাস, পিন-৭১১ ৩২৫
- **হাঁটাল আঞ্চলিক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  হাঁটাল, পিন-৭১১ ৪০৪
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**
  সাঁকরাইল ভারত কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি
- **শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা মন্দির**
  জয়চণ্ডীতলা, প্রামাণিক পাড়া, ডোমজুড়, পিন-৭১১ ৪০৫
- **শ্রীমা সারদা ও শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  গুড়িখালি, খলিসানি, কালীতলা
- **মাকড়দহ (২) অঞ্চল বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সমিতি**
  জোতগিরি, পোঃ লক্ষ্মণপুর, পিন-৭১১ ৩২৩
- **শ্রীশ্রীসারদা আশ্রম**, জঙ্গলপুর
  পোঃ আর্গোরি, পিন-৭১১ ৩০২
- **শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**, বি. গার্ডেন
  ৮/৩ বি. জি. লেন, পিন-৭১১ ১০৩
- **জোঁকা রামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম**, গ্রাম+পোঃ জোঁকা
  থানা—উদয়নারায়ণপুর, পিন-৭১১ ২২৬
- **বেলপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  গ্রাম : বেলপুকুর, পোঃ অযোধ্যা, পিন-৭১১ ৩১২
- **শ্যামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘ**
  গ্রাম ও পোস্টঃ অযোধ্যা (বেলপুকুর), পিন-৭১১ ৩১২
- **ডোমজুড় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**
  ডোমজুড়, পিন-৭১১ ৪০৫, ফোন : ৬৬৯-০৮০৬
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, পোঃ অভয়নগর, বেলানগর
  পিন : ৭১১ ২০৫, ফোন : ৬৫৯-১১৪৪
- **শ্রীদীনবন্ধু পণ্ডিত**, প্রযত্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ হোমিও হল
  পোঃ চক্‌কাশী, থানা : বাউড়িয়া, পিন : ৭১১ ৩০৭
  ফোন : ৬৬১-৮১১২

জেলা : মেদিনীপুর

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, তমলুক-৭২১ ৬৩৬
  ফোন : ৬৬০০৫/৬৬৭৬২
- **রামকৃষ্ণ মঠ**, পোঃ মঠ চণ্ডীপুর-৭২১ ৬৫৯
  ফোন : ৭২২১৮
- **রামকৃষ্ণ মঠ**, গড়বেতা, পোঃ আমলাগোড়া-৭২১ ১২১
  ফোন : ৬৫২০০
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**, পাঁশকুড়া-৭২১ ১৫২
- **খড়গপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি**
  খড়গপুর-৭২১ ৩০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, ঘাটাল-৭২১ ২১২
- **কাঁথি নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ**
  আঠিলাগরি, কাঁথি-৭২১ ৪০১
- **কৃষ্ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, খড়ার-৭২১ ২২২
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**, খড়ার-৭২১ ২২২
- **দাসপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, দাসপুর-৭২১ ২১১
- **ক্ষীরপাই রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম**
  ক্ষীরপাই-৭২১ ২৩২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র**, জাড়া-৭২১ ২৩২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**, চন্দ্রকোণা টাউন-৭২১ ২০১
- **জ্ঞানরঞ্জন হোতা**
  প্রযত্নে কুঠিঘাট রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ
  গোপীবল্লভপুর, পিন-৭২১ ৫০৬
- **খাসবাজার বিবেকানন্দ যুবপাঠচক্র**
  রাধাচন্দনপুর-৭২১ ১৬০
- **হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন**
  হলদিয়া অ্যাক্সারেজ ক্যাম্প, হলদিয়া পোর্ট-৭২১ ৬০৫
- **মোহনপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ মোহনপুর, পিন : ৭২১ ৪৩৬
- **রাধামোহনপুর রামকৃষ্ণ মিলন মন্দির**
  গ্রাম+পোঃ রাধামোহনপুর, পিন-৭২১ ১৬০
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা ও বিবেকানন্দ স্মরণতীর্থ**
  গ্রাম+পোঃ তাজপুর, পিন-৭২১ ৬৫৬
- **শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়**
  গ্রাম+পোঃ ধনেশ্বরপুর, পিন-৭২১ ১৬৬

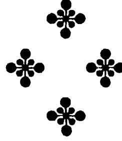
হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্মজন্মান্তরের পাপও তাঁর একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ



যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবত্তত্ত্বের আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী



বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

শক্তিশালী প্রতিরক্ষা



পিয়ারলেস এনক্যাশ বন্ড

২½ বৎসর মেয়াদী একটি ফিক্সড ডিপোজিট যোজনা

ব্যক্তি, বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, ট্রাস্ট, কো-অপারেটিভ সোসাইটি - সকলের জন্যই
বাজারের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় প্রকল্প

ভারতবর্ষের যেকোনো ব্রাঞ্চে ভাঙ্গানো যায়

মেয়াদ	সুনিশ্চিত ক্রমবর্দ্ধমান প্রাপ্তি	জমারাশি
২½ বৎসর	• ১ম বৎসর - ৮.৫% • ২য় বৎসর - ৯.৫% • ২য় বৎসরের পর - ১০.৫%	ন্যূনতম : ১০,০০০ টাকা এবং ৫,০০০ টাকার গুণিতকে যেকোনো উর্দ্ধরাশি

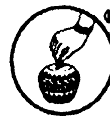
মূল বৈশিষ্ট্যগুলি :

- গ্যারান্টীযুক্ত ক্রমবর্দ্ধমান প্রাপ্তি
- ২ মাস পরে ঋনের সুবিধা (জমারাশির ৭৫% পর্য্যন্ত)
- ১২ মাস পরে যেকোনো সময় টাকা তোলার সুবিধা
- বিনামূল্যে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুবীমার সুযোগ (ব্যক্তির ক্ষেত্রে) *
- বিনামূল্যে পিয়ারলেস সেভিংস কার্ড * — যা থাকলে ২২০০ টিরও বেশী সংস্থা দিচ্ছে তাদের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয়ে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট

* শর্তসাপেক্ষে

ম্যাচিওরিটি দাবীপূরণের মোট পরিমাণ : ৩,০০০ কোটি টাকারও বেশি

বিশদ জানতে আপনার নিকটবর্ত্তী যেকোনো পিয়ারলেস অফিসে যোগাযোগ করুন



® পিয়ারলেস

সঞ্চয়ের সহজ পথ
★
আস্থার প্রতীক

Estd. 1932

Website-http.//www.peerless-in-india.com

গত আর্থিক বৎসরে
নতুন গ্রাহক সংখ্যা : প্রায় ২০ লক্ষ

This is further to the statutory advertisement published in THE ASIAN AGE on 10.04.2001

UDBODHAN
Phone : 554-2248, 554-2403
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com
udbodhan@vsnl.net

Vol. 104
No. 1
JANUARY
2002

Licensed to Post
Without Prepayment
Licence No.
TECH/WB/RNP-15/LPWP 01/2001

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Regn. No.
TECH/WB/RNP-15/2001

উদ্বোধন

১০৪তম বর্ষ



স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

✤ গত ১লা মাঘ ১৪০৮ (১৫ জানুয়ারি ২০০২) **উদ্বোধন ১০৪তম বর্ষে** পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের **১০৩ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম** ✤

✿ বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা **উদ্বোধন** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং **রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন** ও **রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের** সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **উদ্বোধন** আপনাকে পড়তে হবে।

✿ স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে **উদ্বোধন** নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই **উদ্বোধন** একটি সার্থক পারিবারিক পত্রিকা। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা **উদ্বোধন**-এ প্রকাশিত হয়।

✿ **উদ্বোধন** অসাম্প্রদায়িক। **উদ্বোধন**-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার গ্রাহক হওয়া নয়, একটি মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

✿ **উদ্বোধন** শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী বলেছেন, **উদ্বোধন**-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।

✿ স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে **উদ্বোধন** যেন থাকে। **উদ্বোধন**-এর প্রত্যেক গ্রাহক একজন করে নূতন গ্রাহক করলেই এখনি **উদ্বোধন**-এর গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার হয়ে যায়। তাই আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের গ্রাহক করাও আপনার কাছে স্বামীজীর প্রত্যাশা। স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের গর্বিত দায়িত্ব আমাদের সকলের।

✿ **উদ্বোধন**-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে মতিলাল-তরুবালা পালের স্মৃতিতে তাঁদের পুত্রকন্যাদের পক্ষে স্থায়ী ভিত্তিতে 'উদ্বোধন মেধা সম্মান' (একবছরের জন্য **উদ্বোধন**-এর সাম্মানিক গ্রাহকভুক্তি) নিবেদিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জন প্রতি বছর এই সম্মানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। ২০০১ সালের জন্য অনুরূপ সম্মান সুকুমার-বিভাবানী পাড়ুই-এর স্মৃতিতে তাঁদের পুত্র অমর পাড়ুই নিবেদন করেছেন। এই সম্মানপ্রাপকদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পর্ষদ পরিচালিত ২০০১ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উভয় 'সম্মান'-এর জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের **উদ্বোধন**-সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

✿ **উদ্বোধন**-এর সেবায় চারটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি 'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল', অন্য তিনটি যথাক্রমে 'স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ স্মৃতি তহবিল', 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল' এবং 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'। **উদ্বোধন**-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে 'Ramakrishna Math, Baghbazar'—এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। দাতার চিঠিতে বা M.O. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা। সডাক ৯৫ টাকা।

স্বামী সর্বগানন্দ
সম্পাদক

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ



ফাল্গুন ১৪০৮ ২য় সংখ্যা

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

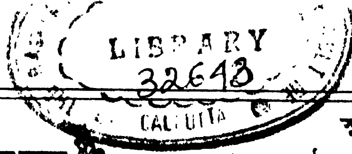
উদ্বোধন

।।১০৪।।



"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ



উদ্বোধন ॥১০৪॥

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র
১০৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র | ১০৪তম বর্ষ | ২য় সংখ্যা | ফাল্গুন ১৪০৮ | ফেব্রুয়ারি ২০০২

প্রচ্ছদ ঃ গোমুখের চিত্র। হিমালয়ের হিমশৈলাবৃত গহ্বর থেকে গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, অবিরাম, উদ্দাম, অক্লান্ত গতিতে। এ যেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবগঙ্গা' বিবেকানন্দ-গোমুখের মধ্য দিয়ে জগৎকল্যাণার্থে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান। শিবচক্ষুটিও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। *আলোকচিত্র ঃ ডাঃ তমোনাশ ভট্টাচার্য।*

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ



সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'
প্রচ্ছদ ❑ মুদ্রণ ঃ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৭৫ টাকা; সডাক ঃ ৯৫ টাকা ❑ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য ঃ ১০ টাকা

দিব্য বাণী

তাঁকে যখন লাভ হয়, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র—কত নিচে পড়ে থাকে। তখন 'ওঁ' উচ্চারণ করবার যো নাই।—এটি কেন হয়? সমাধি থেকে অনেক নেমে না এলে 'ওঁ' উচ্চারণ করতে পারি না।



প্রত্যক্ষ দর্শনের পর যা যা অবস্থা হয় শাস্ত্রে আছে, সেসব হয়েছিল। বালকবৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ, জড়বৎ।

এখানে বাহিরের লোক কেহ নাই, তোমাদের একটা গুহ্যকথা বলছি। সেদিন দেখলাম, আমার ভিতর থেকে সচ্চিদানন্দ বাইরে এসে রূপ ধারণ করে বললে, আমিই যুগে যুগে অবতার। দেখলাম, পূর্ণ আবির্ভাব, তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।

যে রাম, যে কৃষ্ণ, ইদানীং সেই রামকৃষ্ণরূপে ভক্তের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয়, আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না? তিনিই মানুষ হয়ে লীলা করছেন। আমি দেখি, সাক্ষাৎ নারায়ণ। কাঠ ঘষতে ঘষতে যেমন আগুন বেরোয়, ভক্তির জোর থাকলে মানুষেতেই ঈশ্বরদর্শন হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

"এল ও ভি ই"

দক্ষিণেশ্বর হইতে একদিন কলিকাতায় ফিরিবার সময়ে বরানগরের পথে হরিনাথ (পরবর্তী কালে স্বামী তুরীয়ানন্দ) উদাত্ত কণ্ঠে 'শিবমহিম্নস্তোত্র' উদ্ধৃত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্র বর্ণনা করিতেছিলেন।—"অসিতগিরিসমং স্যাদ্ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে... ঈশ পারং ন যাতি" ইত্যাদি। অর্থাৎ যদি নগাধিরাজ হিমালয়কে সমুদ্রের জলে গুলিয়া লেখার কালি তৈয়ারি হয়, যদি স্বর্গের পারিজাত বৃক্ষকে কলম করিয়া স্বয়ং সারদা-সরস্বতী অনন্তকাল ধরিয়া শিবের [এখানে উপমেয় শ্রীরামকৃষ্ণের] মহিমা লিখিয়া চলেন, তথাপি তাঁহার মহিমা কীর্তন কখনো ফুরাইবে না। স্তবকটি আবৃত্তি করিয়া পাশে নরেন্দ্রনাথের দিকে তাকাইয়া তিনি বলিলেনঃ "ঠাকুরের কথা তুমি কিছু বল।" নরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেনঃ "ওঁর কথা কি আর বলব? আমাকে যদি বল, তিনি এল. ও. ভি. ই (l-o-v-e) personified (প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ)।" শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বামী বিবেকানন্দ এইরূপেই দেখিয়াছেন আজীবন। বুদ্ধিমান ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নরেন্দ্রনাথ নানা দিক হইতে দক্ষিণেশ্বরের ঐ অদ্ভুত মানুষটিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতেন। তর্ক করিতেন। ঠাট্টা-তামাশা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অভিজ্ঞ শিক্ষকের ন্যায় শিষ্যের জীবন গঠনে ব্রতী হইয়া নরেন্দ্রনাথের সকল অর্বাচীনতা সহ্য করিতেন। আর তাঁহার হাসিটি ছিল রহস্যময়। নরেন্দ্রনাথ ছিলেন আধুনিক ভারতবর্ষের তথা আধুনিক পৃথিবীর প্রতিনিধি। অপরদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঁচহাজার বৎসরের ঐতিহ্যবাহী সনাতন ধর্ম তথা হিন্দুধর্মের রক্ষাকর্তারূপে নরেন্দ্রনাথের সম্মুখে বিরাজিত। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের একটি অসাধারণ উক্তি উদ্ধৃত করিলামঃ "যখন স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াই তিনি [শ্রীরামকৃষ্ণ] বুঝিয়াছিলেন, সমস্ত ভারত তাঁহার নিকট আসিয়াছে, সমস্ত ভারত তাঁহার পদতলে মস্তক লুটাইতেছে, সমস্ত ভারত তাঁহাকে সর্বস্ব দান করিতে আসিয়াছে। [কারণ] ভারতের জাতীয় আদর্শের বীজ বিবেকানন্দের মধ্যে নিহিত ছিল।"

শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বের ব্যাপারে সন্দেহ থাকিলেও তিনি যে 'প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ', সে-ব্যাপারে নরেন্দ্রনাথের মনে কখনো সংশয় জাগে নাই। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে 'প্রেমস্বরূপ' বলিয়াই স্বামীজী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সেই 'প্রেমস্বরূপ' শ্রীরামকৃষ্ণের বন্দনাগান তিনি রচনা করিয়াছেন। অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় সেই অভিব্যক্তি! "ভাস্বর ভাবসাগর চির উন্মদ প্রেমপাথার।" শ্রীরামকৃষ্ণ যেন উত্তাল তরঙ্গ-সমাকুল প্রেমের সিন্ধু—অনাদি, অনন্ত, অতল। মানুষের দুঃখ-বেদনার আর্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁহার সেই অনন্ত, অনির্বচনীয় আনন্দের সুখধাম হইতে বারংবার টানিয়া নামাইয়াছে। তাঁহার হৃদয়ের ক্ষরণ, তাঁহার বুকের ভিতর মহান দুঃখবোধ নরেন্দ্রনাথের মধ্যে অনুসঞ্চারিত হইবে—এই আশায় তিনি অসীম ধৈর্য সহকারে নরেন্দ্রনাথের জীবন গঠন করিতে সচেষ্ট ছিলেন। অধিকাংশ সাধকজীবনে দেখা যায়, সাধনের আনন্দ একবার লাভ করিলে, মন একবার একাগ্র ভূমিতে আরূঢ় হইলে, ধ্যানের আনন্দে একবার বুঁদ হইয়া দিব্যরসাস্বাদনে অভ্যস্ত হইলে সাধক উহাতেই মত্ত হইয়া রহিতে চাহে। ঐ অবস্থা ত্যাগ করিয়া অপরাপর সংসারপীড়িত মানুষের দুঃখমোচনে সক্রিয় হওয়া দূরে থাকুক, ঐ সাধকমন যেন তাহাদের সমব্যথী হইতেও ইচ্ছা করে না। এমনকি নরেন্দ্রনাথের মতো আধারও ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তিনি একদিন প্রার্থনা করিলেনঃ "আশীর্বাদ করুন পাঁচ-ছয় দিন একনাগাড়ে সমাধিতে থাকব, মাঝেমধ্যে নেমে এসে কিছু খেয়ে [শরীরধারণের নিমিত্ত], আবার সমাধিতে মগ্ন হব।" ঠাকুর কহিলেনঃ "ছিঃ! তুই এত হীনবুদ্ধি? ভেবেছিলাম তুই কোথায় একটি বিশাল বটবৃক্ষের মতো হবি, সেই বৃক্ষের ছায়ায় হাজার হাজার মানুষ এসে আশ্রয় নেবে, আর তুই কিনা নিজের মুক্তি চাস?" নরেন্দ্রনাথ লজ্জিত হইলেন। পরে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন, ঐ অবস্থা [সমাধি অবস্থা] হইতেও উচ্চতর অবস্থা রহিয়াছে। বলিলেনঃ "তুই-ই তো গান করিস, যো কুছ্ হ্যায় সো তুহী হ্যায়।" 'আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা'—যিনি বলিতেছেন তিনি ব্রহ্মবেত্তা। এবং, যিনি শুনিতেছেন, অর্থাৎ শিষ্য—তিনি যোগ্যতা পূর্ণরূপে লাভ করিয়াই এই উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন। এই মণি-কাঞ্চন যোগ সঙ্ঘটিত তখনি সম্ভব, যখন স্বয়ং ঈশ্বর যুগধর্ম স্থাপনের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। ধর্মের ইতিহাস মন্থন করিলে বোঝা যায়, এইরূপ সমাধি-ব্যুত্থিত নেত্রে সর্বভূতে প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের দর্শন সাধকজীবনে সুদুর্লভ।

আর যখন প্রেমস্বরূপ ঈশ্বর স্বয়ং নরদেহ ধারণ করিয়া আসেন? তখন প্রেমের প্লাবনে ধরণী ভাসিয়া যায়। রামকৃষ্ণাবতারে এই অবতরণের চরিত্র কিরূপ তাহার বর্ণনা করিতে গিয়া স্বামীজী একটি অনবদ্য স্তব রচনা করিলেন।

"আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহো
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্।
ত্রৈলোক্যেঽপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধো
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ।।
স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতম্বাহবোত্থং মহান্তং
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্।
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্।।"

ইহার শব্দার্থ সংক্ষেপে যথাসাধ্য আলোচনা করিব। তাহার পূর্বে একটি অসামান্য ঘটনার উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন। কাশীপুরে বিদায়ের সুর তখন ক্রমে ঘনীভূত হইতেছে। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নরেন্দ্রনাথের অকস্মাৎ মনে হইল—"আচ্ছা, উনি তো অনেক সময়ে নিজেকে ভগবানের অবতার বলে পরিচয় দিয়েছেন। এখন এই সময়ে যদি বলতে পারেন 'আমি ভগবান', তবেই বিশ্বাস করি।" আধুনিক সভ্যতার বৈজ্ঞানিক চেতনা অথবা সন্দেহবাদী পাশ্চাত্য মানসিকতা যেন সহসা নরেন্দ্রনাথের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইল, আর অমনি শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া উঠিলেন : "এখনো তোর জ্ঞান হলো না? সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং এ-শরীরে রামকৃষ্ণ—তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।" নরেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিলেন। কৃত অপরাধের নিমিত্ত দরদর ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল তাঁহার আঁখি হইতে।

আচণ্ডালে অপ্রতিহত (আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো) যাঁহার প্রেমের প্রবাহ (যস্য প্রেমপ্রবাহো) অর্থাৎ অত্যাচারিত, দলিত, দুর্বৃত্ত-পাষণ্ড-স্বভাব, নীচ জাতি হইতে শুরু করিয়া চণ্ডাল পর্যন্ত যাঁহার অপ্রতিরোধ্য প্রেম প্রবহমান, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ। জাতিধর্মনির্বিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের অনিবার প্রেমপ্রবাহের প্রমাণ অনেকেই বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বরে রসিক মেথরকে ঠাকুর কৃপা করিলেন। সে মৃত্যুকালে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। নটী বিনোদিনী প্রমুখ পতিতার পরমাশ্রয় ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। পতিতা নারীগণ দক্ষিণেশ্বরেও আসিত। যাহার জীবনে কোন আশ্রয় নাই, শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে তাহাদের স্থান এক অনিবার্য প্রাপ্তি। অক্ষয়কুমার সেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'তে একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিয়াছেন লেখক। পাষণ্ড-স্বভাব এক ব্যক্তি কলিকাতায় রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের নামে নানাবিধ অকথ্য নিন্দামন্দ ও বিষোদ্গার করিত ও সমাগত জনতা তাহা শুনিত। এই কথা শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট কেহ বলিলে তিনি নিরুত্তর রহিলেন। দিনের পর দিন এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছিল। কিছুকাল অতীত হইলে ঐ ব্যক্তির পুত্র ভয়ানক রোগাক্রান্ত হইল। সে বহু অভিজ্ঞ চিকিৎসককে দেখাইয়াও পুত্রের রোগারোগ্য করিতে পারিল না। অবশেষে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের উচ্চভূতি জানিয়াও তাঁহার নিকট যাইবে স্থির করিল। এদিকে ডাক্তার তখন রামকৃষ্ণময় হইয়া আছেন। ব্যবসা বলিতে গেলে সব উঠিয়াছে। রোগীর দল আসিয়া বারবার ফিরিয়া যায়। যখন উক্ত ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, পীড়িত পুত্রের কারণে তাহাদের পাঁচ-ছয় দিবস নিদ্রা-খাওয়া নাই, তথাপি ডাক্তার গাড়ি হাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন। পুত্রশোকে কাতর ঐ ব্যক্তি উর্ধ্বশ্বাসে গাড়ির পশ্চাতে ছুটিতে লাগিল। গাড়ি কাশীপুরে প্রবেশ করিলে ডাক্তার সরকার শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ ব্যক্তি আসিয়া দেখিল, একি! সে উদয়াস্ত যাহার নিন্দা করিয়া আনন্দলাভ করে, ডাক্তার তাঁহারই নিকটে আসিয়াছেন! অধোমুখে সে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। শ্রীরামকৃষ্ণ অপরিচিত ব্যক্তির পরিচয় ও আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কেহ বলিল, এই সেই ব্যক্তি। সব কথা জানিয়া নয়নজলে ভাসিয়া ঠাকুর ডাক্তার সরকারকে বলিলেন : "আমার আর কদিন বা বাকি, আর এই সামান্য গলরোগ। ওর অল্পবয়সী পুত্র, তার গোটা জীবন বাকি। তুমি দয়া করে গিয়ে ওর ছেলের চিকিৎসা করে সারিয়ে তোলো।" পাষণ্ড তখন অশ্রুনদীতে ভাসিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের এই অপ্রতিরোধ্য প্রেমপ্রবাহ সকলকে ভাসাইয়া লইয়া চলিত। সেখানে শত্রু-মিত্র, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, ভক্ত-অভক্তের কোন বেড়াজাল কখনো ছিল না।

যিনি ত্রিলোকের অতীত (লোকাতীতোঽপি), অস্পৃষ্ট, নাম-রূপ বিরহিত নিত্য শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, অথচ লোককল্যাণমার্গ—জগতের হিতসাধন-প্রচেষ্টা কখনো ত্যাগ করেন নাই, (অহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্) তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ। মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক—এই ত্রিলোকে যাঁহার দ্বিতীয় কোন উপমা নাই (ত্রৈলোক্যেঽপ্যপ্রতিমমহিমা), তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনিই অপ্রতিমমহিমা জানকীর প্রাণস্বরূপ (জানকীপ্রাণবন্ধো)। (সীতয়া যো হি রামঃ) অর্থাৎ যিনি ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনিই অধুনা শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ। (অহহ) আহা, ভক্তির আবরণে জ্ঞানঘন তনুকে বেষ্টন করিয়া (ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ)

রাখা, ঐ নিরুপম মূর্তিই শ্রীরামকৃষ্ণ। মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রকে ভক্তিরূপিণী সীতা যেরূপ সর্বদা আবৃত করিয়া রাখিতেন, সেইরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানময় শরীর ভক্তির আবরণে ঢাকা। ঈশ্বর যেরূপ নিজ করুণার আচ্ছাদনে ভক্তকে রক্ষা করিয়া থাকেন, ভক্তও তেমনি ভক্তির আবরণে ঈশ্বরকে রক্ষা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের কাহিনী শুনিয়াছি। গোপীগণের কৃষ্ণপ্রীতির কথা কহিতে গিয়া ব্যাসদেব বলিতেছেন, একদা শ্রীকৃষ্ণ অমসৃণ বন্ধুর পথে চলিয়াছেন, তাঁহার পায়ে পাদুকা নাই। শ্রীরাধার চিন্তায় তাঁহার জগৎ ভুল হইয়া গিয়াছে। গোপীগণ দূর হইতে তাহা দেখিতেছেন। পাছে প্রিয়তমের চলিতে কষ্ট হয়, এই চিন্তায় তাঁহারা উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। অথচ কিভাবে ঐ কষ্ট লাঘব হইবে তাহা মনে আসিতেছে না। সহসা তাঁহারা উপায় আবিষ্কার করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, আমরা আমাদের সূক্ষ্মশরীর প্রতি পদক্ষেপে কৃষ্ণের পদতলে পাতিয়া দিব। ভাবসমাধিতে গোপীগণ লীন হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অনুভব করিলেন তাঁহার পদতলে পৃথিবী হঠাৎ কেমন যেন পেলব হইয়া উঠিয়াছে! স্বামীজীর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত, শ্রীশ্রীমা এইভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণকে সর্বদা রক্ষা করিতেছেন। একদিকে দেখিতে পাই, শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দিব্যভাবে অবস্থান করিতেছেন, যখন তাঁহার দেহবুদ্ধি নাই, তখন শ্রীশ্রীমা সর্ববিধ উপায়ে তাঁহার যত্ন করিতেছেন—নহবতে, শ্যামপুকুরে, কাশীপুর উদ্যানবাটীতে। শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিস্থ মনকে উপযুক্ত মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে 'আমি আমার' জগতে নামাইতেছেন শ্রীশ্রীমা। অপরদিকে শ্রীরামকৃষ্ণও শ্রীশ্রীমায়ের জন্য চিন্তিত। যতই হউক তাঁহারই শক্তি, তাঁহারই ভার্যা। জ্ঞান-প্রতিষ্ঠ হইয়া তিনি জগৎকে ফুৎকারে উড়াইতেছেন না, বরং সঞ্চিত অর্থ দিয়া মায়ের জন্য ডায়মণ্ড-কাটা বালা বানাইয়া দিতেছেন। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন: "জগৎ তিন কালেই মিথ্যা [ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—তিন কাল], এ কি সকলের হয় গা?" তাঁহার সমাধিঋদ্ধ মন ইহা অনুভব করিয়াছিল বলিয়াই তিনি অত্যন্ত সহজ-স্বাভাবিকভাবে অদ্বৈত বেদান্তের এই চরম সিদ্ধান্ত সরল গ্রাম্যভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। প্রশ্ন হইল, জগৎ যদি সত্যই মিথ্যা হয়, তাহা হইলে কষ্ট স্বীকার করিয়া নাম-রূপাতীত নির্গুণ নিরাকার ভূমি হইতে অবতরণই বা কেন, আর জীবদুঃখে কাতর হইয়া আকুল ক্রন্দনই বা কেন? বিচার করিয়া ইহাই বুঝা যায়, মায়ের কারণেই আমরা ঠাকুরকে পাইয়াছি।

ইহা সত্যি কথা। যাহা বুঝিয়াছি তাহা প্রকাশ করিলাম। পাঠক অবশ্য সহমত নাও হইতে পারেন। কখনো কখনো শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞান-প্রতিষ্ঠ রহিতেন। তখন সমাধিস্থ, নিষ্ক্রিয়, অসাড়, জড়বৎ নিস্পন্দ। তাঁহার অনুভব তখন কার্যকারণাতীত সত্তার অনুভব। মন যেন সম্পূর্ণ নির্বাসনা। অথচ মনে সামান্যতম বাসনা না থাকিলে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে মন নামিতে পারে না। মন অ-মন হইয়া যায়। তাই সমাধিতে প্রবেশের পূর্বে ঠাকুর বলিয়া রাখিতেন—'জল খাব' ইত্যাদি। কিন্তু ঐ সামান্যতম বাসনাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার মন যে স্থূলজগতে নামিবে, তাহাও যুদ্ধ করিয়া। তপস্যা করিতে করিতে মন বাহ্যজগতে আসিবে। উপনিষদ্‌কার বলিলেন: "যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ"—জ্ঞানাবলম্বন করিয়া মনকে নিম্নমুখী করা সর্বজ্ঞ সর্ববিদের পক্ষে তপস্যারই নামান্তর। একরস, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অনন্তকে টানিয়া বহুত্বের আঙিনায় নামাইবার এই প্রচেষ্টা তাই শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট মহাতপস্যা। যুদ্ধক্ষেত্র। সাধারণ সাধকের জীবনও যুদ্ধক্ষেত্র। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে স্বভাবত নিম্নমুখী মনকে ঠেলিয়া তুলিবার যুদ্ধ। একটি অপরটির বিপরীতধর্মী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্র এই যুদ্ধেরই যেন প্রতীকীরূপ। সেখানে অর্জুন সাধকাগ্রগণ্য। সারথী শ্রীকৃষ্ণ। আমরা বলিব, আমাদের অন্তরের এই মহারণাঙ্গনে সারথি শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁহারই ইচ্ছামাত্র যুদ্ধের শুরু, তাঁহারই ইচ্ছামাত্র যুদ্ধ স্তব্ধীভূত। যুদ্ধক্ষেত্রের মহাকোলাহলকে মুহূর্তে স্তব্ধ করিয়া শান্তির নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইতে থাকে শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাসিঞ্চনে। বিবেকানন্দ বলিলেন, প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে উত্থিত মহাকোলাহলরাশিকে স্তব্ধ করিয়া (স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতম্ আহব-উত্থং মহান্তম্) যিনি প্রকৃতির অন্ধকারময় অজ্ঞান রজনীকে দূর করিয়া, ঘোরতর অন্ধতমসার আবরণ উন্মোচন করিয়া (হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতি-সহজাম্ অন্ধতামিসমিশ্রাম্) সিংহগর্জনে মধুর ও শান্ত গীতামৃত অর্জুনকে দান করিয়াছিলেন (গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ)—তিনিই এই পৃথিবীর উদ্ধারকর্তা হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে আবির্ভূত (সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্)। তিনি প্রথিতপুরুষ। অর্থাৎ বিখ্যাত পুরুষ। কোথায় বিখ্যাত? ত্রিলোকে বিখ্যাত। কে তাঁহাকে চিনিয়াছে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর? উপনিষদ্ কহিলেন: "ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে"—বায়ু তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া প্রবহমান। "ভীষোদেতি সূর্যঃ"—সূর্যদেব তাঁহার ভয়ে উদিত হইয়া থাকেন। "ভীষাঽস্মদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ"—অগ্নি, ইন্দ্র সকলে তাঁহারই ভয়ে ভীত হইয়া স্ব-স্ব কর্মে ব্যাপৃত। "মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ"—এমনকি স্বয়ং মৃত্যু (যম)-ও তাঁহারই ভয়ে নিজ কর্তব্য করিয়া থাকেন। প্রভুই পরম প্রশাসক। তাই প্রবাদ আছে—'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্' অর্থাৎ সেই পরমপ্রশাসক তুষ্ট হইলে সকলেই তুষ্ট হইয়া থাকেন। [এক]

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে যেসকল তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ১৩৫৯ সালে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনর্মুদ্রিত করা হলো। আশা করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।—সম্পাদক

পরিচারিকা, আগস্ট ১৮৮৬

(মাঘ ১৪০৮-এর পর)

তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণ) কথায় অত্যন্ত মিষ্টতা ও আকর্ষণ ছিল, তাঁহার নিকট বসিলে আর ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ থাকিত না। তাঁহার কথা শুনিলে ও স্বর্গীয় ভাব দেখিলে পাষাণহৃদয় বিগলিত ও পাষণ্ড বিদলিত হইত। তিনি অতি মধুর সঙ্গীত করিতেন। তিনি হরি বলিতেন, কালীও বলিতেন এবং আপন উপাস্যকে সচ্চিদানন্দও বলিতেন। কখনো কখনো মা বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার গভীর ভাব সাধারণ লোকের বুঝা দুঃসাধ্য ছিল, যিনি বুঝিয়াছিলেন তিনি তাঁহার তিন বৎসর পূর্বে দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। এইক্ষণে উভয়ে স্বর্গলোকে প্রেমে মাতামাতি করিতেছেন। এরূপ সাধুলোকের আবির্ভাবে দেশ পবিত্র হয়, দর্শনে পুণ্য হয়।...

ধর্মতত্ত্ব, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬

...পূর্বে ব্রাহ্মধর্ম শুষ্ক তর্ক ও জ্ঞানের ধর্ম ছিল, পরমহংসের জীবনের ছায়া পড়িয়া ব্রাহ্মধর্মকে সরস করিয়া তোলে। পরমহংসও আচার্যের সাহায্য পাইয়া নিরাকার ঈশ্বরের দিকে অধিকতর অগ্রসর হন, ধর্মের উদারতা ও কিয়ৎ পরিমাণে সভ্যতার নিয়মনিষ্ঠা লাভ করেন। যখন আচার্যদেব দলবলে [সদলবলে] পরমহংসের নিকটে এবং পরমহংসদেব আচার্যের ভবনে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিতে লাগিলেন এবং পরমহংসদেবের উচ্চ ধর্মভাব ও চরিত্র পুস্তক ও পত্রিকায় আচার্যদেব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, 'মিরর' ও 'ধর্মতত্ত্ব'-এ তাহার বিবরণসকল লিখা হইল, পরমহংসের উক্তি নামধেয় ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারিত হইল—তখন হইতে তিনি সর্বত্র পরিচিত হইলেন। সচরাচর ব্রাহ্মগণ তো উপদেশ ও শিক্ষালাভ করিবার জন্য তাঁহার নিকটে যাইতেন, ব্রাহ্ম ব্যতীত অপরশ্রেণীর নরনারীও দলে দলে গমনাগমন করিতেন। নূতন ধর্ম দান ও সত্য প্রচারে বা একটা নূতন মণ্ডলী স্থাপন করা পরমহংসের জীবনের লক্ষ্য ছিল না। কেহ উপদেশ প্রার্থনা করিলে বলিতেন, ইহা এ আধারে নয়, সে আধারে, অর্থাৎ কেশবচন্দ্রে। কিন্তু পরে অনেক লোককে তিনি সাধন-ভজন সম্বন্ধে রীতিমতো উপদেশ দিয়াছেন। অনেক সুশিক্ষিত যুবক অনুগত শিষ্য হইয়া তাঁহা কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। শুনিলাম, ন্যূনাধিক পাঁচশত স্ত্রী-পুরুষ তাঁহার শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু তিনি কাহাকেও শিষ্য বলিতেন না এবং আপনাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তিনি প্রচলিত পৌরোহিত্য ও গুরু ব্যবসায়ের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন।

পরমহংসের মানুষ চিনিবার শক্তি আশ্চর্য ছিল, তিনি কোন লোকের মুখ দেখিয়া ও দুই-একটি কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিতেন সে কি ধাতুর লোক।... পরমধার্মিক মহাপণ্ডিত জগদ্বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেই নিরক্ষর পরমহংসের নিকটে শিষ্যের ন্যায়, কনিষ্ঠের ন্যায় বিনীতভাবে একপার্শ্বে বসিতেন, আদর ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার কথাসকল শ্রবণ করিতেন। কোনদিন কোনরূপ তর্ক-বিতর্ক করিতেন না। পরমহংসের জীবনের মূল্যবান জিনিসসকল বেশ করিয়া আপন জীবনে আয়ত্ত ও আদায় করিতেন। সাধুভক্তি কিরূপে করিতে হয়, সাধু হইতে সাধুতা কিভাবে গ্রহণ করিতে হয় কেশবচন্দ্র দেখাইয়া গিয়াছেন। অনেকদিন পরমহংসদেবের নিকটে যাওয়ার পূর্বে দেবালয়ে উপাসনার সময় সাধুভক্তি বিষয়ে তিনি প্রার্থনাদি করিয়া প্রস্তুত হইয়া গিয়াছেন।...

আমরা নানক, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জীবনবৃত্তান্ত পুস্তকেই পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এই জীবন আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। রামকৃষ্ণ বর্তমান সভ্যতার ধার ধারিতেন না, কোন সভায় যাইতেন না, বক্তৃতাও দিতেন না, পুস্তক পত্রিকাদির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিতেন না, কাহারো নিকটে শিক্ষা উপদেশ লাভ না করিয়া কেবল ঈশ্বরকৃপায়, দৈববলে ও সাধনবলে কিরূপ উন্নত পবিত্র জীবন লাভ করিতে হয় তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। হংস যেমন অসার ভাগ পরিত্যাগ করিয়া জল হইতে সার ভাগ ক্ষীর গ্রহণ করে, এই পরমহংসও হিন্দুধর্মের সমুদয় অসারতা ছাড়িয়া তাহার সারমাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।...

ধর্মতত্ত্ব, ৩১ আগস্ট ১৮৮৬

...রামকৃষ্ণ লেখা পড়ার চর্চা প্রায় কিছুই করেন নাই। রীতিমত দুই চারি ছত্র লিখিতে বা পড়িতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। তিনি পুরাণাদি শাস্ত্রের অনেক তত্ত্ব রাখিতেন, পৌরাণিক অনেক সুন্দর সুন্দর উপাখ্যান সচরাচর বলিতেন। তাহা পুস্তক পাঠ করিয়া শিক্ষা করিয়াছেন এরূপ নহে, শাস্ত্রবিৎ পাঠকদিগের মুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিশক্তি ছিল, যাহা একবার শ্রবণ করিতেন, তাহা কখনো ভুলিতেন না।... তিনি ক্রমাগত ৮ বৎসর কাল দুঃসহ তপশ্চরণে অনশনে অনিদ্রায় শরীরকে জীর্ণশীর্ণ করেন। তিনি যোগশাস্ত্রাদি-বিহিত নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে সাধন করেন নাই। আন্তরিক ব্যাকুলতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া রিপুদমন, বৈরাগ্য ও চিত্তশুদ্ধির জন্য এবং যোগসাধন ঈশ্বরদর্শনের জন্য নানা পন্থা ও নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কখনো নারী সাজিয়া সখীভাবে সাধন করিয়াছেন, কখনো প্যাঁজ ভক্ষণ করিয়া মোসলমানের বেশে আল্লা আল্লা জপ করিয়াছেন, কখনো বা পুচ্ছ ধারণ করিয়া হনুমান সাজিয়া রাম রাম বলিয়াছেন। তাঁহার কোন সহচর বলিয়াছেন যে, ১০ বৎসর তাঁহাকে রীতিমতো নিদ্রা যাইতে দেখা যায় নাই। তাঁহার শরীরে এরূপ উত্তাপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, শীতকালের রজনীতেও তাঁহার গাত্রদাহ নিবারণের জন্য গাত্রে মাখন মর্দন করিতে হইত।...

সঙ্কলন ও অনুবাদ ❑ জলধিকুমার সরকার
সম্পাদনা ❑ স্বামী সর্বগানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের দুখানি পত্র*

হেমচন্দ্র দত্তকে লিখিত*



।।১।।
শ্রীশ্রীহরি

২৯শে বৈশাখ [(?)১৩২৪]
বুধবার

পরম আশিৰ্ব্বাদ (আশীর্বাদ)
পরে বাবাজীবন—

তোমার পত্র পাইয়াছি। ঠাকুরকে ডাক, তাহলেই হবে। আর কি লিখিব? তোমরা ভাল আছ শুনে সুকী (সুখী) হইলাম। এখানের মঙ্গল। তোমরা আমার আশিৰ্ব্বাদ (আশীর্বাদ) জানিবে। এখানে যা গরম এখন আসিবার দরকার নাই।

ইতি তোমাদের
মা

।।২।।
শ্রীশ্রীগুরুদেব

জয়রামবাটী
১৩২৪।২৭শে অগ্রহায়ণ

আশীষ (আশিস) অন্তে সমাচার মেতৎ—

বাবা, তোমার পত্রখানা, টাকা পাঁচটী (পাঁচটি) পাইয়া সুখী হইলাম। চাকরী (চাকরি) সম্বন্ধে আমি কি বলিব বল? যেখানে গেলে তোমার সুবিধা হয় সেখানেই যাইবা। তবে মাষ্টার (মাস্টার) মহাশয় ভাল লোক, তাঁহার কাছে থাকিলে সাধু সঙ্গী (সাধুসঙ্গ) হইবে।

আমার ঢাকা যাওয়া সম্বন্ধে আমি ত (তো) কিছুই জানি না। আমার শরীরের যে অবস্থা তাহাতে চলাফেরা করাই কষ্টকর—ঢাকা যাওয়া ত (তো) দূরের কথা। আমি এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

আমি ভাল আছি—তুমি আমার আশিৰ্ব্বাদ (আশীর্বাদ) জানিবা। কলিকাতা যাওয়ায় এখনও কিছু ঠিক হয় নাই। তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল বাঞ্ছনীয়।

আশীঃ
তোমার মাতাঠাকুরানী

---

* হেমচন্দ্র দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র কল্যাণী-নিবাসী মিহিরকান্তি দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।—সম্পাদক



স্বামী শিবানন্দের দুখানি পত্র*

উমাপদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং

RAMAKRISHNA MISSION
BELUR MATH, HOWRAH DIST.
DATED 6/5/1927

শ্রীমান উমাপদ,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা কর তিনি তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে (করিবেন)। তোমার ইহা ত (তো) শুভ বাসনা, ইহা কেন না পূর্ণ হইবে—কত লোকের কত বাসনা পূর্ণ করিতেছেন! তিনি দয়া করিয়া ইহা কি অপূর্ণ রাখিবেন? কখনও না।

মাস্টার মহাশয়ের School-এ কি গোলমাল হইয়াছে শুনিয়াছি। তবে ব্যাপার কি তাহা ঠিক জানি না। তবে মাস্টার মহাশয় যে কোন অযুক্তিকর কার্য করিবেন তাহা বলিয়া মনে হয় না। তুমি তাঁকে লিখিলে বা দেখাশুনা করিলে সব বুঝিতে পারিবে। কাগজে আগে লিখে দিলেই হইল! বোধহয় তাহারা একটা General Strike করে তুলিবার মতলবে ছিল।

আমার শরীর মন্দ নাই। তোমার খুব ভক্তি বিশ্বাস নির্ভরতা লাভ হউক। এইসব বিষয়িক (বৈষয়িক) ব্যাপার লইয়া মন চঞ্চল করিও না। তোমরা আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি।

তোমাদের চির শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

মনোলোভা মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং

Sri RAMAKRISHNA MATH
P.O. BELUR MATH
4/7(19)27

মা মনোলোভা,

তোমাদের কুশল সংবাদ পাইয়া সুখী হইলাম। ঠাকুরের কৃপায় তোমাদের মোটা ভাত কাপড় এবং বাসস্থানের সংস্থান হউক—ইহা আমার তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা জানিবে। তোমরা তাঁহার ভক্ত এবং আশ্রিত। সমস্ত অভাব অভিযোগের কথা তাঁহাকে জানাইবে না ত (তো) আর কাহাকে বলিবে? ভক্ত কখন অন্যায় অভিযোগ বা অভাবের কথা জানায় না, তাহারা যাহাতে একটু নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহার স্মরণ মনন করিতে পারে—সেইজন্য দুই একটা বিপত্তিকারী অভাবের কথা জানায়। ঠাকুরের কৃপায় উমাপদর হয়ত (হয়তো) একটা ভাল কাজ হইয়া যাইতে পারে। যাহা হউক ঐ সবের জন্য বেশী (বেশি) চিন্তিত হইও না। ভক্তি বিশ্বাসেই পরম পুরুষার্থ। ঠাকুরের কৃপায় তোমাদের ভক্তি বিশ্বাস উত্তরোত্তর খুবই বৃদ্ধি লাভ করুক।

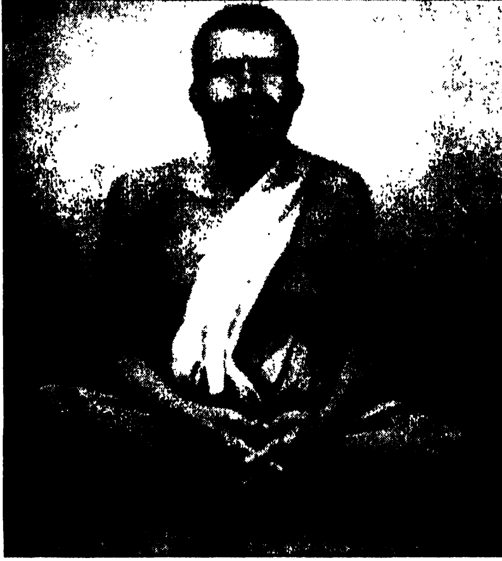
আমার শরীর ঠাকুরের কৃপায় মন্দ নয়। তুমি, উমাপদ, যোগবিলাস আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি।

তোমাদের চির শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

* শিষ্য উমাপদ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী মনোলোভাদেবীকে লিখিত স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের পত্রগুলি উমাপদ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র, দমদম-নিবাসী যোগবিলাস মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। যোগবিলাসবাবু স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য।—সম্পাদক

"মায়ায় ধরিলে মানবকায়"

স্বামী ভূতেশানন্দ



স্বামী তদাত্মানন্দ অঙ্কিত তৈলচিত্র থেকে গৃহীত

তীর্থে, ধর্মস্থানে ভগবৎকথা চিন্তা করাটাই স্বাভাবিক। 'ভাগবত'-এ আছে, শ্রীকৃষ্ণের মহিষীরা সমবেত হয়ে আলোচনা করছেন, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের কোন্ কোন্ বিশেষ গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন। নানা জনে নানা মত পোষণ করছেন। তাঁর রূপ, গুণ, শৌর্য, বীর্য—এরকম এক-একরকম গুণের কথা তাঁরা বলছেন। এটাই স্বাভাবিক। কারণ, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের ভিতরে সব গুণের চরম উৎকর্ষ দেখতেন। স্বভাবতই নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে এক-একজন এক-একদিকে আকৃষ্ট হন।

একবার শ্রীরামকৃষ্ণের যুবক ভক্তেরা দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় ফেরার পথে পরস্পর আলোচনা করছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের কোন্ বিশেষ গুণ কাকে কিভাবে আকৃষ্ট করেছে? কে তাঁর কি বৈশিষ্ট্য দেখেছে? কেউ বলছেন, তাঁর মধ্যে অগাধ জ্ঞান। কেউ বলছেন, এরকম ভক্তির পরাকাষ্ঠা আর কারো মধ্যে দেখা যায় না। কেউ তাঁর কঠিন আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলির সরল বিশ্লেষণে মুগ্ধ হয়েছেন। এইরকম নানা জনের নানা কথা! নরেন্দ্রনাথ চুপ করে শুনছেন। সকলেই জানেন যে, নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের সবচেয়ে প্রিয় পাত্র। তাই নরেন্দ্রনাথকে সকলে প্রশ্ন করলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর কি ধারণা? তিনি একটু চুপ করে থেকে উত্তর দিলেন—"L O V E personified"—স্বয়ং প্রেম মূর্তিধারণ করে এসেছেন। তাঁর প্রেম স্বামীজীকে মুগ্ধ করেছে।

আমরা সাধারণ ভক্তেরা স্বভাবতই ভাবতে পারি যে, তাঁর কি গুণ আমাদের আকৃষ্ট করেছে? অবশ্য আমাদের যার যতটুকু আধার তদনুসারেই ভাবব। যেমন অসীম সমুদ্রকে মাপতে গেলে তার গভীরতা অজ্ঞাতই থাকবে, কারণ সবাই তো তলিয়ে যাব। তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণকে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে পরিমাপ করতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। তা সম্ভব হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। বিশাল সমুদ্রের গভীরতা অনেকটাই আমাদের অজ্ঞাত। তবু তার থেকে যতটুকু অমৃত আস্বাদন করতে, ধারণা করতে পারি তা আমাদের করতে হবে। যে যার আধার মতো এক ছটাক, এক পোয়া বা এক সের হোক ভরে নেবে। তাতে সমুদ্রের কোন পরিমাপ হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে বলছেন যে, নরলীলায় বিশ্বাস হওয়া বড় কঠিন। ভগবান যখন মানুষ হয়ে আসেন, লোকে তখন তাঁকে মানুষের মতোই দেখে। মানুষের মতো হাত, পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আহার-বিহার, এমনকি জন্ম-মৃত্যু পর্যন্ত। কাজেই তারা কি করে ধারণা করবে যে, যিনি সর্বেশ্বর, অসীম অনন্ত—তিনি কিভাবে এই চৌদ্দ পোয়া দেহের মধ্যে নিজেকে সীমিত করলেন!

যখন ভগবান কৃষ্ণ কংসের কারাগারে জন্ম নিলেন, তখন দেবকী এবং বসুদেব তাঁর স্তুতি করেছিলেন। এইজন্যই করেছিলেন যে, তিনি জন্ম নিয়েই দেখা দিলেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারীরূপে। 'ভাগবত'-এ আছে—

"তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদার্যুদায়ুধম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্।।
মহার্হবৈদূর্যকিরীটকুণ্ডলত্বিষা পরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলম্।
উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভির্বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত।।"

(১০।৩।৯-১০)

সেই বালক গর্ভ থেকে প্রসূত হলে প্রথমে বসুদেব তাঁকে দেখলেন। কি রূপে দেখলেন? সাধারণ শিশু যেমন জন্ম নেয় সেরকম নয়। এইজন্যই তাঁকে বলা হলো 'অদ্ভুত বালক'। তাঁর পদ্মপলাশ নেত্র, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। বক্ষস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, গলায় কৌস্তুভ মণি শোভা পাচ্ছে। তিনি পীতাম্বর, তাঁর কান্তি জলপূর্ণ মেঘের মতো শ্যামবর্ণ, মহামূল্য বৈদূর্যমণিশোভিত কিরীটের জ্যোতি তাঁর কেশে প্রতিফলিত হচ্ছে। কাঞ্চী, অঙ্গদ, কঙ্কণ ইত্যাদি অলঙ্কার দ্বারা শোভমান সেই বালককে বসুদেব দেখলেন। কাজেই একে তো সাধারণ বালক বলা যায় না। বসুদেব এবং দেবকী তাঁদের পুত্রকে নবজাত শিশুরূপে নয়, তাঁদের ইষ্টের, উপাস্যের যে-রূপের সাধনা তাঁরা করেছিলেন—সেই রূপে জন্ম নিতে দেখলেন।

তারপর দেবকী ও বসুদেব ভগবানের স্তুতি করছেন, আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গে যা উল্লেখ্য। দেবকী বলছেন, তিনি প্রলয়ের অন্তে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে তাঁর দেহে ধারণ করেন, যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আমরা সীমা করতে পারছি না—সেই বিশ্বকে তিনি একটি বস্তু থেকে আরেকটির দূরত্ব বজায় রেখে দেহের এক অংশে ধারণ করেন। তবে তিনি কত বিশাল! কল্পনা করা যায় না। দেবকী বলছেন, সেই ভগবান 'মম গর্ভগঃ অভূৎ'—আমার গর্ভস্থ সন্তানরূপে আবির্ভূত—

"বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে যথাবকাশং পুরুষঃ পরো ভবান্।
বিভর্তি সোঽয়ং মম গর্ভগোঽভূদহো নৃলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ।।"
(ঐ, ১০।৩।৩১)

নরলীলার একি বিড়ম্বনা! অর্থাৎ, কে বিশ্বাস করবে? এই অনন্ত বিশ্ব যাঁর একটি রোমকূপে, তিনি আবার মানবী দেবকীর গর্ভে ছিলেন!

এইরকম বিস্ময়কর কাণ্ড প্রত্যেক অবতারই করেন। তাঁকে আমরা ঈশ্বররূপে ভাবতে পারি না। আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে তাঁর পরিমাপ করতে পারি না, অথচ তাঁকে বহু লোকে অবতার বলে পূজা করে। ঠাকুর বলছেন, সব ব্যবহার মানুষের মতো, অথচ যেন মানুষ নয়! কেন মানুষ নয়? মানুষের যেসব সীমা আছে সেগুলি তিনি ছাড়িয়ে যান, তাই মানুষ নন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মানুষেরই মতো—শরীর, আহার-নিদ্রা, জরা-ব্যাধি, জন্ম-মৃত্যু পর্যন্ত। কাজেই কি করে বিশ্বাস হবে ইনি ভগবান? তাই ঠাকুর বলছেন, নরলীলায় বিশ্বাস হওয়া বড় কঠিন। আরো বলছেন, রামচন্দ্র যখন অবতার হয়ে এসেছিলেন, মাত্র বারজন ঋষি তাঁকে জেনেছিলেন। আর সকলেই মনে করত, তিনি দশরথের সন্তান। সেরকম শ্রীকৃষ্ণকেও কয়েকজন মাত্র জেনেছিলেন যে, তিনি স্বয়ং ভগবান। বাকি সকলেই, এমনকি তিনি নিজেও মনে করতেন যে, তিনি নন্দের পুত্র। বসুদেবের ছেলে বলেও জানতেন না। ভগবান এইরূপে আত্মগোপন করে জগতে আসেন। জগতের সঙ্কটকাল যখন উপস্থিত হয়, তা থেকে জগৎকে উদ্ধার করার জন্য অতীতে কতবার তিনি এসেছেন এবং ভবিষ্যতেও কতবার আসবেন তা কেউ জানে না। এইজন্য 'ভাগবত'-এ বলা হয়েছেঃ "অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ" (১।৩।২৬)—অবতারের সংখ্যা গণনাতীত। কারণ, অনন্ত কালকে সীমিত করতে পারি না। সেই অনন্তকালে অনন্তবার তাঁর আসা।

ইদানীংকালে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে তাঁর আবির্ভাব, এইটুকুই বুঝছি। তিনি ভক্তদের আলাদা করে জিজ্ঞাসা করতেন—আমাকে তোমার কি মনে হয়? যাঁর যেমন মনে হয়েছে তিনি সেরকম বলেছেন। কেউ বলেছেন জ্ঞানী, কেউ বলেছেন ভক্ত। কথামৃতকার শ্রীমকে তিনি একবার জিজ্ঞাসা করেনঃ "তোমার কি বোধ হয়? আমার কয় আনা জ্ঞান হয়েছে?" শ্রীম বলেনঃ "'আনা'—একথা বুঝতে পারছি; তবে এরূপ জ্ঞান বা প্রেমভক্তি বা বিশ্বাস বা বৈরাগ্য বা উদার ভাব কখনো কোথাও দেখি নাই।" ('কথামৃত', ১।১।১০)

আমরাই বা তাঁকে কতটুকু দেখেছি, কতটুকু জানি যে আমাদের বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে পরিমাপ করব! কাজেই যখন তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করতে যাই তখন সর্বদাই যেন একটা বিভ্রান্তি এসে যায়। তিনি কি? তিনি জ্ঞানী, না ভক্ত, না যোগী, না অন্য কিছু? কিছুই জানি না। কেউ মনে করে যে, তিনি বহুবিধ সাধনা করেছেন। কেউ সিদ্ধপুরুষ বলে মনে করে, আবার কেউ তাঁকে সরল বালক ভাবে। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুরের চিকিৎসা করার জন্য আসতেন। এসেই তিনি ধরা পড়ে গেলেন, চিকিৎসার কথা ছেড়ে ধর্মপ্রসঙ্গ করতেন। ভক্তদের তিনি বলতেনঃ "আর সব কর, but do not worship him as God (তাঁকে ঈশ্বর বলে পূজা করো না)। এমন ভাল লোকটার মাথা খাচ্ছ?" (ঐ, ১।১৮।৬) শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর আকর্ষণ তিনি বুঝছেন। এই আকর্ষণ তাঁর শিশুর মতো সরলতার জন্য। সেই সরলতা শুদ্ধ-পবিত্রতাস্বরূপ। কিন্তু তাঁকে ভগবান বলে আখ্যাত করা নিয়ে তর্ক লেগে যেত।

আমরাও এরকম দেখেছি। আমাদেরই সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে একবার এক ভদ্রলোক বলেছিলেনঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ সাধক, সিদ্ধপুরুষ তা বুঝি, তবে তাঁকে অবতার বলেন কেন—এটা বুঝি না।" তাঁকে বললামঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ থাকুক, আপনি বলুন, শ্রীরামচন্দ্র যাঁকে বলি—তিনি অবতার কিনা।" ভদ্রলোক বললেনঃ "নিশ্চয়ই তিনি অবতার।"

—ঠিক, তবে শ্রীকৃষ্ণ?

—তিনি তো সর্ব অবতারের শ্রেষ্ঠ অবতার।

—তারপর বুদ্ধ?

—হ্যাঁ, বুদ্ধকে তো এখন সবাই অবতার বলে মানে।

—শ্রীগৌরাঙ্গ?

—নিশ্চয়ই, তিনি অবতার!

তখন বললামঃ "এতদূর তো এলেন, আরেকটু এগোলে তো শ্রীরামকৃষ্ণকেও এঁদের ভিতর নিতে পারেন।"

ঐখানেই মুশকিল। যাঁর সঙ্গে আমরা ঘর করি, তাঁকে ঈশ্বর বলে কি করে জানব? 'ঈশ্বর' বলতেই একটা সম্ভ্রমের দূরত্ব আসে; মনে একটা অসীমত্বের ভাব আসে। যাঁর সঙ্গে ঘর করছি তাঁকে দেখে তো ঐ ভাব মনে আসে না, তাই বিশ্বাস হয় না যে, তিনি অবতার। এই বিশ্বাস তৈরি করার জন্য হয়তো বহু বছর অপেক্ষা করতে হয়।

যিশুখ্রিস্ট যখন এসেছিলেন, তখন যে তাঁকে কেউ অবতার বলে গ্রহণ করতে পারেননি তা বাইবেল থেকে বোঝা যায়। তাঁর যেসব শিষ্য পরে তাঁর বাণী প্রচার করেছেন, তাঁরাও পর্যন্ত বুঝতে পারতেন না। যারা সাধারণ মানুষ তারা তো বুঝবেই না, এমনকি যারা অল্পবিস্তর শিক্ষিত তারাও ধরতে পারেননি। বাইবেল লেখা হয়েছিল

যিশুখ্রিস্টের জন্মের অন্তত ২০০ বছর পরে। তার আগে যিশুর কথা কিংবদন্তির মতো চলে আসছিল। মানুষ ঈশ্বরকে ধারণা করতে পারে না, তাঁকে মানুষ-রূপে দেখতে ভালবাসে। তাঁর শুদ্ধি, তাঁর জ্ঞান, তাঁর ভক্তির পরিমাপ করতে চেষ্টা করে। তার পক্ষে এটাই স্বাভাবিক।

শ্রীরামকৃষ্ণকে যদি আমরা ঈশ্বর বলি, তাতেই বা কি? তিনি নিজেই বলছেনঃ "কেউ ডাক্তারি করে, কেউ থিয়েটারের ম্যানেজারি করে, এখানে এসে অবতার বলে। ওরা মনে করে 'অবতার' বলে আমাকে খুব বাড়ালে—বড় করলে! ওরা অবতার কাকে বলে তার বোঝে কি?... যারা সারাজীবন ঐ বিষয়ের চর্চায় কাল কাটিয়েছে... কত সব এখানে এসে অবতার বলে গেছে। অবতার বলায় তুচ্ছজ্ঞান হয়ে গেছে।" ('লীলাপ্রসঙ্গ', গুরুভাব উত্তরার্ধ, ২য় অধ্যায়) কেন তুচ্ছজ্ঞান হলো? কারণ, তারা অবতারের কিছুই বোঝে না, শুধু বলে 'অবতার' বা 'অবতার নয়'। একবার স্বামীজীকে একজন একটি ছবি দেখিয়ে বলছেনঃ "ইনি কি অবতার?" একটু হেসে স্বামীজী বললেনঃ "বাবা, একটু ভাল করে খাওয়া-দাওয়া কর। না খেয়ে খেয়ে মাথাটা একেবারে শুকিয়ে গেছে।" ছবি দেখে অবতার ঠিক করতে হবে! অবতার মানে কি তাই-ই বোঝে না, ছবি দেখে অবতার বলে বোঝা যাবে! এটা মানুষের একটা স্বভাব, যাকে ভালবাসে তাঁকে একটা খুব উঁচু স্থান দিতে চায়। কিন্তু সেই উঁচু স্থানের তিনি কতটা যোগ্য তা জানে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধেও একই কথা। যখন তিনি দক্ষিণেশ্বরে বাস করতেন, তখন সেখানে কালীবাড়ির ঠাকুর-চাকরেরা চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর কাছাকাছি ছিল। দক্ষিণেশ্বরের প্রতিবেশীরা অনেকে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখত, কিন্তু তাঁরা কয়জন তাঁকে ঈশ্বরাবতার বলে মনে করেছে? আর অবতার সম্বন্ধে আমরা বুঝি কি? শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেনঃ "অচিনে গাছ শুনেছ?... সে একরকম গাছ আছে,—তাকে কেউ দেখে চিনতে পারে না।" ('কথামৃত', ৩।৫।২) দেখতে ঠিক গাছের মতো, কিন্তু সেটা কি গাছ তা কেউ জানে না। গ্রামে অনেক জায়গায় এমন অচিন গাছ থাকে। গ্রামবাসীরা যেসব গাছ চেনে তার কোনটার মধ্যেই সে-গাছগুলি পড়ে না। তাই তার নাম দেয় 'অচিন গাছ'। ঠাকুরের 'অচিন গাছ' বলার তাৎপর্য কি? তাৎপর্য হলো—তিনিই এমন অচিন গাছ, যাঁকে আমরা চিনি না। দেহ, আচার, ব্যবহার সবই মানুষের মতো, অথচ মানুষের মাপকাঠিতে তাঁকে পরিমাপ করতে পারি না। কেন ঈশ্বর নিজেকে এমন ছোট করে আর সব মানুষের সমান হয়ে আসেন তা আমরা জানি না, জানলে তো ভালই হতো, মানুষ তখনি তাঁকে বরণ করে নিয়ে তাঁর কৃপায় উদ্ধার হয়ে যেত।

কিন্তু তিনি এমন করেন না। ভগবান কেন কি করেন তা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। তবে এটুকু বেশ বুঝতে পারি যে, তিনি যদি ভগবানরূপে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াতেন, তবে আমরা তাঁর থেকে বহুদূরে থাকতাম। আমাদের ধারণা, ভগবানের সঙ্গে আমাদের অনেক প্রভেদ। কাজেই তাঁর সঙ্গে আমাদের দূরত্ব থাকত। ঠাকুর বলছেন, রাজা ছদ্মবেশে এসে প্রজাদের সঙ্গে মিশে তাদের সুখদুঃখের খবর নেন। রাজবেশে এলে তারা ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত, তাঁর কাছে মন খুলে কথা বলতে পারত না। ভগবান তাই তাঁর ঐশ্বর্যকে ঢেকে সাধারণ মানুষের রূপ নিয়ে আসেন, যাতে মানুষ তাঁকে নাগালের মধ্যে পায়। না হলে তিনি বহুদূরে। তিনি মানুষের সঙ্গে মিশে মানুষ নিয়ে খেলা করছেন। সেই খেলার সঙ্গীরা যদি তাঁর ভগবত্তা অনুভব করে, তবে তারা খেলার সঙ্গী হতে পারবে না। সেইজন্য অবতার নিজের ঐশ্বর্য ঢেকে সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে পৃথিবীতে আসেন।

তাতে দুটি কাজ হয়। মানুষ তাঁর খুব কাছে আসতে সাহস করে; যেমন ব্রজবালকেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিশে খেলা করেছে। কখনো বা তারা শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে উঠেছে, উচ্ছিষ্ট খাইয়েছে। 'ভাগবত'-এ এর খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। গোপ-বালকদের সঙ্গে তিনি নানারকমের খেলা করছেন। রাখালরা যদি তাঁকে ভগবান বলে দেখত, তবে কি তারা ঐভাবে তাঁকে খেলার সঙ্গী করতে পারত? কাজেই তাঁর ভগবান হওয়ার ইচ্ছা নেই। তিনি সঙ্গী হতে চান। ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ করে তিনি নিজেকে ছোট করেছেন। ভগবানের হয়তো ভক্তদের নিয়ে খেলা করার আকাঙ্ক্ষা হয়; অথবা ভক্তদের সঙ্গে মিশে তাদের আকর্ষণ করেন, ধীরে ধীরে তাদের স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে এসব আমাদের কল্পনা। তাঁর কি উদ্দেশ্য তা তিনিই জানেন। বিখ্যাত পণ্ডিত পদ্মলোচনকে সৃষ্টি বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, যে-মিটিঙে ভগবান সৃষ্টির পরিকল্পনা করেন সেই মিটিঙে তিনি হাজির ছিলেন না। কাজেই তিনি জানেন না। একথা বলার তাৎপর্য হলো—ঈশ্বরের কর্ম মানুষের কাছে শুধু দুর্বোধ্যই নয়, অবোধ্যও। কাজেই আমরা যদি তাঁর সান্নিধ্যে আসতে পারি, তাঁকে ভালবাসি, তাতে যে আমাদের পরম কল্যাণ, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। যেভাবেই হোক তাঁর আকর্ষণের আওতায় আসতে হবে, তারপর চুম্বক তার কাজ করবে। আমাদের আর ভাবতে হবে না।

'ভাগবত'-এ বর্ণনা রয়েছে, গোপীরা ভগবানকে ভালবাসতেন; কিন্তু তাঁরা তো তাঁকে ভগবান বলে জানতেন না, তাঁরা তাঁকে তাঁদের প্রেমাস্পদ মনে করতেন। তাহলে অজ্ঞান গোপীদের মুক্তি হলো কি করে? জ্ঞানীরা বলেন, মানুষের জন্মজন্মান্তরে পুঞ্জীভূত কর্মফল অনন্ত কাল ধরেও শেষ হবে না। একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই তা শেষ হতে পারে। কিন্তু গোপীদের তো জ্ঞান হয়নি, তাঁরা তো ব্রহ্মজ্ঞ নন, তাঁদের মুক্তি হলো কি করে? 'ভাগবত'-এ আছে, গোপীরা ভগবানকে ভালবেসেছিলেন। ভগবান যখন দূরে, তখন

তাঁদের তীব্র বিরহবেদনা সহ্য করতে হয়েছে, যা কল্পনাতীত। সেই বেদনার জ্বালায় তাঁদের অশুভ কর্মের ফলভোগ শেষ হয়েছিল। শুভকর্মের ফলে মানুষ সুখ এবং অশুভ কর্মের ফলে দুঃখ ভোগ করে। গোপীদের যতরকমের অশুভ কর্মের ফল তা এই তীব্র বিরহবেদনায় ভোগ হয়ে গেল। আর ভগবানকে পাওয়ার আনন্দে সমস্ত শুভকর্মের ফল ভোগ হলো। জ্ঞানীকে বোঝাবার জন্য ভাগবতকার এইভাবে বললেন।

আসল কথা, ভগবানকে যে আমরা বুঝে চলি তা নয়। তাঁর স্বরূপ এমন যে, তিনি আমাদের আকর্ষণ করে নিয়ে যান। সংসারের আকর্ষণ আছে, আবার ভগবানের আকর্ষণও আছে। মানুষ কোন্‌দিকে যাবে? ছোট-বড় সব চুম্বকই লোহাকে আকর্ষণ করে, কিন্তু আকর্ষণ বেশি বলে লোহা বড় চুম্বকের দিকে যায়। ভগবান সেইরকম বড় চুম্বক। কাজেই বিষয়ের আকর্ষণ ভক্তকে তার লক্ষ্যপথ থেকে ভ্রষ্ট করতে পারে না, কারণ ভগবানের প্রবল আকর্ষণে অন্য সব আকর্ষণ তুচ্ছ হয়ে যায়। 'ভাগবত'-এ আছে—"ইতররাগ-বিস্মারণং নৃণাম্" (১০।৩১।১৪)—ভগবানের আকর্ষণের কাছে মানুষের অন্য সব আকর্ষণ তুচ্ছ। তাঁকে জানলে এত আপন বোধ হয় যে, তাঁর সঙ্গে আর কোন দূরত্ব থাকে না। যেমন নন্দ-যশোদা ও রাধার কাছে শ্রীকৃষ্ণ দূরের নন, একান্ত আপনার।

আমরাও যদি ঠাকুরকে একান্ত আপনার করে নিতে পারি, তাঁকে ভাবতে, বুঝতে পারি তাহলে আর করণীয় কিছু থাকে না, চুম্বক তার কাজ আপনিই করবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে, আমরা এমন ভ্রান্ত, বাসনাবদ্ধ হয়ে আছি যে, অতবড় শক্তির কাছেও আত্মসমর্পণ করছি না। কেন করছি না? ঠাকুর তার কারণ নির্দেশ করেছেন, বলেছেনঃ "কামিনী-কাঞ্চনে মন মলিন হয়ে আছে, মনে ময়লা পড়ে আছে। ছুঁচ কাদা দিয়ে ঢাকা থাকলে আর চুম্বকে টানে না। মাটি-কাদা ধুয়ে ফেললে তখন চুম্বকে টানে। মনের ময়লা তেমনি চোখের জলে ধুয়ে ফেলা যায়। 'হে ঈশ্বর, আর অমন কাজ করব না' বলে যদি কেউ অনুতাপে কাঁদে, তাহলে ময়লাটা ধুয়ে যায়। তখন ঈশ্বররূপ চুম্বকপাথর মনরূপ ছুঁচকে টেনে লন।" ('কথামৃত', ১।৪।৭) আমরা ভগবানকে ডাকি সুখ-সমৃদ্ধি-শান্তিতে থাকবার জন্য। সেটা তো ভগবানকে চাওয়া নয়, বিষয়ভোগেরই নামান্তর মাত্র।

এইজন্য আমরা যে যে-অবস্থাতেই থাকি না কেন, তাঁর জন্য আমাদের ব্যাকুল হতে হবে। তাঁকে চাই—এটা আমাদের বুঝতে হবে। শুধু খেলনা নিয়ে মেতে থাকলে চলবে না। ঠাকুর বলছেনঃ "যতক্ষণ ছেলে চুষি নিয়ে ভুলে থাকে, মা রান্নাবান্না, বাড়ির সব কাজ করে। ছেলের যখন চুষি আর ভাল লাগে না—চুষি ফেলে চিৎকার করে কাঁদে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে দুড়দুড় করে এসে ছেলেকে কোলে লয়।" (ঐ, ১।৩।২) আমরা সংসার-খেলায় এমন মত্ত হয়ে আছি যে, তাঁর প্রতি আমরা কোন আকর্ষণ বোধ করছি না, কোন আকাঙ্ক্ষা মনে জাগছে না। ঠাকুর বলছেন, সংসারে কারো মান-যশ-ঐশ্বর্য হয়েছে, ক্ষমতা হয়েছে। সে ভাবছে, বেশ আছি। ভগবান বলছেন, হ্যাঁ, বেশ আছ। তারপর যখন জীবনসায়াহ্নে সে উপস্থিত হয়, তখন ভাবে সমস্ত জীবনটা আমি করলামটা কি? ভগবান বলছেন, তাই তো তুমি করলে কি?

আমাদের যেন এভাবে না ভাবতে হয় যে, করলাম কি? আমরা জন্মেছি এক সুবর্ণ যুগে, যখন শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকজ্যোতিতে চারিদিক উদ্ভাসিত, তাঁর ভাবাদর্শে আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ। স্থূলশরীরের চেয়েও সূক্ষ্মশরীরে তিনি আরো বেশি পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। স্বামীজী একে 'সত্যযুগ' বলেছেন। সেই যুগে জন্মে, এইরকম পরিমণ্ডলে থেকে যদি তাঁকে না চাই, তাঁর কথা না ভাবি তবে আমাদের মতো দুর্ভাগা আর কেউ নেই। আমাদের ভাবতে হবে—মানুষরূপে আমাদের কাছে যিনি এলেন তাঁর স্বরূপ কি? এই চিন্তা করে তাঁকে হৃদয়ে স্থান দিতে হবে। ভাবতে হবে যে, তিনি আমাদের একান্ত আপনার। শ্রুতি বলছেন, তিনি—

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।"

(কেনোপনিষদ্, ১।২)

যিনি আমাদের কর্ণেরও কর্ণ, মনের মন, বাক্যেরও বাক্য, প্রাণেরও প্রাণ, চক্ষুরও চক্ষু, তাঁকে ভুলে জীবনটা যে বৃথা নষ্ট করছি, তা কি আমরা আমাদের মনকে ভাবতে বলছি? মন কি ব্যাকুল হয়েছে তাঁকে জানবার, তাঁকে কাছে পাওয়ার জন্য? তাঁর আসা তো এইজন্যই। তিনি সর্বদাই আমাদের আহ্বান করছেন, আমরা কি তা শুনছি? যেমন গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের বংশিধ্বনির আহ্বান শুনেছিলেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও দক্ষিণেশ্বরের কুঠিবাড়ির ছাদ থেকে ডেকেছিলেনঃ "তোরা কে কোথায় আছিস আয়।" সেই ডাক কয়েকটি যুবক শুধু শুনেছিল। তিনি এখনো সকলকে আহ্বান করছেন, আমরা যদি এই ডাকে সাড়া না দিয়ে শুধু সংসারের কাজেই ব্যস্ত থাকি, তাহলে আমাদের মনুষ্যজন্ম বৃথা। একথা বলছি না যে, সকলকেই সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হতে হবে। তা সম্ভব নয়। তিনিও তা চাইছেন না। তিনি চাইছেন যে, তাঁর আহ্বান স্বীকার করে তাঁর দিকে একটু মন রাখা—তাহলেই সংসার আমাদের অগ্রগতির পথে বাধা হবে না। এর ভিতরে থেকেও আমরা তাঁর স্বরূপকে আস্বাদন করতে পারব। কিন্তু তাঁকে একেবারে বিস্মৃত হয়ে থাকলে এই যুগে আমাদের জন্মই বৃথা হয়ে যাবে। ভগবান বলছেন, এখানে অমৃতের প্রস্রবণ বয়ে যাচ্ছে, তোমরা এসে এই অমৃত পান করে অমর হও। বারবার ডাকছেন। এই অমৃতধারায় নিস্নাত হলে আমাদের

যত অশান্তি, দুঃখ সব দূর হবে এবং আমরা অমর হব। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, অশান্তিতে জ্বলে পুড়েও আমরা কি ভগবানকে চাই? চাই না। হা-হুতাশ করি সেই বুড়ির মতো।

এক বুড়ি কাঠ কেটে নিয়ে যাচ্ছে আর বলছেঃ "যম, আর পারছি না কষ্ট করতে, আমাকে নিয়ে যাও।" যম তো বুড়ির কাতর প্রার্থনায় এসে হাজির। বলছেনঃ "তুমি আমায় ডাকছ কেন?" বুড়ি তখন ঘাবড়ে গিয়ে যমকে বলল ঃ "এসেছ বাবা। তবে তুমি আমার মাথায় কাঠের বোঝাটা তুলে দাও।" এর অতিরিক্ত যে কিছু আছে, তা আমরা বুঝতে পারছি না। তিনি আসেন সেই কথা বোঝাবার জন্য। তিনি সর্বদাই আহ্বান করছেন—এস এই পথে, এস, এই অমৃত আস্বাদন কর, তারপর তোমরা তোমাদের কাজ কর। তিনি অবতীর্ণ না হলে ঐদিকে দৃষ্টি দেওয়ার কোন উপায় থাকত না। তাই তিনি আমাদের পর্যায়ে নেমে এসে হাত ধরে পথ দেখাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের চেতনা হচ্ছে না। চেতনা যে হচ্ছে না সেইজন্য মনে এমন বেদনা বোধ হওয়া চাই যে, এই যুগে জন্মে আমরা কি করলাম?

ভগবানকে ডাকতে হলে সংসার থেকে দূরে যেতে হবে না। যে যেখানে আছি সেখান থেকেই ভাবতে হবে যে, এই দৈনন্দিন জগতের অতীত একটি সত্য আছে, যাকে ভুলে থাকার জন্য আমরা নানা কাজে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করছি। সময় আর কাটছে না, তাস খেলতে যাচ্ছি বা সিনেমা দেখতে যাচ্ছি, কোনরকমভাবে নিজেকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করছি! কী দারুণ চেষ্টা! তবু ভোগবাসনা বিষাক্ত লাগছে না! তিনি অন্তরে থেকে ডাকছেন—দুঃখ, বিষাদ জেনেও কেন বিষ পান করছ? এইদিকে এস। আমরা খেয়াল করছি না। ভিতরের সঙ্গে বাইরের, সতের সঙ্গে অসতের সংগ্রাম চলছে। এই সংগ্রামে কি শুধু পরাজিতই হব? যাতে তা না হই এইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ জগতে এসেছেন—আমাদের প্রেরণা যোগাতে, শক্তি দিতে, চোখের ওপরকার পর্দা সরিয়ে সেই অমৃতলোকের একটা দৃশ্য দেখিয়ে দিতে। তাতেও যদি চৈতন্য না হয় তবে আমাদেরই দুর্ভাগ্য।

তাই আমাদের ভাবতে হবে যে, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তি করি, তাঁর নাম জপ করি, লীলাকথা পড়ি, কিন্তু তবু যেমন স্বপ্নের ঘোরে ছিলাম, তেমনি থাকছি। কেন? কেন এসব কথা আমাদের অন্তরে স্পর্শ করছে না? কারণ, আমাদের উদ্যমের অভাব। যদি চোখ, কান, বন্ধ করে থাকি তবে সে-দোষ কি তাঁর না আমাদের? তিনি ভোগের জগৎ দিয়েছেন, আবার ভিতরে একটা অতৃপ্তিও দিয়েছেন। নচিকেতা বলছেনঃ "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ" (কঠোপনিষদ্, ১।১।২৭)—মানুষ কখনো বিত্তের দ্বারা সন্তুষ্ট হতে পারে না। ঐশ্বর্যে মানুষ তৃপ্তি পায় না, পাবেও না। অতৃপ্তি হলো ভগবানের এক মহা আশীর্বাদ। অতৃপ্তি, দুঃখ, রূঢ় আঘাত আমাদের জীবনে আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে দেয়। কাজেই তিনি যে নানা দুঃখ অশান্তি দেন, তা শুধু আমাদের কষ্ট দেওয়ার জন্যই নয়। এগুলি তাঁর দয়ার দান। কারণ, এর ভিতর দিয়ে যদি আমাদের ঘুম ভাঙে। ছেলে ঘুমের ঘোরে কাঁদছে, মা তাকে জাগানোর জন্য ধাক্কা দেন, ধাক্কা দেন তারই কল্যাণের জন্য। ঘুম ভাঙলে তার কান্না বন্ধ হবে।

আমরাও ঘুমের ঘোরে কাঁদছি। সুখ-শান্তির জন্য কাঁদছি। তাই এই ঘুম ভাঙাবার জন্য মায়ের একটু ধাক্কা দেওয়ার প্রয়োজন। দুঃখ, অশান্তি, নানারকম বিপদ-আপদ, বিপর্যয় তাঁর আশীর্বাদ—যাতে আমাদের ঘুম ভাঙে, চেতনা জাগে, আমরা বুঝতে পারি যে, আমরা মোহে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছি, কী দুঃস্বপ্নে আমাদের দিন কাটছে। এই দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে ওঠার জন্য আমাদের দুঃখের পর দুঃখ অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু তাঁকে যেন আমরা ভুল না বুঝি।

গোপীদের কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণ অদৃশ্য হয়ে গেলেন, গোপীরা ব্যাকুল হয়ে তাঁকে খুঁজছেন। তারপর দেখা হলে তিনি বলছেন, আমি আরো বেশি করে দুঃখ দিই আকর্ষণ বাড়াবার জন্য। কাজেই তিনি যদি আমাদের দুঃখ দেন, অশান্তি দেন, তাতে যেন তাঁকে আমরা ভুল না বুঝি। কারণ, এর প্রয়োজন আছে। আমরা বলি সুখ চাই, শান্তি চাই, কিন্তু একথা ভুলে যাই যে সবই তো তাঁর। যেখানে যাব সেখানেই দেখব দুঃখ। 'গীতা'য় ভগবান বলছেনঃ "অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।" (৯।৩৩)—জগৎ অনিত্য ও দুঃখময়, তাই এখানে এসে আমার ভজনা কর। কিন্তু আমরা তা করব না, এই জগৎটাকেই আমরা সুখের আগার বলে আঁকড়ে ধরব। তা যদি করি, এই ভ্রান্তি নিয়ে যদি বসে থাকি তবে তিনি কি করবেন? আঘাত দিয়ে আমাদের ঘুম ভাঙাতে হবে না? সেইজন্যই তো তিনি আশীর্বাদস্বরূপ দুঃখ দেন। তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন না, এমনকি তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য গোপন করে দুঃখময় মানবজীবনকে গ্রহণ করে তিনিও দুঃখভোগ করেন। তাতেও যদি ঘুম না ভাঙে তাহলে আমাদেরই দুর্ভাগ্য।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, তিনি তো ইচ্ছা করলেই একে বদলাতে পারেন। আমাদের মনকে যদি তাঁর দিকে ফিরিয়ে দেন তাহলেই তো হয়। যেমন রামপ্রসাদ বলছেনঃ "প্রসাদ বলে মন দিয়েছ মনেরে আঁখি ঠারি।" তুমি মনকে বিষয়মুখী করে দিয়েছ, কাজেই তোমার দিকে মন যাচ্ছে না। এর উত্তর হলো—এসব ভগবানের খেলা। সবাই যদি বুড়ি ছুঁয়ে ফেলে তবে তো আর খেলা চলে না। তাই ঠাকুর বলছেনঃ "তাঁর ইচ্ছা যে, তিনি এইসব নিয়ে খেলা করেন। বুড়িকে আগে থাকতে ছুঁলে দৌড়াদৌড়ি করতে হয় না। সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে, খেলা কেমন করে হয়? সকলেই ছুঁয়ে ফেললে বুড়ি অসন্তুষ্ট হয়। খেলা চললে বুড়ির আহ্লাদ হয়। তাই 'লক্ষের দুটো একটা কাটে, হেসে দাও মা হাতচাপড়ি।' তিনি মনকে

আঁখি ঠেরে ইশারা করে বলে দিয়েছেন, 'যা, এখন সংসার করগে যা।' মনের কি দোষ? তিনি যদি আবার দয়া করে মনকে ফিরিয়ে দেন, তাহলে বিষয়বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি হয়। তখন আবার তাঁর পাদপদ্মে মন হয়।" ('কথামৃত', ১।২।৫) আমরা যখন খেলায় পরিশ্রান্ত হয়ে বলি—আর পারছি না, তখন ভগবান আমাদের দিকে নিশ্চয়ই হাত বাড়িয়ে দেবেন। এই হাত বাড়াবার জন্যই তো তিনি আমাদের কাছে এসেছেন। আমরাও যেন এই ছোট ছোট হাতে তাঁকে স্পর্শ করতে চেষ্টা করি। উভয়ের দিক থেকে চেষ্টা হলে তবেই জীবন সার্থক হবে। তাঁকে আমাদের অন্তরে পাব, আমাদের জীবন পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এই পরিবর্তনের জন্যই তাঁর আসা।

ঠাকুর একবার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করছেন ঃ "আচ্ছা, আপনি কি বল, মানুষের কর্তব্য কি?" বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দিলেন ঃ "আজ্ঞা, তা যদি বলেন, তাহলে আহার, নিদ্রা ও মৈথুন।" ঠাকুর উত্তর শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। ভেবেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্বান, লেখক, শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ, তিনি হয়তো অন্যরকম কিছু বলবেন। ঠাকুর ক্ষুব্ধ হয়ে উত্তর দিলেন ঃ "এঃ! তুমি তো বড় ছ্যাঁচড়া। তুমি যা রাতদিন কর, তাই তোমার মুখে বেরুচ্ছে। লোকে যা খায়, তার ঢেকুর ওঠে। মুলো খেলে মুলোর ঢেকুর ওঠে। ডাব খেলে ডাবের ঢেকুর ওঠে। কামিনী-কাঞ্চনের ভিতরে রাতদিন রয়েছ, আর ঐ কথাই মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। কেবল বিষয়চিন্তা করলে পাটোয়ারি স্বভাব হয়, মানুষ কপট হয়। ঈশ্বরচিন্তা করলে সরল হয়, ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হলে ওকথা কেউ বলবে না।" (ঐ, ৫। পরিশিষ্ট-ক।২) তাই তিনি বলছেন যে, ঈশ্বরলাভ করাকেই জীবনের মূল লক্ষ্য হিসাবে স্থির করবে, অন্তত সেই বিষয়টা সম্বন্ধে অবহিত থাকবে। সাধারণ লোকেরা মনে করে—কত ঋষি, মুনি দীর্ঘকাল ধরে সাধনা করে কিছু ফললাভ করতে পারছেন না, আর আমরা কি করব?

শ্রীম ঠাকুরকে একদিন জিজ্ঞাসা করছেন ঃ "ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়?" ঠাকুর উত্তরে বলছেন ঃ "হ্যাঁ, অবশ্য করা যায়। মাঝে মাঝে নির্জনবাস; তাঁর নামগুণগান, বস্তুবিচার; এইসব উপায় অবলম্বন করতে হয়।" (ঐ, ১।১।৫) সাধারণ লোকেরা এইরকম বলে—আমাদের একটু ঈশ্বরকে দেখিয়ে দিতে পারেন? এ যেন ছেলেখেলা! তাদের উদ্দেশে ঠাকুর বলছেন ঃ "খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। মাগ-ছেলের জন্য লোকে এক ঘটি কাঁদে, টাকার জন্য লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে? ডাকার মতো ডাকতে হয়।" (ঐ) অর্থাৎ নিজেদের কিছু করতে হয়। কিছু না করেই কি আর তাঁকে দেখা যায়? কাজেই কার্যের দ্বারা নিজেদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। ঠাকুর স্পষ্ট করেই বলছেন, তীব্র ব্যাকুলতা চাই। ব্যাকুলতা থাকলে তবেই ভগবানলাভ করা যায়। আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা জপ-ধ্যান করি, কিন্তু তার সার্থকতা সামান্যই। এর কারণ—মনের আগ্রহ নেই। ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন ঃ "ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই—'কি, আমি তাঁর নাম করেছি, আমার এখনো পাপ থাকবে! আমার আবার পাপ কি?'... কৃষ্ণকিশোর পরম হিন্দু, সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সে বৃন্দাবনে গিছল। একদিন ভ্রমণ করতে করতে তার জলতৃষ্ণা পেয়েছিল। একটা কুয়ার কাছে গিয়ে দেখলে, একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বললে, 'ওরে, তুই একঘটি জল আমায় দিতে পারিস? তুই কি জাত?' সে বললে, 'ঠাকুর মহাশয়, আমি হীন জাত—মুচি।' কৃষ্ণকিশোর বললে, 'তুই বল, শিব। নে, এখন জল তুলে দে।' ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ-মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়। কেবল 'পাপ' আর 'নরক'—এইসব কথা কেন? একবার বল যে, অন্যায় কর্ম যা করেছি আর করব না; আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর।" (ঐ, ১।২।৬) এই বিশ্বাস নেই বলেই হাজার নামজপ করলেও আমাদের কোন ফল হচ্ছে না। মানুষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন নয়, বিশ্বাসও নেই, তাই এগোতে পারে না। তাহলে তার উপায় কি? উপায়গুলি তিনি খুব সংক্ষেপে বলেছেন—ঈশ্বরের নামগুণগান, সাধুসঙ্গ, নিত্য-অনিত্য বস্তু-বিচার এবং মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা।

ঠাকুর বদ্ধজীবের কথা বলছেন ঃ "বদ্ধজীবেরা ঈশ্বরচিন্তা করে না। যদি অবসর হয় তাহলে হয় আবোলতাবোল ফালতো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, আমি চুপ করে থাকতে পারি না, তাই বেড়া বাঁধছি। হয়তো সময় কাটে না দেখে তাস খেলতে আরম্ভ করে।" (ঐ, ১।১।৬) কাজগুলো যে খুব ভাল লাগছে বলে মনে করছে তা নয়, শুধু সময় কাটাবার জন্য করছে। আমরা ভুলে যাই যে, সময় কত অমূল্য বস্তু। যে, মনুষ্যজন্ম পেয়েছি তার একটা লক্ষ্য যদি স্থির না করি, দুর্লভ মনুষ্যজন্মের যদি সদ্ব্যবহার না করি তাহলে জীবন বৃথা। যে-সুযোগগুলি আমরা পাই তা কাজে লাগাতে না পারলে আমাদের জীবনটা ব্যর্থ হবে। সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে একেবারে লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারলেও অনেকটা তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে পারি। এটা বিশেষ করে মনে রাখবার।

তিনি সত্যস্বরূপ। আমাদের সেই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর আসা। তাঁর কৃপায় যেন আমাদের ঘুম ভাঙে, তাঁকে যেন আমরা অন্তরে বরণ করতে, তাঁর ডাকে সাড়া দিতে পারি। এই যুগে আমাদের জন্মগ্রহণ যেন সার্থক হয়।* ❑

*** গত ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮২ জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে প্রদত্ত পূজ্যপাদ মহারাজজীর ইংরেজী ভাষণের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ।**

পাতঞ্জল-যোগসূত্র

ব্যাখ্যাতা ঃ স্বামী প্রেমেশানন্দ

অনুলিখন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনা ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্মলক্ষণাবস্থা পরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ।।১৩।।

ইহার দ্বারা ভূত ও ইন্দ্রিয়ের ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপ পরিণাম বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হইল।*

শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্মানুপাতী ধর্মী।।১৪।।

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ধর্ম যাহাতে অবস্থিত, তাহা ধর্মী।

ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ।।১৫।।

ক্রমের বিভিন্নতার জন্য পরিণামও ভিন্ন ভিন্ন হয়।

পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্।।১৬।।

পূর্বোক্ত তিনটি পরিণামের প্রতি চিত্ত সংযম করিলে অতীত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

মন্তব্য ঃ ইন্দ্রিয়গণ এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসকল নানা অবস্থা-পরিবর্তনের মধ্য দিয়া প্রতিক্ষণ চলিতে থাকে। কোন একটি সীমায় উপস্থিত হইলে আমরা তাহা বুঝিতে পারি। কিন্তু সমাহিতচিত্ত যোগী তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি সহায়ে ভূত ও ইন্দ্রিয়ের এই সূক্ষ্ম পরিবর্তন ও পরিণতির গতি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। তাহার ফলে তাঁহারা অতীত ও ভবিষ্যৎ জানিতে পারেন। জ্যোতিষীরা রাশি-নক্ষত্র বিচার করিয়া যেমন মানুষের অতীত জীবনের অবস্থা ও ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাবনা বলিতে পারেন, যোগীরা তেমন এই সমাধি সহায়েই তাহা করিতে পারেন।

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ সর্বভূতরুতজ্ঞানম্।।১৭।।

শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান—এই তিনটি পরস্পর পরস্পরে অধ্যস্ত হওয়ায় সঙ্কর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। উহাদের প্রভেদের উপর চিত্তসংযম করিলে সমুদয় প্রাণীর শব্দজ্ঞান হইয়া থাকে।

মন্তব্য ঃ আমরা যখন কাহারো কথা শুনি, তখন তাহার বাগেন্দ্রিয় স্পন্দিত হইয়া আকাশে একপ্রকার তরঙ্গ উৎপন্ন করে—যাহা আমাদের কানের ভিতর একটি জায়গাতে আঘাত করে। মন তাহা বুদ্ধির নিকট লইয়া যায়। পূর্বসংস্কারের সাহায্যে বুদ্ধি কথাগুলির অর্থ বুঝিয়া থাকে। এই কাজগুলি আমরা লক্ষ্য করিতে পারি না। আমরা ভাবি, সে বলিল আর আমি শুনিয়া বুঝিলাম—এইমাত্র। মানুষের কথা শোনার মধ্যে যে এত বড় একটা জটিল ব্যাপার আছে তাহার কিছুমাত্র আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু যোগী সমাহিত মনের সাহায্যে এই ব্যাপারটির সমস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। তাহার ফলে কোন প্রাণী কোন শব্দ করিলে তিনি ঐ শব্দের অর্থ বুঝিতে পারেন, কিন্তু ভাষা বোঝা সম্ভব হয় না। শোনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকালেই পশুপক্ষীদের বক্তব্য বুঝিতে পারিতেন।

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্।।১৮।।

সংস্কারগুলিকে সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারিলে পূর্বজন্মের জ্ঞান হয়।

মন্তব্য ঃ সমাহিতচিত্ত যোগী সূক্ষ্মদৃষ্টির সাহায্যে পূর্বকর্মফলে চিত্তে যেসকল সংস্কার সঞ্চিত আছে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পান। সংস্কারের কারণ পূর্বজন্মের কর্মসমূহ, তাই এই সংস্কার দেখিয়া পূর্বজন্মের সকল কথাই তিনি জানিতে পারেন।

প্রত্যয়স্য পরচিত্ত-জ্ঞানম্।।১৯।।

অপরের শরীরের চিহ্নগুলিতে চিত্তসংযম করিলে ঐ ব্যক্তির মনের অবস্থা জানিতে পারা যায়।

ন চ তৎ সালম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ।।২০।।

কিন্তু ঐ চিত্তের অবলম্বন জানা যায় না, কারণ তাহা সংযমের বিষয় নয়।

মন্তব্য ঃ মুখ-চোখের ভাব লক্ষ্য করিয়া সাধারণ লোকেও অনেক সময় মনের অবস্থা কিছু কিছু বুঝিতে পারে। যোগী তাহা সম্পূর্ণ ও নির্ভুলরূপে জানিতে পারেন। কিন্তু যে-কারণে চোখ-মুখের এই অবস্থা, তাহা শুধু লক্ষণ-পর্যবেক্ষণেই জানা যায় না, তাহা জানিতে হইলে যোগীকে ঐ ব্যক্তির চিত্তে মন সমাহিত করিতে হইবে।

কায়রূপসংযমাত্তদ্গ্রাহ্যশক্তি-স্তম্ভে চক্ষুঃপ্রকাশাঽসম্প্রয়োগেঽন্তর্ধানম্।।২১।।

দেহের আকৃতির উপর সংযম করিয়া ঐ আকৃতির অনুভব করিবার শক্তিকে বাধা দিয়া দর্শনশক্তির সহিত উহার সংযোগ নষ্ট করিয়া দিলে যোগী লোকসমক্ষে অন্তর্হিত হইতে পারেন।

এতেন শব্দাদ্যন্তর্ধানমুক্তম্।।২২।।

ইহার দ্বারা শব্দাদির অন্তর্ধান বিষয়েও ব্যাখ্যা করা হইল।

মন্তব্য ঃ যোগী নিজের দেহকে এমন এক অবস্থায় রাখিতে পারেন, যখন সর্বসমক্ষে থাকিয়াও অদৃশ্য হইতে পারেন।

---

* মন সর্বদা বৃত্তিতে পরিণত হয়, তাহা ধর্মরূপ-পরিণাম। মন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কালের মধ্য দিয়া চলে। ইহা লক্ষণরূপ-পরিণাম। নিরোধ-সংস্কার ও ব্যুত্থান-সংস্কারের মধ্যে একটি প্রবল ও অপরটি দুর্বল হইলে তাহা অবস্থারূপ-পরিণাম। মনের এই পরিণামত্রয়ের ন্যায় ভূত ও ইন্দ্রিয়েরও ত্রিবিধ পরিণাম হইয়া থাকে।—সম্পাদক

সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্মতৎসংযমাদ-
পরান্তজ্ঞানমরিষ্টেভ্যো বা।।২৩।।

কর্ম দুই প্রকার—এক প্রকার কর্ম শীঘ্র ফল প্রসব করে, দ্বিতীয় প্রকার বিলম্বে করে। ইহাদের উপর অথবা 'অরিষ্ট' নামক মৃত্যুর লক্ষণসমূহের উপর সংযম করিলে যোগী দেহত্যাগের কাল জানিতে পারেন।

মন্তব্য ঃ মানুষের চিত্তে পূর্বজন্মের কর্মসংস্কার সঞ্চিত থাকে। এই জন্মে যাহা ভোগ করিবার জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করেন তাহা প্রারব্ধ কর্ম। যোগীরা বুঝিতে পারেন প্রারব্ধ কর্মের কতটা ক্ষয় হইয়াছে, কতটা বাকি আছে এবং কতদিনে তাহা নিঃশেষ হইবে। তাহার ফলে তিনি দেহত্যাগের সঠিক সময় নিশ্চিতরূপে জানিতে পারেন। 'অরিষ্ট' নামক আরো কতকগুলি লক্ষণ আছে, তাহা দেখিয়াও যোগীরা মৃত্যুকাল নির্ণয় করিতে পারেন।

মৈত্র্যাদিষু বলানি।।২৪।।

মৈত্রী প্রভৃতি (সুখ, দুঃখ, পুণ্য, পাপ) গুণের উপর সংযম করিলে যোগী ঐ গুণগুলির উৎকর্ষ লাভ করেন।

বলেষু হস্তিবলাদীনি।।২৫।।

হস্তী প্রভৃতি প্রাণীর শক্তির উপর সংযম করিলে যোগী সেইসকল প্রাণীর তুল্য বল লাভ করেন।

প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্।।২৬।।

হৃদয়স্থিত জ্যোতির উপর সংযম করিলে সূক্ষ্ম, ব্যবহিত অর্থাৎ অন্তরালে অবস্থিত এবং দূরবর্তী বস্তুর জ্ঞানলাভ হয়।

ভুবনজ্ঞানং সূর্যে সংযমাৎ।।২৭।।

সূর্যে সংযম করিলে সমস্ত জগতের জ্ঞানলাভ হয়।

চন্দ্রে তারাব্যূহজ্ঞানম্।।২৮।।

চন্দ্রে সংযম করিলে তারকাসমূহে জ্ঞানলাভ হয়।

ধ্রুবে তদ্গতিজ্ঞানম।।২৯।।

ধ্রুবতারায় চিত্তসংযম করিলে তারকাসমূহের গতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়।

নাভিচক্রে কায়ব্যূহ-জ্ঞানম্।।৩০।।

নাভিচক্রে সংযম করিলে শরীরের গঠন জানা যায়।

কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ।।৩১।।

কণ্ঠনালীতে সংযম করিলে ক্ষুধা ও পিপাসা দূর হয়।

কূর্মনাড্যাং স্থৈর্যম্।।৩২।।

কূর্মনাড়িতে সংযম করিলে শরীর স্থির হইয়া যায়।

মূর্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্।।৩৩।।

মস্তকের উপরিস্থিত জ্যোতিতে সংযম করিলে সিদ্ধ-পুরুষদের দর্শনলাভ হয়।

প্রাতিভাদ্বা সর্বম্।।৩৪।।

অথবা প্রতিভাশক্তির দ্বারা সমুদয় জ্ঞানলাভ হয়।

হৃদয়ে চিত্তসম্বিৎ।।৩৫।।

হৃদয়ে চিত্তসংযম করিলে মনোবিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়।

মন্তব্য ঃ যোগশক্তির সহায়ে শরীরে অসাধারণ বল সংগ্রহ করা যায়। নিকটবর্তী, অন্তরালবর্তী ও দূরবর্তী সকল বস্তু জানা যায়। ত্রিভুবনের সকল বস্তু অবগত হওয়া যায়। আকাশের তারার গতির বিষয়ে জানা যায়। আবার নিজের দেহের নানা স্থানে সমাহিত মনের সাহায্যে দেহের সকল অবস্থা জানা যায়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা বন্ধ করিয়া রাখা যায়। সমস্ত শরীর নিশ্চল করিয়া রাখা যায়। মানুষের দেহ হইতে একপ্রকার জ্যোতি নির্গত হয়, যোগীরা তাহা দেখিতে পান। মস্তক হইতে যে-জ্যোতি নির্গত হয় তাহাতে মন স্থির করিলে 'সিদ্ধ' নামক দেবপুরুষদিগকে দেখা যায়।

যখন মন ক্রমশ সূক্ষ্ম হইতে হইতে সূক্ষ্মতম অবস্থায় পৌঁছায়, তখন এই বিষয়ে এমন একটি প্রতিভার বিকাশ হয় যাহার সাহায্যে যোগী যাহা দেখিতে চান তাহাই দেখিতে পান। নিজের হৃদয়ে মন একাগ্র করিলে চিত্তের সমস্ত অবস্থা অবগত হওয়া যায়।

সত্ত্বপুরুষয়োরত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষাদ্
ভোগঃ পরার্থত্বাদন্যস্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্।।৩৬।।

পুরুষ বা চিদাত্মা ও সত্ত্ব বা বুদ্ধির প্রতীতির অভাবেই ভোগ হয়, এই ভোগ পুরুষের জন্য। বুদ্ধির অপর অবস্থার নাম স্বার্থ, ইহার উপর সংযম করিলে পুরুষের বা আত্মার জ্ঞান হয়।

ততঃ প্রাতিভশ্রাবণবেদনাদর্শাস্বাদবার্তা জায়ন্তে।।৩৭।।

তাহা হইতে প্রাতিভ বা অলৌকিক বা দিব্য শব্দ শ্রবণ, বেদনা বা দিব্য স্পর্শের অনুভূতি, আদর্শ বা দিব্য রূপ দর্শন, দিব্য রসাস্বাদ এবং বার্তা বা দিব্য ঘ্রাণ বা গন্ধ লাভ করা যায়।

তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ।।৩৮।।

ইহারা সমাধির পথে বাধাস্বরূপ, কিন্তু সাংসারিক বিষয়ে সিদ্ধিলাভের উপায়।

মন্তব্য ঃ জীবন বলিতে কতকগুলি কর্মভোগ মাত্রই বোঝায়। জীব আত্মবিস্মৃত হইয়া বুদ্ধিকে অবিশেষ 'আমি' বলিয়া অনুভব করে। সমস্ত কর্ম বুদ্ধির প্রেরণাতেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু জীবাত্মা মনে করেন, তিনিই সব করিতেছেন। কাজেই কর্মের সমস্ত ফল তিনিই ভোগ করিতেছেন—এরূপ মনে করেন। ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ-মনন করিতে করিতে পুরুষ সম্বন্ধে তাঁহার একটু ধারণা হইলে যখন তিনি 'আমি পুরুষ' এই ধারণায় মন সমাহিত করেন, তখন ঠিক বুঝিতে পারেন তাঁহার ভোগের জন্যই বুদ্ধি সকল কাজকর্ম করিয়া থাকে।

এই জ্ঞান সুস্পষ্ট হইলে যোগী সূক্ষ্মদেহে (বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা নহে) দিব্য রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ অনুভব করিয়া আনন্দলাভ করেন। কিন্তু এইসকল অনুভব মনের সমাহিত অবস্থাকে নষ্ট করে। শুধু ব্যুত্থিত অবস্থায় ইহা যোগসিদ্ধিরূপে দ্রষ্টাকে আনন্দ দান করে। [ক্রমশ] (এগার)

আমার স্মৃতিতে পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ

সবিতা ঘোষ*



আমার পিসিমা গিরিবালা ঘোষ ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিতা ও ভগিনী নিবেদিতার বিশেষ স্নেহভাজন। তিনি আবার ছিলেন ভগিনী সুধীরারও ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের অন্যতম। সেই সুবাদে আমরাও মাঝে মাঝে নিবেদিতা স্কুলে যেতাম। আমাদের বাড়ির সকলেই ঠাকুর-মায়ের অনুরাগী ভক্ত ছিলেন।

যাহোক, আমার যখন নয় বছর বয়স, নিবেদিতা স্কুলের দুজন ছাত্রীকে নিয়ে পিসিমা একদিন বেলুড় মঠে যাচ্ছিলেন। সেদিন ঐ দুটি মেয়ের পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের কাছে দীক্ষা হওয়ার কথা। পিসিমাকে বেলুড় মঠে যেতে দেখে আমিও তাঁর সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করায় তিনি আমাকে নিয়ে যেতে সম্মত হলেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ তখন বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট। আমরা গিয়ে দেখি, তিনি মঠবাড়ির দোতলায় নিজের ঘরে বসে আছেন। যাঁরা দীক্ষা নেবেন তাঁরা সবাই আস্তে আস্তে তাঁর ঘরের ভিতরে ঢুকলেন। দরজা ভেজানোই ছিল। আমিও ঘরে ঢুকে দরজার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম, যাতে অন্য কেউ আমাকে দেখতে না পায়। কিন্তু মহারাজের দৃষ্টি এড়াতে পারলাম না। তিনি আমাকে দেখে ফেললেন এবং সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "কিরে, তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?" আমি বললামঃ "আমি দীক্ষা নেব।" তিনি মৃদু হেসে বললেনঃ "তোর দীক্ষার মন্ত্র মনে থাকবে তো?" আমি তাঁর মুখের হাসি দেখে জোর দিয়ে বললামঃ "ইংরেজী পদ্য, বাঙলা পদ্য সব আমার মনে থাকে, দীক্ষার মন্ত্র নিশ্চয়ই মনে থাকবে।" হঠাৎ পিসিমা এসে বললেনঃ "এখানে দীক্ষা দেওয়া হবে, এখান থেকে চলে এস।" তখন আমিও পিসিমাকে আমার দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। শুনে তিনি আমার হাত ধরে টান দিলেন। মহারাজজী তখন গম্ভীর স্বরে বললেনঃ "ওকে নিয়ে যাবেন না, গঙ্গায় স্নান করিয়ে, পরিষ্কার জামা-কাপড় পরিয়ে আমার কাছে নিয়ে আসুন আর একটি রুপোর টাকা ওর হাতে দিন।" পিসিমা যথারীতি তা-ই করলেন। দীক্ষার সময় মহারাজজী আমাকে তাঁর নিজের কাছে বসালেন এবং আমার কাছ থেকে ফুল চাইলেন। দীক্ষাদান সমাপনান্তে তিনি আমার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে বললেনঃ "এই তোর দক্ষিণা।" এই দিনটি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন বলে আমি মনে করি। দীক্ষা নেওয়ার পরে আমার সে যে কী আনন্দ! গুরুদেবকে প্রণাম করে বললামঃ "তুমি খুব ভাল, আমার কথা শুনলে।" তিনি হেসে আমার মাথায় হাত দিয়ে আদর ও আশীর্বাদ করলেন। আমিও তখন সাহস করে বললামঃ "তোমাকে আমি 'আপনি' না বলে 'তুমি' বলব।"

দীক্ষাগ্রহণের তিনদিন পরে একদিন সন্ধেবেলায় ঠাকুরঘরে জপধ্যান করতে বসেছি। কিন্তু কী আশ্চর্য, দীক্ষার মন্ত্র কোনমতেই মনে পড়ল না। ঠাকুর আর মায়ের ছবির সামনে বসে কত কাঁদলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। মন্ত্র আর কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। পিসিমার কাছে ভয়ে কিছু বললাম না। বাবার কাছে গিয়ে চুপি চুপি বললামঃ "আমি দীক্ষার মন্ত্র ভুলে গেছি।" বাবা আমায় খুব ভালবাসতেন। তিনি আমাকে মন্ত্র ভুলে যাওয়ার কথাটি কাউকে বলতে বারণ করলেন এবং পরদিন তাঁর সঙ্গে মঠে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে বললেন।

পরদিন সকালে বাবার কথামতো তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে তাঁর সঙ্গে বেলুড় মঠে গেলাম। বাবা শুধু এইটুকুই বললেনঃ "তুমি নিজে দীক্ষা নিয়েছ, তুমি নিজেই সব কথা গুরুদেবকে জানাবে। আমি কিন্তু কিছুই বলব না।" মঠে পৌঁছে আমি ছুটে সোজা গিয়ে গুরুদেবের ঘরে ঢুকে পড়লাম এবং প্রণাম করে কাঁদতে কাঁদতে বললামঃ "আমার খুব পাপ হবে।" তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেনঃ "কি হয়েছে তোর?" আমি বললামঃ "দীক্ষার মন্ত্র আমি ভুলে গেছি।" তখন তিনি জোরে হাসতে হাসতে বললেনঃ "তোর যে ইংরেজী পদ্য, বাঙলা পদ্য সব মনে

---

* নিউ আলিপুর নিবাসী শ্রীমতী সবিতা ঘোষ বর্তমানে ৭৩ বছরের বৃদ্ধা।—সম্পাদক

থাকে—তুই বলেছিলি, দেখলি তো 'অহঙ্কার' ভাল নয়।" আমি তখন চুপ করে বসে তাঁর পা টিপছি। হঠাৎ আমার কি মনে হলো, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "এখন মোজা পরে আছ কেন?" মহারাজ বললেন ঃ "আমার পায়ে একটা অসুখ আছে।" আরেকটা কি কথা বললেন তা আমার মনে নেই। তখন তিনি একজন মহারাজকে ডেকে একটি ছোট বাক্স আনালেন এবং তার ভিতর থেকে একটি ছোট কাগজের টুকরো বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন ঃ "তোকে একটা জিনিস দিচ্ছি, তুই ঠাকুরঘরে একটা জায়গায় লুকিয়ে রেখে দিবি, কাউকে বলবি না বা দেখতে দিবি না।" আমি কাগজটি খুলতেই দেখি তাতে আমার দীক্ষার মন্ত্র লেখা। তাই দেখে আমার যে কী আনন্দ! প্রণাম করে ফেরার সময় গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তুই কিছু খেয়েছিস?" আমি 'না' বলাতে তিনি তখন এক মহারাজকে ডেকে চাঙাড়ি ভর্তি করে প্রচুর ফল, মিষ্টি আমাকে দিলেন। নিচে নেমে এসে বাবার কাছে চুপি চুপি বললাম ঃ "আমাকে কাগজের মধ্যে গুরুদেব সব লিখে দিয়েছেন।" বাবা বললেন ঃ "দেখলে তো, সত্যকথা বললে সব কিছু হয়।"

তার বহুদিন পরের ঘটনা। পিসিমা একদিন এসে বললেন ঃ "বেলুড় মঠে নবনির্মিত মন্দিরের উদ্ঘাটন হবে।" আমিও সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় রইলাম।

১৯৩৮ সালের ১৪ জানুয়ারি মন্দির উদ্বোধনের দিন সকালে বাবা, মা ও পিসিমা-সহ আমরা সকলে বেলুড় মঠে গেলাম। উঃ কী ভিড়! লোকে লোকারণ্য! পিসিমা আমার হাত ধরে মন্দিরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বললেন ঃ "এই মন্দির তোমার গুরুদেব তৈরি করেছেন।" হঠাৎ আমার মনে হলো—মন্দিরের এত সুন্দর কারুকার্য যিনি করেছেন, তিনি সত্যিই বিরাট ব্যক্তি। ঠাকুরকে প্রণাম করে পিসিমার হাত ছেড়ে ছুট দিলাম গুরুদেবের ঘরের দিকে। ওপরে উঠে দেখি, গুরুদেব বারান্দায় দাঁড়িয়ে দুজন মেমসাহেবের সঙ্গে কথা বলছেন। আমি গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর কুশল সংবাদ নিলাম ও বললাম ঃ "তুমি কত বড় মন্দির করেছ!" তিনি মুখখানা করুণ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ "নারে, ভাল নেই আমি।" আমি খুব ছেলেমানুষ ছিলাম বলেই হয়তো তাঁর সেদিনের সজল দৃষ্টির মর্মার্থ বুঝতে পারিনি। তাঁকে আর দেখতে পাব না বলেই হয়তো শেষবারের মতো তাঁকে প্রণাম করতে আসা। ততক্ষণে মাইকে আমার নাম ডাকছে। আমি গুরুদেবকে বললাম ঃ "আমি না বলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চলে এসেছি। তাই মাইকে আমাকে ডাকছে।" তিনি শুনে খুব অবাক হলেন। তখন আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছুট দিলাম ও ছুটতে ছুটতে পিছন ফিরে দেখলাম, তিনি আমার দিকে সজল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। এদিকে আমাকে খুঁজে না পেয়ে আমার মা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন আর স্বেচ্ছাসেবকেরা তাঁর চোখেমুখে জল দিচ্ছেন। পিসিমা এসে আমাকে তিরস্কার করাতে বাবা পিসিমাকে আমায় বকতে বারণ করলেন। আমাকে কাছে ডেকে বাবা বললেন ঃ "তুমি নিশ্চয়ই তোমার গুরুদেবকে প্রণাম করবে, তবে আমাদের বলে গেলে ভাল হতো।"

শেষদিকে পিসিমা বারাণসী সেবাশ্রমে থাকতেন এবং মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন। কলকাতায় এলে তিনি নিবেদিতা স্কুলেই থাকতেন। গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের পর পিসিমা বারাণসী থেকে এসে আমাকে বিস্তারিত সব জানালেন। শুনে আমার খুব কান্না পেল। কাঁদতে কাঁদতে বললাম ঃ "তিনি কত ভাল ছিলেন, আমার কথা শুনেছিলেন, আমার মাথায় হাত দিয়ে কত আদর করতেন, আর আমি তাঁকে দেখতে পাব না!" পিসিমা বললেন ঃ "তাঁকে ডাকবে, স্মরণ করবে, তিনি তোমার সব কথা শুনবেন।" পিসিমা আমাকে যাকিছু করণীয় কাজ করালেন। গুরুকৃপাতেই সংসারজগতের অনেক বাধা-বিপত্তি আমি কাটাতে সক্ষম হয়েছি। তাঁর পূত স্পর্শে আমার জীবন ধন্য হয়েছে। ❑

অনুষ্ঠান-সূচী ঃ চৈত্র ১৪০৮

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য	ঃ	**শ্রীরামকৃষ্ণদেব** ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া ২ চৈত্র, শনিবার (১৬ মার্চ ২০০২) **শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব** ১০ চৈত্র, রবিবার (২৪ মার্চ ২০০২) **শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু** দোল পূর্ণিমা ১৪ চৈত্র, বৃহস্পতিবার (২৮ মার্চ ২০০২) **স্বামী যোগানন্দ** ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী ১৮ চৈত্র, সোমবার (১ এপ্রিল ২০০২)
একাদশী-তিথি	ঃ	১১, ২৫ চৈত্র সোমবার, সোমবার (২৫ মার্চ, ৮ এপ্রিল ২০০২)



ফাল্গুন ১৩০৮
ফেব্রুয়ারি ১৯০২

কামিনীকাঞ্চন ও ভক্তিবিশ্বাস

(স্বামী ত্রিগুণাতীত)

সাংসারিক পরিচয়ে কামিনীকাঞ্চনের প্রাধান্য; পারমার্থিকে ভক্তিবিশ্বাসের বিশেষ প্রাধান্য। পারমার্থিক পরিচয়ে কামিনীকাঞ্চন কোনও মতেই উল্লেখযোগ্য হইতে পারে না; সাংসারিক পরিচয়ে ভক্তিবিশ্বাসের উল্লেখ কিছু যে নিন্দনীয় তাহা নহে। ইহার [কামিনীকাঞ্চনের] পরিচয় দুই দিনের জন্য এবং দু-দশ জনের নিকট; কিন্তু উহার [ভক্তিবিশ্বাস] পরিচয় অনন্তকালের জন্য এবং সর্ব্বত্র। কামিনীকাঞ্চনের সামর্থ্য অতি সামান্য; ভক্তি-বিশ্বাসের বল অসীম। কামিনীকাঞ্চনের ধর্ম্ম চঞ্চল; ভক্তিবিশ্বাসের ধর্ম্ম স্থির। কামিনীকাঞ্চনের অসদ্ব্যবহারই প্রায় সর্ব্বত্র দ্রষ্টব্য, সদ্ব্যবহার খুবই কম; ভক্তি-বিশ্বাসে অসদ্ব্যবহারের সম্ভাবনা কুত্রাপি কিছুই নাই, সদ্ব্যবহারই সমস্ত। একে [একটি] প্রায়ই নরকগামী করায়; অপরে [অপরটি] নিশ্চয়ই মোক্ষধামে লইয়া যায়। একটী যেন দানবের সৃষ্ট, অপরটী ("যেন" নয়,) সত্যই ঈশ্বরের প্রদত্ত। একটী সম্রাটকেও পথের ভিখারী করিতে পারে; এমনকি সমগ্র পৃথিবীকেও রসাতলে প্রেরণ করিতে পারে। অপরটী অতি ক্ষুদ্র ভৃত্যকেও সেই জগদীশ্বরের সিংহাসনে অধিরূঢ় করাইতে পারে; এবং চাই কি, এই মর্ত্ত্যেই স্বর্গধাম আনয়ন করিতে পারে। এখন, আপনার চাই কি? কি চাই, বলুন। উইয়ের ঢিবির ন্যায় যদি মাটিতে মাটি মিশাইয়া দিতে চান, অগ্রেরটীকে গ্রহণ করুন। আর যদি ঐ অনন্ত আকাশের ন্যায় নিত্যে নিত্য স্থাপন দেখিতে চাহেন, পরবর্ত্তীটীর উপাসনা করুন। যদি বারুদের ঘরে প্রবেশ করিতে চান, যান—ঐ নরকের দ্বারস্বরূপ কামিনীকাঞ্চনের উপাসনা করুন; আর যদি মণিকোঠায় বাস করিতে চান, আসুন—এই কল্পবৃক্ষস্বরূপ ভক্তিবিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করুন। যদি পুঁটী মাছের ন্যায় অল্পজলে ফর্‌ফর্ করেন, যদি জোনাকের ন্যায় অতি ক্ষণিক ও ক্ষুদ্র আলোক ভালবাসেন, তাহা হইলে আপনার গাত্রের চর্ম্মজালকে অতি সুখপ্রিয় করুন, এই বাহ্যিক নেত্রদ্বয়কে বিস্ফারণ করুন, মানব-মস্তিষ্ককে আধুনিক ও পার্থিব জ্ঞানে পূর্ণ করুন, ক্ষিপ্ত মনকে অভিমানাদির দ্বারা আরও সিক্ত করুন; করিয়া সকল সত্যের উপর যে আধ্যাত্মিক সত্য, সে সত্য জানিবার পথে কণ্টক দিয়া সকল জ্ঞানের উপর যে আত্মজ্ঞান সে-জ্ঞানে জলাঞ্জলি দিয়া, কামিনীকাঞ্চনের আভায় মুগ্ধ হউন। আর যদি বৃহৎ মৎস্যের ন্যায় অগাধ জলে গম্ভীরভাবে বিচরণ করা আপনার স্বভাব হয়, যদি আপনি কৌস্তুভমণির ন্যায় নিত্য ও স্থির আলোকপ্রিয় হন, তাহা হইলে পার্থিব ও চঞ্চল চর্ম্মসুখকে বিসর্জ্জন দিন, বহির্দৃষ্টির রোধ দ্বারা জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত করুন, ক্ষুদ্র মস্তিষ্ককে আধ্যাত্মিক আলোচনা দ্বারা বর্দ্ধিত করুন, মলিন মনকে সদসৎ বিচারাদির দ্বারা মার্জ্জিত করুন, করিয়া একমাত্র পরম সত্যবস্তুর প্রয়াসী হইয়া ভক্তিবিশ্বাসের মাহাত্ম্য আস্বাদন করুন। দেখুন, কামিনীকাঞ্চনরূপ মায়া ও মোহমদিরায় উন্মত্ত হইবেন? না, ভক্তি-বিশ্বাসরূপ আনন্দ ও অমৃতরসে বিহ্বল হইবেন? যদি প্রথমটীর নিকটে যান, থাকুন এখানে; শোকে, তাপে, দুঃখে, পীড়ায়, চিন্তায়, নিরাশায় খাক হইয়া যাইতে থাকুন। অবশেষে জীবদ্দশায়ও আপনার ভিতর আর কিছুই পদার্থ থাকিবে না, সকলে তখন সাংঘাতিক ব্যারামগ্রস্ত ঘোটকের ন্যায় আপনাকে অতি অপদার্থ, নিষ্প্রয়োজনীয় এবং ত্যাজ্য বলিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইবে। আর যদি দ্বিতীয়টীকে গ্রহণ করেন, আসুন—শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তিসম্পন্ন হইয়া বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান প্রভৃতিতে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উত্তরোত্তর পরমসুখী হউন; জীবদ্দশায় ত এইরূপ হইবেনই; অবশেষে মরিয়া যাইলেও, কত লোকে এখানে (স্বর্গের কথা ত ছাড়িয়াই দিন) পুষ্পচন্দন লইয়া আপনার চিত্র পূজা করিবেন এবং আপনাকে কেবলমাত্র স্মরণ করিয়াই জীবনে কত শান্তি লাভ করিবেন।*

*[শ্রীরামকৃষ্ণ কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের কথা বলতেন। মহিলাদের সামনে বলতেন 'পুরুষকাঞ্চন ত্যাগ' কর। স্বামীজী সমন্বয় করে বললেন—কামকাঞ্চন ত্যাগ। এই কামকাঞ্চনই নরকের দ্বারস্বরূপ। 'কামিনী-কাঞ্চন' শব্দের প্রয়োগে নারীর মাতৃত্বের অবমাননার অভিপ্রায় কখনো কারুর ছিল না।—সম্পাদক]

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ● সম্পাদনা : স্বামী সর্বগানন্দ

তুমি ফের আমার সনে

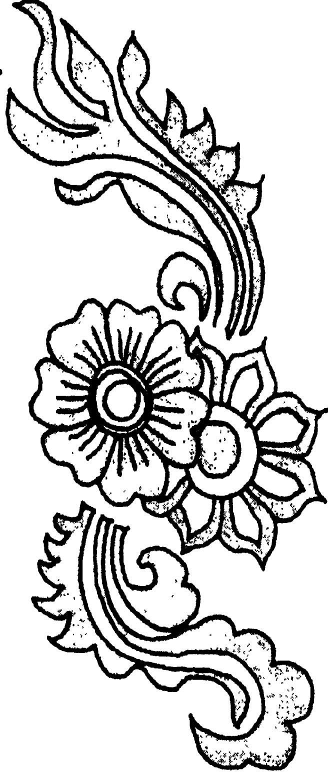
সেখ হাসান ইমাম

আমার তো কিছু নাই তোমারই তো সব,
একথা জেনেছি আমি সংগোপনে,
যাকিছু পেয়েছি আমি তোমারই বৈভব,
অনুভব হয়েছে আমার মনে মনে।
যবে আমি সর্বহারা,
শোকে দুঃখে পাগলপারা,
তুমি যে দাও গো ধরা গোপন ক্ষণে।
অতি ঘোর আঁধার নিশা,
হারায়ে পথের দিশা,
আমি যবে শ্রান্ত পথিক
তুমি ফের আমার সনে।

বিশ্বরূপ

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

বিশ্বভরে দেখি তোমার
উদার অতল রূপ।
ছোটয় বড়য় মিলিয়ে তুমি
অসীম অপরূপ।
ক্ষুদ্র তৃণে ক্ষুদ্র ফুলে
নাচ তুমি দুলে দুলে
(আবার) গ্রহ তারা আকাশ ভরে
বিরাট বিশ্বরূপ।
শুনেছি এ সৌরজগৎ
একটি দুটি নয়;
অনন্ত এ জগৎভরা
রূপের বিস্ময়।
চন্দ্র ও তপন দুটি নাকি
অনিদ্রিত তোমার আঁখি
কঠিন এবং কোমল দুটি
দৃষ্টি অপরূপ।
আকাশ তোমার অঙ্গবাস
বায়ু তোমার বাঁশি
বজ্র তোমার কণ্ঠনাদ
বিজলি তোমার হাসি।
মূর্তি তোমার অভ্রভেদী
এই পৃথিবী পূজার বেদি
জীবন-মরণ তার আরতির
প্রদীপ এবং ধূপ।
বিশ্বভরে দেখি তোমার
উদার অতল রূপ।



একমুঠো ছাই

হরিগোপাল চৌধুরী

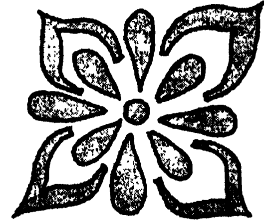
দুরন্ত দিগন্তরেখা বিঁধে—
দুটি রেখা চলে গেছে সিধে;
আসে গাড়ি, যায় গাড়ি—
কালানলে নাচে মহামারী।

চাঁদের পাহাড় থেকে ফুলপরী ডাকে,
ঘুণপোকা চুপি চুপি আল্পনা আঁকে;
পাহাড়ের বুক বেয়ে নেমে আসে ধারা,
সমতলে তলে তলে কাঁদে যে সাহারা;
মনোরম নীলিমায় ভরেছে আকাশ,
ধরাতলে দাউদাউ জ্বলে মরা ঘাস।
চাঁদ ওঠে, ফুল ফোটে, পাখি গান গায়—
সবশেষে যোগফল একমুঠো ছাই।

আপনারে তুই জানলি না

গোষ্ঠবিহারী রাণা

অনেক কিছুই জানলি ভবে
আপনারে তুই জানলি না,
অনেক কথাই ঢুকল কানে
কোন কথাই মানলি না।
কোত্থেকে তুই আসলি ভবে,
কোথায় যাবি, কি-ই বা হবে,
একটু তরেও মনের মাঝে
এসব কথা আনলি না।
আহার নিদ্রা ভোগবাসনায়
রইলি মজে রইলি রে,
সারাজীবন ভূতের বোঝা
আপন কাঁধে বইলি রে।
এই তো রে তোর রকমসকম
করলি শুধুই বকমবকম,
অনেক বড়াই করলি মুখে
অসার কথা কইলি রে।
অনেক পুঁথি পড়লি তবু
কোন নিয়ম পাললি না,
মনের ভিতর শত্রু যেসব
তাদের তো তুই হানলি না।
নেই তো জবাব কোন ধাঁধার,
হৃদয়মাঝে রইল আঁধার,
একটুখানি যত্ন নিয়ে
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বাললি না।
জীবনমাঝে আসল জিনিস
খুঁজলি না তুই খুঁজলি না,
সহজ কথার সহজ মানে
বুঝলি না তুই বুঝলি না।
যুগের ঠাকুর এলেন ঘরে
সহজ কথা বলার তরে,
বেকুব হয়ে রইলি বসে,
চরণ তো তাঁর পূজলি না।



টিকটিকি কুমিরই

মূল তামিল ঃ ময়ন (কে. এন. সুব্রহ্মণ্যম্)*

হিন্দি রূপান্তর ঃ মীনাক্ষী পুরী**

বঙ্গানুবাদ ঃ হিমাংশুশেখর চক্রবর্তী

টিকটিকি কুমিরই
সঙ্গীত নিঃশব্দতা।
জীবন মাত্র মৃত্যুতেই
প্রকাশেই অন্ধকার
দূরত্ব বোঝাতে নৈকট্য
সীমা কেবলমাত্র চোখেতেই
পরিধি কেন্দ্রতে
ঘাস বাঁশ সব একই।

সততা হচ্ছে মায়া
যা আছে তা না থাকাও
যা তেতো তা মিষ্টিও
সত্য হচ্ছে অসত্য
টিকটিকি কুমিরই
ঘাসই বাঁশ।

---

* ময়ন (কে. এন. সুব্রহ্মণ্যম্) [১৯১২-১৯৮৮] তামিলভাষী লেখক, অন্তত সত্তরটি পুস্তক রচনা করেছেন—যার মধ্যে রয়েছে কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস এবং গল্প-সংগ্রহ। ইনি ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে 'সাহিত্য আকাদেমী' পুরস্কারে সম্মানিত হন।

** মীনাক্ষী পুরীর জন্ম ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে। ইনি বর্তমানে দিল্লির বাসিন্দা। তামিলভাষী হলেও ইনি হিন্দি সাহিত্যজগতের বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক। কেন্দ্রীয় হিন্দি নির্দেশালয় দ্বারা তিনি সম্মানীত। তামিল থেকে হিন্দি অনুবাদে ইনি অনেক সহজ ও সক্ষম।

ত্রিবেণী-সঙ্গম

স্বপনকুমার আইচ

তুমি কি ক্লান্ত?
শ্রান্ত?
আমিও!
তাহলে এস এইবেলা স্নান সেরে নিই,
শান্ত স্নিগ্ধতায় ভরে যাই,
আপাদমস্তক নিমজ্জিত হই,
ভালবাসার জলকেলিতে মেতে উঠি—
কিন্তু, ভাই কোথায়?
সঙ্গমে!
কোন্ সঙ্গম?
কেন, স্বামীজী-মা-ঠাকুরের ত্রিবেণী-সঙ্গম।

অশ্রু কল্পতরু

রঘুনাথ ভট্টাচার্য

যাকিছু জেনেছি, যাকিছু বুঝেছি
"অশ্রু কল্পতরু।"
জননীরে কাছে শিশু টেনে আনে,
কঠিন হৃদয়ও স্নেহে গলে যায়, অবশেষে হার মানে।
মনোমালিন্য দূরে সরে যায়,
অশ্রুর হয় জয়।
গালাগালি ভুলে গলাগলি করে,
শত্রুতা ভুলে মিত্রতা করে,
অশ্রু চোখেতে এলে।
সবকিছু ভুলে অনাবিল মনে
অশ্রুতে ডুবে গেলে,
যাকিছু চাইবে সবকিছু পাবে
সেই তাঁকে পাওয়া হবে
পৃথিবীতে কত সম্পদ পাই,
অশ্রুর মতো সম্পদ নাই,
যা দিয়ে পরম মেলে।
জীবনের যবে শুরু,
সেই শুভক্ষণে শিশুর নয়নে
অশ্রু রয় যে ভরে,
সারাজীবনের সুখ ও দুঃখে
অশ্রু রয়েছে ঘিরে।
অবশেষে দিন এল,
প্রাণদীপ নিভে গেল।
মরণ সময়ে তাঁর ও মোদের
নয়নে অশ্রু ঝরিল।
শেষে ফের বলি, অশ্রুর কাছে
ভগবান হার মানে,
অশ্রু যে তাঁরে স্বর্গ থেকে
পৃথিবীতে টেনে আনে
ঠাকুরের ভাবধারায়
অশ্রুসিক্ত হয়ে
তিন টান যদি এক করে পেতে—
সন্তানের মা, সতীর পতিতে,
বিষয়ীর বিষয়েতে,
তখনি তো তুমি ঈশ্বর পেয়ে
সবচেয়ে খুশি হতে।
অতএব তবে, মনে ভাব হবে,
হয়ো নাকো তুমি ভীরু,
সঙ্গে রয়েছে সরল অশ্রু—
"অশ্রু কল্পতরু।"

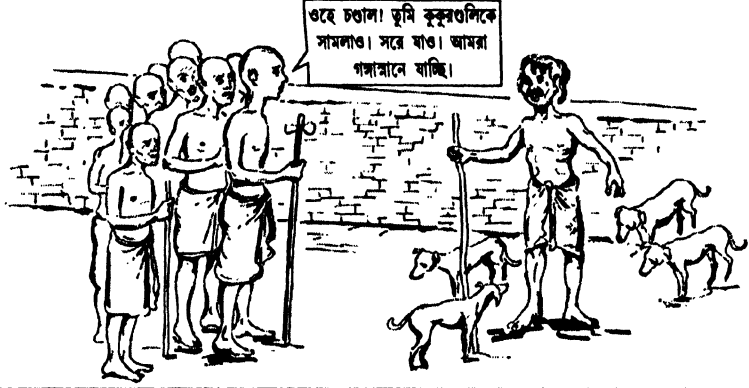


আদি শঙ্করাচার্য ৭

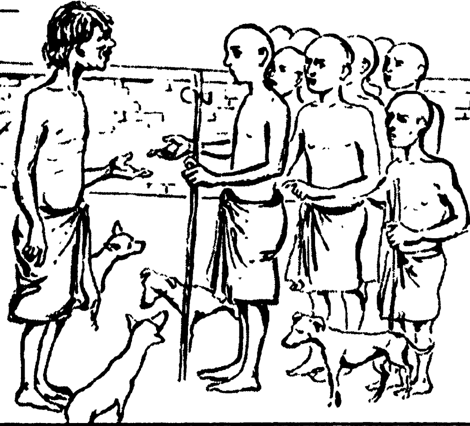
উদ্বোধন

শিশু ও কিশোর বিভাগ

আরেকদিনের ঘটনা। আচার্য শঙ্কর স্ব-শিষ্য গঙ্গাস্নানে চলেছেন। এমন সময়—



চণ্ডাল অট্টহাস্য করে ছন্দোবদ্ধ সংস্কৃতে বলে উঠল—



চণ্ডালের এই জ্ঞানগর্ভ বাক্য শুনে শঙ্কর স্তম্ভিত ও লজ্জিত হলেন। অনুভব করলেন স্বয়ং বিশ্বনাথ আবির্ভূত। তাই মনের আবেগে স্তব করতে লাগলেন। স্তবান্তে চোখ খুলে দেখেন সম্মুখে শিব।



চিত্ররূপ ঃ দেবাশিস বসু

দেবাদিদেব শঙ্কর আচার্য শঙ্করের স্তবে তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করলেন—



এই বলে শিব অন্তর্হিত হলেন।

মালদহের গম্ভীরা গান

ইকবাল দরগাই

লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত, লোকনাট্য গ্রামবাংলাতেই সীমাবদ্ধ। গ্রামের খেটে-খাওয়া সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের জীবনের ভাব আর ভাবনায় এইসব লোক-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে থাকে। গ্রামবাংলার অল্পশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত মানুষজনই এই লোকসংস্কৃতির পরম দরদী, ধারক ও বাহক।

গম্ভীরা উত্তরবঙ্গের মালদা জেলার লোক-উৎসব। এই উৎসব বহু প্রাচীন। স্বাধীনতার আগে মালদহের প্রায় সর্বত্রই এই গম্ভীরা উৎসব ধুমধাম করে অনুষ্ঠিত হতো। স্বাধীনতার পর কিছু থানা বাংলাদেশের মধ্যে চলে যাওয়ায় বর্তমানে মালদহ জেলার মাত্র ৮-১০টি থানায় এই উৎসব হয়।

গম্ভীরা হলো গাজনের উৎসবে শিবার্চনা সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানবিশেষ। পঞ্চাশের দশকেও এই উৎসব উপলক্ষ্যে গ্রামবাংলায় খুশির আমেজ আসত মানুষের মনে। নতুন জামাকাপড় কিনে গম্ভীরা উৎসবে যোগ দিত মানুষ। পরবর্তী কালে আর্থিক অবস্থার অবনতি হওয়াতে এসব আর সম্ভব হয় না। আগে পদ্মফুল ও বাহারি রঙিন ঝালর দিয়ে যত্ন সহকারে গম্ভীরামণ্ডপ সাজানো হতো। খোলা আকাশের নিচে বসত গম্ভীরার আসর। বিরাট চাঁদোয়া বা ত্রিপল দিয়ে গম্ভীরামণ্ডপ আচ্ছাদিত করা হতো। ঘিয়ের প্রদীপ এবং সুগন্ধী ধূপ-ধুনোয় ম-ম করত গম্ভীরামণ্ডপ। এক-এক মণ্ডপে ৬-৭ হাজার থেকে ৯-১০ বা ১২ হাজার টাকা অবধি খরচ করা হতো। পরবর্তী কালে অর্থনৈতিক কারণে এই খরচ কমে দাঁড়িয়েছে ১ থেকে ২ হাজারের মধ্যে।



গম্ভীরা উৎসব বাঙলা বছরের শেষদিনেই শুরু হতো। পরবর্তী কালে সুবিধামতো দিনক্ষণ ঠিক করে নেওয়া হয়েছে। তবুও বাঙলা বছরের শেষদিন চৈত্র সংক্রান্তিতেই গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আদি কাল থেকে আজ অবধি এই গম্ভীরা উৎসব পৌণ্ড্র, নাগর, চাঁই, রাজবংশী, আদিবাসী, গোয়ালা, তিলি, নাপিত, ছুতোর ইত্যাদি সমাজের মানুষের মধ্যেই বেশি প্রচলিত। তবে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষই এই উৎসবে বেশি অংশ নেন।

স্বাধীনতার আগে প্রতি গ্রামে একজন করে দলপতি থাকত। তাদের 'গ্রামের প্রধান' বা 'মণ্ডল' বা 'মোড়ল' বলা হতো। এইসব মোড়লের অধীনে এক-একটি গম্ভীরা থাকত। প্রাচীনকালে এলাকার জমিদারের দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে গম্ভীরা উৎসবের খরচ চলত। পরবর্তী কালে গম্ভীরা সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়। গম্ভীরা উৎসব সাধারণত তিনদিন বা সাতদিন ধরে হয়। উৎসবকে 'ঘটভরা', 'ছোট তামাশা', 'বড় তামাশা', 'ফুলভাঙা', 'বোলাই', 'ঢেঁকি', 'মঙ্গলা' ইত্যাদি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। বারো থেকে ষোল ফুট গোলাকার অংশ নিয়ে হয় আসর। দর্শক-শ্রোতারা এই আসরের প্রায় চারদিকেই বৃত্তাকারে বসে। আসরের একপাশে বসে হারমোনিয়াম, ডুগি-তবলা, বাঁশি, মন্দিরা, ঢোল, কাঁশি ইত্যাদির বাদকেরা। আগে গম্ভীরা নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তী কালে তা অন্য রূপ নিয়েছে।

বর্তমানে গম্ভীরা উৎসব মূলত নৃত্যগীত-নির্ভর। শিব এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে আছেন। শিবের মূর্তি স্থাপন করে পূজা করা, গাজন ইত্যাদি শিব সম্পর্কীয় সবকিছুই গম্ভীরার সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে গম্ভীরাতে নৃত্যগীতই প্রধান। আজকের গম্ভীরা উৎসবের মূল কেন্দ্র হলো মালদহ জেলার সদর ইংরেজবাজার শহর, মহদীপুর, জোত-আরাপুর, সাহাপুর, পুরনো মালদহ, ভোলাহাট ইত্যাদি।

এই গম্ভীরাতে সম্ভবত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যাত্রার প্রভাব পড়ে থাকবে। সেইজন্য একে গম্ভীরা পালাগানও বলা যেতে পারে। গম্ভীরা পালাগানে 'মুখপাদ', 'বন্দনা', 'দ্বৈতগান' বা 'চারইয়ারী', 'পালাবন্দী গান' এবং 'খবর' —এই কয়টি ভাগ বা পর্ব আছে। একটি চরিত্র গম্ভীরার আসরে প্রবেশ করে গানের মাধ্যমে পরিচয় দেয়। একে বলে 'মুখপাদ'। মুখপাদের আবার দুটি শাখাপর্ব আছে—'ধুয়া' ও 'চিতানি'।

বন্দনা পর্বে একজন গম্ভীরা গায়ক-অভিনেতা 'শিব' সেজে আসরে প্রবেশ করে। তার হাতে থাকে ত্রিশূল, গায়ে বাঘছাল, মাথায় জটা। এই শিববেশী গায়ক-অভিনেতাকে অন্য গায়ক-অভিনেতারা দেশের নানা দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে অবহিত করে থাকে, এমনকি তারা একযোগে এসবের প্রতিকারও দাবি করে। তাদের পরনে থাকে ছেঁড়া, মলিন গেঞ্জি। ধুতি মালকোঁচা করে পরা। তাদের কপালে থাকে চুনের টিপ, মাথা ও হাতের কবজিতে ছেঁড়া নেকড়া বা দড়ি বাঁধা থাকে। এদের মুখনিঃসৃত সংলাপ এবং পরনের বেশ যেন গ্রামবাংলার অত্যাচারিত, নিপীড়িত, দরিদ্র

জনগণের জীবন্ত প্রতীক। 'শিব' তাদের কথা মন দিয়ে শোনেন। কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে জিজ্ঞাসাও করেন।

গম্ভীরা গানে শিবকে উপস্থিত করে তাঁর উদ্দেশে গান এবং তাঁকে দেশের অবস্থার কথা সবিস্তারে জানানোর প্রচলন প্রথম শুরু হয় তৎকালীন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি 'বাংলার বাঘ' স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একদা মালদহ শহর ভ্রমণ উপলক্ষ্যে। সেসময়ে ইংরেজবাজার শহরের বিখ্যাত গম্ভীরা-গায়ক মহম্মদ সুফী শিবকে প্রতীক হিসাবে গম্ভীরার আসরে আনার চিন্তাভাবনা করেন। স্যার আশুতোষ না এলেও তাঁর প্রতিনিধি এলে তাঁর সামনেই মহম্মদ সুফী শিবকে উপস্থিত করে গান গেয়ে আসর মাতিয়ে দেন। মহম্মদ সুফীর এই নতুন ভাবনাচিন্তা সেসময়ে দারুণভাবে সফল হয়। তিনি প্রচুর প্রশংসাও লাভ করেন। এর পর থেকেই গম্ভীরা আসরে নিয়মিত 'শিব' উপস্থিত হতে থাকেন।

শিবের বন্দনা শেষ হয়ে গেলে ভাষাসমস্যা, দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, সাধারণ মানুষের নানা দুর্দশা ইত্যাদি বিষয়ে গান পরিবেশিত হয়। গায়ক-অভিনেতাদের মধ্যে একজনের পোশাক থাকে মলিন ও ছেঁড়া। তিনি গ্রামের হতদরিদ্র জনসাধারণের প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধির বক্তব্য-সংলাপ হাস্য-কৌতুকে ভরা, কিন্তু তার মধ্যে বর্তমান থাকে নিষ্ঠুর সত্য। তিনি হাস্যরসের মাধ্যমে কঠিন সত্যকে আসরের চারপাশে বসা দর্শক-শ্রোতাদের সামনে হাজির করেন। দ্বৈতগান ও চারইয়ারী পর্বে গানের চেয়ে নাটকের অংশ তুলনামূলক-ভাবে বেশি। এই পর্বকে লোকনাট্যও বলা চলে। নাটকের প্রধান চারটি অংশ—কাহিনী, চরিত্র, ঘটনা, সমাবেশ ও সংলাপ—সবই থাকে এই পর্বে। এছাড়া নাটকের গতি এবং বীর ও রৌদ্র রসের বাড়াবাড়িও থাকে। আর থাকে সুদীর্ঘ সংলাপ, যার মধ্যে আবেগই প্রধান। স্থূল হাস্যরসের মাধ্যমে কিছুটা ভাঁড়ামির চেষ্টাও থাকে।

এই পর্বে গায়ক-অভিনেতা দৈহিক অঙ্গভঙ্গি, বক্তব্য ও রঙ্গরসিকতা এমন দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পরিবেশন করে যে, দর্শক-শ্রোতাদের মনে তা তীব্র আঘাত করে। তাদের নিমেষে জীবন্ত-জ্বলন্ত সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় গায়ক-অভিনেতা। আর এখানেই তার মুনশিয়ানা। এই পর্বে দ্বৈতগান হলে থাকে দুজন। আর চারইয়ারী হলে থাকে চারজন। শুধু পালাবন্দী গম্ভীরা গান হলে দুই বা চারের অধিক গায়ক-অভিনেতার প্রয়োজন হয়। উল্লেখ্য, গম্ভীরা গানে যে জনগণের প্রতিনিধি হয়ে আসরে নামে, সেই হয় 'গম্ভীরা', দলের সবচেয়ে দক্ষ গায়ক-অভিনেতা। তার সাফল্য-ব্যর্থতা, যথাযথ সংলাপ পরিবেশনেই গম্ভীরা পালাগানের মান ওঠানামা করে থাকে। গম্ভীরা গানের শেষ পর্বকে বলা হয় 'খবর' বা 'রিপোর্ট'। যেখানে গম্ভীরা গানের আসর বসে, সেই অঞ্চলের খবর বা রিপোর্ট এই পর্বে পরিবেশিত হয়ে থাকে। এই পর্বে দুজন গায়ক-অভিনেতা তাদের সংলাপের মাধ্যমে এই সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। সমাজের অন্যায়-অবিচার, দুর্নীতি এবং পুরনো বছরের পর্যালোচনা দক্ষতার সঙ্গে পেশ করা হয়ে থাকে।

গম্ভীরা গানের ভাষা মিশ্র বলা যায়। মালদহ জেলায় নানা জাতি পাশাপাশি বাস করে। রাজবংশী পালিয়াদের প্রভাবও এসেছে ভাষায়। পাশের রাজ্য বিহার থেকে এসেছে হিন্দি ও মৈথিলী। এসব কারণেই গানের ভাষায় মিশ্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

গম্ভীরা গানের সুরেও অনেক বৈচিত্র্য। ঝাঁপতাল, খেমটা, ত্রিতাল, কাহারবা, দাদরা, জংলা, একতাল—এইসব মিলেমিশে তৈরি হয়েছে আলাদা সুর। ইদানীং চটুল হিন্দি ও বাঙলা আধুনিক গানের সুরের প্রভাবও লক্ষ্য করা যাচ্ছে গম্ভীরা গানে। কয়েকটি গানের নমুনা এখানে পেশ করা হলো। শিবকে উদ্দেশ করে গাওয়া হয়—

"কি করলি হে দশা দৈন্য
দেশের লোক পায় না অন্ন
হায় কিরে পস্তানার কথা
শায়েস্তা খাঁর আমহে
শিব হে।
তখন গরিব দুঃখী আছিল সুখী
টাকায় আট মনের ভাও
চাউল হে।।
কষ্ঠে গেল সে সুখের দিন
হনু দিনে দিনে দীনের অধীন
শিব হে।
এখন আট সেরেরও ভাও
জুটে না।
দুবেলা প্যাটে তাও
জুটে না।।
তোর নন্দী ভিরিঙ্গি বুড়হ্যা দামড়া
কি দিয়ে পূজব, কহেক হামরা
শিব হে।।"

সতীশচন্দ্র গুপ্ত রচিত আরেকটি শিববন্দনা—

"ঐ দ্যাগ ন্যাঙটা বুড়া সংটা
সাজ্যা ঢংটা কোর‍্যা আছে বোস্যা।
বুড়া আস্ত খ্যাপা ভষ্ম লাপ্যা
বাঘের ছালটা পড়েছে খোস্যা।।"

দেশের রাজনৈতিক অবস্থাও এ গানে স্থান পেয়েছে—

"চোদ্দ দলেরই চোদ্দ দশা
বাঙালির আর নাইকো ভরসা।
খেতে পাব ভাল থাকব
নির্মূল হলো সব আশা।।
অর্থমন্ত্রী দাঁড়িয়ে শূন্য অর্থভাণ্ডার নিয়ে
রাইটার্স বিল্ডিং বিক্রি হবে সরকারে দেনার দায়ে
কর্মচারীরা পাবে না বেতন, বেড়ে হলো যন্ত্রণা
ঘেরাও, লুটপাটও হলো
পুলিস গুলিও চালাল।
খাদ্যমন্ত্রীর খাদ্য অনবদ্য—অনাহারে মরে দেশ
এদের দ্বারা হবে না পাপের শেষ।।"

আবার অন্য এক গানে আছে—

"মালদা টাউনের খবর
জানাই সব জবর
দয়া করে আপনারা
শুনুন ভাই সবাই।
পৌরসভা এই শহরে
উন্নতি করে
যেথায় সেথায় রাস্তা খুঁড়ে
রাস্তা চলা দায়।।
জেলার সদর হাসপাতাল
হয়ে আছে মহাকাল।
রুগীরা হয় নাকাল
ওষুধ বিনে মারা যায়।।...
সরকারি ইলেকট্রিক সাপ্লাই
গুণের তাদের অন্ত নাই।
জ্যোৎস্না রাতে আলো জ্বালায়
আঁধারে নিভায়।।
পোস্ট আফিস সৌখিন
হয়ে থাকে উদাসীন।
বাড়ির পাশে একমাসে
চিঠি পাওয়া যায়।।"

গম্ভীরা গানে অশ্লীলতা কিছুটা থাকলেও তা কখনো অতিরঞ্জিত নয়। গ্রামের সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষদের চাহিদার পাশাপাশি তা ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিকভাবেই হয়তো এসেছে, তবে তা কখনো শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যায়নি।

প্রাচীনকালে গম্ভীরা উৎসবের চতুর্থ দিনে সঙ বের হতো। এখন আর এসব তেমনভাবে দেখা যায় না। তবে এই জেলার ইংরেজবাজার শহরে আজও বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি সময়ে সঙ বের হয়। এই জেলার গম্ভীরা গানের প্রাণপুরুষ প্রয়াত যোগেন্দ্র চৌধুরীও (ওরফে 'মটর') গম্ভীরার সঙ বের করতেন। গম্ভীরা গানের রচয়িতারা হলেন সাহাপুরের হরিমোহন কুণ্ডু, ইংরেজ-বাজারের মহম্মদ সুফী, মহম্মদ সোলেমান, গোবিন্দলাল শেঠ, শরৎ পণ্ডিত, আবুল হোসেন, দোকড়ি চৌধুরী এবং আরো অনেকে। সুফী মাস্টার ও সোলেমান ডাক্তার মুসলমান হলেও ধর্মনিরপেক্ষতা তাঁরা গম্ভীরা গানে সর্বদা বজায় রেখে গেছেন।

গম্ভীরা গানের সেই জৌলুস আর আগের মতো নেই। নেই সেইসব দক্ষ, নিষ্ঠাবান গায়ক-অভিনেতারাও। এখন অনেকেই অল্প কয়দিন কোন গম্ভীরা দলে থেকে পরে নিজেই নতুন দল গড়ছেন। তেমন গান-রচয়িতা এবং দক্ষ সুরকারেরও অভাব দেখা দিয়েছে। কারণ, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং দক্ষতার বড় অভাব। গ্রামবাংলার নড়বড়ে অর্থনৈতিক কাঠামোর জন্য তরুণ শিল্পী খুঁজে পাওয়াও দুষ্কর। একসময় তবুও গম্ভীরা শিল্পীদের মান ছিল। তেমন টাকাপয়সা না থাকলেও কোনরকমে ঠিক চলে যেত সংসার। ইদানীং এইসব শিল্পীদের ঘরে ঘরে দারিদ্র্যের মহামিছিল। ভিডিও সংস্কৃতি গ্রামবাংলায় ব্যাপকভাবে ঢুকে পড়ে এইসব লোকশিল্প ও শিল্পীদের রুজি-রুটির টান ধরিয়ে দিয়েছে। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, গম্ভীরা গানের প্রাণপুরুষ যোগেন্দ্র চৌধুরী নামী ও দক্ষ গম্ভীরা শিল্পী হয়েও আমৃত্যু দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে জেলার ঐতিহ্যময় লোকশিল্পকে বাঁচাতে গম্ভীরা গান করে গেছেন। অনেক সময় অসুস্থ অবস্থাতেও তাঁকে আসরে গান করতে দেখা গেছে। শুধু অর্থের অভাবে চিকিৎসা করাতে না পেরে তাঁকে নীরবে পৃথিবী ত্যাগ করতে হয়।

এখনো মালদহ জেলার বিভিন্ন গ্রামে গম্ভীরা গানের আসর বসে। এখনো প্রতিটি আসরে লোকসমাগমও হয় প্রচুর। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা—শিল্পীদের অর্থনৈতিক কাঠামো আজও নড়বড়ে। পশ্চিমবঙ্গের যেখানে যত মেলা-উৎসব হয় সেখানে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন শিল্পীদের সুযোগ দিলে মনে হয় গ্রামবাংলার লোকসংস্কৃতি আবার তার পুরনো ঐতিহ্য ফিরে পাবে। ❑

আকরগ্রন্থ

(১) আদ্যের গম্ভীরা—হরিদাস পালিত
(২) বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—আশুতোষ ভট্টাচার্য
(৩) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ
(৪) ভ্রমণে দর্শনে মালদহ—কমল বসাক
(৫) মালদহের গম্ভীরা—প্রদ্যোত ঘোষ
(৬) গম্ভীরা বিশেষ সংখ্যা—পুষ্পজিৎ রায় সম্পাদিত
(৭) বঙ্গীয় শব্দকোষ—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রহস্যময় মহাদেশ আণ্টার্কটিকা*

প্রিয়ব্রত কুণ্ডু

চলেছি আণ্টার্কটিকা—পৃথিবীর দক্ষিণতম মহাদেশ—এক স্বপ্নময় জগৎ। আজও কত প্রশ্ন, কত বিস্ময় জড়িয়ে আছে এই মহাদেশ জুড়ে। এক রহস্যময় জগৎ এই কুমেরু—নিজের চোখে না দেখলে কল্পনাও করা যেত না। ১৯৯৭ সালের ৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা। গোয়ার মার্মাগাঁও বন্দরের সঙ্গে শেষ বন্ধনটা বিচ্ছিন্ন করে নরওয়ের তৈরি বিশাল জাহাজ 'পোলার বার্ড' দুলে উঠল। সকলের মনে চাপা উত্তেজনা। বন্দরের ওপর অসংখ্য মানুষ হাত নেড়ে বিদায় জানালেন আমাদের—৫০ জন সদস্যের ১৭তম ভারতীয় কুমেরু অভিযাত্রী দলকে। ধীরে ধীরে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল মার্মাগাঁওয়ের আলোকমালা।



আণ্টার্কটিকা-গামী জাহাজ 'পোলার বার্ড'

পৃথিবীর বিবর্তনের ইতিহাস আজও অপরিবর্তিতভাবে ছড়িয়ে আছে বরফে ঢাকা এই মহাদেশের কোণায় কোণায়। সেই ইতিহাসের সন্ধানে চলেছেন ভূতত্ত্ব, জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূচুম্বক এবং আরো অনেক বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা। ভারতের মহাসাগর নিগমের (Dept. of Ocean Development) উদ্যোগে সংগঠিত এই অভিযানে ভারত সরকারের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থা এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহণ করেছে। বিশাল এই কর্মযজ্ঞে বিজ্ঞানীদের পাশে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ভারতীয় স্থলসেনার ১৫ জন সৈনিক। ৫০ জনের এই অভিযাত্রী দলে বাঙালির সংখ্যা ৭।

জল, জল আর জল! দীর্ঘ বাইশদিনের এই যাত্রায় সমুদ্রের কত বৈচিত্র্যময় রূপের দর্শন হলো। যাত্রা শুরুর ঠিক সাতদিন পর সবুজের রেখা দেখা গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের 'পোলার বার্ড' মরিশাসের পোর্টলুই বন্দরে নোঙর করল। ভারতীয় এবং ফরাসী সভ্যতার সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা এই ছোট্ট সুন্দর দ্বীপ-দেশ সমুদ্রযাত্রার ক্লান্তি অনেকটা দূর করে দেয়। এখানে আমাদের অভিযানের সঙ্গে তিনজন জার্মান বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করলেন। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন চারজন পাইলট ও দুটো হেলিকপ্টার। প্রসঙ্গত, প্রথম থেকেই জাহাজ পরিচালনায় আছেন নরওয়ে, পোল্যাণ্ড এবং ফিলিপিন্সের কয়েকজন মানুষ। যাইহোক, জাহাজের বিশাল ক্রেনটার সাহায্যে হেলিকপ্টার দুটো ছোট্ট খেলনার মতো উঠিয়ে নিয়ে জাহাজের খোলের ভিতর রেখে দেওয়া হলো। আবার আমরা পাড়ি দিলাম সেই বিস্ময়ের দেশের উদ্দেশে।

এতদিন জাহাজের পরিচালন-কক্ষের কথা ভাবলেই চোখের সামনে ভেসে উঠত একটা ছবি—দুধসাদা পোশাক এবং মাথায় সাদা টুপি পরে সদা সতর্ক চোখে জাহাজের ক্যাপ্টেন এক চক্রাকৃতি যন্ত্রকে একবার এদিক আরেকবার ওদিকে ঘোরাচ্ছেন। কিন্তু আজকের আধুনিকতার যুগে সে-ছবি সম্পূর্ণ ভিন্ন। উপগ্রহ যোগাযোগের মাধ্যমে আজ পৃথিবীর যেকোন অংশের অবস্থান নির্ণয় করা যায়। জাহাজ সম্পূর্ণ নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে সরলরেখা বরাবর এগিয়ে চলে গন্তব্যস্থলের অভিমুখে। তাই আজ জাহাজের পরিচালন-কক্ষে বসে ক্যাপ্টেনকে কম্পিউটার গেম খেলতে দেখলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। অবশ্য অন্য সব জাহাজের মতো বিপৎকালীন সব ব্যবস্থাই আছে এই 'পোলার বার্ড'-এ। চারটে লাইফবোট—প্রত্যেকটিতে ৬০ জন করে উঠতে পারে। চব্বিশ ঘণ্টা চলার মতো ইন্ধনও আছে এতে। সঙ্গে আছে প্রয়োজনীয় সঞ্চারব্যবস্থা এবং মাছধরার বঁড়শি।

* এই রচনাটি দুর্গাপদ ঘোষ প্রমুখ নিবেদিত 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

যেতে যেতে একদিন একইসঙ্গে এক ভয়ের এবং মজার কাণ্ড ঘটল। সেদিন আমরা সকলে যখন মধ্যাহ্ন-ভোজ করছিলাম, তখন হঠাৎ বেজে উঠল আপৎকালীন ঘণ্টা। সবাই ছুটে গেলাম নিজের নিজের কেবিনে। লাইফ-জ্যাকেট নিয়ে পূর্বনির্ধারিত লাইফবোটের পাশে আসতেই দেখি, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সুরেশকে কয়েকজন চেপে ধরে আছে। ছেলেটি এত বেশি আতঙ্কিত যে, আরেকটু হলেই সমুদ্রে ঝাঁপ দিত। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, জাহাজের একাংশে আগুন লেগেছে। যদিও আমরা দিগন্তবিস্তৃত জলরাশির মধ্য দিয়ে ভেসে চলেছি, তবুও আগুন যেকোন জাহাজের পক্ষেই ভয়ঙ্কর। প্রায় ২০ মিনিট পরে সেই আগুন নিভিয়ে জাহাজকে নিরাপদ ঘোষণা করা হলো।

একদিন জাহাজের খোলের মধ্যে আয়োজিত হলো ভলিবল, টেবিল টেনিস ও ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা। সকলের অদম্য উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্যে কখন যে আমরা দোদুল্যমান ৪০ ডিগ্রি (rolling 40s) দক্ষিণ অক্ষাংশ অতিক্রম করলাম, সেটা বুঝতেই পারিনি। উত্তাল সমুদ্রের বিশাল ঢেউয়ের ধাক্কায় সবাই একসময় নড়েচড়ে বসলাম।

ডিসেম্বরের শীতে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ ছেড়ে যখন দক্ষিণ গোলার্ধে প্রবেশ করলাম, তখন সেখানে গ্রীষ্মকাল। পৃথিবীর সূর্যপ্রদক্ষিণ তলের সঙ্গে দৈনিক গতির অক্ষরেখা ২৩½ ডিগ্রি কোণে অবস্থিত হওয়ায় এই ঋতুবৈষম্য। গ্রীষ্মের মরিশাস ছেড়ে আমরা যত দক্ষিণদিকে এগিয়ে চলি, তত সমুদ্র রূপ বদলাতে থাকে। ভারত মহাসাগরের উষ্ণ লবণাক্ত জল আণ্টার্কটিকা-সংলগ্ন দক্ষিণ মহাসাগরের হিমশীতল জলের সঙ্গে মিশে সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলে। বিশাল বিশাল ঢেউয়ের মাথায় আমাদের 'পোলার বার্ড' ছোট্ট ভেলার মতো দুলতে থাকে। জাহাজের ভিতর চলাফেরা তখন দুষ্কর হয়ে ওঠে। খেতে বসে প্রায়ই খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটে, খাবারের থালা আছড়ে পড়ে টেবিল থেকে। সে এক মজার অভিজ্ঞতা!

এই অবস্থায় জাহাজের ডেকে অথবা ব্যালকনিতে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক। তবু আমরা ক্যামেরা-হাতে চলে যাই এই দুর্গম যাত্রার একমাত্র সাথী অ্যালবাট্রস পাখির ছবি তুলতে। গত দু-তিনদিন ধরে জাহাজের সাথে সাথে উড়ে চলেছে এই পাখির দল। ক্লান্ত হলে তারা সমুদ্রের জলের ওপর বসে বিশ্রাম নেয়, তারপর আবার উড়ে চলা। উত্তাল সমুদ্রের সফেন ঢেউয়ের মাথা থেকে তারা খুঁজে নেয় শিকার। এই পাখির দলই যেন আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এল হিমশীতল মেরুদেশের দ্বারপ্রান্তে। হিমেল হাওয়ায় প্রবেশ করতেই কোথায় হারিয়ে গেল সেই অ্যালবাট্রসের দল।

সমুদ্র ধীরে ধীরে অনেক শান্ত হয়ে আসছে, বাড়ছে আমাদের পোশাকের আস্তরণ। তারই সাথে কমছে দিনের আলো। বাইরের সূর্যালোক দেখে মন মানে না, তবুও ঘড়ির কাঁটা ধরে রাতের খাওয়া সম্পন্ন করতে হয়। ইতিমধ্যে আমাদের স্থানীয় সময় ভারতীয় সময়ের থেকে সাড়ে চারঘণ্টা পিছিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ স্থানীয় সময় রাত দশটা মানে ভারতে এখন রাত আড়াইটে। তবু আমাদের চোখে ঘুম আসে না!

দেখতে দেখতে আণ্টার্কটিকা পরিবৃত্ত (Antarktic Circle), অর্থাৎ ৬৬½ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ আমরা অতিক্রম করে গেলাম। কয়েকদিন ধরে আবহাওয়া খারাপ থাকায় বাইরের দৃষ্টি বেশি দূর যাচ্ছিল না। সেই ঘন কুয়াশার মাঝে হঠাৎ চোখে পড়ল বিশাল আকৃতির একটা বস্তু জলে ভাসছে—ঠিক যেন শ্বেতপাথরের তৈরি এক মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। উঁচু উঁচু স্তম্ভগুলো এখনো খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। যত কাছে যাই, ততই অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। এই সেই বহু-আলোচিত দৃশ্যের প্রত্যক্ষরূপ—বিশালকায় এক হিমশৈল (iceberg)। চোখের সামনে টাইটানিকের ছবিটা ভেসে উঠতেই শিহরিত হয়ে উঠলাম।

জাহাজের গতি অনেক কমে গিয়েছে। হিমশৈলকে প্রায় এক কিলোমিটার দূর থেকে পাশ কাটিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। টাইটানিকের পুনরাবৃত্তি কেউ চায় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির সাহায্যে এখন অনেক নিরাপদে হিমশৈলকে এড়িয়ে যাওয়া যায়। র‍্যাডারের মাধ্যমে ক্যাপ্টেনের সামনের কাঁচের পর্দায় ফুটে ওঠে আশপাশের হিমশৈলের অবস্থান। মনুষ্য-দৃষ্টিতে ধরা না পড়লেও র‍্যাডারের দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়।



'প্যাক আইস' কেটে এগিয়ে চলেছে 'পোলার বার্ড'

যত এগিয়ে চলি, হিমশৈলের সংখ্যা তত বেড়ে চলে। কত বিচিত্র তাদের আকৃতি! সবচেয়ে বড় যে

হিমশৈলটিকে দেখলাম, সেটি প্রায় দেড় কিলোমিটার লম্বা হবে। জল এবং বাতাস কত নিপুণ হাতেই না এমন শিল্পের সৃষ্টি করেছে! কোনটাতে এক সুদীর্ঘ সুরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে, কোথাও আবার বিশাল বরফের প্রাচীর। হিমশৈলের সাথে সাথে শান্ত সমুদ্রে টুকরো টুকরো বরফের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। একেই বলে 'প্যাক আইস' (pack ice)। বিশেষভাবে তৈরি আমাদের এই জাহাজ প্যাক আইস ভেঙে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলে। প্যাক আইসের এক-একটা টুকরোর ছোট্ট ভেলায় ভেসে চলেছে দু-একটা পেঙ্গুইন।

ইতিমধ্যে এসে গেল নতুন বছর। মধ্যরাতের সূর্যালোককে সাক্ষী রেখে আমরা স্বাগত জানালাম ১৯৯৮ সালকে। জাহাজের গতি রুদ্ধ হলো ২ জানুয়ারি। সম্মুখে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ফার্স্ট আইসের (first ice) আস্তরণ। শীতকালে সমুদ্রের উপরিভাগ জমে সৃষ্টি হয় ১০-১৫ ফুট পুরু এই বরফের আস্তরণ। আমাদের 'আইসব্রেকার' জাহাজ আর তা ভাঙতে পারল না। অবশ্য গ্রীষ্মের তাপে এবং সমুদ্রজলের চাপে বিশাল এই বরফের আস্তরণ যেকোন সময় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে। ঠিক যেমনটা হয়েছিল ১৫তম অভিযানে—যখন কয়েকজন অভিযাত্রী পেঙ্গুইনের ফটো তুলতে ফার্স্ট আইসে নামে। শেষে তাদের ক্রেনের সাহায্যে উদ্ধার করতে হয়।



'ফার্স্ট আইস'-এর ওপর অভিযাত্রী দলের সদস্যরা ক্রেনের সাহায্যে নামছেন

আমাদের জাহাজ ফার্স্ট আইসের কিনারায় লাগতেই দূর থেকে অসংখ্য কালো কালো বিন্দু ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল। কাছে আসতে দেখা গেল একদল অ্যাডেলি পেঙ্গুইন। মনুষ্যকৃত বিশাল লাল-সাদা জাহাজটিকে তারা দেখতে আসছে। কেউ কেউ দুলকি চালে চলতে চলতে পিছিয়ে পড়ছে, তাই অধৈর্য হয়ে ফার্স্ট আইসের মসৃণ তলে বুক ঘষে দ্রুত দলের অন্য সদস্যদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। কাছে এসে তারা ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাদের দেখল। তারপর ফার্স্ট আইসের কিনারায় গিয়ে দলনেতা বিপদের সম্ভাবনার কথা ভেবে লাফিয়ে পড়ল জলে এবং তার পিছন পিছন সারিবদ্ধভাবে সম্পূর্ণ দলটা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। অনেক দূরে একটা সীলমাছকে নির্বিকারভাবে রোদ পোহাতে দেখলাম। সামনে দিয়ে পেঙ্গুইনের দল চলে গেলেও তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই—যেন তার খাদ্যে রুচি নেই! আসলে শ্লথগতির এই জীবটি বুকে হেঁটে কখনোই পেঙ্গুইনের নাগাল পাবে না, কিন্তু জলের ভিতর বিশালাকায় শরীর নিয়েও তীব্রগতিতে তারা পেঙ্গুইন শিকার করে।

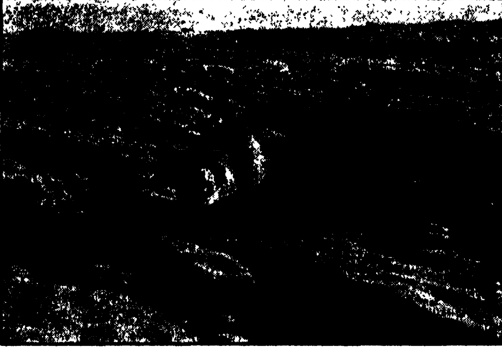


অবশেষে পেঙ্গুইনদের দেশে

সূর্যালোকেই রাতের খাবার খেয়ে একটু শোয়ার চেষ্টা করছি, এমন সময় আমাদের সহযাত্রী শান্তনু এসে আমায় জানাল, একদল পেঙ্গুইন জাহাজের খুব কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছে। সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা নিয়ে ছুটলাম। বাইরে এসে দেখি, জাহাজের তিনজন নাবিক একটা মই লাগিয়ে বিপজ্জনকভাবে ফার্স্ট আইসে নেমে ফটো তুলছে। হঠাৎ সব বাধানিষেধ ভুলে আমরা দুজন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলাম। ইতিমধ্যে পেঙ্গুইনের দল আরো অনেক দূর চলে গেছে, তবে কাছেপিঠে একটা সীল শুয়ে আছে। ঝুঁকির কথা মনে রেখেও সুযোগটা ছাড়তে পারলাম না। এগিয়ে চললাম আমি আর শান্তনু। বেশ কয়েক জায়গায় ফার্স্ট আইসে ফাটল দেখা যাচ্ছে। খুব সাবধানে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম সীলের পাশে। দু-একটা ছবি তুলতেই তার মেজাজ গেল বিগড়ে, অদ্ভুত শব্দ করে তেড়ে এল। তাকে আর বিরক্ত না করে আমরা গেলাম পেঙ্গুইনের দিকে। আমাদের দেখে তারা মাঝ-রাতের ঝিমুনি ছেড়ে নড়েচড়ে বসল। তারাও অবাক চোখে দেখতে লাগল দুপায়ের এই অদ্ভুত জীব-দুটিকে। পিছন ফিরে দেখি, আমরা অনেক দূর চলে এসেছি। সাদা বরফের চাদরের মাঝে ভেসে থাকা বিশালাকৃতির হিমশৈলের পাশে আমাদের জাহাজটা একটা ছোট্ট খেলনা

মনে হচ্ছে। মধ্যরাতের দক্ষিণ দিগন্ত থেকে উঁকি দেওয়া সূর্যের আলোয় আমাদের নিজেদের ছায়ার দৈর্ঘ্য দেখে অবাক হয়ে যাই।

পরদিন কথাটা আর চাপা থাকল না। অপরাধ করেছি ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিয়ে। সত্যিই আজ সেই বিশাল বরফের চাদর ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। তার ওপর এখনো আমাদের পায়ের ছাপ দেখে শিউরে উঠি।



ছবি তুলতে দেখে তেড়ে এল সীল

৩ জানুয়ারি সৌজন্যমূলক উড়ানে দুটো হেলিকপ্টারে আমাদের দলনেতা এবং অন্যান্য আরো পাঁচজন সদস্যের সঙ্গে আমিও পাড়ি দিলাম ভারতীয় স্টেশনের উদ্দেশে। আকাশে উড়তেই আমাদের জাহাজ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে হতে সাদা কাগজের ওপর ছোট্ট এক বিন্দুর মতো কোথায় হারিয়ে গেল! কিছুক্ষণ পর মনে হলো, আমরা বোধ হয় একই জায়গায় শূন্যে ভাসছি। আসলে দিগন্ত-বিস্তৃত এই সাদা বরফের মাঝে দিঙ্‌নির্ণয় করা খুবই কঠিন। আমার ভুল ভাঙল হেলিকপ্টারের Global Positioning Sattelite reading বা GPS দেখে। দূরে একটা কালো রেখা ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসছে দেখলাম। তখন ভাবতে পারিনি, সেই রেখাই প্রায় ৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ শির্মাকার পর্বতমালা। তারই কোণায় কোণায় রয়েছে অসংখ্য হ্রদ। আমাদের হেলিকপ্টার শির্মাকারের ওপর আসতেই 'U' আকৃতির ভারতীয় স্টেশনটা চিনতে অসুবিধা হলো না। তারই সামনে বিশালাকৃতির 'প্রিয়দর্শিনী' হ্রদ।

গত বছর ১৬তম অভিযানে আসা যে ২৬ জন ভারতীয় এতদিন আন্টার্কটিকায় ভারতের পতাকা তুলে ধরেছিলেন, আজ তাঁদের ঘরে ফেরার ডাক এসেছে। অধীর আগ্রহে তাঁরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের দেখে দীর্ঘদিন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এই মানুষগুলি আমাদের আবেগে জড়িয়ে ধরলেন। ভারতীয় তেরঙ্গা পতাকার আদলে অঙ্কিত 'মৈত্রী' স্টেশনে পা রাখতে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি হলো। পৃথিবীর মাত্র ১৩টি দেশের স্থায়ী স্টেশন আছে এই আন্টার্কটিকায়। বিশ্বমৈত্রীর স্তবগায়ক ভারতবর্ষের 'মৈত্রী' তাদের মধ্যে অন্যতম।

প্রতি বছরের মতো এবারও আমাদের অভিযানে আছে দুটি দল—একদল গ্রীষ্মের, যাদের এক অর্থে বলা যায় 'বসন্তের কোকিল', আরেকদল শীতের। গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ দিবালোকে আন্টার্কটিকার কোণায় কোণায় অনুসন্ধান করা অনেক সহজ। তাই বিজ্ঞানীদের মুখ্য অংশটা আসেন শুধু গ্রীষ্মকালে। অর্থাৎ তাঁরা জাহাজে এসে দুমাস আন্টার্কটিকায় নিজের নিজের ক্ষেত্রে গবেষণা করে আবার সেই জাহাজেই ফিরে যান। দলের দ্বিতীয় অংশ রয়ে যায় ঘন অন্ধকার দিনের অপেক্ষায়। কোন কোন ক্ষেত্রে চাই নিরবচ্ছিন্ন তথ্যসংগ্রহ। সেক্ষেত্রে অনেক বিশেষজ্ঞ আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গ ছেড়ে জীবনের দেড়খানা বছর উৎসর্গ করে দেন বিজ্ঞানসাধনায়। সর্বোপরি আমাদের সৈনিক ভাইরা সদা ব্যস্ত থাকেন স্টেশনের রক্ষণাবেক্ষণে।

'মৈত্রী' সম্পূর্ণ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। সামনের প্রিয়দর্শিনী হ্রদের জল গরম করে নলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করে বিকিরণ পদ্ধতিতে উষ্ণ রাখা হয় আমাদের স্টেশন। সবুজহীন আন্টার্কটিকায় কিছুটা সবুজ দেখার প্রচেষ্টা চলেছে 'গ্রীণ হাউস'-এ। স্টেশনের ভিতর ২৬ জনের বসবাসযোগ্য ঘর ছাড়াও আছে বেশ বড় একটা ডাইনিং-কাম-ড্রয়িং রুম। রান্নাঘরে আছে সবরকমের আধুনিক সুবিধা। ইন্দো টিবেটিয়ান বর্ডার পুলিসের ভট্টাচার্যদা নিজের হাতে রান্না করে আমাদের খাওয়ালেন। দীর্ঘদিনের পুরনো কাঁচা সবজি হিমঘর থেকে নিয়ে এসে চট্‌পট্ তৈরি করে ফেললেন নানান খাবার—মাছ, মাংস, আইসক্রীম, আরো কত কী! দীর্ঘদিন হিমঘরে থাকায় স্বাভাবিকভাবেই সেগুলির স্বাদ একটু বদলে গিয়েছে। টাটকা সবজির অভাবে ভিটামিনের পরিপূরণ করতে হয় খাবার টেবিলে রাখা বিভিন্ন ভিটামিন ট্যাবলেটে।

অবশ্য ফিল্ড ক্যাম্পগুলির চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে রান্না করার জন্য কেউ থাকে না। তাছাড়া রান্না করার সময় বা সুযোগ কোথায়! তাঁবুর বাইরে থেকে তুলে আনা বরফ গলিয়ে জল করতে অনেকটা সময় চলে যায়। সেই জলে প্যাকেটে ভরা তৈরি খাবার ফুটিয়ে খেয়ে নেওয়া হয়। আজকের ফাস্ট ফুডের যুগে ব্যাপারটি অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। ফিল্ড ওয়ার্কের পর তাঁবুতে ফিরে স্লিপিং ব্যাগের ভিতর ঢুকে গরম টম্যাটো সুপ মুখে দিলেই সারাদিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। [ক্রমশ]

যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন

ভারতবর্ষ তথা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি সর্বত্র মানুষের মধ্যে একটি দুর্বিষহ অস্থিরতা, নিরাপত্তাবোধের অভাব এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা চোখে পড়ছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক ও ভোগবিলাসের ক্রমবর্ধমান প্রসারে নানান রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বাঙালী যুবগোষ্ঠী আজ দিশাহারা। বিবেকানন্দ-বর্তিকাই আজ তাদের ধ্রুবতারা, একথা ক্রমশ দিবালোকের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। অনেকের মনে নানান প্রশ্ন সময়ে সময়ে ওঠে, যার উত্তর তারা খুঁজে পায় না। প্রশ্নগুলি মূলত মূল্যবোধ এবং আদর্শভিত্তিক। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রবীণ সন্ন্যাসীদের কেউ কেউ ঐসব প্রশ্নের উত্তর দিতে অনুগ্রহ করে সম্মতি জানিয়েছেন। তাই 'যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন' শীর্ষক একটি বিভাগ খোলা হলো। আনন্দের বিষয়, এই বিভাগে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যতম সহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।—সম্পাদক

ঃ নিয়মাবলী ঃ

'যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন' বিভাগে প্রেরিত (ক) প্রশ্নগুলি সুনির্দিষ্ট হওয়া চাই। (খ) প্রেরকের পুরো নাম, ঠিকানা ও জন্মতারিখ উল্লেখ থাকা চাই। (গ) প্রেরকের বয়স অনূর্ধ্ব ৩০ হওয়া চাই। (ঘ) সব প্রশ্নই গ্রাহ্য হবে—এমন বলা যায় না। অনেক সময়ে এমন হতে পারে, একটি প্রশ্নের মধ্যে অন্যগুলির উত্তর সন্নিবেশিত হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে প্রশ্নপ্রেরকের মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ নেই। কারণ, প্রশ্নকর্তা প্রশ্নের উত্তর পেলেই তৃপ্ত হবেন, নিশ্চয়ই। তাঁর নাম প্রকাশিত হলো কি হলো না সে-ব্যাপারটি নিতান্তই গৌণ থাকুক, এই আবেদন জানিয়ে রাখি।—সম্পাদক

প্রশ্ন ঃ *পুরাণে দশাবতারের যে তালিকা রয়েছে, তাতে শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লেখ নেই; কিন্তু আমরা তাঁকে 'যুগাবতার' বলি কেন?*

—জগৎজ্যোতি ব্যানার্জী, কালিম্পং

উত্তর ঃ শ্রীভগবান মানুষের কল্যাণে অবতাররূপে মানবদেহ ধারণ করে আসেন। স্বামীজী তাঁর 'ভক্তিযোগ' বক্তৃতায় বলেছেন যে, ঈশ্বরের অবতারগণ কেবলমাত্র ইচ্ছার দ্বারা ভগবদ্ভাবের সঞ্চার করতে পারেন। তাঁদের ইচ্ছায় অতি দুশ্চরিত্রও মুহূর্তের মধ্যে সাধু হয়ে যান। অবতারগণ ভগবানের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। তাঁদের ভিতর দিয়ে ব্যতীত অন্য উপায়ে ভগবানকে দেখতে পারি না। মানুষ তাঁদের উপাসনা না করে থাকতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন অনুধ্যান করলে স্বামীজীর কথার সত্যতাই প্রমাণিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বামীজী শুধু 'অবতার' বলেননি, 'অবতারবরিষ্ঠ' বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এযুগের অবতার—তাই যুগাবতার। যুগের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার কিনা তা প্রমাণের জন্য দক্ষিণেশ্বরে মথুরবাবু পণ্ডিতদের বিচারসভা বসিয়েছিলেন। তখনকার দিনের বিখ্যাত পণ্ডিত পদ্মলোচন, গৌরী পণ্ডিত প্রমুখেরা শ্রীরামকৃষ্ণের সব লক্ষণ দেখে 'অবতার' বলে ঘোষণা করেছিলেন। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ বিরচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এর গুরুভাব-উত্তরার্ধে এর বর্ণনা আছে।

আবার 'ভাগবত'-এ মাত্র দশজন অবতারের কথা বলা থাকলেও 'অবতারা হি অসংখ্যেয়াঃ' বলেও উল্লেখ আছে। সুতরাং দশাবতার ব্যতীত অবতারের সংখ্যা আরো অনেক। গুণাবতার, শেষাবতার, যুগাবতার প্রভৃতির ব্যাখ্যা সুন্দরভাবে আছে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে 'যুগাবতার' প্রমাণ করার জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ অবতার-প্রসঙ্গের যে যুক্তি দিয়েছেন তা শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

প্রশ্ন ঃ *(১) মনের পরিশুদ্ধি কিভাবে সম্ভব? (২) দীক্ষা নেওয়ার তাৎপর্য কি? এর কিরূপ উপকারিতা আছে? দীক্ষা নিয়ে সঠিকভাবে পালন না করলে কি দোষ হবে?*

—সুগত দাস, টাকি

উত্তর ঃ (১) হিংসা, দ্বেষ ও ঘৃণা মনে স্থান না দেওয়া এবং কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচর্য পালন ও সত্যপথে থাকলে মন পরিশুদ্ধ হয়।

(২) গুরু ঈশ্বরলাভের পথ দেখিয়ে দেন। তিনি ঘটকের কাজ করেন। তিনি ভক্তকে ভগবানের সঙ্গে মিলিয়ে দেন। গুরু পথপ্রদর্শক—যেমন শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু। ঈশ্বরলাভের উদ্দেশে গুরু-প্রদর্শিত সাধন নিয়মিত অনুশীলন করতে ব্রতী হওয়াকে দীক্ষা নেওয়া বলে।

ভারতীয় জীবনের মূল সুর ঈশ্বরকেন্দ্রিক হওয়া। মানুষকে শ্রেয়োলাভ করতে, মোক্ষলাভ করতে হবে। দীক্ষা সেই মোক্ষলাভের পথ।

দীক্ষা নিয়ে সঠিকভাবে পালন না করলে ক্ষতি হওয়া স্বাভাবিক। যেমন কোন অমূল্য রত্নের ব্যবহার না করে ফেলে রাখা।

প্রশ্ন ঃ *স্বামীজী নারীজাগরণের প্রসঙ্গে তাদের শিক্ষার ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনে নারীশিক্ষার কোন সুবন্দোবস্ত নেই। মেয়েদের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত কোন স্কুল-কলেজ নেই। আমি কখনোই মিশনের স্কুলগুলিকে কো-এড করার কথা বলছি না। কিন্তু শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য আবাসিক স্কুল কি করা যায় না? কলেজ হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু সন্ন্যাসীরা কি মেয়েদের স্কুল বা ছাত্রীনিবাস দেখাশোনা করতে পারবেন না? এটা কি দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া নয়?*

—শান্তনু প্রামাণিক, মহিষাদল

উত্তর ঃ রামকৃষ্ণ মিশনে নারীশিক্ষার কোন সুবন্দোবস্ত নেই—একেবারে ভুল কথা। যারা জানে না, তারা একথা বলে।

রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাকার্য আরম্ভ হয়েছিল নারীশিক্ষা দিয়েই। স্বামীজী নিবেদিতাকে দিয়ে বাগবাজারের বোসপাড়া লেনে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় শুরু করিয়েছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে স্বয়ং শ্রীমা সারদাদেবী এই বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেছিলেন ১৮৯৮ সালের ১৩ নভেম্বর। নিবেদিতার মৃত্যুর পর বিদ্যালয়ের নামকরণ হয় 'সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল'। পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ সারদা মিশন প্রতিষ্ঠিত হলে স্কুলটিকে হস্তান্তর করে দেন রামকৃষ্ণ মিশন।

ভারতে বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশনের ৯৮,৪০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ৩২,৮৬১ জন। ছাত্রীরা মিশনের প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। মেয়েদের জন্য স্কুল আছে চেন্নাই মঠে, চেন্নাইয়ের ত্যাগরাজনগরে সারদা বিদ্যালয়ে, তামিলনাড়ুর চেঙ্গালপুটে ও পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সরিষাতে। এর মধ্যে সরিষাতে বালিকা বিদ্যালয় আবাসিক। ত্যাগরাজনগরে সারদা বিদ্যালয়ে দুটি ছাত্রীনিবাস আছে। বাকি স্কুলগুলিতে কো-এডুকেশন আছে—জামশেদপুর (ঝাড়খণ্ড), চেরাপুঞ্জি (মেঘালয়), আলং (অরুণাচল প্রদেশ), কালাডি ও কালিকট (কেরালা), খেতড়ি (রাজস্থান), বিশাখাপত্তনম (অন্ধ্রপ্রদেশ), ভুবনেশ্বর (ওড়িশা), কামারপুকুর, জয়রামবাটী, মনসাদ্বীপ, টাকি এবং মালদা (পশ্চিমবঙ্গ)। নার্সেস ট্রেনিং সেণ্টার আছে—সেবাপ্রতিষ্ঠান (পশ্চিমবঙ্গ), বৃন্দাবন ও লখনৌ (উত্তরপ্রদেশ), ত্রিবান্দ্রাম (কেরালা) এবং ইটানগরে (অরুণাচল প্রদেশ)। গোলপার্কে ইনস্টিটিউট অফ কালচার ও হায়দ্রাবাদ মঠে ভাষাশিক্ষা-কেন্দ্রে মেয়েরা পড়ে। সুতরাং তোমার কথা একেবারেই ঠিক নয়—রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রীনিবাসও আছে, স্কুলও আছে।

স্বামীজী চেয়েছিলেন, শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে নারীজাগরণ হবে। এজন্য তিনি মেয়েদের মঠের পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯৫৪ সালে শ্রীমা সারদাদেবীর জন্মশতবার্ষিকীতে মেয়েদের জন্য শ্রীসারদা মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সম্পূর্ণভাবে মেয়েরা পরিচালনা করে এবং রামকৃষ্ণ মিশন থেকে একেবারে আলাদা। শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের অধীনে শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য স্কুল-কলেজ রয়েছে।

সুতরাং রামকৃষ্ণ মিশন দায়িত্ব না এড়িয়ে সুষ্ঠুভাবে নারীজাগরণের কাজ করছে।

প্রশ্ন ঃ *(১) ধর্মাচরণ এবং পূজা নিশ্চয় এক জিনিস নয়। ধর্মাচরণ মানব-মন ও চরিত্রের বিশুদ্ধিকরণ এবং পূজা হয়তো শ্রদ্ধার নৈবেদ্যে আত্মনিবেদন। তথাপি আমার মনে হয়, পূজাও যেকোন মানুষের অন্তর্লীন এবং অত্যন্ত নিজস্ব এক আত্মিক অনুশীলন। যেকোন প্রকার মূর্তি বা প্রতীকের পূজাই আমার কাছে প্রতীকী বলে মনে হয়। এবিষয়ে স্বামীজীর চিন্তাধারা কি ছিল? দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যয়বাহুল্যের কোন যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। ধর্মানুষ্ঠানের এই ব্যয়বাহুল্য প্রকৃতই আমাকে পীড়িত করে; কারণ ধর্ম হলো অনুশীলন, নিছক অনুষ্ঠানমাত্র নয়। (২) সকল স্বার্থসুখ বিসর্জন দিয়ে মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করা অধিকাংশের পক্ষেই দুঃসাধ্য। তবু জানতে ইচ্ছা হয়, এক সাধারণ ছাত্র বা ছাত্রী ও এক সাধারণ নাগরিকের প্রতি স্বামীজীর অবশ্যপালনীয় নির্দেশ কী?*

—জয়িতা সাহা, বেলেঘাটা, কলকাতা

উত্তর ঃ (১) স্বামীজী তাঁর 'ভক্তিযোগ' বক্তৃতায় এবিষয়ে খুব ভালভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ প্রতীক হলো—যেসকল বস্তু ব্রহ্মের পরিবর্তে উপাসনার যোগ্য। প্রতীক শব্দের অর্থ—বাইরের দিকে যাওয়া, আর প্রতীকোপাসনা-অর্থে ব্রহ্মের পরিবর্তে এমন এক বস্তুর উপাসনা, যা একাংশে অথবা অনেকাংশে ব্রহ্মের খুব সন্নিহিত, কিন্তু ব্রহ্ম নয়। শ্রুতিতে বর্ণিত প্রতীকের ন্যায় পুরাণ এবং তন্ত্রেও বহু প্রতীকের বর্ণনা আছে। সমুদয় পিতৃ-উপাসনা ও দেবোপাসনাকে এই প্রতীকোপাসনার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।... যেখানে ব্রহ্মই উপাস্য, আর প্রতীক কেবল এর প্রতিনিধিস্বরূপ অথবা তার উদ্দীপক কারণমাত্র অর্থাৎ যেখানে প্রতীকের সহায়তায় সর্বব্যাপী ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়, প্রতীককে প্রতীকমাত্র না দেখে জগৎকারণরূপে চিন্তা করা হয়, সেখানে এরূপ উপাসনা বিশেষ উপকারী। শুধু তাই নয়, ধর্মজীবনে নবাগতদের পক্ষে তা একেবারে অনিবার্যরূপে প্রয়োজনীয়।

অতি প্রাচীনকাল থেকে সব দেশের সব ধর্মের ভক্তেরা ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে আনন্দ-অনুষ্ঠান করে থাকেন। যে-কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে ভক্তেরা ঈশ্বরের পূজা করেন, ভক্তি নিবেদন করেন—সেই কয়েকটি দিনে আনন্দ-অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংসার-চাপ থেকে ক্ষণিকের জন্য হলেও মুক্তি পান ভক্তেরা। এসব অনুষ্ঠানে ভক্তেরা যেমন অংশগ্রহণ করেন, তেমনি সাধারণ মানুষেরাও যোগদান করেন। এজন্য আনন্দ-অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে। এসব অনুষ্ঠানের জন্যই ভক্তেরা অর্থ দেন। এতে ব্যয়বাহুল্যের কোন প্রশ্ন আসে না। এছাড়া, আনন্দ-অনুষ্ঠানের সামাজিক দিকও আছে। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রচার হয়, বিভিন্ন লোকের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা হয়, সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হয়, নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা তাদের নিজের সংস্কৃতিকে জানতে পারে। যারা পড়াশুনা করতে পারে না, যারা কিছু জানে না—তারা বক্তৃতা, গান, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী-উপদেশ জানতে পারে।

(২) মোটেই দুঃসাধ্য নয়। সবাইকে যে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে—এমন কোন কথা নেই। কেউ হলে—খুব ভাল কথা। না হলে সংসারে থেকে যথাসাধ্য নিঃস্বার্থপর হয়ে শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করা খুবই সম্ভব। বহু লোক ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে এসব করে থাকেন। তুমি পারবে না কেন?

স্বামীজীর বাণী—'অভীঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নিঃস্বার্থভাবে দেশকে ভালবাস, নিঃস্বার্থভাবে দেশবাসীর সেবা কর। ❑

শিল্পবস্তু সংরক্ষণ প্রসঙ্গে কিছু কথা

দিলীপকুমার রায়

সুন্দর এই পৃথিবীর যেদিকেই তাকাই না কেন, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম নানা বৈচিত্র্যময়, দৃষ্টিনন্দন, চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষামূলক শিল্পবস্তু নজরে পড়ে। সভ্যতার আদি পর্ব থেকেই বিভিন্ন শিল্পবস্তু সংগ্রহ করার এক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এই সংগ্রহের আগ্রহ শিশু থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক পর্যন্ত সকলের মধ্যেই আছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সখ, রুচি বা জ্ঞানপিপাসা মেটাবার জন্য বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির বস্তু সংগ্রহ করে সযত্নে তা সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করে। ছোটরা আনন্দ পায় বিভিন্ন বর্ণময় পাখির পালক, ছোট-বড় নানা আকৃতির ঝিনুক, শামুক, শঙ্খ, দেশ-বিদেশের ডাকটিকিট, পিক্‌চার পোস্টকার্ড, পুতুল, খেলনা ইত্যাদি সংগ্রহ করে। বয়স্করা সংগ্রহ করেন কাঠ, কাগজ, শোলা, পাথর, পোড়ামাটি, গাছ-পাতা, সোনা-রুপো, তুলো-রেশম, অস্থি-চামড়া ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত বিভিন্ন শিল্পবস্তু। ব্যক্তিগত আগ্রহের পাশাপাশি শিল্পবস্তু সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যাপারে সামাজিক আগ্রহও যথেষ্ট বিদ্যমান। এই আগ্রহের ফলে বর্তমানে সারা বিশ্বে দেখতে পাই নানা বিষয়-ভিত্তিক ছোট-বড় অগণিত সংগ্রহশালা। এইসকল সংগ্রহালয় মানব সভ্যতার অগ্রগতির নিদর্শন, জ্ঞানের ভাণ্ডার বা ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে স্পষ্ট প্রতীয়মান। আধুনিক যুগে সংগ্রহালয়কে এক বিশেষ ধরনের শিক্ষা-মন্দির হিসাবে গণ্য করা হয়। এইসকল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-মন্দিরে প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষ এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে নিজ নিজ রুচি ও আগ্রহ অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারেন।

বিভিন্ন প্রকার শিল্পবস্তু সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির উপযুক্ত সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী। সংগ্রাহকের সেই সম্বন্ধে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা না থাকলে কালের কুটিল প্রভাবে শিল্পবস্তুগুলি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাবে। বর্তমান যুগে প্রদর্শনশালা সংক্রান্ত বিদ্যা (Museology) একটি বহুমুখী জ্ঞানচর্চার বিষয়। এই নাতিদীর্ঘ নিবন্ধে বিভিন্ন শিল্পবস্তুর ক্ষয়ক্ষতি নিবারণ ও সংরক্ষণের বিজ্ঞানসম্মত অতি সাধারণ পদ্ধতিসমূহ সংক্ষেপে আলোচিত হলো, যা সংরক্ষণবিদ্যার প্রথম পাঠ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। সংগ্রহকারী সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সামান্য চেষ্টা ও অর্থব্যয় দ্বারা নিখুঁতভাবে এই কার্য সম্পন্ন করতে পারেন।

সংগ্রহকারীকে প্রথমেই জানতে হবে কি কি কারণে শিল্পবস্তুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। বিবিধ কারণগুলির মিথক্রিয়া বা রাসায়নিক বিক্রিয়াই অবক্ষয়ের জন্য দায়ী। সেইজন্য প্রতিটি শিল্পবস্তুর ভৌত ও রাসায়নিক প্রকৃতি এবং অবক্ষয়ের কারণগুলি (factors) সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। গঠন-প্রকৃতি অনুসারে সকল শিল্পবস্তু জৈব বা অজৈব পদার্থ দ্বারা গঠিত। অজৈব পদার্থ দ্বারা নির্মিত শিল্পবস্তু অপেক্ষা জৈব পদার্থ দ্বারা নির্মিত শিল্পবস্তু সংরক্ষণের প্রয়োজন অনেক বেশি। তাই বলে অজৈব শিল্পবস্তু অবক্ষয় থেকে নিরাপদ—এমন ভাবার কোন কারণ নেই। কালের প্রবাহে এইসকল বস্তুও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু খুবই ধীর গতিতে।

এই কারণে সংগ্রহকারী বা সংগ্রহশালার তত্ত্বাবধায়ককে (curator) সর্বদা শিল্পবস্তুর পারিপার্শ্বিক জলবায়ু ও পরিবেশের ওপর নজর রাখতে হয়। মুক্ত পরিবেশে প্রখর সূর্যালোকে, প্রচণ্ড উত্তাপ, ধুলো-ময়লা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি, কুয়াশা, তুষার ইত্যাদি শিল্পবস্তুর পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকারক। গৃহকোণে, শোকেসে বা আলমারির মধ্যে রাখলেই শিল্পবস্তু সুরক্ষিত ও নিরাপদে থাকবে—এমন ভাবার কোন যুক্তি নেই। এমন কিছু দৃশ্য ও অদৃশ্য নিমিত্ত (agents) আছে, যারা দিবারাত্র অতি ধীরে সুরক্ষিত স্থানেও শিল্পসামগ্রীর ক্ষতিসাধন করতে পারে। এইসকল নিমিত্তগুলির কিছু প্রাকৃতিক এবং কিছু মনুষ্য-সৃষ্ট। প্রাকৃতিক কারণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পরিবেশ অর্থাৎ জলবায়ু, আলো, বাতাস, উত্তাপ, বিভিন্ন প্রকারের কীট-পতঙ্গ, জীব-জন্তু, শৈবাল-ছত্রাক ও বায়ুমণ্ডলের দূষণ। মনুষ্য-সৃষ্ট নিমিত্তগুলির মধ্যে প্রধান—সংগ্রহকারী নিজেই। মানুষের অজ্ঞতা, অবহেলা, অনিপুণ হাতে নাড়াচাড়া করা এবং সুষ্ঠু নিরাপত্তার অভাবে শিল্প-বস্তুর অপূরণীয় ক্ষতি হয়। এছাড়াও যেসকল পদার্থ দ্বারা শিল্পবস্তু নির্মিত হয়, তার মধ্যে নানা ত্রুটি থাকার ফলেও ক্ষতি হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে পাথরের ভিতর ক্ষতিকারক লবণের উপস্থিতি বা কাগজের মধ্যে বিভিন্ন অম্লঘটিত পদার্থের উপস্থিতি। সুতরাং সুষ্ঠু সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষককে জানতে হবে শিল্পবস্তুর প্রকৃতি ও ক্ষয়ক্ষতির কারণগুলি।

বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা জানা গিয়েছে, শিল্পবস্তু যে-স্থানে সুরক্ষিত থাকে বা প্রদর্শিত হয়, তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও জলবায়ু শিল্পবস্তুর ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। জলবায়ুর প্রধান দুটি উপাদান হচ্ছে উত্তাপ ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা। এই দুই উপাদানের তারতম্যের ফলে ধাতু ও পাথর-নির্মিত শিল্পবস্তুও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কাঠ, কাগজ, চামড়া প্রভৃতি জৈব পদার্থ

দ্বারা নির্মিত শিল্পবস্তু অধিক আর্দ্রতার প্রভাবে নিজস্ব দৃঢ়তা হারায় বা নষ্ট হয়ে যায়। অপরপক্ষে তালপাতার পুঁথি প্রচণ্ড শুষ্ক আবহাওয়ায় ভঙ্গুর বা পলকা হয়ে যায়। উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা বা স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ বিভিন্ন ধরনের পোকা-মাকড় ও ছত্রাক-জাতীয় আণুবীক্ষণিক জীবাণুদের দ্রুত বংশবিস্তারে সহায়তা করে। আর্দ্রতার সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাব পড়ে জৈব পদার্থ-নির্মিত কোষযুক্ত ও তন্তুময় বস্তুর ওপর, কারণ এইসব শিল্পবস্তু খুবই জলাকর্ষী। ফলে বিভিন্ন ঋতুতে আর্দ্রতার হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য শিল্পবস্তু সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। আবার আবহাওয়ার তারতম্যহেতু আসঞ্জনশীল (adhesive) পদার্থের মধ্যেও পরিবর্তন দেখা যায়। উষ্ণ অথচ আর্দ্র পরিবেশে শিল্পবস্তুর উপাদানসমূহ সহজেই পরস্পর পৃথক হয়ে যায়, কিন্তু অত্যধিক উষ্ণ-শুষ্ক আবহাওয়ায় সেইসব বস্তু ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। অতএব সংগ্রহালয়ের আপেক্ষিক আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। ছোট-বড় সকল প্রকার গ্রন্থাগার ও সংগ্রহালয়ে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সাধারণত ৪৫ থেকে ৬০ শতাংশ এবং উষ্ণতা ৬৮ ডিগ্রি থেকে ৭৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ২০ ডিগ্রি থেকে ২৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে স্থিতিশীল রাখার জন্য সুপারিশ করা হয়।

আপেক্ষিক আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রিত রাখার সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় সংগ্রহালয়কে সম্পূর্ণভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করা; কিন্তু এতে কিছু বিপত্তি আছে। প্রথমত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ-যন্ত্রটি দিবারাত্র চালু রাখতে হবে, নচেৎ বিভিন্ন ঋতুতে দিবা ও রাত্রির উষ্ণতা ও আর্দ্রতার যে তারতম্য ঘটে, তাতে শিল্পবস্তুর ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা থাকে। দ্বিতীয়ত, পরিবেশ দূষণের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য electrostatic filtration ব্যবহার করার ফলে যে ওজোন গ্যাস নির্গত হয়, তা শিল্পবস্তুর পক্ষে বেশ ক্ষতিকারক। তৃতীয়ত, সংগ্রহশালা সম্পূর্ণভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করা অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ। এইসকল কারণে দুই-একটি বিশেষ কক্ষ অথবা একাধিক শোকেস আপেক্ষিক আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণে অনেক সুবিধাজনক। আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য সিলিকা জেল, কলিচুন বা পেঁজাতুলো শোকেসের ভিতর আড়ালে রাখা বিধেয়। গ্রীষ্মকালে টবের গাছ, খসখসের পর্দা বা ভিজা খড় ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব না হলেও মাঝারি বা বৃহৎ সংগ্রহশালা নির্মাণের আগে স্থাপত্যশিল্প-বিশারদের পরামর্শ নেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।

বিভিন্ন প্রকারের কীট-পতঙ্গ জৈব শিল্পবস্তুর বিশেষ ক্ষতিকারক শত্রু। এরা শুধু যে শিল্পবস্তুর ক্ষতিসাধন করে তাই নয়, প্রয়োজনে ঐসকল বস্তুকে খাদ্য হিসাবেও গ্রহণ করে। দিনের বেলায় এরা অন্ধকার, অপরিচ্ছন্ন স্যাঁতস্যাঁতে স্থানে লুকিয়ে থাকে এবং রাত্রিবেলা শিল্পবস্তুর ক্ষতিসাধন করে। এদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন পোকা-নিরোধক বস্তু বা সাজসরঞ্জাম দ্বারা নির্মিত ঘড়-বাড়ি, শোকেস, আলমারি, র‍্যাক ইত্যাদি। এছাড়া প্রয়োজন পোকার বংশবিস্তারে সহায়ক আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা। উন্নয়নশীল দেশে পোকা-মাকড় ধ্বংস করার জন্য রাসায়নিক কীটনাশক দ্রব্যের ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত। যেকোন কীটনাশক দ্রব্য ব্যবহারের আগে পরীক্ষা করে দেখা উচিত দ্রব্যটি শিল্পবস্তু ও ব্যবহারকারীর পক্ষে ক্ষতিকর কিনা।

রাসায়নিক কীটনাশক সাধারণত দুভাবে ব্যবহৃত হয়। কীটনাশক দ্বারা বাষ্পায়ন বা ধূমায়ন করে অথবা কীটনাশকের দ্রাবণ বস্তুটির ওপর প্রয়োগ করে। বাষ্পায়ন প্রক্রিয়া খুবই কার্যকারী, কিন্তু এর ফল দীর্ঘস্থায়ী হয় না। দীর্ঘস্থায়ী সুফল পেতে হলে কীটনাশক দ্রব্যের দ্রাবণ শিল্পবস্তুর ওপর স্প্রে বা ব্রাশ দ্বারা প্রয়োগ করা উচিত। রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের ফলে কিন্তু সংগ্রহশালার ভিতর বায়ুদূষণের সম্ভাবনা থাকে। উপরন্তু প্রদর্শনকক্ষে শিল্পবস্তুর সংখ্যা অত্যধিক হলে প্রতিটি বস্তুকে স্প্রে বা ব্রাশ করা সম্ভব নয়। এরকম ক্ষেত্রে তাক, ড্রয়ার, শোকেস, আলমারি ইত্যাদিতে কীটনাশক দ্রাবণ প্রয়োগ করে শিল্পবস্তু প্রদর্শন করা উচিত। বাষ্পায়নের জন্য সাধারণত Carbon disulphide, Paradichlorobenzene, Carbon tetrachloride, Methynol bromide, Ethylene oxide ইত্যাদি রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়।

কীটনাশক অপেক্ষা শুকনো লঙ্কা, ন্যাপথ্যালিন, কর্পূর, নিমপাতা, তামাকপাতা, পিপুল ইত্যাদির গুঁড়ো ছোট ছোট পশমী কাপড়ের প্যাকেটে করে আলমারির তাক বা ড্রয়ারে রেখে দিলে তা কীটপতঙ্গ বিতাড়নে অধিক কার্যকারী হয় এবং এর ফলে সংগ্রহালয়ের ভিতর বায়ুদূষণের সম্ভাবনা অনেক কম থাকে। এই প্যাকেটগুলি তিন মাস অন্তর বা এগুলির উগ্র গন্ধ নষ্ট হয়ে গেলে অবশ্যই পরিবর্তন করা প্রয়োজন। নচেৎ ঐ গুঁড়ো ধুলো-ময়লায় রূপান্তরিত হয়ে পোকা-মাকড়ের খাদ্য ও বংশবিস্তারের সহায়ক হয়। আরশোলার প্রিয় খাদ্য বই, পত্রিকা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের আঠা। Chlorodane, Pyrethrum, DDT, Sodium fluoride প্রভৃতি কীটনাশক ব্যবহার করলে আরশোলার উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। ঘুণপোকা বা উইপোকার আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পেতে হলে সংগ্রহালয় নির্মাণের সময় ভিত তৈরির মশলার সঙ্গে পরিমাণমত DDT বা Dieldrin জাতীয় রাসায়নিক কীটনাশক মিশ্রণ করা প্রয়োজন। সম্ভব হলে প্রদর্শনকক্ষের প্রতিটি স্তম্ভ ও বিভাজক-প্রাচীরের ভিতে ধাতু-নির্মিত

'termite shield' ব্যবহার করা উচিত। ঘুণপোকা বা উইপোকা-আক্রান্ত শিল্পবস্তু যত শীঘ্র সম্ভব সংগ্রহালয় থেকে পৃথক করে ভালভাবে পরিষ্কার ও বাষ্পায়িত করা বিধেয়।

সুতি, সিল্ক, উল ও কার্পেট-নির্মিত শিল্পবস্তু মথ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে Paradichlorobenzene বা ন্যাপথ্যালিন নিয়মিত ব্যবহার করা উচিত। বাড়ির সোফা, পর্দা, গদি, আসবাবপত্র ইত্যাদি মুক্তবায়ু চলাচল করে এমন স্থানে রেখে প্রতিনিয়ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করলে এবং নিয়মিতভাবে যেকোন কীটনাশক স্প্রে করলে কোনপ্রকার কীটপতঙ্গ আশ্রয় নিতে পারে না। স্তন্যপায়ী জন্তুর চর্ম-নির্মিত শিল্পবস্তু কীটপতঙ্গ, ছত্রাক ইত্যাদির আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হলে Alum ও Arsenic trioxide ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে পাখির চামড়া, পালক ইত্যাদির জন্য Borax গুঁড়ো ব্যবহারই যথেষ্ট। শুঁড় বা হুল-বিশিষ্ট পোকা-মাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হলে Dieldrin, Lindane বা Gammexene-জাতীয় কীটনাশকের দ্রাবণ ব্যবহার খুবই ফলপ্রদ। আর্দ্র পরিবেশে শ্যাওলা, ছত্রাক, লাইকেন ও ব্যাক্টেরিয়া-জাতীয় আণুবীক্ষণিক জীবের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে শিল্পবস্তুকে নিয়মিত পরিষ্কার করা ও মুক্ত বাতাসে রাখা প্রয়োজন। Thymol দিয়ে বাষ্পায়ন করা সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা। শিল্পায়নের প্রভাবে দূষিত বাতাসের মধ্যে যে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক গ্যাস ও জলীয় বাষ্প বিদ্যমান, তার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শিল্পবস্তুকে রক্ষা করতে হলে প্রতিটি বস্তু টিস্যু-পেপার বা অতি মিহি সুতিবস্ত্র দ্বারা আবৃত করে শোকেসের মধ্যে রাখা বিধেয়। জীবাণু ও দুর্গন্ধ-নাশক পদার্থ সংরক্ষণকক্ষে নিয়মিত ব্যবহার করা প্রয়োজন। ছোট ও মাঝারি আকৃতির মূল্যবান ভঙ্গুর শিল্পবস্তু ধুলো-নিরোধক শোকেসে প্রদর্শন করা কাম্য।

শিল্পবস্তুর ক্ষয়ক্ষতির প্রাকৃতিক কারণগুলি এবং তা নিরসনের সম্ভাব্য সহজ উপায়গুলি সংক্ষেপে বর্ণিত হলো। এখন মনুষ্য-সৃষ্ট কারণগুলির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। আমাদের হাত সর্বক্ষণই নানা কারণে তৈলাক্ত বা অপরিষ্কার থাকে। এমন হাতে শিল্পবস্তু নাড়াচাড়া করলে তার যথেষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য ছোট-বড় যেকোন শিল্পবস্তু পরীক্ষা, নাড়াচাড়া বা স্থানান্তরিত করার সময়ে পরিষ্কার সুতির দস্তানা ব্যবহার করা উচিত। অনেক পাঠক-পাঠিকার কু-অভ্যাস থাকে আঙুলে থুতু বা ঘাম লাগিয়ে বইয়ের পৃষ্ঠা ওল্টানো বা বই পড়ার সময় পাতার কোণ মুড়ে রাখা। এসকল অভ্যাস বইয়ের ভীষণ ক্ষতি করে। ফটো, স্লাইড, নেগেটিভ বা ক্ষুদ্রকায় চিত্র ইত্যাদি খালি হাতে স্পর্শ করা অনুচিত। ভারী শিল্পবস্তু বা বড় বড় তৈলচিত্র স্থানান্তরিত করার সময় নরম প্যাডের ওপর রেখে রবারের চাকাযুক্ত ট্রলির সাহায্য নেওয়া উচিত, যাতে কোনরকম আঘাত বা আঁচড় না লাগে। গৃহস্থ বাড়িতে ছোট ছোট পোড়ামাটি, চিনামাটি, পাথর বা ধাতু-নির্মিত শিল্পবস্তু শোকেসে বা আলমারিতে পৃথক পৃথক ভাবে রাখা প্রয়োজন। একসঙ্গে গোছা করে রাখলে ভেঙে যাওয়ার বা আঁচড় লাগার সম্ভাবনা থাকে। সংগ্রহালয়ের চারপাশে ও প্রদর্শনকক্ষে ধূমপান ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্বন্ধে খুবই সতর্ক থাকা প্রয়োজন, নচেৎ যেকোন সময়ে অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে। পুরনো ও অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র, প্যাকিং বাক্স, আসবাবপত্র ইত্যাদি সংগ্রহালয়ের ভিতর বা নিকটে জমা করে রাখা উচিত নয়। প্রদর্শনীকক্ষ বা যে-কক্ষ শিল্পবস্তুর ভাঁড়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়, সেখানে খাদ্যবস্তু রন্ধন ও আহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পরিশেষে বলা যেতে পারে, সংগ্রহালয়ে ত্রুটিহীন নিরাপত্তা ও অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন। ❑

তথ্যসূত্র

(1) The Conservation of Antiquities and Works of Arts—H. J. Plenderlith, London, 1956

(2) Antiquities, Their Restoration & Preservation—A. Lucas, London, 1932

(3) Preservation of Art Objects and Library Materials—O. P. Agrawal, New Delhi, 1993

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ৭

পাশাপাশি ঃ (১) মাদ্রাজ, (৩) আশার আশা, (৫) রক্ত, (৬) শ্যামা, (৮) রাগে কৃতে, (৯) শমন, (১০) নকল, (১১) আগুন, (১৩) পাবন, (১৫) সখারাম, (১৬) পল, (১৭) রবি, (২০) মঙ্গল সিং, (২১) বিভ্রম।

ওপর-নিচ ঃ (১) মাস্টার অ্যাজ আই স হিম, (২) জন্ম, (৩) আমি, (৪) শান্তিতে সে লভুক বিশ্রাম, (৬) শ্যাম, (৭) মান, (৮) রাধা, (৯) শয়ন, (১০) নয়ন, (১২) মম, (১৩) পাপ, (১৪) বল, (১৮) গং, (১৯) চাবি।

শৃগাল-শার্দূল সংবাদ

প্রাচীনকালে অতি সমৃদ্ধশালী পুরিকা নগরীতে 'পৌরিক' নামে এক পরশ্রীকাতর ক্রূরস্বভাব নরপতি ছিল। দেহত্যাগের পর আপন কর্মফলে সে শৃগাল হয়ে জন্মগ্রহণ করে। ঐ জন্মে নিজের পূর্বজন্মের কথা স্মরণ হওয়াতে তার যারপরনাই অনুতাপ উপস্থিত হলো। তখন সকল জীবের প্রতি দয়ালু, সত্যবাদী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে মাংসাহার পরিত্যাগ করে সে নিপতিত ফল মাত্র ভক্ষণ করে দিনযাপন করতে লাগল। শ্মশানে শৃগাল হয়ে জন্মগ্রহণ করে সে সেখানেই অন্যান্য শৃগালের সঙ্গে বাস করত। জন্মভূমির প্রতি আকর্ষণের জন্য অন্যত্র গমন করার বাসনা তার ছিল না। একবার তার স্বজাতীয় শৃগালেরা তার বিশুদ্ধ ভাব দেখে ঈর্ষাপরবশ হয়ে তার মধ্যে বুদ্ধিবৈপরীত্য জন্মানোর জন্য বলল ঃ "ভাই! তুমি কী নির্বোধ! নরমাংসলোলুপ শৃগাল-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এই ঘোরতর শ্মশানে বাস করে শুদ্ধভাবে কালাতিপাত করতে বাসনা করছ! যাহোক, এখন বিশুদ্ধভাব ত্যাগ করে আমাদের ধর্ম অবলম্বন করে মাংস-ভোজনে নিরত হও। আমরা তোমাকে আহারসামগ্রী প্রদান করব।"

তখন সেই বিশুদ্ধস্বভাব শৃগাল সমাহিতচিত্তে তাদের বলল ঃ "বন্ধুগণ! আমার মতে, হীন কুলে জন্মগ্রহণ করলেই যে হীন কাজ করতে হবে—একথা ন্যায়সম্মত নয়। চরিত্রই সকলের সাধুতা ও অসাধুতা সম্পাদন করে থাকে। এখন যাতে আমার যশ চারদিকে বিস্তৃত হয়, আমি তারই চেষ্টা করছি। আমি এই ঘোর শ্মশানে বাস করছি বটে, কিন্তু ধর্ম বিষয়ে আমার যে স্থির সিদ্ধান্ত আছে, তা শোন। কেবল আশ্রমে অবস্থান করলেই ধর্মাচরণ করা হয় না। যদি কোন ব্রহ্মহত্যাকারী আশ্রমের বাইরে গিয়ে গোদান করে, তাহলে কি তার ব্রহ্মহত্যার পাপ লাগবে না? নাকি তার গোদান বৃথা যাবে? তোমরা লোভবশত কেবল উদরপূরণের চেষ্টায় ব্যাপৃত থেকে একেবারে বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছ। পরিণামে যেসকল দোষ ঘটবে, তা তোমরা কিছুই বুঝতে পারছ না। আমি এখন ইহ ও পরত্র উভয় লোকে অতি নিন্দনীয় ও ধর্মহানিকর অনিষ্টের আশঙ্কা করেই দুষ্প্রবৃত্তি থেকে বিরত হয়েছি।"

ঐসময় এক প্রভূত পরাক্রমশালী ব্যাঘ্র সেই শ্মশানে অবস্থান করছিল। সে ঐ বিশুদ্ধস্বভাব শৃগালের কথা শুনে তাকে অতি সচ্চরিত্র ও পণ্ডিত মনে করল এবং তাকে অমাত্যপদে অভিষেক করার মানসে বলল ঃ "আমি তোমার প্রকৃতি অবগত হয়েছি, এখন তুমি স্বাধীনভাবে আহার-বিহার করে আমার সঙ্গে রাজকার্য পরিচালনা কর। আমরা অতি উগ্রস্বভাব; অতএব তুমি আমার কাছে মৃদুতা অবলম্বন করলে অনায়াসেই মঙ্গললাভে সমর্থ হবে।"

তখন শৃগাল সেই শার্দূলের কথাকে সমাদর করে ঈষৎ নম্রবদনে বলল ঃ "মৃগেন্দ্র! আপনি যে ধর্মার্থকুশল বিশুদ্ধ-স্বভাবের সহায়লাভের বাসনা করেছেন, এ আপনার অনুরূপই হয়েছে। আপনি অমাত্য ব্যতিরেকে অথবা প্রাণ-হন্তারক অমাত্যের সাহায্যে কখনোই আধিপত্য সংস্থাপনে সমর্থ হবেন না। নীতিজ্ঞ, দুরভিসন্ধিশূন্য, জিগীষু, নির্লোভ, হিতসাধনে তৎপর—এমন কাউকে আচার্য ও পিতার মতো পূজা করা কর্তব্য। যাহোক, আপনার এখানে থেকে ঐশ্বর্য বা সুখভোগের বাসনা আমার নেই। আপনার পুরনো ভৃত্যদের স্বভাবের সঙ্গে আমার স্বভাব মিলবে না। তারা নিশ্চয় আপনার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবে। মহতের অধীনতাও প্রশংসনীয় নয়। যে-ব্যক্তি দীর্ঘদর্শিতা ও উৎসাহ-গুণে বিভূষিত হয় এবং অন্ধকে ভূয়ো দৃষ্টিদান করে, সেই যথার্থ মহাত্মা। আমি মিথ্যা ব্যবহারে পারদর্শী নই এবং কখনো কারো সেবা করিনি। চিরকাল স্বেচ্ছানুসারে বনে ভ্রমণ করেছি। রাজসন্নিধানে অবস্থান করলে ঈর্ষাপরায়ণরা নিন্দাপ্রচার করে, ফলে বিলক্ষণ কষ্টভোগ করতে হয়। আর বনবাসীদের সঙ্গে বাস করলে নির্ভয়ে ব্রতচর্যাদি অনুষ্ঠান করা যায়। ভৃত্যগণ ভূপতির আহ্বানে যেরকম ভয় পায়, সন্তুষ্টচিত্তে ফলমূলাহারী বনচারিগণ কখনোই সেরকম ভয় পান না। অনায়াসলব্ধ জল ও ভয়সঙ্কুল সুস্বাদু অন্ন—এই উভয়ের মধ্যে, আমার মতে, যাতে ভয়ের বিষয় নেই, তাই সুখাবহ। ভৃত্যগণের মধ্যে অধিকাংশই মিথ্যাপবাদে দূষিত হয়ে প্রাণত্যাগ করে। অতি অল্পই যথার্থ দোষে দূষিত হয়। যাহোক, যদি আপনি নিতান্তই আমাকে অমাত্যপদে অভিষিক্ত করেন, তাহলে আমার প্রতি আপনার ব্যবহার কিরকম হবে আগে তা নির্ধারণ করুন। রাজন্! আমি যে হিতকর কথা বলব, আপনাকে তা মন দিয়ে শুনতে হবে এবং আপনি আমার জন্য যে বৃত্তি বিধান করে দেবেন, কখনো তার অন্যথা করতে পারবেন না। আমি কখনোই আপনার অন্যান্য অমাত্যদের সঙ্গে মন্ত্রণা করব না। তাহলে তারা মহত্ত্বকামনায় আমার ওপর বৃথা দোষারোপ করবে। অতএব আমি কেবল নির্জনে আপনার সঙ্গে মিলিত হয়ে মন্ত্রণা করব। আপনার জ্ঞাতিকার্য উপস্থিত হলে আপনি

আমাকে হিতাহিত কোন কথা জিজ্ঞাসা করবেন না এবং ক্রোধভরে আমার প্রতি বা আমার সঙ্গে মন্ত্রণার পর অন্যান্য মন্ত্রিগণের প্রতি দণ্ডবিধান করবেন না।"

শৃগালের সকল কথা স্বীকার করে শার্দূল তাকে অমাত্যপদে অভিষিক্ত করল। শৃগালের সমাদর দেখে শার্দূলের পূর্বতন ভৃত্যগণ সমবেত হয়ে পদে পদে তার বিদ্বেষাচরণ করতে লাগল। তারা শৃগালের মন্ত্রণাবলে মাংসাহরণে অসমর্থ হয়ে প্রথমত মিত্রভাবে তাকে সান্ত্বনা ও প্রসন্ন করে প্রভূততর ঐশ্বর্যপ্রদান ও নানাভাবে প্রলোভিত করতে চেষ্টা করল। কিন্তু বহুদর্শী শৃগাল কখনই ধৈর্য হারাল না। তখন তারা শৃগালের বিনাশ বাসনায় একত্র হয়ে শার্দূলের আহারের জন্য আনীত উৎকৃষ্ট মাংস শৃগালের গৃহে লুকিয়ে রাখল। কিন্তু শৃগাল নিজের গৃহে সেই মাংস দেখে তা কি জন্য সেখানে আনা হয়েছে সেবিষয়ে সবিশেষ অবগত হয়েও বন্ধুবিচ্ছেদের ভয়ে তা প্রকাশ করল না।

এদিকে ব্যাঘ্র ক্ষুধিত হয়ে ভোজন করার জন্য গাত্রোত্থান করল, কিন্তু আহারের জন্য কিছুমাত্র মাংসও দেখতে পেল না। তখন সে ক্রোধভরে বলল: "অমাত্যগণ! যে দুরাত্মা আমার মাংস অপহরণ করেছে, অবিলম্বে তার অনুসন্ধান কর।" তখন ধূর্তেরা তাকে বলল: "মৃগরাজ! আপনার প্রজ্ঞাভিমানী মন্ত্রীই সেই মাংস অপহরণ করেছেন।" শার্দূল তাদের মুখে এ হেন কথা শুনে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হয়ে তাকে বিনাশ করতে অভিলাষী হলো। শার্দূলের পূর্বমন্ত্রিগণ তাকে সম্বোধন করে বলল: "মৃগরাজ! আপনার মন্ত্রী শৃগাল আমাদের সকলেরই জীবিকা বিলুপ্ত করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। ঐ দুরাত্মা যখন আপনার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করেছে, তখন সে সকল অকার্যই করতে পারে। আপনি আমাদের মুখে তার স্বভাবের বিষয়ে যা শুনলেন, সেবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করবেন না। তার কথা ধার্মিকের মতো, কিন্তু তার স্বভাব অতি ভয়ঙ্কর। ঐ কপট-ধর্মপরায়ণ শৃগাল নিজের ভোজনের জন্যই পরিশ্রম করে ব্রতানুষ্ঠান করেছিল। যদি এই বিষয়ে আপনার অবিশ্বাস জন্মে, তবে আপনি স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করুন।" এই বলে তারা শৃগালের গৃহস্থিত মাংস এনে রাজাকে দেখাল। তখন ব্যাঘ্র স্বচক্ষে সেই শৃগালের গৃহস্থিত মাংস দেখে রোষকষায়িত নেত্রে পূর্বতন মন্ত্রীদের বলল: "তোমরা অবিলম্বে ঐ দুষ্ট শৃগালকে বিনাশ কর।"

ঐসময় শার্দূল-জননী পুত্রের এই আদেশ শুনে তাকে হিতোপদেশ প্রদান করার জন্য সেখানে আগমন করল। সে বলল: "বৎস! তুমি তোমার এইসমস্ত পূর্বমন্ত্রীদের কপট বাক্যে কখনো বিশ্বাস করো না। অসাধুরা সাধুদের এইভাবে অপবাদ দিয়ে থাকে। দুর্জনের স্বভাবই হলো তারা অন্যের উন্নতি সহ্য করতে পারে না। তারা বিশুদ্ধস্বভাবসম্পন্নেরও দোষোৎপাদন করে থাকে। তপঃপরায়ণ বনবাসী মুনিদেরও শত্রু, মিত্র ও উদাসীন—এই তিন ধরনের মানুষ থাকে। আর এই ভূমণ্ডলে প্রায়ই নির্দোষেরা লুব্ধপ্রকৃতিদের, বলবানরা দুর্বলদের, পণ্ডিতেরা মূর্খদের, ধার্মিকেরা অধার্মিকদের এবং সুরূপেরা বিরূপদের বিদ্বেষভাজন হয়ে থাকে। লুব্ধস্বভাব, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, কপট পণ্ডিতেরা বৃহস্পতির মতো বুদ্ধিমান নির্দোষ ব্যক্তিরও দোষোদ্ঘাটন করে। তুমি তোমার মন্ত্রী শৃগালকে মাংস প্রদান করলেও সে তা গ্রহণ করে না। আজ যে সে তোমার অসাক্ষাতে মাংস অপহরণ করেছে—এ কি বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে? অতএব আগে এর সবিশেষ অনুসন্ধান করা তোমার কর্তব্য। এজগতে অনেক অসভ্যকে সভ্যের মতো এবং অনেক সভ্যকে অসভ্যের মতো দেখায়। সুতরাং বিজ্ঞদের উচিত তাদের স্বভাবের সবিশেষ পরীক্ষা করা। পরীক্ষা করে যে-বস্তুর যাথার্থ্য অবগত হওয়া যায়, তার জন্য পরে আর অনুতাপ করতে হয় না। হে বৎস! অধীনস্থকে বিনাশ করা প্রভুর পক্ষে কঠিন নয়; কিন্তু তার ক্ষমাগুণই প্রশংসনীয় ও যশস্কর। তুমি তোমার সুহৃৎ শৃগালকে প্রধান মন্ত্রিত্বপদে স্থাপন করেছ বলে এখন সর্বসাধারণে তোমার বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ হয়েছে। সৎপাত্র লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন; অতএব তুমি কখনো মন্ত্রীর প্রাণদণ্ড দিয়ো না। যে নির্দোষকে অন্যের আরোপিত দোষে দূষিত বলে প্রতিপন্ন করে, সেই নির্বোধকে অবিলম্বেই বিনষ্ট হতে হয় এবং তার আশ্রিত অমাত্যরাও দোষে লিপ্ত হয়ে থাকে।"

শার্দূল-জননী তার পুত্রকে এই হিতোপদেশ প্রদান করছে, এমন সময়ে শৃগালের এক পরম ধার্মিক বন্ধু সেখানে উপস্থিত হয়ে শৃগালের শত্রুপক্ষ যেরকম কপটজাল বিস্তার করেছিল, সেসব বিষয় ব্যাঘ্রের কাছে নিবেদন করল। তখন মৃগরাজ শার্দূল শৃগালের সচ্চরিত্রতার কথা শুনে আহ্লাদিত হয়ে শৃগালের নিকট গমন করে তাকে যথোচিত উপচারে সৎকার ও স্নেহভরে আলিঙ্গন করতে লাগল। কিন্তু নীতিজ্ঞ শৃগাল চুরির অপবাদের জন্য একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হয়ে প্রায়োপবেশনের জন্য শার্দূলের অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন শার্দূল তাকে পুনরায় পূজা করে বারবার নিবৃত্ত করতে লাগল। তখন শৃগাল শার্দূলকে নিতান্ত স্নেহপরতন্ত্র দেখে প্রণাম করে গদগদ কণ্ঠে বলল: "মৃগরাজ! আপনি আগে আমার বিলক্ষণ সমাদর করতেন, এখন আমাকে যারপরনাই অবমানিত করেছেন, সুতরাং আর আমি আপনার কাছে থাকতে পারি না। যেসমস্ত ভৃত্যেরা অসন্তুষ্ট, স্বপদভ্রষ্ট, অবমানিত, হৃতসর্বস্ব, প্রতারিত, দুর্বল, লোভী, ক্রুদ্ধ, অভিমানী, নির্দয়, সতত সন্তপ্ত ও নেশাগ্রস্ত এবং যারা নিরন্তর প্রভুর অন্তরালে অবস্থান করে—তারা সকলের শত্রুতুল্য। তারা কখনোই প্রভুর প্রতি প্রীত হয় না। আমি এখন অবমানিত ও স্বপদভ্রষ্ট হয়েছি, সুতরাং আপনি আমাকে আর কিভাবে বিশ্বাস করবেন এবং আমিই বা কিভাবে আপনার কাছে অবস্থান করব? আপনি আমাকে

পূর্বে সবিশেষ পরীক্ষা করে কার্যদক্ষ বলে গ্রহণ করেছিলেন, এখন আপনিই আবার নির্ধারিত নিয়ম লঙ্ঘন করে আমার অবমাননা করলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞগণ সভামধ্যে একবার যাকে সচ্চরিত্র বলে সমাদর করেন, তার দোষ প্রখ্যাপন করা তাঁর কখনো বিধেয় নয়। যাহোক, এখন আমি অবমানিত হয়েছি, সুতরাং আপনি আর আমাকে বিশ্বাস করতে পারবেন না। আর বিশ্বাস করলেও আমার তাতে বিলক্ষণ উদ্বেগ জন্মাবে। উপরন্তু আপনি আমার কারণে এবং আমি আপনার কারণে নিরন্তর শঙ্কিত থাকলে অনেকেই আমাদের রন্ধ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হবে। দেখুন, একবার যে বিরক্ত হয়েছে, তার সন্তোষ সম্পাদন করা সহজ ব্যাপার নয়। তাকে সন্তুষ্ট করতে হলে নানারকম ছল করতে হয়। একথা প্রসিদ্ধই আছে যে, যার সঙ্গে ভেদ উপস্থিত হয়েছে, তাকে আয়ত্ত করা এবং যে একান্ত অনুরক্ত, তাকে বিয়োজিত করা উভয়ই সুকঠিন। বিরাগভাজনকে পুনরায় আয়ত্ত করতে গেলে তার প্রতি যে প্রীতি জন্মে, তা কপটতাপূর্ণ সন্দেহ নেই। কোন ভৃত্যই স্বার্থশূন্য হয়ে ভর্তার হিতসাধন করে না। সকলেই স্বার্থসাধনে তৎপর। প্রভুর প্রতি ভৃত্যের যথার্থ হিতবুদ্ধি নিতান্ত দুর্লভ, সন্দেহ নেই। আবার যে-রাজার চিত্ত অতিশয় চঞ্চল, তিনি কারো প্রকৃতি পরীক্ষা করতে সমর্থ হন না। একশজনের মধ্যে একজন মাত্র কার্যক্ষম ও নির্ভীক হয়ে থাকে। বুদ্ধিলাঘবের জন্যই অকস্মাৎ অধিকারলাভ, অধিকার পরিত্যাগ, শুভাশুভ কার্যে হস্তক্ষেপ ও মহত্ত্বপ্রাপ্তির বাসনা হয়ে থাকে।"

জ্ঞানবান শৃগাল শার্দূলকে এভাবে ধর্মসঙ্গত উপদেশ দিয়ে প্রসন্ন করে অরণ্যে গমন করল এবং প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করে স্বর্গলাভ করল।

নীতিকথা ঃ চরিত্রই সাধুতা ও অসাধুতা সম্পাদন করে থাকে। ❑

সঙ্কলক ঃ সঞ্জয় মাইতি

শব্দচেতনা 

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর ভিত্তিতে তৈরি বিশেষ শব্দছক

■	১	■	২			৩		■	৪
৫		■		■	■		■	৬	
	■	৭	■	৮	৯		■		■
■	■	১০		■		■	■	■	১১
১২	১৩	■	■	■	১৪		■	১৫	
১৬		■	১৭	১৮	■	■	■	১৯	
	■	■	■		■	২০	২১	■	■
■	২২	■	২৩			■		■	২৪
২৫		■		■	■	২৬	■	২৭	
	■	২৮					■		■

বি.দ্র. ৮নং শব্দচেতনার উত্তর চৈত্র, ১৪০৮-এর পরিবর্তে বৈশাখ, ১৪০৯-এ বেরুবে এবং এইভাবেই চলবে। এতদিন চিঠি পাওয়ার আগেই উত্তর বইতে ছাপা হয়ে যাচ্ছিল। আশাকরি ভবিষ্যতে সেই সমস্যা থাকবে না।—সম্পাদক

পাশাপাশি ঃ (২) মানুষ কখনো গুরু হতে পারে না, ইনিই গুরু। (৫) এটা জানা থাকলে বেতালে পা পড়বে না। (৬) এর দ্বারাই জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। (৮) এরকম হাঁড়িতে দুধ রাখলে নষ্ট হয় না। (১০) ইনিই একরূপে ছেলে হয়ে রয়েছেন। (১২) এতে লেখা আছে—বিশ আড়া জল হবে, কিন্তু টিপলে একফোঁটাও পড়ে না। (১৪) ইনি রামময়জীবিতা। (১৫) ভগবানের বৈঠকখানা। (১৬) "না দেখে নাম শুনে —— মন গিয়ে তায় লিপ্ত হলো।" (১৭) "এক রাম তাঁর হাজার ——।" (১৯) এতেই মানুষ বদ্ধ ও মুক্ত হয়। (২০) স্বপ্নে একে দেখলে ঘুম ভেঙেও বুক দুরদুর করে। (২৩) এটা ময়লা থাকলে মুখ দেখা যায় না। (২৫) এরকম ধান পুঁতলে গাছ হয় না। (২৭) মাঠে জল আনলেও এর যোগ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়। (২৮) শ্রীরামকৃষ্ণ যে-শিষ্যের কোলে উঠে তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন।

ওপর-নিচ ঃ (১) এর তৈরি ঘরে থাকলে ঘরের ভিতর-বাহির সব দেখা যায়। (২) ভগবানলাভের নিমিত্ত আশ্রয়যোগ্য একটি ভাব। (৩) আত্মহত্যা করতে এটাই যথেষ্ট। (৪) ঈশ্বর বিভুরূপে সর্বভূতে থাকলেও সকলের এটা সমান নয়। (৫) "যে সয় সে রয়, যে না সয়, সে —— হয়।" (৬) "লজ্জা, ঘৃণা, —— তিন থাকতে নয়।" (৭) এটি নিজে খেললে ঠিক চালটি বোঝা যায় না, দেখলে বোঝা যায়। (৯) শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ। (১১) বগলে সুতা নিয়ে এ নেচেছিল। (১২) শ্রীরামকৃষ্ণ আদর্শ গৃহীর উপমা দিতে এই মাছের কথা বলতেন। (১৩) "সেই সব জিনে, নিজে —— যেই।" (১৫) "ভক্তি—— লেগে সচ্চিদানন্দ-সাগরে সাকারমূর্তি দর্শন হয়।" (১৮) মেঘ দেখলে এর উদ্দীপন হয়। (২১) সকলে দাবি করে, তার এটা ঠিক চলছে। (২২) এরকম জীব গুটিপোকার মতো, গুটি ছেড়ে বেরতে পারে না, তাতেই মরে। (২৩) বিকারের রোগীর ঘরে এটি রাখা বিপজ্জনক। (২৪) গোলমাল থেকে যেটি নিতে হবে। (২৫) এই কথাটি মুখে বললে নয়, খেলেই নেশা হয়। (২৬) "কথা বলতে ডরাই, না বললেও ডরাই। মনে —— হয়, পাছে তোমা ধনে হারাই।" (২৭) কচ্ছপ জলে থাকলেও তার মনটি থাকে এখানে।

সূত্র ঃ তন্বীতনু পানি

মানবজীবনের উন্নয়নে আত্মসংযমের ভূমিকা*

সৈয়দ আনিসুল আলম

সংযম শব্দের অর্থ নিয়ম অথবা নিয়ন্ত্রণের বন্ধনে চলা। দ্বিতীয় অর্থ ইন্দ্রিয়দমন। এটাই সৃষ্টিরক্ষার প্রধান সূত্র। যেমন সৌরজগৎ তার পরিবারে সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি নিয়ে একটানা সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা বন্ধনের মধ্যে তার অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। শুধু তাই নয়, পারমাণবিক জগতে ইলেক্ট্রন ও প্রোটনের অস্তিত্ব একই সূত্রে গাঁথা। সব জায়গায়ই নিয়মের রাজত্ব। তবে এসব জড়জগতের কথা। এবার আসা যাক জীবজগৎ ও মানবজগতের আলোচনায়। সৃষ্টিকর্তা গাছপালা এবং প্রাণীদের মধ্যে আত্মরক্ষার বিভিন্ন ব্যবস্থা রেখেছেন। কুকুর, বিড়াল, নেউলরা অসুখ হলে গাছ-গাছড়া খেয়ে নিজেদের রোগ সারিয়ে নেয়। কিন্তু মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। তাই তাকে আপন ভালমন্দ বিচার করে কাজ করতে হয়। সেজন্য চাই সুশিক্ষা ও উপযুক্ত ট্রেনিং। যথেচ্ছাচারিতা মানবজীবনের উদ্দেশ্য নয়। প্রাকৃতিক জগতের মতো মানবজীবনেও নিয়ম-কানুন ও শৃঙ্খলা রয়েছে। ঐসকল নিয়ম মেনে চলতে হয়। কিন্তু মানুষের আছে পদে পদে বিপদ। ঘরে ও বাইরে শত্রু। চতুর্দশ ইন্দ্রিয় এবং ছয় রিপুর অবিরত তাড়নায় মানুষ সর্বদা বিব্রত হচ্ছে এবং অনেক সময় পদস্খলন ঘটাচ্ছে।

সারা পৃথিবীতে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিভিন্ন। প্রাণিজগৎ তথা মানবজাতির মধ্যে নানা বিভিন্নতা, ভাষা ও আহার-বিহারের মধ্যেও পার্থক্য দেখতে পাই। মানবজাতি কোন্ পথে চলবে তার পথনির্দেশগুলি বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ধর্মপ্রচারকের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। বস্তুত, ধর্মের সেই মূলনীতিগুলি একই স্রোতে বয়ে চলেছে। মানবজাতির প্রতি ভালবাসা, দয়া, ক্ষমা, সংযম, ত্যাগ ইত্যাদি গুণগুলি সব ধর্মেরই মূলকথা। তবে মানবজীবনের উন্নতির জন্য 'সংযম'কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বেদ, ত্রিপিটক, কোরান, বাইবেল, গ্রন্থসাহেব ইত্যাদি সকল ধর্মগ্রন্থেই সংযমের অশেষ মাহাত্ম্য এবং গুণকীর্তন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সংযমের বা আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে। শুধু সাংসারিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে নয়, আমাদের দৈনন্দিন আহার, নিদ্রা, ভোগ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই নিয়মনীতি মেনে আত্মসংযমী হয়ে চলতে হয়, নচেৎ অশেষ ক্ষতির মধ্যে পড়তে হবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—

"যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।।" (৬।১৭)

—পরিমিত আহার, বিহার, প্রচেষ্টা, নিদ্রা, জাগরণ প্রভৃতি সংযম জীবনযাপনের জন্য অত্যাবশ্যক। লক্ষণীয়, এখানে 'ব্রহ্মচর্য'ই আত্মসংযমের মূল চাবিকাঠি। কৃচ্ছ্রতা ও আত্মসংযমের মাধ্যমে সাধক আমৃত্যু ব্রহ্মচর্য পালন করে ঈশ্বরলাভের সাধনায় দেহ-মন-প্রাণ সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করেন। প্রতিটি জীবের মধ্যে ব্রহ্মের অনুসন্ধানই এর মূলকথা। এবং এই কারণেই ঈশ্বরপ্রেমী মানুষ নিজের সঙ্কীর্ণ গৃহকোণ ছেড়ে সমগ্র জগৎকে আপন করে নেন, ধারণ করেন ব্রহ্মচর্যের শুদ্ধ শ্বেতবস্ত্র। তবে গৃহস্থ মানুষও কিয়দংশে ব্রহ্মচর্য পালন করতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ব্রহ্মচর্যবান ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রবল শক্তি ও মহতী ইচ্ছাশক্তি সঞ্চিত থাকে। পবিত্রতা ব্যতীত এই আধ্যাত্মিক শক্তিলাভ সম্ভব নয়। ব্রহ্মচর্যবান মানুষের আশ্চর্য ক্ষমতা লাভ হয়। জগতের ধর্মনেতাগণ সকলেই পবিত্রচরিত্র, শুদ্ধাচারী এবং ব্রহ্মচর্যবান ছিলেন। এই ব্রহ্মচর্য পালন করেই তাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মচর্যবান ব্যক্তিগণই জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরাট কাজে সাফল্যলাভ করেছেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

"ন তপস্তপ ইত্যাহু ব্রহ্মচর্যং তপোত্তমম্।
ঊর্ধ্বরেতা ভবেৎ যস্তু স দেবঃ ন তু মনুষঃ।।"

—ব্রহ্মচর্যই শ্রেষ্ঠতম তপস্যা। ঊর্ধ্বরেতা ব্রহ্মচারী সাধারণ মানুষ নন, তিনি সাক্ষাৎ দেবতা।

মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে—

"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা।
সম্যগ্জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্।।" (৩।১।৫)

—আমাদের শুদ্ধ জ্যোতির্ময় আত্মাকে সর্বদা সত্য, তপস্যা, সম্যক্ জ্ঞান এবং ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই পেতে হয়।

আবার গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।।"
(৬।৩৫)

—হে মহাবাহো। চঞ্চল মনকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখা যে অতি কঠিন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু হে কুন্তীনন্দন! অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা তাকে বশীভূত রাখা যায়।

---

* এই নিবন্ধটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

আত্মসংযম বিষয়ে শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন—

"আমি তো সন্ন্যাসী আপনা বিরক্ত করি খানি।
দরশন দূরে থাক, প্রকৃতির নাম যদি শুনি।।
তবে হি বিকার পায় মোর তনুমন।
প্রকৃতিদর্শনে স্থির হয় কোন্‌জন।"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

—আমি সন্ন্যাসী, সর্বপ্রকার কামচাঞ্চল্য ও ইন্দ্রিয়লালসার উর্ধ্বে। তবু আমি প্রকৃতির (স্ত্রীলোকের) দর্শন তো দূরের কথা, নাম শুনলেও বিরক্ত হই। আমার তনুমনই যখন প্রকৃতিদর্শনে বিকারগ্রস্ত হয়, তখন অন্য কোন্ ব্যক্তি প্রকৃতি দর্শন করে মন স্থির রাখতে পারে?

এক্ষেত্রে সাধুসঙ্গ বা সৎসঙ্গের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। যিনি সর্বদা শুদ্ধমনে ঈশ্বরচিন্তা করছেন, তাঁর সান্নিধ্য ও উপদেশ সাধারণ মানুষের আত্মোন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক। কারণ, তাঁদের শুভ চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তি সবার অলক্ষ্যে অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এমনকি সাধুপুরুষদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি যদি স্পর্শ করা যায়, তাহলেও অন্তরে সাধুভাবের উদয় হয়। যে-স্থানে বসে কোন সৎপুরুষ করুণাময়ের সাধনা করেছেন, না জেনে যদি সেখানে কিছুক্ষণ কাটানো যায়, তাহলেও আমাদের অন্তর পবিত্র হয়ে উঠবে, উচ্চচিন্তায় মন ভরে যাবে। তাই সাধুসঙ্গ করতে হয় এবং সচ্চরিত্রবান ও উত্তমকর্মকারীর সংশ্রবে থাকতে হয় দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যেও।

আত্মসংযম রক্ষা করতে হলে আরো কতকগুলো আনুষঙ্গিক নিয়মাদি কঠোরভাবে পালন করতে হয়। যেমন নিজের আত্মীয় হোন অথবা পরই হোন কোন রোগগ্রস্ত এবং দুশ্চরিত্র মানুষের হাতে খাওয়া নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এতে অন্যের দেহের রোগ এবং মনের অপবিত্র ভাব আমাদের মধ্যেও অদৃশ্যভাবে সঞ্চারিত হয়। তাই শুদ্ধাচারীদের হাতে খাওয়া দেহ এবং মনের পক্ষে নিরাপদ। পবিত্র কোরানে এবিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কতগুলি নির্দেশ দেওয়া আছে। তার কিয়দংশ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, সুরা শামম আয়াত ৯ ও ১০—"কাদ আফলাহা মান জাক্কাহা ওয়া কাদ খাবা মান দাস্‌সাহা" —নিঃসন্দেহে তার কল্যাণ হবে, যে নিজের নফস্ বা প্রবৃত্তি পরিশুদ্ধ করল এবং ব্যর্থ হলো সেই ব্যক্তি যে তাকে দমন করে রাখল।

বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র ধম্মপদে বলা হয়েছে—

"অলঙ্ক তো চেপি সমং চরেয্যসন্তোদন্তো
বিরতো ব্রহ্মচারী।
সব্বেসু ভূতেসু নিধায় দণ্ডং সো ব্রহ্মণো সো
সমণো স ভিক্‌খু।"

অর্থাৎ অলঙ্কারে ভূষিত হলেও যিনি শান্ত, দান্ত, উপরত এবং ব্রহ্মচারী, যিনি সকল প্রাণীর প্রতি অহিংস হয়ে শম আচরণ করেন—তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, প্রকৃত শ্রমণ, প্রকৃত ভিক্ষু। বস্তুত, মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার সাধু আচরণে ও চরিত্রে। তার পবিত্রতা হলো অন্তরের বস্তু। তাই বাইরের খোলসটা তুচ্ছ, আসল মানুষ আছে ভিতরে। তা চোখ দিয়ে দেখার নয়। মন দিয়ে জানার।

বুদ্ধদেব আরো বলেছেন, কায় বা দেহের সংযম হিতকর আচরণ। সর্বরূপে সংযত ব্যক্তিই ভিক্ষু হন। তিনি সকল দুঃখ থেকে মুক্তি পান।

বাইবেলে উল্লেখ আছে—"Whosoever looketh into a woman with lustful eyes committeth adultery."—যে কোন নারীর প্রতি কামদৃষ্টিতে তাকায় সে ব্যভিচার করে। পুনরায় বলা হয়েছে—"Whenever you are thirsty, drink out of your well."—তৃষ্ণার্ত হলে আপন কূপের জল পান করবে।

নীতিশাস্ত্রবিদ্‌গণ বলেছেন: "বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষয়েৎ"—ইন্দ্রিয়সমূহ এমন বলবান যে, জ্ঞানীদেরও চিত্ত আকর্ষণ করে থাকে। ভোগলালসা-সংযুক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহ আকৃষ্ট করে দেহীকে। ইন্দ্রিয়গণ সেই তুচ্ছ পাপকার্য করতে বাধ্য করে। সাধু-সজ্জনগণ আত্মসংযমের দ্বারা সেই শক্তি প্রতিহত করেন। কোরানে তাই বলা হয়েছে—"ফা ইন্‌নাল জান্‌নাতা হিয়াল মাওয়া", অর্থাৎ যে-ব্যক্তি নিজের সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে দাঁড়াতে ভয় করেছিল এবং নিজ নফ্‌স বা প্রবৃত্তি খারাপ কামনা-লালসা থেকে সংযত রেখেছিল, শান্তির স্বর্গই হবে তার আবাসস্থল।

এখানে দেখা যাচ্ছে, সব ধর্মশাস্ত্রেই দৃষ্টিসংযমের কথা বলা হয়েছে বিভিন্নভাবে। বুদ্ধদেব বলেছেন 'অদর্শন'। শ্রীচৈতন্য বুদ্ধদেবের মতো অদর্শনের কথাই বলেছেন, তবে একটু ঘুরিয়ে—নিজের মধ্য দিয়ে। বাইবেলে বলা হয়েছে কামদৃষ্টিপাত থেকে নিজেকে সংযত রাখতে। গীতায় নির্দেশ করা হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পালন এবং মনকে পবিত্র করাই বড় তপস্যা। পবিত্র কোরানে উল্লিখিত হয়েছে—অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে এবং যা থেকে মনে পাপচিন্তা ও কলুষ ভাব আসতে পারে, তা থেকে নিজ দৃষ্টিকে সংযত রাখতে।

এই অদর্শনের জন্য সাধনা করতে হয় এবং এই সাধনা অভ্যাসসাপেক্ষ। এদের মধ্যে নাসাগ্রে বা দুই ভ্রূর মধ্যে চিত্তকে স্থির করে রাখা অন্যতম। তাছাড়া কূর্ম বা কচ্ছপ যেমন আপৎকালে নিজের দেহের খোলের মধ্যে তার অঙ্গগুলি সংযত করে লুকিয়ে নেয়, তেমনি মানুষও ভোগ-লালসার বস্তু থেকে মনকে সংযত করে নিতে পারে।

উত্তম পরিবেশ এবং নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারাই মন গড়ে ওঠে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আত্মসংযমের পথে এটাই অত্যাশ্চর্য 'কিমিয়া' বা 'আল্‌কেমীরসায়ন'।❑

'কথামৃত'-এ বিভাষিত শ্রীরামকৃষ্ণ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

ওপারের পাহাড়ে বর্ষা নেমেছিল, যখন এই সাগর-ছোঁয়া বাঙলার মৌসুমী মেঘ উত্তর ভারতের মাথা উঁচুউঁচু পাহাড়ে গিয়ে ধাক্কা মেরেছিল। নদীসকলের স্ফীত জলধারা গড়িয়ে দিয়েছিল সাগরের দিকে। ধুয়ে এসেছিল যত পলি। বিহারের ধাতু, গৈরিক মাটি। এই কিছুদিন আগেও দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার জলের রঙ ছিল গেরুয়া। দুই তীর কানায় কানায় ভরপুর।

এখন জলের রঙ কাঁচের মতো স্বচ্ছ। গঙ্গার সেই ভরাট, গম্ভীর মূর্তিও নেই। স্নানে নেমেছেন নরেন্দ্রনাথ। সবাই দেখছেন, যেন শিব নেমেছেন জাহ্নবীতে। এই গঙ্গারই ঐ মাথায় বসে আছেন স্বয়ং বিশ্বেশ্বর, তাঁর রচিত স্বর্ণকাশীতে। নরেন্দ্রনাথের ব্যায়াম করা সুগঠিত শুভ্র শরীর। পশ্চিমে মুখ ঘুরিয়ে স্নান করছেন। পিঠে পড়েছে শরতের রোদ। জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে মুক্তোর দানার মতো। একটু সাঁতার কাটবেন নাকি! নরেন্দ্রনাথ সর্ব বিদ্যায় পারদর্শী। স্নান করছেন আর কণ্ঠনিঃসৃত ঐ সুরে ভেসে যাচ্ছে কোন বাক্যমালিকা! অবশ্যই শিবস্তোত্র—"বিশ্বেশ্বরং বিজিতবিশ্বমনোভিরামং সংসাররোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্।"

সবাই বলতেন, পিতা বিশ্বনাথ অজস্র বাজে ব্যক্তিকে বিনাবিচারে অর্থসাহায্য করতেন। অপদার্থ কিছু সংসারী, বাউণ্ডুলে মানুষ। যে-টাকা দিতেন, সঙ্গে সঙ্গে তারা মদ-ভাঙ খেয়ে উড়িয়ে দিত। শুধু এরাই নয়, বিশ্বনাথ দত্ত বাড়িতে অনেক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়কে আশ্রয় দিয়েছিলেন। নিষ্কর্মার দল বসে বসে অন্নধ্বংস করত। কেউ কেউ আবার নেশাও করত। নরেন্দ্রনাথের পিতার অনুকম্পায় গৃহটি হয়ে উঠেছিল অদ্ভুত এক চিড়িয়াখানার মতো। যুবক নরেন্দ্রনাথ একদিন পিতার মুখের ওপর বলেছিলেন, অযোগ্য ব্যক্তিকে দানধ্যান করার কি এমন দরকার? বিশ্বনাথ অসাধারণ এক উত্তর দিয়েছিলেন: "জীবনটা যে কত দুঃখের তা এখন কি বুঝবি? যখন বুঝতে পারবি, তখন এ দুঃখের হাত থেকে ক্ষণিক নিস্তারলাভের জন্য যারা নেশাভাঙ করে তাহাদের পর্যন্ত দয়ার চোখে দেখবি।" নরেন্দ্রনাথ পিতার উত্তরে অবাক হয়েছিলেন। পিতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন, সেই শ্রদ্ধা আরো শতগুণ বেড়ে গিয়েছিল। এইভাবে জগৎকে কে কবে দেখেছে বা দেখবে? পিতা পুত্রকে দুঃখের উত্তরাধিকারী করতে চেয়েছিলেন।

এরপর নরেন্দ্রনাথ পিতার কাছে অভিযোগ করেছিলেন: "আপনি আমার জন্যে কি আর করেছেন?" বিশ্বনাথ সঙ্গে সঙ্গে আয়নার দিকে আঙুল তুলে বললেন: "যা, আরশিতে নিজের চেহারাটা একবার দেখে আয়, তাহলেই বুঝবি।"

সেই চেহারা গঙ্গার জলে অবগাহন করছে। সে এক দৃশ্য বটে! স্নান শেষ হলো। চুল আর পোশাকের দিকে কোন নজর নেই; অথচ ধনীর পুত্র। সহপাঠীদের কাপ্তেনী বেশভূষা একেবারে সহ্য করতে পারতেন না নরেন্দ্রনাথ। ছাত্রদের মধ্যে কাউকে 'সৌখীনবাবু' দেখলে মুখের ওপর দুকথা শুনিয়ে দিতেন। পুরুষের মধ্যে নারীজনোচিত দুর্বলতা দেখলে তিনি আরো রেগে যেতেন।

বি. এ. পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য তিনি নিজের বাড়ির কোলাহল থেকে দূরে তাঁর মাতামহীর বাড়িতে অবস্থান করতেন। রামতনু বসুর গলিতে সেই বাড়ি। বাইরের দোতলায় তিনি থাকতেন, সম্পূর্ণ আলাদা। মূল বাড়ির সঙ্গে সংস্রবহীন। সামনেই দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি। নরেন্দ্রনাথ এই ঘরটির নাম রেখেছিলেন 'টং'। অতি ক্ষুদ্র একটি ঘর। প্রস্থে চার হাত, দৈর্ঘ্যে আট। ঘরে আসবাবের মধ্যে একটি ক্যাম্পখাট। তার ওপর একটি ক্ষুদ্র ময়লা বালিশ। মেজের ওপর একটি ছেঁড়া মাদুর। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে একটি তাম্বুরা। পাশেই একটি সেতার ও বাঁয়া। বাঁয়া সদা সর্বদাই স্থান পরিবর্তন করে। কখনো পড়ে থাকে মাদুরের একপাশে, কখনো চলে যায় ক্যাম্বিসের খাটের তলায়। কখনো-বা বাঁয়ার ওপর চড়ে বসে আছেন তিনি স্বয়ং। ঘরের একপাশে একটি থেলো হুঁকো, তারই পাশে গুল আর ছাই ফেলবার একটি সরা, তার পাশে তামাক, টিকে আর দেশলাই রাখার একটি মৃৎপাত্র। কুলুঙ্গিতে, খাটের ওপর, মাদুরের ওপর যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে বই, পাঠ্যপুস্তক। একটি দেওয়ালে দড়ি খাটানো। সেই দড়িতে ঝুলছে কাপড়, পিরান ও একটি চাদর।

এই হলো নরেন্দ্রনাথের 'লাইফ স্টাইল'। ইচ্ছা করলেই বাড়ি থেকে একটি পরিষ্কার বালিশ, সুন্দর বিছানা, ভাল ভাল আসবাব, দু-একখানি সুন্দর ছবি দিয়ে

ঘরটিকে সাজাতে পারতেন। কি হবে? কিবা প্রয়োজন! সবই তুচ্ছ। বাইরেটা সাজিয়ে কি লাভ! আত্মতৃপ্তির বাসনায় যে মগ্ন, তাঁর এইসব বাইরের বস্তুর দরকার কি?

স্নানান্তে নরেন্দ্রনাথ বসেছেন তাঁর পরিচিত পোশাকে! স্নাতমূর্তিতে রূপ আরো উদ্ভাসিত। ঠাকুরের কাছে নরেন্দ্রনাথ একা আসেননি। সঙ্গে এসেছেন কয়েকজন ব্রাহ্ম ছোকরা। ঠাকুরের কাছে রয়েছেন রাখাল [পরবর্তী কালের স্বামী ব্রহ্মানন্দ], রামলাল [ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র] ও হাজরা মশাই। মাস্টারমশাই তো রয়েছেনই, তা না হলে এই অপূর্ব লীলা দেখছি কি করে! এই মহাভারতে তিনিই তো সঞ্জয়। সেই দূর অতীতের তিনিই তো নয়ন! আমরা যে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র!

নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাশে আহারে বসেছেন। ঠাকুর কোন্ বেশে বসেছেন, মাস্টারমশাই উল্লেখ করেননি। অনুমান করা যেতে পারে। আশ্বিনের শেষদিন। হিমেল কার্তিকে পা রাখবে চলমান সময়। শীত আসবে। তবে আজ একটু শীত, শীত ভাব। সকালের এই সময়টায়, এই দ্বিপ্রহরে আবহাওয়া অবশ্যই উষ্ণ। তাই ঠাকুরেরও পরিচিত বেশ। পরিধানে শুভ্র ধুতি মাত্র। আনন্দময় পুরুষের মুখমণ্ডল আজ আরো উদ্ভাসিত। কারণ, পাশেই বসে আছেন নরেন্দ্রনাথ। ঠাকুর যাঁকে ঋষি বলেই জানেন। দুজনের আগমনের প্রাগ্‌দৃশ্য ঠাকুর তাঁর সমাধিতে দর্শন করেছিলেন। সেই দর্শনের কথা তিনি বলেছিলেনঃ "একদিন দেখিতেছি—মন সমাধিপথে জ্যোতির্ময় বর্ত্মে উচ্চে উঠিয়া যাইতেছে; চন্দ্র-সূর্য-তারকামণ্ডিত স্থূলজগৎ সহজে অতিক্রম করিয়া উহা প্রথমে সূক্ষ্ম ভাবজগতে প্রবিষ্ট হইল। ঐ রাজ্যের উচ্চ উচ্চতর স্তরসমূহে উহা যতই আরোহণ করিতে লাগিল, ততই নানা দেবদেবীর ভাবঘন বিচিত্র মূর্তিসমূহ পথের দুই পার্শ্বে অবস্থিত দেখিতে পাইলাম। ক্রমে উক্ত রাজ্যের চরম সীমায় উহা আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে দেখিলাম এক জ্যোতির্ময় ব্যবধান (বেড়া) প্রসারিত থাকিয়া খণ্ড ও অখণ্ডের রাজ্যকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া মন ক্রমে অখণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ করিল, দেখিলাম —সেখানে মূর্তিবিশিষ্ট কেহ বা কিছুই আর নাই, দিব্যদেহধারী দেবদবী সকলে পর্যন্ত যেন এখানে প্রবেশ করিতে শঙ্কিত হইয়া বহুদূর নিম্নে নিজ নিজ অধিকার বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতে পাইলাম, দিব্যজ্যোতির্ঘনতনু সাতজন প্রবীণ ঋষি সেখানে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। বুঝিলাম, জ্ঞান ও পুণ্যে, ত্যাগ ও প্রেমে ইঁহারা মানব তো দূরের কথা, দেবদেবীকে পর্যন্ত অতিক্রম করিয়াছেন। বিস্মিত হইয়া ইঁহাদিগের কথা ও মহত্ত্বের বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে দেখি—সম্মুখে অবস্থিত অখণ্ডের ঘরের ভেদমাত্রবিরহিত, সমরস জ্যোতির্মণ্ডলের একাংশ ঘনীভূত হইয়া দিব্য শিশুর আকারে পরিণত হইল। ঐ দেবশিশু ইঁহাদিগের অন্যতমের নিকটে অবতরণপূর্বক নিজ অপূর্ব সুললিত বাহুযুগলের দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ প্রেমে ধারণ করিল; পরে বীণানিন্দিত নিজ অমৃতময়ী বাণী দ্বারা সাদরে আহ্বানপূর্বক সমাধি হইতে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিতে অশেষ প্রযত্ন করিতে লাগিল। সুকোমল প্রেমস্পর্শে ঋষি সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলেন এবং অর্ধস্তিমিত নির্নিমেষ লোচনে সেই অপূর্ব বালককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের প্রসন্নোজ্জ্বল ভাব দেখিয়া মনে হইল, বালক যেন তাঁহার বহুকালের পূর্বপরিচিত হৃদয়ের ধন। অদ্ভুত দেবশিশু তখন অসীম আনন্দ প্রকাশপূর্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিল, 'আমি যাইতেছি, তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে।' ঋষি তাঁহার ঐরূপ অনুরোধে কোন কথা না বলিলেও তাঁহার প্রেমপূর্ণ নয়ন তাঁহার অন্তরের সম্মতি ব্যক্ত করিল। পরে ঐরূপ সপ্রেম দৃষ্টিতে বালককে কিছুক্ষণ দেখিতে দেখিতে তিনি পুনরায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তখন বিস্মিত হইয়া দেখি, তাঁহারই শরীর-মনের একাংশ উজ্জ্বল জ্যোতির আকারে পরিণত হইয়া বিলোম-মার্গে ধরাধামে অবতরণ করিতেছে! নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র বুঝিয়াছিলাম, এ সেই ব্যক্তি।" [দ্রঃ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ', ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, ৪র্থ অধ্যায়]

সীমার ওপারে অনন্তের এলাকার দুজন, দ্রষ্টা আর দৃষ্ট পাশাপাশি আহারে বসেছেন। এ এক অপূর্ব দৃশ্য! কার পাতে কেমন আহার্য! শ্রীম এসম্বন্ধে কিছু বলেননি। বলার কথাও নয়। কালের এপারে বসে আমরা কি অনুমান করে নিতে পারি! নরেন্দ্রনাথ ব্যায়াম করেন, কুস্তি করেন, জিমন্যাস্ট, ক্রিকেট খেলেন, ফুটবল খেলেন, ট্র্যাপিজে খেলা দেখান, ঘোড়ায় চড়েন, সাঁতার কাটেন। আর ঠাকুর আমার পেটরোগা। নবতে মায়ের মাথার ওপর শিকেতে জিওল মাছ থাকে। মা ঠাকুরের জন্য পাতলা করে মাছের ঝোল রেঁধেছেন। সেই ঝোলে আনাজ কি দিয়েছেন? আলু, পেঁপে, কাঁচকলা। শাক রেঁধেছেন নাকি? ঠাকুর যে কলমি শাক ভালবাসতেন। নরেন্দ্রনাথের পাতে কি দেবেন? ফোড়ন দেওয়া মুগের ডাল, ঠাকুর যেমনটি রাঁধতে শিখিয়েছিলেন। পাঁচরকম ভাজা। মৌরলা মাছ। রুই মাছের ঝাল। পুজোর আগে নতুন ফুলকপি উঠেছে, পালং শাক।

নহবত থেকে মা আসছেন, পরিবেশন করতে। মাথায় ঘোমটা। চলনে সলজ্জ স্বাধীনতা। মা পরিবেশন না করলে ঠাকুর যে অন্ন স্পর্শ করতে পারবেন না। [ক্রমশ] (ছয়)

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

স্বামীজীর ক্রিট দ্বীপের স্বপ্ন

আমেরিকা পরিভ্রমণকালে স্বামী বিবেকানন্দকে এক সপ্তাহের মধ্যে বার-চোদ্দটি বা ততোধিক বক্তৃতা দিতে হতো। এরূপ অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমের ফলে কখনো কখনো তাঁর শরীর এতদূর নিস্তেজ হয়ে পড়ত যে, তিনি আর নতুন কিছু বক্তব্য খুঁজে পেতেন না। মনে হতো তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। শত চেষ্টা করলেও তা থেকে আর নতুন চিন্তা বের হবে না, তখন তিনি বিহ্বল হয়ে পড়তেন। এই অবস্থায় সময়ে সময়ে তাঁর কতকগুলি অদ্ভুত অনুভূতি হতো। গভীর রাত্রে তন্দ্রাবেশে তিনি শুনতে পেতেন, পরদিন তাঁকে যেসব কথা বলতে হবে তা কে যেন উচ্চস্বরে তাঁর নিকট বলছে, অথবা উচ্চস্বরে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। সময়ে সময়ে ঐ বক্তৃতাগুলি এত উচ্চস্বরে হতো যে, পাশের ঘরের লোকের কানে পর্যন্ত যেত। তাঁরা পরদিন এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন : "স্বামীজী, কাল অত রাত্রে আপনি কার সঙ্গে এত চেঁচিয়ে কথা বলছিলেন?" স্বামীজী কোনরকমে এসকল প্রশ্ন এড়িয়ে যেতেন।

এই সময়ে ও পরে পাশ্চাত্য দেশে অবস্থানকালে স্বামীজীর নানাপ্রকার যোগজ শক্তিলাভ হয়েছিল। তিনি ইচ্ছা করলে স্পর্শমাত্র লোকের জীবনের গতি ফিরিয়ে দিতে পারতেন, বহুদূরের ঘটনাবলী সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করতেন এবং লোকের মনোভাব অবগত হয়ে তাদের সন্দেহ নিরসন বা জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর প্রদান করতেন। এমনকি লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি তার জীবনের অতীত ইতিহাস পর্যন্ত বলে দিতে পারতেন। কখনো তিনি দু-একজন সত্যার্থীকে ঐরকম বলে দিতেন, তারা তাঁর কথার সত্যতা অনুভব করে তাঁর শিষ্য হয়ে যেত। আর যাদের ভিতর কোনকিছু গলদ থাকত, তারা তাঁর ভয়ে তাঁর ত্রিসীমানা মাড়াত না। উদাহরণস্বরূপ শিকাগো শহরের এক ধনীব্যক্তির কথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। ঐ ব্যক্তি যোগদৃষ্টি বা যোগজ শক্তি সম্পর্কে মোটেই বিশ্বাসী ছিলেন না। বলতেন, ওসব কল্পনামাত্র। স্বামীজীকে একদিন তিনি স্পষ্টই বললেন : "মহাশয়, আপনার কথা যদি সত্য হয় তবে আপনি আমার মনের ভাব বা অতীত জীবনের ঘটনাবৃত্তান্ত বলে দিন।" স্বামীজী একমুহূর্ত ইতস্তত করে তাঁর চোখের দিকে দৃষ্টিস্থাপন করে এমন গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখতে লাগলেন যে, সেই ব্যক্তির বোধ হলো যেন তাঁর মনের তলদেশ পর্যন্ত আলোড়িত হচ্ছে! সে-দৃষ্টিতে কোন কাঠিন্য ছিল না, কিন্তু তবুও তাঁর মনে হতে লাগল যেন তাঁর শক্তি অপ্রতিহত, অপরাজেয় এবং তা অন্তরের অন্তরতম স্থল পর্যন্ত ভেদ করতে সমর্থ। লোকটি সহসা চঞ্চল ও ভীত হয়ে কাতর স্বরে বললেন : "স্বামীজি! মনে হচ্ছে আপনি আমার ভিতরটা মন্থন করে জীবনের সমস্ত গুপ্ত রহস্য টেনে বের করছেন!" এই বলে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করলেন এবং সেদিন থেকে যোগশক্তি সম্বন্ধে তাঁর আর অবিশ্বাস রইল না। স্বামীজীর এই অদ্ভুত 'দর্শন'ক্ষমতা প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে, যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

স্বামীজীর ভারতে ফেরার জাহাজ ছেড়েছিল ৩০ ডিসেম্বর ১৮৯৬। ভূমধ্যসাগরে নেপলস ও পোর্ট সৈয়দের মধ্যবর্তী স্থানে তিনি একদিন রাতে একটি অপরূপ স্বপ্ন দেখেছিলেন—যেন একজন পক্বশ্মশ্রু বৃদ্ধ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন : "তুমি এখন ক্রিট দ্বীপের সন্নিকটে এসেছ। এই স্থান থেকেই খ্রিস্টধর্মের উৎপত্তি হয়।" আগে এখানে থেরাপুটি সম্প্রদায় বাস করত, এই বৃদ্ধ সেই সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি আরো একটি কি কথা বলেছিলেন তা পরে স্বামীজীর বিশেষ স্মরণে ছিল না। একটু গভীরভাবে চিন্তা করে তাঁর মনে হয়, কথাটি ছিল 'এসোনী'। শোনা যায়, যিশুখ্রিস্ট নাকি এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা অনেকটা সন্ন্যাসীর মতো জীবনধারণ করতেন। সেই ঋষিতুল্য বৃদ্ধ ব্যক্তি শেষে বললেন : "আমাদের প্রচারিত সত্য, জ্ঞান ও ধর্মোপদেশ খ্রিস্টানেরা যিশুর উপদেশ বলে প্রচার করেছে। কিন্তু জেনো, প্রকৃতপক্ষে যিশু বলে কোন ব্যক্তি অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করেনি।" বৃদ্ধ ঐ ভূমির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে আরো বললেন : "এই স্থানের ভূগর্ভ খনন করলে আমার কথার যথার্থতা সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাবে।"

স্বামীজীর ঘুম ভেঙে গেল এবং তিনি তাড়াতাড়ি ডেক-এ ছুটে গেলেন। জাহাজের এক কর্মচারীর সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : "এখন রাত্রি কত?" সে জানাল : "রাত্রি বারটা।" স্বামীজী তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, জাহাজ ক্রিট দ্বীপের পঞ্চাশ মাইলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

স্বামীজী স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তির কথাগুলির সঙ্গে এই অত্যাশ্চর্য সামঞ্জস্য দেখে স্তম্ভিত হলেন। যিশুখ্রিস্টের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর ইতিপূর্বে কখনো সন্দেহ হয়নি। কিন্তু এখন তাঁর মনে হলো যে, যিশুখ্রিস্ট অপেক্ষা খ্রিস্টশিষ্য পল-এর ঐতিহাসিক সত্যতা অকাট্য। 'ম্যাথু লিখিত সুসমাচার'-এর 'প্রেরিতদিগের ক্রিয়ার বিবরণ আরো প্রাচীন গ্রন্থ'—একথার অর্থ কি তা এখন বুঝলেন এবং তাঁর মনে হলো, থেরাপুট ও ন্যাজারাথ সম্প্রদায়ের ধর্মমতের মিশ্রণ থেকেই খ্রিস্টধর্মের দার্শনিক ভাগ ও যিশুখ্রিস্টের কল্পনা উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু এবিষয়ে কোন দৃঢ় প্রমাণ না পাওয়ায় তিনি এসকল ভাবনা সাধারণের কাছে প্রকাশ করা উচিত বিবেচনা করলেন না। তবে প্রাচীনকালে আলেকজান্দ্রিয়া যে ভারতীয় ও মিশরীয় ভাবের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল এবং তার প্রভাব যে বহুল পরিমাণে খ্রিস্টধর্মের মধ্যে প্রবেশ করেছে—এবিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

স্বামীজী পাশ্চাত্যের এক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ইংরেজ বন্ধুর কাছে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত লিখে পাঠিয়েছিলেন এবং এতে কোন সত্য নিহিত আছে কিনা সেসম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে বলেছিলেন।

স্বামীজীর দেহত্যাগের কিছু পরে 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় একটি টেলিগ্রাম প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয় যে, ক্রিট দ্বীপ খনন করতে করতে কয়েকজন ইংরেজ খ্রিস্টধর্মের অতীত ইতিহাসের কতকগুলি মূল্যবান প্রমাণ পেয়েছে। ইতিহাস-পাঠকগণ অবশ্যই জানেন যে, ক্রিট দ্বীপের প্রাচীন সভ্যতা আসীরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতার সমকালীন বলে বর্তমান ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক প্রমাণিত হয়েছে।

'এসেনেস' সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু বৌদ্ধধারণা বা রীতিনীতি প্রচলিত ছিল। তারা বহু চিকিৎসাপদ্ধতি জানত। থেরাপুট ঐ সম্প্রদায়ের একটি দল। 'থেরাপুট' শব্দটি বৌদ্ধ শব্দ 'থেরাপুত্ত' থেকে এসেছে। 'থেরাপুত্ত' শব্দের অর্থ নিঃসন্দেহে থেরার শিষ্য বা পুত্র বা অপত্য। 'থেরা' বলতে বৌদ্ধ শ্রমণদের বোঝাত, আর 'পুত্ত' সংস্কৃত 'পুত্র' শব্দেরই অপভ্রংশ। তাই থেরাপুত্ত হলো বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘ, যাঁরা বুদ্ধের বাণী প্রচার করতে মিশর, জুডা প্রভৃতি স্থানে গিয়েছিলেন। এঁরা উদার ধর্মমত পোষণ করতেন এবং তাঁদের দর্শন ছিল সর্বোচ্চ অদ্বৈতভাবের। তাঁদেরই একটি দল ডেড সি-র উপকূলে বসতি স্থাপন করে। খ্রিস্ট এঁদের মধ্য থেকে উদ্ভূত বা প্রকাশিত হন, সেইজন্য খ্রিস্টান ও বৌদ্ধধর্মের শিক্ষাগুলির মধ্যে বা কাহিনীগুলির মধ্যে এত সাদৃশ্য দেখা যায়। আবার এমনও হতে পারে—স্থান, কাল ও পাত্রের মহিমায় গীতার কৃষ্ণ বাইবেলের খ্রিস্টে পরিণত হয়েছেন, কারণ উভয়েরই জন্মরহস্য প্রায় একইপ্রকার, আবার মৃত্যুও তাই।

এতক্ষণ যা লেখা হলো তা বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণের মতামত। এবার আমার নিজস্ব কিছু বিশ্বাস নিবেদন করি। ক্রুশবিদ্ধ যিশুখ্রিস্টকে প্রথমে জেরুজালেমে সমাধিস্থ করা হয়। পরে সমাধি থেকে উঠে জীবিত অবস্থায় শিষ্য ও অনুগতদের সঙ্গে নিয়ে তিনি আফগানিস্থান অতিক্রম করে ভারতের কাশ্মীর রাজ্যে পহলগাঁওয়ে বসতি স্থাপন করেন। এখানে একটি পুরনো মসজিদকে যিশুখ্রিস্টের সমাধি বলে দাবি করা হয়। এই দাবির সমর্থনে যেসব প্রমাণ উপস্থিত করা হয় তা এরকম—

(১) কাশ্মীরের অধিবাসীরা নামের সঙ্গে 'জু' শব্দ ব্যবহার করে না, কিন্তু এই অঞ্চলের অধিবাসীরা নামের সঙ্গে 'জু' শব্দ ব্যবহার করে অপরের সঙ্গে পার্থক্য রক্ষা করছে। এই সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের দেহসৌষ্ঠব অন্য কাশ্মীরীদের সঙ্গে মেলে না, বরং ইজরায়েল বা জেরুজালেমের সমগোত্রীয়।

(২) তামাম কাশ্মীরের সর্বত্র ছাগ পালন করা হয়। কিন্তু এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ছাগ পালন না করে ভেড়া বা মেষ পালন করে। অন্য কাশ্মীরীরা ভেড়া বা মেষ পালন করে না।

(৩) মুসলমান কর্তৃক স্থাপিত মসজিদ কখনো পূর্বমুখী হয় না, সর্বদাই পশ্চিমমুখী। কিন্তু এই ইমারতটি পূর্বমুখী। সুতরাং তা মুসলমান কর্তৃক নির্মিত হয়নি। পরে ইসলাম সভ্যতা এদেশে বিস্তারলাভ করে ইমারতটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করে। এটাই সন্তোষজনক উত্তর।

এছাড়া আরো কিছু পার্থক্য আছে। বিহারের পাঠান মুসলমানরা যেরকম স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলে, সেরকম এরাও অপর সম্প্রদায় থেকে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলে।

এ গেল কাশ্মীরের খবর। জাপানেও একটি সুন্দর সুরক্ষিত বাগানে একটি সুরক্ষিত স্থান আছে। এটি যিশুখ্রিস্টের সমাধি বলে প্রসিদ্ধ। এছাড়াও অন্য জায়গায় যিশুখ্রিস্টের আরো সমাধিক্ষেত্র থাকতে পারে। তাই প্রশ্ন হলো, একই ব্যক্তির তিন জায়গায় তিনটি সমাধিক্ষেত্র কি করে হতে পারে? এটি সত্য যে, তিনটি বিভিন্ন জায়গায় তিনটি মৃতদেহ শায়িত রয়েছে, যা আজও পূজিত হয়! সন্দেহ নেই যে, এই তিনজনই মহাপুরুষ এবং তাঁর অর্থাৎ যিশুর ধর্মমতের বাহক। সুতরাং স্বামীজীর ক্রিট দ্বীপের স্বপ্নাদেশ বর্তমান প্রজন্মের কাছে যে এক মূল্যবান গবেষণার বিষয়, তাতে সন্দেহ নেই।

হীরালাল চক্রবর্তী
আমেদাবাদ, গুজরাট

শ্রীঅরবিন্দের আই.সি.এস. পরীক্ষা ও চাকরি প্রসঙ্গে

'উদ্বোধন'-এর কার্তিক ১৪০৮ সংখ্যায় শ্রীঅরবিন্দের আই. সি. এস. পরীক্ষা ও চাকরি প্রসঙ্গে শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র প্রধান যথার্থই ডাঃ নীরদবরণ চক্রবর্তীর বক্তব্যকে প্রামাণ্য বলে মনে করেছেন। সেজন্য আমি এখানে নীরদবরণ চক্রবর্তীরই কয়েকটি কথার উদ্ধৃতি দিচ্ছি, যার দ্বারা সুস্পষ্ট হবে যে শ্রীঅরবিন্দ আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এক শর্তমূলক চাকরি পেয়েছিলেন এবং শর্তটি ছিল ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। ঐ পরীক্ষায় তিনি স্বেচ্ছায় অনুত্তীর্ণ হয়ে চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। বলা বাহুল্য, স্বেচ্ছায় অকৃতকার্য হওয়াটা অসাফল্য নয়। শ্রীঅরবিন্দের পিতার অন্তরের বাসনা ছিল যে, তাঁর 'অরো' আই. সি. এস. পরীক্ষায় পাশ করে সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করবেন। তাই পিতার কথাকে রক্ষা করার জন্য অরবিন্দ পরীক্ষা দিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকরিতে তাঁর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। শ্রীচক্রবর্তীর ভাষায়—"তখন তিনি ফন্দি আঁটলেন যে লেখার পরীক্ষায় পাশ করে ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় স্বেচ্ছায় ফেল হবেন। এতে দুদিকই বজায় থাকবে—বাবার কথাও রাখা হবে আবার গোলামিগিরি থেকেও অব্যাহতি। কাজেও তিনি তাই করলেন।" ('শ্রীঅরবিন্দায়ন', পৃঃ ২৬) অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় তাঁর 'হে চিরদিনের' গ্রন্থে লিখেছেন : "কৌশলে তিনি অশ্বারোহণ পরীক্ষায় অযোগ্য বলে নিজেকে দেখালেন অথচ নিজে সরাসরি এই সার্ভিস প্রত্যাখ্যান করলেন না, কেননা তাঁর পরিবারের লোকেরা অনুমতি দিতেন না।" (পৃঃ ৪) এই প্রসঙ্গে শ্রীচক্রবর্তী আরো লিখেছেন : "তাঁর হিতৈষী অধ্যাপক প্রথেরো সাহেব সরকারের সঙ্গে বেজায় লড়লেন।... সরকারের কাছে তিনি এক লম্বা চিঠি লিখলেন, 'আমি শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলাম যে, ঘোড়ায় চড়তে পারেননি বলে ঘোষকে আই. সি. এস. চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।' সরকারকে বিশেষ অনুরোধ করলেন যেন তাঁকে আবার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। সরকার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারল না। দেওয়া হলো সুযোগ, বহুবার লোক পাঠানো হলো, পরীক্ষার তারিখ বদলানো হলো, কিন্তু অরবিন্দকে

খুঁজেই পাওয়া যায় না।... অগত্যা পরীক্ষক বিরক্ত হয়ে তাঁকে ফেল করাল; অরবিন্দ মনে মনে হাসলেন।" ('শ্রীঅরবিন্দায়ন', পৃঃ ২৬) যাই হোক, তিনি পরীক্ষায় অন্তত একবার হাজির হয়ে স্বেচ্ছায় অসফল হয়ে থাকুন, অথবা আদৌ হাজির না হয়ে থাকুন—তফাতটা অত্যন্ত তুচ্ছ। সেজন্য তাৎপর্যের দিক থেকে চাকরি পেয়ে বরখাস্ত হওয়া, আর আদৌ চাকরি না পাওয়া একই কথা। এসবই বোঝায় গোলামগিরিকে পরিহার করে চলা। শ্রীঅরবিন্দ স্বমহিমায় ভাস্বর, সেজন্য এই বিতর্ক নিষ্প্রয়োজনই শুধু নয়, বরং সেটি পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়।

আসলে তিনি কেম্ব্রিজে ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবাত্মক বক্তৃতা দিতেন, যা ব্রিটিশ সরকার মোটেই সুনজরে দেখেনি। "পরে তিনি জেনেছিলেন যে, এই বক্তৃতাগুলি তাঁকে সিভিল সার্ভিস থেকে বাদ দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্তগ্রহণে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করেছিল। অশ্বারোহণ পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা হলো একটা উপলক্ষ্য মাত্র, কেননা অন্য কয়েকজন অসফল প্রার্থীকে এই ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং এই ভারতবর্ষের মাটিতে।" ('হে চিরদিনের', পৃঃ ৪)

অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়
বিষ্ণুপুর, টিলবাড়ি, বাঁকুড়া

শ্রীরামকৃষ্ণাব্দ শুভসূচনার প্রস্তাব

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব থেকে সত্যযুগের শুরু। তাঁর এই কথাটির তাৎপর্য কিছুকাল আগে এই 'উদ্বোধন' পত্রিকাতেই গুরুত্ব সহকারে ব্যাখ্যা করেছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বাদশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। তিনি যে-বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করেছিলেন, যুগ-পরিবর্তনের সেই লক্ষণীয় দিগ্‌দর্শনগুলি শাস্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায়। বিশ্বখ্যাত অনেক চিন্তাশীল দার্শনিকের লেখনী থেকেও জানা যায়, যখন মানবসমাজ ধর্মবিশ্বাস হারিয়ে দিশাহারা হয়ে এদিক-ওদিক ছুটেছে, ধর্মের নামে জাতিভেদ, দাঙ্গা ও হানাহানিতে মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ধর্মান্তরিত হয়েছে, কিন্তু জীবনের নিশ্চিত শান্তি খুঁজে পাচ্ছিল না—সেই যুগসন্ধিক্ষণে শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব। তিনি কঠোর সাধনভজন দ্বারা সকল ধর্মকে সত্যজ্ঞান করে বলেছিলেন, সব পথেই সৃষ্টিকর্তা করুণাময়ের দর্শনলাভ সম্ভব। তিনি চেয়েছিলেন, সকল জাতিভেদ ভুলে 'যত মত তত পথ'-এর আদর্শ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ অন্তর থেকে গ্রহণ করুক এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। তাঁর সেই প্রেম-ভালবাসা ও সেবাধর্মের আদর্শ আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। মানবসমাজ তাতে নিরাপদ নিশ্চিত শান্তির আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে। এইসকল ঘটনা-প্রবাহের আলোকে নিশ্চিত করে বোঝা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব থেকে সত্যযুগের শুরু হয়েছে। আমার বিনম্র প্রস্তাব—নবযুগের শুভ সূচনায় নব বর্ষপঞ্জিকার প্রবর্তন করা হোক, যা 'রামকৃষ্ণাব্দ' নামে পরিচিতিলাভ করবে। প্রতি বছর ঠাকুরের জন্মতিথিতে শুভ নববর্ষের ক্যালেণ্ডার প্রকাশিত হবে বেলুড় মঠের সুচিন্তিত তত্ত্বাবধানে, যা মঠ ও মিশনের প্রতিটি শাখাকেন্দ্র থেকে নির্ধারিত মূল্যে ভক্তবৃন্দ সংগ্রহ করতে পারবেন। আমার এই প্রস্তাব 'উদ্বোধন' পত্রিকার সকল পাঠক-পাঠিকা বিবেচনা করে সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করে জনমত গড়ে তুলবেন—এই অনুরোধ জানাই।

ডাঃ বিমল দেবরায়
বিরাটী, কলকাতা-৭০০ ০৫১

প্রসঙ্গ আলাউদ্দিন খাঁ

'উদ্বোধন'-এর গত আশ্বিন ১৪০৮ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী শিবপ্রদানন্দের 'ঊষার শুকতারা অমৃতলাল ও সুর্যময় আলাউদ্দিন' নিবন্ধটি সুলিখিত এবং তথ্যসন্নিবিষ্ট। ঐ নিবন্ধে আলাউদ্দিন খাঁর জন্মসাল (যদিও শ্রদ্ধেয় মহারাজ স্বীকার করেছেন যে, এবিষয়ে মতপার্থক্য আছে) ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ লেখা হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় ডাকবিভাগ গত ১৯ অক্টোবর ১৯৯৯ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে এবং তার ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে (brochure) আলাউদ্দিনের জন্মসাল ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ বলা হয়েছে। এছাড়াও আরো কিছু তথ্য যা ঐ পুস্তিকাতে প্রকাশ করা হয়েছিল, আমি তা হুবহু উদ্ধৃত করছি—

"Ustad Allauddin Khan Saheb (1870-1972) was one of the greatest 'Sarod' players of all time. Although 'Sarod' was his forte all through his long and distinguished career, he also played fairly proficiently on no fewer than 18 musical instruments, and song and taught vocal music, specialising in Dhrupad and Hori, with equal ease. His style was that of 'Senia' gharana, the school of music associated with Tansen. He was a staunch traditionalist in the field of classical music, his command over the instrument was so immense and his melodies so deep, he often held his audiences spellbound for hours together. He was one of the pioneers who introduced the notation system in Hindustani music, and perhaps he was the first Indian musician to capture the imagination of western audience when he accompanied Uday Sankar's dance troupe on the cultural tour of Europe in 1935. He was a teacher and mentor of a number of distinguished musicians. In recognition of his services to the cause of classical music, he was one of the first four musicians of the country who were awarded the Padma Vibhusan in 1958. Earlier, he was awarded Sangeet Natak Academy Award in 1952."

অনির্বাণ মৈত্র
বেলুড় মঠ, হাওড়া, পিন-৭১১ ২০২

সুস্বাস্থ্য ও প্রার্থনা

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

বিভিন্ন পেশায় বিশেষজ্ঞ ও চিন্তাবিদ্‌রা বলছেন, এই নতুন সহস্রাব্দ হবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা-নিয়ন্ত্রিত (knowledge-driven)। এক্ষেত্রে ভারত তার সুপ্রাচীন ও সুমহান মেধাসম্পদের জোরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করতে চলেছে। প্রাচীন বৈদিক ঋষিদের অপূর্ব স্বস্তিবচন—

"সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ্ ভবেৎ।।"

—এর বিরাট শক্তির প্রকৃত মর্মোদ্ধার করতে শুরু করেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নত আমেরিকার মতো দেশও। ৪৮৪ জন হৃদ্‌রোগীর ওপর বিশদ সমীক্ষা চালিয়ে মিড আমেরিকা হার্ট ইনস্টিটিউট বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ পেয়েছে, প্রার্থনায় রোগের উপশম হয়। এই সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে 'জার্ণাল অফ আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন'-এর সাম্প্রতিক সংস্করণে। এই খবরটি গত ৪ নভেম্বর ১৯৯৯ নয়াদিল্লি থেকে প্রকাশিত 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া'-র প্রথম পৃষ্ঠায় যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছে। খবরের শিরোনাম **'মেডিকেল সায়েন্স ফাইণ্ডস ফেইথ ইন প্রেয়ার'**, অর্থাৎ প্রার্থনায় আস্থা খুঁজে পেল চিকিৎসাবিজ্ঞান।

সমীক্ষা রিপোর্ট দিল্লির কুশলী চিকিৎসকমহলে সাড়া ফেলে দিয়েছে। বহু ডাক্তার এবং বেশ কিছু আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব তার সত্যতা সমর্থন করেছেন। 'অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস'-এর (এ. আই. আই. এম. এস.) মতো বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের শল্যচিকিৎসা বিভাগের অতিরিক্ত অধ্যাপক (অ্যাডিশনাল প্রফেসর) ডাঃ অনুরাগ শ্রীবাস্তব বলেছেন: "প্রতিটি অস্ত্রোপচার শুরু করার আগে আমি প্রার্থনা করি। কাটাছেঁড়ার সঙ্গে যেসব জটিলতা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে বলে জানি, সেগুলির কোনটিই যাতে না দেখা দেয়, সেইজন্য প্রার্থনা জানাই মনে মনে। সাধারণত এর ফল ভাল হয় বলে হাতে হাতে প্রমাণও পেয়েছি। দেখেছি অস্ত্রোপচার-পরবর্তী অসুবিধা তেমন কিছু হয়নি।" এদেশের অধিকাংশ হাসপাতালে রোগীর শুভানুধ্যায়ী ও আত্মীয়স্বজনের প্রার্থনা করার মতো আলাদা কোন জায়গা না থাকায় ডাঃ শ্রীবাস্তব বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি জানান, সমস্ত পাশ্চাত্য দেশের প্রায় সব চিকিৎসালয়ে 'মেডিটেশন হল' রয়েছে।

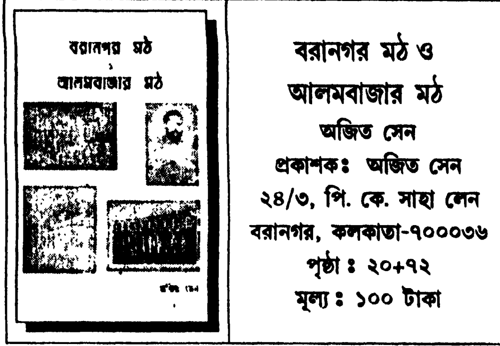
ডায়াগনস্টিক মেডিসিন-বিশেষজ্ঞ ডাঃ অঞ্জলি মিশ্রের নিজস্ব অভিজ্ঞতাই তাঁকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে—পরিপূর্ণ আস্থার সঙ্গে, সম্পূর্ণ নির্ভর করে কেউ যদি প্রার্থনা করতে পারে তাহলে তার সুফল মিলবেই মিলবে। ডাঃ মিশ্র বলেন: "কি করে প্রার্থনায় কাজ দেয় জানি না। তবে তোমার সবটুকু শক্তি যদি প্রার্থনায় নিংড়ে দিয়ে আকুল হও, একাগ্র হও তাহলেই কেল্লা ফতে! ভগবান-টগবান আছে, কি নেই বুঝি না। শুধু এটুকু হলফ করে বলতে পারি, বস্তুর বাইরেও কিছু একটা আছে।"

মার্কিন সমীক্ষকরা ফলাফলের যান্ত্রিক কোন ব্যাখ্যা জোটাতে পারেননি। তাঁরা বলছেন: "এরকম ফলাফল কেন পেলাম বলতে পারছি না।" অবশ্য দিল্লির জনৈক আধ্যাত্মিক পথনির্দেশক তথা লেখক এর একটা বিশ্লেষণ দিয়েছেন। তিনি বলছেন: 'ইতিবাচক শক্তিকে প্রার্থনা বয়ে নিয়ে যায়। বিশেষ কারো প্রতি এই প্রার্থনা নির্দেশিত হতে পারে।' 'প্রার্থনা যেন পার্থিব জগতের ঘণ্টাধ্বনি।' কাজেই বলা চলে, যাঁরা উচ্চতর আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন তাঁদের প্রার্থনার জোর তত বেশি।

ভারতবর্ষের সনাতন বোধই বলে, চিন্তার এক বিশেষ শক্তি রয়েছে। সে-কারণেই অশুভ চিন্তার উদয় হলে শরীর-মনে বিশৃঙ্খলার প্রভাব পড়ে। শাশ্বত ভারতীয় ঐতিহ্যের আধুনিক ধারকরাও বলেন, প্রার্থনা ও চিন্তাশক্তি অবশ্যই অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করা যায়।

এই সমীক্ষা এবং তার ফলাফল সম্পর্কে সার্থক প্রতিক্রিয়া প্রমাণ করে, বিজ্ঞান ও যুক্তিবোধের বাইরে এক উচ্চতর স্তরের সুবিশাল ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডারের গূঢ় রহস্য ভেদ করতে এখন সচেষ্ট ও আগ্রহী হয়ে উঠছে বহির্বিশ্ব। তারা বুঝতে পারছে, শুধু পুঁথিগত বিদ্যা ও টেকনোলজির গরিমা সম্বল করে সুসভ্য হওয়ার বড়াই করে চললে জীবনরসের পথে আরো বহু বস্তু অনাস্বাদিত, অনালোকিত থেকে যাবে। তাই তাদের নজর 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'-এ। স্বামীজী বলেছিলেন, বেদ ও উপনিষদ্ অনিঃশেষ শক্তির ভাণ্ডার। আর শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বচন ছিল—"তোমাদের চৈতন্য হোক"। অবতারবরিষ্ঠের ইঙ্গিতে কল্যাণকামী ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার প্রথম রাষ্ট্রদূত হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দ আন্তর্জাতিক মঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে তপ্ত মানবাত্মাকে শান্তির দিশা দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ এবং স্বামীজীর প্রয়াস—কোনটিই বিফল হওয়ার নয়। তাঁদের ইচ্ছাতেই আজ পাশ্চাত্য দুনিয়ার চৈতন্যশক্তির জাগরণ ঘটছে। তারা উপলব্ধি করছে, নতুন সহস্রাব্দে বিশ্বকে দুঃখ-দুর্দশামুক্ত, মানবতাবাদী, শান্তির বৃহৎ আলয় হিসাবে গড়ে তুলতে হলে ভারতবর্ষের পদতলে আনত হতেই হবে। বিনীত শিক্ষার্থীর মানসিকতায় আহরণ করতে হবে চেতনার সমৃদ্ধি। কারণ, ভারতবর্ষের প্রজ্ঞা যুগ যুগ ধরে ঋষিদের একমুখী নিষ্ঠা এবং জগৎকারকের তপস্যায় অর্জিত। ❑

প্রসঙ্গ বরানগর মঠ ও আলমবাজার মঠ



বরানগর মঠ ও আলমবাজার মঠ
অজিত সেন
প্রকাশকঃ অজিত সেন
২৪/৩, পি. কে. সাহা লেন
বরানগর, কলকাতা-৭০০০৩৬
পৃষ্ঠা ঃ ২০+৭২
মূল্য ঃ ১০০ টাকা

সাম্প্রতি হাতে এল অজিত সেনের রচিত এক প্রয়োজনীয় গ্রন্থ **'বরানগর মঠ ও আলমবাজার মঠ'**। এর আগেও এই দুটি ঐতিহাসিক ভবন নিয়ে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। অজিত সেনের লেখা গ্রন্থটি এই পর্বে আরেকটি নতুন সংযোজন। আলোচ্য গ্রন্থটির বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো—১) চিরাচরিত পদ্ধতি থেকে সরে এসে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা। ২) অধ্যায়-শেষে বিশেষ তথ্যাদির সংযোজন। ৩) উদ্ধৃতি সহযোগে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়বস্তুর যথাসম্ভব নিখুঁত রূপায়ণ। ৪) বহু মানচিত্র (১১টি), হাফটোন ব্লক (৯টি) ও স্কেচ (৪টি) সহযোগে মঠ-দুটির যথাযথ উপস্থাপনা। এবং ৫) তথ্যাদির বিভ্রান্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল মহলের বক্তব্যের উপস্থাপনা।

এককথায় লেখক এই গ্রন্থ প্রণয়নে প্রামাণ্য বিষয়ের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকার জন্য বরানগর মঠ ও আলমবাজার মঠের প্রকৃত ইতিহাস যে উন্মোচিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। লেখক বিস্তৃতভাবে এই দুই মঠের সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পরিকাঠামোর যে পরিচয় দিয়েছেন, তা ঐতিহাসিক সমীক্ষার পক্ষে একান্ত জরুরী।

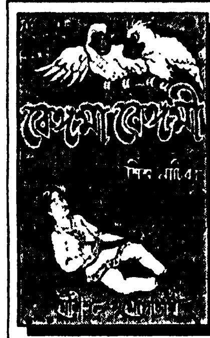
'বরানগর মঠ ও আলমবাজার মঠ' গ্রন্থটি মোট ৪টি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে আছে বরানগর মঠবাড়িটির পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা। এতে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ দেহরক্ষার পর নরেন্দ্রনাথ যুবক ভক্তগণকে একত্র করে কিভাবে বরানগর মঠের পত্তন করলেন তার তথ্যমূলক ইতিবৃত্তি। বরানগর মঠের দ্বিতীয় পর্যায়ে তৎকালীন মঠবাড়িটির চিত্র কেমন ছিল তা উল্লেখ করতে গিয়ে শ্রীসেন বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন, যাতে মঠবাড়িটির পূর্বাপর অবস্থা ও পরিবর্তনের তথ্যচিত্র নিখুঁত পাওয়া যায়। তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে—যারা এই মঠে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন তাঁদের নামের একটি তালিকা। চতুর্থ পর্যায়ে বরানগর মঠ এবং তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম পর্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে মঠে সেইসময় নবীন সাধকেরা কি কি অনুষ্ঠান করেছিলেন তার একটি ইতিবৃত্ত।

বইটির দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত হয়েছে আলমবাজার মঠের ইতিহাস। প্রথম পর্যায়ে বরানগর থেকে মঠ কিভাবে আলমবাজারে স্থানান্তরিত হলো, তার উল্লেখ রয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে মঠবাড়িটির আকৃতি কেমন ছিল তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে পরিবেশিত হয়েছে দুই মঠের তুলনামূলক আলোচনা ও মূল্যায়ন।

গ্রন্থটির তৃতীয় অংশে রয়েছে ১২টি মূল্যবান পরিশিষ্ট, যার মধ্যে 'শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ' সংবাদটি (২৫ আগস্ট ১৮৮৬ 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত—'উদ্বোধন' পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থটির চতুর্থ অংশে বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র স্থান পেয়েছে। পরিশেষে বলতে হয়, এই তথ্যমূলক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনার জন্য লেখকের সাধুবাদ প্রাপ্য। যাঁরা ইতিহাস ভালবাসেন, যাঁরা ইতিহাসকে জানতে চান—তাঁরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ থাকবেন শ্রীসেনের এই ধরনের একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হাতে পাওয়ার জন্য।❑

একটি সার্থক শিশুনাট্যের সঙ্কলন



বেঙ্গমা-বেঙ্গমী
গৌরীশ মুখোপাধ্যায়
প্রকাশকঃ মধুমিতা প্রকাশন
৪/এইচ-২/১৩৩, হো-চি-মিন সরণি, কলকাতা-৭০০০৬১
পৃষ্ঠা ঃ ১০+১২৬
মূল্য ঃ ৪০ টাকা

আমাদের কিশোর সমাজ একদিন 'চাঁদের পাহাড়'-এর শঙ্কর হতে চেয়েছিল, কিন্তু তার পরবর্তী প্রজন্ম হতে চায় খলনায়ক! 'যখের ধনে'র বিমল কিংবা কুমার আজ আর ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আফ্রিকায় গুপ্তধন আবিষ্কারে যেতে চায় না। এখনকার কিশোরদের কল্পরাজ্যে কাশফুল,

তালপাতার ভেঁপুর বদলে অস্ত্রের ছড়াছড়ি! এ হেন পরিস্থিতিতে কিশোর-মনে এক সুস্থ সুন্দর আনন্দের স্পর্শ দিতে প্রবীণ স্বাধীনতা-সংগ্রামী, 'মাস্টারমশাই' নামে সমধিক পরিচিত গৌরীশ মুখোপাধ্যায় আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন **'বেঙ্গমা-বেঙ্গমী'** নামে পাঁচটি শিশু-নাটিকার এক চমৎকার সঙ্কলন-গ্রন্থ।

আজকের কৈশোর বড় একা, একদম একা। নিশ্চিন্দি-পুরের অপু কিংবা টেনিদার সঙ্গে স্বামী ঘুটঘুটানন্দ অভিযান কিংবা ঘনাদার বিশ্বপরিক্রমা—এসবের হদিস এরা জানে না। সুকুমার রায় এদের জীবন শুরু হতেই শেষ হয়ে যায়। এরকম এক দমবন্ধ করা পরিস্থিতিতে কচিকাঁচাদের কাছে অক্সিজেন হিসাবে কাজ করবে গৌরীশবাবুর আনন্দ ও বিমল হাস্যময় এই শিশু-নাটিকার সঙ্কলনগ্রন্থখানি।

এই গ্রন্থে রয়েছে মোট পাঁচটি নাটক—(১) 'অদ্ভুত-কিম্ভুত, (২) 'তাঁতীবৌ', (৩) 'আঙুল কাটা রাজা', (৪) 'শেয়াল-মামা' এবং (৫) 'বিভীষণের হাফ্‌টাইম্‌'। নাম দেখেই বোঝা যায়, এগুলির মধ্যে রয়েছে নানান মজার উপাদান। বাস্তবিক, এগুলি পড়তে বয়স্কদেরও ভাল লাগবে। শুরু করলে শেষ না করে ছাড়া যাবে না। লেখার মুনশিয়ানায় নাটকগুলি প্রাণবন্ত ও সতেজ হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি হাসি ও আনন্দের আবহকে জমিয়ে তোলার কাজে এবং আগ্রহান্বিত করে তোলার পক্ষেও এই সরস নাটকগুলি বিশেষভাবে সহায়ক। সমস্ত লেখার ভিতর ফুটে উঠেছে শিশুনাটিকার একটি ভাব-ঐতিহ্য এবং অবশ্যই নাটকের ব্যাকরণগত মূল্যবান দিকটি, যা আমাদের বুঝে দেখা এবং মনে রাখার প্রয়োজন আছে। সর্বোপরি সাহিত্যের যে দাবি, অর্থাৎ ভাবের গুণগত উৎকর্ষ তা নিপুণভাবে রক্ষা করে গেছেন গৌরীশবাবু। সুতরাং কিশোর-কিশোরীরা শুধু যে আনন্দই পাবে, তা নয়; তারা এক সুস্থ মূল্যবোধেও অভিষিক্ত হতে পারবে।

শিল্পী পার্থ বিশ্বাসের আঁকা প্রচ্ছদ গ্রন্থটিকে ভিন্ন ধরনের এক মাত্রা এনে দিয়েছে। এই পুস্তকের মূল আকর্ষণ নাটকের ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থবাহী চিত্রের শিল্পকর্ম, যা এই গ্রন্থের সম্পদবিশেষ। গ্রন্থটির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল।❑

—সুকান্ত বসু

ইতিহাসচর্চার এক নতুন দিক

গৌতম মুখোপাধ্যায়



ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোকে পুরাতন মালদহ
সঙ্কলক ঃ ডঃ রাধাগোবিন্দ ঘোষ
প্রকাশকঃ পুরাতন মালদহ দেবদেউল গ্রন্থ প্রকাশন সমিতির পক্ষে অসীম আগরওয়ালা, পুরাতন মালদহ।
পৃষ্ঠা ঃ ২০+৩০২
মূল্য ঃ ১২৫ টাকা

সাম্প্রতিক কালে ইতিহাসচর্চার একটি অন্যতম প্রবণতা আঞ্চলিক ইতিহাস (regional history) চর্চার ওপর গুরুত্ব আরোপ। নানা দিক থেকে আলোচনা করে তাকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের সঙ্গেও মিলিয়ে দেখা হয়, যাতে বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াগুলোর আরো স্পষ্টতর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ডঃ রাধাগোবিন্দ ঘোষ সঙ্কলিত **'ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোকে পুরাতন মালদহ'** গ্রন্থটি আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার একটি নিদর্শন।

গ্রন্থটি 'প্রথম তরঙ্গ' ও 'দ্বিতীয় তরঙ্গ'—এই দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশে সন্নিবেশিত হয়েছে পুরনো মালদহের অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অংশবিশেষ এবং অন্যান্য ধর্মের পুরাকীর্তি। দ্বিতীয়াংশে প্রধানত হিন্দু ও লৌকিক দেবদেবী এবং মন্দির সম্পর্কিত রচনা স্থান পেয়েছে। 'মুখবন্ধ'-এ ডঃ রাধাগোবিন্দ ঘোষ পুরনো মালদহের ইতিহাসকে যতটা পিছনে নিয়ে গেছেন, খুব কম রচনাই ততটা পুরনো ইতিহাসকে ধরতে সক্ষম হয়েছে। অবশ্য সব বিষয়বস্তুও ততটা পুরনো নয়।

'মুখবন্ধ' থেকে জানা যায়, গ্রন্থটির তথ্যসূত্র অনেকাংশে মৌখিক ইতিহাস (hearsay) বা স্মৃতিকথা। এক্ষেত্রে

ভ্রম-সংশোধন

গত কার্তিক ১৪০৮ সংখ্যার ৮১৭ পৃষ্ঠার শেষ পঙ্‌ক্তিতে 'দেব্যপরাধক্ষমাপনস্তোত্রম্‌'-এর পরিবর্তে 'দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্রম্‌', ৮২০ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে ২০তম পঙ্‌ক্তিতে 'মাণ্ডুক্য'-এর পরিবর্তে 'মাণ্ডূক্য', ৮২১ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ৭ম পঙ্‌ক্তিতে 'সংস্করণ'-এর পরিবর্তে 'মুদ্রণ' হবে। ৮২৬ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ১ম পঙ্‌ক্তিতে 'উচিৎ'-এর পরিবর্তে 'উচিত' হবে।

গত পৌষ ১৪০৮ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে জয়ন্তী রায়ের 'প্রসঙ্গ গীতাঞ্জলি ও কয়েকটি তথ্য' শীর্ষক চিঠিতে 'নোবল/noble'-এর পরিবর্তে 'নোবেল/nobel' হবে।—সম্পাদক

বিপত্তির সম্ভাবনা থাকে। স্মৃতি একমাত্র ভরসা হওয়ায় কিছু তথ্য ভ্রমপূর্ণ বা বিলুপ্ত হতে পারে। কিছু অংশ প্রক্ষিপ্তও হতে পারে। ফলে অনৈতিহাসিক তথ্যও প্রবিষ্ট হতে পারে। তাই সেগুলি অন্য কোন তথ্য-প্রমাণাদির দ্বারা যাচাই করা প্রয়োজন। কার্যনির্বাহ সমিতির সম্পাদকের নিবেদন-এ অসীম আগরওয়ালা বলেছেনঃ "উপকরণের অভাবে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলো প্রমাণসাপেক্ষ করতে পারিনি।... স্বভাবতই অনিচ্ছাকৃত কিছু ত্রুটি রয়ে গেল।"

গ্রন্থটিতে ইতিহাসের পাশাপাশি জনশ্রুতি, কিংবদন্তি ও অলৌকিক ঘটনাবলীরও সহাবস্থান রয়েছে। কিন্তু এগুলিকে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে সরাসরি গণ্য করা যায় না। এগুলিকে সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে তৎকালীন সামাজিক পরিকাঠামো, অর্থনীতি বা সংস্কৃতির অস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। এগুলি এই গ্রন্থে সংগৃহীত হওয়ার ফলে ভাবী গবেষকরা এগুলি সুনিপুণভাবে ব্যবহার করতে পারবেন।

বিভিন্ন স্থানীয় দেবদেবী সম্পর্কিত রচনাগুলিতে ধর্মীয় জীবন এবং তৎসম্পর্কিত ধর্মীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়, যদিও সবকটি রচনা সমমানের নয়। পুরনো মালদহের বিদ্যালয়গুলির ইতিহাস থেকে শিক্ষা-ব্যবস্থার একটা রূপরেখা পাওয়া যায়, যদিও তাতে সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমান্বয়িক ইতিহাস পাওয়া যায় না। সমগ্র গ্রন্থের 'প্রথম তরঙ্গ'-এর লেখাগুলিকে বেশি বিশ্লেষণমূলক ও বুদ্ধিদীপ্ত মনে হয়েছে। ডাঃ রণজিৎ আগরওয়ালার লেখায় তৎকালীন সাংস্কৃতিক চিত্রটি খুব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে এবং তা প্রমাণ করে, আঞ্চলিক সংস্কৃতির একটা আলাদা ধারা আছে। গ্রন্থটির অন্যান্য অংশ থেকেও এর সমর্থন মেলে। রাধাকান্ত দাসের খাতার মর্মোদ্ধার করে সামাজিক পরিকাঠামো সংক্রান্ত যেসব তথ্যের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

গোকুলবিহারী আগরওয়ালার লেখা থেকে পুরনো মালদহের অর্থনৈতিক টানাপোড়েন এবং সেই সংক্রান্ত সামাজিক পরিবর্তনের সূত্রগুলি খুব সুন্দরভাবে পাওয়া যায়। ডঃ রাধাগোবিন্দ ঘোষও তাঁর রচনায় পুরনো নথিপত্র খুব দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। পরিবর্তনশীল অর্থনীতি আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও সমাজকে কিভাবে পরিবর্তিত করে, তার রূপরেখা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাই এধরনের লেখাগুলিকে শুধু পুরনো মালদহের ইতিহাসের জন্য নয়, আরো বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।

পুরনো নথি ও বিভিন্ন রচনা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে লেখা এম. আতাউল্লাহের রচনাটি মুসলিম স্থাপত্য ও পুরাকীর্তির একটি প্রামাণ্য ইতিহাসের খসড়া বলে বিবেচিত হতে পারে। পুরনো মালদহের শিখ গুরুদোয়ার সংক্রান্ত মোক্তার সিং-এর রচনাটিও অনন্য। এদুটি রচনা থেকে পুরনো মালদহের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের একটা রূপরেখা পাওয়া যায়। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে ডাঃ দেবপ্রসাদ সাটিয়ার ও নিতাইপদ দাসের রচনাদুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও প্রথমোক্ত রচনাটি ক্রমানুযায়ী আগে সন্নিবেশিত হলে এবং দুটি লেখা পরপর সন্নিবেশিত হলে ভাল হতো বলে মনে হয়েছে। প্রসঙ্গত, গ্রন্থটির প্রচ্ছদে ও অন্যত্র 'সঙ্কলন' বানানটির ভ্রম অত্যন্ত চোখে পড়ে।

পরিশেষে বলা যায়, পুরনো মালদহের ঐতিহ্যপূর্ণ ইতিহাসের একটা পর্যায়কে ধরার এই প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য। পুরনো মালদহের বৃহত্তর ইতিহাসের সন্ধানে এটা প্রথম পদক্ষেপ। 'মুখবন্ধ'-এ ডঃ ঘোষ বলেছেনঃ "পুরাতন মালদহের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রবন্ধগুলি এক উল্লেখযোগ্য দলিল বলে বিবেচিত হবে।" সব প্রবন্ধ না হলেও বেশ কিছু প্রবন্ধের ক্ষেত্রে একথাটি মানতেই হয়। ❑

প্রাপ্তি-সংবাদ

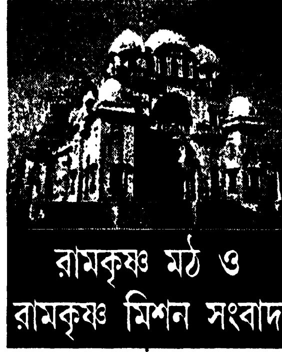
- **শতবর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম বারাণসী (১৯০২-২০০২)।** প্রকাশকঃ স্বামী জ্ঞানঘনানন্দ, অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, বারাণসী। পৃষ্ঠাঃ ৩২। মূল্যঃ ১০ টাকা।
- **শকুন্তলা—কৃষ্ণা সেন।** প্রকাশকঃ সুরজিৎ ঘোষ, প্রমা প্রকাশনী। ৫, ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলকাতা-৭০০০১৭। পৃষ্ঠাঃ ৪৮। মূল্যঃ ২৫ টাকা।
- **হিন্দুধর্ম মানবতার দিশারী—যজ্ঞেশ্বর দেবশর্মা।** প্রকাশিকাঃ কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়। ১৭, বিপ্লবী বারীন ঘোষ সরণি, কলকাতা-৭০০০৬৭। পৃষ্ঠাঃ ২৪। মূল্যঃ ৩ টাকা।
- **বৈভবলক্ষ্মীব্রত।** প্রকাশকঃ সাহিত্য সঙ্গম, বাওয়াসীদী, পাঞ্চোলী শেরীর সামনে, গোপীপুরা, সুরাট-৩৯৫০০১, গুজরাট। পৃষ্ঠাঃ ৪০। মূল্যঃ ৫ টাকা।
- **রাত জাগা পাখী—বিকাশ চক্রবর্তী।** প্রকাশকঃ বিনয়কুমার চক্রবর্তী। পৃষ্ঠাঃ ৪+১২। মূল্যঃ ২০ টাকা।
- **লুঠ হয়ে যায় স্বদেশভূমি—দেবল দেব।** প্রকাশকঃ উৎস মানুষ প্রকাশন। পৃষ্ঠাঃ ৮+৬৪। মূল্যঃ ৩০ টাকা।
- **চৌবাচ্চায় মাগুর মাছের চাষ—মাণিকলাল আচার্য্য।** প্রকাশকঃ শান্তি বুক স্টোর্স, ৬৯/১ এস. কে. দেব রোড, ব্লক—এল-১, ফ্ল্যাট—১, কলকাতা-৭০০ ০৪৮। পৃষ্ঠাঃ ৬+২৬। মূল্যঃ ২২ টাকা।
- **Self Development—Swami Premeshananda.** Published by: Swami Asaktananda, Secretary, Ramakrishna Mission Ashrama, Narendrapur, 24 Parganas (S). Pages: 6+38. Price: Rs. 3.

উৎসব-অনুষ্ঠান

চণ্ডীপুর রামকৃষ্ণ মঠ (মেদিনীপুর,পশ্চিমবঙ্গ) ঃ গত ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর ২০০১ যুবসম্মেলন ও ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। দুদিনের সম্মেলনে আলোচনা করেন স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী, স্বামী বলভদ্রানন্দজী, স্বামী অমূল্যানন্দজী ও তিমিরবরণ ত্রিপাঠি। যুবসম্মেলনে ৪০০ যুব-প্রতিনিধি এবং ভক্তসম্মেলনে ১৫০ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

বরানগর রামকৃষ্ণ মঠ (কলকাতা-৭০০০৩৬) ঃ গত ১৫-১৬ ডিসেম্বর ২০০১ মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বিশেষ পূজা, কালীকীর্তন, ভজন, গীতি-আলেখ্য, রামায়ণগান, 'ভাগবত' পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুদিনের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন কাশীপুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী তত্ত্ববোধানন্দজী এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দজী। ভাষণ দান করেন স্বামী সনাতনানন্দজী ও স্বামী অচ্যুতানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে ১০০ দুঃস্থ মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। এছাড়া গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও ১৮০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উৎসব পালিত হয়।

কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের (বিহার) সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হয় গত ২০ ডিসেম্বর ২০০১। উৎসবের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে বিহার সরকারের গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী নারায়ণ যাদব একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রামপ্রকাশ মাহাতো-সহ বহু উচ্চ-পদস্থ কর্মী, শিক্ষক, ছাত্র ও স্থানীয় অধিবাসী উপস্থিত ছিলেন।



কালাডি আশ্রম (কেরালা) গত ২৮-৩০ ডিসেম্বর ২০০১ একটি 'সমগ্র কেরালা বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন' ও জাতীয় সমন্বয় শিবির পরিচালনা করে। শিবিরের সূচনা করেন ভারতের যুবকল্যাণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পি. রাধাকৃষ্ণণ। শিবিরে রাজ্যের যুবকল্যাণ মন্ত্রী এম. এ. কুডাপ্পন, ভারতের রেল ও সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ও. রাজাগোপাল এবং বিশিষ্ট কয়েকজন বক্তা ভাষণ দেন।

বারাসত রামকৃষ্ণ মঠ (উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) ঃ গত ৫-৯ জানুয়ারি ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমা ও শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বেদপাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, ধর্মসভা প্রভৃতি ছিল পাঁচদিনব্যাপী উৎসবের অনুষ্ঠিত বিষয়। বিভিন্ন দিনে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দজী, টাকি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী যতীন্দ্রানন্দজী, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী ও আশ্রম-অধ্যক্ষ স্বামী মুক্তিকামানন্দজী। বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন স্বামী অসক্তানন্দজী, স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী সনাতনানন্দজী, স্বামী অজরানন্দজী, স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী বলভদ্রানন্দজী ও স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী। বিশেষ উল্লেখ্য, গত ৬ জানুয়ারি নবনির্মীয়মাণ দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ এবং বিশেষ পূজা করেন স্বামী বৈদ্যনাথানন্দজী। এই কয়দিনের উৎসবে প্রায় ১০,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

উটকামণ্ড আশ্রম প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর উদ্‌যাপন

তামিলনাড়ুর নীলগিরি পর্বতমালায় অবস্থিত উটকামণ্ড বা 'উটি'র শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ তার প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর উদ্‌যাপন করল গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখে। আশ্রমটির ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী শিবানন্দজী (মহাপুরুষ মহারাজ) ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে। আশ্রমটির সূচনার সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঘটনা জড়িত আছে।

স্বামী শিবানন্দজী যখন প্রথমবার নীলগিরি যান, তখন সেখানকার ভাবঘন পরিবেশে মুগ্ধ হয়ে তিনি সেখানে মঠের সন্ন্যাসীদের সাধনভজনের জন্য একটি আশ্রম স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এদিকে সি. তিরুভেনগাডাম পিল্লাই নামে অনুন্নত জাতির একজন ধোপা স্বপ্নে দেখেন, তাঁর ইষ্টদেবী মা শীতলা বলছেন ঃ "তোর কাছে জনকতক লোক মঠ তৈরি করার জন্য জায়গা চাইতে এলে তুই দিস।" পরপর কদিন এভাবে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তিনি সানন্দে দু-একর জায়গা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের নামে দানপত্র করে দেন (১১. ৭. ১৯২৪)। এই স্বপ্নবৃত্তান্তের কথা মহাপুরুষ মহারাজ স্বয়ং একাধিক চিঠিতে লিখে মন্তব্য করেছেন ঃ "ঠাকুরের কী যে আশ্চর্য লীলা! আমরা কেহই কিছু বুঝি না।... ঠাকুর মহা-মহিমার্ণব ঈশ্বরাবতার; কোথায় কাহার দ্বারা তাঁর কী কার্য করাইয়া লন আমরা কিছুই জানিতে পারি না। ধন্য তিনি!" নীলগিরি থেকে ফেরার আগে স্থানীয় ভক্তদের বিপুল আগ্রহ ও উদ্দীপনার মধ্যে স্বামী শিবানন্দজী জুন ১৯২৪-এর তৃতীয় সপ্তাহে আশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এরপর স্থানীয় ভক্তরা মন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভ করে বছর দুয়েকের মধ্যে তা সম্পূর্ণ করেন। ১৯২৬-এর ২৪ সেপ্টেম্বর তাঁর দ্বিতীয়বার উটকামণ্ড অবস্থানকালে আশ্রমের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করেন মহাপুরুষ মহারাজ। নতুন মন্দিরে নতুন সিংহাসনে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর পট প্রতিষ্ঠা করে তিনি তাঁদের পূজা, আরতি, ভোগ নিবেদন ও হোম করেন। কেবল আশ্রমপ্রতিষ্ঠাই নয়, উটকামণ্ড-সহ সন্নিহিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা প্রসারে স্বামী শিবানন্দজীর ভূমিকা চিরস্মরণীয়।

জায়গাটি সম্বন্ধে তিনি বলতেন ঃ "(এখানে) ভগবৎ উদ্দীপনা খুব হয়। ধ্যানভজন খুব ভাল হয়।" অনাড়ম্বর, পবিত্র, উচ্চ আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে মহাপুরুষ মহারাজ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে স্থানীয় বহু মানুষকে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারায় আকৃষ্ট করেছিলেন।

বিগত ৭৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে উটকামণ্ডের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠটি নিত্য পূজা-অনুষ্ঠানাদি ছাড়াও বিভিন্ন সেবা-মূলক কাজে ব্যাপৃত থেকেছে। তার মধ্যে রয়েছে দরিদ্রদের আর্থিক সাহায্যদান, দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিকর খাদ্য, পোশাক ও শিক্ষা-সরঞ্জাম বিতরণ প্রভৃতি।

১৯২৬-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে মহাপুরুষ মহারাজ ছিলেন উটকামণ্ডের 'গোদাবরী হাউস'-এ। সেখান থেকে তাঁর সঙ্গে স্থানীয় ভক্তরা ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিমূর্তি মাথায় করে নিয়ে গিয়েছিলেন নতুন মঠে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০১-এ এই ঘটনার অনুরূপ পুনরাবৃত্তি করা হয়। 'গোদাবরী হাউস'-এর বর্তমান মালিক একজন মুসলমান ভদ্রলোক। তাঁর সানন্দ সম্মতিক্রমে ঐ বাড়ির যে বড় ঘরটিতে মহাপুরুষ মহারাজ অবস্থান করেছিলেন বলে জানা যায়, সেখানে সমবেত হন সাধু, ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দ। ঠাকুর, মা, স্বামীজী ও মহাপুরুষ মহারাজের পটের সামনে আরতি ও ভজনগান করা হয়। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ প্রায় তিনশো জন সাধুভক্ত মিলে বেদমন্ত্রোচ্চারণ ও ভজন করতে করতে ঠাকুর, মা, স্বামীজী ও মহাপুরুষ মহারাজের প্রতিকৃতি নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে মঠে পৌঁছান। প্রতিকৃতিগুলি মন্দিরে স্থাপন করে অর্ঘ্যদান করা হয় ও পুনরায় আরতি করা হয়। তারপর উপস্থিত সন্ন্যাসীদের মধ্যে কয়েকজন সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রায় সাড়ে তিনশো ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

প্রতিবেদক—সোমনাথ ভট্টাচার্য

বহির্ভারত

সাম্প্রতিক আমেরিকান প্রবৃত্তি

[মাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির প্রাক্তন আচার্য তথা রামকৃষ্ণ মিশন বস্টন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী সর্বগতানন্দের একটি অভিজ্ঞতার কথা]

মাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির এক ছাত্র প্রায়ই নানারকম উপদেশের জন্য আমার কাছে আসত। ছাত্রটি বেশ মেধাবী। এম. আই. টি. থেকে স্নাতক হওয়ার পর সে সেখানেই একটি চাকরি গ্রহণ করে। যথাসময়ে সে একজন অধ্যাপক হয় এবং বিবাহ করে। সেইসময় আমি তাদের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর একটি কপি (ইংরেজী) উপহার দিই। তারা দুজনেই শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর প্রতি খুবই আকর্ষণ বোধ করতে থাকে; কিন্তু 'কামিনী' ও 'কাঞ্চন' শব্দদুটি নিয়ে তারা খুবই অস্বস্তির মধ্যে পড়ে যায়। এবিষয়ে অধ্যাপক আমাকে জানালে, আমি তাকে বলি যে, তাদের যে-অংশগুলি ভাল লাগে, তারা যেন শুধু সেগুলিই পড়ে; বাকি অংশগুলি তারা বাদ দিতে পারে।

তার বেশ কিছুদিন পর এম. আই. টি.-র সকল অধ্যাপক ও আচার্যগণ ঐ সংস্থার অধ্যক্ষের সঙ্গে এক মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রিত হন। সেদিন ঐ অনুষ্ঠানে আমার সেই অধ্যাপক বন্ধুটি আমার পাশে এসে বসল। কথায় কথায় সে জানতে চায় যে, আমার কাছে 'কথামৃত'-এর আর কয়টি কপি অবশিষ্ট আছে। আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ "কেন, সেগুলি পুড়িয়ে ফেলতে চাও?" সে জবাব দিল, সেগুলি সে তার বন্ধুদের দিতে চায়। প্রসঙ্গ-ক্রমে সে কিছুদিন আগে কেম্ব্রিজ, মাসাচুসেটস্-এ অনুষ্ঠিত একটি সভার কথা বলল। সেই সভায় বহু মনোবিদ্, ধর্মনেতা, বৈজ্ঞানিক এবং আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভায় আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল 'সাম্প্রতিক আমেরিকান প্রবৃত্তি' (The Modern American Trend)।

শক্তি, মুনাফা, ভোগ, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে সেখানে বিবিধ আলোচনা হয়। অবশেষে একজন সমাজ-বিজ্ঞানী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ "বর্তমানে আমেরিকায় আমাদের অনেকেরই আরাধ্য দেবদেবী হলেন ডলার-সম্রাট এবং কাম-সম্রাজ্ঞী।" অধ্যাপক বলল ঃ "শব্দগুলি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার 'কথামৃত'-এ শ্রীরামকৃষ্ণের কথাগুলি মনে পড়ে গেল। প্রায় একইপ্রকার শব্দ—'কামিনী' ও 'কাঞ্চন'।" সে বলতে থাকে ঃ "ভারতবর্ষ অপেক্ষা এই আমেরিকায় আজ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর বিশেষ প্রচার প্রয়োজন। সেই কারণেই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর কপিগুলি আমার বন্ধুদের দেওয়ার জন্য আমি বিশেষভাবে আগ্রহী।" এই কথা শুনে স্বাভাবিকভাবেই আমি তাকে আরো কয়েক কপি 'কথামৃত' দিলাম। সেও খুব খুশি হলো।❑

মূল ইংরেজী থেকে ভাষান্তর ঃ রামেন্দু ব্যানার্জী

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব উৎসব ঃ গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ মহাসমারোহে শ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সকালে মঙ্গলারতি, সানাইবাদন, ভক্তিগীতি, বিশেষ পূজা ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী সর্বগানন্দজী। পরিবেশিত হয় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিবৃন্দের কালীকীর্তন এবং অভিনীত হয় সতী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের যাত্রাপালা। এছাড়া ভক্তিগীতি ও গীতিনাট্য পরিবেশন করেন নীলাঞ্জন নন্দী এবং জগবন্ধু মৈত্র ও সম্প্রদায়। সারাদিনব্যাপী উৎসবে ভোর ৪টা ৩০ মিঃ থেকে রাত ৯টা ৩০ মিঃ পর্যন্ত হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়েছিল। সমাগত প্রায় সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ৯ ও ২৮ জানুয়ারি ২০০২ যথাক্রমে **শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ** এবং **শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজের** জন্মতিথিতে সন্ধ্যারতির পর তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী বিনির্মলানন্দজী।

গত ১৯ জানুয়ারি ২০০২ **শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের** জন্মতিথি পালন করা হয়। ভোরে মঙ্গলারতি,

সকালে ভক্তিগীতি এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে শিবপুর রামকৃষ্ণ মন্দিরের যাত্রাপালা পরিবেশিত হয়। সন্ধ্যারতির পর স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। এদিন বহু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

জাতীয় যুবদিবস পালন: গত ১২ জানুয়ারি ২০০২ বৈদিকস্তোত্র পাঠ, আলোচনা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস পালন করা হয়। এদিন প্রারম্ভিক ভাষণ দেন স্বামী সর্বগানন্দজী এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দজী, স্বামী বিনির্মলানন্দজী এবং অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য। প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন ডঃ কমল নন্দী ও তারকনাথ দে। সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন কাশীনাথ নন্দী, বলাই ঘোষ প্রমুখ। সমাপ্তি ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে স্বামী সনকানন্দজী ও অধ্যাপক শঙ্কর রায়। অনুষ্ঠানে প্রায় ১৫০ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক অংশগ্রহণ করেছিল।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

বাগ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (হিমাচল প্রদেশ): গত ২০-২৪ নভেম্বর ২০০১ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও ধর্মসভা ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ। ধর্মসভায় ভাষণ দান এবং একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। বক্তব্য রাখেন দিল্লি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী গোকুলানন্দজী ও এই আশ্রমের স্বামী সুব্রতানন্দজী। আশ্রমে ৪ দিন অবস্থান করে পূজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজ বহু দীক্ষার্থীকে দীক্ষাদান করেন।

মাল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ (জলপাইগুড়ি): গত ২১ নভেম্বর ২০০১ সঙ্ঘের নবনির্মিত মন্দিরের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কোষাধ্যক্ষ স্বামী প্রমেয়ানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষণ দান করেন স্বামী প্রমেয়ানন্দজী, স্বামী লোকনাথানন্দজী, স্বামী অক্ষয়ানন্দজী, স্বামী বিজয়ানন্দজী প্রমুখ। এদিন দুপুরে প্রায় ২০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

দীঘা সারদা রামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্র (মেদিনীপুর): গত ২৪-২৫ নভেম্বর ২০০১ ভক্তসম্মেলন ও যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। নগর-পরিক্রমা, ভক্তিগীতি, পাঠ ও আলোচনা ছিল ভক্তসম্মেলনের অনুষ্ঠিত বিষয়। সম্মেলনে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী অতন্দ্রানন্দজী। সম্মেলনের উদ্বোধন ও আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী অক্ষতানন্দজী এবং স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী, হেমন্তকুমার দত্ত প্রমুখ। দুপুরে প্রায় ২০০ ভক্ত প্রসাদ পান। পরদিন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয় যুবসম্মেলন। ভক্তিগীতি ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের অনুষ্ঠিত বিষয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী অমৃতলোকানন্দজী, স্বামী অক্ষতানন্দজী, দীপক ভট্টাচার্য প্রমুখ। প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী ও স্বামী সুরেন্দ্রানন্দজী। দুদিনের সম্মেলনে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে স্বামী নিত্যবোধানন্দ ও বিমলানন্দ কর। সম্মেলনে প্রায় ২০০ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক যোগদান করেন।

বামুনমুড়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (উত্তর চব্বিশ পরগনা): গত ২ ডিসেম্বর ২০০১ পাঠ, আলোচনা ও ভক্তিগীতির মাধ্যমে একটি ভক্তসম্মেলন আয়োজিত হয়। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। স্বাগত-ভাষণ দেন সেবাশ্রমের সম্পাদক চণ্ডিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। 'কথামৃত' এবং 'মায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী সনকানন্দজী। 'গীতা' পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুজিত গুপ্ত ও অমল রায়। সম্মেলনে প্রায় শতাধিক ভক্ত যোগদান করেন।

স্যাণ্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (উত্তর চব্বিশ পরগনা): গত ২ ডিসেম্বর ২০০১ একটি শিক্ষাসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। প্রায় ১০০ শিক্ষানুরাগীর উপস্থিতিতে শিক্ষাসম্মেলন আয়োজিত হয় যোগেশগঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। 'চরিত্র ও আদর্শ সমাজ গঠনে শিক্ষকদের ভূমিকা ও করণীয়' বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী, স্বামী চিৎস্বরূপানন্দজী, অধ্যাপক শ্যামল সরদার ও ডঃ শশাঙ্কশেখর মণ্ডল।

কোঠার শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী স্মৃতি মন্দির (ওড়িশা): গত ৫ ডিসেম্বর ২০০১ কোঠারে শ্রীশ্রীমায়ের ৯১তম পদার্পণ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীশ্রীমা পালকিতে চড়ে যেমনভাবে কোঠারে পদার্পণ করেছিলেন, তদনুরূপ এদিন সকালে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি পালকিতে রেখে ভজন-কীর্তন সহকারে সাধু ও ভক্তগণ শোভাযাত্রা-সহকারে নগর পরিক্রমা করে। শ্রীশ্রীমা যে-ঘরে দ্বিমাসাধিক ছিলেন, সেখানে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজিত ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শিবেশ্বরানন্দজী, স্বামী ত্রিলোচনানন্দজী, সমরেশকুমার নিয়োগী প্রমুখ। উৎসবে উপস্থিত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সুন্দরবন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ (উত্তর ২৪ পরগনা): গত ৯ ডিসেম্বর ২০০১ একটি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় হাটাগাছা হাইস্কুলে। সম্মেলনের সূচনা ও আলোচনা করেন স্বামী অঘোরাত্মানন্দজী। এতে ১৭০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

গুরুদাসনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ঘাটাল (মেদিনীপুর): গত ৯ ডিসেম্বর ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ

কালচারের সহযোগিতায় গুরুদাসনগর বিদ্যালয়ে একটি যুবসম্মেলন আয়োজিত হয়। সঙ্গীত, পাঠ, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন ডাঃ সুকুমার গোস্বামী। আলোচনা করেন স্বামী নির্লিপ্তানন্দজী, স্বামী নির্বিকল্পানন্দজী ও ডাঃ সোমনাথ চ্যাটার্জী। সম্মেলনে প্রায় ৩০০ যুব ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। স্বাগত ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে রতনচন্দ্র খামরুই ও অধ্যাপক কমলকুমার মান্না।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, গোপালপুর (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ৯ ডিসেম্বর ২০০১ বেদপাঠ, সঙ্গীত, পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে স্বাগত-ভাষণ দেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী নিষ্ঠানন্দজী। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী বিমুক্তানন্দজী। ভাষণ দেন স্বামী পুরাতনানন্দজী ও স্বামী বিশ্বাদ্যানন্দজী। ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী শ্যামলানন্দজী, অনির্বাণ দাসগুপ্ত প্রমুখ। সম্মেলনে ৩৫০ জন ভক্ত যোগদান করেন।

গাঁতী, বামুনিয়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) : গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০১ বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায়। সঙ্গীত, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল সম্মেলনের বিষয়। 'স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভারতের পুনর্গঠন', 'স্বামীজীর শিক্ষাভাবনায় ধর্ম ও জাতীয়তাবোধ' প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী চিৎরূপানন্দজী, সুধাংশু বিশ্বাস, সুভাষ গাইন, গোপেন চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ৩৫০ জন যুব প্রতিনিধি ও অভিভাবক উপস্থিত ছিল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অমিয় দাস।

পালপাড়া সারদা নারী পাঠচক্র (নদীয়া) : গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০১ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে ১৭৬ জন ভক্ত যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী একব্রতানন্দজী, রীণা চৌধুরী, স্বপ্না কুণ্ডু প্রমুখ। ভাষণ দান করেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী ও স্বামী বরদাত্মানন্দজী।

গড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ (কলকাতা-৭০০ ০৮৪) : গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০১ সঙ্ঘের উদ্যোগে একটি ভক্তসম্মেলন আয়োজিত হয় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সভাকক্ষে। ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও আলোচনাসভা ছিল সম্মেলনের বিষয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ডঃ প্রসিত রায়চৌধুরী এবং ভাষণ দান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। এতে ৭০ জন ভক্ত যোগদান করেছিলেন।

১০ মাইল বাজার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ, নামখানা (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) : গত ২২ ডিসেম্বর ২০০১ সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন বুলবুল চক্রবর্তী। আয়োজিত ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী, সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ ভাস্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রায় ২০০০ ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে ১৫ জন দরিদ্র মানুষকে কম্বল ও ৪২ জন মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে বই দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দ্বীপেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

নববারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ্ (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, পাঠ প্রভৃতি এবং ধর্মসভা ছিল দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের বিষয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী ও ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী। এদিন দুপুরে প্রায় ১১০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

বোড়াল শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) : গত ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর ২০০১ প্রভাতফেরি, 'কথামৃত' ও বাইবেল পাঠ, বিশেষ পূজা, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী ঋদ্ধানন্দজী ও অশোককুমার ঘোষ। উৎসবে প্রায় ৩০০ ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

গোপালনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সঙ্ঘ (পুরুলিয়া) : গত ২৫ ডিসেম্বর ২০০১ বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অভিভাবক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান ও সম্মেলনে আলোচনা করেন যথাক্রমে চপলাকান্ত পণ্ডা এবং স্বামী শিবপ্রদানন্দজী ও স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

নববারাকপুর শ্রীসারদা সঙ্ঘ (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ২৫-২৮ ডিসেম্বর ২০০১ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সঙ্ঘের রজতজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন, ৪২৭ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ, শিক্ষাসম্মেলন, ধর্মসভা প্রভৃতি ছিল উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ। ধর্মসভায় সভানেতৃত্ব করেন শ্রীসারদা মঠের অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণাজী এবং ভাষণ দান করেন উক্ত মঠের সাধারণ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত শিক্ষাসম্মেলনে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা অচিন্ত্যপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণাজী, রুবি ভট্টাচার্য প্রমুখ।

বালুরঘাট সারদা সঙ্ঘ (দক্ষিণ দিনাজপুর) : গত ২৮-৩০ ডিসেম্বর ২০০১ **উত্তরাঞ্চল রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের** ১৯তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, 'কথামৃত' ও 'মায়ের কথা' পাঠ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ধর্মসভা ছিল তিনদিনব্যাপী সম্মেলনের বিশেষ অঙ্গ। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী প্রমেয়ানন্দজী, স্বামী গোপেশানন্দজী, স্বামী পরাশরানন্দজী, স্বামী অক্ষরানন্দজী, স্বামী আত্মলোকানন্দজী ও পূর্ণিয়া আশ্রমের স্বামী বিজয়ানন্দজী। সম্মেলনে উত্তরবঙ্গ, আসাম ও নেপালের ৪০টি সংস্থা থেকে প্রায় দুই শতাধিক প্রতিনিধি যোগদান করেন।

আদ্রা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (পুরুলিয়া) : গত ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর ২০০১ একটি যুবসম্মেলন ও ভক্তসম্মেলন

আয়োজন করা হয়। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত দুটি সম্মেলনে ৬৫০ জন যুব-প্রতিনিধি ও ভক্ত যোগদান করেন। স্তোত্র, 'কথামৃত' ও 'মায়ের কথা' পাঠ, ভক্তিগীতি এবং আলোচনাচক্র ছিল সম্মেলনের অনুষ্ঠিত বিষয়। আলোচনা করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী, স্বামী সন্দর্শনানন্দজী ও স্বামী বিবেকাত্মানন্দজী।

গোবরডাঙ্গা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘ (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ১ জানুয়ারি ২০০২ সানাইবাদন, গীতাপাঠ, বিশেষ পূজা ও আলোচনার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

সরকারপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ১ জানুয়ারি ২০০২ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ ও সঙ্কীর্তনের মাধ্যমে কল্পতরু উৎসব পালিত হয়। 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ ও আলোচনা করেন অধ্যাপক নীরেন্দ্রলাল গুহ।

মির্জাপুর শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালিকা আশ্রম, সিঙ্গুর (হুগলী) : গত ১ জানুয়ারি ২০০২ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে কল্পতরু উৎসব পালন করা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন গাগুরপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী আত্মবিকাশানন্দজী, স্বামী কেশবানন্দ গিরি, রামসিং পাল প্রমুখ। এই উপলক্ষ্যে প্রায় ১৫,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয় এবং ৫০০ দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ধুতি, শাড়ি, চাদর ও ৫৪ জনের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, ভাঙড় (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) : গত ১ জানুয়ারি ২০০২ সানাইবাদন, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও 'কথামৃত' পাঠ, বিশেষ পূজা, পদাবলী কীর্তন, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী এবং ভাষণ দেন স্বামী ঋতানন্দজী, স্বামী অম্বিকেশানন্দজী প্রমুখ। স্বাগত-ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে অলোককুমার ঘোষ ও জয়দেব সাধুখাঁ। উৎসবে প্রায় ৩৫,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শিলচর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (অসম) : গত ১ জানুয়ারি ২০০২ ভক্তিগীতি, জপধ্যান, পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 'কথামৃত', 'মায়ের কথা' ও 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' পাঠ ও আলোচনা করেন যথাক্রমে অজিত রায়, রবিভূষণ রায় ও ননীগোপাল দেবনাথ। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রসূনকান্তি দেব ও রবীন্দ্রকুমার রায়। কল্পতরু উৎসবের তাৎপর্য আলোচনা করেন অতীন দাস।

কোঠাবাড়ি মা সারদা সেবাকেন্দ্র (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ১ জানুয়ারি ২০০২ বৈদিক স্তোত্রপাঠ, পূজা, জপ-ধ্যান, 'কথামৃত' ও 'মায়ের কথা' পাঠ, ভক্তিগীতি এবং ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন চিত্তপ্রিয় মৃধা। পাঠে অংশগ্রহণ করেন সুভাষচন্দ্র গায়েন ও মাণিকচন্দ্র মণ্ডল। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্যাণ্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের স্বামী দেবব্রতানন্দজী। উৎসবে উপস্থিত প্রায় ২৫০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

রামপুরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্র (বীরভূম) : গত ১ জানুয়ারি ২০০২ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি ও আলোচনার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু উৎসব পালিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন দীপিকা রায়, রিয়া মণ্ডল ও নীলা মুখার্জী। 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন মিলনকুমার মুখার্জী। কল্পতরু দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন বিশ্বেশ্বর রায়।

নাগভবন (কলকাতা-৭০০ ০০৬) : গত ১ জানুয়ারি ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের ৯৪তম কল্পতরু উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, পালা-কীর্তন, পাঠ ও ধর্মসভা ছিল উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। বিভিন্ন সময়ে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী, মলয় সাহা, রাজু দাস, তপন সিন্‌হা প্রমুখ। 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী পূতানন্দজী। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পুরাতনানন্দজী, স্বামী গোবিন্দানন্দজী, ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য প্রমুখ। এদিন প্রায় ৪,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। এই উপলক্ষ্যে গত ৩ জানুয়ারি একটি সাধুভাণ্ডারার আয়োজন করা হয়েছিল।

সেবাব্রত

সাঁনবাধা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (বাঁকুড়া) : গত ২০ ডিসেম্বর ২০০১ দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ২০টি কম্বল এবং ২টি চাদর বিতরণ করা হয়েছে।

পরলোকে

'উদ্বোধন'-এর লেখক হৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ গত ২১ নভেম্বর ২০০১ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য সুবর্ণপ্রভা সরকার গত ২০ নভেম্বর ২০০১ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। সত্যনিষ্ঠ, সুমধুর ব্যবহার ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ডাঃ রত্নজিৎ কৃষ্ণ ভট্টাচার্য গত ২১ নভেম্বর ২০০১ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। চাকরিজীবনে তিনি অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ-এ বিশিষ্ট পদে নিযুক্ত ছিলেন। অবসরগ্রহণের পর তিনি রামকৃষ্ণ মিশন নরেন্দ্রপুর আবাসিক হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। তিনি ছিলেন সৎ, কর্মনিষ্ঠ এবং 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত গ্রাহক ও আগ্রহী পাঠক।

শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা বাণী ভট্টাচার্য গত ২০ ডিসেম্বর ২০০১ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি ছিলেন আমেরিকা স্যাক্রামেন্টো আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী প্রপন্নানন্দজীর জননী। দীন-দুঃখীর প্রতি সহানুভূতি ও দানশীলতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি প্রায় ৪০ বছরের অধিক 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহিকা ছিলেন। ❑

নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের ওপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

✽

হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

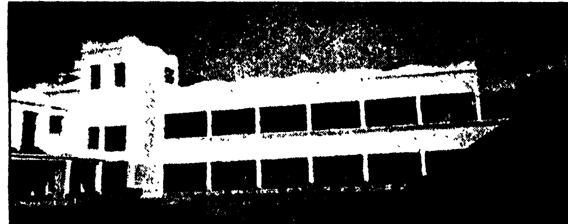
✽

মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকেই আছে, তার বিকাশই ধর্ম।

স্বামী বিবেকানন্দ



সহৃদয় জনসাধারণের প্রতি আবেদন



সহৃদয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ অর্থানুকূল্যে আমাদের ভগ্নপ্রায় স্কুলগৃহটি পুনর্নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাঁদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।

আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি।

১।	১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ	ঃ	১,২০,০০০ টাকা
২।	দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
৩।	পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
৪।	আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প	ঃ	১০,০০,০০০ টাকা
৫।	একখানা অ্যাম্বুল্যান্স (Ambulance)	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
			২৬,২০,০০০ টাকা

A/c Payee চেক/ড্রাফট 'Ramakrishna Mission Ashrama, Ramharipur'—এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফট পাঠাবার ঠিকানা—সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা—বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ ঃ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন নং ৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি

স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
রামহরিপুর, জেলা ঃ বাঁকুড়া

তাঁর নামবীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ



জেলাভিত্তিক 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৩

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

বাংলাদেশ ❑ রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা-৩

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ❑ সত্যনারায়ণ রায়, ৮২৫ ডেটন কোর্ট, কনকর্ড, সি. এ.-৯৪৫১৮, ই. মেল : satya_ray@yahoo.com

দিল্লি

- রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, নিউ দিল্লি-১১০০৫৫
- পারমিতা ঘোষাল, ৪০/১৮, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯
- মঞ্জুলা ঘোষ, ৯, শিবালিক অ্যাপার্টমেন্ট, অলকানন্দা নিউ দিল্লি-১১০০১৯, ফোন : (০১১) ৬২১-৮৪৭৪

আন্দামান

- রামকৃষ্ণ মিশন, পোর্ট ব্লেয়ার, পিন : ৭৪৪১০৪ ফোন : (০৩১৯২) ৩২৪৩২

আসাম

- রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, শিলচর
- রামকৃষ্ণ মঠ, করিমগঞ্জ
- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন রোড উলুবাড়ি, গুয়াহাটি, জেলা : কামরূপ-৭৮১০০৭
- রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বনগাইগাঁও
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, তিনসুকিয়া-৭৮৬১২৫
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, মহাত্মা গান্ধী রোড, নগাঁও-৭৮২০০১
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, পোঃ হোজাই, নগাঁও-৭৮২৪৩৫
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, জি. এন. বি. রোড পোঃ দুম দুমা, জেলা : তিনসুকিয়া-৭৮৬১৫১
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম গোসাইগাঁও, জেলা : কোকড়াঝাড় (বি. এ. সি.)-৭৮৩৩৬০
- পরিমলকৃষ্ণ পাল প্রযত্নে মেসার্স মা কালী স্টোর্স, বি. জি. রেলওয়ে গেট পোঃ + জেলা : কোকড়াঝাড়-৭৮৩৩৭০
- এম. কে. বুক সেলার্স, পো : বি. চারালী, জেলা : শোণিতপুর
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, পূর্ণানন্দ রোড, ডিব্রুগড়-৭৮৬০০১
- শান্তিকুমার রায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (তেজপুর), জেলা : শান্তিপুর

ত্রিপুরা

- রামকৃষ্ণ মিশন, আগরতলা
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পোঃ খোয়াই, লালচড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা-৭৯৯২০১
- সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, উদয়পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১২০
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম পোঃ বিলোনিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১৫৫
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি রোড ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা-৭৯৯২৫০

নাগাল্যান্ড

- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ডিমাপুর-৭৯৭১১২

ওড়িশা

- রামকৃষ্ণ মঠ, চক্রতীর্থ, পুরী
- শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার সমিতি খটবিন সাহী, কটক-৭৫৩০০৮
- শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, হামিরপুর, পোঃ রাউরকেল্লা-৭৬৯০০৩

অরুণাচল প্রদেশ

- শ্যামল সিন্‌হা রায়, সম্পাদক, বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল নাহারলগন, ইটানগর-৭৯১১১৩

বিহার

- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামকৃষ্ণ অ্যাভেনিউ, পাটনা-৮০০০০৪

ঝাড়খণ্ড

- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ১১, ১২ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ রোড, মোরাবাদি, রাঁচি-৮৩৪০০৮
- শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ সেক্টর-১বি, বোকারো স্টীল সিটি
- রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি বিষ্টুপুর, জামশেদপুর-৮৩১০০১
- রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি, ব্যাঙ্ক রোড, ধানবাদ
- রীতা ভট্টাচার্য, 'অনুভব', এইচ. ই. স্কুল রোড, হীরাপুর, ধানবাদ-৮২৩৬৮৮

উত্তরপ্রদেশ

- রামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ নিরালানগর, লখনৌ-২২৬০২০

মধ্যপ্রদেশ

- রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ কোয়ার্টার নং ৫০৭, (এস. এস.)/২, বাচেলি, জেলা : বস্তার

অন্ধ্রপ্রদেশ

- পি. কে. মুখোপাধ্যায়, চীফ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)
- এম. কে. পাল, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) ও. এন. জি. সি., কে. জি. পি ডি. নাম্বার : ৪৬-৭-৩৫, দানাভাইপেটা, রাজমুন্দ্রি-৫৩৩১০৩

মহারাষ্ট্র

- রামকৃষ্ণ মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন মার্গ, খার, মুম্বাই-৪০০ ০৫২
- প্রদীপচন্দ্র পাল, 'গুরুধাম', ই-২৮, আর. এইচ.-১, সেক্টর-৮ বাসী, নবী, মুম্বাই-৪০০৭০৩
- মহুয়া দাশগুপ্তা, ৮-এ/১১, বৃন্দাবন সোসাইটি, থানে-৪০০৬০১

গুজরাট

- সলিলচন্দ্র ঘোষ, সি-৩-৫০১, ও. এন. জি. সি. কলোনী আমেদাবাদ-৩৮০০০৫
- মীরা মিত্র, প্রযত্নে জি. সি. মিত্র ৩/৮২, জি. আর. টাউনশিপ, জওহরনগর, বরোদা-৩৯১৩২০
- মোহিতরঞ্জন দাস, ৫০৩, নর্মদা টাওয়ার্স ও. এন. জি. সি. কলোনী, পোঃ আঙ্কলেশ্বর-৩৯৩০১০
- প্রভাত মুখার্জী, সাইকৃপা অ্যাপার্টমেন্ট সিভিল হাসপাতাল রোড, নানকওয়াড়া, ভালসাড-৩৯৬০০১ ফোন : ০২৬৩২/৪২৩৭৩ ই. মেল : dr.pulak@ad1.vsnl.net.in

আমাদের প্রকাশিত চিরায়ত গ্রন্থরাজি

প্রবন্ধ

রমেশচন্দ্র দত্ত
প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাস ৬০
বাংলার কৃষকসমাজ ৬০

গর্ডন চাইল্ড
ম্যান মেক্‌স হিমসেলফ ৮০
সোশ্যাল ইভলিউশন ৬০

পল লাফার্গ
সম্পত্তির বিবর্তন ৪০
সমাজ, দর্শন ও ধর্মচিন্তার বিবর্তন ৭৫

লুইস হেনরী মর্গ্যান
এনসিয়েন্ট সোসাইটি (২ খণ্ডে) ১৭০

বার্ট্রান্ড রাসেল
মানুষের কি কোনও ভবিষ্যৎ আছে? ৪০
প্রব্লেমস অফ ফিলসফি ৭৫

চার্লস ডারউইন
ডিসেন্ট অফ ম্যান (৩ খণ্ডে) ১৬৫
অরিজিন অফ স্পিসিস (২ খণ্ডে) ২৫০

সিগমুন্ড ফ্রয়েড
স্বপ্ন ৬০
স্নায়ুরোগ ১০০
স্বপ্ন সমীক্ষণ (১ম খণ্ড) ১২৫

কার্ল গুস্তাভ ইয়ুঙ
স্বপ্নপ্রতীক ১০০

সুশোভন সরকার
বাংলার রেনেসাঁস ৬০

এ. সি. মুরহাউস
লিখন ও বর্ণমালা ৩৫

বসুধা চক্রবর্তী
মানবতাবাদ ৭৫

অমিয় রায়চৌধুরী
শতবর্ষের সিনেমা ও চার্লি চ্যাপলিন ১৮০

সৌমেন গুহ
সের্গেই আইজেনস্টাইন: জীবন ও চলচ্চিত্র ৭৫

প্রবীর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
বাঙালির শিক্ষাচিন্তা (১ম খণ্ড) ১৫০

আনা ফ্রাঙ্ক
আনা ফ্রাঙ্ক রচনা সমগ্র ১০০

শিবাদিত্য দাশগুপ্ত ও সন্দীপন ভট্টাচার্য সম্পাদিত
ঋত্বিক ঘটকের ১৮টি সাক্ষাৎকার
ও ঋত্বিক সম্পর্কে ২১ জনের লেখা
সাক্ষাৎ ঋত্বিক ১৫০

চিত্রকলা ও ভাস্কর্য

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি
নোটবুক (১ম ভাগ) ৯০

হারবার্ট রিড
শিল্পের সারার্থ (দ্য মিনিং অফ আর্ট) ১৫০

নির্মাল্য নাগ
শিল্পচেতনা ১৫০ (১০০টি আর্টপ্লেট-সহ)
চিত্রভাষা ১৫০ (১০০টি আর্টপ্লেট-সহ)

কমলকুমার মজুমদার
বঙ্গীয় শিল্পধারা ও অন্যান্য প্রবন্ধ ৬০
বাংলার মনোলোক ১২৫

সন্তোষকুমার বসু
ভারতশিল্পে দেহজ শ্রম ও অন্যান্য প্রবন্ধ ১০০

টমাস ক্র্যাভেন
ফেমাস আর্টিস্টস অ্যান্ড দেয়ার মডেলস ১২৫

ক্লিফোর্ড হল
প্রতিকৃতি অঙ্কন : আঙ্গিক ও প্রকরণ ৭০

পিয়ের লা মুর
শিল্পী তুলুজ লোত্রেকের জীবনী উপন্যাস
মুল্যাঁ রুজ ১৮০

মীরা মুখোপাধ্যায়
বিশ্বকর্মার সন্ধানে ৮০

সুধীর খাস্তগীর
আমার এ পথ ১০০

সন্দীপন ভট্টাচার্য সম্পাদিত
ছবির রাজনীতি রাজনৈতিক ছবি ১২৫

সংগীত

উৎপলা গোস্বামী
ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত ১০০

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে
হিন্দুস্থানী সংগীতি-পদ্ধতি (১২খণ্ডে ১৪৫৫)

পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস
সেতার ও অন্যান্য তারযন্ত্র বাদনের আকর গ্রন্থ
সপ্ততন্ত্রিকা তত্ত্ব (৪ খণ্ডে ২৭৫)
ঠুমরী লহরী (৩ খণ্ডে ৩৪৫)
গজল-এ-গুলিস্তাঁ ১০০
পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিতব্য ১৫০০ রাগের কোষগ্রন্থ
রাগতন্ত্রমালা (১ম খণ্ড ১২০)

গীতা সোম সম্পাদিত
ভজন ও ভক্তিগীতি-মালিকা ৭০
(১ম খণ্ড : মীরাবাঈ) স্বরলিপি-সহ ১০০টি গান
ভজন ও ভক্তিগীতি-মালিকা ১০০
(২য় খণ্ড : জয়দেব, বিদ্যাপতি, কবীর, সুরদাস, রুইদাস, রামদাস, ব্রহ্মানন্দ, সুখানন্দ, মলুকদাস, হরিদাস, নরসী মেহতা)
ভজন ও ভক্তিগীতি-মালিকা ১০০
(৩য় খণ্ড : তুলসীদাস, নানক, তানসেন, বৈজু বাওরা, আমীর খুসরো, নিজামুদ্দিন আউলিয়া প্রমুখ)

অহোবল পণ্ডিত
বিশ্লেষণ-সহ সরল বঙ্গানুবাদ
সংগীত-পারিজাত ১০০

সঙ্গীতকলানিধি তাপস আদিত্য
কণ্ঠসংগীত মধ্যমা
(মধ্য, রবীন্দ্র পরীক্ষার কণ্ঠসংগীত পাঠক্রম অনুসারে লিখিত)

সুবোধচন্দ্র নন্দী সংগীতশাস্ত্রী
সংগীত সুধা ১ম খণ্ড
(সংগীত শিক্ষার্থীদের ক্রিয়াত্মক পাঠক্রম অনুসারে লিখিত)

আয়ুর্বেদ

মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদ-সহ

আচার্য্য গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ ১৩০

মহর্ষি বাগ্‌ভট
রসরত্নসমুচ্চয় (২ খণ্ডে ৪৫০)
সংযোজন : আচার্য্য বিজয়কালী ভট্টাচার্য্য ● রসরহস্য বিজ্ঞানম্‌ ।। উপেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ● পরিভাষা প্রদীপঃ ।।

ভিষগ্বর গোবিন্দদাস বিশারদ
(বিনোদলাল সেনগুপ্ত অনূদিত)
মাধবকরনিদান-সহ ভৈষজ্যরত্নাবলী (৩ খণ্ডে ৪৮০)

মহর্ষি কণাদ
নাড়ীবিজ্ঞান ও নাড়ীপ্রকাশ ৪০

মহামতি শ্রীমৎ মাধব কর
নিদান ২০০
সংযোজন : বৈদ্যাচার্য্য বিজয়রক্ষিত ● রোগবিজ্ঞান।। কবিরাজ ভুবনেশ্বর গুপ্ত ● রোগনির্ণয়-সংগ্রহ ।। কবিরাজ অমৃতলাল গুপ্ত ● নাড়ীজ্ঞান-রহস্য ।।

কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
আয়ুর্বেদ সংগ্রহ (৪ খণ্ডে ৬০০)

কবিরাজ অমৃতলাল গুপ্ত
আয়ুর্বেদ শিক্ষা (৪ খণ্ডে ৫০০)

শার্ঙ্গধর
চিকিৎসা সংগ্রহ ১০০

মহর্ষি সুশ্রুত
সুশ্রুত সংহিতা (৪ খণ্ডে ৬০০)

মহর্ষি চরক
চরক সংহিতা (৪ খণ্ডে)

মহর্ষি বাগ্‌ভট
অষ্টাঙ্গহৃদয় (২ খণ্ডে ৩০০)

শ্রীচক্রপাণি দত্ত
চক্রদত্ত ১৪০

মহামতি ভাবমিশ্র
ভাবপ্রকাশ (৪ খণ্ডে ৯০০)

রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ
আয়ুর্বেদ সোপান ৭৫

সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন
কায়-চিকিৎসা ১৫০

রাখালচন্দ্র দত্ত কবিরাজ
আয়ুর্বেদীয় ফলিত চিকিৎসাবিধান ২৪০

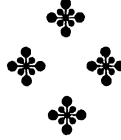
অধ্যাপক আশীষকুমার মল্লিক
আয়ুর্বেদ সিদ্ধান্ত :
দর্শন ও পদার্থ সূত্র ২৫০

অধ্যাপক আশীষকুমার মল্লিক সম্পাদিত
আয়ুর্বেদ সংকলন ২২৫
সংকলনে অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থসমূহ
কবিরাজ কালীশচন্দ্র সেনগুপ্ত ● শারীরবিজ্ঞান।।
কবিরাজ অমৃতলাল গুপ্ত ● বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা।।
কবিরাজ বিজয়কালী ভট্টাচার্য ● আয়ুর্বেদের ইতিহাস।।
কবিরাজ কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন ● সহজ রোগনির্ণয়।।

দীপায়ন ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৯ ফোন ২২৪১৪১৩০

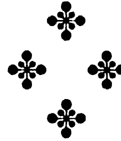
হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্মজন্মান্তরের পাপও তাঁর একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ



যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবত্তত্ত্বের আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী



বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ



উপভোগ করুন নিরাপত্তাপূর্ণ সুখী জীবনের পরম আনন্দ

পিয়ারলেস এম.আই.এস : ২০০০



মেয়াদ	সুনিশ্চিত প্রাপ্তি (প্রতিমাসে)	জমারাশি
১ বৎসর	৬৪৩ টাকা : প্রথম বর্ষে	১,০০,০০০ টাকা
২ বৎসর	৭৪০ টাকা : দ্বিতীয় বর্ষে	(ন্যূনতম ১০,০০০ টাকা
২½ বৎসর	৮৩৫ টাকা : দ্বিতীয় বর্ষের পরে	ও ৫,০০০ টাকার গুণিতকে
২½ বৎসরে	মোট ২১,৬০৬ টাকা	যেকোন উচ্চরাশি)

মূল বৈশিষ্ট্যগুলি :

- গ্যারান্টিযুক্ত প্রাপ্তি
- অগ্রীম পোস্টডেটেড চেক—পুরো আর্থিক বৎসরের
- উচ্চ লিকুইডিটি
- বাজারে তুলনামূলকভাবে স্বল্প মেয়াদি প্রকল্পগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ প্রাপ্তি
- তিনমাস পরে জমারাশির ৭৫% পর্যন্ত ঋণ পাওয়ার সুবিধা

ম্যাচিওরিটি দাবীপূরণের মোট পরিমাণ :
৩,০০০ কোটি টাকারও বেশি



Estd 1932

® পিয়ারলেস
সঞ্চয়ের সহজ পথ
★
আস্থার প্রতীক

Website-http://www.peerless-in-india.com

ARUN SIGN/PGFI:392

UDBODHAN
Phone : 554-2248, 554-2403
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com
udbodhan@vsnl.net

Vol. 104
No. 2
FEBRUARY
2002

Licensed to Post
Without Prepayment
Licence No.
TECH/WB/RNP-15/LPWP-01/2002

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Regn. No.
TECH/WB/RNP-15/2002

উদ্বোধন

১০৪তম বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত



প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

✤ গত ১লা মাঘ ১৪০৮ (১৫ জানুয়ারি ২০০২) **উদ্বোধন ১০৪তম বর্ষে** পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় **নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব** নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের **১০৩ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম** ✤

✿ **বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। **ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য** এবং **রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের** সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত** রামকৃষ্ণ **সঙ্ঘের** একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **উদ্বোধন** আপনাকে পড়তে হবে।

✿ স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে **উদ্বোধন** নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই **উদ্বোধন** একটি সার্থক **পারিবারিক পত্রিকা**। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা **উদ্বোধন**-এ প্রকাশিত হয়।

✿ **উদ্বোধন** অসাম্প্রদায়িক। **উদ্বোধন-এর** গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার **গ্রাহক** হওয়া নয়, একটি **মহান ভাবাদর্শ ও** ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

✿ **উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী** এবং **স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।**

✿ **স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন যেন থাকে। উদ্বোধন**-এর **প্রত্যেক** গ্রাহক **একজন করে নূতন গ্রাহক করলেই** এখনি **উদ্বোধন**-এর **গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার** হয়ে যায়। তাই আপনার **নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়**, **অন্যদের গ্রাহক করাও** আপনার কাছে **স্বামীজীর প্রত্যাশা**। স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের **গর্বিত দায়িত্ব আমাদের সকলের।**

✿ **উদ্বোধন-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে** মতিলাল-তরুবালা পালের স্মৃতিতে তাঁদের পুত্রকন্যাদের পক্ষে **স্থায়ী ভিত্তিতে 'উদ্বোধন মেধা সম্মান' (একবছরের জন্য উদ্বোধন-এর সাম্মানিক গ্রাহকভুক্তি)** নিবেদিত হয়েছে। **পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জন প্রতি বছর এই সম্মানের** যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। **২০০১ সালের** জন্য অনুরূপ **সম্মান** সুকুমার-বিভারানী পাড়ুই-এর স্মৃতিতে তাঁদের **পুত্র অমর পাড়ুই** নিবেদন করেছেন। **এই সম্মানপ্রাপকদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পর্ষদ পরিচালিত ২০০১ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উভয় 'সম্মান'-এর জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বোধন-সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ** করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

✿ **উদ্বোধন**-এর সেবায় চারটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি **'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল'**, অন্য তিনটি যথাক্রমে **'স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ স্মৃতি তহবিল', 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল'** এবং **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'। উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে 'Ramakrishna Math, Baghbazar'—এই নামে** পাঠাবেন। **ঠিকানা : সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩।** দাতার চিঠিতে বা M.O. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা। সডাক ৯৫ টাকা।

স্বামী সর্বগানন্দ
সম্পাদক

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ



চৈত্র ১৪০৮ ৩য় সংখ্যা

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন

১০৪



"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ



শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম

পোঃ কালাডি, জেলা ঃ এর্নাকুলাম, কেরালা, পিন ঃ ৬৮৩৫৭৪
দূরভাষ ঃ (০৪৮৪) ৪৬২৩৪৫/৪৬১০৭১ এবং ৪৬৩১৪১ (বিদ্যালয়)
ই. মেল ঃ **srka-adv@eth.net** এবং **srka-adv@netkracker.com**

সেবাব্রতের আহ্বান

একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

বন্ধু এবং শুভার্থীগণ,

আপনারা নিশ্চয়ই অবহিত আছেন যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে চরিত্রগঠনের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিগণের ভাবধারার বিকাশ ঘটিয়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্রেম ও শ্রদ্ধা, গ্রহণ ও সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে এক নব্য সমাজধারা প্রবর্তন করে যে ব্যাপক আন্দোলনের সূচনা করেছে, তার অন্তর্নিহিত সার্বজনীনতা, আধুনিকতা এবং সমন্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আজ এই আন্দোলন একটি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ভাবরূপে স্বীকৃতিলাভ করেছে।

শিক্ষার মাধ্যমে এই মানবিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শগুলিকে মানুষের কাছে অতি সহজে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশে, প্রায় শতবর্ষ পূর্বে রামকৃষ্ণ মিশন এই জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। গত ৬৫ বছর ব্যাপী শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জনহিতকর নানা কাজে মূল্যবান অবদানের জন্য কেরালা প্রদেশের কালাডিতে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্রটির, বোধকরি, আজ আর নতুন করে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। আদি শঙ্করাচার্যের পবিত্র জন্মস্থানে অবস্থিত এই শাখাকেন্দ্রটি বর্তমান পরিকাঠামোর মধ্যেই একটি নতুন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

অতএব, আমরা সমাজসচেতন এবং লোকহিতকর সকল বন্ধু, সাহায্যকারী এবং শুভার্থীদের কাছে এই মহৎ কাজের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাতে বাধ্য হচ্ছি। এককালীন, মাসিক ভিত্তিতে অথবা 'স্পনসর' রূপে যেকোন আর্থিক সাহায্য সরাসরি আশ্রমের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই সাহায্য সকলের মধ্যে এক সুসম্পর্ক গড়ে তুলবে এবং এই মহৎ কাজে যৌথ উদ্যোগের অংশীদার হতে পারার জন্য সমাজের কাছে সকলে ধন্যবাদার্হ হবেন সেবিষয়ে সন্দেহ নেই।

আনুমানিক ব্যয়ের তালিকা

(১)	উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য নতুন বাড়ি নির্মাণ	৭৫ লক্ষ টাকা
(২)	পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানের জন্য পরীক্ষাগার নির্মাণ	১৫ লক্ষ টাকা
(৩)	অফিস এবং শ্রেণীকক্ষের জন্য আসবাবপত্র ইত্যাদি	৫ লক্ষ টাকা
(৪)	লাইব্রেরীর জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি	৫ লক্ষ টাকা
(৫)	বিদ্যালয়ের কাজের জন্য একটি গাড়ি ক্রয়	৫ লক্ষ টাকা
	মোট	১০৫ লক্ষ টাকা

সকল দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।
আপনার আন্তরিক সাহায্য প্রার্থনা করি।

আপনাদের শ্রীরামকৃষ্ণের
স্বামী পুরন্দরানন্দ
অধ্যক্ষ



উদ্বোধন

॥১০৪॥

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র

১০৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে

দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র

১০৪তম বর্ষ | ৩য় সংখ্যা | চৈত্র ১৪০৮ | মার্চ ২০০২

প্রচ্ছদ : গোমুখের চিত্র। হিমালয়ের হিমশৈলাবৃত গহ্বর থেকে গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, অবিরাম, উদ্দাম, অক্লান্ত গতিতে। এ যেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবগঙ্গা' বিবেকানন্দ-গোমুখের মধ্য দিয়ে জগৎকল্যাণার্থে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান! শিবচক্ষুটিও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। *আলোকচিত্র : ডাঃ তমোনাশ ভট্টাচার্য।*

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ



সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।

ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ : ৭৫ টাকা; সডাক : ৯৫ টাকা ❑ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য : ১০ টাকা

Statement about Ownership and Other Particulars of

UDBODHAN

FORM IV

Place of Publication :	1, Udbodhan Lane, Baghbazar Kolkata-700 003
Periodicity of its Publication :	Monthly
Printer's Name	Swami Satyavratananda
Whether citizen of India	Yes
Address	1, Udbodhan Lane, Kolkata-700 003
Publisher's Name	Swami Satyavratananda
Whether citizen of India	Yes
Address	1, Udbodhan Lane, Kolkata-700 003
Editor's Name	Swami Sarvagananda
Whether citizen of India	Yes
Address	1, Udbodhan Lane, Kolkata-700 003
Name & Address of Individuals who own the Newspaper and partners or shareholders holding more than 1% of the capital	Trustees of the Ramakrishna Math, Belur Math, Howrah-711 202 West Bengal

Swami Ranganathananda	*President*	do
Swami Gahanananda	*Vice-President*	do
Swami Atmasthananda	*Vice-President*	do
Swami Smarananananda	*General Secretary*	do
Swami Shivamayananda	*Asstt. Secretary*	do
Swami Suhitananda	,, ,,	do
Swami Bhajanananda	,, ,,	do
Swami Srikarananda	,, ,,	do
Swami Prameyananda	*Treasurer*	do
Swami Atmaramananda	Trustee	do
Swami Gautamananda	,,	do
Swami Gitananda	,,	do
Swami Mumukshananda	,,	do
Swami Prabhananda	,,	do
Swami Tattwabodhananda	,,	do
Swami Vagishananda	,,	do
Swami Vandanananda	,,	do

I, Swami Satyavratananda, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. SWAMI SATYAVRATANANDA
Signature of Publisher

Date : 1. 3. 2002

Printed in compliance with the Rule 8 of the Registration of Newspapers (Central) Rules 1956









সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্।। (গীতা, ৫।৪)

ঈশ্বরলাভের দুটি পথ। জ্ঞানপথ ও কর্মপথ। জ্ঞানপথে বিচার করিতে হয়—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। সাধকের অন্তর্নিহিত আত্মাই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। কর্মপথে সমত্ব বুদ্ধি আরোপ করিয়া পূর্ণরূপে নিষ্কাম হইয়া [অর্থাৎ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে স্থিত হইয়া] সাধক পরম মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। দুটি পথ পৃথক নহে। যাঁহারা পণ্ডিত, সত্যদর্শী—তাঁহারা একথা জানেন। তাঁহারা ইহাও জানেন, জ্ঞানী ও কর্মী উভয়ই স্বীয় সাধনমার্গে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হইলে একই মোক্ষফল লাভ করিয়া থাকেন।

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।। (ঐ, ৫।৫)

জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ যে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন, কর্মযোগী সাধকগণও সেই পদই প্রাপ্ত হন। যিনি সাংখ্য (জ্ঞানমার্গ) ও যোগ (নিষ্কাম কর্মমার্গ)-এর সমত্ব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থদর্শী, তিনিই সত্যপ্রতিষ্ঠ মহাপুরুষ।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।। (ঐ, ৫।১০)

নিষ্কাম কর্ম করা সহজসাধ্য নহে। এবং কর্ম সকলকেই করিতে হয়। কর্মফল তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইতে থাকে। উহা গ্রহণ করিব না বলিলে সে শুনে না। অতএব, উহা গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরকে সমর্পণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। 'ভক্ত'-এর সম্মুখে ঈশ্বর বিরাজমান। কিন্তু 'জ্ঞানী' ব্রহ্ম ব্যতীত কিছু জানেন না। তাই শ্রীভগবান বলিয়াছেন, 'ব্রহ্মণ্যাধায়'—ব্রহ্মার্পণ-বুদ্ধিতে কর্ম করিতে হইবে। সঠিকভাবে কর্ম অনুষ্ঠিত হইলে এবং কর্ম-সমর্পণ যথাযথ হইলে উহা সাধককে স্পর্শও করিবে না—যেমন পদ্মপত্রে জলবিন্দু পড়িলেও উহা গড়াইয়া যায়, পত্রকে স্পর্শ করে না। কর্ম স্পর্শ না করিলে সাধক সহজেই শোক, দুঃখ, ক্ষোভ, রিপু, জন্ম ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া আনন্দময় স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

"এল ও ভি ই"

[পূর্বানুবৃত্তি]

'প্রথিতপুরুষঃ' শব্দের আরেকটি অর্থ 'অন্তর্যামী'। জীবের অন্তরে থাকিয়া যিনি তাহাকে পরিচালনা করেন, তিনি অন্তর্যামী। উপনিষদ্‌কার বর্ণনা করিয়াছেন: "তম্ অন্তর্যামিণং য ইমং চ লোকং পরং চ লোকং সর্বাণি চ ভূতানি যঃ অন্তরো যময়তীতি।" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৩।৭।১) অর্থাৎ ইহলোক-পরলোকে তিনি সমস্ত জীবের অন্তরে বাস করিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। এই কারণেই আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত কেহই তাঁহাকে অস্বীকার করিতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথিতপুরুষ। তিনি অন্তর্যামী। স্বামী বিবেকানন্দ স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণই সকলের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে বিরাজিত। তাঁহার অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিলে অথবা তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে নিজেরই অস্তিত্বসঙ্কট উপস্থিত হইয়া থাকে। তিনিই আমাদের নিত্য সুহৃদ, নিত্য "সঙ্গী বজ্রহস্ত দীপ্ত অন্তর্যামী"। অন্তর্যামিরূপে তিনি আমাদের অন্তরে রহিয়া ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। 'অন্তর্যামী' শব্দের আরেকটি অর্থ হইল, যিনি সকলের মনের কথা জানেন, মনোগতজ্ঞ। একদা হরিপ্রসন্ন (পরবর্তী কালে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পদসেবা করিতেছেন। সহসা শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন: "আমি সকলের অন্তর কাঁচের আলমারির মধ্যে জিনিসপত্র রাখলে যেমন দেখা যায়, ঠিক তেমনি দেখতে পাই।" হরিপ্রসন্ন ভীত হইয়া ভাবিলেন: "তাহলে তো আমার ভিতরেও কি সব আছে দেখতে পাচ্ছেন।" অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো কারোর ভিতরের মন্দ বস্তু প্রকাশ করিয়া তাহাকে অপ্রস্তুত করিতেন না। যে-কথা হইতেছিল, ঠাকুর অন্তর্যামী, সকলের মনোগতজ্ঞ। কিন্তু তিনি সাক্ষিবৎ আচরণ করেন। সব দেখিয়া, বুঝিয়াও কিছুই করেন না। যখন সাধক শরণাগত হইয়া তাঁহার নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিবে, তখনই তিনি অন্তর্যামিরূপে তাহার মন ও ইন্দ্রিয়সকল নিয়ন্ত্রণ করিবেন। ভগবদ্গীতার সেই মহান আশ্বাসবাণী উদ্ধৃত করিতেছি—"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ/ অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।" (১৮।৬৬) সকল ধর্মাধর্ম বিসর্জন দিয়া আমার অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হও। আমি [শ্রীভগবান] তোমাকে সমস্ত সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ পাপ হইতে মুক্ত করিয়া মোক্ষ বা মুক্তি প্রদান করিব। শোক করিও না, শোকের কোন হেতু নাই।

'প্রথিতঃ পুরুষঃ' শব্দটির উল্লেখ গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে (১৮) রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"তস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।।"

—সেই কারণে আমি ক্ষরের অতীত, অক্ষর অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম। আমিই ত্রিভুবনে ও চতুর্বেদে প্রথিতপুরুষ। শ্রীশঙ্করাচার্য ইহার সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ অধ্যায়ে পূর্বতন শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন—"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ"। পুরুষ দুই প্রকার—ক্ষর ও অক্ষর। ক্ষয়িষ্ণু এই জগৎসংসার অপরিবর্তনীয় বলিয়া মনে হইলেও জগৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল। আমাদের এই রক্ত-মাংসের স্থূল মানবদেহও অহরহ পরিবর্তিত হইতেছে। আমরা মোহগ্রস্ত হইয়া এই পরিবর্তনকে চাক্ষুষ করিতে না পারিলেও এই শরীর সতত ক্ষয়িষ্ণু। এই 'ক্ষয়িষ্ণু পুরুষ'ই ক্ষর। বস্তুত, শরীর-মন-বুদ্ধি পরিবর্তিত হইতেছে—ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। তাই এই 'ক্ষয়িষ্ণু মানুষ'-এর স্থূল আকারকে গীতামুখে শ্রীভগবান 'ক্ষর' বলিয়া উল্লেখ করিলেন। যিনি এই শরীরের মধ্যে আছেন, তিনি শরীরী। তিনিই শরীরের মালিক। শঙ্করাচার্য বলিলেন—জন্মজন্মান্তরের ভূয়ো ভূয়ো সংস্কারের আশ্রয়স্থলরূপে সেই জীবাত্মাই অক্ষরপুরুষ। কিন্তু ভগবান নিজে কী? বলিলেন—'অহং ক্ষরম্ অতীতঃ'—আমি ক্ষরের অতীত। ক্ষরপুরুষ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এবং 'অক্ষরাদপি চ উত্তমঃ'—'অক্ষর' হইতে আমি উৎকৃষ্টতম, 'উত্তমঃ'। অথবা ঊর্ধ্বতম, তাই 'উত্তমঃ'। অর্থাৎ আমি [ভগবান] অক্ষর অপেক্ষা উত্তম—ঊর্ধ্বে অবস্থিত। উৎকৃষ্ট বলিলে 'সমপর্যায়ভুক্তি'র সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। অর্থাৎ অক্ষর-পুরুষ এবং শ্রীভগবান সমশ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়েন, একই শ্রেণীর মধ্যেই একজন অপর হইতে উৎকৃষ্ট। এই আশঙ্কায় শঙ্করাচার্য সাথেসাথেই বলিলেন 'ঊর্ধ্বতমো বা'। অক্ষর-পুরুষেরও ঊর্ধ্বে তিনি অবস্থিত। অতএব মর্মার্থ ইহাই হইল—আমাদের এই ক্ষয়িষ্ণু স্থূলশরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সম্মিলিতভাবে 'ক্ষরপুরুষ'। কর্মাশয় অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ জন্মের সংস্কারবাহী কারণশরীর-সহ গমনাগমনশীল জীবাত্মাই অক্ষরপুরুষ। কিন্তু ঈশ্বর ইঁহারও ঊর্ধ্বে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত সত্তা, যাহা সকলপ্রকার কার্য-কারণের অতীত। আমাদের আলোচ্য সেই ঈশ্বর কে? তিনিই প্রথিতপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। 'লোকে বেদে চ'—বেদে এবং

চতুর্দশ ভুবনে প্রখ্যাত সেই প্রথিতপুরুষই ইদানীং রামকৃষ্ণতনু ধারণপূর্বক জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

স্বামীজী পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের বন্দনাস্তব রচনা করিলেন—যেন নিজের কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। সেই একবার শ্রীরামকৃষ্ণের শিয়রে দাঁড়াইয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন—"এখন, যদি এই সময়ে উনি বলেন 'আমি ভগবান' তাহলে বিশ্বাস করি।" শ্রীরামকৃষ্ণের তখন মুমূর্ষু অবস্থা। তথাপি সহসা চমকিত হইয়া তিনি বলিলেন ঃ "এখনো তোর জ্ঞান হলো না? সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ।" এই কথা শুনিয়া মৌনবিস্ময়ে নরেন্দ্রনাথ অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে এই অপরাধবোধ তাঁহার হৃদয়ে কাঁটার মতো বিঁধিত। তবু তিনি বারংবার পরীক্ষা করিতেও ছাড়িতেন না। অবশ্য আমাদের লাভই হইল। তাঁহার সেই অপরাধবোধ সৃষ্টি করিল সুললিত ছন্দের এক অপূর্ব বন্দনাস্তব। আজ তিনি তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ভাবিলেন—এখনো তো শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের মূল তাৎপর্য কী তাহা বলা হইল না। অনতিবিলম্বে আরো একটি অনবদ্য কাব্যিক সুষমামণ্ডিত স্তবাংশ রচনা করিলেন—

"নরদেব দেব জয় জয় নরদেব
শক্তিসমুদ্রসমুত্থতরঙ্গং দর্শিতপ্রেমবিজৃম্ভিতরঙ্গম্।
সংশয়রাক্ষস-নাশমহাস্ত্রং যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যম্।।
অদ্বয়তত্ত্ব-সমাহিতচিত্তং প্রোজ্জ্বলভক্তিপটাবৃতবৃত্তম্।
কর্মকলেবরমদ্ভুতচেষ্টং যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যম্।।"

নরদেব—যিনি নররূপ ধারণ করিয়া নরের মধ্যে বিরাজ করিয়াও দেবতাতুল্য। 'দেব' অর্থ দেবতা। যিনি নরদেব, নররূপধারী—তিনি কি দেবতা হইতে পারেন? স্বামীজী বলিতেছেন—কখনো তোমাকে মানুষ বলিয়া মনে হইতেছে। মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য। আবার কখনো—কৈ! মানুষ তো দেখিতেছি না। এ যে দেবতা! ধরিয়াও ধরিতে পারি না।—"ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না, ওকে দাও ছেড়ে, দাও ছেড়ে"—রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা কখনো কখনো দেখিতে পাই। তাই স্বামী প্রেমেশানন্দ গান রচনা করিয়াছিলেন—"ধরা দিতে এসে লুকাও পুনঃ হেসে একি লীলা মা তোমার।" সেইরূপ মনবিভ্রান্তকারী মায়াধীশ শ্রীরামকৃষ্ণকে বন্দনা করিবার এক অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া স্বামীজী বলিলেন—'নরদেব দেব'। দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে অবশেষে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া ভাবিলেন—নাঃ, দেবতা বলা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণকে মানুষরূপেই দেখিতে হয়। জয়ধ্বনি করিয়া গাহিয়া উঠিলেন—'জয় জয় নরদেব'। শ্রীরামকৃষ্ণ দূরবর্তী দেবতা নহেন, এখন তিনি মনুষ্যপদবাচ্য দেবমূর্তি। তাঁহাকে দেখা যায়, তাঁহার কথা শুনা যায়। তাঁহার সেবা করা যায়। তাঁহার উপদেশানুসারে জীবনে চলা যায়। তাঁহার উপদেশের ভিত্তিতে নব্য জীবনদর্শন নির্মাণ করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের এই নব্য জীবনদর্শন কী, পরবর্তী স্তবকে স্বামীজী তাহা নির্দেশ করিলেন।

একদা শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন ঃ "এবারে দেখলাম পূর্ণ [শক্তির] আবির্ভাব।" শক্তিব্যতীত জগদুদ্ধার সম্ভব নহে। শক্তির অন্তর্ভুক্ত এই অবতারলীলা এবং সেই শক্তিসমুদ্রকে মন্থন করিয়া যে মহাতরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, শক্তিকে অবলম্বন করিয়া নিরাকার ব্রহ্মবস্তু যেভাবে রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই আমাদের সম্মুখে সাকাররূপী 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নামধেয় এক অনুপম দিব্য চরিত্র—'শক্তি-সমুদ্রসমুত্থতরঙ্গম্'। এবং সেই নিরূপম চরিত্রের মধ্যে প্রধান লক্ষণীয় দিকটি হইল—প্রেমের বিকাশমাধুর্য। তিনি যে 'এল ও ভি ই' personified—প্রেমের মূর্তিমান বিগ্রহ। আর, কামারপুকুর হইতে শুরু করিয়া দক্ষিণেশ্বর, শ্যামপুকুর, কাশীপুর—সর্বত্র আমরা দেখিয়াছি প্রেমের বাজারে আনন্দের মেলা। স্বামীজী বর্ণনা করিলেন—'দর্শিতপ্রেম-বিজৃম্ভিতরঙ্গম্'। প্রেমের অভিনব লীলামাধুর্যে চতুর্দিক ভাসিয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমঘনমূর্তি স্মরণ করিয়াই 'সখার প্রতি' কবিতায় বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন—"শোন বলি মরমের কথা জেনেছি জীবনে সত্য সার/ ...প্রেম, প্রেম—এই মাত্র ধন/ জীব ব্রহ্ম, মানব ঈশ্বর, ভূতপ্রেত-আদি দেবগণ, পশু-পক্ষী, কীট-অণুকীট এই প্রেম হৃদয়ে সবার/ ...ছাড় বিদ্যা জপ যজ্ঞ বল স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল/ ...ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়।"

উপনিষদের সত্যদ্রষ্টা ঋষি ঘোষণা করিলেন—এই বিশ্বচরাচর সেই প্রেমস্বরূপ আনন্দসত্তা হইতে জন্মিয়াছে, প্রেমেই তাহার স্থিতি, প্রেমেতেই উহা লয়প্রাপ্ত হইতেছে—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিবিশংবিশন্তি।" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ৩।৬) এবং যাহার অন্তরে এই শুদ্ধসত্ত্ব প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে, তাহার চিত্ত কেমন? নিঃসংশয়। তাহার অন্তরে কোন সংশয় থাকে না। যেকোন প্রকার সংশয় সাধকের সর্বনাশ ডাকিয়া আনে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সেই অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন—"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"। কিন্তু উপলব্ধির গভীরে সকল সংশয় বিনাশপ্রাপ্ত হয়। মন তখন এক দিব্য প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠালাভ করে। এবং সেইখানেই সাধকের সাফল্য। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যচরিত্রের স্মরণ ও অনুধ্যানরূপ মহা অস্ত্রের সাহায্যে 'সংশয়-রাক্ষস'কে অনায়াসে নিধন করা যায়। 'সংশয়রাক্ষসনাশ-

মহাস্ত্রম্'। সেই কারণেই 'যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যম্' অর্থাৎ ভববৈদ্যস্বরূপ সেই গুরুর শরণ আমি গ্রহণ করিতেছি। যাঁহার অনুপম লীলারসাস্বাদনে আমার মনের সংশয় দূর হইয়াছে, আমি সত্যকে জানিয়াছি—সেই সদ্‌গুরুর শরণ লইতেছি। তিনি ভববৈদ্য। এবং ভবরোগের উপলক্ষ্যই তো সংশয়। সেই রোগ যিনি আরোগ্য করিয়া দেন, তাঁহাকেই 'ভববৈদ্য' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অতএব শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের উদ্দেশ্যই হইল ব্যক্তি তথা সমষ্টির যাবতীয় সংশয় দূর করিয়া সমগ্র মানবজাতিকে পারমার্থিক সত্য উদ্ঘাটনের সাধনে শিক্ষিত করিয়া সংশয়শূন্য মানুষকে সত্যপ্রতিষ্ঠ হইতে সাহায্য করা।

অনিবার্যভাবেই প্রশ্ন উঠিবে—এই সাধনের পদ্ধতি কি হইবে? পরের স্তবকে বিবেকানন্দ স্বয়ং তাহার উত্তর প্রদান করিলেন। 'সাধন' এই যুগের উপযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্বামীজী বলিলেন, সাধন আর কিছুই নহে, যুগের সাধন—'যোগসমন্বয়'। কর্ম, ধ্যান, ভক্তি ও জ্ঞানের যথার্থ সমন্বয়ই এই যুগের সাধন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং করিয়া দেখাইয়াছেন এই যোগসমন্বয় কিভাবে হইতে পারে। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অভূতপূর্ব সমন্বয়সাধনের দিব্যলীলা স্মরণ করিয়া লিখিলেন—"অদ্বয়তত্ত্ব সমাহিতচিত্তম্, কর্মকলেবরমদ্ভুত চেষ্টম্, প্রোজ্জ্বলভক্তিপটাবৃতবৃত্তম্।" অর্থাৎ অদ্বৈততত্ত্বে যাঁহার চিত্ত সমাহিত বা স্থিত, যিনি ভক্তির পটে (আচ্ছাদনে) আবৃত, যাঁহার অদ্ভুত কর্মময় জীবন—তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুরের অদ্ভুত কর্মপ্রচেষ্টা। সাধারণ বুদ্ধিতে তাহার ব্যাখ্যা মেলে না। জ্ঞানপ্রতিষ্ঠ থাকিয়া ভক্তির আবরণে ঢাকিয়া তাঁহার যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টা। স্বামীজী ইহাকে বলিয়াছেন—"**রামকৃষ্ণের ছাঁচ**"। নিরন্তর কর্মে ব্যাপৃত, অথচ নিজে কিছুই করিতেছেন না। "মায়ের যদি ইচ্ছা হয় তো হবে।" জ্ঞানপ্রতিষ্ঠ বলিয়াই তাঁহার অবস্থান কর্মের ঊর্ধ্বে। এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—"নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ" (৫।৮)—তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষগণ জানেন, তাঁহারা কিছুই করেন না। পরন্তু মন, বুদ্ধি, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ই সকল কর্মে অংশগ্রহণ করিয়া থাকে। অতি কমনীয় আশ্চর্য এক ভক্তির আবরণে ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিলে স্বতই মনে হইবে তিনি কিছুতেই নাই। জিজ্ঞাসিত হইলে বলিবেন: "আমার কি করার আছে বল; সবই মায়ের ইচ্ছা।" অথচ তাঁহার ইচ্ছাতেই সব হইতেছে! একবার মনে হইতেছে, তিনি কিছুই করেন না। আবার মনে হইতেছে, তিনিই সব করাইতেছেন, তিনিই সকল কর্মের উদ্গাতা। কাজেই মানুষ ধন্দে পড়িয়া যায়। ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে এই কথারই উল্লেখ করিয়া শ্রীভগবান বলিতেছেন: "মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ"। "ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।" সকল প্রাণী আমার মধ্যে অবস্থিত, কারণ আমি সর্বব্যাপী। আমি তাহাদের ভিতরে অবস্থিত নহি। আবার দেখ আমার অদ্ভুত ঈশ্বরীয় যোগবিভূতি—কোন ভূতবর্গই আমার মধ্যে নাই। একা আমি বর্তমান।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও দেখিতে পাই, তিনি সবকিছুতে আছেন, অথচ নাই। তাঁহাকে ঘিরিয়া প্রবল উন্মাদনা। তিনি স্থির নিশ্চল বসিয়া আছেন, সহাস্যবদন, সমাধিস্থ! তাই স্বামীজী বলিলেন—'অদ্বয়তত্ত্ব সমাহিতচিত্তম্'। কী সেই অদ্বয়তত্ত্ব? এক ব্রহ্মবস্তুই সত্যরূপে আছেন, দ্বিতীয় বস্তু কিছু নাই। "সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম"—'যত্র যত্র নেত্র পড়ে' কেবলই ব্রহ্মবস্তুর স্ফুরণ হইতে থাকে। এইরূপ সমাহিতচিত্ত ভবরোগবৈদ্যের আমি শরণ লইতেছি—'যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যম্'।

শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনের বর্ণনা করিয়া স্বামীজী আমাদের কিছু ইঙ্গিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। এই দিব্যস্তোত্রের মধ্য দিয়া তিনি আমাদের সাধনপথ বলিয়া দিয়াছেন। পরবর্তী কালে যে-বিষয়ের উপর স্বামীজী বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া বক্তৃতাদি করিতেন, তাহাই স্মরণ করিতে হইবে। মানুষের মধ্যে চারপ্রকার প্রবণতা বিদ্যমান। যথা—কর্মপ্রবণতা, ধ্যানপ্রবণতা, প্রেমপ্রবণতা এবং জ্ঞান-প্রবণতা। সমাজের অধিকাংশ মানুষ এই প্রবণতাগুলিকে বিষয়মুখে প্রয়োগ বা প্রবাহিত করিয়া থাকেন। এবং তাহার ফলে রজোগুণ বৃদ্ধি পাইয়া সমাজের প্রভূত ঐহিক উন্নতি সাধিত হইতেছে। অথচ পারমার্থিক সত্য উদ্ঘাটনের কাজে এই প্রবণতাসকল ব্যবহৃত হয় না বলিয়া মানুষ জন্মমৃত্যুর ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া শোক-দুঃখ-ক্ষোভ-ক্লেদ-রিপু-অষ্টপাশাদির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে—মুক্তির স্বাদ পায় না। স্বামীজী বারংবার স্বস্বরূপানুসন্ধানে এইসকল প্রবণতার প্রয়োগের কথা বলিয়াছেন। ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইলেই 'যোগ' শব্দের সার্থকতা। কর্মপ্রবণতা যখন আমাদের মনকে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত করিবে, তখন উহাই কর্মযোগে পরিণত হইবে। এইরূপে 'ধ্যানযোগ' কিংবা 'রাজযোগ', 'ভক্তিযোগ', 'জ্ঞানযোগ' প্রভৃতি নামকরণ হইয়া থাকে। সত্যান্বেষী মুমুক্ষু জীবের পক্ষে এই যুগে চতুর্যোগের এই সমন্বয় সাধনই কর্তব্য। অর্থাৎ মানুষের অন্তরের বিষয়মুখী সকল প্রবণতাকে ঈশ্বরমুখী করিয়া তুলিতে হইবে, ইহাই প্রশস্ত উপায়। ইহাই এই যুগের পক্ষে সর্বাধিক উপযুক্ত পথ। পরকালে বিশ্বাসী না হইলেও এই যোগসমন্বয় যেকোন মানুষের পক্ষেই পূর্ণ চারিত্রিক বিকাশের সহায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। (দুই)

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে যেসকল তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ১৩৫৯ সালে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনর্মুদ্রিত করা হলো। আশা করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।—সম্পাদক

ধর্মতত্ত্ব, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬

(পূর্বানুবৃত্তি)

...বরফ তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) অতিশয় প্রিয় ছিল। তিনি পদার্পণ করিলে আচার্যদেব তাঁহার জন্য বরফ আনাইতেন। কখনো কখনো দক্ষিণেশ্বরেও বরফ পাঠাইয়া দিতেন। পরমহংস জিলিপি খাইতে ভালবাসিতেন। একদিন মিষ্টান্নাদি খাওয়া হইলে কেহ কেহ আরো খাওয়ার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন ঃ "আমার গলা পর্যন্ত পূর্ণ, আর একটি সর্ষপ পরিমাণ দ্রব্যেরও ভিতরে প্রবেশ করিবার পথ নাই। তবে জিলিপির পথ হবে, জিলিপি হলে একখান খাইতে পারি।" কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "যখন একেবারে পথ নাই, তখন জিলিপির পথ কেমন করে হবে?" তিনি বলিলেন ঃ "যেমন কোন মেলা উপলক্ষ্যে রাস্তায় গাড়ির অত্যন্ত ভিড় হয়, পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, একটি মানুষও কষ্টেসৃষ্টে চলিতে পারে না, তবে এ অবস্থায় যদি লাটসাহেবের গাড়ি আসে, অন্য অন্য গাড়ি সরিয়া স্থান করিয়া দেয়, এইরূপ জিলিপি খাইবার পথ হবে, অন্য অন্য খাদ্যদ্রব্য জিলিপিকে সম্মান করিয়া পথ ছাড়িয়া দিবে।" আচার্যদেবের শেষ অবস্থায় সঙ্কট পীড়ার সময় পরমহংসদেব আসিয়া তাঁহাকে একবার দেখিয়া গিয়াছিলেন। তখন দুইজনের পরস্পর খুব ভাবের কথা হইয়াছিল। পরমহংস একদিন অপরাহ্নে কোন প্রচারকের সঙ্গে ব্রহ্মমন্দির দেখিতে গিয়াছিলেন। মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া "এখানে তিনশত লোক নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করেন, তাঁহার নাম করেন"—এই বলিয়াই ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়েন। তিনি উপাসনায় কোনদিন যোগ দেন নাই, যোগ দিবেন কি, পূর্বেই যে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন।

তত্ত্বমঞ্জরী, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৮৬

...সাধুরা রামকৃষ্ণকে 'পরমহংস' বলিতেন এবং অনুমান হয় তোতাপুরী এই উপাধি প্রদান করেন। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক সাধন শিক্ষাকালেও তৎ তৎ সাম্প্রদায়িক উপাধিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তৎসমুদয় এত গোপনভাবে রাখিয়াছিলেন যে আমরা কখনো তাঁহার প্রমুখাৎ শ্রবণ করি নাই। যদিও তাঁহাকে পরমহংস বলা হইত কিন্তু শাস্ত্রমতে যে-অবস্থাকে পরমহংস বলে সেসকল লক্ষণ তাঁহাতে নিয়ত দেখিতে পাওয়া যাইত না। পরমহংস বৈদান্তিক সাধকদিগের চরমাবস্থাকে বলে। অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা-জ্ঞানে সচ্চিদানন্দকে সার বোধ করাই পরমহংসের কার্য। তাঁহার এ অবস্থাও ছিল এবং সময়ান্তরে অনিত্য পার্থিব পদার্থেরও নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া জল, বৃক্ষ, মৃত্তিকা, প্রস্তরও পূজা করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাকে কোন সম্প্রদায়েই সন্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে না। অথবা সকল সম্প্রদায়ই তাঁহার সম্প্রদায় বলিলে সত্যকথা বলা হয়। কারণ বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, পরমহংস, যোগী, মুসলমান, কর্তাভজা, নবরসিক, বাউল, পঞ্চনামী, গৌড়ীয়, ব্রাহ্ম প্রভৃতি নানাবিধ মতাবলম্বীরা তাঁহার উপাসক ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া নিশ্চয় করিয়া জানিতেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দ্বারা কেশবচন্দ্র সেন সাধারণ ভক্তিসাধন প্রণালী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যখন পরমহংসদেবের প্রত্যক্ষ ধর্মোপদেশের পরাক্রমে কেশববাবুর পাশ্চাত্য ভাব সংযুক্ত বৈদান্তিক ব্রাহ্মধর্মের ভক্তি ক্রমে শিথিল হইতে লাগিল, তখন তাহা রক্ষার জন্য অগত্যা পরমহংসদেবের প্রকৃত হিন্দু ভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। একথা অধিক দিন অপ্রকাশিত ছিল না।

কেশববাবু যেসময়ে পরমহংসদেবের সহিত সম্মিলিত হন, তখন তিনি ব্রহ্মের ঐশ্বর্য-ভক্ত ছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি সাকার নিরাকার ও ব্রহ্মশক্তি লইয়া অতিশয় তর্ক-বিতর্ক করেন।... এই তর্কের দ্বারা কেশববাবু শক্তি স্বীকার করিতে বাধ্য হন এবং তদবধি মাতৃভাবে উপাসনা করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তদবধি ভক্তির মাধুর্যরস তাঁহার মধ্যে ক্ষরিত হইতে দেখা গিয়াছে। কেশববাবু 'নববিধান' বলিয়া যে নূতন ধর্মভাব প্রচলিত করিয়াছেন তাহা নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধন-ফলের আভাসমাত্র বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। কথিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেব নিজে সাধন দ্বারা সকল ধর্মের সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া নিশ্চিতভাবে বসিয়াছিলেন। কেশববাবু তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি হয় পরমহংসদেবের প্রকৃত ভাব অনুধাবন করিতে পারেন নাই, না হয় নিজের বুদ্ধির পরিচয় দিবার জন্য তাহাতে কিঞ্চিৎ কারিকরী করিয়া অর্থাৎ যে-ধর্মে যতটুকু সার বলিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন তাহা সংগ্রহ করিয়া এক নূতন বিধানের সৃষ্টি করেন। যেমন ঈশা হইতে প্রেম, চৈতন্য হইতে ভক্তি, বুদ্ধ, নানক হইতে জ্ঞান ইত্যাদি। কিন্তু পরমহংসদেব তাহা বলিতেন না। তাঁহার মতে প্রত্যেক মতই সত্য। যে-মতে প্রেমের কাহিনী কথিত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রেম বিচ্যুত করিয়া লইলে তাহার কি অবস্থা হইবে? যেমন কোন ব্যক্তির মস্তক, কোন ব্যক্তির শরীর, কাহারো হস্ত এবং কাহারো পদ কর্তন করিয়া একটি কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি সংগঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সেই খণ্ডিত অঙ্গ যে যে শরীরে ছিল, তাহা সেই শরীরেরই উপযোগী হইয়া স্বভাব হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার শোভা স্বাভাবিক—কৃত্রিম নহে। সেইরূপ যে যে ধর্মমত প্রচলিত আছে, তাহাতে একটি একটি স্বতন্ত্র ভাবের প্রথমাবস্থা হইতে পূর্ণ পুষ্টিকাল পর্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে।... পরমহংসদেব সেইজন্য যখন যে-মতে সাধন করিয়াছিলেন তখন সেই সেই মতের কোন প্রক্রিয়া স্বেচ্ছাচারীর বশবর্তী হইয়া পরিত্যাগ করেন নাই। যাঁহারা পরমহংসদেবকে নববিধানের প্রবর্তনকর্তা বলিয়া সংবাদপত্রে আন্দোলন করিতেছেন তাঁহাদের এইজন্য বলি যে, তাহা তাঁহাদের বুঝিবার ভুল হইয়াছে।

সঙ্কলন ❑ জলধিকুমার সরকার
সম্পাদনা ❑ স্বামী সর্বগানন্দ

স্বামী শিবানন্দের চারখানি পত্র*



উমাপদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

॥১॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং

বেলুড় মঠ
২৮/৮/১৯২৫

শ্রীমান উমাপদ,

তোমার চিঠি পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আমার শরীর খারাপ হয়েছিল। এখন অপেক্ষাকৃত ভাল আছি। বৃদ্ধ পিতার সেবা ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? ঘর ত্যাগ করিলে কি সংসার ত্যাগ করা হয়? সংসারের অবশ্যকর্তব্যকর্মগুলি তাঁরই সংসার, তিনিই সব হয়েছেন, এইভাবে তাঁর সেবার ভাবে করিয়া যাও। এতে সত্যই তাঁর সেবা হইবে। তা না করে বৃদ্ধ পিতার সেবা ছাড়িয়া চলিয়া গেলে কি পাড়ার লোক আসিয়া সেবা করিবে? তোমাদের খুব ভক্তি বিশ্বাস হউক, এই ইচ্ছা করি। তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁর ধ্যান, চিন্তা, সেবা এইসব করিয়া যাও। আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিও। ইতি।

তোমার শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

॥২॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ
দেওঘর
৩০/১/১৯২৬

শ্রীমান উমাপদ,

তোমার চিঠি পাইলাম। তোমার পিতার দেহত্যাগ হইয়াছে শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তাঁর আত্মার কল্যাণ হউক, মঙ্গল হউক। তাঁর ইচ্ছায় সবই হয়। শরীর সকলেরই যাবে, শরীর নশ্বর। কিন্তু শরীরী যিনি, তাঁর বিনাশ নাই। না জানার জন্যই দুঃখ হয়, শোক হয়। যথাসাধ্য তোমার পিতার শেষকার্য করিও। অর্থাভাব কিছুই নয়। অভাব মনে করিলেই অভাব। তোমার চেয়েও তো অনেক গরিব-দুঃখী আছে। তারাও আনন্দে ভগবানের নাম করে আছে। তবে তিনি কল্পতরু, যা চাইবে তাই পাবে। তিনি যেমন অবস্থায় রাখেন, সেই অবস্থায় থেকে তাঁর চিন্তা করতে পারলেই সব মঙ্গল। তোমার খুব বিশ্বাস ভক্তি হউক এবং তিনি তোমায় [তোমার] অন্য কল্যাণও করুন। এসব চাইতে হয় না। তাঁর কৃপায় আপনা থেকেই আসে। তিনি তোমাকে শান্তি দিন। আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিও। ইতি।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

---

* শিষ্য উমাপদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের পত্রগুলি উমাপদ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র, দমদম-নিবাসী যোগবিলাস মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। যোগবিলাসবাবু স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য।—সম্পাদক

।।৩।।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
১১/৩/(১৯)২৬

শ্রীমান উমাপদ,

তোমার প্রেরিত ৫্ পাইলাম ও পত্রও পৌঁছিল। তোমার সংসারে আয় কম এবং ব্যয়ও অধিক। টাকা আমাকে পাঠাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি প্রভুর সন্ন্যাসী সন্তান। আমার নিজের টাকায় বিশেষ প্রয়োজন হয় না। যাহা কিছু আবশ্যক হয়, প্রভুর ইচ্ছায় সবই আসে এবং তাহাও অতি কম।* সংসারে অনেক প্রকারের অভাব হয়। তোমার আয় কম, কাজও অস্থায়ী, অল্পদিনের জন্য। প্রার্থনা করি, কাজটি স্থায়ী হউক বা অন্য একটি স্থায়ী কাজ হউক। ঠাকুরে বিশ্বাস ভক্তি দৃঢ় হউক এবং তুমি শান্তিতে থাক। আমার শরীর তত মন্দ নয়। মঠেরও সব একপ্রকার কুশল, তাঁর ইচ্ছায়। ইতি।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

[* "তাহাও অতি কম"-এর অর্থ—'যাহা কিছু আবশ্যক হয়', তাহা অতি কম।—সম্পাদক]

।।৪।।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং

Sri Hathiramjee Math
Ootcamond
23/6/(19)26

শ্রীমান উমাপদ,

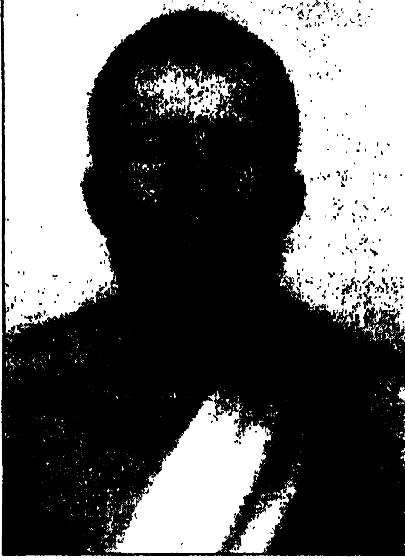
তোমার পত্র পাইলাম। তুমিও বোধহয় এতদিনে আমার এখান হইতে লিখিত পত্র পাইয়া থাকিবে। Off. Sub. Inspector of School-এর post পাইয়াছ। বেশ ভালই হইয়াছে। এইরূপ করিয়া ক্রমশ permanent post পাইয়া যাইবে ভয় নাই। হয়তো এইটাতেই permanent হইয়া যাইতে পারিবে।

নিজের উপর গুরুভার থাকিলে মানুষ কি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারে? ইহা অতি সত্য এবং আমিও তাহা বুঝি। তুমি যাহাতে নিশ্চিন্ত হইতে পার, তজ্জন্য সতত প্রার্থনা করিতেছি জানিবে। তিনি তোমার যা হয় একটা উপায় করিয়া দিবেন। তাঁহার শরণ লও। তিনি উপায় করিয়া দিবেনই দিবেন। তোমার যদি তাঁহাকে ডাকিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয় এবং এইসকল সাংসারিক অনটন যদি তাহার প্রতিকূল কারণ হয়, তাহা হইলে তোমায় নিশ্চয় বলিতেছি—তোমার এ অনটন ও দুশ্চিন্তা শীঘ্রই দূর হইয়া মোটা ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিবেন। তিনি ভক্তবৎসল, তাঁহাকে ডাকিতে যে চায়, তার সব বাধাবিঘ্ন দূর হইতেই হইবে। তুমি তাঁহাতে শরণ লইয়াছ। কোনরূপ ভাবনাচিন্তা করিবে না। তাঁহাতে মন স্থির রাখিয়া যাহা তিনি দেন আনন্দে গ্রহণ করিয়া নির্লিপ্তভাবে সংসার করিয়া যাও। আমাদের সমস্ত কুশল। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহ শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানিবে। ইতি।

তোমার চির শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’-এর ভূমিকা*

স্বামী ভূতেশানন্দ



স্বামী তদাত্মানন্দ অঙ্কিত শ্রীরামকৃষ্ণের তৈলচিত্র থেকে গৃহীত

“তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ।।”
(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০।৩১।৯)

কথামৃতকার শ্রীম ‘কথামৃত’ গ্রন্থের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ-রূপে এই শ্লোকটি ভাগবত থেকে উদ্ধৃত করেছেন। শ্লোকটির পটভূমিকা সংক্ষেপে বলছি।

অরণ্যের মধ্য থেকে ভগবান বংশীধ্বনি করেছেন। সেই বংশীধ্বনি কানে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে গোপীরা যেখানে যে-অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায় ছুটেছেন তাঁর দর্শনে। প্রস্তুত হওয়ার, ঘরের কাজকর্ম গুছিয়ে যাওয়ার সময় নেই তাঁদের। ভারি সুন্দর সে-বর্ণনা। হয়তো কেউ সাজছিলেন। সাজার সময় কোথায় কি দিতে হবে, কোথায় কি আভরণ পরতে হবে—সব ভুলে গিয়েছেন। প্রসাধন অসমাপ্ত থাকল। সেই অবস্থায় ছুটে চলেছেন সকলে।

“বিছুরি দেহ নিজহ গেহ
এক নয়নে কাজর রেহ,
বাহে রঞ্জিত মঞ্জীর এক
এক কুণ্ডল দোলনী।।”

কেউ একটি চোখে কাজল পরেছেন, কারো এক হাতে বলয়, কারো বা এক কানে কুণ্ডল পরা হয়েছে। কোন গোপী রান্না করেছিলেন, উনুনে ভাত চাপানো ছিল—তা আর নামাবার সময় হলো না। কারো দুধ উথলে পড়ছে, খেয়াল নেই। কেউ সন্তানকে স্তনদান, কেউ পতিসেবা করছিলেন। সব ফেলেই ছুটেছেন। ভগবানের আহ্বান এসেছে, প্রস্তুতির অবকাশ নেই। ‘ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে।’ একজন গোপীর অবস্থা শোচনীয়। তাঁর দ্বার বন্ধ। তিনি দেখলেন অন্তরায় হয়েছে দেহ। সঙ্গে সঙ্গে দেহ পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। কেউ কেউ ঈশ্বরের জন্য সর্বস্ব পরিত্যাগ করেন, কিন্তু যে-দেহ মানুষের ‘আমি’র সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে তা যদি ভগবানলাভের পথে অন্তরায় হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাকে পরিত্যাগ কর—এর কোন তুলনা হয় না। ভগবানের কাছে গোপীরা গিয়েছেন কত আশা নিয়ে যে, ভগবান তাঁদের গ্রহণ করবেন, স্বীকার করবেন। তখন রাত্রি গভীর। অরণ্যের মধ্যে ভগবান তাঁদের স্বাগত জানিয়ে বললেনঃ “স্বাগতং ভো মহাভাগাঃ”—মহাভাগ্যবতী তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি। বলছেনঃ “কিং প্রিয়ং”—তোমাদের জন্য কি প্রিয় কার্য করব? ইংরেজীতে বলে—What can I do for you? অত্যন্ত গতানুগতিকভাবে সম্বোধন করে বলা। যে-গোপীরা সর্বস্ব ত্যাগ করে গিয়েছেন, তাঁরা ঐরকম সম্ভাষণ প্রত্যাশা করেননি। তারপর ভগবান বলছেনঃ এখন গভীর রাত্রি, আর হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল এই অরণ্য। তোমরা এখানে এলে কেন? তাছাড়া তোমরা কুলবধূ, লোকলজ্জা আছে। হঠকারিতা করে চলে এসেছ। যাই হোক, এসে বনের অপূর্ব শোভা দেখেছ, সুন্দর জ্যোৎস্না, কত ফুল ফুটেছে, কত সুন্দর দৃশ্য দেখা হলো; এখন যার যার ঘরে চলে যাও।

গোপীরা খুব আহত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বললেনঃ “হে কৃষ্ণ, তুমি কি আমাদের মনোভাব জান না? আমরা সর্বস্ব ত্যাগ করে তোমার পদপ্রান্তে উপনীত হয়েছি তা কি এই বনের শোভা দেখবার জন্য? না, তুমি আমাদের ঐহিক বাসনা পূর্ণ করবে বলে? জেনো, আমাদের এরকম আকাঙ্ক্ষা কিছু নেই। তুমি সব জান, তবু এইভাবে আমাদের সম্বোধন করায় আমরা অত্যন্ত বেদনা বোধ করছি।” এইসব বলে তাঁরা অনুযোগ করলেন। গোপীদের মতো মহাপ্রাণ রমণীরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে যেমন আশা করেছিলেন তেমন

* ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’-এর প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ ঠিক একশ বছর আগে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। শতবর্ষপূর্তির কথা মনে রেখে পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের এই মূল্যবান ভাষণটি প্রকাশিত হলো। ভাষণটির স্থান ও তারিখ জানা যায়নি।

সম্ভাষণ তাঁরা পাননি। তারপরেও ভগবানের সঙ্গে তাঁদের কথাবার্তা অনেক হলো। ইতিমধ্যে ভগবান গোপীদের সঙ্গে আনন্দে বিহার করতে করতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। গোপীরা তাঁকে চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তৃণ তরুলতা সকলকে বলছেন ঃ "তোমরা কি জান ভগবান কোন্‌দিকে গিয়েছেন? পৃথিবী তুমি কি জান?" উন্মাদিনীর মতো তাঁরা খুঁজে বেড়াচ্ছেন আর সেইসঙ্গে সমস্বরে ভগবানের স্তুতি গাইছেন, যা 'গোপীগীতা' নামে খ্যাত। তারই একটি শ্লোক কথামৃতকার উদ্ধৃত করেছেন। বলছেন, 'তব কথামৃতং'—তোমার কথারূপ অমৃত, 'তপ্তজীবনম্‌'—যাদের তপ্ত হৃদয় তাদের পক্ষে প্রাণপ্রদ। সংসারতপ্ত মানবের পক্ষে তোমার কথারূপ অমৃতবারি যেন নতুন জীবন দান করে, 'কবিভিরীড়িতং'—জ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞরা তোমার স্তুতি করেন। 'কল্মষাপহম্‌'—তোমার কথা সব পাপ নিবারণ করে। শুধু তাই নয়, মানুষ কাউকে স্পর্শ করে, কোন জল পান করে, কোন তীর্থ দর্শন করে পবিত্র হয়, সেখানে তোমার এই স্তুতিকথা 'শ্রবণমঙ্গলম্‌'—শোনামাত্রই জীবের কল্যাণ হয়। 'শ্রীমদ্'—এই কথার ভিতর কত শোভা, সৌন্দর্য এবং এ একটু-আধটু কথা নয় যে, বলতে বলতে ফুরিয়ে যাবে। 'আততম্‌'—বিস্তৃত। ভগবানের লীলাকথার অন্ত নেই। এগুলি কারা গ্রহণ করে? 'ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ'—বহু পুণ্যশালী যাঁরা তাঁরাই এই পৃথিবীতে এই কথারূপ অমৃত পান করতে পারেন। অর্থাৎ যাঁরা এই কথা শোনার সুযোগ পান তাঁদেরও মহাভাগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথারূপ অমৃত বর্ষণ করার প্রথমেই কথামৃতকার গোপীগীতার এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন। কেন করেছেন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথাসমুদ্র সর্বজীবের পিপাসা নিবৃত্তি করে মরণশীল জীবকে যেমন অমৃতের সন্ধান দেয়, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'ও সেইরকম। সকল পাপী-তাপীকে শান্তি দেয়, কলুষতা, মলিনতা দূর করে এবং সেই কথামৃত অফুরন্ত। কথামৃতকার শ্রীম—যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীতে 'মাস্টারমশাই' নামে পরিচিত, তিনি বলছেন ঃ "সেই সমুদ্র থেকে আমি একটু সংগ্রহ করে রেখেছি।"

প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনা বলছি। স্বামী সুবোধানন্দ—যাঁর ডাকনাম ছিল 'খোকা মহারাজ'—ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন ঃ "তুই মাস্টারের কাছে যাস।" তিনি যাননি। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কিরে গিয়েছিলি?" তিনি বললেন ঃ "গৃহস্থের কাছে আমি কি করতে, কি শুনতে যাব?" ঠাকুর হেসে বললেন ঃ "নারে যাস।" অগত্যা ঠাকুরের কথা রক্ষার জন্য খোকা মহারাজ মাস্টারমশায়ের কাছে গিয়ে বলেছিলেন ঃ "ঠাকুর বলেছেন তাই আপনার কাছে এসেছি।" মাস্টারমশাই বয়সে প্রবীণ, খোকা মহারাজ অল্পবয়স্ক। তিনি হেসে বললেন ঃ "আমার এখানে নিজের কিছু নেই। আমি গঙ্গা-তীরে বাস করি, আর আমার ঘরে একটা জালায় সেই গঙ্গা-জল সংগ্রহ করে রাখি। কেউ এখানে এলে তার থেকে একটু দিই।" এই কথামৃত তিনি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন বলে আজ তা লক্ষ লক্ষ নরনারীকে শান্তি দিচ্ছে, অমৃতের সন্ধান দিচ্ছে।

এই পটভূমিকা না জানলে 'কথামৃত'-এর মূল্য আমরা বুঝতে পারব না। তাই বললাম, মাস্টারমশাই যেন ঠাকুরের দ্বারা প্রেরিত হয়ে লিপিকাররূপে তাঁর কথাগুলি সংগ্রহ করে লিখেছেন। মাস্টারমশাইকে দিয়েই ঠাকুর লেখাবেন। ঠাকুর জানতেন তাঁর সন্তানদের কাকে দিয়ে কি করাবেন। মাস্টারমশাইকে দিয়ে তাঁর লীলাকথা লেখাবেন আগে থেকেই যেন ঠিক ছিল এবং সেভাবে তাঁকে তিনি তৈরি করছেন। কোন একটা ঘটনা সম্পর্কে তিনি মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা করছেন ঃ সেদিন যে ওখানে গিয়েছিলাম, কি বলেছিলাম? মাস্টারমশাই বলছেন ঃ আপনি এই এই বলেছিলেন। ঠাকুর সংশোধন করে দিচ্ছেন ঃ না ও কথা বলিনি, এ কথা বলেছি। ('কথামৃত', ৯ নভেম্বর ১৮৮৪, ৩।১০।৫) এইরকম নানা জায়গায় মাস্টারমশাইকে তিনি শুধরে দিয়েছেন। কেন এত চেষ্টা-যত্ন? তিনি আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিলেন যে মাস্টারমশাই এমন একটি যন্ত্র হবেন—যাঁর মধ্য দিয়ে তাঁর 'কথামৃত' অবিকৃতভাবে জনসমাজে পরিবেশিত হবে।

অবিকৃত হওয়া দরকার—এইটি হচ্ছে বড় কথা। কোন গ্রন্থকার যখন কারো সম্বন্ধে কিছু লেখেন তখন তাঁর ভিতরে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি হয়তো একভাগ থাকেন আর তিনভাগ গ্রন্থকার নিজে। অর্থাৎ গ্রন্থকার তাঁর interpretation বা ব্যাখ্যা দিয়ে বিষয়টিকে তাঁর মনোমতো করে বলেন। ঠাকুর চাইতেন মাস্টারমশাই যখন তাঁর কথাগুলি পরিবেশন করবেন, তখন যেন তাঁকে নতুন ছাঁচে না ঢেলে পরিবেশন করেন। ভক্তদের সমক্ষে যেভাবে অমৃত বর্ষিত হয়েছে, অবিকল সেভাবে যেন পরিবেশিত হয়। ঠাকুর এবিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন এবং মাস্টারমশাইকেও বারেবারে সতর্ক করে দিয়েছেন। এমনভাবে ঠাকুর আর কাউকে জিজ্ঞাসা করতেন না যে, তিনি কি বলেছেন এবং কোথায় তাঁর ভুল হয়েছে। এ যেন মাস্টারমশাইয়ের ওপরে ঠাকুরের মাস্টারি!

মাস্টারমশাইকে ঠাকুর এত করে তৈরি করেছিলেন কেন? কারণ, তা না করলে আমরা এই অমৃত পেতাম কোথায়? স্বামী বিবেকানন্দ থেকে আরম্ভ করে ঠাকুরের আরো অন্য অনেক ত্যাগী সন্তান ছিলেন। প্রত্যেকের কাজের ধারা যেন শ্রীরামকৃষ্ণের মনে আগে থেকে নির্দিষ্ট করা ছিল। ঠিক যাকে দিয়ে যা করাবার, তাকে দিয়ে তাই করাচ্ছেন। কোন জায়গায় ব্যতিক্রম হবে না। স্বামী শিবানন্দ মহারাজ—যিনি তখন 'তারক' নামে পরিচিত—একদিন ঠাকুর যখন ভক্ত-পরিবৃত হয়ে উপদেশাদি দিচ্ছেন, তিনি তখন এককোণে বসে নোট লিখে রাখছিলেন। ঠাকুর লক্ষ্য করেছেন, হেসে বললেন ঃ "ওরে, এ তোকে করতে হবে

না।" অর্থাৎ একজন এর জন্য নির্দিষ্ট আছেন, আর দরকার নেই। স্ব স্ব ভাব অনুসারে এক একজনের জন্য এক এক কর্মধারা, ঠাকুরের এটি একটি সুনির্দিষ্ট প্রণালী। তাঁর মধ্যে কোন এলোমেলো ভাব নেই। যদিও ঠাকুরকে দেখলে বা তাঁর কথা শুনলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে সেগুলি যেন অসংবদ্ধ, তিনি মুহুর্মুহু সমাধিতে ডুবে যাচ্ছেন, বাহ্যজগৎ অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে, দেহবুদ্ধি পর্যন্ত তিরোহিত হয়ে যাচ্ছে—সেই মানুষের আর সাংসারিক জ্ঞান কি থাকবে? ঠাকুর নিজেই বলতেন, কোমরে কাপড়টা পর্যন্ত থাকে না। কিন্তু সেই এলোমেলো মানুষটির মধ্যে একটি সুন্দর, সুপরিকল্পিত কর্মধারা আছে এবং সেসব কর্ম যেন নিখুঁতভাবে সম্পাদিত হয়—এবিষয়ে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ খুব গোছালো ছিলেন। প্রতিটি জিনিস তিনি গুছিয়ে রাখতে চাইতেন। কোন জিনিস অগোছালো দেখলে বিরক্ত হতেন। বলতেন, যে বাইরের ছোটখাটো বিষয়ে এলোমেলো—সে বড় বড় বিষয় বা ভগবৎ সাধনাতেও সুসংহত হবে না। এমনকি অতি তুচ্ছ সাংসারিক বিষয়েও ভক্তদের সচেতনতার অভাব থাকলে বিরক্ত হয়েছেন, সংশোধন করে দিয়েছেন। বলেছেন: "ভক্ত হবি বলে বোকা হবি কেন?" যোগেন মহারাজ—স্বামী যোগানন্দকে তিনি একটি কড়াই কিনতে বলেছিলেন। তিনি নিজে দেখে না নিয়ে দোকানদারকে বিশ্বাস করেছিলেন। বলেছিলেন: "দেখো বাপু, ঠিক ঠিক দাম নিয়ে ভাল জিনিস দিও, ফাটা-ফুটো না হয়।" দোকানীও 'আজ্ঞা মশায়, তা দেব বৈকি' ইত্যাদি নানা কথা বলে বেছে বেছে তাঁকে একটি কড়াই দিয়েছে, তিনিও দোকানীর কথায় বিশ্বাস করে কড়াইটি আর পরীক্ষা না করেই নিয়ে এলেন। দক্ষিণেশ্বরে এসে দেখলেন, কড়াইটি ফাটা। ঠাকুর সে-কথা শুনেই বললেন: "সে কিরে? জিনিসটা আনলি, তা দেখে আনলিনি? দোকানী ব্যবসা করতে বসেছে—সে তো আর ধর্ম করতে বসেনি? তার কথায় বিশ্বাস করে ঠকে এলি? ভক্ত হবি, তা বলে বোকা হবি? লোকে তোকে ঠকিয়ে নেবে? ঠিক ঠিক জিনিস দিলে কিনা দেখে তবে দাম দিবি; ওজনে কম দিলে কিনা তা দেখে নিবি; আবার যেসব জিনিসের ফাউ পাওয়া যায় সেসব জিনিস কিনতে গিয়ে ফাউটি পর্যন্ত ছেড়ে আসবিনি।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, গুরুভাব উত্তরার্ধ, ৩য় অধ্যায়)

ছোটখাটো ব্যাপারেও তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে বলতেন। বলতেন, আমি নিজের পরনের কাপড় পর্যন্ত ঠিক রাখতে পারি না, কিন্তু জিনিসপত্র অগোছালো রাখি না। যখন হুঁশ থাকে, তখন যে-জিনিস যেখানে থাকে সেখানেই রাখি। তাঁর কথাগুলি শুনে যেন মনে না করি, হঠাৎ একটা উচ্ছ্বাসের বশে তিনি বলেছেন আর ভক্তেরা ভক্তির আতিশয্যে সেগুলিকে সংগ্রহ করে লিখে রেখেছেন। তা নয়। প্রত্যেকটি কথার মধ্যে যে গভীর ব্যঞ্জনা রয়েছে, সেগুলিকে অনুধ্যান করতে হবে। সাধনার ফলে তাদের তাৎপর্য স্পষ্ট হবে।

তাই মাস্টারমশাই অতি নিষ্ঠাভরে কথাগুলি সংগ্রহ করে রেখেছেন এবং যখন তিনি নিজে ব্যাখ্যা করতেন তা হতো অতি অপূর্ব। কারণ ঠাকুরের সঙ্গে থেকে থেকে, ঠাকুর কিভাবে কোন্ কথাটি বলেছেন তা তাঁর হৃদয়ে গাঁথা হয়ে থাকত। 'কথামৃত' ঠাকুর পরিবেশন করেছেন, মাস্টারমশাই তার বক্তা। যেমন ভাগবতের বক্তা শুকদেব।

সেই মাস্টারমশাই যখন ঠাকুরের কাছে প্রথম গিয়েছেন, তখন তাঁর শিক্ষা কিভাবে আরম্ভ হয়েছিল 'কথামৃত'-এর গোড়াতেই তিনি দেখিয়েছেন। ঠাকুরের সম্বন্ধে তিনি শুনেছিলেন, তবে খুব আগ্রহ নিয়ে তাঁর কাছে যে গিয়েছিলেন তা নয়। তাঁর শ্যালক বেড়াতে বেড়াতে তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গিয়েছেন। যেতে যেতে বলেছেন: "গঙ্গার ধারে একটি চমৎকার বাগান আছে, সে-বাগানটি কি দেখতে যাবেন? সেখানে একজন পরমহংস আছেন।" ('কথামৃত', ১।১।২) মাস্টারমশাই শুনলেন, কিন্তু খুব আগ্রহ নিয়ে শুনেছেন বলে মনে হয়নি। দক্ষিণেশ্বরে এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে দেখলেন—ছোট্ট একটি ঘর, সেখানে ঠাকুর থাকেন, অন্যান্য লোকজন সেখানে আসেন। মাস্টারমশায়ের শ্যালক সিধু তাঁকে সেখানে নিয়ে গেলেন। তিনি দরজা থেকেই দেখলেন, ভিতরে একঘর লোক। আর একজন তক্তপোশের ওপর বসে আছেন। পরনে সাদা ধুতি, গায়ে কোন জামা নেই। মুখে একটু দাড়ি, সমবেত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলছেন। মাস্টারমশাই একটু সঙ্কোচবোধ করলেন ভিতরে যেতে। কেউ 'আসুন' বলায় ভিতরে গেলেন। গিয়ে করজোড়ে নমস্কার করলেন—ভদ্রতার খাতিরে যেমন করে। কিছুক্ষণ কথাবার্তা শুনলেন, পরে বেরিয়ে এলেন। ভাবলেন, বাগানটা একবার ভাল করে দেখে আসি, তারপর এখানে আসব। ঠাকুরের কথাগুলি তাঁর ভালই লাগছিল, কিন্তু অত ভিড়ের মধ্যে যেন তাঁর পোষাচ্ছিল না। বাগান দেখার পর ফিরে এসে দেখেন ঘর বন্ধ। ঘরে ধুনো দেওয়া হয়েছে। মাস্টারমশায়ের ইচ্ছা ভিতরে যাওয়ার। কিন্তু দরজা বন্ধ দেখে ইতস্তত করছেন। কাছে কালীবাড়ির দাসী বৃন্দেকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: "হাঁগা, সাধুটি কি এখন এর ভিতর আছেন?" বৃন্দে উত্তর দিল: "হ্যাঁ, এই ঘরের ভিতর আছেন?" মাস্টারমশাই জিজ্ঞাসা করলেন: "আচ্ছা, ইনি কি খুব বই-টই পড়েন?" বৃন্দে বলল: "আর বাবা বই-টই! সব ওঁর মুখে!" মাস্টার আবার জিজ্ঞাসা করলেন: "আচ্ছা, ইনি বুঝি এখন সন্ধ্যা করবেন? আমরা কি এ ঘরের ভিতর যেতে পারি? তুমি একবার খবর দিবে?" বৃন্দে: "তোমরা যাও না বাবা। গিয়ে ঘরে বসো।" (ঐ)

মাস্টারমশাই শুনে ভাবছেন, ঠাকুর হয়তো বিদ্বান পণ্ডিত হবেন, কিন্তু বইও পড়েন না, আর সাধুর বেশবাসও তেমন দেখা যাচ্ছে না। অর্ধনগ্ন, ভদ্রভাবেও বসে নেই। যাই হোক,

লোকটিকে একবার দেখা ভাল। এইসব ভেবে ভিতরে ঢুকেছেন। ঠাকুর তাঁর কথা জানতে চাইলেন : "কোথায় থাক, কি কর, বরাহনগরে কি করতে এসেছ?" ইত্যাদি। মাস্টার সমস্ত পরিচয় দিলেন। আর কিছু কথাবার্তার পর মাস্টার প্রণাম করে বিদায় গ্রহণ করলেন। ঠাকুর বললেন : "আবার এসো।" (ঐ)

এরপর দ্বিতীয় দিন মাস্টারমশাই সকালবেলা দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছেন। ঠাকুর তখন কামাতে যাচ্ছেন। নাপিতের সামনে বসেই মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলছেন। তারপর কথাপ্রসঙ্গে বলছেন : "তোমার কি বিবাহ হয়েছে?" মাস্টারমশাই উত্তর দিলেন : "আজ্ঞা হাঁ।" ঠাকুর শিহরিত হয়ে বললেন : "ওরে রামলাল। যাঃ, বিয়ে করে ফেলেছে!" মাস্টারমশাই চিন্তিত, বিয়ে করে কি একটা অপরাধ করেছি? ঠাকুর আবার প্রশ্ন করছেন : "তোমার কি ছেলে হয়েছে?" মাস্টারমশাই এবার ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলেন : "আজ্ঞে, ছেলে হয়েছে।" ঠাকুর আবার আক্ষেপ করে বলছেন : "যাঃ, ছেলে হয়ে গেছে!" কিছুক্ষণ পরে সস্নেহে বলছেন : "আচ্ছা, তোমার পরিবার কেমন? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি?" মাস্টারমশাই ভাবছেন, এ আবার কি প্রশ্ন! বললেন : "আজ্ঞা ভাল, কিন্তু অজ্ঞান।" বলে বিপদ করেছেন। ঠাকুর অমনি বললেন : "আর তুমি জ্ঞানী?" মাস্টারমশাই বর্ণনা দিচ্ছেন : "মাস্টারের অহঙ্কারে আবার বিশেষ আঘাত লাগিল।" তিনি ভেবেছিলেন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। স্কুলে পড়ান, কয়েকটি বিষয় তাঁর অধিগত। তিনি তিনটি বিষয় পড়াতে পারেন। এরকম শিক্ষক এখন দুর্লভ। পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে গর্ব না থাকলেও নিজে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি বলে বিশ্বাস তো ছিল। কিন্তু ঠাকুর বলছেন, তোমার স্ত্রী অজ্ঞান আর তুমি কি জ্ঞানী? মাস্টার-মশাই ভাবছেন, জ্ঞান কাকে বলে আর অজ্ঞান কাকে বলে?

অতএব প্রথমেই জ্ঞান-বিচারের অভিমান চূর্ণ, তারপর কথাবার্তা। ঐদিন থেকেই মাস্টারমশাই ঠাকুরের প্রতি একটা অদ্ভুত আকর্ষণ বোধ করলেন। মনে প্রশ্ন—মানুষটি কে? বাইরে রূপের ছটা নেই, পোশাকের পারিপাট্য নেই। একেবারে সাধারণ মানুষ। অথচ তাঁর কথাগুলি যেন সমস্ত শাস্ত্রের সার নিষ্কাষণ। এত গভীর জ্ঞান অথচ লেখাপড়া করেননি, ভাষায় কোন পারিপাট্য নেই, সহজ সরল ভাষায় কথা বলছেন। কিন্তু কথাগুলি সহজ নয়। জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে এক একটি রত্ন বের করছেন। সবাই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কথামৃত বর্ষণের আরম্ভ এইভাবে।

তারপর থেকেই মাস্টারমশাই ঠাকুরের দুর্বার আকর্ষণের কেন্দ্রে পড়ে গিয়েছেন। আবার পরের দিন, তার পরের দিন এসে হাজির। দেখলেন, একঘর যুবক বসে আছে, ঠাকুর তাদের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করছেন। তখন তিনি ভাবছেন, আগের মানুষটি কোথায়? যিনি ভর্ৎসনা করে তাঁর অভিমান চূর্ণ করেছিলেন? মাস্টারমশাইকে দেখে বললেন : "ঐরে আবার এসেছে?" বলে একটি গল্প বললেন : "দ্যাখ, একটা ময়ূরকে বেলা চারটার সময় আফিম খাইয়ে দিছিল। তার পরদিন ঠিক চারটার সময় ময়ূরটা উপস্থিত—আফিমের মৌতাত ধরেছিল—ঠিক সময় আফিম খেতে এসেছে!" (ঐ, ১।১।৯) অর্থাৎ মাস্টারমশাইও সেই আফিমখোর ময়ূরের মতো আবার এসেছেন। তাঁর তখনো সঙ্কোচ কাটেনি, কিন্তু ঠাকুরের নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার। তিনি জানেন যে, তাঁর চিহ্নিত সন্তানদের একজন এসেছেন, আর ঠিক সেই সময়েই—যখন তাঁর অন্যান্য চিহ্নিত সন্তানরা তাঁকে ঘিরে বসে আছেন। যাঁদের সঙ্গে তাঁকে পরবর্তী কালে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ হয়ে কাটাতে হবে—তাঁদের দেখে নিলেন। এঁদের মধ্যে স্বামীজীও ছিলেন। অবশ্য এঁরা সবাই মাস্টারমশায়ের থেকে বয়সে ছোট, তাই তিনি ঐ হাসি-তামাশায় অসঙ্কোচে যোগ দিতে পারছেন না। তিনি একটু লাজুক প্রকৃতিরও ছিলেন। ঠাকুর হেসে বলছেন : "দ্যাখ, এর একটু উমের বেশি কিনা, তাই একটু গম্ভীর। এরা এত হাসিখুশি করছে, কিন্তু এ চুপ করে বসে আছে।" মাস্টারমশায়ের বয়স তখন সাতাশ বছর। দু-চারদিন পরে ঘনিষ্ঠতা বাড়লে তিনি যে শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিবারভুক্ত তা অনুভব করতে লাগলেন। সেই সম্বন্ধ চিরকাল অটুট ছিল, তার গভীরতা দিনে দিনে বাড়ল। শ্রীরাধিকা বলছেন :

"পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল—অবধি না গেল।।"
(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ)

প্রথমে চোখে দেখে তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তার থেকে যে প্রেমের উৎপত্তি হলো তা দিন দিন বাড়তে লাগল, তার আর সীমা কোথাও রইল না। সেইরকম ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সন্তানদের যে সম্বন্ধ, তাতে মাধুর্যের কোন সীমা ছিল না। মাস্টারমশাই সেই পরিবারভুক্ত। ঠাকুরের কথারূপ অমৃত পরিবেশনের জন্য যেন বিধি-নির্দিষ্ট। কথামৃতের প্রতিটি কথাই অমৃত। ঠাকুরের জীবনের এক-একদিনের চিত্র মাস্টারমশাই হুবহু বর্ণনা করেছেন।

বর্ণনার রীতি একটু জেনে রাখা ভাল। মাস্টারমশায়ের অপূর্ব মেধাশক্তি ছিল, যখন শুনতেন প্রায় শ্রুতিধরের মতো সেগুলি যেন মনের মণিকোঠায় দৃঢ়াঙ্কিত হয়ে থাকত, তারপর বাড়িতে একটি ডায়েরিতে সব নোট করে রাখতেন। দিন, তারিখ, সময় সব দিয়ে কে কে উপস্থিত ছিলেন, কি কি কথা হলো সূত্রাকারে লিখতেন—যে-সূত্রগুলির অর্থ তিনিই কেবল বুঝতেন। তারপর এইরকম বহু সম্ভার একত্র হলে সেগুলি বিস্তার করে লিখতে আরম্ভ করতেন। লিখতে শুরু করার আগে একটি দিনের ঘটনা দিনপঞ্জী থেকে দেখে নিয়ে ধ্যান করতেন। ধ্যান করতে করতে সমস্ত দিনের চিত্রটি যখন তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠত তখন কলম ধরতেন।

এইজন্য তাঁর লেখায় দেখা যাবে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বর্ণনা তাঁর দৃষ্টিকে এড়ায়নি। প্রথমে তাঁর মনের অক্ষরে লিখিত হয়েছে, তার থেকে তুলে ছাপার অক্ষরে সেগুলি 'কথামৃত'রূপে প্রকাশ পেয়েছে। বর্ণনাগুলি এত জীবন্ত যে, মনে হয় আমরা সাক্ষাতে বসে ঘটনাগুলি দেখছি। ডায়েরির পাতায় অথবা অন্তরের মণিকোঠায় যেগুলি সঞ্চিত ছিল—ধ্যানে পুনরাবিষ্কৃত হয়ে তা ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। এরই নাম 'কথামৃত'।

'কথামৃত'-এর অমৃতদায়িনী, অমরত্বদায়িনী শক্তি অফুরন্ত। ভারতের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান ভাষায় তা অনূদিত হয়েছে। বিদেশেও বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং ঐসব দেশের মানুষ এই অমৃতের আস্বাদ পেয়ে মুগ্ধ ও অভিভূত। এমন অপূর্ব বস্তু তাঁরা কল্পনাও করতে পারেনি। দুরূহ তত্ত্বকথাকে এত সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা—এ কল্পনা করা যায় না। ঠাকুরের নিজস্ব প্রকাশভঙ্গিও কী সুন্দর! অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, ঠাকুরের অভিব্যক্তি কত কবিত্বপূর্ণ, মর্মস্পর্শী। তিনি দার্শনিক, তিনি কবি, শিল্পী এবং হাস্যরসিকও।

ঠাকুরের অক্ষরপরিচয় ছিল। পুঁথি লিখতেন, তাঁর অক্ষরগুলি সুন্দর। যদিও তাঁর পড়াশুনা বেশিদূর এগোয়নি। লেখাপড়ায় তাঁর আগ্রহই ছিল না। তাঁর মনই ছিল সর্বজ্ঞানের ভাণ্ডার। আর ছিল দুর্নিবার কৌতূহল ও ঔৎসুক্য, যার জন্য তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিক থেকে নানা জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। 'কথামৃত'-এর বর্ণনাগুলিতে কত-রকমের দৃষ্টান্তের ছড়াছড়ি, যেগুলি তাঁর ভূয়োদর্শনের পরিচয়। কত কি দেখেছেন, বিচিত্রভাবে সেসব অনুভব করেছেন এবং প্রত্যেকটি ঘটনা তাঁর মনের মধ্যে সঞ্চয় করে রেখেছেন। যখনি প্রয়োজন হয়েছে তা প্রকাশ করেছেন এবং অপরের মর্মকে স্পর্শ করেছেন। সেখানে ভাষায় কোন সচেতন পারিপাট্য নেই। ভাষার মারপ্যাঁচে তত্ত্বকে দুর্বোধ্য করার চেষ্টা করা হয়নি। যে-ভাষায় তিনি প্রকাশ করেছেন তা নিরক্ষর গ্রাম্য কৃষক পর্যন্ত বুঝতে পারে। আবার বড় বড় পাণ্ডিত্যের গবেষণার বিষয়ও তার মধ্যে অনেক। এই হলো 'কথামৃত'-এর বৈশিষ্ট্য। একদিকে অতি সাধারণ ব্যক্তিও বোঝেন, আরেক দিকে এর জটিল তত্ত্বগুলি বড় বড় পণ্ডিতদেরও চিন্তার বিষয়। তাঁরাও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িক পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ছিলেন বিখ্যাত বাগ্মী। ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে তিনি অসাধারণ বক্তা ছিলেন। তিনিও শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছেন। বলছেন, আমরা শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করে কেবল ঘোল খেয়েছি, ইনি তার সারবস্তুটি অর্থাৎ মাখনটি খেয়েছেন। কথামৃত না থাকলে শাস্ত্রের সারমর্মকে আমরা এমনভাবে বুঝতে পারতাম না। শাস্ত্র অতি দুরূহ, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়ঃ "শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে—চিনিটুকু লওয়া বড় কঠিন।" ('কথামৃত', ৪।২০।৫) পিঁপড়ে বালিকে পরিহার করে কেবল চিনি সংগ্রহ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনি শাস্ত্রের সারবস্তুকে সংগ্রহ করে সহজ সাবলীল অনবদ্য ভাষায় আমাদের কাছে পরিবেশন করেছেন। তিনি এইজন্য ঠাট্টা করে বলতেন—"আমি হংস।" দুধে জলে মেশানো থাকলে হাঁস যেমন জলকে পরিত্যাগ করে দুধটি নেয়, তিনিও সেইভাবে সবকিছুর সার অংশটি গ্রহণ করেছেন, অসার বস্তুকে বর্জন করেছেন। তবে শাস্ত্রকে তিনি উপেক্ষা করেননি। বলেছেনঃ "নিজে পড়ি নাই, কিন্তু ঢের সব যে শুনেছি গো? সেসব মনে আছে। অপরের কাছ থেকে ভাল ভাল পণ্ডিতের কাছ থেকে বেদ-বেদান্ত দর্শন-পুরাণ সব শুনেছি। শুনে তাদের ভেতর কি আছে জেনে, তারপর সেগুলোকে (গ্রন্থগুলোকে) দড়ি দিয়ে মালা করে গেঁথে গলায় পরে নিয়েচি।" (লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব-পূর্বার্ধ, ২য় অধ্যায়) একথা বর্ণে বর্ণে সত্য। কারণ, ঠাকুর যখন উপমা বা দৃষ্টান্ত দিয়ে শাস্ত্রের কথা বলতেন, তখন বড় বড় পণ্ডিতও মুগ্ধ বিস্মিত হতেন, ভাবতেন—এমন সহজে এত গূঢ় তত্ত্বকেও প্রকাশ করা যায়!

যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ একটা দৃষ্টান্ত দিতেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে—"জীবজগৎসুদ্ধ তিনি। যদি একটা বেলের খোলা, শাঁস, বিচি আলাদা করা যায়। আর একজন বলে, বেলটা কত ওজনে ছিল দেখ তো, তুমি কি খোলা বিচি ফেলে শাঁসটা কেবল ওজন করবে? না, ওজন করতে হলে খোলা বিচি সমস্ত ধরতে হবে। ধরলে তবে বলতে পারবে বেলটা এত ওজনের ছিল। খোলাটা যেন জগৎ, জীবগুলি যেন বিচি। বিচারের সময় জীব আর জগৎকে অনাত্মা বলেছিলে, অবস্তু বলেছিলে। বিচার করবার সময় শাঁসকেই সার, খোলা আর বিচিতে অসার বলে বোধ হয়। বিচার হয়ে গেলে সমস্ত জড়িয়ে এক বলে বোধ হয়।" ('কথামৃত', ১।৯।২) সেই-রকম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে বলে—চিৎ-অচিৎ-বিশিষ্ট যে ভগবান অর্থাৎ জীবজগৎ উভয়কে নিয়ে তিনি। কাউকে বাদ দিচ্ছেন না, যেমন বেলের কোন অংশটা বাদ যাচ্ছে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে বললেন, যখন সানাই বাজে একজন পোঁ ধরে থাকে, তার অন্য সুর নেই। সে কেবল একটা সুর দিয়ে রাখে, তাকে 'পোঁ' বলে। এটি পটভূমিকা-রূপে কাজ করে। আরেকজন সানাইতে নানা-রকম সুর বাজায়। বিভিন্ন রকমের মতবাদ যেন সানাইয়ের নানা সুর। আর ঐ পোঁ ধরে থাকাটা হচ্ছে অদ্বৈত। অদ্বৈত মানে এক সুর, কোন বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু বৈচিত্র্য না থাকলেও সেটি নানা ভাবের পটভূমিকা। আরো কত সুন্দরভাবে তিনি বিভিন্ন মতবাদকে বুঝিয়েছেন। এক জায়গায় বলছেন, ভগবান কেমন জান? "যেমন মোমের

গাছ—ডাল, পালা, ফল—সব মোমের" (ঐ, ৪।৮।৪) মোম দিয়ে তৈরি একটি বাগান। সবই মোমের, যদিও আকারে বৈচিত্র্য আছে। তেমনি তিনি এই জীবজগৎ সব হলেও তত্ত্বত একই আছেন। জগদ্রূপ বিচিত্রতা তাঁতে প্রকাশ পাচ্ছে। এই যে একই তত্ত্বের বহু বিচিত্রতা, এইটি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। ঠাকুর বললেন, আমি সব লই। বেলের বিচি লই, খোলা লই। বলছেন তাঁর নিজস্ব ভাষায়।

তাহলে ঠাকুর কি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। একদিন স্বামীজী বলছেন, ব্রহ্ম বাক্য-মনের অতীত, আমরা তাঁর উপাসনা করি দূর থেকে। ঠাকুরকে বলছেন : "আমি ঈশ্বর, তুমি ঈশ্বর, জন্মমরণশীল যাবতীয় পদার্থ সকলই ঈশ্বর—ইহা অপেক্ষা অযুক্তিকর কথা অন্য কি হইবে? গ্রন্থকর্তা ঋষি-মুনিদের নিশ্চয় মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, নতুবা এমন সকল কথা লিখিবেন কিরূপে?" (লীলাপ্রসঙ্গ, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়) ঠাকুর বললেন, সে কি রে? ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, তিনি সবকিছুতে অনুস্যূত হয়ে রয়েছেন। স্বামীজী তখনো 'বিবেকানন্দ' হননি—নরেন্দ্রনাথ। পরিহাস করে তিনি হাজরামশাইকে বলছেন : "উহা কি কখনো হইতে পারে? ঘটিটা ঈশ্বর, বাটিটা ঈশ্বর, যাহা কিছু দেখিতেছি এবং আমরা সকলেই ঈশ্বর?" ঠাকুর তখন "তোরা কি বলছিস রে" বলে হাসতে হাসতে নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। স্বামীজী পরে বলেছিলেন : "ঠাকুরের ঐদিনকার অদ্ভুত স্পর্শে মুহূর্তমধ্যে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। স্তম্ভিত হইয়া সত্য সত্যই দেখিতে লাগিলাম, ঈশ্বর ভিন্ন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অন্য কিছুই আর নাই!... বাটীতে ফিরিলাম, সেখানেও তাহাই। যাহা কিছু দেখিতে লাগিলাম, সেসকলই তিনি—এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। খাইতে বসিলাম, দেখি অন্ন, থাল, যিনি পরিবেশন করিতেছেন —সেসকলই এবং আমি নিজেও তিনি ভিন্ন অন্য কেহ নহে! দুই-এক গ্রাস খাইয়াই স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম। 'বসে আছিস কেন রে, খা না'—মার ঐরূপ কথায় হুঁশ হওয়ায় আবার খাইতে আরম্ভ করিলাম।... রাস্তায় চলিয়াছি, গাড়ি আসিতেছে দেখিতেছি, কিন্তু অন্য সময়ের ন্যায় উহা ঘাড়ে আসিয়া পড়িবার ভয়ে সরিবার প্রবৃত্তি হইত না! মনে হইত, উহাও যাহা আমিও তাহাই!... হেদুয়া পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইতে যাইয়া উহার চতুষ্পার্শ্বে লৌহরেলে মাথা ঠুকিয়া দেখিতাম, যাহা দেখিতেছি তাহা স্বপ্ন রেল, অথবা সত্যকার!... যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম, তখন ভাবিলাম উহাই অদ্বৈতজ্ঞানের আভাস! তবে তো শাস্ত্রে ঐবিষয়ে যাহা লেখা আছে তাহা মিথ্যা নহে।" ঠাকুর এইভাবে তাঁকে অনুভব করিয়ে দিলেন।

ঠাকুর কিরকম করে এক এক অধিকারীকে এক এক ভাবে শিক্ষা দিতেন 'কথামৃত'-এর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তার পরিচয় আছে। তিনি কখনো কাউকে তুচ্ছ করেননি। প্রত্যেককে তার নিজের ভাবের ভিতর দিয়ে এগিয়ে দিয়েছেন। বারবার বলতেন, কারো ভাব নষ্ট করতে নেই। যে যে-ভাব নিয়ে আছে, তাকে সেই ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। কথামৃতে এমন দৃষ্টান্ত অনেক পাব যে, কিভাবে জ্ঞানীকে জ্ঞানের, ভক্তকে ভক্তির, যোগীকে যোগের, কর্মীকে কর্মের পথে এগিয়ে যেতে তিনি প্রেরণা যোগাচ্ছেন। এই হলো তাঁর বিশিষ্টতা। আবার আমাদের মনে প্রশ্ন উঠবে—ঠাকুর তাহলে কি?

ঠাকুরকে দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী—কোনটাই বলতে পারি না। বলতে পারি না তিনি ভক্ত, জ্ঞানী না যোগী? তিনি হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান—কোন্ সম্প্রদায়ের? কোন্ মতাবলম্বী? প্রশ্নগুলি আমাদের বিভ্রান্ত করে। ঠাকুরেরই একটা সুন্দর উপমা আছে—"একজন লোক বাহ্যে গিয়েছিল। সে দেখলে যে, গাছের উপর একটি জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আরেকজনকে বললে—দেখ, অমুক গাছে একটি সুন্দর লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলাম। লোকটি উত্তর করলে, 'আমি যখন বাহ্যে গিয়েছিলাম আমিও দেখেছি—তা সে লাল রঙ হতে যাবে কেন? সে যে সবুজ রঙ।' আরেকজন বললে, 'না না, আমি দেখেছি হলদে।' এইরূপে আরো কেউ কেউ বললে, 'না জরদা, বেগুনী, নীল' ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে, 'আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে-জানোয়ারটিকে বেশ জানি—তোমরা যা বলছ, সব সত্য—সে কখনো লাল, কখনো সবুজ, কখনো হলদে, কখনো নীল, আরো সব কত কি হয়! বহুরূপী। আবার কখনো দেখি কোন রঙই নাই।' " ('কথামৃত', ১।৩।৫)

এই বহুরূপীটি কে? যে-ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন তিনি, যাঁর রূপ ও ভাববৈচিত্র্যের শেষ নেই। বহু লোকের বহু ভাব, তাদের বিভিন্ন পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কত বিচিত্রতা তাঁর ভিতরে। এই বৈচিত্র্য 'কথামৃত'-এর ছত্রে ছত্রে পাই।

'কথামৃত' কিভাবে পথভ্রান্ত মানুষের মনের গতিকেও পরিবর্তিত করে তার ভিতরকার সদ্বৃত্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারে সে-সম্বন্ধে লেখক জরাসন্ধ* তাঁর একটি উপন্যাসে যা বলেছিলেন সেটির উল্লেখ করছি। তিনি জেলার ছিলেন। জেলে একটি মেয়ে কয়েদী এসেছিল। সে এমন দুর্দান্ত যে তার কাছে কেউ যেতে পারত না। কাছে গেলে আঁচড়ে কামড়ে দিত। তাকে একটা solitary cell-এ রাখা হয়েছিল। জেলার খুব সহৃদয় ছিলেন। ভাবলেন, সকলে ওকে পরিহার করে চলে, দেখি তো ওর মনের ভাবটা কি? তার সঙ্গে কথা

* এই বছর প্রখ্যাত সাহিত্যিক জরাসন্ধ (চারুচন্দ্র চক্রবর্তী)-র (১৯০২-১৯৮১) জন্মশতবর্ষপূর্তি।—সম্পাদক

বলতে চেষ্টা করলে সে কথাই বলে না, বলে: "যান যান, আমাকে তত্ত্বকথা শোনাতে আসবেন না।" তখন জেলার বললেন: "মা, তুমি কি একটি বই পড়বে?" "কি বই?" —মেয়েটি প্রশ্ন করল। বলল: "নীতিকথা অনেক পড়েছি।" জেলার বললেন: "না, নীতিকথা নয়, তুমি একবার পড়ে দেখ, ভাল লাগবে।" মেয়েটি বলল: "রেখে যান দেখব।" জেলার একখানি 'কথামৃত' তাকে দিলেন। প্রথম এক-দুইদিন বইটি সে খুলেও দেখেনি। জেলার আবার বললেন: "মা, বইটা একবার খুলেই দেখো না।" জেলারের অনুরোধে বা অন্য প্রেরণায় সে বইটি খুলে দেখল। জেলের নিয়মানুসারে সপ্তাহান্তে বই ফেরত নিতে এলে মেয়েটি ওয়ার্ডেনকে গালাগালি দিয়ে বিদায় করল, বই দিল না। জেলারকে জানালে তিনি এসে বললেন: "মা, বইটা কি তোমার পড়া শেষ হয়নি?" তখন মেয়েটি উত্তর দিল: "সব বই কি পড়া শেষ হয়?" জেলার বুঝলেন, এই বই পড়া শেষ হয় না। তখন তিনি উৎসাহ দিতে বললেন: "ওটা জেলের বই, দিয়ে দাও। আমি তোমাকে আরেকখানা বই দেব।" তিনি তাঁর কথা রাখলেন।

জেলের আসামী—যাকে দুর্দান্ত বলে সকলে পরিহার করেছে—'কথামৃত' পড়ে তার ভিতরে আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। যে-কথা অপরাধীর মনকে, জগৎকে পরিবর্তন করে—সেই অমৃত কথাকে যিনি পরিবেশন করেছেন, তাঁর মধ্যে না জানি কত আধ্যাত্মিক শক্তি নিহিত ছিল! একটি দৃষ্টান্ত—ঠাকুরের একজন ভক্ত অত্যন্ত মদ্যপান করতেন। অন্যান্য ভক্তরা ঠাকুরকে বলছেন—এই মাতালটি এখানে আসে, আমাদের লজ্জা হয়। লোকে বলবে এটি মাতালের আড্ডা, আমাদের সম্বন্ধেও লোকেদের সন্দেহ হবে। ঠাকুর হেসে বললেন: "বেচারা মদ খায় খাক না, কদিন খাবে?" মাতাল নেশার জন্য মদ খায়, ঠাকুর তাকে যে-নেশা ধরাচ্ছেন একবার সেই নেশা ধরলে আর মদের নেশা তাকে আকর্ষণ করতে পারবে না। তাই বলছেন: "কদিন খাবে?" ঠাকুর তাকে বর্জন করেননি। এর সবচেয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত গিরিশবাবু। চারিত্রিক দোষ যাকে বলে, তার সবই তাঁর ছিল। তিনি নিজেই বলতেন: "পৃথিবীতে এমন পাপ কিছু নেই যা এই গিরিশ ঘোষ করেনি।" সেই গিরিশ ঘোষকে ঠাকুর কি করে আকৃষ্ট করলেন তা দেখবার মতো। 'কথামৃত'-এ তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

ঠাকুর নিজে গিয়েছেন গিরিশবাবুর অভিনয় দেখতে। গিরিশবাবুকে জানানো হলো—শ্রীরামকৃষ্ণ আপনার অভিনয় দেখতে চান। গিরিশবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের নামটুকু শুধু শুনেছিলেন, আর ভেবেছিলেন—লোকে যায়-টায়, হয়তো এক বুজরুক হবে। দেখতে হয় দেখবেন, আসবেন। তবে তিনি সাধুলোক, তাঁর পয়সা লাগবে না। তাহলে কোথায় বসবেন তিনি? যেখানে হোক একজায়গায় বসবেন। তাঁকে কোন সম্মানিত আসন দেওয়ার প্রয়োজন নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ নাটক দেখলেন। তারপর তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলো, গিরিশ ঘোষ মুগ্ধ হলেন, দেখলেন এঁর ভিতরে কোন বাহ্য আড়ম্বর বা সাধুর ঢঙ নেই। কিন্তু তখনো তাঁকে গ্রহণ করতে পারেননি। ক্রমশ একটু একটু করে পরিচয় হচ্ছে। গিরিশবাবুর মধ্যে শিষ্টতা বলে কোন বস্তু ছিল না, কথাবার্তায় প্রায়শই অশ্লীল ভাষা বেরত। ঠাকুর সেগুলিকে উপেক্ষা করতেন। অপরে বিরক্ত হতো, কিন্তু ঠাকুরের বিরক্তি নেই। ঘনিষ্ঠতা যত বাড়ছে গিরিশবাবুর আকর্ষণও তত বাড়ছে।

একদিনের ঘটনা। ঠাকুর গিরিশের অভিনয় দেখতে গিয়েছেন। ঝোঁকের মাথায় ঠাকুরকে অজস্র গালাগালি দিয়েছেন। ঠাকুর হাসিমুখে সেই গালাগাল শুনে ফিরে এসেছেন। দক্ষিণেশ্বরের ভক্তেরা খুবই বিরক্ত, বলছেন: "মশাই আপনাকে আর কখনো ওখানে যেতে দেব না।" এদিকে গিরিশের অবস্থা কি? বাড়িতে ফিরে ছট্‌ফট্ করছে: "এ কি করলাম? যিনি এত অনুগ্রহ করে আমার মতো এত দুরাচারী, পাপী-তাপীকে নিজে এসে দেখা দিলেন—তাঁকে অপমান করলাম?" সর্বক্ষণ একটা অন্তর্দাহ অনুভব করছেন তিনি। কখনো ভাবছেন ছুটে যাই দক্ষিণেশ্বরে, গিয়ে ক্ষমা চাই। কখনো ভাবছেন, না, তা করা চলবে না। আমার মনের দুর্বলতা আমি কেন প্রকাশ করব? অন্তরের জ্বালা ক্রমশ বাড়ছে। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসার পরে দক্ষিণেশ্বরেও সেই প্রসঙ্গ চলছে। হঠাৎ রামচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলে ঠাকুরের ইচ্ছা হলো গিরিশের বাড়ি যাবেন। যখন গিরিশের বাড়ি গিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন, গিরিশ ঠাকুরকে দেখেই তাঁর পাদপদ্মে লুটিয়ে পড়লেন। বললেন: "আজ যদি তুমি না আসতে ঠাকুর, তাহলে বুঝতাম, তুমি এখনো নিন্দা-স্তুতিকে সমান জ্ঞান করতে পারনি। তোমার পরমহংস নামে অধিকার আসেনি। আজ বুঝেছি, তুমি সেই, তুমি সেই।"

'কথামৃত'-এর কোন প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ না করে কেবল তার পটভূমিকাটি বললাম। সাধারণ কতকগুলি কথা বলেছি, কারণ ঠাকুরের কথাগুলি বলে শেষ করা যায় না। এটি যার যার নিজের আস্বাদনের বস্তু। পড়তে হয়, অনুধ্যান করতে হয়, তারপর আস্বাদন হয়। ঠাকুরেরই কথা—ভাসা ভাসা থাকলে হবে না, ডুব দিতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের এমন একটি সর্বাবগাহী আদর্শ দিয়ে গিয়েছেন যা প্রত্যেকের পক্ষে অনুসরণীয়। গৃহী অথবা সন্ন্যাসী, জ্ঞানী কিংবা ভক্ত, পণ্ডিত অথবা মূর্খ—সকলের পক্ষেই তা কল্যাণকর। যদি চেষ্টা করি—অল্প দুর্বল চেষ্টাও যদি হয়—তাহলেও ভয় নেই; কারণ ঠাকুর নিজে বলেছেন: "তুমি তাঁর দিকে এক পা বাড়ালে তিনি তোমার দিকে দশ পা এগিয়ে আসবেন।" সুতরাং তাঁর শ্রীচরণে এই প্রার্থনা করি, তিনি তাঁর পাদপদ্মে আমাদের সকলের মনকে এমন আকর্ষণ করুন যাতে আমাদের জন্ম সার্থক হয়। ❑

পাতঞ্জল-যোগসূত্র

ব্যাখ্যাতা ঃ স্বামী প্রেমেশানন্দ

অনুলিখন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ
সম্পাদনা ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
[পূর্বানুবৃত্তি]

বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ।।৩৯।।

যখন চিত্তের বন্ধনের কারণ দূর হয় এবং প্রচার-সংবেদন অর্থাৎ শরীরস্থ নাড়িসমূহের জ্ঞানলাভ হয় তখন যোগী অপরের শরীরে প্রবেশ করিতে পারেন।

মন্তব্য ঃ বহুকাল মনকে সমাহিত রাখিতে পারিলে সংসারের উপর আকর্ষণ শিথিল হইয়া যায়। তখন যোগী স্পষ্ট দেখিতে পান, স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীর সম্পূর্ণ আলাদা। তখন তিনি ইচ্ছা করিলে নিজ শরীর হইতে বহির্গত হইয়া অন্য দেহে প্রবেশ করিতে পারেন। আচার্য শঙ্কর এইরূপ করিয়াছিলেন।

উদানজয়াজ্জল-পঙ্ক-কণ্টকাদিস্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ।।৪০।।

উদান নামক স্নায়ুপ্রবাহ জয় করিলে যোগী জলে বা পঙ্কে ডুবিয়া যান না, কাঁটার উপর দিয়া হাঁটিতে পারেন এবং ইচ্ছামৃত্যু অবস্থা লাভ করেন।

মন্তব্য ঃ সমাধিযোগে প্রাণের উদান ক্রিয়া আয়ত্তাধীন করিয়া যোগী জলের উপর কিংবা কণ্টকের উপর দিয়া চলিতে পারেন। উদান ক্রিয়ার সাহায্যে যোগী ইচ্ছামাত্র দেহত্যাগ করিতে পারেন।

সমানজয়াৎ প্রজ্বলনম্।।৪১।।

সমান প্রবাহকে জয় করিতে পারিলে যোগীকে জ্যোতি বেষ্টন করিয়া রাখে।

মন্তব্য ঃ সমান ক্রিয়াকে আয়ত্তাধীন করিলে যোগীর শরীরে জ্যোতি প্রকাশ করিবার শক্তি হয়। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এ উল্লিখিত যোগী গিরিজার* শরীর হইতে জ্যোতি বাহির হইত।

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাদ্দিব্যং শ্রোত্রম্।।৪২।।

কর্ণ ও আকাশের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, তাহার উপর সংযম করিলে দিব্য কর্ণ লাভ হয়।

মন্তব্য ঃ আমরা যখন কোন শব্দ শুনি তখন আকাশের গায়ে একটা স্পন্দন উত্থিত হয় এবং তাহা আমাদের কানে আসিয়া আঘাত করে। আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশের দ্বারা নির্মিত। আকাশে মনঃসংযোগ করিলে নানাপ্রকার দিব্য শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাল্লঘুতুলসমাপত্তে-শ্চাকাশগমনম্।।৪৩।।

শরীর ও আকাশের সম্বন্ধের উপর সংযম করিলে যোগী নিজেকে তুলার মতো লঘু করিয়া আকাশপথে চলিতে পারেন।

মন্তব্য ঃ আমাদের শরীর আকাশের দ্বারা নির্মিত। শরীর ও আকাশ একই বস্তু—এই জ্ঞানে মন স্থির করিলে দেহকে তুলার মতো হালকা করিতে পারা যায়। তাহার ফলে যোগী পাখির ন্যায় আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে পারেন।

বহিরকল্পিতা বৃত্তিমহাবিদেহা ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ।।৪৪।।

দেহের বাহিরে মনের যে-ধারণা, তাহার নাম 'মহাবিদেহ'। তাহার উপর সংযম করিলে প্রকাশের আবরণ ক্ষয় হয়।

মন্তব্য ঃ যোগী বাহিরের কোন বস্তুতে মন এত একাগ্র করিতে পারেন যে, তাঁহার মনের আশ্রয় সূক্ষ্মদেহ যে স্থূলদেহের ভিতর আছে তাহা তিনি ভুলিয়া যান। যেমন কোন এক ব্যক্তি কলকাতায় বসিয়া কাশীর ধ্যান করিতে করিতে ঠিক বোধ করিতে পারেন যে, তিনি কাশীতেই আছেন। ইহা মহাবিদেহ অবস্থা। এই অবস্থা লাভ করিয়া যোগীর চিত্ত হইতে রজঃ ও তমোগুণ সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া যায় এবং তাঁহার জ্ঞানশক্তি সর্বতোভাবে প্রকাশিত হয়।

স্থূলস্বরূপ-সূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্ব-সংযমাদ্ভূতজয়ঃ।।৪৫।।

*ভূতগণের স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব**—এই পঞ্চবিধ অবস্থার উপর সংযম করিতে পারিলে ভূতজয় হয়। অর্থাৎ মহাভূতসমূহ অধীনস্থ হয়।*

---

* শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় গিরিজার এই সিদ্ধাই নষ্ট হইয়া যায়।—সম্পাদক

** স্থূল—ভূতগণের দৃশ্যমান অবস্থা; স্বরূপ—ভূতগণের গুণভাব, যেমন পৃথিবীর কাঠিন্য, জলের তরলতা ইত্যাদি; সূক্ষ্ম—ভূতগণের সূক্ষ্ম রূপ বা তন্মাত্রা; অন্বয়—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রত্যেক প্রাণীতে অন্বিত হওয়ার অবস্থা; অর্থবত্ত্ব—ভোগপ্রদানের সামর্থ্য।—সম্পাদক

ততোঽণিমাদি-প্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পৎতদ্ধর্মানভিঘাতশ্চ।।৪৬।।

তাহা হইতে অণিমাদি সিদ্ধির আবির্ভাব হয়, কায়-সম্পদ লাভ হয় এবং শারীরিক ধর্মগুলি অক্ষুণ্ণ থাকে।

রূপ-লাবণ্য-বল-বজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ।।৪৭।।

সৌন্দর্য, সুন্দর অঙ্গকান্তি, বল ও বজ্রের মতো দৃঢ়তা—এইগুলি কায়সম্পদ।

মন্তব্য ঃ আমাদের দেহের উপাদান পঞ্চভূতের স্বভাব ও ক্রিয়াতে মন একাগ্র করিয়া পূর্ণভাবে সমাহিত করিতে পারিলে পঞ্চভূতের উপর পূর্ণ কর্তৃত্বলাভ হয়। তাহার ফলে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি* লাভ, দেহে রূপ-লাবণ্যের অসাধারণ প্রকাশ এবং শরীর বজ্রের ন্যায় দৃঢ় হয়। আমাদের শরীর সাধারণত প্রাকৃতিক নিয়মে ক্ষয় হয়, ব্যাধিগ্রস্ত হয়। কিন্তু এই প্রকার সমাধিতে সিদ্ধ যোগীর দেহে বাহ্যপ্রকৃতি কোন ক্রিয়া করিতে পারে না।

গ্রহণস্বরূপাস্মিতান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ।।৪৮।।

ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়মুখী গতি, সেই বিষয়ে উৎপন্ন জ্ঞান ও অহঙ্কার এবং তাহাদের মধ্যে তিনগুণের প্রকাশ ও ভোগ-সামর্থ্য—এইগুলির উপর সংযম করিলে ইন্দ্রিয় জয় হয়।

ততো মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ।।৪৯।।

তাহা (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-জয়) হইতে মনের ন্যায় দেহ বেগবান হয়, ইন্দ্রিয়গণ দেহনিরপেক্ষ শক্তিলাভ করে এবং তাহা হইতে প্রকৃতিজয় হইয়া থাকে।

মন্তব্য ঃ ইন্দ্রিয়গণে মন সমাহিত করিলে যোগী ইন্দ্রিয়ের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করেন। তাহার ফলে যোগী ইচ্ছামাত্র যেকোন স্থানে চলিয়া যাইতে পারেন, ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না লইয়াই রূপ-রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু অনুভব করিতে পারেন। মোট কথা, সমগ্র প্রকৃতিই যেন তাঁহার দাসী বা সম্পূর্ণ আজ্ঞানুবর্তী হইয়া পড়ে। যোগী তাহাকে যেমন চালান সে তেমনিই চলিতে থাকে। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে যোগী সর্বশক্তিমান হন।

সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ।।৫০।।

পুরুষ ও বুদ্ধির প্রভেদজ্ঞানের উপর সংযম করিলে সকল বস্তুর উপর প্রভুত্ব ও সর্ববিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়।

মন্তব্য ঃ এইরূপে পূর্বোক্ত অবস্থা লাভ করিলে যোগী তাঁহার স্বরূপ ও তাঁহার লীলাক্ষেত্র প্রকৃতিকে সুস্পষ্টরূপে দুইটি ভিন্ন প্রকৃতির (type) বস্তু বলিয়া জানিতে পারেন। যোগী তখন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হন।

তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্।।৫১।।

এইগুলির প্রতি বৈরাগ্য জন্মিলে অবিদ্যাজনিত বিবিধ দোষের বীজ ক্ষয় হয় এবং তাহার ফলে মুক্তি বা কৈবল্য-প্রাপ্তি হয়।

মন্তব্য ঃ যোগী সর্বজ্ঞ অবস্থা লাভ করিয়া যদি প্রকৃতি লইয়া খেলা করিবার বাসনা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারেন, তবে তিনি অন্তহীন আনন্দ ও শান্তি-স্বরূপ কৈবল্য অবস্থা প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার উপর প্রকৃতির আর কোন প্রভুত্ব থাকে না।

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ।।৫২।।

*স্থানিগণ অর্থাৎ দেবতাগণ উপনিমন্ত্রণ অর্থাৎ প্রলুব্ধ করিতে আহ্বান করিলেও তাহাতে যেন 'সঙ্গ' বা আসক্ত না হন অথবা বিস্মিত বা উল্লসিত বোধ ('স্ময়') না করেন। কারণ ইহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে।***

মন্তব্য ঃ কৈবল্যপ্রাপ্তির যোগ্যতা পূর্ণ হইলে নানাপ্রকার সূক্ষ্মদেহধারী দেবতা যোগীকে ভোগের প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার নির্বাণের পথ রুদ্ধ করিতে পারেন। বুদ্ধদেব, যিশুখ্রিস্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ অবতার-পুরুষদের জীবনে এইপ্রকার ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। এই অবস্থায় যাঁহারা বুদ্ধদেব, যিশুখ্রিস্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখের ন্যায় স্ব-স্ব ইষ্টবস্তু বা লক্ষ্যে স্থির থাকিতে পারেন তাঁহারা অচিরে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।

[ক্রমশ] (বারো)

---

* অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি—অণিমা, লঘিমা, মহিমা বা গরিমা, প্রাপ্তি (দূরবর্তী বস্তুকে নিকটে আনার শক্তি), প্রাকাম্য (যথেচ্ছ বিচরণ), বশিত্ব, ঈশিত্ব (প্রভুত্ব) এবং যত্রকামাবসায়িত্ব (যথেচ্ছ সঙ্কল্প সিদ্ধি)।—সম্পাদক

** পূর্ণ সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত যোগীর সতর্ক থাকা একান্ত প্রয়োজন। যোগপ্রভাবের অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া যোগীর প্রলুব্ধ, উল্লসিত বা বিস্মিত বোধ করা উচিত নয়। এই সমস্ত অনুভূতি সিদ্ধি বা মুক্তি বা কৈবল্য-লাভের প্রতিবন্ধক। উহারা যোগীর পতন ঘটায়। পুরাণাদিতে বড় বড় মুনিঋষিদের সিদ্ধির পূর্বে প্রলুব্ধ হওয়ার উপাখ্যান অনেক পাওয়া যায়। ঐসমস্ত উপাখ্যানে দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট যোগী বা সাধকেরা সিদ্ধির দ্বারপ্রান্তে আসিয়া পতিত হইয়াছেন। এই সমস্ত উপাখ্যানের মূল তাৎপর্য হইল ইহাই—যোগী বা সাধকেরা যেন কোন মুহূর্তেই নিজেদের অবস্থাকে সুনিশ্চিত বা সুরক্ষিত না ভাবেন, এমনকি সিদ্ধির প্রাক্-মুহূর্তেও পতনের সম্ভাবনা থাকে। আত্মতুষ্টি সাধকের জীবনে অত্যন্ত ক্ষতিকর।—সম্পাদক

চৈত্র ১৩০৮
মার্চ ১৯০২



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণজন্মমহোৎসব

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঊনসপ্ততিতম জন্ম-মহোৎসব বেলুড় মঠে আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল। ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়া তাঁহার জন্মতিথি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় এই দিন নিত্যপূজা সমাপনের পর বেলা নয়টা হইতে এই জন্মতিথি নিমিত্তক সর্ব্বদেবদেবীর পূজা আরম্ভ হইল। প্রথমে গুরুমূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ষোড়শোপচারে পূজা হইল। তৎপরে গণেশ, সূর্য্য, শিব ও বিষ্ণুর অর্চ্চনা হইল। পরে বিষ্ণুর মৎস্য কূর্ম্মাদি দু-একটী অবতারের পূজাসমাপনান্তে তাঁহার জন্মমুহূর্ত্ত পড়াতে জন্মতিথি পূজা অগ্রে করিয়া লওয়া হইল। দশাবতারের পূজাসমাপনান্তে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, দত্তাত্রেয়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, কপিল, জগন্নাথ, শঙ্করাচার্য্য, এমনকি নানক, মহম্মদ ও ঈশারও পূজা হইল। শ্রীরামচন্দ্রের পূজার সময় সীতাদেবী ও ভক্তপ্রবর হনুমানেরও পূজা সমাধা হয়। এই পূজা সমাপ্ত হইতে প্রায় সন্ধ্যা হইল।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে নিত্য আরাত্রিক ও ভোগের পরে রাত্রি দশটা হইতে প্রত্যূষ পর্য্যন্ত মহামায়ার দশমহাবিদ্যারূপ দশরূপের পূজা হইল। পূজান্তে হোম আরম্ভ হইল। যে যে দেবদেবীর পূজা হইল, তাঁহাদের প্রত্যেকের নামে আহুতি দিয়া পরিশেষে গুরুমূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সকল দেবদেবী ও অবতারের সমষ্টিজ্ঞানে তাঁহার নামে আহুতি দেওয়া হইল। পরে পূর্ণাহুতিদানের পর এই মহাপূজা সমাপন হইল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিরাট সার্ব্বভৌমিক ভাবের যৎকিঞ্চিৎ উপলব্ধির চেষ্টা করাই তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষ্যে এই সকল দেবদেবীর পূজার উদ্দেশ্য।

তৎপরের রবিবারে (২রা চৈত্র) সাধারণের জন্য বিরাট মহোৎসব হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি বৃহৎ চিত্রপট অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। দলে দলে প্রায় শতাধিক সঙ্কীর্ত্তনসম্প্রদায় আসিয়া তাঁহার সমক্ষে গাইতে লাগিলেন। বাউল, হরিনাম এবং গৌরাঙ্গ উপাসকসম্প্রদায় অনেক আসিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ সম্প্রদায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম উপলক্ষ্যে তাঁহাকে অবতারজ্ঞানে তাঁহার নামে বিশেষ বিশেষ সঙ্গীত রচনা করিয়া গান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সর্ব্বসুদ্ধ লোক প্রায় ২০/২৫ হাজার হইয়াছিল। আহিরীটোলা ঘাট হইতে হোরমিলার কোম্পানীর তিনখানি জাহাজ বেলা আটটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অনবরত বেলুড় মঠে যাতায়াত করিয়াছিল। জাহাজের বন্দোবস্ত অতি সুন্দর হইয়াছিল। সমস্ত দিন সরবত ও নানাবিধ প্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

কেহ কেহ এতদ্বিধ মহোৎসবকে হুজুক বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। আমাদের কিন্তু তাহা বোধ হয় না। প্রথমতঃ, মহোৎসবে কি উপকার হয় বলিয়া পরে শ্রীরামকৃষ্ণ-মহোৎসবের বিশেষত্ব বলিতে চেষ্টা করিব।

প্রকৃত সাধনা নিজের নিজের অন্তরের ব্যাপার, সত্য কথা; কিন্তু সকলে সমবেত হইয়া মধ্যে মধ্যে ভগবদ্গুণ কীর্ত্তন করিলে অনেকে যথেষ্ট উপকার পাইয়া থাকেন, ইহা অনেকের প্রত্যক্ষ। মহোৎসবাদিতে অনবরত ভগবন্নাম শ্রবণ করিয়া মন যে কিছুক্ষণের জন্যও ভগবদ্ভাবে বিভোর থাকে, তাহার সন্দেহ কি? অনেকের মন এইরূপ সঙ্কীর্ত্তনাদির ভাবে বিভোর হইয়া একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, দেখা যায়। তদ্ব্যতীত নানা স্থান হইতে পরিচিত অপরিচিত নানাবিধ ভক্তমণ্ডলীর একত্র সমাগমে ও আলাপে পরস্পরের অনেক আধ্যাত্মিক উপকার হয়, ইহা বলা বাহুল্য।

এক্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণমহোৎসবের বিশেষত্ব বলিব। রামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক জীবনের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট না হইবে, এরূপ চক্ষু থাকিতে অন্ধ বোধ হয় খুব কম আছে। হিন্দুধর্ম্ম বেদবেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্রাদির সংস্কৃত রচনাবলীর ভিতর অথবা হয়ত কোন নিভৃত পর্ব্বতগুহায় কোন যোগীর হৃদয়াভ্যন্তরে গুপ্ত ছিল। যাঁহার জীবনব্যাপী কঠোর সাধনায় সেই হিন্দুধর্ম্ম আমরা সকলে একটু একটু বুঝিতে পারিতেছি, ঘোর সংসারে মগ্ন হইয়াও আশার আলোক দেখিতে পাইতেছি, যাঁহার হৃদয়ের অমানুষিক উদারতায় আমরা এখন সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোককে ভ্রাতা বলিয়া বুঝিতে শিখিতেছি, যাঁহার অপূর্ব্ব ত্যাগের মোহনমন্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া কত কত যুবক আজ এই ভোগপ্লাবিত বঙ্গভূমির ভিতর ত্যাগের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন—সেই মহাপুরুষের নামে যেকোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে সাধারণে যোগ দিলে তাঁহাদের হৃদয়ে কিয়ৎক্ষণের জন্যও যে সেই মহাপুরুষের আভা পড়ে, সেবিষয়ে কি সন্দেহ আছে?

এ মহোৎসব আবার যে-সে স্থানে নহে অথবা যে-সে ব্যক্তি ইহার অনুষ্ঠাতা নহে। ভগবান রামকৃষ্ণদেব যাঁহাদিগকে পুত্রাধিক স্নেহবশে সাধনের গুহ্য রহস্য শিখাইয়া ও উপলব্ধি করাইয়া এই ঘোর কলির মধ্যে পাবন তীর্থস্বরূপ রাখিয়া গিয়াছেন, সেই তাঁহার সাক্ষাৎ প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যগণ ইহার উদ্যোক্তা ও অনুষ্ঠাতা। দুর্ভাগ্যবশে সেই পবিত্র মূর্ত্তি দর্শনে বঞ্চিত আমাদের কি এমন শুভ মুহূর্ত্ত, পবিত্র মাহেন্দ্রক্ষণ উপেক্ষা করা উচিত?

কী অপূর্ব্ব দৃশ্য! সাধু, গৃহী, ধনী, মধ্যবিত্ত, নির্ধন, শাক্ত, বৈষ্ণব সকলে এক ক্ষেত্রে আনন্দ করিয়া ভগবন্নামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। মনে হয়, একদিন সমগ্র ভারত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহিমায় দ্বেষাদ্বেষী ভুলিয়া সর্ব্ববিষয়ে উন্নত, মহামহিমাময় এক শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হইয়া আবার জগতে আপন গৌরব ঘোষণা করিবে। ইতি—জনৈক দর্শক

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : স্বামী সর্বগানন্দ

রহস্যময় মহাদেশ আণ্টার্কটিকা*

প্রিয়ব্রত কুণ্ডু

[পূর্বানুবৃত্তি]

এই অভিযানে দূর ও নিকট সঞ্চার ব্যবস্থার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে এসেছি আমি। আমার সঙ্গে আছেন দুজন সহকারী সদস্য—ভি. এস. নটিয়াল এবং সঞ্জয় কৌশিক। সেই দায়িত্বের সুবাদে গিয়েছিলাম 'মৈত্রী' থেকে আরো প্রায় ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণে হামবোল্ড পাহাড়ের



হামবোল্ড পাহাড়ের কোলে GSI ক্যাম্প

কোলে, যেখানে GSI-এর দুজন বিজ্ঞানী দিনের পর দিন ভূতত্ত্বের বিভিন্ন তথ্য পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। এই হামবোল্ডেই নবম অভিযানে লেখা হয়েছিল এক করুণ কাহিনী। চারজন অভিযাত্রী শীতের প্রকোপ কমাতে তাঁবুর ভিতর জেনারেটর চালু রেখে ঘুমিয়েছিল। গন্ধহীন ভারী কার্বন-মনোক্সাইড গ্যাস তাদের চিরনিদ্রায় ঠেলে দেয় সেদিন। স্বভাবতই এসব করুণ কাহিনী নির্জন এই মহাদেশে মনের ওপর কিছুটা চাপ সৃষ্টি করে। হেলিকপ্টার করে তাই আমি হাজির হলাম সর্বপ্রকার দূরসঞ্চার ব্যবস্থার সুযোগ প্রদান করতে।

দুর্ভাগ্য না সৌভাগ্য জানি না, পরের দিন থেকে আবহাওয়া গেল বদলে। আমি সেখানে আটকে গেলাম পাঁচদিনের জন্য। এই সুবাদে বহু আলোচিত তুষারঝড় দেখতে পেলাম। বরফের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা তীব্রগতিতে ছুটে আসছে। তাঁবুর বাইরে পা রাখা মুশকিল। দু-তিন মিটার দূরের বস্তুও দেখা যায় না। সারাদিন তাঁবুর ভিতর স্লিপিং ব্যাগে পা ঢুকিয়ে বসে বসে কেটে গেল। সঙ্গে অবশ্য ছিল গরম চা, কফি এবং সুপ।

'মৈত্রী' থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার পশ্চিমে লংলেকের ধারে দীর্ঘদিন তাঁবু খাটিয়ে আছেন কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তনু বোস ও সুশান্ত সামন্ত। মধুর স্বভাবের এই দুই তরুণ ছিল সবার প্রিয়। তাই কাজের অবসরে অনেকেই পায়ে হেঁটে হাজির হতেন তাঁদের তাঁবুতে নতুন কিছু রসদ নিয়ে। দুপুর একটায় আমরা যখন সেখানে পৌঁছালাম, আশপাশে কোন জনমানব দেখা গেল না। অথচ সবকিছু খোলা। এটাই আণ্টার্কটিকার বৈশিষ্ট্য—পৃথিবীর একমাত্র মহাদেশ, যেখানে চুরি-ডাকাতির ভয় নেই। তবে হ্যাঁ, খাবার চুরির ভয় আছে। সে-চোর মানুষ নয়, 'স্কুয়া'। প্রায় চিলের মতো দেখতে সাদা ও বাদামী রঙের এই মেরুদেশের পাখিগুলো ভয়ঙ্কর সাহসী, প্রায় হাতের কাছ থেকে খাবার ছিনিয়ে নিয়ে যায়। দলছাড়া পেঙ্গুইনের পরিণতি স্কুয়ার শিকার।

লংলেকের নীল জল দেখে আর থাকতে পারলাম না। দিনটা উজ্জ্বল সূর্যালোকিত, তাই সাহস করে নেমে



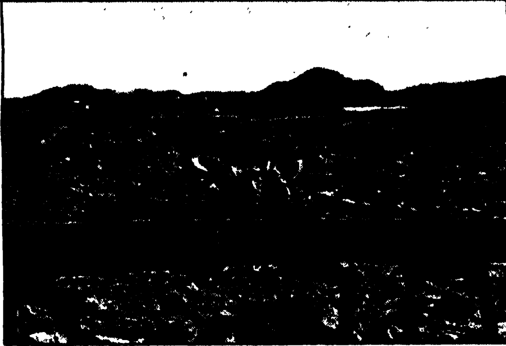
লংলেকের হিমশীতল জলের পরশ নেওয়ার লোভ সামলানো গেল না

পড়লাম হিমশীতল জলে। দিল্লির সৌরভ গুপ্তাও নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। কিন্তু জল যে এত ঠাণ্ডা হবে তা কল্পনা করতে পারিনি। অগভীর সেই হ্রদের জলে কোনরকমে মাথা ডুবিয়ে ছুটে চলে এলাম ডাঙায়। অনেকক্ষণ নিজের পাদুটো নিজের বলে মনে হচ্ছিল না। প্যাকেটে ভরা শুকনো পোলাও গরম জলে ফুটিয়ে তৈরি হলো মধ্যাহ্নভোজ। খাওয়া শেষ করেই আমরা এগিয়ে

* এই রচনাটি দুর্গাপদ ঘোষ প্রমুখ নিবেদিত 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

চললাম আরো পশ্চিমে। কিছুদূর যেতেই পেলাম শির্মাকার পর্বতমালার সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য দক্ষিণ গঙ্গোত্রী হিমবাহ। শির্মাকারের দক্ষিণে আণ্টার্কটিকার মূল ভূখণ্ড জুড়ে জমে আছে কয়েক লক্ষ বছরের পুরনো হাজার হাজার ফুট পুরু বরফের চাদর। একেই বলে 'ক্যাপ আইস' (cap ice)। দিগন্তবিস্তৃত এই চাদরের একটা প্রান্ত দুটো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে যেন ঢলে পড়েছে শির্মাকারের কোলে। সেই প্রান্ত থেকে গঙ্গার স্নেহধারার মতো অনবরত বয়ে চলেছে বরফ-গলা জল। সেই জলেই তৈরি হয়েছে সামনের দক্ষিণ গঙ্গোত্রী হ্রদ। পৃথিবীর দক্ষিণতম প্রান্তের এই গঙ্গোত্রীর রূপ দেখে মোহিত হতে হয়।

শির্মাকারের দক্ষিণে ক্যাপ আইসের মধ্য থেকে মাথা তুলে আছে শিবলিঙ্গ এবং ডিটাইয়া পর্বতশৃঙ্গ। তাদের পিছনে রেখে আরো দক্ষিণে গেলে পড়ে রুশ বিমানবন্দর। আণ্টার্কটিকায় খোলা জায়গার অভাব নেই, তবুও এই জায়গাটিকে বিশেষভাবে তৈরি করে মেরুদেশীয় উড়োজাহাজের ওঠানামার উপযুক্ত করে তুলেছেন আমাদের নিকটবর্তী রাশিয়ান স্টেশন 'নোভো'র অভিযাত্রী দল। বরফের মধ্যে অর্ধেক ডুবে থাকা ছোট্ট কাঠের বাড়িটায় থাকা-খাওয়ার সবরকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আছে। এই মেরুদেশে বিমানের আনাগোনা খুবই কম। এই নির্জন প্রান্তে শুধু স্কুয়াদেরই আনাগোনা!



জলের পাইপ লাইনের ওপর স্কুয়া-দম্পতি, পিছনে ত্রিশূল পাহাড়

দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততার মাঝেও প্রকৃতির প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল রূপের আনন্দ উপভোগ করে চলেছি কয়েকদিন ধরে। সময়ের সাথে সাথে বদলে যায় দিন-রাত্রির খেলা। জানুয়ারি মাসে ছিল আলোকোজ্জ্বল রাত্রি। মধ্যাহ্নে সূর্য উত্তর-মধ্য আকাশে, মধ্যরাত্রে সূর্য পশ্চিমদিক ঘুরে পৌঁছে যায় দক্ষিণ দিগন্তরেখায়। ফেব্রুয়ারি শুরু হতেই মধ্যরাতের সূর্য ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিগন্তরালে মুখ লুকাতে থাকে, বাড়ে রাতের অন্ধকার।

পরিবার-পরিজন ছেড়ে, মানবসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রায় ১২,০০০ কিলোমিটার দূরে যে মানুষগুলি মাসের পর মাস বিভিন্ন কর্মযজ্ঞে মেতে আছেন, তাঁদের মুখে হাসি এনে দিতে পারে সুদূর থেকে ভেসে আসা সেই আপনজনের কণ্ঠস্বর অথবা একটুকরো চিঠি। আধুনিক উপগ্রহ যোগাযোগের মাধ্যমে এসবই সম্ভব। কেবল টেলিফোন, ফ্যাক্স বা টেলেক্স নয়, সুদূর আণ্টার্কটিকায় বসে ই-মেল এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোন গবেষণাগার, যেকোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তথ্যের



পিঠে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন ভূতত্ত্ববিজ্ঞানীরা

আদানপ্রদান সম্ভব। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক আমাদের ছোট্ট উপগ্রহ টার্মিনালটি। ছোট্ট ব্রিফকেসের আকারের টার্মিনালটি উঁচিয়ে ধরে পৃথিবীর যেকোন টেলিফোন নম্বরে কথা বলা যায়। সুদূর ফিল্ড ক্যাম্পে আপৎকালীন সহায়তার জন্য এই টার্মিনালের উপস্থিতি নিঃসঙ্গ অভিযাত্রীদের মনোবল বাড়িয়ে দেয়।

দূরসঞ্চার কক্ষটি যেন আমাদের মাতৃভূমির জানালা। সেই জানালা দিয়ে কত ভাল-মন্দ বাতাস বয়ে আসে 'মৈত্রী'র আঙিনায়। নায়ক সুবেদার সিন্ধের পদোন্নতি, সত্যনারায়ণের পিতৃত্বলাভ—এসব খবর যেমন সুযোগ

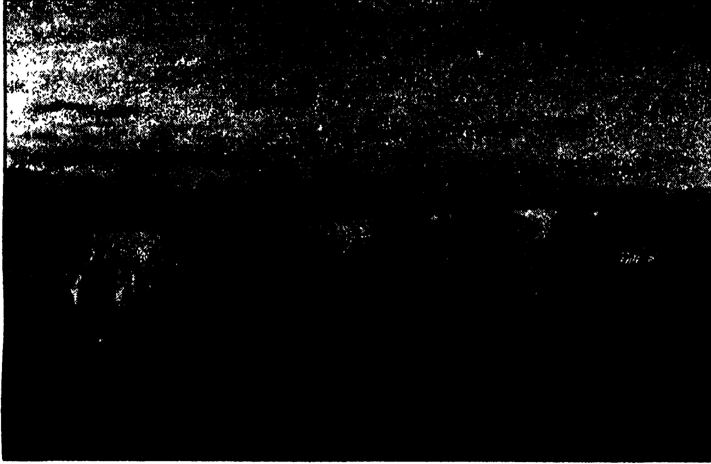


তিরঙ্গাখচিত ভারতের 'মৈত্রী' স্টেশনে নবাগত বিজ্ঞানীদের অবতরণ

করে দেয় সান্ধ্য মজলিসের, ঠিক তেমনি যখন আসে তসরিমের মায়ের দেহাবসানের খবর, তখন সবাই কেঁপে ওঠে। একমুহূর্তের জন্য নিজেদের অসহায় মনে হয়। কারণ, জাহাজ তো এই মুহূর্তে ভারতের উদ্দেশে পাড়ি দেবে না! এমন কত মানসিক চাপ প্রতিনিয়তই পড়ছে সবার মনে। বিশেষ করে শীতকালীন অভিযাত্রীদের—যাঁদের ছেড়ে জাহাজ ফিরে যাবে ভারতবর্ষে, তাঁদের কথা ভাবলেই বিস্মিত হতে হয়। দুমাস সম্পূর্ণ অন্ধকার—সূর্যের একটি রশ্মিও দেখা যায় না। স্টেশনের বাইরে তখন পা রাখাই দুষ্কর!

দেখতে দেখতে বিদায়ের সময় এসে গেল। ফেব্রুয়ারির প্রথমেই সব ফিল্ড ক্যাম্প থেকে সদস্যরা মূল স্টেশন 'মৈত্রী'তে ফিরে এসেছেন। তাঁদের অনেকেই জাহাজে ফিরে গিয়েছেন। শুধু এন. ভি. সত্যনারায়ণ, প্রেমকিশোর এবং আমি—এই তিনজন আন্টার্কটিকাকে আরো কাছ থেকে দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না। হেলিকপ্টারে না ফিরে আমরা অপেক্ষা করলাম কনভয়ের জন্য। এখন শীতটা আরো অনেক বেড়েছে, দিনের বেলায় প্রায় –১০/১৫ ডিগ্রি পর্যন্ত নেমে যায়। রাতের অন্ধকারও দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে—প্রায় ৮/৯ ঘণ্টা সূর্যালোকের দেখা পাওয়া যায় না। সামনের 'প্রিয়দর্শিনী' হ্রদের রঙ বদলে গিয়েছে—নীল জল জমে সাদা হয়েছে। আর কিছুদিন পরই তার ওপর ভারী ভারী বুলডোজার চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে।

কনভয়তে রয়েছে বরফের ওপর চলার উপযুক্ত আটখানি গাড়ি—'পিস্টন বুলি'। প্রতিটা গাড়ির এক-একটা সুন্দর নাম আছে—সবই ভারতের বিখ্যাত নদীর নামে—ঝিলম, কয়না, পম্পা ইত্যাদি। প্রতিটি গাড়ির পিছনে ট্রলিতে চাপানো বিশাল বিশাল কন্টেনার। পম্পার পিছনে বাঁধা বাঞ্জারাতে (Banjara) আমাদের তিনজনের স্থান হলো। বাঞ্জারা হলো ভ্রাম্যমাণ বাসোপযুক্ত ঘর। অনেকটা ট্রেনের কামরার মতো। এখানে আছে আটজন মানুষের শোওয়ার ব্যবস্থা। লাগোয়া একটা রান্নাঘর ও টয়লেটও আছে। প্রায় পনেরো-ষোলো দিনের রসদ জমা আছে রান্নাঘরে। আন্টার্কটিকার আবহাওয়া বড়ই চপল। যেকোন মুহূর্তে উঠতে পারে তুষারঝড়, তখন এক পাও এগোনো যাবে না। হয়তো চার-পাঁচ দিন আটকে থাকতে হবে একজায়গায়। তখন এই বাঞ্জারাই একমাত্র আশ্রয়। অবশ্য সঙ্গে আছে 'জীবনদীপ'—জেনারেটরবাহী ছোট্ট এক স্লেজগাড়ি। বাঞ্জারার জীবন-দীপশিখা জ্বালিয়ে রাখার দায়িত্ব তার।



ভয়ঙ্কর এক হিমশৈল, যার মাত্র এক-দশমাংশ সমুদ্রের ওপরে দৃশ্যমান

২৬ ফেব্রুয়ারির প্রথম সূর্যালোকে 'প্রিয়দর্শিনী' লেককে দেখলাম চকচক করছে। চারিদিকে সৃষ্টি হয়েছে কেমন এক মায়াময় পরিবেশের। বারবার পিছনে ফিরে তাকাই। হয়তো জীবনের শেষবারের মতো দেখা। বিশাল লম্বা জলের পাইপের পাশে শ্রেণিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ঝিলম, পম্পা, গোদাবরী ও আরো অনেক গাড়ি। বছরের প্রথম কনভয়। গতবছরের অভিজ্ঞ সৈনিক ভাইরা বর্তমান অভিযাত্রী দলের সৈনিক ভাইদের পাঠ দিতে দিতে বিভিন্ন স্তরের বরফের ওপর গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে ১২০ কিলোমিটার দূরে অপেক্ষারত 'পোলার বার্ড'-এ। সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলাম। আমাদের যাত্রা শুরু হলো ঠিক সকাল সাড়ে পাঁচটায়। শির্মাকারের পাথুরে জমি ছেড়ে আমরা উঠে এলাম দক্ষিণের ক্যাপ আইসে। শিবলিঙ্গ ও ডিটাইয়াকে পাশে রেখে এগিয়ে চললাম পূর্বাভিমুখে। শির্মাকারকে অর্ধবৃত্তাকারে পরিক্রমা করে আমরা যখন 'শেল্ফ আইস' (shelf ice)-এ এসে পড়লাম তখন বেলা বারোটা। শেল্ফ আইস হলো তটভূমি থেকে সমুদ্রের ওপর প্রলম্বিত হাজার হাজার ফুট পুরু দিগন্তবিস্তৃত ভাসমান বরফের আস্তরণ। এই শেল্ফ আইসের এক-একটা বিশাল টুকরো ভেঙে জলে ভেসে যায়, তৈরি হয় ভয়ঙ্কর হিমশৈল। হাজার ফুট পুরু এই

বরফের আস্তরণের ওপর দিয়ে আমরা খুব সাবধানে এগিয়ে চললাম। গ্রীষ্মের তাপে বরফের উপরিভাগ অনেক জায়গায় গলে ছোট ছোট হ্রদের সৃষ্টি করেছিল। শীতের শুরুতে আবার সব জমতে শুরু করেছে। ওপর থেকে সদ্য জমে ওঠা এই বরফের ঘনত্ব বোঝা খুব মুশকিল। অভিজ্ঞ চোখে খুব সাবধানে সৈনিক বন্ধুরা আমাদের নিয়ে চলেছেন। মাঝপথে হলো মধ্যাহ্নভোজের বিরতি। মৈত্রী থেকে প্যাকেটে করে আনা সুস্বাদু মটন বিরিয়ানি খেয়ে আবার এগিয়ে চললাম। বিকাল গড়িয়ে এল। চারিদিকের বরফের রঙ বদলাতে শুরু করল। সাদা বরফের ওপর যেন সোনার আস্তরণ!

দেখতে দেখতে এসে গেল 'দক্ষিণ গঙ্গোত্রী'— ভারতের প্রথম স্থায়ী স্টেশন, যা আজ বরফের নিচে সমাহিত। ১৯৮৩ সালে তৃতীয় অভিযানের সময় গড়ে তোলা হয় এই স্থায়ী স্টেশন। স্বল্পায়ু স্টেশনটি ১৯৮৯ সালে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। আজ সেখানে আছে ছোট্ট একটা কেবিন—যেখানে ভূ-চুম্বকীয় ও মেরুদেশের তুষার পর্যবেক্ষণ করার জন্য কয়েকজন বিজ্ঞানী তুষারঝড় এবং হিমেল হাওয়া সহ্য করে নিরবচ্ছিন্নভাবে তথ্যসংগ্রহ করে চলেছেন।

অবশেষে রাতের অন্ধকারে আটটা গাড়ি সারিবদ্ধভাবে পোলার বার্ডের কাছে এসে পৌঁছাল। ফ্লাডলাইটের আলোয় আলোকিত পোলার বার্ডকে এক রাজপ্রাসাদ মনে হচ্ছিল। জাহাজের ডেকে বেরিয়ে এসে উপস্থিত সকলে স্বাগত ও অভিনন্দন জানালেন আমাদের—বছরের প্রথম সফল কনভয় টিমকে। জাহাজের বিশাল লম্বা ক্রেনটা আমাদের তোলার জন্য দড়ির তৈরি একটা ঝুড়ি নামিয়ে দিল, আন্টার্কটিকাকে শেষবারের মতো স্পর্শ করে জাহাজে উঠে এলাম।

পরদিনই তুষারঝড় শুরু হয়ে গেল। শেল্ফ আইসে বাঁধা দড়ি কেটে জাহাজকে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে আসা হলো। শেল্ফের ওপর রাখা দেড়বছরের রসদ এবং অন্যান্য সামগ্রী আবার কনভয়তে করে মৈত্রী স্টেশনে পৌঁছানোর পর জাহাজ ভারতের উদ্দেশে পাড়ি দেবে। তারই মাঝে এই আবহাওয়া বিভ্রাট। জাহাজে উঠে সকলেই ঘরে ফেরার দিন গুনতে শুরু করে। এতদিন কর্মব্যস্ততার মাঝে বাড়ির কথা তেমন মনেই হয়নি, এখন আবহাওয়ার জন্য আরেকটা দিনও নষ্ট করতে মন চায় না।

দুদিন পর আবহাওয়া ঠিক হতেই বরফ সরিয়ে গাড়িগুলো উদ্ধার করা হলো। কনভয় ফিরে গেল মৈত্রী স্টেশনে। দুর্ভাগ্যবশত কনভয় মৈত্রী পৌঁছাতেই আবার আবহাওয়া বদলে গেল। হিমেল হাওয়ার তেজ বাড়তে লাগল। সহযাত্রীদের অবিলম্বে মৈত্রী থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। পরদিন সকালে ঝুঁকি নিয়েই অস্ট্রেলীয় পাইলট ডেভিড এবং পেরি উড়ে গেল দুটো হেলিকপ্টার নিয়ে। আমরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকলাম। প্রায় ঘণ্টা তিনেক পর আবার চপারের শব্দ শুনে সবাই ছুটে এলাম জাহাজের ডেকে। ঘন কুয়াশার মধ্যেও দুই পাইলট হেলিকপ্টার 'ল্যাণ্ড' করালেন দোদুল্যমান জাহাজের হেলিডেকে। সকলে সুস্থশরীরে জাহাজে ফিরে এসেছে দেখে আমরা নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য আমাদের দলনেতা মিস্টার সিভন সশরীরে বিদায় জানাতে আসতে পারলেন না।



পাশে বরফের পাহাড়, সামনে হ্রদ

৯ মার্চ ১৯৯৮ ঠিক দুপুর আড়াইটায় আমাদের জাহাজ আন্টার্কটিকার তটভূমি ছেড়ে যাত্রা শুরু করল ভারতবর্ষের দিকে। যদিও গত কয়েকদিন ধরে প্রতীক্ষা করছিলাম এই সময়টির জন্য, তবুও বিদায়মুহূর্তে বারবার পিছন ফিরে তাকাতে ইচ্ছা করছিল। যা দেখলাম তা সারাজীবনের অমূল্য সঞ্চয় হয়ে রইল। চোখের সামনে থেকে সরে যেতে লাগল সবকিছু। সেই স্বপ্নময় দেশ বাস্তবের ছোঁয়া দিয়ে আবার যেন হারিয়ে গেল স্বপ্নের মধ্যে!

বিদায় আন্টার্কটিকা, বিদায়! [সমাপ্ত] ❑

হেথা নয়

(স্বামীজীর বক্তৃতার কাব্যরূপ)

নচিকেতা ভরদ্বাজ

জলপ্রপাতের কলকলধ্বনি, বিহগকুলের কলকাকলি এবং
সূর্য-চন্দ্র-তারকার অপরূপ জ্যোতির্লেখা,
এমনকি সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের
অপার সৌন্দর্যরাশি, কী যে মনোরম
উপভোগ্য—তাতে নেই কোন সন্দেহের
অবকাশ। কিন্তু তবু প্রাচ্য মনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয় এইসব
নিসর্গের রূপচিত্রাবলী। এই আমাদের ভারতীয় মন
ভাবুক হইতে চায় অতীন্দ্রিয় ভা[illegible]র রাজ্যের।
স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে—এজগৎ [illegible]ড়িয়ে নীরব
অন্য দূর আকাশের, অন্য কিছুর [illegible]চ্যবাসী বর্তমানের
ইহজগতের সব গণ্ডি ভেদ করে [illegible]
সমস্ত ক্ষুদ্র খণ্ড সীমানা [illegible]
অসীমের অন্তর্লোকে, স্থান-কাল-পাত্রের
সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে "সব পেয়েছির দেশে"
চলে যেতে যায় তারা—সকল [illegible]রিয়ে [illegible]
"হেথা নয়, হেথা নয়, আর [illegible]
"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য [illegible]থা, অ[illegible]

সন্ন্যাসী হে বীর

সঞ্জয় ধর

কোন্ পুণ্যলোক হতে এসেছিল আলো,
ঘুচে গেল অন্ধকার, ঘুচে গেল কালো।
পৃথিবীর বুকে যত আবর্জনারাশি,
উন্মীলিত হলো আজি অন্ধকার নাশি।
সত্য হলো আবির্ভূত, মিথ্যা হলো লয়,
প্রেম হলো প্রকাশিত, ঘৃণা হলো ক্ষয়।
মূঢ়তার অবসান জ্ঞানের প্রকাশ,
দিল আজি মানবেরে বিদ্যার আশ্বাস।
মন্দ আজি বিভ্রান্তির সৃষ্টি নাহি করে,
বিজ্ঞতার অহঙ্কার আজি ধরা পড়ে।
পাণ্ডিত্যের অভিমান হলো বিদূরিত
[illegible] আজি করে না দূষিত
[illegible]রিবেশ। জ্ঞানহীন জন
[illegible]লতা; মূর্খ জ্ঞানী হন।
[illegible]গত তব আগমনে
[illegible]ন গাহে প্রতি জনে।
[illegible] দিল বিজয়ের টিকা
[illegible]সথা হলো লিখা—
[illegible]মি, হলো তব জয়,
[illegible]বাণী অব্যয় অক্ষয়।
[illegible]বে সেই পথ চাহি,
[illegible]র ওঠে শুধু গাহি।

আমরা [illegible]

মনোজ [illegible]টুয়া

যে রাখবার সে ঠিকই রাখে
আমরা শুধু মিথ্যে মিথ্যে ভাবি
এই দুনিয়ার তালাটি যার কাছে
সেই গুছিয়ে রেখেছে সব চাবি
শুধু আমরা মিথ্যে মিথ্যে ভাবি।
রোজ সকালে সুয্যিটাকে কে তুলেছে ডেকে
সন্ধেবেলা ডুবিয়ে দিচ্ছে ফের
কোন্ সাগরে
ডুবে যাচ্ছে আলো
যার কাজ তা তিনিই করেন
সব,
আমরা শুধু মিথ্যে মিথ্যে ভাবি।
সময় হলেই ঘুম আসবে চোখে
সময় হলেই স্নান করতে
সাগরজলে নাবি
আমরা শুধু মিথ্যে মিথ্যে ভাবি।



বিশ্বভুবন আনত চরণতলে

গোপা আচার্য

দ্যুতিময় দুটি চোখে অপার করুণা—
নেমে আসে বীজমন্ত্র হয়ে—"শিবজ্ঞানে জীবসেবা"।
দীক্ষা দিলে সেবাব্রতে প্রেমিক সন্ন্যাসী।
তোমার বুকে জ্ঞানসূর্য জ্বলে—
পথের দিশারী, অন্ধকার আবর্জনায় আগুন জ্বালালে,
পুড়ে পুড়ে হোক খাঁটি সোনা—এই স্বপ্ন।
অন্তরে অন্তরে জ্বালালে প্রদীপ—
সেই আলোর শিখা পথ চেনাল মানুষ হওয়ার।
নারী পেল মূল্য তার—মাতা, ভগিনীর।
দাসত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়ে উঠে এল পুরুষের পাশাপাশি।

ভুবনবিজয়ী দীপ্তি তোমার মুখে
ঝরে ঝরে পড়ে রশ্মিকণার মতো
দিব্যপ্রভায় আলোময় হলো সব—
দেখ, বিশ্বভুবন আনত চরণতলে।

মিনিয়াপোলিসে বিবেকানন্দ

চিন্ময়ীপ্রসন্ন ঘোষ

চলেছেন জ্ঞানসূর্য বেদান্ত-কেশরী...
প্রত্যুৎপন্নমতিময় দুটি চোখ, পরনে গৈরিক, উষ্ণীষ শিরোপরে।
মূর্তিমান তিতিক্ষা কিংবা ভারতাত্মা হেঁটে চলেছেন দিগ্বিজয়ে—
দুহাতে দুই অস্ত্র—জ্ঞান আর প্রেম। আজ
'সাদা সাদা মানুষের দেশে' যুগাবতার বিবেকানন্দ-শরীরে।

মিনিয়াপোলিস—মিসিসিপি তীর, মিনেসোটা রাজধানী
সুরম্য নগরী, জেগে আছে নিমীলিত নয়নে।
পূর্বপারে তার সহোদর সেন্ট পল...
মনে পড়ে যায় স্মৃতিপটে নিজ জন্মনগরী... কলকাতা... সিমলা আর
নিখিল পাপহর জাহ্নবীরেখা।
আহা, রজতশুভ্ররূপ আজ মিনিয়ার হিমসম্পাতে!
সিনিহাহা জলপ্রপাত, হাহা করে হাসে মখমলী রোদে।
স্থাণুর ললাটে সহস্র শশীকলা যেন। পঞ্চাশ ফুট উচ্চ তুহিনমৌলী
স্তম্ভিত করে।

আনন্দস্বরূপের সে কী আনন্দ! জমে গেছে লেক। শ্লেজে চড়ে বসলেন
নবীন সন্ন্যাসী। তাপমান শূন্যের একুশ ডিগ্রি নিচে। স্কেটিং চলছে হৈহৈ করে।

ইউনিটেরিয়ান চার্চ-অভ্যন্তরে। থিক্‌থিক্ ভিড়!
যাজক সাইমন্স পাশে যুগনায়ক, জাতীয় পোশাকে। পরিচয় করিয়ে দিলেন
যাজক প্রাচ্য ও প্রতীচীর। ২৪ নভেম্বর ১৯৯৩। বেজে উঠল কম্বুকণ্ঠ
চমৎকার ইঙ্গ-ভাষে সূচীপড়া নীরবতা। গল্প দিয়েই শুরু করলে তুমি :
অন্ধের হস্তিদর্শন। গল্পের 'চক্ষুষ্মান' হয়ে বললে : ঝগড়া থামাও। হ্যাঁ,
সবাই ঠিক, কিন্তু এক এক স্পর্শের অনুভূতি দিয়ে দেখেছ—তোমরা। বললে :
ঈশ্বরানুভূতি, নিমজ্জমানের প্রাণবায়ুর আকুতি।
আর ঈশ্বরকে এইভাবে যখন চাইবে তোমরা
আমরা স্বাগত জানাব ভারতে। কারণ, মিশনারিরা
যাবেন তখন অন্তরে ভালবাসা নিয়ে, ঘৃণা বা
গোঁড়ামি নিয়ে নয়।

কী বজ্রনির্ঘোষ! সাহস-বিস্তৃত বক্ষপটে সত্যের হিরণ্ময় দ্যুতি!
প্রেম নিয়ে গিয়েছিলে মিনিয়াপোলিসে, ভেঙে দিতে
যত অহঙ্কার, গোঁড়ামি আর সংশয়!

কী অদ্ভুত! শতবর্ষ পরেও জনজীবনে উজ্জ্বল প্রাণবন্ত তোমার
হাতে গাঁথা সংস্কৃতির অভিনব তত্ত্বগুলি।
মিনিয়াপোলিস থেকে ডেস্ মোইন্স—শিকাগো থেকে
ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে দিকে সে যে তোমার হাতেই গ্রথিত।

দোললীলা

সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়

দোল এসেছে মন রাঙাতে
মাতল সবাই মাতল
সর্বজনের মর্মমূলে
লাগল নাচন লাগল।

পলাশ শিমূল আগুনপারা
রঙের খেলার আমন্ত্রণে
মৃদঙ্গ-শ্রীখোলের তালে
মাতব যে সঙ্কীর্তনে।।

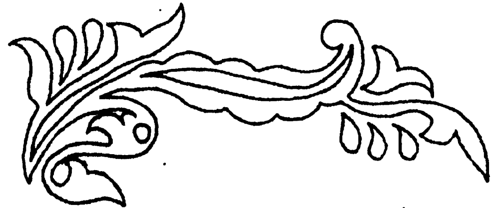
রাধা খেলেন কৃষ্ণ খেলেন
খেলেন নিখিল মর্তজন
বহুবর্ণে বিনন্দিত
আবির ছড়ায় প্রভঞ্জন।

দোল ফাগুনে মহাপ্রভুর
মহান আবির্ভাবে
আনন্দেরই হাট বসেছে
ঠাকুর বিভোর দিব্যভাবে।

ভাবের ঘোরে দেখেন ঠাকুর
শ্রীগৌরাঙ্গদেব
নাচেন ভক্ত-পরিবৃত
ঐ নিত্যানন্দদেব।

আরো কয়েক ভক্তপ্রবর
দিব্যচোখে উদ্ভাসিত
ঠাকুর পরিকররূপে
পুনর্জন্মে আবির্ভূত।

আহা এমন অরূপলীলা
এই কলিতে কে দেখেছে
ধন্য সেই মানবকূলে
আলোর দিশা যে পেয়েছে।



অলঙ্করণ : জয়ন্ত ঘোষ

জাতীয় লিগ ও ভারতীয় ফুটবল

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতীয় লিগ ভারতীয় ফুটবলের মরাগাঙে জোয়ার আনতে পারেনি। অথচ প্রথম বছর অর্থাৎ ১৯৯৬ সালে অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে, ঘটা করে জাতীয় লিগের সূচনাপর্বে ফুটবল ফেডারেশনের কর্মকর্তারা বলেছিলেন, এবার ভারতীয় ফুটবল সাবালক হতে চলেছে। মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানি ফিলিপস জাতীয় লিগের স্পনসর, স্টার টিভিতে প্রতিটি ম্যাচ দেখানো হবে—স্বপ্নের এই ফানুসটা রঙিন ডানা মেলে শুধু ওড়ার অপেক্ষায়। দেশের অগণিত ফুটবলপ্রেমীকে আশাবাদী করে তুলেছিল প্রথম জাতীয় লিগের প্রেক্ষাপট। কিন্তু হা-হতোহস্মি! পরবর্তী পর্যায়ে জাতীয় লিগ পর্যবসিত হলো কলকাতার ঘরোয়া লিগ বা ডুরাণ্ড, রোভার্সের মতো গতানুগতিক টুর্ণামেন্টে।

আসলে রয়েছে বিসমিল্লায় গলদ। ভারতীয় ফুটবলের পরিচালকদের অধিকাংশই ফুটবল ছেড়ে অগ্রাধিকার দেন রাজনীতিকে। প্রথম জাতীয় লিগের সময় সারা দেশ জুড়ে ফুটবলের উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল। সেসময় বাণিজ্যিক পৃষ্ঠপোষকতারও অভাব ছিল না। মিডিয়াও প্রচারে কার্পণ্য করেনি। এই তিন উপাদানের মিশেলে ফুটবলের এক চমৎকার বাতাবরণ তখন তৈরি হচ্ছে ধীরে ধীরে। এ হেন পরিমণ্ডলে ফুটবল প্যাকেজিঙে নতুন মাত্রা সংযোজন করতে ব্যর্থ হলেন আমাদের ফুটবলকর্তারা। ফলে ভারতীয় ফুটবল যে তিমিরে ছিল, সেখানেই পড়ে রইল।

জাপান, চীন, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া আদ্যন্ত পেশাদারী মোড়কে জাতীয় লিগ চালু করে আজ এশীয় ফুটবলে বড় শক্তি হয়ে উঠেছে। জাপান বিশ্বকাপ ও অলিম্পিক খেলে ফেলেছে। চীন কুড়ি বছরের চেষ্টায় বিশ্বকাপের টিকিট জোগাড় করে নিয়েছে। আমরা একশ কুড়ি বছর ফুটবল খেলেও ক্ষুদ্র উপমহাদেশীয় গণ্ডির মধ্যে পড়ে রয়েছি। অলিম্পিক ও বিশ্বকাপ দূর অস্ত্, এশিয়ান গেমসেও খেলার ছাড়পত্র পাওয়াও এরপর দুষ্কর হয়ে দাঁড়াবে। এখন ভারতীয় ফুটবলাররা দেশের হয়ে খেলতে একেবারেই উৎসাহী নয়। তার কারণ, দেশের হয়ে খেললে তাদের আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। ক্রিকেটারদের মতো সামাজিক সম্মান ও মর্যাদাও বাড়ে না। তাই জাতীয় দলের হয়ে খেলাটা ফুটবলারদের কাছে বিন্দুমাত্র আবেগ, উদ্দীপনার সঞ্চার করে না। জাতীয় দলের খেলা ও আন্তর্জাতিক ম্যাচের খবরাখবর সম্পর্কে ফুটবলপ্রেমীদেরও ন্যূনতম আগ্রহ নেই। ফলে ফুটবলারদের মধ্যেও আন্তর্জাতিক স্তরে ভাল খেলার তাগিদ থাকে না।

অনুন্নত দেশসমূহে ফুটবল পরিকাঠামো তৈরি ও খেলার মান উন্নতির জন্য ফিফা কোটি কোটি ডলার অনুদান দেয়। ফিফার সক্রিয় পৃষ্ঠপোষণায় এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কোন্ খাতে কিভাবে খরচ হয়, কতটাই বা উন্নত হয় ভারতীয় ফুটবলের সাংগঠনিক পরিকাঠামো—তা কেউই জানে না। শোনা যায়, গতবছর মিলেনিয়াম কাপ টুর্ণামেন্টের স্পনসর মুম্বাইয়ের 'স্টুডিও ২০০১' নাকি এ. আই. এফ. এফ.-কে ২২ কোটি টাকা দিয়েছিল টুর্ণামেন্ট সংগঠনের জন্য। তৃতীয় শ্রেণীর কয়েকটি বিদেশী টিম এনে হালকা মানের এই টুর্ণামেন্টটি করতে খরচ হয়েছিল প্রদেয় টাকার অর্ধেক। বাকি টাকায় কোন পরিকল্পনাপ্রসূত কর্মতৎপরতা দেখাতে পারেনি ফেডারেশন। ফিফা প্রতি চারবছর অন্তর যে টাকাটা পাঠায়, তার কতটা কোন্ খাতে খরচ হলো, কতটাই বা উদ্বৃত্ত হচ্ছে তা তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা দরকার।

এবারে আসা যাক জাতীয় লিগের গুণগত উৎকর্ষের পর্যালোচনায়। ১৯৯৬-২০০১—এই পাঁচ বছরের জাতীয় লিগ কয়জন ভাল বিদেশী ফুটবলারকে হাজির করতে পেরেছে ভারতীয় দর্শকের সামনে? বহু খুঁজে, স্ট্যাটিস্টিক্স হাতড়ে গুটিকয়েক নামই মনে পড়ে। উজবেকিস্তানের ইগর স্কিভরিন, ব্রাজিলের জোস ব্যারেটো, নাইজেরিয়ার জর্জ এক্কা, লাইবেরিয়ার সানডে সিয়া, ইউক্রেনের আন্দ্রে শেভচেঙ্কো—এরকম কতিপয় ফুটবলার ছাড়া আর কার নাম করা যায়? ইস্টবেঙ্গলের ঘানা-আগত জ্যাকসন, সুলে মুসা বা নাইজেরিয়ার ওমোলোজারা জাতীয় লিগের আগেই কলকাতার লিগ, শিল্ড খেলে ফেলেছিলেন। কোনমতেই তাঁদের জাতীয় লিগের ফসল বলা যাবে না।

প্রতিবছর জাতীয় লিগে অংশগ্রহণকারী প্রায় প্রতিটি ক্লাবেই ভুরি ভুরি তৃতীয় শ্রেণীর বিদেশী ফুটবলার আসে। তাদের স্কিলহীন, টেকনিক-শূন্য গা-জোয়ারী খেলায় কতটা উপকৃত হচ্ছে ভারতীয় ফুটবল? এদের বলদর্পী খেলার দরুন ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে ভারতীয় ফুটবলাররা। অথচ এদের চেয়ে অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয় ফুটবলাররা ঠিকমতো সুযোগ পেলে জাতীয় লিগের তাৎপর্যটাই অন্য মাত্রা পেয়ে যেত। যে-কারণে জাতীয় লিগের পত্তন, তার অনেকটাই সফল হতো। গোয়ার আলভিটো ডি কুনহা, জুলস আলবার্তো, মহারাষ্ট্রের খালিদ জামিল, কর্ণাটকের ভেঙ্কটেশ, বাংলার দীপক মণ্ডল, কেরালার মহম্মদ নাজিবরা যথেষ্ট যোগ্য ভারতীয় ফুটবলার। জাতীয় লিগে ঠিকমতো গুরুত্ব দেওয়া হয় না এদের। তাই ভারতীয় দলের হয়ে যখন আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে নামে তারা, তখন একধরনের হীনম্মন্যতায় আচ্ছন্ন থাকে, ফলে নিজেদের আসল খেলাটা ভুলে যায়।

ফেডারেশনের উচিত বিদেশী ফুটবলারদের বিভিন্ন ক্লাবে খেলার ক্ষেত্রে ন্যূনতম মান নির্ধারণের ব্যবস্থা করা এবং অতীতের প্রখ্যাত খেলোয়াড়দের তত্ত্বাবধানে তাদের যোগ্যতা ও ক্ষমতা যাচাই করে দেখা। বড় শরীরের আপাত সুবিধা নিয়ে তারা খেলে যাবেন দিনের পর দিন, আর অপেক্ষাকৃত যোগ্য দেশী ফুটবলারদের জায়গা হবে রিজার্ভ বেঞ্চে—এই অবস্থার পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরী। গত কয়েক বছরে ভারতীয় ফুটবলে তাজা রক্তের যোগান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। জেমস সিংহ, রতন সিংহ, বুগো সিংহ, জীবন মোরেস, খাম্বিতান সিংহ, খালিদ জামিল, আলভিটো ডি কুনহা, দীপক মণ্ডল, দেবজিৎ ঘোষ, হরদীপ সাম্ধা, হরদীপ গিল—এরকম অজস্র নাম করা যায়, যাদের ওপর নির্দ্বিধায় ভরসা রাখা যায়। কিন্তু এদের ক্লাব-কর্তৃপক্ষ তৃতীয় শ্রেণীর আফ্রিকান ফুটবলারদের ওপর অতিরিক্ত ভরসা করে অনিশ্চিত অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বহু প্রতিভাবান ও যোগ্য ভারতীয় ফুটবলারকে।

জাতীয় লিগের মতো প্রতিটি রাজ্যে ঘরোয়া ফুটবল লিগে পেশাদারী পরিকাঠামো তৈরি করলে রাজ্যস্তরের ফুটবলও উন্নত হবে। কলকাতার লিগ —যাকে একসময় বলা হতো এশিয়ার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ, তা আজ মৃতপ্রায়। আগে প্রতি বছর মে মাসে শুরু হতো কলকাতার লিগ ফুটবল। পুজোর আগেই শেষ হয়ে যেত। তারপর হতো আই. এফ. এ. শিল্ড। এখন লিগই সময়মতো শেষ হয় না। সুপার লিগের খেলা পুজোর আগে শেষ হয়ে গেলেও প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিশনের খেলা শেষ হতে হতে বছর গড়িয়ে যায়। এতে খেলোয়াড়দের মতো সাধারণ দর্শকদের মধ্যেও একধরনের হতাশা ও বিতৃষ্ণা জন্ম নেয়। আর কলকাতা যেহেতু ভারতীয় ফুটবলের মক্কা, তাই কলকাতা লিগ ফুটবলকে রসাতলে পাঠিয়ে ভারতীয় ফুটবলের অস্তিত্ব বজায় থাকবে কি করে? পাঞ্জাবে ফুটবল লিগ হয় না। কেরালা, মহারাষ্ট্রেও নমো নমো করে লিগ চলে। একমাত্র গোয়ায় ফুটবল লিগ আঙ্গিক ও ব্যবস্থাপনার দিক থেকে খানিকটা হলেও পেশাদারী। একমাত্র গোয়াতেই প্রতিটি ক্লাব আধুনিক ফুটবলের চাহিদা ও তাৎপর্য মেনে প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক দিক থেকে ভারতের অন্যান্য প্রান্তের ক্লাবগুলির থেকে এগিয়ে রয়েছে।

ফিফার নিয়মানুযায়ী প্রতিটি ক্লাবে মাল্টি জিম, সুইমিং পুল, নিজস্ব স্টেডিয়াম বাধ্যতামূলক। এদেশে কয়টি ক্লাবে এসব ব্যবস্থা রয়েছে? ক্লাব তো কোন্ ছাড়, একমাত্র ব্যাঙ্গালোর ছাড়া আর কোথাও কোন রাজ্যসংস্থারই নিজস্ব স্টেডিয়াম নেই। সর্বোপরি ভারতবর্ষের ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা এ. আই. এফ. এফ.-এর নিজস্ব কোন অফিস বা কার্যালয়ই নেই। যে যখন সচিব হয়, তখন সে তার নিজের অঞ্চলে একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে সেখান থেকে ফেডারেশন চালায়। এই হাস্যকর অবস্থাই ভারতীয় ফুটবলের প্রতীকী দিকচিহ্ন। শোনা যাচ্ছে এবার দিল্লিতে স্থায়ী কার্যালয় হবে। ফিফার প্রদেয় টাকায় ব্যাঙ্গালোরে ফুটবল অ্যাকাডেমি হবে। ফেডারেশনের বর্তমান সচিব গোয়ার আলবার্তো কোলাসো মোটামুটি সৎ ও দক্ষ প্রশাসক বলে পরিচিত। মনে হয় তাঁর সদিচ্ছা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিকাঠামো গঠন ও উন্নয়নে খানিকটা গতি আসতে পারে। পঙ্কজ গুপ্ত, এম. দত্তরায়, অশোক ঘোষের আমলে ভারতীয় ফুটবলে গঠনমূলক কাজকর্ম হতো। তাঁরা নিজেদের ক্ষুদ্র কায়েমী স্বার্থের প্রতি ততটা মনোযোগী ছিলেন না, তাই তখন ভারত আন্তর্জাতিক ফুটবলে খানিকটা হলেও সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছিল। অশোক ঘোষের পরবর্তী কর্মকর্তাদের মধ্যে কোলাসো মনে হয় ব্যতিক্রম, অন্তত এখনো পর্যন্ত তাঁর ভূমিকা ইতিবাচক ইঙ্গিতই দিচ্ছে।


ব্যারেটোকে দেখে কতখানি অনুপ্রাণিত এদেশের ফুটবলাররা?

তবে জাতীয় লিগ ভারতীয় ফুটবলারদের মানসিকতায় কিছুটা হলেও পরিবর্তন এনেছে। এটাই একমাত্র ভাল দিক। তিন/সাড়ে তিন মাসের তুল্যমূল্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়পড়তা ফুটবলারদের লড়াই করার ইচ্ছা ও ভাল খেলার খিদে বাড়িয়ে দিয়েছে। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও বেড়েছে ক্লাবগুলি ভাল স্পনসর পেয়ে যাওয়ায়। তবে সাধারণ মানের আফ্রিকান ফুটবলারের পরিবর্তে যদি লাতিন আমেরিকা কিংবা ইউরোপ থেকে মোটামুটি চলনসই ফুটবলার আনে ক্লাবগুলি, তবে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে এদেশীয় ফুটবলারদের স্কিল, টেকনিকও আরো উন্নত হবে। সেইসঙ্গে ক্লাব-কোচদের সতর্ক থাকতে হবে, এদেশীয় ফুটবলাররা যেন বিদেশী-নির্ভর হয়ে নিজেদের খেলাটা হারিয়ে না ফেলে, বরং তারা যেন নিজেদের উত্তরোত্তর উন্নত ও পরিশীলিত করে ক্লাব তথা দেশের সম্পদ হয়ে উঠতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন এদেশীয় খেলোয়াড়দের প্রতি তাঁদের আস্থা ও আন্তরিক সহযোগিতা।

এবছর আন্তর্জাতিক সার্কিটে বেশ কিছু টুর্ণামেন্ট খেলতে হবে ভারতকে। আফ্রো-এশিয়ান গেমস (যদি হয়), দক্ষিণ আফ্রিকায় চারদেশীয় টুর্ণামেন্ট, ইংল্যাণ্ড সফর, সবশেষে এশিয়াড। জাতীয় লিগ আমাদের ফুটবলারদের কতটা শাণিত করে তুলবে, তার ওপর নির্ভর করছে এইসব টুর্ণামেন্টে ভারতের পারফরমেন্সের রেখচিত্র।❑

স্মৃতিসৌরভ

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের কোন একসময় আমার পিতা ডাক্তার রামসত্য মুখোপাধ্যায় প্রথমবার বেলুড় মঠে যান এবং সেখানে স্বামী ধর্মানন্দ মহারাজের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন। সেই সূত্রে পূজনীয় মহারাজ একবার নাসিগ্রামে [বর্তমানে বাংলাদেশে] আমাদের বাড়িতে আসেন। তারপর থেকে প্রায় আট-দশ বছর যাবৎ প্রত্যেকবারই শীতের সময় তিনি আমাদের গ্রামে আসতেন এবং প্রায় দুমাস করে থাকতেন। তাঁর কৃপায় আমরা শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের আশ্রয় লাভ করি।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুন আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম দিন। ঐদিন সকাল দশটায় শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ কৃপা করে আমাকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেন। আমি তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র। ঐদিন আমার পিতারও দীক্ষা হয়। আমরা একইসঙ্গে পূজনীয় মহাপুরুষজীর কাছ থেকে মহামন্ত্র লাভ করি। সেদিন আমাদের গ্রামের আরো কয়েকজন ভাগ্যবান ভক্তেরও পূজনীয় মহারাজের কাছে দীক্ষা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সতীশচন্দ্র গোস্বামী, গোবিন্দদাস হাজরা, নিতাইচাঁদ রায়, লক্ষ্মণ রায়, ভোলানাথ পাঁজা, রাখালদাস গোস্বামী, সৌরেন্দ্র রায় এবং জ্ঞান মুখোপাধ্যায়। আমি ছাড়া তাঁরা সকলেই আজ শ্রীরামকৃষ্ণলোকের বাসিন্দা।

যাহোক, দীক্ষার পর দুপুরে নৌকা করে আমরা দক্ষিণেশ্বরে যাই। সেখানে মা ভবতারিণীকে দর্শন ও প্রণাম করে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে যাই। সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যবহৃত অমূল্য জিনিসপত্র দর্শন ও স্পর্শন করতে পেরে ধন্য হই। ঠাকুরের ঘরে বসে কিছুক্ষণ তাঁর অনুধ্যানে কাটিয়ে আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালদাদাকে দর্শন ও প্রণাম করি। তিনি আমাদের সকলকে মা কালীর প্রসাদ দেন ও সুললিত কণ্ঠে একটি শ্যামাসঙ্গীত গেয়ে শোনান। আমাদের হৃদয় আনন্দে ভরপুর হয়ে যায়।

বিকালে মঠে ফিরে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ধ্যারতি দর্শন করি। ঠাকুরঘর তখন ছিল পুরনো মঠবাড়ির দোতলার ওপরে, এখন যাকে 'পুরনো মন্দির' বলা হয়। নতুন মন্দির তখনো হয়নি। আরতির পর পুনরায় আমরা মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করি। তিনি তখন খাটের ওপর বসেছিলেন। আমায় তিনি প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন। আমি পরম তৃপ্তিলাভ করি।

সেদিন মঠে পূজনীয় স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজ ও পূজনীয় স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজেরও চরণস্পর্শ করার সৌভাগ্য হয়।

মহাপুরুষ মহারাজের মহাসমাধি লাভের সংবাদ পেয়ে আমি মঠে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে, আমি পৌঁছাবার আগেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হয়ে যায়। তবে তাঁর অন্ত্যেষ্টিস্থল স্পর্শ করে তাঁকে প্রণাম করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

ডাক্তারী পড়া উপলক্ষ্যে আমায় কলকাতায় থাকতে হতো। সেসময় বহুবার মঠে গিয়েছি এবং কখনো কখনো রাত্রিবাসও করেছি। সেই সুবাদে মঠের অনেক প্রাচীন মহারাজের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাঁরা আমাকে আত্মীয়ের ন্যায় ভালবাসতেন। এভাবেই পূজনীয় স্বামী শুদ্ধানন্দজী মহারাজ, ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজ এবং পূজনীয় স্বামী ওঙ্কারানন্দজী মহারাজের সংস্পর্শে আসি। তাঁরা আমাকে খুব ভালবাসতেন। স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ ও স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজকেও দর্শন ও প্রণাম করার সৌভাগ্য আমার হয়।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে আমি কাশী গিয়েছিলাম। সেখানে আমি নিতান্ত অপরিচিত। কিন্তু আশ্চর্য, কাশী অদ্বৈত আশ্রমের তৎকালীন অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী শান্তানন্দজী মহারাজ আমাকে পরিচিতের ন্যায় আদর-আপ্যায়ন করেন। তিনি নিজে আমায় সঙ্গে করে বিশ্বনাথজীর পূজা করান। সন্ধ্যায় আশ্রমের ছাদে তিনি আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে জপধ্যান করাতেন। ওখানে আমি পূজনীয় স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ এবং আরো অনেক প্রাচীন সাধুর দর্শনলাভ করি। আমার মহা সৌভাগ্য যে, আমি যুগাবতার শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয়ে আসতে পেরেছি, তাঁর সন্তানদের চরণ স্পর্শ করতে পেরেছি।

বেলুড় মঠ আমাদের বংশের গুরুস্থান। আমাদের বাড়ির প্রায় সকলেই বেলুড় মঠে দীক্ষিত। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য পার্ষদগণ সকলেই ওখানে বিরাজ করছেন। তাই আমাদের কাছে বেলুড় মঠ সর্বতীর্থসার। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আমার প্রার্থনা—আমি তাঁর আশ্রিত সন্তান, তিনি যে আমার সর্বস্ব, ইহকাল-পরকালের গতি—এই বিশ্বাস যেন আমার মনে চিরজাগ্রত থাকে, তাঁর কৃপায় আমি যেন বাকি জীবনটা আনন্দেই থাকি। ❑



শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদবৃন্দ (চিত্রটি কাল্পনিক)

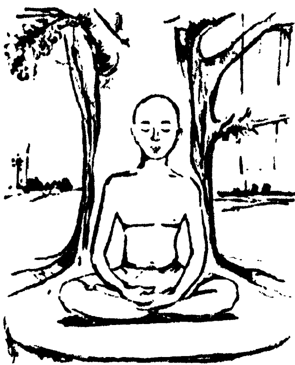


আদি শঙ্করাচার্য ৮















চিত্ররূপ ঃ দেবাশিস বসু

আদ্যিকালের মহাভারত

অমূল্যচন্দ্র কর্মকার

সভাপর্ব শুরু হয়েছে। ভগবান বাসুদেবের উপস্থিতি সেই সভাকে আরো মহিমান্বিত করে তুলবে। দ্বারে সুবর্ণনির্মিত রথ অপেক্ষা করছে। যাত্রাকালীন করণীয়টুকু সেরেই বাসুদেব রথে উঠবেন। এখন মহাভারত থেকেই সেই বর্ণনাটুকু তুলে ধরা যাক—"তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ যাত্রাকালোচিত কার্য করিবার মানসে স্নানান্তে অলঙ্কার পরিধান করিয়া মাল্য, জপ, নমস্কার ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্য দ্বারা দেবদ্বিজগণের পূজা সমাধা করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে তৎকালোচিত সমস্ত কার্য সমাপন করিয়া স্বপুর গমনোদ্যোগে বহিঃকক্ষে বিনির্গত হইলেন। স্বস্তিবাচক ব্রাহ্মণগণ দধিপাত্র, ফল, পুষ্প ও অক্ষত প্রভৃতি মাঙ্গল্য-বস্তু হস্তে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। বাসুদেব তাঁহাদিগকে ধনদানপূর্বক প্রদক্ষিণ করিলেন।" আসল যাত্রা কিন্তু অনেক দেরি। কারণ, তাতে তিথিনক্ষত্রযুক্ত শুভ মুহূর্ত দরকার। তাছাড়া অস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত হওয়ার ব্যাপারও আছে।

অন্যদিকে তাকান। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকালে বিপত্তারণ মধুসুদনের উপস্থিতি শুধু এক আকুল ডাকের অপেক্ষা-মাত্র। এই বৈশিষ্ট্যটুকু ছিল বলেই মহাভারত তার যুগকেও পিছনে ফেলে আসতে পেরেছে।

মহাভারতের মানুষগুলোই ছিলেন এমন বড়মাপের যে, তাঁদের সমীহ না করে উপায় নেই। ভাল বা মন্দ যেদিক দিয়েই বিচার করা হোক না কেন। ভীম রেগে গেলে আশপাশে তাকাতেন কোথায় একটা বড় রকমের গাছ পাওয়া যাবে—কারণ ওটাই ছিল তাঁর প্রিয় হাতিয়ার। মহাবলী ভীমকে মহাবাহু, সিংহস্কন্ধ, কম্বুগ্রীব, কমলনয়ন, সুরূপ বলাটাই যথেষ্ট নয়, তিনি যে একজন সুদক্ষ সূপকারও ছিলেন, সেকথা ভুললে চলবে না। দুর্যোধন ভীমের সঙ্গে লড়াই করবেন বলে দীর্ঘ তেরোবছর ধরে লোহার তৈরি এক বিশাল মূর্তিকে নিয়ে গদা ও মুষ্টিযুদ্ধ অভ্যাস করেছিলেন।

একলব্যকে দ্রোণ শিষ্য করেননি বলে তাঁর অস্ত্রশিক্ষা থেমে যায়নি। অভিমন্যুর খ্যাতি শুধু বীরত্বে নয়, তিনি নিজ পিতা অর্জুনের কাছ থেকে বিজ্ঞান শিক্ষাও নিয়েছিলেন। বৃহস্পতি-পুত্র কচ ছিলেন কুল, শীল, বিদ্যা, তপস্যা ও শমদমাদি দ্বারা অলঙ্কৃত। গুরু শুক্রাচার্যের কাছে বিদ্যাশিক্ষার মধ্যেই তাঁর কর্তব্য শেষ হয়নি, তিনি অবসরসময়ে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও ফলপুষ্পাদি আহরণ করে গুরুকন্যা দেবযানীর মনোরঞ্জন করতেন। যুধিষ্ঠিরের রাজপ্রাসাদে দাসীরা ছিল সেবাকুশলা, আজ্ঞানুবর্তিনী ও নৃত্যগীত প্রভৃতি চৌষট্টিকলায় সুশিক্ষিতা। রাজাদের অনেক কিছু শিখতে হতো এবং ক্রোধ, অনৃত, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা ইত্যাদি চোদ্দপ্রকার রাজদোষ থেকে সতর্ক থাকতে হতো। কৌশিক নামে এক তপস্বী ব্রাহ্মণ ধর্মের তত্ত্ব শেখার জন্য মিথিলায় এক ধর্মব্যাধের কাছে গিয়েছিলেন। সেই ব্যাধ বরাহ ও মহিষের মাংস বিক্রি করে জীবিকানির্বাহ করতেন বটে, কিন্তু নিজে পশুবধ করতেন না, মাংসও ভোজন করতেন না। মহর্ষি নারদ ছিলেন সর্বশাস্ত্রবিশারদ। তিনি বেদ, উপনিষদ্, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ ইত্যাদিতে পারদর্শী ছিলেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন কবি, পুরাকল্প বিশেষবিৎ এবং ইতিহাস, পুরাণ, রাজনীতি, ধর্মনীতি, যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ।

মহাভারতের সেই ধারা আজো অব্যাহত।

মানুষের চিরন্তন প্রশ্ন, দৈব ও পুরুষকার—এদের মধ্যে কে বড়? এ-প্রশ্ন মহাভারতের আগেও ছিল। মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে এ-প্রশ্ন রেখেছিলেন। যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে একই প্রশ্ন করলে তিনি আগের উত্তর তুলে ধরেছিলেন। বীজ না বুনলে যেমন ফল পাওয়া যায় না, সেইরকম পুরুষকারকে বাদ দিয়ে দৈবও সুসিদ্ধ হয় না। ভীষ্ম সমগ্র মানবজাতিকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, দৈবকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই—পুরুষকারের সাহায্যে দৈবের প্রতিকূলতা অতিক্রম করা সম্ভব। পুরুষকার অর্জন না করলে দৈবের দাক্ষিণ্য কাজে আসবে না। যেমন দস্যু-তস্করেরা দুর্লভ ধনরত্ন লাভ করলেও তা ভোগ করতে সমর্থ হয় না।

এইরকম আশ্বাস মহাভারত ছাড়া আর কে দিতে পারবে?

মহাভারত কখনো বিচ্ছিন্নতাকে প্রশ্রয় দেয়নি। তাই দেখতে পাই মহামুনি গর্গের অনূঢ়া কন্যা সারাজীবন তপশ্চর্যা করেও জীবনের অন্তিমলগ্নে জানতে পারলেন যে, তিনি স্বর্গলাভের পক্ষে অনুপযুক্তা; কারণ তিনি পতিগ্রহণ করেননি। মহর্ষি জরৎকারু ও মহর্ষি অগস্ত্যের অভিজ্ঞতাও পৃথক নয়। উভয়েই পিতৃপুরুষদের বিলাপ শুনেই বুঝতে পেরেছিলেন, একক জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। মহাভারত অনুযায়ী জীবনে নারী-পুরুষ উভয়কে যৌথভাবেই চলতে হবে। সমাজকে বাদ দিয়ে ধর্ম হয় না। ধর্মকে বাদ দিয়ে সমাজও হয় না।

মহাভারত ক্ষুদ্রকে কখনো অবহেলা করেনি। দীর্ঘ পনের দিন ধরে খাণ্ডবদহন চলেছিল এবং বনের সমস্ত প্রাণীই তাতে দগ্ধ হয়েছিল। রক্ষা পেয়েছিল শুধু চারটি পক্ষিশাবক। শারিকা নামে এই পক্ষিশাবকদের অগ্নিদেব রক্ষা করেছিলেন, কারণ তারা ছিল নিতান্তই অসহায়—ডানা পর্যন্ত গজায়নি। মহাভারতে ক্ষুদ্রের অবদানও অসামান্য। শান্তিপর্বে উল্লেখ পাই, এক দুর্যোগের রাতে শীতে ও ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হয়ে এক ব্যাধ বনে বৃক্ষতলে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে বাস করত এক কপোত। সে দয়াপরবশ হয়ে আগুন সংগ্রহ করে ব্যাধকে সুস্থ হতে সাহায্য করে। ব্যাধের ক্ষুধানিবারণের উপায় না পেয়ে নিজেই সেই আগুনে আত্মাহুতি দেয়। অথচ সেই ব্যাধ কপোতের পত্নীকে খাঁচায় বন্দী করে রেখেছিল এবং কপোত তা দেখতেও পাচ্ছিল।

মহাভারত ছাড়া এমন অতিথিসেবা-পরায়ণতা আর কোথায় পাব?

মহারাজ যুধিষ্ঠির একবার রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। বিভিন্নজনকে ভিন্ন ভিন্ন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। যেমন—দুর্যোধন উপঢৌকন গ্রহণ, দুঃশাসন ভোজ্যদ্রব্যের তত্ত্বাবধান, সঞ্জয় রাজপরিচর্যা, কৃপাচার্য রত্নের দেখাশোনা ও দক্ষিণাপ্রদান করেছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি শ্রীকৃষ্ণ নিজেই পালন করেছিলেন। তিনি স্বয়ং সমস্ত অতিথি-ব্রাহ্মণদের পাদপ্রক্ষালন করেছিলেন। মহাভারত ছাড়া এ-দৃশ্য আর কোথায় দেখা যায়?

মহাভারত বলে—সত্য সকল ধর্মের আধার ও পরম গতি। মিথ্যা অপেক্ষা মহাপাতক আর কিছুই নেই। অনুশাসনপর্বে উল্লেখ আছে, মহারাজ বসু একশ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা সত্ত্বেও একটিমাত্র মিথ্যা কথা বলার জন্য রসাতলে গমন করেন। কিন্তু অবাক লাগে যখন দেখি সত্য কথা বলার অপরাধে কৌশিক নামে এক তপস্বী ব্রাহ্মণকেও নরকে যেতে হয়। কর্ণপর্বে এই বেদপারগ ও সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। মহাভারত তাঁকে ক্ষমা করেনি, কারণ তাঁর সত্যবাদিতার সুযোগ নিয়ে কিছু দস্যু কয়েকজন নিরীহ পথিকের অবস্থান জানতে পারে এবং তাদের হত্যা করে। কর্মের গহন গতি। মানুষের দুর্বোধ্য এই 'কর্ম'-এর রহস্য মহাভারতেই উন্মোচিত।

এবার এক অদ্ভুত ধর্মাচরণের কথায় আসা যাক। শেষ-পর্যন্ত মহর্ষি বিশ্বামিত্র ধরা পড়লেন। মধ্যরাত্রির দারুণ অন্ধকারেও ভীষণদর্শন চণ্ডালের দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু চণ্ডাল নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, মহর্ষি চুরি করার জন্যই তার ঘরে প্রবেশ করেছেন। লোভনীয় সামগ্রী মোটেই ছিল না—শুধু একখণ্ড কুকুরের পৃষ্ঠমাংস। অবশ্য মহর্ষির এভাবে আসার কারণ ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিতে দীর্ঘ বারোবছর ঘোর অনাবৃষ্টি। শুধুমাত্র প্রাণধারণের তাগিদে স্ত্রী-পুত্র ও লোকালয় পরিত্যাগ করে বনের মধ্যে হিংস্র চণ্ডালপল্লীতে মহর্ষি এভাবে ধরা পড়লেন।

কিন্তু কুকুর শৃগাল অপেক্ষা অপকৃষ্ট। পৃষ্ঠমাংসে আরো অপবিত্র। তার ওপর অভোগ্য চণ্ডালের ঘর থেকে চুরি। মহর্ষির এই প্রয়াস চণ্ডাল কিছুতেই সমর্থন করতে পারে না। মহর্ষি যুক্তি দেখান—দেহ তার মিত্র, প্রিয়তম ও পূজ্য। সেই দেহকে রক্ষা করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। প্রতিবাদ জানায় চণ্ডাল। অধর্ম আচরণের চেয়ে জীবনবিসর্জনও শ্রেয়, বিশেষত একজন ঋষির পক্ষে। কিন্তু মহর্ষি অটল। জীবনকে বাদ দিয়ে ধর্ম নয়, কিন্তু কোন্‌টি শ্রেয়—অনাহারে প্রাণবিসর্জন না অভক্ষ্য খেয়ে জীবনধারণ? বেঁচে থাকলে তবে ধর্মাচরণ। শেষপর্যন্ত মহর্ষি চেয়ে নিলেন মাংসখণ্ড। প্রথমেই দেবতাদের উদ্দেশে তিনি তর্পণ করলেন সেই নিষিদ্ধ মাংস দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে অঝোর ধারায় বর্ষা নেমে এল।

ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণা যে কত সীমিত, মহাভারত তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

মহাভারতের আসল বৈশিষ্ট্য তার নমনীয়তা—যেকোন পরিস্থিতির সঙ্গে সে মানিয়ে নিতে পারে। মহাভারত বিত্তবান হয়েছে সম্পদ সংগ্রহ করে নয়, সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে। মহাভারত মানুষকে বলে—সত্যনিষ্ঠ হও, ধর্মপথ অবলম্বন কর, নিজের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখ কিন্তু প্রয়োজন হলে সবকিছু বিসর্জন দিয়ে আগে বিপন্ন মানুষকে উদ্ধার কর। মানবকল্যাণে মহাভারত তার সাধনা ও সিদ্ধির সবটুকু বিলিয়ে দিয়ে হয়তো শুধু হৃদয়বত্তাটুকু নিয়েই চিরকাল বেঁচে থাকবে। ❑

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ রামায়ণ ও মহাভারত প্রসঙ্গ*

বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'-এর প্রথম প্রকাশের শতবর্ষপূর্তিতে নিবেদিত প্রবন্ধ—সম্পাদক

"যে রাম যে কৃষ্ণ—ইদানীং সেই রামকৃষ্ণ।"—শরীরত্যাগ করার কয়েকদিন আগে প্রিয়তম শিষ্য নরেন্দ্রনাথের সন্দেহমোচনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথাটি বলেছিলেন।

রাম-রসায়ন রামায়ণ আর কৃষ্ণ-রসায়ন মহাভারত থেকে অজস্র কাহিনী যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ বারেবারে শুনিয়েছেন ভক্তবৃন্দের কাছে। শ্রবণমঙ্গল সেইসব অপূর্ব কথনের কিয়দংশমাত্র লিপিবদ্ধ করে ভাবিকালকে কৃতার্থ করেছেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ওরফে মাস্টারমশাই বা শ্রীম।

রামায়ণ-মহাভারতের এইসব কাহিনী ঠাকুর বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিবৃত করেছেন। প্রয়োজনে কোন কোন কাহিনী একাধিকবারও বলেছেন। শৈশবে-বাল্যে সাধুসঙ্গে থেকে, কথক ঠাকুরদের মুখে শুনে এবং যাত্রা দেখে শ্রুতিধর ও স্মৃতিধর ঠাকুরের মনে এইসব গল্প প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল সারাজীবনের মতো। উপদেশমূলক গল্পে, কথকতায় ও নাট্যরূপে মূল গ্রন্থের বাইরের অনেক কিছুও কথক বা লেখকের কল্পনা-আশ্রিত হয়ে প্রচারিত হয়ে থাকে। তাই এইসব কাহিনীর উৎস অধিকাংশ স্থলেই বাল্মিকী বা ব্যাসদেবের রচনা নয়, এমনকি কৃত্তিবাস বা কাশীরামের অনুবাদেও এইসব কাহিনীর সন্ধান প্রায়শই পাওয়া যায় না। ঠাকুরের শ্রীমুখে রামায়ণ-মহাভারত প্রসঙ্গগুলির উৎস কখনো মূল বা অনূদিত রামায়ণ-মহাভারত, কখনো যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণ, কখনো লোককথা।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর পঞ্চম ভাগের ষষ্ঠ খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের (পরিচ্ছেদ-শিরোনাম—শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত নিজ চরিত) মধ্যে কথামৃতকার একটি ইংরেজী শিরোনাম দিয়েছেন—"Fond of Charitable houses and of Ramayana and Mahabharata." এর পরে মাস্টারমশাই শ্রীরামকৃষ্ণের কথা উদ্ধৃত করেছেন—"সদাব্রত, অতিথিশালা যেখানে দেখতুম—গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দেখতুম। কোনখানে রামায়ণ কি ভাগবত পাঠ হচ্ছে—তা বসে বসে শুনতুম। তবে যদি ঢং করে পড়ত, তাহলে তা নকল করতুম আর অন্য লোকদের শুনাতুম।"

কথামৃত ভবন প্রকাশিত 'কথামৃত'-এর বর্ণনা কালানুক্রমিক নয়। [উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 'কথামৃত' কালানুক্রমিক।] যেহেতু বর্তমান রচনাটি প্রথমোক্ত 'কথামৃত' অবলম্বনে রচিত, তাই এতে কালানুক্রম রক্ষিত হয়নি। দ্বিতীয়ত, গীতা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ যা যা বলেছিলেন, তা উল্লেখ করলে সেটি একটি পৃথক প্রবন্ধের আকার ধারণ করবে। তাই মহাভারতের আলোচনায় গীতা প্রসঙ্গে আমরা যাচ্ছি না।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীম-র তৃতীয় সাক্ষাতের দিন বিভিন্ন প্রসঙ্গে ঠাকুর তিনটি গল্প পরিবেশন করেন। তৃতীয়টির প্রসঙ্গ রামায়ণ। এটিই 'কথামৃত'-এ বর্ণিত প্রথম রামায়ণ প্রসঙ্গ। একজন ভক্ত বদ্ধজীবের মুক্তির উপায় কি ঠাকুরের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, বিশ্বাস হয়ে গেলেই হলো। বিশ্বাসের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। এরপর তিনি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দুটি রামায়ণী কথা শুনিয়েছিলেন।

ঠাকুর বলেছিলেনঃ "পুরাণে আছে রামচন্দ্র—যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হলো, কিন্তু হনুমান রাম নামে বিশ্বাস করে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে পড়ল। তার আর সেতুর দরকার হয় নাই।" এর পরে ঠাকুর বলেছিলেন বিভীষণের কাহিনী। বিভীষণ একটি পাতায় রামনাম লিখে এক সমুদ্রপারযাত্রীর কাপড়ে বেঁধে দিয়ে বলেছিলেন—কোন ভয় নেই, তুমি বিশ্বাস করে সমুদ্রের জলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যাও, অবিশ্বাস করলেই কিন্তু জলে ডুবে যাবে। সমুদ্রের ওপর অনেকখানি পথ অতিক্রম করার পর লোকটির ইচ্ছা হলো, দেখা যাক কাপড়ে এমন কি বস্তু বাঁধা আছে যার জোরে হেঁটে সমুদ্র পার হওয়া যায়? কাপড়ের খুঁট খুলে দেখে পাতার ওপর শুধু 'রাম' নাম লেখা। শুধু রাম নাম দেখে যেই তার মনে অবিশ্বাস এল, অমনি সে সাগরে ডুবে গেল। (১।১।৭)

পরের দিন ঠাকুর রামায়ণ থেকে হনুমান আর মন্দোদরী বিষয়ক একটি গল্প বলেন। ঠাকুরের ঘরের দেওয়ালে একটি হনুমানের পট ছিল। সেই ছবি দেখতে দেখতেই ঠাকুরের মনে হনুমানের ভক্তিভাবের কথা উদিত হলে তিনি

---

* এই নিবন্ধটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

বলেছিলেন : "দেখ, হনুমানের কি ভাব! ধন, মান, দেহসুখ কিছুই চায় না; কেবল ভগবানকে চায়! যখন স্ফটিকস্তম্ভ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে পালাচ্ছে, তখন মন্দোদরী অনেকরকম ফল নিয়ে লোভ দেখাতে লাগল! ভাবলে ফলের লোভে নেমে এসে অস্ত্রটা যদি ফেলে দেয়; কিন্তু হনুমান ভুলবার ছেলে নয়; সে বললে—

'আমার কি ফলের অভাব।
পেয়েছি যে ফল, জনম সফল,
মোক্ষফলের বৃক্ষ রামহৃদয়ে।।
শ্রীরামকল্পতরুমূলে বসে রই—
যখন যে ফল বাঞ্ছা সেই ফল প্রাপ্ত হই।
ফলের কথা কই, (ধনি গো) ও ফল গ্রাহক নই;
যাব তোদের প্রতিফল যে দিয়ে।।' " (১।১।৯)

১৮৮২ সালের ২৮ অক্টোবর একই দিনে ঠাকুর একটি রামায়ণ ও একটি মহাভারত-আশ্রিত কাহিনী পরিবেশন করেন। ভগবানের দর্শন পেলে ভক্তের সাধ হয় তাঁর লীলা দর্শন করতে। এই কথা বলে উদাহরণ হিসাবে ঠাকুর রাবণ-জননী নিকষা ও রামের কাহিনী বলেছিলেন। রাবণবধের পর রামচন্দ্র রাক্ষসপুরীতে ঢুকলে বৃদ্ধা নিকষা দৌড়ে পালাতে থাকেন। তখন লক্ষ্মণ রামকে বলেন, নিকষার এত বয়স, কত পুত্রশোকাদি পেয়েছে—সেও প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছে! নিকষাকে অভয় দিয়ে রামচন্দ্র তাঁকে কাছে ডেকে পালাবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে নিকষা বলেন : "রাম, এতদিন বেঁচে আছি বলে তোমার এত লীলা দেখলাম, তাই আরো বাঁচবার সাধ আছে। তোমার আরো কত লীলা দেখব।" (১।৩।৭)

ঐদিনটি এক ব্রাহ্মভক্তের জন্মান্তর প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলেন : "আমি শুনেছি জন্মান্তর আছে। ঈশ্বরের কার্য আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কি বুঝব? অনেকে বলে গেছে, তাই অবিশ্বাস করতে পারি না।" এই কথা বলে তিনি মহাভারত থেকে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের প্রসঙ্গ অবতারণা করে বলেন, শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের চোখে জল দেখে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানী, অষ্টবসুর এক বসু পিতামহ ভীষ্মও দেহত্যাগের সময় মায়ায় কাঁদছেন। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা ভীষ্মকে বলাতে তিনি অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, তুমি তো ভাল করেই জান আমি সেজন্য কাঁদছি না। যখন ভাবছি, যে-পাণ্ডবদের সারথি স্বয়ং ভগবান, তাদেরও দুঃখ-বিপদের শেষ নেই, তখন এই মনে করে কাঁদছি যে ভগবানের কার্য কিছুই বুঝতে পারলাম না। (১।৩।৭)

১৮৮৩ সালের ২২ জুলাই রামায়ণ-মহাভারতের কোন প্রসঙ্গ নয়, তবে এই দুই মহাকাব্যের নায়কদ্বয় রাম ও কৃষ্ণ সম্বন্ধে ঠাকুর বলেন : "রাম ও কৃষ্ণ চিদানন্দ-সাগরের দুটি ঢেউ।" (১।৬।৩)

ঐ বছরই ১৯ আগস্ট মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডবদের ভক্তির প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেন, পাণ্ডবদের অত বিপদ! কিন্তু তাও তাঁরা চৈতন্য একবারও হারাননি। তাঁদের মতো জ্ঞানী ভক্ত কোথায়? (১।৭।২)

একই বছরে ২৬ নভেম্বর ভাব ও কুম্ভক প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভায় অর্জুনের লক্ষ্যভেদের প্রসঙ্গ টেনে বলেছিলেন, অর্জুন যখন লক্ষ্য বিদ্ধ করেছিলেন, তখন মৎস্যচক্ষু ছাড়া আর কোনদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। এমনকি মাছের চোখ ছাড়া আর কোন অঙ্গ দেখতে পাননি অর্জুন। এরকম অবস্থায় বায়ু স্থির হয়, কুম্ভক হয়। (১।৮।৪)

১৮৮৪ সালের ২৫ জুন শশধর পণ্ডিতকে হাসতে হাসতে বলেছিলেন ঠাকুর : "আজ আমার খুব দিন। আমি দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখলাম।" তাঁর এই বাক্যের গূঢ়ার্থ সকলের বোধগম্য হয়নি বুঝে ব্যাখ্যা করলেন তিনি রামায়ণের প্রসঙ্গ টেনে—সীতা রাবণকে বলেছিলেন রাবণ পূর্ণচন্দ্র আর রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চাঁদ। তার অর্থ—রাবণের সম্পদ যতদূর হওয়ার হয়েছে, এবার দিন দিন তা হ্রাস পাবে, আর রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চাঁদ—তাঁর দিন দিন বৃদ্ধি হবে! (১।১১।৬)

ঐ বছর ২৬ অক্টোবর মহিমাচরণকে ঠাকুর বলেছিলেন, ব্রহ্মানন্দ লাভ করলে ইন্দ্রিয়সুখের জন্য আর মন দৌড়ায় না। এই প্রসঙ্গে তিনি রামায়ণ থেকে উদাহরণ দিয়ে বলেন, রাবণকে কেউ বলেছিল—তুমি সীতার জন্য মায়ায় নানারূপ ধরেছ, একবার রামরূপ ধরে যাও। রাবণ তাতে বলেছিলেন—'তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবধূসঙ্গঃ কুতঃ'—যখন রামকে চিন্তা করি, তখন ব্রহ্মপদ তুচ্ছবোধ হয়, পরস্ত্রী তো সামান্য কথা। তা রামরূপ কি ধরব! (১।১৩।৬)

১৮৮৫ সালের ২২ অক্টোবর সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণ প্রসঙ্গে রামায়ণ থেকে উদাহরণ দিয়ে ঠাকুর বলেছিলেন : "পুরাণে আছে রাবণের রজোগুণ, কুম্ভকর্ণের তমোগুণ আর বিভীষণের সত্ত্বগুণ। তাই বিভীষণ রামচন্দ্রকে লাভ করেছিলেন। তমোগুণের আরেকটি লক্ষণ—ক্রোধ। ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না।" এপ্রসঙ্গে সাময়িকভাবে তমোগুণের শিকার ভক্ত হনুমানের কথাও বলেছেন ঠাকুর। হনুমান ক্রোধে লঙ্কা পুড়িয়ে দিলেন যখন, তখন তাঁর জ্ঞান নেই যে সীতার কুটির নষ্ট হবে! (১।১৫।২)

ঐদিনই অবতার মানতে অস্বীকৃত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে বোঝাবার জন্য ঠাকুর ঈশানকে নির্দেশ দেন অবতার প্রসঙ্গে কিছু বলার জন্য। ঠাকুরের নির্দেশে ঈশান ডাক্তার সরকারকে অবতার সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেন রামায়ণের কাকভূষণ্ডীর কথা। (১।১৫।৩)

এর চারদিন পরে ২৬ অক্টোবর ডাক্তার সরকারের কাছেই অহৈতুকী ভক্তির প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে ঠাকুর রামায়ণ থেকে অহল্যা এবং নারদের দুটি উদাহরণ দিয়েছিলেন। অহল্যার ভক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন,

অহল্যা রামচন্দ্রকে বলেন—হে রাম, যদি শূকরযোনিতে জন্ম হয়, তাতেও আমার আপত্তি নেই, কিন্তু যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি থাকে, আমি আর কিছু চাই না। আর নারদের অহৈতুকী ভক্তি বিষয়ে বলেছিলেন, রাবণবধের কথা স্মরণ করাবার জন্য নারদ অযোধ্যায় রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সীতারামকে দর্শন করে স্তব করেন। রামচন্দ্র দেবর্ষিকে বর দিতে চাইলে তিনি বলেছিলেন—যদি বরই দেবে, তবে এই বর দাও যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধাভক্তি থাকে আর তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় যেন মুগ্ধ না হই। রাম আরো কিছু বর দিতে চাইলে নারদ তা অস্বীকার করে বলেছিলেন—আর কিছু চাই না, কেবল চাই তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি। (১।১৭।৫)

পরদিন ২৭ অক্টোবর ঠাকুর ডাক্তার সরকারকে রামায়ণ থেকে রাম-লক্ষ্মণ ও বশিষ্ঠের কাহিনী শুনিয়েছিলেন। লক্ষ্মণ শ্রীরামকে বলেছিলেন পুত্রশোকাতুর বশিষ্ঠদেবের পুত্রশোকে অধীরতার কথা। উত্তরে রামচন্দ্র বলেছিলেন: "ভাই, যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞানও আছে। যার এক জ্ঞান আছে তার অনেক জ্ঞানও আছে। যার আলো বোধ আছে, তার অন্ধকার বোধও আছে। ব্রহ্ম জ্ঞান-অজ্ঞানের পার, পাপ-পুণ্যের পার, ধর্মাধর্মের পার—শুচি-অশুচির পার।" (১।১৮।২)

১৮৮৩ সালের ১১ মার্চ কেদারকে উদ্দেশ্য করে ঠাকুর বলেছিলেন: "ঋষিরা রামচন্দ্রকে বললেন—'রাম, আমরা জানি তুমি দশরথের ব্যাটা। ভরদ্বাজাদি ঋষিরা তোমাকে অবতার জেনে পূজা করুন। আমরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চাই।' রাম এই কথা শুনে হেসে চলে গেলেন।"

কেদার এই ব্যাপারটি ঋষিদের বোকামি বলাতে ঠাকুর বললেন: "ঋষিরা জ্ঞানী ছিলেন, তাই তাঁরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চাইতেন। আবার ভক্তরা অবতারকে চান ভক্তি আস্বাদন করবার জন্য। তাঁকে দর্শন করলে মনের অন্ধকার দূরে যায়। পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যখন সভাতে এলেন, তখন সভায় শতসূর্য যেন উদয় হলো। তবে সভাসদ লোকেরা পুড়ে গেল না কেন? তার উত্তর—তাঁর জ্যোতি জড়জ্যোতি নয়। সভাস্থ সকলের হৃদপদ্ম প্রস্ফুটিত হলো। সূর্য উঠলে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়।" এর পরে ঠাকুরের সমাধি হয়ে যায়। সমাধিভঙ্গে পূর্বপ্রসঙ্গেই ঠাকুর বলেছিলেন: "অবতার যখন আসে, সাধারণ লোকে জানতে পারে না—গোপনে আসে। দুই-চারিজন অন্তরঙ্গ ভক্ত জানতে পারে। রাম পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণ অবতার—একথা বারজন ঋষি কেবল জানত। অন্যান্য ঋষিরা বলেছিল, 'হে রাম, আমরা তোমাকে দশরথের ব্যাটা বলে জানি।' " (২।২।৩)

ঐবছর ৮ এপ্রিল অধর সেন তাঁর বন্ধুর পুত্রশোকের কথা ঠাকুরের কাছে নিবেদন করলে ঠাকুর সময়োচিত কিছু সান্ত্বনাবাণী দেওয়ার পর পুত্রশোকের গুরুত্ব বোঝাতে রামায়ণ থেকে উদাহরণ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, রাবণ বধ হলে লক্ষ্মণ দৌড়ে গিয়ে দেখলেন তার হাড়ের ভিতর এমন একটা জায়গা নেই—যেখানে ছিদ্র নেই। তখন তিনি রামকে বললেন—তোমার বাণের কী মহিমা! রাবণের শরীরে এমন জায়গা নেই, যেখানে ছিদ্র না হয়েছে। তাতে রামচন্দ্র বললেন—হাড়ের মধ্যে ঐ ছিদ্রগুলি বাণের জন্য নয়। শোকে রাবণের হাড় জরজরে হয়েছে। ঐ ছিদ্রগুলি সেই শোকের চিহ্ন—হাড় বিদীর্ণ করেছে। (২।৩।৫)

একই বছরের ১৪ ডিসেম্বর। এইদিনের বর্ণনায় আছে, ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল 'অধ্যাত্মরামায়ণ' পড়ছেন আর ঠাকুর শুনছেন। মাস্টারমশায়ও অন্যতম শ্রোতা। পাঠ শুনে ঠাকুর ভাবাবস্থায় মধুর কণ্ঠে রামনাম উচ্চারণ করতে লাগলেন। তারপর রামলালদাদাকে বললেন গুহক চণ্ডালের কথা পড়তে। 'ভক্তমাল' গ্রন্থ থেকে রামলাল গুহকরাজের কথা পড়েছিলেন। (২।১২।১)

১৮৮৪ সালের ৫ এপ্রিল ঠাকুর প্রাণকৃষ্ণ মুখার্জীকে 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে'—এই কথার উদাহরণ প্রসঙ্গে বলেছেন, রামচন্দ্র অবতার হলেও সীতার শোকে কাতর হয়ে কেঁদেছেন। (২।১৩।১)

একই দিনে রামায়ণ থেকে আরেকটি গল্প শুনিয়েছেন ঠাকুর। বলেছেন, রামচন্দ্র যখন জ্ঞানলাভের পর সংসারে না থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন দশরথের অনুরোধে বশিষ্ঠ রামকে বোঝালেন—যদি সংসার ঈশ্বরছাড়া হয়, তবে তিনি সংসার ত্যাগ করতে পারেন। এতে রামচন্দ্র চুপ করে রইলেন, কারণ তিনি ভাল করেই জানেন, ঈশ্বর ছাড়া কিছুই নেই। তাই তাঁর আর সংসারত্যাগ হলো না। (২।১৩।১)

ঐবছর ২১ সেপ্টেম্বর প্রেমোন্মাদ, ভক্তি-উন্মাদ, জ্ঞানোন্মাদ ইত্যাদি অবস্থার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেছেন, ভক্তি-উন্মাদের অবস্থা হয়েছিল হনুমানের। অগ্নিপরীক্ষার সময় সীতা আগুনে প্রবেশ করছেন দেখে হনুমান রামকে মারতে গিয়েছিলেন। (২।১৪।৩)

এর কয়েকদিন পরে ১১ অক্টোবর ঠাকুর ভক্তদের কাছে রামের প্রতি নারদের অহৈতুকী ভক্তি প্রসঙ্গে যা বলেন, আগেই (২৬ অক্টোবর ১৮৮৫ তারিখের বর্ণনায়) সেকথা বর্ণিত হয়েছে।

এর পরেই 'অধ্যাত্মরামায়ণ' উদ্ধৃত করে ঠাকুর বলেছেন রাম-লক্ষ্মণের কথোপকথনের কথা। লক্ষ্মণ রামকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কত ভাবে, কত রূপে থাক? কি করে তোমায় চিনতে পারব? উত্তরে রাম বললেন, যেখানে উর্জিতা ভক্তি, সেখানে আমি নিশ্চয়ই আছি। উর্জিতা ভক্তির চিহ্ন হিসাবে ঠাকুর বলেছেন—উর্জিতা ভক্তিতে ভক্ত হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়। যেমন চৈতন্যদেবের হয়েছিল। (২।১৯।৬)

কয়েকদিন পর ২০ অক্টোবর মারোয়াড়ি ভক্তকে অবতার প্রসঙ্গে বোঝাতে ঠাকুর আবার রামায়ণীকথা এনেছেন। বলেছেন, অবতারকে সবাই চিনতে পারে না।

নারদ যখন রামচন্দ্রকে দর্শন করতে গেলেন, রাম তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললেন—আমরা সংসারী জীব। আপনাদের মতো সাধুরা না এলে কি করে পবিত্র হব? আবার যখন সত্যপালনের জন্য বনে গেলেন তখন রাম দেখলেন, বনবাসের কথা শুনে অবধি ঋষিরা আহার ত্যাগ করে পড়ে আছেন। রাম যে সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তা তাঁরা অনেকেই জানতেন না। (২।২১।২)

'কথামৃত'-এর প্রথম ভাগে বর্ণিত (২৬ অক্টোবর ১৮৮৪ সাল) সীতাকে ভোলাতে রাবণের রামরূপ না ধরার গল্পটি আবার ১৮৮৫ সালের ১ মার্চ ঠাকুর ভক্তদের কাছে পরিবেশন করেন। (২।২৩।২) ১৮৮৩ সালের ১১ মার্চ বনবাসী রাম-চন্দ্রকে ঋষিদের দশরথের পুত্র বলে চেনার যে-কাহিনী ঠাকুর বলেছিলেন, ১৮৮৫ সালের ২৪ এপ্রিলও তিনি গিরিশচন্দ্র প্রমুখ ভক্তদের কাছে ঐ কাহিনীটি বলেন। (২।২৪।৬)

১৮৮৬ সালের ১৬ এপ্রিল রামাবতার ও কৃষ্ণাবতারের বিভিন্ন ভাব প্রসঙ্গে ঠাকুর সীতা ও রাধার কথা বলেন। ঠাকুর ঐদিন বলেছিলেন—একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। রামাবতারে শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ভাবের প্রকাশ। কৃষ্ণাবতারে ওসবই ছিল, আবার মধুর ভাবও ছিল। "শ্রীমতীর মধুর ভাব—ছেনালী আছে। সীতার শুদ্ধ সতীত্ব—ছেনালী নাই।" (২।২৬।৩)

১৮৮২ সালের ৫ আগস্ট ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে সেব্য-সেবক ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতে ঠাকুর রামায়ণ থেকে উদাহরণ দিয়েছেন শ্রীরাম ও হনুমানের। তিনি বলেছেন, রাম হনুমানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি রামচন্দ্রকে কিভাবে দেখেন। হনুমান উত্তরে বললেন—যখন 'আমি' বোধ থাকে তখন দেখি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ—তুমি প্রভু, আমি দাস। আর যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি তুমিই আমি—আমিই তুমি। (৩।১।৫)

ঐদিন শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে বিভীষণের রামনামে বিশ্বাস সম্পর্কিত কাহিনীটি বলেন, যেটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ঐ বছরেরই ২২ অক্টোবর। জ্ঞানীদের মতে অবতার অসংখ্য—এই কথা বলে ঠাকুর অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের কথা উত্থাপন করেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম বলে স্তব করলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, আমি পূর্ণব্রহ্ম কিনা দেখবে এস। এই বলে এক জায়গায় তাঁকে নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণ বললেন—কি দেখছ? অর্জুন বললেন—আমি এক বৃহৎ বৃক্ষ দেখছি, তাতে থোলো থোলো কালো ফল ফলে রয়েছে। কৃষ্ণ তাঁকে বৃক্ষের আরো কাছে গিয়ে দেখালেন—ওগুলো কালো ফল নয়, তাঁর মতো অসংখ্য কৃষ্ণ ফলে রয়েছে গাছে অর্থাৎ সেই পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপ বৃক্ষ থেকে অসংখ্য অবতার হয়ে যাচ্ছে। (৩।৩।২)

১৮৮৩ সালের ২১ জুলাই ঠাকুর মাস্টারমশাইকে একটি রামায়ণী এবং একটি মহাভারতীয় কাহিনী বলেন। ঈশ্বরের কর্ম বোঝার চেষ্টা না করে তাঁকে চিন্তা করাই বিধেয়—এই কথা বলে ঠাকুর হনুমানের রামচিন্তা সম্বন্ধে বলেছিলেন, হনুমানকে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ কি তিথি? উত্তরে হনুমান বলেছিলেন, আমি তিথিনক্ষত্র জানি না—কেবল এক রাম চিন্তা করি। এরপর ঐ একই প্রসঙ্গে ঠাকুর বললেন—বলরাম কৃষ্ণের কাছেই থাকতেন, কিন্তু কৃষ্ণকে ভগবান বলে জানতেন না। একথা শুনে মাস্টারমশাই বলেন: "আপনি ভীষ্মদেবের কথা যেমন বলেছিলেন।" ছাত্রের পরীক্ষা নেওয়ার মতো করে ঠাকুর জানতে চাইলেন, তিনি কি বলেছিলেন? তার উত্তরে মাস্টারমশাই শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মদেবের ক্রন্দনের কাহিনীটি বলেন, যা আগেই বর্ণিত হয়েছে। (৩।৪।১)

১৮৮৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর ঈশ্বরই কর্তা, মানুষ যন্ত্রস্বরূপ—এই প্রসঙ্গে কেশব কীর্তনীয়া ঠাকুরকে বলেন—তিনিই করণ-কারণ। দুর্যোধন বলেছিলেন—"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" ঠাকুর তাঁকে সমর্থন করে বলেন: "হ্যাঁ, তিনি সব করাচ্ছেন বটে; তিনিই কর্তা, মানুষ যন্ত্রের স্বরূপ।" (৩।৭।২)

ঐদিনই সেব্য-সেবক ভাব বিষয়ে রামচন্দ্র ও হনুমানের সংলাপের পূর্ববর্ণিত কাহিনীটি পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখে শুনি। একই দিনে নিষ্ঠা-ভক্তি প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেন—রামরূপ বৈ আর অন্য কোন রূপ হনুমানের ভাল লাগত না। গোপীদেরও এত নিষ্ঠা যে, তারা দ্বারকায় পাগড়িবাঁধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখতেই চাইল না। (৩।৭।৩)

সংসারত্যাগেচ্ছু রামচন্দ্রকে বশিষ্ঠদেবের উপদেশ বিষয়ক যে-কাহিনীটি ঠাকুরের মুখে ইতিপূর্বে শুনেছি, সেটি একই বছরের ২ মার্চেও ঠাকুর উপস্থাপিত করেছিলেন। ঐদিন পূর্ববর্ণিত রাম-নিকষার কাহিনীটিও ঠাকুর ভক্তদের কাছে বলেন।

১৮৮৪ সালের ২ মার্চ 'ঈশ্বরের কার্য সাধারণের অবোধ্য'—এই প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লিখিত শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের ক্রন্দন-কাহিনী পরিবেশন করেন ঠাকুর। (৩।৮।২) [ক্রমশ] (১)

বিজ্ঞপ্তি

বিগত আশ্বিন মাসে সুধী পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো হয়েছিল, ২০০২ সালে (মাঘ ১৪০৮—পৌষ ১৪০৯) 'উদ্বোধন' পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছু বাড়াতে হবে। তদনুযায়ী চলতি বছরের গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা ধার্য হয়েছে। কেউ ডাকে বই সংগ্রহ করলে আরো ২০ টাকা সহ মোট ৯৫ (পঁচানব্বুই) টাকা পাঠাবেন। ইতোমধ্যে অনেকেই ভুল করে ৭৫ টাকা সডাক খরচ পাঠিয়েছেন। তাঁদের অনুরোধ জানাই—আপনারা বাকি দেয় ডাকখরচ ২০ টাকা অবিলম্বে মানি অর্ডার করে পাঠাবেন।—সম্পাদক

ভারতের গ্রামোন্নয়ন এবং স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী সন্নিরুদ্ধানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন ঃ "Real India lives in villages"—প্রকৃত ভারতবর্ষ গ্রামে বাস করে। ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগই গ্রামের বাসিন্দা। আজ স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পরেও এই জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই পড়ে রয়েছে দারিদ্র্যসীমার নিচে। তাই গ্রামের উন্নয়ন ব্যতীত ভারতের উন্নতির কথা চিন্তাই করা যায় না।

সাধারণভাবে গ্রামোন্নয়নের লক্ষ্য সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক—সবক্ষেত্রেই পরিমাণগত ও গুণগতভাবে আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।

ভারতে গ্রামোন্নয়নের চিত্র

ভারতে গ্রামোন্নয়নের কাজ ব্যাপকভাবে শুরু হয় স্বাধীনতার পর। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য ব্যতীত ভারতের উন্নতিতে আগ্রহী ছিল না। তারা ভারতের সেইটুকু উন্নতিই চাইত, যাতে বেশি করে ভারতের সম্পদ নিজেদের দেশে নিয়ে যাওয়া যায় এবং ভারতে তাদের শাসন জোরদার কায়েম করা যায়। ভারত থেকে কম দামে কাঁচামাল তাদের দেশে নিয়ে গিয়ে তারা তাদের তৈরি দ্রব্য চড়া দামে বিক্রি করত ভারতেরই বাজারে। এছাড়া 'Home Charge' (ভারতের জন্য তাদের প্রশাসনিক খরচ) বাবদ ভারতের সম্পদ তারা নিয়ে যেত নিজেদের দেশে।

তবু এরই মধ্যে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে কিছু কিছু অর্থনীতি এবং গ্রামোন্নয়নের চিন্তা-ভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছিল। কিভাবে দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কট মোচন করা যায়, দারিদ্র্য দূর করা যায় অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশকে এগিয়ে নেওয়া যায়—এই উৎকণ্ঠার ভাগীদার হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর বহু মনীষীকে আমরা দেখতে পাই। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), দাদাভাই নওরোজী (১৮২৫-১৯১৭), মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে (১৮৪২-১৯০১) এবং রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)।

প্রাক্-স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে বিচ্ছিন্নভাবে যেসব জায়গায় গ্রামোন্নয়নের পরীক্ষা হয়েছিল সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাঞ্জাবের গুরগাঁও জেলা, কেরালার মারটানডাম, গুজরাটের বরোদা ও উত্তরপ্রদেশের এটোয়া। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমে শিলাইদহ ও পাতিসারে কাজ শুরু করেন (১৯০৫-১৯১৫) এবং পরবর্তী কালে এই কাজের জন্য বেছে নেন শ্রীনিকেতনকে। মহাত্মা গান্ধী স্বনির্ভর গ্রাম এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য বেছে নেন গুজরাটের ওয়ার্ধার নিকট সেগাঁও, যার নতুন নামকরণ হয় 'সেবাগ্রাম'। এরই পাশাপাশি চলছিল স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়ন প্রচেষ্টা। যেমন—কর্ণাটকের পুনামপেটের নিকট কুর্গ (১৯২৭), বর্তমান বাংলাদেশের হবিগঞ্জ, খাসি ও জয়ন্তীয়া হিলস্ (খাসি উপজাতি) (১৯২৪), পশ্চিমবঙ্গের সাগরদ্বীপ (১৯২৬) ইত্যাদি স্থানে।

ভারতে পরিকল্পনামাফিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা শুরু হয় স্বাধীনোত্তর যুগে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে (পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে)। পাঁচহাজারের ওপর সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক (Community Development Block)-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু পদ্ধতিটি ছিল Democratic Centralism, অর্থাৎ গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোতে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা। আমলা এবং প্রযুক্তিবিদ্‌দের দ্বারা রচিত একটি সাধারণ উন্নয়ন পরিকল্পনা সারা ভারতে প্রয়োগ করা হতো; তাতে জনগণের অংশগ্রহণ ছিল না। কাজের সফলতা বা অগ্রগতির বিচার হতো টাকা খরচের নিরিখে—গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের বিচারে নয়। আর অনুসৃত অর্থনীতিটি হলো Mixed Economy অর্থাৎ মিশ্র অর্থনীতি।

সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (Community Development Project) শুরু হয় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২ অক্টোবর থেকে, যার প্রায় সমস্ত ব্যাপারটিই আমদানি করা হয়েছিল বিদেশ থেকে এবং আমেরিকার ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সহায়তায় ১৯৫১ সালে শুরু করা ১৫টি Pilot Project-এর এক বছরের অভিজ্ঞতা ছিল এর ভিত্তি। এই প্রকল্প এবং এর সাথে ১৯৫৩ সালে শুরু করা জাতীয় সম্প্রসারণ পরিষেবা (National Extension Service) ধীরে ধীরে সমগ্র দেশে

ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী কালে এগুলির মূল্যায়নে দেখা যায় যে, এই পরিকল্পনাটি থেকে বেশ কিছু সুফল পাওয়া গেলেও কৃষি ও অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি এবং উন্নয়নের ফল সমাজে যাদের প্রাধান্য, প্রধানত সেই শ্রেণীর কুক্ষিগত হয়েছে। এরই পরিণতিতে ষাটের দশকের প্রথম দিকে শুরু হয় 'নিবিড় কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা' (Intensive Agricultural District Programme—IADP এবং Intensive Agricultural Area Programme—IAAP)। 'Grow more food' Campaign-এর হাত ধরে উচ্চ ফলনশীল জাত (High Yeilding Variety—HYV) এবং অন্যান্য কৃষিপ্রযুক্তির সাহায্যে আসে 'সবুজ বিপ্লব' এবং দেশ ধীরে ধীরে খাদ্যশস্য উৎপাদনে মোটামুটি স্বনির্ভর হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও সবুজ বিপ্লবের ফলে উপকৃত হয় প্রধানত দেশের একটি ক্ষুদ্র অংশের কৃষকেরা, যারা তুলনামূলকভাবে বৃহত্তর অংশের চেয়ে অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক বেশি সচ্ছল, যাদের জমিতে সেচ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আছে, আর জমি সমস্যাসঙ্কুল নয় অর্থাৎ প্রধানত পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের চাষীরা।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 'বলবন্ত রাই মেহতা কমিটি'র সুপারিশক্রমে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে স্বনির্ভরশীল করা এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণ বাড়ানোর উদ্দেশে পঞ্চায়েতকে এর সামিল করা হলো। কিন্তু কয়েক বছর পর 'অশোক মেহতা কমিটি'র মূল্যায়নে দেখা যায়, এই ব্যবস্থাও আশানুরূপ ফল দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ছয়টি পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনার পরেও দেখা যাচ্ছে, গ্রামের মানুষের উন্নতি আশানুরূপ হয়নি। ১৯৬০ থেকে ১৯৮১—এই সময়ের মধ্যে মাথাপিছু গড় জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার ছিল বছরে ১.৪ শতাংশ এবং এই স্বল্প বৃদ্ধিও সমভাবে বণ্টিত নয়; ফলে দেখা যায় GNP (Gross National Product) বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র লোকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সত্তরের দশকের প্রথমদিকে অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক দণ্ডেকর এবং অধ্যাপক রথ তথ্য প্রকাশ করেন যে, দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। ফলে এটি পরিষ্কার হয় যে, GNP বৃদ্ধি এবং কিছু পরিকাঠামো সৃষ্টি করতে পারলেই সাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটবে—এই ধারণা ঠিক নয়।

এই ত্রুটি দূরীকরণের উদ্দেশে সত্তরের দশকের প্রথম থেকে বঞ্চিত শ্রেণীর জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় আঞ্চলিক প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প (SFDA, MFALDA), খরা-পীড়িত এলাকার প্রকল্প (DPAP), সামগ্রিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (CADP), সুসংহত উপজাতি উন্নয়ন প্রকল্প (ITDP) ইত্যাদি। এতৎসত্ত্বেও দেখা গেল, ১৯৭৭-৭৮ সালে শতকরা ৫১ ভাগ গ্রামবাসী দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। এর প্রধান কারণ প্রান্তিক চাষী, ভাগচাষী ও কৃষি-শ্রমিক শ্রেণী এইসব প্রকল্পের দ্বারা বিশেষ উপকৃত হতে পারেনি।

এর পর ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮০-১৯৮৫) আসে বিশ দফা কর্মসূচী ও নতুন বিশ দফা কর্মসূচী, যার ভিতর উল্লেখযোগ্য 'সুসংহত গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা' (IRDP)। এরই সঙ্গে আছে TRYSEM, RLEGP ইত্যাদি। IRDP-এর মাধ্যমে সরাসরি সবচেয়ে গরিব পরিবারগুলিকে পরিকল্পনার আওতায় নিয়ে আসা হয় এবং পরিকল্পনা তৈরি ও রূপায়ণে সরকারি কর্মচারী এবং পঞ্চায়েত উভয়কেই সামিল করা হয়। IRDP, TRYSEM, DWCRA প্রভৃতি পরিকল্পনাগুলি কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছে 'স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা' (SGSY)-রূপে।

এই সমস্ত উদ্যোগের ফলে বিগত ৫০ বছরে গ্রামীণ জীবনযাত্রার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মৃত্যুহার, বিদ্যুৎ, কৃষি যন্ত্রপাতি ও উপকরণ, প্রযুক্তিগত সহায়তা, পরিকাঠামো, কৃষি ঋণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে। ভারত আজ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভর। ১৯৪৭ সালে আমাদের মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ৫ কোটি টন যা আজ চার গুণ বেড়ে ২০ কোটি টনে দাঁড়িয়েছে। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা এখন ৪০ শতাংশেরও নিচে। দেশে এসেছে খাদ্যশস্য উৎপাদনে 'সবুজ বিপ্লব', দুগ্ধ উৎপাদনে 'শ্বেত বিপ্লব' এবং মৎস্য উৎপাদনে 'নীল বিপ্লব'।

বেশ কিছু উন্নয়ন হয়েছে একথা অনস্বীকার্য, তবু একে আশানুরূপ বলা চলে না। পরিকল্পনাগুলি ওপরতলায় তৈরি হওয়ার ফলে জনগণের অংশগ্রহণ এবং স্বনির্ভর উন্নয়ন ব্যবস্থার উদ্ভব সম্ভব হয়নি। উন্নয়নের ফলে বেশি উপকৃত হয়েছে সমাজের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল শ্রেণী। তার ফলে ধনী আরো ধনী হয়েছে, গরিব হয়েছে আরো গরিব। প্রথম তিন দশকে উৎপাদনের ওপর যতটা গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রে সে-তুলনায় খুবই কম। গ্রামের মানুষের স্বনির্ভরশীলতার জন্য গ্রামীণ কুটিরশিল্পের উন্নতি আশানুরূপ হয়নি। গ্রামের মানুষের উন্নয়ন-সচেতনতা এবং সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা গড়ে ওঠেনি; প্রাকৃতিক

পরিবেশের ওপর নজর না দেওয়ার ফলে পরিবেশদূষণ বেড়েছে এবং পাশ্চাত্যের অনুকরণে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় মানুষের চরিত্র, নীতিপরায়ণতা, মূল্যবোধ—এসবের উন্নতির প্রচেষ্টার অভাবে সেগুলির অবনতি হয়েছে। বিদেশী ঋণের বোঝায় আজ প্রতি ভারতবাসীর মাথা বিকিয়ে আছে।

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা

স্বামী বিবেকানন্দ শুধু একজন মানবপ্রেমিক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক, যাঁর চিন্তার ব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয় জীবন, সমাজ ও দেশের সর্বক্ষেত্রে। স্বামী বিবেকানন্দ অর্থনীতিবিদ্ ছিলেন না। অর্থশাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্ব নিয়েও তিনি মাথা ঘামাননি। তাঁর সমসাময়িক অর্থনীতিবিদ্‌দের দ্বারা যে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন তাও নয়। তবুও স্বামীজীর নিজস্ব একটি অর্থনৈতিক চিন্তাধারা ছিল। দেশের মানুষের দুঃখ-কষ্টে, অভাবে ও অশিক্ষায় তাঁর প্রাণ কাঁদত বলেই এই চিন্তাধারা একটি নিজস্ব পথে প্রবাহিত হয়েছিল এবং দরিদ্র মানুষের উন্নতির জন্য তাঁর এই আকুতির মূলে ছিলেন তাঁর গুরু যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের জীবনের দুটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়—প্রথমটি মথুরবাবুর সঙ্গে কাশী-বৃন্দাবনাদি তীর্থদর্শনে যাওয়ার পথে দেওঘরের নিকট কোন এক গ্রামে এবং দ্বিতীয়টি নদীয়া জেলার রাণাঘাটের নিকট মথুরবাবুর জমিদারিভুক্ত কলাইঘাটা গ্রামে। উভয় ক্ষেত্রেই গ্রামবাসীদের দুঃখ-দারিদ্র্যে ঠাকুরের হৃদয় করুণায় পূর্ণ হয়। তিনি মথুরবাবুকে বলেন তাদের জন্য মাথার তেল, পরনের কাপড় ও পেট ভরে খাবার দিতে। তীর্থে অনেক খরচের কথা ভেবে মথুরবাবু একটু দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছেন দেখে ঠাকুর বললেন : "দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না। আমি এদের কাছেই থাকব; এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাব না।" এই বলে বালকের ন্যায় গোঁ ধরে তিনি দরিদ্রদের মধ্যে গিয়ে উপবেশন করলেন। তখন গ্রামবাসীদের দুঃখ দেখে ঠাকুরের চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছে, হৃদয়ে অপূর্ব করুণার আবেশ হয়েছে।

বেদমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ, আর স্বামী বিবেকানন্দ হলেন সেই বেদের শ্রেষ্ঠ ভাষ্য। সেই শ্রীরামকৃষ্ণরূপী বেদমুখেই উচ্চারিত একটি অতি বাস্তব কথা—"খালি পেটে ধর্ম হয় না।" একই সুরে সুর মিলিয়ে স্বামীজী বললেন : "যে-ঈশ্বর আমাকে ইহজীবনে এক টুকরো রুটি দিতে পারেন না, তিনি যে পরজীবনে আমাকে স্বর্গরাজ্য দেবেন, একথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।" "যে-ধর্ম বা যে-ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন করতে পারে না অথবা অনাথ শিশুর মুখে একমুঠো খাবার দিতে পারে না, আমি সে-ধর্মে বা সে-ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।"

স্বামীজী অর্থনীতির ছাত্র ছিলেন না সত্য, কিন্তু জন স্টুয়ার্ট মিলের রচনাবলী তাঁর ভালভাবেই পড়া ছিল। তখন মিল ছিলেন পৃথিবীর অর্থনীতিবিদ্‌দের মধ্যে অগ্রণী। অর্থনীতি সম্পর্কেও যে স্বামীজীর সুগভীর জ্ঞান ছিল—এই মতের সমর্থন মেলে এরিক হ্যামণ্ডের উক্তির মধ্যে। তিনি লিখেছেন : "Swamiji soon showed that he was equally versed in History and Political Economy. He stood among these people on their own ground." ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর (ধর্মমহাসম্মেলনের ঠিক আগে) American Social Science Association-এর সভায় স্বামীজী "Use of Silver in India" শীর্ষক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। অর্থশাস্ত্র এবং মুদ্রাব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান না থাকলে তাঁর পক্ষে এই বক্তৃতা দেওয়া সম্ভব হতো না।

তবে স্বামীজী অর্থনৈতিক চিন্তার ব্যাপারে তাঁর পূর্বসূরিদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন না। তাঁর চিন্তাধারা ছিল সম্পূর্ণভাবে মৌলিক ও স্বতন্ত্র, যার ভিত্তি ছিল তাঁর গভীর দেশপ্রেম, ইতিহাস-সচেতনতা ও দূরদৃষ্টি। বিভিন্ন স্থানে স্বামীজীর অর্থনৈতিক চিন্তার যে মূলসূত্রগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, সেগুলি আহরণ করে একটি সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা কর্মসূচীর মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা সম্ভব এবং নতুন সহস্রাব্দেও তা হবে সমভাবে প্রাসঙ্গিক।

বিবেকানন্দের মতে উন্নয়নের অর্থ হলো মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের জাগরণ—যার প্রকাশ ঘটবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক—প্রতিটি ক্ষেত্রেই। স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল একটি শোষণহীন সমাজ, যেখানে থাকবে প্রত্যেক মানুষের সমানাধিকার। বিবেকানন্দই প্রথম ভারতীয় যিনি নিজেকে সমাজতন্ত্রী হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই সমাজতান্ত্রিক চিন্তার মূল ভিত্তি ছিল অদ্বৈতবাদ। আর এমন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার পন্থা বা উপায় স্বামী বিবেকানন্দের নিজস্ব চিন্তাধারা-প্রসূত। মার্ক্সীয় চিন্তাধারার প্রভাব স্বামীজীর ওপর ছিল না। স্বামীজীর সমাজতন্ত্রের রূপটাই ছিল অন্য ধরনের। এই প্রসঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উক্তি : "কার্ল মার্ক্সের বই থেকে এই সমাজবাদের জন্ম হয়নি। ভারতের চিন্তা ও সংস্কৃতিতেই রয়েছে এর উৎস। বিবেকানন্দের সমাজচিন্তা সেই উৎস থেকেই প্রবাহিত, যার রূপায়ণের ওপর নির্ভর করছে ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি।" [ক্রমশ] (এক)

'কথামৃত'-এ বিভাষিত শ্রীরামকৃষ্ণ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

পায়েস হয়েছিল কি? শেষ পাতে মা কি পায়েস পরিবেশন করলেন? মাথায় ঘোমটা টেনে ঠাকুরের সামনে থালাটি নামিয়ে দিয়ে তিনি কি আর ফিরে এসেছিলেন?

মা তাঁর দক্ষিণেশ্বরের জীবন সম্পর্কে বলছেন ঃ "তিনি বলতেন, 'ওরে হৃদু, আমার বড় ভাবনা ছিল যে পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, কে জানে—এখানে কোথায় শৌচে যাবে, আর লোকে নিন্দে করবে, তখন লজ্জা পেতে হবে। তা ও কিন্তু এমন যে কখন কি করে, কেউ টেরই পায় না, বাইরে যেতে আমিও কখনো দেখলুম না।' তাঁর ঐ কথা শুনে আমার এমন ভাবনা হলো যে কি বলব! ভাবলুম—ওমা, উনি তো যা চান তাই 'মা' ওঁকে দেখিয়ে দেন, এইবার বাইরে গেলেই ওঁর চোখে পড়তে হবে দেখছি। ব্যাকুল হয়ে জগদম্বাকে ডাকতে লাগলুম, 'হে মা, আমার লজ্জা রক্ষা কর।' তা আমার এমনি মা-টি যেন দুই পাখা দিয়ে আমাকে ঢেকে রাখতেন! এত বছর ছিলুম, একদিনও কারো সামনে পড়িনি। লোকে আমাকে ভগবতী বলে, আমিও ভাবি—সত্যিই বা তাই হব।... আহা! দক্ষিণেশ্বরে কি সব দিনই গেছে, মা। ঠাকুর কীর্তন করতেন, আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নহবতের ঝাপড়ির ভিতর দিয়ে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম, হাত জোড় করে পেন্নাম করতুম, কি আনন্দই ছিল! দিনরাত লোক আসছে, আর ভগবানের কথা হচ্ছে।"

এই আবরু উপেক্ষা করে মায়ের পক্ষে পরিবেশন করা কি সম্ভব ছিল? শ্রীম আমাদের বড় ধন্দে রেখে গেছেন। ঠাকুরের জন্য, ঠাকুরের ভক্তদের জন্য মা কি রাঁধতেন? দক্ষিণেশ্বরের জীবনে মায়ের একমুহূর্তও বিশ্রামের সময় ছিল না। ভক্তদের জন্য রোজ তিন সের, সাড়ে তিন সের আটার রুটি হতো। ডাল হতো। মাছের পদও হতো। ঠাকুরের জন্য স্পেশাল মাছের ঝোল। ভাত তো হতোই। রুটি রাতের ব্যবস্থা। আরেকটি বিশেষ বস্তু হতো—ঘন দুধ। অল্প আঁচে দুধ জ্বাল দিয়ে সর তোলা। ঠাকুর সর খেতে ভালবাসতেন। এরপর পান সাজা। এক-আধটা নয়, অনেক খিলি। কিছু পানে শুধু চুন, সুপুরি। কিছু পানে মসলা-এলাচের তরিবাদি। এই বিশেষ খিলি ভক্তদের জন্য। দুরকমের পান কেন? যোগেন-মার এই প্রশ্নের উত্তরে মা বলেছিলেন ঃ "যোগেন, ভালগুলো ভক্তদের, এদের আমাকে আদর-যত্ন করে আপনার করে নিতে হবে। আর সাধারণগুলো ওঁর জন্যে। উনি তো আপনার আছেনই।"

যোগেন-মা আরো কিছু তথ্য দিচ্ছেন, বলছেন ঃ "ঠাকুরের মা যতদিন বেঁচেছিলেন (তিনি থাকতেন নহবতের দ্বিতলে) ঠাকুর ততদিন নহবতে খেতেন। ছেলেরা কেউ না থাকলে স্নানের সময় মা ঠাকুরকে তেল মাখিয়ে দিতেন। গোলাপ-দিদি এলে (ঠাকুরের লীলায় প্রবেশ করলে) ঠাকুর একদিন তাকে ভাতের থালা আনতে বলেন। সেই থেকে গোলাপ-দিদিই রোজ ভাত নিয়ে যেত।"

ঠাকুর সুক্ত খেতে ভালবাসতেন। গাঁদালের ঝোল, ডুমুর, কাঁচকলা দিয়ে। ফোড়ন দেওয়া ডাল তাঁর প্রিয় ছিল। পছন্দ করতেন নারকেল নাড়ু। আজকের এই দিনটি ঠাকুরের অন্যান্য দিনের মতোই। বিশেষত্ব এই—পাশের আসনে বসে আছেন নরেন্দ্রনাথ।

শ্রীম একটি লাইনেই এই আহারপর্ব গুটিয়ে দিলেন—"নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছেই আহার করলেন।" পরের দৃশ্য—নরেন্দ্রনাথের বিশ্রামের জন্য ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে বিছানা করে দিতে বলেছেন। প্রথমে মাদুর, তার ওপর লেপ। বালিশ এসেছে। বিছানা কে পাতলেন? মাস্টারমশাই উপস্থিত ভক্তদের দেখিয়ে দিয়েছেন আগেই—রাখাল, রামলাল, হাজরা আর দু-একটি ব্রহ্মজ্ঞানী ছোকরা।

আহারান্তে পান। ঠাকুরের নির্দেশ। মুখের গন্ধ দূর করে। মা যে অনেক পান সেজে ডাবরে রাখেন। ভক্তদের জন্য বিশেষ পান। সেই পানের একটি খিলি কি নরেন্দ্রনাথের মুখে? সুন্দর মুখের সুন্দর দুটি ঠোঁট কি তাম্বুলরাগে রক্তিম হয়ে উঠেছে?

নরেন্দ্রনাথ বালিশে কনুই রেখে আয়েস করে বসেছেন। ঠাকুরও বসেছেন পাশে। পরিতৃপ্ত তাম্বুলচর্বণ। আজ বড় সুখ! এমন দৃশ্য আর কি দেখা যাবে পরে! দুই

যোদ্ধা পাশাপাশি। একটু বিশ্রাম, একটু অবসর। শ্রীকৃষ্ণের নিলয়ে এবারের কুরুক্ষেত্রের পার্থ। যুদ্ধটা কেমন হবে? দাশরথি রায় তার আভাস পেয়েছিলেন—

"ভক্তি রথে চড়ি, লয়ে জ্ঞান তূণ,
রসনা ধনুকে দিয়ে প্রেমগুণ,
ব্রহ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম অস্ত্র তাহে সন্ধান করে।।"

মাঝ অক্টোবর, আশ্বিনের শেষ। কার্তিকে পা। বেলা ছোট। বাইরে রোদের তাপ। পঞ্চবটীর ছায়ায় ছায়ায় পাখির বিশ্রাম, কূজন। পশ্চিমে ঢলছেন সূর্য। নিস্তরঙ্গ গঙ্গাবক্ষে কিরণের নৃত্য। পঞ্চবটী এবারের শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের অস্ত্রপরীক্ষাশালা। দীর্ঘ চোদ্দ বছর ধরে সনাতন শাস্ত্র আর সাধনার ধার পরীক্ষা করেছেন। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, যোগ ও সন্ন্যাসের জীবন্ত গীতা করেছেন নিজেকে। তন্ত্রকে চালিত করেছেন সঠিক পথে।

প্রতিদিনই একাধিক সাধুসন্তের সমাগম হচ্ছে পঞ্চবটীতে। রানীর ব্যবস্থায় তাঁদের আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হয় না। পঞ্চবটীর দিকে তাকালেই গেরুয়াদর্শন হয়। গঙ্গার তীরে আশ্রয়, আহার, দিশা-জঙ্গলের সুবিধা। উত্তরের দরজা দিয়ে দৃষ্টি নহবত ছুঁয়ে সোজা চলে যেতে চায় পোস্তার পাশ দিয়ে সেই আমলকীতলার জঙ্গলাকীর্ণ নিচু জায়গাটিতে, যেখানে রাতের পর রাত শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনা করেছিলেন নিশাচরদের গ্রাহ্য না করে।

নরেন্দ্রনাথের পাশটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ। মাস্টারমশাই দেখছেন, কালান্তরের আমাদের দেখাচ্ছেন, কলের গান হয়ে আমাদেরও তাঁর কথা শোনাবেন। শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় মাস্টারমশাই আমাদের একালের 'অডিও-ভিডিও'; কিন্তু তিনি নিজেকে ঘরের কোন্ জায়গাটিতে বসিয়েছেন? কোথায় রয়েছেন অন্যান্যরা?

ঠাকুর যেন আজ সদানন্দ এক বালক। উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল তাঁর। ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের দিকে মুখ করে বসে আছেন। আজ যেন নিজেকে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত করছেন। হাসছেন, নিজের চরিত্র বর্ণনা করছেন, সাধনকালে নিজের কি অবস্থা হয়েছিল সেই কথা বলছেন।

উন্মত্ত অবস্থা। "কেবল ঈশ্বরের কথা শোনবার জন্যে ব্যাকুলতা হতো। কোথায় ভাগবত, কোথায় অধ্যাত্ম, কোথায় মহাভারত খুঁজে বেড়াতুম। এঁড়েদার কৃষ্ণকিশোরের কাছে অধ্যাত্ম শুনতে যেতুম।"

ঠাকুর বলে চলেছেন। নরেন্দ্রনাথ ও ভক্তবৃন্দ মোহিত হয়ে শুনছেন।

"কৃষ্ণকিশোরের কী বিশ্বাস! বৃন্দাবনে গিছিল, সেখানে একদিন জলতৃষ্ণা পেয়েছিল। কুয়ার কাছে গিয়ে দেখে, একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল, 'আমি নীচ জাতি, আপনি ব্রাহ্মণ; কেমন করে আপনার জল তুলে দেব?' কৃষ্ণকিশোর বললে, 'তুই বল শিব। শিব শিব বললেই তুই শুদ্ধ হয়ে যাবি।' সে 'শিব', 'শিব' বলে জল তুলে দিলে। অমন আচারী ব্রাহ্মণ সেই জল খেলে! কী বিশ্বাস!"

কৃষ্ণকিশোরের বিশ্বাস ঠাকুরের মনে স্থায়ী ছাপ ফেলেছে। এই কাহিনী শুনে নরেন্দ্রনাথও বোধহয় তাঁর চরিত্রের মতো আরেক চরিত্রের সন্ধান পেলেন। এই জাতিভেদ তো তাঁর কাছেও দুর্বোধ্য এক শাস্ত্রবিধান। শৈশবের কথা কি তাঁর মনে পড়ছে? তাঁর সেই চাচার কথা? পিতার অনেক মক্কেলের এক মক্কেল।

নরেন্দ্রনাথ তাঁর নিজের জীবনের অতীত পৃষ্ঠায় সরে যাচ্ছেন নাকি? তাঁদের বাড়ির বৈঠকখানা। পিতার মক্কেলরা সব বসে আছেন। দেওয়ালের পেরেকে ঝুলছে সারি সারি হুঁকো। এক-একটি হুঁকোর এক-এক জাত! ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ক্ষত্রিয়, মুসলমান!

চাচা ছিলেন মজার মানুষ। বৈঠকখানায় ঢুকেই সব বালিশ একের পর এক, একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে পা ছড়িয়ে ঠেসান দিয়ে আয়েস করে বসতেন। হাতে হুঁকো। অর্ধনিমীলিত চোখে ফুড়ুক ফুড়ুক টান। আর মাঝে মাঝে বলে উঠতেন—'ইয়া আল্লা', 'লা-এলাহা এল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রাসুলোল্লাহ'।

চাচা নরেন্দ্রনাথকে ভীষণ ভালবাসতেন। গল্প শোনাতেন আরব দেশের। মিষ্টান্ন ইত্যাদি খেতে দিতেন। নিঃসঙ্কোচে খেতে থাকতেন শিশু নরেন্দ্রনাথ। হিন্দুরা আঁতকে উঠতেন। জাত গেল, জাত গেল! উদার পিতা বিশ্বনাথ দত্ত গ্রাহ্য করতেন না। লখনৌ ঘরানার মানুষ।

শিশু নরেন্দ্রনাথের মহা কৌতূহল—মানুষ, তার আবার জাত, সেই জাত যায়! জাতেরও মৃত্যু হয়: মানুষটা বেঁচে থাকে। একদিন নরেন্দ্রনাথ পিতা আর মক্কেলদের অনুপস্থিতিতে ঘরে ঢুকে বিভিন্ন জাতের হুঁকোয় ঠোঁট লাগিয়ে ফুড়ুক ফুড়ুক টানলেন।

জাত গেছে কি? পিতা পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন—"কি কচ্ছিস?"

কিশোরের উত্তর: "দেখছি, জাত কিভাবে যায়! জাত না মানলে কি হয়?"

লালনের সেই প্রশ্ন:

"সব লোকে কয়,
লালন কি জাত সংসারে।
পৈতে দেখে বামন চিনি
বামনি চিনি কিভাবে!" [ক্রমশ] (সাত)

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

প্রসঙ্গ 'মহারাণা প্রতাপসিংহ'

গত শারদীয় (আশ্বিন ১৪০৮) 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'মহারাণা প্রতাপসিংহ' প্রবন্ধটির কয়েকটি ত্রুটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমত, লেখক ঐতিহাসিক আলবেরুণীকে আকবরের সমসাময়িক বলেছেন। কিন্তু তিনি তো এসেছিলেন সুলতান মামুদের সঙ্গে। আসলে লেখক যে-ঐতিহাসিকের কথা বলতে চেয়েছেন, তাঁর নাম আব্দুল কাদির বদায়ুনী এবং তাঁর গ্রন্থের নাম 'মুন্তাখাব-উৎ-তওয়ারীখ' বা 'তারীখ-ই-বদায়ুনী'। বদায়ুনী ছিলেন সম্রাট আকবরের সভাসদ। কট্টর মোল্লা ও হিন্দুবিদ্বেষী হিসাবে তাঁর কুখ্যাতি ছিল। হিন্দুদের সঙ্গে আকবরের মাখামাখি তিনি সুনজরে দেখেননি। হলদিঘাটের যুদ্ধে তিনি স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন। উদ্দেশ্য—কাফের মেরে বেহেস্তে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করা। হলদিঘাট যুদ্ধের যে প্রত্যক্ষ বিবরণ তিনি দিয়েছেন তা প্রামাণিক। হিন্দুবিদ্বেষী হলেও তিনি রাণা প্রতাপের বীরত্বের প্রশংসা করেছেন। তাঁর সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, রাণা প্রতাপের সঙ্গে সম্মুখসমর হয়েছিল মানসিংহের নয়, মাধোসিংহের। এই মাধোসিংহকে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন মানসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র। অথচ মাধোসিংহকে ডঃ যদুনাথ সরকার বলেছেন—"the youngest brother of Man Singh" (A History of Jaipur, p. 50) আর ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো বলেছেন—মানসিংহের জ্যেষ্ঠভ্রাতা (দ্রঃ রাজস্থান কাহিনী, পৃঃ ৪)। জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ যাই হোক না কেন, মাধোসিংহ ছিলেন মানসিংহের ভাই, পুত্র কখনোই নয়।

দ্বিতীয়ত, মদ্যপানাসক্ত আকবরের ক্রূরতার নমুনা পেশ করতে গিয়ে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় আবুল ফজলের 'দলপত বিলাস' গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। ঐ নামের কোন বই নেই আবুল ফজলের। প্রকৃতপক্ষে বইটির লেখক বিকানীরের যুবরাজ দলপৎ সিংহ (দ্রঃ The Mughal Empire, Ed. R. C. Majumdar, p. 16)। হিন্দিতে লেখা এই গ্রন্থটির সাহিত্যিক মূল্য থাকতে পারে, ঐতিহাসিক মূল্য আদৌ নেই। কোন সাহিত্যগ্রন্থ থেকে কোন কাহিনী গ্রহণ করে তাকে ঐতিহাসিক সত্য বলে চালানো যায় না। অথচ শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় এমন উদাহরণ আরো আছে। যেমন, বিকানীর-রাজ রায়সিংহের ছোট ভাই কবি পৃথ্বীরাজের সঙ্গে রাণা প্রতাপের চিঠি চালাচালির যে-কাহিনী ব্যক্ত করেছেন তিনি, তা নিছকই কল্পনা। ঐতিহাসিকেরা এ-কাহিনী মেনে নেননি। মনে রাখতে হবে, রাণা প্রতাপ কখনোই নীচমনা ছিলেন না। মোঘলের অধীনতা স্বীকার না করে তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীনভাবে বাস করতে। কিন্তু তিনি তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আকবর সম্পর্কে কোন কটু মন্তব্য করেছেন—এমন উদাহরণ ইতিহাসে নেই। বাদশাহের মহত্ত্ব বাড়ানোর জন্য আবুল ফজল বলেছেন যে, প্রতাপ আকবরকে 'বাদশাহ' না বলে 'তুর্ক' বলে সম্বোধন করতেন। কবি পৃথ্বীরাজের রচনায়ও তাই আছে। কিন্তু প্রতাপের সারা জীবনে কখনো কোথাও এভাবে বাদশা-বিদ্বেষ প্রকাশ পায়নি।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় মানসিংহ ও প্রতাপের একত্রে ভোজনে না বসার যে কাল্পনিক কাহিনী পরিবেশন করেছেন তা আছে 'বংশ ভাস্কর' নামে একটি অর্বাচীন গ্রন্থে। কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই। আসলে সিসোদিয়া ও কাছোয়াদের একটা আভ্যন্তরীণ বিবাদ ছিল। সেটাই অতিপল্লবিত হয়েছে ভাটদের গানে। আর সেই অতিরঞ্জিত কাহিনী বিনা বিচারে গ্রহণ করেছেন কর্ণেল টড। টডের লেখাকে প্রামাণিক ভেবে অনেকে ডুবেছেন স্বখাতসলিলে। ডঃ কানুনগোর মতে, টডের পনেরো আনা রচনাই মিথ্যা। ইতিহাস পাঠে আমরা জানি যে, মানসিংহ ও প্রতাপের সম্পর্ক কোনদিনই তিক্ততায় পর্যবসিত হয়নি। আকবরও সন্দেহ করতেন মানসিংহের আন্তরিকতায়। তাই প্রতাপকে জব্দ করতে না পারার জন্য তিনি সাময়িক বরখাস্তও করেন মানসিংহকে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, একবার শিকাররত মানসিংহকে বাগে পেয়েও ঝালা সর্দার বীদার নিষেধে তাঁর কোন ক্ষতি করেননি প্রতাপ। কাহিনীটি 'বীর-বিনোদ' কাব্যপ্রণেতা শ্যামলদাসজীর কল্পনাপ্রসূত, ঐতিহাসিক সত্য নয়। আর যদি সত্য বলে মেনেও নিই, তাহলেও এতে প্রমাণিত হয় প্রতাপের মহত্ত্ব। মানসিংহের প্রতি তাঁর বিদ্বেষও অপ্রমাণ হয়। মানসিংহ ছিলেন সমরকুশলী যোদ্ধা, বহু যুদ্ধজয়ের স্থপতি। প্রতাপ ছিলেন দেশপ্রেমিক। তাঁর স্বাদেশিকতা ও আন্তরিকতায় কোন খাদ ছিল না। কিন্তু সুশিক্ষিত মোঘল সৈন্যের সঙ্গে সম্মুখসমরে যাওয়া তাঁর ভুল হয়েছিল। বিশেষ করে যে-সৈন্যদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তৎকালীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনানায়ক। হলদিঘাটের যুদ্ধের পর আর বোকামি করেননি প্রতাপ। বাকি জীবন তিনি গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন। ফলে শাহী ফৌজ তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর সম্পর্কে ডঃ যদুনাথ সরকার বলেছেন : "Maharana Pratap Singh was brave as a lion, and so were his chansmen and wild Bhil auxiliaries. But he was unfit to lead in a modern war, which is in effect a game of chess." (A History of Jaipur, p. 50) আবুল ফজলের মতকে মেনে নিয়ে তিনি বলেছেন : "He had no plan to battle." মানসিংহ ও প্রতাপের যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন ডঃ সরকার তা প্রণিধানযোগ্য—"Pratap was an independent prince. Man Singh was a servant; but the servant of a master who had set out to give India's millions a long unknown peace, justice, universal toleration and 'careers open to talent'." (Ibid., p. 55)

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বাদশাহের যে প্রধান হাতির কথা উল্লেখ করেছেন, তার নাম 'গজমুক্তা'। তারই স্মৃতিতে নাকি তৈরি হয়েছিল ফতেপুর সিক্রির হিরণমিনার। বাঘ শিকারে গিয়ে রাণা যে অস্ত্রে আঘাত পেয়েছিলেন তা ধনুকে গুণ টানতে গিয়ে। সেকথার উল্লেখ প্রবন্ধে না থাকায় ধারণা হবে, রাণা বুঝি বাঘের দ্বারা আহত হয়েছিলেন।

প্রভাসচন্দ্র চৌধুরী
কেশাপাট, মেদিনীপুর

প্রসঙ্গ 'শ্রীরামকৃষ্ণ, কুবীর গোঁসাই ও তাঁর জনপ্রিয় একটি গান'

'উদ্বোধন'-এর গত জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ সংখ্যায় আমার লেখা 'শ্রীরামকৃষ্ণ, কুবীর গোঁসাই ও তাঁর জনপ্রিয় একটি গান' প্রসঙ্গে গত কার্তিক ১৪০৮ সংখ্যায় একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। এবিষয়ে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে জানাতে চাই।

প্রথমে চিঠির প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাক। রচনাটিতে আমি স্পষ্ট করে লিখেছি—ঠাকুরের গাওয়া বহু গানে দেখা যায়, মূল গানের থেকে কথার কিছু পার্থক্য রয়েছে। উদাহরণ হিসাবে আমি রামপ্রসাদ সেনের একটি গানের উল্লেখ করেছি। পত্রলেখক এবিষয়ে আমার সঙ্গে একমত বলে মনে হলো। কিন্তু 'ভাবনা'র পরিবর্তন কি গানগুলির মধ্যে পাওয়া যায়? পত্রলেখক যদি আরো কয়েকবার লেখাটি পড়েন, তাহলে বোধহয় বুঝতে সুবিধা হবে আমি কি বলতে চেয়েছি। *প্রাচীন গানগুলি ঠাকুর যখন গেয়েছেন তখন দেখা গেছে বিষয়বস্তু থেকে গানগুলি কখনো বিচ্যুত হয়নি, গানের কথারও 'আমূল' পরিবর্তন হয়নি। মনে রাখতে হবে, আমাদের আলোচ্য বিষয় ঠাকুরের গাওয়া গান, অন্যান্য প্রাচীন গান নয়।*

ঠাকুরের গাওয়া এই একটি মাত্র গানই 'ভাব' এবং 'ভাষা'র দিক থেকে বিচ্যুত হয়েছে। ভাষার সঙ্গে এই ভাবের পরিবর্তনও আমার আলোচ্য বিষয় ছিল। 'দেহতত্ত্ব'-এ বিশ্বাস থাকায় কুবীরের রচনায় যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই তা হলো—ঈশ্বর সকলের অলক্ষ্যে থাকেন, তিনি মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে 'গুরু' বা 'কর্তা'রূপে আবির্ভূত হন। এই কর্তাকে আরাধনা করলেই ঈশ্বরের আরাধনা করা হয়। তাই তিনি লিখছেন ঃ "তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি নাকো রত্নধন।" অর্থাৎ রত্নধন আছে সেই গুরুর মধ্যে, যাঁর মধ্যে ঈশ্বর স্বয়ং বিরাজ করছেন। তাঁকেই ভজনা করতে হবে। অপরপক্ষে ঠাকুর বলছেন ঃ "তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন", অর্থাৎ সাকার রূপের মাধুর্যরসে ডুব দিতে হবে। তিনি যেকোন রূপের হতে পারেন। 'কৃষ্ণ' অথবা 'কালী'। এক্ষেত্রে দুজনের ভাবনার কি কোন পার্থক্য থাকছে না? এছাড়া শুধু কথার পার্থক্য ঠাকুরের গাওয়া অনেক গানে পাওয়া গেলেও কথার 'আমূল' পরিবর্তন আলোচ্য গানটির ক্ষেত্রেই একমাত্র পাওয়া যায়। দুটি গান একটু মন দিয়ে পড়লেই সেটি বোঝা যাবে। *এই কথার 'আমূল' পরিবর্তনটাই আমার আলোচনার বিষয় ছিল* এবং তার কতগুলো কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছি মাত্র। যে-সাধনরীতি (কর্তাভজা) শ্রীরামকৃষ্ণ অপছন্দ করতেন, তার বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত গান তিনি হয়তো ইচ্ছা করেই করেননি—একথা কি বলা যায় না? ঠাকুর বারবার বলেছেন, 'মাতৃরূপা ব্রহ্মের' সন্ধান পেতে গেলে ঈশ্বরের মাধুর্যরসে ডুব দিতে হবে। সাহেবধনী সম্প্রদায় মাতৃবন্দনা করে না। তাহলে মাতৃসাধক ঠাকুর গানটি নিজের মতো করে পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন—একথা কি বলা যায় না? আর এই পরিবর্তন তো যথার্থ লোকশিক্ষার জন্যই।

নজরুলের রচিত গানের যে-প্রসঙ্গ আনা হয়েছে সে-সম্পর্কে জানাই, নজরুলের রচিত প্রায় সব গানের (যেসব গান প্রয়াত মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় রেকর্ড করেছিলেন) প্রশিক্ষক ছিলেন বিমান মুখোপাধ্যায়, যাঁর কাছে আমি দীর্ঘদিন ধরে বাঙলা গানের প্রশিক্ষণ নিয়ে চলেছি। তাঁর মতে, এই কথার পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রেই হয়েছিল—(১) শিল্পীর রেকর্ড করার সময়ে বিশেষ 'মুড'-এর জন্য এবং (২) সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গিয়ে (মূলত যে-সুরগুলির বিমানবাবু অনেকটা পরিবর্তন করেছিলেন এবং সেগুলি জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেছিল)। কিন্তু নজরুলের কোন গানের কথা বা ভাবের তিনি 'আমূল' পরিবর্তন করেননি। এই 'আমূল' শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। প্রচলিত খেয়াল ঠুংরী অথবা ভজনের ক্ষেত্রেও আমার একই মত। আর ঠাকুর তো সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন না, তিনি স্বয়ং অবতারবরিষ্ঠ, লোকগুরু। তাঁর প্রতি কথার এবং কাজের মধ্যে যে অধ্যাত্মচেতনা এবং সামাজিক পরিবর্তন ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে তা সময়ের প্রয়োজনে মানুষের কল্যাণের জন্যই। সেইজন্যই তো তাঁর প্রতিটি বিষয়ে আমাদের এত অনুরাগ।

চিঠির দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাই, আমার রচনার ৩৩১ পাতার নিচের দিকে 'শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত' নামে একটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছি। গ্রন্থটির সম্পাদনা করেন পূজ্যপাদ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ। প্রকাশিত হয় রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার থেকে। গ্রন্থটির ১৯৯১ সালে প্রকাশিত সংস্করণের ৫৭ পৃষ্ঠায় 'সংশ্লিষ্ট তথ্য' অংশের প্রথম পঙ্‌ক্তিতে লেখা রয়েছে—"কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ আটদিন গানটি গেয়েছেন, তার মধ্যে সাতদিনের বিবরণে গানটি সম্পূর্ণ আছে।"

দেবাশিস দত্ত
১, রাজকিশোর দে লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৫

'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে এই প্রসঙ্গ এখানেই সমাপ্ত হলো। যদি আরো কিছু প্রশ্নাদি থাকে পাঠকবর্গ সরাসরি দেবাশিস দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।—সম্পাদক

মাতৃদুগ্ধ ও শিশুর গঠন

চৈতালী মুখার্জী

সামাজিক রীতি অনুযায়ী দুধকে আমাদের দেশে অনেক উচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। কোন শুভকাজে দুধ ছাড়া চলে না। তা সত্ত্বেও শিশুকে দুধ খাওয়ানো সম্বন্ধে বহু ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। বিশেষ করে মাতৃদুগ্ধের ব্যাপারে। এসব দুর করা অত্যন্ত জরুরী। ৫০-৬০-এর দশকে পাশ্চাত্য দেশে শিশুকে মাতৃদুগ্ধ খাওয়ানো প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ভ্রান্ত ধারণা থেকেই। মনে করা হতো যে, শিশু দুধ খেলে মায়ের দৈহিক সৌন্দর্যের হানি হয়, বিকল্প দুধের ব্যবস্থা করলে মাতৃদুগ্ধের প্রয়োজন হয় না এবং মাতৃদুগ্ধের চেয়ে গরু, মোষ বা ছাগলের দুধ এবং বিশেষ করে কৌটোর দুধ শিশুর পক্ষে আরো উপকারী। অবশ্য ভারতবর্ষ-সহ পৃথিবীর বহু দেশের মানুষই এমন ধারণা পোষণ করে। কারণ তাদের ধারণা, এতে অনেক-কিছু দ্রব্য যোগ করা আছে। দুঃখের কথা, বহু চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মী এমনকি গণমাধ্যমের বিজ্ঞাপনেও এরূপ ধারণা প্রচার করা হয়।

পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমাদের দেশেও একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে মায়েরা শিশুদের মাতৃদুগ্ধ বন্ধ করে দেয়। পরিতাপের বিষয় এই যে, শিক্ষিত মহিলারাই এই বিষয়ে অগ্রণী। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দুধরনের মায়েদের মধ্যেই আরো একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, মায়ের কোন অসুখ হলেই শিশুকে মাতৃদুগ্ধ বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এটি এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, মায়ের একটু সর্দিকাশি, জ্বর, অম্বল বা ডাইরিয়া হলেও শিশুকে মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত করা হয়। কিন্তু মায়ের সংক্রামক ব্যাধি হলেও শিশু কিছুমাত্র সংক্রামিত হয় না যদি দুধ খাওয়ানোর পর শিশুকে মায়ের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখা হয়। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, গর্ভাবস্থাতেও ফুলটি (Placenta) মায়ের আঁচলের মতো জীবাণু ছেঁকে নিয়ে গর্ভস্থ শিশুকে বহুলাংশে সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা করে।

পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, শিশুকে স্তন্যপান করালে পরবর্তী কালে মায়ের ব্রেস্ট-ক্যান্সারের সম্ভাবনা খুবই কমে যায়। পক্ষান্তরে যেসব মায়েরা শিশুদের স্তন্যপানে বঞ্চিত করেন অথবা যাঁদের সন্তান হয় না, এই বৈজ্ঞানিক তথ্য জানার পরই পাশ্চাত্যে আবার মাতৃদুগ্ধ দেওয়া শুরু হয় এবং আনন্দের বিষয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের সরকারও এবিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে (Baby Friendly Hospital Initiative বা BFHI আন্দোলনের সাহায্যে) জনসাধারণের মধ্যে এই তথ্য প্রচারে সচেষ্ট হয়েছেন এবং স্বল্পকালের মধ্যে সাফল্যও পাওয়া গেছে বা যাচ্ছে। জন্মের আধঘণ্টা পর থেকে সঠিকভাবে শিশুকে বুকের দুধ দেওয়াকে 'Baby Friendly' বা 'শিশু কল্যাণকর কাজ' বলা হয়।

এসত্ত্বেও একথা স্বীকার করতেই হবে, আমাদের দেশের মতো বিপুল জনসংখ্যার দেশে শুধু সরকারি এবং কতিপয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রচেষ্টায় খুব বেশি এগনো সম্ভব নয়। তাই অধিক সংখ্যায় মানুষকে এবিষয়ে অবহিত করে গণসচেতনতা বাড়িয়ে তুলতে হবে।

মাতৃদুগ্ধের উপকারিতা

শিশুর ক্ষেত্রে : (১) এতে শিশুর প্রয়োজনীয় সবরকম পুষ্টিকর উপাদান আছে। খাদ্যে যে-কটি পুষ্টিকর উপাদান শিশুর পক্ষে প্রয়োজনীয়, তার সবকটিই সঠিক পরিমাণে মাতৃদুগ্ধে আছে। (২) মাতৃদুগ্ধে হজমকারী পাচক রস বা এঞ্জাইম (Lypase) আছে, যার ফলে শিশুর পেট ফাঁপে না এবং পেটের অসুখ হয় না। (৩) মায়ের দেহে তৈরি রোগ-প্রতিরোধক অ্যান্টিবডি (Immunoglobulin) এতে আছে, যা বহু মারণ ব্যাধি থেকে শিশুকে রক্ষা করে। (৪) এতে দেহবৃদ্ধিকারী উপাদান (growth factor) আছে, যার ফলে শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি এবং মানসিক বিকাশ সঠিকভাবে হয়। (৫) মাতৃদুগ্ধ শিশুর চোয়ালের গঠনে সাহায্য করে। (৬) এতে সঠিক তাপমাত্রা বজায় থাকে—গরম করার প্রয়োজন হয় না। (৭) স্তনপানের মাধ্যমে মায়ের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক নিবিড়ভাবে গড়ে ওঠার সুযোগ হয়। মনে রাখা দরকার যে, এটি সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত।

চার মাস পর্যন্ত শিশুকে মাতৃদুগ্ধ ছাড়া অন্য কিছু খাওয়ানোর দরকার নেই, (exclusive breast feeding) এমনকি জল পর্যন্ত নয়। জল খাওয়ানোর দরকার মনে হলে মায়ের দুধ দিলেই হবে। কারণ—(ক) মাতৃদুগ্ধে প্রয়োজনীয় জল আছে। (খ) জল খাওয়ালে সামান্য ভুলত্রুটিতে জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে। (গ) জলে পেট ভরে থাকলে শিশু কম খাবে এবং কম খেলে শিশু দিন দিন অপুষ্টিতে ভুগবে। তাছাড়া এর ফলে স্তন্যদুগ্ধ কখনো নিঃশেষ হয় না। নিঃশেষ না হলে আবার প্রচুর দুধ স্তনে আসবে না। প্রচুর দুধ স্তনে না এলে রক্তে প্রোল্যাক্টিন (Prolactin) হরমোন আসবে না এবং এর ফলে শিশুর অপুষ্টি ছাড়াও মায়ের ক্ষেত্রে, এই সময় স্বাভাবিক উপায়ে গর্ভনিরোধ হবে না।

মায়ের ক্ষেত্রে : (১) মায়ের বুকে ক্যান্সারের সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। (২) পেট ও কোমরের গড়ন ও জরায়ু আগের মতো আকারে তাড়াতাড়ি চলে আসে। (৩) শতকরা

৭০ শতাংশ মায়ের মাসিক বন্ধ থাকে (lactaronal amaenorrhoea)। ফলে বিনা ওষুধে মায়ের কয়েক মাস গর্ভনিরোধ হয়ে থাকে। (অবশ্য শিশু সম্পূর্ণ স্তন্যপান করলে।) (৪) মাতৃদুগ্ধ পান করলে নারীদেহের সৌন্দর্য নষ্ট হয় না। মাকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি দিলেই মায়ের সৌন্দর্য অটুট থাকে। আমাদের চারপাশে দেখতে পাই মা, জেঠিমা, ঠাকুমারা ৫-৬টি সন্তানের মা হওয়া সত্ত্বেও এবং অধিক দিন স্তন্যপান করানোর পরও প্রৌঢ়কালেও তাঁদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য অটুট আছে। বয়স হলে যে সৌন্দর্য কমে যায় তা অবিবাহিত মেয়েদের ক্ষেত্রেও হয়।

শিশুর জন্মের একঘণ্টার মধ্যে মা ও শিশু দুজনেরই পুষ্টির দিকে নজর দিতে হবে। মাকে পুষ্টিকর সহজপাচ্য খাদ্য (মাছ, ভাত বা রুটি) দিতে হবে এবং নবজাতকের জন্য মায়ের বুকের দুধ। এইসময় মাকে প্রচুর পরিমাণ জল বা জলীয় খাদ্য খেতে হবে। প্রসবের পর চার-পাঁচদিন যে ঘন আঠালো দুধ বেরোয়, তাকে 'কলস্ট্রাম' (colostrum) বলে। এটি অত্যন্ত উপকারী। এর মধ্যে শিশুদের বহু মারাত্মক সংক্রামক রোগের অ্যান্টিবডি ও অন্যান্য ভিটামিন আছে, সেজন্য এটি শিশুকে অবশ্যই খাওয়াতে হবে। এতে শিশুর পায়খানাও পরিষ্কার হয়।

কৌটার দুধ শিশুর পক্ষে ক্ষতিকারক। কারণ, এতে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও অ্যান্টিবডি থাকে না। এছাড়া কৌটা থেকে দুধ বানানোর সময় জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে। বোতলে খাওয়ানোর পর প্রতি বার বোতল ও নিপ্‌ল জলে ফোটানো হয় না, এতে বোতল ও নিপ্‌ল দুটিতেই জীবাণু থেকে যায়। তাতে শিশুর ডাইরিয়া হয়। কৌটার দুধ তরল করে তৈরি করলে জলে পেট ভরে থাকবে, যার ফলে শিশুর অপুষ্টি হবে। এছাড়া কৌটার দুধে চর্বি বেশি যোগ করার জন্য শিশুর দেহে অত্যধিক চর্বি জমে যায়, যে-চর্বি পরবর্তী কালে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কমানো যায় না, ফলে শিশুরা মোটা হয়ে পড়ে। তাই মায়ের দুধ সম্পূর্ণ নিরাপদ। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বেশ কিছু চিকিৎসক এখনো কৌটার দুধ খাওয়াতে বলেন।

পূর্বে ধারণা ছিল, তিন মাসের কম বয়স্ক শিশু গরুর দুধ হজম করতে পারে না। তাই সমপরিমাণ জল ও পরিমাণমতো চিনি বা গুড় মিশিয়ে অর্থাৎ মাতৃদুগ্ধের মতো করে (humanisation of milk) শিশুকে খাওয়াতে বলা হতো। কিন্তু এধারণার কোন ভিত্তি নেই বরং এটি ক্ষতিকর, কারণ জল মেশালে পুষ্টিগুণ কমে যায় এবং জল দূষিত হলে নানা রোগ হতে পারে। সদ্যজাত শিশুকে যদি গরুর দুধ খাওয়াতেই হয়, তবে কিছু না মিশিয়ে গরুর দুধ খাওয়ানোই শ্রেয়। কারণ, শিশু সেই দুধ হজম করতে সক্ষম। যেহেতু আমাদের দেশে ২% গরুর যক্ষ্মা আছে, তাই দুধকে একটু ফুটিয়ে নিতে হবে।

মা স্তন্যপান করানোর সময় শিরদাঁড়া সোজা করে বসবে। শিশুর শিরদাঁড়াও যথাসম্ভব সোজা করে হাত ও কোলের সঙ্গে ৪৫° কোনাকুনি (<৪৫°) অবস্থায় শিশুকে রাখতে হবে। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, তার নাক যেন চাপা না পড়ে। শুয়ে কখনো স্তন্যপান করানো উচিত নয়, এতে মা ঘুমিয়ে পড়লে শিশুর নাকে চাপা পড়ে শ্বাসরোধ হয়ে মারা যেতে পারে ও দুধ গড়িয়ে কানে ঢুকে পুঁজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

একদিকের স্তনের দুধ খালি না হওয়া পর্যন্ত অন্য স্তনে খাওয়ানো উচিত নয় এবং মাকে মনে রাখতে হবে কোন্ স্তনে দুগ্ধপান করা বন্ধ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে সেই স্তন থেকেই পান করানো আরম্ভ করতে হবে। স্তন সম্পূর্ণ খালি না হলে প্রচুর দুধ আসবে না।

বোতল অপেক্ষা ঝিনুক-বাটিতে দুধ খাওয়ানো ভাল, কারণ তা পরিষ্কার করা সহজ। মাতৃদুগ্ধ খাওয়ানোর সময় নিপ্‌ল পরিষ্কার করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ ওখানেই একটি রস (secretion) বেরোয় যা জীবাণুনাশক। কিন্তু যদি দৃশ্যত ধুলো-ময়লা থাকে তবে তা জল ও সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

দুধ খাওয়ানোর পরে শিশুকে ঢেঁকুর তুলিয়ে শোয়ানো উচিত। নচেৎ শিশুর মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়। একে 'কট ডেথ' (cot death) বলে।

মায়ের দুধ কখন খাওয়ানো উচিত নয়

স্তনবৃন্তে পুঁজ জাতীয় অসুখ হলে কিংবা মা গুরুতর অসুস্থ হলে বাচ্চাকে তা খাওয়ানো উচিত নয়। তাছাড়া সব অবস্থাতেই স্তনদুগ্ধ খাওয়ানো যাবে। মায়ের সংক্রামক ব্যাধি হলে কেবলমাত্র খাওয়ানোর সময়ই শিশুকে মায়ের কাছে আনা যাবে এবং সাবধানে খাওয়াতে হবে। এমনকি মায়ের যক্ষ্মা বা কুষ্ঠ হলেও শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো যাবে। মানুষের যক্ষ্মা টিউবারকুলোসিস হিউমানিস (Mycobacterium Tuberculosis Humanis) জাতীয় জীবাণু দ্বারা হয়। এটি বুকের বা ফুসফুসের যক্ষ্মা। গরুর দুধে যে যক্ষ্মার জীবাণু থাকে তা হলো টিউবারকুলোসিস বোভাইন (M. Tuberculosis Bovine)। এতে মানুষের অন্ত্রে কখনো কখনো যক্ষ্মা (Intestinal T. B.) হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানুষের অন্ত্রে যক্ষ্মা ফুসফুস থেকে আসে। ফুসফুসের যক্ষ্মার জীবাণু (টিউবারকুলোসিস হিউমানিস জীবাণু) শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করে। তাই যক্ষ্মা-আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধের মধ্য দিয়ে শিশুর দেহে যক্ষ্মার জীবাণু প্রবেশ করে না। এক্ষেত্রে যক্ষ্মাগ্রস্তা মায়ের উচিত আঁচল দিয়ে নিজের মুখ ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে দুধ খাওয়ানো।

খাওয়ানোর পর শিশুকে অন্যত্র সরিয়ে নিলে শিশুর যক্ষ্মা হবে না। কারণ, ফুসফুসের যক্ষ্মা বায়ুর মাধ্যমে ছড়ায়। তাই মায়ের থুতু, হাঁচি, কাশির ফলে হাওয়ার মাধ্যমে শিশুর ফুসফুসে যক্ষ্মার জীবাণু প্রবেশ করতে পারে—মায়ের দুধের মাধ্যমে নয়।

এছাড়া মায়ের যক্ষ্মা বা কুষ্ঠ থাকলে ১ মাস নিয়মিত চিকিৎসার পরেই তা নন-ইনফেকশাস হয়ে যায়। তখন মায়ের থুতুতে যক্ষ্মাজীবাণু থাকে না। মায়ের রোগ থাকলেও সংক্রামণ ক্ষমতা থাকে না।

এছাড়া মায়ের যদি অন্যান্য রোগ যেমন ডাইরিয়া, অম্বল বা পেটের কোন অসুখ হয়, তাহলেও শিশু মাতৃদুগ্ধ খেলে তার সংক্রমণ হবে না। কারণ, এগুলি ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার ওপর নির্ভর করে। মাকে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ অপরিচ্ছন্নতাজনিত অসুখে ভুগলে মায়ের (যেমন পেটের রোগ, সর্দিকাশি ইত্যাদি) দুধের পরিমাণ কমে যায় ও শিশু অপুষ্ট হয়। এছাড়া পরিবার পরিকল্পনার ভূমিকাও এখানে অনস্বীকার্য, কারণ বারবার সন্তান প্রসবে মা অপুষ্ট থাকলে দুধের পরিমাণ কমে যায় এবং শিশু অপুষ্টির শিকার হয়।

শিশুর মানসিকতার বিকাশ ও শারীরিক বৃদ্ধির হার

শিশুর মানসিকতার বৃদ্ধি : ১ম মাসে—নিজে নিজে হাসে। ২য় মাসে—শব্দ শুনে ঘাড় ঘোরায়। ৩য় মাসে—ঘাড় শক্ত হয়। ৪র্থ মাসে—কিছু পেলে ধরতে চায় (হাতের মুঠো দিয়ে)। ৫ম মাসে—বিছানায় নিজে নিজে উপুড় হয়। ৬ষ্ঠ মাসে—পিছনে বালিশ দিলে বসতে পারে। ৭ম মাসে—বিনা বালিশে বসতে পারে। ৮ম মাসে—হামা দেয়। ৯ম মাসে—কিছু ধরে দাঁড়াতে পারে। ১০ম মাসে—কিছু না ধরেই দাঁড়াতে পারে। ১১ ও ১২ মাসে—অল্প অল্প হাঁটে ও পড়ে যায় এবং অর্থবোধক দু-একটা কথাও বলতে পারে। ১৫ মাসে—না পড়ে গিয়ে হাঁটতে পারে। আরো একটু কথা বলতে পারে। ১৮ মাসে—ভালভাবে হাঁটে ও অল্প দৌড়ায়। এসময় বেশি কথা বলতে পারে। শেখালে নাক, কান, দাঁত, চোখ দেখাতে পারে। ২৪ মাসে—দৌড়ায় ও ধরে ধরে সিঁড়িতে উঠতে পারে। ৩ বছরে—ছড়া, গান শেখালে মুখস্থ করতে পারে।

এই সময়সীমার একটু এদিক-ওদিক হতে পারে। বেশি ব্যতিক্রম হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির হার : জন্মের সময়—২.৫ কেজি থেকে ৩ কেজি ওজন। ৬ মাসে—ওজন দ্বিগুণ ও ১টি-২টি দুধে দাঁত বেরোয়। ১২ মাসে—জন্মসময়ের তিনগুণ ওজন। আরো কয়েকটি দাঁত বেরোয়। ২৪ মাসে—জন্মসময়ের চারগুণ ওজন হয়। এর পর প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই কেজি ওজন বৃদ্ধি হয়—৫ বছর বয়স পর্যন্ত। এই বয়সের মধ্যে সাধারণত সবকটি দুধে দাঁত বেরিয়ে যায়। এই সময়ের দু-এক মাস এদিক-ওদিক হতে পারে। কিন্তু এর বেশি ব্যতিক্রম হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

মস্তিষ্কের গঠন ভ্রূণ অবস্থায় আরম্ভ হয় ও ছয় বছরের মধ্যে এর শতকরা ৯০ ভাগ গঠিত হয়ে যায়। সুতরাং মায়ের অথবা শিশুর অপুষ্টিজনিত কারণে গঠনপ্রক্রিয়া ব্যাহত হলে শিশু জড়বুদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা। আয়োডিনের অভাবে শুধু গলগণ্ড হয় না—মস্তিষ্কের গঠনও ব্যাহত হয় অর্থাৎ শিশু স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন না হয়ে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন হতে পারে। সেজন্য মা ও শিশু সকলেরই আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়া উচিত।

৫ বছরের মধ্যে শিশুর শতকরা ৪০ ভাগ শরীর বা দেহ গঠিত হয় অর্থাৎ যৌবনে তার যত ওজন হবে, তার ৪০ শতাংশ ওজন এই বয়সের মধ্যেই হয়ে যায়। সুতরাং এই সময় অপুষ্টি শুধু তার মস্তিষ্ক নয়—দেহেরও ক্ষতি করে। অর্থাৎ তার স্বাভাবিক উচ্চতা, গ্রন্থি ও শরীরাংশ যেমন—স্নায়ুতন্ত্র, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, বৃক্ক, যকৃত, অগ্ন্যাশয়, খাদ্যনালী, চোখ ইত্যাদি এবং পেশী ও হাড়ের গঠন ব্যাহত হয়।

শিশুকে অতি শৈশবকাল থেকে সৎ শিক্ষা ও ভাল অভ্যাসে অভ্যস্ত করতে হয়, কারণ সামাজিক সুশিক্ষা ও শারীরিক-মানসিক বৃত্তি ৫ বছর বয়সের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ সংগঠিত হয়ে যায়। তাই বাড়ি ও পরিবেশ এমন হওয়া উচিত যে, শিশু পরবর্তী কালে দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক ভাবে সুস্থ, সবল ও নৈতিক জীবনযাপন করতে পারবে। খেলা, গান, ছবি আঁকা, সুস্থ ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস ও দয়া-শ্রদ্ধা-দান ইত্যাদি বৃত্তিগুলি এই বয়সের মধ্যেই সংগঠিত হয়ে যায়। সামাজিক ও মানসিক শিক্ষার জন্য বাড়িতে এমন একটি দৃষ্টান্ত তৈরি করতে হবে যে, বাবা, মা, ভাই, বোন ও বাড়ির অন্যান্য লোকজনদের মধ্যে একটি সুন্দর ভালবাসার বন্ধন গড়ে ওঠে। শিশু যদি একটি সুস্থ পরিবেশে বেড়ে ওঠে, তবে তার মনও সুন্দর ও সুস্থ হয়, তার মধ্যে একটি অর্থপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। সে ভবিষ্যৎ জীবনে চারিত্রিক বিচ্যুতির শিকার হয় না। এই কারণেই দেখা যায়, বেশির ভাগ অসামাজিক কাজকর্মের মানুষ problem family বা broken family (মা-বাবার মতানৈক্য) থেকেই আসে। এসব মানসিকতা তৈরি হয়ে যায় শিশুর ৫ বছর বয়সের মধ্যে। উপরি উক্ত বিষয়গুলি আমাদের মায়েদের অবহিত হওয়া দরকার, যাতে সুস্থ পরিবার ও সমাজ গড়ে ওঠে।

মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন যে, শিক্ষার তিনটি স্তর আছে। প্রথম স্তর—Cognitive অর্থাৎ Knowledge বা জ্ঞান।

যথা—ছবি, ছড়া, গান, লেখাপড়া ইত্যাদি। দ্বিতীয় স্তর—Affective অর্থাৎ Attitude building। এর অর্থ—সে যা শিখেছে তার ওপর বিশ্বাস, আস্থা ও শ্রদ্ধা জন্মানো। তৃতীয় স্তর—Psycho-motor বা Skill-development, অর্থাৎ সেই শিক্ষা কার্যকরী করা। এই শিক্ষা শুধু সে নিজের জীবনেই কার্যে পরিণত করে না, অপরকেও উদ্বুদ্ধ করে কার্যকরী করতে। হাজার হাজার বছর আগে আমাদের মুনিঋষিরা এই শিক্ষাই তো দিয়েছেন জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম যোগের মাধ্যমে।

পৃথিবীর বহু দেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, পারিবারিক ও পরিবেশগত অসুবিধা ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় বেড়ে ওঠা বেশির ভাগ শিশু পরবর্তী জীবনে অপরাধপ্রবণ, মাদকাসক্ত ও বিশৃঙ্খল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়। আমাদের অজান্তেই এই অভ্যাস ৫ বছর বয়সের মধ্যেই সংগঠিত হয়ে যায়। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ বর্তমান ইউরোপ এবং আমেরিকান সমাজ। সেখানে সমস্তপ্রকার ভোগ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও খুনোখুনি, রাহাজানি, মাদকদ্রব্য সেবন, আত্মহত্যার হার আমাদের দেশগুলির থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে অনেক বেশি।

আমাদের দেশেও গ্রামাঞ্চলের চেয়ে শহরাঞ্চলে এগুলি অনেক বেশি হয়ে থাকে সামাজিক পরিস্থিতির পার্থক্যের জন্য। আবার আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে অনেক বেশি, কারণ আদিবাসীরা এখনো তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসেনি অর্থাৎ তাদের সমাজে উল্লিখিত দোষগুলি বহুলাংশে কম। সুতরাং ভবিষ্যতের জন্য প্রাণবান, রুচিবান, সুস্থ নাগরিক গড়ে তুলতে হলে শিশুর দৈহিক গঠন ও মানসিক বিকাশ—এই দুটি বিষয়ের ওপরেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে এবং আধুনিক যুগের সবরকম কুপ্রভাব থেকে শিশুকে রক্ষা করতে হবে। ❑

শব্দচেতনা 

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন ও বাণীভিত্তিক বিশেষ শব্দছক

১						■	২	৩
	■	■	■	■	■	৪	■	
	■	৫	■	৬		■	■	
৭			৮		■	৯		
■	■	■		■	১০	■	■	■
১১			■	১২		১৩		১৪
	■	■	১৫		■		■	
	■	১৬	■	■	■	■	■	
১৭		■	১৮					

সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম দশজনের নাম জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

পাশাপাশি : (১) যাঁর আকর্ষণে শ্রীচৈতন্য পুরীধামে গিয়েছিলেন (২) "অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ —— হরিঃ।" (৪) "যদি গৌর না হইত, কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম ——।" (৬) এখানে আগমনের পর নিমাইয়ের প্রথম ভাবাবেশ হয় (৭) নিমাইয়ের দাদা বিশ্বরূপের সন্ন্যাসনাম (৯) পুরী সম্প্রদায়ের এই সন্ন্যাসী নিমাইয়ের দীক্ষাগুরু (১১) পুরীধামে চৈতন্যদেবের আবাস (১২) চৈতন্যদেবের সময় ইনিই বাংলার নবাব (১৫) শ্রীক্ষেত্রে নরেন্দ্রসরোবরে মহাপ্রভু ভক্তসঙ্গে এই লীলা করেন (১৬) "জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু ——।" (১৭) "ভুজে —— বেণুং শিরসি শিখিপুচ্ছং কটিতটে।" (১৮) "জীবের দুঃখে সতত অধীর, কৌপীনবাস মুণ্ডিতশির।/ —— আস্বাদনে কামকাঞ্চন-পরিহার।"

ওপর-নিচ : (১) "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা —— কাময়ে।" (৩) এঁকে মহাপ্রভু জননীর তত্ত্বাবধানের জন্য নবদ্বীপে রেখে দেন (৫) "প্রেমধন বিলায় —— রায়।" (৬) "নবনীরদ-বরণ কিসে —— শ্যামচাঁদ রূপ হেরে।" (৮) "—— শম্ভুব্রহ্মা-সুরবরগণেশার্চিতপদো।" (১০) "নিজ —— নাচত নয়ন ঢুলায়ত,/ গাওত কত কত ভকতহি মেলি।" (১১) ইনি নিমাইয়ের ব্যাকরণের অধ্যাপক এবং পরে একান্ত ভক্ত (১২) এই উৎসবে মহাপ্রভুর জন্ম (১৩) "—— টলমল টলমল করে, গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে।" (১৪) একই নামে চৈতন্যদেবের দুই বিখ্যাত শিষ্য; একজন যবন, অপরজনকে মহাপ্রভু ত্যাগ করেন স্ত্রীভক্তের কাছে ভিক্ষাগ্রহণের অপরাধে।

সূত্র : **তন্বীতনু পানি**

মিছরির রুটি আড় করে খেলেও মিষ্টি লাগে

স্বামী সুপর্ণানন্দ



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—
গদ্যে রূপান্তর
ইন্দিরা আচার্য
পৃষ্ঠা : ২৪+৪৫৬
মূল্য : ১০০ টাকা

ন্দিরা আচার্য-কৃত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি'র 'গদ্যে রূপান্তর' করার পিছনে অল্প একটু ঐশী শক্তির প্রেরণা রয়েছে বলে অনুবাদিকা প্রস্তাবনায় উল্লেখ করেছেন। ভক্তের লেখায় ভক্তদের প্রীতি জন্মে। ভক্তবৃন্দ এখানেও তাই লক্ষ্য করবেন। অ-ভক্তেরা অনেক দোষ খুঁজবেন। পাবেনও।

'পুঁথি' যখন পদ্যে সুর করে ঘরে ঘরে গীত হওয়ার জন্য লিখিত হয়েছিল, তখন সকলে (স্বামীজী পর্যন্ত) এর আবেদনে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। বস্তুত রামায়ণ, মহাভারতের মতো ভক্তদের ঘরে ঘরে শরৎকালের সন্ধ্যায় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'টিও সমমর্যাদায় পঠিত হবে—এমন ভাবনা সকলেরই ছিল। সেই পুঁথির গদ্যে রূপান্তর ঘটল—হয়তো এই প্রথম। এবং আশা করি, এরপর আরো ঘটবে। ইন্দিরাদেবীর অনুবাদ পুঁথির ভাষার মতোই সরল এবং কোনভাবেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ নয়। একেবারে ভক্তির রসে জারিত অনুবাদ। পড়তে পড়তে হাঁফিয়ে উঠতে হয় না। ছোট ছোট বাক্য। শব্দসম্ভারের গাম্ভীর্য নেই। এমনকি গদ্য বলে যাকে ইন্দিরাদেবী বহাল রেখেছেন—তাকে তো আমাদের পদ্য বলেই মনে হয়েছে। যেমন—"বাল্যবিধবা সন্তানহীন ধনী কামারনীর কি ভাগ্যি, ভিক্ষা দিল তাঁয়, বিশ্বে ভিক্ষা দেন যিনি।" (পৃঃ ১৫) এমন দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাবে। তা দোষের নয়। পদ্যে যেমন আছে—প্রায় তেমনটি রেখেই অনুবাদ করা হয়েছে—অহেতুক পাণ্ডিত্য প্রদর্শন নেই। এখানে পুঁথিটির বিষয়বস্তু অল্প পরিসরে ভক্তবৃন্দ পাবেন। তাই এই প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না। নইলে বলতে হয়—কাঠের গুঁড়োকে আবার করাত দিয়ে গুঁড়ো করে কী পাব? বইটির প্রকাশকের নাম নেই কেন বুঝলাম না। ❑

যুগে যুগে যুগাবতারগণের অবতরণ

স্বামী বিনির্মলানন্দ



সম্ভবামি যুগে যুগে
'বসুমতী' শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম-শতবার্ষিকী সংখ্যা থেকে সঙ্কলিত
প্রকাশকঃ
স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯
পৃষ্ঠা : ১২+১৪০
মূল্য : ৬০ টাকা

র্ম যখন গ্লানিযুক্ত হয়, আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হয়ে মানুষ যখন অধর্মে লিপ্ত হয়—তখনি ধরণীর ভার দূর করতে এবং ধর্মকে পুনঃসংস্থাপনার্থ ধরায় আবির্ভাব ঘটে অবতার-গণের। তাঁরা ললিত লীলালোক থেকে মলিন মায়ামঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে মানবের সেই আত্মস্বরূপের বিস্মৃতিকে স্মৃতির পথে আনতে, অধর্মের পুঞ্জীকৃত পঙ্ক থেকে উদ্ধার করতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হন। যুগপ্রয়োজনানুযায়ী রূপপরিগ্রহপূর্বক অবতারগণ প্রপঞ্চে প্রকাশিত হয়ে অত্যুজ্জ্বল জীবনাদর্শ ও প্রেরণাময় বাণীর দ্বারা মানুষের প্রসুপ্ত প্রজ্ঞাকে প্রবুদ্ধ করে তোলেন। ফলে মানবের প্রকৃত স্বরূপের বিকাশ এবং 'মানহংস' পদবিতে উর্ধ্বায়ন ঘটে।

মানুষের চেতনাকে চেতায়িত করতে এইরূপে যুগ-পরম্পরায় আবির্ভূত হয়েছিলেন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যিশুখ্রিস্ট, শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের প্রায় পাঁচশ বছর পর 'দরিদ্রের পর্ণকুটিরে শান্ত, স্নিগ্ধ, নিবিড় বৃক্ষরাজিতে পূর্ণ', কোলাহলশূন্য কামারপুকুরে অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হলেন এক নিরক্ষর ব্রাহ্মণরূপে। তাঁর ভাষায় বলা যায় : "দেখলাম খোলটি ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাইরে এল, এসে বললে 'আমি যুগে যুগে অবতার।' " ভারতের সনাতন ধর্ম যখন বিপন্ন, ঈশ্বর-আত্মার অস্তিত্বে যখন মানুষ সন্দেহাকুল, বৈদেশিক দার্শনিকদের জড়বাদসর্বস্ব মতবাদে যখন আসক্ত হয়ে পড়েছিল ভারত-বাসী, তখনি এই ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে।

দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, বেদান্ত, তন্ত্র প্রভৃতি সম্প্রদায়গত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে শ্রীরামকৃষ্ণ উপলব্ধি করেছিলেন—ঈশ্বর এক এবং মত ও পথ ভিন্ন—"যত মত তত পথ"। জীবনের শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি তাঁর সেই

উপলব্ধসঞ্জাত মহাবাণী জগৎকল্যাণে অকাতরে বিতরণ করে গেছেন, দিয়ে গেছেন সর্বসংশয়নাশী মহামন্ত্র।

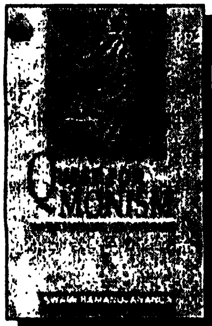
তাঁর দেহাবসানের পর তাঁর সেই জীবনানুসারী বাণী জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষের যাতে কল্যাণ হয়, সেজন্য তাঁর ত্যাগী ও গৃহী পার্ষদগণ তা প্রচার করে গেছেন নিজেদের জীবনে রূপায়িত করে। এছাড়া বহু চিন্তাবিদ্, দার্শনিক ও লেখকের প্রজ্ঞালোকে শ্রীরামকৃষ্ণ যেরূপে প্রতিভাত হয়েছেন, তা লেখনী দ্বারা প্রকাশ করতে তাঁরা কার্পণ্য করেননি। এইভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয়ে তাঁদের উপলব্ধি ও চিন্তাপ্রসূত ধারণা রচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে সেই রচনা ও বক্তৃতার কিয়দংশ 'বসুমতি' প্রেসের স্বত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৯৩৫ সালে 'জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। এতে শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন পার্ষদ ও তৎকালীন প্রথিতযশা কবি ও লেখকের লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবাদর্শ এবং প্রতিভাত হয়েছে অধ্যাত্মজগতের আলোকদিশারী-রূপে। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতে এবং প্রাচীন ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হতে গ্রন্থটির আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

সেই আবশ্যকতা পূরণ করতে বাক্-সাহিত্য লিমিটেডের পক্ষ থেকে স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায় 'বসুমতী'তে প্রকাশিত রচনাগুলি সঙ্কলন করে 'সম্ভবামি যুগে যুগে' নামে প্রকাশ করেছেন। আশা করি তথ্যান্বেষী পাঠকের কাছে এটি একটি তথ্য ও তত্ত্ব-বহুল গ্রন্থরূপে স্বীকৃত হবে। সঙ্কলন-গ্রন্থটিতে ৩০টি বাছাই করা রচনা ছাপানো হয়েছে। এই গ্রন্থটি স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী পার্ষদবৃন্দের ভাষণ ও লেখা থেকে আরম্ভ করে ঋষি অরবিন্দ, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ মনীষিবৃন্দ এবং সুরেশচন্দ্র কবিরত্ন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ সাহিত্যিকগণের লেখায় ঋদ্ধ। এই সমস্ত লেখায় শ্রীশ্রীঠাকুরের অসাধারণ জীবন ও অননুকরণীয় ভাবাদর্শ বিশেষভাবে বিকশিত হয়েছে। তাই গ্রন্থটি শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ-তপস্যাপূত অলৌকিক জীবন ও ভুবনপাবনকারী বাণীর দর্পণরূপে চিত্রিত হয়েছে—বলা যায়। ❑

অদ্বৈতবাদের সন্ধানে—প্রবর্তকদের জন্য 'বিবেকচূড়ামণি'

জলধিকুমার সরকার



Quest for Monism : Vivekachudamani for Beginners
Swami Ramanujananda
Published by :
Swami Shakrananda,
President
Ramakrishna Math
Puranattukara
Trisur-680-551
Page : 4+108
Price : Rs. 35

স্বামী রামানুজানন্দ রচিত **'Quest for Monism : Vivekachudamani for Beginners'** গ্রন্থে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে ৫৮০টি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শঙ্করাচার্য-রচিত 'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ এসম্বন্ধে বলেছেন যে, বেদান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা শঙ্করাচার্য। তিনি অকাট্য যুক্তিসহায়ে বেদের সারসত্যগুলি সংগ্রহ করে অপূর্ব জ্ঞানশাস্ত্র রচনা করেছেন, যা তাঁর ভাষ্যের মাধ্যমে শিক্ষণীয়। ব্রহ্মনির্দেশক পরস্পরবিরোধী বাক্যাবলী গ্রথিত করে দেখিয়েছেন যে, একমাত্র সেই নির্বিশেষ সত্তাই আছেন। আরো দেখিয়েছেন যে, চড়াইপথে অগ্রগতি ধীরে ধীরে সম্ভব এবং মানুষের ধারণশক্তির তারতম্য অনুসারে ব্রহ্মনির্দেশক বিচিত্র বর্ণনাগুলিও অতি প্রয়োজনীয়। শঙ্করাচার্য শিক্ষা দেন: দেবতার শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ তিনটি—(১) মনুষ্যদেহধারণ, (২) ঈশ্বরলাভের ইচ্ছা এবং (৩) জ্ঞানের আলোক দিতে সমর্থ আচার্য। এই তিনটি লাভ করলে মুক্তি আমাদের করতলগত। একমাত্র জ্ঞানই আমাদের মুক্তি দিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ধর্মগুলি তিরোহিত হবে। সাধারণের পক্ষে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে ধারণা করা কঠিন, কিন্তু এই গ্রন্থে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচিত হওয়ায় বিষয়টি তাঁদের কাছে অনেকটা সহজবোধ্য হয়েছে। হলিউড বেদান্ত সোসাইটির স্বামী স্বাহানন্দ ও বোর্ণ-এণ্ড সেণ্টারের স্বামী দয়ানন্দ গ্রন্থটি পড়ে লেখককে উৎসাহিত করেছেন। সাধারণ বাঙালি পাঠকদের অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আলোকপাত করার জন্য বইটির বাঙলায় অনুবাদ প্রকাশ বাঞ্ছনীয়। ❑

প্রাপ্তি-সংবাদ

- **শ্রীশ্রীসারদা মা ক্যুইজ—ক্ষিতি দত্ত।** প্রকাশক : নবকুমার শীল, ৩৩/৩ডি, চেতলা সেণ্ট্রাল রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭। পৃষ্ঠা : ৪৮। মূল্য : ১৫ টাকা।
- **বোধোদয়—সম্পাদনা : অজিত ঘোষাল।** প্রকাশক : নবগ্রাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠমন্দির, ৩৩/বি, রবীন্দ্রনাথ রোড, নবগ্রাম, হুগলী, পিন-৭১২২৪৬। পৃষ্ঠা : ২৪+৩০+১০।

উৎসব-অনুষ্ঠান

বেলুড় মঠে গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীমায়ের ১৪৯তম জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। সারাদিনব্যাপী উৎসবে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়েছিল। প্রায় ২২,০০০ ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। এদিন আয়োজিত বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ।

কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির (বিহার)ঃ গত ২০-২২ ডিসেম্বর ২০০১ বিদ্যামন্দিরের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের সমাপ্তিপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভক্তসম্মেলন, বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সম্মেলন ও ধর্মসম্মেলন ছিল এই উৎসবের অনুষ্ঠিত বিষয়। প্রথমদিন প্রদীপ জ্বেলে উৎসবের উদ্বোধন এবং ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। দ্বিতীয়দিন ভক্তসম্মেলনে আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী বিমলাত্মানন্দজী ও স্বামী অক্ষয়ানন্দজী। আশীর্বাণী দান ও ভক্তগণের প্রশ্নের উত্তর দান করেন পূজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজ। তৃতীয়-দিনের প্রাক্তনী সম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং 'নরনারায়ণ' যাত্রাপালা ছিল উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ।

পোরবন্দর আশ্রম (গুজরাট)ঃ গত ৯ জানুয়ারি ২০০২ আশ্রমের নবনির্মিত প্রার্থনা হল-এর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। গত ১২ জানুয়ারি নবনির্মীয়মাণ গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রী জগমোহন। এই উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় ভারী শিল্পমন্ত্রী ডঃ বল্লভভাই কাথিরিয়া।

স্বামীজীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে গত ১২ জানুয়ারি ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে **বেলুড় মঠ** এবং তার নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্র জাতীয় যুবদিবস পালন করে—**অদ্বৈত আশ্রম (কলকাতা), বরানগর মিশন, আগরতলা আশ্রম, আলং মিশন, ভুবনেশ্বর মঠ, দিল্লি মিশন, গদাধর আশ্রম, ইছাপুর মঠ, জম্মু আশ্রম, জামতাড়া মঠ, জয়রামবাটী মাতৃমন্দির, কানপুর আশ্রম, লিমডি আশ্রম, মনসাদ্বীপ মিশন, পোরবন্দর আশ্রম, পুরী মঠ, পুরী মিশন, রাঁচি স্যানাটোরিয়াম, বৃন্দাবন সেবাশ্রম ও ভিট্টিলা আশ্রম।**

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির (সারদাপীঠ)ঃ হীরকজয়ন্তী বর্ষ (৬০ বছর) উপলক্ষ্যে গত ২২-২৪ জানুয়ারি তিনদিনব্যাপী একটি শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীর সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। গত ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি বিদ্যামন্দিরের উদ্যোগে এবং ইউ. জি. সি.-র সহযোগিতায় ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের 'কোয়ান্টাম থিওরি'র শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জাতীয় স্তরে একটি সম্মেলন আয়োজিত হয়। এতে ইউ. জি. সি.-র চেয়ারম্যান ডঃ হরি গৌতম ভাষণ দান করেন। সম্মেলনে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০০ অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা যোগদান করেন।

গত ১৯ জানুয়ারি ২০০২ **বেণী পালের বাগানবাড়িতে** অবস্থিত **রামকৃষ্ণ মঠে (সিঁথি, কলকাতা)** নবনির্মিত 'মেমোরিয়াল হল'-এর উদ্বোধন করেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে বহু সাধু ও ভক্তের সমাগম হয়েছিল। আপাতত এই স্মৃতিমন্দিরের দায়িত্বে থাকবেন বরানগর রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সনাতনানন্দজী মহারাজ।



ছাত্রকৃতিত্ব

রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থা (নিউ দিল্লি) পরিচালিত উত্তর-মধ্যম (উচ্চ মাধ্যমিকের সমপর্যায়ভুক্ত) পরীক্ষায় **বেলুড় মঠ বিবেকানন্দ বেদ-বিদ্যালয়ের (পশ্চিমবঙ্গ)** এক ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এজন্য ছাত্রটি স্মারকপত্র-সহ একটি স্বর্ণপদক লাভ করেছে।

কেন্দ্রীয় (নিউ দিল্লি) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০০১ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় **দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের (বিহার)** এক ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

সেবাব্রত

শীতকালীন ত্রাণকার্য

বিগত শীতে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে **পুরী মঠ (ওড়িশা)** ১,০০০ কম্বল, **ধানেতি শিবির (গুজরাট)** ৪২৩টি কম্বল, **পাটনা আশ্রম (বিহার)** ৩০০ কম্বল এবং **মেদিনীপুর আশ্রম (পশ্চিমবঙ্গ)** ১৫৫টি কম্বল ও ৩৪৯টি শীতের পোশাক বিতরণ করেছে।

গঙ্গাসাগর মেলাত্রাণ

গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষ্যে **মনসাদ্বীপ আশ্রম (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা)** গত ১১-১৬ জানুয়ারি ২০০২ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান ও সরিষা আশ্রমের সহযোগিতায় ৩,২৬২ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দান, দরিদ্র তীর্থযাত্রীর মধ্যে ২০০ কম্বল ও পোশাক-পরিচ্ছদ বিতরণ এবং ১,২৮৫ জন তীর্থযাত্রীর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া এই আশ্রমের মাধ্যমে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ধাবলাত অঞ্চলের দরিদ্র পরিবারের মধ্যে ৮০২টি কাঠের খুঁটি ও ৭,২০০ খোলা বিতরিত হয়েছে।

গুজরাট ভূমিকম্প পুনর্বাসন ত্রাণ

লিমডি ও পোরবন্দর আশ্রমের সহযোগিতায় **বেলুড় মঠ** ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করে দিয়েছে। গত ৯ জানুয়ারি ২০০২ বিদ্যালয়গুলি শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উদ্বোধন করেন এবং সেগুলি

সরকারের হাতে অর্পণ করা হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় বহু গ্রামবাসী ও ছাত্রছাত্রী যোগদান করেছিল। এছাড়া ৩৫২টি বাড়ি ও ৭৩টি বিদ্যালয়ের কাজ এগিয়ে চলেছে।

কাশী সেবাশ্রমের একশ বছর পূর্তির সমাপ্তি অনুষ্ঠান

বারাণসীর 'রামকৃষ্ণ মিশন হোম অফ সার্ভিস' (কাশী সেবাশ্রম)-এর শতবর্ষপূর্তি (২০০০ সাল) উপলক্ষ্যে বৎসরাধিক কাল ধরে পালিত উৎসবের সমাপ্তি পর্বটি অনুষ্ঠিত হলো গত ১৪-১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২। এই উপলক্ষ্যে উদ্বোধন করা হলো বহির্বিভাগের রোগীদের জন্য নবনির্মিত শতবার্ষিকী স্মারক ভবনের। উদ্বোধন করলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ।



কাশী সেবাশ্রমের একশ বছর পূর্তির সমাপ্তি অনুষ্ঠানের একটি দৃশ্য

স্বামী বিবেকানন্দের জীবদ্দশায় রামকৃষ্ণ মিশনের অল্প যে-কয়েকটি কেন্দ্রের সূচনা হয়েছিল, কাশী সেবাশ্রম তাদের অন্যতম। সেদিক দিয়ে ঐতিহ্যবাহী এই কেন্দ্রটি শুধু যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, তা-ই নয়; কাশী ও সন্নিহিত অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে দীর্ঘদিন ধরে বহুভাবে চিকিৎসা ও আনুষঙ্গিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে এটি ভারতবর্ষের 'মেডিক্যাল ম্যাপ'-এও এক অনন্য স্থান অধিকার করে নিয়েছে।

সেবাশ্রমটির সূত্রপাত অতি সামান্যভাবে, কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণরূপে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে উদ্দীপ্ত যুবক চারুচন্দ্র (পরে স্বামী শুভানন্দ) তাঁর বন্ধু যামিনীরঞ্জনের কাছে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছিলেন স্বামীজীর ভাব—'বহুরূপে সম্মুখে' উপস্থিত 'জীবে প্রেম' করার মাধ্যমে ঈশ্বরসেবার নব আদর্শ। একদিন ভোরবেলায় যামিনীরঞ্জন কাশীর এক অপরিচ্ছন্ন গলিতে পড়ে থাকতে দেখলেন মৃত্যুপথযাত্রী এক বৃদ্ধাকে—সর্বাঙ্গে তার মলমূত্র। তাঁকে ধুইয়ে মুছিয়ে নিজের কাপড় দিয়ে জড়িয়ে একটু সুস্থ করে তুলে এই নিঃসম্বল যুবক চার আনা ভিক্ষা করে দুধ কিনে খাওয়ালেন বৃদ্ধাকে। পরে যামিনীরঞ্জন, চারুচন্দ্র ও অন্য কয়েকজন মিলে তাঁকে স্থানান্তরিত করলেন ভেলুপুর হাসপাতালে। দিন পনেরোর মধ্যে বৃদ্ধা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলেন। এই সেবাকাজে উৎসাহিত যুবকেরা গড়ে তুললেন 'হোম অফ রিলিফ'। তাঁদের মধ্যে চারুচন্দ্র ও যামিনীরঞ্জন ছাড়াও ছিলেন কেদারনাথ (পরে স্বামী অচলানন্দ), হরিনাথ (পরে ভক্তরাজ মহারাজ ওরফে স্বামী সদাশিবানন্দ), বিভূতিভূষণ, হরিদাস, জগৎদুর্লভ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রমুখ। যাঁরা এঁদের উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্বামীজীর শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দ।

অবিমুক্তপুরী কাশীতে দেহত্যাগ করলে স্বয়ং বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা জীবের মুক্তিবিধান করেন—এই চিরন্তন বিশ্বাসে বহু মানুষ বৃদ্ধবয়সে কাশীতে এলেও তাঁদের অনেকের শেষজীবন হয় নিদারুণ যন্ত্রণাময়। মুখে জল দেওয়ার বা সামান্য পথ্যের ব্যবস্থা করার কেউ থাকে না। পথেই মৃত্যু হয় তাঁদের। এইসব মানুষের সেবায় সংগঠিতভাবে আত্মনিয়োগ করলেন চারুচন্দ্র প্রমুখ যুবকেরা। কাশীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অসহায়, অসুস্থ, বিপন্ন বৃদ্ধবৃদ্ধাদের নিয়ে এসে তাঁদের খাবার, ওষুধপত্র, শুশ্রূষা ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করতে আরম্ভ করলেন তাঁরা। অন্যদিকে দ্বারে দ্বারে চলল অন্ন ও অর্থভিক্ষা।পরে ১৯০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি ছোট বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হলো বৃদ্ধবৃদ্ধাদের। যুবকবৃন্দের এই নীরব, স্বার্থলেশহীন সেবায় আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে এলেন শহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি—যাঁদের মধ্যে ছিলেন বাবু প্রমদাদাস মিত্র, মুনশি মাধোলাল, মোক্ষদাদাস মিত্র প্রমুখ। সকলে মিলে ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯০০-তে গঠন করলেন 'পুওর মেন্স রিলিফ অ্যাসোসিয়েশন, বেনারস'। ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য থেকে দেশে ফিরে বারাণসীধামে পৌঁছালে তাঁকে জানানো হলো বিপুল সংবর্ধনা। নবপ্রবর্তিত সেবাকর্মে অত্যন্ত খুশি হয়ে স্বামীজী সেবকদের বললেন : "'রিলিফ' কাকে দেবে? 'সেবা' ছাড়া আর কিছু দিতে পার না তোমরা। সব অহঙ্কার ও কামনা-বাসনা ছেড়ে সত্য ও প্রেমের পথ অনুসরণ কর; মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা কর। এইভাবে কাজ করে যাও; লক্ষ্যে পৌঁছাবে। গরিবদের জন্য সংগৃহীত প্রতিটি পয়সাকে তোমার আপন রক্তবিন্দু জ্ঞান করবে। এই মহান কর্ম ঠিকভাবে ও স্থায়িভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে তারাই, যারা সব স্বার্থপূর্ণ কামনা-বাসনা ত্যাগ করেছে।" সেইসঙ্গে সংগঠনের সদস্যদের অনুরোধক্রমে স্বামীজী জনসাধারণের উদ্দেশে সেবাশ্রমের তরফে একটি আবেদনপত্রও তৈরি করে দেন, যার প্রাণস্পর্শী ভাষায় মানুষের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। ধীরে ধীরে রূপ নিতে থাকে এক বৃহৎ সেবাযজ্ঞ।

কাশীর লাক্সাতে ১৯০২ সালেই 'রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম' স্থাপিত হয়েছিল। সেখানেই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থি রেখে নিত্য পূজা ও ভোগরাগাদি হতো। ঠাকুরের অস্থিসহ অষ্টধাতুর পাত্রটি একবার চুরি হয়ে যায়। পরে ঐ পাত্রটি অদ্বৈত আশ্রমের পাশের জঙ্গলাকীর্ণ জমিতে পাওয়া যায় এবং সেখানেই ঠাকুরের সব অস্থিটুকু ভূমিতে পড়ে গেছে অনুমিত হয়। তখন স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ বলেছিলেন : "ঠাকুরের অস্থি যখন ওখানে গিয়াছে তখন ও-সব জায়গাই তাঁর হয়ে যাবে।" তারপর ১৯১০ সালের জুলাই মাসে ঐ অঞ্চলেই নবনির্মিত হাসপাতাল-সহ স্থায়িভাবে

উঠে আসে সেবাশ্রম। (এটিই সেবাশ্রমের বর্তমান অবস্থান।) নির্মাণকার্য তত্ত্বাবধান করেছিলেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ। **'রামকৃষ্ণ মিশন হোম অফ সার্ভিস'** নামে সেই থেকে সেবাশ্রমের পরিচিতি। ১৯১২ সালের নভেম্বর মাসে শ্রীমা সারদাদেবী সেবাশ্রমে পদার্পণ করেন। উপস্থিত ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, স্বামী তুরীয়ানন্দজী ও স্বামী শিবানন্দজী। সেবাশ্রমে বাড়ি, বাগান ও ব্যবস্থাদি দেখে অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে মা বলেন: "এখানে ঠাকুর নিজে বিরাজ করছেন, আর মা লক্ষ্মী পূর্ণ হয়ে আছেন। ... স্থানটি এত সুন্দর যে, আমার ইচ্ছা হচ্ছে কাশীতে থেকে যাই।" বাড়ি ফিরেই তিনি একজন ভক্তকে দিয়ে সেবাশ্রমে দশ টাকা দানস্বরূপ প্রেরণ করেন। সেই দশ টাকার নোটখানি সেবাশ্রমে অতিযত্নে সুরক্ষিত আছে আজও।

বর্তমানে সেবাশ্রমের কর্মকাণ্ড ব্যাপক ও বহুমুখী। ২৩০ শয্যার হাসপাতালে রয়েছে সাধারণ চিকিৎসা ও শল্যচিকিৎসার অত্যাধুনিক সুযোগসুবিধা। রয়েছে বিশাল মেডিক্যাল বহির্বিভাগ; প্যাথোলজি-সহ অন্যান্য ডায়াগনস্টিক বিভাগ, পৃথক নারীবিভাগ, ভ্রাম্যমাণ ডিস্পেনসারি, বৃদ্ধবৃদ্ধাবাস, অবসরপ্রাপ্ত সাধুদের নিবাস, লাইব্রেরি, অতিথিভবন, গোশালা ইত্যাদি। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত এখানে সবধরনের চিকিৎসা করা হতো সম্পূর্ণ নিখরচায়; পরবর্তী কালে সামান্য অর্থ গৃহীত হতে থাকে। এখনো 'ইণ্ডোর বেড'গুলির প্রায় ২০ শতাংশ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পরিচালিত হয়—ডায়াগনসিস, টেস্ট ইত্যাদিসহ। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত মানুষেরই এখানে চিকিৎসা হয়।

সেবাশ্রমের শতবর্ষপূর্তি উৎসবের সূচনা হয় ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০০-এ সেবাশ্রম-সংলগ্ন রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজার মাধ্যমে। প্রায় দেড় বছর ধরে বিভিন্ন পর্বে চলে এই শতবর্ষপালন উৎসব। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২-এ সকালে নবনির্মিত শতবার্ষিকী ভবনের উদ্বোধন করেন শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। বিকালে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে তিনি বলেন: "মন্দির-মসজিদের পূজায় ব্যস্ত লোক আজ মানবসমাজের অনাদর করছে। প্রত্যেক জীবাত্মায় রয়েছে দৈবী শক্তি; প্রত্যেক মানুষে আছে ঈশ্বরের নিবাস। তাই মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। এটিই বেদান্তের বাণী। হাজার বছর ধরে আমরা বেদান্তের কথা বলছি, কিন্তু জীবনে তা কাজে লাগাইনি। নিজের ভাল চাইলে মানুষের ভাল করতে হবে—তাদের সেবা করতে হবে।" সেবাশ্রমের এই শতবর্ষপূর্তি উৎসবের নানা দিনে অনুষ্ঠিত হয় নরনারায়ণসেবা, শোভাযাত্রা, ভজন, ধর্মসভা, সাধুভাণ্ডারা, প্রসাদ বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি। অনুষ্ঠানগুলিতে বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষদ্বয় শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী ও শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী এবং অনেক প্রবীণ সন্ন্যাসী। দেশ-বিদেশ থেকে সমাগত বহু সাধু ও ভক্তের সানন্দ অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানগুলি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

পরলোকে

স্বামী অমোঘানন্দজী (করমভাই) মহারাজ গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০১ কনখল সেবাশ্রমের হাসপাতালে ৮৯ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। বার্ধক্যজনিত রোগে তিনি গত কয়েক বছর যাবৎ ভুগছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য করমভাই মহারাজ ১৯৩৩ সালে বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৪২ সালে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ কর্তৃক সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হন। যোগদান কেন্দ্র ছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে আসানসোল, রেঙ্গুন সেবাশ্রম, সারদাপীঠ, সারগাছি, মায়াবতী, দিল্লি, রাঁচি স্যানাটোরিয়াম এবং কনখল সেবাশ্রমে কর্মী হিসাবে ছিলেন। সুরাটে (গুজরাট) ১৯৬৮-১৯৬৯ সালে, শ্রীকাকুলামে (অন্ধ্রপ্রদেশ) ১৯৮১ সালে এবং বিকানীরে (রাজস্থান) ১৯৮৭ সালে তিনি ত্রাণকার্যে যোগদান করেন।

স্বামী গণানন্দজী (নারায়ণ) মহারাজ গত ৩ জানুয়ারি ২০০২ কেরলের কালাডি আশ্রমে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। আপাতদৃষ্টিতে তিনি সুস্থই ছিলেন। ঐদিন রাত ৮টা নাগাদ অকস্মাৎ তীব্র পেটের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাতাঠাকুরানীর নাম করতে থাকেন। আধঘণ্টার মধ্যে ঈশ্বরের নাম নিতে নিতে তাঁর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ হয়। শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য নারায়ণ মহারাজ কালাডি আশ্রমে ১৯৩৭ সালে যোগদান করেন। পরে ১৯৫২ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছে তিনি সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত হন। কালাডি ছাড়া তিনি চেন্নাই মঠ, তিরুভাল্লা ও ত্রিচুর আশ্রমেও কর্মী হিসাবে ছিলেন। ৩২ বছর কালাডি আশ্রমের অধ্যক্ষ থাকার পর বিগত চার বছর তিনি স্বেচ্ছাবসর নিয়ে সেখানেই ছিলেন।

স্বামী গর্গানন্দজী (শিবশঙ্কর) মহারাজ ৭১ বছর বয়সে গত ২৮ জানুয়ারি ২০০২ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। তাঁর ক্যান্সার হয়েছিল। স্বামী শঙ্করানন্দজীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে তিনি ১৯৫২ সালে কলকাতা স্টুডেন্টস হোম কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং স্বীয় গুরুর কাছেই সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন ১৯৬১ সালে। স্টুডেন্টস হোম ছাড়াও তিনি বেলুড় মঠ, উদ্বোধন, দেওঘর, পুরুলিয়া, পুরী মিশন, রামহরিপুর, ভুবনেশ্বর, কাঁথি, গদাধর আশ্রম এবং কাঁকুড়গাছিতে কর্মী হিসাবে সেবা করেছেন। ১৯৫২ সালে তিনি সুন্দরবনে ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ করেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। বেশ কিছু স্তোত্রাদি এবং গান তিনি রচনা করে সুরারোপ করেছিলেন।❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন: গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী সনকানন্দজী। গত ১৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী মহারাজ এবং শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী বিনির্মলানন্দজী।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে।❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

তেজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (অসম) : গত ১ জানুয়ারি ২০০২ বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ ও ভক্তিগীতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের 'কল্পতরু' উৎসব পালিত হয় এবং গত ৫ জানুয়ারি বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি ও আলোচনার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়। সভায় আলোচনা করেন স্বপন দত্ত।

ইছাপুর শ্রীমা সঙ্ঘ (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ৪-৬ জানুয়ারি ২০০২ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, স্তোত্রাদি ও 'চণ্ডী', 'মায়ের কথা', 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালন করা হয়। উৎসবের শেষদিনে আয়োজিত ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী ওঙ্কারাত্মানন্দজী, ব্রহ্মচারী সুমন, ব্রহ্মচারী অনিলভাই ও শুভময় বোস। সভায় সভাপতিত্ব করেন সুজন চন্দ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন বাবলাভাই ও সম্প্রদায় এবং ইতু ঘোরই।

দাঁতন শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম (মেদিনীপুর) : গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ বৈদিক স্তোত্র ও 'চণ্ডী' পাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ এবং আলোচনার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়। শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন বিমলা পাল।

মালকানগিরি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (ওড়িশা) : গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ 'চণ্ডী' ও 'মায়ের কথা' পাঠ, কালীকীর্তন, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন জ্যোতি সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

শ্যামপুকুরবাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৭০০০০৪) : গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে ভক্তিগীতি, পাঠ, গীতি-আলেখ্য ও আলোচনাসভা আয়োজিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন এবং 'মায়ের কথা' পাঠ করেন কেয়া ঘোষ। আলোচনা করেন কৃষ্ণা সেন।

ডিগবয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (অসম) : গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ বিশেষ পূজা, পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালিত হয়। সভায় ভাষণ দান এবং দুঃস্থদের মধ্যে ২৮টি কম্বল বিতরণ করেন অসম সরকারের শ্রমমন্ত্রী রামেশ্বর ধানোয়ার। এদিন দুপুরে প্রায় ৭০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

অমরকানন শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাদল আশ্রম (বাঁকুড়া) : গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, 'গীতা', 'চণ্ডী', 'কথামৃত' ও 'মায়ের কথা' পাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ১৭,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

সাঁত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (হাওড়া) : গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'গীতা' পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বপন চ্যাটার্জী ও কানাইলাল বক্সী। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও 'শতরূপে সারদা' থেকে পাঠ করেন যথাক্রমে ক্ষুদিরাম চক্রবর্তী ও ভবেশ বিশ্বাস। এদিন দুপুরে প্রায় ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

দক্ষিণ বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) : গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সানাইবাদন, প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। সভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী বোধসারানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৩০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

ইড়পালা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (মেদিনীপুর) : গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ বিশেষ পূজা, পাঠ, আলোচনা ও ভক্তিগীতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ৩৮ জন দুঃস্থ মহিলাকে নতুন শাড়ি প্রদান করা হয়। গত ১২ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, সঙ্গীত, পাঠ এবং আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। 'বাণী ও রচনা' পাঠ এবং আলোচনা করেন গোপীবল্লভ গোস্বামী। বক্তব্য রাখেন পঙ্কজ কুণ্ডু, দুলাল জানা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০ জন ছাত্রছাত্রী ও ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয় (হাওড়া) : গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ বিশেষ পূজা, গীতি-আলেখ্য ও ৪,০০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়। গত ৬ জানুয়ারি একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় ভাষণ দেন 'নিবোধত' পত্রিকার সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণাজী ও সংযুক্ত সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা সদাত্মপ্রাণাজী। ১৩ জানুয়ারি সকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, দুপুরে ডঃ বাসন্তী চৌধুরীর 'ভাগবত প্রসঙ্গ' এবং সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা আয়োজিত হয়। সভায় ভাষণ দেন স্বামী পুরাণানন্দজী ও স্বামী বলভদ্রানন্দজী এবং ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন বাণীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কৃষ্ণনগর রামকৃষ্ণ আশ্রম (নদীয়া) : গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও আলোচনার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শ্বেতা মিত্র, তৃপ্তি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। চণ্ডীপাঠ ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

পাঁশকুড়া শ্রীসারদা সঙ্ঘ (মেদিনীপুর) : গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন বিজয়া মণ্ডল, রত্নেশ্বর মান্না প্রমুখ। সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিজয়লক্ষ্মী মান্না।

হেলান শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (হুগলী) : গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ বেদ, 'গীতা' ও 'চণ্ডী' পাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও আলোচনার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন আনন্দ চক্রবর্তী প্রমুখ। আলোচনা

করেন স্বামী পরানন্দজী। এদিন দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ, সম্বলপুর (ওড়িশা) : গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে পূজা, ভক্তিগীতি এবং বাল-আশ্রমবাসী ও স্থানীয় বৃদ্ধাদের মধ্যে ৫০টি শতরঞ্চি বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন কাকলি মুখার্জী ও নেপাল রণবিড়া।

সাঁইথিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (বীরভূম) : গত ৬ জানুয়ারি ২০০২ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বৈদিক স্তোত্র ও 'চণ্ডী' পাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, প্রভাতফেরি, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। পূজা করেন বিমলেন্দু ভট্টাচার্য। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী সারদাত্মানন্দজী, ডঃ ভাস্কর কয়ড়ী প্রমুখ। ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক ডঃ বিশ্বনাথ বিশ্বাস, ভবানীমোহন মুখোপাধ্যায়, বিনীতা চন্দ্র প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রায় ৬০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

নাওরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ত্রিগুণাতীত সেবাশ্রম (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) : গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, পাঠ ও ভক্তিগীতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়। 'মায়ের কথা' ও 'চণ্ডী' পাঠ করেন যথাক্রমে মাধবচন্দ্র বিশ্বাস ও রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বপন মণ্ডল। অনুষ্ঠানে ৪,৭২৯ জন ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন (মেদিনী-পুর) : গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে শাড়ি বিতরণ ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়। সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন জগদীশ চক্রবর্তী ও কমলকৃষ্ণ দত্ত। দুপুরে প্রায় ২৫০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

ঝামাপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৭০০০০৯) : গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীমায়ের কথা পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী গোবিন্দানন্দজী। সরোদবাদন করেন ভূপেন্দ্রনাথ শীল।

রাণাঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবা সঙ্ঘ (নদীয়া) : গত ৫ ও ৬ জানুয়ারি ২০০২ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও আলোচনার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়। শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী সত্যদেবানন্দজী ও সমরেন্দ্র চৌধুরী। এই উপলক্ষ্যে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়।

শিবপুর সারদা সেবা সঙ্ঘ (হাওড়া) : গত ৫-৬ জানুয়ারি ২০০২ প্রভাতফেরি, স্তোত্র ও 'চণ্ডী' পাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তি-গীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পুরাণানন্দজী ও স্বামী সনকানন্দজী। সভাশেষে ১০০ দুঃস্থ মানুষকে কম্বল প্রদান করা হয়।

হালতু শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ট্রাস্ট (কলকাতা-৭০০০৭৮) : গত ৬ জানুয়ারি ২০০২ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালিত হয়। বিভিন্ন সময়ে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী সত্যস্থানন্দজী, ডাঃ কৃষ্ণা হালদার প্রমুখ। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী এবং স্বামী সত্যস্থানন্দজী ও ডঃ কমল নন্দী।

সাঁকরাইল সেন্ট্রাল শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ (হাওড়া) : গত ৬ জানুয়ারি ২০০২ স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, প্রশ্নোত্তর পর্ব ও আলোচনাসভা ছিল সারাদিনব্যাপী সম্মেলনের বিশেষ অঙ্গ। ক্যুইজ পরিচালনা ও সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী এবং প্রশ্নোত্তরপর্ব পরিচালনা ও ভাষণ দান করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুচিত্রা চক্রবর্তী ও মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

ঠাকুরপুকুর আনন্দ বিবেক (কলকাতা-৭০০ ০৬৩) : গত ৬ জানুয়ারি ২০০২ পাঠ, ভক্তিগীতি ও আলোচনার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উৎসব পালিত হয়। আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী।

মোহনপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (মেদিনীপুর) : গত ৭ জানুয়ারি ২০০২ পাঠচক্রের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে প্রভাত-ফেরি, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পরব্রহ্মানন্দজী ও স্বামী ভুবনেশ্বরানন্দজী এবং সভাপতিত্ব করেন কাজলচন্দ্র দাশ। এই উপলক্ষ্যে ১,১৫০ জন ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ এবং ৭৮ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে স্কুল ইউনিফর্ম প্রদান করা হয়।

বিধাননগর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্র (কলকাতা-৭০০ ০৬৪) : গত ১০-১২ জানুয়ারি ২০০২ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের সভাপতি সত্যকৃষ্ণ দাশশর্মা।

প্রসাদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত কুটির (হুগলী) : গত ১১-১২ জানুয়ারি ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। প্রভাতফেরি, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ভক্তিগীতি ও আলোচনাসভা ছিল সম্মেলনের বিশেষ অঙ্গ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, স্বামী কেশবানন্দজী ও ব্রহ্মচারী দুর্গাচৈতন্য এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী গৌরীনাথানন্দজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন গৌতম মুখোপাধ্যায়, সোনালী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। দুপুরে প্রায় ৪,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় অভিনীত হয় 'সমর্পণ' নাটক।

খেপুত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি আশ্রম (মেদিনীপুর) : গত ১২ জানুয়ারি ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আশ্রমের বার্ষিক উৎসব ও জাতীয় যুবদিবস পালন করা হয়। প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, গীতি-আলেখ্য, তরজা গান, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, হরিনাম-সঙ্কীর্তন ও ধর্মসভা ছিল অনুষ্ঠানের

প্রধান অঙ্গ। গীতি-আলেখ্য ও তরজা গান পরিবেশন করেন যথাক্রমে নীহাররঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও সম্প্রদায় এবং তপন হালদার ও সম্প্রদায়। দুপুরে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী ভুবনেশ্বরানন্দজী এবং বক্তব্য রাখেন সুভাষচন্দ্র ঘোষ, সুশীলচন্দ্র বেরা প্রমুখ। সভান্তে স্বাগত-ভাষণ দেন আশ্রমাধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী শিশির। এই উপলক্ষ্যে বহু দুঃস্থ মানুষের মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছদ, ধুতি-শাড়ি ও ৬৫টি সোয়েটার বিতরণ করা হয়।

তিনসুকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি (অসম)ঃ গত ১২ ও ১৩ জানুয়ারি ২০০২ নগর পরিক্রমা, ভক্তিগীতি, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও আলোচনাসভার মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মদিন পালন করা হয়। সভায় আলোচনা করেন নরোত্তমনগর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী ঈশাত্মানন্দজী, চাবুয়া কেন্দ্রের বিধায়ক রাজু সাহু ও তিনসুকিয়া কেন্দ্রের বিধায়ক রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিং।

হলদিবাড়ি মিউনিসিপ্যালিটি (কোচবিহার)ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০২ হলদিবাড়ি পৌরসভায় স্বামীজীর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন করা হয়। মূর্তিটির আবরণ উন্মোচন এবং ভাষণ দান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। বক্তব্য রাখেন স্বামী অক্ষয়ানন্দজী, অধ্যাপক ডঃ হোসেনুর রহমান, ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ প্রমুখ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

মগুলগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ (বর্ধমান)ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০২ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ভক্তিগীতি, 'বাণী ও রচনা' থেকে পাঠ, প্রশ্নোত্তর পর্ব ও আলোচনাসভা ছিল সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন কালচাঁদ পাল। পাঠে অংশগ্রহণ করেন অনামিকা গণ ও অরুণ ঘোষ। আলোচনা করেন স্বামী দুর্গানন্দজী, স্বামী মহেন্দ্রানন্দজী প্রমুখ। সম্মেলনে ৯০ জন যুবপ্রতিনিধি ও ৫০ জন ভক্ত যোগদান করেন। অনুষ্ঠানশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সুধীর হাজরা।

ডিমাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি (নাগাল্যাণ্ড)ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মদিন উদ্‌যাপন করা হয়। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত, লোকগীতি ও নৃত্য এবং যুবসম্মেলন ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। সম্মেলনে ভাষণ দেন নরোত্তমনগর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী ঈশাত্মানন্দজী, নাগাল্যাণ্ডের শিক্ষামন্ত্রী চুবা চাং, নাগাল্যাণ্ডের বিধায়ক আতভি সের্মা ও ওয়াই. পেটন এবং ডাঃ টি. কে. শর্মা। সভাপতিত্ব করেন বিজয় ভার্মা। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে সুধাংশুরঞ্জন চক্রবর্তী ও জহর ভট্টাচার্য। সম্মেলনে বহু ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বাগুইআটি রামকৃষ্ণ মন্দির (কলকাতা-৭০০ ০৫৯)ঃ গত ১৩ জানুয়ারি ২০০২ আনন্দনিকেতন ভবনে ভক্তিগীতি, জপধ্যান, পাঠ, প্রশ্নোত্তর পর্ব ও আলোচনার মাধ্যমে একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী ও নীলরতন চ্যাটার্জী। পরিবেশিত হয় 'গীতালি সঙ্গীত সংস্থা'র গীতি-আলেখ্য। পাঠে অংশগ্রহণ করেন শ্যামল রায়, সমরেশ নিয়োগী ও অনিতা পোদ্দার। আলোচনা করেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী ও স্বামী পদ্মানন্দজী। প্রশ্নোত্তর-পর্ব পরিচালনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দেন আদিত্যজ্যোতি রায়।

সেবাব্রত

বরুণা রামকৃষ্ণ জনকল্যাণ সেবাশ্রম (মেদিনীপুর)ঃ গত ৬ জানুয়ারি ২০০২ এক রক্তদান শিবিরে ৭২ জন রক্তদান করেন এবং ৯০ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে পোশাক-পরিচ্ছদ দেওয়া হয়।

ইছাপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ (উত্তর চব্বিশ পরগনা)ঃ গত ১০-১৩ জানুয়ারি ২০০২ এক চক্ষুচিকিৎসা শিবিরে ৫৩ জনের চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়।

বিলাসিপাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (ধুবড়ি, অসম)ঃ গত ১২ জানুয়ারি ২০০২ স্বামীজীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ৫০ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয় এবং একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য কলকাতাবাসী অমরেন্দ্রনাথ গুহরায় গত ২২ ডিসেম্বর ২০০১ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বহু প্রবীণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি 'উদ্বোধন'-এর আজীবন গ্রাহক ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য কলকাতাবাসী অতুলচন্দ্র দত্ত গত ২৪ ডিসেম্বর ২০০১ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন ও শ্রীচরণ স্পর্শ করে প্রণাম করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

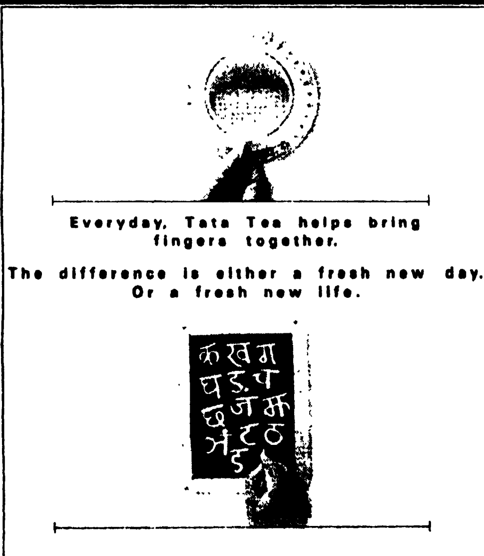
শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা সোনালী রায় এক আকস্মিক পথদুর্ঘটনায় গত ২৫ ডিসেম্বর ২০০১ পরলোকগমন করেন। দিল্লিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারে তিনি অগ্রণী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে তাঁর আত্মা শান্তিলাভ করুক, এই প্রার্থনা।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ধীরেন্দ্রনাথ দেবনাথ গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০১ পরলোকগমন করেন। তিনি ত্রিপুরায় মরণোত্তর চক্ষুদান সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী দুটি চোখ মৃত্যুর পর দান করা হয়েছে। তিনি ছিলেন আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সমিতির সহ-সভাপতি। এছাড়া বহু জনকল্যাণকর কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য সুধীরকুমার ঘোষরায় গত ২২ ডিসেম্বর ২০০১ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি হিন্দমোটরের শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। 'উদ্বোধন' যাতে ঘরে ঘরে পৌঁছাতে পারে সেজন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। ❑

ঈশ্বরে অনুরাগ হলে সমস্ত বিশ্বকেই আপন বোধ হয়। কারণ, সবই তাঁর সৃষ্টি।

স্বামী বিবেকানন্দ



তাঁর নামবীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

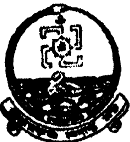
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-প্রকাশিত বাঙলা গ্রন্থরাজি

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

গ্রন্থ	মূল্য
স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)	১০০.০০
স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)	১০০.০০
আত্মজ্ঞান	২২.০০
আত্মবিকাশ	২০.০০
আমার জীবনকথা (২ খণ্ডে)	১২৫.০০
ঈশ্বরদর্শনের উপায়	৩৫.০০
কর্মবিজ্ঞান	১০.০০
তরুণ বাংলার আদর্শ	৫.০০
দেবী দুর্গা	৬.০০
পত্র-সংকলন	১৬.০০
পঞ্চদশী-দর্শনের পরিচয়	৫.০০
পুনর্জন্মবাদ	৩০.০০
বিংশ-শতাব্দীর ধর্ম	৫.০০
ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	২০.০০
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	৩০.০০
মরণের পারে	৫০.০০
মনের বিচিত্র রূপ	১২.০০
মানুষের দিব্যস্বরূপ	২৫.০০
মুক্তির উপায়	১৫.০০
যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব	৫.০০
যুগে যুগে যাঁদের আগমন	২৮.০০
যোগদর্শন ও যোগসাধনা	৫০.০০
যোগশিক্ষা	৪০.০০
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম	২০.০০
সর্বজনীন ধর্ম ও বেদান্ত	৩০.০০
সাংখ্য, বৌদ্ধ ও বেদান্তদর্শন	৩০.০০
স্বামী বিবেকানন্দ	২.০০
স্তোত্ররত্নাকর ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি	১২.০০
হিন্দুনারী	২৫.০০
হিন্দুরা যীশুখ্রীস্টের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু গীর্জার ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ কেন?	৫.০০
বেদান্ত দর্শন	১০.০০
খ্রীস্টীয় বিজ্ঞান এবং বেদান্ত	৫.০০

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত

গ্রন্থ	মূল্য
অধ্যাত্মসাধনায় দেবতা ও দেবীভাবনা	৪.০০
অভেদানন্দ-দর্শন (২ খণ্ডে)	১৪০.০০
কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব	১৮.০০
তীর্থরেণু	২৬.০০
তন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনা	৪০.০০
তন্ত্রতত্ত্বপ্রবেশিকা	৬০.০০
নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৪৫.০০
পদাবলী-কীর্তনের ইতিহাস	৩৫.০০
বাণী ও বিচার (৮ খণ্ডে)	৪০০.০০
বিবেকানন্দের দর্শনচিন্তায় মন্ত্রতত্ত্ব ও মন্ত্রসাধনা	২০.০০
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (৩ খণ্ডে)	২২০.০০
শ্রীরামকৃষ্ণচন্দ্রিকা	৪০.০০
ভারতীয়-সঙ্গীত—ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক রূপরেখা	৩৪.০০
মন ও মানুষ (৩ খণ্ডে)	১৫৮.০০
মহিষাসুরমর্দ্দিনী-দুর্গা	৩০০.০০
মন্ত্রভাবনা ও সঙ্গীত	১৪.০০
রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মচেতনা	২০.০০
রাগ ও রূপ (২ খণ্ডে)	২২০.০০
সঙ্গীতপ্রতিভায় স্বামী বিবেকানন্দ	৮.০০
সঙ্গীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান	৫০.০০
সঙ্গীতে সাহিত্য, রসভাবনা ও সুন্দর	২৫০.০০
স্বামী অভেদানন্দ	৫.০০
স্বামী অভেদানন্দের জীবন ও দর্শন	৩৬.০০



শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

(পুস্তক প্রচার বিভাগ)

১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের ওপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকেই আছে, তার বিকাশই ধর্ম।

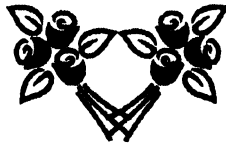
স্বামী বিবেকানন্দ

ভগবান যদিও সর্বত্র আছেন বটে কিন্তু তাঁকে আমরা জানতে পারি কেবল মানবচরিত্রের মধ্য দিয়ে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আমাদের পূর্বপুরুষগণের রীতিনীতিগুলি মন্দ ছিল বলিয়া যে ভারতের অবনতি হইয়াছে তাহা নহে; এই অবনতির কারণ, ঐ রীতিনীতিগুলির যে ন্যায়সঙ্গত পরিণতি হওয়া উচিত ছিল তাহা হইতে দেওয়া হয় নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ





জেলাভিত্তিক 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৪

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

হুগলী

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, আঁটপুর
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম**, ৭০ প্রফুল্ল চাকী রোড, কোতরং
- **শ্রীরামকৃষ্ণ মনন সভা**
  ১৫৬ এস. সি. চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোন্নগর, পিন : ৭১২২৩৫
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ**
  গ্রাম+পোঃ পুইনান, পিন : ৭১২৩০৫
- **স্বামী উমেশানন্দ**, অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম
  কুণ্ডুঘাট, বাঁশবেড়িয়া-৭১২৫০২
- **সিঙ্গুর রামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ (রেজি. নং—এস/এইচ/৬৯০৫)**
  প্রযত্নে মোহিত বর্মণ, ঘনশ্যামপুর, পূর্বপাড়া বারোয়ারী, পলতাগড়
  সিঙ্গুর, পিন : ৭১২৪০৯, ফোন : ৬৩০-০৪৩৯/০০৯৪
- **সুশান্ত মাইতি**, প্রযত্নে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালিকা আশ্রম
  (কামাক্ষাতলা), মির্জাপুর পশ্চিমপাড়া, সিঙ্গুর, পিন : ৭১২৪০৯
  ফোন : ৬৩০-০৭০৯
- **ডঃ চিন্ময়ী নন্দী**
  (স্টেট ব্যাঙ্কের পিছনে), পোঃ ডানকুনি, পিন : ৭১১২২৪
- **মনীষা নন্দী**, প্রযত্নে দেবজিৎ নন্দী
  স্টেশন রোড, পোঃ ডানকুনি, পিন : ৭১১২২৪
- **হরনারায়ণ বিশ্বাস**
  ৫ রাজেন্দ্র অ্যাভেনিউ প্রথম লেন, উত্তরপাড়া, পিন : ৭১২২৫৮
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার**
  প্রযত্নে অজিতকুমার মুখার্জী, ৬৪/জি ডঃ সরোজ মুখার্জী স্ট্রীট
  উত্তরপাড়া, পিন : ৭১২২৫৮, ফোন : ৬৬৩-৮৫২৬
- **গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়**, রামকৃষ্ণ কুটীর
  ১০৩/২, বি. কে. স্ট্রীট, উত্তরপাড়া
  পিন : ৭১২২৫৮ ফোন : ৬৬৩-৭০৪৬
- **বরুণকুমার চক্রবর্তী**, সম্পাদক, শ্রীবিবেকানন্দ সঙ্ঘ
  ত্রিবেণী কেন্দ্র, গ্রাঃ বৈকুণ্ঠপুর, পোঃ ত্রিবেণী
  পিন : ৭১২৫০৩, ফোন : ৮৪৬২৮৪
- **সারদা-রামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ**, প্রযত্নে নিকুঞ্জবিহারী দাস
  কোঁচাটী, পোঃ ত্রিবেণী, পিন-৭১২৫০৩
- **অশোক ব্যানার্জী (দেবু)**
  শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠচক্র, পীরতলা, শিয়াখালা।
- **দীপশিখা ঘোষ, সম্পাদিকা, মাঙ্গলিক মহিলা মহল**
  জনাই, পিন : ৭১২৩০৪, ফোন : ৯১১২-৪৪১১৪
- **গরলগাছা বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**, গ্রাম+পোঃ গরলগাছা, মান্নাপাড়া
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, গ্রাম+পোঃ ভাঙ্গামোড়া, পিন : ৭১২৪১০
- **স্বপন মুখোপাধ্যায়**
  সম্পাদক, শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ
  ১৩বি, সান্যাল লেন, পোঃ শ্রীরামপুর
  পিন : ৭১২২০১, ফোন : ৬৬২-৬৬৭৮
- **কল্পতরু বিবেকানন্দ যুব উন্নয়ন কেন্দ্র**
  তারকেশ্বর, পিন-৭১২৪১০
- **শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ**
  ৩০৫, নারায়ণ রায়ের বেড়, ঝিঙ্গেপাড়া, পিন-৭১২১০৩

নদীয়া

- **রামকৃষ্ণ আশ্রম**, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, বঙ্কিমনগর, হালালপুর-৭৪১২০১
- **রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ**, চাকদহ-৭৪১২২২
- **বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন**, চাকদহ-৭৪১২২২
- **রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ**, ব্লক-বি, সিভিক সেণ্টার
  কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- **কল্যাণী শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি**, এ-৮/২৩৪, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- **ছায়া ভট্টাচার্য**, রামকৃষ্ণ নিকেতন
  বি-৪/৪৬৬, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- **রামকৃষ্ণ সারদা কুটীর**, প্রযত্নে অসীমকুমার দে
  নলুয়া পাড়া, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র**, প্রযত্নে স্বপনকুমার ভৌমিক
  ৩৫ বেঁজেখালি লেন, নূতন পল্লী, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০৯
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাসঙ্ঘ**, রানাঘাট-৭৪১২০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ**, পোঃ বগুলা, পিন-৭৪১৫০২
- **তাহেরপুর বিবেকানন্দ পাঠচক্র**, ডি/৭/৯৭, পোঃ তাহেরপুর

বীরভূম

- **বোলপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যকেন্দ্র**
  পৌর বাণিজ্যিক সদন (বাস স্ট্যান্ড), স্টল নং ৫
  পিন-৭৩১২০৪
- **আকালীপুর রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম**, ভদ্রপুর-৭৩১২০৩
- **মিলন দাস**, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ
  চৈতালি মার্কেট, সিউড়ি-৭৩১১০১
- **ডঃ ভাস্কর কয়ড়ী**, প্রযত্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  সাঁইথিয়া (কলেজ রোড), সাঁইথিয়া-৭৩১২৩৪

মুর্শিদাবাদ

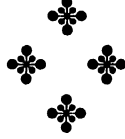
- **শান্তশ্রী**, বেলডাঙ্গা সারদা রামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  আশ্রমপাড়া, বেলডাঙ্গা, পিন-৭৪২১৩৩

বাঁকুড়া

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, পোঃ রামহরিপুর, পিন-৭২২২০৩
- **শ্রীমা সারদা পাঠচক্র**, কোতুলপুর-৭২২১৪১
- **উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়**
  'অঙ্কন', স্টল নং-২, মোহনবাগান মার্কেট, পিন-৭২২১০১
- **বিষ্ণুপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  প্রযত্নে নিমাই মুখোপাধ্যায়, বৈলাপাড়া, কলেজ রোড
- **ডঃ সুনির্মল বেরা**
  প্রযত্নে সারেঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি
  সারেঙ্গা, পিন-৭২২১৫০

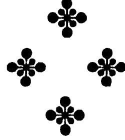
হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্মজন্মান্তরের পাপও তাঁর একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ



যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবত্তত্ত্বের আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী



বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
Phone : 554-2248, 554-2403
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com
udbodhan@vsnl.net

Vol. 104
No. 3
MARCH
2002

Licensed to Post
Without Prepayment
Licence No.
TECH/WB/RNP-15/LPWP-01/2002

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Regn. No.
TECH/WB/RNP-15/2002

উদ্বোধন

১০৪তম বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র



✤ গত ১লা মাঘ ১৪০৮ (১৫ জানুয়ারি ২০০২) **উদ্বোধন ১০৪তম বর্ষে** পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় **নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের** গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের **১০৩ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম** ✤

✿ বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা **উদ্বোধন** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং **রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন** ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **উদ্বোধন** আপনাকে পড়তে হবে।

✿ স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে **উদ্বোধন** নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই **উদ্বোধন** একটি সার্থক **পারিবারিক পত্রিকা**। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা **উদ্বোধন**-এ প্রকাশিত হয়।

✿ **উদ্বোধন** অসাম্প্রদায়িক। **উদ্বোধন**-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার গ্রাহক হওয়া নয়, একটি **মহান ভাবাদর্শ** ও ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

✿ **উদ্বোধন** শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী বলেছেন, **উদ্বোধন**-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।

✿ স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে **উদ্বোধন** যেন থাকে। **উদ্বোধন**-এর প্রত্যেক গ্রাহক একজন করে নূতন গ্রাহক করলেই এখনি **উদ্বোধন**-এর গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার হয়ে যায়। এই আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের গ্রাহক করাও আপনার কাছে স্বামীজীর প্রত্যাশা। স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের গর্বিত দায়িত্ব আমাদের সকলের।

✿ **উদ্বোধন**-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে মতিলাল-তরুবালা পালের স্মৃতিতে তাঁদের পুত্রকন্যাদের পক্ষে স্থায়ী ভিত্তিতে '**উদ্বোধন মেধা সম্মান**' (একবছরের জন্য **উদ্বোধন**-এর সাম্মানিক গ্রাহকভুক্তি) নিবেদিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জন প্রতি বছর এই সম্মানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। ২০০১ সালের জন্য অনুরূপ সম্মান সুকুমার-বিভারানী পাড়ুই-এর স্মৃতিতে তাঁদের পুত্র অমর পাড়ুই নিবেদন করেছেন। এই সম্মানপ্রাপকদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পর্ষদ পরিচালিত ২০০১ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উভয় 'সম্মান'-এর জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের **উদ্বোধন**-সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

✿ **উদ্বোধন**-এর সেবায় চারটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি '**উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল**', অন্য তিনটি যথাক্রমে '**স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ স্মৃতি তহবিল**', '**স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল**' এবং '**স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল**'। **উদ্বোধন**-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে '**Ramakrishna Math, Baghbazar**'—এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা : সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। দপ্তরের চিঠিতে বা M.O. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা। সডাক ৯৫ টাকা।

স্বামী সর্বগানন্দ
সম্পাদক

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ
সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ



বৈশাখ ১৪০৯ ৪র্থ সংখ্যা

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন

॥ ১০৪ ॥



"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

ফোন ঃ
৬৫৪-১১৪৪, ৬৫৪-১১৮০, ৬৫৪-৫৩৯১
৬৫৪-৯৫৮১, ৬৫৪-৯৬৮১, ৬৫৪-৫৭০০
ফ্যাক্স ঃ ৬৫৪-৪৩৪৬
E-mail : rkmhq@vsnl.com



রামকৃষ্ণ মঠ

বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া
পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১২০২

আবেদন ঃ রামকৃষ্ণ সংগ্রহ মন্দির, বেলুড় মঠ

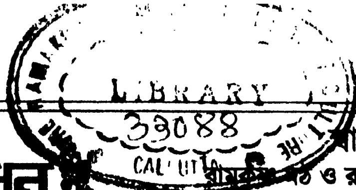
অনেকেই জানেন যে, বিশ্ব জুড়ে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের পথিকৃৎগণের পুণ্য স্মৃতিচিহ্নসমূহ সংরক্ষণের জন্য ২০০১ সালের ৭ মে বুদ্ধপূর্ণিমার দিন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ত্রয়োদশ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠে নবনির্মিত **"রামকৃষ্ণ সংগ্রহ মন্দির"**-এর শুভ উদ্বোধন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যগণের ব্যবহৃত জিনিসপত্রাদি এই মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হচ্ছে। এইসব জিনিসপত্রাদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণের জন্য একটি সংরক্ষণশালা এই মিউজিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এপর্যন্ত অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাঁদের নিকট রক্ষিত স্মৃতিচিহ্নাদি আমাদের অর্পণ করেছেন। বর্তমানে আমাদের একান্ত প্রয়োজন একটি চার ফুট ব্যাসের ঝাড়লণ্ঠন ও প্রাচীনকালে ব্যবহৃত দেওয়ালগিরি ও দীপাধার। এগুলি সংগ্রহ করে আমাদের সাহায্য করার জন্য আমরা পুনরায় ভক্তবৃন্দ, জনসাধারণ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট আবেদন জানাচ্ছি।

ভক্ত ও অনুরাগীদের যেকোন দান **"রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম"**-এর জন্য উল্লেখ করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠালে ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হবে।

স্বামী স্মরণানন্দ
সাধারণ সম্পাদক

ঠিকানা ঃ

রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ
হাওড়া-৭১১২০২



উদ্বোধন ॥১০৪॥

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র
১০৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র

১০৪তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা বৈশাখ ১৪০৯ এপ্রিল ২০০২

প্রচ্ছদ : গোমুখের চিত্র। হিমালয়ের হিমশৈলাবৃত গহ্বর থেকে গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, অবিরাম, উদ্দাম, অক্লান্ত গতিতে। এ যেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবগঙ্গা' বিবেকানন্দ-রূপ গোমুখের মধ্য দিয়ে জগৎকল্যাণার্থে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান। শিবচক্ষুটিও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। *আলোকচিত্র : ডাঃ তমোনাশ ভট্টাচার্য।*

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ



সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ : ৭৫ টাকা; সডাক : ৯৫ টাকা ❑ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য : ১০ টাকা



রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়

অনুষ্ঠান-সূচী (বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে) ❑ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ / ২০০২-২০০৩ খ্রিস্টাব্দ

তিথি-কৃত্য

রামনবমী	চৈত্র শুক্লা নবমী	৭ বৈশাখ	রবিবার	২১ এপ্রিল	২০০২
শ্রীশঙ্করাচার্য	বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী	২ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	১৭ মে	"
শ্রীবুদ্ধদেব	বৈশাখ পূর্ণিমা	১১ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	২৬ মে	"
গুরুপূর্ণিমা (ব্যাসপূর্ণিমা)	আষাঢ় পূর্ণিমা	৮ শ্রাবণ	বুধবার	২৪ জুলাই	"
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী	২২ শ্রাবণ	বুধবার	৭ আগস্ট	"
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	শ্রাবণ পূর্ণিমা	৫ ভাদ্র	বৃহস্পতিবার	২২ আগস্ট	"
শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী	শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী	১৪ ভাদ্র	শনিবার	৩১ আগস্ট	"
স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী	২০ ভাদ্র	শুক্রবার	৬ সেপ্টেম্বর	"
স্বামী অভেদানন্দ	ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী	১৪ আশ্বিন	মঙ্গলবার	১ অক্টোবর	"
স্বামী অখণ্ডানন্দ	ভাদ্র অমাবস্যা	১৯ আশ্বিন	রবিবার	৬ অক্টোবর	"
স্বামী সুবোধানন্দ	কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী	৩০ কার্তিক	শনিবার	১৬ নভেম্বর	"
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী	২ অগ্রহায়ণ	সোমবার	১৮ নভেম্বর	"
স্বামী প্রেমানন্দ	অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী	২৭ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	১৩ ডিসেম্বর	"
যীশুখ্রিস্ট		৮ পৌষ	মঙ্গলবার	২৪ ডিসেম্বর	"
শ্রীমা সারদাদেবী	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী	১০ পৌষ	বৃহস্পতিবার	২৬ ডিসেম্বর	"
স্বামী শিবানন্দ	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী	১৪ পৌষ	সোমবার	৩০ ডিসেম্বর	"
স্বামী সারদানন্দ	পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী	২৩ পৌষ	বুধবার	৮ জানুয়ারি	২০০৩
স্বামী তুরীয়ানন্দ	পৌষ শুক্লা চতুর্দশী	৩ মাঘ	শুক্রবার	১৭ জানুয়ারি	"
স্বামী বিবেকানন্দ	পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী	১০ মাঘ	শুক্রবার	২৪ জানুয়ারি	"
স্বামী ব্রহ্মানন্দ	মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া	২০ মাঘ	সোমবার	৩ ফেব্রুয়ারি	"
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	মাঘ শুক্লা চতুর্থী	২২ মাঘ	বুধবার	৫ ফেব্রুয়ারি	"
স্বামী অদ্ভুতানন্দ	মাঘ পূর্ণিমা	৩ ফাল্গুন	রবিবার	১৬ ফেব্রুয়ারি	"
শ্রীরামকৃষ্ণদেব	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া	২০ ফাল্গুন	বুধবার	৫ মার্চ	"
(শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব)		২৪ ফাল্গুন	রবিবার	৯ মার্চ	"
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	দোল পূর্ণিমা	৩ চৈত্র	মঙ্গলবার	১৮ মার্চ	"
স্বামী যোগানন্দ	ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী	৬ চৈত্র	শুক্রবার	২১ মার্চ	"
রামনবমী	চৈত্র শুক্লা নবমী	২৭ চৈত্র	শুক্রবার	১১ এপ্রিল	"

পূজা-কৃত্য

শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজা	বৈশাখ অমাবস্যা	২৬ জ্যৈষ্ঠ	সোমবার	১০ জুন	২০০২
স্নানযাত্রা	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা	৯ আষাঢ়	সোমবার	২৪ জুন	,
রথযাত্রা	আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া	২৭ আষাঢ়	শুক্রবার	১২ জুলাই	"
মহালয়া	ভাদ্র অমাবস্যা	১৯ আশ্বিন	রবিবার	৬ অক্টোবর	"
শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা	আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী	২৫ আশ্বিন	শনিবার	১২ অক্টোবর	"
শ্রীশ্রীকালীপূজা	দীপান্বিতা অমাবস্যা	১৮ কার্তিক	সোমবার	৪ নভেম্বর	"
শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা	কার্তিক শুক্লা নবমী	২৭ কার্তিক	বুধবার	১৩ নভেম্বর	"
শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা	কার্তিক পূর্ণিমা	৩ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	১৯ নভেম্বর	"
শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা	মাঘ শুক্লা পঞ্চমী	২৩ মাঘ	বৃহস্পতিবার	৬ ফেব্রুয়ারি	২০০৩
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি	মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী	১৬ ফাল্গুন	শনিবার	১ মার্চ	"

একাদশী-তিথি (রামনাম-সঙ্কীর্তন)

বৈশাখ—	৯, ২৪ (এপ্রিল ২৩, মে ৮)	কার্তিক—	১৫, ২৯ (নভেম্বর ১, ১৫)
জ্যৈষ্ঠ—	৮, ২২ (মে ২৩, জুন ৬)	অগ্রহায়ণ—	১৪, ২৯ (নভেম্বর ৩০, ডিসেম্বর ১৫)
আষাঢ়—	৬, ২১ (জুন ২১, জুলাই ৬)	পৌষ—	১৪, ২৯ (ডিসেম্বর ৩০, জানুয়ারি ১৪)
শ্রাবণ—	৪, ২০ (জুলাই ২০, আগস্ট ৫)	মাঘ—	১৪, ৩০ (জানুয়ারি ২৮, ফেব্রুয়ারি ১৩)
ভাদ্র—	১, ১৭, ৩১ (আগস্ট ১৮, সেপ্টেম্বর ৩, ১৭)	ফাল্গুন—	১৪, ২৯ (ফেব্রুয়ারি ২৭, মার্চ ১৪)
আশ্বিন—	১৬, ২৯ (অক্টোবর ৩, ১৬)	চৈত্র—	১৩, ২৯ (মার্চ ২৮, এপ্রিল ১৩)

উদ্বোধন
১০৪
বৈশাখ ১৪০৯
এপ্রিল ২০০২



দিব্য বাণী

সেবা

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।। (গীতা, ৪।৩৪)

সত্যদ্রষ্টা (তত্ত্বদ্রষ্টা) গুরু (আচার্য)-কে প্রণিপাত, শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, পরিপ্রশ্ন (যেখানে যেখানে বুঝিতে বাধিতেছে, সেই ক্ষেত্রে প্রশ্ন করিয়া স্বীয় ধারণা পরিষ্কার করিয়া লওয়া) এবং সেবার (কায়িক, মানসিক ও বৌদ্ধিক সেবা) মাধ্যমে প্রীত করিলে তিনি যথার্থ 'জ্ঞান' উপদেশ করিয়া থাকেন।

* * * * *

প্রেমে মানুষে মানুষে, আর্যে ম্লেচ্ছে, ব্রাহ্মণে চণ্ডালে, এমনকি পুরুষে নারীতে পর্যন্ত ভেদ করে না। প্রেম সমগ্র বিশ্বকে আপনার গৃহসদৃশ করিয়া লয়। যথার্থ উন্নতি ধীরে ধীরে হয়, কিন্তু নিশ্চিতভাবে। যেসকল যুবক ভারতের নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নরূপ একমাত্র কর্তব্যে মনপ্রাণ নিয়োগ করিতে পারে, তাহাদের মধ্যে কাজ কর, তাহাদিগকে জাগাও—সঙ্ঘবদ্ধ কর এবং ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত কর। একাজ ভারতের যুবকগণের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

—স্বামী বিবেকানন্দের পত্র, ২ মে ১৮৯৫

* * * * *

আপ অকেলা সব করৈ, ঔরোঁকে সির দেই।
দাদূ সোভা দাসকোঁ, অপনা নাৰঁ ন লেই।।
ঘট পরচৈ সেৰা করৈ, প্রত্তখি দেখৈ দেৰ।
অৰিনাসী দর্শন করে দাদূ পূরী সেৰ।। (দাদূ, ২১।২৪, ৪।২৫৭)

যোড়শ শতাব্দীর সাধকভক্ত দাদূ বলিতেছেনঃ "হে প্রভু, আপনি একাই সব কার্য করেন, কিন্তু নাম হয় অন্যের। দাদূর মতে, তাহাতে দাসের (সেবকের)-ই গৌরব। কারণ, ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়, তাঁহার (ঈশ্বরের) নাম গোপনই থাকে।

ঈশ্বর যে কেবল সেবকের অন্তরে থাকেন তাহা নহে। তিনি সেবকের অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া দর্শন দেন। এই ঘটের (সেবকের অন্তরাত্মা) পরিচয় পাইয়া যদি সেবা করে, তাহা হইলে ঘটের মধ্যেই দেবতাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে। আর, অবিনাশী ব্রহ্মের যদি দর্শনলাভ হয়, হে দাদূ, তবেই তো সেবা পূর্ণতা লাভ করে!

"এল ও ভি ই"

[পূর্বানুবৃত্তি]

প্রসঙ্গঃ সেবাযোগ

শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বিখ্যাত উক্তি—"শিবজ্ঞানে জীবসেবা"। এই উক্তির মধ্যে যে-তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, তাহার ভিত্তিতেই স্বামী বিবেকানন্দ শুরু করিলেন যুগধর্ম প্রবর্তন এবং মহাসেবা যজ্ঞ। স্বামীজীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন 'এল ও ভি ই' অর্থাৎ LOVE। কেমন LOVE? LOVE personified—প্রগাঢ় প্রেমের ঘনীভূত মূর্তি। সেই প্রেম 'ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু' পর্যন্ত বিস্তৃত। ঐহিক সকল কামনা-বাসনা সেখানে জ্বলিয়া-পুড়িয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। ইন্দ্রিয়াতীত, দিব্য, শুদ্ধ, পবিত্র সেই প্রেমের ব্যাপ্তি রক্তমাংসের এই শরীরকে অতিক্রম করিয়া, এমনকি মন, বুদ্ধি যেস্থানে পৌঁছাইতে পারে না, সেই স্থান পর্যন্ত প্রলম্বিত। এবং চিদ্‌স্বরূপ সেই প্রেমঘন সত্তাই আমাদের **সাধ্য**, আর 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' আমাদের **সাধন**। স্বামীজী বহুভাবে, বহুবার এই কথাই বলিয়াছেন। এই বিষয়ে পূর্বে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। এখন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিষয়টির বিশ্লেষণে আমরা প্রবৃত্ত হইব।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া তাহাকে সরকারি নথিভুক্ত করিবার পূর্বে ইহার নিজস্ব সংবিধান রচনা করিয়া স্বামীজী বলিলেন—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইল। অর্থাৎ আত্মার (নিজের) মুক্তিসাধন এবং জগতের হিতসাধন করিবার জন্য এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রশ্ন হইতে পারে, সচরাচর দেখা যায় যেকোন সন্ন্যাসি-সঙ্ঘেরই একমাত্র উদ্দেশ্য—আত্মার (নিজের) মুক্তিসাধন। এবং ইহাই বাঞ্ছনীয়। সেখানে জগতের হিতসাধনের প্রয়োজনই বা কোথায়, তাৎপর্যই বা কী? তত্ত্বকথায় আসিবার পূর্বে বাস্তব পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে স্বামীজীর মনোভাব কী ছিল তাহা বিবেচ্য। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে লক্ষ লক্ষ সাধু-সন্ত, সন্ন্যাসী 'অনাশ্রমী' হইয়াও সমাজে আছেন এবং বৃহত্তর অর্থে সমাজই তাঁহাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বহন করিতেছে। স্বামীজী ইহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি ইহাও লক্ষ্য করিলেন যে, যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষের সংখ্যা অত্যল্প। এই মুষ্টিমেয় সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষকে স্কন্ধে তুলিয়া সমাজ নৃত্য করিবে। কিন্তু বাকি বিরাট সংখ্যক সংসার-ত্যাগী, নিষ্কর্মী সন্ন্যাসী, সাধু-সন্ত বলা যায় রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমাজে গলগ্রহস্বরূপ হইয়া আছেন। সমাজ তাহাদের নিকট তো কিছুই পায় না, বরং 'পান হইতে চুন খসিলে' ধুন্ধুমার কাণ্ড বাঁধিয়া যায়। আর এইসকল গৃহত্যাগী, কর্মত্যাগী, ধর্মধ্বজাধারিগণের সংখ্যা বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না। মনে রাখা দরকার, আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য এবং শেষভাগের কথা বলিতেছি। তখনো রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হয় নাই। ধর্মক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংগঠন নির্মাণের কথা কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ উচ্চারণ করিলেও 'সন্ন্যাসী সঙ্ঘ'-এর কথা কেহ কখনো কোথাও ভাবিতে পারে নাই। স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম ব্যক্তি যিনি সমাজের ওপর কোনরূপ দায় না চাপাইয়া একটি সন্ন্যাসী সংগঠন সৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন। এই সংগঠন বা সঙ্ঘ সমাজের নিকট হইতে অবশ্যই কিছু গ্রহণ করিবে, কিন্তু পরিবর্তে ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও 'সেবা' বিতরণ করিবে। সমাজের নিকট ইহা গলগ্রহরূপে হাজির হইবে না। অবশ্য ইহা বিবেকানন্দের মন-গড়া কিছু নূতন পন্থা বা পদ্ধতি নহে। প্রাচীন যুগে বৈদিক অনুশাসনেই দেখিতে পাই, সংগঠনরূপে না থাকিলেও এই দেওয়া-নেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ঋষি বলিয়াছিলেনঃ "স্বাধ্যায়ন্মা প্রমদঃ। ...স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।" অর্থাৎ স্বাধ্যায় (শিক্ষাচর্চা, সাধন) হইতে কখনো বিরত হইবে না। পরেই বলিলেন, 'প্রবচন' অর্থাৎ শিক্ষাদান কার্য হইতেও কখনো বিরত হইবে না। শিক্ষাগ্রহণ এবং শিক্ষাদান উভয় কার্যই একত্রে চলিবে, এককভাবে কখনো তাহা চলিতে পারে না। অতএব স্বামীজী বৈদিক যুগের প্রাচীন পদ্ধতিই অনুসরণ করিয়া একটি সংগঠন নির্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া সেই প্রাচীন 'গুরুকুলবাস' অথবা 'অন্তেবাসী' পদ্ধতিতে সৃষ্টি হইল 'রামকৃষ্ণ মঠ'। সমাজ লাভবান হইল। সাধু-সন্ন্যাসিগণ নিজের সাধনপন্থা

হিসাবেই 'সেবাকার্য'কে অঙ্গীকার করিয়া লইলেন। আত্মার মুক্তিসাধন অর্থাৎ নিজের মোক্ষলাভের একটি অব্যর্থ পদ্ধতি হিসাবেই এই সেবাযজ্ঞ ক্রমশ স্বীকৃতি লাভ করিল। একদিকে যেমন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসিবৃন্দের সাধনের প্রেরণাও খর্বিত হইল না, অপরদিকে সমাজও বঞ্চিত হইল না। আর এই সেবাযজ্ঞের ভিত্তিভূমি হইল বিবেকানন্দ-উদ্দিষ্ট 'এল ও ভি ই' তত্ত্ব। সুতরাং এই অবস্থায় 'কর্ম' কর্ম রহিল না। উহা উপাসনায় রূপান্তরিত হইয়া সাধককে '**ব্রহ্মকর্মসমাধি**' প্রদান করিল। যে-ব্যক্তি অজ্ঞান, তাহার দৃষ্টিতে ইহা 'কর্ম' বটে। কিন্তু যিনি জ্ঞান-প্রতিষ্ঠ, তাঁহার বাহ্য কর্মকে লোকে কর্ম বলিয়া অভিহিত করিলেও তাঁহার নিজের কর্মবোধ নাই। 'আমি কর্তা'—এই বোধ নাই। এক অখণ্ড, শুদ্ধ, মুক্ত প্রেমস্বরূপ চৈতন্যবোধে তিনি তখন অভিস্নাত হইয়াছেন।

এখনো একটি সন্দেহ মনে থাকিয়া যায়। সাধারণ সাধকের মনে এই প্রশ্ন আসিতে পারে—জগতের হিতসাধন যখন করিতেছি তখন 'আমিত্ব'-বোধ অথবা 'কর্তৃত্ব'-বোধ আমার ইষ্টসাধনের পথে অন্তরায় হইতেই পারে! ইহার মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। এইখানেই এই তত্ত্বের সহিত 'এল ও ভি ই'-তত্ত্বের সংযোগ ঘটিল। শ্রীরামকৃষ্ণ যে 'প্রেমস্বরূপ' তাহা অন্তরে অনুভব হইলে সাধক 'আমি কর্তা'—এই বোধ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। গীতামুখে শ্রীভগবান বলিলেন ঃ "জন্ম কর্ম চ মে দিব্যং এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ/ ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন।।" অর্থাৎ যে আমার (ভগবানের) দিব্য জন্ম ও কর্মরহস্য অবগত আছে, মৃত্যুর পর তাহার পুনর্জন্ম হয় না। সে আমাকেই প্রাপ্ত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জন্ম, দিব্য কর্মের রহস্য যাহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছে তিনিই অনুভব করেন, শ্রীরামকৃষ্ণ 'এল ও ভি ই পার্সনিফায়েড'। কারণ, 'আমি কর্তা'—এই বোধ এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তা'—এই বোধ কখনো একত্রে থাকিতে পারে না। 'শ্রীরামকৃষ্ণই কর্তা'—এই বোধ তাঁহারই পরম প্রেমস্বরূপতার অনুভবজাত এক দিব্য বোধ। ইহাই মানুষকে জীবন্মুক্তির স্বাদ প্রদান করিয়া থাকে। এই প্রেমের কারণে যে 'সেবা', তাহাকেই স্বামীজী ঠাকুরের বাণী উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—"শিবজ্ঞানে জীবসেবা"।

'সেবাধিকার' সহজে মেলে না। বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুযায়ী 'সেবা' খুবই দুরূহ কার্য। সেবার মধ্যে আনন্দ আছে। দুঃখ আছে। বিপদও আছে। ইষ্ট (সেব্য) যখন সেবা গ্রহণ করেন তখন তাহা সেবককে দিব্য আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু সেবক যখন তাঁহার পরিকল্পিত পদ্ধতিতে সেবা করিতে সমর্থ হইতেছেন না, তাহা তখন আধি-ভৌতিক, আধিদৈবিক বা আধ্যাত্মিক যে-কারণেই হউক, সেবকের অন্তরে তীব্র পীড়ার কারণ হইয়া উঠে। আর যখন সেবায় কিঞ্চিন্মাত্র অবহেলার কারণে সেব্য উহা গ্রহণ করিলেন না, তখন সেবকের পক্ষে উহা কেবল পীড়াদায়ক নহে, বিপজ্জনক। কারণ শাস্ত্রকার বলিলেন, এই অবহেলার কারণ 'অহঙ্কার' এবং অহঙ্কারই সেবককে সেব্য হইতে দূরে ঠেলিয়া দেয়। বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুযায়ী ভগবানের দৃষ্টিতে মনুষ্যের সকল অপরাধই ক্ষমার্হ, একমাত্র 'সেবাপরাধ' ক্ষমার অযোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-গীত একটি প্রাচীন গানে গীতিকার বলিতেছেন ঃ "আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, শুদ্ধাভক্তি দিতে কাতর হই গো/ আমার ভক্তি যেবা পায়, তারে কেবা পায়, সে যে 'সেবা' পায় হয়ে ত্রিলোকজয়ী।।" 'সে যে সেবা পায়'—ইহার অর্থ হইল, সে 'সেবাধিকার' পায়। অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তি যাহার হইয়াছে, তাহারই কেবলমাত্র 'সেবাধিকার' জন্মিয়াছে। ইহা বড় সাঙ্ঘাতিক কথা! এই সেবাধিকার কাহার হইয়াছে? উক্ত গীতিকার বলিতেছেন ঃ "শুদ্ধাভক্তি এক আছে বৃন্দাবনে, গোপ-গোপী বিনে অন্যে নাহি জানে।" অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তিসম্পন্ন গোপ-গোপীগণেরই সেবাধিকার জন্মিয়াছে। অবশ্য ইহা দ্বাপরযুগের কথা। এই কলিযুগেও কি একই কথা? তাহাই এখন বর্ণিত হইতেছে।

স্বামীজী বলিলেন, সেবাই এই যুগের সাধন। প্রাচীনকালে যে পরিবেশ ছিল এখন তাহা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। মানুষের যে শারীরিক, মানসিক সাধন-সামর্থ্য অতীতকালে ছিল, এখন তাহা নাই। যুগে যুগে প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনধারা ও সামর্থ্য পরিবর্তিত হইতে থাকে। অতএব 'প্রাচীনকালে অমুক ছিল কি তমুক ছিল, এখন কিছুই নাই, এখন আমরা সর্বস্বান্ত' ইত্যাদি বিলাপের কিছু প্রয়োজন নাই। যাহা এই যুগোপযোগী তাহা জানিয়া লইতে হইবে। এবং সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করিতে হইবে। তাই 'যোগসমন্বয়' এবং 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-রূপ আধুনিক পদ্ধতির নির্দেশ দিলেন যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ।

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে, স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্রে বলিয়াছেন ঃ "অদ্বয়তত্ত্বসমাহিতচিত্তং, প্রোজ্জ্বলভক্তিপটা-বৃতবৃত্তং, কর্মকলেবরমদ্ভুতচেষ্টম্।" অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে অদ্বৈতজ্ঞান, অদৃষ্টপূর্ব প্রেম এবং অদ্ভুত কর্মের



সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এবং শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং যোগচতুষ্টয়ের সমন্বয় সাধন করিয়া দেখাইয়া গেলেন যে, ইহা সম্ভব। স্বামীজী বারংবার বলিলেন—প্রত্যেক মানুষের মধ্যে জ্ঞানপ্রবণতা (knowledge faculty), প্রেমপ্রবণতা (emotional faculty), কর্মপ্রবণতা (work faculty) এবং ধ্যানপ্রবণতা (mystic faculty) বিদ্যমান। পশুর মধ্যে ইহাদের সব নাই। এই চারপ্রকার প্রবণতাকে ঈশ্বরলাভার্থ প্রয়োগ করিতে পারিলেই উহারা 'জ্ঞানযোগ', 'ভক্তিযোগ', 'কর্মযোগ' এবং 'রাজযোগ' নামে অভিহিত হয়। এই প্রবণতাগুলি ধর্ম ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতে পারে না, তাহা নহে। যেকোন ক্ষেত্রেই এই চারটি প্রবণতার সুষম প্রয়োগ মানুষকে সাফল্যের শীর্ষে লইয়া যায়। প্রাত্যহিক জীবনে সকলেরই অল্পবিস্তর মানসিক বিচার-বিশ্লেষণ, হিসাব-নিকাশ কিছু না কিছু করিতে হয়। একজন মুটেও পারিশ্রমিক কম পাইলে বিচার করিয়া দেখে সে কতটা কম পাইল। ইহাই তাহার জ্ঞানপ্রবণতা। এই জ্ঞানপ্রবণতাই 'জ্ঞানযোগ' হইয়া ওঠে যখন মানুষের এই সহজাত প্রবৃত্তি ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথে প্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ যখন সে বিচার করে—ঈশ্বরই সদ্‌বস্তু, বাকি সব অসদ্‌বস্তু। দ্বিতীয়ত, সকল মানুষের মধ্যেই স্নেহ, ভালবাসা, আবেগ, শ্রদ্ধা রহিয়াছে। তাহার এই সহজাত 'প্রেম-প্রবণতা'-কে ঈশ্বরমুখী করিলে তাহা 'ভক্তিযোগ' নামে অভিহিত হয়। তৃতীয়ত গীতার বাণী স্মরণ করা যাইতে পারে—"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ"। অর্থাৎ মানুষ বা মনুষ্যেতর কোন প্রাণী কর্ম ব্যতীত একক্ষণও থাকিতে পারে না। কেহই থাকিতে পারে না বলিলে নিশ্চয়ই ভুল হইবে। কারণ, যিনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, কর্মকে অতিক্রম করিয়াই তিনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার জীবনে কর্মপ্রসঙ্গ নাই। উহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। আমরা সাধারণ মনুষ্য বলিয়া নিজেদের চিহ্নিত করিয়াছি এবং অনুভব করি, আমাদের মধ্যে এই জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম-প্রবণতাসকল যথার্থই বিদ্যমান। সুতরাং কর্মত্যাগ সম্ভব না হইলে উহাকে ঈশ্বরার্থেই প্রয়োগ করিয়া কর্মকে 'কর্মযোগে' পরিণত করাই বুদ্ধিমানের কার্য। চতুর্থত, মানুষের মধ্যে অতীন্দ্রিয় সত্তাকে জানিবার অথবা মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থার কথা জানিবার কৌতূহল রহিয়াছে। মনকে একাগ্র করিয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে উপরত করিবার ক্ষমতা মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যমান। ইহাকে স্বামীজী mystic faculty বলিলেন। ইহার অধিক চর্চা না হইলেও ইহা মানুষকে বিপদের মধ্যে শান্ত রাখে, পথহারাকে পথ দেখায়, অসহায়ের নিকট সহায়ের কারণ হয়, বিপথগামীকে সঠিক পথে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া থাকে। এই প্রবণতাকে ঈশ্বরমুখী করিয়া তুলিলে ইহাই 'রাজযোগ' নামে আখ্যাত হইয়া থাকে।

স্বামীজী বলিলেন, 'যোগসমন্বয়' কলিযুগের সাধন। অথচ 'সেবা'র মধ্যে এই 'যোগসমন্বয়' হইয়া যায়। অল্পায়াসে অথবা অনায়াসে। কারণ, সেবা করিতে যাইয়া সেবক তাহার কর্মপ্রবণতাকে নিরন্তর ইষ্টপথে পরিচালিত করে বলিয়া তাহার সকল কর্মই কর্মযোগে পরিণত হয়। তাহার আবেগ, ভালবাসা, আকুতি, বিরহ—সবকিছুই ইষ্ট-অভিমুখে ধাবিত হয় বলিয়া তাহার emotional faculty ক্রমশ ভক্তিযোগে পরিণতি লাভ করে। তাহার মনের মধ্যে সদাসর্বদা বিচার চলিতে থাকে—কোন্ কর্মটি কর্তব্য অথবা কোন্‌টি অকর্তব্য। কোন্ কাজে ইষ্ট প্রীত হইবেন, কোন্ কাজে রুষ্ট হইবেন। অথবা এই এই বস্তু অথবা ব্যক্তিবর্গ আমার ইষ্টপথে অন্তরায়। অতএব ইহাদের অবিলম্বে ত্যাগ করা প্রয়োজন। ইত্যাদি তাহার জ্ঞানপ্রবণতা ইষ্টপথেই তাহাকে পরিচালিত করে বলিয়া সে জ্ঞানযোগীও বটে। যোগসমন্বয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ—পবনপুত্র মহাবীর হনুমান। কখনো তিনি বিরাট কর্মযোগী, কখনো তিনি অগাধ জ্ঞানমূর্তি। আবার কখনো ভক্তিতে, আবেগে রোরুদ্যমান হইয়া উন্মাদের ন্যায় শ্রীরামচরণে দণ্ডবৎ পতিত। আবার কখনো একাকী নির্জন স্থানে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন, মন চিদানন্দ অখণ্ড ইষ্টসত্তায় বিলীন হইয়াছে, বাহিরে জড়বৎ নিস্পন্দ।

অতএব এই দীর্ঘ আলোচনার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ ঃ

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের গঠন কেবলমাত্র কাষায়বস্ত্রধারী সন্ন্যাসীদের লইয়াই নহে, পরন্তু সমগ্র শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী লইয়া। এই সঙ্ঘের একেবারে গোড়ার কথা হইল—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"। এই মন্ত্রের সাধন কি? যোগসমন্বয়। যোগ কত প্রকার? স্বামীজী বলিলেন যোগচতুষ্টয়ের কথা—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ এবং রাজযোগ। এই চার যোগের সমন্বয় কিভাবে সাধিত হইতে পারে? সেবাযোগের মাধ্যমে। কিভাবে সেবাযোগ করিতে পারা যায়? "শিবজ্ঞানে জীবসেবা" মন্ত্র অবলম্বন করিয়া। এই মন্ত্রের অধিষ্ঠান বা ভিত্তি কী? স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ—যিনি 'এল ও ভি ই পার্সনিফায়েড'। অর্থাৎ এই 'এল ও ভি ই' তত্ত্বের ওপর যাহা কিছু সব দাঁড়াইয়া আছে। [সমাপ্ত] ❑

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে যেসকল তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ১৩৫৯ সালে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনর্মুদ্রিত করা হলো। আশা করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।—**সম্পাদক**

তত্ত্বমঞ্জরী, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৮৬

(পূর্বানুবৃত্তি)

পরমহংসদেব যেরূপ সর্বধর্ম বিশ্লিষ্ট করিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে এক অপূর্ব ভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ইহাতে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি এককালে চূর্ণীকৃত হইয়াছে। তাঁহার মতে যে-কেহ কোন মতবিশেষকে ঈশ্বরের একমাত্র ধর্মপথ বলিয়া উল্লেখ করেন তাহা তাঁহাদের ভ্রম জ্ঞান করিতে হইবে। ইহা ভূরি ভূরি প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা [তিনি] সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। ইতিপূর্বে তাহা আমরা এই পত্রিকায় [তত্ত্বমঞ্জরী] বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও করা হইবে।

পরমহংসদেব অদ্বিতীয় ঈশ্বর স্বীকার করিয়া তাঁহাকে সর্বত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং সেই মর্মেই সকলকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তিনি এই নিমিত্ত সকল সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের দলভুক্ত হইয়া যাইতে পারিতেন। তখন তাঁহাকে অন্য মতাবলম্বী বলিয়া কদাচিৎ বিশ্বাস করা যাইত। তিনি কখনো বৈষ্ণবদিগের সহিত রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ-গুণানুবাদ কীর্তন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া যাইতেন। কখনো বা নিরাকার ব্রহ্মের ভাব লইয়া নির্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া পড়িতেন। কখনো কালী, দুর্গা প্রভৃতি শক্তির নাম কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র একেবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিতেন এবং কখনো বা ঘোষপাড়ার সহজ মানুষের ভাব লইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেন। মসজিদ গীর্জাদির স্থান পর্যন্ত কিছুই উপেক্ষা করিতেন না।

পরমহংসদেবের এই ভাব অতি বিচিত্র। তিনি অদ্বৈতজ্ঞান-ভিত্তির উপর চৈতন্য-হর্ম্য নির্মাণপূর্বক নিত্যানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ একাধারে অদ্বৈতজ্ঞান, সর্বত্র চৈতন্যদর্শন এবং সর্বদা আনন্দ উপলব্ধি করা পরমহংসদেবের অপূর্ব ভাব ছিল। হিন্দুশাস্ত্রে অদ্বৈতজ্ঞানের অনেক কথা আছে, এই পন্থার অনেক সাধক হইয়াছিলেন; চৈতন্যদর্শন অর্থাৎ ভক্তিমতেরও অগণন সাধক হইয়া গিয়াছেন, এবং আনন্দমতেরও ভূরি ভূরি সিদ্ধপুরুষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের ন্যায় সমুদয় ভাব একত্রীভূত করিয়া ইতিপূর্বে কেহই সাধন করেন নাই অথবা শিক্ষা দেন নাই। যদিও গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন যে, যেকেহ যেরূপে তাঁহার উপাসনা করিবে তাহারই সেইরূপে মনোরথ পূর্ণ হইবে। কিন্তু সাধন করিয়া কেহই তাহা এপর্যন্ত দেখেন নাই অথবা দেখান নাই। রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধকেরা যদিও কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম একত্রে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কালীভাবই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। তাঁহারা কালীকেই সকলের নিদান জানিতেন। কিন্তু পৃথক পৃথক ভাব পৃথক পৃথক সাক্ষাৎ করিয়া একস্থানে তাহাদের পর্যবসান করিয়া কেহই দেখাইতে পারেন নাই! হিন্দুশাস্ত্রেও এপ্রকার কোন মুনি, ঋষি বা অবতারও হন নাই, যাঁহাদের দ্বারা এই মহাভাব প্রকটিত গিয়াছে [হইয়াছে]।

বেদব্যাস, ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮

একদিন আচার্যদেব (শশধর তর্কচূড়ামণি) তাঁহার কলিকাতার আবাস-ভবনে বহুতর ধর্মপিপাসু শ্রোতৃবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া নানাবিধ ধর্মবিষয়ে আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় অকস্মাৎ পরমহংসদেব একজন শিষ্য-সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরাও সেইসময় তথায় উপস্থিত ছিলাম। আচার্যদেব ইতিপূর্বে তাঁহাকে কখনো দেখেন নাই, অন্য কোনরূপ পরিচয়ও ছিল না। তিনি পরমহংসদেবকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্বক তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া যেমন উপবেশন করাইতে যাইবেন অমনি দেখেন পরমহংস অচৈতন্য—একেবারে পূর্ণ সমাধিস্থ। এই অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া আচার্যদেবের দুই চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।... ক্রমে পরমহংসের অল্প অল্প বাহ্যজ্ঞান সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি থাকিয়া থাকিয়া অঙ্গ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন : "মা! শশধরের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পাঠালি, পাঠাইয়ে আমায় অমন করে দিলি কেন মা! আমি যে তোর ছেলের সঙ্গে কথা কইতে পারছি না। মা! আমায় ভাল করে দে মা!" এইরূপ বলিতে বলিতে আরো একটু বাহ্যজ্ঞানের সঞ্চার হইল। তখন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন : "ভাই শশধর! দেখ আজ মায়ের কাছে বসে আছি, এমন সময় মা আমায় বললেন যে, হাঁরে রামকৃষ্ণ! আমার শশধরের সঙ্গে তুই একবার দেখা করলিনি? সেও যে আমার প্রিয় ছেলে। আজ তার কাছে যা, গিয়ে দেখা করে আয়গে। মা বললেন, আর থাকতে পারলাম না। অমনি চলে এলাম। অনেকদিন আসব আসব করছিলাম, আজ তা হয়ে গেল।" এইরূপ বলিতে বলিতে আবার সমাধি হইয়া গেল। কিছুক্ষণ সমাধির অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় জ্ঞানসঞ্চার হইল। তৎপরে দুইজনে নানা ভাবভঙ্গিতে কত কি কথা হইল।... এইরূপে ক্রমেই রামকৃষ্ণের অপূর্ব ভাবের কথা চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। রামকৃষ্ণকে জানিতেন না—এরূপ সাধুসন্ন্যাসী ভারতে অতি বিরল। আমরা হরিদ্বারে একজন ব্রহ্মচারীর নিকট রামকৃষ্ণের বিষয় যেরূপ শুনিয়াছিলাম তাহাতে আমাদের আশ্চর্য হইতে হইয়াছিল। আমরা তৎপূর্ব হইতেই রামকৃষ্ণের নিকট সর্বদা যাতায়াত করিতাম, কিন্তু তখন তিনি আমাদের তত মনাকর্ষণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু হরিদ্বার হইতে ফিরিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি শতগুণে বৃদ্ধি পাইল।... আমরা এইসময় তাঁহার নিকট নানা ধর্মাবলম্বী দর্শককে পরিপূর্ণ দেখিতাম।... পরমহংসদেবের আশ্রয় পাইয়া কেশববাবুর হৃদয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়। সেই পরিবর্তনের ফলে 'নববিধান' প্রসব হয়।

সঙ্কলন ❑ জলধিকুমার সরকার
সম্পাদনা ❑ স্বামী সর্বগানন্দ

(অপ্রকাশিত পত্র)

স্বামী শিবানন্দের চারখানি পত্র*

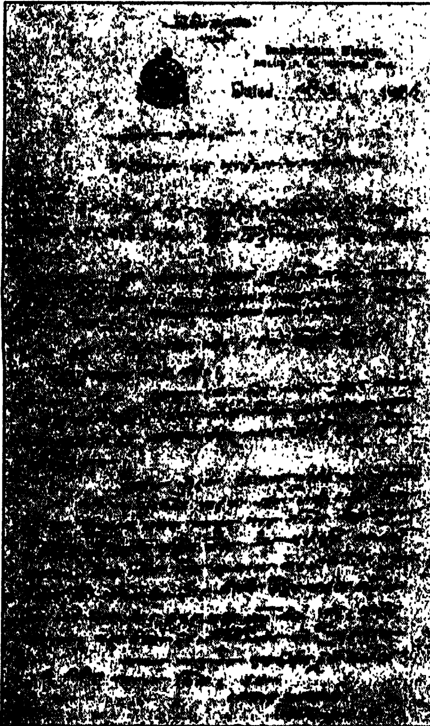


উমাপদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

।।১।।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Ramkrishna Mission,
BELUR P.O. HOWRAH Dist.
Dated 18.3.1926



শ্রীমান উমাপদ,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি।

১ম প্রশ্নের উত্তর—শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া তৎপ্রতি চাহিয়া তাঁর চিন্তা করিলে নিশ্চয়ই ধ্যান হইবে।

২য় উত্তর—হাঁ, জপের দ্বারাই কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ হয়। তাঁর জাগরণ ভক্তের অজ্ঞাতসারে হয় এবং ঠাকুরের দর্শনও লাভ হয়। জাগরণের লক্ষণ—জপে আনন্দ বোধ হওয়া।

৩য় উত্তর—গুরু বীজ 'ঐং'। ইষ্টচিন্তার পূর্বে গুরুচিন্তা ঐ মন্ত্রের সহিত করিও।

৪র্থ—না, তোমার কোনরূপ আসন মুদ্রা করিবার প্রয়োজন নাই। যে আসনে বসিয়া জপধ্যানের কোন অসুবিধা না হয় অর্থাৎ আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া করাই ভাল।

তোমার স্ত্রীকে তোমার সুবিধামত একদিন মঠে আনিয়া দীক্ষিত করিয়া লইয়া যাইও। ইতিমধ্যে তাঁকে ঠাকুরের বিষয় যতদূর পার বলিবে। ঠাকুর সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পড়িতে দিবে। তাঁর প্রতিমূর্ত্তি একখানি তাঁকে দিবে, নিত্য প্রণাম করিতে বলিবে। ঠাকুরের বিষয় পাঠ করিয়া তাঁর জীবনী চিন্তা করিতে বলিবে। এইরূপে তাঁর উপর শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি কিছু কিছু স্থাপিত হইবে। পরে দীক্ষা হইলে ভবিষ্যতে সাধনপথ সুগম হইবে।

আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে ও বাড়ির সকলকে দিবে। ইতি।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

---

* স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের পত্রগুলি দমদম-নিবাসী যোগবিলাস মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।—সম্পাদক

।।২।।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Ramkrishna Mission,
BELUR P.O. HOWRAH Dist.
Dated 14.4.1926

শ্রীমান উমাপদ,

তোমার চিঠি পাইলাম। পুরশ্চরণ বা অভিষেকাদি করিবার তোমার কোন দরকার নাই। ওসব করিতে হইবে না। মা কালীর পূজায় পশুবলিদান না দিয়ে অনুকল্পে কলা, কুমড়ো ইত্যাদি বলি দিতে পার, মা তাহাতে অপ্রসন্ন হবেন না।

জপের সময় উত্তর বা পূর্ব দিকে মুখ করিয়া বসিও। এই দুই দিকে মুখ করিয়া বসাই প্রশস্ত। তোমার স্ত্রীকে কথামৃত এবং রামকৃষ্ণ উপদেশ পড়িতে দিও। অতি সহজ কথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা তাহাতে আছে। বেশ বুঝিতে পারিবে। ভগবানের দাসীর মতো থাকিতে বলিও, যথাসাধ্য তাঁর নাম করিতে বলিও, তাহলেই হলো। তোমরা আমার খুব আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিও। তোমাদের খুব ভক্তি বিশ্বাস হউক। ইতি।

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

।।৩।।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

SRI RAMAKRISHNA MISSION
MYLAPORE, MADRAS
21.5.1926

শ্রীমান উমাপদ,

শ্রীশ্রীঠাকুরের কার্যের জন্য আমাকে এখানে আসিতে হইয়াছে। ২/১ বৎসর অন্তর এরূপ আসিতে হয়। আমি ২রা মে বেলুড় হইতে যাত্রা করিয়া পথে ৺ভুবনেশ্বর, পুরী ও Waltare হইয়া ১১ই মে এ মঠে পৌঁছিয়াছি। এখানকার কার্য প্রায় আপাততঃ শেষ হইয়া আসিয়াছে। সপ্তাহের মধ্যে বা পরে কোন শীতল পাহাড়ে যাইবার কথা হইতেছে। চিঠিপত্র যদি লেখ তো এই ঠিকানায় লিখিও, আমি যেখানে থাকি পাইব।...

আর অধিক কিছু লিখিবার নাই। আশা করি তুমি ও তোমাদের বাড়ির সকলে ভাল আছ ও আছে। আমার শরীর তত মন্দ নয়। এখানে গরম খুব, তবে অসহ্য নয়। অন্য কাজের কোনরূপ আশা পাইতেছ কি?

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

।।৪।।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

BELURMATH P.O.
HOWRAH DT., BENGAL (INDIA)
20/12/(19)30

শ্রীমান উমাপদ,

তোমার ও করুণাময়ের পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। ঠাকুরের কৃপায় তাঁর নামে আনন্দ পাচ্ছ জেনে খুবই প্রীত হইয়াছি। তাঁর দয়ায় ঐসব বৃদ্ধি পাইবে। প্রেম, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়বিমুখতা প্রভৃতি লাভ হইবে। তবে সাবধান, আমি একজন ভক্ত, জ্ঞানী, অপরের চেয়ে উচ্চস্তরের ব্যক্তি—এইসব ভাব যেন মনে উদয় না হয়। তাহা হইলেই সর্বনাশ। ঠাকুরের কাছে খুব প্রার্থনা করবে যেন অভিমান, অহঙ্কার হৃদয় অধিকার না করে।

আমার শরীর তাঁর কৃপায় আর খারাপ হয় নাই। একপ্রকার চলে যাচ্ছে। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে এবং করুণাময়কে জানাইয়া সুখী করিবে। ইতি।

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

পাতঞ্জল-যোগসূত্র

ব্যাখ্যাতা ঃ স্বামী প্রেমেশানন্দ

অনুলিখন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনা ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্।।৫৩।।

ক্ষণ (সময়ের ক্ষুদ্রতম অংশ) ও তাহার পূর্বাপর ভাবগুলির উপর সংযম করিলে বিবেকজ্ঞান জন্মে।

জাতিলক্ষণদেশৈরন্যতানবচ্ছেদাত্তুল্যয়োস্ততঃ প্রতিপত্তিঃ।।৫৪।।

জাতি, লক্ষণ ও দেশ দ্বারা যেসকল বিষয় পৃথক না হওয়ায় অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, পূর্বোক্ত সংযমের দ্বারা তাহাদের পৃথক জ্ঞান হয়।

তারকং সর্ববিষয়ং সর্বথা-বিষয়মক্রমঞ্চেতি বিবেকজং জ্ঞানম্।।৫৫।।

যে বিবেকজ্ঞান সকল বস্তুকে এবং তাহাদের সকলপ্রকার অবস্থাকে যুগপৎ গ্রহণ করিতে পারে, তাহা তারকজ্ঞান।

মন্তব্য ঃ স্বরূপ উপলব্ধির উপায় আত্ম-অনাত্ম বিবেক। সেই বিবেকজ্ঞান লাভ করিবার আরেকটি উপায়—সময়ের সূক্ষ্মতম অবস্থাতে মন সমাহিত করা। একহাজার পদ্মপাতাকে যদি একটি সূঁচ দিয়া এক আঘাতে বিদ্ধ করা যায় তাহা হইলে বিদ্ধ করিবার ক্ষণটি একহাজার অংশে বিভক্ত হইল। সময়ের এইরূপ সূক্ষ্ম অংশকে গভীর সমাধিতে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে জগতের সকল বস্তুর স্বভাব, পরিণাম প্রভৃতি সবই জানা যায় অর্থাৎ প্রকৃতির বিষয়ে যোগীর কিছুই অজ্ঞাত থাকে না।

এইরূপ জ্ঞানলাভ করিলে এই ভববন্ধন হইতে ত্রাণলাভ করা যায় বলিয়া এই জ্ঞানের নাম 'তারকজ্ঞান'। কারণ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সকল বিষয় জানিবার জন্য তাঁহার কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। তিনি ইচ্ছা করিলেই একই সঙ্গে সৃষ্টির সমস্ত বিষয় জানিতে পারেন।

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি।।৫৬।।

যখন সত্ত্ব (অর্থাৎ বুদ্ধি) পুরুষের মতোই শুদ্ধ হইয়া যায়, তখন কৈবল্যলাভ হয়।

মন্তব্য ঃ বিবেকজ্ঞানের পূর্ণপ্রকাশ হইলে বুদ্ধিতে বাসনার লেশমাত্র থাকে না। বুদ্ধি তখন এত স্বচ্ছ হইয়া যায় যে, স্বরূপ ও বুদ্ধির মধ্যে কোন পার্থক্য বোধ হয় না। তখন বুদ্ধির আর কোন প্রয়োজনও থাকে না, তাই তাহা তিরোহিত হইয়া যায়, যোগী তখন কেবল নিজের স্বরূপবোধ করেন। ইহাই কৈবল্যপ্রাপ্তি।

।। বিভূতিপাদ সমাপ্ত।।

কৈবল্যপাদ

'কৈবল্য' অর্থাৎ পূর্ণমুক্তি সম্বন্ধে ধারণা মানুষের হওয়া সুদুষ্কর। সাধারণত হিন্দুদের মধ্যে যাহারা একটু সদ্ভাবে জীবনযাপন করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মুক্তির কথা বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলিলেই বুঝা যায় যে, তাঁহারা জীবনে যেসব দুঃখ পাইয়াছেন সেইসব দুঃখের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এমন এক সুখকর স্থানের কল্পনা তাঁহারা করিয়া থাকেন। মানুষের মনের প্রবল বৃত্তি সুখলালসা। যেখানে গেলে তাঁহারা সুখে থাকিতে পারিবেন, সেইস্থানই তাঁহাদের কাম্য। সেইজন্য নানা ধর্মসম্প্রদায়ের লোকের মনে পরলোক বা স্বর্গ সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিচিত্র ধারণা আছে। সুতরাং সুখের বিষয়ে অর্থাৎ মানুষ কি পরিমাণ সুখলাভ করিতে পারেন, তাহা লইয়াই তাঁহার জীবনের আদর্শ গঠিত হইয়া থাকে।

পরলোকের ধারণার নিরিখে আমরা ভক্ত মানুষকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত দেখিতে পাই। প্রথম স্তরে দেখি, মানুষের ধারণা—নিজের নিজের ধর্মানুযায়ী সৎকর্ম করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। সেই স্বর্গের ধারণা আবার কোন দুই ব্যক্তির একপ্রকার হইতে পারে না। কারণ, মানুষে মানুষে বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। দ্বিতীয় স্তরের ভক্তরা মৃত্যুর পর ভগবানের নিকট গিয়া থাকিবেন—এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন। এই কল্পনারও আবার বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। রামের ভক্ত মৃত্যুর পর চৈতন্যময় অযোধ্যায় যাইবেন, কৃষ্ণের ভক্ত চৈতন্যময় নিত্যবৃন্দাবনে যাইবার আশা করেন। নারায়ণের ভক্তরা কল্পনা করেন বৈকুণ্ঠ নামক এক পরম রমণীয় স্থানে তাঁহাদের ইষ্টদেবতা মা লক্ষ্মীকে লইয়া মানুষের মতো সংসার করেন। সেখানে রান্নাবান্না হয়, ভক্তেরা নারায়ণের প্রসাদ পাইয়া থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জনৈকা ভক্ত মহিলাকে 'বৈকুণ্ঠের রাঁধুনী' বলিতেন। তৃতীয় স্তরের ভক্তদের অর্থাৎ জ্ঞানীদের দেখাশুনার কিছুই নাই। তাঁহারা শুধু এক বস্তু নিজেকে লইয়া এমন বিভোর হইয়া থাকেন যে, তাঁহাদের কিছুমাত্র অভাব বা কোন কিছুর প্রয়োজনবোধ থাকে না। সেই অবস্থাকে 'নির্বাণ' বলা হয়। 'বাণ' শব্দের অর্থ দেহ। 'নির্বাণ' শব্দের অর্থ যেখানে স্থূল, সূক্ষ্ম বা কারণ কোন দেহই থাকে না।

সর্বদেশে সর্বকালে মানুষের মনে স্বর্গের কল্পনা স্বাভাবিক। কিন্তু স্বর্গ যে ভগবানকে লইয়া আনন্দ করিবার স্থান, তাহা অতি অল্প লোকই জানে। গীতাতে আছে, বহু সহস্র মানুষের মধ্যে কচিৎ কেহ অধ্যাত্মসাধনায় মনোনিবেশ করে, আবার ঐ প্রকারের সহস্র সহস্র সাধকের মধ্যে কচিৎ কেহ পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারে।[১] প্রাচীন ঋষিগণ সর্বসাধারণের নিকট জ্ঞানের বিষয়ে প্রচার করা প্রয়োজন মনে করিতেন না। কারণ, জীবাত্মার সংসার দেখা সম্পূর্ণ না

হইলে সে কিছুতেই মুক্তিলাভ করিতে চাহে না। যাহার ভোগ শেষ হয় নাই, অথচ মুক্তির প্রতি সাধারণভাবে অনুরাগ আছে তেমন সাধকরা কিছুটা সত্ত্বগুণভাবাপন্ন। কিন্তু তাঁহারা নিরায়াসে থাকিবার লালসায় সর্বপ্রকার কর্ম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচিন্তার ভানে তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। রজোগুণী সাধকগণ নানাপ্রকার উৎকট ক্রিয়া করিয়া যশোলাভের চেষ্টায় অধঃপতিত হন। আর তমোগুণী সাধক মুক্তির প্রয়াসের নাম করিয়া কর্তব্যকর্মে অবহেলা করিয়া নিম্নগামী হন। এইসব সাধক নিতান্ত অধঃপতিত না হইলেও ভোগের পথে থাকিবার ফলে যেটুকু জ্ঞান হইবার আশা ছিল, তাহাও নষ্ট হয়।

ভারতের সামাজিক এক বিষম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ঈশ্বরাবতার বুদ্ধদেব মানবজাতির নিকট সর্বপ্রথম নির্বাণবাদ প্রচার করেন। স্বামীজী বুদ্ধদেবের মহত্ত্বের কথা অনেক স্থলে খুবই উচ্ছ্বাসের সহিত বলিয়াছেন, আবার তাঁহার ধর্মপ্রচারের ফলে মানুষের যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহাও সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন। আসল কথা হইল—"সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।"[২]

ভারতে দীর্ঘকাল মানবতত্ত্বের গবেষণা করিয়া মনীষিগণ যাহা জানিলে আর জানিবার কিছু বাকি থাকে না তাহা জানিয়াছিলেন। তাঁহারা মানবসমাজকে চতুরাশ্রমে বিভক্ত করিয়া ভোগ হইতে অভ্যুদয়, অভ্যুদয় হইতে নিঃশ্রেয়স লাভ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যাহারা নিঃশ্রেয়সার্থী তাহাদের জন্য তাঁহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্বাণলাভ করিবার একটি অব্যর্থ পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মহর্ষি পতঞ্জলি সেই পন্থাটি প্রদর্শন করিবার জন্য 'যোগসূত্র' রচনা করিয়াছিলেন। অধ্যাত্মসাধনা সম্বন্ধে ইহা একটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। ইহা তাত্ত্বিক বা theoretical সাধনার গ্রন্থ নহে, ইহাতে অধ্যাত্মসাধনার শুধু প্রায়োগিক বা practical দিকই মহর্ষি পতঞ্জলি দেখাইয়াছেন। শরীর, মন এবং বুদ্ধি কিভাবে সাজাইয়া ঐ সাধনা কার্যে কিভাবে পরিণত করিতে হয়, তাহা অতি চমৎকাররূপে তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন। মন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ভূমিতে আরোহণ করিয়া কি অভিজ্ঞতালাভ করে তাহা সুস্পষ্টরূপে 'যোগসূত্র'-এ বলা হইয়াছে। মানুষের ব্যক্তিগত শক্তি বর্ধিত হইতে হইতে সৃষ্টির সমস্ত রহস্য কিরূপে সে অবগত হয় এবং বিশ্বের সমস্ত শক্তির সহিত এক হইয়া গিয়া কিরূপে জীব সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হয়, তাহা নিশ্চিতরূপে মহর্ষি পতঞ্জলি এখানে দেখাইয়াছেন। অবশেষে সর্বপ্রকার জ্ঞেয় হইতে জ্ঞাতা যে কী পরিমাণ বৃহৎ এবং সেই জ্ঞাতৃত্বলাভই যে সাধনার শেষ সীমা, তাহা এখানে তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন। এখানে 'জ্ঞাতৃত্ব' বলিতে 'স্বস্বরূপজ্ঞান' বুঝিতে হইবে।

বেদান্ত বলেন—নির্গুণ ব্রহ্ম নিজের অচিন্তনীয় শক্তির প্রভাবে নিজেকে বহুধাবিভক্ত করিয়া বহুরূপ ধরিয়া সৃষ্টি-রূপে পরিণত হইয়াছেন, আবার সৃষ্টির প্রত্যেকটি জীব আত্ম-বিস্মৃত হইয়া এই জগৎ দেখিয়া বেড়াইতেছে। ঐ অনন্ত জীবগণের মধ্যে যাহারা বিবর্তিত হইয়া জিজ্ঞাসু মানব হইতে পারে, তাহারা এই যোগপ্রণালী অবলম্বন করিয়া পূর্ণত্বপ্রাপ্তির ফলে ব্রহ্মের সগুণ-নির্গুণ সব ভাব অনুভব করিতে পারে।

জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ।।১।।

সিদ্ধি বা শক্তিসমূহ জন্ম, ঔষধ, মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধি হইতে জাত হয়।

মন্তব্য ঃ মানুষের জীবনে প্রকৃতির সহিত অবিরাম যুদ্ধ চলিতেছে। আমরা নিত্য দেহরক্ষার জন্য অন্নবস্ত্রের প্রয়োজনে যেসব কাজ করি, তাহা তো প্রকৃতির নিকট হইতে আবশ্যকীয় বস্তু আহরণ। ইহা বিজ্ঞানের সাহায্যে বর্ধিত হইয়া কত প্রসারিত হইয়াছে তাহা তো সকলেই দেখিতেছি। প্রাচীনকালে প্রকৃতির ওপর কর্তৃত্বলাভ করিবার জন্য যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহাই 'যোগ' নামে অভিহিত। মানসিক শক্তির সাহায্যে রোগ ভাল করা, দূরদেশের সংবাদ আনা প্রভৃতি নানাপ্রকার অদ্ভুত শক্তিলাভ করিয়া মানুষ নিজে শক্তিমান হইতে পারে এবং অন্যের দুঃখ কিছু দূর করিতে পারে। এইরূপ অসাধারণ শক্তিলাভকেই 'সিদ্ধি' নাম দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারবশত কেহ কেহ এইসব সিদ্ধি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। ঔষধপ্রয়োগে মানুষকে বেহুঁশ করিয়া যেমন একালে অস্ত্রোপচার করা হয়, পূর্বেও এইপ্রকার নানারকম ঔষধের কথা লোকে জানিত। মন্ত্রবলে অসাধ্য সাধন করা এবং নানারূপ কঠোর তপস্যা করিয়া অসাধারণ শক্তিলাভের কথা এখনো কোথাও কোথাও শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শুধুমাত্র যোগের পথে সমাধিবলে যেসব শক্তি উপস্থিত হয়, তাহাই মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক উপকারী। [ক্রমশ] (তেরো)

---

১ "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।/ যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।" (গীতা, ৭।৩)
—ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী যে সুদুর্লভ এবং ব্রহ্মজ্ঞানলাভ যে সুদুষ্কর, সেকথা অর্জুনকে বুঝাইতে গিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একথা বলিতেছেন। পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমেশানন্দজী এখানে গীতার বক্তব্য উল্লেখ করিয়া যোগশাস্ত্র-কথিত কৈবল্যলাভের বিষয়টি সুস্পষ্ট করিতে চাহিয়াছেন। এই উল্লেখের মাধ্যমে বেদান্ত ও যোগের নিবিড় সম্পর্কটিও তিনি সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করিয়াছেন।—**সম্পাদক**

২ গীতার অন্তর্গত শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত একটি উক্তির এই অংশের উদ্ধৃতি দান করিয়া স্বামী প্রেমেশানন্দজী ইহা বুঝাইয়াছেন যে, স্বামীজী যখন বুদ্ধদেবের সমালোচনা করিয়াছেন সেই সমালোচনা বুদ্ধদেবের নহে, কর্মের সঙ্গে যে-দোষ স্বাভাবিকভাবেই সংযুক্ত থাকে তাহার। শ্রীকৃষ্ণ সেকথাই বলিয়াছেন ঃ "সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ"। (গীতা, ১৮।৪৮)—অগ্নি যেমন স্বাভাবিকভাবে ধূমের দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই সকল কর্মই ত্রিগুণাত্মক হওয়ার জন্য দোষযুক্ত হয়।—**সম্পাদক**

বৈশাখ ১৩০৯
এপ্রিল ১৯০২



ইন্দ্রের ব্রহ্মজ্ঞানলাভ

প্রজাপতি বলিতেন, নিষ্পাপ, অজর, অমর, অশোক, ক্ষুৎপিপাসারহিত, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প আত্মাকে অন্বেষণ করিতে হইবে, তাঁহাকে জানিতে হইবে। যিনি তাঁহাকে জানেন, তিনি সমুদয় লোক ও সমুদয় কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হন। দেবাসুর উভয়েরই এই বাক্য শুনিয়া আত্মজ্ঞানলাভে ইচ্ছা হইল। দেবতারা ইন্দ্রকে এবং অসুরেরা বিরোচনকে তাঁহাদের প্রতিনিধি করিয়া আত্মবিদ্যাশিক্ষার্থ প্রজাপতির নিকট পাঠাইলেন। তাঁহারা প্রজাপতির নিকট গিয়া বত্রিশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য করিলেন। বত্রিশ বর্ষ পরে প্রজাপতি তাঁহাদিগকে তাঁহাদের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা যখন তাঁহাদের আত্মজ্ঞান-লাভেচ্ছা নিবেদন করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, এই চক্ষে যে-পুরুষ দৃষ্টিগোচর হইতেছেন, তিনিই আত্মা; ইনিই অমৃত, অভয় ও ব্রহ্ম-স্বরূপ। তাঁহারা উভয়ে প্রজাপতিবাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া মনে করিলেন, তিনি ছায়াকেই আত্মা বলিতেছেন। এই মনে করিয়া তাঁহারা বলিলেন, জলে যে ছায়া দেখা যায় তাহাই আত্মা, না আরসীতে যাহা দেখা যায় তাহাই আত্মা? প্রজাপতি বলিলেন, তিনি এই সমুদায়েই আছেন। এক সরা জল লইয়া তাহাতে আত্মাকে দেখ। যদি তখনও না জানিতে পার, তবে আমায় বলিও। তাঁহারা তাহা দেখিয়া বলিলেন, আমরা যেমন, লোম হইতে নখ পর্য্যন্ত তাহার অবিকল প্রতিরূপ দেখিতেছি। তখন প্রজাপতি তাঁহাদিগকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া জলে দেখিতে বলিলেন; তাঁহারাও দেখিয়া বলিলেন, আমরা যেমন সজ্জিত হইয়াছি, ঠিক সেইরূপ জলে আপনাদিগকে দেখিতেছি। তখন তিনি বলিলেন, ইনিই অমৃত ও অভয়-স্বরূপ; ইনিই ব্রহ্ম। তাঁহারা কৃতার্থম্মন্য হইয়া চলিয়া গেলেন। প্রজাপতি বলিতে লাগিলেন, হায়, দেবাসুর উভয়েই আত্মজ্ঞান না পাইয়া চলিয়া গেল। বিরোচন ত অসুরদের নিকট যাইয়াই তাহাদিগকে বলিল, প্রজাপতির উপদেশ, এই দেহই আত্মা। অসুরেরা সেই উপদেশ গ্রহণ করাতে অসুরসম্প্রদায় এখনও দানরহিত, শ্রদ্ধাশূন্য, ভোগনিষ্ঠ ও দৈহিকপরায়ণ [দেহগতপ্রাণ]।

ইন্দ্রও দেবগণের নিকট ফিরিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার বিচার উপস্থিত হইল যে, এই দেহ যখন সুন্দর বসন-ভূষণে শোভিত হইলে তাহার ছায়াও তদ্রূপ হয়, সেইরূপ কোন অঙ্গহীন হইলে ইহার ছায়াও ত অঙ্গহীন হইবে—অতএব এই ছায়া কখন আত্মা হইতে পারে না। এই মনে করিয়া গুরুর নিকটে প্রত্যাবৃত্ত হইলে গুরু আর বত্রিশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য করাইয়া যে-পুরুষ স্বপ্নে নানাবিধ অনুভব করেন, তিনিই আত্মা—এই উপদেশ দিলেন। ইহাতে ইন্দ্র প্রথমতঃ তৃপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু পুনর্ব্বার সন্দিগ্ধ হইয়া গুরুকে নিবেদন করিলেন, স্বপ্নাবস্থায় মন দেহের ধর্ম্মে লিপ্ত নহেন বটে, কিন্তু নানাপ্রকার দুঃখে মনের শোক ও চাঞ্চল্য ঘটে। গুরু তাঁহাকে আরো বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করাইয়া স্বপ্নশূন্য সুষুপ্তিই আত্মার প্রকৃত অবস্থা বলিয়া উপদেশ দিলেন। ইন্দ্র তাহাতেও যখন তৃপ্ত হইলেন না, বলিলেন, সুষুপ্তাবস্থায় "আমি" জ্ঞানই যখন থাকে না, তখন উহাকে কি করিয়া অমৃতস্বরূপ আত্মা বলা যায়? তখন প্রজাপতি তাঁহাকে আর পাঁচ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করাইয়া আত্মার স্বরূপতত্ত্ব উপদেশ করিলেন।

প্রেরিত পত্র

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উদ্বোধন সম্পাদক মহাশয়েষু—

মহাশয়, বিগত ২৭শে ফাল্গুন মঙ্গলবার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে ঢাকাস্থ "রামকৃষ্ণ মিশন" গৃহে আসনোপরি তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক রামকৃষ্ণ-পুঁথি হইতে ঠাকুরের স্তোত্র ও জন্মকথা পাঠ করা হয়। তৎপর হরিসংকীর্ত্তন ও কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত মণ্ডলীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

নিঃ রামকৃষ্ণ মিশনের সভ্যগণ, ঢাকা

বিজ্ঞাপন

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় জ্যৈষ্ঠ মাসের উদ্বোধন বন্ধ রহিল। পর সংখ্যা আষাঢ়ে বাহির হইবে।*

সঙ্কলন ঃ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

---

* [তৎকালে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯-এ 'উদ্বোধন' অফিসে বাৎসরিক ছুটি থাকায় ঐ মাসে 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। সেই কারণে জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ (মে ২০০২) সংখ্যার 'উদ্বোধন'-এ এই বিভাগে কোন লেখা প্রকাশিত হবে না। —সম্পাদক]

নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ*

সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়

আলফ্রেড লুইস ক্রোবার সভ্যতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে সাংস্কৃতিক বিকাশের চরমাবস্থার কথা উল্লেখ করেছিলেন। যেকোন সভ্যতার 'সাংস্কৃতিক পরিস্ফুটন' (Cultural Flouroscence) সেই সভ্যতার তুরীয় অবস্থাটিকে চিহ্নিত করে। উনবিংশ শতাব্দী এই বাঙালি সংস্কৃতির এক 'চরমাবস্থা'র কাল। এই কালের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিফলিত হয়েছিল কিছু যুগোত্তীর্ণ প্রতিভায়। স্বামী বিবেকানন্দ সেই যুগমনীষার এক সংহত রূপ। এক ক্রান্তিলগ্নে তিনি ভারতীয় সভ্যতা, সমাজ ও জাতীয় জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা এবং সমালোচনা করেছেন। এক হিসাবে এই আলোচনাগুলিকে স্বামীজীর বহুমাত্রিকতার একটি প্রকাশরূপে বর্ণনা করা যায়। তবে খণ্ডিত পর্ব হিসাবে নয়, বরং স্বামীজীর মনন ও বোধের সংশ্লেষণে জাত সামগ্রিকতার প্রকাশ হিসাবেই একে দেখা ভাল।

১৮৯৩ সালে স্বামীজী আমেরিকার শিকাগো ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা দান করেছিলেন। সেদেশের চিন্তার তরঙ্গগুলি তাঁকে স্পর্শ করেছিল। অদ্ভুত নিজস্বতায় সেগুলিকে আত্তীকরণ করেছিলেন তিনি। সেইসঙ্গে তাঁর মধ্যে জাগ্রত ছিল এক দীপ্ত ভারতীয়ত্ববোধ। দেশের সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিনে নেওয়ার প্রবল আগ্রহ তাঁকে জারিত করেছিল অন্তরে-বাইরে। এই সময়ে ও তার পরবর্তী সময়ে মানুষ, সভ্যতা, সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যগুলি পড়লে তাঁকে একজন প্রাজ্ঞ 'মানববিজ্ঞানী' বলেই মনে হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর অবস্থান তথা বক্তব্যগুলির ব্যাপ্তি নির্ণয়ের একটি প্রয়াস করা যেতে পারে।

নৃতত্ত্ব ঃ স্বামীজীর সমসাময়িক চিত্র

ডারউইনের 'অরিজিন অব স্পিসিস'-এর প্রকাশ (১৮৫৯ সাল) সমসাময়িক চিন্তার জগতে যে সুগভীর প্রভাব ফেলেছিল, নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে সেই প্রভাবকে যুগান্তকারী বলা যায়। বলতে গেলে, মানুষের উৎপত্তি, বিস্তার ও বিবর্তন সম্পর্কিত চিন্তাধারা সেই প্রথম সুনির্দিষ্টভাবে দানা বাঁধতে শুরু করে। ইংল্যাণ্ডে জায়মান এই বিষয়টির আভাস আমেরিকায় ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এরই মধ্যে আমেরিকায় প্রকাশ পায় হেনরী মরগ্যানের বিখ্যাত গ্রন্থ 'অ্যানসিয়েন্ট সোসাইটি' (১৮৭৭)। এর কিছু আগে ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হয় এডোয়ার্ড টেলরের 'প্রিমিটিভ কালচার'। বিশ্ব-নৃতত্ত্বের প্রাথমিক ভিত্তি রচনায় এই দুটি গ্রন্থের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৮৮৪ সালে অক্সফোর্ডে নৃতত্ত্ব-বিদ্যা পড়ানো শুরু হয়। তার কিছু পরে শুরু হয় আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই সময়ে নৃতত্ত্বের কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখাও প্রকাশ পায়। তার মধ্যে ছিল হেনরী মেনের 'অ্যানসিয়েন্ট ল' (১৮৬১), ফ্রেজারের 'গোল্ডেন বাউ' (১৮৯০) ইত্যাদি। তাত্ত্বিক দিক থেকে নৃতত্ত্ববিদ্যা অবশ্য তখনো বিশেষ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেনি। তবে মূলত টেলর ও মরগ্যানের গ্রন্থদুটির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল একমুখী পরিণামবাদ (Unilinear Evolutionism)। নৃতত্ত্বের ইতিহাসে বলতে গেলে এটিই সম্ভবত সামাজিক বিবর্তন ব্যাখ্যা করার জন্য প্রথম তত্ত্বগত প্রয়াস।

ভারতবর্ষেও নৃতত্ত্বের শৈশবাবস্থা চলছিল তখন। যদিও যেসময় থেকে ভারতে নৃবিজ্ঞানের সূচনা বলে ধরা হয়, তা শুরু হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই—সেই ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার সময় থেকে। তা সত্ত্বেও নৃবিজ্ঞানের পঠনপাঠন একক ও নির্দিষ্ট বিষয় হিসাবে তখনো ভারতে শুরু হয়নি। তবে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণাল 'ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকুইটি' (১৮৭২)-তে প্রায় নিয়মিত ভারতের সমাজ, মানুষজন ইত্যাদি নিয়ে লেখা প্রকাশিত হচ্ছিল। এছাড়া স্বামীজীর জীবনকালের মধ্যে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ভারতীয় নৃতত্ত্বের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। এর মধ্যে উল্লেখ করা যায় ল্যাথামের লেখা 'এথনোগ্রাফি অফ ইণ্ডিয়া' (১৮৫৯), রিসলীর 'ট্রাইব অ্যাণ্ড কাস্টম অফ বেঙ্গল' (১৮৯১) গ্রন্থদুটির। সাঁওতালদের ওপর বেশ কিছু বইও এসময়ে প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতবর্ষে নৃবিজ্ঞানের ওপর এই ধরনের লেখালিখির মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র কায়েম রাখতে সহায়তা করা। বিদেশী শাসককুলকে এদেশের মানুষ তাদের আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করার জন্যই এই ধরনের লেখাগুলি প্রকাশ করত।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নৃতত্ত্বের পরিমণ্ডল স্বামীজীর সমসাময়িক কালে কতদূর ব্যাপ্ত ছিল তা জানলে আমরা স্বামীজীকে তাঁর কালের নিরিখে দেখার সুযোগ পাব। যেসময়ে প্রথাগতভাবে নৃতত্ত্বচর্চা শুরু হয়নি এবং পেশাগতভাবে কোন নৃতাত্ত্বিক বর্তমান ছিলেন না এবং যেসময়ে নৃতত্ত্বের লেখালিখি বলতে কতিপয় বিদ্বান, সমাজসচেতন মানুষের সমাজ, সভ্যতা নিয়ে রচনাগুলিকেই বোঝানো হতো—সেসময়ে স্বামীজীর লেখাগুলিও যে

* স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা।

এধারায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন, তা বুঝতে গেলে সমসাময়িক পটভূমিটুকু জানার প্রয়োজনীয়তাটি অস্বীকার করা যায় না। যাহোক পরবর্তী পর্যায়ে স্বামীজীর নির্দিষ্ট তথা প্রাসঙ্গিক বক্তব্যগুলি কেন্দ্র করে আলোচনা করা হলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

ভারতের আদিম মানুষ

এপ্রসঙ্গে আলোচনার সূচনা হতে পারে স্বামীজীর 'আর্য ও তামিল' প্রবন্ধ থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করে। সেখানে তিনি লিখছেনঃ "সত্যই, এ এক নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। হয়তো সম্প্রতি আবিষ্কৃত সুমাত্রার অর্ধবানরের কঙ্কালটিও এখানে পাওয়া যাইবে। ডলমেনেরও অভাব নাই। চকমকি-পাথরের অস্ত্রশস্ত্রও যেকোন স্থানে মাটি খুঁড়িলেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। হ্রদ-অধিবাসিগণ, অন্তত নদীতীরবাসিগণ নিশ্চয়ই কোনকালে সংখ্যায় প্রচুর ছিলেন। গুহাবাসী এবং বৃক্ষপত্র-পরিহিত মানুষ এখনো বর্তমান। বনবাসী আদিম মৃগয়াজীবীদের এখনো এদেশের নানা অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।"[১] বর্তমান নৃতাত্ত্বিক জ্ঞানের আলোকে যদি স্বামীজীর এই কথাগুলি বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে তাঁর প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি সম্বন্ধে একটা পরিচয় আমরা পেতে পারি।

১৮৯১ সালে মধ্য জাভার সোলা নদীর তীরবর্তী ট্রিনিল গ্রাম থেকে আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমির অধ্যাপক ডঃ ইউজিন দুবয় আবিষ্কার করেন মানব-সদৃশ একটি প্রাণীর মস্তিষ্কের হাড়ের কিছু অংশ আর ডান পায়ের ফিমার হাড়। সাধারণ্যে প্রচলিত পরিভাষায় এর নাম—'জাভা মানব'। এর বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হলো—'*Pithecanthropus erectus*'। ল্যাটিন ভাষায় দেওয়া এই নামটির বাঙলা অর্থ হলো 'খাড়াভাবে দণ্ডায়মান হতে সক্ষম বনমানুষ-তুল্য মানুষ'। বৈজ্ঞানিকেরা ধারণা করেন, আধুনিক মানুষ অর্থাৎ *Homo sapiens sapiens* বিবর্তিত হয়েছে এই জাভামানব থেকেই, পরবর্তী কালে এর বৈজ্ঞানিক নামকরণ করা হয়েছে *Homo erectus erectus*, যার গণ—Homo, প্রজাতি erectus এবং উপপ্রজাতিও erectus দাঁড়াতে পারে। দেখা যাচ্ছে যে, আধুনিক মানব ও জাভামানব একই গণের অন্তর্ভুক্ত। স্বামীজীর সমসাময়িক কালে সংঘটিত এই আবিষ্কার বিশ্বজুড়ে ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই অভিঘাত তাঁর মননজগতেও নিশ্চয় চিন্তাতরঙ্গের জন্ম দিয়েছিল। এপ্রসঙ্গে তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য ছিল—ভারতবর্ষেও এধরনের আদিম মানুষের অস্তিত্বের নিদর্শনলাভ সম্ভব। স্বামীজীর ধারণা যে কতদূর সত্য, তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রায় এক শতাব্দীকাল অপেক্ষার পর। ১৯৮২ সাল নাগাদ ভারতেও সমধর্মী একটি আবিষ্কার হয় মধ্যপ্রদেশে নর্মদা নদীর তীরবর্তী হাথনোড়া গ্রামে। জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার ভূবিজ্ঞানী অরুণ সোনাকিয়া আবিষ্কার করলেন এক আদিম মানবের ডানদিকের খুলির কিছু ফসিলীভূত অবশেষ, আর সেইসঙ্গে অ্যাচুলীয় গোত্রীয় সংস্কৃতির কিছু পাথুরে অস্ত্রশস্ত্র। মধ্য প্লিস্টোসীন যুগের এই গাঁট্টাগোট্টা অল্প উচ্চতার মানুষটির নাম দেওয়া হলো—'*Homo ecrectus narmadalensis*'। ডাকনামে তা হলো 'নর্মদামানব'। পূর্বে আবিষ্কৃত জাভা-মানবের সঙ্গে একই গণ ও প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত করা হলো তাকে। মানবগণভুক্ত ফসিলীভূত অবশেষ বলতে ভারতে এটিই একমাত্র আবিষ্কার। যদিও অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার নৃ-বিজ্ঞানী ডঃ সাংখ্যায়ন আরো একটি নতুন আবিষ্কারের দাবি করেছেন।[২]

পাথরের অস্ত্রশস্ত্র

আদিম মানুষের বসবাসের নিদর্শন হিসাবে প্রচুর সংখ্যক পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ভারতবর্ষের যেকোন স্থানেই পাওয়ার সম্ভাবনার কথা স্বামীজী উল্লেখ করেছেন। সাধারণভাবে এধরনের কথা বলার ভঙ্গিকে কথার পিঠে কথা মনে হলেও আক্ষরিক অর্থেই ভারতের বহু স্থানেই পাওয়া গিয়েছে প্রচুর সংখ্যায় প্রস্তরায়ুধ। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে আবিষ্কৃত এই পাথরের অস্ত্রশস্ত্রগুলি আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী এই ভূখণ্ডে মানব-বসবাসের নিদর্শনস্বরূপ ছড়িয়ে রয়েছে। বলা যায়, দীর্ঘ সাত লক্ষ বছর ধরে মানব-সংস্কৃতির যে ধারাবাহিকতা ভারতে বর্তমান ছিল, তার দলিল এই প্রস্তরায়ুধগুলি। বিভিন্ন পরিবেশগত ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে সর্বত্র ফসিলীভবনের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ ভারতে বর্তমান ছিল না। তাই সেই অর্থে যথেষ্ট সংখ্যায় মানব-ফসিল আমরা পাইনি। কিন্তু পাথরের অস্ত্রগুলি কালের করাল থাবা এড়িয়ে মানব-অস্তিত্বের উজ্জ্বল সাক্ষ্যের মতো বিরাজ করছে।

প্রাগৈতিহাসিক অস্ত্রের আবিষ্কার প্রসঙ্গে যে উৎখননের (প্রত্নতাত্ত্বিক পরিভাষায় 'excavation') কথা স্বামীজী বলেছেন, সেপ্রসঙ্গে কিছু সংযোজন করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে যে পাথরের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে, অনেকক্ষেত্রেই তার জন্য কোন উৎখনন করার প্রয়োজন হয়নি। বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমিভাগের ওপর (surface findings) এগুলিকে পাওয়া গিয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় মেদিনীপুরের বেলপাহাড়ী অঞ্চলে তারাফেনী নদীতীরবর্তী ভূমিভাগে প্রচুর সংখ্যায় কালো কোয়ার্টজ পাথরের মধ্য-প্রস্তরযুগীয় ক্ষুদ্রাস্ত্র (microliths) সংগৃহীত হয়।[৩] ফাঁকা মাঠ (ডাঙা জমি) ও নদীতীরের উঁচু টিবির ঘাসজমির ওপর যেন খোলামকুচির মতো ছড়িয়ে ছিল ক্ষুদ্রাস্ত্রগুলি। স্বামীজীর বক্তব্য যে কতখানি সত্য তথা

বিজ্ঞানভিত্তিক, তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব্যতীত সম্যক্ উপলব্ধি করা বোধহয় সম্ভব নয়।

বর্তমানে নৃতত্ত্বকে মূলত চারটি শাখায় ভাগ করা হয়—শারীরিক বা জৈবিক নৃবিজ্ঞান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান, প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান এবং ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান। আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যা আলোচনা করলাম তা মূলত শারীরিক বা জৈবিক নৃবিজ্ঞান এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানের পটভূমিতে স্বামীজীর বক্তব্যের মূল্যায়ন। পরবর্তী পর্যায়ে দেখব সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নিয়ে স্বামীজীর চিন্তাভাবনা যেভাবে পল্লবিত হয়েছিল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে তার স্বরূপটি কি প্রকার। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে যে-প্রশ্নটি চলে আসে তা হলো—নৃতত্ত্বের বিভিন্ন শাখায় স্বামীজীর এই যে অজানিত পদচারণা, তা কি সমসাময়িক বিশিষ্ট নৃতাত্ত্বিকদের কথা মনে করিয়ে দেয় না? সেসময়ের প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী—যেমন ফ্রাঞ্জ বোয়া, আলফ্রেড ক্রোবার প্রমুখ নৃবিজ্ঞানের সব শাখায় কম-বেশি লেখালিখি করেছেন। বলা যায় এটা একধরনের যুগবৈশিষ্ট্য, যা স্বামীজীর মধ্যেও প্রতিভাত হয়েছিল। অবশ্য লেখার সংখ্যা বা বিষয়গত দিক দিয়ে কোনভাবেই এদের সঙ্গে স্বামীজীর তুলনা করা হচ্ছে না—হয়তো তা যুক্তিযুক্তও নয়। তাসত্ত্বেও নৃতাত্ত্বিক আলোচনার পরিমণ্ডলে স্বামীজীকে আমরা ভীষণভাবে যুগের সঙ্গে সম্পর্কিত দেখতে পাই।

বর্ণাশ্রম ঃ স্বামীজী কি সমর্থন করতেন?

বর্ণাশ্রম প্রথা একটি বহুমাত্রিক ব্যবস্থা। এর সবটাই খারাপ কিংবা সবটাই ভাল—এরকম কোন নির্দিষ্ট প্রকরণে একে বিভাজিত করা যায় না। স্বামীজীর কাছে এই প্রথা তাই স্বাভাবিকভাবেই একাধিক রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। তিনি এই প্রথার নমনীয়তা লক্ষ্য করেছেন, যা মানুষের উত্তরণের অনুকূল হতে পারে। তাঁর ভাষায় ঃ "জাতিভেদ প্রথা চিরদিনই খুব নমনীয় ছিল; মাঝে মাঝে নিম্নস্তরের জাতিগুলির সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য ইহা একটু অতিরিক্ত নত হইয়া পড়িত।"[৪]

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী শ্রীনিবাস যে 'ব্রাহ্মণায়ন' (Brahmanisation) এবং পরবর্তী কালে 'সাংস্কৃত্যায়ন' (Sanskritization)-এর কথা বলেছেন, তা এক হিসাবে মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন। স্বামীজী নিজের জীবনেও এর জয়গান গেয়েছেন। আর 'Creative India' গ্রন্থে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার যথার্থই স্বামীজীর জীবনদর্শনকে সমাজের 'গতিশীলতার গীতা' (Gita of social mobility) বলেছেন।

অত্যন্ত প্রাচীনকাল থেকেই সাংস্কৃত্যায়নের মতো পদ্ধতি ক্রিয়াশীল ছিল। সেইসঙ্গে বর্ণব্যবস্থা নিম্নবর্ণের মানুষের শিল্পপ্রতিভা স্ফুরণে সহায়তা করেছিল। বৃত্তিগত নিশ্চয়তার কারণে বর্ণাশ্রমের গ্রহণযোগ্যতা আরো বেড়ে যায়। স্বামীজীও বর্ণব্যবস্থার এই বৃত্তিগত স্থায়িত্বের দিকটিতে দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং এটি যে বর্ণব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার অন্যতম কারণ, তাও তাঁর নজর এড়ায়নি। তা বলে জাতিপ্রথায় যে পরিবর্তনের ছোঁয়া ক্রমশ লাগছিল, তা তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। একজায়গায় তিনি লিখছেন ঃ "আধুনিক প্রতিযোগিতা প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কত দ্রুতবেগে জাতিপ্রথা উঠিয়া যাইতেছে।... আর্যাবর্তে ব্রাহ্মণ দোকানদার, জুতাব্যবসায়ী ও শুঁড়ি খুব দেখিতে পাওয়া যায়।"[৫] এই একই নিঃশ্বাসে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পরের অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর বক্তব্য স্মরণ করা যায় ঃ "মুচি চাষি হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ঔষধের দোকান করিতেছে, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, উগ্রক্ষত্রিয় কোথাও চাকরি করিতেছে, কোথাও ছুতারের কারখানা, কোথাও জুতার দোকান খুলিয়াছে।"[৬]

স্বামীজী বৃত্তি পরিবর্তনের কারণ হিসাবে দেখেছেন যে আধুনিক প্রতিযোগিতাকে, অধ্যাপক বসু ব্রিটিশ রাজত্বকালে জাতিপ্রথার পরিবর্তনের কারণ হিসাবে সেই একই ঘটনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ কি চিন্তার সমান্তরাল অভিব্যক্তি, নাকি অধ্যাপক বসু স্বামীজীর চিন্তা দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হয়েছিলেন? যদি প্রভাবিত না হয়ে থাকেন তাহলে বলতে হয়, পরবর্তী কালে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমাজ-বিশ্লেষণের ফলে যে-সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হয়েছিলাম, তা বহু পূর্ববর্তী সময়ে স্বামীজীর অতলান্ত দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। তাই বলা যায়, সময়ের অনেক আগেই এগিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তবে ভারতীয় নৃবিজ্ঞানের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক বসু যে স্বামীজীর চিন্তাভাবনার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, তার একাধিক সাক্ষ্য বর্তমান।

বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার ওপর তাত্ত্বিক আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকে social mobility অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তন বা আরোহণের পদ্ধতিটি। স্বামীজীর মতে, এই আরোহণ কোন জাতির কোন একক ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে না। সামাজিক স্তরক্রমে (social hierarchy) কোন জাতিকে উন্নীত হতে হলে সেই জাতির সমস্ত সদস্যকে উন্নীত হতে হয়। একেই পরবর্তী কালে শ্রীনিবাস বলেছিলেন 'group mobility' (দলগত উত্তরণ), যা ভারতীয় জাতিপ্রথার বৈশিষ্ট্য। এও একধরনের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, যা জাতিপ্রথার অন্তরে নিহিত। এসম্পর্কে স্বামীজী অবহিত ছিলেন। তাই একসময় এই প্রথার বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ "সর্বদা মনে রাখিও, আমাদের সামাজিক প্রথাগুলির উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, পৃথিবীর আর কোন দেশেরই সেরূপ নহে। আমি

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই জাতিভেদ দেখিয়াছি, কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, অন্য কোথাও সেরূপ নহে।"[৭]

এখানে স্বামীজীর বক্তব্যের ওপর কিঞ্চিৎ নৃতাত্ত্বিক টীকা সংযোজন করা যায়। স্বামীজী বলেছেন যে, তিনি পৃথিবীর প্রায় সবদেশে 'caste' দেখেছেন; কিন্তু 'caste' শব্দটিকে সাধারণত যে-অর্থে ব্যবহার করা হয় সেই অর্থে caste শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই দেখা যায়। তবে ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে 'caste' বা জাতি একধরনের 'class' বা শ্রেণী। এই 'class' কিন্তু পৃথিবীর সব দেশেই দেখা যায়। ভারতবর্ষে এই 'class'-এর বৈশিষ্ট্য হলো এখানে তা 'closed class' (বদ্ধ শ্রেণী), যা আসলে 'caste' বা জাতিরই নামান্তর। অন্যান্য দেশে যা দেখা যায়, পরিভাষাগতভাবে তাকে বলা হয় 'open class' (মুক্ত শ্রেণী)। তবে স্বামীজী যে মহনীয়তার কথা বলেছেন তা অনস্বীকার্য।

বর্ণব্যবস্থা তথা জাতিপ্রথার দুর্বলতার দিকগুলিকে স্বামীজী তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। আক্রমণ করেছেন ছুঁতমার্গ ও আচারসর্বস্ব হিন্দুয়ানিকে। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা শুধুমাত্র একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল না, এর অস্তিত্বের মূল আরো গভীরে মানুষের বোধের জগতে প্রোথিত ছিল। তবে পরবর্তী কালে সামাজিক ন্যায়ের ঘাটতি এই প্রথাকে ভিতর থেকে কুরে কুরে জীর্ণ করে দিচ্ছিল। সেইসঙ্গে নব্যতর অর্থনীতির অভিঘাত তো ছিলই। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেনঃ "দুঃখ এইখানে যে, তাঁহারা (ব্রাহ্মণরা) বিজিতকে ঠিক নিজেদের সমান আসন দিতে সমর্থ হন নাই। সেই ভেদবিষে সংশ্লেষমূলক সমাজের দেহ উত্তরোত্তর দুর্বল ও পঙ্গু হইয়া পড়িল।"[৮]

বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে স্বামীজী লিখেছেনঃ "হিঁদুর (এখনকার) ধর্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই—ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। (এখনকার) হিঁদুর ধর্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়—ছুঁতমার্গে।"[৯]

কতখানি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি থাকলে এধরনের মন্তব্য করা যায়! সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় যখন জাতিসম্পর্ক তথা সামাজিক স্তরক্রমে অবস্থান নির্ণয় করা হয়, তখন খাদ্যগ্রহণ সংক্রান্ত বিধিনিষেধগুলিকে বৈজ্ঞানিকভাবে পর্যালোচনা করা হয়। সেইসঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ির বিধিনিষেধের ওপর গড়ে ওঠে স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য ইত্যাদি বিভাগ। খাদ্যগ্রহণ সংক্রান্ত যে-নিয়ম বা বিধি থাকে, তাকে 'commensality' বলা হচ্ছে। তার ওপর ভিত্তি করে জাতিকে বিভাজিত করা হয় শুদ্ধজাতি, জলচল জাতি, অজলচল জাতি—এইভাবে। এইসঙ্গে পঙ্‌ক্তিভোজন বা খাদ্যের আদানপ্রদানকে বিবেচনা করা হয়। তাই সমাজবিজ্ঞানীরা খাদ্যগ্রহণ আদানপ্রদান সম্বন্ধীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে 'স্থিত বৈশিষ্ট্য' (stable character) হিসাবে গণ্য করে থাকেন। "ধর্ম ঢুকেছে ভাতের হাঁড়িতে" একারণে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ।

জাতিপ্রথার বিষময় ফল সম্বন্ধে স্বামীজী এতটাই সচেতন ছিলেন যে, তার সমাধানের উপায় সম্পর্কেও তাঁকে চিন্তান্বিত দেখা যায়। তিনি বলছেনঃ "উচ্চবর্ণকে নিম্ন করিয়া, আহার-বিহারে যথেচ্ছাচার অবলম্বন করিয়া, কিঞ্চিৎ ভোগসুখের জন্য স্ব স্ব বর্ণাশ্রমের মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া জাতিভেদ-সমস্যার মীমাংসা হইবে না; পরন্তু আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যদি বৈদান্তিক ধর্মের নির্দেশ পালন করে, প্রত্যেকেই যদি ধার্মিক হইবার চেষ্টা করে, প্রত্যেকেই যদি আদর্শ ব্রাহ্মণ হয়—তবেই এই জাতিভেদ-সমস্যার সমাধান হইবে।"[১০]

অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতার জাগরণ না ঘটলে আমাদের সমূহ বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। জাতিপ্রথা সেই ধর্মার্থবোধের এক সামাজিক প্রকাশ। ১৯৭০-র দশকে বিশিষ্ট ফরাসী সমাজবিদ্ লুই ডুমো (Luis Dumont) তাঁর 'Homo Hierarchicus' গ্রন্থে ভারতীয় জাতিপ্রথার এই মাত্রাটিকে বিশ্লেষণ করেছেন।

উপরি উক্ত বক্তব্যটির প্রাসঙ্গিক বিস্তার ঘটিয়ে যা বলা যায় তা হলো—জাতিপ্রথাগত সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে তিনি এর সম্পূর্ণ অবলুপ্তি বা যারা উচ্চাসনাসীন তাদের টেনে নামানোর কথা বলছেন না, বরং পিছিয়ে-পড়া মানুষগুলির উত্তরণ ও উন্নয়নের কথা তাঁর বক্তব্যে আমরা পাই। বস্তুত, ভারতবর্ষের মতো কল্যাণকামী রাষ্ট্রের (welfare state) মূল লক্ষ্যও বর্তমানে তাই। রাষ্ট্র এলেই যে রাজনীতির প্রসঙ্গ এসে পড়ে জাতিপ্রথার মধ্যে, সেই রাজনৈতিক উপাদানের অবস্থান তিনি দেখেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেনঃ "জাতিভেদ রাজনীতিক ব্যবস্থাসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।"[১১]

হয়তো স্বামীজীর মনে ক্ষীণ আশা ছিল—জাতিপ্রথার ভাল দিকটি যদি বাস্তবে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে প্রযুক্ত হয়, দেশের পক্ষে তা সৌভাগ্যের সূচনা করবে।

জাতীয় চরিত্র পর্যালোচনা

যদিও বর্তমান নৃতত্ত্বে কোন জাতির জাতীয় চরিত্র পর্যালোচনা (national character study) বিশেষ একটা করা হয় না, তথাপি একসময় জাতীয় চরিত্র পঠন নৃতাত্ত্বিক গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছিল যে, ১৯৪৪ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার 'Office of War Information'-এ নৃতাত্ত্বিক-দের নিয়ে একটি বিভাগ গঠন করা হয়, যার নাম 'Foreign Morale Analysis Section'। এই বিভাগের কাজ ছিল

যুযুধান বিরোধী রাষ্ট্রগুলির সামাজিক ও মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ করা এবং তা থেকে যুদ্ধ কোন্‌দিকে যাবে সেবিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা। প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এই বিভাগের নৃবিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছিলেন, জাপান ১৯৪৫ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে কোন একসময়ে আত্মসমর্পণ করবে। বাস্তবে ঘটেছিল তাই-ই। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে জাপান আত্মসমর্পণ করে। স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তী সময়ে নৃবিজ্ঞানে জাতীয় চরিত্র পঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী রুথ বেনেডিক্টকে এই পদ্ধতি উদ্ভাবনের কৃতিত্ব দেওয়া হয়। ১৯৩৪ সালে একটি গ্রন্থে তিনি আমেরিকার দুটি আদিবাসী গোষ্ঠীকে তাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে দুভাগে ভাগ করেন। স্বামীজীর রচনায়ও কোন জাতিকে এইভাবে তাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে চিহ্নিত করতে দেখি। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধে যে তিনটি জাতির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, সেগুলি ছিল ফরাসি, ইংরেজ ও হিন্দু। তাঁর বক্তব্যে পাই ঃ "রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসি জাতির চরিত্রের মেরুদণ্ড।" "ইংরেজ-চরিত্রে ব্যবসাবুদ্ধি, আদানপ্রদান প্রধান; যথাভাগ, ন্যায়বিভাগ ইংরেজদের আসল কথা।" "হিন্দু বলছেন কি যে, রাজনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতা—বেশ কথা, কিন্তু আসল জিনিস হচ্ছে পারমার্থিক স্বাধীনতা—'মুক্তি'।" অর্থাৎ ভারতীয় চরিত্রের মূলটি নিহিত রয়েছে ধর্মে—একথা নিয়ে হয়তো বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে; কিন্তু একথা কোনমতেই অস্বীকার করা যাবে না যে, ভারতীয়দের জীবনের প্রতিটি পরতে ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে তবেই স্বামীজীর বক্তব্যের তাৎপর্য অনুধাবন করা যাবে।

স্বামীজীর অবদান ঃ
নৃতত্ত্বের কিছু সাম্প্রতিক তত্ত্বের আলোকে

মানব-সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে স্বামীজীর ভাবনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে অধ্যাপক সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন ঃ "স্বামীজীর মধ্যে ঘটেছিল সমাজতত্ত্ববিদ্‌ ও নৃতত্ত্ববিদের যুগ্ম সমাহার, কখনো কখনো তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মনস্তাত্ত্বিকের সুগভীর বিশ্লেষণ।"[১২]

স্বামীজীর পর্যবেক্ষণক্ষমতার অসাধারণত্ব সম্পর্কে আমরা বর্তমান প্রবন্ধে অনেক প্রমাণ পেয়েছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এমনটি হওয়ার কারণ কি? মনে হয় মেধা ও মননের প্রগাঢ়তা ছাড়াও আরো কতকগুলি ব্যাপার ছিল, যাদের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। প্রথমত, স্বামীজী সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেছিলেন। এক বিস্তৃত ভূখণ্ডের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটেছিল। নৃতত্ত্বে যাকে বলে 'ক্ষেত্রসমীক্ষা' তা অনেকাংশে তাঁর জীবনে সম্ভব হয়েছিল। এই বিস্তৃত পরিব্রাজক জীবনে রাজার অট্টালিকা থেকে দরিদ্রের পর্ণকুটির—বিভিন্ন স্থানে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন। ফলে প্রকৃত ভারতবর্ষের চেহারাটি তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছিল। প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী ব্রোনিস্‌ল ম্যালিনস্কি যাকে বলছেন 'Participant observation' (অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ), তার প্রভূত অবকাশ তাঁর জীবনে ঘটেছিল। দ্বিতীয়ত, স্বামীজীর বহুবিস্তৃত পড়াশোনা, বিশেষ করে দর্শন ও ইতিহাসে এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় চিন্তাগত কাঠামটি জুগিয়েছিল। তৃতীয়ত, বিশ্বমনীষার সঙ্গে স্বামীজীর যেভাবে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছিল তাতে তাঁর দৃষ্টিতে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল। চতুর্থত, মানুষের জন্য কিছু করা, মানুষের জন্য অনুভব করা অর্থাৎ 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শ, যা না থাকলে একজন যথার্থ মানববিজ্ঞানী গড়ে ওঠে না—সেই সবকিছুর আদর্শ সমাহার হয়েছিল স্বামীজীর মধ্যে। এপ্রসঙ্গে তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থটির কথা স্মরণ হয়। অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন গোস্বামী লিখেছেন, স্বামীজী যেন তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে বলতে চেয়েছেন যে, কেউ বাইরের দৃষ্টিতে কোন দেশকে বুঝতে পারে না। সহানুভূতির সঙ্গে সেই দেশের একজন হয়ে সে-দেশকে উপলব্ধি করতে হবে—"তাদের চোখে তাদের দেখতে হবে।"[১৩] কোন দেশকে তার সভ্যতা বা সংস্কৃতিকে জানার জন্য 'তাদের চোখে তাদের' দেখার যে-পদ্ধতি, তা এক অর্থে নৃতাত্ত্বিক চিন্তায় সাম্প্রতিক সংযোজন। পরিভাষাগতভাবে একে বলে 'Emic Analysis' বা 'Emic View'। তাই পুনর্বার বলতে হচ্ছে, এক্ষেত্রেও স্বামীজী তাঁর সময়ের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন।

'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত ডঃ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ' প্রবন্ধে সমাজের মৌল প্রকৃতি সম্বন্ধে স্বামীজীর ধারণাকে অংশত প্রকৃতিবাদী (naturalistic), অংশত হিতবাদী (utilitarian) বা উদ্দেশ্যবাদী (purposive) বলেছেন।[১৪] এপ্রসঙ্গে সংযোজন করা যায়, পদ্ধতিগতভাবে স্বামীজী কতকাংশে প্রত্যক্ষবাদী (empiricist) ছিলেন; আবার ভাববাদী (idealistic) ব্যাখ্যার সঙ্গে তিনি মিলিয়েছিলেন বস্তুবাদী বিশ্লেষণ—যাকে পরিভাষাগতভাবে সাংস্কৃতিক বস্তুবাদ (cultural materialism) বলতে পারি। হয়তো একেই বলা যায় 'কার্যে পরিণত বেদান্ত'। ডঃ মুখোপাধ্যায় স্বামীজীর উদ্দেশ্যবাদের দ্যোতক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সমাজের পুনর্নবীকরণের (rejuvination) জন্য স্বামীজী-কথিত সুস্পষ্ট পথনির্দেশিকার কথা বলেছেন। এই পুনর্নবীকরণ প্রকৃতপক্ষে সামাজিক পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের (revivalistic movement) একপ্রকার পূর্বাভাস। একে তাই আমরা 'নিঃশব্দ বিপ্লব' বলতে পারি। তথাকথিত প্রকাশ্য সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে

এর কিছু তফাত অবশ্যই ছিল, কিন্তু তাসত্ত্বেও এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। রোমাঁ রোলাঁ তাঁর 'Prophets of the New India' গ্রন্থে একেই বোধহয় বলেছেন 'মানবজাতির ঐক্য আন্দোলন' (Human Unity Movement)। শুধুমাত্র আন্দোলনের পূর্বাভাস জানিয়েই স্বামীজী নিশ্চেষ্ট হননি, এর ভবিষ্যৎ রূপরেখাটি কি হতে পারে তার বিশ্লেষণ করেছিলেন তিনি। অন্তঃসলিলা এই আন্দোলনের মানবকল্যাণমুখী দিকটি কিভাবে প্রকাশ পাবে সেসম্বন্ধে আমরা স্বামীজীর সুনির্দিষ্ট বক্তব্যর সন্ধান পাচ্ছি। সমাজের সকল সম্পদ শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির হাতে সঞ্চিত থাকলে তা যে শুভ হবে না—এ তিনি বুঝেছিলেন।তিনি লিখছেন ঃ "হৃৎপিণ্ডে রুধির সঞ্চয় অত্যাবশ্যক, তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু। ... সমাজের কল্যাণের জন্য বিদ্যা বা শক্তি... কেবল সর্বত সঞ্চারের জন্য পুঞ্জীকৃত। যদি তাহা না হইতে পায়, সে-সমাজশরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।"[১৫]

এই অসমতার সমাধানে তিনি কী বলছেন? তাঁর লেখা থেকেই উদ্ধৃতি দেওয়া যাক—"যেখানেই যাও, জাতিবিভাগ থাকিবেই। কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, অধিকার-তারতম্যগুলিও থাকিবে। এগুলিকে প্রচণ্ড আঘাত করিতে হইবে।... আর ইহাই আমরা চাই—কাহারো কোন বিশেষ অধিকার নাই, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি করিবার সমান সুবিধা থাকিবে।"[১৬]

আজও ভারতবর্ষে এই অসঙ্গতিকে আমরা দূর করতে পারিনি। কিন্তু সমাজকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ফলবতী করতে হলে স্বামীজীর বক্তব্যের রূপায়ণ আবশ্যক। এমনকি স্বামীজীর তাত্ত্বিক অবস্থান প্রসঙ্গে যে 'কার্যে পরিণত বেদান্ত' বা 'নব বেদান্ত'-এর কথা বলা হয়, তাকে নৃতত্ত্বের পরিভাষায় একধরনের 'বিশ্ববীক্ষা' (world view) বলা যেতে পারে। এই বীক্ষণ না থাকলে মানুষের অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব নয়।

এত কথা বলার পরও স্বামীজীর অবস্থান-নির্ণায়ক স্থানাঙ্কগুলি সম্বন্ধে শেষকথা এখনো বলা যায় না। একজন যুগপুরুষ কালচিহ্নকে তার দেহে কিছু পরিমাণে হলেও ধারণ করেন। কালগত মাত্রা এজন্য জরুরী, আবার তা অন্তিমও নয়। তাই অর্থনীতি, সামাজিক অবস্থা, ইতিহাস এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি—সবকিছুই আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা জরুরী হয়ে পড়ে। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো একটি বহুমাত্রিক সমাজে (plural society), যেখানে এখনো অনেক সংস্কৃতি সভ্যতায় উত্তরণের অপেক্ষায়—এই পরিস্থিতিতে স্বামীজীর বক্তব্যের এই ধরনের মূল্যায়ন হওয়া জরুরী। এধরনের কাজ যে একেবারে হচ্ছে না তা নয়, তবে আরো বেশি হওয়া দরকার। আমাদের বেঁচে থাকার অনেক জটিল প্রশ্নের উত্তর আমরা এর মধ্যে পেতে পারি। ❑

তথ্য সহায়িকা

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ২য় সং, ১৩৭১, পৃঃ ৩৭৭-৩৭৮
২। The emergence of Human Family & Species : The status of Indian fossil evidence in old world scenario—A. R. Sankhyan in 'Abstract' of National Seminar on Man & Environment, March 30-31, 1999, Deptt. of Anthropology, Calcutta University
৩। A preliminary report on prehistoric field work at the middle upper reaches of Tarafeni River Valley, Midnapur, West Bengal—Sumahan Bandyopadhyay; unpublished Msc. Dessertation Department of Anthropology, Calcutta University, 1997
৪। 'বাণী ও রচনা', ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৮
৫। ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২য় সং, ১৩৭১, পৃঃ ৩৮৪
৬। হিন্দু সমাজের গড়ন—নির্মলকুমার বসু, বিশ্বভারতী, ১৩৯১, পৃঃ ১২৩
৭। 'বাণী ও রচনা', ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৮৯
৮। হিন্দু সমাজের গড়ন, পৃঃ ১৫০
৯। 'বাণী ও রচনা', ৭ম খণ্ড, ৩য় সং, ১৩৮০, পৃঃ ১০৯
১০। ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৮৭
১১। ঐ, ৯ম খণ্ড, ৩য় সং, ১৩৮০, পৃঃ ৪৯৩
১২। স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতবর্ষের লোকজীবন—সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ', ১৯৮৮, পৃঃ ৬৭৪
১৩। স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'—চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, 'উদ্বোধন', ৭০তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৭৪, পৃঃ ৯৩
১৪। 'উদ্বোধন', ৭৩তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৭৮, পৃঃ ৩৭১
১৫। 'বাণী ও রচনা', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৩৫
১৬। ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৮

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ৮

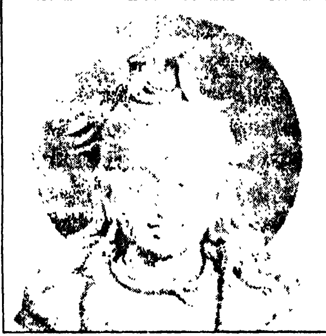
পাশাপাশি ঃ (২) সচ্চিদানন্দ, (৫) নাচ, (৬) ভক্তি, (৮) নতুন, (১০) বাবা, (১২) পাঁজি, (১৪) সীতা, (১৫) হিয়া, (১৬) কানে, (১৭) নাম, (১৯) মন, (২০) বাঘ, (২৩) আরশি, (২৫) সিদ্ধ, (২৭) আল, (২৮) সারদানন্দ।

ওপর-নিচ ঃ (১) কাঁচ, (২) সখ্য, (৩) নরুন, (৪) শক্তি, (৫) নাশ, (৬) ভয়, (৭) দাবা, (৯) তুলসী, (১১) বেয়ান, (১২) পাঁকাল, (১৩) জিনে, (১৫) হিম, (১৮) ময়ূর, (২১) ঘড়ি, (২২) বন্ধ, (২৩) আচার, (২৪) মাল, (২৫) সিদ্ধি, (২৬) সন্দ, (২৭) আড়া।

শব্দচেতনা ৮-এর সঠিক উত্তরদাতার নাম ঃ
অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়, রুণা রায়চৌধুরী ও মালতী মুখোপাধ্যায়।

জ্যোতির্লিঙ্গ বৈদ্যনাথেশ্বর

স্বামী অচ্যুতানন্দ



ইতিপূর্বে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে বিশ্বনাথ, কেদারনাথ, সোমনাথ, নাগেশ্বর, ত্র্যম্বকেশ্বর, ঘৃষ্ণেশ্বর, ভীমাশঙ্কর এবং মহাকাল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবার জ্যোতির্লিঙ্গ বৈদ্যনাথেশ্বর।—লেখক

লাটুরের ভূমিকম্পবিধ্বস্ত হরেগাঁও অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ দেখতে গিয়ে শুনেছিলাম কাছাকাছি দুটি জ্যোতির্লিঙ্গ আছে। একটি ঔড্রা নাগনাথ, অন্যটি পারলি বৈদ্যনাথ। একদিন জেলা সদর লাটুরে একটি বিশেষ কাজে যাওয়ার সময়ে ক্যাম্পের সহকারী এক সাধুকে অনুরোধ করেছিলাম, পারলি বৈদ্যনাথ কি আজ দর্শন করা সম্ভব? তিনি অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়ে জানিয়েছিলেন, অবশ্যই, কারণ ঐ অঞ্চলের বীড জেলায় এক কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে তাঁর দেখা করা প্রয়োজন। সুতরাং এক পথে দুই কাজই হবে।

সেইমতো একটা জিপে আমরা দুজন সাধু ও একজন কর্মী দুপুরে হরেগাঁও ক্যাম্প থেকে বেরলাম। লাটুরের আগে পর্যন্ত মাঝে মাঝে পথের দুদিকে বিগত ভূমিকম্পের ধ্বংসের চিহ্ন, আর তারই মাঝে নতুন করে গড়ে তোলা ঘরবাড়ি, নতুন মেরামত করা ঝকঝকে প্রশস্ত রাস্তা। ত্রাণের মালপত্র যাতে দ্রুত যথাস্থানে পৌঁছে যেতে পারে সেইজন্য সরকারি প্রচেষ্টায় এইসব রাস্তা মেরামত করা হয়েছে। আমাদের গাড়ি এই সুন্দর রাস্তায় ছুটে চলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লাটুর শহরে পৌঁছেছি। সেখানকার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে আমরা রওনা দিলাম অম্বেজোগাই-এর পথে। এটি বীড জেলার মধ্যে পড়ে। দূরে দূরে পাহাড়। সবুজ গাছপালায় ঢাকা। তুলো, আখ আর সূর্যমুখীর খেত মাঝেমাঝে দুপাশে সরে যাচ্ছে। আধুনিক বাড়িঘর, তার সঙ্গে গ্রামের ঘরবাড়িও।

বিকাল প্রায় চারটার সময় এসে পৌঁছালাম এই অঞ্চলের বিখ্যাত শক্তিপীঠ অম্বেজোগাই মন্দিরে। এটি বীড জেলায়। এখান থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে বৈদ্যনাথ মন্দির। লাটুর থেকে বীড ৪০ কিলোমিটার। রাস্তার নামও —অম্বেজোগাই রোড। রাস্তা থেকে একটু নেমে মায়ের প্রাচীন মন্দির। বিশাল তোরণ পার হয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। এই মন্দির দেবী যোগেশ্বরীর। অম্বা অর্থাৎ মা, আর যোগেশ্বরী থেকে 'যোগেই'। আদর করে মাকে এই নামে ডাকা হয়। কিংবদন্তি, এই যোগেশ্বরী দেবীর সঙ্গে পারলি বৈদ্যনাথের বিয়ে হওয়ার কথা হয়েছিল। কিন্তু বরযাত্রী দেবীর মন্দিরে পৌঁছানোর আগেই বিয়ের লগ্ন পার হয়ে যায়। বরযাত্রীরা সব পাথর হয়ে যায়। আর ওদিকে পারলি থেকে কিছু দূরে দেবী অম্বেজোগাই অপেক্ষারতই থেকে যান।

আমরা যোগেশ্বরী দেবীকে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে এসে ডানদিকের রাস্তা ধরে প্রায় আধঘণ্টা যাওয়ার পর পারবনি জেলার মধ্য দিয়ে এসে পৌঁছালাম একটি ছোট টিলার কাছে। রাস্তা থেকে টিলাতে ওঠার সিঁড়ি আছে। গাড়ি একটু ঘুরে একটি বিরাট তোরণের ভিতর দিয়ে একপাশে গাড়ি রাখার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। গোটা মন্দিরপ্রাঙ্গণ দুর্গের মতো খুব উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মনে হয় মুঘল আমলের বিদেশী লুণ্ঠনকারীদের হাত থেকে মন্দিরকে রক্ষা করার জন্য এইরকম দুর্গাকৃতি মন্দির করা হয়। পাথরের প্রাচীরঘেরা চত্বরে হলুদ রঙ করা পাথরের মন্দির। পারলি গ্রামের প্রান্তে এই সুন্দর বিরাট মন্দির ও প্রাচীরের চারদিকে চারটি দ্বার। ভিতরেও প্রশস্ত অঙ্গন। তার মাঝখানে গর্ভমন্দির ও নাটমন্দির। মন্দিরের বাইরে সামনেই একটি বেশ বড় দীপস্তম্ভ আছে, যেটি মহারাষ্ট্রের বেশির ভাগ মন্দিরেই দেখা যায়। পাথরের একটি স্তম্ভের গায়ে অনেক খাঁজ কেটে প্রদীপ তৈরি করা হয়েছে। প্রতি সন্ধ্যায় এখানে প্রদীপ জ্বালানো হয়। প্রধান দরজার সামনে একটি মিনার আছে, তাকে 'প্রাচী' বা 'গবাক্ষ' বলে। এই স্তম্ভের একটি বৈশিষ্ট্য শুনলাম—প্রতি আশ্বিন ও চৈত্র মাসের একটি বিশেষ দিনে সূর্যোদয়ের সময় সূর্যের প্রথম কিরণ এই মিনারের গবাক্ষপথে সোজা এসে বৈদ্যনাথের লিঙ্গমূর্তির ওপর পড়ে। আমরা বেশ কিছু সিঁড়ি ভেঙে ওপরে এসেছি। খুব উঁচু উঁচু ধাপ। একে এদেশে 'ঘাট' বলে। প্রাচীন এই ঘাট ১১০৮ শকাব্দে (১১৮৬ খ্রিস্টাব্দে) তৈরি করা হয়—একটি প্রাচীন লিপিতে লেখা আছে।

এখানকার আরেকটি বৈশিষ্ট্য—নাটমন্দির ও গর্ভমন্দির একই সমতলে অবস্থিত। সেজন্য দূর থেকে শিবলিঙ্গ দর্শন করা যায়। সচরাচর গর্ভগৃহ একটু নিচু ও লিঙ্গ কোন কুণ্ডমধ্যে থাকায় দূর থেকে দর্শন করা সম্ভব হয় না। প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু এই মন্দিরের সিলিং ও চূড়া মোটা মোটা কাঠ দিয়ে তৈরি। দেখেই বোঝা যায় বেশ প্রাচীন।

আমরা দূর থেকেই লিঙ্গমূর্তি দর্শন করতে করতে গর্ভমন্দিরের কাছে এলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। মন্দিরের ভিতর খুব বেশি বড় নয়। আর লিঙ্গও বেশি বড় নয়—এক-দেড় ফুট হবে। কালোপাথরের চকচকে লিঙ্গ। তখন শৃঙ্গার হয়ে গিয়েছে। একটু পরেই আরতি হবে। বেশ বড় রুপোর সাপের ফণা মাথার ওপরে লিঙ্গকে বেষ্টন করে আছে। প্রবাদ, এই লিঙ্গ নাকি শালগ্রাম শিলার তৈরি। লিঙ্গের চারকোণে চারটি বড় বড় জাগপ্রদীপ জ্বলছে। তাতেই দর্শন হয়। এককোণে দেবী পার্বতীর মূর্তি। আমরা রিলিফ ক্যাম্প থেকে আসছি, সেজন্য সঙ্গে জল-ফুল-বেলপাতা কিছুই আনতে পারিনি। তাই পূজারীজীর কাছ থেকে ঘটিতে জল চেয়ে নিয়ে শিবের মাথায় দিয়ে প্রাণভরে স্পর্শ করে প্রণাম জানালাম দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম বৈদ্যনাথেশ্বরকে—"পূর্বোত্তরে প্রজ্জ্বলিকানিধানে সদা বসন্তং গিরিজাসমেতম্/ সুরাসুরারাধিতপাদপদ্মং শ্রীবৈদ্যনাথং তমহং নমামি।"—যিনি পূর্বোত্তর দিশায় চিতাভূমি শ্মশানে সর্বদা পার্বতীর সঙ্গে বিরাজিত, দেবতা-দানব সকলের দ্বারা সর্বদা পূজিত যাঁর শ্রীচরণকমল, সেই শ্রীবৈদ্যনাথকে প্রণাম।

কিছুক্ষণ এককোণে দাঁড়িয়ে একটু ভাল করে দর্শন ও একটু জপ করে বেরিয়ে এলাম। এবারে আরতি হবে, তার যোগাড় হচ্ছে। সমস্ত গর্ভমন্দির আবার ধুয়ে ফেলা হলো। তারপর গৌরীপট্টের চারিদিক ঘিরে পাঁচজন পূজারী বসলেন, সব আরতির উপকরণ সাজিয়ে দেওয়া হলো। বিরাট ঘণ্টা-ঝাঁজ-ডমরু ও জয়ঢাকের বাজনার তালে তালে শিব-আরাত্রিক স্তোত্রের সঙ্গে আরতি আরম্ভ হলো। সমস্বরে পুরোহিত ও উপস্থিত ভক্তেরা গাইতে লাগলেন—"জয় শিব ওঙ্কারা হর শিব ওঙ্কারা। ব্রহ্মা বিষ্ণু সদাশিব অর্ধাঙ্গী ধারা/ জয় শিব ওঙ্কারা।... ত্রিগুণ স্বামী কী আরতি/ জো কোঈ নর গাবে/ ভগত শিবানন স্বামী/ মনবাঞ্ছিত ফল পাবে।" প্রায় একঘণ্টা ধরে দীর্ঘ আরতি চলল। আমরাও সেই অপূর্ব আরতি দর্শন করে বাইরে এলাম। প্রণাম জানালাম—"বৈদ্যানাং পূজিতং সত্যং লিঙ্গমেতৎ পুরাতনম্/ বৈদ্যনাথমিতি খ্যাতং সর্বকামপ্রদায়কম্।।"—বৈদ্যদের পূজিত অতি প্রাচীন এই লিঙ্গ 'বৈদ্যনাথ' নামে খ্যাত। যিনি সকল কামনা পূর্ণ করেন, তাঁকে আবার প্রণাম।

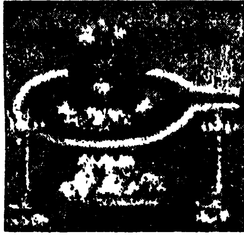
আমার সঙ্গী মারাঠি সাধুটির কাছে জানতে চাইলাম, এই অদ্ভুত মন্ত্রটির তাৎপর্য কি, আর 'বৈদ্যনাথ' নামটিই বা কেন? তিনি আমাকে বললেনঃ "এই মন্দিরের বিশেষত্ব অনেক। প্রধান হচ্ছে—এখানে প্রবেশপথে গণেশজীকে দর্শন করে ঢুকতে হয়। আমরা ঢোকার পথে বাঁদিকে শুধু দূর থেকে দর্শন করেই এসেছি। এখন চলুন আগে তাঁকে দর্শন করি তারপর একে একে সব বলছি। এই যে দেখছেন বিরাট গণপতি বিগ্রহ লাল সিঁদুর মাখানো, এঁর মুখখানি দেখুন। শুঁড় অতি সামান্য। ইনি বিঘ্নবিনাশন—এই মন্দিরের রক্ষাকর্তা। ভক্তদেরও সর্ব বিপদ্‌ভঞ্জক ও সিদ্ধিদাতা। এঁকে প্রণাম করা এই তীর্থে অবশ্যকর্তব্য।

"এখন মন্দিরের কথা কিছু শুনুন। দক্ষিণ ভারতের কন্যাকুমারী থেকে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী পর্যন্ত একটি সরলরেখা টানলে তার ঠিক ওপর পারলি গ্রাম। প্রবাদ, এই গ্রাম মেরুপর্বত বা নাগনারায়ণ পর্বতের ঢালে অবস্থিত। পুরাণে এই গ্রাম 'কান্তিপুর', 'মধ্যরেখা', 'বৈজয়ন্তীক্ষেত্র'—এই সব নামেও অভিহিত হয়েছে। এখানে শিব-পার্বতী একসঙ্গে বিরাজ করেন। তাই এই স্থানকে কাশীক্ষেত্রের সমান মর্যাদা দেওয়া হয়। পারলি গ্রাম খুবই স্বাস্থ্যকর। এখানে একটি বেশ বড় তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র আছে। আর এই পারলি গ্রামের পাহাড়ী অঞ্চল ও নদীর আশপাশে এখনো নানাধরনের বনৌষধি আছে, যা আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। প্রবাদ, প্রাচীনকাল থেকেই বৈদ্যরা এই ঔষধি ব্যবহার করতেন আর সেই জঙ্গলমহালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বৈদ্যদের দ্বারাই তখন পূজিত হতেন। তাই এই শিবলিঙ্গ 'বৈদ্যনাথ' নামে প্রচারিত হন। ভগবান নারায়ণ সমুদ্রমন্থনের পর সংগৃহীত অমৃতকুম্ভ এখানে এই লিঙ্গের পিছনে লুকিয়ে রাখেন। তাঁর অনুসরণকারী দানবেরা এই লিঙ্গকে স্পর্শ করতে গিয়ে লিঙ্গ থেকে নির্গত জ্যোতিতে তড়িতাহত হয়ে ফিরে যায়। কিন্তু ভক্তেরা এই লিঙ্গ স্পর্শ করলে পবিত্র হয়ে যায়। তাই এই লিঙ্গের অন্য নাম 'ধন্বন্তরী' বা 'অমৃতেশ্বর'। আবার দেবতাদের জয় হয় অমৃতলাভে, তাই এখানকার নাম 'বৈজয়ন্তীতীর্থ'।

"এই মন্দির যা দেখছেন, এর প্রাচীন অবস্থার জীর্ণোদ্ধার হয় ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে। পরে হোলকার রানী অহল্যাবাঈ এর বর্তমান রূপটি দেন। পারলির কাছেই ত্রিশূলাদেবী পাহাড় থেকে পাথর এনে এই মন্দির ও দুর্গপ্রাকার তৈরি করিয়ে দেন। নাটমণ্ডপটি তৈরি করান শ্রীরামরাও নানা দেশপাণ্ডে স্থানীয় গ্রামের কারিগরদের সাহায্যে। তাঁর স্মৃতিতে মন্দিরের পাশে রামরাজেশ্বর মহাদেবের একটি মন্দিরও আছে। এই তীর্থ বীরশৈব লিঙ্গায়েত গোষ্ঠীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ। এই মন্দির পরিচালনার জন্য শ্রীমন্ত পেশবা অনেক জমি-জায়গা দান করে একটি ট্রাস্ট করে দিয়েছেন। তাঁরাই এখন মন্দিরের সেবাপূজার কাজ দেখাশোনা করেন। এই তীর্থের অন্য নাম 'হরিহরতীর্থ', এখানে একাধারে যেমন শিবশক্তি, তেমনি

হরিহরেরও মিলন স্থান। বৈদ্যনাথের পূজায় সেজন্য বিশেষ তিথিতে বেলপাতার সঙ্গে তুলসীপাতাও দেওয়া হয়। আবার পাশের নারায়ণ-মন্দিরে বেলপাতাও দেওয়া যায়। পাশের হরিহর কুণ্ডের জল দিয়েই বৈদ্যনাথের পূজা হয়। এটি এখানকার অন্যতম বিশেষত্ব। শ্রাবণ মাসে ও প্রতি সোমবার এখানে বিরাট উৎসব হয়। এই গাড়ির রাস্তা ছাড়া এখানে আসতে হলে মহারাষ্ট্রের সাউথ সেণ্ট্রাল রেলওয়ের পার্বনি স্টেশনে নেমে গাড়ি বদলে পারলি বৈজনাথ স্টেশনে আসা যায়। এই মন্দিরের আশপাশে আরো অনেক মন্দির আছে। —প্রাচীন রামমন্দির, গোপীনাথ, দত্তাত্রেয়, মা কালী, শনিরাজ, বিঠ্ঠলদেব, ভেঙ্কটেশজী, বালাজী ইত্যাদি।"

মন্দিরের বাইরে এসে তীর্থভূমি পারলিকে প্রণাম জানিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। রাত্রি হয়ে গিয়েছে। চারিদিক অন্ধকার। মাঝেমধ্যে আলো জ্বলছে কিছু বাড়িতে। দূরে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রের আলোর মালা পাহাড়ের গায়ে। আমাদের গাড়ির ভিতরে অন্ধকার। তারই মধ্যে বসে সহযাত্রী আমাকে শোনাতে লাগলেন শ্রীবৈদ্যনাথক্ষেত্রের তীর্থমাহাত্ম্য।



মহারাষ্ট্রের বৈজনাথ শিবলিঙ্গ



দেওঘরের বৈদ্যনাথ শিবলিঙ্গ

"এই বৈদ্যনাথক্ষেত্রকে কেউ বলেন 'বৈজনাথ'—আগে তাঁর কথা শুনুন। বিখ্যাত শৈব ব্রাহ্মণ সাধক দশানন রাবণ একবার তাঁর রাজ্য লঙ্কাতে তাঁর আরাধ্য দেবতা দেবাদিদেব মহাদেব নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠিত করতে মনস্থ করলেন। তিনি সোজা কৈলাসে গিয়ে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। পাহাড়ের গায়ে একটি কুণ্ড করে তাতে অগ্নি স্থাপন করে হোম শুরু করলেন। দীর্ঘ তপস্যাতেও যখন মহাদেবের দর্শন মিলল না, তখন নিজের মাথা কেটে সেই হোমে আহুতি দিতে লাগলেন। একে একে নয়টি মাথা আহুতি দেওয়ার পর দশমটির ক্ষেত্রে স্বয়ং মহাদেব আবির্ভূত হয়ে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করে বর দিতে চাইলেন। রাবণ বললেন, 'হে প্রভু, আমি চাই তুমি স্বয়ং আমার রাজ্যে চল, আমি সেখানে প্রাণভরে তোমার সেবাপূজা করব।' শিব তাঁর তপস্যা ও প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে তাঁর নয়টি মাথা স্বস্থানে জোড়া লাগিয়ে দিয়ে তাঁকে বললেন, 'তাই হবে। তুমি আমার এই আত্মলিঙ্গটি নিয়ে গিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠা কর, আমি তাঁতেই অধিষ্ঠিত থেকে সকলের কল্যাণ করব। তবে একটি কথা, আমার লিঙ্গটি নিয়ে যাওয়ার সময়ে তুমি পথে এঁকে কোথাও মাটিতে রাখতে পারবে না। তাহলে কিন্তু এঁকে আর তুলতে পারবে না।' এইসময় দেবী পার্বতী রাবণকে বললেন, 'তুমি শিবলিঙ্গ স্পর্শ করার আগে স্নান ও আচমন করে পবিত্র হয়ে তারপরে নিয়ে যাও।' রাবণ যথাবিধি স্নান-আচমনাদি করে শিবপার্বতীকে প্রণাম করে সেই আত্মলিঙ্গকে কাঁধে নিয়ে লঙ্কার পথে রওনা হলেন। দেবতারা প্রমাদ গণলেন—শিব যদি লঙ্কাপুরীতে অধিষ্ঠিত হন, তবে তো রাবণ-বিনাশ হবে না! তাই শিব যাতে লঙ্কায় না যেতে পারেন তার ব্যবস্থা করার জন্য তাঁরা কৌশল করলেন। স্বয়ং নারায়ণ, কোন মতে ইন্দ্র, আবার কোন মতে গণেশ—এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধরে এই পারলি গ্রামের কাছে এসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ওদিকে রাবণ এই গ্রামের কাছে এসে দারুণ প্রকৃতির বেগ অনুভব করতে লাগলেন দৈবী মায়ার প্রভাবে! ঐ যে মা পার্বতী রাবণকে রওনা হওয়ার আগে আচমন করতে বলেছিলেন, সেই আচমনের সময় তিনি গঙ্গা-যমুনাকে রাবণের পেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। এখন এখানে এসে স্বর্গের নদীরা রাবণের শরীর থেকে বাইরে আসার জন্য পেটের ভিতর তুমুল তোড়জোড় আরম্ভ করল। বিপন্ন রাবণ সেই বেগধারণে অসমর্থ হয়ে দেখলেন—কাছেই এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে। কোনরকমে তাঁর হাতে লিঙ্গটি দিয়ে বললেন, 'দেখো, এঁকে মাটিতে নামিও না, আমি একটু পরেই তোমার হাত থেকে এঁকে নেব।' এই বলে একটু নিরিবিলিতে গিয়ে বসলেন। কিন্তু দৈবী মায়ায় তাঁর ক্রিয়া আর শেষ হতে চায় না। এই স্রোতোধারায় একটি নদীর সৃষ্টি হয়ে গেল। ওদিকে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাতর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'আমি তো আর এই ভার বইতে পারছি না। দুর্বল বৃদ্ধ মানুষ আর কতক্ষণ ধরে থাকব। তাড়াতাড়ি এস।' কিন্তু রাবণের তখন সঙ্গীন অবস্থা। বাধ্য হয়ে ব্রাহ্মণ সেখানেই শিবলিঙ্গকে রেখে চলে গেলেন। রাবণেরও ক্রিয়া তখন সমাপ্ত। উঠে এসে হাত-পা ধুয়ে দেখেন, সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নেই। শিবকে তুলতে গিয়ে দেখেন, শিব সুপ্রোথিত হয়ে গিয়েছেন সেখানে। তখন দৈববাণী হলো—'আর তো আমাকে পাবে না, তুমি কথা রাখতে পারলে না।' রাবণ রেগে গিয়ে ফিরে গেলেন লঙ্কায়। আর এই অরণ্য অঞ্চলে এই লিঙ্গকে প্রথম দেখলেন এক ভীল, নাম তার 'বৈজু'। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করে এই জ্যোতির্লিঙ্গের পূজা করলেন। তাই এর নাম হলো 'বৈজনাথ'।

"এছাড়া এই পারলি বৈজনাথ বা বৈদ্যনাথের আরেকটি সুপ্রচলিত কাহিনী আছে। সমুদ্রমন্থনের সময় মন্থনরজ্জু হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় নাগরাজ বাসুকীর শরীরের অস্থিগুলি চূর্ণপ্রায় হয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন

নীলকণ্ঠ মহাদেব তাঁর প্রিয় নাগরাজ বাসুকীকে এখানে এই ভেষজ বনৌষধিপূর্ণ স্বাস্থ্যকর পাহাড়ে নিয়ে এসে কৃপা করেন ও সারিয়ে তোলেন। তাঁর সেরে ওঠার পরে শিব ফিরে যেতে চাইলে নাগরাজ বাসুকী প্রার্থনা করেন, তিনি যেন এইরকম জগৎকল্যাণে এইখানেই বিরাজিত থাকেন। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে শিব তখন কৈলাস থেকে তাঁর একটি আত্মলিঙ্গ এখানে এনে প্রতিষ্ঠা করতে বলেন। কিন্তু বাসুকীর দুই কন্যা—পার্বলি ও পারলি চাইলেন শিবকে তাঁদের নিজেদের প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে। বিপন্ন বাসুকী আবার ছুটলেন কৈলাসে, সেখানে মহাদেব তাঁকে আরো একটি লিঙ্গ দিলেন। একটি থাকল এই পারলিতে, অন্যটি বৈদ্যনাথধামে। এখানে কন্যা পারলি খুব ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে শিবের পূজা করতে লাগলেন। অন্তিমে শিব কৃপা করে তাঁকে সাযুজ্য মুক্তি দিলেন। পারলি শিবের সঙ্গে লীন হয়ে গেলেন। সেই থেকে এই গ্রামের নাম হলো 'পারলি', আর ভগবানের নাম হলো 'পারলি বৈদ্যনাথ'। শিব বৈদ্যের কাজ করেছিলেন বলেও শিবের নাম হলো 'বৈদ্যনাথ'। তাই শাস্ত্রে বলা হচ্ছে—'বৈদ্যনাথেশ্বরং নাম্না লিঙ্গং ব্যাধিবিনাশনম্/ প্রসিদ্ধং ত্রিযুলোকেযু ভুক্তিমুক্তিপ্রদং সতাম্।। জ্যোতির্লিঙ্গমিদং শ্রেষ্ঠং দর্শনাৎ পূজনাদপি/ সর্বপাপহরং দিব্যং ভক্তিবর্ধনমুত্তমম্।। শরীরং দুর্লভং প্রাপ্য বৈদ্যনাথস্য দর্শনম্/ ন করোতি নরো যস্তু জন্ম তস্য নিরর্থকম্।।'

"এছাড়াও প্রায় এইরকম আরেকটি কাহিনী বলে প্রসঙ্গ শেষ করছি। রাবণ শিবের কৃপায় অনন্ত শক্তি লাভের আশায় কৈলাসে তপস্যা করার সময় যখন নিজের মাথা কেটে হোম করছিলেন, তখন শিব আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বরদান করে তাঁর মাথা সব জোড়া লাগিয়ে দিলেন এবং অতুল বলের অধিকারী হওয়ার আশীর্বাদও করলেন। শিব নিজের প্রতিনিধি এই বৈদ্যনাথ লিঙ্গকে দান করলেন। রাবণ মদমত্ত হয়ে শিবলিঙ্গকে নিয়ে হুঙ্কার দিয়ে লঙ্কার পথে যাত্রা করলে দেবতারা শঙ্কিত হয়ে নারদকে ধরলেন একটা বিহিত করতে। নারদ অভয় দিয়ে যে-পথে রাবণ লঙ্কায় যাচ্ছেন সেই পথে বীণা-হাতে দাঁড়িয়ে থাকলেন। রাবণ দ্রুতগতিতে সেখানে হাজির হলে নারদ তাঁকে থামিয়ে বললেন, 'কোথা থেকে আসছ মহাবীর রাবণ, তোমার কাঁধে ওটা কি? তোমাকে খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছে—ব্যাপারখানা কি?' মনের আনন্দে রাবণ তাঁর তপস্যা, বরলাভ ও শিবপ্রাপ্তির কথা সব নারদকে বলে ফেললেন।

"এই কথা শুনে নারদ বললেন, 'রাবণ তুমি একেবারে মহামূর্খ, নির্বোধ! আমি তোমার হিতৈষী, ভাল কথা বলছি —লিঙ্গকে এখানে রেখে তুমি ফের কৈলাসে যাও। শিব পাগল ভোলানাথ, গাঁজার নেশায় কি বলে কিছু ঠিক নেই, তোমাকে কি বলেছে—"অয়ং বৈ মত্ততাং প্রাপ্তঃ কিং কিং দেব ব্রবীতি চ"। অতএব তুমি কৈলাসে গিয়ে তোমার বল কতদূর বেড়েছে তা পরীক্ষা করার জন্য পুরো কৈলাস পর্বতকে তুলে আবার ফের বসিয়ে দিতে যদি পার, তাহলে বুঝব তোমার ঠিক ঠিক বরলাভ হয়েছে। যাও, শিগ্গির যাও।' মদগর্বিত আসুরিকবুদ্ধি রাবণ আবার কৈলাসে ফিরে গিয়ে পুরো কৈলাসকে উপড়ে তুলে ধরলেন। ফলে শিবপার্বতীর আসন টলতে লাগল। শিব চিন্তিত হয়ে 'কিং জাতং, কিং জাতং'—কি হলো, কি হলো বলাতে পার্বতী বললেন, 'তোমার কীর্তিমান শিষ্যেরই কাণ্ড এটি।' শিব তখন রেগে গিয়ে রাবণকে অভিশাপ দিলেন, 'শীঘ্রঞ্চ তব হস্তানাং দর্পঘ্নশ্চ ভবিষ্যন্তি'—শিগ্গিরই তোমার বাহুগর্ব নাশকারী পুরুষ আবির্ভূত হবে। এইভাবে রাবণের দর্প নাশ করে শিব এই স্থানে রাবণের রেখে যাওয়া লিঙ্গে 'বৈদ্যনাথ' নামে অধিষ্ঠিত হলেন।" আমাদের পারলি বৈদ্যনাথ স্মরণকথা শেষ হতে হতেই আমরা হরেগাঁও ক্যাম্পে প্রায় এসে গেলাম।

এরপরে আমার আরেকটু কথা ছিল, সেটি তাঁকে বললাম। এই পারলি বৈদ্যনাথকে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম হিসাবে বলা হয়—'পরল্যাং বৈদ্যনাথং'। কিন্তু এখনো অনেক ভক্ত আছেন যাঁরা মনে করেন ঝাড়খণ্ডের বৈদ্যনাথধামে যে বৈদ্যনাথ আছেন—তিনিও এই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। সেখানকার পাণ্ডা-পুরোহিতরাও এই কথা বলেন। সেখানকার লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও ঐ রাবণঘটিত কাহিনী। তাই এখানেও তাঁর নাম 'রাবণেশ্বর বৈদ্যনাথ' বা 'ভীল বৈজু'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। এখানে প্রোথিত হওয়ার সময় তাঁর লিঙ্গদেহ পৃথিবীর ওপরে মাত্র অষ্টাঙ্গুলি পরিমাণ বাইরে ছিল। আজও এই লিঙ্গ মাত্র আট আঙুল উঁচু। আর বৈজু নামে যে ভীল এঁর প্রথম পূজা করেন, তিনি দ্বাপরে অর্জুন হয়ে জন্মগ্রহণ করেন ও শিবের কৃপায় কৃষ্ণের সহায়তায় পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন। ঐ বৈজুর নাম থেকে এদেশের লোকেরা কখনো 'বৈজনাথ' বা 'বৈদ্যনাথ' নামে এই শিবকে পূজা করেন। আর শিবের পূজার জন্য এখানে তখনি একটি কূপ খনন করে সেখানে মন্ত্রপাঠপূর্বক সর্বতীর্থকে আবাহন করা হয়। নাম তার 'চন্দ্রকূপ'। আজও সেই চন্দ্রকূপের জল পবিত্র বারি হিসাবে শিবের পূজায় লাগে। দেওঘর শহরের সীমান্তে সেই বৈজু ভীলের স্মরণে একটি মন্দির এখনো আছে। এই দেবগৃহ বৈদ্যনাথধামই 'দেওঘর বৈদ্যনাথ' বলে প্রসিদ্ধ। এটি পূর্বাঞ্চলের ভক্তসাধারণের বহু পরিচিত, তাই এই তীর্থের বিস্তারিত বিবরণ আর দেওয়া হলো না।

সারা রাস্তা এই তীর্থমাহাত্ম্য স্মরণ করতে করতে এসে আবার তাঁর উদ্দেশে প্রণাম জানালাম—"শিবেতি চন্দ্রচূড়েতি শঙ্করেতি হরেতি চ/ পার্বতী প্রাণনাথেতি বদ জিহ্বে নিরন্তরম্।।" ❏

রামকৃষ্ণ নাম

সলীল বিশ্বাস

কামনা-মদির বাসনাকলুষ ভোগবন্ধন হতে
দীপ্রজাগর সত্যমন্ত্র রামকৃষ্ণ নাম,
বিষাদবিধুর তাপপীড়িত দিনযাপনা থেকে
মুক্তিকল্প শক্তিমন্ত্র রামকৃষ্ণ নাম।

খল-অবিদ্যা অপরাপরতা মায়ালাঞ্ছনা হতে
প্রমাদীপনার বোধনমন্ত্র রামকৃষ্ণ নাম,
অযোগযাপিত অবর[illegible] অবোধিমারণ থেকে
ঋতপ্রেক্ষার জ্যোতির্মন্ত্র রামকৃষ্ণ নাম।

অনাশঋদ্ধ আত্মজ্ঞানের বন্ধশাতনবহ্নি
পরাচেতনার চেতনামন্ত্র রামকৃষ্ণ নাম,
পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর শক্তিপরাত্মিকা
অমৃতাত্মন নিত্যসত্য রামকৃষ্ণ নাম।

মহান আত্মা বিবেকানন্দ—তোমাকে

অনুপম বরাট

রহস্যের প্রতিধ্বনি তোমার সত্তায়—
আজ অপরূপ ধ্বনি হয়ে মর্মরিত প্রতিটি হৃদয়ে।
অদৃশ্য অশ্রুত সুরে বাঁশি বেজে ওঠে জীবনের স্তরে—
তোমার স্বপ্নের ভারত নির্মাণের স্বপ্ন ঘন হয়ে আছে
অদৃশ্য সাক্ষরে।
ভালবাসা ঝরনা হয়ে
প্লাবনের গান গেয়ে ওঠে।
সে-সঙ্গীত অনেকেই শোনে।
নিদ্রিত শবের ঘুম ভাঙে—
তোমার উদাত্ত কণ্ঠ—
বল ভারতবাসী
মুচি মেথর... সবাই আমার ভাই
আমারই রক্তের কণা প্রবাহিত
তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে।
সে-সঙ্গীত আজও অনেকেই শোনে—
মহান আত্মার নীরব আহ্বান
বাধার প্রাচীর ভেঙে পড়ে
প্রেমের প্রবল স্রোতে—
সেই ভালবাসা এক কণা দাও—
তৃপ্ত হোক তৃষিত অন্তর।

মানুষের কবিতা

বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমরা চলেছ কোথায় বন্ধু?
কোন্ সে তীর্থপথ?
আমার জন্য দাঁড়াবে বন্ধু?
থামাবে চলার রথ?

আমার হাতেও লেগেছে রক্ত
ধূসর আমার চোখ
আমিও খুঁজছি পুণ্যতীর্থ
জুড়াতে মনের ক্ষোভ।

তোমাদের মতো আমিও [illegible]
মরে শুধু বেঁচে আছি
অন্ধকারের আমিও তো কীট
চারিদিকে শুধু মাছি।

কুরে কুরে খায় প্রত্যহ তারা
গলিত আমার শব
চারিদিকে শুধু শকুনের দল
শকুনীর কলরব।

কোথায় কেদার? কোথায় বদরী?
কোথায় পুণ্যধাম?
নিয়ে যাবে সেথা আমাকে বন্ধু
পুরাতে মনস্কাম?

কঙ্কাল হয়ে বেঁচে আছি শুধু
ইতিহাস হব বলে
মানুষ বলে চিনিবে কি কেউ
পরিচয় নাহি দিলে?

আগামীর যারা নৃতত্ত্ববিদ্ হবে
এইখানে তারা মানুষের ধ্বংসাবশেষ পাবে।



জীবন্ত বুদ্ধের সামনে দাঁড়ালে

শৈলেন্দ্র হালদার

নির্বাক্ পাহাড়ের গায়ে
ধ্যানমগ্ন মূর্তি ঐ প্রেম ও করুণার
সুদূর অতীত হতে
নিথর দাঁড়িয়ে আছে অনন্তের স্রোতে।

তুমি কি শোননি তাঁর মগ্ন কণ্ঠস্বর?
তুমি কি দেখোনি তাঁর হৃদয়ের ঝড়?

ধর্মের আড়ালেই দানবের দল
যতটুকু আছে তার হিংস্র পশুবল—
তাই দিয়ে ভাঙে ওরা শিল্পের সুষমা;
ক্ষমা নেই ক্ষমা
সভ্যতায় কালি লেপা এই বর্বরতা
পৃথিবী জানাবে তারে ঘৃণার বারতা।

মানুষের অন্তরে যে পরশ লেগে
সভ্যতার এই আলো উঠেছে যে জেগে,
তারে কেন ধ্বংস কর, নিচে আন টানি—
শোননি কি বাণী?

জীবন্ত বুদ্ধের সামনে দাঁড়ালে—
তুমিও তো গলে যেতে তোমার আড়ালে।
তোমার অতীতে তুমি চালালে কুঠার,
সে তোমার হার।

নিথর মূর্তি দেখে পেও না গো ভয়;
মানুষেরে ভালবেসে আপনারে কর জয়।।

উত্তরণ

সঞ্জয় ভুঁইয়া

নিজের ভিতর তৈরি কর গভীরতা
একবার ভগবানের পায়ে হাত রেখে
আরেকবার পশ্চিমমুখো বসে সুমধুর আজানে,
ডেকে আন পরিত্রাতা বলে
যাকে ভেবে নিয়েছ একবার,
আর কোন দ্বিচারণ নয় সজ্ঞানে, অজ্ঞানে।
শুধু সারারাত ধরে বেড়ে ওঠা
একটা-দুটো বিগত গ্লানি জমে জমে
পাহাড় হয়ে গেলে
তিনবার উচ্চারণ কর সেই পবিত্র নাম—
'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ...'
তারপর জেনো তুমি মানুষ হিসাবে উত্তীর্ণ...

মহান স্থপতি

শিশির মুখোপাধ্যায়

সাধনমার্গে ঠাকুর রচিলে নবীন সংবিধান
অচ্যুত থেকে বিচ্যুতজনে শোনালে মহানিদান।
নাশিলে হে প্রভু সত্যচ্যুতি
আঁধারেতে দিলে আলোকের দ্যুতি,
ঈশ্বরলাভে সঠিক দিয়েছ ঠিকানার সন্ধান।

ভবতারিণীর মহিমা শোনায়ে মাতায়েছ ধরাতল
মাতৃসাযুজ্য লাভের নেশায় হইয়াছ টলমল।
জ্যান্ত দুর্গা জ্ঞানে ভার্যারে
পূজিলে ঠাকুর ষোড়শোপচারে,
তোমার তত্ত্ব সাধনকারীকে সদা দানে মহাবল।

কালী-কৃষ্ণেরে সমদর্শনে তোমার সে-কীর্তন
নরলোক আর সুরলোকে তার হইল অনুরণন।
বাঁশি ও অসির ভেদ মুছে দিলে
"যত মত তত পথ" শোনাইলে,
বিশ্ব বরণ করেছে তোমার সাধন উপকরণ।

হরির অংশে উদিয়া কহিলে, জগৎ ব্রহ্মময়
ব্রহ্মময়ীর কৃপা বিনা কভু হরিলাভ নাহি হয়।
হরিপ্রেমে হলে ব্রজগোপীগণ
কাত্যায়নীর ব্রতেও মগন,
শিখাইলে তুমি শ্যাম ও শ্যামাতে দ্বন্দ্ব যেন না রয়।

অভেদত্বের ব্যাখ্যা তোমার হয়নি নিরর্থক
ধর্মাচরণে সমন্বয়ের বার্তা সদর্থক।
নাশিছে তোমারি জীবনের বেদ
ধর্মার্থীর ভ্রান্তি ও খেদ
কালী-কালা আর ব্রহ্মমনন হয়েছে সমার্থক।

সত্য ধ্রুবে রাঙিয়ে মন

পদ্মরাগ সরকার

বোধে-অবোধে বাঁধা যে-মন।
মত-অমতে হাঁটতে যেমন,
হোঁচট নিত্য প্রতি পলে—
আত্মভুলে নিত্য সাঁতার অসৎ জলে,
মুছতে সে-ক্লেদ উপায় মাত্র একটি সৎ—
সত্য ধ্রুবে মন রাঙিয়ে হাঁকাও রথ।

দিগন্তে খাদ গহন গভীর কালোয় মিশে—
দুর্গম হোক, হোক দুস্তর ভয়টা কিসে?
আঁধার পাশ ছিন্ন করে ছুটিয়ে রথ
আলোর স্নানে ঘুচবে ক্লেদ, মিটবে ক্ষত।

ভারতের গ্রামোন্নয়ন এবং স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী সন্নিরুদ্ধানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামীজীর আর্থ-সামাজিক চিন্তাধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য-গুলি হলো ঃ

১। শিক্ষাই একমাত্র সমাধান

স্বামী বিবেকানন্দের মতে, 'Education is the panacea' অর্থাৎ শিক্ষা হচ্ছে সর্বরোগহর মহৌষধ। তাঁর মতে, যেকোন প্রকার উন্নয়নের জন্যই শিক্ষার স্থান সর্বোচ্চ। তিনি বলেছেন ঃ "কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা! ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রদেরও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরিবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এই পার্থক্য হইল?---শিক্ষা, জবাব পাইলাম।" তিনি চেয়েছিলেন জনগণকে শিক্ষিত করতে, যাতে তারা নিজেদের অবস্থা এবং উন্নতির উপায় বুঝতে পারে; তারপর নিজেরাই নিজেদের উন্নতি করবে—"প্রত্যেককেই তাহার নিজের মুক্তির পথ করিয়া লইতে হইবে। রাসায়নিক দ্রব্যের একত্র সমাবেশ করাই আমাদের কর্তব্য—দানাবাঁধার কার্য ঐশ্বরিক বিধানে স্বতই হইয়া যাইবে। আসুন, আমরা তাহাদের মাথায় ভাব প্রবেশ করাইয়া দিই—বাকিটুকু তাহারা নিজেরাই করিবে। ইহার অর্থ, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিতে হইবে।" আরেক জায়গায় স্বামীজী বলছেন ঃ "আমাদের রমণীগণের মীমাংসিতব্য অনেক সমস্যা আছে—সমস্যাগুলিও বড় গুরুতর। কিন্তু এমন একটিও সমস্যা নাই, 'শিক্ষা' এই মন্ত্রবলে যাহার সমাধান না হইতে পারে।" তবে মনে রাখতে হবে, শিক্ষা বলতে স্বামীজী কতকগুলি শব্দ শেখা বোঝাননি। বিভিন্নভাবে তিনি প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন। এককথায়—"মানুষের ভিতর যে পূর্ণত্ব প্রথম হইতেই বিদ্যমান, তাহারই প্রকাশসাধনকে বলে শিক্ষা।"

২। ভারতের উন্নয়ন হবে ধর্মকে আশ্রয় করে

সনাতন ধর্মের দেশ ভারত। ধর্মই হচ্ছে ভারতের মূল সুর—প্রাণপাখি। তাই ধর্মকে বাদ দিয়ে ভারতের উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বামীজী বলেছেন, প্রথমত ধর্মের উন্নতি আবশ্যক। ভারতকে সামাজিক বা রাজনৈতিক ভাবে প্লাবিত করার আগে প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত করতে হবে। তাঁর মতে—"যখনি জাতীয় শরীর দুর্বল হয়, তখনি সেই জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক, মানসিক ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় সকল ক্ষেত্রেই সর্বপ্রকার রোগজীবাণু প্রবেশ করে ও রোগ উৎপন্ন করে।... আমাদের ধর্মই আমাদের তেজ, বীর্য এমনকি জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি।... এই ধর্মেই আমাদের জাতীয় মন, জাতীয় প্রাণপ্রবাহ দেখিতে পাইবে। ধর্ম অনুসরণ কর, তোমরা গৌরবান্বিত হইবে; ধর্ম পরিত্যাগ কর, তোমাদের মৃত্যু নিশ্চয়।" সেজন্যই তিনি বলছেন ঃ "তোমরা ধর্মে বিশ্বাস কর বা নাই কর, যদি জাতীয় জীবনকে অব্যাহত রাখিতে চাও, তবে তোমাদিগকে এই ধর্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে।... আমাদের কার্যের এই মূল কথাটা সর্বদা মনে রাখিবে—জনসাধারণের উন্নতিবিধান—ধর্মে একবিন্দুও আঘাত না করিয়া।... তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্মবিশ্বাস ও সাধনে ঘোর হিন্দু হইতে পার? ইহাই করিতে হইবে।" স্বামীজী আমাদের বারংবার সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ঃ "ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক বিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা আপনি আসিবে। কিন্তু যদি ধর্মকে বাদ দিয়া লৌকিক জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা কর, তবে তোমাদিগকে স্পষ্টই বলিতেছি, ভারতে তোমাদের এ-চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।" 'স্বধর্ম' বা 'জাতিধর্ম' শীর্ষক অধ্যায়ে ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য') স্বামীজী বলছেন ঃ "এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম; আর তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা ঝেঁটানো, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান—এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয় তো হবে; নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামেচিই সার, রামচন্দ্র!" তাঁর মতে, ধর্মই হচ্ছে শিক্ষার ভিতরকার সারবস্তু।

৩। জাতীয় উন্নয়ন হবে ভারতের নিজস্ব পথে

স্বামী বিবেকানন্দের মতে, ভারতের উন্নতিসাধন করতে হবে ভারতবর্ষের নিজস্ব পথ অবলম্বন করে। মাদ্রাজের ভিক্টোরিয়া হল-এ প্রদত্ত 'আমার সমরনীতি' নামক বিখ্যাত বক্তৃতায় স্বামীজী বলছেন ঃ "আমাদিগকে আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। বৈদেশিক সংস্থাগুলি জোর করিয়া আমাদিগকে যে-প্রণালীতে চালিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তদনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা বৃথা; উহা অসম্ভব।" জাতীয় উন্নয়নে স্বামীজীর চিন্তা দাঁড়িয়ে আছে এই নীতির ওপরেই। অন্যত্র তিনি বলেছেন ঃ "নতুন অবশ্য শিখতে হবে, করতে হবে, কিন্তু তা বলে পুরনোগুলিকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে নাকি?" তিনি আমাদেরকে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন ঃ "অপর কাহাকেও অনুকরণ করিতে

যাইও না। আমাদিগকে এই আরেকটি বিশেষ বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে—অপরের অনুকরণ সভ্যতা বা উন্নতির লক্ষণ নহে।... অনুকরণ কখনই উন্নতির কারণ হয় না, বরং উহা মানুষের ঘোর অধঃপতনের চিহ্ন।" শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন যে, আমাদের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক সর্বপ্রকার শিক্ষা আমাদের নিজেদের হাতে নিতে হবে এবং যতদূর সম্ভব, জাতীয় ভাবে ঐ শিক্ষা প্রদান করতে হবে। চিঙ্গলপুট থেকে ট্রেনে মাদ্রাজ গমনকালে 'হিন্দু' পত্রিকার জনৈক প্রতিনিধির সঙ্গে স্বামীজীর কিছু কথোপকথন হয়। স্বামীজীর মুখে জাপানের প্রশংসা শুনে সেই প্রতিনিধি স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ "আপনার কি ইচ্ছে যে, ভারত জাপানের মতো হোক?" উত্তরে স্বামীজী বললেন ঃ "তা কখনোই নয়। ভারত ভারতই থাকবে। ভারত কেমন করে জাপান বা অন্য জাতের মতো হবে? যেমন সঙ্গীতে একটা করে প্রধান সুর থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক জাতেরই এক-একটা মুখ্য ভাব থাকে, অন্য অন্য ভাবগুলি তার অনুগত। ভারতের মুখ্য ভাব হচ্ছে ধর্ম। সমাজসংস্কার এবং অন্য সবই গৌণ।" স্বামীজীর মতে, অন্যান্য জাতির বর্তমান সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে ভিন্ন ধরনের বিজ্ঞান, ঐতিহ্য এবং পদ্ধতি অনুযায়ী। আমাদের পিছনে আবার আরেক ধরনের ঐতিহ্য এবং হাজার হাজার বছরের 'কর্ম' রয়েছে। স্বভাবতই আমরা কেবল আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী আমাদের নিজস্ব খাতেই চলতে পারি এবং আমাদের সেইরকমই করতে হবে।

৪। আমূল সংস্কার প্রয়োজন

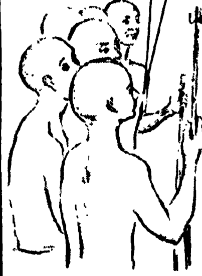
তথাকথিত সমাজসংস্কারকগণের জোড়াতালি দেওয়া সমাজসংস্কারে স্বামীজী বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি চাইতেন আমূল সংস্কার। তিনি সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে তার মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছেন—"সংস্কারকদের আমি বলতে চাই, আমি তাঁদের যেকোন জনের চেয়ে বড় সংস্কারক। তাঁরা একটু-আধটু সংস্কার করতে চান, আর আমি চাই আমূল সংস্কার। আমাদের পার্থক্য কেবল সংস্কারের পদ্ধতিতে। তাঁদের পদ্ধতি ধ্বংসের, আমার পদ্ধতি গঠনের। আমি সাময়িক সংস্কারে বিশ্বাসী নই, আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী।" রোগের বিভিন্ন উপসর্গ দূর করার চেয়ে তিনি তার মূল কারণটিরই বিনাশসাধন চেয়েছেন—"সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার বাহিরের কোন চেষ্টা দ্বারা হইবে না, মনের উপর কার্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা যতই লম্বা লম্বা কথা বলি না কেন, বুঝিতে হইবে সমাজের দোষ সংশোধন করিতে হইলে প্রত্যক্ষভাবে চেষ্টা না করিয়া শিক্ষাদানের দ্বারা পরোক্ষভাবে উহার চেষ্টা করিতে হইবে।" তাঁর মতে—"পার্লামেন্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ কোন আইন দ্বারা কখনো কোন জাতি উন্নত বা ভাল হয় না, কিন্তু সেই জাতির অন্তর্গত লোকগুলি উন্নত ও ভাল হইলেই জাতির ভাল হইয়া থাকে।" স্বামীজীর চোখে সমস্যাটির বিশ্লেষণ সাধারণ সমাজসংস্কারকগণের চেয়ে ভিন্ন—"সম্পূর্ণ সমাজসংস্কার সমস্যাটি এই দাঁড়ায়—সংস্কার যারা চায় তারা কোথায়? আগে তাদের তৈরি কর।... কয়েকটি লোক মনে করল, কোন একটা জিনিস মন্দ—সেই অনুযায়ী কিন্তু গোটা জাতিটা চলবে না।... প্রথমে সমগ্র জাতিকে শিক্ষা দাও;... সমাজসংস্কারের জন্যও প্রথম কর্তব্য হলো জনসাধারণকে শিক্ষিত করা।" স্বামীজী মনে করতেন, মানুষের মধ্যে শক্তির প্রভেদহেতু তাদের অবস্থার প্রভেদ থাকবে—এব্যাপারে সাম্য থাকতে পারে না। কিন্তু বিশেষাধিকার ও শোষণের বিলোপসাধন করতে হবে। তবে তার পথ সঙ্ঘাতের নয়—সহায়তার। সকলকেই ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করতে হবে, কাউকে নিচে নামানোর প্রয়োজন নেই।

৫। দারিদ্র্য ও অন্নাভাবের সমস্যা

স্বামীজী জানতেন, দারিদ্র্য ও অন্নাভাবের সমস্যার সমাধান ব্যতীত দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ—"ভারতের সমস্ত দুর্দশার মূল জনসাধারণের দারিদ্র্য।" ক্ষুধার্ত মানুষের অন্নচিন্তাই একমাত্র চিন্তা। তাই স্বামীজী চেয়েছেন আলস্য-দুর্বলতারূপ তমোগুণ কাটিয়ে রজোগুণের উন্মেষ—কর্মতৎপরতা। তিনি চেয়েছেন পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এবং অর্থকরী লৌকিক বিদ্যার প্রসার ঘটিয়ে প্রথমে এই দারিদ্র্য ও অন্নাভাব দূর করতে—"প্রথমে অন্নের ব্যবস্থা করতে হবে, তারপর ধর্ম।" তাই তিনি বলছেন ঃ "অন্ন! অন্ন! যে-ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখবেন—এ আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে ওঠাতে হবে, গরিবদের খাওয়াতে হবে,... আরো খাদ্য, আরো সুযোগ প্রয়োজন।" স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে দেখা যায় ধর্মের সঙ্গে অর্থনৈতিক চিন্তার এক সুষ্ঠু সমন্বয়—"সুতরাং যখন কোন ধর্মমত সফল হয়, তখন বুঝতে হবে, অবশ্যই তার আর্থিক মূল্য আছে। একই ধরনের হাজার সম্প্রদায় ক্ষমতার জন্য লড়াই করলেও যে-সম্প্রদায় আর্থিক সমস্যা সমাধান করতে পারে, সে-ই প্রাধান্যলাভ করবে। পেটের চিন্তা, অন্নের চিন্তা মানুষের প্রথম চিন্তা। মানুষ যখন হাঁটে, তখন তার পেট চলে আগে, মাথা চলে পরে—তা কি লক্ষ্য করনি?" [ক্রমশ] (দুই)



অনুরূপ আরেকটি আশ্চর্য ঘটনা—
আচার্য শঙ্কর শিষ্যদের নিয়ে চলেছেন উত্তরমুখে। অদূরে ১০,০০০ ফুট উচ্চতায় বদরিকাশ্রম—ভগবান বিষ্ণুর বিশেষ লীলাস্থল। হিমালয়ের কোলে অপূর্ব স্থান।



হে নমস্য পূজারিশ্রেষ্ঠ, আমার মহাভাগ্য আজ এখানে আসতে পেরেছি। স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু চার যুগে এখানে প্রত্যক্ষ বিরাজিত। আপনাদের নিত্যপূজা, ভোগ ইত্যাদি হয় তো?
আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা শালগ্রাম শিলায় নিত্য পূজা করি। মন্দিরে বিগ্রহ নেই। চীনের দস্যুদের ভয়ে বিগ্রহকে পাশের কূপে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সেই বিগ্রহ আর পাওয়া যায়নি।



কথা শুনে শঙ্কর চিন্তিত হলেন। ধ্যানে নিমগ্ন হলেন তিনি।



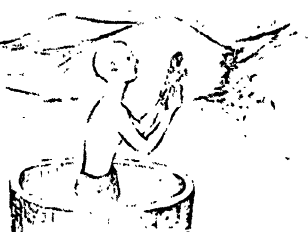
হে অর্চক, আপনাদের হাতে মূর্তি উদ্ধার করে দিলে আপনারা প্রতিষ্ঠা করে পূজা করবেন তো?



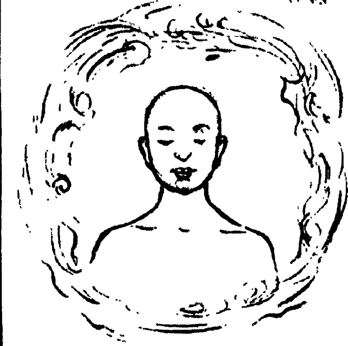
আমরা ধন্য হব, কৃতকৃতার্থ হব। কিন্তু তা কি করে সম্ভব, হে যতিবর?



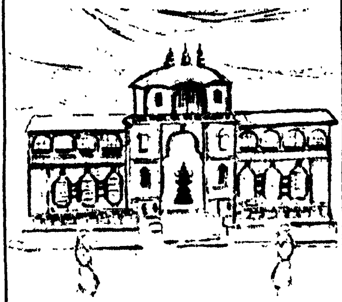
হে যতিবর, এই কূপে নামবেন না, এর সঙ্গে অলকানন্দার যোগ আছে। জল বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা। অনেকেই এইভাবে প্রাণ হারিয়েছে।
শঙ্কর পুরোহিতের বারণ না শুনে কূপে নেমে গেলেন।



অবশেষে শঙ্কর উঠে এলেন বিষ্ণুমূর্তি নিয়ে।
কিন্তু বিষ্ণুর ভাঙা মূর্তি উঠেছে। হাতের কয়েকটি আঙুল নেই। মূর্তিটি অলকানন্দায় বিসর্জন দিয়ে আবার ডুব দিলেন। আবারও ভাঙা মূর্তি, তৃতীয়বারেও ঐ ভাঙা মূর্তি উঠল। শঙ্করের মন দুঃখে ভরে উঠল।
চিত্ররূপ ঃ দেবাশিস বসু



সহসা এক দৈববাণী শুনে সকলে চমকে উঠল—
"হে বাল যতিরাজ, কলিযুগে আমি এই ভগ্ন বিগ্রহেই পূজা গ্রহণ করব।"



আনন্দের আর সীমা নেই। শঙ্কর বদরী-নাথজীর প্রতিষ্ঠা স্বয়ং নিষ্পন্ন করে এগিয়ে চললেন ব্যাসাশ্রমের দিকে। শঙ্খ বেজে উঠল দিকে দিকে।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ রামায়ণ ও মহাভারত প্রসঙ্গ*

বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর প্রথম প্রকাশের শতবর্ষপূর্তিতে নিবেদিত—সম্পাদক

১৮৮৪ সালের ৯ নভেম্বর চারবার রামায়ণ প্রসঙ্গ এসেছে ঠাকুরের শ্রীমুখে। তার মধ্যে 'হনুমানের তিথিনক্ষত্র না জানা—শুধু রামকে জানা'র কথাও আছে, যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। অপর তিনটি ঘটনা শ্রীরামের বনবাসকালের। ঠাকুর বলছেন—রাম-লক্ষ্মণ পম্পা সরোবরে গিয়েছেন। একটি কাক তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে বারবার জল খেতে গিয়েও খাচ্ছে না দেখে বিস্মিত লক্ষ্মণ রামকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে শ্রীরামচন্দ্র বলেন, কাকটি পরম ভক্ত। দিবারাত্র রামনাম জপ করছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু জল খেতে গেলে পাছে রামনাম জপে ফাঁক যায়, তাই খেতে পারছে না। (৩।১০।১)

ঈশ্বরে ষোল আনা মন রাখা প্রসঙ্গে ঠাকুর শুনিয়েছেন রাম-বিরহিনী সীতার কথা। হনুমান সীতার খবর নিয়ে এলে রামচন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—সীতাকে কেমন দেখে এসেছ হনুমান? উত্তরে হনুমান বলল—সীতার শুধু শরীর পড়ে আছে, তার ভিতরে মনপ্রাণ নেই। মনপ্রাণ তিনি শ্রীরামের পাদপদ্মে সমর্পণ করেছেন। (ঐ)

তৃতীয় কাহিনীটিও পম্পা সরোবরের পটভূমিকায়। পম্পা সরোবরে স্নানের সময় রাম-লক্ষ্মণ সরোবরের কাছে মাটিতে ধনুক গুঁজে রাখলেন। স্নানান্তে লক্ষ্মণ ধনুক তুলে দেখেন তা রক্তাক্ত। রাম তা দেখে বললেন—বোধহয় অজান্তে কোন জীবহিংসা হয়ে গেল। মাটি খুঁড়ে লক্ষ্মণ একটি মুমূর্ষু কোলাব্যাঙ দেখতে পেলেন। রাম জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি শব্দ করনি কেন? আমরা তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতাম। সাপে ধরলে তো খুব চিৎকার কর। ভেকটি তার উত্তরে বলল—রাম, যখন সাপে ধরে, তখন 'রাম রক্ষা কর' বলে চিৎকার করি। এখন দেখছি, রামই আমায় মারছেন, তাই চুপ করে আছি। (ঐ)

পরদিন ঠাকুর মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করছেন ভক্তদের সঙ্গে যেসব বিষয়ে কথা হয়েছে সেই সম্পর্কে। সেসময় উঠল রামায়ণী কথাও, সদ্যবর্ণিত পম্পা সরোবরে ভেকের কথাও। তারপর হলো হনুমানের কথা এবং লক্ষ্মণের প্রশ্নের উত্তরে রামের বলা উর্জিতা ভক্তির কথা—যা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। (৩।১০।৫)

১৮৮৫ সালের ৭ মার্চ বশিষ্ঠদেবের পুত্রশোকে রাম-লক্ষ্মণের কথোপকথন প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন ঠাকুর। এটি আগেই উল্লিখিত হয়েছে। ঐ বছরই ৯ মে নারদের স্তবে তুষ্ট রামচন্দ্রের পূর্ববর্ণিত কাহিনীটি ভক্তদের শুনিয়েছেন ঠাকুর। (৩।১৫।৩) একই বছর ২৩ মে মহিমাচরণকে ঠাকুর রামায়ণী কাহিনী শুনিয়েছিলেন সবকিছুর অনিত্যতা প্রসঙ্গে। ঠাকুর বলেছেন, সামনে সাগর দেখে লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ হাতে ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন—আমি বরুণকে বধ করব, এই সমুদ্র আমাদের লঙ্কায় যেতে দিচ্ছে না। রাম তাকে বোঝালেন—লক্ষ্মণ যাকিছু দেখছ সব স্বপ্নবৎ অনিত্য। সমুদ্রও অনিত্য, তোমার ক্রোধও অনিত্য। মিথ্যাকে মিথ্যা দ্বারা বধ করা—সেটাও মিথ্যা। ঐদিন আবার বশিষ্ঠদেবের পুত্রশোক প্রসঙ্গও এসেছে ঠাকুরের শ্রীমুখে। (৩।১৬।১) একই দিনে মহাভারত থেকে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ—'তুমি ত্রিগুণাতীত হও'-এর কথাও বলেন ঠাকুর। (ঐ)

ঐ বছরের ১৩ জুন পুরুষ-প্রকৃতি যোগ প্রসঙ্গে কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়কে ঠাকুর রামের প্রতি নারদের একটি উক্তির উল্লেখ করেন। নারদ বলেছিলেন—হে রাম, যত পুরুষ সব তোমার অংশ, আর যত স্ত্রী সব সীতার অংশ। (৩।১৭।১)

ঐ একই দিনে জন্মমৃত্যুতত্ত্ব বোঝাতেও রামায়ণ প্রসঙ্গ এসেছে। ঠাকুর বলেছেন—কৈলাসে শিব বসে আছেন, নন্দী আছেন কাছে। হঠাৎ একটা ভারি শব্দ হলো। নন্দীর জিজ্ঞাসার উত্তরে শিব বললেন—রাবণের জন্ম হলো, এ তারই শব্দ। একটু পরে আবার একটা শব্দ হলে নন্দীর প্রশ্নের উত্তরে শিব বললেন—এবার রাবণ বধ হলো। এই কাহিনী বলে ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন—জন্ম-মৃত্যু এসব ভেলকির মতো। এই আছে, এই নেই। ঈশ্বর ছাড়া সব

* স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা।

অনিত্য। জলই সত্য, জলের ভুড়ভুড়ি এই আছে, এই নেই। ভুড়ভুড়ি জলে মিশে যায়, যে-জলে উৎপত্তি, সেই জলেই লয়। (৩।১৭।২)

ঐদিনই ঠাকুর কাপ্তেনকে শুনিয়েছেন অধ্যাত্ম রামায়ণের কথা। তাতে আছে—হে রাম, তুমিই ব্যাপ্য, তুমিই ব্যাপক, 'বাচ্য-বাচকভেদেন ত্বমেব পরমেশ্বরঃ'। (৩।১৭।৩)

ভগবানের ভক্তাধীনতা প্রসঙ্গে একই দিনে মহাভারত থেকে ঠাকুর বলেছেন—দুর্যোধন কৃষ্ণকে অত যত্ন দেখালে আর বললে, এখানে খাওয়া-দাওয়া করুন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের কুটিরে গেলেন। তিনি ভক্তবৎসল, বিদুরের শাকান্ন তিনি অমৃতজ্ঞানে খেলেন। (৩।১৭।৪)

ঐবছর ২৪ জুলাই শুদ্ধাভক্তি সাধনের ব্যাপারে ঠাকুর পূর্ববর্ণিত অহল্যা এবং নারদের রামের প্রতি শুদ্ধাভক্তির কথা উত্থাপন করেন। (৩।১৮।২) এর চারদিন পর ২৮ জুলাই হনুমানের জ্ঞানভক্তি আর নারদের শুদ্ধাভক্তি বিষয়ে রামায়ণের যে দুটি প্রসঙ্গ এনেছেন ঠাকুর, তাও আগে বর্ণিত হয়েছে। (৩।১৮।৩)

একই বছরে ১৮ অক্টোবর নিত্যলীলাযোগ প্রসঙ্গে ঠাকুর একটি মহাভারতীয় এবং একটি রামায়ণী কাহিনী শুনিয়েছেন। মহাভারত থেকে বলেছেন কচের কথা। বৃহস্পতিপুত্র কচ নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন। সমাধিভঙ্গ হলে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি এখন কি দেখছ? কচ বললেন—দেখছি যেন জগৎ তাঁতে জুড়ে রয়েছে। তিনিই পরিপূর্ণ। যাকিছু দেখছি সব তিনিই হয়েছেন। এর ভিতর কোন্‌টা ফেলব, কোন্‌টা নেব ঠিক করতে পারছি না। (৩। ২০।৩)

তারপরে ঠাকুর বললেন, হনুমানের কথা। হনুমান সাকার-নিরাকার সাক্ষাৎকার করেছিলেন, তারপরে দাস ভাবে, ভক্তের ভাবে ছিলেন। (ঐ) একই দিনে বশিষ্ঠদেবের পুত্রশোক বিষয়ে রামের অভিব্যক্তির কথা আবার বর্ণিত হয়। (৩।২০।৪) মহাভারত থেকে শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে বৃহৎবৃক্ষে থোলো থোলো কৃষ্ণ ফলে থাকার পূর্ববর্ণিত কাহিনীটি ঐদিন ঠাকুর আরেকবার শোনান। (ঐ)

একই দিনে ডাক্তার সরকারকে ঠাকুর রামায়ণ থেকে বিভীষণের কথা বলেছেন—বিভীষণ লঙ্কার রাজা হতে চাননি। তিনি রামকে বলেছিলেন—তোমাকে দেখেছি, আবার রাজা হয়ে কি হবে? উত্তরে রাম বলেছিলেন—বিভীষণ, তুমি মূর্খদের জন্য রাজা হও। যারা বলছে, তুমি এতদিন রামের এত সেবা করলে, তোমার কি ঐশ্বর্য হলো? তাদের শিক্ষার জন্য তুমি রাজা হও। (ঐ)

১৮৮৩ সালের ১ জানুয়ারি 'রামের ইচ্ছা'য় তাঁতির জীবনধারণের কথা উল্লেখ করে ঠাকুর রামায়ণী কথা, হনুমানের শরণাগতি এবং পম্পা সরোবরে কোলাব্যাঙের পূর্ববর্তী কাহিনীটি পরিবেশন করেন। (৪।১।২)

ঐবছর ২৫ ফেব্রুয়ারি মহাভারত থেকে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মদেবের ক্রন্দনের কথা ঠাকুর বলেছেন। একাহিনীও আগে বিভিন্ন দিনের কথার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। আবার এর পরেই বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের দিব্যচক্ষুদানের কথাও ঠাকুর বলেছিলেন। (৪।২।১)

একই বছর ২ মে বিভীষণ বিষয়ে বলেছেন—যদি অহঙ্কার করতে হয় তবে বিভীষণের মতো। আমি রামকে প্রণাম করেছি, এ-মাথা আর কারো কাছে অবনত করব না। একটু পরেই ঠাকুর দুর্যোধনের পূর্বোদ্ধৃত উক্তির কথা বলেছেন—'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'। (৪।৪।১)

ঐবছর ১৮ জুন ঠাকুর বলেন—শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে অর্জুনকে বলছেন, তুমি যুদ্ধ করবে না কি বলছ? তুমি ইচ্ছা করলে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হতে পারবে না। তোমার প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধ করাবে। (৪।৬।২)

একই বছরে ১৬ ডিসেম্বর গান গাইতে গাইতে ঠাকুরের হৃদয়ে হঠাৎ সীতার উদ্দীপন হওয়ায় তিনি বলেছিলেন—মা, সীতার মতো করে দাও—একেবারে সব ভুল, কোনদিকে হুঁশ নেই। কেবল এক চিন্তা—কোথায় রাম! (৪।৭।২)

একটু পরেই রামচন্দ্রের তীব্র বৈরাগ্য, সংসারত্যাগের অভিলাষ এবং বশিষ্ঠদেবের যুক্তিতে সে-সঙ্কল্প ত্যাগের প্রসঙ্গ ঠাকুর উল্লেখ করেছেন। (ঐ)

তিনদিন পরে ঠাকুর 'ঈষৎ হাসিয়া' এই কাহিনীরই অন্য ব্যাখ্যা করেছেন। মাস্টারমশাই যখন তাঁকে বললেন—বশিষ্ঠদেব তো রামচন্দ্রকে বলেছিলেন সংসার ঈশ্বর ছাড়া হলে তা ত্যাগ করতে পার, তখন ঠাকুর মৃদু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—সে রাবণবধের জন্য। তাই রাম সংসারে রইলেন, বিবাহ করলেন। (৪।৭।৫)

২৪ ডিসেম্বর ১৮৮৩ ঠাকুর পূর্ববর্ণিত রাম, ভরদ্বাজ ও অন্যান্য ঋষিদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন ভক্তদের কাছে। (৪।৮।২) ঐদিনই অবতার ও নরলীলা বিষয়ে বলতে গিয়ে ঠাকুর রামচন্দ্রের বিষয়ে বলেন—নরলীলায় অবতারকে মানুষের মতো ব্যবহার করতে হয়। তাই অবতারপুরুষ রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হয়েছিলেন। (৪।৮।৩)

১৮৮৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি মধুসূদন ডাক্তারকে নাম-মাহাত্ম্য বোঝাতে ঠাকুর বলছেন—ভগবান আর তাঁর নাম তফাত নয়। সত্যভামা যখন তুলাযন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে বসিয়ে মণি-মাণিক্য দিয়ে ওজন করছিলেন তখন হলো না। রুক্মিণী যখন কৃষ্ণনাম লিখে তুলাযন্ত্রে রাখলেন, তখন ওজন ঠিক হলো। (৪।১০।৩) ঐবছর ২৪ ফেব্রুয়ারি ঠাকুর এই রচনায় পূর্বোল্লিখিত নারদের উক্তিটি আবার বলেছেন—জগতের সব পুরুষ তুমিই আর সব স্ত্রীলোক সীতা। (৪।১১।২)

একই বছরে ২৩ মার্চ নরলীলায় আকৃষ্ট ঠাকুর বিভীষণ সংক্রান্ত একটি কাহিনী পরিবেশন করেন—একজন সদাগর লঙ্কার কাছে জাহাজ ডুবে যাওয়ার ফলে লঙ্কার কূলে ভেসে উঠেছিল। তখন বিভীষণ লঙ্কার রাজা। তাঁর আদেশে লোকটিকে নিয়ে আসা হলো। বিভীষণ আনন্দে বিভোর হয়ে বলে উঠলেন—আহা, এটি আমার রামচন্দ্রের ন্যায় মূর্তি—সেই নর-রূপ। এই কথা বলে তিনি ঐ লোকটিকে বসনভূষণ পরিয়ে পূজা আর আরতি করতে লাগলেন। গল্পটি বলে ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন ঃ "এই কথাটি যখন আমি প্রথম শুনি, তখন আমার যে কী আনন্দ হয়েছিল, বলা যায় না।" (৪।১২।১)

একটু পরে পূর্বকথা প্রসঙ্গে দেশে দেখা রামযাত্রার কথা উত্থাপন করেন ঠাকুর। বলেন—রামযাত্রা হচ্ছে। কৈকেয়ী রামকে বনবাসে যেতে বললেন। হলধারীর বাবা যাত্রা শুনতে গিয়েছিল—একেবারে দাঁড়িয়ে উঠল। যে কৈকেয়ী সেজেছে, তার কাছে গিয়ে 'পামরী' বলে প্রদীপ দিয়ে তার মুখ পোড়াতে গেল। (ঐ)

ঐবছর ২৫ মে ঠাকুর নারদের উক্তি—'রামের অংশে সব পুরুষ আর সীতার অংশে সব স্ত্রী' এবং রামচন্দ্রের কাছে তাঁর শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনার কথা বলেন। (৪।১৩।৩) একই বছর ২০ জুন লঙ্কায় রাজত্ব করতে রাজি না হওয়া বিভীষণকে রামচন্দ্রের উপদেশ—মূর্খদের শিক্ষার জন্য রাজত্ব করার কাহিনীটি বলেন ঠাকুর। (৪।১৪।১) ঐবছরই ৩ জুলাই ঠাকুর রামের কাছে নারদের শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনার প্রসঙ্গটি আবার বলেন। (৪।১৫।৫) একমাস পরে ৩ আগস্ট নারদ প্রসঙ্গটি আরেকবার বলেন (৪।১৬।২)। ঐ বছরের ১৪ সেপ্টেম্বর বশিষ্ঠের পুত্রশোকের কাহিনীটিও ঠাকুরের শ্রীমুখে পুনঃকথিত হয়। (৪।১৯।১)

কয়েকদিন পরে ১৯ সেপ্টেম্বর অদ্বৈতবংশের গোস্বামীর সঙ্গে মহাপুরুষ বংশের মহিমা প্রসঙ্গে ঠাকুর মহাভারতীয় কথা উত্থাপন করেন। তিনি বলেন—হাজার দোষ থাকলেও বংশে মহাপুরুষ জন্মালে তিনিই টেনে নেন। উদাহরণ হিসাবে বললেন—গন্ধর্বরা কৌরবদের বন্দী করলে যুধিষ্ঠির গিয়ে তাঁদের মুক্ত করেছিলেন। যে-দুর্যোধন এত শত্রুতা করেছেন, যাঁর জন্য যুধিষ্ঠিরাদির বনবাস—তাঁকেই তিনি গিয়ে মুক্ত করলেন। (৪।২০।৩)

এজন্মে অথবা পূর্বজন্মে সুকর্ম করলে তার ফল পাওয়া যায়—এর উদাহরণ হিসাবে ঐদিনই ঠাকুর মহাভারত থেকে শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রৌপদীর কথা শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকালে তাঁর ব্যাকুল ক্রন্দনে সাড়া দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ দেখা দিয়ে বললেন—তুমি যদি কাউকে বস্ত্র দান করে থাক—মনে করে দেখ, তবে লজ্জা নিবারণ হবে। দ্রৌপদী বললেন—স্নানকালে একজন ঋষির 'কপনী' ভেসে গিয়েছিল। নিজের বস্ত্র থেকে একটুকরো বস্ত্র দ্রৌপদী সেসময় তাঁকে দিয়েছিলেন। একথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—তবে আর তোমার ভয় নেই। (৪।২০।৪)

ঐদিনই হাজরা মহাশয় ঠাকুরকে প্রণাম করলে তিনি বলেন ঈশ্বরকে তুষ্ট করতে, কারণ 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্'। এরপর তিনি কৃষ্ণ-দ্রৌপদীর অন্য একটি আখ্যায়িকা বর্ণনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্রৌপদীর হাঁড়িতে পড়ে থাকা শাক খেয়ে বললেন—আমি তৃপ্ত হয়েছি, তখন জগৎসুদ্ধ জীব তৃপ্ত হয়েছিল। (৪।২০।৫)

ঐবছর ৫ অক্টোবর সমাগত দুই হিন্দিভাষী সাধুর সঙ্গে 'কৃষ্ণে ফল সমর্পণ' প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেন—যুধিষ্ঠির যখন সব পাপ কৃষ্ণকে সমর্পণ করতে যাচ্ছিলেন, তখন ভীম সাবধান করলেন—অমন কর্ম করো না। কৃষ্ণকে যা অর্পণ করবে সহস্রগুণ তাই হবে। (৪।২২।২) ঐদিন কীর্তনীয়া নীলকণ্ঠকে ঠাকুর পূর্বোল্লিখিত হনুমানের সেব্য-সেবক এবং সোঽহম্ ভাবের গল্পটি বলেন। (৪।২২।৫)

১৮৮৫ সালের ১৫ জুলাই ঠাকুর ঈশ্বরদর্শন প্রসঙ্গে বলছেন, দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে একদিন তোতাপুরী আর হলধারী অধ্যাত্মরামায়ণ পড়ছিলেন। এমন সময় ঠাকুর দেখলেন—নদী-বন-সবুজ রঙের গাছপালা, তারই মধ্যে রাম-লক্ষ্মণ চলে যাচ্ছেন। আরেকদিন দক্ষিণেশ্বরে কুঠির সামনে ঠাকুর ভাবের মধ্যে অর্জুনের রথ দেখেছিলেন, যে-রথে বসেছিলেন পার্থসারথী শ্রীকৃষ্ণ। (৪।২৩।৯)

ঐবছর ১০ আগস্ট ঠাকুর পণ্ডিত শ্যামাপদকে অধ্যাত্মরামায়ণ সম্পর্কে বলেছেন, এই গ্রন্থ জ্ঞান-ভক্তিতে পরিপূর্ণ। শবরীর উপাখ্যান, অহল্যার স্তব সব ভক্তিতে পরিপূর্ণ। (৪।২৫।১)

একই বছরে ২৭ আগস্ট ঠাকুর বলেন, সীতার শোকে রাম ধনুক তুলতে না পারায় লক্ষ্মণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। অবতারের এই অবস্থার ব্যাখ্যা হিসাবে ঠাকুর বলেন ঃ "পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।" (৪।২৫।২)

[ক্রমশ] (দুই)

ভারতবর্ষ তথা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি সর্বত্র মানুষের মধ্যে একটি দুর্বিষহ অস্থিরতা, নিরাপত্তাবোধের অভাব এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা চোখে পড়ছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক ও ভোগবিলাসের ক্রমবর্ধমান প্রসারে নানান রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বাঙালী যুবগোষ্ঠী আজ দিশাহারা। বিবেকানন্দ-বর্তিকাই আজ তাদের ধ্রুবতারা, একথা ক্রমশ দিবালোকের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। অনেকের মনে নানান প্রশ্ন সময়ে সময়ে ওঠে, যার উত্তর তারা খুঁজে পায় না। প্রশ্নগুলি মূলত মূল্যবোধ এবং আদর্শভিত্তিক। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রবীণ সন্ন্যাসীদের কেউ কেউ ঐসব প্রশ্নের উত্তর দিতে অনুগ্রহ করে সম্মতি জানিয়েছেন। তাই 'যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন' শীর্ষক একটি বিভাগ খোলা হলো। আনন্দের বিষয়, এই বিভাগে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী ধ্যানেশানন্দজী মহারাজ।—সম্পাদক

ঃ নিয়মাবলী ঃ

'যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন' বিভাগে প্রেরিত (ক) প্রশ্নগুলি সুনির্দিষ্ট হওয়া চাই। (খ) প্রেরকের পুরো নাম, ঠিকানা ও বয়স উল্লেখ থাকা চাই। (গ) প্রেরকের বয়স অনূর্ধ্ব ৩০ হওয়া চাই। (ঘ) সব প্রশ্নই গ্রাহ্য হবে—এমন বলা যায় না। অনেক সময়ে এমন হতে পারে, একটি প্রশ্নের মধ্যে অন্যগুলির উত্তর সন্নিবেশিত হয়ে আছে। সেক্ষেত্রে প্রশ্নপ্রেরকের মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ নেই। কারণ, প্রশ্নের উত্তর পেলেই প্রশ্নকর্তা তৃপ্ত হবেন, আশা করি। তাঁর নাম প্রকাশিত হলো কি হলো না সে-ব্যাপারটি নিতান্তই গৌণ থাকুক, এই আবেদন জানিয়ে রাখি।—**সম্পাদক**

প্রশ্ন ঃ *"গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা ভাল।"—এই বাণীর বর্তমান যুগে তাৎপর্য কী?* ***—স্বপন নিয়োগী, চন্দ্রকোণা***

উত্তর ঃ "গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা ভাল।" বাঃ, বেশ কথা। আর, কথাটি বলেছেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ। তখন চল ভাই সকলে মিলে ফুটবল খেলি। ফুটবলেরও তো প্রচার, প্রসার চাই! স্বামীজীর এটি এক জনপ্রিয় উক্তি। কিন্তু প্রশ্ন করি, স্বামীজী এইটাই চেয়েছিলেন কি? স্বামীজী কি চেয়েছিলেন আবালবৃদ্ধবনিতা ফুটবল খেলুক, তাহলেই সব হবে? স্বামীজীর এই উক্তিটি আংশিক উক্তি। সম্পূর্ণ উক্তিটি বিচার করা চাই। স্বামীজীর বক্তব্য হলো ঃ "হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও—তোমাদের নিকট ইহাই আমার বক্তব্য। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরো নিকটবর্তী হইবে। আমাকে অতি সাহসপূর্বক এই কথাগুলি বলিতে হইতেছে। কিন্তু না বলিলেই নয়। আমি তোমাদিগকে ভালবাসি। আমি জানি পায়ে কোথায় কাঁটা বিঁধিতেছে। আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তোমাদের বলি, তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা আরো ভাল বুঝিবে।" অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে, স্বামীজী যুবসম্প্রদায়ের কাছে কি প্রত্যাশা করেন। সুস্থ-সবল শরীর না হলে ঈশ্বরচিন্তা, ঈশ্বরলাভ হয় না। উপনিষদেও ঋষি বলেছেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" দুর্বল শরীর কোন কাজের নয়। তাই সুস্থ-সবল শরীর গঠন অত্যন্ত জরুরী।

পরিব্রাজকরূপে স্বামীজী সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছিলেন। খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা। বলেছিলেন, বর্তমান ভারত 'হাড়জিরজিরে জড়পিণ্ডময়'! আরো বলেছিলেন ঃ "শরীরে বল নেই, হৃদয়ে উৎসাহ নেই, মস্তিষ্কে প্রতিভা নেই। কি হবে রে জড়পিণ্ডগুলোর দ্বারা?" সুতরাং স্বামীজীর কথার তাৎপর্য এবার আশা করি বোঝা গেছে। যেকোন উক্তির একটি লক্ষ্যার্থ থাকে, এবং একটি বাক্যার্থ থাকে। কখনো কখনো লক্ষ্যার্থ ও বাক্যার্থ পৃথক হয়, কখনো দুটি অভিন্ন হয়। এই ক্ষেত্রে 'ফুটবল খেলা' বাক্যার্থ হলেও লক্ষ্যার্থ হলো শরীরটিকে শক্তপোক্ত করে তোলা। শরীর শক্তপোক্ত হলে আত্মবিশ্বাস আসবে, হৃদয়ে উৎসাহ জেগে উঠবে।

প্রশ্ন ঃ *মনঃসংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের উপায় কী?* ***—মানস সামন্ত ও রাজকুমার ঘোষ, ওড়গঞ্জ, মেদিনীপুর***

উত্তর ঃ মনই আসল—কি অধ্যাত্মপথে, কি সাধারণ মনুষ্যজীবনে। "মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ"—মনেই বদ্ধ, মনেই মুক্ত। কাজেই মনঃসংযম এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ একই কথা। 'আত্ম' অর্থ নিজে, অর্থাৎ নিজেকে সংযত করা। শাস্ত্রে দেখা যায়, কোথাও কোথাও দেহকে 'আত্মা' বলা হয়েছে। অথবা কোথাও প্রাণ বা মন কিংবা বুদ্ধিকে 'আত্মা' বলা হয়েছে। আবার অনেক সময় 'অহং'কে 'আত্মা' বলা হয়েছে। যদিও ঠিক ঠিক অর্থে 'আত্মা' এগুলির কোনটিই নয়। কিন্তু শাস্ত্রে যখন যাকে 'আত্মা' বলা হয়েছে, তাকে বশীভূত বা সংযত করাই আত্মনিয়ন্ত্রণ। আরো একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়, 'আত্মা' বলে যাকেই অভিহিত করা হোক না কেন, মনের কথাই এসে যায়। কারণ, জীবনের সব কাজ ও চিন্তা মনের সাহায্যেই করি। আর, বুদ্ধি বা অহং যাই বলি না কেন, তা মনেরই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থামাত্র। সুতরাং আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থ একটাই—মনের নিয়ন্ত্রণ বা মনের সংযম। আরো সহজ ভাষায় বললে বলা যায়, মনঃসংযম বা মনোনিয়ন্ত্রণ করা মানে মনকে একাগ্র করা বা মনকে 'concentrate' করা। সংযত মন সূচাগ্র অবস্থা লাভ করে এবং ফলত সূক্ষ্মবিষয় ধারণা করার যোগ্যতা অর্জন করে। এই সংযত মন দিয়ে যে-কাজই করা যাক না কেন, তা সুন্দর হয়ে ওঠে, সাফল্য লাভ হয়। প্রাচীন যুগে আমাদের

মুনি-ঋষিরা মনের অভূতপূর্ব গুণের কথা জানতেন। তাই তাঁরা মনকে সংযত করার এক উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। তাকে রাজযোগে 'অষ্টাঙ্গমার্গ' বলে স্বামীজী বর্ণনা করেছেন। স্বামীজীর 'রাজযোগ' গ্রন্থটিতে এই পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। তার সঙ্গে চাই ভালবাসা। অর্থাৎ যে-বস্তুতে মনকে একাগ্র করা হচ্ছে, সেই বস্তুর প্রতি তীব্র ভালবাসাই মনের মূল পাথেয়। অবশ্য স্বামীজী সাবধান করে দিয়ে একথাও বলেছেন যে, উপযুক্ত গুরুর কাছে থেকে এই রাজযোগ অভ্যাস করা দরকার।

প্রশ্ন ঃ *'স্বদেশমন্ত্র'-এ স্বামীজী বলেছেন, সীতা আমাদের নারীজাতির আদর্শ। কি অর্থে একথা বলেছেন?*

—আশিস দে, লক্ষ্মণপুর, মেদিনীপুর

উত্তর ঃ মানবজীবনের উদ্দেশ্য মোক্ষ বা মুক্তিলাভ। সেই মুক্তি সংযমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সংযম ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাক্ষাৎ ধর্মরূপিণী সীতা তাই ভারতবর্ষে নারীজাতির আদর্শ। সহ্যগুণের জ্বলন্ত মূর্তিরূপে আদর্শ সতীত্বে, আদর্শ মাতৃত্বে, আদর্শ ধর্মপ্রাণতায়, আদর্শ তিতিক্ষায়, নৈতিকতা ও সাহসে সীতা একটি অনন্য চরিত্র। জননী ধরিত্রী যেমন সহ্যগুণসম্পন্না, ধরিত্রীকন্যা সীতাও যেন তেমনি, বরং আরো বেশি সহ্যগুণশালিনী। কোন জাতিতে নারীর মধ্যে এই সহ্যগুণের প্রকাশ হ্রাস পেলে সেই জাতির সর্বনাশ। সারা পৃথিবীর দেশে দেশে ঘুরে স্বামীজীর নানান অভিজ্ঞতা হয়েছিল। নিজে তিনি ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন। কাজেই কেবল ভক্তিগদগদ চিত্তে তিনি যে সীতাকে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরেছেন তা নয়। ভারতবর্ষ থেকে ধর্ম মুছে গেলে, স্বামীজী বলতেন, পৃথিবীতে কোথাও ধর্ম থাকবে না। আর ভারতবর্ষে ধর্ম রক্ষিত হতে পারে মূলত জাতীয় স্তরে উন্নতমানের নারীচরিত্রের মাধ্যমেই। কাজেই আদর্শ নারীচরিত্রের জন্য আমরা দেশের বাইরে খুঁজে বেড়ালে যে সম্পূর্ণ ভুল করব, সেব্যাপারে সন্দেহ নেই। আমাদের নারীর আদর্শ—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। 'স্বদেশমন্ত্র'-এ "হে ভারত ভুলিও না..." ইত্যাদি কথায় স্বামীজী সেই কথাই তুলে ধরেছেন।

প্রশ্ন ঃ *রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করতে গেলে কি ধরনের যোগ্যতা থাকা উচিত? করণীয় কি কি আছে? যোগদান করে দীক্ষা গ্রহণ করা চলে কি? অথবা যোগদানের পূর্বেই দীক্ষা নেওয়া প্রয়োজন?* ***—গুঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, অরুণাচল প্রদেশ***

উত্তর ঃ তোমার প্রশ্নের ধরন দেখে মনে হচ্ছে, তুমি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করতে আগ্রহী। তাহলে বলি, এখানে যোগদানের পূর্বে তুমি নিজের মনকে যাচাই করে নেবে। নিজেকে প্রশ্ন করে জেনে নেবে, কেন তুমি এখানে যোগদান করতে ইচ্ছুক। তোমার মন হয়তো উত্তর দেবে—"কেন? আমি স্বামীজীর কাজ করব। সংসার ত্যাগ করে মানুষের সেবা করব। স্বামীজীর দেওয়া আদর্শ—'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র পথ অনুসরণ করব! আমি সন্ন্যাসী হব।" ভাল কথা। এইবার মনকে জিজ্ঞাসা কর—"যা হতে চাইছ, তার যোগ্যতা তোমার আছে তো?" যোগ্যতা কাকে বলব? শাস্ত্র অনুযায়ী যোগ্যতা চারটি গুণের সমষ্টি। শম (মনের সংযম), দম (ইন্দ্রিয়ের সংযম), উপরতি (বিষয়মুখী ইন্দ্রিয়কে উপরত অর্থাৎ নিবৃত্ত করে মন-সহ ইন্দ্রিয়কে অন্তর্মুখী করা), তিতিক্ষা (শীত-গ্রীষ্মাদি কষ্টসহিষ্ণুতা), শ্রদ্ধা ও সমাধান (চিত্তের পরম একাগ্রতা)—এই হলো প্রথম গুণ—ষট্‌সম্পত্তি। বিবেক (নিত্য ও অনিত্য বস্তুকে পৃথক করার বিশেষ ক্ষমতা) হলো দ্বিতীয় গুণ। বৈরাগ্য (লক্ষ্যপথে চলার সময়ে যাকিছু মনকে লক্ষ্যচ্যুত করতে চাইছে, তার প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা এবং ঘৃণা) হলো তৃতীয় গুণ। এবং সবশেষে মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মুক্তিলাভের প্রবলতম ইচ্ছা। এই গুণসকল সাধকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এই যুগে অবশ্য এই গুণচতুষ্টয় বজায় রাখা এব, পরিপক্ব হলে সাধু হওয়া—নিতান্তই দুরাশা। শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী এসে যেন সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসী হওয়া ব্যাপারটা বেশ সহজ করে যুগোপযোগী পন্থা নির্দেশ করেছেন। তাঁরা বললেন, ঈশ্বরের ওপর তীব্র ভালবাসাই হলো মূলকথা। অর্থাৎ আমরা বলি—শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর ওপর অকৃত্রিম ভালবাসাই হলো মূলকথা। এই ভালবাসার মধ্যে কোন দোকানদারী নেই যে, এই এত দিলুম, এত দাও। নির্মল, পবিত্র, অহৈতুকী ভালবাসাই সাধুজীবনের মূলমন্ত্র।

যেহেতু রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশন) একটি সংগঠন, তাই অবধারিতভাবেই কিছু নিয়মকানুন রাখার প্রয়োজন আছে। অতএব সামাজিক বা লৌকিক কিছু নিয়মকানুন মেনেই এই সঙ্ঘে যোগদান করা সম্ভব। কোন অবিবাহিত যুবক যদি কেবল মাধ্যমিক পাশ (প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ) করে থাকে, তাহলে সে ২৫ বছর বয়সের পূর্বে যোগদান করতে পারে। স্নাতক বা গ্র্যাজুয়েট (বা সমতুল্য ডিপ্লোমা) ডিগ্রি থাকলে ২৮ বছর বয়সের মধ্যে যোগদান করতে পারে এবং স্নাতকোত্তর বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বা এম. বি. বি. এস. ডাক্তার অথবা ডক্টরেট ডিগ্রিপ্রাপ্ত কেউ ৩০ বছরের মধ্যে যোগদান করতে পারে। সর্বক্ষেত্রে অবিবাহিত যুবকই কেবল যোগদানের অনুমতি পায়। যোগদানের পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনী, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা', স্বামীজীর পত্রাবলী ইত্যাদি পড়ে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। যোগদানের একবছর পর নাম নথিভুক্ত হবে। তিনবছর পরে প্রশিক্ষণ শিবির—দুবছরের জন্য। আরো চারবছর পরে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষালাভ ঈশ্বরের ইচ্ছায় হতে পারে। ❑

প্রসঙ্গ তুলসীদাস-রচিত 'রামচরিতমানস'-এ মহাবীর*

স্বামী অবধূতানন্দ

[illegible]মচরিতমানস'-এ রামনামের মাহাত্ম্য বলতে গিয়ে তুলসীদাস বলছেন—

"নহিঁ কলি করমন ভগতি বিবেকূ। রাম নাম অবলম্বন একূ।।
কালনেমি কলি কপট নিধানূ। নাম সুমতি সমরথ হনুমানূ।।"

(বালকাণ্ড, ২৬।৪)

—কলিযুগে না আছে কর্ম, না ভক্তি, আর না জ্ঞান। রামনামই একমাত্র অবলম্বন। কপটের আধার কলিযুগরূপী কালনেমিকে সংহার করতে রামনামই বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী হনুমানের মতো।

তুলসীদাস 'রামচরিতমানস'-এর শুরুতেই বন্দনাগীতি[illegible] বলছেন—

"প্রনবউঁ পবনকুমার খল বন পাবক গ্যানঘন।[illegible]
জাসু হৃদয় আগার বসহিঁ রাম সর চাপ ধর।।"

—পবনকুমার হনুমানকে আমি প্রণাম করি, যিনি [illegible] বনকে ভস্ম করতে অগ্নিরূপী, যিনি জ্ঞানঘনমূর্তি আর যাঁর [illegible] হৃদয়রূপী আগারে ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে শ্রীরাম নিবাস কর[illegible]

হনুমান রামের সেবা করেছেন সর্বান্তঃকরণে [illegible] স্বতঃস্ফূর্তভাবে। শুধু তেজীয়ান, বীর্যশালীই নন, তিনি প[illegible] জ্ঞানী ও ভক্তির আচার্যও ছিলেন। তিনি একজন উচ্চ[illegible] যোগী ও চিরজীবী পরমশ্রদ্ধেয় মহাপুরুষ। ভারতে[illegible] কোটি ভক্ত মহাবীর হনুমানকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার স[illegible] করেন। পৃথিবীতে এধরনের চরিত্র বিরল। তাঁর [illegible] ছিল তেজের সঙ্গে ধৈর্য, ধর্মজ্ঞানের সঙ্গে হৃদয়বত্তা ও [illegible]লতা। তাঁর বিনয়ের সঙ্গে ছিল বুদ্ধিদীপ্ত পৌরুষ। তিনি [illegible] নিষ্কাম কর্ম ও দাস্যভক্তির জীবন্ত আদর্শ। তিনি ছিলেন জিতেন্দ্রিয় ও পরম ত্যাগী।

'ভাগবত'-এর একাদশ স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলছেন ঃ "হে উদ্ধব, যুগসমূহের মধ্যে আমি সত্যযুগ, বেদ বিভাগকারীদিগের মধ্যে আমি দ্বৈপায়ন কবি, ষড়্গুণযুক্ত আবির্ভাবের মধ্যে আমি বাসুদেব এবং কিম্পুরুষ (বানর)-গণের মধ্যে আমি হনুমান।"

ভগবান শিবের একাদশ রুদ্রাবতার বা অংশাবতার-রূপে হনুমান পূজিত হন। বিশ্বের কল্যাণের নিমিত্ত এবং ভগবৎসেবার উচ্চাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেবা, ত্যাগ, ও দাস্যভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখতে পাওয়া যায় হনুমানের চরিত্রে। ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ। মহাবীর প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন ঃ "মহাবীরের চরিত্রকেই তোদের এখন আদর্শ করতে হবে। দেখ না, রামের আজ্ঞায় সাগর ডিঙিয়ে চলে গেল। জীবন-মরণে দৃক্‌পাত নেই। মহা জিতেন্দ্রিয়, মহা বুদ্ধিমান, দাস্যভাবের ঐ মহান আদর্শে জীবন গঠন করতে হবে।"

'কথামৃত'-এ পাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন ঃ "হনুমান সাকার-নিরাকার সাক্ষাৎকার করবার পর সেব্য-সেবকের ভাবে, ভক্তের ভাবে থাকতেন। রামচন্দ্রকে বলেছিলেন—রাম, কখনো ভাবি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; কখনো ভাবি তুমি সেব্য, আমি সেবক। আর রাম, যখন তত্ত্বজ্ঞান হয় তখন দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি।"

সেবাধর্মকে সমস্ত শাস্ত্র অত্যন্ত কঠিন বলেছেন। অপরের কল্যাণে স্বার্থত্যাগ, ভক্তিমুক্তি পর্যন্ত ত্যাগ করা চাই। তুলসীদাস বলছেন—

"সুর নর মুনি সবকৈ ইহ রীতী।
স্বারথ লাগি করহিঁ সব প্রীতি।।"

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ১১।১)

আত্মমুক্তিকামী মুনিদেরও পর্যন্ত স্বার্থপর বলা হয়েছে। [illegible]ন ভগবানের রূপসুধা পান পর্যন্ত ত্যাগ করে রামের [illegible]য় সর্বদা নিরত, তাই রামের মুখের দিকে না তাকিয়ে [illegible] দৃষ্টি চরণে নিবদ্ধ আছে।

[illegible]মানবের সেবা তথা 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' ভক্তির [illegible] অঙ্গ। যিনি ভগবদ্‌ভক্ত হতে চান তিনি মানুষকে [illegible]জ্ঞানে সেবা করেই ভক্তিভাবনাকে প্রকট করবেন। [illegible]সীদাস বলছেন—

"[illegible]ড় চেতন জগ জীব যত সকল রামময় জানি।
[illegible]বউঁ সব কে পদ কমল সদা জোরি জুগ পানি।।"

(বালকাণ্ড, দোহা-৭গ)

[illegible] জড় এবং চেতন যত জীব আছে সবই রামময়—[illegible]ন তাদের বন্দনা করা অর্থাৎ সেবা করাই ধর্ম।

"[illegible] পর হিত সরিস ধর্ম নহিঁ ভাঈ।
পড় পীড়া সম নহিঁ অধমাঈ।।" (উত্তরকাণ্ড, ৪০।১)

—রাম হনুমানকে বলছেন, হে ভাই, অপরের ভাল করার মতো কোন ধর্ম নেই আর অপরকে দুঃখ দেওয়ার মতো এত নীচতা (পাপ) আর কিছুতে নেই।

আরো বলছেন—

"সোই সেবক প্রিয়তম মম সোঈ।
মম অনুসাসন মানৈ জোঈ।।" (ঐ, ৪২।৩)

* স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা। [শ্যামলী চৌধুরী নিবেদিত।]

—যে আমার নির্দেশ মানে সে-ই আমার সেবক এবং সে-ই আমার প্রিয়তম।

বাল্মিকী রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, পদ্মপুরাণ ও রামচরিতমানস-এ হনুমানের চরিত্র বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। সমগ্র ইতিহাস, পুরাণ এবং শাস্ত্র একবাক্যে স্বীকার করেছেন—হনুমানের ন্যায় রামের ভক্তবৎসল সেবক পৃথিবীতে আর কেউ নেই। তাই তুলসীদাস বলছেন ঃ আমার মনে এরূপ বিশ্বাস—

"রাম তে অধিক রাম কর দাসা।"

(ঐ, ১১৯।৮)

আবার রাবণ-বধের উপায়স্বরূপ ব্রহ্মা দেবতাগণকে বলছেন—

"বানর তনু ধরি ধরি মহি হরি পদ সেবহু জাই।"

(বালকাণ্ড, ১৮৭।১)

—তোমরা সকলে বানরশরীর ধারণ করে পৃথিবীতে গিয়ে রামের চরণ সেবা কর।

ব্রহ্মার কথার তাৎপর্য এই যে, নিজ নিজ জীবনের দুর্গুণসমূহকে দূর করতে হলে প্রথমে ভোগবাসনা থেকে মুক্ত হয়ে সেবা ও ত্যাগের বৃত্তি নিয়ে ভগবানের তথা জীবমাত্রেরই ভগবদ্বুদ্ধিতে সেবা করা চাই।

তুলসীদাস 'বিনয় পত্রিকা'য় বানরদের বিভিন্ন প্রকার মোক্ষের সাধনপদ্ধতির কথা বলেছেন।

"কৈবল্য সাধন অখিল ভালু মর্কট।" (৫৮।৮)

শ্রীরাম সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম এবং সীতা পরাশক্তির প্রতীক। জনকনন্দিনীর অন্বেষণ তথা পরাভক্তিলাভই জীবনের উদ্দেশ্য। হৃদয়ে ব্রহ্মভাব তথা শান্তির প্রতিষ্ঠা না হলে দুর্গমরূপ রাক্ষসবধ হয় না। বানরেরা সীতার খোঁজে বেরিয়ে পথ ভুলে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করেছে এবং তৃষ্ণার্ত হয়ে নিরাশ ও অসহায় বোধ করছে—এমতাবস্থায় একমাত্র হনুমানই তাদের ঠিক পথে পরিচালিত করে সরোবরের কাছে নিয়ে গেলেন এবং সেখানে ফলমূল ও সুমিষ্ট জল পান করে বানরেরা তৃপ্তিলাভ করল।

সাধনাবস্থায় সাধকের মনে সংশয়, সন্দেহ, অবিশ্বাস ও হতাশা এলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। আত্মপ্রচেষ্টা, বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের সাহায্যে সাধক লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। 'রামচরিতমানস'-এ হনুমানকে প্রবল বৈরাগ্যের [illegible] বলা হয়েছে। জগতে দুইপ্রকারের মহাপুরুষ আছেন। একপ্রকার মহাপুরুষ কেবল নিজের মুক্তির চেষ্টা করেন এবং আরেক প্রকারের মহাপুরুষ নিজে মুক্ত হওয়ার পর অপরকেও মুক্তির পথে টেনে নিয়ে যান। হনুমান এই দ্বিতীয় প্রকারের মহাপুরুষ। 'বিনয় পত্রিকা'য় তুলসীদাস হনুমান সম্বন্ধে বলছেন—

"মঙ্গল মুরতি মারুত নন্দন। সকল অমঙ্গল মূল নিকন্দন।।
পবন তনয় সন্তন হিতকারি। হৃদয় বিরাজত অবধ বিহারী।।"

(৩৬।১-২)

অর্থাৎ পবনপুত্র হনুমান কল্যাণের মূর্তি, সমস্ত দুর্গুণ ও অমঙ্গলের মূল বিনাশকারী, সাধুর হিতাকাঙ্ক্ষী এবং শ্রীরাম সর্বদা তাঁর হৃদয়ে বিরাজিত।

'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এ হনুমান রামের নিকট বরপ্রার্থনা করে বলছেন ঃ "হে রাম, যতদিন পৃথিবীতে তোমার নাম প্রচলিত থাকবে ততদিন আমিও যেন তোমার নামের সঙ্গে বিদ্যমান থাকি।" শ্রীরাম 'তথাস্তু' বলে বললেন ঃ "জীবন্মুক্ত ও অমর হয়ে তুমি পৃথিবীতে বিচরণ করবে, কল্পান্তে তুমি সাযুজ্য মুক্তি লাভ করবে।" 'রামচরিতমানস'-এ মহাদেব পার্বতীকে বলছেন—

"হনুমান সম নহিঁ বড় ভাগী।
নহিঁ কোউ রাম চরন অনুরাগী।।
গিরিজা জাসু প্রীতি সেবকাঈ।
বারবার প্রভু নিজ মুখ গাঈ।।"

(উত্তরকাণ্ড, ৪৯।৪-৫)

—হে গিরিজে, হনুমানের মতো ভাগ্যবান কেউ নেই, আবার শ্রীরাম-চরণে এমন অনুরাগীও কেউ নেই, যার প্রেমানুরাগ এবং সেবার কথা প্রভু নিজমুখে বারবার প্রশংসা করেন। 'রামচরিতমানস'-এর উত্তরকাণ্ডে কাকভূষুণ্ডি গরুড়কে বলছেন—

"সেবক সেব্য ভাব বিনু ভব ন তরিঅ উরগারি।"

(ঐ, ১১৯ ক)

অর্থাৎ হে গরুড়, আমি সেবক আর ভগবান সেব্য (স্বামী)—এই ভাব ছাড়া সংসাররূপী সমুদ্র পার হওয়া অসম্ভব। হনুমানের জীবনে বল, বুদ্ধি, বিবেক, বৈরাগ্য, সাধনা প্রভৃতি প্রবলভাবে থাকা সত্ত্বেও দৈন্যভাব ও শরণাগতির ভাব বিদ্যমান। নিরভিমানতা ও দৈন্য মানুষের জীবনে বড়ই মহত্ত্বপূর্ণ। কঠোর সাধনার পরই ঠিক ঠিক শরণাগতি ও নির্ভরতা আসে। সাধকমাত্রেরই হনুমানের চরিত্র থেকে নম্রতা, ঈশ্বরনির্ভরতা, শীল, পুরুষার্থ প্রভৃতির প্রেরণা ও শিক্ষালাভ করা উচিত। হনুমান সাগর ডিঙিয়ে লঙ্কায় গিয়ে সীতার সন্ধান নিয়ে রামের নিকট ফিরে এলে শ্রীরাম তাঁকে বলছেন ঃ "হে হনুমান শোন, দেবতা, মুনি, মানুষ বা অন্য কোন দেহধারীর মধ্যেও তোমার মতো উপকারী আমার আর কেউ নেই। প্রতিদানে আমি তোমাকে [illegible] হে পুত্র, আমি তোমার নিকট চিরঋণী রইলাম।" [illegible] হনুমান তখন—

"সুনি প্রভু বচন বিলোকি মুখ গাত হরষি হনুমন্ত।
চরণ পরেউ প্রেমাকুল ত্রাহি ত্রাহি ভগবন্ত।।"

(সুন্দরকাণ্ড, ৩২)

—প্রভুর কথা শুনে হনুমান অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং প্রেমবিহ্বল হয়ে "হে ভগবান আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলতে বলতে শ্রীরামের চরণে লুটিয়ে পড়লেন। এই হলো ঠিক ঠিক শরণাগতি ও নিরভিমানতার ভাব। প্রশংসা শুনে খুশি হন না—এমন মানুষ জগতে বিরল। রাম যখন বলছেন—

"কহু কপি রাবণ পালিত লঙ্কা।
কেহি ৰিধি দহেউ দুর্গ অতি ৰঙ্কা।।" (ঐ, ৩২।৩)

—হে হনুমান বলো তো, রাবণের দ্বারা সুরক্ষিত লঙ্কা আর ঐ সুদৃঢ় দুর্গকে তুমি কেমন করে জ্বালালে? উত্তরে হনুমান অহঙ্কার ত্যাগ করে বললেন ঃ "বানরের বাহাদুরি ঐ পর্যন্তই যে, তারা এক ডাল থেকে আরেক ডালে লাফিয়ে যেতে পারে। আমি যে সমুদ্র লঙ্ঘন করে স্বর্ণলঙ্কা জ্বালিয়েছি এবং রাক্ষসদের মেরে অশোক বন ধ্বংস করেছি, সেসবই তো আপনারই প্রতাপ। হে নাথ, এতে আমার কিছুমাত্র কৃতিত্ব নেই।"—

"সো সৰ তব প্রতাপ রঘুরাঈ।
নাথ ন কছু মোরি প্রভুতাঈ।।" (ঐ, ৩২।৫)

'রামচরিতমানস'-এ দেখা যায়, রাবণ তাঁর সভাতে হনুমানকে জিজ্ঞাসা করছেন ঃ "হে বানর, তুই কে? কার বলে তুই অশোকবন, আমার পুত্র অক্ষয় ও অন্যান্য রাক্ষসদের বধ করলি?" হনুমান তখন নির্ভয়ে রাবণকে বললেন—

"জাকে ৰল লবলেস তেঁ জিতেহু চরাচর ঝারি।
তাসু দূত মৈঁ জা করি হরি আনেহু প্রিয় নারি।।"
(ঐ, ২১)

—যাঁর বলের নামমাত্র পেয়ে তুমি চরাচর বিশ্বকে জয় করেছ আর যাঁর প্রিয় পত্নীকে তুমি হরণ করেছ, আমি তাঁর দূত। রাবণের হিতের জন্য হনুমান সাম, দাম, দণ্ড, ভেদ, নীতি প্রদর্শনপূর্বক উপদেশ দিয়ে বলছেন—

"মোহমূল ৰহু সূল প্রদ ত্যাগহু তম অভিমান।
ভজহু রাম রঘুনায়ক কৃপা সিন্ধু ভগবান।।"
(ঐ, ২৩)

—মোহ যার মূল, এমন পীড়াদায়ক তমোগুণী অভিমান ত্যাগ কর, আর রঘুকুলস্বামী কৃপাসিন্ধু রামের ভজনা কর।

'রামচরিতমানস'-এর সুন্দরকাণ্ডের প্রারম্ভে বন্দনা ও প্রণামমন্ত্রে তুলসীদাস বলছেন—

"অতুলিতবলধামং হেমশৈলাভদেহং
দনুজবনকৃশানুং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্।
সকলগুণনিধানং বানরাণামধীশং
রঘুপতিপ্রিয়ভক্তং বাতজাতং নমামি।।" (৩)

উপরি উক্ত শ্লোককটিতেই মহাবীর হনুমানের চরিত্রের বিশেষ বিশেষ দিকগুলি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে ঃ (১) 'অতুলিতবলধামং'—হনুমান কেবল বলবানই নন, তার চেয়েও বেশি কিছু। তাঁকে বলবান না বলে বলধাম বলা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি বলের ভাণ্ডার। হনুমান স্বয়ং বলশালী এবং অপরকে পর্যন্ত বল প্রদান করতে সমর্থ। তাই এই বিশেষণ সার্থক। হনুমানের আরেক নাম 'সঙ্কটমোচন'। সুগ্রীব সঙ্কটগ্রস্ত হলে হনুমান তাঁর সঙ্কটমোচন করেছেন। সীতার অনুসন্ধানে গিয়ে বানরেরা বিপদে পড়লে হনুমান তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। শক্তিশেলে লক্ষ্মণের জীবনসঙ্কট উপস্থিত হলে হনুমান বৈদ্য ও ওষধি সংগ্রহ করে এনে লক্ষ্মণের জীবনদান করেছেন। ভরত, সীতা, এমনকি ভগবান শ্রীরামের পর্যন্ত সঙ্কট তিনিই দূর করেছেন। 'হনুমান চালীশা'য় তুলসীদাস বলছেন—

"কো নহি জানত হ্যায় জগমেঁ।
কপি সঙ্কট মোচন নাম তিহারী।।"

(২) 'হেমশৈলাভদেহং'—সুবর্ণ পর্বতের মতো কান্তিযুক্ত দেহ। "কনক বরণ তন তেজ বিরাজা।" (রামচরিতমানস, ৪।২৯।৪) অর্থাৎ তাঁর শরীরের বর্ণ সোনার মতো। সারা শরীরে তেজ বিচ্ছুরিত। আজন্ম ব্রহ্মচারী, তাই দেহ জ্যোতির্ময়। স্বর্ণকে অগ্নিতে তপ্ত করলে যেমন ঔজ্জ্বল্য বাড়ে, তেমনি ত্যাগ, সেবা, সঙ্ঘর্ষ ও তপস্যার দ্বারা হনুমানের দেহকান্তি, সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে।

(৩) 'দনুজবনকৃশানুম্'—রাক্ষসকুলরূপী বনের অগ্নিস্বরূপ তিনি। বনের প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন বিনা বিচারে ছোট-বড় সমস্ত বৃক্ষকে ভস্ম করে দেয়, হনুমানও সেইরকম লঙ্কার রাক্ষসদের ধ্বংস করেছেন এবং স্বর্ণলঙ্কা ছারখার করেছেন। লঙ্কাযাত্রাকালে পথে তিনি সুরসা, সিংহিকা ও লঙ্কিনীকে পরাজিত করেছেন। লঙ্কায় এসে তিনি রাবণের মনে ভয় ও ত্রাসের সৃষ্টি করেছেন এবং লঙ্কার বহু রাক্ষসের প্রাণনাশ করেছেন।

(৪) 'জ্ঞানিনাম্ অগ্রগণ্যম্'—জাম্ববান বলছেন ঃ "বুদ্ধি বিবেক বিজ্ঞান নিধানা।" (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ২৯।২) বাল্মিকী রামায়ণে আছে, মাতা অঞ্জনার নির্দেশে হনুমান সূর্যনারায়ণের সমীপে গিয়ে বেদ, বেদাঙ্গ প্রভৃতি শাস্ত্র, কলা এবং সঙ্গীত প্রভৃতি অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। রাম-লক্ষ্মণের নিকট হনুমানের শুদ্ধ ভাষা, উচ্চারণ, বেদজ্ঞান ও ব্যাকরণ-জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

(৫) 'সকলগুণনিধানং'—সমস্ত গুণের আকর বা খনি। সাম, দাম, ভেদ, দণ্ড ও নীতির উপদেশ দ্বারা অপরকে স্ববশে আনায় তিনি পটু। দুষ্টের সঙ্গে দুষ্টতা, সজ্জনের সঙ্গে সাধু ব্যবহারে তিনি অভিজ্ঞ ও নিপুণ। নিষ্কাম সেবাভাব, জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য ও যোগের সমন্বয় হনুমানের চরিত্রে বিদ্যমান।

(৬) 'বানরাণামধীশম'—বানরদের প্রভু ও নেতা। সাগর পার হওয়ার সময় জাম্ববান হনুমানকে বলছেন ঃ "জগতে এমন কোন্ কাজ আছে যা তুমি করতে পার না! রামের কাজের জন্যই তোমার জন্ম।" "রাম কাজ লাগি তব অবতারা।" (৪।২৯।৩) এই কথা শোনা মাত্রই হনুমান পর্বতের মতো বিশাল আকার ধারণ করলেন।

(৭) 'রঘুপতিপ্রিয়ভক্তম্'—শ্রীরাম ছাড়া হনুমানের আর কোন ইচ্ছা বা আশ্রয় নেই। শ্রীরামের কাজের জন্যই তাঁর জীবনধারণ। শ্রীরামের প্রতি প্রেমই হনুমানের একমাত্র সাধন ও সিদ্ধি। হনুমানের সেবাভাবনা, সেবাপরায়ণতায় খুশি হয়ে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত এবং অযোধ্যাবাসী সকলেই হনুমানের

নিকট ঋণস্বীকার করেছেন। তুলসীদাস হনুমানকে "রামায়ণং মহামালারত্নং বন্দেঽনিলাত্মজম্" বলে বন্দনা করেছেন।

"এক ভরোসো এক বল এক আশ বিশ্বাস।
এক রাম ঘনশ্যাম হিত চাতক তুলসীদাস।"
(দোঁহা-৫০১)

চাতকের মতো তুলসীদাসও একমাত্র শ্রীরামের ওপর ভরসা করেই সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেছেন। হনুমানও তেমনি নিজের হৃদয় চিরে লক্ষ্মণ ও অন্যান্য সভাসদ্দের দেখিয়েছেন যে, রাম ও সীতা সর্বদা তাঁর হৃদয়েই অধিষ্ঠিত।

(৮) অন্তিম বিশেষণ—'বাতজাতম্' অর্থাৎ পবনপুত্র। এবং বায়ুর ন্যায় অপ্রতিহত। বাল্মিকী রামায়ণে আছে—নিতান্ত শৈশবেই একদিন জননীর অনুপস্থিতিতে ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় উদীয়মান সূর্যকে ফল মনে করে হনুমান তাঁকে ধরার জন্য আকাশে উঠে সূর্যের নিকট পৌঁছায়। পবনদেব শিশুটিকে সূর্যের তেজ থেকে রক্ষা করতে তুষার-শীতল বায়ু প্রবাহিত করতে লাগলেন। সেদিন ছিল সূর্যগ্রহণ, তাই রাহুকে সূর্যের কাছে দেখে প্রথমে তাঁকেই ধরতে যান। রাহু ভয় পেয়ে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হয়। ইন্দ্র ঐরাবতে চড়ে হনুমানের নিকট পৌঁছান। হনুমান সাদা ফল মনে করে ঐরাবতকে ধরতে যান। দেবরাজ ইন্দ্র ভয়ে বজ্রদ্বারা তাঁকে প্রহার করেন। বজ্রের আঘাতে 'হনূ' বা চোয়ালে চো[illegible] লাগায় হনুমান মূর্ছিত হয়ে নিচে পড়ে যান। সেই থেকে তাঁ[illegible] নাম হয় 'হনুমান'। আবার 'মনোজবং মারুততুল্যবে[illegible] বিশেষণটিও হনুমানের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ [illegible] ব্যক্তি বায়ু ও মনের ন্যায় সতত গতিশীল হয়, সে-ই [illegible] সফলতা লাভ করে। এরূপ বিশেষ অধিকারী ব্যক্তি[illegible] পরহিতে জীবন সমর্পণ করতে পারে। তুলসীদাস[illegible] 'রামচরিতমানস'-এ হনুমানকে কখনো 'পবনপুত্র', আ[illegible] কখনো 'প্রভঞ্জনসূত' বলে উল্লেখ করেছেন। হনুমান য[illegible] নিজ বল প্রতাপ-সহ ঝড়ের বেগে চলেছেন, তখন তিনি [illegible] প্রভঞ্জন এবং যখন রামকে স্মরণ করে দাসভাবে কাজ [illegible] করছেন, তখন তিনি পবনপুত্র। মৃদুমন্দ শীতল ও সু[illegible] বায়ু যখন ধীরে ধীরে বইতে থাকে তখন তা সকলের নি[illegible] সুখদায়ী হয়। তখন তিনি 'পবনপুত্র'।

রামের মনে আনন্দ ও সুখ দেওয়া, সীতার অ[illegible]জ্বালা শীতল করে সুখশান্তি প্রদান করা এবং ভরত, লক্ষ্মণ, সু[illegible] ও বিভীষণকে পর্যন্ত সুখশান্তি ও আনন্দ দান প্রভৃতি কার্য একমাত্র হনুমানের দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছে। হনুমান যেখানে গেছেন সেখানেই প্রভুর মহিমা ও সুখশান্তি পৌঁছে দিয়েছেন। ভরত বলেছেন ঃ "তোমাকে আলিঙ্গন করে আমার মনে হচ্ছে যেন সাক্ষাৎ রামের হৃদয়সুখ অনুভব করছি।" হনুমানের বিশেষত্ব হলো—জাতি, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতি ভেদ থেকে তিনি মুক্ত। ত্যাগ, সেবা, কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও যোগের সমন্বয় ঘটেছে হনুমানের চরিত্রে। নিজের চরিত্রের মাধ্যমে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সদুপদেশের দ্বারা জ্ঞানের বিতরণ, ভক্তির মহিমা প্রকাশ ও পরোপকাররূপ নিষ্কাম কর্ম যখনি প্রয়োজন হয়েছে, তিনি করেছেন। হনুমান সাকার-নিরাকার সাক্ষাৎকারের পর সেব্য-সেবকের ভাবে, ভক্তের ভাবে থাকতেন।

পরম ভক্ত ও জ্ঞানী হয়েও বিনম্রতা ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। মেঘনাদের শক্তিশেলে লক্ষ্মণ মূর্ছিত হলে সুষেণ বৈদ্যের নির্দেশানুযায়ী মৃতসঞ্জীবনী ইত্যাদি ঔষধাদি আনার জন্য হনুমান হিমালয়ে যান, কিন্তু ঔষধ চিনতে না পেরে সমগ্র পর্বতটি হাতে নিয়ে অযোধ্যার ওপর দিয়ে আকাশপথে ফিরছিলেন। এমন সময় ভরতের দৃষ্টি আকাশপথে নিবদ্ধ হলে তিনি মায়াবী রাক্ষস মনে করে তাঁকে বাণ মারলেন। হনুমান পর্বতসহ 'জয় শ্রীরাম' বলে মাটিতে পড়ে মূর্ছিত হয়ে গেলেন। ভরত যখন দেখলেন—এ রাক্ষস নয়, পরম ভক্ত রামের দাস হনুমান, তখন রোদন করতে লাগলেন। নিজেকে ধিক্কার দিয়ে তিনি বললেন ঃ "আমিই সমস্ত অনর্থের মূল। ভগবান আমাকে রামবিমুখ করেছেন, তার ওপর এই ভয়ানক দুঃখ দিলেন। কায়মনোবাক্যে যদি আমার শ্রীরামের প্রতি অকপট প্রীতি থাকে তাহলে এঁর ক্লান্তি ও বেদনা দূর হোক।" এই কথা উচ্চারণ করামাত্র হনুমানের চেতনা ফিরল। ভরত হনুমানকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ও রামের কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করলেন। লক্ষ্মণের জীবনসংশয় উপস্থিত হয়েছে এবং তার জন্য সূর্যাস্তের পূর্বেই ঔষধ নিয়ে ফিরতে [illegible]বে শুনে ভরত বিলাপ করতে করতে বললেন ঃ "হা দৈব! [illegible] পৃথিবীতে কেন জন্মালাম! প্রভুর একটা কাজেও তো [illegible] এলাম না।" ভরত হনুমানকে বললেন ঃ

"চড়ু মম সায়ক সৈল সমেতা।
পঠবৌঁ তোহিহ জহঁ কৃপা নিকেতা।।"
(লঙ্কাকাণ্ড, ৫৯।৩)

[illegible] পাহাড় সমেত আমার বাণের ওপর চড়, আমি [illegible] প্রভু রামের কাছে এখনি পাঠাব। এতে হনুমানের [illegible] প্রথমে একটু অহং ভাব এলেও রামের প্রতাপের কথা [illegible] বাণের ওপর উঠে পড়লেন এবং ভরতের প্রশংসা [illegible] করতে প্রভুর কাছে পৌঁছে গেলেন। একদা রাম [illegible]র প্রশংসা করলে হনুমান রামকে বলেন ঃ [illegible]র প্রতি ভরতের যেরূপ ভক্তি-বিশ্বাস সেরকম [illegible]াস যদি আমার থাকত, তাহলে লক্ষ্মণের জন্য [illegible] ও পর্বতসহ ঔষধ আনার কোন প্রয়োজনই হতো না। আপনিই কৃপা করে ভরতের মনে ভ্রমের সৃষ্টি করে আমার অহঙ্কারকে দূর করেছেন।" হনুমান ধন, মান, দেহসুখ কিছুই চাননি, কেবল ভগবানকে চেয়েছেন। যখন স্ফটিকস্তম্ভ থেকে রাবণের মৃত্যুবাণ ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে হনুমান পালাচ্ছেন, তখন মন্দোদরী অনেকরকম ফল নিয়ে লোভ দেখাতে লাগলেন। ভাবলেন, ফলের লোভে অস্ত্র নিচে ফেলে দেবে, কিন্তু হনুমান ভোলার পাত্র নন, তিনি বললেন—

"আমার কি ফলের অভাব।
পেয়েছি যে ফল, জনম সফল,

মোক্ষফলের বৃক্ষ রামহৃদয়ে।
শ্রীরামকল্পতরুমূলে বসে রই—
যখন যে ফল বাঞ্ছা সেই ফল প্রাপ্ত হই।।"

('কথামৃত', পৃঃ ৩০)

শিবিরাজা শরণাগত কপোতের রক্ষার জন্য নিজের শরীরের মাংস বাজপাখিকে দিয়ে মহান হয়েছেন, হরিশ্চন্দ্র সত্যরক্ষার জন্য বিশ্বামিত্র ঋষিকে নিজ রাজ্য ও সর্বস্ব দান করে বিশ্ববরেণ্য হয়েছেন। কোন এক মহান কর্মযজ্ঞে আহুতি দিয়ে এইসব মহাপুরুষেরা চিরকীর্তিমান হয়েছেন, কিন্তু হনুমান চরিত্রের মধ্যে সবকিছুর একত্র সমাবেশ ঘটেছে, তাই তিনি মহান থেকেও মহান এবং বিশ্ববন্দ্যরূপে সকলের ঘরে ঘরে পূজিত হচ্ছেন। রাম ছাড়া যেমন রামায়ণ হয় না, হনুমান ছাড়া তেমনি রামের মহিমা প্রকাশ পায় না। স্বয়ং রাম হনুমানকে বলেছেন ঃ "হে কপিবর, তুমি আমার কাছে লক্ষ্মণের চেয়েও প্রিয়। সকলে আমাকে সমদর্শী বলে, কিন্তু সেবক আমার প্রিয়, কারণ সে অনন্যগতি (আমি বিনা তার আর কোন সহায় নেই)।" (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ২।৪)

"সো অনন্য জাকেঁ অসি মতি ন টরই হনুমন্ত।
মৈঁ সেবক সচরাচর রূপ স্বামী ভগবন্ত।।" (ঐ, ৩)

—হে হনুমান, অনন্যগতি তাকেই বলে, যার এই বুদ্ধি কখনোই বিচলিত হয় না যে, আমি সেবক আর এই চরাচর বিশ্ব আমার প্রভু শ্রীভগবানেরই রূপ।

'বাল্মিকী রামায়ণ'-এ আছে, রাম মহাপ্রস্থানের পূর্বে হনুমানকে বলেন ঃ "যতদিন আমার কথা ধরাতলে লোকসমাজে প্রচারিত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তোমার কীর্তি বিদ্যমান থাকবে এবং তুমি আনন্দে বাস করবে। তুলসীদাসের ভাষায় আমরাও প্রণাম জানিয়ে বলি ঃ "যেখানে যেখানে রঘুনাথের গুণগান করা হয়, সেখানে সেখানেই যিনি মস্তকে অঞ্জলি স্থাপনপূর্বক সাশ্রু নয়নে অবস্থান করেন—সেই রাক্ষস-বিধ্বংসী মারুতিকে সকলে প্রণাম করি।" ❑

শব্দচেতনা 

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' অবলম্বনে তৈরি বিশেষ শব্দছক

■	১	২	■	৩	৪	■	৫	৬
৭	■	৮		■	৯		■	
■	১০		■	১১		■	১২	
১৩		■	১৪		■	১৫		■
■	১৬		■	১৭		■	১৮	
১৯		■	২০		■	২১		■
	■	২২		■	২৩		■	২৪
■	২৫	■	২৬	২৭	■	২৮	২৯	■
৩০			■	৩১		■	৩২	

পাশাপাশি ঃ (১) "জীবের —— প্রকার ভেদ।" (৩) "নির্জনে —— করে করে কুলকুণ্ডলিনীকে জাগাতে হয়।" (৫) "—— কোটির মানুষ সমাধিব পরে আর নামতে পারে না।" (৭) ঠাকুর জগৎকে এই মহামন্ত্র দান করেছেন। (৮) ঠাকুর রামপ্রসাদের এই গানটি গাইতেন—"মন কি —— কর তাঁরে।" (৯) বলরাম বসুর বাড়িতে ঠাকুর টেনেছিলেন। (১০) "দিলাম তোরে সেই মন্তোর; এখন —— তোর।" (১১) এই পাখিটি সেয়ানা, কিন্তু বিষ্ঠা খায়। (১২) "একমাত্র ঈশ্বরদর্শন হলে —— বুদ্ধি যায়।" (১৩) "—— কালের সঙ্গে যিনি রমণ করেন তিনিই মহাকালী।" (১৪) ঠাকুর বলেছেন, তাঁর অন্তরঙ্গরা কেউ অংশ, কেউ ——। (১৫) এইটি বদ্ধ হলেই জীব, আর মুক্ত হলেই শিব। (১৬) "যেমন —— তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়।" (১৭) "যোগীর মন ঈশ্বরে"—একথা বোঝাতে ঠাকুর এর ডিমে তা দেওয়ার উপমা দিয়েছেন। (১৮) "ঈশ্বরেব কাছে —— কুমড়ো চাইতে নেই।" (১৯) "নানা শাস্ত্র জানলে কি হবে, —— নদী পার হতে জানা দরকাব।" (২০) পুকুরের চার ঘাটের মধ্যে এক ঘাটের লোক জলকে এই বলে। (২১) এই বস্তুটি যখন ভাজা হয়, দু-চারটে খোলা থেকে লাফিয়ে পড়ে। (২২) এই বস্তুটি শোলার দেখলেও আসলেব উদ্দীপন হয়। (২৩) হঠযোগের চূড়ান্ত অবস্থায় এই সমাধি হয়। (২৪) ঠাকুর গাইতেন ঃ "—— জানেবে কালী কেমন।" (২৬) "লক্ষ্মণ —— কুশকে বলছেন, তোবা ছেলেমানুষ রামচন্দ্রকে জানিস না।" (২৮) "অনন্ত পথ, অনন্ত ——।" (৩০) এই হাওয়া যে গাছে লাগে, সেসব চন্দন হয়ে যায়। (৩১) যার অটল আছে তার এটাও আছে। (৩২) এর তৈরি পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে আর ফেরেনি।

ওপর-নিচ ঃ (২) যাত্রা-গায়ক নীলকণ্ঠ ঠাকুরকে বলেছেন ঃ "এখান থেকে অমূল্য —— নিয়ে গেলাম।" (৪) গোলকধাম খেলায় হাজরার গুটি বারবার এখানে পড়েছে। (৬) এই অবতারে ভগবান স্ব-স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে মায়াবদ্ধ হয়েছিলেন। (৭) ঠাকুর স্বামীজীকে এই গানটি শিখিয়েছিলেন—"আমার —— ত্বং হি তারা।" (১০) ঠাকুর বলেছেন, এইটি অবতারের হয়, জীবের হয় না। (১১) জাহাজ এখানে গেলে আর ফেরে না। (১২) এটি ভিজে থাকলে জ্বলে না। (১৯) "কালীর —— জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দময়।" (২০) "এখানে —— ফোঁড়া শিব, বসানো শিব নয়।" (২১) ঠাকুরের বাবা যখন এটি পরে যেতেন, গাঁয়ের দোকানীরা উঠে দাঁড়াত। (২৪) ঠাকুর গাইতেন ঃ "সুরধনীর তীরে হরি বলে ——, বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।" (২৫) এই বস্তুটির বিভিন্ন নাম ও প্রকার। (২৭) ঠাকুর —— তলার ধ্যানে মহম্মদকে দেখেছিলেন। (২৯) "কারণশরীরকে তন্ত্রে বলে 'ভাগবতী ——'।"

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আষাঢ় ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

সূত্র ঃ **শুক্লা পাঠক**

'কথামৃত'-এ বিভাষিত শ্রীরামকৃষ্ণ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

ঠাকুর বলতেনঃ "খাবে গরম শোবে নরম।" মেঝের বিছানাটি বেশ নরম। নরেন্দ্র বিশ্রাম করবেন। ঠাকুরের আহ্বানে ঋষিলোক থেকে যাঁর এই মরলোকে আগমন। সমাধি থেকে যাঁকে নামিয়ে এনেছেন ঠাকুর। তবে সময়ের এই ব্যবধান কেন? ১৮৩৬ আর ১৮৬৩! প্রায় ২৭ বছর। কারণটা কি? এই সুন্দর শারদ দ্বিপ্রহরে ঠাকুর তাঁর সাধনজীবনের স্মৃতিচারণ করছেন। রাসমণির দেবালয়ে পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণ। সাধারণ পুরোহিত নন। প্রস্তর প্রতিমার তত্ত্ব অবগত হবেন। জীবলোক আর দেবলোকের মধ্যে সহজ কোন সরণি আছে কি? ভক্তির কোন্ চাবি দিয়ে সেই দুরধিগম্য পথের দরজা খোলা যায়? উপনিষদ্ যে বললেন, সে অতি দুরূহ পথ—"ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া"—তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের মতোই দুর্গম। বললেন—"যতো বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—বাক্য আর মন যাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে। নাকি এইরকম?—পরবর্তী কালের কবি রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে প্রকাশ—

"তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।
বুঝতে নারি কখন তুমি দাও যে ফাঁকি।।
ফুলের মালা দীপের আলো ধূপের ধোঁওয়ার
পিছন হতে পাইনে সুযোগ চরণ ছোঁওয়ার,
স্তবের বাণীর আড়াল টানি তোমায় ঢাকি।।"

পূজার ছলে মানুষ কি যুগ যুগ ধরে নিজেকেই নিজে ঠকাচ্ছে? আমি মৃন্ময়ীর রহস্য আগে জানব। ১৮৫৫ থেকে ১৮৬৬—এগারোটি বছর ঠাকুরের আকুল সাধনা। দেখা যদি না দাও, এই নাও—প্রাণ নাও। দেখা পেলেন। সাকার নয়, নিরাকার। জ্যোতির ঢেউ আছড়ে আছড়ে এসে পড়ছে। সংজ্ঞা হারালেন।

সাধনার ফল সিদ্ধি। ঠাকুরের জীবনে ঘটল বিপরীত। সিদ্ধির পর শুরু হলো প্রগাঢ় সাধনা। অরূপের রূপ দেখেছি, এইবার দেখতে চাই রূপের রূপ। প্রতিমা থেকে নেমে এস মা তুমি জীবন্ত হয়ে। দেবী, তোমাকে মানবী হতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় তা সম্ভব হলো। সাধারণ মানুষ বলতে লাগল, ইনি উন্মাদ।

নরেন্দ্রনাথ তখনো নেমে আসেননি। ঠাকুর মহানন্দে তাঁর অতীত জীবনকথা তাঁকে শোনাচ্ছেন। উনিশ বছরের যুবক নরেন্দ্রনাথ। বি. এ. পড়ছেন। তরুণের মনে বদ্ধমূল করতে চাইছেন দুটি গুণ—ঈশ্বরবিশ্বাস আর সাধনে বিশ্বাস।

কৃষ্ণকিশোরকে ঠাকুর খুব ভালবাসতেন। তাঁর অতি পছন্দের মানুষ। কে এই সৌভাগ্যবান, যাঁর কথা এতবার? কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য আড়িয়াদহে থাকতেন। পরম ভক্ত। শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন তাঁর ইষ্ট। সদাসর্বদা রামনাম জপ করতেন। এমন বিশ্বাস যে, 'মরা' শব্দটিকেও তিনি মহামন্ত্র জ্ঞান করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, নাম আর নামী অভেদ। তাঁর এক পুত্র মৃত্যুর সময় 'রাম' বলেছিল। কৃষ্ণকিশোর বলেছিলেনঃ "ও রাম বলেছে, ওর আর ভাবনা নেই।"

কৃষ্ণকিশোরের সহধর্মিণীও ঠাকুরের পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি ঠাকুরকে মনে করতেন তাঁর ইষ্টদেবতা। উত্তম রাঁধুনী ছিলেন তিনি। ভাল ভাল পদ তৈরি করে ঠাকুরকে নিবেদন করতেন। ঠাকুরও সানন্দে গ্রহণ করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেতেন 'অধ্যাত্মরামায়ণ' শুনতে। কখনো কখনো দুজনের খুব তর্ক বেঁধে যেত। তখন এই ভক্তিমতী মহিলা বলতেনঃ "ওঁর সঙ্গে ওরকম করো না। উনি হলেন আমাদের ইষ্টদেব স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র।"

ভক্ত কৃষ্ণকিশোর ঠাকুরের আগেই চলে গেলেন। তাঁর পুত্র রামপ্রসন্ন মাকে প্রথম প্রথম খুব অবহেলা করতেন। সেজন্য ঠাকুর রামপ্রসন্নের ওপর খুব অপ্রসন্ন হয়েছিলেন।

এঁড়েদার গঙ্গারঘাটে এক সাধু এসেছেন। দুই বন্ধু ঠাকুর আর কৃষ্ণকিশোর ঠিক করলেন, একদিন তাঁকে দর্শন করতে যাবেন। ঠাকুর হলধারীকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তুমি যাবে?"

ঠাকুর যাঁকে 'হলধারী' বলছেন, তাঁর প্রকৃত নাম রামতারক চট্টোপাধ্যায়। ঠাকুরের কাকা রামকানাই চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। সুপণ্ডিত, নিষ্ঠাবান ও বাক্‌সিদ্ধ। শাস্ত্রগ্রন্থে অসামান্য দখল। ঠাকুরের চেয়ে বয়সে বড়। মা ভবতারিণীর পূজারী হয়ে মন্দিরে এসেছিলেন। পশুবলির ঘোর বিরোধী ছিলেন। অত্যন্ত ক্ষুণ্ণমনে মা ভবতারিণীর পূজা করতেন। একদিন তাঁর কানে এল মায়ের শাসন—ঐ মন নিয়ে আমার পূজা করো না। অশ্রদ্ধার পূজা আমি গ্রহণ করি না। সাবধান পূজারী! গ্রাহ্য করলেন না রামতারক। ভাবলেন, মনের ভুল। মনের খেয়াল। পূজা চলতে লাগল। কিছুদিন পরেই তাঁর একটি ছেলের আকস্মিক মৃত্যু হলো। তখন আতঙ্কিত রামতারক বিষ্ণুমন্দিরের পূজারী হলেন।

ঠাকুর সেই হলধারীর কথা বলছেন। বাইরে রোদ ক্রমশই নরম হয়ে আসছে। মাঝগঙ্গায় সার সার জেলে-নৌকা। এই মরশুমের শেষ ইলিশ ধরছে। সাধুদর্শনে যাওয়ার আহ্বানে হলধারী কি বললেন? বললেন ঃ "একটা মাটির খাঁচা দেখতে গিয়ে কি হবে?"

ঠাকুর হাসছেন। ব্যাখ্যা করছেন, হলধারী এমন কথা বললেন কেন? "হলধারী গীতা-বেদান্ত পড়ে কিনা! তাই সাধুকে বললে 'মাটির খাঁচা'। কৃষ্ণকিশোরকে গিয়ে আমি ঐকথা বললুম। সে মহা রেগে গেল। আর বললে, 'কি! হলধারী এমন কথা বলেছে? যে ঈশ্বরচিন্তা করে, যে রামচিন্তা করে, আর সেইজন্য সর্বত্যাগ করেছে, তার দেহ মাটির খাঁচা! সে জানে না যে, ভক্তের দেহ চিন্ময়!' এত রাগ—কালীবাড়িতে ফুল তুলতে আসত, হলধারীর সঙ্গে দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নিত! কথা কইবে না!"

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। শান্ত, সংযত, কিঞ্চিৎ লাজুক প্রকৃতির। ঠাকুর যাঁকে বলেন গম্ভীরাত্মা, তিনি একপাশে বসে গভীর মনোযোগে প্রতিটি কথা শুনছেন। শুনছেন না, লিখছেন। মনের খাতায় লিখে রাখছেন। একটি শব্দও না হারিয়ে যায়। কেন? পরে জানা যাবে, যখন মহেন্দ্রনাথ 'শ্রীম' হবেন।

ঠাকুর বলছেন ঃ "কৃষ্ণকিশোর আমায় বলেছিল, 'পৈতেটা ফেললে কেন?' যখন আমার এই অবস্থা হলো, তখন আশ্বিনের ঝড়ের মতো একটা কি এসে কোথায় কি উড়িয়ে নিয়ে গেল! আগেকার চিহ্ন কিছুই রইল না। হুঁশ নেই! কাপড় পড়ে যাচ্ছে, তা পৈতে থাকবে কেমন করে! আমি বললুম, তোমার একবার উন্মাদ হয়, তাহলে তুমি বোঝ!"

দক্ষিণেশ্বর গ্রামখানি রাতের অন্ধকারে তলিয়ে আছে। নিঝুম প্রকৃতি। মন্দিরের কর্মচারীরা গভীর নিদ্রায়। গঙ্গা প্রবাহের কণ্ঠে স্রোতের গান গাইছে। পঞ্চবটীর বড় বড় গাছের মাথায় হনুমানছানার নড়াচড়া। মাঝে মাঝে প্যাঁচার কর্কশ কণ্ঠস্বর। দূরে শিয়ালের ডাক।

শ্রীরামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে তাঁর আড়ম্বরহীন শয্যায় উঠে বসলেন। বেরিয়ে এলেন তাঁর ঘর থেকে। এগিয়ে চলেছেন পঞ্চবটীর সেই দুর্গম পথে। অসমান, খানাখন্দে ভরা, জঙ্গলাকীর্ণ। সেইখানে একটি আমলকী বৃক্ষ। একে কবরডাঙা, তার ওপর জঙ্গল। দিনের বেলাতেও কেউ ঐদিকে যেতে সাহস করে না। আর রাতে তো কথাই নেই। ভূতের ভয়!

প্রথমেই ত্যাগ করলেন বস্ত্র। খুলে ফেলে দিলেন পৈতে। আর দেখা গেল না কোথায় তিনি। আমলকী গাছটি নিচু জমিতে, তায় জঙ্গল। সেই গাছের তলায় কেউ বসলে দিনের বেলাতেই অদৃশ্য, রাতের অন্ধকারে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। শাস্ত্রে আছে, আমলকীতলে ধ্যানে বসে যে যা কামনা করবে তাই পাবে।

হৃদয়রাম ঠাকুরের ভাগনে। পিসতুতো দিদি হেমাঙ্গিনী দেবীর ছেলে। পিতা কৃষ্ণচন্দ্র। শিহড়ে বাস। ঠাকুরের সমবয়সী। দীর্ঘাকৃতি, সুশ্রী, সুপুরুষ, সাহসী, বুদ্ধিমান। তাঁর সন্দেহ, রোজ রাতে মামা যায় কোথায়? সারাটা দিন মন্দিরে পূজাপাঠ। রাতেও ঘুম নেই। শরীর থাকবে কি করে?

একদিন অনুসরণ করলেন।

ধ্যানে বসে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সাপখোপে ভরা দুর্গম আমলকীতলে। ভূতের ভয় পাওয়াবার জন্য হৃদয়রাম ঢিল ছুঁড়তে লাগলেন। ভূতের তোয়াক্কা শ্রীরামকৃষ্ণ করেন না। হৃদয়রাম একদিন সাহস করে একেবারে কাছে এগিয়ে গেলেন। "পরিধেয় বস্ত্র, যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করে সুখাসনে ধ্যানমগ্ন!" মামা কি শেষে পাগল হলো!

সে-রাতে জঙ্গলাকীর্ণ ঐ দুর্গমে যে-কথা হলো দুজনে, আমলকী গাছ শুনেছিল।

"এ কী হচ্ছে? পৈতে কাপড় ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে বসেছ যে!"

বারবার প্রশ্ন। ধ্যান ভাঙল। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ঃ "তুই কি জানিস? এইভাবে পাশমুক্ত হয়ে ধ্যান করতে হয়। অষ্টপাশ—ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাতি, অভিমান। জাতের অভিমান পৈতে—আমি ব্রাহ্মণ। তাই সেটাও ত্যাগ। যখন ফিরব তখন সব পরব।"

হৃদয়রাম এমন কথা আগে শোনেননি।

নরেন্দ্রনাথ ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী এই শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে পাবেন না। তাপস শ্রীরামকৃষ্ণ আজ সিদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি কৃপা করে অতীত দর্শন করাচ্ছেন কথার মালা গেঁথে। [ক্রমশ] (আট)

বিজ্ঞপ্তি

বিগত আশ্বিন মাসে সুধী পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো হয়েছিল, ২০০২ সালে (মাঘ ১৪০৮—পৌষ ১৪০৯) 'উদ্বোধন' পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছু বাড়াতে হবে। তদনুযায়ী চলতি বছরের গ্রাহকমূল্য ৭৫্ টাকা ধার্য হয়েছে। কেউ ডাকে বই সংগ্রহ করলে আরো ২০্ টাকা সহ মোট ৯৫্ (পঁচানব্বুই) টাকা পাঠাবেন। ইতোমধ্যে অনেকেই ভুল করে ৭৫্ টাকা সডাক খরচ পাঠিয়েছেন। তাঁদের অনুরোধ জানাই—আপনারা বাকি দেয় ডাকখরচ ২০্ টাকা অবিলম্বে মানি অর্ডার করে পাঠাবেন।—সম্পাদক

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

প্রসঙ্গ "সৃষ্টিতত্ত্ব ও প্রাণীর ক্রমবিকাশ : বিজ্ঞান মতে ও বেদান্ত দৃষ্টিতে"

'উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত জলধিকুমার সরকারের 'সৃষ্টিতত্ত্ব ও প্রাণীর ক্রমবিকাশ : বিজ্ঞান মতে ও বেদান্ত দৃষ্টিতে' প্রবন্ধটি পাঠকের মনে কিছু প্রশ্ন তুলেছে। জলধিবাবুর প্রবন্ধটি সুলিখিত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ, কিন্তু বিষয়টি জটিল এবং অত্যন্ত বিতর্কিতও। কারণ, বিশ্বসৃষ্টি এবং পৃথিবীতে প্রাণসৃষ্টি সম্বন্ধে বেদ, উপনিষদ্ ও সংহিতার যুগ থেকে নানা বিতর্কিত এবং আপাত বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। ঋগ্বেদ, তৈত্তিরীয় সংহিতা, তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, সাংখ্য দর্শন ইত্যাদি প্রাচীন ভারতের গ্রন্থরাজিতে বিশ্বসৃষ্টি এবং আকাশ, ভূমি, জল, বায়ু ইত্যাদি সৃষ্টির পরম্পরা নিয়ে নানারকমের মত রয়েছে। এগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যাবে বৈদ্যনাথ বসু এবং রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারীর লেখা "Vedic Astronomy : Its relevance today" প্রবন্ধে (Bulletin of the Ramakrishna Mission Institute of Culture, June & July, 2001)। এছাড়া সৃষ্টি এবং প্রলয়ের কথা রয়েছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের ৭-৮ নং শ্লোকে; উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-এর প্রথম খণ্ডের (সপ্তদশ সংস্করণ) ৪২ পৃষ্ঠায়; আরো বহু শাস্ত্রগ্রন্থে এবং পুরাণে। উপরি উক্ত মতবাদগুলি সবই ভারতীয় দর্শনের মূল ধারার অন্তর্ভুক্ত। এইসব মতে দেখা যায়, সৃষ্টির পিছনে একজন সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা এবং হাত রয়েছে—তিনি কোথাও 'ব্রহ্ম', কোথাও 'আত্মা', কোথাও 'পুরুষ', আবার কোথাও 'আদ্যাশক্তি মহামায়া'।

আধুনিক জড়বিজ্ঞানেও বিশ্বসৃষ্টির বিষয়ে অনেক তত্ত্বের আলোচনা রয়েছে, কিন্তু সেসব নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্কেরও শেষ নেই। এইসব বিজ্ঞানীরা অবশ্য একটি বিষয়ে একমত, তা হলো—বিশ্বসৃষ্টি এবং পৃথিবীতে জীবনসৃষ্টি দুই-ই জড়পদার্থের মধ্যে সংঘটিত আকস্মিক দুর্ঘটনার ফল, এর পিছনে কোন সৃষ্টিকর্তা বা তাঁর ইচ্ছার কোন অস্তিত্ব এঁরা স্বীকার করেন না। জড় এবং জীবনের মধ্যে কোন missing link-এর অস্তিত্বের কথাও এঁরা মানেন না। এঁরা বানরকে দিয়ে শেক্সপীয়রের সনেট লেখাবার জন্য বরং লক্ষ লক্ষ বছর চেষ্টা চালিয়ে যাবেন, কিন্তু লেখার টেবিলে শেক্সপীয়রকে বসতে দেবেন না (দ্রঃ স্যার জেমস জীন্স-এর প্রবন্ধ 'The Dying Sun')। এই বিপুল পরিমাণ চেষ্টার ফলে যে পুঞ্জীভূত আবর্জনার (debris) সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে থেকে সত্যটুকুকে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব। এঁরা বলেন, সেই আকস্মিক দুর্ঘটনার মুহূর্তেই মহাকালের জন্ম হয়েছে, তার আগে মহাকালের কোন অস্তিত্বই ছিল না। কী হাস্যকর বিজ্ঞান! সময় অনন্ত কিন্তু অনাদি নয়, এবং সে এক দুর্ঘটনার সন্তান! শুধু বিতর্ক আর বিতর্ক—বিজ্ঞানীরা হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে হয়রান হয়ে গেলেন, কিন্তু ৭০-৭৫ বছর ধরে গভীর অনুসন্ধান করেও হাবল্-এর ধ্রুবকের মান (Hubble's Constant) ঠিকমতো জানতে পারেননি, যার ওপর নির্ভর করছে মহাবিশ্বের বর্তমান বয়স, এর বিস্তার এবং অন্যান্য সব গুরুতর প্রশ্নের উত্তর। এইসব বিতর্কের সমাধানসূত্র খুঁজতে গেলে একটি গোটা বই হয়ে যাবে। বর্তমান আলোচনায় সেই সমাধান খোঁজা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সূর্যের সৃষ্টি, তার বিবর্তন, পৃথিবীর বয়স ইত্যাদি বিষয়ে যে কোন কোন পাঠকের মনে প্রশ্ন জেগেছে ('উদ্বোধন', শ্রাবণ ১৪০৮ সংখ্যার ৪৮১ পৃষ্ঠায় শ্রীহরনাথ ভট্টাচার্য এবং ভাদ্র ১৪০৮ সংখ্যার ৫৫০ পৃষ্ঠায় শ্রীঅগ্নিভ দাস-এর চিঠি দ্রষ্টব্য), সেবিষয়ে খুব সংক্ষেপে কিছু আলোকপাতের চেষ্টা করাই আমার বর্তমান চিঠির উদ্দেশ্য।

নক্ষত্রের জন্ম, বিবর্তন এবং মৃত্যু (Life Cycle of Stars) সম্বন্ধে যেসব তত্ত্ব বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন তা বর্তমানে জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যার (Astrophysics) একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং গবেষণার বিষয়। মহাকাশের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে কোটি কোটি নক্ষত্রজগৎ (galaxy) এবং এইসব নক্ষত্রজগতের প্রতিটিতে রয়েছে কয়েক হাজার কোটি নক্ষত্র, তাছাড়াও রয়েছে অজস্র পরিমাণ গ্যাস এবং ধূলিরাশি। এক-একটি প্রমাণ সাইজের নক্ষত্রজগতের বিস্তার প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ জুড়ে। আমাদের নিজস্ব নক্ষত্রজগতে (ছায়াপথ বা Milky Way Galaxy) রয়েছে দশহাজার কোটিরও বেশি নক্ষত্র—সূর্য তারই একটি অতি সাধারণ নক্ষত্র। আকাশে সূর্যের থেকে কয়েক হাজার গুণ কম উজ্জ্বল নক্ষত্র যেমন আছে, তেমনি আছে তার থেকে লক্ষ গুণ বেশি উজ্জ্বল নক্ষত্রও। কেমন করে মহাকাশে এইসব নক্ষত্র জন্মায় ও পরিণতি পায়, কেমন করে বাঁচে, কতদিন বাঁচে, 'শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর' কেমন করে আসে এবং কেন আসে—এসব প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত কিছু আলোচনা এখানে রাখবার চেষ্টা করছি।

প্রতিটি নক্ষত্রজগতের মধ্যে সর্বত্র মিলেমিশে ছড়িয়ে রয়েছে রাশিরাশি গ্যাস (প্রধানত হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম) এবং ধূলিকণা—এই গ্যাস এবং ধূলিকণাই হলো নতুন নক্ষত্র সৃষ্টির জন্য 'কাঁচামাল'। এইসব গ্যাসের ভৌত অবস্থা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম—কোথাও ঘনত্ব খুব বেশি আবার কোথাও খুব কম, আবার বহু জায়গায় ঘনত্ব মাঝামাঝি; তাপমাত্রার ক্ষেত্রেও একইরকম। কোথাও তাপমাত্রা এত বেশি যে, গ্যাস আয়নিত (ionized) হয়ে রয়েছে, আবার কোথাও গ্যাস হিমশীতল, আণবিক আকারে (molecular form) রয়েছে, কোথাও বা রয়েছে সাধারণ পারমাণবিক আকারে (atomic form)। আবার এই বহু বিভিন্ন ঘনত্ব এবং তাপমাত্রার অস্তিত্বের জন্য গ্যাস কোথাও অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য আকারে রয়েছে, কোথাও বা রয়েছে ঘনমেঘের আকারে। মহাকাশে গ্যাসের এই বিভিন্ন ভৌত অবস্থা আমরা কিন্তু আজ সত্যিসত্যিই জানতে পেরেছি ফটোগ্রাফি এবং এই গ্যাস থেকে যে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তড়িৎচৌম্বক রশ্মির বিকিরণ হয়, তার পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনার সাহায্যে। আমরা দেখতে পাই যে, মহাকাশের স্থানে স্থানে অতি বিশাল আকৃতি এবং ভরের হিমশীতল আণবিক গ্যাসীয় মেঘ (Giant molecular cloud) ছড়িয়ে রয়েছে, যাদের এক-একটির ভর এক লক্ষ থেকে এক কোটি সৌর ভরের সমান এবং যাদের বিস্তার দশ থেকে একশো আলোকবর্ষ।

জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই হিমশীতল অতি বৃহৎ আণবিক গ্যাসীয় মেঘের মধ্যেই একসময় গুচ্ছ গুচ্ছ নতুন নক্ষত্রের জন্ম হয়; এর পর্যবেক্ষণলব্ধ প্রমাণও পাওয়া গেছে ভূরি ভূরি। ছোট-বড় গ্যাসীয় মেঘগুলি কিন্তু মহাকাশে স্থির নয়, তারা প্রচণ্ড গতিতে মহাকাশে বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পরস্পরে সংঘাত হচ্ছে, সংঘাতের ফলে পরস্পর মিলেমিশে যাচ্ছে—ফলে ঘনত্ব এবং ভর উভয়ই বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে একসময় অতিকায় গ্যাসমেঘগুলি ঘন এবং বড় হতে হতে ক্রমবর্ধমান অভিকর্ষজ চাপের ফলে তাদের স্থিতাবস্থা (stability) হারিয়ে ফেলে, ফলে মহাকর্ষীয় ভাঙন শুরু হয় এবং টুকরো টুকরো হয়ে যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই ঘটনাকে বলে গ্যাসীয় মেঘের 'gravitational collapse and fragmentation'। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার জেমস জীন্স অঙ্ক কষে দেখিয়েছিলেন কী অবস্থায় একটি গ্যাসীয় গোলক এভাবে ভেঙেচুরে যাবে এবং বিভিন্ন ভরের টুকরোয় বহুধাবিভক্ত হয়ে যাবে। প্রত্যেক টুকরোর ভর নির্ভর করবে সেটির ঘনত্ব এবং তাপমাত্রার ওপরে। যেহেতু একটি অতিকায় গ্যাসপিণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ঘনত্ব এবং তাপমাত্রা বিদ্যমান, অতএব পিণ্ডটি যখন ভাঙবে তখন ছোট, বড়, মাঝারি নানা ভরযুক্ত টুকরোয় পরিণত হবে। জ্যোতির্বিদ্যায় এই প্রত্যেকটি টুকরোর ভরকে বলা হয় 'Jeans Mass'। আবার আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে স্যার ফ্রেড হয়েল নানারকম হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, ভাঙন একবার শুরু হলে তা ক্রমান্বয়ে পরপর চলতে থাকবে যতক্ষণ না প্রতিটি টুকরো ক্ষুদ্রতম 'জীন্স মাস'-এ পরিণত হবে। ফ্রেড হয়েল এই ঘটনাকে বলেছেন মেঘের 'Hierarchical fragmentation'।

ক্রমে আরো দীর্ঘস্থায়ী ভৌত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ছোট-বড় এই টুকরোর প্রত্যেকটি এক-একটি প্রাক্‌নক্ষত্রের (proto star) রূপ নেবে। আরো পরে ক্রমসঙ্কোচনের ফলে প্রাক্‌নক্ষত্রগুলির কিছু অংশ ক্রমে এক-একটি ছোট-বড় নক্ষত্রে পরিণত হবে। এভাবে এক-একটি অতিকায় আণবিক গ্যাসপিণ্ডের মধ্যে এককালে গুচ্ছ গুচ্ছ নক্ষত্র দলবদ্ধভাবে জন্ম নেয় বলে বর্তমানে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন। তাঁদের আরো বিশ্বাস, কোন নক্ষত্রই বোধহয় এককভাবে জন্ম নেয় না। গ্যালাক্সির অসম ঘূর্ণনের ফলে এর মধ্যে যে একটি বিচ্ছিন্নকারী বল সর্বদা কাজ করে, সেই বলই কালক্রমে নক্ষত্রের গুচ্ছগুলিকে ভেঙেচুরে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, যেজন্য আমরা আকাশে এত একক নক্ষত্র দেখতে পাই।

এবারে আমরা সূর্যের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে পারি। প্রাক্‌নক্ষত্রগুলি প্রত্যেকটি প্রথমে থাকে অনুজ্জ্বল, বিশালকায়, অপেক্ষাকৃত কম ঘনত্বযুক্ত এক-একটি গ্যাসীয় গোলক—চারিদিকে আরো হালকা গ্যাসের আস্তরণের মধ্যে ঢাকা থাকে। তারপর ক্রমসঙ্কোচনের ফলে এগুলিতে গ্যাসের ঘনত্ব এবং তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং ক্রমশ এগুলি এক-একটি উজ্জ্বল তারারূপে প্রকাশিত হতে থাকে। মহাকর্ষীয় সঙ্কোচনের ফলে ক্রমশ এগুলির মধ্যে মহাকর্ষীয় শক্তির (Gravitational energy) সৃষ্টি হতে থাকে। সৃষ্ট শক্তির কিছুটা পৃষ্ঠতল থেকে আলোরূপে বিকীর্ণ হয়ে যায়, বাকিটা দেহের ভিতরে থেকে অন্তর্দেশীয় তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। মহাকর্ষীয় সঙ্কোচন এভাবে দীর্ঘকাল চলতে চলতে এবং কেন্দ্রের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে একসময় যখন এক কোটি ডিগ্রি কেলভিস ছাড়িয়ে যায়, তখন কেন্দ্রের সেই প্রচণ্ড তাপে এবং বিপুল চাপে কেন্দ্রের হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রজ্বলন শুরু হয় এবং হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হতে থাকে। বিজ্ঞানীদের মতে, হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রজ্বলন মুহূর্ত থেকেই নক্ষত্রজীবনের মূল ধারা শুরু হয় এবং নক্ষত্রটি সুস্থিত গঠন (stable structure) প্রাপ্ত হয়। এই মুহূর্তের আগে পর্যন্ত নক্ষত্রটিকে ক্রমসঙ্কোচনের দ্বারা মহাকর্ষীয় শক্তি উৎপন্ন করতে হয়েছে। কিন্তু এবারে হাইড্রোজেন প্রজ্বলনের ফলে নক্ষত্রের মধ্যে নতুন এক বিপুল শক্তির উৎস খুলে গেছে, কাজেই শক্তির জন্য আর সঙ্কোচনের দরকার নেই। সূর্যের মতো নক্ষত্রের জীবনে এই মহাকর্ষীয় সঙ্কোচনকাল প্রায় দশ কোটি বছর। দশ কোটি বছর ধরে সঙ্কোচনের পরে সূর্য তার সুস্থিত গঠন পেয়েছে। তারপর থেকে সূর্যের কেন্দ্রে হাইড্রোজেন প্রজ্বলন দ্বারা পদার্থের রূপান্তরের মাধ্যমে আইনস্টাইনের সূত্র $E = mc^2$ (E = শক্তি, m = ভর এবং c = আলোর গতিবেগ) অনুযায়ী শক্তি তৈরি হচ্ছে এবং সেই একই পরিমাণ শক্তি সৌরদেহ থেকে বিকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হিসাব কষে দেখেছেন, হাইড্রোজেনের রূপান্তরের মাধ্যমে সৌরকেন্দ্রে মোট যে-পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হতে পারে তার দ্বারা সূর্য বর্তমান হারে (4×10^{33} আর্গ প্রতি সেকেণ্ডে) শক্তি খরচ করলেও অন্তত বারো বিলিয়ন বছর (এক বিলিয়ন = একশো কোটি) চলে যাবে। বারশো কোটি বছরকেই ধরা হয় সূর্যের মূল আয়ুষ্কাল। এর মধ্যে সূর্যের বর্তমান বয়স সাড়ে চার থেকে পাঁচ বিলিয়ন বছর কেটে গেছে, অবশিষ্ট এখনো রয়েছে সাত থেকে সাড়ে সাত বিলিয়ন বছর। তারপরে সূর্য নানারকম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আরো দু-এক বিলিয়ন বছর বেঁচে ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে এবং শেষপর্যন্ত একটি অত্যন্ত অনুজ্জ্বল, ক্ষুদ্রাকার এবং অত্যন্ত বেশি ঘনত্বযুক্ত 'শ্বেতবামন' (white dwarf) নক্ষত্রে পরিণত হবে। শ্বেতবামন নক্ষত্রকে বিজ্ঞানীরা মনে করেন 'মৃত নক্ষত্র'।

পরিশেষে জানাই, আদি গ্যাসপিণ্ডটি ভাঙনের ফলে যে খুব ছোট টুকরোগুলি জন্ম নেবে, সেগুলি কিন্তু নক্ষত্র হয়ে উঠবে না, কারণ এগুলির ভর একটা নির্দিষ্ট সীমার নিচে থাকার জন্য এগুলির কেন্দ্রে যথেষ্ট তাপ ও চাপের সৃষ্টি হয় না, ফলে এদের কেন্দ্রে হাইড্রোজেনের প্রজ্বলন শুরুই হয় না; অর্থাৎ এরা পদার্থের রূপান্তরের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন করতে অপারগ। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন, কোন টুকরোর ভর সৌর-ভরের আট শতাংশের কম হলে সে আর নক্ষত্র হতে পারবে না। এগুলিকে বলা হয় 'substellar objects'—কিছুকাল অল্প উজ্জ্বল জীবন কাটিয়ে এগুলি ধীরে ধীরে অনুজ্জ্বল বস্তুতে পরিণত হয় এবং অদৃশ্যরূপে আকাশে থেকে যায়। প্রসঙ্গত বলে রাখি, সূর্যকে জ্বালিয়ে রাখার মতো প্রয়োজনীয় শক্তির জন্য এর কেন্দ্রে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৬০ কোটি মেট্রিক টন হাইড্রোজেন জ্বালানি খরচ হয়।

বৈদ্যনাথ বসু
সোনারপুর
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

রবীন্দ্র-সাহিত্যে সবুজের জয়যাত্রা*

গৌরী বসু

রবীন্দ্র-সাহিত্যের এক বিশেষ পর্বে 'যৌবন' নতুন তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের যুবমানস সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা তখনি স্বচ্ছ স্ফটিকায়িত হয়ে ওঠে। 'সবুজপত্র' (১৯১৪) যখন প্রকাশিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ৫৩। প্রমথ চৌধুরী ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ঠিকই, কিন্তু ঐ পত্রিকা প্রকাশের পিছনে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহই ছিল সবচেয়ে বেশি। তাঁর 'সবুজের অভিযান' 'সবুজপত্র'-এর প্রথম সংখ্যায় বেরিয়েছিল। এই কবিতার ভিতর ঐ পত্রিকার ধ্যান এবং ধারণার কথা স্পষ্ট হয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কবি প্রৌঢ়ত্বের দোরগোড়ায় এসে যেন নতুনভাবে যৌবনকে উপলব্ধি করলেন, যে-যৌবন চিরজীবী।

'বলাকা'র কবিতায় এবং 'ফাল্গুনী' নাটকে রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছে। এর আগে বা পরের কবিতাতেও যে যৌবনের কথা বলা হয়নি, তা নয়। কিন্তু তাদের মধ্যে রূপের হেরফের ঘটেছে। 'সোনার তরী' বা 'মানসী'র কবিতায় আবেগই মুখ্য। যৌবন-ভাবনাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'দুরন্ত আশা'র নাম করা যেতে পারে। এই ভাবনারই কায়াকল্প ঘটেছে সপ্তরোর্ধের কবিতাগুলিতে। সেখানে যৌবন এসেছে সংযত-সংহত মূর্তি নিয়ে 'শ্যামলী'র 'চিরযাত্রী' এবং 'শেষ সপ্তক'-এর ৪৫তম কবিতায়। কবির আয়ুর তরণী যখন যৌবনের ঘাট পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বের কূলে এসে ভিড়েছে, এমন সময় ডাক এল নবীনের দরবার থেকে। 'পর্যাপ্ত তারুণ্যের পরিপূর্ণ' রূপ অলোকসামান্য দেহ ধারণ করল। 'এ জন্মের সমস্তটা' স্বচ্ছ হয়ে উঠল চোখের সামনে। অনুভব করলেন—

"ভরা যৌবনের দিনেও
যৌবনের সংবাদ
এমন জোয়ারের বেগে এসে লাগেনি আমার লেখনীতে।
আমার মন বুঝল
যৌবনকে না ছাড়ালে
যৌবনকে যায় না পাওয়া।"

'বলাকা'র কবিতাগুলি লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ ফরাসি দার্শনিক বার্গসঁর (Bergson) গতিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন, পৃথিবীর অন্তরে রয়েছে চলিষ্ণুতা। গাছ চলছে, ফুল চলছে, পাখি চলছে, আকাশ-বাতাস চলছে, হাওয়া চলছে, নদীর জল চলছে। যারা সজীব ও প্রাণবন্ত তারাই চলছে। তাই যৌবনও চলছে—সে অনন্ত পথের যাত্রী। নবীনের যাত্রাপথ বিপদসঙ্কুল, দুর্গম। তবু ওরা বলে—



"রুদ্র মোদের হাঁক দিয়েছে
বাজিয়ে আপন তূর্য।
মাথার 'পরে ডাক দিয়েছে
মধ্যদিনের সূর্য।
মন ছড়ালো আকাশ ব্যেপে,
আলোর নেশায় গেছি খেপে,
ওরা আছে দুয়ার ঝেঁপে—
চক্ষু ওদের ধাঁধবে
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।"

রুদ্রের সেই আহ্বান যে একবার শুনেছে, সে কখনোই বাঁধা গণ্ডির ভিতর নিশ্চিত আরামে 'সুখের খাঁচাতে' বন্ধ থাকতে পারে না; 'প্রমত্ত' সর্বনাশের মতোই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপদের আবর্তে। এর বিপরীতে রয়েছে জীর্ণ, প্রাচীন, স্থবিরত্ব। মনের সব জানালা-দরজা বন্ধ করে প্রাচীন নিজের চারদিকে টেনে দিয়েছে বিধি-নিষেধের বেড়াজাল। এই অচলায়তনের মধ্যে এতটুকু ভুল-ত্রুটি হওয়ার উপায় নেই। এখানে শুধু নিশ্চিন্ততা। সেই অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় যৌবন যেন এক মস্ত অনিয়ম। দস্যুর মতো 'চিরাভ্যাসের' বাঁধন ছেঁড়ার জন্য তার আবির্ভাব। প্রবীণের ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে ঝড়ের মাতনে সবকিছু ওলট-পালট করে দিয়েই তার তৃপ্তি। 'অমৃতের অধিকার'কে সে লড়াই করে জিতে নেবে। জীবনে লক্ষ্মীর প্রসাদলাভে বঞ্চিত বলে অলক্ষ্মীই তার বরদাত্রী। তার উদ্দেশেই কবি ঘোষণা করেন—

"ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ
শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ—
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।"

যৌবনের স্বরূপ ঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজন বার্ধক্যকে তার নিজস্ব ভূমিতে স্থাপন করা। কারণ, জীবনচক্রে যৌবনের মতো বার্ধক্যও একটি অবস্থামাত্র। তাকে অস্বীকার করে নয়, তাকে মেনে নিয়েই যৌবনের পূর্ণতা। 'ফাল্গুনী' নাটকে এই কথাটাই ধুয়োর মতো বারবার বেজেছে—"প্রৌঢ়দেরই যৌবনটি নিরাসক্ত যৌবন। তারা ভোগবতীর পার হয়ে আনন্দলোকের ডাঙা দেখতে পেয়েছে। তারা আর ফল চায় না, ফলতে চায়।"

নবযৌবনের দল বসন্তোৎসব করবে। অকারণ প্রাণের পুলকে তারা স্পন্দিত। ওরা খবর পেয়েছে এক ভয়ঙ্কর বুড়োর। অগস্ত্যের মতো সে পৃথিবীর যৌবন-সমুদ্র শুষে খেতে চায়। সে যেখানে থাকে তার চারপাশে সবুজের আভাসমাত্র নেই, আছে অন্ধকার আর শ্মশানের ধূসরতা। সবাই তাকে ভয় পায়। সেই বুড়োকে নবযৌবনের দল

---

* ২৫শে বৈশাখ স্মরণে নিবেদিত

ধরবে। তারপর তাকে প্রাণের সবুজ রঙে রাঙিয়ে দিয়ে মাতবে বিজয়োৎসবে। ভয়কে জয় করে নাম-না-জানা পথে ওরা বেরিয়ে পড়ে। রাস্তায় কতরকম মানুষের সঙ্গে দেখা—কত কথার লেনদেন! কেউই বুড়োর ঠিকানা জানে না। শেষপর্যন্ত তাদের পথ দেখায় এক অন্ধ বাউল। চোখের আলো তার নিভে গেছে, কিন্তু অন্ধকারের ভিতর যে-আলো থাকে, সেই আলোর ঝরনাধারায় ধুয়ে গেছে তার সমস্ত অন্তর। গান গেয়ে সে পথ চলে। তার গান এগিয়ে যায় আগে, আর সে চলে তার পিছন পিছন। চন্দ্রহাস, নবযৌবনের দলের অগ্রদূত, সঙ্গীদের গুহার বাইরে রেখে নিজে ঢোকে গহ্বরের ভিতর। বুড়োকে ধরবেই, এই তার পণ। যখন সে বাইরে এল, তখন পুবের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে সূর্যের আবির্ভাবে। অন্ধকার কেটে গেছে। সবাই দেখল চন্দ্রহাস যাকে ধরে এনেছে, সে বুড়ো নয়, তাদের দলের সর্দার—জীবন সর্দার। ওরা বুঝল, এতদিন সর্দারের সঙ্গে থেকেও তাকে চিনতে পারেনি। পিছন থেকে দেখে তাকে ভুল করেছিল। আজ সামনে দাঁড়িয়ে সব ভুল ভাঙল।

বিশ্বপ্রকৃতিতে মৃত্যু, বার্ধক্য এবং শীত নঙর্থক। মৃত্যু জীবনকে গ্রাস করছে, বার্ধক্য যৌবনকে রিক্ত করছে আর শীত প্রকৃতিকে দীর্ণ করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, প্রকৃতিতে শীত একটা অবস্থামাত্র। শীতের শীর্ণতায় বিগত বসন্তের পাতা ঝরে যায়। এই পাতা ঝরানোর মধ্য দিয়ে শীত বসন্তের আগমনের ভূমিটি প্রস্তুত করে রাখে। তাই বসন্ত অত সহজে সজ্জিত হয় কিশলয়ে, ফুলে, পাখির গানে। শীতের প্রয়োজন পুরাতনের অবসান ঘটিয়ে নতুনের আগমনকে ত্বরান্বিত করার জন্য। তবু একথা মেনে নিয়েও বলা যায়, যা ছিল তাকে হারানোর মধ্যে একটা ব্যথা লুকিয়ে থাকে। এই বেদনাটুকুই শীত দিয়ে যায় বসন্তের অন্তরে। কচি পল্লবের মর্মরে শোনা যায় ঝরাপাতার দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ। সরষে ফুলের আগুন-লাগা প্রান্তরের ওপর ঝুঁকে পড়া নীল আকাশের বুকে জমে থাকে কার অশ্রুজল! মনে হয়—

"বসন্তে কি শুধু ফোটা ফুলের মেলা রে।
দেখিসনে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে।।"

ঋতুচক্রে শীত যেমন অনিবার্য ঘটনা, জীবনে জরা ও মৃত্যুও তেমনি। শীত যেমন বসন্তকে সাজিয়ে দেয় রাজার সাজে, মৃত্যুও তেমনি জীবনকে নবীন এবং জরা যৌবনকে চিরায়ত করে। চুলে পাক ধরলেই কেউ প্রৌঢ়ত্বের দ্বারে পৌঁছে যায় না। চিত্ত যদি সজীব ও শ্যামল থাকে, তখন চুলে পাক ধরল কিনা, চামড়ায় টান পড়ল কিনা, সেটা বড় কথা নয়। তার যৌবন শুরু হয় তখন থেকেই। সে যে যুবক—এবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। কারণ, মনের সজীবতাই এক্ষেত্রে তারুণ্যের একমাত্র মাপকাঠি। 'ফাল্গুনী' নাটকে যৌবনের দলে দাদার বয়স সবথেকে কম। কিন্তু সে তরুণ নয়, প্রবীণতম। আর যৌবনের দল? নিজেদের পরিচয় তারা দিয়েছে এই বলে—"আমরা যে ভারি কাঁচা, আমরা যে একেবারে নতুন, ভাবের রাজ্যে আমাদের পাকা দলিল কোথায়।" তারাই গলা ছেড়ে গাইতে পারে—

"আমরা নূতন যৌবনেরি দূত
আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত।"

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'র 'স্বাদেশিকতা' প্রবন্ধে বয়োবৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসুর কথা বলেছেন। চুল-দাড়ি তাঁর সাদা হয়ে গেছে, অথচ "আমাদের দলের মধ্যে বয়সে যে-ব্যক্তি সকলের চেয়ে ছোট, তাহার সঙ্গেও তাঁহার বয়সের কোন অনৈক্য ছিল না। তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটির মতো হইয়া তাঁহার অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন তাজা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল।" অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁকে এতটুকু নীরস করতে পারেনি। পৃথিবীর হিসাবে তাঁর বয়স বেড়েছিল, কিন্তু মনটি ছিল তাঁর যুবকের মতোই তরতাজা। রবীন্দ্রনাথের নাটকে বারেবারে এই ধরনের চরিত্র এসেছে। 'শারদোৎসব'-এ সন্ন্যাসী, 'অচলায়তন'-এ গুরু বা দাদাঠাকুর, 'মুক্তধারা'য় ধনঞ্জয় বৈরাগী, 'রক্তকরবী'তে বিশুপাগল, 'রাজা'য় ঠাকুরদা এবং 'ডাকঘর'-এ ফকির বা ঠাকুরদা। বয়সের ছাপ এদের গায়ে লাগে না। তারুণ্য তাদের চিরসঙ্গী। এদের ঘিরে থাকে কচিকাঁচার দল, সংসারের বৈষয়িক জ্ঞান যাদের স্পর্শ করেনি।

কিন্তু বেদনার মূল্য না দিলে তো পরমকে পাওয়া যায় না। সমস্ত মহৎ চেতনার নিভৃততম প্রদেশে থাকে গভীর ব্যথা। পথ চলতে চলতে 'ফাল্গুনী'র নবযৌবনের দলও আচ্ছন্ন হয়েছে নিগূঢ় বিষণ্ণতায়। আকাশ তাদের কাছে "যেন যাবার বেলাকার বন্ধুর মতো।" তারাদের মধ্যে দেখা যায় যুগ-যুগান্তের ফেলে আসা মানুষের 'অনিমেষ দৃষ্টি'। ফুলগুলোর মধ্যে কারা যেন বলছে—'মনে রেখো'। তারা শুনতে পাচ্ছে, এখানে "জগৎটা কেবল 'পাব পাব' বলছে না, সঙ্গে সঙ্গেই বলছে 'ছাড়ব ছাড়ব'।" তাদের বসন্তোৎসবে আজ 'ঝরা-পাতার সুর'। এতদিন তারা চলার আবেগেই ছুটেছিল, অর্থ কিছু বোঝেনি। এখন বিদায়ের বাঁশিতে 'কোমল ধৈবতের' গোপন মিড়ে অশ্রুসাগর দুলে উঠেছে। তরুণের খণ্ডিত দৃষ্টি আজ পূর্ণতা পেয়েছে। বসন্ত যেন এতদিন তাদের হাসি দিয়ে ভুলিয়েছিল। আজ তার চোখে জল দেখেছে বলেই হাসির অর্থ বুঝতে পেরেছে। ওরা অনুভব করেছে—"চলার মধ্যে কান্না আছে তাই যৌবনকে সবুজ দেখি।" এ-সত্য বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বসন্তবোধ সম্পূর্ণ হয়েছে। যে-অধরাকে ধরার জন্য বেরিয়েছিল, তার কাছে ধরা দেওয়ার জন্য তারা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে—"মনের ভিতর বলছে, সে যদি আমাকে চায় তবে আমিও বসে থাকব না।"

রবীন্দ্রনাথের যৌবনচেতনা তাঁর জীবনবোধের একটা বড় দিক। তাঁর জীবনের অন্তরতম প্রদেশে যে পূর্ণতাবোধ রয়েছে, তা-ই কবিকে পথ দেখিয়েছে আলোয়-আঁধারে, পথে-বিপথে। নৈরাশ্যের সর্বগ্রাসী প্লাবন থেকে তাকে রক্ষা করেছে। জীবনে বারবার শেষের মধ্যে অশেষের সুর তিনি শুনেছেন। সেই সুরই তাঁকে প্রসন্ন করেছে। এখানেই তাঁর মহান প্রাপ্তি। ❑

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার স্বরূপ

অ্যান্ড্রু ভিকার্স ও ক্যাথেরিন হেপবার্ণ

পটভূমি

হোমিওপ্যাথিতে, খুব অল্পমাত্রায় ওষুধ প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করা হয়। এর মতবাদ হচ্ছে—"অসুখ ভাল হবে অনুরূপ চিকিৎসা দ্বারা" (Like should be cured with like)। অর্থাৎ চিকিৎসক এমন ওষুধ ঠিক করেন যা সুস্থ ব্যক্তিকে প্রয়োগ করলে অনুরূপ রোগলক্ষণ প্রকাশ পাবে। যেমন, পিঁয়াজ থেকে 'অ্যালিয়াম কেপা' (Allium Capa) পাওয়া যায়। কাঁচা পিঁয়াজের সংস্পর্শে চোখে জল পড়ে, চোখ ও নাকের চারপাশে জ্বালা জ্বালা করে এবং নাক দিয়ে জল পড়ে। 'হে ফিভার' (Hay fever) নামক অ্যালার্জিতে, বিশেষত যদি চোখ ও নাক দু-জায়গা থেকেই জল পড়ে, তাহলে এই ওষুধ দেওয়া যেতে পারে।

অন্যান্য যেসব দ্রব্য থেকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ তৈরি হয়, তার মধ্যে আছে বেলেডোনা, আর্ণিকা ও ক্যামোমাইল (Camomile—তীব্র গন্ধযুক্ত গাছ), সালফার ও পারদ জাতীয় খনিজ পদার্থ, ল্যাচেসিস (সাপের বিষ) জাতীয় প্রাণিজ পদার্থ এবং কখনো কখনো হিস্টামিন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ। ওষুধ তৈরি করা হয় দফায় দফায় তরলীকরণ (serial dilution) এবং সেইসঙ্গে জোর ঝাঁকানি (succussion) দিয়ে। এই তরলীকরণ ও ঝাঁকানি যত বেশি হবে, ওষুধ তত 'শক্তিশালী' (potent) হবে।

হোমিওপ্যাথিতে ওষুধের প্রয়োগবিধি (prescribing practice) সম্বন্ধে নানা মত আছে। আদর্শ বা চিরায়ত (classical) হোমিওপ্যাথি মতে, চিকিৎসকরা রোগীর ধাত (constitution) অনুযায়ী একটিমাত্র ওষুধ ঠিক করেন। এই 'ধাত' বলতে একটি জটিল অবস্থা বোঝায়—যার মধ্যে আছে রোগীর অসুখ, তার আগের বিভিন্ন অসুখের ইতিহাস, ব্যক্তিত্ব এবং তার আচরণ (behaviour)। দুজন রোগী—যাদের রোগনির্ণয় (diagnosis) মোটামুটি হয়তো একই, কিন্তু তাদের ওষুধ ধাত অনুযায়ী আলাদা হয়ে যেতে পারে।

অন্যধরনের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকরা কতকগুলি ওষুধের সংমিশ্রণে (complex homeopathy) চিকিৎসা করেন অথবা রোগনির্ণয় অনুযায়ী ওষুধ দেন। এই দুপ্রকার চিকিৎসাপদ্ধতির মধ্যে কোন্‌টি ভাল, সেসম্বন্ধে অভিমত দেওয়ার মতো যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না।



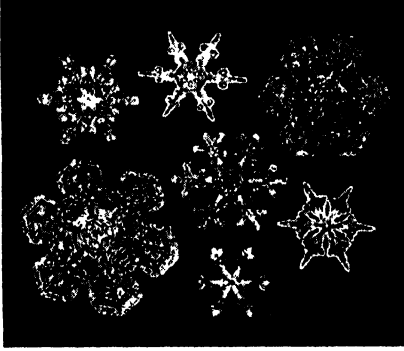
হোমিওপ্যাথির জনক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান

হোমিওপ্যাথি ওষুধ কিভাবে কাজ করে?

সকলে জানেন যে, অনেক হোমিওপ্যাথি ওষুধ অতি-আণবিক (ultra-molecular), অর্থাৎ তাদের এত বেশি তরলীকরণ করা হয় যে, তাতে আদি ওষুধের একটি অণুও হয়তো থাকে না। ওষুধের ফলাফল সুবিধাজনকভাবে (conveniently) জৈবরসায়নের ভাষায় (biochemical terms) বলা হয় বলে হোমিওপ্যাথি শাস্ত্র একেবারে অবোধ্য না হলেও খুব কঠিন ব্যাপার হয়ে আছে। অনেক বৈজ্ঞানিক বলেন যে, হোমিওপ্যাথিতে যে ফল হয় তা 'প্ল্যাসিবো ফল' (placebo effect)। ওষুধ না খাইয়ে কোন কোন রোগীকে তার অজান্তে ওষুধের মতো দেখতে কোন দ্রব্য খাওয়ানো হলে তাকে বলে 'প্ল্যাসিবো'*। কিন্তু বেশ কয়েকটি বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষা (rigorous replicated doubleblind randomised trials), যেমন —একদল রোগীকে ওষুধ ও অন্য দলকে না জানিয়ে প্ল্যাসিবো খাইয়ে এবং পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করে প্রমাণিত হয়েছে যে, রোগীদের হোমিওপ্যাথি ওষুধ এবং প্ল্যাসিবো খাওয়ানোর ফলাফলে যথেষ্ট তফাত আছে। এইধরনের

* এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, 'British Medical Journal' (19-26 August 2000)-এ প্রকাশিত 'Randomised controlled trial of homeopathy versus placebo in perennial allergic rhinitis with overview of four trial series' নামক প্রবন্ধে মত প্রকাশ করা হয়েছে—আগে যেমন সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছিল, তাকেই আবার জোরদার করা হলো। অর্থাৎ হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়ার ফল প্ল্যাসিবো খাওয়ার ফল থেকে পৃথক।—অনুবাদক

ফল পাওয়াতে প্রতিক্রিয়া দুরকম হয়েছে। একদল লোক মনে করে যে, এই পরীক্ষা-প্রক্রিয়া একপেশে (methodological bias) ছিল বলেই ঐরকম ফল পাওয়া গেছে। অন্য দল মনে করে, ঐ পরীক্ষা-ফলই প্রমাণ করছে যে, হোমিওপ্যাথি ওষুধে কাজ হয়, যদিও কোন্ কোন্ জৈবপদার্থবিজ্ঞান অনুসারে (biophysical mechanism) কাজ হয় তা জানা যাচ্ছে না। এর সম্ভাব্য একটি অর্থ করা যেতে পারে (এবং বর্তমানে যা নিয়ে অনুসন্ধান চলছে) যে, দফায় দফায় তরলীকরণের সময় দ্রাবকের (solvent—জল) অণুগুলি স্থায়িভাবে পরিবর্তিত হয়ে আদি দ্রাবিত পদার্থের (solute) 'স্মৃতি' (memory) ধরে রেখে জটিল জাফরি (lattice) তৈরি করে। কারো কারো মতে, হোমিওপ্যাথি ওষুধ কিভাবে কাজ করে তা জানার চাবিকাঠি হলো এই জটিল ধরনের জাফরি তৈরি হওয়া।



কেউ কেউ মনে করেন, হোমিওপ্যাথির প্রক্রিয়াগুলি ওপরের চিত্রে প্রদর্শিত জলীয় অণুর সাহায্যে জটিল ল্যাটিস গঠনের ওপর নির্ভরশীল

চিকিৎসাকালে কি হয়?

পুরনো অসুখের চিকিৎসায় অসুখের ইতিহাস বিশদভাবে নেওয়া হয়। রোগীকে তার অসুখের বিস্তৃত ইতিহাস ও রোগলক্ষণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়। রোগ-লক্ষণ ব্যাপারে আরো জিজ্ঞাসা করা হয়—লক্ষণগুলি কিভাবে (modality) আসে, বিভিন্ন ঋতুতে, বিভিন্ন আবহাওয়া বা দিনের বিভিন্ন সময়ে সেগুলি পরিবর্তিত হয় কিনা, রোগীর মেজাজ (mood), ব্যক্তিত্ব, ব্যবহার, পছন্দ-অপছন্দ, কি কি খাওয়া সহ্য হয়, মানসিক চাপ (stress) ইত্যাদি। এগুলি করা হয় তার রোগলক্ষণ সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট চিত্র (symptom picture) তৈরির জন্য। সেই রোগলক্ষণ-চিত্রকে 'মেটিরিয়া মেডিকা'তে বর্ণিত ওষুধ-চিত্রের (drug-picture) সঙ্গে মেলানো হয়। তারপরে তার ফলের ভিত্তিতে এক বা একাধিক ওষুধ দেওয়া হয়—সাধারণত 'বড়ি' (pill) আকারে। কোন কোন ক্ষেত্রে এক বা দুই মাত্রায় ওষুধ দেওয়া হয়, আবার অন্যক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে প্রতিদিন ওষুধ দেওয়া হয়। চিকিৎসা আরম্ভ হওয়ার ২-৬ সপ্তাহ পরে কতটা রোগ উপশম হলো, তা খতিয়ে দেখা হয় এবং ওষুধের বা তার তরলীকরণ মাত্রার পরিবর্তন করা হয়। রোগীর প্রাথমিক রোগলক্ষণ সাধারণত একাধিক ওষুধের সঙ্গে খাপ খায় এবং এই অবসরে চিকিৎসক ঠিক ওষুধ দেওয়া হয়েছিল কিনা তা বিবেচনা করতে সময় পান। যদি রোগীর অবস্থার উন্নতি দেখা যায়, চিকিৎসক ওষুধ বন্ধ করে দেখেন যে, রোগী ক্রমশ ভালর দিকে যাচ্ছে কিনা। যদি রোগলক্ষণ আবার ফিরে আসে, তাহলে সেই ওষুধই আগের মাত্রায় বা উচ্চতর মাত্রায় আবার শুরু করা হয়। যদি রোগীর লক্ষণ বদলে গেছে বলে মনে করা হয়, তবে ওষুধ বদল করা হয়, যদিও আগের রোগনির্ণয় (diagnosis) একই থাকে।

নিজস্ব চিকিৎসাপেশায় (private practice) রোগীর পরীক্ষা একঘণ্টা পর্যন্ত চলতে থাকে। তবে সরকারি চিকিৎসালয়ে (National Health Service) রোগ-পরীক্ষার জন্য ১০-১৫ মিনিট সময় রাখা হয়। কোন কোন চিকিৎসক রোগীকে তার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে বলেন।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাক্ষেত্রের পরিধি

রোগীদের মধ্যে বেশির ভাগের রোগ পুরনো হয় এবং ঘুরে ঘুরে আসে। যেমন একজিমা, গেঁটে বাত (Rheumatoid arthritis), বহুদিন ধরে পাতলা দাস্ত হওয়া (Irritable bowel syndrome), ক্লান্তি (fatigue disorders), ঘন ঘন সর্দিকাশি বা প্রস্রাবের অসুখ (Recurrent upper respiratory or urinary tract infections), হাঁপানি, মাথায় প্রবল যন্ত্রণা (migrain), মেয়েদের মাসিকের অসুখ (dysmenorrhoea) এবং মানসিক ব্যাধি (mood disorders)। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকরা অনেকরকম রোগের চিকিৎসা করেন, যেগুলি প্রচলিত রোগের পর্যায়ে (conventional diagnosis) পড়ে না। অন্যান্য পূরক চিকিৎসকদের (complementary medical practitioners) মধ্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদেরই বেশি ডাকা হয় শিশুরোগ চিকিৎসায়।

কোন কোন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক বলেন যে, হোমিওপ্যাথি-মতে চিকিৎসা করা যায় না—এমন অসুখ খুব কমই আছে এবং হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রে বিচিত্র ধরনের অসুখের কথা আছে, যেমন—টিউবারাস স্ক্লেরোসিস,

বন্ধ্যাত্ব, মায়োস্থেনিয়া গ্রেভিস, এরোপ্লেনে চড়তে ভয় পাওয়া এবং সিস্টিক ফাইব্রোসিস। এসব বলা সত্ত্বেও কোন্ কোন্ রোগে এই চিকিৎসা কার্যকরী হয়, এব্যাপারে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। যাঁদের মেডিকেল ট্রেনিং আছে, তাঁদের মত ট্রেনিং-বিহীনদের চেয়ে অধিকতর রক্ষণশীল। হঠাৎ ঘটে যাওয়া (acute) অসুখ—যেমন সর্দি, কালশিটে পড়া (bruise), গাঁট ব্যথা, হে-ফিভার প্রভৃতিতে লোকে ওষুধ নিজে কিনে খায়।

গবেষণা

হোমিওপ্যাথি ওষুধ কিভাবে কাজ করে তা ঠিকমতো জানা না থাকায় গবেষকরা এই চিকিৎসা 'প্ল্যাসিবো' চিকিৎসা কিনা সেটি প্রমাণ করার ওপরই জোর দেন। এই বিষয়ে বর্তমানে যে সাক্ষ্য পাওয়া গেছে তাতে প্রমাণ হয় যে, বোধহয় এই চিকিৎসা প্ল্যাসিবো চিকিৎসা নয়। বিখ্যাত 'ল্যান্সেট' (Lancet) পত্রিকায় ১০০টিরও বেশি ভালভাবে পরিচালিত গবেষণার (placebo controlled trial) যে-বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় যে-ফল পাওয়া গেছে, তা এই চিকিৎসার পক্ষেই যায়। বিশ্লেষকদের অভিমত হচ্ছে—"প্রকাশনায় সামান্য পক্ষপাতিত্ব থাকলেও আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যা পেলাম, তাতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় যা উপকার দেখা যায় তা যে সম্পূর্ণভাবে প্ল্যাসিবোর ফল তা বলা যায় না।" 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ল্যাবরেটরি গবেষণায় যে প্রতারণার ঘটনা ধরা পড়েছিল তাতে হোমিওপ্যাথির মৌলিক গবেষণায় আঘাত পড়েছে। তাহলেও ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় জানা গেছে যে, হোমিওপ্যাথি ওষুধের কোন কোনটি অতি-আণবিক স্তরে জন্তু, গাছ ও দেহকোষের ওপরে জৈব (biological) প্রভাব ফেলে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকরা সাধারণত যেসব অসুখে চিকিৎসা করেন, তার ফলাফল বিষয়ে স্পষ্ট সাক্ষ্য কম পাওয়া যায়। অনেক গবেষণায় (trials) জটিল অবস্থায় উপনীত (acute) অসুখে একটিমাত্র ওষুধ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে গবেষণা করা সহজ হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে চিকিৎসকরা ঠিক যেভাবে চিকিৎসা করেন তা প্রতিফলিত হচ্ছে না। ধরা যাক, ইংল্যাণ্ডে পরিচালিত গবেষণায় ১৪৪ জন রোগীকে নিয়ে 'হে-ফিভার' অসুখের যে বিখ্যাত গবেষণায় ঘাস-রেণু থেকে তৈরি হোমিওপ্যাথি ওষুধ ও প্ল্যাসিবো (ঘাস-রেণু) ব্যবহার করা হয়েছিল, তাতে যদিও হোমিওপ্যাথি ওষুধের যথেষ্ট কার্যকারিতা পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু চিকিৎসকরা যেভাবে চিকিৎসা করেন তা ঠিক কতটা গবেষণার মতো হয় তা স্পষ্ট নয়। কারণ, বেশির ভাগ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক 'হে-ফিভার' অসুখে কেবলমাত্র ঘাস-রেণু থেকে তৈরি ওষুধ ব্যবহার করেন না।

বর্তমানে যেসব অসুখে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা হয় তাদের কোন্‌টিতে যে এই ওষুধ যথার্থ কার্যকরী, তার স্পষ্ট সাক্ষ্য নেই। বেশির ভাগ সেইসব অসুখে—যেমন মনমরা হয়ে থাকা (depression), ক্লান্তিবোধ, একজিমা প্রভৃতিতে হোমিওপ্যাথি কার্যকরী কিনা, সেবিষয়ে ঠিকমতো গবেষণা (randomised trials) করে দেখা হয়নি। তাছাড়া যেগুলি সম্বন্ধে গবেষণা চালানো হয়েওছিল, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সে-গবেষণাগুলি অন্যত্র পুনরাবৃত্ত হয়নি।

চিকিৎসার নিরাপত্তা

এই চিকিৎসায় অপ্রত্যাশিত খারাপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে—এমন দৃষ্টান্ত খুব কম। চিকিৎসা আরম্ভ হওয়ার পর সাময়িকভাবে অসুখের বাড়াবাড়ি হয়েছে (aggravation reaction)—এমন ঘটনার কথা শোনা যায়, তবে একে চিকিৎসকরা ভাল লক্ষণ বলেন। এর চেয়ে বেশি উদ্বেগের ব্যাপার হচ্ছে যে, কোন কোন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের বিশ্বাস, অ্যালোপ্যাথি ওষুধ হোমিওপ্যাথি ওষুধের কাজ নষ্ট করে দেয়। এই বিশ্বাসে অ্যালোপ্যাথি ওষুধ বন্ধ করার ফলে অনেক খারাপ ঘটনা ঘটে গেছে। অনেক অশিক্ষিত (non-medical) হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক টিকা নেওয়ার ঘোর বিরোধী, যদিও 'সোসাইটি ফর হোমিওপ্যাথস'-এর আধিকারিকী মত (offcial policy) হচ্ছে যে, রোগীকে সমস্ত তথ্য দিয়ে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়া হোক। টিকা না নিতে তাকে যেন বাধ্য করা না হয়। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকরা টিকার বদলে অন্য ওষুধ ব্যবহারের কথা বলেন, কিন্তু সেইসব ওষুধের কার্যকারিতা ঠিকমতো যাচাই করে (clinical trial) দেখা হয়নি বলে সেগুলিকে টিকার প্রতিকল্প (substitute) বলা যায় না। কোন কোন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের ধারণা যে, টিকা নিলে ভালর চেয়ে খারাপ ফল হয় বেশি।

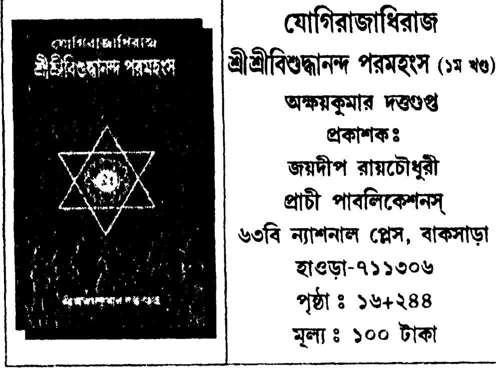
হোমিওপ্যাথি ওষুধের সঙ্গে অন্য ওষুধ (drugs) মিশিয়ে দেওয়া হয়—এমন উদাহরণ আছে। তবে ব্রিটেনে রেজিস্ট্রিকৃত চিকিৎসক দ্বারা এমন হওয়া সম্ভব নয় বলেই মনে হয়।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ইউরোপে খুব জনপ্রিয়। বর্তমানে ১০,০০০-এর বেশি জার্মান ও ফরাসি চিকিৎসক এই চিকিৎসায় রত। **[British Medical Journal, 23 October 1999, pp. 1115-1118]** ❑

ভাষান্তর : জলধিকুমার সরকার

গল্পে গাথায় যোগিরাজাধিরাজ

লোকনাথ চক্রবর্তী



যোগিরাজাধিরাজ
শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস (১ম খণ্ড)
অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত
প্রকাশকঃ
জয়দীপ রায়চৌধুরী
প্রাচী পাবলিকেশনস্
৬৩বি ন্যাশনাল প্লেস, বাকসাড়া
হাওড়া-৭১১৩০৬
পৃষ্ঠা ঃ ১৬+২৪৪
মূল্য ঃ ১০০ টাকা

মৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের প্রদর্শিত সাধনপথটি চিরকালই অতি দুর্লভ। কারণ, তিনি সূর্যবিজ্ঞান অবলম্বনে যোগের পথে সাধককে এগিয়ে দিতেন। বাহ্য পরিচয়েও তিনি একটি অসাধারণ মাত্রা ধারণ করেছিলেন, সেটি হলো যোগ, জ্যোতিষ এবং চিকিৎসা। যখন বিশুদ্ধানন্দজী শরীরে ছিলেন তখনি উক্ত তিনটি বিষয়ের সঙ্গে সমাজের বিশেষ পরিচয় ছিল না। শুধুমাত্র সুধীজনের নির্দিষ্ট গোষ্ঠী এবিষয়ে কিছু অবগত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ এবং অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্তকে আমরা চিনেছি তাঁদের রচনার মাধ্যমে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আজও সূর্যবিজ্ঞান, যোগজ্যোতিষ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত যে দু-চার কথা আমরা জানতে পারছি তা তাঁদেরই লেখনীর প্রসাদে।

১৩৫৪ বঙ্গাব্দে অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত লিখেছিলেন **'যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস'**। সম্প্রতি তার পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। কোন রচনার সার্থকতা যে-কয়টি সূত্রে বিচার করা হয় তার অন্যতম হলো রচনার আয়ু। বলা বাহুল্য, লেখকের এই দীর্ঘায়ু রচনাটি শুধুমাত্র বেঁচে থাকার মাহাত্ম্যেই সীমাবদ্ধ নয়; ঘটনার উপস্থাপন, ভাষার মাধুর্য এবং রচনাশৈলী —সবই একটি বিশেষ মাত্রাকে স্পর্শ করায় আলোচ্য গ্রন্থটি কালোত্তীর্ণ হয়েছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ব্যাসদেবের শ্রীমদ্ভাগবতম্ বা বাল্মীকীর রামায়ণে যে-ধারায় অবতারের বন্দনা ও বর্ণনা পাওয়া যায়, তার থেকে স্বতন্ত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত। আবার 'কথামৃত'-এ বাঙ্ময় বিগ্রহে অনন্য রূপে ভক্তহৃদয় আলোকিত করে বিরাজ করছেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব। পরবর্তী কালে ভক্তসমাজে গুরুবন্দনার ধারায় 'কথামৃত'-এর প্রভাব বিশেষভাবেই চোখে পড়ে। তবে লক্ষণীয় হলো, অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত তাঁর গুরুদেবের জীবন, বাণী ও মাহাত্ম্য পরিবেশন করেছেন গল্পের ধারায়। বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসের নির্দিষ্ট সাধনধারার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় হয়ে যাচ্ছে এই গুরু-শিষ্য সংলাপ ও সংবাদের মাধ্যমে।

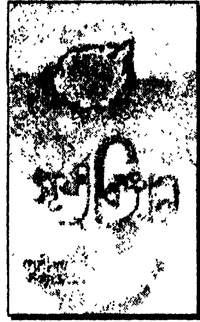
স্বামী বিশুদ্ধানন্দের পরিমণ্ডলে অতিলৌকিক ঘটনার ছড়াছড়ি এবং লক্ষণীয় বিষয় হলো—সেই অ-সাধারণ কার্যকলাপ কোনভাবেই 'জাদু' নয়। তিব্বতের নিকটবর্তী তপস্থলী 'জ্ঞানগঞ্জ'-এর সঙ্গে অখণ্ড বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যেখানে যখন বিশুদ্ধানন্দজী উপস্থিত থেকেছেন, তখনি সেখানে একটা 'যোগ' সূত্র স্থাপিত হতো। জ্ঞানগঞ্জে 'সূর্যবিজ্ঞান'-এর চর্চা ছিল। এই বিজ্ঞানের সঙ্গে এখনো আমাদের তেমন কোন পরিচয় নেই, কারণ বিষয়টি সম্পূর্ণ যোগসাধ্য এবং অতিসূক্ষ্ম তার ব্যবহার। যদিও জড় ও চেতন উভয়ই বিজ্ঞানের বিষয়, তবু সূর্য এর কেন্দ্রস্বরূপ এবং প্রধান আশ্রয় বলে বিশুদ্ধানন্দজীর চর্চিত বিজ্ঞান 'সূর্যবিজ্ঞান' নামেই পরিচিত। এর সামান্য পরিচয় হলো এইরকম—জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সবই সূর্যের অধীন। ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়াশক্তিও সূর্যের থেকেই প্রসারিত হচ্ছে। দেবযানপথের লক্ষ্য ও মুক্তির দ্বার হলেন সূর্য। যোগশাস্ত্রে সর্বজ্ঞাতৃত্ব ও সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব নামে বিশিষ্ট সিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। সবিতাতত্ত্বের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সূর্যে সংযম করলে ভুবন-জ্ঞান এবং যাবতীয় পদার্থের জ্ঞান হয়—একথাও যোগশাস্ত্রে আছে। সূর্যালোকেই জগৎ প্রকাশিত হয়। সূর্য থেকে সর্বদা যে তেজোধারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, তাকে সংযত করে একমুখে প্রবাহিত করতে পারলে জীবের বিক্ষিপ্ত জ্ঞান নিবৃত হয়ে একাগ্রজ্ঞানের উদয় হয়। তারপর সেই সংহত রশ্মি ক্রমশ উর্ধ্বে উত্থিত হলে তখন প্রণবের আলোয় পরমতত্ত্ব প্রকাশমান হয়।

এই সূর্যবিজ্ঞানের মাধ্যমেই বিশুদ্ধানন্দজী একরকম চিকিৎসাও করতেন। তাতে তাপিত পীড়িতের ক্লেশমুক্তি হতো। মাত্র ইহজগতেরই নয়, তিনি 'ভবরোগ'-এরও বৈদ্য ছিলেন। লেখকের নৈপুণ্যে এই বার্তা মসৃণভাবে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। বিশুদ্ধানন্দজীর ধারার কথা হলো—প্রকৃতির সব ব্যাপারই রঙের খেলা। যে নির্লিপ্ত দর্শক, সে দেখতে পায়। সূর্যরশ্মিকে ব্যবহার করেই বিশুদ্ধানন্দ কখনো শূন্য থেকে স্ফটিক সৃষ্টি করেছেন, গোলাপকে পরিণত করেছেন জবা কিংবা গন্ধরাজে। নানা গন্ধের খেলা চলত সবসময়, তাই অনেকে তাঁকে 'গন্ধীবাবা' নামেও জানত। তিনি সূর্যবিজ্ঞান অবলম্বনেই সকলের সঙ্গে যোগজ্যোতিষ এবং যোগচিকিৎসার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রকৃতির জগতে হস্তক্ষেপের জন্য তিনি নিয়মিত কুমারীভোজন, পূজা ইত্যাদিও করিয়েছেন। অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত তাঁর মেধা ও পরিশ্রম সদ্ব্যয় করে আমাদের যে বিরল এবং বহুমূল্য একটি সাধনধারার সঙ্গে কিছুটা প্রকাশ্যে, কিছুটা প্রচ্ছন্নে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, সেজন্য অধ্যাত্মপিপাসুজনের কৃতজ্ঞতা তাঁর প্রতি থাকবেই।

প্রথম খণ্ডে ১৩৪০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাস পর্যন্ত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। প্রায় আড়াইশো পৃষ্ঠা আলোচনার পরেও বাকিটুকু জানার টান বেশ ভালভাবে বেঁচে থাকছে—লেখক ও তাঁর বিষয়, বলা বাহুল্য, এখানেই সম্পূর্ণ, সুন্দর ও সার্থক। ❑

সূর্যই প্রাণ

দেবব্রত দাস



সূর্য্যবিজ্ঞান
ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ
প্রকাশকঃ
জয়দীপ রায়চৌধুরী
প্রাচী পাবলিকেশনস্
৬৩বি ন্যাশনাল প্রেস, বাকসাড়া
হাওড়া-৭১১৩০৬
পৃষ্ঠা : ২২৪
মূল্য : ৭৫ টাকা

"জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।।"

—এটি হলো সূর্যপ্রণাম। এই প্রসঙ্গে বহুশ্রুত কৃষ্ণপুত্র শাম্বের কুষ্ঠরোগমুক্তির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। শাম্ব ও অপর ১৪ জন কুষ্ঠরোগী তিনটি স্থানে সূর্যের প্রভা অঙ্গে ধারণ করে মহাব্যাধি থেকে মুক্তিলাভ করেন—(১) পূর্বে সমুদ্রতীরে উদয়াচলে—সূর্য প্রথম যেখানে আবির্ভূত হন, সেখানে তিনি পূর্বোত্তর কোণে উদিত হন; সেজন্য তাঁকে সেখানে 'কোণাদিত্য' বলা হয়। স্থানটি 'কোণবল্লভক্ষেত্র', 'কোণাদিত্যক্ষেত্র', 'মৈত্রেয়বন' ইত্যাদি নামে পরিচিত। (২) সূর্য মধ্যাহ্নকালে যমুনার দক্ষিণভাগে দ্বারকার নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান করেন। তখন তিনি 'কালপ্রিয়' নামে অভিহিত হন। স্থানটি 'কালনাথক্ষেত্র' নামে প্রসিদ্ধ। (৩) পঞ্চনদীর দেশ পাঞ্জাবের চন্দ্রভাগা তীরে 'মিত্রবন' হলো সূর্যের অস্তাচলমান স্থান। তাঁর এই অস্তাচলভাব বিবিধ চর্মরোগ ও কুষ্ঠঘটিত দেহের বিকৃতি বিনাশ করে। এই আদ্যস্থানে তিনি দক্ষিণ-পশ্চিমে অস্তাচলে যান। এই মিত্রবনকে সূর্যের 'মূলস্থান' বলা হয়েছে। অর্থাৎ সূর্যরশ্মির প্রভাব দ্বারা বিভিন্ন চর্মরোগ ও কুষ্ঠের নিরাময়ের প্রাকৃতিক চিকিৎসা সম্ভব।

এছাড়াও শাম্ব ভারতের বাইরে থেকে শাকদেশীয় সূর্যোপাসক মগ ব্রাহ্মণদের ভারতে আনেন কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা করানোর জন্য। 'অন্তরীক্ষ' (এখনকার কাশ্মীর) অতিক্রম 'দেবলোক' 'ইলাবৃত বর্ষ' বা 'স্বর্গে'র (বর্তমানে মধ্য এশিয়ার পামির, পূর্ব তুর্কীস্থান ইলাবৃত বর্ষের অন্তর্গত) নিকটবর্তী কোন স্থানের নাম ছিল 'শাকদ্বীপ'। শাকদ্বীপের মগ ব্রাহ্মণরা সূর্যোপাসক ছিলেন। কুষ্ঠব্যাধিকে দেহ থেকে আমূল ধ্বংসের চিকিৎসাবিধি একমাত্র তাঁরাই জানতেন। সূর্যালোকের বিবিধ স্থান ও কাল তাঁরাই নির্ণয় করেছেন, কারণ তাঁরা জানতেন যে, সূর্যই এই সব ব্যাধির নিরাময় করতে পারেন। তাই তাঁরা সূর্যোপাসনা ও বিবিধ কর্ম দ্বারা এই গুণ আয়ত্ত করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে সূর্যই একমাত্র অনাবৃত প্রত্যক্ষ ঈশ্বর, যিনি সকল দেবতা ও পিতৃগণের ঊর্ধ্বে। তিনিই সকল শক্তির উৎস। তিনি বিশ্বের রক্ষাকর্তা ও নিয়ন্তা, স্রষ্টা ও ধ্বংসকারী। তিনি সমস্ত অমঙ্গল ও ব্যাধিকে ধ্বংস করেন।

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ তাঁর **'সূর্য্যবিজ্ঞান'** নামক গ্রন্থে সূর্যবিজ্ঞানরহস্য, তাঁর গুরুদেব যোগিরাজ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব এবং 'জ্ঞানগঞ্জ' নামক সাধনক্ষেত্র সম্বন্ধে বলেছেন: "প্রকৃতপক্ষে সূর্যবিজ্ঞান অতি প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান। কিন্তু সাধারণ জগতে আমাদের গুরুদেবের আবির্ভাবের পূর্বে ইহার রহস্য কেহ বিশেষভাবে জানিত না অথবা জানিলেও তাহা প্রকাশ করে নাই। এজন্য সেসম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই। আমি সর্বপ্রথম যখন শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শনলাভ করি, তখনি ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হই এবং ক্রমশ ইহার বিস্তারিত রহস্যও অবগত হই। পরে শ্রীগুরুদেবকে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি এই বিজ্ঞান এবং ইহার সহিত অন্যান্য বিজ্ঞান—যেমন চন্দ্রবিজ্ঞান, নক্ষত্রবিজ্ঞান, বায়ুবিজ্ঞান, ক্ষণবিজ্ঞান এইসব জ্ঞানগঞ্জ হইতে ব্রহ্মচর্য অবস্থায় অবস্থানকালে শিক্ষণ করিয়াছেন। পরে ক্রমশ তিনি নিজে ইহার বিকাশও সম্পাদন করিয়াছেন। সাধারণত সূর্যবিজ্ঞানের রহস্যই সর্ববিধ লৌকিক বিজ্ঞানের মূল রহস্য। মোটকথা এই, সূর্য হইতে জগতের যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং এই বিজ্ঞান জানিলে সকল পদার্থই ইচ্ছানুরূপ নির্মাণ করা যায়। তিনি বলিতেন সূর্যের নাম 'সবিতা', কারণ ইহাই বিশ্বপ্রসবের মূল। সূর্যবিজ্ঞান শিখিতে হইলে সূর্যের রশ্মি সম্বন্ধে পরিজ্ঞান থাকা আবশ্যক। সূর্যবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুসারে জগতের সকল পদার্থই সূর্য হইতে উদ্ভূত।... আর প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানগঞ্জ একটা স্থিতি। হিমালয়ে কত জায়গা ঘুরে খুঁজে বেড়ায়, খুঁজে কোথায় পাবে সেটা? অথচ এখানেই বসে জ্ঞানগঞ্জ পেতে পার।"

প্রাচীনকালে সূর্যবিজ্ঞান বা সাবিত্রীবিদ্যা বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক সাধনার ভিত্তিস্বরূপ ছিল। সূর্যমণ্ডল পর্যন্তই সংসার বর্তমান, সূর্যমণ্ডলের ভেদ না করে মুক্তি সম্ভব নয়। বস্তুত, সূর্যমণ্ডল পর্যন্তই বেদ বা শব্দব্রহ্ম বর্তমান, এর পরে সত্য বা পরমব্রহ্ম বর্তমান। সূর্যসিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, ঋক্ই সূর্যের মণ্ডল এবং যজুঃ ও সাম হলো এঁর মূর্তি। সূর্য হলেন কালাত্মক, ত্রয়ীময় ভগবান।

ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রণব বা ওঁকার বা উদ্গীথই হলো সূর্য এবং ইনিই নাদব্রহ্ম বা শব্দব্রহ্ম। ইনি নিরন্তর 'রব' করতে থাকেন বলেই 'রবি' নামে বিখ্যাত। ত্রয়ীবিদ্যা ছন্দোরূপ তিন বেদে এই উদ্গীথকে আবৃত করে রেখেছে। এর বাইরে মৃত্যুরাজ্য বর্তমান। প্রণব-সূর্যের দুটি অবস্থা। প্রথম অবস্থায় এর রশ্মিমালা চারিদিকে বিকীর্ণ হয়—এটি হলো প্রণব-সূর্যের 'সৃষ্ট্যুন্মুখ' অবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থায় সমস্ত রশ্মিমালা সংযত হয়ে

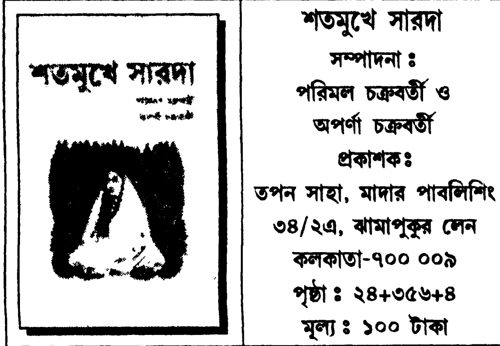
মধ্যবিন্দুতে বিলীন হয়। এই দ্বিতীয় অবস্থাটি হলো প্রণবসূর্যের 'শুদ্ধাবস্থা'। উদ্‌গীথ বা প্রণবই অধিদেবরূপে সূর্য; আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে একেই 'প্রাণ' বলা হয়।

বেদত্রয়ই যখন সূর্য এবং প্রাণই যখন বেদের ঘনীভূত প্রকাশ, তখন সূর্য হলো প্রণবেরই ব্রহ্মবিকাশ। ভারতীয় ঋষিগণ বলেন যে, শুদ্ধ আত্মতেজ অংশত সূর্যমণ্ডল ভেদ করে জগতে আসে। শুদ্ধভূমি থেকে জগতে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য এবং জগৎ থেকে শুদ্ধধামে যাওয়ার জন্য সূর্যই দ্বারস্বরূপ।

ডঃ গোপীনাথ কবিরাজকৃত 'সূর্য্যবিজ্ঞান' আমাদের কাছে চিন্তা-ভাবনার একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দেয়। বইটি প্রকাশ করেছেন প্রাচী পাবলিকেশনস্, যাঁরা ভারতীয় দর্শন ও সনাতন ধর্ম সম্বন্ধীয় বই প্রকাশে যথেষ্ট সুনামের অধিকারী। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বইটিতে অত্যধিক মুদ্রণপ্রমাদ পাঠকের মনঃসংযোগ ব্যাহত করে। ❑

মাতৃবাণীর পীযূষধারা

চিন্ময়ীপ্রসন্ন ঘোষ



শতমুখে সারদা
সম্পাদনা ঃ
পরিমল চক্রবর্তী ও
অপর্ণা চক্রবর্তী
প্রকাশক ঃ
তপন সাহা, মাদার পাবলিশিং
৩৪/২এ, ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯
পৃষ্ঠা ঃ ২৪+৩৫৬+৪
মূল্য ঃ ১০০ টাকা

সারদা সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে। ও জ্ঞান-দায়িনী। মহাবুদ্ধিমতী। ও কি যে সে! ও আমার শক্তি।"—স্বয়ং যুগাবতার চিনিয়ে দিয়েছেন যুগজননীকে। পক্ষান্তরে ব্যক্তও করে ফেলেছেন নিজের স্বরূপ "ও আমার শক্তি"—এই কথার মধ্য দিয়ে। তাই স্পষ্টতই যুগজননী জ্ঞানদায়িনীর জীবনই বাণী। তিনিই যে স্বয়ং বাণী—সরস্বতী! সকলের মা। জন্মজন্মান্তরের মা। আর এই মায়ের কথামৃত নিয়ে তাঁর শতসন্তানের মনন ও অনুধ্যানের সঙ্কলনগ্রন্থ 'শতমুখে সারদা'। মাতৃবাণীর অমিয়-নির্ঝর থেকে একশোটি বাণী সংগ্রহ করে একশোজন লেখক তাঁদের নিজস্ব উপলব্ধি ও অনুভূতি অনুপমভাবে ব্যক্ত করেছেন। বাণী তো নয়, যেন শাশ্বত সত্যের উচ্চারণ। প্রতিটি শব্দ যেন ব্রহ্মস্বরূপ। তদ্গত চিত্তে পাঠ করলেই তা শক্তিময়ী হয়ে ওঠে। প্রাণে আনে মাতৃসান্নিধ্যের সুখস্পর্শ। অন্তর অভিস্নাত হয় স্নিগ্ধ করুণায়। মায়ের জীবন যেমন এযুগের সর্বোত্তম আদর্শ, তাঁর বাণীও তেমনি অমেয় শক্তিপ্রদ। উভয়ের আলোচনা ও অনুধ্যানে আমরা মা-ময় হয়ে উঠি।

আলোচ্য বইটিতে লেখক-তালিকায় আছেন সমাজের নানা স্তরের মানুষ। লেখক-লেখিকা, ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে গায়ক-গায়িকা, উকিল, বিচারপতি, ব্যবসায়ী, ইঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসক, কবিরাজ, নৃত্যশিল্পী, অভিনেতা, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, গৃহস্থ-গৃহিণীরা যেমন আছেন, তেমনি আছেন সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরাও। আজকের মূল্যবোধের সঙ্কট ও আবিলতার দিনে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ মায়ের বাণীগুলি নিয়ে কি ভাবছেন ও কিভাবে রূপায়িত করার চেষ্টা করছেন তার হদিস পাওয়া যাবে বইটিতে। এদিক দিয়ে সম্পাদনা যথেষ্ট অর্থবহ ও তাৎপর্যময়।

এরকম এক অভিনব প্রচেষ্টার জন্য সম্পাদক ও সম্পাদিকা অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। কিন্তু কাজটি যথেষ্ট কঠিন ও দুরূহ। সেকথা সম্পাদকীয়তে তাঁরা স্বীকারও করে নিয়েছেন। সম্পাদনার প্রতি যথেষ্ট সহমর্মিতা রেখেই বলা যায়, এত সুন্দর ও মূল্যবান কাজটিতে আরেকটু যত্নশীল হওয়ার আবশ্যকতা ছিল। অমনোযোগী লেখা কোন কোন ক্ষেত্রে পাঠকের মনঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দৃষ্টান্ত অত্যল্প হলেও অনুপস্থিত বলা যায় না। 'কবি মানে জ্ঞানী'—মায়ের এই বাণীটির অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনা লেখক সম্যক্ উপলব্ধিতে না এনে অত্যন্ত লঘুভাবের পরিচয় দিয়েছেন। আবার পুনর্কথন ও অপ্রাসঙ্গিক বা অতি-উদ্ধৃতিও পাঠকের মনে রসসঞ্চারে ব্যাঘাত ঘটায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে—'দুঃখই তো ভগবানের দয়ার দান' আলোচনাটি। এমন দৃষ্টান্ত আরো দেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া মায়ের মুখে উচ্চারিত ঠাকুরের কথা কিংবা গানের কলিও 'মায়ের কথা' হিসাবে আলোচিত হয়েছে। এই উক্তি-নির্বাচন যথেষ্ট পীড়াদায়ক।

মাতৃবাণীর অভিনবত্ব ও অমোঘত্ব স্বতঃপ্রণোদিতভাবেই ভাস্বর হয়ে ওঠে। ঘৃতের স্বরূপত্ব বোঝাতে কোন উপমাই চলে না। উপমা-উদ্ধৃতি কাব্যালঙ্কার বটে, কিন্তু পরিমিত ব্যবহারেই সৌন্দর্যের মাত্রা বৃদ্ধি করে। যাই হোক, অধিকাংশ লেখাই সুপাঠ্য ও ভক্তিরসাপ্লুত। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের অনবদ্য বিশ্লেষণী আলোচনা বইটির প্রধান আকর্ষণ। এছাড়াও স্বামী গোকুলানন্দ, প্রব্রাজিকা শুদ্ধাপ্রাণা, হোসেনুর রহমান, নচিকেতা ভরদ্বাজ, তাপস বসু ও সম্পাদকদ্বয়ের লেখা যথেষ্ট মনোগ্রাহী।

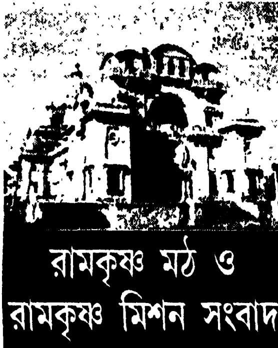
বইটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য বাণীগুলির উৎস, আকর গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ও প্রকাশনার উল্লেখে এবং আলোকচিত্র ও প্রচ্ছদের মানোন্নয়নে অনেকাংশেই নির্ভরশীল। এই ক্ষেত্রগুলিতে বইটি প্রত্যাশিত মানে পৌঁছাতে পারেনি। তবে স্বামী নির্জরানন্দের স্বল্পায়তন ভূমিকা গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। পরিশেষে বলি, এই সম্পাদিত গ্রন্থটি ভক্তমণ্ডলীর এক অপূর্ব প্রাপ্তি। এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে মাতৃ-অনুধ্যান সার্থক হোক। ❑

উৎসব-অনুষ্ঠান

বেলুড় মঠে গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২, সোমবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। আবহাওয়া মনোরম থাকায় সারাদিন ধরে বহু ভক্তের সমাগম হয়েছিল। দুপুরে প্রায় ১২,৫০০ ভক্তকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী মুমুক্ষানন্দজী মহারাজ।

রাঁচি মোরাবাদি আশ্রম (ঝাড়খণ্ড)ঃ গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০০২ আশ্রমের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উপলক্ষ্যে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। এদিন তিনি আশ্রমের একটি ভিডিও কনফারেন্স পরিষেবার উদ্বোধন করেন।

পোর্টব্লেয়ার রামকৃষ্ণ মিশন (আন্দামান)ঃ গত ৪ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০২ যথাক্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উৎসব পালন এবং একটি বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিশেষ পূজা, বৈদিক স্তোত্রপাঠ, ভজন, ভক্তিগীতি প্রভৃতি ছিল উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। ভজন পরিবেশন করেন দুলাল মজুমদার। তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় 'স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতীয় নারী' প্রসঙ্গে স্থানীয় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। এটি পরিচালনা করেন ডি. পি. মুখোপাধ্যায়।



শিকরাকুলীনগ্রাম রামকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দ আশ্রম (উত্তর চব্বিশ পরগনা)ঃ গত ১২-১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' পাঠ, নগর-পরিক্রমা, রামনাম-সঙ্কীর্তন, যাত্রাপালা, ধর্মসভা প্রভৃতি ছিল তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ। বিভিন্ন দিনে ভাষণ দান করেন স্বামী সনাতনানন্দজী, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী, স্বামী বলভদ্রানন্দজী, অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ নন্দ, অধ্যাপক শ্যামল সরদার ও বাসুদেব বর্মন। ১২ ফেব্রুয়ারি যুবসম্মেলনে প্রায় ৩,০০০ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। ১৪ ফেব্রুয়ারি দুপুরে প্রায় ১২,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। এছাড়া ২৪ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত এক শিক্ষক সম্মেলনে ২১০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে আলোচনা করেন স্বামী মুমুক্ষানন্দজী, স্বামী সুপর্ণানন্দজী ও ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা।

পোরবন্দর আশ্রম (গুজরাট)ঃ গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২ একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে ভাষণ দান করেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী 'ভারতরত্ন' এ. পি. জে. আব্দুল কালাম।

কালাডি আশ্রম (কেরালা)ঃ গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২ আশ্রমের নবনির্মিত 'ব্রহ্মানন্দোদয়ম্' উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন-এর দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়।

ছাত্রকৃতিত্ব

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ২০০১ সালের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় **বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের (চেন্নাই বিদ্যাপীঠ)** ছাত্ররা বি. এ. পরীক্ষায় দর্শনে ১ম, ৩য় (দুজন), ৪র্থ ও ৫ম; সংস্কৃতে ১ম, ২য় ও ৩য়; বি. এসসি. পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যায় ১ম স্থান অধিকার করেছে; এম. এ. পরীক্ষায় দর্শনে ২য়, ৩য়, ৫ম ও ৬ষ্ঠ; সংস্কৃতে ১ম ও ২য় এবং এম. এসসি. পরীক্ষায় রসায়নে ২য় স্থান অধিকার করেছে।

সায়েন্স অলিম্পিয়াড ফাউণ্ডেশন পরিচালিত জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড পরীক্ষায় **দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের (ঝাড়খণ্ড)** ছাত্ররা রাজ্যস্তরে ১ম এবং জাতীয় স্তরে ৩য় স্থান অধিকার করেছে।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রাচ্য বিজ্ঞানমেলায় আঞ্চলিক স্তরে **আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের** একটি ছাত্র ত্রিপুরার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে।

পুষ্করের সাবিত্রী-মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের মূর্তিপ্রতিষ্ঠা

রাজস্থানের আজমীরের কাছে অবস্থিত পুষ্কর হিন্দুদের মহাতীর্থস্থান। মহাভারত-সহ বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে এই পুণ্যভূমির উল্লেখ আছে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২, শ্রীপঞ্চমী তিথিতে পুষ্করের বিখ্যাত সাবিত্রী-মন্দিরে স্থাপিত হয় শ্রীমা সারদাদেবীর এক অনুপম মর্মর মূর্তি। দেবী সাবিত্রীর পাশে এবার থেকে বিরাজ করবেন দেবী সারদাও—আমাদের সকলের আপনজন—'মা'।

কিংবদন্তি আছে, পৃথিবীর সৃষ্টিকালে প্রজাপতি ব্রহ্মার হাত থেকে একটি পূত পদ্মফুল মাটিতে পড়ে যায় আর সেই পতনস্থলে সৃষ্ট হয় এই পুষ্কর হ্রদ। এই হ্রদের একপার্শ্বে আজও একটি ব্রহ্মা-মন্দির আছে। সম্ভবত ভারতবর্ষের এটি একমাত্র ব্রহ্মামন্দির। কথিত আছে, স্বয়ং আদি শঙ্করাচার্য এই মন্দিরটির স্থাপনা করেন। এই মন্দিরে একটি ব্রহ্মামূর্তির পাশাপাশি মাতা গায়ত্রীরও একখানি মূর্তি রয়েছে। ব্রহ্মামন্দিরটির অদূরে একটি পাহাড়ের ওপর অবস্থিত সাবিত্রী-মন্দির। ব্রহ্মা-পত্নী সাবিত্রী এভাবে দূরে চলে গেলেন কেন? কেন তাঁরও ঠাঁই হলো না স্বামিপার্শ্বে? পৌরাণিক কাহিনীতে এই প্রশ্নের উত্তর মেলে।

একদা এই পুষ্করেরই তীরে এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা। কিন্তু শক্তি বিনা কেমন করে সম্পন্ন হবে যজ্ঞ? ডাক পড়ল মাতা সাবিত্রীর। কিন্তু কোথায় তিনি? দুর্ভাগ্যবশত তিনি উপস্থিত ছিলেন না সেখানে। ওদিকে লগ্ন বয়ে যায়। প্রজাপতি তখন ডেকে নিলেন পাশে দাঁড়ানো এক গোপবালাকে। তাঁর নাম 'গায়ত্রী'। যজ্ঞ শুরু হওয়ার আগে ঐখানেই গায়ত্রীকে বিবাহ করলেন চতুর্মুখ ব্রহ্মা, তারপর

শক্তি-সহযোগে সমাধা হয়ে গেল সেই মহাযজ্ঞ। এর কিছু পরেই উপস্থিত হলেন দেবী সাবিত্রী। সব দেখেশুনে ক্রোধান্বিতা দেবী চলে গেলেন নিকটবর্তী রত্নাগিরি পাহাড়ের ওপর। শুরু করলেন এক কঠোর তপস্যা। এই তপস্যাস্থলেই গড়ে ওঠে বর্তমান সাবিত্রী-মন্দির।

এছাড়া দেবীভাগবতে এই অঞ্চলটিকে ৫১টি মহাশক্তি-পীঠের অন্যতম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কথিত আছে, সতীর খণ্ডিত শরীরের কবজি (wrist) এই অঞ্চলে পড়ে।

কিন্তু এই অঞ্চলের স্থানমাহাত্ম্য অধিকতর মহিমান্বিত হয়ে ওঠে সাবিত্রী-মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের আগমনে। ১৮৯৭ সালে স্বামী যোগানন্দ, গোলাপ-মা, যোগীন-মা এবং লক্ষ্মীদিদিকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীশ্রীমা আসেন এই 'তীর্থগুরু' পুষ্কর দর্শনে। সাবিত্রী-মন্দিরে প্রবেশ করে এক দিব্যভাবে আপ্লুত হয়ে পড়ে তাঁর মন। তিনি সমাধিস্থা হয়ে যান।

এই ঘটনার স্মৃতিরক্ষার্থে আজমীর সরকারি কলেজের অধ্যাপক ওমপ্রকাশ শর্মা ঐ মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের একখানি পট স্থাপনে উদ্যোগী হন। ১৯৭৩ সালে মন্দিরের তৎকালীন অধিগ্রাহক তথা পূজারী বেণীগোপাল শর্মার অনুমতিক্রমে সাবিত্রী মূর্তির পাশে শ্রীশ্রীমায়ের একখানি পট সংস্থাপিত হয়।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২ শ্রীপঞ্চমী তিথিতে জয়পুর রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যবস্থাপনায় ঐ পটটির স্থলে স্থাপিত হয় শ্রীশ্রীমায়ের একটি নাতিবৃহৎ (২'×১½') অনিন্দ্যসুন্দর মর্মর-মূর্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে লক্ষ্য করে একবার বলেছিলেন ঃ "ও সারদা—সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।" তাই সরস্বতী-পূজার পুণ্যলগ্নেই সারদামূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হলো। দেবী সাবিত্রী আর মা সারদার অলৌকিক সহাবস্থানে পুষ্কর হয়ে রইল মহাতীর্থ।

মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর ঐদিনই আয়োজিত হয় ষোড়শোপচারে পূজা এবং যজ্ঞ। ঐ পূজায় পূজারীর আসনে ছিলেন স্বামী একনিষ্ঠানন্দজী।

জয়পুর, আজমের, কিষেণগড়, দিল্লি প্রভৃতি দূরদূরান্তর থেকে অগণিত ভক্ত উপস্থিত হন এই অনুষ্ঠানে। পূজাশেষে সকলেই শ্রীশ্রীমায়ের প্রসাদ গ্রহণ করেন। ঐদিন এক দরিদ্রনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। প্রায় ৫০০ দরিদ্র মানুষকে বসে খাওয়ানো হয়। দিল্লি, বৃন্দাবন, খেতড়ির রামকৃষ্ণ মিশন থেকে আগত সন্ন্যাসিগণ এই বিপুল কর্মযজ্ঞ দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন।

দেহত্যাগ

স্বামী যজ্ঞানন্দজী মহারাজ (মহিমারঞ্জন মহারাজ) ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে সরিষা আশ্রমে প্রয়াণ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। ১৯৩১ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করে ১৯৪৪ সালে সরিষা আশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৫৩ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি সন্ন্যাসলাভ করেন। তিনি ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত আশ্রমের বিভিন্ন কাজে যুক্ত ছিলেন। এরপর থেকেই তিনি দীর্ঘ ২৭ বছর আশ্রমের সম্পাদকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। প্রায় দেড় বছর যাবৎ তিনি সম্পাদকের পদ ত্যাগ করে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। তাঁর স্বভাব ছিল সরল ও স্নেহপ্রবণ। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ১৬ মার্চ ২০০২ বিশেষ পূজা ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উদ্‌যাপন করা হয়।

গত ২৮ মার্চ ২০০২ শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে তাঁর জীবনী পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী সনকানন্দজী।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

কুরুমগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (বীরভূম) ঃ গত ১৫ জানুয়ারি ২০০২ বিশেষ পূজা, 'গীতা' ও 'চণ্ডী' পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালন করা হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী দেবময়ানন্দজী। ধর্মসভায় স্বামী শিবনাথানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে ভাষণ দেন স্বামী দেবময়ানন্দজী, স্বামী বাগীশানন্দ পুরী, লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত, অসিতকুমার মাল প্রমুখ।

দাসপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (মেদিনীপুর) ঃ গত ১৮ জানুয়ারি ২০০২ বহু সন্ন্যাসী ও ভক্তের উপস্থিতিতে নবনির্মিত মন্দিরের উদ্বোধন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পট স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, কীর্তন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী, স্বামী কালাতীতানন্দজী ও ডাঃ বিশ্বনাথ কোণ। স্বাগত-ভাষণ দেন শিশির পাইন। এদিন দুপুরে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

পাঁশকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (মেদিনীপুর) ঃ গত ১৮ জানুয়ারি ২০০২ বহু সাধু ও ভক্তের উপস্থিতিতে নবনির্মিত উপাসনাগৃহ ও বিদ্যাভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ।

পাণিত্রাস বিবেকানন্দ সেবাসমিতি (হাওড়া) ঃ গত ১৯ ও ২০ জানুয়ারি ২০০২ হাওড়া জেলা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সঙ্গীত, গীতিনাট্য, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ধর্মসভার মাধ্যমে। সভায় ভাষণ দেন স্বামী রমানন্দজী, স্বামী অজরানন্দজী, স্বামী নির্বিকল্পানন্দজী, স্বামী ঋতানন্দজী, বিনয়

ঘোষ ও অভিজিৎ গাঙ্গুলী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী।

দমদম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ (কলকাতা-৭০০ ০৩০)ঃ গত ১৯ ও ২০ জানুয়ারি ২০০২ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী ও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় 'কথামৃত' পাঠ করেন ডঃ নীলিমা ধর এবং ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী। দ্বিতীয় দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দজী, ডঃ কমল নন্দী ও দেবনাথ চক্রবর্তী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন নির্মলকুমার রায়, চন্দনকুমার রায় প্রমুখ। সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শঙ্কর আইচ।

সোদপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (উত্তর চব্বিশ পরগনা)ঃ গত ২০ জানুয়ারি ২০০২ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ধর্মসভার মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হিল্লোল রায়, তরুণ ব্যানার্জী, স্বাগতা রায় প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী।

জিরাট শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (হুগলী)ঃ গত ২০ জানুয়ারি ২০০২ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, প্রভাতফেরি, 'কথামৃত' পাঠ ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী ও অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এই উপলক্ষ্যে প্রায় ৪০০ ভক্ত প্রসাদ পান এবং ২০ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পাঠসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

হরিপাল শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম (হুগলী)ঃ গত ২০ জানুয়ারি ২০০২ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে ভক্তিগীতি, বিশেষ পূজা ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা করেন স্বামী সাংখ্যানন্দজী। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সৎপ্রভানন্দজী ও সমীরকুমার নিয়োগী এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী গৌরীনাথানন্দজী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রায় ১,২০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

আড়িয়াদহ বিবেকানন্দ সাংস্কৃতিক চক্র (কলকাতা-৭০০ ০৫৭)ঃ গত ২০ জানুয়ারি ২০০২ ভক্তিগীতি, পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। আলোচনা করেন স্বামী সনাতনানন্দজী এবং পাঠে অংশগ্রহণ করেন সুনীল রুদ্র। এই উপলক্ষ্যে ৫০ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে কম্বল ও ৩৫০ জন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পাঠসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

নিমতা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ (কলকাতা-৭০০ ০৪৯)ঃ গত ২০ জানুয়ারি ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, কীর্তন ও ধর্মসভা ছিল অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, শিবপদ মুখার্জী প্রমুখ। 'কথামৃত' পাঠ করেন স্বামী একব্রতানন্দজী এবং ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী।

গোপালনগর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (হুগলী)ঃ গত ২০ জানুয়ারি ২০০২ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, গীতি-আলেখ্য ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষণ দেন স্বামী ব্রহ্মপদানন্দজী। এদিন দুপুরে প্রায় ৮০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বেলডিহা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (হুগলী)ঃ গত ২৫-২৭ জানুয়ারি ২০০২ একটি কৃষি-উদ্যান মেলার আয়োজন করা হয়। মেলার উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী শিবময়ানন্দজী, স্বামী অমেয়ানন্দজী প্রমুখ। এই মেলায় কৃষিবিষয়ক আলোচনাচক্র এবং ফল-ফুল ও সবজির প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী।

বেরহামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবা সঙ্ঘ (ওড়িশা)ঃ গত ২৫-২৭ জানুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, স্তোত্র ও 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্ঘের নবনির্মিত একটি প্রার্থনাগৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন এবং ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী দীনেশানন্দজী। সভায় ভাষণ দেন উপেন্দ্রনাথ দাস, প্রমোদ সাউ, শর্মিষ্ঠা চৌধুরী প্রমুখ। এই উপলক্ষ্যে বহু দরিদ্র মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ এবং ৩০০ রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

মাকড়দহ ২নং অঞ্চল স্বামী বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সমিতি, জোতগিরি (হাওড়া)ঃ গত ২৬ জানুয়ারি ২০০২ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন ও আলোচনা করেন স্বামী সনাতনানন্দজী। এছাড়া আলোচনা করেন পাঁচুগোপাল মণ্ডল, দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী প্রমুখ এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌরীশঙ্কর গাঙ্গুলী। সম্মেলনে প্রায় ৪০০ যুবপ্রতিনিধি যোগদান করেন।

কুমরুল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (হুগলী)ঃ গত ২৬ জানুয়ারি ২০০২ শোভাযাত্রা, 'গীতা' ও 'চণ্ডী' পাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, প্রায় ১৫,০০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ-বিতরণ ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুপ্রিয় রায়। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী, স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী ও স্বামী ভয়হরানন্দজী।

গোয়াবাগান রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ (কলকাতা-৭০০ ০০৬)ঃ গত ২৬-২৭ জানুয়ারি ২০০২ বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও যুবসম্মেলনের মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। সম্মেলনে সঙ্গীত পরিবেশন করেন অসীম অধিকারী প্রমুখ। বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণানন্দজী, স্বামী বলভদ্রানন্দজী, অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য, গোপেন চৌধুরী, তারকনাথ দে প্রমুখ। প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন স্বামী পূর্ণানন্দজী ও ডঃ কমল নন্দী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দুলালচন্দ্র মান্না।

তিলজলা বিবেকানন্দ সেবা সংসদ (কলকাতা-৭০০ ০৩৯)ঃ গত ২৬-২৭ জানুয়ারি ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বিশেষ পূজা, শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা ছিল দুদিনব্যাপী উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। পূজা করেন স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী অনিমেষানন্দজী, নিত্যরঞ্জন মণ্ডল প্রমুখ। দুদিনের সভায় স্বামী বলভদ্রানন্দজীর সভাপতিত্বে ভাষণ দেন স্বামী অনিমেষানন্দজী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ। স্বাগত-ভাষণ দেন শৈলেন্দ্র নন্দী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অশোককুমার মাইতি।

শরৎ কলোনী শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি বিবেকানন্দ পাঠচক্র (কলকাতা-৭০০ ০৮১)ঃ গত ২৬-২৭ জানুয়ারি ২০০২ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' পাঠ ও ধর্মসভার মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়। পূজা করেন অশোককুমার মুখার্জী। প্রথমদিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা দেবাত্মপ্রাণাজী ও অশোককুমার মুখার্জী। দ্বিতীয়দিনের সভায় ভাষণ দেন স্বামী সর্বগানন্দজী ও অনুপ মণ্ডল। দুদিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রফুল্লচন্দ্র অঙ্কুর।

গান্ধী কলোনী শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র ও সেবাশ্রম (কলকাতা-৭০০ ০৯২)ঃ গত ২৬-২৮ জানুয়ারি ২০০২ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, ভক্তিগীতি, রামায়ণ গান, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় বিভিন্ন দিনে আলোচনা করেন স্বামী ঋদ্ধানন্দজী, স্বামী সত্যদেবানন্দজী, প্রণবেশ চক্রবর্তী, প্রব্রাজিকা নির্ভীকপ্রাণাজী প্রমুখ। এই উপলক্ষ্যে প্রায় ২,০০০ নরনারায়ণকে সেবা করা হয় এবং ২০০ মানুষকে নববস্ত্র প্রদান করা হয়।

চাতরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি (বীরভূম)ঃ গত ২৭ জানুয়ারি ২০০২ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে উষাকীর্তন, ভক্তিগীতি, শোভাযাত্রা, 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৮০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী শিবনাথানন্দজী, স্বামী দেবময়ানন্দজী ও স্বামী ধ্রুবানন্দজী।

ঘোষপাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্ সঙ্ঘ (হাওড়া)ঃ গত ২৭ জানুয়ারি ২০০২ নগর-পরিক্রমা, পূজা, পাঠ ও ধর্মসভার মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সগুণানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ এবং ৬৫০ জন ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ (হুগলী)ঃ গত ২-৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে প্রথমদিন শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণাজী, বিধায়ক রত্না দে ও সাংসদ আকবর আলি খন্দকার এবং 'মায়ের কথা' থেকে পাঠ করেন মন্দিরা মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয়দিন অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ পূজা, 'পুঁথি', 'গীতা' ও স্তোত্র পাঠ, 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতি। সভায় ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুব্রত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। ভাষণ দেন স্বামী অজরানন্দজী ও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

খড়ার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (মেদিনীপুর)ঃ গত ২-৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২ নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, প্রায় ৮,০০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মসভার মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। দুদিনের ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী জ্যোতির্ঘনানন্দজী এবং স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী। সন্ধ্যায় 'মীরার বঁধুয়া' যাত্রাপালা অভিনীত হয়।

পাতুল মিলন মন্দির শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (হুগলী)ঃ গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, ভক্তিগীতি, ও ধর্মসভার মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ধর্মসভায় স্বামী গৌরীনাথানন্দজীর সভাপতিত্বে ভাষণ দেন স্বামী বরানন্দজী ও বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন আদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাগত-ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে তাপস মুখোপাধ্যায় ও চিত্রলেখা সরকার।

হাঁটাল আঞ্চলিক শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র (হাওড়া)ঃ গত ৩ ফেব্রুয়ারি বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় হাঁটাল বিশালাক্ষী হাইস্কুল প্রাঙ্গণে। সঙ্গীত, পাঠ, প্রশ্নোত্তর পর্ব ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের অনুষ্ঠিত বিষয়। সঙ্গীতে মানবেন্দ্র চক্রবর্তী, পাঠে প্রতিমা সাউ ও মমতা মাজী অংশগ্রহণ করেন। প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী। বিভিন্ন অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী সর্বগানন্দজী, মনোজিৎ মণ্ডল, প্রণবকুমার ঘোষাল এবং প্রব্রাজিকা অচিন্ত্যপ্রাণাজী ও গৌতমকুমার দাস। সম্মেলনে স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে মনোরঞ্জন মান্না ও তুহিনকুমার পাত্র। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রায় ৭৫০ জন ভক্ত প্রসাদ পান।

চলান্তি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বালেশ্বর, ওড়িশা)ঃ গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'বাণী ও রচনা' পাঠ এবং আলোচনার মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মতিথি পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ২৫০ জনকে প্রসাদ এবং ২০ জন দরিদ্র মানুষকে কম্বল দেওয়া হয়।

পাড়াতল অঞ্চল স্বামী বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (বর্ধমান)ঃ গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মতিথি পালন করা হয়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগ (কলকাতা-৭০০ ০৩২)ঃ গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২ 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও আধুনিক নৈতিকতা' প্রসঙ্গে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী জিতাত্মানন্দজী, অধ্যাপক দীপক ঘোষ, অধ্যাপক আনন্দময় মান্না ও প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী। পৌরোহিত্য করেন উপাচার্য অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। স্বাগত-ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে অধ্যাপক জ্ঞানাঞ্জন নাগ ও অধ্যাপক অশেষ রায়চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বহু ছাত্রছাত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

কল্যাণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ (নদীয়া)ঃ গত ৭-১০ ফেব্রুয়ারি ২০০২ বিশেষ পূজা, পাঠ, গীতি-আলেখ্য, ভক্তিগীতি, নগর-পরিক্রমা, কীর্তন, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। বিশেষ পূজা এবং ভাষণ দান করেন স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী। গীতাপাঠ করেন ডঃ নমিতা দত্ত, সবিতা সরকার, শ্রাবণী চক্রবর্তী এবং ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অমর পাড়ুই ও সম্প্রদায়। এছাড়া পরিবেশিত হয় গীতিনাট্য ও লীলাকীর্তন। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী, স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী এবং প্রব্রাজিকা গৌতমপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণাজী। উৎসবের শেষদিনে প্রায় ৪,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

রঘুনাথপুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র (হুগলী) : গত ৮-১০ ফেব্রুয়ারি ২০০২ হুগলী জেলা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের ১৮তম বার্ষিক সম্মেলন উদ্‌যাপিত হয়। বিশেষ পূজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, নাট্যানুষ্ঠান ও আলোচনাসভা ছিল সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ। পূজা করেন স্বামী সাংখ্যানন্দজী। সভায় বিভিন্ন দিনে আলোচনা করেন স্বামী সর্বময়ানন্দজী, স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী যতীশানন্দজী, প্রাক্তন অধ্যক্ষ রামসিংহ পাল, প্রধানশিক্ষক সেখ হাসান ইমাম, ডঃ পরেশচন্দ্র দাস ও অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ আদক। উপনিষদ্ পাঠ করেন স্বামী সন্নিরুদ্ধানন্দজী।

রানীগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র (বর্ধমান) : গত ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০২ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি যুবসম্মেলন ও বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় আয়োজিত যুবসম্মেলনের সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প মন্ত্রী বংশগোপাল চৌধুরী। আলোচনা করেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী শৈলজানন্দজী ও অধ্যাপক ডঃ আব্দুস সামাদ। এতে প্রায় ২০০ যুবপ্রতিনিধি যোগদান করেছিল। পরদিন বিশেষ পূজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, পাঠ ও ধর্মসভার মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী অধ্যাত্মানন্দজী এবং ভাষণ দান করেন স্বামী গিরিশানন্দজী ও স্বামী শৈলজানন্দজী। এদিন দুপুরে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

হালিসহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ (বীজপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব স্মরণে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশেষ পূজা, নগর পরিক্রমা, গীতি-আলেখ্য, শ্রুতিনাটক ও ধর্মসভা ছিল অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ। বিশেষ পূজা করেন প্রব্রাজিকা তন্ময়প্রাণাজী এবং সকালের ধর্মসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা বোধপ্রাণাজী। দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অম্বিকেশানন্দজী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

চুঁচুড়া শ্রীশ্রীমা সারদা সঙ্ঘ (হুগলী) : গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০২ পূজা, 'গীতা' ও 'চণ্ডী' পাঠ, প্রায় ৪০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ এবং ধর্মসভার মাধ্যমে সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। সভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা সদানন্দপ্রাণাজী।

পাত্রসায়ের শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ (বাঁকুড়া) : গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০২ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় যুবসম্মেলন আয়োজিত হয়। অনিল কেজরিওয়ালের স্বাগত-ভাষণান্তে আলোচনা করেন স্বামী অচ্যুতাত্মানন্দজী, স্বামী শিবপদানন্দজী ও সুশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন স্বামী জ্যোতির্ঘনানন্দজী। অংশগ্রহণকারী প্রায় ৪০০ যুবপ্রতিনিধিকে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর একটি করে ছবি এবং কলম প্রদান করা হয়।

বহির্ভারত

শ্রীমঙ্গল বিবেকানন্দ শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদ্ (মৌলভীবাজার, বাংলাদেশ) : গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মতিথি উদ্‌যাপন করা হয়। বিশেষ পূজা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, দরিদ্র মানুষের মধ্যে বস্ত্র-বিতরণ, সঙ্গীত, আলোচনাসভা প্রভৃতি ছিল উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি দ্বীপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অধ্যক্ষ পরিমলকান্তি দেব, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রলাল দাশ, বিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী প্রমুখ।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য মণীন্দ্রচন্দ্র দত্ত গত ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ জোড়হাটে (অসম) নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। তিনি ছিলেন জোড়হাট শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের উপ-সভাপতি এবং বিশিষ্ট আইনজীবী। তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বহু প্রাচীন সন্ন্যাসীর স্নেহভাজন এবং 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা সুষমারানী দে গত ১৮ জানুয়ারি ২০০২ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি কলকাতার যশোহর রোডস্থ রামকৃষ্ণ সেবা নিকেতনের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন। স্বাবলম্বিতা ও সেবাপরায়ণতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

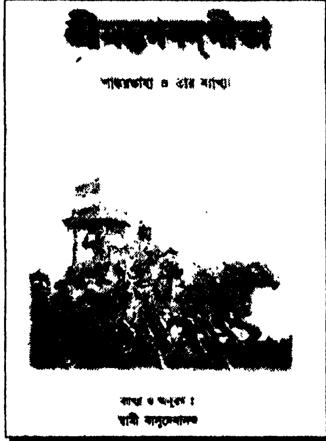
শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য প্রেমতোষ বক্সী গত ১৯ জানুয়ারি ২০০২ বাঁকুড়ার নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহান্তকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজ, শ্রীম প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। তিনি 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক এবং বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সমাজসেবার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সরল ও অনাড়ম্বর জীবন এবং সুমধুর ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ডাঃ দামোদর মাহাত গত ২৬ জানুয়ারি ২০০২ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি 'ডাক্তার মহারাজ' স্বামী মহেশ্বরানন্দজীর সঙ্গ এবং তাঁর কাছ থেকে ডাক্তারী শিক্ষালাভ করেন। বহু স্থানে তিনি স্বেচ্ছাসেবা দান করেছেন।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা অমিয়া সিন্‌হা হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৮ জানুয়ারি ২০০২ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি 'উদ্বোধন'-এর দীর্ঘদিনের গ্রাহিকা ছিলেন। ❑



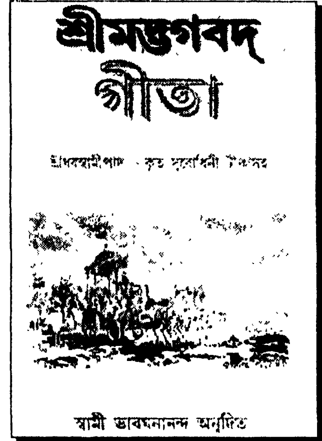
উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত বই ও ক্যাসেট



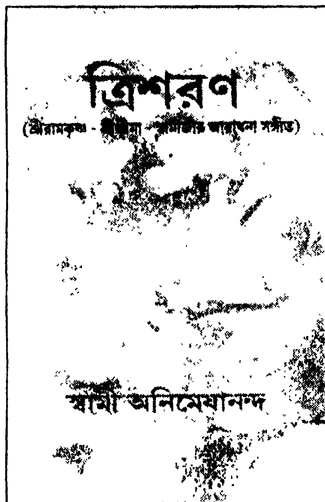
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (শাঙ্করভাষ্য ও তার ব্যাখ্যা)
ব্যাখ্যা ও অনুবাদ : স্বামী বাসুদেবানন্দ
২০০.০০



শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী
মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত
৮০.০০



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সুবোধিনী টীকাসহ)
অনুবাদ : স্বামী ভাবঘনানন্দ
৯০.০০



ত্রিশরণ
স্বামী অনিমেষানন্দ
মূল্য : ৩৫ টাকা



দিব্য গীতি
(হিন্দি ভজন)
স্বামী সর্বগানন্দ
মূল্য : ৩৫ টাকা



অন্তরে জাগিছো মা
স্বামী অনিমেষানন্দ
মূল্য : ৩০ টাকা

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

তাঁর নামবীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

আবেদন

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের পৈতৃক জন্মভিটায় "রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম" ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমানে এখানে একটি সাধুনিবাসের বিশেষ প্রয়োজন। ইহার জন্য প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। তন্মধ্যে প্রায় অর্ধেক অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। ভক্তদিগের নিকট আমাদের আবেদন, তাঁহারা এই প্রকল্পে তাঁহাদের সাধ্যমতো দান পাঠাইয়া এই মহান কার্যে সহায়তা করুন।

সেবাশ্রমে প্রেরিত সমস্ত দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত। A/c Payee Cheque/ Draft **"Ramakrishna Sevashram, Bamunmura"** লিখিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে অনুরোধ করি—

RAMAKRISHNA SEVASHRAM
BAMUNMURA, P.O.—BADU
DIST.—NORTH 24 PARGANAS
PIN.—743202

এরকম মনে করা ভাল নয় যে, আমার ধর্মই ঠিক আর অন্য সকলের ধর্ম ভুল। সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকলেই হলো। অনন্ত পথ—অনন্ত মত। **শ্রীরামকৃষ্ণ**

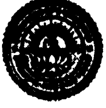
*

ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজন? নিন্দা ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, কিন্তু কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে, তা বলতে পারে কজনে? **শ্রীমা সারদাদেবী**

*

টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধাবিঘ্নের বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে পারে। **স্বামী বিবেকানন্দ**

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন? **স্বামী বিবেকানন্দ**



শ্রীরামকৃষ্ণ-অক্ষয়কুমার পাঠচক্র (রেজি. নং—এস/এল ৪৩৩৩)

অক্ষয়পল্লী ◆ ময়নাপুর ◆ বাঁকুড়া

আবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণ-কৃপাধন্য, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি'-প্রণেতা, পুণ্যশ্লোক **অক্ষয়কুমার সেনের জন্মস্থান ময়নাপুর গ্রামে (জেলা—বাঁকুড়া)** রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একাদশ অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের শুভ আশীর্বাদে ও শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির, জয়রামবাটীর পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজের ঐকান্তিক প্রেরণায় ১৯৮৭ সালে **'শ্রীরামকৃষ্ণ-অক্ষয়কুমার পাঠচক্র'** প্রতিষ্ঠিত হয়। বিষ্ণুপুর মহকুমায় প্রথম স্থাপিত এই পাঠচক্র শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ মহারাজের প্রত্যক্ষ নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে এবং পূজ্যপাদ স্বামী স্বাহানন্দ, স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী চেতনানন্দ, স্বামী নির্লিপ্তানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসিবৃন্দের উৎসাহ ও সহযোগিতায় এই গ্রামীণ এলাকায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবাদর্শ প্রচার ও সেবাকার্যের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

সম্প্রতি শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী অমেয়ানন্দজী মহারাজের পরামর্শক্রমে এই পাঠচক্র স্বামীজীর আদরের 'শাকচুন্নী', ভক্তকবি অক্ষয়কুমার সেনের পূত স্মৃতিরক্ষাকল্পে তাঁর জন্মভিটা এবং তাঁর শেষজীবনে নির্জনবাস ও শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাপূজার জন্য নির্মিত একটি দালানবাড়ি (বর্তমানে ধ্বংসপ্রায়) অধিগ্রহণ এবং আনুষঙ্গিক কিছু উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য পনের লক্ষ টাকার নিম্নরূপ একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই মহৎ উদ্দেশ্য রূপায়ণে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুরাগী, ভক্তবৃন্দ, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের কাছে মুক্তহস্তে দান করার জন্য আবেদন জানাই। ***'শ্রীরামকৃষ্ণ-অক্ষয়কুমার পাঠচক্র'***—এই নামে মানি অর্ডার, চেক বা ড্রাফটের মাধ্যমে দান প্রেরণ করতে অনুরোধ করছি। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আশীর্বাদ সকলের ওপর বর্ষিত হোক।

প্রকল্প	আনুমানিক ব্যয়
১। অক্ষয়কুমার সেনের জন্মভিটা ক্রয়	১ লক্ষ টাকা
২। তাঁর ঠাকুরদালান ও সংলগ্ন জমি ক্রয়	১ লক্ষ টাকা
৩। ঐ দালান পুনর্নির্মাণ	৪ লক্ষ টাকা
৪। পাঠচক্র-সংলগ্ন জমি ক্রয়	১ লক্ষ টাকা
৫। সাধুদের জন্য বিশ্রাম-ভবন নির্মাণ	৩ লক্ষ টাকা
৬। উক্ত স্থানসমূহের সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ	৩ লক্ষ টাকা
৭। পাঠচক্রের মন্দির সংস্কার	২ লক্ষ টাকা

ইতি
বিনীত

অমরশঙ্কর ভট্টাচার্য
সভাপতি
ফোন ঃ ০৩২৪৪-৫০৩৬৪

> ধর্মই মানবের চিন্তা ও জীবনের সর্বোচ্চ স্তর।
> **স্বামী বিবেকানন্দ**



জেলাভিত্তিক 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৫

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

জেলা : উত্তর চব্বিশ পরগনা

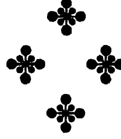
- **রামকৃষ্ণ মঠ**, বারাসত
- **শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ আশ্রম**
  পোঃ রাজারহাট-বিষ্ণুপুর, পিন : ৭৪৩ ৫১০
- **রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম**, রহড়া
- **বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
- **গোবরডাঙ্গা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘ**, খাঁটুরা
- **বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ**, নববারাকপুর
- **অলক পালচৌধুরী**, প্রসন্ন চ্যাটার্জী রোড
  সঙ্কটাপল্লী, পোঃ ঘোলা বাজার, পিন : ৭৪৩১৭০
- **ঘোলা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, বি-৭, বি পার্ক, সোদপুর
- **বিবেকানন্দ আলোচনা-চক্র**, নিমতলা
- **ইছাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
- **মানিক ঘোষ**, **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**
  শ্রীমা সারদা সরণি, গঙ্গাপুর, দত্তপুকুর, পিন : ৭৪৩ ২৪৮
- **বীজপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ**
  শহীদনগর, কাঁচড়াপাড়া
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**, প্রযত্নে সুবীরকুমার মণ্ডল
  ১৫৪ ঘটক রোড, কাঁচড়াপাড়া, পিন : ৭৪৩১৪৫
- **স্যান্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**
  পোঃ স্যান্ডেলেরবিল, হিঙ্গলগঞ্জ, পিন : ৭৪৩ ৪৩৫
- **হালিশহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ**
  প্রযত্নে রামকৃষ্ণ চিলড্রেন্স হোম
  গ্রাম+পোঃ মালঞ্চ, ভায়া : হাজিনগর, থানা : বীজপুর
- **পান্নালাল ব্যানার্জী**, প্রযত্নে তারা আলয়
  ২৯ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড (স্টেশনের সম্মুখে)
  পোঃ নৈহাটী, পিন : ৭৪৩ ১৬৫
- **কথাশিল্প**, প্রযত্নে গোপালচন্দ্র ঘোষ
  শক্তিগড়, চাকদা রোড, বনগ্রাম, ফোন : ৫৫-৬৯৪/৭২৫
- **বিবেকানন্দ বুক সেন্টার**, প্রযত্নে বাসুদেব সাধুখাঁ
  'ট' বাজার, বনগ্রাম, ফোন : (৯৫৩২১৫) ৫৯৩৯৭
- **সুজিত ঘোষ**, ৩ এফ. রোড, আনন্দপুরী
  পোঃ নোনা চন্দনপুকুর, ব্যারাকপুর, ফোন : ৫৬০-১২৩০
- **রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ (পাঠচক্র)**, ৪৭/৭ টেগোর টেম্পল রোড
  পোঃ শ্যামনগর, পিন : ৭৪৩ ১২৭
- **শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**, বনগ্রাম, পিন : ৭৪৩ ২৩৫
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, রামকৃষ্ণপল্লী
  বনগ্রাম, পিন : ৭৪৩ ২৩৫
- **নিমতলা বিবেকানন্দ আলোচনাচক্র**
  শরৎ পাঠাগার, নিমতলা, পোঃ পূর্ব বিষ্ণুপুর
- **শ্রীশ্রীমা সারদা সঙ্ঘ**, ৪৭ কে. এন. মুখার্জী রোড
  তালপুকুর, বারাকপুর, পিন : ৭৪৩ ১৮৭
- **স্বপন চক্রবর্তী**, **সম্পাদক**, **শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ দেবালয় (বেড়াচাঁপা অঞ্চল), পিন : ৭৪৩ ৪২৪
- **ভাটপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**
  প্রযত্নে শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮/২ বিন্দুবাসিনী রোড
  পোঃ ভাটপাড়া, পিন : ৭৪৩ ১২৩
- **ন'পাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**
  কৃষ্ণনগর রোড, পোঃ ন'পাড়া, বারাসত
  পিন : ৭৪৩ ৭০৭, ফোন : ৫৪২-৩৭৩৯/৬৭০২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত চলমান পাঠচক্র**
  প্রযত্নে কালীপ্রসাদ সরকার
  টাকী রোড, পোঃ বসিরহাট, ফোন : ৫৫০১৮
- **রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ**, সোদপুর রোড, মধ্যমগ্রাম, পিন : ৭৪৩ ২৭৫
- **হাবড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম**
  স্বামীজী সরণী, হাবড়া, ফোন : ৫৫৩৯২

জেলা : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, সরিষা
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ**, ভাঙ্গড়
- **হৃদয়ভূষণ নস্কর**, **প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ কন্যানগর, আমতলা, পিন : ৭৪৩ ৩৯৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, পোঃ বি-রামকৃষ্ণপুর, পিন : ৭৪৩ ৬১০
- **রামকৃষ্ণ পাঠমন্দির**, গ্রাম : চকমানিক, পোঃ বাওয়ালি, পিন : ৭৪৩ ৩৮৪
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম** (বাটানগর), পোঃ মহেশতলা, পিন : ৭৪৩ ৩৫২
- **বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য**
  সম্পাদক, বারুইপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ প্রচার সমিতি
  পিন : ৭৪৩ ৩০২, ফোন : ৪৩৩-৮৩৬৯
- **জীবনকৃষ্ণ দাস**, প্রযত্নে মহেশ্বর স্টোর্স
  কাছারী বাজার, বারুইপুর, পিন : ৭৪৩ ৩০২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ স্টোর্স**, প্রযত্নে অনন্তকুমার দাস
  পোঃ চাম্পাহাটী, চাম্পাহাটী বাজার
  পিন : ৭৪৩ ৩৩০, ফোন : ৯১১৮-৬০৪৫০
- **শঙ্করচন্দ্র মণ্ডল**, প্রযত্নে কৃষ্ণগোপাল নস্কর
  গ্রাম : বিবেকানন্দ পল্লী, পোঃ দক্ষিণ বারাসত, পিন : ৭৪৩ ৩৭২
- **শতদল সাধুখাঁ**
  প্রযত্নে 'গৃহশ্রী', হরিধন চক্রবর্তী সরণি, সোনারপুর
- **বিভূতিভূষণ ঘরামি**, **প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ কৌতলা, পিন : ৭৪৩ ৬০৩, ফোন : ৯১৭৪-৭৪৩১৫
- **কাশীনগর বিবেকানন্দ যুব কেন্দ্র**
  গ্রাম+পোঃ কাশীনগর, পিন : ৭৪৩ ৩৪৯
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
  ১০ মাইল বাজার, পোঃ মহারাজগঞ্জ
  থানা : নামখানা, পিন : ৭৪৩ ৩৫৭
- **ডাঃ হরেকৃষ্ণ সিংহ**, **প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ** চেতনা
  ২৩৩ জেমস লং সরণি, জোকা
  পিন : ৭৪৩ ৫১২, ফোন : ৪৬৭-১১৫২
- **রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম**
  গ্রাম+পোঃ বিবেকানন্দপুর, পিন : ৭৪৩ ৩৫২

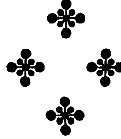
হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্মজন্মান্তরের পাপও তাঁর একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ



যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবত্তত্ত্বের আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী



বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
Phone : 554-2248, 554-2403
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com
udbodhan@vsnl.net

Vol. 104
No. 4
APRIL
2002

Licensed to Post
Without Prepayment
Licence No.
TECH/WB/RNP-15/LPWP-01/2002

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Regn. No.
TECH/WB/RNP-15/2002

উদ্বোধন

১০৪তম বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত



প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

✤ গত ১লা মাঘ ১৪০৮ (১৫ জানুয়ারি ২০০২) **উদ্বোধন ১০৪তম বর্ষে** পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় **নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব** নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের **১০৩ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম** ✤

✡ **বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত** মাসিক পত্রিকা **উদ্বোধন** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে স্বামী **বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের** একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **উদ্বোধন** আপনাকে পড়তে হবে।

✡ স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে **উদ্বোধন** নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই **উদ্বোধন** একটি সার্থক **পারিবারিক পত্রিকা**। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা **উদ্বোধন**-এ প্রকাশিত হয়।

✡ **উদ্বোধন** অসাম্প্রদায়িক। **উদ্বোধন-এর** গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার **গ্রাহক** হওয়া নয়, একটি **মহান ভাবাদর্শ** ও **ভাবান্দোলনের** সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

✡ উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।

✡ স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন যেন থাকে। উদ্বোধন-এর প্রত্যেক গ্রাহক একজন করে নূতন গ্রাহক করলেই এখনি উদ্বোধন এর গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার হয়ে যায়। তাই আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের গ্রাহক করাও আপনার কাছে স্বামীজীর প্রত্যাশা। স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের গর্বিত দায়িত্ব আমাদের সকলের।

✡ উদ্বোধন-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে মতিলাল তরুবালা পালের স্মৃতিতে তাঁদের পুত্রকন্যাদের পক্ষে স্থায়ী ভিত্তিতে 'উদ্বোধন মেধা সম্মান' (একবছরের জন্য উদ্বোধন-এর সাম্মানিক গ্রাহকভুক্তি) নিবেদিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জন প্রতি বছর এই সম্মানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। ২০০২ সালের জন্য অনুরূপ সম্মান সুকুমার-বিভাবানী পাড়ুই এর স্মৃতিতে তাঁদের পুত্র সমর পাড়ুই নিবেদন করেছেন। এই সম্মানপ্রাপকদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পর্ষদ পরিচালিত ২০০২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ১০ জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উভয় 'সম্মান'-এর জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বোধন-সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

✡ উদ্বোধন-এর সেবায় পাঁচটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি 'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল', অন্য চারটি যথাক্রমে 'স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ স্মৃতি তহবিল', 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল', 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল' এবং 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মৃতি তহবিল'। উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে '**Ramakrishna Math, Baghbazar**'—এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা : সম্পাদক/**Editor**, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। দাতার চিঠিতে বা M.O. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন।

স্বামী সর্বগানন্দ
সম্পাদক

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫্ টাকা। সডাক ৯৫্ টাকা। প্রতি সংখ্যা পৃথকভাবে ১০্ টাকা।

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ
সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ



জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ ৫ম সংখ্যা

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন

॥ ১০৪ ॥



"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ



শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম

লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০ ✦ ফোন ঃ ৩৯৩৯৭৫

আবেদন

স্বামী বিবেকানন্দ পবিত্র এই শিবভূমি বারাণসীক্ষেত্রে বেদান্তের প্রচার ও প্রসারের জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপন করার মানসে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য, স্বীয় গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দ মহারাজজীকে বারাণসীতে প্রেরণ করেন।

স্বামী শিবানন্দজী '**শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত** আশ্রম' নামে কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করেন একটি ভাড়াবাড়িতে। আনুষ্ঠানিকভাবে আশ্রমের উদ্ঘাটন হয় ৪ জুলাই ১৯০২। দিনটি বিশেষ স্মরণীয় এই কারণেও যে, এই দিনেই বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দ মহাসমাধিতে লীন হয়েছিলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, **বারাণসীর শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম মূলকেন্দ্র বেলুড় মঠেরই একটি শাখা।**

জগজ্জননী শ্রীমা সারদাদেবীর পাদস্পর্শে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্যদের আগমনে ও বসবাসে পবিত্রীকৃত এই আশ্রম ভক্তদের কাছে এক পুণ্য তীর্থক্ষেত্র ও উচ্চতর জীবনমূল্যবোধে আগ্রহীদের কাছে প্রেরণাস্বরূপ।

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন, আশ্রম তার সার্থক অস্তিত্বের শতবর্ষ পূর্ণ করছে আগামী ৪ জুলাই ২০০২। এই ঐতিহাসিক সময়টিকে স্মরণীয় করার জন্য আমরা বর্ষব্যাপী ভাবসমৃদ্ধ বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে মনস্থ করেছি। যেমন, বারাণসীর বিভিন্ন বৈদিক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সম্মেলন, সাধুভাণ্ডারা, ভক্তসম্মেলন, সাধারণ সভা, প্রখ্যাত শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক সঙ্গীতানুষ্ঠান, ছাত্র-যুব সম্মেলন ইত্যাদি। আশ্রমের শতবর্ষের ইতিহাস-সম্বলিত একটি পুস্তিকা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

আশ্রম ভবন, যেখানে বৃদ্ধ ও অবসরপ্রাপ্ত সন্ন্যাসীরা বসবাস করেন, তা একশো বছরেরও অধিক প্রাচীন। আজ ভবনের সংস্কারসাধন বা পুনর্নির্মাণের নিতান্ত প্রয়োজন।

শতবর্ষপূর্তি উৎসব উদ্যাপন, আশ্রম ভবনের সংস্কারসাধন এবং বৃদ্ধ ও অবসরপ্রাপ্ত সাধু, যাঁরা জীবনের সুদীর্ঘ সময় এই সংস্থার সেবায় উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের সেবার জন্য একটি স্থায়ী আমানত তৈরি করার পরিকল্পনাও আছে। তদনুযায়ী খরচপত্রের হিসাবটি নিম্নরূপ ঃ

১। শতবর্ষ উৎসব উদ্যাপনের জন্য	১০ লক্ষ টাকা
২। ভবন সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের জন্য	১৫ লক্ষ টাকা
৩। বৃদ্ধ ও অবসরপ্রাপ্ত সাধুদের সেবার জন্য স্থায়ী আমানত প্রকল্পে	১০ লক্ষ টাকা
মোট	**৩৫ লক্ষ টাকা**

আমরা আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছি ভক্ত, শুভাকাঙ্ক্ষী, সুহৃদ ও ভাবানুরাগীবৃন্দের কাছে—এই মহৎ পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলুন আপনাদের সহযোগিতা ও দানের দ্বারা।

অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক বা ড্রাফ্‌ট্‌ '**রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, বারাণসী**'—এই নামে হবে। **এই দান আয়কর বিভাগের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত।**

বিনীত

স্বামী জ্ঞানঘনানন্দ

অধ্যক্ষ



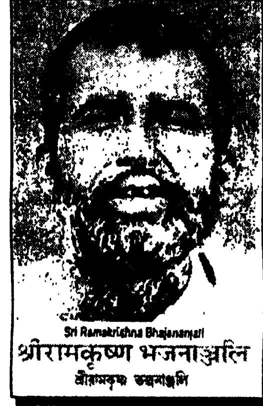
রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ

পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া-৭১১ ২০২ ● ফোন : ৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২ ● বৈদ্যুতিন ডাক : rmsppp@vsnl.com

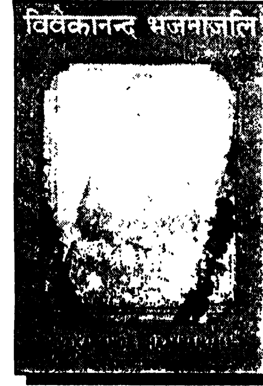
সারদাপীঠ থেকে প্রকাশিত অডিও ক্যাসেটসমূহ

মূল্য ❑ SP-1 ও SP-31–34 : ৩৫ টাকা, অন্যান্য : ৩০ টাকা

SP-1	শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্
SP2, SP-7, SP-8, SP-10–12	কথামৃতের গান (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড)
SP-3	শ্রীরামনামসংকীর্তন
SP-4	বক্তৃতা—যুগপুরুষ (স্বামী ভূতেশানন্দজী)
SP-5	শ্রীশ্রীচণ্ডীস্তব (আবৃত্তি : স্বামী সর্বগানন্দ)
SP-6	শিবমহিমা
SP-9	শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা
SP-13	শ্রীসারদাবন্দনা
SP-20	বিবেকানন্দবন্দনা
SP-24	শ্রীকৃষ্ণবন্দনা
SP-14–16	কালীকীর্তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)
SP-17	বীরবাণী
SP-18	গীতিবন্দনা
SP-19	বক্তৃতা—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান (স্বামী ভূতেশানন্দজী)
SP-21–22	সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড)
SP-23	ওঠো জাগো
SP-25	শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি
SP-26	বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি
SP-27	বেদমন্ত্র (আবৃত্তি : স্বামী সর্বগানন্দ)
SP-28	সরস্বতী বন্দনা
SP-29	**Ramakrishna Movement (Swami Bhuteshanandaji)**
SP-30	**Religion in Practice (do)**
SP-31–34	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (আবৃত্তি : স্বামী সর্বগানন্দ) (১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড)
SP-35	আগমনী
SP-36	ভজন সুধা



পরিবেশনা : রুদ্র রায় ও স্বামী সর্বগানন্দ



পরিবেশনা : সুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী সর্বগানন্দ

অডিও সি. ডি. / মূল্য প্রতিটি ১৫০ টাকা

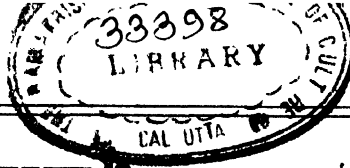
Cd/SP-1	শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্	(সান্ধ্য আরাত্রিক ভজন, গুরুবন্দনা, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দ স্তোত্র, রামকৃষ্ণ শরণম্)
Cd/SP-3	শ্রীরামনামসঙ্কীর্তন	রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রে একাদশী প্রভৃতি দিনে গাওয়া হয় (সংস্কৃত ও হিন্দি)
Cd/SP-31–34	শ্রীমদ্ভগদ্গীতা (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ)	(সংস্কৃত) (সুরে আবৃত্তি ১ম—১৮শ অধ্যায়)

স্বামী সর্বগানন্দ, স্বামী নরেন্দ্রানন্দ, স্বামী দিব্যব্রতানন্দ, শ্রীমহেশরঞ্জন সোম, শ্রীঅনুপ জালোটা ও অন্যান্য শিল্পিগণ প্রচলিত ও নতুন সুরে গেয়েছেন।

প্রাপ্তিস্থান : বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি (কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক)

ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে M.O. অথবা Bank draft মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে।

Video Cassette : Centenary Celebration of the Ramakrishna Mission at Belur Math in 1998. 80 minutes available. Rs. 250.00



স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র
১০৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

উদ্বোধন ।।১০৪।।

সূচীপত্র | ১০৪তম বর্ষ | ৫ম সংখ্যা | জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ | মে ২০০২

প্রচ্ছদ : গোমুখের চিত্র। হিমালয়ের হিমশৈলাবৃত গহ্বর থেকে গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, অবিরাম, উদ্দাম, অক্লান্ত গতিতে। এ যেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবগঙ্গা' বিবেকানন্দ-রূপ গোমুখের মধ্য দিয়ে জগৎকল্যাণার্থে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান। শিবচক্ষুটিও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। *আলোকচিত্র : ডাঃ তমোনাশ ভট্টাচার্য।*

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ



সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ : ৭৫ টাকা; সডাক : ৯৫ টাকা ❑ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য : ১০ টাকা

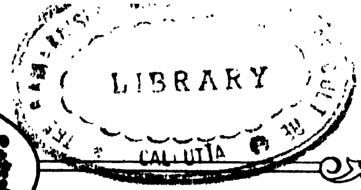


'উদ্বোধন' : পূজা সংখ্যা (আশ্বিন ১৪০৯)

একটি জরুরী বিজ্ঞপ্তি

- যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও **'উদ্বোধন'**-এর আশ্বিন ১৪০৯/সেপ্টেম্বর ২০০২ (শারদীয়া) সংখ্যা প্রকাশিত হবে। **মূল্য : ৫০ টাকা।**
- **'উদ্বোধন'**-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা **মূল্য দিতে হবে না।** গ্রাহকরা ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে অগ্রিম টাকা জমা দিলে **অতিরিক্ত** প্রতি কপি ৩০ টাকায় পাবেন। অতিরিক্ত কপি রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিলে পাঠানোর খরচ বাবদ **অতিরিক্ত** ২২ টাকা (প্রতি কপির ডাকমাশুল) জমা দিতে হবে। কপিটি অগ্রিম জমার ক্যাশমেমো দেখিয়ে **২৭ সেপ্টেম্বর ২০০২ থেকে ১০ অক্টোবর ২০০২ পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে (By Hand)** কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করবেন।
- **শারদীয়া সংখ্যাটির ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সাধারণ ডাকে আমরা পাঠাতে চাই না।**
- ডাকযোগে (By Post) যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) নিলে ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে **কার্যালয়ে অবশ্যই জানাবেন।** কোন সংবাদ **টেলিফোনে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।** ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে **লিখিতভাবে** কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে তাঁদের পত্রিকা সাধারণ ডাকযোগেই (By Post) যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
- যাঁরা ডাকযোগে (By Post) পত্রিকা নেন, তাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি রেজিস্ট্রি ডাকে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রতি কপির জন্য **অতিরিক্ত ২২ টাকা** পাঠাতে হবে। তবে ঐ সংক্রান্ত সংবাদ এবং ২২ টাকা গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে অবশ্যই কার্যালয়ে এসে পৌঁছানো প্রয়োজন।
- আমাদের গ্রাহকভুক্তিকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে যাঁরা সডাক গ্রাহক হয়েছেন/নবীকরণ করেছেন, তাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি ঐ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সংগ্রহ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকভুক্তিকেন্দ্রগুলিতে ১৬ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে সেই সংবাদ জানাতে হবে, যাতে আমাদের কাছে ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে তারা সংবাদটি দিতে পারে।
  - মনে রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ করার সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় **গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক। উল্লেখ না থাকলে অথবা কোন একটিমাত্র উল্লেখ করলে সংবাদটি গ্রাহ্য হবে না।**
  - প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্ত্বেও অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে জানান এবং তাঁদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। আমরা বিশেষভাবে জানাই, **নির্ধারিত তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না।** আশা করি, গ্রাহকদের সহৃদয় সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।
  - **কিছু অসৎ ব্যক্তি** কোন কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের শারদীয়া সংখ্যা সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা যাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ করবেন [২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর ২০০২-এর মধ্যে], তাঁদের বিশেষভাবে জানানো হচ্ছে যে, **শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় তাঁদের নবীকরণ/ গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/M.O. প্রাপ্তি-কুপন/আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।**
  - **যদি ক্যাশমেমো/রসিদ/M.O. প্রাপ্তি-কুপন হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ২০ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে সেই মর্মে সম্পাদকের কাছে তা ডুপ্লিকেট-সহ লিখিতভাবে জানিয়ে সংগ্রহের অনুমতি নিতে হবে। নতুবা আমাদের পক্ষে তাঁদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না।** আশা করি, গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে এব্যাপারে আমাদের **সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।**
  - **১০ অক্টোবরের পরে নিলে পূজাসংখ্যা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না।**
- **কাজের দিন : (সোম-শুক্র) সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ পর্যন্ত এবং শনিবার বেলা ১-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা, রবিবার বন্ধ থাকে।**
- **১২ অক্টোবর থেকে ২১ অক্টোবর ২০০২ পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে। পূজাবকাশের পর ২২ অক্টোবর ২০০২ মঙ্গলবার কার্যালয় খুলবে।**

উদ্বোধন ॥১০৪॥
জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯
মে ২০০২



দিব্য বাণী

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি। (ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪৬)

সত্য এক। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সেই এক সত্যকে বিভিন্নভাবে দর্শন করে সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ ও যুগাচার্যগণ এক সত্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করিয়া থাকেন। বর্ণনার বিভিন্নতা কিংবা ব্যাখ্যার বিভিন্নতা কখনই 'এক সত্য'-কে একাধিক করে না, বরং সত্যের অসীমত্ব, অনন্তত্ব, অতলত্বই প্রমাণ করিয়া থাকে।

* * * * *

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্।।
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।। (গীতা, ৫।৪, ৫)

শ্রীভগবান গীতামুখে বলিলেন ঃ সাংখ্য (জ্ঞানমার্গ) এবং যোগ (কর্মমার্গ) একই লক্ষ্যে মানুষকে লইয়া যায়। যাহারা ইহাদের পৃথক মনে করেন, তাহারা বালকমাত্র। পণ্ডিতগণ প্রাণে প্রাণে জানেন, এই দুই মার্গ—উভয়েই এক পরম সত্যে উপনীত হইবার দুই ভিন্ন পথমাত্র।

* * * * *

যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্যবীর্যতরঙ্গে আমাদের বহু কালার্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়, ভয় হয়; পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট' হইয়া যাই।

এইজন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্যকিরণ। যাহা দুর্বল, দোষযুক্ত তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবাণ, বলপ্রদ তাহা অবিনশ্বর—তাহার নাশ কে করে?—স্বামী বিবেকানন্দ ('উদ্বোধন', প্রস্তাবনা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা)



বিবেকানন্দের উত্তরাধিকার

অথবা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উত্তরাধিকার। যাহাই ভাবি না কেন, এই প্রসঙ্গে কিছু আত্মসমালোচনামূলক বিশ্লেষণ এবং কিছু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করিবার সময় আসিয়াছে। দিকে দিকে যেন অশান্তির রণদামামা বাজিতেছে, সাধারণ মানুষের হৃদয় প্রকম্পিত হইতেছে। সম্মুখের আলো কি ক্রমশ নিভিয়া আসিতেছে? যে বাতাবরণে সমাজের আনাচে-কানাচে হিংসা, দুর্বৃত্তায়ন, অশান্তির আগুন ক্রমশ উদ্দীপিত হইতেছে, তাহাতে আমাদের চক্ষু অন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে—আমরা কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। ঈশ্বর, আত্মা, সত্য, প্রেম—সবই যেন কেমন ঝাপসা হইয়া যাইতেছে। সাম্প্রতিক সামাজিক অস্থিরতার কারণেই কি এই তমসার গাঢ় অন্ধকার ঘনাইতেছে, না কি আমাদের দৃষ্টিশক্তির স্বচ্ছতা আমরা ক্রমশ হারাইতেছি? আমাদের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হয় নাই। যে চক্ষু উন্মীলনে সমর্থ সে দেখিতেছে, ঐ দূরে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্বামীজী প্রসন্ন কিন্তু আরক্তিম নয়নে আমাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, বেদনায় জর্জরিত হইয়া কি যেন বলিতে চাহিতেছেন। কিন্তু সেই স্বর আমাদের নিকট পৌঁছাইতেছে না। আমরা নিজেকে তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া জানি না অথবা ভাবিতে চাহি না। কারণ ঐরূপ ভাবিলে কষ্ট হইবে, কষ্ট পাইতে হইবে। অথচ পৃথিবীর ইতিহাস এই উত্তরাধিকার-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাঁহার গ্রন্থে (Ideas and Opinion) লিখিয়াছেন: "A hundred times a day I remined myself that my inner and outer life depends upon the labours of other men, living or dead, that I must enert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving." অর্থাৎ দিনের মধ্যে শতবার আমি নিজেকে স্মরণ করাইতে চাহি, আমার অন্তর্জীবন এবং বহির্জীবন মৃত বা জীবিত অসংখ্য মানুষের ত্যাগের উপর নির্ভর করিতেছে এবং আমারও উচিত তীব্র উদ্যমের সহিত একইভাবে তাঁহাদের ঋণ শোধ করা।

ইহা তাঁহার উত্তরাধিকারবোধ এবং দায়বদ্ধতাবোধের পরিপূর্ণ অনুপম আত্মপ্রকাশ। যেদিক হইতেই দেখা হউক না কেন, বুঝিতে পারি আমাদের সমাজ এই উত্তরাধিকার সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অবশ্য সাংবিধানিক উত্তরাধিকারের কথা বলিতেছি না। উত্তরপুরুষের অধিকারই উত্তরাধিকার। পূর্বে যাহার বা যাহাদের অধিকার ছিল তাহারা এখন নাই। এখন পরবর্তী প্রজন্ম আসিয়া প্রাক্তনদিগের স্থান দখল করিয়াছে। কিন্তু "সেই tradition সমানে চলেছে।" একই দীপশিখা জ্বলিতেছে যুগ যুগ ধরিয়া। একই সংস্কৃতি, একই ধর্ম, একই আবেগমথিত উত্তরাধিকার প্রজন্মের পর প্রজন্ম ভোগ করিয়া আসিতেছে এই চিরন্তন ভারতবর্ষে। প্রশ্ন হইতে পারে, যুগ যুগ ধরিয়া যদি সেই একই বৈদিক উত্তরাধিকার আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি, তাহা হইলে 'বৈদিক উত্তরাধিকার' না বলিয়া 'বিবেকানন্দের উত্তরাধিকার' বলিবার প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? তাহার কারণ খুবই স্বচ্ছ। দৈনন্দিন সামাজিক জীবনে প্রায়শই দেখা যায়, উত্তরাধিকারী নিজে উত্তরাধিকার সম্পর্কে সচেতন নহে। কেউ আসিয়া মনে করাইয়া দিলে তাহার মনে পড়ে অথবা অজ্ঞাত তথ্য জানিতে পারিয়া অবাক বিস্ময়ে সে ভাবিতে থাকে, 'তাই তো! আমি এই এত কিছুর মালিক!' যে তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল, সে তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী। কখনো কখনো এমনও ঘটে, স্মারক কেবল স্মরণ করাইয়াই নিবৃত্ত রহিলেন না, কেমন করিয়া সেই সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইবে তাহাও সবিশেষ বলিয়া দিলেন। হাজার হাজার বৎসরব্যাপী যে-ধর্ম, যে-সংস্কৃতি ভারতবর্ষের বুকে পুঞ্জীভূত হইয়া রক্ষিত আছে, তাহার কথা দেশবাসী বিস্মৃত হইয়াছিল। বিবেকানন্দ সেই কথা স্মরণ করাইবার জন্যই নিজ জীবন উৎসর্গ করিলেন। এই যুগের উপযুক্ত আঙ্গিকে, উপযোগী ভাষায় সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতিকে নূতনভাবে উপস্থাপিত করিলেন বলিয়াই ইহাকে 'বিবেকানন্দের উত্তরাধিকার' বলিলে ভুল হইবে না। গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিয়াছিলেন: "স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ।" অর্থাৎ মহৎ যোগবিদ্যা কালের করাল চুম্বনে ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। বস্তুত, 'কালঃ জগদ্ভক্ষকঃ'—মহাকাল সবকিছু খাইয়া ফেলে। স্বাভাবিক কারণেই পাঁচহাজার বৎসরের প্রাচীন শাস্ত্রবাণী এই যুগে মানুষের বোধগম্য কিংবা গ্রাহ্য বা

প্রযোজ্য নাও হইতে পারে। তাই এমন একজন প্রবক্তার প্রয়োজন হইয়াছিল যিনি শাশ্বত তত্ত্বসমূহকে যুগোপযোগী করিয়া জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে পারেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাবের তাৎপর্য এইখানে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন ঃ "ভারতবর্ষকে জানিতে চাহিলে বিবেকানন্দ পড়।"

সাধারণ অর্থে 'উত্তরাধিকার' বলিতে যাহা বুঝায় তাহা অত্যন্ত স্থূলবস্তু সম্পর্কিত। কোন দেশ বা জাতির রাষ্ট্রীয় সংবিধানে উল্লিখিত 'উত্তরাধিকার'-এর অর্থ জমি-জমা, বাস্তু, টাকা-পয়সা, ব্যবসা অথবা পদাধিকার (post) সম্পর্কিত 'real property'-র উত্তরাধিকার। আমাদের দৃষ্টি আরো প্রসারিত করিলে আমরা ক্রমশ স্থূলজগতের অন্তরালে যে মহান সূক্ষ্মজগৎ বর্তমান, সেই রাজ্যে প্রবেশ করিব। সেই সূক্ষ্মজগতের উত্তরাধিকার-ই প্রকৃত উত্তরাধিকার। সেই উত্তরাধিকার সাংস্কৃতিক কিংবা মানসিক বা বৌদ্ধিক, অথবা বলা যায় সামগ্রিকভাবে মানুষের **আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার**। স্বামীজীর মতে, ভারতবর্ষের অস্তিত্ব অনেকাংশেই নির্ভর করিতেছে এই আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের উপর। সকল বস্তুকে হিন্দুশাস্ত্র তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। · আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক। অর্থাৎ বিশ্বচরাচরে যেকোন বস্তুর এই তিনটি চরিত্র সদা বিদ্যমান—ব্যষ্টিগতভাবেই হউক, কি সমষ্টিগতভাবেই হউক। যেমন ভারতবর্ষের 'উত্তরাধিকার'-এ নিশ্চয়ই ইহার ভৌগোলিক অবস্থান এবং তাহার প্রভাব বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। ইহাই ভারতবর্ষের **আধিদৈবিক উত্তরাধিকার**। ভারতবর্ষের বিচিত্র ভাষা-জাতি-বর্ণময় রঙিন ফুলের সাজির যে ধারাবাহিকতা, তাহাকে এই দেশের **আধিভৌতিক উত্তরাধিকার** বলিতে পারি। কিন্তু স্বামীজী বারংবার স্মরণ করাইয়া দিলেন—ভারতবর্ষের অস্তিত্ব যাহার উপর নির্ভরশীল তাহা তাহার আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার। অতএব 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উত্তরাধিকার' বলিতে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারকেই বুঝাইতেছে। আধ্যাত্মিকতাই এদেশের প্রাণভ্রমর। এই প্রাণভ্রমরকে টিপিয়া হত্যা করিলে জাতির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ধর্মের কাজ হইল এই আধ্যাত্মিকতাকে রক্ষা করা। যে-ধর্ম কেবলমাত্র আচার-অনুষ্ঠান লইয়া ব্যস্ত, তাহাকে স্বামীজী ধর্ম বলিতে রাজি নহেন। এবং সেই সেই ধর্মাবলম্বীগণকেও যথার্থ 'ধার্মিক' বলিয়া অভিহিত করা যায় না। অবশ্য কতিপয় বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ইহাকেই যথার্থ ধর্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। যাঁহারা জীবনে কখনো 'ধর্ম' আচরণ করিলেন না, তাঁহাদের হস্তেই যখন 'ধর্মরক্ষা' ও ধর্মের ব্যাখ্যার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়, তখন বুঝিতে হইবে দেশে দুর্দিন শুরু হইয়াছে, ইহাকে রোধ করা শক্ত। সাধারণ দরিদ্র, অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, শোষিত মানুষ 'ধর্ম কী' তাহা না বুঝিয়া উহার অপব্যাখ্যার দ্বারাই প্রভাবিত হইয়া থাকে মূলত নিজেদের দুর্বলতার কারণেই। ইহা তাহাদের দোষ নহে। বরং দোষ সেই শিক্ষিত সমাজের, যাহারা 'ইতো-নষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হইয়া নিজেদের পিতৃপুরুষকে 'পাগল' বলিয়া থাকে। ইহাদের কথা চিন্তা করিয়াই স্বামীজী গভীর ক্ষোভের সহিত বলিয়াছিলেন ঃ "Bring light to the uneducated, bring more light to the educated." অর্থাৎ, যাহারা অশিক্ষিত তাহাদের আলো দেখাও, যাহারা শিক্ষিত তাহাদের আরো বেশি আলোর প্রয়োজন।

যথাযথ বিশ্লেষণ করিয়া 'উত্তরাধিকার' শব্দটি উচ্চারণ করিতে গেলে স্বতই কয়েকটি প্রশ্ন মনে আসে। প্রথমত, কিসের উত্তরাধিকার? দ্বিতীয়ত, পূর্বাধিকারী কে? তৃতীয়ত, উত্তরাধিকারীই বা কে? এবং এই 'উত্তরাধিকার' পূর্বপুরুষ হইতে উত্তরপুরুষে কিভাবে অনুবর্তিত হইবে। পূর্বেই আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের কথা বলা হইয়াছে। বস্তুত, এই তিনটি অবিচ্ছেদ্যভাবেই যুক্ত। পূর্বকথার সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি করিব। প্রথমেই ধরা যায় আধিভৌতিক উত্তরাধিকারের কথা। আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষে অসংখ্য ভাষা, অসংখ্য জাতের মানুষ, অসংখ্য রীতিনীতি, অসংখ্য বৈচিত্র। ভারতবর্ষের বিচিত্র পশুসম্পদ! ভারতবর্ষের অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর্ষণে সারা পৃথিবী হইতে আগত অসংখ্য পর্যটকের ভারত-পরিভ্রমণ, মায় আইনের তোয়াক্কা না করিয়া প্রতিবেশী দেশের মানুষের সহিত অবাধ মিশ্রণ—এই সবই সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের আধিভৌতিক রূপ। ইহা ভূতবর্গ সম্পর্কিত, তাই আধিভৌতিক। এরপর ভারতবর্ষের আধিদৈবিক রূপ। সে অপূর্ব রূপের কি তুলনা আছে?

"তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী শ্যামধরণী সরসা।।
ঊর্ধ্বে চাহ অগণিত মণি-রঞ্জিত নভো নীলাঞ্চলা,
সৌম্য মধুর দিব্যাঙ্গনা শান্তকুশল দরশা।।
দূরে হের চন্দ্রকিরণ উদ্ভাসিত গঙ্গা,
নৃত্য পুলক গীতিমুখর কলুষ হর তরঙ্গা।...
ওই হের স্নিগ্ধ সবিতা উদিছে পূরব গগনে,
কান্তোজ্জ্বল কিরণ বিতরি ডাকিছে সুপ্তি মগনে।।"

আমাদের দেশমাতৃকার ভাগ্যবিধাতা জনগণমন-অধিনায়কের ইহাই দিব্যরূপ। ইহা দেবতা সম্পর্কিত, তাই আধিদৈবিক এই রূপ। উত্তরে তুষারকিরীটধারী নগাধিরাজ হিমালয়, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর। স্বর্গ হইতে যেন সুরধুনী বিচিত্র রাগে গঙ্গা, যমুনা, কাবেরী, গোদাবরী-রূপে দেশমাতৃকার অঙ্গে অঙ্গে স্রোতবতী হইয়া তাহাকে আরো লাবণ্যময়ী করিয়া তুলিতেছে। একদিকে বিশাল অরণ্যরাজি যেন অপর প্রান্তের দিগন্তপ্রসারিত মরুভূমিকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছে—'আহা তোমার ঐ ধূসর রূপ যদি আমি পেতাম, গুর্জরী টৌরীর মূর্চ্ছনায় সীমাকে অতিক্রম করে চলে যেতাম প্রিয়তমের অনন্ত অঞ্চলছায়ে'। অবশ্য এই সুন্দর প্রকৃতি যে সর্বদাই দেশবাসীর জীবনধারণের অনুকূল তাহাও নহে। কোথাও লক্ষ লক্ষ মানুষ সহসা গৃহহারা হইয়া স্বজনবিয়োগের ব্যথায় ক্রন্দনাকুল, আবার কোথাও অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষকে যেন ধ্যানমগ্ন করিয়া তুলিতে প্রয়াসী। এই প্রাকৃতিক সম্পদ, ভূসম্পদ, জলসম্পদ, বনজসম্পদ আমাদের দেশমাতৃকার 'আধিদৈবিক রূপ'।

ইহার পর আমাদের বিবেচ্য ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক রূপ। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ধর্ম, ভারতবাসীর বিচিত্র মানসিক গঠন, তাহার অন্তরে পুঞ্জীভূত ধর্মভিত্তিক জাতীয় সংহতি, তাহার পরধর্মসহিষ্ণুতা, তাহার মহান উদারতা ও প্রেম, তাহার পাঁচহাজার বৎসরের প্রাচীন সভ্যতার মহান ঐতিহ্যের অনুপম ধারাবাহিকতা ইত্যাদি সবই ভারতবর্ষের 'আধ্যাত্মিক রূপ'-এর অন্তর্গত। এবং এই আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের প্রতিফলনের তারতম্য অনুসারে আমরা স্থূলজগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহার অনুবর্তন করিয়া থাকি। অর্থাৎ এই আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারেরই বিভিন্ন প্রকাশ ঘটিয়া থাকে, যেমন— সামাজিক উত্তরাধিকার, পারিবারিক উত্তরাধিকার, সম্প্রদায়গত উত্তরাধিকার, বিদ্যাগত উত্তরাধিকার, জাতিগত উত্তরাধিকার। আরো অগ্রসর হইলে পাইব— বিবেকানন্দের উত্তরাধিকার, যাহার মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে সেবার উত্তরাধিকার, আত্মত্যাগের উত্তরাধিকার, দরিদ্রের দুঃখমোচনের উত্তরাধিকার, আনুগত্যের উত্তরাধিকার, সাধনভজনপ্রিয়তার উত্তরাধিকার, সত্যনিষ্ঠার উত্তরাধিকার কিংবা গুরুভক্তির উত্তরাধিকার! প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে সকল বিপ্লবী কিংবা স্বাধীনতা সংগ্রামী মানুষ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন বিবেকানন্দ-প্রদত্ত দেশপ্রেমের উত্তরাধিকার এবং আত্মত্যাগের উত্তরাধিকার। আরো ভাবা যাইতে পারে। যথা, আত্মসচেতনতার উত্তরাধিকার, আত্মবিকাশের উত্তরাধিকার, প্রকৃত শিক্ষার উত্তরাধিকার, প্রেমের উত্তরাধিকার, পবিত্রতার উত্তরাধিকার, কিংবা মাতৃত্বের উত্তরাধিকার! এতসব বুঝিয়া, দেখিয়া কেহ যদি প্রশ্ন করেন ঃ "আচ্ছা ভোগের উত্তরাধিকার কি নাই?" তাহার উত্তরে বলিব, ভোগের উত্তরাধিকারও রহিয়াছে, অবশ্য যথার্থ ভোগ কাহাকে বলে সম্যক্ বুঝিলেই এই ভোগের উত্তরাধিকার উত্তরপ্রজন্মে অনুবর্তিত হইতে পারে, নতুবা নহে।

ত্যাগভূমি ভারতবর্ষে ভোগের মন্ত্র ঋষির কণ্ঠে উচ্চারিত হইল—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'। ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। স্বামীজী বারংবার বলিয়াছেন, ত্যাগের দ্বারাই যথার্থ ভোগ সম্ভব এবং উহাই আমাদের সমাজের ভিত্তিস্বরূপ। কিছুই না বুঝিয়া পশুর ন্যায় ভোগ করিবার উপদেশ সনাতন শাস্ত্র কখনো দেন নাই। মানুষের অন্তর্নিহিত ভোগলিপ্সাকে সংহত করিয়া স্বীয় কর্তব্য সুসম্পাদনের মাধ্যমে সমগ্র সমাজটিকে 'ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ'রূপ চার পুরুষার্থ সাধনের একটি অনুপম যন্ত্রে পরিণত করিবার যে প্রয়াস বা মন্ত্র পরম্পরাক্রমে আমরা পাইয়াছি, তাহাই আমাদের জাতীয় উত্তরাধিকার। ভোগবাদী দেশ আমেরিকা, ইউরোপ অথবা ভারতেতর অন্যান্য দেশের 'আকর্ষণীয় বাজার' আজ আমাদের দুয়ারে উপস্থিত হইয়াছে। আমার প্রশ্ন, ভারতবর্ষের মানুষ কি 'ভোগ' করে নাই? হয়তো আমেরিকা-ইউরোপে এখন বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির সাহায্যে 'ভোগ' অন্য মাত্রা পাইয়াছে। কিন্তু ভগবান মানুষকে যে-পরিমাণ ভোগক্ষমতা দিয়াছেন, পাশ্চাত্য মানুষ তাহা লঙ্ঘন করিবে কিরূপে? মুষ্টিমেয় হইলেও ভারতবর্ষের কিছু মানুষ ঐ ভোগের চরম সীমা পর্যন্ত যাইয়া অবশেষে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।।" (মনুসংহিতা, ২।৯৪)

—কামনার পরিপূর্তির দ্বারা কামনাকে প্রশমিত করা যায় না; অগ্নিকে কি কখনো ঘৃতাহুতির দ্বারা নির্বাপিত করা সম্ভব? অর্থাৎ 'ত্যাগের মধ্যে ভোগের উৎসব'—ইহাই ভারতের 'আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার'। পাশ্চাত্য আদর্শকে নিজেদের আদর্শ বলিয়া ভাবিলে এই জাতির অবলুপ্তির পথ প্রশস্ততর হইবে। বরং পাশ্চাত্যের মানুষ ত্যাগের মন্ত্র শিখিবার জন্য, প্রশান্তি লাভ করিবার জন্য আজ ভারতবর্ষের দিকে তাকাইতেছে। [ক্রমশ]

সমসাময়িক গ্রন্থ ও স্মৃতিচারণে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে যেসকল তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ১৩৫৯ সালে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনর্মুদ্রিত করা হলো। আশা করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।—সম্পাদক

আচার্য্য কেশবচন্দ্র, মার্চ ১৮৭৫

পরমহংস রামকৃষ্ণ দিন দিন প্রগাঢ় প্রীতিবন্ধনে কেশবচন্দ্রের সহিত আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। কেশবচন্দ্রের গৃহে আগমন করিয়া তাঁহার সহিত রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ করা এবং কোন একটি উপলক্ষ্য হইলেই কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণ-সহ তাঁহার বসতিস্থলে গমন করা একপ্রকার নিত্যকৃত্য হইয়া পড়িয়াছে। কেশবচন্দ্রকে দেখিলে রামকৃষ্ণের ভাবপ্রধান চিত্ত একেবারে উথলিত হইয়া উঠিত। সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি আর সান্তুতে থাকিতে পারিতেন না, অনন্ত আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে এমনি অধিকার করিয়া ফেলিতেন যে, তিনি নিকটে আসিয়াই বিহ্বল হইতেন, কথাসমুদয় এলোমেলো এবং মূর্চ্ছিতাবস্থা উপস্থিত হইত। অনেকক্ষণ পরে সংবিৎ লাভ করিয়া এত কথা বলিতেন যে, আর কাহার প্রায় কথা বলিবার অবসর থাকিত না। ভাবের পর ভাবের সমাগম হইত, তাই অন্যের কথা বন্ধ করিয়া দিয়া আপনি কথা বলিতেন।... উৎসব হইয়া গিয়াছে, তাহার কয়েকদিন পর হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া রামকৃষ্ণ ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত। ব্রহ্মমন্দিরে কেহ উপস্থিত ছিলেন না, দ্বারবান দ্বারা মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াই মূর্ছা। যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি প্রবেশ করিয়াই মূর্ছিত হইলেন কেন? তিনি তাহার উত্তর দিলেন যে, প্রবেশমাত্র স্থানের পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য তাঁহার হৃদয়কে আসিয়া অধিকার করিল; আর যখন স্মরণ হইল, এখানে বসিয়া এত লোক পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, তখন তিনি আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। রামকৃষ্ণ ইহার পূর্বে আর কখনো ব্রহ্মমন্দির দর্শন করেন নাই।

(গ্রন্থলেখক—উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়)

কেশবচরিত, জানুয়ারি ১৮৮৫

উভয়ের [শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবের] যোগে ধর্মজগৎ অনেক বিষয়ে উপকৃত হইয়াছে। হিন্দুধর্মের শাখাপ্রশাখার মধ্যে যেসকল আধ্যাত্মিক মধুর ভাব আছে তাহা বিধানবিশ্বাসীদিগের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। যে ধর্ম একসময়ে নিতান্ত কঠোর নীরস ছিল, এইরূপে তাহা সরস ও অত্যন্ত সরল হইল। কোথায় বৈদান্তিক জ্ঞানবিচার, আর কোথায় মাতার সঙ্গে শিশুর কথোপকথন। আরাধনা প্রার্থনায় গ্রাম্যকথার চলন এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। *(গ্রন্থলেখক—'চিরঞ্জীব শর্মা' বা ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল)*

কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা

রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় একদিন আদি সমাজ দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনজন উপাসনা করিতেছিলেন। পরমহংস উপাসনার পর বলিলেন : "এই তিনজনের ভিতর একজনকে দেখে বুঝিতে পারিলাম ইঁহারই হইয়াছে।" তারপর তিনি কেশবের সঙ্গে ভাব করেন। তারপর থেকে আমাদের বাড়িতে আসিতেন, ঐ তেতলার ঘরে প্রথম আমি তাঁহাকে দেখি। কেশবের কাছে এসে তিনি কেশবের হাত ধরে নাচিতেন ও গান গাহিতেন। আর একদিন কমলকুটীরে মাঘোৎসবের সময় বরণের দিন সংকীর্তনের পর আমি বলিলাম : "আপনি কিছু খান।" তিনি খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন : "হাঁ, মা বলিয়া দিয়াছিলেন, কেশবের বাড়ি থেকে একখানি জিলিপি খেয়ে আসিস।" আমি একখানি জিলিপি দিলাম, তিনি হাত কাৎ করিয়া লইয়া খাইলেন (তিনি হাত সোজা করিতে পারিতেন না)। তারপর যখন চলিয়া যান, কেশবকে বলিলেন : "দেখ কেশব, আমি যখন আসি, মা বলিয়াছিলেন, 'কেশবের বাড়িতে যাইতেছ, একটি কুলপী বরফ খেয়ে এসো।' " তখন সেখানে কুলপীওয়ালা ছিল না, কেশব কুলপী কোথায় পান ভাবিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ একজন কুলপীওয়ালা আসিল; একটি কুলপী কেশব দিলেন, তিনি খুব আহ্লাদ করিয়া খাইলেন। সেই বরণের দিন সংকীর্তনের সময় কেশব ও পরমহংস অনেকক্ষণ হাত ধরাধরি করিয়া নাচিলেন। কীর্তন শেষ হইয়া গেলে তিনি আমায় বলিলেন : "দেখ মা, তোর যত নাড়িভুঁড়ি নিয়ে পৃথিবীর লোকে এর পরে নাচবে। তোর এই ভাণ্ড থেকে এই ছেলে বেরিয়েছে।"

তাঁহাকে আমার বড় ভাল লাগিত। আমি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যাইতাম। তিনি যে কত ভাল ভাল কথা বলিতেন, তাহা এখন আমার সব মনে নাই। একবার বলিয়াছিলেন : "দেখ মা, ভায়ে ভায়ে দড়ি ধরে মাপে আর বলে, এই দিকটা তোর আর ওই দিকটা আমার। কিন্তু কার জায়গা মাপছে আর কেই বা নেয়, সেটা কিছু ঠিক করে না।" আর একদিন দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আমি ও কেশব যাই, তিনি অনেক কথার পর আমায় বলিলেন : "দেখ, মা, আমি অনেক কষ্টে মাকে ধরেছি, কিন্তু কেশবের সঙ্গে মিশে সেটুকু যায়, বুঝি আমি শেষে এসে নিরাকারে পড়ি।" এই রকম যে কত কথা হইত তার শেষ নাই। কিন্তু এখন সব মনে আসিতেছে না।" *(গ্রন্থসম্পাদক—যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর)*

সঙ্কলন ❑ জলধিকুমার সরকার

সম্পাদনা ❑ স্বামী সর্বগানন্দ

অপ্রকাশিত পত্র

স্বামী অখণ্ডানন্দের দুখানি পত্র



।।১।।

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
মহুলা পোঃ (মুর্শিদাবাদ)
১৪।৬।(১৯)২৭

শ্রীমান বিনোদেশ্বরবাবু

সম্মিলনীর তিনটি প্রস্তাব সমন্বিত তোমার এক পত্র আমি কিছুদিন পূর্বে কলিকাতায় পাইয়াছিলাম। প্রস্তাব তিনটি উত্তম। ৺সমীপে [ঈশ্বর সমীপে] আমার এই প্রার্থনা যে উহা সাফল্যমণ্ডিত হউক।

আমি গত রবিবার রাত্রের গাড়ীতে এখানে নিরাপদে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আশ্রমের সংবাদ শুভ। আমিও বর্তমানে একপ্রকার ভালই আছি। আশাকরি তোমরা সকলেও ভাল আছ। শ্রীমান গোপাল আমাকে কলিকাতায় একখানা 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' দিয়াছিল। উহা কি তোমার কাছে পাঠাইবে?

তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীঅখণ্ডানন্দ

।।২।।

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

আশ্রম সারগাছি
২১।২।(১৯)৩৬





পরম শুভাশীর্বাদমস্তুঃ

পরে সমাচার এই যে, তোমার পত্র পাইয়া বিস্তারিত সমাচার অবগত হইয়াছি। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক [করুন] এবং তাঁহার কৃপায় তোমাদের সকল অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হোক। ইহাই আমার সতত প্রার্থনা জানিবে।

আমি আগামী রবিবার মঠে যাইব। অভয় ও আর কয়েকজন আমার সঙ্গে যাইবে। মঠ হইতে আবার খুব শীঘ্রই এখানে ফিরিয়া আসিব।

অভয়বাবাজী আসিবার পর হইতেই আবার সেবাশুশ্রূষার সুব্যবস্থা হইয়াছে। বর্তমানে আমার যেরূপ অবস্থা তাহাতে উহার মত সেবক না থাকিলে চলে না। আমার সেবা এখানে যাহারা করিত, তাহারা সেবার অর্থ বুঝে না।

গৌরী, শিবাণী ও তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীঅখণ্ডানন্দ



স্বামী সুবোধানন্দের দুখানি পত্র

শ্রীযুক্ত গুরুনাথ কাহালী পণ্ডিত মহাশয়কে লিখিত

৺শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জয়তি

বেলুড় মঠ
৫।৩।(১৯)৩৫

প্রিয় পণ্ডিতমহাশয়,

মহাপুরুষ মহারাজ আজকাল পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছেন। ডাক্তার তাঁহাকে নীচে নামিতে বারণ করিয়াছেন সুতরাং নীচে নামেন না। আপনারা তাঁহার শুভাশীর্বাদ জানিবেন, শ্রীমান-শ্রীমতীদের জানাইবেন।

আমি আজকাল ভাল আছি, কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধ নিত্য খাইতেছি আরও কিছুদিন খাইব ইচ্ছা আছে, যাহাতে সম্পূর্ণ অসুখ সারিয়া যায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। গঙ্গায় স্টীমারে রোজ বেড়াই। আজকে ৺শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা, সকাল হইতেই বৃষ্টি হইতেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা আপনারা জানিবেন, শ্রীমান-শ্রীমতীদের জানাইবেন। আশাকরি সমস্তই কুশল সংবাদ। ইতি

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, আপনাদের
শ্রীসুবোধানন্দ

শ্রীমতী ইন্দুবালা দাশগুপ্তকে লিখিত



শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন
পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া
৯।১।(১৯)৩৮

কল্যাণীয়া,

মায়ী তোমার পত্রে বিস্তারিত অবগত হইলাম এবং তুমি ও গোপাল অনেকটা ভাল আছ জানিয়া খুব আনন্দিত হইয়াছি। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের কৃপায় তোমরা সম্পূর্ণ নিরাময় হও এবং শান্তি ও আনন্দে থাক।

উপস্থিত আমার শরীর ভাল এবং পূর্বের ন্যায়ই আহার এবং সকাল বিকালে মঠেই বেড়াইতেছি। তুমি ও বাসাস্থ সকলে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানিবে। মহাপুরুষজী ও মঠের অন্যান্য খবর ভাল। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাদের সতত কল্যাণ করুন।

গৌরী, কনক ও মালতী, আনু এবং সাধনা প্রভৃতি সকলের পত্রই আমি পাইয়াছি। তাহারা ভালই আছে। ইতি

তোমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসুবোধানন্দ

পাতঞ্জল-যোগসূত্র

ব্যাখ্যাতা ঃ স্বামী প্রেমেশানন্দ

অনুলিখন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ
সম্পাদনা ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

সমাধি, তপস্যা ও মন্ত্রজপ—এই তিন উপায়ে যে সিদ্ধিলাভ করা যায় তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কোন কোন ব্যক্তির মধ্যে জন্ম হইতেই সিদ্ধাই দেখা যায়। কোন কোন দ্রব্যগুণে মানুষের 'সিদ্ধাই' অর্থাৎ psychic power হইতে শুনা যায়। 'সিদ্ধি' সম্বন্ধে স্বামীজী বলিয়াছেন ঃ "milestone of progress।"—সাধনায় কোন একটা সিদ্ধিলাভ হইলে সাধকের উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। তবে সাধারণত দেখা যায়, যাঁহারা চিত্তশুদ্ধির সাধনরূপে নিষ্কাম কর্ম, ঈশ্বর-উপাসনা এবং অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া যোগে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের কোনপ্রকার সিদ্ধি হইলে তাঁহারা আর অগ্রসর না হইয়া ঐ সিদ্ধি লইয়াই মাতিয়া থাকেন, কাহারো কাহারো অধঃপতন হইতেও দেখা যায়।

'সিদ্ধি' দুই প্রকার—প্রথম জ্ঞানাত্মক, দ্বিতীয় ক্রিয়াত্মক। প্রথম প্রকার সিদ্ধিতে দূরদর্শন, দূরশ্রবণ, অন্যের চিন্তা বুঝিবার ক্ষমতা লাভ হয়। কেউ কেউ নিজের এবং অন্যান্য সকলের অতীত ও ভবিষ্যতের কথা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারেন। দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধি সাধারণত ছয়প্রকার—মারণ, উচাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন, স্বস্ত্যয়ন ও বিদ্বেষণ।

তবে সিদ্ধির অন্ত নাই, অষ্টসিদ্ধির কথা তো সকলেই জানে। অষ্টাঙ্গ যোগের সাধনার দ্বারা এমন কোন কর্ম নাই যাহা করিতে পারা যায় না, এমন কোন বিষয় নাই যাহা জানা যায় না। যদিও বর্তমানে যোগসাধনার কোনকিছুই দেশে প্রচলিত নাই, তথাপি রোগ ভাল করা, ভবিষ্যৎ বলা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে জনসাধারণ, এমনকি আধুনিক শিক্ষিতগণও বিশ্বাসবান। তাহার ফলে বহু লোকই প্রবঞ্চিত হয় এবং কোন স্থলে কাহারও অল্প-স্বল্প সিদ্ধি আছে কিনা নির্ণয় করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

জাত্যন্তর-পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।।২।।

প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা এক জাতি অন্য এক জাতিতে পরিণত হয়।

নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।।৩।।

সৎ ও অসৎ কর্ম প্রকৃতির পরিণামের সাক্ষাৎ কারণ নয়, উহা কেবল বাধাগুলি দূর করিয়া দেয়, যেমন কৃষক জলের গতিপথের বাধা দূর করিয়া দিলে জল স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হয়।

মন্তব্য ঃ মানুষের উন্নতি-অবনতি আমরা সর্বদাই লক্ষ্য করিয়া থাকি। এই সম্বন্ধে মানুষের ধারণা এত ভ্রমাত্মক যে, কেহ কেহ 'ভগবানের ইচ্ছায় সব হয়', কেহ বা 'কপালের লেখা'ই ইহার কারণ মনে করে। অতি অল্পসংখ্যক লোকের ধারণা—নিজের কর্মফলেই উন্নতি-অবনতি হইয়া থাকে। এই বিষয়টি আমাদের জানা অত্যাবশ্যক। এখানে দুইটি সূত্রে ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝানো হইল।

মহর্ষি পতঞ্জলি বলিতেছেন, মানুষের জীবনে যে উন্নতি-অবনতি দেখা যায় তাহা জীবের স্বভাব অর্থাৎ স্বরূপের প্রকাশ ও অপ্রকাশ মাত্র। এই জগতের সমস্ত বস্তুকে আমরা খণ্ড খণ্ড বিভক্ত দেখিতে পাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জগতের সকল বস্তু এক অখণ্ড সত্তায় অবস্থিত। গীতায় আছে, "ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।"[৩] সেইজন্য যতই ভেদবৈষম্যের দিক হইতে মন সরাইয়া ভিতরের অখণ্ড সত্তার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই ভিতরে সমষ্টির ঐশ্বর্য প্রকাশিত হয়।

আমরা মনে করি, মানুষের পুরুষকার ও তপস্যাই তাহার উন্নতির হেতু। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার চেষ্টার ফলে উন্নতিপথের বাধাগুলি দূর হয় মাত্র। শক্তি ভিতর হইতেই আসিয়া থাকে। যেমন, কোন জলাশয় হইতে নিকটবর্তী জমিতে জল আনিতে হইলে ঐ জলাশয় ও ক্ষেত্রের মধ্যে যে মৃত্তিকারাশি বাধাস্বরূপ উপস্থিত থাকে তাহা সরাইয়া দিলে উন্মুক্ত স্থান পাইয়া জল ক্ষেত্রে আসিয়া পড়ে।

এই তত্ত্বটি জানিলে মানুষের মন হইতে নিরাশা সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া যায় এবং পুরুষকার অবলম্বন করিবার অবাধ উৎসাহ উপস্থিত হয়। এইজন্য এই তত্ত্বটি সকলের জানা একান্ত প্রয়োজন। স্বামীজী তাই বলিয়াছেন ঃ "Education is the manifestation of the perfection already in man. Religion is the manifestation of the divinity already in man."

---

৩ যেমন সূত্রে মণিসমূহ গ্রথিত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আত্মভূত আমাতে অনুস্যূত ও বিধৃত রহিয়াছে। (গীতা, ৭।৭)

নির্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ।।৪।।

যোগী নিজের অহংভাব হইতে একাধিক চিত্ত বা মন করিতে পারেন।

প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্।।৫।।

যদিও পূর্বোক্ত সৃষ্ট মনগুলির কাজ বিভিন্ন, কিন্তু এক আদি মনই ইহাদের নিয়ন্তা।

মন্তব্য ঃ বিদ্যামায়ার সাহায্যে ব্রহ্ম একটি অংশে নিজেকে বহুধা বিভক্ত করেন, প্রত্যেক অংশ এক-একটি জীব। ইহার অর্থ—জীবের সম্মুখে একটা আবরণের মতো বস্তু আসিয়া উপস্থিত হয় এবং জীব ঐদিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে নিজের স্বরূপ একেবারেই ভুলিয়া যায়। তাহার পর কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া ঐ আবরণের মধ্যে নানাপ্রকার বিচিত্র পরিবর্তন হইয়া থাকে। জীব তাহা দেখে, কিন্তু তাহার বোধ হয়—এই পরিবর্তন ও পরিণাম তাহারই হইতেছে। ইহাই জীবের জীবন।

জীব এই মায়ার খেলা দেখিবার জন্য এত আগ্রহ অনুভব করে যে, ঐ খেলা শেষ না হইলে তাহার স্ব-স্বরূপ জ্ঞান কিছুতেই ফিরিয়া আসে না। খেলার শেষদিকে খেলাটি খুব জমিয়া উঠে। তাহার ফলে সুখের সহিত অপরিসীম দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। খুব কষ্ট পাইলে জীবের মনে মাঝে মাঝে এই চিন্তা উঠে যে, এই জীবন না থাকিলেই ভাল হইত। জীবের এই বেদনা দূর করিবার জন্য শান্তিলোকের সংবাদ ও তথায় যাইবার উপায় পরব্রহ্ম জীবের নিকট প্রেরণ করেন মহাপুরুষ ও নানা শাস্ত্রের মাধ্যমে। অতি অল্পসংখ্যক লোকের কানেই এই সংবাদ পৌঁছায়। যাহারা শুনিতে পায় তাহারাও ঐ পথে 'যাইব যাইব' ভাবিয়া অনেক জন্ম কাটাইয়া দেয়। যাহারা প্রবলবেগে সাধনপথে অগ্রসর হয়, অতীত লক্ষ জন্মের সংস্কাররাশি তাহাদিগকে পিছন হইতে টানিতে থাকে। মুক্তিলাভের যোগ্যতালাভ করিয়াও বহু সাধক এইভাবে অতীত সংস্কারের প্রাবল্যে স্ব-স্বরূপ জ্ঞানের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। দেবতাদের প্রলোভনের কথা যাহা বলা হইয়াছে তাহা ঐ পূর্বসংস্কারের অন্য একরূপ প্রকাশ মাত্র।

এই অতীত সংস্কারের শক্তি সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় করিবার জন্য সিদ্ধযোগীরা একটি অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। যেসকল অপূর্ব বাসনার টান চিত্তে থাকে, সেইসকল বাসনা ভোগ করিয়া নিঃশেষ করিবার জন্য তাঁহারা নিজ সত্তা হইতে কতকগুলি জীব নির্মাণ করেন এবং তাহাদের (ঐসকল জীবের) দেহ-মনের সাহায্যে অভুক্ত ভোগ্যগুলি ভোগ করিয়া তাঁহাদের সংস্কাররাশি ধ্বংস করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, ছোট ছোট ভোগ-বাসনা একটু ভোগ করিয়া ত্যাগ করিতে হয় এবং বড়গুলি বিচারের দ্বারা ত্যাগ করিতে হয়। পুরাণে আছে, যোগীরা 'নির্মাণ দেহ' অবলম্বনে ভোগ শেষ করিতেন।

পূর্ব সংস্কারের প্রেরণাতেই মানুষের জন্ম হয়। কিন্তু এই নির্মাণদেহধারী জীবের পিছনে তো তাহার নিজের কোন সংস্কার নাই, তাহা হইলে তাহাদের দেহমন কিরূপে তৈরি হয়? ঋষি বলিতেছেন, এই জীবগণের কোন পৃথক সত্তা নাই, ইহারা যোগীর খেলার পুতুলের মতো—নির্মাতাকে খেলা দেখাইয়া থাকে মাত্র। পূর্বেই বলা হইয়াছে, সিদ্ধপুরুষ প্রকৃতির উপর প্রভূত কর্তৃত্বলাভ করেন। তিনি নিজসত্তা হইতেই যেন ('অস্মিতামাত্রাৎ') এই নির্মাণদেহগুলি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এইসব দেহের সাহায্যে তাঁহার ভোগের কৌতূহল মিটিয়া গেলে জীবগুলি শূন্যে বিলীন হইয়া যায়। ব্যাপারটি স্বপ্নের মতো। যেমন স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু সংস্কাররূপে তাহা থাকে।

এই ব্যাপারটি অত্যন্ত অদ্ভুত ও অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পূর্বেই বারবার বলা হইয়াছে, জগতের প্রকৃতি মহামায়া যোগীর অনেকাংশে অধীন হইয়া যায় এবং সেইজন্য তাঁহারা অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারেন।[৪]

তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্।।৬।।

বিভিন্ন চিত্তের মধ্যে যে চিত্ত সমাধিলাভ করিয়াছে তাহা বাসনাশূন্য।

মন্তব্য ঃ মানবচিত্ত সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। সেইসকল কথার সারমর্ম এই যে, স্ব-স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে মন সম্পূর্ণ সমাহিত হওয়ার পর ব্যুত্থিত হইলে সিদ্ধ করা বীজের ন্যায় পূর্বসংস্কার-বর্জিত যে চিত্ত অনুভূত হয়, তাহাতে বাসনার লেশমাত্র থাকে না। [ক্রমশ] (চোদ্দ)

---

৪ 'নির্মাণচিত্ত' প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ 'কৈবল্যপাদ'-এর ৪ সংখ্যক সূত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিষয়টি সহজভাবে বুঝাইয়াছেন ঃ ''যোগিগণ শীঘ্র শীঘ্র কর্মক্ষয় করিবার জন্য 'কায়ব্যূহ' অর্থাৎ একসঙ্গে বহু দেহ সৃজন করেন। এইসকল দেহের জন্য তাঁহারা তাঁহাদের অস্মিতা বা অহংতত্ত্ব হইতে অনেকগুলি মন সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের মূল চিত্তের সহিত পৃথগত্ব বুঝাইবার জন্য এই নির্মিত চিত্তসমূহকে 'নির্মাণচিত্ত' বলা হয়।''

পরবর্তী (৫) সূত্র ব্যাখ্যায় স্বামীজী বলিয়াছেন ঃ ''ভিন্ন ভিন্ন মন ভিন্ন ভিন্ন দেহে কার্য করে, এগুলিকে 'নির্মাণচিত্ত' এবং এই শরীরগুলিকে 'নির্মাণদেহ' বলে; অর্থাৎ বিশেষভাবে নির্মিত শরীর ও মন।... যে-উপাদান হইতে এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, এই নির্মাণচিত্তও সেই উপাদান হইতে নির্মিত।... অস্মিতাই সেই উপাদান, সেই সূক্ষ্মবস্তু, যাহা হইতে যোগীর এই নির্মাণচিত্ত ও নির্মাণদেহ প্রস্তুত হয়। সুতরাং যখনি যোগী প্রকৃতির এই শক্তিগুলির রহস্য অবগত হন, তখনি তিনি অস্মিতা নামক উপাদান হইতে যত ইচ্ছা মন ও শরীর নির্মাণ করিতে পারেন।''—সম্পাদক

ভারতের গ্রামোন্নয়ন এবং স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী সম্বিরুদ্ধানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

৬। কৃষি ও শিল্পের একযোগে উন্নয়ন

স্বামী বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন, ভারতবর্ষের উন্নতি করতে হলে কৃষি ও শিল্পের একযোগে উন্নয়ন দরকার। তাই তিনি চেয়েছিলেন কৃষি উৎপাদন বাড়াতে, সঙ্গে সঙ্গে শিল্পোন্নয়ন এবং এই দুয়ের সুষ্ঠু সমন্বয়, যাতে একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে স্বামীজী বলছেন : "পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর—চাকরি-গুখুরি করে নয়, নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে নিত্যনতুন পন্থা আবিষ্কার করে।" সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আজ থেকে এক শতাব্দী পূর্বেই তিনি চেয়েছিলেন আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কৃষিক্ষেত্রে কাজে লাগাতে।

স্বামীজী ভারতে শিল্পায়নের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, দরকার হলে বিলাসদ্রব্যও উৎপাদন করতে হবে, যাতে গরিব লোকেরা কাজ পায়—"বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু-ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিব লোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়।" তবে যন্ত্রশিল্পের সমর্থক হলেও স্বামীজী ক্ষুদ্রশিল্পকে অবহেলা করেননি। কিন্তু সেজন্য গান্ধীজীর মতো শুধু চরকা বা কুটিরশিল্পের ওপর নির্ভর করে থাকার পক্ষপাতি তিনি ছিলেন না। শিল্পায়ন বলতে স্বামীজী বৃহৎ শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণই বুঝতেন। তাঁর ভাষায়—"আমাদের বস্তুজ্ঞান অর্জন করতে হবে, যাতে আমরা (বিদ্যুৎ ও অন্যান্য) শক্তিকে সংগঠিত করে ব্যবহার করতে সমর্থ হই। এ-জিনিস কিছুটা আমাদের পাশ্চাত্য থেকে শিখতেই হবে।" প্রথমবার আমেরিকা যাত্রাকালে সহযাত্রী জামসেদজী টাটাকে তিনি এব্যাপারে উৎসাহ দেন। তিনি আরো বলেন যে, মাড়োয়ারিরা ব্যবসায়ে টাকা খাটিয়ে সামান্য লাভ করে। যদি তারা ইউরোপীয়দের পকেট ভরাবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে কতগুলি ফ্যাক্টরি ও ওয়ার্কশপ তৈরি করত, তাহলে তাদেরও লাভ হতো আর দেশেরও সুদূরপ্রসারী মঙ্গল হতো। অবশ্য স্বামীজী বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের অন্ধ সমর্থক ছিলেন না। তাই তিনি বলেছেন যে, অল্পস্বল্প যন্ত্রপাতি ভাল, কিন্তু বেশি যন্ত্র মানুষকে যান্ত্রিক করে ফেলে। বৃহদায়তন উৎপাদনে, বিশেষ করে যান্ত্রিক সভ্যতার সম্প্রসারণে অল্পসংখ্যক লোকের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়—আমেরিকায় এবিষয়টি তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। বৃহদায়তন শিল্পের এই ত্রুটি সম্পর্কে স্বামীজী অবহিত ছিলেন বলেই ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসংস্থার প্রতি তাঁর সহানুভূতির অভাব ছিল না।

৭। জাতীয় উন্নয়নে মানুষের গুরুত্ব সর্বাধিক

উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোন বস্তু অপেক্ষা মানুষকেই স্বামীজী সবচেয়ে মূল্যবান বলে মনে করেছেন। তিনি জানতেন, সৎ ও চরিত্রবান মানুষ ব্যতীত কোন উন্নয়নই সম্ভব নয়—"বিশ্বজগতে এই মানবদেহই শ্রেষ্ঠ দেহ এবং মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষ সর্বপ্রকার জীবজন্তু হইতে, এমনকি দেবাদি হইতেও উচ্চতর। মানুষ অপেক্ষা উচ্চতর আর কেউ নাই।" তাঁর মতে জগতে সমুদয় ধনরাশির চেয়ে মানুষ হচ্ছে বেশি মূল্যবান। জগতের ইতিহাস হলো—পবিত্র, গম্ভীর, চরিত্রবান এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন কয়েকটি মানুষের ইতিহাস। তাই তিনি বলছেন : "টাকা-ফাকা সব আপনা-আপনি আসবে। মানুষ চাই, টাকা চাই না। মানুষ সব করে, টাকায় কি করতে পারে? মানুষ চাই—যত পাবে ততই ভাল।" "মানুষ হও, রামচন্দ্র! অমনি দেখবে ওসব বাকি আপনা-আপনি গড়গড়িয়ে আসছে।" "মানুষ চাই, মানুষ চাই; আর সব হইয়া যাইবে।" "মানুষেই তো টাকা করে। টাকায় মানুষ করে—একথা কবে কোথায় শুনেছিস?"

৮। দরিদ্র জনসাধারণকে অবহেলা করাই ভারতের জাতীয় পাপ

স্বামী বিবেকানন্দ জানতেন যে, দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতির জীবন—"মনে রাখিবে, দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত হইতেছে।" জাতির অদৃষ্ট নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার ওপর। তাই তিনি বলছেন : "আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তা-ই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ।" এরই প্রতিকারকল্পে তাঁর নির্দেশ—"যদি lower class-দের education দিতে পার, তাহলে উপায় হতে পারে।... বড়মানুষেরা কোন্ কালে কোন্ দেশে কার কি উপকার করেছে? সকল দেশেই বড় বড় কাজ গরিবেরা করে।" তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে উচ্চারিত সেই বাণী—"ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।" "ঐ যারা চাষাভুষা-তাঁতি-জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য—বিজাতি-বিজিত স্বজাতি-নিন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না।" স্বামীজী মনে করতেন, যদি প্রকৃতিতে বৈষম্য থাকে তথাপি সকলের পক্ষে সমান সুবিধা থাকা উচিত। কিন্তু যদি কাউকে অধিক, কাউকে কম সুবিধা দিতেই হয়, তবে বলবান অপেক্ষা দুর্বলকে অধিক সুবিধা দিতে হবে। অর্থাৎ চণ্ডালের বিদ্যাশিক্ষা যত আবশ্যক, ব্রাহ্মণের তত নয়। তিনি বলিতেন, যদি ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের আবশ্যক,

চণ্ডালের ছেলের দশজনের আবশ্যক। তাঁর মতে, জনসাধারণকে শিক্ষিত করা, তাদের উন্নত করাই জাতীয় জীবনগঠনের পন্থা। নিজের পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী তাঁর গুরুভাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখছেন ঃ "মনে কর, কতকগুলি সন্ন্যাসী যেমন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কোন্ কাজ করে? তেমনি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, map, camera, globe ইত্যাদির সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে কিনা?" তিনি বারংবার বলতেন ঃ "যদি পর্বত মহম্মদের নিকট না-ই আসে, তবে মহম্মদকেই পর্বতের নিকট যাইতে হইবে। দরিদ্র লোকেরা যদি শিক্ষার নিকট পৌঁছিতে না পারে (অর্থাৎ নিজেরা শিক্ষালাভে তৎপর না হয়), তবে শিক্ষাকেই চাষির লাঙলের কাছে, মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সব স্থানে যাইতে হইবে।

৯। উন্নয়নে জনসাধারণের অংশগ্রহণ

সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ব্যতীত দেশের উন্নয়ন হতে পারে—একথা স্বামীজী বিশ্বাস করতেন না। তিনি প্রকৃত জাতি বলতে এই আপামর জনসাধারণকেই লক্ষ্য করেছেন—"সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাহারা? না, এই তুমি আমি দশজন বড় জাত!!! আর যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলেও তোমার আমার কি অহঙ্কার যে, আমরা অন্য সকলকে পথ দেখাই?" জনগণকেই শক্তির উৎস বলে নির্দেশ করে স্বামীজী বলেছেন ঃ "সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক বা বাহুবলের দ্বারা, সে-শক্তির আধার প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল।" তাই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রসঙ্গে স্বামীজীর সেই বিখ্যাত বাণী ঃ "তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি।... এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!!! অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।"

১০। নারীজাতির শিক্ষা এবং অংশগ্রহণ

নারীজাতির উন্নতিসাধন এবং জাতীয় উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণের ওপর স্বামীজী সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি মনে করতেন, স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হলে ভারতের কল্যাণের সম্ভাবনা নেই। এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নয়। আর এই কারণেই তাঁর স্ত্রীমঠ স্থাপনের প্রথম উদ্যোগ। তিনি বলছেন ঃ "মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে-দেশে যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সেই দেশ—সে-জাত কখনো বড় হতে পারেনি, কস্মিন্ কালে পারবেও না। তোদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এইসব শক্তিমূর্তির অবমাননা করা।" স্বামীজী মনে করতেন, এই স্ত্রীজাতির অভ্যুদয়ের জন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রীগুরু গ্রহণ, নারীভাবে সাধন, মাতৃভাব প্রচার। ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে শ্রীশ্রীমায়ের আগমন। তিনি চেয়েছেন মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে এই সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে। 'মহানির্বাণতন্ত্র' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে স্বামীজী বলছেন ঃ " 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ'—ছেলেদের যেমন ৩০ বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য করে বিদ্যাশিক্ষা হবে, তেমনি মেয়েদেরও করিতে হইবে। কিন্তু আমরা কি করছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে পারো? তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না।" হরিপদ মিত্রকে লেখা ঐ চিঠিতেই আমেরিকার মেয়েদের কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী বলছেন ঃ "আর এদের মেয়েরা... ২৫ বৎসর ৩০ বৎসরের কমে কারুর বিবাহ হয় না। আর আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন।" 'মনুসংহিতা'র একটি শ্লোক, যেটি স্বামীজীর মুখে প্রায়শই শোনা যেত সেটিও তিনি ঐ চিঠিতে উল্লেখ করেছেন—"যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"—যেখানে স্ত্রীলোকেরা পূজিতা হন, সেখানে দেবতারাও আনন্দ করেন।

১১। সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠান গঠন

স্বামী বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন, দেশ ও জাতির উন্নয়নের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। একক প্রচেষ্টা অপেক্ষা মিলিত প্রচেষ্টা অনেক বেশি কার্যকরী। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে তাঁর এই ধারণা আরো দৃঢ়মূল হয়। তাই তিনি চেয়েছেন ত্যাগ ও সেবার আদর্শে গঠিত সুশৃঙ্খল সঙ্ঘ, যা দেশ ও দশের কল্যাণে করবে আত্মোৎসর্গ। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা মে বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটীতে রামকৃষ্ণ মিশন গঠনকালে তিনি বলছেন ঃ "নানা দেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সঙ্ঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না।" স্বামীজী বারংবার নির্দেশ দিয়েছেন সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য—"তোমাদের জাতির মধ্যে organisation (সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য করিবার) শক্তির একেবারেই অভাব। ঐ এক অভাবই সকল অনর্থের কারণ। পাঁচজনে মিলে একটা কাজ করিতে একেবারেই নারাজ। Organisation-এর প্রথম আবশ্যক obedience (আজ্ঞাবহতা)।" আমেরিকা থেকে মাদ্রাজী ভক্তদের উদ্দেশে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে স্বামীজী লিখছেন ঃ "সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করবার ভাবটা আমাদের চরিত্রে একেবারে নেই, এটা যাতে আসে—তার চেষ্টা করতে হবে। এটি করার রহস্য হচ্ছে ঈর্ষার অভাব। সর্বদাই তোমার ভ্রাতার মতে মত দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে—সর্বদাই যাতে মিলেমিশে শান্তভাবে কাজ হয়,

তার চেষ্টা করতে হবে। এটাই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করার গুপ্ত রহস্য।" হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লেখা একটি পত্রে তিনি বলছেন ঃ "আমার সমাদর হোক আর নাই হোক—আমি এই যুবকদলকে সঙ্ঘবদ্ধ করতেই জন্মগ্রহণ করেছি। আর শুধু এরাই নয়, ভারতের নগরে নগরে আরো শত শত যুবক আমার সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। এরা দুর্দমনীয় তরঙ্গাকারে ভারতভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হবে এবং যারা সর্বাপেক্ষা দীন হীন ও পদদলিত—তাদের দ্বারে দ্বারে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, নীতি, ধর্ম ও শিক্ষা বহন করে নিয়ে যাবে—এটিই আমার আকাঙ্ক্ষা ও ব্রত, এটি আমি সাধন করব কিংবা মৃত্যুকে বরণ করব।"

১২। যুবকদের মাধ্যমে কাজ

দেশ ও জাতির উন্নয়নের জন্য স্বামীজী সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেছেন যুবকদের ওপর। তিনি জানতেন যুবকদের মধ্যে যে উৎসাহ, উদ্যম, জীবনীশক্তি বর্তমান, তাকে উন্নয়নের পথে লাগাতে পারলে তবেই জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব। তাই তিনি বলছেন ঃ "ভারতমাতা অন্তত সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো মানুষ চাই, পশু নয়।" "বীর্যবান, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবক আবশ্যক। এইরূপ একশত যুবক হইলে সমগ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দেওয়া যায়।" এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য স্বামীজী সবচেয়ে বেশি ভরসা করেছেন মাদ্রাজ এবং বাংলার যুবকদের ওপর। আমেরিকা থেকে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা একটি পত্রে স্বামীজী বলছেন ঃ "অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত একদল যুবক গঠন কর। তোমাদের উৎসাহাগ্নি তাদের ভিতর জ্বালিয়ে দাও। আর ক্রমশ এই সঙ্ঘ বাড়াতে থাক—তার পরিধি বাড়তে থাকুক।" বাঙালি যুবকদের প্রতি তাঁর আহ্বান ঃ "বঙ্গীয় যুবকগণ, তোমরা ধনী ও বড়লোকের মুখ চেয়ে থেকো না; দরিদ্রেরাই পৃথিবীতে চিরকাল মহৎ ও বিরাট কর্মসমূহ সাধন করেছে।" "ওঠ, জাগ, জগৎ তোমাদের আহ্বান করছে।... অতএব হে কলকাতাবাসী যুবকগণ! হৃদয়ে এই উৎসাহের আগুন জ্বালিয়ে জাগরিত হও।" তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দিয়ে তিনি বলছেন যে, বঙ্গীয় যুবকগণের স্কন্ধে অতি গুরুভার সমর্পিত। আর কখনো কোন দেশের যুবকদলের ওপর এত গুরুভার পড়েনি। তাদের প্রতি স্বামীজী আস্থা এবং আশা প্রকাশ করে বলছেন ঃ "আমি চাই a band of young Bengal (একদল যুবক বাঙালি); এরাই দেশের আশা-ভরসাস্থল। চরিত্রবান, বুদ্ধিমান, পরার্থে সর্বত্যাগী এবং আজ্ঞানুবর্তী যুবকগণের ওপরেই আমার ভবিষ্যৎ ভরসা—আমার idea (ভাব)-গুলি যারা work out (কাজে পরিণত) করে নিজেদের ও দেশের কল্যাণ-সাধনে জীবনপাত করতে পারবে।"

১৩। আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতা

স্বামীজী মনে করতেন, জনসাধারণকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শেখানো না যায়, তবে জগতের সমগ্র ঐশ্বর্য ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত হবে না। সেজন্য তিনি আত্মবিশ্বাস এবং আত্মনির্ভরশীলতার ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নিজেদেরই নিজেদের উন্নতি করতে হবে—এই ছিল তাঁর নির্দেশ। তিনি বলছেন ঃ "সবসময় তোমাদের এটা মনে রাখা বিশেষ দরকার যে, প্রত্যেক জাতকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের চেষ্টায় নিজের উদ্ধারসাধন করতে হবে। সুতরাং অপরের কাছে সাহায্যের প্রত্যাশা করো না।" চাকরিরূপ পরের দাসত্ব করার চেয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি প্রভৃতির সাহায্যে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোর জন্য তিনি সবসময় উৎসাহ দিতেন। তিনি চেয়েছিলেন দেশে কারিগরী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে, যাতে মানুষ স্বনির্ভর হতে পারে—"একটু technical education পেলে লোকগুলো কিছু করে খেতে পারবে; চাকরি চাকরি করে আর চেঁচাবে না।" "চাকরিতে-গোলামিতে এত দুঃখ দেখেও তোদের চেতনা হচ্ছে না। কাজেই দুঃখও দূর হচ্ছে না।" "যদি অর্থ উপায়ের স্পৃহাই থাকে, তবে যা—আমেরিকায় চলে যা আমি ব্যবসায়ের বুদ্ধি দেব। দেখবি পাঁচবছরে কত টাকা এনে ফেলতে পারবি।" "টাকা না জোটে তো জাহাজের খালাসী হয়ে বিদেশে চলে যা। দিশি কাপড়, গামছা, কুলো, ঝাঁটা মাথায় করে আমেরিকা-ইউরোপে পথে পথে ফিরি করগে।" "এত বিদ্যা শিখে পরের দোরে ভিখারির মতো 'চাকরি দাও, চাকরি দাও' বলে চেঁচাচ্ছিস।... ভারতে যেসব পণ্য উৎপন্ন হয়, দেশবিদেশের লোক তাই নিয়ে তার ওপর বুদ্ধি খরচ করে নানা জিনিস তৈরি করে বড় হয়ে গেল; আর তোরা তোদের বুদ্ধিটাকে সিন্দুকে পুরে রেখে ঘরের ধন পরকে বিলিয়ে 'হা অন্ন, হা অন্ন' করে বেড়াচ্ছিস!"

সেই ত্রিকালদর্শী সত্যদ্রষ্টা ঋষিই আবার আমাদের শুনিয়েছেন আশার বাণী ঃ "ঐরূপ কর্মতৎপরতা ও আত্ম-নির্ভরতা কালে দেশে আসবেই আসবে—বেশ দেখতে পাচ্ছি। There is no escape (গত্যন্তর নেই); যারা বুদ্ধিমান, তারা ভাবী তিনযুগের ছবি সামনে প্রত্যক্ষ দেখতে পায়। ঠাকুরের জন্মাবার সময় হতেই পূর্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে—কালে তার উদ্ভিন্নচ্ছটায় দেশ মধ্যাহ্ন-সূর্যকরে আলোকিত হবে।" ❑ [সমাপ্ত]

গ্রন্থ সহায়ক

(১) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা
(২) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ
(৩) Swami Vivekananda's vision of rural development —Swami Prabhananda
(৪) বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তা—সুব্রত গুপ্ত
(৫) বিবেকানন্দ ও আজকের অর্থনীতি—স্বামী সোমেশ্বরানন্দ

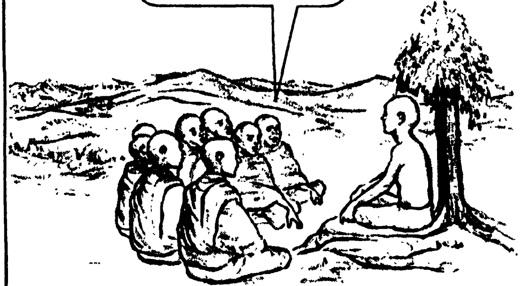


আদি শঙ্করাচার্য ১০

উদ্বোধন
শিশু ও কিশোর বিভাগ

শ্রীশঙ্কর বদরীক্ষেত্র ছেড়ে এগিয়ে চলেছেন ব্যাসাশ্রমের দিকে।

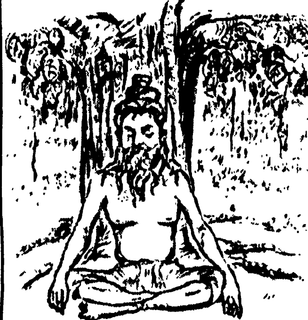




ব্যাসদেব লক্ষশ্লোকী মহাভারত রচনার পরিকল্পনা করে ভাবলেন, কে লিখবে? খুব চিন্তিত হলেন। এমন সময়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার দর্শন পেলেন। ব্রহ্মা বললেন—

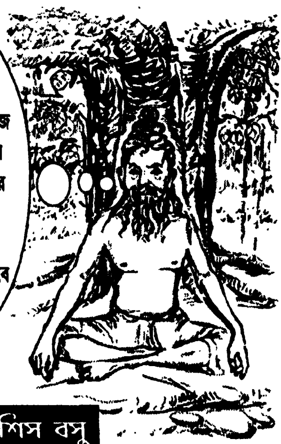


ব্যাসদেব তখন গণেশের ধ্যানে নিমগ্ন হলেন।

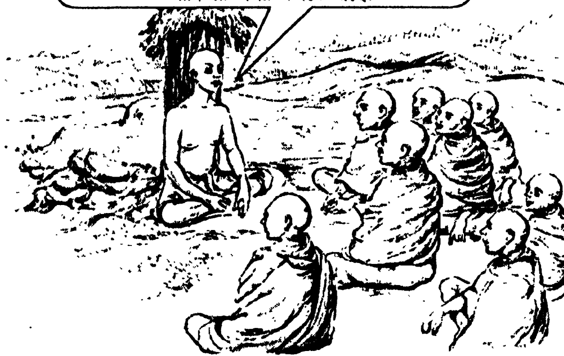


গণপতি গণেশ আবির্ভূত হয়ে বললেন—





চিত্ররূপ : দেবাশিস বসু



'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ রামায়ণ ও মহাভারত প্রসঙ্গ*

বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর প্রথম প্রকাশের শতবর্ষপূর্তিতে নিবেদিত—সম্পাদক

১৮৮৬ সালের ১৭ এপ্রিল। মাস্টারমশাইয়ের স্ত্রী পুত্রশোকে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে পড়লে ঠাকুর তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে এনে প্রসাদ খেতে বলেন এবং পুত্রশোক প্রসঙ্গে বলেন, অর্জুন জ্ঞানী, সঙ্গে রয়েছেন কৃষ্ণ। তবু পুত্র অভিমন্যুর শোকে তিনি একান্ত অধীর হয়েছিলেন। (৪।৩৩।১)

১৮৮২ সালের ২ এপ্রিল ঠাকুর কাম-ক্রোধ-লোভ ইত্যাদি থেকে সাবধান থাকতে হয়—এই কথা বলতে গিয়ে হনুমানের ক্ষণক্রোধ প্রসঙ্গ এনেছেন। ক্রোধে লঙ্কা দগ্ধ করার সময় অশোকবনে সীতার যে কোন ক্ষতি হতে পারে, তা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গিয়েছিলেন হনুমান। (৫।১।২)

ঐবছর ১০ নভেম্বর দুর্যোধনের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিদুরের বাড়ি যাওয়ার পূর্ববর্ণিত কাহিনীটি বলে ঠাকুর যোগ করেন ঃ "তিনি ভক্তবৎসল। বৎসের কাছে গাভীর মতো তিনি ভক্তের পিছে পিছে যান।" (৫।২।৪)

'কথামৃত'-এ পরবর্তী যেদিনে ঠাকুরের শ্রীমুখে শ্রীরাম প্রসঙ্গ এসেছে ব্যতিক্রমীভাবে তাতে সঠিক তারিখ দেওয়া নেই। শুধু 'ডিসেম্বর ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ' বলা আছে। তবে ঐদিনটি যে বড়দিনের ছুটির মধ্যে, সে-কথার উল্লেখ আছে অর্থাৎ তারিখটি ডিসেম্বরের শেষদিকের কোন একদিন। ঐদিন রামনাম প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেছিলেন ঃ "রামনাম করা বেশ। যে-রাম দশরথের ছেলে, আবার জগৎ সৃষ্টি করেছেন; আর সর্বভূতে আছেন। আর অতি নিকটে আছেন—অন্তরে বাহিরে।" এই বলে ঠাকুর দোঁহা থেকে বলছেন—

"ওহি রাম দশরথকী বেটা, ওহি রাম ঘট ঘটমে লেটা
ওহি রাম জগৎ পশেরা, ওহি রাম সব সে নিয়ারা।।"
(৫।৩।৩)

১৮৮৩ সালের ১০ জুন ঠাকুর ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে গান গাইতে বললে রামলালদাদা অন্য গানের সঙ্গে রামায়ণ সংক্রান্ত দুটি গান গেয়েছিলেন। প্রথমটি রাবণবধের পর মন্দোদরীর বিলাপগীতি—

"কি করলে হে কান্ত! অবলারি প্রাণকান্ত
হয় না তাহা শান্ত এ প্রাণান্ত বিনে।..."

এই গানটি শুনতে শুনতে অশ্রুবিসর্জনরত ঠাকুর বলেছিলেন, তিনি ঝাউতলায় বাহ্যে করতে গিয়ে নৌকার মাঝিদের ঐ গান গাইতে শুনে সারাক্ষণ কেঁদেছিলেন। রামলালদাদার গাওয়া অন্য গানটি এইরকম—

"শুনেছি রাম তারকব্রহ্ম, মানুষ নয় রাম জটাধারী।
পিতে কি নাশিতে বংশ সীতে তার করেছ চুরি।।"
(৫।৬।২)

ঐদিনই মায়া প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেছিলেন, মায়া দ্বার না ছেড়ে দিলে ঈশ্বরদর্শন হয় না। রাম, লক্ষ্মণ আর সীতা একসঙ্গে যাচ্ছেন। সবার আগে রাম, মাঝে সীতা, পিছনে লক্ষ্মণ। সীতা মাঝে থাকাতে লক্ষ্মণ যেমন রামকে দেখতে পাচ্ছেন না, তেমনি মাঝে মায়া থাকার ফলে জীব ঈশ্বরকে দেখতে পায় না। ঠাকুর একটু পরে অবতারেরও দেহবুদ্ধি প্রসঙ্গে বলেছেন, সীতার জন্য রাম কেঁদেছিলেন। (৫।৬।৪)

ঐবছর ২২ সেপ্টেম্বর ব্রহ্ম আর শক্তির অভেদত্ব প্রসঙ্গে ঠাকুর হনুমানের রামস্তবের কথা উল্লেখ করেছেন। লঙ্কা থেকে ফিরে এসে হনুমান রামকে স্তব করে বলছেন—হে রাম, তুমিই পরব্রহ্ম আর সীতা তোমার শক্তি। কিন্তু তোমরা দুজনে অভেদ। যেমন সর্প আর তার তির্যগ গতি, দুগ্ধ আর তার ধবলবর্ণ, জল আর তার হিমশক্তি, তেমনি অভেদ। একই দিনে অধ্যাত্মরামায়ণ থেকে ঋষিদের রামের কাছে প্রার্থনার কথাও বলেন ঠাকুর। ঋষিরা বলেছিলেন—হে রাম, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না। (৫।৮।২)

পরদিন গৌরী পণ্ডিতের রামায়ণের চরিত্র ব্যাখ্যানের কথা ঠাকুর বিবৃত করেছেন—রাবণের দশ মুণ্ড দশ ইন্দ্রিয়। কুম্ভকর্ণ তমোগুণী এবং বিভীষণ সত্ত্বগুণী। তাই বিভীষণ রামকে পেয়েছিলেন। (৫।৯।১)

এই বছর ১৬ অক্টোবর হনুমানের নিষ্ঠাভক্তি প্রসঙ্গে বলরামের পিতাকে ঠাকুর বলেন, দ্বাপরযুগে হনুমান দ্বারকায় এলে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে বলেছিলেন—হনুমান

* স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা।

রামরূপ না দেখলে সন্তুষ্ট হবে না। তাই তিনি হনুমানের জন্য রামরূপ ধারণ করেছিলেন দ্বারকায়। (৫।১১।১)

ঐদিনই কৃষ্ণার্জুন প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেছেন, কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন—অষ্টসিদ্ধির কোন একটাও থাকলে আমাকে পাবে না। একটু শক্তি হতে পারে মাত্র। (ঐ)

একই দিনে আবার সংসারত্যাগেচ্ছু রামচন্দ্রকে বশিষ্ঠদেবের যুক্তি-সহ সংসারত্যাগ করতে নিষেধ করার পূর্ববর্ণিত গল্পটিও বলেছিলেন। (৫।১১।২)

২২ ডিসেম্বর পূর্বকথিত সীতার শোকে রামের ক্রন্দনকাহিনী ঠাকুর ভক্তদের শুনিয়েছেন। (৫।১২।৫)

১৮৮৪ সালের ৯ মার্চ বিদ্যার সংসার প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেছেন—বিদ্যার সংসারীরা জানে, ঈশ্বরই একমাত্র আপনার লোক। সুখে-দুঃখে তাঁকে ভোলে না, যেমন পাণ্ডবেরা। এখানে ঠাকুর কোন মহাভারতীয় কাহিনী বলেননি, শুধু 'পাণ্ডবেরা' কথাটির উল্লেখ করেছেন। (৫। ১৪।১)

ঐবছর ২৪ মে সর্বভূতে ঈশ্বর থাকলেও মানুষে তাঁর বেশি প্রকাশ—এই প্রসঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের কথা এনেছেন ঠাকুর। বলেছেন, রাম লক্ষ্মণকে বলেছিলেন—হাতি এত বড় জানোয়ার, কিন্তু ঈশ্বরচিন্তা করতে পারে না। রামবর্ণিত উর্জিতা ভক্তির কথাও ঐপ্রসঙ্গে ঠাকুর বলেছিলেন। (৫।১৫।৪)

একই দিনে অধ্যাত্মরামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড থেকে ঠাকুর রাম-নারদ সংলাপ শোনান। নারদ রামচন্দ্রকে বলেন—'রাম, তুমি অযোধ্যায় বসে থাকলে রাবণবধ কেমন করে হবে? তুমি যে সেইজন্য অবতীর্ণ হয়েছ।' উত্তরে রাম বললেন—'নারদ, সময় হোক। রাবণের কর্মক্ষয় হোক, তবে তার বধের উদ্যোগ হবে।' (৫।১৫।৫)

১৮৮৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পূর্ববর্ণিত 'অষ্টসিদ্ধির একটা থাকলে কিছু শক্তি হয়, কিন্তু ভগবদ্‌প্রাপ্তি হয় না'—শ্রীকৃষ্ণ-কথিত এই উক্তিটি আবার বলেন ঠাকুর। একটু পরেই পূর্বে বর্ণিত পুত্রশোকাতুর বশিষ্ঠ প্রসঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের সংলাপের কথাও ঠাকুর বলেন। (৫।১৬।২)

ঐদিন রামবর্ণিত উর্জিতা ভক্তির কথাও ঠাকুর বলেন। এরপর 'সময় না হলে কিছু হয় না'—এই বিষয়ে গিরিশচন্দ্রকে বলতে গিয়ে ঠাকুর লক্ষ্মণ ও লবকুশের কথা বলেছেন। তিনি বলছেন—লক্ষ্মণ লব-কুশকে বলেছিলেন—তোমরা ছেলেমানুষ, রামচন্দ্রকে জান না। তাঁর পাদস্পর্শে পাষাণী অহল্যা মানবী হয়েছে। তাতে লবকুশ বলে—মুনিবাক্যে পাষাণী মানবী হয়েছিল। গৌতম মুনি বলেছিলেন—ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র ঐ আশ্রমের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর পাদস্পর্শে অহল্যা মানবী হবে। (৫।১৬।৪)

পঞ্চম ভাগের পরিশিষ্ট অংশের চতুর্থ পরিচ্ছেদে কথামৃতকার মাস্টারমশায় একবার ঠাকুর-কথিত যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের পূর্ববর্ণিত 'বশিষ্ঠদেব-রামচন্দ্র সংবাদ' পরিবেশন করেন।

পর্যবেক্ষণে দেখা গেল, 'কথামৃত'-এ রামায়ণ-মহাভারতের প্রথম প্রসঙ্গটি রামায়ণের। বিভীষণ ও অনামী ব্যক্তির এই প্রসঙ্গটি ১৮৮২ সালের ৫ মার্চ কথিত। শেষ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় ১৮৮৬ সালের ১৭ এপ্রিল এবং এটি ছিল মহাভারতীয় কথা—অর্জুনের পুত্রশোক বিষয়ে।

'কথামৃত'-এ উল্লিখিত রামায়ণী চরিতাবলী (মূল 'কথামৃত'-এর ক্রমানুসারে)—বিভীষণ, হনুমান, মন্দোদরী, নিকষা, রাম, সীতা, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, কাকভূষণ্ডী, বালি, অহল্যা, নারদ, বশিষ্ঠ, লক্ষ্মণ, ভরদ্বাজাদি ঋষিগণ, পরশুরাম, গুহ, কাক, ভেক, বরুণদেব, দশরথ, শবরী, কৈকেয়ী ও লব-কুশ।

মূল 'কথামৃত'-এর ক্রমানুসারে উল্লিখিত মহাভারতীয় চরিতাবলী—শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, অর্জুন, দুর্যোধন, বিদুর, সত্যভামা, রুক্মিনী, গন্ধর্ব, দ্রৌপদী, যুধিষ্ঠির, ভীম, অভিমন্যু ও পাণ্ডবগণ।

মহাভারতীয় থেকে রামায়ণী চরিত্রসংখ্যা যেমন বেশি, তেমনি মহাভারত কথা থেকে রামায়ণ কথাই বেশি সংখ্যায় এবং বেশি বার পরিবেশিত হয়েছে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'-এ। আরো দেখা যায়, অনেকগুলি গল্প যেমন একবারই পরিবেশিত হয়েছে, তেমনি অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন দিনে ভিন্ন ভিন্ন ভক্তমণ্ডলীতে পরিবেশিত।

পরমপুরুষ কথিত এই রামায়ণ-মহাভারত আশ্রিত কাহিনীগুলির উৎস সন্ধানে কোন উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ব্রতী হতে পারেন। ❑

ভ্রম-সংশোধন

'উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪০৮ সংখ্যার ১৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত বাক্য "মনে হয় এই... পথে যেতে হবে" উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-এর ১০ম বল্লীতে রয়েছে। ভুলবশত '৯ম পরিচ্ছেদ' ছাপা হয়েছিল। পরের পৃষ্ঠায় দুটি উদ্ধৃতির ("হ্যাঁরে নরেন... বেদে আছে কি?" এবং "দেখলি বাঙাল... মহাপ্রাণতার জন্য মানি") উৎসস্থল 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-এর ১০ম বল্লী।

গত ফাল্গুন ১৪০৮ সংখ্যার ৮৯ পৃষ্ঠার তৃতীয় অনুচ্ছেদের ১২-১৩ পঙ্‌ক্তিতে লেখা রয়েছে—"অক্ষয়কুমার সেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'-তে একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিয়াছেন লেখক।" বাক্যটিতে 'লেখক' শব্দটি অনবধানবশত ছাপা হয়েছে।

গত চৈত্র ১৪০৮ সংখ্যার ১৭১ পৃষ্ঠায় স্বামীজীর দীর্ঘ উক্তিটির ("ঠাকুরকে ঐদিনকার... তাহা মিথ্যা নহে।") উৎসস্থল 'লীলাপ্রসঙ্গ', ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়। ঐ সংখ্যার ১৮৪ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ৫ম পঙ্‌ক্তিতে "নাসিগ্রামে (বর্তমান বাংলাদেশে)"-এর পরিবর্তে "নাসিগ্রামে (বর্ধমান জেলান্তর্গত) হবে।—সম্পাদক

মুক্ত ভাষার মুক্ত কথা*

দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়

বহতা নদীর মতো জনগণেশ-উচ্চারিত শব্দ-পারাবারের রূপ পরিবর্তনের খবর বিস্মিত করেছিল শব্দের বিশ্বকর্মা শব্দবিদ্ বৈদিক ঋষিদের। ভাষা-পারাবারের তীরে বসে ঢেউ গুনতে গুনতে তৈরি হয়েছিল বর্ণের উচ্চারণ-পদ্ধতি। অনুভূত হয়েছিল ছন্দের দোলা। যাস্ক তৈরি করেছিলেন 'নিঘণ্টু'—শব্দের তালিকা আর 'নিরুক্ত'—শব্দের জন্মকথা। ঋষি-উচ্চারিত সেইসব চমকে দেওয়া থমকে দেওয়া শব্দের বিস্ময় অ-পার! বেদের কবিদের ভাষা খেয়ালিপনা আর হেঁয়ালিপনার মোড়কে মোড়া। যাকে বলে 'মুক্ত ভাষা'। কিছুটা আলগা বাঁধন আর বাকিটা বেশ আঁটোসাঁটো। মহাভারতের কবির ভাষাও অনেকটা ঐধরনের, যাকে আমরা 'আর্ষপ্রয়োগ' বলতে অভ্যস্ত।

এই মুক্ত ভাষা কি শুধু বেদ আর মহাভারতেই আছে? না। বেদের কালেই মুক্ত ভাষার বাতাসে ভেসে গিয়েছিল বর্ণ-উচ্চারণ। তারপর সেই শিথিলতার দমকা বাতাস ঢুকে পড়েছিল ভাষা-পালি-অর্ধমাগধী-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের আনাচে-কানাচে, প্রাকৃত-জনের মুখের উচ্চারণে এবং সাহিত্যের আঙিনায়। তারও অনেক পরে আধুনিক ভাষাকে প্লাবিত করেছে সে। সুকুমার রায়ের খেয়াল-খোলা ভাষার স্বপন-দোলা আর শিব্রাম চকরবরতির মতো কথা বলার বিপদ অধিকার করেছে পাঠকসমাজকে। তাঁদের মতো দিকপালদের কলমের ডগাতেই ঘটেছে ভাষার মুক্তি।

শিথিল ভাষার প্রাণভ্রমরের আশ্চর্য কৌটা বেদ, মহাভারত আর রামায়ণ। তারই মধ্যে বেদ-মহাভারতের শব্দ-সন্ধান করতে চাই। কেননা বেদ-মহাভারতের ভাষা বেগবতী, তেজস্বিনী, ওজস্বিনী—স্রোতস্বিনী ফল্গুধারা। রামায়ণের ভাষায় স্নিগ্ধতার আবেশ। বেদের সময় ভাষার নাম ছিল 'বাক্', আর মহাভারতের ভাষার নাম 'সংস্কৃত' হয়নি তখনো। অর্থাৎ লৌকিক বা কথ্য ভাষা—প্রাকৃতজনের ভাষাই হলো মহাভারতের ভাষা। পাণিনির সময় ছিল লোকভাষা = ভাষা, কবিভাষা = ছন্দস্।

শব্দ কল্পবৃক্ষ। দেখিয়ে দিয়েছেন সুকুমার রায়। তাঁর শব্দকল্পদ্রুমের বাতাস আর বেঠিক বেতাল চালের শব্দের মিনেকাজ আজও হতবাক করে দেয়। বেঠিক বেতাল চালের শব্দের মালা গেঁথে অতি সমৃদ্ধ লোকভাষা, কবিভাষা এবং সন্ধ্যাভাষার খনি তৈরি হয়েছিল বেদ-মহাভারতের মুক্তধারায়—চর্যাগীতির বহু বহু আগে। সেই শব্দে স্নাত আমরা। ক্রমাগত খনিতে হাত ডুবিয়ে তুলছি রত্ন, কিন্তু ক্ষয় হয়নি আজও। ক্রমবর্ধিষ্ণু সে! ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেছে বাক্-সমুদ্র (২৩।১)। সমুদ্রের ক্ষয় নেই—বাকেরও নেই।

"শব্দ জোড়ে, শব্দ ভাঙে, বিশ্ব জুড়ে শব্দ-ঢেউ—
কেউ শুনছে, শুনছে না কেউ, শুনতে গিয়ে ফিরছে কেউ।"
('বেদ ও শ্রীঅরবিন্দ'—গৌরী ধর্মপাল, পৃঃ ২০)

এবার মূল বক্তব্যে আসা যাক। সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত হয়নি এমন কিছু শব্দ বেদ-মহাভারতের খনিতে জ্বলজ্বল করছে। কিছু শব্দ আবার লোকমুখে চলতে চলতে ভাষা-ছন্দের মণিপ্রবালশৈলী পালি-অর্ধমাগধীতে স্থান পেয়েছে অথচ সেগুলি সংস্কৃতে পাওয়া যায় না। ভাষার ক্রমবিবর্তনে পাওয়া কিছু শব্দ দেখে মনে হয়, ধাতুর অর্থ যতই বদলাক না কেন, মূল অর্থ ছেড়ে খুব বেশি দূরে যেতে পারেনি। এই সত্য বোধহয় প্রচলিত, অপ্রচলিত এবং স্বল্প-প্রচলিত—সবরকম শব্দের ক্ষেত্রেই খাটে। যেমন—√হি = পাঠানো। "অস্মা ইদ্ উ স্তোমং সং হিণোমি" (ঋগ্বেদ, ১।৬১।৪)—এঁরই উদ্দেশে পাঠাই আমার গান (দ্রঃ বেদের ভাষা ও ছন্দ—গৌরী ধর্মপাল)। মহাভারতে √হি = ছোঁড়া। "প্রাহিণোদ্রাক্ষসঃ ক্রুদ্ধো ভীমশ্চ ন চচাল হ" (বনপর্ব, ১০।৫১)—ক্রুদ্ধ রাক্ষস পাথর ছুঁড়ল, ভীম কিন্তু অনড়! সংস্কৃতে উচ্চারিত 'পুরুষঃ' বেদ এবং মহাভারতের কোন কোন জায়গায় 'পূরুষঃ'। ঋক্ প্রাতিশাখ্য বলেছে, অর্ধর্চের অন্তে 'পূরুষ' হবে (৯।৪০)। "অদো যৎ দারুঃ প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপূরুষম্" (ঋগ্বেদ ১০।১৫৫।৩)—ঐ যে একটা কাঠ ভাসছে নদীর কিনারে, কোন লোক নেই। মহাভারতে পাই—"ঈদৃশং দুঃখমানীয় মোদতে পাপপূরুষঃ" (বনপর্ব, ২৪।৬)—সে একটা পাপী। দেখছেন না এত দুঃখ দিয়েও কেমন আনন্দে আছে!

√মিহ্ মানে সেচন। অকৃপণ বর্ষণ বোঝাতে বেদ আর মহাভারতে যথাক্রমে 'মীড়্হুষে' এবং 'মীঢুষে' পাওয়া যায় (ড়্হ্ = ঢ়)। শব্দ-দুটি যথাক্রমে রুদ্র এবং শূলপাণি শিবের বিশেষণ। "যজ্ঞং রুদ্রায় মীড়্হুষে ভরধ্বম্" (ঋগ্বেদ, ১।১২২।১)—অকৃপণবর্ষণ রুদ্রের উদ্দেশে যজ্ঞের আয়োজন কর তোমরা (বেদের ভাষা ও ছন্দ)। মহাভারতে শিব-প্রণাম—"নমঃ... শর্বায় মীঢুষে শূলপাণয়ে" (বনপর্ব, ৩৫।৭৬, ৭৭)—প্রণাম তোমায় শূলপাণি, তুমি জগতের সংহারক আর অকৃপণ (বর্ষণকারী) স্রষ্টা। মহাভারতে 'শর্ব' = সংহারক। বেদে 'শর্ব' = হিংসক। "অমন্যমানান্ শর্বা

* স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা।

জঘান" (ঋগ্বেদ, ২।১২।১০)—হিংসক অবিশ্বাসীদের হন্তা তিনি (শর্বা—শরু দ্বারা হত্যাও বোঝায়)। বেদে 'কাণুকা' = প্রিয় অথবা কানায় কানায় পূর্ণ। "ইন্দ্রঃ সোমস্য কাণুকা" (ঋগ্বেদ, ৮।৭৭।৪)—সোমপ্রিয় ইন্দ্র, ইন্দ্রপ্রিয় সোম। অথবা দুজনেই দুজনকে পেয়ে কানায় কানায় ভরে ওঠেন।

√ধূ = নাড়ানো। "প্র স্মশ্রু দোধুবৎ উর্ধ্বথা ভূৎ" (ঋগ্বেদ, ১০।২৩।১)—উর্ধ্বে আবির্ভূত হলেন দাড়ি নাড়াতে নাড়াতে (বেদের ভাষা ও ছন্দ)। মহাভারতে—"ধুনয়ামাস বেগেন বায়ুশ্চণ্ড ইব দ্রুমম্" (বনপর্ব, ১০।৫৯) —বাতাসের প্রচণ্ড তাণ্ডবে ঘূর্ণিত মহাদ্রুমের মতো তাকে ঘোরাতে লাগলেন। চণ্ড = প্রচণ্ড। √মিষ্ = দেখা। "ন হি ত্বৎ আরে নিমিষশ্ চন ঈশে"—তব ইচ্ছা বিনে নিমেষেও নয়নে ফেলিতে পারে না কেহ (বেদের ভাষা ও ছন্দ)। মহাভারতের ভাষা—"সংশয়ং গমিতো যুদ্ধে মিষতাং সর্বধন্বিনাম্" (আদিপর্ব, ২।২৭৫)—সুধন্বাদের চোখের পলক পড়তে না পড়তেই যুধিষ্ঠিরের প্রাণ সংশয়ান্বিত হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথের ভাষা—ছন্দস্—"দেখেছিনু করুণা তব আঁখি নিমেষে গেল সে ভেসে।" (গীতবিতান) √বাশ্ = কাতর ডাক (হাম্বা রব)। যাস্কের দেওয়া উদাহরণ—

"নিষ্টক্রাসঃ[১] চিৎ ইৎ নরঃ ভূরিতোকাঃ[২] বৃকাৎ[৩] ইব।
বিভ্যস্যন্তঃ ববাশিরে শিশিরং জীবনায় কম্।।"

—বহু সন্তান নিয়ে[২] বস্ত্রহীন[১] মানুষরা দাঁতালো[৩] শীতে বিদ্ধ হয়ে করুণ স্বরে বলছে, ঐ জীবনদাতা বসন্ত এল বলে! মহাভারতের ভাষা—

"তাং শুষ্যমানামত্যর্থং কুররীমিব বাশতীম্।
করুণং বহু শোচন্তীং বিলপন্তীং মুহুর্মুহুঃ।।"

(বনপর্ব, ৫২।২০)

—শোকে শুষ্কপ্রায় দময়ন্তী কুররী পাখির মতো করুণ আর্তনাদ করছেন, বিলাপ করছেন শোকে অনবরত।

যাস্কের দেওয়া ঋগ্বেদের আরেকটি উদাহরণে শব্দের ছটা—"বৃক্ষে বৃক্ষে[১] নিয়তা মীময়দ্[৩] গৌঃ[২] ততো বয়ঃ[৪] প্র পতাৎ পূরুষাদঃ।" (ঋগ্বেদ, ১০।২৭।২২; নিরুক্ত, ২।১।৬।১)—ধনুতে ধনুতে[১] আরোপিত জ্যাতে[২] টঙ্কার হয়[৩], তারপর তীরবেগে বাণ[৪] শত্রুর ওপর পড়ে। নিজন্ত √মীম্ = শব্দ করা।

পুরস্ = সামনে। বেদে এবং মহাভারতে পুরস্-যোগে তৈরি শব্দ অব্যয়ের অর্থ ত্যাগ করেনি। "অগ্নিম্ ঈড়ে পুরোহিতম্।" (ঋগ্বেদ, ১।১।১)—অগ্নির করি অর্চন যিনি সামনে আছেন (বেদের ভাষা ও ছন্দ)। পুরএতা ভবা নঃ (ঋগ্বেদ, ১।৭৬।২)—অগ্রগামী হও আমাদের (বেদের ভাষা ও ছন্দ)। মহাভারতে আছে—"বাসুদেবং পুরস্কৃত্য সর্বে তে ক্ষত্রিয়র্ষভা... উপবিবিশুঃ" (বনপর্ব, ১১।৪)—ক্ষত্রিয়বরেরা বসলেন বাসুদেবকে আগুয়ান করে। "যথা হি কামো ভবতস্ তথা কৃতং মহানসে ত্বং ভব মে পুরস্কৃতঃ" (বিরাটপর্ব, ৭।১২)—তোমার ইচ্ছাই আমার হলো—প্রধান পাচক হও আমার।

বেদে 'সঙ্গর' = প্রতিশ্রুতি/চুক্তি/অঙ্গীকার (agreement)। মহাভারত এবং পালিসাহিত্যে 'সঙ্গর' = প্রতিজ্ঞা। মহাভারতে আছে সত্যসঙ্গর, স্থিরসঙ্গর (বনপর্ব, ৪০।২৫, ৩৯।২২)

বেদ-মহাভারতে 'বসু' আর 'দ্রবিণ' মানে ধন। কিতব = জুয়াড়ী। পালিতে 'কিটব'। অর্থ একই। বেদে √জম্ভ্ = দাঁতে পিষে খাওয়া। ঋগ্বেদের অপালা সূক্তে অপালা ভালবেসে ইন্দ্রকে বলছেন—"জম্ভসুতম্ পিব" (৮।৯১।২)—দাঁতে পিষে সবন করেছি সোম, পান কর হে ইন্দ্র। গুজরাটী ভাষায় জমন্ = খাওয়া। "চলো জম্বাবেসিয়ে"—চলো খেতে বসি। বাঙলায় গরুর জাব্না বা জাবর কাটা-র উৎস √জম্ভ্। বেদে √মুষ্ = চুরি করা। "উপ-ইৎ-দদাদি ন স্বং মুষায়তি" (ঋগ্বেদ, ৬।২৮।২)—ইন্দ্র বরং আরো দেন তাকে, চুরি করেন না যা আছে তার (বেদের ভাষা ও ছন্দ)। এই √মুষ্ কি মূষিকের চরিত্র চিত্রিত করেছে? √বল্গ্ = লাফানো। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আছে 'বল্গাঃ' (১।৩।২)। মহাভারতে 'ৰবলগতুঃ' (বনপর্ব, ৩৯।২৫)। বাঙলায় বলি—বল্গা হরিণ। বাঙলায় দুধ উথলানোকে বলে বলকানো/বলক।

বেদে ও নিঘণ্টুতে পাওয়া 'কল্মলীকিনম্' = ঝলমলে আলো। "নমস্যা কল্মলীকিনম্ নমোভিঃ" (ঋগ্বেদ, ২।৩৩।৮)—ঝলমলে দীপ্তিকে কর নমস্কার বারংবার। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর 'শব্দকথা'য় বলেছেন ঃ "দন্ত্য ল'য়ে কোমল ও চঞ্চলভাব আনে।" সঙ্গে একটা প্রশ্নও তুলেছেন ঃ "রুটি কোমলতা পাইয়া কি লুচিতে পরিণত হইয়াছে?" (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃঃ ৬২) তবে ল'কার উচ্চারণে চাঞ্চল্য আছে—একথা সত্যি। নিঘণ্টুতে 'মল্মলাভবন্' = জ্বলন্ত শিখা আর অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্রের ভাষায়—'দলমমল দলমমল গলে মুণ্ডমালা' (শব্দকথা, পৃঃ ৭) একথা সমর্থন করে। আবার রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায়—"মহাপ্রাণ বর্ণের বেগবত্তা, বলবত্তা, স্থূলতা সমস্তই হ-কারাদি শব্দে বিদ্যমান।" মহাভারতে পাওয়া ভাবপ্রকাশের একটি ভঙ্গিমা —"হা হা ভূতম্ অতীব আসীদ্ ভৃশং চ প্ররুরোদ হ" (বনপর্ব, ৫৬।৭০)—সবাই হায় হায় শব্দে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল। 'হা হা ভূতম্' অনুকরণজাত শব্দ। রামেন্দ্রসুন্দর হ-কারের বেগবত্তা বলবত্তা ও স্থূলতা বোঝাতে উদাহরণ দিয়েছেন—"আকস্মিক হেঁচকা টানে কোন জিনিসকে হেঁচড়িয়া লইয়া যাওয়া হোঁতকা স্বভাবের কাজ।" (শব্দকথা, পৃঃ ৬৫)। মহাভারতে পাওয়া আরেকটি অনুকরণজাত শব্দ 'চট্চটা'।

শব্দটি ত্বকে আঘাত বোঝায়। "ততশ্চট্চটাশব্দঃ সুঘোরঃ সমুপদ্যত।/ পাণ্ডবস্য চ মুষ্টীনাং কিরাতস্য চ যুধ্যতঃ।।" (বনপর্ব, ৩৫।৫৭)—ভয়ঙ্কর চট্চট্ শব্দে কিরাত-অর্জুনের মুষ্টিবর্ষণ চলল। বেদেও 'চিত্তি' = চট্চট্। বেদ আর নিরুক্ততে পাওয়া একটি উদাহরণ—

"অয়ং স শিঙক্তে১ যেন গৌরভীবৃতা২ মিমাতি মায়ুং ধ্বসনাবধি শ্রিতা।

সা চিত্তিভিরর্নি হি চকার মর্তং বিদ্যুদ্ভবন্তী প্রতি বব্রিমৌহত।।"

(ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।২৯; নিরুক্ত, ১।৯।১)

—এই সেই বিদ্যুৎ-আড়াল-করা১ বৃষ্টি-ঝরানো শব্দমুখর২ মেঘ। এতেই রয়েছে বিদ্যুৎ—যা চমকায়, চট্চট্ শব্দ করে। মানুষের মনে ত্রাস হয়। আবার সেই মেঘ নিজেকে গুটিয়ে নেয়। ঝর্ঝর্ শব্দে জল পড়ে। যাস্ক বলেছেন, 'জঝ্ঝ জঝ্ঝ' শব্দে জল পড়ে। জঝ্ঝতি = জল। "জঝ্ঝতিঃ আপঃ ভবন্তি শব্দকারিণ্যঃ।" (নিরুক্ত, ৬।১৬।১৪)

যাস্ক 'বেকনাট' (দ্বি+এক+√নট্) শব্দের অর্থ বলেছেন 'কুসীদজীবী' (সুদখোর)। এককে দুই করার চেষ্টায় সবসময় নাচছে সুদের কারবারি। √নট্ = নাচা।

বেদের ভাষায় 'তোকম্' = সন্তান (নিঘণ্টু, ২ অপত্য-নাম)। "বলং তোকায় তনয়ায় জীবসে" (ঋগ্বেদ, ৩।৫৩।১৮)—বাঁচার বল দাও মোদের সন্তান সন্ততিকে হে (বেদের ভাষা ও ছন্দ)। 'ভূরিতোকাঃ' = অনেক সন্তানের জনক-জননী। 'নিষ্টক্রাসঃ' = বস্ত্রহীনরা। রবীন্দ্রনাথের ছন্দস্—"আছে যার ভুরি ভুরি" অথবা প্রাকৃত জনের মুখের ভাষা 'ভূরিদান' বেদ-মালার একটি মুক্তো। "ভূরি-দা ভূরি দেহি নো/ মা দভ্রং ভূরি-আ-ভর।" (ঋগ্বেদ, ৪।৩২।২০)—তুমি ভূরি-দাতা, দাও ভূরি ভূরি/ অল্প না, নিয়ে এসো ভূরি ভূরি (বেদের ভাষা ও ছন্দ)। তেমনি ছান্দস্ মোতিহারের আরেকটি মোতি 'আদুরি' = আদরণীয় বাঙলায় এসেছে। "বামং বামং তে আদুরে দেবো দদাতু অর্যমা" (ঋগ্বেদ, ৪।৩০।২৪; নিরুক্ত, ৬।৩১।১)—ওরে আদুরি তোকে ঢেলে সাজান অর্যমা। 'বামং' মানে 'বমনীয়ম্'। √বন্ ধাতুটি মুখ্য অর্থ ছেড়ে গৌণ অর্থে ব্যবহৃত হলে কাব্য হয় সুন্দর। যেমন, "সূর্যঃ বমতি"—সূর্যের রশ্মিচ্ছটা বিকীর্ণ হচ্ছে। ভবভূতি বলেছেন ঃ "তেজাংসি বমতি।" (উত্তররামচরিত, ৬ষ্ঠ অঙ্ক) কালিদাসের ভাষা—

"স্পর্শানুকূলা ইব সূর্যকান্তাস্ তদ্ অন্যতেজঃ অভিভবাদ্ বমন্তি।" (শকুন্তলা, ২ অঙ্ক)—সূর্যকান্তমণি স্পর্শে শীতল কিন্তু অন্য তেজের প্রভাবে তাপ বিকিরণ করে। √বম্

'উদ্গার' ক্রিয়ার গৌণ প্রয়োগ ভার্জিলও দেখিয়েছেন ঃ "... turbidus[1] hic caeno[2] vastaque voragine[3] gurges[4]/ aestuat[5], atque omnem cocyto eructat[6] harenam.[7]" (Aeneid, Book VI line 295-304)—"Here, thick[1] with mud[2] and of fathomless flood[3], an eddying current[4] seethes[5] and belches[6] into Cocytus all its sand[7]."

কাব্যাদর্শে দণ্ডী বলেছেন—

"নিষ্ঠ্যুত-উদগীর্ণ-বান্তাদি-গৌণবৃত্তিব্যপাশ্রয়ম্।
অতি-সুন্দরম্ অন্যত্র গ্রাম্যকক্ষাং বিগাহতে।।"

বেদে 'গম্ভীর' = গভীর। "গম্ভীরাঁ উদধীর্ ইব" (ঋগ্বেদ, ৩।৪৫।৩)—গভীর সমুদ্রের মতো (বেদের ভাষা ও ছন্দ)। লাঙ্গল শব্দ ছান্দসিক। "শুনং কৃষতু লাঙ্গলম্" (ঋগ্বেদ, ৪।৫৭।৪)—সুখে চষুক লাঙল (মাটি)। লাঙলের 'ফলা' এসেছে বৈদিক 'ফালা' থেকে। "শুনং নঃ ফালা বি কৃষন্তু ভূমিম্" (ঋগ্বেদ, ৪।৫৭।৮)—আমাদের ফাল মাটিতে চষুক সুখে (বেদের ভাষা ও ছন্দ)। জেলেদের 'জাল' (জল+অণ্) বৈদিক। যাস্ক বলেছেন ঃ "জালং জলচরং ভবতি জলে ভবং বা জলে শয়ং বা" (নিরুক্ত, ৬।২৭।৫)—জাল জলে বিচরণ করে, জলেই থাকে বা জলে বিছানো থাকে।

বেদে রাজা বা মোড়ল বোঝাতে 'বিশপতি' আর মহাভারতে 'বিশাংপতি' (পদটি সমস্তপদ এবং ব্যাসবাক্য) শব্দ রয়েছে। "সস্তু শ্বা সস্তু বিশ্পতিঃ" (ঋগ্বেদ, ৭।৫৫।৫)—কুকুর ঘুমোক মোড়ল ঘুমোক (বেদের ভাষা ও ছন্দ)। মহাভারতে—"কিং বালিশমতিং রাজন্ ন আস্থিতঃ অসি বিশাংপতে।/ গতাস্ তে সময়ং কৃত্বা নৈতদ্ এবং ভবিষ্যতি।।" (বনপর্ব, ৮।৭)—ওহে রাজা! ওহে দলের পতি! তুমি এত বোকা? তারা শপথ করে চলে গেছে, আর ফেরার সম্ভাবনা নেই। (সময় = শপথ)

বেদ (ঋগ্বেদ, ১০।১০।১৩) ও নিরুক্তে (৬।১৮।৪) 'লিবুজা' মানে লতা (= ব্রততি), জহ্বা = জিভ (√হেব)।

ছন্দস্ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত জন-গণেশের উচ্চারিত আধুনিক ভাষার সৌষ্ঠবে ছড়িয়ে থাকা স্বল্প প্রচলিত এবং অপ্রচলিত শব্দ-সন্ধানে বেদ-মহাভারত পথ দেখাতে পারে আজও। এমনকি অধুনা-প্রচলিত একটি অশ্লীল বাঙলা শব্দ ভাঙলে বেরিয়ে আসে ছান্দসিক ধাতু—যার অর্থ আজও বদলায়নি। বার্তিককার কাত্যায়নকে সমর্থন করে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি তাঁর সমাজে অ-প্রচলিত কয়েকটি ক্রিয়াপদের উল্লেখ করেছেন। শব্দগুলি—উষ (<√বস্) = উষিতাঃ (বাস করেছিল), তের (<√তৄ) = তীর্ণাঃ (পার হয়েছিলে), চক্র (<√কৃ) = কৃতবন্তঃ (করেছিলে), পেচ (<√পচ্) = পক্কবন্তঃ (রেঁধেছিলে)। প্রত্যেকটি ক্রিয়াপদ

ধাতুগুলির লিট্‌-লকারের মধ্যম পুরুষ বহুবচনের রূপ। নিঘণ্টু এবং বেদে পাওয়া পথ্যা (ঋগ্বেদ, ১০।১৪।২) সংস্কৃতে নেই (সং পন্থা), যার অর্থ হলো পথ। কিন্তু অপভ্রংশে আছে স্খলিত চেহারায়—পথ্‌থা। য-কার উচ্চারণের দাপট জিভ সইতে পারেনি।

মহাবৈয়াকরণ পতঞ্জলির উচ্চারণ প্রসঙ্গে আসা যাক। মহাভাষ্যের ভূমিকা 'পস্পশা আহ্নিক'-এ 'মিশ্রিতব্যম্' না বলে উচ্চারণ করেছেন 'ম্লেচ্ছিতবৈ'। 'তব্য' প্রত্যয়ের বদলে 'তবৈ' প্রত্যয় আর র-ফলার বদলে ল-কার উচ্চারণ বেদের ভাষার অনুরণন নয় কি? পাণিনিকে স্মরণ করলেই বোঝা যাবে, পতঞ্জলির মুখোচ্চারিত ভাষার নাম ছিল 'ভাষা'। ভাষার নাম 'সংস্কৃত' তখনো হয়নি। ম্লেচ্ছন = মিশ্রণ। সেই বেদ থেকে আজ পর্যন্ত র ও ল যখন তখন স্থান পালটায়। তার ছোট্ট একটি উদাহরণ শরীল = শরীর।

ভাষা স্খলিত-রূপ থেকে সংস্কৃত-রূপ পায়, আবার সংস্কৃত-রূপ থেকে স্খলনের দিকে যায়। এই প্রক্রিয়াই চলে আসছে, চলবেও। যেকোন ভাষার স্খলিত চেহারা (un-organised form) নেওয়ার প্রবণতা আছে, প্রয়োজনীয়তাও আছে। অনেকটা দিন-রাত্রির মতো। ভাষা 'un-organised' না হলে 're-organised' হবে কী করে? প্রাকৃত ভাষা আর সংস্কৃত ভাষার আলগা বাঁধন আর বজ্র-বাঁধন লোকভাষা আর পণ্ডিতি ভাষার স্পষ্ট পদচিহ্ন নয় কী?

বিবৃতি (Hiatus) বৈদিক ভাষার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য—অজএকপাদ। অপভ্রংশেও এমন নজির মেলে—গুরুউবএসেঁ। যদি বলি আমাদের বাঙলাতেও আছে! 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।' 'বজ্রাঁটুনি' বললে আঁটুনির বজ্রদৃঢ়তা টলে যাবে যে! তাই সেই দৃঢ়তাকে অটল রেখে আরামপ্রিয় জিভ উচ্চারণ করতে অভ্যস্ত 'বজ্র আঁটুনি'। মহা মহা পণ্ডিতরা এ-সত্য স্বীকার করে গেছেন। ভেঙে কথা বললে শব্দ ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। শব্দ ধ্বনিময়—উচ্চারণসর্বস্ব। তাতে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'বেগের আবেগ' ('বলাকা')। শব্দের অর্থ আর ব্যঞ্জনা থেকে যায় একইভাবে, পালটায় শুধু ধ্বনি আর উচ্চারণ। যেন জাদুকরের ভোজবাজি! কৌটোর ভিতর কৌটো, তার ভিতর কৌটো। রবীন্দ্রনাথের ভাষা—

"সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরান্তরে।" (বলাকা)

শব্দ ঘোরে প্রাকৃতজনের মুখে মুখে। খোলস বদলায়। কালের গর্ভে কিছু শব্দ যায় হারিয়ে। কেউবা হয়ে থাকে শব্দ-জীবাশ্ম। ভাষাতাত্ত্বিক, শব্দবিদ্, শব্দবিজ্ঞানীরা কখনো হদিশ পান, আবার কখনো পান না। "উত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোতি এনাম্" (ঋগ্বেদ, ১০।৭১।৪)—শুনেও শোনে না কেউ কেউ একে (বেদের ভাষা ও ছন্দ)। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"শব্দময়ী অপ্সররমণী,
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।" (বলাকা)

আধেক ধরা পড়েও শব্দের আধেক থাকে বাকি। কারণ, তার অনেকটাই অস্পষ্ট—অনাবিষ্কৃত।

"বলিতে না পারে স্পষ্ট করি—
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।" (ঐ)

বাক্যপদীয়কার ভর্তৃহরিও বোধহয় তাই অনুভব করেছিলেন। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র তো বটেই।

ভাষা তার পদচিহ্ন রেখে যায় বংশানুক্রমে—দূর হতে দূরান্তরে। 'বংশ' মানে পাঠককুল আর গুরুশিষ্যপরম্পরা। পাঠকবর্গ প্রত্যক্ষ বা অ-প্রত্যক্ষভাবে এই দুই নৌকারই হালের মাঝি। বংশপরম্পরায় থেকে যায় পুনরাবৃত্তি (repetition) এবং কুশীলকবৃত্তি (plagiarism)। এইভাবেই চার বেদ, দুই মহাকাব্য আর সমৃদ্ধ সাহিত্যের জন্ম। আর আমরা? আমরা বেদের ঋষি, ব্যাস, বাল্মীকি, বিদ্যাপতি, রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার, শিব্রাম, জগদীশচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষা আর ভাবকে বয়ে নিয়ে চলেছি ভগীরথের মতো। আমরাও কুশীলক—আবার কুশীলক নই-ও। কেন?

"মাটি-চোর গাছগুলো, মাটিরাও গাছ-চোর
একে যদি চুরি বল সকলেই জোচ্চর
পৃথিবীটা হলো কিসে? সূর্যের গা-চুরি না?
এটাকে বলছ চুরি? কথাগুলো গা-জুরি না?"
(বেদ ও শ্রীঅরবিন্দ—গৌরী ধর্মপাল, পৃঃ ৯২) ❑

উৎস নির্দেশ

১। বেদের ভাষা ও ছন্দ—গৌরী ধর্মপাল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৯ সং
২। বেদ ও শ্রীঅরবিন্দ—গৌরী ধর্মপাল, শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৯৮১ সং
৩। নিরুক্তম্—অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত, ১-৩ খণ্ড, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৫ সং
৪। নিঘণ্টু—পরিতোষ ঠাকুর সম্পাদিত বেদগ্রন্থমালা, ১ম খণ্ড, বেদ প্রকাশন
৫। রামেন্দ্র-রচনাবলী—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ৩য় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৬ সং
৬। Aeneid Book VI line 295-304, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের লাতিন ভাষার শিক্ষক প্রদীপ ঘোষ অনূদিত
৭। সঞ্চয়িতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৯৬ সং
৮। মহাভাষ্যম্—পস্পশা আহ্নিকম্—সঙ্ঘমিত্রা দাশগুপ্ত সম্পাদিত, দোলা প্রিন্টার্স, ১৩৭৭ সং

কালো মেয়ে

শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়

কালো মেয়ে, তোমার চোখের মাঝে কি আছে জানি না
সুষুপ্ত ভাষায় কি মধুরিমা মিশিয়ে কোথায়
চলেছ অবাক সুরে প্রাত্যহিক জীবনের সাথে,
নীরব প্রহরে শুধু মাঝে মাঝে পরিচয় পাই!

গভীর অতলে আছে সঞ্জীবিত আরেক আকাশ
সেখানে আমার ভাষা পায় নাকো আলো
কিছু বা রহস্যে ঘেরা কিছু অজানিত,
জানি মনে ভুলি নাই পৃথিবীতে এইটুকু ভাল!

যখন ফাল্গুন আসে সঙ্গোপনে অবাক আমায়
শালিকের শিশু সেথা খুশি মনে লুটোপুটি খায়
ভুলে যাই পৃথিবীতে আছে কিছু গৈরিক আভাস
সেখানে আমার মন অকস্মাৎ ছুটে চলে যায়!

কালো মেয়ে, তোমার হৃদয়ে আছে অতলান্ত আশা—
আমারে অবাক করে যেইদিন পাই কিছু ভাষা!

অনুরাগ

বুদ্ধদেব রায়

আমাকে তুমি ভালবাস।
তোমার মঙ্গলহস্ত আমার মস্তকে তুমি রেখেছ;
ধরে রেখেছ আমায়,
বসেছ আমার হৃদয়াসনে।

প্রতি মুহূর্তে, আমার প্রত্যেক কর্মে দৃষ্টি রেখেছ;
আমার কোন কথা, কোন আবেগই
তোমার অজানা নয়।
তুমি আমার আনন্দের সাথী, ব্যথার ব্যথী।

আমি দেখেছি
যখনি তোমার থেকে দূরে সরে যাই,
তোমার চোখে বেদনার আভাস; করুণ মিনতি।
এসবই আমি জানি,
হৃদয়ঙ্গম হোক বা না হোক।
তোমাকে আমি আরাধনা করি সকালে, সন্ধ্যায়।

দুঃখ হয় তবু—
অগাধ ভালবাসা তোমার প্রতি
কেন আমার হৃদয়ে জাগে না।
কেন—কেন—কেন?

হে দয়াময়—
তোমাকে আমি ভালবাসতে চাই।
প্রার্থনা করি তোমারই কাছে
তুমিই আমায় শেখাও
তোমাকে ভালবাসতে।

অনুভব

রতন ভট্টাচার্য

অন্ধ রাত্রির বুক ছেঁকে
তুলে এনেছি 'রা'-কারান্ত সাধনপথে
অনুপ্রেরণা দিয়েছে 'ম' ধ্বনির অনুপ্রাস।
সহস্রাব্দীর কৃত্রিমতাতেও হারায়নি
'কৃ'-ধাতুর উপযোগিতা। জীবনযন্ত্রণার
উষ্ণ প্রদাহে জ্বালা ভুলতে
পাশে আছে 'ষ্ণ', অনুভবে এলে তুমি।
ধোপার গামলায় মনকে চেতনার রঙে রাঙাতে
বারবার ছুটেছি বেলুড়, দক্ষিণেশ্বরে।
গভীর শ্রদ্ধায় চোখ বুজে যতবার
হেঁটেছি আত্মবিশ্লেষণের পথে,
উত্তর পেয়েছি একটাই—বিশ্বচেতনা রামকৃষ্ণময়।
আঘাত-ব্যাঘাত-আনন্দ, সমস্ত উৎসের
গর্ভগৃহে সদানন্দ মূর্তিতে তুমিই
দাঁড়িয়ে আছ সর্বদা, 'ওঁ'-কার রূপী
সৎ-চিৎ-আনন্দময়।

ব্যাপ্ত বাতায়ন থেকে

শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

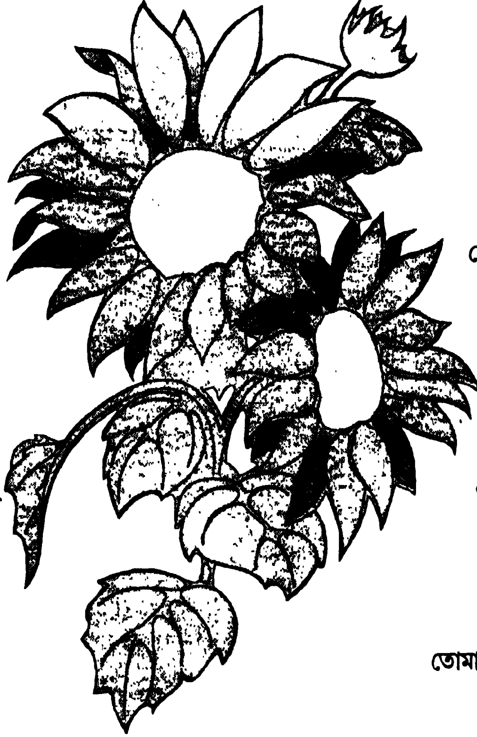
উপলখণ্ডে অবরুদ্ধ পথ
চড়াই দীর্ঘায়ত সম্মুখে আমার
তবু যেতে হবে অনেক অনেক দূর,
যেখানে জেগে আছে আর্য সকাল
যেখানে মনের মাধুরিমা সত্য ও সততায়
নিত্য রচনা করে ঈশ্বরের বাগান।

সীমা ভেঙে ব্যাপ্তির বাতায়নে
সত্যজিৎ আমি
এখন ব্যাপ্ত বাতায়ন থেকে চেয়ে চেয়ে দেখা
সীমাহীন আকাশপারে 'একম্, অদ্বিতীয়ম্'।

কেন্দুবিল্বের ডাক

অরুণ মৈত্র

অজয়ের পারে পারে
সারা অঙ্গ ধুয়ে নিয়ে
গেরুয়ার জলে
যেন বারবার ফিরে ফিরে আসি।
ঐ যে অদূরে দেখি
ভস্মঢাকা বল্মীকের স্তূপ
স্তব্ধ হয়ে আছে—
কত কথা, কথকতা করে
এখন নির্বাক;
আর
অন্যদিকে তার
ধুনি জ্বেলে ধ্যানমগ্ন ধূম্রজালে ঢাকা
এক অলৌকিক সত্তা অভিনব।
বিষয়ী বিবেক নিয়ে
আমি এর কোন অর্থ খুঁজেই পাই না...
কিন্তু তবু বারবার ঘুম ভেঙে
জেগে জেগে উঠি
পায়ে পায়ে হেঁটে গিয়ে
পদতলে বসি।
বুকের পাঁজর ভেঙে
কান্না ঝরে যায়
অঝোর ধারায়;
কে হে তুমি বাজাও বাঁশরি
নিশিদিন আমার অন্তরে।



চোখ

সোমা দত্ত

চোখে চোখ রাখলে
দেখি,
কথা, নীরবতা,
শোক-দুঃখ-অশ্রুবিন্দু
জমাট তারল্যে।

দেখি,
চোখে চোখে উল্লাসের ধ্বনি—
যেন মৃত্যুগন্ধলাঞ্ছিত
এ-পৃথিবী
শেষকথা নয়।

চোখে চোখ রাখলে
দেখি, চোখের গভীরে
অপেক্ষমান সমস্ত ক্রন্দনে
এক রাজপুত্রের বিনিদ্র রজনী;
রাত্রির রাজপথে
তাঁর একা নিষ্ক্রমণ।

তবু, দৃষ্টির দিগন্ত পেরিয়ে
প্রতিটি চোখে—
তোমারই নিরবচ্ছিন্ন তাকিয়ে থাকা।

চোখে রাখলে চোখ,
প্রভু,
নির্ভুল দেখি তোমাকেই।

তোমার রাজ্যে

দিব্যেন্দু হালদার

তোমার কৃষ্টি, বিশ্বসৃষ্টি, নিত্য আলোর রেখা।
স্বরূপ-অরূপ, মিলনমেলা, যায় গো শুধু দেখা।।
আলো-আঁধার, জড়-চেতনে খুঁজে বেড়াই মিল।
তোমার রাজ্যে কোন কার্যে নেইকো গোঁজামিল।।

সুখ-দুঃখ, অসুখ-বিসুখ, শোক-অশোকের জ্বালা।
জোয়ার-ভাটা, দুয়ার আঁটা, সূর্যাস্তের খেলা।।
হিত-বিপরীত, গ্রীষ্ম ও শীত ধরে আকাশ নীল।
তোমার রাজ্যে কোন কার্যে নেইকো গোঁজামিল।।

এপার-ওপার, সাগর নদী ছুটছে নিরন্তর।
রাগ-বিরাগের ব্যথায় কাঁদে ঘুমন্ত অন্তর।।
বাদী-প্রতিবাদী, আদিম-নবীন খোলা আবদ্ধ খিল।
তোমার রাজ্যে কোন কার্যে নেইকো গোঁজামিল।।



ছোট-বড়, লম্বা-খাটো রয় গো পাশাপাশি।
সীমা-অসীমায়, বিশ্বভূমায় গড়া কান্না-হাসি।।
পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্ম সমান সমান, ভরা বিশ্বনিখিল।
তোমার রাজ্যে কোন কার্যে নেইকো গোঁজামিল।।

সাদা-কালোয় নেইকো বাধা, একসাথেতে মিশে।
দুঃখ-সুখের ঢেউ খেলানো, জগৎ ওঠে হেসে।।
কোমল-কঠোর অমল মিলে, নেইকো ফাঁকা বিন্দু-তিল।
তোমার রাজ্যে কোন কার্যে নেইকো গোঁজামিল।।

আসল-নকল এক হয়ে যায়, ধনী-নির্ধন শেষে।
চোখের দেখা, মুখের কথায় যায় গো ভালবেসে।।
সরল-গরল, কঠিন-তরল এক করে সব দিল।
তোমার রাজ্যে কোন কার্যে নেইকো গোঁজামিল।।

"...প্রিয়েরে দেবতা"

জয়দীপ ঘোষ

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন ঃ "অগ্নি তুমি শান্তিজল তুমি।"

বিবেকানন্দ অবশ্যই অগ্নি। সমস্ত অর্থেই। তিনি নিজে জ্বলেছেন সারাজীবন। সে-আগুন তাঁর বুকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেব। আর নরেন পুড়েছে ধূপের মতো। "আমার এ-ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে।" ১৮৯৯-এর ১ নভেম্বর একটি চিঠিতে নিবেদিতাকে লিখছেন স্বামীজী ঃ "কাউকে না কাউকে এজগতে দুঃখভোগ করতেই হবে; আমি খুশি যে, প্রকৃতির কাছে যারা বলিপ্রদত্ত হয়েছে আমিও তাদের একজন।" কিংবা ১৯০০ সালের ২৮ মার্চ মেরি হেলকে পাঠানো অট্টহাসি—"হাঃ হাঃ বোকা মেয়ে, ভালমন্দ দুই-ই আমার উপভোগ্য।... I am Jesus, I am Judas Eskariot. Both my play my fun. Now I am going to be truly Vivekananda." একটু আগে আমরা একে বললাম 'অট্টহাসি'। শুধু তাই? বৃষ্টিপতনের শব্দের মতো কোন যন্ত্রণার ক্ষরণ শোনা যাচ্ছে না? মৃদুতম সেই শব্দ, ভাল বোঝা যায় না। যেমন, শীতভোরের কুয়াশার মধ্যে দাঁড়ালে বোঝা যায় না মনটা হঠাৎ ভাল হয়ে উঠল, নাকি খারাপ! আনন্দ আর ব্যথার সীমারেখা অস্পষ্ট হয়ে যায় বিবেকানন্দে এসে।

বাড়িতে দারিদ্র্যের দুঃসহ ভার! বাবা মারা গেছেন সদ্য। চাকরির সন্ধানে ঘুরছে যুবক নরেন্দ্রনাথ, কিন্তু চাকরি কৈ? (আজ আমরা রসিকতা করে কেবল এইটুকুই বলতে পারি—'ভাগ্যিস!') রোদ্দুরে ঘুরতে ঘুরতে পায়ের তলায় ফোস্কা পড়ে গেছে তার। মনুমেন্টের ছায়ায় বসে পড়ে এই যুবক। বাড়ি ফিরে যাবে? সে জানে, বাড়িতে খাবার নেই। পেট ভরে জল খেয়ে বাড়ি ফিরে সে মাকে বলে বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাওয়ার বানানো গল্প। কিন্তু, এ কিছু নয়। যিনি বিবেকানন্দ হবেন, এ তো তাঁর প্রাপ্য। কিন্তু এরপর, বিশ্বাসঘাতকতা আর শঠতার যে নির্লজ্জ প্রদর্শনীর হাট খুলে গেল নরেন্দ্রনাথের সামনে, বিবেকানন্দ তাকে ভুলতে পারেননি কখনো। মনে পড়ে 'সখার প্রতি' কবিতার ঐ লাইন কয়খানা? "হও জড়প্রায়, অতি নীচ, মুখে মধু, অন্তরে গরল—/ সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ, তবে পাবে এ-সংসারে স্থান।" সম্পত্তির লোভে আত্মীয়স্বজনরা মামলা করতেও পিছপা হয়নি সেদিন!



অবশ্য, এও সয়ে যায়। "We learn through smiles, tears we learn."—মেরি হেলকে লিখেছিলেন একবার।[1] "যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি"—দক্ষিণেশ্বরের এক 'মূর্খ' ব্রাহ্মণ তো বহুদিন আগেই বলে গেছেন। নরেন্দ্রনাথ শিখছে। 'বিবেকানন্দ' হয়ে ওঠা শিখছে। সেই ব্রাহ্মণের পদতলে বসে বলছে—আমায় নির্বিকল্প সমাধি দিন। নির্বিকল্প সমাধি? "লজ্জা করে না তোর একথা বলতে?" —ধমকে ওঠেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মুহূর্তে কান্নার গমকে ভরে ওঠে সমস্ত শরীর। এ কী বলছেন ঠাকুর? মুক্তি নেই, মুক্তি নেই কোথাও! শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ হাতে রণসজ্জা পরিয়ে দেন তাঁকে। পৃথিবীর প্রান্তরে তাঁকেই কাঁধে বয়ে বেড়াতে হবে যোদ্ধার দায়। সমস্ত মানুষের হয়ে শরবিদ্ধ হতে হবে তাঁকে। সেই তাঁর নিয়তি। দুঃখের ক্রুশকাঠ কাঁধে নিয়ে সেই পথ হাঁটার শুরু। এই হলো 'true Vivekananda'। এই হলো ধূপের ধোঁয়া।

ধূপ? নাকি মশাল? নাকি দুই-ই? একটা বড় মশাল থেকে ছোট ছোট নানা মশালে আগুন ছড়িয়ে যাওয়া।

---

১ পত্রাবলী—স্বামী বিবেকানন্দ, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯০০

অলিম্পিক খেলায় যেমন হয়! কত বিখ্যাত, নাতি-খ্যাত, অখ্যাত মানুষের ধারাবাহিক জ্বলে যাওয়া ঐ এক আগুনে। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর সুবিশাল গ্রন্থ 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ'-এর একেবারে শেষে তেমনি একজনের কাহিনী শুনিয়েছেন। এক ফরাসী নারী, নাম সিমন এঁভ্যা। তখন তিনি জীবনমৃত্যুর মাঝখানে যন্ত্রণাকাতর, একা। শুয়ে আছেন শেষশয্যায়। হঠাৎ দেখলেন, এক অপরূপ 'আলোকিত বরতনু'। কে? কে? কয়েকদিন আগে 'রাজযোগ' বইটি পড়েছিলেন তিনি। বইটির লেখক এক ভারতীয় সন্ন্যাসী, নাম স্বামী বিবেকানন্দ। ইনি কি সেই তিনি? হ্যাঁ, তিনিই তো। বিবেকানন্দ হাসছেন। অসহ্য, অসহ্য! "স্বামীজী, আপনি হাসছেন! আমি মৃত্যুশয্যায়, যন্ত্রণার শেষ নেই, তবু হাসছেন! কী নিষ্ঠুর আপনি।" উদ্ধত ক্রোধে মুখ ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছেন সেই নারী, হঠাৎ চোখে পড়ল ঐ সন্ন্যাসীর শরীরে। এ কি! ওঁর বুকে অত বড় ক্ষত কেন? রক্ত ঝরছে ঐ ক্ষত থেকে। হাসছেন, তবু হাসছেন তিনি। ধীর 'ঘণ্টাধ্বনির মতো' কণ্ঠ বাজল তাঁর—"ভয় পেও না, নিরাশ হয়ো না। তুমি দুর্বল নও। বাঁচতেই হবে।... রক্ত ঝরবে। এজগতে তবু হাসব আমরা।"

"এজগতে তবু হাসব আমরা।" যত দুঃখ যত ব্যথা তত হাসি। নিঠুরতার সম্রাট বিবেকানন্দ এই শিক্ষা দিয়ে গেলেন। আর তাঁর সবচেয়ে প্রিয় যারা, তাদের উদ্দেশে এই প্রার্থনা—"তোমরা যেন জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো মরতে পার—এই সবসময় বিবেকানন্দের প্রার্থনা।" কী বলা যাবে এরপর? তফাৎ যাও, তফাৎ যাও, এই মানুষটার বেশি কাছাকাছি যাওয়া ভাল নয়।

আমাদের মনে পড়বে স্বামীজীর 'পানপাত্র' (The Cup) কবিতাটি। তিনি তাঁর নিজে হাতে বিষপাত্র তুলে দিতে চাইছেন তাদের হাতে, যারা সবচেয়ে কাছের, সবচেয়ে প্রিয়—"এ নির্মম নিরানন্দ/ নিঃসঙ্গ সাধন—আর কারো তবে নয়,/ এ শুধু তোমার।" বিবেকানন্দ কল্যাণময়, বিবেকানন্দ সর্বজীবের পরিত্রাতা—ভুল, ভুল। অন্তত অর্ধসত্য। সকলের জন্য পরিত্রাণ বয়ে আনতে ভারি বয়ে গেছে তাঁর! আর সকলের পরিত্রাণের জন্য কাউকে কাউকে পুড়ে যাওয়ার নিষ্ঠুর আশীর্বাদ প্রাণ ভরে দিয়ে গেছেন তিনি। "যে-ব্যক্তি সত্য সত্য জগতের দায় ঘাড়ে নেয়, (সে) জগৎকে আশীর্বাদ করতে করতে আপন পথে চলতে থাকে, তার মুখে একটিও নিন্দার কথা, একটিও সমালোচনার কথা থাকে না।... সে স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেই পাপ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে।... যারা পরিত্রাণ পাচ্ছে এ-কাজ তাদের নয়।"[২] এক অনাবিল ভোরবেলায় নিবেদিতাকে একখানি অসামান্য চিঠিতে একথা শোনাচ্ছেন স্বামীজী!

এই হলো আগুন। দাবানলের মতো অশান্তিময় আগুন। আর আগুন নেভাবার জল? শান্তিজল? সে-ও এই। বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-তীর্থে আরো অনেকের সঙ্গে আসেন তথাকথিত নিচু জাতের কিছু মানুষ; আসেন বারবনিতারা, আসেন সেই তাঁরা—আমরা ভদ্রলোকেরা যাঁদের 'ছোটলোক' বলে সুখ পাই। সমাজে নানা গুঞ্জন ওঠে। কেউ কেউ প্রত্যাখ্যান করার কথা ভাবেন এই সঙ্ঘকে। সেইসময়ে স্বামীজীর অন্য গুরুভাইরাও যেন কিছুটা দ্বিধায়। কী করবেন তাঁরা? তাঁরা তাঁদের নেতার আদেশ শুনতে চান। স্বামীজী শশিভাইকে সাগরপার থেকে চিঠিতে লিখলেন—"যাহারা ঠাকুরঘরে গিয়াও ঐ বেশ্যা, ঐ নিচজাতি, ঐ গরিব, ঐ ছোটলোক ভাবে—তাহাদের সংখ্যা যত কম হয় ততই মঙ্গল। যাহারা ভক্তের জাতি বা যোনি বা ব্যবসায় দেখে, তাহারা আমাদের ঠাকুরকে কি বুঝিবে? প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যে, শত শত বেশ্যা আসুক তাঁর পায়ে মাথা নোয়াতে, বরং একজন ভদ্রলোক না আসে নাই আসুক।"[৩] এই চিঠি, বলা চলে, তথাকথিত ভদ্রলোকদের গালে উত্তম এক থাপ্পড়!

আবার এমন মায়ের মতো ডাকই বা কজন জানে? মেরি হেল তখন সদ্য হারিয়েছেন তাঁর পিতাকে। মৃত্যুকে সেই তাঁর প্রথম কাছ থেকে দেখা। হাহাকারে দীর্ণ হয়ে আছে হৃদয়। 'চিরবিশ্বস্ত ভ্রাতা' বিবেকানন্দ তাঁকে বললেন ঃ "যদি আমাদের দুঃখ বিনিময় করা সম্ভব হতো এবং তোমাকে দেওয়ার মতো আনন্দভরা মন যদি আমার থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই বলছি, চিরদিনের জন্য তোমার সঙ্গে তা বিনিময় করে নিতাম।"[৪] আজ যদি স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হতো আমাদের, তাহলে বলতাম—বসুন, ঝগড়া আছে। কেন আপনি সমস্ত দুঃখ এভাবে নিজের কাঁধে নিয়ে নিয়ে বেড়ান? কেন আপনি এমন ভাষায় চিঠি লেখেন? এইসমস্ত চিঠি পড়ে আমাদের কষ্ট হয়, কষ্ট হতে থাকে, বোঝেন না? আপনার জন্য, আপনাকে ভালবাসি বলে কষ্ট হয়। এত যন্ত্রণা ধারণ করতে কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল আপনাকে?

মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল তখন ভারতে আসতে চান। জানতে চান ভারতবর্ষের ধর্ম, তার শিক্ষা আর সংস্কৃতিকে। এদেশের রৌরব দারিদ্র্যের পাশে দাঁড়াতে

২ পত্রাবলী, ৬ ডিসেম্বর ১৮৯৯ ৩ ঐ, ২৩ আগস্ট ১৮৯৬ ৪ ঐ, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯০০

চান। সেজন্য বিবেকানন্দের অনুমতি প্রার্থনা করলেন তিনি। বিবেকানন্দ সাদর আমন্ত্রণ জানালেন তাঁকে—"ভারতের জন্য, বিশেষত, ভারতের নারীসমাজের জন্য পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। ... তুমি ঠিক সেইরূপ নারী।"[৫] কিন্তু এই উদাত্ত আহ্বানের পাশাপাশি বিশেষভাবে সাবধান করে দিলেন মার্গারেটকে—"এদেশে এলে তুমি নিজেকে অর্ধ-উলঙ্গ অসংখ্য নরনারীতে পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে। তাদের জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে বিকট ধারণা; ভয়েই হোক বা ঘৃণাতেই হোক—তারা শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে এবং তারাও এদের খুব ঘৃণা করে। পক্ষান্তরে শ্বেতাঙ্গরা তোমাকে খামখেয়ালী মনে করবে এবং তোমার প্রত্যেকটি গতিবিধি সন্দেহের চোখে দেখবে।" তবু, তুমি স্বাগত—বললেন স্বামীজী। কিন্তু যদি বিফল হন মার্গারেট? যদি সাধ্যে না কুলায় কোনদিন তাঁর? ভারতে এসেও কোনদিন যদি ফিরে যেতে ইচ্ছা করে পুরনো বৈভবে? "আমার দিক থেকে নিশ্চয়ই জেনো যে, আমাকে আমরণ তোমার পাশে পাবে—তা তুমি ভারতবর্ষের জন্য কাজ কর আর নাই কর, বেদান্ত ধর্ম ত্যাগ কর আর ধরেই থাক।" নিবেদিতা এক অসামান্যা মহীয়সী নারী, কিন্তু সত্যি বলতে কী তাঁর জায়গায় খুব সাধারণও যদি কেউ হতেন—তিনিও এমন আশ্বাসের পর নির্দ্বিধায় ঝাঁপ দিতেন ভারততীর্থের মহাসরোবরে। আমাদের এমনই মনে হয়। নিবেদিতা বিবেকানন্দকে বলতেন 'রাজা'—'The King'। ইনি হলেন এমন রাজা, যিনি বলতে পারেন—"দুঃখভার জর্জরিত যে যেখানে আছ—সব এস, তোমাদের সব বোঝা আমার ওপর ফেলে দিয়ে আপন মনে চলতে থাক, আর তোমরা সুখী হও এবং ভুলে যাও যে আমি একজন কোনকালে ছিলাম।"[৬]

স্বামীজীকে নানান কারণে শ্রদ্ধা করা যায়, হাজারো কারণে তাঁকে প্রণাম জানানো যায়, লক্ষ কারণে তাঁকে স্মরণ করা যায়। কিন্তু ঐ শেষবাক্যটি লিখতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা কখনো ঘুচবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন যুবক নরেন্দ্রকে বলেছিলেনঃ "(তোর) চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে কাজ করতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে তখন চাবি খুলব।" ঝঞ্ঝাময় উত্তাল প্রায় দুটি দশক কাটিয়ে স্বামীজী বুঝলেন, তাঁর কাজ আপাতত শেষ হয়েছে। এবার দায়িত্ব বুঝে নিক অন্যরা। এবার তাঁর যাওয়ার পালা। "যাই, প্রভু যাই।" ছোট গাছকে জায়গা দেওয়ার জন্য বড় বটগাছকে সরে দাঁড়াতে হবে, অনেক হলো। এইবার, এই শেষ কদিনে দেখি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ছবি, যেন নতুন এক বিবেকানন্দ। তিনি খেলা করেন তাঁর পোষা হাঁসটার সঙ্গে, পোষা ছাগলটার পিছনে দৌড়ান সবকিছু ভুলে। আবার সাধ করে কত কী নামও রাখা হয়েছে তাদের—'হংসী', 'মটরু'!! তিনি নিজ হাতে মঠের জমিতে চাষ করা সাঁওতালদের খেতে দেন। এইসব দৃশ্য আজকের আমরা কেউ দেখিনি। কিন্তু ভাবতে গেলেই এত সারল্যের টানে আমাদের প্রতিদিনের দীনতা-তুচ্ছতা-অপযাপনের ভার একটু যেন সরে যায়, তাই না?

সিস্টার ক্রিস্টিন স্বামীজীকে এই বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেনঃ "A saint is more holy, more pure, more single minded than ordinary men. But with Swami Vivekananda, there could be no comparison. He was a class by himself."[৭] আমরা এত চমৎকার করে কথা বলতে পারি না। এমনকি কখনো কখনো এইসব 'holy-pure-single minded'-জাতীয় বিশেষণগুলি কেমন ভারী মনে হয় আমাদের। আমাদের সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়। দেবতাকে প্রিয় করি। প্রিয়েরে দেবতা। ❑

---

৫ পত্রাবলী, ২৯ জুলাই ১৮৯৭

৬ ঐ, ৬ ডিসেম্বর ১৮৯৯

৭ 'Swami Vivekananda as I saw Him', Reminiscences of Swami Vivekananda, Advaita Ashrama, 2nd Ed., p. 158

সমাধানঃ শব্দচেতনা ৭

পাশাপাশিঃ (১) জগন্নাথদেব, (২) সদা, (৩) হে, (৬) গয়া, (৭) শঙ্করারণ্য, (৯) ঈশ্বর, (১১) গম্ভীরা, (১২) হোসেনশাহ, (১৫) কেলি, (১৬) মে, (১৭) সব্যে, (১৮) ব্রজপ্রেমরস।

ওপর-নিচঃ (১) জগদীশ, (৩) দামোদর, (৫) গোরা, (৬) গণ্য, (৮) রমা, (১০) রসে, (১১) গঙ্গাদাস, (১২) হোলি, (১৩) নদে, (১৪) হরিদাস।

পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের পূতস্মৃতি

শেফালি দাস*

রামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনেতিহাসের বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই নানা অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ, যা একান্ত বাস্তব। তাঁদের মনোদর্পণে ভেসে উঠত মানুষ তথা জীবের হৃদয়কন্দরের নানা সূক্ষ্ম চিন্তারাশি। তাই কোন মানুষ যদি অন্তরের কোন শুভ বাসনা নিয়ে তাঁদের সান্নিধ্যে আসতেন, তাঁরা তা বুঝতে পেরে তা পূরণ করতেন। এই অন্তর্যামিত্ব গুণ তাঁদের পার্ষদদের মধ্যেও দেখা যেত। আমার জীবনে এমন এক ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছিল পূজনীয় স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের সান্নিধ্যে এসে।



আমার বয়স তখন ১৮ বছর। তখন আমরা ঢাকায় থাকি। একবার আমার স্বামী সারগাছিতে গিয়েছেন পূজনীয় মহারাজের দর্শনের জন্য। আমার স্বামীর মনে এক প্রবল বাসনা ছিল। মহারাজকে প্রণাম করে যেই তিনি তা বলতে যাবেন, ঠিক তখনি মহারাজ বললেন ঃ "তুমি ঠাকুরের চরণে আশ্রয় নিয়েছ, আর তোমার স্ত্রীর তো সে-সৌভাগ্য পাওয়া চাই! তাকে নিয়ে এস আমি তাকে দীক্ষা দেব।" আমার স্বামীর মনোগত ইচ্ছা মহারাজ মুহূর্তমধ্যেই বুঝে গিয়েছিলেন। সেদিনই তিনি দীক্ষার দিনক্ষণ ঠিক করে বাড়ি ফিরেছিলেন।

যথারীতি দীক্ষার দিন আমি ও আমার স্বামী সারগাছিতে হাজির হলাম। আমাদের সঙ্গে অবশ্য আমার বড়দাও ছিলেন। তিনি আমার চেয়ে ১৪/১৫ বছরের বড়।

আমাদের দেখাদেখি আমার দাদাও মহারাজের কাছে দীক্ষা নিতে চাইলেন। তাঁর কথা শুনে মহারাজ একটু যেন অবাক হয়ে দাদার মুখের দিকে তাকালেন এবং বললেন ঃ "সে কি! তোমার তো ছোটবেলায় কুলগুরুর কাছে দীক্ষা হয়ে গেছে! আমি আবার কি করে দীক্ষা দেব?" মহারাজের কথা শুনে আমরা তো সবাই বিস্মিত! আমার দাদাও মনে করতে পারলেন না যে, তাঁর দীক্ষা হয়ে গিয়েছে। তিনি তখন পূজনীয় মহারাজের কাছে মন্ত্রদীক্ষা নেওয়ার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। বারবার তিনি মহারাজের কাছে দীক্ষার জন্য অনুনয় করতে লাগলেন। শেষে আমার স্বামীও মহারাজকে খুব ধরে বসলেন। তিনি মহারাজকে বললেন ঃ "মহারাজ, এতদূর এসে ফিরে যাবে! আপনি কৃপা করে এঁকে আপনার চরণে আশ্রয় দিন।" তখন মহারাজ দাদাকে দীক্ষা দিতে সম্মত হলেন। একটু ধ্যানস্থ হয়ে মহারাজ দাদার কুলগুরু প্রদত্ত মন্ত্রই পুনরায় শোধন করে তাঁকে দীক্ষা দিলেন।

এমনই ছিল পূজনীয় স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের অন্তর্যামিত্ব। দীক্ষাগ্রহণের পর আমার অকৃতদার বড়দা ব্রহ্মচারীর মতো জীবনযাপন করতেন। তিনি দীর্ঘদিন বেলুড় বিদ্যামন্দিরের ম্যানেজার ছিলেন। বৃদ্ধবয়সে তিনি বনগাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ঠাকুরের সেবাকাজে নিযুক্ত থেকে জীবনপাত করেন। ❑

---

* চেন্নাই নিবাসী শেফালি দাসের কন্যা শিখা বিশ্বাসের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

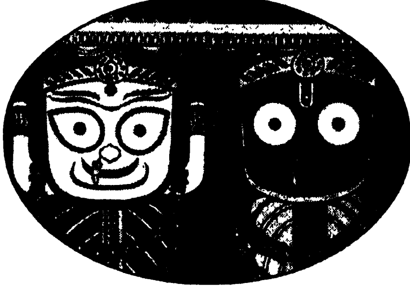
অনুষ্ঠান-সূচী ঃ আষাঢ় ১৪০৯

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে

পূজা-কৃত্য	ঃ	স্নানযাত্রা জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা ৯ আষাঢ়, সোমবার (২৪ জুন ২০০২) রথযাত্রা ২৭ আষাঢ়, শুক্রবার (১২ জুলাই ২০০২)
একাদশী	ঃ	৬, ২১ আষাঢ় শুক্রবার, শনিবার (২১ জুন, ৬ জুলাই ২০০২)

"তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে তুমিই ধন্য ধন্য হে"

স্বামী শ্রীনিবাসানন্দ



গীতামুখে (৯।২২) শ্রীভগবান বলছেন—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং সে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।"

—যেসকল মদ্গতপ্রাণ ভক্ত অনন্যচিত্ত হয়ে সদা আমার উপাসনা করে, আমাতে নিত্যযুক্ত সেইসব ভক্তদের যোগ ও ক্ষেম (আহার্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তু) আমি বহন করে থাকি।

অর্জুন মিশ্র একজন ঈশ্বরপ্রেমী ভক্ত। কিছু পাণ্ডিত্যও আছে। সস্ত্রীক থাকেন নীলাচলে। অতি দারিদ্র্যের জীবন, কিন্তু সন্তোষ ও আনন্দে পূর্ণ। ভিক্ষান্ন যা পাওয়া যায় তা শুদ্ধভাবে প্রস্তুত করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে উভয়ে সেই প্রসাদ গ্রহণ করেন। নিঃসন্তান বলে তাঁদের অখণ্ড অবসর। নিরুপদ্রব এই তীর্থবাস। শ্রীভগবানের স্মরণ-মননের অঢেল সময়। ব্রাহ্মণীও জপতপ করেন, মনপ্রাণ দিয়ে স্বামীর সেবা করেন, গৃহদেবতার পূজার্চনাও করেন। ব্রাহ্মণ রোজ গীতাপাঠ করেন। একদিন যখন তিনি উপরি উক্ত শ্লোকটি চিন্তা করছেন, তখন মনে সংশয় উপস্থিত হলো—একি কথা? যিনি ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান, তিনি কি ভক্তের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু নিজে মাথায় করে বহন করেন? না তা হতেই পারে না। তাহলে কি হবে? ওটি 'দদাম্যহম্' (আমি দান করি) হলেই সমীচীন হয়। অর্থাৎ ভগবান ভক্তকে আহার্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তু দান করেন।

এই সিদ্ধান্ত করেই ক্ষান্ত হলেন না পণ্ডিতাভিমানী মিশ্রজী। তৎক্ষণাৎ কলমের লালকালিতে 'বহাম্যহম্' কেটে 'দদাম্যহম্' লিখে সুস্থির হলেন। হ্যাঁ, এই ঠিক হয়েছে।

অতঃপর তিনি ভিক্ষায় বের হলেন। ভিক্ষা কিন্তু সহজে মিলল না, অনেক দেরি হতে লাগল। এদিকে বেলা বেড়ে দুপুর হতে চলল, স্বামীর দেখা নেই। ব্রাহ্মণী ঘরবার করছেন—কখন ভিক্ষা আসবে, রান্না করে ঠাকুরকে নিবেদন করা হবে, তারপর প্রসাদ পাওয়া।

ইত্যবসরে এক কাণ্ড ঘটল। দুটি সুদর্শন বালক ব্রাহ্মণীর গৃহদ্বারে এসে উপস্থিত হলো। একজনের বর্ণ শ্যামল, অন্যজনের গৌরবর্ণ। মাথায় তাদের চাঙারি—শ্রীজগন্নাথদেবের নানাপ্রকার অতি মহার্ঘ মহাপ্রসাদ, সুগন্ধ বের হচ্ছে চাপা দেওয়া কাপড়ের মধ্য থেকে।

বিস্মিতা ব্রাহ্মণী তাদের মাথা থেকে চাঙারি নামিয়ে বললেন: "কে এমন নিষ্ঠুর যে এইসব দুধের বালকদের মাথায় এই বোঝা চাপিয়েছে?" তারপর তাদের দুজনকে কোলে করে তিনি আদর করতে লাগলেন, কিন্তু সবিস্ময়ে দেখলেন তাদের পিঠ যেন কেউ ধারালো কিছুর দ্বারা কেটে দিয়েছে এবং তা থেকে রক্ত বেরচ্ছে। বালকেরা উত্তর দিল: "কি বলব মা, আপনাদের বামুনঠাকুর আমাদের পিঠ কেটে দিয়েছে এবং মন্দিরের প্রসাদ আমাদের মাথায় চাপিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

"তাই নাকি? এই বামুনঠাকুর এত নিষ্ঠুর তা তো জানতাম না!" বিস্ময়ে দুঃখে ক্ষোভে ব্রাহ্মণী মূর্ছাগত হলেন। বালকদুটিও এই সুযোগে অদৃশ্য হলো।

কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ ফিরে এসে দেখেন ব্রাহ্মণী মূর্ছিতা, সারা ঘরময় নানাপ্রকার সুগন্ধ প্রসাদসম্ভার। কিছুই বুঝতে পারলেন না তিনি। চোখেমুখে জল ছিটিয়ে তিনি ব্রাহ্মণীর মূর্ছা ভাঙালেন। কিন্তু এ কী! সতী যে অভিমানে পতির সঙ্গে বাক্যালাপই বন্ধ করে দিয়েছেন! অনেক অনুনয় বিনয়ের পর ব্রাহ্মণী বললেন: "এতকাল তোমার সঙ্গে ঘর করলাম, কিন্তু তুমি যে এত নিষ্ঠুর তা তো জানতাম না।" ব্রাহ্মণ বিস্মিত হয়ে বললেন: "কেন? কি করেছি?" ব্রাহ্মণী বললেন: "ঐ দুটি সুন্দর বালকের পিঠ কেটে দিয়েছ, আবার ভারি বোঝা তাদের মাথায় চাপিয়ে দিয়েছ?" —"সে কি আমি?" ব্রাহ্মণ তো শুনে অবাক।

ব্রাহ্মণ আত্মস্থ হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, কিছুক্ষণ পর যেন তিনি সম্বিৎ ফিরে পেলেন, বুঝতে পারলেন, স্বয়ং জগন্নাথ ও বলরাম এসেছিলেন তাঁর ভুল ভাঙাতে। স্বগতোক্তির মতোই বললেন: "হ্যাঁ, আমিই সেই অহঙ্কারী নরাধম। শ্রীভগবানের কথায় অবিশ্বাস! তাঁর শ্রীমুখ-উচ্চারিত কথা কেটেছি, কিন্তু গীতা যে তাঁরই তনু সেই জ্ঞান নেই! ব্রাহ্মণী তুমিই ধন্য। পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে ডাক, এই মহাপ্রসাদ বিতরণ কর। সহজ ভক্তিতে তুমি যা পেয়েছ, আমার পক্ষে তা দুষ্প্রাপ্য।" ❑

এবারের বিশ্বকাপ মাতাবেন যাঁরা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়



বিশ্বকাপ ফুটবল! অলিম্পিকের পরই বিশ্বের সর্বোত্তম ক্রীড়াপ্রদর্শনীর ঘণ্টাধ্বনি তার সুরলহরী নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে আদিগন্ত। আর মাত্র কদিন, তারপর ২৯ মে থেকে তামাম বিশ্ব পরবর্তী একমাস মেতে থাকবে বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে। এবারের বিশ্বকাপ সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, নতুন সহস্রাব্দের প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এশিয়ার মাটিতে। ফুটবলের এই রাজসূয় যজ্ঞ এই মহাদেশে এই প্রথম। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া ভাগাভাগি করে বিশ্বকাপের আয়োজন করেছে। গত বিশ্বকাপের মতো এবারও সারা বিশ্বের প্রতিটি মহাদেশে আঞ্চলিক পর্বের প্রতিযোগিতার পর ২৯টি দেশ ফাইনাল রাউণ্ডে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। গতবারের বিজেতা ফ্রান্স এবং আয়োজক রাষ্ট্র হওয়ার সুবাদে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এখন চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ—কোন্ দেশ চ্যাম্পিয়ন হতে পারে, নতুন কোন্ শক্তির উদয় দেখবে এবারের বিশ্বকাপ? সর্বোপরি কারা হয়ে উঠবে এবারের আসরের বর্ণময় চরিত্র—যাঁদের ক্রীড়াশৈলী রামধনু হয়ে ফুটে উঠবে জাপান-কোরিয়ার আকাশে? এবারের নিবন্ধ তেমনই কয়েকজন সম্ভাব্য তারকাকে নিয়ে।



বিশ্বকাপ ফুটবল ও ব্রাজিল যেন পরস্পরের পরিপূরক বা সম্পূরকও বলা চলে। চারবারের বিশ্ববিজেতা ব্রাজিল এবারও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অন্যতম দাবিদার। আর এই ব্রাজিল দলে আক্রমণের কাণ্ডারি হলেন দুই 'আর' অর্থাৎ রোনাল্ডো ও রিভাল্ডো। '৯৪-এর বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য রোনাল্ডো '৯৮-এ সর্বাধিক আলোচিত ফুটবলার হওয়ার সুবাদে মিডিয়া ও বিশ্ববাসীর অতুলস্পর্শী চাপ সামলে নিজের স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারেননি। তা সত্ত্বেও ব্রাজিল-কোচ লুই ফিলিপ স্কোলারির তুরুপের তাস রোনাল্ডোই। দুবার বিশ্বের সেরা ফুটবলার হয়েছেন তিনি, পেয়েছেন গোল্ডেন বুট। একটা সময়ে সবচেয়ে দামি ফুটবলার ছিলেন, '৯৭-এ ব্রাজিলের কোপা আমেরিকা জয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং '৯৮-এর বিশ্বকাপে মাঝেমধ্যে ঝলসে উঠেছিলেন বটে, তবে ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেননি। গতি, শক্তি ও স্কিল সবই আছে, এবারের বিশ্বকাপে রোনাল্ডোকে স্বমূর্তিতে দেখা যাবে—আশা করা অমূলক নয়।

রোনাল্ডোর পার্টনার রিভাল্ডো আটলান্টা অলিম্পিকে তাঁর পায়ের জাদুতে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন বিশ্ববাসীকে। অলিম্পিকের পারফরমেন্সের ষাট শতাংশ দেখাতে পারলেই ব্রাজিল কেল্লা ফতে করে দিতে পারে। দীর্ঘদেহী রিভাল্ডোর দুটো পা-ই সমান কার্যকরী। হেডেও তিনি যথেষ্ট দক্ষ। প্রথমে ইতালির ইণ্টার মিলান এবং তারপর স্পেনের বার্সিলোনার হয়ে ঘরোয়া ও ইউরোপীয়ান লিগে প্রচুর গোল করে মহাতারকা হয়ে উঠেছেন তিনি। স্বদেশীয় রোনাল্ডোকে টপকে তিনি ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার হয়েছেন গোল করা ও করানোর যুগপৎ মুনশিয়ানার জন্য। এই দুজন ছাড়াও ব্রাজিল নির্ভরশীল উইঙ্গার ডেনিলসনের ওপর, যাঁর গতি ও ড্যাজল ত্রাসের সঞ্চার করে বিপক্ষ ডিফেণ্ডারদের মনে।

ইতালির সুদর্শন যুবক দেল পিয়েরো একার শক্তিতে দলকে চ্যাম্পিয়ন করানোর ক্ষমতা রাখেন। বিশ্ববিখ্যাত জুভেন্তাসের প্রধান স্তম্ভ দেল পিয়েরো ডেড বল সিচ্যুয়েশন থেকে গোল করতে সিদ্ধ। একটু বেশি আঘাতপ্রবণ, না হলে যেকোন পরিস্থিতিতে একার কৃতিত্বে ম্যাচের রঙ বদলে দিতে পারেন। ফ্রান্স বিশ্বকাপে আশানুরূপ খেলতে না পারলেও গত ইউরো কাপে তিনি চিনিয়ে দিতে পেরেছেন তাঁর জাত। ইতালিকে ফাইনালে তুলতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। ফাইনালে অসাধারণ খেলেও দুর্ভাগ্যবশত গোল্ডেন গোলে ইতালিকে হারতে হয়েছিল বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সের কাছে। দেল পিয়েরোর সঙ্গী ক্রিশ্চিয়ান ভিয়েরি সব অর্থেই একজন শিল্পী ফুটবলার। গত বিশ্বকাপে নরওয়ের বিরুদ্ধে তিনি ছবির মতো গোল করেন—যে-গোলটি ঐ বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা গোলের মর্যাদা লাভ করেছিল। বিশ্বকাপ ও ইউরো কাপে প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই গোল করে ভিয়েরি তাঁর কীর্তিখ্যাত পূর্বসূরী পাওলো রোসির কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছেন। অসাধারণ কার্যকরী ফুটবলার ভিয়েরির ওপর ইতালির অনেক আশা। দেল পিয়েরো, জিয়ান ফ্রাঙ্কো জোলা ও ভিয়েরির কম্বিনেশন যদি ঠিকঠাক ক্লিক করে, তবে ইতালিকে রোখে কার সাধ্য! ইতালির ক্যাটানেশিয় ডিফেন্স বরাবরই বিপক্ষ দলগুলির

কাছে শক্ত গাঁট। এই তিন ফরোয়ার্ড যদি নিজেদের খেলা খেলতে পারে, তবে ইতালিও ব্রাজিলের মতো চারবার কাপ জয়ের নিক্তিতে অতুলনীয় গৌরবের অধিকারী হতে পারে।

ইংল্যাণ্ড অনেকদিন পরে বিশ্বফুটবলে বড় শক্তি হয়ে উঠেছে। আর তাদের এই উত্থানের পিছনে যে দুই খেলোয়াড় প্রধান ভূমিকা নিয়েছেন, তাঁরা হলেন ডেভিড বেকহ্যাম ও মাইকেল আওয়েন। বেকহ্যামের গোলক্ষুধা ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড দলকে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। গত বিশ্বকাপে চমৎকার শুরু করেও মাঝপথে মাথা গরম করে ফেলায় ভুগতে হয়েছিল ইংল্যাণ্ডকে। এবার বেকহ্যাম ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক, তাঁর ওপর গুরুদায়িত্ব। জাপান-কোরিয়ায় অসম্ভব জনপ্রিয় তিনি। তাঁর সঙ্গে আওয়েনের যুগলবন্দী এক অন্য মাত্রা এনে দিতে পারে বিশ্বকাপকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইংল্যাণ্ডের এই নয়নের মণি পায়ে গুরুতর আঘাত পেয়ে ছয় সপ্তাহের জন্য শয্যাশায়ী। তাঁর এই আঘাত শুধু ইংরেজদেরই নয়, ফুটবলপ্রেমী সকল মানুষকেই আহত করেছে। তিনি সুস্থ হয়ে উঠে বিশ্বকাপের আসর মাতাবেন—এই প্রার্থনা সারা বিশ্বের।

আর্জেন্টিনার হয়তো মারাদোনার মতো সুপার ন্যাচারাল প্রতিভাসম্পন্ন কোন ফুটবলার নেই, কিন্তু রয়েছেন বহু যুদ্ধের পোড় খাওয়া গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতা-সহ একঝাঁক কার্যকরী ফুটবলার। বাতিস্তুতা দেশের সর্বাধিক গোলদাতা। আন্তর্জাতিক ফুটবলে যথেষ্ট সম্মানীয় চরিত্র। এবারে প্রায় খেলা ছেড়ে দেওয়ার সময়ে তিনি যদি সকলকে ছাপিয়ে যেতে পারেন, তা হবে সোনালী চুলের এই বর্ণময় ফুটবলারের জীবনের প্রকৃত মাহেন্দ্রক্ষণ। তবে বাতিস্তুতা নয়, এবারে আর্জেন্টিনা বিশেষভাবে নির্ভরশীল মাঝমাঠের দুই ফুটবলার ওর্তেগা ও ভেরনের ওপর। গত বিশ্বকাপে ওর্তেগা অসাধারণ খেলেছিলেন। গোটা আর্জেন্টিনা দলকে মাঝমাঠ থেকে চালনা করেছিলেন। জিনেদিন জিদানের ছায়ায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন বলে তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন হয়নি। এবার যদি গতবারের পারফরমেন্সের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারেন, তবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কোন প্রশ্নই থাকবে না। বিশ্বকাপ শুধু নয়, '৯৬-এ রূপো জয়ী আর্জেন্টিনার অলিম্পিক দলের প্রধান কাণ্ডারি হিসাবে ফুটবলবিশ্বে তিনি তাঁর আগমনী বার্তা জানান দিয়েছিলেন। ছোট চেহারার ওর্তেগা যেন মারাদোনার প্রতিচ্ছবি। সারা মাঠ জুড়ে খেলেন, দুই উইংকে সবসময় সচল রাখেন। প্রয়োজনে ডিফেন্সে নেমে এসে অতিরিক্ত স্টপারের কাজ করে দেন। এই ওর্তেগার সঙ্গে হার্ণান ক্রেসপো ও দিয়েগো সিমোনের বোঝাপড়া আর্জেন্টিনার ফুটবল-পাগল মানুষকে ফের কাপ জেতার স্বপ্ন দেখাচ্ছে। সিমোনেও এবার তারকা হওয়ার দাবিদার। গোলটা ভালই চেনেন তিনি। গত দুবছরে আর্জেন্টিনার সিংহভাগ জয় এসেছে সিমোনের জয়সূচক গোলের সুবাদে। আরেক তরুণ ফুটবলার স্যাভিওলাও এবার মিডিয়ার নেকনজরে থাকবেন। গত যুব বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা দলের সর্বাধিক গোলদাতা হওয়ার সুবাদে ইতিমধ্যেই বিশ্বফুটবলে তিনি পরিচিত মুখ, বিশ্বময় ডিফেণ্ডারদের নজরবন্দী।

পর্তুগালের লুই ফিগো এই মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে দামি ফুটবলার। রেকর্ড পরিমাণ ৬ কোটি ডলারের বিনিময়ে বার্সিলোনা থেকে তাঁকে নিয়ে এসেছে রিয়েল মাদ্রিদ। শক্তিশালী কাঠামোর ফিগো একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ ফুটবলার। ড্রিবলিং, পাসিং, শ্যুটিং, হেডিং, গতি, উপস্থিত বুদ্ধি-সহ দলকে চালনা করা—সববিষয়ে একমেবাদ্বিতীয়ম্। জিদান, বেকহ্যাম, রিভাল্ডোর থেকেও কার্যকরী ফুটবলার ফিগো, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে গত ইউরো কাপে। অখ্যাত অনভিজ্ঞ তরুণ ফুটবলারদের নিয়ে গড়া দল পর্তুগালকে তিনি সেমিফাইনাল পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। ফিগোর খেলা দেখে বিমোহিত তাবড় তাবড় ফুটবলবোদ্ধা তাঁকে একবিংশ শতাব্দীর ফুটবলার হিসাবে অভিহিত করেছেন।

একই কথা প্রযোজ্য তাঁর ক্লাব-সতীর্থ স্পেনের স্ট্রাইকার রাউলের সম্পর্কেও। রাউলের খেলা দেখে অনেকে তাঁর মধ্যে পূর্বসূরী এমিলিও বুত্রাগুয়েনোর ছায়া দেখতে পেয়েছেন। যে-দেশে পৃথিবীর সেরা ফুটবল লীগ অনুষ্ঠিত হয়, সেই স্পেন বিশ্বকাপে কোনবারই তেমন সুবিধা করতে পারে না। দেখা যাক এবারে রাউলের স্পেন সেই খরা কাটিয়ে উঠতে পারে কিনা।

অলিভার বিয়েরহফ রিক্ত, ছন্নছাড়া জার্মানি দলের একমাত্র আশার প্রদীপ। '৯৬-এর ইউরো কাপে তাঁর গোলেই জার্মানি ফাইনালে চেক প্রজাতন্ত্রকে হারিয়ে কাপ জিতেছিল। ক্লিন্সম্যানের অবসরে অলিভার বিয়েরহফই মাঠ ও মাঠের বাইরে জার্মানির অবিসংবাদী নেতা। গতবারের 'বিস্ময় দল' ক্রোয়েশিয়া এবারও নির্ভরশীল ডাভর সুকেরের ওপর। ফ্রান্স বিশ্বকাপে সর্বাধিক গোলদাতা সুকের এবারও নায়ক হওয়ার অন্যতম দাবিদার।

নিবন্ধের যতি টানা যাক গতবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স দলের প্রধান কাণ্ডারী জিনেদিন জিদানের কথা বলে। '৯৮-এর বিশ্বকাপের মুখ্যচরিত্র জিদান এবারও তাঁর প্রোজ্জ্বল ফুটবল-শৌকর্য নিয়ে মাঠ মাতাবেন—এমনই ভাবনায় বুঁদ হয়ে আছে কোটি কোটি মানুষ। বিশ্বকাপ, ইউরো কাপ জিতিয়েছেন দেশকে, আরেকবার জেতাতে পারলে পেলে, গ্যারিঞ্চা, বেকেনবাউয়ার, ক্রুয়েফ, মারাদোনার মতো কিংবদন্তিদের সঙ্গে 'হল অফ ফেম'-এ নিজের স্থান করে নিতে পারবেন তিনি। পাশে আছেন ইউরি জোরকায়েফের মতো সুযোগ্য বলপ্লেয়ার। জিদানের স্কিমিং আর জোরকায়েফের স্ট্রাইকিং এবিলিটি আবার ফ্রান্সকে বিশ্বের শীর্ষে তুলে আনতে পারে। ❑

"যাকে যেমন তাকে তেমন"

স্বামী জ্ঞানপ্রকাশানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের বিখ্যাত উক্তি—"যাকে যেমন তাকে তেমন" কথাটিতে 'যাকে' আর 'তাকে' বলতে মানুষ, প্রাণী বা বস্তু যেকোনটিই হতে পারে। আবার 'যেমন' এবং 'তেমন' বলতে ঐ ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুর অবস্থা বোঝানো যায়। অর্থাৎ ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুর মূল্যায়ন অর্থে বা তাকে শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা, মান-অপমান কতটুকু দেওয়া হলো বা না হলো তারই প্রকাশ বোঝায়। প্রত্যেকটি জিনিসের একটি বস্তুগত মূল্য বা মান রয়েছে। সেই মান আপেক্ষিক অর্থাৎ কম-বেশি, ছোট-বড় হতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, বিভুরূপে তিনি সর্বভূতে এক হয়ে আছেন, কিন্তু শক্তিবিশেষ! অনেকে যাকে মানে গনে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে। তাই সেই সেই পাত্র বা বস্তু-ভেদে তাকে মানও দিতে হয়।[১]

আবার "যাকে যেমন তাকে তেমন" কথাটি থেকে মনে হয়—যে-ব্যক্তি যেরূপ চরিত্রের অধিকারী তার সাথে সেরূপ ব্যবহার বা আচরণ করাই সমীচীন। অর্থাৎ ভাল লোকের সাথে ভাল ব্যবহার, মন্দ লোকের সাথে মন্দ ব্যবহার। শঠে শাঠ্যং। অর্থাৎ শঠের সাথে শঠের মতো ব্যবহার। কিন্তু এই প্রয়োগ ঠিক নয়। কারণ, শঠকে শঠতা দিয়ে তার ভুল বোঝাতে গেলে সবটাই অসৎ এবং অসম্ভব হয়ে পড়ে। সাধারণ মানবের ধারণা এমনই যে, যদি কেউ খারাপ ব্যবহার করে তবে তার সঙ্গে খারাপ আচরণ করেই প্রতিদান দেওয়া উচিত। এটি মলিন মনের পরিচয়। এ হলে চলবে না, কারণ হিংসাকে হিংসা দিয়ে প্রশমিত করা যায় না। ঈর্ষাকে ঈর্ষা দিয়ে স্তিমিত করা যায় না। সমাজে অবশ্য নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রাভঙ্গের লোক কম নেই। আর এই করে সংসারে শান্তি আসতে পারে না।

বস্তুত, মন আর মুখ এক না হলে "যাকে যেমন তাকে তেমন" কথাটি আচরণের ক্ষেত্রে যথার্থ প্রয়োগ হয় না। মনের মধ্যে এক রেখে মুখে আরেক বললে তা পাটোয়ারি বা চালাকি হয়ে যায়। দু-একদিন পরে এমন ব্যবহার লোকে টের পায় এবং যারপরনাই তাকে প্রতারক হিসাবেই চিহ্নিত করে।

শুনলে মনে হবে, "যাকে যেমন তাকে তেমন" বাক্যটি যেন একটু বৈষম্যদোষে দুষ্ট। কারণ, শাস্ত্র বলছেন ঃ "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" সবকিছুতেই ব্রহ্ম বিরাজমান। এক্ষেত্রে বড়-ছোট, ভাল-মন্দ, ভদ্র-অভদ্র—এমন ভাবনার স্থান নেই। কারণ, ব্রহ্মবস্তুতে দ্বৈতভাব নেই। তাই মনে রাখতে হবে, আমরা এখানে জগৎসংসার নিয়ে আলোচনা করছি। সংসারে সব দ্বৈতবোধেরই কথা। অদ্বৈতবোধে জগৎ নেই, সংসার নেই, হেয়-উপাদেয় নেই। আলাদা আলাদা প্রাণী বা বস্তু নেই। যা আছে তা বোধে বোধ করা যায়, মুখে বলা যায় না। আর ব্রহ্মজ্ঞানীর দৃষ্টিতে সবই এক। তাঁর কাছে এসব কথা আলোচনার বিষয়বস্তুই হতে পারে না। তাই ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর সাথে আচরণ বা ব্যবহার করার পূর্বে লক্ষ্য রাখতে হবে কোন্ ব্যক্তি কি কাজ করছেন এবং তা কোন্ অবস্থায়? তারই প্রেক্ষাপটে তাকে শ্রদ্ধা-মান দেওয়া বা না দেওয়া। সমাজে বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও কিভাবে শান্তিলাভ করা যায়, শ্রীশ্রীমা তাঁর মানবলীলায় আচরণ করে দেখিয়ে গিয়েছেন। শ্রীশ্রীমাকেও সমাজের আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, ভাল-মন্দ বিভিন্ন লোকের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং সেসব ক্ষেত্রে কিভাবে তিনি নিজের আচরণে শান্তি রক্ষা করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য।

বেলুড় মঠে একজন চাকর চুরির দায়ে ধরা পড়ে মঠ থেকে বিতাড়িত হয়। সে কোথায় যাবে কুল-কিনারা করতে না পেরে চলে আসে বাগবাজারে। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে সে সব অপরাধ স্বীকার করে তাঁর শরণ নিল। শ্রীশ্রীমা তার সব কথা শুনে বাবুরাম মহারাজকে ডেকে বললেন তাকে মঠে নিয়ে গিয়ে পুনরায় কাজে বহাল করতে। বাবুরাম মহারাজ ইতস্তত করে বললেন, স্বামীজী ওকে দেখে রেগে যেতে পারে। শ্রীশ্রীমা সাথে সাথে বললেন ঃ "আমি বলছি, নিয়ে যাও।" মায়ের সিদ্ধান্ত। তাই নরেন্দ্রনাথও মাথা পেতে নিলেন।[২] শ্রীশ্রীমা চিন্তা করলেন, চাকরটি সাধারণভাবেই দরিদ্র। বেতনই বা কত পায়! যা পায় তা দিয়ে সংসার চালাতে পারছে না। তাই সে বাধ্য হয়েই এই অন্যায় কাজটি করেছে। সে এখন অসহায়। শ্রীশ্রীমা তাই প্রথমে তাকে স্নেহধারায় সিক্ত করে খাওয়ার ব্যবস্থা করালেন। খেয়েদেয়ে মানসিক শান্তি ফিরে পেল সে। শ্রীশ্রীমা বাবুরাম মহারাজকে বললেন ঃ "দেখ বাবুরাম, এ-লোকটি বড় গরিব। অভাবের তাড়নায় ওরকম করেছে। তাই বলে নরেন ওকে গালমন্দ করে তাড়িয়ে দিলে! সংসারের বড় জ্বালা; তোমরা সন্ন্যাসী, তোমরা তো তার কিছু বোঝ না! একে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।" বাস্তবিক, এর জন্য সহানুভূতি প্রয়োজন, সাহায্য প্রয়োজন। জগৎসংসারে কত বড় বড় রুই-কাতলা চুরি-ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে, তাদের বিচার করার বা শাস্তি দেওয়ার কেউ নেই। সে-তুলনায় এ তুচ্ছ চুরির ঘটনাটি কি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখা যায় না? সুসন্তানের চেয়ে কুসন্তানের প্রতিই মায়েদের নজর বেশি, চিন্তা বেশি। তাই তিনি

১ দ্রঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩।১৮।৩

২ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃঃ ২৮৭

স্নেহবিগলিত হয়ে অপরাধীকে শাস্তির পরিবর্তে স্বস্তি দিয়েছেন। ফলে অপরাধীও নিজ ত্রুটি বুঝতে পেরে অনুতপ্ত, লজ্জিত। শ্রীশ্রীমা জানতেন, দোষ ধরতে সকলেই পারে, ভাল করতে পারে খুবই কম লোকে।

সংসারে শ্রীশ্রীমাকে ভাই, ভাইঝি, ভাইয়ের বউ ইত্যাদি বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজন নিয়ে থাকতে হতো। এক ভ্রাতৃবধূ বিধবা, পাগলী। তার কন্যা রাধু। আরেক ভাইঝি নলিনী মাতৃহারা। রাধু-নলিনীর মধ্যে অহি-নকুল সম্পর্ক। কেউ কারো ভাল দেখতে পারে না। রাধুর শ্বশুরবাড়িতে তত্ত্ব পাঠাতে সবসময়ে নলিনীদি একটা অশান্তি সৃষ্টি করে। বিপদ এড়াতে শ্রীশ্রীমা নলিনীদিকেই মুরুব্বি বানিয়ে জানতে চান, এব্যাপারে তার কি মত? দেখা গেল, নলিনীদি মায়ের দেওয়া ফর্দ দেখে বললেন ঃ "ওতে কি করে হবে, পিসিমা? ওরা যেমনই ব্যবহার করুক, আর রাধিটা তো একটা পাগল, জ্ঞানগম্য কিছু নেই। কিন্তু তোমার তো একটা মর্যাদা আছে। তুমি অত ছোট নজর দেখাতে যাবে কেন, পিসিমা?" এই বলে শ্রীশ্রীমা যা দিতে চেয়েছিলেন, তার সাথে আরো কিছু জিনিস যোগ করে দিলেন নলিনীদি। ফলে অশান্তির সম্ভাবনা কমল।[৩]

এ বিচিত্র সংসারে নলিনীদির মতো লোকের অভাব নেই। সকলেই মান-অপমান বোঝে। সংসারে যে বোকা সেও তার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন। কাকে বেশি এবং কাকে কম ভালবাসা হয়, সকলেই তা বুঝতে পারে। সংসারের ছোট-খাটো সবই কাজ। এগুলি একজনে করতে পারলেও কোন কোন সময় অপরকে জিজ্ঞাসা করে নিতে হয়। তাতে সংসারে সকলে তাদের নিজ নিজ অবস্থান ও মর্যাদা জেনে সুখী হয়। রাধুর শ্বশুরবাড়িতে তত্ত্ব পাঠাতে শ্রীশ্রীমাই যথেষ্ট। কাউকেই জিজ্ঞাসার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, অর্থের যোগান তাঁর। কেনাকাটার লোক তাঁরই। ভাল-মন্দ, সাধ্য-অসাধ্য সবই তাঁকে বহন করতে হয়। সেখানে ভ্রাতৃকন্যাদের পরামর্শের প্রয়োজন আদৌ ছিল কি? না থাকলেও তিনি দেখছেন, রাধু-নলিনীদির সম্পর্ক ভাল নয়। একে অপরকে সহ্য করতে পারে না। এমতাবস্থায় রাধুর শ্বশুরবাড়িতে তত্ত্ব পাঠাতে নলিনীদির মতামত জানা দরকার। না হলে এই সামান্য বিষয় নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড শুরু হবে। এ অভাবনীয় ঘটনা এড়াতে শ্রীশ্রীমা নলিনীদিকেই যেন মুরুব্বি বানালেন। ফলও ফলেছে অত্যাশ্চর্যরূপে। যেন তিনি এসব কিছু বোঝেন না, নলিনীদিই তাঁর মর্যাদা রক্ষার জন্য সতত পরামর্শ দিচ্ছেন! তাঁর পরামর্শমতো তত্ত্ব পাঠানোয় তিনি খুবই খুশি। তাই তো শ্রীশ্রীমা বলতেন ঃ "যাকিছু কর না কেন সকলকে নিয়ে একটু মান দিয়ে পরামর্শ শুনতে হয় বৈকি!... সব লোককে কিছু কিছু অধিকার দিয়ে নিজেকে একটু নিচু হয়ে চলতে হয়।" গার্হস্থ্য জীবনে তো বটেই, দশজনকে নিয়ে যাদের চলতে হয় তাদের সকলেরই এ উপদেশ গ্রহণীয়।

বর্তমান সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এখনো পুরোপুরি হয়নি। বিশেষ করে পুরুষশাসিত সংসারে মেয়েদের অবস্থান তেমন সুদৃঢ় নয়। পুরুষেরা সর্বদাই তাদের হেয় প্রতিপন্ন করে। তাদের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠাবোধ করে। নারীদের ভোগ্যপণ্য ব্যতীত খুব বেশি একটা শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে প্রতিনিয়তই চোখে পড়ে নারী-নির্যাতন, নারী-উপেক্ষণ। এসব ক্ষেত্রে তাদের কি কিছুই করার নেই? শুধু মুখ বুজে সহ্যই করতে হবে? এসব প্রশ্নের উত্তর শ্রীশ্রীমার জীবনের একটি ঘটনায় জানা যাবে। হরিশ খ্যাপাটে, পাগল। একদিন সে হঠাৎ শ্রীশ্রীমায়ের পিছু নেয়। শ্রীশ্রীমা বলছেন ঃ "বাড়ির ভিতর যেই ঢুকছি, অমনি হরিশ আমার পিছু পিছু ছুটছে।... তখন বাড়িতে আর কেউ নেই। আমি কোথায় যাই? তাড়াতাড়ি ধানের হামারের চারদিকে ঘুরতে লাগলুম। ও আর কিছুতেই ছাড়ে না। সাতবার ঘুরে আর আমি পারলুম না। তখন... আমি নিজ মূর্তি ধরে দাঁড়ালুম। তারপর ওর বুকে হাঁটু দিয়ে জিব টেনে ধরে গালে এমন চড় মারতে লাগলুম যে ও হেঁ হেঁ করে হাঁপাতে লাগল।"[৪]

সমাজে পাগল হরিশের অভাব নেই। বিকৃতমস্তিষ্ক নিম্নশ্রেণীর মানুষ সর্বত্রই বিদ্যমান। তাদের কুমতলব কিভাবে প্রশমিত করা যায় শ্রীশ্রীমা যেন তার উপমাই রেখে গেলেন। সাতবার ঘুরে যখন নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না, তখন তিনি নিজ মূর্তি ধারণ করলেন। তাঁর 'নিজ মূর্তি'কে ভক্তেরা দেবী দুর্গার বগলা রূপ বলেই ভাবেন। আসলে সাধারণ মেয়েদের ভিতরও আত্মবিশ্বাসরূপ দৈবী শক্তি বিদ্যমান, যে-শক্তিতে রুখে দেওয়া যায় যেকোন পাশবিক শক্তিকে। সেটাই তিনি দেখালেন, মেয়েরা অবলা নয়। তাদের মধ্যেও শক্তি রয়েছে। একটু চেষ্টা করলেই নিজের সম্ভ্রম নিজে রক্ষা করা যায়। এখানে ভীত-বিহ্বলের স্থান নেই। হীনচরিত্র লোকের হীনভাব এভাবে প্রশমিত সম্ভব। অসৎ প্রবৃত্তির মানুষগুলো এধরনের আঘাত পেলে তারাও সুস্থ হবে হরিশের মতো।

অপরদিকে আরেক পাগল গোল করত কোয়ালপাড়া আশ্রমে যখন শ্রীশ্রীমা অসুস্থ রাধুকে নিয়ে অবস্থান করছিলেন। সেও সময়ে অসময়ে এসে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করত। একদিন গভীর রাতে হঠাৎ ঝড়ের মধ্যে সে এসে হাজির। শ্রীশ্রীমা আঁতকে উঠলেন। কারণ, রাধুর ঘুম ভেঙে গেলে সে রাতে আর ঘুমাবে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, পাগলকে 'খুড়োমশাই' ডেকে মিষ্টিকথায় আপ্যায়ন

---

৩ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ২৪৮ ৪ ঐ, পৃঃ ১২৩

করে এক ছিলিম তামাক সেবন করানোর কথা বললে সে চলে যায়, বেসামাল কিছু করে না। শ্রীশ্রীমাও যেন তাই পাগলকে মিষ্টিকথায় অনুরোধ করলেন : "বাবা এত রাতে গোল করো না। বাড়িতে রোগী আছে। তুমি চলে যাও।" শ্রীশ্রীমায়ের কথাতে পাগলের মন ভিজে গেল। সে বিশেষ কোন কথা না বলে ধীরে ধীরে চলে গেল।[৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ সাধু নাগ মহাশয় একবার মাতৃদর্শনে এসেছেন বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে। শ্রীশ্রীমা তখন সেখানে থাকতেন। নাগ মহাশয় এসে সিঁড়িতে মাথা ঠুকে ঠুকে ফুলিয়েছেন। শ্রীশ্রীমাকে সে-সংবাদ দিতে তিনি নাগ মহাশয়কে তাঁর কাছে পাঠাতে বললেন। কিন্তু নাগ মহাশয় তখন চলতে পারছেন না, তাঁর দুচোখ জলে ভাসছে, পা ভাবের ঘোরে টলছে। লজ্জাপটাবৃতা শ্রীশ্রীমা সন্তানস্নেহে বিচলিত হয়ে উঠলেন, সমস্ত সঙ্কোচ ভুলে নাগ মহাশয়কে ডেকে সামনে বসিয়ে নিজ হাতে তাঁর চোখের জল মুছিয়ে দিলেন। নাগ মহাশয় শ্রীশ্রীমায়ের চরণস্পর্শ করে তখন শুধু 'মা মা' বলে ডাকছেন। মাতৃপ্রেমে তিনি উন্মাদ, অথচ শান্ত, স্থির। এদিকে সেদিন একাদশী, সামনে শ্রীশ্রীমায়ের খাবার রাখা আছে। তিনি নাগ মহাশয়কে তা-ই খাইয়ে দিতে লাগলেন, কিন্তু ভাবের আবেশে নাগ মহাশয় প্রথমে তা খেতে পারছিলেন না। শ্রীশ্রীমা তাঁর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে ও ঠাকুরের নাম করতে হুঁশ এল। তখন মাও খেলেন, নাগ মহাশয়কেও খাইয়ে দিতে লাগলেন।[৬]

একবার শ্রীশ্রীমা জলবসন্তে আক্রান্ত হয়েছেন। তখন তাঁকে বাগবাজার স্ট্রিটে এক পূজারীর চিকিৎসাধীনে রাখা হয়েছে। ব্রাহ্মণ প্রত্যহ এলে শ্রীশ্রীমা তাঁকে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করতেন, পদধূলি নিতেন। একদিন জনৈক সেবক প্রতিবাদস্বরূপ বললেন, এরূপ বিনয় তাঁকে করা অশোভন, বিশেষত ব্রাহ্মণ হয়তো চরিত্রহীন। শ্রীশ্রীমা সহজ উত্তর দিলেন : "কি জান, হাজার হোক ব্রাহ্মণ। ভেকের মান দিতে হয়। ঠাকুর তো আর ভাঙতে আসেননি।"[৭]

শ্রীরামকৃষ্ণের জননী চন্দ্রমণিদেবী শেষবয়সে গঙ্গাতীরে বাস করার ইচ্ছায় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট থাকতেন। বৃদ্ধা মাকে কাছে রেখে ঠাকুরও সাধ্যমতো সেবাযত্ন করতেন। শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন বলে তিনি নিজ হস্তেই শাশুড়ির সেবাভার নিয়েছিলেন। শ্বশ্রূমাতা বৃদ্ধ বয়সে চলচ্ছক্তি-রহিত হয়ে তাঁর ওপর অনেক বিষয়ে যে নির্ভর করতেন, শ্রীশ্রীমা তা বুঝতেন। তাই বৃদ্ধা কোন প্রয়োজনে যখনি তাঁকে ডাকতেন, তখনি তিনি শীঘ্র বৃদ্ধার পাশে উপস্থিত হতেন। কেউ যদি সাবধান করে দিত যে, এভাবে ছুটলে নহবতের নিচু দরজায় মাথা ঠুকে যেতে পারে, শ্রীশ্রীমা উত্তরে বলতেন : "হলোই বা। তিনি আমার গুরুজন, আর মা! আহা, তিনি বুড়ো হয়েছেন! আমি যদি তাড়াতাড়ি না যাই, তাঁর অসুবিধা হতে পারে। সেজন্যেই দৌড়ে যাই।" ঠাকুরের জননী তখন নহবতের ওপরতলায় থাকতেন, আর শ্রীশ্রীমা থাকতেন নিচে।

শ্রীশ্রীমা দেখালেন, বৃদ্ধা মাতাকে সেবা করতে গিয়ে শরীরে আঘাত লাগলেও তা অতি তুচ্ছ। কারণ, বৃদ্ধার প্রয়োজন বলেই তিনি ডেকেছেন। হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি না করলে এ সেবা বোঝা যাবে না। কারণ, আমরা সেবাবিমুখ বলে এর কিছু বুঝতে পারব না। আধুনিক যুগের ছেলেমেয়েরা একটু শিক্ষিত হয়েই নিজেদের খুব বড় মনে করে এবং বড় কোন পদে চাকরি করে সমাজের সম্মানীয় স্থানে উঠে বন্ধুমহলে পিতা-মাতাকে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে—এমনকি অশিক্ষিত পিতা-মাতাকে ইংরেজীতে Teacher বা Servant বলেও পরিচিত করান। ইংরেজীতে বলার কারণ—পিতা-মাতা যেন বুঝতে না পারেন যে, তাদের ছেলে তাদের কি বলে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে বৌমারা শাশুড়িদের বৃদ্ধাশ্রমে রাখার পক্ষপাতী। এই প্রেক্ষাপটে সেবা আর কতদূর আন্তরিক হতে পারে? স্বামীর মাকে নিজের মায়ের মতো আপন করার মানসিকতা আর কোথায়? এমনিতেই রক্তের অহঙ্কারে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের করুণ অবস্থা উপলব্ধি হয় না, তাঁদের গুরুজন বলে বোধ হয় না। সর্বদাই এঁরা অবহেলিত, উপেক্ষিত। সংসারের বোঝা বলে বোধ হয়। নিজেদেরও যে কয়দিন পরে এরূপ অবস্থায় কাল কাটাতে হতে পারে—সেকথা ভুলক্রমেও মনে পড়ে না। শ্রীশ্রীমা একথাটি স্মরণ করিয়ে যেন সংসারের সকলের সম্বিত ফিরিয়ে আনতে বৃদ্ধা শাশুড়ির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

শ্রীশ্রীমার ছিল অবারিত দ্বার। অত্যন্ত হীন কর্ম করে কেউ কেউ এসেছে মায়ের কাছে। পূর্বে যারা বারবনিতা ছিল এমন স্ত্রীলোকদের মায়ের কাছে আগমন সম্পর্কে সম্ভ্রান্ত মহিলাদের প্রবল আপত্তি ছিল। তাদের মধ্যে একজন শ্রীশ্রীমাকে বলেন, যদি এভাবে পতিতারা এখানে যাতায়াত করে তবে তাঁদের পক্ষে এখানে আসা অসম্ভব হয়ে উঠবে। শ্রীশ্রীমা তার উত্তরে বললেন : "যারা আমার আশ্রয় নিয়েছে তারা এখানে আসবে। তাদের জন্য যদি কেউ এখানে আসা বন্ধ করে তো আমি কি করব?" জনৈক সাধুও এধরনের কথা শ্রীশ্রীমাকে বললে তিনি বলেছিলেন : "ওদের যদি এখানে আসা বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে আমি এখান থেকে চলে যাব।"[৮]

কী অদ্ভুত মানবিকতা! কী উদার মানসিকতা! শ্রীশ্রীমা উপলব্ধি করলেন মানুষ কেন হীনকর্মে প্রবৃত্ত হয়। সমাজের

---

৫ মাতৃসান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ, পৃঃ ৮৮ ৬ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ১৩৭ ৭ ঐ, পৃঃ ১৮৪

৮ শতরূপে সারদা, পৃঃ ৫১২-৫১৩

অন্যদের নিষ্পেষণে মানুষ দারিদ্র্য আর ক্ষুধার জ্বালায় হীন কাজ বেছে নেয়। অথবা মায়া-মোহে অজ্ঞানতার কারণেই নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। সহানুভূতির পরিবর্তে কত লোকের গালাগালিই না সহ্য করতে হয়েছে তাদের। স্বামী শয্যাশায়ী অথবা নেই, সংসার চলছে না। এমতাবস্থায় কেউ কেউ সংসারের ভরণ-পোষণের জন্যই এ-কাজে লিপ্ত হয়েছে। মানুষ জেনেশুনে হীন কাজ করতে চায় না, করতে বাধ্য হয়। অসহায়ার প্রতি তখন কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় না, বরং দারিদ্র্যের সুযোগে হীন কাজে খাটায়। আবার হীন কাজ করলে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসে হাজার জন! তাকে তাচ্ছিল্য করে, ঘৃণা করে সকলে। সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়কে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, এজীবন গ্রহণে বাধ্য করেছে কারা? এজীবনে লিপ্ত হওয়ার জন্য দায়ী কারা? তখন কি উত্তর দেবেন সমাজপতিরা? অথচ মানুষ বাঁচতে চায়—বেঁচে থাকার অধিকার তার রয়েছে। তারাও পাপপুণ্য বোঝে। সমাজে মর্যাদা পেতে চায়। তাই তারা আশ্রয় নেয় সমাজেরই গণ্যমান্য সহানুভূতিশীল কারো নিকট। শ্রীশ্রীমায়ের নিকট তারা আসে একটু সহানুভূতি ও ভালবাসা পাওয়ার আশায়। এ-ভালবাসার আধারকে ধরে তারা সমাজে পুনরায় উঠতে চায়। পূর্বজীবন ভুলে যেতে চায়। তারা অনুতপ্ত হয়ে নবজীবন প্রার্থনা করে। শ্রীশ্রীমাও তাদের সুখ-দুঃখের কথা শোনেন। তাদের মিষ্টিকথায় আপ্যায়ন করেন। সকলে আশ্রয় পেয়ে 'মা' ডাকে। শ্রীশ্রীমা তাদের দূরে ফেলতে পারেন না। কারণ, তিনি জানেন এরা অসহায়, নিরাশ্রয়। এদেরও ভালবাসা উচিত। তাদের সুখে-দুঃখে ব্যথিত হওয়া উচিত। তাছাড়া দোষে-গুণে মানুষ—কেউ কম, কেউ বেশি। আবার কারো দোষ প্রত্যক্ষ, কারো দোষ পরোক্ষ। পরোক্ষদের ধরা যায় না। কারণ, তারা চতুর। ধরা পড়ে দুর্বল, বোকারা। আর যারা ধরা পড়ে তাদের প্রতি অবিচারের শেষ নেই। তাই শ্রীশ্রীমা বলতেন ঃ "দোষ ধরতে নেই। দোষ মানুষ করবেই। গুণটিই ধরতে হয়।" তিনি আরো বলতেন ঃ "ধূলোকাদা সন্তানরা মাখবেই। তা ধুলো ঝেড়ে মাকেই তো কোলে নিতে হয়।" সমাজের সকলের মন যদি এরকম হয়, তবে সংসার 'ধোঁকার টাটি' না হয়ে 'মজার কুটি'তে পরিণত হতে পারে।

শ্রীশ্রীমা "যাকে যেমন তাকে তেমন" বাক্যের সার্থক রূপায়ণ যে শুধু মানুষের ক্ষেত্রে করেছেন, তা নয়। বাড়ির পোষা পশুপাখির প্রতিও তাঁর ভালবাসা কম ছিল না। বাড়ির পোষা গাভির একটি বাছুর ছিল। সে একদিন হঠাৎ গগনবিদারী চিৎকারে চারিদিকে ছোটাছুটি করতে লাগল। এভাবে তার অস্থিরতার কারণ কেউ বুঝতে পারেনি। কিন্তু শ্রীশ্রীমা ঘরে থাকতে পারলেন না। বাছুরের আর্তনাদে তিনি তার কাছে এসে তাকে বুকে টেনে নিলেন। পেট, নাভি ও শরীর একটু টিপে দিতেই তার চিৎকার বন্ধ হলো। তার পেটে ব্যথা হয়েছিল, মায়ের স্নেহমাখা স্পর্শে তার উপশম হলো।[৯]

"যাকে যেমন তাকে তেমন" কথাটিতে শুধু যে মানুষ বা প্রাণীর কথাই বলা হয়েছে তা নয়, সংসারের সাথে যুক্ত যেকোন বস্তুই হতে পারে। যেমন ঘর পরিষ্কার করার ঝাঁটাটি। অনেক সময় ব্যবহারের পর আমরা এটিকে তাচ্ছিল্যভাবে দূরে ফেলে দিই। শ্রীশ্রীমায়ের দৃষ্টি এড়ায়নি এক্ষেত্রেও। বস্তুত, আমরা অনেকেই কাজশেষে উপকারী বস্তু বা ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করে তাচ্ছিল্যভরে দূরে সরিয়ে দিই। কিন্তু কোন বস্তু বা মানুষের কাছ থেকে আমরা যতটুকু সাহায্য পাই, তা আমাদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা প্রয়োজন। ছোট ছোট কাজ দেখেই মানুষের বড় কাজ করার নমুনা পাওয়া যায়, অথবা তার কাজের প্রতি শ্রদ্ধা আছে কিনা তা বোঝা যায়। শ্রীশ্রীমা বলতেন, ঝাঁটাটিও সংসারের অঙ্গ। যত ছোটই হোক, তার একটা সম্মান আছে। যার যা সম্মান তাকে তা দিতে হয়। শ্রীশ্রীমা বলতেন, যাকে রাখ সে-ই তো রাখে। ঘরবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এই ছোট্ট বস্তুটি একান্তই অপরিহার্য। তাই এটির প্রতি করুণা করে নয়, বরং প্রয়োজনেই এটির ভাল ব্যবহার করা উচিত।

মানবজীবনে শান্তিলাভের উপায় হিসাবে শ্রীশ্রীমা বলতেন ঃ "যখন যেমন তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন।" এটি একটি বাণী হলেও যেন তিনটি মন্ত্র। এর যেকোন একটি পালন করতে পারলে মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে সুখী হতে পারবে। শুধু ব্যক্তিগত নয়, অন্যকেও সুখী করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। "যখন যেমন তখন তেমন" বাক্যে সময় বা কালকে বোঝানো হয়েছে, "যাকে যেমন তাকে তেমন" বাক্যে পাত্র এবং "যেখানে যেমন সেখানে তেমন" বাক্যে স্থান বোঝানো হয়েছে। এই স্থান-কাল-পাত্র হিসাব করে পরস্পর পরস্পরের সাথে আচরণ করলে কখনো ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলতেন ঃ "দেশ-কাল-পাত্রভেদ বিবেচনাপূর্বক সংসারে সকল বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে এবং আপনাকে না চালাইতে পারিলে শান্তিলাভে অথবা নিজ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিতে কেহ সমর্থ হয় না।"[১০] শ্রীশ্রীমায়ের জীবনদর্শন আলোচনায় দেখা যায়, তিনি যথার্থই তাঁর বাণীর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছিলেন। আমরা যদি তাঁর এই কথাটি জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারি, তবে আমাদের প্রত্যেকের জীবন আনন্দময় হয়ে উঠবে। তখন সংসার হবে 'ভগবানের বৈঠকখানা'। ❑

৯ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ২৯২

১০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, ২য় ভাগ, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ২৭৮

"শরণাগত হও, শরণাগত হও"

মারুফী খান



পাশ্চিমের আকাশ লাল হয়ে গেছে। দিনের শেষ সূর্যালোক ছুঁয়ে আছে আমার একচিলতে হাসপাতালের জানালাটাকে। আমার বোধে, যুক্তিতে, বিশ্বাসে খেলা করে চলেছে অবিরত, নিরন্তর তাঁর উপস্থিতি।

—কতদূর কষ্ট বয়ে বয়ে হেঁটে চলেছিস ওরে মোর ক্লান্ত মেয়ে!

নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্য থেকে এ কোন্ সুললিত করুণ ব্যথিত কণ্ঠ আমার চেতনাকে স্পর্শ করে যায়? আমি হোঁচট খেয়ে খেয়ে শুধু বলি : মাগো, শুধু শুনি চরণধ্বনি, দাও না কেন দেখা?

হাহাকার ওঠে হৃদয় মন্থন করে, তৃষ্ণায় কণ্ঠ আসে শুকিয়ে। আমি কেন পাই না তোমার শুভ্রবসনের শীতল আলিঙ্গন? কেবলই বুঝি চলেছ পাশে পাশে, কাছে কাছে, নিকটে নিকটে। তবে কেন আকুল কান্নায় ভিজিয়ে দিতে পারি না তোমার পূর্ণিমার আলোমাখা মুখখানি? তবে কি শুধু দেখতে চাও, জানতে চাও আমার কতটা বিশ্বাস, কতটা ভালবাসা? মাগো, মনে পড়ে সেই পদিপিসির কথা। গল্পটা ছিল এমন—মায়ের কোলে ছোট্ট ভাইটি যখন ঘুমের ঘোরেই ফিক্‌ফিক্ করে হেসে উঠত, পদিপিসি নিজের কদমছাঁটা কাঁচা-পাকা চুলগুলোয় বিলি কাটতে কাটতে, পা-দুখানা মেলে বসে নাকিস্বরে মাড়ি বের করে বলত : "দ্যাখ দ্যাখ, পোলারে কয় যম, তোর মারে লইসি আমি। খোকা ফিক্ কইর‍্যা হাসে আর কয়—দূর হ্ তুই শাকচুন্নি, আমি এইমাত্তর মার দুধ খাইসি না?"

ছোট্ট ভাইটির মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে এত্তটুকুন দিদি বলে : "মা, ভাই একথা বলছে, সত্যিই?"

পদিপিসির কোন্ আদিম সংস্কার বিশ্বাস থেকে ছাড়া পায় মনের আনন্দে, আর ছোট্ট খুকির বিশ্বাস জন্মায় সরলতায়। সত্যিই তো, মাকে বুঝি কেউ নিয়ে যেতে পারে? কী দারুণ যুক্তি! এসব মানে না বিজ্ঞান, মানে না তর্ক। বিশ্বাস, বিশ্বাস, প্রগাঢ় বিশ্বাসের নীল দ্যুতি ভরে ওঠে চিত্তকুঠুরিতে। যে-পথ অন্ধকার, বিসর্পিল, ভয়ঙ্কর—সে-পথ পাড়ি দিয়ে চলি। বারবার হাতদুটো বাড়িয়ে খুঁজি তোমাকে, অনুভব হয় কি তোমার কোমল মুঠিখানি?

হাসপাতালের জানালায় এখন সন্ধ্যাতারা ফোটার আলো। দুদিন আগেও যে-অন্ধকার ছিল মিশির মতো কালো, তা থেকে এখন যেন নতুন করে হিরণ আলো ফুটে বেরচ্ছে অস্ফুট বেদনার আবরণ ভেদ করে পরিপূর্ণ সুখের উপলব্ধিতে।

—শরণাগত আছিস নাকি রে মূঢ় মোর মেয়ে?

কী আশ্চর্য। এ কণ্ঠে কী ঝরছে, সুধা না অমৃত? হিমঠাণ্ডা ঘরে বুকের মধ্যে যখন তীব্র কাঁপুনী দাঁতে দাঁত ঘষে দিচ্ছে চরম নির্দয়তায়, তখন কাঙাল চোখ থেকে অবিরত ঝরছে কেন কান্নার নোনা জল। মাগো, বড় বিশ্বাসে যে ধরেছি তোমার নামখানি।

বিলুপ্ত হয়ে যায় বিশ্বচরাচর, তুচ্ছ হয়ে যায় কষ্টের মাথা-উঁচু হিমালয়, অনুভব হয় সুকোমল এক প্রশান্ত গাঢ় তৃপ্তি। শরশয্যায় শুয়ে মনে হয় পুষ্পরাজ্যে আমার বিহার। বলি অনুচ্চ কণ্ঠে : মাগো, বড় কষ্ট, বড় দাহ! তবু তো তোমাতে শরণাগত। দাও তোমার স্নেহ, পান করাও তোমার বুকের অমৃত আমাকে। এ-সন্তান জাত, পাত, ধর্ম বোঝে না, মা শুধু তোমায় বোঝে।

মৃত্যুর রুদ্র চণ্ডাল-নৃত্য থেমে যায় সম্মুখে। প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিতে ডুবতে ডুবতে সে শুধুমাত্র সুচবিদ্ধ যন্ত্রণাকে শরীরের কোষে, হৃদ্‌যন্ত্রে ঢুকিয়ে দিয়ে ফিরে যায়—অশুভ, অসহ্য। আমি কান্নার অথৈ তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে ফের জেগে উঠি, হেসে উঠি—যাকে তুমি ফেরাবে ভাব, তাকে নেয় কোন্ সে-শক্তি?

—মা বলে ডেকেছিস যখন, তখন আয়, মোর বুকে আয় বাছারে।

আমি শান্ত হয়ে তোমার বুকটার মধ্যে ঢুকে যাই। হাসপাতালের কাটাছেঁড়া ঘর আর হিম বয়ে আনে না। আমি মাতৃবক্ষের উষ্ণতাটুকু খুঁজে পাই। আমি জেনে গেছি আগামী কালের প্রথম রবিরশ্মি তোমার মুখ হয়ে চুমায় চুমায় জাগিয়ে দেবে আমায়। আমি ফের আনন্দের কান্নায় কাঁদতে কাঁদতে জগৎকে বলতে থাকব তোমার অমিয় বাণী—"শরণাগত হও, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও।" ❑

'কথামৃত'-এ বিভাষিত শ্রীরামকৃষ্ণ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

মেঝেতে নরম বিছানা। নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণ বসে আছেন মুখোমুখি। নরেন্দ্রনাথের মুখে মিঠা পান। মৃদু মৃদু চিবোচ্ছেন। খয়ের আর পানের রসে তাঁর আয়ত চোখদুটিতে সামান্য লালের আভাস।

ঠাকুর সাতাশ বছর আগের তাঁর সাধনজীবনের কথা নরেন্দ্রনাথকে বলছেন। এঁড়েদার বন্ধু কৃষ্ণকিশোরের উন্মাদ অবস্থা হলো। ঠাকুর খুব মজা করে সেই কথা বলছেন ঃ "তাই হলো! তার নিজেরই উন্মাদ হলো। তখন সে কেবল 'ওঁ ওঁ' বলত আর একঘরে চুপ করে বসে থাকত। সকলে মাথা গরম হয়েছে বলে কবিরাজ ডাকলে। নাটাগড়ের রাম কবিরাজ এল। কৃষ্ণকিশোর তাকে বললে, 'ওগো, আমার রোগ আরাম কর; কিন্তু দেখ, যেন আমার ওঁকারটি আরাম করো না।' "

ঠাকুরের বর্ণনা শুনে সকলে এক দমক হেসে নিলেন।

ঠাকুর আবার প্রসঙ্গে প্রবেশ করলেন ঃ "একদিন গিয়ে দেখি, বসে ভাবছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয়েছে?' বললে, 'ট্যাক্সওয়ালা এসেছিল—তাই ভাবছি। বলেছে, টাকা না দিলে ঘটি-বাটি বেচে লবে।' আমি বললাম, 'কি হবে ভেবে? না হয় ঘটি-বাটি লয়ে যাবে। যদি বেঁধে লয়ে যায় তোমাকে তো লয়ে যেতে পারবে না। তুমি তো 'খ' গো!' "

শেষকথাটি ঠাকুর এমন একটি সুন্দর ভঙ্গি করে বললেন, নরেন্দ্রনাথ হেসে উঠলেন। সেই হাসি ছড়িয়ে পড়ল সকলের মুখে। ঘরের পরিবেশ জমে উঠেছে। কোন কথাই তুচ্ছ কথা নয়, অথচ মজায় ভাসছে। 'খ' গো। 'খ' মানে! ঠাকুর এইবার সেইটি ব্যাখ্যা করছেন।

"কৃষ্ণকিশোর বলত, আমি আকাশবৎ। 'অধ্যাত্ম' পড়ত কিনা! মাঝে মাঝে 'তুমি খ' বলে ঠাট্টা করতুম। হেসে বললুম, 'তুমি খ'; ট্যাক্স তোমাকে তো টানতে পারবে না।"

ঠাকুর এইবার যেন একটু গম্ভীর হলেন—"উন্মাদ অবস্থায় লোককে ঠিক ঠিক কথা, হক কথা বলতুম। কারুকে মানতুম না। বড়লোক দেখলে ভয় হতো না।"

যদু মল্লিক।

কে তিনি? কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার মতিলাল মল্লিকের দত্তকপুত্র। বিশাল ধনী তো বটেই; কিন্তু ভগবদ্‌ভক্ত। ধনীরা সাধারণত মদগর্বী হন। যদুনাথ ব্যতিক্রম। আবার অসাধারণ বাগ্মী। ১৮৪৪ সালে তাঁর জন্ম। ভাল ছাত্র ছিলেন। ১৮৬১ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে এণ্ট্রান্স পাশ করে বি. এ. পর্যন্ত পড়েন। কিছুদিন আইনও পড়েছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন। দুটি উচ্চ পদ লাভ করেছিলেন—অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ও কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার। যদুলাল নির্ভীক সমালোচক ছিলেন। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত সরকারি কর্মচারীদের কঠোর সমালোচনা করতেন। কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান স্যার হেনরি হ্যারিসন তাঁকে বলতেন 'দি ফাইটিং কক'। যদুলাল ছিলেন দানশীল। শিক্ষার ব্যাপারে ছিলেন যথেষ্ট উদার। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির দক্ষিণে গঙ্গার তীরের তিনতলা বাড়ি ও বাগানটি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য অবারিত ছিল। বাগানের প্রধান কর্মচারীর ওপর আদেশ ছিল, ঠাকুর যখনি বাগানে বেড়াতে আসবেন, তখনি গঙ্গার ধারের বৈঠকখানাটি খুলে দিতে হবে। ঠাকুর বসবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই ঐ বাগানে বেড়াতে যান। এই বৈঠকখানাতেই তাঁর একটি অলৌকিক দর্শন হয়েছিল। দেওয়ালে ঝোলানো ছিল যিশুখ্রিস্টের একটি ছবি। ঠাকুর তন্ময় হয়ে দেখছেন। ছবিটি হঠাৎ জীবন্ত জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। সেই জ্যোতি ঠাকুরের অন্তরে প্রবেশ করে তাঁর জন্মগত সমস্ত হিন্দু সংস্কার লয় করে দিল। খ্রিস্টীয় ভাবের সাধনপথ খুলে গেল। পরিপূর্ণ তিনদিন তিনি খ্রিস্টান ভাবে রইলেন। যিশুই তাঁর দেবতা। তিনদিনের দিন পঞ্চবটীতে যিশুকে দর্শন করলেন। যিশু প্রবেশ করলেন ঠাকুরের শরীরে।

ঠাকুর সেই যদুলাল মল্লিকের বাগানে একদিনের একটি ঘটনা এইবার বলছেন—"উন্মাদ অবস্থায় লোককে ঠিক ঠিক কথা, হক কথা মুখের ওপর বলে দিতুম। কারো রেয়াত করতুম না। সেদিন বাগানে যতীন্দ্র এসেছিল।"

যতীন্দ্র কে?

খুব বড় মানুষ। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত জমিদার। দানবীর। 'মহারাজা' উপাধি পেয়েছিলেন। বিদ্যোৎসাহী। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য। বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য। হিন্দুধর্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস।

ঠাকুর সেই বিখ্যাত মানুষটির কথা বলছেন ঃ "যদু মল্লিকের বাগানে যতীন্দ্র এসেছিল। আমিও সেখানে ছিলাম। আমি তাকে বললাম, 'কর্তব্য কি? ঈশ্বরচিন্তা করাই আমাদের কর্তব্য কিনা?' যতীন্দ্র বলল, 'আমরা সংসারী লোক। আমাদের কি আর মুক্তি আছে! রাজা যুধিষ্ঠিরই নরক দর্শন করেছিলেন।' তখন আমার বড় রাগ হলো। বললাম, 'তুমি কিরকম লোক গা! যুধিষ্ঠিরের কেবল নরক দর্শনই মনে করে রেখেছ? যুধিষ্ঠিরের সত্যকথা, ক্ষমা, ধৈর্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরভক্তি—এসব কিছু মনে হয় না! আরো কত কি বলতে যাচ্ছিলাম। হৃদে আমার মুখ চেপে ধরলে! যতীন্দ্র একটু পরেই 'আমার একটু কাজ আছে' বলে চলে গেল।"

সৌরীন্দ্র ঠাকুর, আরেক বড় মানুষ। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বংশের সন্তান। হরকুমার ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। 'রাজা' এবং 'স্যার' উপাধি পেয়েছিলেন। ঠাকুর এই বড় মানুষটির বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার কথা বলছেন। আগে দেখা হয়েছিল। আবার দেখা অনেক দিন পরে। "অনেকদিন পরে কাপ্তেনের সঙ্গে সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি গিছলাম। তাকে দেখে বললাম, 'তোমাকে রাজা-টাজা বলতে পারব না, কেননা সেটা **মিথ্যা কথা** হবে।' আমার সঙ্গে খানিকটা কথা কইলে। তারপর দেখলাম, সাহেব-টাহেব আনাগোনা করতে লাগল। রজোগুণী লোক, নানা কাজ লয়ে আছে। যতীন্দ্রকে খবর পাঠানো হলো। সে বলে পাঠালে, 'আমার গলায় বেদনা হয়েছে।' "

'কাপ্তেন'-এর পরিচয়? প্রকৃত নাম বিশ্বনাথ উপাধ্যায়। জাতিতে নেপালী। মতান্তরে কনৌজী ব্রাহ্মণ। তিনি নেপালের রাজার উকিল ছিলেন। রাজার প্রতিনিধি হিসাবে তিনি কলকাতায় বাস করতেন। ঠিকানা—২৫ শ্যামপুকুর স্ট্রিট। শোভাবাজার রাজবাড়ির দেববংশের বাড়ি। এই বাড়ির ওপরতলার একটি অংশে কাপ্তেনের বসবাস। ঠাকুর তাঁকে 'কাপ্তেন' বলে ডাকতেন।

প্রথমজীবনে কাপ্তেন হাওড়া জেলার লিলুয়ার ঘুষুড়িতে নেপালীদের একটি শালকাঠের কারখানায় গোমস্তার চাকরি নিয়ে নেপাল থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। এইসময় তিনি একদিন স্বপ্নে দেখেন যে, এক মহাপুরুষ বিষ্ঠার মাঝখানে বসে তত্ত্বজ্ঞান দেওয়ার জন্য তাঁকে ডাকছেন। স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার পর তিনি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, এ কী অদ্ভুত স্বপ্ন!

এই স্বপ্নদর্শনের কয়েকদিন পরে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরকে দর্শন করেই চমকে উঠলেন, এই তো সেই মহাপুরুষ! পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই বাস্তবের সঙ্গে স্বপ্নের মিলন। অত্যন্ত দ্বিধা নিয়েই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ঠাকুর তাঁর সঙ্গে এমন আন্তরিক ব্যবহার করলেন, যেন কতদিনের পরিচয়!

শুরু হলো দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া-আসা। ঠাকুরের চরণে মন-প্রাণ সমর্পণ। ঠাকুরের একান্ত অনুগত ভক্তে রূপান্তর। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন লিলুয়ায় গেলেন তাঁর কাঠের কারখানাটি দেখতে। সেইসময় কাপ্তেন খুব বিপদে পড়েছেন। বিশ্রী অভিযোগ—কাঠগোলার তহবিল তছরূপ করেছেন তিনি। নেপালের রাজদরবারে তলব। তলব পেয়ে নির্দোষ বিশ্বনাথ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে দৌড়ালেন। ঠাকুর তাঁকে অভয় দিলেন—"কালীর ইচ্ছায় আবার তুমি ফিরে আসবে।"

হিসাবপত্র দেখে নেপাল-রাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। উচ্চপদ ও 'কাপ্তেন' উপাধি নিয়ে তিনি ফিরে এলেন কলকাতায়। এইবার তিনি হয়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণময়। বিশ্বনাথের পিতা ছিলেন ইংরেজ ফৌজের সুবেদার। যুদ্ধক্ষেত্রে একহাতে বন্দুক নিয়ে অপর হাতে শিবপূজা করতেন।

কাপ্তেন ছিলেন মাতৃভক্ত। উচ্চাসনে মাকে বসিয়ে নিজে বসতেন পায়ের কাছে। মাঝেমাঝে মাকে কাশীতে পাঠাতেন। তাঁর সেবার জন্য বারো-তেরোজন সঙ্গী। খরচের কথা ভাবতেন না।

বেদ-বেদান্ত-গীতা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। স্তবপাঠ করতেন অতি সুন্দর। ঠাকুর মুগ্ধ হয়ে তাঁর পূজা দেখতেন।

ঠাকুর এইবার আরেকটি ঘটনা বলছেন—"সেই উন্মাদ অবস্থায় আরেকদিন বরানগরের ঘাটে দেখলাম জয় মুখুজ্জে জপ করছে..."। [ক্রমশ] (নয়)

বিজ্ঞপ্তি

বিগত আশ্বিন মাসে সুধী পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো হয়েছিল, ২০০২ সালে (মাঘ ১৪০৮—পৌষ ১৪০৯) 'উদ্বোধন' পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছু বাড়াতে হবে। তদনুযায়ী চলতি বছরের গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা ধার্য হয়েছে। কেউ ডাকে বই সংগ্রহ করলে আরো ২০ টাকা-সহ মোট ৯৫ (পঁচানব্বুই) টাকা পাঠাবেন। ইতোমধ্যে অনেকেই ভুল করে ৭৫ টাকা সডাক খরচ পাঠিয়েছেন। তাঁদের অনুরোধ জানাই—আপনারা বাকি দেয় ডাকখরচ ২০ টাকা অবিলম্বে মানি অর্ডার করে পাঠাবেন।—সম্পাদক

ধর্মীয় সঙ্ঘর্ষ, শান্তি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ*

স্বামী জিতাত্মানন্দ

গত ২৯ আগস্ট ২০০০ নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের (U.N.) সদর দপ্তরে আয়োজিত সভায় প্রদত্ত ইংরেজী ভাষণের লেখককৃত বঙ্গানুবাদ।—সম্পাদক

ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে, হিন্দুধর্মের পক্ষ থেকে এবং আমার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আমার নমস্কার জানাচ্ছি। হিন্দুদের ধর্মচিন্তায় আপনারা কেউ জন্মগত পাপী নন। আপনারা সকলেই জন্মগত দেবতা। অনন্ত ঈশ্বর আমাদের শরীরের মধ্যেই সুপ্ত আছেন। তাই আপনাদের সকলকে প্রণাম জানাচ্ছি। আপনারাই জীবন্ত বুদ্ধ। আপনারাই জীবন্ত খ্রিস্ট। (হর্ষধ্বনি) প্রাচীন ভারতের হিন্দুরা অনুভব করেছিলেন, ঈশ্বর এক অনন্ত রহস্যে আবৃত এবং সেইহেতু এই অনন্ত রহস্যে যাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই অনন্ত পথও থাকবে। তাই তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—সত্য এক, ঈশ্বর এক। সত্যদ্রষ্টারা তাঁকে বহু নামে ডাকেন। আমরা সব ধর্মমতকেই মানি, সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানকেই শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, সত্য এক। সেই সত্যই ঈশ্বর এবং সেই ঈশ্বর আমাদের মধ্যেই নিহিত রয়েছেন। (হর্ষধ্বনি)

গতকাল থেকে আমি ভাবছিলাম সম্মেলনের প্রযোজক শ্রীবাওয়া জৈন সম্পর্কে—যিনি বিশ্বশান্তির স্বপ্ন দেখেছেন। সেইসঙ্গে আমি বিভিন্ন বক্তার বিস্ময়কর ভাবগুলিও চিন্তা করছিলাম। কিছু ভাব বেদনাদায়ক মনে হয়েছিল। যখন শুনলাম—"যিশুখ্রিস্টই একমাত্র ঈশ্বরপুত্র", তখন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। যিশু নিশ্চয়ই ঈশ্বরপুত্র। কিন্তু বুদ্ধ, মহাবীর, প্রফেট মহম্মদ—এঁরা তাহলে কারা? এঁরাও কি ঈশ্বরের আদিষ্টপুত্র নন? আমরা বলি—"যিশু ঈশ্বর-পুত্র।" আমরা জানি এটি সত্য। কিন্তু যে-মুহূর্তে আমরা বলব—"যিশুই একমাত্র ঈশ্বরপুত্র", সেই মুহূর্তেই আমরা ধর্মবিবাদ ও মৌলবাদের বীজ বপন করব। (জোর হর্ষধ্বনি)

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, ভারতের হিন্দুরা গির্জায় যান, মসজিদেও যান। আমরা যারা শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত হিন্দুমতে বিশ্বাস করি, আমরা কেবলমাত্র মন্দির-গির্জাতেই যাই না। পরন্তু আপনারা কি জানেন যে, আমরা হিন্দুমন্দিরেই পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও আড়ম্বরের সঙ্গে খ্রিস্ট-জন্মসন্ধ্যা উদ্‌যাপন করি? আমরা ঈদ উৎসবে মুসলমান ভাইদের আলিঙ্গন করি। আপনারা কি জানেন, আমরা গুরু নানক, বুদ্ধ, মহাবীরের জন্মজয়ন্তী পালন করি? আমি জানি না সারা পৃথিবীতে খ্রিস্টানদের এমন একটিও গির্জা আছে কিনা যেখানে খ্রিস্টধর্ম-বহির্ভূত কোন ধর্মের উৎসব পালন করা হয়। শান্তির পথ একমুখী নয়। বহু পথের সঙ্গমের মধ্যেই শান্তি আসে। (হর্ষধ্বনি) আমরা কেবল অপর ধর্মকে সহন করি না। কারণ, সহনীয়তার অর্থই হলো কোন কিছু অসহনীয়কে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মেনে নেওয়া। আর আমাদের হিন্দুধর্ম কেবল গ্রহণই করেনি, আপনাদের ধর্মানুষ্ঠানকে আমাদের হিন্দুমন্দিরে উদ্‌যাপন করা হয়েছে। শ্রীবাওয়া জৈন লিখেছিলেন, তিনি বিশ্বশান্তির পূর্বতন পথগুলি দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন এবং তিনি নতুন পথ অনুসন্ধান করছেন। শ্রীবাওয়া জৈন স্মরণ রাখুন, কেবল সহনশীলতা নয়, কেবল গ্রহণ নয়, বরং অপর ধর্মকে নিজের ধর্মের আঙিনায় এনে সম্মান করা—এই শান্তির নতুন পথ। আমরা গত একশো বছর ধরে এই পথ ধরে চলেছি। আজও কি বিশ্ব এই পথ গ্রহণ করবে না?

আরো একটি বক্তব্য আছে। একজন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ইসলামের মত নাও মেনে নিতে পারেন। একজন ইসলামধর্মাবলম্বী খ্রিস্টধর্মের মত নাও মানতে পারেন। কিন্তু সার্বজনীন সত্যগুলি চিরন্তন। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ নীতি (laws of Gravitation) অথবা আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্ব (Theory of Relativity) সকলকেই মেনে নিতে হবে। আমি যদি রাষ্ট্রপুঞ্জের এই অট্টালিকার বিশতলায় দাঁড়িয়ে বলি, আমি নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ নীতিকে বিশ্বাস করি না এবং আমি শূন্যের মধ্যে হাঁটতে শুরু করি, তাহলে কি হবে? মৃত্যুই আমাকে আলিঙ্গন করবে। যা সত্য তা সার্বজনীন। যেটি সত্য তা আপনার, আমার, টম, ডিক, হ্যারী সকলের পক্ষেই সত্য।

আজকের কোয়ান্টাম তত্ত্ব সর্বাধুনিক পদার্থবিদ্যা। মহাকাশ পদার্থবিদ্যা এবং শারীরতত্ত্বের সর্বশেষ আবিষ্কারের মাধ্যমে দুটি সার্বজনীন তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। একটি হলো যা আপাতদৃষ্টিতে সসীম, তা

* স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা।—সম্পাদক

অসীমের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সীমিত মানুষ তাই অনন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত। এই সত্যটিকেই যিশু বলেছিলেন : "ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য তোমাদের মধ্যেই নিহিত আছে।" আবার বলেছিলেন : "আমি এবং স্বর্গীয় পিতা এক।" দ্বিতীয় সার্বজনীন সত্যটি Bell's Theorem-এর পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত experiment থেকে বেরিয়েছে। সেটি হলো—আমরা সকলে কেবল আধ্যাত্মিক স্তরেই নয়, জাগতিক ভাবেও এক গভীর স্তরে পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এই পৃথিবী থেকে মহাকাশের এন্ড্রোমিডা পর্যন্ত আমরা পরস্পর সংযুক্ত। "ম্যাকবেথ (তার আমন্ত্রিত অতিথির) নিদ্রাকে হত্যা করেছে, তাই ম্যাকবেথের জীবনে আর নিদ্রা আসবে না।" আমি যদি আপনাকে হত্যা করি, আমি আমার বাকি জীবনের নিদ্রাকেই হত্যা করব। এই দুটি সার্বজনীন সত্য পৃথিবীর সব ধর্মের মূলভিত্তি। প্রিয় মুসলমান, খ্রিস্টান, হিন্দু ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, আজ আমরা গোঁড়ামি আর মৌলবাদের ওপর দাঁড়িয়ে ধর্মশিক্ষা নিচ্ছি। কিন্তু আগামী কাল এই উন্নততর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের যুগে আমাদের সন্তান-সন্ততিরা আমাদের প্রত্যাখ্যান করবে ও হাস্যাস্পদ ভাববে যদি আমরা ধর্মকে যুক্তি-বিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করতে না পারি। ভ্রাতৃগণ, আমাদের হৃদয়কে আরেকটু বড় করতে হবে। নিজেরা যুক্তিনির্ভর হয়ে ধর্মকেও যুক্তিনির্ভর করতে হবে।

শ্রীবাওয়া জৈন আমাদের জানিয়েছিলেন দারিদ্র্য দূরীকরণের সমস্যা প্রসঙ্গে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি এবিষয়ে অনেক ভাল কাজ করেছেন। কিন্তু একটি তথ্য আপনাদের জানাতে চাই, সেটি হলো গত একশো বছর ধরে হিন্দুরা এত গতিশীল হয়েছেন যে, যদি নিঃসঙ্কোচে বলতে হয়, তবে আমরা বলব আজ ভারতবর্ষ তার দরিদ্র লোকদের বাঁচানোর জন্য অন্য কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন বোধ করে না। আমি 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামক প্রতিষ্ঠানের সভ্য। সমাজের অন্ধকারতম অঞ্চলে আমাকে কাজ করতে হয়েছে। আমাদের আজ অন্য কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। এই কাজের জন্য আমরা অর্থনৈতিক, ধার্মিক, নৈতিক এবং সাংগঠনিক দিক থেকে যথেষ্ট বলবান।

দারিদ্র্য কেবল অর্থনৈতিকই নয়। অনুন্নত দেশে আমরা অর্থনৈতিক দারিদ্র্য দেখি, আর উন্নত দেশে আমরা দেখি আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য। এই সুন্দর দেশ আমেরিকার আজ কি হাল হয়েছে? এই বছর (২০০০) ১৮ জানুয়ারি আমি হলিউডে ছিলাম। ঐদিনের 'Los Angeles Times'-এ দেখলাম—আমেরিকার যুবক-যুবতীদের শতকরা ২১ ভাগ উন্মাদ। অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলিতে আজ ক্রমবর্ধমান মদ্যপান, ওষুধের নেশা, মানসিক বিষাদ আর আত্মহত্যার কথা একবার ভেবে দেখেছেন কি? সুইডেন অর্থনৈতিকভাবে উন্নততম, কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যা সেখানেই হয়। শ্রীবাওয়া জৈন, দয়া করে শুনুন। দেখতে পাচ্ছি একদিন রাষ্ট্রপুঞ্জের Secretary Genarel-এর পদটি আপনার জন্যই আসবে। আপনি অসাধারণ মেধাবী যুবক। কিন্তু মাফ করবেন, আপনি এখনো যুবক। দয়া করে মনে রাখবেন আগামী কালের প্রয়োজন হচ্ছে আধ্যাত্মিক দারিদ্র্যের দূরীকরণ। আর আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায় হচ্ছে নিত্য চিন্তন করা—"আমি এই সীমিত শরীর নই, আমি দেহাতীত আত্মা এবং আত্মা অনন্তস্বরূপ।" ভারতের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির মহাবীর স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন : "Christs and Buddhas are but waves on the Infinite Ocean than I am." (যিশুখ্রিস্ট এবং বুদ্ধের মতো মহামানবরা সেই মহাসাগরের ঢেউমাত্র, যে-মহাসাগর আমার প্রকৃত স্বরূপ।)

যিশু আমাদের মধ্যে সুপ্ত রয়েছেন। বুদ্ধ আমাদের মধ্যে সুপ্ত রয়েছেন। ঈশ্বর আমাদের মধ্যেই সুপ্ত রয়েছেন। আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি এই সুপ্ত ঈশ্বরকে জাগ্রত করতে শেখায়। আধ্যাত্মিকতাই আমাদের সীমিত শরীরের মধ্যে অসীম ঈশ্বরকে জাগ্রত করে। কিভাবে সেই জাগরণ হয়? আপনারা সকলেই তা জানেন। আমার বলার প্রয়োজন নেই, বহু আধ্যাত্মিক পথ আপনাদের জানা আছে। তবে আমরা হিন্দুরা সেই আদি শব্দটি উচ্চারণ করি—'ওম্'। এই 'ওম্' থেকে এসেছে খ্রিস্টানদের 'Amen' ('আমেন'), আর মুসলমানদের 'আমিন'। চলুন আমরা 'ওম্'-কার ধ্বনি করেই শেষ করি। 'ওম্' সার্বজনীন ঈশ্বরবাচক শব্দ। তাই আমরা এটি উচ্চারণ করি।

"হরি ওম্, হরি ওম্, হরি ওম্।"

এরপর আমরা আবৃত্তি করি—আমি শিবস্বরূপ, আমি অনন্তজ্ঞান ও মহিমা-স্বরূপ, আমিই শিব। শিব আমাদের মধ্যেই রয়েছেন—

"অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো
বিভূত্বাচ্চ সর্বত্র সর্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন চাসঙ্গতং নৈব মুক্তির্ন মেয়-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্।।"

আমিই শিব, অনন্তজ্ঞান, অনন্তজীবন, অনন্ত আনন্দের স্বরূপ। আপনারা সকলেই শিবস্বরূপ, খ্রিস্টস্বরূপ, বুদ্ধ-স্বরূপ। সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ। ❑

উনিশ শতকে বাংলা, অসম এবং বিবেকানন্দ ঃ একটি অনুসন্ধান

সুভাষ দে

১৯০১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষদিকে স্বামী বিবেকানন্দ কয়েকজন শিষ্য, মা ভুবনেশ্বরী দেবী এবং আরো কয়েকজনকে নিয়ে পূর্ববাংলা ও অসমে ভ্রমণ করেছিলেন। পূর্ববাংলা পরিভ্রমণের পরে ১৯০১ সালের ৫ এপ্রিল স্বামীজী দলবল-সহ ঢাকা, চন্দ্রনাথতীর্থ প্রভৃতি ভ্রমণ সাঙ্গ করে অসমে আসেন। ধুবড়ি হয়ে তিনি কামাখ্যাতীর্থ দর্শন করেন, গুয়াহাটিতে বক্তৃতা দেন এবং শিলং শহরে বাস করেন—এভাবে মাসাধিককাল অসমে কাটিয়ে ১৯০১ সালের ১২ মে তিনি বেলুড় মঠে ফিরে আসেন। তাঁর অসম আগমন ও অবস্থিতির বিস্তৃত বিবরণ স্বামী গম্ভীরানন্দের 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে পাওয়া যায়।

স্বামীজীর সেই অসম আগমনের একশো বছর পূর্ণ হলো গত বছর। কিন্তু অসমের সঙ্গে স্বামীজীর যোগাযোগ ঘটেছিল এই ঘটনারও বহু বছর পূর্বে। তার আগে তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে অসমের যোগাযোগের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই বিবরণ রয়েছে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'-এ।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে অসমের মানুষের প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনা পাই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর ১৮৮৫ সালের ১৩ জুনের দিনলিপিতে। সেখানে এক অসমবাসীকে বলা হয়েছে কখনো 'অসমিয়া ছোকরা', কখনো বা 'অসমিয়া বালক'। বর্ণনাটি এইরকম—

"শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে সেই পূর্বপরিচিত ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। আজ শনিবার ১৩ই জুন ১৮৮৫, (৩২শে জ্যৈষ্ঠ ১২৯২) জ্যৈষ্ঠ শুক্লা প্রতিপদ, জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি। বেলা তিনটা।...

"পণ্ডিতজী মেঝের উপর মাদুরে বসিয়া আছেন। একটি শোকাতুরা ব্রাহ্মণী ঘরের উত্তরের দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। কিশোরীও আছেন। মাস্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। সঙ্গে দ্বিজ ইত্যাদি। অখিলবাবুর প্রতিবেশীও বসিয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে একটি আসামী ছোকরা।"

এটি ১৮৮৫-র বর্ণনা। ১৮৮১-তে অর্থাৎ এর চারবছর আগেই নরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাতের ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটে গেছে এবং 'আসামী ছোকরা' যখন ঠাকুর-দর্শনে এসেছেন—সেসময়ে নরেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে, ঠাকুরের ভাষায়, 'ডাইলুট' হয়ে গেছেন।

উক্ত দিনটিতে অখিলবাবুর প্রতিবেশীর সঙ্গে ঠাকুরের বাক্যালাপ চলাকালীন অসমিয়া বালকটি কোন কথা বলেনি।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—(অখিলবাবুর প্রতিবেশীকে) হ্যাঁগা, তুমি অনেককাল আস নাই। সাত-আট মাস হবে।

প্রতিবেশী—আজ্ঞা, এক বৎসর হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার সঙ্গে আরেকটি আসতেন।

প্রতিবেশী—আজ্ঞে হাঁ, নীলমণিবাবু।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি কেন আসেন না? একবার তাঁকে আসতে বলো, তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিও। (প্রতিবেশীর সঙ্গী বালক দৃষ্টে) এ-ছেলেটি কে?

প্রতিবেশী—এ-ছেলেটির বাড়ি আসামে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আসাম কোথা? কোন্‌দিকে?"

'কথামৃত'-এ এবং অন্যান্য শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাশ্রিত গ্রন্থে এই অখিলবাবু বা তাঁর প্রতিবেশীর কোন পরিচয় নজরে পড়েনি। অসমের সঙ্গে সেই প্রতিবেশীর যোগাযোগের সূত্রটিই বা কি ছিল? 'নীলমণিবাবু' কি অসমিয়া ভদ্রলোক? তবে অসম সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি থেকে মনে হয়, তিনি অসম প্রসঙ্গ সেদিনই প্রথম শুনলেন। অখিলবাবুর প্রতিবেশীর সঙ্গে অসমিয়া বালকের যোগাযোগই বা ঘটল কিভাবে? কলকাতায় এত দর্শনীয় বস্তু থাকতে দক্ষিণেশ্বরে অসমিয়া বালক কেন আসে? এসব নানা প্রশ্ন মনে জাগে।

এই প্রসঙ্গটির শেষে দেখা যাচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন ঃ "রাধিকা বিশুদ্ধসত্ত্ব, প্রেমময়ী।... বৈষ্ণবদের গ্রন্থে আছে, রাধা জন্মগ্রহণ করে চোখ খুলেন নাই; অর্থাৎ এই ভাব যে, এ-চক্ষে আর কাকে দেখব? রাধিকাকে দেখতে যশোদা যখন কৃষ্ণকে কোলে করে গেলেন, তখন কৃষ্ণকে দেখবার জন্য রাধা চোখ খুললেন। কৃষ্ণ খেলার ছলে রাধার চক্ষে হাত দিছলেন। (আসামী বালকের প্রতি) এ কি দেখেছ, ছোট ছেলে চোখে হাত দেয়?"

একঘর লোকের মধ্যে বৈষ্ণব প্রসঙ্গে বিশেষ করে অসমিয়া বালককে উদ্দেশ করে শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তি কি এইজন্য যে, অসমিয়া বালক একশরণীয়া বা মহাপুরুষিয়া বৈষ্ণবধর্মের দেশের লোক?

এবার স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গে আসা যাক। ১৯০১ সালে অসম ভ্রমণের বহু আগেই অসমের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল একটি সঙ্গীতসঙ্কলন গ্রন্থের সম্পাদনা-সূত্রে। গ্রন্থটির নাম 'সঙ্গীতকল্পতরু'। প্রকাশকাল ১৮৮৭। এই গ্রন্থে মোট গান আছে ৬৪৭টি। এবং আশ্চর্যের বিষয়, এখানে স্থান পেয়েছে দুটি অসমিয়া গানও। গান-দুটি 'আসাম ছাত্র সভার বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে' রচিত হয়েছিল বলে শিরোনামে দেওয়া আছে। তবে মনে হয়, উক্ত সংস্থার নামটি সঠিক নয়। কেননা ঐসময় অসম থেকে যেসব ছাত্ররা কলকাতায় পড়তে আসতেন, তাঁদের তৈরি একটি উল্লেখযোগ্য সংগঠনের নাম জানা যায়, সেটি হলো 'অসমীয়া সাহিত্য সভা' বা 'অসমীয়া

ছাত্ৰর সাহিত্য সভা'। এই সভা সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায় উষারঞ্জন ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রনাথ আৰু অসম' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন : "কলিকতাত পঢ়াশুনা কৰি থাকোতে কেইবাগৰাকী অসমীয়া যুৱকে ১৮৭২ চনত 'অসমীয়া সাহিত্য সভা' বা 'অসমীয়া ছাত্ৰৰ সাহিত্য সভা' প্রতিষ্ঠা কৰে। সময়টো মন কৰিব লগিয়া, অসমীয়া ভাষা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোৱাৰ এ বছৰ আগতে। গঙ্গাগোবিন্দ ফুকন, জগন্নাথ বৰুৱা আৰু মাণিকচন্দ্র বৰুৱা আদি সকলেই প্রধানত এই অনুষ্ঠানৰ প্রতিষ্ঠাপক আছিল।... সভা-সমিতি পতা হৈছিল, অসমীয়া ছাত্ৰসকলৰ মেছত, অর্থাৎ ৬৭ মির্জাপুৰ স্ট্রিট, ১৪ প্রতাপচন্দ্র চেটার্জি লেন, ৬২ সীতাৰাম ঘোষ স্ট্রিট আৰু ২ ভবানী দত্ত লেনত। বুধ বৰীয়া সভা আছিল এক প্রকাৰ তুলুঙা মেজাজৰ। প্রতি শনিবাৰে আলোচনা হৈছিল ভাষা সাহিত্য আৰু গধুৰ বিষয় সম্পর্কে।" (কলকাতায় পড়াশোনা করার সময় কয়েকজন অসমিয়া যুবক ১৮৭২ সালে 'অসমিয়া সাহিত্য সভা' বা 'অসমিয়া ছাত্রের সাহিত্য সভা' প্রতিষ্ঠা করে। সেইসময়টা উল্লেখযোগ্য, অসমিয়া ভাষা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার একবছর আগে। গঙ্গাগোবিন্দ ফুকন, জগন্নাথ বরুয়া আর মানিকচন্দ্র বরুয়া প্রমুখ সকলেই প্রধানত এই অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাপক ছিলেন। সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হতো অসমিয়া ছাত্রদের মেসে অর্থাৎ ৬৭ মির্জাপুর স্ট্রিট, ১৪ প্রতাপচন্দ্র চ্যাটার্জি লেন, ৬২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট এবং ২ ভবানী দত্ত লেনে। বুধবারের সভা ছিল একপ্রকার কড়া মেজাজের। প্রতি শনিবারে আলোচনা হতো ভাষা, সাহিত্য আর গভীর বিষয় সম্পর্কে।)

স্বামী বিবেকানন্দের (তখন নরেন্দ্রনাথ) সঙ্গীতসঙ্কলন গ্রন্থে অসমিয়া গানের অন্তর্ভুক্তি থেকে বোঝা যায়, কলকাতায় বসবাসকারী অসমিয়া ছাত্রেরা সেইসময় তাঁদের বিদ্যানুরাগ, সপ্রতিভতা, নানা বিষয়ে আগ্রহ-উৎসাহ—সব মিলিয়ে সমসাময়িক বিদ্বৎ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁদের একনিষ্ঠ সাহিত্যচর্চা, মাতৃভাষার প্রতি টান অপর সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তি এবং ছাত্রসমাজকে আকৃষ্ট করেছিল। তাছাড়া উনিশ শতকের নয়ের দশকে অসম-বাংলা সম্পর্কের মধ্যে এক উদার আকাশের মুক্তি যে ছিল, সেসম্পর্কেও আমরা নিশ্চিত হতে পারি—যখন দেখি নরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং বৈষ্ণবচরণ বসাক তাঁদের সঙ্গীতসঙ্কলন গ্রন্থে অসমিয়া যুবক ছাত্রদের সংগঠনের বাৎসরিক উৎসবে গীত দুটি গানকে ঠাঁই দিচ্ছেন। ১৮৮৬ সালে এই সঙ্গীতসঙ্কলনটি প্রকাশিত হওয়ার দুবছর পর স্থাপিত হয়েছিল 'কলিকতা অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা' (২৫ আগস্ট ১৮৮৮)। কিন্তু এই ছাত্রসভার সভ্যদের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে যে প্রবল অনুরাগ ও অধ্যয়ন ছিল, সেকথা অসমিয়া সাহিত্যের ইতিহাসকারেরা সকলেই স্বীকার করেছেন। কাজেই নরেন্দ্রনাথ দত্ত নামে কলকাতার তখনকার উজ্জ্বলতম যুবকটির সঙ্গে কোন না কোনভাবে অসমের ছাত্রদের, যাঁরা পরবর্তী কালে সকলেই অসমের বরেণ্য পুরুষ, তাঁদের যোগাযোগ হয়েই থাকবে। অন্তত সঙ্গীতের সূত্রে তো বটেই। কেননা তখনকার কলকাতার ব্রাহ্মসমাজ-কেন্দ্রিক যে সাংস্কৃতিক আবহ, সেখানে "নরেন্দ্রর মতো গাইতে বাজাতে কেউ পারে না।" গান শোনানোর জন্য নানা জায়গা থেকে ডাক আসত নরেন্দ্রনাথের কাছে। সুতরাং সঙ্গীতের সূত্রেই হয়তো তৎকালীন কলকাতার অসমিয়া ছাত্রসমাজের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের কোন যোগসূত্র গড়ে উঠে থাকবে। বয়সেও এঁরা সকলেই তাঁর সমসাময়িক ছিলেন।

সেসময় বাঙলা ও অসমের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ও গ্রহণের ক্ষেত্রটি ছিল নির্মল ও অবাধ। সে-বিবরণ ও স্বীকৃতি রয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থে—"হেমচন্দ্র গুণাভিৰাবৰ অভ্যুদয়ৰ কালছোৱাতে ইংৰাজী শিক্ষাৰ পোহৰ পোৱা দুই-চাৰিজন অসমীয়া ডেকাই ভাষা-জননীৰ সেৱাত আত্মনিয়োগ কৰিছিল। এফালে যেনেকৈ ইংৰাজী শিক্ষা আৰু সাহিত্যৰ লগত এওঁলোকৰ পৰিচয় ঘটিছিল, আনফালে বঙলা সাহিত্যৰ সংস্পর্শটো এওঁলোকে নহাকৈ-থকা নাছিল। অসমত বঙলা ভাষা প্রবর্তনৰ ফলতে হওক, নাইবা কলিকতাত উচ্চশিক্ষা লাভ কৰিবলৈ যোৱাৰ ফলতেই হওক, বঙলা সাহিত্য অধ্যয়ন কৰাৰ সুবিধা এওঁলোকে লাভ কৰিছিল। এই দ্বৈত প্রভাবদ্বাৰা উদ্বুদ্ধ হৈ শিক্ষিত ডেকাসকলে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য ৰচনা কৰিবলৈ প্রয়াস কৰে।" (হেমচন্দ্র গুণাভিরামের অভ্যুদয়ের সময়ে ইংরেজী শিক্ষার আলো পেয়ে দু-চারজন অসমিয়া যুবক ভাষা-জননীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। একদিকে যেরকম ইংরেজী শিক্ষা আর সাহিত্যের সাথে তাঁদের পরিচয় হয়েছিল, অন্যদিকে বঙ্গসাহিত্যের সংস্পর্শেও তাঁরা এসেছিলেন, অসমে বাঙলা ভাষা প্রবর্তনের ফলেই হোক নতুবা কলকাতায় উচ্চশিক্ষা লাভ করতে যাওয়ার জন্যই হোক, বাঙলা সাহিত্য অধ্যয়ন করার সুবিধা তাঁরা লাভ করেছিলেন। এই দ্বৈত প্রভাব দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষিত যুবকবৃন্দ সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য রচনা করতে প্রয়াস করেন।)

কিন্তু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এইরকম কোন আদান-প্রদানের ইতিহাস এখনো অপেক্ষিত। হলে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। নিজের ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাবান থেকেও কিভাবে সমসাময়িক পরিমণ্ডলের গ্রহণযোগ্য উপাদান দিয়ে নিজের সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে সঙ্গীতসৃষ্টি ও চর্চাও যে দূরে থাকেনি—এই বিষয়টি হয়তো পারস্পরিক অনেক ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাবে বলেই বিশ্বাস।

তবে ১৮৪৯-এ দেবেন্দ্রনাথের কামাখ্যাদর্শন, সেই পর্বেই আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের বাঙলা ভাষায় 'কামাখ্যা যাত্রা পদ্ধতি'র রচনা, ১৮৮৫-র শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে 'আসামী

ছোকরা'র উপস্থিতি, ১৮৮৬-তে দুটি অসমিয়া গানকে 'সঙ্গীতকল্পতরু' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্তি এবং এর প্রায় পনেরো বছর পরে স্বামীজীর অসম ভ্রমণ—এই চিন্তা-চর্চা-ভ্রমণ-আগমনের ধারাবাহিকতা কিন্তু যেকোন কারণেই হোক খুব স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ এবং প্রবলভাবে বজায় থাকল না।

'সঙ্গীতকল্পতরু' গ্রন্থের 'আসাম ছাত্র সভার বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে' শিরোনামে যে-দুটি অসমিয়া গান সঙ্কলিত হয়েছে, সে-দুটি এবার উদ্ধৃত করা যাক—

(ক) রাগিণী—ঝিঁঝিট, তাল—একতাল

"কি সুখর দিন আজি, কেনে প্রীতি ভাব এ,
আনন্দে নধরে হিয়া সকলো ভাই বন্ধুর এ।..."
(কি সুখের দিন আজ, কেন প্রীতি ভাব এ,
আনন্দে ধরে না হৃদয় (হিয়া) সকল ভাই বন্ধুর এ।)

(খ) রাগিণী—বাগেশ্রী কানেড়া, তাল—আড়াঠেকা

"করুণা বিতরি প্রভু, দিয়া শান্তি পদ ছায়া,
মঙ্গল মলয় আনি, করা শুদ্ধ পাপ হিয়া।..."
(করুণা বিতরি প্রভু, দেয় শান্তি পদছায়া,
মঙ্গল মলয় এনে কর শুদ্ধ পাপ হিয়া (হৃদয়)।)

এই গানদুটির রচয়িতা হিসাবে কারো নাম দেওয়া হয়নি। 'প্রাসঙ্গিক তথ্য ও আলোচনা' অংশে গীতিকারের নামের স্থানে লেখা আছে 'অজ্ঞাত'। (দ্রঃ সঙ্গীতকল্পতরু, পৃঃ ২৮৪-২৮৫)

প্রশ্ন উঠতে পারে, 'সঙ্গীতকল্পতরু'র সম্পাদক ও সঙ্কলক হিসাবে তো একা নরেন্দ্রনাথ দত্ত নন, সেখানে বৈষ্ণবচরণ বসাকের নামও আছে। তবে অসমিয়া গীতদুটির সঙ্কলনভুক্তি প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথের নাম বা কৃতিত্বই কেন শুধু উল্লেখ করা হবে? এবিষয়ে বলতে হয় যে, তিনি যখন কলকাতার বুকে একজন উজ্জ্বল মেধাসম্পন্ন ছাত্র ও সঙ্গীতকার হিসাবে পরিচিত, তখনি তিনি বৈষ্ণবচরণ বসাকের সহযোগী হয়ে 'সঙ্গীতকল্পতরু'র মতো একটি সুবৃহৎ সঙ্গীতসঙ্কলনের কাজে হাত দেন এবং দারুণভাবে সফল হন। কিন্তু পরবর্তী কালে বৈষ্ণবচরণ বসাক একা যখন এই 'সঙ্গীতকল্পতরু' গ্রন্থটিকে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন এবং নাম পরিবর্তিত করে 'বিশ্বসঙ্গীত' রাখেন, সেখানে কিন্তু ঐ অসমিয়া গানদুটি বর্জিত হয়। তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত সমগ্র বিশ্বে আলোড়নসৃষ্টিকারী 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামে খ্যাতিমান। তাঁর তখন সঙ্গীতের সম্পাদনা-সঙ্কলনের পরিমণ্ডলে বাঁধা থাকার অবসর কোথায়? তাছাড়া মনে হয়, হয়তো বৈষ্ণবচরণ বসাকের পক্ষে নরেন্দ্রনাথ দত্তের এই পরিবর্তনকে সহজে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। এইজন্য 'সঙ্গীতকল্পতরু'কে পুনর্মুদ্রিত করার সময় নাম পরিবর্তন বিষয়ে তিনি যে-যুক্তি দিয়েছেন তা যথেষ্ট সবল মনে মনে হয় না। তিনি 'সচিত্র বিশ্বসঙ্গীত' নামে গীতসঙ্কলনটির চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় বলছেন: " 'সঙ্গীতকল্পতরু'র বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া অনেক নীচ প্রকৃতির লোক সঙ্গীতকল্পতরু নামের অনুকরণ করিয়া কয়েকখানি অসার সঙ্গীতপুস্তক প্রকাশ করায় ৪র্থ (সংস্করণ গ্রন্থের) নাম পর্যন্ত পরিবর্তন উচিত বিবেচনা (ইহার নাম 'বিশ্বসঙ্গীত') রাখা হয়।... যেহেতু 'সঙ্গীতকল্পতরু'র ইহাই সংশোধিত পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ এবং অতঃপর 'সঙ্গীত-কল্পতরু'ও আর মুদ্রিত হইবে না।"

আমরা ধরে নিতে পারি, ঐ পর্বে অসমের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের ছাত্রদের সংস্পর্শে ও সান্নিধ্যে নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রীতি ও গুণমুগ্ধ হিসাবে তাঁদের সংগঠনের বাৎসরিক সভায় গীত অসমিয়া গানদুটিকে তাঁর সঙ্কলনে স্থান দিয়েছিলেন। এই সহানুভূতি ও সম্মান তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে বৈষ্ণবচরণ বসাকের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বিশ্বসঙ্গীত'-এ অসমিয়া গানদুটি বাদ পড়ে যায়। তাছাড়া স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সঙ্গীতে ত্রৌর্য্যত্রিক। একাধারে গায়ক-সুরকার-গীতিকার। পূর্ণ সঙ্গীতরসিক। এ সমঝদারি বৈষ্ণবচরণের কাছে আশা করা যায় না। তিনি ছিলেন "তদানীন্তন বিখ্যাত জিমন্যাস্টিক শিক্ষক বৈষ্ণবচরণ।" (বাঙ্গালির সার্কাস, পৃঃ ৬৬) তাছাড়া দুজনে মিলে সঙ্কলনের কাজ করলেও স্বয়ং বৈষ্ণবচরণ বসাকই 'সঙ্গীতকল্পতরু'র আখ্যাপত্রে জানিয়েছেন: "শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি. এ. মহাশয়ই প্রধানত ইহার অধিকাংশ সংগ্রহ করেন।" কাজেই অসমিয়া গানদুটিও যে স্বামীজীরই সংগ্রহ করা—একথা মনে করা যায়।

উনিশ শতকের সেই পরিমণ্ডলে অসম ও বাংলার মধ্যে একটা যোগসূত্র পরোক্ষে হলেও গড়ে উঠেছিল, যে-ধারাবাহিকতা নানা কারণে আর বজায় থাকেনি। তাছাড়া 'সঙ্গীতকল্পতরু'র কাজ চলাকালীনই নরেন্দ্রনাথ দত্তের জীবনের ধারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। সেকথা অবশ্য সঙ্কলনের ভূমিকায় বৈষ্ণবচরণ জানিয়েছেন: "তিনি (স্বামীজী) নানা অলঙ্ঘনীয় কারণে অবসর না পাওয়ায়... আমিই ইহার অবশিষ্টাংশ পূরণ করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করিলাম।" বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার প্রকাশিত 'সঙ্গীতকল্পতরু'র সম্পাদক ও পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকারক ডঃ সর্বানন্দ চৌধুরী এই অংশটির যথার্থ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের সামান্য আগে অথবা পরে নরেন্দ্রনাথ সঙ্কলনের কাজ শুরু করেন (আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৮৬)। তবে শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পরেও যে সঙ্কলনের কাজ চলছিল তার সপক্ষে প্রমাণ হলো, শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের শূন্যতা নিয়ে এখানে বেশ কিছু গান আছে। 'সঙ্গীতকল্পতরু'তে 'পরমহংস রামকৃষ্ণ' শিরোনামে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচিত সে-গানদুটি যথাক্রমে—

(ক) "(আমি) সাধে কাঁদি।
হৃদয়-রঞ্জনে; না হেরে নয়নে, কেমনে পরান বাঁধি।..."

(খ) "কোথা গেলে রামকৃষ্ণ সাধক-রতন
তোমা বিনে তমোময় হেরি এ ভুবন।..." (পৃঃ ৪৬৩)

কাজেই সম্পাদকের যে-মন্তব্য, কাশীপুরের বাগানবাড়ি এবং বরানগর মঠে অবস্থানকালে অথবা বরানগর মঠে আগমনের পর স্বামীজী এই কাজটি করেন—তা যথার্থ। তিনি আরো বলেন, সম্ভবত বরানগর মঠে অবস্থানের প্রথম পর্বেই তিনি সংগ্রহকার্য থেকে নিজেকে সরিয়ে আনেন। সময়টি মনে করার মতো। ততদিনে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং স্বামী বিবেকানন্দ-সহ অল্প কয়েকজন যুবক দিনরাত সেবাকর্মে রত আছেন। এটিই বৈষ্ণবচরণ-কথিত 'অলঙ্ঘনীয় কারণ'।

তবে প্রাদেশিকতা বা আঞ্চলিকতাবাদের বিচ্ছিন্ন মনোভাবের স্ফুরণ সে-পর্বে না থাকলেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও স্বীকৃতি যে তৎকালীন বঙ্গের অন্তত গীত-সঙ্কলকেরা দিয়েছিলেন, সেদিক থেকেও অসমিয়া গানদুটির অন্তর্ভুক্তিকে বিচার করা চলে। কেননা 'সঙ্গীতকল্পতরু'র পরবর্তী কালে সঙ্গীতসঙ্কলন গ্রন্থ 'সঙ্গীতরাগ কল্পদ্রুম'-এ কিন্তু নানা ভাষার গান সঙ্কলিত হতে দেখা যায়। (প্রথম প্রকাশ ১৮৪৬, সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ—১৯১৬। আখ্যাপত্রে আছে—"ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রালোচনা ও সংস্কৃত হিন্দী গুজরাতি মারাঠী কর্ণাটী তৈলঙ্গী তামিল বাঙ্গালা উড়িয়া আরব্য, পারস্য পেগুয়ান ইংরাজি ও রাজপুতানার নানা প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত নানা সুরে প্রাচীন গান সংগ্রহ, কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগসাগর বিরচিত" ইত্যাদি।) 'সঙ্গীতকল্পতরু'তে 'নানাবিষয়ক সঙ্গীত' অংশে সংস্কৃত, উড়িয়া, অসমিয়া, সাঁওতালী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার গান সংগ্রহে পূর্বোক্ত সঙ্কলনের আদর্শটি অনুসৃত হয়ে থাকতে পারে। যদিও 'সঙ্গীতকল্পতরু'র পরবর্তী নবকলেবরে নবনামকরণে 'বিশ্বসঙ্গীত' নামে যে প্রকাশ, তাতে অসমিয়া গানদুটি বর্জিত হয়েছে দেখা যায়; কিন্তু এরপরে উনিশ শতকের শেষে অন্য একটি গীতসঙ্কলনে অসমিয়া গান পাওয়া যায়। সঙ্কলনটির নাম 'সঙ্গীতসহস্র' (৬৫/২ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা, গ্রন্থকার সমিতি থেকে প্রকাশিত, ১৮৯১ সং।) এই গ্রন্থেও 'নানা ভাষাসঙ্গীত' পর্যায় "অসমিয়া, উড়িয়া, সাঁওতালী সহ অন্যান্য ভাষার গান" রয়েছে। তবে একটি ব্যাপার লক্ষণীয়, 'সঙ্গীতকল্পতরু'তে অসমিয়া গানদুটি 'নানাবিষয়ক সঙ্গীত' পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত, নানা ভাষার সঙ্গীত হিসাবে নয়। অর্থাৎ স্বামীজী এখানে বিষয়কে গুরুত্ব দিচ্ছেন যতটা, ভাষাকে ততটা নয়। সুদূর অসম থেকে একদল উৎসাহী অসমিয়া নব্য যুবক কলকাতায় আসেন পড়াশুনার জন্য এবং তাঁদের সংগঠনের বাৎসরিক উৎসবকে সঙ্গীত দ্বারা নন্দিত করছেন—স্বামীজীর কাছে হয়তো বিষয় হিসাবে এটিই সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছিল।

এরপর অনেকদিন অতিবাহিত হয়েছে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রে বয়ে গেছে অনেক জল। অসম-বাংলার পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে এসেছে অনেক বাঁক-বিভঙ্গ। স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব এরপর অসমে সর্বাধিক অনুভূত হয়েছিল ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধকালে। এবিষয়ে রাধিকামোহন ভাগবতী বলেন : "অসমত ৰামকৃষ্ণ পৰমহংস দেৱতকৈ স্বামী বিবেকানন্দহে সকলোৰে মাজত সুপৰিচিত। বিশেষকৈ যুৱচামৰ মাজত জীৱিত কালৰেপৰা স্বামীজি ভাৰতবৰ্ষৰ জাগৃতিৰ প্ৰতিৰূপ হিছাপেই শ্ৰদ্ধেয় হৈ আহিছে। স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ কালছোৱাত তেওঁৰ উত্তিষ্ঠিত জাগ্ৰত প্ৰাপ্য বৰাণ নিৰোধিত বাণীত তেতিয়াৰ যুৱচাম উদ্বুদ্ধ হৈছিল। ধৰ্মীয় ভাৱত নহ'লেও জীৱন জাগৃতিৰ অবলম্বনৰূপে বিবেকানন্দ অসমৰ নব জাগৰণত বিবেক স্বৰূপ যুৱচামৰ মাজত শ্ৰদ্ধাভাজন হোৱাৰ বহুতো প্ৰমাণ আছে। স্বামী বিবেকানন্দৰো এই ৰাজ্যৰ প্ৰতি নিজা আকৰ্ষণ থকাটো স্পষ্ট।" (অসমে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব থেকে স্বামী বিবেকানন্দ সকলের মধ্যে সুপরিচিত। বিশেষ করে যুবমহলের মধ্যে জীবিতকাল থেকেই স্বামীজী ভারতবর্ষের জাগৃতির প্রতিরূপ হিসাবে শ্রদ্ধালাভ করে এসেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তাঁর 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' বাণীতে তখনকার যুবসমাজ উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। ধর্মীয় ভাবে না হলেও জীবন-জাগৃতির অবলম্বন-রূপে বিবেকানন্দ অসমের নবজাগরণের বিবেকস্বরূপ যুবসমাজে শ্রদ্ধাভাজন হওয়ার বহু প্রমাণ আছে। স্বামী বিবেকানন্দের এই রাজ্যের প্রতি আকর্ষণ থাকাটা স্পষ্ট।)

কিন্তু অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেছে স্বামীজী যখন কলকাতার ছাত্র, সেসময়ে অসম থেকে পড়তে যাওয়া ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সম্ভাব্য যোগাযোগের সূত্র ও ঘটনাগুলি। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ পর্বে নগর কলকাতায় নরেন্দ্রনাথ দত্তের মতো যুবক অসমের উজ্জ্বল মেধাসম্পন্ন যুবকদের সঙ্গে নিবিড় সখ্য, শ্রদ্ধা ও সান্নিধ্যে হয়তো লাভ করেছিলেন পরম প্রীতি ও প্রেরণা; তারই ফলশ্রুতি হয়তো, তাঁর সম্পাদিত গীতসঙ্কলনে 'আসাম ছাত্র সভা'র বাৎসরিক অধিবেশনে গীত দুটি অসমিয়া গানের অন্তর্ভুক্তি—তা কে বলতে পারে? ❑

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

(১) যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ
(২) শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত
(৩) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমকালীন কলকাতার সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা—নিশীথরঞ্জন রায়, 'উদ্বোধন' শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন
(৪) অসমিয়া সাহিত্যর সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত—সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা
(৫) রবীন্দ্রনাথ আৰু অসম—উষারঞ্জন ভট্টাচার্য
(৬) সঙ্গীতকল্পতরু—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক
(৭) ভারতর কল্যাণ আমার কল্যাণ—সঙ্কলক স্বামী বিমলাত্মানন্দ (ভূমিকা), রাধিকামোহন ভাগবতী

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

'অন্য ভগবান'

এই লেখাটির প্রেরণার উৎস সম্প্রতি 'উদ্বোধন' পত্রিকায় 'যুব-সম্প্রদায়ের প্রশ্ন' শিরোনামে একটি নতুন বিভাগের সংযোজন। এই ধরনের একটি আলোচনার মাধ্যম—বিশেষ করে যুবসম্প্রদায়কে নিয়ে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের দেশের যুবসমাজের কাছে অনেক কিছু আশা করেছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর স্বপ্নের ভারতবর্ষের বর্তমান দুর্দশা নিঃসন্দেহে তাঁর কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক হতো। গত ১০০ বছর ধরে স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' আমাদের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু তার অনুশীলন কোথায়? স্বামীজী চেয়েছিলেন বেলুড় মঠকে নিয়ে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি অনেক কিছু করেছেন এবং উত্তরসূরিদের জন্য নির্দেশাবলী রেখে গিয়েছেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের প্রচার বহুল পরিমাণে ব্যাপ্ত হলে এবং বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রাধান্য পেলে দেশে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসতে পারে, কারণ মানুষের নৈতিক উন্নতি ছাড়া দেশের উন্নতির কোন সম্ভাবনাই নেই। জাতীয় সম্পদ দু-চার শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়াটাই সবকিছু নয়। ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সাফল্য লাভ করতে পারে যখন দেশের অধিবাসীরা আদর্শ সমাজজীবন যাপনের যোগ্যতা অর্জন করে। গণতন্ত্রের প্রবক্তা প্রখ্যাত ফরাসি দার্শনিক রুশো বলেছিলেন, গণতন্ত্র এমনই একটি নিখুঁত রাষ্ট্রব্যবস্থা, যেটা স্থাপন করা সম্ভব হয় একমাত্র তখনি—যখন দেশের নাগরিকরা প্রত্যেকে দেবতুল্য চরিত্রের অধিকারী হয়। তিনি বলেছিলেন : "If there were a people of Gods... then only so perfect a form of Government as democracy would be possible." একথার সত্যতা দেশের বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যর্থতা থেকেই বুঝতে পারা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে চার্লস ডারউইন 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন'-এর তত্ত্ব ঘোষণা করেছিলেন। এরই ফলস্বরূপ মানুষ ধর্ম এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়ে সুখভোগের আশায় অর্থকে ভগবানের স্থলাভিষিক্ত করে। বিশেষ করে আমেরিকায় এই প্রবণতা চরম পর্যায়ে ওঠে। এই অবস্থার পর্যালোচনা করে মনীষী রোমাঁ রোলাঁ বলেছিলেন যে, অর্থ আমেরিকানদের জীবনে 'অন্য ভগবান'-এর রূপ ধারণ করেছে। এই মানসিকতা আজকে আরো বেড়েছে এবং সারা পৃথিবীতে বিস্তারলাভ করেছে। ভারতবর্ষেও এই ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম। এর পরিণাম সহজেই অনুমেয়। স্বামী বিবেকানন্দের গর্বের মাতৃভূমিতে ভ্রষ্টাচার এবং জড়বাদের এই প্রাবল্য বিশেষ হতাশাব্যঞ্জক। তিনি আশা করেছিলেন, ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমে ভারতবর্ষ বিশ্বজগতে অন্য দেশের কাছে আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠবে। অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় যে, স্বামীজীর এই প্রত্যাশা অপূর্ণ রয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, দেশের যে অপরিসীম দারিদ্র্য তাঁর মনকে পীড়িত করত সে-অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন এখনো হয়নি। বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৯৭ সালে ভারতবর্ষে শতকরা ৪৪.৭ ভাগ লোক আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যরেখার নিচে বাস করে। ভারতে দারিদ্র্যরেখার নিচে বাস করে এমন লোকের সংখ্যা শতকরা ৩৫ ভাগ। ভ্রষ্টাচারের ক্ষেত্রেও আমরা অনেক দেশের চেয়ে অগ্রণী, যার প্রমাণ পাওয়া যায় বার্লিন থেকে প্রকাশিত Transparency International-এর গত কয়েক বছরের রিপোর্টে। এইসব প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, মোট ৯০টি দেশের মধ্যে দুর্নীতির মানদণ্ডে ভারতের স্থান মাত্র কয়েকটি দেশের ঊর্ধ্বে।

এখন অতিরিক্ত অর্থোপার্জনই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অর্থ যা দিতে পারে সেইটাই একমাত্র কাম্য। অধিকাংশ মানুষের কাছে অর্থাকাঙ্ক্ষার কোন সীমারেখা নেই—যাকে 'অন্য ভগবান' সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাকে লাভ করাই মনুষ্যজীবনের সাধনা। এরূপ মানসিকতা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে অনেক সমস্যা ও অশান্তি সৃষ্টি করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, Transparency International-এর চেয়ারম্যান পিটার আইগেন সম্প্রতি একটি Global Forum-এ বলেছিলেন, নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রনায়ক সানি আবাশা তাঁর দেশ থেকে যে ৭ বিলিয়ন ডলার অর্থ অসৎ উপায়ে সরিয়ে নিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে রেখেছিলেন, সেই টাকার সাহায্যে আফ্রিকায় H.I.V. এবং AIDS-এর যে epidemic চলেছে তার অনেকটা প্রতিবিধান হতে পারে। সেরকম সার্বিয়ার স্লোবোডান মিলোসেভিক যে ৭০ মিলিয়ন ডলার আত্মসাৎ করে সুইস ব্যাঙ্কে রেখেছিলেন সেই টাকাতে সার্বিয়ার দুর্দশা অনেক পরিমাণে দূরীভূত করা যেতে পারে।

আমাদের দেশে দারিদ্র্য দূরীকরণের যেসমস্ত প্রকল্প সরকার থেকে নেওয়া হয়, তার অধিকাংশ অর্থ দুর্নীতিগ্রস্ত বিভিন্ন স্তরে আত্মসাৎ হয়ে যায়। ফলে দুঃস্থ ও দরিদ্র মানুষের কাছে তাদের প্রাপ্য অর্থের অতি সামান্যই গিয়ে পৌঁছায়। বিষয়টি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং বর্বর মানসিকতার পরিচায়ক। কিছুদিন আগে ভারতীয় ক্রিকেটের এবং বিদেশী কয়েকজন দিক্‌পাল খেলোয়াড়ের অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের অসৎ উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়ে পড়ায় জাতীয় মানসে বিশেষ বেদনার সঞ্চার হয়। বর্তমান সমাজে সর্বস্তরে দুর্নীতির যে ব্যাপক প্রসার ঘটেছে তার একটি দুঃখজনক প্রতিফলন এই ঘটনার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র অর্থের লোভে এই প্রতিভাবান যুবকেরা নিজেদের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা বিপন্ন করতে দ্বিধাবোধ করেননি। অথচ এঁরা সকলেই প্রচুর অর্থোপার্জন করতেন ক্রিকেট-জগৎ থেকে এবং বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে। এও জানা গেছে যে, মুম্বাই সিনেমাশিল্পে অপরাধ-জগতের সঙ্গে অর্থনৈতিক মেলবন্ধন গভীররূপে বিদ্যমান। দেশের রাজনৈতিক এবং শিল্পব্যবসায় জগতের ক্রমবর্ধমান ভ্রষ্টাচারে এগুলি নতুন সংযোজন।

সোভিয়েত রাশিয়ায় কমিউনিজমের বিপর্যয় শুধুমাত্র একটি দমনমূলক সমাজব্যবস্থার ব্যর্থতার পরিচায়ক নয়, এটি একটি পরার্থপর আদর্শের পরাজয়ের সূচকও বটে। আদর্শগতভাবে মার্কসবাদী কমিউনিজমের উচ্চতম সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বার্থের কোন স্থান নেই বলেই আদর্শটি পরার্থপর, তবে আধ্যাত্মিক অর্থে নয়। যার যেমন ক্ষমতা ও যোগ্যতা সেই দিয়ে প্রত্যেক নাগরিক দেশের ও সমাজের সেবা করবে। প্রতিদানে সে কিন্তু পাবে শুধু সেইটুকুই, যেটা তার প্রয়োজন—"From each according to his

ability—to each according to his need." এটা অতি উচ্চ আদর্শের কথা। আরো বলা হয়েছে যে, এই অবস্থায় সমাজের মানুষ এমন একটি স্তরে পৌঁছাবে যেখানে state বা coercion-এর কোন প্রয়োজন হবে না—"The state will wither away." কার্ল মার্কস 'Economic Interpretation of History' এবং 'Dialectical Materialism'-এর সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। এই দার্শনিক মতবাদকে অনেকে 'Utopian' বা অবাস্তব আখ্যা দিয়ে নাকচ করে থাকেন। এই জড়বাদী মতাদর্শ সম্পর্কে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ আছে এবং এর সাফল্য সম্পর্কে বহু চিন্তানায়ক সন্দেহ পোষণ করেন। কারণ, মানুষের সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাস শুধুমাত্র অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বিচার করা একটি একপেশে এবং অসম্পূর্ণ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা।

বর্তমানে একশ্রেণীর মানুষ বলছেন যে, সাম্যবাদ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির পরিপন্থী। আজকের দুনিয়ায় যে-মত প্রাধান্যলাভ করেছে সেটি হলো—ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারাই সমাজের অগ্রগতি সম্ভব। যদিও এই অবস্থায় প্রাথমিকভাবে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ক্রমশ বর্ধিত সম্পদের অংশ দেশের বিভিন্ন স্তরের লোকেরাও পেতে থাকে।

আজকের আমেরিকাতেও অনর্থক ব্যক্তিগত অর্থ অর্জনের বিরুদ্ধে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। 'America's obsession with wealth' নামে যে-মতাদর্শের প্রচার চলছে, তাতে ব্যক্তিগত সম্পদ ও ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির স্তুতি ও প্রশংসা করার প্রবণতাকে নিন্দা করে কিছু বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্ জনমত তৈরির চেষ্টা করছেন। বিশিষ্ট কংগ্রেসম্যান মার্টিস ওলাভ সাবো এবং মনস্তত্ত্ববিদ্ জর্জ ডি. কোহেন ধনী ও দরিদ্র আমেরিকাবাসীদের আয়ের পার্থক্য কমিয়ে আনার কথা বলেছেন। এমনকি প্রথম জন একটি বিল প্রণয়ন করেছিলেন 'Income Equity Act' নামে আমেরিকা-বাসীদের মধ্যে আর্থিক সমতা আনার জন্য। এঁরা মনে করেন—অর্থোপার্জন ভাল, কিন্তু কোন ব্যক্তির সীমাহীন অর্থ সঞ্চয় করা সমাজের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। 'Responsible Wealth' নামে একটি সংস্থা আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে তৈরি হয়েছে। আর্থিক নীতির ব্যাপারে তাঁরা বলেন: "What is good for working Americans is, in the end, good for all Americans."

ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত যে-ধরনের প্রচেষ্টাই অনুসরণ করা হোক না কেন, সবকিছুর মূলে রয়েছে মানুষ। এই কারণেই স্বামী বিবেকানন্দ উপযুক্ত শিক্ষা ও চরিত্রগঠনের কথা বারংবার বলেছিলেন। ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন শাস্ত্র এবং ঐতিহ্য যে মৈত্রী ও সাম্যের বার্তা বহন করে আসছে এবং যে-ভাবাদর্শ স্বামীজী নতুন করে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছিলেন তারই অনুশীলন সমাজের উন্নতিবিধান করতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আজকের যুবসমাজের ধারণা খুবই সীমিত। অধ্যাপক রাইকমল দাশগুপ্ত তাঁর সুদীর্ঘ শিক্ষক-জীবনের অভিজ্ঞতায় ঠিক এই কথাই লিখেছেন 'Swami Vivekananda and our younger generation' প্রবন্ধে, যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৪ সালে 'Swami Vivekananda—A hundred years since Chicago—A commemorative volume' নামক গ্রন্থে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কোন পর্যায়েই স্বামী বিবেকানন্দকে গুরুত্বপূর্ণভাবে উপস্থাপিত করা হয়নি।

বর্তমানে অর্থকরী বিদ্যার্জনের আকর্ষণে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা ছুটে চলেছে, ফলে pure arts বা pure science পড়তে তারা মোটেই যাচ্ছে না এবং আমাদের দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। পরিণামে সমাজ, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণার গতি রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। এটা নিঃসন্দেহে চিন্তার ব্যাপার।

রাজনীতিসর্বস্ব সমাজজীবনে যে-দুর্দশা আজ প্রকট হয়ে উঠেছে সেপ্রসঙ্গে স্বামীজীর কথা আমাদের বিশেষভাবে মনে করতে হবে। তিনি রাজনীতি পরিহার করে আগে মানুষ তৈরির কথা বলেছিলেন। তিনি আরো বলেছিলেন, স্বাধীনতা এনে দিলেও আমরা কি তা রক্ষা করতে পারব? আজকে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের মধ্যে আমরা সেই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র খবর সংগ্রহ নয়—প্রকৃত শিক্ষা মানুষের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি ও দেবত্ব আছে উন্মেষ ঘটায়। তাই বলা যেতে পারে, আজকের মুখ্যত জড়বাদী শিক্ষাব্যবস্থা অসম্পূর্ণ এবং ব্যক্তিত্বের সার্বিক বিকাশ আনতে অপারগ। প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে চরিত্র গঠনের মধ্য দিয়ে সামাজিক ও মানবিক উন্নতিবিধান সম্ভব।

বিকাশকলি বসু
কলকাতা

প্রসঙ্গ 'দার্শনিক দৃষ্টিতে দেবী দুর্গা'

'উদ্বোধন'-এর গত কার্তিক ১৪০৮ সংখ্যায় 'দর্শন' বিভাগে আমার প্রবন্ধ 'দার্শনিক দৃষ্টিতে দেবী দুর্গা' প্রকাশিত হয়েছিল। সেই প্রবন্ধে দুটি অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি থেকে গিয়েছে। পূজনীয় সম্পাদক মহারাজ আমাকে তা সংশোধনের উপদেশ দিয়েছিলেন। 'সূতসংহিতা' থেকে যে-দুটি শ্লোক আমি ঐ লেখাটিতে উদ্ধৃত করি, তার মাত্রা ও ছন্দ নষ্ট হয়েছে। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে শ্লোক-দুটি সূত্রসহ উল্লেখ করছি—

(১) ৮৪৩ পৃষ্ঠায় 'সূতসংহিতা' থেকে উদ্ধৃত প্রথম শ্লোকটির মাত্রা ও ছন্দ নষ্ট হয়েছিল এবং একটি পদও ভুল হয়েছিল। সেটি শুদ্ধরূপ হবে এইরকম—

"শিবামেতামুমামেনাং জড়শক্তিং তথৈব চ।
জড়কার্যং জগজ্জীবং তেষাং ভেদং তথৈব চ।।"

(৪।১৩।৪২)

(২) ঐ পৃষ্ঠাতেই 'সূতসংহিতা' থেকে উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকটির একটি পদ ভুল হয়েছিল। এর শুদ্ধ রূপটি হলো—

"করুণাসাগরামেতাং যঃ পূজয়তি শাঙ্করীম্।
কিং ন সিধ্যতি তস্যেষ্টং তস্যা এব প্রসাদতঃ।।"

(৪।১৩।৪১)

অনিচ্ছাকৃত এই দুটি ভুলের জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

দেবব্রত দাস
পটারী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৫

মনস্তাত্ত্বিক রোগে ভেষজের ব্যবহার

হৃদীন্দ্রনাথ চৌধুরী

মনস্তাত্ত্বিক রোগে ভেষজের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনার আগে আমাদের জানা প্রয়োজন—মনস্তাত্ত্বিক রোগ কি এবং কিভাবে এই রোগ সারানো সম্ভব?

মনস্তাত্ত্বিক রোগের চলতি নাম 'মানসিক রোগ' বা 'মানসিক অবসাদ'। এর ইংরেজী নাম 'নার্ভাস ব্রেকডাউন'। এই রোগ সাধারণত অত্যন্ত মানসিক চাপের ফলে অথবা হঠাৎ মনে কোন গভীর শোক, যেমন প্রিয়জনের মৃত্যুতে যদি দুঃখ সহ্য করা সম্ভব না হয়, তখনি এই রোগ হয়।

এই রোগের প্রধান লক্ষণ মানসিক অবসাদ, যার ফলে কোন কাজই মানসিক রোগীর করতে ভাল লাগে না, পড়াশুনা করতে কষ্টবোধ করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এধরনের রোগীরা মাথার যন্ত্রণায় খুব কষ্ট পায়। রোগীর স্নায়বিক দুর্বলতাও প্রকাশ পায়। এই রোগের আরেকটি প্রধান লক্ষণ দিনের পর দিন রাত্রে ঘুম না হওয়া।

মনস্তাত্ত্বিক রোগের চিকিৎসায় বিভিন্নপ্রকার ওষুধের ব্যবহার রয়েছে, যেমন—আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথি ও অ্যালোপ্যাথি। কিন্তু বহুদিন যাবৎ ওষধি গাছপালা নিয়ে গবেষণার ফলে এই নিবন্ধকারের যে অভিজ্ঞতা, তাতে নানারকম ভেষজের ব্যবহারে এই রোগ সম্পূর্ণ সারানো সম্ভব। এই ভেষজের ব্যবহারে শরীরে কোনরকম সমস্যার উদ্ভব হয় না বরং শরীর সর্বদা ঠাণ্ডা থাকে ও স্নায়বিক দুর্বলতার অবসান ঘটে। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় রোগীরা সুস্থ হলেও অনেকসময় মানুষ বিভিন্নরকম সমস্যার সম্মুখীন হয়। একপ্রকার অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা—যার ইংরেজী নাম 'শক থিরাপি' অর্থাৎ বিদ্যুতের দ্বারা চিকিৎসা—এতে অনেক সময় দেখা যায় যে, অনেক রোগীর সাময়িক স্মৃতি লোপ পায়, অবশ্য পরে তা ফিরে আসে। কিন্তু হোমিওপ্যাথি বা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় এরকম কোন সমস্যা হয় না বা রোগীর শরীরে কোন উপসর্গ দেখা দেয় না।

ভারতবর্ষে ৬০-৮০ ভাগ গাছপালা ওষধি-রূপে পাওয়া যায়। এইরকম গাছ বা তার বিভিন্ন অংশ থেকে নানারকম ওষুধ তৈরি হয়। আমাদের দেশে এই চিকিৎসায় যেসমস্ত গাছপালা ব্যবহৃত হয় সেগুলির ব্যবহারের নিয়ম নিম্নরূপ—

(১) **জটামাংসী** : ১০ গ্রাম এই গাছের শিকড় এক রাত্রি জলে ভিজিয়ে সেই জল পরদিন সকালে মুখ-হাত ধুয়ে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ছেঁকে দুই কাপ খেতে হবে। কিছুদিন নিয়মিত খেলে স্নায়বিক দুর্বলতার অবসান ঘটে। এটা ঘুমের পক্ষেও খুবই ভাল।

(২) **ভ্যালেরিয়ান** : এই গাছের শিকড়ের মূল জটামাংসীর মতো তৈরি করে ঐ নিয়মে খেলে একইরকম ফল পাওয়া যায়।

(৩) **শতমূল** : ২০ গ্রাম পরিমাণ এই গাছের টাটকা শিকড় বেটে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে সকালের জলখাবারের আগে খেলে স্নায়বিক দুর্বলতা কমে এবং ধীরে ধীরে এই রোগ থেকে রোগীরা অব্যাহতি পায়।

(৪) **শুষনি** : এই গাছের শাক তথা কাঁচা পাতার রস ২-৩ চামচ দিনে প্রধান খাবার খাওয়ার আগে খেতে হবে। এই পাতার রস স্নায়ুকে সবল করে ও ভাল ঘুম হয়।

(৫) **ব্রাহ্মী** : এই ভেষজের কাই এক কাপের চার ভাগ খেলে নিদ্রাহীনতা দূর হয়, স্মৃতিশক্তি বাড়ে এবং স্নায়বিক দুর্বলতা কমে।

(৬) **ঘৃতকুমারী** : এই গাছের পাতার মজ্জা বেটে নিয়ে মাথার তালুতে লাগালে অনিদ্রা দূর হয় এবং সমস্ত শরীরে একটা ঠাণ্ডা ভাব আসে। তবে অধিক ব্যবহারে সর্দি হতে পারে।

(৭) **পুনর্নবা** : ফুল আসা গাছের টাটকা শিকড়ের কাই ১০-১৫ গ্রাম রাত্রে শোওয়ার আগে খেলে ভাল ঘুম হয় এবং নিয়মিত ব্যবহারে রোগীরা অনিদ্রা থেকে অব্যাহতি পায়।

(৮) **অশ্বগন্ধা** : ৫ গ্রাম শিকড়-চূর্ণ দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দিনে একবার খেলে শরীর ও মনের বল বৃদ্ধি হয়।

(৯) **পুদিনা** : বড় চামচের ১ চামচ পুদিনা পাতা এক কাপ জলে ৩০ মিনিট ভিজিয়ে ঐ জল খেলে পেটের রোগে খুবই উপকার পাওয়া যায়।

(১০) **জিরা** : বড় চামচের এক চামচ ভাজা জিরের গুঁড়ো কলার সঙ্গে মিশিয়ে রাত্রে নিয়মিত খেলে অনিদ্রা দূর হয় ও স্নায়বিক দুর্বলতার অবসান হয়।

(১১) **মৌরী** : ছোট মৌরী ৪ চামচ ১ গ্লাস ফুটন্ত জলে মিছরি দিয়ে মিশিয়ে রাত্রে খাওয়ার পর খেলে পেট ঠাণ্ডা থাকে।

(১২) **জাফরান** : ৬-১০টি ফুলের পাপড়ি আধ কাপ জলে ভিজিয়ে কয়েকদিন খেলে ভাল ঘুম হয়। আঙুলের একটিপ জাফরান নিয়মিত খেলে মানসিক অবসাদ দূর হয়।

এখানে পাঠকদের বিশেষ অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, উল্লিখিত নিয়মগুলি নিজেরা ব্যবহার না করে আয়ুর্বেদিক বিশেষজ্ঞদের পরামর্শমতো খাওয়া উচিত।

প্রকৃতপক্ষে মনস্তাত্ত্বিক রোগীদের দিনের পর দিন যে বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয়, ঐ নিদ্রা কোনরকমে যদি আবার ফিরিয়ে আনা যায় তাহলে মানসিক রোগের অবসান হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মনস্তাত্ত্বিক রোগীদের নিকট আত্মীয়দের সবসময় কর্তব্য হলো রোগীর সঙ্গে খুব হালকাভাবে কথা বলা, পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করা, তাকে ভাল ভাল জায়গায় বেড়ানোর ব্যবস্থা করা, সরিষার তেল সারাশরীরে মাখিয়ে ঠাণ্ডা জলে স্নান করানো ইত্যাদি। রোগীকে জানানো প্রয়োজন যে, এই রোগ কিছুই নয়, খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়া যায় ও আগের মতো সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ করা সম্ভব। ❑

তারা মা, বামাক্ষ্যাপা ও সাধনরহস্য

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়



মহাপীঠ তারাপীঠ (৫ খণ্ডে)
বিপুলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
প্রকাশকঃ তারানন্দ স্বামী
জয়তারা পাবলিশার্স
৭৫ যোধপুর পার্ক
কলকাতা-৭০০ ০৬৮
১ম খণ্ড—পৃষ্ঠা ঃ ২৪+১২৮, মূল্য ঃ ৭৫ টাকা; ২য় খণ্ড—পৃষ্ঠা ঃ ৩০+১৩৬, মূল্য ঃ ৭৫ টাকা; ৩য় খণ্ডঃ পৃষ্ঠা ঃ ৩৮+১৩৮, মূল্য ঃ ৭৫ টাকা; ৪র্থ খণ্ড—পৃষ্ঠা ঃ ৭৪+৫৮২, মূল্য ঃ ৭০ টাকা; ৫ম খণ্ড—পৃষ্ঠা ঃ ৮৪+৮৪৮, মূল্য ঃ ১৫০ টাকা

গবেষক বিপুলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের চব্বিশ বছরের সাধনার ফলশ্রুতি পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত মহাগ্রন্থ '*মহাপীঠ তারাপীঠ*'। প্রথম খণ্ডের 'নিবেদন'-এ লেখক বলেছেন ঃ ''তারা মায়ের অসীম কৃপায় আমার তারাপীঠে আসা, 'মহাপীঠ তারাপীঠ' গ্রন্থ রচনার দৃঢ়সঙ্কল্প গ্রহণ করা, তথ্য সংগ্রহ, তারাপীঠের বহু উন্নয়নে অংশগ্রহণ, সাধুসন্তের সাক্ষাৎকার, 'মহাপীঠ তারাপীঠ' গ্রন্থ রচনা শুরু প্রভৃতি সকল ঘটনা যেন একটি পূর্বপরিকল্পিত সুন্দর ছকে বাঁধা ছিল। শুধু পর পর ঘটে গেল মাত্র। সাগরের ঢেউ যেমন একে একে তীর ছুঁয়ে যায়। জন্মজন্মান্তরের নিবিড় সংযোগ ছাড়া এইরকম বিচিত্র ব্যাপার ঘটে না। একথা পরবর্তী কালে আমাকে অনেক সাধক-সাধিকা বলেছিলেন।''

বীরভূমের তারাপীঠ একটি প্রখ্যাত পীঠস্থান। বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত সতীদেহ শিবস্কন্ধ থেকে যে যে স্থানে পড়েছিল সেই একান্নটি স্থানে সতীপীঠ গড়ে উঠেছে। আলোচ্য গ্রন্থের লেখকের বিশ্বাস, পীঠস্থানের সংখ্যা একশো আট। প্রসিদ্ধি আছে, তারাপীঠে সতীর তৃতীয় নয়ন পড়েছিল। লেখক মনে করেন—''তারাপীঠ চরম ত্যাগের পীঠ। ভোগের নয়। এখানে ভোগ মানে মৃত্যু আর ত্যাগ মানে মুক্তি। যিনি এখানে ত্যাগের সঙ্কল্প নিয়ে আসবেন, তিনি তারামায়ের অফুরন্ত অমৃত লাভ করবেন। মুক্তিলাভ করবেন চিরতরে জন্ম-মৃত্যুর ঘোর আবর্ত থেকে।... তারা মা, বামদেব এখানে সর্বদা সদাজাগ্রত হয়ে বিরাজ করছেন। প্রতিটি ভাল-মন্দের সূক্ষ্ম বিচার তাঁরা করছেন প্রতি মুহূর্তে।''

তারাপীঠ হিন্দুদের প্রধান তীর্থগুলির অন্যতম। তারা মা এখানকার অধীশ্বরী। তাঁর উপাসক বামদেব বা বামাক্ষ্যাপা একজন উচ্চকোটির সাধক-রূপে প্রসিদ্ধ। অনেকে তাঁকে শিবের অবতার আখ্যা দেন। '*মহাপীঠ তারাপীঠ*' গ্রন্থটি যেমন এই পুণ্য পীঠস্থানের একটি আকর্ষণীয় ইতিবৃত্ত, তেমনই এটি এক মহান সাধকের প্রামাণ্য চরিতকথা।

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আছে তারাপীঠের প্রাচীন যুগ, আদি ও মধ্য যুগ অর্থাৎ পৌরাণিক কাহিনী, সৃষ্টিতত্ত্ব (তন্ত্রগ্রন্থ ও কিংবদন্তি মিলিয়ে), তারাতত্ত্ব ইত্যাদি থেকে বামাক্ষ্যাপার আদিলীলা পর্যন্ত। মধ্যযুগের তারাপীঠ সম্পর্কে নানা তত্ত্ব ও তথ্য এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আলোচিত হয়েছে সেই সময়কার কয়েকজন তন্ত্রসাধকের কথা। রয়েছে বামাক্ষ্যাপার আবির্ভাব ও তাঁর লীলার কিছু বিচিত্র কাহিনী। আর রয়েছে মধ্যযুগের তারাপীঠের প্রাকৃতিক শোভার বিবরণ ঃ ''ওপরে নীল নভঃমণ্ডল। অন্তহীন নীলিমার অসীম বিস্তৃতি। নীচে দিগন্তবিস্তৃত মহাশ্মশান। নিবিড় শ্যামলিমায় আবৃত সেই ভয়াল সুন্দর মহাশ্মশান। পাশে বয়ে চলেছে কাল-প্রবাহস্বরূপ পরম পবিত্র দ্বারকা নদী। বহু যুগ যুগান্তের অগণিত অকথিত ইতিহাস বুকে নিয়ে। সেই বিশাল ঘনঘোর মহাশ্মশানের বুকের মাঝে বিরাজ করছে তারা মায়ের মন্দির। দূরে বহুদূরে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে ছোট ছোট গ্রাম আর শস্যক্ষেত্র। সবুজের মিষ্টি ছোঁয়ায় তা স্বপ্নের মতোই সুন্দর।'' (পৃঃ ৪০)

দ্বিতীয় খণ্ডে বামাক্ষ্যাপার দিব্য মহাজীবনের বিশাল মধ্যলীলা (তাঁর আটাশ বছর বয়স থেকে ছাপ্পান্ন বছর বয়স পর্যন্ত) বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও তাঁর লীলার সঙ্গে যুক্ত অন্য অনেক সাধক, সাধিকা ও মনীষীর কথাও এখানে লিপিবদ্ধ। এঁদের সংখ্যা চল্লিশ জনের মতো। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীমাধবানন্দ গিরি মহারাজ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথ দত্ত (পরে স্বামী বিবেকানন্দ), শাওন ফকির, তারাক্ষ্যাপা, মগনানন্দ ভৈরবী, বহেরাবাবা, জয়তারাবাবা, পূর্ণানন্দ গিরি, ভৈরবী মা, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, শশধর তর্কচূড়ামণি, পাহাড়ীবাবা, রামানন্দ ভারতী এবং কেশব সাধু। লেখক লিখেছেন বামাক্ষ্যাপাকে দর্শনের জন্য নরেন্দ্রনাথ ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে নাকি তারাপীঠে এসেছিলেন; সঙ্গে ছিলেন তাঁর বন্ধু (পরবর্তী কালে শিষ্য) শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। [শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী—যাঁকে স্বামীজী 'বাঙাল' বলে ডাকতেন, তাঁর সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ হয়েছে ১৮৯৭ সালে। কাজেই ১৫ বছর আগে শিষ্যকে নিয়ে স্বামীজীর বামাক্ষ্যাপার কাছে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।—**সম্পাদক**] তাঁদের বামাক্ষ্যাপা প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিলেন। কিন্তু কোন প্রামাণ্য গ্রন্থের উল্লেখ তিনি করেননি। আমরা এরকম ঘটনা কখনো শুনিনি। বস্তুত, যেসব প্রাচীন তথ্য এই গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে, তার তথ্যসূত্র উল্লেখ না থাকায় তথ্যগুলির সত্যতা সম্পর্কে একটা সন্দেহ থেকেই যায়।

তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে বামাক্ষ্যাপার অন্ত্যলীলার প্রথমাংশ। প্রধানত তিনি ছিলেন তন্ত্রসাধক, কিন্তু তন্ত্রের মাধ্যমে তিনি

সাধনমার্গের এমন এক উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন—যেখানে সমন্বয় ঘটেছিল শৈব, বৈষ্ণব ও বাউল সাধনার। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নানা মতাবলম্বী যে-সাধকগণ তাঁর কাছে আসতেন তাঁর সান্নিধ্য ও উপদেশ লাভ করার জন্য, তাঁদের সংখ্যা অনেক। মাত্র কয়েকজনের নামই বিশেষভাবে উল্লেখ করা সম্ভব—শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়াবাবা ও তাঁর শিষ্য শ্রীশ্রীযোগানন্দ ভারতী ১০৮ মৌনীবাবা, শম্ভুগিরি মহারাজ, ঠাকুর হরনাথ, নবনী দাস এবং অঘোরী বাবা। গৃহী ভক্তদের মধ্যে আছেন ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র সরকার প্রমুখ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন দ্বারকানাথ পুরী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কার্তিক গোঁসাই, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, নগেন্দ্রনাথ বাগচী, হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং যদুনাথ সিংহ। এইসব সাধুসন্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের চিত্রও গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিশ্লেষিত হয়েছে বামাক্ষ্যাপার সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্বরূপ।

চতুর্থ খণ্ডে আছে বিশাল তত্ত্বে ও তথ্যে পরিপূর্ণ একশো পনেরোটি অধ্যায়ে বিভক্ত বামাক্ষ্যাপার অন্ত্যলীলার অর্থাৎ তাঁর উনসত্তর থেকে চুয়াত্তর বছর বয়সের বিবরণ। এখানে মহান ও খেয়ালী সাধকের জীবনের নানা অলৌকিক ঘটনার কথা আছে। এই খণ্ডের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যিশুখ্রিস্টের জীবন-সম্পর্কিত। নিকোলাস নটভটিখের 'The Unknown Life of Jesus Christ' গ্রন্থের কয়েকটি তথ্য অনুসরণ করার পরে বিপুলবাবু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তাঁর জীবনের সতেরো বছর (যখন তাঁর বয়স ছিল তেরো থেকে উনত্রিশ) খ্রিস্ট ভারতবর্ষে বাস করেছিলেন এবং তাঁর সিদ্ধিলাভ এইসময়ে ঘটেছিল। ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পরে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আশি বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকার পরে কাশ্মীরে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের পঁয়তাল্লিশ অধ্যায়ে আছে।

গ্রন্থের পঞ্চম তথা শেষ খণ্ডে ২ শ্রাবণ ১৩১৮ সালে বামাক্ষ্যাপার প্রয়াণের পর থেকে ১৪০০ সালের রথযাত্রা পর্যন্ত তারাপীঠের আধুনিক যুগের বিস্তৃত ইতিহাস পঞ্চাশটি অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে। এইসঙ্গে রয়েছে বামাব্দ-সহ শ্রীশ্রীবামপঞ্জী, তারাপীঠে আগত অজস্র সাধক-সাধিকার সাধনকাহিনী, কয়েকজন বিশিষ্ট সাধক মনীষী ও ভক্ত নরনারীর বামাক্ষ্যাপার কৃপালাভের স্মৃতিচারণ (যাঁদের মধ্যে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শীতলাদাস বাবাজী, বিনয়কুমার শাস্ত্রী, চারণকবি মুকুন্দ দাস, নিস্তারিণী দেবী প্রমুখ)। এছাড়া তারাপীঠের আধুনিক রূপরেখা, পূজাপার্বণ, দেশ-বিদেশে তারাসাধনার কথা, সর্ব ইষ্টের মহাসমন্বয়-রূপে তারাপীঠ প্রভৃতি বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। সবশেষে ত্রিলোকজয়ী তারা মা, চন্দ্রশেখর শিব, নারায়ণ ও শিবাবতার বামাক্ষ্যাপার উদ্দেশে স্তবগানের ষোড়শ অর্ঘ্য দিয়ে লেখকের 'মহাপূজা' সমাপ্ত হয়েছে।

আধুনিক বাঙলা ধর্মগ্রন্থের তালিকায় **'মহাপীঠ তারাপীঠ'** একটি উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় সংযোজন। লেখক বিপুলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের গভীর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, ভক্তি, পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাতে হয়। তাঁর রচনাশৈলীও সরল এবং চিত্তাকর্ষক।

তবে বর্তমান সমালোচকের মনে হয়েছে যে, লেখকের পক্ষে আরেকটু পরিমিতবোধ ও মিতভাষণের প্রয়োজন ছিল। প্রথম পরিকল্পনামতো চার খণ্ডে গ্রন্থটি যদি সম্পূর্ণ হতো, তাহলে এটি সুন্দরতর হতো। অলৌকিক ঘটনার ব্যাপারেও আরেকটু সংযত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব রয়েছে এবং অতিরঞ্জনের প্রলোভন লেখক সবসময় জয় করতে পারেননি। অনর্থক অনেক অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে শুধুমাত্র গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির জন্য। একটি নির্দেশিকারও খুব প্রয়োজন ছিল। ❑

সাধনা ও আহার

রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়



শ্রীরামকৃষ্ণের আহারলীলা
গৌরী মিত্র
প্রকাশকঃ
এস. বি. নায়ক
গ্রন্থতীর্থ
৬৫/৩এ কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩
পৃষ্ঠা ঃ ১৬
মূল্য ঃ ৫ টাকা

পনিষদে বলা হয়েছেঃ "আহার-শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৭।২৬।২)—আহার শুদ্ধ হলেই সত্ত্বশুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়। আবার গীতায় আছে—"আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ। রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।।" (১৭।৮)—যেসকল আহার আয়ু, উদ্যম, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বৃদ্ধি করে এবং সরস, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও মনোরম, সেইগুলি সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আহার সম্পর্কিত শাস্ত্রানুসারী বিচারাদির কঠোর অনুশাসন পরিলক্ষিত হয়। যেখানে-সেখানে, যার-তার হাতে এবং যেকোন ব্যক্তির দেওয়া খাদ্যবস্তু তিনি গ্রহণ করতে পারতেন না; অথবা বলা যায়, জীবের কল্যাণের

জন্যই তাদের মধ্যে আহার সম্বন্ধে শাস্ত্রসম্মত সাত্ত্বিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করতেই তিনি সেসকল আহার গ্রহণ করতেন না। আবার দেখা গেছে, শুদ্ধসত্ত্ব আহারের সন্ধান পেলে অনাহূতভাবেই সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে তিনি তা গ্রহণ করেছেন। আহার্য বস্তুর শুদ্ধতা ও গুণাগুণ বিচার এবং তার পরিমিতিবোধ—আহার সম্বন্ধে সাত্ত্বিক জীবনের প্রার্থিত এই মূল্যবান বোধগুলি তাঁর জীবনালোকের প্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আবার শুধু নিজের ক্ষেত্রেই নয়, তিনি তাঁর লীলাসঙ্গী সাক্ষাৎ সন্তানদের আধার অনুযায়ী সাধনার সহায়ক পৃথক পৃথক আহার্য বস্তু নির্বাচন ও তার পরিমাণ নির্ধারণের দিকেও সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।

মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ও তা সাধনের উপায় সম্বন্ধে শিক্ষাদানের জন্যই করুণাময় শ্রীরামকৃষ্ণের দেহধারণ এবং তাঁর অসংখ্য লীলা সঙ্ঘটন। এই লীলাপর্বগুলি অনুধ্যান করলে আমরা উপলব্ধি করি যে, সেগুলি হলো লোকশিক্ষা ও লোককল্যাণের জন্য তাঁর অহৈতুকী কৃপার নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশ। সেই আঙ্গিকে বিচার করলে তাঁর আহারপর্বটিও ছিল একটি লীলাবিশেষ; কারণ জীবের কল্যাণের জন্যই তাঁর অপরাপর লীলাপর্বের পাশাপাশি নিজের জীবনে আহারের ক্ষেত্রে সত্ত্বগুণের শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি ঘটিয়ে তিনি জীবের অনুসরণযোগ্য এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, এই তাঁর 'আহারলীলা'—যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছিল আহার্য বস্তু সম্বন্ধে তাঁর রসবোধও।

গৌরী মিত্র রচিত **'শ্রীরামকৃষ্ণের আহারলীলা'** শীর্ষক পুস্তিকাটিতে আহার সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের নানা তথ্য তথা সাত্ত্বিক জীবনোপযোগী তাঁর নির্দেশাদি অতি যত্নসহকারে সন্নিবদ্ধ করা হয়েছে। পরিকল্পনাটি নতুনত্বের দাবি রাখে এবং নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। পুস্তিকাটিতে বিষয়বস্তুর সামগ্রিক উপস্থাপনাটিও চিত্তাকর্ষক। শ্রীরামকৃষ্ণানুরাগীদের পুস্তিকাটি ভাল লাগতে পারে।

অনবধানবশত পুস্তিকাটিতে কিছু মুদ্রণপ্রমাদ ঘটে গেছে, যেমন—"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীমা লিখিত" (পৃঃ ১১) ইত্যাদি। ভবিষ্যতে পুনর্মুদ্রণকালে এগুলি সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের বিশেষ প্রয়োজন। ❑

শব্দচেতনা 

আচার্য শঙ্করের জীবন ও বাণীভিত্তিক বিশেষ শব্দছক

১					■	২		৩
	■	■	■	■	৪		■	
৫				■	■	৬		
	■	■	■	■	৭		■	■
৮				৯	■	■	■	■
■	■	■	■	১০				১১
■	■	১২		■	■	■	■	
১৩			■	■	১৪			
	■	১৫		■	■	■	■	
১৬			■	১৭				

পাশাপাশি : (১) শঙ্করাচার্যের প্রধান শিষ্যচতুষ্টয়ের অন্যতম (২) "জলে বানলে —— শত্রুমধ্যে অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি।" (৪) আচার্য-প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের একটি (৫) শঙ্করাচার্যের স্থাপিত যোশীমঠ বা জ্যোতির্মঠ এইখানে অবস্থিত (৬) "যাবদ্ বিত্তোপার্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।/ পশ্চাদ্ধাবতি জর্জরদেহে —— পৃচ্ছতি কোঽপি ন গেহে।।" (৭) "গঙ্গাস্তবমিমমলং নিত্যং পঠতি —— যঃ স জয়তি সত্যম্।" (৮) আচার্য শঙ্কর তাঁর এই শিষ্যকে শারদামঠের ভার দেন (১০) "শঙ্করমৌলিনিবাসিনি —— মতিরাস্তাং তব পদকমলে।" (১২) "ন জায়া ন —— ন বৃত্তির্মমৈব।" (১৩) আত্মা ও অনাত্মার পরস্পর অধ্যাসকে শঙ্করাচার্য এই আখ্যা দিয়েছেন (১৪) আচার্যের প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য (১৫) "ন —— ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।" (১৬) "নিদ্রালস্যপ্রসক্তঃ স্ব —— ভরণে সর্বদা ব্যাকুলাত্মা।" (১৭) গৌড়ের এই বিখ্যাত মীমাংসক আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

ওপর-নিচ : (১) আচার্য-প্রণীত শৃঙ্গেরী মঠাম্নায়ের দেবতা (২) "নষ্টে দ্রব্যে কঃ ——।" (৩) "যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিঃ —— ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ।" (৯) শাঙ্করভাষ্যে এই শব্দটির অর্থ 'ক্রান্তদর্শী' (১১) ইনি মিথিলার দুর্ধর্ষ কর্মোপাসন পণ্ডিত হলেও আচার্যের সঙ্গে বিচারে পরাস্ত হয়ে তাঁর অন্যতম প্রধান শিষ্য হন (১২) আচার্য শঙ্করের পিতামহ (১৩) ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর অন্তজ জীবের কারণরূপে একেই প্রতিপাদিত করেছেন।

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম শ্রাবণ ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

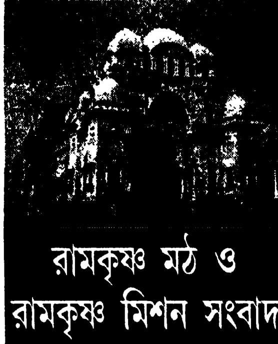
***সূত্র :* তন্বীতনু পানি**

উৎসব-অনুষ্ঠান

বেলুড় মঠে গত ১৬ মার্চ ২০০২, শনিবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের ১৬৭তম জন্মতিথি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। দুপুরে প্রায় ২৪,০০০ ভক্ত খিচুড়ি-প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। গত ২৪ মার্চ, রবিবার নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে লক্ষাধিক ভক্ত ও দর্শকের সমাগম হয়েছিল। এদিন প্রায় ৩২,০০০ ভক্ত খিচুড়ি-প্রসাদ গ্রহণ করেন।

পোর্টব্লেয়ার রামকৃষ্ণ মিশন (আন্দামান) : গত ১৬ ও ২৪ মার্চ ২০০২ বৈদিক স্তোত্রপাঠ, ভক্তিগীতি, বিশেষ পূজা, পাঠ ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পালন করা হয়। 'কথামৃত' থেকে পাঠ করেন স্বামী অমৃতরূপানন্দজী এবং 'পুঁথি' থেকে পাঠ করেন স্বামী হরিদেবানন্দজী। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী শ্রীবাসানন্দজী, স্বামী হরিদেবানন্দজী ও স্বামী অমৃতরূপানন্দজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন দুলাল মজুমদার।

তমলুক রামকৃষ্ণ মঠ (মেদিনীপুর) : গত ১৬ মার্চ ২০০২ বেদপাঠ, ভজন, ভক্তিগীতি, সেতারবাদন, রামায়ণ গান, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উৎসব পালিত হয়। এদিন দুপুরে প্রায় ৯,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী, স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী, শান্তিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শিবতোষ বাগচি।



রামকৃষ্ণ মিশন, নিউ দিল্লির প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উদ্‌যাপন

নিউ দিল্লির রামকৃষ্ণ মিশন গত ৩ মার্চ ২০০২ থেকে প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করল। এই উপলক্ষ্যে একটি স্মারকগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে।

ভারত তথা বিশ্বে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন প্রসারের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বর্তমান রাজধানীতে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের এই কেন্দ্রটির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বামী বিবেকানন্দ (তখন বিবিদিষানন্দ) তাঁর বিখ্যাত ভারত-পরিভ্রমণকালে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে এসে প্রায় তিন সপ্তাহ ছিলেন; তাঁর সঙ্গে ছিলেন তিন গুরুভ্রাতা—স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজী সূত্রপাত করেন রামকৃষ্ণ মিশনের। তাঁর দেহাবসানের পর দিল্লিতে স্বামী শর্বানন্দজী স্থানীয় ভক্তদের নিয়ে একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন, ৪ মে ১৯২৭-এ যার প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পাদন করেন স্বামী অম্বিকানন্দজী। ৭৫ বছরের ব্যবধানে সেই কেন্দ্রটিই বর্তমানের বিস্তৃত ও বিখ্যাত নিউ দিল্লি রামকৃষ্ণ মিশন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে এই কেন্দ্রে পদার্পণ করেছিলেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ; অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে চারজনের পদধূলি পড়েছে দিল্লিতে এবং একজনের দিল্লির এই আশ্রমটিতে। এখানকার স্থায়ী আশ্রমবাড়ির প্রথম ইঁটটিকে বেলুড় মঠে যথাচারে শুদ্ধিকরণ ও উৎসর্গ করে দেন তৎকালীন সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ। সেটিকে দিল্লিতে নিয়ে এসে ভিত্তিপ্রস্তররূপে স্থাপন করা হয়। আশ্রমের মূল মন্দিরটি বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের আদলে নির্মিত হয় ১৯৫৪-৫৭ খ্রিস্টাব্দে—শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবর্ষ পালনের অঙ্গরূপে।

বর্তমানে এই কেন্দ্রের প্রধান কার্যসূচীর মধ্যে আছে—শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি পালন, দিল্লিতে ও অন্যান্য রাজ্যে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক নানা পাঠ, আলোচনাসভা ও শিবির পরিচালনা, গ্রন্থাগার (সাধারণের জন্য একটি ও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি), বিনামূল্যে পাঠকক্ষ পরিচালনা, দাতব্য হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারি, যক্ষ্মা (টি. বি.) ক্লিনিক ও ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র পরিচালনা, বিবিধ প্রয়োজনে ত্রাণ ও উদ্ধারকার্য পরিচালনা প্রভৃতি। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সুসংহত পদ্ধতিতে যক্ষ্মারোগ নিরাময় তথা প্রতিরোধের লক্ষ্যে দিল্লিতে স্থাপিত প্রথম মেডিকেল কেন্দ্রটিই হলো রামকৃষ্ণ মিশনের এবং এখনো এটি কেন্দ্র-শাসিত দিল্লিতে এধরনের একমাত্র বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। এর কাজ বহুবিস্তৃত এবং দীর্ঘদিন ধরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু মানুষ এর দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়েছেন এবং হচ্ছেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, দিল্লির রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রটি দেশের রাজধানীতে অবস্থিত বলে এর অন্যতর গুরুত্ব আছে। বিগত ৭৫ বছরে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত বহু ভক্ত ও চিন্তাশীল মানুষ এই কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর উদার ভাবধারায় পুষ্ট হয়েছেন এবং সে-ভাবকে বহন করে নিয়ে চলেছেন আপন আপন ক্ষেত্রে। এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আন্তর্ধর্ম সম্মেলন, মানবীয় উৎকর্ষ ও মূল্যবোধভিত্তিক আলোচনাচক্র এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র বিষয়ে বহু সভা-সেমিনার প্রভৃতি। এখানে আছে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী-ভিত্তিক একটি স্থায়ী প্রদর্শনী। এছাড়া নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানভিত্তিক পাঠচক্র।

আশ্রমের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উৎসব পালনের সূচনায় ৩ মার্চ ২০০২-এর প্রভাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে বিশেষ পূজা সুসম্পন্ন হয়। ঐদিন আশ্রমের নবনির্মিত ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। এরপর ঐদিন এবং পরবর্তী বিভিন্ন দিনে

নানা অনুষ্ঠানে মূল্যবান ভাষণ দান করেন স্বামী স্মরণানন্দজী, স্বামী প্রভানন্দজী, স্বামী সুহিতানন্দজী, স্বামী নিখিলাত্মানন্দজী, স্বামী অকামানন্দজী, স্বামী জিতাত্মানন্দজী, স্বামী যুক্তাত্মানন্দজী, স্বামী আত্মবিদানন্দজী, স্বামী গিরিজেশানন্দজী প্রমুখ। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডঃ করণ সিংহ, অধ্যাপক রাজপুত, সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী জগমোহন প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন পণ্ডিত যশরাজ, প্রতীক চৌধুরী, স্বামী সর্বগানন্দজী এবং স্বামী প্রজ্ঞাত্মানন্দজী। ডঃ করণ সিং এই উপলক্ষ্যে স্বামী সর্বগানন্দ-গীত 'দিব্যগীতি' ক্যাসেটটি প্রকাশ করেন। এছাড়া অনুষ্ঠিত হয় ভক্তসম্মেলন, মূল্যবোধ-শিক্ষা সম্পর্কিত সেমিনার, 'বিবেকানন্দ দিবস' ও যুবসম্মেলন।

সেবাব্রত

পুনর্বাসন

গুজরাটে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনের জন্য বেলুড় মঠ যে-প্রকল্পগুলি নিয়েছিল, তা দ্রুতগতিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এপ্রিল মাসের রিপোর্টে জানা যায়, লিমডি ও পোরবন্দর কেন্দ্রের মাধ্যমে গত মাসে ৮টি বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে। গুজরাট সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি সেগুলির উদ্বোধন করেন। এছাড়া ধানতলি শিবির ও পোরবন্দর আশ্রম ৩৩২টি বাড়ির নির্মাণের দায়িত্ব নিয়েছিল। সেগুলির মধ্যে ৪২টি বাড়ি সমাপ্ত হয়েছে এবং ২৪০টি বাড়ি হস্তান্তরিত করা হয়েছে।

বহির্ভারত

হবিগঞ্জে (বাংলাদেশ) মন্দির প্রতিষ্ঠা

গত ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২ তিনদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হবিগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (বাংলাদেশ) নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির উদ্বোধন-উৎসর্গ উৎসব এবং আশ্রমের ৮০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। উৎসবের প্রথম দিন সকাল ৭.৩০ মিনিটে বাস্তুপূজা ও যজ্ঞ শুরু হয় এবং সন্ধ্যায় শেষ হয়। পরিচালনা করেন হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য। ঐদিন সকাল ৯.৩০ মিনিটে নবনির্মিত 'বিবেকানন্দ' ছাত্রাবাসের দ্বারোদ্ঘাটন ও 'বসন্ত হল'-এর ফলক উন্মোচন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। বিকাল ৪টা থেকে আলোচনাসভা শুরু হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল—'শ্রীমা সারদাদেবী'। আশীর্বাণী প্রদান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। সভায় পৌরোহিত্য করেন দিনাজপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অমৃতত্বানন্দজী। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী এবং ঢাকা মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী অক্ষরানন্দজী। আলোচক ছিলেন স্বামী বিমলাত্মানন্দজী ও স্বামী সর্বেশ্বরানন্দজী। সন্ধ্যা ৭টায় ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দজী।

দ্বিতীয় দিন ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে সকাল ৮টায় নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। প্রতিষ্ঠা-পূজা করেন স্বামী তত্ত্векবিদানন্দজী। সকাল ৯টায় এক বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রায় সাধু-ব্রহ্মচারী এবং অগণিত ভক্ত অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় প্রশাসন শোভাযাত্রার সময় সবরকম সহযোগিতা করেন। দুপুরে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করা হয় এবং বিভিন্ন শিল্পী ভক্তিগীতি ও বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সন্ধ্যা ৬টায় ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল—'শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির'। এদিনের সভাতেও আশীর্বাণী প্রদান করেন শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। সভাপতিত্ব করেন স্বামী অক্ষরানন্দজী। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বামী প্রমেয়ানন্দজী এবং স্বামী শিবময়ানন্দজী। আলোচক ছিলেন স্বামী শুকদেবানন্দজী এবং স্বামী আত্মজ্ঞানানন্দজী। সভাশেষে বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুকুমার বাউরী।

উৎসবের শেষ দিন ১৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা থেকে অনুষ্ঠিত হয় ভক্তসম্মেলন। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন ভট্টাচার্য। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্বামী অক্ষরানন্দজী, স্বামী প্রমেয়ানন্দজী, স্বামী দীনেশানন্দজী, অধ্যাপক গুরুপদ পালিত, অধ্যাপক প্রণবকুমার সিংহ এবং অধ্যাপক বিজিতকুমার দে। বিকাল ৫টায় আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল—'স্বামী বিবেকানন্দ ও সেবাধর্ম'। সভাপতিত্ব করেন স্বামী পরদেবানন্দজী। আলোচনায় অংশ নেন স্বামী শিবময়ানন্দজী, স্বামী অমৃতত্বানন্দজী এবং স্বামী ঋতানন্দজী। ভক্তিমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনদিনের উৎসব সমাপ্ত হয়।

উৎসবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শক্তিনাথানন্দজী। উৎসবে ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ৩৯ জন সাধু-ব্রহ্মচারী এবং প্রায় তিনহাজার ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। প্রতিদিনই দুপুরে ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। মন্দির নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত স্থপতি এবং অন্যান্য কলাকুশলীদের উপহার প্রদান করা হয়। সমগ্র উৎসবটি স্থানীয় জনসাধারণ এবং বাংলাদেশের শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগীদের মনে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে।

ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ (বাংলাদেশ)ঃ গত ১৬-২২ মার্চ ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি এবং মঠের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবের বিভিন্ন সময়ে বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের আইন, বিচার ও সংসদ সম্বন্ধীয় মন্ত্রী মওদুদ আহমেদ এবং ভারত ও শ্রীলঙ্কার হাইকমিশনার ভিন্ন বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তি।

দিনাজপুর আশ্রম (বাংলাদেশ)ঃ গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০২ খোচনায় আশ্রম-পরিচালিত রামকৃষ্ণ শিশু বিদ্যালয়ের নবনির্মিত 'গীতা ভবন'-এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ।

দেহত্যাগ

স্বামী জগদীশানন্দজী (প্রভাত মহারাজ) হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১ এপ্রিল ২০০২ রাত ১টা ৫ মিনিটে কিষাণপুর আশ্রমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহান্তকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। গত কয়েকবছর ধরে তিনি বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করার পর তিনি ১৯৬৬ সালে দিল্লি কেন্দ্রে যোগদান করেন। এরপর ১৯৭৫ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। পরবর্তী কালে তিনি নরেন্দ্রপুর, তমলুক ও সিঙ্গাপুর আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। শেষে তিনি কিষাণপুর আশ্রমে প্রথম সাতবছর কর্মী হিসাবে যুক্ত থাকার পর শেষ চারবছর অধ্যক্ষপদে বৃত ছিলেন। প্রয়াত স্বামী জগদীশানন্দজী মহারাজ সহজ-সরল, স্নেহপ্রবণ ও মিষ্টস্বভাবের জন্য সকলের প্রিয় ছিলেন। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন : গত ১ এপ্রিল ২০০২, সোমবার শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে তাঁর জীবনী পাঠ করেন স্বামী সৌম্যাত্মানন্দজী।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

সিঙ্গুর রামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ (হুগলী) : গত ২-৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বেদপাঠ, উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গায়ত্রী ও দীপযজ্ঞ, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। 'গীতা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন অধ্যাপক পিনাকী মুখোপাধ্যায়। কথায় ও গানে 'ভাগবত' এবং 'কথামৃত' পরিবেশন করেন যথাক্রমে নবব্রত ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারী সুমন। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অজয় মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী ও শুভময় বসু। স্বাগত-ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে ডাঃ কালোসোনা পাধা ও দিলীপরতন ভট্টাচার্য।

হরিপাল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (হুগলী) : গত ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০২ পাঠচক্রের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে উষাকীর্তন, বেদ ও 'চণ্ডী' পাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। দুপুরে ৩৭৫ জন ভক্ত প্রসাদ পান। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী বরানন্দজী প্রমুখ।

ক্ষীরপাই রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (পশ্চিম মেদিনীপুর) : গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০২ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সকালে চণ্ডীপাঠ এবং 'মায়ের কথা' আলোচনা করেন যথাক্রমে বিমলেন্দু বিশ্বাস ও প্রদ্যোৎ সরকার। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী বিষ্ণুরূপানন্দজী, অলোকময় বসু প্রমুখ। সন্ধ্যায় সঙ্গীতালেখ্য ও শ্রুতিনাটক পরিবেশিত হয়। দুপুরে প্রায় ৬,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

চন্দননগর বারাসত গেট কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন (হুগলী) : গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০২ ভক্তিগীতি, পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। 'কথামৃত' পাঠ করেন স্বপন ভট্টাচার্য। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শ্রীপর্ণা চৌধুরী, কোয়েল চক্রবর্তী ও অভীক চ্যাটার্জি। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন শ্রীসারদা মঠের সাধারণ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী।

স্যাণ্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০২ সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, নাটক, তরজা গান ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। 'কথামৃত' পাঠ করেন এই আশ্রমের স্বামী দেবব্রতানন্দজী। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী ও মহম্মদ নাসিরুদ্দিন। উৎসবে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

নবগ্রাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠমন্দির (হুগলী) : গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২ নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী ধৃতাত্মানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভক্তিগীতি, 'রামচরিতমানস' পাঠ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। 'রামচরিতমানস' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী পুরাণানন্দজী। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী ধৃতাত্মানন্দজী, স্বামী পুরাণানন্দজী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও অজিত ঘোষাল। এদিন প্রায় ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

আগরা সারদামণি পল্লীমঙ্গল সংস্থা (মেদিনীপুর) : গত ১৭-১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালন করা হয়। বেদপাঠ, ভজন, বিশেষ পূজা, কীর্তন, প্রায় ২,৯০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ, ধর্মসভা প্রভৃতি ছিল উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ। তিনদিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অমৃতলোকানন্দজী, স্বামী চেতনানন্দ সরস্বতী, ডাঃ শ্যামল গুপ্ত ও অঞ্জন মহাপাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২ বেদপাঠ, সঙ্গীত ও আলোচনার মাধ্যমে হোমিও দর্শন ও বিজ্ঞানের ওপর একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ডাঃ সুশান্ত বাওয়ালী, ডাঃ অমিত নাগ প্রমুখ চিকিৎসক এবং ছাত্রছাত্রী-সহ ৩৫০ জন এতে অংশগ্রহণ করেছিল। উল্লেখ্য, ২৩ জানুয়ারি রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় আয়োজিত যুবসম্মেলনে ৭৫০ জন যুবপ্রতিনিধি যোগদান করে। সঙ্গীত ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের প্রধান বিষয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সত্যরূপানন্দজী, অধ্যাপক ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাস, ডঃ নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন স্বামী স্বগতানন্দজী।

সারেঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি (বাঁকুড়া) : গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২ বেদপাঠ, প্রশ্নোত্তর পর্ব ও আলোচনার মাধ্যমে একটি যুবসম্মেলন আয়োজিত হয়। সম্মেলনে সুকুমার চ্যাটার্জির স্বাগত-ভাষণান্তে আলোচনা করেন স্বামী ব্রহ্মনিষ্ঠানন্দজী, স্বামী ব্রহ্মবিদানন্দজী ও ডাঃ সুনির্মল বেরা। যুবপ্রতিনিধিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। এতে ৯২ জন যুবপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিল।

কল্যাণী শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি (নদীয়া) : গত ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২ নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'পুঁথি' ও 'কথামৃত' পাঠ, গীতি-আলেখ্য, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-উৎসব পালন করা হয়। প্রথম দিনের ধর্মসভায় আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণাজী ও ডঃ নমিতা দত্ত। দ্বিতীয়দিনের সভায় আলোচনা করেন স্বামী ইন্দ্রাত্মানন্দজী ও বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী। এই উপলক্ষ্যে ৯ জন দুঃস্থ মহিলাকে নববস্ত্র প্রদান করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, ভাঙড় (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) : গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের ৯ম ষাণ্মাসিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। পাঠ, ভজন ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের অন্যতম বিষয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী ও স্বামী সত্যস্থানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে অলোককুমার ঘোষ ও সন্তোষকুমার ঘোষ। সম্মেলনে ২৯টি আশ্রম থেকে ১০২ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। উল্লেখ্য, গত ২৩ ফেব্রুয়ারি আলপনা ও শঙ্খবাদন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

জাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র (মেদিনীপুর) : গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাঠচক্রের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতিনাট্য, রক্তদান শিবির, পাঠ ও ধর্মসভা ছিল উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ। সকালে 'মায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা করেন ব্রহ্মচারিণী সুপ্রভা এবং 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন ব্রহ্মচারিণী সুবর্ণা। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। বৈকালিক ধর্মসভায় মোহিনী মঙ্গলের স্বাগত-ভাষণান্তে বক্তব্য রাখেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী অচ্যুতাত্মানন্দজী ও অধ্যাপক কমলকুমার মান্না।

পুরুলিয়া প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ (বাঁকুড়া) : গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-উৎসব পালন করা হয়। তরজাগান পরিবেশন করেন স্বপন সরকার ও রামগোপাল মণ্ডল। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী তত্ত্বস্থানন্দজী।

কোঠাবাড়ি মা সারদা সেবাকেন্দ্র (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ২৪ ফেব্রুয়ারি রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ভক্তিগীতি, পূজা, জপধ্যান, পাঠ, প্রশ্নোত্তর পর্ব ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের বিশেষ অঙ্গ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, চিত্তপ্রিয় মৃধা প্রমুখ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মানিকচন্দ্র মণ্ডল, ডঃ অরুণকুমার দাস ও অসিত বসু। পৌরোহিত্য করেন স্বামী ধর্মেশ্বরানন্দজী। সম্মেলনে প্রায় তিনশতাধিক ভক্ত যোগদান করেন।

ধুচনিখালী শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ৩ মার্চ ২০০২ পূজা, পাঠ, স্তব-স্তুতি, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 'কথামৃত' এবং 'মায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী যতীশানন্দজী, স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী ও শ্যামলকুমার সরদার। সভাপতিত্ব করেন ধীরেন্দ্রনাথ রায়। উৎসব উপলক্ষ্যে দুঃস্থ মহিলা ও বালিকাদের মধ্যে ৪০টি শাড়ি এবং ৭৫টি পোশাক বিতরণ করা হয় এবং প্রায় ৫,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

রঘুনাথগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (মুর্শিদাবাদ) : গত ৩ মার্চ ২০০২ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' পাঠ, ৪০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ এবং ধর্মসভার মাধ্যমে সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী শিবনাথানন্দজী ও স্বামী দেবময়ানন্দজী।

নাটাগড় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ৮-১০ মার্চ ২০০২ আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে নগর-পরিক্রমা, গীতি-আলেখ্য, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' পাঠ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী। তিনদিনের ধর্মসভায় বিভিন্ন সময়ে ভাষণ দান করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দজী, স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী, স্বামী শুকদেবানন্দজী এবং প্রব্রাজিকা দেবাত্মপ্রাণাজী ও অধ্যাপিকা ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অনিলকুমার সেনগুপ্ত। উৎসব উপলক্ষ্যে প্রায় ৮,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ এবং ১৫০ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

পূর্ব সিঁথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৭০০ ০৩০) : গত ১০ মার্চ ২০০২ সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, কালীকীর্তন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী সনাতনানন্দজী, স্বামী পূর্ণানন্দজী, স্বামী দেবস্বরূপানন্দজী এবং অধ্যাপক ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। এদিন দুপুরে প্রায় ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

মধ্যমগ্রাম রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ১০ মার্চ ২০০২ পাঠ, আলোচনা, ধর্মসভা এবং ১,৫০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন করা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী ও স্বামী পূর্ণানন্দজী।

ডোমজুড় জয়চণ্ডীতলা শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা মন্দির (হাওড়া) : গত ১০ মার্চ ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণোৎসব উপলক্ষ্যে পূজা, ভক্তিগীতি, উষাকীর্তন, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, 'কথামৃত' ও 'মায়ের কথা' পাঠ এবং ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন নেপাল ঘোষাল ও অমর পাড়ুই। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী যোগাত্মানন্দজী ও সচ্চিদানন্দ শ্রীমানী। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

দুর্গাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (বর্ধমান) : গত ৯-১১ মার্চ ২০০২ নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, রচনা প্রতিযোগিতা ও ধর্মসভার মাধ্যমে সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়। ধর্মসভায় বিভিন্ন দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী, স্বামী তত্ত্বস্থানন্দজী, স্বামী গিরিশানন্দজী, স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী ও স্বামী বিবেকাত্মানন্দজী। উৎসবে প্রায় ৪,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

তেজু শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি (লোহিত, অরুণাচল প্রদেশ) : শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে গত ১৬ মার্চ ২০০২ বিশেষ পূজা, ভজন, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা এবং ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয়ে আলোচনা করেন ডাঃ বিশ্বনাথ শর্মা ও অশোক কামলি। এদিন প্রায় ৪০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

তেলুয়া রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (হুগলী) : গত ১৪-১৬ মার্চ ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, নরনারায়ণ সেবা, গীতি-আলেখ্য, বিচিত্রানুষ্ঠান, যাত্রাপালা ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিনের ধর্মসভায় বিভিন্ন সময়ে ভাষণ দান করেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, অমরেন্দ্র আদক ও ব্রহ্মচারিণী বেলাদেবী। এই উপলক্ষ্যে আরামবাগের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়।

আরারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (বিহার) : গত ১৬ মার্চ ২০০২ উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, রামায়ণ পাঠ, বাউলগান, কীর্তন, প্রায় ১,০০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন রাধারমণ চৌধুরী ও সন্তোষকুমার শুকুল এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী বিজয়ানন্দজী।

ঘোঁজা শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলী (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ১৬ মার্চ ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ভজন, পূজা, পদাবলী-কীর্তন, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পদাবলী-কীর্তন এবং ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন যথাক্রমে করুণাময়ী দেবনাথ এবং নিবেদিতা রায় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন সত্যপ্রিয় চক্রবর্তী। ধর্মসভায় আলোচনা করেন নন্দদুলাল চক্রবর্তী ও শিবাজী ঘোষ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সুতপা রায়। এদিন প্রায় ৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

সেবাব্রত

হিজলডিহা বিবেকানন্দ সেবাসমিতি (বাঁকুড়া) : গত ৩ মার্চ ২০০২ এক রক্তদান শিবিরে ৬১ জন রক্তদান করেন।

বাগআঁচড়া রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম (নদীয়া) : গত ১০ মার্চ ২০০২ এক চক্ষুচিকিৎসা শিবিরে প্রায় ৪০০ জনের চোখের চিকিৎসা করা হয়।

বহির্ভারত

পিরোজপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বাংলাদেশ) : গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা ছিল উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন দীপঙ্কর মণ্ডল। এদিন বিভিন্ন সময়ে ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী, স্বামী দীনেশানন্দজী, স্বামী পরদেবানন্দজী, জনাব মোঃ আজমল হোসেন, সুধাংশুশেখর হালদার, মালা দেবনাথ, ডাঃ এস. দাস প্রমুখ। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে আশ্রম-সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও আশ্রম-সভাপতি অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ রায়।

কৈলাশগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বাংলাদেশ) : গত ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আশ্রমের নবনির্মিত উপাসনালয় ও বিদ্যাপীঠের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিন দ্বারোদ্ঘাটন এবং বিশেষ পূজা করেন স্বামী পরদেবানন্দজী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন কাননবালা সরকার। শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন অণিমারানী রায়, মনীষা রায় প্রমুখ। পরদিন আয়োজিত সর্বধর্মসম্মেলনে অধ্যাপিকা ইতিরানী বসুর উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশনের পর আলোচনা করেন স্বামী পরদেবানন্দজী, মাইকেল গোমেজ, জনাব ইদরীস আলী খান, অধ্যাপিকা বিষ্ণুপ্রিয়া সাহা প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন আশ্রম-সভাপতি সুধাংশুকুমার রায়। সভান্তে 'বিবেকানন্দের শিকাগো যাত্রা' নাটক মঞ্চস্থ করেন।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা সুনীতি ঘোষ গত ২২ জানুয়ারি ২০০২ ইষ্টনাম স্মরণ করতে করতে প্রয়াণ করেন। পূর্ব সিঁথি সারদা সেবা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ডাঃ হীরামন মল্লিক গত ২৩ জানুয়ারি ২০০২, ৫০ বছর বয়সে পরলোক-গমন করেন। তিনি ছিলেন 'দলিত' সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি গোয়ালিয়র আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী স্বরূপানন্দজীর আশ্রমে শৈশব থেকে ক্রমে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন এবং সহৃদয় সমাজসেবী হিসাবে পরিচিত হন।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, ডিব্রুগড়-নিবাসী অমূল্যকুমার মিত্র গত ২৫ জানুয়ারি ৮৬ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গত ৬ বছর যাবৎ তিনি ডিব্রুগড় আশ্রমের সম্পাদক ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০২ পরলোকগমন করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি স্থানীয় তালপুকুর (উত্তর চব্বিশ পরগনা) সারদা সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য এবং 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত গ্রাহক ও আগ্রহী পাঠক হরিপদ চৌধুরী গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২ পরলোকগমন করেন। দেহান্তকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি স্থানীয় হালিশহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন। ❑

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ



তাঁর নামবীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

এরকম মনে করা ভাল নয় যে, আমার ধর্মই ঠিক আর অন্য সকলের ধর্ম ভুল। সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকলেই হলো। অনন্ত পথ—অনন্ত মত। শ্রীরামকৃষ্ণ

*

ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজন? নিন্দা ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, কিন্তু কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে, তা বলতে পারে কজনে? শ্রীমা সারদাদেবী

*

টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধাবিঘ্নের বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ

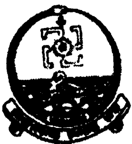
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-প্রকাশিত বাঙলা গ্রন্থরাজি

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)	১০০.০০	মনের বিচিত্র রূপ	১২.০০
স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)	১০০.০০	মানুষের দিব্যস্বরূপ	২৫.০০
স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড)	১০০.০০	মুক্তির উপায়	১৫.০০
আত্মজ্ঞান	২২.০০	যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব	৫.০০
আত্মবিকাশ	২০.০০	যুগে যুগে যাঁদের আগমন	২৮.০০
আমার জীবনকথা (২ খণ্ডে)	১২৫.০০	যোগদর্শন ও যোগসাধনা	৫০.০০
ঈশ্বরদর্শনের উপায়	৩৫.০০	যোগশিক্ষা	৪০.০০
কর্মবিজ্ঞান	১০.০০	শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম	২০.০০
তরুণ বাংলার আদর্শ	৫.০০	সর্বজনীন ধর্ম ও বেদান্ত	৩০.০০
দেবী দুর্গা	৬.০০	সাংখ্য, বৌদ্ধ ও বেদান্তদর্শন	৩০.০০
পত্র-সংকলন	১৬.০০	স্বামী বিবেকানন্দ	২.০০
পঞ্চদশী-দর্শনের পরিচয়	৫.০০	স্তোত্ররত্নাকর ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি	১২.০০
পুনর্জন্মবাদ	৩০.০০	হিন্দুনারী	২৫.০০
বিংশ-শতাব্দীর ধর্ম	৫.০০	হিন্দুরা যীশুখ্রীস্টের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু গীর্জার ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ কেন?	৫.০০
ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	২০.০০		
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	৩০.০০	বেদান্ত দর্শন	১০.০০
মরণের পারে	৫০.০০	খ্রীস্টীয় বিজ্ঞান এবং বেদান্ত	৫.০০

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত

অধ্যাত্মসাধনায় দেবতা ও দেবীভাবনা	৪.০০	ভারতীয়-সঙ্গীত—ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক রূপরেখা	৮০.০০
অভেদানন্দ-দর্শন (২ খণ্ডে)	১৪০.০০		
কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব	১৮.০০	মন ও মানুষ (৩ খণ্ডে)	১৫৮.০০
তীর্থরেণু	২৬.০০	মহিষাসুরমর্দ্দিনী-দুর্গা	৩০০.০০
তন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনা	৪০.০০	মন্ত্রভাবনা ও সঙ্গীত	১৪.০০
তন্ত্রতত্ত্বপ্রবেশিকা	৬০.০০	রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মচেতনা	২০.০০
নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৪৫.০০	রাগ ও রূপ (২ খণ্ডে)	২২০.০০
পদাবলী-কীর্তনের ইতিহাস	৩৫.০০	সঙ্গীতপ্রতিভায় স্বামী বিবেকানন্দ	৮.০০
বাণী ও বিচার (৮ খণ্ডে)	৪০০.০০	সঙ্গীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান	১২৫.০০
বিবেকানন্দের দর্শনচিন্তায় মন্ত্রতত্ত্ব ও মন্ত্রসাধনা	২০.০০	সঙ্গীতে সাহিত্য, রসভাবনা ও সুন্দর	২৫০.০০
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (৩ খণ্ডে)	২২০.০০	স্বামী অভেদানন্দ	৫.০০
শ্রীরামকৃষ্ণচন্দ্রিকা	৪০.০০	স্বামী অভেদানন্দের জীবন ও দর্শন	৩৬.০০



শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

(পুস্তক প্রচার বিভাগ)

১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬



জেলাভিত্তিক 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৬

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

বর্ধমান

- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, আসানসোল-৭১৩৩০১
- শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, শ্যামসায়র (পূর্ব)
  বর্ধমান-৭১৩১০১
- নরহরি পুস্তকালয়
  ৮১ বি. সি. রোড, বর্ধমান-৭১৩১০১
- রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম
  রামমোহন অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৪
- আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায়
  ডি/২০, গ্রীসম স্ট্রীট, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২১২
- স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি
  বিদ্যাসাগর অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫
- নিমানন্দ নায়ক, ৬৩ কবিগুরু সরণি
  সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-৭১৩২১৬, ফোন ঃ ৫৬৮৮২৩
- সাধুডাঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
  ডি. ভি. সি. কলোনী, দুর্গাপুর-৭১৩২০১
- রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি
  এ. বি. এল. টাউনশিপ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৬
- গুসকরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কালচারাল সেন্টার
  পিন-৭১৩১২৮
- অঞ্জনকুমার পাল
  প্রযত্নে বিবেকানন্দ পাঠচক্র
  কুমোরপাড়া (নারায়ণ ভবন), কাটোয়া-৭১৩১৩০
- শীতল ব্যানার্জী
  প্রযত্নে শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি, শ্রীখণ্ড-৭১৩১৫০
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র
  আমলাদহি, চিত্তরঞ্জন-৭১৩৩৩১
- পানাগড় রামকৃষ্ণ আশ্রম
  দার্জিলিং মোড়, পানাগড় বাজার-৭১৩১৪৮
- স্বামী অসীমানন্দ, সম্পাদক
  শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবামৃত সঙ্ঘ সেবাশ্রম
  গ্রাম—বুদবুদ, পোঃ বুদবুদ-৭১৩৪০৩, ফোন ঃ ৫১২৬৫০
- রানীগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র
  ৫৫/১ ভীমাচরণ রোড, কুমার বাজার,
  রানীগঞ্জ, পিন ঃ ৭১৩৩৪৭
- শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (মহীতোষ সামন্ত)
  বাঁকোলা এরিয়া কমপ্লেক্স, পোঃ উখড়া, পিন-৭১৩৩৬৩

উত্তরবঙ্গ

- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
  জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১
- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
  মালদা-৭৩২১০১
- বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
  রামকৃষ্ণ টিম্বার ডিপো
  নিউ মার্কেট, বালুরঘাট
  দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১
- স্বপনকুমার আইচ
  প্রযত্নে তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম
  বিধানপল্লী, তুফানগঞ্জ
  কুচবিহার-৭৩৬১৬০
- শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কুচবিহার
  অজয়কুমার গাঙ্গুলী
  রাজবাড়ি গভঃ হাউসিং, ব্লক সি-১/৯
  কুচবিহার-৭৩৬১০১, ফোন ঃ ২৮৬৮৮

বিপণন-কেন্দ্র ঃ কলকাতা-হাওড়া

- শ্যামবাজার বুক স্টল
  ২২০, এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৪
- পাতিরাম বুক স্টল
  কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
- অদ্বৈত আশ্রম স্টল
  শিয়ালদহ স্টেশন, ৩নং প্ল্যাটফর্ম
- অদ্বৈত আশ্রম স্টল
  হাওড়া স্টেশন (মেন এবং নিউ কমপ্লেক্স)
- রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম
  বেলুড় মঠ
- সর্বোদয় বুক স্টল
  হাওড়া রেলস্টেশন

ঈশ্বরে অনুরাগ হলে সমস্ত বিশ্বকেই আপন বোধ হয়। কারণ, সবই তাঁর সৃষ্টি।
স্বামী বিবেকানন্দ

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?
স্বামী বিবেকানন্দ

"অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়।।"
(গীতা, ৮।৫)

—যে মৃত্যুকালে আমাকেই (ভগবানকে) স্মরণ করে দেহত্যাগ করে, সে আমারই (ভগবানেরই) ভাব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মুক্তিলাভ করে—এবিষয়ে কোন সংশয় নেই।

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী



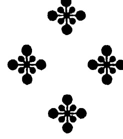
শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, পরোপকারী, বিনয়ী, সুপরিচিত আইনজীবী স্বর্গীয় অনিলকুমার বসু বিহারের আরারিয়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের উন্নতিকল্পে বহু শ্রমদান করেছিলেন ও আজীবন প্রেসিডেন্টরূপে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। প্রবাসে থাকাকালীন তিনি 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক ছিলেন।

২০০১ সালের ২৬ মে ৮৯ বছর বয়সে তিনি সজ্ঞানে পুণ্য শ্রীরামকৃষ্ণলোকে যাত্রা করেছেন। আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁকে প্রণাম জানাই ও তাঁর আত্মার শান্তিকামনা করি।

স্ত্রী, কন্যা, জামাতা, নাতি-নাতনি

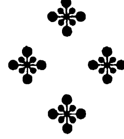
হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্মজন্মান্তরের পাপও তাঁর একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ



যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবত্তত্ত্বের আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী



বেদান্তই জগতের একমাত্র সার্বভৌম ধর্ম; কারণ উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না। উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমুদয়ই শিক্ষা দিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত কোন ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
Phone : 554-2248, 554-2403
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com
udbodhan@vsnl.net

Vol. 104
No. 5
MAY
2002

Licensed to Post
Without Prepayment
Licence No.
TECH/WB/RNP-15/LPWP-01/2002

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Regn. No.
TECH/WB/RNP-15/2002

উদ্বোধন

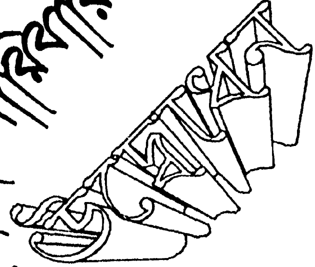
১০৪তম বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র



✤ গত ১লা মাঘ ১৪০৮ (১৫ জানুয়ারি ২০০২) উদ্বোধন ১০৪তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০৩ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম ✤

✡ বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র উদ্বোধন আপনাকে পড়তে হবে।



✡ উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।

✡ উদ্বোধন-এর সেবায় পাঁচটি স্থায়ী তহবিল আছে। একটি 'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল', অন্য চারটি যথাক্রমে 'স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ স্মৃতি তহবিল', 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল', 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল' এবং 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মৃতি তহবিল'। উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টে পাঠালে অনুগ্রহ করে **'Ramakrishna Math, Baghbazar'**—এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। দাতার চিঠিতে বা M.O. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন দিতে গেলে **'Udbodhan Office, Kolkata'**—নামে চেক বা ড্রাফ্‌ট পাঠাবেন।

স্বামী সর্বগানন্দ
সম্পাদক

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫্ টাকা। সডাক ৯৫্ টাকা। প্রতি সংখ্যা পৃথকভাবে ১০্ টাকা।

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ



"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন

॥ ১০৪ ॥

আষাঢ় ১৪০৯ ৬ষ্ঠ সংখ্যা



"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

ফোন :
৬৫৪-১১৪৪, ৬৫৪-১১৮০, ৬৫৪-৫৩৯১
৬৫৪-৯৫৮১, ৬৫৪-৯৬৮১, ৬৫৪-৫৭০০
ফ্যাক্স : ৬৫৪-৪৩৪৬
E-mail : rkmhq@vsnl.com



রামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া
পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১২০২

আবেদন : রামকৃষ্ণ সংগ্রহ মন্দির, বেলুড় মঠ

অনেকেই জানেন যে, বিশ্ব জুড়ে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের পথিকৃৎগণের পুণ্য স্মৃতিচিহ্নসমূহ সংরক্ষণের জন্য ২০০১ সালের ৭ মে বুদ্ধপূর্ণিমার দিন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ত্রয়োদশ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠে নবনির্মিত **"রামকৃষ্ণ সংগ্রহ মন্দির"**-এর শুভ উদ্বোধন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যগণের ব্যবহৃত জিনিসপত্রাদি এই মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হচ্ছে। এইসব জিনিসপত্রাদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণের জন্য একটি সংরক্ষণশালা এই মিউজিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এপর্যন্ত অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাঁদের নিকট রক্ষিত স্মৃতিচিহ্নাদি আমাদের অর্পণ করেছেন। বর্তমানে আমাদের একান্ত প্রয়োজন একটি চার ফুট ব্যাসের ঝাড়লণ্ঠন ও প্রাচীনকালে ব্যবহৃত দেওয়ালগিরি ও দীপাধার। এগুলি সংগ্রহ করে আমাদের সাহায্য করার জন্য আমরা পুনরায় ভক্তবৃন্দ, জনসাধারণ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট আবেদন জানাচ্ছি।

ভক্ত ও অনুরাগীদের যেকোন দান **"রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম"**-এর জন্য উল্লেখ করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠালে ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হবে।

স্বামী স্মরণানন্দ
সাধারণ সম্পাদক

ঠিকানা :

রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ
হাওড়া-৭১১২০২



সহৃদয় জনসাধারণের প্রতি আবেদন

সহৃদয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ অর্থানুকূল্যে আমাদের ভগ্নপ্রায় স্কুলগৃহটি পুনর্নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাঁদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।

আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি।

১।	১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ	ঃ	১,২০,০০০ টাকা
২।	দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
৩।	পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
৪।	আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প	ঃ	১০,০০,০০০ টাকা
৫।	একখানা অ্যাম্বুল্যান্স (Ambulance)	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
			২৬,২০,০০০ টাকা

A/c Payee চেক/ড্রাফ্‌ট **'Ramakrishna Mission Ashrama, Ramharipur'**—এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফ্‌ট পাঠাবার ঠিকানা—সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা—বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ ঃ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন নং ৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি

স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
রামহরিপুর, জেলা ঃ বাঁকুড়া

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত
উদ্বোধন
॥১০৪॥
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র
১০৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র

১০৪তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা আষাঢ় ১৪০৯ জুন ২০০২

প্রচ্ছদ ঃ গোমুখের চিত্র। হিমালয়ের হিমশৈলাবৃত গহ্বর থেকে গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, অবিরাম, উদ্দাম, অক্লান্ত গতিতে। এ যেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবগঙ্গা' বিবেকানন্দরূপ গোমুখের মধ্য দিয়ে জগৎকল্যাণার্থে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান। শিবচক্ষুটিও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। (আলোকচিত্র ঃ ডাঃ তমোনাশ ভট্টাচার্য)

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ   সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

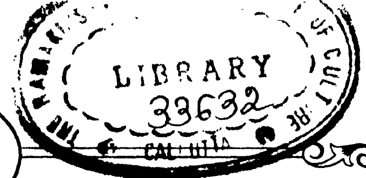
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৭৫ টাকা; সডাক ঃ ৯৫ টাকা ❑ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য ঃ ১০ টাকা



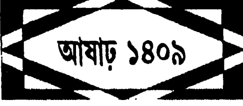
'উদ্বোধন' : পূজা সংখ্যা (আশ্বিন ১৪০৯)

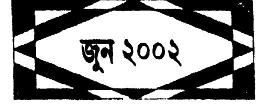
একটি জরুরী বিজ্ঞপ্তি

- যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও **'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন ১৪০৯/সেপ্টেম্বর ২০০২** (শারদীয়া) সংখ্যা প্রকাশিত হবে। **মূল্য : ৫০ টাকা।**
- 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না। গ্রাহকরা ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে অগ্রিম টাকা জমা দিলে অতিরিক্ত প্রতি কপি ৩০ টাকায় পাবেন। অতিরিক্ত কপি রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিলে পাঠানোর খরচ বাবদ অতিরিক্ত ২২ টাকা (প্রতি কপির ডাকমাশুল) জমা দিতে হবে। কপিটি অগ্রিম জমার ক্যাশমেমো দেখিয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০২ থেকে ১০ অক্টোবর ২০০২ পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করবেন।
- শারদীয়া সংখ্যাটির ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সাধারণ ডাকে আমরা পাঠাতে চাই না।
- ডাকযোগে (By Post) যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) নিলে ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে কার্যালয়ে অবশ্যই জানাবেন। কোন সংবাদ টেলিফোনে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে লিখিতভাবে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে তাঁদের পত্রিকা সাধারণ ডাকযোগেই (By Post) যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
- যাঁরা ডাকযোগে (By Post) পত্রিকা নেন, তাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি রেজিস্ট্রি ডাকে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রতি কপির জন্য অতিরিক্ত ২২ টাকা পাঠাতে হবে। তবে ঐ সংক্রান্ত সংবাদ এবং ২২ টাকা গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে অবশ্যই কার্যালয়ে এসে পৌঁছানো প্রয়োজন।
- আমাদের গ্রাহকভুক্তিকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে যাঁরা সডাক গ্রাহক হয়েছেন/নবীকরণ করেছেন, তাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি ঐ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সংগ্রহ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকভুক্তিকেন্দ্রগুলিতে ১৬ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে সেই সংবাদ জানাতে হবে, যাতে আমাদের কাছে ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে তারা সংবাদটি দিতে পারে।
  - মনে রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ করার সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক। উল্লেখ না থাকলে অথবা কোন একটিমাত্র উল্লেখ করলে সংবাদটি গ্রাহ্য হবে না।
  - প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্ত্বেও অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে জানান এবং তাঁদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। আমরা বিশেষভাবে জানাই, নির্ধারিত তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহকদের সহৃদয় সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।
  - কিছু অসৎ ব্যক্তি কোন কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের শারদীয়া সংখ্যা সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা যাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ করবেন [২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর ২০০২-এর মধ্যে], তাঁদের **বিশেষভাবে** জানানো হচ্ছে যে, শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় তাঁদের নবীকরণ/ গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/M.O. প্রাপ্তি-কুপন/আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।
  - যদি ক্যাশমেমো/রসিদ/M.O. প্রাপ্তি-কুপন হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ২০ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে সেই মর্মে সম্পাদকের কাছে তা ডুপ্লিকেট-সহ লিখিতভাবে জানিয়ে সংগ্রহের অনুমতি নিতে হবে। নতুবা আমাদের পক্ষে তাঁদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে এব্যাপারে আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।
  - ১০ অক্টোবরের পরে নিলে পূজাসংখ্যা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না।
- কাজের দিন : (সোম-শুক্র) সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ পর্যন্ত এবং শনিবার বেলা ১-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা, রবিবার বন্ধ থাকে।
- ১২ অক্টোবর থেকে ২১ অক্টোবর ২০০২ পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে। পূজাবকাশের পর ২২ অক্টোবর ২০০২ মঙ্গলবার কার্যালয় খুলবে।













অপ্পমাদো অমতপদং পমাদো মচ্চুনো পদং।
অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি যে পমত্তা যথামতা।।

এতং বিসেসতো ঞত্বা অপ্পমাদং হি পণ্ডিতা।
অপ্পমাদে পমোদন্তি অরিয়ানং গোচরে রতা।।

তে ঝায়িনো সাততিকা নিচ্চং দল্‌হপরাক্কমা।
ফুসন্তি ধীরা নিব্বানং যোগক্‌খেমং অনুত্তরং।।

উট্‌ঠানবতো সতিমতো সুচিকম্মস্‌স নিসম্মকারিনো।
সঞ্‌ঞতস্‌স চ ধম্মজীবিনো অপ্পমত্তস্‌স যসো'ভিবড্‌ঢতি।।

(ধম্মপদ, অপ্পমাদবগ্‌গো, ১-৪)

অপ্রমাদ অমৃতের সন্ধান দেয়। মনের অ-চাঞ্চল্যই অপ্রমাদ। প্রমাদ মৃত্যুর পথস্বরূপ (মচ্চু নো পদং [মৃত্যোঃ পথম্])। প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি অপ্রমত্ত, তাই তাঁহার মৃত্যু নাই। আর প্রমত্ত ব্যক্তিগণ মৃতস্বরূপ অর্থাৎ অলস এবং প্রমত্ত।

মানব মৃত্যু ও পুনর্জন্মের অধীন। এই সত্য যাঁহারা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া অপ্রমাদপরায়ণ হইয়াছেন এবং আর্যগণের [এক্ষেত্রে বুদ্ধ ও প্রত্যেকবুদ্ধ-আদির অর্থাৎ যাঁহারাই বোধ-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন] মার্গে বিচরণ করিয়া অপ্রমাদ আনন্দলাভ করেন তাঁহারা ধ্যাননিষ্ঠ, উদ্যমশীল এবং নিত্য দৃঢ়পরাক্রম [দৃঢ়সঙ্কল্পযুক্ত]। তাঁহারাই পরম শান্তি অর্থাৎ নির্বাণ (অর্হত্ত্ব) লাভ করেন।

যিনি সতত জাগরিত, সতত স্মৃতিমান এবং পবিত্রকর্মা, যিনি বিশেষ বিচারপূর্বক কর্ম করেন, সংযতেন্দ্রিয় এবং ধর্মপরায়ণ—অপ্রমাদী সেই পুরুষের যশ বর্ধিত হয়।



বিবেকানন্দের উত্তরাধিকার

[পূর্বানুবৃত্তি]

অতএব ধর্মই ভারতবর্ষের প্রথম উত্তরাধিকার। এদেশের জাতীয় জীবনকে টানিয়া লইয়া চলে ধর্ম। কৌতুকপ্রদ একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। এক বালক তাহার পিতার সহিত কোথাও যাইবে বলিয়া রেলগাড়িতে উঠিয়াছে। ট্রেন ছাড়িতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া বালক বারংবার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে ঃ "বাবা, গাড়ি চলছে না কেন?" পিতা শেষে বিরক্ত হইয়া বলিলেন ঃ "আমরা ঠেলা দিচ্ছি না তো গাড়ি চলবে কি করে?" শুনিয়া বালক ঐ কামরার ভিতরেই দেওয়ালে ঠেলিতে লাগিল। পিতা বলিলেন ঃ "দাঁড়াও, দাঁড়াও, সব লোক উঠুক, তারপরে তুমি আমি দুজনে মিলে ঠেলব।" বালক নিরস্ত হইল। অতঃপর 'সিগন্যাল' হইয়াছে দেখিয়া এবং গার্ডের বাঁশি শুনিয়া পিতা পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ "চল ঠেলি।" তখন উভয়ে গাড়ি যেদিকে চলিবে সেইদিকে কামরার দেওয়ালে ঠেলা লাগাইতে শুরু করিল। কয়েক মুহূর্ত পরে গাড়ি প্রথমে ধীর গতিতে, পরে কিঞ্চিৎ দ্রুত গতিতে চলিতে লাগিল। পিতা পুত্র-সহ পরিশ্রান্ত হইয়া নিজ আসনে ফিরিয়া আসিলেন। বালকের মুখে তখন আত্মতৃপ্তির হাসি। সে বুঝিল, তাহাদের ঠেলাতেই গাড়ি চলিতেছে! আমাদের জাতীয় স্তরে এইরূপ বালকোচিত ব্যবহার কেহ কেহ করিয়া থাকেন। জাতির অগ্রভাগে 'সনাতন ধর্ম'-রূপ যে মহাকায় 'ইঞ্জিন'টি আমাদের জাতীয় জীবনকে টানিয়া লইয়া চলিতেছে, আমরা অনেকে তাহার অস্তিত্ব সম্পর্কেই সচেতন নহি। অথচ ইহাই আমাদের জাতীয় উত্তরাধিকার। কিন্তু যথার্থ ধর্ম কি তাহা না বুঝিয়া যখন কেহ 'ধর্ম ধর্ম' করিয়া থাকে, তাহা দেখিয়া ধর্মবেত্তা চিন্তানায়কগণ বুঝিতে পারেন, যেন কপিবর মুক্তার মালা পরিয়াছে! ধর্মের সহায়ক হিসাবে সমাজসংস্কারাদি যাহাকিছু আবশ্যক, তাহার পদ্ধতিগত যেকোন প্রশ্ন তুলিবার পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ নির্দেশিত প্রথম সাবধানবাণীটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন—"আমাদের কাজের মূল কথাটা সবসময় মনে রেখো—ধর্মে একটুও আঘাত না করে জনসাধারণের উন্নতি।" ইহা বিবেকানন্দ-আগত উত্তর প্রজন্মের মহনীয় উত্তরাধিকার। এবং বলা বাহুল্য, ইহাই সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের পাশব সাম্প্রদায়িকতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাধান।

বিবেকানন্দের নিজের ভাষায় এই উত্তরাধিকারের সংজ্ঞা আরো স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট ঃ

"ইউরোপী সভ্যতা নামক বস্ত্রের এইসব হলো উপকরণ। এর তাঁত হচ্ছে—এক নাতিশীতোষ্ণ পাহাড়ী সমুদ্রতটময় প্রদেশ; এর তুলো হচ্ছে—সর্বদা যুদ্ধপ্রিয় বলিষ্ঠ নানা জাতের মিশ্রণে এক মহা খিচুড়ি জাত। এর টানা হচ্ছে—যুদ্ধ, আত্মরক্ষার জন্য, ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ। যে তলওয়ার চালাতে পারে, সে হয় বড়। যে তলওয়ার না ধরতে পারে, সে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে কোন বীরের তলওয়ারের ছায়ায় বাস করে, জীবনধারণ করে। এর পোড়েন বাণিজ্য, এ সভ্যতার উপায় তলওয়ার, সহায় বীরত্ব, উদ্দেশ্য ইহ-পারলৌকিক ভোগ।

"আমাদের কথাটা কী? আর্যরা শান্তিপ্রিয়, চাষবাস করে, শস্যাদি উৎপন্ন করে শান্তিতে স্ত্রী-পরিবার পালন করতে পেলেই খুশি। তাতে হাঁপ ছাড়বার অবকাশ যথেষ্ট; কাজেই চিন্তাশীলতার, সভ্য হবার অবকাশ অধিক। আমাদের জনকরাজা স্বহস্তে লাঙল চালাচ্ছেন এবং সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মবিৎও তিনি।... [এখানে] শান্তি আছেন ভোগ বিসর্জনে; ভোগ আছেন মননশীলতায়, বুদ্ধিচর্চায়—শরীরচর্চায় নেই।... বিদ্যা ও ধর্মের পায়ের তলায় তলওয়ার রইল। তার [তলওয়ারের] একমাত্র কাজ ধর্মরক্ষা করা, মানুষ ও গবাদি পশুর পরিত্রাণ

করা, বীরের নাম আপৎ-ত্রাতা ক্ষত্রিয়। লাঙ্গল, তলওয়ার [ইত্যাদি] সকলের অধিপতি রক্ষক রইলেন ধর্ম। তিনি রাজার রাজা। জগৎ নিদ্রিত হলেও তিনি সদা জাগরূক। ধর্মের আশ্রয়ে সকলে রইল স্বাধীন।''

কোন দেশের ভৌগোলিক চেহারা, তাহার জলসম্পদ, প্রাণিসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ সেই দেশের মানুষের মনকে সেইভাবে গড়িয়া তুলে। ইহাকে বলা হইয়াছে জাতির 'আধিদৈবিক উত্তরাধিকার'। শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষের ভৌগোলিক রূপটি কেমন করিয়া মনে প্রভাব বিস্তার করে? স্বামীজী বলিলেন ঃ

''অতি বিশাল নদনদীপূর্ণ, উষ্ণপ্রধান সমতল ক্ষেত্র—আর্যসভ্যতার তাঁত। আর্যপ্রধান, নানাপ্রকার সুসভ্য, অর্ধসভ্য, অসভ্য মানুষ—এ বস্ত্রের তুলো, এর টানা হচ্ছে বর্ণাশ্রমাচার, এর পোড়েন—প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব ও সঙ্ঘর্ষ নিবারণ।''

পাশ্চাত্যবাসী তথাকথিত 'সভ্য' ইউরোপীয়গণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

''তুমি ইউরোপী, কোন্ দেশকে কবে ভাল করেছ? যেখানে দুর্বল জাতি পেয়েছ, তাদের সমূলে উৎসাদন করেছ। তাদের জমিতে তোমরা বাস করছ, তারা একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেছে। তোমাদের আমেরিকার ইতিহাস কী? তোমাদের অস্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড, প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জ—তোমাদের আফ্রিকা?

''কোথা সেসকল বুনো জাত আজ? একেবারে নিপাত। বন্য পশুবৎ তাদের তোমরা মেরে ফেলেছ; যেখানে তোমাদের শক্তি নাই, সেথা মাত্র [সেইখানেই] অন্য জাত জীবিত।

''আর ভারতবর্ষ কস্মিন্‌কালেও তা করেনি। ... ভারতবর্ষে প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্বলকে রক্ষা করার জন্য।''

আজ হইতে একশত বৎসর পূর্বে 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' নামক প্রবন্ধে বিবেকানন্দ তাঁহার লেখনীরূপ সুতীক্ষ্ণ তরবারির সাহায্যে যে-সত্য উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন, সেই সত্য আজও পর্যন্ত সমভাবে বাস্তব। তিনি বলিলেন ঃ

''ইউরোপীরা যার এত বড়াই করে, সে [সেই] 'সভ্যতার উন্নতি' (progress of civilisation)-র মানে কী? তার মানে এই যে, উদ্দেশ্যসিদ্ধি—অনুচিত উপায়কে উচিত করে। চুরি, মিথ্যা এবং ফাঁসি অথবা স্টানলি (stanley) দ্বারা তার সমভিব্যাহারী ক্ষুধার্ত মুসলমান রক্ষীদের—এক গ্রাস অন্ন চুরি করার দরুন চাবকানো, এসকলের ঔচিত্য বিধান করে। '[তুমি] দূর হও, আমি তথায় আসতে চাই'-রূপ বিখ্যাত ইউরোপী নীতি, যার দৃষ্টান্ত—যেথায় ইউরোপীর আগমন, সেথাই আদিম জাতির বিনাশ—সেই নীতির ঔচিত্য বিধান করে! এই সভ্যতার অগ্রসরণ লণ্ডন নগরীতে ব্যাভিচারকে, পারিতে [প্যারিসে] স্ত্রী-পুত্রাদিকে অসহায় অবস্থায় ফেলে পালানোকে এবং আত্মহত্যা করাকে 'সামান্য ধৃষ্টতা' জ্ঞান করে, ইত্যাদি।''

আর এখন ভারতবর্ষে উহাই ঘটিতেছে! একশত বৎসর পূর্বে এই দেশমাতৃকার যে-রূপ স্বামীজী প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, আজ বাহ্যত তাহার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অথবা বিজ্ঞান-প্রযুক্তিগত প্রেক্ষাপটে সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। তবু বিবেকানন্দের কথা পড়িলে মনে হয় তিনি যেন এই সমাজের মানুষ, মনে হয় আজ তিনি সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথাগুলি বলিতেছেন। কারণ, স্বামীজী ভারতবর্ষের আন্তর রূপ যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ পরিবর্তন এখনো হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। কেবল চিরকালের 'নম্র হিন্দু' এখন 'ধর্ম'-কে কেন্দ্র করিয়াই হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে। বাবরি মসজিদ কিংবা গোধরা কাণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দু-মুসলিম উভয়েই পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হইয়া রক্তাক্ত পরিণতির দিকে চলিয়াছে। কে বুঝিবে, কাহাকেই বা বুঝাইবে যে, এই সন্ত্রাস এবং দাঙ্গার পশ্চাতে 'যথার্থ ধর্ম'-এর কোন ভূমিকা নাই। ইহা মানুষের আদিম প্রবৃত্তিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। হিন্দুধর্ম কিংবা ইসলামধর্ম কোনটিই ধর্মের নিজস্ব রূপে দোষী নহে, বরং বিকৃতভাবে ধর্মের উপস্থাপনাই এই হিংসার কারণ। তাই প্রশ্ন জাগে, আমরা স্বামীজীর তিরোধানের একশত

বৎসর পরেও কি তাঁহার যথার্থ উত্তরাধিকারী হইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছি? শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বলা হয়, তিনি একাধারে একদিকে সন্ন্যাসীর আদর্শ ছিলেন, অপরদিকে গৃহস্থের আদর্শ ছিলেন। অর্থাৎ আদর্শ সন্ন্যাসী কিংবা আদর্শ গৃহস্থ জীবন কেমন হইবে তাহা শিক্ষা করিতে চাহিলে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের অনুধ্যান আমাদের কর্তব্য। কিন্তু স্বামীজী সম্পর্কে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—"বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী, সংসারেই ঢুকল না, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার কাকে বলে জানল না, সে আবার সংসারের সমস্যা বুঝবে কী?" বস্তুত তাহা নহে। বিবেকানন্দের অসাধারণ মেধা, তাঁহার ব্যাপক অনুভব তাঁহাকে যেমন একদিকে সন্ন্যাসধর্মের চূড়ান্ত আদর্শে সংস্থাপিত করিয়াছিল, অপরদিকে তেমনি ধূলিমলিন এই সংসারের দৈনন্দিন যাবতীয় সমস্যার যন্ত্রণা এবং তাহার সমাধান তাঁহার চিত্তে স্বতই উদ্ভাসিত করিয়া দিত। সেই কারণে তিনি গার্হস্থ্য জীবনযাপন না করিলেও সংসারজীবনের আদর্শকে তাঁহার বক্তৃতা কিংবা কথোপকথনের মাধ্যমে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। সংসারে থাকিবার কৌশল তিনি বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন—"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"—এই জগৎ বীরের ভোগ্য, কাপুরুষের নহে। তাঁহার জ্বালাময়ী লেখনী হইতে স্বতই নিষ্ক্রান্ত হইল—

"তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে।... বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য প্রকাশ কর, সাম-দান-ভেদ-দণ্ড-নীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক। আর লাথি-ঝাঁটা খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরলোকেও তাই। এইটি শাস্ত্রের মত। সত্য, সত্য, পরম সত্য—স্বধর্ম কর হে বাপু! অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে। মহা উৎসাহে অর্থোপার্জন করে স্ত্রী-পরিবার দশজনকে প্রতিপালন—দশটা হিতকর কার্যানুষ্ঠান করতে হবে। এ না পারলে তুমি কিসের মানুষ? গৃহস্থই নও—আবার 'মোক্ষ'!! [গৃহস্থই হইতে পারিলে না আবার পরম পুরুষার্থ 'মোক্ষ' 'মোক্ষ' করিয়া চিৎকার করিতেছ!!]... আর ঐ যে মিনমিনে পিনপিনে, ঢোক গিলে গিলে কথা কয়, ছেঁড়া ন্যাতা সাতদিন উপবাসীর মতো সরু আওয়াজ; সাতচড়ে কথা কয় না—ওগুলো হচ্ছে তমোগুণ, ওগুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্ত্বগুণ নয়, পচা দুর্গন্ধ। অর্জুন ঐ দলে পড়েছিলেন বলেই... প্রথম ভগবানের মুখে কি কথা বেরুল দেখ—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'; শেষ—'তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব'। [হে পার্থ, তুমি তোমার ক্লীবত্ব ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর। শেষে বলিতেছেন, উঠিয়া দাঁড়াও, যশোবান হও।]"

উপরের দীর্ঘ উদ্ধৃতি হইতে আমরা সহজেই আমাদের নিকট স্বামীজীর প্রত্যাশা কী ছিল তাহা নির্ধারণ করিতে পারি। স্বামীজী যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন, সবরকম গুণ একজনের মধ্যে প্রকাশিত হইবে, তাহা সম্ভব নহে। কিন্তু কোন একটি বা দুটি গুণ, সন্ন্যাসী কিংবা গৃহী—সেই ব্যক্তি যাহাই হউন না কেন, তাঁহার চরিত্রে বিকাশলাভ করিলে এই সমাজের রূপ আমূল পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। তাই বোধ হয় অধিকারী কিংবা 'উত্তরাধিকারী' হওয়া সহজ কাজ নহে। কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক বা ধর্মজীবনে নহে, সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের বৈষয়িক ব্যাপারেও এই কথা প্রযোজ্য। সরকারি আইন অনুসারে 'উত্তরাধিকার' নির্ধারিত হইতে পারে বটে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি 'যথার্থ উত্তরাধিকারী' কিনা তাহা তাহার ভবিষ্যৎ আচরণের মধ্য দিয়াই প্রমাণিত হইবে। 'যোগ্য উত্তরাধিকারী' পূর্বপুরুষের 'সম্পত্তি' কেবল রক্ষাই করে না, বরং তাহার নেতৃত্বে উহা ক্রমশ বর্ধিত ও পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। সরকারি আইন উত্তরপুরুষের অধিকার কিয়দংশ রক্ষা করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার নৈতিক ও চারিত্রিক দোষজাত বিপথগামিতা হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা আইনের নাই। ফলত পিতার প্রচুর সম্পত্তির 'উত্তরাধিকারী' হইয়াও অনতিবিলম্বে রাস্তায় রাস্তায় বিচরণরত ক্লিন্ন শরীরে ছিন্নবস্ত্রধারীকে ইতিহাস বহুবার সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়াছে দেখা যায়। অতএব বিবেকানন্দের উত্তরাধিকারী হইতে গেলেও প্রথমে

তাহার যোগ্যতা অর্জন করা আবশ্যক। বস্তুত, আমাদের দেশ যত যত বিবেকানন্দকে আবিষ্কার করিবে ততই জাতির দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাইবে।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে—পরম্পরাক্রমে যে সনাতন ধর্ম ভারতবর্ষকে ধারণ করিয়া আছে তাহার অতিরিক্ত কিছু 'উত্তরাধিকার' আমরা কি বিবেকানন্দের নিকট হইতে পাইয়াছি? বোধ হয় পাইয়াছি। তাহা 'বিবেকানন্দ তত্ত্ব'। (গত মাঘ ১৪০৮ সংখ্যার 'কথাপ্রসঙ্গে' এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে।) এই তত্ত্বের বিশেষ প্রকাশ আমরা ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; স্বামীজীর গুরুভ্রাতাগণের মধ্যে প্রধানত স্বামী অখণ্ডানন্দের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই তত্ত্বের উপর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ অধিষ্ঠিত। এই মহান তত্ত্বের বাঙ্ময় রূপ স্বামীজী স্বয়ং প্রকট করিলেন—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"। (গত বৈশাখ ১৪০৯ সংখ্যার 'কথাপ্রসঙ্গে' দ্রষ্টব্য।) স্বামীজী বলিলেন ঃ

"কায়মনোবাক্যে জগদ্ধিতায় দিতে হইবে। পড়েছ—'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব'; আমি বলি—'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে।

"বড় হতে গেলে কোন জাতির বা ব্যক্তির পক্ষে এই তিনটি জিনিসের প্রয়োজন ঃ (ক) সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস, (খ) হিংসা ও সন্দিগ্ধভাবের একান্ত অভাব, (গ) যারা সৎ হতে বা সৎ কাজ করতে সচেষ্ট, তাদেরকে সহায়তা।

"অন্যে যাই ভাবুক আর করুক, তুমি কখনও তোমার পবিত্রতা, নৈতিকতা আর ভগবৎপ্রেমের আদর্শকে নিচু করো না।... যে ভগবানকে ভালবাসে তার পক্ষে চালাকিতে ভীত হবার কিছু নেই। স্বর্গে ও মর্তে পবিত্রতাই সবচেয়ে মহৎ ও দিব্য শক্তি।

"আমি চাই, আমার সব ছেলেরা, আমি যত বড় হতে পারতাম—তার চেয়ে শতগুণে বড় হোক। তোমাদের প্রত্যেককেই এক একটা 'দানা' [দৈত্য-দানা] হতে হবে—আমি বলছি, অবশ্যই হতে হবে। (১) আজ্ঞাবহতা, (২) উদ্দেশ্যের উপর অনুরাগ ও (৩) সবসময় তৈরি হয়ে থাকা—এই তিনটি যদি থাকে; কিছুতেই তোমাদের হঠাতে পারবে না।"

অর্থাৎ আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। সমসাময়িক কালে বিবেকানন্দকে যে-বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহা মূলত বাঙালী তথা ভারতবাসীর ইংরেজতোষণ এবং নব্য ইংরেজী শিক্ষার কারণে। এখন সেই মানসিকতা অনেকাংশেই পরিবর্তিত হইয়াছে। পরাধীন ভারতে বিবেকানন্দের 'দেশপ্রেমিক' রূপটিই বিশেষ প্রকটিত ছিল। এখন ভারতবর্ষের মানুষ বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিবেকানন্দকে বিচার করিতে শিখিয়াছে। এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতাও ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। একদিকে যেমন ভোগসর্বস্ব পাশ্চাত্য চিন্তাতরঙ্গ মানুষের মধ্যে বিপুল অভিঘাত সৃষ্টি করিয়াছে, অপরদিকে তাহার বৈজ্ঞানিক সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে তাহার পক্ষে 'বিবেকানন্দ তত্ত্ব' উত্তরোত্তর গ্রহণীয় হইয়া উঠিতেছে। এবং প্রচণ্ড জড়বাদী বায়ুর তুফানের মধ্য দিয়া চলিয়াও বিবেকানন্দরূপ অদ্ভুত 'নুলিয়া'র দক্ষ পরিচালনায় বৃহত্তর জনমানস ক্রমশ 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবসমুদ্রে' অবগাহন স্নানের জন্য যোগ্যতা অর্জন করিতেছে। কেবল হিন্দু নহে, সর্বধর্মের মানুষই অনুভব করিতেছে, স্বামীজী-নির্দেশিত 'সেবাযোগ' এই যুগের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার। উত্তরপুরুষ হিসাবে আমাদের নিশ্চয়ই দায়বদ্ধতা আছে। এবং পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার ও সুকৃতি আমাদের এই 'আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ও দায়বদ্ধতা'র বিকাশ ঘটাইতে সাহায্য করে যদিও, কিন্তু কেবল কি আমাদেরই দায়? ইহা স্বামীজীরও দায়। আমাদের তৈয়ারি করিয়া লওয়া তাঁহারই দায়। সেকথা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিলেন ঃ "I am a voice without a form." (আমি অশরীরি বাণী।) একটি পত্রে নাঞ্জুণ্ডা রাওকে লিখিলেন—

"আমরণ কাজ করে যাও—আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি, আর আমার শরীর চলে গেলেও আমার শক্তি তোমাদের সঙ্গে কাজ করবে।" (দুই)

সমসাময়িক স্মৃতিকথায় শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে যেসকল তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ১৩৫৯ সালে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনর্মুদ্রিত করা হলো। আশা করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।

মনে রাখতে হবে, বর্তমান চয়নটি লেখক ৪৫ বছর পরে নিজের অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন। তারও পাঁচবছর পরে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে।—সম্পাদক

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

Reflections & Reminiscences, 1947

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন অনেক সঙ্গী নিয়ে তাঁর জামাতা কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ-এর স্টিমারে চড়ে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সৌভাগ্যবশত ঐ দলে আমিও ছিলাম। আমরা তীরে নামিনি, পরমহংস তাঁর ভাগনে হৃদয়ের সঙ্গে স্টিমারে চড়লেন। হৃদয়ের সঙ্গে এক চুপড়ি মুড়ি ও আমাদের জন্য কিছু সন্দেশ ছিল। স্টিমার সোমরা অভিমুখে চলতে আরম্ভ করল। পরমহংসের পরনে ছিল লালপেড়ে ধুতি ও বোতাম খোলা জামা। তিনি স্টিমারে চড়তেই আমরা সব দাঁড়িয়ে উঠলাম; কেশব তাঁকে হাত ধরে নিয়ে এসে তাঁর কাছে বসালেন। কেশব হাতের ইশারা করে আমায় তাঁদের কাছে বসতে ডাকলেন। আমি প্রায় তাঁদের পা ছুঁয়ে বসলাম। পরমহংস কৃষ্ণকায় ছিলেন, দাড়ি ছিল, চোখ পুরাপুরি খোলা ছিল না, কিন্তু সে-চোখে অন্তর্দৃষ্টি বোঝা যেত। পরমহংসের উচ্চতা ছিল মাঝারি ধরনের, ছিপছিপে গড়ন—যাকে শীর্ণকায় বলা যেতে পারে। তাঁর ধাত উত্তেজনাপ্রবণ (nervous temperament) ছিল বলা যেতে পারে এবং সামান্য যন্ত্রণাতেই তিনি কাতর হয়ে পড়তেন। কথা বলার সময় সামান্য তোতলামি ছিল, যেটা সকলের ভালই লাগত। তিনি সাদাসিধা বাঙলায় কথা বলতেন, কখনো 'তুই' কখনো 'তুমি' বলে ফেলতেন। আলোচনাকালে পরমহংস একনাগাড়ে বলে যেতেন, কেশব ও অন্যান্যরা সশ্রদ্ধ উৎসুক শ্রোতা হয়ে থাকতেন। প্রায় ৪৫ বছর আগের ঘটনা হলেও পরমহংস যেসব কথা বলেছিলেন তা যেন আমার মানসপটে অনপনেয়ভাবে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে। আমি অন্য কাউকে এধরনের কথা বলতে শুনিনি। এ যেন বহু বর্ষে অর্জিত গভীর আধ্যাত্মিক সত্য, নিজস্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার নিরবচ্ছিন্ন ঝরনাধারা—যার উৎস হলো তাঁর নিজস্ব ভক্তি ও জ্ঞান। তিনি যেসব .উপমা বা অলঙ্কার ব্যবহার করতেন ও যথোপযোগী উদাহরণ দিয়ে বোঝাতেন, সেগুলি ছিল যেমন হৃদয়গ্রাহী, তেমনি মৌলিক। কখনো কখনো তিনি কথা বলতে বলতে কেশবের কাছাকাছি সরে যেতেন যতক্ষণ না তাঁর শরীরের কোন অংশ অজ্ঞাতভাবে কেশবের কোলের ওপর গিয়ে পড়ত; কিন্তু কেশব স্থির হয়ে বসে থাকতেন, কখনো সেখান থেকে সরে আসতেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্টিমারে উঠে আসন গ্রহণ করার পর চারধার চেয়ে দেখলেন। চারধারে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের দেখে তিনি খুশি হয়ে বললেনঃ "বাঃ, বাঃ, এদের চোখগুলি বেশ।" তারপরে প্রায় অর্ধনিমীলিত নেত্রে সাহেবের পোশাক পরা এক যুবককে স্টিমারের রেলিঙের ওপর বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "ও কে? সাহেবের মতো দেখতে?" কেশব স্মিতহাস্যে জানালেন যে, ও সদ্য বিলেতফেরত। পরমহংস হাসতে হাসতে বললেনঃ "বুঝেছি, সাহেব দেখলে ভয় লাগে।" যুবকটি ছিল কুচবিহারের কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ, যার সঙ্গে পরবর্তী কালে কেশবের দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ হয়েছিল। এর পরমুহূর্তেই শ্রীরামকৃষ্ণ আশপাশের লোকদের সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে গেলেন এবং তাঁর বিভিন্ন সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে বলতে লাগলেনঃ "আমি কখনো কখনো মনে করতাম যে, আমি ব্রাহ্মণী হংসী, সঙ্গীকে খুঁজছি। পুরনো সংস্কৃত কাব্যে আছে যে, ব্রাহ্মণী হংস ও হংসী নদীর উভয় তীরে বসে সারারাত পরস্পরকে আহ্বান করে। কখনো কখনো বিড়ালছানা হয়ে মিউমিউ করে মাকে ডাকতাম, মাও সাড়া দিতেন।" এইভাবে কিছুক্ষণ কথা বলার পর হঠাৎ তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং শিশুর মতো হেসে বললেনঃ "সাধনকালের গুহ্য কথা বলতে নেই।" তিনি আরো পরিষ্কার করে বললেন যে, সমাধি অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না; সেসময় ভগবানের চিন্তায় আত্মা নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তারপরে তিনি চারদিকে সমবেত লোকের মুখ দেখে বললেন যে, মুখ দেখে মানুষের চরিত্র নির্ণয় করা যায়। মুখের প্রতিটি অংশ তার চরিত্রের কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। তার মধ্যে চোখই প্রধান, তবে অন্যান্য অংশও যেমন কপাল, কান, নাক, ঠোঁট, দাঁত—এগুলিও চরিত্রের কোন না কোন দিক নির্দেশ করে। এইভাবে তিনি একাই কথা বলে চললেন যতক্ষণ না নিরাকার ব্রহ্মের কথা এল। তিনি দু-তিনবার 'নিরাকার' 'নিরাকার' কথাটি বললেন এবং বলতে বলতে গভীরভাবে সমাধিমগ্ন হয়ে গেলেন। পরমহংস যখন সমাধিস্থ ছিলেন, সেই অবসরে কেশবচন্দ্র সেন আমাদের বোঝালেন যে, তাঁর সঙ্গে সম্প্রতি পরমহংসের কথাবার্তায় নিরাকার ব্রহ্মের কথা উঠলেই তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন।

আমরা সমাধি অবস্থায় পরমহংসকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করলাম। তাঁর সারা শরীর প্রথমে এলিয়ে পড়ে পরে সামান্য শক্ত হয়ে উঠল। হাত-পা নড়ল না বা বিকৃত হলো না, মাংসপেশী শক্ত হলো না। হাত-পা স্থির হয়ে রইল। হাতদুটি কোলের ওপর, আঙুল হালকাভাবে বদ্ধ। স্থির হয়ে আলগাভাবে তিনি বসে রইলেন। মুখ একটু ওপরদিকে তোলা এবং শান্ত ভাব বর্তমান। চোখ প্রায় (সম্পূর্ণভাবে নয়) বদ্ধ, চোখের তারাগুলি কোনদিকে তাকিয়ে নেই, স্থির দৃষ্টি, মস্তিষ্কে কোন সংবাদ পাঠাচ্ছে বলে মনে হলো না। ঠোঁটদুটি ঈষৎ ফাঁক, মুখে অবর্ণনীয় স্বর্গীয় হাসি, যার জন্য তাঁর ধবধবে সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে। অদ্ভুত ঐ হাসিতে এমন কিছু প্রকাশ পাচ্ছে, যা ফটো কোনকালেই প্রকাশ করতে পারে না। [ক্রমশ]

সঙ্কলন ও অনুবাদ ❑ জলধিকুমার সরকার

সম্পাদনা ❑ স্বামী সর্বগানন্দ

অপ্রকাশিত পত্র

স্বামী শিবানন্দের চারখানি পত্র



শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবীকে লিখিত

।।১।।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়, হাওড়া
২৭শে পৌষ (১৩ জানুয়ারি ১৯২৭)

মা ইন্দুবালা,

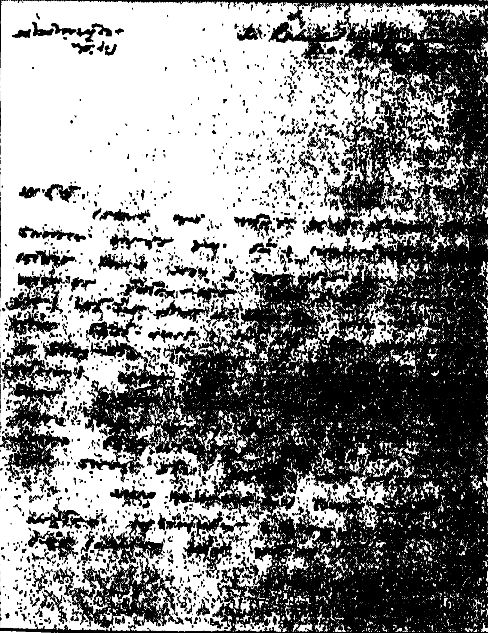
তোমার পত্র পাইলাম। উত্তরে অধিক লিখিবার কিছুই নাই। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতরে ভগবানকে ডাকিতে কখনই ভুলিবে না। নিত্য পদার্থই তিনি—আর সবই নশ্বর। সুতরাং তাঁর কৃপায় তাঁকে না ভুল হয়—এইটি মনে রাখিবে। এবং আত্মীয়-স্বজন সকলকেই এই কথা বলিবে।

আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি ও তোমরা সকলে জানিবে। ইতি।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

।।২।।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্



Sri Ramakrishna Math
P.O. Belur Math
8.8.(19)27

মা ইন্দু,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। জগতে ভগবানকে কয়জন চায় বল! যেখানেই যাইবে সেইখানেই দেখিবে সকলে অহং ও মমত্ব লইয়া ব্যস্ত। তিনিই যাদের মন ফিরিয়া দেন তাঁরাই ভগবানকে চায়। সবই তাঁর লীলা—কখন কাকে কি ভাবে রাখেন তিনিই জানেন। সেইজন্য তিনি তোমাদের যে ভগবৎ ভক্তি দিয়াছেন ইহা খুব ভাগ্যের কথা জানিবে। তোমরা খুব তাঁকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ডাকিবে, প্রার্থনা করিবে—যেন প্রভু আর তোমায় কখনও বিস্মরণ না হই। অপর যাহারা জগতে আছেন, তাদেরও তিনি দেখিতেছেন, তাঁর ইচ্ছা এবং সময় হইলে ভগবৎ ভক্তি তাহারাও লাভ করিবে।

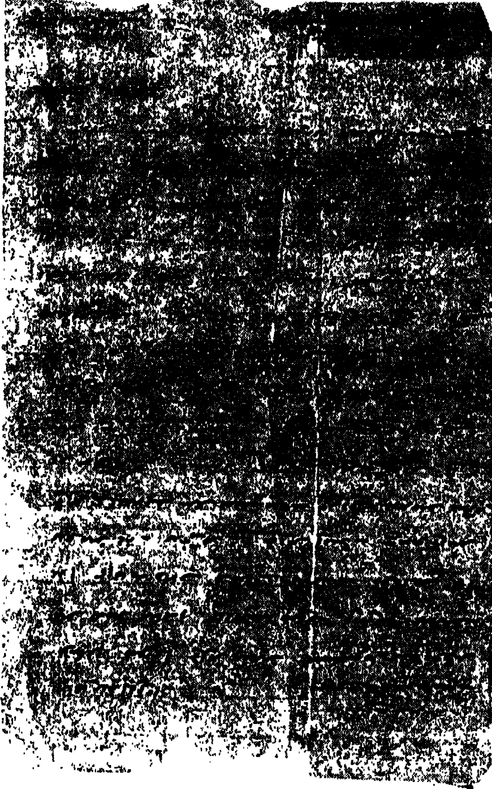
আমার শরীর মন্দ নয়। তোমরা আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ঠাকুর তোমাদের মঙ্গল করুন। ইতি।

তোমাদের শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

শ্রীপঞ্চানন রায় (প্রামাণিক)-কে লিখিত

।।৩।।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্



Sri Ramakrishna Math
P.O. Belur Math
14.4.(19)28

শ্রীমান পঞ্চানন,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। তোমার দীক্ষাদি ঠিকই হইয়াছে। কুচিন্তা ও কুপ্রবৃত্তি ওসব শরীর ও মনের—তুমি ওসব চিন্তা কেন কর? ঠাকুরের নাম স্মরণ-মনন ও তাঁর চিন্তা যেমন করে যাচ্ছ করো। শরীর-মনের অপবিত্রতায় কি তাঁর নাম কলুষিত হয়? এসব বুদ্ধি কে তোমায় দিল? তুমি ওসব কমাইবার চেষ্টা না করিয়া ভগবানের নাম যত করিতে পার—করিয়া যাও। শরীরের যা ধর্ম্ম সে তা করুক—তোমায় ওজন্য ভাবিতে হইবে (না)। তুমি ভগবানের নাম করে যাও—তাতে কমবার কমুক, বাড়বার হয় বাড়ুক। তুমি কিন্তু তাঁকে ভুলো না। এইরূপ ভাবে চলতে পারলে দেখবে ওসব চলে যাবে। প্রার্থনা করি ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন। তুমি আমার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি।

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

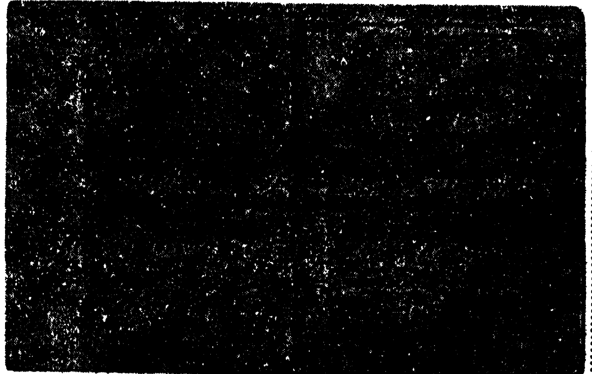
।।৪।।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Sri Ramakrishna Math
P.O. Belur Math
28.1.(19)29

শ্রীমান পঞ্চানন,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। বিশ্বাস, ভক্তি, নিষ্ঠা ও ধৈর্য্যর অভাবেই তোমাদের মনে নানাবিধ সন্দেহ উঠে এবং নিজেরা কষ্ট পাও। এর উপায় তোমার নিজের হাতেই আছে। না কর তো আর কি করব! ভগবানের প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস লাভ কি এতই সোজা—যদি কোন জিনিষ কষ্টসাধ্য থাকে তাহা উহাই। কষ্ট করে, ধৈর্য্য ধরে শরৎ মহারাজ যাহা বলে গেছেন তাহা দিনকতক করে দেখ দিকি কিছু হয় কিনা। কিছু করব না অথচ পেঁন পেঁন করব। একে কি ভক্তি বলে? ভক্তি থাকে কোমর বেঁধে লেগে যাও, নিশ্চয়ই বস্তুলাভ হইবে। প্রার্থনা করি ঠাকুরের কৃপায় তোমার ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, বিশ্বাস লাভ হউক। আমার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি।



শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

পাতঞ্জল-যোগসূত্র

ব্যাখ্যাতা ঃ স্বামী প্রেমেশানন্দ

অনুলিখন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ
সম্পাদনা ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

কর্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্।।৭।।

কর্ম সাধারণত তিন প্রকার—শুভ, অশুভ ও মিশ্র। কিন্তু যোগীদের ক্ষেত্রে নয়।

মন্তব্য ঃ যেকোন কর্ম করিলে তাহার সঙ্গে শুভ ও অশুভ উভয়ই জড়িত থাকে। গীতায় বলা হইয়াছে ঃ "সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।"[৫] কিন্তু চিত্তের বৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া তাহাকে ঈশ্বরচিন্তায় নিযুক্ত রাখিলে যোগীর মনে কোন বাসনা না থাকায় তাঁহার কর্মের সহিত পাপপুণ্যের কোন সংস্রব থাকে না।

ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্।।৮।।

এই তিন প্রকার কর্ম হইতে কেবল সেই বাসনাগুলিই প্রকাশিত হয়, যেগুলি সেইসময় প্রকাশিত হওয়ার উপযুক্ত। (অপর বাসনাগুলি সেই সময়ে স্তিমিত অবস্থায় থাকে)

জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্যং স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ।।৯।।

স্মৃতি ও সংস্কার একরূপ বলিয়া জাতি, দেশ ও কালের ব্যবধান থাকিলেও বাসনা অনন্ত কালব্যাপী থাকে।

তাসামনাদিত্বঞ্চাশিষো নিত্যত্বাৎ।।১০।।

সুখের বাসনা নিত্য বলিয়া বাসনা অনাদি।

মন্তব্য ঃ জীব পূর্বসংস্কারবশে কর্ম করে এবং ঐ কর্ম আবার সংস্কাররূপে নিজের চিত্তে সঞ্চিত হয়, ঠিক 'ব্যুমেরাং'-এর মতো। তবে এই কর্ম কবে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা কেউই বলিতে পারে না, কেবল চক্রের মতো উহাতে আমাদের জীবন অনন্তকাল ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে একদিন ঐ ঘূর্ণি হইতে কোনক্রমে বাহির হইয়া পড়িলে চিরশান্তি লাভ হয়। তাহা হইলে কর্মের আদি নাই, কিন্তু অন্ত আছে—এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়।

যাঁহারা পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন তাঁহারা বলেন, এই জগৎ স্বপ্নবৎ। স্বপ্নের সময় আমরা কত জীবজন্তু, গাছপালা, ঘরবাড়ি ইত্যাদি দেখি এবং বহুপ্রকার ঘটনা যেন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু জাগিয়া উঠিলে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারি, ঐসকল বস্তু কিছুই ছিল না এবং কোন ঘটনাও ঘটে নাই। ইহা এক অত্যাশ্চর্য ভোজবাজি বা ভেলকিমাত্র। স্বপ্নকালে মন এইসব বস্তুর আকার ধারণ করে এবং নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি করিয়া ঐসব ঘটনার অভিনয় করে মাত্র। স্বপ্নজগতে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার—এই চারিজন বাজি দেখায়। প্রকৃতপক্ষে সূক্ষ্মদেহই এইসব দৃশ্যরূপে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। ঠিক রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের ন্যায় ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। স্বপ্নকালে যে-ব্যক্তিকে দেখিলাম, সে তো কোন পিতার ঔরসে মাতার গর্ভে কোন দেশে বা কোন কালে জন্মগ্রহণ করে নাই।

এই জীবননিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে, মায়ার আবরণ দূর হইলে যোগী বুঝিতে পারেন, তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন বা অনুভব করিয়াছিলেন তাহা সবই স্বপ্নবৎ মিথ্যা।

কোন জীবই মরিতে চায় না, চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে চায়। তাই এক দেহ নাশ হইতে না হইতে সে আরেক দেহ ধারণ করে। ঘটনাচক্রে বা কর্মফলে তাহার যে-স্থানে যে-কালে যে-সমাবেশে দেহ নির্মিত হয়, ঠিক তদনুযায়ী বাসনার প্রকাশ হয়। এক জন্মে অনন্ত জন্মের সঞ্চিত বাসনা ভোগ হওয়া সম্ভব নয়। তাই এক-একটি অবস্থায় যেসব ভোগের সম্ভাবনা, সেইসব ভোগমাত্রই হইয়া থাকে। কোন পুরুষ যদি কর্মবশে নারীদেহে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার মনে নারীজনোচিত ভোগবাসনা উঠিবে, পুরুষদেহে যেসব বাসনা থাকে তাহা উঠিবে না। এইরূপে অনন্ত প্রকার দেহধারণে পূর্বসঞ্চিত কর্মের কিয়দংশ মাত্র ভোগ হয়, বাকি সব সঞ্চিত থাকিয়া বারংবার জন্মের কারণ হয়। শতজন্ম পূর্বে কোন একটা কাজ করার ফলে একটা সংস্কার চিত্তে সঞ্চিত হইয়াছিল, পূর্বের জন্মসমূহে অবস্থা অনুকূল না থাকায় সেই বাসনা চিত্তে উঠিবার সুযোগ পায় নাই। শতজন্ম পরে সুযোগ পাইয়া কোথা হইতে আশ্চর্যরূপে সেই বাসনা মনে উদিত হইল। কর্ম ও জন্মান্তর রহস্য জানিতে পারিলে জীবনের উন্নতিপথের অনেক বিঘ্নই দূর করা যায়।

হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে তদভাবঃ।।১১।।

বাসনাগুলি হেতু, ফল, আধার ও বিষয়—এইগুলির সঙ্গে সংযুক্ত, ইহাদের অভাব হইলে বাসনাও নষ্ট হয়।

মন্তব্য ঃ সৃষ্টিতে একগাছি তৃণ হইতে মনুষ্য পর্যন্ত অনন্ত প্রকারের জীবনলীলা চলিতেছে। প্রত্যেক জীবের জীবনে জীবনরক্ষা ও বিষয়ভোগ—এই দুই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতি জীব অবিরাম কী দারুণ উদ্যম করিয়া থাকে তাহা

৫ অর্থাৎ অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনি সকল কর্মই ত্রিগুণাত্মক বলিয়া দোষযুক্ত হয়। (গীতা, ১৮।৪৮)—সম্পাদক

ভাবিলে ভয় উপস্থিত হয়। আমাদের দেহের মধ্যে কী যে অপার সংগ্রাম দিবানিশি চলিতেছে, একটু লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝা যায়। দুঃখনিবৃত্তির কী বিরাট আয়োজন চলিয়াছে, ইহার উদ্দেশ্যই বা কি, কোথা হইতে ইহার উদ্ভব এবং ইহার পরিণাম কি হইবে তাহা কেউই জানে না।

কিন্তু এই ব্যাপারটি অদ্ভুত, ঠিক সেই 'কৌপীন কা ওয়াস্তে' গল্পের মতো। এই দুঃখের হাত হইতে নিবৃত্তিলাভের চেষ্টা করিবার কৌশল কাহারো জানা নাই।কোনপ্রকারে অল্পস্বল্প জানিবার চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হওয়া যায় না। তাই ভগবান বলিয়াছেনঃ "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।"[৬] ইহাদের মধ্যে দুই-একজন সিদ্ধিলাভ করিলেও সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিতে পারে এমন লোক খুবই দুর্লভ।[৭]

যোগশাস্ত্র বলিতেছেন, এই জীবনের সমস্ত কর্মই ঠিক একটি যন্ত্রের ক্রিয়ার ন্যায়। এই যন্ত্রটি সম্মুখ হইতে সরাইয়া না রাখিলে তাহার ক্রিয়া অনুভব হইবেই এবং তাহার প্রতিক্রিয়াও নিবারণ করা সম্ভব নয়। তাই যোগসাধনার প্রণালী অনুসারে চিত্তকে নিরুদ্ধ করিয়া ক্রমে ক্রমে এই 'কাঁচা আমি'টিকে দূর করিয়া দিলেই সব ঝঞ্ঝাট মিটিয়া যাইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেনঃ "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।" শ্রীকৃষ্ণ বলিতেনঃ "সর্বং কর্মাখিলং পার্থং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।"[৮] অর্থাৎ নিজের স্বরূপ জানিলে আর কোন কষ্টই থাকে না।

অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্মাণাম্।।১২।।

বস্তুর ধর্মসকল বিভিন্ন রূপ ধারণ করে বলিয়া তাহাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ তাহাদের স্বরূপে অপ্রকাশিতরূপে থাকে।

তে ব্যক্তসূক্ষ্মা গুণাত্মানঃ।।১৩।।

এইসকল ধর্ম কখনো ব্যক্ত, কখনো বা সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে এবং গুণই ইহাদের স্বরূপ।

পরিণামৈকত্বাদ্বস্তুতত্ত্বম্।।১৪।।

পরিণামের মধ্যে একত্ব দেখা যায় বলিয়া বস্তু প্রকৃতপক্ষে একই।

মন্তব্যঃ আমরা কালকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া দেখি। কালের গতিতে প্রকৃতির যে পরিবর্তন হয় তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়া 'কোন জিনিস এখন নাই', আবার 'কোন জিনিস ভবিষ্যতে হইবে'—এইরূপ মনে করি। কিন্তু "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।"—যাহা আছে, তাহা নাই হইবে কিরূপে; এবং যাহা নাই, তাহার সত্তা আসিবে কোথা হইতে? তাই জ্ঞানীরা বুঝিতে পারেন, কোন বস্তু আমাদের সম্মুখে না থাকিলেও তাহা কারণের মধ্যে রহিয়াছে; আর যাহা হইবে তাহাও যাহা আছে, তাহা হইতেই উপস্থিত হইবে। কোন বস্তু ব্যক্ত হইলেই আমরা তাহাকে বর্তমানে অবস্থিত দেখি এবং অব্যক্ত হইলে ভাবি তাহা নাই। কালের পরিবর্তনে বস্তুর যে-পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি, তাহা ভ্রম। জ্ঞানীদের এই ভ্রম হয় না। কারণ, 'সৎ' বস্তু ও 'অসৎ' বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন।[৯] মূলত এক ছাড়া দুই নাই। এক ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি নানাপ্রকারে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হইয়া থাকে মাত্র।

বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাত্তয়োর্বিভক্তঃ পন্থাঃ।।১৫।।

বস্তু এক হইলেও চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া অনুভূতি বিভিন্ন প্রকার হয়। একই বস্তু সম্পর্কে অনুভূতি ও বাসনা বিভিন্ন হয় বলিয়া মন ও বিষয় ভিন্ন প্রকৃতির।

তদুপরাগাপেক্ষিত্বাচ্চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্।।১৬।।

চিত্তে বস্তুর প্রতিবিম্বিত হওয়ার অপেক্ষা থাকায় বস্তু কখনো জ্ঞাত, কখনো বা অজ্ঞাত থাকে।

সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাঽপরিণামিত্বাৎ।।১৭।।

চিত্তবৃত্তিগুলিকে সর্বদা জানা যায়, কারণ উহাদের জ্ঞাতা পুরুষ অপরিণামী।

ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ।।১৮।।

মন দৃশ্য পদার্থ বলিয়া স্বপ্রকাশ নয়।

একসময়ে চোভয়ানবধারণম্।।১৯।।

একই সময়ে দুইটি বস্তুকে বুঝিতে পারে না বলিয়া মন স্বপ্রকাশ নয়।

মন্তব্যঃ বস্তু এক হইলেও জীবের চিত্তে সর্বদা তাহা প্রকাশিত হয় না, সেইজন্য মানুষে মানুষে জ্ঞানের এত প্রভেদ। তাহা হইলে কি যাহা কোন মানুষই জানে না তাহা নাই? তাহা নয়। জানাজানিটা চিত্তের সঙ্গে সম্পর্কিত হইয়া হয়।

এই জগতের প্রভু চিৎ বা চৈতন্য অনন্তকাল ধরিয়া স্থির হইয়া প্রকৃতির দিকে চাহিয়া আছেন। সুতরাং প্রকৃতির সকল ব্যাপারই তিনি সর্বদা জানিতে পারেন। আমাদের মন-বুদ্ধি চিৎ বা পুরুষের দৃশ্য। কারণ, আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যখন কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করি তখন তাহা বুঝিতে পারি, কিন্তু মন-বুদ্ধি যখন প্রত্যক্ষ করে তখন সে সেই বস্তুর সহিত এক হইয়া যায়। সে যে ইহা দেখিতেছে, তাহা বুঝিতে পারে না। তাই পুরুষ দ্রষ্টা, বাকি সবকিছু দৃশ্য মাত্র। [ক্রমশ] (পনের)

---

৬ সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে এক-আধজন আত্মজ্ঞানলাভের প্রয়াস করেন। (গীতা, ৭।৩)—সম্পাদক

৭ বস্তুত, ঠিক এই কথাটি পূর্বে উদ্ধৃত গীতার শ্লোকের শেষার্ধে ভগবান অর্জুনকে বলিয়াছিলেনঃ "যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।" (৭।৩)—সম্পাদক

৮ সমস্ত কর্ম অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ এবং সমস্ত শ্রৌত ও স্মার্ত যজ্ঞোপাসনাদি ব্রহ্মজ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। (ঐ, ৪।৩৩)—সম্পাদক

৯ গীতায় এই কথাগুলিই ভগবান "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" ইত্যাদি শ্লোকে (২।১৬) বলিয়াছেন।—সম্পাদক



আষাঢ় ১৩০৯
জুন ১৯০২

আসল ও নকল
(স্বামী শুদ্ধানন্দ)

সব জিনিষেরই আসল ও নকল আছে। গয়লা দুধে জল দেয়—ঘিওয়ালা ঘিয়ে চর্ব্বি মিশায়—মিঠাইওয়ালা পূর্ব্বদিনের অবিক্রীত বস্তুগুলি দ্বারা নূতন করিয়া খাবার তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করে। সেইরূপ নকল মানুষ আছে, নকল সাধু আছে, নকল বৈরাগ্য আছে, নকল জ্ঞান আছে, নকল যোগসিদ্ধি আছে, নকল ভক্তি আছে, নকল দেশহিতৈষিতা আছে। ফলকথা, সব জিনিষেরই নকল আছে।

একদল লোক আছেন, তাঁরা সংসারে নকল দেখিয়া দেখিয়া ব্যথিত হইয়া বিরক্ত হইয়া ভীত হইয়া নিরাশ হইয়া গেছেন। তাঁদের এমন হইয়াছে যে, সত্য কিছু দেখিলেও ভান বোধ হয়। তাঁরা সহজে সত্য বলিয়া কিছু নিতে চান না। এমনকি, অনেকের এমন পর্য্যন্ত যেন ধারণা হইয়া যায় যে, সত্য বুঝি বাস্তবিকই কিছু নাই।

এ শ্রেণীর লোককে আমরা দোষ দিতে পারি না। তাঁহারা নিজে ভুগিয়া ভুগিয়া ঠেকিয়া ঠেকিয়া এইরূপ শিখিয়াছেন। তাই সদাই ভয়, সদাই আতঙ্ক। দেখিলেন, আজ একটী বিশ্বাস করিলেন—কাল সেই বিশ্বাসে এমন আঘাত লাগিল যে, এইরূপ সকল অবলম্বনই তাঁহাদের ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া এখন তাঁহারা যেন নিরবলম্ব হইয়া বসিয়া আছেন।

'যেন' বলিবার মানে আছে। বাস্তবিক নিরবলম্ব থাকিবার যো নাই। নকল কথাটী দ্বারাই আসলের অস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে। যাহার আসল নাই, তাহার নকল হইবে কিরূপে? তুমি আসল জিনিষ খুঁজিয়া পাও নাই—একথা সত্য হইতে পারে; তাই বলিয়া উহার অস্তিত্বের অপলাপ করিও না—আসল নাই বলিয়া লোককে আসলের অন্বেষণে বিরত হইতে উপদেশ দিও না। আসল জিনিষ অতিশয় আয়াসলভ্য—কঠোর সাধনলভ্য। কোথায় তোমার সেই আয়াস? কোথায় তোমার সেই সাধন?

নকলকে ক্রমাগত গালাগাল দিয়া বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে আসল জিনিষ পাইবার চেষ্টা কর—আসল মানুষ নিজে হইবার চেষ্টা কর। এই নকলের রাজ্যে, এই মায়ার রাজ্যে অতি সুন্দর জিনিষও অতি কুৎসিৎ রূপ ধারণ করে। অদ্বৈতবাদ নাস্তিকতায়, শুষ্কতায় ও অহম্মন্যতায়, যোগসিদ্ধি বুজ-রুকিতে, ভক্তি ভণ্ডামীতে, সন্ন্যাস যথেচ্ছাচারে, ক্রিয়াকলাপ কপটাচারে, নিষ্ঠা গোঁড়ামীতে পরিণত হয়। এ হইবেই; এ কেউ বারণ করিতে পারে না। কোনরূপ আইনকানুন করিয়াই কেহ প্রকৃতির গতিরোধ করিতে পারে নাই। তাই বলিয়া সদা অতি সাবধানী হইয়া উন্নতির কেহ চেষ্টা করিবে না—উচ্চ চিন্তার রাজ্যে, উচ্চ ভাবের রাজ্যে বিচরণ করিতে প্রয়াস পাইবে না—একথা বলা বৃথা। সর্ব্বদা দুর্ব্বলতার সাজসজ্জা করিয়া বসিয়া থাকা কাপুরুষের লক্ষণ। পেট খারাপ করিবে বলিয়া চিরকাল মাছের ঝোল ভাত খাইলে পেটের পরিপাকশক্তির চির অবনতি সাধিত হয়।

উচ্চ ভাব আছে, উচ্চ লোক আছে—এ বিশ্বাস যত্নসহকারে অর্জ্জনীয়। যাহার এ বিশ্বাস নাই, তাহার কিছুই নাই; তাহার ভবসাগর পারের সম্বল মোটেই নাই। উন্নতির সম্ভাবনীয়তায় যাহার বিশ্বাস নাই, সে উন্নতি করিবে কি করিয়া?

বিজ্ঞান যেসকল নব নব আবিষ্কার করিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে, তাহার মূলে কি এই প্রবল বিশ্বাস নাই? বৈজ্ঞানিক Quack অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে দুই- একজন এমন থাকিতে পারেন, যাঁহারা আজ উপহাসাস্পদ হইলেও শতবর্ষ পরে জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া চিরপূজ্য হইবেন। এই কারণে যাঁহারা সকল বিষয়ে—আপাত অসম্ভব বিষয়ের চর্চ্চায় রত, তাঁহারা উপহাসাস্পদ না হইয়া উৎসাহের যোগ্য। সমুচিত প্রণালী সহকারে তাঁহাদের অন্বেষণকে সংযত কর, তাঁহাদের অনুসন্ধানপ্রণালী সম্বন্ধেও তোমার অভিজ্ঞতালব্ধ সৎপরামর্শ দাও, কিন্তু উড়াইয়া দিও না।

অদ্বৈতবাদী এইরূপ এক মহা অসম্ভব বিষয়ে প্রয়াসী। তিনি মানুষে ভগবানে এক করিতে চান। তাঁহার বড় আশা। কে জানে, তাঁহার এ আশা পূর্ণ হইবে কিনা? কে জানে, তাঁহার সোঽহম্ কেবল কল্পনামাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে অথবা একদিন সত্যে পরিণত হইবে। বলিতে না পারিলেও তিনি উৎসাহযোগ্য, কারণ তিনি মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষার, সকল বাসনার চরম তৃপ্তি করিতে চাহিতেছেন। তাঁহাকে তাঁহার অনুসন্ধানে সহায়তা কর, তাঁহার ভাবগুলি ধারণার চেষ্টা কর—বাধা দিও না।

যোগী যোগবলে প্রকৃতি বিজয় করিতে চান। কেন না তিনি আমাদের সম্মানাস্পদ হইবেন? তাঁহার উদ্ভাবিত সাধনপ্রণালীসকল নিজ নিজ তর্কশোধিত করিয়া অনুষ্ঠান করুক, experiment করিতে থাকুক—বংশানুক্রমে পুরুষপরম্পরায় চলুক যোগানুষ্ঠান। দেখ, তাহাতে প্রকৃতি বিজয় হউক না হউক, অন্ততঃ দেহ মনের উপর ক্রমশঃ কিছু কিছু আধিপত্য হয় কিনা।

ভক্ত ভাবে মাতুক না—দেখ না কতদূর মাতিতে পারে, কতদূর সমাধিস্থ হইতে পারে। তোমরাও ত নানা বিষয়ে মাতিয়া বিহ্বল হইতেছ; তাহার এই নিরবলম্ব নিরীহ মাতামাতিতে তুমি এত বিরক্ত কেন? দেখ, ভাবাবেশে মন কতদূর মজে।

আর সন্ন্যাসী? দাও তাহাদিগকে চেষ্টা করিতে; দেখ, তাহারা কামকাঞ্চন কতদূর জয় করিতে পারে। কামের উচ্ছেদ কতদূর সম্ভব, দেখ; তুমিও না হয় তাহার পথে একটু একটু চেষ্টা কর। সে ভোগবিলাস ত্যাগ করুক, সব জিনিষের অবলম্বন একটু একটু করিয়া ছাড়ুক। তাহাকে আরো ত্যাগ করিতে উপদেশ দাও। কোন বিষয়ে বিফল হইয়াছে বলিয়া তাহাকে নিজ ভূমিতে টানিয়া আনিবার অন্যায় চেষ্টা করিও না।

দুর্ব্বলতা দূর কর—ভরসায় বুক বাঁধ। দুর্ব্বল যে, সে কি পারে? সে যে কিছু পারে না। তাহার কি জগতে স্থান আছে? যে যোগ্যতম, সেই জগতে স্থান পাইবে। অতএব হে সাধু, আদর্শের ভান করিয়া অনেককে দেহপুষ্টি করিতে দেখিলে তুমি বিরক্ত না হইয়া এইটুকু মনে করিয়া মনকে প্রবোধ দাও—জগতে এখনও আদর্শের নামটাও আছে। ভেকটা দেখিয়া কাহারও না কাহারও আসলে রুচি ও চেষ্টা হইলে হইতে পারে। আর তুমি তোমার সাধ্যমত সেই সত্যানুসন্ধানের চেষ্টায় লোকের মন ফিরাও। ভুল দেখাইয়া লোককে ব্যতিব্যস্ত করিও না। ভুল ভ্রান্তি আছে—সকলে জানে। পেটের দায়ে অনেকে ভণ্ডামী করিয়াও থাকে। তোমার পেটের দায় না থাকে, একবার সাহসে বুক বাঁধিয়া সত্যের জ্যোতি প্রকাশ কর—দুর্ব্বল জগতে শক্তিসঞ্চার কর।

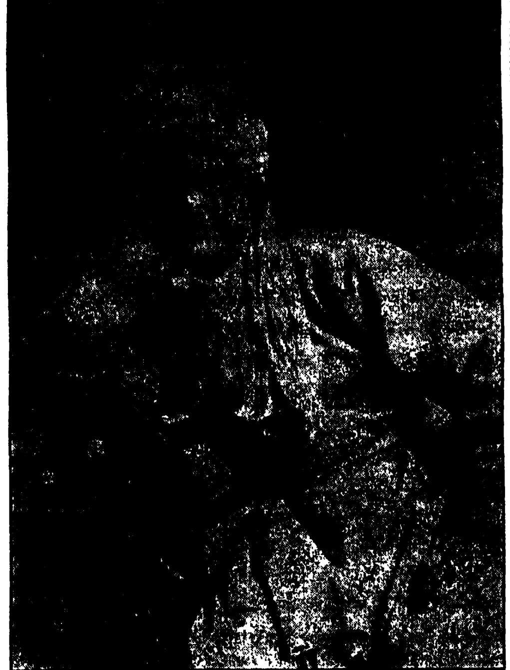
সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : স্বামী সর্বগানন্দ

স্বামীজী যখন লস এঞ্জেলেসে মিসেস ব্লজেটের অতিথি হয়েছিলেন...*

সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত

শিকাগোর ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার মাটিতে প্রথম পদার্পণ করেন ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই। তারপর বহু প্রতিকূলতার পথ অতিক্রম করে শেষপর্যন্ত ঐ মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভাষণ দান করে তিনি যে জগদ্বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন, সে-কাহিনী আজ সর্বজনবিদিত ইতিহাস। ঐ প্রাথমিক সাফল্যের পর আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের মানুষের অন্তরে আধ্যাত্মিকতার আলোক বিস্তারের জন্য তিনি তিন বছরের অধিককাল বক্তৃতা দান করে, ক্লাস নিয়ে এবং ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষাদান করে অবশেষে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতা প্রত্যাবর্তন করলেন। পাশ্চাত্য দেশে এই কঠোর পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল। তাই একদিকে হৃতস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার এবং অন্যদিকে বেদান্তধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণের মহান বার্তা সেদেশের জনমানসে আরো দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করার অভিপ্রায়ে তিনি ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুন পুনর্বার পাশ্চাত্যযাত্রা করলেন। এবারে তাঁর সঙ্গী হলেন গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা। প্রথমে তাঁরা লণ্ডনে গেলেন এবং উইম্বলডনে কিছুদিন নিবেদিতার আতিথ্যে থাকার পর ১৬ আগস্ট সেখান থেকে যাত্রা করে স্বামীজী ও তুরীয়ানন্দজী আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে পৌঁছালেন ২৮ আগস্ট। সেদিনই তাঁদের দুজনকে নিয়ে যাওয়া হলো পুরনো বন্ধু মিস্টার ফ্রান্সিস লেগেটের স্টোন রিজের 'রিজলি ম্যানর' নামে মনোরম আবাসটিতে। এই মুক্ত পরিবেশে হালকা মেজাজে ও স্বচ্ছন্দচিত্তে তিনি প্রায় আড়াই মাস কাটালেন, ফলে তাঁর স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হলো।

কিন্তু স্বামীজীর জীবনের উদ্দেশ্য তো এভাবে নিশ্চিন্ত দিনযাপন নয়, তাই বেদান্তপ্রচারের কাজটি পুনর্বার শুরু করার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। এই সময়ে (১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ৯ অক্টোবর) লেগেটদের কাছে মিসেস এস. কে. ব্লজেট নামে এক অপরিচিতা মহিলার চিঠি এল। চিঠিতে একটি দুঃসংবাদ লেখা ছিল—বেটি লেগেট ও মিস ম্যাকলাউডের ভ্রাতা টেলর ম্যাকলাউড লস এঞ্জেলেসে তাঁর গৃহে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। দুঃসাহসিকতা ছিল টেলরের মজ্জায় মজ্জায়; মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি আমেরিকার গৃহযুদ্ধে লড়াই করার জন্য বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন এবং অশেষ বিপদসঙ্কুল জীবনযাপন করে একবার কিছুদিনের জন্য বাড়ি ফিরেছিলেন, তারপরই আবার ভাই ডোনাল্ডকে নিয়ে পশ্চিমপ্রান্তে আরিজোনার উদ্দেশে যাত্রা করেন। সেখানে ডোনাল্ড অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীর গুলিতে নিহত হন এবং টেলর হত্যাকারীর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বহু বছর সন্ধান চালিয়েও বিফল হন। প্রায় দশবছর এই ভ্রাতার কোন খোঁজ জোসেফিনরা পাননি, তাই সংবাদ পাওয়ার দুঘণ্টার মধ্যেই মিস ম্যাকলাউড লস এঞ্জেলেসের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তাঁর যাওয়ার মুহূর্তে স্বামীজী হাত তুলে সংস্কৃত ভাষায় আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন এবং জোর দিয়ে বললেন: "কিছু ক্লাসের আয়োজন করো, আমিও সেখানে যাব।"



মিস ম্যাকলাউড লস এঞ্জেলেস শহরের প্রান্তদেশে অবস্থিত গোলাপগাছে ঘেরা একটি শ্বেতশুভ্র কুটিরে গিয়ে উঠলেন এবং প্রথমেই অগ্রজ টেলরের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি দেখলেন, টেলর সত্যিই খুব অসুস্থ—

* স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা।

বাঁচার আশা নেই বললেই চলে। তিনি প্রায় একঘণ্টা দাদার পাশে কাটালেন নানা কথা বলে। তখনি তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, তাঁর মাথার ওপরদিকে স্বামীজীর একখানি প্রমাণ আকারের আলোকচিত্র টাঙানো আছে। এরপর তিনি গৃহকর্ত্রী মিসেস ব্লজেটের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন এবং কিছু না জানার ভান করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "আমার দাদার শয্যার ওপরে যে-প্রতিকৃতিটি দেখলাম, সেটি কার?" প্রশ্ন শুনে সত্তর বছরের বৃদ্ধা সশ্রদ্ধচিত্তে বললেনঃ "এই পৃথিবীতে যদি কোনকালে ঈশ্বর আবির্ভূত হয়ে থাকেন, তবে এই মানুষটিই তিনি।" মিস ম্যাকলাউড পুনরায় প্রশ্ন করলেনঃ "এঁর সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন?" বৃদ্ধা বলতে লাগলেনঃ "১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে আমি শিকাগোর ধর্মমহাসভায় উপস্থিত ছিলাম। আমি দেখেছিলাম, যখন এই যুবাপুরুষটি দাঁড়িয়ে উঠে শ্রোতৃবৃন্দকে সম্বোধন করে বললেন—'আমেরিকাবাসী আমার ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ', তখন সাতহাজার মানুষ একযোগে দাঁড়িয়ে উঠল এমন কিছুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে, যার সঠিক কারণ তাদের নিজেদেরও তখন জানা ছিল না। অবশেষে যখন বক্তা তাঁর ভাষণ শেষ করলেন তখন আমি দেখলাম, মহিলারা ঝাঁকে ঝাঁকে বেঞ্চের ওপর দিয়ে দ্রুতপদে চলেছে তাঁর কাছে পৌঁছাবার আগ্রহে। তখন আমি আপন মনে বললাম, 'বাছা আমার, মানুষের এ হেন ভাবাবেগের জোয়ারকে যদি তুমি প্রতিহত করতে পার, তবে বুঝব তুমি বাস্তবিকই ঈশ্বর।' " স্বামীজীর ঐ বৃহৎ রঙিন চিত্রটি মিসেস ব্লজেট শিকাগোতে থাকাকালে সংগ্রহ করেছিলেন এবং পরে সেটিকে লস এঞ্জেলেসের স্বগৃহে যত্ন সহকারে টাঙিয়ে রেখেছিলেন। তখন তিনি কল্পনাও করতে পারেননি যে, এই মহান মানুষটি একদিন তাঁরই গৃহে অতিথি হতে পারেন। এই কথোপকথনকালেই মিস ম্যাকলাউড মিসেস ব্লজেটকে জানান, তিনি স্বামীজীকে চেনেন এবং তিনি এখন প্রায় দুশো লোকের বাসস্থান ক্যাটস্কিল পর্বতের অন্তর্গত স্টোন রিজে তাঁদের গৃহে অবস্থান করছেন। তিনি আরো জানালেন, আমন্ত্রণ জানালে তিনি মিসেস ব্লজেটের গৃহে আসবেন এবং লস এঞ্জেলেসে ক্লাস নেবেন।

ব্লজেটের গৃহে ম্যাকলাউডের আগমনের তিন সপ্তাহের মধ্যে টেলর ম্যাকলাউড মারা গেলেন এবং তার কিছুদিন পর ৩ ডিসেম্বর অপরাহ্নে স্বামীজী ট্রেনযোগে লস এঞ্জেলেসে উপস্থিত হলেন। ম্যাকলাউড সেখানে সানন্দে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং প্রথমে মিসেস স্পেন্সার নামে স্বামীজীর এক গুণগ্রাহী মহিলার গৃহে নিয়ে এলেন। সেখানে থেকে স্বামীজী জনসমক্ষে একটি বক্তৃতা দান করেছিলেন এবং মাত্র একসপ্তাহ পরেই মিসেস ব্লজেটের ৯২১, ওয়েস্ট টোয়েন্টি ফার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িতে এলেন তাঁর অতিথিরূপে বাস করতে।

মিসেস ব্লজেটের কুটিরটিতে ছিল তিনটি শয়নঘর, একটি রান্নাঘর, একটি খাওয়ার ঘর এবং একটি বৈঠকখানাঘর। এই গৃহে বাসকালে মিসেস ব্লজেট স্বামীজীকে স্নেহময়ী জননীর মতো সেবাযত্ন করেছেন। মেরি হেলের কাছে স্বামীজী এই মহিলা সম্বন্ধে বলেছিলেনঃ "ইনি স্থূলকায়া, বর্ষীয়সী, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, সুরসিকা এবং খুবই মাতৃস্নেহপরায়ণা।" এই গৃহে স্বামীজীর জীবন ছিল আড়ম্বরহীন, উদ্বেগশূন্য এবং পরম শান্তিতে পরিকীর্ণ—যে-শান্তি তিনি নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। প্রায় ঐসময়ে মিস ম্যাকলাউড মেরি হেলকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেনঃ "অনন্ত লোকের কী প্রাণ-মাতানো নিঃশ্বাসবায়ু তিনি (স্বামীজী) সর্বদা নিজের সঙ্গে নিয়ে আসেন!"

জনসমক্ষে প্রদত্ত স্বামীজীর বক্তৃতাগুলি শুনতে মিসেস ব্লজেট বিশেষ যেতেন না। তিনি যখন ভাষণ দিতে যেতেন তখন এই স্নেহময়ী মহিলা নানা গৃহস্থালি কাজকর্ম করতেন, বিশেষত গৃহে ফিরে স্বামীজী আহার করবেন বলে নানারকম সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করে রাখতেন। স্বামীজীর প্রয়াণের পর ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে মিসেস ব্লজেট তাঁর সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে মিস ম্যাকলাউডকে একটি দীর্ঘ ও সুন্দর পত্র লিখেছিলেন। এটি প্রথমে 'বেদান্ত অ্যাণ্ড দ্য ওয়েস্ট' পত্রিকায়, তারপর 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় এবং শেষে 'রেমিনিসেন্সেস অফ স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। এটি থেকেই মিসেস ব্লজেটের গৃহে স্বামীজীর অবস্থানের এক অপরূপ আলেখ্য আমরা পাই, যা তাঁর জীবনচরিতের একাংশেরও মূল্যবান উপাদান। ঐসময়ের কথা আলোচনা করতে হলে আমাদের এই পত্রখানির সাহায্য অবশ্যই নিতে হবে। মিসেস ব্লজেটের এই স্মৃতিকথাটির অংশবিশেষের অনুবাদ উদ্ধৃত করা যাকঃ "আমি সর্বদাই স্মরণ করি সেই দ্রুত অপসৃয়মাণ ও অবিস্মরণীয় শীতের উজ্জ্বল দিনগুলির কথা, যখন আমরা যাপন করেছি নিছক এক মুক্ত ও আনন্দময় পরিবেশে। তখন আমাদের আনন্দিত ও উৎকৃষ্ট থাকা ভিন্ন অন্য কোন বিকল্প ছিল না।... আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জেনেছিলাম—যদিও অল্পকালের জন্য, তথাপি ঐকালে আমি স্বামীজীর শিশুসুলভ প্রকৃতির দিকটি শতবিধরূপে দেখতে পেয়েছি, যা সকল কল্যাণময়ী নারীর মাতৃত্বের অনুভূতির কাছে নিয়ত আবেদন করবে। কাছের মানুষদের ওপর তিনি এমনভাবে নির্ভর করতেন, যা

তাঁকে তাঁদের হৃদয়ের একান্ত নিকটে টেনে আনত। আমার ধারণা, মিড ভগিনীগণও স্বামীজীর এই দিকটি লক্ষ্য করেছেন।

"তিনি এই পৃথিবীর আয়ুষ্কালের মতো প্রাচীন যাবতীয় বিষয়সমূহের অনিঃশেষ জ্ঞানের অধিকারী এবং একজন ঋষি ও দার্শনিক হলেও আমার মনে হয়েছে যে, তাঁর সেই ব্যবসায়িক বুদ্ধির একান্তই অভাব ছিল, যা পশ্চিমী দুনিয়ার মানুষদের এক স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত করেছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রাত্যহিক ঘরোয়া ব্যাপারে আপনি তাঁকে আপাতদৃষ্টিতে সামান্য সেবা করে যাচ্ছিলেন, কোন কোন তুচ্ছ বিষয়ে তাঁকে কখনো কখনো শুধরে দিতে হতো। যখন আমরা মাতৃভাব নিয়ে সামান্য সেবাযত্ন করি, তা যতই অকিঞ্চিৎকর হোক না কেন, তার ফলস্বরূপ আমাদের ভালবাসার পাত্রের চারপাশে সৃষ্টি হয় এক অসীম কোমলতার বাতাবরণ; তারপর কোন এক বিষাদময় দিবসে আমরা সেই স্বর্গীয় ভালবাসাপূর্ণ সেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হই এবং পড়ে থাকি 'র‍্যাচেলে'র মতো—যিনি তাঁর সন্তানগণের জন্য শোক করে চলেছেন, কারণ তারা নেই। অতএব আমি জানি যে, একজন আনন্দময় ও অসাধারণ সঙ্গীকে হারানোর বেদনার কথা বাদ দিলে একথা সত্য যে, তাঁর প্রতি আপনার অকুণ্ঠ সেবা তাঁকে আপনার খুব কাছে নিয়ে এসেছিল।"

স্বামীজী মিসেস ব্লজেটের গৃহে কিছুদিন রঙ্গরস ও বুদ্ধিদীপ্ত আলাপ-আলোচনার মধ্যে কাটিয়ে অনেকটাই সুস্থবোধ করেছিলেন। মিসেস ব্লজেট তাঁর স্মৃতিকথায় দু-একটি মজার কথারও উল্লেখ করেছেন। একবার স্বামীজী তাঁকে বেশ যত্ন করে দেখাচ্ছিলেন কী কৌশলে তিনি মাথার চারপাশে পাগড়িটা বাঁধেন, আর অন্যদিকে তখন তাঁর একটি বক্তৃতাসভায় হাজির হওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে বলে মিস ম্যাকলাউড তাঁকে তাড়াতাড়ি করার জন্য তাগাদা দিচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময়ে মিসেস ব্লজেট স্বামীজীকে তাড়াহুড়ো না করার জন্য একটি মজার গল্প বলেন। গল্পটা হলো এইরকম—এক আসামীকে ফাঁসিতে ঝোলাবার জন্য রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল; তখন ঐ ফাঁসির দৃশ্য তাড়াহুড়ো করে দেখতে যাওয়ার জন্য পথে জনতার ঠেলাঠেলি পড়ে গিয়েছে। তাই দেখে অভিযুক্ত ব্যক্তি চেঁচিয়ে তাদের বলল ঃ "মশাইরা, তাড়াহুড়ো করার কোন দরকার নেই, কারণ আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না ফাঁসিমঞ্চে পৌঁছাচ্ছি, ততক্ষণ সেখানে কোন মজার ব্যাপার থাকবে না।" গল্পটি বলে মিসেস ব্লজেট বললেন ঃ "স্বামীজী, আমিও আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, আপনি যতক্ষণ না বক্তৃতামঞ্চে পৌঁছাচ্ছেন, ততক্ষণ সেখানে কোন মজার ব্যাপার ঘটবে না।" কথাগুলি শুনে স্বামীজী বালকের মতো খুব হাসলেন এবং পরে যখনি মিস ম্যাকলাউড তাঁকে সভায় সময়মতো উপস্থিত হওয়ার জন্য তাগাদা দিতেন, তখনি তিনি দুষ্টুমির হাসি হেসে বলতেন ঃ "তাড়াহুড়ো কেন, যতক্ষণ না আমি সেখানে যাচ্ছি, ততক্ষণ সেখানে আকর্ষণীয় কিছুই থাকবে না।"

স্বামীজীর বালকভাবের অন্যরকম চিত্রও আমরা পাই মিসেস ব্লজেটের স্মৃতিচারণায়। একদিন স্বামীজী দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করেছেন এবং তারপরেই মুগ্ধ শ্রোতারা তাঁর কথা আরো শোনার জন্য চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে ফেলেছে; তিনি তখন কোনরকমে তাদের ঘেরাও থেকে বেরিয়ে বাড়িতে পালিয়ে এসে স্কুল থেকে ছাড়া পাওয়া একটি বালকের মতো রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে বলেন ঃ "এবার আমরা রান্না করব।" দিব্যশক্তিসম্পন্ন ও মহাজ্ঞানী আচার্যের ভাবটি তখন তাঁর মধ্যে থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে এবং আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর শিশুসুলভ সারল্যের রূপটি। আবার সেসময় সদাপ্রহরারতা ম্যাকলাউড রান্নাঘরে এসে তাঁকে বক্তৃতার পরিপাটি পোশাকে বাসনকোসনের মধ্যে আবিষ্কার করে মৃদু ভর্ৎসনা করে বাড়ির পোশাক পরে নিতে বলেন।

মিসেস ব্লজেটের স্মৃতিচারণে আরেকটি ভিন্নরকমের চিত্র পাওয়া যায়। একদিন সকালে মিসেস ব্লজেটের গৃহে বেশ কয়েকজন শ্রোতা এসেছেন মহাজ্ঞানী এই সন্ন্যাসীর মুখ থেকে কিছু অমৃতকথা শুনবেন বলে। কিন্তু স্বামীজী তখন চোখ নামিয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছেন, তাঁর মুখের ভাব সাধারণের বোধাতীত। এদিকে শ্রোতৃবৃন্দ ব্যাকুলচিত্তে অপেক্ষা করছে। তারপর একসময় তাঁর ধ্যানমৌন ভাবের অবসান হলে তিনি মিসেস লেগেটের দিকে তাকিয়ে এক সরল শিশুর মতো প্রশ্ন করলেন ঃ "আমি কী নিয়ে বলব?" সকলে অবাক হলেন এই ভেবে যে, অশেষ গুণসম্পন্ন এই মানুষটি—যাঁর মধ্যে রয়েছে শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করার এক ঐশী ক্ষমতা—তিনিই কিনা অন্যদের কাছ থেকে তাঁর বক্তব্যবিষয় জানতে চাইছেন!

ঐ গৃহে বাসকালে স্বামীজী খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে নেওয়ার জন্য স্নানঘরে ঢুকে যেতেন। তারপরই শোনা যেত তাঁর গভীর ভরাট কণ্ঠে সংস্কৃত ভাষায় মধুর মন্ত্রোচ্চারণ। সংস্কৃত ভাষা মিসেস ব্লজেটের জানা না থাকলেও, তিনি লিখেছেন, স্তোত্রসমূহের অন্তর্নিহিত ভাবগুলি তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন এবং প্রত্যূষের ঐ ভক্তিরসাপ্লুত কণ্ঠস্বর এই মহান হিন্দু সম্পর্কে তাঁর মধুরতম স্মৃতিভাণ্ডারের অন্যতম সম্পদ। স্নানের পরে স্বামীজী এলোমেলো চুলে বেরিয়ে এসে প্রাতরাশের

জন্য তৈরি হয়ে নিতেন। মিসেস ব্লজেট পিঠেজাতীয় যেসকল সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করে রাখতেন, সেগুলি রান্নাঘরের টেবিলে বসে তাঁরা খেতেন এবং তখন চলত হাস্যপরিহাস ও বুদ্ধিদীপ্ত নানা আলোচনা। এধরনের চায়ের আসরেই গৃহকর্ত্রী ও অন্য অতিথিগণ স্বামীজীকে সর্বোত্তম ভূমিকায় দেখতে পেতেন। তখন তিনি যেন তাঁর চিন্তারাশিকে অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত করে দিতে পারতেন। এইরকম এক প্রাতঃকালীন আসরে মিসেস ব্লজেট সংবাদপত্রে প্রকাশিত একজন গৃহবধূকে নিপীড়ন কিংবা কোন শিশুর প্রতি অত্যাচারের কাহিনী পাঠ করে সক্রোধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সেই আইনব্যবস্থাকে যা হীন বর্ণসঙ্কর জাতির অবাধ সৃজনে সহায়তা করে—যে-জাতির মানুষগুলি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে ভিক্ষুক, উন্মাদ ও অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে এবং সমাজজীবন দুর্বিষহ করে তোলে। উত্তেজিত গৃহকর্ত্রীর কথাগুলি শুনে স্বামীজী উপস্থিত শ্রোতাদের শোনালেন সেই প্রাচীন যুগের কথা, যখন শারীরিক শক্তি প্রদর্শন করে পুরুষকে স্ত্রীলাভ করতে হতো; তারপর তিনি দেখালেন যুগের পর যুগ ধরে ধাপে ধাপে কিভাবে নারীগণের অবস্থার ক্রমিক উন্নতি হয়েছে। চিন্তাধারার বিবর্তন ক্রমশ উদারতার পথে অগ্রসর হয়েছে এবং তাদের জন্য অধিকতর স্বাধীনতা ও সুখের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সেদিন স্বামীজীর বক্তব্যের সারকথা ছিল যে, সকল বৃহৎ সংস্কারকার্যই ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয়েছে, নচেৎ জগতের শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য বিঘ্নিত হতো।

মিসেস ব্লজেট তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন ঃ "আমি জনসমক্ষে প্রদত্ত স্বামীজীর বক্তৃতাবলী খুব কমই শুনেছি। আমার বয়স ও গৃহস্থালি কাজকর্ম আমাকে মার্থার মতো গৃহাভ্যন্তরে দিন কাটানো ছাড়া অন্য সুযোগ দেয়নি।" তথাপি আমরা জানি, শিকাগো ধর্মমহাসভার ভাষণগুলি ছাড়াও স্বামীজীর আরো কিছু বক্তৃতা তিনি শুনেছিলেন। এমন দু-একটি বক্তৃতার কথা তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন। একবার স্বামীজী কোন সভায় যখন বক্তৃতা করে চলেছেন, তখন একজন মহিলা নিজেকে জাহির করতেই যেন সময়-অসময় বিচার না করে একটা প্রশ্ন করে বসলেন ঃ "স্বামী, আপনাদের দেশের সন্ন্যাসীদের খরচ কে চালায়? আপনি তো জানেন, তাঁরা সংখ্যায় প্রচুর।" স্বামীজীর ক্ষিপ্র উত্তর—"মহাশয়া, আপনাদের দেশের যাজকদের ব্যয়ভার যাঁরা বহন করেন, তাঁরাই—মহিলারা।" শুনে শ্রোতাগণ হেসে উঠলেন এবং সেই মুহূর্তে মহিলাটি কিছুটা দমে গেলেন, আর স্বামীজী তাঁর বক্তৃতা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

শিকাগোর ম্যাসনিক টেম্পলে স্বামীজী-প্রদত্ত আরেকটি বক্তৃতার কথাও মিসেস ব্লজেট তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন। সেখানে বক্তৃতাসভায় একজন প্রখ্যাত ধর্মযাজক প্রশ্ন করেছিলেন ঃ "সন্ন্যাসীজি, আপনি ধর্মমতসমূহে বিশ্বাস করেন, তাই না?" উত্তরে স্বামীজী বললেন ঃ "হ্যাঁ তাই। তবে যখন সেটির প্রয়োজন। আপনারা একটা গাছ ফলাবার জন্য বীজ রোপণ করেন এবং তার চারপাশে একটা বেড়া বেঁধে দেন, যাতে শূকর বা ছাগল মাড়িয়ে না দেয়। কিন্তু যখন সেই বীজ বর্ধিত হয়ে একটি দীর্ঘপ্রসারিত শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষে পরিণত হয়, তখন আর বেড়ার প্রয়োজন হয় না।" উত্তরের জন্য স্বামীজীকে কখনোই ভাবতে হতো না, সর্বদাই যেকোন পরিস্থিতির সঙ্গে তিনি পাল্লা দিয়ে চলতে পারতেন।

মিসেস ব্লজেটের গৃহ থেকে প্রতিদিনই প্রভাতকালে, মাঝে মাঝে প্রাতরাশের পর, স্বামীজী ও মিস ম্যাকলাউড (সম্ভবত মিসেস ব্লজেটের 'ট্রিক্স' নামে কুকুরটিও সঙ্গে নিয়ে) দেড় মাইল দূরবর্তী একটি গৃহে যেতেন মিসেস মেল্টন নামে এক চিকিৎসকের কাছে, যিনি চুম্বকের সাহায্যে রোগনিরাময় করতে পারতেন। তিনি লিখতে বা পড়তে পারতেন না এবং কথা বলতেন নিগ্রোদের স্থানিক ভাষায়। তাঁর চিকিৎসাপদ্ধতিও ছিল একটু অদ্ভুত ধরনের; রোগীর দেহে তিনি এমনভাবে ম্যাসাজ করে চৌম্বকশক্তি উৎপাদন করতেন যে, তাদের ছালচামড়া যেন উঠে আসত এবং তারা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠত। এই চিকিৎসকের ওপর ম্যাকলাউড ও মিসেস লেগেটের অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাঁদের এই বিশ্বাস জন্মাবার বিশেষ কারণও ছিল। মিসেস লেগেট কিছু উপকার পেয়েছিলেন। স্বামীজী কিন্তু এই যন্ত্রণাদায়ক চিকিৎসায় মোটেই উৎসাহবোধ করেননি। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি মিসেস বুলকে স্যান ফ্রান্সিস্কো থেকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ "জো-র (ম্যাকলাউডকে স্বামীজী এই নামেই ডাকতেন) এত উৎসাহ সত্ত্বেও আমি ঐ চিকিৎসায় সত্যিকারের কোন উপকার পাইনি, শুধু তাঁর হাতের ঘষাঘষির ফলে আমার বুকের ওপর কিছু কালশিটে পড়ে গিয়েছে।"

মিসেস ব্লজেটের গৃহে অবস্থানকালে ম্যাকলাউড মিসেস বুলকে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন, দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর কোন বাধা না ঘটলে স্বামীজী বাগানের দোলনার বিছানায় শুয়ে শুয়ে ফরাসি ভৌগোলিক ও সমাজদর্শনবিদ্ এলিসি রেক্লুসের 'দি আর্থ অ্যাণ্ড ইটস্ ইনহ্যাবিট্যান্টস' গ্রন্থপাঠে মগ্ন হয়ে যেতেন। কখনো কখনো মিস ম্যাকলাউড ঐসময়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতেন বা তাঁর কাছে যেসব চিঠি আসত, বিশেষত নিবেদিতার

চিঠিগুলি তাঁকে পড়ে শোনাতেন। কিন্তু স্বামীজী তখন অল্পই কথা বলতেন। নিবেদিতাকে সেসময় ম্যাকলাউড লিখেছিলেন, ইতিপূর্বে স্বামীজীকে এতটা প্রশান্ত তিনি কখনো দেখেননি এবং জানিয়েছিলেন যে, তাঁর এমন মনোভাব দেখে মনে হচ্ছে, হয়তো তাঁর কর্মপরিকল্পনার আকস্মিক পরিবর্তন আসন্ন।

ঐকালে স্বামীজীর অন্তরে এতটা প্রশান্তির ভাব বিরাজ করলেও তিনি সন্ধ্যার দিকে প্রায়ই অতিথি-অভ্যাগতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কথাবার্তা বলতেন। অন্যদের গৃহে আমন্ত্রিত হয়েও মাঝে মাঝে তিনি যেতেন। মিসেস ব্লজেটের গৃহ থেকে স্বামীজী যে একবার অন্তত একটি থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলেন, সেকথা ম্যাকলাউডের একটি চিঠি থেকে জানা যায়। তিনি নিবেদিতাকে লিখেছিলেনঃ "আগামী শনিবার (২৩ ডিসেম্বর ১৮৯৯) আমরা 'ভারতাগত আমার বন্ধু' দেখতে যাচ্ছি, যেটি স্বামীজীর ওপর একটি প্রহসন। এটির বিষয়বস্তু খুবই হাসির ও মজার। তাঁর এত সব বক্তৃতার পরে এটি হবে তাঁর চিত্তবিনোদনের পক্ষে এক উৎকৃষ্ট ব্যাপার।" বস্তুত, এই নাটিকাটির উদ্বোধন হয়েছিল স্বামীজীর আমেরিকায় প্রথমবার আগমনের পর ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে নিউ ইয়র্ক শহরে এবং পরে ইংল্যাণ্ড ও সমগ্র আমেরিকা মহাদেশে প্রদর্শিত হয়েছে। তিন অঙ্কের এই নাটিকাটিতে বিশেষ বুদ্ধির ছাপ ছিল না এবং যথাযথভাবে বলতে গেলে, এটি স্বামীজীর ওপর প্রহসনও নয়, বরং এটি ছিল নিউ ইয়র্ক সমাজে তাঁকে অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন পুরুষরূপে দেখানো নিয়ে একটি ব্যঙ্গাত্মক নাটিকা। এর সম্পর্কে মিসেস হ্যান্সবরো জানিয়েছেন, স্বামীজী এটি দারুণভাবে উপভোগ করেছিলেন। অধ্যাপক বমগার্ট (যিনি এই দলের অন্যতম সদস্য) বলেছিলেন, নাটিকাটি দেখে তিনি আর কাউকে এত জোরে এবং এত অধিকক্ষণ হাসতে দেখেননি।

স্বামীজী যখন মিসেস ব্লজেটের গৃহে অবস্থান করে লস এঞ্জেলেসের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন বা ক্লাস নিচ্ছিলেন, সেসময় একদিন (১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর) তিনজন মহিলা এসে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। তাঁরা এসেছিলেন স্বামীজীকে তাঁদের প্যাসাডোনার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতে। তাঁরা সম্পর্কে পরস্পরের ভগিনী—এলিস মিড হ্যান্সবরো, হেলেন মিড ও ক্যারি মিড ওয়াইকফ। স্বামীজীর জীবনচরিতে এঁরা 'মিড ভগিনীত্রয়' নামে আখ্যাত। তাঁর বক্তৃতা শুনে তাঁরা আকৃষ্ট হয়েছেন শুনে স্বামীজী বললেনঃ "যদি আপনারা ক্লাস নেওয়ার বন্দোবস্ত করতে পারেন, তবে সেখানে শ্রোতাদের সম্মুখে ভাষণ দিতে আমি রাজি।" স্বামীজীর কথা শুনে ভগিনীগণ অবিলম্বে ব্লানচার্ড বিল্ডিংে পরপর তিনটি ক্লাসের ব্যবস্থা করে ফেললেন। ১৯, ২১ এবং ২২ ডিসেম্বর সেগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁরা স্বামীজীকে স্বগৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু প্রথমদিকে তিনি মিসেস ব্লজেটের বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মতি দিতে পারেননি। পরে একদিন প্রভাতে, সম্ভবত ৮ জানুয়ারি ১৯০০, একখানি ঘোড়ার গাড়িতে চেপে তিনি মিড ভগিনীদের গৃহে উপস্থিত হন। মিড ভগিনীগণ তাঁকে স্বাগত জানালে তিনি সহাস্যে বললেনঃ "আমি তোমাদের বাড়িতে থাকতে এলাম।"

এইভাবে শেষ হয় মিসেস ব্লজেটের গৃহে স্বামীজীর একমাসব্যাপী অবস্থান, যা এক মধুর স্মৃতি হয়ে সদা জাগরুক থাকে মিসেস ব্লজেটের হৃদয়ে। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর তিনি লিখেছিলেনঃ "এখন জীবনের যাবতীয় যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে স্বামীজী সুষুপ্তিতে নিমগ্ন। জীবনের এইসব বৈসাদৃশ্য ও কোলাহলের মধ্যে তিনি আর ফিরবেন না, অথবা পুনর্বার দেহবাস পরিধান করবেন না, আমার তাই বিশ্বাস। কারণ, একথা সত্য, আমরা তাঁকে আর কখনো দেখব না। আসুন আমরা এই প্রত্যাশা করি, মর্তের বিচ্ছেদ ও বেদনার বহু ঊর্ধ্বে কোন দূরবর্তী তারকায় তাঁর প্রশান্ত আত্মা পুনর্বার আবির্ভূত হয়ে মানুষের আন্তরজীবনকে চালিত ও প্রভাবিত করুক।" ❑

অনুষ্ঠান-সূচীঃ শ্রাবণ ১৪০৯

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে

জন্মতিথি-কৃত্য	**ঃ**	**গুরুপূর্ণিমা (ব্যাসপূর্ণিমা)** আষাঢ় পূর্ণিমা ৮ শ্রাবণ, বুধবার (২৪ জুলাই ২০০২) **স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ** আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী ২২ শ্রাবণ, বুধবার (৭ আগস্ট ২০০২)
একাদশী	**ঃ**	৪, ২০ শ্রাবণ শনিবার, সোমবার (২০ জুলাই, ৫ আগস্ট ২০০২)

তুমি

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

ভুবন ভরিয়া তুমি আছ শুধু
আমি বলে কেউ নাই...
তবু কেন এই ব্যর্থ আমিরে
প্রচার করিতে চাই?
তোমার জীবনে তোমার রাগিণী
বাজাইতে হবে, তাই শুধু জানি,
জীবনের পথে দিবসে নিশীথে
শত কর্মের ভিড়ে
সংসার ভরা আশা-নিরাশার
ঘূর্ণিপাকের তীরে।

ধুলো হয়ে যাক নিত্যদিনের
মোহ কামনার কারা
তুচ্ছের লাগি এজীবনে কভু
হব না আত্মহারা।
হৃদয়-কমল বর্ণে গন্ধে
নাচিবে নিত্য মহা আনন্দে
তৃষিতের মুখে মধু ঢেলে দেব
দুঃখেরে করিব সুখ,
তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে
উজাড় করিব বুক।

তোমার শোভায় সাজাব আমার
জীবনের সবখানি;
দিনশেষে যেন তুলে দিতে পারি
তোমারই চরণে আনি।
জীবনের যত অনিত্য ধন,
বিষয়-বাসনা, বিষের দহন,
দুঃখ, দৈন্য, বেদনা, রোদন
ব্যথা, বঞ্চনা, গ্লানি
সকলেরই বুকে ফুটুক তোমার
চির মঙ্গল-বাণী।



মুক্তির পথ

সুবর্ণা বিশ্বাস

হে প্রভু,
তুমিই যদি দেখালে মুক্তির পথ
তবে তব চরণে বরিয়া লও
মোর প্রাণ,
চঞ্চল হৃদয়
অকৃত্রিম প্রেম ভালবাসা।
তব দুয়ারে রয়েছি দাঁড়ায়ে
আমি এক ভিখারিনি,
তব দয়া মোর
প্রাণের অতল তলে।
বয়ে নিয়ে যাক সুদূর প্রদেশ দেশে
যেথা আছে শুধু
প্রেম ভক্তি শ্রদ্ধার প্রজ্ঞাপন,
আছে শুধু মায়ামুক্ত
বন্ধনমুক্ত
স্বপ্নিল আত্মজ্যোতি।

বিবেকবাণীর কাব্যরূপ

প্রণবরঞ্জন ভৌমিক

খোয়ায়ে তোমার শেষ সম্বল
হও একেবারে নিঃস্ব
চরম প্রাপ্তি আসবে তখন
মুঠোয় সকল বিশ্ব।
* * *
ধর্ম যেন কামধেনু
অমৃতভাণ্ডার
আঘাত-প্রত্যাঘাতে তবু
সুধা ঝরে তার।
* * *
যত সম্পদ বিত্ত বিভব
এ বিশ্বে সবই তাঁর
তুমি কেবল পেয়েছ তার
গচ্ছিত রাখার ভার।

গোলাপ যেমন স্বভাব বশে
মধুর সুবাস ছড়ায়
তোমার মিষ্টি স্বভাবটুকু
বিলাও তেমন ধরায়।
* * *
প্রকৃতি বল অদৃষ্ট বল
যার যা মনে লয়
সবার মূলে তাঁরই ইচ্ছা
অন্য কিছুই নয়।
* * *
কিছুই পারে না জেনো
তোমায় মুক্তি দিতে
যদি না অর্জন কর
তা আপনার চিতে।

* * *

তুমি শুধু আমটুকু খাও
পরান ভরে পেটটি পুরে
অসার ঝুড়ি নিয়ে ওরা
বিবাদ করুক বিশ্রী সুরে।

কথোপকথন

জয়দেব চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর!
আজ কি খেলে?
ভাল লাগল?
জানি তুমি বলবে, না,
নয়তো বলবে—
খুব ভাল।
তুমি আশায় আশায়
বসে রইলে,
কত লোক আসবে বলে।
কেউ এল না,
তুমি দীর্ঘশ্বাসও
ফেললে না—
কেননা তুমি যেন
ধরেই রেখেছিলে
কেউ আসবে না।
ঠাকুর, তুমি যদি
আমার মতো হতে
তবে কত ব্যথা যে
জমা হতো
কত কাঁদতে হতো
কত বিফল মনে হতো।
কিন্তু তোমার তা হয় না।
কেননা তুমি তো
সমান করে নিতে পার।
তোমার সবেতেই সাম্য
সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনা
আলো-অন্ধকার।

সবেতেই তুমি স্থির,
অচঞ্চল।
ঠাকুর, তুমি বেশ,
অদ্ভুত, না?
কি সুন্দর তোমার দৃষ্টি,
শান্ত, নিরাসক্ত
পূর্ণ, নির্লিপ্ত
প্রেমময়, উদাসীন
নির্বাক, বাঙ্ময়।
টানা টানা চোখে
এত ভাব কি করে
প্রকাশ হয়?
শুধু চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।
তুমি কি দেবে
আমাকে চেয়ে থাকতে?
তুমি মুখ ফিরিয়ে নেবে না?
তুমি বিরক্ত হবে না?
না, না, তুমি হবে না।
আমি তোমার দিকে
চেয়ে থাকব
তুমি সরে যাবে না
তুমি আমাকে ঘৃণা
করবে না,
বল, ঠাকুর—
আমি অকৃতী অধম
তবুও তুমি আমায়
ভালবাসবে।



রথের রশি

সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগের থেকে যুগান্তরে
রথের রশি টানছে যারা
ধন্য তাদের পুণ্য দুটি হাত,
কৃপার বাতাস তারেই দোলায়
দিয়েছে যে সব জগদ্ধিতায়
আরোহী যে মূর্ত জগন্নাথ।

সেবক যখন বিপর্যস্ত
আকুল হয়ে খুঁজতে ব্যস্ত
কোথায় গেছে নিরুদ্দিষ্ট পথ,
তদ্গত প্রাণ ভক্তজনের
হৃদয়দ্বারে সহসা থামে
আমার প্রভু জগন্নাথের রথ।

বাউল

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

কে তোকে আশান দেবে মন?
মেঘে মেঘে অকাল উচ্ছ্বাসে
হঠাৎ প্রগাঢ় হয়ে আসে
বুকে তোর দুপুর যখন।

কে তোকে আশান দেবে, হায়,
একা সেই মানুষ যখন
চোখের চাদর খুলে চায়,
মৃত জোনাকির স্তূপ ভেঙে
শ্বাপদসঙ্কুল ঘন বন!

কে তোকে আশান দেবে তখন, ও মন?



তোমার চরণতলে

শচীন দত্ত

প্রদীপের আলো নিভে গেছে কবে
তেল নেই তার বুকে
গহন আঁধারে ঢাকা চরাচর
কেউ নেই আর সুখে।

তমালের ডালে নেই শুকশারি
কোকিল ডাকে না ভুলে
চাতক-কণ্ঠ তৃষ্ণাকাতর
দেখে না দৃষ্টি তুলে।

তারাভরা রাত নীরব নিথর
পাদপে শীর্ণ লতা
স্তব্ধ প্রকৃতি মলিন প্রকাশ
বুকে তার ব্যাকুলতা।

কান পেতে আছি যদি কালস্রোতে
ভেসে আসে নামগান
কলুষ-হরণী প্রেম সুধারসে
ভরে ওঠে সব প্রাণ।

তখনি আবার আলোর শিখাটি
হঠাৎই উঠবে জ্বলে
যত প্রাণী জীব জানাবে প্রণাম
তোমারই চরণতলে।



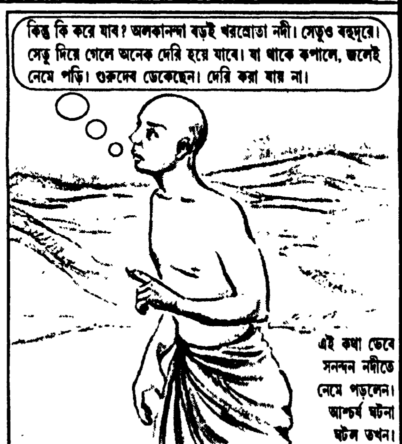
আদি শঙ্করাচার্য ১১

শিশু ও কিশোর বিভাগ











চিত্ররূপ ঃ দেবাশিস বসু



বিশ্বায়ন, সন্ত্রাসবাদ ও আমরা

স্বামী পরাশরানন্দ

ভারতের জাতীয় রেল মিউজিয়ামের ঠিকানা—www.railmuseum.org। দিল্লি টেলিফোনের ঠিকানা—www.bol.net.in। ব্রডকাস্টিং ইঞ্জিনীয়ারিং সোসাইটির ঠিকানা—www.besindia.com। বাড়ির নম্বর, রাস্তার নাম বা পোস্ট অফিস এখন আর ঠিকানা নয়, এযুগের ঠিকানা 'ওয়েবসাইট'। নতুন প্রজন্মের ভাষা টিভি, পত্রের মাধ্যম ই-মেল, লাইব্রেরির বই ইন্টারনেটের স্ক্রিন, জিনিসপত্রের মূল্য বিনিময়ের মাধ্যম ক্রেডিট কার্ড। কৃষিভিত্তিক, গ্রামপ্রধান এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে এক-তৃতীয়াংশ মানুষের আবাস যে-দেশে, সেই ভারতবর্ষ রাতারাতি আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের ছোঁয়ায় তৃতীয় বিশ্বের পিছিয়ে পড়া দেশ থেকে কি একলাফে টক্কর দিচ্ছে অতি উন্নত পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে? বিশ্বায়নের আশ্চর্য মহিমা দেখে অবাক হতে হয়। অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন রাতারাতি হয়ে গেল কিভাবে?

এযুগ মিডিয়ার। হয়তো একটি ঘটনা বারবার মিডিয়া-প্রচারের ফলে একমাত্র সত্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে! যথার্থ সত্যের কিংবা ঘটনার বৃহৎ একটি অংশ জনমানসে কখনই ধরা পড়ছে না। দিন দিন মানুষ হয়ে উঠছে কর্মব্যস্ত, কর্মচঞ্চল। অবসর নেই, যেটুকু অবসর তা কাটাবার উপায় সস্তা রাজনীতি ও মিডিয়ার আকর্ষণ! সঠিক তথ্য অনুসন্ধান ও গভীরে গিয়ে জানার ইচ্ছা বা সময় অধিকাংশ মানুষেরই নেই। তাই স্বাভাবিক-ভাবেই প্রশ্ন ওঠে—ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, ই-মেল, ওয়েবসাইট, ক্রেডিট কার্ড ভারতের একশো পাঁচ কোটি লোকের মধ্যে কতজনের জন্য? ভারতের আর্থ-রাজধানী মুম্বাইয়ের পাশে এশিয়ার সবচেয়ে বৃহত্তর বস্তি। 'সিলিকোন ভ্যালি' ব্যাঙ্গালোরের চল্লিশ কিলোমিটার দূরে; বহু গরিব লোকই 'রাগি'র সঙ্গে জল মিশিয়ে তাদের প্রধান খাবার খায়, দুধ কেনার সামর্থ্য তাদের নেই। আর কলকাতার পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে গ্রামের ছেলেদের প্যান্টের ওপরে জামা জোটে না। তিনটি বিখ্যাত মহানগরীর পাশের ছবিগুলি এইরকম। দেশের বৃহত্তম অংশকে বঞ্চিত করে সীমিত উচ্চবিত্ত ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মানই দেশের অর্থনীতির সঠিক চিত্র কি? বিশ্বায়ন কার, কাদের জন্য? এদেশে উন্নত দেশগুলির পণ্যসামগ্রী বিক্রির অবাধ সুযোগ করে দেওয়ার অর্থ কি বিশ্বায়ন? যেকোন বিদ্যাই আজ খুব দ্রুত পৃথিবীর সর্বপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। বিশ্বায়নের এটি নিশ্চয় একটি শুভফল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য যুগের পরে এযুগ শূদ্রের যুগ। ব্রাহ্মণ যুগের কুক্ষীগত বিদ্যা এযুগে সব মানুষের মধ্যে ব্যাপ্ত, গভীরতার প্রশ্নে এখন যাচ্ছি না।

স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের ধ্যান-জ্ঞান এখন তিনটি 'ক'—ক্রিকেট, ক্যুইজ এবং কম্পিউটার। এখানেও বিশ্বায়নের দীর্ঘ ছায়া বিদ্যমান। বহুজাতিক বাণিজ্য সংস্থাগুলি প্রচার ও চটকদারী বিজ্ঞাপনের দ্বারা ক্রিকেটকে তৃতীয় বিশ্বের মানুষের কাছে নেশায় পরিণত করেছে (কিন্তু ক্রিকেটজগতে ভারতের স্থান একই বিন্দুতে!!), কম্পিউটার শিক্ষা স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের কাছে অক্সিজেনের মতোই আবশ্যিক আর ঘন ঘন মিডিয়া প্রচার ও ফিল্মস্টারের আকর্ষণে ক্যুইজ এখন ছাত্রছাত্রীদের এক আকর্ষণীয় বিনোদনের বস্তু। সবকিছুতেই একটা হালকা তরল ভাব ও গভীরতার অভাব পরিস্ফুট। ছেলেমেয়েদের চিন্তাশক্তি দিনে দিনে কমে যাচ্ছে, কোন অজানা বিষয় নিয়ে একপৃষ্ঠা লেখার ক্ষমতাও তাদের নেই। টিভির অগুন্তি চ্যানেলে হরেকরকম বিনোদন দেখে তাদের মূল্যবোধ কৈশোরেই লুপ্তপ্রায়। খোলা বাজার, উদার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের এটি কুফল।

গত কয়েক মাস ধরে একটা শব্দ গোটা পৃথিবীকে আলোড়িত করছে। শব্দটি 'সন্ত্রাস'। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কের বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে আকস্মিক বিমান হানায় সমগ্র বিশ্বের ছয় হাজার মানুষ কংক্রিটের জঙ্গলে ঝলসে পুড়ে মারা গেল। তারা জানল না, কি তাদের অপরাধ। শতাব্দীর প্রথম বৃহৎ সন্ত্রাসের শিকার এই ছয় হাজার নিরপরাধ মানুষ। এই ঘটনার পরই গোটা বিশ্বে 'সন্ত্রাস' (terrorism) ও 'সন্ত্রাসবাদী' (terrorist) শব্দদুটি খুব চালু হয়ে গিয়েছে। 'সন্ত্রাস' শব্দটি একটি যুক্তশব্দ। সম্ এবং ত্রাস-এর সমন্বয়ে এটি গঠিত। ত্রাস-এর অর্থ ভীষণ ভয়, উপসর্গ সম্-এর প্রভাবে ভয়ের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাস বলছে, ভারতীয় জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিতে 'সন্ত্রাস' শব্দটি ছিল অজ্ঞাত। শক, হূন ইত্যাদির আক্রমণের কথা বাদ দিলে ভারতভূমিতে সন্ত্রাসের আগমন ঘটল ১০০০ থেকে ১০২৭ সালের মধ্যে সুলতান মামুদের ১৭বার ভারত-আক্রমণের মাধ্যমে। ঐতিহাসিক স্মিথের ভাষায়—'একজন ক্ষমতাশালী লুণ্ঠনকারী দস্যু' হিসাবে তিনি ভারতে নির্বিচারে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে গিয়েছেন। একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের মতে—"তাঁর বারংবার আক্রমণের ফলে ভারতের অপরিমিত সম্পদ লুণ্ঠিত হয় এবং সবই দেশের বাইরে চলে যায়, যা আর কখনো ফিরে

আসেনি। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যুদ্ধে ভারতীয় যোদ্ধাদের অধিকাংশ বিনষ্ট হয় এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক কিছু ওলটপালট হয়ে যায়। এভাবে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিক্ষয়ের ফলে পরবর্তী কালে হিন্দুদের পক্ষে তুর্কি আক্রমণ প্রতিরোধ করার শক্তি হ্রাস পায়।" গোটা দেশের মানুষের মনে এই যে অবর্ণনীয় ভীতি ও মৃত্যুযন্ত্রণার সৃষ্টি, এ কি সন্ত্রাস নয়? আরেকটু পরের ইতিহাস—সালটা ১৩৯৮, সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে এক পা-ওয়ালা কুখ্যাত তুর্কিনেতা তৈমুর লঙ দিল্লি ও আশপাশে যথেচ্ছ লুণ্ঠন ও লক্ষাধিক লোককে হত্যা করে। এক ঐতিহাসিকের মতে—"তৈমুরের ভারত-আক্রমণের ফলে কেবলমাত্র উত্তর ভারতে জনজীবন ও বিপুল পরিমাণ সম্পত্তিই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি, সারাদেশ জুড়ে এক চরম নৈরাজ্য ও অরাজকতার সূত্রপাত হয়। দিল্লিনগরী শ্মশানে পরিণত হয়। তৈমুরের হাতে যারা নিষ্কৃতি পেয়েছিল, তারা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রাণ হারায় এবং এর ফলে দিল্লির জনসংখ্যা এত কমে গিয়েছিল যে, দিল্লির আকাশে দু-মাস ধরে একটি পাখিকেও উড়তে দেখা যায়নি। লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে গবাদি পশুও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।" ভারতের মাটিতে এর থেকে বড় সন্ত্রাস আর হয়নি বলেই মনে হয়। এসব আজকের কথা নয়, ইতিহাস বলছে আজ থেকে ছয়-সাতশো কি হাজার বছর আগের কথা। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ভারতে হিন্দুদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় অবস্থার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীরা ইতিহাস বইয়ে সেসব পড়েছে। সমস্ত রকম ধর্মীয় আচার-আচরণ নিষিদ্ধ করে এবং অসংখ্য মন্দির ধ্বংস করে (যার মধ্যে কাশীর বিশ্বনাথ-মন্দির, মথুরার শ্রীকৃষ্ণ-মন্দির, বৃন্দাবনের গোবিন্দজীর মন্দির অন্যতম) তিনি হিন্দুমানসে যে বিরাট ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংসের পরে যে 'সন্ত্রাস' শব্দটি শোনা যাচ্ছে, তা এর তুলনায় কিছুই নয়।

আর ব্রিটিশরাজ? স্বামী বিবেকানন্দের মতে—"রক্ত-শোষণই যেখানে প্রধান উদ্দেশ্য, সেখানে মঙ্গলকর কিছু হতে পারে না। নির্দোষ সমালোচনার ফল বিনা বিচারে নির্বাসন অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।" ইতিহাসের পাতা থেকে দু-একটি ঘটনার উল্লেখ করলেই 'সুশিক্ষিত' ও 'সভ্য' ইংরেজ জাতির নগ্নরূপ প্রকাশ পায়। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল পঞ্জাবের তৎকালীন মুখ্য প্রশাসক লেফটেন্যান্ট গভর্ণর মাইকেল ও. ডায়ার অমৃতসর শহরের জালিয়ানওয়ালাবাগে দশহাজার নিরস্ত্র মানুষের সভায় বিরাট সেনাবাহিনীর সাহায্যে পঞ্চাশটি রাইফেল থেকে ১৬০০ রাউণ্ড গুলিবর্ষণ করে প্রায় সহস্রাধিক লোককে হত্যা করে। আবার 'সান্ধ্য আইন' জারি করে আহতদের মুখে জল দেওয়ার জন্যও কাউকে গৃহের বাইরে আসতে দেওয়া হয়নি। 'স্বদেশ পরিচয়' গ্রন্থে জীবন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "কেবলমাত্র অমৃতসর শহরেই নয়, এরপর অমৃতসর-সহ পঞ্জাবের পাঁচটি জেলায় সামরিক আইন জারি করা হয়। সামরিক শাসনে শহরাঞ্চলে বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ বন্ধ থাকে। জনসাধারণকে মাটিতে বুক দিয়ে চলতে বাধ্য করা, প্রকাশ্য রাজপথে নগ্ন করে বেত্রাঘাত করা, হাতে শেকল ও কোমরে দড়ি বেঁধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা, ১০৭ জনকে খাঁচায় বন্দী করে প্রখর রৌদ্রের মধ্যে রাখা—এইসব অত্যাচার চলতে থাকে।" ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন দমনে ব্রিটিশ শাসকের আরেকটি ভয়ঙ্কর রূপ—"আন্দোলন দমনের জন্য সরকার নিষ্ঠুর দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। গ্রেপ্তার, জরিমানা, প্রহার, লাঠি, গুলি, মেশিনগান প্রভৃতি ছিল সাধারণ ব্যাপার। বহু স্থানে সামরিক বাহিনীর ডাক পড়ে ও বিমান থেকে গুলি বর্ষণ করা হয়। পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর তাণ্ডব শুরু হয় সারা দেশে।" ঐতিহাসিক ডঃ বিপিন চন্দ্র লিখছেন ঃ "পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশের হাতেই দেশকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ তারা যা খুশি তাই করার অধিকার পেয়েছিল। বহু ছোটবড় শহর সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। যথেচ্ছ খুন, লুণ্ঠন, গৃহে অগ্নিসংযোগ ও নারীর সতীত্ব হনন করে সরকার এই বিদ্রোহ দমনে সচেষ্ট হন। সরকারি হিসাব থেকে জানা যায় যে, পুলিশ ৫৩৮টি জায়গায় গুলি চালিয়ে ১০২৮ জনকে হত্যা ও ৩০০০ জনকে আহত করে।" জওহরলাল নেহরুর মতে, সামরিক বাহিনী ও পুলিশের গুলিতে নিহতের সংখ্যা ছিল দশহাজারের কাছাকাছি। সরকারি মতে, এই আন্দোলনে বন্দীর সংখ্যা ছিল ৬০, ২২৯ জন। এছাড়া পাইকারি হারে পিটুনি কর ধার্য করা এবং বহু ক্ষেত্রে সমস্ত গ্রামবাসীকে ধরে চাবুক মারা হতো। আন্দোলন দমনে সরকারি নিষ্ঠুরতার কথা বলতে গিয়ে জওহরলাল নেহরু বলেছেন, সৈন্যদল বিমানে এসে গ্রামে আক্রমণ চালিয়ে গ্রামগুলিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিত। তারপর তারা লাঙল চালিয়ে সেই গ্রামগুলির অস্তিত্বও সম্পূর্ণভাবে মুছে দিত। (দ্রঃ 'স্বদেশ পরিচয়')

বিশ্বপটভূমিকার দিকে এবার একটু তাকানো যাক। যে-বিপ্লব নিয়ে আমরা গালভরা প্রশংসায় অভ্যস্ত, সেই বিপ্লবের স্বরূপ কি? পৃথিবীর বিখ্যাত বিপ্লবগুলির আলোচনা করলে দেখতে পাব, তা জন্ম দিয়েছে এক-একটি *বিরাট সন্ত্রাসের। বহু-বন্দিত ফরাসি বিপ্লব* (১৭৮৯

খ্রিস্টাব্দ) ইউরোপের ইতিহাসে জন্ম দিল এক সন্ত্রাস ও বিভীষিকাময় অধ্যায়ের। এই সন্ত্রাসের জন্ম দিলেন রোবেসপিয়ের (১৭৫৭-১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দ), যিনি হাজার হাজার ব্যক্তিকে গিলোটিনে হত্যা করে নিজেও গিলোটিনের শিকার হন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, যে-বিপ্লব সাধারণ নাগরিকের সমান অধিকার ও দাবির জন্য শুরু হয়েছিল, সাধারণতন্ত্র বা গণতন্ত্র ছিল যে-বিপ্লবের স্বপ্ন—তা পর্যবসিত হলো নেপোলিয়নের একনায়কতন্ত্রে (১৮০৪ খ্রিস্টাব্দ)। ১৯১৬-১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার বিপ্লব জন্ম দিল স্ট্যালিনের নেতৃত্বে ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদের। ১৯৩০ থেকে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে সন্ত্রাস-কবলিত রাশিয়া আর্তনাদ করেছিল একটু শান্তি ও মুক্ত বাতাসের জন্য। রাশিয়া বিপ্লবের মূলনীতি ছিল এই সন্ত্রাস। ট্রটস্কির মতে—"সন্ত্রাসবাদ যিনি ত্যাগ করবেন, শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রাধান্যও তিনি ত্যাগ করবেন।" (দ্রঃ Terrorism and Communism—Leon Trotsky) ট্রটস্কি ছিলেন সামগ্রিক নিপীড়ন ও বলপূর্বক শাসনের হোতা, কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত নীতির শিকার হলেন তিনি স্বয়ং—১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ আগস্ট মেক্সিকোতে স্ট্যালিনের লোক তাঁকে হত্যা করল। বলশেভিক বিপ্লবের ইতিহাস সেই বিপ্লবীদেরই ইতিহাস, যারা পরস্পরকে শুধু হত্যা করে গেল—যতক্ষণ না বিপ্লব নিজেই হত হয়ে থামাল তার গতি। সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের (১৯৯১) পরে বলশেভিক বিপ্লবের নীতি রাশিয়া ত্যাগ করেছে।

যুদ্ধ জন্ম দেয় যুদ্ধের, সন্ত্রাস জন্ম দেয় সন্ত্রাসের। লক্ষ্য একটাই—ক্ষমতা দখল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) শেষ হলো এক মর্মান্তিক পরিণতিতে। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ এপ্রিল গুলি করে মারা হলো মুসোলিনীকে, ৩০ এপ্রিল হিটলার আত্মহত্যা করলেন, ৭ মে জার্মানি মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে জেনেও ৬ ও ৯ আগস্ট আমেরিকা জাপানের দুটি শহরে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটাল। কেউ কেউ বলে, এটি পার্ল হারবারের প্রতিশোধ ও জাপানকে উচিত শিক্ষাদান। আবার কারো কারো মতে, সমগ্র বিশ্বে এক মহা সন্ত্রাস সৃষ্টি ও নিজের শক্তি প্রদর্শন করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

এছাড়া অতি শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির অন্যান্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানো এবং সামরিক শক্তি-প্রদর্শনও এক বীভৎস সন্ত্রাসের রূপ নেয়। এর সাক্ষী ভিয়েতনাম। দীর্ঘ দু-দশক ধরে ভিয়েতনাম যুদ্ধে হাজার হাজার নিরীহ লোককে মেরে ফেলা, বিশালাকার কেমিক্যাল বোমা নিক্ষেপ করে দেশকে মরুভূমিতে পরিণত করা অবশ্যই এক বৃহৎ সন্ত্রাসের সাক্ষ্য। চমস্কি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে (American Power and the New Mandarins—1967) বলেছেন : "আমরা ভিয়েতনামে যা করেছি তা নিশ্চয় অপরাধীর কাজ।" সেসময় আমেরিকান পার্লামেন্টের কয়েকজন সেনেটরও আমেরিকার এই নারকীয় অপকীর্তিকে সমর্থন করেননি।

হিংসা ও অহিংসা নিয়ে ভারতে ও বহির্ভারতে অনেক আলোচনা, সেমিনার ও লেখালেখি হয়েছে। হিংসা-অহিংসার জন্ম কোথায়? কামানের গোলায়, বন্দুকের গুলিতে না মিশাইল ক্ষেপণাস্ত্রে? এর উৎপত্তি মানুষের মনে। বিশ্বায়নের যুগে কয়েক মিনিটের মধ্যে গোটা পৃথিবী জেনে যাচ্ছে পৃথিবীর অপর প্রান্তে কি ঘটছে। "চিত্তনদী নাম উভয়তো বাহিনী, বহতি কল্যাণায় বহতি পাপায় চ।" শুভ বা অশুভ শক্তির প্রয়োগ এবং তাদের চিন্তা মানুষের মনের ওপর নির্ভর করছে। শক্তিমাত্রই প্রশংসার নয়, রাম ও রাবণের শক্তি এক নয়, দেবী ও মহিষাসুরের শক্তি এক নয়, অর্জুন ও দুর্যোধনের শক্তি এক নয়, মহাত্মা গান্ধী ও হিটলারের শক্তি এক নয়। একটি সৃষ্টি ও কল্যাণের, অপরটি ধ্বংসের ও বিনাশের। সাধারণ মানুষের মনের প্রবণতাই এই যে, অশুভ বিষয় খুব দ্রুত শেখা হয়ে যায়, কিন্তু সারাজীবনে অল্পমাত্র শুভ বিষয় শেখা হয়ে ওঠে। তাই বিশ্বায়নের যুগে মিডিয়ার কল্যাণে ফ্লোরিডার গায়ক জনপ্রিয়তার নিরিখে ভারতে শীর্ষে। সবকিছু জানতে হবে, সব খবরাখবর নিতে হবে, ছোট ছোট ক্যুইজমাস্টার হয়ে কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কে সব ঢুকিয়ে দিয়ে যন্ত্রমানবে পরিণত হতে হবে—চিন্তাশক্তির স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ খর্ব করে! এই কি নতুন প্রজন্মের কাছে বিশ্বায়নের উপহার? গভীরতার অভাব, নিজের সভ্যতা-সংস্কৃতির শিকড়ে বা মূলে না যাওয়া, টুকরো টুকরো তাৎক্ষণিক উত্তেজনায় মনের ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলা—এটাই কি আমরা নতুন প্রজন্মকে দিয়ে যাচ্ছি?

মিডিয়ার কল্যাণে ঘন ঘন যুদ্ধ ও সন্ত্রাসের দৃশ্য দেখানোর ফলে সারা বিশ্বের কিশোর-কিশোরীরা মহড়া দিতে শুরু করেছে সন্ত্রাসবাদের। বন্ধুদের সাথে ইউরোপে বেড়াতে যাওয়ার অনুমতি না দেওয়ায় আমেরিকায় বারো বছরের একটি ছেলে বাবাকে গুলি করে হত্যা করে। ইউরোপে তেরো বছরের একটি মেয়ে "তুমি আমাকে বারবার একই কথা বলে বিরক্ত করছ কেন?"—এই কথা বলে মাকে গুলি করে হত্যা করল। পাটনার তেরো বছরের অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্র "অভিষেক স্যারনে কাল মুঝকো বহুৎ ডাটা, আজ উনকো গোলি মার দেঙ্গে।"—বলে

নিজের পকেটে লুকিয়ে রাখা রিভলবার সহপাঠীকে দেখায়। বিশ্বব্যাপী মানব-সভ্যতা ও মানব-সংস্কৃতির পরিণতি হচ্ছে এই—নতুন প্রজন্ম হয়ে উঠছে ধৈর্যহীন, হিংস্র ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির। ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, প্রেম—এই শব্দগুলি থেকে দূরে সরে এসে চর্চা হচ্ছে বুলেট ও বন্দুক-সংস্কৃতির।

এই পরিস্থিতিতে আমরা অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের অনুরাগীরা তাঁদের জীবন ও বাণী থেকে কি কোন আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না? 'বিশ্বায়ন' শব্দটি—যা নিয়ে আজকের পৃথিবী উত্তাল—সেটি আমাদের কাছে কোন নতুন শব্দ নয়। বরং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজেই করে গিয়েছেন। তিনি শ্রীশ্রীমাকে বলেছিলেন ঃ "দেখ গো, স্বপ্নে দেখলাম, এক দেশে গেছি, সেখানে সব সাদা সাদা লোক, তাদের ভাষা আমি বুঝি না। কিন্তু তারা খুব ভক্ত।" বলেছিলেন ঃ "আমার অনেক সাদা ভক্ত আসবে।" আমেরিকার শিকাগো শহরে ধর্মমহাসভায় যাবেন কিনা মনস্থির করতে পারছেন না স্বামী বিবেকানন্দ, হঠাৎ দর্শন হলো শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাগরের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছেন, আর তাঁকে অনুসরণ করতে বলছেন। মানুষ শুধুমাত্র যন্ত্র বা কম্পিউটার নয়, মস্তিষ্ক ছাড়াও তার একটি হৃদয়—একটি সত্তা আছে। মস্তিষ্কচর্চার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, যার সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে আমেরিকা ও ইউরোপের উন্নত দেশগুলিতে। আর মানুষের নিজস্ব সত্তা বা আত্মা প্রাচ্যের প্রতিভূ হিসাবে বিদ্যমান, যার পরিপূর্ণতা সাধিত হয়েছে এই ভারতবর্ষে। আগামী দিনে সার্থক বিশ্বায়ন ঘটবে এই দুয়ের সমন্বয়ে, শুধুমাত্র একটির দ্বারা নয়। আর শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অশ্রুতপূর্ব আধ্যাত্মিক সাধনা, যা দেখা তো দূরের কথা, মানুষের ইতিহাসে যা কখনো শোনা যায়নি—তাই হয়ে উঠবে সার্থক বিশ্বায়নের মহামন্ত্র। হিন্দুধর্মের যতগুলি শাখাপ্রশাখা—সবগুলিতে সিদ্ধিলাভ করে অদ্বৈতবাদ সাধনার সর্বোচ্চ শিখরে তিনি উঠেছেন, ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের সাধন করে করে এই ধর্মপথগুলির চরম লক্ষ্যে পৌঁছেছেন এবং সবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায় বিভিন্ন পথের কথা বললেও প্রত্যেকের চরম লক্ষ্য কিন্তু একই। তাই তাঁর অবিস্মরণীয় উক্তি—"যত মত তত পথ"। বিশ্বে সমস্ত মানুষের যে স্বকীয়তা বা নিজস্ব সত্তা রয়েছে, সেই আধ্যাত্মিকতার চরম লক্ষ্য যদি একই হয়, তাহলে কি বিশ্বায়ন হলো না? সংবাদ পরিবেশনের দ্রুততা ইন্টারনেট, ই-মেল প্রভৃতির সাহায্যে একধরনের বিশ্বায়ন, আর ভাবরাজ্যে আরেক ধরনের বিশ্বায়ন।

এই বিশ্বায়নের প্রতিফলন শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনে আমরা অহরহ দেখতে পাই। মুসলমান ডাকাত আমজাদকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলাপার্ষদ স্বামী সারদানন্দজীর সঙ্গে একাসনে বসিয়েছেন। এক পারসি ধর্মাবলম্বীকে তিনি মন্ত্রদীক্ষা দান করে তার সমস্ত ভার গ্রহণ করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেও তিনি তাঁর জগন্মাতার স্নেহদৃষ্টিতে বলেছেন ঃ "বাবা, ওরাও (ইংরেজরা) তো আমার ছেলে। আমার কি একপেশে হলে চলে?" নিবেদিতা প্রমুখ বিদেশিনীদের তিনি নিজের মেয়ের মতো আপন করে নিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে তিনি একপাত থেকে মিষ্টান্নাদি গ্রহণ করেছেন। ধর্ম-রুচি-ভাষা-সংস্কার সব ভিন্ন, কিন্তু ভাববিনিময়ে কোন অসুবিধা তাঁর হয়নি। "গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যস্তু ছিন্ন-সংশয়াঃ"—এরই মূর্ত প্রতীক ছিলেন শ্রীশ্রীমা। এ যদি বিশ্বায়ন না হয় তো কাকে বিশ্বায়ন আখ্যাত করা যাবে?

যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের নয়বছর কর্মবহুল জীবনের চারবছরই কেটেছে বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্যে অধ্যাত্মবাদের মহান বাণী প্রচারে। তাঁর সেই প্রচেষ্টা নিষ্ফল হতে পারে না। পাশ্চাত্য মনীষীদের ভাবরাজ্যে সেই চিন্তাধারা ক্রমে দানা বেঁধে বিভিন্নরূপে সূক্ষ্মভাবে আজও কাজ করে চলেছে। আর ভারতবাসীকে তিনি তমোগুণ থেকে রজোগুণে উত্তরণের যে-আহ্বান জানিয়েছেন, তারই ফলে ভারতের শিরায় শিরায় কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ঝিমিয়ে পড়া ভারতবাসীর মধ্যে আজ নতুন প্রাণশক্তি দেখা যাচ্ছে। মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে সব ব্যাপারে এগিয়ে আসছে। আগামী দিনের ভারত তথা বিশ্ববাসীর উদ্দেশে তাঁর বাণী—"What we want are western science coupled with Vedanta and Brahmacharya as the guiding motto." (আমাদের চাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্তের সমন্বয়, যার মূলে থাকবে ব্রহ্মচর্য।) নতুন যুগের বিশ্বায়নের মূলমন্ত্র।

মুনি, ঋষি, যোগীদের দেশ ভারতবর্ষ, যেখানে যোগসাধনার একেবারে প্রথম ধাপে শেখানো হয়—"অহিংসা পরমো ধর্মঃ", সেই দেশে অতি প্রাচীন কাল থেকেই হিংসা ও ত্রাস ছিল অজানা। পুরাণে, শাস্ত্রে পাই—ঋষিদের আশ্রমে ঋষিদের সঙ্গে একই সাথে বাস করত বাঘ-হরিণ এবং অন্যান্য পশুপাখি। যেন তারা একই পরিবার। করুণার অবতার বুদ্ধদেব থেকে শুরু করে প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেম ও মৈত্রীর বাণী যেখানকার আকাশ-বাতাসকে মথিত করে তুলেছে, সে-দেশবাসীর

কাছে সন্ত্রাস ছিল একেবারেই অজানা। তাই বিধর্মী বিদেশীদের ধর্মের নামে লুণ্ঠতরাজ, হত্যা ও সন্ত্রাসে দেশবাসী হয়ে গিয়েছিল হতচকিত। হাজার হাজার নিরীহ প্রাণ লুটিয়ে পড়েছিল প্রায় বিনা প্রতিরোধে। নির্বিচারে অহিংসা ও ক্ষমার ব্যাপক অনুশীলনের ফল ভারতকে পেতে হয়েছে। হাজার বছরের পরাধীনতা এবং বিদেশী শক্তির নির্যাতন ও অত্যাচার নীরবে সহ্য করে যেতে হয়েছে। ভারত স্বাধীন হওয়ার মুহূর্তে ধর্মীয় মৌলবাদ ও সন্ত্রাস এখনো অনেকের স্মৃতিতে অম্লান। এদেশের মাটি প্রেম ও ভালবাসার, হিংসা ও হত্যার নয়। এখনো পর্যন্ত যা ছোটখাট সঙ্ঘর্ষ, খুনোখুনি ও সন্ত্রাসের খবর আমরা পাই, হয় তা বিদেশী শক্তির মদতে কিংবা তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় অথবা জীবনরক্ষার একান্ত তাগিদে।

মাতাল জগাই-মাধাইয়ের ছোঁড়া পাথরে রক্তাক্ত নিত্যানন্দ তাদেরকেই আলিঙ্গন করতে গিয়েছিলেন। কলকাতার জানবাজারে রানী রাসমণির বাড়িতে কালীঘাটের পুরোহিত শ্রীরামকৃষ্ণকে আকস্মিক পদাঘাত করলে প্রতিবাদ তো দূরের কথা, তিনি সভয়ে দেখেন কেউ দেখে ফেলল কিনা; কারণ, মথুরবাবুর কানে গেলে পুরোহিতের সমূহ বিপদ হতে পারত। পাঁচহাজার বছরের ভারতের সাধনা শান্তি ও প্রেমের সাধনা, রজো ও তমোগুণকে নাশ করে সত্ত্বগুণ প্রকাশের সাধনা। দেশময় তীর্থ ও নদীগুলি পবিত্রতাস্বরূপিণী, সু-উচ্চ পর্বতশৃঙ্গগুলি দেবভূমি, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন আধ্যাত্মিকতার নিয়মে আবর্তিত। পরিবার ও সমাজ যেখানে নৈতিকতার উঁচু সুরে বাঁধা—সেখানে ভয়-ত্রাস, হিংসা-দ্বন্দ্বের অবকাশ কোথায়? অবশ্য ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজের সমন্বয়ে গড়া যুগাচার্য বিবেকানন্দের বাণীই ভারতবাসীর কাছে এযুগের একমাত্র মন্ত্র। আমাদের প্রয়োজন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্তের সমন্বয়, ব্রহ্মচর্য হবে যার মূলমন্ত্র। আমাদের দরজা খোলা রাখতে হবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রের আধুনিকতম উন্নতির খবরাখবর ও প্রয়োগ জানতে হবে মাতৃভূমিকে রক্ষা ও তার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য। কিন্তু সাথে সাথে এই মহান আর্যভূমির পাঁচ-সাত হাজার বছরের আধ্যাত্মিকতা, সংস্কৃতির চর্চা সমানভাবে করে যেতে হবে। শিকড় ছাড়া যেমন গাছ বাঁচতে পারে না, শিকড়ই তাকে মাটি থেকে রস যুগিয়ে তার সজীবতা রক্ষা করে—তেমনি হাজার হাজার বছরের কৃষ্টি ও ধর্মের যে-শিকড় ভারতের মাটিতে প্রোথিত ও লালিত হয়েছে তাকে রক্ষা করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হবে দেশবাসীর প্রধান কর্তব্য। আজ্ঞাবহতা ও পবিত্রতা-রূপী ব্রহ্মচর্যকে অবশ্যই সাথে রাখতে হবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উড্রো উইলসনের দশ দফা শান্তিপ্রস্তাব শুনে শ্রীশ্রীমা মন্তব্য করেছিলেন—এসব তাদের অন্তঃস্থ নয়, সব মুখস্থ। অর্থাৎ প্রস্তাবটি সীমাবদ্ধ শুধুমাত্র মুখের কথায়, হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে উঠে এসে বাস্তবে তার সঠিক রূপায়ণ হয়নি। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির আজ বোধ হয় ভাববার সময় এসেছে—এত শান্তির বাণী, প্রস্তাব, আলোচনা, সেমিনার সত্ত্বেও দিনে দিনে অশান্তি, হিংসা, খুনোখুনি ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা বেড়ে যাচ্ছে কেন? এর উত্তর শ্রীশ্রীমায়ের উপরি উক্ত কথাগুলিতেই রয়েছে। যে-দেশের মানুষের মাথাপিছু বার্ষিক আয় গড়ে ত্রিশ-বত্রিশ হাজার ডলার—তারা কিভাবে তিন-চারশ ডলার আয়ের মানুষগুলিকে সমকক্ষ ভাববে? অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য জাগতিক ব্যাপারে সমকক্ষতা কখনো আসবে না, সমকক্ষতা আসবে যদি আমরা প্রতিটি মানুষের অন্তরে যে-ভগবান রয়েছেন, তাঁকে ধরার চেষ্টা করি। সাদা-কালো, হিন্দু-মুসলমান, ধনী-গরিব—কোনকিছুই প্রাধান্য পাবে না, পাবেন কেবল সেই ভগবান—যাঁর কথা শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন ঃ "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।" পরবর্তী কালে কবি বলেছেন ঃ "পৃথিবীতে আছে শুধু এক জাতি/ সে-জাতির নাম মানুষ জাতি।"

পুরনো সহস্রাব্দ পশ্চিম আকাশকে লাল করে অস্তমিত হয়ে গিয়েছে, নতুন সহস্রাব্দ পুবের আকাশকে নব অরুণিমায় রাঙিয়ে দিয়ে নতুন শপথ নিয়ে উপস্থিত। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে আমরা আজ এক 'মানুষ জাতি' হিসাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই—পৃথিবীকে আরো সুন্দর, আরো সমৃদ্ধিশালী ও শান্তির আবাসরূপে গড়ে তুলব। ❑

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ১০

পাশাপাশি ঃ (১) চার, (৩) গান, (৫) জীব, (৭) মা, (৮) তত্ত্ব, (৯) রথ, (১০) মন, (১১) কাক, (১২) দেহ, (১৩) মহা, (১৪) কলা, (১৫) পাশ, (১৬) ভাব, (১৭) পাখি, (১৮) লাউ, (১৯) ভব, (২০) পানি, (২১) খই, (২২) আতা, (২৩) জড়, (২৪) কে, (২৬) লব, (২৮) মত, (৩০) মলয়, (৩১) টল, (৩২) নুন।

ওপর-নিচ ঃ (২) রতন, (৪) নরক, (৬) বরাহ, (৭) মা, (১০) মহাভাব, (১১) কালাপানি, (১২) দেশলাই, (১৯) ভক্ত, (২০) পাতাল, (২১) খড়ম, (২৪) কে, (২৫) জল, (২৭) বট, (২৯) তনু।

শব্দচেতনা ১০-এর সঠিক উত্তরদাতার নাম ঃ

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, মীনাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায়
নন্দদুলাল ঘোষ, রঞ্জু ঘোষ

ভারতবর্ষ তথা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি সর্বত্র মানুষের মধ্যে একটি দুর্বিষহ অস্থিরতা, নিরাপত্তাবোধের অভাব এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা চোখে পড়ছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক ও ভোগবিলাসের ক্রমবর্ধমান প্রসারে নানান রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বাঙালী যুবগোষ্ঠী আজ দিশাহারা। বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথই আজ তাদের ধ্রুবতারা, একথা ক্রমশ দিবালোকের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। অনেকের মনে নানান প্রশ্ন সময়ে সময়ে ওঠে, যার উত্তর তারা খুঁজে পায় না। প্রশ্নগুলি মূলত মূল্যবোধ এবং আদর্শভিত্তিক। রামকৃষ্ণ সংঘের প্রবীণ সন্ন্যাসীদের কেউ কেউ ঐসব প্রশ্নের উত্তর দিতে অনুগ্রহ করে সম্মতি জানিয়েছেন। তাই 'যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন' শীর্ষক একটি বিভাগ খোলা হলো। আনন্দের বিষয়, এই বিভাগে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ।—সম্পাদক

ঃ নিয়মাবলী ঃ

'যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন' বিভাগে প্রেরিত (ক) প্রশ্নগুলি সুনির্দিষ্ট হওয়া চাই। (খ) প্রেরকের পুরো নাম, ঠিকানা ও বয়স উল্লেখ থাকা চাই। (গ) প্রেরকের বয়স অনূর্ধ্ব ৩০ হওয়া চাই। (ঘ) সব প্রশ্নই গ্রাহ্য হবে—এমন বলা যায় না। অনেক সময়ে এমন হতে পারে, একটি প্রশ্নের মধ্যে অন্যগুলির উত্তর সন্নিবেশিত হয়ে আছে। সেক্ষেত্রে প্রশ্নপ্রেরকের মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ নেই। কারণ, প্রশ্নের উত্তর পেলেই প্রশ্নকর্তা তৃপ্ত হবেন, আশা করি। তাঁর নাম প্রকাশিত হলো কি হলো না সে-ব্যাপারটি নিতান্তই গৌণ থাকুক, এই আবেদন জানিয়ে রাখি।—সম্পাদক

প্রশ্ন ঃ *বিবেকানন্দ-অনুরাগী কোন একুশ বছরের যুবক যদি দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করতে চায়, তবে কোন্ পথের পথিক হওয়া উচিত—রাজনীতি, আমলাতন্ত্র, না রামকৃষ্ণ মিশনে সন্ন্যাস?*

—তপোস্মিত সেনগুপ্ত, শিলিগুড়ি

উত্তর ঃ যে-পথেই দেশসেবা করা হোক না কেন, তা নিঃস্বার্থভাবেই হওয়া উচিত। কাজেই তা রাজনীতির মাধ্যমে হবে, না আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে হবে, না রামকৃষ্ণ মিশনে সন্ন্যাসগ্রহণের মাধ্যমে হবে—সেবিষয়ে নিজেই বিবেচনা করে ঠিক করতে হবে। তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই স্বার্থপরতা ত্যাগ না করলে হবে না। আর তার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করে সন্ন্যাস নিতে হবে—এমন কোন কথা নেই।

প্রশ্ন ঃ *(ক) 'ইষ্টদেবতা' বা 'ঈশ্বর' দর্শনের উপায় কি? (খ) যুবসম্প্রদায় আজ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শের সঙ্গে যুক্ত হলে নিজের স্বরূপ ফিরে পাবে কি? (গ) গৃহী ভক্তের জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা কতখানি?*

—সঞ্জয় বিশ্বাস, নোহারী, অরুণাচল প্রদেশ

উত্তর ঃ (ক) ঈশ্বরলাভের সাধনায় নিজেকে পূর্ণমাত্রায় নিয়োজিত করাই হলো ঈশ্বরদর্শনের উপায়। এজন্য চাই তীব্র ব্যাকুলতা।

(খ) নিজের স্বরূপ কোন ব্যক্তি কখনো হারায়নি। কিন্তু সেই বিষয়ে সচেতনতা নেই। তাই সেই 'হুঁশ' ফিরে পাওয়ার জন্য শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে যুক্ত হলেই হবে না, তার মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে দিতে হবে। তাহলেই আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে নিজের মধ্যে সেই সচেতনতা ফিরে আসবে। আর নিজের স্বরূপ বলতে যদি সাধারণভাবে বলতে চাও যে সৎ চরিত্র, পবিত্রতা, অন্যের প্রতি ভালবাসা ইত্যাদি, তাহলে তাও অর্জন করতে সক্ষম হবে পূর্বোক্ত পথে ঠিক ঠিক লেগে থাকতে পারলে। আরেকটু পরিষ্কার করে বললে—সচেতনভাবে নিঃস্বার্থপর হয়ে জীবনযাপন করলে অথবা সেবা করলে নিজের ভিতর থেকে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা আসবে, তার দ্বারাই যুবসমাজ নিজের স্বরূপ জানতে পারবে।

(গ) ধর্মের প্রয়োজনীয়তা বা অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যেকোন ব্যক্তিকে নিজেই অনুভব করতে হবে। তবে গৃহী ভক্তেরা ধর্মজীবনের অনুগামী হলে সংসারের বহু দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও জীবনে প্রকৃত শান্তি অনুভব করতে সমর্থ হবেন। এই শান্তি ও আনন্দ একমাত্র ধর্মপথে থাকলেই পাওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ *কুলকুণ্ডলিনী কি? সেটি কোথায় থাকে? ঠাকুর যে কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়ে তোলার কথা বলেছেন, সেই পথে কি পরমব্রহ্মকে লাভ করা যেতে পারে? সাধারণ সাধকের পক্ষে এটি কি সম্ভব?*

—সব্যসাচী দে, মোহনপুর, মেদিনীপুর

উত্তর ঃ এই স্বল্প পরিসরে কুণ্ডলিনী কি তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। শাস্ত্র বলেন যে, আমাদের মেরুদণ্ডের সর্বনিম্ন প্রদেশে অর্থাৎ মূলাধারে (বা মূলাধার চক্রে) কুলকুণ্ডলিনী শক্তির অবস্থিতি। অধ্যাত্মসাধনার পথে অগ্রসর হলে ঐ শক্তি অন্যান্য চক্রগুলি (সহস্রার বা মস্তক বাদে মোট ছয়টি চক্র অর্থাৎ মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র

সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলা হয়েছে) অতিক্রম করে সহস্রারে উপনীত হন। বিভিন্ন চক্রে কুলকুণ্ডলিনীর গমনের সময় সাধকের বিভিন্ন ধরনের আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়। সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সহস্রারে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে থাকে। অতএব সাধক সাধারণই হোন বা অসাধারণই হোন আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্য কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ আবশ্যক। এই শক্তির জাগরণ যেকোন আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমেই হয়। স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' গ্রন্থ বা যোগশাস্ত্র বা তন্ত্রশাস্ত্রের কোন প্রাথমিক গ্রন্থ পড়লে এই বিষয়ে আরো জানা যাবে।

প্রশ্ন ঃ *ঠাকুর বলেছেন, বেশি কাজকর্মে না জড়িয়ে ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখ। অপরদিকে স্বামীজী কাজের কথা বলেছেন। ঠাকুর বললেন, ভগবান কি স্কুল, হাসপাতাল করে দেবেন? অন্যদিকে স্বামীজী মানবসেবা, অন্নসেবা ইত্যাদির কথা বলেছেন। এর মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায় বা কিভাবে করব?*

—শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, সাঁকরাইল

উত্তর ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলেছেন ও স্বামীজী যা বলেছেন—এই দুয়ের সামঞ্জস্য এইভাবে হতে পারে যে, দুটিই ঈশ্বরলাভের উপায়। যাকিছু করা যাক না কেন প্রাধান্য দিতে হবে ঈশ্বরলাভের প্রতি। যতক্ষণ না নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন করা যাচ্ছে ততক্ষণ নিঃস্বার্থভাবে মানবসেবা করলে চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে ঠিক ঠিক মানবসেবা অসম্ভব। অতএব শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা এক শ্রেণীর সাধকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আর স্বামীজীর কথা অপর এক শ্রেণীর সাধকের জন্য প্রয়োজন।

প্রশ্ন ঃ *আমি অরুণাচল প্রদেশের ইটানগরে থাকি। বেলুড় মঠ থেকে অনেক দূরে থাকি বলে বেলুড় মঠ বা রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারি না। এত দূরে থেকে আমি কিভাবে ঠাকুরের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারব তা দয়া করে জানাবেন। প্রসঙ্গত বলে রাখি, এখানে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি হাসপাতাল আছে। মাঝেমধ্যে সেখানে গেলেও কাজের প্রচণ্ড চাপে সবসময় যেতে পারি না। তাই আমার উপরি উক্ত প্রশ্নটি রাখলাম।*

—গুঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, অরুণাচল প্রদেশ

উত্তর ঃ তুমি ইটানগরে থাক। কাজের চাপে ইটানগরের রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রে খুব একটা যাওয়া সম্ভব হয় না। কাজেই ওখানে থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মসূচীতে কিভাবে অংশগ্রহণ করবে? তবে একটা কাজ করতে পার। নিজের দৈনন্দিন জীবনকে সৎপথে নিয়ন্ত্রিত করে আধ্যাত্মিক জীবনযাপন কর এবং যখন সময়-সুযোগ পাবে তখন যথাসাধ্য কিছু নিঃস্বার্থ সেবা করতে চেষ্টা করো। এই সেবার সুযোগ তুমি শুধু রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র কেন, যেকোন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই নিতে পার। শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর নির্দেশমত সেবার আদর্শটি নিজের মধ্যে পরিষ্কার করে রাখা দরকার। ঠাকুর-স্বামীজীকে যত যত ভালবাসবে তত তত সেবা ঠিক ঠিক হবে।



সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

(গ্রাহকদের জন্য)

১। ডাক বিভাগের বন্দোবস্ত অনুযায়ী ইংরেজী মাসের ২৩ (অথবা ২৪) তারিখে 'উদ্বোধন' পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট বাঙলা মাস অনুযায়ী ৮ বা ৯ তারিখ হয়। গ্রাহকদের প্রতি অনুরোধ পত্রিকা সময়মতো না পেলে পরবর্তী ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করে তবেই আমাদের দপ্তরে চিঠি দিয়ে জানাবেন। সম্ভব হলে আমরা একটি অতিরিক্ত কপি পাঠাব। কোন গ্রাহককে বছরে দুটির বেশি অতিরিক্ত কপি দেওয়া সম্ভব নয়। তিনমাস হয়ে গেলে এই অতিরিক্ত কপি দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

২। ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) যাঁরা পত্রিকা সংগ্রহ করেন তাঁরা ইংরেজী মাসের ২৫ তারিখ থেকে পত্রিকা সংগ্রহ করে নিতে পারেন। যদি কোন গ্রাহকের পত্রিকা নিতে দেরি হয় তিনি অবশ্যই দুমাসের মধ্যে পত্রিকাটি সংগ্রহ করবেন। নাহলে পত্রিকাটি পাওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। আশা করি সহৃদয় গ্রাহকগণ পত্রিকা দপ্তরের অসুবিধার কথা চিন্তা করে উপরি উক্ত নিয়মগুলি যথাযথ পালন করবেন।

বিবেকানন্দের রচনায় বাঙলা গদ্যরীতি*

দেবী মুখোপাধ্যায়

উনিশ শতকের বাঙলা গদ্যে হুতোম-নকসা ও আলালী রীতির সঙ্গে বিদ্যাসাগর-মৃত্যুঞ্জয়-বঙ্কিমী রীতির মেলবন্ধন হতে পেরেছিল কিনা, অথবা বিভিন্ন লেখকের রচনায় এই দুই রীতি সমান্তরাল চলতে চলতে প্রথমটি অপেক্ষাকৃত অব্যবহারের ফলে শীর্ণ ও ব্রাত্য হয়ে গিয়েছিল কিনা—এবিষয়ে বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও গবেষণার অবকাশ আছে। উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে যাঁরা এই উভয় রীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং উপজীব্য বিষয়ের দাবি মেনে নিয়ে প্রকরণ নির্মাণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম অবশ্যই স্বামী বিবেকানন্দ।

সব ভাষাতেই যেটা স্বাভাবিক—ভৌগোলিক এলাকা সাপেক্ষে নানা উপভাষা থাকে তাদের নিজস্ব উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যে, শব্দসম্ভার ও স্থানিক সমাজভাষাতাত্ত্বিক বৈচিত্র নিয়ে, বাঙলা ভাষারও তেমনি অঞ্চলবিশেষে উপভাষিকতা বর্তমান, যাতে সেই সেই অঞ্চলের মাটি-জল-বাতাস-উদ্ভিজ্জ প্রকৃতি ও লৌকিক আচার-উপাদান ও ধ্বনিবৈশিষ্ট্য ওতপ্রোত হয়ে থাকে। কিন্তু ক্রমশ কোন একটি বিশেষ এলাকার উপভাষা মুখ্য হয়ে উঠে তাবৎ অঞ্চলের মান্য উপভাষা হিসাবে নিজের স্থান করে নেয়—যে-এলাকা সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক কারণে একটি ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা ও জীবিকার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে গড়ে ওঠে। এই উপভাষা শিষ্ট শিক্ষিত নাগরিকদের মৌখিক ব্যবহারের ফলে মার্জিত হতে থাকে, আঞ্চলিক গ্রাম্যতা, স্থূলত্ব, কিছুটা তথাকথিত অশ্লীলতা ঝেড়ে ফেলে দিতে থাকে। সভা-সমিতি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সভ্য ও ভব্য ভাববিনিময় মাধ্যম হিসাবে শিষ্টজনগ্রাহ্য এক মান্য রূপ লাভ করে।

এইভাবেই উনিশ শতকের কলকাতা ও তৎসংলগ্ন গঙ্গার উভয় তীরের কথ্যভাষা সারা বাংলার মান্য চলিত-ভাষা হয়ে বাঙালির জীবনে ও সাহিত্যে মান্যতা পেয়েছে। বিবেকানন্দ একটি বিখ্যাত নাতিদীর্ঘ (অনধিক ৬০০ শব্দ-সমন্বিত) প্রবন্ধে এই বিষয়ে মূল্যবান, তর্কাতীত ও যুক্তিনিষ্ঠ মন্তব্য রেখেছেন—যা শিক্ষিত বাঙালি মাত্রই অবগত আছেন। প্রবন্ধটির নাম 'বাঙ্গালা ভাষা'।

এই প্রবন্ধের কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করা যাক—''যদি বল... বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা। পূর্ব-পশ্চিম যেদিক হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্ ভাষা লিখতে হবে, যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে তত পূর্ব-পশ্চিমী ভেদ উঠে যাবে।... কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশি নিকট—সেকথা হচ্ছে না, কোন্ ভাষা জিতছে, সেইটি দেখ।... যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে-কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন।... সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে।''

এই বক্তব্য প্রকাশের পরে প্রায় শতবর্ষ ধরে প্রাকৃতিক নিয়মেই বুদ্ধিমান বাঙালি 'পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে-কথা-কওয়া ভাষা'কে এক করতে প্রযত্ন করে চলেছেন এবং 'কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ' করেছেন। কারণ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে যে-ভাষা জিতছে তাকে গ্রহণ করাতেই দেশের কল্যাণ।

কিন্তু 'কলকেতার ভাষা' উনিশ শতকের শেষভাগে যেমনটি ছিল, আজ একবিংশ শতকের প্রারম্ভে আর তেমনটি নেই। কারণ, ভাষা বহতা নদীর মতো, কালে কালে তার শব্দ-উপাদান, ব্যাকরণগত বিন্যাস ও উচ্চারণরীতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে চলে। এই পরিবর্তনের মধ্যেও একটি মান্য চলিতভাষা (কলকাতার শিষ্ট চলিতভাষা) বাঙলা সাহিত্যে স্থায়ী রূপলাভ করতে সমর্থ হয়েছে, আদরণীয় ও আদৃত হয়েছে (পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ—উভয় অঞ্চলের শিষ্ট কথনে ও লিখনে সমভাবে)। এরও মূলে রয়েছে 'পুস্তকের ভাষা' ও 'ঘরে-কথা-কওয়া ভাষা'র একীকরণের প্রয়াস। প্রসঙ্গত নমুনাস্বরূপ চারটি বিভিন্ন সময়ের লেখকের চলিতভাষা রচনার অংশবিশেষ উদ্ধার করা যাক, যাতে 'ঘরে-কথা-কওয়া ভাষা'র ক্রমশ মান্য চলিত হয়ে ওঠার পরম্পরা স্পষ্ট হবে।

[১] কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' থেকে—

(ক) ''অ্যাং যায়, ব্যাং যায়, খলসে বলে আমিও যাই, বামুন কাএতরা ক্রমে সভ্য হয়ে উঠলো দেখে সহরের নবশাক, হাড়িশাক, মুচিশাক মহাশয়রাও হামা দিতে আরম্ভ কল্লেন—ক্রমে ছোটো জেতের মধ্যেও দ্বিতীয় রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যেসাগর ও কেশব সেন জন্মাতে লাগলো—সন্ধ্যার পর দুগাছি আটা ও একটু ন্যাবড়ানোর বদলে ফাউলকারী ও রোলরুটি ইন্‌ট্রোডিউস্ হলো।''

(ক) ''চক্‌বাজারের বাবু প্যালানাথ একহারা বেঁটেখেঁটে মানুষ... সৌখীনের রাজা... সর্বদা পোসাক ও টুপি পরে

* স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা।

থাকেন... লক্ষ্ণৌ ফ্যাসানে (বাইয়ের ভেড়ুয়ার মতো) চুড়িদার পায়জামা রামজামা, কোমরে দোপাটা ও বাঁকা টুপি। বাবুর বাই ও খেমটা মহলে বড় মান। তাদের কোন দায় দফা পড়লে বাবু আড় হয়ে পড়ে আফোতের তামাম করেন... হিন্দুয়ানি মাথায় রেখে কাছা খুলে ফয়তা দেন।"

[২] **স্বামী বিবেকানন্দের 'ভাববার কথা' থেকে—**

(ক) "লক্ষ্ণৌ সহরে মহরমের ভারী ধুম।... বে-সুমার লোকের সমাগম।... দর্শকবৃন্দের ভিড়ের মধ্যে দূর গ্রাম হতে দুই ভদ্র রাজপুত তামাসা দেখতে হাজির। ঠাকুর-সাহেবদের —যেমন পাড়াগেঁয়ে জমিদারের হয়ে থাকে—'বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ'। সে মোসলমানি সভ্যতা, কাফ্-গাফের বিশুদ্ধ উচ্চারণসমেত লস্করী জবানের পুষ্পবৃষ্টি, আবা-কাবা চুস্ত-পায়জামা তাজ-মোড়াসার রঙ্গ-বেরঙ্গ সহরপসন্দ ঢঙ্গ অতদূর গ্রামে গিয়ে ঠাকুর-সাহেবদের স্পর্শ করতে আজও পারেনি। কাজেই ঠাকুররা সরল-সিধে, সর্বদা শিকার করে জমামরদ কড়াজান্ আর বেজায় মজবুত দিল্।"

১৮৯৪ সালে 'মঠে লিখিত' পত্র থেকে—

(খ) "কোন একটা স্বাধীন চিন্তা কাহারও মাথায় আসে না—সেই ছেঁড়া কাঁথা, সকলে পড়ে টানাটানি—রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন তেমন ছিলেন;... হরে হরে, বলি একটা কিছু করে দেখাও যে তোমরা কিছু অসাধারণ—খালি পাগলামি! আজ ঘণ্টা হল, কাল তার উপর ভেঁপু হল, পরশু তার উপর চামর হল, আজ খাট হল কাল খাটের ঠ্যাঙে রূপো বাঁধানো হল—আর লোকে খিচুড়ি খেলে আর লোকের কাছে আষাঢ়ে গল্প ২০০০ মারা হল।... যাদের মাথায় ঐ রকম বেল্কোমো ছাড়া আর কিছু আসে না, তাদের নাম imbecile। ঘণ্টা ডাইনে বাজবে বা বাঁয়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়, পিদ্দিম দুবার ঘুরবে বা চারবার—ঐ নিয়ে যাদের মাথা দিনরাত ঘামতে চায়, তাহাদেরই নাম হতভাগা।... ঘণ্টার উপর চামর চড়ানো নয়, আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট বসব কি আধঘণ্টা বসব—এ-বিচারের নাম 'কর্ম' নয়, ওর নাম পাগলা-গারদ। ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী-বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে, এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন। এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে।... আমাদের দেশে মহা ব্যারাম, পাগলা-গারদ দেশময়।"

[৩] **রাজশেখর বসুর 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' থেকে—**

"দেখুন, অডিটর ফডিটর আমি বুঝি না।... ভারি আজকাল সব বুককিপিং শিখছেন। সে কি জানেন—একটা গোলকধাঁধা, কেউ যাতে না বোঝে তারই চেষ্টা। আমি বুঝি রোজ কত টাকা এল কত খরচ হল আর মজুদ রইল কত। আমি যখন আমড়াগাছি সাব-ডিভিশনের ট্রেজারির চার্জে, তখন এক নতুন কলেজ-পাশ গোঁফকামানো ডেপুটি এলেন আমার কাছে কাজ শিখতে। সে ছোকরা কিছুই বোঝে না অথচ অহঙ্কারে ভরা। আমার কাজে গলদ ধরবার আস্পর্ধা। শেষ লিখলুম কোল্ডহ্যাম সাহেবকে, যে হুজুর, তোমরা রাজার জাত, দু ঘা দাও তাও সহ্য হয়, কিন্তু দিশি ব্যাঙাচির লাথি বরদাস্ত করব না। তখন সাহেব নিজে এসে ছোকরাকে ধমকালেন, আমাকে পিঠ চাপড়ে হেঁসে বল্লেন, ওয়েল তিনকড়ি বাবু, তুমি হলে কত কালের সিনিয়র অফিসার, একজন ইয়ং চ্যাপ তোমার কদর কি বুঝবে? তারপর দিলেন আমাকে নওগাঁয়ে গাঁজা গোলার চার্জে বদলি করে।"

[৪] **বুদ্ধদেব বসুর 'প্রথম ও শেষ' থেকে—**

"দুটি বটগাছের চারা পাশাপাশি রোপণ করলে, তারা বেড়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় যেমন অবিচ্ছেদ্য কোলাকুলি হতে থাকে তেমনি এই ছবছর ধরে তুই আর আমি পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় অন্তরঙ্গতায় জড়িত হয়ে বড় হয়ে উঠেছি। আকাশেতে বাষ্পকণা আর সূর্যালোক দুইই তো থাকে, কিন্তু দুয়ের যখন মিলন হয় তখনই দেখা দেয় ইন্দ্রধনু। তুই আর আমি মিলে সেই মনোহরণ ইন্দ্রধনু সৃষ্টি করেছিলাম; তারি অন্তরালে ছিলো আমাদের মনের সীমাহীন রাজত্ব—এক মুঠো নীল কাপড়ের মত কূলহীন ক্ষয়হীন মৃত্যুহীন আকাশ।"

এই নমুনাগুলি সংগ্রহ করার সময় যথাসাধ্য সম-সম্ভাবনাপ্রত্যয়ী পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যময় শিষ্ট চলিত রীতি আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ এবং পরবর্তী কালের লেখকদের কাছে ঈর্ষণীয় ও অনুশীলনসিদ্ধ রীতি। এই বাক্যগুলির চলিত ক্রিয়াপদকে সাধু ক্রিয়াপদে স্থানান্তর করলেও এর শিষ্ট চলিতস্বাদের কোন ব্যত্যয় ঘটবে না। অথচ এই রীতি ও বাক্যগঠন-উপাদান সর্বাংশে 'ঘরে-কথা-কওয়া ভাষা' নয়। বিবর্তনের পথ বেয়ে, বিদ্যাসাগরীয়-বঙ্কিমী সাধু গদ্যরীতিকে সযত্নে পাশে সরিয়ে রেখে এক স্বতন্ত্র রীতির বিকাশ ঘটেছে এই রচনায়। সমকালীন অনেকের লেখায়, অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের 'সবুজপত্র'-উত্তর রচনাগুলিতে এই শিষ্ট পরিশীলিত রীতির ব্যবহার হয়েছে—শব্দ নির্বাচনে, ক্রিয়াপদ সংস্থানে এবং পদবিন্যাসে।

কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনায় ('হুতোম প্যাঁচার নকশা') 'কলকেতা'র ঐ 'ঘরে-কথা-কওয়া ভাষা'র মধ্যে স্বাভাবিক-ভাবেই যথেষ্ট ফারসি শব্দ ও অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন ইংরেজি শব্দের ব্যবহার দেখা গেল। বাক্যবিন্যাসে কিছুটা অশিষ্ট, অপরিশীলিত এবং লৌকিক কথ্যরীতির অবিকল প্রয়োগ হুতোম যেমন সাহসের সঙ্গে করেছেন (এবং টেকচাঁদ যেমন করেছেন আলালী ভাষায়), বিবেকানন্দের যে-রচনাংশটির উল্লেখ করা হয়েছে তাতেও এই সাহসী ও সাবলীল রীতির প্রয়োগ দেখা যায়।

এই প্রয়োগের আরো এক তাৎপর্য আছে। মাত্র চার দশকের মধ্যে প্রচণ্ড প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর এবং কর্মবহুল যে-জীবন বিবেকানন্দ অবিশ্বাস্য গতিময়তায় অতিবাহিত করে গেলেন, তার সঙ্গে তাল রেখেই যেন তাঁর গদ্যও নিঃসৃত হয়েছে দুরন্ত বর্ষার বেগদৃপ্ত ঝরনার মতো। তাই তাঁর শব্দব্যবহার তথাকথিত পরিশীলনবর্জিত, প্রয়োজনে ইংরেজি, ফারসি ও স্থূল লৌকিক কথ্য উপাদানবহুল। উদাহরণ—'লস্করী জবান', 'বে-সুমার', 'রঙ্গবেরঙ্গ সহর-পসন্দ', 'আষাঢ়ে গল্প ২০০০', 'বেল্‌কোমো', 'আঁটকুড়ির ব্যাটাদের গুষ্টির পিণ্ডি', 'খাটের ঠ্যাং' ইত্যাদি।

পরশুরামের বিদ্রূপাত্মক রচনার যে-ভাষা ও শব্দ-ব্যবহার পূর্বে প্রদত্ত তৃতীয় নমুনায় বর্তমান, তাতে বিবেকানন্দের বাক্‌রীতির অনুস্পন্দন অনুভব করা যায়। এমনকি সাধুভাষায় লিখিত তাঁর রচনাগুলির সাধু ক্রিয়াপদ-গুলিকে চলিতরূপে লিখে নিলে শিষ্ট চলিত বাঙলা লিখনরীতির মনোজ্ঞ নিদর্শন তৈরি হবে।

বিবেকানন্দ বাঙলা গদ্যরীতির অপর এক প্রাতিষ্ঠানিক ধারাতেও অনেক নিবন্ধ ও পত্র রচনা করেছেন, তা হলো বিদ্যাসাগর-মৃত্যুঞ্জয়-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যিকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত ও সমৃদ্ধ সাধুরীতি। 'কলকেতা'র 'ঘরে-কথা-কওয়া ভাষা'য় লিখিত গদ্যরচনাগুলির (যা মুখ্যত রসরচনা ও রঙ্গব্যঙ্গমিশ্রিত তাৎকালিক সমাজচিত্র সম্বলিত ছিল) সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েই উপজীব্য বিষয়ের গাম্ভীর্য, কৌলীন্য ও গুরুত্ব অনুযায়ী তৎসম শব্দবহুল, সমাসবদ্ধ, দীর্ঘ বাক্য-সমন্বিত গদ্যরূপ প্রবর্তন করতে হয়েছিল—যার পথিকৃৎ রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্রে যার পূর্ণতা প্রাপ্তি। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ 'ঘরে-কথা-কওয়া' চলিত-ভাষা ও ভাবগাম্ভীর্যবাহী শিষ্ট সাধুরীতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। তার কয়েক দশক পরে বিবেকানন্দের রচনায় এই বিবর্তনধর্মী সাধুরীতির সার্থক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কিছু উদাহরণ দিলে বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

[ক] (১) **বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' থেকে—**

"এই প্রস্তরমূর্তিসকল যে খোদিয়াছিল—এই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণভূষিত বিকম্পিত বেলাঞ্চল প্রবৃদ্ধসৌন্দর্য সর্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্তিমান সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্তি যাহারা গড়িয়াছে তাহারা কি হিন্দু? এই কোপপ্রেমগর্বসৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিত-রত্নহারা পীবরযৌবনভারাবনতদেহা... স্ত্রীমূর্তি যাহারা গড়িয়াছে তাহারা কি হিন্দু?"

(২) **বিবেকানন্দের 'বর্তমান সমস্যা' থেকে—**

"ক্ষুৎপিপাসা-কাম-ক্রোধাদি-বিতাড়িত, সৌন্দর্যতৃষ্ণাকৃষ্ট ও মহান অপ্রতিহতবুদ্ধি, নানাভাবপরিচালিত একটি অতি বিস্তৃত জনসঙ্ঘ সভ্যতার উন্মেষের প্রায় প্রাক্কাল হইতেই নানাবিধ পথ অবলম্বন করিয়া যে স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন—ভারতের ধর্মগ্রন্থরাশি, কাব্যসমুদ্র, দর্শনসমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ত্রশ্রেণী, প্রতি ছত্রে তাঁহার প্রতি পদবিক্ষেপ, রাজাদিপুরুষবিশেষবর্ণনাকারী পুস্তকনিচয়াপেক্ষা লক্ষগুণ স্ফুটীকৃতভাবে দেখাইয়া দিতেছে।"

[খ] (১) **বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত' থেকে—**

"সে প্রফুল্লতা, সে সুখ আর নাই কেন? আকাশের নীলিমায় আর সে উজ্জ্বলতা থাকে না কেন? যাহা তৃণপল্লবময়, কুসুমবাসিত, স্বচ্ছকল্লোলিনীশীকর-সিক্ত, বসন্তপবনবিধূত বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহা বালুকাময়ী মরুভূমি বলিয়া বোধ হয় কেন? যৌবনে অর্জিত সুখ অল্প কিন্তু সুখের আশা অপরিমিতা। এখন বুঝিয়াছি যে, সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে তরঙ্গে আমাকে প্রহত করিয়া আবার আমাকে কূলে ফেলিয়া যাইবে।"

(২) **বিবেকানন্দের 'বর্তমান সমস্যা' থেকে—**

"কয়জন এ জগতে সত্ত্বগুণ লাভ করে—এ ভারতে কয়জন? সে মহাবীরত্ব কয়জনের আছে যে, নির্মম হইয়া সর্বত্যাগী হন? সে দূরদৃষ্টি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ হয়? সে বিশাল হৃদয় কোথায়, যাহা সৌন্দর্য ও মহিমাচিন্তায় নিজ শরীর পর্যন্ত বিস্মৃত হয়? যাঁহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়, আর এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য কোটি কোটি নরনারীকে সামাজিক আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে?... দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল।"

[দ্বিতীয় গদ্যাংশটিতে স্পষ্টতই প্রথমটির গদ্যরীতির সাদৃশ্য বর্তমান।]

এখন স্বয়ং বিবেকানন্দকে একটি প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে। তিনি যে বলেছিলেনঃ "চলিতভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে?... যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর... সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়?" ('বাঙ্গালা ভাষা') তাহলে তিনি নিজে বক্তব্য প্রকাশের জন্য এই 'অস্বাভাবিক', 'অপ্রাকৃতিক', 'কল্পিত' ভাষারীতিকে গ্রহণ করলেন কেন? উপজীব্য ভাব, ভাবনা, idea কি এই রীতির দাবি করেছিল—যাতে মনে হয়েছিল, 'সংস্কৃতের গদাই লস্করি চাল নকল করে' যে কৃত্রিম সাধুভাষার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তাকেও সময়বিশেষে বা বিষয়বিশেষে গ্রহণ করতে হয়? এবং বলা বাহুল্য, এই সাধুরীতিতে গদ্য রচনায় তিনি সমান পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁর রচনাবলী পাঠ করলে যেকোন পাঠক তাঁর গদ্যের বলিষ্ঠতা ও সাবলীলতার পরিচয় পাবেন।

পরিশেষে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের দিকে মনোযোগ দেওয়া যাক। ভাষা, উপভাষা ও মান্য উপভাষার সংজ্ঞা ও

বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আধুনিক সমাজভাষাবিজ্ঞান (socio-linguistics) যেভাবে আলোকপাত্ করে, ভাষার ওপর সমাজের প্রভাব তথা সমাজক্রিয়ার ওপর ভাষার প্রভাব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ও বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা উপহার দেয়, বিবেকানন্দের 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি প্রায় শতবর্ষ পূর্বে লিখিত হলেও সেই চিন্তারই আভাস দেয়। অপরদিকে, এই প্রবন্ধের কয়েকটি বাক্য ও ভাষা মনস্তত্ত্বের কিছু মৌলিক ধারণাকে সমর্থন করে। বিস্ময়করভাবে কয়েকটি বাক্যাংশ ভাষা-মনস্তত্ত্বের বিতর্কিত ক্ষেত্রগুলিকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। যখন তিনি লিখছেন ঃ "যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর,... যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর...", তখন তিনি স্পষ্টতই অনুমান করছেন যে, আমরা কথা বলার ভাষা দিয়ে দর্শন-বিজ্ঞান গবেষণার চিন্তা করি। সত্যই কি আমরা ভাষা দিয়েই চিন্তা করি, এবং যদি করি, তবে সে-ভাষা কি আটপৌরে কথা বলার চলিতভাষা? মস্তিষ্কের ভাষা-উৎপাদনক্ষেত্র চিন্তাক্ষেত্রকে উদ্দীপিত করে, না চিন্তা একটা ভাষা-নিরপেক্ষ ব্যাপার, যা প্রকাশের প্রয়োজন পড়লে তবেই ভাষাক্ষেত্রকে নির্দেশ পাঠায় বাক্য তৈরি করার জন্য—স্নায়ুমনস্তত্ত্বের কাছে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে কি? যদি মেনে নেওয়াই যায় যে, আমরা বিমূর্ত বিষয়ের চিন্তাকে সংগঠিত ও পল্লবিত করার জন্য ভাষার দ্বারস্থ হই, তবে তো একথাও মেনে নিতে হয়, কোন্ প্রকার চিন্তার জন্য কোন্ প্রকার ভাষারীতি (language mode) উপযোগী তাও বেছে নিই আমরা, এবং সেই ভাষারীতি, লৌকিক চলিত উপভাষা, মান্য চলিত উপভাষা, অথবা তৎসম শব্দবহুল সমাসবদ্ধ পদসমন্বিত (সম্ভবত হ্রস্ব ক্রিয়াপদ/ কথ্যরীতির ক্রিয়াপদ দিয়ে গড়া) শিষ্টরীতি—এসবের কোন একটি হতে পারে বিষয়সাপেক্ষে।

ভাবতে অবাক লাগে, ভাষামনস্তত্ত্বের এত সূক্ষ্ম বোধ ও জিজ্ঞাসা কত দশক আগে বিবেকানন্দের রচনায় আভাসিত হয়েছিল! ❑

শব্দচেতনা ১২

স্বামীজীর জীবন, বাণী ও রচনাকে ভিত্তি করে তৈরি বিশেষ শব্দছক

■	১		■	২		■	৩	
৪		■	৫		■	৬		■
	■	৭		■	৮		■	৯
■	১০		■	১১		■	১২	
১৩		■	১৪		■	১৫		■
	■	১৬		■	১৭		■	১৮
■	১৯		■	২০		■	২১	
২২		■	২৩		■	২৪		■
	■	২৫		■	২৬		■	২৭

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ভাদ্র ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

পাশাপাশি ঃ (১) ভুবনেশ্বরী দেবী এই বলে তাঁর দুরন্ত ছেলের মাথায় জল ঢালতেন (২) স্বামীজী বলেছেন, ভারতবাসীকে আগে এইটি দান করতে হবে (৩) স্বামীজী আক্ষেপ করেছেন যে, এই মহাত্মার দেশে আজ ব্রহ্মচর্যের হানি (৪) পরিব্রাজক অবস্থাতেই স্বামীজী এইটি দান করতে শুরু করেন (৫) রাজযোগে স্বামীজী বলছেন ঃ "সাধারণ লোকের শরীরে সুষুম্না নিম্নদিকে ——।" (৬) স্বামীজীর এই জিনিসটি একদিন ঠাকুরের কাছে আলুনি লেগেছিল (৭) " 'দাও, দাও'—যেবা ফিরে চায়, তার —— বিন্দু হয়ে যান।" (৮) ভারতবাসীর মতো আমেরিকাবাসীকেও স্বামীজী এই সম্বোধন করেছেন (১০) "সে ধারাও —— হলো, শূন্যে শূন্যে মিলাইল।" (১১) "জগৎটা হচ্ছে একটা পুষ্পাচ্ছাদিত ——।" (১২) "এর খনি ছেড়ে কাচখণ্ডের অন্বেষণে যেও না।" (১৩) "নিঃশেষে নিভেছে তারা ——" (১৪) "ভারতের উদ্দেশ্য হলো——।" (১৫) "আমি দ্রষ্টা, সাক্ষী; আমি —— নই।" (১৬) "গরজে গঙ্গা জটা ——, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে।" (১৭) ঠাকুর বলেছেন ঃ "নরেন্দ্র মায়ের হাতের ——।" (১৯) স্বামীজী যুবকদের উদ্দেশে বলেছেন ঃ "—— হইতে যাইও না, সেবা কর।" (২০) "ধর্ম তরে করি কত ——, গঙ্গাতীর শ্মশান আলয়।" (২১) "প্রত্যূষ ও গোধূলি এই দুই সময়ে প্রকৃতি —— থাকে।" (২২) "ওর —— নাহি জানি।" (২৩) "আমাদের পরিচালিত করার জন্য তাঁর মঙ্গল —— প্রসারিত হবে।" (২৪) "দিবে শক্তি সে জননী তোমা —— হীন।" (২৫) "ভক্তার্জন যুগল-চরণ তারণ-ভব ——।" (২৬) "প্রাণায়াম —— প্রশ্বাসের ক্রিয়া নয়।" (২৭) স্বামীজী যাঁর সম্পর্কে গুরুভাইদের বলেছেন ঃ "এঁকে তোমরা কেউ চেননি।"

ওপর-নিচ ঃ (১) ভারতীয় নারীর এখন এই জিনিসটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বলে স্বামীজী মনে করেছেন। (২) এই বিশ্বাসকে বিদ্রূপ করায় ঠাকুর স্বামীজীকে বলেছিলেন ঃ "বিশ্বাস আবার দুরকম হয় নাকি?" (৩) পাশ্চাত্যে স্বামীজী এই উপনিষদ্‌বাণী উচ্চারণ করলেন ঃ "—— দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণ।" (৪) "মহামহীয়ান যিনি —— হতে দীন।" (৫) দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দিন যাওয়ার সময়ে এরাও দু-একজন স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন। (৬) "—— গীত শুনাতে তোমায়।" (৭) ঠাকুর বলতেন ঃ "নরেন্দ্র ধ্যান ——।" (৮) "—— দেখি, কেমনে পৃথিবী আছিল প্রতীক্ষারত কতকাল।" (৯) মিসেস ওলি বুলকে স্বামীজী ডাকতেন '—— মাতা' বলে। (১০) "সাধুতাই, পবিত্রতাই ——।" (১১) "আমেরিকায় দেখেছি 'যা দেবী সর্বভূতেষু ——রূপেণ সংস্থিতা'।" (১২) "অতীত-আগামি-কাল——" (১৩) ঠাকুর স্বামীজীকে সব কিছু খেতে দিতেন, কারণ তাঁর ভিতরকার জ্ঞানাগ্নিতে সব —— হয়ে যায়। (১৪) "—— বারি বানোয়ারী সেঁইয়া যানে কো দে।" (১৫) "ওদেশে যাদের —— দিয়েছি তারা সবাই ব্রাহ্মণ।" (১৬) স্বপ্নে এঁর মৃত্যু দেখে বিচলিত স্বামীজী সত্যতা যাচাই করতে এক পিশাচসিদ্ধের কাছে গিয়েছিলেন (১৭) "—— উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।" (১৮) স্বামীজী বেলুড় মঠে এই দুর্গার পূজা করতে চেয়েছিলেন। (১৯) এই বিচারের দ্বারাই নির্বিকল্প সমাধি হয় (২০) "আমাদের জাতের এই এক —— দোষ, ঈর্ষা আর পরশ্রীকাতরতা।" (২১) "মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও ——" (২২) ঠাকুরের কাছে শোনা এগুলিই স্বামীজী পাশ্চাত্যে ধর্ম ব্যাখ্যাকালে বলতেন (২৩) "—— হর হর ভূতনাথ, পশু-পতি।" (২৪) সাধারণের কাছে ঐহিক বিষয়ে বক্তৃতার পারিশ্রমিকে স্বামীজী ধর্ম-সম্বন্ধীয় ——টি চালাতেন।

সূত্র ঃ শুক্লা পাঠক

অমরাবতী অমরনাথ

স্বামী প্রসন্নাত্মানন্দ



"বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণম্
বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিম্।
বন্দে সূর্য-শশাঙ্কবহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ম্
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ং চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম্।।"

এই সেই মহাতীর্থ, ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে যা দর্শন করে স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে বলেছিলেন ঃ "আমি কী আনন্দই উপভোগ করিয়াছি! আমার মনে হইতেছিল যে, তুষারলিঙ্গটি সাক্ষাৎ শিব! আর তথায় কোন বিত্তাপহারী ব্রাহ্মণ (পাণ্ডা) ছিল না, কোন ব্যবসায় ছিল না, কোন কিছু খারাপ ছিল না; সেখানে কেবল নিরবচ্ছিন্ন পূজার ভাবই ছিল। আর কোন তীর্থক্ষেত্রেই আমি এত আনন্দ উপভোগ করি নাই।"[১] ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দও এখানে এসেছিলেন।

১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাস। অসংখ্য পুণ্যার্থীর সঙ্গে আমিও চলেছি সেই অমরনাথ তীর্থ দর্শনে। যাঁরা অমরনাথ দর্শন করেছেন বা যাঁরা করেননি সবাই অমরনাথের যাত্রাপথ সম্বন্ধে কিছু না কিছু গল্প শুনিয়েছেন। ফলে কৌতূহল, কল্পনা এবং যাত্রার ক্লেশ সম্বন্ধে একটা মানসিক প্রস্তুতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল। শুনেছি আগে নাকি পহেলগাঁও থেকে হাঁটতে হতো। পথও ছিল দুর্গম। না ছিল খাওয়ার ব্যবস্থা, না ছিল থাকার। একটা আটজনের তাঁবুতে চার লাইনে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জনকে হাঁটু মুড়ে বসে রাত কাটাতে হতো। তাছাড়া বৃষ্টি, তুষারপাত আর হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা তো ছিলই।

গত দুবছর যাত্রীরা অমরনাথ দর্শনে যেতেই পারেননি। যাঁরা খুব ভাগ্যবান তাঁরা গতবছর (১৯৯৬) একেবারে প্রথমদিকে দর্শন করেছেন। ১৯৯৫-তে উগ্রপন্থীদের দৌরাত্ম্য হাজার হাজার ভারতবাসীকে সরিয়ে রেখেছিল দেবাদিদেব মহাদেবের দরবার থেকে। আর ১৯৯৬-তে যাত্রার মাঝপথে হয়েছিল ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। তাই এবছর প্রথম থেকেই ছিল একটা সাজ-সাজ রব।

জম্মু-কাশ্মীর সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার যৌথ উদ্যোগে বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন এবছর অমরনাথ দর্শনের জন্য। পুরাণে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের বর্ণনায় কাশ্মীরে কোন শিবলিঙ্গের উল্লেখ নেই। জ্যোতির্লিঙ্গ অনাদি। এঁকে প্রতিষ্ঠা করা হয় না। যিনি প্রথম পূজা করেন তাঁর নাম অনুসারে নাম হয় শিবলিঙ্গের। অনেকের মতে, কাশ্মীরের কপিলেশ্বরই পরবর্তী কালে অমরনাথ হয়েছেন। কারণ, মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে বলা হয়েছে—

"হরিদ্বারে মহেশানি গঙ্গাধর ইতি স্মৃতঃ।
বদরিকাশ্রম মধ্যে কপিনাথেশ্বরোঽহম্।।
রজতাচল মধ্যে তু কুবেরেশ্বর ঈড়িতঃ।
অযোধ্যায়াং কৃত্তিবাসো কাশ্মীরে কপিলেশ্বরঃ।।"

চলেছি সেই কপিলেশ্বর দর্শনে। জুন মাসের গোড়ায় কলকাতার ১২ জওহরলাল নেহরু রোড থেকে নেওয়া হয়েছিল অমরনাথ যাওয়ার অনুমতিপত্র। বাংলা, বিহার, ওড়িশা মিলে এই কেন্দ্র থেকে তিনহাজার আবেদনপত্র বিলি করা হয়েছে বিনামূল্যে। এরপর ডাক্তারি পরীক্ষা। সংগ্রহ করতে হয় সুস্থ শরীরের প্রমাণপত্র, সঙ্গে রাখতে হয় দুটি পাসপোর্ট ছবি। কিন্তু পহেলগাঁওতে গিয়ে দেখি বাধানিষেধের এত কড়াকড়ি নেই। যাইহোক, অবশেষে অমরনাথ দর্শনের সরকারি ছাড়পত্র গলায় ঝুলিয়ে ১৭ জুলাই জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেসে বেলা সাড়ে এগারোটায় আমরা চারজন সন্ন্যাসী এসে পৌঁছালাম জম্মু স্টেশনে। ট্রেনে অর্ধেকের ওপরই অমরনাথ-যাত্রী। স্টেশনমাস্টার থেকে শুরু করে অটোওয়ালা প্রত্যেকেই অমরনাথ-যাত্রীদের জন্য শশব্যস্ত। একটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করার মতো। জম্মুতে—বিশেষত যাঁরা হিন্দু আছেন, অমরনাথ-যাত্রীদের সাহায্য করাকে তাঁরা একটি নৈতিক ও ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করেন, তাই বছরের এই সময়টির জন্য তাঁরা অপেক্ষা করেন।

১ যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৩য় খণ্ড, ৫ম সং, পৃঃ ১৩০

সেদিন বিকালেই পহেলগাঁও যাওয়ার জন্য বাসের টিকিট কাটা হলো জনা প্রতি ৯৫ টাকায়। জম্মু থেকে পহেলগাঁওয়ের দূরত্ব প্রায় ২৯৪ কিলোমিটার। সময় লাগে ১২ ঘণ্টার মতো। পরদিন ভোর ৩টের সময় উঠে তৈরি হয়ে নিয়ে যখন ৪.১৫ মিনিটে বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছালাম, তখন টিপ্‌টিপ্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে। বাস টার্মিনাসের সামনে ভিড়, কারণ যাত্রীদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তল্লাশি হচ্ছে। সঙ্গে মালপত্রের তালা খুলে আমরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালাম। মেটাল ডিটেক্টর ও নানারকম আধুনিক যন্ত্র দিয়ে সব পরীক্ষা করে তবে বাসে ওঠার অনুমতি পেতে হবে। এখান থেকেই যাত্রীদের সমস্ত দায়দায়িত্ব আধা সামরিক বাহিনীর বি. এস. এফ.-এর কর্তৃত্বে চলে যাচ্ছে। এবছর অমরনাথ-যাত্রার মূল তদারকিতে আছেন সি. আর. পি., মিলিটারি এবং কয়েক ব্যাটেলিয়ান বি. এস. এফ.-এর জওয়ানরা। এঁদের অতন্দ্র প্রহরা, পরমাত্মীয়ের মতো ব্যবহার, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা আর অকল্পনীয় সহযোগিতা এবারের অমরনাথ-যাত্রাকে অন্যান্য বারের তুলনায় অনেক সহজ ও নিশ্চিন্ত করেছে। সামনে, মাঝে, পিছনে বুলেটপ্রুফ মিলিটারি গাড়ি, অমরনাথ গুহা অবধি রাস্তার প্রতি বাঁকে, বাড়ির ছাদে, পাহাড়ের ওপর, গাছ-গাছালির ঘন ঘোরাটোপে, আরো কত নজর এড়ানো জায়গায় কয়েক হাজার জওয়ানের গোটা পঞ্চাশেক চেকপোস্ট এবং গোটা চারেক দক্ষ বোমা-ধরা কুকুরের মধ্য দিয়ে আমাদের এগারোটা বাসের প্রায় ৬৫০ জন যাত্রীর কনভয় যখন জম্মু থেকে পহেলগাঁও অভিমুখে যাত্রা করল তখন ভোর ৫.৩০ মিনিট। সবার মুখে 'ব্যোম্‌ ব্যোম্‌ ভোলে', 'জয় অমরনাথ শিব' ধ্বনি। মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি!

অমরনাথ সম্পর্কে পুরাণে এক মনোরম কাহিনী আছে। দেবর্ষি নারদের কাছ থেকে খবর পেয়ে মা পার্বতী মহেশ্বরকে ধরে বসলেন, তাঁকে অমরত্বলাভের রহস্য শোনাতে হবে। জগৎকারণ শঙ্কর ছাড়া আর কেই বা জানেন অনন্ত সৃষ্টির মূল রহস্য, অমরত্ব প্রাপ্তির তত্ত্বকথা? নাছোড়বান্দা পার্বতীকে কিছুতেই ভোলাতে না পেরে এক নির্জন স্থানের অনুসন্ধান করতে করতে দেবাদিদেব এলেন এই বিশাল গুহার দ্বারপ্রান্তে। নিচে দিয়ে কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছে স্বচ্ছ, নির্মল অমরগঙ্গার ধারা। চারপাশে ধবধবে সাদা, নরম, পেঁজা তুলোর মতো বরফের আস্তরণ। দূরে দূরে বরফমোড়া মাঝারি ধরনের গিরিশিখর, আর হাতছোঁয়া দূরত্বে ধূসর মেঘের ভেলা। অতি মনোরম পরিবেশ! স্থির হলো এই নির্জন কন্দরেই উমাপতি শোনাবেন 'অমরকথা'। যোগবলে তিনি দেখে নিলেন কাছাকাছি কোন দেবতা অথবা পূর্ণাঙ্গ প্রাণী আছে কিনা। কারণ, যে এই 'অমরকথা' শুনবে—সে-ই যে অমর হয়ে যাবে! যদি সবাই অমর হয়ে যায় সৃষ্টিচক্র চলবে কি করে? অবশেষে ত্রিলোকনাথ শুরু করলেন 'অমরকথা'।

কিন্তু, ইতিমধ্যে ঘটল এক অঘটন। সেই নিভৃত গিরিগুহায় কোন পূর্ণাঙ্গ প্রাণী ছিল না ঠিকই, কিন্তু একটি প্রায় ফুটন্ত শুকপাখির ডিম ছিল। এইসময় হঠাৎ সেটা ফুটে এক শুকশাবক বেরিয়ে এল। এদিকে ত্রিলোচন অমরকথা বলতে বলতে তন্ময় হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে চলার পর ক্লান্ত উমা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। কিন্তু শুকপাখিটি গলা ফুলিয়ে 'হুঁ হুঁ' করে সম্মতিসূচক শব্দ করে অমরকথা শুনে যেতে লাগল। দিন গেল, রাত গেল, মাস গেল। অবশেষে একদিন শেষ হলো এই অমরকাহিনী। মহাদেব চোখ মেলে দেখলেন, উমা তন্দ্রাচ্ছন্ন। তাহলে কে এতদিন 'হুঁ হুঁ' করে সাড়া দিয়েছে? নিশ্চয়ই এখানে কোন পূর্ণাঙ্গ প্রাণী আছে। ক্রুদ্ধ রুদ্র চারিদিকে তাকালেন। দেখলেন, গুহার এক কোণে এক ছোট্ট শুকপাখি বসে রয়েছে। পশুপতি ত্রিশূল নিয়ে পাখিটিকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। ছোট্ট পাখিটি তাঁকে ফাঁকি দিয়ে গুহার বাইরে উড়ে পালিয়ে গেল। মহাদেবও তাকে তাড়া করলেন, কিন্তু মারতে পারবেন কেন? শুকপাখি যে তখন 'অমরকথা' শুনে অমর হয়ে গেছে। উড়তে উড়তে শুক এসে পৌঁছাল বদরিকাশ্রমে। সরস্বতীর তীরে ব্যাসদেবের আশ্রমে তখন তাঁর স্ত্রী বটিকাদেবী স্নান সেরে সূর্যপ্রণাম করছেন। সহসা বটিকাদেবী হাই তুললেন। শুক সেই সুযোগে বটিকাদেবীর মুখের ভিতর দিয়ে উদরে প্রবেশ করল।

মহাদেব তো শুকের পিছনে তাড়া করে এসে বটিকাদেবীকেই হত্যা করতে উদ্যত হলেন! কিন্তু বটিকাদেবী তো নিরপরাধ। দোষী শুক। কিন্তু মহাদেব বটিকাদেবীকে হত্যা না করে শুককে হত্যা করবেন কি করে? সুতরাং তাঁকে হার মানতে হলো। তিনি শান্ত হলেন। বটিকাদেবীকে আশীর্বাদ করে তিনি বললেন ঃ "এই শুক তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে ব্রহ্মজ্ঞানী হবে। আর যে-গুহায় বসে সে অমরকথা শ্রবণ করেছে সেটি আজ থেকে অমরতীর্থে পরিণত হবে। কারণ, আমি অমরনাথ-রূপে চিরস্থায়ী হব সেখানে।"

বারোবছর বটিকাদেবীর গর্ভবাসের পর যেদিন জ্ঞানী শুকদেব ভূমিষ্ঠ হলেন, সেইদিনই সংসার ত্যাগ করলেন। ইনিই ব্যাসপুত্র পরমভাগবত শুকদেব। কৃত্তিবাস মহাদেব যে-গুহায় বসে পার্বতী ও শুকপাখিকে অমরকথা শুনিয়েছিলেন সেই গুহাই অমরতীর্থ, সেইখানেই শিব অমরনাথ-রূপে চির বিরাজমান। সেই পবিত্র স্থানই আমাদের গন্তব্য।

স্বামীজী বা অভেদানন্দজী কিন্তু জম্মু থেকে পহেলগাঁও হয়ে অমরনাথ যাননি। স্বামীজী অমরনাথ গিয়েছিলেন

নৈনিতাল থেকে পঞ্জাব-রাওয়ালপিণ্ডি-বারমূলা-শ্রীনগর হয়ে, আর অভেদানন্দজী গিয়েছিলেন শ্রীনগর থেকে সরকারি গাড়িতে পহেলগাঁওয়ে। কাশ্মীরে গণ্ডগোলের পর থেকে এখন আর কেউ শ্রীনগর হয়ে যায় না। তবে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের পর এবছর শ্রীনগরে কিছু যাত্রী এবং বিদেশী পর্যটকরা গিয়েছেন।

জম্মু থেকে প্রায় ৬৬ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে আমরা সকাল ৭.৪৫ মিনিটে উধমপুরে থামলাম। বেশ বড় শহর। পাহাড়ি পথের পাক এখনো শুরু হয়নি। একটি খুব বড় ধাবায় সকালে চা-জলখাবার সেরে আবার মিলিটারি প্রহরায় চলতে শুরু করলাম ঠিক ৮.৩০ মিনিটে। আরো ৪৪ কিলোমিটার চলার পর আমরা পৌঁছালাম পত্নীটপে। উচ্চতা প্রায় ৬,৫০০ ফুট। ঘন কুয়াশায় চারিদিক ঢাকা। টিপ্‌টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। জনশ্রুতি, এক বৃদ্ধা নাকি বাস করত এখানে পাহাড়ের চূড়ায় দেওদার অরণ্যের মাঝে। জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক যখন তৈরি হচ্ছে, তখন এই বৃদ্ধা কর্মরত শ্রমিকদের জল সরবরাহ করত। এই বৃদ্ধার নাম ছিল 'পাটনি'। বৃদ্ধা মারা যাওয়ার পর কালপ্রবাহে 'পাটনি' 'পত্নী'তে পরিণত হলো, আর শৈলশিখর রূপান্তরিত হলো 'টপ'-এ। আমাদের বাস এখন পাহাড়ি পাক রাস্তায় কখনো উঠছে আবার কখনো নামছে। রাস্তাও ধীরে ধীরে দুর্গম হচ্ছে। প্রায় পাঁচ-ছয় জায়গায় ধস নেমেছে দেখতে পেলাম। সেনাবাহিনীর নিরলস কর্মীরা বুলডোজার প্রভৃতি দিয়ে ধস পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। বেলা ১২টার সময় এসে পৌঁছালাম রামবন। এখানেই দুপুরের খাওয়া সারা হলো। রামবন এই অঞ্চলের সবচেয়ে নিচু জায়গা। রামবনের পর থেকে শুরু হবে খাড়া চড়াই। যেহেতু এবার অমরনাথ-যাত্রীদের বাসের কনভয় একসঙ্গে যাচ্ছে, থামছে একই জায়গায়, একসঙ্গে—তাই অন্যান্য দোকানপাটের বিক্রি এবারে একেবারে বন্ধ। আগে যাত্রীরা নিজেদের মর্জিমতো যেত, যেখানে খুশি থামত, পছন্দমতো দোকান থেকে জিনিস কিনত, খেত। কিন্তু এবারে সব নিয়মমাফিক—একসঙ্গে, একই জায়গা থেকে করা হচ্ছে। বাঁশির সঙ্কেত পেতেই আমরা যে যার বাসে উঠে পড়লাম। সেনাবাহিনীর পাইলট কার বাঁশি বাজালে বুঝতে হবে এইবার কনভয় ছাড়বে।

বিকাল ৩টের সময় এসে পৌঁছালাম বানিহালে। অদূরেই ভারতের আধুনিক স্থাপত্যশিল্পের গৌরব বানিহাল টানেল বা জওহর টানেল। ১৯৫৬ সালে পাহাড় ভেদ করে তৈরি হয়েছে পাশাপাশি দুটি টানেল। 'বানিহাল' শব্দের অর্থ 'তুষার ঝড়'। দুর্গম প্রকৃতিকে সুগম করেছে এই কৃত্রিম সুড়ঙ্গপথ। জম্মুর সঙ্গে কাশ্মীর ও লাদাখের সড়কপথের সহজতম যোগাযোগ এটি। খুবই গুরুত্বপূর্ণ পথ, তাই রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রহরার কড়াকড়ি এখানে খুব বেশি। পথের একপাশে লোহার রেলিং দিয়ে আড়াল করা পথচারীদের জন্য ফুটপাথ। পাশে নর্দমা। কারণ, গুহার গা বেয়ে অনবরত টপ্‌টপ্ করে জল পড়ছে। পথের ধারে দোকানে বৈকালিক চায়ের পাট চুকিয়ে সব গাড়িকে পরপর সাজিয়ে যাত্রীর সংখ্যা পরীক্ষা করে বাস আরো এক ঘণ্টা পর ছাড়ল। সুড়ঙ্গের ওপার থেকে আরেক দল নিরাপত্তাবাহিনী আমাদের নিয়ে যাবে। বাসের হেডলাইটের আলোর ক্ষীণ সূত্র ধরে নিকষ-কালো অন্ধকার সুড়ঙ্গ পার হওয়া এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। গাড়ির ধোঁয়ায় চোখ-জ্বালা নিয়ে ৯ মিনিট ১০ সেকেণ্ড পরে ওপারের আলোয় বেরলাম। পহেলগাঁওয়ে পৌঁছালাম বিকাল ৬টা নাগাদ।



যাত্রাপথের প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী 'লিডার' বা 'নীলগঙ্গা' নদী

অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য এই পহেলগাঁওয়ের! দূরে নীল আকাশের ছাতা মাথায় বরফের টুপি পরে সারি সারি পাহাড়ের চূড়া। ১৫০ ফুট চওড়া লিডার বা নীলগঙ্গার ওপারে থাকে থাকে পাইন গাছের সারি, এখানকার লোকেরা বলে 'ফেস' গাছ। ঝকঝকে আবহাওয়া। অমরনাথের যাত্রাপথে এই লিডার নদীটি প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী। অনেকে বলেন, পারিপার্শ্বিক যে অসংখ্য নদী সমতলে অবতরণ করেছে, কোলাহাই উৎস থেকে নিঃসৃত এই নদীটি তাদের নেতা; তাই নাম 'লিডার'।

কথিত আছে, পুত্র গণপতিকে নিয়ে সদাশিব একবার স্থানীয় মামলীশ্বর গ্রামে এসেছিলেন বিশ্রামের জন্য। গণেশকে পাহারায় রেখে তিনি কক্ষাভ্যন্তরে বিশ্রামে রত ছিলেন। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র বিশেষ প্রয়োজনবশত মহেশ্বরের সাক্ষাৎপ্রার্থী হলেন। কিন্তু গণেশ কিছুতেই ইন্দ্রকে ভিতরে ঢুকতে দিলেন না। ইন্দ্র দেবরাজ, তিনিই বা কেন এই অপমান সহ্য করবেন? ফলত গণপতি ও শচীপতির প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হলো। যুদ্ধের মাঝে একসময় শ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত গণপতি একচুমুকে পাশের নদীর সব জলটুকু খেয়ে ফেললেন। এদিকে চোখ খুলে বিশ্রামরত শিব বুঝতে

পারলেন কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে তিনি যুদ্ধরত পুত্র ও পুরন্দরকে শান্ত করলেন এবং নিরুপায় হয়ে ত্রিশূল দিয়ে লম্বোদরের উদর ছিদ্র করে নদীকে মুক্ত করে দিলেন। লম্বোদরের উদর থেকে সৃষ্ট নদী 'লম্বোদরী'। লিডার 'লম্বোদরী'র অপভ্রংশ। এর জল নীল। পুরাণে আছে, হরপার্বতী সেখানে একবার রাত্রিযাপনের জন্য এসেছিলেন। লীলাকালে চন্দ্রচূড়ের মুখমণ্ডলে পার্বতীর নয়নাঞ্জন লেগে যায়। পরে লিডারের স্বচ্ছ-শীতল ধারায় বিশ্বম্ভর তাঁর মুখ ধুয়ে ফেলেন। সেই গাঢ় নীল নয়নাঞ্জনে স্ফটিক-স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী নীলধারায় রূপান্তরিত হয়। তাই লিডারের আরেক নাম 'নীলগঙ্গা'।

পহেলগাঁও থেকেই সরকারি ব্যবস্থায় টেন্ট (তাঁবু), পিট্টু (কুলি), পণি (ঘোড়া) ইত্যাদি ঠিক করতে হয়। ছয়জনের তাঁবু জনা প্রতি ২৩৪ টাকা। পিট্টুতে চন্দনবাড়ি থেকে পবিত্র গুহায় যাওয়া-আসা ৯০০ টাকা (৩০ কিলো মাল বহন করে), পণিতে করে চন্দনবাড়ি থেকে গুহায় যাওয়া-আসা ২,০০০ টাকা। ডাণ্ডি বহন করে ৮ জন, চন্দনবাড়ি থেকে ডাণ্ডিতে গুহায় যাওয়া-আসা ৬,০০০ টাকা। যাত্রীদের চেকিং, পিট্টু ইত্যাদি ঠিক করতে আমাদের প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। প্রসঙ্গত, চন্দনবাড়ি ও পিসুঘাটির মাঝামাঝি 'তীর্থস্থানেশ্বর' নামে একটি জায়গা আছে। যাইহোক, পহেলগাঁও বাস টার্মিনাসে যখন পৌঁছালাম তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ঘড়ির কাঁটায় তখন কিন্তু রাত ৮টা!

হোটেলের ভিড় ঠেলে একটু এগোলেই মেলার আসর। রাস্তার একদিকে টেন্টের জঙ্গল, মেলা, নাগরদোলা, ম্যাজিক, কথাবলা পুতুল। অন্যদিকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা সেবাদলের লঙ্গরখানা। গাড়ি, বাস, সামরিক বাহিনী, যাত্রী, দোকান-পসার, লঙ্গরখানা, উচ্চস্বরে মাইকে হিন্দি ভক্তিগীতি, কাশ্মীরী শাল-কার্পেটের দোকানের ঝলমলে আলোয় এক জমজমাট আসর! অনেকটা কলকাতার দুর্গাপূজায় সন্ধ্যার রাস্তাঘাটের মতো। শুনলাম, সরকার আদেশ দিয়েছে সব দোকানপাট খুলে রাখার।

সে-রাত পহেলগাঁওয়ে কাটিয়ে পরদিন চন্দনবাড়ির উদ্দেশে বাস ধরলাম। ছোট মিনিবাস। যা লোক ধরার কথা, তার দ্বিগুণ লোক নিয়ে চারটি মিনিবাসের একটি কনভয় আগের মতো মিলিটারি সতর্কতায় ঠিক সকাল ৮টায় চন্দনবাড়ির উদ্দেশে পহেলগাঁও ছাড়ল। ভাড়া ৪০ টাকা জনা প্রতি। মোট যাত্রীর শতকরা প্রায় ৪০ জন বাঙালি। পহেলগাঁও থেকে চন্দনবাড়ি ১৬ কিলোমিটার। ধুলোভর্তি পাথুরে রাস্তা খুবই খাড়াই। পাশে ভঙ্গুর পাহাড়, তাই ঘন ঘন ধস নামে। আগে এই পথে সবাইকে হেঁটে যেতে হতো এবং চন্দনবাড়িতে রাত কাটাতে হতো। এখনো কিছু কিছু যাত্রী হাঁটছেন। এই অঞ্চলের লোকেদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ। পথের ধারে ধারে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, এমনকি বড়রাও দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করছে বাসের যাত্রীদের কাছে। ঘন কালো মেঘ ও ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে চন্দনবাড়িতে আসতে সময় লাগল ১ ঘণ্টা। এখান থেকে হাঁটাপথ শুরু। গরম পোশাক, হাতে লাঠি নিয়ে তৈরি হতে হতে আরো ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। যাত্রীদের সেবার জন্য এখানেও ছত্র খোলা হয়েছে। তাঁদের পীড়াপীড়িতে একটু গরম চা খেয়ে আমরা যখন হাঁটা শুরু করলাম, ঘড়িতে তখন ঠিক সকাল ১০টা। টিপ্‌টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। লোহার সাঁকো দিয়ে লিডার পার হয়ে কয়েক কিলোমিটার এগিয়ে মিলিটারি চেকপোস্টে বাধা পেলাম। ওপরে যাওয়ার ক্লিয়ারেন্স নেই। প্রায় একঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ওপরে যাওয়ার নির্দেশ এল। 'ব্যোম্ ব্যোম্ ভোলে' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে পিট্টু, পণি, ডাণ্ডি ও পয়দল যাত্রীর এক বিশাল দলে আমরা বহুশ্রুত পিসুটপের দিকে যাত্রা করলাম।

চন্দনবাড়ি থেকে অমরনাথ যাওয়ার দুটি পথ। একটি শেষনাগ, পঞ্চতরণী হয়ে। যে-পথে আমরা যাব, স্বামীজী গিয়েছিলেন সেই পথেই। আরেকটি পথ আস্তানমার্গ ও কালহ্রদ হয়ে, যে-পথে স্বামীজী ফিরে এসেছিলেন। এ-পথ দুর্গম ও বিপজ্জনক হলেও আগে এ-পথে একদিনে পহেলগাঁও ফিরে আসা যেত। এখন এ-পথে কেউ আসে না। এবছর তো প্রশ্নই নেই। কারণ, এবার যাত্রীরা সম্পূর্ণ সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন।

আজ ১৯ জুলাই ১৯৯৭। স্বামীজী চন্দনবাড়ি এসেছিলেন ৩০ জুলাই ১৮৯৮। ঠিক ৯৯ বছর আগে। নিবেদিতার বর্ণনা অনুযায়ী সেদিনও এখানে বৃষ্টি হয়েছিল।

অমরনাথ যাত্রাপথে প্রথম কঠিন চড়াই পিসুটপ (৩,৩৭৭ মিটার)-এর নিচ থেকে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে তাকালে মনে হয় পর্বতরূপী বিরাট শিবলিঙ্গকে কেউ যেন মুঠো মুঠো নানা রঙের দোপাটি ফুলে অঞ্জলি দিয়েছে। সারাটা পাহাড়ে বিভিন্ন রঙের পোশাকের যাত্রীদের নড়াচড়ায় ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে পিসু পাহাড়কে! বৃষ্টি এখন থেমে গেছে। পাকদণ্ডী বা পয়দাল মার্গে পথ ছোট করে উঠছি। ভয়ঙ্কর পিসুর রূপ এখনো বুঝতে পারিনি। প্রায় অক্লেশে ওপরে উঠছি। দেবতারা নাকি এই ঢালু পথে বড় বড় পাথর গড়িয়ে নিচে ফেলে দৈত্যদের পিষে মেরে ফেলতেন। তাই এর নাম 'পিসুটপ'। 'কাশ্মীর ও তিব্বতে' বইতে স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন ঃ "পিশু শব্দে একপ্রকার উকুন বোঝায়, তাহা হইতে অথবা 'পিসর' শব্দ হইতে এই পর্বতের নামকরণ হইয়াছে। 'পিসর' কাশ্মিরী শব্দ, ইহার অর্থ 'পিচ্ছিল'।... ঘোড়া বা ঝাম্পান চড়িয়া কেহ এই পর্বতে আরোহণ করিতে সক্ষম নহে, কারণ পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল ও উর্ধ্বমুখী।" [ক্রমশ] (এক)

'কথামৃত'-এ বিভাষিত শ্রীরামকৃষ্ণ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

বরানগরের গঙ্গার ঘাটে জয় মুখুজ্যে জপ করছে, কিন্তু অন্যমনস্ক। ঠাকুর বিকেলবেলা ভাগনে হৃদয়কে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। হাঁটতে হাঁটতে চটকলের পাশ দিয়ে চলে এসেছেন বরানগরের গঙ্গার ধারে। গঙ্গা বইছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। ঠাকুরও সেই গতিতে গতি মিলিয়েছেন।

১৮ শতকের বরানগর পল্লী। জনপদের তেমন চাকচিক্য নেই। ব্যবসার ঘাঁটি। গঙ্গাই সম্পদ। জলপথে নানারঙের পালতোলা বড়, মাঝারি নৌকা। গঙ্গার ধারে ধারে কলকাতার বাবুদের প্রমোদ উদ্যান। স্থানীয় জমিদারদের পেল্লায় পেল্লায় বাড়ি। নির্জন দেবালয়। কয়েকটি বিদ্যা-প্রতিষ্ঠান। পণ্ডিতমশাইদের টোল। বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট বাজার। সাধারণ মানুষের কুটির। বণিক আর বৃত্তিজীবী নানা বর্ণের মানুষ। ব্রাহ্মণদের দাপট। অতি প্রাচীন একটি জনপদ। মা গঙ্গার কৃপায় বহমান বহু ইতিহাসের সাক্ষী। কাশীধাম ও নবদ্বীপ ছাড়া এত গঙ্গার ঘাট আর কোথাও নেই।

ঠাকুর যে-পথে এলেন, সেই পথেরই একপাশে সতীদাহের ঘাট। ঐ ঘাটে শেষ সতীদাহ হয়েছিল ১৭৮৯ সালে। ঐ পথেরই একপাশে ছিল সেই ভক্তের কুটির। চৈতন্যযুগে মহাপ্রভু গঙ্গাপথে যেতে যেতে ভক্তটিকে কৃপা করেছিলেন। সেই ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি কাঁথা। মহাপ্রভুর পথ ধরে ঠাকুরের এই বৈকালিক ভ্রমণ। দক্ষিণেশ্বর থেকে আসার পথে সেই বিখ্যাত তীর্থস্থানটিও তিনি অতিক্রম করে এসেছেন—বরানগর পাঠবাড়ি। প্রায় ৫০০ বছর আগে গঙ্গার তীরে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ্ রঘুনাথ উপাধ্যায়ের একটি ভজনকুটির ছিল। মহাপ্রভু একবার পুরী যাওয়ার পথে ঐ ভজনকুটিরে তিনদিন ছিলেন। তিনদিন ধরে ভক্ত রঘুনাথের 'ভাগবত' পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আনন্দে বিভোর মহাপ্রভু বলেছিলেনঃ রঘুনাথ! তোমাকে আমি 'ভাগবতাচার্য' উপাধি দিয়ে গেলাম। বৈষ্ণব মহাজনদের আশ্রমকে বলা হয় 'শ্রীপাট'। এই আশ্রমটি ব্যতিক্রম। রঘুনাথের অসাধারণ 'ভাগবত' পাঠের জন্য এই আশ্রমের নাম হলো 'পাঠবাড়ি'। শ্রীচরণদাসবাবাজী এই ঐতিহাসিক স্থানটিকে একটি আশ্রমে পরিণত করলেন। পূর্বাশ্রমে এঁর নাম ছিল রাজেন ঘোষ। ঠাকুরের সঙ্গে রাজেন ঘোষের আলাপ। ঠাকুর 'ভাগবত' শুনতে ভালবাসেন।

হৃদয়কে নিয়ে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর থেকে বেরিয়ে আসেন 'ভাগবত'-এর টানে। কুঠিঘাট রাস্তাটি পশ্চিমে গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে। সেই পথে গঙ্গার অতি সন্নিকটে ভক্ত ব্রাহ্মণ নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবাস। তাঁকে সবাই 'ঠাকুরদাদা' বলেন। তিনি কথকঠাকুর। তাঁর কথকতার আসর ছেড়ে কেউ উঠতে পারতেন না। সবাই মোহিত হয়ে যেতেন। তাঁরই জনৈক ভক্ত স্বপ্ন পেয়ে নিমতা অঞ্চলের বিশেষ একটি কাঁঠাল গাছ ছেদন করিয়ে বিশাল গুঁড়ি থেকে মা কালী-সহ শায়িত শিবমূর্তি একসঙ্গে নির্মাণ করান। ঠাকুরদাদার বাড়ির সামনে অনেকটা খোলা জমি ছিল। সেই জমিতে মন্দির তৈরি করে মাকে প্রতিষ্ঠা করেন। মা সিদ্ধেশ্বরী। ঠাকুরদাদার কাছে ঠাকুর 'ভাগবত' শুনতে আসেন।

আসার পথে ঠাকুর মণিলাল মল্লিকের বাগানবাড়িটি ফেলে এসেছেন। ঠাকুর ঐ বাগানেও মাঝেমধ্যে আসেন। সামনে রাস্তা, পিছনে গঙ্গা। আলমবাজার থেকে মিলের সামনে দিয়ে যে-রাস্তাটি কুঠিঘাটে এসে পড়েছে, বাগানটি সেই পথের ধারে। মল্লিকমশাই ব্রাহ্ম, ঠাকুরের পরম ভক্ত, ঠাকুরের স্নেহধন্য। মণিলাল কলকাতার সিঁদুরিয়াপটীতে থাকেন। দানবীর। ঠাকুর একদিন এই বাগানে মল্লিক পরিবারের জন্য রান্না করা তরকারি খেয়েছিলেন। তখন তাঁর দিব্যোন্মাদ অবস্থা।

আসার পথে ঠাকুর আরেকটি কালীমন্দির পেরিয়ে এসেছেন। গঙ্গার তীরে। সুন্দর বাঁধানো ঘাট। বিশাল চাঁদনী। দুপাশে দুটি নহবত। প্রহরে প্রহরে নানা রাগে সানাই বাজে। সুরের ধারা গঙ্গাধারার সঙ্গে মিশে যায়।

বিশাল ফটক। মাথার ওপর সিংহ। কেয়ারি করা অপূর্ব বাগান। প্রশস্ত নাটমন্দির। অতিথিনিবাস। শ্বেতপাথরের মেঝে। রুপোর সিংহাসনে সালঙ্কারা স্নেহময়ী মা। দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর মতো রূপ; যেন সহোদরা! দ্বাদশ শিবমন্দির দুপাশে। বড় মনোরম বৃক্ষশোভিত জয় মিত্রের কৃপাময়ী কালীমন্দির।

ইংরেজের কলকাতায় টাকা ওড়ে। ধরতে পারলেই বড়লোক। নুনের ব্যবসা, চুনের ব্যবসা, সুদে টাকা ধার। জয় মিত্র ধনী মানুষ। তাঁর কলকাতার বাড়িতে দুর্গাপুজার নবমীর দিনে অসংখ্য মোষ আর পাঁঠা বলি দেওয়া হতো। বলিদানের পর মিছিল বেরত পথ-পরিক্রমায়। সারা গায়ে রক্তমাখা মানুষের নাচ। বাজনা, গান।

বাঁদিকে সামান্য এগলেই আরেকটি মায়ের মন্দির। শ্রীশ্রীব্রহ্মময়ী কালীমাতা। এই মন্দির সম্পর্কে জনৈক সাধু ভক্ত পয়ারে লিখেছেন ঃ

"(দে) প্রামাণিক বংশে জন্ম অতীব দয়াল।
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ আর শ্রীরামগোপাল।।
বরাহনগরে বাস নিষ্ঠাবান অতি।
দেব দ্বিজ ইষ্টপদে বড়ই ভকতি।।
বার ব্রত দান আদি ধর্ম আচরণ।
প্রতিবেশী দীন দুঃখী সেবা পরায়ণ।।
খুল্লতাত ভ্রাতুষ্পুত্র দুয়ের সম্বন্ধ।
শিবকালী স্থাপনায় করিলা নিবন্ধ।।
উভে মিলি করে কাজ যথা প্রয়োজন।
পাঁচটি মন্দির ক্রমে হইল গঠন।।"

১৮৫২ সাল, ১২৫৯ বঙ্গাব্দ, মাঘী পূর্ণিমার দিন এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। প্রবেশপথের দুপাশে চারটি শিবমন্দির, তারপর মা ভবতারিণীর মূল মন্দির।

"রাসমণির মা কালী, এই কালীমাতা।
এক ব্যক্তি উভয়ের আছিলা নির্মাতা।।"

একই ভাস্কর দুটি মূর্তি খোদাই করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠার তিনবছর আগে শ্রীশ্রীব্রহ্মময়ী কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠা।

"সুমিষ্ট মা, মাসী নাম দিলা সে কারণে।
প্রভু রামকৃষ্ণ ইহা শুনেছি শ্রবণে।।
ঠাকুর রামকৃষ্ণ আর শ্রীগৌরাঙ্গ।
আসিলেন এই গ্রামে লয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ।।"

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির আর প্রামাণিক ঘাট রোডের মা ব্রহ্মময়ীর মূর্তির নির্মাতা হাওড়া জেলার দাঁইহাট-নিবাসী নবীন ভাস্কর।

এই পথেই ডানদিকে বাঁক নিয়ে কাশীপুর শ্মশানটিকে ডানদিকে রেখে বাঁদিকে পড়ে আরেকটি দেবালয়—দশমহাবিদ্যা মন্দির। উলটোদিকে কোণাকুণি, গঙ্গাতীরের সুবৃহৎ ঘাটটি যাঁর নামে চিহ্নিত, তাঁর নাম রতনবাবু। রতন রায় নড়াইলের দাপুটে জমিদার ছিলেন।

মথুরবাবু আর ঠাকুর একদিন বেড়াতে বেড়াতে এই দশমহাবিদ্যা মন্দিরে এসেছিলেন। সে বেশ খুশি খুশি, সুখী সুখী, ফুরফুরে ভ্রমণ। মধুর বিকেল। সূর্য সবে ডুবে গেছে পশ্চিমে। সোনার আভা ফিরোজা আকাশে। গঙ্গার ধারের বিশাল বিশাল বৃক্ষে সদ্য ঘরে ফিরে আসা পাখিদের বাসা চিনে নেওয়ার বিভ্রাট। কলহের কুঁচো কুঁচো টুকরো বাতাসে ঝরছে।

ঠাকুর দেবালয়ে প্রবেশ করেই বললেন ঃ মথুর! মায়ের দেবালয়ের এই হীন দশা আমার যে সহ্য হচ্ছে না। শুনেছি, ভোগ চড়ে না। নিত্যভোগের একটা মাসিক ব্যবস্থা তুমি করে দাও।

মথুরবাবু বললেন ঃ ঠাকুর! এই দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রামরতন দত্ত রায় রানীমার চিরশত্রু। নড়াইলের এই জমিদারটির সঙ্গে আমাদের কম লাঠালাঠি হয়েছে যশোরের জগন্নাথপুর তালুক নিয়ে! আমাদের বিশ্বস্ত লেঠেল মহাবীরকে পিছন থেকে ছুরি মেরে পাঁকে পুঁতে দিয়েছিল। গ্রামকে গ্রাম আগুন লাগিয়ে ছারখার করে দিয়েছিল। শেষে আদালত। দুবছর মামলা লড়ে হেরে গেল। মন্দিরের জন্য বালি-উত্তরপাড়ায় জায়গা কিনতে পারা গেল না, দশ আনি ছয় আনির এই জমিদারদের বাগড়ায়।

রানী রাসমণি মথুরবাবুকে বললেন ঃ বাবা, ছোট ঠাকুরের ইচ্ছা। আমাদের রাখতেই হবে। রামরতন যাই করে থাকুক।

রানী নিজেই বলে দিলেন ঃ "মাসে দু-মন চাল আর নগদ দুটো করে টাকা। শুধু দক্ষিণেশ্বর নয়, বরানগর গ্রামখানিও ঠাকুরের অধিগত। বরানগর ঘাটে দাঁড়িয়ে ঠাকুর বরানগরবাসী ভক্তদের সঙ্গে কথা বলতেন। জয় মুখুজ্যে তাঁদেরই একজন। ঠাকুর সেই অতীতের কথাই নরেন্দ্রনাথকে বলছেন ঃ "সেই উন্মাদ অবস্থায় আরেকদিন বরানগরের ঘাটে দেখলুম, জয় মুখুজ্যে জপ করছে কিন্তু অন্যমনস্ক। তখন কাছে গিয়ে দুই চাপড় দিলুম।"

উন্মাদ, দিব্যোন্মাদ। কঠোর শিক্ষক। জপ নিয়ে, ধ্যান নিয়ে খেলা করো না। যদি লাগতে চাও, এক মনে লাগাও। মনকে বিষয়-ভ্রমণে ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বরের তল্লাস? [ক্রমশ]

(দশ)

বিবেকানন্দের বৈজ্ঞানিক চেতনা ও শিল্পভাবনা*

অমূল্যধন দাসশর্মা

উনিশ শতকের শেষপাদে বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনা ও প্রেরণার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের শতবর্ষব্যাপী নবজাগরণ এক নতুন ব্যঞ্জনা লাভ করেছিল। স্বল্পায়ু জীবনের শেষ দশবছর তিনি পরমার্থ ও লোকব্যবহারের প্রায় সকল বিভাগেই প্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষ্য রেখে গিয়েছেন।

বিবেকানন্দের বহুধা-প্রসারিত চিন্তা ও বহুমাত্রিক প্রতিভার একটি বিশেষ দিক হলো তাঁর বৈজ্ঞানিক চেতনা ও শিল্পভাবনা। তিনি কেবলমাত্র ভাব বা আবেগের দ্বারা পরিচালিত হতেন না, অথবা কল্পনাসর্বস্ব মানুষও ছিলেন না। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা চিন্তা করতে গিয়ে শিল্প ও কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বহুবার বলেছেন। শুধুমাত্র ধর্ম বা ধ্যান নিয়ে নিশ্চেষ্ট থাকার মানুষ ছিলেন না তিনি, তাঁর বিভিন্ন রচনা ও বক্তৃতার মধ্যে আভাসিত তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি—একটু যত্নের সঙ্গে পড়লেই তা বোঝা যায়। এক শিষ্যকে একটি চিঠিতে তিনি লিখলেন : "একবার চোখ খুলে দেখ, স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকারটা উঠছে! তোদের ঐ শিক্ষায় সে-অভাব পূর্ণ হবে কি?—কখনো নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর—চাকুরি-গুখুরি করে নয়—নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে নিত্যনূতন পন্থা আবিষ্কার করে।" এ কোন ধর্মীয় নির্দেশ নয়। বাস্তব অনুভূতির এমন উদ্দীপনাময় সুর, এমন দৃপ্ত আহ্বান আমরা এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মুখে শুনতে পাব, কখনো কি ভাবতে পেরেছিলাম? আজ আমরা কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি এবং তাই নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষারও অন্ত নেই। কিন্তু বিস্মিত হই তখনি যখন প্রায় একশো বছর আগে বিবেকানন্দ বলছেন : "আমাদের চাই কি, জানিস? স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজি আর science পড়ানো, চাই technical education, চাই যাতে industry বাড়ে, লোকে চাকরি না করে দুপয়সা করে খেতে পারে।" দূরদর্শী সন্ন্যাসী যেন দেশের ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং নির্দেশ দিলেন—'technical education' আর 'industry'।

স্বামীজীর আবির্ভাবের চল্লিশ বছর পূর্বে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে লেখা রাজা রামমোহন রায়ের ঐতিহাসিক পত্রটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। শিবনাথ শাস্ত্রী পত্রটিকে 'নবযুগের শঙ্খধ্বনি' বলে অভিহিত করেছেন। ঐবছর সাধারণ শিক্ষাসমিতিতে প্রাচ্যবিদ্যানুরাগী সভ্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। তাঁরা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েকটি সংস্কৃত কলেজ এবং আরবি ফারসি মাদ্রাসা খুলতে চাইছিলেন। সেকালের একজন বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদ হওয়া সত্ত্বেও রামমোহন কিন্তু কলকাতায় নতুন করে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের বিরোধিতা করে লর্ড আমহার্স্টকে যে-পত্রটি লিখলেন তার সংক্ষিপ্ত মর্ম হলো—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয় প্রজাদের শিক্ষার জন্য বার্ষিক কিছু অর্থব্যয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় ভারতীয়গণ এই ভেবে আশান্বিত যে, এখন থেকে ছাত্রদের গণিত, বিজ্ঞান এবং শারীরসংস্থান প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হবে। কিন্তু বর্তমানে জানা গেছে যে, ইউরোপে লর্ড বেকনের পূর্ববর্তী কালে ছাত্ররা যেরকম শিক্ষা লাভ করত, ভারতীয় ছাত্ররাও হিন্দু পণ্ডিতদের দ্বারা সেইরকম প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করবে। দুহাজার বছর পূর্বে তারা যা জানত, এখনো তাদের সেই দর্শন ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের কূটতত্ত্বপূর্ণ জ্ঞানই শিক্ষা করতে হবে। সংস্কৃত কঠিন ভাষা। এই ভাষার দুর্ভেদ্য আবরণের অন্তরালে যে-জ্ঞান নিহিত আছে তা সংরক্ষণ করার জন্য নতুনভাবে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা নেই। দেশের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বর্তমানে শিক্ষার্থীদের সে-শিক্ষা দান করছেন। সরকার থেকে নিয়মিত বৃত্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করলে তাঁরা আরো বেশি আগ্রহের সঙ্গে তাঁদের কর্মে প্রবৃত্ত হবেন। ভারতীয় যুবক যদি সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষায় কিংবা বেদান্ত দর্শনের আলোচনায় জীবনের মূল্যবান বারো বছর সময় ব্যয় করে তবে তাদের প্রকৃত উন্নতি কিভাবে সম্ভব হবে? এদেশের উন্নতিবিধান যখন সরকারের উদ্দেশ্য, তখন গণিত, প্রকৃতিবিজ্ঞান, রসায়ন, শরীরতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন এবং সেইজন্য উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়, দরকারি পুস্তক ও অন্যান্য সরঞ্জাম এবং ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষক প্রভৃতির জন্য যে-ব্যয় হবে তা সরকারি অর্থেই নির্বাহিত হতে পারবে।

লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত রামমোহনের এই মূল্যবান পত্রটি জাতীয় শিক্ষার ইতিহাসে প্রথম দলিল হিসাবে স্বীকৃত। কিন্তু রামমোহনের চিঠিটি যতই যুক্তিসঙ্গত হোক না কেন, তিনি তার কোন উত্তর পাননি। রামমোহনের আধুনিক মতবাদ, প্রগতিবাদী শিক্ষা ও সমাজনীতি—সমস্তই যে রক্ষণশীল সমাজ প্রতিকূলতার চোখে দেখত, সরকারের তা অজানা ছিল না। তাই রামমোহনের, অর্থাৎ ব্যক্তি-বিশেষের পত্রে সরকার নীরব রইলেন।

* স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা।

রামমোহনের এই ঐতিহাসিক পত্রটির দীর্ঘ প্রায় ৮০ বছর পরে স্বামীজী পূর্বোক্ত পত্রদুটি লেখেন, যার মধ্যে আমরা তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও শিল্পচিন্তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাই। কিন্তু আমরা যখন ভাবি যে, পত্রদুটির লেখক মূলত ধর্মজগতের একজন ব্যক্তিত্ব, গৈরিকবসন পরিহিত এক বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, তখন আমাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। ভারতবর্ষের কোন সন্ন্যাসী কি আজ পর্যন্ত এমন বৈপ্লবিক চিন্তার পরিচয় দিতে পেরেছেন?

বিবেকানন্দের এই বাস্তব সত্যনিষ্ঠার পিছনে ছিল বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তা ও অনুভূতি। তাঁর পূর্ববর্তী অদ্বৈতবেদান্তিগণ বেদান্তকে সংসারবিমুখ বৈরাগ্য-শাস্ত্রে পরিণত করেছিলেন। বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ, অভাব-অনটন, নানা জটিল আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা, কর্তব্য-অকর্তব্য প্রভৃতি যখন ভ্রমাত্মক ভেদজ্ঞান-প্রসূত, তখন সেই ভূমি থেকে যথাশীঘ্র মুক্তিলাভ করে ব্রহ্মে লীন হওয়াই ছিল তাঁদের মতে চরম ও পরম পুরুষার্থ। জগৎ-প্রতীতি মায়াজনিত এই বিশ্বাস বিবেকানন্দের থাকলেও এই জগৎকে তিনি অবজ্ঞা করতে পারেননি। অদ্বৈতবেদান্তকে তিনি লোকোত্তর ব্রহ্মালোক থেকে টেনে এনে মানবসমাজের সামগ্রিক রূপের মধ্যে এক বৃহত্তম মানবিকতাবোধের সঙ্গে একাত্ম করে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। আর এখানেই তিনি অনন্য, নতুন যুগের নতুন বেদান্তের প্রবক্তা—যা সংসারবিমুখ নয়, সর্বাংশে সমাজমুখী।

সন্ন্যাসিকুলে স্বামীজীই প্রথম সদর্পে বলতে পেরেছিলেন: "এতদিন আমাদের দেশের ধর্মের মহাদোষ কি ছিল জান? সে-ধর্ম কেবল দুটি কথা জানত—ত্যাগ ও মুক্তি। এজগতে কি শুধু মুক্তিই দরকার? অগণিত গৃহস্থের জন্য কি কিছুই চাই না?" ১৮৯৪ সালের নভেম্বর মাসে তিনি মাদ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে একটি চিঠিতে আরো স্পষ্টভাবে লিখলেন: "সারা ভারতে যে লাখখানেকের বেশি যথার্থ আধ্যাত্মিক নরনারী নেই, একথা আমাদের মানতেই হবে। এই মুষ্টিমেয় লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভারতের ত্রিশ কোটি (তখনকার হিসাবে) মানুষকে অনাহারে এবং অসভ্য অবস্থায় থাকতে হবে? একজন লোকও কেন না খেয়ে মরবে?... বাহ্যসভ্যতা আবশ্যক, এমনকি প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসের ব্যবহারও আবশ্যক, যাতে গরিব লোকেদের জন্য নতুন নতুন কাজের সৃষ্টি হয়।

"অন্ন! অন্ন! যে-ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখবেন—একথা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে ওঠাতে হবে, গরিবদের খাওয়াতে হবে, শিক্ষার বিস্তার করতে হবে।... সর্বসাধারণের জন্য আরো খাদ্য, আরো সুযোগ চাই।"

স্বামীজী এর পাশাপাশি ধর্মীয় আন্দোলনের অর্থনৈতিক পটভূমির প্রতিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ১৯০০ সালের ২৬ মে তিনি আমেরিকার স্যান ফ্রান্সিস্কোতে 'গীতা'র ওপর এক বক্তৃতায় প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন: "যখনি কোন ধর্মমত সফল হয়, তখন বুঝতে হবে অবশ্যই তার আর্থিক মূল্য আছে। একই ধরনের সহস্র সম্প্রদায় ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম করলেও যে-সম্প্রদায় আর্থিক সমস্যা সমাধান করতে পারে, সে-ই প্রাধান্য লাভ করবে। পেটের চিন্তা—অন্নের চিন্তা মানুষের প্রথম। অন্নের ব্যবস্থা প্রথমে, তারপর মস্তিষ্কের। মানুষ যখন হাঁটে, তখন তার পেট চলে আগে, মাথা চলে পরে—এ কি লক্ষ্য করেননি? মস্তিষ্কের অগ্রগতির জন্য এখনো কয়েক যুগ লাগবে।"

পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে পরিচয় লাভ করে স্বামীজী বুঝতে পেরেছিলেন, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাতে হলে পাশ্চাত্য জগতের জড়বিজ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডার থেকেও উপাদান সংগ্রহ করতে হবে। তাই ভারতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের—বেদান্ত ও বিজ্ঞানের অপূর্ব সংমিশ্রণ ও সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায়—"ভারতবর্ষ ইউরোপকে দেবে তার অধ্যাত্মসম্পদ, পরিবর্তে ইউরোপ ভারতবর্ষকে দেবে তার বিজ্ঞান ও ব্যবহার-শিল্প।"

একজন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হয়েও দেশে বিজ্ঞানচর্চার দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রখর। ১৮৯৪ সালের জুন মাসে শিকাগো থেকে হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে তিনি লিখলেন: "ধরুন, যদি আমরা গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলতে সক্ষম হই, তবু দরিদ্রঘরের ছেলেরা সেসব বিদ্যালয়ে পড়তে আসবে না; তারা বরং ঐসময় জীবিকা অর্জনের জন্য হালচাষ করতে বেরিয়ে পড়বে। আমাদের না আছে প্রচুর অর্থ, না আছে এদেরকে শিক্ষাগ্রহণে বাধ্য করার ক্ষমতা। সুতরাং সমস্যাটি নৈরাশ্যজনক বলেই মনে হয়। কিন্তু আমি এরই মধ্যে একটি পথ বের করেছি। তা এই—যদি পর্বত মহম্মদের কাছে নাই আসে, তবে মহম্মদকেই পর্বতের কাছে যেতে হবে। দরিদ্র লোকেরা যদি শিক্ষার কাছে পৌঁছাতে না পারে (অর্থাৎ নিজেরা শিক্ষালাভে তৎপর না হয়), তবে শিক্ষাকেই চাষির লাঙলের কাছে, মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সব স্থানে যেতে হবে। প্রশ্ন হতে পারে যে, কিভাবে তা সাধিত হবে?...

"মনে করুন, কোন একটি গ্রামের অধিবাসীরা সারাদিনের পরিশ্রমের পর গ্রামে ফিরে এসে কোন একটি গাছের তলায় অথবা অন্য কোন স্থানে সমবেত হয়ে আলাপ-আলোচনায় সময় কাটাচ্ছে। সেসময় জন-দুই শিক্ষিত সন্ন্যাসী তাদের মধ্যে গিয়ে ছায়াচিত্র কিংবা ক্যামেরার সাহায্যে গ্রহনক্ষত্রাদি সম্বন্ধে কিংবা বিভিন্ন জাতি বা বিভিন্ন দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে ছবি দেখিয়ে কিছু শিক্ষা

দিল। এভাবে গ্লোব, মানচিত্র প্রভৃতির সাহায্যে মুখে মুখে কত জিনিসই না শেখানো যেতে পারে! চক্ষুই যে জ্ঞানলাভের একমাত্র দ্বার তা নয়, পরন্তু কর্ণদ্বারাও শিক্ষার কার্য যথেষ্ট হতে পারে।"

১৮৯৪ সালে অন্য একটি চিঠিতে স্বামীজী মঠের সমস্ত গুরুভাইদের লক্ষ্য করে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে একই পরামর্শ দিয়ে বললেন : "শশী, তোকে একটা নূতন মতলব দিচ্ছি। যদি কার্যে পরিণত করিতে পারিস তবে জানব তোরা মরদ, আর কাজে আসবি। হরমোহন, ভবনাথ, কালীকৃষ্ণবাবু, তারকদা প্রভৃতি সকলে মিলে একটা যুক্তি কর। গোটাকতক ক্যামেরা, কতকগুলো ম্যাপ, গ্লোব, কিছু chemicals (রাসায়নিক দ্রব্য) ইত্যাদি চাই। তারপর একটা মস্ত কুঁড়ে চাই। তারপর কতকগুলো গরিব-গুরবো জুটিয়ে আনা চাই। তারপর তাদের Astronomy, Geography (জ্যোতিষ, ভূগোল) প্রভৃতির ছবি দেখাও আর...—কোন্ দেশে কি হয়, কি হচ্ছে, এ দুনিয়াটা কি, তাদের যাতে চোখ খুলে, তাই চেষ্টা কর—সন্ধ্যার পর, দিন-দুপুরে—কত গরিব-মূর্খ বরানগরে আছে, তাদের ঘরে ঘরে যাও—চোখ খুলে দাও। পুঁথি-পাতড়ার কর্ম নয়—মুখে মুখে শিক্ষা দাও। তারপর ধীরে ধীরে centre extend (কেন্দ্রের প্রসার) কর—পার কি? না, শুধু ঘণ্টা নাড়া?"

বেকার সমস্যাই আজ এদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা। দ্রুত শিল্পায়ন ছাড়া এই সমস্যার সমাধান প্রায় অসম্ভব। এই কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি স্তরে এদেশের বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ্ ও প্রযুক্তিবিদ্দের সহযোগিতায় কারিগরি শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। অল্পবয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক স্তর থেকেই বিজ্ঞান-সচেতন করে তোলার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পর্যায়ক্রমে বিজ্ঞান বিষয়ক যে কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে তা এই চিন্তা ও পরিকল্পনারই ফলশ্রুতি। বর্তমান কালের অর্থনীতিবিদ্ ও প্রযুক্তিবিদ্দের চিন্তা ও বিভিন্ন পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় একশতাব্দী পূর্বে দূরদর্শী এক সন্ন্যাসীর বিজ্ঞানচেতনা ও যুগোপযোগী শিল্পচিন্তা এবং সর্বোপরি তৃণমূল স্তরের অজ্ঞ, দরিদ্র, খেটে খাওয়া মানুষ—যাদের ঘর্মাক্ত, কর্দমাক্ত জীবনযাত্রা—তাদের সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রাথমিক পরিচয় ঘটানোর এই ব্যাকুলতা ও পরিকল্পনা আমাদের, এমনকি একালের যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়—যাঁদের কাছে বিবেকানন্দ নিছক ধর্মজগতের একজন মানুষ বলেই চিহ্নিত তাঁদের মনেও বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

স্বামীজী ধর্মের জটিল তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক পন্থায় বিশ্লেষণ করে কী আশ্চর্যভাবে পরিবেশন করেছেন তা জানা যায় তাঁর 'রাজযোগ' গ্রন্থখানি পাঠ করলে। ধর্মশাস্ত্রে 'আত্মা' একটি দুর্বোধ্য বিষয়। এই দুর্বোধ্য বিষয়টিকে বোঝাতে গিয়ে তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তার যে অপূর্ব বিশ্লেষণ করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। বস্তুত, রাজযোগ সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতা শুনতে গিয়ে পাশ্চাত্য শ্রোতাদের মনে হতো, ক্লাসে যেন তাঁরা বিজ্ঞানের কোন অধ্যাপকের কাছে পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে কোন বক্তৃতা শুনছেন। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর সমসাময়িকদের মধ্যে হরিদাস মিত্রের মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি যখন বেলগাঁওতে, তখন স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। 'স্বামীজীর কথা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন : "I had not met anyone who could equal Swamiji in his brilliant exposition of religion in the light of science and his successful reconciliation of the two."

অতীন্দ্রিয় জ্ঞানলাভ হলো অথচ তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বোঝা গেল না—এটা বিবেকানন্দের চিন্তার বাইরে ছিল। আলমোড়ায় তিনি একটি ছোট ল্যাবরেটরি স্থাপন করে সেখানে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন সম্পর্কে নিয়মিত লেকচারের আয়োজন করেছিলেন। বেলুড় মঠেও তিনি অনুরূপ শিক্ষার প্রচলন করতে চেয়েছিলেন। এই সম্পর্কে ১৮৯৭ সালের জুন মাসে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে একটি চিঠিতে তিনি লিখলেন : "শুদ্ধানন্দ লিখেছে—কি Ruddock's Practice of Medicine পাঠ হচ্ছে। ওসব কি nonsense ক্লাসে পড়ানো? একসেট Physics আর Chemistry-র সাধারণ যন্ত্র ও একটা microscope ১৫০/২০০ টাকার মধ্যে হয়ে যাবে। শশীবাবু (ডঃ শশিভূষণ ঘোষ) সপ্তাহে একদিন এসে Chemistry Practical-এর উপর লেকচার দিতে পারেন ও হরিপ্রসন্ন (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) Physics ইত্যাদির উপর। আর বাঙলা ভাষায় যেসকল উত্তম Scientific (বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয়) পুস্তক আছে, তা সব কিনবে ও পাঠ করাবে।" এরই এক মাস পরে অন্য একটি চিঠিতে স্বামীজী তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দকে নির্দেশ দিলেন : "যতদূর পর্যন্ত কাজ হয়েছে তাতে আমি খুব সন্তুষ্ট; কিন্তু আরো এগিয়ে যেতে হবে। আগে আমি একবার লিখেছিলাম, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধীয় কতকগুলি যন্ত্র যোগাড় করে এবং ক্লাস খুলে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন, বিশেষত শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে সাদাসিধে ও হাতে-কলমে শিক্ষা দিলে ভাল হয়, কৈ সেসম্বন্ধে তো কোন উচ্চবাচ্য এপর্যন্ত শুনিনি।

"আরেকটা কথা লিখেছিলাম—বিজ্ঞানের যেসব গ্রন্থ বাঙলা ভাষায় অনুবাদ হয়ে গেছে, সেইগুলি কিনে ফেলা উচিত; তার সম্বন্ধেই বা কি হলো?"

বিবেকানন্দ বলেছেন : "Science is nothing but the finding of unity." জড়বাদী বিজ্ঞানীরা সত্যসন্ধানে ব্রতী হয়ে সিদ্ধান্ত করেছেন—বস্তুই প্রথম ও শেষ সত্য। স্বামীজী বলতে চেয়েছেন : "জড়বাদী ঠিকই বলেন, এক ছাড়া দুই নেই। কেবল তাঁরা সেই এক-কে 'বস্তু' বলে অভিহিত করেন,

আর আমি বলি 'ব্রহ্ম'। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আধুনিক জড়বাদী বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহ কেবল বৈদান্তিকদের কাছেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। অপরপক্ষে আধুনিক বিজ্ঞান স্বক্ষেত্রে অবস্থান করেও আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হতে পারে যদি বেদান্তের সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করে।"

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি বিবেকানন্দের বিশেষ অনুরাগ ও আগ্রহ ছিল সত্য, কিন্তু তাই বলে জড়বিজ্ঞানের প্রতি মানুষের অন্ধ আনুগত্য তিনি সমর্থন করেননি। এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেনঃ "If religion has its superstitions, science has its superstitions too." জড়বিজ্ঞানের কল্যাণের দিকটি অর্থাৎ ভারতবাসীকে জীবনসংগ্রামে শক্তিশালী ও তার ইহলৌকিক মঙ্গলসাধনে বিজ্ঞানের যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই স্বামীজী গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন, এর আত্মঘাতী দিক সম্বন্ধে তাঁর প্রবল বিতৃষ্ণা ছিল। পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান ও ভারতের অধ্যাত্মজ্ঞানকে তিনি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধেই দেখতে চেয়েছিলেন। যে মণিমাণিক্য ভারতের নিজস্ব—ঋষির তপস্যালব্ধ সেই জ্ঞান ও ধ্যানলোক-বিহারিণী প্রজ্ঞার সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের গ্রন্থিবন্ধনের কথা তিনি বিশেষভাবে চিন্তা করতেন।

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা চিন্তা করতে গিয়ে স্বামীজী শিল্পের প্রয়োজনীয়তার কথা বহুবার বলেছেন। তিনি যেমন বেদান্ত প্রচার দ্বারা ভারতবর্ষকে বিশ্বসভায় একটি মর্যাদার আসনে বসিয়েছিলেন, তেমনি তাঁর সময় আমরা আরেকজন ভারতবাসীকে পাই—যিনি ভারতবর্ষকে বিশ্বের শিল্প-মানচিত্রে সর্বপ্রথম স্থাপন করার জন্য তাঁর সমস্ত প্রতিভা ও পরিশ্রম নিয়োগ করেছিলেন। তিনি এদেশে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রবর্তক বিশ্রুতকীর্তি জামসেদজী টাটা। স্বামীজী তাঁর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। জামসেদজী টাটা স্বামীজীর দ্বিতীয়বার আমেরিকা-যাত্রার সময় একই জাহাজে যাচ্ছিলেন। এঁদের দুজনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছিল অনেক। জাহাজে এই তরুণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করে টাটা যারপরনাই মুগ্ধ হন। প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন, আমি ঘন্টা-নাড়া সন্ন্যাসী হতে চাই না, আমি চাই ভারতবর্ষ তাঁর নিজের মহিমায় আবার প্রতিষ্ঠিত হোক। আমি চাই ভারতবর্ষ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে, আমি চাই কুশিক্ষা, কুসংস্কার, অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করতে। সেজন্য আমার প্রথম প্রয়োজন, দেশের যুবকদের শিল্পশিক্ষা দেওয়া। জামসেদজী টাটা বললেনঃ "Monks should do industrial and technological teaching." ১৮৯৮ সালে যখন স্বামীজী বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপন করেন, সেই সময় জামসেদজীও দেশে বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে স্বামীজীর মতের সমর্থনে তাঁকে একটি চিঠি লেখেন।

বিবেকানন্দের পূর্বসূরী রামমোহন রায় ইংরেজ-শাসনকে শুভকর শক্তি বলে মনে করেছিলেন। নবাবী আমলের ভয়াবহ অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলা থেকে ইংরেজ-শাসন জনগণকে অব্যাহতি দিয়েছিল—একথা হয়তো রামমোহনের মনে ছিল। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্বাঙ্গীণ শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছিলেন। স্বামীজীর আবির্ভাব রামমোহনের প্রায় এক শতাব্দী পরে। ইংরেজ শাসন এদেশের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ—একথা স্বামীজী কখনোই মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু রামমোহনের চিন্তার ইতিবাচক দিকটি তিনি স্বীকার করেছেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে শিল্প আসছে—এটা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই ইংল্যাণ্ডের ভারতবিজয়কে তিনি একটি অভিনব ব্যাপার বলে উল্লেখ করেছেন। বলেছেনঃ "এ নূতন মহাশক্তির সংঘর্ষে ভারতে কি নূতন বিপ্লব উপস্থিত হইবে ও তাহার পরিণামে ভারতের কি পরিবর্তন প্রসারিত হইবে, তাহা ভারতেতিহাসের গতকাল হইতে অনুমিত হইবার নহে।" তাই দেখা যায়, বর্তমান ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে প্রত্যক্ষ করে স্বামীজী অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী করলেনঃ "আমি দেখতে পাচ্ছি, কলকাতার গঙ্গার দুই তীরে চটকল আর পাটকলের আকাশচুম্বী চিমনি উঠবে; গঙ্গার জল এইসব কলের আবিলতায় পূর্ণ হবে। শেষবারের মতো তোমরা এই কলুষনাশিনী গঙ্গার বারি পান করে নাও। মা আমার পণ্যবাহিনী হবেন।" দেশে পণ্যের উৎপাদন প্রয়োজন আর তার জন্য প্রয়োজন শিল্পের—এই শিল্পবিপ্লব ইংল্যাণ্ডের সংস্পর্শেই সম্ভব এবং তার ফলে ভারতবর্ষের সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনে আসবে বিরাট পরিবর্তন, সন্ন্যাসীর এই যে অর্থনীতিক ভবিষ্যদ্দৃষ্টি—এর তুলনা নেই।

ভারতবর্ষের বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে যখন দেশে শিল্পায়ন ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রসারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তখন বিবেকানন্দের বহুমুখী চিন্তাভাবনার এই বিশেষ দিকটির কথা আলোচনা করতে গেলে গৈরিকবসনের অন্তরালে আমরা অন্য এক বিবেকানন্দকে প্রত্যক্ষ করি—যাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও শিল্পভাবনা শতাব্দীর ব্যবধানেও আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী বলেই মনে হয়। ❑

তথ্যসূত্র

(১) পত্রাবলী—স্বামী বিবেকানন্দ

(২) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম, ৬ষ্ঠ ও ৮ম খণ্ড

(৩) বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৩য় খণ্ড

(৪) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী

(৫) Selection from Educational Records—Edited by H. Sharp, Part-I

(৬) বঙ্গদেশে শিক্ষাপ্রসার (১৭৬৫-১৮৮২)—ডঃ নমিতা চক্রবর্তী

(৭) সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ—মণি বাগচি

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

শ্রীরামকৃষ্ণ-সুধাসাগরে

শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতলীলার আমরা কতটুকুই বা জানি। যত জানছি ততই যেন আপ্লুত হয়ে যাচ্ছি। আমার আপ্লুত হৃদয়ে সঞ্চিত একটি সুপরিচিত কাহিনী 'উদ্বোধন'-পাঠকবর্গের কাছে উপস্থাপিত করতে চাই।

যোগীন-মা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত। তিনি থাকতেন বাগবাজারে। তিনি একবার ঠাকুরকে বাড়িতে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। ঠাকুর একদিন যোগীন-মার বাড়িতে আসেন।

যোগীন-মার ভাই হীরালাল শ্রীরামকৃষ্ণকে পছন্দ করত না। সে ঠাকুরকে ভয় দেখাবার জন্য বাগবাজারের বিখ্যাত মল্লযোদ্ধা মন্মথকে বাড়িতে নিয়ে আসে। মন্মথ নিয়মিত ব্যায়াম করত। তার গায়ে অসুরের মতো শক্তি। সে সখের থিয়েটারে ডাকাতের ভূমিকায় অভিনয়ও করত। হীরালাল ভাবল, মন্মথর ষণ্ডামার্কা চেহারা দেখে ঠাকুর ভয় পেয়ে যাবেন। কিন্তু ফল হলো বিপরীত, ঠাকুরের সামনে এসে মন্মথ ঠাকুরের পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল আর বলল : আমি বড় অপরাধী, আমি মহাপাপী, আমাকে ক্ষমা করুন। ঠাকুর বললেন : তুমি দক্ষিণেশ্বরে যেও।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ গঙ্গাধর (পরবর্তী কালে স্বামী অখণ্ডানন্দ) মন্মথকে চিনতেন। মন্মথ একদিন তাঁর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে এল। সে খালি হাতে এল না—এক হাঁড়ি নবীন ময়রার রসগোল্লা নিয়ে এল। মন্মথ ঠাকুরকে প্রণাম করলে গঙ্গাধর মহারাজ ঠাকুরকে বললেন : এ ডাকসাইটে গুণ্ডা। অনেকে এর নাম শুনে ভয় পায়। অনেকে মারামারি করার জন্য একে ডাকে। ঠাকুর মন্মথর গায়ে হাত দিয়ে বললেন : কী শক্ত রে!

মন্মথ তখন বিখ্যাত ধনী কীর্তি মিত্রের ছেলে প্রিয় মিত্রের নায়েব। মন্মথ সবকিছু খেত, কিছু বাছবিচার করত না। সে পৈতে ফেলে দিয়েছিল। ঠাকুর বললেন : পৈতে পরবে। মন্মথ বলল : ঘামে বড় ভিজে যায়, তাই ফেলে দিয়েছি।

ঠাকুর মন্মথকে কোন এক শনিবার আসতে বলেন। মন্মথ সত্যিই আবার এল। হাতে তার নবীন ময়রার রসগোল্লার হাঁড়ি। সে দুদিন মাত্র ঠাকুরের কাছে এসেছে, তাতেই তার জীবনে এল আমূল পরিবর্তন। সে আবার গলায় পৈতে পরল। চাকরি ছাড়ল। সে চুল কাটত না, মাথায় উকুন বাসা বাঁধল। সবসময় সে 'মা' 'মা' বলে ডাকত।

স্বামীজী মন্মথকে চিনতেন। স্বামী শিবানন্দও মন্মথকে চিনতেন। ঠাকুরের কাছে আসার অনেক দিন পরে শিবানন্দজী অখণ্ডানন্দজীকে একদিন জানান : "সেই মন্মথ বাগবাজারের রাস্তায় সিদ্ধেশ্বরীতলার নিকটেই তার মামার বাড়িতে থাকত। আমরা ঐপথে গেলে তার মুখে 'মা' 'মা' শুনে থমকে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তা শুনতাম। তুমি তাকে যা দেখেছিলে, সে এখন আর তা নেই। তার সে-শরীরও নেই। একমাথা চুল—তাও উকুনে ভরা। উকুনগুলো মাথা থেকে পড়ে গেলে আবার সেগুলিকে তুলে মাথায় রাখে।"

অখণ্ডানন্দজী মহারাজ মন্মথের শেষবয়সের অবস্থা বর্ণনা করেছেন : "সে একদৃষ্টে সূর্যের দিকে তাকিয়ে উন্মনা হয়ে বসে আছে। পরনে কোঁচা-কাছা দেওয়া গেরুয়া কাপড়। গলায় ধবধবে যজ্ঞসূত্র। শরীর তপঃক্লিষ্ট। বাহিরের কোনদিকেই তার ভ্রূক্ষেপ নাই।"

প্রসঙ্গত, মন্মথ মারা যাওয়ার আগে গেরুয়া কাপড় পরত। তার গলায় পৈতে থাকত। সারাদিন বাড়িতে জপতপ করে কাটাত। স্বামী অখণ্ডানন্দ স্মৃতিচারণ করেছেন : "মন্মথের অবস্থা দেখামাত্র আমার বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। ঠাকুরের অলৌকিক প্রভাব অনুভব করে অতিমাত্র বিস্ময়াভিভূত হলাম।"

কিছুদিন পর মন্মথর কলেরায় মৃত্যু হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-সুধাসাগরে পড়ে গুণ্ডা মন্মথ হয়ে যায় 'সাধু মন্মথ'।

অরুণকুমার সেনগুপ্ত
দাওনাগাজী রোড, বালী, হাওড়া, পিন-৭১১২০১

রক্তদান প্রসঙ্গে কিছু কথা

দান মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে সর্বজনস্বীকৃত। যুগে যুগে অন্নদান, বস্ত্রদান, আশ্রয়দান, বিদ্যাদান, গোদান—এমনই সব বিচিত্র দানের মহিমায় মানবজাতির ইতিহাস মহিমান্বিত হয়েছে। এযুগে মৃত্যুপথযাত্রীকে রক্তদান করে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে আনাকে শ্রেষ্ঠ দান মনে করলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। রক্তদানের মতো স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সেবাকর্মে আছে তৃপ্তি। "মানুষের জন্য মানুষ।"—এই বোধকে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টায় শুধু একটি জীবনকে বাঁচানো নয়, সামাজিক দায়িত্ব-সচেতনতায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে একজনের রক্ত অন্যের দেহে সঞ্চারিত হলে সংস্কারমুক্ত মানসিকতার সৃষ্টি হয়। বাঁচে একটি অমূল্য জীবন।

এই জীবনকে বাঁচানোর জন্য গড়ে তুলতে হবে আন্দোলন। রক্তদান আন্দোলনের সার্থক রূপায়ণে চাই কয়েকটি বৈশিষ্ট্য—প্রথমত দৃষ্টিভঙ্গি, দ্বিতীয়ত দৃষ্টিভঙ্গির যোগাযোগ, তৃতীয়ত বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন এবং চতুর্থত সাফল্যে আস্থা অর্জন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রক্তদান আন্দোলন সার্থক রূপায়ণের পথে বৈদেশিক আক্রমণ, উগ্র প্রাদেশিকতা, জাতিতে জাতিতে হানাহানি, ধর্মের নামে ব্যভিচার ও ভণ্ডামি, সাম্প্রদায়িকতা, মানুষের প্রতি মানুষের অবিশ্বাস, হিংসা, স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার অন্তরায় হয়ে উঠেছে।

মানুষের দেহে মানুষের রক্তই সঞ্চালিত করতে হয়। কিন্তু মানবদেহে রক্তের মধ্যে আছে নানা বিভাগ। মানুষের রক্তকে প্রধানত চারটি Group-এ ভাগ করা হয়—A, B, AB আর O

এবং প্রত্যেকটি Blood Group-এ আছে RH Positive ও RH Negative। যে-ব্যক্তি যে-গ্রুপের, কেবল সেই গ্রুপের সুস্থ মানব-রক্তই দেহে সঞ্চালিত করার নিয়ম। বৈজ্ঞানিক হনস্টেন রক্ত-সংরক্ষণের এমন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, যার ফলে বোতলে সংরক্ষিত রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না। অবশ্য বোতলের রক্তকে অবিকৃত রাখা নির্ভর করে তাপমাত্রা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিকতার ওপর। কলকাতাতে প্রথম সরকারি Blood Bank স্থাপিত হয় ১৯৪৫ সালে। বর্তমানে রক্তসংরক্ষণের জন্য কলকাতার মতো বড় বড় শহর, জেলা ও মহকুমা হাসপাতালেও Blood Bank স্থাপিত হয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে রক্তের চাহিদা বছরে ৮০ লক্ষ বোতল। অথচ বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন ও স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে সংগ্রহ হয় মাত্র ৩০ লক্ষ বোতল। অর্থাৎ ঘাটতি ৫০ লক্ষ বোতল। এর কারণ অশিক্ষিত, এমনকি শিক্ষিত মানুষের মধ্যে সংশয়, ভীতি, অজ্ঞতা, কুসংস্কার-জাত অহেতুক আশঙ্কা।

অতএব রক্তদান আন্দোলনের মূল কাজ হবে সর্বস্তরের মানুষকে অবহিত করা, মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা—যার ফলশ্রুতিস্বরূপ মানুষ আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে আসে স্বেচ্ছা রক্তদানে। সুতরাং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমাদের এগিয়ে আসতে হবে সঠিক লক্ষ্যে। কারণ, রক্ত এমনই এক মূল্যবান বস্তু, যার কোন বিকল্প নেই। তাই একের প্রয়োজনে অপর ব্যক্তি রক্ত না দিলে রক্ত পাওয়ার উপায় থাকে না।

পরিশেষে বলি, জীবসেবাই যদি ঈশ্বরসেবা হয়, তবে সেই সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মৃত্যুযন্ত্রণাকাতর মানুষের প্রতি মমতাপরায়ণ হয়ে দেশের সুস্থ-সবল প্রতিটি মানুষ এগিয়ে আসুক নিজের রক্ত দিয়ে মানুষের সেবা করতে। তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হোক প্রাচীন ঋষির বাণী—

"মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ
মধুনক্তমুতোষসো
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।"

—আমাদের ওষধিসকল মধুময় হোক, রজনী ও উষা মধুময় হোক, মধুময় হোক ধরণীর ধূলিকণা।

ডাঃ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, ডাঃ জে. আর. ধর মহকুমা হাসপাতাল
বনগ্রাম, উত্তর চব্বিশ পরগনা-৭৪৩২৩৫

"জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে..."

ঠাকুর বলেছেন, বিষয়াসক্ত সংসারী লোকেরা সবসময় মায়ায় ডুবে থাকে। কী সেই মায়া? সে হলো একরকমের একদেশদর্শী টান, যা নিজের স্ত্রী-পুত্র-পিতা-মাতার বাইরে আর কিছু জানে না।

আর দয়া হলো ঠিক এর উল্টোটা। প্রেম যার সর্বজীবে, সকলের দুঃখে যে ব্যাকুলপ্রাণ, সকলের কল্যাণে নিবেদিত যার সমস্ত প্রার্থনা—সে-ই দয়াবান। ঠাকুর তাই বললেন : মানুষকে দয়াশীল হতে হলে ঈশ্বরের প্রতি শুদ্ধাভক্তি দরকার।... সংসারে থাকতে হবে পাঁকাল মাছের মতো। আপনজনের প্রতি দায়দায়িত্ব পালন করবে, কিন্তু মন রাখবে ঈশ্বরে।

সে-মন আমাদের কৈ? ভোগবিলাসে, ঐশ্বর্য-আড়ম্বরে, শরীরী নানা চাহিদায় বদ্ধ আমাদের মন। "সংসারী লোকেরা হলো বদ্ধ জীব, কামিনীকাঞ্চনে বাঁধা হয়ে রয়েছে। মনে করে কামিনী ও কাঞ্চনেতেই সুখ হবে।... জানে না যে ওতেই মৃত্যু হবে।"—ঠাকুর সাবধান করে দিয়েছিলেন আমাদের। আমরা মনে রাখিনি। জীবনের সমুদ্রে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের আঘাত সহ্য করে, ক্ষতবিক্ষত হতে হতে কোনক্রমে টিকে আছি আমরা।

আজ, আমার কর্মজীবন পেরিয়ে এসে বুঝতে পারি ঠাকুরের ঐ বাণীর মর্মার্থ। বুঝতে পারি লোভ, মোহ, কামনা-বাসনার আপসহীন নিবৃত্তিই জীবনের পাথেয়। এই বিলম্ব বোধোদয় অবশ্য পীড়া দেয় আমাকে। আমার জীবনে এপর্যন্ত ছিল সুখ-সম্ভোগের তৃপ্তিদায়ক ধারাবাহিকতা, সাংসারিক অশান্তির কোন কুটিল ভ্রূকুটি আমায় ছুঁয়ে যায়নি বললেই চলে। কিন্তু হঠাৎই একদিন ঘটে গেল দারুণ বিপর্যয়। সমস্ত ছন্দোময়তা ভেঙে তছনছ হয়ে গেল, আমি আর আমার সমগ্র পরিবার এবার দেখতে পেলাম জীবনের অন্য পিঠটাও।

এই দারুণ দুঃসময়ে আমার দিকে পরিত্রাণের হাত বাড়িয়ে দেন আমারই কিছু নিষ্ঠাবান আন্তরিক আর সৎ সহকর্মী। তাঁদের এই অযাচিত সাহায্য আমার জীবনে যেন নতুন এক দিগন্ত খুলে দেয়।

আমি কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজারের কর্মিবৃন্দের কথা বলছি। বিপর্যয়ের ভয়াল মুহূর্তে তাঁরা এগিয়ে এলেন আমার আশ্রয় হয়ে। আজ 'উদ্বোধন'-এর পাঠকদের আমি এইসব সহৃদয় মানুষের কথা জানাতে চাই।

এঁরা যে কেবল তাঁদের কাজে দায়িত্ববান এবং একনিষ্ঠ তাই নন, এঁদের বেশির ভাগই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। এমন বহু সহকর্মীকে আমি দেখেছি, যাঁরা তাঁদের হাজারো কাজের ফাঁকে ফুরসত পেলেই ঠাকুর-মা-স্বামীজীর কথা বলতে ভালবাসেন। আমার প্রতি এঁদের যে অভাবনীয় ব্যবহার, তারও প্রেরণা যোগান, বস্তুত, স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণই। এঁদের সকলের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে একটি সৎসঙ্গ—যেখানে নিয়মিত ঠাকুর-মা-স্বামীজীর জীবন ও বাণী নিয়ে চর্চা হয়, আলোচনা হয়, সঙ্গে সঙ্গে স্বল্প ক্ষমতা সত্ত্বেও নানান জনহিতকর কাজের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

এই পবিত্র বেষ্টনীতে আমিও সামিল হয়ে যাই একদিন। এঁদের সাহচর্য অল্পে অল্পে আমায় চিনতে শেখায় ঠাকুর-মা-স্বামীজীর মহৎ জীবনকে। সেই চিনতে শেখা কবে ব্যাকুলতায় বদলে গেছে—আমি নিজেও বুঝতে পারিনি। আজ বিভিন্ন সভায় আমি ছুটে যাই ঠাকুরের কথা শুনব বলে।

জীবনের এই উপান্তে দাঁড়িয়ে যেন সেই মহা আলোকের দিশা খুঁজে পাই অল্পে অল্পে। এই আলোর পথে আমার সহচর লালবাজার পুলিশ দপ্তরের কিছু সহকর্মী—এই কথাটাই আপনাদের কাছে আজ সগর্বে জানাতে চাই।

প্রদীপ গুহ
কলকাতা-৭০০ ০২৯

মানবদেহে 'মিনারেল সল্ট'-এর গুরুত্ব

সৈয়দ আনিসুল আলম

আমাদের দেহগঠনের ক্ষেত্রে প্রোটিনের পরেই খনিজ লবণ বা মিনারেল সল্ট-এর স্থান। দেহের মোট ওজনের শতকরা ৪ ভাগ খনিজ লবণ। তার মধ্যে প্রায় ৪ ভাগের ৩ ভাগ ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস। অবশিষ্ট অংশ অন্যান্য খনিজ পদার্থ। এইসকল খনিজ লবণ অতি সামান্য মাত্রায় প্রয়োজন হলেও স্বাস্থ্যরক্ষায় এদের গুরুত্ব অপরিসীম। এদের বলা হয় 'মাইক্রোমিনারেলস' (micro-minerals)—যেমন ক্যালসিয়াম (১.৫-২.২), ফসফরাস (০.৮-১.২), পটাশিয়াম (০.৩৫), সালফার (০.২৫), সোডিয়াম (০.১৫), ক্লোরিন (০.১৫), ম্যাগনেসিয়াম (০.০৫)। এছাড়াও আছে 'ট্রেস এলিমেন্টস' (Trace elements)—যেমন লৌহ (৫.০৩৪), ম্যাঙ্গানিজ (০.০০০৩), তামা (০.০০০১৫), আয়োডিন (০.০০০০৪)। মানবদেহে আরো কয়েকটি প্রয়োজনীয় খনিজ ধাতু যেমন—জিঙ্ক, নিকেল, কোবাল্ট, ফ্লোরিন, অ্যালুমিনিয়াম, বোরন, আর্সেনিক, মলিবডেনাম, ক্যাডমিয়াম, সিলিকন, স্ট্রনসিয়াম আছে, যাদের পরিমাণ ওদের থেকেও নগণ্য।

এইসকল খনিজ লবণের মধ্যে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম, তামা ও ম্যাঙ্গানিজ ক্ষারজাতীয় পদার্থ। এদের দ্বারা দেহের ক্ষারত্ব ভাব (alkalinity) সুরক্ষিত থাকে। তেমনি ফসফরাস ও ক্লোরিন অ্যাসিড উৎপন্নকারী পদার্থ। আমাদের দেহে ক্ষার ও অ্যাসিড উৎপন্নকারী খনিজ লবণগুলি সঠিক অনুপাতে থাকলে দেহ সুস্থ-সবল থাকে। খনিজ পদার্থগুলির কাজকর্ম পরস্পর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়। যেমন ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস একসঙ্গে হাড় ও দাঁত গঠনে সাহায্য করে। শৈশব ও কৈশোরে দেহগঠন ও বৃদ্ধির মুখে খনিজ লবণ একান্ত দরকার। এগুলির অভাব হলে দেহগঠন ব্যাহত হয়। তাছাড়া নানারকম অসুখও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় লৌহের অভাবে অ্যানিমিয়া, ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন-ডি-এর অভাবে রিকেট, আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড ইত্যাদি রোগ হয়।

সংক্ষেপে খনিজ লবণের কাজ

(১) খনিজ লবণ দেহগঠনের কাজ করে। অস্থি, পেশি, রক্ত ইত্যাদি গঠনে সক্রিয় অংশ নেয় ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ, সালফার, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি। শিশু ও কিশোরদের দেহগঠনে এগুলি অপরিহার্য।

(২) এনজাইম ও কো-এনজাইম সক্রিয় রাখে।

(৩) পেশি সঞ্চালনে সাহায্য করে।

(৪) দেহের আভ্যন্তরীণ কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন—আমাদের রক্তের আস্রবণ চাপ (osmotic pressure) এবং ph-এর সমতা রক্ষা করতে সহায়তা করে। দেহের জলীয় অংশের সমতা রক্ষায় সাহায্য করে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, ক্লোরিন ইত্যাদি।

(৫) দেহের কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থিরস উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে।

(৬) খাদ্য থেকে শক্তি মুক্ত করতে এবং দেহের অন্যান্য কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে ফসফরাস, আয়োডিন, সালফার ইত্যাদি।

ক্যালসিয়াম ঃ

আমাদের দেহের মোট ক্যালসিয়ামের পরিমাণ সারা দেহের ওজনের এক-পঞ্চমাংশ। এর শতকরা ৯৯ ভাগ থাকে হাড়ে ও দাঁতে। বাকি শতকরা ১ ভাগ থাকে দেহের কোমল তন্তুতে, রক্তে এবং দেহের জলীয় অংশে। প্রতি ডেসিলিটার প্লাজমায় ৯-১১ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। কোমল তন্তুতে শতকরা ০.৫ ভাগ এবং অতিরিক্ত তন্তুজ রসে শতকরা ০.১ ভাগ ক্যালসিয়াম বর্তমান। এই লবণ ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও ক্যালসিয়াম ফসফেট-রূপে বর্তমান থাকে।

কার্য ঃ দাঁত ও হাড়ের গঠনে এটি একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু এর সঙ্গে ফসফরাসের দরকার। দেখা যায় ক্যালসিয়াম ভিটামিন-ডি-র অভাবে শোষিত হয় না। এজন্য হাড়ের ভাল গঠন হতে পারে না, যার ফলে শিশুদের রিকেট রোগ হয়। আবার ক্যালসিয়াম শোষণে ও বিপাকে প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড-নিঃসৃত হরমোন বিশেষভাবে আবশ্যক।

দাঁত ও হাড় গঠন ছাড়াও ক্ষত থেকে নির্গত রক্তের জমাটবাঁধায়, নার্ভের উত্তেজনা আনতে এবং হরমোনের প্রক্রিয়া সম্পাদনে এই লবণটি প্রয়োজন। তাছাড়া হৃৎপিণ্ডের নিয়মিত ছন্দোময় স্পন্দন, পেশির ঠিকমতো সঙ্কোচন, স্নেহপদার্থ এবং লৌহগঠিত লবণ দেহে গ্রহণযোগ্য করা ক্যালসিয়ামের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এইভাবে ক্যালসিয়াম দেহের পুষ্টিসাধন এবং জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে আয়ু দীর্ঘ করতে সহায়তা করে। রক্তে ক্যালসিয়ামের হার নির্দিষ্ট পরিমাণ বজায় রাখতে পারে প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের হরমোন। এর কাজ ঠিকমতো না হলে রক্তে ক্যালসিয়ামের হার বেড়ে যায়, ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশে পাথর (stone) সৃষ্টি হয়। অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম খেলে 'হাইপার ক্যালসিমিয়া' হয়।

উৎস ঃ দুধ, ছানা, পনির, দই, ডিমের কুসুম, সবুজ শাকসবজি, বাদাম, গম, ভুট্টা, জই, বিভিন্ন ফল, মুগ, মুসুর প্রভৃতি ডালে যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়াম থাকে। তবে ছানা

ও দুধের উপকারিতা বেশি, তার কারণ এদের মধ্যে ফসফরাস যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। এসব ছাড়া শিম, বাঁধাকপি, মুলো, কড়াইশুঁটি, আতা, বেল ও ঝুনো নারকেলে প্রচুর ক্যালসিয়াম আছে। ১০০ গ্রাম ঝুনো নারকেলে ২১০ মিলিগ্রাম ফসফরাস আছে। নারকেলে যথেষ্ট ফ্যাট ও সামান্য প্রোটিন আছে। এজন্য নারকেল উৎকৃষ্ট খাদ্য।

প্রয়োজনীয়তা ঃ ধাতব পদার্থগুলি শরীরের তরল পদার্থের সঙ্গে মিশে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রসমূহের কর্ম সম্পন্ন করতে সহায়তা করে। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলার প্রতিদিন প্রায় ০.৬-০.৯ গ্রাম ক্যালসিয়াম প্রয়োজন। দেহের ওজন ও আয়তন অনুযায়ী এর প্রয়োজন বেশি হয়। তবে গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী নারীর প্রতিদিন ১.০-১.২০ গ্রাম আবশ্যক। শিশু ও বাড়ন্ত বালক-বালিকাদের ক্যালসিয়ামের দৈনিক প্রয়োজন ০.৭৫-১.০ গ্রাম। তাই তাদের দৈনিক আধ কিলোর বেশি দুধ খাওয়ানো দরকার।

অভাবজনিত কুফল ঃ প্রয়োজনের তুলনায় ক্যাল-সিয়ামের ঘাটতি হলে অস্থির পুষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হয়, পানসে দাঁত হয়, তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায়, দাঁতে পোকা লাগে, দাঁতের নানারকম রোগ হয় এবং অল্পবয়সে দাঁত তুলতে হয়। তাছাড়া শিশুদের পায়ের হাড় অপুষ্টির জন্য বেঁকে যায় এবং চলতে শেখে দেরিতে। শিশুদের ক্যালসিয়ামের বেশি অভাব হলে তাদের রিকেট রোগ হয়। ক্যালসিয়ামের অভাবে শারীরিক দুর্বলতা আসে, জীবনীশক্তি হ্রাস পায় এবং অকালবার্ধক্য আসে।

ফসফরাস ঃ

আমাদের সারা দেহে প্রায় ৭০০ গ্রাম ফসফেট আছে। এর মধ্যে হাড়ে প্রায় ৬০০ গ্রাম, মস্তিষ্কে প্রায় ৫ গ্রাম, রক্তে প্রায় ২ গ্রাম, কোমল টিস্যুতে শতকরা ১৫ ভাগ এবং অতিরিক্ত তন্তুজ রসে শতকরা ১ ভাগ ফসফেট থাকে।

উৎস ঃ দুধ, ছানা, মাংস, ডিম, বাদাম, নারকেল, ডাল, পাতিলেবু, গাজর, ধনেপাতা ইত্যাদিতে ফসফরাস বর্তমান।

প্রয়োজনীয়তা ঃ ৭০ কিলোগ্রাম ওজনের প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিদিন প্রায় ১.৫ গ্রাম ফসফরাস প্রয়োজন, অর্থাৎ প্রতি কিলোগ্রাম খাদ্যে প্রায় ০.০২ গ্রাম ফরফরাস প্রয়োজন। শিশু ও বালক-বালিকাদের জন্য ফসফরাস বয়স্কদের তুলনায় দেড় গুণ বেশি লাগে—প্রতিদিন প্রায় ২ গ্রাম। গর্ভবতী মহিলাদের শেষের কয়েক সপ্তাহ প্রতিদিন প্রায় ৩ গ্রাম প্রয়োজন। স্তন্যদানকালে দৈনিক ১.৬-২ গ্রাম আবশ্যক হয়। আগেই বলা হয়েছে, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন-ডি পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। তাই দুধ, ছানা, ডিম ইত্যাদির সঙ্গে সবুজ শাকসবজিও আহার করা প্রয়োজন। শসা, গাজর, বিট, ধনেপাতা, পুদিনাপাতা, পাতিলেবু প্রভৃতি দিয়ে তৈরি স্যালাড নিয়মিত খাওয়া দরকার। ফসফরাস হাড় ও দাঁতের গঠনে অতি মূল্যবান উপাদান।

পটাশিয়াম ঃ

সারা দেহের রক্ত, রস ও টিস্যুতে পটাশিয়াম বর্তমান। প্রতি ১০০ সি.সি. রক্তে ২০০ মিলিগ্রাম, প্রতি ১০০ সি.সি. প্লাজমাতে ২০ মিলিগ্রাম, প্রতি ১০০ গ্রাম দেহকোষে ৪৪০ মিলিগ্রাম, প্রতি ১০০ গ্রাম পেশিতে ২৫০-৪০০ মিলিগ্রাম এবং প্রতি ১০০ গ্রাম নার্ভ-টিস্যুতে ৫৩০ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম আছে।

উৎস ঃ টাটকা শাকসবজি, ফল ও বাদাম পটাশিয়ামের প্রধান উৎস। তাছাড়া আখ, গুড়, আনারস, কমলালেবু, কলা, খেজুর, আলু, কপি ও মুরগির মাংসে প্রচুর পটাশিয়াম আছে। অধিকাংশ সবজিতে ক্যালসিয়াম ও পটাশিয়াম একসঙ্গে থাকে। এইরকম খাদ্য নির্বাচন উত্তম এবং উপকারী।

প্রয়োজনীয়তা ঃ বয়স্কদের জন্য প্রতিদিন ১.৮-৫.৫ গ্রাম, শিশুদের জন্য ০.৩৫-১.২ গ্রাম এবং বালক-বালিকাদের জন্য ০.৫-৪.৫ গ্রাম প্রয়োজন।

কার্য ঃ পটাশিয়াম হৃৎপিণ্ড সক্রিয় রাখতে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের ছন্দোময় স্পন্দন বজায় রাখতে, স্নায়ুতন্ত্রের আবেগ ও উত্তেজনা পরিবহনে, পেশির সঙ্কোচন ও সঞ্চালনের কাজে, অ্যাসিড ও ক্ষারের সমতা বজায় রাখতে, কয়েকটি এনজাইম সক্রিয় রাখার কাজে এবং দেহের জলীয় অংশের সমতা রক্ষার কাজে বিশেষ প্রয়োজন।

পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ও সোডিয়ামের সহযোগিতায় হৃৎপিণ্ডের কার্য পরিচালনা করে।

অভাবজনিত ফল ঃ প্রয়োজনের তুলনায় পটাশিয়াম কম আহার করলে পেশি দুর্বল হয়, পক্ষাঘাত দেখা দিতে পারে, পেট ফাঁপে, সবসময় ঘুম ঘুম ভাব আসে, হৃৎপিণ্ডের পেশি দুর্বল হয়, মনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় ও কাজে ভুল হয় এবং স্নায়বিক উত্তেজনা দেখা দেয়। প্লাজমা বা রক্তরসে পটাশিয়ামের হার শতকরা ৬ মিলিগ্রামে নেমে গেলে মৃত্যু ঘটে। দেহকোষের মধ্যে পটাশিয়ামের হার শতকরা ৩০০-৪০০ মিলিগ্রাম এবং দেহকোষের বাইরে তরল পদার্থে ও প্লাজমায় শতকরা ২০ মিলিগ্রাম থাকে। তাছাড়া হৃৎপিণ্ডের মধ্যে পটাশিয়ামবিহীন তরল পদার্থ প্রবাহিত করা হলে হৃৎক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

সোডিয়াম ঃ

দেহের সমস্ত রক্তরসেই সোডিয়াম বর্তমান, তবে এটা প্রধানত সোডিয়াম ক্লোরাইড ও সোডিয়াম বাই-কার্বোনেট অবস্থায় থাকে। দেহকোষের ভিতরে নগণ্য পরিমাণে এবং কোষের বাইরে প্লাজমা বা রক্তরসে এটি বেশি বর্তমান। তাছাড়া থাকে টিস্যুর রসে সোডিয়াম ক্লোরাইড-রূপে। অশ্রু, স্বেদ, মুখের লালা ও থুতুতে সোডিয়াম বেশি থাকে। তাছাড়া রক্ত, প্লাজমা, লিম্ফ, পেশি, দেহকোষ ও নার্ভতন্তুতে সোডিয়াম বর্তমান।

উৎস ঃ খাবার লবণ, মাখন, খোয়া ক্ষীর, পনির ইত্যাদিতে সোডিয়াম পাওয়া যায়। মুড়ি, নোনতা বিস্কুট,

আচার প্রভৃতিতে এটি সোডিয়াম ক্লোরাইড-রূপে থাকে। অন্যান্য খাদ্যের তুলনায় আটা, চাল, বেশি পাকা ফল, দুধে সোডিয়ামের পরিমাণ কম।

প্রয়োজনীয়তা ঃ বয়স্কদের দৈনিক ১.০-৩.৫ গ্রাম, শিশুদের ০.১-০.৫ গ্রাম, বালক-বালিকাদের ০.৩-২.৫ গ্রাম সোডিয়াম প্রয়োজন। আমাদের জীবনধারণের জন্য সোডিয়াম অপরিহার্য।

কার্য ঃ আমাদের দেহে সোডিয়াম অ্যাসিড ও ক্ষারের সমতা বা ভারসাম্য (acid-base equilibrium) বজায় রাখে, দেহের মধ্যে সমতা রক্ষা করে, রক্তে ও কলারসে আস্রবণের চাপ (osmotic pressure) বজায় রাখে, রক্তের আঠাল ভাব (viscosity) রক্ষা করে, স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা· বহনের ক্ষমতা রক্ষা করে যায়, ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে পরিপাকের পর খাদ্যকণাগুলিকে বিশোধিত করতে সাহায্য করে, পেশি সঙ্কোচনে সহায়তা করে এবং পেশিতন্তুর মধ্যে উত্তেজনা আনে।

আমাদের দেহে টিস্যুর রসে শতকরা ২.৯ ভাগ সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। এজন্য আমাদের দৈনিক ২-৪ গ্রাম লবণ আহার করতে হয়, যাতে এই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সোডিয়ামকে রাখা যেতে পারে। তাছাড়া আমাদের দেহকোষ ও কলায় (টিস্যু) আস্রবণ চাপ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকলে তবেই দেহের জল রক্তে, কোষে এবং কলায় সহজে যাতায়াত করতে পারে। এর ফলে খাদ্যকণাগুলি জলের সঙ্গে মিশে ঠিকঠিকভাবে শোষিত হয়ে যায় ঐসকল দেহকলার মধ্যে। খাদ্যরসের সঙ্গে ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে সোডিয়াম শোষিত হলেও দেহে তার নির্দিষ্ট সীমা থাকে। অতিরিক্ত সোডিয়াম কিডনির মাধ্যমে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। দেহে সোডিয়াম ক্লোরাইডের হার নির্দিষ্ট রাখতে এবং তা প্রয়োজনমতো বের করে দেওয়ার কাজ নিয়ন্ত্রণ করে কিডনির অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত এনডোস্টোরন হরমোন। কোন কারণে এই হরমোন ক্ষরণ কমে গেলে 'অ্যাডিসন্স ডিজিজ' অসুখ হয়। আবার এই হরমোন বেশি বেড়ে গেলে দেহের মধ্যে সোডিয়াম জমে যায়। এর ফলে দেহে জল জমে এবং 'শোথ' দেখা দেয়। নেফ্রাইটিস এবং হৃৎপিণ্ডের রোগেও দেহে সোডিয়াম জমা হয় এবং এইরকম জল জমে 'শোথ' দেখা দেয়।

সোডিয়াম প্রস্রাব ছাড়াও মল ও ঘামের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। সেজন্য গরমকালে বেশি ঘাম হলে মাঝেমধ্যে পাতিলেবুর সঙ্গে লবণ-জল খেলে খুব উপকার হয়। তাছাড়া অনেকক্ষণ ধরে ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হলে অথবা বেশি বমি হলে দেহ থেকে প্রচুর সোডিয়াম বেরিয়ে যায়, যার ফলে দেহে অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেমন—চোখ-মুখ বসে যায়, পেশিতে টান পড়ে ও খিঁচুনি হয় এবং দাঁতকপাটি লাগে। এই অবস্থায় স্যালাইন সলিউশন খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা উচিত। শিশুদের এইরকম ডি-হাইড্রেশন হলে গায়ের চামড়া কুঁচকে যায় এবং চোখ কোটরে ঢুকে যায়। এই সময় সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার প্রয়োজন। তাছাড়া বাড়িতে 'O. R. S.' বা 'Oral rehydration solution salt' তৈরি করে খাওয়ালে সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাওয়া যায়। এটা তৈরি করা খুব সহজ—এক গ্লাস জলে ৬ চামচ চিনি এবং ½ চামচ লবণের মিশ্রণ। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, বেশি লবণ ব্যবহার করে রক্তচাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। লবণ ব্যবহার একেবারে কমিয়ে দিয়ে বা বন্ধ করে 'হাইপারটেনশন' বা উচ্চরক্তচাপে সুফল পাওয়া গেছে। তাই উচ্চরক্তচাপে 'সল্ট-ফ্রি' খাদ্যের প্রয়োজন। সেইসঙ্গে ভাত, আটা, খুব বেশি পাকা ফল খাওয়া চলবে। প্রস্রাবের দোষ না থাকলে চিনি খাওয়া যাবে।

সালফার ঃ

সারা দেহের ওজনের শতকরা প্রায় ০.২৫ অথবা ১৫০-২০০ গ্রাম সালফার আছে।

উৎস ঃ সালফার সাধরণত জৈব খাদ্যে পাওয়া যায়। এটা কয়েক রকম প্রোটিন, হরমোন, চুলের কিরাটিনে পাওয়া যায়। অল্প পরিমাণ অজৈব সালফেট টিস্যু, দেহকোষ এবং দেহের তরল পদার্থে বর্তমান। ১০০ মিলিলিটার রক্তের ০.১-১ মিলিগ্রাম সালফার জৈব পদার্থ হিসাবে থাকে।

মাছ, মাংস, ডিমের কুসুম, শিম ও শুঁটিজাতীয় সবজি বাঁধাকপি, পিঁয়াজ, যকৃত বা মেটে ও অন্যান্য খাদ্যশস্যে যথেষ্ট পরিমাণে সালফার আছে। পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রোটিন আহার করলে সালফারের প্রয়োজন মেটে। কারণ, প্রোটিনে প্রায় শতকরা ১ ভাগ সালফার থাকে।

কার্য ঃ প্রোটিন তৈরির ক্ষেত্রে সালফারের প্রয়োজন হয়। সালফার প্রোটিন ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি যৌগিক পদার্থে পাওয়া যায়। কয়েকটি ভিটামিনে সালফার কো-এনজাইমের কাজ করে। আরো কয়েকটি জটিল রাসায়নিক কাজে সালফারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। চুল ও নখের পুষ্টির জন্যও সালফার আবশ্যক।

ক্লোরিন ঃ

খাবার লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইডে ক্লোরিন থাকে।

উৎস ঃ ঘন সবুজ শাকসবজি, মাংস, কলা, আনারস, টমেটোতে এই লবণ থাকে। তাছাড়া ক্লোরিন দ্বারা পরিশ্রুত খাবার জল থেকেও এটি পাওয়া যায়।

প্রয়োজনীয়তা ঃ এর দৈনিক চাহিদা ১০০-২০০ মিলি মোল। দৈনিক ৩-৫ গ্রাম খাবার লবণ আহার করলে ঐ পরিমাণ ক্লোরিন পেয়ে যাই।

কার্য ঃ অন্ত্রে গ্যাস্টিক জুস বা পাচক রস তৈরি করতে ক্লোরিন একান্ত প্রয়োজন। অন্ত্রের মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড অণু ভেঙে হাইড্রোজেনের সঙ্গে ক্লোরিন সংযুক্ত হয় এবং

পাচক রস হাইড্রোক্লোরিন অ্যাসিড তৈরি করে। ক্লোরিনের এটাই প্রধান কাজ।

প্রতি ১০০ সি.সি. রক্তে ২৫০ মিলিগ্রাম, ১০০ সি.সি. প্লাজমায় ৩৭৫ মিলিগ্রাম, প্রতি ১০০ গ্রাম দেহকোষে ১৯০ মিলিগ্রাম এবং মাংসপেশিতে প্রতি ১০০ গ্রামে ৪০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকে।

ম্যাগনেসিয়াম ঃ

ম্যাগনেসিয়াম মানবজীবন ধারণের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান। এটি দেহের সমস্ত কোষে এবং টিস্যুতে বর্তমান। সারা দেহে প্রায় ২৩ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম আছে। তার প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ অর্থাৎ ১৬ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম হাড়ে ও দাঁতে বর্তমান। শতকরা ২৫ ভাগ ম্যাগনেশিয়াম দেহকোষের মধ্যে এবং অবশিষ্ট ৫ ভাগ অতিরিক্ত দেহরস ও প্লাজমায় বর্তমান।

উৎস ঃ সবজিই ম্যাগনেসিয়ামের প্রধান উৎস। শিম, কড়াইশুঁটি, মটরশুঁটি, সোয়াবিন, আলু, কাগজি বাদাম ও অন্যান্য খাদ্যশস্যে এটি পাওয়া যায়।

প্রয়োজনীয়তা ঃ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য দৈনিক প্রায় ৩০০-৩৫০ মিলিগ্রাম, গর্ভবতী ও প্রসূতিদের জন্য ৪৫০ মিলিগ্রাম এবং বালক-বালিকাদের জন্য ১৫০-২৫০ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম আবশ্যক।

কার্য ঃ ম্যাগনেসিয়াম অনেক এনজাইমের কাজে সহযোগী হিসাবে থাকে। টিস্যুর কাজকর্মে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এটি ক্যালসিয়ামের মতো খানিকটা স্নায়ু ও পেশির উত্তেজনায় কাজ করে। ম্যাগনেসিয়াম অস্থি ও দাঁত গঠনের মূল্যবান উপাদান এবং এর অভাবে ধনুষ্টঙ্কারের মতো অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে।

লৌহ ঃ

পুষ্টির জন্য লৌহ একটি খুব প্রয়োজনীয় খাদ্য-উপাদান। এটি 'ট্রেস এলিমেন্টস'-এর অন্যতম হলেও মানবদেহে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির দেহে লৌহ থাকে ৩-৫ গ্রাম। তার শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ থাকে রক্তের লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনে। শতকরা ৪ ভাগ থাকে পেশিতে। শতকরা ২৫ ভাগ থাকে যকৃতে, প্লীহায়, কিডনিতে ও অস্থিমজ্জায়। অবশিষ্ট ১ ভাগ থাকে রক্তের জলীয় অংশে বা প্লাজমায় এবং বিভিন্ন এনজাইমে।

উৎস ঃ যকৃত বা মেটে, মাংস, মাছ, ঢেঁকিছাঁটা চাল, ডিমের কুসুম, আটা, ডাল, বাদাম, পালংশাক, পেঁয়াজকলি, মুলোশাক, পুঁইশাক, লালশাক, কচুশাক, নটেশাক, বিন, করলা, উচ্ছে, সোয়াবিন, টমেটো, গুড় ইত্যাদিতে লৌহঘটিত খনিজ লবণ বেশ পাওয়া যায়।

কয়েকটি বিশেষ খাদ্যে প্রতি ১০০ গ্রামে লোহার পরিমাণ—মাছে ০.৬ মিলিগ্রাম, মাংসে ২ মিলিগ্রাম, যকৃতে ১২ মিলিগ্রাম, ডালে ৪-৫ মিলিগ্রাম, সজনে ডাঁটায় ৫.৩ মিলিগ্রাম, সবুজ শাকে ২-৯ মিলিগ্রাম, পিঁয়াজে ১.৬ মিলিগ্রাম, ডিমে ১ মিলিগ্রাম, গুড়ে ১১ মিলিগ্রাম।

প্রয়োজনীয়তা ঃ একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দৈনিক লৌহ প্রয়োজন ২০-২৪ মিলিগ্রাম। তাছাড়া দেহের ওজন ৭০ কিলোগ্রাম থেকে বেশি হলে প্রতি কিলোগ্রামে ০.২ মিলিগ্রাম অতিরিক্ত লৌহ প্রয়োজন। মহিলাদের আরো বেশি লাগে। ঋতুকালে, গর্ভধারণের সময় এবং বাচ্চাকে দুধ পান করানোর অবস্থায় তাদের দৈনিক ৪০ মিলিগ্রাম লৌহের আবশ্যক।

রক্তের লোহিত কণিকার রঞ্জক পদার্থ হিমোগ্লোবিনের মূল উপাদান প্রোটিন, লোহা ও গ্লোবিন। প্রশ্বাসের সঙ্গে আমরা অক্সিজেন টেনে নিই। সেই অক্সিজেন দ্বারাই ফুসফুসে রক্ত বিশোধিত হয়। সেই বিশোধিত রক্ত সারা দেহের কোষে কোষে প্রেরিত হয়। সেখানে দহন ক্রিয়ার ফলে দেহের প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপন্ন হয়। রক্তের হিমোগ্লোবিনের মাধ্যমেই এই কর্মচক্র সম্পাদিত হয়। তাই হিমোগ্লোবিনে লোহার অভাব হলে সব দেহকোষে অক্সিজেনের ঘাটতি হবে। এর ফলে দেহে বিপাক বা মেটাবলিজমের ব্যাঘাত ঘটবে। এর জন্য দেহে কম শক্তি হবে, উৎসাহ-উদ্দীপনা কমে যাবে, কোন কাজ করতে ইচ্ছে হবে না, দেহে দুর্বলতা বোধ হবে এবং অবসাদ আসবে। জেনে রাখা দরকার, প্রোটিনের অভাব হলেই লোহার অভাব হয়। অভাব বেশি হলে বা বেশিদিন চললে রক্তাল্পতা রোগ হয়।

খাদ্যের সঙ্গে আমরা যে-লোহা গ্রহণ করি, তার শতকরা ১০ ভাগ শোষিত হয়। এই শোষণকার্য ক্ষুদ্রান্ত্রের কোষগুলির মধ্যে প্রোটিনের সঙ্গে যুক্তভাবে হয়ে থাকে। দেহের রক্তস্রোতে অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে কতক অংশ চলে যায় অস্থিমজ্জায় ও প্লীহায়। এই প্লীহায় তৈরি হয় হিমোগ্লোবিন। এর কতকাংশ জমা হয় যকৃতে এবং কিছু অংশ জমা হয় পেশিতে মায়োগ্লোবিন-রূপে। তাছাড়াও কিছু অংশ এনজাইমের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যে-লোহাটুকু শোষিত হয় না তা বেরিয়ে যায় মলের সঙ্গে। রক্তের লোহা বেরিয়ে যায় মল, মূত্র ও ঘামের সঙ্গে।

অনেকদিন ধরে পেটের অসুখে ভুগলে অথবা পাকস্থলীতে জারক রস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ঘাটতি হলে লোহা-শোষণে ব্যাঘাত ঘটে।

রক্তে লোহা থাকে ৮০-১২০ মাইক্রোগ্রাম। তার যোগান আসে খাদ্যবস্তুর লোহা থেকে এবং যকৃত, পেশি ইত্যাদিতে সঞ্চিত লোহা থেকে। লোহিত রক্তকণিকার জীবনকাল গড়ে ১০০ দিন। তারপরই সেগুলি ভেঙে গিয়ে লোহা মুক্ত করে দেয়। ঐ লোহার কিছু অংশ নতুন রক্তকণিকা গঠনে অংশ নেয়। অবশিষ্ট অংশ মল, মূত্র ও ঘামের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। তবে হিমোগ্লোবিনের গঠনে নগণ্য পরিমাণে তামারও প্রয়োজন হয়।

কার্য ঃ দেহের প্রতিটি কোষে খাদ্যকণাগুলিকে জারিত ও আত্মস্থ (assimilation) করার জন্য লোহা প্রয়োজন হয়। কোন কোন এনজাইম গঠনে লোহা অংশগ্রহণ করে। লোহা অ্যানিমিয়া নিরাময়ক ও প্রতিরোধক।

তাম্র ছাড়া লৌহ কাজ করতে পারে না। তাই দৈনিক আমাদের দেহে ১২ মিলিগ্রাম লোহার প্রয়োজন হলে সেইসঙ্গে অন্তত ২ মিলিগ্রাম তামার আবশ্যক হয়।

শিশুদের ৩-৪ মাস বয়স থেকেই ডিমের কুসুম এবং অন্যান্য লৌহপ্রধান খাদ্য দেওয়া দরকার।

অ্যানিমিয়ার কারণ ঃ দৈনিক খাদ্যে প্রোটিনের অভাব হলে, পেটের দোষে লৌহশোষণে অসমর্থ হলে এবং কোন কারণে দেহ থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হলে—যেমন, শিরা কেটে দেহ থেকে বেশি রক্ত বেরিয়ে গেলে, রক্তস্রাবী অর্শ থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলে, মেয়েদের ঋতুকালে অতিমাত্রায় রক্তস্রাব হলে অথবা লিভারের দোষ হলে অ্যানিমিয়া হয়।

তাম্র ঃ

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দেহে ১০০-১৫০ মিলিগ্রাম তামা থাকে। তার মধ্যে প্রায় ৬২ মিলিগ্রাম পেশিতে, ২০ মিলিগ্রাম অস্থিতে এবং ১৮ মিলিগ্রাম যকৃতে পাওয়া যায়। এটি রক্তের লোহিতকণিকায়, লিভারে ও মস্তিষ্কেও পাওয়া যায়।

প্রয়োজনীয়তা ঃ বয়স্ক লোকদের দৈনিক ২-৫ মিলিগ্রাম এবং বালক-বালিকাদের ০.৫-২.৫ মিলিগ্রাম তামার প্রয়োজন।

উৎস ঃ মাছ, যকৃৎ, মসুরডাল, শিম ও শুঁটিজাতীয় সবজি, বিট, নটেজাতীয় শাক, ধনেপাতা, পুদিনা, কাঁচা লঙ্কা, আলু ও বাদাম ইত্যাদিতে তামা বর্তমান।

কার্য ঃ হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষে এবং তার রাসায়নিক কাজে তামা লৌহকে সাহার্য্য করে। এর সাহায্য ছাড়া দেহকোষে খাদ্যকণা অক্সিজেনের দ্বারা জারিত হতে অসুবিধা সৃষ্টি করে। শিশুখাদ্যে তামার অভাবে পরিশেষে অ্যানিমিয়া দেখা দেয়। তামা একজাতীয় প্রোটিনের উপাদান। যেমন, ফেরো-অক্সিডেজ এবং হেমোসায়ানিন্। কোন কোন এনজাইমের কাজে তামার ভূমিকা আছে। জানা গেছে যে, অস্থিগঠনের কাজে এবং লৌহ-শোষণের কাজ সহজতর করার ক্ষেত্রেও তামার ভূমিকা আছে।

অভাবজনিত ফল ঃ দেহের ওজন তামার ঘাটতির ফলে কমতে থাকে। তাম্রবিহীন খাদ্য গ্রহণের ফলে দেহের ওজন এত কমে যায় যে, শেষে মারাত্মক অবস্থা হয়। যে-খাদ্যে তাম্র নামমাত্র থাকে অথবা থাকে না—এমন খাদ্য বেশিদিন আহার করলে অ্যানিমিয়া হয়। এছাড়া কিছুদিনের মধ্যে চুল সাদা হয়ে যায়, আবার পর্যাপ্ত পরিমাণ তাম্রঘটিত খাদ্য আহার করলে পুনরায় মাথার চুল কালো হয়। তামার অভাবে অস্থির পুষ্টি বিষয়ে গোলযোগ দেখা দেয়, শিশুদের হাড় অস্বাভাবিক সরু হয়ে যায়, 'এট্রফি অফ মাইটো কন্‌ড্রিয়াম হয়—যার ফলে এয়োটা, করোনারি আর্টারি, পালমোনারি আর্টারির নমনীয়তা ও স্থিতিস্থাপকতা হারানোয় ঐসকল আর্টারি ছিঁড়ে বা ফেটে গিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। মস্তিষ্কে তামার ঘাটতি হলে কয়েকটি মূল্যবান কর্মকেন্দ্রে গোলযোগ সৃষ্টি হয় এবং সামঞ্জস্যহীন আচরণ ও কাজকর্ম দেখা দেয়।

ম্যাঙ্গানিজ ঃ

ম্যাঙ্গানিজ 'ট্রেস এলিমেন্টস'-এর অন্তর্ভুক্ত।

উৎস ঃ সবুজ পত্রবহুল সবজি, বিট, মিষ্টি আলু, কাঁচা কলা, নারকেল, কাগজি বাদাম, চিনা বাদাম, আখরোট, পিঁয়াজকলি, পুদিনাপাতা, ধনেপাতা ইত্যাদিতে এবং প্রাণিজ খাদ্যের মধ্যে যকৃতে ও কিডনিতে এর প্রাচুর্য আছে।

প্রয়োজনীয়তা ঃ বয়স্ক পুরুষ ও নারীদের প্রতিদিন ৫ মিলিগ্রাম এবং শিশু ও বালক-বালিকাদের দৈনিক ০.৫-৩ মিলিগ্রাম আবশ্যক।

কার্য ঃ ম্যাঙ্গানিজ অনেকরকম এনজাইমের মৌলিক উপাদান অথবা তাদের সহায়কারী হিসাবে কাজ করে। জীবদেহে এটি জন্মনিয়ন্ত্রণের ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ ম্যাঙ্গানিজের অভাবে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হয়। হাড়ের গঠনে এর কিছুটা ভূমিকা রয়েছে এবং শর্করাজাতীয় খাদ্যবিপাকে এর প্রভাব আছে।

আয়োডিন ঃ

উৎস ঃ সামুদ্রিক মাছ, পিঁয়াজে যথেষ্ট পরিমাণ আয়োডিন পাওয়া যায়। তাছাড়া, মাংস, ডিম, দুধ ও সবজিতে অল্প পরিমাণ থাকে।

সমুদ্রের জলে আয়োডিন থাকে বেশি, তাই সমুদ্রের কাছাকাছি এলাকার মাটিতে উৎপন্ন শাকসবজি, খাদ্যশস্য, ফলমূল ইত্যাদিতে এটি পাওয়া যায়। কাজেই এইসকল খাদ্যদ্রব্য গলগণ্ড-প্রতিরোধক। সামুদ্রিক মাছ এবং সামুদ্রিক মাছের যকৃতের তেলেও আয়োডিন থাকে। যেমন কড লিভার অয়েল, হেলিবার্ট অয়েল ও শার্ক অয়েল। সামুদ্রিক উদ্ভিদ এবং ছাগলের দুধেও আয়োডিন পাওয়া যায়। তাছাড়া যৎসামান্য আয়োডিন মাংস, মাছ, ডিম ও দুধে পাওয়া যায়। টাটকা শাকসবজিতে অতি অল্প পরিমাণ আয়োডিন থাকে, তবে জল ও খাদ্যে দোষ থাকলে আয়োডিন-বর্জিত খাদ্যে পরিণত হয়। আজকাল বাজারে আয়োডিন-মিশ্রিত লবণ পাওয়া যায়। ঐ লবণ ব্যবহার করাই উত্তম।

প্রয়োজনীয়তা ঃ আমাদের দেহে আয়োডিনের পরিমাণ ১২-১৫ মিলিগ্রাম। এর প্রায় ৬৫ ভাগ থাইরয়েড গ্রন্থিতে থাকে। প্লাজমায় ৫-৮ মাইক্রোগ্রাম আয়োডিন আছে। দৈনিক আয়োডিনের প্রয়োজন খুবই কম, অথচ এর গুরুত্ব অনেক বেশি। বয়স্ক মানুষের সারাবছরে ৫-১৫ মিলিগ্রাম অর্থাৎ প্রতিদিন ১০০-১৫০ মাইক্রোগ্রাম আয়োডিন প্রয়োজন। গর্ভবতী ও প্রসূতিদের একটু বেশি আবশ্যক।

অভাবজনিত ফল : আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড রোগ হয়। শিশুদের আয়োডিনের অভাবে থাইরয়েড গ্রন্থির হরমোন থাইরক্সিন সংশ্লেষে সক্ষম হয় না, তখন খাদ্য-বিপাক ক্রিয়া ব্যাহত হয়। এর ফলে শিশু দৈহিক ও মানসিকভাবে নিশ্চল ও দুর্বল হয়ে পড়ে। দেহের বৃদ্ধি কমে যায় এবং সে অবশেষে বামন বা খুব বেঁটে হয়ে যায়। এই রোগকে 'ক্রেটিনিজম' বলে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে 'মিক্সিডিমা' রোগ হয়। তাদের বিপাক ক্রিয়া কমে যায়, হাত-পা ফোলে, চোখের চামড়া ঝুলে পড়ে, চুল ঝরে যায়, শরীরে ও মনে স্থবিরতা এনে দেয়, ফলে তারা অথর্ব ও জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

কার্য : আয়োডিন থাইরয়েড গ্রন্থিতে থাইরক্সিন হরমোন তৈরি করে। অস্থি, চর্ম ও চুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও মসৃণতার জন্য আয়োডিন-ঘটিত খাদ্যের প্রয়োজন। দেহের মধ্যে বিপাক ক্রিয়ায় আয়োডিন একান্ত আবশ্যক। মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও গঠনের জন্য আয়োডিন প্রয়োজন। গর্ভ রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রসূতি মায়েদের দুধ উৎপাদনে আয়োডিন-ঘটিত খাদ্যের প্রয়োজন।

জিঙ্ক :

উৎস : যকৃৎ বা মেটে, দুধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য ও ডিমে জিঙ্ক যথেষ্ট পাওয়া যায়। তাছাড়া ঢেঁকিছাঁটা খাদ্যশস্য, শিম ও কড়াইশুঁটি, মটরশুঁটি, ডাল, সবজি—যেমন লেটুস, স্পিনাক, পত্রবহুল শাক ইত্যাদিতেও জিঙ্ক বর্তমান।

প্রয়োজনীয়তা : বয়স্কদের দৈনিক ১৫ মিলিগ্রাম, গর্ভবতী ও প্রসূতিদের ২০-২৫ মিলিগ্রাম এবং শিশু ও বালক-বালিকাদের ৩-১০ মিলিগ্রাম জিঙ্ক প্রয়োজন।

৭০ কিলোগ্রাম ওজনের মানবদেহে ১.৪ থেকে ২.৩ গ্রাম জিঙ্ক আছে। এটি সবচেয়ে বেশি থাকে চর্মে এবং প্রস্টেট গ্রন্থিতে (প্রতি ১০০ গ্রামে ৭০-৮৬ মিলিগ্রাম), মাঝারি পরিমাণে থাকে হাড়ে ও দাঁতে (প্রতি ১০০ গ্রামে ১৫-২৫ মিলিগ্রাম), কম পরিমাণে আছে কিডনি, হার্ট, পেশি, প্লীহা ও প্যাংক্রিয়াসে (প্রতি ১০০ গ্রামে ২.৩-৫.৫ মিলিগ্রাম) এবং সবচেয়ে অল্প থাকে মস্তিষ্ক ও ফুসফুসে (প্রতি ১০০ গ্রামে ১.৪-১.৫ মিলিগ্রাম। এটি প্যাংক্রিয়াটিক জুসের মাধ্যমে পিত্তের মধ্যে ক্ষরিত হয়। এছাড়া প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে ৬৫০-৮৫০ মাইক্রোগ্রাম জিঙ্ক থাকে। প্রতি ১০০ মিলিলিটার প্লাজমায় ১২০-১৪০ মাইক্রোগ্রাম জিঙ্ক থাকে।

কার্য : ভিটামিন-এ-র বিপাকে জিঙ্কের ভূমিকা আছে। এটি লিভার থেকে রক্তের ভিটামিন-এ যোগান দেয়। বহুমূত্র রোগে প্যাংক্রিয়াসের জিঙ্ক উপকারে আসে বলে জানা গেছে। ইনসুলিনের সুরক্ষায় এবং ক্ষরণের কাজে জিঙ্ক অংশগ্রহণ করে। কতকগুলি এনজাইমের ক্ষেত্রেও জিঙ্ক অপরিহার্য অংশ হিসাবে থাকে।

অভাবজনিত ফল : মানবদেহে জিঙ্কের অভাব হলে দেহের বৃদ্ধি হ্রাস পায় এবং দেহ খর্ব ও বামন হয়ে যায়। সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে জিঙ্কের অভাব বাধার সৃষ্টি করে। জিঙ্কের অভাব ক্ষত সারতে বিলম্ব ঘটায়।

নিকেল :

প্রতি লিটার রক্তে ১.১-৩.৬ মাইক্রোগ্রাম নিকেল থাকে।

উৎস : প্রাণীর মাংসে নিকেল অতি অল্প পরিমাণ পাওয়া যায়।

প্রয়োজনীয়তা : বয়স্কদের প্রতিদিন কম করে ২০ মাইক্রোগ্রাম নিকেল প্রয়োজন।

কার্য : নিকেল দেহের বৃদ্ধিতে কাজ করে। তাছাড়া সন্তান জন্মদানে নিকেলের ভূমিকা রয়েছে। কয়েকটি এনজাইমের কাজকে নিকেল সক্রিয় করে তোলে।

প্রতিক্রিয়া : নিকেল সাধারণভাবে বিষাক্ত ধাতু না হলেও যাঁরা নিকেল-বিশোধন অথবা ঐরূপ কাজ করে, তাদের ফুসফুস ও চর্মে রোগ হয়। লিভার সিরোসিস এবং ক্রনিক ইউরিসিয়ায় রক্তে নিকেলের পরিমাণ কমে যায়। তরুণ মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কসন হলে রক্তে নিকেলের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যায়। হার্ট স্ট্রোকে রক্তে নিকেলের পরিমাণ অত্যধিক বেড়ে যায়। তৃতীয় ডিগ্রির অগ্নিদগ্ধের ক্ষেত্রেও ঐরূপ রক্তে নিকেল বৃদ্ধি পায়।

কোবাল্ট :

উৎস : প্রাণিজ খাদ্যেই কোবাল্ট পাওয়া যায়। এটি কোন সবজি-খাদ্যে নেই।

প্রয়োজনীয়তা : আমাদের দৈনিক সাধারণ খাদ্যে ৫-৮ মাইক্রোগ্রাম কোবাল্ট প্রয়োজন। যেখানে নিকেল গ্রহণের পরিমাণ অল্প, সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া বেশি হয়।

কোবাল্ট ভিটামিন বি-১২-এর অপরিহার্য উপাদান। এতে ০.০৪৫-০.০৭ মাইক্রোগ্রাম কোবাল্ট থাকে।

কার্য : কোবাল্ট এনজাইম তৈরিতে সাহায্য করে। বোন ম্যারো বা অস্থিমজ্জার ক্রিয়াকলাপে এটি প্রয়োজন। অস্থিমজ্জার কাজ নিয়মিত রাখতে এবং লোহিত রক্ত-কণিকার বৃদ্ধি ও পূর্ণতা পেতে এটি প্রয়োজন হয়। কোবাল্টের ঘাটতি হলে ভিটামিন বি-১২-এর ঘাটতি হয়, যার ফলে শেষে অ্যানিমিয়া দেখা দেয়।

ফ্লোরিন :

উৎস : খাবার জলে, চা, কয়েকটি সামুদ্রিক মাছে এবং উদ্ভিদে ফ্লোরিন পাওয়া যায়।

প্রয়োজনীয়তা : বয়স্কদের প্রতিদিন ২-৩ মিলিগ্রাম, বালক-বালিকাদের ০.৫-২ মিলিগ্রাম ফ্লোরিন প্রয়োজন।

কার্য : ফ্লোরিন অস্থি ও দাঁতে অতি নগণ্য পরিমাণে থাকে। এটি অস্থি শক্ত করতে পারে, দাঁতের স্বাস্থ্য আনে, দাঁতের এনামেল শক্ত করে। ফ্লোরিন দাঁতকে কেরিজ (caries) বা অস্থিক্ষয় রোগ থেকে রক্ষা করে। জল ও ফ্লোরিনের অনুপাতে ২ মিলিয়ন বা কুড়ি লক্ষ ভাগের কম

পরিমাণ ফ্লোরিন গ্রহণ করলে দাঁতের রোগ হয় এবং দাঁতে হলদে বা কাল দাগ পড়ে। আবার অধিক ফ্লোরিন ব্যবহারের ফলে 'ফ্লোরোসিস' রোগ হয়। দাঁতে এনামেল ক্ষয় হয় এবং দাঁতে গর্ত হয়।

মলিবডেনাম ঃ

উৎস ঃ ধনেপাতা, লাল নটেজাতীয় শাক, মেথিশাক ও চিনাবাদামে প্রচুর মলিবডেনাম পাওয়া যায়।

প্রয়োজনীয়তা ঃ বয়স্কদের প্রতিদিন ০.৫ মিলিগ্রাম এবং বালক-বালিকাদের ০.০৫-০.৩ মিলিগ্রাম মলিবডেনাম আবশ্যক।

কার্য ঃ মলিবডেনাম কতকগুলি এনজাইমের ক্রিয়াকর্মে সহায়তা করে। অতি নগণ্য পরিমাণ মলিবডেনাম তামার কাজে সাহায্য করে।

সিলেনিয়াম ঃ

উৎস ঃ উদ্ভিদজগৎ সিলেনিয়ামের প্রধান উৎস।

প্রয়োজনীয়তা ঃ বয়স্ক মানুষদের প্রতিদিন ০.২ মিলিগ্রাম এবং বালক-বালিকা ও শিশুদের ০.০২-০.১ মিলিগ্রাম সিলেনিয়াম প্রয়োজন।

কার্য ঃ যেসব অঞ্চলের মাটিতে সিলেনিয়ামের পরিমাণ খুবই অল্প, সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে হৃদ্‌রোগ অধিক হয়। সিলেনিয়াম ভিটামিন-ই-র চাহিদা কিছুটা পূরণ করতে পারে। সিলেনিয়াম মেমব্রেন বা ঝিল্লির মধ্যস্থিত টিস্যুকে অধিক অক্সিডেশন থেকে রক্ষা করে।

কাচশিল্প, মৃৎশিল্প এবং রঙ কারখানার শ্রমিকদের ওপর সিলেনিয়াম-ঘটিত বিষক্রিয়া হতে দেখা যায়। সিলেনিয়াম-সমৃদ্ধ মাটির ওপর জন্মানো ঘাস জন্তুরা আহার করলে তাদের দেহেও সিলেনিয়াম-ঘটিত বিষক্রিয়ার ফলে রোগ জন্মায়।

ক্রোমিয়াম ঃ

ক্রোমিয়াম মানবদেহের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। বয়স্কদের থেকে শিশুদের মধ্যে এর ঘনত্ব বেশি থাকে।

উৎস ঃ কাগজি লেবু, কাজুবাদাম, আখরোট, কাঁচা আম, পিঁয়াজকলি, বিট, গাজর, লাল নটেজাতীয় শাকপাতা, ধনেপাতা, লাউ ইত্যাদিতে মোটামুটি ভালই ক্রোমিয়াম থাকে।

প্রয়োজনীয়তা ঃ বয়স্কদের প্রতিদিন ৭০ মাইক্রোগ্রাম ক্রোমিয়াম আবশ্যক।

কার্য ঃ ক্রোমিয়াম শর্করা, প্রোটিন এবং চর্বিজাতীয় খাদ্যবিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। ক্রোমিয়াম ইনসুলিনকে কর্মক্ষমতা প্রদান করে। সেইজন্য একে 'গ্লুকোজ টলারেন্স ফ্যাক্টর' বলা হয়। ক্রোমিয়াম অ্যায়োর্টার গায়ে প্লেক (plaque) জমতে দেয় না এবং তা জমলেও কমিয়ে দিতে পারে। তাছাড়া এটি সিরামের কোলেস্টেরল-লেভেল কমিয়ে দেয়। ক্রোমিয়াম অ্যামিনো অ্যাসিড একত্রীভূত করে প্রোটিন বিপাকে সহায়তা করে। প্রোটিন-জনিত অপুষ্টির ক্ষেত্রে ক্রোমিয়াম আহার করলে দেহের ওজন বৃদ্ধির পক্ষে খুবই হিতকর হয়।

ক্রোমিয়াম কারখানার কর্মীদের মুখমণ্ডলের অনাবৃত অংশে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আর্সেনিক ও অ্যালুমিনিয়াম এমনিতেই আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্য এবং জলের মাধ্যমে বেশি এসে যায়। তাই এইসকল ধাতুর আধিক্য থেকে রক্ষা পেতে সদাসতর্ক থাকতে হবে। ❑

সহায়ক গ্রন্থ

(১) Clinical Dietetics and Nutrition—Dr. F. P. Antia

(২) Health and Longevity—Dr. A. C. Salmon

(৩) Biochemistry—Debajyoti Das

(৪) Text Book of Medical Biochemistry—(Brig) Dr. M. N. Chatterjee & Dr. Rana Shinde

(৫) Food, Health, Vitamins—R. H. A. Plimmer & V. G. Rlimmer

(৬) Webster's Encyclopedic Dictionary

(৭) খাদ্য ও পুষ্টি—অধ্যাপিকা ডঃ নারায়ণী বসু

ভ্রম-সংশোধন

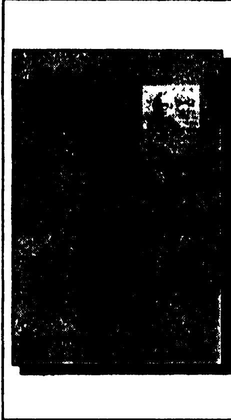
'উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪০৮ সংখ্যার ১৬১ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ৩৪ পঙ্‌ক্তিতে 'স্বামী প্রেমেশানন্দ'-এর পরিবর্তে 'স্বামী তপানন্দ' হবে।

'উদ্বোধন'-এর গত জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ সংখ্যার ৩১০ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ২৫তম পঙ্‌ক্তিতে 'remined'-এর পরিবর্তে 'remind', ৩১২ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ৫ম পঙ্‌ক্তিতে পশ্চিমে 'প্রশান্ত মহাসাগর'-এর পরিবর্তে 'আরবসাগর' এবং ৩১৫ পৃষ্ঠায় স্বামী সুবোধানন্দের পত্রদ্বয়ের তারিখ '৫।৩।৩৫' এবং '৯।১।৩৮' হবে।

অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিগুলির জন্য আমরা দুঃখিত।

দেশ যেখানে দলের চেয়ে বড়

দেবব্রত দাস



লোকশক্তি ও সমসমাজ
জয়প্রকাশ নারায়ণ
সম্পাদনা ঃ সজল বসু
প্রকাশক ঃ
লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি
৪২, আনন্দ পালিত রোড
কলকাতা-১৪
ও
সুজন পাবলিকেশনস্
৭বি লেক প্লেস, কলকাতা-২৯
পৃষ্ঠা ঃ ১৬+১৩০
মূল্য ঃ ৫০ টাকা

ব্রিটিশ-পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেয়ে ভারতের স্বাধীনতা আসে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। প্রজাতন্ত্ররূপে ভারতের আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি—যা 'সাধারণতন্ত্র দিবস'-রূপে চিহ্নিত। ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন মধ্যরাতে দেশে জারি হয় জরুরী অবস্থা—গণতন্ত্রের কণ্ঠ হয়েছিল রুদ্ধ। ১৯৭৭ সালে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পিছনের মূল ব্যক্তিত্বটি ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, যিনি 'জে. পি.' নামে পরিচিত।

সেকালে জয়প্রকাশ নারায়ণের লোকশক্তি ও লোকসঙ্ঘর্ষের চিন্তাভাবনা বিকল্প এক পথের সন্ধান দিয়েছিল—যেখানে সামাজিক নেতৃত্ব গড়ে উঠেছিল এক নতুন ধারায়, অরাজনৈতিক আধারে। এর উদাহরণ হিসাবে মেধা পাটেকর, সুন্দরলাল বহুগুণা, বাবা আমতের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁদের গঠনকর্ম ও প্রতিরোধ আন্দোলনই বর্তমানে ভারতীয় গণতন্ত্রে অতন্দ্র প্রহরী।

সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় ইতিহাসে জয়প্রকাশ নারায়ণই (১৯০২-১৯৭৯) যথার্থ অর্থে শেষ শিক্ষিত বৌদ্ধিক নেতা—যিনি দেশের সমস্যা বুঝতে চাইতেন রাষ্ট্রনায়কের দৃষ্টিতে, পার্টি-নেতার দৃষ্টিতে নয়। ক্ষমতার বাইরে থেকে, মন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির পদ থেকে দূরে সরে থেকে তিনি গণতন্ত্র রক্ষায় ব্রতী হন এবং অমানুষিক লাঞ্ছনা ও নির্যাতন ভোগ করেন। বিহার ও উত্তরপ্রদেশের সীমান্তের এক গ্রামে তাঁর জন্ম, পাটনায় প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করার পর আমেরিকায় শিক্ষাগ্রহণ, আমেরিকায় মার্কসবাদী হয়ে ওঠা, দেশে ফিরে এসেই অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান, কংগ্রেসের শ্রমিক কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি গঠন, '৪২-এর আন্দোলন চলাকালীন দেশকে মুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে চিঠি প্রচার, স্বাধীনতার পর সোস্যালিস্ট পার্টি গঠন, ভূদান আন্দোলনে যোগদান, বিহারে জন আন্দোলনের নেতৃত্বগ্রহণ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামী ভূমিকা আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে।

বর্তমান কোয়ালিশন যুগ ও অস্থির রাজনীতির জন্য অনেক সমালোচক জয়প্রকাশকেই দায়ী করেন। কিন্তু জয়প্রকাশের আন্দোলনের ফলেই রাজনীতির স্তরে গড়ে উঠেছে এক নতুন সামাজিক জোট। আগে প্রান্তিক ও নীরব ছিল এমন বহু গোষ্ঠী ক্ষমতার অলিন্দে জায়গা করে নিয়েছে, সোচ্চার হয়েছে নিজেদের দাবি-দাওয়ায়। এই সূত্রে গণতন্ত্রের ভিত শক্ত হয়েছে, উন্নয়ন ভাবনায় যুক্ত হয়েছে প্রান্তিক গরিব মানুষদের কল্যাণের কর্মসূচী।

জয়প্রকাশ নারায়ণের জন্মশতবর্ষে তাঁর বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব, ভারতীয় গণতন্ত্রে তাঁর অবদান তুলে ধরার জন্য প্রকাশিত হয়েছে তাঁর একটি সঙ্কলনগ্রন্থ—**'লোকশক্তি ও সমসমাজ'**। গ্রন্থটিতে মোট ১৩টি অধ্যায়—(১) সমাজতন্ত্র কেন চাই, (২) মার্কসবাদ থেকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ, (৩) ভারতে সমাজবাদের পথ, (৪) স্বপ্নের সমাজে নৈতিকতা, (৫) পঞ্চায়েত রাজ-এর দর্শন ও কর্মসূচী, (৬) আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ, (৭) বিহার আন্দোলন ঃ পথ ও লক্ষ্য, (৮) জাতি ও গণতন্ত্র, (৯) গণতন্ত্রের নাটক ও নাগরিক অধিকার, (১০) গণ আন্দোলন ও লোকশক্তি, (১১) সম্পূর্ণ ক্রান্তি, (১২) সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য সব মানুষের কল্যাণ এবং (১৩) ছোট রাজ্যের পক্ষে।

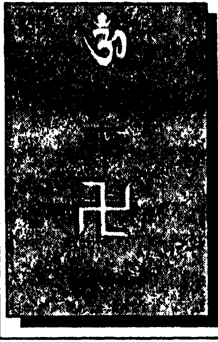
গ্রন্থটিতে তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন ঃ "বিয়ের অল্প পরেই আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাই এবং ফিরি কট্টর মার্কসবাদী হয়ে। অন্যদিকে, আমার স্ত্রী চলে যান সবরমতী আশ্রম এবং গান্ধীজীর দত্তক কন্যা হন, গান্ধীজী ও তাঁর আদর্শে গভীরভাবে অনুরক্ত হন।... আজ আমি যা হয়েছি, তাঁর সাহায্যেই সম্ভব হয়েছে। আমার হয়ে ওঠায় তাঁর অবদান ভুলতে পারি না।" (পৃঃ ১১৬) আবার সমাজবাদ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ "সমাজবাদ এমন সমাজ চায় যেখানে মানুষের সমান অধিকার, সমান সুযোগ, কাজের অধিকার ও পূর্ণ জীবনের অধিকার স্বীকৃত।" (পৃঃ ১১৬-১১৭) লোকশক্তির জাগরণ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ঃ "যদি আন্দোলনে প্রভাবশালী নির্দলীয় নেতৃত্ব দাঁড় করানো যায়, পর্যাপ্ত লোক-জাগৃতি হয়, লোকশক্তি সৃষ্টি হয়, তবে আন্দোলনের নির্দলীয় স্বরূপ উপস্থাপিত করা সম্ভব।" (পৃঃ ৯৬-৯৭) অন্য এক প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ "মানবজীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে এত প্রশ্ন এবং এত সমস্যা রয়েছে যে, সেগুলির সমাধান খোঁজার কাজ কখনোই শেষ হতে পারে না। কিন্তু এত সব কাজ কে করবে এবং কবে করবে তা ভেবে আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না।... আমাদের কেবল 'ক্যাটলেটিক এজেন্ট' হয়ে থাকতে হবে।" (পৃঃ ১১১)

এই প্রামাণ্য দলিলস্বরূপ সঙ্কলনগ্রন্থ **'লোকশক্তি ও সমসমাজ"** প্রকাশ করে যেন 'ক্যাটলেটিক এজেন্ট'-এর কাজ করেছেন সম্পাদক, অনুবাদকগণ ও প্রকাশকদ্বয়। ডঃ সজল বসু সম্পাদনা ছাড়াও গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি রচনার অনুবাদ করেছেন। এছাড়া অনুবাদ করেছেন ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মিত্র কৌটিল্য এবং পরমেশ বসু।

বাঙলা ভাষায় জয়প্রকাশ নারায়ণের চিন্তাধারা প্রকাশ নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে এক বড় প্রাপ্তি।❑

ভক্তিরসের ফল্গুধারায় বৈদিক সাহিত্য

অমলেন্দু চক্রবর্তী



বৈদিক সাহিত্যে ভক্তি
ডঃ দিলীপকুমার দত্ত
প্রকাশিকা ঃ
ছায়া দত্ত
'শৈলছায়া গঙ্গোত্রী'
মানুষপুর, ব্যাণ্ডেল জং
হুগলী-৭১২১২৩
পৃষ্ঠা ঃ ২০+৭৬+৪
মূল্য ঃ ৪০ টাকা

পরম তত্ত্বের প্রতি সহজ স্বাভাবিক আকর্ষণ বা অহেতুকী প্রীতিই হলো ভক্তির মর্মবাণী। বিষয়ের দিকে অবিবেকী ব্যক্তির যেমন স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে, ভক্তের মন তেমনি ভগবানের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভব করে। নারদীয় ভক্তিসূত্রে ভক্তিকে পরম প্রেমরূপা বলা হয়েছে। এই প্রেমস্বরূপ অনির্বচনীয়—বাক্যে একে প্রকাশ করা যায় না। সত্যই সূক্ষ্ম গভীর তত্ত্বকে প্রকাশ করার কোন ভাষা নেই। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।৯) তাই বলা হয়েছে ঃ "যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"—বাক্য যেখান থেকে ফিরে আসে, মনও তাকে পায় না। সাধারণত ভক্তির নয়টি লক্ষণ বলা হয়—

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।"

এই আত্মনিবেদনই সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ সকল সাধনের পরিসমাপ্তি হলো এই শরণাগতিতে। শ্রীভগবান 'গীতা'তে এই শরণাগতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন বলেছেন। সর্বশেষ উপসংহারে ভগবান যথার্থই বলেছেন ঃ

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষিয়ষ্যামি মা শুচঃ।।" (১৮।৬৬)

সমস্ত সাধনারই বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ ভেদ আছে। ভক্তি-সাধনাতেও এই ভেদ দেখতে পাওয়া যায়। ভক্তিবাদীরা বৈধীভক্তি বলতে বুঝেছেন শাস্ত্রের শাসনভয়ে অনুষ্ঠিত শ্রবণ ও কীর্তন। আবার এই শ্রবণ ও কীর্তন যদি মধুর আস্বাদন দান করে বলে অনুষ্ঠিত হয়, যদি শ্রীভগবানের নাম করতে করতে প্রতি পদে, প্রতি অক্ষরে পূর্ণামৃতের আস্বাদন পাওয়া যায়, যদি চিত্ত আনন্দে ভরপুর হয়ে একটি সুখময় প্রকাশের রাজ্যে ডুবে যায়, তখন সেই রসময়ের রসিক ভাবুকের সঙ্গে রসের খেলায় পরিণত হয়। ভগবান এখানে ষড়ৈশ্বর্যময় সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নন; তিনি এখন মাধুর্যময়, তিনি লাবণ্যের খনি।

বৈদিক সাহিত্য সত্যই ভারতবর্ষের এক বিশাল মহাভারত। ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্রে রয়েছে সংহিতা-ব্রাহ্মণ-উপনিষদ্-আরণ্যকে বহুবিস্তৃত বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি। ডঃ দিলীপকুমার দত্ত তাঁর **'বৈদিক সাহিত্যে ভক্তি'** গ্রন্থটিতে স্বল্প পরিসরে ভক্তিবাদের মহিমাকীর্তন করেছেন। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি"—ছান্দোগ্য উপনিষদের (৭।২৩।১) এই পঙ্‌ক্তিটির মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, ভূমার সন্ধান ও তার শাশ্বত আনন্দের আস্বাদ দান করাই ভারতীয় ধর্মসাধনার মূল কথা। এ-সাধনায় যদিও কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—এই তিনটি ধারাই মর্যাদা পেয়েছে, তথাপি তুলনামূলক বিচার করতে গিয়ে এই ত্রিসত্য বা যোগত্রয়ের মধ্যে ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত। প্রায় এধরনের উক্তি গীতায় শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠেও শোনা যায়। জ্ঞানী ও ভক্তের তুলনায় ভক্তের শ্রেষ্ঠত্বের কথা শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করেছেন অর্জুনের কাছে। স্বীকার করেছেন ভক্তের অবিনাশিত্বের কথা—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" (গীতা, ৯।৩১)—আমার ভক্তের কখনো বিনাশ হয় না।

জীব জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ থেকে মুক্তি পেতে চায়—এই তো সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের চরমতত্ত্ব। কিন্তু এর ওপরেও ভক্তির স্থান—এই কথাই 'ভাগবত'-এ বলা হয়েছে। ভাগবতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ভগবৎ উপাসনার রসস্বরূপতা। উপনিষদে রয়েছে "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই রসস্বরূপ; রসস্বরূপ তাঁকে লাভ করে জীবও আনন্দময় হয়ে যায়।

ডঃ দত্তের মতে, যাঁরা জ্ঞানবাদী অদ্বৈতপন্থী সাধক, তাঁরাও ভক্তির গৌরবমহিমাকে এবং সাধনক্ষেত্রে ভক্তিচেতনাকে কখনো অস্বীকার করতে পারেননি। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যের জ্ঞানকে সৌরজ্ঞান বলে স্বীকার করলেও তাঁর ভিতর ভক্তিচন্দ্রের শীতল আলোও লক্ষ্য করেছিলেন।

নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ উপনিষদের মূল লক্ষ্য হলেও ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশসূত্রে সেখানে প্রেমভক্তির আন্তর গভীর রূপটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে এই সত্যটি উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ "ব্রহ্মবিদ্যার আনুষঙ্গিক রূপেই ভারতবর্ষে প্রেমভক্তির ধর্ম আরম্ভ হয়।" (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ১৪৭) বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা প্রসঙ্গে যে ব্রহ্মানন্দের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তা এই প্রেমভক্তিরই সমগোত্রীয়। অর্থাৎ সেই ব্রহ্মানন্দই পরবর্তী কালের নানা ভক্তিসাহিত্যে 'ভক্তি' নামে বর্ণিত হয়েছে। অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ যদিও সমগ্র উপনিষদ্ সাহিত্যেই ছড়িয়ে আছে, তাহলেও ভক্তির ক্ষেত্রে অপরিহার্য যে দ্বৈতজ্ঞান, তার প্রয়োজনীয়তা উপনিষদের ঋষিগণও বারে বারে উপলব্ধি করেছেন। জীবাত্মা সাধকের প্রতি তাই উপনিষদের একান্ত উপদেশ ঃ "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ১।৪।৮) বহিরঙ্গে অদ্বৈত জ্ঞানসাধনার অভ্যন্তরে উপনিষদ্‌সমূহে এভাবেই প্রভাবিত হয়েছে দ্বৈতবাদী ভক্তি ও লীলারসের ফল্গুধারা। যৌক্তিক তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যন্তরে পরমাত্মার প্রতি সাধকের প্রেমাকর্ষিত প্রিয়ত্বের এই উপলব্ধিই ঔপনিষদিক চিন্তাধারার সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য। লেখকের মতে, ভক্তির ভূমিতে পরম তত্ত্বের সাক্ষাৎ আকর্ষণ অনুভূত হয় বলে ভক্তিযোগকেই মোক্ষমার্গের নিরাপদ রাজপথ বলা হয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে একদিকে বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্য এবং অন্যদিকে বৈষ্ণব সাহিত্যে ডঃ দত্তের স্বচ্ছন্দ ও অবাধ যাতায়াত নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। ভক্তিতত্ত্বের অন্তর্নিহিত দর্শনটি আবিষ্কার করতে গিয়ে তিনি কাব্য, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের তথ্যভিত্তিক আশ্রয় নিয়েছেন। তবে গ্রন্থটি বেশি মাত্রায় উদ্ধৃতি-নির্ভর বলে সাধারণ পাঠকের রসাস্বাদনে একটু ব্যাঘাত ঘটবে বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু বিদগ্ধ সমাজে গ্রন্থটি অবশ্যই গৌরব অর্জন করবে।❑

উৎসব-অনুষ্ঠান

কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ (হুগলী) ঃ গত ১৬-১৮ মার্চ ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, বাউল গান, রামায়ণ গান, ধর্মসভা ছিল উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। আয়োজিত ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী। এদিন প্রায় ১০,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। ৩১১ জন দরিদ্র মানুষকে ধুতি ও শাড়ি প্রদান করা হয় এবং উৎসবকে কেন্দ্র করে আয়োজিত হয় একটি বিরাট মেলা। এই উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নবনির্মিত প্রার্থনাগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী।

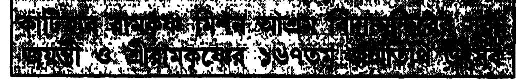
মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ১৬-১৮ মার্চ ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী', 'পুঁথি', 'কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ, যাত্রানুষ্ঠান, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী ব্রজেশানন্দজী, স্বামী অবধূতানন্দজী, জয়দেব দাস প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী শান্তিদানন্দজী।



রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (বাঁকুড়া) ঃ গত ২২-২৪ মার্চ ২০০২ শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, বাউল গান, পদাবলী কীর্তন, রামায়ণ গান, যাত্রানুষ্ঠান, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে তিনদিন ধরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করা হয়। উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন সম্রাট সরকার। কীর্তন ও বাউলগান পরিবেশন করেন যথাক্রমে অখিলবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ও সম্প্রদায় এবং দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়। তিনদিনের ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মুমুক্ষানন্দজী, স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী, স্বামী অচ্যুতানন্দজী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও পূর্বা সেনগুপ্ত। সভাপতিত্ব করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী তত্ত্বস্থানন্দজী। উৎসবকে কেন্দ্র করে একটি গ্রামীণ মেলার আয়োজন করা হয়। উৎসবে প্রায় ২০,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম (উত্তরপ্রদেশ) ঃ গত ৭ এপ্রিল ২০০২, ৩০ শয্যাবিশিষ্ট নবনির্মিত প্রসূতিসদনের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। এদিন নবনির্মিত দন্ত-বিভাগের দ্বারোদ্ঘাটন করেন উত্তরপ্রদেশের উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি শ্যামলকুমার সেন। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় ৩০০-র অধিক অতিথির উপস্থিতিতে ভাষণ দেন স্বামী স্মরণানন্দজী, স্বামী সুহিতানন্দজী এবং আগ্রা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষা ডাঃ বীণা মিশ্র।

মঠ-চণ্ডীপুর রামকৃষ্ণ মঠ (মেদিনীপুর) ঃ গত ২০-২১ এপ্রিল ২০০২ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী স্তবানন্দজী। অনুষ্ঠানে প্রায় ৬,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী ও স্বামী অজরানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে মঠাধ্যক্ষ স্বামী দুর্গাত্মানন্দজী ও অধ্যাপক অরবিন্দ মিশ্র।



বিহারের কাটিহারে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির তার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করেছে ২০০১ খ্রিস্টাব্দে। এই আশ্রমটির সূচনা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কাটিহার-পূর্ণিয়া-আরারিয়া অঞ্চলে ত্রাণকার্যের জন্য বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ প্রেরণ করেন স্বামী মহাদেবানন্দজীকে। তাঁরই উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় সুরেন্দ্রনাথ সাহার নেতৃত্বে একদল ভক্ত ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কাটিহার আশ্রমের শুভারম্ভ করেন অনাড়ম্বরভাবে। একটি ছোট ঠাকুরঘরে ধর্মালোচনা ও স্থানীয় রোগীদের সামান্য সেবাশুশ্রূষা করা হতো। ধীরে ধীরে কর্মধারা প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের শুভ ইচ্ছায় ও আশীর্বাদে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে কাটিহার আশ্রম রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের শাখাকেন্দ্ররূপে গণ্য হয়। দেশ-বিভাগের অব্যবহিত পরে (১৯৪৭) উদ্বাস্তুদের খাওয়া-দাওয়া ও চিকিৎসার কার্যে আশ্রমটি যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ করে। পরবর্তী কালে উদ্বাস্তু শিশুদের শিক্ষার চিন্তাই জন্ম দেয় বর্তমান বিদ্যামন্দিরের। উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে মাত্র সাতটি শিশুকে নিয়ে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে বুদ্ধপূর্ণিমায় শুরু হয় বিদ্যাদানের মহাযজ্ঞ। আজ এই বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১,৭০০। উন্নয়ন হয়েছে বিভিন্ন পর্বে। আগে বিদ্যালয়ে ছিল কেবল বাঙলা-মাধ্যম; পরে সংযোজিত হয়েছে ইংরেজি-মাধ্যমও। চালু হয়েছে কিণ্ডার-গার্টেন (KG) স্কুল; প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ছাত্রাবাস। স্থানীয় অঞ্চলে কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরটি শিক্ষাক্ষেত্রে বলিষ্ঠ অবদান রেখেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শিক্ষাসেবা ছাড়াও কাটিহার আশ্রম বিভিন্ন সময়ে নানা ত্রাণকার্য পরিচালনা করেছে ও নিয়মিতভাবে দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিনামূল্যে শিক্ষাদান কেন্দ্র (কোচিং সেণ্টার) পরিচালনা করে চলেছে।

বিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ২০০১ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মদিনে দীপ জ্বালিয়ে ও ৫০টি গ্যাস-বেলুন আকাশে উড়িয়ে সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। সুবর্ণ জয়ন্তীর সমাপ্তি উপলক্ষ্যে ২০ ডিসেম্বর ২০০১-এ আয়োজিত অনুষ্ঠানে শুভাগমন করেন

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অপর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। তিনদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনাচক্র।

এবছর ১৬ মার্চ ২০০২-এ অনুষ্ঠিত হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি এবং ২২-২৪ মার্চ ২০০২-এ পালিত হয় বার্ষিক উৎসব। ঐ উৎসবে বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা দেন মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সচিব স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী, রতনলাল পোদ্দার, এস. কে. পণ্ডিত প্রমুখ। হিন্দি ভজন-সহ বিভিন্ন ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দজী। বাউল গান ও রামায়ণ-মহাভারত কথকতা করেন যথাক্রমে সুকুমার বাউল ও নিখিল চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া অনুষ্ঠিত হয় জাদুপ্রদর্শনী এবং শিশুমন্দির ও বিদ্যামন্দিরের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

পুনে রামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশ্বজনীন মন্দির প্রতিষ্ঠা

পুনে শহরকে বলা হয় মহারাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক রাজধানী। শহরটি রাজ্যের এক প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী স্থান। পুনে মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলাও। কোন কোন মতে পুনে বা পুনা শহরটি হলো প্রাচীন যুগের পুণ্যপুর। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই অঞ্চলটি দণ্ডকারণ্যের অংশ ছিল। বেদশা গুহার শিলালিপি থেকে জানতে পারা যায় যে, একসময় এখানে বৌদ্ধধর্ম প্রধান হয়ে উঠেছিল।

মহারাষ্ট্র রাজ্যে রামকৃষ্ণ মঠের তিনটি কেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম হলো পুনে শহরস্থ এই কেন্দ্রটি। অপর দুটি কেন্দ্র মুম্বাই ও নাগপুরে অবস্থিত। সিংহগড়, লোকমান্যনগর ও সরসবাগ— এই তিনদিক থেকে তিনটি রাস্তা এসে একত্র মিলিত হয়েছে। প্রায় ত্রিরাস্তার সঙ্গমস্থলেই রামকৃষ্ণ মঠের অবস্থান। তবে কিছুটা সিংহগড়ের দিকে বিট্‌ঠলবাড়ি রোডের ওপর প্রায় ছয় একর জমির ওপর অবস্থিত রামকৃষ্ণ মঠ পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত। মঠের প্রবেশদ্বার উত্তরদিকে বিট্‌ঠলবাড়ি রোডের ওপর। মঠের পিছনেই অবস্থিত পার্বতী পাহাড়। আর পাহাড় ও আশ্রমের মাঝখানে বয়ে চলেছে একটি বড় খাল বা নালা।

আশ্রমটি ভক্তদের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। তারপর তা রামকৃষ্ণ মঠের পরিচালনাধীনে আসে ১৯৮৪ সালে। এতদিন পর্যন্ত আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবা ও পূজা একটি ছোট ঠাকুরঘরেই সম্পন্ন হয়ে আসছিল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই নতুন বিশ্বজনীন মন্দিরটির নির্মাণকার্য শুরু হয় ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। মন্দির তৈরি সম্পন্ন হয় ২০০২-এর এপ্রিলে। গর্ভমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি। মূর্তি তৈরি করেছেন কলকাতার জি. পাল অ্যাণ্ড সন্স। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এঁদেরই পূর্বপুরুষ বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্মরমূর্তি তৈরি করেছিলেন। গর্ভমন্দিরের সংলগ্ন নাটমন্দিরটিতে প্রায় ৪০০ জন একসঙ্গে বসে প্রার্থনা করা যায়। মন্দিরটি মোট ১,২৪০ বর্গমিটার জায়গার ওপর তৈরি হয়েছে। মন্দিরের সর্বোচ্চ শিখরটি প্রায় ১৮ মিটার উঁচু। সবমিলিয়ে ২৪টি শিখর রয়েছে। গর্ভমন্দিরের বাইরেও একেবারে নাটমন্দিরের সামনের দুইদিকে বিশেষ নকশায় প্রস্তুত দুটি কুলুঙ্গিতে শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের ফ্রেমে বাঁধানো ছবি রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মন্দিরের প্রধান দরজা থেকে নেমে যাওয়া সিঁড়ির ধাপগুলি শেষ হলেই সেখানে তৈরি করা হয়েছে তোরণ, যেটি বৌদ্ধযুগীয় শিল্পকলার আদলে নির্মিত। মন্দিরটি নির্মাণে প্রায় ৪ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

পুনে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই বিশ্বজনীন মন্দির প্রতিষ্ঠাকার্যের সূচনা হয় ১৯ এপ্রিল ২০০২। শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে নির্মিত হয়েছিল একটি যজ্ঞশালা। এইদিন বিশেষভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত পণ্ডিতগণ যজ্ঞশালার বাস্তুযাগ করেন সকাল ৮টা থেকে। সভামণ্ডপে বিকাল ৫টায় অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় 'সার্বজনীন মন্দিরের আবশ্যকতা' বিষয়ে বক্তৃতা করেন স্বামী সত্যরূপানন্দজী, স্বামী নিখিলাত্মানন্দজী ও স্বামী গৌতমানন্দজী। সন্ধ্যা ৭টায় রামায়ণগান পরিবেশন করেন প্রমোদ রাণাডে।

২০ এপ্রিল যজ্ঞশালায় সকাল ৮টায় শুরু হয় রুদ্রযাগ, চণ্ডী (সপ্তশতী) হোম। সকাল ৯টায় সভামণ্ডপে 'বর্তমান যুগ ও স্বামী বিবেকানন্দ' বিষয়ে আলোচনাতে বক্তব্য রাখেন ডঃ ওমপ্রকাশ বর্মা, আচার্য কিশোর ব্যাস, স্বামী নিখিলেশ্বরানন্দজী ও স্বামী জিতাত্মানন্দজী। সমস্ত দিন ধরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলার পর বিকাল ৫টায় সভামণ্ডপে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। এরপর ধর্মসভায় স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ-সহ ডঃ এস. আর. তড়গট্টি ও অধ্যাপক মুরলীধর সায়নেকর বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য-বিষয়গুলি ছিল জ্ঞানেশ্বরীর শিক্ষা এবং ভাগবৎ ধর্ম ও মহারাষ্ট্রের সাধক-সাধিকাগণ। সন্ধ্যা ৭টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাঁশি বাজিয়ে শোনান পণ্ডিত রনু মজুমদার।

২১ এপ্রিল ছিল সমস্ত কর্মকাণ্ডের প্রধানতম দিন। এইদিনই শ্রীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। ভোর থেকেই শুরু হয় সেই মহাযজ্ঞ উদ্‌যাপন। ভোর ৫টায় শ্রীশ্রীঠাকুরের পুরনো মন্দিরে মঙ্গলারতি হয়। তারপর সকাল ৬.৩০-এ সমবেত সাধু-ব্রহ্মচারীদের বৈদিক মন্ত্রপাঠ ও ভজন-গানের সঙ্গে মঙ্গলকলস, শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতিচিহ্ন (relic), শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পট নিয়ে শুরু হয় শোভাযাত্রা। ইতিমধ্যে মন্দিরের চারপাশে ঘেরা অংশের বাইরে সমবেত হয়েছেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ভক্ত নরনারীবৃন্দ। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জয়ধ্বনি, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, ভজনগান—সবকিছু একত্র করে শোভাযাত্রা তিনবার নতুন মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। প্রদক্ষিণ শেষে পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজ শ্রীমন্দিরের মূলদ্বার উন্মুক্ত করেন ও ভিতরে প্রবেশ করে গর্ভমন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্মরমূর্তিতে অর্ঘ্য প্রদান করেন। তারপর সমবেত সকল সাধু-ব্রহ্মচারীও

শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে অর্ঘ্য দেন। নাটমন্দিরে বহুক্ষণ ধরে চলতে থাকে নৃত্যের সঙ্গে ভজন গান। সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দ সকলেই তাতে যোগ দেন। এইদিন যজ্ঞশালায় সৌরযাগ, পূর্ণাহুতি ইত্যাদি সম্পন্ন হয়। সকাল ৮টায় নবনির্মিত মন্দিরে শুরু হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, পরে রামনাম-সঙ্কীর্তন। সকাল ৯টার পর মন্দিরের প্রধান শিখরের ওপর বিশেষ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান 'কলসারোহণ' সম্পন্ন হয়। সকাল ১১টায় পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজ 'স্বামী শিবানন্দ স্মৃতিকক্ষ'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এই স্মৃতিকক্ষটি নির্মিত হয়েছে নবনির্মিত মন্দিরের নিম্নতলে (basement)।

এরপর সারাদিন ধরে চলতে থাকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিকাল ৫টায় সভামণ্ডপে শুরু হয় ধর্মসভা। সভার শুরুতে পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজ সকলের উদ্দেশে তাঁর আশীর্বচন প্রদান করেন। তারপরই ভারতীয় ডাকবিভাগের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ ডাকটিকিট ও 'ফার্স্ট ডে কভার' প্রকাশ করা হয়। এই ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। তিনি তাঁর ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। সভার প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনন্তকুমার বলেন, ভারতীয় রাজনীতির কুরুক্ষেত্র থেকে তিনি এসে হাজির হয়েছেন বিশ্বজনীন শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠা-রূপ ধর্মক্ষেত্রে। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানারূপ অগ্রগতির মধ্যেও বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের রূপটি যে খুব আশাপ্রদ নয় তা উল্লেখ করেন। আর এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তিনি ধর্মের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সভা সমাপ্তির পর মন্দিরে সন্ধ্যারতি সম্পন্ন হয়। রাত সাড়ে ৭টায় সভামঞ্চে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করেন পণ্ডিত রাজন ও সাজন মিশ্র।

এইদিনের অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র, বাংলাদেশের বিভিন্ন কেন্দ্র ও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ছাড়াও অন্যান্য আশ্রম থেকে ৩০০-রও অধিক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী যোগ দেন।

এছাড়াও ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত চলে নানা অনুষ্ঠান। তার মধ্যে যেমন ছিল বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, তেমনি ছিল ধর্মমহাসভা, ধর্মসভা ইত্যাদি। ঐ চারদিনে বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ, ভারতের উচ্চতম ন্যায়ালয়ের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি পি. এন. ভগবতী, ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টের অধ্যক্ষ এস. এম. দত্ত, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও রাজ্যসভার প্রতিনিধি ডঃ রাজা রামান্না, পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ বি. জি. ভীড়ে ও আরো অনেকে।

বহির্ভারত

দিনাজপুর রামকৃষ্ণ আশ্রম (বাংলাদেশ) ঃ গত ১৬-১৯ মার্চ ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, বেদ ও স্তব পাঠ, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রথমদিনে প্রায় ৭,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। শেষদিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন ডাঃ মিলন বসু, নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়, অসীমা মজুমদার প্রমুখ এবং সভাপতিত্ব করেন বাগেরহাট রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী পরদেবানন্দজী। সভাশেষে আশ্রমের ছাত্ররা 'ভক্ত মথুর' নাটক অভিনয় করেছিল।

দেহত্যাগ

ব্রহ্মচারী তিতিক্ষাচৈতন্য (রবিন) গত ১ মে ২০০২ সকাল ৫টা ১৫ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। দেহান্তকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৩ বছর। মৃত্যুর ২ বছর আগে তাঁর ব্রেনে একটা টিউমার হয়েছিল, সেজন্য তাঁকে চেন্নাইয়ের অ্যাপেলো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৯১ সালে রাঁচি মোরাবাদি আশ্রমে যোগদান করেন। যোগদানকেন্দ্র ভিন্ন তিনি আসানসোল, চণ্ডীপুর ও মনসাদ্বীপ আশ্রমে বিভিন্ন সময়ে ঠাকুরের সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন সহজ-সরল ও প্রফুল্ল স্বভাবের।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ১৭ মে শুক্রবার এবং ২৬ মে রবিবার ২০০২ যথাক্রমে শ্রীশঙ্করাচার্য ও শ্রীবুদ্ধদেবের জন্মতিথি পালন করা হয়। ঐ দুই তিথিতে সন্ধ্যারতির পর শ্রীশঙ্করাচার্যের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী সর্বগানন্দজী এবং 'ভগবান বুদ্ধ ও স্বামী বিবেকানন্দ' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী সনকানন্দজী।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

মঠ-বিষ্ণুপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (মেদিনীপুর) ঃ গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০২ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। পাঠ, সঙ্গীত, প্রশ্নোত্তরপর্ব ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের বিষয়। আলোচনা করেন স্বামী ভুবনেশ্বরানন্দজী, চৈতন্যপুর আশ্রমের স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী ও অধ্যাপক নির্মল মাইতি। প্রশ্নোত্তরপর্ব পরিচালনা করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শক্তি চক্রবর্তী, জয়ন্ত অধিকারী ও সরোজ চক্রবর্তী। সম্মেলনে প্রায় ২০০ ছাত্রছাত্রী যোগদান করেছিল।

উমরকোট রামকৃষ্ণ সারদা সেবা সঙ্ঘ (দণ্ডকারণ্য, ওড়িশা) ঃ গত ১৬ মার্চ বিশেষ পূজা, ভজন, 'কথামৃত' পাঠ ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

পাঞ্চেৎ ড্যাম শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্ঘ (ধানবাদ, বিহার) : প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ, বাউলগান, ৩০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন কমলকুমার সরকার, অনুপম পাণ্ডা প্রমুখ। বাউলগান পরিবেশন করেন কৃষ্ণপদ ধীবর, কালীপদ ভাণ্ডারী প্রমুখ।

রূপহী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি (নগাঁও, অসম) : গত ১৬ মার্চ ২০০২ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি ও ৫০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন করা হয়।

বলাইচক রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও সেবাশ্রম (হুগলী) : গত ১৬ মার্চ ২০০২ সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী গৌরীনাথানন্দজী ও অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ আদক। এদিন প্রায় ৪,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

ডোমজুড় শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র (হাওড়া) : গত ১৬ মার্চ ২০০২ পূজা, পাঠ ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন করা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী ও প্রণবেশ চক্রবর্তী। এদিন প্রায় ৯০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

ডোমজুড় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (মহামায়াপুর, হাওড়া) : গত ১৬ মার্চ ২০০২ পূজা, পাঠ ও ভক্তিগীতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন করা হয়। পূজা করেন স্বামী যোগাত্মানন্দজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অমর পাড়ুই ও সম্প্রদায়। অনুষ্ঠানে প্রায় ১,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

গোবরডাঙা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘ (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ১৬ মার্চ ২০০২ সানাইবাদন, 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, বিশেষ পূর্জা এবং প্রায় ৫০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন করা হয়। 'কথামৃত' পাঠে বলহরি বিশ্বাস এবং সঙ্গীতে বেবী বিশ্বাস অংশগ্রহণ করেন।

হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন (পূর্ব মেদিনীপুর) : গত ১৬ মার্চ ২০০২ বিশেষ পূজা, 'পুঁথি' পাঠ, ভক্তিগীতি, ৫০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হয়।

কৃষ্ণনগর রামকৃষ্ণ আশ্রম (নদীয়া) : গত ১৬ মার্চ ২০০২ বিশেষ পূজা, পাঠ, ১,৫০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি পালিত হয়। 'গীতা' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ করেন যথাক্রমে নারায়ণচন্দ্র দেবনাথ ও স্বামী দেবতাত্মানন্দ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অশোক দাস, শ্বেতা মিত্র প্রমুখ। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পরেশাত্মানন্দজী, ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী ও খোকন চক্রবর্তী।

খেপুত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি আশ্রম (মেদিনীপুর) : গত ১৬ মার্চ ২০০২ বিশেষ পূজা, কীর্তন ও 'কথামৃত' পাঠের মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি পালন করা হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন ব্রহ্মচারী শিশির।

ইমামবাজার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ (হুগলী) : গত ১৬ মার্চ ২০০২ বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি ও ৫০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন করা হয়।

শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি (বর্ধমান) : গত ১৬ মার্চ ২০০২ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী', 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রায় ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

মূলাজোড় রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ১৬ মার্চ ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'গীতা', 'চণ্ডী' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ, গীতি-আলেখ্য এবং আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয়ে আলোচনা করেন রণজিৎকুমার সাহা। দুপুরে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

ইড়পালা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (মেদিনীপুর) : গত ১৬ ও ১৭ মার্চ ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষণ দেন স্বামী নিত্যযুক্তানন্দজী ও অলোক ঘোষ। এদিন দুপুরে ৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। উল্লেখ্য, ১০ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত একটি চিকিৎসা-শিবিরে ৩৫০ জন রোগী চিকিৎসিত হন।

নাগেরবাজার রামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ (কলকাতা-২৮) : গত ১৬ ও ১৭ মার্চ ২০০২ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতিনাট্য ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন করা হয়। উৎসবে প্রায় ৮০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ধর্মসভায় ভাষণ দেন দীপ্তিকুমার শীল।

তেজপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (অসম) : গত ১৬-১৭ মার্চ ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' পাঠ, চিত্রাঙ্কন, ৯০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। পূজা করেন স্বামী অরুণাত্মানন্দজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সাধনা ভট্টাচার্য প্রমুখ। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পবিত্রচিত্তানন্দজী ও অপূর্ব মিত্র মজুমদার। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বপনকুমার দত্ত।

শ্যামপুকুরবাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৪) : গত ১৬-১৮ মার্চ ২০০২ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, সুশান্ত দত্ত ও কেয়া ঘোষ। গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন তপন সিন্‌হা, পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও সুজিত গুপ্ত। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী প্রভানন্দজী, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী ও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। পাঠে অংশগ্রহণ করেন সুব্রত চক্রবর্তী ও সত্রাজিৎ দাসগুপ্ত।

ভদ্রকালী শ্রীরামকৃষ্ণ পাদতীর্থ সেবক সঙ্ঘ (হুগলী) : গত ১৬-১৭ মার্চ ২০০২ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, পুঁথি পাঠ,

১,০০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন করা হয়। দুদিনের ধর্মসভায় প্রথমদিন স্বামী সর্বময়ানন্দজী এবং দ্বিতীয়দিন প্রব্রাজিকা অব্যক্তপ্রাণাজী আলোচনা করেন। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন চন্দন সেন, বিমল গোস্বামী প্রমুখ। 'পুঁথি' পাঠ ও আলোচনা করেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

উলুবেড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম (হাওড়া) : গত ১৬ ও ১৭ মার্চ ২০০২ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, গীতি-আলেখ্য, বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী' পাঠ, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ধর্মসভা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম। দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

হাইলাকান্দি রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি (অসম) : গত ১৬-২৪ মার্চ ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়েছিল। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পিগণ এবং লীলাগীতি পরিবেশন করেন অরুণকৃষ্ণ ঘোষ ও সম্প্রদায়। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী লোকনাথানন্দজী। অনুষ্ঠানে সহস্রাধিক ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

পুইনান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ (হুগলী) : গত ১৭ মার্চ ২০০২ আয়োজিত ভক্তসম্মেলনের বিষয় ছিল প্রভাতফেরি, 'কথামৃত', 'গীতা', 'মায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা, ভক্তিগীতি, আলোচনাচক্র, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতি। আলোচনা করেন স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দজী।

কাঁচড়াপাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ (নদীয়া) : গত ১৭ মার্চ ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, প্রভাতফেরি, 'চণ্ডী' পাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় আলোচনা করেন বাঁশবেড়িয়া আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী উমেশানন্দজী, ডঃ দীপক দত্ত, ডঃ নমিতা দত্ত প্রমুখ।

নারায়ণপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ১৭ মার্চ ২০০২ নগর-পরিক্রমা, স্তোত্র ও 'চণ্ডী', 'কথামৃত' পাঠ, বিশেষ পূজা, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব আয়োজিত হয়। সকালে 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণাজী। বিকালে আয়োজিত ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, নারায়ণ চক্রবর্তী, সন্তোষকুমার ঘোষ ও চন্দ্রমাধব শীল। সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সুধীরকুমার রাহা।

বহড়াগোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবপ্রচার এবং সেবাসমিতি (পূর্ব সিংভূম, ঝাড়খণ্ড) : গত ১৭ মার্চ ২০০২ বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ, লোকগীতি, বাউলগান, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন করা হয়। ধর্মসভায় কালীপদ পাণ্ডার সভাপতিত্বে ভাষণ দেন লক্ষ্মীকান্ত রজক ও মৃত্যুঞ্জয় সাহু। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডাঃ শান্তনু পাণ্ডা। দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। লোকগীতি ও বাউলগান পরিবেশন করেন সুনীলবরণ মাহাত ও সম্প্রদায়।

রামকৃষ্ণ রোড রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (ইটালগাছা, কলকাতা-৭৯) : গত ১৭ ও ২০ মার্চ ২০০২ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতিনাট্য ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সাথী চক্রবর্তী। ভাষণ দেন স্বামী সোমাত্মানন্দজী ও নচিকেতা ভরদ্বাজ। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে পীযূষকান্তি দাস ও বিকাশ মাঝি।

সাঁইথিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (বীরভূম) : গত ১৮ মার্চ ২০০২ বিশেষ পূজা, নগর-পরিক্রমা, ভক্তিগীতি, পাঠ ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করা হয়। 'কথামৃত' পাঠ করেন ভবানী মুখোপাধ্যায়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন বিকাশ মণ্ডল ও ডঃ ভাস্কর কয়ড়ী। ধর্মসভায় আলোচনা করেন মুকুল দত্ত, ডঃ অপূর্ব ঘোষ প্রমুখ।

বিবেকানন্দ সোসাইটি (কলকাতা-৬) : গত ১৮-১৯ মার্চ ২০০২ সোসাইটির প্রতিষ্ঠার শতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে দ্বিতীয় পর্বে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে প্রথমদিনের আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ এবং আলোচনা করেন ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর, বিপ্লব তরফদার ও প্রতাপকুমার রাহা। স্বাগত-ভাষণ দান এবং দ্বিতীয়দিনের অনুষ্ঠানে মায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন দীপ্তিকুমার শীল। পৌরোহিত্য করেন প্রব্রাজিকা সদানন্দপ্রাণাজী। দুদিনে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুকান্ত ভট্টাচার্য ও অলোকা রায়। গত ২০ মার্চ 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক বক্তৃতা' প্রদান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। উল্লেখ্য, গত ৪ ফেব্রুয়ারি স্বামীজীর জন্মতিথিতে তাঁর বিষয়ে আলোচনা করেন সোমনাথ ভট্টাচার্য।

পরলোকে

স্বামী নিষ্ঠানন্দ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২ প্রয়াণ করেছেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। তিনি উত্তর চব্বিশ পরগনার গোপালপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। পবিত্রতা ও নিয়মশৃঙ্খলায় নিষ্ঠা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য বাঁকুড়া-নিবাসী বিজয়বসন্ত মণ্ডল গত ১১ জানুয়ারি ২০০২ ৮৭ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস হোমের তিনি ছিলেন মেধাবী প্রাক্তন ছাত্র। স্বামী নির্বেদানন্দজী ও স্বামী ধ্যানাত্মানন্দজীর উৎসাহে দেশের মানুষের নিরক্ষরতা দূর করার উদ্দেশ্যে তিনি দক্ষিণ বাঁকুড়ায় দুটি উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, তেজপুর-নিবাসী জ্যোতিষচন্দ্র দাস সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি ছিলেন সেবাপরায়ণ ও ধীর-স্থির প্রকৃতির এবং আশ্রমের একনিষ্ঠ কর্মী।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য শিবপ্রসাদ গুহ গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০২, ৭২ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন প্রয়াত স্বামী জয়দেবানন্দজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং মিশনের বহু প্রাচীন সন্ন্যাসীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। ❑

ভগবান যদিও সর্বত্র আছেন বটে কিন্তু তাঁকে আমরা জানতে পারি কেবল মানবচরিত্রের মধ্য দিয়ে।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঈশ্বরে অনুরাগ হলে সমস্ত বিশ্বকেই আপন বোধ হয়। কারণ, সবই তাঁর সৃষ্টি।

স্বামী বিবেকানন্দ

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

তাঁর নামবীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

এরকম মনে করা ভাল নয় যে, আমার ধর্মই ঠিক আর অন্য সকলের ধর্ম ভুল। সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকলেই হলো। অনন্ত পথ—অনন্ত মত। শ্রীরামকৃষ্ণ

*

ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজন? নিন্দা ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, কিন্তু কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে, তা বলতে পারে কজনে? শ্রীমা সারদাদেবী

*

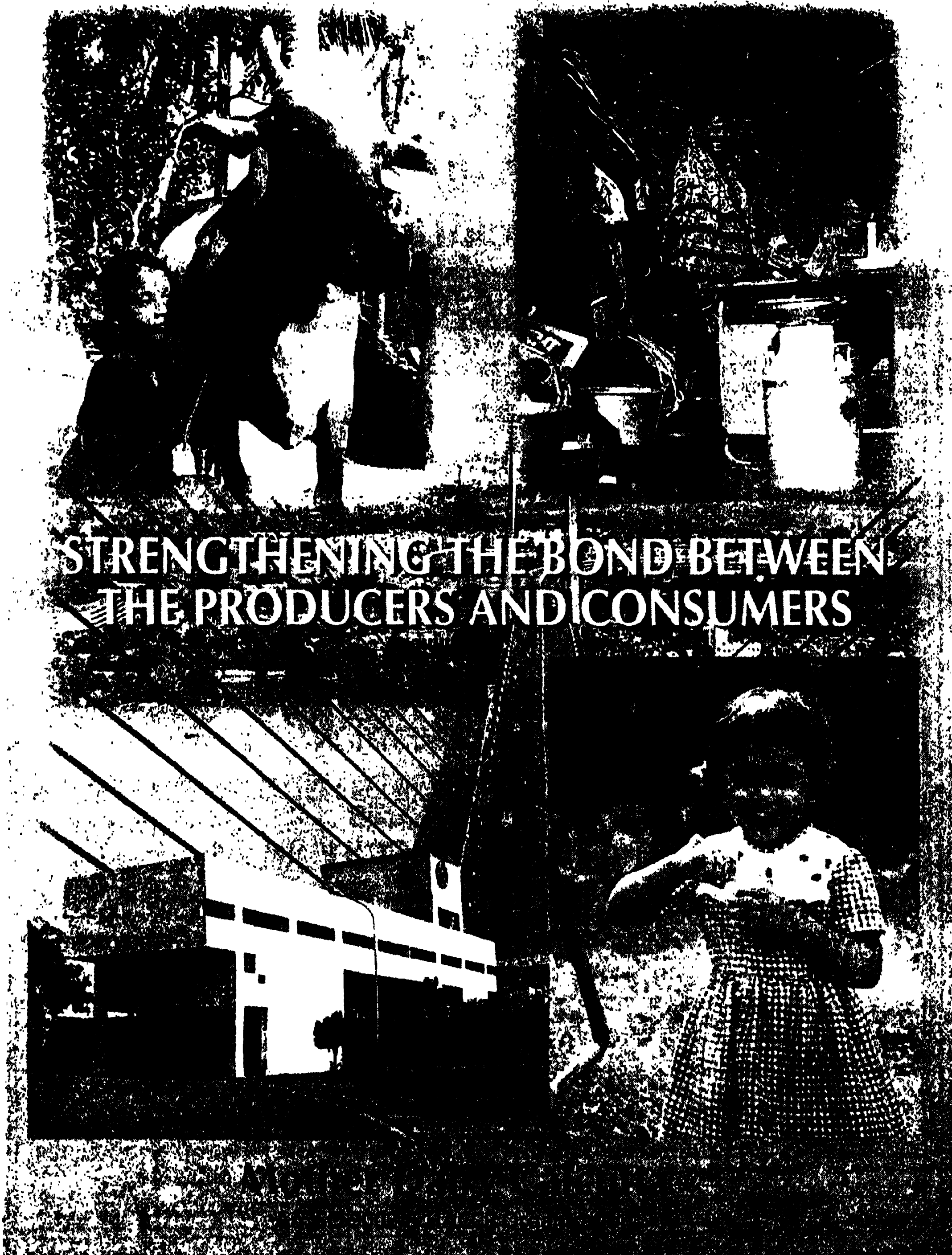
টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধাবিঘ্নের বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ

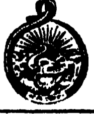
ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

The remedy for weakness is not brooding over weakness, but thinking of strength. Teach men of the strength that is already within them.

Swami Vivekananda


STRENGTHENING THE BOND BETWEEN
THE PRODUCERS AND CONSUMERS



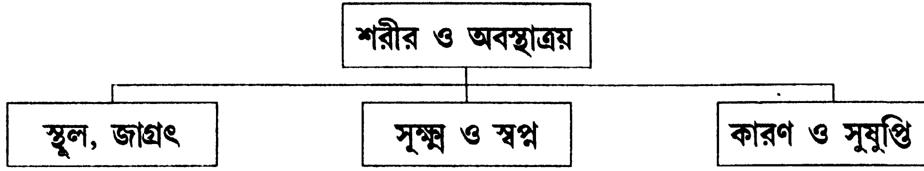
জেলাভিত্তিক 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ১

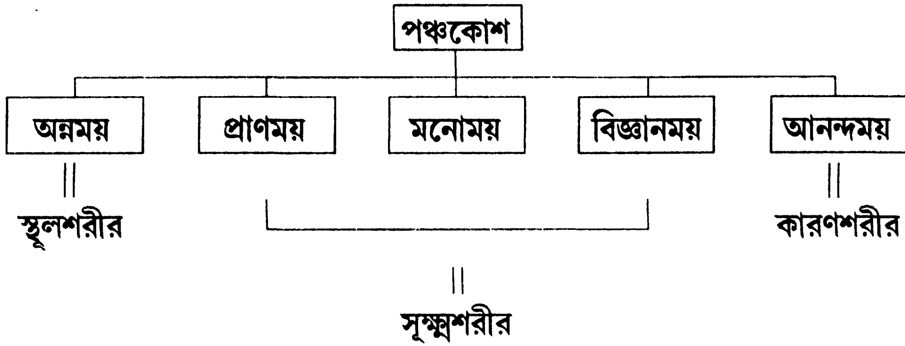
গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

কলকাতা

- **রামকৃষ্ণ মঠ (যোগোদ্যান)** কাঁকুড়গাছি, ফোন ঃ ৩৩৪-৬০০০
- **রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম)** হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, ভবানীপুর, ফোন ঃ ৪৫৫-৪৬৬০
- **সেঞ্চুরি বোর্ডস**, ২৮বি গড়িয়াহাট রোড কলকাতা-২৯, ফোন ঃ ৪৪০-৬২৮৭/৭৬৭৯
- **কথামৃত সঙ্ঘ** ❑ ৩৬ রসা রোড সাউথ থার্ড লেন ফোন ঃ ৪২২-০৩৩২
- **বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র** ডি ডি ৪৪, সল্ট লেক, কলকাতা-৬৪
- **রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম**, ৫/৩৬ বিজয়গড়, কলকাতা-৩২
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ ও প্রার্থনা-মন্দির** ৭৩ ডায়মন্ডহারবার রোড, বড়িশা (সখের বাজার) ফোন ঃ ৪৪৬-০৬৮৮/৪৪৭-১৩৭১
- **দেবাশিস পেপার সাপ্লায়ার্স** ১৩/৫/৩ রামকান্ত বোস স্ট্রীট, বাগবাজার
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবনালোক** ❑ সেলিমপুর
- **বিবেকানন্দ যুবকল্যাণ কেন্দ্র** ❑ চেতলা
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম** ❑ টেম্পল লেন, ঢাকুরিয়া
- **শোভনা ভৌমিক** ❑ ৯ আর. এন. টেগোর রোড নবপল্লী, কলকাতা-৬৩, ফোন ঃ ৪৬৭-১১২২
- **ত্রিপর্ণ রামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র** বি/৬/৪, ৩৯এ গোবিন্দ আড্ডি রোড, কলকাতা-২৭
- **আঢ্য ব্রাদার্স** ১২/১বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি-বিবেকানন্দ পাঠচক্র** শরৎ কলোনী, কলকাতা-৮১
- **বিবেক-বাণী স্টাডি সার্কেল** ১৩১ মেট্রোপলিটন কো-অপারেটিভ হাউসিং সেক্টর-এ, ই. এম. বাইপাস, কলকাতা-৩৯
- **মলয় ভৌমিক** ❑ ৪/১ বেনেপাড়া লেন, কলকাতা-১৪
- **আর. ভি. ব্রিগস অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ** ৯ বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট, কলকাতা-১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনসঙ্ঘ, সঙ্ঘমন্দির** ১১ তারামণি ঘাট রোড, পশ্চিম পুটিয়ারি, কলকাতা-৪১
- **'সারদা ভবন', জীবনকুমার ভট্টাচার্য** ৩৪ প্রিয়নাথ ঘোষ স্ট্রীট, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬
- **পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম** ৪/১৮-বি বিদ্যাসাগর উপনিবেশ, কলকাতা-৪৭
- **হ্লাদিনী** ❑ **স্বত্বাধিকারিণী ঃ** সুচিত্রা চ্যাটার্জী ৮০এ যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেনিউ কলকাতা-৫ ফোন ঃ ৫৩০-২৫৮০ (দুপুর ১২টা—সন্ধ্যা ৭টা)
- **দাসানুদাস সাহা** ❑ ১এ কুমারটুলী স্ট্রীট কলকাতা-৫, ফোন ঃ ৫৫৪-৬২৯৯
- **ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়** ❑ ১/২ডি সেন্টার সিঁথি রোড কলকাতা-৫০, ফোন ঃ ৫৫৬-৯৫৭২
- **রবি হাজরা** ১৩/৬/৩ রামকান্ত বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৩
- **সুধাংশু বিশ্বাস**, শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ৬ বরদা ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭, ফোন ঃ ২১৮-১২৮৫
- **বিজনকৃষ্ণ অধিকারী** প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবা কেন্দ্র ১৫৩ বিবেকানন্দ সরণি, গরফা, কলকাতা-৭৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ**, বিরাটি, কলকাতা-৫১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবায়তন**, ২৪/৬১ যশোর রোড এয়ারপোর্ট, গেট নং-১, কলকাতা ২৮ ফোন ঃ ৫১১-৭০৬৪
- **দক্ষিণ দুর্গানগর বিবেকানন্দ মন্দির** ৪৮ বিবেকানন্দ সরণি, কলকাতা-৬৫
- **দমদম শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা পরিষদ**, ২নং এয়ার পোর্ট গেট পোঃ রাজবাটী, কলকাতা-৮১, ফোন ঃ ৫১১-৮২৪১
- **পার্থ ভট্টাচার্য**, প্রযত্নে শ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ সেবাসংসদ ২ মতিলাল কলোনী, কলকাতা-৮১ ফোন ঃ ৫১২-৬৮৮৫/৯৯১৭
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ**, (শকুন্তলা পার্ক) ৪১/সি/১ শ্যামসুন্দর পল্লী, কলকাতা-৬১ ফোন ঃ ৪৫২-৬০৩৮
- **অমরানন্দ ভট্টাচার্য**, ডলফিন স্টুডিও ৩/১ ভূপেন রায় রোড, বেহালা, কলকাতা-৩৪ ফোন ঃ ৪৫৮-৯৪২৭, ৪৪৬-০৩৮১
- **কালীমোহন সাহা**, ৭/২ ব্রজমোহন মণ্ডল রোড সন্তোষপুর, যাদবপুর, কলকাতা-৭৫ ফোন ঃ ৪১৬-৬২১৩
- **তিলজলা বিবেকানন্দ সেবাসংসদ** ১৪৩/২০, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৩৯
- **সৌম্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস** ২৮৬/১ শরৎ বোস লেন, মাঠপাড়া কলকাতা-৮১, ফোন ঃ ৫১২-৫৭৪৭
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ, উদয়পুর** প্রযত্নে চুনিলাল দে, ৫ ঈশ্বর বিশ্বাস লেন, নিমতা কলকাতা-৪৯, ফোন ঃ ৫৪১-০১২২

বেদান্ত দর্শনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জীবের তিনপ্রকার শরীর ও তিনপ্রকার অবস্থা

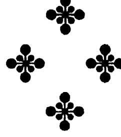






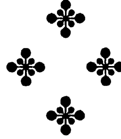
দেহত্যাগের আগে যদি কেউ ঈশ্বরের সাধন করে, আর সাধন করতে করতে ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, তাকে আর পাপ কখনো স্পর্শ করবে? অর্থাৎ ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, আর পাপ স্পর্শ করবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ



ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজনে? নিন্দা-ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, তাকে ভাল করতে পারে কজনে? আমার ছেলে যদি ধুলো-কাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে।

শ্রীমা সারদাদেবী



বেদে কোথাও নরকের কথা নাই। বেদের অনেক পরবর্তী পুরাণে এই নরকের প্রসঙ্গ আছে। বেদের সর্বাপেক্ষা অধিক যে-শাস্তির কথা পাওয়া যায়—তাহা পুনর্জন্ম, অর্থাৎ আরেকবার উন্নতির সুবিধা লাভ করা।

স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
Phone : 554-2248, 554-2403
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com
udbodhan@vsnl.net

Vol. 104
No. 6
JUNE
2002

Licensed to Post
Without Prepayment
Licence No.
TECH/WB/RNP-15/LPWP-01/2002

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Regn. No.
TECH/WB/RNP-15/2002

উদ্বোধন

১০৪তম বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

✣ গত ১লা মাঘ ১৪০৮ (১৫ জানুয়ারি ২০০২) **উদ্বোধন ১০৪তম বর্ষে** পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় **নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের** গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের **১০৩ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম** ✣

✡ **বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। **ভারতীয় সংস্কৃতি** ও ঐতিহ্য এবং **রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের** সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের** একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **উদ্বোধন** আপনাকে পড়তে হবে।

✡ **উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।**

✡ **উদ্বোধন**-এর সেবায় পাঁচটি স্থায়ী তহবিল আছে। একটি **'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল'**, অন্য চারটি যথাক্রমে **'স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ স্মৃতি তহবিল', 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল', 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'** এবং **'স্বামী অভয়ানন্দ স্মৃতি তহবিল'**। **উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত।** আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টে পাঠালে অনুগ্রহ করে **'Ramakrishna Math, Baghbazar'**—এই নামে পাঠাবেন। **ঠিকানা : সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩।** দাতার চিঠিতে বা M.O. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন দিতে গেলে **'Udbodhan Office, Kolkata'**—নামে চেক বা ড্রাফ্‌ট পাঠাবেন।

স্বামী সর্বগানন্দ
সম্পাদক

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা। সডাক ৯৫ টাকা। প্রতি সংখ্যা পৃথকভাবে ১০ টাকা।

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ
সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ



শ্রাবণ ১৪০৯ ৭ম সংখ্যা

উদ্বোধন

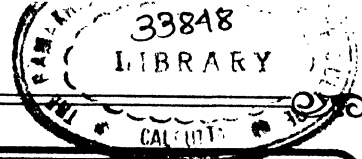
[illegible]

শ্রীরামকৃষ্ণ

আনন্দবাজার পত্রিকা

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১

"Mankind ought to be taught that religions are but the varied expressions of THE RELIGION which is oneness, so that each may choose the path that suits him best." —**Swami Vivekananda**

সূচীপত্র

উদ্বোধন ।।১০৪।।

১০৪তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা শ্রাবণ ১৪০৯ জুলাই ২০০২

প্রচ্ছদ : গোমুখের চিত্র। হিমালয়ের হিমশৈলাবৃত গহ্বর থেকে গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, অবিরাম, উদ্দাম, অক্লান্ত গতিতে। এ যেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবগঙ্গা' বিবেকানন্দ-রূপ গোমুখের মধ্য দিয়ে জগৎকল্যাণার্থে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান। শিবচন্দ্রটিও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। *আলোকচিত্র : ডাঃ তমোনাশ ভট্টাচার্য।*



স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।

ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ : ৭৫ টাকা; সডাক : ৯৫ টাকা ❑ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য : ১০ টাকা

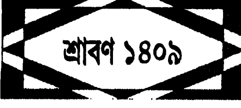


'উদ্বোধন' ঃ পূজা সংখ্যা (আশ্বিন ১৪০৯)

একটি জরুরী বিজ্ঞপ্তি

- যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও **'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন ১৪০৯/সেপ্টেম্বর ২০০২ (শারদীয়া) সংখ্যা প্রকাশিত হবে। মূল্য ঃ ৫০ টাকা।**
- **'উদ্বোধন'-এর** গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না। **গ্রাহকরা ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে** অগ্রিম টাকা জমা দিলে **অতিরিক্ত প্রতি কপি ৩০ টাকায় পাবেন। অতিরিক্ত কপি রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিলে পাঠানোর খরচ বাবদ অতিরিক্ত ২২ টাকা (প্রতি কপির ডাকমাশুল) জমা দিতে হবে। কপিটি অগ্রিম জমার** ক্যাশমেমো দেখিয়ে **২৭ সেপ্টেম্বর ২০০২ থেকে ১০ অক্টোবর ২০০২ পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে (By Hand)** কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করবেন।
- **শারদীয়া সংখ্যাটির ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সাধারণ ডাকে আমরা পাঠাতে চাই না।**
- ডাকযোগে (By Post) যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) নিলে ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে কার্যালয়ে অবশ্যই জানাবেন। কোন সংবাদ টেলিফোনে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে লিখিতভাবে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে তাঁদের পত্রিকা সাধারণ ডাকযোগেই (By Post) যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হবে।**
- **যাঁরা ডাকযোগে (By Post) পত্রিকা নেন, তাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি রেজিস্ট্রি ডাকে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রতি কপির জন্য অতিরিক্ত ২২ টাকা পাঠাতে হবে। তবে ঐ সংক্রান্ত সংবাদ এবং ২২ টাকা গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে অবশ্যই কার্যালয়ে এসে পৌঁছানো প্রয়োজন।**
- আমাদের **গ্রাহকভুক্তিকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে যাঁরা সডাক গ্রাহক হয়েছেন/নবীকরণ করেছেন, তাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি ঐ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সংগ্রহ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকভুক্তিকেন্দ্রগুলিতে ১৬ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে সেই সংবাদ জানাতে হবে, যাতে আমাদের কাছে ২৪ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে তারা সংবাদটি দিতে পারে।**
  - ✤ মনে রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যাটি **ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ** করার সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় **গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক। উল্লেখ না থাকলে অথবা কোন একটিমাত্র উল্লেখ করলে সংবাদটি গ্রাহ্য হবে না।**
  - ✤ প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে **এই বিজ্ঞপ্তি** দেওয়া সত্ত্বেও **অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে** জানান এবং তাঁদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। আমরা **বিশেষভাবে জানাই, নির্ধারিত তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না।** আশা করি, গ্রাহকদের সহৃদয় সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।
  - ✤ কিছু অসৎ ব্যক্তি কোন কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের শারদীয়া সংখ্যা সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা **যাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (By Hand)** সংগ্রহ করবেন [২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর ২০০২-এর মধ্যে], তাঁদের **বিশেষভাবে** জানানো হচ্ছে যে, **শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় তাঁদের নবীকরণ/ গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/M.O. প্রাপ্তি-কুপন/আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।**
  - ✤ **যদি ক্যাশমেমো/রসিদ/M.O. প্রাপ্তি-কুপন হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ২০ আগস্ট ২০০২-এর মধ্যে সেই মর্মে সম্পাদকের কাছে তা ডুপ্লিকেট-সহ লিখিতভাবে জানিয়ে সংগ্রহের অনুমতি নিতে হবে। নতুবা আমাদের পক্ষে তাঁদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না।** আশা করি, গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে **এব্যাপারে আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।**
  - ✤ **১০ অক্টোবরের পরে নিলে পূজাসংখ্যা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না।**
- **কাজের দিন ঃ (সোম-শুক্র) সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ পর্যন্ত এবং শনিবার বেলা ১-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা, রবিবার বন্ধ থাকে।**
- **১২ অক্টোবর থেকে ২১ অক্টোবর ২০০২ পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে। পূজাবকাশের পর ২২ অক্টোবর ২০০২ মঙ্গলবার কার্যালয় খুলবে।**









ওঁ নমঃ প্রণবার্থায় শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্তয়ে।
নির্মলায় প্রশান্তায় দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ।।

গুরু দক্ষিণামূর্তি। কৃপামূর্তি। গুরু নির্মল। সদ্‌গুরুর নির্মল অন্তঃকরণে চিদাভাস এবং অব্যবহিত অপরোক্ষ অনুভূতি স্বতই বিদ্যমান। তাই তিনি প্রশান্ত। তাঁহার মধ্যে শুদ্ধ চিদাত্মক জ্ঞানের স্বাভাবিক পরিস্ফুরণ। তিনি শুদ্ধজ্ঞানৈক মূর্তি। গুরুশক্তি ঈশ্বরের শক্তির প্রত্যক্ষ প্রকাশ। ঈশ্বরের প্রতীক প্রণব—ওঙ্কার। তাই গুরুও প্রণবাত্মক। সেই দক্ষিণামূর্তি গুরুকে আমার প্রণতি জ্ঞাপন করি।

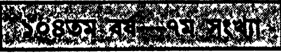
নিধয়ে সর্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিণাম্।
গুরবে সর্বলোকানাং দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ।।

গুরুশক্তি সর্ববিদ্যার আধারস্বরূপ। পরা কিংবা অপরা বিদ্যা গুরুকৃপাতেই লাভ হইয়া থাকে। যেকোন বিদ্যাই এক আদি বিদ্যার বিচিত্র বহিঃপ্রকাশমাত্র। সেই বিদ্যানিধি দক্ষিণামূর্তি ভবরোগেরও চিকিৎসক। স্বর্গ-মর্ত-পাতাল সর্বত্র বিদ্যার যে প্রকাশ, তাহা গুরুশক্তির মাধ্যমেই সঙ্ঘটিত। দক্ষিণামূর্তি সেই গুরুকে প্রণাম করি।

মৌনব্যাখ্যাপ্রকটিতপরব্রহ্মতত্ত্বং যুবানং
বর্ষিষ্ঠান্তেবসদৃষিগণৈরাবৃতং ব্রহ্মনিষ্ঠৈঃ।
আচার্যেন্দ্রং করকলিতচিন্মুদ্রমানন্দরূপং
স্বাত্মারামং মুদিতবদনং দক্ষিণামূর্তিমীড়ে।।

দক্ষিণামূর্তি ব্রহ্মের মায়িক মূর্তি। ইহা সদাশিবের জ্ঞানোপদেশক রূপ। তিনিই 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের 'তৎ'-পদার্থ এবং 'ত্বম্'-পদার্থ। অবিদ্যাবশে ভেদ-জ্ঞান তাঁহাতেই প্রকাশিত হয় এবং তাঁহাতেই নির্বৃত হয়। সেই গুরুমূর্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ বশিষ্ঠাদি ঋষিবৃন্দকে নির্বাক প্রসন্ন দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া জ্ঞানদান করিয়াছিলেন। তিনিই জ্ঞানমুদ্রাধারী, প্রসন্নবদন, তরুণ আচার্যরাজ। আপনাতে আপনি মগ্ন, স্বাত্মারাম সেই দক্ষিণামূর্তির স্তববন্দনা করি।

(শঙ্করাচার্যকৃত 'দক্ষিণামূর্তিস্তোত্র' হইতে)





বিবেকানন্দের উত্তরাধিকার

সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে

[পূর্বানুবৃত্তি]

যদিও পূর্বের তুলনায় শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও ভাবনা সারা পৃথিবীব্যাপী অধিকতর বেগে প্রসারিত ও ব্যাপ্ত হইতেছে, তথাপি বিশ্বের মোট জনসংখ্যার তুলনায় এখনো পর্যন্ত রামকৃষ্ণ-সচেতন অথবা বিবেকানন্দ-সচেতন মানুষের সংখ্যা অনুপাতে আশানুরূপ নহে। বোধ হয় নিঃশব্দে ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শ জগতে সম্প্রসারিত হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ এখনি আনিব না। যথাসময়ে সে-প্রসঙ্গ আসিবে। কারণ, বিবেকানন্দরূপ অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শ্রীরামকৃষ্ণরূপ অধরাকে ধরা সম্ভব নহে। কিন্তু বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গও আনিতে ভয় হয়। কারণ, বিবেকানন্দের পূর্ণাবয়ব মানস-নয়নে চাক্ষুষ করা সুদুষ্কর। তাই কেহ তাঁহাকে দেশপ্রেমিক বলিয়া জানিয়াছে, কেহ যুবনায়ক, কেহ-বা কর্মযোগী বলিয়া জানিয়াছে। কেহ তাঁহাকে বিদ্রোহী-সন্ন্যাসী বলিয়া আখ্যা দেন, কেহ বলেন যুগনায়ক। কেহ কেহ তাঁহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বলিয়া মানিলেও তাঁহাকে যুগাচার্যের আসন দিতে নারাজ। অবশ্য তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভাকে কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। তথাপি তাঁহার সারগর্ভ উক্তির অংশমাত্র পড়িয়া কিংবা বুঝিয়া অথবা উদ্ধৃত করিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন, এমনকি তাঁহাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। মনে এক অনির্বচনীয় ভীতির সঞ্চার হয় যখন ভাবি এই কৃতঘ্নোচিত ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করিলে সমাজের সমূহ ক্ষতি হইবে বৈ লাভ কিছুই হইবে না। সম্প্রতি ইহা লইয়া সংবাদপত্রেও লেখালেখি হইয়াছে। ইহার পূর্বে 'কথাপ্রসঙ্গে' জাতীয় সংহতির উদ্গাতা হিসাবে বিবেকানন্দকে কেন চিহ্নিত করা হইয়া থাকে তাহা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। স্বাধীনতা-বিপ্লবী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গমকে মহাত্মা গান্ধী একদা পত্রে লিখিয়াছিলেনঃ *"স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর জন্য নিশ্চয়ই কারুর কাছ থেকে কোন ভূমিকার প্রয়োজন নেই। তাঁর বাণীর নিজস্ব অপ্রতিরোধ্য আবেদনই যথেষ্ট।"* এই অপ্রতিরোধ্য আবেদনে সাড়া দিয়াই সুভাষচন্দ্র বোস 'নেতাজী'তে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন, মার্গারেট নোবল 'নিবেদিতা'য় রূপান্তরিত হইয়াছিলেন। রুদ্ধ আবেগে নেতাজী লিখিয়াছিলেনঃ *"আজ যদি স্বামীজী জীবিত থাকিতেন তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হইতেন, অর্থাৎ তাঁকে নিশ্চয়ই আমি গুরুপদে বরণ করিতাম।"* বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ'-রূপ যে সংহতি-মন্ত্র স্বামীজী জাতিকে উত্তরাধিকার-সূত্রে দান করিয়াছিলেন তাহা আজও পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয় নাই বরং কায়েমী স্বার্থপর মানুষের উত্তরোত্তর সংখ্যাধিক্যের কারণে আজ তাহাও অবজ্ঞাত। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ 'রাখীবন্ধনের রীতি' পুনরারম্ভ করিলেন। 'প্রবাসী' পত্রিকায় লিখিলেনঃ *"আধুনিক কালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোন আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি—দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান।... বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যেসব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙুলকে নয়।"* রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন তাঁহারই সমসাময়িক এক মহাপুরুষের উদ্দেশে। ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র স্বামীজীর মধ্যে ছিল না বলিয়াই তাঁহার সমকালীন মহনীয় ব্যক্তিত্বগণও তাঁহাকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

'সেবাযোগ' অথবা "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"র যে উত্তরাধিকার উত্তর প্রজন্মের জন্য স্বামীজী রাখিয়া গেলেন, তাহার বাস্তবায়নের জন্য আরেকটি তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা এই মুহূর্তে আমাদের স্মর্তব্য। অত্যন্ত সহজ ভাষায় অতল-গভীর এই তত্ত্বের শ্রীরামকৃষ্ণের স্বমুখের উপস্থাপনা—*"যত মত তত পথ"*। ধর্মসমন্বয়ের এই মহা-সংহতি বার্তা সমগ্র বিশ্বে বিশেষভাবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাহন। বস্তুত, ধর্ম প্রচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। জীবন হইতে জীবনে প্রজ্বলিত প্রদীপশিখার ন্যায় উহা লক্ষ লক্ষ দীপে



অনুবর্তিত হইবে—এই উচ্চাদর্শই সনাতন ধর্মের শাশ্বত উত্তরাধিকার। ধর্মপ্রচারকবর্গের ব্যর্থতার কারণেই সংহতি বিনষ্ট হইয়া যায় ও পুনরায় সংহতি ও সমন্বয় স্থাপনের প্রশ্ন উঠে। স্বামীজী ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসাডোনায় 'ইউনিভার্সালিস্ট চার্চ'-এ বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন ঃ "ভ্রাতৃত্ব আছেই; কেবল কতিপয় ব্যক্তি আছেন যাঁরা এই ভ্রাতৃত্ব দেখতে পান না এবং ভ্রাতৃত্বের নতুন কোন সংজ্ঞা আকুলচিত্তে অন্বেষণ করেন। তেমনি সার্বজনীন ধর্মও আছেই। কেবল যদি ধর্মপ্রচারকবৃন্দ এবং আরো কতিপয় মানুষ যাঁরা স্বেচ্ছায় বিভিন্ন ধর্মের প্রচারকার্যের ভার নিজ নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করেছেন, তাঁরা চুপ করলেই দেখা যাবে সার্বজনীন ধর্ম প্রকাশিত রয়েছে।"

আমাদের জাতীয় সংহতির প্রশ্নে 'বিচ্ছিন্নতাবাদ', 'সন্ত্রাসবাদ' ইত্যাদি বাহির হইতে আমদানি করা শব্দ। সনাতন ধর্মে 'বহিষ্করণ' নাই। সবই গ্রহণ। যদি পরধর্মসহিষ্ণুতার প্রসঙ্গ উঠে, স্বামীজী মনে করিতেন ইহা হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য নহে। কারণ ইহাতে 'যখনি ইচ্ছা আমি তোমার ক্ষতিসাধন করিতে পারি, কিন্তু করিতেছি না'-রূপ একটি প্রচ্ছন্ন অহঙ্কারের আভাস লক্ষিত হয়। সনাতন ধর্ম অপরকে কেবল সহ্যই করে না, তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া লয়। সুতরাং ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেশীয় ধর্ম ও রাজনীতির চরিত্রে কখনোই ইউরোপীয়ান বা মুসলিমদের ন্যায় অন্য জাতিকে ধ্বংস করিয়া নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রবণতা ছিল না। দেশীয় রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ-দাঙ্গা প্রভৃতি ছিল মূলত রাজনৈতিক কারণে, ধর্মের কারণে নহে। কিন্তু আকামণি গোষ্ঠী, আলেকজাণ্ডার, হুন, মহম্মদ বিন কাসেম, সুলতান মামুদ এবং পরবর্তী কালে মোঘল যুগে এই সন্ত্রাস শুরু হইল। পরে উহা ধর্মীয় চরিত্র ধারণ করিল। অথচ সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন প্রেম বিতরণের মাধ্যমে। সনাতন ধর্মান্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিরোধ থাকিলেও উহা কখনো রক্তক্ষয়ী শত্রুতায় পর্যবসিত হয় নাই। কিন্তু খ্রিস্টান ও ইসলামধর্মে দেখা যায় নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাহারা 'একে অপরকে বিনাশ'-এর নীতিতে চলিয়া থাকে। প্যাসাডোনায় ঐদিন বক্তৃতাকালে স্বামীজী এই প্রসঙ্গে আরো বলিলেন ঃ "If the sword is not used directly, other means will be used. Just hear what one of the best preachers in New York says—hc preaches that the Filipinos should be conquired because that is the only way to teach christianity to them! They are already catholics; but he wants to make them presbyterians." এবং সেই কারণে যুদ্ধের মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষের প্রাণের মূল্যে ঐ পাদরী তাহার প্রেসবিটেরিয়ান ধর্ম ফিলিপিনোদের উপর চাপাইয়া দিবে। স্বামীজী তীব্র ধিক্কার দিয়া আমেরিকার মাটিতে একাকী দাঁড়াইয়া খ্রিস্টানদিগকে বলিলেন ঃ "Think of the state of the world when a man is not ashamed to stand up and utter such arrant nonsense; and think of the state of the world when an audience cheers him! Is this civilisation?" (একবার চিন্তা করুন বিশ্বের সেই দৈন্যদশা যখন মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে এইপ্রকার কদর্য প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করে; আর, বিশ্বের আরও দুর্দশার দিন সেইদিন যেদিন একদল শ্রোতা তাকে বাহবা জানায়। এই কি সভ্যতা?) অর্থাৎ এই ধরনের 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' কিংবা 'সন্ত্রাসবাদ' অবশ্যই বিবেকানন্দের দেওয়া উত্তরাধিকার হইতে পারে না। সাম্প্রতিক ঘটনার স্রোত যেদিকে চলিয়াছে তাহার প্রেক্ষিতে মনে নানান প্রশ্ন উঠে। উত্তর খুঁজিয়া পাই। বিশ্বায়ন, জটিল আন্তর্জাতিক রাজনীতি, মুক্ত বাজারনীতি এবং অত্যন্ত সক্রিয় বিচ্ছিন্নতাকামী যে অলক্ষ্য শক্তি আজ ভারতবর্ষের অস্তিত্বকে মুছিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে, তাহা হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উত্তরাধিকার সম্পর্কে বিশেষ সচেতনতা।

পূর্ব প্রসঙ্গে আসি। অর্থাৎ ভারতবর্ষের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার বিষয়ে সচেতনতার যে অভাব বা দৈন্য বর্তমানে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে তাহা মূলত শিক্ষার অভাবের কারণে। যথার্থ শিক্ষার অভাবে 'ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ'-রূপ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ের সাধন ব্যাহত হইতেছে—ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগতভাবে। এখন তমো হইতে রজোতে উত্তীর্ণ হইয়াও বিদেশাগত 'আহার-নিদ্রা-অর্থোপার্জন ও ইন্দ্রিয়চারিতা'-র এই বৃত্তে ভারতবর্ষের মানুষ ঘুরপাক খাইতেছে। ইহা দীর্ঘদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণকে স্বরূপ ভুলাইয়া রাখিতে পারিবে না, একথা নিশ্চিত। কারণ, আমরা সচেতন না হইলেও বেদান্তের মহান উত্তরাধিকার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সম্পদ—অন্তরের আত্মার দিকে আমাদিগকে সতত আহ্বান করিতেছে। সেই সম্পদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সম্পদ আর নাই। সেই সম্পদ আমাদের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার। শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিকম্ ভজনে স্বামীজী অনবদ্য উপমায় তাহা ব্যক্ত করিলেন ঃ "সম্পদ তব শ্রীপদ ভব গোষ্পদ বারি যথায়।" যাহার অন্তরে ঐ শ্রীপদযুগল সম্পদরূপে প্রতিভাত হইয়াছে তাহার নিকট সারা বিশ্বের ঐশ্বর্য-সমষ্টি 'গোষ্পদ বারি'-র তুল্য তুচ্ছ। [গরুর খুরের চাপে মাটিতে যে-পরিমাণ গর্ত হয়




উহাতে সঞ্চিত জল যেরূপ সাগরস্থিত জলরাশির তুলনায় তুচ্ছ—সেইরূপ।] ইহাই আমাদের 'বিবেকানন্দের উত্তরাধিকার'। সাধকজীবনে আধিভৌতিকের উত্তরণই আধিদৈবিক। আর আধিদৈবিক পর্যবসিত হয় আধ্যাত্মিক অনুভবে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমুদ্রই আমাদের চরম উত্তরাধিকার বলিয়া স্বামীজী ঘোষণা করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন ঃ "যত মত তত পথ"। বহু-আলোচিত, বহু-উদ্ধৃত একটি উক্তি। পণ্ডিত ও বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ এই সহজ উক্তির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বহু শাস্ত্র এবং যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন। উহার প্রয়োজন আছে। তবে 'শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণম্'-এ উহা যদি পর্যবসিত হয় তাহা হইলে আমাদেরই ক্ষতি। ভারতবর্ষে এক-একটি শব্দকে লইয়া চুলচেরা বিচার অতীতে বহু হইয়াছে। এখনো হইতেছে। পূর্বে যে-আলোচনা ধর্মানুগ ও শাস্ত্রভিত্তিক ছিল, আজ তাহা অসার বাক্যাড়ম্বরে পর্যবসিত হইয়াছে। (এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার মূল কিছু মানুষের স্বার্থসিদ্ধি।) একজন বিদেশী বিবেকানন্দ-অনুরাগী বলিয়াছিল ঃ "I find Vivekananda full of contradictions, is it true?"—আমি দেখিতেছি বিবেকানন্দ বহুক্ষেত্রেই স্ববিরোধী কথা বলিয়াছেন। ইহা কি সত্য? উত্তরে বলিতে হয়, ইহা অবস্থাভেদে এবং অধিকারিভেদে সত্য। যখন যে-পরিস্থিতিতে স্বামীজী প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, সেই প্রেক্ষিতে ঐ উত্তর প্রযোজ্য ছিল বলিয়াই তাঁহাকে ঐ উত্তর দিতে হইয়াছিল। এমন যদি হয়, কেহ একজন সূর্য কখনো দেখে নাই; যখন সূর্যগ্রহণকালে সে দেখিল, বলিল, সূর্যের আকার এক কলা চন্দ্রের ন্যায়। তাহাকে সূর্য গোলাকৃতি বলিলে সে বিশ্বাস করিবে না। অতএব তাহারই কথায় সায় দিয়া বলিতে হইবে—হ্যাঁ, সূর্য এক কলা চন্দ্রের ন্যায়। আমরা জানি সত্য দুই প্রকার—ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক। এই ব্যবহারিক বা আপেক্ষিক সত্যের ক্ষেত্রে স্বামীজীর উক্তির মধ্যে স্ববিরোধী ভাব পরিলক্ষিত হইলে তাহা অস্বাভাবিক কিছু নহে। কিন্তু সাধারণ অজ্ঞ মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করিয়া তাহার যথার্থ ব্যাখ্যার পরিবর্তে বিবেকানন্দকে বেদধর্ম-বিরোধী কিংবা মৌলবাদী আখ্যা দিলে ব্যাখ্যাতার অজ্ঞতা অথবা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য প্রণোদনের কথাই প্রমাণিত হয়।

বিবেকানন্দের উত্তরাধিকার অফুরন্ত আশার উত্তরাধিকার—যে-আশার বাণী ঋষিকণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল ঃ "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ/ আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।"—হে অমৃতের পুত্রবর্গ, শোন সেই মহান সত্যকাহিনী...। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আশার বাণী শুনাইয়াছেন পাঞ্চজন্যধারী শ্রীকৃষ্ণ—"ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।" অর্থাৎ হে অর্জুন, জানিবে কল্যাণকারীর কখনো বিনাশ নাই। একই কথা অন্য আঙ্গিকে উচ্চারিত হইল শিকাগো ধর্মমহাসভায়—"It (Universal Religion) will be a religion which will have no place for persecution or intolerance in its polity which will recognise divinity in every man and woman, and whose whole scope, whose whole force will be created in aiding humanity to realise its own true divine nature." (এই বিশ্বজনীন ধর্মে হানাহানি অথবা অসহিষ্ণুতার কোন স্থান থাকবে না, এই ধর্ম প্রত্যেক নর-নারীর দিব্য সত্তার উন্মোচন ঘটাবে, মানুষের দিব্য-স্বরূপের উপলব্ধির জন্য এই ধর্মের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হবে।) পত্রাবলীতে স্বামীজী লিখিলেন ঃ "আমি মানসচক্ষে দেখিতেছি, এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া মহা মহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে।" কাহারা জাগিতেছে? বিবেকানন্দের উত্তরাধিকারী কে? তাহারা চিহ্নিত। স্বামীজী স্বয়ং তাহাদের প্রশস্তি করিয়া কম্বুকণ্ঠে বলিলেন ঃ "তোমাদের [অভিজাত গোষ্ঠী] পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্বকালের অনেকগুলি রত্নপেটিকা রক্ষিত রয়েছে। এতদিন দেবার সুবিধা হয় নাই। এখন ইংরেজ রাজ্যে—অবাধ বিদ্যাচর্চার দিনে উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।... এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচারবল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মানিকের আংটি—ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও, আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো; তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটি-জীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন-ধ্বনি—'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে'।" [সমাপ্ত] ❑



স্বামী বিবেকানন্দের দুখানি পত্র



মিসেস জর্জ ডব্লু হেলকে লিখিত

নিউ ইয়র্ক
১০ এপ্রিল ১৮৯৪

মা,

এইমাত্র আপনার চিঠি পেলাম। স্যালভেশানিস্টদের প্রতি আমার ঐকান্তিক শ্রদ্ধা রয়েছে; প্রকৃতপক্ষে, খ্রিস্টান মিশনারিদের মধ্যে এঁদের এবং অক্সফোর্ড মিশনের ভদ্রলোকদের প্রতিই আমার যেটুকু শ্রদ্ধা। তাঁরা ভারতের জনসাধারণের সঙ্গে, জনসাধারণের ন্যায় এবং জনসাধারণের জন্য জীবনযাপন করেন। প্রভু তাঁদের আশীর্বাদ করুন। কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখিত হব, যদি তাঁরা কোন ছলচাতুরী করেন। ভারতে আমি কোন 'লর্ড'-এর কথা শুনিনি, সিংহলে [শ্রীলঙ্কা] তো নয়ই। আমেরিকান ও হিন্দুদের মধ্যে যতটা তফাৎ তার চেয়ে বেশি তফাৎ সিংহল ও উত্তর ভারতের মানুষের মধ্যে। বৌদ্ধ পুরোহিত ও হিন্দুর মধ্যেও কোন যোগসূত্র নেই। আমাদের পোশাক, রীতিনীতি, ধর্ম, খাদ্য, ভাষা দক্ষিণ ভারতের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সিংহলের থেকে তো বটেই। আপনি তো জানেন যে, আমি নরসিংহের ভাষার একটি শব্দও বলতে পারি না!! যদিও সেই স্থান হলো মাদ্রাজ মাত্র। ভাল কথা, আপনাদের হিন্দু রাজকন্যারা রয়েছে; একজন লর্ড নয় কেনই বা, সেটি তো উচ্চতর উপাধি নয়।

শিকাগোতে জনৈক মিসেস স্মিথ (মিসেস আর্থার স্মিথ) ছিলেন। মিসেস স্টকহ্যামের গৃহে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি গার্ণসিদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। ডাঃ গার্ণসি এই শহরের সেরা চিকিৎসকদের মধ্যে অন্যতম এবং অতি সজ্জন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁরা আমাকে খুব ভালবাসেন এবং অত্যন্ত চমৎকার মানুষ। আগামী শুক্রবার আমি বস্টনে যাচ্ছি। নিউ ইয়র্কে আমি মোটেই বক্তৃতা করছি না। আমি ফিরে আসব এবং তারপর এখানে কয়েকটা বক্তৃতা দেব।

গত কয়েকদিন থেকে আমি ধনী গোল্ড-এর কন্যা মিস হেলেন গোল্ড-এর গ্রামের প্রাসাদোপম আবাসে অতিথি হয়ে আছি, শহর থেকে সেখানে যেতে গাড়িতে এক ঘণ্টা লাগে। পৃথিবীর এক অন্যতম অতি সুন্দর ও বৃহদায়তন কাচের ঘরের উদ্যান তাঁর আছে, যা সকলপ্রকার বিচিত্র উদ্ভিদ ও পুষ্পে পরিপূর্ণ। তাঁরা প্রেসবিটেরিয়ান ধর্মাবলম্বী এবং তিনি একজন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা মহিলা। সেখানে আমার খুব চমৎকার সময় কেটেছে।

আমার বন্ধু মিঃ ফ্ল্যাগের সঙ্গে আমার বহুবার দেখা হয়েছে। তিনি মহানন্দে উড্ডীয়মান। এখানে আরেকজন মিসেস স্মিথ রয়েছেন; তিনি খুব ধনী ও ধর্মপ্রাণা। আজ তিনি আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করেছেন।

বক্তৃতা থেকে টাকা তোলা আমি ছেড়ে দিয়েছি। নিজেকে আমি আর ছোট করতে পারি না। যখন একটা উদ্দেশ্য সামনে ছিল তখন কাজ করতে পেরেছি; তা চলে যাওয়ার পর আমি নিজের জন্য অর্থোপার্জন করতে পারি না। ফিরে যাওয়ার পক্ষে আমার যথেষ্টই আছে। এখানে একটি পেনিও রোজগার করতে আমি চেষ্টা করিনি, এবং কিছু উপহার ফিরিয়ে দিয়েছি যা এখানকার বন্ধুরা আমাকে দিতে চেয়েছিলেন। বিশেষত [মিঃ] ফ্ল্যাগ—তাঁর টাকা আমি গ্রহণ করিনি। ডেট্রয়েটে আমি দাতাদের অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং তাঁদের বলেছি যে, আমার কর্মপ্রচেষ্টার সাফল্যলাভের প্রায় কোন সম্ভাবনা না থাকায় তাঁদের দেওয়া টাকা রাখার কোন অধিকার আমার নেই; কিন্তু তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন যে, যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমি যেন তা জলে ছুঁড়ে ফেলি। কিন্তু বিবেকের অনুশাসনে আমার পক্ষে তা আর নেওয়া সম্ভব নয়। মা, আমি এখন বেশ স্বচ্ছল। প্রভু আমার জন্য সর্বত্র সহৃদয় ব্যক্তি ও গৃহের ব্যবস্থা করেন; সুতরাং পাশবিক পার্থিবতায় নিমজ্জিত হওয়ার আমার মোটেই প্রয়োজন নেই।

নিউ ইয়র্কের লোকেরা যদিও বস্টনবাসীদের মতো ততটা বুদ্ধিদীপ্ত নয়, আমার মনে হয় তারা অধিকতর আন্তরিক। বস্টনবাসীরা ভাল করে জানে কিভাবে প্রত্যেকের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করে নিতে হয়। আর আমার আশঙ্কা, তাদের বদ্ধমুষ্টির আঙুলের ফাঁক দিয়ে জল পর্যন্ত গলে না!!! প্রভু তাদের আশীর্বাদ করুন!!! আমি যাওয়ার অঙ্গীকার করেছি এবং অবশ্যই যাব; তবে প্রভু, আমাকে আন্তরিক অজ্ঞ এবং দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যেই জীবন কাটাতে দিন এবং ভণ্ড ও লম্বা লম্বা বুলিবাজদের ছায়াও যেন মাড়াতে না হয় সারাজীবন। আমার গুরুদেব যেমন বলতেন—শকুন অনেক উঁচুতে ওড়ে, কিন্তু মন পড়ে থাকে মাটিতে গলিত শবের দিকে।

আমি কয়েকদিনের জন্য মিসেস ব্রিডের অতিথি হব এবং বস্টনের খানিকটা দেখে নিউ ইয়র্কে ফিরে আসব।

আশা করি ভগিনীরা ভাল আছে এবং ঐকতানবাদন গভীরভাবে উপভোগ করছে। এই শহরে সঙ্গীতের বড় একটা চর্চা নেই। এটা একটা আশীর্বাদ (?)। সেদিন বার্ণামের সার্কাস* দেখতে গিয়েছিলাম। এটি নিঃসন্দেহে একটি চমৎকার জিনিস। এখনো আমি শহরের কেন্দ্রস্থলে যাইনি। এই রাস্তাটি খুব চমৎকার ও নিরিবিলি।

---

* তৎকালীন আমেরিকায় পি. টি. বার্ণামের সার্কাস অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।—সম্পাদক

সেদিন বার্ণামদের ওখানে একটি সুন্দর সঙ্গীতালেখ্য শুনলাম, তাঁরা একে বলেন 'স্প্যানিশ সিরিনাডা'। তা যাই হোক না, আমার সেটি দারুণ ভাল লেগেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে মিস গার্ণসি বেশি আওয়াজ পছন্দ করেন না, যদিও তাঁর সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে দুনিয়ার যাবতীয় কোলাহলপূর্ণ সামগ্রী রয়েছে এবং সেজন্য তিনি এটি বাজাতে পারেননি। এর ফলে আমার বরাবর দুঃখ থেকে যাবে।

আপনার আজ্ঞানুবর্তী
বিবেকানন্দ

পুনঃ—খুব সম্ভবত মিসেস ব্যাগলির অতিথি হয়ে আমি অ্যানিস্কোয়ামে যাব। এই গ্রীষ্মে সেখানে তাঁর একটি চমৎকার বাড়ি হয়েছে। তার আগে যদি পারি আরেকবার শিকাগো ফিরে যাব।

বি



সিস্টার ক্রিস্টিনকে লিখিত



আলমোড়া
২০ মে ১৮৯৮

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

তোমার সান্ত্বনাপ্রদ চিঠিখানা সবেমাত্র পেলাম। বর্তমানে আমেরিকান মহিলাদের সঙ্গে আরেকবার হিমালয়ে এসেছি এবং এখান থেকে কাশ্মীরে যাওয়ার ইচ্ছা আছে। গত বছরে বারংবার ইনফ্লুয়েঞ্জা হওয়ার ফলে আমার স্বাস্থ্যের আবার অবনতি ঘটেছে এবং আশা করছি পার্বত্য হাওয়া আমাকে অনেকটা সজীব করে তুলবে।

পুরনো উপসর্গটা পুরনো বন্ধুর মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে—নাছোড় অথচ অনুত্তেজক। কাশ্মীর থেকে আমরা কলকাতায় ফিরব এবং তারপর 'আরেকবার আমেরিকা অভিমুখী'। তথাপি এসবই নির্ভর করছে প্লেগরোগ আমাদের কলকাতা শহরে মহামারী আকারে হাজির না হওয়ার ওপর। সেক্ষেত্রে নিজের নগরীতে থেকে আমাকে যথাসাধ্য কাজ করতেই হবে।

বেবির মনের অবস্থা এতই অব্যবস্থিত জেনে দুঃখিত হলাম। আশাকরি খুব শীঘ্রই তার জন্য ভারতে একটি বাড়ি পাব, আর যদি তুমি চাও এবং তোমার কর্তব্য যদি অনুমোদন করে তবে তোমার জন্য আরেকটি।

আমি নিশ্চিত জানি তুমি শুনে খুশি হবে, কলকাতার নিকটে গঙ্গাতীরে একখণ্ড জমি পেয়েছি এবং মঠস্থাপনের জন্য এর পরিবেশ খুবই আশাব্যঞ্জক। আমার পাশ্চাত্যের বন্ধুদের জন্য খুব শীঘ্রই আলমোড়ার নিকটে হিমালয়ের কোন স্থানে একটি আবাস স্থাপন করার আশা রাখি। কলকাতা থেকে হিমালয়ের মধ্যে আমার কাজ চলবে। মোদ্দা কথা, ক্রমাগত কষ্টকর দৌড়ঝাঁপ করে আমি ক্লান্ত এবং সেজন্য আমি চাই প্রকৃত বিশ্রাম ও প্রশান্তি; কে জানে তা শীঘ্র মিলবে কিনা!

কাজ করে করে নিজেকে ক্ষয় করে ফেলো না, প্রিয় ক্রিস্টিনা। দীর্ঘ—দীর্ঘ বিশ্রাম নাও। কর্তব্যের কোন শেষ নেই, আর দুনিয়াটা হলো চূড়ান্ত স্বার্থপর।

এবার আমেরিকা ও ইওরোপ ভ্রমণের পর আমার পর্যটনপর্ব শেষ করে কলকাতায় ফিরে যাব, আর নীরব কর্ম ও প্রশান্তিতে ডুবে থাকব এবং ভবিষ্যৎ কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেব। দয়া করে মিসেস ফ্রাঙ্কি এবং অপর সকল বন্ধুদের আমার ভালবাসা জানিও। মিসেস ব্যাগলির মৃত্যুসংবাদ জেনে আমি খুবই দুঃখিত। তিনি একজন উত্তম বন্ধু ছিলেন। আমি সঙ্কল্প করেছি যে, আমেরিকায় আমার পরবর্তী যাত্রাটিকে বক্তৃতা-সফর হতে দেব না এবং ডেট্রয়েটে কয়েকদিনের জন্য যদি তুমি আমাকে একটি নিরিবিলি আবাসের ব্যবস্থা করে দিতে পার তবে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব। আমার প্রয়োজনাদির কথা ভেবে তোমার চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। আজকাল এগুলি সবই ভারতীয় অর্থাৎ শূন্যের ঠিক আগের ধাপে। এমনকি তুমি যে আদব-কায়দায় জীবনযাপন কর, তা এখানে আমাদের কাছে নিছক বিলাসিতা।

এই গ্রীষ্মে আমরা আমেরিকায় রওনা হতে পারব বলে মনে হয় না; তবে আমার নিশ্চিত ধারণা, আগামী শরৎকালে নিশ্চয়ই পারব।

প্রফুল্ল মনে থাকবে। "কল্যাণকারীর কখনো দুর্গতি হয় না।"

চিরস্থায়ী ভালবাসা সহ

সদা প্রভুপদাশ্রিত তোমাদের
বিবেকানন্দ

---

* এই পত্রটি 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১৯৭৯ সালের আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। পত্রের মাত্র তিনটি বাক্য 'বাণী ও রচনা'র ৮ম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে (৩৯২ নং পত্র) এবং ভুল করে মিস নোবলকে লেখা বলে ছাপা হয়েছে। চিঠিটি এখানে সম্পূর্ণ আকারে উপস্থাপন করা হলো।
—সম্পাদক

পাতঞ্জল-যোগসূত্র

ব্যাখ্যাতা ঃ স্বামী প্রেমেশানন্দ

অনুলিখন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ
সম্পাদনা ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

চিত্তান্তরদৃশ্যত্বে বুদ্ধি বুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ।।২০।।

যদি কল্পনা করা যায়—দ্বিতীয় কোন চিত্ত প্রথম চিত্তকে প্রকাশ করে, তবে এইরূপ কল্পনার শেষ হইবে না এবং স্মৃতিও অটুট থাকিবে না।

চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধিসম্বেদনম্।।২১।।

চিতি (পুরুষের শক্তি) অপরিণামী। মন চিতিশক্তির আকার গ্রহণ করিয়া জ্ঞানময় হয়।

দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্বার্থম্।।২২।।

মন যখন দ্রষ্টা ও দৃশ্য বস্তু উভয়ের দ্বারা রঞ্জিত হয়, তখনি উহা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে।

মন্তব্য ঃ কেহ কেহ এইরূপ বলিতেন যে, চিত্ত যখন বস্তুর আকারে আকারিত হইয়া বস্তু অনুভব করে তখন অন্য এক চিত্ত পূর্বের চিত্তের পশ্চাতে থাকিয়া তাহার সত্তার স্বাতন্ত্র্য অনুভব করে। কিন্তু এই কথাটি একান্তই অযৌক্তিক। দ্বিতীয় চিত্ত কল্পনা করিলে তাহার ক্রিয়া লক্ষ্য করিবার জন্য আরেক চিত্তের কল্পনা করিতে হয়। এইরূপ চিত্তের উপর চিত্ত কল্পনা করিতে করিতে কল্পনা কখনো শেষ হয় না। কিন্তু একটি পুরুষ সকল চিত্তের দ্রষ্টা—এই সত্য বুঝিতে পারিলে এই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হইয়া যায়।

চিত্ত জড় হইয়া সত্তার স্বাতন্ত্র্য জানিবে কিরূপে? পুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া চিত্ত পুরুষের তেজে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। তাহার ফলে তাহাতে দৃশ্য প্রতিফলিত হয়। তখন অজ্ঞানাচ্ছন্ন পুরুষ ভ্রমে মনে করেন, 'আমি দেখিলাম' এবং জ্ঞানিপুরুষ দেখেন, চিত্তে বাহ্য বস্তু প্রতিফলিত হইয়াছে মাত্র। এই ব্যাপারে রহস্য এই যে, মায়ার প্রভাবে যখন এই সৃষ্টিখেলা আরম্ভ হয়, তখন চিৎ বা পুরুষ তাঁহার সম্মুখে চিত্তকে বা বুদ্ধিকে দেখিতে পান এবং চিত্তের সম্মুখে সৃষ্টি উপস্থিত থাকায় তাহা চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয়। পুরুষের সম্মুখে চিত্ত এবং চিত্তের সম্মুখে জগৎ স্থাপিত হইলেই সৃষ্টিলীলা আরম্ভ হয়।

তদসংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ।।২৩।।

মন অসংখ্য বাসনার দ্বারা রঞ্জিত হইলেও সংহত বস্তু বলিয়া অপরের অর্থাৎ পুরুষের জন্য কাজ করে।

মন্তব্য ঃ চিত্তের কাজ দেখিলে মনে হয়, তাহার নিজ প্রয়োজনে বহু প্রকারের কাজে সে সর্বদা ব্যস্ত, তাহার যেন প্রয়োজনের অন্ত নাই। কিন্তু চিত্ত বা বুদ্ধি যতই কর্মব্যস্ত হউক না কেন, সে একা কিছুই করিতে পারে না; তাহার পিছনে অহঙ্কার, মন ও পূর্বসংস্কার তাহাকে কর্মসাধনে নিয়োজিত রাখে। তাহাতেই এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয় হয় যে, পুরুষ পিছনে থাকিয়া এই ব্যবস্থাটি করিয়া বুদ্ধিকে ভৃত্যের মতো খাটাইয়া লইতেছে, বুদ্ধি স্বাধীন বা স্বতন্ত্র নয়।

বিশেষদর্শিন আত্মভাব-ভাবনা-বিনিবৃত্তিঃ।।২৪।।

বিবেকী ব্যক্তি মনকে পুরুষ হইতে পৃথক বলিয়া জানিতে পারেন।

মন্তব্য ঃ দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রকৃতির এইসব লীলা পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে মানুষের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ হয়। এই জগতে সর্বদাই দেখা যায়, যে যে-বিষয় লইয়া দীর্ঘকাল চিন্তা করে—সেই বিষয়ে তাহার বুদ্ধির প্রখরতা প্রকাশ পায়। চাষের কাজে চাষির নিকট হইতে আমরা পরামর্শ লইতে বাধ্য হই। বিদ্বান বুদ্ধিমান কোন লোককে গরু চরাইতে হইলে যে অনেকদিন গরু চরাইয়াছে তাহার নিকট হইতেই তাহাকে কৌশল শিখিতে হইবে। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে দীর্ঘকাল গবেষণা করে, তাহার বুদ্ধিতে বিবেকশক্তি প্রকাশিত হয়। তাহা চরম অবস্থায় উপনীত হইলে তাহাকে বলে 'বিবেকখ্যাতি'। এই অবস্থায় সাধক জড় ও চৈতন্যের ভেদ সুস্পষ্ট দেখিতে পান।

এই ব্যাপারটি একটি রাসায়নিক ক্রিয়ার মতো। দুধ হইতে ছানা আলাদা করিতে হইলে আমরা দুধে অ্যাসিড মিশাইয়া দিই। ঠিক সেইরূপ আমাদের বোধশক্তিতে বিবেকখ্যাতি মিশাইয়া দিলে পুরুষ ও প্রকৃতি বা অবিদ্যা বা মায়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া যায়। তখন আমি যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার কিছুই নই, সেগুলি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাই। তখন নিজের সম্বন্ধে আর কোন চিন্তাভাবনা থাকে না।

তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্‌ভাবং চিত্তম্।।২৫।।

তখন (বিবেকীর নিকট) চিত্ত বিবেকপ্রবণ হইয়া কৈবল্যের পূর্বাবস্থা লাভ করে।

মন্তব্য ঃ মানসিক এই অবস্থা কৈবল্যপ্রাপ্তির ঠিক পূর্বস্তর। তখন বুদ্ধি বিবেকখ্যাতিতে একেবারে ডুবিয়া থাকে।

তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ।।২৬।।

ইহার বিঘ্নরূপে মধ্যে মধ্যে অন্য চিন্তা মনে উদিত হয়। সেগুলি পূর্বসংস্কার হইতে জাত।

হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্।।২৭।।

অবিদ্যা, অস্মিতা প্রভৃতি ক্লেশগুলিকে যেসকল উপায়ের দ্বারা নাশ করা যায়,[১০] *এই বিঘ্নগুলিকেও সেইসকল উপায়ে নাশ করিতে হইবে।*

মন্তব্য ঃ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই অবস্থাতেও পূর্বসংস্কারের একটু-আধটু সাড়া পাওয়া যায়। দেবতারা

---

১০ দ্রঃ সাধনপাদ, সূত্র ১০-১১।—সম্পাদক

যোগীদের মন ফিরাইবার চেষ্টা করেন—ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।[১১]

প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্বথাবিবেকখ্যাতের্ধর্মমেঘঃ সমাধিঃ।।২৮।।

তত্ত্বসমূহের জ্ঞানলাভের পূর্বে যিনি ঐশ্বর্য ত্যাগ করেন, বিবেকজ্ঞান লাভ হইলে তাঁহার 'ধর্মমেঘ' নামক সমাধি উৎপন্ন হয়।

ততঃ ক্লেশকর্মনিবৃত্তিঃ।।২৯।।

'ধর্মমেঘ' সমাধি লাভ হইলে ক্লেশ ও কর্মের নিবৃত্তি হয়।

মন্তব্য ঃ এই অবস্থায় যাঁহারা বিবেকখ্যাতি অটুট রাখিয়া নিজের সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্তা ব্যবহারে না লাগাইয়া মন-বুদ্ধিকে নির্বাণোন্মুখ রাখিতে পারেন, তাঁহাদের জীবনে মায়ামোহ বা দুঃখ-কষ্ট কিছুই থাকে না, তাঁহারা পবিত্রতার মূর্তিস্বরূপ হইয়া যান। কেউ তাঁহাদের নিকট আসিলে তাঁহাদের পবিত্রতার প্রভাবে সেও নিজেকে পবিত্র বোধ করে।

তদা সর্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্জ্ঞেয়মল্পম্।।৩০।।

তখন জ্ঞানের সকল আবরণ ও অশুদ্ধি নাশ হওয়ায় জ্ঞান অনন্ত হয় এবং জ্ঞেয় অল্প হইয়া যায়।

মন্তব্য ঃ গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন ঃ "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।"[১২] শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন চিদাকাশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজ বলিতেন ঃ "যখন ব্রহ্মবোধে বোধ হয়, তখন মনে হয় এই সৃষ্টিটা যেন এক কোণায় পড়িয়া আছে।"

এই সৃষ্টিটা তো মায়ার খেলা। প্রকৃতি বা মায়া নিজ শরীর হেলাইয়া দুলাইয়া তিন গুণের সাহায্যে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা তাহার বৈচিত্র্য দেখিয়া এমন ভুলিয়া রহিয়াছি যে, ব্যাপারটার তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারি না।

আমাদের চারিধারে জলরাশি বাষ্প হইয়া আকাশে উঠিতে থাকে এবং উপরে জমাট বাঁধিয়া মেঘের আকারে প্রকাশ পায়। মেঘের গায়ে কত ভঙ্গি, কত আলোর ছটা, কত বিদ্যুতের খেলা—তাহা যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। এই চমকপ্রদ মেঘের খেলার মূল কারণ ঐ বাষ্প মাত্র। এই সৃষ্টির সকল ব্যাপারই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার বিচিত্র লীলা। যাঁহারা একবার স্ব-স্বরূপের সন্ধান পান তাঁহাদের কাছে এই খেলা এমন তুচ্ছ মনে হয় যে, ঐদিকে দৃষ্টি ফিরাইবার তাঁহাদের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা থাকে না। আর তাঁহারা যে-বস্তুকে বোধে বোধ করেন তাহা সর্বতোভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাহাকে 'ব্রহ্ম' বলে এইজন্য যে, তাহা অপেক্ষা বৃহৎ আর কোন বস্তু নাই। 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থই হইল—'বৃহত্তম'।

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তির্গুণানাম্।।৩১।।

গুণগুলির কার্য শেষ হইয়া গেলে তাহাদের পরিণামও শেষ হইয়া যায়।

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ।।৩২।।

যে-পরিণাম ক্ষণ অর্থাৎ মুহূর্তকালের জন্য এবং যাহাকে একটি শ্রেণীর শেষপ্রান্তে যাইলে বুঝা যায়, তাহার নাম 'ক্রম'।

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি।।৩৩।।

যখন গুণসমূহে পুরুষের আর কোন প্রয়োজন থাকে না, তখন তাহাদের প্রতিলোমক্রমে লয়কে 'কৈবল্য' অথবা চিৎ-শক্তির বা চৈতন্যশক্তির 'স্বরূপপ্রতিষ্ঠা' বলা হয়।

মন্তব্য ঃ যোগী এই অবস্থা লাভ করিলে প্রকৃতির দিকে আর দৃষ্টিপাত করেন না। সুতরাং প্রকৃতির যেসকল পরিণাম এতকাল ধরিয়া চলিয়াছিল, তাহা এখন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। প্রকৃতি এতকাল খেলা করিয়া পুরুষকে নানাপ্রকার ভোগে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, এখন ভোগ শেষ হওয়া মাত্র তিনি (অর্থাৎ পুরুষ) যে-স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে আবার প্রতিষ্ঠিত হন।

উপসংহার

যোগশাস্ত্রের মূলকথাগুলি বুঝিতে কষ্ট হয় না, কিছুকাল একটু অভ্যাস করিলেই কথাগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু সূত্রে যেসব সূক্ষ্ম বিষয়ের পর্যবেক্ষণ ও বিচার আছে, তাহা অনেকদিন চিন্তা না করিলে বুঝা যায় না। সাধারণ লোকের নিকট ঐসব সূক্ষ্ম আলোচনা চিত্তাকর্ষক হয় না। বিশেষত প্রাচীন ধরনে রচিত সূত্রগুলি প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে বুঝা কষ্টকর।

সূত্রগুলির অনেক টীকা-টিপ্পনী আছে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে তাহার মর্ম বুঝা খুবই কঠিন। উহাদের পাশাপাশি স্বামীজীর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা সাধারণের নিকট অতি বিস্তৃত বলিয়া মনে হইবে।

বর্তমানে আমরা যে-ব্যাখ্যা করিলাম, উহা 'প্রধানত' স্বামীজীর ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া করা হইয়াছে। তবে এই ব্যাখ্যাগুলিতে জটিল সূত্রগুলির কেবল সারমর্মটুকু উল্লেখ করা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে নানা কারণে নূতন প্রকারের ব্যাখ্যাও করা হইয়াছে। স্বামীজীর অসাধারণ প্রাঞ্জল ও প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যার সহিত পড়িলে বুঝার পক্ষে সহজ হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে জ্ঞান, কর্ম, যোগ ও ভক্তি—এই চারিটি পূর্ণভাবে সমন্বিত আছে—ইহা স্বামীজী বলিয়াছেন। কাহারো সন্দেহ হইতে পারে, রাজযোগে তো কেবল মন একাগ্র করিবার কথা আছে—ভক্তির কথা কোথায়? কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে মন একাগ্র করিবার চেষ্টা করিলে ইহা কি বুঝিতে হইবে না যে, সেই ব্যক্তি বিষয়টিকে অত্যন্ত প্রিয়জ্ঞান করে? এইজন্যই তো সদ্গুরুর নিকট হইতে নিজের ইষ্ট বাছিয়া লইতে হয়। আমাদের দেশে গুরু শিষ্যকে স্বতন্ত্র ইষ্টমন্ত্র বলিয়া দেন। [সমাপ্ত] ❑

---

১১ দ্রঃ বিভূতিপাদ, সূত্র ৫২ ও সংশ্লিষ্ট পাদটীকা।—**সম্পাদক**

১২ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন ঃ আমার বিভূতি অনন্ত। সেসব জানিবার তোমার কোন প্রয়োজন নাই। তুমি শুধুমাত্র এইটুকু জানিয়া রাখ যে, আমি এক পাদমাত্র দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছি। (গীতা, ১০।৪২)—**সম্পাদক**

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত গুরুতত্ত্ব

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত থেকে সঙ্কলিত

(২৪ জুলাই ২০০২ গুরুপূর্ণিমা স্মরণে)

প্রতিবেশী—"মহাশয়, সংসারে থেকে কি ভগবানকে পাওয়া যায়?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"অবশ্য পাওয়া যায়, তবে যা বললুম—সাধুসঙ্গ আর সর্বদা প্রার্থনা করতে হয়। তাঁর কাছে কাঁদতে হয়। মনের ময়লাগুলো ধুয়ে গেলে তাঁর দর্শন হয়। মনটি যেন মাটি-মাখানো লোহার ছুঁচ—ঈশ্বর চুম্বক পাথর, মাটি না গেলে চুম্বক পাথরের সঙ্গে যোগ হয় না। কাঁদতে কাঁদতে ছুঁচের মাটি ধুয়ে যায়, ছুঁচের মাটি অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, পাপবুদ্ধি, বিষয়বুদ্ধি। মাটি ধুয়ে গেলেই ছুঁচকে চুম্বক পাথরে টেনে লবে—অর্থাৎ ঈশ্বরদর্শন হবে। চিত্তশুদ্ধি হলে তবে তাঁকে লাভ হয়।... সংসারে হবে না কেন? ঐ সাধুসঙ্গ, কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা, মাঝে মাঝে নির্জনে বাস; একটু বেড়া না দিলে ফুটপাথের চারাগাছ, ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলে।" (৩৯)*

প্রতিবেশী—"যারা সংসারে আছে, তাহলে তাদেরও হবে?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"সকলেরই মুক্তি হবে। তবে গুরুর উপদেশ অনুসারে চলতে হয়। বাঁকাপথে গেলে ফিরে আসতে কষ্ট হবে। মুক্তি অনেক দেরিতে হয়। হয়তো এজন্মেও হলো না; আবার হয়তো অনেক জন্মের পর হলো।"

প্রতিবেশী—"গুরুর উপদেশ বললেন। গুরু কেমন করে পাব?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"যে-সে লোক গুরু হতে পারে না। বাহাদুরী কাঠ নিজেও ভেসে চলে যায়, অনেক জীবজন্তুও চড়ে যেতে পারে। হাবাতে কাঠের ওপর চড়লে, কাঠও ডুবে যায়, যে চড়ে সেও ডুবে যায়। তাই ঈশ্বর যুগে যুগে লোকশিক্ষার জন্য নিজে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। সচ্চিদানন্দই গুরু।" (৩৯-৪০)

শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের প্রতি—"তুমি প্রকৃতি দেখে শিষ্য কর না, তাই এইরূপ ভেঙে ভেঙে যায়। মানুষগুলি দেখতে সব একরকম, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। কারু ভিতর সত্ত্বগুণ বেশি, কারু রজোগুণ বেশি, কারু তমোগুণ। পুলিগুলি দেখতে সব একরকম। কিন্তু কারু ভিতর ক্ষীরের পোর, কারু ভিতর নারিকেলের ছাঁই, কারু ভিতর কলায়ের পোর।... আমার তিন কথাতে গায়ে কাঁটা বেঁধে। গুরু, কর্তা আর বাবা। গুরু এক সচ্চিদানন্দ। তিনিই শিক্ষা দিবেন। আমার সন্তান ভাব। মানুষগুরু মেলে লাখ লাখ। সকলেই গুরু হতে চায়। শিষ্য কে হতে চায়? লোকশিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন আর আদেশ দেন, তাহলে হতে পারে। নারদ, শুকদেবাদির আদেশ হয়েছিল। শঙ্করের আদেশ হয়েছিল। আদেশ না হলে কে তোমার কথা শুনবে?

"আবার মনে মনে আদেশ হলে হয় না। তিনি সত্য সত্যই সাক্ষাৎকার হন, আর কথা কন।... সে-কথার জোর কত!" (১০২-১০৩)

শ্রীরামকৃষ্ণ—"মানুষের কি সাধ্য অপরকে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত করে। যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া, তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন। সচ্চিদানন্দ-গুরু বৈ আর গতি নাই।...

"যদি সদ্‌গুরু হয়, জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘুচে। গুরু কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা। শিষ্যের অহঙ্কার আর ঘুচে না; সংসারবন্ধন আর কাটে না।...

"যদি গুরুর কৃপায় একবার অহংবুদ্ধি যায়, তাহলে ঈশ্বরদর্শন হয়।... জীব তো সচ্চিদানন্দস্বরূপ। কিন্তু এই মায়া বা অহঙ্কার তাদের সব নানা উপাধি হয়ে পড়েছে। আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে।" (১৩৪-১৩৫)

"যদি মানুষ গুরুরূপে চৈতন্য করে তো জানবে যে, সচ্চিদানন্দই ঐরূপ ধারণ করেছেন। গুরু যেমন সেথো; হাত ধরে নিয়ে যান। ভগবানদর্শন হলে আর গুরু-শিষ্য বোধ থাকে না। সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরুশিষ্যে দেখা নাই!" (২০৮)

"তাই গুরুর কৃপা হলে আর ভয় নাই! তিনি জানিয়ে দেবেন, তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি।" (২৩২)

"গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতে হয়, গুরুকে ঈশ্বরজ্ঞান করলে তবে হয়। তাই বৈষ্ণবেরা বলে, গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব।" (২৪৪)

"ঠিক ভক্তের লক্ষণ আছে। গুরুর উপদেশ শুনে স্থির থাকে।... আরেকটি লক্ষণ। ঠিক ভক্ত জিতেন্দ্রিয় হয়, কামজয়ী হয়। গোপীদের কাম হতো না।" (২৪৮)

"তাঁকে কে জানবে? আমি জানবার চেষ্টাও করি না! আমি কেবল 'মা' বলে ডাকি! মা যা করেন। তাঁর ইচ্ছা হয় জানাবেন, না ইচ্ছা হয় নাই বা জানাবেন। আমার বিড়ালছাঁর স্বভাব।" (৩২৯)

(পরবর্তী অংশ ৫০৫ পৃষ্ঠায়)

---

* বন্ধনীর মধ্যে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' অখণ্ড, ৬ষ্ঠ সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা দেওয়া হয়েছে।—সঙ্কলক

স্বামী বিবেকানন্দ আজও সমভাবেই প্রাসঙ্গিক*

স্বামী ভূতেশানন্দ

স্বামীজী সম্পর্কে আমার বক্তব্য গবেষণামূলক কিছু হবে না, তাঁর সম্বন্ধে যে-কথাগুলি সকলের মনে হয়—সেই কথাগুলিই স্মরণ করছি মাত্র। স্বামীজীকে দর্শন করেছেন—এমন কেউ আমাদের সঙ্ঘে জীবিত নেই। সঙ্ঘের বাইরেও যাঁরা স্বামীজীকে দর্শন করেছেন এবং সেই দর্শনের স্মৃতি এখনো জাগরূক আছে—এমন ব্যক্তিও খুঁজে পাওয়া যাবে না, কারণ সেরকম কেউ আর জীবিত নেই। স্বামীজী স্থূলদেহ ত্যাগ করেছেন ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে। কাজেই এখন যাকিছু তথ্য সব বই থেকেই জানতে হবে। নতুন করে কিছু বলার সামর্থ্য বা উপায় কারো নেই, তবে বিদগ্ধ বক্তা বক্তব্যগুলিকে চিত্তাকর্ষক করতে পারেন। তাঁর স্মৃতিপূজা হিসাবেই এই আলোচনা।

শিবমহিম্নস্তোত্রে আছে—

"মম ত্বেতাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ
পুনামীত্যর্থেঽস্মিন্ পুরমথন বুদ্ধির্ব্যবসিতা।"

—তোমার গুণকীর্তনজনিত পুণ্যের দ্বারা আমার বাক্য পবিত্র হবে, এই অভিপ্রায়েই আমার মন এই বিষয়ে তৎপর হয়েছে। বাক্যশুদ্ধির সঙ্গে সম্বন্ধ চিত্তশুদ্ধির। হে ত্রিপুরারি, আমার চেষ্টা শুধু এই কারণেই।

তাঁকে বোঝানো উদ্দেশ্য নয়, এই উপায়ে নিজের মনকে শুদ্ধ করাই উদ্দেশ্য। লোকোত্তর পুরুষদের সম্বন্ধেও এই কথা। এই প্রসঙ্গে আমাদের শোনা কথা একটি বলছি। একদিন স্বামীজী বেলুড় মঠে ঘরের মধ্যে একলা পাদচারণা করতে করতে নিজের মনে বলছেনঃ "আর একটা বিবেকানন্দ যদি থাকত, তাহলে বুঝত এই বিবেকানন্দ কি করে গেল।" যখন স্বামীজী একথা বলছেন, তখন বুঝতে হবে এ তাঁর আত্মম্ভরিতা নয়, কারণ সেটা তাঁর ছিল না, আর কাউকে তিনি শোনাচ্ছেনও না—এটা তাঁর স্বগতোক্তি। এইটিই হচ্ছে স্বামীজী সম্বন্ধে প্রকৃত মূল্যায়ন।

স্বামীজীকে বুঝতে হলে আরেকটি স্বামীজী দরকার। পরিমাপ করতে গেলে সেই অতলস্পর্শী চরিত্রের কেউ তল পাবে না। তাঁকে বুঝেছিলেন একমাত্র ঠাকুর স্বয়ং। ঠাকুর উপমা দিতেন—নরেন হচ্ছে রাঙাচক্ষু রুই, সহস্রদল পদ্ম, বড় দীঘি, আরও কত কি! আদর করে এসব বলার পাত্র তিনি ছিলেন না। তিনি দিব্যদৃষ্টি দিয়ে যা দেখেছেন তাই বলেছেন। সুতরাং সেই ব্যক্তিত্বকে বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাদের বুদ্ধি বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এখন ধীরে ধীরে স্বামীজী সম্বন্ধে দেশে-বিদেশে অনেক গবেষণা হচ্ছে। কিছুদিন আগে একজন বিদেশী এসেছিলেন, তাঁর কাছে শুনলাম তিনি স্বামীজী সম্বন্ধে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছেন। যে-ব্যক্তি এইরকম বিশ্বের বিস্ময়, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের কতটুকু বলারই বা সাহস হবে?

স্বামীজী আজন্ম ধ্যানসিদ্ধ। কিন্তু অবতারপুরুষদেরও সহজাত শক্তি ও সম্পদ ক্রমে ক্রমে উন্মোচন করতে হয়। ঠাকুরকেও করতে হয়েছে এবং তা কি কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে করতে হয়েছে তা আমরা তাঁর জীবনেতিহাস থেকেই পাই। আর তার চেয়েও বেশি করতে হয়েছে স্বামীজীকে। ঠাকুর ছিলেন কেন্দ্রীয় শক্তির পুঞ্জ—তাঁর শক্তি ভিন্ন ভিন্ন আধারের মধ্য দিয়ে কাজ করবে। সেই প্রবাহ ধারণক্ষম হতে হলে আধারগুলিকে বিশুদ্ধ হতে হয়, যাতে তার বেগ ধারণ করতে পারে। এই যন্ত্রগুলির মধ্যে স্বামীজী আবার অনন্য, অতুলনীয়। ঠাকুর বলছেনঃ "নরেন্দ্রের মতো একটি ছেলেও আর দেখিতে পাইলাম না। যেমন গাইতে-বাজাতে, তেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি বলতে-কইতে, আবার তেমনি ধর্মবিষয়ে! সে রাতভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে করতে সকাল হয়ে যায়, হুঁশ থাকে না। আমার নরেন্দ্রের ভিতর এতটুকু মেকি নাই, বাজিয়ে দেখ—টং টং করছে। আর সব ছেলেদের দেখি, যেন চোক-কান টিপে কোনরকমে দু-তিনটে পাস করেছে, ব্যস, এই পর্যন্ত—ঐ করতেই যেন তাদের সমস্ত শক্তি বেরিয়ে গেছে। নরেন্দ্রের কিন্তু তা নয়, হেসেখেলে সব কাজ করে, পাস করাটা যেন তার কাছে কিছুই নয়! সে ব্রাহ্মসমাজেও যায়, সেখানে ভজন গায়, কিন্তু অন্য সকল ব্রাহ্মের ন্যায় নয়—সে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী। ধ্যান করতে বসে তার জ্যোতিঃদর্শন হয়। সাধে নরেন্দ্রকে এত ভালবাসি?"[১] তিনি খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন—কোথায় এমন নিখুঁত যন্ত্র পাবেন, যাকে ব্যবহার করে তাঁর জগদুদ্ধার কার্যকে সার্থক করবেন। কলকাতার রাস্তা দিয়ে যখন যেতেন, ছেলেমানুষের মতো একবার এদিক, আরেকবার ওদিক মুখ বাড়িয়ে দেখতেন। বলতেন, আমি কেন এরকম করি জান? দেখি কোথায় একটি আধার পাই, যোগ্য ব্যক্তি পাই, যাকে দিয়ে মায়ের যন্ত্ররূপে কাজ করানো যায়। তাঁর কথায়—"আমার কথা লবে কে? আমি সঙ্গী

---

* স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা।

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, ঠাকুরের দিব্য ভাব ও নরেন্দ্রনাথ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ২১ সং, ২য় পাদ, পৃঃ ৬৮

খুঁজছি—আমার ভাবের লোক খুব ভক্ত দেখলে মনে হয়, এই বুঝি আমার ভাব নিতে পারবে। আবার দেখি, সে আর একরকম হয়ে যায়!" আবার বলছেন ঃ "দেখ, একজন মরিয়া ভূত হইয়াছিল। অনেককাল একাকী থাকায় সঙ্গীর অভাব অনুভব করিয়া সে চারিদিকে অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কোন স্থানে মরিয়াছে শুনিলেই সে সেখানে ছুটিয়া যাইত। ভাবিত, এইবার বুঝি তার একজন সঙ্গী জুটিবে। কিন্তু দেখিত, মৃতব্যক্তি গঙ্গাবারি-স্পর্শে বা অন্য কোন উপায়ে উদ্ধার হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া আসিয়া সে পুনরায় পূর্বের ন্যায় একাকী কালযাপন করিত। ঐরূপে সে-ভূতের সঙ্গীর অভাব আর কিছুতেই ঘুচে নাই। আমারও ঠিক ঐরূপ দশা হইয়াছে।"[২]

ঠাকুরও সেইরকম সঙ্গী খুঁজে বেড়াতেন। মনের মতো সেই সঙ্গী পেলেন নরেন্দ্রকে। পেয়ে তাঁর কী আনন্দ! প্রথম দর্শন থেকেই তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে নরেন্দ্রের কথা বলতেন। কখনো কখনো নিজেকে সামলাতে না পেরে তাঁর সামনেই বলতে শুরু করতেন। নরেন্দ্র বিরক্ত হয়ে উঠে চলে যেতেন। তাঁর সঙ্গে ঠাকুরের অপূর্ব সম্বন্ধ থেকে বোঝা যায়, নরেন্দ্রনাথের মহত্ত্ব কিরকম। তাঁর যেসব বৈশিষ্ট্য আমরা বুঝতে পারি না, তা-ও ঠাকুর দেখছেন তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে। 'নরেন', 'নরেন' করে তিনি যেন পাগল! পরীক্ষাও কম করেননি, কিন্তু সব পরীক্ষায় নরেন উত্তীর্ণ হয়েছেন। বলছেন—এর ভিতরে আর কোন খাদ নেই, নিখাদ। কিন্তু সেই নরেনকে কত কষ্টভোগ করতে হলো! অভাবের কষ্ট, আত্মীয়বিয়োগের কষ্ট। কৈশোরে পিতৃবিয়োগ হলো, ফলে সংসারের অবস্থা বিপর্যস্ত। এইসব দুঃখ-বেদনা পেয়ে পেয়ে তাঁর হৃদয় অত্যন্ত বেদনাতুর হয়ে গিয়েছিল। সেই বেদনা নিজের পরিজনদের জন্য বেদনা নয়, সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য বেদনা।

একদিনের ঘটনা—স্বামীজী তাঁর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে বেদান্তবিচার করছিলেন। সেই সময় গিরিশবাবু এসেছেন। স্বামীজী ঠাট্টা করে গিরিশবাবুকে বলছেন ঃ "কি, জি. সি.! এসব তো কিছু পড়লে না, কেবল কেষ্ট-বিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে।" জি. সি. (গিরিশবাবুকে স্বামীজী ঐভাবে সম্বোধন করতেন) সাধারণ ব্যক্তি নন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না থাকলেও অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁর। গিরিশবাবু উত্তরে বললেন ঃ "হাঁ হে নরেন, একটা কথা বলি। বেদ-বেদান্ত তো ঢের পড়লে, কিন্তু এই যে দেশে ঘোর হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, মহাপাতকাদি চোখের সামনে দিনরাত ঘুরছে, এর উপায় তোমার বেদে কিছু বলেছে? ঐ অমুকের বাড়ির গিন্নি—এককালে যার বাড়িতে রোজ পঞ্চাশখানি পাতা পড়ত, সে আজ তিনদিন হাঁড়ি চাপায়নি; ঐ অমুকের বাড়ির কুলস্ত্রীকে গুণ্ডাগুলো অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে; ঐ অমুকের বাড়িতে ভ্রূণহত্যা হয়েছে, অমুক জোচ্চোরি করে বিধবার সর্বস্ব হরণ করেছে—এসকল রহিত করবার কোন উপায় তোমার বেদে আছে কি?" শুনতে শুনতে স্বামীজীর বেদান্তবিচার উঠে গেল, চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে লাগল। তিনি উঠে গেলেন সেখান থেকে। তখন গিরিশবাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলছেন ঃ "দেখলি বাঙাল, কত বড় প্রাণ! তোর স্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে মানি না; কিন্তু ঐ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্য মানি। চোখের সামনে দেখলি তো মানুষের দুঃখকষ্টের কথাগুলো শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে স্বামীজীর বেদ-বেদান্ত সব কোথায় উড়ে গেল!"[৩]

আমরা স্বামীজীকে নানা কারণে শ্রদ্ধা করি। বহুমুখী তাঁর প্রতিভা। সবচেয়ে বড় কথা তাঁর এই হৃদয়বত্তা। একবার দক্ষিণেশ্বর থেকে ফেরার পথে ঠাকুরের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে—কে তাঁকে কিভাবে দেখেছেন। কেউ ঠাকুরের অদ্ভুত সরল ভাষায় ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব বলার সামর্থ্য, কেউ তাঁর সমাধি—ইত্যাদি বিষয়ে বলছেন। স্বামীজী চুপ করে আছেন। তখন স্বামীজীকে একজন বললেন, নরেন তুমি তো কিছু বলছ না। তিনি উত্তরে বললেন ঃ "আমি বলি LOVE Personified—প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ।" এইভাবেই তিনি ঠাকুরকে বুঝেছিলেন।

ঠাকুরকে তিনি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। সেই গ্রহণ কিভাবে? এমন করে গ্রহণ যে নিজের ব্যক্তিত্ব, নিজের যাকিছু সব চিরকালের জন্য তাঁর পায়ে সমর্পণ। বলছেন—এই মাথাটা একটা পাগলা বামুনের পায়ে বিক্রি হয়ে গেছে। নরেনকে ঠাকুর খুঁজে খুঁজে, বেছে বেছে কুড়িয়ে নিয়েছেন। একটি রত্নকে পেয়েছেন, তাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে জগতে তাঁর ভাবধারার বাহকরূপে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এমন অপূর্ব বাহক আর কে আছে? স্বামীজী নিজের ব্যক্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করে ঠাকুরকে সেই জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, অথচ ঠাকুরের নাম কত কম বলেছেন। তিনি পাশ্চাত্যে যখন প্রচারকার্যে গেছেন, তখন কেউ তাঁকে ঠাকুরের নাম পর্যন্ত বলতে শোনেনি। তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ ভক্তরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে ঠাকুরের নাম শুনেছেন।

---

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম অধ্যায়, পৃঃ ৫৯-৬০

৩ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ৩ সং, পৃঃ ৩৮-৩৯

একবার ঠাকুর বলরাম-মন্দিরে এসেছেন। ঠাকুর আর নরেন্দ্রাদি কয়েকজন হলঘরটিতে শুয়েছিলেন। হঠাৎ নরেন্দ্র বলে উঠলেন—বুড়ো আমার ভিতরে ঢুকছেন। ইংরেজিতে বলছেন ঃ "The old man is entering me." ঠাকুর হেসে বললেন ঃ আমি বুঝি না বুঝি? বলছিস—বুড়ো ভিতরে ঢুকছে। নিশ্চয়ই ঢুকব। তাঁর ভাষায় বললেন তিনি—পড় পড় করে ঢুকে যাব। অর্থাৎ স্বামীজীর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব থাকবে না। কারণ, তাঁকে মা যে যন্ত্র করেছেন। তাতে ঠাকুর নিজেকে লক্ষ্য করে বলছেন, তিনি থাকবেন। কাজেই ঠাকুরের ব্যক্তিত্বকে প্রচার করার অর্থ তাঁর নিজেকেই প্রচার করা—এইরকম বোধ করতেন।

স্বামীজী সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ স্থাপন করলেন। স্বামীজীই করলেন বলা চলে—কারণ, ঠাকুরের দেহত্যাগের পর যখন তরুণ ভক্তরা সব বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন তখন স্বামীজী নিজে সকলের কাছে গিয়ে তাঁদের ঠাকুরের ভাবে উদ্দীপিত করতে লাগলেন। তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন যে, তাঁদের জন্য বিরাট কর্তব্যের বোঝা রয়েছে। সেই বোঝা তাঁদের মাথায় তুলে নিতে হবে। ঠাকুরের ভাবাদর্শ স্ব স্ব জীবনে প্রতিফলিত করে জগতে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। স্বামীজী তাঁদের মর্মে মর্মে তা প্রবেশ করিয়ে দিলেন। এইভাবে ধীরে ধীরে সঙ্ঘ গড়ে উঠল। ঠাকুর নিজেই বলেছেন ঃ "নরেন শিক্ষে দিবে।" প্রথমে সঙ্ঘগঠন, তারপর সেই সঙ্ঘের দ্বারা জগতে ঠাকুরের ভাবের বিস্তার হবে।

এই হলো ঠাকুরের দিব্যদৃষ্টি। তদনুযায়ী তিনি নরেন্দ্রনাথকে নিখুঁতভাবে গড়ে তুললেন। কত রকমের পরীক্ষা! অর্থকষ্টে নরেন্দ্রনাথের সংসার বিপন্ন। তখনকার দিনের একজন গ্র্যাজুয়েট, চাকরির তখন অভাব ছিল না, কিন্তু চাকরি কোথাও জুটছে না। চাকরির জন্য দরখাস্ত নিয়ে দরজায় দরজায় ঘুরছেন তিনি, কিন্তু কোথাও তা মিলল না। কিছুদিন বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন স্কুলে শিক্ষকতা করলেন। তখন অপর শিক্ষকেরা দেখলেন, তাঁদের প্রভাব নষ্ট হবে, তাঁরা বিদ্যাসাগরকে বললেন—ও পড়াতে পারে না, ওকে বিদায় করুন। বিদ্যাসাগর শ্রীমকে বলে পাঠালেন যে, নরেন্দ্রনাথকে বলে দিও তাকে আর আসতে হবে না। এই কথা নরেন্দ্রনাথকে বলা হলে তিনি বললেন—তাই নাকি! আমি তো ভাবছিলাম আমি খেটে খেটে পড়াই, ভালই পড়াই। ঠিক আছে, কাল থেকে আর যাব না। চাকরিটিও গেল।

এইভাবে যখন নিঃস্ব নিঃসম্বল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি, তখন মনে প্রবল দ্বন্দ্ব উঠছে, ভয়ানক একটা অভিমান হচ্ছে। একদিন সকালবেলা অভ্যাসবশত ভগবানের নাম করছেন, তাঁর মা বললেন—খুব তো ভগবান ভগবান করা হলো, তা ভগবান করল কি? নরেন্দ্র ভাবলেন—তাই তো! বাড়িতে মা, ভাইবোনেরা একমুঠো খেতে পায় না, ভগবান এই অভাব দূর করতে পারছেন না? তখন তীব্র অভিমান ভগবানের ওপরে। তিনি বলছেন, যে-ভগবান এইরকম আর্তের দুঃখ দূর করতে পারেন না, পীড়ন থেকে তাকে রক্ষা করতে পারেন না—সেইরকম ভগবানে আমি বিশ্বাস করি না। তিনি যেন তীব্র ঈশ্বরদ্রোহী হলেন। বন্ধুবান্ধবেরা তাঁর ভাব দেখে আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে গেলেন। বললেন, নরেন্দ্র বিগড়ে গেছে। ঠাকুরের কাছে সেই কথা গেল। তাঁরা তাঁকে বললেন, আপনি এত 'নরেন নরেন' করেন, সেই নরেন কিন্তু এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সে নাস্তিক হয়ে গেছে, কিছু মানে না। ঠাকুর শুনলেন, খুব আঘাত লাগল মনে; কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। তারপর তারা যখন আরো বলছে তখন তিনি বললেন, তোরা যদি নরেনকে এইভাবে সমালোচনা করিস তবে তোদের মুখ দেখতে পারব না। তখন তা বন্ধ হলো।

তারপর নরেন্দ্রনাথ যেদিন ঠাকুরের কাছে এলেন, ঠাকুর বললেন ঃ "ওরে, আমি যে ওসব কথা বলতে পারি না। তুই যা না কেন? মাকে মানিস না—সেইজন্য তোর এত কষ্ট।" নরেন্দ্র বললেন ঃ "আমি তো মাকে জানি না; আপনি আমার জন্য মাকে বলুন—বলতেই হবে; আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়ব না।" ঠাকুর আবার বললেন ঃ "ওরে, আমি যে কতবার বলেছি, 'মা, নরেন্দ্রের দুঃখ-কষ্ট দূর কর।' তুই মাকে মানিস না; সেইজন্যেই তো মা শুনেন না। [তখন নরেন্দ্রনাথ সাকার রূপে বিশ্বাস করতেন না, তিনি ব্রহ্মবাদী ছিলেন।] আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার; আমি বলছি, আজ রাত্রে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা চাইবি, মা তোকে তাই দিবেন। মা আমার চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি—ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করিয়াছেন; তিনি ইচ্ছা করিলে কী না করিতে পারেন?" তখন নরেন্দ্রনাথ ভাবলেন, তাই তো, উনি বলছেন, কখনো তো মিথ্যা বলেন না, সুতরাং একবার দেখাই যাক। ঠাকুরের কথায় তিনি গেলেন কালীমন্দিরে। কী অদ্ভুত অনুভূতি! যে-দেবীকে তিনি এতদিন পাথরের প্রতিমা বলে দেখে এসেছেন, তাঁকে তখন দেখছেন যেন চিন্ময়ী। তাঁর ভাব যেন জ্বলজ্বল করছে। চারিদিক উদ্ভাসিত তাঁর প্রভায়। নরেন্দ্রনাথ অভিভূত হয়ে গেলেন। কিসের জন্য সেখানে গিয়েছেন তা ভুলে গেলেন। বারবার মাকে প্রণাম করে বলতে লাগলেন ঃ "মা, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, যাহাতে তোমার অবাধ দর্শন নিত্য লাভ করি ঐরূপ করিয়া দাও।" এই বলে কিছুক্ষণ অভিভূত থেকে ফিরে এলেন। ঠাকুর বললেন ঃ

"কিরে, মায়ের নিকটে সাংসারিক অভাব দূর করিবার প্রার্থনা করিয়াছিস তো?" নরেন্দ্রনাথ বললেনঃ "না মহাশয়, ভুলিয়া গিয়াছি! তাই তো এখন কি করি?" ঠাকুর বললেনঃ "যা যা, ফের যা, গিয়ে ঐ কথা জানিয়ে আয়।" নরেন্দ্র আবার গেলেন, কিন্তু সেই এক অনুভূতি। ভুলে গেলেন সব কথা। কেবল শ্রদ্ধা-ভক্তি-জ্ঞান-বিশ্বাস চাইলেন। আবার ফিরে এলেন। ঠাকুর তৃতীয়বার পাঠালেন, এবারও একই অবস্থা। ঠাকুর হেসে বললেনঃ "আচ্ছা যা, তাদের [নরেন্দ্রনাথের মা ও ভাইবোনেদের] মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব কখনো হবে না।"[৪] স্বামীজী সংসারের সুখভোগ করবেন—এটা ঠাকুরেরও অভিপ্রেত ছিল না। দুঃখের অনুভূতি যেন তাঁর মর্মে মর্মে প্রবেশ করে, তাই এইরকম অবস্থার ভিতর দিয়ে তাঁকে নিয়ে গিয়েছেন। শেষপর্যন্ত তিনি যাচাই করে নরেন্দ্রনাথকে বুঝে নিলেন। এইভাবে তাঁকে কত পরীক্ষাই ঠাকুর করেছেন!

স্বামীজীকে বুঝতে গেলে তাঁর বাগ্মিতা, তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডার—যা দেখে সকলে স্তম্ভিত হয়—তা দেখলেই হবে না। স্বামীজীর ব্যক্তিত্বকে দেখতে হলে এই ছোট ছোট ঘটনার ভিতর দিয়ে দেখতে হবে। সামান্য ঘটনা, কিন্তু তার মধ্য দিয়ে তাঁর হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। এইগুলি দিয়ে তাঁকে বুঝতে হবে। আমরা তাঁর বিচার-বিশ্লেষণ, তাঁর দার্শনিকতা বা পাণ্ডিত্যকে উপেক্ষা করতে বলছি না। এগুলি পণ্ডিতের কাছে সমাদরের বস্তু। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বামীজীকে কাছে পেতে হলে, তাঁর মহত্ত্বকে আস্বাদন করতে হলে এইসব ছোট ছোট ঘটনার ভিতর দিয়েই করতে হবে।

স্বামীজীর কাছে কেউ অবহেলিত নয়। তখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের উৎসব আরম্ভ হয়েছে। একবার অনেকে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন যে, এই উৎসবে অনেক পতিতারা যায়, এই অবস্থায় ভদ্রলোকের যাওয়া চলে না। এর প্রতিবিধান করতে হবে। অবহেলিত যারা, ঘৃণ্য যারা, যারা পতিতা—তারা যেন ওখানে যেতে না পারে। স্বামীজীকে সেকথা জানানো হলো। তিনি বললেন, ঠাকুর কি কয়েকটি ধর্মাত্মা পবিত্র ব্যক্তি—যারা অশুচির স্পর্শেই অস্পৃশ্য হয়ে যায়—এরকম কয়েকজনের জন্য এসেছিলেন? ঠাকুর এসেছিলেন সমাজে অবহেলিত, নিন্দিত যারা, যারা অধঃপতিত—তাদের কল্যাণের জন্য। যদি কোন তথাকথিত ভদ্রলোক না আসে তাহলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু যারা সমাজে অবহেলিত তাদের জন্য ঠাকুরের দরজা যেন সর্বদা উন্মুক্ত থাকে। স্বামীজীর এই ভাব। সকলের জন্য করুণা। বিশেষ করে যারা অবহেলিত, দলিত, পীড়িত—তাদের জন্য তাঁর প্রাণ সর্বদা কাঁদত। পাশ্চাত্য দেশে কত ভোগবিলাসের মধ্যে তাঁকে থাকতে দেওয়া হয়েছে। দুগ্ধফেননিভ শয্যায় তিনি শুতে পারলেন না। মেঝেয় গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদেছেন আর চোখের জল ফেলেছেন। ভেবেছেন, এখানে এত প্রাচুর্য, আর আমাদের দেশের মানুষ দুমুঠো অন্ন পায় না! কী দুঃখ, কী দৈন্য, কী দুরবস্থা তাদের! এরই প্রতিকারের জন্য তিনি পাশ্চাত্য দেশে গিয়েছিলেন। কিন্তু গিয়ে কি দেখলেন? যে-দৈন্য আমাদের দেশে এত প্রকট, এত নগ্ন—যার জন্য আমরা জগতের কাছে নিন্দিত, অবহেলিত, সেই ভারতের চেয়েও প্রবলতর অভাব-দারিদ্র্য রয়েছে সেখানে। সে-অভাব হলো ধর্মের, আধ্যাত্মিকতার, নৈতিকতার। স্বামীজী প্রথমে গিয়েছিলেন দরিদ্র ভারতের জন্য অর্থসংগ্রহ করতে। তার দ্বারা যদি দেশে কিছু করা যায়। কিন্তু দেখলেন সেখানেও অভাব কম নয়। যেখানে যে-অভাব, সেখানে তা দেওয়াই হলো দূরদর্শী মানুষের কাজ। কাজেই সেখানে তিনি ধর্মদানে ব্যাপৃত হলেন। কেউ কেউ তাকে বলল, আপনি আমেরিকার জন্য কাজ করছেন? ভারতে আপনার জন্ম, আপনার ভারতের জন্য কাজ করা দরকার। স্বামীজী বললেনঃ ভারতে আমার জন্ম—এটা আমার হাতে নয়, দৈব ঘটনা মাত্র। যেখানে যে-অভাব দেখব তা দূর করার চেষ্টা করব। তাদেরই সেবা করব। ভারত আমায় কিনে রাখেনি বা ভারতে জন্মেছি বলে আমার ক্ষেত্র সেখানেই সীমিত নয়। তাঁর এমন উদার দৃষ্টি! ভারতের দুঃখ তাঁকে পীড়িত করেছে, কিন্তু সেইসঙ্গে পীড়িত করেছে জগতের অন্যত্র যে-দুঃখ তা-ও।

সেই বিশ্ববরেণ্য স্বামীজীকে চিন্তা করে তাঁর সম্বন্ধে দু-চার কথা আলোচনা করলাম মাত্র। যত দিন যাবে তত আমরা তাঁকে জানব। তাঁর ভাবকে আমরা যত গ্রহণ করতে পারব, জীবনকে সেই খাতে যত প্রবাহিত করতে পারব ততই আমাদের কল্যাণ। তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের বুদ্ধি যেন সেই ভাবে প্রবাহিত হয় এবং তাঁর আশীর্বাদে আমরা আমাদের জীবনকে যেন উন্নত করি, ধন্য, পবিত্র করে তুলতে পারি। তিনি যে-আদর্শে তাঁর জীবন উদ্‌যাপিত করেছেন, সেই আদর্শ যেন আমাদের জীবনে রূপায়িত হয়।* ❑

৪ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩১-১৩২

* ১৬ জানুয়ারি ১৯৮২ স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে প্রদত্ত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন সহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের ভাষণের সম্পাদিত অনুলিপি।—সম্পাদক

সমসাময়িক পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতিচারণ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে যেসকল তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ১৩৫৯ সালে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনর্মুদ্রিত করা হলো। আশা করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।

লেখক জাহাজে ভ্রমণ করেছিলেন ১৮৮১ সালে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধি অবস্থা দর্শন করেছিলেন ১৮৮৬ সালে। এই স্মৃতিকথাটি তিনি লিখেছিলেন প্রায় ৪৫ বছর পর এবং পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল আরো ২২ বছর পর।—সম্পাদক

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

Reflections & Reminiscences, 1947

(পূর্বানুবৃত্তি)

আমরা কয়েক মিনিট ধরে নিঃশব্দে পরমহংসের নিশ্চল অবস্থা প্রত্যক্ষ করলাম। তারপরে কেশবচন্দ্রের নববিধানের ধর্মসঙ্গীত গায়ক ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল খোলকরতাল-সহ একটি ধর্মসঙ্গীত গাইলেন। গান জমে উঠলে পরমহংস চোখ খুললেন, চারিদিকে তাকালেন—যেন কোন অচেনা জায়গায় এসেছেন। গান শেষ হলে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ "এরা কারা?" তারপরেই নিজের মাথায় কয়েকবার চাপড় মেরে বেশ জোরের সঙ্গে বললেন ঃ "নেমে যা, নেমে যা।" তিনি যে সমাধিস্থ হয়েছিলেন, সেকথা কেউ উচ্চারণ করল না। পরমহংস সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে মধুর কণ্ঠে গান ধরলেন ঃ "কালী মা কি কল করেছ।" গান শেষ হলে কিভাবে গলা সাধতে হয় এবং ভাল গলার লক্ষণ কি—এইসব বর্ণনা করলেন।

সন্ধ্যার অনেক পরে পরমহংসদেবকে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে দিয়ে আমরা কলকাতা ফিরে এলাম। আহিরীটোলা ঘাটে কোন যানবাহন না পাওয়াতে কেশবচন্দ্রকে মসজিদবাড়ি স্ট্রিটের কালীচরণ ব্যানার্জির বাড়ি পর্যন্ত হেঁটে যেতে হলো, কারণ ওখানে তাঁর রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল।

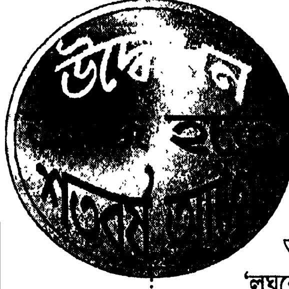
শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করে ও তাঁর কথা শ্রবণ করে আমি আমার আত্মীয় (আমার চেয়ে সামান্য বয়োজ্যেষ্ঠ) মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কাছে গিয়ে সব বললাম ও তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে যেতে বললাম। তিনি পরের বছর সেখানে গিয়েছিলেন এবং পরমহংসের কথাবার্তা শুনে এতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, তাঁর ডায়েরিতে সব সংক্ষিপ্ত আকারে লিখে রেখেছিলেন। তিনি আমায় বলেছিলেন যে, একদিনে তিনি যা শুনতেন তা লিখতে তাঁর তিনদিন লাগত। তাঁকে জীবিকার জন্য চাকরি করতে হতো—তিনি পেশায় শিক্ষক ও অধ্যাপক ছিলেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তিনি 'মাস্টারমশাই' নামে খ্যাত। উপরি উক্ত ডায়েরি থেকেই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' রচিত হয়েছিল।... এই বইটিই একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ—যাতে শ্রীরামকৃষ্ণের সব বাণীগুলি লিখিত হয়েছে। মহেন্দ্রনাথ প্রতিদিন যেতে পারতেন না এবং সবসময় তাঁর কাছে থাকতে পারতেন না। কাজেই এটা খুবই সম্ভব যে, শ্রীরামকৃষ্ণের বহু মূল্যবান কথা অজানা রয়ে গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হওয়ার কিছু পরেই আমায় করাচি যেতে হয়। এর পরে তাঁকে জীবিত অবস্থায় দেখা বা তাঁর কথা শোনা আমার আর হয়নি। কিন্তু ১৮৮৬ সালের ১৬ আগস্ট পরমহংস রামকৃষ্ণের মহাসমাধির দিন কলকাতায় ছিলাম। বিকালে বাড়ি থেকে বের হচ্ছি, এমন সময় একটি ছাপানো স্লিপ আমার হাতে এল—যাতে লেখা ছিল যে, পরমহংস রামকৃষ্ণের মহাসমাধি হয়েছে। আমি গাড়ি চালিয়ে সোজা কাশীপুর উদ্যানবাটীতে গেলাম, যেখানে এই মহান যোগী জীবনের শেষদিনগুলি অতিবাহিত করেছেন। দেখলাম, যাঁরা তাঁকে দেবতারূপে পূজা করতেন, গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর সেবা করতেন—তাঁরা সকলে তাঁকে ঘিরে রয়েছেন। আমি গিয়ে দেখলাম, গৃহের সামনে উন্মুক্ত আকাশের নিচে পুষ্প ও নতুন শুভ্র বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে তাঁর দেহ শায়িত রয়েছে। দেহ ডানপাশ ফেরা, মাথার নিচে একটি বালিশ, দুই পায়ের মধ্যেও বালিশ। ক্যান্সারের অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁর যে-ওষ্ঠদুটি উপদেশদানে কখনো বিরত হয়নি, তারা আজ মৃত্যুর করাল ছায়ায় নিস্তব্ধ। তাঁর মুখমণ্ডলে পরম প্রশান্তি ও রাজকীয় ভাব ফুটে রয়েছে। মুখে ঈষৎ হাসি দেখে মনে হয়, সমাধি অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ), মহেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য শিষ্যবর্গ, নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ত্রৈলোক্যনাথ ও অন্যান্যরা মাটিতে বসে আছেন। তাঁদের পাশে বসে আমি যখন সামনে শায়িত রামকৃষ্ণের মুখের ভাব দেখলাম, তখন তাঁর সেই কথা মনে পড়ল যে, শরীর একটা খোলমাত্র, অন্তর্নিহিত আত্মাকে বোঝা কঠিন। গ্রীষ্মের উত্তপ্ত অপরাহ্ণ পার হওয়ার জন্য যখন আমরা অপেক্ষা করছিলাম, একখণ্ড মেঘ আকাশে ভেসে এল এবং কয়েক ফোঁটা বারিবর্ষণও হলো। যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা বললেন যে, প্রাচীন শাস্ত্রে দেখা যায়, স্বর্গ থেকে এই পুষ্পবৃষ্টি স্বর্গমর্তের এই মহান মানবকে অমরধামে নিয়ে যাওয়ার স্বাগত অভ্যর্থনা।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এতদিন ঈশ্বর যে আমায় বাঁচিয়ে রেখেছেন তা এইজন্য যে, আমি যাতে সকলকে জানাতে পারি—আমি রামকৃষ্ণকে স্বচক্ষে দেখেছি, তাঁর কথা স্বকর্ণে শুনেছি এবং তাঁর নিরুদ্বেগ শান্তিতে মহাসমাধি অবস্থাও প্রত্যক্ষ করেছি। ❑

অনুবাদ ❑ জলধিকুমার সরকার

সম্পাদনা ❑ স্বামী সর্বগানন্দ



শ্রাবণ ১৩০৯
জুলাই ১৯০২

স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধি

আজ অতি কষ্টে, অতি কাতর প্রাণে গ্রাহকগণের হৃদয়ে এক অতি প্রবল শোকের উদ্দীপন করিয়া দিতেছি।

কাহারও শুনিবার আর বাকি নাই যে, আমাদের পূজ্যপাদ স্বামীজী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আপাততঃ যে দিন তিনি দেহত্যাগ করেন, সেই দিনের সমুদয় ঘটনার সামান্য বিবরণ দিতেছি। ইচ্ছা রহিল, তাঁহার অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী এক ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে গ্রাহকগণের হস্তে পরে অর্পণ করিব।

বিগত ৪ঠা জুলাই, বাঙ্গালা ২০শে আষাঢ় শুক্রবার রাত্রি নয় ঘটিকার সময় তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

তিনি ইদানীং মাস কতক হইল, তাঁহার ভীষণ "এলবুমেনুরিয়া" (এক প্রকার প্রস্রাবের ব্যারাম*) রোগে ভুগিতেছিলেন। কবিরাজি চিকিৎসায় সে রোগ হইতে এক প্রকার মুক্তিলাভ করেন। দেহত্যাগের মাসখানেক পূর্ব্ব হইতে তিনি ভালই ছিলেন, বলিতে পারা যায়। যে দিন [তিনি] দেহত্যাগ করেন, সেইদিন প্রাতঃকালে যজুর্ব্বেদের একটি মন্ত্র ("সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মি" ইত্যাদি) ও উহার টীকা একজন সন্ন্যাসী শিষ্যকে পড়িতে বলিলেন। শুনিয়া তিনি বলিলেন যে, টীকাতে 'সুষুম্নঃ' শব্দের যাহাই অর্থ থাক, পরবর্ত্তী ষট্‌চক্রবাদিগণ সুষুম্না নাড়ীর যে সকল কথা কহিয়া থাকেন, তাহার বীজ (অর্থাৎ ভিত্তি) এই মন্ত্রে রহিয়াছে দেখ।

ইহাতে বোধ হয়, সে দিন তাঁহার মনে ষট্‌চক্রের ভাব ও সাধনা বিশেষ জাগরূক ছিল।

পরে বেলা আটটা হইতে এগারটা পর্য্যন্ত ঠাকুরের ঘরে ধ্যান করিলেন। অন্য অন্য দিন এতক্ষণ ধরিয়া ধ্যানও করিতেন না, এবং যাহাও করিতেন, বায়ুশূন্য স্থানে বসিয়া করিতে পারিতেন না। সে দিন কিন্তু দরজা বন্ধ করিয়া ধ্যান করিয়াছিলেন।

ধ্যানান্তে একটি সুন্দর শ্যামা বিষয়ক গান গাইতে লাগিলেন। অনেকেই নীচে হইতে শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গানটি এই—'মা কি আমার কালো, কালোরূপা এলোকেশী হৃদিপদ্ম করে আলো'। সে দিন আহারের সময় অতি তৃপ্তির সহিত আহার করিয়াছিলেন। আহারান্তে প্রায় ২॥০ ঘণ্টা ধরিয়া শিষ্যগণকে 'লঘুকৌমুদী' ব্যাকরণ পড়াইলেন। পরে বৈকালে জনৈক গুরুভাইয়ের সহিত প্রায় ১॥০ মাইল বেড়াইয়া আসিলেন। অনেক দিন এত বেশী বেড়াইতে পারেন নাই। সে দিন তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার শরীর খুব ভাল ছিল। বেড়াইতে বেড়াইতে মঠে একটী বেদবিদ্যালয় স্থাপন করিবার ইচ্ছা বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। মঠে ফিরিয়া আসিয়া শৌচাদি করিয়া বলিলেন, শরীর খুব হালকা বোধ হইল। পরে খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর নিজের ঘরে যাইয়া জনৈক শিষ্যকে বলিলেন, আমার জপের মালা আনিয়া দাও। পরে তিনি শিষ্যটীকে বাহিরে যাইতে বলিয়া সেই ঘরে একান্তে জপ করিতে বসিলেন।

তাহার পরদিন শনিবার অমাবস্যায় শ্যামাপূজা করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে সেদিন অনেক কথাবার্ত্তা কহেন। ঘণ্টাখানেক জপ করিতে করিতে শয়ন করিলেন ও সেই শিষ্যকে ডাকিয়া নিজের মাথায় একটু বাতাস করিতে বলিলেন। তখনও তাঁহার হাতে মালা ছিল। শিষ্য মনে করিলেন, বোধ হয় তাঁহার নিদ্রার আবেশের মত আসিল। ঘণ্টাখানেক পরে তাঁহার হাত একটু কাঁপিল। পরে দুইবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। শিষ্য মনে করিল যে, তাঁহার সমাধি হইল। তখন সে নীচে হইতে জনৈক সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া লইয়া যাইল। তিনি গিয়া দেখিলেন, স্বামীজির নাড়ী নাই ও নিঃশ্বাস বন্ধ। ইতিমধ্যে আর একজন সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে সমাধিস্থ মনে করিয়া ক্রমাগত ঠাকুরের নাম করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনমতে সমাধি ভঙ্গ আর হইল না। সেই রাত্রে জনৈক বিচক্ষণ ডাক্তারকে আনয়ন করা হইল। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, দেহত্যাগ হইয়াছে।

তাহার পরদিন সকালে দেখা গেল, চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ এবং নাসিকা ও মুখ দিয়া অল্প রক্ত পড়িয়াছে। অপরাপর ডাক্তারগণ বলিলেন, মস্তিষ্কের ভিতর কোন স্থান ফাটিয়া গিয়াছে। ইহাতে বেশ বোধহয়, জপ ও ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়া দেহাবসান হয়!

* ইনফেক্সন-জনিত এই রোগের উৎস কিডনির অক্ষমতার কারণে প্রস্রাবে অ্যালবুমিনের আধিক্য।—সম্পাদক

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : স্বামী সর্বগানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার প্রচারকার্য্য

শ্রীম

১৯০২ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের অব্যবহিত পরে আশ্বিন মাসে বাঙলা মাসিক পত্রিকা 'নব্যভারত'-এ মাস্টারমশাই অর্থাৎ কথামৃতকার শ্রীম 'স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার প্রচারকার্য্য' নামে একটি সুদীর্ঘ রচনা প্রকাশ করেন। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন দেবীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। লেখাটির অংশবিশেষের পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ করা হলো। একমাস পরে কার্ত্তিক ১৩০৯ সংখ্যার মাসিক 'সাহিত্য' পত্রিকায় এই লেখার ওপর কয়েকটি মন্তব্য করা হয়। আমাদের মনে হয়েছে ঐ মন্তব্যগুলি আগে পড়া দরকার। তাই প্রথমেই সেই মন্তব্যগুলি উপস্থাপন করা হলো। শ্রীম-র রচনা এবং তার সমালোচনার বানান ও ভাষা এবং পাদটীকা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। মাধুকরী' বিভাগে সন্তোষকুমার দত্তের সৌজন্যে 'উদ্বোধন'-এর নিবেদন।—সম্পাদক

'সাহিত্য'

সমালোচনা বিভাগ

নব্যভারত। ভাদ্র ও আশ্বিন। শ্রীযুক্ত 'ম— বি.এ.' "স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার প্রচারকার্য্য" নামক যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য। লেখক এক স্থলে বলিয়াছেন,— "বিবেকানন্দ শুধু পণ্ডিত নন, তিনি সাধু মহাপুরুষ। শুধু পাণ্ডিত্যের জন্য ইংরেজ ও আমেরিকাবাসিগণ তাঁকে ভৃত্যের ন্যায়, সন্তানের ন্যায় সেবা করেন নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, ইনি আর একজাতীয় লোক। লোকে সম্মান, টাকা, ইন্দ্রিয়সুখ, সন্ন্যাস, পাণ্ডিত্য লইয়া রহিয়াছে; ইঁহার এক লক্ষ্য ঈশ্বরলাভ।" আবার— "স্বামী বিবেকানন্দ কামিনীকাঞ্চনত্যাগী। তিনি নির্জ্জনে গুরুর কৃপায় অনেকদিন সাধন করিয়াছিলেন। তিনি যথার্থ কর্ম্মযোগের অধিকারী। তবে তিনি সন্ন্যাসী, মনে করিলেই ঋষিদের মত অথবা তাঁহার গুরুদেব পরমহংস দেবের মত কেবল জ্ঞান ভক্তি লইয়া থাকিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার জীবন কেবল ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য হয় নাই। সংসারীরা যে সকল বস্তু গ্রহণ করে, অনাসক্ত হইয়া তাহাদের কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, স্বামীজী তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন।"

স্বামী বিবেকানন্দ মান্দ্রাজীদের নিকট আমেরিকা হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের দাস; তাঁহারই দূত হইয়া তাঁহার মঙ্গল বার্ত্তা তিনি সমগ্র জগৎকে বলিয়াছেন।[১]

মান্দ্রাজে তৃতীয় বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, আমি সারগর্ভ যা কিছু কথা বলিয়াছি, সমস্তই পরমহংসদেবের, অসার যদি কিছু বলিয়া থাকি, সে সব আমার।...

কলিকাতায় ৺রাধাকান্ত দেবের বাড়ীতে যখন তাঁহার অভ্যর্থনা করা হয়, তখনও বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-পরমহংসদেবের শক্তি আজ জগৎব্যাপী, হে ভারতবাসীগণ, তোমরা তাঁহাকে চিন্তা কর, তাহা হইলে সকল বিষয়ে মহত্ত্ব লাভ করিবে। তিনি বলিলেন—

"If this nation wants to rise it will have to come enthusiastically round his name. It does not matter who preaches Ramakrishna, whether I or you or anybody. But him I place before you and it is for you to judge, and for the good of our race, for the good of our nation, to judge now what you shall do with this great ideal of life... Within ten years of his passing away this power has encircled the globe. Judge him not through me. I am only a weak instrument. His character was so great that I or any of his disciples, if we spent hundreds of lives, could do no justice to a millionth part of what he really was."

গুরুদেবের কথা বলিতে বলিতে স্বামী বিবেকানন্দ একেবারে পাগল হইয়া যাইতেন। ধন্য গুরুভক্তি!

আজ আমরা একটু আলোচনা করিব, পরমহংসদেবের সেই বিশ্বজনীন ধর্ম্ম স্বামী কিরূপ প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১। ঈশ্বরদর্শন
(Realisation of God)

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম কথা ঈশ্বরকে দর্শন করিতে হইবে। কতকগুলি মত মুখস্থ বা শ্লোক মুখস্থ করার নাম ধর্ম্ম নয়। এই ঈশ্বর দর্শন হয় যদি ভক্ত ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে ডাকে, তা এ জন্মেই হউক অথবা জন্মান্তরেই হউক। একদিনের তাঁহার কথাবার্ত্তা আমাদের মনে পড়ে। দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়িতে কথা হইতেছিল।...

"শুধু 'তিনি আছেন' বলে বসে থাকলে কি হবে। হালদারপুকুরে বড় মাছ আছে। পুকুরের পাড়ে শুধু বসে

১ "It was your generous appreciation of him whose message to India and to the whole world, I the most unworthy of his servants, had the privilege to bear; it was your innate spiritual instinct which saw in him and his message the first murmurs of that tidal wave of spirituality which is destined at no distant future to break upon India in all its irresistible powers." *etc. : Reply to Madras Address.*

থাকলে কি মাছ পাওয়া যায়? চারা করো, চার ফেলো। ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আসবে, আর জল নড়বে। তখন আনন্দ হবে। হয়তো মাছটার খানিকটা একবার দেখা গেলো, মাছটা ধপাঙ্গ করে উঠলো। যখন দেখা গেল, আরো আনন্দ।"[২]

ঠিক এই কথা স্বামীও চিকাগোর ধর্ম্মসমিতি সমক্ষে বলিলেন—অর্থাৎ ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে লাভ করা, দর্শন করা—

"The Hindu does not want to live upon words and theories. He must see God, and that alone can destroy all doubts. So the best proof a Hindu sage gives about the soul, about God is *"I have seen the soul;* I have seen God."... The Whole struggle in their system is a constant struggle to become perfect, to become divine, to reach God and see God; and this reaching God, seeing God becoming perfect even as the Father in heaven is perfect, constitutes the religion of the Hindus."

Lecture on Hinduism (Chicago Parliament of Religions.)...

স্বামী তাঁহার রাজযোগ নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, আজকাল লোকে বিশ্বাস করে না যে ঈশ্বর দর্শন হয়; লোকে বলে হাঁ পূর্ব্বকালে ঋষিরা অথবা খ্রীষ্ট আদি মহাপুরুষগণ আত্মদর্শন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আজ কাল আর তাহা হয় না। স্বামীজী বলেন, অবশ্য হয়—মনের যোগ (concentration) অভ্যাস কর, অবশ্য হৃদয় মধ্যে তাঁহাকে পাইবে।...

স্বামী New York নামক নগরে ৯ই জানুয়ারি, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বজনীন ধর্ম্ম কাহাকে বলে *(Ideal of Universal Religion)* এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন—অর্থাৎ যে ধর্ম্মে জ্ঞানী, ভক্ত ও যোগী বা কর্ম্মী সকলেই মিলিত হইতে পারে। বক্তৃতা সমাপ্ত হইবার সময় ঈশ্বরদর্শন যে সব ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, এই কথা বলিলেন;—জ্ঞান কর্ম ভক্তি এগুলি নানা পথ, নানা উপায়, কিন্তু গন্তব্য স্থান একই অর্থাৎ ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার।...

মান্দ্রাজীদের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও ঐ কথা—হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষত্ব ঈশ্বর-দর্শন—বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য ঈশ্বর-দর্শন—

"The one idea which distinguishes the Hindu religion from every other in the world, the one idea to express which the sages almost exhaust the vocabulary of the Sanskrit language is that man must realise God.... Thus to realise God, the *Brahman* as the *Dvaitas* (dualists) says, or to become *Brahman* as the *Advaitas* say is the aim and end of the whole teachings of the *Vedas.*

Reply to Madras Address.

স্বামী ২৯এ অক্টোবর, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে বক্তৃতা করেন, বিষয়—ঈশ্বর দর্শন *(Realisation)*। এই বক্তৃতায় কঠোপনিষৎ পাঠ করিয়া নচিকেতার কথা উল্লেখ করিলেন। নচিকেতা ঈশ্বরকে দেখিতে চান, ব্রহ্মজ্ঞান চান। ধর্ম্মরাজ যম বলিলেন, বাপু যদি ঈশ্বরকে জানিতে চাও, দেখিতে চাও, তাহা হইলে ভোগ আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে, ভোগ থাকিলে যোগ হয় না, অবস্তু ভালবাসিলে বস্তু লাভ হয় না। স্বামী বলিতে লাগিলেন, আমরা বলিতে গেলে সকলেই নাস্তিক, কতকগুলি বাক্যের আড়ম্বর লইয়া ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিতেছি। যদি একবার ঈশ্বর দর্শন হয়, তাহা হইলে সত্য সত্যই বিশ্বাস কিনা করিতে পারে?

২। সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়

(Harmony of all Religions)

নরেন্দ্র[৩] ও অন্যান্য কৃতবিদ্য যুবকগণ ঠাকুর রামকৃষ্ণের সকল ধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। সকল ধর্ম্মে সত্য আছে, একথা পরমহংসদেব মুক্তকণ্ঠে তো বলিতেন। কিন্তু তিনি আরো বলিতেন, সকল ধর্ম্মই সত্য—অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্ম্ম দিয়া ঈশ্বরের পঁহুছান যাইতে পারে। এক দিন, ২৭এ অক্টোবর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে, ৺কেশবচন্দ্র সেন কোজাগর লক্ষ্মী পূজার দিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ষ্টীমারে করিয়া দেখিতে গিয়াছিলেন ও তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। পথে জাহাজের উপর অনেক বিষয়ে কথা হইল। ঠিক এই সকল কথা ১৩ই আগষ্ট অর্থাৎ কয়েক মাস পূর্ব্বে হইয়াছিল।...

কি প্রেমের ধর্ম্ম! একথা তিনি তো বার বার বলিলেন, কিন্তু কয় জন ধারণা করিতে পারিল? এক ৺কেশব সেন কতকটা পারিয়াছিলেন। আর বিবেকানন্দ। তিনিই জগতের সম্মুখে এই প্রেমের ধর্ম্ম অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া প্রচার করিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ মতুয়ার বুদ্ধি (dogmatism) করিতে বার বার নিষেধ করিয়াছিলেন। 'আমার ধর্ম্ম সত্য ও তোমার মিথ্যা'—এটীর নাম 'মতুয়ার বুদ্ধি'; এইটী যত অনর্থের মূল। স্বামী এই অনর্থের কথা চিকাগো ধর্ম্মসমিতি সমক্ষে বলিলেন। বলিলেন, খ্রীষ্টান, মুসলমান ইত্যাদি অনেকেই ধর্ম্মের নামে কত রক্তারক্তি, কাটাকাটী, মারামারি করিয়াছেন।

"Sectarianism, bigotry and its horrible descendant, fanaticism, have possessed long this beautiful earth. It has filled the earth with violence, drenched it often and often with human

২ যীশু খ্রীষ্টও তাঁর শিষ্যদের এই কথা বলিতেন। "Blessed are the pure in spirit, for they shall see God."

৩ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র—স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ব্বের নাম।

blood, destroyed civilization and sent whole nations to despair."

Lecture on Hinduism;
Chicago Parliament of Religions.

স্বামী অপর এক বক্তৃতায় 'সকল ধর্ম্ম সত্য' এ কথা বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন।...

আমেরিকায় স্বামী Brooklyn Ethical Society নামক সভায় হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। অধ্যাপক Dr. Lewis James সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানেও প্রথম কথা, সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়। স্বামী বলিলেন, একজনের ধর্ম্ম সত্য, আর সকলের ধর্ম্ম মিথ্যা, এরূপ হইতে পারে না। যে ধর্ম্ম সত্য বলিতেছ, সে একটী ব্যাধি বিশেষ বলিতে হইবে। সকলের পাঁচটী আঙ্গুল আর একজনের যদি ছয়টী হয়, বলিতে হইবে যে, তাহার একটী রোগ বিশেষ।...

স্বামী চিকাগো ধর্ম্মমণ্ডল সভা সম্মুখে যে দিন প্রথম বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হন, যে বক্তৃতা শুনিয়া চার পাঁচ সহস্র লোক মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে আসন ত্যাগ করিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন[৮], সেই বক্তৃতা মধ্যে এই সমন্বয়-বার্ত্তা ছিল। স্বামী বলিয়াছিলেন—

"I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. *We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as ture.* I belong to a religion into whose sacred language, the Sanskrit, the word 'exclusion' is untranslatable."

৩। স্বামী বিবেকানন্দ, কর্ম্মযোগ ও স্বদেশহিতৈষণা

ঠাকুর রামকৃষ্ণ সর্ব্বদা বলিতেন 'আমি ও আমার' এইটী অজ্ঞান, 'তুমি ও তোমার' এইটী জ্ঞান।...

ঠাকুরের কথা—শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসা, এর নাম মায়া। সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্ম্মের লোকদের ভালবাসা, এটী দয়া থেকে হয়—ভক্তি থেকে হয়। তবে স্বামী বিবেকানন্দ অত স্বদেশের জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন কেন?

স্বামী চিকাগো ধর্ম্মমণ্ডলে একদিন বলিয়াছিলেন, আমার গরীব স্বদেশবাসীদের জন্য এখানে অর্থ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম, ভারি কঠিন; খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীদের নিকট, যাহারা খ্রীষ্টান নয়, তাদের জন্য টাকার জোগাড় করা কঠিন।...

স্বামীর একজন প্রধান শিষ্যা শ্রীমতী ভগ্নী নিবেদিতা (Miss Margaret Noble) বলেন যে, স্বামী যখন চিকাগো নগরে বাস করেন, তখন ভারতবাসীদের কাহারও সহিত দেখা হইলে তিনি অতিশয় যত্ন করিতেন, তা তিনি যে জাতিই হউন—হিন্দু হউন, বা মুসলমান, বা পার্শী বা যিনিই হউন। তিনি নিজে কোন ভাগ্যবানের বাটীতে অতিথিরূপে থাকিতেন। সেইখানেই নিজের দেশের লোককে লইয়া যাইতেন। গৃহস্বামীরাও তাঁহাদের খুব যত্ন করিতেন; আর তাঁহারা বেশ জানিতেন যে, তাঁহাদের যত্ন যদি না করেন, তাহা হইলে স্বামীজী নিশ্চয়ই তাঁহাদের গৃহত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবেন।...

দেশের লোকের কিরূপে দারিদ্র্য-দুঃখ বিমোচন হয়, তাহাদের কিসে সৎশিক্ষা হয়, কিসে তাহাদের ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়, এই জন্য স্বামী সর্ব্বদা ভাবিতেন।

কিন্তু তিনি দেশের লোকের জন্য যেরূপ দুঃখিত ছিলেন, আফ্রিকাবাসী নিগ্রোর জন্যও সেইরূপ দুঃখিত থাকিতেন। শ্রীমতী নিবেদিতা বলেন, স্বামী যখন দক্ষিণ United States মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, কেহ কেহ তাঁহাকে আফ্রিকাবাসী (Coloured man) মনে করিয়া গৃহ হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা শুনিলেন, ইনি তাহা নহেন, ইনি হিন্দু সন্ন্যাসী ও বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ, তখন তাঁহারাই অতি সমাদরে তাঁহাকে লইয়া গিয়া সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'স্বামী, যখন আমরা তোমাকে বলিলাম তুমি কি আফ্রিকাবাসী? তখন তুমি কিছু না বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলে কেন?' স্বামী বলিলেন, 'কেন আফ্রিকাবাসী নিগ্রো কি আমার ভাই নয়?'

অর্থাৎ স্বদেশবাসী কি জগৎ ছাড়া? নিগ্রোকেও যেমন ভালবাসা, স্বদেশবাসীকেও সেইরূপ ভালবাসা, তবে তাহাদের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকা, তাই তাদের সেবা আগে। এরি নাম অনাসক্ত হয়ে সেবা। এরি নাম কর্ম্মযোগ। সকলেই কর্ম্ম করে, কিন্তু কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। সব ত্যাগ করে ভগবানের অনেক দিন ধরিয়া নির্জ্জনে ধ্যান চিন্তা না করিলে এরূপ স্বদেশের উপকার করা যায় না। " 'আমার দেশ' বলিয়া নয়, তাহা হইলে তো মায়া হইল; 'তোমার (ঈশ্বরের) এরা' তাই এদের সেবা করিব। তোমার আদেশ, তাই দেশের সেবা করিব; 'তোমারই এ কাজ' আমি তোমার দাস, তাই এই ব্রতপালন করিতেছি, সিদ্ধি হউক অসিদ্ধি হউক, সে তুমি জান; আমার নামের জন্য নয়, এতে তোমার মহিমা প্রকাশ হইবে।"

যথার্থ স্বদেশ-হিতৈষিতা (Ideal Patriotism) কাহাকে বলে, লোকশিক্ষার জন্য স্বামী তাই এই দুরূহ ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাহাদের গৃহ পরিজন আছে, কখন ভগবানের জন্য যাহারা ব্যাকুল হয় নাই, যাহারা 'ত্যাগ' এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করে, যাহাদের মন সর্ব্বদা কামিনী কাঞ্চন ও এই পৃথিবীর মান সম্ভ্রমের দিকে, যাহারা ঈশ্বর দর্শন জীবনের উদ্দেশ্য শুনিয়া অবাক্ হয়, তাহারা স্বদেশহিতৈষিতার এই মহান উচ্চ আদর্শ কিরূপে গ্রহণ

8 "When Vivekananda addressed the audience as sisters and brothers of America, there arose a peal of applause that lasted for several minutes." *Dr. Barrows's Report.* "But eloquent as were many of the brief speeches no one expressed so well the spirit of the Parliament of religions and its limitations as the Hindu monk.... He is an orator by Divine right." *New York Critique.*

করিবে। স্বামী স্বদেশের জন্য কাঁদিতেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা এটীও মনে রাখিতেন যে, এই অনিত্য সংসারে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। বিলাত হইতে ফিরিবার পর হিমাচল দর্শন করিতে আলমোরায় গিয়াছিলেন। আলমোরাবাসীরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বোধে পূজা করিতে লাগিলেন। স্বামী নগাধিরাজ দেবতাত্মা হিমগিরির অত্যুচ্চ শৃঙ্গাবলি সন্দর্শন করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া রহিলেন। বলিলেন, আজ এই পবিত্র উত্তরাখণ্ডে সেই পবিত্র তপোভূমি দেখিতেছি, যেখানে ঋষিগণ সর্ব্বত্যাগ করিয়া, এই সংসারের কোলাহল হইতে প্রস্থান করিয়া নিশিদিন ঈশ্বর চিন্তা করিতেন। তাঁহাদেরই শ্রীমুখ হইতে বেদমন্ত্র বিনির্গত হইয়াছিল। হায়! কবে আমার সে দিন হইবে! আমার কতকগুলি কাজ করিবার ইচ্ছা আছে বটে, কিন্তু এই পবিত্র ভূমিতে অনেক দিন পরে আবার আসিবার পর সকল বাসনা এককালে অন্তর্হিত হইতেছে, ইচ্ছা হয় বিরলে বসিয়া শেষ কয় দিন হরিপাদপদ্ম চিন্তায় গভীর সমাধি মধ্যে নিমগ্ন হয়ে শেষের কয় দিন কাটাইয়া যাই।...

হিমালয় দেখিলে আর কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা হয় না—মনে এক চিন্তার উদয় হয়—কর্ম্ম-সন্ন্যাস।

"As peak after peak of this Father of mountains began to appear before my sight, all those propensities to work, that ferment that had been going on in my brain for years, seemed to quiet down, and the mind reverted to that one eternal theme which the Himalayas always teach us, the one theme which is reverberating in the very atmosphere of the place, the one theme that I hear in the rushing whirlpools of its rivers—*Renunciation.*"

"এই কর্ম্ম-সন্ন্যাস, এই ত্যাগ করিতে পারিলে মানুষ অভয় হয়—আর সকল বস্তুই ভয়াবহ—

"সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।"...

"এখানে আসিলে আর সাম্প্রদায়িক ভাব থাকে না, ধর্ম্ম লইয়া ঝগড়া বিবাদ কোথায় পালাইয়া যায়[৫] কেবল একটী মহান সত্যের ধারণা হয়—ঈশ্বর দর্শনই সত্য, আর যা কিছু জলের ফেণার ন্যায়—ভগবানের পূজাই একমাত্র জীবনে প্রয়োজন, আর সমস্তই মিথ্যা।

৫ "Strong souls will be attracted to this Father of mountains in time to come, when all this fight between sects and all those differences in dogmas will not be remembered anymore, and quarrels between your religion and my religion will have vanished altogether, when mankind will understand that *there is but one eternal religion and that is the perception of the Divine within, and the rest is mere froth!* Such ardent souls will come here knowing that the world is but vanity of vanities, knowing that *every thing is useless except the worship of the Lord and the Lord alone.*"
—*Speech at Almora.*

"ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু! অথবা মধুকর পদ্মের উপর বসিতে পাইলে আর ভন্ ভন্ করে না।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া যেখানে ইচ্ছা যাও। স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীর গৃহ, ধন, পরিজন, আত্মীয়, কুটুম্ব, স্বদেশ বিদেশ আবার কি? যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন, ঈশ্বরকে না জানলে এসব ধন, বিদ্যা কি হবে? হে মৈত্রেয়ী, আগে তাঁকে জানো, তার পর অন্য কথা! স্বামী এইটী জগৎকে দেখাইলেন। যেন বলিলেন, হে জগৎবাসীগণ, আগে বিষয় ত্যাগ করে নির্জ্জনে ভগবানের আরাধনা কর, তার পর যা কিছু কর কিছুতেই দোষ নাই, স্বদেশের সেবা কর, ইচ্ছা হয় কুটুম্ব পালন কর, কিছুতেই দোষ নাই, কেন না তুমি এখন বুঝিতেছ যে সর্ব্বভূতে তিনি আছেন—তিনি ছাড়া কিছুই নাই—সংসার, স্বদেশ কিছুই তিনি ছাড়া নয়। ভগবানের সাক্ষাৎকারের পর দেখিবে, তিনিই পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন। বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, রাম, তুমি যে সংসার ত্যাগ করিবে বলিতেছ, আমার সঙ্গে বিচার কর; যদি ঈশ্বর এ সংসার ছাড়া হন, তবে ত্যাগ কোরো।[৬] রামচন্দ্র আত্মার সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, তাই চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, ছুরীর ব্যবহার জেনে ছুরী হাতে কর। স্বামী বিবেকানন্দ জগৎকে, যথার্থ কর্ম্মযোগী কাহাকে বলে, দেখাইলেন।...

ঈশ্বর দর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য; আর এ দেশের ঐ এক কথা। আগে ঐ কথা তার পর অন্য কথা! 'রাজনীতি' (Politics) প্রথম হইতে বলিলে চলিবে না। আগে অনন্যমন হইয়া ভগবানের ধ্যান চিন্তা কর, হৃদয় মধ্যে তাঁহার অপরূপ রূপ দর্শন কর। তাঁহাকে লাভ করিয়া তখন 'স্বদেশের' মঙ্গলসাধন করিতে পারিবে; কেন না, তখন মন অনাসক্ত; 'আমার দেশ' বলিয়া সেবা নয়—সর্ব্বভূতে ভগবান্ আছেন বলিয়া তাঁহারই সেবা। তখন স্বদেশ বিদেশ ভেদবুদ্ধি থাকিবে না। তখন কিসে জীবের মঙ্গল সাধন হয়, ঠিক বুঝিতে পারা যাইবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, দাবাবড়ে যারা খেলে, তারা ঠিক চাল বুঝতে তত পারে না; যারা উদাসীন, কেবল বসে খেলা দেখে, তারা উপর চাল বেশ বলে দিতে পারে। কেননা, উদাসীনের নিজের কোন দরকার নাই, রাগদ্বেষবিমুক্ত। উদাসীন অনাসক্ত জীবনমুক্ত মহাপুরুষ নির্জ্জনে অনেক দিন সাধন করিয়া যাহা লাভ করিয়া বসিয়া আছেন, তাহার কাছে আর কিছুই ভাল লাগে না—

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।।

হিন্দুর রাজনীতি সমাজনীতি তাই সমস্তই ধর্মশাস্ত্র। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ইত্যাদি মহাপুরুষ এই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রণেতা। তাঁহাদের কিছুরই প্রয়োজন নাই। তথাপি ভগবান্

৬ যোগবাশিষ্ঠ

কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া গৃহস্থের জন্য তাঁহারা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁরা উদাসীন হয়ে দাবাবড়ের চাল বলে দিচ্ছেন, তাই দেশ কাল পাত্র বিশেষে তাঁহাদের কথায় একটী ভুল হইবার যো নাই।

বিবেকানন্দ কর্ম্মযোগী। অনাসক্ত হইয়া পরোপকারব্রত রূপ কর্ম্ম করিয়াছেন। তাই কর্ম্মীদের সম্বন্ধে তাঁহার কথার এতো মূল্য। অনাসক্ত হইয়া এই দেশের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, যেমন পূর্ব্বতন মহাপুরুষগণ জীবের মঙ্গলার্থ বরাবর করিয়া গিয়াছেন। এই নিষ্কাম ধর্ম্ম পালনার্থ যেন আমরাও তাঁহার পদানুসরণ করিতে পারি। কিন্তু এটী কি কঠিন ব্যাপার! প্রথমে হরিপাদপদ্ম লাভ করিতে হইবে!—তজ্জন্য বিবেকানন্দের ন্যায় ত্যাগ ও তপস্যা করিতে হইবে! তবে এই অধিকার হইতে পারে।

ধন্য ত্যাগী মহাপুরুষ! তুমি যথার্থই তোমার গুরুদেবের পদানুসরণ করিয়াছ! তাঁর মহামন্ত্র—আগে ঈশ্বর লাভ, তাহার পর অন্য কথা, তুমিই সাধন করিয়াছ! তুমিই বুঝিয়াছিলে, ভগবান্‌কে ছাড়িয়া দিলে, এ সংসার যথার্থই স্বপ্নবৎ, ভেল্কী বাজি; তাই সর্ব্ব ত্যাগ করিয়া তাঁর সাধন আগে করিয়াছিলে। যখন দেখিলে, সর্ব্ব বস্তুর প্রাণ তিনি, যখন দেখিলে তিনি ছাড়া কিছুই নাই, তখন আবার এই সংসারে মনোনিবেশ করিলে; তখন হে মহাযোগিন্, সর্ব্বভূতস্থ সেই হরির সেবার জন্য আবার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলে; তখন তোমার গভীর অপার প্রেমের অধিকারী সকলেই হইল—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বিদেশী, স্বদেশবাসী, ধনী, দরিদ্র, নর, নারী, সকলকেই তুমি প্রেমালিঙ্গন দান করিয়াছ! তখন তীব্র বৈরাগ্যবশতঃ যে গর্ভধারিণী মাতৃদেবীকেও ত্যাগ করিয়া চক্ষের জলে ভাসাইয়া গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলে, তখন সেই মাকে আবার দর্শন দিলে ও বাৎসল্য স্বীকার করিয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলে! তোমার গুরুভাইরা তোমার অদ্ভুত স্নেহ ও তোমার সর্ব্বভূতে সেই অপার প্রেম স্মরণ করিয়া আজ তোমার বিরহে শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা তোমার সেই পঞ্চম বর্ষীয় প্রেমানুরঞ্জিত বালকমূর্ত্তি, তোমার সদানন্দ রূপ আজ না দেখিতে পাইয়া ভগ্নহৃদয় লইয়া বাস করিতেছেন; তাঁহারা নিশিদিন বিরলে বসিয়া তোমার জন্য মণিহারা ফণীর ন্যায়, অথবা শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে রাখালদিগের ন্যায় আকুল হইয়া কাঁদিতেছেন,—তাঁহারা দিন গণনা করিতেছেন, কবে পিতা ও তোমার সহিত পিতার পরমধামে তাঁহাদের সম্মিলন হইবে! তুমি পিতার কার্য্য সাঙ্গ করিয়া আজ তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া আছ ও তোমার গন্ধর্ব্ববিনিন্দিত অতুলনীয় কণ্ঠে তাঁর নাম গুণকীর্ত্তন করিতেছ! এসো, একবার আসিয়া তোমার প্রাণের ভাইদের সান্ত্বনা কর! আর যাহাদিগকে গুরুদেবের পথ প্রদর্শন করাইয়া, তাঁহার পথে তুলিয়া লইয়া, কাছে রাখিয়া অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলে, যাহাদের একটু অসুখ হইলে চিন্তিত হইতে ও শতবার খপর লইতে, তাহারা তোমাকে অনেক দিন দেখে নাই; তাহারা মাতৃহীন বালকের ন্যায় দীনহীন হইয়া রহিয়াছে; এসো, তাহাদের ও তোমার ভাইদের সান্ত্বনা করিবে! আর সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গার তীরে যে তপোবনে মহাপূজার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছ; হরিময় জগতের সেবার্থ অশ্রুতপূর্ব্ব পরিশ্রম সহকারে কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম সাঙ্গ করণান্তর বিশ্রামার্থ যে তপোবনে ফিরিয়া আসিয়াছিলে; যে তপোবনে, গভীরতত্ত্বচিন্তা ও ধ্যান সমাধি হইতে মন নামাইবার জন্য মাঝে মাঝে বালকের ন্যায় তরু লতা পশু পক্ষী লইয়া ক্রীড়া করিতে ও তাহাদের সন্তান বোধে লালন পালন করিতে; যে তপোবনে সাক্ষাৎ মহাকালীর সম্মুখে তাঁহার সেবায় মহাসমাধিমগ্ন তোমার মহামন্ত্রপূত দেব-দেহ প্রজ্বলিত হোমাগ্নি মধ্যে আহুতি প্রদান করিয়াছ,—আজ সেই তপোবনে তোমার ভাইরা বিষণ্ণ বদনে সাশ্রুনয়নে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতঃ দিন যাপন করিতেছেন; আজ সেই তপোবনে তোমার লালিত পশুপক্ষী পর্য্যন্ত কাতর, তুমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার দিবে বলিয়া ও তাহাদের লইয়া আনন্দ করিবে বলিয়া, তুমি কখন আসিবে বলিয়া, তাহারা উর্দ্ধগ্রীব হইয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকে; অতএব এসো, ভক্ত চূড়ামণি, তোমার গভীর স্নেহের জিনিসগুলিকে একবার দেখিয়া যাও, একবার আসিয়া তাহাদের হৃদয়ের গভীর বেদনা দূর কর!!

৪। ঈশ্বর সাকার না নিরাকার

...স্বামী বিবেকানন্দ এই সাকার পূজার অর্থ আমেরিকাতে প্রথমেই বুঝাইলেন। বলিলেন, ভারতবর্ষে পুতুল পূজা হয় না।

"At the very outset I may tell you there is no polytheism in India. In every temple, if one stands by and listens he will find the worshippers applying all the attributes of *God* to these *Images.*"

Lecture on Hinduism.

ঈশ্বরকে ভাবিতে গেলেই সাকার চিন্তা বই আর কিছু আসিতে পারে না, একথা মনোবিজ্ঞান (Psycho'ogy) সাহায্যে স্বামী বুঝাইতে লাগিলেন। বলিলেন—

"Why does a Christian go to Church? Why is the cross holy? Why is the face turned towards the sky in prayer? Why are there so many images in the Catholic church? Why are there so many images *in the minds* of Protestants when they pray? My brethren, we can no more think about *anything* without a material image than we can live without breathing. Omnipresence to almost the whole world means nothing. Has God superficial area? If not, then when we repeat the word we think of the extended earth; that is all."

—*Lecture on Hinduism* (Chicago)

স্বামীজীও বলিলেন, 'অধিকারী ভেদে সাকার পূজা ও নিরাকার পূজা। সাকার পূজা কুসংস্কার নহে—মিথ্যা নহে, নিম্নস্থানীয় সত্য'।...

সকলের পক্ষে এক নিয়ম হইতে পারে না। ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনি নানা ভক্তের নিকট নানা ভাবে প্রকট হইতেছেন। হিন্দু এইটী বুঝেন।...

৫। পাপবাদ

স্বামীজীর গুরুদেব বলিতেন, ঈশ্বরের নাম লইলে ও আন্তরিক তাঁহার চিন্তা করিলে পাপ পালিয়ে যায়। যেমন তুলার পাহাড় অগ্নিস্পর্শে একক্ষণে পুড়িয়া যায়; অথবা যেমন বৃক্ষে পাখী অনেক বসিয়াছে, হাততালি দিলে সব উড়ে যায়। একদিন কেশববাবুর সহিত কথা হইতেছিল—

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি)। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। আমি মুক্ত পুরুষ, সংসারেই থাকি, আর অরণ্যেই থাকি, আমার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান; রাজাধিরাজের ছেলে; আমায় আবার বাঁধে কে? যদি সাপে কামড়ায় 'বিষ নাই' 'বিষ নাই' জোর করে বল্লে বিষ ছেড়ে যায়? তেমনি 'আমি বদ্ধ নই' 'আমি বদ্ধ নই' 'আমি মুক্ত' এই কথাটী রোক করে বলতে বলতে তাই হয়ে যায়। মুক্তই হয়ে যায়।

"খ্রীষ্টানদের একখানা বই (Bible) একজন দিলে। আমি পড়ে শুনাতে বললাম। তাতে কেবল পাপ আর পাপ!

"তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেও কেবল 'পাপ' আর 'পাপ'। যে ব্যক্তি 'আমি বদ্ধ' 'আমি বদ্ধ' বারবার বলে, সে শ্যালা বদ্ধই হয়ে যায়। যে রাতদিন 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' এই করে সে তাই হয়ে যায়!

"ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই—কি! আমি তাঁর নাম করেছি, আমার এখনও পাপ থাকবে! আমার আবার বন্ধন কি, পাপ কি?...

"একবার বলো যে অন্যায় কর্ম্ম যা করেছি তা আর করবো না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর!"

স্বামীজী খ্রীষ্টানদের এই পাপবাদ সম্বন্ধে বলিলেন, পাপী কি! তোমরা অমৃতের অধিকারী, Sons of Immortal Bliss, তোমাদের ধর্ম্মযাজকেরা রাত দিন নরকাগ্নির কথা বলে, সে কথা শুনিও না।...

আমেরিকায় Hartford নামক স্থানে স্বামী বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এখানকার American Consul Paterson সাহেব তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন ও সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। স্বামী আবার খ্রীষ্টানদের পাপবাদ সম্বন্ধে বলিলেন, যদি ঘর অন্ধকার হয়, তাহলে 'অন্ধকার' 'অন্ধকার' 'অন্ধকার' করিলে কি হইবে? আলো জ্বালো তবে তো হবে।...

৬। 'কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ'—সন্ন্যাস

...বিবেকানন্দ কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী, তাই তাঁর ঈশ্বর বিষয়ে লোক শিক্ষা দিবার অধিকার। বিবেকানন্দ বেদান্তে ও ইংরাজি ভাষা ও দর্শনাদিতে পণ্ডিতাগ্রগণ্য, তাই কি তাঁর মাহাত্ম্য? বিবেকানন্দ অসাধারণ বাগ্মী, তাই কি তাঁর মাহাত্ম্য? এর উত্তর ঠাকুর রামকৃষ্ণ দিবেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ভক্তদের সম্বোধন করিয়া পরমহংসদেব ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

"এই ছেলেটীকে[৭] দেখছো, এখানে এক রকম। দুরন্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে, যেন জুজুটী; আবার চাঁদনীতে যখন খেলে, তখন আর এক মূর্ত্তি। এরা নিত্য সিদ্ধের থাক। এরা সংসারে কখন বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হইলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। এরা সংসারে আসে জীব শিক্ষার জন্য। এদের সংসারের বস্তু কিছু ভাল লাগে না—এরা কামিনী কাঞ্চনে কখন আসক্ত হয় না।

"বেদে আছে হোমাপাখীর কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখী থাকে। সেই আকাশেতেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লেই ডিমটা পড়তে থাকে। ডিম পড়তে পড়তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে তার চোখ ফোটে আর ডানা বেরোয়। চোখ ফুটলেই দেখতে পায় যে, সে পড়ে যাবে, আর মাটীতে লাগলে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে পাখী মার দিকে একেবারে চোঁচা দৌড় দেয়, আর উচুতে উঠে যায়।"

বিবেকানন্দ এই 'হোমাপাখী'—তাঁর জীবনের এক লক্ষ্য মার কাছে চোঁচা দৌড় দিয়ে উঠে যাওয়া—গায়ে মাটী না ঠেকতে ঠেকতে অর্থাৎ সংসার স্পর্শ না করতে করতে ভগবানের পথে অগ্রসর হওয়া।...

বিবেকানন্দ শুধু পণ্ডিত নন,—তিনি সাধু মহাপুরুষ। শুধু পাণ্ডিত্যের জন্য ইংরেজ ও আমেরিকাবাসীগণ তাঁকে ভৃত্যের ন্যায় সন্তানের ন্যায়, সেবা করেন নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, ইনি আর এক জাতীয় লোক। লোকে সম্মান, টাকা, ইন্দ্রিয়সুখ, সন্ন্যাস, পাণ্ডিত্য লইয়া রহিয়াছে; ইঁহার এক লক্ষ্য ঈশ্বর লাভ।[৮] আমেরিকায় তাঁহার প্রলোভন কম হয় নাই। একে জগৎব্যাপী প্রতিষ্ঠা। তাহাতে সর্ব্বদাই পরমাসুন্দরী উচ্চ বংশীয়া সুশিক্ষিতা মহিলাগণ সর্ব্বদা আসিয়া আলাপ ও সেবা করিতেন। তাঁহার এত মোহিনী শক্তি যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে বিবাহ করিতে

---

৭ স্বামী বিবেকানন্দ তখন General Assembly কলেজে পড়েন। বয়স সবে ১৯।২০; তাঁহার বাড়ী তখন কলেজের কাছে সিমুলিয়ায়। পিতার নাম ৺বিশ্বনাথ দত্ত, হাইকোর্টের আটর্নি। বালকের নাম নরেন্দ্র। কলেজে থাকিয়া বি, এ, পাশ করেছিলেন। তখন Hastie সাহেব প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার মা আছেন ও ভাই ভগ্নীরা আছেন।

স্বামীর জন্মদিন সোমবার পৌষ সংক্রান্তি ১২৬৯ সাল প্রাতে ৬।৩৩।৩৩ সময়, সূর্য্যোদয়ের ৬ মিনিট পূর্ব্বে, বয়স ৩৯ বৎসর ৫ মাস ২৪ দিন হইয়াছিল।

৮ "Truth Never comes where lust and fame and greed
Of gain reside. No man who thinks of woman
As his wife can ever perfect be?
Nor he who owns however little—
So give these up, *Sanyasin* bold say
"Om tat sat, om!"

Song of the Sanyasin by Vivekananda.

চাহিতেন। একজন অতি ধনাঢ্যের কন্যা (heiress) সত্য সত্য একদিন আসিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "স্বামী! আমার সর্ব্বস্ব ও আমাকে আপনাতে সমর্পণ করিলাম।" স্বামী তদুত্তরে বলিলেন, "ভদ্রে! আমি সন্ন্যাসী, আমার বিবাহ করিতে নাই। সকল স্ত্রীলোক আমার মাতৃস্বরূপা।"...

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত

কলিকাতা

৭। স্বামী ও কর্ম্মযোগ; নিষ্কাম কর্ম্ম।

পরমহংসদেব বলিতেন, "কর্ম্ম সকলেরই করিতে হয়। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম, এ তিনটী ঈশ্বরের কাছে পৌছিবার পথ। কর্ম্ম করিতে হইলে, অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে হয়। 'আমি কর্ত্তা' এটী অজ্ঞান। আমার ধন জন, কার্য্য কলাপ, এটীও অজ্ঞান। আপনাকে অকর্ত্তা জেনে ঈশ্বরকে ফল সমর্পণ করে কাজ করিতে হয়। গীতায় যে আছে কর্ম্মযোগ, সে এই। তবে কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। অনেক দিন নির্জ্জনে ঈশ্বরের সাধন না করিলে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করা যায় না। কোন দিক থেকে আসক্তি আসিয়া পড়ে, ইহা জানিতে পারা যায় না। মনে করিতেছি, আমি অনাসক্ত হইয়া ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করিয়া দানাদি কার্য্য করিতেছি। কিন্তু বাস্তবিক আমি লোকমান্য হইবার জন্য করিতেছি, নিজেই বুঝিতে পারিতেছি না। যে ব্যক্তি গৃহস্থ, যার গৃহ পরিজন আত্মীয় কুটুম্ব আমার বলিবার আছে, তাহাকে দেখিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম ও অনাসক্তি, পরার্থে স্বার্থত্যাগ, এ সকল শিক্ষা করা বড় কঠিন। কিন্তু সর্ব্বব্যাপী কামিনীকাঞ্চনত্যাগী সাধু মহাপুরুষ যদি নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া দেখান, তাহা হইলে লোকে সহজে বুঝিতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ কামিনীকাঞ্চনত্যাগী। তিনি নির্জ্জনে গুরুর কৃপায় অনেক দিন সাধন করিয়াছিলেন। তিনি যথার্থ কর্ম্মযোগের অধিকারী। তবে তিনি সন্ন্যাসী, মনে করিলেই ঋষিদের মত অথবা তাঁহার গুরুদেব পরমহংসদেবের মত কেবল জ্ঞান ভক্তি লইয়া থাকিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার জীবন কেবল ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য হয় নাই। সংসারীরা যে সকল বস্তু গ্রহণ করে, অনাসক্ত হইয়া তাহাদের কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, স্বামীজী তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি অর্থ ও মান, এ সকলকে সন্ন্যাসীর ন্যায় কাকবিষ্ঠা জ্ঞান করিতেন বটে, অর্থাৎ নিজে ভোগ করিতেন না; কিন্তু তাহাদিগকে পরার্থে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা নিজে কাজ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। যে অর্থ বিলাত ও আমেরিকার বন্ধুবর্গ হইতে তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত অর্থ জীবের মঙ্গল কল্পে ব্যয় করিয়াছেন। স্থানে স্থানে মঠ স্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতার নিকটস্থ বেলুড়ে, আলমোরার নিকটস্থ মায়াবতীতে, ৺কাশীধামে, মান্দ্রাজে মঠ স্থাপন করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে নানা স্থানে—দিনাজপুর, বৈদ্যনাথ, কিষেণগড়, দক্ষিণেশ্বর ও অন্যান্য স্থানে—সেবা করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের সময় পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকবালিকাগণকে অনাথাশ্রম করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। রাজপুতনার অন্তর্গত কিষেণগড় নামক স্থানে অনাথাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন, এ আশ্রমে ইংরেজ Commissioner নিজে আসিয়া অনেক উৎসাহ প্রদান ও সহায়তা করিয়াছিলেন। মুরসিদাবাদের নিকট ভাবদা গ্রামে এখনও অনাথাশ্রম চলিতেছে। স্বামী হরিদ্বার নিকটস্থ কন্খলে পীড়িত সাধুদিগের জন্য সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। প্লেগের সময় প্লেগব্যাধি আক্রান্ত রোগীদিগকে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া সেবা সুশ্রুষা করাইয়াছেন। দরিদ্র কাঙ্গালের জন্য একাকী বসিয়া কাঁদিতেন! আর বন্ধুদের সমক্ষে বলিতেন, 'হায়! এদের এত কষ্ট, ঈশ্বরকে চিন্তা করিবার অবসর পর্য্যন্ত নাই!'

সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত।

সূচী।

কলিকাতা;

তিনি সন্ন্যাসী। তাঁহার এ সকল কর্ম্মের কি প্রয়োজন? কেবল লোকশিক্ষার জন্য? সংসারী! লোককে শিক্ষা দিবার জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে এ সকল কর্ম্ম করাইলেন। এখন সংসারী লোকে শিখিবে যে, যদি তাহারাও কিছু দিন নির্জ্জনে ঈশ্বরের সাধন করিয়া ভক্তি লাভ করে, তাহারাও স্বামীজীর ন্যায় নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে পারিবে, যথার্থ অনাসক্ত হইয়া দানাদি সৎকার্য্য করিতে পারিবে। স্বামীজীর গুরুদেব ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, "হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গলে আঠা লাগবে না।" অর্থাৎ নির্জ্জনে সাধনের পর ভক্তি লাভ করিয়া পৃথিবীর কার্য্যে হাত দিলে যথার্থ নির্লিপ্ত ভাবে কাজ করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন অনুধ্যান করিলে, নির্জ্জনে সাধন কাহাকে বলে একটু আভাস পাওয়া যায়। বিবেকানন্দের এ সকল কর্ম্ম কেবল লোকশিক্ষার জন্য।

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা
জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্
কর্ত্তুমর্হসি।।

এই গীতোক্ত কর্ম্মযোগ অতিশয় কঠিন। তাই সাধুরা জ্ঞান ও ভক্তি পথ অবলম্বন করিয়া সংসার কোলাহল ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে ঈশ্বর সাধন করেন। তবে বিবেকানন্দের ন্যায় উত্তম অধিকারী বীরপুরুষ কেবল এই কর্ম্মযোগের অধিকারী। ভগবানকে অনুভব করিতেছেন, অথচ লোকশিক্ষার জন্য সংসারে কর্ম্ম করিতেছেন, এরূপ মহাপুরুষ পৃথিবীতে কয়টী? ঈশ্বর-প্রেমে মাতোয়ারা, কামিনীকাঞ্চনের দাগ একটীও লাগে নাই, অথচ জীবের সেবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন, এরূপ আচার্য্য কয়টী দেখা যায়?...

তিনি যে এরূপ কর্ম্ম করিতে পারিতেন, সে কেবল তাঁর তপস্যার গুণে। তিনি কিরূপ ঈশ্বর চিন্তা করিয়া বেলুড় মঠে দিন কাটাইতেন, তাঁহার মানবলীলা সম্বরণ করিবার দিনের ঘটনাগুলি স্মরণ করিলে যথেষ্ট হইবে।...

ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দকে শিষ্যদের মধ্যে প্রধান আসন দিয়া গিয়াছেন। স্বামীও তাঁহার প্রধান শিষ্যের কাজ করিয়াছেন। তিনি সমগ্র জগৎ সমক্ষে ঠাকুর রামকৃষ্ণের বিজয় ঘোষণা করিয়াছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান সনাতন হিন্দুধর্ম্ম। এই হিন্দুধর্ম্মের বিজয় পতাকা স্বামী বিবেকানন্দ দেশ বিদেশে স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন।

এখন ত্রিতাপে তাপিত নরনারী মাত্রেই ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে আসিতে পারিবে ও শান্তি লাভ করিবে।❑

"আমি কখনো চল্লিশ পেরুব না"*

স্বামী চেতনানন্দ

জীবনসায়াহ্নে স্বামীজী বিদায়সঙ্গীত গাইতে শুরু করলেন। ১৮৯৭ সালে স্বামীজী পাশ্চাত্যে বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণের মহান বাণী প্রচার করে ভারতে ফিরলেন। তিনবছর ধরে পাশ্চাত্যবাসীদের 'কালরাত্রি মোহরাত্রি' ভাঙিয়ে নিজের শরীরটাকে ভেঙে ফেললেন। আমেরিকায় থাকতেই তিনি গাইতে শুরু করলেন ঃ "My play is done; O Mother, break my chains and make me free." ১৮৯৮ সালের ৪ জুলাই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে কাশ্মীরে লিখলেন সেই বিখ্যাত কবিতা 'To the Fourth of July'। কে জানে তখনি তিনি দিনটি নিজের মহাপ্রয়াণের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন কিনা। এরপর গেলেন অমরনাথ দর্শনে। সেখানে দেবাদিদেব মহাদেব তাঁকে দিলেন 'ইচ্ছামৃত্যু' বর। তারপর 'মৃত্যুরূপা মাতা' কবিতাটি লিখে আবৃত্তি করতে করতে বললেন ঃ "এর প্রত্যেকটা কথা সত্য। আর আমি তা কাজেও প্রমাণ করেছি—দেখ, আমি মৃত্যুকে বরণ করেছি।"[১]

শাস্ত্র বলেন—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ 'অতিমৃত্যুমেতি', 'ন বিভেতি কদাচন', 'ন বিভেতি কুতশ্চন'। অর্থাৎ তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, কখনো কাউকে ভয় করেন না। কাশ্মীরে একদিন অসুখের পর দু-খণ্ড পাথর তুলে স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেন ঃ "যখনি মৃত্যু আমার কাছে আসে, আমার সব দুর্বলতা চলে যায়। তখন আমার ভয় বা সন্দেহ বা বাহ্যজগতের চিন্তা—এসব কিছুই থাকে না। আমি শুধু নিজেকে মৃত্যুর জন্য তৈরি করতে থাকি। তখন আমি এইরকম শক্ত হয়ে যাই (তিনি দু-হাতে পাথর দুখানিকে পরস্পর ঠুকলেন), কারণ আমি শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করেছি।"[২]

১৮৯৯ সালে স্বামীজী আবার গেলেন পাশ্চাত্যে। একদিন নিউ ইয়র্কে অভেদানন্দজীকে বললেন ঃ "দেখ ভাই, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে—বড় জোর আর তিন-চার বছর বাঁচব।" অভেদানন্দ আপত্তি জানালেন ঃ "অমন কথা বলতে নাই, স্বামীজী। তোমার তো দ্রুত স্বাস্থ্যোন্নতি হচ্ছে। তাছাড়া আমাদের যে এখনো অনেক কাজ বাকি—এ তো সবে শুরু।" স্বামীজী উত্তরে বললেন ঃ "আমার কথা বুঝতে পারছ না ভাই! আমার অনুভব হচ্ছে, আমি যেন বেজায় বেড়ে যাচ্ছি। আমার অন্তর এত বেড়ে যাচ্ছে যে, সময়ে সময়ে মনে হয়, এশরীরে তাকে এঁটে রাখা সম্ভব হবে না। আমি প্রায় ফেটে যাবার মতো হয়েছি। এই হাড়মাংসের খাঁচা আমাকে নিশ্চয়ই আর বেশিদিন ধরে রাখতে পারবে না।"[৩]

এই সময়ে স্বামীজীর কথাবার্তা ও চিঠি পড়লে বোঝা যায়, তিনি মুক্ত বিহঙ্গমের মতো দু-ডানায় ভর করে অনন্তের পানে ওড়ার চেষ্টা করছিলেন। ১৪ অক্টোবর ১৯০০ স্বামীজী প্যারিস থেকে ক্রিস্টিনকে লেখেন ঃ "গাছের শাখায় ঘুমন্ত পাখি রাত পোহালে যেমন জেগে উঠে গান করে, আর উড়ে যায় গভীর নীলাকাশে—ঠিক তেমনিভাবেই আমার জীবনের শেষ।... আমি পেয়ে গিয়েছি আমার লক্ষ্যকে। আমি যে-মুক্তার সন্ধানে জীবন-সমুদ্রে ডুব দিয়েছিলাম, তা তুলে আনতে পেরেছি।"

এর কয়েক মাস আগে ১৮ এপ্রিল ১৯০০ স্বামীজী মিস ম্যাকলাউডকে লেখেন ঃ "এখন পুঁটলি-পাঁটলা বেঁধে সেই মহান মুক্তিদাতার অপেক্ষায় যাত্রা করে বসে আছি। 'অব শিব পার করো মেরা নেইয়া।'... বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে! জীবনের প্রতি আকর্ষণও কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে। রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সে গম্ভীর আহ্বান! যাই, প্রভু যাই! ঐ তিনি বলছেন, 'মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক, তুই আমার পিছু পিছু চলে আয়।' যাই, প্রভু যাই।"

মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞের কাছে জীবন ও মৃত্যু মায়ার খেলামাত্র। আত্মার জন্মও নেই, মরণও নেই। দেহের জন্ম ও মরণ ব্রহ্মজ্ঞকে ব্যথা বা শোক দিতে পারে না। মৃত্যুকে কি করে ভালবাসা যায় স্বামীজী তা শেখাতে চেয়েছিলেন 'কাউন্ট অফ রিশিলু'কে। পরবর্তী কালে কাউন্ট তাঁর স্মৃতিচারণ করেন এবং শচীন্দ্র মজুমদার (পরবর্তী কালে স্বামী ব্রহ্মময়ানন্দ) তাঁর গীতাবিষয়ক গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ করেন ঃ

"১৯৫১ সালের একটি স্মরণীয় ঘটনা জানাচ্ছি। নিউ ইয়র্কের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ কাউন্ট আরমণ্ড ডি রিশিলুকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ

---

* স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা।

১ যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৮

২ স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ৩৭৫

৩ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৯

করেন। আমি ঐ ভোজসভায় উপস্থিত ছিলাম। কাউন্ট ছিলেন ফ্রান্সের বনেদি বংশ বিখ্যাত কার্ডিনাল রিশিলুর বংশধর।

"কাউন্ট তখন ৮০ বছরের বৃদ্ধ। তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর চতুর্থ স্ত্রী—এক আমেরিকান মহিলা, যিনি কাউন্টের থেকে অনেক বছরের ছোট। কাউন্ট স্মৃতিচারণ করে বললেন যে, স্বামীজী যখন প্যারিসে, তখন তিনি নিয়মিতভাবে স্বামীজীর ক্লাসে যোগ দিতেন। কিন্তু তিনি সবসময় পিছনের সারিতে বসতেন, যাতে কেউ তাঁকে দেখতে না পায়। এরূপে বেশ কিছুদিন পরে, একদিন ক্লাসের শেষে কাউন্ট যখন চুপচাপ দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, স্বামীজী হঠাৎ তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে হাত ধরে বললেন, 'হে যুবক, আমি লক্ষ্য করেছি তুমি নিয়মিত আমার ক্লাসে যোগদান করছ। তুমি যদি চাও, আমি তোমাকে একটা জিনিস দিতে পারি।'

"কাউন্ট প্রত্যুত্তরে বললেন, 'কি জিনিস স্বামীজী?' 'মৃত্যুকে কি করে ভালবাসা যায়—তা তোমাকে শেখাতে পারি।'—বললেন বিবেকানন্দ। কাউন্ট বিস্ময়ে প্রত্যুত্তর দিলেন, 'মৃত্যুকে ভালবাসা! মৃত্যুকে ভালবেসে আমার কি প্রয়োজন?' কাউন্ট বলে চললেন, 'আমার যৌবন আছে, স্বাস্থ্য আছে, আর আছে অতুল ঐশ্বর্য। আমি জীবনটা উপভোগ করতে চাই। মৃত্যুকে ভালবেসে আমার কি লাভ?'

"কাউন্ট বললেন, স্বামীজী তাঁকে এবিষয়ে আর কোন পীড়াপীড়ি করলেন না, কেবল বললেন, 'আমার কথা তুমি একদিন বুঝবে এবং মৃত্যুকে ভালবাসতে চাইবে।'

"কাউন্ট তারপর আমাদের বললেন যে, বহুবছর পরে (তিনি স্বামীজীর সংস্পর্শে আসেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে) তিনি বুঝতে পারেন—স্বামীজী কি শেখাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হায়! স্বামীজী চলে গেছেন। অপূর্ব সুযোগ হারিয়েছেন তিনি।"[৪]

'মৃত্যুকে ভালবাসা' মানে অহমিকার মৃত্যুবরণ করা। এটাই মানবজীবনের লক্ষ্য। স্বামীজী কাউন্টকে দিতে চেয়েছিলেন এমন একটি মানসিক অবস্থা, যাতে সে যখন মরণের মুখোমুখি হবে তখন সে হেসে মরণকে উপহাস করতে পারবে।

স্বামীজী বিদেশে মৃত্যুবরণ করতে চাননি। দ্বিতীয়বার ভারতে ফেরার পথে কায়রোতে তিনি ম্যাডাম কালভেকে বলেন: "আমি মরবার জন্য শীঘ্র ভারতে ফিরে যেতে চাই এবং আমি আমার গুরুভাইদের সঙ্গে থাকতে চাই।" কালভে সবিস্ময়ে বললেন: "সে কি স্বামীজী! আপনি কেন মরবেন? আপনাকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।"[৫]

আমেরিকা থেকে ফিরে স্বামীজী দারুণ শীতের মধ্যে সদ্য পতিহীনা মিসেস সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দিতে মায়াবতীতে যান। সেখানে তিনি পনেরো দিন ছিলেন। তারপর তিনি তাঁর গর্ভধারিণী মাকে তীর্থ করানোর জন্য পূর্ববঙ্গে ও আসামে যান। শিলঙে হাঁপানীর কষ্টের মধ্যেও তিনি বলেছিলেন: "যাক, মৃত্যুই যদি হয়, তাতেই বা কি আসে যায়? যা দিয়ে গেলুম, দেড়হাজার বছরের খোরাক।"[৬]

তারপর ১৯০২ সালের প্রথমদিকে তিনি গেলেন গয়া-কাশী। তাঁর জীবনের শেষ জন্মদিন (১২ জানুয়ারি) কাটে বুদ্ধগয়ায়। পরিব্রাজক জীবনের প্রারম্ভে কাশীতে স্বামীজী বলেছিলেন: "আমি যাইতেছি; কিন্তু যতদিন না আমি সমাজের উপর বোমার মতো ফাটিয়া পড়িতে পারি, যতদিন সমাজকে অনুগত ভৃত্যের মতো আমার অনুসরণ করাইতে না পারি, ততদিন আমি ফিরিব না।"[৭] তিনি তাঁর এই শপথ প্রতিপালন করেছিলেন।

স্বামীজীর জীবনের শেষের দিনগুলি অপূর্ব। সৈনিক সন্ন্যাসীর প্রচারযুদ্ধের উন্মাদনা থেমে গেছে, রয়েছে তখন কেবল মানবজাতির প্রতি করুণা, অনুকম্পা ও অনন্ত ভালবাসা। শান্ত সচ্চিদানন্দ সাগরে চিরদিনের জন্য ডুববার মুখে তিনি ছিলেন পরের কল্যাণচিন্তায় মগ্ন। তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন: "একটি আত্মাকে সাহায্য করার জন্য যদি আমায় জন্ম জন্ম আসতে হয়, হোক না তা কুকুর-জন্ম, তবু তাতে আমার কষ্ট নেই।"[৮]

জীবনের শেষপ্রান্তে ক্লান্ত, অসুস্থ স্বামীজীকে গুরুভাইরা ও শিষ্যেরা কড়া প্রহরার মধ্যে রাখতেন, যাতে কোন আগন্তুক এসে তাঁকে বিরক্ত করতে না পারে। তাতে স্বামীজী বলেছিলেন: "আরে দেখ, এ-শরীরে আর কি প্রয়োজন? পরের কল্যাণের জন্যই এ দেহ পাত হউক। ঠাকুরকে দেখিসনি, শেষদিন পর্যন্ত লোককল্যাণের জন্য শিক্ষা দিয়ে গেছেন? আমার কি উচিত নয় তাই করা? আর এ-দেহ গেলেই বা কি আসে যায়? এ তো অতি তুচ্ছ পদার্থ। যদি দেশের লোকের হৃদয়নিহিত আত্মাকে প্রবুদ্ধ করার জন্য শত শতবার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, তাতেও আমি পশ্চাৎপদ নই।"[৯]

---

৪ The Bhagavad Gita—Sachindra Majumdar, Asian Humanities Press, Berkeley, California, 1991, pp. 91-92

৫ Swami Vivekananda in the West'—Marie Louise Burke, Part VI, p. 397

৬ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৭

৭ বিবেকানন্দের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ, অনুবাদক—ঋষি দাস, পৃঃ ১৬

৮ রামকৃষ্ণের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ, অনুবাদক: ঋষি দাস, পৃঃ ২৩

৯ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩৫

।।৪ জুলাইয়ের ঘটনাপঞ্জী।।

মর্তলোকে স্বামীজীর শেষদিনটি প্রসঙ্গে বিভিন্ন ঘটনা নানা গ্রন্থে ছড়িয়ে রয়েছে। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত 'The Life of Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples' গ্রন্থে স্বামীজীর মহাসমাধির সাতটি বর্ণনা আছে। তাছাড়া স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামীজীর বিভিন্ন শিষ্য ও নিবেদিতার নানা বিবরণও রয়েছে। স্বামীজীর মৃত্যু বড়ই অদ্ভুত। পরে স্বামী সারদানন্দ আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দকে লিখেছিলেন ঃ "[স্বামীজী] সর্বদাই বলতেন, 'আমার কার্য হইয়া গিয়াছে, এখন তোরা সব কর, দ্যাখ, শোন, আমায় ছুটি দে।' কখনো বলতেন, 'আমার মৃত্যু শিয়রে। কাজকর্ম ও খেলা ঢের করা গিয়াছে, যা কাজ করিয়া দিয়াছি তাই এখন জগৎ নিক, তাই বুঝতে এখন ঢের দিন লাগবে। ও খেলা কি চিরকাল করতে হবে? ও করিয়া ফেলিয়া দিয়াছি।'... [শরীরত্যাগের] দু-চারদিন আগে রাখালকে বলিয়াছিলেন, 'এবার যা হয় একটা এসপার-ওসপার করিব, হয় শরীরটা ধ্যানজপ করিয়া সারিয়া কাজে ভাল করিয়া লাগিব, না হয় তো ভগ্ন শরীর ছাড়িয়া দিব।"[১০]

১০০ বছর আগের ৪ জুলাই দিনটিতে আমরা মানসচক্ষে দেখার চেষ্টা করব। গঙ্গাতীরে বেলুড় মঠ। বর্ষাকাল। পুরনো মঠবাড়ি ও পুরনো মন্দির। সবুজ ঘাসে ভরা মাঠের প্রাঙ্গণ। নানা বৃক্ষে পরিশোভিত ফল-ফুলের বাগান। এবড়ো-খেবড়ো গঙ্গার কিনারা। প্রসন্নসলিলা ভাগীরথী কুলকুল নাদে ছুটে চলেছে সমুদ্রের পানে। প্রত্যূষে পাখির কূজনে মঠের সন্ন্যাসীর নিদ্রাভঙ্গ। সবাই চলেছে পুরনো ঠাকুরঘরে স্বামীজীর সঙ্গে ধ্যান করতে।

ভোর ৪টা। কোন জীবনীগ্রন্থে নেই যে ঐদিন ভোরে স্বামীজী ঠাকুরঘরে ধ্যান করতে গিয়েছিলেন কিনা। শরীর খারাপ থাকলে তিনি সাধারণত নিজের ঘরেই ধ্যান করতেন। কিন্তু সেদিন তিনি বেশ সুস্থ ছিলেন। স্বামী সারদানন্দের চিঠিতে রয়েছে ঃ "মঠের সমস্ত দেখাশুনা তিনিই করিতেন এবং ছেলেদের পড়াশুনার ভারও তিনিই লইয়াছিলেন। ইদানীং পূর্বের ন্যায় বৈরাগ্যর ভাবটা খুব প্রবল হইয়াছিল। রাত্রি ৪টার সময় সকলকে লইয়া ঠাকুর ঘরে গিয়া জপধ্যান করিতেন।"[১১]

স্বামী প্রেমানন্দের চিঠিতে রয়েছে ঃ "প্রায় দুইমাস হতে ছেলেদের নিয়মমত ধ্যানভজন করাতেন এবং নিজেও উহাতে যোগ দিতেন।... 'কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীর-মনুসঞ্জ্বরেৎ' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪।৪।২) প্রায় এই শ্লোক আওড়াতেন।"[১২]

সকাল ৬—৮টা। স্বামীজী সকলের সঙ্গে বসে প্রাতরাশ করলেন। স্বামী প্রেমানন্দের ভাষায় ঃ "ঐদিন প্রাতঃকালে উঠে যেমন স্ফূর্তি করতেন, সেইরূপ স্ফূর্তি, হাসি, বিদ্রূপ আমার সঙ্গে কত হলো। যেমন গরম দুধ ও ফলাদি খান সেইরূপ খেলেন ও আমায় খাওয়াইবার জন্য কত আগ্রহ করলেন। তারপর গঙ্গার একটা ইলিশ মাছ এবৎসরে এই প্রথম কেনা হলো, তার দাম নিয়ে আমার সঙ্গে কত রহস্য হতে লাগল। একজন বাঙাল ছেলে (ব্রজেন্দ্র) ছিল, তাকে বললেন, 'তোরা নতুন ইলিশ পেলে নাকি পূজা করিস, কি দিয়ে পূজা কত্তে হয় কর।' "[১৩]

চা খেতে খেতে স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের সঙ্গে অতীতদিনের অনেক আলোচনা ও গল্প করলেন এবং পরদিন শনিবার অমাবস্যা থাকায় ঐদিন রাতে কালীপূজা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। একটু পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা তন্ত্রসাধক ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী উপস্থিত হন। তাঁকে দেখে স্বামীজী সানন্দে বলেন ঃ "এই যে ভট্টাচার্য মহাশয়ও এসেছেন।" তিনি তৎক্ষণাৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী বোধানন্দকে পূজার সমস্ত আয়োজন ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে বললেন। মতান্তরে, ১১টার পর ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তীকে দেখে স্বামীজী খুশি হয়ে বললেন ঃ "এই যে ভট্টাচার্য! বাঃ, বেশ হয়েছে! কাল শনিবার, অমাবস্যা, বড় ভাল দিন।" স্বামী প্রেমানন্দকে বলিলেন ঃ "দে, কাল মহামায়ীর পূজা লাগিয়ে দে।"[১৪]

সকাল ৮—১১টা। স্বামীজী আবার ঠাকুরঘরে একা ধ্যান করতে গেলেন। স্বামী প্রেমানন্দ লিখেছেন ঃ "আন্দাজ ৮.৩০ বেলার সময় তিনি ঠাকুরঘরে ধ্যান করবার জন্য উঠিলেন। আমি প্রায় ৯.৩০টায় পূজার জন্য ঠাকুরঘরে উঠিলাম। আমায় দেখে কহিলেন, 'আমার আসন ঠাকুরের শয়নঘরে করে চারিদিকের দরজা বন্ধ করে দে।' অন্যদিন আমি পূজা করিলেও ঐ পূজাঘরের এক কোণে স্বামীজী বসিয়া ধ্যান করিতেন। আজ অন্যমত করিলেন। আন্দাজ ১১টার পর ধ্যান থেকে উঠিয়া—'মা কি আমার কালো,/ কালরূপা এলোকেশী হৃদিপদ্ম করে আলো।' গুনগুন রবে এই গান গাহিলেন।"[১৫] প্রত্যেক বিবরণীতে আছে যে, তিনি এইকালে ৩ ঘণ্টা ধ্যান করেন।

ধ্যানের পর তিনি স্বহস্তে ঠাকুরের বিছানা ঝেড়ে দিলেন। ঐ বন্ধ ঘরে কী ঘটেছিল—কেউ জানে না। তা

১০ পত্র-সঙ্কলন—স্বামী অভেদানন্দ, পৃঃ ১১ ১১ ঐ ১২ ঐ, পৃঃ ১৫ ১৩ ঐ, পৃঃ ১৬-১৭
১৪ প্রেমানন্দ জীবনচরিত—স্বামী ওঙ্কারেশ্বরানন্দ, পৃঃ ১৫৪
১৫ পত্র-সঙ্কলন, পৃঃ ১৭

চিরদিন রহস্যময় হয়ে থাকবে। তারপর ওপরের ঠাকুরঘর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে তিনি উঠানে একটু পায়চারি করলেন। ঐকালে স্বামী প্রেমানন্দ স্বামীজীকে অস্ফুটস্বরে বলতে শুনলেন ঃ "যদি আরেকটা বিবেকানন্দ থাকত তবে বুঝতে পারত বিবেকানন্দ কি করে গেল! কালে কিন্তু এমন শত শত বিবেকানন্দ জন্মাবে।" একথা শুনে প্রেমানন্দজী বিচলিত হলেন।

১১—১২টা। স্বামীজীর মনে হঠাৎ শাস্ত্রের একটা *বিশেষ অংশ দেখার ইচ্ছা হলো। তাঁর আদেশে স্বামী* শুদ্ধানন্দ গ্রন্থাগার থেকে শুক্লযজুর্বেদ এনে ভাষ্যসমেত এই মন্ত্রটি পাঠ করলেন ঃ

"সুষুম্নঃ সূর্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্বস্তস্য নক্ষত্রাণ্যাপ্সরসো ভেকুরয়ো নাম।
স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্ তাভ্যঃ স্বাহা।।"

(বাজসনেয় সংহিতা, মাধ্যন্দিন শাখা, ১৮।৪০)

এই শ্লোকের মহীধর-কৃত ভাষ্য সম্বন্ধে স্বামীজী বললেন ঃ "এ-ব্যাখ্যা আমার মনে লাগছে না। ভাষ্যকার সুষুম্না পদের যে-ব্যাখ্যাই করুন, পরবর্তী কালে তন্ত্রাদিতে দেহাভ্যন্তরস্থ সুষুম্নানাড়ি বলে যা উক্ত হয়েছে তারই বীজ এই বৈদিক মন্ত্রে নিহিত রয়েছে। তোরা এইসব শ্লোকের প্রকৃত মর্ম প্রণিধান করবার চেষ্টা করবি। শাস্ত্রের অর্থ সম্বন্ধে নিজে নিজে চেষ্টা করবি; তাহলেই মৌলিক ব্যাখ্যা বার করতে পারবি।"[১৬]

দুপুর ১২—১টা। স্বামীজী সাধারণত নিজের ঘরে একাকী আহার করতেন। কিন্তু সেদিন সকলের সঙ্গে নিচে বসে আহার করেন। স্বামী প্রেমানন্দ ও ঈশ্বরচন্দ্রকে পাশে বসিয়ে স্বামীজী ইলিশ মাছের ভাজা, ঝোল ও অম্বল দিয়ে অতি তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করেন। খাবার সময় রঙ্গ করে বললেন ঃ "একাদশী করে খিদেটা খুব বেড়েছে, ঘটিবাটি-গুলো ছেড়েছি কষ্টে।"[১৭] আহারান্তে নানা প্রসঙ্গের পর পানার্থে জল চেয়ে রহস্য করে তিনি স্বামী প্রেমানন্দকে বললেন ঃ "Fish wants water to swim. (মাছ সাঁতার কাটবার জন্য জল চাইছে।) দে, এক গ্লাস জল দে।"[১৮]

বেলা ১—১.৩০টা। খাওয়ার পর স্বামীজী একটু বিশ্রামের জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু বিশ্রাম হলো না। বিরাট জাম্বো জেট (বোয়িং ৭৪৭) আকাশে ওড়ার আগে রানওয়েতে এসে দাঁড়ায়। তখন এর চারটি ইঞ্জিন ভীষণ দ্রুতবেগে চলতে থাকে এবং সারা প্লেনটা থরথর করে কাঁপতে থাকে। যে-মুহূর্তে কন্ট্রোল টাওয়ারের নির্দেশ পায়, অমনি তীরবেগে ছুটে অনন্ত আকাশে উড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। স্বামীজীর শরীর ও মন তেমনি অনন্তের উদ্দেশে ওড়ার আগে দ্রুত কাজ করছিল। তাঁর পক্ষে অলসভাবে নরম বিছানায় শুয়ে কালক্ষেপণ করা সম্ভব ছিল না।

বেলা ১.৩০—৪.৩০টা। বিভিন্ন গ্রন্থে সময়ের বিভিন্নতা আছে। আমরা সেগুলির সামঞ্জস্য করে এই সময়গুলি স্থির করেছি। প্রায় প্রত্যেক বিবরণীতে রয়েছে যে, শেষদিনে স্বামীজী সকালে ৩ ঘণ্টা ধ্যান করেন এবং *দুপুরের পর ৩ ঘণ্টা ব্যাকরণ পড়ান।* স্বামী প্রেমানন্দের পত্রে রয়েছে ঃ "বেলা ১টার পর আমায় তুলে বললেন, 'চল পড়িগে, সন্ন্যাসী হয়ে দিবানিদ্রা খারাপ। আমার আজ ঘুম হলো না। একটু ধ্যান করে মাথাটা কিছু ধরেছে, Brain weak হয়েছে, দেখছি।' তারপর Library-র ঘরে বসে ৩ ঘণ্টা পাণিনি ব্যাকরণ পড়াইলেন।"[১৯]

স্বামীজী বেলুড় মঠের নিয়মাবলীতে লিখেছেন ঃ "বিদ্যার অভাবে ধর্মসম্প্রদায় নীচদশা প্রাপ্ত হয়। অতএব সর্বদা বিদ্যার চর্চা থাকিবে।" সেই শেষদিনে নিজের মাথাধরা ও অসুস্থতা সত্ত্বেও মঠের সাধু ও ব্রহ্মচারীদের নিয়ে ওপরে লাইব্রেরি ঘরে তিনি বরদরাজের 'লঘুকৌমুদী' পড়ালেন। জনৈক সাধু স্বামীজীর ক্লাসের বর্ণনা দেন ঃ "পাঠ ৩ ঘণ্টা ধরে চলেছিল। কোন একঘেয়েমি ছিল না। শিক্ষাদানকালে স্বামীজী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মজার গল্প বা কৌতুকপ্রদ শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। ব্যাকরণের কোন কোন নীরস সূত্রকে তিনি বিভিন্ন রসিকতার মাধ্যমে এমন হাস্যোদ্দীপক করে তুলেছিলেন, যাতে ঐ শাস্ত্রের কথাগুলি ব্রহ্মচারীদের মনে চিরকালের মতো গেঁথে যায়। তাঁর এই শিক্ষাপ্রণালী বিষয়ে তিনি বলেছিলেন যে, কলেজে পড়বার কালে তিনি এক রাতে তাঁর সহপাঠী দাশরথি সান্যালকে সমগ্র ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস এইভাবে আয়ত্ত করিয়েছিলেন। এদিনে ব্যাকরণ ক্লাসের পর স্বামীজীকে একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।"

৪.৩০—৫.৩০টা। স্বামীজী একটু জল ও এক কাপ গরম দুধ খেলেন। তারপর স্বামী প্রেমানন্দকে সঙ্গে নিয়ে বেলুড় বাজার পর্যন্ত বেড়াতে গেলেন। তখন গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড থেকে মঠের বর্তমান গেট ছিল না। দক্ষিণদিকের গেট দিয়ে বেলুড় গ্রামের ভিতর দিয়ে যেতে হতো। সেদিন যাতায়াত মিলে স্বামীজী প্রায় ২ মাইল হাঁটলেন। বেড়াবার কালে একটা বাগান দেখে তিনি বললেন যে, আমেরিকার রিজলী ম্যানরে মিঃ লেগেটের বিরাট বাগান কী করে অল্প

১৬ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫১
১৭ পত্র-সঙ্কলন, পৃঃ ১৭-১৮
১৮ প্রেমানন্দ জীবনচরিত, পৃঃ ১৫৪
১৯ পত্র-সঙ্কলন, পৃঃ ১৮

লোকের সাহায্যে যন্ত্র দিয়ে পরিষ্কার রাখে। তারপর স্বামী প্রেমানন্দকে বলেন ঃ "আমায় কেন নকল করবি? ঠাকুর নকল কত্তে বারণ কত্তেন। আমার মতো উড়ন চড়ে হবি নে।"[২০] সেই অপরাহ্নে স্বামীজী ছেলেদের বলেছিলেন ঃ "কেউ যদি কখনো আমাকে নকল করে, তাকে পদাঘাতে দূর করে দেবে। আমাকে নকল করতে চেয়ো না।"[২০] সেদিন বেড়াবার কালে নানা প্রসঙ্গের মধ্যে বেদ-বিদ্যালয়ের কথা উঠল। প্রেমানন্দজী অভেদানন্দজীকে চিঠিতে লিখেছেন ঃ "মঠে একটি বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন—এই ইচ্ছা কদিন হতে খুব প্রবল হইয়াছিল। শেষের দিনেও বেদ-সংক্রান্ত পুস্তক আনাইবার জন্য পুনা ও বোম্বাই নগরে তিনখানা চিঠি লেখা হয়। আমার সঙ্গে ঐদিন বেদ-বিদ্যালয় সম্বন্ধে কত কথাই হইয়াছিল! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বেদ পড়িয়া কি হবে?' 'কুসংস্কারগুলো যাবে বেদ পড়িলে' কহিলেন।"[২২]

৫.৩০—সন্ধ্যা ৭টা ঃ বেড়িয়ে এসে স্বামীজী বাথরুমে গেলেন। ফিরে এসে মঠের বারান্দায় বসলেন। কখনো আমগাছের নিচে বেঞ্চিতেও বসতেন। সমাগত সাধু-ব্রহ্মচারীদের বললেন ঃ "আজ আমার শরীর বড় হালকা বোধ হচ্ছে। আজ বেশ আছি।" স্বামী প্রেমানন্দকে পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাস তন্নতন্ন করে বোঝালেন এবং উপনিবেশের ইতিহাস (History of Colonics)-এর কথা বললেন। স্বামীজী বললেন ঃ "ভারত অমর হয়ে থাকবে যদি সে ভগবৎসন্ধান চালিয়ে যায়। কিন্তু ভারতের মৃত্যু হবে যদি সে রাজনীতি ও সামাজিক সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয়।"[২৩]

তারপর স্বামী প্রেমানন্দ সন্ধ্যারতির জন্য ঠাকুরঘরে গেলে স্বামীজী ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন। ৬.৩০ নাগাদ তিনি দেখলেন, ঠাকুরের মন্দিরের নিচে বারান্দায় বসে সাধুরা চা খাচ্ছেন। তিনি তাঁদের কাছে গিয়ে বললেন ঃ "আমাকে এক কাপ চা দিতে পারিস?" খুশি মনে তিনি তাঁদের সঙ্গে বসে চা খেলেন।[২৪]

৭টা নাগাদ ঠাকুরের আরতির শঙ্খ ও ঘণ্টা বাজল। স্বামীজী মঠবাড়ির পশ্চিমের বারান্দা থেকে উঠলেন এবং দেখলেন, সাধু-ব্রহ্মচারীরা ঠাকুরঘরে যাচ্ছে। তিনি নিজের ঘরে যাওয়ার জন্য দরজা খুলে ওপরে ওঠার সিঁড়িতে পা দিলেন। সেবক স্বামী বোধানন্দ তাঁর পিছনেই ছিলেন। স্বামীজী হঠাৎ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। স্বামী বোধানন্দ তাঁর স্মৃতিকথাতে লিখেছেন ঃ "আমি একতলার সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন জুলাই মাস। ভারতে প্রচুর মশা এবং তা এমন মারাত্মক যে, ওর কামড়ে ম্যালেরিয়ার আশঙ্কা থাকে। মশারি ছাড়া রাত্রে কেউ ঘুমাতে পারে না। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, সাধুদের অনেকেরই মশারি ছেঁড়া। ছেঁড়া জায়গা দিয়ে মশা ঢুকলে তাদের আর বের করতে পারা যায় না। আমার প্রতি তাঁর শেষ আদেশ ছিল—'দেখিস, সাধুরা যেন সবাই নতুন মশারি পায়।' "[২৫]

এ চিত্র অনবদ্য। এ ছবি রং ও তুলি দিয়ে ক্যানভাসে ধরে রাখবার মতো। সিঁড়ির দ্বিতীয় বা তৃতীয় ধাপে রেলিং ধরে দণ্ডায়মান 'হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক' সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। পায়ে চটি, পরনে গেরুয়া কাপড়, গায়ে ফতুয়া, মুণ্ডিত মস্তক। গ্রীষ্মের দরুন ঘর্মাক্ত কলেবর। তাঁর ডাগর ডাগর চোখদুটি করুণায় ও অনুকম্পায় ভরা—তাকিয়েছেন শিষ্যের প্রতি। আর ভাবছেন কি করে সাধুদের ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচানো যায় এবং নির্দেশ দিচ্ছেন নতুন মশারি কেনার। সত্যিই বিস্ময় জাগে যে, এ মহাপ্রাণ পঞ্জিকা দেখে মৃত্যুর দিন ঠিক করে রেখেছেন এবং দুঘণ্টার মধ্যে তিনি মহাসমাধি লাভ করবেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও তাঁর হৃদয় পরকল্যাণচিন্তায় মগ্ন।

সন্ধ্যা ৭—৯.১০টা। স্বামীজী ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে সেবক ব্রহ্মচারী ব্রজেন্দ্র। তাঁকে স্বামীজী বললেন ঃ "আমার মালা দু-ছড়া দে।" জপে বসবার আগে সেবককে বললেন ঃ "যতক্ষণ না ডাকি, অন্য ঘরে গিয়ে জপধ্যান কর।" ("Wait and meditate till I call you.") বিবেকানন্দের মুখ দিয়ে নির্গত হয়েছে মানবজাতির প্রতি অজস্র বাণী। আর আজ এই শেষলগ্নে হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে বেরিয়ে এল তাঁর শেষবাণী—"অপেক্ষা কর ও ধ্যান কর—যতক্ষণ না আমি তোমাকে ডাকি।"

স্বামীজী সাধারণত তাঁর ঘরে ধ্যানে বসতেন পূর্বমুখী হয়ে অর্থাৎ গঙ্গার দিকে মুখ করে অথবা উত্তর-পূর্বমুখী হয়ে দক্ষিণেশ্বরের দিকে লক্ষ্য করে। কিন্তু তাঁর শেষ ধ্যানে ব্যতিক্রম দেখা যায়। ২৮ আগস্ট ১৯০২ নিবেদিতা মিসেস হ্যামণ্ডকে লেখেন ঃ "অদ্ভুত কথা বলি, সেদিন প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন করে উত্তর-পশ্চিম দিকে মুখ করে

২০ পত্র-সঙ্কলন, পৃঃ ১৭
২১ নিবেদিতা লোকমাতা—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৫-১০৬
২২ পত্র-সঙ্কলন, পৃঃ ১৬
২৩ Vivekananda : Yogas and other works—Swami Nikhilananda, p. 178
২৪ দ্রঃ Vedanta Darpana, New York, May 1932
২৫ ঐ

ধ্যানে বসেছিলেন।"[২৬] কেন এই ব্যতিক্রম? স্বামীজীর ঘরের ঠিক উত্তর-পশ্চিম দিকে বেলুড় মঠের পুরনো মন্দিরের ওপরতলায় ঠাকুরঘর। মনে হয় তাঁর শেষ ধ্যান ছিল পুরনো মন্দিরের ঠাকুরের বিগ্রহের ওপর। ২৮ জুলাই ১৯০২ নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে লেখেনঃ "ব্রহ্মানন্দ বলেছিলেন, 'এবার ও (স্বামীজী) চলে যাবে ঠাকুরের মতোই। কারণ প্রতিদিন ঠাকুরকে দেখছি ওর মধ্যে।' "[২৭]

প্রায় ১ ঘণ্টা বাদে অর্থাৎ ৮টা নাগাদ স্বামীজী ব্রহ্মচারী ব্রজেন্দ্রকে ডেকে ঘরের জানালা খুলে দিতে বললেন এবং মাথায় বাতাস করতে বলে মেঝেতে শুয়ে ধ্যান করতে লাগলেন। (বর্তমানে সেই জায়গায় স্বামীজীর ক্যাম্পখাটটি রয়েছে।) একটু পরে তিনি ব্রজেন্দ্রকে পা টিপে দিতে বললেন এবং তখন তাঁর একটু নিদ্রাবেশ হলো। স্বামী সারদানন্দের পত্রে রয়েছেঃ "প্রায় এক ঘণ্টা এইরূপ স্থির হইয়া চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিবার পর ডান হাতখানি ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল এবং কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম হইতে লাগিল। মিনিট দুই ঐরূপ হইবার পর মুখ দিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন। পরে মিনিট দুই আবার স্থির থাকিয়া মুখ দিয়া আরেকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন এবং সেইসঙ্গে মাথাটি নড়িয়া উঠিল এবং চক্ষু ভ্রূমধ্যে স্থির হইয়া রহিল, আর মুখে এক অপূর্ব জ্যোতি ও হাসি দেখা গেল।"[২৮]

স্বামী প্রেমানন্দ লিখেছেনঃ "এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগের পর একেবারে সমাধি। তখন ব্রজেন্দ্র ভয় পেয়ে গোপালদাকে ডাকিয়া বলে—কি হইল দেখুন। ইহার দু-এক মিনিট পরে আমি গিয়া সমাধিস্থ দেখিয়া শশীর বাবাকে ডাকিয়া স্বামীজীর কানে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের নাম করিতে লাগিলাম—যদি সমাধি ভঙ্গ হয়। কী সে জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল! কী সে স্বর্গীয় তেজঃপূর্ণ বিস্ফারিত নেত্র! কেবল কৌপিন-পরিহিত সে সুন্দর শরীরে এক অপূর্ব কান্তি পরিলক্ষিত হয়েছিল! তার পরদিবসেও সে-মুখমণ্ডল দর্শন করে অনেকের দুঃখ-শোক দূর হয়েছিল! ঠিক যেন শিব শুয়ে আছেন! কোন অঙ্গের কোনরূপ বিকৃতি হয় নাই! ইচ্ছা করে যেন শরীর ত্যাগ করলেন!... ঠাকুর যে বলতেন—'তুই যেদিন স্বস্বরূপ জানতে পারবি সেদিন তুই শরীর ছেড়ে দিবি। তাই হইল!' "[২৯]

অপর একটি বিবরণীতে রয়েছে, ব্রহ্মচারী ব্রজেন্দ্র যখন স্বামীজীর পদসেবা করছিলেন, তখন তিনি বামপার্শ্বে শয়ন করেছিলেন। তারপর রাত ৯টা নাগাদ তিনি পার্শ্ব পরিবর্তন করে শয়ন করলেন এবং ছোট ছেলে যেমন স্বপ্নে কেঁদে ওঠে সেরূপ একটা অস্ফুট শব্দ করলেন। হাতখানা একবার একটু কেঁপে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল এবং মাথাটা বালিশ থেকে পাশে পড়ে গেল। তারপর আরেকটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল এবং একটু পরেই সব স্থির হয়ে গেল।

রাত তখন ৯.১০। স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হলো—"আমি কখনো চল্লিশ পেরুব না।" দেহত্যাগ কালে তাঁর বয়স ছিল ৩৯ বছর ৫ মাস ২৪ দিন।

।। মহাসমাধির পরে।।

ব্রহ্মচারী ব্রজেন্দ্র কিছু বুঝতে না পেরে প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী অদ্বৈতানন্দের কাছে গিয়ে সব জানালেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর ঘরে এলেন। মঠে তখন সবে খাওয়ার ঘণ্টা পড়েছে। খবর পাওয়ামাত্র সকল সাধু-ব্রহ্মচারী স্বামীজীর ঘরে সমবেত হলেন। স্বামী বোধানন্দ স্বামীজীর জন্য রাঁধছিলেন। তিনি রান্না ফেলে ছুটলেন। স্বামী অদ্বৈতানন্দ স্বামীজীর নাড়ির স্পন্দন না পেয়ে স্বামী বোধানন্দকে নাড়ি দেখতে বললেন। তিনিও নাড়ির গতি অনুভব না করে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। স্বামী অদ্বৈতানন্দ তখন স্বামী নির্ভয়ানন্দকে বললেনঃ "হায়! হায়! আর কি দেখছ? শীঘ্র মহেন্দ্র ডাক্তারকে (বরানগরের মহেন্দ্রনাথ মজুমদার) ডেকে আন।" একজন তখনি ডাক্তার ডাকতে ছুটলেন এবং আরেকজন কলকাতায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দকে সংবাদ দিতে গেলেন। রাত ১০.৩০-এ উভয়ে মঠে এসে পৌঁছালেন। শোকার্ত স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামীজীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। স্বামী সারদানন্দ অতিকষ্টে তাঁকে তুললেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ কেঁদে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বললেনঃ "সামনে থেকে যেন হিমালয় পাহাড় অদৃশ্য হয়ে গেল।" যথাকালে ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া চালু করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু নিষ্ফল হলেন। রাত ১২টায় তিনি জানালেন যে, প্রাণবায়ু বের হয়ে গেছে।

সকালে সংবাদ পেয়ে নিবেদিতা এবং কলকাতার বহু লোক বেলুড় মঠে উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মচারী নাদু (হরেন) স্বামীজীর মৃত্যুসংবাদ তাঁর মা ও ভাইকে জানাতে সিমলায় যান। তাঁরা সবাই মঠে আসেন। তারপর স্বামীজীর মাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নিবেদিতা কারণ জিজ্ঞাসা করায় গিরিশ ঘোষ তাঁকে বুঝিয়ে বলেন যে, মায়ের পক্ষে নিজের সন্তানকে চিতায় দাহ করা দেখলে খুব কষ্ট হবে, তাই তাঁকে সরিয়ে নেওয়া হলো।

---

২৬ নিবেদিতা লোকমাতা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৪

২৭ ঐ, পৃঃ ১০৩

২৮ পত্র-সঙ্কলন, পৃঃ ১২-১৩ ২৯ ঐ, পৃঃ ১৯-২০

শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর গেলে গিরিশচন্দ্র ঠাকুরকে দেখতে যাননি। তাঁর কাছে ঠাকুর ছিলেন স্বয়ং ভগবান, তাই সংবাদদাতাকে তিনি বলেছিলেন যে, ভগবান কখনো মরেন না। কিন্তু তিনি স্বামীজীর দাহকালে উপস্থিত ছিলেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তাঁকে বললেনঃ "নরেন চলে গেল!" গিরিশচন্দ্র বললেনঃ "চলে যাননি, দেহত্যাগ করলেন।"[৩০]

স্বামীজী সত্যিই চলে যাননি। বেলুড় মঠে স্থূলশরীর ছেড়ে তিনি প্রথমে জ্যোতির্ময় দেহ নিয়ে আবির্ভূত হলেন মাদ্রাজে এবং রামকৃষ্ণানন্দজীকে বললেনঃ "দ্যাখ শশী, স্থূলশরীরটাকে থুতুর মতো ফেলে দিয়ে স্বস্বরূপ পরিগ্রহ করেছি।"[৩১]

১৪ জানুয়ারি ১৯০৪ সালে নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে চিঠিতে লেখেনঃ "যে-কথা বলতে যাচ্ছি সে-কথা ভবিষ্যতে কারো কাছে কখনোই তুলবে না; অত্যন্ত পবিত্র গোপন বস্তুর মতো একে রক্ষা করবে। স্বামীজী সদানন্দের কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই আবির্ভাবের কালে সদানন্দের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। সদানন্দ পূর্ণ হয়ে আছেন এই বিষয়ে। তিনি অনুভব করছেন—চরম সিদ্ধি পেয়ে গেছেন।"[৩২]

স্বামীজীর শরীরত্যাগের এক সপ্তাহের মধ্যে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। স্বামী অখণ্ডানন্দ সংবাদ পেয়ে এক-বস্ত্রে নগ্নপদে মুর্শিদাবাদ থেকে বেলুড় মঠে পৌঁছালেন। সোজা স্বামীজীর ঘরে গিয়ে তিনি ধ্যানমগ্ন হলেন। স্বামী প্রেমানন্দ তাঁকে আলিঙ্গন করে কাঁদলেন। অখণ্ডানন্দজী তারপর একদিন কলকাতার কালীঘাটে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে স্বামীজীর শেষদিনগুলির কথা শুনে বেদনা লাঘব করতে যান। পরবর্তী কালে (১৭ জানুয়ারি ১৯৩৬) অখণ্ডানন্দজী মিস ম্যাকলাউডকে বলেনঃ "এখন তোমাকে যেমন দেখছি, দেহত্যাগের পর স্বামীজীকে তেমন দেখেছি। তা না হলে আমি বাঁচতুম না। বিয়োগব্যাথা এত হয়েছিল, আত্মহত্যা করতে গিয়াছিলাম। স্বামীজী বাধা দিলেন। চলন্ত ট্রামগাড়ির নিচে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হয়েছিলাম, তিনি আমায় ধরে ফেললেন।"

মিস ম্যাকলাউড বলেনঃ "হ্যাঁ, তিনি তোমার মধ্যে, আমার মধ্যে, সকলের মধ্যে বাস করেন। তিনি মরতে পারেন না—অমর। তিনি আত্মা।"[৩৩]

বিবেকানন্দ-রূপী মানুষটি অন্তর্হিত হলেন; কিন্তু তাঁর অশরীরী বাণী ও অলৌকিক জীবন এখনো অগণিত মানবের অন্তরাত্মার অনুপ্রেরণা জাগিয়ে জানাচ্ছে যে, তিনি এখনো জীবিত। বিবেকানন্দের আদর্শের কখনো মরণ হবে না। এখনো পৃথিবীর অসংখ্য লোক তাঁর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে তাঁর আদর্শকে ধরে বেঁচে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। ❑

---

৩০ স্বামী বিবেকানন্দ—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ১১৮

৩১ স্বামী সারদানন্দ—ব্রহ্মচারী প্রকাশচন্দ্র, পৃঃ ১৪৫

৩২ নিবেদিতা লোকমাতা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১০

৩৩ স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ, পৃঃ ১৭-১৮

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ১১

পাশাপাশি ঃ (১) আনন্দগিরি, (২) পর্বতে, (৪) গিরি, (৫) বদ্রীনাথ, (৬) বার্তাং, (৭) নরো, (৮) হস্তামলক, (১০) বিমলে মম, (১২) বিদ্যা, (১৩) অবিদ্যা, (১৪) সনন্দন, (১৫) ধর্মো, (১৬) জঠর, (১৭) মুরারি মিশ্র।

ওপর-নিচ ঃ (১) আদি বরাহ, (২) পরিবারো, (৩) তেষাং, (৯) কবি, (১১) মণ্ডন মিশ্র, (১২) বিদ্যাধর, (১৩) অন্তজ।

শব্দচেতনা ১১-এর সঠিক উত্তরদাতার নাম ঃ

অনিমা সর্বাধিকারী

অনুষ্ঠান-সূচী ঃ ভাদ্র ১৪০৯

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে

জন্মতিথি-কৃত্য ঃ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ
শ্রাবণ পূর্ণিমা
৫ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার
(২২ আগস্ট ২০০২)

শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী
শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী
১৪ ভাদ্র, শনিবার
(৩১ আগস্ট ২০০২)

স্বামী অদ্বৈতানন্দ
শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী
২০ ভাদ্র, শুক্রবার
(৬ সেপ্টেম্বর ২০০২)

একাদশী ঃ ১, ১৭, ৩১ ভাদ্র
রবিবার, মঙ্গলবার, মঙ্গলবার
(১৮ আগস্ট; ৩, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০২)

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ—
এক অভিনব সন্ন্যাসী সঙ্ঘ

স্বামী ঋতানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থে স্বামী সারদানন্দ উল্লেখ করেছেন, সমস্ত সাধনে সিদ্ধ হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি অসাধারণ উপলব্ধি হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে একটি হলো—শ্রীশ্রীজগদম্বার হাতের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে উদার মতের একটি নতুন সম্প্রদায় তাঁকে প্রবর্তন করতে হবে।[১]

ভারতে বৈদিক কাল থেকেই সন্ন্যাসের কথা জানতে পারা যায়। বুদ্ধপূর্ব যুগে মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালী কেমন ছিল তা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে আমরা জানি, প্রাচীন কাল থেকেই ঐতিহ্য হিসাবে মানুষের জীবনে চতুর্বর্গের কথা আছে। এই চতুর্বর্গলাভের জন্য মানুষের জীবনকে চতুরাশ্রমে বিভক্ত করা হয়েছিল। শৈশবে গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্যাবলম্বন করে বাস, পরে যৌবনে সংসারধর্মে প্রবেশ, পঞ্চাশোর্ধ্বে সস্ত্রীক বানপ্রস্থ অবলম্বন করে ঋষিদের আশ্রমে থেকে জীবনযাপন ও উপাসনা এবং চূড়ান্তে পত্নীকে আশ্রমে রেখে সন্ন্যাস গ্রহণ করে একাকী পরিব্রাজক জীবনযাপন—এই ছিল জীবনের আদর্শগত ধারা। তবে এই আদর্শ সমাজজীবনে কতদূর ব্যাপ্ত, গভীর এবং কতদিন পর্যন্ত প্রতিপালিত হয়েছিল তা বলা কঠিন। মূলকথা, তৎকালীন ভারতবর্ষে জীবনের লক্ষ্য ছিল মোক্ষপ্রাপ্তি। সমস্ত ভাবনার মধ্যে মুক্তি-ভাবনা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল। বেদ, উপনিষদ্, পুরাণাদিতেও দেখা যায়, এই লক্ষ্যকে স্থির করে মানুষ স্বধর্ম পালনের মাধ্যমে নিজ নিজ জীবনধারাকে প্রবহমান রাখতে চেষ্টা করত। সকলেই এতে সফল হতো কিনা বলা যায় না, কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য যে ত্যাগ বা সন্ন্যাস অপরিহার্য, তা ছিল সর্বজনস্বীকৃত।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক জাবাল উপনিষদে বলা হয়েছে, জনক যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে অনুরোধ করেছিলেন ঃ "ভগবন্, আমাকে সন্ন্যাসের বিষয়ে বলুন।" তখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে বলেছিলেন ঃ "ব্রহ্মচর্য সমাপন করে গৃহী হবে, গৃহী হওয়ার পর বনী হবে, বনী হওয়ার পর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে। যদি তার অন্যথা হয়, তবে ব্রহ্মচর্য থেকে প্রব্রজ্যা বা গার্হস্থ্য থেকেই প্রব্রজ্যা বা বাণপ্রস্থ থেকেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা যায়। আবার, অব্রতী বা ব্রতী, স্নাতক বা অস্নাতক, উৎসন্নাগ্নিক (বাণপ্রস্থী) বা অগ্নি পরিত্যাগকারী—যেই হোক না কেন, যেদিনই বৈরাগ্য আসবে সেদিনই সন্ন্যাস গ্রহণ করবে।"

কিভাবে সন্ন্যাসী থাকবে সে-সম্পর্কে উপনিষদে বলা হয়েছে—সন্ন্যাসিগণ নদীপুলিনেই অবস্থান করবেন, যদি কোন কারণে তাঁর বাইরে থাকতে হয়, তবে কোন দেবালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করবেন, লোকালয়ে নয়। তাঁরা সুখপ্রাপ্তি বা দুঃখ পরিহারের জন্য শরীরকে অত্যন্ত পীড়িত করবেন না। এভাবেই সন্ন্যাসীকে জীবনযাপন করতে হবে। সুতরাং বোঝা যায়, সন্ন্যাসীদের কোনরকম গণ বা দল সৃষ্টি করা বিহিত নয়। তাঁরা নিঃসঙ্গ থাকবেন। সন্ন্যাসী যে একাকী থাকবেন, সেকথা দক্ষস্মৃতি এবং নারদ-পরিব্রাজক উপনিষদেও বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—সন্ন্যাসী যখন একাকী বিচরণ করেন তখন তাঁর 'ভিক্ষু' সংজ্ঞা হয়। দুজন মিলিত হলে 'মিথুন', তিনজনে 'গ্রাম' এবং তার বেশি মিলিত হলে 'নগর' রূপ পরিগ্রহ করে। নগর, গ্রাম বা মিথুন—এসব কিছুই গঠন করা কর্তব্য নয়। অর্থাৎ বহু বা তিনজন বা দুজন সন্ন্যাসীরও একত্রে অবস্থান উচিত নয়। এমন করলে তাঁরা সন্ন্যাসধর্ম থেকে বিচ্যুত হবেন। অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের কোন গণ বা সঙ্ঘ স্থাপনা অবিহিত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত। শুধু তাই নয়, এরকম সন্ন্যাসিগণ বা সঙ্ঘ-ভাবনার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও শ্লেষ করা হতো।

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে দেখা যায়, বুদ্ধের জীবৎকালে একটিমাত্র সম্প্রদায় ছিল—পরিব্রাজক সম্প্রদায়, যা 'সঙ্ঘ' নামে অভিহিত হয়। বাইরের লোকেদের কাছে 'শাক্যপুত্তীয় সমন' অর্থাৎ শাক্যবংশোদ্ভূত ব্যক্তিকে যে-ভিক্ষুরা অনুসরণ করেন—এই ছিল তাঁদের পরিচয়। বর্ষাকালে এই ভিক্ষুরা কোন একটি নির্জন স্থানে বাস করতেন। তাকে বলা হতো 'বস্সবাস'। বৌদ্ধ সঙ্ঘ বা ভিক্ষুদলের কোন চিহ্নিত বা নির্বাচিত প্রধান ছিলেন না। একত্র মিলিত হলে তাঁরা কতকটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিজেদের সাংগঠনিক কাজকর্ম সম্পন্ন করতেন। শোনা যায়, আনন্দ বুদ্ধকে তাঁর উত্তরাধিকারীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। বুদ্ধ উত্তরে বলেছিলেন, ঃ "ধম্ম-বিনয়ের যেসব বিধি আমি তোমাদের সকলের জন্য দিয়েছি, আমি চলে গেলে তারাই তোমাদের আচার্য হোক।"[২] কিন্তু ক্রমশ

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, ১৪০৮, পৃঃ ২১৬

২ সাধ্য ও সাধনা—স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, পৃঃ ২৬

বৌদ্ধধর্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নানা সংস্থার উদ্ভব হয়, ভিক্ষুরা বিভিন্ন স্থানে বাস করতে থাকেন এবং সঙ্ঘবদ্ধ হন। তবু কিছু ভিক্ষু আগের মতো নিভৃতচারী থেকে যান। এই উভয় শ্রেণীর সন্ন্যাসীদের নিয়ে বৌদ্ধসঙ্ঘ গঠিত হয়। কিন্তু এই সঙ্ঘ কখনো কেন্দ্রিতভাবে সংগঠিত হয়নি।

দীর্ঘ বারো বছরের অদৃষ্টপূর্ব তপস্যার পর শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রীশ্রীজগদম্বা আদেশ করেন ঃ "ওরে, তুই ভাবমুখে থাক।"[৩] আমরা জানি, জগদ্ধিতের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বৈত এবং অদ্বৈত ভাবের মিলনভূমিতে ভাবমুখে অবস্থান করে একদিকে যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে মন রেখে জগৎকল্যাণের প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি ইন্দ্রিয়াতীত জগতের উচ্চভূমিতেও ইচ্ছামাত্রই বিচরণ করতে পারতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সর্বসাধনার ইতি করেছিলেন শ্রীমা সারদাদেবীকে ষোড়শীরূপে পূজার পরে তাঁকে নিজের সমস্ত সাধনার ফল তাঁকে সমর্পণ করে এবং শ্রীমায়ের মধ্যে জগন্মাতৃত্বের সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটিয়ে তাঁকে জগৎকল্যাণের জন্য নিয়োজিত করার আকুল প্রার্থনার মাধ্যমে। এসময়েই তাঁর জীবনের সাধনলব্ধ সকল অভিজ্ঞতা জগতের কল্যাণার্থে জগতে প্রচার এবং উপযুক্ত অধিকারীদের মধ্যে তা বিতরণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ এক অমোঘ ব্যাকুল আহ্বান জানিয়েছিলেন—"তোরা কে কোথায় আছিস, আয়।"

সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালেই তাঁর ভাবাদর্শে আগ্রহী কয়েকটি ভক্তগোষ্ঠী, বিশেষ করে কলকাতার বাগবাজার, শ্যামপুকুর, সিমুলিয়া এবং গঙ্গার পশ্চিমপাড়ে কোন্নগরে গড়ে ওঠে। এই ভক্তগোষ্ঠীর মধ্য থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ অন্তরঙ্গ বলে কয়েকজনকে বেছে নেন এবং তাঁরাই ভবিষ্যতে তাঁর ত্যাগী সন্তানরূপে পরিচিত হন। গলরোগকে উপলক্ষ্য করে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর বাগানবাড়িতে অবস্থান করতে থাকেন, তখন এই চিহ্নিত ত্যাগী সন্তানরা একত্রিত হন এবং তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এখানেই নরেন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অবর্তমানে ত্যাগী সন্তানদের নেতা নির্বাচিত করেন এবং যাতে ছেলেরা বাড়ি ফিরে না গিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ত্যাগের জীবনযাপন করে, সেব্যাপারে নরেন্দ্রনাথকে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। অন্ত্যলীলাকালে কাশীপুর অবস্থানের মধ্যে বহু সময় শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যয় করেছিলেন নরেন্দ্রনাথকে একাকী বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও শিক্ষাদানের ব্যাপারে। জগৎকে শিক্ষাদানের জন্য নরেন্দ্রকে লিখিত 'চাপরাস' দান এবং তাঁর মধ্যে শক্তিসঞ্চার করা এসময়ের অন্যতম দুটি দৈবনির্দিষ্ট ঘটনা। যাই হোক, এভাবেই কাশীপুরে নবীন সন্ন্যাসিসঙ্ঘ বা প্রথম মঠ রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের কেন্দ্রে স্থাপিত হলো।[৪]

আমাদের আলোচনায় 'ভাবান্দোলন' ও 'সঙ্ঘ' দুটি শব্দই প্রায়শ ব্যবহৃত হবে। শব্দদুটি প্রায় সমার্থক হলেও দুটির ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট থাকা দরকার। বলা যায়, 'ভাবান্দোলন' শব্দটি অতিশয় ব্যাপক এবং বেশির ভাগটাই অমূর্ত। 'সঙ্ঘ' শব্দটি সে-তুলনায় কম ব্যাপক এবং অনেকটাই মূর্ত। শ্রীরামকৃষ্ণের কাশীপুর অবস্থানের কালকেই (১১ ডিসেম্বর ১৮৮৫—১৬ আগস্ট ১৮৮৬) রামকৃষ্ণ মঠের (তখন 'সঙ্ঘ' শব্দ সমার্থক) পত্তনকাল এবং রামকৃষ্ণ মিশন গঠিত হয় ১ মে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে। পরে 'সঙ্ঘ' শব্দটি ব্যাপক অর্থে অর্থাৎ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন উভয়কেই একটি শব্দে বোঝাতে থাকে। সঙ্ঘ যেন একটি পাখি এবং তার দুটি ডানা হলো রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার সার গ্রহণ করে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনরূপ যে-প্রবাহ শুরু হয়েছিল, সেটি সঙ্ঘের এই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করার অনেক বছর আগে—শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানের সময়েই। তাই দক্ষিণেশ্বরকে রামকৃষ্ণ-ভাবগঙ্গার উৎস বলে তাকে গোমুখের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে।[৫] সেই গোমুখ থেকে উৎসারিত হয়ে রামকৃষ্ণ-ভাবগঙ্গা ক্ষীণধারায় কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় প্রবাহিত হয়ে শ্যামপুকুর (২ অক্টোবর ১৮৮৫—১১ ডিসেম্বর ১৮৮৫), কাশীপুর (১১ ডিসেম্বর ১৮৮৫—১৬ আগস্ট ১৮৮৬), বরানগর (১৯ অক্টোবর ১৮৮৬—প্রথমার্ধ ১৮৯২), আলমবাজার (প্রথমার্ধ ১৮৯২—১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮) এবং বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে মাস দশেক (১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮—৯ ডিসেম্বর ১৮৯৮) রসসঞ্চার করে বর্তমান বেলুড় মঠে (৯ ডিসেম্বর ১৮৯৮) যেন একটা বিরাট আবর্তের সৃষ্টি করেছিল। বেলুড় মঠ যেন গঙ্গোত্রী। এখান থেকেই এই ভাবধারা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং একদিন তা সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করবে—এই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের দৃঢ় প্রত্যয়। অর্থাৎ দেখা গেল ভাবান্দোলনের অমূর্ত ভাবের প্রধান ধারা যেন কালক্রমে ধীরে ধীরে জমাটবাঁধা সঙ্ঘরূপে একটি মূর্ত ভাব গ্রহণ করল।

৩ 'লীলাপ্রসঙ্গ', ১ম ভাগ, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবমুখে, পৃঃ ১

৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৬

৫ রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা—স্বামী প্রভানন্দ, পৃঃ ১৪

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেনঃ "আমাদের গুরুদেব (শ্রীরামকৃষ্ণ) ছিলেন সম্পূর্ণ মৌলিক। সুতরাং আমাদের প্রত্যেককেও হয় মৌলিক হতে হবে, নয়তো কিছুই না।"[৬] শ্রীরামকৃষ্ণের মাধ্যমে যে-সঙ্ঘের বীজবপন এবং তাঁর চিহ্নিত ত্যাগী সন্তানদের দ্বারা যেটি লালিত ও পরিচালিত, তা যে বিভিন্ন দিক থেকে মৌলিক ও অভিনব হবে তা বলাই বাহুল্য। এই নিবন্ধে স্বল্প পরিসরে আমরা সেবিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

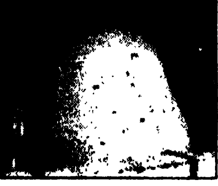
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ মূলত কোন মানুষের সৃষ্ট নয়। "এ সঙ্ঘ আমরা সৃষ্টি করিনি। ঠাকুরের অসুখের সময় এই সঙ্ঘ তিনি নিজেই সৃষ্টি করেন।"—বলেছেন মহাপুরুষ মহারাজ।[৭] পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমৎ তোতাপুরীর কাছে শাস্ত্রবিধি অনুসরণপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন একদিকে আদি শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হলেন, তেমনি কাশীপুরে তাঁর এগারো জন ভবিষ্যতের ত্যাগী সন্তানদের হাতে সন্ন্যাসের বাহ্যচিহ্নস্বরূপ গেরুয়াবস্ত্র দান করে নবীন সন্ন্যাসী সঙ্ঘকে সন্ন্যাসের গুরুপরম্পরার মধ্যে নিয়ে এলেন। "ঠাকুর তো আমাদের সন্ন্যাসী করে গিয়েছিলেনই; সেই ভাব আরো পাকা হলো আঁটপুরে।"—স্বীকার করেছেন মহাপুরুষ মহারাজ।[৮] আঁটপুরে ত্যাগব্রত সঙ্কল্পগ্রহণ এবং বরানগর মঠে দু-দফায় পনেরো জনের আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস এবং পরে বেলুড় মঠে হরিপ্রসন্নের সন্ন্যাস শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষ্যদের নিয়ে নবীন সন্ন্যাসী সঙ্ঘ সৃষ্টির ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।[৯]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ সৃষ্টির পশ্চাতে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের অসামান্য জীবন ও তাঁর দীর্ঘ বারো বছরের অলৌকিক সাধনার পুঞ্জীভূত ফল। তারই সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে বরানগর ও আলমবাজার মঠে তাঁর ত্যাগী সন্তানদের পৃথিবীর ত্যাগ-তপস্যার ইতিহাসে এক নজিরহীন বিস্ময়কর কঠোর তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রতা। তাঁদের সমবেত অদৃষ্টপূর্ব সাধনার কাহিনী নিয়েই সাড়ে পাঁচবছরের তপস্যাদীপ্ত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আত্মোৎসর্গের প্রথম হোমকুণ্ড বরানগর মঠ। যাঁরা এসময়ে মঠে যাতায়াত করতেন তাঁরা সবিস্ময়ে ভাবতেনঃ "এরা কারা? চোখ থেকে যেন অগ্নিবর্ষণ হচ্ছে, দেখতে উন্মাদের মতো।"[১০] "সে-কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেত—মানুষের কথা কি!"—স্মরণ করেছেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ।[১১] ত্যাগীদের এই দৃঢ় অপ্রতিহত মানসিকতার উৎসও শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামীজীর স্বীকারোক্তি—"শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে আমরা এক অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছি, কেবল বাক্‌সর্বস্ব না হইয়া যথার্থ জীবনযাপনের জন্য একটা ঐকান্তিক ইচ্ছা ও বিরামহীন সাধনার অনুপ্রেরণা তাঁহার নিকট আমরা লাভ করিয়াছিলাম।"[১২] সেই ঐকান্তিক ইচ্ছা ও বিরামহীন সাধনার অনুপ্রেরণার অবিচ্ছিন্ন ধারাকে ভাবিকালের কাছে জীবন্ত করে রাখার প্রয়াস প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করল এই নবীন সঙ্ঘের মধ্যে। তাই স্বামী সদানন্দ গর্বের সঙ্গে বলতেনঃ "We are not mere Sadhus, we belong to the line of prophets."[১৩]

জগতের সকলের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব বিকাশের জন্য শ্রীমা সারদাদেবীকে তিনি রেখে গিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ধর্মের ইতিহাসে অনন্য। সন্ন্যাসীর নারীগুরুকরণ, স্ত্রীগ্রহণ, নারীশিষ্যকরণ ইত্যাদি অকল্পনীয় হলেও এগুলি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের অন্যান্য ঘটনার মতোই সহজ ও স্বাভাবিক এবং একই-সঙ্গে বৈপ্লবিক। শুধু রেখে যাওয়া নয়, জগৎকল্যাণরূপ আরব্ধ ব্রতে লীলাসঙ্গিনী শ্রীমাকে অবতীর্ণ করানো এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মর্তলীলা অবসানের পর দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ধরে সন্ন্যাসী সঙ্ঘকে লালন এবং 'সর্বোচ্চ আদালত' হয়ে শ্রীমায়ের অব্যর্থ নির্দেশ দান ঐতিহাসিক এবং যুগপৎ বিস্ময়কর। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-তত্ত্বকে সুচারুরূপে ব্যাখ্যা স্বামী বিবেকানন্দ করলেও অত্যন্ত জরুরি ছিল এই তত্ত্বের একটি ব্যবহারাদর্শ জগৎকে দেখানো। সে-কাজটিই শ্রীমা তাঁর সমগ্র জীবনটি ধরে করে গেছেন। নিঃসন্দেহে শ্রীমায়ের জীবনটি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের ব্যবহারিক দিকটিকে জগৎসমক্ষে প্রকাশিত করে এই নব্য আন্দোলন ও সঙ্ঘকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করেছে। তিনি একইসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, সারদেশ্বরী আশ্রম এবং সারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন—তিনটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্ঘজননী। কোন একজন নারীর জীবনে এরকম ঘটনা শুধু অভিনব নয়, ইতিহাসেও নজিরহীন দৃষ্টান্ত। নারীমুক্তি বা নারী-জাগরণের পথপ্রদর্শক হিসাবে নারীমানসে শ্রীমা সারদাদেবী হয়ে রয়েছেন এক অনুপম আদর্শ। [ক্রমশ] (এক)

---

৬ পত্রাবলী—স্বামী বিবেকানন্দ, পৃঃ ৬১৪
৭ মহাপুরুষ শিবানন্দ, পৃঃ ১৫৫-১৫৬
৮ শিবানন্দ বাণী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০
৯ রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা, পৃঃ ২৫-২৬
১০ ঐ, পৃঃ ৬৩
১১ 'বাণী ও রচনা', ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৯
১২ পত্রাবলী, পৃঃ ৩৬২-৩৬৩
১৩ স্বামীজীর পদপ্রান্তে—স্বামী অজজানন্দ, ৪র্থ সং, পৃঃ ২৩২



অমরাবতী অমরনাথ

স্বামী প্রসন্নাত্মানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

দুপুর একটা নাগাদ পিসু চড়াইয়ের মাথায় উঠে এলাম। স্থানে স্থানে সবুজ ঘাস। চারদিকে পর্বতশৃঙ্গ। গাড়োয়াল রেঞ্জের মতো অত উঁচু নয়, কিন্তু প্রতিটি শৃঙ্গ থেকেই কিছুদুর পর্যন্ত বরফের প্রলেপ চুঁইয়ে নেমেছে। উজ্জ্বল রৌদ্র, ঠাণ্ডাও খুব বেশি নয়। অপূর্ব পরিবেশ। ওপরে গিয়ে দেখি, যাত্রীদের আপ্যায়নের বিস্তর ব্যবস্থা। দিল্লির সেবাদল ছত্র খুলেছে—গরম গরম লুচি, আলুর তরকারি, হলদিরামের ভাজি, টিনপ্যাক থেকে টাটকা-কাটা ফ্রুট স্যালাড, গ্লুকোজ, এমনকি লজেন্স পর্যন্ত। যে যত পার খাও! তাঁদের ব্যবহার, আতিথেয়তা এবং বিনামূল্যে এরকম ব্যবস্থা সত্যই মনে রাখার মতো। ধন্যবাদ তাঁদের—যাঁরা নিজেরা এত কষ্টস্বীকার করেছেন তীর্থযাত্রীদের কষ্টলাঘবের জন্য।

স্বামীজী এবং তাঁর সঙ্গীদের পিসুটপে পৌঁছাবার কিছুটা আগে একটি তুষারাবৃত পথ পেরোতে হয়েছিল। স্বামীজী নিবেদিতাকে তাঁর জীবনের প্রথম এই তুষারাবৃত পথটি পায়ে হেঁটে পেরোতে বলেছিলেন। এই কথাই ভাবতে ভাবতে পিসু চড়াই থেকে রওনা হলাম দুপুর ২টায়। চন্দনবাড়ি থেকে ৩ কিলোমিটার এসেছি, যেতে হবে আরো ৯ কিলোমিটার, তবে শেষনাগ। এই পথটি খুব চড়াই নয়, তবে নাগকোটি থেকে শেষ ৩ কিলোমিটার আবার চড়াই। এখানে দুটি ধারার সঙ্গমস্থল। একটি ধারা আসছে শেষনাগ থেকে, আরেকটি আসছে সোনাসর থেকে।

শেষনাগে পৌঁছালাম প্রায় ৬টা নাগাদ। ঘন মেঘে তখন চারিদিক ঢেকে গেছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হলো। নীলাভ-সবুজ শান্ত জলরাশি শেষনাগ। চারপাশে পাহাড়-ঘেরা। প্রতিটি পাহাড় থেকে একটি করে অর্থাৎ প্রায় ৫-৬টি ঝরনা শেষনাগে পড়েছে। এখন দুটি ছাড়া আর বাকিগুলি জমে বরফ হয়ে গেছে। দুটি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে শেষনাগ থেকে নীলগঙ্গা প্রচণ্ড বেগে নিচে ফণা তুলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। শেষনাগ যেন ধ্যানমগ্ন ঋষি! স্থির জল। এক স্বর্গীয় পরিবেশ। হবে নাই বা কেন? তপস্বী সশ্রবের নামের সঙ্গে যে শেষনাগ জড়িয়ে রয়েছে। ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে 'দুর্লভ' নামে এক নাগবংশীয় রাজা কাশ্মীরে রাজত্ব আরম্ভ করেন। এই বংশের রাজা সুশ্রবস এই হ্রদটি খনন করান এবং এর তীরে তপস্যা করে এটিকে তীর্থে পরিণত করেন। তাঁরই নামে এর নাম হয় 'সুশ্রবনাগতীর্থ' বা 'শেষনাগ'। অনেকে বলেন তুষারস্রাব বা ঝরনাগুলি সর্পিলগতিতে এই হ্রদে পড়েছে, তাই 'স্রাবনাগ' ক্রমে 'শেষনাগ'-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

প্রায় আধঘণ্টা একইভাবে দাঁড়িয়ে শেষনাগকে দেখছি। অমরেশ্বর চাননি যে, অমরকথা শুনে সবাই অমর হয়ে যাক। তাই তাঁর গলায় জড়ানো সাপটিকে তিনি রেখে যান শেষনাগে। সাপটি কিন্তু তাঁর কৃপায় অমর হয়ে গেছে। অমরনাথজীর ছড়ি যখন নিচে নিয়ে গিয়ে হ্রদের তীরে একটি নির্দিষ্ট পাথরের ওপর রেখে পূজারী ও সাধুরা স্নান সারেন শেষনাগের জলে, তখন নাকি একটি দুধের মতো সাদা পঞ্চমুখী সাপ উঠে দাঁড়ায় ছড়ির কাছে। নীরবে প্রণতি জানায়। মহন্তজী তাঁকে খেতে দেন। তখন ধীরে ধীরে সাপটি চলে যায় শেষনাগের অতল গহ্বরে একবছরের জন্য। সবটাই অবশ্য লোকমুখে শোনা গল্প।



শেষনাগের শ্রী সৌন্দর্য

প্রায় অর্ধবৃত্তাকার পথ ঘুরে পৌঁছালাম তাঁবুর কলোনিতে। অনেক খুঁজে তবে পেলাম আগে থেকে ঠিক করা আমাদের সরকারি তাঁবু। খুব ভাল ব্যবস্থা। মাটিতে মোটা প্লাস্টিক শিট, একটা মোটা তোষক, দুটি কম্বল, একটি বালিশ, জেনারেটরের আলো, জায়গায় জায়গায় লোহার কল, মেডিকেল টেন্ট। অনুসন্ধানকেন্দ্র থেকে কোন পিট্টু বা যাত্রীর নাম ধরে খোঁজা হচ্ছে। লঙ্গরখানায় খাওয়ার ব্যবস্থা, কখন কি খাবার পাওয়া যাচ্ছে বা যাবে তাও ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে মাইকে।

আজ ১৯ জুলাই। আগামী কাল গুরুপূর্ণিমা। শেষনাগে রাত্রে একটু বেশি ঠাণ্ডা অনুভব করলাম। সেবা ট্রাস্ট থেকে গরম গরম ডাল-ভাত খেয়ে রাত ৯টা নাগাদ তাঁবুতে ফিরেও শুতে পারলাম না। প্রকৃতি তাঁর অপূর্ব সুষমায় সর্বত্যাগী গিরিশের মহিমাকে যেন আরো বড় করে তুলেছেন। শুধু অমরনাথের গুহাতেই নয়, সারাটা পথেই ব্যাপ্ত রয়েছেন ত্রিলোকনাথ শম্ভু। শেষনাগের প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন ঃ "দুই পার্শ্বে চিরতুষারাবৃত পর্বতমালা। ... হ্রদটির দৃশ্য উপরের পথ হইতে এইরূপ সুন্দর দেখায় যে, ইহাকে স্বর্গের অপ্সরাদের স্নানের স্থান বলিয়া ভ্রম হয়।"

এই জায়গাটির অপর নাম 'বায়ুযান' বা 'ওয়েবযান'। একসময় এখানে বায়ুরূপী এক ভয়ঙ্কর অত্যাচারী দৈত্য বাস করত। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেবতারা মহাদেবের কাছে এলেন। কিন্তু দৈত্য যে শঙ্করেরই ভক্ত! দেবতাদের একান্ত অনুরোধে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিতে হলো যে, ত্রিভুবনের

মঙ্গলের জন্য নারায়ণ যদি বায়ুদৈত্যকে বিনাশ করেন, তবে তিনি বাধা দেবেন না। তখন ভগবান বিষ্ণু শেষনাগ তথা বাসুকীনাগকে আদেশ দিলেন মর্তে এসে বায়ুদৈত্যকে বিনাশ করতে। শেষনাগ মর্তে এসে এক নিঃশ্বাসে এই স্থানের বায়ু শুষে নিলেন। বায়ুর অভাবে সঙ্গে সঙ্গে বায়ুদৈত্যের প্রাণ নিঃশেষিত হলো, আর এই রমণীয় উপত্যকার নাম হলো 'বায়ুযান'। এখানে তাই অক্সিজেনের অভাব আছে। বহু যাত্রীর এখানে নিঃশ্বাসের কষ্ট হয়। কাশ্মীরি ভাষায় 'নাগ' শব্দের অর্থ 'সরোবর' বা 'জলাশয়'। এরপর আর কোন জলাশয় পাওয়া যায় না। তখন শুধুই বরফের রাজত্ব আর নদী। তাই হয়তো এই জলাশয়ের নাম 'শেষনাগ'। নাগাধি-রাজের কৃপায় আমাদের কিন্তু এখানে কোন কষ্ট হয়নি।



তুষারাবৃত পথে যাত্রিদল পুণ্যতীর্থ মানসে

পরদিন সকালে আমাদের তৈরি হয়ে বেরতে প্রায় ৮টা বেজে গেল। ঝলমলে রৌদ্র। দলে দলে যাত্রীরা 'অমরনাথজী কি জয়', 'ব্যোম্ ব্যোম্ ভোলে' জয়ধ্বনিতে হিমদেবতাকে স্পর্শের আকাঙ্ক্ষায় এগিয়ে চলেছে। সেবা ট্রাস্টের স্বেচ্ছাসেবকরা প্রায় জোর করেই কাজু-কিসমিস-কেশরী দেওয়া সুস্বাদু হালুয়া খাওয়ালেন। তারপর হাঁটা। আমরা এখন যে-পাহাড়টিতে রয়েছি, সেই পাহাড় থেকেও একটি বড় জলধারা শেষনাগে পড়েছে। সেই ধারাটির পাশ দিয়ে আমরা চলেছি অমরনাথ-পথের সর্বোচ্চ চড়াই মহাগুণাস গিরিবর্ত্মের দিকে। এই মহাগুণাসই এই ধারাটির উৎস। এই পথটি শুধুই চড়াই। বায়ুযান পেরতেই বরফ শুরু হয়ে গেল। হাঁটছি, কখনো কখনো দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি আর প্রাণভরে দেখে নিচ্ছি সীমার মাঝে অসীম যিনি সেই বিরাট ভগবানকে। শেষনাগ থেকে ৫ কিলোমিটার দূরেই কিংবদন্তির মহাগুণাস টপ। মানুষের জীবনটাও এইরকম চড়াই-উতরাই। কখনো আনন্দ, কখনো দুঃখ, আর প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে জীবনটাকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া। পথের শেষে এই সংসারচক্র থেকে নিষ্ক্রমণ। কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম, আবার চড়াই-উতরাই। জীবনের সঙ্গে এত মিল আছে বলেই বোধহয় মানুষ দলে দলে ছুটে আসে পাহাড়ের টানে। আর আছে বিরাটের সমারোহ। এই বিরাটের মধ্যেই অনন্ত হাতছানি দিয়ে ডাকে মানুষকে তার স্বরূপ দেখানোর জন্য। তাই তো যুগ যুগ ধরে সাধু-সন্তরা বেছে নেন হিমালয়ের সুকোমল স্নেহনীড়।

মিলিটারিরা খাবার জন্য যাত্রীদের নুন-জল দিচ্ছেন মহাগুণাস টপের নিচে। ৪,২৭৬ মিটার ওপরে কয়েক বর্গফুট সমতল অংশ। সেখানে রয়েছে চিকিৎসাকেন্দ্র, অক্সিজেন, খাবারের দোকান, বিশ্রামের জন্য তাঁবু, সহায়তা করার জন্য সেনাবাহিনী আর নিষ্ঠাবান সেবাদল কর্মীরা। অমরনাথজীর কৃপায় পার হয়ে গেলাম মহাগুণাস টপও। দেবাদিদেবের কৃপায় কোন যাত্রীকেই খুব একটা বিপর্যস্ত হতে দেখলাম না। এর পরের রাস্তাটা শুধুই নামা। পৌষপাত্থরী থেকে ৮ কিলোমিটার হেঁটে বেলা ৩টে নাগাদ পৌঁছালাম পঞ্চতরণী। এখানেও একটা ছোটখাট তাঁবুর শহর হয়েছে। বহু অনুসন্ধান করে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট তাঁবুটি বের করলাম। এখানেও শেষনাগের মতো সুন্দর ব্যবস্থা। সুন্দর নীল আকাশ। সাদা-সাদা মেঘের টুকরো ও পর্বতশিখরের বরফ মেশামেশি করে আমাদের ঘিরে রেখেছে। ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন : "At these heights we often found ourselves in great circles of snow-peaks. Those mute giants that have suggested the Hindu mind the idea of the Ash-encovered God."[২]

অনেকটা সবুজ, কিন্তু পাথুরে সমতলকে কয়েকটি খরস্রোতা নদী আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে—এটাই পঞ্চতরণী। স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন : "পঞ্চতরণীর পাঁচটি ধারা পার হয়ে 'ভৈরবঘাট' বা 'বৈরাগীঘাট' পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত নাতিবৃহৎ মাঠ। এটাই পঞ্চতরণী। দুটি ধারায় জল এক হাঁটুর কম, অপরগুলি গভীর ও বেগবতী। অনেকে এই পাঁচটি ধারার নাম বলেন—'ভীমা', 'ভগবতী', 'সরস্বতী', 'ঢাকা' ও 'বর্গশিখা'। একটি কাঠের পুলের ওপর দিয়ে একটির পর একটি নদী পেরিয়ে উঠে এলাম মালভূমির মতো একটি উপত্যকার উঁচু অংশে। এখানেই আমাদের তাঁবু। ঝলমলে রোদ। শেষনাগ থেকে ঠাণ্ডা অনেক কম।

কথিত আছে, পার্বতীকে পর্বতগুহায় নিয়ে যাওয়ার সময় অমরনাথ যখন আনন্দে নৃত্য করেছিলেন, তখন তাঁর জটাজাল থেকে উৎসারিত হয়েছিল স্রোতস্বিনীর ধারা পঞ্চতরণী। আসলে একটি ধারাই এই সমতলে পাঁচটি ভাগে ভাগ হয়েছে এবং পরে আবার একটি ধারায় পরিণত হয়েছে। তীর্থের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক পুণ্যার্থীকে স্নান করতে হয় পঞ্চতরণীতে। তারপর ভূর্জপত্রের বস্ত্র পরে বা কৌপীনমাত্র পরে বা সম্পূর্ণ পাশমুক্ত বিবস্ত্র হয়ে শিবদর্শন করতে হয়। স্বামীজীও স্নান করেছিলেন পঞ্চতরণীতে। নিবেদিতা

২ Notes of Some Wanderings with Swami Vivekananda, p. 95

লিখেছেন : "এখানকার ঠাণ্ডা বেশ শুষ্ক ও প্রীতিপ্রদ ছিল। ছাউনির সম্মুখে এক কঙ্করময় শুষ্ক নদীগর্ভ। উহার মধ্য দিয়া পাঁচটি তটিনী চলিয়াছে। ইহাদের সকলগুলিতেই, একটির পর অপরটিতে ভিজা কাপড়ে হাঁটিয়া গিয়া যাত্রিগণের স্নান করার বিধি। সম্পূর্ণ লোকের নজর এড়াইয়া স্বামীজী কিন্তু এই নিয়মটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন।"[৩]

সেদিন রাত্রে তাঁবুতে কাটিয়ে পরদিন ২১ জুলাই ১৯৯৭ সকাল ৭টায় অমরনাথ গুহায় রওনা হলাম। এখান থেকে অমরনাথ গুহা ৬ কিলোমিটার। গতকাল আমরা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে এসেছি, এবার উত্তরদিকে চললাম। আমাদের বাঁদিকে পঞ্চতরণীর জলধারা, আর ডানদিকে পাহাড় অনেকটা দূরে। এখান থেকে সন্ত সিং মার্গ ধরে প্রথম ৩ কিলোমিটার খুব চড়াই, আর শেষ ৩ কিলোমিটার সমতল। আধ কিলোমিটার যেতে না যেতেই একটা ছোট কিন্তু বিপদসঙ্কুল গ্লেসিয়ার পেরতে হলো। পণি ও যাত্রীদের পায়ের চাপে বরফ খুব তাড়াতাড়ি গলে যাচ্ছে, ফলে জলকাদায় পাথর আলগা হয়ে হুড়মুড় করে বসে যাচ্ছে। সরকারি কর্মীরা অন্য একটি পথ তৈরি করেছেন। অমরনাথ-যাত্রার সারাটা রাস্তার মতো এখানেও কয়েক মিনিট অন্তর পিছন থেকে ঘোড়াওয়ালাদের সতর্কতামূলক 'হৌস' শব্দে দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। প্রায় ৩ কিলোমিটার চড়াই ভাঙার পর দেখলাম নিচ থেকে একটি রাস্তা মিশেছে আমাদের এই রাস্তাটির সঙ্গে। ওটি বালতালের রাস্তা। শোনমার্গ থেকে বালতাল হয়ে অমরনাথ গুহা মাত্র ১৫ কিলোমিটার। কিন্তু রাস্তা খুব খাড়া। এখানেই পবিত্র গুহার নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া অমরগঙ্গা ও পঞ্চতরণীর ধারার সঙ্গমস্থল। এতক্ষণ আমরা পঞ্চতরণীকে বাঁদিকে রেখে আসছিলাম। এবার সঙ্গমকে বাঁদিকে রেখে অমরগঙ্গার ধার ধরে গুহা পর্যন্ত যাব। এই পথটা উতরাই, সমতল আর সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা। পথ চলতে খুব ভাল লাগে, কিন্তু খুব পিচ্ছিল। কিছুদূর এগতেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। অমরতীর্থ অমরনাথের অমর গুহা (৩,৯৫২ মিটার) দেখা যাচ্ছে। বিশাল গুহা। এতদিন যেমনটি ছবিতে দেখেছি। অমরনাথ পর্বতের চূড়াটি দেখতে চেষ্টা করলাম। টুকরো টুকরো ধূসর মেঘের ফাঁক-ফোকর দিয়ে বুঝতে পারলাম না। ঝকমকে রৌদ্র। নিচে অমরগঙ্গার শীতল-স্বচ্ছ জলে বহু পুণ্যার্থী স্নান করছেন।

স্বামীজীরাও গুহার সামনের এই কয়েক কিলোমিটার তুষারাবৃত পথ পেয়েছিলেন। স্বামীজী রোক করে একটা খাড়া চড়াই ভেঙে ওঠার ফলে ক্লান্ত হয়ে সঙ্গীদের থেকে একটু পিছিয়ে পড়েন। নিবেদিতা লিখেছেন : 'অনেক বিলম্বে স্বামীজী আসিয়া পৌঁছিলেন ও 'আমি স্নান করিতে যাইতেছি, তুমি এগোও'—এই কয়টি মাত্র কথা বলিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। অর্ধঘণ্টা পরে তিনি শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।"[৪]

নদীতট থেকে উঁচুতে রাস্তার ধারে সারি সারি দোকান তৈরি হয়েছে। বিক্রি হচ্ছে পূজার উপকরণ, খাবার, তুষারলিঙ্গের ছবি ইত্যাদি। আপৎকালীন রাত্রিবাসের জন্য কয়েকটি তাঁবু রয়েছে, রয়েছে মিলিটারি ক্যাম্প। এইসব পেরিয়ে শুরু হলো সিঁড়ি। সিঁড়ির বাঁদিকে অমরনাথ পাহাড় থেকে একটা ঝরনা নেমে এসে অমরগঙ্গায় মিশেছে। এখান থেকে গুহার প্রবেশপথ প্রায় ১০০-১৫০ ফুট ওপরে। সিঁড়িতে নিরাপত্তাবাহিনী শেষবারের মতো যাত্রীদের পরীক্ষা করে নিচ্ছে। ক্যামেরা থাকলে ফটো তুলে দেখে নিচ্ছে সত্যই সেটা ক্যামেরা কিনা! অনেকে বলাবলি করছে, এখানে নাকি প্রায় ১৬০টি সিঁড়ি আছে। ৩,৯৫২ মিটার উঁচুতে প্রায় ৬০০ ফুট উঁচু আর ১৫০ ফুট চওড়া গুহামন্দির।



দূর থেকে দৃশ্যমান অমরনাথ গুহা

সেই কোন্ কালে এক পথভ্রষ্ট মেষপালক গুর্জর সম্প্রদায়ের আক্রাম বাট মল্লিক সামনের পাহাড়ে বিরাট এক গুহার মুখ ও ভিতরে জ্বলন্ত প্রভা দেখতে পায়। দুরন্ত শীত, তার ওপর শিলাবৃষ্টি, সঙ্গে একপাল মেষ! কোনরকমে অমরগঙ্গা পার হয়ে রাত্রির জন্য সে আশ্রয় নেয় সেই গুহায়। পরদিন সকালে তার সঙ্গীরা আবিষ্কার করল, সেই গুহা, গুহাদেবতা আর হারিয়ে যাওয়া গুর্জরকে। সেই অপরূপ তুষারশুভ্র হিমলিঙ্গের চরণে মাথা রেখে তারা প্রতিজ্ঞা করল—"যতদিন গুর্জর, যতদিন এই পথ, ততদিন তোমার পূজা।" আজও তাই পহলগাঁও থেকে ৬ মাইল পূর্বে বটকূট গ্রামবাসী মুসলমান এই গুর্জর সম্প্রদায় প্রতি শ্রাবণী পূর্ণিমায় ছড়ি আসার জন্য এই পথ পরিষ্কার রাখে। আজও অমরনাথজীর মোট পূজার এক-তৃতীয়াংশ পায় এই মুসলমান গুর্জর সম্প্রদায়, এক-তৃতীয়াংশ পায় মার্তণ্ডের পাণ্ডা পূজারীরা এবং এক-তৃতীয়াংশ পায় শ্রীনগর শঙ্করাচার্য মঠাধীশ। ভারতবর্ষে একমাত্র এই তুষারশিব অমরনাথজীকেই হিন্দু, মুসলমান এবং শিখ—এই তিন সম্প্রদায়ই দর্শন, পূজন ও ভজন করে থাকেন।

---

৩ স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ১১৫ ৪ ঐ

অমরনাথজীর ইতিহাস আরো পুরনো। কাশ্মীর ও হিমাচলের সর্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাস কলহনের 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, প্রায় তিনহাজার বছর আগে 'রামদেব' নামে কাশ্মীরে এক রাজা ছিলেন। তিনি 'শুকদেব' নামে এক লম্পট রাজপুরুষকে এই মহাতীর্থে বন্দী করে রেখে পরে নীলগঙ্গায় ফেলে হত্যা করেন। 'রাজতরঙ্গিণী'তে আরো বলা হয়েছে যে, খ্রিস্টপূর্ব ৩৪ থেকে ১৭ সাল পর্যন্ত রাজত্বকালের কোন একসময় তৎকালীন কাশ্মীরের মহারাজ সৈদিমতি তুষারলিঙ্গ দর্শন করেছিলেন। মধ্যযুগে সম্রাট আকবরের সভাসদ আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে তুষারতীর্থ অমরনাথ যাত্রার বিবরণ দিয়েছেন। বর্তমান যুগে পণ্ডিত হরিদাস টিকু এই যাত্রাকে জনপ্রিয় করে তোলেন।

সত্যযুগে মহর্ষি ভৃগু প্রথম এই গুহার সন্ধান পান। তিনি তক্ষককে শ্রাবণী পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে গুহাতীর্থে অমরনাথজীর সুধালিঙ্গ দর্শন করার নির্দেশ দেন। সঙ্গে দেন একটি দণ্ড (ছড়ি), কারণ দণ্ড হাতে থাকলে কোন বিপদ হবে না। সেই থেকে আজও প্রতি শ্রাবণী পূর্ণিমায় দণ্ড যাচ্ছে অমরনাথে। নামে 'ছড়ি' হলেও এটি আসলে একটি রূপার দণ্ড। বছরের অন্য সময়ে এই ছড়ি থাকে শ্রীনগরের বর্ষাচকে দশনামী আখড়ায়।

'ব্যোম্ ব্যোম্ ভোলে', 'জয় অমরনাথ বাবা কী জয়' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত। অতগুলি সিঁড়ির শেষে আমরা পবিত্র গুহামন্দিরের প্রথম ধাপে প্রবেশ করলাম। বেশ বিস্তৃত চাতালের মতো জায়গা। সেখানে জুতো খুলে আরো কয়েকটি সিঁড়ি উঠে দ্বিতীয় ধাপে উঠলাম। এটিও চাতালের মতো বিস্তৃত অংশ, কিন্তু আগেরটির চেয়ে ছোট। অনেকে পায়ে পলিব্যাগ বেঁধেছেন, কারণ গুহার ভিতরে সর্বদাই অজস্র ধারায় টপ্‌টপ্ করে জল পড়ছে। বেশ ঠাণ্ডা। সূর্যের আলোও কম, রৌদ্র ঢোকে না। কথিত আছে, চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে এই লিঙ্গের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। পূর্ণিমাতে মহাদেবের পূর্ণমূর্তি দেখা যায় এবং অমাবস্যায় খুব কমে যায়। আরো চারটি সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে তৃতীয় চাতালটিতে উঠলাম। এটি আয়তনে খুব ছোট। গুহার শেষপ্রান্তের কোমর-সমান উঁচু পাথরের বেদি, লোহার রেলিং দিয়ে আড়াল করা। বেদির ওপরেই স্বয়ম্ভু অমরনাথের অমরলিঙ্গ। ধীরে ধীরে সেই তুষার-স্ফটিক লিঙ্গের সামনে এসে দাঁড়ালাম। কম্পিত হস্তে স্পর্শ করলাম লিঙ্গ থেকে বিস্তৃত অংশের তুষারগাত্র। মুঠো ভরে অঞ্জলি দিলাম সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সচন্দন বিল্বপত্র—

"ত্বত্তো জগদ্ভবতি দেব ভব স্মরারে।
ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মৃড় বিশ্বনাথ।।
ত্বয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ।
লিঙ্গাত্মকং হর চরাচরবিশ্বরূপিন্।।"

এই পরম মুহূর্তটিতে অমরনাথ শিবলিঙ্গের সামনে শিবতুল্য স্বামী বিবেকানন্দের অনুভূতির একটু আভাস নিবেদিতা দিয়েছেন—"বিরাট গুহার সূর্যকিরণ-রহিত এক অংশে বিশাল তুষারলিঙ্গের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার (স্বামীজীর) মনে হইল, তিনি মহাদেবের প্রত্যক্ষ দর্শনে ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার অঙ্গ তখন ভস্মাবৃত, পরিধানে কৌপীন ব্যতীত অন্য বস্ত্র নাই। গুহা তখন মহাদেবের স্তুতিবাদে ও 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' রবে মুখরিত। স্বামীজী ভক্তিবিহ্বল চিত্তে সকলের অলক্ষিতে কয়েকবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া লইলেন এবং অতঃপর একটা ভাবাবেগ সামলাইবার জন্য অকস্মাৎ দ্রুতপদে বাহিরে নির্গত হইলেন। তাঁর বদনমণ্ডল তখন আরক্তিম—চোখের সম্মুখে শিবলোকের সমস্ত দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে—তিনি দেবাদিদেবের শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়াছেন। পরে তিনি বলেছিলেন যে, পাছে তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়েন, এইজন্য নিজেকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু, তাঁহার দৈহিক ক্লান্তি এত অধিক হইয়াছিল যে, জনৈক ডাক্তার পরে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার হৃৎপিণ্ডের গতিরোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তৎপরিবর্তে উহা চিরদিনের মতো বর্ধিতায়তন হইয়া গিয়াছিল।"[৫]

প্রায় ছয়-সাড়ে ছয় ফুট সুকঠিন উজ্জ্বল বরফের লিঙ্গমূর্তি। পিছনের দিকটা সরু হয়ে ওপরের অজ্ঞাত গহ্বরে মিলিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে যেন চন্দ্রচূড়ের মাথায় অনন্তনাগ ফণাবিস্তার করে রয়েছেন। লিঙ্গদ্বারের বামদিকে নিচের চাতালে তুষার গণেশ, দক্ষিণে একই বেদির ওপর পার্বতী। যুক্তি না মানলেও দর্শনে মন যেন মেনে নেয় যে, সেই শুকপাখিটি এখনো গুহায় উড়ে বেড়াচ্ছে। সব দর্শন করে প্রায় ঘণ্টাখানেক গুহার মধ্যে কাটিয়ে প্রণাম করে নেমে আসতে লাগলাম। তখন আকাশে মেঘের ঘনঘটা। ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।

অমরনাথ যাত্রাকালে মঠের প্রবীণ সাধুরা আমাদের বলেছিলেন ঃ "অমরনাথ যাচ্ছ, দেখো খালি হাতে যেন ফিরো না।" স্বামীজীও দর্শনের পর নিবেদিতাকে বলেছিলেন ঃ "You do not now understand, but you have made the pilgrimage, and it will go on working. Causes must bring their effects. You will understand better afterwords. The effect will come."[৬] স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী বিফলে যাওয়ার নয়। সুধালিঙ্গ দর্শনে তাঁর কাছে তাই সেই সনাতন প্রার্থনাই করি—"বহুজনসুখায়, বহুজন-হিতায়।" [সমাপ্ত] ❑

৫ স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ১১৫ ৬ Notes of Some Wanderings with Swami Vivekananda, p. 97

হে ৪ঠা জুলাই

স্বামী বিবেকানন্দ

অনুবাদঃ অঙ্কুর সাহা

দেখ, সেই ঘন কালো পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ
সারারাত পর্দার মতো ঢেকেছিল ধরিত্রীকে,
এখন তারা গলে যায়, মিলিয়ে যায়।
পৃথিবীর ঘুম ভাঙে তোমার যাদুকাঠির
ছোঁয়ায়। পাখিরা দলবেঁধে গান গায়।
ফুলেরা তাদের শিশিরভেজা তারাখচিত
মুকুট পরে তোমায় স্বাগত জানায় হাত নেড়ে।

গভীর ভালবাসায় জলাশয়েরা মেলছে
লক্ষ লক্ষ পদ্মচোখ, তোমায় স্বাগত জানাতে
তাদের অন্তরের অন্তঃপুর থেকে।
তোমাকে আহ্বান জানাই, হে আলোকময়!
আজকের দিনে তুমি স্বাগতম্।
হে সূর্য, তোমার আলোর সঙ্গে ঝরছে মুক্তি।

ভেবে দেখ, কিভাবে প্রতীক্ষা করেছে পৃথিবী এতদিন
আর খুঁজেছে তোমায় দেশে দেশে, কালে কালে।
কেউ ছেড়েছে ঘরের মায়া, কেউ স্বজন বন্ধুবান্ধব
তোমার সন্ধানে বরণ করেছে আত্মনির্বাসন,
পার হয়েছে বিষণ্ণ সাগর আর আদিম অরণ্য,
পায়ে পায়ে তার জীবনমরণ লড়াই।

তারপর একদিন তাদের পরিশ্রমের ফল ফলল
তাদের সাধনা, আকাঙ্ক্ষা ও আত্মত্যাগ
সফল হলো, পূর্ণ হলো, স্বীকৃত হলো।
তখন তুমি সন্তুষ্ট, প্রসন্ন মনে উঠে দাঁড়িয়ে
মানবজাতিকে দেখালে মুক্তির আলো।

হে প্রভু, তুমি এগিয়ে চল অপ্রতিরোধ্য পথে
যতক্ষণ না মধ্যদিনের আলো ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীময়,
তোমার আলো বিকীর্ণ হয় দেশে দেশে
আর নিপীড়িত নরনারী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে
দেখায় তাদের হাতপায়ের ভাঙা শেকল, আর
অনুভব করে অপার আনন্দ ও পুনর্জীবন!*

---

* 'To The Fourth of July', The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V

ভাষা কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। তাই অনুবাদ-সাহিত্যও প্রগতিশীল। যে-কবিতার অনুবাদ হয়েছে, পঞ্চাশ বছর পরে তার আবারও অনুবাদ হওয়া তাই দোষনীয় কখনোই নয়।

১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস। এর ঠিক ১২২ বছর পরে ১৮৯৮ সালের ৪ঠা জুলাই স্বামীজী তাঁর শিষ্যশিষ্যাদের সঙ্গে কাশ্মীর উপত্যকায় ভ্রমণে রত ছিলেন। ঐদিন তিনি এই কবিতাটি লেখেন এবং পাঠ করেন ভোরে প্রাতরাশের সময়। ৪ বছর পরে ঐ একই দিনে স্বামীজীর মহাপ্রয়াণ। প্রসঙ্গত, তৃতীয় রাষ্ট্রপতি টমাস জেফারসনের (১৭৪৩-১৮২৬) মৃত্যুদিনও ৪ঠা জুলাই।—সম্পাদক

কৃপা কর

বনফুল

স্বামীজী, তোমার মুখোমুখি হতে
লজ্জা পাই
তোমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করার
সাহস নাই।
শুনেও শুনিনি তব বীর-বাণী
চেয়েছিলে যাহা হইতে পারিনি
স্কন্ধে ঝুলালে ভিক্ষার ঝুলি
দ্বারে দ্বারে শুধু ভিক্ষা চাই।
এ অভাগাদের কি হবে উপায়
বলে দাও দেব তুমি তাহাই।
বীর সন্ন্যাসী হে শক্তিমান
বাড়ায়ে তোমার বজ্রমুঠি
নরক হইতে টেনে তোল প্রভু
ধরিয়া মোদের চুলের ঝুঁটি
মোরা নই তব স্পর্শ-যোগ্য
হয়েছি ঘৃণ্য কামের ভোগ্য
তবু কৃপা কর, পঙ্ক হইতে
পঙ্কজদল উঠুক ফুটি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ কবিতাটি হাওড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের সুবর্ণজয়ন্তী (১৩৮৩ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায় মুদ্রিত।

আমায় তুমি সাজাও গো নাথ

অমিতাভ ভট্টাচার্য

আমায় তুমি সাজালে নাথ
তোমার আপন হাতে
প্রেম-মমতা-ভালবাসা
মান-অভিমান বিত্ত আশা
সকল দিয়ে আমায় নানান
প্রসাধনের সাথে
আমায় তুমি সাজালে নাথ
তোমার আপন হাতে।

তোমার সাজে সখার ডোরে
পেলেম সবায় আপন করে
পাখির ডাকে প্রাণ জুড়ালেম
ফুলের শোভায় প্রাতে
আমায় তুমি সাজালে নাথ
তোমার আপন হাতে।

এ-সাজ পরে তোমার সভায়
বসতে হবে এ বড় দায়
তোমার সাজের যোগ্য কর
তোমার করুণাতে
আমায় তুমি সাজাও গো নাথ
তোমার আপন হাতে।

তুমি যে জ্যোতির্ময়

নারায়ণচন্দ্র সাউ

রাজার রাজা হে বিবেকানন্দ, তুমি যে জ্যোতির্ময়
সম্রাট তুমি আজীবন এক, তুমি চিরনির্ভয়
তুমি যে জ্যোতির্ময়।

সপ্তঋষির এক ঋষি তুমি আকাশে তারকা আঁকা,
শ্রীরামকৃষ্ণ-পরশে নিখাদ প্রোজ্জ্বল হোমশিখা,
তব হোমানলে অপনীত হোক মালিন্য সংশয়,
যত অপমান ভয়।
রাজার রাজা হে বিবেকানন্দ, তুমি যে জ্যোতির্ময়।

তোমারি মধ্যে ঝলকে শানিত খাপখোলা তলোয়ার,
দুচোখে তোমার আঠারো সূর্য জ্বলন্ত দুর্বার।
বিশ্বভুবনে বিবেকানন্দ উজ্জ্বল অক্ষয়,
চিরবিদ্রোহী নটরাজ তুমি নির্ভয়, দুর্জয়।
রাজার রাজা হে বিবেকানন্দ, তুমি যে জ্যোতির্ময়।

অন্যেরা যদি দীপশিখা হয়, তুমি যে জ্ঞানের সূর্য,
পুরুষ মধ্যে পুরুষোত্তম, হৃদয়ে ক্ষাত্রবীর্য।
সহস্রদল পদ্ম তুমি যে হোমাপাখি নীলাকাশে,
রামকৃষ্ণের আত্মার বাণী তব হৃদে উচ্ছ্বাসে।
প্রচারিলে তুমি বেদ-উপনিষদ্ বিশ্বভুবনময়,
রাজার রাজা হে বিবেকানন্দ, তুমি যে জ্যোতির্ময়।
সম্রাট তুমি আজীবন এক, তুমি চিরনির্ভয়,
তুমি যে জ্যোতির্ময়।

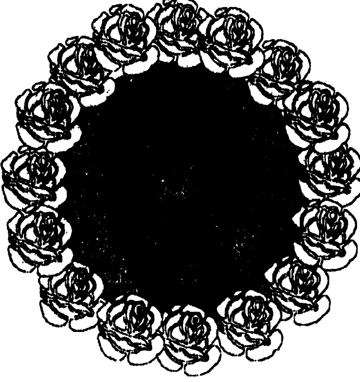
কন্যাকুমারীতে স্বামী বিবেকানন্দ

মঞ্জুভাষ মিত্র

আঠারশো বিরানব্বই সালের কথা—বছরের শেষদিকে
নবীন সন্ন্যাসী স্বামীজীর আগমন কন্যাকুমারীতে
নাগরকয়েল থেকে পদব্রজে এসেছেন তিনি
এসেছেন নিরজনে অনন্তের কাছ থেকে নির্দেশ নিতে
ঈশ্বর অনন্ত, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের কাছে,
সারদা মায়ের ছবি ভ্রাম্যমাণ হৃদয়ে লুকানো আছে
সেও তো পরমা সত্য; মানুষের সেবাধর্ম অঙ্গীকার করে,
মানুষকে ভালবাসা শ্রেষ্ঠ ধর্ম—এই কথা শেখাবেন বলে
তিনসাগরের মিলনবিন্দুতে তিনি ধ্যানরত মগ্ন চোখ বুজে
এই স্থান মন্ত্রপূত, এখানে রয়েছে কন্যাকুমারিকা দেবীর মন্দির
নীল জলধির বুকে অনতিদূরেই দুটি শিলাখণ্ড জেগে
দিব্যজননীর শ্রীচরণ ছোঁয়া আজও ঐখানে লেগে
শিবকে পাবেন বলে তন্ময়ী তপস্যা এইখানে করেছেন তিনি
শশীভালী তিনি উমা দিগন্তদর্পণে তিনিই শিবানী
স্বামীজীর কানে আসে মহা নীলসাগরের বাণী
তাঁর দুটি চোখে স্বপ্ন দিতে ছুটে আসে উথালপাথাল নীল ঢেউ
এইখানে তিনি এসেছেন একথা কি জানে কেউ
অচিরেই বিশ্বজয়ী হয়ে ফিরবেন আমেরিকা-শিকাগোর থেকে
জন্মভূমির মানুষকে ভালবেসে জীবনকে উৎসর্গিত করবেন তিনি
হে সমুদ্র সাক্ষী থাক, হে কন্যাকুমারী সাক্ষী থাক
শতাব্দী শতাব্দী কেটে গেল,
আমরা এখনো আছি অমৃতের পুত্র ঐ দেবসন্ন্যাসীর কাছে ঋণী।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন*

বাল গঙ্গাধর তিলক



স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি বরেণ্য দেশপ্রেমিক বাল গঙ্গাধর তিলকের শ্রদ্ধা নিবেদন। ৪ জুলাই ১৯০২ স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের সংবাদ পেয়ে লোকমান্য তিলক ৮ জুলাই ১৯০২ মারাঠি ভাষায় প্রকাশিত 'কেশরী' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে স্বামীজীর প্রতি তাঁর ভাবাবেগপূর্ণ এই শ্রদ্ধার্ঘ্যটি নিবেদন করেন। পুনার এস. ভি. সহস্রবুদ্ধে কর্তৃক অনূদিত এবং ঈষৎ পরিমার্জিত হয়ে ইংরেজি ভাষায় সেই লেখাটি জুলাই ২০০০ সংখ্যার 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বর্তমান রচনাটি ঐ ইংরেজি লেখার বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ করেছেন রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।—সম্পাদক

গত শুক্রবার বেলুড় মঠে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের সংবাদ শুনে হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হাজার হাজার মানুষ গভীর শোকাচ্ছন্ন। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের নামের সঙ্গে পরিচিত নন, এমন হিন্দুর সংখ্যা খুবই কম। ঊনবিংশ শতাব্দীকে 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান'-এর ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতির শতাব্দী বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। সেই শতাব্দীরই শেষ অর্ধে পাশ্চাত্য দেশের বুদ্ধিজীবিগণের মনে ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছরের প্রাচীন সেই সনাতন আধ্যাত্মিকতার আলো জ্বালিয়ে দেওয়া, ঐ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মনোহারিত্ব সম্বন্ধে তাঁদের অবহিত করানো এবং যে-দেশের মানুষের মধ্যে এমন একটি বিজ্ঞানের উন্মেষ ঘটেছে, তাঁদের সম্বন্ধে একটি শ্রদ্ধামিশ্রিত সহৃদয়তার ভাব জাগিয়ে তোলা খুব একটা তাৎপর্যহীন ব্যাপার নয়। সেসময় এদেশে পাশ্চাত্যের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তথা ইংরেজি শিক্ষার অন্তঃপ্রবাহ এতই প্রবল ছিল যে, তার প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজন ছিল একজন অসাধারণ সাহসী এবং মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব। স্বামী বিবেকানন্দের আগে 'থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি' এদেশে একাজ শুরু করেছিলেন বটে, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দই তর্কাতীতভাবে প্রথম সে-কাজটিকে একটি হিন্দুধর্মোপযোগী রূপ প্রদান করলেন। বর্তমানে আমাদের বিদ্যালয়সমূহে আমরা যে-শিক্ষা লাভ করছি, তা শুধুমাত্র বুদ্ধিগত; সেখানে ছাত্রদের মনে কোনরকম ধর্মীয় ভাবের বিকাশ ঘটে না। পরন্তু শুধুমাত্র নিজের ধর্মকেই নয়, 'ধর্ম' বিষয়টিকেই তারা উপহাস করতে শেখে। শৈশবে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যেও অনুরূপ প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের এই সন্তানটির বয়স হয়েছিল প্রায় ৩৫/৪০ বছরের মতো। তার অর্থ, কুড়ি বছর আগে এদেশে যে-শিক্ষাধারার প্রচলন ছিল, তিনিও সেই ধারাতেই শিক্ষালাভ করেছিলেন। অতএব পাঠকগণ সহজেই অনুমান করতে পারেন, সেই শিক্ষার প্রকৃতি কিরূপ ছিল; কারণ একথা বললে খুব একটা ভুল হবে না যে, সেকালে কলকাতা তথা বোম্বাই এবং পুনাতে প্রচলিত ইংরেজদের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদানের পদ্ধতি মোটামুটিভাবে একই প্রকার ছিল।

স্বামীজীর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ। জাতিতে তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়। ১৮/১৯ বছর বয়সে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দর্শনশাস্ত্রে ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। প্রথমদিকে তাঁরও প্রবণতা ছিল নিরীশ্বরবাদেরই দিকে। ধর্মীয় আচার্যগণের সঙ্গে আলোচনার সময় 'আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?'—এই প্রশ্নে তিনি তাঁদের বিব্রত করে তুলতেন। কিন্তু শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সান্নিধ্যলাভের পর থেকেই তাঁর জীবনে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ক্রমে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয়তম শিষ্য হয়ে ওঠেন এবং পরবর্তী কালে গ্রহণ করলেন সন্ন্যাসব্রত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন জনপরিচিতি লাভ করায় অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার ইংরেজি ভাষায় তাঁর একটি জীবনী রচনা করেন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধি হয়। তারপর থেকেই তাঁর সেই অদ্বৈতবাণীর প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তাঁর শিষ্যগণ। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকাবাসীদের মধ্যে সেই বাণী প্রচার করলেন। আমেরিকার উদ্দেশে যাত্রা করার আগে পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯১-১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে একবার পুনায় আসেন। তাঁকে আমেরিকায় পাঠানোর পরিকল্পনাটি প্রথম উদিত হয় মাদ্রাজে এবং মাদ্রাজবাসীরা তাঁকে এব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে

* স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা।

শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভায় হিন্দুদের অদ্বৈতবাদের পতাকা উড্ডীন করে তাকে পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত করার সম্পূর্ণ কৃতিত্বই স্বামী বিবেকানন্দের।

বর্তমানে আমেরিকা মহাদেশ বলতে বিজ্ঞানের সকল বিভাগের পীঠস্থান বোঝায়। এমন একটি স্থানে খ্রিস্টান ধর্মযাজকগণের উপস্থিতিতে অদ্বৈতবাদের প্রচার এবং তাকে জনপ্রিয় করে তোলার কাজটি কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, হিন্দুধর্মে উচ্চারিত সত্যসমূহ এতই মহান যে, সেগুলি শুধুমাত্র ভারতবাসীদের মধ্যেই নয়, পরন্তু অন্যান্য দেশবাসীর মধ্যেও প্রচারিত হওয়া উচিত এবং সেটি করাই হিন্দুদের প্রধান কর্তব্য। হিন্দুদের অমূল্য সম্পদ বলে যদি কিছু থাকে, সেটি হলো তাঁদের 'ধর্ম'। সেই ধর্মকে পরিত্যাগ করলে হিন্দুগণ সমগ্র বিশ্বের কাছে নিজেদের বিদ্রূপ এবং সমালোচনার পাত্র করে তুলবেন। "হিন্দুধর্মকে বোঝবার চেষ্টা কর, তার মৌলিক সত্যগুলিকে উপলব্ধি কর, বিজ্ঞানসম্মতভাবে সেগুলি বিশ্লেষণ কর এবং তোমার ও তোমার দেশের নাম চিরস্মরণীয় করে তোল।"—এজাতীয় কথা বারবার তাঁর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। তিনি প্রায়ই বলতেন ঃ "একথা সত্য যে, ভক্তি ধর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ; কিন্তু অদ্বৈতভাব জাগ্রত না হলে ধর্ম পূর্ণতা লাভ করে না।" অন্য ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করার সময়ও তিনি এই সত্যটি সম্বন্ধে সচেতন থাকতেন। তিনি খ্রিস্টানদের কখনো তাদের ধর্ম ত্যাগ করতে বলেননি। কিন্তু তাঁর উপলব্ধি হলো ঃ "তোমরা যিশুখ্রিস্টের আরাধনা কর, ভাল কথা; কিন্তু যেহেতু তোমাদের ধর্ম তত্ত্বজ্ঞানরহিত, সেইজন্য ঐ ধর্মে হিন্দুধর্মের এই অদ্বৈত ভাবটি আরোপ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে।" অতি সংক্ষেপে বলা যায় যে, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি শাশ্বত ধর্মের সেই সনাতন মার্গগুলির সঙ্গে অন্য কোন ধর্মেরই কোনরকম সঙ্ঘাত নেই। শুধু তাই নয়, এই মার্গগুলি প্রত্যেকের পক্ষে উপযোগী হওয়ায় তিনি প্রায়ই বলতেন যে, যাঁরা বংশপরম্পরায় এপথের সন্ধানলাভ করেছেন, তাঁদের কর্তব্য সেগুলির মাহাত্ম্য প্রচার করা। ধর্মের প্রতি ভারতবাসীর উদাসীনতা দেখে তাঁর বুক ভেঙে যেত, তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, ধর্মের পুনরুত্থান ব্যতীত আমাদের দেশের উন্নতি সম্ভব নয়; আর তার জন্যই তিনি আমৃত্যু কঠিন সংগ্রাম করে গেলেন। আমেরিকাবাসীদের মধ্যে শিষ্যত্বগ্রহণ প্রথার প্রবর্তন করে এবং সেখানে অদ্বৈতবাদের বাণী প্রচার করে সিংহল হয়ে দেশে ফিরে তিনি প্রথম পৌঁছালেন মাদ্রাজে। সেখান থেকে তিনি যান কলকাতা এবং তারপর হিমালয়ের কোলে আলমোড়ার আশ্রমে। সুদীর্ঘ এই যাত্রাপথের সর্বত্র তিনি বিপুল অভিনন্দন লাভ করেন এবং সেসকল স্থানে দেওয়া তাঁর বক্তৃতাগুলি ছিল খুবই অনুপ্রেরণাদায়ী। আমেরিকানদের সহায়তায় তিনি হুগলী নদীর তীরে বেলুড়ে সন্ন্যাসীদের জন্য একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমাদের নিজস্ব মতবাদ অনুযায়ী সেখানে ধর্মীয় আচার্য গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন। এই মঠে সর্বসাধারণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একটি মন্দির নির্মাণ করা হয়। আলমোড়া* থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা। তাঁর হিতৈষী বন্ধুগণ এই পত্রিকার প্রকাশে সাহায্য করে চলেছেন। ১৮৯৬-১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুগণ রাজপুতানায় গিয়ে অসংখ্য মানুষকে খ্রিস্টান মিশনারিদের কবল থেকে রক্ষা করেন। ঠিক এই সময় প্রয়োজন ছিল বেশ কিছু ধর্মাচার্যের; কিন্তু উপযুক্ত শিষ্যের অভাবে তাঁদের অপ্রতুলতা সমগ্র ভারতবর্ষে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করার যে-ইচ্ছা স্বামীজীর ছিল, তা ফলপ্রসূ হতে দেয়নি। কিন্তু কলকাতা, আলমোড়া, আজমীর, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে তাঁর বেশ কিছুসংখ্যক শিষ্য আছেন। আমেরিকাতেও আছেন বেশ কয়েকজন। মাত্র ছয়মাসের মধ্যে ফরাসি ভাষা আয়ত্ত করে তিনি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসে অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনীতে 'বেদান্ত' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন; তার জন্য স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় তিনি বিপুলভাবে প্রশংসিত হন।

গত প্রায় একবছর ধরে বুকের যন্ত্রণার জন্য তাঁর শরীর বিশেষ ভাল যাচ্ছিল না। সেই কারণেই জাপান থেকে বারবার আমন্ত্রণ আসা সত্ত্বেও তাঁর সেখানে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। গত শুক্রবার যে-টেলিগ্রামটি আমরা পেয়েছি, তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, প্রাত্যহিক সান্ধ্যভ্রমণের পর তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়। তিনি তাঁর সেবককে ডেকে তাঁর শরীরত্যাগের ইঙ্গিত দেন এবং তিনবার গভীর শ্বাসগ্রহণের পর তিনি 'মহাসমাধি' লাভ করেন। এত অল্পবয়সে তাঁর এই মহাসমাধিলাভ সমগ্র দেশের পক্ষে খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আমাদের আক্কালকোটার স্বামীজীর মতোই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন প্রকৃতই পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্। কিন্তু কেবলমাত্র স্বামী বিবেকানন্দই সমগ্র বিশ্বের দরবারে, সকল শ্রেণীর মানুষের সামনে অদ্বৈতবাদের পতাকা তুলে ধরা, হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুদের মহত্ত্ব সম্বন্ধে

* আলমোড়া থেকে নয়, উত্তরাখণ্ডের 'মায়াবতী' নামক স্থান থেকে প্রকাশিত হয় 'প্রবুদ্ধ ভারত'।—সম্পাদক

তাদের অবহিত করানো এবং 'ধর্ম'কে প্রতিষ্ঠা করার কঠিন দায়ভার গ্রহণ করেছিলেন। উপরন্তু, তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, উদ্যম এবং আন্তরিকতার সাহায্যে এই কাজের জন্য একটি দৃঢ়ভিত্তিও স্থাপন করে গেলেন। সকলেরই ইচ্ছা এবং আশা ছিল যে, সেই ভিত্তির ওপরই গড়ে উঠবে এমন একটি পরিমণ্ডল—যেটি তিনি স্বয়ং ভাস্বর করে তুলবেন। তাঁর এই অকালপ্রয়াণে সেটি বাস্তবায়িত হলো না।

প্রায় ১,২০০ বছর পূর্বে একজন ঋষি হিন্দুধর্মের প্রকৃত রূপটি শুধু ব্যক্ত করেই বিরত থাকেননি, উপরন্তু তার সত্যতাও প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, আমাদের দেশে যে-ধর্মের বিকাশ ঘটেছিল, সেই ধর্ম স্বতই ছিল আমাদের এক অমূল্য সম্পদ ও শক্তিস্বরূপ এবং সেই ধর্ম সমগ্র বিশ্বে প্রচার করাই হলো আমাদের একমাত্র কর্তব্য। সেই ঋষি হলেন শঙ্করাচার্য। আর উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অভ্যুদয় ঘটল আরেকজন ঋষির। তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের অসমাপ্ত কাজকে সম্পূর্ণ করতেই হবে এবং আমাদের বিনীত অনুরোধ, তাঁরই কোন শিষ্য অথবা অন্য যেকেউ এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে সেটি সুসম্পন্ন করুন। আমাদের যদি গর্ব করার মতো কোন নিজস্ব সম্পদ থাকে, তবে সেটি হলো শুধুমাত্র আমাদের ধর্ম। আমাদের যাবতীয় গৌরব, আমাদের স্বাধীনতা—সবকিছুই আজ আমরা হারিয়েছি। কিন্তু আজও আমাদের 'ধর্ম' অবশিষ্ট আছে। এই ধর্ম কিন্তু খুব সুলভ বস্তু নয়। আমরা অভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষালাভ করেছি যে, উন্নত দেশগুলি প্রকাশ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করার পরেও এই ধর্মের মূল ভাবটি আজও পবিত্র এবং অপ্রতিরোধ্যই থেকে গেছে। এমন এক পটভূমিকায় আমরা সেই ধর্মকে যদি পরিত্যাগ করি, তবে আমাদের 'কথামালা'র সেই মোরগটির মতো [যে নিজেকে জহুরি কল্পনা করে সকলের পরিহাসের পাত্র হয়ে উঠেছিল] সমগ্র বিশ্বের উপহাসের পাত্র হয়ে উঠতে হবে। এই বিশেষ সত্যটি আমাদের সর্বক্ষণ স্মরণ রাখতে হবে। এখন এমন এক সময় এসে গেছে যে, আমাদের যদি কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু থাকে, তবে এই প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বের দরবারে সেটিকে উপস্থিত করে তার সারবত্তার প্রমাণ দিতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই কাজটিই করে গেছেন। তিনি যদি আর কিছুকাল জীবিত থাকতেন, তবে এই জাতিকে তার জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় অগ্নিশক্তি আমরা তাঁর কাছ থেকেই লাভ করতাম। এটি সুস্পষ্ট যে, তিনি আমাদের জন্য যা করে গেলেন, তা পরিশোধ করতে হলে তাঁর বাণীগুলি আত্তীকরণ করতে হবে।

আগামী দিনের মানুষ তাঁর জীবন থেকে প্রেরণালাভ করুক এবং অদ্বৈতবাদের সঙ্গে অন্যান্য সকল ধর্মের সমন্বয়-সাধনের কৃতিত্ব বর্তমান প্রজন্মের ঋষিগণ অর্জন করুন—ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা জানিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের অতি সংক্ষিপ্ত এই জীবনবৃত্তান্ত আমি সমাপ্ত করছি।

স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আমরা দু-তিনবার স্বামীজীকে পুনায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর শারীরিক অসুস্থতার জন্য এবং অন্য নানা কারণে পুনার মানুষ স্বামীজীর বক্তৃতা সরাসরি শোনার সৌভাগ্যলাভ থেকে বঞ্চিত থেকে গেলেন। ❑



সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

(গ্রাহকদের জন্য)

১। ডাক বিভাগের বন্দোবস্ত অনুযায়ী ইংরেজি মাসের ২৩ (অথবা ২৪) তারিখে 'উদ্বোধন' পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট বাঙলা মাস অনুযায়ী ৮ বা ৯ তারিখ হয়। গ্রাহকদের প্রতি অনুরোধ পত্রিকা সময়মতো না পেলে পরবর্তী ইংরেজি মাসের ২৩ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করে তবেই আমাদের দপ্তরে চিঠি দিয়ে জানাবেন। সম্ভব হলে আমরা একটি অতিরিক্ত কপি পাঠাব। কোন গ্রাহককে বছরে দুটির বেশি অতিরিক্ত কপি দেওয়া সম্ভব নয়। তিনমাস হয়ে গেলে এই অতিরিক্ত কপি দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

২। ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) যাঁরা পত্রিকা সংগ্রহ করেন তাঁরা ইংরেজি মাসের ২৫ তারিখ থেকে পত্রিকা সংগ্রহ করে নিতে পারেন। যদি কোন গ্রাহকের পত্রিকা নিতে দেরি হয় তিনি অবশ্যই দুমাসের মধ্যে পত্রিকাটি সংগ্রহ করবেন। নাহলে পত্রিকাটি পাওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। আশা করি সহৃদয় গ্রাহকগণ পত্রিকা দপ্তরের অসুবিধার কথা চিন্তা করে উপরি উক্ত নিয়মগুলি যথাযথ পালন করবেন।



আদি শঙ্করাচার্য ১২

শিশু ও কিশোর বিভাগ

চতুর্দিকে শঙ্করের মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ল। জ্যোতির্ধামের রাজা তাঁর পাদবন্দনা করলেন।





শঙ্কর গীতা, উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রের যে-ভাষ্য (ব্যাখ্যা) দিয়েছিলেন, রাজা তা লিখে রাখার জন্য কয়েকজন লিপিকার নিযুক্ত করলেন।

জ্যোতির্ধাম থেকে শঙ্কর গেলেন তুঙ্গনাথ। সেখানে মুগ্ধ পণ্ডিতগণ অতীব আনন্দে তাঁর একটি মূর্তি স্থাপন করলেন।



তুঙ্গনাথ থেকে কেদারনাথ। কেবলই তুষার। সেখান থেকে গঙ্গোত্রী, গোমুখ। আনন্দে বিহ্বল শঙ্কর রচনা করলেন 'গঙ্গাস্তোত্রম্'।

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে,
ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে
মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে।



গঙ্গোত্রীতে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন দেবী গঙ্গার পবিত্র মন্দির।



চিত্ররূপ ঃ দেবাশিস বসু

এই সময়ে আচার্যের বয়স ১৬ বছর। বেশির ভাগ সময় তিনি ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। জ্যোতিষিরা বলেছিলেন, ১৬ বছরে তাঁর মৃত্যুযোগ আছে। শিষ্যগণ খুব চিন্তিত হলেন। কিন্তু ধ্যানমগ্ন ঋষিকে কিছু বলার সাহসও কারোর নেই।



হঠাৎ এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল।

সত্য-মিথ্যা

মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে কোন একসময় কর্ণ-কর্তৃক অর্জুন পরাজিত হইলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বীর যোদ্ধা অর্জুনকে ধিক্কারপূর্বক বলিলেন ঃ "হে অর্জুন! যদি অদ্য তুমি সমরচারী সূতপুত্রকে নিবারণ করিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে তোমা অপেক্ষা অস্ত্র-শস্ত্রে সুনিপুণ অন্য এক ভূপালকে এই গাণ্ডীব প্রদান কর।" মহাবীর অর্জুন ধর্মরাজ-কর্তৃক গাণ্ডীব ত্যাগ করার কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিবার জন্য অসিগ্রহণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বিরত করিলেন এবং যথার্থ ধর্ম কি তা বোঝাতে উপদেশছলে এই গল্পটি বলিলেন।

সাধুব্যক্তিই সত্য কথা কহিয়া থাকেন। সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। সত্যতত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়। সত্যবাক্য প্রয়োগ করাই অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু যে-স্থানে মিথ্যা সত্যস্বরূপ ও সত্য মিথ্যাস্বরূপ হয়, সে-স্থলে মিথ্যা-বাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে। বিবাহ, প্রাণবিয়োগ ও সর্বস্বাপহরণকালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ করিলেও পাতক হয় না। যে সত্য ও অসত্যের বিশেষ মর্ম অবগত না হইয়া সত্যানুষ্ঠানে সমুদ্যত হয়, সে নিতান্ত বালক। আর যে-ব্যক্তি সত্য ও অসত্যের যথার্থ নির্ণয় করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধর্মজ্ঞ। জ্ঞানী ব্যক্তি অন্ধবধকারী বালক ব্যাধের ন্যায় দারুণ কর্মানুষ্ঠান করিয়াও বিপুল পুণ্যলাভ করিতে পারেন। আর অজ্ঞান ব্যক্তি ধর্মাভিলাষী হইয়াও কৌশিকের ন্যায় মহাপাপে নিমগ্ন হয়।

অর্জুন কহিলেন ঃ হে জনার্দন! আমি বালক ও কৌশিকের যথাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, আপনি সবিস্তারে উহা কীর্তন করুন।

বাসুদেব কহিলেন ঃ হে অর্জুন! পূর্বকালে বালক নামে এক সত্যবাদী ব্যাধ ছিল। সে কেবল বৃদ্ধ পিতা, মাতা, পত্নী ও পুত্র প্রভৃতি আশ্রিত ব্যক্তিদিগের জীবিকানির্বাহের নিমিত্ত মৃগ বিনাশ করিত। একদা ঐ ব্যাধ মৃগয়ায় গমন করিয়া কুত্রাপি মৃগ প্রাপ্ত হইল না। পরিশেষে এক অপূর্ব নেত্রবিহীন শ্বাপদ (কুকুরের তুল্য পদবিশিষ্ট মাংসাশী পশু) তাহার নয়নগোচর হইল। শ্বাপদ ঘ্রাণ দ্বারা দূরস্থ বস্তুও অবগত হইতে পারিত। ব্যাধ উহাকে একাগ্রচিত্তে জলপান করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিল। তখন সেই অন্ধ শ্বাপদ নিহত হইবামাত্র আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। অপ্সরাদিগের অতি মনোরম গীতবাদ্য আরম্ভ হইল এবং সেই ব্যাধকে স্বর্গে সমানীত করিবার নিমিত্ত বিমান সমুপস্থিত হইল। হে অর্জুন! সেই শ্বাপদ তপঃপ্রভাবে বরলাভ করিয়া প্রাণিগণের বিনাশের হেতু হওয়াতে বিধাতা উহাকে অন্ধ করিয়াছিলেন। ব্যাধ সেই ভূতগণনাশক মৃগকে বিনাশ করিয়া অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিল। অতএব ধর্মের মর্ম অতি দুর্জ্ঞেয়।

আর দেখ, কৌশিক নামে এক বহুশ্রুত তপস্বিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতিদূরে নদীকূলের সঙ্গমস্থানে বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ সর্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগরূপ ব্রত অবলম্বনপূর্বক তৎকালে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। একদা কতকগুলি মানুষ দস্যুভয়ে ভীত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলে দস্যুরাও ক্রোধভরে যত্নসহকারে সেই বনে তাহাদিগকে অন্বেষণকরত সেই সত্যবাদী কৌশিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, হে ভগবন্! কতকগুলি ব্যক্তি এইদিকে আগমন করিয়াছিল, তাহারা কোন্ পথে গমন করিয়াছে যদি আপনি অবগত থাকেন, তাহা হইলে সত্য করিয়া বলুন। কৌশিক দস্যুগণ-কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্যপালনার্থে তাহাদিগকে কহিলেন, কয়েকজন ব্যক্তি এই বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম-পরিবেষ্টিত অটবী (বন, অরণ্য) মধ্যে গমন করিয়াছে। তখন সেই ক্রূরকর্মা দস্যুগণ তাহাদের অনুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ ও বিনাশ করিল। সূক্ষ্মধর্মানভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিকও সেই সত্যবাক্যজনিত পাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হইলেন।

হে ধনঞ্জয়! ধর্মনির্ণয়ানভিজ্ঞ অল্পবিদ্য ব্যক্তি জ্ঞানীদিগের নিকট সন্দেহ ভঞ্জন না করিয়া ঘোরতর নরকে নিপতিত হয়। ধর্ম ও অধর্মের তত্ত্ব নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে অনুমান দ্বারা নিতান্ত দুর্বোধ্য ধর্মের নির্ণয় করিতে হয়। অনেকে 'শ্রুতি'কে ধর্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না; কিন্তু 'শ্রুতি'তে সমুদায় ধর্মতত্ত্ব নির্দিষ্ট নাই, এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়। প্রাণিগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধর্ম নির্দেশ করা হইয়াছে। অহিংসাযুক্ত কার্য করিলেই ধর্মানুষ্ঠান করা হয়। হিংস্রদিগের হিংসানিবারণার্থেই ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণিগণকে ধারণ (রক্ষা) করে বলিয়া

'ধর্ম' নামে নির্দিষ্ট হইতেছে। অতএব **যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম**। যাহারা অন্যের সন্তোষ উৎপাদনই ধর্ম—ইহা স্থির করিয়া অন্যায় সহকারে পরদারাপহরণাদি কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের সহিত আলাপ করাও কর্তব্য নহে। যদি কেহ কাহাকে বিনাশ করিবার মানসে কাহার নিকট তাহার অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্বন করা উচিত। যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তাহা হইলে সে-স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করাই কর্তব্য। ঐরূপ স্থলে মিথ্যাও সত্যস্বরূপ হয়। যে-ব্যক্তি কোন কার্য করিবার মানসে ব্রত অবলম্বন করিয়া তাহা সেই কার্যে পরিণত না করে, সে কখনোই তাহার ফললাভে সমর্থ হয় না। প্রাণনাশ, বিবাহ, সমস্ত জ্ঞাতিনিধন এবং উপহাস—এই কয়েক স্থলে মিথ্যা কহিলেও উহা দোষাবহ হয় না। ধর্মতত্ত্বদর্শীরাও উহাতে অধর্ম নির্দেশ করেন না। যে-স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারাও চৌরসংসর্গ হইতে মুক্তিলাভ হয়, সে-স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়। সে-মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্যস্বরূপ হয়। সমর্থ হইলেও চৌরাদিকে ধনদান কদাপি বিধেয় নহে। পাপাত্মাদিগকে ধনদান করিলে অধর্মাচরণ নিবন্ধন দাতাকেও নিতান্ত নিপীড়িত হইতে হয়। হে অর্জুন! আমি তোমার হিতার্থ শাস্ত্র ও ধর্মানুসারে আপনার বুদ্ধি-সাধ্যানুরূপ ধর্মলক্ষণ কীর্তন করিলাম। ধর্মার্থে মিথ্যা কহিলেও যে অনৃত নিবন্ধন পাপভোগী হইতে হয় না, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে ধর্মরাজকে তোমার বধ করা উচিত কিনা, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। ❑

সঙ্কলক ঃ সঞ্জয় মাইতি

(৪৬৯ পৃষ্ঠার পর)

"ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। গুরুর মুখে শুনে নিতে হয়—কি করলে তাঁকে পাওয়া যায়। গুরু নিজে পূর্ণজ্ঞানী হলে তবে পথ দেখিয়ে দিতে পারে।" (৩৯৬)

"কি জান, ডিমের ভিতর ছানা বড় না হলে পাখি ঠোকরায় না। সময় হলেই পাখি ডিম ফুটোয়। তবে একটু সাধন করা দরকার। গুরুই সব করেন—তবে শেষটা একটু সাধনা করিয়ে লন। বড় গাছ কাটবার সময় প্রায় সবটা কাটা হলে পর একটু সরে দাঁড়াতে হয়। তারপর গাছটা মড়মড় করে আপনিই ভেঙে পড়ে।" (৪২১)

"অহঙ্কার, উপাধি—এসব ত্যাগ হলেই ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়।" (৪২২) "গুরু কর্ণধার।" (৪৪২)

শ্রীরামকৃষ্ণের অল্পে অল্পে সমাধি ভঙ্গ হইতেছে। ঠাকুর সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের সহিত কথা কহিতেছেন। 'কৃষ্ণ' এই কথা এক একবার উচ্চারণ করিতেছেন। আবার এক-একবার পারিতেছেন না। বলিতেছেন—"কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ!—কৈ তোমার রূপ আজকাল দেখি না! এখন তোমার অন্তরে বাহিরে দেখছি—জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—সবই তুমি! মন, বুদ্ধি সবই তুমি! গুরুর প্রণামে আছে—অখণ্ডমণ্ডলাকারং... তুমিই অখণ্ড, তুমিই আবার চরাচর ব্যাপ্ত করে রয়েছে! তুমিই আধার, তুমিই আধেয়! প্রাণকৃষ্ণ! মনকৃষ্ণ! বুদ্ধিকৃষ্ণ! আত্মাকৃষ্ণ! প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন!" (৫৩১)

ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন। ভক্তেরাও সেইসঙ্গে নাচিতেছেন ও গাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতের প্রতি)—"এর নাম ভজনানন্দ। সংসারীরা বিষয়ানন্দ নিয়ে থাকে।... ভজন করতে করতে তাঁর যখন কৃপা হয়, তখন তিনি দর্শন দেন—তখন ব্রহ্মানন্দ।" (৬০২)

"তিনি বিষয়বুদ্ধির অগোচর। কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তির লেশ থাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না। কিন্তু শুদ্ধমন, শুদ্ধবুদ্ধির গোচর—যে-মনে, যে-বুদ্ধিতে আসক্তির লেশমাত্র নাই। শুদ্ধমন, শুদ্ধবুদ্ধি আর শুদ্ধ আত্মা—একই জিনিস।" (৬৪২)

"ঈশ্বরকে তুষ্ট কর, সকলেই তুষ্ট হবে। 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্'।...

"শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে—চিনিটুকু লওয়া বড় কঠিন। তাই শাস্ত্রের মর্ম সাধুমুখে গুরুমুখে শুনে নিতে হয়। তখন আর গ্রন্থের কি দরকার?" (৬৬৭)

"গুরু না থাকেন, তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, তিনি কেমন—তিনিই জানিয়ে দেবেন।" (৭৯৯)

"তেমন ব্যাকুল হয়ে ডাকতে পারলে তাঁর দেখা দিতেই হবে।" (৮৩৪) ❑

সঙ্কলক ঃ স্বামী পরিপূর্ণানন্দ

এই নাও তোমাদের একটি 'মা'

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সন্তানের যত আবদার মায়ের কাছে। পিতার কাছে যা চলে না, মায়ের কাছে চলে। মায়ের ওপর রাগ করা যায়, অভিমান করা যায়, অন্যায় আবদার করা যায়। রোগশয্যায় শিয়রে সারা রাত জেগে থাকবেন মা। পিতা উদ্বিগ্ন হবেন, ডাক্তারের কাছে দৌড়বেন; সেবা করবেন মা। যার মা নেই তার কেউ নেই।

পিতার শাসন, মাতার স্নেহ। যেন সন্দেশের পাক। সন্তানকে চলিত কথায় বলে 'ছানা'। সেই ছানা পিতার শাসনের আঁচে। মাতার স্নেহশর্করা আর অভিজ্ঞ পাকে পরিণত হবে চরিত্রবান, আদর্শবান, স্বাদু মানুষে।



ঠাকুর জানতেন, তাই অন্য অবতারেরা যা করেননি, তিনি তাই করেছিলেন। আমাদের জন্য 'মা' তৈরি করেছিলেন। সন্ন্যাসধর্মের সারকথা কি? সর্বস্ব ত্যাগ। পিতা, মাতা, সংসার—সব ত্যাগ করে মোক্ষের সন্ধানে বেরিয়ে যাও। যদি পাও পেলে, যদি না পাও পরের বার এসে আবার চেষ্টা করো।

ঠাকুর সব পালটে দিলেন। পৃথিবী, পৃথিবীর মানুষ, দুঃখ-সুখ—এসব ছেড়ে যদি চলেই যাবে, তাহলে এলে কেন পৃথিবীতে! মাস্টারমশাইকে একদিন প্রচণ্ড তিরস্কার করলেন। দক্ষিণেশ্বরে বসেই কথা হচ্ছে। গিরীন্দ্রনাথ মিত্র ও আরো অনেকে রয়েছেন। গিরীন্দ্র প্রশ্ন করেছেন ঃ "বাপ-মা যদি কোন গুরুতর অপরাধ করে থাকেন, কোন ভয়ানক পাপ করে থাকেন?" ঠাকুর বললেন ঃ "তা হোক। মা দ্বিচারিণী হলেও ত্যাগ করবে না। মা-বাপ কি কম জিনিস গা? তাঁরা প্রসন্ন না হলে ধর্মটর্ম কিছুই হয় না। চৈতন্যদেব তো প্রেমে উন্মত্ত; তবু সন্ন্যাসের আগে কতদিন ধরে মাকে বোঝান। বললেন, 'মা! আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখা দেব।' "

ঠাকুরের হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল মাস্টারমশাইয়ের দিকে। পারিবারিক শান্তির জন্য মাস্টারমশাই ভিন্ন হয়েছিলেন। ঠাকুর গিরীন্দ্রের দিক থেকে সরে এসে মাস্টারমশাইকে বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলতে লাগলেন ঃ "আর তোমাকেও বলি, বাপ-মা মানুষ করলে, এখন কত ছেলেপুলেও হলো, মাগ নিয়ে বেরিয়ে আসা! বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে ছেলে মাগ নিয়ে বাউল বৈষ্ণবী সেজে বেরোয়। তোমার বাপের অভাব নাই বলে; তা না হলে আমি বলতুম ধিক্।" ঠাকুর মানুষের ঋণের কথা বলছেন। "দেবঋণ, ঋষিঋণ, মাতৃঋণ, পিতৃঋণ, স্ত্রীঋণ। মা-বাপের ঋণ পরিশোধ না করলে কোন কাজই হয় না। স্ত্রীর কাছেও ঋণ আছে। হরিশ স্ত্রীকে ত্যাগ করে এখানে এসে রয়েছে। যদি তার স্ত্রীর খাবার যোগাড় না থাকত, তাহলে বলতুম ঢ্যামনা শ্যালা!"

সন্ন্যাসী সর্বস্ব ত্যাগ করে পাহাড়ে চলে যান। যাঁরা সন্ন্যাসী, তা ধর্ম-সন্ন্যাসী, জ্ঞান-সন্ন্যাসী, কর্ম-সন্ন্যাসী যাই হন, তাঁরা সংসারকে অস্বীকার করে অসংসারীর মতো বিচরণ করেন।

ঠাকুর সর্বস্বের সর্বস্ব, পূর্ণের পূর্ণকে দিয়ে দিলেন জগৎকারণে। নিয়ে এলেন স্ত্রী। সহধর্মিণী। তাঁকে করলেন জগন্মাতা। মানবমন্দিরে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই নাও তোমাদের একটি 'মা'। পাথরের 'মা' থেকে চিন্ময়ীকে প্রকাশ করে, দুঃখ-সুখের মা, ধনী-নির্ধনের মা, পাপী-পুণ্যবানের 'মা'টিকে রেখে গেলাম। তিনি মানুষের ভাষায় কথা বলবেন। মানুষের সংসারের বাতাস নেবেন। দারিদ্র্যকে অঙ্গভূষণ করে দরিদ্রের মর্যাদা বাড়াবেন। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান সবাই তাঁর সন্তান। ব্রাত্য, অব্রাত্যে ভেদ থাকবে না। শাস্ত্রের মন্দিরে পুরোহিতের শাসনমুক্ত পথের মা, ঘরের মা, জ্ঞানীর মা, মূর্খের মা, বালকের মা, প্রবীণের মা, পাগলের মা, সুস্থের মা, কীট-পতঙ্গের মা।

এমন একটি প্রকাশ, এমন একটি নির্মাণ শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কে করেছেন, করতে পারতেন! কাতরে অকাতরে দিয়ে গেলেন কল্যাণীকে।

মায়ের কাছে যত আবদার। ও মা! দাও না মা ঠাকুরের ঘরের দরজাটা খুলে। আমি তোমার আঁচলের আড়াল থেকে সেই মৈনাককে দেখি। কিছু বলেন তো শুনব, কিছু দেন তো নেব। না হয় তোমারি পায়ে পায়ে ফিরে আসব তোমার ঘরকন্নায়। ❑

স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়

সত্যানন্দ চক্রবর্তী

অভিযোগ নয়, প্রার্থনা

মনের অশান্তি দেহকে অসুস্থ করে। এমনকি শিশু যখন মাতৃগর্ভে, তখন থেকেই মায়ের অশান্ত মন শিশুর মন ও দেহকে প্রভাবিত করে। ফলস্বরূপ শিশুর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াতে বাধা সৃষ্টি করে, যার ফলে জন্মাবধি মানসিক ও দৈহিক অসুস্থতা অবশ্যম্ভাবী। তাই গর্ভাবস্থাতে মাকে সৎগ্রন্থ পাঠ, ত্যাগ ও উৎফুল্ল জীবনের অভ্যাস করতে হবে। তবেই তো তিনি আদর্শ ও স্বাস্থ্যবান সন্তান জগৎকে উপহার দিতে সক্ষম হবেন।

শিশুমাত্রেই ছটফটে, চঞ্চল, দুরন্ত স্বভাবের হয়। এই গুণাবলী স্বাভাবিক। কোনভাবেই এর জন্য কুণ্ঠিত হওয়া অথবা তিরস্কার করা উচিত নয়।

সাধারণত যে-মায়েদের মন-প্রাণ সংসারের জ্বালায় জর্জরিত, তাঁদের সন্তানরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবাধ্য, মিথ্যাবাদী, ক্রোধী, জেদী, বদরাগী, অমনোযোগী অথবা সংসারের অশান্তির কারণ হয়ে থাকে। এমন সন্তানদের দোষের ইতিহাস অপরকে জানিয়ে মায়েরা হালকা হতে চান। আদপে তা কখনোই হয় না, উপরন্তু সন্তানরা আরো জেদী হয়ে যায়।

সকল মাতা-পিতার উচিত সন্তানের দোষ-ত্রুটি, অভিযোগ অপর কাউকে প্রকাশ না করা। প্রকাশ করা হোক পরম কল্যাণময় ঈশ্বরের কাছে। তিনি বড় আপনার জন। তাঁর নিকট কাতর হয়ে প্রার্থনা জানালে তিনি নিশ্চয়ই শুনবেন। কেঁদে কেঁদে বলতে হবে —এই সন্তানদের তুমিই দিয়েছ সুতরাং তুমিই এদের দোষ খণ্ডন করে আদর্শ মানুষ করে দাও। ওদের সৎপথে মোড় ঘুরিয়ে দাও। পরার্থে সকলের সেবায় ওরা নিজেদের সঁপে দিক।

পাঁকাল মাছ হওয়া

জীবনে কেবল নিজ পুত্র-কন্যা-পরিজনের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য যারা অবাঞ্ছনীয় পথ অবলম্বন করেছেন, তাঁদের সুখ ক্ষণস্থায়ী। বৃদ্ধবয়সে পুত্র-কন্যা-পরিবারের কাছ থেকে অবহেলা প্রাপ্তি অনিবার্য। অগত্যা মনে কষ্ট কুরে কুরে খায়। পুত্র-কন্যারা ও পুত্রবধূরা বৃদ্ধ পিতামাতার উপদেশ, পরামর্শ নিরর্থক মনে করে। এমনকি সংসারে তাদের উপস্থিতি বোঝা মনে করে। অগত্যা নিদ্রাহীনতা, ক্রমশ বহুমূত্র রোগের আক্রমণ।

বহুমূত্রজনিত দুর্বলতা ও দায়িত্বশূন্য অবসরজীবনে মনে আসে অপমান, ঘৃণা, অভিমান ও তীব্র মনস্তাপ। আমার বাড়ি, আমার গাড়ি, আমার ফ্রিজ, টেলিফোন ইত্যাদি, কিন্তু সেজন্য সামান্যমাত্র কৃতজ্ঞতা স্বীকার নেই! হয়তো এই সম্পদ পিছনের দরজা থেকেই আনতে হয়েছে। অর্থাৎ 'যাদের জন্য করি চুরি তারাই বলে চোর!' হায়রে! তীব্র ক্ষোভ, ক্ষোভ থেকে দেহে কম্পন, ক্ষুধাহীনতা, শিরঘূর্ণন, তীব্র হৃদ্‌যন্ত্রের ধরফরানি-সহ ব্যথা।

বিক্ষুব্ধ মন সংসারের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে গৃহত্যাগী হতে তীব্র ইচ্ছা জাগে। সাধু সাবধান! ভুলেও এপথে পা বাড়াবেন না। গ্লানি আরো বেড়ে যাবে। নিজের দুর্গ অনেক শ্রেয়। এমতাবস্থায় কয়েকদিনের জন্য একান্তবাস করে আসা ভাল। ঘরের মধ্যে বসে বসে অন্যের দোষত্রুটির পরিমাপ বন্ধ করা, নিয়মিত কোন সেবাপ্রতিষ্ঠানে পরার্থে সেবাতে নিয়োজিত হওয়া, সদাসর্বদা সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সংসারের সকল সদস্যকে শিবজ্ঞানে সেবা করা, সেইসঙ্গে ভুলত্রুটির জন্য মনে মনে ক্ষমাপ্রার্থনা করা। প্রয়োজনে কেঁদে কেঁদে প্রভুর কাছে প্রার্থনা জানানো, যাতে তিনি সৎপথে চলার প্রেরণা যোগান। ব্যস, দেখা যাবে অবিলম্বে বহুমূত্র, উচ্চ রক্তচাপ, অক্ষুধা, শিরঘূর্ণন ক্রমশ আপনাকে মুক্তি দিচ্ছে।

ধ্যান ও হাঁটুর বাত

কিছুদিন পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির, বেলুড় মঠে ভোরবেলা মঙ্গলারতি দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল। মন্দিরের সর্বত্র শতাধিক সাধু ও ব্রহ্মচারী ধ্যানমগ্ন ছিলেন। মনে হচ্ছিল, যেন এক-একটি প্রস্তরনির্মিত ধ্যানমগ্ন মূর্তি বসে আছেন।

এভাবেই সকলকে প্রত্যহ ভোরে এবং নিজ বাসস্থানে ধ্যানমগ্ন হওয়া উচিত। বিভিন্ন মঠ, মিশন, আশ্রমের অধিকাংশ সন্ন্যাসী হাঁটুর ব্যথা, ফোলা, শোথ, রসবাত, গাউট, নিম্নাঙ্গের অবসন্নতা বা অসাড় বোধ, কম্পন, বেদনাদায়ক ওঠা-বসা, হাঁটুতে কটকট শব্দ, সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারা, উঠেও কখনো কখনো ধপ্ করে পড়ে যাওয়া, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা বা অসামঞ্জস্যভাবে বেঁকে বেঁকে হাঁটা ইত্যাদি কষ্টভোগ করে থাকেন।

দীর্ঘসময় একাসনে পা ও হাঁটু মুড়ে বসে থাকার জন্যই এই অবস্থা হয়। কারণ, এতে হাঁটুর পিছনদিকের (Poplitial) ধমনী, শিরা, গ্রন্থি দ্বারা রক্ত ও বিভিন্ন প্রকারের অতি প্রয়োজনীয় তরল পদার্থের যাতায়াত স্তব্ধ হয়। এর দ্বারা ঊর্ধ্বাঙ্গের সঙ্গে নিম্নাঙ্গের যোগাযোগ রুদ্ধ হয়ে যায়। যেমন রবার বা পলিথিনের পাইপে যদি কোনভাবে ভাঁজ পড়ে যায়, তাহলে জলের গতিও স্তব্ধ হয়। অর্থাৎ যেখানে ভাঁজ পড়ে সেপর্যন্ত জল এলেও অপরদিকে জল সঞ্চালন বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভাঁজপড়া অংশটি সোজা করে দিলেই জল চলাচল শুরু হয়ে যায়।

বৃদ্ধ বয়সে হাঁটু অকেজো হওয়া বড়ই বেদনাদায়ক। যাঁরা অধিক সময় একাসনে বসে থাকেন, তাঁরা যেন নিয়মিতভাবে হাঁটুর পিছনের দিকে সরষের তেল মর্দন করেন, হাঁটুদুটিতে চাপ না দিয়ে বসেন, হাঁটুদুটিকে সমকোণে (right-angle) রেখে বসেন। হাঁটুকে সুস্থ রাখার জন্য পদহস্তাসন, শীর্ষাসন, সর্বাঙ্গাসন, বিপরীত করণী মুদ্রা, উত্থিত পদাসন ব্যায়াম করেন। হাঁটু ফোলা যদি একাদশী, অমাবস্যা বা পূর্ণিমাতে হয় তাহলে ভাত, আলু, দৈ, মিষ্টি, টক, আমিষ ব্যবহার সাবধানে করবেন অথবা বর্জন করবেন। ধ্যানের সময় এয়ারকণ্ডিশন, এয়ারকুলার, সজোরে পাখা ব্যবহার করবেন না। ধ্যানের আগে জল বা অন্য কোন শীতল পানীয় পান করলে ধ্যানে বিঘ্ন ঘটতে পারে। ❑

বিশ্বকাপ ফুটবল ২০০২ ঃ উঠে আসছে তৃতীয় বিশ্ব

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়


দিত সূর্যের দেশে শেষপর্যন্ত ফুটবলেরই জয় হলো। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর 'বল গেম'-এ বিশ্বশ্রেষ্ঠের শিরোপা পেল ব্রাজিল, যারা ফুটবলটা খেলে হৃদয়ের গভীরতম আবেগ ও নান্দনিক উৎকর্ষে জনচিত্ত সম্মোহনের দায়বদ্ধতা থেকে। জার্মানির যান্ত্রিক ফুটবলকে ব্রাজিলের শিল্প, সৃজনধর্মী টেকনিকের বশীভূত হয়ে হারস্বীকার করতে হলো। ১৭তম বিশ্বকাপের ফাইনালে ব্রাজিল রোনাল্ডোর দেওয়া ২ গোলে জার্মানিকে হারিয়ে পঞ্চমবারের মতো 'ভিকট্রি পোডিয়ামে' উঠে প্রমাণ করে দিল, ফুটবল ও ব্রাজিল একে অপরের পরিপূরক। রোনাল্ডো টুর্ণামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতা (৮ গোল) হয়ে 'সোনার বুট' পেয়েছেন। 'সোনার বল' পেলেন রানার্স আপ জার্মানির অধিনায়ক এবং এই বিশ্বকাপের শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক অলিভার কান। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ধারক খেলায় তুরস্ক দক্ষিণ কোরিয়াকে ৩-২ গোলে হারিয়ে দেয়। এই দুটি দেশের অভাবনীয় উত্থান এবারের বিশ্বকাপে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এবারের বিশ্বকাপ সবদিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রায় ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে এসে ব্রাজিলের কাপ জয়, গোত্রহীন দেশগুলির চমকপ্রদ সাফল্য, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, ইতালি, পর্তুগাল ও স্পেনের মতো ফেভারিট দলগুলির পদস্খলন বিশ্ব ফুটবলের মাত্রা ও মানদণ্ডের সরল সমীকরণটাই বদলে দিয়েছে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স এবারও ছিল হট ফেভারিট। অথচ চোট পেয়ে জিনেদিন জিদানের সাইডলাইনে অবস্থান দলের ভারসাম্যটাই টলিয়ে দিল। আত্মপ্রত্যয়হীন ফ্রান্স প্রথম থেকেই ছিল নড়বড়ে, কোন গোল না করেই গ্রুপ থেকে বিদায় নেয়। আর্জেন্টিনা অবশ্য 'গ্রুপ অফ ডেথ'-এ থাকার চাপ নিতে পারেনি। যে-দলের রিজার্ভ বেঞ্চ এত শক্তিশালী, দলের প্রতিটি পজিশনে সমযোগ্যতার একাধিক প্রতিভাসম্পন্ন খেলোয়াড়—তাদের গ্রুপ লিগ থেকেই বিদায় মন থেকে মেনে নিতে কষ্ট হয়। ইংল্যাণ্ড, স্পেন, ইতালির খেলা ছিল আলো-আঁধারিতে ভরা। কখনো খুব আকর্ষক, কখনো অতি-সাধারণ। ইতালি, স্পেন অবশ্য খানিকটা দুর্ভাগ্যেরও শিকার। রেফারির ভুল সিদ্ধান্তও তাদের অগ্রগতিকে আটকে দেয়।

বস্তুত, তৃতীয় সহস্রাব্দ ও একবিংশ শতাব্দীর প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলকে কেন্দ্র করে ফুটবলের প্রকৃত বিশ্বায়ন ঘটে গেল। আরো গুছিয়ে বললে, বিশ্ববিপ্লবের পথ প্রশস্ত হলো। এতদিন বিশ্ব ফুটবল বলতে ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকাকে বোঝাত। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার বিশ্বকাপ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেল ফুটবলের যথার্থ আন্তর্জাতিক চরিত্র। ফুটবলে যারা এতদিন ব্রাত্য ছিল, অন্তত ফিফার কাছে, তারাই এবারের বিশ্বকাপে সবচেয়ে উত্তেজক দল হিসাবে নিজেদের মেলে ধরেছে। সেনেগাল, নাইজিরিয়া, তুরস্ক, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়ার খেলা দেখে আনন্দ পাননি—এমন মানুষ সারা বিশ্বে খুঁজে পাওয়া যাবে না বোধহয়। বিশেষ করে সেনেগাল। যাদের ফুটবল সম্পর্কে এতদিন কোন ধারণাই ছিল না সাধারণ মানুষের, তারা প্রথমবার আসরে নেমেই মিডিয়ার যাবতীয় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। সেনেগালের খেলার মধ্যে ছিল একধরনের রোমান্টিসিজম, যার মাদকতা উপভোগ করেছে গ্যালারি ও টিভির দর্শক।

তুকতাক, ঝাড়ফুঁক বা ব্ল্যাক ম্যাজিকের দেশ বলেই এতদিন সেনেগালের পরিচিত ছিল বহির্বিশ্বে। মাঝে অবশ্য সেনেগালের রাজধানী প্যারিস-ডাকার দীর্ঘতম কার র‍্যালির জন্য সেনেগালের নাম উঠে আসে 'গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস'-এ। আর এবার ফুটবলের দৌলতে বিশ্বসংসারে মর্যাদাব্যঞ্জক অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে উত্তর আফ্রিকার একদা ফরাসি উপনিবেশ সেনেগাল। এবছর আফ্রিকান নেশন্স কাপে রানার্স হলেও সেনেগালকে নিয়ে কারোরই তেমন কোন প্রত্যাশা ছিল না। অনেকটা ১৯৯০-এর ক্যামেরুনের মতো অজানা শক্তি হিসাবে বিশ্বকাপ খেলতে এসেছিল সেনেগাল। আর প্রথম সুযোগেই 'ভিনি ভিডি ভিসি'। একেবারে খোদ বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন দলকে ধরাশায়ী করে ছাড়ে তারা। আর সেই ঐতিহাসিক কীর্তিকে পরবর্তী পর্বে অনেকটাই বাড়িয়ে নিয়ে যায় সেনেগাল। গ্রুপে দ্বিতীয় স্থান নিয়ে সেনেগাল নক আউট পর্বে যায়, আর সেখানেও চমক অব্যাহত। ইউরোপের অন্যতম ব্যালান্সড দল সুইডেনকে নিয়ে ছেলেখেলা করে জেতে সেনেগাল। অদূর ভবিষ্যতে আফ্রিকার ফুটবল যে সিংহের দাপট নিয়ে বিশ্বজুড়ে রাজত্ব করবে, তার একটা ইঙ্গিত বহন করছে সেনেগালের এবারের কর্তৃত্বব্যঞ্জক পারফরমেন্স।

নাইজিরিয়া, ক্যামেরুন বিগত দুটি অলিম্পিকে ফুটবলের সোনা জিতেছে। এবারের বিশ্বকাপে প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারলেও নাইজিরিয়া সৃজনধর্মী ফুটবলের সুললিত লাবণ্য ছড়িয়ে যায় বিশ্বকাপে। গতি, টাচ প্লে, বল কন্ট্রোলের অনুপম নিদর্শন ছড়িয়েও নাইজিরিয়া বিদায় নেয় গ্রুপ থেকে মূলত দুটি কারণে। এক—সবচেয়ে শক্ত গ্রুপে থাকার চাপ, দুই—গোলমুখে 'ফিনিশিং'-এ তীক্ষ্ণতা বা ভেদশক্তির অভাব। ক্যামেরুনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। গ্রুপ লিগে তিনটি ম্যাচে সারাক্ষণ দাপটে খেলে, বল পজেশনের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক সুবিধা নিয়েও নক আউট পর্বে উঠতে পারেনি ট্যাকটিক্সে বৈচিত্র্যের অভাবে। তবে আফ্রিকান চ্যাম্পিয়ন হিসাবে ক্যামেরুন যে জার্মানি ও আয়ার্ল্যাণ্ডের সমীহ আদায় করে নিয়েছে তা ম্যাচ দেখেই বোঝা গেছে। জার্মান কোচ রুডি ফোলার ও আইরিশ কোচ কেন ম্যাকার্থি রীতিমতো হোমওয়ার্ক করে, চার-পাঁচ রকমের স্ট্রাটেজি তৈরি করে সবদিক থেকে প্রস্তুত হয়ে মাঠে নামিয়েছিলেন নিজের নিজের দলকে। আর বিশ্ব ফুটবল থেকে বহুদিন বহিষ্কৃত থাকার পর মাত্র দশবছর আন্তর্জাতিক সার্কিটে খেলে দক্ষিণ আফ্রিকা যথেষ্ট শক্তিশালী দল হয়ে উঠেছে। ক্রিকেট, রাগবির মতো ফুটবলেও দক্ষিণ আফ্রিকাকে আর উপেক্ষা করতে পারবে না উন্নাসিক ইউরোপ।

জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া পরিচিত পরিবেশে, দর্শক সমর্থনের মধ্যে খেলার সুযোগ পেয়েছে বলে তাদের পারফরমেন্স এত ভাল হয়েছে—এভাবে মূল্যায়ন করা বোধ হয় ঠিক হবে না। দুটো দলই আক্রমণাত্মক, ইতিবাচক ফুটবল খেলেছে। ড্র নয়, জেতার উদ্দেশ্য নিয়ে মাঠে নেমেছে। গত শতাব্দীর গোড়ায় জাপানের হাতে জার-শাসিত রাশিয়া ভূপতিত হয়েছিল সমরাঙ্গণে। আর এবার ক্রীড়াঙ্গণে—বিশ্ব ফুটবল মঞ্চে উদিত সূর্যের দেশের রক্তিমাভায় গৌরবান্বিত এশিয়া। শক্তিশালী রাশিয়াকে ফুটবল-যুদ্ধে হারিয়ে জাপান বুঝিয়ে দিয়েছে, এশিয়াকে আটকে রাখা যাবে না। বেলজিয়ামও হারাতে পারেনি জাপানকে। অন্যদিকে একদা শত্রু, এখন সহযোগী দক্ষিণ কোরিয়া 'রোভিং' ফুটবলের চূড়ান্ত প্রতিফলন দেখিয়েছে। ইতালি, স্পেন, পর্তুগালের মতো ফেভারিট দলের বিরুদ্ধে আগাগোড়া 'প্রেসিং ফুটবল' খেলে জয় তুলে নিয়েছে কোরিয়ানরা। ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী দল ইতালির বিরুদ্ধে একটা এশিয়ান টিম 'প্রেসিং ফুটবল' খেলে জিতছে—এব্যাপারটা কল্পনাতেও আনা সম্ভব ছিল না এতদিন। স্পেন, পর্তুগালকেও মাথা তুলতে দেয়নি কোরিয়া। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজনীতিতে 'সুপার পাওয়ার' হলেও ফুটবলে তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসাবে গণ্য হয়। ১৯৯৪-এ নিজেদের দেশে খেলার সুবাদে দ্বিতীয় রাউণ্ডে উঠেছিল যুক্তরাষ্ট্র, তেমন আহামরি না খেলেও। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পারে নবজন্ম হলো যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল ঘরানার। পর্তুগালকে গ্রুপের প্রথম ম্যাচে হারিয়ে যে চমকের শুরু, তার পূর্ণতা দেখা গেল দ্বিতীয় রাউণ্ডে শক্তিশালী মেক্সিকোর সমাপতনে। বেসবল, বাস্কেটবলের মতো ফুটবলেও যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বমঞ্চে চিরস্থায়ী আসন তৈরি করে নিতে যে বদ্ধপরিকর, তা বোঝাতে যেন এবারের আসরকেই বেছে নিয়েছিলেন আমেরিকান ফুটবলাররা।

২০০২ বিশ্বকাপ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেল ব্রাজিল, ইতালি, আর্জেন্টিনা, জার্মানি, ইংল্যাণ্ড, স্পেন, ফ্রান্সের মতো ঐতিহ্যমণ্ডিত কুলীন দেশগুলির সঙ্গে একাসনে বসতে চলেছে আফ্রিকা, এশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলসমাজ।

তবে সবাইকে ছাপিয়ে গেছে তুরস্ক। শিল্পের সঙ্গে নিয়ম, অঙ্কের সঙ্গে ছন্দ মিশিয়ে যে ফুটবল দেখা গেছে তুরস্কের ফুটবলারদের পায়ে, তার কথা বহুদিন মনে রাখবে বিশ্ববাসী। অধিনায়ক হাসান সুকুর যদি নিজের খেলার পঞ্চাশ ভাগ খেলতে পারতেন, তাহলে তুরস্কই হয়তো কাপটা নিয়ে চলে যেত। তুরস্কের হাসান সাস, উমিত দাভালা, ইলহাম মনসিজ, রুশতু, সেনেগালের পাপা ডিয়ুপ, কামারা, দক্ষিণ কোরিয়ার আং জুঙ হোয়ান, যুক্তরাষ্ট্রের মারিও ডোনোভানরা নিঃসন্দেহে সোনালী প্রজন্মের নবোদিত নক্ষত্র হিসাবে বিশ্ব ফুটবলকে মহিমান্বিত করেছে। পরবর্তী কয়েক বছর এরাই আধুনিক ফুটবলের ঋত্বিক হিসাবে বিরাজ করবেন দেশ থেকে দেশান্তরের সবুজ গালিচায়।

তবে শেষপর্যন্ত কিন্তু ফুটবলের ঐতিহ্য, পরম্পরা তথা ঘরানারই জয় হলো। এর আগে পর্যন্ত চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের সঙ্গে তিনবারের বিজেতা জার্মানি ফাইনালে খেলে ফিফা তথা জাপান কর্তৃপক্ষকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। যতই তুরস্ক, যুক্তরাষ্ট্র বা সেনেগাল চমক সৃষ্টি করুক, এরকম দুটি গোত্রহীন দেশের মধ্যে ফাইনাল হলে বাণিজ্যিক দিক থেকে হয়তো মার খেয়ে যেত ফিফা ও জাপান ফুটবল ফেডারেশন। তবে ব্রাজিল ও জার্মানির ফাইনালে খেলাটাও কম বিস্ময়ের নয়। দুটো দেশই নেহাত ভাগ্যের জোরে মূলপর্বে আসতে পেরেছে। গত দুবছরে ব্রাজিল, জার্মানির বারংবার ব্যর্থতার প্রেক্ষিতেও তাদের ফাইনাল খেলাটাই অঘটনের বিশ্বকাপে সবচেয়ে বড় চমক। ❑

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং প্রসঙ্গত

'উদ্বোধন'-এর গত আশ্বিন ১৪০৮ সংখ্যায় ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে আমার একটি পত্র 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিপ্লবী ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ হিসাবে কয়েকটি অজ্ঞাত তথ্য সকলকে জানানোর জন্যই এই পত্রের অবতারণা।

ভারতবর্ষের সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম অগ্রণী পুরুষ যাদুগোপাল ১৯০৫ সালে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। তমলুকের হ্যামিল্টন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার পর তিনি ডাফ কলেজ (এখনকার স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল)-এ ভর্তি হন। ১৯০৮ সালে তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। মেডিকেল কলেজের মেধাবী ছাত্র ছিলেন যাদুগোপাল। প্যাথোলজি ফাইনাল পরীক্ষার আগের দিন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে তিনি বেরিয়ে পড়েন সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য এবং পরে প্রয়োজনে আত্মগোপন করেন।

১৯১৫ সালে যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর 'যুগান্তর' দলের নেতৃত্বের ভার যাদুগোপালের ওপর পড়ে। ১৯১৫-১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি বিহার, অসম, তিব্বত ও চীনের সীমান্ত পর্যন্ত কখনো মৌলবি, মুটে, মজদুর ও ডাক্তারের ছদ্মবেশে ইংরেজ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ইংরেজ সরকার তাঁর নামে হুলিয়া জারি করে ২০,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে তাঁকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরিয়ে দেওয়ার জন্য।

পুরুলিয়ার বলরামপুরে ডাঃ সামসুদ্দিন ও নলিনীকান্ত কর তাঁর কম্পাউণ্ডার গোফুর নামে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিহারের পূর্ণিয়ায় ছিলেন বাঙালি মুসলমান ডাঃ ইউসুফ, পাটনায় ডাঃ ঈশানচন্দ্র চৌধুরী, মির্জাপুরে ডাঃ পতিতপাবন রায়। দুজন মৌলবির কাছে তিনি উর্দু শিখেছিলেন এবং নামাজের বই দেখে নামাজ পড়া ও আজান দেওয়া মুখস্থ করেছিলেন। তা এত নিষ্ঠার সঙ্গে ও নিখুঁতভাবে করতেন যে, কোনদিন কেউ সন্দেহ করেননি যে তিনি মুসলমান নন। অনেকেই তাঁকে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র নায়ক সব্যসাচীর চরিত্রের প্রেরণা বলে ভাবেন। ১৯১৪-১৯১৮ সালের বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁকে ধরতে না পেরে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ ভেবেছিল, তিনি নিশ্চয়ই গোপনে আমেরিকায় পালিয়ে গিয়েছেন। তাই তাঁদের বড় কর্মচারী ডেনহ্যাম আমেরিকায় তাঁর খোঁজখবর আরম্ভ করেন এবং আমেরিকা সরকারের অনুমতি নিয়ে অনেক ভারতীয়ের বাড়ি খানাতল্লাসি করে। ধনগোপালকেও বহু বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়েছিল এদের হাতে।

যাদুগোপালের নামে মিথ্যা 'Violation of Neutrality Act' মামলা করে Extradition-এর ব্যবস্থা করে। যাদুগোপাল চতুরঙ্গ সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন। তিনি মনে করতেন, ছাত্র, মজদুর, কৃষক ও সৈন্য একজোট হয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে নামলে স্বাধীনতা অবধারিত। তাই অস্ত্রশস্ত্রের রসদ সংগ্রহ ও দেশের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে বিদেশের দরবারে তুলে ধরার দ্বিবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি তাঁর প্রাণপ্রতিম ছোট ভাই ধনগোপালকে জাপান হয়ে আমেরিকায় পাঠান। তিনি তাঁর এই ছোট ভাইটিকে যে কি পরিমাণে ভালবাসতেন তার প্রমাণ আমি পেয়েছি যখনি তিনি কথাপ্রসঙ্গে ধনগোপালের নাম উল্লেখ করতেন, তখনি তাঁর চোখদুটি জলে ভরে উঠত।

১৯২১ সালে আত্মগোপনকারীদের ওপর থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা তুলে নেওয়া হয়। তখন তিনি আত্মপ্রকাশ করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারি পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তুতি চেয়ে দরখাস্ত করেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এর বিরোধিতা করে বলেন, M.B. পরীক্ষা কি এতই সোজা যে, ছয়বছর জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে একবছরেই পরীক্ষা দেবে? শুধু অর্থদণ্ডই হবে। তাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার ভাইস চ্যান্সেলার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেন, এতে আমাদের কি ক্ষতিবৃদ্ধি হবে? যদি সে পাশ করতে পারে তো প্রশংসার পাত্র আর না পারলে তারই অর্থক্ষতি হবে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ অনুমতিতে যাদুগোপাল তৎকালীন বেসরকারি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন এবং সেই বছরই অর্থাৎ ১৯২২ সালে মেডিসিনে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বহুবার গ্রেপ্তার করে। ১৯২৮ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত তাঁকে রাঁচিতে অন্তরিন করে রাখা হয়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমার মনে পড়ছে, যা আমার দাদুর মুখে শুনেছি। বাংলায় তাঁকে রাখা নিরাপদ নয় ভেবে ব্রিটিশ সরকার যখন তাঁকে বাংলার বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা করে তখন আমার পিতামহ বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁকে বলেন: "যাদুগোপাল, তুমি যদি রাঁচি যেতে চাও তাতে ওরা নিশ্চয়ই রাজি হবে।" রাঁচিতে তখন আরেকজন আন্দামান-ফেরত বিপ্লবী জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এবং তিনি টিবিতে ভুগছিলেন। তাই তিনি বলেন, যাদুগোপাল রাঁচিতে গেলে তাঁর চিকিৎসা করতে পারবে, খরচও কম হবে। তাঁর কথা শুনে যাদুগোপাল রাঁচি এসে দেখেন, ইংরেজ সরকার জীবনলালকে আলমোড়ায় পাঠিয়ে দিয়েছে। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়কে হাজারীবাগ জেলে বন্দী করে রাখা হয়। জয়প্রকাশ নারায়ণও তাঁর সঙ্গে সেই জেলে ছিলেন। তিনি জয়প্রকাশ নারায়ণকে জেল থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁকে যখন বিহারের রাজ্যপালের পদ অলঙ্কৃত করার জন্য অনুরোধ করা হয় তখন তিনি বিনীতভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলতেন: "দেশভক্তি কখনো L.I.C. পলিসি নয় যে, অবসরজীবনে ভাঙিয়ে খাব।" নাম ও যশের মোহ তাঁকে কখনো প্রলোভিত করতে পারেনি। চিকিৎসক হিসাবে তাঁর খুব খ্যাতি ছিল। তাঁর লেখা 'Treatment of Tuberculosis' বইটি দেশে-বিদেশে প্রচুর খ্যাতিলাভ করেছিল। তাঁর লেখা 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' বিপ্লবের ইতিহাসে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে পরিচিত। ১৯২৫ সালে মেদিনীপুর জেলে বসে লেখা তাঁর 'ভারতের সমরসঙ্কট' বইটি ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার তা বাজেয়াপ্ত করে। তাই বইটির প্রচার তেমন

হয়নি। বইটি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে, তা থেকে বোঝা যাবে তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি কতটা প্রখর ছিল—"প্রাচ্যের জাতিরা আলস্য, অজ্ঞতা ও অবসাদে ডুবেছিল। শত শত বৎসরের জড়তা ভেঙে চীন জেগে উঠেছে। চীন জাগার সঙ্গে সঙ্গে তার চেতনায় সাড়া পড়েছে। যেভাবে তার লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে তাতে চল্লিশ কোটি লোকের স্থানসঙ্কুলান হওয়া শক্ত। কাজেই তাকে নানা দেশে ছেয়ে ছড়িয়ে পড়তে হবে। ভারতের হাজার মাইল তার সীমানার সঙ্গে মিশে আছে। শান্তিতে যদি এসমস্যার মীমাংসা না হয় তাহলে ভারতের গায়ে আঁচড় লাগবে কিনা কে বলতে পারে? চীন একটু সুস্থির হতে পারলেই যে তিব্বত সমস্যা জটিল হয়ে উঠবে, সেবিষয়ে আর সন্দেহ নেই। এখনো তিব্বত ও লাসার ওপর চীনের চক্ষু আছে। তিব্বতে চীনার পক্ষপাতি দল শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠছে। চীন যদি একবার তিব্বতে কর্তৃত্ব করতে পারে তাহলে টোয়াং প্রদেশে সহজে গোপনে ভারত প্রবেশের আড্ডা বানিয়ে ফেলবে।" প্রায় ৭৩ বছর আগে লেখা এই রাজনৈতিক বিশ্লেষণ আজকের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় ভবিষ্যদ্বাণী বলেই মনে হয়। আবার অন্যদিকে দেখা যায়, তিনি তাঁর পিতার ন্যায় সঙ্গীতপিপাসু ছিলেন। নিজে ভাল গান করতেন এবং প্রায় ৫০০টির মতো গান নিজে রচনা করে সুর দিয়েছিলেন।

অনেক সমাজসেবী সংস্থার সঙ্গে যাদুগোপাল যুক্ত ছিলেন, বিশেষ করে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে। রাঁচিতে রামকৃষ্ণ মিশন টি. বি. স্যানাটোরিয়ামের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি অনেক সাহায্য করেছিলেন এবং অনেকদিন পর্যন্ত কার্যকরী সমিতির অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৭৬ সালের ৩১ আগস্ট তাঁর দেহাবসান হয়।

শ্যামলী মুখোপাধ্যায়
সার্কুলার রোড, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড-৮৩৪০০১

আমার ছেলেবেলার কনখল ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম

৩০-৩৫ বছর আগেকার কথা বলছি। কনখলে এখনকার মতো জনবসতি ছিল না। গাছপালায় ঘেরা নির্জন জায়গা। এলাহাবাদ থেকে আসার তেমন ভাল ট্রেন তখনো ছিল না। ২০-২২ ঘণ্টা কেটে যেত ট্রেনে। কনখলের কাছাকাছি এলেই বাতাস যেন বদলে যেত, শিরশিরে পাহাড়ী গন্ধভরা। গাছপালায় ঘেরা ইউক্যালিপটাস, পপলার, দেবদারু, ফার্ণ, আর কিছুটা শিমুল, পলাশও থাকত। হরিদ্বার স্টেশনটাও ছিল ছোট। প্রায় খোলা। মস্ত একটা বটগাছের চারপাশে অপেক্ষমান যাত্রীরা বসে থাকত। স্টেশনে গাড়ি থামতেই বাবা-মায়ের সঙ্গে আমিও চট করে নেমে পড়তাম। কুলির সঙ্গে মোট নিয়ে বেরিয়েই টাঙ্গা ধরতাম। হু-হু করে ঠাণ্ডা বাতাস বইত। সারা গায়ে শিহরণ। অনেক মন্দির ও ধর্মশালা পেরিয়ে টাঙ্গা এসে দাঁড়াত রামকৃষ্ণ মিশনের গেটে। আমরা এসে গেছি খবর পেয়ে পুরনো চাকর সুখদেব অথবা কোন সাধু-ব্রহ্মচারী অতিথিশালার কোণায় গুরুদাস মহারাজের (স্বামী অতুলানন্দ) স্মৃতিবিজড়িত বড় ঘরটা খুলে দিতেন। তাঁকে দেখে খুব বড় দরের সাধু মনে হতো। জানলা খুলে দিলেই ভোরের রোদ লুটিয়ে পড়ত মেঝেতে। ঝগড়ু এসে ঝাঁট দিয়ে যেত। মা-বাবা জিনিসপত্র খুলতে ব্যস্ত হতেন। আমি কিন্তু দৌড় দিতাম গোশালায়। গিয়ে দেখতাম, আমার বন্ধুরা অর্থাৎ রোশন, সেবা, কিশোরী সকলে মিলে বসে আগুনে হাত সেঁকছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় চতুর্দিক কনকন করছে। আমি পৌঁছাতেই খুশিতে তারা হাঁকডাক শুরু করত। খড়ের আগুনে মটরশুঁটি বা আলু পুড়িয়ে খেতে কী ভালই না লাগত! তাড়াতাড়ি গোশালায় গিয়ে বসন্ত মহারাজের (স্বামী বেদ্যানন্দ) হাত ধরে ঝুলে পড়তাম। মনে হতো তিনি যেন আমার আজন্মের বন্ধু। মঙ্গলা, সরস্বতী, বুধাই, ধবলি, কপিলা—একে একে সবার কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম। গরু তো পশুই, কিন্তু আমার মনে হতো ওরাও আমার আসার প্রতীক্ষায় ছিল। ওরই মধ্যে একটি কালো গাইয়ের দুধ আমার জন্য আলাদা করে রাখা হতো, যাতে আমার কৃশ শরীরটা একটু মোটা হয়। মোটা হই বা না হই অষ্টপ্রহর খেতখামার, গোশালা, বাগানের ধারে লাফালাফি করে খুব আনন্দে কাটাতাম।

তখন মন্দিরটা ছিল ছোট, কিন্তু খুবই সুন্দর। মা-বাবা তো বাইরে বসতেন, আমি মন্দিরের ভিতরে পূজারী মহারাজের পাশে বসে বিঘ্নসৃষ্টির চেষ্টা করতাম। তখন বসন্ত মহারাজ আমাকে নিজের কোলে টেনে নিতেন। ধূপের গন্ধ, সঙ্গে ফুলমালা, দীপ দিয়ে সাজানো ঠাকুরকে আমার খুব নিজের মনে হতো। প্রার্থনা করতাম: "হে ঠাকুর, অঙ্কে যেন একশোয় একশো পাই। নইলে মায়ের হাতে বেদম মার খাব।" সেই যে অভ্যাস হয়ে গেল, এখনো রোগীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখে মনে মনে ঠাকুরকেই ডাকি। তখন কেন জানি না চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতি পুরো ভরসা পাই না।

মন্দিরটা ঘিরে কত যে গাছপালা! মা-বাবা একবার গুণে বলেছিলেন, আঠারো রকমের জবা—লাল, গোলাপি, হলুদ, নীল, সাদা, গেরুয়া, আরো কত কী! তাছাড়া, গোলাপ, জুঁই, মধুমালতী, দোলনচাঁপা, গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকার কত না বাহার! স্বামী জীবন্মুক্তানন্দ গোলাপ ফুটিয়েছিলেন অনেক রকমের। তিনি আমাকে ভালবাসতেন, দেখলেই বলতেন 'ইলাহাবাদী আমরুদ'। কত রকমের গাছ ছিল—তেজপাতা, কামরাঙা, বেল, রকমারি আম, জাম, জামরুল, চালতা আরো কত কী! চালতা গাছটা এখনো টিকে আছে পরিপূর্ণ মহিমায় আমার কোয়ার্টারের কাছে। এখন অনেক বাড়িঘর হয়েছে। নির্মমভাবে গাছ কাটতে হয়েছে। অনেক সিলভার ওক, ইউক্যালিপটাসও কাটা পড়েছে।

তখন হাসপাতালটি ছোট ছিল। ডাক্তার একজন-দুজন ছিলেন বটে, তবে সাধু-ব্রহ্মচারীরা অনেক কিছু সামলাতেন। রৌদ্রস্নাত গাছপালায় ঘেরা হাসপাতালে এখন তো আমি ডাক্তার। কিন্তু তখনকার ঐ ছোট ছেলেটির খুব ভাল লাগত পরিচ্ছন্ন হাসপাতাল, বেডগুলির ফর্সা সাদা চাদর টানটান করে পাতা দেখে। ব্রহ্মচারীরা নিজের হাতে প্রতি রবিবার ঘর-বারান্দা পরিষ্কার করতেন। "Work is worship" কথাটা যেন জীবন্ত হয়ে উঠত। Radiologist তেমন কেউ ছিলেন না। কিন্তু চিত্ত মহারাজকে দেখেছি অক্লেশে X-Ray বিভাগ সামলাতে। কী অনলস কর্মী ছিলেন তিনি!

ভোর থেকে টাইপ করে চলতেন রুদ্র মহারাজ (স্বামী ভাবরূপানন্দ)। তখন আমি একটু বড়। তাঁকেও খুব উত্যক্ত করতাম। আমি স্বামীজীর মূর্তির সামনে বসে বকবক করে চলতাম অনাদি মহারাজ কি সত্যেন মহারাজের (স্বামী সত্যরূপানন্দ) সঙ্গে। শক্তি মহারাজ (স্বামী ত্র্যম্বকানন্দ) আমলকী শুকোতে দিতেন, বেলের বড়ি করে রাখতেন। কুলোয় লঙ্কা শুকতো। শুকনো আমলকী চুষতে চুষতে জল খেতাম।

সেসময় হাসপাতালটা সত্যিই সেবাশ্রম ছিল। নিয়তি মহারাজকে (স্বামী নিত্যশুদ্ধানন্দ) হাসপাতালে কাজ করতে দেখেছি। নিরলস সেবা। মোহন্ত মাখন মহারাজ ছিলেন ছোটখাটো মানুষ, কিন্তু খুবই পরিশ্রমী। সেবাশ্রমের কাজে তিনি দূরদূরান্তে হেঁটে চলে যেতেন, দুহাতে বড় বড় ঝুলি ভরে জিনিসপত্র বয়ে আনতেন হেঁটে। পরে কান্তরাজ মহারাজকে (স্বামী প্রসন্নানন্দ) দেখেছি পুরনো ব্যবহৃত খামগুলিও কেটে কুটে কাজে লাগাতেন। বিলাসিতা তো ছিলই না, কী পরিশ্রমই না করতেন। তখন আশ্রমের এত গাড়িও ছিল না। প্রথমদিকে একটা ছোট অস্টিন, পরে একটা জীপ। রমানাথ মহারাজ ধীরে ধীরে হাসপাতালকে নতুন রূপ দিলেন। স্বামী কল্যাণানন্দ ও স্বামী নিশ্চয়ানন্দের সেবাশ্রম হলো হাসপাতাল। তাঁদের অসমাপ্ত কাজ নিয়তি মহারাজ আরো সুষ্ঠভাবে চালানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এখন তো মহিলা বিভাগ হয়েছে, Ultra Sound, X-Ray হয়েছে, ECG আছে। চেষ্টা চলছে CT Scan-এর। আর উল্লেখযোগ্য হলো চব্বিশ ঘণ্টা সেবারত Lab, শিশুবিভাগ, ওষুধের দোকান। কী অক্লান্ত পরিশ্রম সন্ন্যাসীরা করছেন! আর সীমিত বেতনভোগী ল্যাবের ছেলেদের অবদানও কম নয়।

যে-আমি পুরনো লোক গঙ্গা ও সুখদেবকে বিরক্ত করতাম, নির্দিষ্ট সময়ের পনেরো মিনিট আগেই খাওয়ার ঘণ্টা বাজিয়ে হীরু মহারাজের (স্বামী মধুরানন্দ) মাথা খারাপ করে ফেলতাম, Christmas Eve-এ সতৃষ্ণ নয়নে কেক-বিস্কুটের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অর্বাচীনের মতো ভাষণ দিতাম—"Why I love Christ?" যে-আমি শিবানন্দজীর জন্মদিনে সত্যেন মহারাজের কাছ থেকে রসগোল্লার হাঁড়ি জোগাড় করতাম, তিনবছর বয়সে জল আর নুন পরিবেশন করতাম—সেই আমি আমার ভালবাসার কনখল আশ্রমের হাসপাতালে ডাক্তার হয়ে এসেছি। ডাক্তারি ভাল লাগে, তবে আরো ভাল লাগত ৩০ বছর আগে বসন্ত মহারাজের কাছ থেকে চটের জামা পরে, গলায় ঘণ্টা ও গাঁদার মালা ঝুলিয়ে গরুর শোভাযাত্রা lead করা। সে এক স্বপ্নের জগৎ!

ডাঃ স্মরজিৎ চৌধুরী
রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনখল
হরিদ্বার-২৪৯৪০৮

শব্দচেতনা ১৩

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজীর জীবন ও বাণীভিত্তিক বিশেষ শব্দছক

১			২			৩		৪	
					৫				
৬								৭	
					৮				
৯		১০					১১		১২
					১৩				
			১৪						
১৫	১৬					১৭		১৮	১৯
			২০						
২১					২২				

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আশ্বিন ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

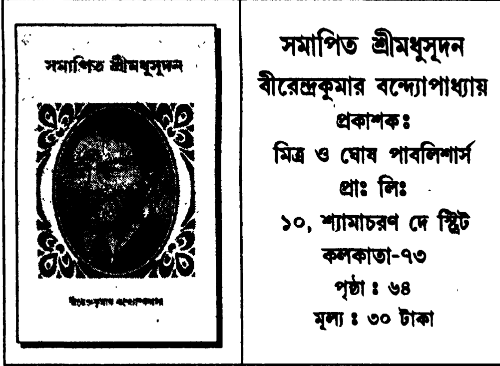
পাশাপাশি : (১) স্বামীজী মিসেস হেলকে এই নামে ডাকতেন (৪) উট এরকম ঘাস খায় (৫) ভক্ত এটা হতে চায় না, কিন্তু খেতে ভালবাসে (৬) কাছ থেকে দেখলে আকাশ আর সমুদ্রের জলে এটি থাকে না (৭) এটা খেলে ঝাল লাগবেই (৮) এ জল থেকে দুধ আলাদা করতে পারে (৯) এদের আগে ফল পরে ফুল (১৩) এই ঝড়ে বোঝা যায় না কোন্‌টা কোন্ গাছ (১৪) স্বামীজীকে এই চিরলাঞ্ছিত জাতির কুলতিলক বলা হয়েছে (১৫) এটি জলে থাকুক ক্ষতি নেই, কিন্তু এতে যেন জল না থাকে (১৮) সাক্ষী দিতে হলে এঁকেও কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতে হয় (২০) এরকম 'আমি'তে দোষ নেই (২১) নির্জনে বসে একে কাঁড়তে হয় (২২) স্বামীজীর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ।

ওপর-নিচ : (১) শ্রীমকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই নামে ডাকতেন (২) এটা অস্পৃশ্য, কিন্তু পাট করার পর ঠাকুরঘরেও নিয়ে যাওয়া যায় (৩) কামারপুকুরে ইনি বালক শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতারজ্ঞানে পূজা করতেন (৪) হাতে তেল মেখে এটি ভাঙতে হয় (৯) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে ইনিই প্রথম তাঁর কাছে আসেন (১০) কেশব সেনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের স্টিমার-ভ্রমণকালে এই সাহেবও ছিলেন (১১) "প্রেমের এ —— অতনু-গঞ্জন, কি মধুর বিভা বিকাশে নয়ন!" (১২) মন স্থির না হলে এটি হয় না (১৪) প্রাণ এরকম হলেই ঈশ্বরদর্শন হবে (১৬) এর ঘরে থাকলে গায়ে একটু কালি লাগবেই (১৭) এটি মিষ্টির মধ্যে নয় (১৯) এই রাজা হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ হয়ে অনেক তপস্যা করে ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছিলেন।

সূত্র : **তন্বীতনু পানি**

'সমাপিত শ্রীমধুসূদন' ঃ ধ্রুপদী কাব্যের চিরায়ত অথচ আধুনিক আবেদন

স্বামী শিবপ্রদানন্দ



আধুনিক বাঙলা কাব্যের প্রথম দ্বারমোচনকারী হিসাবে রবীন্দ্রনাথ মাইকেল মধুসূদন দত্তের উদ্দেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বাঙলা সাহিত্যের যুগসন্ধিক্ষণে মধুসূদনের অভ্যুদয় ঘটেছিল। পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন ঘটিয়ে তাঁর দৈবী প্রতিভা এমন সার্থকতা লাভ করেছিল যা তাঁকে বাঙলা কাব্যের এক নতুন পথিকৃৎ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। স্বামী বিবেকানন্দ মধুসূদনের প্রতিভা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন ঃ "ঐ একটা অদ্ভুত genius (প্রতিভা) তোদের দেশে জন্মেছিল।... 'মেঘনাদবধ'-এর মতো দ্বিতীয় কাব্য বাঙলা ভাষাতে তো নেই-ই, সমগ্র ইউরোপেও অমন একখানা কাব্য বেশি নেই।"

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মধুসূদন দত্তের চিঠির সূত্রে জানা যায় যে, 'মেঘনাদবধ' কাব্য রচনার আগেই 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের রচনা সম্পূর্ণ হয়েছিল। 'ব্রজাঙ্গনা' কিছুদিন অমুদ্রিত অবস্থায় থাকার পর 'মেঘনাদবধ' কাব্যের সঙ্গে প্রায় একত্রই প্রকাশিত হয়। 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে শ্রীরাধিকা পরমাপ্রকৃতি নন, বিরহ-বিধুরা রমণীমাত্র। বৃন্দাবন অপ্রাকৃতিক বৃন্দাবন নয়, সুরম্য উপবন মাত্র। মধুসূদন-রচিত শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ নন, প্রেমিকপুরুষ মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে বিষাদিনী মূর্তি হিসাবে শ্রীরাধিকাকে পাঠকসমাজে উপস্থাপিত করে জয়দেব অথবা বিদ্যাপতি রচিত ধারা থেকে পৃথক স্বাতন্ত্র্যে আপন বৈভবে মাথা তুলেছিলেন শ্রীমধুসূদন। এছাড়া তিনি ১৮৬১-১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে এগারোটি পত্রকাব্য-সম্বলিত 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের প্রথম খণ্ড রচনা করেন। আরো দশটি পত্রকাব্য লিখে 'বীরাঙ্গনা' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের জন্য তাঁর আগ্রহ ছিল। কিন্তু সেই ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়নি। ইউরোপে থাকাকালীনও তিনি ঐবিষয়ে চেষ্টা করে বিফল হন। অসাফল্যের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন ঃ "মধুসূদনকে যে-অবস্থায় য়ুরোপে বাস করিতে হইয়াছিল... সে-অবস্থায় মনের ভাব ধারাবাহিকরূপে গ্রথিত করিয়া কাব্যরচনা সম্ভবপর নয়। সাময়িক উচ্ছ্বাসে তিনি এক-একটি নূতন বিষয় আরম্ভ করিতেন, কিন্তু, তাহার পর, দৃঢ়তার ও সহিষ্ণুতার অভাবে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, আবার একটি নূতন বিষয় আরম্ভ করিতে বাধ্য হইতেন।"

মধুসূদনের দেহান্তের ১২৭ বছর পর একালের একজন যশস্বী সাহিত্যসেবী বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সমাপিত শ্রীমধুসূদন' গ্রন্থে 'বীরাঙ্গনা'র পাঁচটি, 'ব্রজাঙ্গনা'র একটি এবং 'ভারত আখ্যান'-এর দুটি—সর্বমোট আটটি কবিতা সার্থকভাবে সম্পূর্ণ করেছেন। এই অভিনব ও আত্মবিশ্বাসী প্রচেষ্টায় মধুসূদনের ভাব, ভাষা ও ছন্দ অক্ষুণ্ণ থেকেছে। আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ লিখেছেন ঃ "গম্ভীর ও ওজস্বিনী ভাষায় 'সমাপিত' এই পত্রকাব্যগুলি পড়তে পড়তে দুটি কবির রচনার ভেদরেখা নির্ণয় করা মাঝে মাঝে কঠিন হয়ে ওঠে। মধুসূদন এগুলি কিভাবে সমাপ্ত করতেন আমাদের অজ্ঞাত। তবে পাঠক হিসাবে আমাদের মনে হয় অনুজ কবির এই সশ্রদ্ধ নিবেদনে তিনি অবশ্যই সন্তুষ্ট হয়ে প্রশ্রয়ের হাসি হাসতেন।"

বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টা অশেষ গৌরবের, কারণ মধুসূদন-রচিত কাব্যের সার্থক পরিসমাপ্তি তাঁর সৃজনশীলতাকে সমমর্যাদায় উত্তীর্ণ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের শেষে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার নদীনিমজ্জতায় মৃত্যু হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈবাহিক দামোদর মুখোপাধ্যায় তাঁদের নদী থেকে উদ্ধার করে পুনর্জীবিত করে 'মৃন্ময়ী' নামে একটি উপন্যাস লেখেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' গ্রন্থের পরিপূরক হিসাবে 'কাজল' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। বর্তমান বছরটি প্রমথনাথ বিশীর জন্মশতবর্ষ। তাঁর জন্মশতবর্ষে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে পারি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের সঙ্গে তাঁর 'পঞ্চম পর্ব' ও 'ষষ্ঠ পর্ব' শীর্ষক দুটি গ্রন্থের সার্থক সংযোজনের কথা। সেই ঐতিহ্যের ধারায় বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃজনী শক্তি আপন ঔজ্জ্বল্যে দীপ্যমান।

এই প্রসঙ্গে 'সমাপিত শ্রীমধুসূদন' গ্রন্থের 'পরিচায়িকা' অংশে বিশিষ্ট ভাষাবিদ্ ও শিক্ষাব্রতী ডঃ পবিত্র সরকার যথার্থ মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ "মধুসূদনের সমস্ত শর্ত মেনে অথচ ভাষায় বীরেন্দ্রকুমারের নিজস্বতা রক্ষা করেই এ

পত্রকাব্যগুলি রচিত হয়েছে। এ শুধু মধুসূদনের অন্ধ অনুসরণ নয়, কবি বীরেন্দ্রকুমারেরও নিজস্ব বিস্তার।" বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক কালের জীবনবোধের নিরিখে পৌরাণিক কাহিনীর ইঙ্গিতকে আশ্চর্য দক্ষতায় প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন। তাঁর রচনার অসাধারণ শক্তিতে পৌরাণিক নারীচরিত্রগুলি জীবন-সত্যের আকুতি ও মৌলবাণীকে উচ্চারণ করতে সক্ষম হয়েছে, যা পত্রকাব্যগুলিকে অনুপম প্রসাদমাধুর্যে শ্রীমণ্ডিত করেছে। 'বীরাঙ্গনা' কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিশিষ্ট অধ্যাপক-গবেষক ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত লিখেছেন ঃ "মহাকাব্য ও পুরাণ কাহিনীর আশ্রয়ে, সমকালীন জীবনদৃষ্টির আলোকে তিনি চিরকালীন মানবপ্রাণের প্রশ্নকে রূপায়িত করেছেন এ কাব্যে, এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।" 'সমাপিত শ্রীমধুসূদন' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কেও এই উক্তিটি সমধিক প্রযোজ্য।

বিদ্যাসাগরের নারীমুক্তির প্রগতিশীল আন্দোলন মধুসূদনের সংবেদনশীল কবিমনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। তিনি তাঁর সমকালীন নারীমুক্তির মন্ত্রকে সমগ্র কবিচেতনা দিয়ে গ্রহণ করে তাঁর হৃদয়ের মূলে মানবতাবাদের প্রেরণার সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। 'বীরাঙ্গনা' কাব্য এই সফল সংযুক্তিকরণের প্রত্যক্ষ ফল। তাই 'বীরাঙ্গনা' কাব্যটি বিদ্যাসাগরের নামে উৎসর্গিত হওয়ার বিশেষ তাৎপর্য আছে। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের গঠনরীতির জন্য মধুসূদন ওভিদ-রচিত 'The Heroides or Epistle of the Heroines' কাব্যের কাছে ঋণী। তবু কবি মধুসূদনের কাব্যগঠনকৌশল এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের বিভায় উজ্জ্বল, যা তাঁর কাব্যপ্রতিভাকে স্বকীয়তার নৈপুণ্য প্রদান করেছে। প্রাচীন বিষয়বস্তুকে যুগচেতনার সাহায্যে সঞ্জীবিত করে তাতে নতুন প্রাণসঞ্চার করার এক দুর্লভ প্রতিভা মধুসূদনের ছিল। অন্যদিকে সেই ধারার অনুসারী বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 'সমাপিত শ্রীমধুসূদন' কাব্যগ্রন্থে নাটকীয় সংলাপভঙ্গি, আখ্যান-গৌরব ও লিরিক উচ্ছ্বাসের ত্রিবেণীসঙ্গম সচেতন পাঠকবর্গকে কাব্যতীর্থে উত্তীর্ণ করে।

কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু ঐক্য না থাকলে দুটি বিষয়ের মধ্যে স্বাঙ্গীকরণ সম্ভব হয় না। প্রাচীন ইতালি ও ভারতের জাতীয় সংস্কারে কতকগুলি বিষয়ে ঐক্য ছিল। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বিশিষ্ট অধ্যাপক-গবেষক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন ঃ "বহু দেবদেবী-বিশ্বাসী নিয়তিবাদী প্রাচীন ইতালীয় সমাজের সঙ্গে ভারতীয় সমাজের ধর্ম ও জীবন-বিশ্বাসে যে ঐক্য দেখা যায়, তাহার মধ্য দিয়া মধুসূদন ইতালীয় কবি ওভিদের সঙ্গে ঐক্য অনুভব করিয়াছেন। শিক্ষায় দীক্ষায় ধ্যান-ধারণায় দুই দেশের দুই কবির মধ্যে যে অভিন্ন মানস-পরিমণ্ডল গঠিত হইয়াছিল, 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে স্বাঙ্গীকরণের তাহাই ছিল ভিত্তি।"

সুরগত বৈচিত্র্যহীনতা পয়ার, ত্রিপদী এবং বৈষ্ণব পদাবলীর মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রধান ত্রুটি। দীর্ঘকাল ধরে পয়ার ও ত্রিপদী পদে পদে এবং পর্বে পর্বে মিত্রাক্ষর সৃষ্টি করে যে একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল, মধুসূদন তা উপলব্ধি করে পয়ার ত্রিপদীর বহিরঙ্গ পরিচয় অপরিবর্তিত রেখেও অন্তর্গত মুক্তির সুরগত বৈচিত্র্য এনেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে 'মেঘনাদবধ', 'ব্রজাঙ্গনা' ও 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের নতুন রসবোধ বাঙালি বিদগ্ধ মনকে পুলকিত করেছিল, যাকে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য 'অক্ষরবৃত্ত দীর্ঘ ত্রিপদী ও লঘু ত্রিপদীর একটি মিশ্র রচনা' হিসাবে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

আধুনিক কালের কবি বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মধুসূদনের রীতি অনুসরণ করে (ষষ্ঠ কবিতাটি ছাড়া) অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাঁর অনুভূতি ও মননের জগৎকে মেলে ধরেছেন। তাঁর অন্তরের কথাকে জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই অমিত্রাক্ষর ছন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। বর্তমান কালের অন্যতম অগ্রগণ্য কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লিখেছেন ঃ "কথাকে যদি ছন্দে না বাঁধি, তার অন্তরের সুর তাহলে ভাল করে মুক্তি পায় না। ছন্দ আসলে কথার মধ্যে গতির তাড়া জাগিয়ে দেয়।" বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত পত্রকাব্যের গতিময়তা আমাদের আবিষ্ট করে রাখে। তবে আধুনিক কাব্যের উদ্দাম গতির জগতে তাঁর রচনা অন্যতম বিরল ঘটনা, কারণ অমিত্রাক্ষর ছন্দের সংযত অভিব্যক্তিকে 'সমাপিত শ্রীমধুসূদন' গ্রন্থের পত্রকাব্যগুলি আমাদের ধ্রুপদী সাহিত্যের চিরায়ত অনুভবে পৌঁছে দেয় অথচ তা সম্পূর্ণ আধুনিক। ইউরোপীয় বহিরঙ্গ জীবনধারার অন্ধ অক্ষম অনুকরণকেই আমরা ভুলক্রমে আধুনিকতা হিসাবে চিহ্নিত করি। আসলে চেতনার গভীরে শক্তির উদ্বোধন ঘটিয়ে বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামের অধিকার অর্জন ও আত্মরক্ষার ক্ষমতালাভকেই আধুনিকতা বলা চলে। মার্জিত রুচি এবং সংযম বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রকাব্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, কারণ তাঁর পত্রকাব্যে গান্ধারী, উষা, শর্মিষ্ঠা প্রভৃতি চরিত্র চেতনার গভীর থেকে আশ্বাসের শক্তিকে তুলে এনে মানব-জমিনে উৎকর্ষের ফুল ফুটিয়েছেন। সেইসব চিরকালীন মানবী চরিত্র জীবনের বেদনারক্তে পা ডুবিয়ে আনন্দের আকাশে নিরন্তর মাথা তুলে মানুষের দুর্জয় যাত্রার সহযাত্রিনী হয়েছেন।

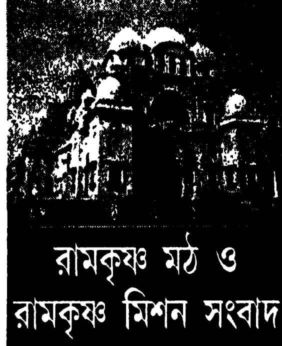
নির্বিচার আনুগত্যকে প্রশ্রয় না দিয়ে বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উদার, যুক্তিবাদী ও স্বচ্ছ মানবিক দৃষ্টিবলে দুর্বল, দেশাচার ও যুক্তিহীন প্রথানুগত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছেন। কাব্যসাহিত্যে যা শুভ ও সুন্দর তা গ্রহণ করতে তিনি কখনোই পরাঙ্মুখ হননি। তাই কবিতাপ্রেমী পাঠককুলের কাছে 'সমাপিত শ্রীমধুসূদন' বিশেষ আদরণীয় কাব্যগ্রন্থ ও সাহসী নিবেদন হিসাবে গৃহীত হবে। পত্রকাব্যের উদ্ধৃতি আলোচনায় পরিহার করে সচেতন ও আগ্রহী পাঠকবৃন্দকে বিস্তৃত পরিসরে প্রত্যক্ষভাবে সেই কাব্যসুধার আস্বাদগ্রহণের জন্য হার্দিক আহ্বান জানাই, কারণ তাঁর লেখনীতে তুলে নেওয়া চ্যালেঞ্জ অনুভবী পাঠককে রোমাঞ্চিত করবে, সন্দেহ নেই।

স্বল্প হলেও মুদ্রণপ্রমাদ চোখকে পীড়িত করেছে। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আরো আন্তরিক হলে তা দৃষ্টিনন্দন হতে পারত। ডঃ পবিত্র সরকার রচিত 'পরিচায়িকা' এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের 'ভূমিকা' গ্রন্থটির মর্যাদা ও গুরুত্ব বহুলাংশে বর্ধিত করেছে। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স এই প্রকাশনার মাধ্যমে সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। ❑

উৎসব-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ মঠ (বলরাম-মন্দির, কলকাতা-৩) : গত ১লা মে ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশনের ১০৫তম প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপিত হয়। মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, ভজন, ভক্তিগীতি, সরোদবাদন ও আলোচনাসভা ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম বিষয়। বৈকালিক আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। আলোচনা করেন স্বামী রমানন্দজী ও ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা। সভার শুরুতে স্বাগত-ভাষণ দান এবং সমাপ্তিতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে বলরাম-মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী পূতানন্দজী ও ডঃ কমল নন্দী। বিভিন্ন সময়ে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী সর্বগানন্দজী, প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবাশিস দত্ত। সমাগত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গোপেন্দ্র চৌধুরী।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান (কলকাতা-২৬) : প্রতিষ্ঠান-সংলগ্ন বস্তিবাসীদের বসবাসের উন্নতিবিধানের উদ্দেশে এবং প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিধি বাড়ানোর জন্য সেবাপ্রতিষ্ঠান পূর্ব কলকাতার বাগমারিতে একটি হাউসিং কমপ্লেক্স নির্মাণ করেছে। গত ১৪ এপ্রিল ২০০২, ৭৮টি ফ্ল্যাট-সমন্বিত এই কমপ্লেক্সটির উদ্বোধন করেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় আশীর্বাণী প্রদান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। গরিব বস্তিবাসীরা আরামপ্রদ ওনারশিপ ফ্ল্যাট পাওয়ায় তিনি খুব খুশি হয়ে বলেন : "এটাই ঠিক ঠিক স্বামীজী-কথিত 'সেবাধর্ম'।" সভার প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাঁর ভাষণে বলেন : "রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে আমার বহুদিনের যোগাযোগ। দুঃস্থ মানুষের উন্নতিকল্পে মিশনের নিঃস্বার্থ জনহিতকর কাজ দেখে আমি খুবই মুগ্ধ হচ্ছি। তবে বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য তাঁরা আশানুরূপ কাজ করতে পারছেন না এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভাব ও আদর্শ জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে অসমর্থ হচ্ছেন।" পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ সূর্যকান্ত মিশ্র বিশেষ অতিথির ভাষণে বলেন : "বহুদিন ধরে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছি। মানুষের দুঃখকষ্ট লাঘবের পদ্ধতি দেখে রামকৃষ্ণ মিশনের কাজে আমি খুব খুশি।" তিনি আরো বলেন : "মিশন যদি একটা 'মেডিকেল কলেজ' স্থাপনে উদ্যোগ নেয়, সরকার যথাসাধ্য সাহায্য করবে।" এরপর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী সভাপতির ভাষণে বলেন : "বহু অসুবিধার মধ্য দিয়ে মিশনকে কাজ করতে হচ্ছে। তাছাড়া প্রয়োজনানুরূপ সাধুকর্মীর অভাববশত কোন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না।" সভায় স্বাগত-ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী সর্বলোকানন্দজী ও স্বামী বোধাতীতানন্দজী। অনুষ্ঠানে বহু সাধু, ভক্ত ও স্থানীয় অধিবাসী যোগদান করেছিলেন।



রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার (কলকাতা-২৯) : গত ১৫ মে ২০০২ ইনস্টিটিউট অফ কালচার সংলগ্ন সদ্যক্রীত জমিতে একটি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় তিনি আশীর্বাণী প্রদান করেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। ভাষণ দেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী। উল্লেখ্য, গত ১৬ মে পূজ্যপাদ সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজ সংস্কারসাধিত প্রার্থনাকক্ষের উদ্বোধন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, বারাণসীর শতবর্ষপূর্তি

মহাপবিত্র তীর্থক্ষেত্র কাশীধামে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম-এর শতবর্ষ পূর্ণ হলো। আশ্রমটির সূচনা হয় ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই, অর্থাৎ স্বামীজীর মহাসমাধির দিন। স্বামী বিবেকানন্দের একান্ত ইচ্ছা ছিল কাশীতে বেদান্ত প্রচারের একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর সেই শুভ অভিলাষকে বাস্তবে রূপায়িত করতে বারাণসীতে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী শিবানন্দজী (মহাপুরুষ) মহারাজ। প্রথমে কাশীর লাক্সা অঞ্চলে একটি বাগান (তখন 'খাজাঞ্চি বাগিচা' নামে পরিচিত) ও তার মধ্যস্থ প্রাচীন এক বাড়িকে নিয়ে আশ্রমের সূচনা হয়। সূচনার ঠিক পরের দিনই (৫ জুলাই) স্বামীজীর দেহ-ত্যাগের সংবাদ পেয়ে মর্মাহত হন মহাপুরুষজী। এর কয়েক-দিন পরে রথযাত্রার শুভদিনে মহাপুরুষ মহারাজের ইচ্ছানুসারে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি পাশাপাশি বসিয়ে যথাবিহিত পূজা, হোম, ভোগরাগসহ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকার্য সুসম্পন্ন হয়। মহাপুরুষ মহারাজই আশ্রমের নাম দেন—'শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম'। অবিমুক্তপুরী কাশীধামে রামকৃষ্ণ-বেদান্ত ভাবপ্রচার ও নিবিড় অধ্যাত্মসাধনার জন্যই মূলত এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। স্বামী শিবানন্দজী বলতেন : "এই কাশীক্ষেত্রের সবটাই শিবের শরীর। আমরা শিবের মধ্যে বাস করছি।... এ হচ্ছে মহাশ্মশান, এখানে একটু চেপে ধ্যানজপ করলে খুব জমে যায়।" স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বলতেন : "কাশী হচ্ছে জগৎ-ছাড়া, মহা চৈতন্যময় স্থান। এখানে বসে ভজন করলে, যা করা যায় তার দশগুণ বেড়ে যায়। আর খুব শীঘ্র মন্ত্র চৈতন্য হয়। কাশী মুক্তিক্ষেত্র। এখানে বাবা বিশ্বনাথ অযাচিতভাবে জীবকে মুক্তি দিচ্ছেন। সকলেই মুক্ত হয়ে যাবে, জো-সো করে এখানে পড়ে থাকতে পারলেই হয়।... কী আর বলব, শিবক্ষেত্র, শিবই গুরু! একদিকে মা অন্নপূর্ণা অন্ন দিয়ে

বাইরের অভাব দূর করছেন, অন্যদিকে বাবা বিশ্বনাথ ধর্ম দিচ্ছেন, মুক্তি দিচ্ছেন।"



বারাণসীর শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মরমূর্তি

কাশীর এই অদ্বৈত আশ্রমের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠের প্রথম পর্বের বহু পুণ্যস্মৃতি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। প্রতিষ্ঠার অল্পকালের মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের মধ্যে স্বামী সারদানন্দজী, স্বামী তুরীয়ানন্দজী, স্বামী প্রেমানন্দজী ও স্বামী ব্রহ্মানন্দজী এই আশ্রমে পদার্পণ করেছেন। শ্রীশ্রীমা আগমন করেছেন আরো পরে। এসেছেন স্বামী অদ্ভুতানন্দজী, স্বামী সুবোধানন্দজী। আশ্রমে প্রথম দিকে তীব্র আর্থিক অসচ্ছলতা ছিল। সে-সময়কার সন্ন্যাসীদের কঠোর সাধনজীবন ও একান্ত ঈশ্বরনির্ভরতা ছিল দৃষ্টান্তমূলক। মহাপুরুষ মহারাজকে সাহায্য করার জন্য এইসময়ে বাইরের একটি ছেলে এসে আশ্রমে থাকত। মহারাজ তখন তাঁর কাছে সামান্য যাকিছু টাকাকড়ি থাকত, তা একটি টিনের বাক্সে রেখে দিতেন। ছেলেটি একদিন ঐ বাক্স থেকে সমস্ত টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। সে-টাকা আশ্রমের বাড়ি-ভাড়া দেওয়ার জন্য রাখা ছিল। মহারাজ খুব বিপদে পড়ে গেলেও যখন দেখলেন যে, একটি পয়সা তখনো বাক্সে রয়ে গেছে, তখন তিনি ছেলেটির প্রশংসা করে বললেন ঃ "আহা, ছেলেটির ধর্মবুদ্ধি আছে, ঠাকুরের ভোগের বাতাসার পয়সাটি সে রেখে গেছে।" এদিকে ভাড়া বাকি পড়ে যাওয়ায় বাড়িওয়ালা মহারাজকে তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে টাকা দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে ও অপমান করে সারাদিন আটকে রাখে। অবশেষে সন্ধ্যার সময় কয়েকজন ভক্ত মিলে একটা মিটমাট করে তাঁকে ছাড়িয়ে আনেন। এই কষ্ট ও লাঞ্ছনা তিনি স্বামীজীর দেওয়া কর্তব্যসাধন মনে করে নীরবে সহ্য করেন।

অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর আগে স্বামীজীর জীবদ্দশাতে কাশীতেই অসুস্থ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সেবাকল্পে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম'। স্বামীজী বলেছিলেন ঃ "একদিকে ঠাকুরের মন্দির হবে, আরেকদিকে সেবাকাজ চলবে। সেবকেরা ধ্যান-ধারণা করে সেবাশ্রমের কাজে জীবনে তা প্রতিফলিত করবে—এই আমি চাই।" অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রায় চার বছর পরে একটি বড় জমি-বাড়ি সংগৃহীত হয় ও সেখানে উঠে আসে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও অদ্বৈত আশ্রম, পাশাপাশি। শেষোক্তটিই বর্তমান শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, বারাণসী। শ্রীশ্রীমা ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে এই আশ্রমগৃহেই প্রথম শুভাগমন করেন। সেসময়ে ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর দুটি পট নিত্য পূজিত হতো। কুলুঙ্গিতে রাখা থাকত শ্রীশ্রীমায়ের ছবি। মা এসে ঠাকুরকে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার পর নিজের ছবিতেও অঞ্জলি প্রদান করে বলেছিলেন ঃ "এটিতেও দুটি ফুল দিও।" এই সময় মা স্বামী শান্তানন্দজীকে বলেন ঃ "কাশী তোমাদের স্থান; বাবা, সাধন কী জান, তাঁর পাদপদ্মে সর্বদা মন রেখে তাঁর চিন্তাতে মনকে ডুবিয়ে রাখা, তাঁর নাম সর্বদা জপ করা।" আশ্রমের দোতলা নির্মিত হয়ে যাওয়ার পর পশ্চিমের কোণের ঘরে মহাপুরুষ মহারাজ থাকতেন। এইসময় একদিন আশ্রমে থাকাকালে তিনি বাবা বিশ্বনাথের দর্শন লাভ করেন। ক্রমে ক্রমে সেই মূর্তিতেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেন। অদ্বৈত আশ্রম মহাপুরুষজীর খুব প্রিয় ছিল। নিয়মিত তিনি এই আশ্রমের খোঁজখবর নিতেন।

পরবর্তী কালে অদ্বৈত আশ্রমে নির্মিত হয় চুনার পাথরে তৈরি বর্তমান সুরম্য মন্দির ও শ্রীরামকৃষ্ণের শ্বেতপাথরের বিগ্রহ। ঠাকুরের পার্ষদ্ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর করা নকশা অনুযায়ী তাঁরই তত্ত্বাবধানে তৈরি হয় মন্দিরটি। ঠাকুরের জন্মশতবর্ষে তাঁর তিথিপূজার দিন (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬) মহাসমারোহে মন্দির উৎসর্গ ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকার্য সুসম্পন্ন করেন বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ (তিনি তখন রামকৃষ্ণ মঠের সহাধ্যক্ষ)। মূল মন্দিরের বেদিতে একটি পাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের কেশ, নখ ও একটি দাঁত প্রোথিত হয়। শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও মহাপুরুষ মহারাজের দেহাবশেষও আলাদাভাবে এখানে রক্ষিত আছে। কাশীর প্রাচীন মন্দিরের ধাঁচে নির্মিত এই মন্দিরটি সমগ্র রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম প্রস্তর মন্দির। মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে কাশীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ একত্রে একটি বিরাট শোভাযাত্রা করে শ্রীরামকৃষ্ণের আলোক-চিত্র নিয়ে কাশীর প্রধান প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করেন। পরবর্তী কালে অদ্বৈত আশ্রমে নির্মিত হয় লাটু মহারাজের স্মৃতিকক্ষ, দুর্গামণ্ডপ ও মহাবীরের মন্দির। রামকৃষ্ণ মঠের এই তৃতীয় কেন্দ্রটি (এর আগে প্রতিষ্ঠিত হয় মুর্শিদাবাদের সেবাকেন্দ্র ও মাদ্রাজের রামকৃষ্ণ মঠ) শতবর্ষ অতিক্রম করে তার সুদীর্ঘ যাত্রাপথের সন্ধিলগ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা ও বেদান্ত-চর্চার সুমহান সাধনস্থলরূপে অবস্থান করছে।

নতুন মঠকেন্দ্র

'বলরাম-মন্দির ট্রাস্ট' এতদিন বেলুড় মঠের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। এখন এটি রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়ের শাখাকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হলো। বলরাম-মন্দিরের নতুন নামকরণ হয়েছে ঃ

রামকৃষ্ণ মঠ (বলরাম-মন্দির)। ঠিকানা ঃ ৭ গিরিশ অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০ ০০৩। ফোন ঃ ৫৫৪-৫০০৬।

অনুরূপভাবে 'শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দ আশ্রম' বেলুড় মঠের শাখাকেন্দ্ররূপে নির্দিষ্ট হলো। নতুন নামকরণ হয়েছে ঃ **রামকৃষ্ণ মঠ, শিকরা-কুলীনগ্রাম। ঠিকানা ঃ জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৪২৮। ফোন ঃ (০৩২১৭) ৪৯৯৮০। কলকাতা থেকে ফোন ঃ ৯১২৭-৪৯৯৮০।**

ছাত্রকৃতিত্ব

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ পরিচালিত ২০০২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের ফলাফল নিম্নরূপ ঃ **মালদা** ও **বরানগর** বিদ্যালয়ের তিনটি ছাত্র যথাক্রমে প্রথম ও পঞ্চম এবং নবম স্থান অধিকার করেছে। **মালদার** ৮৩ জন, **মেদিনীপুরের** ৮৫ জন, **নরেন্দ্রপুরের** ১২৮ জন ও **রহড়ার** ১৮৪ জন পরীক্ষার্থীর সকলেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে।

'স্টার' পেয়ে যারা উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের পরিসংখ্যান দেওয়া হলো ঃ **আসানসোল**—৮২/১২৯, **বরানগর**—১০০/১৫৭, **কামারপুকুর**—৩৮/৯৩, **কাটিহার**—২১/৮২, **মালদা**—৭২/৮৩, **মনসাদ্বীপ**—১১/৭৮, **মেদিনীপুর**—৩৪/৮৫, **নরেন্দ্রপুর**—১২৬/১২৮, **পুরুলিয়া**—৬৪/৯১, **রহড়া**—১২৫/১৮৪, **রামহরিপুর**—২৫/৬৭, **সারগাছি**—২৫/৮১, **সরিষা** (দুটি বিদ্যালয়)—৭৪/২৬৮ এবং **টাকি**—১৪/৬১।

বিশেষ উল্লেখ্য, নরেন্দ্রপুর অন্ধ বিদ্যালয়ের ১৫ জন পরীক্ষার্থীর সকলেই এবছর 'স্টার' পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ পরিচালিত ২০০২ সালের সি. বি. এস. ই. পরীক্ষায় **দেওঘর বিদ্যাপীঠের** ৬৯ জন পরীক্ষার্থীর সকলেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাছাড়া অরুণাচল প্রদেশের **আলঙের** ৮১ জনের মধ্যে ৬২ জন ও **নরোত্তমনগরের** ২৯ জনের মধ্যে ২৪ জন এবং ত্রিপুরার **বিবেকনগরের** ৪৫ জনের মধ্যে ৩৮ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। অধিকন্তু 'স্টার' পেয়ে উত্তীর্ণের পরিসংখ্যান হলো ঃ **আলং**—২৩/৮১, **দেওঘর**—৬২/৬৯, **নরোত্তমনগর**—৬/২৯ এবং **বিবেকনগর**—২৩/৪৫।

ত্রাণ

গুজরাট পুনর্বাসন ত্রাণ

গত ২৬ জানুয়ারি ২০০১ গুজরাটে ভয়াবহ ভূমিকম্পে ২৫টি জেলার ১৮১টি তালুক ও ৭,৬৩৩টি গ্রামের লক্ষ লক্ষ মানুষ আহত, অসহায় ও গৃহহীন হয়ে পড়েছিল। সেইসকল মানুষের সাহায্যার্থে রামকৃষ্ণ মিশন প্রাথমিক ত্রাণ দেওয়ার পর কয়েকটি শিবির ও আশ্রমের মাধ্যমে বাসস্থান ও বিদ্যালয় নির্মাণ করে দিয়েছে। সর্বমোট ৩৫৩টি বাড়ি ও ৭৬টি বিদ্যালয় নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করেছিল; সেগুলি সবই বাস্তবায়িত হয়েছে।

পোরবন্দর আশ্রমের মাধ্যমে ৮০টি বাড়ি এবং **ধানেতি শিবিরের** মাধ্যমে ২৭৩টি বাড়ি নির্মিত হয়েছে। **পোরবন্দর আশ্রমের** মাধ্যমে ৩৫টি বিদ্যালয়, **ধানেতি শিবিরের** মাধ্যমে ৩টি বিদ্যালয়, **মোরবি শিবিরের** মাধ্যমে ১০টি বিদ্যালয়, **সুরেন্দ্রনগর শিবিরের** মাধ্যমে ৭টি বিদ্যালয় ও **লিমডি আশ্রমের** মাধ্যমে ২১টি বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া **লিমডি আশ্রমের** মাধ্যমে ৪টি পুকুর খনন করা হয়েছে।

দেহত্যাগ

স্বামী ভাবঘনানন্দজী (সত্যব্রত মহারাজ) ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে গত ২ মে ২০০২ ভোর ৫টা ১৫ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহান্তকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করার পর তিনি ১৯৫৬ সালে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে যোগদান করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদানকেন্দ্র ভিন্ন তিনি বিভিন্ন সময়ে সারদাপীঠ, টাকি, রহড়া ও কাঁথিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। দীর্ঘ প্রায় ত্রিশ বছর যাবৎ তিনি বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণকেন্দ্রের আচার্য ছিলেন এবং বেলুড় মঠে গত তিন বছর ধরে অবসর জীবনযাপন করছিলেন। পূজ্যপাদ মহারাজ ছিলেন কঠোর তপস্বী, আত্মপ্রশংসাবিমুখ, পণ্ডিত ও সহজ-সরল স্বভাবের।

স্বামী অজাতানন্দজী (নিত্যানন্দ মহারাজ) হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় গত ১৯ মে ২০০২ ভোর ৪টা ৫৫ মিনিটে কাশী সেবাশ্রমে প্রয়াণ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। দেহান্তের দুদিন আগে উচ্চ রক্তচাপ ও অত্যধিক জ্বর অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৫৩ সালে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৬১ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। বেলুড় মঠ ছাড়া তিনি সারদাপীঠ ও কাশী সেবাশ্রমে কর্মী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। পূজনীয় মহারাজ তপস্বী ও স্নেহপরায়ণ ছিলেন। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজা ঃ গত ১০ জুন ২০০২ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে ফলহারিণী কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধন-এ শ্রীশ্রীমায়ের ৯৪তম পদার্পণ উৎসব ঃ গত ১৪ জুন ২০০২ সাড়ম্বরে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ পদার্পণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি, শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ প্রভৃতি ছিল উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ। এদিন সকালে আয়োজিত ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী সুপর্ণানন্দজী ও স্বামী বলভদ্রানন্দজী। আন্দুল কালীকীর্তন সমিতি কালীকীর্তন এবং তমলুকের শিল্পীরা শ্রুতিনাটক পরিবেশন করেন। এছাড়া পরিবেশিত হয় রাহুল চট্টোপাধ্যায়ের সেতারবাদন এবং সতী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের যাত্রাভিনয়। উৎসবে আগত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ (কলকাতা-৮৪) : গত ২৩ মার্চ ২০০২ গীতিনাট্য ও ধর্মসভার মাধ্যমে সঙ্ঘের বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা মহেশপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা সুদীপ্তপ্রাণাজী।

আমলাদাহি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র (চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান) : গত ২৩ ও ২৪ মার্চ ২০০২ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, যুবসম্মেলন, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, রক্তদান শিবির, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অজয়কুমার চ্যাটার্জি। দুদিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অধ্যাত্মানন্দজী, স্বামী গিরিশানন্দজী, স্বামী অমৃতানন্দজী প্রমুখ। উৎসবে প্রায় ৬,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

দীঘা সারদা রামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্র (মেদিনীপুর) : গত ২৪ মার্চ ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠ, ভজন, ভক্তিগীতি, চিকিৎসা-শিবির এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় আলোচনা করেন হেমন্তকুমার দত্ত, সুশান্ত চক্রবর্তী, উমাকান্ত মাইতি প্রমুখ। সভায় স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সেবাকেন্দ্রের স্বামী নিত্যবোধানন্দজী।

পুতুণ্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (শক্তিগড়, বর্ধমান) : গত ২৪-২৫ মার্চ ২০০২ বেদপাঠ, শোভাযাত্রা, 'চণ্ডী' পাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, তরজা গান ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব পালন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন জয়শ্রী মুখার্জি। ধর্মসভায় ভাষণ দেন বর্ধমান শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী শান্তানন্দজী। উৎসবে প্রায় ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

রানিয়া কুলটিকারি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) : গত ২৪ মার্চ ২০০২ নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র-বিতরণ, নাটক ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হয়। সকালে 'কথামৃত' পাঠ এবং ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী। উৎসবে প্রায় ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

সোনামুখী শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিবেকানন্দ আশ্রম (বাঁকুড়া) : গত ২৫ মার্চ ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সম্মেলনে আলোচনা করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী ও স্বামী বিবেকাত্মানন্দজী। এদিন একটি সাধুনিবাসের উদ্বোধন এবং সভাপতিত্ব করেন অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মুমুক্ষানন্দজী। সম্মেলনে প্রায় ৪০০ ভক্ত যোগদান করেছিলেন।

রামপুরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্র (বীরভূম) : গত ২৮ মার্চ ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ ও শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী আলোচনা এবং ভক্তিগীতির মাধ্যমে দোলপূর্ণিমা উদ্যাপিত হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন তপতী রায় ও দীপক রায় এবং 'কথামৃত' পাঠ করেন বিশ্বেশ্বর রায়। উল্লেখ্য, গত ডিসেম্বর মাসে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, মুকুন্দবিহারী স্মৃতি গ্রন্থাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে পাঠচক্রের বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়েছিল। ধর্মসভায় ভাষণ দান এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী।

বিবেকানন্দ সোসাইটি (কলকাতা-৬) : গত ২৮-৩০ মার্চ ২০০২ তিনদিন ধরে সঙ্গীত ও আলোচনার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিন শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী সনাতনানন্দজী ও দীপ্তিকুমার শীল। দ্বিতীয়দিন শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী ও পূর্বা সেনগুপ্ত। তৃতীয়দিন স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী ও ডঃ কমল নন্দী। তিনদিনের অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুকান্ত ভট্টাচার্য, করুণাময়ী ভট্টাচার্য ও স্বপন চট্টোপাধ্যায়।

সোদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ২৮-৩১ মার্চ ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চারদিন ধরে সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব উদ্যাপিত হয়। বিশেষ পূজা, বাউলগান, লীলাকীর্তন ও ধর্মসভা ছিল উৎসবের অন্যতম বিষয়। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী জয়ানন্দজী, স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, অধ্যাপক সুপ্রিয় ভট্টাচার্য এবং প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণাজী ও অধ্যাপিকা কাকলী দাস। পূজা করেন স্বামী অম্বিকেশানন্দজী। অনুষ্ঠানে প্রায় ১,২০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বিধাননগর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্র (কলকাতা-৬৪) : গত ২৯-৩১ মার্চ ২০০২ কেন্দ্রের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, গীতি-আলেখ্য, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিনের ধর্মসভায় স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী ও স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী প্রভানন্দজী। দ্বিতীয়দিনের সভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা দেবাত্মপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণাজী এবং সভানেতৃত্ব করেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী। তৃতীয়দিনের সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী ও স্বামী সুপর্ণানন্দজী এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী তত্ত্ববোধানন্দজী। উৎসবে প্রায় ৩,০০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সোদপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ৩০ মার্চ ২০০২ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জয়া ধর। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দজী।

নাহারলগন বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল (অরুণাচল প্রদেশ) : গত ৩০ মার্চ ২০০২ সারাদিনব্যাপী একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অর্চনা ভৌমিক। বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী।

গোন্দলপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি (চন্দননগর, হুগলী) : গত ৩০-৩১ মার্চ ২০০২ সমিতির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ

পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, নাটক, গীতি-আলেখ্য ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুদিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সনকানন্দজী, স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী, ডাঃ দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত ও অধ্যাপক নিত্যনিরঞ্জন কুণ্ডু।

পাঁশকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (মেদিনীপুর) : গত ৩১ মার্চ ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব উৎসব ও সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, শোভাযাত্রা, পাঠ, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। 'কথামৃত' এবং 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ ও আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী ও স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী অতন্দ্রানন্দজী, জয়ন্তকুমার বেরা প্রমুখ। দুপুরে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দজী। ভাষণ দান করেন স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী, স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী ও স্বামী অতন্দ্রানন্দজী। সভায় স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে জগত্তারণ আচার্য ও অধ্যাপক সুভাষচন্দ্র মান্না।

শিয়াখালা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠচক্র (হুগলী) : গত ৩১ মার্চ ২০০২ পাঠচক্রের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, 'চণ্ডী' পাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সমীর পাত্র। বৈকালিক ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী, বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী, শিউলি ব্যানার্জি প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০০ ভক্তের উপস্থিতি ছিল।

পশ্চিম রাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৩২) : গত ৩১ মার্চ ২০০২ বিশেষ পূজা, নগর-পরিক্রমা, ভক্তিগীতি, 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী ও অধ্যাপক অরুণেশ কুণ্ডু এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী ধর্মেশ্বরানন্দজী।

ন-পাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ৩১ মার্চ ২০০২ সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ১,২৫০ জন ভক্ত প্রসাদ পান। ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী অম্বিকেশানন্দজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী এবং সন্তোষকুমার ঘোষ।

শ্যামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘ (অযোধ্যা, হাওড়া) : গত ৩১ মার্চ ২০০২ 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন মহুয়া মণ্ডল, সুকুমার দত্ত প্রমুখ। দুপুরে প্রায় ৯০০ ভক্ত প্রসাদ পান। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী ব্রহ্মপদানন্দজী, গৌরহরি বেরা ও অধ্যাপক মাধাই বৈদ্য। এই উপলক্ষ্যে ৪৩ জন দুঃস্থ মানুষকে বস্ত্র প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, ২৩ জানুয়ারি পাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালিত হয়েছে। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী সগুণানন্দজী।

বিশ্ববিবেক তীর্থ (যাদবপুর, কলকাতা-৩২) : গত ৩১ মার্চ ২০০২ স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, শিশুনৃত্য ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুনৃতা দত্ত, গায়ত্রী সরকার প্রমুখ। আলোচনা করেন স্বামী স্বগতানন্দজী এবং কলকাতা উচ্চ আদালতের বিচারপতি অলোককুমার বসু। স্বাগত-ভাষণ দেন অমলচন্দ্র ব্যানার্জি।

কোন্নগর শ্রীরামকৃষ্ণ মনন সভা (হুগলী) : গত ৩১ মার্চ ২০০২ 'চণ্ডী', 'গীতা' ও স্তবপাঠ, উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন রামচন্দ্র পাল, কাঞ্চন মুখার্জি, ইন্দ্রাণী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সকালের ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণাজী এবং সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী ও স্বামী পরিপূর্ণানন্দজী।

পাণ্ডু বিবেকানন্দ পাঠচক্র (গৌহাটী, অসম) : গত ২৯ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল ২০০২ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাঠচক্রের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, যাত্রাপালা ও ধর্মসভা ছিল উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সঙ্গীতা দাস, সুধীর তালুকদার, শিবেন ব্যানার্জি প্রমুখ। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দজী, স্বামী দিব্যানন্দজী, অধ্যাপিকা ভারতী চক্রবর্তী, অধ্যাপক উমাকান্ত দেবশর্মা প্রমুখ।

হিজলডিহা বিবেকানন্দ সেবাসমিতি (বাঁকুড়া) : গত ১ এপ্রিল ২০০২ একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। পূজা, পাঠ, শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত ও আলোচনাসভা ছিল সম্মেলনের মুখ্য বিষয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন দেবব্রত সিংহ ঠাকুর। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী শিবপদানন্দজী, স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী, স্বামী অচ্যুত্যানন্দজী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রায় ৪,০০০ ভক্ত ও ছাত্রছাত্রীকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বারাকপুর শ্রীশ্রীমা সারদা সঙ্ঘ (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ৬ এপ্রিল ২০০২ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করে। সান্ধ্য ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয়ে আলোচনা করেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

দত্তপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ৬-৭ এপ্রিল ২০০২ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, পাঠ ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন করা হয়। প্রথমদিনের ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী অম্বিকেশানন্দজী, স্বর্ণকমল বিশ্বাস প্রমুখ। দ্বিতীয়দিনের অনুষ্ঠানে 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা এবং ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী। ভাষণ দেন সন্তোষকুমার ঘোষ ও দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। 'কথায় ও গানে কথামৃত' পরিবেশন করেন ব্রহ্মচারী সুমন। সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অমলেশ মুখোপাধ্যায়। এদিন দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন সঙ্ঘ (কলকাতা-৪১)ঃ গত ৭ এপ্রিল ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা ছিল অনুষ্ঠিত বিষয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সর্বগানন্দজী।

সুন্দরবন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ ঃ গত ৭ এপ্রিল ২০০২ দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় **স্যাণ্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে (উত্তর চব্বিশ পরগনা)**। সম্মেলনে আলোচনা করেন স্বামী সত্যস্থানন্দজী, স্বামী অঘোরাত্মানন্দজী, দীপককুমার রায় প্রমুখ। এতে ১৭টি আশ্রম থেকে প্রায় ৩০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

সীতারামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ (বর্ধমান)ঃ গত ৭ এপ্রিল ২০০২ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সান্ধ্য ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী গিরিশানন্দজী ও অধ্যাপক আবদুস সামাদ। সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জয়দেব মুখোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, গত ৬ এপ্রিল ১৪২ জন যুবপ্রতিনিধির সমাবেশে একটি যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী গিরিশানন্দজী, স্বামী শৈলজানন্দজী ও স্বামী শুভব্রতানন্দজী।

ভাঙামোড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (হুগলী)ঃ গত ৬-৮ এপ্রিল ২০০২ সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বিশেষ পূজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি, 'গীতা' ও 'চণ্ডী' পাঠ, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ধর্মসভা ছিল উৎসবের অঙ্গ। দুপুরে প্রায় ৬,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সকালের ধর্মসভায় ভাষণ দেন কৃষ্ণনগর রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বেদান্তানন্দজী, অরুণ দেব ও ডাঃ অশোককুমার দে এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী কৌশিকানন্দজী। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী শুকদেবানন্দজী এবং ভাষণ দেন অধ্যাপক প্রশান্ত রায় ও ডঃ বিশ্বনাথ দাস। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অনিলকুমার ভট্টাচার্য। সন্ধ্যায় রামায়ণগান পরিবেশিত হয়।

বেড়ী রামকৃষ্ণপল্লী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (উত্তর চব্বিশ পরগনা)ঃ গত ৭ও ৮ এপ্রিল ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ৩,০০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ ও যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে একটি দন্ত-চিকিৎসা শিবির পরিচালিত হয়।

চলান্তি শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (বালেশ্বর, ওড়িশা)ঃ গত ৭ এপ্রিল ২০০২ ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ধর্মসভার মাধ্যমে সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন কমলেশ রায় এবং শিবব্রত চক্রবর্তী ও সম্প্রদায়। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী সুপর্ণানন্দজী, স্বামী প্রিয়রূপানন্দজী, ওড়িশা ভাবপ্রচার পরিষদের আহ্বায়ক তত্ত্বকন্দর মিশ্র ও জলেশ্বর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা বীণা পট্টনায়ক। উৎসবে প্রায় ৩,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

নিমতা রামকৃষ্ণ-সারদা ভক্ত সঙ্ঘ (কলকাতা-৪৯)ঃ গত ১৩ এপ্রিল ২০০২ বিশেষ পূজা, ভজন, গীতি-আলেখ্য, 'কথামৃত' পাঠ ও ধর্মসভার মাধ্যমে সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ভজন পরিবেশন করেন স্বামী একব্রতানন্দজী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী। অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

পিতুলসাহা পশড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম (মেদিনীপুর)ঃ গত ১৩-১৫ এপ্রিল ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হয়। বেদপাঠ, বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতি ছিল উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শচীকান্ত বেরা, অশোক বেরা প্রমুখ। ধর্মসভায় ভাষণ দেন পরমানন্দ সাহু, সখারাম সামন্ত, সহদেব মাইতি প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী।

পাকুড় শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (ঝাড়খণ্ড)ঃ গত ১৪ এপ্রিল ২০০২ একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, পাঠ ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের প্রধান বিষয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন কেয়া পাণ্ডে, কৃষ্ণা দাস প্রমুখ। 'কথামৃত' এবং 'ভাগবত' পাঠ ও আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী আনন্দগিরি ও স্বামী বাগীশানন্দ পুরী। স্বামী শিবনাথানন্দজীর সভাপতিত্বে আলোচনা করেন স্বামী দেবময়ানন্দজী, স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজী, বদ্রীনাথ তিওয়ারী প্রমুখ।

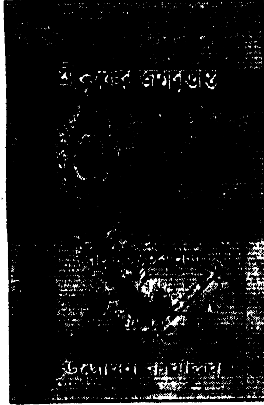
পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য সত্যরঞ্জন ঘোষ গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২, ৭৮ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য শ্রীধরচন্দ্র দত্ত গত ১১ মার্চ ২০০২, ৫৭ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি কাঁড়ারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং বহু জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ও কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে কর্মরত ছিলেন। পরোপকারিতা ও মধুর ব্যবহার ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

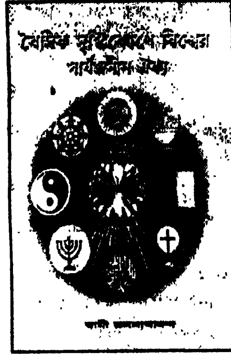
শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, নতুন দিল্লি-নিবাসী ক্ষিতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত গত ২০ মার্চ ২০০২, ৮৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। সুগায়ক ও সুবক্তা প্রয়াত সেনগুপ্ত দীর্ঘ ৪০ বছর যাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবপ্রচারে বৃত ছিলেন। স্বামী উমানাথানন্দজী (শ্রীশ মহারাজ) তাঁর অনুজ।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা-নিবাসী রামেশ্বর সরকার গত ২৬ মার্চ ২০০২ রাত ১টা ২৫ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন। দক্ষিণ কলকাতাস্থিত বড়িশায় বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণের জন্য বেলুড় মঠকে তিনি জমি দান এবং অর্থসাহায্য করেছিলেন। তিনি 'উদ্বোধন'-এর আজীবন গুণগ্রাহী পাঠক এবং বিশিষ্ট দাতা ছিলেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকা যখন আর্থিক অনটনের মধ্যে ছিল, তখন থেকেই তিনি উদারহস্তে দান করে এসেছেন—এখনো তা অব্যাহত আছে। প্রয়াত রামেশ্বরবাবু রামকৃষ্ণ মঠের বহু প্রবীণ সন্ন্যাসী, মঠের অধ্যক্ষ ও সহাধ্যক্ষ মহারাজগণের স্নেহের পাত্র ছিলেন। ❑



শ্রীমদ্ভাগবত (শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত)

স্বামী ভূতেশানন্দ ৪০.০০



বৈদিক দৃষ্টিকোণে বিশ্বের সার্বজনীন ঐক্য

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ৫.০০



যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ

মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত ৮০.০০



ভজন মঞ্জরী ◆ রাজকুমার ভারতী



শিব শক্তি মালা ◆ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ

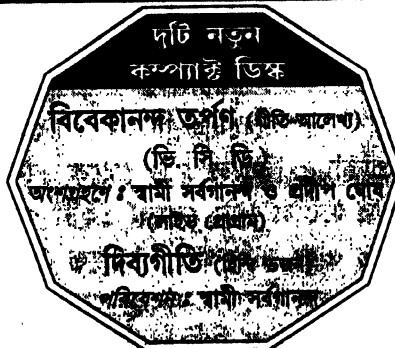


ভজন সুধা ◆ স্বামী জয়রাম



করুণারূপিণী জননী শ্রীসারদাদেবী

স্বামী ধর্মদানন্দ ৫.০০



উদ্বোধন কার্যালয়
প্রকাশিত
নতুন গ্রন্থ ও ক্যাসেট



স্বামী প্রেমানন্দের জীবন ও স্মৃতিকথা

সঙ্কলক ও সম্পাদক ঃ

স্বামী চেতনানন্দ ২৫.০০

ডাক মারফত বই ক্রয় করতে হলে সরাসরি "ম্যানেজার, উদ্বোধন অফিস, ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৩"—এই ঠিকানায় লিখুন।

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ



তাঁর নামবীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

এরকম মনে করা ভাল নয় যে, আমার ধর্মই ঠিক আর অন্য সকলের ধর্ম ভুল। সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকলেই হলো। অনন্ত পথ—অনন্ত মত। শ্রীরামকৃষ্ণ

*

ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজন? নিন্দা ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, কিন্তু কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে, তা বলতে পারে কজনে? শ্রীমা সারদাদেবী

*

টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধাবিঘ্নের বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ



জেলাভিত্তিক 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ২

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

জেলা : হাওড়া

- **রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম** ❑ বেলুড় মঠ
- **রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম**
  ৪ নম্বর পাড়া লেন, পিন-৭১১ ১০১
- **সাঁত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**
  নর্থ বাকসাড়া, পোঃ জগাছা, পিন-৭১১ ৩১১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ**
  গ্রাম+পোঃ মোল্লাহাট
  থানা : শ্যামপুর, পিন-৭১১ ৩১৪
- **মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয়**
  গ্রাম+পোঃ মাকড়দহ, পিন-৭১১ ৪০৯
- **নির্মল ঘোষ**, ৬ রায় জে. এন. রায়বাহাদুর রোড
  বাদামতলা, বালী-৭১১ ২০১, ফোন : ৬৫৪-৪০৪৫
- **বালী গ্রামাঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**
  রবীন্দ্র পল্লী (সাঁপুইপাড়া)
  পোঃ সাঁপুইপাড়া (বালী), পিন-৭১১ ২২৭
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ সঙ্ঘ**
  ঘোষপাড়া বাজার, বালী, ফোন : ৬৭১-৪৫১৯/৪৪৩৫/০৭৮৭
- **বালী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**
  অরুণাভ সরণি, পোঃ ঘোষপাড়া, বালী
- **সারদা বুক এজেন্সি**
  ১৫/৬ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন
  কদমতলা, পিন-৭১১ ১০১
- **শুকদেব সাঁতরা** ❑ গ্রাম : উত্তর পীরপুর
  পোঃ বানীবন, ভায়া : উলুবেড়িয়া, পিন-৭১১ ৩১৬
- **পাণিত্রাস বিবেকানন্দ সেবা সমিতি**
  গ্রাম+পোঃ পাণিত্রাস, পিন-৭১১ ৩২৫
- **হাঁটাল আঞ্চলিক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  হাঁটাল, পিন-৭১১ ৪০৪
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**
  সাঁকরাইল ভারত কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি
- **শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা মন্দির**
  জয়চণ্ডীতলা, প্রামাণিক পাড়া, ডোমজুড়, পিন-৭১১ ৪০৫
- **শ্রীমা সারদা ও শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  গুঁড়িখালি, খলিসানি, কালীতলা
- **মাকড়দহ (২) অঞ্চল বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সমিতি**
  জোতগিরি, পোঃ লক্ষ্মণপুর, পিন-৭১১ ৩২৩
- **শ্রীশ্রীসারদা আশ্রম**, জঙ্গলপুর
  পোঃ আর্গোরি, পিন-৭১১ ৩০২
- **বি গার্ডেন শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**
  ৩৪/৩ দানেশ শেখ লেন, পিন-৭১১ ১০৯
- **বেলপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  গ্রাম : বেলপুকুর, পোঃ অযোধ্যা, পিন-৭১১ ৩১২
- **শ্যামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘ**
  গ্রাম ও পোস্টঃ অযোধ্যা (বেলপুকুর), পিন-৭১১ ৩১২
- **ডোমজুড় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**
  ডোমজুড়, পিন-৭১১ ৪০৫, ফোন : ৬৬৯-০৮০৬
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, পোঃ অভয়নগর, বেলানগর
  পিন : ৭১১ ২০৫, ফোন : ৬৫৯-১১৪৪
- **শ্রীদীনবন্ধু পণ্ডিত**, প্রযত্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ হোমিও হল
  পোঃ চক্কাশী, থানা : বাউড়িয়া, পিন : ৭১১ ৩০৭
  ফোন : ৬৬১-৮১১২
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাব্রত সঙ্ঘ**, দেউলপুর, হাওড়া

জেলা : মেদিনীপুর (পূর্ব ও পশ্চিম)

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, তমলুক-৭২১ ৬৩৬
  ফোন : ৬৬০০৫/৬৬৭৬২
- **রামকৃষ্ণ মঠ**, পোঃ মঠ চণ্ডীপুর-৭২১ ৬৫৯
  ফোন : ৭২২১৮
- **রামকৃষ্ণ মঠ**, গড়বেতা, পোঃ আমলাগোড়া-৭২১ ১২১
  ফোন : ৬৫২০০
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**, পাঁশকুড়া-৭২১ ১৫২
- **খড়গপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি**
  খড়গপুর-৭২১ ৩০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, ঘাটাল-৭২১ ২১২
- **কাঁথি নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ**
  আঠিলাগরি, কাঁথি-৭২১ ৪০১
- **কৃষ্ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, খড়ার-৭২১ ২২২
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**, খড়ার-৭২১ ২২২
- **দাসপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, দাসপুর-৭২১ ২১১
- **ক্ষীরপাই রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম**
  ক্ষীরপাই-৭২১ ২৩২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র**, জাড়া-৭২১ ২৩২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**, চন্দ্রকোণা টাউন-৭২১ ২০১
- **কুঠিঘাট রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
  গোপীবল্লভপুর, পিন-৭২১ ৫০৬
- **খাসবাজার বিবেকানন্দ যুবপাঠচক্র**
  রাধাচন্দনপুর-৭২১ ১৬০
- **হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন**
  হলদিয়া অ্যান্সারেজ ক্যাম্প
  হলদিয়া পোর্ট-৭২১ ৬০৫
- **মোহনপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ মোহনপুর, পিন : ৭২১ ৪৩৬
- **রাধামোহনপুর রামকৃষ্ণ মিলন মন্দির**
  গ্রাম+পোঃ রাধামোহনপুর, পিন-৭২১ ১৬০
- **শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়**
  গ্রাম+পোঃ ধনেশ্বরপুর, পিন-৭২১ ১৬৬
- **বরুণা রামকৃষ্ণ জনকল্যাণ সেবাশ্রম**
  গ্রাম : বরুণা (ভুটা), পোঃ ভুটা, পি. এস. : দাসপুর

সারদারতি

গঙ্গারতির সুরে

১। জয় সারদা জগজ্জননি, জয় জয় তুমি ভবানি শিবানি । (জয় তুমি)
পরব্রহ্মপরাশক্তি, চিদ্‌রূপিণি পরাশক্তি
কৃপাকণা দাও জননি
(দাও) চরণাশ্রয় জননি।।

২। কৈলাসে গিরিশিখরে, জানি মোরা তব নিজ ধাম মাগো । (আছে তব)
জীবদুখে কাতর প্রাণে, জগতের দুঃখমোচনে
নরকলেবরে জননি ।
(এলে) মাতৃরূপধারিণি।
(এলে) নরশরীরে মৃড়ানি।।

৩। ব্রহ্ম সনাতনি সারদা তুমি মাগো, শ্রীরামকৃষ্ণ শকতি ।
(তুমি, রামকৃষ্ণের শকতি)
জয়রামবাটীতে এলে মা, জয়রামবাটীতে এসেছ
অপারকরুণারূপিণি ।
(যোগ)-মায়াবিহারিণি জননি।।

৪। মনে পড়ে শৈশবকালেতে সে মহান, দিব্যলীলা কাহিনী ।
(মাগো তব জীবনের)
অপার দুঃখসাগরে, তুমি ছিলে আনন্দরূপিণি
জয় শ্যামানন্দিনি।
(রাম)-চন্দ্রের প্রাণরূপিণি।।

৫। কামারপুকুরে তুমি নবাগতা, শ্রীমতি লজ্জাপটাবৃতা মা । (তুমি লজ্জা)
শ্রীরামকৃষ্ণ সাহচর্যে, সুদক্ষা হলে সব কার্যে
ভাবী জগতের জননি, (তুমি) মাতাঠাকুরানি ভবানি ।

৬। একদিন স্বামী সন্দর্শনে জয় মা, আসিবার কালে ভীষণা।
(মাগো আসিবার)
কালীমূর্তি দেখে দস্যুর, তব কৃপালাভে সেই দস্যুর—
জীবন ধন্য জননি ।
(তুমি) পরমাপ্রকৃতিরূপিণি।।

৭। যুগ অবতার যিনি এসেছেন এ যুগেতে, মাতৃভাব জাগাতে ।
(এ ধরায় মাতৃভাব)
সঁপিলেন তব শ্রীচরণে, সকল সাধনা এই জনমের
আকুল পরাণে জননি ।
(তুমি) ষোড়শীরূপধারিণি।।

৮। নহবতে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তুমি মাগো, কত না দুঃখ সয়েছ ।
(হাসিমুখে কত না)
জনমদুখিনি তুমি জানকী, জনমদুখিনি সীতা জননি—
পতিসেবা তবু করেছ।
(কত) ভক্তের সেবা করেছ।।

৯। অনাসক্তির পরাকাষ্ঠা এতদিনে, জগত এমন দেখেনি ।
(ইতিহাসে জগত)
কাশীপুরে অমানবী সেবাতে, বিষ্ণুপ্রিয়া যেন এল ধরাতে
ধ্বনিবে সে মহান বাণী। (যুগে যুগে)
জুড়াইবে পরাণখানি।।

১০। পতিবিরহে তব প্রাণ মন আহামরি, দাবানল সম দহিল ।
(দুঃসহ দাবানল)
পঞ্চতপায় তব বেদনার, সীমাহীন অসহ্য যাতনার—
উপশম হলো জননি। (তুমি)
শ্রীরাধিকারূপধারিণি।।

১১। মহিমা তব উদ্ভাসিত পলে পলে, সঙ্ঘজননি সারদা ।
(সন্ন্যাসী সঙ্ঘ)
বিবেকানন্দ মহাশক্তি, তোমারই প্রেরণা দিল মুক্তি—
প্রেমসুধা নির্ঝরিণি। মাগো জ্ঞানদায়িনি শিবানি।
তুমি নরশরীরে মৃড়ানি।।

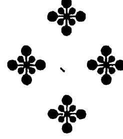
১২। দেবী প্রসন্না হও মাগো ক্ষণে ক্ষণে, কাতরে মাগে জননি।
(তব সুত)
কুপুত্র যদি বা হয় গো, কুপুত্র যদি বা হই মা
স্নেহময়ী তুমি জননি, মাগো কৃপাময়ি সুরধুনি।

১৩। রামকৃষ্ণপূজিতা তুমি জয় মা আদ্যাশক্তি ভবানি ।
(তুমি আদ্যাশক্তি)
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, ইন্দ্র প্রজাপতি ভাস্কর
ধ্যায় তব শ্রীপদখানি। (তুমি)
সীতা-রাধিকারূপিণি।।
তুমি সারদেশ্বরী জননি । মাগো জন্মান্তর জননি
জয় জয় মা জয় মা জয় জয় মা।
জয় জয় মা জয় মা জয় জয় মা।।

রচনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

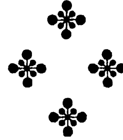
দেহত্যাগের আগে যদি কেউ ঈশ্বরের সাধন করে, আর সাধন করতে করতে ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, তাকে আর পাপ কখনো স্পর্শ করবে? অর্থাৎ ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, আর পাপ স্পর্শ করবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ



ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজনে? নিন্দা-ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, তাকে ভাল করতে পারে কজনে? আমার ছেলে যদি ধুলো-কাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে।

শ্রীমা সারদাদেবী



বেদে কোথাও নরকের কথা নাই। বেদের অনেক পরবর্তী পুরাণে এই নরকের প্রসঙ্গ আছে। বেদের সর্বাপেক্ষা অধিক যে-শাস্তির কথা পাওয়া যায়—তাহা পুনর্জন্ম, অর্থাৎ আরেকবার উন্নতির সুবিধা লাভ করা।

স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
Phone : 554-2248, 554-2403
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com
udbodhan@vsnl.net

Vol. 104
No. 7
JULY
2002

Licensed to Post
Without Prepayment
Licence No.
TECH/WB/RNP-15/LPWP-01/2002

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Regn. No.
TECH/WB/RNP-15/2002

উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের

১০৪তম বর্ষ

একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০৪ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত



প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

✤ গত ১লা মাঘ ১৪০৮ (১৫ জানুয়ারি ২০০২) **উদ্বোধন ১০৪তম বর্ষে** পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০৩ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম ✤

✿ স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে **উদ্বোধন** নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই **উদ্বোধন** একটি সার্থক **পারিবারিক পত্রিকা**। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা **উদ্বোধন**-এ প্রকাশিত হয়।

✿ **উদ্বোধন** অসাম্প্রদায়িক। **উদ্বোধন-এর গ্রাহক** হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার গ্রাহক হওয়া নয়, একটি মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

✿ স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে 'উদ্বোধন' যেন থাকে। উদ্বোধন-এর প্রত্যেক গ্রাহক একজন করে নূতন গ্রাহক করলেই এখনি উদ্বোধন-এর গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার হয়ে যায়। তাই আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের গ্রাহক করাও আপনার কাছে স্বামীজীর প্রত্যাশা। স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের গর্বিত দায়িত্ব আমাদের সকলের।

একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা

✿ উদ্বোধন-এর সেবায় পাঁচটি স্থায়ী তহবিল আছে। একটি 'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল', অন্য চারটি যথাক্রমে 'স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ স্মৃতি তহবিল', 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল', 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল' এবং 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মৃতি তহবিল'। উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টে পাঠালে অনুগ্রহ করে **'Ramakrishna Math, Baghbazar'**—এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা : সম্পাদক/**Editor,** ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। দাতার চিঠিতে বা M.O. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন দিতে গেলে **'Udbodhan Office, Kolkata'**—নামে চেক বা ড্রাফ্‌ট পাঠাবেন।

স্বামী সর্বগানন্দ
সম্পাদক

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা। সডাক ৯৫ টাকা। প্রতি সংখ্যা পৃথকভাবে ১০ টাকা।

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ

ভাদ্র ১৪০৯ ৮ম সংখ্যা

উদ্বোধন



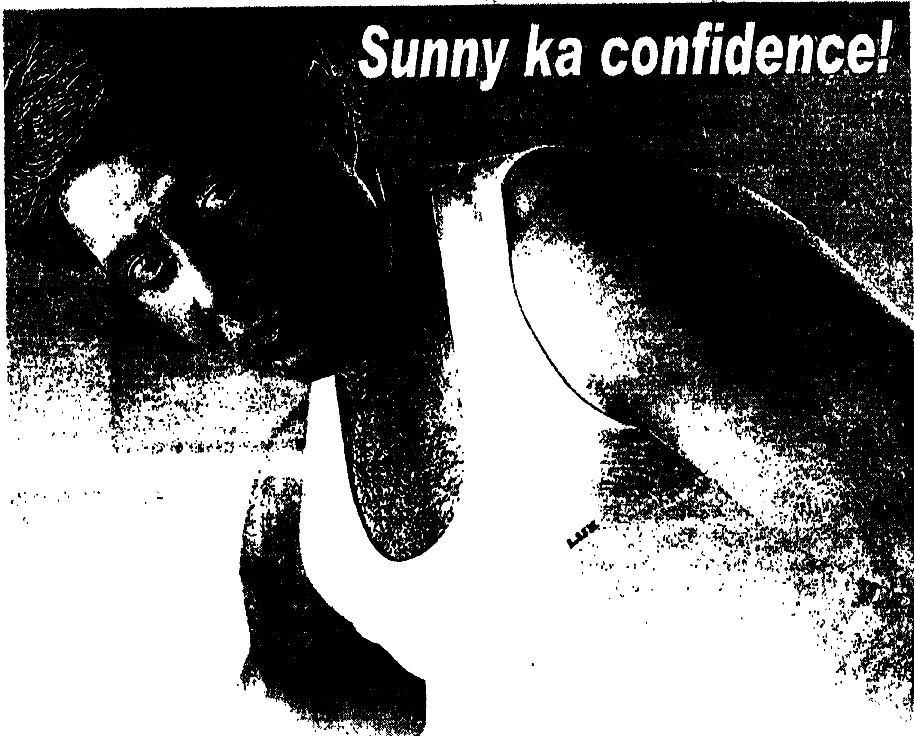
[illegible]তম বর্ষ ❀ উদ্বোধন কার্যালয় ❀ কলকাতা

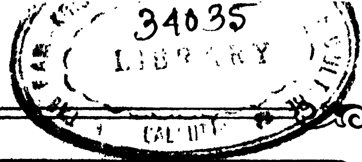


"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান---পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

"Mankind ought to be taught that religions are but the varied expressions of THE RELIGION which is oneness, so that each may choose the path that suits him best." —**Swami Vivekananda**





সূচীপত্র

উদ্বোধন ॥১০৪॥
১০৪তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা ভাদ্র ১৪০৯ আগস্ট ২০০২

প্রচ্ছদ ঃ গোমুখের চিত্র। হিমালয়ের হিমশৈলাবৃত গহ্বর থেকে গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, অবিরাম, উদ্দাম, অক্লান্ত গতিতে। এ যেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবগঙ্গা' বিবেকানন্দ-রূপ গোমুখের মধ্য দিয়ে জগৎকল্যাণার্থে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান। শিবচক্ষুটিও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। *আলোকচিত্র ঃ ডাঃ তমোনাশ ভট্টাচার্য।*

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ



সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৭৫ টাকা; সডাক ঃ ৯৫ টাকা ❑ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য ঃ ১০ টাকা



নবীকরণ ও গ্রাহকভুক্তি

২০০৩ খ্রিস্টাব্দ ● ১৪০৯-১৪১০ বঙ্গাব্দ

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে 'উদ্বোধন' ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

'উদ্বোধন' : ১০৫তম বর্ষ, ২০০৩ (মাঘ ১৪০৯—পৌষ ১৪১০) সালের জন্য আপনি নবীকরণ করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন।

গ্রাহকভুক্তি : ১০৫তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৩) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে। গ্রাহকমূল্য ৭৫্ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ৯৫্ টাকা। বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র : ৮০০্ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০্ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০্ টাকা।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি : ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০০্ টাকা (উদ্বৃত্ত কিছু থাকলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নামে জমা থাকবে) এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০্ টাকা (এক বা ন্যূনতম ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০্ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি : M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'**—এই নামে পাঠাতে পারেন। নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে 'নতুন গ্রাহক হতে চাই' খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন।

'চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে।

M.O. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্ছনীয়।

❑ কার্যালয় খোলা থাকে : বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।

❑ যোগাযোগের ঠিকানা : সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩
ফোন : ৫৫৪-২২৪৮, ৫৫৪-২৪০৩ ● e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com

উদ্বোধন
১০৪
ভাদ্র ১৪০৯
আগস্ট ২০০২

দিব্য বাণী

শ্রীভগবান ত্রিলোকপতি বিষ্ণু যে তত্ত্বজ্ঞান সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন তাহা নিম্নরূপ—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্।।
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ।।
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেম্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেম্বহম্।।
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা।।

[শ্রীমদ্ভাগবত, ২।৯।৩৩-৩৬]

শ্রীমদ্ভাগবতের সারকথা এই চারিটি শ্লোকে বিধৃত হইয়াছে। শ্রীভগবান বলিতেছেন—

সৃষ্টির পূর্বে সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থের মূল কারণ কি ছিল?—'আমি'। অন্য কিছুই ছিল না। সৃষ্টির পরবর্তী যাহা কিছু আছে, তাহাও 'আমি'। আর এই জগৎ যখন চিদাত্মকরূপে প্রতীত হইবে, তাহাও 'আমি'।

জ্ঞাতা [যে জানিতেছে] থাকিলেই 'প্রকাশ' এবং 'অপ্রকাশ' প্রতীত হইয়া থাকে, জ্ঞাতার অভাবে তাহা প্রতীত হয় না। যাবতীয় অচেতন বস্তু আমার মায়া বলিয়া জানিবে, জ্ঞাতা থাকিলে উহা প্রতীয়মান হয়।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ প্রভৃতি পঞ্চভূত যেরূপ ঘট-পটাদিতে প্রবিষ্ট থাকে, আবার অপ্রবিষ্টও থাকে, তেমনি আমি পরমাত্মারূপে সর্বভূতে প্রবিষ্ট থাকি, কিন্তু আমার সেই অবস্থানই শেষকথা নহে।

সকল কার্যে উপাদান-কারণরূপে সহ-স্থিতি (অনুবর্তন) এবং সকল কার্যে নিমিত্ত-কারণরূপে অনবস্থিতি (অননুবর্তন)—এই অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা যে-'বস্তু' সকল কার্যে সকল সময়ে অবস্থান করিতেছে তাই তত্ত্বপিপাসুর একমাত্র বিচার্য।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহান বাণী

আজও প্রাসঙ্গিক

যখন কংস জানিতে পারিল কারাগারে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিল। কিন্তু দেখিল দেবকীর এক কন্যাসন্তান লাভ হইয়াছে, পুত্র নহে। মনে মনে কিঞ্চিৎ হতাশ হইলেও 'শত্রুর শেষ রাখিতে নাই' ভাবিয়া সে ঐ কন্যাকে তুলিয়া আছাড় মারিতে উদ্যত হইলে কন্যা অদৃশ্য হইয়া গেল। যোগমায়ার কণ্ঠে দিক্‌দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া আকাশবাণী হইল—'তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।' দিনটি ছিল কৃষ্ণা অষ্টমী তিথি।

এই পৌরাণিক কাহিনী সকলের বিদিত। বস্তুত, কংস একটি প্রতীক মাত্র। অজস্র প্রতীকী ঘটনা, প্রতীকী উপাখ্যান, প্রতীকী উপদেশ ও বাক্য বিভিন্ন পুরাণ, উপনিষদাদিতে পাওয়া যায়, যাহা আজও পর্যন্ত একইভাবে প্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হয়। ইতিহাসের গতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি পরিবর্তিত হইতে থাকিলেও ঋষিরা মানুষের যেসকল জন্মগত স্বভাবের উল্লেখ করিয়াছিলেন, সৃষ্টির আদি হইতে এখনো পর্যন্ত তাহা অবিকৃত রহিয়াছে। এই স্বভাব-চারিত্র্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে বর্ণনা করিয়াছেন দুইভাগে। এক—মানুষের অন্তরের **দৈবীসম্পদ**, দুই—তাহার **আসুরীসম্পদ**। আসুরী গুণবৃত্তিকে 'সম্পদ' বলিবার হেতু কি? স্বামী বিবেকানন্দ যেরূপ বলিতেন: *"An analysis of religion shows that man does not travel from fallacy to truth, but from a lower truth to higher truth."* (মানুষ মিথ্যা হইতে সত্যে গমন করে না, নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে গমন করে।) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে এই দৈবীসম্পদ ও আসুরীসম্পদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন শ্রীভগবান। কংসের কথা চিন্তা করিলে মনে হয় উহা আসুরীসম্পদের জ্বলন্ত প্রতীক। যুগে যুগে সমাজে যে আসুরীবৃত্তির বিকাশ ঘটে, উহাই প্রতীক আকারে মহিষাসুর, কংস, রাবণ, হিরণ্যকশিপু-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের কথা স্মরণ করিলে স্বার্থ, হিংসা, স্বৈরাচারিতা, উৎকট বস্তুবাদিতা মানসনয়নে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে। যদি প্রশ্ন করা হয়, কংসের আদর্শ কী ছিল? উত্তর সহজলভ্য। চূড়ান্ত ক্ষমতাসীনতা, প্রবল ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা, ভোগ, মদ্যপান, ছলে-বলে-কৌশলে পরের ধন আত্মসাৎ করা ও দুর্বলকে পীড়ন করা, নারী-নির্যাতন এবং সনাতন ধর্মের আপ্রাণ বিরোধিতা করা। সে হয়তো ভাবিত, রাজার কর্তব্য করিয়া সে জগতের কল্যাণ করিতেছে; কিন্তু বস্তুত, কল্যাণের পরিবর্তে জগতের যে মহা অকল্যাণ সাধিত হইতেছে, সে-ধারণা তাহার ছিল না। আসুরীশক্তির বর্ণনা দিয়া শ্রীভগবান বলিলেন—

"দম্ভো-দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্।।"

অর্থাৎ **দম্ভ** (ধর্মধ্বজিত্ব অর্থাৎ ধর্মাচরণ না করিয়াও নিজেকে ধার্মিক ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করা), **দর্প** (বিপুল ধনরাশির কারণে অথবা স্বজনের গর্বে গর্বিত—অহঙ্কার), **অভিমান** (যোগ্যতা না থাকিয়াও সম্মানা-কাঙ্ক্ষা), **ক্রোধ**, **পারুষ্য** (বাক্যে ও ব্যবহারে অপরের প্রতি কর্কশ স্বভাব) এবং **অজ্ঞান** (কর্তব্য কী, অকর্তব্যই বা কী, গুরুজনের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করিতে হয় ইত্যাদি ব্যাপারে অনবধানতা) যেন আসুরীবৃত্তির মুখবন্ধ। ইহার পর ঐ কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া একাদিক্রমে "প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ..." ইত্যাদি শ্লোক বলিয়া চলিলেন শ্রীভগবান।

আসুর প্রকৃতির মানুষের ধর্মে **প্রবৃত্তি** নাই, কিন্তু অধর্ম হইতেও নিবৃত্ত হয় না। "যস্মাদ্ অনর্থহেতোঃ নিবর্তিতব্যং সা নিবৃত্তিঃ"—অনর্থ ঘটিতে পারে এরূপ কর্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়াই **নিবৃত্তি** (শ্রীশঙ্করাচার্য)। **শুচিতা** নাই—তাহাদের শরীর অশুচি, মন অশুচি, বাসস্থান অশুচি, তবু ভাবে 'বেশ আছি'। সদাচার কাহাকে বলে তাহারা জানে না। ইহারা **অসত্যে** প্রতিষ্ঠিত। মিথ্যাচারী ও মিথ্যাভাষী হইতে ইঁহাদের বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ হয় না। জগতের নিয়ন্তা, পালক ঈশ্বরের অস্তিত্বই ইহারা স্বীকার করে না। ইহাদের বক্তব্য, বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণের এবং প্রাণিবর্গের কামবৃত্তির ফলশ্রুতি এই জগৎ। কাজেই পৃথক করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই।

সুতরাং ইহারা ইন্দ্রিয়সুখের পরিপূর্তিকেই একমাত্র সত্য বলিয়া ধরিয়া লয়। বর্তমান সমাজেরও ইহাই সঠিক চিত্র বলিয়া বোধ হইতেছে। এই ইন্দ্রিয়চারিতা কখনো মনের বাসনাপূর্তির কারণ হইতে পারে না। বরং ইহা ক্রমশ দুষ্পূরণীয় কামনায় রূপান্তরিত হইয়া মানুষকে মনুষ্যপদবাচ্য আর থাকিতে দেয় না। কামনা-বাসনায় জর্জরিত তাহাদের হৃদয় মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং কোন্‌টি ঠিক, কোন্‌টি বেঠিক তাহা নির্ধারণে অক্ষম হইয়া অসত্যকেই সত্য বলিয়া

ধারণা করে। সমগ্র সমাজ কলুষিত হইয়া উঠে ও সমাজে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। লোকায়ত ব্যবহারে (বস্তুবাদী ভোগসর্বস্ব জীবনে) ক্রমশ অভ্যস্ত হইয়া তাহারা পারলৌকিক ক্রিয়াদি ত্যাগ করে। সুতরাং ক্রমে ক্রমে সমাজের সর্বস্তরে নির্ভয়ে হত্যাকাণ্ড, রাহাজানি ইত্যাদি ক্রূরকর্ম করিতে তাহাদের সমস্ত সঙ্কোচ দূরীভূত হয়। মানুষ হিংস্র হইয়া উঠে। লজ্জার আবরণ খসিয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ যেন আমাদের মানসনয়নে সমাজের একটি পূর্ণ লেখচিত্র সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেছেন।

আরও বিস্তারিতভাবে তিনি নিজস্ব স্বতন্ত্র ভঙ্গিমায় বলিয়া চলিলেন—অগণিত আশার বন্ধনে স্বতই বদ্ধ হইয়া, কাম-ক্রোধের বশবর্তী হইয়া 'নিজে সুখে থাকিব' ভাবিয়া তাহারা পরস্বাপহরণ করিতে সর্বদা যত্নশীল। 'আজ আমার এই ধনলাভ হইয়াছে' ভাবিয়াই পরমুহূর্তে ভাবিল—'কাল অমুক কর্মটি করিতে হইবে, তাহা হইলে ঐ বিপুল ধনরাশিও আমার হস্তগত হইবে!' 'আজ এই শত্রুকে নিধন করিলাম, কাল ঐ শত্রুকে নাশ করিব।' কখনো নিজেকে ভাবিতেছে—'আমিই ঈশ্বর। জগতে ভোগ করিবার অধিকার একমাত্র আমারই আছে।' ধনী ব্যক্তি যদি আসুরীগুণসম্পন্ন হয়, সে মনে করে 'অর্থের প্রতি সকলেরই দুর্বলতা আছে'। অর্থাৎ সে সকলকে ক্রয় করিয়া লইবে। সমাজে এই ধরনের মানুষের সংখ্যাধিক্য হইলেও ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় নীতি-প্রতিষ্ঠ মানুষ এখনও খুঁজিলে পাওয়া যাইবে। যাহারা আত্মশ্লাঘী মানুষ তাহারা সকলের সহিত দুর্ব্যবহারে লিপ্ত হইয়া পড়ে। তাহার সকল কাজ 'নামকে ওয়াস্তে' অর্থাৎ লোকদেখানো—'যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে'। কারণ, সে দম্ভে পূর্ণ হইয়া থাকে, ধর্মাচরণ না করিয়াও নিজেকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করিতে যাহা কিছু অন্যায় করা প্রয়োজন কোন কিছুতেই সে পরাঙ্মুখ হয় না! এবং এইরূপ আসুরী মনোবৃত্তিই ক্রমশ সমাজ ও জাতির বিনাশের কারণ হইয়া উঠে।

আধুনিক বাস্তব জীবনের অপূর্ব লেখচিত্র যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। আধুনিক সভ্যতার মুক্ত বাজারনীতি, বিশ্বায়ন ইত্যাদি বৃহৎ 'কন্সেপ্ট' মানুষকে ক্ষণে ক্ষণে বিভ্রান্ত করিয়া শোষণের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছে। তাহার মধ্যে শোভা পাইতেছে সুপরিকল্পিত সুচিন্তিত উন্নয়নমূলক কর্মসূচী, অথবা বহুজাতিক সংস্থা, হয়তো যাহার শীর্ষে অবস্থান করিতেছেন কিছু ক্ষমতাসীন মানুষ, যাঁহাদের মধ্যে দৈবী-সম্পদের একান্ত অভাব। তাঁহারা জগতের মানুষকে হাজার হাজার 'আশাপাশে' বদ্ধ করিতেছেন, নিজেরাও তাহার শিকার হইতেছেন।

ভাবিলে বিস্ময় জাগে। কমপক্ষে আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে লিখিত এই গীতাগ্রন্থে যেসকল কথা বিধৃত হইয়াছিল, আজও তাহা সমভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু শ্রীভগবান আমাদের নিরাশ করিবার জন্য নিশ্চয়ই এরূপ বিষয়ের অবতারণা করেন নাই। বরং বিপরীতটাই সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই সুন্দর উপমাটি মনে পড়িয়া যায়। বহুরূপী বাঘ সাজিয়া পাড়ায় আসিয়াছে। বালক-বালিকাদিগকে ভয় দেখাইতেছে। সহসা এক কিশোর বলিয়া উঠিল : "ওগো, এ যে আমাদের হরে।" বহুরূপী বুঝিল, তাহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে। সে এখন যতই বাঘের বেশে থাকুক, কেহ ভয় পাইবে না। অগত্যা অন্য পাড়ায় চলিল ভয় দেখাইয়া কিছু জীবিকা অর্জন করিতে। মানুষ যখন আসুরীসম্পদ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হইয়া উঠিবে তখন তাহার অনর্থাশঙ্কা আপনি দূরীভূত হইবে, অকল্যাণপ্রদ বৃত্তিসকল অন্তর্ধান করিবে। কিন্তু এইখানেই শেষ হইল না। শ্রীভগবান দৈবীসম্পদেরও বিশ্লেষণ করিলেন অনবদ্য স্বাতন্ত্র্যে।

শ্রীশঙ্করাচার্য 'দৈবীসম্পদ'-এর সংজ্ঞা দিলেন তাঁহার গীতাভাষ্যে। "তত্র সংসারমোক্ষয়ে দৈবী প্রকৃতি।" দৈবীসম্পদ মুক্তির কারণ। সংসারবন্ধন মোচনের কারণ। ইহা জন্মজন্মান্তরের অনাদি কর্মরাশির দহনের উপায়। শোক, ক্ষোভ, ষড়রিপু, নৈরাশ্য, দুরাশা, হতাশা, হৃদয়ের তীব্র জ্বালা, যন্ত্রণা, অভিমান, স্বার্থপরতা হইতে পরিত্রাণের কারণ এই দৈবীসম্পদ। অভ্যাস করিলেই এই দৈবীসম্পদ আয়ত্ত হয়। তাই কেবল আসুরীসম্পদকে চিনিয়া লইয়া তাহাকে দূর করাই যে একমাত্র কাম্য তাহা নহে, পরন্তু দৈবীগুণবৃত্তিও একই সঙ্গে অনুশীলনীয়। স্বামীজী বারংবার বলিতেন : "মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশসাধনই ধর্ম।" পশুত্ব বর্জন করিয়া মনুষ্যত্বে উত্তরণের পর দেবত্বের বিকাশসাধনে তৎপর হওয়াই আমাদের লক্ষ্য—ইহাই সনাতন ধর্মের সনাতন শিক্ষা। ঐ কারণেই যাহা কিছু নিয়ম-বিধি, ব্রত, তপস্যা।

অধ্যায়ের শুরু হইয়াছে দৈবীসম্পদের এক নাতিদীর্ঘ বর্ণনার মাধ্যমে—"অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগ-ব্যবস্থিতিঃ... অভিজাতস্যভারত" ইত্যাদি। (১৬।১-৩)

ভারী চমৎকার বর্ণনা! যে 'অভয়'-এর প্রসঙ্গ উঠিল তাহাকে স্বামীজী 'অভীঃ' বলিয়াছেন। দৈবীসম্পদের প্রথম সম্পদ অভয় অর্থাৎ ভয়হীনতা। অন্তরে ভয়ের অভাব। সাহসিকতা এবং অভয় একবস্তু নহে। সম্রাট আলেকজাণ্ডার একদা এক ভারতীয় মুনির আচরণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন : "আপনি আমাদের দেশে চলুন। আমার দেশবাসী আপনাকে দেখিয়া অনুপ্রাণিত হইবে।" মুনিবর অসম্মত হইলেন। তরবারি উন্মুক্ত করিয়া সম্রাট কহিলেন : "জানেন আমি কে? আমার আজ্ঞা পালন না করিবার অর্থ দেহ ও মস্তকের পৃথকীকরণ।" মুনি অট্টহাস্য




করিয়া বলিলেন : "তুমি বহির্জগতের সম্রাট হইতে পার, অন্তর্জগতের সম্রাট তো তুমি নহ। আমার শরীরকে হত্যা করিতে পার, কিন্তু আমাকে তুমি স্পর্শও করিতে পারিবে না।" কারণ, "আমি তো নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা, অবস্থাত্রয়সাক্ষী।" বিস্মিত আলেকজাণ্ডার হয়তো পুনরাবৃত্তি করিলেন : "সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ!" মুনির হৃদয়ে ইহাই 'অভয়'। আসুরীশক্তি যতই মহিমাপূর্ণ হউক না কেন, উহার গভীরতম প্রদেশে 'ভয়' আছে। স্বামীজী তাই বলিতেন, "Face the brutes"—পশুশক্তির মুখোমুখি হও। তাহা হইলেই সে পলায়ন করিবে।

গীতোক্ত দৈবীসম্পদসকল পরস্পর সম্বদ্ধ। **'সত্ত্বসংশুদ্ধি'** অর্থাৎ অন্তঃকরণের (সত্ত্ব) সংশুদ্ধি বা শুদ্ধিকরণ। সত্ত্বসংশুদ্ধি হইলেই মানব 'অভয়প্রতিষ্ঠ' হইতে পারে। সত্ত্বসংশুদ্ধির ফলশ্রুতি **জ্ঞান-যোগব্যবস্থিতিঃ**। অর্থাৎ জ্ঞান এবং যোগ (ব্যবহারিক সাধন)-এ পূর্ণপ্রতিষ্ঠা। ইন্দ্রিয়াদির সংযম হইলেই একাগ্রতাসাধন পূর্ণত্ব লাভ করে এবং এই একাগ্রতার সাহায্যে স্বাত্মানুভবই যোগ। অতএব দৈবী-সম্পদের মূল তিনটি স্তম্ভ হইল—(১) অভয়, (২) সত্ত্ব-সংশুদ্ধি এবং (৩) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি। সত্ত্বসংশুদ্ধি যদি আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের ভিত্তিস্বরূপ হয়, তাহা হইলে 'যোগ' আমাদের অন্তর্জগতের ক্ষেত্রে অবলম্বনীয়। অর্থাৎ আমাদের এই প্রাত্যহিক জীবনকে সুন্দর ও ঈশ্বরকেন্দ্রিক করিয়া তুলিবার জন্য যে বাহ্য নিয়ম-বিধি, তাহা ক্রমশ সত্ত্ব-সংশুদ্ধিতে পরিণতি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু যোগ মনের একাগ্রতাসাধন সাপেক্ষ। যোগী বহির্জগৎ অপেক্ষা অন্তর্জগতের ব্যাপারে বেশি সচেতন। মনোজগৎ তাঁহার নিকট সহজেই প্রত্যক্ষীভূত। 'অভয়প্রতিষ্ঠা'র লক্ষ্যে দুটিই প্রয়োজন। **পরবঞ্চনাত্যাগ**, **অহিংসাবৃত্তি** অবলম্বন, **সত্যবাক্যে নিষ্ঠা**, **শান্ত স্বভাব**, **অপৈশুন** (পরছিদ্রান্বেষণ না করা), **সর্বপ্রাণীর প্রতি দয়া**, **অলোভ**, **মৃদুতা** (ঈশ্বর বিষয়ে মৃদু বা সহনশীল, অন্যায়-অবিচার দেখিলে কঠোর), **হ্রী** (কুকর্মে বা কুচিন্তায় লজ্জা) ইত্যাদি বাহ্য সাধনের পরিণতি সত্ত্ব-সংশুদ্ধিতে। শ্রীকৃষ্ণ ত্যাগের কথা বলিলেন। যাহার চরমোদ্দেশ্য স্বার্থত্যাগ এবং বাসনাত্যাগ। কিন্তু কখন, কিভাবে স্বার্থবুদ্ধি আসিয়া পড়িবে তাহার স্থিরতা নাই। তাই সর্বদা সচেতন থাকিয়া হিংসা, ক্রোধ, কাম, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য ইত্যাদি সহকারী বৃত্তিগুলিকেও ত্যাগ করিবার অভ্যাস চাই। পতঞ্জলি মুনি এই গুণাবলীকে 'যম' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই 'ত্যাগ' নেতিবাচক বলিয়া ইতিবাচক কিছু অভ্যাস করিবার নির্দেশ দিয়া শ্রীভগবান দৈবীসম্পদের তালিকা পূর্ণ করিলেন। **দান**, **দম** (ইন্দ্রিয় সংযম), **যজ্ঞ**, **স্বাধ্যায়** (সদ্‌গ্রন্থ অর্থাৎ মুক্তিসারী গ্রন্থ পাঠ ও ইষ্টমন্ত্র জপ) **তপঃ** (তপস্যা বা কষ্টসহিষ্ণুতা), **সারল্য** (আর্জবম্,ঋজুতা), **তেজ** (বীর্যবত্তা), **ক্ষমা**, **ধৃতি** (ধৈর্য), **শৌচ**, **অদ্রোহ** (বিদ্রোহী মনোভাব ত্যাগ করা অর্থাৎ সকল পরিস্থিতিতে লোকব্যবহার মানাইয়া লওয়া), **নাতিমানিতা** (অতিমানী ভাবের বিপরীত ভাব)—এইগুলি দৈবীসম্পদ।

কিন্তু মানুষের মনের বাসনা কখনো কখনো দুষ্পূরণীয় বলিয়া প্রতীত হয়। কিছুতেই আর তৃপ্তি হয় না। বাস্তবিকই "ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি"—উপভোগের দ্বারা কামনার বিনাশসাধন কখনো সম্ভব নহে। তাই বিচারপূর্বক কামনা ত্যাগই শ্রেয়। মনের অধোগতি অন্তরে অনুভূত হইলে তৎক্ষণাৎ সাবধানতা অবলম্বন ও বিচারপূর্বক মনকে ইষ্টচিন্তায় নিবিষ্ট করাই বিধেয়। যথাসাধ্য অভ্যাস চাই। তবু স্বামীজী মহান আশার বাণী শুনাইলেন। শিষ্যকে বলিলেন : "মাভৈষ্ট বিদ্বংস্তব নাস্ত্যপায়ঃ/ সংসারসিন্ধো-স্তরণেস্ত্যুপায়ঃ"—হে বিদ্বান (আচার্যবান)! তোমার ভয় নাই। কারণ, সংসারসিন্ধু উত্তরণের উপায় আছে। সদ্‌গুরু আসিয়া ব্যাকুল শিষ্যকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

আজ পাশ্চাত্যের ভোগলিপ্সা এদেশের সমাজে অনুসঞ্চরিত হইয়াছে। সাম্যবাদ, সমাজবাদ, গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ইত্যাদি মানবকল্যাণমূলক যাহা কিছু তত্ত্ব সবই প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি ও ইন্দ্রিয় সুখভোগেচ্ছার ঝঞ্ঝাবাতে ভাসিয়া যাইতেছে। এখন উপনিষদ্-গীতাদিতে বিধৃত মানুষের মানবীয় সত্তার গোড়ায় যাইতে না পারিলে ধার করা কোন নীতি বা তত্ত্ব ভারতবর্ষকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চিত। একদা স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন : "... And what will save Europe is the religion of the Upanishads." (...এবং ইউরোপকে একমাত্র উপনিষদের ধর্মই বাঁচাইতে পারে)। বস্তুত ভারতবর্ষের মহান আদর্শই ইউরোপ-আমেরিকার দিগ্‌-নির্দেশকরূপে আবির্ভূত হইতেছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উপনিষদ্-মথিত সারবস্তু বিবৃত রহিয়াছে—'দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ'। উপরি উক্ত 'বাদ'-সকল সবই গীতার শিক্ষার অন্তর্গত দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যে সিংহনাদ করিয়াছিলেন, তাহাই আজকের মহামন্ত্র। সেই পাঞ্চজন্য পুনরায় ধ্বনিত হইতেছে। সনাতন ধর্মের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

ভারতবর্ষের এই চরম সঙ্কটমুহূর্তে আমরা যে চারিত্র্য-দূষণ প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহা মহাসমুদ্রের উপরিতলের তরঙ্গরাজিমাত্র। অতল গভীরে মহনীয় বার্তা ধ্বনিত হইতেছে, নির্মল শান্তিপ্রবাহ অটুট রহিয়াছে। এখন যথাপ্রয়োজন প্রস্তুতির অপেক্ষা মাত্র। ❑

সমসাময়িক পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে যেসকল তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ১৩৫৯ সালে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনর্মুদ্রিত করা হলো। আশা করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।—সম্পাদক

পরমহংসের উক্তি

ধর্মতত্ত্ব, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬

হরির আগমন কিরূপে হয়?

সূর্যোদয়ের পূর্বে যেমন অরুণোদয় হয়, হরি যখন আইসেন তখন তিনি নিজেই সমস্ত যোগাড় করিয়া ভক্তের বাড়িতে অগ্রে পাঠান; প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, ব্যাকুলতা সাধকের হৃদয়ে প্রেরণ করেন। যথা রাজা কোন ভৃত্যের বাড়িতে গমনকালে পূর্বে আপন ভাণ্ডার হইতে গৃহের সাজসজ্জা ও তাঁহার উপবেশনযোগ্য আসন ইত্যাদি পাঠাইয়া দেন।

*

ধর্মকথা অনেক শুনা গেল, তত উপকার হচ্ছে না কেন?

সাঁকোর জল যেমন একদিক দিয়া আইসে, আর দিক দিয়া চলে যায়, অনেকের কাছে ধর্মকথা তদ্রূপ, তাহার এক কান দিয়া শোনে, তাহাদের অন্য কান দিয়া বাহির হইয়া যায়।

*

পরমাত্মা ও জীবাত্মা কিরূপ?

পরমাত্মা সাগরের ন্যায়, জীবাত্মা সাগরবক্ষস্থ বুদ্‌বুদের ন্যায়। সাগর হইতে বুদ্‌বুদের উৎপত্তি, সাগরেতেই স্থিতি। উভয় বস্তুত এক, প্রভেদ এই যে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, আশ্রয় ও আশ্রিত।

*

মাকে পৃথিবীতে কেন দেখা যায় না?

ইনি বড়লোকের মেয়ে, চিকের আড়ালে থাকেন। ভক্ত সন্তানেরা প্রকৃতিরূপ চিকের ভিতর যাইয়া তাঁকে দেখেন।

*

তাঁর প্রতি কিরূপ মন চাই?

যেমন কৃপণের ধনে মন, তেমন তাঁতে মন চাই।

*

ঈশ্বরের চরণাশ্রয় লাভ করিলেও কি আমিত্ব থাকে?

স্পর্শমণির স্পর্শে লোহার তরবার সোনা হয়, কিন্তু তখনও তরবারের আকার থাকে, কেবল তাহার ধার থাকে না। সেইরূপ ঈশ্বরলাভেও মনুষ্যের আমিত্ব থাকে, কেবল মন্দ আমিত্ব থাকে না।

*

বিরক্ত বৈরাগী কিরূপ?

যে ব্যক্তি পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া করে বৈরাগী হয়ে বাহির হয়ে যায়, এরূপ ব্যক্তিকে বিরক্ত বৈরাগী বলে। সে দুদিনের বৈরাগী, পশ্চিমে চাকুরি জুটলে তাহার আর বৈরাগ্য থাকে না।

*

হঠাৎ কি প্রচুর উন্নতি হয় না?

ঘরে যে পাঠ মুখস্থ করে, সে-ই হাইকোর্টের জজ হয়, নতুবা অনাহারী ম্যাজিস্টর। একেবারে কেউ হাইকোর্টের জজ হয় না। অনেক পরিশ্রমে দ্বারি মিত্র (বিখ্যাত উকিল দ্বারকানাথ মিত্র) হওয়া যায়।

*

ভক্তির তমো কিরূপ?

বাহু তুলে নৃত্য করে হরিবোল বলা ভক্তির তমো।

পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি : সুরেশচন্দ্র দত্ত প্রকাশিত ডিসেম্বর ১৮৮৪

মই, বাঁশ, সিঁড়ি, দড়ি প্রভৃতি নানা উপায় দ্বারা যেমন অট্টালিকার ছাদে উঠা যায়, সেইরূপ ঈশ্বরের রাজ্যে যাইবারও নানাবিধ উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্মই এক-একটি উপায় দেখাইয়া দিতেছে।

*

দুই ব্যক্তি পরস্পর ঘোর তর্ক আরম্ভ করিয়াছে। একজন বলিতেছে, অমুক উদ্যানে সুন্দর লালবর্ণের একটি পক্ষী আছে। অপরজন বলিতেছে, তোমার ভুল হইয়াছে, পক্ষীটি লাল বর্ণ নয়, নীল বর্ণবিশিষ্ট। তর্কের মীমাংসা না হওয়ায় অবশেষে উভয়ে উদ্যানরক্ষকের নিকট উপস্থিত হওত প্রথম ব্যক্তি বলিল—"কেমন হে উদ্যানরক্ষক, তোমার এই উদ্যানে একটি লাল বর্ণের পক্ষী আছে?" উদ্যানরক্ষক বলিল—"আজ্ঞে হাঁ।" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—"কি বলিলে, সেটি তো লাল পক্ষী নয়, নীল পক্ষী।" উদ্যানরক্ষক বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ।" উদ্যানরক্ষক জানিত সে পক্ষীটি বহুরূপী, এজন্য যে যে বর্ণ বলিল সে তাহাতেই হাঁ বলিল। সচ্চিদানন্দ হরিও বহুরূপ, তিনি এক তিনি অনন্ত, তিনি বিশ্বরূপী ভগবান। যে তাঁহাকে দেখে নাই, যে তাঁহার মর্ম বুঝে নাই—সেই সাকার নিরাকার লইয়া তর্ক করে, কিন্তু প্রকৃত ভক্ত বলেন, হাঁ, তিনি সাকার, তিনি নিরাকার।

সঙ্কলন ❑ জলধিকুমার সরকার

সম্পাদনা ❑ স্বামী সর্বগানন্দ

অপ্রকাশিত পত্র



স্বামী শিবানন্দের চারখানি পত্র*

উমাপদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

[১]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং

Sri Ramakrishna Math
P.O. Belur Math
27/5/27

শ্রীমান্ উমাপদ,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। মঠে থাকিলে যদি সুবিধা হয়, মাসে মাসে একবার করে এসো তাতে ক্ষতি নাই—তবে প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি করা ঠিক নয়। ঠাকুরের যদি ইচ্ছা হয় আসিবে—এই পর্য্যন্ত বলাই ভাল।

[শ্রীরামকৃষ্ণের] গায়ত্রীর অর্থ আলাদা আর লিখিলাম না—ইহাতেই লিখিতেছি বলিয়া দিও "ঠাকুরকে গুরু বা শাস্ত্র হইতে জানিব বা জানি—জেনে তাঁর সম্বন্ধে ধ্যান করি বা করিব। তাঁকে জানি এবং ধ্যান করি বা করিব বলিয়া তিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি তাঁর জ্ঞান ও ধ্যানের দিকে প্রেরণ করুন।

আমার শরীর আজকাল ভালই আছে। এখানে মাঝে মাঝে বেশ বৃষ্টি হইতেছে। আশাকরি তোমাদের সমস্ত কুশল। তোমরা আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে এবং খোকাকে জানাইবে। ইতি।

তোমাদের শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

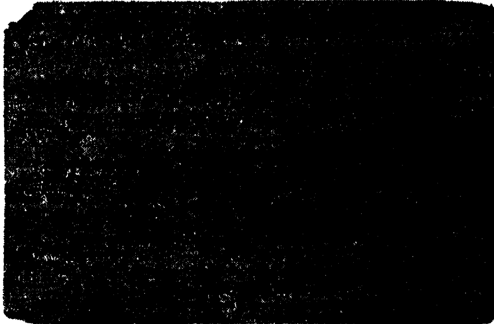
[২]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং

Sri Ramakrishna Math
P.O. Belur Math
8/8/27

শ্রীমান্ উমাপদ,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আশাকরি বৌমা ঠাকুরের কৃপায় এতদিনে সুস্থ হইয়া থাকিবে। তাহাকে ও তোমার পুত্রকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ দিবে।



সামাজিক নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে নিশ্চয়। তবে গোঁড়ামি না থাকে। যথা কোথায় নিমন্ত্রণে গিয়াছ তাহাদের অনিচ্ছাকৃত বা অজ্ঞানতার জন্য কোন ভুল হইয়াছে—তজ্জন্য যে গোলমালের সৃষ্টি করিতে হইবে তাহা নহে। তাহার পর ক্ষেত্র বুঝিয়া কর্ম্ম করিতে হয়। যথা উপনিষদে আছে—কোন ব্রাহ্মণ দুর্ভিক্ষের সময় প্রাণরক্ষার্থ নীচবর্ণের অন্ন গ্রহণ করিয়াছিল—উহাতে কোন পাপ হয় নাই ইত্যাদি। তবে সাধারণভাবে নিষ্ঠার সহিত নিজবর্ণের সামাজিক নিয়ম মানিয়া চলা খুবই ভাল। বর্ণগত নিয়ম মানিয়া চলার জন্যই এত সামাজিক গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে।

আমার শরীর ঠাকুরের কৃপায় মন্দ নয়। শরৎ মহারাজের শরীর একটু খারাপ যাইতেছে। অন্যান্য সমস্ত কুশল। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন। ইতি।

তোমার চির শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

---

* শিষ্য উমাপদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের পত্রগুলি উমাপদ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র, দমদম-নিবাসী যোগবিলাস মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

[৩]
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং

Sri Ramakrishna Math
P.O. Belur Math
11/9/27

শ্রীমান্ উমাপদ,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। এবার মঠের সকলকারই মন খারাপ। তাছাড়া অনেকেরই শরীর অসুস্থ সেইজন্য বোধহয় এবৎসর ঠাকুরের ইচ্ছায় মঠে প্রতিমায় পূজা হইবে না। তবে তিনদিন ঘটে বা বিশেষ পূজাদি হইবে।

আমার শরীর মাঝে সর্দিজ্বরের মত হইয়া অসুস্থ হইয়াছিল। পূর্ণিমা কাটিয়া গেলে বোধহয় সুস্থ হইব। তবে তেমন কিছু নয়—চিন্তিত হইও না। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ঠাকুর তোমাদের ভক্তি বিশ্বাস বৃদ্ধি করুন। ইতি।

তোমাদের সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

[৪]
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং

Ramakrishna Advaita Ashram
Laksha, Benaras City
4/1/28

শ্রীমান্ উমাপদ,

তোমার পত্রে কুশল সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। তোমরা আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ঠাকুর নিশ্চয়ই তোমাদের জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস দিবেন। যেমন তাঁর উপর নির্ভর করিয়া আছ সেইরূপ ভাবেই থাক—উহাই আত্যন্তিক কল্যাণ লাভের একমাত্র পন্থা।



তুমি মায়ের পূজা করিবার যে বীজ এখান হইতে পাইয়াছ তাহাই ব্যবহার করিবে। ৺দক্ষিণা কালিকার বীজ ব্যবহারের প্রয়োজন নাই। আমার শরীর তাঁর কৃপায় একপ্রকার ভাল। কবে মঠে ফিরিব তাহার এখনও স্থির নাই। যোগবিলাস ও তাহার মাতা ভাল আছে জানিয়া সুখী হইলাম। তাহাদের আমার আশীর্ব্বাদ দিবে ও তুমি জানিবে। ইতি।

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের ভবিষ্যৎ

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

এই রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দিন অর্থাৎ ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এ পাকিস্তানের করাচির 'দ্য ডেইলি গেজেট'-এর বিশেষ 'পাকিস্তান স্বাধীনতা দিবস' সংখ্যায় এবং পরে 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর অক্টোবর ১৯৪৭ সংখ্যায়।—সম্পাদক

১. ভূমিকা

ভারতের ক্ষেত্রে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ তারিখটি সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, এই দিনটি চিহ্নিত করছে একটি যুগের সমাপ্তি এবং অপর এক যুগের সূচনাকে। ১৭৫৭-তে পলাশীকে দিয়ে শুরু হয়েছিল যে বিদেশী আধিপত্যের, তার অবসান ঘটল আজ—ঠিক ১৯০ বছর পরে। ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দেখলে রাজনৈতিক দাসত্বের এই যুগকে কিন্তু সংক্ষিপ্ত এক ছিন্নাংশ বলেই মনে হয়। আমাদের ইতিহাসের এই দৃশ্যান্তরের যথার্থ তাৎপর্য তখনি অনুধাবন করা যাবে, যখন আমরা সময়ের দিক দিয়ে একটু দূরত্বে অবস্থান করব, কারণ কেবল তখনি ঘটে-যাওয়া ঘটনার নিরপেক্ষ বিচার করা সম্ভব। শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ্‌রা ছাড়া অন্যদের পক্ষে কিন্তু সমসাময়িক ঘটনার নির্মোহ বিশ্লেষণ করা দুরূহ। তাই, এরকম কোন ঘটনা সাধারণ একজন মানুষের কাছে একরকম মনে হবে, আবার বড় এক চিন্তাবিদের কাছে তা অন্যরকম ব্যঞ্জনা নিয়ে উপস্থিত হবে।

২. রাজনৈতিক স্বাধীনতা বনাম রাজনৈতিক পরাধীনতা

একজন সাধারণ মানুষের কাছে রাজনৈতিক দাসত্ব বলতে হয়তো অস্বাভাবিক কিছুই বোঝায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা তার দৈনন্দিন জীবনের ছোট্ট দিগন্তের অন্তর্গত অভ্যস্ত জীবনচর্যাকে ব্যাহত না করে। কিন্তু সেই মানুষটিই যখন রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে ওঠে, তখন এই দাসত্ব তার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে—মনে হয় পরাধীনতার নানা বিধিনিষেধ যেন প্রতিপদে তার নবলব্ধ স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদার ভাবকে আঘাত করে চলেছে। এই মূল্যবোধ-সচেতনতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সে পরিণত হয় একটি রাজনৈতিক সত্তায়; পরিণত হয় এমন এক মানুষে—যে সামান্য পার্থিব ও দৈহিক নিরাপত্তার ওপরে মূল্য দেয় তার স্বাধীনতাকে, তার মুক্তিকে। আর এইভাবেই মানুষের জীবনে সূত্রপাত হয় এক আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধের; সূচনা হয় এক নৈতিক তথা আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের প্রাথমিক বিকাশের। এই 'সদ্যোজাত' ব্যক্তিত্বই পরবর্তী কালে নিজ জীবনে রাজনৈতিক শিক্ষা এবং স্বাধীনতার মূল্যবোধের নিবিড় চর্চার মাধ্যমে পরিণত হয় সেই পূর্ণাঙ্গ সামাজিক সত্তায়—যাকে আমরা বলি 'নাগরিক'। এই 'নাগরিক'-এর বিবর্তন বা গড়ে ওঠাই হলো রাজনীতির লক্ষ্য; উচ্চতম সামাজিক লক্ষ্যও এটিই।

৩. আধুনিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়াল ভারত

শান্তির প্রতিশ্রুতি নিয়ে উনিশ শতকে হাজির হওয়া রাজনৈতিক শাসন তথা দমনকে এদেশের বিশাল হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় মোটামুটি মেনে নিয়েছিল তাদের দৈহিক ও আর্থিক নিরাপত্তার কথা ভেবে এবং পূর্ব পূর্ব শতকের অনিশ্চয়তার হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসাবে। কিন্তু সেটা ছিল একটা পর্ব; সংক্ষিপ্ত এক পর্বমাত্র। রাজনৈতিক দাসত্ব যখন সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে সমূলে উৎপাটন করতে চায়, যখন একটা জনগোষ্ঠীর কার্যকলাপকে সীমায়িত করতে চায় তখন তা একটা চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়। যে-জনগোষ্ঠীর ভিতরে প্রাণশক্তির ভাণ্ডার আছে—সে এই চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, আর যাদের তা নেই—তারা ব্যাপারটাকে সহজভাবে মেনে নিয়ে একটা জনসম্প্রদায় হিসাবে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ব্যক্তিমানুষ হিসাবে নতুন দেহমন নিয়ে বেঁচে থাকে মাত্র। পৃথিবীর ইতিহাস শেষোক্ত ঘটনার নজিরবিহীন নয়। ভারতের কাছে চ্যালেঞ্জটা এসেছিল সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক-রাজনৈতিক—দুদিক থেকেই। ভারত উঠে দাঁড়িয়েছিল প্রথমে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জ রুখতে, তারপর রাজনৈতিক ক্ষেত্রের। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ প্রত্যক্ষ করেছিল প্রথম প্রতিরোধটিকে, আর বর্তমান শতক আজ পর্যন্ত দেখছে দ্বিতীয়টিকে। আর এইভাবেই প্রমাণিত হয়ে চলেছে আমাদের জনগণ ও তাদের উত্তরাধিকারের প্রাণশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব। এই দ্বিবিধ প্রক্রিয়া ও অতি স্বল্প সময়ে তার দ্বারা অর্জিত সাফল্যের আকর্ষক কাহিনীতেই নিহিত আছে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের 'রোমান্স' এবং সমগ্র পৃথিবীর কাছে সেই ইতিহাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য।

পাশ্চাত্যের কাছ থেকে আসা নতুন সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে ভারত যেভাবে উঠে দাঁড়িয়েছে, তার মধ্যে বিশেষ একটি দিকের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা দরকার, কারণ এর মধ্যে আছে সচল সংহতির একটি লক্ষণ, যা কিনা দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জের প্রত্যুত্তরের (অর্থাৎ রাজনৈতিক

স্বাধীনতা সংগ্রামের) ক্ষেত্রেও তার নিজস্ব স্বাক্ষর রেখেছে এবং ভারতের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পর্কসমূহের ক্ষেত্রেও সফল প্রয়োগের প্রতিশ্রুতি বহন করে। এই লক্ষণীয় বিশেষত্বটি হলো স্বীকার ও সমন্বয়সাধনের একটি ভাব; বর্জন নয়, গ্রহণ-এর ভাব—যা নবভারতের চেতনা ও কর্মের আপন বৈশিষ্ট্য। প্রথমদিকে যা ছিল শুধুই প্রতিক্রিয়াশীল (কেবল আক্ষরিক অর্থেই ব্যবহৃত) এবং প্রায়শই ক্ষমাভিখারী ও নেতিবাচক—তা-ই পরবর্তী কালে রূপান্তরিত হয়ে যায় এক সৃজনশীল চিন্তা-আন্দোলনে এবং চেষ্টা করে যেকোন পরীক্ষিত মানবীয় মূল্যবোধকে স্বীকার তথা সমন্বিতরূপে গ্রহণ করতে—তা সে-মূল্যবোধ বৈজ্ঞানিক বা ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা সামাজিক—যা-ই হোক না কেন এবং তার উদ্ভব পূর্ব বা পশ্চিম—যেখানেই হোক না কেন।

৪. বিবেকানন্দ এবং আধুনিক ভারতীয় নবজাগরণ

আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এই পর্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রবক্তা ও প্রতিনিধিরূপে অবস্থান করছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি ছিলেন সেইসব মানুষদের মধ্যে একজন, যাঁরা ব্রিটিশ-প্রভাবের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন আমাদের সমাজ ও সভ্যতার অচলায়তন ভেঙে তাদের প্রসারণশীল করার এক সুপ্ত সম্ভাবনাকে। তাঁর ব্যক্তিত্বে এসে মিশেছিল অতীত ও বর্তমান, মিশেছিল প্রাচীন প্রজ্ঞা ও আধুনিক জ্ঞান। তিনি আমাদের অতীত গৌরব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন; আবার গভীরভাবে অনুভব করতেন আমাদের বর্তমান অবনয়ন। মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন একজন হিন্দু; আবার অন্যান্য ধর্মকেও তিনি ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের সামাজিক বাণীর তিনি ছিলেন একজন অনুরাগী এবং ভারতীয় জীবন ও চিন্তায় তাদের প্রভাবকে তিনি মূল্য দিতেন। সর্বোপরি, তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন আধুনিক চিন্তার নিজস্ব ভাবে—যে-চিন্তার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক অবদান রয়েছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবদান রয়েছে জীবন ও সমাজের ক্ষেত্রে। এইসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণে রাখতে হবে, আধুনিক প্রেক্ষাপটে মানবীয় সম্পর্কসমূহের আন্তর্জাতিক চরিত্র সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন তিনি। তাঁর ভূমিকা ছিল না এমন কোন প্রতিক্রিয়াশীল দেশপ্রেমিকের, যিনি তাঁর দেশকে অন্যান্য জাতির অস্বাস্থ্যকর স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাবেন, অথবা যিনি অন্য দেশের স্বাধীনতার বুকের ওপর দিয়ে বেপরোয়াভাবে চালিয়ে নিয়ে যাবেন নিজের জাতীয়ত্বের রথটিকে। ভারতকে তিনি ভালবাসতেন, সেইসঙ্গে ভালবাসতেন সমগ্র মানবতাকেও—একই তীব্রতায়। সঙ্কীর্ণ গার্হস্থ্য প্রাচীর যে-মানুষজাতিকে খণ্ডবিখণ্ড করে দিতে পারেনি, তার গৌরবে আস্থা জ্ঞাপন করে এক পত্রে তিনি লিখছেন: "আমাদের কাছে কিবা ভারত, কিবা ইংল্যাণ্ড, কিংবা আমেরিকা? আমরা সেই ঈশ্বরের সেবক, অজ্ঞজনেরা যাঁকে 'মানুষ' নামে ডাকে।" আমরা এর সঙ্গে যোগ করতেই পারি—অধিক অজ্ঞজনেরা যাঁকে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান বা ভারতীয়, রাশিয়ান, আমেরিকান ইত্যাদি নামে ডাকে।

স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের এই দিকটির প্রতি জওহরলাল নেহরু এইভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন: "অতীতে দৃঢ়মূল এবং ভারতের ঐতিহ্যের গৌরবে পূর্ণ বিবেকানন্দ কিন্তু জীবনসমস্যার প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে ছিলেন আধুনিক। ভারতের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে একরকম সেতুর মতো ছিল তাঁর অবস্থান।" (দ্রঃ The Discovery of India, p. 400)

নেহরু নিজে ছিলেন একজন আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ১৮৯৭ সালে প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে মানবজাতির ঐক্য প্রসঙ্গে এই উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন তাঁর গ্রন্থে: "এমনকি রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রেও আজ থেকে বিশ বছর আগে যেসব সমস্যা শুধুমাত্র জাতীয় চরিত্রের ছিল, তাদের আজ আর কেবল জাতীয় স্তরে সমাধান করা যাচ্ছে না। বিশাল মাত্রা নিয়ে দৈত্যের আকারে তারা হাজির হচ্ছে। একমাত্র আন্তর্জাতিক স্তরে বিস্তৃততর আলোকে দেখলে তবেই তাদের সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংগঠন, আন্তর্জাতিক জোটবন্ধন, আন্তর্জাতিক আইনকানুন—আজকের দিনে এইগুলি আমাদের চাই-ই চাই। ওতেই প্রমাণিত হয় পারস্পরিক সংহতি।... সমগ্র পৃথিবী একসঙ্গে সাড়া না দিলে কোন উন্নয়ন সম্ভব নয় এবং এটা দিন দিন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, কোন একটা সমস্যারও সাম্প্রদায়িক, জাতীয় বা সঙ্কীর্ণ স্তরে সমাধান কোনদিন সম্ভব নয়। প্রত্যেক ভাবকে প্রসারিত হতে হবে ততক্ষণ, যতক্ষণ না সেটি সমগ্র বিশ্বকে ছেয়ে ফেলছে; প্রত্যেক আশা-আকাঙ্ক্ষা-লক্ষ্যকে বিস্তৃত হতে হবে ততক্ষণ, যতক্ষণ না সে তার আওতায় নিয়ে আসতে পারছে সমগ্র মানবতাকে—কিংবা বলা ভাল—সমগ্র জীবনকে।" (Ibid., pp. 401-402)

ভারতের সাম্প্রতিক অতীত সম্বন্ধে এই শর্ত প্রয়োগ করে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর হিন্দু ও মুসলিম স্বদেশবাসীদের কাছে একটি শিক্ষা ও সাবধানবাণী তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "আমি একেবারে নিশ্চিত যে, অন্যান্যদের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে কোন ব্যক্তি বা জাতি বেঁচে থাকতে পারে না এবং যখনি কেউ তার শ্রেষ্ঠত্ব, নীতি বা শুচিতার মিথ্যা দোহাই দিয়ে এইভাবে আলাদা থাকার চেষ্টা করেছে, তখনি সে তার সাঙ্ঘাতিক ফললাভ করেছে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি থেকে নিজেদের আলাদা করে রাখাটাই আমাদের অধঃপতনের কারণ এবং এর একমাত্র প্রতিকার হলো বিশ্বের মূলস্রোতে ফিরে যাওয়া। গতিই হলো জীবনের

লক্ষণ।" (The Discovery of India, p. 402-তে উদ্ধৃত) এই বাক্যগুলি উক্ত হয়েছিল পঞ্চাশ বছর আগে; কিন্তু আজও তারা অদ্ভুত সতেজতা ও শক্তি বহন করে। স্বামী বিবেকানন্দের সময়ে পৃথিবীর ঘটনাপরিসরে ভারত একটা কোন সক্রিয় উপাদান ছিল না। বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কাছে ভারতের অতীত গৌরব ছিল সহানুভূতিশীল মন্তব্য ও অধ্যয়নের একটি বিষয়মাত্র। কিন্তু এমনিতে সমগ্র বিশ্ব সাধারণভাবে ভারতের দুরবস্থায় করুণা প্রকাশ করত। তার নিজের সন্তান-সন্ততিও আপন জননীর বৃদ্ধ, হতশ্রী অবস্থা দেখে নিজেই নিজের ওপর করুণা করত।

কিন্তু অতি দ্রুত এইসব বদলে গেল। অন্যের দ্বারা বিজিত হওয়ার 'শক' এবং পরাধীনতার গ্লানি এল একটা চ্যালেঞ্জের রূপে। অতীতে অন্য বহু জাতির আন্তর অগ্নি এইরকম চ্যালেঞ্জের মুখে নিভে গেছে। এমনকি ভারতেও অনেকে ভাবলেন—এবারেও তা-ই হবে। বাস্তবে কিন্তু তা মোটেই ঘটল না; ভারত জ্বলে উঠল—নব ভাব ও কর্মের বিস্ফোরণ ঘটল; শুরু হলো সত্যকার এক জাতীয় পুনরুজ্জীবন-প্রক্রিয়া। এই জাগরণের প্রথম পর্যায়ে এল আত্ম-আবিষ্কার; তারপর এল আত্ম-প্রকাশ।

বলা যেতে পারে, ভারতের এই আত্ম-আবিষ্কার প্রক্রিয়া তার চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করল আজ—এই ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এ—ভারতবর্ষের পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে। এর দ্বারা যে-শক্তির উন্মোচন হলো, তা এখন থেকে আরো তীব্র আকারে সৃজনশীল আত্ম-প্রকাশ'-এর রূপে অভিব্যক্ত হয়ে চলবে।

৫. বিবেকানন্দের 'স্বদেশ নীতি'

'ব্যক্তি' বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে বিশ্বের সাংস্কৃতিক শক্তির স্রোতোধারায় বহন করে নিয়ে গেছেন। 'ভাবরূপী' বিবেকানন্দ ভারতীয় জনগণকে সুসংহত করে ভারতবর্ষকে বিশ্ব-জাতি-সঙ্ঘে পৌঁছে দিতে প্রয়াসী হয়েছেন। বিবেকানন্দ তাঁর দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, সকল জাতির নৈতিক নেতৃত্বদানের জন্য ইতিহাসের ধারায় যে-সক্ষমতা অর্জন করার প্রয়োজন, তা ভারতের আছে। আধুনিক বিশ্ব-পরিস্থিতিতেও দেখা যাচ্ছে, যেকোন জাতির নিজস্ব শক্তিকে এক দৃঢ় নৈতিক পথপ্রদর্শন করা একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিন্তু বিবেকানন্দের মতে, ভারতবর্ষ আগে নিজের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পরিবর্তন সাধন না করে নিয়ে সেই ভূমিকা গ্রহণ বা সদর্থকরূপে পালন করতে পারে না। আর এর মধ্যেই নিহিত আছে তাঁর কথিত 'স্বদেশ নীতি'র কার্যক্ষেত্র। এই নীতির সাহায্যেই সমগ্র বিশ্বের দায়িত্ব স্বীকার ও পালনের সেই জায়গায় পৌঁছানো সম্ভব, যাকে তিনি বলেছেন তাঁর 'বিদেশ নীতি'।

বিশ্বের প্রেক্ষাপটে ভারতের কার্যকরী অংশগ্রহণের তিনটি পূর্বশর্ত হলো—রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সামাজিক সংহতি। প্রথমটি আজ অর্জিত হওয়ার ফলে বাকি রইল দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি। অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা ও সামাজিক বিভাজন যে আমাদের দেশের মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ব্যক্তিত্বের কত বড় ক্ষতি করেছে, তা বিবেকানন্দই প্রথম আমাদের দেখিয়ে দিলেন। তাঁর মতে, 'অনৈচ্ছিক' দারিদ্র্য একাধারে আধ্যাত্মিকতাবর্জিত ও নীতিবিরুদ্ধ। তিনি মনে করতেন, ধর্ম খালি পেটের জন্য নয়। সামাজিক অসাম্য ও পদাধিকারের অসম ভেদাভেদ রাষ্ট্রদেহে এক ব্যাধিস্বরূপ। আসমুদ্রহিমাচল ভারত পরিভ্রমণের সময় ভারতবর্ষের রোগজীর্ণ, ছিন্নাঙ্গ দেহ-মনের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি, যেমন পূর্বে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে এবং নিজে সাহিত্য ও ইতিহাস-চর্চার মাধ্যমে তিনি প্রত্যক্ষ অনুভব করেছিলেন এদেশের শাশ্বত অনিঃশেষ আধ্যাত্মিক ঐক্যকে। বিবেকানন্দ দেখলেন, আদর্শ ও বাস্তবে বিস্তর ফারাক এবং নিজের হৃদয় ও হস্তকে একযোগে ব্যবহার করলেন সেই বাস্তবকে আদর্শের কাছাকাছি করে গড়ে তুলতে। বহু যন্ত্রণা ও উদ্বেগের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করে অগ্রসর হলেন তিনি—আধুনিক ভারতের যথার্থ সমস্যাটিকে সম্পূর্ণ উন্মোচিত করতে ও তার সমাধান সন্ধান করতে। ভারতকে নিয়ে তাঁর গভীর ভালবাসা ও তাঁর সুদৃঢ় পরিকল্পনা আপন স্বদেশবাসীর কাছে উত্তরাধিকারস্বরূপ অর্পণ করার লক্ষ্যে তিল তিল করে নিজেকে দান করে অকালে মৃত্যুবরণ করলেন বিবেকানন্দ। বর্তমান ভারতবর্ষের মুখমণ্ডলে ও মানসিকতায় রয়েছে বিবেকানন্দের সেই হৃদয় ও প্রতিজ্ঞার অভ্রান্ত অভিজ্ঞান। তাঁর মহীয়সী পাশ্চাত্য শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার কথায় ঃ "গুরুদেবের স্বভাবের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত ছিল একটি জিনিস, যেটির ব্যাপারে তিনি কখনো আপস করে চলতে শেখেননি। সেটি হলো তাঁর স্বদেশপ্রেম এবং স্বদেশের দুর্দশায় তাঁর বেদনা। যে-কয়টি বছর আমি তাঁকে প্রায় প্রত্যহ দেখেছি, সেই সময়ে মনে হয়েছে, ভারতবর্ষের চিন্তা ছিল তাঁর শ্বাসবায়ুর মতোই। একথা সত্যি যে, তিনি কাজ করেছেন ভিত্তিভূমিতে। না তিনি 'জাতীয়তা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, না তিনি এই যুগকে 'জাতি-গঠন'-এর যুগ বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর কথায়, 'মানুষ গড়া'ই ছিল তাঁর নিজের কাজ। কিন্তু জন্ম থেকেই তিনি একজন প্রেমিক, এবং তাঁর প্রেমের রানী ছিলেন তাঁর মাতৃভূমি। সূক্ষ্মভাবে রক্ষিত কোন ঘণ্টা যেমন সামান্যতম ধ্বনিতেও শিহরিত, স্পন্দিত হয়ে ওঠে, তেমনি ছিল তাঁর হৃদয়ও—ভারত-সম্পর্কিত যেকোন ব্যাপারেই। ভারত-ভূমিতে উত্থিত যেকোন অস্ফুট রোদনধ্বনিতে সাড়া দিতে তাঁর মধ্যে অবশ্যই উঠত এক সহমর্মী প্রতি-ধ্বনি। ছিল না এমন কোন ভয়ার্ত ক্রন্দন, দুর্বলতাজনিত কম্পন কিংবা অপমানজনিত সঙ্কোচ—যা তিনি জানতেন না বা বুঝতেন

না। ভারতের পাপের বিষয়ে তিনি ছিলেন কঠোর; তার জাগতিক জ্ঞানের অল্পতার বিষয়ে আপসহীন—কিন্তু তা শুধু এই একটি কারণে যে, ভারতের দোষত্রুটিকে তিনি নিজের দোষত্রুটি মনে করতেন। বিপরীতপক্ষে, এমন আর কেউই ছিলেন না, যিনি ভারতের মহৎ ভবিষ্যতের চিন্তায় তাঁর মতো এমন বিভোর হয়ে থাকতেন—সদাসর্বদা।" (দ্রঃ The Master as I Saw Him, pp. 49-50)

৬. স্বাধীন ভারতবর্ষে গণতন্ত্র

দেশ যখন আজ বিদেশী শাসন থেকে মুক্তির দিনটিকে নিয়ে উৎসব করছে, তখন স্বামী বিবেকানন্দকে ও আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর ধারণাকে স্মরণে রাখলে আমাদের পক্ষে ভাল হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আমাদের সংস্কৃতি হলো হিন্দু, মুসলিম ও অন্যান্য উপকরণে গঠিত সমৃদ্ধ এক কারুকার্যের মতো। তিনি এও বিশ্বাস করতেন যে, হিন্দু ও মুসলিমদের পরস্পরের কাছ থেকে এমন কয়টি জিনিস শেখার আছে, যা তাদের আরো ভাল হিন্দু ও মুসলিম তো করে তুলবেই; তার চেয়েও বড় কথা—তাদের আরো ভাল মানুষ করে তুলবে। মানুষ-গড়াই ছিল তাঁর ধর্ম, আর তাই তিনি তাঁর দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন সঙ্কীর্ণ সব ভালবাসা ও ঘৃণা ত্যাগ করে সেই পরিপূর্ণতায় গড়ে উঠতে—যার অপর নাম চরিত্রের আদর্শায়ন। একইভাবেই তিনি হিন্দুদের আহ্বান জানিয়েছিলেন জাতপাতের সাম্প্রদায়িক আনুগত্য পরিত্যাগ করে মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্বের পরিচয়বাহী পূর্ণতা ও সর্বজনীনতায় গড়ে উঠতে। মানুষ-গড়ার এই ধর্মের পথে এক সক্রিয় সহায়করূপে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন গণতন্ত্রের সেই আধুনিক তত্ত্ব ও প্রয়োগকে—যার মধ্যে আছে স্বাধীনতা, সমতা ও ব্যক্তিমানুষের পবিত্রতায় গভীর বিশ্বাস।

৭. গণতন্ত্র এবং দেশবিভাগের ট্র্যাজেডি

গণতন্ত্রের শক্তি হলো তার নাগরিক। ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের লক্ষ্য হলো হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, পারসি প্রভৃতিদের এমন 'নাগরিক'-এ পরিণত করা—যারা সার্বজনীন ও মানবিক কিছু মৌলিক মূল্যবোধের প্রতি অনুগত থাকবে। এই মহান প্রক্রিয়া বিশ্বের মহৎ ধর্মগুলির অনুপ্রেরণা থেকে যথোপযুক্ত প্রাণশক্তি আহরণ করবে। বস্তুতপক্ষে, রাজনৈতিক, এমনকি অর্থনৈতিক গণতন্ত্রও বেশিদূর যেতে পারে না বা বিপথে চালিত হতে পারে সেই পথপ্রদর্শন ও অনুপ্রেরণার অনুপস্থিতিতে—যা কেবল ধর্মই তাকে প্রদান করতে পারে। কিন্তু সেই অনুপ্রেরণা বা উদ্দীপনার সন্ধান করতে হবে নানা ধর্মীয় সম্প্রদায় বা তাদের অনড় অনুশাসনের মধ্যে নয়—ধর্মগুলির অন্তর্ভাগে নিহিত মৌল সত্যের মধ্যে। গণতন্ত্রকে এক নৈতিক তথা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে উন্নীত করার এই কাজে স্বাধীন ভারতকে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

বর্তমান ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে উপরি উক্ত মন্তব্যগুলিকে কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর, একটু বেশিই সাহসিক বলে মনে হতে পারে। আমাদের স্বাধীনতা তার সঙ্গে বহন করে এনেছে অনেকটা দুঃখকে; যে-কণ্ঠ আজ আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করবে, সেই কণ্ঠই ঘোষণা করবে আমাদের দুটি রাজনৈতিক সত্তায় বিভাজনও। বিভাজন দুঃখবহ ঠিকই, কিন্তু আমরা একে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিভাজনের থেকে বেশি আর কিছু ভেবে আরো ট্র্যাজিক করে তুলব না। ওপর থেকে দেখলে একে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভিত্তিতে করা এক বিভাজন বলে মনে হয়। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এটি আসলে শুধুমাত্র এক রাজনৈতিক বিভাজন, রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা-প্রসূত; কিন্তু সংস্কৃতি ও ধর্মের তকমা লাগানো। অস্বীকার করার উপায় নেই, এর ফলে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং বিপুল পরিমাণ পার্থিব ও মানবীয় ধ্বংসলীলা ঘটে গেছে।

৮. যেসব সামাজিক বল একদিন এই বিভাজনকে পরাস্ত করবে

কিন্তু এসবের দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, হিন্দুধর্মের 'ক্ষতিকর' স্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ইসলামীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রয়োজন একটা পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের; বরং শুধু এইটুকুই প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় মনে করতে শুরু করেছে যে, তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যক্তিত্বকে ব্যক্ত করার জন্য পৃথক একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজন। কখনো যদি দেশবিভাগ এই ইচ্ছা পূরণ করতে পারেও, তখনি তা নিজেকে পরাহত করবে মৌলিক এক চাহিদার অভাববোধের কারণে। দেশের মানুষ একটা বা দুটো স্বাধীন রাষ্ট্রের অধীনেই থাকুন না কেন, মনেপ্রাণে কিন্তু তাঁরা একই। আর তাই, ভারত ও পাকিস্তানের রাজ্যসমূহের পিছনে সবসময়ই বিরাট ছায়া ফেলে অবস্থান করবে বৃহৎ এক 'অখণ্ড' ভারতবর্ষ। সেই ভারত কিন্তু দ্বিধাবিভক্ত ভারতের সামাজিক উপাদানগুলির ওপর এবং রাজনৈতিক রাজ্যগুলির ওপর নিয়তই আছড়ে পড়তে বাধ্য।

ভারতীয় জনসাধারণের সামাজিক গঠন ভারতের সামাজিক ন্যায়নীতি ও রাজনৈতিক অবস্থার ওপর তার প্রভাব ফেলবেই। তাই যাকিছু আন্তর প্রেরণা আছে, তা সবই একত্বের লক্ষ্যে; সামাজিক বলগুলি কেবল এই উদ্দেশ্যেই অগ্রসর হতে পারে; এবং বিভাজন সত্ত্বেও উভয় রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু-সমস্যা হলো এমন এক শক্তিশালী কারণ, যা একদিন নিয়ে আসবে একত্ব—যদিও আপাতদৃষ্টিতে বিপরীতটাই মনে হয়। এবং এই একত্ব বিগত কয়েক দশক ধরে নানা বোঝাপড়া ও চুক্তির রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও

মারপ্যাঁচের মধ্য দিয়ে যে একত্বের চেষ্টা করা হয়েছিল, তার থেকে উচ্চতর ও অধিকতর স্থায়ী ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হবে।

রাজনৈতিক চাপ আমাদের বিভাজিত করেছে, কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক চাপ আমাদের এক করবে এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক বলসমূহের ও বিশ্ব পরিস্থিতির বাস্তব রূপের দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত সংস্কৃতি সে-প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে। এই প্রক্রিয়া সবসময়ই একটি সমাজের ভিতর কাজ করে, আর তাতে সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ক্রমবিস্তারী সমন্বয় সাধিত হয়। ভারতের ক্ষেত্রে কিন্তু এতকাল এর বিপরীতপক্ষে আমাদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল বিশাল এক তৃতীয় শক্তির—এক বহিঃশক্তির উপস্থিতির—যে নিজের স্থায়িত্বের স্বার্থে ক্রমাগত আমাদের শক্তিশালী জাতীয় বলসমূহকে বিঘ্নিত করে চলেছিল। এখন এই অতিকায় তৃতীয় শক্তির অপসারণের ফলে সামাজিক বলসমূহের কার্যকর ক্রিয়ার ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়ে গেল। আর এই বিশ্বাসই বাঁচিয়ে রেখেছে সেইসব মানুষকে, যাঁরা দেশবিভাগের যন্ত্রণা ভোগ করেও নিরাশ বা বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছেন না। এখনো এই অংশটি বিশাল এবং এর মধ্যে আছে প্রভাবশালী রাজনৈতিক ও অ-রাজনৈতিক সংগঠন, পৃথগ্‌ভাবে আছেন বহু ব্যক্তি—মুসলিম ও হিন্দু উভয়ই। উদ্‌গীরণ-উন্মুখ তীব্র আবেগ ও অন্ধ ঘৃণার বর্তমান অস্বাভাবিক অবস্থা কেটে গিয়ে ভারত-আকাশ যখন নির্মল ভাব ধারণ করবে, তখন দেশ উপরি উক্ত বিশ্বাস ও দর্শনের সত্যতা ও শক্তিকে চিনতে পারবে। কয়েকজন মাত্র অবিচল মানুষের বিশ্বাস তখন পরিণত হবে জনসাধারণের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায়; আর তাতেই সম্ভব হবে ছিন্ন করে দেওয়া অংশগুলির পুনর্যোজনা ও সংহতি; জনসাধারণের সমন্বিত ইচ্ছায় সম্ভব হবে একটি 'অটল সত্যের' 'টলে' যাওয়া—Unsettling of a settled fact.

৯. রাজনীতি ঃ আর্থ-সামাজিক শক্তিগুলির হাতের খেলনা

গৌরবোজ্জ্বল এই পরিণতির অভিমুখে নীরবে ও অবিচলিতভাবে কাজ করে যাওয়াটাই দেশের সামনে বর্তমান কর্তব্য। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, রাজনীতি হলো সামাজিক শক্তিগুলির হাতের খেলনা। রাজনীতির থেকে বেশি মৌলিক হলো সমাজতত্ত্ব। সামাজিক শক্তিগুলিকে সামাজিক সংহতির লক্ষ্যে সদর্থক ব্যবহারের পথে আমাদের দেশ স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব ও বাণী থেকে অনুপ্রেরণা ও পথপ্রদর্শন খুঁজে পাবে।

মুসলিম ও তফসিলী জাতিভুক্তদের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন দেশে সামাজিক শক্তিগুলির এক সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে। হিন্দু সমাজের ওপর গণতন্ত্রের প্রভাব সে-সমাজের আভ্যন্তরীণ ভেদাভেদ দূর করে তাকে সুস্থিত করার চেষ্টা করবে। মুসলিম সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন যত বেশি হবে, ততই একজন সাধারণ মুসলিম মানুষ আরো কম করে উগ্র সাম্প্রদায়িক উস্কানির শিকার হতে থাকবেন; বরং তার জায়গায় তিনি তাঁর ধর্মের সার্বজনীন ও মানবীয় দিকগুলি গ্রহণ ও অনুধাবন করতে সমর্থ হয়ে উঠবেন। সহনশীল এক ইসলামীয় ধর্মজীবন যাপন ও প্রচার হলো ভবিষ্যতের ভারতীয় মুসলিমের কর্তব্য। সাম্প্রতিককালে এধর্মের যেসব বিভাজনী শক্তি এবং নেতিবাচক ও স্বার্থদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির আবাহন করা হয়েছে, তাদের অপসারণ করে সে-জায়গায় নিয়ে আসতে হবে এই ধর্মেরই মহান সমন্বয়কারী দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যক্রমসমূহকে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইসলামী গণতন্ত্রকে গড়ে উঠতে হবে মানবীয় গণতন্ত্রে। হিন্দু সমাজের তথা পৃথিবীর ওপর এই গণতন্ত্রের প্রভাব হবে পূর্ণাঙ্গ। বিবেকানন্দ এই মত পোষণ করতেন যে, হিন্দুধর্মের সৌন্দর্যের হানি হয়েছে তার সামাজিক অসাম্যের দ্বারা। আমেরিকা থেকে ভারতে এক অনুগত ভক্তকে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে রয়েছে এই উচ্চকিত উদ্বেগ ঃ

"পৃথিবীতে কোন ধর্মই হিন্দুধর্মের মতো এত উচ্চতানে মানবতার গৌরব প্রচার করে না, আবার পৃথিবীতে কোন ধর্মই হিন্দুধর্মের মতো এমনভাবে দরিদ্র পতিতদের গলায় পা দিয়ে দলে না। প্রভু আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, দোষটা ধর্মের নয়; হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারী প্রতারক পুরোহিতশ্রেণীই 'পারমার্থিক ও ব্যবহারিক'-এর রূপে যতসব শোষণতন্ত্র আবিষ্কার করে।

"দোষটা ধর্মের নয়। অন্যদিকে দেখ, তোমার ধর্ম তোমাকে শিক্ষা দেয় যে, প্রত্যেক প্রাণীই হলো তোমার আপন সত্তা—কয়েকগুণ ছোট বা বড় আকারে। কিন্তু অভাব ছিল ব্যবহারিক প্রয়োগের, অভাব ছিল সহানুভূতির, অভাব ছিল হৃদয়বত্তার।"

১০. হিন্দুধর্ম ও ইসলামের পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ অতীত ও বর্তমান

ভারতবর্ষের ইতিহাস তথা ভারতবর্ষের ইসলামীয় ও হিন্দু সমাজের চরিত্র অন্যরকম হতে পারত যদি ইসলাম ভারতবর্ষে আসত বন্ধুরূপে, শান্তিপূর্ণভাবে। ইসলাম পারত হিন্দুধর্মের সামাজিক সৌধের বিশুদ্ধীকরণের জন্য তার সামাজিক সাম্যের বাণী উপহার দিতে। হিন্দুধর্ম আনন্দের সঙ্গে সে-শিক্ষা গ্রহণ করে ভ্রাতৃপ্রতিম ধর্মটিকে দান করতে পারত আপন সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হলো, ইসলাম তার সর্বাধিক কার্যকরী রূপগুলিতে ভারতে এসেছিল কেবল সামরিক বিজেতাদের মাধ্যমে, যাঁরা ইসলাম প্রচার করলেও পালন করেছিলেন নিজেদের জাতীয় বর্বরতা, যাঁরা ভারতকে লুণ্ঠন করে হিন্দুধর্মকে নির্মম প্রহার করেছিলেন এবং ইসলামকে হিন্দুমনের চক্ষুশূল করে তুলেছিলেন। আন্তর্ধর্ম ও আন্তঃ-সাংস্কৃতিক যোগাযোগের এই তিক্ত অধ্যায়গুলিতে ফলল বিষময় ফল, অথচ অন্যরূপে

সে-যোগাযোগ মানুষের ধর্ম ও সংস্কৃতির পক্ষে বিশেষ উপকারী ফল প্রদান করতে পারত।

তবুও, মানুষের উন্মত্ততা ও উৎকট আবেগের ওপর দিয়ে কাজ করে সামাজিক শক্তিগুলি। যেমন, একবার যখন ইসলাম এদেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, তখন শুরু হলো সমন্বয় ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের প্রক্রিয়া এবং মধ্যযুগে উত্তর ভারতের হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের মহান সাধকদের জীবন ও কর্ম আমাদের ইতিহাসে সংযোজন করেছে উজ্জ্বল এক অধ্যায়ের। সাধারণভাবে বলতে গেলে, তাঁদের কর্মের মধ্যে হিন্দুধর্মের ছাপ পড়েছে ভাব ও ধর্মের ক্ষেত্রে; আর ইসলামের ছাপ পড়েছে সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে। ইতিহাসের রূপরেখায় কবীর, নানক, দাদু, চৈতন্য, সুরদাস প্রমুখকে স্বল্পস্থায়ী ও বিস্মৃতপ্রায় মনে হলেও বর্তমান যুগে আমাদের কাছে তাঁরা আদর্শ ও অনুপ্রেরণাস্বরূপ। অস্থির সময়ে বিচ্ছিন্ন কয়েকজন যদি এমন গৌরবময় ফললাভ করে থাকেন, তবে সাহসী, আত্মসচেতন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে উভয় ধর্মের শক্তিকে গঠনমূলক সৃজনাত্মক ধারায় প্রবাহিত করতে পারলে আধ্যাত্মিক সুস্থিরতা ও সামাজিক সংহতি এবং বিবেকানন্দের ভাষায় 'মানুষ-গড়া'র মহৎ লক্ষ্যে আরো কত বেশি ফলই না লাভ করা যেত! আধুনিক গণতন্ত্রের তত্ত্ব ও প্রয়োগের এবং বিশ্বে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন শক্তির সহায়তায় এই প্রচেষ্টা যে সগৌরব পরিণতি লাভ করবে, তা হলো—আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে গঠিত ও মানব-কল্যাণের নৈতিক প্রেরণায় সমৃদ্ধ ভারতীয় এক জনতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ।

১১. পারস্পরিক ভাবগ্রহণের সামাজিক প্রক্রিয়া শুরু করার স্বাধীনতা

এটিই কি সব ধর্মের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়? এতেই কি পৃথিবীর মহান ধর্মগুলির প্রফেট ও প্রতিষ্ঠাতাদের অন্তর আনন্দিত হওয়ার কথা নয়? মানবীয় লক্ষ্যে নিয়োজিত হলে আধুনিক বিশ্বশক্তিসমূহ কি স্বভাবতই এরই জন্ম দেবে না? এই পরিণতি কি ভারতকে পৃথিবীর সকল জাতির নৈতিক নেতৃত্ব প্রদানকারী এক সমৃদ্ধ শক্তিশালী জাতিরূপে গড়ে তুলবে না? হিন্দুধর্মের মতো ভারতীয় ইসলাম ও ভারতীয় খ্রিস্টধর্ম কি পারে না আপন আপন বিশেষত্ব নিয়ে ও পৃথিবীর মানুষের কাছে আপন আপন বাণী নিয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিশ্বশক্তিরূপে গড়ে উঠতে? ধর্ম সবচেয়ে বেশি পুষ্ট হয় ভারতের মাটিতে; ভারতীয়রা—হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলিম নির্বিশেষে—গভীরভাবে ধর্মপ্রাণ। সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক আবেগের সঙ্গে মিশে এই ধর্মভাব অত্যন্ত হিংস্র প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে। আধ্যাত্মিকতা ও মানবসেবার আবেগের সঙ্গে মিশে এটি আবার অত্যন্ত গভীর প্রেরণারও পরিচয় রেখেছে। এখন হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টানের দায়িত্ব হলো এটি দেখা যে, তাঁদের ধর্ম যেন এই দ্বিতীয় দিকটিকেই প্রকাশ করে। সাধারণ এক মুসলিমকে এটা বুঝতেই হবে যে, সামরিক বিজেতা ও ধর্মোন্মাদেরা হলো ব্যতিক্রমী ও অস্বাভাবিক এমন কিছু মানুষ, যারা ইসলামের নাম করে নিজেদের রক্ততৃষ্ণা ও অহঙ্কার লুকিয়ে রাখে। তারা বড়জোর সামরিক নেতা; ধর্মীয় নেতা নয়। সাধারণ মুসলমানকে তাঁর ধর্মের সেইসব সাধুসন্তকে আরো বেশি করে শ্রদ্ধা করতে শিখতেই হবে, যাঁরা মানুষকে যুগিয়েছেন আশা ও আনন্দ। এর ফলে ভারতীয় মুসলমান অন্যান্য ধর্মের তথা সেইসব ধর্মের আচার্য ও সাধুসন্তের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব গড়ে তুলতে পারবেন। ইসলামের প্রফেট মানুষের কাছে এসেছিলেন বার্তাবাহকরূপে, তিনি এসেছিলেন সমন্বয়সাধন করতে; তিনি এসেছিলেন—যেমন তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন—মানবতার আশীর্বাদরূপে, অভিশাপরূপে নয়। মেষশাবকের মতো মৃদু, অথচ সিংহের মতো বলবান ও সাহসী সেই প্রফেট তাঁর জনসাধারণের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে তিনি উৎকর্ষের যে-দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা তাঁর অনুগামীদের কাছে অনুপ্রেরণার এক চিরন্তন উৎস।

পারস্পরিক শ্রদ্ধা নিয়ে আসবে পারস্পরিক ভাববিনিময়। এই সামাজিক উপাদানটিকে আমরা দীর্ঘকাল চেপে রেখেছি; ফলে আমাদের ধর্মে ও ব্যক্তিত্বে এসেছে নানা বিকার। এখন সময় এসেছে সামাজিক বিবর্তনের এই অবশ্যম্ভাবী দিকটিকে তার নিজের মতো কাজ করতে দেওয়ার। সেটাই আমাদের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথ। এটি একটি ভাল লক্ষণ যে, ভারতীয় খ্রিস্টধর্ম কিছু সাময়িক প্রলোভন সত্ত্বেও (যে-প্রলোভনগুলি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে অবস্থিত কিছু রাজনৈতিক প্রভাবের দ্বারা সৃষ্ট) এই মহান সত্যকে অনুধাবন করেছে এবং সচেতনভাবে সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এর দ্বারা ভারতীয় খ্রিস্টধর্মের ভবিষ্যৎ যে গৌরবজনক হবে—তা নিশ্চিত। কবে ভারতীয় ইসলাম নিজেকে ফিরে পাবে? ভারতীয় মুসলমান কবে এই ধর্মে আপন অসাধারণত্ব প্রদান করে গড়ে তুলবেন এমন একদল সন্তসাধক, যাঁরা সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবেন? কোন ধর্ম যে জীবন্ত, তার পরিচয় হলো সে-ধর্মের সেইসব সাধক—যাঁরা ঈশ্বরত্ব তথা সর্বোচ্চ মানবীয় ভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহন করেন। 'আসল রাজনীতি'র সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ ও দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ধর্মের অন্তঃসারকে পর্যন্ত ধ্বংস করে দিতে পারে।

সমাজ আজ তার নেতৃবৃন্দের কাছে এই পথপ্রদর্শন প্রত্যাশা করে। আমাদের স্নায়ুগুলি হিংসা-দ্বেষজনিত উদ্বেগ ও পীড়ন বেশিদিন সহ্য করতে পারে না। দুই স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষ আহ্বান জানাচ্ছে সকল সংগ্রামের অবসান ঘটানোর; দাবি জানাচ্ছে সর্বদিকে প্রেমের প্রবাহ প্রেরণ করার।

১২. হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্বন্ধে বিবেকানন্দের ভবিষ্যৎ-দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন ভারতের এই গৌরবময় ভবিষ্যতে এবং নিরন্তর তিনি সেই লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। এই বিশ্বাসটিকে তিনি আমাদের কাছে উত্তরাধিকারস্বরূপ অর্পণ করে গেছেন। তিনি জানতেন, ভারতভূমিতে বিভিন্ন ধর্মের পারস্পরিক মিলন কী মহান আশীর্বাদই না বহন করে নিয়ে আসবে! সপ্তদশ শতকে যখন পরিস্থিতি এখনকার তুলনায় অনেক কম অনুকূল ছিল, তখন আমাদের কিছু ভবিষ্যৎদ্রষ্টা পূর্বপুরুষ তাৎপর্যপূর্ণ প্রচেষ্টা করেছিলেন এই লক্ষ্যে—যাকে তখনকার দিনে বলা হতো 'সমুদ্রসঙ্গম'। আজ সমসাময়িক ভারতবর্ষে এর সার্থক রূপায়ণের ক্ষেত্র প্রস্তুত। হিন্দুধর্ম ও ইসলামের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বিবেকানন্দ তাঁর এক মুসলমান বন্ধু মহম্মদ সর্ফরাজ হোসেনকে যে-চিঠি লিখেছেন, জওহরলাল নেহরুর ভাষায় সেটি 'বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ' (দ্রঃ The Discovery of India, p. 403, foot note)। ১০ জুন ১৮৯৮ তারিখে লেখা এই চিঠিটি পুরোপুরি উদ্ধৃত করাটা সবচেয়ে ভাল হবে :

"সুহৃদ্বরেষু—আপনার চিঠি পড়ে খুব ভাল লাগল এবং এটি জেনে অত্যন্ত আনন্দ পেলাম যে, ঈশ্বর আমাদের মাতৃভূমির জন্য নিঃশব্দে অসাধারণ বস্তুসকল তৈরি করছেন।

"আমরা তাকে বেদান্তবাদ বা যেকোন 'বাদ'ই বলি না কেন, ঘটনা হলো—ধর্ম ও চিন্তার শেষকথা হলো অদ্বৈতবাদ; এবং এটিই একমাত্র স্থান, যেখান থেকে দেখলে সব ধর্ম ও সম্প্রদায়কে ভালবাসতে পারা যায়। আমরা বিশ্বাস করি, এটিই ভবিষ্যৎ জ্ঞানালোকদীপ্ত মানবতার ধর্ম। হিন্দুর কৃতিত্ব হয়তো এইখানে যে, তারা অন্যান্য জাতির আগেই এই ভাবে পৌঁছেছে, কারণ হিব্রু বা আরবদের থেকে তারা প্রাচীনতর জাতি। কিন্তু ফলিত বা প্রয়োগমূলক অদ্বৈতবাদ, যা সকল মানুষকে আপন আত্মারূপে দেখে সেইমতো তাদের সঙ্গে ব্যবহার করে—তা এখনো হিন্দুদের মধ্যে সামগ্রিকভাবে রূপ নিয়ে উঠতে পারেনি।

"অন্যদিকে আমাদের অভিজ্ঞতা হলো এই যে, এমন কোন ধর্ম যদি থাকে, যার অনুগামীরা তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিকল্পনার মধ্যেই এই একত্বের দিকে রীতিমতো অগ্রসর হয়ে থাকেন—এধরনের ব্যবহারের গভীরতর অর্থ ও অন্তর্নিহিত আদর্শ সম্বন্ধে প্রত্যেক হিন্দু যতটা পরিষ্কারভাবে অবহিত থাকেন, সাধারণত তার কিছুমাত্রও না জেনে—তবে সে-ধর্মের নাম ইসলাম এবং কেবলই ইসলাম।

"তাই আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, বেদান্তের তত্ত্বসমূহ যত সূক্ষ্ম ও সুন্দরই হোক না কেন, প্রয়োগমূলক ইসলামের সাহায্য ব্যতিরেকে সেগুলি বিশাল মানবসমাজের কাছে একেবারেই মূল্যহীন। মানবতাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই সেই লক্ষ্যে—যেখানে বেদও নেই, বাইবেলও নেই, কোরানও নেই; যদিও সেটি করতে হবে বেদ-বাইবেল-কোরানকে সু-সমন্বিত করেই। মানুষকে এই শিক্ষা দিতে হবে যে, বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত ধর্মসমূহের মূলে আছে কেবল **'এক ধর্ম'**—যার নাম একত্ব—যাতে প্রত্যেকে সেই পথ বেছে নিতে পারে যা তার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত।

"আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে একমাত্র আশা হলো হিন্দুধর্ম ও ইসলাম—এই দুই মহান ধর্মদর্শনের—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহের—সংযোগ ও সমন্বয়।

"আমি মানসচক্ষে দেখছি, বর্তমান বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা ভেদ করে উঠে দাঁড়াচ্ছেন ভবিষ্যতের আদর্শ ভারতবর্ষ—গৌরবান্বিত, অভেদ্য রূপে—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ পরিগ্রহ করে।

"ঈশ্বর আপনাকে মানবতার সেবায়, বিশেষ করে আমাদের দরিদ্র, অতিদরিদ্র মাতৃভূমির সেবায় মহান যন্ত্রস্বরূপ গড়ে তুলুন, সতত এই প্রার্থনা জানাই। ভালবাসা-সহ—আপনার বিবেকানন্দ।"

১৩. উপসংহার

আধ্যাত্মিকভাবে সুগ্রথিত, আর্থিকভাবে শক্তিশালী, সামাজিকভাবে স্থিতিশীল এবং নৈতিকভাবে পরিপূর্ণ এক ভারতবর্ষ হয়ে দাঁড়াবে বিশ্বের মধ্যে অনন্য এক শক্তি। এই ছিল আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন। পৃথিবী ভারতের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে। সভ্যতার সুস্থিতি নির্ভর করে বিশ্বের প্রভাবশালী শক্তিগুলিকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিশা প্রদানের ওপর। বিশ্ব আহ্বান জানাচ্ছে। ভারতবর্ষ কি তাতে কর্ণপাত করবে? সাড়া দেবে? বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন, ভারত সাড়া দিতে পারে এবং সাড়া দেবে। স্বাধীন ভারত সেই বিশ্বাস, সেই স্বপ্ন অন্তরের অন্তরে গ্রহণ করুক এবং বীরদর্পে এগিয়ে চলুক। "ওঠো! জাগো! লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত কিছুতেই থেমো না।" ❑

অনুবাদক ● **সোমনাথ ভট্টাচার্য**

এই বিশেষ নিবন্ধটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো—সম্পাদক

তর্কাতীত এক মহান চরিত্র ঃ শ্রীকৃষ্ণ

সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

বস্তুবাদী ঐতিহাসিকদের মতে (এঁদের মধ্যে ডি. ডি. কোশাম্বীর নাম উল্লেখযোগ্য) যদুবংশের নাম আর্যগোষ্ঠী বলে ঋগ্বেদে বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণ কিন্তু বহিরাগত, তাঁকে যদুবংশের সঙ্গে পরবর্তী কালে যুক্ত করা হয়েছে।[১] কারণ, তাঁর গায়ের রঙ আর্যবিরোধী। আর্যপ্রধান ইন্দ্রের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষও কৃষ্ণের আর্যবিরোধী ভাব প্রকট করে। আমাদের প্রশ্ন, অর্জুন আর্যনেতা ইন্দ্র-পুত্র, তাঁরও কিন্তু গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ, অর্থাৎ আর্যবিরোধী। এঁদের মতে, সমস্ত কুরুক্ষেত্র সংগ্রামে পাণ্ডবপক্ষে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁরা কেউই আর্য নন। কিন্তু ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ, যাঁরা পাণ্ডব-পক্ষীয় ছিলেন তাঁরা ভরতবংশীয় এবং পুরুবংশীয়দের মতোই ইন্দ্র-উপাসক অর্থাৎ আর্যবংশীয়।

আসলে এই যুদ্ধকে বস্তুবাদী ঐতিহাসিকেরা আর্য-অনার্যদের মধ্যে অর্থনৈতিক শ্রেণীসংগ্রাম হিসাবে প্রতিপন্ন করতে চান। অবশ্যই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আর্য-অনার্য সংগ্রাম ছিল না, তবে যদুকুলোদ্ভব কৃষ্ণ সবসময়ই অনার্যদের অধিকারলাভের পক্ষেই ছিলেন। সেজন্যই কি তাঁকে অনার্য আখ্যা পেতে হয়েছে? গায়ের রঙই যদি বিচারের মানদণ্ড হয়, তাহলে যুধিষ্ঠির ও ভীম তপ্তকাঞ্চনবর্ণ ছিলেন। অর্জুন ও নকুল ছিলেন শ্যামবর্ণ। তাহলে কি যুধিষ্ঠির ও ভীম আর্য, অর্জুন ও নকুল অনার্য। কিন্তু ভীম-কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান অনার্য প্রথা বলে কেউ কেউ অভিহিত করেন। তাহলে ভীম আর্য না অনার্য?

এইভাবে আর্য-অনার্য ব্যাপারটি ইচ্ছামতো আরোপ করতে গিয়ে যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে, তা নিরসনের জন্য বস্তুবাদীরা এখানে নিজেদের সংশোধন করে নিয়ে বলেন যে, আসলে আর্য-অনার্য জনজাতি মিশ্রণে যে নতুন জনজাতির সৃষ্টি হয়েছিল, কুরুক্ষেত্রে তাদেরই সঙ্গে কৌরবদের যুদ্ধ হয়েছিল। এরা যদি সঙ্কর-জাতি হন তাহলে কৌরবরাও তাই, কারণ ধীবরকন্যা সত্যবতীর পুত্র ব্যাসদেব হলেন পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্র উভয়েরই পিতা। সুতরাং কুরুক্ষেত্রে একটি মিশ্র জনজাতির সঙ্গে অপর একটি মিশ্র জনজাতির যুদ্ধ হয়, অর্থাৎ যুদ্ধটি হয় সমপর্যায়ের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে। আর্য-অনার্যে সংগ্রাম নয় এবং অর্থনৈতিক সংগ্রাম তো নয়ই। যুদ্ধটি এক ক্ষত্রিয় রাজপুত্র ও রাজন্যবর্গ দ্বারা গঠিত দলের সঙ্গে অপর রাজপুত্র ও রাজন্যবর্গের মধ্যে, রাজ্যের ন্যায্যাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্বপ্রসূত।

অতএব দেখা যাচ্ছে, বস্তুবাদীদের যুক্তি ও কথায় অনেক অসঙ্গতি আছে। গীতাকে এঁরা উচ্চবর্ণের বর্ণ-হিন্দুদের সামরিকবৃত্তির গ্রন্থ বলে অভিহিত করেছেন। অথচ গ্রন্থের প্রবক্তা অনার্য এবং আর্যনায়ক ইন্দ্রবিরোধী! তিনিই আবার উচ্চমার্গের বর্ণহিন্দুর স্বার্থরক্ষার জন্য গীতা বলছেন! এ কিরকম উল্টোপাল্টা যুক্তি!

এছাড়া এঁদের মতে বৈদিক বর্ণাশ্রমের ব্যাপারে গীতা রক্ষণশীল এবং জাতিভেদপ্রথার ভিত্তি তৈরি করেছে গীতা। কী ভয়ানক অসঙ্গতিপূর্ণ কথা। অনার্য ও ইন্দ্রবিরোধী কৃষ্ণ বর্ণাশ্রমের ব্যাপারে রক্ষণশীল! তিনি আবার আর্যদের ভগবান হিসাবে অমোঘ বাণী দিচ্ছেন!

ডি. ডি. কোশাম্বীর মতে, কৃষ্ণকাহিনী এক যুগসন্ধিক্ষণে আর্য-অনার্যের মিলনকাহিনী। আর্যদের ব্যয়সাধ্য যজ্ঞ ও বলিপ্রথা একসময় ভাগবতধর্মের নতুন ব্যবস্থায় বিদায় নেয়। নতুন কৃষিসমাজ গড়ে উঠল, খাণ্ডবদাহ যার প্রমাণ। এছাড়া কৃষ্ণ ও গরুড়কাহিনীর মধ্যে নাগ ও গরুড়—এই দুই জনজাতির মিলন ঘটেছে।

কিন্তু কোশাম্বীর মতে—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিস্তৃত বর্ণনার মধ্যে রয়েছে সুবিধাবাদের এক চরম নিদর্শন। এতে একদিকে প্রতিভাত হয়েছে একটি উন্নত সমন্বয়ী সমাজের চিত্র, অপরদিকে তুলনামূলকভাবে আদিম মানবসমাজের উৎপাদন পদ্ধতি ও ধর্মীয় সাধনা। আসলে গীতা হলো সামন্ততন্ত্রের চূড়ান্ত সিদ্ধি, যেখানে ভক্তিযোগ নির্যাতিত মানুষদের সম্বল হয়েছিল। এটি ব্রাহ্মণ্যশ্রেণীর সৃষ্টি, অহিংস বৌদ্ধ ভারতকে নৈতিকভাবে যুদ্ধকে স্বীকৃতি দেওয়ানোর জন্য। তাদের সমন্বয়ী দৃষ্টির পশ্চাতে এটিও কাজ করেছে। গীতায় অসংখ্য অসঙ্গতি আছে। এ এমনই একটি গ্রন্থ যা নিষ্কাম কর্মের নামে দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে মানুষকে যা ইচ্ছা করার স্বাধীনতা দিয়েছে। অর্থাৎ গীতা একদিকে বর্ণাশ্রমের নিগড়ে বেঁধেছে বলা হচ্ছে, অপরদিকে যা খুশি করার অধিকার দিয়েছে—এ কি করে হয়?

ভগবদ্গীতার বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে সুবিধাবাদের চরম নিদর্শন কিভাবে রয়েছে তা কিন্তু খুব স্পষ্ট করে এঁরা কেউই বলেন না। এতে যে উন্নত সমন্বয়ী সমাজের একটি চিত্র আছে তা স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে আদিম উৎপাদন পদ্ধতি ও ধর্মীয় সাধনার নমুনা রয়েছে বলে যে এদের বিশ্বাস তা কি ঠিক? অবশ্যই তখন সমাজ কৃষিনির্ভর, উৎপাদন পদ্ধতি আজকের মতো বৈজ্ঞানিক প্রথায় নয়, কিন্তু নানারকম শিল্পকর্ম যে বেদের কালেই ছিল এবং বহুবিধ শিল্পীরও যে নাম পাওয়া যায় তার প্রমাণও আছে এবং শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের দক্ষতার জন্য প্রাচীন ভারতে যে সমৃদ্ধি

১ Myth and Reality—D. D. Koshambi

এসেছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। এর জন্য প্রাচীন বিশ্বে ভারত বহির্বাণিজ্যে অগ্রণী দেশ ছিল। 'পেরিপ্লাস অফ দি সি' গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে। সুতরাং উৎপাদন পদ্ধতি আদিম—এ কি ঠিক কথা! তাছাড়া উৎপাদন-প্রথা আদিম হলেই কি ধর্মীয় সাধনাকেও আদিম হতেই হবে?

গীতায় যে ধর্মীয় সাধনার নমুনা রয়েছে তা আদিম তো নয়ই, সর্বোচ্চ বলে আজও সমাদৃত। সুতরাং এবিষয়ে কোশাম্বী প্রমুখ বস্তুবাদী ঐতিহাসিকদের ধারণা একদেশদর্শিতা-দুষ্ট। একথাও মতবাদদুষ্ট যে, গীতার সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের কোন যোগ আছে। ভক্তিযোগ সর্বশ্রেণীর সাধারণ মানুষদের আশ্রয়স্থল হতে পেরেছিল, তার কারণ যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ড এবং উপনিষদের উচ্চ দর্শন—উভয়ই সাধারণ মানুষের সাধ্যের অতীত বা বোধের অগম্য ছিল। তাই গীতায় সাধারণ মানুষদের উপযোগী ধর্ম যেমন দেওয়া হয়েছে, তেমন উচ্চ অধিকারীর উপযোগী অদ্বৈতবাদ বা উচ্চতম জ্ঞানমার্গের কথাও বলা হয়েছে। কর্মযোগও সাধারণ মানুষদের উপযোগী। কিন্তু তার সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের কি সম্পর্ক?

এটি ব্রাহ্মণ্যধর্মের সৃষ্টি বৌদ্ধভারতকে যুদ্ধকে স্বীকৃতি দেওয়ানোর জন্য—একথাও ঠিক নয়, কারণ গীতা বৌদ্ধ-পরবর্তী যুগের ব্যাপার নয়, বুদ্ধের কয়েক হাজার বছর পূর্বে রচিত—এবিষয়ে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। আর নিষ্কাম কর্ম তত্ত্বের এটি তো অপব্যাখ্যা যে, এতে মানুষকে যা খুশি তা করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। নিজ কর্তব্যকর্ম লোকে ফলাফলের আকাঙ্ক্ষা না করে নিষ্ঠার সঙ্গে করবে, কর্মের উদ্দেশ্য হবে সুচারুভাবে করা, ঈশ্বরের প্রীতির জন্য করা এবং লোকহিতের জন্য করা। এতে যা খুশি তা করবার স্বাধীনতা কি করে হয়? নৈতিকতার সীমারেখা এর চারপাশে অত্যন্ত স্পষ্ট।

কোশাম্বী প্রমুখের মতে, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও বহু অসঙ্গতি আছে। সবচেয়ে বড় অসঙ্গতি—তিনি শাশ্বত শান্তির একমাত্র উৎস, অথচ নিজ মাতুল কংসকে নৃশংসভাবে হত্যা করতেও দ্বিধান্বিত নন। কংস কি প্রকৃতির লোক ছিলেন—এ আমরা পূর্বেও দেখেছি। অসংখ্য শিশুঘাতী, পিতাকে কারারুদ্ধ করে অন্যায়ভাবে সিংহাসনে আসীন, ভগিনী ও ভগিনীপতিকে কারারুদ্ধ করে তাদের সদ্যজাত শিশুসন্তানদের হত্যাকারী কংসের চেয়ে নৃশংস ও মানবতার শত্রু আর কে আছে? কৃষ্ণ-বলরামকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই তো কংস তাঁদের নন্দালয় থেকে আনিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁরা যা করেছেন তা আত্ম-রক্ষার্থে। তাঁদের কি আত্মরক্ষার অধিকারও থাকতে নেই?

কৃষ্ণের আরো অপরাধ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে নির্দ্বিধায় শিশুপালকে হত্যা করা। 'নির্দ্বিধায়' কথাটা কি ঠিক? তৎপূর্বে কৃষ্ণ শিশুপালের মাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে তার একশো অপরাধ ক্ষমা করেছেন। এবারে তাকে কেন হত্যা করলেন? কারণ, শিশুপাল উপস্থিত রাজন্যবর্গকে বিদ্রোহী করে তুলে যুধিষ্ঠিরের আয়োজিত যজ্ঞটি পণ্ড করতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণ ছিলেন যজ্ঞরক্ষার দায়িত্বে। সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই তাঁকে শিশুপালকে হত্যা করতে হয়েছিল। না হলে যজ্ঞক্ষেত্রেই যুদ্ধ বেধে যেত এবং বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটত। তাহলেই কি ভাল হতো? আর শিশুপাল ছিল জরাসন্ধের সেনাপতি, জরাসন্ধের সকল নৃশংস দুষ্কর্মের সহায়ক। সে যজ্ঞ পণ্ড করতেই এসেছিল। তার মতো নৃশংস মনের শত্রুদের বিনাশ করার জন্য, তাদের থেকে সাধুব্যক্তিদের পরিত্রাণের জন্যই তো কৃষ্ণাবতার।

কৃষ্ণ কি পাণ্ডবদের অন্যায় ও শৌর্যবিরোধী রণকৌশল অনুসরণ করিয়েছিলেন?

কৃষ্ণের সম্পর্কে এঁদের আরেকটি অভিযোগ—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের যে-রণকৌশল অনুসরণ করিয়েছিলেন তা অন্যায়, শৌর্যবিরোধী এবং যেকোন সুস্থ ব্যবহারের পরিপন্থী। এঁরা কি বলতে চান যে, কৌরবদের অনুসৃত যুদ্ধনীতি খুব ন্যায় ও শৌর্যসম্মত ছিল? বোধহয় সপ্তরথীতে মিলে অভিমন্যুবধ বা যুদ্ধশেষে দুর্যোধনের নিয়োগে নৈশ অভিযানে পাণ্ডবশিবিরে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র-সহ পাঞ্চাল বীরদের নিদ্রিত অবস্থায় সেই অতি কাপুরুষোচিত ও অতি নৃশংস হত্যাকাণ্ড খুব শৌর্য ও নীতিসম্মত ছিল! বস্তুবাদীদের মতে এরাই ধর্মপক্ষ!

এখন দেখা যাক বস্তুবাদীদের মত অনুযায়ী কৃষ্ণ কি কি শৌর্যবিরোধী রণকৌশল পাণ্ডবদের অনুসরণ করিয়েছিলেন এবং কখন? তাঁদের মতে এরূপ শৌর্যবিরোধী রণনীতি অনুসরণের ঘটনা হলো পাঁচটি—(১) ভীষ্মবধ, (২) জয়দ্রথ বধ, (৩) দ্রোণবধ, (৪) কর্ণবধ এবং (৫) দুর্যোধন বধ।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন যে, এই পাঁচটি ঘটনার ক্ষেত্রেই প্রক্ষিপ্ত অংশের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি ঘটিয়েছেন অবশ্যই পরবর্তী কালের কৃষ্ণদ্বেষীরা। রাজশেখর বসু বলেছেনঃ "মহাভারতে সবচেয়ে রহস্যময় পুরুষ কৃষ্ণ। বহু হস্তক্ষেপের ফলে তাঁর চরিত্রেই বেশি অসঙ্গতি ঘটেছে।... সাধারণত তাঁর আচরণ গীতাধর্মব্যাখ্যাতারই যোগ্য, তিনি বীতরাগভয়ক্রোধ স্থিতপ্রজ্ঞ লোকহিতে রত।"[২] তিনি আরো বলেছেনঃ "মূল মহাভারতের রচয়িতা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বললেও সম্ভবত তাঁর আচরণে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার বেশি দেখাননি।"[৩] বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন যে, অতিপ্রাকৃত ব্যাপার যেখানেই এসেছে তা মূল মহাভারতের অংশ নয়, তা প্রক্ষিপ্ত। অথচ বস্তুবাদী

২ মহাভারত, ভূমিকা ৩ ঐ

ঐতিহাসিক ও সমালোচকেরা মূল মহাভারত না ধরে প্রক্ষিপ্ত অংশকে অকাট্য ধরে নিয়ে সমালোচনা করেছেন।

প্রথম, ভীষ্মবধের ব্যাপারে শিখণ্ডী কাহিনী অতিপ্রাকৃত ব্যাপার, সেজন্য পরিত্যাজ্য বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। আসলে অর্জুন প্রথমে বৃদ্ধ পিতামহের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করতে চাননি। কৃষ্ণ তাঁকে অবহিত করালেন যে, ভীষ্মকে নিপাতিত না করায় তাঁর হাতে প্রতিদিন অগণিত সাধারণ সৈন্য প্রাণ হারাচ্ছে। এটা ঠিক হচ্ছে না। তাছাড়া এরকম চললে যুদ্ধ-জয়ের কোন আশা নেই। তখন অর্জুন তৎপর হয়ে ভীষ্মকে বধ করলেন। কৃষ্ণ এখানে যা করেছেন বা বলেছেন তা অন্যায়ও নয়, অপরাধও নয়, অত্যন্ত বাস্তব এবং যুক্তিসম্মত। সমস্ত পাণ্ডবসেনা ভীষ্মের হাতে বিনষ্ট হলে যুদ্ধে পরাজয় অনিবার্য, নিশ্চয়ই পরাজয়ের জন্য তাঁরা এই লোকক্ষয়কারী ধর্মযুদ্ধ করছিলেন না। কৃষ্ণ যে-বক্তব্য রেখেছিলেন অর্জুনের সামনে তা হলো—"তুমি ক্ষাত্রধর্মানুসারে ভীষ্মবধের প্রতিজ্ঞা করেছ, এখন পশ্চাৎপদ হচ্ছ কেন? তুমি ঐ দুর্ধর্ষ ক্ষত্রিয় বীরকে রথ থেকে নিপাতিত কর, নতুবা তোমার জয়লাভ হবে না।"[৪] এর মধ্যে অন্যায় বা অধর্মের কি আছে?

তারপরের ঘটনা জয়দ্রথবধের। প্রিয় পুত্র অভিমন্যু অন্যায় যুদ্ধে নিহত হলে অর্জুন শোকার্ত হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, এই হত্যাকাণ্ডের অন্যতম নায়ক জয়দ্রথকে পরদিন সূর্যাস্তের পূর্বে বধ করবেন। না পারলে অগ্নিতে প্রবেশ করবেন। কিন্তু কৌরবেরা গুপ্তচরমুখে অর্জুনের কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা শুনে পরদিন এমনভাবে ব্যূহরচনা করে জয়দ্রথকে লুকিয়ে রাখলেন যে, সূর্য যখন অস্তাচলে তখন উপায়ান্তর না দেখে কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র দ্বারা সূর্যকে আবৃত করলেন এবং অর্জুনকে নির্দেশ দিলেন অগ্নিপ্রবেশের আয়োজন করতে। অর্জুন অগ্নিপ্রবেশের আয়োজনে প্রবৃত্ত হলে মজা দেখার জন্য অন্যান্য কুরুবীরদের সঙ্গে জয়দ্রথও বেরিয়ে এলেন পাণ্ডবদের সামনে। সেই মুহূর্তে কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র সরিয়ে নিলেন সূর্যের মুখ থেকে, জয়দ্রথ আর পালানোর সুযোগ পেলেন না। অর্জুন সম্মুখস্থিত জয়দ্রথকে হত্যা করলেন সহজেই।

সুদর্শন চক্রের দ্বারা সূর্যের মুখ আবৃত করা—এ তো সুস্পষ্টই অতিপ্রাকৃত ঘটনা, বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। হতে পারে কিছুক্ষণের জন্য আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়েছিল, কেউ কেউ বলেন তখন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তবে কৃষ্ণ মানবদেহ ধারণ করে যখন এসেছেন, তখন সুদর্শন চক্রের দ্বারা সূর্যের মুখ আবৃত করতে কখনোই পারেন না। কারণ মানবদেহ ধারণ করে আসার অর্থ দেহধারণের সমস্ত সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে আসা। যাই ঘটে থাকুক—আকাশ মেঘাবৃত হয়ে থাকুক কিংবা সূর্যগ্রহণ হয়ে থাকুক—ঈশ্বরেচ্ছায় হয়েছে। এবং কৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর, সুতরাং তিনিই এটা ঘটিয়েছেন—এরকম একটি ধারণা থেকে পরবর্তী কালের কবিকল্পনায় দাঁড়াল যে, কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র দিয়ে সূর্যের মুখ ঢেকে দিয়েছিলেন। এ কখনোই আদি মহাভারতের অংশ নয়।

তাছাড়া কালীপ্রসন্ন সিংহ-কৃত মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদ পড়লে দেখা যায়, সূর্যের পুনঃপ্রকাশের পরও বহুক্ষণ ধরে যুদ্ধ চলেছে এবং যুদ্ধ করতে করতেই কৃষ্ণার্জুন জয়দ্রথের আত্মগোপনের জায়গায় পৌঁছে যান এবং যাঁরা জয়দ্রথকে রক্ষা করছিলেন তাঁদের সকলকে পরাজিত করেই অর্জুন সম্মুখযুদ্ধে জয়দ্রথকে বধ করেন। এই অংশটুকু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে কোথা থেকে কতটা প্রক্ষিপ্ত।

দ্রোণবধ আরেকটি ঘটনা, যার জন্য সমালোচকেরা কৃষ্ণনিন্দায় মুখর। দ্রোণবধের প্রাক্কালে দেখা যায়, যুধিষ্ঠির দ্রোণকে কৃষ্ণের পরামর্শে এই মিথ্যা বললেন যে, অশ্বত্থামা (দ্রোণপুত্র) নিহত হয়েছেন। অবশ্য সত্যবাদী যুধিষ্ঠির সঙ্গে সঙ্গে নিম্নস্বরে বলেছিলেন 'ইতি কুঞ্জর' (অশ্বত্থামা নামে হস্তী নিহত হয়েছে, হস্তীটিকে ভীম বধ করেছিলেন)। কিন্তু কৃষ্ণের নির্দেশে জোরে ঢাকঢোল দামামা বাজানোয় দ্রোণ যুধিষ্ঠিরের নিম্নস্বরে বলা কথা কয়টি শুনতে পেলেন না। তিনি জানলেন তাঁর পুত্র অশ্বত্থামা নিহত হয়েছেন এবং তৎক্ষণাৎ অস্ত্রত্যাগ করলেন, তখনি ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর শিরোশ্ছেদ করেন।

এখানেও কালীপ্রসন্ন সিংহের আক্ষরিক অনুবাদ পাঠ করলে দেখা যায় যে, যুধিষ্ঠিরের মুখে অশ্বত্থামা নিহত হওয়ার সংবাদ শুনেই দ্রোণ তৎক্ষণাৎ অস্ত্রত্যাগ করেননি, তারপরও বহুক্ষণ ধরে তিনি নবযুবকের ন্যায় মহা-বিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন। আসল কথা, দ্রোণ অধর্ম যুদ্ধ করছিলেন—এমন সব অস্ত্র সাধারণ সৈনিকদের ওপর প্রয়োগ করছিলেন, যা তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ নিষিদ্ধ ছিল। এখানেও যুদ্ধের বিবরণের মাঝখানে একটি জায়গায় কৃষ্ণদ্বেষিগণ কৃষ্ণের প্ররোচনায় যুধিষ্ঠিরের মিথ্যা বলার মিথ্যা কাহিনীটি ঢুকিয়েছেন, বেশ ভাল করেই বোঝা যায়। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কথা, মহাভারতে পর্বসংগ্রহাধ্যায় বা অনুক্রমণিকাপর্বাধ্যায়ে কোথাও যুধিষ্ঠির কর্তৃক মিথ্যা বলার উল্লেখমাত্র নেই। সেখানে শুধু এইকথা ধৃতরাষ্ট্র বিলাপে উল্লেখ আছে যে—"যখন শুনিলাম, ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধধর্মের বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া মরণে স্থিরনিশ্চয়, বিশস্ত্র ও রথস্থিত দ্রোণাচার্যের শিরোশ্ছেদ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই।" আর পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে দ্রোণবধ সম্পর্কে এই কথাকয়টি লেখা আছে—"সমরে দ্রোণাচার্য হত হইলে

৪ মহাভারত, পৃঃ ৪০৪

অশ্বত্থামা ক্রোধান্ধ হইয়া যে ভীষণ নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহাও এই পর্বে (দ্রোণপর্বে) বর্ণিত আছে।"

আসলে দ্রোণ যুদ্ধ করতে করতে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়েন। সেকথাও কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত মহাভারতের দ্রোণপর্বে পাওয়া যায়—"সত্যসন্ধ মহাবীর দ্রোণাচার্য মহারথগণের প্রতি ধাবমান হইলে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত ও প্রচণ্ড বায়ু সেনা-গণকে ভীতকরত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল।... তৎকালে মহারথ দ্রোণ নিতান্ত নিস্তেজ হইলেন।" তখনি দ্রোণ অস্ত্রত্যাগ করে বসে পড়েন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন তার কিছুক্ষণ পরে তাঁর শিরোশ্ছেদ করেন।

কৃষ্ণনিন্দার অপর একটি ঘটনা কর্ণবধের অব্যবহিত পূর্বে। সেদিন নারায়ণী সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে বহুদূরে চলে গিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করে লাঞ্ছনা করেন, তবে তাঁকে বধ না করে ছেড়ে দেন, কারণ ইতিপূর্বে কুন্তীকে তিনি কথা দিয়েছিলেন—অর্জুন ছাড়া পাণ্ডবদের অন্য কাউকে তিনি বধ করবেন না। যুদ্ধের মাঝখানে নারায়ণী সেনাদের পর্যুদস্ত করে ফিরে এসে যুধিষ্ঠিরের অবস্থানের জায়গায় তাঁকে না দেখে অর্জুন তাঁর সংবাদ নেওয়ার জন্য শিবিরে আসেন। কর্ণহস্তে লাঞ্ছিত যুধিষ্ঠির তখন অপমানের জ্বালায় জ্বলছিলেন। অর্জুনকে ফিরতে দেখে তিনি জানতে চাইলেন, অর্জুন কি কর্ণকে বধ করে এসেছেন? অর্জুন 'না' বলায় ক্ষুব্ধ যুধিষ্ঠির তখন তাঁকে গাণ্ডীব ত্যাগ করতে বলেন। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, কেউ যদি তাঁকে গাণ্ডীব ত্যাগ করতে বলে তাহলে তিনি তাকে তৎক্ষণাৎ বধ করবেন। অর্জুন প্রতিজ্ঞানুযায়ী যুধিষ্ঠিরকে বধ করতে উদ্যত হলে কৃষ্ণ তাতে বাধা দিয়ে বললেন: "সত্যরক্ষার জন্যও কখনো প্রাণিহিংসা করবে না, তা সবচেয়ে বড় অধর্ম।" আরো বললেন: "ধর্মজ্ঞ জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে তুমি নীচ লোকের মতো হত্যা করবে? তুমি কি বালকের মতো প্রতিজ্ঞা করেছিলে?" অর্জুন নিরস্ত হলেন, কিন্তু সত্যভ্রষ্ট হলেন ভেবে আত্মহনন করতে উদ্যত হলেন। তখনো কৃষ্ণ বাধা দিলেন এবং বললেন যে, কখনো কখনো সত্য মিথ্যার তুল্য, আর মিথ্যা সত্যতুল্য অর্থাৎ কল্যাণকর। একটি পুরাকাহিনীর দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন তিনি। পুরাকালে মহর্ষি কৌশিকের আশ্রমে একদিন কয়েকজন ব্যক্তি দস্যুতাড়িত হয়ে এসে আত্মগোপন করে। দস্যুগণ এসে তাদের কথা জানতে চাইলে মহর্ষি কৌশিক সত্যকথা বললেন। ফলে দস্যুগণ আত্মগোপনকারী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে হত্যা করল এবং তাদের যথাসর্বস্ব অপহরণ করল। মৃত্যুর পর কৌশিককে নরকে যেতে হলো। কারণ, এখানে মিথ্যা ছিল সত্যের তুল্য হিতকর, আর সত্য ছিল মিথ্যার তুল্য অহিতকর। যখন সত্য বললে অপরের প্রাণনাশ ও সমূহ সর্বনাশ, তখন মিথ্যা বলে তাদের প্রাণরক্ষা করবে—এই হলো কৃষ্ণের বক্তব্য। এর জন্য কৃষ্ণ-চরিত্রকে যতই সমালোচনা করা হোক না কেন, এই মানবিকতার জন্যই কৃষ্ণ-চরিত্র আরো মনোহর এবং পূজার্হ হয়ে উঠেছে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

তাছাড়া তখনকার দিনের ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিদের একটি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই যে, যা হিতকর—তাই সত্য, যা অহিতকর—তাই অসত্য। "যদ্ভূতহিতমত্যন্তম্ তৎ সত্যম্।" শান্তিপর্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে শুকদেব-নারদ সংবাদ শোনান, যার মধ্যে নারদ বলছেন: "সত্যের সমান তপস্যা নেই, সত্যবাক্য শ্রেয়, কিন্তু সত্য অপেক্ষাও হিতবাক্য বলবে। যা প্রাণিগণের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর, তাই আমার মতে সত্য।"

সুতরাং এটি ভারতবর্ষের একটি প্রাচীনতম বিশ্বাস, এটি শুধু কৃষ্ণের কথা নয়। তাই এর জন্য কৃষ্ণের কেন নিন্দা প্রাপ্য হবে? তাছাড়া কথাগুলির অন্তর্নিহিত মানবিকতা ও যুক্তি অপূর্ব, এতে সন্দেহ নেই।

কর্ণবধ কৃষ্ণের অপর একটি অন্যায় আচরণের প্রমাণ বলে প্রচার করা হয়। কর্ণবধের সময় কর্ণের রথচক্র ভূমিতে বসে গিয়েছিল। কর্ণ তখন অর্জুনকে বললেন: "পাণ্ডুপুত্র, মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর, দৈবক্রমে আমার রথের বামচক্র বসে গিয়েছে। তুমি কাপুরুষের অভিসন্ধি ত্যাগ কর।... ধর্মোপদেশ স্মরণ করে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর।" তখন কৃষ্ণ তাঁকে যেসকল প্রশ্ন করেন তা হলো—দ্রৌপদীকে দ্যূতসভায় সেই নিষ্ঠুর লাঞ্ছনা করার কালে, ভীমকে বিষপ্রয়োগে হত্যার চেষ্টা করার সময়, জতুগৃহদাহ করে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার অপচেষ্টার ক্ষেত্রে, কপট দ্যূতে যুধিষ্ঠিরকে হারিয়ে বনে প্রেরণের কালে এবং সপ্তরথী মিলে অভিমন্যুবধের সময় তাঁর এই ধর্মবোধ কোথায় ছিল? এই সঙ্গত কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় অপরাধ কোথায়? এই কথাগুলি শুনেই কর্ণ অর্জুনকে মারার জন্য এমন ভয়ঙ্কর বাণ নিক্ষেপ করেন, যার ফলে অর্জুনের হাত থেকে গাণ্ডিব পড়ে যায়, সেই সুযোগে কর্ণ রথচক্র টেনে তোলার চেষ্টা করে বিফল হন। তখন অর্জুন যমদণ্ডের ন্যায় আঞ্জলিক বাণ নিক্ষেপ করে কর্ণবধ করেন। এর মধ্যে অন্যায় কোথায়? অর্জুনের আত্মরক্ষার অধিকার নেই? বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, ঋষির শাপে কর্ণের রথচক্র বসে যাওয়ার কাহিনী পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত এবং কাহিনীটি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে তাই মনে হয়। কর্ণ অজেয়—একথা মোটেই ঠিক নয়, বহুবার অর্জুনের কাছে তিনি পরাজিত হয়েছেন। এসকল অপচেষ্টার প্রয়োজন অর্জুনের ছিল না, কৃষ্ণেরও প্রয়োজন ছিল না কোন অপকৌশল শেখানোর। তিনি শেখানওনি, কারণ অধর্মাচার তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অধর্মাচারের প্রয়োজন হয়নি, অবিশ্রান্ত যুদ্ধে রণক্লান্ত কর্ণ শিবিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আসা অর্জুনের সঙ্গে পারেননি সেদিন, যেমন পূর্বেও অনেকবার পারেননি অর্জুনের সঙ্গে সম্মুখসমরে।

কর্ণ-চরিত্র সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত—"কর্ণ-চরিত্র অতি মহৎ ও মনোহর।" কিন্তু রাজশেখর বসু ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন : "আমরা কর্ণ-চরিত্রে নীচতা ও মহত্ত্ব দুইই দেখিতে পাই (নীচতাই বেশি)।"[৫]

আমরা রাজশেখর বসুর সঙ্গে একমত, কারণ সবকিছু ছেড়ে দিলেও দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা ও অভিমন্যুবধের সময় কর্ণ নীচতার চরম দেখিয়েছেন। কর্ণের প্রতি যে সামাজিক অবজ্ঞা প্রদর্শিত হয়েছে সূতপুত্র পরিচিতির কারণে, তার জন্য সকলেরই মনে তাঁর প্রতি সহানুভূতি জাগে। কিন্তু তার জন্য কর্ণকৃত দুষ্কর্মের ক্ষালন হয় না।

সর্বশেষ ও সবচেয়ে বেশি কৃষ্ণনিন্দার ঘটনা দুর্যোধনবধের কাহিনীর মধ্যে নিহিত, এর জন্য বহুকাল ধরেই কৃষ্ণ নিন্দিত হয়ে আসছেন। অথচ একাহিনীটির মধ্যে পরবর্তী কালের স্থূলহস্তের অবলেপন অতি সুস্পষ্ট। সভাপর্বে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার সময় দুর্যোধন দ্রৌপদীকে নিজ স্থূল উরু প্রদর্শন করেছিলেন, ভীম তখনি সর্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—একদিন গদাঘাতে ঐ উরু তিনি ভগ্ন করবেন। তখন কিন্তু এমন কথা কারো মুখে শোনা যায়নি যে, সেটা হবে অন্যায়-যুদ্ধ। কিন্তু বাস্তবে সেটা যখন তিনি করলেন তা নাকি কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুনের ইঙ্গিতে। এবং তখন ত্রিলোকের অধিবাসী 'ছিঃ ছিঃ' করতে লাগল। ভীমকে নয়, কৃষ্ণকে! এবং দুর্যোধনের ওপর স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল!! কি কারণে? তার সারাজীবনব্যাপী অসৎকর্মগুলির জন্য? তারপর বলরাম, যাঁর বরাবর দুর্যোধনের ওপর পক্ষপাতিত্ব (কে জানে কেন?), ক্রুদ্ধ হয়ে ভীমকেই বধ করতে চাইলেন। কৃষ্ণ কর্তৃক বাধা পেয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি স্থানত্যাগ করলেন।

একাহিনী যে সর্বৈব মিথ্যা, তার প্রমাণ পর্বসংগ্রহ অধ্যায়ে এসম্বন্ধে শুধু একটি বাক্য বলা হয়েছে, যার মধ্যে অন্যায় যুদ্ধের নামগন্ধ নেই। বাক্যটি হলো—"যুদ্ধে বৃকোদর ভয়ানক গদাঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করলেন।"[৬] আর অনুক্রমণিকাপর্বে ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ করতে করতে বলেছেন : "যখন শুনিলাম দুর্যোধন গদাযুদ্ধে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছিল, ইত্যবসরে ভীমসেন অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাহাকে সমরশায়ী করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই।" অর্থাৎ স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্রও বলতে পারেননি যে, অন্যায় যুদ্ধে দুর্যোধনকে মারা হয়েছে। অন্যায় যুদ্ধে মারার কথা যে মিথ্যা, এর চেয়ে আর বড় প্রমাণ তার কি হতে পারে?

যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণটি মনোযোগ সহকারে পড়লেও বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজশেখর বসুর অনুবাদ অনুসারে—"সহসা দুর্যোধনকে নিকটে পেয়ে ভীম মহাবেগে তাঁর গদানিক্ষেপ করলেন, দুর্যোধন সত্বর সরে গিয়ে ভীমকে প্রহার করলেন। ভীম রুধিরাক্ত দেহে কিছুক্ষণ মূর্ছিতের ন্যায় রইলেন, তারপর আবার দুর্যোধনের প্রতি ধাবিত হলেন। ভীমের প্রহার ব্যর্থ করবার ইচ্ছায় দুর্যোধন লাফিয়ে উঠলেন, সেই অবসরে ভীম সিংহের ন্যায় গর্জন করে গদাঘাতে দুর্যোধনের দুই উরু ভগ্ন করলেন।"[৬] ভীম যা করলেন তা আত্মরক্ষায়, না হলে তো তাঁরই মস্তক চূর্ণ হতো। তারপরই ভূপতিত শত্রুকে ভর্ৎসনা করে ভীম বললেন : "আমাদের শঠতা, দ্যূতক্রীড়া বা বঞ্চনা নেই, আমরা আগুন লাগাই না, নিজের বাহুবলেই শত্রুবধ করি।"[৭] ভীমের কথাগুলি লক্ষণীয়, নিজেই অধর্ম করলে সেই মুহূর্তেই এইসকল কথা কি ভীম বলতে পারতেন?

দুর্যোধন তখন কৃষ্ণকেই কুরুক্ষেত্রের ধ্বংসযজ্ঞের জন্য দায়ী করলেন এবং তাঁকে 'কংসদাস' ইত্যাদি ভাষায় অভিহিত করে গালিবর্ষণ করলেন। কৃষ্ণের তেজঃপূর্ণ উত্তর লক্ষণীয়। এখানে কালীপ্রসন্ন সিংহের আক্ষরিক অনুবাদ অনুসরণীয়। কৃষ্ণ বলছেন : "হে গান্ধারীনন্দন, তুমি অসৎপথ অবলম্বনপূর্বক ভ্রাতা, পুত্র, বন্ধুবান্ধব ও অনুচরবর্গের সহিত নিহত হইলে। তোমার পাপেই মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও তোমার ন্যায় অসৎচরিত্র সূতপুত্র নিহত হইয়াছেন। পূর্বে আমি তোমার নিকট বারবার প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি দুরাত্মা শকুনির পরামর্শে লোভপ্রভাবে পাণ্ডবগণকে পৈতৃক রাজ্যের অংশপ্রদান কর নাই। তুমি ভীমসেনকে বিষান্ন ভক্ষণ করাইয়াছিলে এবং আর্যা কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণকে বধ করিবার নিমিত্ত জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিলে। রে দুরাত্মনে। তুমি যৎকালে সভামধ্যে দ্রৌপদীকে বিবিধ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলে, সেইকালে তোমার বধসাধন করা কর্তব্য ছিল। তুমি শঠতাচরণপূর্বক দ্যূতনিপুণ শকুনির প্রভাবে অক্ষক্রীড়ায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ ধর্মরাজকে পরাজিত করিয়াছিলে।... এবং তোমার দোষেই বহুসংখ্যক রথী একত্র হইয়া একমাত্র বালক অভিমন্যুর বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—এইসকল কারণে তুমি নিহত হইলে। হে নির্লজ্জ! তুমি আমাদিগের উপর যে কুকর্ম আরোপিত করিতেছ স্বয়ং সেইসকল কুকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ।... প্রবল লোভে ও ভোগতৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া বিস্তর অকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ। এখন তাহারই পরিণত ফলভোগ কর।"[৮] এখানেও কৃষ্ণের দৃপ্ত উত্তরে কোন অধর্ম আচরণকারীর অন্তর্গ্লানির কোন প্রকাশ নেই, দৃঢ়ভাবে অপরাধীর দিকে তিনি অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন।

---

৫ মহাভারত, ভূমিকা ৬ ঐ, পৃঃ ৫৩০ ৭ ঐ

৮ মহাভারত—কালীপ্রসন্ন সিংহ, শল্যপর্ব, পৃঃ ৯০৩

কিন্তু এর পরেই সুস্পষ্ট প্রক্ষিপ্ত অংশ ঢোকানো হয়েছে কৃষ্ণদ্বেষীদের দ্বারা। সেখানে কৃষ্ণের মুখে বিপরীত কথা বসানো হয়েছে। তিনি বলছেন যে, তিনিই মায়াবলে কূট উপায়ে ভীষ্ম-দ্রোণ প্রমুখকে বধ করিয়েছেন। কারণ এদের ধর্মযুদ্ধে জয় করা যেত না। 'মায়াবলে' অর্থাৎ অপ্রাকৃত শক্তি প্রয়োগে। এরূপ অপ্রাকৃত সবকিছুই বর্জনীয়। এখানেই বলা হয়েছে ঃ "দুর্যোধনের উপর আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হলো, অপ্সরা ও গন্ধর্বগণ গীতবাদ্য করতে লাগল।... দুর্যোধনের এইপ্রকার সম্মান দেখে কৃষ্ণ ও পাণ্ডব প্রভৃতি লজ্জিত হলেন।" আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হওয়া যে কতদূর সত্য ঘটনা সে তো সকলেই জানেন, আর এর সঙ্গে এই মিথ্যা ঘটনা সুকৌশলে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন ঃ "যিনি মহাভারতের সর্ব পাপাত্মার অধম পাপাত্মা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহার এরূপ অদ্ভুত সম্মান ও সাধুবাদ, আর যাঁহারা সকল ধর্মাত্মার শ্রেষ্ঠ ধর্মাত্মা বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহাদের এই অধর্মাচরণের জন্য লজ্জা, মহাভারতে আশ্চর্য! ইহা সমস্ত মহাভারতের বিরোধী।... কেননা, মহাভারতের উদ্দেশ্যই দুর্যোধনের অধর্ম ও কৃষ্ণ-পাণ্ডবদের ধর্মকীর্তন।"[৯]

রাজশেখর বসুর অনুবাদ একটু অন্যরকম, কিন্তু তাঁর অনুবাদের মধ্য দিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে এসেছে, সেজন্য সেটিও এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। দুর্যোধনের গালিগালাজের উত্তরে কৃষ্ণের দৃপ্ত উত্তর ঃ "গান্ধারীর পুত্র, তুমি পাপের পথে গিয়েই আত্মীয়-বান্ধবসহ হত হয়েছ। ভীষ্ম পাণ্ডবদের অনিষ্টকামনায় যুদ্ধ করছিলেন, সেজন্যই শিখণ্ডী কর্তৃক নিহত হয়েছেন। দ্রোণ স্বধর্ম ত্যাগ করে তোমার প্রীতির জন্য যুদ্ধ করছিলেন, তাই ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁকে বধ করেছেন। বহু ছিদ্র পেয়েও অর্জুন কর্ণকে মারেননি, বীরোচিত উপায়েই তাঁকে মেরেছেন। অর্জুন নিন্দিত কার্য করেন না, তাঁর দয়াতেই তুমি এবং ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-অশ্বত্থামা প্রভৃতি বিরাটনগরে নিহত হওনি। তুমি আমাদের যেসব অকার্যের কথা বলেছ তা তোমার অপরাধের জন্যই আমরা করেছি। লোভের বশে এবং অতিরিক্ত শক্তিলাভের বাসনায় তুমি যেসব দুষ্কর্ম করেছ এখন তারই ফলভোগ কর।"[১০] এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, ভীষ্ম অর্জুনের হাতে নয়, নিহত হয়েছেন শিখণ্ডীর হাতে, দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে এবং কর্ণকে অর্জুন কোন অন্যায় যুদ্ধে নিহত করেননি। এই তথ্যগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেনি রাজশেখর বসুর অনুবাদের এই কথাকয়টি—"তুমি আমাদের যেসব অকাজের কথা বলেছ তা তোমার অপরাধের জন্য করেছি।" আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, এগুলি কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে অন্যরকম—"তুমি আমাদিগের উপর যে কুকর্ম আরোপিত করিতেছ স্বয়ং সেই কুকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ।" সমস্ত বিবৃতিটির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেছে কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদই, সেজন্য মনে হয় এটিই যথার্থ অনুবাদ।

দুর্যোধন বধের পর শল্যপর্বের ১৩তম অধ্যায়ে অন্যায় যুদ্ধের অভিযোগ তুললেন বলরাম। এটি পুরো প্রক্ষিপ্ত মনে হয়। নারীর জঘন্য অমর্যাদাকারী এবং বহুবিধ দুষ্কর্মের অনুষ্ঠাতা এই মহাপাপিষ্ঠের সমর্থনেও কথা বলা যায়? আমাদের বিস্ময় জাগে যখন দেখি এই মহাপাপিষ্ঠকে সমর্থন করছেন বস্তুবাদী ঐতিহাসিকেরা—যাঁরা আজকে নারীমুক্তির অত্যন্ত সরব প্রচারক! এঁদের রচিত গ্রন্থাদিতে প্রচুর কৃষ্ণনিন্দা আছে, কিন্তু দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার উল্লেখমাত্র নেই!!! আমাদের প্রশ্ন—ঐরকম জঘন্য নারী-অমর্যাদার যে নায়ক, তার কোন্ শাস্তি পাওয়া উচিত? আশ্চর্যের বিষয়—সম্প্রতি একজন বর্ষিয়সী সাহিত্যিক দুর্যোধনকে ধর্মপক্ষ বলেছেন![১১] আমাদের বিবেচনায় 'মহাভারতের মহারণ্যে' তিনি পথ হারিয়েছেন, নতুবা নারী হয়ে দ্রৌপদীর ঐরকম লাঞ্ছনাকারীকে তিনি 'ধর্মপক্ষ' বলেন কি করে?

বস্তুবাদীদের বিচারে[১২] যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের ছত্রিশ বছর নাকি কেবল অশান্তি, মৃত্যু, বিশৃঙ্খলা। অর্থাৎ কৃষ্ণের সহায়তায় ধর্মরাজ্য কোথায় স্থাপিত হলো? প্রমাণ কি না ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, গান্ধারী, কুন্তী প্রমুখের বনগমন এবং কয়েক বছর পর দাবানলে মৃত্যু! বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে গৃহত্যাগ করে বনবাসে ঈশ্বরচিন্তা করবেন বৃদ্ধেরা—সেকালে তো এটাই নিয়ম ছিল। ইতিপূর্বে ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখের পিতামহী সত্যবতী বধূ অম্বিকা ও অম্বালিকাকে নিয়ে বাণপ্রস্থে যান। এটাই ভরতবংশের ঐতিহ্য। আর দাবানলে মৃত্যু তো দুর্ঘটনা। এও আবার অশান্তি, মৃত্যু এবং বিশৃঙ্খলার প্রমাণ! এ হলো তথাকথিত যুক্তিনিষ্ঠ বস্তুবাদীদের সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখা সাক্ষ্যপ্রমাণ! এই সমালোচকদের উদ্দেশ্য অজ্ঞ লোকদের যেনতেনপ্রকারেণ বিশ্বাস করানো যে, কৃষ্ণের সহায়তায় কোন ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়নি এবং সেজন্য এঁরা ভুল তথ্য ও বিকৃত তথ্য পরিবেশন করতেও তৎপর।

দৃষ্টান্ত—পাণ্ডবেরা নাকি ধৃতরাষ্ট্রদের সঙ্গে কুন্তীও বনগমন করতে চাইলে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করতে প্রয়াস

---

৯ কৃষ্ণচরিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭২
১০ মহাভারত—রাজশেখর বসু, পৃঃ ৫৩৩
১১ মহাভারতের মহারণ্যে—প্রতিভা বসু
১২ সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভাগবদ্গীতা—জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাননি। এটি সম্পূর্ণ ভুল তথ্য। কারণ আশ্রমবাসিক পর্বের তৃতীয় অধ্যায়ে আছে যে, যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকেও প্রতিনিবৃত্ত করতে প্রয়াস করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি কুন্তীকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস করলেন, কিন্তু সফল হলেন না।

শান্তিপর্বে যখন যুধিষ্ঠির শোভাযাত্রা করে চলেছেন সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য, দুর্যোধন-মিত্র জনৈক চার্বাক-পন্থী (মহাভারতে 'চার্বাক রাক্ষস' বলে অভিহিত করা হয়েছে) তাঁকে কটুবাক্য বলে। তখন উপস্থিত ব্রাহ্মণেরা তাকে হত্যা করে। সেখানে কৃষ্ণের মুখে এই অবিশ্বাস্য কাহিনী বসানো হয়েছে যে, পুরাকালে চার্বাককে ব্রহ্মা বলেছিলেন—ব্রাহ্মণকে কখনো অপমান করো না, তাহলে ধ্বংস হবে। এই কাহিনী অবিশ্বাস্য। কারণ, কৃষ্ণ কখনো ব্রাহ্মণপক্ষীয় ছিলেন না। তাছাড়া চার্বাক এখানে ব্রাহ্মণদের তো অপমান করেননি, করেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে। এই সুস্পষ্ট প্রক্ষিপ্ত অংশটিকে অবলম্বন করে জনৈক সমালোচক[১৩] সিদ্ধান্ত দিয়েছেন চার্বাকপন্থী নাস্তিকতা নাশ করে, রাজাদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে, ব্রাহ্মণদের ভূতলস্থ দেবতা ঘোষণা করে কৃষ্ণের ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা হলো!! তা শুধু নয়, ব্রাহ্মণদের দ্বারা শূদ্রদের দমনপীড়নে ধর্মীয় সমর্থনের জন্যই রামায়ণ-মহাভারতের অবতার-কাহিনী, মনুস্মৃতি প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র এবং ভাগবদ্গীতার প্রয়োজন হয়েছিল। উপরি উক্ত চার্বাক-কাহিনী থেকে এত সব সিদ্ধান্ত কি করে পাওয়া গেল? যুক্তিশাস্ত্রের কোন্ রীতি অনুসারে? এরই নাম সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 'বিচার'! এ যদি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচার হয়, তাহলে বিজ্ঞানের 'বিচার' সত্য থেকে বহু দূর। কৃষ্ণকে ব্রাহ্মণপক্ষীয় বলা সম্পূর্ণ ইতিহাসবিরুদ্ধ। তখনকার সমাজবিপ্লবে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধপক্ষীয় জনগণের পক্ষীয়, জরাসন্ধ প্রমুখ ছিলেন ব্রাহ্মণপক্ষীয়—এ আমরা পূর্বেই দেখেছি। উপরি উক্ত চার্বাক-কাহিনী থেকে একটিই বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়, সেটি হলো—দুর্যোধন বস্তুবাদী চার্বাকপন্থী ছিলেন, সেজন্যই অধর্মপক্ষীয় হলেও তার জন্য আজকের বস্তুবাদীদের এত দরদ!

গীতায় প্রতিষ্ঠিত সামাজিক আদর্শ

প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্গীতা পাঠ করলে (বিশেষ করে ষোড়শ অধ্যায়) আমরা দেখি যে, সব মানুষকে দিব্যকর্মের আদর্শ দেখিয়ে দিব্যজীবনের অধিকারী করাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধর্মসংস্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আচার্য শঙ্কর অবশ্য তাঁর ভাষ্যে বলেছেন যে, বর্ণাশ্রম-লক্ষণযুক্ত ধর্মের রক্ষার জন্য বিষ্ণু দেবকীপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এখন শঙ্করকে কেন এরূপ ব্যাখ্যা দিতে হয়েছিল, সেবিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের অভিমত স্মর্তব্য। বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের ফলে ধর্মের মহতী বিনষ্টির সম্ভাবনার কালে সদাচার ও সত্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে এরূপ ব্যাখ্যা দিতে হয়েছিল, না হলে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ঃ "যাহা চারিদিক হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তাহা জুড়িয়া তুলিবার কোন উপায় ছিল না।" কিন্তু তৎসত্ত্বেও রামানুজ এ-ব্যাখ্যা গ্রহণ করেননি, তাঁর ধর্মে পারিয়াকেও স্থান দেওয়া হয়েছে। এবং এরই সমর্থন ভগবদ্গীতায় (নবম অধ্যায়, ৩২) আছে, যেখানে বলা হয়েছে—ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেই আমার শরণ নিলে মুক্ত হয়। মোটের ওপর গীতায় যে সার্বভৌম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত, তার লক্ষ্য হলো জ্ঞানে সকলকে সর্বভূতে সমদর্শী হতে হবে, প্রেমে সর্বভূতে প্রীতিমান হতে হবে, কর্মে সর্বভূত হিতসাধনে ব্রতী হতে হবে। বস্তুত, গীতায় সাম্যদৃষ্টি ও সর্বভূতহিতসাধনার্থে নিষ্কাম কর্মব্রতের ওপর প্রতিষ্ঠিত অত্যাচার ও শোষণবর্জিত এক আদর্শ মানবসমাজের পরিকল্পনাই পাওয়া যায়। সেদিক দিয়ে গীতা সত্যিই সমাজতত্ত্বের শেষকথা। সুতরাং এবিষয়ে বস্তুবাদীরা যা বলছেন তার বিন্দুবিসর্গও সঠিক নয়। ❑

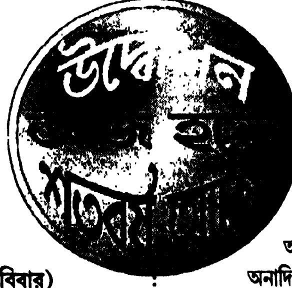
১৩ সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা—জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই বিশেষ রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

বিজ্ঞপ্তি ঃ শারদীয়া সংখ্যা ২০০২

শারদীয়া সংখ্যাটি যাঁরা হাতে হাতে নেবেন বলে জানিয়েছেন, তাঁরা ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর ২০০২-এর মধ্যে অবশ্যই সংগ্রহ করুন।

ভাদ্র ১৩০৯
আগস্ট ১৯০২



সারদানন্দ স্বামীর বক্তৃতার সারাংশ

(রামকৃষ্ণ মিশন, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮, রবিবার)

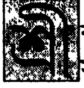
পূর্ব্বে যে সকল বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে, আজ তাহার সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করিব।... প্রথমে আমরা দেখিয়াছি, বেদ কাহাকে বলে। বেদ অর্থে জ্ঞান; ভগবানের অনন্ত জ্ঞান, যাহা তাঁহার সহিত অনন্তকাল অবস্থিত রহিয়াছে। এইজন্য আমাদের শাস্ত্রে বলে, বেদ অনাদি।... এই অনাদিজ্ঞান কখন কোন ভাগ্যবানের নিকট আবির্ভূত হন। যাঁহারা এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহাদিগকে ঋষি বলে। ঋষি অর্থে মন্ত্রদ্রষ্টা। এই জ্ঞান কেবল যে এক জাতীয় লোকের নিকটেই আবির্ভূত হন, তাহা নহে। বেদে অনেক স্ত্রীলোক ঋষি বলিয়া কথিত হইয়াছেন।... এই জ্ঞান সকলেরই নিকট জাতি ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে উপস্থিত হইতে পারে। পূর্ব্বে বৈদিক কালে ব্রাহ্মণত্ব জাতিগত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইহা গুণগত ছিল। বেদের অনেক স্থলে দেখা যায় যে, পূর্ব্বে একবর্ণ ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ কথা আছে যে, পূর্ব্বে কেবল ক্ষত্রিয় বর্ণ ছিল, পরে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হইল। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। বেদের প্রাচীন অংশ ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আর্য্যগণ কেবল পঞ্চনদের গুণ গান করিতেছেন এবং আপনাদের পূর্ব্ব বাসস্থান অত্যন্ত শীতল দেশ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। এই সময়ে তাঁহারা নূতন দেশে আসিয়া আদিমনিবাসীদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন এবং স্বভাবতঃ ধর্ম্ম অনুসারে সকলে, ক্ষত্রিয় বল, ব্রাহ্মণ বল, এক জাতিই ছিলেন। পরে ধর্ম্মকার্য্যে ব্যাপৃত ও অধিক জ্ঞান সম্পন্ন হওয়াতে তাঁহাদের মধ্যে কতক লোক ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। প্রথমে এই ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব কতকগুলি গুণের সমষ্টি মাত্র হওয়াই সম্ভবে [সম্ভব হবে]। অথবা স্বভাবপ্রেরিত গুণ যুদ্ধ বিগ্রহ, যজ্ঞোপাসনাদি কর্ম্মানুসারেই হওয়া সম্ভব। গুণ ও কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্বাদি চিরকালই জগতে বর্ত্তমান রহিয়াছে ও থাকিবে।... ভারতে এখনো সত্ত্বগুণবিশিষ্ট যথার্থ ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন সাত্ত্বিকভাবাপন্ন দুই চারিটী লোক দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য দেশে ইহা আরো বিরল। এইরূপ আধুনিক ইউরোপীয় জাতিরা ক্ষত্রিয়গুণসম্পন্ন। ইংরাজ জাতিতে বৈশ্য গুণের অধিক সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কোন কোন সময়ে কোন এক গুণ অধিক প্রবল দেখা যায়। বর্ত্তমান কাল বৈশ্যগুণ-প্রধান। বৈশ্যগুণহীন লোকের একালে অধোগতি প্রাপ্তি হইতেছে।... ভগবান গীতায় বলিয়াছেন, গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা আমি চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। অতএব সদ্‌গুণসম্পন্ন হইলেই বেদে অধিকার হইত ও এখনও হওয়া উচিত। আমরা দেখিয়াছি, বেদ দুইভাগে বিভক্ত। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ডে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ার দ্বারা স্বর্গাদি লাভ হওয়ার কথা কথিত আছে। স্বর্গ অর্থে পৃথিবী অপেক্ষা কোন উচ্চতর লোক; যেখানে অধিককালস্থায়ী সুখ ভোগ করিতে পারা যায়। কিন্তু এই সুখ ভোগের পর আবার মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হয়। আমাদের শাস্ত্রোক্ত দেবতাসকল ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি একটী একটী পদমাত্র। যে কেহ কর্ম্মদ্বারা উচ্চগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ইন্দ্র হইয়াছেন ও সেই পদে কিছুদিন অবস্থান করিয়া আবার তাঁহার পতন হইয়াছে। মনুষ্য মাত্রেই কর্ম্মদ্বারা এই পদলাভ করিতে পারেন। বেদের কর্ম্মকাণ্ড স্বর্গাদি লোক লাভের উপায় বলিয়া দেয়। কিন্তু ঐ সকল সুখও নিত্য নয়। সেই জন্য মনুষ্য তাহাতে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। তাহার প্রাণ নিত্যবস্তুলাভের জন্য লালায়িত। বেদের জ্ঞানকাণ্ডে সেই নিত্য পদার্থের বিষয়ই বর্ণিত আছে। আমরা দেখিয়াছি, শাস্ত্রে সৃষ্টি অনাদি বলিয়াছেন।... সৃষ্টি অনাদি হইলেও সৃষ্টির বিকাশাবস্থা অনাদি নহে। কখন প্রকাশিত কখন লুপ্তাবস্থায় বীজ ও বৃক্ষ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া সৃষ্টি অনাদিকাল হইতে প্রবাহিত রহিয়াছে।... ভগবান বলিতেছেন, জগৎ আমার এক অংশমাত্র। যদি সৃষ্টি অনাদি হইল, তবে এই বৈষম্যের কারণ কি? শাস্ত্র বলেন, এই বৈষম্যের কারণ কর্ম্ম। সুতরাং কর্ম্মও অনাদি। আমাদের সকলকেই কর্ম্ম করিতে হইতেছে। কর্ম্ম না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না। কর্ম্মের সহিত তাহার ফল নিত্যসংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। কর্ম্ম করিলে তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে; তবে মুক্তি কিরূপে সম্ভবে [সম্ভব হবে]? নিষ্কাম ভাবে নিঃস্বার্থ হইয়া কার্য্য করিলে কর্ম্মফলে লিপ্ত হইতে হয় না ও সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থতা সমগ্র বন্ধন নাশ করিয়া দেয়। ইহাকেই কর্ম্মযোগ কহে। এক কথায় বলিতে গেলে স্বার্থশূন্য হওয়াই ধর্ম্ম। কি কর্ম্মযোগী, কি ভক্তিযোগী, কি জ্ঞানযোগী, সকলেই নিঃস্বার্থ হইতে চেষ্টা করিতেছে।... সকলেই ছোট স্বার্থপর 'আমি'জ্ঞান ভূমা মহান্ আমিতে ডুবাইতে চেষ্টা করিতেছে। কেহবা সর্ব্বভূতে সেই এক আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া সেই মহান্ আমিকে সকলের ভিতর দেখিতে চেষ্টা করিতেছে। অপর কেহ আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভগবানকেই সর্ব্বত্র দেখিতে চেষ্টা করিতেছে। বুঝিয়া দেখিলে দুই পথের উদ্দেশ্যই এক, কেবল নামের ভিন্নতা মাত্র প্রতীয়মান হয়। আমরা দেখিয়াছি, কর্ম্মে কোন দোষ নাই। কর্ম্মের ভাল মন্দ গুণ আমাদের নিজের ভাব লইয়া হইয়া থাকে।... নীচকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উচ্চতর কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই ক্রমে নিঃস্বার্থ হইতে পারিব।... যে যেমন অবস্থায় অবস্থিত, সেই অবস্থায় তাহার সম্বন্ধে যাহা ঈশ্বরপথে অগ্রসর হইবার প্রতিবন্ধকতা [সৃষ্টি] করে, তাহাই তাহার সম্বন্ধে সংসার। তাহার সেই সংসার ত্যাগ করিতে হইবে।... এইরূপে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থায় উঠিতে হইবে, নিঃস্বার্থ হইতে হইবে, পরে এমন অবস্থা উপস্থিত হইবে, যখন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইয়া কার্য্য করিতে পারিবে। আমরা দেখিয়াছি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের যেরূপ কার্য্য, পর পর জন্মে সেইরূপ দেহাদি প্রাপ্তি হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসমূহ দ্বারা মনুষ্য এরূপ পিতামাতা প্রাপ্ত হয়, যাঁহারা তাহাকে ঐরূপ দোষ বা গুণযুক্ত দেহাদি প্রদান করিতে পারেন। আপাততঃ দেখিলে সন্তানে দোষ গুণ অনুক্রমিত হওয়ার কারণ পিতামাতাই বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক সন্তানের কর্ম্মই ঐরূপ পিতামাতা অন্বেষণ করিয়া লয়।... এই দৃষ্ট স্থূল ব্রহ্মাণ্ড এক বিরাট দেহ। আমাদের এই সকল ক্ষুদ্র দেহ সেই বিরাটেরই অংশ মাত্র। সেইরূপ আমাদের মনসমূহও সেই বিরাট মনের অংশ মাত্র।... দেহ ও মন একই রূপ দেখিতে থাকিলেও সেই বিরাট দেহ ও মন হইতে তাহাদের উপাদান আমরা অবিরত গ্রহণ করিতেছি। ভগবানের অনন্ত শক্তি সকলেরই অন্তরে নিহিত রহিয়াছে। তাঁহা হইতেই আমরা নিজ নিজ শক্তি গ্রহণ ও বিকাশ করিতেছি। এই শক্তির অপব্যয় না করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিলেই জীবনের মহান্ লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিব।

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : স্বামী সর্বগানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ— এক অভিনব সন্ন্যাসী সঙ্ঘ

স্বামী ঋতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]



শ্রীরামকৃষ্ণের অভিন্ন-সত্তা হিসাবে গৃহীত শ্রীমা সারদাদেবীকে সঙ্ঘজননীরূপে পূজা করা জগতের ধর্ম-ইতিহাসে অভিনবত্বের নিদর্শন। এবিষয়ে উত্তরাখণ্ডের সাধুসমাজে কিরকম আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল তার সামান্য উল্লেখ করা যেতে পারে। কনখল সেবাশ্রমের ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের পট মহাপুরুষ মহারাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এপ্রসঙ্গে কল্যাণ মহারাজ বলেছিলেনঃ "এখানে সন্ন্যাসীর আশ্রমে ঠাকুরঘরে পূজার আসনে মেয়েমানুষের ছবি রাখতে আপত্তি তুলে তখনকার অনেক বহিরাগত সাধুকর্মীরা মায়ের পট আসন হতে উঠিয়ে দেয়। পরে তা দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা হয়। মহাপুরুষজী তখন কাশীতে ছিলেন। তিনি এই গণ্ডগোলের সংবাদ পেয়ে কনখলে চলে আসেন এবং ঠাকুরঘরে গিয়ে প্রণামান্তে দেওয়াল হতে পট নামিয়ে আসনে যথাস্থানে পূর্ববৎ রাখেন। তারপর আর কেউ এবিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করতে সাহস করেনি।"[১৪]

শ্রীমা সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বোদ্ধা, বিশ্লেষক এবং ব্যবহারক। তিনিই সম্যক বুঝেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনের নিগূঢ় তাৎপর্য। তাঁর সেই প্রার্থনা—"ওরা সব তোমাকে, আর তোমার ভাব উপদেশ নিয়ে একত্র থাকবে। আর এই সংসার-তাপদগ্ধ লোকেরা, তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে। এইজন্যই তো তোমার আসা।"[১৫] এই ছোট অথচ অব্যর্থ প্রার্থনাটির মধ্যে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আদর্শ অর্থাৎ আত্মমুক্তি ও জগদ্ধিত—দুটিই স্পষ্টভাবে বিধৃত। মা ভাবে দেখেছেন, কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবগঙ্গা প্রবাহিত হলো শ্রীরামকৃষ্ণের চরণদ্বয় থেকে এবং বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে গঙ্গার ঘাটে দেখেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবগঙ্গার ভগীরথ হলেন নরেন।

দ্বিতীয়বার দার্জিলিং যাওয়ার আগে স্বামীজী কলকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের চরণবন্দনা করেছিলেন। কিছু কথাবার্তা হওয়ার পর আবেগভরে তিনি বলতে থাকেনঃ "মা, আমি তাঁর বাণী প্রচার করতে চাই, আর সেজন্য যত শীঘ্র সম্ভব একটি সঙ্ঘ স্থাপন করতে চাই। কিন্তু যত দ্রুত তা করতে চাইছি, ততটা দ্রুত পারছি না বলে কষ্ট পাচ্ছি।" এবার শ্রীমা স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলেনঃ "স্থির জেনো, ঠাকুর শীঘ্রই তোমার ইচ্ছা পূরণ করবেন। দেখবে অল্পদিনের মধ্যে তোমার ভাব কার্যকরী হচ্ছে।"[১৬]

ত্যাগী সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রীশ্রীমা একবার এই বলে চিরদিনের জন্য আশ্বস্ত করেছিলেনঃ "তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব।" সত্যিই তিনি তাই করেছেন। সেসব দুর্দিনের কথা স্মরণ করে স্বামীজী বলেছিলেন, সেসময়ে একজন ছাড়া তাদের কেউই সহানুভূতি জানায়নি। সেই একজন হলেন—'নিখিল-মাতৃ-হৃদয়-সাগর-মন্থন-সুধা-মুরতি' শ্রীমা সারদাদেবী।

শ্রীশ্রীমা নিজমুখে বলেছেনঃ "আহা, এর জন্যে ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। তবে তো তাঁর কৃপায় আজ মঠ-টঠ যাকিছু।"[১৭] "বোধগয়ায় মঠ, তাদের অত সব জিনিসপত্র, কোন অর্থের অভাব নেই, কষ্ট নেই—দেখে কাঁদতুম, আর ঠাকুরকে বলতুম, 'ঠাকুর, আমার ছেলেরা থাকতে পায় না, খেতে পায় না, দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের যদি অমন একটি থাকবার জায়গা হতো।' তা ঠাকুরের ইচ্ছায় মঠটি হলো।"[১৮]

শ্রীশ্রীমায়ের নিত্যসঙ্গী যোগীন-মা যথার্থই বলেছিলেনঃ "যাকিছু দেখছ (মঠ আশ্রমাদি) সব ওঁরই (মায়ের) কৃপায়! যেখানে যা দেখেছেন—শিলটি নোড়াটি (দেববিগ্রহ) কেঁদে কেঁদে বলেছেন, 'ঠাকুর! আমার ছেলেদের একটু মাথা রাখবার জায়গা কর, দুটি খাবার সংস্থান কর।' "[১৯]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ স্থাপনে শ্রীশ্রীমায়ের ভূমিকা বা অবদান প্রসঙ্গে কোন মূল্যায়নই যথেষ্ট হবে না বলে আমাদের বিশ্বাস। শুধু একথাটুকু আমাদের হৃদয়ে জাগরুক রাখতে পারি যে, এই সঙ্ঘস্থাপনে বিশ্বমাতৃত্বের প্রতিমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ-অভিন্ন শ্রীমা সারদাদেবী আকুল প্রার্থনা করে কেঁদেছিলেন। সে-প্রার্থনা এবং কান্নার শক্তি দুর্বার, অপ্রতিরোধ্য। শুধু মনে হয়, তাঁর সেই অশ্রুধারা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বীজকে মাতৃস্নেহের রসধারায় সিঞ্চিত করে শুধুমাত্র অঙ্কুরিত নয়, বরং রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যরূপ বিশাল মহীরুহে পরিণত করছে।

এতদিন আত্মমুক্তিই সন্ন্যাসীর একমাত্র লক্ষ্য বলে জানা ছিল। আত্মমুক্তির জন্য জগৎসংসার থেকে সমস্ত

১৪ শিবানন্দ-স্মৃতিসংগ্রহ, ১ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ১৩৩
১৫ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃঃ ২৫৮
১৬ শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে, ১ম ভাগ, পৃঃ ২০৪
১৭ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ২৫৮
১৮ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১১শ সং, পৃঃ ১৯০
১৯ শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা—স্বামী সারদেশানন্দ, পৃঃ ২০

সম্পর্ক ছিন্ন করে নিঃসঙ্গ ভগবদ্‌নির্ভর জীবন ছিল সন্ন্যাসীর আকাঙ্ক্ষিত। স্বামী বিবেকানন্দ ভারত পরিক্রমা করে অনুভব করলেন—ভারত আবার উঠবে। ভবিষ্যৎ ভারত অতীতের সমস্ত গৌরবকে ছাড়িয়ে যাবে। শিকাগোয় হিন্দুধর্মের বিজয়কেতন উড়িয়েও তিনি স্থির থাকতে পারেননি। ভারতবর্ষের সর্বপ্রকার উন্নতির জন্য তাঁর অন্তরে সে কী তীব্র ইচ্ছা! ধমনীতে ক্ষত্রিয় রক্ত, হৃদয়ে অসীম সাহস আর কর্মে তীব্র স্পৃহা—এ যেন একেবারে অন্য নরেন্দ্রনাথ।

মঠ তখন আলমবাজারে। নতুন নতুন ভাবনা, অভিনব সব চিন্তাসমন্বিত একটির পর একটি চিঠি আসছে গুরুভাইদের কাছে। যেন এক-একটি কামানের গোলা! গুরুভাইরা সচকিত হয়ে পড়ছেন—"এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysical (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—গুরুদেব বলতেন না?... কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে... আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে কিনা।"[২০] "সমাজকে, জগৎকে electrify (বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন) করতে হবে।"[২১] "গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নয়, মহাকার্যের নিশান—কায়মনোবাক্যে 'জগদ্ধিতায়' দিতে হইবে।"[২২] "যে আপনি নরক পর্যন্ত গিয়ে জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র—ইতরে কৃপণাঃ। এই test, যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে আপনার ভাল চায় না, 'প্রাণাত্যয়েঽপি পরকল্যাণচিকীর্ষবঃ' (প্রাণ দিয়েও পরের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী) তারা।... তাঁর চরিত্র, তাঁর শিক্ষা, ধর্ম চারিদিকে ছড়াও—এই সাধন, এই ভজন; এই সাধন, এই সিদ্ধি।... Organisation (সঙ্ঘ) শব্দের অর্থ division of labour (শ্রমবিভাজন)—প্রত্যেকে আপনার আপনার কাজ করে এবং সকল কাজ মিলে একটা সুন্দর ভাব হয়।"[২৩] "আমাদের সব শক্তি সংহত করতে হবে—একটা সম্প্রদায় গড়বার জন্য নয়, আধ্যাত্মিক ব্যাপারের জন্যও নয়, কিন্তু বৈষয়িক দিকটার জন্য।"[২৪] "সব ত্যাগ করেছ, এখন শান্তির ইচ্ছা, মুক্তির ইচ্ছাটাকেও ত্যাগ করে দাও তো বাবা। কোন চিন্তা রেখো না; নরক-স্বর্গ ভক্তি বা মুক্তি সব don't care।... আপনার ভাল কেবল পরের ভালয় হয়, আপনার মুক্তি এবং ভক্তিও পরের মুক্তি ও ভক্তিতে হয়—তাইতে লেগে যাও, মেতে যাও, উন্মাদ হয়ে যাও। ঠাকুর যেমন তোমাদের ভালবাসতেন, আমি যেমন তোমাদের ভালবাসি, তোমরা তেমনি জগৎকে ভালবাস দেখি।... আমরা সন্ন্যাসী। ভক্তি, ভুক্তি, মুক্তি—সব ত্যাগ। জগতের কল্যাণ করা, আচণ্ডালের কল্যাণ করা—এই আমাদের ব্রত, তাতে মুক্তি আসে বা নরক আসে।"[২৫]

স্থির হয়ে যায় নবীন সন্ন্যাসী সঙ্ঘের আদর্শ—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—আত্মমুক্তি ও জগদ্ধিত। স্বামীজীই প্রথম সন্ন্যাসী, যিনি পাশ্চাত্যের জড় সভ্যতার সমৃদ্ধি, দরিদ্রের প্রতি তাদের সহানুভূতি, নারীদের স্বাধীনতা, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা এবং ব্যবসায়িক ঐক্য দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং তৃপ্তিবোধ করেছেন। স্বামীজীর বিশ্বাস, সঙ্ঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না এবং উদ্দেশ্যের একতা ঐক্যবন্ধনের প্রধান কারণ। আমেরিকায় সবচেয়ে বড় যে-প্রলোভনে স্বামীজী পড়েছিলেন, রসিকতা করে বলেছিলেন সে হলো সঙ্ঘ।[২৬] তিনি লক্ষ্য করেছেন, ভারতবর্ষের হাজার হাজার ভবঘুরে সন্ন্যাসী আত্মমুক্তির অছিলায় ঘোরতর স্বার্থপর এবং সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে। চিত্তশুদ্ধি আত্মজ্ঞানের পূর্বশর্ত। আমিত্ব—চূড়ান্ত স্বার্থপরতা ও বন্ধন। জগৎকল্যাণের জন্য সেটির বিসর্জন সন্ন্যাসীর আত্মমুক্তির দ্বার উদ্ঘাটন করে দেবে। কিন্তু স্বামীজীর মতে জগদ্ধিত সন্ন্যাসীর একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, অন্যতম উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য দুটিই—আত্মমুক্তি ও জগতের হিতসাধন। তবে আত্মমুক্তির সাধন হিসাবে জগৎকল্যাণের প্রচেষ্টাকে নতুন পথ ও অভিনব সাধন বলে তিনি নির্দেশ করলেন মধ্যম অধিকারীদের জন্য। উত্তম অধিকারীদের জন্য স্বামীজী আরো এগিয়ে গিয়েছেন, যেখানে ভক্তি-মুক্তির ইচ্ছা সব ত্যাগ। সমগ্র জীবনটি জগৎকল্যাণের যূপকাষ্ঠে নিঃশেষে নিঃশর্তে নিবেদিত। এটিই সন্ন্যাসের মহান আদর্শ।

স্বামীজীর প্রেরিত পত্রগুলি তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করল গুরুভাইদের মনে। তাঁরা কখনো শিহরিত, কখনো উত্তেজিত, আবার কখনো সংশয়াচ্ছন্ন। বিপরীত ভাবনারও প্রকাশ কারো কারো মধ্যে দেখা দিল। ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বামীজীকে একটি চিঠি লেখেন। স্বামীজীর সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে গিরিশচন্দ্র মঠের গুরুভাইদের একজনকে লিখে জানালেন ঃ "নরেন্দ্রনাথের মধ্যে ভাবের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ঠাকুরের নরেন্দ্র নির্ভেজাল ছিলেন এবং রয়েছেন।"[২৭]

---

২০ 'বাণী ও রচনা', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩২৩
২১ ঐ, পৃঃ ৩৫৭
২২ পত্রাবলী, পৃঃ ২৪২
২৩ 'বাণী ও রচনা', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৭-৩৫৮
২৪ পত্রাবলী, পৃঃ ২২৬
২৫ ঐ, পৃঃ ২৬০
২৬ Reminiscences of Vivekananda, p. 138
২৭ রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা—স্বামী প্রভানন্দ, ১ম প্রকাশ, পৃঃ ৭৫

স্বামী বিবেকানন্দ ফিরে এলেন আলমবাজার মঠে। ছোট আকারে মঠের নিয়মাবলী তৈরি করলেন। শুরুতেই উল্লেখ করলেন ঃ "শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করে নিজের মুক্তিসাধন করা ও জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণসাধনে শিক্ষিত হওয়ার জন্য এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হলো।" নির্দ্বিধায় সন্ন্যাসে নবীনতম আদর্শকে অপর একটি নিয়মে গ্রথিত করে বললেন ঃ "নিজের মুক্তিসাধনের জন্য মাত্র যিনি চেষ্টা করেন, তদপেক্ষা যিনি অপরের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন তিনি মহত্তর কার্য করেন।"*

স্বামী বিবেকানন্দ লক্ষ্য করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মতো সর্বযোগে সুসমন্বিত চরিত্র জগতে এর আগে আর আসেনি। সেজন্য জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের সুষম সমবায়ে সর্বাঙ্গসুন্দর চরিত্রগঠনই এযুগের উদ্দেশ্য ও তার জন্যই সকলের প্রাণপণ চেষ্টা করা কর্তব্য। চারযোগের সমন্বয়ে যার চরিত্র গঠিত হয়নি, তার জীবন "শ্রীরামকৃষ্ণ-মুষায় দ্রুত হয়নি।" একপেশে চরিত্রের প্রতিষেধ হিসাবে আধুনিক জগতে এরকম সুসমন্বিত জীবন আদর্শ বলে সর্বজনস্বীকৃত। 'প্রবল আদর্শবাদের সঙ্গে প্রবল কার্যকারিতা'—সন্ন্যাসীদের এই নবাদর্শ স্বামীজী ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুন সন্ধ্যায় বেলুড় মঠে তরুণ সন্ন্যাসী ও শিষ্যদের স্মরণ করিয়েছিলেন।[২৮] স্বামীজী কোন কোন গুরুভাই ও শিষ্যদের মধ্যে একটি যোগ বা ভাবের প্রাধান্যকে স্বীকার করেছেন বা প্রশ্রয় দিয়েছেন সত্য, কারণ তিনি জানতেন, ব্যক্তিগতভাবে কারো কোনভাবে ন্যূনতা থাকলেও সঙ্ঘে সমষ্টিগতভাবে পূর্ণতা পাওয়া সম্ভব। তাঁর ভাষায়—"আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে হয়তো একজনও সেই পূর্ণতা লাভ করতে পারবে না; তবু আমরা পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান, ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যবিধান এবং পরস্পরের অভাব পরিপূর্ণ করার মাধ্যমে সমষ্টিগতভাবে ঐ পূর্ণতা পেতে পারি। এতে প্রত্যেকের জীবনেই সমন্বয়ভাবের প্রকাশ হলো না বটে, কিন্তু কতকগুলি লোকের মধ্যে একটা সমন্বয় হলো, আর সেটা অন্যান্য প্রচলিত ধর্মমত হতে সুনিশ্চিত অগ্রগতি, তাতে সন্দেহ নেই।"[২৯]

স্বামীজী একসময়ে উল্লেখ করেছিলেন—বৌদ্ধধর্মের একটি বড় ত্রুটি এই যে, তার সবকিছুই সন্ন্যাসীদের জন্য, গৃহীদের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। এই ত্রুটির সংশোধনের জন্য তিনি রামকৃষ্ণ মঠের পাশাপাশি রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেন। উক্ত সংস্থার পরিচালকদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন সন্ন্যাসী, কয়েকজন গৃহী। অবশ্য পরবর্তী কালে নিজেদের কর্মে ব্যস্ত থাকার ফলে গৃহী সদস্যরা সঙ্ঘের পরিচালক হিসাবে থাকতে পারেননি এবং পরিচালনার দায়িত্ব সন্ন্যাসী সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। তবে ১৯০৯ সালে নিবন্ধভুক্ত এই রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্যদের মধ্যে যেমন সন্ন্যাসীরা আছেন, তেমনি আছেন গৃহিভক্ত এবং অনুরাগীরাও। সে-ধারা আজও বিদ্যমান। সুতরাং সন্ন্যাসী সদস্যগণ যদিও সঙ্ঘের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ, তেমনি সামগ্রিক সঙ্ঘের উপচ্ছায়ায় যাঁরা বিরাজ করছেন সেই গৃহী সদস্যরাও সঙ্ঘেরই অঙ্গ।

স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি নিজে সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসী সঙ্ঘ স্থাপনের জন্য প্রাণপাত করেছেন, তিনিই নির্মমভাবে সন্ন্যাস আশ্রমের সবচেয়ে বড় ত্রুটির উল্লেখ করে সেই ত্রুটি থেকে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে সাবধান করেছেন। ঐতিহাসিক প্রজ্ঞাবলে তিনি দেখেছিলেন, বৌদ্ধধর্ম নির্বিচারে সন্ন্যাস-গ্রহণকে আদর্শ করেছিল বলে বিরাট সমাজদেহ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাঁর মতে, সমাজের শ্রেষ্ঠ অংশ (cream of thc society) সন্ন্যাসাশ্রমে চলে আসে বলে সমাজ দুর্বল হয়ে যায়। এর প্রতিবিধানে তিনি নির্বিচারে সন্ন্যাসগ্রহণের বিরোধী ছিলেন এবং একইসঙ্গে সমাজের—বিশেষ করে দুর্বল শ্রেণী এবং নারীর জাগতিক শিক্ষা ও সর্বপ্রকার উন্নয়নের বিভিন্ন পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে তারা সমাজের সর্বস্তরেই নিজ নিজ অবদানকে অক্ষুণ্ণ রেখে সমাজকে দিন দিন সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাবে। এধরনের সমাজ থেকে ঠিক ঠিক সন্ন্যাসের অধিকারী কিছুসংখ্যক ত্যাগী যুবক বা যুবতী সন্ন্যাস অবলম্বন করলে শেষপর্যন্ত সন্ন্যাসাশ্রম এবং বিরাট সমাজদেহ উভয়েরই কল্যাণ হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনেও দেখি, কারো ভাব নষ্ট না করে অধিকারিভেদে তাঁরা কতজনকে ত্যাগ বা সংসারের পথে এগিয়ে দিয়েছেন।

স্বামীজী এই সন্ন্যাসী সঙ্ঘের ওপর দেবত্ব আরোপ করে বলেছিলেন ঃ "এই সঙ্ঘই তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) অঙ্গস্বরূপ এবং সঙ্ঘেই তিনি সদা বিরাজিত। একীভূত সঙ্ঘ যে-আদেশ করেন তা-ই প্রভুর আদেশ; সঙ্ঘকে যিনি পূজা করেন, তিনি প্রভুর পূজা করেন এবং সঙ্ঘকে যিনি অমান্য করেন তিনি প্রভুকে অমান্য করেন।"[৩০] এই বাণী থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রভুর সত্তা এই সঙ্ঘে সদা বিরাজিত থেকে তাকে পূর্ণতার দিকে পরিচালিত করছেন।

---

* উত্তরাখণ্ডে সাধুসমাজে একসময় রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের 'ভাঙ্গী সাধু' বলে নিন্দা ও বিদ্রূপ করা হতো। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠার একশো বছরের মধ্যেই দেখা গেল ভারতবর্ষে এমন কোন সন্ন্যাসী সম্প্রদায় নেই—যাঁরা কিছু না কিছু সেবামূলক কাজ গ্রহণ করছেন।

২৮ ভারতে বিবেকানন্দ, পৃঃ ২৮৮   ২৯ পত্রাবলী, পৃঃ ১০৮-১০৯   ৩০ মঠের নিয়মাবলী, পৃঃ ১০

সঙ্ঘ ও শ্রীরামকৃষ্ণের অভিন্নতা-নির্দেশ এবং সঙ্ঘকে জীবন্ত বলে বর্ণনা নিঃসন্দেহে অভিনব।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ শ্রীরামকৃষ্ণের জমাটবাঁধা ভাবের বহিঃপ্রকাশ। এযুগের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ভাবনা—"যত মত তত পথ"। সর্বমতসহিষ্ণুতা, সর্বধর্মসমন্বয়ের শুধুমাত্র প্রচারক নয়, আদর্শস্থাপক এই সঙ্ঘ। সব মতকে পথ বলে গ্রহণ এবং সর্বধর্মের সত্যতাকে আত্তীকরণের মাধ্যমে এই অনন্যসাধারণ সঙ্ঘ শুধু কোন একটি বিশেষ ধর্মের নয়, বলা যায় সমস্ত ধর্মের মানুষের কাছেই আদর্শস্থানীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতেন সঙ্কীর্ণতা ও একদেশদর্শিতাকে। একে তিনি বলতেন—"মতুয়ার বুদ্ধি"। তাঁর মতে—"যে সমন্বয় করেছে সেই-ই লোক।"[৩১] যেকোন প্রকার মৌলবাদের বিরুদ্ধে সর্বাধিক শ্লেষ প্রকাশ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীম একদিন কথাপ্রসঙ্গে যথার্থই বলেছিলেনঃ "এখান থেকে একটা স্রোত যদি বয়, তাহলে বেশ হয়।... এখান থেকে যা হবে সে তো আর একঘেয়ে হবে না।"[৩২]

বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মহাপুরুষ ও অবতারদের পূজা এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের পূজার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জগতে এখনো এমন কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দেখা যায়নি যেখানে একই মন্দিরে হিন্দুধর্মের উৎসবাদি, খ্রিস্টমাস ইভ পালন এবং অন্যান্য ধর্মীয় মহাপুরুষদের জীবন ও বাণী বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। স্বামীজী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেনঃ "সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে আরেকটি নতুন সম্প্রদায় তৈরি করে যেতে আমার জন্ম হয়নি।"[৩৩] যদিও ইতিহাসের কালচক্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবনাকে নিয়ে এক নতুন সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে, কিন্তু তার বিশেষত্ব হলো—এটি একটি 'সম্প্রদায়হীন সম্প্রদায়'। "সম্প্রদায়ের যেসকল উপকারিতা তাও তাতে পাব, আবার তাতে সার্বভৌম ধর্মের উদার ভাবও থাকবে।"[৩৪] স্বামীজীর ভয় ছিল—"ঠাকুরের উক্তিসব একত্র করে তাকে একমাত্র শাস্ত্র করলে তাঁর বিশাল ভাব ও আমাদের আজীবন পরিশ্রমের এই ফল হবে যে, আমরা একটি ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়ের স্রষ্টা হব ও বহু বিবদমানভাবে বিভক্ত এই সমাজকে আরো কোলাহলময় করে তুলব।... অতএব আমাদের সনাতন শাস্ত্র বেদই একমাত্র শাস্ত্ররূপে পরিগৃহীত ও প্রচারিত হবে।"[৩৫]

স্বামীজীর উন্মুক্ত মন শুধুমাত্র অতীত বা বর্তমানের ধর্ম বা মহাপুরুষদের গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হয়নি। ভবিষ্যতে যত ধর্ম বা মহাপুরুষ আসতে পারেন তাঁদেরও সমশ্রদ্ধায় গ্রহণ করার উদার মানসিকতা তিনি সঙ্ঘের সদস্যদের কাছে আশা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন—"অতি বিশালতা, অতি উদারতা ও মহাপ্রবলতা একাধারে সন্নিবিষ্ট হতে পারে।"[৩৬] তিনি সেটি দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেই। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন তাঁর ভাষায়—'ধর্মমহাসভা-স্বরূপ'।[৩৭] সত্যিই শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন তাঁরই অননুকরণীয় গল্পের সেই 'আশ্চর্য রঙওয়ালা'। তাই বিভিন্ন মত বা পথের মানুষ উত্তরোত্তর এই উদার ভাবের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। অন্য ধর্মের অনুগামীরাও শ্রীরামকৃষ্ণ-নামে দীক্ষা নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যতম বিশেষত্ব হলো কারো স্বকীয়তা নষ্ট না করা। ধর্মান্তরণ না করে নিজ নিজ মত বা পথ বা ধর্মে আরো নিষ্ঠাবান হওয়ার উপদেশ করা হয়। হিন্দুকে আরো ভাল হিন্দু, মুসলমানকে আরো ভাল মুসলমান এবং খ্রিস্টানকে আরো ভাল খ্রিস্টান হতে বলা হয়। স্বধর্ম ছেড়ে পরধর্ম গ্রহণ অনাবশ্যক এবং নিজ পথটি সত্য, সেটি অনুসরণ করে উদ্দেশ্যলাভ অবশ্যই সম্ভব—এই সরল সত্যটি মানুষকে উপলব্ধি করানো এই নবীন সঙ্ঘের এক নবীনতম প্রয়াস।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারেও দেখা যায় অভিনবত্ব। পূর্বের অবতারদের জীবন ও বাণীর প্রচার হতে যথেষ্ট সময় লেগেছিল এবং অনেকের ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রশক্তি সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মরলীলা অবসানের বারো বছরের মধ্যে স্বামীজী দাবি করেছেন—"ভারতবর্ষ ইতোমধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের হয়ে গেছে।"[৩৮] এবং তাঁর জীবন ও বাণী সমগ্র পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক স্থানে প্রচারিত হয়েছে। ভাবপ্রচারকে শক্তিশালী করতে তিনি আগস্ট ১৮৯৮ থেকে সঙ্ঘের ইংরেজি মাসিকপত্র 'প্রবুদ্ধ ভারত' এবং ১৪ জানুয়ারি ১৮৯৯ থেকে সঙ্ঘের বাঙলা মাসিকপত্র 'উদ্বোধন' প্রকাশ করেন। স্বামীজী শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে 'উদ্বোধন' পত্রিকা সম্বন্ধে বলেছিলেনঃ "এই পত্রের ভাব, ভাষা সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে।"[৩৯] লক্ষণীয় যে, বর্তমানে যেন স্বামীজীর ইচ্ছানুসারেই পত্রিকার ভাষা, বানানবিধিতে পরিবর্তিত-পরিবর্ধিত আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে।

---

৩১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ৫৯৩
৩২ ঐ, পৃঃ ৭৪০
৩৩ 'বাণী ও রচনা' ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫
৩৪ পত্রাবলী, পৃঃ ১০৯
৩৫ মঠের নিয়মাবলী, পৃঃ ১১, ২০
৩৬ ঐ
৩৭ ভারতে বিবেকানন্দ, পৃঃ ১৬৯
৩৮ পত্রাবলী, পৃঃ ৫৪১
৩৯ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, ৭ম সং, পৃঃ ১২২

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ গঠন ও পরিচালনে স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য শিষ্যদের অবদান প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় বিশেষভাবে উল্লেখ করা না গেলেও সেপ্রসঙ্গে নিবেদিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যের স্মরণ অবশ্যকর্তব্য। নিবেদিতা যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ যেমন অর্থহীন হয়ে দাঁড়াত, স্বামীজীর পশ্চাতে এই গুরুভ্রাতারা না থাকলে তাঁর জীবন ও পরিশ্রম তেমনি বিফল হয়ে যেত।[৪০]

স্বামীজীও বলেছেন ঃ "আমাদের কেন্দ্র তো ঠাকুরই। আমরা এক-একজন সেই জ্যোতিঃকেন্দ্রের এক-একটি কিরণ।"[৪১] ত্যাগী শিষ্যরা প্রত্যেকেই তাঁর হাতে গড়া। কিন্তু তাঁরা এক-একজন দিকপাল। এঁরা প্রত্যেকেই ধর্মশক্তির এক-একটা কেন্দ্রের মতো।

পাশ্চাত্যে স্বামীজীর বেদান্তপ্রচার এবং ভারতবর্ষের মহিমা সদর্পে ঘোষণার পর দেখা গেল ভারতবর্ষও যেন এতদিনের গ্লানি ও অবমাননা ভুলে জেগে উঠছে। এসময়ে আলমবাজার মঠে সুধীর (পরবর্তী কালে স্বামী শুদ্ধানন্দ), কালীকৃষ্ণ (পরবর্তী কালে স্বামী বিরজানন্দ)—এরকম প্রায় কুড়িজন নব্যশিক্ষিত যুবক কিছুদিনের মধ্যে স্বামীজীর ত্যাগ ও সেবার আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করতে মঠে যোগ দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যদের পরবর্তী প্রজন্মে এঁরাই হলেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের স্তম্ভস্বরূপ। স্বামীজী ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের ত্যাগের জীবন এবং জগদ্ধিতের যন্ত্র হিসাবে তৈরি করতে মনোনিবেশ করেন। এসময়ে স্বামীজী এই নব্যসঙ্ঘের সদস্যদের জীবনের দিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ "আমার জীবনের ব্রত রামকৃষ্ণ বা বেদান্তপ্রচার নয়, আমার দেশের মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব জাগানোই আমার কাজ।"[৪২]

আগেই বলা হয়েছে, এসময়ে মঠ পরিচালনার জন্য কিছু নিয়মাবলী স্বামীজী রচনা করেন। মঠ পরে নীলাম্বরবাবুর বাগানে স্থানান্তরিত হলে মঠের নিয়মাবলীকে আরো প্রসারিত এবং পরিবর্ধিত করা হয়। মঠের নিয়মাবলীর মধ্যে মঠ পরিচালনের বিভিন্ন দিক সুসম্পন্নের জন্য পালনীয় বিধিনিষেধের পাশাপাশি তার গঠনমূলক কাঠামোর মধ্যে আধুনিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিকল্পনা এবং সম্পূর্ণ সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয়। "নিয়মাবলী নিয়মকে অতিক্রম বা নিয়মের ঊর্ধ্বে ওঠার জন্য"—একথাটি উল্লেখ করে স্বামীজী সন্ন্যাসীর নিত্য-মুক্ত স্বরূপের কথাই স্মরণ করিয়েছেন।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ নারীমুক্তি ও শূদ্রজাগরণে ব্যাপক প্রয়াস এবং সর্বহারা মানুষের সুখ-দুঃখের ভাগী হওয়ায় সমকালীন রাজনীতিক এবং সামাজিক নতুন চিন্তাধারার নির্যাস যে মানবতাবোধ বা লোককল্যাণচিকীর্ষা—তার সঙ্গে সমান তালে নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং সর্বোপরি ধর্মীয় অগ্রগতি সাধনে যত্নশীল।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবন যুক্তিবিচার, বিজ্ঞানমনস্কতা ও আধুনিকতার পরাকাষ্ঠা এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ তা যথাযথ অনুশীলনে তৎপর। ধর্মের নামে সাধারণ মানুষ চেতনার জাগরণের চেয়ে অলৌকিকতার প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা খুব স্বাভাবিকভাবে এগুলিকে পরিহার করেছেন এবং স্বামীজী সচেতনভাবেই অলৌকিকত্বকে বর্জন করতে বলেছেন। দেশাচার বা লোকাচার যে তাঁরা মানতেন না তা নয়, তবে যে অনর্থক দেশাচার পদে পদে মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে, তা তাঁরা কেউই সমর্থন করেননি। ধর্মের নামে তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-কবচ, অন্ধ গুরুবাদের প্রশ্রয় এই ত্রয়ীর জীবনে একেবারে অনুপস্থিত। সেই ধারাতে সুস্নাত এই সঙ্ঘ মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশ এবং দৈনন্দিন জীবনে সেই দেবত্বের প্রয়োগে অঙ্গীকারবদ্ধ। এমনকি ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শকে মানুষ গ্রহণ করুক—স্বামীজী তাই চাইতেন।

নবীন সঙ্ঘের অন্যতম লক্ষ্য ব্যক্তিজীবনে ভাব-সংশুদ্ধি। পরিমাণগত দিকের চেয়ে গুণগত মানের দিকে এখানে বেশি নজর দেওয়া হয়। মূলভাবকে স্বাত্মীকরণ এবং তা ব্যক্তিজীবনে পরিস্ফুট হলে সমষ্টিজীবনে তার প্রতিফলন পড়তে বাধ্য। ভাব-সংশুদ্ধির জন্য বিপরীত ভাবাপন্নদের নির্মমভাবে পরিহারের সুপারিশ এবং নির্দেশ মঠের নিয়মাবলীতে যথেষ্ট রয়েছে। উল্লেখ্য, সামাজিক সংস্কার আন্দোলন এবং রাজনীতির সঙ্গে বিন্দুমাত্র সংস্রব রাখে না এই সঙ্ঘ। পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ এবং সমালোচনার তীব্র বিরোধী ছিলেন স্বামীজী। বরং তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জগতে এরকম কোন সামাজিক সমস্যা নেই যার সমাধান শিক্ষার যাদুমন্ত্রে না হয়। সোজা কথায়, জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাদের উন্নত করার মাধ্যমেই জাতীয় জীবনগঠনের প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত এই সঙ্ঘ।

মঠ নীলাম্বরবাবুর বাগানে থাকাকালে নিবেদিতার ব্রহ্মচর্য গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাগবাজারে তাঁর স্থাপিত মেয়েদের বিদ্যালয়টি শ্রীমা সারদাদেবীর আশীর্বাদধন্য এবং ভারতে নারীশিক্ষার এক অগ্রদূত

৪০ দ্রঃ স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, পৃঃ ৮৮

৪১ 'বাণী ও রচনা', ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১১০

৪২ More about Ramakrishna—Swami Prabhananda, p. 256

হিসাবে ইতিহাসে চিহ্নিত। ১৮৯৮ সালের কলকাতার প্লেগ মহামারীতে নিবেদিতার আমরণ সেবার মনোভাব সঙ্ঘকে কলকাতার মানুষের কাছে নতুন দৃষ্টিতে উপস্থাপিত করে খুবই জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের নতুন চিন্তাভাবনায় শুধুমাত্র গুরুভাইরা সংশয়াপন্ন হয়েছিলেন তা নয়, হিন্দুসমাজের পণ্ডিত, পুরোহিত অর্থাৎ সনাতনপন্থীদের একাংশ তাঁর নব্য ভাবের গভীরতা এবং উদারতার পরিচয় না পেয়েই তাঁর ভাবের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। এমনকি বালী-বেলুড়ের বহু মানুষ মঠের বিরুদ্ধে কুৎসা পর্যন্ত রটাতে শুরু করে। স্বামী বিবেকানন্দ পূর্বাশ্রমে কায়স্থ থাকার ফলে তাঁর সন্ন্যাসে অধিকার নেই এবং কালাপানি পেরিয়েছেন বলে তাঁকে সমাজচ্যুত করা উচিত—ইত্যাদি বহুযুগলালিত কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বশে সমাজে প্রচণ্ড শোরগোল ওঠে। স্বামীজী পাশ্চাত্য থেকে ফিরে এলে এসব অছিলায় তাঁকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পর্যন্ত ঢুকতে দেওয়া হয়নি। যাইহোক, বেলুড়ে মঠ প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে ধীরে ধীরে স্বামীজী মঠে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন পূজা-পার্বণাদি বিশেষ করে দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা এবং কালীপূজা যথাবিহিত শাস্ত্রসম্মত উপায়ে বিপুল সমারোহে শুরু করেন। কয়েকটি পূজায় শ্রীমা সারদাদেবীর আগমন ভক্তবৃন্দকে অতুল আনন্দের অধিকারী করেছিল। এছাড়া সন্ন্যাসের সনাতন মন্ত্রাদির যথাযথ ব্যবহার, শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজা এবং ব্রহ্মচর্যদীক্ষার মন্ত্রাদি রচনা প্রাচীন সনাতনপন্থীদের কাছে সঙ্ঘকে ধীরে ধীরে খুবই মর্যাদাপূর্ণ ও আদরণীয় করে তুলল। মানুষের বুঝতে দেরি হলো না, 'নবযুগচক্র'—যার সূচনা হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের মাধ্যমে, তা ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কৃতির মধ্যে মূলকে প্রোথিত রেখেও বিশ্বজনীন উদারতায় ভরপুর এবং ভবিষ্যতের সকলপ্রকার কল্যাণকর সম্ভাবনাকে গ্রহণ করতে উন্মুখ থেকে জগৎকল্যাণে নিয়োজিত। এই সঙ্ঘ এক এবং অদ্বিতীয়—একথা বললে অতিকথন হবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশাতেই তাঁর বিরুদ্ধে বলা হতো—তাঁর faculty of organisation নেই, অর্থাৎ তিনি দল চালাতে জানেন না।[৪৩] ইতিহাসের পরিহাস, আজ ঐতিহাসিক থেকে শুরু করে সমাজবিজ্ঞানী—সকলেই স্বীকার করছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল অসাধারণ faculty of organisation। তার মূল রহস্য বা চাবিকাঠি হলো, তিনি অপরের ভাব অনুযায়ী কথা বলতে পারতেন আর তাঁর ছিল অফুরন্ত ভালবাসা, ছিল 'Unconcious method'—'মতলবহীন কার্যধারা'। কেননা তিনি ছিলেন জগন্মাতার ওপর একান্ত নির্ভরশীল। ঢাকঢোল পিটিয়ে পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করে অথবা ইস্তেহার প্রকাশ করে সংস্কারকের নামাবলী গায়ে দিয়ে 'saviour' বলে নিজেকে প্রকাশ বা প্রচার ছিল তাঁর ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই হয়তো তাঁর কার্যধারাকে (method) সমকালে অনেকেই বুঝে উঠতে পারেননি। আবার অনেকেই পেরেছেন। বলা যায়, বর্তমানে আরো বেশি মানুষ পারছেন।

শ্রীমা সারদাদেবী স্বাভাবিকভাবেই ঘটনার বাহ্য আস্তরণ ভেদ করে অন্তর্দেশের গভীরতা স্পর্শ করতে পারতেন। তিনি বলেছিলেন ঃ "তাঁর (ঠাকুরের) ইচ্ছামৃত্যু ছিল। সমাধিতে অনায়াসে দেহ ছাড়তে পারতেন। বলতেন, 'আহা, ওদের (ছেলেদের) একটা ঐক্য করে বেঁধে দিতে পারতুম!' এতদিন তো এ বলছে, 'নরেনবাবু কেমন আছেন?' ও বলছে, 'রাখালবাবু কেমন আছেন?'—এই রকম ছিল। তাই অত কষ্টেও দেহ ছাড়েননি।"[৪৪]

একসময় সাধু-ব্রহ্মচারীরা মাঝেমধ্যে আশ্রমের কাজ ফেলে কোয়ালপাড়া থেকে জয়রামবাটীতে মায়ের কাছে এসে থাকতেন। স্বামী কেশবানন্দ তাঁদের নামে নালিশ করে মাকে অনুরোধ করেন, যাতে তিনি তাঁদের আশ্রয় না দেন এবং চলে যেতে বলেন। তাতে শ্রীশ্রীমা উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন ঃ "সে কি গো? ওসব কি কথা বলছ? ভালবাসাই তো আমাদের আসল। ভালবাসাতেই তো তাঁর সংসার গড়ে উঠেছে।"[৪৫]

ভালবাসায় ভরা তাঁর এই সংসারের রূপটি দেখেছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত। দুর্লভ সেই ভালবাসাকে মানবীয় ভাবনায় যতদূর সম্ভব ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি—"এইরূপ জমাট ভালবাসা কখনো দেখি নাই। একজনের গায়ে চিমটি কাটিলে অপরজনে 'উঁহু' করিয়া ওঠে।"[৪৬] "ইহা যে একটি জীবন্ত ভালবাসা, মুঠো করা যাইতে পারে, ছোঁয়া যাইতে পারে, গায়ে মাখা যাইতে পারে ইহা বরাহনগরের মঠে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইত।"[৪৭]

অদ্বৈততত্ত্বের ভিত্তিভূমি একত্ব। তা থেকেই ভালবাসার প্রস্রবণ। সেই প্রস্রবণের ধারাতে সমগ্র জগৎকে নিস্নাত করতেই এই সঙ্ঘ। তাই স্বামী প্রেমানন্দ সঙ্ঘ এবং ভালবাসাকে অভিন্ন দেখতেন। বলতেন ঃ "ভালবাসার আরেক নাম রামকৃষ্ণ মিশন।"[৪৮]

---

৪৩ 'কথামৃত', পৃঃ ৫০৭ ৪৪ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ১৯৭-১৯৮ ৪৫ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ২৫৯

৪৬ শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ৩০

৪৭ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ১২২

৪৮ রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা, পৃঃ ৬১

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক রাইটকে স্বামীজী লিখেছিলেন ঃ "আমি কোনদিন 'মিশনারি ছিলাম না, কোনদিন হবও না—আমার স্বস্থান হিমালয়ে।"[৪৯] নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, স্বামীজী জীবনে যতবার তাঁর স্বস্থান হিমালয়ে গিয়ে গভীর ধ্যানে ডুবে যেতে চেয়েছেন, তখনি অভাবনীয়ভাবে কোন না কোন জরুরী সমস্যায় তাঁকে নেমে আসতে হয়েছে। করতে হয়েছে তাঁর 'গুরুভাইদের দাসত্ব'—যার জন্য তিনি দৈবনির্দিষ্ট।

সত্যিই তো, তাঁকে না শ্রীরামকৃষ্ণ ধ্যান ভাঙিয়ে অখণ্ডের ঘর থেকে নামিয়ে এনেছিলেন মানুষের ঘুম ভাঙাবেন বলে! তাঁকে তো নেমেই থাকতে হবে—যতদিন না 'মায়ের' কাজ শেষ হয়। যাহোক, এরকম গুরুভ্রাতৃগতপ্রাণ সন্ন্যাসীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দেখে প্রমদাদাস মিত্র স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ "আপনি সন্ন্যাসী হয়েও এত শোকাকুল কেন? সন্ন্যাসীর পক্ষে শোক প্রকাশ করা অনুচিত।" স্বামীজীর নির্দ্বিধ উত্তর ঃ "বলেন কি! সন্ন্যাসী হয়েছি বলে হৃদয়টা বিসর্জন দেব? প্রকৃত সন্ন্যাসীর হৃদয় সাধারণ লোকের হৃদয় অপেক্ষা বরং আরো অধিক কোমল হওয়া উচিত।... যে-সন্ন্যাসে হৃদয় পাষাণ করতে শিক্ষা দেয়, আমি সে-সন্ন্যাস গ্রহণ করি না।"[৫০]

ভালবাসার এই যে স্বরূপ, সঙ্ঘজীবনে তার তাৎপর্য কি? এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে স্বামীজী শিষ্যা নিবেদিতাকে বলেছিলেন ঃ "আজ যদি আমি মদ্যপ অসচ্চরিত্র হয়ে যাই, আমার শিষ্যরা আমাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে, কিন্তু এমন গুরুভাই আছে, যাদের কাছে আমি সেই একই নরেন থাকব। যখন এমন ভালবাসা দেখা দেয়, তখনি জন্ম নেয় নতুন ধর্ম।"[৫১] যথার্থই এমন ভালবাসা থেকে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিস্তৃতি। এই ভালবাসাই সঙ্ঘের প্রাণশক্তি—প্রাণপাখি।

স্বামীজী লিখছেন ঃ "এখন নূতন ভারত, নূতন ঠাকুর, নূতন ধর্ম, নূতন বেদ। হে প্রভো, কবে এ পুরানোর হাত থেকে উদ্ধার পাবে আমাদের দেশ!"[৫২]

এই নতুন দেশ, নতুন জগৎ গড়তেই সৃষ্টি হলো অতুলনীয় এই নবীন সঙ্ঘের। স্বামীজীর ভাষায় ঃ "আমরা এক নূতন ভারতের সূচনা করেছি—যথার্থ উন্নত ভারত, পরের দৃশ্যটুকু দেখবার অপেক্ষায় আছি।"[৫৩]

পরের দৃশ্যও স্বামীজী এঁকেছেন তাঁর মানসচক্ষে—"নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়-জঙ্গল পাহাড়-পর্বত থেকে।"[৫৪]

আসল কথা, বিবেকানন্দ 'প্রফেট'। প্রফেটের বৌদ্ধিক স্তরের ওপরে আধ্যাত্মিক স্তরে বিচরণের একটা সহজাত ক্ষমতা থাকে। সেই ক্ষমতা বলেই তিনি সত্যকে স্পষ্ট দেখেছেন এবং সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। মহাপ্রস্থানের দুদিন আগে অতর্কিতে বললেন ঃ "এই বেলুড়ে যে আধ্যাত্মিক শক্তির ক্রিয়া শুরু হয়েছে, তা দেড়হাজার বছর ধরে চলবে—তা একটা বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নেবে। মনে করো না, এটা আমার কল্পনা, এ আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।"[৫৫]

বিবেকানন্দ দার্শনিকভাবে কখনোই পৃথিবীতে 'স্বর্গরাজ্য' কল্পনা করতে পারেননি। সৃষ্টির গতিকে তিনি তরঙ্গায়িত মনে করতেন। কখনো উত্থান, কখনো পতন। অতীতের ভারতীয়, কল্পনার সত্যযুগ নিয়ে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন, ভবিষ্যতের স্বর্ণযুগের কল্পনা সম্বন্ধেও তাই। তবু তাঁর সতৃষ্ণ মানবপ্রেম সত্যযুগের ভাবনায় মগ্ন থাকতে চেয়েছে। এই সত্যযুগও তাঁর কাছে একটি বৃহৎ উত্থান ছাড়া কিছু নয়। তরঙ্গচূড়ায় অবস্থান করার পরে নিম্নপতন ঘটবেই। ইতিহাসের গতিকে তিনি এইভাবেই দেখেছেন। তবু তাঁর বিশ্বাস—"তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) যেদিন থেকে জন্মেছেন, সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল। আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ ভেদ, ধনী-নির্ধনের ভেদ, পণ্ডিত-বিদ্বান ভেদ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ভেদ—সব তিনি দূর করে দিয়ে গেলেন। আর তিনি বিবাদ-ভঞ্জন—হিন্দু-মুসলমান ভেদ, ক্রিশ্চান-হিন্দু ইত্যাদি সব চলে গেল। ঐ যে ভেদাভেদে লড়াই ছিল, তা অন্য যুগের; এই সত্যযুগে তাঁর প্রেমের বন্যায় সব একাকার।"[৫৬]

এই হলো সত্যযুগের আবাহন-মন্ত্র। সত্যযুগ আবাহনের মঙ্গলশঙ্খ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শ। আর তারই ভগীরথ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের নির্যাসরূপ শান্তি ও সাম্যের বাণী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ জগদ্বাসীর হৃদয়ে নিরলস অনুরণন তুলে যাবে—যতদিন না মানুষ জানবে সে এবং ঈশ্বর এক ও অভিন্ন। [সমাপ্ত] ❑

---

৪৯ পত্রাবলী, পৃঃ ১৩৪
৫০ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৬
৫১ রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা, পৃঃ ৬১-৬২
৫২ 'বাণী ও রচনা', ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৮
৫৩ পত্রাবলী, পৃঃ ৬৬৫
৫৪ 'বাণী ও রচনা', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৬৪-৬৫
৫৫ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭১
৫৬ 'বাণী ও রচনা', ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৭২

রথীর প্রতি সারথি

মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন পার্থ, ক্ষান্ত হও হেরি রণস্থল?
নহ শুধু বীরোত্তম, বুদ্ধিমান তুমি।
রণাঙ্গন নহে রঙ্গভূমি,
ভালমতো আছ অবগত।
দাঁড়াইয়া রণভূমে শত্রুর সমুখে
জড়তা না সাজে তোমা কুন্তীর নন্দন।

ভাবিয়া না পাই আমি
কি কারণে কলেবর তব কম্পমান?
বিষাদে মলিন মুখ,
কোথা বীর্য তব?
হেরি তোমা রুদ্ধবাক্
মনে জাগে পরম বিস্ময়।
গাণ্ডীব শিথিল তব বাম ভুজ হতে?
কহ প্রকাশিয়া তব ক্লৈব্যের কারণ।
কিবা মোহগ্রাসে আজি এ ঘোর সমরে?
এ বিষমক্ষণে হেরি চঞ্চলতা তব
অতীব বিস্মিত আমি।

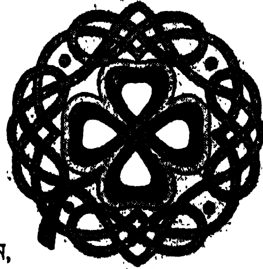
কি কহিলে?
আত্মীয় নিধন তরে প্রাণ ব্যাকুলিত?
হেন উক্তি নাহি শোভে তব রসনায়।
আত্মপর কেবা তব? কাহার নিধন?
কারে স্মরি কাতর হৃদয়?
ভুলিলে কি হেতু তুমি—
জীবাত্মা নশ্বর নহে শাস্ত্রের বচন?
জীর্ণ বাস ত্যজি নর পরিধান করে যথা নূতন বসন,
সেইরূপ এক দেহ পরিহরি অন্য দেহে গতি জীবাত্মার।



তবে মৃত্যু কিছু নহে? মাত্র কায়ান্তর—
জীর্ণদেহ দূরে রাখি নূতনে প্রবেশ।
এ জীবন যেন পান্থশালা,
তবু ক্ষণতরে অনিত্য সম্পর্ক লাগি মানব আকুল
পথিকের প্রাণ যথা পথিকের তরে,
মধ্যপথে পরস্পর ভিন্নদিকে চলি যায়,
দিন শেষে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর অপরের স্মৃতি।

রাখি মতি পরমের পদে হে ধীমান
কার্যে তব হও আগুয়ান।
চতুর্বর্গ ফললাভ হইবে নিশ্চয়।
ভেদাভেদ না করি বিচার, অনাসক্ত চিতে
নিষ্কাম কর্মেতে ঢাল তব তনুমন,
ফলাফল না করি প্রত্যাশা।

তুমি কেবা, কত শক্তি ধর তুমি?
সিদ্ধিলাভ ঈশ্বর-অধীন,
বিধাতার অঙ্গুলিহেলনে নিয়ন্ত্রণ হইতেছে এই ত্রিভুবন।
তুমি নাহি কর কোন কাজ ধরা মাঝে,
হেথায় নিমিত্ত মাত্র তুমি সব্যসাচী।
লঘু ক্রীড়নক যথা বাজিকর-করে
নাচায় তেমতি তোমা মহাশক্তিধরে।



'আমি কর্তা, আমি যোদ্ধা, আমার সংগ্রাম'
এই অজ্ঞানতা, পার্থ, কর পরিহার।
এই মোহ কভু সত্য নহে।
অন্তরে অন্তরে তব একমাত্র সত্য জেনো সার
'চিরদাস আমি শুধু, পালি আমি তাঁহার আদেশ।'

পথ-চেনা

কাকলী পাণ্ডা

'আমার' 'আমি'তে মশগুল হয়ে
আর কতকাল কাটাবে, তুমি পথভ্রান্ত?
জ্ঞানের আলোর পরিধি
যদি তোমার সীমাবদ্ধ, তবে—
ভক্তির প্রদীপে, বিশ্বাসের রসদ ঠেলে দেখ
উদ্ভাসিত তোমার পথ।
'আমি আমার' গণ্ডি সেখানে নিঃশেষিত।

জীবনের রাস্তার মোড়ে ঈশ্বরের
করুণার শান্তি বিরাজিত।
তোমার নিদ্রায়, তোমার জাগরণে
তাঁরই অনুভূতি,
তুমি তাঁরই প্রেরণায়,
তাঁরই কল্পনার অমৃতের সৃষ্টি,
তাঁরই পদপ্রান্তে প্রজ্বলিত—দীপাধার মাত্র।

মুখ্যু মানুষটা

কানাইলাল বসু

মানুষটা,
জ্যান্ত দুর্গার স্বামী।
কি নাম?
শিব নয়,
মহেশ্বরও নয়,
গদাধর—তাঁর নাম।
কামারপুকুর যাঁর ধাম।
গেঁয়ো মুখ্যু মানুষটা
"যত মত তত পথ" বলে
কাঁপিয়ে দিল জগৎটা।
কারণ,
একথা
পৃথিবী আগে শোনেনি,
কেউ কোনদিন বলেনি।
মানুষটা
প্রমাণ করেছে,
খ্রিস্টানের ওয়াটার,
মুসলমানের পানি,
আর হিঁদুর জল—
সবই
ঐ একই পুকুরের
একই জল।
সত্যটি পরম,
উক্তিটি চরম।
এর বিকল্প হয় না,
হবে না।
গদাধর মানুষ-রূপে এলেন,
'রামকৃষ্ণ' হয়ে চলে গেলেন।
"তোমাদের চৈতন্য হোক"
বলে
পৃথিবীর মানুষকে
আশিস জানালেন।
তাঁর কথা
কেউ শোনে,
কেউ শোনে না।
কেউ বিশ্বাস করে,
কেউ করে না।







কেউ গুরুত্ব দেয়,
কেউ দেয় না।
সাধারণের ধারণা,
তিনি বোধহয়
শুধু,
আধ্যাত্মিক সাধনারই প্রেরণা।
আমার তো মনে হয় না।
হলে দূরদর্শী,
দেখা যাবে,
দেশের
পার্থিব সমস্যা সমাধানেও
তিনি সমান পারদর্শী।
তাঁর পথ-দেখানো বাণী,
ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারে
জাতিভেদের হানাহানি।
লোকে বোঝে না
তা নয়,
বুঝতে চায় না।
তাই
কাজেও হয় না।
তাই তো
বলেছে বুদ্ধিজীবী,
লোকটা নাকি
মৃগীরুগী,
তবু
দেখা যাচ্ছে
সেই মৃগীরুগীই
আজ
সারা বিশ্বে পূজিত হচ্ছে।
জানি না,
কার কাছে
তাঁর কী পরিচয়?
আমার কাছে
পরিচয় তাঁর
গদাধর অবতার।
প্রণাম জানাই
চরণে তাঁর।

ভগবান, জ্ঞানী ও ভক্ত

অরুণলাল নন্দী মজুমদার

নেই কো অন্ত, তুমি অনন্ত, তুমি স্বরাট, বিরাট।
তুমি সান্ত, অতি প্রশান্ত, ভকত-হৃদয়-সম্রাট।।
জ্ঞানীর জ্ঞানে তুমি নির্গুণ, অসীম, নিরাকার।
ভকত-চিতে তুমিই আবার সগুণ, সসীম, সাকার।।
নির্গুণ তোমার সঠিক স্বরূপ, নাই তো কোন সংশয়।
জীবসেবায়, স্বীয় মায়ায় সগুণ তুমি, দৃঢ় প্রত্যয়।।
সীমার বাঁধন নেই কো তোমার, অসীম তোমার ব্যাপ্তি।
তুমি ভক্তাধীন, ভক্তবৎসল, তাই সসীমে তোমার তৃপ্তি।।
সচ্চিদানন্দ-নীরে ভকতি-হিমে ধর সাকার রূপ।
জ্ঞানসূর্যে রূপ গলে যায়, হও অখণ্ড, অরূপ।।
নির্গুণ-সগুণ, অসীম-সসীম, নিরাকার-সাকার।
তোমার দৃষ্টিতে ভেদ নাই কোন, ইহাই সত্য, সার।।
যার যেমন ভাব, ভাবে সে তেমন, তুমি আছ সদা সবাকার।
জ্ঞানী ও ভক্তে সম ভালবাস, উভয়ই তোমার আপনার।।

তাই তোমার আনন্দ...

অরুণ মৈত্র

নিখিলময় ছড়িয়ে আছে আলো
আনন্দেরই ঢেউ লেগেছে মনে;
কোথায় তিনি লুকিয়ে রাখেন আনন
খোঁজ করেছি জগদ্বাসী জনে।
আকাশময়, বাতাসময় তিনি
আলোয় এবং অন্ধকারে যিনি
সমানভাবে থাকেন অনুভবে;
তিনিই জানেন কে করে তাঁর খোঁজ
কে তাকে যে আপন বলে ভাবে।
জলে, স্থলে, বনে এবং মনে
সবখানেতে জড়িয়ে আছেন তিনি
আষ্টেপৃষ্ঠে এবং চেতনায়;
শোকে তাপে যখন ভরাডুবি
হাত বাড়িয়ে মেলে ধরেন সব-ই
বন্ধ-চোখেও তাকেই দেখা যায়।
আসেন তিনি, সত্যি সত্যি আসেন
নিত্যকালই—আকুল প্রার্থনায়;
সাড়াটি দেন সত্যি হলে ডাকা
কপট স্বভাব নেহাৎ অন্তরায়।
শরণ নিলে নির্ভয়তা জাগে
ফুল তো ফোটে সত্য-অনুরাগে
খোঁজ পেয়ে যাই পরমতম ধনে;
নিখিলময় ছড়িয়ে আছে আলো
আনন্দেরই ঢেউ লেগেছে মনে।

হরিপদ মিত্রের গৃহে স্বামীজী

গোরাচাঁদ কুণ্ডু

১৮৯২ সালে ভারত পর্যটনকালে উনত্রিশ বছর বয়স্ক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ আতিথ্য স্বীকার করেছিলেন দাক্ষিণাত্যের বেলগাঁওয়ে এক উচ্চপদস্থ বাঙালি অফিসার হরিপদ মিত্রের গৃহে। উচ্চপদে মোটা মাইনের চাকরি, মান, যশ, জৌলুস—সংসারসুখের সমস্ত উপকরণ থাকা সত্ত্বেও হরিপদ মিত্রের মনে সর্বদাই কেমন যেন একটা অভাববোধ ও বিষণ্ণতার ছায়া লেগে থাকত—তিনি নিজেই সেকথা অকপটে বলেছেন তাঁর স্মৃতিকথায়।[১] এমনই এক সময়ে প্রসন্নবদন যুবক সন্ন্যাসী—যাঁর পদ্মপলাশলোচন থেকে বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ছিল, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ। যুবক সন্ন্যাসীর অপরূপ মূর্তি দেখে হরিপদ মিত্র ভাবে আপ্লুত হয়েছিলেন। ভ্রমণপথে পর পর জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুগ্রস্ত মানুষ দেখার পরে একদিন প্রশান্তমূর্তি কোন সন্ন্যাসীকে দেখে বিষাদগ্রস্ত রাজকুমার সিদ্ধার্থের মনে যে তুষ্টিভাবের উদয় হয়েছিল, এ কি সেই ভাবেরই ছায়া? হরিপদ মিত্র ভাবতে লাগলেন—"তিনি আমা অপেক্ষা হাজারগুণে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান; ইচ্ছা করিলে অনেক টাকা উপার্জন করিতে পারেন, তথাপি টাকা-কড়ি ছোঁন না এবং সুখী হইবার সমস্ত বিষয়ের অভাব সত্ত্বেও আমা অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী।... মনে হইল, এমন নিঃস্পৃহ, চিরসুখী, সদাসন্তুষ্ট, প্রফুল্লমুখ পুরুষ তো কখনো দেখি নাই!"[২]

মিত্র পরিবারে সকলের, এমনকি ভৃত্যদেরও ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও প্রবল আগ্রহের টানে আটদিনের জন্য স্বামীজীকে বেলগাঁওয়ে কাটাতে হয়। আনন্দ-উচ্ছ্বাস, তর্ক-বাদানুবাদ, শাস্ত্রবিচার, বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ এবং তারই মধ্যে অতি সরল মজার কথার মধ্যে উত্তুঙ্গ অধ্যাত্মচিন্তা—সবই ছিল ঐ আটদিনের ঘটনাপঞ্জিতে। সাধারণ থেকে অসাধারণ সকল স্তরের মানুষের জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় চক্ষুরুন্মীলন ঘটিয়ে স্বামীজী তাদের আনন্দের স্রোতে ভাসিয়েছিলেন।

সাধু, বিশেষত অল্পবয়সের কর্মত্যাগী সন্ন্যাসীকে সাধারণত অলস প্রকৃতির বলে সেকালে অনেকে মনে করত। পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা বাড়লে হরিপদবাবুও একদিন স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "সন্ন্যাসীরা এরূপ অলস হইয়া কেন কালক্ষেপ করেন? অপরের সাহায্যের উপর কেন নির্ভর করিয়া থাকেন? সমাজের হিতকর কোন কাজকর্ম কেন করেন না?" স্বামীজীর ক্ষিপ্র উত্তরঃ "আচ্ছা, বল দেখি—তুমি এত কষ্টে অর্থ উপার্জন করিতেছ, তাহার যৎসামান্য অংশ কেবল নিজের জন্য খরচ করিতেছ; বাকি কতক অন্য কতকগুলি লোককে আপনার মনে করিয়া তাহাদের জন্য খরচ করিতেছ। তাহারা সেজন্য না তোমার কৃত উপকার মানে, না যাহা ব্যয় কর তাহাতে সন্তুষ্ট! বাকি—যকের মতো প্রাণপণে জমাইতেছ; তুমি মরিয়া গেলে অন্য কেহ তাহা ভোগ করিবে, আর হয়তো আরো টাকা রাখিয়া যাও নাই বলিয়া গালি দিবে। এই তো গেল তোমার হাল। আর আমি ওসব কিছু করি না। ক্ষুধা পাইলে পেট চাপড়াইয়া, হাত মুখে তুলিয়া দেখাই। যাহা পাই তাহা খাই। কিছুই কষ্ট করি না, কিছুই সংগ্রহ করি না। আমাদের ভিতর কে বুদ্ধিমান—তুমি না আমি?"[৩] স্বামীজীর এই ব্যঙ্গাত্মক তাৎক্ষণিক উত্তরে হরিপদ মিত্র একেবারে হতবাক হয়ে রইলেন, কেননা এযাবৎ কারো কাছ থেকেই এমন স্পষ্ট ও সত্যবাক্য তাঁকে শুনতে হয়নি। বস্তুত, ত্যাগ-জীবন ও ভোগ-জীবনের মধ্যে পরিণামে যে বহুতলপ্রসারী গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান, স্বামীজীর কথায় তারই ইঙ্গিত নিহিত এবং এই ইঙ্গিতের দ্যোতনায় রয়েছে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই চিঁড়েভেজা বুদ্ধির কথা। তিনি বলেছিলেনঃ "যে-বুদ্ধিতে টাকা হয়, বাড়ি হয়, ডেপুটির কর্ম হয়, উকিল হয়—সে-বুদ্ধি চিঁড়েভেজা বুদ্ধি। সে-বুদ্ধিতে জোলো দইয়ের মতো চিঁড়েটা ভেজে মাত্র। শুকো দইয়ের মতো উঁচু দরের দই নয়। যে-বুদ্ধিতে ভগবানলাভ হয়—সেই বুদ্ধিই শুকো দইয়ের মতো উৎকৃষ্ট দই।"[৪] সন্ন্যাসীর ভাঁড়ে শুকো দই, আর বিষয়ীর ভাঁড়ে জলো দই—এই উভয় দইয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করে হরিপদ মিত্র নিশ্চয়ই সেদিন চমৎকৃত হয়েছিলেন।

হরিপদবাবু বলেছেনঃ "আমারও ক্রমে সাহস বাড়িতে লাগিল।"[৫] বর্ধিত সাহসে বলীয়ান হয়ে হরিপদবাবু ঠিক করলেন স্বামীজীকে এবার এমন একটা কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন, যার কোন সদুত্তর এযাবৎ কেউই দিতে পারেননি—এমনকি খ্রিস্টান মিশনারিদের সঙ্গেও এই তর্কের মীমাংসা হয়নি। প্রশ্নটি হলো—ঈশ্বর কি একইসঙ্গে দয়াময় ও ন্যায়বান হতে পারেন? এ যেন শ্রীম কর্তৃক উত্থাপিত (এবং শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক মীমাংসিত) যুগযুগান্তরের সেই চিরকালীন প্রশ্নের প্রতিধ্বনি—"ঈশ্বর কি একই কালে সাকার ও নিরাকার হতে পারেন?" হরিপদবাবুর ধারণা, এই তর্কের মীমাংসা হয়নি এবং স্বামীজীও এ-সমস্যা পূরণ

---

১ Reminiscences of Vivekananda—Haripada Mitra, 1st Ed., p. 24
২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ৩৬১
৩ ঐ, পৃঃ ৩৬৪
৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ, ২৭ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ
৫ 'বাণী ও রচনা', ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৩

করতে পারবেন না। কিন্তু স্বামীজীকে একথাটি বলতেই তৎক্ষণাৎ তাঁর উত্তর ঝলসে উঠল : "তুমি তো science অনেক পড়িয়াছ, দেখিতেছি। প্রত্যেক জড়পদার্থে দুইটি opposite forces—centripetal and centrifugal কি act করে না? যদি দুইটি opposite forces জড়বস্তুতে থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে দয়া ও ন্যায় opposite হইলেও কি ঈশ্বরে থাকা সম্ভব নয়? All I can say is that you have a very poor idea of your God."[৬]

হরিপদ মিত্র তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন : "আমি তো নিস্তব্ধ।"[৭] পরে তিনি লিখছেন : "আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই যথা—Chemistry, Physics, Geology, Astronomy, Mixed Mathematics প্রভৃতিতে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রশ্নই অতি সরল ভাষায় দুই-চার কথায় বুঝাইয়া দিতেন।"[৮] হরিপদবাবু নিজে বিজ্ঞানের একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। স্বামীজীর জ্ঞানগরিমা বিষয়ে তাঁর এই কথাগুলি শ্রদ্ধাপ্লুত ভক্তজনের অতিশয়োক্তি নয়। আসলে সংসার-নিস্পৃহ বিষয়-বৈরাগী সন্ন্যাসী হয়েও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বামীজী অবাধে বিচরণ করেছেন এবং বহু ক্ষেত্রে তাঁর অপ্রতিরোধ্য অধিকার ও যোগ্যতার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। জীবনের প্রারম্ভিক কালে দক্ষিণেশ্বরে ভগবৎ-বাক্য উচ্চারিত হয়েছিল : "দেবী সরস্বতীর জ্ঞানালোকে নরেন কেমন জ্বলজ্বল করছে।"[৯] পরবর্তী কালে নরেন্দ্র-প্রতিভার এই আলো শুধু অধ্যাত্মবিদ্যা ও দর্শনচিন্তার ক্ষেত্রেই নয়, নব্য বিজ্ঞানচিন্তার দিগন্তকেও উদ্ভাসিত করেছে—সুবিস্তৃত না হলেও তারই একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ হরিপদ মিত্রের স্মৃতিচারণে নিবদ্ধ।

সেটা ১৮৯২ সালের কথা। জগতের মানুষ তখনো মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের নাম পর্যন্ত শোনেনি। আইনস্টাইন জগৎজোড়া খ্যাতি লাভ করেছিলেন ১৯০৫ সালে, যখন তাঁর যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব 'Theory of Relativity' বা আপেক্ষিকতাবাদ প্রকাশিত হওয়াতে দেশ-কাল সম্বন্ধীয় তৎকাল-প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মতবাদ একেবারে নস্যাৎ হয়ে গেল। কিন্তু পরমাশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, 'Space Time Continuum' বা 'Relativity'-র যে-তত্ত্ব প্রচার করে আইনস্টাইন বিজ্ঞানজগতে যুগান্তর ঘটিয়েছেন, স্বামী বিবেকানন্দ হুবহু সেই তত্ত্বটি বলেছেন হরিপদ মিত্রকে —বলেছেন আইনস্টাইনের মতবাদ প্রকাশিত হওয়ার তেরো বছর পূর্বে। অবশ্য তফাত এই যে, আইনস্টাইন তত্ত্বটি বলেছেন গণিত বিজ্ঞানের ভাষায় আর স্বামীজী বলেছেন সহজ-সরল ঘরোয়া আলাপচারিতায়—যার মধ্যে রয়েছে ঋষির প্রজ্ঞালোক।

ব্যাপারটি বিশদভাবে বোঝার জন্য ১৯৫৫ সালের ২৪ জুলাই 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'রবিবাসরীয়' বিভাগে প্রকাশিত 'আপেক্ষিকতাবাদের পঞ্চাশ বছর' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। উক্ত প্রবন্ধে বলা হয়েছে : "[পুরানো যুগের বিজ্ঞান অনুযায়ী] বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন দর্শক থাকুক বা না থাকুক এবং কোন ঘটনা ঘটুক বা না ঘটুক অন্তহীন একটা দেশ এবং সীমাহীন একটা কাল থেকে যাবেই। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব এই মতবাদকে সম্পূর্ণ বদলে দিল।... দেশ (Space) ও কাল (Time)-কে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে পারি না, দেশ ও কাল পরস্পর বিজড়িত।... দেশ ও কালকে দুটি বিচ্ছিন্ন সত্তা বলে ধারণা করাটা ভুল।" এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে হরিপদ মিত্রের স্মৃতিকথা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটি উদ্ধৃত হলো : "স্বামীজীর সহিত একদিন 'অনন্ত' (Infinity) সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়।... তিনি বলিলেন, 'There can be no two infinities.' আমি সময় অনন্ত (time is infinite) ও আকাশ অনন্ত (space is infinite) বলায় তিনি বলেন, 'আকাশ অনন্তটা বুঝিলাম, কিন্তু সময় অনন্তটা বুঝিলাম না। যাহা হউক, একটা পদার্থ অনন্ত—একথা বুঝি, কিন্তু দুইটা জিনিস অনন্ত হইলে কোন্‌টা কোথায় থাকে? আর একটু এগোও, দেখিবে সময়ও যাহা আকাশও তাহাই।' "[১০] অতএব স্বামীজীর প্রজ্ঞায় যে-তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়েছিল ১৮৯২ সালে—তেরো বছর পরে সেই তত্ত্বটি উদ্ঘোষিত হলো আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদে।

উপরি উক্ত প্রবন্ধে আরো বলা হয়েছে : "আপেক্ষিকতা তত্ত্বকে নূতন করে সাজানোর ফলে তড়িৎচৌম্বক ক্ষেত্র ও মহাকর্ষের ক্ষেত্রকে একই আইনের সূত্রে বেঁধে আইনস্টাইন তার নাম দিয়েছিলেন 'ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরি' বা 'একীকৃত ক্ষেত্র তত্ত্ব'। পরে তত্ত্বটিকে কিছু সংশোধন করে তিনি আশা করেছিলেন যে, একটিমাত্র তত্ত্বের সাহায্যে মহাকর্ষশক্তি, তড়িৎচৌম্বক শক্তি, প্রবল ও দুর্বল পরমাণু কেন্দ্রীনের শক্তি তথা বস্তুজগতের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রদান করার পথ অধিকতর সুগম হয়ে উঠতে পারে।... কিন্তু কাজ পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি পরলোকে চলে গেলেন।" শক্তি তথা বস্তুজগতের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় একটিমাত্র তত্ত্বের সাহায্যে দেওয়ার জটিল গাণিতিক প্রচেষ্টা এখনো অব্যাহত। সেই প্রচেষ্টা আরো এগোলে এবং সফল হলে বিজ্ঞান কোন্ সত্যে উপনীত হবে, 'Infinity'-র আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজী তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথায়। তিনি

---

৬ 'বাণী ও রচনা', ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৩ ৭ ঐ ৮ ঐ, পৃঃ ৩৭৩-৩৭৪

৯ যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৯৯

১০ 'বাণী ও রচনা', ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৫

বলছেন ঃ "আরো অগ্রসর হইয়া বুঝিবে, সকল পদার্থই অনন্ত এবং সেইসকল অনন্ত পদার্থ একটা বৈ দুইটা-দশটা নয়।"[১১] বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি মনে করেন, অত্যাধুনিক বিজ্ঞানচিন্তার গতি-প্রকৃতি ও তার গবেষণালব্ধ ফল স্বামীজীর সিদ্ধান্তের দিকেই অগ্রসরমান। প্রসঙ্গত 'Statesman Festival 2000' পত্রিকায় প্রকাশিত 'Who Considered Relativity First: Albert Einstein or Swami Vivekananda' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

আবার আমরা হরিপদ মিত্রের স্মৃতিচারণে ফিরে যাই। তিনি লিখেছেন ঃ "স্বামীজীর এক-একদিনের এইরূপ কথাবার্তা ধরিয়া রাখিতে পারিলে এক-একখানি পুস্তক হইত।"[১২] "এত বৎসরের কঠোর সন্দেহ ও অবিশ্বাস স্বামীজীকে দেখিয়া ও তাঁহার দুই-চার কথা শুনিয়াই সব দূর হইল। আর জিজ্ঞাসা করিবার কিছুই নাই।"[১৩]

স্বামীজীর পদার্পণে হরিপদ মিত্রের গৃহে যে আনন্দস্রোতের প্রবাহ চলছিল, তা বন্ধ হওয়ার সময় যখন ঘনিয়ে এল—স্বামীজীর সেই বিদায়লগ্নে তিনি স্বামীজীকে [যাঁকে মিত্র-দম্পতি ইতিমধ্যে দীক্ষাগুরু-পদে অভিষিক্ত করেছিলেন] সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করে বললেন ঃ "আজ পর্যন্ত আন্তরিক ভক্তির সঙ্গে কাউকে প্রণাম করিনি। আজ আপনাকে প্রণাম করে কৃতার্থ হলাম।" আর, প্রণাম করতে করতে ভেবেছেন—"ইনি কি মনুষ্য না দেবতা।"[১৪] ❑

---

১১ 'বাণী ও রচনা', ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৫
১২ ঐ, পৃঃ ৩৮৩ ১৩ ঐ, পৃঃ ৩৬৫ ১৪ ঐ, পৃঃ ৩৬১

শব্দচেতনা ১৪

সহায়ক গ্রন্থ ঃ ঋগ্বেদ, কঠ ও মুণ্ডক উপনিষদ্, গীতা, বিবেকচূড়ামণি, অষ্টাবক্রগীতা, শিবমহিম্নস্তোত্র, বীরবাণী, স্তবকুসুমাঞ্জলি

■	১		২	■	■	৩		৪	■
৫		■	৬				■	৭	৮
	■	■	■	■	■	■	■	■	
৯	১০	■	১১			১২	■	১৩	
■		■		■	■		■		■
■		■		■	■		■		■
১৪		■	১৫				■	১৬	১৭
	■	■	■	■	■	■	■	■	
১৮	১৯	■	২০			২১	■	২২	
■	২৩			■	■	২৪			■

পাশাপাশি ঃ (১) কিমপি —— বোধং কেবলানন্দরূপম্ (বি.), (৩) জনক——ভাবো বৃত্তয়ঃ সংস্কৃতাশ্চ (বীরবাণী), (৫) —— প্রকাশতে বিশ্বং তদাহং ভাস এব হি (অ., ২য় অঃ), (৬) ——ং মরণশোকজরাটবীনাং (বিশ্বনাথাষ্টকম্), (৭) নাশ্রিত্য তাং —— কুতঃ শরণং ব্রজামঃ (বীরবাণী), (৯) ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং —— গচ্ছতি (গীতা, ৬ষ্ঠ অঃ), (১১) প্রকটিতপরপ্রেম্না যো ——সংজ্ঞঃ (বীরবাণী), (১৩) ——সুখকৃতে সত্ত্বোদ্রিক্তৌ মৃড়ায় নমো নমঃ (শিবমহিম্নস্তোত্র), (১৪) স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্ম —— ব্রহ্মণি স্থিতঃ (গীতা, ৫ম অঃ), (১৫) হে —— ভব রুদ্র পিণাকপাণে (শিবনামাবল্যষ্টকম্), (১৬) কৃতাকৃতে চ দ্বন্দ্বানি —— শান্তানি কস্য বা (অ., ৯ম অঃ), (১৮) ——দেব দেব জয় জয় নরদেব (বীরবাণী), (২০) ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে —— (মু. উ.), (২২) তথা তবামী —— লোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি (গীতা, ১১শ অঃ), (২৩) মন্তেতি হেলয়া কিঞ্চিন্মা গৃহাণ —— মা (অ., ৮ম অঃ), (২৪) পদনখনীর——জনপাবন্ (দশাবতারস্তোত্রম্)।

ওপর-নিচ ঃ (১) —— জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ (কঠ উ.), (২) —— বদ্ধো যদা চিত্তং কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি শোচতি (অ., ২য় অঃ) (৩) তব ——মহিমা নিগমে খ্যাতঃ (গঙ্গাস্তোত্রম্) (৪) তমেব মার্গং —— নির্দিশামি (বি.) (৫) বশ্যাত্মনা তু —— শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ (গীতা, ৬ষ্ঠ অঃ), (৮) দুরিত——দক্ষং দক্ষজাদত্তদোষং (বীরবাণী) (১০) বৈদুষ্যং বিদুষাং —— ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে (বি.) (১১) কালী করালী চ —— চ (মু. উ.), (১২) উদারচরিতানাং তু —— কুটুম্বকম্ (হিতোপদেশ), (১৩) জগজ্জনন্যৈ ——পিত্রে নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় (হরগৌর্যষ্টকম্) (১৪) হৃদি কলয়তি —— ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ (বি.) (১৭) স —— পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম (ঋগ্বেদ, ১০।১২১), (১৯) ——রুদ্রপিতামহবিষ্ণুনুতং হরিচন্দনকুঙ্কুমপঙ্কযুতম্ (সরস্বতীস্তোত্রম্), (২০) ন চ প্রাণসংজ্ঞো ন বৈ —— বায়ুঃ (নির্বাণষট্কম্), (২১) যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা —— মানে (ঋগ্বেদ, ১০।১২১), (২২) ——নয়ন-নিযুক্তং নীলকণ্ঠং নমামঃ (বীরবাণী)।

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম কার্তিক ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

সূত্র ঃ শুক্লা পাঠক



আদি শঙ্করাচার্য ১৩



জ্যোতির্ধামের রাজা উত্তরকাশী পর্যন্ত আচার্য শঙ্করকে অনুগমন করেছিলেন। তিনি রাজাকে বৈদিক ধর্ম পুনঃস্থাপন করতে উপদেশ দিয়ে বিদায় দিলেন।



কিন্তু আচার্যকে নির্লিপ্ত ও সমাধির জন্য উন্মুখ দেখে উদ্বিগ্ন শিষ্যরা ভাবলেন, তাঁর মনকে সাধারণ ভূমিতে নামিয়ে আনার জন্য তাঁর কাছে শাস্ত্রশিক্ষা দান করার প্রার্থনা জানাবেন। তাঁদের প্রার্থনায় আচার্য শঙ্কর সম্মত হলেন।

একদিন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। আচার্য শিষ্যদের পড়াচ্ছেন, এমন সময়—



ব্রাহ্মণকে আসনগ্রহণ করতে অনুরোধ করলে তিনি শঙ্করাচার্যের সামনে উপস্থিত হলেন।



ব্রাহ্মণ প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন এবং আচার্য শঙ্কর যুক্তি দিয়ে তার উত্তর দিতে লাগলেন। শাস্ত্রের বিভিন্ন জটিল তত্ত্ব নিয়ে বিচার শুরু হলো। বিচারের আর শেষ হয় না। দিনের পর দিন কেটে গেল। সপ্তম দিনে বিচারের পর ঐ ব্রাহ্মণ চলে গেলে শিষ্য পদ্মপাদ আচার্যকে জিজ্ঞাসা করলেন—



চিত্ররূপ ঃ দেবাশিস বসু

পরদিন সকালে ব্রাহ্মণ এসে এক জটিল প্রশ্ন করলেন। আচার্য তাঁর পাদবন্দনা করে বিনীতভাবে বললেন—



দেবত্বে উত্তরণ ও ঋষি অরবিন্দ

দিলীপ রায়

রুতে ছিল এক সনাতন ধর্মের কথা। বেদ ছিল তার ভিত্তিভূমি। যেমন করে বহু নদীর জলে আপ্লুত হয়েও সমুদ্রের এক নিজস্বতা বজায় থাকে, তেমন করে বহু ঋষির ভাবনায় সমৃদ্ধ বেদ এক নৈর্ব্যক্তিক দর্শন। এইজন্য ঋষি অরবিন্দ বলেছিলেন ঃ "The religions culture which now goes by the name of Hinduism... gave itself no name because it set itself no sectarian limit, it claimed no universal adhesion, asserted no sole infalliable dogma, set up no single narrow path or gate of salvation; it was less a creed or a cult than a continuously enlarging tradition of the God ward endeavour of the human spirit." (Religion and Spirituality—Sri Aurobinda, Vol. I)

বহু ভাবনার অন্তহীন সমাহারে সৃষ্ট হয়েছে এই আধ্যাত্মিকতা। তাই আমরা সাধারণত 'ধর্ম' বলতে যা বুঝি তার সঙ্গে সনাতন ধর্মের বিস্তর তফাত। সনাতন ধর্ম ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, সমষ্টিকেন্দ্রিক। এই ধর্ম কোন উপদেশের মধ্যে সীমিত হয়ে থাকেনি। এর ভাবনা ক্রমবর্ধমান, ক্রমপ্রসারিত।

বেদকে মূলত জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। কর্মকাণ্ড আমাদের চতুরাশ্রমের প্রথম দুই আশ্রম ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্যের জন্য সঙ্কলিত হয়েছে। জ্ঞানকাণ্ড সঙ্কলিত হয়েছে শেষ দুই আশ্রম অর্থাৎ বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসকালীন অবস্থার জন্য।

সনাতন ধর্মের সনাতন ভাবনা বিধৃত রয়েছে জ্ঞানকাণ্ডে। চারটি মহাবাক্যে চারটি বেদের ধর্মভাবনাকে একত্রিত করলে এক চিরন্তন তত্ত্বের মালা রচনা করা যাবে অনায়াসে। ঋগ্বেদের ঋষি ঐতরেয় উপনিষদে বলেছেন—"প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"। সামবেদের ঋষি ছান্দোগ্য উপনিষদে বলেছেন—"তত্ত্বমসি"। যজুর্বেদের ঋষি বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলেছেন—"অহং ব্রহ্মাস্মি"। অথর্ববেদের ঋষি মাণ্ডুক্য উপনিষদে বলেছেন—"অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। যেন জিজ্ঞাসু মানুষ ঋষিদের কাছে জানতে চাইছে—ব্রহ্ম কি? বৈদিক ঋষিরা ব্রহ্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জানাচ্ছেন, প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম। প্রজ্ঞানই ঋগ্বেদের মূল বিষয়। তারপর এল উপদেশ। ঋষিরা বোঝাতে চাইলেন—এই প্রজ্ঞান তোমার ভিতর থেকেই প্রকাশ পাবে; বললেন—তুমিই সেই ব্রহ্ম। এটা হলো সামবেদের মূল সুর। মানুষ যখন ব্রহ্মকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করার চেষ্টা করবে, তখন তার মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটতে থাকবে। উচ্চারিত হবে যজুর্বেদের মহাবাক্য—আমি সেই ব্রহ্ম। অনুভব যত গভীর হবে ততই অনিত্য শরীরের অন্তরালে আত্মাকে নির্দেশ করে জিজ্ঞাসু বলবেন—এই আত্মাই ব্রহ্ম। সে বলবে—"অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। অথর্ববেদের ঋষিবাক্যের সঙ্গে তার একাত্মতা চলে আসবে। একথা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলে অবশ্যই কল্যাণ, নইলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা সাধ্যাতীত। 'নৈবেদ্য'তে একালের কবি রবীন্দ্রনাথ সেকালের ঋষিবাক্যকে ভাষান্তর করে বললেন ঃ

> "শোন বিশ্বজন,
> শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
> দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে।
> মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
> জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
> মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।"

অপরদিকে, বেদের কর্মকাণ্ডে রয়েছে যুগধর্মের ভাবনা। কারণ তা সংসারকেন্দ্রিক। যা সরে সরে যায়—তাই সংসার। যা নিয়ত গতিশীল, যা পরিবর্তিত হয় তাই জগৎ। ফলে কর্মকাণ্ডের আলোচনা করতে গিয়ে, কর্মকাণ্ডভিত্তিক নির্দেশ দিতে গিয়ে আচার্যরা তাকিয়েছেন যুগধর্মের দিকে, জাতিধর্মের দিকে। যুগে যুগে তার রূপ পরিবর্তিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যুগধর্মের ভিত্তিভূমি হওয়া উচিত সনাতন ধর্ম। যেন সনাতন ধর্মকে কেন্দ্র করেই যুগধর্মের প্রকাশ বৃত্তের পরিধি বরাবর ঘুরতে থাকে। উদ্দেশ্য কেন্দ্রে পৌঁছানো। যুগধর্মের এই পরিবর্তনের দিকটা একটু লক্ষ্য করা যাক। শঙ্করাচার্য বলেছিলেন ঃ

> "গেয়ং গীতানামসহস্রং ধ্যেয়ং শ্রীপতিরূপমজস্রম্।
> নেয়ং সজ্জনসঙ্গে চিত্তং দেয়ং দীনজনায় চ বিত্তম্।।"

সদ্‌গ্রন্থ পাঠ কর, শ্রীপতির ধ্যান কর, সৎসঙ্গ কর আর দীনজনকে বিত্তদান কর—এই ছিল তাঁর নির্দেশ। চৈতন্যদেব 'দীনজনকে বিত্তদান কর' না বলে বললেন—'জীবে দয়া কর'। অর্থাৎ শুধু বিত্তদানই যথেষ্ট নয়, দয়ালু হৃদয়ে বিত্তদান করার প্রয়োজন রয়েছে। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করতে। দয়ার বদলে এল সেবার ভাবনা। জীবকে শিব মনে করার নির্দেশ এল এরই সঙ্গে। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বললেন ঃ "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" এল সেবার অন্তর্নিহিত প্রেমের ভাবনাও। এইভাবে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের দূরত্ব ক্রমশ কমে আসতে চাইছে। আচার্যগণ সত্যকে সরাসরি উপস্থাপিত করতে চাইছেন মানুষের কাছে। কারণ, মানুষ যতই কম জিজ্ঞাসু হয়ে পড়ছে ততই সত্যকে নিয়ে যেতে হচ্ছে তাদের কাছে। জ্ঞানকাণ্ডই সেক্ষেত্রে ধ্রুব এবং মুখ্য হয়ে

উঠেছে। যুগধর্মের বদলে সনাতন ধর্ম ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছে আবার।

এই পরিবর্তনের আরেকটা বিশেষ কারণ আছে। তপোবনের যুগে ঋষিরা ছিলেন সংখ্যায় বহু। জিজ্ঞাসুরা সবাই ঋষি হয়ে উঠেছেন আত্মস্থ অবস্থার মধ্য দিয়ে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তপোবনের শুদ্ধতা পিছনে ফেলে আমরা সত্য থেকে ত্রেতা, ত্রেতা থেকে দ্বাপর, দ্বাপর থেকে কলিতে প্রবেশ করেছি। কলি থেকে আবার সত্যে ফিরে যেতে হবে। সত্যযুগে সকলেই ছিলেন ঋষি কিংবা ঋষিপ্রতিম। সকলেই ছিলেন ধ্যানমগ্ন এবং যোগস্থ। তাঁদের কোন অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল না। ত্রেতায় এসে এক-চতুর্থাংশ ধ্যানমগ্নতা নষ্ট হয়ে গেল। তিনভাগ রইল। ফলে বাহ্য অবলম্বনের প্রয়োজন দেখা দিল। শুরু হলো অগ্নির প্রতীকে উপাসনা। শুরু হলো যাগযজ্ঞের আধিক্য। দ্বাপরে এসে দুই-চতুর্থাংশ ধ্যানমগ্নতা নষ্ট হয়ে গেল। বাকি রইল দুই ভাগ। তখন প্রতীকী উপাসনার বদলে মুখ্য হয়ে আত্মপ্রকাশ করল দেবদেবীর বন্দনা। দেবালয়ের দেবদেবী ও পূজাপাঠের আধিক্য দেখা দিল। কলিতে কেবলমাত্র এক-চতুর্থাংশ অবশিষ্ট আছে। তিন-চতুর্থাংশ ধ্যানমগ্নতাই ক্ষয় হয়ে গেছে। তাই কলির জন্য অবলম্বন শুধু নামগান। শুধু নামেই উপলব্ধি। এই নামেরই আরেক দিক হলো ভগবদ্ আলোচনা। সামান্য আলোচনা ও তারই যৎসামান্য অনুধাবন করাই যথেষ্ট—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"

বিভিন্ন যুগধর্ম ভিন্ন ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সমষ্টির পরিবর্তে ব্যষ্টির প্রাধান্য এসে পড়েছে সমস্ত ভাবনায়। যুগধর্মেও এর ছাপ পড়েছে। মননের পরিবর্তে স্থান পেয়েছে অনুকরণ। এরই মধ্যে কলুষতার গ্লানিতে বিরক্ত কেউ কেউ সমষ্টিকে অস্বীকার করেছেন। জগৎকে ত্যাগ করে আত্মমুক্তির পথ বেছে নিয়েছেন তাঁরা। প্রয়োজন সমষ্টির চেতনা ফেরানো। সমষ্টিকে প্রবুদ্ধ করা।

বিবেকানন্দের বাণী অনুপ্রাণিত করেছিল শ্রীঅরবিন্দকে। প্রবুদ্ধ ঋষি অরবিন্দ সমষ্টির কথা ভেবে সত্যযুগকে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়ে সনাতন ধর্মের জ্ঞানকাণ্ডকে উপস্থাপিত করেছেন নবতর ব্যাখ্যার মাধ্যমে। কঠ উপনিষদে (২।২।১৩) বলা হয়েছিল—

"নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।।"

অর্থাৎ সকল অনিত্য বস্তুর কারণশক্তি, ব্রহ্মাদির চৈতন্য-স্বরূপ, অদ্বিতীয় হয়েও যিনি জীবের কর্মফল বিধান করেন —সেই সত্তাকে যাঁরা উপলব্ধি করেন, তাঁরা শাশ্বত শান্তি লাভ করেন।

ঋষি অরবিন্দের দৃষ্টিতে এই হলো পুরুষোত্তমের ভাবনা। এই দৃষ্টির সঙ্গে তিনি মিলিয়ে নিয়েছেন 'সোঽহম্'-এর ভাবনা; মিলিয়ে নিয়েছেন "অহং ব্রহ্মাস্মি"র মহাবাক্যকে।

একাগ্রতার অভাবকে দূর করে মনকে একমুখী করার জন্য ঋষি অরবিন্দ গুরুত্ব দিয়েছেন যোগের ওপর। শ্রীকৃষ্ণ যেমন করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সখা অর্জুনকে বলেছিলেন : "যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি", তেমন করেই কর্মক্ষেত্রের মানুষদের যোগযুক্ত হতে বলেছেন ঋষি অরবিন্দ। আর একইসাথে বলেছেন দেবত্বে উন্নীত হওয়ার কথা। জড়ত্ব থেকে প্রাণে, প্রাণ থেকে মানসে, মানস থেকে অতিমানসে উত্তীর্ণ হয়ে মানুষ পাবে তার বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত আনন্দময় সত্তাকে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।২) বলা হয়েছে—

"অন্নাৎ ভূতানি জায়ন্তে জাতানি অন্নেন বর্ধন্তে।
অদ্যতে অত্তি চ ভূতানি। তস্মাৎ অন্নং তদ্ উচ্যতে।।"

অর্থাৎ, জীবসমূহ অন্ন থেকেই জন্ম নিয়েছে, অন্নের দ্বারাই বর্ধিত হচ্ছে, অন্নই প্রাণীদের খাদ্য এবং খাদক। এইজন্য এর নাম 'অন্ন'। এই অন্ন সেই জড় তত্ত্বের প্রতীক, যার মধ্য থেকে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রাণকে জড়ের মধ্যে নিহিত বলে ধরে নিতে হয়। নইলে জড় থেকে প্রাণ আসবে কি করে? এই প্রশ্ন এক বিশেষ উত্তরকেই নির্দেশ করে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (ঐ) আরো বলা হয়েছে —"অন্যোঽন্তরঃ আত্মা প্রাণময়ঃ। তেন এষ পূর্ণঃ।" এবং প্রাণের কথা সবিস্তারে বলার পর এও বলা হয়েছে— "অন্যোঽন্তরঃ আত্মা মনোময়ঃ। তেন এষ পূর্ণঃ।" (ঐ, ২।৩) অর্থাৎ মনোময় আত্মা প্রাণময়ের মধ্যেই নিহিত। মনোময় আত্মার শিরস্থান যজুর্মন্ত্র, দক্ষিণ ও বাম পক্ষ যথাক্রমে ঋক্ ও সাম মন্ত্র, ব্রাহ্মণাংশ এর আত্মা এবং অথর্ব ও অঙ্গিরার মন্ত্রগুলি এর স্থিতিকারক পুচ্ছ। তাহলে জড় থেকে প্রাণের প্রকাশ এবং প্রাণের মধ্যে মনের প্রকাশ হয়েছে—একথা বলার পরিবর্তে বলা উচিত—জড়ের মধ্যে প্রাণ রয়েছে এবং প্রাণের মধ্যে মন রয়েছে। তফাত শুধু প্রকাশের তারতম্যে। তবে এখানেই এর শেষ নয়। "অন্যোঽন্তরঃ আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। তেন এষ পূর্ণঃ।" (ঐ, ২।৪) অর্থাৎ মনোময়ের অন্তস্থ হয়ে আছে বিজ্ঞানময় আত্মা। শ্রদ্ধা এর শিরস্থান, ঋত ও সত্য এর দুই পক্ষ, যোগ এর আত্মা এবং মহত্ত্ব এর পুচ্ছ। মনের গভীরে নিহিত এই বিজ্ঞানময় আত্মাকে প্রকাশিত করতে হলে আমাদের যোগাশ্রিত হতে হবে। এরও পরে অর্থাৎ শেষ অবস্থায় আত্মা আনন্দময়—"অন্যোঽন্তরঃ আত্মা আনন্দময়ঃ। তেন এষ পূর্ণঃ।" (ঐ, ২।৫)

ঋষি অরবিন্দ বলেছেন, যদি অন্নময় জড় অবস্থা থেকে আমরা প্রাণময় অবস্থা পেয়ে থাকি এবং প্রাণময় অবস্থা থেকে মনোময় অবস্থায় উপনীত হয়ে থাকি, তাহলে এবার মনোময় অবস্থা থেকে বিজ্ঞানময় অবস্থায় যেতে হবে—যে বিজ্ঞানময় অবস্থার মধ্যেই সুপ্ত রয়েছে আত্মার আনন্দময়

পরিচয়। ঋষি অরবিন্দের ভাবনায় এই উত্তরণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক না হয়ে হবে সমষ্টিকেন্দ্রিক। সর্বোপরি এই উত্তরণ জগৎ-বর্জিত নয়, হবে জগৎ-যুক্ত। জড়, প্রাণ ও মানসলোকের অধিকার, ভোগ ও ভোগাতীত অবস্থার মধ্য দিয়ে এই দেবত্বদানের অঙ্গীকার জানিয়েছেন তিনি। 'সাবিত্রী' কাব্যে যেন শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং বলছেন—

"I sacrifice not earth to happier worlds,

I keep my will to save the world and man."

জগতের কল্যাণের জন্য তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ—একথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন তিনি।

শ্রীঅরবিন্দের ভাবনা অনুসরণ করে আমরা মনে করতে পারি, এই উদ্ঘাটন মনের স্তরেই থেমে থাকতে পারে না। যিনি 'এক' থেকে 'বহু' হয়েছেন—তিনি 'বহু' থেকে 'এক' হয়ে উঠবেন এটাই স্বাভাবিক। মানুষ তাই প্রকৃতির সেই পরীক্ষাগারের বিষয়—যেখানে একদিন দেবত্ব প্রকাশিত হবে। অন্নময় কোষ থেকে রূপান্তর ঘটবে আনন্দময় কোষে। অনুভবের আলো ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং পরিশেষে জ্বলতে থাকবে তার পূর্ণ দীপ্তিতে।

এপ্রসঙ্গে আরেকটি কথা আলোচনা করার অবকাশ রয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ উদ্ঘাটনের মধ্যে দুটি ধারাকে ক্রিয়াশীল দেখেছেন। এক—আরোহণের ধারা, অন্যটি—অবরোহণের ধারা। জড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রাণশক্তি যখন আরোহণের পথ অন্বেষণ করছে, তখন বিশুদ্ধ প্রাণশক্তি অবরোহণ করে তার সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে প্রাণের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটাচ্ছে। এমনি করেই জড়ের মধ্যে প্রাণের প্রকাশ ঘটেছে। একইরকমভাবে প্রাণের মধ্যে মনের বিকাশ সম্ভব হয়েছে। মন থেকে অতিমনের রূপান্তর ঘটবে সেই আরোহণ ও অবরোহণ প্রক্রিয়ার যুগপৎ ক্রিয়ায়। এতে রূপান্তরের কাজ ত্বরান্বিত হবে।

যেমন ধরা যাক, একটি নদীপথের উৎসে রয়েছে এক বিশাল পাথর। জলের ধারা চাইছে সেই পাথরটিকে সরাতে, কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না। পাথরের বাধায় জলের প্রবাহ বইছে ধীরে ধীরে। এমনই শীর্ণ হয়ে রয়েছে সেই নদী যে, তাকে নদী বলে চিহ্নিত করাই দুষ্কর। কিন্তু হঠাৎ যদি নদীর প্রচেষ্টার সঙ্গে বাইরের ঝড় এক আশীর্বাদের মতো এসে যুক্ত হয়, তখন সেই নদীর ধারাই পাথরটিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। উৎসের জল প্রকাশের পথ পেয়ে হয়ে উঠবে বেগবতী। পাথরটিকে গড়িয়ে নিয়ে যাবে তার পথচলার তালে তালে। আঘাতে আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে সেই বিশাল পাথর। শেষে তা হয়ে উঠবে বালিকণার মতোই সূক্ষ্ম। আপাত জড়ত্বের পিছনে এমন করেই স্তিমিত থাকে প্রাণের ধারা। জড়ত্বের পাথর গড়াতে শুরু করলে সেই প্রাণের ধারা হয়ে ওঠে প্রবল থেকে প্রবলতর। আর জড়ত্ব নেয় বালুকণার রূপ।

শ্রীঅরবিন্দ চেয়েছেন—মন থেকে অতিমনের রূপান্তরে শুধু প্রকৃতি নয়, এবার এগিয়ে আসুক মানুষের সাধনা। মানুষের মনরূপী এক বিশেষ শক্তি রয়েছে। সেই শক্তি তার সাধনাকে চালিত করবে, প্রকৃতির কাজকে ত্বরান্বিত করবে। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মানুষের মধ্যে চেতনে বা অচেতনে এই যোগক্রিয়া সদাসর্বদাই ঘটে চলেছে। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—"All life is yoga." তাঁর দৃষ্টিতে মন যখন এই যোগকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করবে, তখন তা হয়ে উঠবে 'Integral Yoga' এবং রূপান্তরের কাজ হয়ে উঠবে সহজতর ও দ্রুততর।

'Integral Yoga' কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতির ধ্যান বা মন্ত্র উচ্চারণ নয়। একাগ্রতার মধ্য দিয়ে, অন্তর্মুখী ও ঊর্ধ্বমুখী ভাবনার মধ্য দিয়ে, ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে এই যোগ সাধনা করতে বলেছেন তিনি। নিজেকে উন্মুক্ত করে মহাশক্তির আবেশকে গ্রহণ করতে হবে। বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা আর আত্মসমর্পণ। অর্থাৎ 'faith, aspiration and surrender' হবে এই যোগযাত্রার তিনটি পাথেয়।

আকাঙ্ক্ষা বা প্রার্থনা, আত্মসমর্পণ বা শরণাগতি এবং বিশ্বাস আপাতভাবে অদ্বৈতবোধের বিরোধী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভাবনাটি আদৌ অদ্বৈতের ভিত্তিভূমি বেদান্তের বিরোধী নয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬।১৮) সুস্পষ্টভাবে এই শরণাগতির কথা বিধৃত হয়েছে—

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।।"

অর্থাৎ যিনি পূর্বে হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টি এবং বেদসমূহ প্রকাশ করেছিলেন, মুমুক্ষু আমি সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের শরণ গ্রহণ করছি।

আশ্বাসের কথা এই যে, 'Integral Yoga'-র অবরোহণের দিকটি দেখার ভার শ্রীঅরবিন্দ নিয়েছেন নিজেই। তিনি মানসকে অতিমানসে রূপান্তরিত করার জন্য যেমন আরোহণের নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি অতিমানসের স্তরকে নামিয়ে এনেছেন পৃথিবীতে। সৃষ্টি করেছেন অলৌকিক দেবমুহূর্ত—"The hour of God." তবে সমস্ত জড় যে-কারণে প্রাণে রূপান্তরিত হয়নি—সেই কারণেই সমস্ত প্রাণ লাভ করেনি মনের শক্তিকে। আবার সেই একই কারণে সমস্ত মানস অতিমানসে রূপান্তরিত হবে—এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। যারা দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, তারা এগিয়ে যাবে। অন্যরা এগোবে ধীরগতিতে। তাই শ্রীঅরবিন্দ যে অতিমানসকে অবরোহণ করিয়েছেন, তার সুফল প্রাপ্তির জন্য আমাদের আরোহণের পথ ধরতে হবে। প্রার্থনা করতে হবে। শরণাগত হতে হবে প্রতিনিয়ত।

দুঃখের কথা, মানসিক উন্নতির দিক থেকে আমাদের অগ্রগতি বড় কম। নইলে বিশ্বজুড়ে কেন এত সঙ্ঘাত, এত হিংসার উন্মাদনা দেখা যাবে? নাসার প্রবীণ ব্লুমারিশ ঋষি এজিকেলের এক বর্ণনার ভিত্তিতে একটি কৃত্রিম উপগ্রহের পরিকল্পনা করেছেন। হয়তো এমনই এক কৃত্রিম উপগ্রহে চড়ে ভিন্ন জগতের একদল প্রাণী সেসময়ে পৃথিবীতে এসেছিল। ব্লুমারিশ মন্তব্য করেছেন, তাদের বিজ্ঞানের অগ্রগতি বর্তমান পৃথিবীর বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে অনায়াসে। কিন্তু যন্ত্র-পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে তাদের যে মানসিক অবস্থার পরিচয় মেলে—সেই হিতাকাঙ্ক্ষা, সেই উদারতা আমাদের মধ্যে প্রকাশ পায় না। আমাদের মন তুলনামূলকভাবে অনেক নিম্নস্তরে রয়েছে। মনের বিবর্তনের, মনের উন্নতির দিকে আমাদের নজর নেই। বর্তমান সভ্যতা শুধু কৌশলগত ও যন্ত্রবদ্ধ হয়ে রয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতিকে জয় করার প্রচেষ্টা থেকে এসেছে এই কৌশলগত উল্লম্ফন। জড় থেকে বেরিয়ে এসে প্রাণ তার আধিপত্য বিস্তার করতে ফিরে তাকিয়েছে জড়জগতের দিকেই। অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করার সমষ্টিগত চেষ্টা তেমন হয়নি।

মুখে শান্তির বাণী উচ্চারণ করলেই কি শান্তি আসে? কখনোই আসে না। এর প্রধান কারণ—শান্তির উৎস-সন্ধানে বিশেষ আগ্রহ দেখায় না আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা। 'এক' থেকে যখন 'বহু' এল, তখন আত্মরক্ষার তাগিদে যে-স্বার্থপরতা, যে-অহংবোধ আমাদের মধ্যে প্রবেশ করল তার অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার প্রয়াস আমাদের বিশেষ নেই। তবু আত্মরক্ষার প্রারম্ভিক স্তর পেরিয়ে এসে নিজের নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে আমাদের একত্বের রস আস্বাদন করতে হবে।

সৃষ্টির শুরুতে 'এক' হয়েছিল 'বহু'—নিজের অস্তিত্বকে সর্বত্র অনুভব করার জন্য। মধ্যে দুঃখ ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে ঘটে চলেছে বিভিন্ন ভাবনার ভিন্ন ভিন্ন একত্রীকরণ। আর শেষে 'বহু'র মধ্যে 'এক'-এর এবং 'এক'-এর মধ্যে 'বহু'র রসাস্বাদন ঘটবে। আচার্য শঙ্কর বলেছিলেন ঃ

"বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ কৌপিনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।।"

(কৌপীনপঞ্চকম্)

শ্রীঅরবিন্দের আশ্বাস শুধু কৌপীনবন্তের জন্য নয়। সমষ্টির জন্য। প্রতিটি প্রাণের জন্য। কারণ, ক্ষর এবং অক্ষরের অতীতে রয়েছেন পুরুষোত্তম—এই আশ্বাস তাঁর। ❑

এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ১২

পাশাপাশি ঃ (১) শিব, (২) অন্ন, (৩) শুক, (৪) দীক্ষা, (৫) বদ্ধ, (৬) গান, (৭) সিন্ধু, (৮) ভাই, (১০) বন্ধ, (১১) শব, (১২) হীরা, (১৩) দল, (১৪) মুক্তি, (১৫) মন, (১৬) মাঝে, (১৭) যন্ত্র, (১৯) নেতা, (২০) মত, (২১) শান্ত, (২২) গতি, (২৩) হস্ত, (২৪) ক্লান্তি, (২৫) পার, (২৬) শ্বাস, (২৭) মা।

ওপর-নিচ ঃ (১) শিক্ষা, (২) অন্ধ, (৩) শুন, (৪) দীন, (৫) বন্ধু, (৬) গাই, (৭) সিদ্ধ, (৮) ভাব, (৯) ধীরা, (১০) বল, (১১) শক্তি, (১২) হীন, (১৩) দগ্ধ, (১৪) মুঝে, (১৫) মন্ত্র, (১৬) মাতা, (১৭) যত, (১৮) জ্যান্ত, (১৯) নেতি, (২০) মস্ত, (২১) শান্তি, (২২) গল্প, (২৩) হর, (২৪) ক্লাস।

শব্দচেতনা ১২-এর সঠিক উত্তরদাতার নাম ঃ

কুন্তল মজুমদার, নন্দদুলাল ঘোষ, লীলাবতী ঘোষ, মুক্তি সেন, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত, দিলীপকুমার মৌলিক

অনুষ্ঠান-সূচী ঃ আশ্বিন ১৪০৯

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে

জন্মতিথি-কৃত্য ঃ **স্বামী অভেদানন্দ**
ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী
১৪ আশ্বিন, মঙ্গলবার
(১ অক্টোবর ২০০২)
স্বামী অখণ্ডানন্দ
ভাদ্র অমাবস্যা
১৯ আশ্বিন, রবিবার
(৬ অক্টোবর ২০০২)

পূজাতিথি-কৃত্য ঃ **মহালয়া**
ভাদ্র অমাবস্যা
১৯ আশ্বিন, রবিবার
(৬ অক্টোবর ২০০২)
শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা
আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী
২৫ আশ্বিন, শনিবার
(১২ অক্টোবর ২০০২)

একাদশী ঃ ৬, ২৯ আশ্বিন
বৃহস্পতিবার, বুধবার
(৩, ১৬ অক্টোবর ২০০২)

যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন

ভারতবর্ষ তথা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি সর্বত্র মানুষের মধ্যে একটি দুর্বিষহ অস্থিরতা, নিরাপত্তাবোধের অভাব এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা চোখে পড়ছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক ও ভোগবিলাসের ক্রমবর্ধমান প্রসারে নানান রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বাঙালি যুবগোষ্ঠী আজ দিশাহারা। বিবেকানন্দ-বর্তিকাই আজ তাদের ধ্রুবতারা, একথা ক্রমশ দিবালোকের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। অনেকের মনে নানান প্রশ্ন সময়ে সময়ে ওঠে, যার উত্তর তারা খুঁজে পায় না। প্রশ্নগুলি মূলত মূল্যবোধ এবং আদর্শভিত্তিক। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রবীণ সন্ন্যাসীদের কেউ কেউ ঐসব প্রশ্নের উত্তর দিতে অনুগ্রহ করে সম্মতি জানিয়েছেন। তাই 'যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন' শীর্ষক একটি বিভাগ খোলা হলো। আনন্দের বিষয়, এই বিভাগে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ।—সম্পাদক

ঃ নিয়মাবলী ঃ

'যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন' বিভাগে প্রেরিত (ক) প্রশ্নগুলি সুনির্দিষ্ট হওয়া চাই। (খ) প্রেরকের পুরো নাম, ঠিকানা ও বয়স উল্লেখ থাকা চাই। (গ) প্রেরকের বয়স অনূর্ধ্ব ৩০ হওয়া চাই। (ঘ) সব প্রশ্নই গ্রাহ্য হবে—এমন বলা যায় না। অনেক সময়ে এমন হতে পারে, একটি প্রশ্নের মধ্যে অন্যগুলির উত্তর সন্নিবেশিত হয়ে আছে। সেক্ষেত্রে প্রশ্নপ্রেরকের মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ নেই। কারণ, প্রশ্নের উত্তর পেলেই প্রশ্নকর্তা তৃপ্ত হবেন, আশা করি। তাঁর নাম প্রকাশিত হলো কি হলো না সে-ব্যাপারটি নিতান্তই গৌণ থাকুক, এই আবেদন জানিয়ে রাখি।—সম্পাদক

প্রশ্ন ঃ *স্বামীজী যুবসম্প্রদায়কে ব্রহ্মচর্য পালন করে চলার কথা বলেছিলেন। ভারতের মহান আচার্যগণও ব্রহ্মচর্যকে ঈশ্বরলাভের অন্যতম পথ বলে বারংবার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বর্তমান ভোগসর্বস্বতার যুগে, যখন পদে পদে নানা প্রলোভন আমাদের চারদিক থেকে হাতছানি দিচ্ছে, এই অবস্থায় কি ব্রহ্মচর্য রক্ষা করে চলা সম্ভব? যদি হয়, তাহলে কিভাবে?*

—কোহিনূর রায়, কলকাতা-৭০০ ০১৯

উত্তর ঃ হ্যাঁ কঠিন! কিন্তু সম্ভব। প্রত্যেক মানুষেই জৈবিক প্রবণতা কাজ করছে। ঐ প্রবণতাকে স্বাভাবিক দিক থেকে মোড় ফিরিয়ে উচ্চতর ও উচ্চতম স্তরে নিয়ে যাওয়াকেই ব্রহ্মচর্য পালন বলে। কিন্তু তা সহজে হয় না। সামনে এমন কোন আদর্শ বা আকর্ষণী শক্তি থাকা দরকার, যা মানুষের মনকে জৈবিক প্রবণতাগুলি থেকে ঘুরিয়ে দিয়ে উচ্চতর ও উচ্চতম আদর্শের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। একেই ইংরেজিতে বলে 'Sublimation' (অর্থাৎ সূক্ষ্মতর বা উচ্চতর স্তরে আরোহণ)। আর তা হতে গেলে মনকে ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়। ঈশ্বরকে ভালবাসতে হয়। মন-প্রাণ তাঁতে সমর্পণ করতে হয়। অবশ্য এই উপায় অবলম্বন সম্ভবপর না হলে অন্যান্য সৃজনাত্মক কাজকর্মের মধ্যে মনকে ডুবিয়ে রাখতে হয়। যেমন—সঙ্গীত, কলা, বিজ্ঞান ইত্যাদি। মূলকথা হচ্ছে মন কোন্ দিকে ধাবিত হচ্ছে অর্থাৎ স্থূলবিষয়ে না সূক্ষ্মবিষয়ে—তা সর্বদা লক্ষ্য রাখা দরকার এবং তার ওপরই নির্ভর করছে সবকিছু।

প্রশ্ন ঃ *আমাদের দেশে শক্তিদায়িনীরূপে বিভিন্ন তিথিতে মাতৃবন্দনা করা হয়। অথচ আবহমান কাল থেকেই অত্যাচারের শিকার হয়ে আসছে নারী। এর কারণ কি? মেয়েদের রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদানের অসুবিধা কোথায়?*

—সুমি আইচ, বারাসত, উত্তর চব্বিশ পরগনা

উত্তর ঃ মানুষের মধ্যে পাশবিক বা আসুরিক স্বভাবও রয়েছে, দৈবীস্বভাবও রয়েছে। মানুষ দৈবীস্বভাবকে পুষ্ট করতে পারলে তা নারীজাতিকে কেবল ভোগ্যবস্তুরূপে না দেখে ঈশ্বরের অংশরূপে শ্রদ্ধা করতে শেখায়। যখনি কোন জাতির মধ্যে দুর্বলতা প্রবল হয়, তখনি দৈবীভাব নষ্ট হয়ে আসুরীভাব প্রাধান্যলাভ করে। এই কারণেই নারীজাতির প্রতি অবহেলা ও অত্যাচার হয়ে থাকে। তাই আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের উচ্চ ভাবগুলি বজায় রেখে তার সঙ্গে আধুনিক গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ভাবকে সুদৃঢ় করতে পারলে নারীজাতির ওপর অত্যাচার বন্ধ হয়ে যেতে পারে। (আরো বিশদ আলোচনার জন্য এবারের 'কথাপ্রসঙ্গে' দ্রষ্টব্য—সম্পাদক)

'রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ' সন্ন্যাসীদের প্রতিষ্ঠান। একই আদর্শে গঠিত হয়েছে 'শ্রীসারদা মঠ' ও 'রামকৃষ্ণ সারদা মিশন'—যা সন্ন্যাসিনীদের দ্বারা পরিচালিত। এটি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের Sister Organisation। যেসকল মেয়েরা সন্ন্যাসের আদর্শ নিয়ে জীবনযাপন করতে চায়, তাদের নিয়েই শ্রীমা সারদাদেবীর নামে এই প্রতিষ্ঠান হয়েছে। সন্ন্যাসজীবন যাপনের জন্য সেখানেও মেয়েরা যোগদান করতে পারে।

প্রশ্ন ঃ *ইতিহাসে পড়ি, আদিম মানুষ প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজেদের অসহায় বোধ করত এবং বিভিন্ন বিরূপ শক্তিকে তুষ্ট করতেই ধর্মাচরণ করত। তদনুসারে প্রাচীন সভ্যতাগুলিতে সানগড, গড অফ রেন্স, থর ওডিন প্রভৃতি*

দেবদেবীর বেশির ভাগই প্রাকৃতিক শক্তির দ্যোতক, এমনকি মধ্যযুগেও খোদ বঙ্গদেশে সাপ ও বাঘ থেকে আত্মরক্ষার্থে মা মনসা ও দক্ষিণ রায় পূজিত হয়েছেন। আমার প্রশ্ন, তবে কি মানবসভ্যতায় ধর্মভাব ও ধর্মাচরণের সূচনা ভয়ভীতি বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে? প্রেম-ভক্তি থেকে নয়?

—সঞ্জয় দত্ত, গড়িয়া, কলকাতা-৭০০ ০৮৪

উত্তর ঃ শক্তির উৎস যাই হোক না কেন, মানুষের শক্তির প্রয়োজন তো আছেই। সেই শক্তিকে মানুষ যদি প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশে খুঁজে পায়—তা ভয়বশত বলা ঠিক নয়। মানুষ বর্তমানে যে পঞ্চেন্দ্রিয়গোচর স্তরে বাস করছে তা অতিক্রম করে প্রকৃতির রহস্যগুলি উদ্ঘাটনের চেষ্টা করে চলেছে। সেটিই ধর্মের মূল উৎস বলা যেতে পারে। ভয়ভীতির জন্যও কেউ কেউ এই শক্তির সাহায্য চাইতে পারে। তাকে অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, মানুষ সর্বতোভাবে জীবনযাত্রার বাধাবিঘ্নগুলিকে অতিক্রম করতে সচেষ্ট। কিন্তু এমন একটি সময় আসে যখন এই প্রচেষ্টাগুলি থাকে অতি সাধারণ স্তরে। অবশ্য প্রেম-ভক্তির মাধ্যমে সেই মহাশক্তিকে খোঁজ করাই শ্রেষ্ঠ উপায়।

স্বামী বিবেকানন্দ 'ধর্মের প্রয়োজন' বক্তৃতায় বলেছেন ঃ "প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে চেতন ব্যক্তিরূপে কল্পনা করা হইতেই ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে।" তিনি ঐ বক্তৃতাতেই আরো বলেছেন ঃ "বিভিন্ন ধর্ম হইতে এই একটি সত্যই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, এক সূক্ষ্ম অখণ্ড সত্তা আছে—যাহাকে কখনো আমাদের নিকট ব্যক্তিবিশেষরূপে, অথবা নীতিবাদরূপে, অথবা নিরাকার সত্তারূপে, অথবা সর্বানুস্যূত সারবস্তুরূপে উপস্থাপিত করা হয়। আমরা সর্বদাই সেই আদর্শে উন্নীত হইবার চেষ্টা করিতেছি। প্রত্যেক মানুষ যেমনই হউক বা যেখানেই থাকুক, তাহার অনন্ত শক্তি সম্বন্ধে একটা নিজস্ব আদর্শ আছে, প্রত্যেকেরই এক অসীম আনন্দের আদর্শ আছে। আমাদের চতুর্দিকে যেসকল কর্ম সম্পাদিত হয়, সর্বত্র যে কর্মচাঞ্চল্য প্রকটিত হয়, এগুলি অধিকাংশই এই অনন্ত শক্তি অর্জনের, এই অসীম আনন্দলাভের প্রচেষ্টা হইতে উদ্ভূত হয়।"

প্রশ্ন ঃ *যজ্ঞোপবীতধারী ব্রাহ্মণদের মতো আমরাও অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের মানুষেরা দেবতার শাস্ত্রবিহিত পূজার্চনা এবং ভোগনিবেদন করতে পারি কি? আমাদের কি শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজারতি করার অধিকার আছে?*

—অঞ্জন চৌধুরী, শিলচর, অসম

উত্তর ঃ বৈদিক যুগে এবং পরবর্তী কালেও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের যজ্ঞোপবীত ধারণের ও অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিকার ছিল। তাই শাস্ত্রবিহিত পূজার অধিকার যে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদেরই আছে তা ঠিক নয়। অবশ্য কিছু কিছু পূজাকার্যে ব্রাহ্মণদেরই অধিকার দেওয়া হয়েছে। তারও কারণ হিসাবে মনে হয় বহু শতাব্দী ধরে সমাজে প্রবর্তিত বিভিন্ন প্রথা ও তাদের ধারাবাহিক ব্যবহার। এগুলি বিভিন্ন সময়ে প্রবর্তিত হওয়ার পর ধারাবাহিকভাবে সমাজে চলে আসার ফলে মনে হচ্ছে যেন সমাজে বরাবরই ঐরূপ নিয়ম ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজারতি সবাই করতে পারেন। ভগবানের সঙ্গে ভক্তের ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে। ভক্ত যদি অনুরাগের সঙ্গে ভগবানের আরাধনা করেন, তাহলে তিনি তা অবশ্যই গ্রহণ করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ে ২৬নং শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।/ তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।।"

অর্থাৎ যে-ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তাঁর সেই ভক্তিপূত উপহার প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করি।

প্রশ্ন ঃ *স্বামী বিবেকানন্দ চরিত্রগঠনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আমিও স্বামীজীর আদর্শে চরিত্র গঠন করতে চাই। কিন্তু স্বামীজীর আদর্শে চরিত্র গঠন করব বললেই কি করা যায়? চরিত্র গঠনের জন্য বংশগত বা জিনগত এবং পরিবেশগত উপাদানগুলিও দায়ী নয় কি?*

—কার্তিক প্রামাণিক, বর্ধমান-৭১৩৪২২

উত্তর ঃ চরিত্রগঠনের পথে অনেক বাধা আসতে পারে। তা বংশগত হোক বা জিনগত হোক বা পরিবেশগত হোক—তাতে আমাদের কি আসে যায়। প্রকৃতি-সৃষ্ট সকলপ্রকার বাধা নিজের পুরুষকারের দ্বারা অতিক্রম করাই চরিত্রগঠন। যে-পরিমাণে আমরা জীবনে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারি, সেই পরিমাণেই চরিত্র গঠিত হয়। জীবনকে একটি challenge বলে নিতে হবে। আর এই জীবনের রহস্যকে আবিষ্কার করার উদ্দেশ্যে ঠিক ঠিক মন-প্রাণ দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে চরিত্রগঠন আপনা থেকেই হবে।

প্রসঙ্গ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ

'উদ্বোধন'-এর গত আশ্বিন ১৪০৮ সংখ্যায় স্বামী শিবপ্রদানন্দ রচিত 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সুধাসাগর-তীরে: উষার শুকতারা অমৃতলাল ও সূর্যময় আলাউদ্দিন' শীর্ষক সচিত্র নিবন্ধটি আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম। তিনি তাঁর প্রতিবেদনের এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ছিলেন কালীভক্ত। একজন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ হয়ে তাঁর কালীভক্তির যে-পরিচয় একদা পেয়েছি সে-প্রসঙ্গে সামান্য নিবেদন করতে চাই।

১৯৫১ সালের মার্চ মাস। নিউ দিল্লি কালীবাড়ির কর্তৃপক্ষ কালীবাড়ির প্রাঙ্গণে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সরোদবাদনের ব্যবস্থা করেন। যথাসময়ে তিনি মন্দিরের প্রধান গেটে উপস্থিত হন বটে, কিন্তু সঙ্গীতানুষ্ঠানের আসরে না গিয়ে তিনি সোজা কালীমন্দিরের দিকে এগিয়ে সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরে পৌঁছান এবং ভূমিষ্ঠ হয়ে মা কালীকে প্রণাম করেন। প্রণাম শেষে তিনি সঙ্গীতের আসরে পৌঁছান। বলা বাহুল্য, ঐ সন্ধ্যায় শহরের বহু সঙ্গীতপিপাসু ও শ্রোতা এই কিংবদন্তি মানুষটিকে দেখার ও তাঁর সরোদবাদন শোনার জন্য ভিড় জমিয়েছিলেন। ঐ স্মরণীয় সন্ধ্যায় তাঁর সরোদে রাগ 'দুর্গা' দিয়ে শুরু করেন। তাঁর সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করেছিলেন পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। সরোদে আলাপ শুরু করার তিন-চার মিনিট বাদেই মন্দিরে সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টা বেজে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ওস্তাদজী সরোদ বাজানো বন্ধ করে কোল থেকে সরোদটিকে তুলে তাঁর সামনে গালিচার ওপর রাখেন এবং দুহাত জোড় করে ও চোখ বন্ধ করে স্থির হয়ে বসে থাকেন। আরতি শেষে তিনি সরোদটিকে আবার কোলে তুলে নিয়ে বাজাতে থাকেন। উপস্থিত শ্রোতারা এই অশীতিপর বয়স্ক ব্যক্তির সরোদবাদন শুনে যেমন মুগ্ধ হয়ে যান, তেমন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী একজন মানুষের—যিনি নিষ্ঠার সঙ্গে দিনে পাঁচবার নামাজ পড়েন—মা কালীর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচয় পেয়ে অবাক হন।

স্বামী শিবপ্রদানন্দ মহারাজের নিবন্ধ থেকে জানা যায় যে, আলাউদ্দিন খাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর প্রতিও গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঐদিনই পেয়েছি যখন তাঁর বুকের দুদিকের জামার ওপর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ও শ্রীমা সারদাদেবীর ফটো সম্বলিত দুখানা লকেট লাগানো দেখেছি।

পীযূষকান্তি রায়
চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯

ডায়াবিটিসের পক্ষে 'কোজেন্ট ডিবি' ফলপ্রদ নয়

আমি বেশ কয়েক বছর যাবৎ সপরিবারে জাম্বিয়াতে থাকি। আমার জন্মভূমি থেকে বহুদূরে থাকলেও 'উদ্বোধন' পত্রিকার সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনের যোগাযোগ এবং আমাদের পরিবারের বেশির ভাগ সদস্যই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে দীক্ষিত।

২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে (আশ্বিন) 'উদ্বোধন' পত্রিকার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে 'ডায়াবিটিস রোগে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রগতি' নামে একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে ডায়াবিটিসের কয়েকটি ওষুধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, 'কোজেন্ট ডিবি' ডায়াবিটিসের পক্ষে বিশেষ উপকারী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গত দেড়বছর যাবৎ এই ওষুধটি নিয়মিত খেয়েও আমার কোন লাভ হয়নি। আমি ছাড়াও এখানকার আরো অনেকে এই ওষুধটি এক-দেড় বছর ধরে খেয়েও কোন ফল পাননি, সেরে যাওয়া তো বহুদূরের কথা।

কিছুদিন আগে ওষুধটির কেমিক্যাল অ্যানালাইসিস করে জানা গিয়েছে, বিটা কোষের ওপর এর কোনরকম কার্যক্ষমতা নেই। মনে হয়, পুরো ব্যাপারটিই ব্যবসাভিত্তিক প্রচার। প্রতিটি প্যাকেট ১৪০ টাকা করে এবং বছরে লাগে ৫২টি প্যাকেট, অর্থাৎ ৭২৮০ টাকা লাগে একবছর ধরে 'কোর্স' কমপ্লিট করতে। ভারতবর্ষে এইভাবে লোক ঠকিয়ে নানারকম ওষুধপ্রস্তুতকারক সংস্থা প্রচুর অর্থোপার্জন করে চলেছে। তাই 'উদ্বোধন'-পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানাই, 'কোজেন্ট ডিবি' ওষুধটি ব্যবহারের আগে যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা করা উচিত।

দীপঙ্কর ভৌমিক
লুসাকা, জাম্বিয়া

প্রসঙ্গ 'ভারতের গ্রামোন্নয়ন এবং স্বামী বিবেকানন্দ'

'উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪০৮ সংখ্যায় 'ভারতের গ্রামোন্নয়ন এবং স্বামী বিবেকানন্দ' শীর্ষক যে-নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে, সেটি অত্যন্ত সুলিখিত এবং প্রেরণাদায়ক। 'উদ্বোধন'-এর পৃষ্ঠায় এই ধরনের লেখা আমরা সর্বদা আশা করি। তবু না বললেই নয় বলে বলছি, তাতে সামান্য কিছু তথ্যগত ভুল চোখে পড়ল। নিবন্ধের পঞ্চম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে—"মহাত্মা গান্ধী স্বনির্ভর গ্রাম এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য বেছে নেন গুজরাটের ওয়ার্ধার নিকট সেগাঁও, যাঁর নতুন নামকরণ হয় সেবাগ্রাম।" তথ্যটি সঠিক নয়, কারণ ওয়ার্ধা গুজরাটে নয়, মহারাষ্ট্রে—নাগপুরের কাছে। গুজরাটে (আমেদাবাদে) গান্ধীজী যে মূল সবরমতি আশ্রম স্থাপন করেন, তাও গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি বহুধা কর্মযজ্ঞের কেন্দ্র ছিল।

স্বাধীন ভারতে পঞ্চাশের দশকে বহুখ্যাত সরকারি সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প যেমন চালু হয়, ঐসময়ই বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে মিশনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয় 'জনশিক্ষা মন্দির' কর্মশালা। প্রকৃত গরিব, বঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া সমাজের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বৃত্তিমূলক এবং স্বনিযুক্তি ও স্বনির্ভর উদ্দেশ্যভিত্তিক বিস্তৃত কর্মপ্রবাহ গ্রামবাংলায় নিঃশব্দ বিপ্লবের মতো তার ব্রত আজও চালিয়ে যাচ্ছে।

উক্ত নিবন্ধের শেষ পৃষ্ঠায় 'স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"স্বামী বিবেকানন্দ অর্থনীতিবিদ্ ছিলেন না।" সসঙ্কোচে বলি—কথাটা ঠিক হলো না বোধহয়। স্বামীজী কি যে ছিলেন না, কি জানতেন না তার মূল্যায়ন কে করবে? ভুলে গেলে চলবে না, নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ঠাকুরের 'আঠারো কলা'র প্রশংসা। স্বামীজীর মতো জ্ঞান-প্রতিভা-মেধাসম্পন্ন মনীষী এপর্যন্ত কেউ জন্মায়নি। যোগ ও আধ্যাত্মিক শক্তির বলে তিনি দিব্যদৃষ্টিতে সর্ববিষয়েই সত্যস্বরূপের অনায়াস উপলব্ধি করতে পারতেন। এমন বিশ্বপথিক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী কজন এসেছেন, যিনি পাহাড় সমুদ্র জঙ্গল ডিঙিয়ে দুঃখীর ক্রন্দন শুনেছেন, হৃদয় মিলিয়েছেন? শুধু তিনি চেয়েছিলেন কিছু শুদ্ধাত্মা সর্বত্যাগী কর্মী, যারা দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করবে, আর কিছু আবশ্যকীয় অর্থ। সেই অর্থ ভিক্ষা করতেই তাঁকে বহুকাল ইউরোপ-আমেরিকায় থাকতে হয়েছিল।

দুঃখ ও লজ্জার বিষয়, স্বাধীনোত্তর ভারতে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থায় গ্রামোন্নয়নের কিছু কাজ হলেও এদেশে শুদ্ধ চরিত্র ও ত্যাগাদর্শের অভাবে সবই যেন 'ভস্মে ঘি'। দেশের নেতাদের এবং প্রতিটি কর্মীর যেদিন স্বামীজীর মতো প্রাণ কাঁদবে, সেদিনই দেশোন্নয়ন ঘটবে। কারণ, "চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না"।

বিমলেন্দু মুখোপাধ্যায়
উত্তরপাড়া, হুগলী-৭১২২৫৮

প্রসঙ্গ শ্রীঅরবিন্দের চাকরি

'উদ্বোধন'-এর গত ফাল্গুন ১৪০৮ সংখ্যায় শ্রীঅরবিন্দের আই. সি. এস. পরীক্ষা ও চাকরি প্রসঙ্গে অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যের সঙ্গে আরো কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি, যেখানে তাঁর চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার কোন উল্লেখ নেই। একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করেন : "আপনি আই. সি. এস. পরীক্ষার আদৌ বসলেন কেন? আর কি কোন প্রেরণায় (যোগের) অশ্বারোহণ হতে বিরত হন?" উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলেন : "না, না, যোগের কোন অভিজ্ঞতাই আমার সেসময় ছিল না।" বস্তুত, শুধুমাত্র পিতার ইচ্ছানুসারে তিনি পরীক্ষায় বসেন। প্রশাসনের কাজে তাঁর আদৌ কোন আকর্ষণই ছিল না। তাঁর আগ্রহ ছিল কবিতা ও সাহিত্যে, বিভিন্ন ভাষা শিক্ষায় ও দেশের স্বাধীনতা প্রয়াসে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রীঅরবিন্দই একমাত্র ভারতীয়, যাঁর নাম ১৯৫০ সালে সুইডিস অ্যাকাডেমির কাছে তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রায় সব রাজ্যের বিশিষ্ট নাগরিকেরা সম্মিলিতভাবে পাঠান। নোবেল কমিটির কাছে এই প্রস্তাব পেশ করেন ১৯৪৫ সালের 'নোবেল লরিয়েট' চিলির গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল এবং সমর্থন করেন ১৯৩৮ সালের 'নোবেল লরিয়েট' আমেরিকার পার্ল বাক। কিন্তু ১৯৫০ সালে শ্রীঅরবিন্দের মহাসমাধি সূচনাতেই এই সম্ভাবনার ইতি টেনে দেয়। (দ্রঃ শৃঙ্খল, ৫০তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, পৃঃ ৩৪৩)

নীরদবরণ চক্রবর্তী লিখেছেন : "১৮৯২-এর অক্টোবর মাসে শ্রীঅরবিন্দ কেমব্রিজ ছেড়ে লণ্ডনে চলে আসেন। অশ্বারোহণে পাশ করার আরেক সুযোগ পান ১৫ নভেম্বর। শ্রীঅরবিন্দ ঐদিন পরীক্ষাকেন্দ্রে না যেয়ে লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেন। সন্ধ্যায় বাড়ি এসে বড় ভাই বিনয়ভূষণকে বললেন, 'আমি বয়ে গেছি।' কিছুক্ষণ পরে মেজভাই মনোমোহন বাড়িতে এসে যখন খবরটা শুনলেন, তিনিও চিৎকার-চেঁচামেচি করে বাড়ি ফাটাতে থাকলেন। এত সবের মধ্যেও শ্রীঅরবিন্দ নিশ্চুপ নিরুদ্বিগ্ন। শুধুমাত্র মনোমোহনই নয়, শ্রীঅরবিন্দের এইরূপ ব্যবহারে তাঁর শিক্ষক প্রথেরো ও কটন সাহেব উভয়েই খুব বিচলিত হন। তাঁদের মতে, শ্রীঅরবিন্দের প্রতি ঘোরতর অবিচার হয়েছে। তাঁরা কর্তৃপক্ষের নিকট চিঠি লিখলেন। এই দুই পত্রে কাজ হয়েছিল এবং কর্তৃপক্ষ শ্রীঅরবিন্দকে আরেকটি সুযোগ দিতে স্বীকৃত হলেন। কিন্তু তাঁরা শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হন। শ্রীঅরবিন্দ অশ্বারোহণে অকৃতকার্যতার জন্য আই. সি. এস. পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারলেন না।" (সর্বকালের সার্বজনীন শ্রীঅরবিন্দ, পৃঃ ১৩-১৪)

তবে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় রেকর্ড মার্কস পেয়ে আই. সি. এস. পরীক্ষায় শ্রীঅরবিন্দ চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। মোহিতকুমার বসাকের মতে—"কিন্তু এখনও অনেক বাকি। এই ডিগ্রি পেতে হলে অন্তত দুবছর তাঁকে শিক্ষানবিশ থাকতে হবে। আর তারপর? তারপর শেষ পরীক্ষা ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষা। শিক্ষানবিশ রইলেন অরবিন্দ। শেষও হলো দুটো বছর কালের অগ্রগতিতে।" (অরবিন্দ স্মৃতি, পৃঃ ১২) এই শিক্ষানবিশ থাকাকে চাকরি হিসাবে ধরলে সমস্যা মিটে যায়। কিন্তু এই তথ্যও নির্ভুল বলে মনে হয় না। কারণ, তিনি আই. সি. এস. পাশ করলেন ১৮৯২ সালের আগস্ট মাসে। আর ১৮৯২ সালের ১৫ নভেম্বর অশ্বারোহণের জন্য দ্বিতীয়বার সুযোগ পান। এখানে মাত্র আড়াই মাসের ব্যবধান। তারপর ১৮৯৩ সালের ১২ জানুয়ারি তিনি ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করেন। কাজেই তাঁর চাকরি ও বরখাস্ত হওয়ার ব্যাপারে কোন বিতর্ক নয়, এই বিষয়ে কেউ আলোকপাত করতে পারলে আমাদের জিজ্ঞাসু মন পরিতৃপ্ত হবে। নতুবা তাঁর বাণীই আমাদের সান্ত্বনা—"Neither you, nor anyone knows anything at all of my life; it has not been on the surface for men to see."

প্রহ্লাদচন্দ্র প্রধান
বাহারপোতা, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৫১

ধূমকেতুর কাহিনী

শৈবালকুমার গুহ

গ্রহ-উপগ্রহ ছাড়া আকাশে মাঝে মাঝে আরেকরকম জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হয়। এদের বলা হয় 'ধূমকেতু' (Comet)। এদের ঝাঁটার মতো আকৃতি সহজেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ধূমকেতু হঠাৎ একসময় আকাশের কোণে দেখা দেয় এবং দিন দিন এর রূপ ম্লান থেকে ম্লানতর হয়ে শেষে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রথম আবির্ভাবের সময় ধূমকেতুকে একটি উজ্জ্বল আলোকপিণ্ডের মতো দেখায়। কিন্তু এরা সূর্যের যত কাছে আসতে থাকে, এদের উজ্জ্বল ধোঁয়ার মতো 'পুচ্ছ'টি তত স্পষ্ট হতে থাকে।

ধূমকেতুর আবির্ভাব বিরল এবং আকস্মিক। তাই প্রাচীনকালে এই আবির্ভাব মানবসমাজের পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গলজনক বলে বিবেচিত হতো। তখন লোকের ধারণা ছিল যে, ধূমকেতু দেখা দিলে রাজার মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি অমঙ্গলজনক ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডমণ্ড হ্যালি সর্বপ্রথম গণনা করে দেখান যে, ধূমকেতুদের মধ্যে অনেকেই সৌরজগতের অধিবাসী এবং অন্যান্য গ্রহের মতো তারাও নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে। কাজেই এদের আবির্ভাবের সঙ্গে লোকসমাজের অমঙ্গলের কোন সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়, আর ধূমকেতু দেখে অযথা আতঙ্কিত হওয়ারও কোন কারণ নেই।

ধূমকেতু সম্পর্কে অনেকেরই অভিমত যে, এরা সৌরজগতের বাইরের অধিবাসী। মহাশূন্যে ঘুরতে ঘুরতে এরা হয়তো দিক্‌ভ্রান্ত পরিব্রাজকের মতো দৈবাৎ সৌরজগতে প্রবেশ করে। যেগুলির গতিবেগ কম থাকে, সেগুলি আর সৌরজগতের আকর্ষণ এড়িয়ে মহাশূন্যে ফিরে যেতে পারে না। অন্যান্য গ্রহের মতো সূর্যের বিপুল আকর্ষণে বাঁধা পড়ে তারই চারদিকে উপবৃত্তাকার (Elliptic) পথে ঘুরতে থাকে। এদেরই নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হতে দেখা যায়। কিন্তু যে-ধূমকেতুর গতিবেগ খুব বেশি থাকে, সেটি দৈবাৎ সৌরজগতে প্রবেশ করলেও অনায়াসে সূর্যের এবং অন্যান্য গ্রহের আকর্ষণজনিত বল এড়াতে পারে, তাই তা অল্পদিনের মধ্যে অধিবৃত্তাকার (Parabolic) কিংবা পরাবৃত্তাকার (Hyperbolic) পথে আবার মহাশূন্যে ফিরে যায়। বলা বাহুল্য, এমন ধূমকেতু একবার দেখা দিয়েই হারিয়ে যায় মহাশূন্যের অসীম অন্ধকারে।

১৩৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যেসব ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল, তাদের মধ্যে অন্তত ২৪টি উজ্জ্বল ধূমকেতুর কক্ষপথ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে সক্ষম হন জ্যোতির্বিজ্ঞানী হ্যালি। শুধু তাই নয়, ১৫৩১, ১৬০৭ এবং ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে আবির্ভূত তিনটি ধূমকেতুর কক্ষপথের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে তাঁর ধারণা হয় যে, এরা আসলে একই ধূমকেতু। এজন্য তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, ধূমকেতুটি আবার ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে ফিরে আসবে। হ্যালির মৃত্যুর পর ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে বিস্ময়বিমূঢ় জগদ্বাসী লক্ষ্য করল যে, ঐ ধূমকেতুটি সত্য সত্যই আবার ফিরে এসেছে। সেই থেকে ঐ ধূমকেতুটি হ্যালির নামেই নামাঙ্কিত হয়ে আছে। সূর্যের কাছে ফিরে আসতে এর প্রায় ৭৫ বছর লাগে। হ্যালির ধূমকেতুকে আবার ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে দেখা গিয়েছে।

যেসব ধূমকেতুর গতিপথ উপবৃত্তাকার বলে প্রমাণিত হয়েছে, তাদের প্রত্যেকটিকেই যে পুনরায় দেখা যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তার কারণ একাধিক। পর্যবেক্ষণের সামান্য ত্রুটির জন্য গণনার ভুল হওয়া বিচিত্র নয়। গ্রহদের আকর্ষণজনিত বলের প্রভাবে ধূমকেতুর গতিপথ পরিবর্তিত হওয়া খুবই সম্ভব, বিশেষত সৌরজগতের ভিতর দিয়ে চলার সময় ধূমকেতুটি যদি দৈবাৎ কোন বড় গ্রহের সন্নিকটে উপস্থিত হয়। আবার গ্রহ-উপগ্রহের আকর্ষণজনিত বলের প্রভাবে ধূমকেতুটি ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে। এরকম কয়েকটি ধূমকেতুর বিবরণ আমাদের জানা আছে।

বিজ্ঞানী চাঁদনার গণনা করে দেখান যে, একটি ধূমকেতুর পরিক্রমণকাল ছিল ২৭ বছর। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে সেই ধূমকেতুটি দৈবাৎ বৃহস্পতির খুব কাছ দিয়ে যায়। এর ফলে এর গতিপথ বদলে যায় এবং নতুন পথে এর পরিক্রমণকাল দাঁড়ায় মাত্র ৭ বছর। এই অবস্থায় একে নতুন করে আবিষ্কার করা হয় ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে, তখন এটি 'ব্রুক্সের ধূমকেতু' বলে পরিচিত হয়। শুধু তাই নয়, পরীক্ষার ফলে আরো বোঝা গেল যে, ঐসময় ধূমকেতুটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। এর পর থেকে দেখা গেল, বিচ্ছিন্ন অংশদুটি পরস্পর থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে।

বায়েলার ধূমকেতুটি প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে। তখন এর পরিক্রমণকাল ছিল ৬.৬ বছর। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে এটি হঠাৎ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। বিচ্ছিন্ন অংশদুটিকে পুনরায় ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে দেখা গেল, কিন্তু এবারে তাদের মধ্যে ব্যবধান আগের চেয়ে অনেক বেশি। এরপর আর এই অংশদুটির কোনটিকেই ফিরে আসতে দেখা যায়নি। কিন্তু ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে যখন পৃথিবী পূর্বোক্ত

ধূমকেতুর কক্ষপথ অতিক্রম করছিল, তখন প্রচুর উল্কাপাত হতে দেখা গেল। বিজ্ঞানীদের অনুমান, বায়েলার ধূমকেতুটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে অসংখ্য উল্কাপিণ্ডে পরিণত হয়েছে।

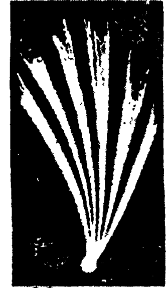
কয়েকটি ধূমকেতুকে খালি চোখেই দেখা যায়, আবার কতকগুলিকে দেখার জন্য দূরবিনের সাহায্য নিতে হয়। ধূমকেতুর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মতো। সূর্য থেকে যখন দূরে থাকে, তখন এরা একেবারে অদৃশ্য থাকে। সূর্যের কাছে এলে এদের প্রথমে খানিকটা পুঞ্জীভূত মেঘের মতো দেখা যায়। আরো কাছে এলে ক্রমশ এদের 'মস্তক' ও 'পুচ্ছ' স্পষ্ট দেখা যায়। মস্তকে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল একটি 'নিউক্লিয়াস' (Nucleus) বা কেন্দ্রবিন্দু এবং তার চারদিকে স্বল্পোজ্জ্বল কুয়াশার আবরণের মতো 'কোমা' (Coma) দেখা যায়। ক্রমে মস্তক থেকে একটি দীর্ঘ উজ্জ্বল পুচ্ছ বেরিয়ে আসে। ধূমকেতু যখন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তখন তার পুচ্ছটি যেন সূর্যের ঠিক বিপরীত দিকে বিক্ষিপ্ত হতে থাকে। এজন্য ধূমকেতু তার কক্ষপথে যখন সূর্য থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকে, তখন তার পুচ্ছটিই আগে আগে চলতে থাকে, পিছনে পড়ে থাকে না।


এডমণ্ড হ্যালি (১৬৫৬-১৭৪২ খ্রিঃ)


হ্যালির ধূমকেতু (১৯১০-১৯১১ খ্রিঃ)


ডোনাটির ধূমকেতু (১৮৫৮ খ্রিঃ)


ধূমকেতু বেনেট (১৯৭০ খ্রিঃ)


চিসিয়ুক্সের ধূমকেতু (১৭৪৪ খ্রিঃ)

ধূমকেতুর মস্তক আকারে একটি গ্রহের চেয়ে বড় হতে পারে, আর তার ঝাঁটার মতো পুচ্ছটি লম্বায় কয়েক কোটি মাইল হওয়াও বিচিত্র নয়। আয়তনে এত বড় হওয়া সত্ত্বেও এর ওজন এত কম যে, এর পক্ষে গ্রহ তো দূরের কথা— সামান্য একটা উপগ্রহের গতি পরিবর্তন করাও সম্ভব হয় না। অনেকের অনুমান, ধূমকেতুর মস্তকটি কতকগুলি জড়কণা দিয়ে গঠিত, তবে এই জড়কণাগুলি পরস্পর থেকে বেশ খানিকটা দূরে দূরে রয়েছে। ধূমকেতুর দেহে খানিকটা গ্যাসও থাকে। ধূমকেতুতে এরূপ গ্যাসের পরিমাণ এত কম যে, দৈবাৎ যদি ধূমকেতুর পুচ্ছের সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষও হয় তবু আমরা কিছুই টের পাব না।

গ্রহদের মতো ধূমকেতুর মস্তক থেকেও সূর্যালোক প্রতিফলিত হয় বলে তাকে উজ্জ্বল দেখায়। বিজ্ঞানীদের মতে ধূমকেতুর দীপ্তিমান হওয়ার আরেকটি কারণ, সূর্য থেকে অবিরত যে ইলেকট্রন-স্রোত প্রবাহিত হয় তারই সংঘাতে হয়তো কম চাপের গ্যাসের আয়নীভবন (Ionisation) প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয় এবং তারই ফলে একরকম দীপ্তি দেখা যায়, যেমন বায়ুশূন্য নলে তড়িৎপ্রবাহ পাঠিয়ে ক্যাথোড রশ্মি (Cathode rays) পাওয়া যায়। ধূমকেতুর পুচ্ছটি কিন্তু ভারি অদ্ভুত! দেখে মনে হয়, ধোঁয়ার মতো সূক্ষ্ম খানিকটা জড়বস্তু যেন মস্তক থেকে বহুদূর পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞানীদের অনুমান, ধূমকেতুর লেজের অংশটি এত সূক্ষ্ম জড়বস্তু নিয়ে গঠিত যে তা সূর্যকিরণের প্রবল স্রোতে বহুদূর পর্যন্ত ভেসে গেছে, তাই ধূমকেতুর এমন ঝাঁটার মতো আকৃতি আমরা দেখতে পাই। এসব জড়কণিকার আকার খুব ছোট, তাই তার ওপর সূর্যের আকর্ষণজনিত বলের তুলনায় সূর্যকিরণের চাপ আরো বেশি প্রবল হয়।

বিভিন্ন ধূমকেতুর পুচ্ছে আবার নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। কারো পুচ্ছ থাকে একটি, আবার কারো দুটি। কোন কোন ধূমকেতু আবার বহুপুচ্ছবিশিষ্ট। একাধিক পুচ্ছবিশিষ্ট ধূমকেতুর আলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, তাতে বিভিন্নরকম গ্যাস আছে, তার কোনটি হয়তো ভারি আর কোনটি হালকা। বিভিন্ন গ্যাসের ওজন বিভিন্ন বলে তাদের বিক্ষিপ্ত হওয়ার মাত্রাও বিভিন্ন। তাই ধূমকেতুর পুচ্ছের গঠনে বৈচিত্র্য দেখা যায়। হাইড্রোজেন হালকা বলে সোজা উঠে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, কার্বনের কোন যৌগ গ্যাসীয় অবস্থায় থাকলে তা ওজনের ভারে ঈষৎ বেঁকে যায়, আর ধাতব গ্যাস থাকলে ওজনের ভারে তা আরো বেঁকে যায়। এভাবে পৃথক পৃথক পুচ্ছের সৃষ্টি হয়।

ধূমকেতু আকাশের একটি দর্শনীয় জ্যোতিষ্ক সন্দেহ নেই, কিন্তু সৌরজগতে এর প্রভাব-প্রতিপত্তি বিশেষ নেই বললেই চলে। তার কারণ, আয়তনে বিশাল হলেও এতে পদার্থ বিশেষ কিছু নেই। বস্তুত, একটা ক্ষুদ্র গ্রহকণিকাতে যেটুকু পদার্থ তাও এর পক্ষে যথেষ্ট। ❑

সারা বুলের 'সন্ত' হওয়ার এক মনোজ্ঞ ইতিবৃত্ত

স্বামী সত্যাত্মানন্দ



Saint Sara
Pravrajika Prabuddhaprana
Published by :
Pravrajika Amalaprana
General Secretary,
Sri Sarada Math
Dakshineswar, Kol-76
***Pages :* 20+536+12**
***Price :* Rs. 150.00**

স্বামীজী যখন আমেরিকায় বেদান্তের বাণী প্রচার করছিলেন, তখন বহু নরনারী তাঁর সু-উচ্চ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে তাঁর গুণমুগ্ধ হয়েছিলেন। এইসময় কিছু অসুখী খ্রিস্টান ধর্মযাজক তাঁকে নানাভাবে আক্রমণ করলে সেখানকার কিছু ধর্মপ্রাণ উদার মহীয়সী মহিলা তাঁকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং সেইসব আক্রমণ তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিহত করতে সাহায্য করেছিলেন। এঁদের অনেকে তাঁর একান্ত অনুগত শিষ্যাও হয়েছিলেন। মিস সারা চ্যাপম্যান বুল তাঁদের অন্যতম।

ছোটবেলা থেকেই ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে তিনি উদার ও গোঁড়ামিমুক্ত ছিলেন এবং পরবর্তী কালে পুরুষশাসিত সমাজে নারীমুক্তি ও নারীদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সচেতন (যা তিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন) হয়ে উঠেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্বে কিছুদিন অলৌকিক বিষয়ে (থিওজফি) তাঁর আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। পরে ভারত থেকে আগত ধর্মপ্রচারক মোহিনীমোহন চ্যাটার্জির সংস্পর্শে ধর্মবিষয়ে তাঁর সহজাত উদার ও যুক্তিগ্রাহ্য একটি দর্শন গড়ে ওঠে। ক্রমশ তিনি ভারতীয় উদার ধর্মমতের প্রতি আকৃষ্ট হন। শিকাগো ধর্মমহাসভার পর ১৮৯৪ সালের জুলাই মাসে গ্রীন-একর ধর্মসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচয় সারা বুলের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আনে। স্বামীজীর মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন সত্য ও ভালবাসার এক প্রতিমূর্তিকে, আবিষ্কার করলেন এক মহাজীবনকে। স্বামীজীকে তিনি গুরুপদে বরণ করলেন। স্বামীজী তাঁকে 'মা' বলে সম্বোধন করতেন। স্বামীজী তাঁর মধ্যে দেখেছিলেন শক্তি, মুক্তি ও সাহসিকতার প্রতিফলন।

আমেরিকায় থাকাকালীন ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে স্বামীজী দুটি বিষয় শিখেছিলেন। এক—সংগঠন তৈরি করে কাজ করা; দুই—জগতের উন্নতিকল্পে স্ত্রীজাতির উন্নয়ন। এই দ্বিতীয় কাজের দায়িত্ব তিনি দুজনের ওপর দিয়েছিলেন। তাঁরা হলেন সারা বুল ও ভগিনী নিবেদিতা। স্বামীজী বলেছিলেন : "Mrs. Ole Bull is a saint, a real saint, whom to see is a pilgrimage."

নরওয়েবাসী প্রসিদ্ধ বেহালাবাদক ওলি বুলের বিধবা পত্নী, বিদুষী, ধনে-মানে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিতা সারা বুল সংসারের কঠিন দায়িত্ব পালন করেও বিরাট মাতৃত্বের সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। এই কাহিনী প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা রচিত **'Saint Sara'** গ্রন্থে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আমেরিকায় বেদান্ত ধর্মপ্রচারে স্বামীজী বিশেষভাবে দুজনের ওপর নির্ভর করতেন—সারা বুল ও মিস ম্যাকলাউড। "In Mrs. Bull and Miss McLeod I have very strong friends. They stand by me here, through thick and thin." ব্যক্তিগতভাবে স্বামীজীর আর্থিক ব্যাপারে সবরকম ঝক্কি সামলানো, স্বামীজীর গভীর আবেগপ্রবণ মনকে, যা আমেরিকায় বেদান্ত ধর্মপ্রচারে গোড়ার দিকে বিঘ্ন ঘটাতে পারত, মায়ের মতো আশ্রয়দান এবং খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সারা বুল যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন। স্বামীজী তাঁর মধ্যে সাংগঠনিক শক্তি ও বুদ্ধির পরিচয় পেয়েছিলেন। স্বামীজীর অনুপস্থিতিতে ভিন্ন রুচিসম্পন্ন আমেরিকান শিষ্য-শিষ্যা ও অনুরাগীদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা, পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও তাঁদের দিয়ে বেদান্ত সমিতিসমূহের দৃঢ় ভিত্তি নির্মাণ ও বেদান্ত প্রচারের কাজ চালানোর দুঃসাহসিক কাজও তিনি করেছেন। এসব কাজে তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও দূরদৃষ্টি ছিল।

একাধারে 'গুরু' ও 'সন্তান' স্বামীজীকে ভালবেসে তিনি ভারতবর্ষে স্বামীজী-প্রবর্তিত সেবাযজ্ঞেও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ভারতে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, শিল্প ও বিজ্ঞানের বিকাশে তাঁর সাহায্য ও অনুপ্রেরণা, স্বামীজী ও তাঁর গুরুভাইদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও অর্থসাহায্য, স্বামীজীর বক্তৃতাসমূহ প্রকাশনার দায়িত্ব, রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষত্রাণে অর্থসাহায্য, নারীজাতির উন্নয়নে নিবেদিতার স্কুল প্রতিষ্ঠায় ও অর্থসংগ্রহে সাহায্য, বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু ও ওকাকুরাকে গবেষণা ও শিল্পে সাহায্যদান প্রভৃতি ঘটনা তাঁর গুরুর প্রতি ভালবাসার নিদর্শন। বেদান্তকে বাস্তব কর্মজীবনে প্রয়োগ করে 'আমিত্ব' মোছার এ ছিল এক গোপন ও নীরব সাধনা। একসময় রামকৃষ্ণ মিশনের ট্রাস্ট ডিডে তাঁর নাম রাখার কথাও স্বামীজী ভেবেছিলেন। "In India Raja Ajit Singh of Khetri, and in America Mrs. Ole Bull—these are two persons on whom I can depend at anytime. Of all the friends, I

have in the world you two show such wonderful steadiness of purpose, and both are so calm and silent that it was only when the results came that people could infer that they were working."—স্বামীজী বলেছিলেন।

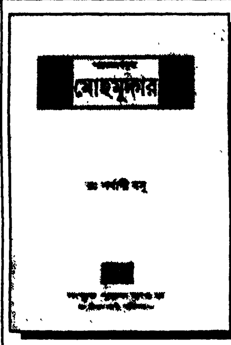
শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন : "সারার কত বড় হৃদয় দেখেছ? নরেন ছাড়া আর কারুর এত বড় হৃদয় নেই।" উল্লেখ্য, শ্রীশ্রীমার প্রথম ছবি, যে-ছবি আমরা এখন মন্দিরে পূজা করি, ক্যামেরাতে তোলার ব্যবস্থা সারা বুলই করেছিলেন। শ্রীগুরু সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন এক অমূল্য উপদেশ—"One should listen to and obey all his (a Guru or teacher) directions for spiritual advancement. But in things temporal, one could most truly serve a Guru by using one's best discernment, even if at times it were not in agreement with the suggestions given." (p. 273)—যা তিনি নিজের জীবনে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন।

স্বামী সারদানন্দজী বলেছিলেন : "Sara was chosen by the divine will to be one of the few main pillars of Sri Ramakrishna's work. She carried this responsibility like a Queen."

রামকৃষ্ণ-বেদান্ত ভাবান্দোলনের ইতিহাস—এদেশে ও বিদেশে, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের গোড়াপত্তন, বেলুড় মঠের প্রাথমিক পর্যায় ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কথা, অনেক তথ্য এই গ্রন্থটি পড়লে জানা যাবে। কুড়িটি অধ্যায়ে বিভক্ত গবেষণাধর্মী পাঁচশ পাতার এই গ্রন্থটিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য ব্যক্তিগত চিঠি ও ছবির সংযোজন (যার অধিকাংশ মেরি লুইস বার্কের সংগ্রহশালা থেকে পাওয়া)—গ্রন্থটির আকর্ষণ ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। সারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের প্রথম সাধারণ সম্পাদিকা পূজনীয়া প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণাজী (যিনি গ্রন্থটি লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন) ও মেরি লুইস বার্ক ('সিস্টার গার্গী' নামে সমধিক পরিচিতা)-এর উদ্দেশে নিবেদিত গ্রন্থটি পড়ে পাঠক-পাঠিকা, বিশেষত মায়েরা সারা বুলের শিক্ষা-সংস্কৃতি-সংগঠনী শক্তি-ভক্তি ও মুক্তি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবেন ও ভারতবর্ষের উন্নতিকল্পে নিজেদের নিয়োজিত করবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।□

আত্মজ্ঞান মোহনাশক

দেবব্রত দাস



শঙ্করাচার্যকৃত মোহমুদ্গর
সম্পাদিকা :
ডঃ শর্বাণী বসু
প্রকাশক :
দেবাশিস ভট্টাচার্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণি
কলকাতা-৭০০ ০০৬
পৃষ্ঠা : ১২+৩৪
মূল্য : ১২ টাকা

...হমুদ্গর' আদি শঙ্করাচার্যের (৭৮৮—৮২০/৮২১ খ্রিস্টাব্দ) একটি অনবদ্য দার্শনিক রচনা। শঙ্করাচার্যের মতে, আসক্তিই মোহ—যাকে অজ্ঞানতা বলা যেতে পারে। এই অজ্ঞানতাই আমাদের বন্ধনের কারণ। আত্মজ্ঞানই পারে এই মোহরূপ অজ্ঞান থেকে মানুষকে মুক্ত করতে। আত্মজ্ঞানই হলো সেই মুদ্গর, যার প্রহারে মোহরূপ অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। শঙ্করাচার্যের এই দৃষ্টিভঙ্গি যথার্থভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে বইটির সম্পাদিকা ডঃ শর্বাণী বসু-কৃত মুখবন্ধে।

মূল 'মোহমুদ্গর' ৩৭টি শ্লোকে সম্পূর্ণ। তার মধ্যে প্রথম ১৬টি শ্লোকে 'আত্মজ্ঞান' সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। ষোড়শ শ্লোকে 'জীবন্মুক্তি'র ধারণা এল—"নির্মোহত্বে নিশ্চলিতত্বং নিশ্চলিতত্বে জীবন্মুক্তিঃ"—মোহমুক্ত হওয়ার জন্য স্থৈর্য আসে, আর তখনি জীবন্মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

'মোহমুদ্গর' বেদান্তের চরম কাব্যিক নির্যাস। দার্শনিক তত্ত্বকথা সাধারণ লোক বোঝে না, তারা চায় সহজ সরলভাবে জীবনবোধের কথা শুনতে। "দারা পুত্র পরিবার কে তোমার, তুমিই বা কার?" (মোহমুদ্গর, ২)—এই অনুভব মানুষের জীবনে সত্য হয়ে ওঠে যখন সে বোঝে—"ধনোপার্জনের শক্তি থাকা অবধিই নিজের পরিবার পরিজন অনুরক্ত থাকে।" (ঐ, ১৪) এতেই তার চোখ খুলে যায়, জেগে ওঠে আত্মজ্ঞান, মোহ নাশ হয়। এই আলোচনার ক্ষেত্রে ডঃ শর্বাণী বসু অবশ্যই কৃতিত্বের অধিকারিণী।

বিভিন্ন উপনিষদ্ ছাড়াও ডঃ বসু ষোড়শ শ্লোকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত থেকে উদাহরণ দিয়েছেন। কিন্তু ইংরেজি অনুবাদে (বিশেষ করে দ্বিতীয় ও একাদশ শ্লোকে) তিনি আক্ষরিক অনুবাদ না করে ভাবানুবাদ করলেই ভাল করতেন। সংস্কৃত 'সমুজ্জ্বলা' টীকার পরে বাঙলা ব্যাখ্যা দিলে ভাল হতো। পরবর্তী সংস্করণে এই ত্রুটি সংশোধিত হবে, আশা করা যায়। এছাড়াও মুদ্রণপ্রমাদের জন্য সপ্তম শ্লোকের অর্থ অর্থহীনতায় পরিণত হয়েছে।

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার এই ত্রিভাষিক গ্রন্থটি প্রকাশ করে ভারতীয় দর্শন তথা ভারততত্ত্বের গবেষক, অনুরাগী ও সাধারণ পাঠক সকলেরই উপকার করেছেন।□

দক্ষিণী বার্তা

কোয়েম্বাটোর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়টি (তামিলনাড়ু) ১৯৩০ সালে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য অবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ার প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ১৯৩৪ সালে বহু বিদ্যালয়-সমন্বিত সংস্থাটি রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত হয়। এটি কোয়েম্বাটোর-উটকামণ্ড রোডের ওপর অবস্থিত। এই সংস্থাটিতে আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সিনিয়র বেসিক স্কুল, অটোনমাস শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, দৃষ্টিহীনদের প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি ১৬টি ইনস্টিটিউট এর সঙ্গে যুক্ত। ঐ আশ্রমের সন্ন্যাসী-কর্মী স্বামী হিতকামানন্দ দক্ষিণ ভারতীয় রীতিনীতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে জীবন্ত ভাষায় আশ্রমের উৎসবের একটি বর্ণনা করেছেন। প্রতিবেদনটি তথ্যমূলক ও সুলিখিত।—সম্পাদক

"অযুত কণ্ঠে বন্দনাগীতি ভুবন ভরিয়া উঠিছে তব অমিয় বারতা"—গেয়েছেন সাধক কবি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে। তবে এখানে জন্মতিথিতে নয়, তাঁর তামিল অনুরাগীরা ইংরেজি বছরের প্রথম রবিবারে সারাদিন ধরে তাঁর আরাধনা করেন। সংখ্যাটাও নেহাত ফেলনা নয়—K. G. (বালোয়াড়ি) থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট সব স্তরের সাড়ে চারহাজার ছাত্রছাত্রী এবং প্রায় পাঁচশ শিক্ষক-অধ্যাপক তাঁর জন্মোৎসব 'গুরুপূজা' নাম দিয়ে উদ্‌যাপন করেন। এঁদের আহ্বান তিনি উপেক্ষা করবেন কি করে? শ্রীরাম অবতারে তিনি মা দুর্গাকেই অকালে আরাধনা করেছিলেন। এখন নিজের বেলায় অকালবোধনে আসতে গররাজি হবেন কিভাবে? ঠাকুর-দেবতাদের এই এক সমস্যা—যেটা মানুষের নেই। ভক্ত ডাকলেই যেতে হবে—যখন, যেখানে, যে-অবস্থায়, যে-চেহারায় তাঁকে ভক্ত চাইবে—তাঁকে হাজির হতেই হবে। দরকার পড়লে একই সময়ে লক্ষ জনের কাছে। দোষ মানুষের নয়, তাঁরই। তিনিই নারদকে বলেছিলেন: "নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ/ মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।।" শুধু কি তাই? "অহং ভক্তপরাধীনো" বলে তিনি অঙ্গীকারও করেছিলেন। এখন সেই দায় তাঁকে বইতে হচ্ছে। তিনি কথা রাখেন। 'গুরুপূজা'য় এলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।



প্রস্তুতিপর্ব: কলেবর ছোট নয়, প্রায় ১,০০০ বিঘা জায়গা জুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের রাজ্যপাট। এর অর্ধেকটাতে চাষাবাদ এবং এখানকার সবচেয়ে প্রভাবশালী দেবতা 'মুরুগা'র (কার্তিকেয়) বাহনদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র। বাকি অংশে একটি মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ (বি. এড), একটি ক্রীড়াশিক্ষক শিক্ষণ কলেজ (বি. পি. এড), একটি আর্টস অ্যাণ্ড সায়েন্স কলেজ (১,১০০ ছাত্র), একটি প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক শিক্ষণ (১ম থেকে ৮ম শ্রেণী) কেন্দ্র, একটি পলিটেকনিক, একটি শিল্পবিদ্যালয় (আই. টি. আই), একটি এগ্রিকালচারাল (ডিপ্লোমা) ইনস্টিটিউট, একটি তামিল মাধ্যমের উচ্চ বিদ্যালয়, একটি তামিল মাধ্যমের আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়, একটি ইংরেজি মাধ্যমের উচ্চ বিদ্যালয়, একটি জুনিয়র হাই স্কুল, একটি বালোয়াড়ি। এর সঙ্গে আছে প্রতিবন্ধীদের জন্য আন্তর্জাতিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, ছয়টি ছাত্রাবাস (মোট আবাসিক দেড়হাজার) এবং ১২টি খেলার মাঠ।

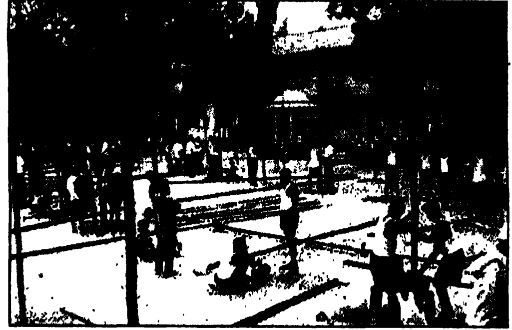
'বরণের এয়ো সেজে' কোন 'দোয়েল শ্যামা' আগমনীর আহ্বান এখানে শোনায় না। কিন্তু দক্ষিণের হালকা শীতের স্পর্শ গায়ে লাগার সাথে সাথেই নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সব প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের কাছেই 'গুরুপূজা'র প্রথম বিজ্ঞপ্তি চলে যায়। একেবারে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির বোর্ড অফ ডাইরেক্টরদের পলিসি নির্ধারণের ঢঙে সকল প্রতিষ্ঠানের প্রধানশিক্ষক/ শিক্ষিকা, কলেজের অধ্যক্ষ, সেই সেই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী—এঁদের সকলের পরামর্শক্রমে, প্রধান অতিথি, প্রধান বক্তা, শিক্ষামূলক প্রদর্শনীতে কোন্ প্রতিষ্ঠান কি বিষয়ক প্রদর্শনী উপস্থাপন করবে, কে প্রদর্শনী উদ্বোধন করবেন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কোন্ কোন্ বিখ্যাত ভক্তিসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পীকে ডাকা হবে ইত্যাদি সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় স্থির হয়।

এক সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় মিটিং হয় ছোট আকারে। সেখানে তহবিল সংগ্রহ কিভাবে হবে, কারা কারা কোন্ অঞ্চলে কালেকশনে যাবেন, কোন্ সাধুকর্মী কোন্ দলে কোন্ দিনে যাবেন ইত্যাদি ঠিক হয়। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তৃতীয় মিটিং হয় উৎসবের কাজের দায়িত্ব বণ্টন বিষয়ে। ঐদিন বিভাগীয় প্রধানরা ছাড়াও গত উৎসবে বিভিন্ন কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক-অধ্যাপকরা সবাই থাকেন। গত বছরের উৎসবে যে যে সমস্যা হয়েছিল তার বিশ্লেষণ হয় এবং এবছরে তা দুর করতে যা যা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা ঠিক করা হয়। একই দায়িত্ব একই প্রতিষ্ঠানকে পরপর তিনবছর পালন করতে হয়। চতুর্থ বছরে পরস্পরের মধ্যে দায়িত্বের অদলবদল করা হয়। প্রয়োজনে প্রত্যেক বিভাগে ছাত্রছাত্রী, স্বেচ্ছাসেবক ও তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক-অধ্যাপকদের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি কতটা হবে তা ঠিক হয়। এর ওপরে ভিত্তি করে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান থেকে আসা কর্মীদের বিস্তারিত তালিকা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আসামাত্রই তা একত্র করে তিরিশ পাতার সাইক্লোস্টাইল করা সম্পূর্ণ কার্যবণ্টনের তালিকা তৈরি হয় এবং সব প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এই তালিকাটি একটা দর্শনীয় বস্তু। একটু নমুনা দেওয়া যাক। নারায়ণসেবা বা অন্নদানের মাঠ তৈরি, প্যাণ্ডেল তৈরি, ভাঁড়ারঘর দেখাশোনা, রান্নাবান্না, পরিবেশন, বাসনপত্র পরিষ্কার (উৎসবের আগে ও পরে)—এমন প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজ কাদের দায়িত্বে কারা করবে তার পাকাপোক্ত বিবরণ তালিকাতে থাকে।



কোয়েম্বাটোর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের প্রধান প্রবেশপথ



মারুতি কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকরা প্রধান প্যাণ্ডেল নির্মাণে ব্যস্ত

যথাসময়ে প্রস্তুতি শুরু হচ্ছে কিনা, কাজ চলাকালে এবং উৎসব-শেষে ঐ কাজের তদারক কারা করবে তাও ঠিক করা হয়। যেটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তা হলো সমস্ত কাজই করবে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা। রান্নার জন্য শুধু বাইরের পেশাদার রাঁধুনি আনা হবে। প্যাণ্ডেলের সরঞ্জাম প্রয়োজনমতো ভাড়া করা বা কেনা হয়। সমস্ত ছোট বড় প্যাণ্ডেল শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ছাত্রছাত্রীরা করে। সমস্ত ক্যাম্পাস পরিষ্কার তারা করে। এন. সি. সি, এন. এস. এস ও স্কাউটের ছেলেরা পুলিশের কাজ করে। মূল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য প্রায় ৫০,০০০ বর্গফুট জুড়ে প্যাণ্ডেল মারুতি কলেজের ২২০ জন ছাত্র মিলে করে মাত্র তিনদিনে। উৎসবের ঠিক তিনদিন আগে ভোরবেলা মঙ্গলারতির পর ঠাকুরের পট সাজিয়ে তাতে অর্ঘ্য দিয়ে সেই অর্ঘ্য-সহ একটা চন্দনকাঠের বড় খুঁটি প্যাণ্ডেলের ঈশানকোণে পুঁতে প্যাণ্ডেল তৈরির সূচনা করেন এখানকার প্রবীণতম সন্ন্যাসী অথবা সম্পাদক। সেখানে আরতি এবং ভজনও হয়। তারপর যথারীতি প্যাণ্ডেল বাঁধা চলে। এর উদ্দেশ্য—এই কাজ যে পূজাই, সে-ভাব ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করা। এরপর এগ্রিকালচার ইনস্টিটিউটের ছেলেরা প্রায় ৬০,০০০ বর্গফুট জায়গায় অন্নদানের প্যাণ্ডেল তৈরি করে। পলিটেকনিকের ছেলেরা নানান প্রদর্শনী, জুতা রাখা, বইয়ের দোকান ইত্যাদির ছোট ছোট বহু প্যাণ্ডেল তৈরি করে। স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা মিলে সাইকেল, গাড়ি ও স্কুটার রাখার জন্য ব্যারিকেড তৈরি করে। একদল ছাত্র ও অধ্যাপক উৎসব উপলক্ষ্যে যে মেলা বসবে তাতে দোকানদার, নাগরদোলা ইত্যাদির ব্যবস্থাপকদের নিয়ন্ত্রণ করেন। এভাবেই সব ব্যবস্থা হয়।

৬ জানুয়ারি ২০০২ঃ গুরুপূজার দিন ভোর ৫টায় শ্রীরামকৃষ্ণের মঙ্গলারতি হলো। তারপরই অতিথিদের জুতো রাখার জায়গাতে গিয়ে প্রথম জুতোজোড়া জমা নিলেন আশ্রম-সম্পাদক স্বামী আত্মারামানন্দজী। তখন থেকেই কাজ চালু হলো। এরপর বি. এড কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্ররা এবং অন্যান্য সেকশনের স্বেচ্ছাসেবকেরা পরপর কাজ চালাল পর্যায়ক্রমে শিফট্‌ বদল করে। এইভাবে অতিথি বা পরিদর্শকদের অভ্যর্থনা করার রেওয়াজ ও প্যাণ্ডেল তৈরির রেওয়াজ সবই চলে আসছে প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক অবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ারের সময় থেকে। উৎসবের প্রবর্তন তিনিই করেন প্রায় ৬৫ বছর আগে।

মঙ্গলারতির পরই বৈদিক শান্তিমন্ত্র পাঠ ও ভজন করলেন সাধু ও ব্রহ্মচারীরা। তারপর সকাল ৭টায় পতাকা উত্তোলন করলেন প্রধান অতিথি স্বামী আশুতোষানন্দজী। এরপর সারাদিন ধরে বিভিন্ন ভক্তগোষ্ঠী, ছাত্রছাত্রী ও শিল্পী ভক্তিমূলক সঙ্গীত, গান, নাচ, অভিনয় ইত্যাদি করেন। দুপুরের আগে বিশেষ অনুষ্ঠানে ভজন পরিবেশন করেন ভক্তিসঙ্গীতশিল্পী পিথুকুলি মুরুগাদাস ও সম্প্রদায়। ইনি গত ৬০ বছর অবিচ্ছিন্নভাবে এই অনুষ্ঠানে গান গাইছেন। বিকালে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রোতার উপস্থিতি প্রায় তিনহাজার। অন্নদান প্যাণ্ডেলে প্রায় ষোল হাজার মানুষ প্রসাদ পান। শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক প্রদর্শনীতে দারুণ ভিড়, বিরাট লাইন—টিকিটের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও। মেলাতেও দর্শনীয় ভিড়। দোকানদারদের কোন পয়সা দিতে হয় না। সারাদিনে প্রায় ৭০-৭৫ হাজার মানুষের এক মহামিলন।

সন্ধ্যারতির পর প্রায় সাড়ে সাতটা নাগাদ উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের অনুষ্ঠান। গতবছর ছিল বিখ্যাত শিল্পী কাদরী গোপালনাথের স্যাক্সোফোন বাদন। এবারে বিখ্যাত বংশীবাদক এস. শশাঙ্ক বাঁশি বাজিয়ে শোনান প্রায় রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত। এবারের অনুষ্ঠানে দক্ষিণের বিখ্যাত লোকনৃত্য করাগাট্টম ছিল বিশেষ আকর্ষণীয়। এতে 'রণপা'র মতো লাঠিতে ভর দিয়ে নাচ, গান, নানা কসরত, যুদ্ধ, চোখ কাপড় দিয়ে বেঁধেও লক্ষ্যভেদ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। সবমিলিয়ে আনন্দময় আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের জগদ্ব্যাপী আনন্দযজ্ঞের খানিকটা সারাদিন ধরে আস্বাদন করা হলো। তাঁর জয়ধ্বনি দিয়েই প্রায় রাত ১০টায় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

শুরু থেকে শেষ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এত বড় অনুষ্ঠানে সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-অধ্যাপকদের সানন্দ আন্তরিক অংশগ্রহণ, যা কোথাও তেমন দেখা যায় না। ধন্য টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ার—যিনি অতিশয় ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান হয়েও সন্ন্যাসীর মতোই জীবনযাপন করে এই অসাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও তার অতুলনীয় ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন প্রায় এককভাবে। তিনি তাঁর আত্মজীবনী (ভারতীয় বিদ্যাভবন

প্রকাশিত) 'The Sacred Touch'-এ নিজের যাবতীয় সাফল্যকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের 'পবিত্র স্পর্শের' ফলশ্রুতি বলেই বর্ণনা করেছেন। অবিনাশীলিঙ্গম মহাপুরুষজীর কৃপা পেয়েছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের অপূর্ব পরিকাঠামো, দৃঢ় সম্বদ্ধ প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণপ্রণালী, ভবিষ্যৎ বিকাশের অপূর্ব অনুকূল পরিবেশ—সবকিছুই তাঁর বিরল দূরদৃষ্টির সাক্ষর হিসাবে বর্তমান। এই প্রতিষ্ঠান দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামীজী-শিবানন্দজীর বিশেষ কৃপাধন্য 'আইয়া'কে (এই নামেই অবিনাশীলিঙ্গম সকলের দ্বারা সশ্রদ্ধভাবে সম্বোধিত হতেন) সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাতে ইচ্ছা হয়। [তামিল ভাষায় 'আইয়া' শব্দের অর্থ 'শ্রদ্ধেয় মহাশয়'। বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র যাঁরা তাঁদের প্রতিই এটি প্রযুক্ত হয়। গ্রামে 'বাবা'—এই সম্বোধন হিসাবেও এই শব্দের ব্যবহার হয়।]

উৎসব-অনুষ্ঠান

চেঙ্গলপট্টু আশ্রম : গত ৭ জুন ২০০২ আশ্রম পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে 'স্বামী বিবেকানন্দ ভবন' নামে একটি নবনির্মিত বিদ্যালয় ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ।

দেহত্যাগ

স্বামী আপ্তানন্দজী (সুশান্ত) গত ২০ জুন ২০০২ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে দশহরার দিন ভোর ৪টা ২৫ মিনিটে মুম্বাই রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গত বছর শারীরিক কষ্টের জন্য তাঁকে লখনৌ রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। সেখান থেকে তাঁকে মুম্বাইয়ের হিন্দুজা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এখানে তাঁর ক্যান্সার (ম্যালিগন্যান্ট টিউমার) ধরা পড়ে। গত নভেম্বরে অস্ত্রোপচার করা হয়। সেখানে কিছুদিন রাখার পর তাঁকে মুম্বাই মিশন হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এখানেই কয়েক মাস থাকার পর তাঁর দেহাবসান ঘটে।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য স্বামী আপ্তানন্দজী ১৯৯০ সালে গড়বেতা আশ্রমে যোগদান করেন। ২000 সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস লাভ করেন। গড়বেতা ছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে রহড়া ও শ্যামলাতাল কেন্দ্রে কর্মী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা ও প্রফুল্ল প্রকৃতির। আর অঙ্কনশিল্পে ছিল তাঁর যথেষ্ট নিপুণতা। এমনকি রোগশয্যায় থেকে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যেও শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশানুসারী বহু উদ্দীপক ছবি অঙ্কন করেছেন। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা : প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম ও তৃতীয় বৃহস্পতিবার যথাক্রমে 'ভাগবত' ও 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করছেন স্বামী সনকানন্দজী। দ্বিতীয় ও চতুর্থ শুক্রবার 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ ও আলোচনা করছেন স্বামী সর্বগানন্দজী। প্রথম ও তৃতীয় রবিবার 'গীতা' এবং দ্বিতীয় রবিবার কঠোপনিষদ্ পাঠ ও আলোচনা করছেন যথাক্রমে স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দজী ও স্বামী বিনির্মলানন্দজী। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

ভোলামহেশ্বরতলা শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ পাঠচক্র (কলকাতা-৬৩) : গত ৯-১০ এপ্রিল ২০০২ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 'চণ্ডী', 'গীতা', 'কথামৃত' ও 'মায়ের কথা' পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। পরিবেশিত হয় অরিন্দম চ্যাটার্জী ও সম্প্রদায় কর্তৃক কালীকীর্তন। সন্ধ্যায় আলোচনা করেন স্বামী বুদ্ধদেবানন্দজী। অনুষ্ঠানে প্রায় ৮০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

চন্দননগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ (হুগলী) : গত ১৪ এপ্রিল ২০০২ সারাদিনব্যাপী একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, সমবেত জপধ্যান, পাঠ ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ। 'লীলাপ্রসঙ্গ' এবং 'নারদীয় ভক্তিসূত্র' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন যথাক্রমে স্বামী সগুণানন্দজী ও অনীশ রায়চৌধুরী। ভগিনী নিবেদিতার রচনা থেকে পাঠ করেন ডাঃ তারকনাথ তরফদার। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী সগুণানন্দজী, স্বামী অচ্যুতাত্মানন্দজী, স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী এবং ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। সভাপতিত্ব করেন স্বামী সনাতনানন্দজী। সম্মেলনে প্রায় ১০০ ভক্তের উপস্থিতি ছিল।

ইছাপুর-নবাবগঞ্জ রামকৃষ্ণ সাধন সমিতি (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ১৪-১৬ এপ্রিল ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, লীলাকীর্তন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন মলয়া নাগ, কল্যাণ মুখার্জি, বিষ্ণুপদ ঘোষ প্রমুখ। শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তন পরিবেশন করেন লক্ষ্মী সরকার ও সম্প্রদায়। বিশেষ পূজা করেন স্বামী অম্বিকেশানন্দজী। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সুপর্ণানন্দজী ও অধ্যাপক মনোতোষ দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠানে প্রায় ২,৫০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বারুইপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ প্রচার সমিতি (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) : গত ২১ এপ্রিল ২০০২ বিশেষ পূজা, পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন করা হয়। 'কথামৃত' পাঠ করেন সীতাংশুদেব চট্টোপাধ্যায়। পূজা করেন স্বামী দেবেশ্বরানন্দজী। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী ওঁকারাত্মানন্দজী ও বিমল পাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রায় ৪০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। এই উপলক্ষ্যে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র প্রদান করা হয়।

পর্ণশ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (বেহালা, কলকাতা-৬০) : গত ২১-২৪ এপ্রিল ২০০২ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা,

ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে পাঠচক্রের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বিভিন্ন দিনে ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও বাউলগান পরিবেশন করেন যথাক্রমে প্রণব দাশগুপ্ত প্রমুখ এবং ব্রজগোপাল দাস, দীনবন্ধু গোস্বামী ও সম্প্রদায়। ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন রিষড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী কপিলানন্দজী, ডঃ হোসেনুর রহমান, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত ও মৃগাঙ্কমোহন ঘোষ। উৎসবে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

বনগ্রাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ২৬-২৭ এপ্রিল ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, পাঠ, কীর্তন, তরজা গান ও ধর্মসভা। গোবরডাঙা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী সত্যরূপানন্দজী ও স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দজী ধর্মসভায় আলোচনা করেন। ঐদিন প্রায় ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। ২৫ এপ্রিল রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় আয়োজিত যুবসম্মেলনে ২৫০ জন যুবপ্রতিনিধি যোগদান করেছিল। পাঠ, প্রশ্নোত্তরপর্ব ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের মুখ্য বিষয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী, অধ্যাপক বাসুদেব বর্মণ, দেবব্রত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, আলিপুরদুয়ার (জলপাইগুড়ি) : গত ২৬-২৮ এপ্রিল ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, নাটক, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অজরানন্দজী ও স্বামী অক্ষয়ানন্দজী। উৎসবে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

তপন শ্রীরামকৃষ্ণ সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ (দক্ষিণ দিনাজপুর) : গত ২৬-২৮ এপ্রিল ২০০২ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, রামায়ণগান, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ধর্মসভা প্রভৃতি ছিল তিনদিনব্যাপী উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। রামায়ণগান পরিবেশন করেন সুবলচন্দ্র দাস ও সম্প্রদায়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন মালদা রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী গোপেশানন্দজী। সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কার্তিকচন্দ্র পাল।

শকুন্তলা পার্ক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ (কলকাতা-৬১) : গত ২৮ এপ্রিল ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী রাজীবানন্দজী। আয়োজিত ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী, স্বামী স্বগতানন্দজী, স্বামী বলভদ্রানন্দজী ও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। বিশিষ্ট শিল্পিরা ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন।

জাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (মেদিনীপুর) : গত ৩০-৩১ এপ্রিল ২০০২ বিশেষ পূজা, প্রভাতফেরি, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত 'রামকৃষ্ণ' নামযজ্ঞ, বেদ ও 'গীতা' পাঠ এবং ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব উৎসব পালন করা হয়। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী শিবরূপানন্দজী, অলোককুমার ঘোষ প্রমুখ।

পুইনান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ (হুগলী) : গত ১ মে ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। গুরুবন্দনা, ভক্তিগীতি, পাঠ ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের অন্যতম বিষয়। সম্মেলনে উপস্থিত প্রায় ২০০ ভক্তের উপস্থিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণাজী।

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (কলকাতা-৪৭) : গত ১ মে ২০০২ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় সারাদিনব্যাপী একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সঙ্গীত, পাঠ, প্রশ্নোত্তরপর্ব ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের প্রধান বিষয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী ও গৌতম চট্টোপাধ্যায়। 'যুবসমাজের প্রতি স্বামীজীর আহ্বান' বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী চিদ্রূপানন্দজী। যুবপ্রতিনিধিদের প্রশ্নের উত্তর দান করেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী ও স্বামী চিদ্রূপানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দেন সেবাশ্রমের সম্পাদক সলিলকুমার বিশ্বাস। সম্মেলনে প্রায় ২০০ যুবপ্রতিনিধি উপস্থিত ছিল।

মুরারই শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ (বীরভূম) : গত ১-২ মে ২০০২ একটি নবনির্মিত প্রার্থনাগৃহ ও সাধুনিবাসের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, 'চণ্ডী', 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। প্রার্থনাগৃহ ও সাধুনিবাসের দ্বারোদ্ঘাটন এবং ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী শিবনাথানন্দজী। এছাড়া ভাষণ দেন স্বামী জ্ঞানালোকানন্দজী, স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী প্রমুখ। 'কথামৃত' পাঠ এবং ভাষণ দেন স্বামী দেবময়ানন্দজী। গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন স্বামী ধ্রুবানন্দ পুরী। অনুষ্ঠানে প্রায় ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

সুভাষনগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (কলকাতা-৬৫) : গত ২-৫ মে ২০০২ পূজা, পাঠ, নগর-পরিক্রমা, ভক্তিগীতি, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বাউলগান, পল্লীগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের দ্বিতীয় দিনের সান্ধ্য ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের ওপর ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা বেদরূপাপ্রাণাজী ও ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। তৃতীয় দিনের সান্ধ্যসভায় স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী গোবিন্দানন্দজী ও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। চতুর্থ দিনের বৈকালিক সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী ও ডঃ সত্যজ্যোতি দাস।

বৃহত্তর কলকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ (কলকাতা-৬) : গত ৪-৫ মে ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিষদের ১৯তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বিবেকানন্দ সোসাইটির সভাকক্ষে। শুরুতে বেদপাঠ করেন ডঃ চন্দন রায় ও ডঃ গৌতম মুখোপাধ্যায়। বিপ্লব তরফদারের স্বাগত-ভাষণান্তে আলোচনা করেন স্বামী ঋদ্ধানন্দজী, স্বামী বোধসারানন্দজী, স্বামী জ্ঞানব্রতানন্দজী প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি স্বামী পূতানন্দজী। সম্মেলনে ১৫টি সদস্য আশ্রম থেকে ৪৯ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। পরদিন যুবসম্মেলনে রচনা, বক্তৃতা, আবৃত্তি ও প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা এবং আলোচনার ব্যবস্থা ছিল। এতে ১৫০ জন যুব-প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গীত

পরিবেশন করেন ডঃ চন্দন রায়। সম্মেলনে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহাধ্যক্ষদ্বয় শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী ও শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজের আশীর্বাণী পাঠের পর আলোচনা করেন স্বামী সুখানন্দজী ও ডঃ গৌতম মুখার্জি। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ভাবপ্রচারের আহ্বায়ক ডঃ কমল নন্দী।

পাড়াতল অঞ্চল স্বামী বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (বর্ধমান) ঃ গত ৪-৫ মে প্রভাতফেরি, 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, যাত্রাপালা ও ধর্মসভার মাধ্যমে সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। 'কথামৃত' পাঠ করেন সুনীতি মুখোপাধ্যায়। আলোচনা এবং ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী সত্যস্থানন্দজী। দুপুরে প্রায় ২,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় 'নটী বিনোদিনী' যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হয়।

কাসুন্দিয়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম (হাওড়া-১) ঃ গত ৪-৫ মে ২০০২ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে দুদিনে দুটি ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের ধর্মসভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন তরুণ সরকার, সুভাষ চক্রবর্তী ও অসীম দত্ত। স্বামী তত্ত্ববোধানন্দজীর সভাপতিত্বে আলোচনা করেন স্বামী সত্যস্থানন্দজী ও তরুণ গোস্বামী। দ্বিতীয় দিনের সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রব্রাজিকা সেবাত্মপ্রাণাজী। প্রব্রাজিকা সদাত্মপ্রাণাজীর সভানেতৃত্বে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা সদ্ভাবপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা গৌতমপ্রাণাজী। দুদিনের সভায় স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আশ্রমের সম্পাদক বিমলকুমার ঘোষ।

গোমুণ্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (মেদিনীপুর) ঃ গত ৫ মে ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বেদপাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন জিতেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সুরেন্দ্রানন্দজী ও স্বামী ভুবনেশ্বরানন্দজী। উৎসবে প্রায় ১৫,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শুড়িখালী শ্রীশ্রীমা সারদা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (হাওড়া) ঃ গত ৫ মে ২০০২ আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, 'কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'বাণী ও রচনা' পাঠ এবং ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন নীতীশ ব্যানার্জি, সুব্রত মণ্ডল, সমর মণ্ডল প্রমুখ। দুপুরে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অজরানন্দজী ও জয়গুরু ব্রহ্মচারী।

জামালপাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ (উত্তর চব্বিশ পরগনা) ঃ গত ৫-৭ মে ২০০২ সেবাসঙ্ঘ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। প্রথমদিন পথপরিক্রমা, বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী', 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র-বিতরণ ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করা হয়। প্রথমদিন 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, ডাঃ সত্যগোপাল সিন্‌হা, কুমারেশ দাসশর্মা। দ্বিতীয় দিনের ২০০ যুব-প্রতিনিধির যুবসম্মেলনের দায়িত্বে ছিলেন প্রণবেশ চক্রবর্তী। অংশগ্রহণ করেন স্বামী ঋদ্ধানন্দজী ও সুধীর কর্মকার। তৃতীয় দিন সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। উৎসবে ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণাজী ও ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য।

হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন (মেদিনীপুর) ঃ গত ১২ মে সঙ্গীত, পাঠ, প্রশ্নোত্তরপর্ব ও আলোচনার মাধ্যমে একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সঙ্গীত, পাঠ, প্রশ্নোত্তরপর্ব ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের অনুষ্ঠিত বিষয়। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী, স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী, স্বামী শিবজ্ঞানানন্দজী ও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। সম্মেলনে স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কমলকৃষ্ণ দত্ত ও দেবপ্রসাদ মণ্ডল।

সেবাব্রত

টালিগঞ্জ বিবেকানন্দ যুবকেন্দ্র (কলকাতা-৩৩) ঃ গত ১৫ মে ২০০২ স্থানীয় ৩টি বিদ্যালয়ের ৮ জন দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে ৯ম শ্রেণীর সকল পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয়।

গড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ (কলকাতা-৮৪) ঃ গত ২৬ মে ২০০২, ৫টি বিদ্যালয়ের ৪২ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয়।

মণ্ডলগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ (বর্ধমান) ঃ গত ২৬ মে ২০০২ আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ৩ জন মহিলা-সহ ২৬ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য অশোককুমার মুখোপাধ্যায় গত ৬ এপ্রিল ২০০২ পরলোক-গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি পেশায় ডাক্তার হলেও মিলিটারিতে ব্রিগেডিয়ার ছিলেন। সেবাপরায়ণতা ও সুমিষ্ট ব্যবহার ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা ও বিশেষ স্নেহধন্যা অধ্যাপিকা বাসন্তী মুখোপাধ্যায় গত ১৭ এপ্রিল ২০০২ নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের ভাষণগুলির ক্যাসেট থেকে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়ে 'কথামৃত প্রসঙ্গ', 'কঠোপনিষদ্', 'শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ', 'মুণ্ডকোপনিষদ্' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আত্মপ্রচারবিমুখ, সদালাপী ও বিনয়ী স্বভাবের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা রানু ঘোষাল গত ২১ এপ্রিল ২০০২ জপরত অবস্থায় পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি দুর্গাপুরস্থ বিধান-নগর কালীবাড়ি সারদা সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত্রী-সভানেত্রী ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ঈশ্বরচন্দ্র প্রামাণিক গত ২২ এপ্রিল ২০০২ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহান্তকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি মেদিনীপুর জেলার দশগ্রাম এস. এস. শিক্ষাসদনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং ১৯৬৪ সালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় শিক্ষকের সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। ❑

দৃষ্টিহীন বালকদের আবাসিক বিদ্যালয়

নরেন্দ্রপুর

আবেদন

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইণ্ড বয়েজ একাডেমি ৪৫ বছরের বেশি সময় ধরে দৃষ্টিহীন বালক এবং যুবকদের সাধারণ শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কাজে নিযুক্ত। এখান থেকে প্রশিক্ষণলাভের পর বহু দৃষ্টিহীন ব্যক্তি নিজ দক্ষতায় কর্মে নিযুক্ত এবং পরিবার প্রতিপালন করে সমাজের মূলস্রোতে সংযুক্ত হয়েছেন। এখানকার দৃষ্টিহীনদের কৃষি ও পশুপালন প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণান্তে স্বনিযুক্তি প্রকল্পে পুনর্বাসন এক অনন্য বিদগ্ধজনস্বীকৃত কর্মপ্রচেষ্টা। এর সঙ্গে রয়েছে প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলের প্রতিবন্ধীদের সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন প্রকল্প। বহুলাংশে অবহেলিত, অনাদৃত এইসব দৃষ্টিবাধিতদের পূর্ণ সামাজিকীকরণের এই প্রচেষ্টায় আপনিও সামিল হোন। এদের পুনর্বাসন প্রকল্পে মুক্তহস্তে দান করুন। **রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত সর্বপ্রকার দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত।** রেখাঙ্কিত চেক বা ড্রাফট 'রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইণ্ড বয়েজ একাডেমি'র নামে পাঠাবেন। পাঠাবার ঠিকানা—**সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা-৭০০ ১০৩।**

স্বামী অসক্তানন্দ
সম্পাদক

যোগাযোগ ঃ

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
নরেন্দ্রপুর, কলকাতা-৭০০ ১০৩
ফোন ঃ ৪৭৭-২২০১ ফ্যাক্স ঃ ০৯১-০৩৩-৪৭৭২০৭০
ই. মেল ঃ bbarkm@vsnl.net

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

তাঁর নামবীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এরকম মনে করা ভাল নয় যে, আমার ধর্মই ঠিক আর অন্য সকলের ধর্ম ভুল। সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকলেই হলো। অনন্ত পথ—অনন্ত মত। শ্রীরামকৃষ্ণ

*

ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজন? নিন্দা ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, কিন্তু কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে, তা বলতে পারে কজনে? শ্রীমা সারদাদেবী

*

টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধাবিঘ্নের বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ



'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৩

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

বাংলাদেশ ❑ রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা-৩

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ❑ সত্যনারায়ণ রায়, ৮২৫ ডেটন কোর্ট, কনকর্ড, সি. এ.-৯৪৫১৮, ই. মেল : satya_ray@yahoo.com

দিল্লি

- **রামকৃষ্ণ মিশন**, রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, নিউ দিল্লি-১১০০৫৫
- পারমিতা ঘোষাল, ৪০/১৮, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯ ফোন : (০১১) ৬৪৭-১৫৪৯, ৬৪৮-৪৩৭১
- **মঞ্জুলা ঘোষ**, ৯, শিবালিক অ্যাপার্টমেন্ট, অলকানন্দা নিউ দিল্লি-১১০০১৯, ফোন : (০১১) ৬২১-৮৪৭৪

আন্দামান

- রামকৃষ্ণ মিশন, পোর্ট ব্রেয়ার, পিন : ৭৪৪১০৪ ফোন : (০৩১৯২) ৩২৪৩২

আসাম

- রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, শিলচর
- রামকৃষ্ণ মঠ, করিমগঞ্জ
- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন রোড উলুবাড়ি, গুয়াহাটি, জেলা : কামরূপ-৭৮১০০৭
- রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বনগাইগাঁও
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, তিনসুকিয়া-৭৮৬১২৫
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, মহাত্মা গান্ধী রোড, নগাঁও-৭৮২০০১
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, পোঃ হোজাই, নগাঁও-৭৮২৪৩৫
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, জি. এন. বি. রোড পোঃ দুম দুমা, জেলা : তিনসুকিয়া-৭৮৬১৫১
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম গোসাইগাঁও, জেলা : কোকড়াঝাড় (বি. এ. সি.)-৭৮৩৩৬০
- পরিমলকৃষ্ণ পাল, প্রযত্নে মেসার্স মা কালী স্টোর্স বি. জি. রেলওয়ে গেট, পোঃ + জেলা : কোকড়াঝাড়-৭৮৩৩৭০
- এম. কে. বুক সেলার্স, পো : বি. চারালী, জেলা : শোণিতপুর
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, পূর্ণানন্দ রোড, ডিব্রুগড়-৭৮৬০০১
- শান্তিকুমার রায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (তেজপুর), জেলা : শান্তিপুর

ত্রিপুরা

- **রামকৃষ্ণ মিশন**, আগরতলা
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পোঃ খোয়াই, লালচড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা-৭৯৯২০১
- **সম্পাদক**, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, উদয়পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১২০
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম পোঃ বিলোনিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১৫৫
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি রোড ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা-৭৯৯২৫০

নাগাল্যান্ড

- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ** সেবাশ্রম, ডিমাপুর-৭৯৭১১২

ওড়িশা

- রামকৃষ্ণ মঠ, চক্রতীর্থ, পুরী
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার সমিতি** খটবিন সাহী, কটক-৭৫৩০০৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**, হামিরপুর, পোঃ রাউরকেল্লা-৭৬৯০০৩

অরুণাচল প্রদেশ

- **শ্যামল সিন্‌হা রায়**, সম্পাদক, বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল নাহারলগন, ইটানগর-৭৯১১১৩

বিহার

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, রামকৃষ্ণ অ্যাভেনিউ, পাটনা-৮০০০০৪

ঝাড়খণ্ড

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম** ১১, ১২ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ রোড, মোরাবাদি, রাঁচি-৮৩৪০০৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ** সেক্টর-১বি, বোকারো স্টীল সিটি
- **রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি** বিষ্টুপুর, জামশেদপুর-৮৩১০০১
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি**, ব্যাঙ্ক রোড, ধানবাদ
- **রীতা ভট্টাচার্য**, 'অনুভব', এইচ. ই. স্কুল রোড, হীরাপুর, ধানবাদ-৮২৩৬৮৮

উত্তরপ্রদেশ

- রামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ নিরালানগর, লখনৌ-২২৬০২০

মধ্যপ্রদেশ

- রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ কোয়ার্টার নং ৫০৭, (এস. এস.)/২, বাচেলি, জেলা : বস্তার

অন্ধ্রপ্রদেশ

- পি. কে. মুখোপাধ্যায়, চীফ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)
- **এম. কে. পাল**, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) ও. এন. জি. সি., কে. জি. পি ডি. নাম্বার : ৪৬-৭-৩৫, দানাভাইপেটা, রাজমুন্দ্রি-৫৩৩১০৩

মহারাষ্ট্র

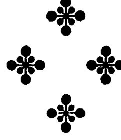
- রামকৃষ্ণ মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন মার্গ, খার, মুম্বাই-৪০০ ০৫২
- **প্রদীপচন্দ্র পাল**, 'গুরুধাম', ই-২৮, আর. এইচ.-১, সেক্টর-৮ বাসী, নবী, মুম্বাই-৪০০৭০৩
- **মহুয়া দাশগুপ্তা**, ৮-এ/১১, বৃন্দাবন সোসাইটি, থানে-৪০০৬০১

গুজরাট

- **সলিলচন্দ্র ঘোষ**, সি-৩-৫০১, ও. এন. জি. সি. কলোনী আমেদাবাদ-৩৮০০০৫
- **মীরা মিত্র**, প্রযত্নে জি. সি. মিত্র ৩/৮২, জি. আর. টাউনশিপ, জওহরনগর, বরোদা-৩৯১৩২০
- মোহিতরঞ্জন দাস, ৫০৩, নর্মদা টাওয়ার্স ও. এন. জি. সি. কলোনী, পোঃ আঙ্কলেশ্বর-৩৯৩০১০
- **প্রভাত মুখার্জি**, এ/৭, রচনা সোসাইটি বি-এইচ সানফ্লাওয়ার অ্যাপার্টমেন্ট, টিথল রোড ভালসাড-৩৯৬০০১, ফোন : ০২৬৩২/৪২৩৭৩ ই. মেল : pkmukrji@yahoo.com

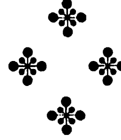
দেহত্যাগের আগে যদি কেউ ঈশ্বরের সাধন করে, আর সাধন করতে করতে ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, তাকে আর পাপ কখনো স্পর্শ করবে? অর্থাৎ ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, আর পাপ স্পর্শ করবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ



ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজনে? নিন্দা-ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, তাকে ভাল করতে পারে কজনে? আমার ছেলে যদি ধুলো-কাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে।

শ্রীমা সারদাদেবী



বেদে কোথাও নরকের কথা নাই। বেদের অনেক পরবর্তী পুরাণে এই নরকের প্রসঙ্গ আছে। বেদের সর্বাপেক্ষা অধিক যে-শাস্তির কথা পাওয়া যায়—তাহা পুনর্জন্ম, অর্থাৎ আরেকবার উন্নতির সুবিধা লাভ করা।

স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
Phone : 554-2248, 554-2403
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com
udbodhan@vsnl.net

Vol. 104
No. 8
AUGUST
2002

Licensed to Post
Without Prepayment
Licence No.
TECH/WB/RNP-15/LPWP-01/2002

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Regn. No.
TECH/WB/RNP-15/2002

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ



"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন

১০৪

শারদীয়া সংখ্যা

আশ্বিন ✿ ১৪০৯ ✿ ৯ম সংখ্যা

১০৪ তম বর্ষ ✿ উদ্বোধন কার্যালয় ✿ কলকাতা



''পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।''

শ্রীরামকৃষ্ণ

ফোন ঃ
৬৫৪-১১৪৪, ৬৫৪-১১৮০, ৬৫৪-৫৩৯১
৬৫৪-৯৫৮১, ৬৫৪-৯৬৮১, ৬৫৪-৫৭০০
ফ্যাক্স ঃ ৬৫৪-৪৩৪৬
E-mail : rkmhq@vsnl.com



রামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া
পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১২০২

আবেদন ঃ রামকৃষ্ণ সংগ্রহ মন্দির, বেলুড় মঠ

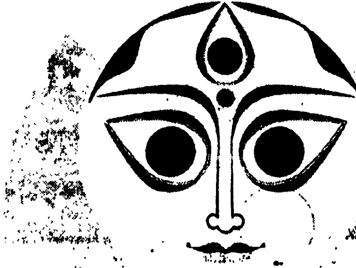
অনেকেই জানেন যে, বিশ্ব জুড়ে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের পথিকৃৎগণের পুণ্য স্মৃতিচিহ্নসমূহ সংরক্ষণের জন্য ২০০১ সালের ৭ মে বুদ্ধপূর্ণিমার দিন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ত্রয়োদশ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠে নবনির্মিত "**রামকৃষ্ণ সংগ্রহ মন্দির**"-এর শুভ উদ্বোধন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যগণের ব্যবহৃত জিনিসপত্রাদি এই মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হচ্ছে। এইসব জিনিসপত্রাদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণের জন্য একটি সংরক্ষণশালা এই মিউজিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এপর্যন্ত অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাঁদের নিকট রক্ষিত স্মৃতিচিহ্নাদি আমাদের অর্পণ করেছেন। বর্তমানে আমাদের একান্ত প্রয়োজন একটি চার ফুট ব্যাসের ঝাড়লণ্ঠন ও প্রাচীনকালে ব্যবহৃত দেওয়ালগিরি ও দীপাধার। এগুলি সংগ্রহ করে আমাদের সাহায্য করার জন্য আমরা পুনরায় ভক্তবৃন্দ, জনসাধারণ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট আবেদন জানাচ্ছি।

ভক্ত ও অনুরাগীদের যেকোন দান "**রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম**"-এর জন্য উল্লেখ করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠালে ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হবে।

স্বামী স্মরণানন্দ
সাধারণ সম্পাদক

ঠিকানা ঃ

রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ
হাওড়া-৭১১২০২











ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়—ঠাকুর, কৃপা করে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর একবার ধর, আমি তোমায় দর্শন করি।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

Do not fly away from the wheels of the world-machine, but stand inside it and learn the secret of Work.

Swami Vivekananda



The darkness of centuries is dispersed as soon as a light is brought into a room. The accumulated sins of countless lives vanish by a single glance of God.

Sri Ramakrishna

আহার, চালচলন, ভাব-ভাষাতে তেজস্বিতা আনতে হবে। সবদিকে প্রাণের বিস্তার করতে হবে—সব ধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করতে হবে, যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণস্পন্দন অনুভব হয়। তবেই এই ঘোর জীবনসংগ্রামে দেশের লোক বাঁচতে পারবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

"যত মত তত পথ।"
শ্রীরামকৃষ্ণ

ঈশ্বরলাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।
শ্রীরামকৃষ্ণ

সহ্যের সমান গুণ নেই, সন্তোষের সমান ধন নেই।
শ্রীমা সারদাদেবী

যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।
শ্রীমা সারদাদেবী



নবীকরণ ও গ্রাহকভুক্তি

২০০৩ খ্রিস্টাব্দ ● ১৪০৯-১৪১০ বঙ্গাব্দ

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে 'উদ্বোধন' ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

'উদ্বোধন' ঃ **১০৫তম বর্ষ, ২০০৩ (মাঘ ১৪০৯—পৌষ ১৪১০) সালের জন্য [illegible] করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন।**

গ্রাহকভুক্তি ঃ ১০৫তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৩) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে। গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ৯৫ টাকা। বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র ঃ ৮০০ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০ টাকা।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০০ টাকা (উদ্বৃত্ত কিছু থাকলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নামে জমা থাকবে) এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি ঃ M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'**—এই নামে পাঠাতে পারেন। নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে 'নতুন গ্রাহক হতে চাই' খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন।

'চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে।

M.O. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্ছনীয়।

❑ কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।

❑ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩
ফোন ঃ ৫৫৪-২২৪৮, ৫৫৪-২৪০৩ ● e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com

সূচীপত্র

উদ্বোধন ।।১০৪।।

১০৪তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা আশ্বিন ১৪০৯ সেপ্টেম্বর ২০০২

[পরপৃষ্ঠায়]

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ



[illegible] সম্পাদক ঃ [illegible]

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।

ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

প্রচ্ছদ ❑ মুদ্রণ ঃ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য (২০০২ সালের জন্য) ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৭৫ টাকা; সডাক ঃ ৯৫ টাকা

আলাদাভাবে কিনলে বর্তমান সংখ্যার মূল্য ঃ ৫০ টাকা ❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) ঃ ৩০০০ টাকা

পূজাবকাশ

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয়ের সকল বিভাগ ১২ অক্টোবর থেকে ২১ অক্টোবর ২০০২ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

দিব্য বাণী



জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীযতো নিদহাতি বেদঃ।
স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ।।

যাঁহা হইতে মানুষ জ্ঞান লাভ করে, সেই দেবীর উদ্দেশে যাগকালে আমরা সোমরস নিষ্কাশন করি। সেই দেবী সর্বজ্ঞা; যাহারা আমাদের শত্রু হইতে ইচ্ছা করে, তিনি তাহাদিগকে দগ্ধ করেন। তিনি আমাদের সকল বিপদ দূর করেন। নাবিক যেমন নৌকার সাহায্যে সমুদ্র অতিক্রম করে, সেইরূপ তিনি আমাদিগকে পাপ হইতে তারণ করেন।

বিশ্বানি নো দুর্গহা জাতবেদঃ সিন্ধুর্ন নাবা দুরিতাতিপর্ষি।
অগ্নে অত্রিবন্মনসা গৃণানোঽস্মাকং বোধ্যবিতা তনূনাম্।।

হে সর্বজ্ঞে, সকলবিপদ্‌হন্ত্রি! নাবিক যেমন নৌকার সাহায্যে সমুদ্র অতিক্রম করে, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে তারণ কর। হে দেবি! অত্রি মুনি যেমন 'সকলের সুখ হউক' এইরূপ সর্বদা মনে মনে ভাবনা করেন, তুমিও সেইরূপ মনে মনে গুণের উচ্চারণ করিয়া আমাদের (স্থূল এবং সূক্ষ্ম) শরীরের রক্ষক হও।

গোভির্জুষ্টমযুজো নিষিক্তং তবেন্দ্রবিষ্ণোরনুসঞ্চরেম।
নাকস্য পৃষ্ঠমভিসংবসানো বৈষ্ণবীং লোক ইহ মাদয়ন্তাম্।।

হে দেবি! আমরা নিজ নিজ সৌভাগ্যের উদ্দেশ্যে দুঃখাদিশূন্য সর্বব্যাপী তোমার ভৃত্য হইয়া তোমাকে পশুর দ্বারা, অমৃতধারার দ্বারা স্নান করাইয়া সেবা করিব। স্বর্গে বাসকারী দেবতাগণ তোমাতে ভক্তি প্রদান করিয়া আমাদিগকে ইহলোকে বাঞ্ছিত ফল প্রদানপূর্বক হৃষ্ট করুন।

—মহানারায়ণ উপনিষদ্ ও ঐতরেয় আরণ্যক

"এক তুমি তোমা মাঝে আমি একা নির্ভয়ে"

শান্ত নিরিবিলি একটি আশ্রম। কোথাও হরিণ, কোথাও রাজহংস, কোথাও স্বাস্থ্যবতী গাভীর নিঃশঙ্ক বিচরণ। কোথাও আশ্রম-বালকগণ আনন্দে গুরুসন্নিধানে স্বাধ্যায়ে নিমগ্ন। কোথাও বা পক্ষীর কূজনে বৃহৎ বৃক্ষরাজি প্রাণচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। মেধস মুনির আশ্রমে মুনির দিব্য আধ্যাত্মিক স্পর্শে সকলই সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। আশ্রমের প্রধান দ্বার দিয়া একজন সুপুরুষ প্রবেশ করিলেন। দেখিলে রাজপুরুষ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু তাঁহার চলাফেরায় কেমন যেন উদ্দেশ্যহীনতার ছাপ। মুনিবরের সম্মুখে আসিয়া সসঙ্কোচে তিনি জানিতে চাহিলেন, অসঙ্কোচে স্বীয় সমস্যার কথা ব্যক্ত করিবেন কিনা। মুনিবর তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন।

আমরা এখন পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিব অতি সম্প্রতি কী ঘটিয়াছে। যবনের দল আসিয়াছিল রাজা সুরথের রাজ্যে। তিনি কাপুরুষ ছিলেন না। তাঁহার সৈন্যবলও ছিল পর্যাপ্ত। এতাবধি দেশের প্রজাবর্গকে তিনি অপত্যস্নেহে লালন করিয়াছেন। সংখ্যালঘু শত্রুকুলকে সহজেই পরাস্ত করিবার দৃঢ় প্রত্যয়ও তাঁহার ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্র বিপরীত আকার ধারণ করিল। জঘন্য পরাজয়ে ভীত, সন্ত্রস্ত হইলেন রাজা সুরথ। দেখিলেন নিজ অশ্বটি এখনো আছে। 'মৃগয়া করিতে চলিলাম' বলিয়া তিনি বাহির হইলেন নিরুদ্দিষ্টের পথে এবং 'জগাম গহনং বনম্'—ক্রমশ গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। বহুদূর ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন একস্থানে অরণ্য ক্রমশ লঘু হইয়া এক মনোরম আশ্রমিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার মনে হইল রাজপ্রাসাদে শান্তি নাই; কিন্তু এখানে বন্য জন্তুসকলও কেমন শান্তিতে বিচরণ করিতেছে। রাজকার্য পরিত্যাগই শ্রেয়, এবং এখন হইতে আমি এখানেই শান্তিতে আশ্রমিক জীবনযাপন করিব। এই ভাবিয়া রাজা সুরথ কিছুদিন মেধস মুনির আশ্রমে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু হায়, বাহিরের শত্রু সংসর্গ ত্যাগ হইলেও ভিতরের শত্রু তো সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে! একি! এ যে সেই ভোগলিপ্সা, সেই ক্ষমতার লোভ, সেই পরিজন-দর্শনার্তি, আর সুন্দর পবিত্র পরিবেশকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করিবার লজ্জাকর অক্ষমতা! ঘটনাক্রমে একজন সঙ্গীও জুটিয়া গেল। তিনি বৃত্তিতে বৈশ্য—ব্যবসায়ী। নাম 'সমাধি'। নিষ্ঠুর আত্মীয়-পরিজন তাঁহাকে চূড়ান্ত দুর্ব্যবহার ও অপমান করিয়া স্বগৃহ হইতে তাড়াইয়াছে। তিনিও পত্নী-তাড়িত, পুত্র-লাঞ্ছিত, মিত্র-ঈর্ষিত হইয়া সংসার হইতে পলায়ন করিয়াছেন। তাহাদের সম্মুখে কোনরূপ সাহস প্রদর্শন করিবার ক্ষমতা তাঁহার হয় নাই। তিনিও মনের দুঃখে গহন বনে ইতস্তত ঘুরিয়া

শারদ শুভেচ্ছা ও প্রার্থনা

বাঙালীর পরম আকাঙ্ক্ষিত শারদ উৎসব সমাগত। এই শুভলগ্নে আমরা 'উদ্বোধন'-এর সঙ্গে যুক্ত সকলকে জানাই আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা। জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা—উৎসবের দিনগুলি যেন আমরা শান্তি ও আনন্দে, প্রীতি ও শ্রদ্ধায়, সহিষ্ণুতা ও সমন্বয়ে অতিবাহিত করিতে পারি। আমরা যেন আমাদের দুর্বলতা, সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থবুদ্ধিকে অতিক্রম করিতে পারি। আমাদের মনুষ্যত্বকে যেন জাগ্রত রাখিতে পারি। মা আমাদের সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।

—সম্পাদক



সহসা এই আশ্রমে উপনীত হইয়াছেন। মুনির আশ্রমে অতি সুখে কিছুদিন দুই আগন্তুক অতিবাহিত করিলেন। অতিথি-আপ্যায়নতার তুলনা হয় না। অপার শান্তির বাতাবরণ চতুর্দিকে। কিন্তু হায়! সেই সংসার আবার আসিয়া উপস্থিত হইল! গাভী যেমন জাবর কাটে, ঘনিষ্ঠ হইবার পরে দুই বন্ধু এখন সেইরূপ তাঁহাদের সংসারাসক্তির কারণে মনোগত সংসারকে বাহিরে টানিয়া আনিলেন। এবং তদ্বিষয়ে আলোচনা, বিলাপ করিয়া কখনো তাঁহারা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পরিজনবর্গকে গালমন্দ করিতে লাগিলেন, কখনো বা 'তাহারা কত ভাল' ইত্যাদি ভাবিয়া পুনরায় সেখানে প্রত্যাবর্তনের সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনে কখনো হৃতগৌরব ফিরাইয়া আনিবার সঙ্কল্প উঠিতে লাগিল, কখনো ক্ষমতার শীর্ষে থাকিবার তৃপ্তির অভাব তাঁহাদিগকে বারংবার পীড়ন করিতে লাগিল, কখনো বা তাঁহাদের অন্তরের মহানুভবতা পরিজনবর্গের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিবার প্রেরণা দিতে লাগিল। কিন্তু সবই যে তাঁহাদের মোহাচ্ছন্ন সত্তারই বৃথা আশ্রয়লাভের ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা-প্রসূত—ইহা বুঝিবার সামর্থ্য তাঁহাদের ছিল না। বাহ্যত যে শান্তিময় পরিবেশ আশ্রমে বিরাজ করিতেছে তাহা যদিও অটুট রহিল, কিন্তু তাঁহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হইল না। অবশ্য মেধস মুনির তপস্যাপূত আশ্রমিক পরিমণ্ডলকে কলুষিত করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের ছিল না। বরং অতি জঘন্য দুষ্কৃতী আসিলেও আশ্রমের আবহ তাহার মনকে পবিত্র করিয়া তুলে—ইহা প্রসিদ্ধ।

আমরাও নিজেদের জীবনে অনুরূপ পরিস্থিতিতে কখনো কোন আশ্রমের নিরাপদ আশ্রয়ে যাইবার চেষ্টা করিয়া থাকি। তাই রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধির সাংসারিক জ্বালা-যন্ত্রণার কাহিনী আমাদের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলীরই অনুরূপ। তাঁহাদের মানসিক প্রস্তুতির অভাবে তাঁহারা সংসারের অভিঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া পরিশেষে মেধস মুনির আশ্রমে আসিয়া পড়িলেন। এইবার শুরু হইল তাঁহাদের মানসিক প্রস্তুতি—তাঁহাদের শ্রেয়োলাভের সাধনা। কারণ, দুঃখকে অবলম্বন করিয়াই তো সত্য ও শান্তি মানুষের জীবনে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে! তখন নিজের মনেই প্রশ্ন উঠে—'কোথায় আমি ভুল করিতেছি? কেন এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমার বাঞ্ছিত বস্তু পাইলাম না? যে-বস্তুকে এতদিন সর্বোচ্চ কাম্য বলিয়া ভাবিয়াছি, তাহা সত্যই কি আমার কাম্য, আমার শ্রেয়োলাভের সহায়ক, অথবা অন্য কোন যথার্থ শ্রেয় বস্তু আমার অজানা রহিয়া গিয়াছে?' মনের মধ্যে এই প্রশ্ন উঠিলেই বুঝিতে হইবে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের দ্বার খুলিয়াছে; নতুবা যাহা পাইয়াছি, যাহা করিতেছি, যে-দুঃখরাশিকে সুখ বলিয়া ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় চলিয়াছি—তাহাতেই তৃপ্ত থাকিলে আর যাহা কিছু হউক, আত্মজ্ঞানের সম্ভাবনা অন্তরে কেমন করিয়া জাগিবে? পতঞ্জল মুনি বলিয়াছেন—'সর্বং দুঃখম্ বিবেকিনঃ'—যাহারা বিবেকী তাহারা এই সংসারকে দুঃখময় বলিয়াই জানে। সাংখ্যকার বলিতেছেন—"দুঃখ-ত্রয়াভিঘাৎ জিজ্ঞাসা"। অর্থাৎ তিন প্রকার দুঃখ—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক; এই দুঃখের অভিঘাতেই মানুষের মনে প্রশ্ন উদিত হয়। যে কখনো কাঁদে নাই, সংসারের লাঞ্ছনা দেখে নাই, দুর্বলের উপর সবলের নিপীড়ন অনুভব করে নাই, তাহার সংসার-স্বপ্ন বিদূরিত হওয়া সুকঠিন। অতীতের নিকট এই শিক্ষাই আমরা লাভ করি। সংসারের দুঃখের মাত্রা সিদ্ধার্থের হৃদয়কে উদ্বেল করিয়াছিল। যিশু অপরের দুঃখে আকুল ক্রন্দন করিয়াছিলেন। সেই অশ্রু তাঁহার হৃদয় হইতে রক্তধারায় ক্ষরিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যাবস্থার দারিদ্র্য-যাতনা, তাঁহার অন্তর্ভেদী প্রখর সংসার-বিশ্লেষণী দৃষ্টি এবং মহাশক্তিময়ী আদ্যাশক্তি ভবতারিণীর দর্শনের জন্য অপার অশ্রুবিসর্জন তো প্রত্যক্ষ সাম্প্রতিক ইতিহাস! সকল সাধক-সাধিকার জীবনেই দেখা যায় তাঁহাদের দুঃখভারক্লিষ্ট অন্তর একান্তই একা, সঙ্গ দিবার কেহ নাই। সাধিকা মীরাবাঈয়ের জীবনের ঘটনাক্রম স্মরণ করা যাইতে পারে। অট্টালিকা-প্রায় গৃহ, পরিজনের আশ্বাস, সুহৃদ্‌বর্গের উপস্থিতি, বিপুল অর্থভাণ্ডার—কিছুরই ভরসা নাই।

এই একাকীত্বেরই মহিমা কীর্তিত হইয়াছে শ্রীশ্রীচণ্ডীর বর্ণনায়। শ্রীভগবান গীতামুখেও সাধকের 'জন-সংসদ'-এর প্রতি বীতভৃষ্ণার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তব জীবনের চিত্র তো ইহার বিপরীত। একদিকে আমাদের এই সমাজ, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-সমন্বিত

সংসারের প্রতি দুর্বার মোহ, তাহার কর্মব্যস্ত জীবনযাত্রা, তাহার রোগ-দুঃখ-সুখ-হাসি, ব্যক্তি মানুষের দৈনন্দিন বাঁচিয়া থাকিবার তাগিদ, তাহার উপায় অন্বেষণ, ব্যর্থতার গ্লানি, সাফল্যের অহঙ্কার; অপরদিকে মনের অবলম্বনের জন্য বিচিত্র পুরাণ-কাহিনী, যথা মহাদেবীর শারদ উপস্থিতি, মহাড়ম্বরে দশভুজার দানবনিধন, গগনে ইন্দ্রাদি দেবতাদের সমাবেশ, আবার কোথাও মহিষাসুরের হৃৎকম্প-সৃষ্টিকারী খল খল অট্টহাস, তাহার ক্রুদ্ধ নেত্রক্ষেপণ, রুধিরপ্লাবিত ভূপৃষ্ঠ, আবার কোথাও মঙ্গলশঙ্খধ্বনি-সূচিত দেবীর কল্যাণ-স্পর্শ। কল্যাণ-অকল্যাণ, মঙ্গল-অমঙ্গলের দোলায় দোদুল্যমান নৈসর্গিক এবং পারলৌকিক প্রেক্ষাপটে দ্যাবা-পৃথিবীর ইহাই যদি চরিত্র হয়, তাহা হইলে একাকীত্বের প্রসঙ্গ উঠিতেছে কি করিয়া? উত্তরে বলিতে হয়, বস্তুত এত বাগাড়ম্বর, এত স্তব, স্তুতি, এই বিশ্বসৃষ্টির এত রহস্যময়তা সবই ঐ একাকীত্ব নিরূপণের জন্যই নির্ধারিত। রাজা সুরথের ন্যায় সাধক যখন চরম একাকীত্ব অনুভব করিবেন, তখনি তাঁহার সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ আসন্ন বুঝিতে হইবে। এবং ইহার পরিণতি কী? অবশ্যই দেবীর দর্শনলাভ। কোন্ দেবী? একা সেই মহাশক্তি—যিনি স্বীয় অঘটনঘটন-পটীয়সী মায়াশক্তিবলে বহু হইতে পারেন। নিশুম্ভকে নিহত হইতে দেখিয়া যখন শুম্ভ বলিল—

"বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাঽতিমানিনী।।"
(১০।৩)

—হে বলগর্বে দর্পিতা উদ্ধতা দুর্গা, তুমি গর্ব করিও না। কারণ অতিগর্বিতা হইয়াও তুমি অন্যান্য দেবীর শক্তি আশ্রয় করিয়াই যুদ্ধ করিতেছ। তখন চণ্ডিকাদেবী বলিলেন—

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ।।
(১০।৪)

—ওরে মূর্খ! আমি জগতে একাকিনী, আমা-ব্যতীত আর কে আছে? এই দ্যাখ, ব্রহ্মাণী-সহ সব শক্তি আমাতেই বিলীনা হইতেছে! শুম্ভ দেখিল, সত্যই শক্তিরূপিণী মূর্তিসকল একে একে দেবী চণ্ডিকার মধ্যে প্রবেশ করিল। দেবী রহিলেন একাকী। মহাশক্তি একা, অদ্বিতীয়া! সেই মহাশক্তিরই বিচিত্র প্রকাশ সূর্যে, অগ্নিতে, বায়ুতে, জীবনের উন্মদ প্রাণোচ্ছলতায় বাঁচিবার মধ্যে, মৃত্যুতে। সেই মহাশক্তিই মানুষকে অদ্ভুত মোহে আচ্ছন্ন করিয়া লক্ষ যোনি ভ্রমণ করাইয়া থাকেন। আবার সেই মহাশক্তিই কখনো বিদ্যাশক্তিরূপে তাহাকে 'অপরোক্ষানুভূতি' প্রদান করেন। সেই চৈতন্যময়ী, মহাশক্তিময়ী 'মা'-ই মানুষের অন্তরতম সত্য। সাধক কমলাকান্ত তাই বলিয়াছেন—"যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে/ মন তুই দেখ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীতে দিনের পর দিন ধ্যান করিতেন, গোপনে, রাত্রের অন্ধকারে—একাকী। ভক্ত 'একাকী' হইলেই ভগবানের দর্শনলাভ করিতে পারে। আলেক-জান্দ্রিয়ার মরমী সাধক প্লটিনাস (Plotinus) এই একাকী চলার অপূর্ব বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন—এ যেন, "Flight of the alone to the alone!" 'একাকী'র উদ্দেশে একার এক অনন্য যাত্রা!

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান এই একাকীত্বের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন—

"যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ।।"
(৬।১০)

—একাকী, সংযতচিত্ত যোগীর পক্ষেই প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করা সম্ভব। যোগী যখন অনাসক্তির অমৃতরসে আসিক্ত হইয়া ঈশ্বরের সহিত নিরন্তর যুক্ত

হইবার প্রয়াস করিবে তখনি ক্রমে ক্রমে তাহার নয়নসম্মুখে একটি একটি করিয়া সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটিত হইতে থাকিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তোতাপুরীজীকে বলিলেন ঃ "কই গো, নিরাকারের ধ্যান তো হচ্ছে না। মায়ের ভুবন-মোহিনী রূপই এসে যাচ্ছে বারবার"—তখন সিদ্ধসাধক এক খণ্ড কাঁচ লইয়া শিষ্যের ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে আঘাত করিয়া বলিলেন ঃ "এইখানে মনোনিবেশ কর।" তখন 'জ্ঞানরূপ তরবারি'র সাহায্যে মায়ের রূপ দ্বিখণ্ডিত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের মন অখণ্ডের দিকে ধাবিত হইল। সঙ্গে তখন আর কে ছিলেন? কেহই নহে। এমনকি গুরু তোতাপুরীও নহে। 'সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু-শিষ্যে দেখা নাই।' ইহাই তো যথার্থ 'Flight of the alone to the alone'!

শ্রীকৃষ্ণসমীপে কুন্তিদেবী প্রার্থনা করিলেন ঃ "প্রভু, দুঃখ দিও, তাহা হইলে তোমাকে সর্বদা মনে রাখিতে পারিব।" শ্রীশ্রীমায়ের ভাষায়—"দুঃখ ভগবানের দয়ার দান।" এই দুঃখই মানুষকে 'একাকী' হইতে শিক্ষা দেয়। যেখানে সুখের পসরা সাজানো রহিয়াছে, যেখানে বহু জনসমাগমে অন্তর পুলকিত হইতেছে—সেখানে ঈশ্বর বিস্মৃতির অন্তরালে চলিয়া যান। মন তখন ঈশ্বরকে ভুলিয়া 'জনসংযোগ'-এর জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। সেই কারণে তুলসীদাস একটি দোঁহায় বলিয়াছেন—

"তুলসী উহাঁ যাইয়ে জঁহা আদর না করে কোঈ।
মান ঘাটে, মন মরে, রামকো স্মরণ হোঈ।"

ইহা একটি auto-suggestion (আত্ম-প্রস্তাবনা)। তুলসীদাস নিজেই নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ঃ হে তুলসী! সেখানেই যাইও যেখানে কেহই তোমাকে আদর করিবে না। 'মানের গালে চুনকালি পড়ুক'—মন মরিবে, অহঙ্কার ঘুচিবে, সাথে সাথে ঈশ্বরের স্মরণ-মনন বৃদ্ধি পাইয়া পরম ভগবন্নির্ভরতায় জন্ম সার্থক হইবে।

কিন্তু ইহসংসারে মানুষ 'একাকীত্ব'কে ভয় পায়। 'একাকীত্ব'-এর সংজ্ঞা কী, তাহা সঠিক না জানাই এই ভীতির গূঢ় কারণ। অথচ সংসারী মানুষ, দুঃখকে স্বাগত জানাইবার মানসিক প্রস্তুতি নাই বলিয়াই পরিজন-পরিবৃত হইয়াও নিরন্তর ঐ একাকীত্বের যন্ত্রণায় কাতর হইতে থাকে। বিত্তশালী হইয়াও, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পৌত্র-পৌত্রী দ্বারা পরিবৃত হইয়াও, বিপুল সামাজিক প্রতিপত্তি, সম্মান, খ্যাতি লাভ করিয়াও অনেক মানুষই সংসারে নিজেকে বড় একা বোধ করিয়া থাকেন—ইহা ঘটনা। সব থাকিয়াও কিছুই নাই। এই 'একাকীত্ব' নেতিবাচক। কারণ, ঈশ্বর তাহার পার্শ্বে সদা বিরাজমান—এই বোধ তাহার নাই বলিয়াই তাহার একাকীত্ব—সত্যই বড় 'একা'। ভক্তের কিংবা যোগীর একাকীত্ব তাহা নহে। বস্তুত, পরমপ্রাপ্তিতে পরিণতিলাভ করিবার জন্যই ভক্ত বা যোগীর মহনীয় 'একাকীত্ব' তাহার চলার পথকে পূর্ণায়ত করিয়া তুলে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ছন্দোময় অভিব্যক্তি সততই মনকে এক নূতন দিগন্তে পৌঁছাইয়া দেয়—

"স্তব্ধ সর্ব কোলাহল, শান্তিমগ্ন চরাচর,
এক তুমি তোমা মাঝে আমি একা নির্ভয়ে...
মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে।"

এই নির্ভরতা যাহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছে, অগাধ দুঃখকে স্বাগত জানাইতে তাহার হৃদয় কম্পিত হয় না। প্রচণ্ড কোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও সে 'স্তব্ধ সর্ব কোলাহল'। প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যে থাকিয়াও সে 'কর্মহীন'। চক্ষু বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিলেও তাহার 'মনশ্চক্ষু' অন্তরের অনন্ত সুখে নিমগ্ন, যেখানে 'শান্তিমগ্ন চরাচর'। ইন্দ্রিয়লালসা, মনের উন্মত্ত নৃত্য, অভীপ্সা, আবেগ, সঙ্কল্প সবই সেখানে শান্ত। প্রাণ যেন সেখানে নির্বাক্। দেহজ্ঞানও স্তিমিত। বাহিরের কোলাহল বাহিরেই পড়িয়া থাকে। অন্তরের পবিত্র নিঃসঙ্গতায় ঐ কোলাহল পৌঁছায় না। ইহার জন্য কি পর্বতে, গুহায়, গিরিকন্দরে, নদীতীরে যাইতে হইবে? বিচিত্র শব্দময় মহানগরীর প্রচণ্ড কর্মব্যস্ত জীবনস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে, তাহার অলিগলিতে বাস করিয়া প্রতি মুহূর্তে জীবনধারণের সহস্র সমস্যার সম্মুখীন হইয়াও এই ঈশ-নির্ভর নিঃসঙ্গতা অর্জন কি সম্ভব? হ্যাঁ, একান্তই সম্ভব। ব্যাকুল হৃদয়ের তীব্র সংবেগ অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলে। আর যদি নিতান্তই সম্ভব না হয়? তবুও সম্ভব, জগৎ-পরিপালিনী জগজ্জননী শ্রীশ্রীমায়ের আশ্বাসবাণী মহানাদধ্বনির ন্যায় হৃদয়ে অনুরণিত হইলেই সম্ভব—"আর কেউ না থাক জানবে আমার একজন 'মা' আছেন।" ❑

সমসাময়িক গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে যেসকল তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ১৩৫৯ সালে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনর্মুদ্রিত করা হলো। আশা করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।—সম্পাদক

পরমহংসের উক্তি, ডিসেম্বর ১৮৮৪

তর্ক করিও না। তুমি তোমার মতের উপর যেমন নির্ভর কর, অপরকে তাহার মতের উপর সেইরূপ নির্ভর করিতে দাও। বৃথা তর্কে কিছু ফল হইবে না। ঈশ্বরের কৃপা হইলে সকলেই আপন আপন ভুল বুঝিতে পারিবে।

*

অল্পজলবিশিষ্ট সরোবরের উপরিভাগে আস্তে আস্তে পান করিও, কেননা তাহা পরিষ্কার, কিন্তু আলোড়ন করিও না, তাহা হইলে ভিতর হইতে ময়লা নির্গত হইয়া জল ঘোলা করিয়া ফেলিবে। হে অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট মানব, পবিত্রতা লাভ করিতে যদি চাও তবে তুমি বিশ্বাসের সহিত সাধনায় প্রবৃত্ত থাক, শাস্ত্রীয় বিচারে কভু নিযুক্ত হইও না।

*

কাঁচা ময়দা গরম ঘৃতে ফেলিয়া দিলে ছক্‌ছক্ করিয়া শব্দ হয় এবং যে-পরিমাণে ময়দা ভাজা হইতে থাকে সেই পরিমাণে শব্দেরও হ্রাস হইয়া আইসে। অল্প জ্ঞান পাইলে মনুষ্য বক্তৃতাদিতে বাহ্য আড়ম্বর করিতে থাকে, কিন্তু জ্ঞানের গভীরতা জন্মিলে আর আড়ম্বর সম্ভবে না।

*

কুম্ভীর জলের উপরিভাগে ভাসিতে বড় ভালবাসে; কিন্তু কি করে, মনুষ্যের উৎপীড়নে, প্রাণভয়ে অগত্যা জলের মধ্যে থাকিতে হয়, উপরে ভাসিতে পারে না। তথাপি সে সুবিধামত হুস্‌হুস্ করিতে করিতে জলের উপরিভাগে এক একবার আইসে। হে সংসারী মানব, সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিতে তোমারও ইচ্ছা হয় আমি জানি, কিন্তু কি করিবে, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন পালনের জন্য যদি তোমাকে একান্তই ভ্রান্তির অগাধ জলে নামিতে হয়, তবে মধ্যে মধ্যে এক-একবার হরিনাম স্মরণ করিও, তাঁহার নিকট ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিও, দুঃখ জানাইও, তিনি যথাসময়ে অবশ্যই তোমাকে মুক্ত করিবেন।

*

বাউল যেমন দুই হস্তে দুইপ্রকার বাদ্য বাজায় এবং মুখে গান করে, হে সংসারী মানব, তুমিও ঈশ্বরেতে আত্মসমর্পণ করিয়া সেইরূপ নানা কার্যে ব্যস্ত থাক।

*

চকমকি প্রস্তর শতবর্ষ জলের মধ্যে পড়িয়া থাকিলেও লৌহ দ্বারা আঘাত করিবামাত্র তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইবে। প্রকৃত বিশ্বাসী ভক্ত সন্তান শতসহস্র অবিশুদ্ধ অবস্থার মধ্যে বাস করিলেও তাঁহার অন্তরের ভাব কখনোই বিদূরিত হইবে না।

*

স্রোতের জল বেগে যাইতে যাইতে এক-একস্থানে ঘুরিতে থাকে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার সোজা হইয়া বেগে চলিয়া যায়। পবিত্র আত্মা ধার্মিকদিগের মনেও অবস্থাবিশেষে অবিশ্বাস, নিরাশা, দুঃখ প্রভৃতির আভা পড়ে, কিন্তু সে-ভাব অধিকক্ষণ থাকিতে পায় না, শীঘ্রই বিদূরিত হইয়া যায়।

*

মাঠের জল কেহ ব্যবহার না করিলেও সূর্যকিরণে আপনি শুকাইয়া যায়। পাপী মানব ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া পড়িয়া থাকিলে তাঁহার দয়াগুণে-আপনা-আপনি পবিত্র হইয়া যায়।

*

তরঙ্গপূর্ণ ময়লা জলমধ্যে চন্দ্রবিম্ব যেমন খণ্ড খণ্ড দেখায়, মায়াপূর্ণ সংসারী মানবের অন্তরে সেইরূপ ঈশ্বরের আংশিক আভামাত্র দেখা যায়।

*

মনের একাগ্রতা আনয়ন করিবার জন্য ধ্যান করিবার পূর্বে হাততালি সহকারে কিয়ৎকাল 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিবে। বৃক্ষের নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া হাততালি দিলে যেমন বৃক্ষস্থিত পক্ষীসকল উড়িয়া যায়, তেমনি তোমার মনরূপ বৃক্ষস্থিত চিন্তারূপ পক্ষীসকলও উড়িয়া যাইবে।

*

উপাসনা ততক্ষণ আবশ্যক, যতক্ষণ না নামে অশ্রুপাত হয়। হরিনাম শুনিলেই যাহার চক্ষে আপনি-আপনি জল আইসে, তাহার আর উপাসনা করিবার আবশ্যক হয় না।

*

এক ডুবে রত্ন না পাইলে রত্নাকর রত্নহীন মনে করিও না। ধৈর্যধারণপূর্বক সাধনায় প্রবৃত্ত থাক, যথাসময়ে ঈশ্বরের কৃপা তোমার উপর অবতীর্ণ হইবেই হইবে।

*

জল ও দুগ্ধ মিশ্রিত হইয়া যায় বটে, কিন্তু দুগ্ধকে মাখনে পরিণত করিতে পারিলে আর জলের সহিত মিশ্রিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সচ্চিদানন্দ হরিকে একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে শতসহস্র বদ্ধজীবের মধ্যে বাস করিলেও আর তোমার বিশ্বাস ক্ষীণ হইবে না।

সঙ্কলন ❑ জলধিকুমার সরকার

স্বামী বিবেকানন্দের তিনখানি পত্র

মিসেস জর্জ ডব্লু. হেলকে লিখিত

ডেট্রয়েট
১০ মার্চ ১৮৯৪

মা,

গতকাল সন্ধ্যায়[১] নিরাপদে ডেট্রয়েটে পৌঁছেছি। কনিষ্ঠা কন্যাদুটি আমার জন্য একটি ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। সুতরাং সবকিছুই ঠিকঠাক ছিল। আশা করছি বক্তৃতাটি উতরে যাবে, কারণ মেয়েদের মধ্যে একজন বলছিল যে, গরম কেকের মতো টিকিটগুলি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এখানে এসে মিঃ পামারের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম; তাতে আমাকে অনুরোধ জানিয়ে লিখেছেন, আমি যেন তাঁর গৃহে পদার্পণ করি ও তাঁর অতিথি হই।

কাল রাতে যেতে পারিনি। আজ তিনি যেকোন সময়ে আমাকে নিতে আসবেন। মিঃ পামারের কাছে যাচ্ছি বলে ভয়ঙ্করভাবে ঠাসা ব্যাগটা খুলিনি। ব্যাগটাকে আবার ভর্তি করার ভাবনা আমাকে হতাশ করে তোলে। সেজন্য আজ সকালে আমি দাড়ি কামাতে পারিনি। যাহোক, দিনের মধ্যে যেকোন সময় কামিয়ে নিতে পারব আশা করি। এই মুহূর্তে আমি বস্টন ও নিউ ইয়র্কে যাওয়ার কথা ভাবছি, কারণ গ্রীষ্মকালে মিসিগানের শহরগুলিতে আমি যেতে ও থাকতে পারি; কিন্তু নিউ ইয়র্ক ও বস্টনের ফ্যাসন-দুরস্তেরা তখন পালিয়ে যাবেন। প্রভু পথপ্রদর্শন করবেন।

মিসেস ব্যাগলি ও সম্পূর্ণ পরিবারটি আমার পুনরাগমনে আন্তরিকভাবে আনন্দিত হয়েছেন এবং লোকেরা আবার আমাকে দেখতে ভিড় করছে।

এখানকার ফটোগ্রাফারটি তাঁর তোলা ছবিগুলির মধ্যে কয়েকটি আমাকে পাঠিয়েছেন। সেগুলি যথার্থই জঘন্য হয়েছে। মিসেস ব্যাগলির সেগুলি মোটেই পছন্দ হয়নি। প্রকৃত ঘটনা হলো এই যে, দুই ফটোর অন্তর্বর্তী কালে আমার মুখমণ্ডল এত চর্বিগ্রস্ত ও ভারী হয়েছে যে, বেচারা ফটোগ্রাফার আর কী-ই বা করবে!

দয়া করে চার কপি ফটোগ্রাফ পাঠিয়ে দেবেন। হোল্ডেনের[২] সঙ্গে এখনো পর্যন্ত কোন বন্দোবস্ত হয়নি। সবকিছুই খুব চমৎকার বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। 'স্-সিনেটের প্-পামার'[৩] অত্যন্ত চমৎকার মানুষ এবং আমার প্রতি খুবই সদয়। তাঁর একজন ফরাসিদেশীয় খাস বাবুর্চি আছে—প্রভু তাঁর উদরটিকে আশীর্বাদ করুন। আমি অনশনে কাটাবার চেষ্টা করছি, আর গোটা দুনিয়াটা আমার বিরুদ্ধে!! তিনি সারা ওয়াশিংটনের সবচেয়ে সেরা ভোজ দিতেন! নিরুপায়! আমি শরণাগত!

মিঃ পামারের বাড়ি থেকে আমি আরো লিখব।

যদি হিমালয় পর্বত দোয়াত হয়, সমুদ্র হয় কালি, যদি স্বর্গের শাশ্বত দেবদারু (দেবদূতরা)[৪] হয় কলম এবং আকাশটা যদি হয় কাগজ, তাহলেও আমি আপনার ও আপনাদের নিকট যে-কৃতজ্ঞতার ঋণে ঋণী তার একবিন্দুও লিখে উঠতে পারব না। হেল স্বরগ্রামের[৫] চার পূর্ণ স্বর ও চার অর্ধ স্বরকে দয়া করে আমার ভালবাসা জানাবেন।

প্রভুর আশীর্বাদ আপনার ও আপনার পরিজনদের ওপর চিরদিন বর্ষিত হোক।

সকৃতজ্ঞ স্নেহবন্ধনে চিরবদ্ধ আপনার
বিবেকানন্দ

---

১ শুক্রবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজী ডেট্রয়েট ছেড়ে ওহিওর আডায় যান। অবশ্য নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি যে, তিনি সেখান থেকে শিকাগোয় ফিরে গিয়েছিলেন কিনা। অনুমান করা যায়, স্বামীজীর ডেট্রয়েটের অনুরাগিগণ তাঁকে আহ্বান করে নিয়ে গিয়েছিলেন খ্রিস্টানদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য, যা তাঁর বিরুদ্ধে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

২ এক বক্তৃতা-ব্যবস্থাপক সংস্থার ডেট্রয়েটের প্রতিনিধি।

৩ মিঃ টি. ডব্লু. পামার ছিলেন তোতলা; সেজন্য স্বামীজী মজা করে তাঁর নামের বানানটা এইভাবে লিখেছেন এবং উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে রেখেছেন।

৪ দেওদর হোল সিডারের (সিড্রাস দেওদরা) একটি উপপ্রজাতি। সংস্কৃত ভাষায় 'দেব' মানে দেবতা বা দেবদূত এবং 'দারু' মানে বৃক্ষ বা কাষ্ঠ; সুতরাং 'দেবদারু' অর্থ বলা যায় দেবদূতের বৃক্ষ।

৫ হেল পরিবারের চার পূর্ণ স্বর হলেন মিঃ ও মিসেস জর্জ ডব্লু. হেল, মাদার টেম্পল ও মিঃ ম্যাথুউস এবং অর্ধ স্বরগুলি হলো হ্যারিয়েট ও মেরী হেল এবং হ্যারিয়েট ও ইসাবেল ম্যাকিণ্ডলি—যথাক্রমে মিঃ ও মিসেস হেলের কন্যাদ্বয় ও ভাগনিদ্বয়।

ভগিনী ক্রিস্টিনকে লিখিত

(১)

মঠ বেলুড়, হাওড়া জেলা
১৫ ডিসেম্বর ১৮৯৮

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

কাশ্মীর থেকে লেখা আমার চিঠিটিকে তুমি নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর ভুল বুঝেছ। যকৃতের এই পীড়াটি পুনরায় শুরু হওয়ার পর থেকে আমি মাঝে মাঝেই বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ি এবং তুমি যদি আমাকে না বোঝ বা মার্জনা না কর তবে আর কে-ই বা করবে? মানুষ সবচেয়ে বেশি যা ভালবাসে, তারই সম্পর্কে কখনো কখনো শঙ্কিত হয়ে ওঠে, তবে সেই ভীতি নিবিড় আনন্দদায়ক।

তুমি কেমন আছ? এত পরিশ্রম করে তুমি প্রায়ই নিজেকে এতটা অবসন্ন করে ফেলছ কেন? বেবির খবর কি?

যদি বেঁচে থাকি তবে এই গ্রীষ্মে তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করব। আমার মতো কোন ব্যক্তিই এরকম কর্মের বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েনি, আবার তা থেকে মুক্ত হতে আমার চেয়ে বেশি চেষ্টাও কেউ করেনি। আমাকে কে বেশি চালনা করেছে বলে তোমার মনে হয়—মস্তিষ্ক না হৃদয়? 'মা'-ই আমাদের পথপ্রদর্শিকা। যাকিছু ঘটে এবং ঘটবে, সব তাঁরই নির্দেশে। এখনকার মতো বিদায় এবং তিনটি রহস্যপূর্ণ বছরের কথা ভেবে তুমি কিছুমাত্র উতলা হয়ো না। তারা তাদের যাবতীয় রহস্য উন্মোচন করবে এবং তোমার ভাণ্ডারে তাদের শুভফল জমা পড়বে। কোন সৎচিন্তারই বিনাশ নেই এবং আমি নিশ্চিত, তোমার চিন্তাধারা বরাবরই মহান।

'মা' তোমাকে সর্বদা রক্ষা করুন এবং তোমাকে সৎ, পবিত্র ও স্বাস্থ্যবতী রাখুন; আর তিনি সতত তোমার আকাঙ্ক্ষাসমূহ ফলবতী করুন—নিরন্তর এই প্রার্থনা জানাই।

সদা প্রভুপদাশ্রিত তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—খুব সম্ভবত তোমার এই চিঠির উত্তর আসার আগেই আমি ইওরোপ রওনা হব। খামের ওপর ঠিকানাটি যদি সঠিক না হয় তবে কিছু মনে করো না। নতুন খাতাটি আমি হারিয়ে ফেলেছি, এটি পুরনো খাতা থেকে নিয়েছি।*

---

* এই চিঠি থেকে মাত্র একটি পঙ্‌ক্তি 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র ৮ম খণ্ডে (১ম সং, পত্রসংখ্যা ৪০৯) প্রকাশিত হয়েছিল এবং ঐ চিঠিতে কাউকেই সম্বোধন করা হয়নি। চিঠিখানি এখানে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হলো।

(২)

১৭১৯ তুর্ক স্ট্রিট
স্যান ফ্রান্সিস্কো, ক্যালিফোর্ণিয়া
১২ মার্চ ১৯০০

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

নিউ ইয়র্ক হয়ে আসা তোমার একখানা চিঠি এইমাত্র পেয়েছি। সেদিন মিসেস ফ্রাঙ্কির ঠিকানায় তোমাকে একখানা চিঠি দিয়েছি, কারণ আমার নোটবইতে লেখা ঠিকানাগুলির মধ্যে কোন্‌টা তোমার সঠিক ঠিকানা সেসম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছিলাম না! টেলিপ্যাথি বা আহাম্মকী—এটা কোন্‌টা?

ইতিমধ্যে তুমি নিশ্চয়ই আমার চিঠিখানা পেয়েছ। আমার সম্পর্কে বিশেষ কিছু খবর নেই, কেবল দিনগুলি একই তালে চলে যাচ্ছে—অর্থোপার্জন সামান্যই; প্রচুর কাজ এবং ঘোরাঘুরি। এপ্রিল মাসে এই স্থান ত্যাগ করব এবং কয়েকদিনের জন্য শিকাগো যাব, তারপর ডেট্রয়েটে এবং অতঃপর নিউ ইয়র্ক হয়ে ইংল্যাণ্ডে। আশা করি তুমি ভাল আছ। আমার মানসিক অবস্থা এখন অত্যন্ত প্রশান্ত ও শান্তিময় এবং আশা করি জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলিতেও তাই থাকবে।

মিসেস ফ্রাঙ্কি ও আমাদের অন্যান্য বন্ধুবর্গ কেমন আছেন?

সকল ভালবাসা সহ
বিবেকানন্দ

শান্তির জন্য ধর্ম

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের সঙ্গে বেলুড় মঠে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২-এ সাক্ষাৎ করেন এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রাক্তন বিচারপতি **পালক বসু**। পরে শ্রীবসু সেদিনের কথোপকথনের বিশেষ কিছু অংশ লিপিবদ্ধ করে রাখেন। তারই কিছু নির্বাচিত অংশ মহারাজজীর অনুমতিক্রমে এখানে উপস্থাপন করা হলো। মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন সোমনাথ ভট্টাচার্য।



পূজ্যপাদ মহারাজজী গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২-এ বারাণসীতে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের শতবর্ষ-পূর্তি উৎসবের সমাপ্তি উপলক্ষ্যে বহির্বিভাগের রোগীদের জন্য নবনির্মিত একটি স্মারক ভবনের উদ্বোধন করেন। এই কথোপকথনটি শুরু হয় সেই প্রসঙ্গ দিয়ে।

মহারাজ : ভারত-প্রত্যাবর্তনের পর স্বামী বিবেকানন্দ বারাণসী গিয়েছিলেন। সেখানে একদল যুবক দরিদ্রদের জন্য একটি সেবাশ্রম খুলে কাজ শুরু করেছে দেখে তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন। ঠাকুরের যে-কথামৃতকে স্বামীজী সমগ্র বিশ্বে প্রচার করলেন, তাকে তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করতে দেখলেন। আজ একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে আক্ষরিক-ভাবে পালিত হয়ে আসছে ঠাকুরের কথামৃত-আশ্রিত রামকৃষ্ণ-মিশন-দর্শন : 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'। লক্ষ্য করুন, এতগুলি বছর ধরে মিশন কী সেবাটাই না করেছে! সত্যিই অসাধারণ।

শ্রীবসু : হ্যাঁ মহারাজ, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীভিত্তিক স্বামী বিবেকানন্দের এই দর্শনকে আন্তর্জাতিক মানুষ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছে। আজ সারা বিশ্ব জুড়ে মিশনের ১৪৮টিরও বেশি শাখা। সারা দেশ জুড়ে তৈরি হয়েছে আরো অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন—যারা এই লক্ষ্য অনুসরণ করে মানুষকে নানাভাবে সেবা করে চলেছে।... মহারাজ, সাম্প্রতিক কালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবরগুলো বড়ই উদ্বেগজনক এবং সেটা আরো এইজন্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামীরা যা গড়ে তুলতে চাইছেন, এসব তার উলটো দিকে যাচ্ছে।

মহারাজ : প্রকৃত ধর্ম কখনো হিংসা ছড়াতে পারে না, আবার ধর্মের নামে হিংসা ছড়ানোও যায় না। স্বরূপত ধর্ম হলো এক শান্তিপূর্ণ উদ্যোগ। এটি কখনো হিংসাকে স্বীকার করতে পারে না। যেকোন ধর্মের যা তাৎপর্য, হিংসা তার বিপরীত।

শ্রীবসু : কিন্তু মহারাজ, অভিযোগ উঠেছে যে, ধর্মের নামে কিছু চরমপন্থী মৌলবাদীর দায়িত্বজ্ঞানহীন কার্যকলাপের ফলে কয়েক মিনিটের মধ্যে হাজার হাজার নিরীহ প্রাণ নিঃশেষিত হয়ে গেছে ...

মহারাজ : ধর্মের অর্থ হলো সত্য, এবং সত্যধর্মের অর্থ শান্তি, সন্তোষ ও সেবা। ধর্ম বলতে যা বোঝায়, সেই অর্থে প্রকৃত কোন ধর্ম অনৈক্য বা হিংসাকে অনুমোদন করতে পারে না—ওগুলো পাগলামি মাত্র।... 'ইসলাম' কথাটিরই মানে হলো শান্তি, আত্মসমর্পণ, আজ্ঞাবহতা এবং ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ শরণাগতি। সত্য ধর্মরূপে ইসলাম প্রচার করে মানুষে মানুষে সৌভ্রাতৃত্ব ও সমতা। গীতার যা

অন্তর্নিহিত দর্শন, তা কোরান ও নিউ টেস্টামেন্টেরও অন্তর্দর্শন।

[বিচারপতি বসুর মন্তব্যঃ সাক্ষাৎকারের এইখানে এসে মনে পড়ে গেল মহারাজজীর দুটি বইয়ের কথা। প্রথমটির নাম 'The Message of Prophet Mohammad' (প্রফেট মহম্মদের বাণী)—যাতে আছে ১৯৪০ সালে রেঙ্গুনে (বর্তমান মায়ানমার) Muslim Students' Society of Burma-র ব্যবস্থাপনায় প্রফেটের জন্মদিন (২১ এপ্রিল) উপলক্ষ্যে দেওয়া মহারাজজীর বক্তৃতার একটি সঙ্কলন। দ্বিতীয় বইটি হলো 'The Christ We Adore' (যে-যিশুকে আমরা বন্দনা করি)। এই বইটিতে আছে—প্রাক-ক্রিসমাস সান্ধ্য উৎসব উপলক্ষ্যে ১৯৫৪-তে কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে প্রদত্ত মহারাজজীর বক্তৃতা, যেটি পরে ইনস্টিটিউটের 'বুলেটিন'-এ প্রকাশিত হয়। বইটির উপসংহারে রয়েছে মহারাজজীর এই আকর্ষক মন্তব্যঃ "যিশুখ্রিস্টের বাণী হলো আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের বাণী। সে-বাণীর তাৎপর্য আছে কেবল তখনি, যখন সাংসারিক বন্ধনকে আমাদের বিরক্তিকর ও গুরুভার বলে মনে হয় এবং আমরা নিজেদের স্বাধীনতার সন্ধান করি ঐশ্বরিক স্বাধীনতার মধ্যে। প্রভু এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, তখন আমরা যা সন্ধান করছি, তা লাভ করব। চাওয়া, খোঁজা আর দরজায় করাঘাত করাটা আমাদের কাজ; আর প্রদান করা, প্রকাশ করা ও উন্মুক্ত করাটা ঈশ্বরের। এই মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা যিশুখ্রিস্টের বন্দনা করি। এ-ই হলো গ্রহণ ও আত্মীকরণের হিন্দু-পদ্ধতি।"]

মহারাজ ঃ সমস্ত মানুষকে উদার ভাবের শিক্ষা দিতে হবে। মুসলমান সমাজের প্রজ্ঞাদীপ্ত বুদ্ধিজীবীদের সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে হবে সেই ভাব; সেইসঙ্গে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে প্রফেট মহম্মদের বাণীর ওপর। এই কাজে দেরি করা উচিত নয়, কারণ সারা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করছে ক্রমবর্ধমান হিংসা—যা শুধু সেই ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, অন্য যেকোন ধর্মের ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ অবান্তর ও অযৌক্তিক।... দেখুন, কোন ধর্মের অনুগামীরা কেন অল্প কয়েকজন স্বার্থান্বেষীর প্ররোচনায় প্রভাবিত হয়ে অন্য ধর্মের অনুগামীদের বিরুদ্ধাচরণ করবে? এধরনের কর্ম বিপরীত তরফ থেকে প্রতিক্রিয়ায় ইন্ধন যোগাবেই। হিংসা শুধু নিয়ে আসবে আরো বেশি হিংসা।... এটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক যে, আরব দুনিয়ায় কয়েকজন ধর্মীয় নেতাকে শারীরিক-ভাবে শেষ করে দেওয়া হয়েছে এই কারণে যে, তাঁরা কিছু উদার ভাব প্রচার করতে চেয়েছিলেন। তাই, যা বলছিলাম—সাধারণ মানুষ ও বুদ্ধিজীবীদের জেগে উঠতে হবে এবং প্রফেট মহম্মদের বাণী সম্বন্ধে ভুল-বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে সঠিক তথ্য প্রচারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। আপনি ডঃ রফিক জাকারিয়ার নাম শুনেছেন?

শ্রীবসু ঃ হ্যাঁ, মহারাজ, উনি মুম্বাইয়ের একজন নামকরা ব্যারিস্টার এবং মহারাষ্ট্র রাজনীতিতে খুব সক্রিয় একজন মানুষ। ভারতের হয়ে তিনি UNO (সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ)-তে প্রতিনিধিত্বও করেছেন। উনি অনেকগুলি বই লিখেছেন—যার মধ্যে সাম্প্রতিক-তম হলো 'The Man Who Divided India'।

মহারাজ ঃ ডঃ জাকারিয়া আমার বিশেষ বন্ধু। উনি ওঁর অনেক বইতে ও সংবাদপত্র রচনায় প্রফেট মহম্মদের বাণী ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, সে-বাণীতে কী সুন্দরভাবে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের ভাব অন্তর্নিহিত আছে। সমাজের কাছে এধরনের বুদ্ধিজীবীরা হলেন সম্পদ। আমি ওঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের কদর করি। রফিক জাকারিয়ার মতো মানুষকে আরো কাজ করতে হবে; এগিয়ে যেতে হবে উদার ভাব নিয়ে একটি গোটা সম্প্রদায়কে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে। আগেই বলেছি, ইসলামের অর্থ—শান্তি, সন্তোষ, সত্য, ভ্রাতৃত্ব ও সমতা। শ্রীরামকৃষ্ণ যার মূর্ত বিগ্রহ, সেই 'সর্বধর্ম-সমন্বয়'ই হলো একমাত্র শক্তি, যা শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা "যত মত তত পথ"-এর আদর্শে বিশ্বসমাজে ঐক্য ও শান্তি বজায় রাখতে ও গড়ে তুলতে পারে। এই কথাগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ এতটাই জোর দিয়ে বলতে পেরেছিলেন, কারণ তিনি নিজে ঈশ্বরলাভের প্রায় সবরকম পথেই সাধনা করেছিলেন। ❑

অখণ্ডের ঋষি

স্বামী ভূতেশানন্দ



ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীমা সারদাদেবী সম্বন্ধে যেমন মানুষের আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে, তেমনি স্বাভাবিকভাবে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কেও মানুষ আগ্রহী হচ্ছে। কারণ, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর স্থান, স্বামী বিবেকানন্দের স্থান তারই সমপর্যায়ের বলা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণকে, এমনকি শ্রীমা সারদাদেবীকেও যদি বুঝতে চাই তাহলে স্বামী বিবেকানন্দের আলোকপাত অনুসরণ না করলে বুঝতে পারব না। অনেকে বলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন ধর্মের গূঢ় রহস্য বা সূত্র, আর স্বামী বিবেকানন্দ সেই সূত্রের ভাষ্য বা ব্যাখ্যা। স্বামীজীর ব্যাখ্যাকে যদি অনুসরণ না করি, তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের বুদ্ধির অগম্যই থেকে যাবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণকে যখন তাঁর পার্ষদেরা প্রথম দেখেছিলেন তখন তাঁদের ভিতরেও এই ধারণাই ছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, আধ্যাত্মিক জগতে একটি বিরাট নক্ষত্র। তাঁর কথা ও আচরণ, এই জগতে তাঁর আসার উদ্দেশ্য এর বেশি বোঝার সামর্থ্য বোধহয় তখনো কারো হয়নি। আমরা জানি, তাঁর পার্ষদরা কেউ কেউ তাঁকে 'অবতার' বলে ঘোষণা করলে শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দিত না হয়ে বিরক্ত বোধ করতেন। তিনি একদিন বলছেন ঃ "কেউ ডাক্তারি করে, কেউ থিয়েটারের ম্যানেজারি করে —এখানে এসে অবতার বললে। ওরা মনে করে 'অবতার' বলে আমাকে খুব বাড়ালে—বড় করলে! ওরা অবতার কাকে বলে, তার বোঝে কি?" [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, গুরুভাব দ্বিতীয়ার্ধ] বাস্তবিক মুখে অবতার বলে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমাকে বড় করতে চাই, কিন্তু অবতার মানে আমরা কতটুকু বুঝি? আমাদের বুদ্ধি এত সামান্য, দৃষ্টি এত সীমিত যে, আমাদের সাধ্য নেই সেই দুরাবগাহী বিরাট সমুদ্রের অল্প অংশও আমরা ধারণা করতে পারি। তাই আমাদের চেয়ে থাকতে হয় শ্রীরামকৃষ্ণরূপ গভীর সমুদ্রের আবিষ্কর্তা এবং প্রকাশক স্বামী বিবেকানন্দের দিকে। স্বামী বিবেকানন্দকে যখন আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি দিয়ে দেখি, তখন তাঁকে বোঝার একটু সাহস হয় যে, তিনি কে? আবার বিবেকানন্দের দৃষ্টি দিয়ে যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখি, তখন বিস্মিত হয়ে যাই যে, এই সাধারণ মানুষটির মধ্যে এত গভীরতা! এত তাৎপর্য!

একদিন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরুভাইদের বলছেন, ঠাকুরের এক-একটি কথা নিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শনগ্রন্থ লেখা যেতে পারে। সেখানে উপস্থিত বন্ধু হরমোহন মিত্র তাঁর একথা শুনে অবাক হয়ে বললেন ঃ "বটে! আমরা তো ঠাকুরের কথার অত গভীর ভাব বুঝতে পারি না! তাঁর কোন একটি কথা ঐভাবে আমাকে বুঝিয়ে বলবে?" স্বামীজী তখন বললেন ঃ "আচ্ছা, ঠাকুরের যেকোন একটি কথা ধর, আমি বুঝুচ্চি।" বন্ধুটি তখন বললেন ঃ "বেশ, সর্বভূতে নারায়ণ দেখা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে ঠাকুর 'হাতি-নারায়ণ ও মাহুত-নারায়ণে'র যে-গল্পটি বলেন সেইটি বুঝিয়ে বল।" [ঐ, ১ম ভাগ, গুরুভাব-পূর্বার্ধ, ১ম অধ্যায়] স্বামীজী তখন এই গল্পটির মধ্য দিয়ে যে একটি গূঢ়তত্ত্বের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—তিনদিন ধরে তার ব্যাখ্যা করলেন। এইরকম মর্ম উদ্ঘাটন করার সামর্থ্য একমাত্র স্বামীজীরই ছিল। আর সকলে হয়তো মুগ্ধদৃষ্টিতে ঠাকুরকে দেখেছেন, তাঁদের স্ব স্ব জীবন ঠাকুরের আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন, তাঁর কাছ থেকে পথের নির্দেশ পেয়ে নিজেদের জীবনকে সার্থক করেছেন, জগতের ইতিহাসেও অনেক অবদান রেখে গিয়েছেন। কিন্তু যেভাবে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝেছিলেন, সেভাবে বোঝার সামর্থ্য আর কারো ছিল না।

স্বামীজী বলছেন ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার কিরে? অবতারের বাবা!" কথাটি শুনলে অতিশয়োক্তি মনে হবে। আমরা অবতারও বুঝি না, 'অবতারের বাবা' কাকে বলে

তাও জানি না। কথা হচ্ছে, যে-তত্ত্ব আমাদের দুর্জ্ঞেয় সেই তত্ত্বকে প্রকাশ করার সামর্থ্য সাধারণের হয় না, কারণ তা সম্ভব নয়। তাই আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝতে হলে স্বামীজীর দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। অনেক কথা আছে যা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়ে তিনি জগৎকে বলেছেন। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজী সম্বন্ধে যখন বলেছেন, তখন তাঁকে বুঝেছিলেন বলেই বলেছেন। এটি অনুধাবন করার। নরেন্দ্রনাথ তখনকার দিনের একজন শিক্ষিত যুবক, অতিশয় তার্কিক, কারো কথা মেনে নেন না, যাকে বলে—কাউকে তোয়াক্কা করেন না এবং নিজের ভাবে চলেন। সবাই তা জানে। কেউ কেউ এইজন্য তাঁর প্রশংসা করে, আবার অনেকে তাঁর হাবভাব দেখে বলে, ছোঁড়াটা একেবারে বেয়াড়া! কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মতো জহুরী দেখামাত্রই তাঁকে চিনেছেন এবং তখনি তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে পরীক্ষাও কম করেননি। সর্বভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, এ এক অমূল্য রত্ন, তাঁর জগদুদ্ধার কার্যে সহকারী হয়ে এসেছে। আমরা একটি অলৌকিক ঘটনার কথা জানি, যা লীলাপ্রসঙ্গকার খুব সচেতনভাবে অলৌকিকতাকে পরিহার করে আলোচনা করেছেন। এই ঘটনাটি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের স্বমুখেই শুনেছেন। ঠাকুর বলেছিলেন ঃ "একদিন দেখিতেছি—মন সমাধিপথে জ্যোতির্ময় বর্ত্মে উচ্চে উঠিয়া যাইতেছে; চন্দ্র-সূর্য-তারকা-মণ্ডিত স্থূলজগৎ সহজে অতিক্রম করিয়া উহা প্রথমে সূক্ষ্ম ভাবজগতে প্রবিষ্ট হইল।... ক্রমে উক্ত রাজ্যের চরম সীমায় উহা আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে দেখিলাম এক জ্যোতির্ময় ব্যবধান (বেড়া) প্রসারিত থাকিয়া খণ্ড ও অখণ্ডের রাজ্যকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া মন ক্রমে অখণ্ডের রাজত্বে প্রবেশ করিল, দেখিলাম—সেখানে মূর্তিবিশিষ্ট কেহ বা কিছুই আর নাই,... কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতে পাইলাম দিব্যজ্যোতির্ঘন-তনু সাতজন প্রবীণ ঋষি সেখানে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন।... এমন সময়ে দেখি, সম্মুখে অবস্থিত অখণ্ডের ঘরের ভেদমাত্রবিরহিত, সমরস জ্যোতির্মণ্ডলের একাংশ ঘণীভূত হইয়া দিব্যশিশুর আকারে পরিণত হইল। ঐ দেব-শিশু ইঁহাদিগের অন্যতমের নিকটে অবতরণপূর্বক নিজ অপূর্ব সুললিত বাহুযুগলের দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ প্রেমে ধারণ করিল;... সুকোমল প্রেমস্পর্শে ঋষি সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলেন এবং অর্ধস্তিমিত নির্নিমেষ লোচনে সেই অপূর্ব বালককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের প্রসন্নোজ্জ্বল ভাব দেখিয়া মনে হইল, বালক যেন তাঁহার বহুকালের পূর্বপরিচিত হৃদয়ের ধন। অদ্ভুত দেবশিশু তখন অসীম আনন্দ প্রকাশপূর্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিল, 'আমি যাইতেছি, তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে।' ঋষি তাঁহার ঐরূপ অনুরোধে কোন কথা না বলিলেও তাঁহার প্রেমপূর্ণ নয়ন তাঁহার অন্তরের সম্মতি ব্যক্ত করিল।... তাঁহারই শরীর-মনের একাংশ উজ্জ্বল জ্যোতির আকারে পরিণত হইয়া বিলোমমার্গে ধরাধামে অবতীর্ণ করিতেছে! নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র বুঝিয়াছিলাম, এ সেই ব্যক্তি!" [ঐ, ২য় ভাগ, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, ৪র্থ অধ্যায়]।

ঐ দিব্যশিশুটি কে তা আর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেননি। আমরা বুঝতে পারি, সেই শিশুটি তিনি নিজে—যিনি অখণ্ডের ঘরে জমাটবাঁধা একটি রূপ। এটি একটি প্রারম্ভিক কথা। এর দ্বারা আমাদের বুঝতে হবে, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দকে কি দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। স্বামীজী সম্পর্কে তিনি বলছেন ঃ "দেখিলাম, কেশব যেরূপ একটা শক্তির বিশেষ উৎকর্ষে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে, নরেন্দ্রের ভিতর ঐরূপ আঠারোটা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান! আবার দেখিলাম, কেশব ও বিজয়ের অন্তর দীপশিখার ন্যায় জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল রহিয়াছে; পরে নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখি, তাহার ভিতরের জ্ঞানসূর্য উদিত হইয়া মায়া-মোহের লেশ পর্যন্ত তথা হইতে দূরীভূত করিয়াছে।" [ঐ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়] আরো বলছেন ঃ "অনেক দেখলাম, কেউ দশদল, কেউ শতদল, নরেন্দ্র সহস্রদল পদ্ম।" কখনো বলছেন—নরেন সাধারণ নয়, জগন্মাতার বিশেষ যন্ত্ররূপে জগৎকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছে। এই দৃষ্টি দিয়ে দেখে তিনি তাঁর আদরের নরেন্দ্রকে মনের মতো করে তৈরি করেছেন। তাঁকে দিয়ে সাধন-ভজন করাচ্ছেন, তাঁকে আদর করছেন, শাসন করছেন। আবার নানাভাবে পরীক্ষাও করছেন। সব পরীক্ষায় নরেন্দ্রনাথ উত্তীর্ণ। তাঁকে কিসের জন্য ঠাকুর এইভাবে তৈরি করছেন তা তখনো কেউ বোঝেনি। আমরা এখন বুঝতে পারছি।

এই জগতে যে ধর্মভাব, আধ্যাত্মিকতার দৈন্য তা দূর করার জন্য একটি অপূর্ব যন্ত্ররূপে নরেন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণ তৈরি করেছেন। অনেকদিন থেকে নরেন্দ্রনাথ ধরেছেন তাঁকে সমাধি অনুভব করাতে হবে—নির্বিকল্প সমাধি চাই। তার চেয়ে আর বড় কথা নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কথায় কোন কান দেন না। বিশেষ করে ধরলে বলেন, মার ইচ্ছা হলে হবে। একদিন নরেন্দ্রনাথ সেই সমাধি অনুভব করলেন। তাঁর এক গুরুভাই সেটা বুঝতে না পেরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে বললেন, নরেন মরে গেছে। তাঁর কোন সংজ্ঞা নেই। ঠাকুর শুনে হাসলেন। তারপরে নরেন্দ্রনাথ সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হলে ঠাকুর তাঁকে ডেকে

স্বামী বিবেকানন্দের দুটি অপ্রকাশিত ছবি



আমেরিকার হলিউড কেন্দ্রে এই ছবি দুটি পাওয়া গেছে। সম্ভবত মিস আইডা আনসেল (ওরফে স্বামীজীর স্নেহধন্যা উজ্জ্বলা) ছবি দুটি হলিউডের স্বামী কৃষ্ণানন্দকে



উপহার দিয়েছিলেন। ১৯৯৭ সালে স্বামী কৃষ্ণানন্দের প্রয়াণের পর ছবি দুটি প্রকাশ লাভ করে। ছবি দুটি কোথায়, কখন তোলা হয়েছিল জানা যায়নি। তবে অনুমান করা হচ্ছে সানফ্রান্সিসকোতে ১৯০০ সালে ছবি দুটি তোলা হয়েছিল।

পাঠালেন। তিনি গেলে ঠাকুর বললেন ঃ "এখন দেখলি তো? এখন মা তোর দরজায় চাবি বন্ধ করে রাখলেন, মায়ের কাজ করবি, তারপরে মা চাবি খুলে দেবে।" অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট প্রণালীতে ঠাকুর স্বামীজীকে তৈরি করছেন।

মায়ের কাছে চাবি! সেই মা কে? ঠাকুরই তো মা। তাঁর কাছে চাবি, তিনি যখন চাবি খুলে দেবেন তখন নরেন্দ্রনাথ আবার সমাধিসুখ অনুভব করবেন অর্থাৎ জগতের উদ্ধার-কার্য সম্পন্ন না করা পর্যন্ত তাঁর ছুটি নেই। স্বামীজী কিন্তু স্বেচ্ছায় এই দায়িত্ব বরণ করেননি। বলেছেন, আমার জীবনের আদর্শ ছিল সমাধিতে মগ্ন হয়ে হিমালয়ের কোন গুহায় বসে থাকা, কিন্তু এই পাগলা বামুনের পাল্লায় পড়ে আমার সব গেল। আমি যতবার চেষ্টা করেছি আমাকে জোর করে টেনে এনে আবার এই জগতের কাজে নামিয়েছেন। ঠাকুরের ওপরে তাঁর যেন কত অভিমান, কত রাগ! তবু তাঁকে মন-প্রাণ সব সমর্পণ করেছেন। বলতেন ঃ "আসছে জন্মে না হয় বড় গুরু দেখা যাবে, এ-জন্ম এ-শরীর সেই মূর্খ বামুন কিনে নিয়েছে।" [বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পত্রসংখ্যা ২২০]

একদিন নরেন্দ্রনাথ তাঁর গুরুভাইদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় ফিরছেন। কথা উঠল ঠাকুরের সম্বন্ধে তাঁদের কি ধারণা? কেউ বলছে—অপূর্ব জ্ঞান, কেউ বলছে—অসাধারণ ভক্তি। এরকম নানা জনের নানারকম মন্তব্য হচ্ছে। নরেন্দ্রনাথ চুপ করে আছেন। তখন অনেকে তাঁকে বললে—তুমি কি বল? স্বামীজী উত্তরে বললেন—LOVE personified—প্রেমের মূর্তবিগ্রহ। ঠাকুরকে তিনি এইভাবে দেখেছেন। ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল অদ্ভুত। ঠাকুরের কাছে তিনি যে আত্মসমর্পণ করেছেন তা একদিনে নয়। ঠাকুরের সঙ্গে তিনি অনেক দ্বন্দ্ব করেছেন, বলেছেন—তাঁর সঙ্গে এমন লড়াই বোধহয় আর কেউ করেনি! পদে পদে তিনি ঠাকুরের কথার প্রতিবাদ করেছেন, তর্ক করেছেন, আর বলেছেন—প্রতিবারই হারতে হয়েছে। যে-ঠাকুর লেখাপড়া জানতেন না, শিষ্ট সমাজে চলার উপযুক্ত কিনা সন্দেহ—তাঁর কাছে স্বামীজী বারবার পরাভূত। কেন? কারণ, ঠাকুরের যে অপূর্ব শক্তি, তার কাছে কে না পরাস্ত হয়!

ঠাকুর একদিন তাঁর সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি নরেন্দ্রনাথকে সমর্পণ করলেন। কাশীপুরে মহাসমাধির আগে তিনি নরেন্দ্রনাথকে ডেকে সামনে বসিয়ে একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। স্বামীজী এসম্পর্কে পরে বলেছেন, তখন তাঁর অনুভব হয়েছিল—"যেন, ঠাকুরের দেহ হইতে তড়িৎকম্পনের মতো একটা সূক্ষ্ম তেজোরশ্মি তাঁহার দেহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। পরিশেষে তিনিও বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছিলেন। কতক্ষণ এইভাবে কাটিয়াছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। চেতনা লাভ করিয়া তিনি দেখিলেন, ঠাকুরের চক্ষে অশ্রুবর্ষণ হইতেছে। ইহাতে অতীব চমৎকৃত হইয়া এইরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলিলেন, 'আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের কাজ করবি। কাজ শেষ হলে পরে ফিরে যাবি।' " [যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম ভাগ] কেউ কেউ প্রশ্ন করে, এই চোখের জল কেন? তিনি কি সত্যই দৈন্যবোধ করছিলেন? তখন বুদ্ধি অনুসারে বলি, দৈন্য নয়, দুঃখের জন্য চোখের জল নয়—এ আনন্দাশ্রু। আনন্দ একারণে যে, তিনি এমন একজন উত্তরাধিকারীকে পেয়েছেন, যার ওপর তাঁর জগৎ-উদ্ধারকার্যের যে-আদর্শ, তাকে রূপায়িত করার দায়িত্ব দেওয়া যায়। এই শক্তিমান ব্যক্তিই তাঁর পতাকা বহন করে চারিদিকে নিয়ে যাবেন, বিশ্বজয় করবেন। এই স্বামীজী সম্বন্ধে আমরা সাধারণ মানুষ কতটুকুই বা জানি আর কি-ই বা বলব?

তবে এইটুকু বুঝতে পারি, স্বামীজী ধর্মজীবনকে নতুনভাবে আমাদের কাছে পরিবেশন করেছেন। তিনি ঠাকুরের কাছ থেকে তা পেয়েছেন। স্বামীজী না বললে আমরা কেউ ঠাকুরকে বুঝতে পারতাম না যে, তিনি এই তত্ত্ব প্রকাশ করতে দেহধারণ করে এসেছেন। ঠাকুরকে আমরা সাধারণভাবে একজন খুব উঁচুদরের ভক্ত বা উঁচু-দরের জ্ঞানী, বড়জোর একজন মহাপুরুষ ভাবতে পারতাম। কিন্তু জগৎকে একটা পরিবর্তন এনে দিতে পারে, এমন বিপুল শক্তি যে তাঁর ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে—একথা স্বামীজীর সাহায্য ছাড়া আমরা কখনো বুঝতে পারতাম না।

শৈশবের নরেন্দ্রনাথকে আমরা দুরন্ত ছেলেরূপে দেখি। আজকের শিশুরা যদি স্বামীজীর বাল্যজীবন পড়ে তাহলে আনন্দ পাবে, প্রেরণা পাবে। দুরন্ত হলেও তাঁর মধ্যে শৈশব থেকেই অমিত তেজ, বুদ্ধিমত্তা, সকলের প্রতি ভালবাসা, নেতৃত্বের শক্তি—এগুলি প্রকাশিত হয়েছে। তারপরে যখন তিনি ঠাকুরের কাছে গিয়েছেন তখন যুবক, কলেজে পড়ছেন। সেসময় তিনি শুধু পাঠ্যবিষয়েই তৃপ্ত ছিলেন না। বেশি করে বাইরের চিন্তাজগতের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিলেন। বড় বড় লেখকের, নানা পণ্ডিতের বই তিনি ইতিমধ্যেই পড়ে ফেলেছেন। অপূর্ব মেধা, বুদ্ধি ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তি তাঁর। সকলে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখত তাঁকে। ঠাকুর বলছেন ঃ "এই ছেলেটিকে দেখছ, এখানে একরকম। দুরন্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে, যেমন জুজুটি, আবার চাঁদনিতে যখন খেলে, তখন আর এক

মূর্তি।" ('কথামৃত', ১।৯।৭) অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথ যখন সাধারণ মানুষের ভিতরে আছেন তখন একরকম, যখন নেতৃত্ব দিচ্ছেন তখন আরেক রকম, কিন্তু ঠাকুরের কাছে যখন চুপটি করে বসে আছেন তখন আবার অন্যরকম। তবে ঠাকুরের কাছে শান্ত হয়ে বসে তাঁর কথা শুনলেও, আগেই বলেছি, ঠাকুরকে তিনি এককথায় মেনে নিতেন না, তর্ক করতেন। ঠাকুরও তাঁকে তর্কে উৎসাহিত করতেন। অনেকসময় অনেকে বিরক্ত হয়েছেন—ছেলেটা কে যে ঠাকুরের সঙ্গে এত তর্ক করে! ঠাকুর বলছেন, তর্ক করে যাচাই করে নেওয়া ভাল। নিজের সম্বন্ধেও ঠাকুর বলতেন ঃ "আমি বলছি বলে নিবি না। আমার প্রত্যেকটি কথা যাচিয়ে বাজিয়ে নে। যদি যুক্তিসিদ্ধ মনে হয় তবেই গ্রহণ করবি।" তাই বিশেষ করে তিনি নরেন্দ্রনাথকে তর্কে উৎসাহিত করতেন। আবার কখনো কখনো অন্যদের বলতেন ঃ "যা বলি বিশ্বাস কর।" নরেন্দ্রকে কখনো তা বলতেন না। নরেন্দ্রের সঙ্গে এই তাঁর সম্পর্ক। নরেন্দ্রকে তিনি নানারকম করে সাধন করালেন। তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি বাড়াতে যে এটা করলেন তা নয়, তাঁকে একটি সঙ্ঘের নেতৃত্ব দেওয়ার উপযুক্ত করে তৈরি করার জন্য এটা করলেন। ঠাকুর বললেন ঃ "নরেন শিক্ষে দিবে।" নরেন জগদ্গুরুরূপে শিক্ষা দেবে এবং তাঁর অন্যান্য ভক্তদের নেতারূপে তিনি নরেন্দ্রকে সামনে রেখে গেলেন।

তারপর ঠাকুরের দেহাবসানের পর নরেন্দ্রনাথ তাঁর গুরুভাইদের সকলকে একত্র করতে সচেষ্ট হলেন। তখনো তাঁরা সকলে সংসারত্যাগ সম্পর্কে দৃঢ়সঙ্কল্প হননি। নরেন্দ্র সকলকে ডেকে ঠাকুরের উদ্দীপনাপূর্ণ কথা বলে তাঁদের বোঝাতে লাগলেন যে, ঠাকুর এসেছিলেন আমাদের সকলকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য। তাঁর দেহাবসানের পর আমাদের আদর্শ কি ভুলে যাব? এইসব কথায় তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে সকলে একসঙ্গে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন, সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করলেন। তারপরে তাঁরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লেন। রমতা সাধুরা যেমন হয়। নরেন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম নন। তিনিও পাহাড় পর্বতে ঘুরে তপস্যা করতে লাগলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ বলছেন, ভিতরে এমন একটা প্রবল শক্তির আলোড়ন চলছে যা তাঁকে কোথাও স্থির হয়ে থাকতে দিচ্ছে না, ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে, ভারতের সর্বত্র ঘুরিয়ে তন্নতন্ন করে তাঁকে দেখাচ্ছে। ধনী থেকে দরিদ্র, রাজা থেকে ভিখারি—সকলের সঙ্গে তিনি সমভাবে মিশেছেন, সমগ্র দেশের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছে। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন আবু পাহাড়ের কাছে স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে স্বামীজীর দেখা হলো। তিনি তুরীয়ানন্দজীকে বললেন ঃ "হরিভাই, আমি এখনো তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছুই বুঝি না।... কিন্তু আমার হৃদয় খুব বেড়ে গেছে এবং আমি অপরের ব্যথা বোধ করতে শিখেছি। বিশ্বাস কর, আমার তীব্র দুঃখবোধ জেগেছে।" (যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম ভাগ) ঠাকুর তাঁকে এইজন্য তৈরি করেছিলেন, প্রেরণা দিয়েছিলেন।

ঠাকুর একদিন নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তুই কি চাস?" নরেন্দ্র বললেন ঃ "আমি সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকতে চাই। কখনো কখনো শরীরধারণের জন্য একটু নামব, আবার সমাধিতে ডুবে যাব।" ঠাকুর একথা শুনে তিরস্কার করে বললেন ঃ "সে কিরে! আমি কোথায় ভেবেছি তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি—যার ছায়ায় এসে ক্লান্ত পথিক তার শ্রান্তি দূর করবে, আর তুই কিনা নিজের মুক্তি চাস? এ তো অতি তুচ্ছ হীন কথা।" জগতের জন্য যে আসছে তাঁর নিজের সমাধিতে মগ্ন থাকার অবকাশ নেই—ঠাকুর এই শিক্ষা দিচ্ছেন। স্বামীজী শুনেছিলেন, কিন্তু তখনো পর্যন্ত শিক্ষাটি সেভাবে আত্মস্থ করেননি। তারপরে ধীরে ধীরে—তাঁর ভাষায়—যখন হৃদয় প্রসারিত হলো তখন দেখলেন যে, এই বিশাল ভারতের বিপুল জনগণের কী দুঃখ-দুর্দশা! দুর্দশা বলতে সবরকমের দুর্দশা—আধ্যাত্মিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক, দৈহিক তো বটেই। স্বাস্থ্যের অবস্থা শোচনীয়, শিক্ষা প্রায় নেই বললেই হয়। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও এক অবস্থা। সাধারণ মানুষ ধর্মের গভীর তত্ত্ব কিছুই জানে না। বলছেন—ঋষির বংশধরেরা আজ পশুর মতো জীবন-যাপন করছে!

তিনি এইসব দুঃখ ভুলতে পারছিলেন না—কি করে এই অগণিত মানুষের দুঃখ দূর হতে পারে? দুঃখ দূর করা মানে ঠাকুরের কথারই প্রতিধ্বনি করে স্বামীজী বলেছেন, প্রথমে অন্নদান, তারপর বিদ্যাদান, তারপরে ধর্মদান। ঠাকুর যে বলেছিলেন ঃ "খালি পেটে ধর্ম হয় না।"—একথা স্বামীজী ভোলেননি। বলছেন, এই দেশকে প্রথমে অন্ন দিয়ে পুষ্ট করতে হবে, শিক্ষা দিয়ে মার্জিত করতে হবে। তারপরে এদের ধর্মের উচ্চতর ধারণা করার সামর্থ্য হবে। কিন্তু সন্ন্যাসীর সহায়-সম্বল নেই, একাকী তিনি কি করবেন ভাবছেন। এমন সময় কেউ কেউ তাঁকে বলল—স্বামীজী, আপনাকে এদেশের লোক চিনবে না, আপনি পাশ্চাত্য দেশে মর্যাদা পাবেন। স্বামীজী নিজের কদর চাইতেন না। তিনি ভাবলেন, পাশ্চাত্য দেশ সমৃদ্ধ, যদি তাদের কাছ থেকে ভিক্ষা করে কিছু পাওয়া যায় তাহলে আমাদের এই গরিব দেশের সেবায় লাগানো যেতে পারে। কাজেই পাশ্চাত্য দেশে গেলে হয় না? কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় যাবেন না। বলছেন, ঠাকুরের আদেশ পেলে যাব।

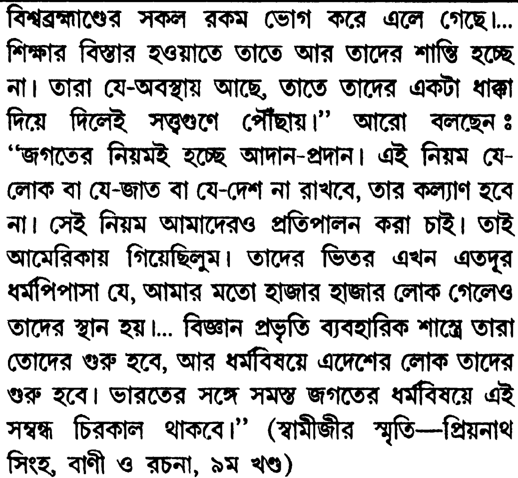
ঠাকুরের আদেশ একরকম পেলেন। একটি অনুভব হলো। দেখছেন যে, ঠাকুর সমুদ্রের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, আর স্বামীজীকে বলছেন, তুই আয়। তবুও তিনি যেতে রাজি হলেন না। বললেন, মা যদি আদেশ দেন তাহলেই যাব। মায়ের কাছে খবর পাঠানো হলো, মা বললেনঃ "হ্যাঁ বাবা, তুমি যাবে বৈকি, এটি ঠাকুরের ইচ্ছা। তোমাকে যেতে হবে।" তবে স্বামীজী রাজি হলেন, তারপর গেলেন।

গেলেন কিভাবে? সহায় নেই, সম্বল নেই। প্রথমে তাঁর অনুরাগীরা কোনরকম করে যাওয়ার খরচটি দিয়েছিল। কিন্তু তিনি যাবেন না বলে সেই টাকা বিতরণ করে দিয়েছিলেন। তারপরে খেতড়ির রাজা এবং আরো কয়েকজনের সাহায্যে তিনি যাওয়ার খরচ পেয়ে আমেরিকায় গেলেন। সেখানে তখন বিশ্বধর্মসম্মেলন হচ্ছে, তিনি সেই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য গেলেন। কি উদ্দেশ্যে? ধর্মপ্রচার করার উদ্দেশ্যে নয়, উদ্দেশ্য—এই দরিদ্র নিরন্ন ভারতের জন্য যদি ভিক্ষা করে কিছু সাহায্য আনতে পারেন।

প্রথমে সেখানে গিয়ে তিনি যে কষ্ট সহ্য করলেন তা বিস্তার করে বলা বাহুল্য। শিকাগোর সেই ধর্মমহাসভায় প্রথমদিন বক্তৃতা করেই তিনি সেখানে বিখ্যাত হয়ে পড়লেন। তার আগে তিনি সেদেশে কিংবা এদেশে 'বিবেকানন্দ' নামটি পর্যন্ত সবসময় ব্যবহার করেননি। নিজেকে গোপন রাখার জন্য নাম বদলে বদলে ঘুরতেন, যাতে তাঁর গুরুভাইরা না বুঝতে পারেন। শিকাগো থেকে বিবেকানন্দ নামে তাঁর পরিচিতি হলো। তখন তিনি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে পড়লেন। কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে কি কঠোর সংগ্রাম তাঁকে করতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও তাঁর অপরিসীম ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, অনন্যসাধারণ মেধা, সর্বোপরি আদর্শের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা আর একাগ্রতা তাঁকে উজ্জীবিত করে রেখেছিল। এই সূত্রে ভারতকে তিনি আরো চিনেছিলেন, তারপরে পাশ্চাত্য দেশকে জানতে চিনতে আরম্ভ করলেন। ঘুরে ঘুরে আমেরিকা-ইউরোপের নানা স্থানে গেলেন—প্রায় বিশ্ব পরিভ্রমণ করার মতো। শেষে তাঁর এই অভিজ্ঞতা হলো—ভারতে যেমন অন্নাভাব আছে পাশ্চাত্য দেশেও তেমনি অভাব আছে, সে-অভাব ধর্মের। পাশ্চাত্য দেশ অতুল ঐশ্বর্যের ভিতরে যেন মোহাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে কোন চেতনাই নেই। তাই স্বামীজী তখন ভাবলেন যে, ভারতের সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির একটি সমন্বয় হওয়া দরকার। যার ফলে পাশ্চাত্য ভারতের কাছ থেকে আধ্যাত্মিক সম্পদ গ্রহণ করবে, আর ভারত পাশ্চাত্য থেকে তার ঐহিক সম্পদ, তার বৈজ্ঞানিক, কারিগরী শিক্ষা প্রভৃতি গ্রহণ করবে। দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সংস্কৃতির সমন্বয়ে তখন একটি নতুন বিশ্বসংস্কৃতি গড়ে উঠবে। স্বামীজীর এই অবদান শুধু ভারতের ক্ষেত্রেই নয়, পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগে স্বামীজী এসম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না, কিন্তু ওদেশে যাওয়ার পর তাঁর এই অনুভব হলো।

ঠাকুর স্বামীজীকে যে এই বিরাট যন্ত্ররূপে তৈরি করেছিলেন, তা আগে কে জানত? জগৎকে দেওয়ার মতো স্বামীজীর যে এত ঐশ্বর্য, এত সম্পদ আছে তা তখন কে তা বুঝতে পেরেছিল? আমরা ভারতবাসীরা কিছুই জানতাম না, পশ্চিমীদের কাছেও তিনি অজ্ঞাতই ছিলেন। কিন্তু তারপর দেখা যাচ্ছে, স্বামীজীকে যন্ত্রস্বরূপ করে ঠাকুর সমস্ত বিশ্বে একটা নতুন ধারা প্রবর্তন করলেন, যার প্রভাব দেখে এখন দেশ-বিদেশের মনীষীরা বিস্মিত হয়ে যাচ্ছেন। কী অপূর্ব কর্মধারা—যা কল্পনাতীত! আর স্বামীজী যে-আদর্শ জগৎকে দিচ্ছেন, তার জন্য তিনি কোথাও অভিমান করে বলছেন না—ভারত তোমাদের ধর্মগুরু হয়ে থাকতে চায়। তিনি বলছেন—ভারতেরও দেওয়ার কিছু আছে, যেমন তোমাদের দেওয়ার আছে। পারস্পরিক আদান-প্রদান ব্যতীত কোন দেশ বাঁচতে পারে না। যখন দেওয়ার মতো কিছু না থাকে, কারো বাঁচার অধিকার থাকে না। যে দিতে পারে এবং নিতেও পারে—সেই বাঁচে। এজগতে এইভাবে পরস্পরের সহযোগিতার দ্বারা বিশ্ব এগিয়ে চলবে, যার প্রধান লক্ষ্য হবে আধ্যাত্মিক চেতনা। আর সেই চেতনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য এমন একটি সমাজ তৈরি হবে, যা সকলকে আধ্যাত্মিক অনুভূতির শীর্ষস্থানে নিয়ে যেতে সবরকম সুযোগ করে দেবে। স্বামীজীর আদর্শ এইরকম। স্বামীজীকে কেবল 'patriot' বা দেশপ্রেমিক বলব না, তাঁর ছিল বিশ্বপ্রেম।

স্বামীজীর বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহ একবার তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেনঃ "আচ্ছা স্বামীজী, তোমার নিজের দেশের লোক নিজেদের ধর্ম বুঝতে না পেরে কেউ খ্রিস্টান, কেউ মুসলমান, কেউবা অন্য কিছু হচ্ছে। তাদের জন্য তুমি কিছু না করে গেলে কিনা আমেরিকা-ইংল্যাণ্ডে ধর্ম বিলাতে?" স্বামীজী উত্তর দিলেনঃ "কি জানিস, তোদের দেশের লোকের যথার্থ ধর্ম গ্রহণ করবার শক্তি কি আছে?... যে-দেশের লোক পেটটা ভরে খেতে পায় না, তার ধর্ম হবে কি করে? যে-দেশের লোকের মনে ভোগের কোন আশাই মেটেনি, তাদের নিবৃত্তি কেমন করে হবে? তাই আগে যাতে মানুষ পেটটা ভরে খেতে পায় এবং কিছু ভোগবিলাস করতে পারে—তারই উপায় কর, তবে ক্রমে ঠিক ঠিক বৈরাগ্য এলে ধর্মলাভ হতে পারে। বিলাত-আমেরিকার লোকেরা কেমন জানিস? পূর্ণ রজোগুণী,



বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল রকম ভোগ করে এলে গেছে।... শিক্ষার বিস্তার হওয়াতে তাতে আর তাদের শান্তি হচ্ছে না। তারা যে-অবস্থায় আছে, তাতে তাদের একটা ধাক্কা দিয়ে দিলেই সত্ত্বগুণে পৌঁছায়।" আরো বলছেনঃ "জগতের নিয়মই হচ্ছে আদান-প্রদান। এই নিয়ম যে-লোক বা যে-জাত বা যে-দেশ না রাখবে, তার কল্যাণ হবে না। সেই নিয়ম আমাদেরও প্রতিপালন করা চাই। তাই আমেরিকায় গিয়েছিলুম। তাদের ভিতর এখন এতদূর ধর্মপিপাসা যে, আমার মতো হাজার হাজার লোক গেলেও তাদের স্থান হয়।... বিজ্ঞান প্রভৃতি ব্যবহারিক শাস্ত্রে তারা তোদের গুরু হবে, আর ধর্মবিষয়ে এদেশের লোক তাদের গুরু হবে। ভারতের সঙ্গে সমস্ত জগতের ধর্মবিষয়ে এই সম্বন্ধ চিরকাল থাকবে।" (স্বামীজীর স্মৃতি—প্রিয়নাথ সিংহ, বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড)

স্বামীজীকে যদি কেউ বলতেন যে—আপনি তো ভারতে জন্মেছেন, তাহলে ভারতের জন্য কাজ করেন না কেন? তাহলে তৎক্ষণাৎ স্বামীজী উত্তর দিতেনঃ "ভারতে আমি জন্মেছি—এটা দৈব ঘটনা। আমি যেখানেই থাকব সেখানে যে-অভাব দেখব সেই অভাব দূর করবার জন্য চেষ্টা করব, তাদের সেবা করব। ভারতে জন্মেছি বলে ভারতের দাসত্ব করব—তা নয়।" স্বামীজী বিশ্বের নাগরিক, সমগ্র জগতের জন্য তাঁর আবির্ভাব। তবে আমরা ভারতবাসীরা তাঁর কাছ থেকে অনেক বেশি পেয়েছি। তার কারণ—এই দেশে তাঁর জন্ম, এই দেশের সঙ্গে তাঁর আবাল্য পরিচয়। এই দেশের দারিদ্র্য-দুঃখ মর্মে মর্মে তিনি অনুভব করেছেন এবং সেই দারিদ্র্যমোচন করার জন্যই তিনি আমেরিকাযাত্রা করেছেন। কিন্তু সেজন্য তাঁকে ভারতের বলে সীমায়িত করলে আমরা ভুল করব।

স্বামীজী বলেছেন, ঠাকুর এসেছিলেন জগতের কুলকুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে দিতে। সেই জগৎ এই সমগ্র বিশ্ব। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের ভেদরেখা দিয়ে খণ্ডিত জগৎ নয়। ঠাকুর 'মতুয়ার বুদ্ধি' ত্যাগ করতে বলেছেন। তিনি তো জানতেন, এই ভারত ছাড়াও অন্য জায়গাতেও তাঁর ভক্তেরা আছে। তাদের ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন বর্ণ, কিন্তু তবুও তারা তাঁরই। জগতের মানুষকে ধর্মের পথে, পূর্ণতার পথে চালিয়ে নিয়ে যেতেই তো তাঁর আসা। সেইজন্যই অখণ্ডের ঘর থেকে যন্ত্রস্বরূপ করে নরেন্দ্রনাথকে নামিয়ে আনা, তাঁর সমাধির দরজায় তালা দিয়ে রাখা, আর সেই উদ্দেশ্য-পূরণের জন্যই সমুদ্রের ওপর দিয়ে পশ্চিম অভিমুখে হেঁটে যেতে যেতে স্বামীজীকে তাঁর অনুসরণ করতে বলা। স্বামীজী ঠাকুরের সেই মহা সমন্বয়ের বার্তাবাহী দূত—একথা আমাদের মনে রাখতে হবে। তবেই আমরা স্বামীজীকে বুঝতে পারব। তাঁর চরণে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন আমাদের সবরকম ভেদবুদ্ধি, ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত করেন, তাঁর কৃপায় আমরা যেন সকলেই সেই পূর্ণতার পথে এগিয়ে যেতে পারি।❑

ধুবড়িতে (অসম) প্রদত্ত পূজ্যপাদ মহারাজজীর ভাষণের সম্পাদিত অনুলিপি। ভাষণটির তারিখ অজ্ঞাত।

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ১৩

পাশাপাশি ঃ (১) মাদার চার্চ, (৪) কাঁটা, (৫) চিনি, (৬) রং, (৭) লঙ্কা, (৮) হাঁস, (৯) লাউকুমড়ো, (১৩) নবানুরাগ, (১৪) আর্য, (১৫) নৌকা, (১৮) জজ, (২০) পাকা, (২১) চাল, (২২) পরিব্রাজক।

ওপর-নিচ ঃ (১) মাস্টার, (২) চামড়া, (৩) শ্রীনিবাস, (৪) কাঁঠাল, (৯) লাটু, (১০) কুক, (১১) তনু, (১২) যোগ, (১৪) আটুপাটু, (১৬) কাজল, (১৭) মিছরি, (১৯) জনক।

শব্দচেতনা ১৩-এর সঠিক উত্তরদাতার নাম ঃ

শৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুষ্ঠান-সূচী ঃ কার্তিক ১৪০৯

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে

জন্মতিথি-কৃত্য ঃ স্বামী সুবোধানন্দ
কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী
৩০ কার্তিক, শনিবার
(১৬ নভেম্বর ২০০২)

পূজাতিথি-কৃত্য ঃ শ্রীশ্রীকালীপূজা
দীপান্বিতা অমাবস্যা
১৮ কার্তিক, সোমবার
(৪ নভেম্বর ২০০২)

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা
কার্তিক শুক্লা নবমী
২৭ কার্তিক, বুধবার
(১৩ নভেম্বর ২০০২)

একাদশী ঃ ১৫, ২৯ কার্তিক
শুক্রবার, শুক্রবার
(১, ১৫ নভেম্বর ২০০২)

শ্রীম-র সাধনার অমৃতকুম্ভ

স্বামী প্রভানন্দ

১৯০২ সালে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' প্রথম প্রকাশিত হয়। তাই এই বছরে 'কথামৃত'-এর শতবর্ষপূর্তি উদ্‌যাপিত হচ্ছে। বস্তুত, 'কথামৃত' এবং কথামৃতকার শ্রীমকে পৃথক করা যায় না। প্রবীণ গবেষক ও বিদগ্ধ সন্ন্যাসী স্বামী প্রভানন্দজী 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর শতবর্ষ-পূর্তির শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন শ্রীম-অনুধ্যানের মধ্য দিয়ে।



মহাভারত থেকে জানি দেবাসুরের দ্বন্দ্ব অনেকদিন ধরে চলেছিল। দেবতারা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা শক্তিসঞ্চয়ের জন্য প্রার্থনা জানালেন বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণুর উপদেশে দেবতাদের সিদ্ধান্ত হলো —সমুদ্রমন্থন করে অমৃত সংগ্রহ করতে হবে। যে-কাহিনীটি মহাভারতে রয়েছে তার সঙ্গে বায়ুপুরাণ বা মৎস্যপুরাণের কাহিনীর কিছু পার্থক্য থাকলেও প্রায় একই মূল কাহিনী থেকে জানা যায় যে, সমুদ্রমন্থন করে সংগৃহীত অমৃতের সবটুকু পাওয়ার জন্য দেবতারা খুব চেষ্টা করলেন। তার খানিকটা চুরি হয়ে গিয়েছিল। এপ্রসঙ্গে রাহু-কেতুর কাহিনী প্রসিদ্ধ।

'অমৃত' শব্দটি নানান অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যখন খুব শীত পড়ে তখন যদি একটু আগুন পোহানো যায়, তা মনে হয় অমৃত। যখন কেউ রাজসম্মান পায়, তখন বলে অমৃতের আস্বাদন করছে। আবার অযাচিত কিছু পেলে তখনো বলি, যেন অমৃত পেলাম। এসব অর্থে এখানে 'অমৃত' শব্দ ব্যবহার করছি না। 'অমৃত' শব্দ ব্যবহার করছি উপনিষদে ব্যবহৃত অর্থে। উপনিষদ্ বলেছেন "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।" (মুণ্ডক উপনিষদ্, ২।২।৭) এ-অমৃতত্ব লাভ মানুষের চির-আকাঙ্ক্ষিত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঃ "ঈশ্বরলাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।" ঈশ্বর-লাভ অমৃতত্ব লাভের তুল্য। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, দেবাসুরের দ্বন্দ্ব, সমুদ্রমন্থন এবং তা থেকে অমৃত আহরণ—এসব প্রতিযুগেই চলছে। 'অসুর' শব্দের অর্থ প্রাণবান, দেহসর্বস্ব। 'দেবতা' শব্দের উৎপত্তি 'দিব্' ধাতু থেকে। দেবতা হবেন দীপ্তিমান, দ্যোতনাত্মক স্বরূপসন্ধানী, অন্তর্মুখী। দেব ও অসুরের দ্বন্দ্ব চিরকালের দ্বন্দ্ব, দৈবশক্তি ও আসুরিক শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব এখনো চলেছে। ঠাকুর যাকে বলেছেন কলিকাল, তা হচ্ছে আধুনিক কাল। আধুনিক কালে মানুষ দেহের প্রতি—স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের প্রতি অত্যধিক আসক্ত, দেহাতিরিক্ত তার যে সত্তা—সেদিকে তার হুঁশ নেই।

আরো কথা। প্রত্যেক যুগেই দেবাসুরের সংগ্রামের পরিণতিতে অমৃত সঞ্চিত হয়েছে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ অমৃত সংগ্রহ করে 'গীতামৃত' উপহার দিয়েছেন। যুগে যুগে বিভিন্ন ঈশ্বরকল্প পুরুষ এসে অমৃত বিতরণ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের ঘোষণা—এখন নতুন যুগ, নতুন বেদ, নতুন দেবতা। নতুন দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ জগদ্বাসীকে অমৃত উপহার দিয়েছেন। সে-অমৃতের প্রচার ও প্রসার করার দায়িত্ব পড়েছিল কয়েকজনের ওপর। সাধারণের মধ্যে বিতরণের জন্য বিশেষ দায়িত্ব পড়েছিল মহেন্দ্র মাস্টারের ওপর। তিনি ঠাকুরের 'মহিন্দর' বা 'মাস্টার' বা 'ইংলিশম্যান'। নানান নামে ঠাকুর তাঁকে ডাকতেন। তিনিই আমাদের সুপরিচিত কথামৃতকার 'শ্রীম'। তিনি কঠোর সাধনা করে সেই অমৃতধারণে সমর্থ কুম্ভরূপে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। সেই গড়ে তোলার কাহিনী এবং অমৃত বিতরণে তাঁর ভূমিকা আমাদের আলোচ্য।

যেমন পরিশ্রমের, তেমনি তপস্যার কোন বিকল্প নেই। তপস্যার জয়গানে সব শাস্ত্র মুখর। মানুষের এমন কোন কাম্য নেই যা তপস্যার দ্বারা পাওয়া যায় না। সবকিছুই পাওয়া যেতে পারে। তপস্যা সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেছেন ঃ

"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ৩।২) তপস্যা অবলম্বন করেই আমাদের সেই ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করতে হবে, পরম সত্যে পৌঁছাতে হবে। তপস্যা আশ্রয় করেই নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। তপস্যার দ্বারা শ্রীম তাঁর দেহ-মনকে তৈরি করেছিলেন, বুদ্ধিকে পরিমার্জিত করেছিলেন, তাঁর জীবনকুম্ভটিকে নির্মাণ করেছিলেন; তাঁর সত্তার মধ্যে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন উপস্থিত হয়েছিল এবং তিনি অমৃত ধারণ ও বহন করার অসাধারণ সামর্থ্য অর্জন করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণকে মাস্টারমশায় প্রথম দেখেছিলেন ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বা মার্চের কোন এক রবিবারে সন্ধ্যার মুখে। প্রথম দর্শনেই তাঁর মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার হলো। কঠ উপনিষদের নচিকেতার মতো মাস্টার-মশায়ের মনও শ্রদ্ধার ভাবে আবিষ্ট হলো। তাঁর মনে হলো, পুরীধামে যেন রামানন্দ প্রমুখের সঙ্গে চৈতন্যদেব ঈশ্বর বিষয়ে আলাপ করছেন। মনে হলো শ্রীরামকৃষ্ণ যেন সেই 'ভাগবত'-এর কথক শুকদেব! কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর আহ্বান 'আবার এসো' তাঁর মনে গেঁথে গেল। মাস্টারমশায়ের নতুন এক জীবন শুরু হলো। কয়েকদিন পরে ঠাকুর তাঁকে কথাপ্রসঙ্গে বলছেন ঃ "দেখ, ঈশ্বরদর্শন না হলে কিছুই হয় না। আর ঈশ্বরদর্শন করতে হলে চাই ব্যাকুলতা, বিবেক ও বৈরাগ্য।" মাস্টারমশায় চুপ করে আছেন। একটু পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করছেন ঃ "বুঝেছ?" মাস্টারমশায় বলছেন ঃ "হ্যাঁ বুঝেছি।" ঠাকুর আবার বলছেন ঃ "ও বোঝাতে হবে না। ধারণা করতে হবে। ধারণা করতে অভ্যাস করতে হয় এবং অভ্যাস করতে করতেই ধারণার শক্তি বাড়ে। ধারণা না হলে মনে দাগ কাটে না। গান শোনার সময় গানের কথা বুঝে নিয়ে ধারণা করার চেষ্টা করলে গানটা মনে দাগ কেটে যায়, মনে সেটা ঠিক ঠিক বসে যায়। ঠিক তেমনি শাস্ত্র এবং গুরুর উপদেশ ঠিক ঠিক মনে ধারণা করতে পারলে, বুঝতে হবে যে আমাদের মন প্রস্তুত হয়েছে। আর তখনি সেই উপদেশ অনুযায়ী জীবনযাপনের চেষ্টা করা সম্ভব। অর্থাৎ সে-বিষয়ে মন তন্ময় হলে, তদ্গত হলেই তদনুযায়ী সাধক উপলব্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারে।" আরো একটা কথা, ঐ বছরের শেষের দিকে ঠাকুর একদিন মাস্টারমশায়কে বলছেন ঃ "দেখ, ঈশ্বরের উপর যদি সত্যিকারের ভালবাসা না আসে তাহলে উপদেশ ঠিক ঠিক ধারণা হয় না।" দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন ঃ "এই যে কাঁচ, তার উপর যদি একটা কালি মাখিয়ে না দেওয়া যায় তাহলে তা দিয়ে ফটো তোলা যায় না। মনের উপর ভক্তির প্রলেপটি ঠিকমতো না থাকলে উপদেশ ঠিকমতো ধারণা হয় না।" 'কথামৃত'-এ ঠাকুরের জীবন ও বাণী সংক্রান্ত অফুরন্ত উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে। আবার ঠিক তার পাশে পাশেই অঙ্কিত হয়েছে মাস্টারমশায়ের সাধনজীবনের ইতিহাস। লেখা রয়েছে—মাস্টারমশায় ঠাকুরের উপদেশ অনুসরণ করে কিভাবে ভক্তির পথ ধরে সাধনজীবনে এগিয়ে যাচ্ছেন।

মাস্টারমশায় একজন ছাপোষা সংসারী। সাংসারিক জ্বালায় জর্জরিত হয়ে তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসে পৌঁছেছিলেন ঠিক 'ঝড়ের এঁটো পাতার' মতো। প্রথম দিনের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে ঠাকুর পরে বলেছিলেন যে, একটা ছেঁড়া জুতো ও একটা ভাঙা ছাতা নিয়ে মাস্টারমশায় উপস্থিত হয়েছিলেন। মাস্টারমশায় নিজে মুখে বলেছিলেন ঃ "আমি যখন প্রথম যাই কী অদ্ভুত কাণ্ড! বাড়িতে বনিবনা হলো না বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে।... মনে হলো এ-বাড়িতে আর থাকা হবে না। সুইসাইড করে সব জ্বালা-যন্ত্রণা দূর করব।... শেষে ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ।" এর সাত-আট দিন পরে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের উঠান দিয়ে ঠাকুর হেঁটে যাচ্ছিলেন, তিনিও যাচ্ছিলেন। মাস্টারমশাই নিজের নাম পরিবর্তন করে লিখেছেন 'মণি'। 'মণি' বলছেন ঠাকুরকে ঃ "এসব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আত্মহত্যা করাই ভাল।" ঠাকুর শুনেই উত্তর করলেন ঃ "ওকথা কেন, তোমার যে গুরুলাভ হয়েছে।"[1]

শুরু হলো তাঁর নতুন জীবন। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে আমূল পরিবর্তন এসে উপস্থিত হলো।[2] এসবকিছু অন্তর্জগতের পরিবর্তন। দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকল। অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি জানতে পারলেন যে, তিনি অন্য দশজনের মতো নন। তিনি অবতারের লীলাসঙ্গী। ঠাকুর বলতেন, চাররকমের জীব আছে—বদ্ধজীব, নিত্যজীব, মুমুক্ষুজীব আর মুক্তজীব। তিনি নিত্য-জীবের থাকের। তিনি অতীতে ঈশাবতার শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে এসেছিলেন, এবারেও তিনি ঈশাবতারের সঙ্গেই উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে ঠাকুর বিভিন্ন সময়ে নানান কথা বলেছেন—সেগুলোকে মাস্টারমশায় তাঁর নিজের জন্য মনে করতেন 'মহাবাক্য'। উপনিষদের মহাবাক্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি মহামূল্যবান এই কথাগুলি তাঁর সাধনজীবনের দুর্লভ সম্পদ। ঠাকুরের সেসব কথার অধিকাংশই 'কথামৃত'-এর

---

১ শ্রীম-দর্শন—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪০

২ শ্রীম তাঁর এই দুর্লভ অভিজ্ঞতা একটি কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। কবিতাটি 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

মধ্যে প্রকাশিত হয়ে গেছে। ঠাকুরের কথায় তিনি জানতে পারেন যে, ভক্তদের মধ্যে যাঁরা ঠাকুরের কাছে আসতেন, তাঁদের মধ্যে দুটো থাক। তাঁদের তিনি বহিরঙ্গ আর অন্তরঙ্গ—এই দুই ভাগে ভাগ করতেন। যাঁরা অন্তরঙ্গ তাঁরা বলেন না যে, আমায় উদ্ধার কর। তাঁদের দুটো জিনিস জানলেই হলো, প্রথমত শ্রীরামকৃষ্ণ কে? তারপর তাঁরা কে? শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ কি? ঠাকুর শ্রীমকে বলছেন ঃ "তুমি এই শেষ থাকের।" এটি একটি 'মহাবাক্য'। একদিন ভাবাবস্থায় ঠাকুর বলছেন ঃ "এতক্ষণ কি দেখছিলাম? ব্রহ্মাণ্ড একটা শালগ্রাম। তার ভিতর তোমার দুটো চক্ষু দেখেছিলাম।" এধরনের অলৌকিক অনেক কথা 'মহাবাক্য'গুলির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। এভাবে মাস্টারমশায় জানতে পারেন যে, তাঁর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে একটি বিশেষ ভূমিকা। সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানতে পারেন যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার।

অবতারতত্ত্ব ধারণা করা খুব সহজ নয়। তার জন্য প্রয়োজন তীব্র তপস্যার। অবতারতত্ত্ব ধারণা করার জন্য মাস্টারমশায়কেও প্রচুর তপস্যা করতে হয়েছিল। ক্রমশ তিনি বুঝতে পারেন ঠাকুরের স্বরূপ। একদিন তিনি ঠাকুরকে বলেন ঃ "ঈশ্বর যেমন অনন্ত, আপনিও তেমনি অনন্ত।" আবার যখন ঠাকুর জানতে চান ঃ "এই যে অবতার বলে বলছ, এটা পূর্ণ না অংশ না কলা?" শ্রীম উত্তরে বলছেন ঃ "আজ্ঞা ওজন বলতে পারছি না।" অর্থাৎ 'quantify' করতে পারছি না। "তবে তাঁর শক্তি অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তি অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি তো আছেনই।" এভাবে দেখতে পাই, ঠাকুর সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ক্রমশ বিবর্তিত হচ্ছে, গভীর হচ্ছে এবং খুব পরিষ্কার হয়ে উঠছে। একদিন শ্রীম বলছেন ঃ "আমার মনে হয় যিশুখ্রিস্ট, চৈতন্যদেব এবং আপনি একই ব্যক্তি।" ঠাকুর সম্মতি জানালেন। মজার কথা, তার কিছুদিন আগেই বলরাম-মন্দিরে বসে তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন ঃ "যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ।" এই কথা যে ঠাকুর বিভিন্ন জনকে বলেছিলেন, 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এ তার উল্লেখ আছে। অতঃপর তাঁর একটা নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছিল। যিনি রাম যিনি কৃষ্ণ—তিনিই যে শ্রীরামকৃষ্ণ, শুধু তা নয়, তাঁর ধারণা হয়েছিল—যিনি যিশুখ্রিস্ট, যিনি চৈতন্যদেব, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীম ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তরে প্রকারান্তরে বলেছিলেন যে, ঠাকুরের মধ্য দিয়েই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বটি বুঝতে পারা যায়। অবতারতত্ত্বের মর্মটি তিনি ধারণা করতে পেরেছেন দেখে ঠাকুর তাঁর পিঠ চাপড়েছিলেন। এইভাবে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর এবং অন্যান্য অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সঙ্গে তাঁর যে-সম্পর্ক—এই জানাজানির সাধনা চলতে থাকে।

এধরনের বোঝাপড়ার সাধনা চলার মুখেই শ্রীগুরু কতকগুলি শর্ত আরোপ করেন। বলা যেতে পারে, তিনি একটা লক্ষ্মণরেখা টেনে দিয়েছিলেন। মাস্টারমশায় গৃহত্যাগ করতে চেয়েছেন, আত্মহত্যা করতে চেয়েছেন, সন্ন্যাস নিতে চেয়েছেন, কিন্তু ঠাকুর এসবই নিষেধ করে দিলেন। তাঁর জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল গৃহস্থ-সন্ন্যাসীর জীবন। অসাধারণ এই ভাবটি। এটি আমাদের শাস্ত্রেই রয়েছে—'দেবীভাগবত'-এ। 'কথামৃত'-এও একটি জায়গায় মাস্টারমশায় 'গৃহস্থ-সন্ন্যাসী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধন-প্রচেষ্টার সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। শুধু ভগবানলাভ নয়, ভগবানলাভ তাঁর মতো নিত্যজীবের কাছে বড় প্রশ্ন নয়—সেটা তাঁদের হাতের মুঠোতেই থাকে; কিন্তু অবতারের সঙ্গী হিসাবে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল একটি ভূমিকা। সেই ভূমিকাটি জেনে নিয়ে তা পালনের জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং সেটি পালন করাই তাঁর লক্ষ্য। দেখা গেল, তিনি দুটি মুখ্য ভূমিকায় উপস্থিত হয়েছেন। গৃহস্থ-সন্ন্যাসীর মডেল তাঁর প্রথম ভূমিকা। দ্বিতীয় ভূমিকায় তিনিই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাগবতের কথক এবং প্রতিবেদক।

'কথামৃত'-এর মধ্যেই একজায়গায় রয়েছে সাধন-ভজনের উদ্দেশ্য তিনটি—প্রথমত, জ্ঞানলাভ। দ্বিতীয়ত, লোকশিক্ষার প্রসার। আর তৃতীয়ত, প্রত্যেকের নিজস্ব যে একটা স্বভাব রয়েছে, যে Inherent tendency নিয়ে সে জন্মায়—স্বভাববশেই সে সেগুলি বিকাশের জন্য সাধনা করে। একথা শ্রীম নিজমুখে বলেছিলেন। অল্প বয়সেই তাঁর ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। কেশবচন্দ্রের দ্বারা তিনি বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাছাড়া স্কুল-কলেজে তিনি একজন সেরা ছাত্র ছিলেন। ঠাকুরের কাছে যাঁরা যাতায়াত করতেন, তাঁদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমাপে তিনি ছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট। স্বভাববশত সাধনপথে চলতে চলতে তিনি কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। যেমন বিচার এবং বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব, সাকার-নিরাকার উপাসনার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি। সেসব দ্বন্দ্ব তাঁকে ধীরে ধীরে অতিক্রম করতে হয়েছিল। একটি ঘটনা বলা যাক। আমরা দেখি গীতাতে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন ঃ "স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে।" (১০।১৩) —তুমি যেকালে নিজেই বলছ 'আমি অবতার', সেকালে আমি বিশ্বাস করছি। ঠাকুর মাস্টারমশায়কে বিশুদ্ধ বিশ্বাসের পথ ধরে চলতে আদেশ করেন। বলছেন, বিচার সাধককে বেশি দূর যেতে সাহায্য করে না। প্রায়ই ঠাকুর তাঁকে বলেছেন ঃ "তোমার বিচারের মাথায় বজ্রাঘাত কর।" বিশ্বাসের পথে শ্রীম কতটুকু এগিয়েছেন তা দেখার

জন্য একদিন তিনি পরীক্ষা করছেন, বলছেন তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা। মা কালীর দর্শনলাভের পর তাঁর মনে একদিন প্রশ্ন জাগল, এই যে দর্শনলাভ করেছি সেটা ঠিক তো? সামনে পড়েছিল একটা বড় পাথর। তিনি ভাবলেন—যদি পাথরটা তিনবার লাফিয়ে ওঠে, তাহলে বুঝব দর্শন সব ঠিকঠিক হয়েছে। যেই মনে করা অমনি তিনবার পাথরটা লাফিয়ে উঠল। মাস্টারমশায় সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তুমি বিশ্বাস কর।" উত্তরে মাস্টারমশায় বলছেন ঃ "আপনি যখন বলছেন নিশ্চয়ই বিশ্বাস করছি।" পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে তিনি সাধনপথে এগোতে থাকেন।

তিনি যে-সাধনপথ অনুসরণ করছিলেন, বলা যায় সেটা রামায়ণের বিভীষণের সঙ্গে তুলনীয়। অধ্যাত্ম-রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের ২৯নং শ্লোকে দেখি বিভীষণ আশ্রয় নিতে এসেছেন শ্রীরামচন্দ্রের কাছে। বিভীষণ প্রার্থনা করে বলছেন ঃ "অহং ত্বৎপাদসদ্ভক্তিনিঃ-শ্রেণীং প্রাপ্য রাঘব।/ ইচ্ছামি জ্ঞানযোগাখ্যং সৌধমারোঢু-মীশ্বর।।"—হে রাঘব, হে প্রভো! আমি তোমার চরণ-কমলে শুদ্ধাভক্তিরূপ সোপান অবলম্বন করে ধীরে ধীরে জ্ঞানযোগ নামক সৌধশিখরে আরোহণ করতে চাই। অর্থাৎ ভক্তিযোগ আশ্রয় করে আমি সেই জ্ঞানের শিখরে উঠতে চাই। মাস্টারমশায় প্রথম জীবনে ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে এসে এবং পাশ্চাত্য দর্শন পাঠ করে জ্ঞানের পথটি বেছে নিয়েছিলেন। তিনি দর্শনশাস্ত্রের ভাল ছাত্র ছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে তাঁর জীবনে পরিবর্তন উপস্থিত হলো, তিনি ভক্তির পথ আশ্রয় করলেন। ভক্তি আশ্রয় করে এগোবার পথে মনকে পরিষ্কার করতে হয়, পবিত্র রাখতে হয়। যেমন কোন বয়ামে ভাল ঘি রাখতে হলে প্রথমেই বয়ামটা ভাল করে পরিষ্কার করতে হয়। নতুবা ভাল ঘি নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক তেমনি ভক্তিকে ধারণ করার জন্য মনটাকে আগে সাফ করতে হয়। আরো কথা, কাঁচ থেকে ধুলো-ময়লা শুধু পরিষ্কার করলেই হবে না, কাঁচটি বেশ মসৃণ হওয়া চাই। নতুবা তার ওপর সিলভার নাইট্রেট দিলেও সুস্পষ্ট ছবি উঠবে না। তখনকার দিনে কাঁচের ওপর সিলভার নাইট্রেট লাগিয়ে নিয়ে ছবি তোলা হতো। সিলভার নাইট্রেট-রূপ ভক্তির প্রলেপ শুদ্ধ মনের ওপর লাগিয়ে ছবি তুললে তবেই সুন্দর ছবি উঠবে।

যাহোক, ভক্তির পথ ধরে শ্রীম জ্ঞানের পৈঠায় ওঠার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। ভক্তির পথ ধরে তিনি গীতোক্ত 'একভক্তি বিশিষ্যতে' বা ভাগবতোক্ত 'একান্তী ভক্তি' আশ্রয় করলেন। এ-ভক্তির লক্ষণ ঈশ্বরাসক্তি এবং অনন্যাশ্রয়। স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ গুরুরূপে কৃপা করেছেন। তিনিই একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র অবলম্বন—এই ভাবটি ধরে নিয়ে মাস্টারমশায় নিত্যযুক্ত হয়ে থাকলেন। এবিষয়ের ধ্যান-ধারণাতে নিজেকে তিনি ব্যাপৃত রাখলেন। তাঁর সমস্ত উপাসনা হয়ে দাঁড়াল 'সদা তদ্ভাবভাবিত' হওয়া। তিনি যাকিছু করেছেন, যাকিছু শুনেছেন, যাকিছু দেখেছেন বা যেখানে গিয়েছেন—সবকিছুই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবে সম্পৃক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য সব ভাবনা তাঁর মনে ফিকে হয়ে গেল। সাধনপথে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন কিনা সেটা মাঝেমাঝে যাচাই করে দেখতেন।

এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। বলা হয়েছে, তিনটি লক্ষণ যাচাই করে দেখতে হবে—ভক্তি, বিরক্তি এবং ভগবৎপ্রবোধ। সাধনপথের চমৎকার 'test'। একটিতে উন্নতি হলে অপর দুটি আপনা থেকে উপস্থিত হবে। ভক্তির পথে এগোলে আরো দুটি ভাব আপনা থেকে এসে পড়ে। বিরক্তি আসবে। বিরক্তি মানে ঈশ্বর ভিন্ন অন্য সমস্ত বিষয় 'আলুনি' মনে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আসক্তি কমে যাবে। ক্রমে ভগবান সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার হবে এবং ভগবানের সান্নিধ্যের অনুভূতি স্পষ্টতর হয়ে উঠবে। উদাহরণ দিয়ে ঠাকুর বলতেন ঃ "একটা বরফের পাহাড়ের দিকে যতই এগিয়ে যাবে ততই শীত বেশি লাগবে, শীতের রাতে প্রজ্বলিত আগুনের দিকে যতই এগিয়ে যাবে ততই তাপ বোধ করবে। তেমনি সাধনার অগ্রগতির সঙ্গে ভগবৎপ্রবোধ স্পষ্টতর হবে। আরো কথা, সাধনপথে এগিয়ে গেলে সাধকের অনুরাগের বৃদ্ধি হয়—শ্রীভগবানের প্রতি অনুরাগ-ভালবাসা বেড়ে যায়। বিষয়ের প্রতি বিরক্তি যত বাড়ে, ঈশ্বরপ্রীতি ততই বাড়ে। তার সঙ্গে সঙ্গে যেসমস্ত সংশয় থাকে, সেগুলি ক্ষীণ হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত সব সংশয়ের অবসান হয়। এসবকিছুই স্বসংবেদ্য। সাধক নিজে নিজেই বুঝতে পারেন।

আর এগোতে এগোতে যখন সাধকের মনে দৃঢ় ধারণা হয়ে যায়—"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ" (গীতা, ৬।২২)—যা পেলে চাওয়া-পাওয়ার আর কিছুই বাকি থাকে না তখন সমস্যা মিটে যায়। সাধক চরম উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন কিনা সেবিষয়ে ভাল পরীক্ষা হচ্ছে—গীতার ভাষায়—"যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।" (ঐ) দেখতে পাই, ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে মাস্টারমশায়ের আটবছরের ছেলে নির্মল মারা গেছে। তাঁর স্ত্রী তো পাগলিনী হয়ে গেলেন। মাস্টারমশায় নিজেও শোকে বিহ্বল। তাঁর স্মৃতিবিজড়িত কোন কিছুতে চোখ পড়লেই তিনি কাঁদতে

আরম্ভ করেন। এত বিহ্বল। মাসের পর মাস। নির্মলকে মনে করে তিনি হাউহাউ করে কাঁদছেন। আবার সেই মাস্টারমশায় যখন সাধনপথে অনেকটা এগিয়ে গেছেন, তখন ছোট-বড় পারিবারিক এবং অন্যান্য সমস্যার মুখে পড়ে বা গুরুতর কোন বিপদের সম্মুখীন হয়েও তিনি বিচলিত হচ্ছেন না। তিনি স্থির হয়ে রয়েছেন। সব দ্বন্দ্বকে জয় করে তিনি ভক্তিরসামৃতে তৃপ্ত হয়েছিলেন।

তাছাড়াও ঠাকুরের উপদেশ অনুযায়ী মাস্টারমশায় যাচাই করে করে ভক্তির পথ ধরে এগিয়ে চলেছিলেন। অনন্যা ভক্তি বা একভক্তি আশ্রয় করে তিনি এগিয়ে চলেছিলেন। অগ্রগতি সম্বন্ধে গীতাতে সুন্দরভাবে বলা হয়েছে—"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।/ জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।" (১১।৫৪) সাধারণভাবে এ-তত্ত্ব শুনেছি, দেখেছি, বুঝেছি বললেই হবে না, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করতে হবে। তত্ত্বালোকে তার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। তাতে একাকার হয়ে যেতে হবে। মাস্টারমশায়ও ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং পরিণতিতে শ্রীভগবানকে নিঃসংশয়ভাবে লাভ করেছিলেন, সামগ্রিকভাবে লাভ করেছিলেন। যেমন গীতাতে বলা হয়েছেঃ "অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি..."। (৭।১) যিনি শ্রীগুরুরূপে তাঁকে কৃপা করেছিলেন, তাঁকে সামগ্রিকভাবে জানতে হবে। তাঁকে জানার চেষ্টা করতে হবে। অবশ্য এটা সত্যিকথা যে, অবতারকে পুরোপুরি জানা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণকে সবটুকু ধারণা করে ফেলেছি —এটা মনে করা ভ্রান্তির লক্ষণ, নিজের 'কাঁচা আমি'র স্ফীতির পরিচায়ক বৈ তো নয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাঁকে জানার নিয়ত চেষ্টা থাকা চাই।

এভাবে তিনি ভক্তির পথ ধরে এগিয়ে চলেছিলেন। ঠাকুর বলছেনঃ "ভক্তির পথ ধরে গেলে ব্রহ্মজ্ঞান হতে পারে।... ভক্তেরা প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। 'আমি দাস—তুমি প্রভু', 'আমি ছেলে—তুমি মা'—এই অভিমান রাখতে চায়।" এই সাধনপথই শ্রীম আশ্রয় করেছিলেন।

অবশ্য মাঝেমাঝেই মাস্টারমশায় অনুভব করেছেন জ্ঞানপথের হাতছানি—নিরাকার সাধনের আহ্বান। একদিনের ঘটনা। ১৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩। সকাল ৯টা। পঞ্চবটীমূলে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মাস্টারমশায়ের অন্তরঙ্গ আলাপন হচ্ছে। মাস্টারমশায়ের আকাঙ্ক্ষা ভক্তির সঙ্গে জ্ঞান। তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেনঃ "জ্ঞান ভক্তি—দুই-ই কি হয় না?" ঠাকুর উত্তরে বলেনঃ "খুব উঁচুঘরের সাধকের বা ঈশ্বরকোটিদের হয়ে থাকে। জীবকোটিদের আলাদা কথা।" ঠাকুর এর কারণও ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু মাস্টারমশায় শান্ত হন না, আশা ছাড়েন না, আবার প্রশ্ন করেনঃ "কেন, তাঁর কৃপায়? তিনি কৃপা করলে তো ছুঁচের ভিতর দিয়ে উট যেতে পারে।"

ঠাকুরের কাছেই তিনি একথা শুনেছেন। কৃপার অগাধ শক্তি মেনে নিলেও মাস্টারমশায়ের মনের কথা, তাঁর আসল দাবি ঠাকুর যেন মানতে পারেন না। তিনি বলেনঃ "কিন্তু কৃপা কি অমনি হয়? ভিখারি যদি পয়সা চায়, দেওয়া যায়, কিন্তু একেবারে যদি রেলভাড়া চেয়ে বসে?"

মাস্টারমশায় নিঃশব্দে দণ্ডায়মান। শ্রীরামকৃষ্ণও চুপ করে আছেন। কিছুক্ষণ সময় চলে যায়। শেষপর্যন্ত ঠাকুর মাস্টারমশায়ের আবদার যেন মেনে নেন। হঠাৎ তিনি বলতে থাকেনঃ "হ্যাঁ বটে, কারু কারু আধারে তাঁর কৃপা হলে হতে পারে, দুই-ই হতে পারে।"

প্রিয় শিষ্যের নির্ভেজাল ভক্তির একমুখিনতা দেখে প্রীত গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যকে একাধারে জ্ঞান ও ভক্তি মঞ্জুর করেছিলেন। মাস্টারমশায়ের সাধনজীবনে এটা স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু এতেও বোধকরি তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি অধিকতর কিছুর জন্য হাত বাড়িয়েছিলেন।

মাস্টারমশায় জানতে পেরেছিলেন আরেকটি অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের সূত্র। গূঢ়তত্ত্বের সূত্র ব্যাখ্যা করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, যে দেখেছে সে জ্ঞানী। যে খেয়েছে, যে আস্বাদন করে উপকার লাভ করেছে—সে বিজ্ঞানী। বিজ্ঞান হচ্ছে বিশেষরূপে জানা। ঈশ্বরকে দর্শন করে তাঁর সঙ্গে আলাপ, পরমাত্মীয়-জ্ঞানে আলাপের নাম হচ্ছে বিজ্ঞান। এই ভাবাদর্শ ছিল শ্রীম-র লক্ষ্য। মনে হয়, সেই লক্ষ্যে তিনি পৌঁছেছিলেন। পৌঁছাবার পর দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা আস্বাদন করাই যেন তাঁর একমাত্র সাধন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি'-তে আছে—"উলটি পালটি কোষে, মধু পিয়ে শুযে শুষে/ মুখে নাহি গুণ গুণ সাড়া।।" এটা কোন নতুন কথা নয়। ঠাকুরেরই প্রদত্ত উপমা। পদ্মফুলে যখন অলি আসে, তখন সে প্রথম গুণ গুণ করে। তারপর যখন মধুপান করতে থাকে, তখন গুণ গুণ বন্ধ হয়ে যায়। এখানে কবি একটু জুড়েছেন—সেই মধুর কোষটি উলটিয়ে পালটিয়ে নানানভাবে চুষছে। সুন্দর কথা! ঠাকুরও কিন্তু বলেছেন মিছরির রুটির কথা। এখনকার দিনের আইসক্রিমের স্টিক, সেটা ঘুরিয়েফিরিয়ে যেভাবেই খাই না কেন, একইরকম মিষ্টি আস্বাদ পাওয়া যাবে। কিন্তু মানুষ তৃপ্ত হয় না, তাই একবার এদিক দিয়ে, একবার ওদিক দিয়ে আস্বাদন করে। মাস্টারমশায় সেইভাবে ঠাকুরের লীলা আস্বাদন করে চলেছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিলঃ "আপনারা ঠাকুরকে দেখেননি, দেখলে অবাক হয়ে যেতেন। তাঁর সবকিছু

সুন্দর। তিনি দেখতে সুন্দর, তাঁর কথাবার্তা সুন্দর। আপাতদৃষ্টিতে তিনি একটু তোতলা কিন্তু সেকথা যে কী মিষ্টি; তাঁর গলার স্বর কী মিষ্টি! ব্যবহার কী মিষ্টি! যা করেন তাই মিষ্টি! অপূর্ব সুন্দর, অনুপম তিনি, তাঁর সবকিছু ভাল।" কিন্তু এত রসাস্বাদন করেও তৃপ্তি হতো না তাঁর। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে, তাঁর লীলা সম্বন্ধে আরো জানতে চান। গীতাতেও দেখি অর্জুন বলছেনঃ "ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্" (১০।১৮)—হে কৃষ্ণ, তোমার দিব্য অমৃত জীবনের আরো কথা শুনতে চাই, আরো বল। তোমার দিব্যলীলা, তোমার ঐশ্বর্য সম্বন্ধে আরো বল। ঠিক একই কথা শুনি শ্রীম-র মুখে। শেষের দিকে শ্রীম বলছেন—তৃপ্তি হলো না। ঠাকুর তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন যে, ভাবের জগতে তৃপ্তি বাকি থেকেই যায়। ভক্তের যে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তা পূরণ করার জন্যই ঈশ্বর দেহধারণ করে বারবার আসেন, কিন্তু যে-সাধক যত উন্নত পর্যায়ের, তাঁর আকাঙ্ক্ষা তত বেশি হয়। সাধক আরো পেতে চান, আরো বেশি পেতে চান।

এই অবস্থায় আরূঢ় শ্রীমকে দেখে মনে পড়ে একটি রূপকল্প। বর্ষাকালে বাতাস জলকণাতে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। তেমনি শ্রীম-র মনপ্রাণ সব যেন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল। তখন তাঁর অবস্থাটা কিরকম? একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। চৈতন্যদেব তাঁর অবস্থার কথা বলছেনঃ "চিত্ত কাড়ি তোমা হইতে চাহি বিষয়ে লাগাইতে।" অর্থাৎ ভগবানের দিক থেকে মনটা সরিয়ে বিষয়ে অচৈতন্য বস্তুতে মন দেওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু "যত্ন করি নারি কাড়িবারে"—কিন্তু তোমার থেকে মন সরিয়ে আনতে পারি না। শ্রীম-র অবস্থাটা প্রায় তাই হয়ে দাঁড়ায়। ঠাকুর দেখলেন, এমন অবস্থায় মায়ের কোন কাজ হবে না। তিনি তাঁকে আটকালেন, সামলে নিয়ে তাকে বললেনঃ "মায়ের একটু কাজ করতে হবে।" ঠাকুর তাঁকে সন্ন্যাসী হতে দেন না, ভাবে একেবারে বুঁদ হয়ে থাকতে দেন না। তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ভূমিকা ঠিক করে দেন। তাঁর বাইরের প্রচেষ্টা সমস্ত কমে গেল, ভিতরের ঐশ্বর্য বাড়তে আরম্ভ করল। ভক্ত এবং ভগবানের যে লীলাবিলাস, তার ঐকান্তিক ভাবের বিকাশ এই পর্যায়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল। এই সময়ে দেখা দিল তার অপূর্ব বৈভব।

সেসময়ে ঠাকুর কাশীপুর উদ্যানবাটীতে রয়েছেন। ঠাকুর একদিন বলছেনঃ "নালা পুকুর এক হয়ে এখন একটু হেলছে দুলছে। এতে (মাস্টারমশায়কে দেখিয়ে বলছেন) আমাতে এক হয়ে গেছি।" কী ভীষণ কথা! ভাবলে গা শিউরে ওঠে। স্বয়ং ঠাকুর বলছেনঃ "এতে আমাতে এক হয়ে গেছি।" অর্থাৎ ভাবের রাজ্যে একাকার হয়ে গেছেন। অথচ বাইরে দৈনন্দিন জীবনে মাস্টারমশায়কে তিনি বুঁদ হয়ে থাকতে দিচ্ছেন না। একদিন প্রশ্ন করা হলো ঠাকুরকে—মাস্টারের ভাব হয় না কেন? ঠাকুরের উত্তর—না, ওকে কাজ করতে হবে। কী আশ্চর্য কথা! কী কঠিন পথ! শ্রীম-র মনের স্বাভাবিক গতি সেই উচ্চস্তরে থাকা, ভাবে বুঁদ হয়ে থাকা, কিন্তু ঠাকুর তাঁকে টেনে ধরে নামিয়ে রেখেছেন। তাঁকে দিয়ে মায়ের কাজ করাতে হবে। শ্রীম নানান যুক্তি দিয়ে এড়াতে চান। তাই তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে ঠাকুর বলেনঃ "দেখ, সব যাওয়া কি ভাল? ভাগবতের পণ্ডিতকে একটা পাশ দিয়ে ঈশ্বর রেখে দেন লোকশিক্ষার জন্য। মা সেইজন্য তোমাকে সংসারে রেখেছেন।" তবুও শ্রীম এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেন না, তিনি নানা ওজর আপত্তি প্রকাশ করতে থাকেন। হঠাৎ একদিন—রাত তখন ৯টা—মাস্টারমশায় কাছে দাঁড়িয়ে, দেখা গেল ঠাকুর গম্ভীর হয়ে গেছেন! গঙ্গার দিকের পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঠাকুর গম্ভীর কণ্ঠে বলছেনঃ "দেখ, কেউ যেন মনে না করে—আমি না হলে চলবে না।" শেষকালে তিনি বলছেনঃ "জলের কত কল রয়েছে। একটি কল ভেঙে গেলে কি জল বন্ধ হয়ে যায়? ইঞ্জিনিয়ার ভাঙা কলটি বদলিয়ে নতুন একটা কল লাগিয়ে দেয়।"

একথা শোনার পর শ্রীম স্থির করলেন যে, ঠাকুর যা আদেশ করছেন বা যা চাইছেন, নির্বিচারে তাই করবেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁকে ঠাকুরের ভাবের সংবাহক হতে হবে। এরপর একদিন শ্রীম শুনছেন, ঠাকুর ভাবস্থ হয়ে বলছেনঃ "মা, আমি আর বকতে পারি না—রাম, মহেন্দ্র (শ্রীম), বিজয় প্রভৃতিকে শক্তি দাও। এরা এখন থেকে তোমার কাজ করুক।" ঠাকুর এভাবে ধীরে ধীরে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট দায়িত্ব তাঁকে তুলে দিলেন। তাছাড়া কিভাবে সে-দায়িত্ব পালন করতে হবে তা তিনি আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন। দেখতে পাই, শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাগবতের প্রতিবেদক হিসাবে তৈরি হয়েছেন। শ্রীম প্রতিভাধর প্রতিবেদক। তাঁর বর্ণনার অসাধারণ ক্ষমতা। তিনি নিজে অনুভব করেছেন—স্বয়ং ভগবান উপস্থিত জগতের কল্যাণের জন্য। যে-কথাগুলি ঠাকুরের মুখে শুনে তিনি সত্যকে সামান্যটুকু ক্ষুণ্ণ না করে উপস্থাপিত করেছেন, তা নিবিষ্ট চিত্তে পড়লেই মনে হবে—শ্রীরামকৃষ্ণ যেন সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর দিব্য উপস্থিতি শ্রীম-র রচনার মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আবার দেখতে পাই তিনি নারদের মতো কথকও বটে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের গুণগান করে চলেছেন। শ্রীম-র মুখে

ঠাকুরের 'কথামৃত' শোনা ছিল পরম ভাগ্যের বিষয়, তা ছিল ভিন্ন স্বাদের। তিনি নিজেই বুঝিয়ে বলছেন ঠাকুরের কথার মধ্যে কি যাদু ছিল। একদিনের ঘটনা। শ্রীম বলছেন ঃ "দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে একঘর ভর্তি লোক বসা। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও ছিলেন। ঠাকুর বলছেন, 'মাইরি বলছি, মা এসেছেন।' এই হলো Test—দর্শন ও আলাপ... এ যেন public demonstration of God. চোখের সামনে এনে ধরে দিয়েছেন। একঘর লোক বসা। সেও আবার কেমন, সকলেরই প্রায় modern, sceptical outlook. ইংরেজি শিক্ষায় যা হয়।... তাই ঠাকুরকে এরূপ পরীক্ষা দিতে হয়েছিল।"[৩] শ্রীমকে আরো কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। তাঁর চারদিকে ছিল অনেক কট্টর সমালোচক ও স্বভাবনিন্দুক ব্যক্তি।

ঠাকুরের মুখের কথা স্বকর্ণে শুনে, তা নিখুঁতভাবে অন্তরে ধারণা করে তিনি ঠাকুরের ভাবে ভাবিত হয়ে প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। তিনি ঠাকুরের প্রচারের জন্য অন্তরের তাগিদ অনুভব করছিলেন। সেই বেদের যুগে যেমন ঋষি বলেছিলেন ঃ "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ", তেমনি তিনিও বারবার বলতে চেয়েছেন—শোন, শোন, আমার কাছে সুসমাচার শোন, স্বয়ং ভগবান এসেছেন। হাত বাড়িয়ে আছেন, এগিয়ে এস। শ্রীম-র ভূমিকা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী দিলীপ রায় তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন ঃ "পিতৃদেবের জীবদ্দশায় যত সাধু দেখেছিলাম তার মধ্যে সেরা সাধু ছিলেন শ্রীম। আমি ঠাকুরের কথা তাঁর কাছে শুনতে গেছি একথা শুনে শ্রীম কেঁপে উঠে চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'প্রভাস, ও প্রভাস! (প্রভাস তাঁর বড় ছেলে) দেখে যা, এইটুকু ছেলে আমার কাছে এসেছে কিনা ঠাকুরের কথা শুনতে।...' বলে আমার দিকে ফিরে বলছেন, 'দেখ বাবা দেখ, আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে।' বলে দুটি হাত সোজা করে আমার সামনে বাড়িয়ে দিলেন। দেখি সত্যিই দুহাতের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়—দুফোঁটা চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে আর কি। তিনি কোঁচার খুঁটে দুচোখ মুছে ধরা গলায় বললেন, 'বেঁচে থাক বাবা, শতায়ু হও।'... তারপর আর কি! তিনি উজিয়ে উঠে একটানা বলে চললেন ঠাকুরের কথা। আহা কী সুন্দর কথা! বলতে লাগলেন চোখের জল মুছতে মুছতে—কিভাবে ঠাকুর গান গাইতেন, নাচতেন, ছোটদের সঙ্গে ফচকিমি করতেন, খাওয়াতেন, গান গাইতে গাইতে কিভাবে শিশু ভোলানাথ হয়ে যেতেন দিগম্বর—এইসব। আর সব ছাপিয়ে তাঁর অগাধ স্নেহের কথা।"[৪] এইসঙ্গে স্মরণ করা যাক পল ব্রান্টনের প্রতিবেদন। অনুসন্ধিৎসু ব্রান্টনের প্রশ্ন ছিল—শ্রীরামকৃষ্ণ অবিশ্বাসীদের কিভাবে প্রভাবিত করতেন। শ্রীম-র সাফ জবাব ঃ "Two persons taste red pepper. One does not know its name; he has never even seen it before.... Will not both of them have a burning sensation on the tongue?"[৫] ব্রান্টন শুনে মুগ্ধ হন। এসব সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায় শ্রীম-র অসাধারণ ভূমিকাটি। আমরা দেখতে পাই, শ্রীম ক্রমে ক্রমে তৈরি হয়েছিলেন একটি পূর্ণ কুম্ভে—যে-কুম্ভের অমৃত হলো শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এবং বাণী থেকে আহৃত সুধা। শ্রীম চেয়েছিলেন, 'কথামৃত' আট-নয় খণ্ডে লিখতে। তাঁর ইচ্ছা ছিল সে-উপাদান থেকে তিনি ঠাকুরের একখানি প্রামাণ্য জীবনী লিখবেন। সেটি আর করা হয়নি। কুম্ভে সংগৃহীত অমৃতের প্রতিটি বিন্দু মধুর ও ওজঃসম্পন্ন।

শ্রীম-র মুখের কথা নানান গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। স্বামী নিত্যাত্মানন্দের লেখা ষোল খণ্ডের গ্রন্থ 'শ্রীম-দর্শন' রয়েছে। স্বামী জগন্নাথানন্দের লেখা দুই খণ্ডের বই 'শ্রীম-কথা' রয়েছে। তাছাড়া তাঁর নিকটের মানুষ স্বামী ধর্মেশানন্দ প্রমুখ যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অনেকের স্মৃতিকথার মধ্যে ছড়িয়ে আছে নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্য। এসব লেখার মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে একজন প্রাণবন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারক শ্রীম-র প্রচারকার্যের বিবরণ।

আমরা জানি স্বামী বিবেকানন্দ, স্বয়ং শ্রীশ্রীমা—এঁরাও শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপ অমৃত ধারণ করেছিলেন নিজ নিজ জীবনে। তাঁরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শের ব্যাখ্যাতা—'Interpreter'। শ্রীশ্রীমা, স্বামী প্রেমেশানন্দের ভাষায়, ছিলেন ঠাকুরের ব্যবহারাদর্শ—'Practical Ideal'। শ্রীম-র ছিল প্রতিবেদকের—reporter-এর দায়িত্ব। সে-দায়িত্ব যে-নিপুণতার সঙ্গে তিনি বহন করেছিলেন তা অতুলনীয়।

তাঁর কাছে যে দুর্লভ সম্পদ সংগৃহীত হয়েছিল, তা নিয়ে তিনি প্রথমে চুপচাপ ছিলেন। অনেকেই বুঝতে পারেননি। দুই-একজন ঠাকুরের সন্তান বুঝতে পেরেছিলেন। তারপর ঠাকুরের মহাসমাধির প্রায় দশ বছরের মধ্যেই দেখা গেল পরপর কয়েকটি ঘটনা ঘটে

৩ শ্রীম-দর্শন, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩৯-৪০
৪ স্মৃতিচারণ—দিলীপকুমার রায়, পৃঃ ২৩৩-২৩৪
৫ A Search in Secret India, p. 131

যাচ্ছে। প্রথমে তিনি 'সচ্চিদানন্দ গীতারত্ন' নাম ধারণ করে ঠাকুরের উপদেশগুলি সঙ্কলন করে ছাপাতে আরম্ভ করলেন। চতুর্থ সংস্করণ বেরিয়েছিল। এরপর তিনি ইংরেজিতে সংলাপের ধাঁচে 'dialogue form'-এ দুটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। হৈচৈ পড়ে গেল। প্রতিবাদও শোনা গেল, তিনি কেন ঠাকুরের ভাষা বাঙলায় লিখছেন না? তিনি বাঙলায় লিখতে আরম্ভ করলেন। বর্তমানে 'কথামৃত' যে-আকারে আমরা দেখি, সেটা লিখতে আরম্ভ করে তিনি প্রথমে শ্রীশ্রীমাকে পড়ে শুনিয়েছেন; তারপর রামকৃষ্ণ মিশনের সাপ্তাহিক মিটিঙে পড়ে শুনিয়েছেন। এদিকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা বেরতে আরম্ভ করল। এভাবে ধাপে ধাপে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারের মধ্যে উদ্ভাসিত দীপ্ত সূর্য শ্রীরামকৃষ্ণ, দিগন্তব্যাপী তাঁর প্রচণ্ড চোখধাঁধানো শক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে মধ্যাহ্নসূর্য। তাঁকে ধরা বেশ কঠিন। এদিকে শ্রীম ঠাকুরের কথা থেকে জানতে পেরেছিলেন যে, প্রভাতসূর্যের আলো যেমন মিঠে নরম থাকে, সেরকম ভাব নিয়ে অবতার আসেন। 'কথামৃত'-এ শ্রীম এই ভাবটি আশ্রয় করে শ্রীরামকৃষ্ণকে উপস্থাপিত করেছেন। এই কারণে 'কথামৃত'-এর শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য। যাঁরা তাঁকে কাছ থেকে জানতে চান, যাঁরা তাঁকে সহজে পেতে চান তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান রয়েছে 'কথামৃত'-এ। এটাই হচ্ছে শ্রীম-র শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারের বৈশিষ্ট্য। অসাধারণ সাফল্যলাভ সত্ত্বেও শ্রীম কখনো মনে করেননি যে, তিনি ঠাকুরকে সবটুকু বুঝে ফেলেছেন। প্রমদাদাস মিত্রের সঙ্গে তাঁর কিছু পত্রালাপ হয়। সেখানে দেখা যায়, মিত্রমশায় বারবার প্রতিবাদ করে বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মতবাদ অদ্বৈতসুধা; কেননা বিবেকানন্দের সংস্পর্শে এসে তাঁর ধারণা হয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন পাক্কা অদ্বৈতবাদী। এদিকে শ্রীম যেভাবে বুঝেছিলেন এবং নিজের জীবনে তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন—সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী। নিজের ধ্যান-ধারণার স্বপক্ষে তিনি একটি চিঠিতে যুক্তি দিয়ে লিখেছেনঃ "As I have understood Him." সেইজন্য বুঝতে হবে 'কথামৃত' আর অন্য কিছুই নয়, শ্রীম-র সাধনা-সিদ্ধ শুদ্ধ চিত্তে প্রতিবিম্বিত শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা—তাঁর জীবন ও বাণী। সুতরাং তিনি যেমন বুঝেছিলেন, সেইটি তিনি উপস্থাপিত করেছেন আন্তরিকভাবে, নিষ্ঠার সঙ্গে নিপুণ ভাবে। সেটিই হচ্ছে আমাদের সুপরিচিত 'কথামৃত'। তিনি ঠাকুরের নির্বাচিত বাহক—"Vessel, conduit for the flow of the message and power of Sri Ramakrishna, the Divine."—কতকটা বাইবেলের ভাষায় বলা হলো। এই যে সংবহনক্ষম আধার—ইনিই 'শ্রীম' বলে পরিচিত। ইনিই হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণরূপ অমৃতের অমৃতকুম্ভ। এই অমৃত ধারণ করে তিনি যে অপূর্ব এক মহান ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন সেটা শ্রীযুক্ত, মঙ্গলঘন, কল্যাণস্পর্শী।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীবহ শ্রীম আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে তিনি নিজেকে আদর্শ গৃহিরূপে গড়ে তুলেছিলেন। সে-আদর্শ গৃহস্থ-সন্ন্যাসীর আদর্শ। শ্রীমকে দেখে সংসারী মানুষ যেন শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ দৈবশক্তি সম্বন্ধে ধারণা করতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে সংসারী মানুষের জীবনের সমস্যার কিভাবে সমাধান হয় তা তাঁর নিজের জীবনকে উন্মোচিত করে 'কথামৃত'র মধ্যে তুলে ধরেছেন। তাছাড়া বিভিন্ন জনের কাছে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, তাতে মানুষ ভরসা পেয়েছে। সাংসারিকতার ফলে গৃহস্থদের জীবনে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়, মাঝে মাঝে জীবনের চলার পথে যে কুয়াশা দেখা দেয়—সেইসব ভেদ করে যদি এগিয়ে যেতে হয়, তাহলে শ্রীম-কথিত 'কথামৃত'ই সুগম পথ।

'কথামৃত' কি? সংক্ষেপে বলা যায়, মাস্টারমশায় তপস্যা করে তাঁর মনটিকে শুদ্ধ-নিখাদ করেছিলেন এবং বিশুদ্ধ মনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর বাণী সম্বন্ধে যা ধারণা করেছিলেন, সেটি তাঁর নিপুণ ভাষায়, অসাধারণ নিজস্ব ভঙ্গিমায় প্রকাশ করেছেন। এটাই হচ্ছে 'কথামৃত'। 'কথামৃত'র একটি সংস্করণের একটি খণ্ডের মধ্যে নোট রয়েছে যে—'কথামৃত'র মধ্যে যাকিছু রয়েছে তার সবকিছু শ্রীম সাক্ষাৎ শুনে সেদিনই লিখে রেখেছিলেন। সমগ্র 'কথামৃত' সম্পর্কে একথা বোধকরি খাটে না। মাস্টারমশায়ের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বা মার্চের এক রবিবারে। কিন্তু 'কথামৃত'র মধ্যে স্থান পেয়েছে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি থেকে আরম্ভ করে অনেক দিনের ঘটনা। অবশ্য সেগুলি তিনি অন্যান্য নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে সংগ্রহ করে 'কথামৃত'-এ স্থান দিয়েছিলেন। তাছাড়া এটাও বুঝতে হবে যে, তিনি যা শুনেছেন তাই যেমন প্রকাশ করেছেন, তেমনি তিনি যা বুঝেছিলেন তা-ই উপস্থাপিত করেছেন। দেখা যায় একই দিনে একই ঘটনায় শ্রীম ও লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দ উপস্থিত। অথচ তাঁদের দুজনের বর্ণনার মধ্যে বিরাট পার্থক্য! একথা মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন জন একই ঘটনা বিভিন্নভাবে দেখে থাকেন। নিজের রুচি, নিজের সামর্থ্য, তদানীন্তন মানসিক অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে দেখেন। সেইজন্য

দেখা যায় একই ঘটনার বিভিন্ন বর্ণনা। কিন্তু শ্রীম-র মুনশিয়ানা ছিল। তাই তাঁর রচনার আবেদন প্রচুর। এই আবেদন অগ্রাহ্য করা দুঃসাধ্য। এর আবেদন এমনই প্রবল যে, প্রায় একশো বছরের মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় 'কথামৃত' ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে। বলা যায়, জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে 'কথামৃত' বাইবেলের প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বী। এমনই তার আবেদন। আজকের দিনে এটি লক্ষ্য করার মতো।

এসব ছাড়াও, 'কথামৃত'র অনন্যতা হলো—ইতিপূর্বে কোন অবতারকল্প পুরুষের জীবনী বা বাণীর এরকম 'direct evidence' নেই। লক্ষ্য রাখতে হবে, খ্রিস্টধর্ম প্রচারিত হয়েছিল রাজশক্তির সাহায্য নিয়ে এবং Constantine-এর আগে পর্যন্ত খ্রিস্টধর্মের যে রূপ ছিল, সেটা অনেকটা পালটে গিয়েছিল। ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রেও। অশোকের পরে যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল, তা আকারে ও প্রকাশে বুদ্ধদেব-প্রচারিত উপদেশ থেকে পরিবর্তিত। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে এধরনের কোন বিকৃতি ঘটেনি। শ্রীরামকৃষ্ণের 'direct evidence' তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যরা, বিশেষ করে কথামৃতকার সযত্নে তুলে রেখেছেন এবং উপস্থাপিত করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী। শ্রীম ঢাকা-চাপা না দিয়ে সবকিছু খোলাখুলি বলেছেন। খোলাখুলি প্রকাশ করতে গিয়ে শ্রীম সময় সময় নিজেকেও খাটো করেছেন, কটাক্ষ করেছেন। নিজের মান-সম্মান সবকিছু অগ্রাহ্য করে তিনি ঠাকুরের মহিমাকে উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেছেন। এমনটি অন্য কোন অবতারকল্প পুরুষের ক্ষেত্রে হয়নি। তাছাড়া খ্রিস্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইসলামধর্মের প্রচার হয়েছিল রাজশক্তির সাহায্যে। আর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর বাণী নিজস্ব অন্তর্নিহিত শক্তির দাপটে বিভিন্ন ভাষায় পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। জাতি-ধর্ম-সংস্কৃতি ও ভাষার বাধা অতিক্রম করে সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে একটি ভাবান্দোলন—শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের অন্যতম প্রধান শরিক শ্রীম। একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর বসে আছেন, আর তিনিও আছেন। ৫ অক্টোবর ১৮৮৪। শ্রীম বলছেন ঃ "এখান থেকে একটা স্রোত যদি বয় তাহলে বেশ হয়। সে-স্রোতের টানে সব ভেসে যাবে। এখান থেকে যা হবে সে তো আর একঘেয়ে হবে না।" ঠাকুর মৃদু মৃদু হেসে শ্রীম-র এই ভাবনায় সম্মতি জানালেন। সেই স্রোতই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন। সারা পৃথিবীতে তা ছড়িয়ে পড়েছে, পড়ছে এবং জনজীবনকে ধীরে ধীরে প্রভাবিত করছে। ছোট-বড় নানারকম সমস্যা অতিক্রম করে এই আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে চলেছে। তার প্রভাব সাহিত্য, দর্শন, শিল্প—সর্বক্ষেত্রে স্পষ্ট।

সর্বশেষে আমরা স্মরণ করতে চাই, শ্রীম-র স্থির ধারণা হয়েছিল তিনি যা করছেন তা তিনি নিজের ইচ্ছায় করছেন না, ঠাকুরই তাঁকে করাচ্ছেন। সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণই সব। যেমন ট্রামের ট্রলি, যতক্ষণ তারের সঙ্গে যোগ, গাড়ি আলো পাখা সব ঠিক চলছে। ট্রলিটাকে নিচু করে দাও তো কোনকিছুই আর চলে না। এখন বেশ দেখতে পাচ্ছি যে, ঠাকুর হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন আর শেষটুকুও তিনি নিশ্চয়ই নিয়ে যাবেন।"

ঠাকুর 'সার্টিফিকেট' দিয়েছিলেন—"এর অভিমান নেই।" বাস্তবিক শ্রীম নিরভিমান। শ্রীম একদিন তাঁর ভূমিকা সম্বন্ধে বলছেন ঃ "তাই তো। সমুদ্রে কেউ জালা নিয়ে যায়, কেউ কলসি নিয়ে যায়, কেউ ঘটি নিয়ে যায়, যার যা পাত্র তাই ভরে জল নিয়ে আসে। আর কলকাতায় এসে সেই জল সবাইকে একটু একটু করে ছড়িয়ে দেয়। " শ্রীম জানতেন, ঠাকুর সমুদ্র। আর সেই সমুদ্র থেকেই বিবেকানন্দ জল সংগ্রহ করে ছড়িয়েছেন বিশ্বে। অন্যান্য ঠাকুরের সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গ শিষ্যরাও তাই করেছেন। তিনিও তাঁর সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁর পাত্রে সাগরের জল বা অমৃত ধারণ করে বিতরণ করেছেন। এবিষয়ে তাঁর নিজস্ব কোন কৃতিত্ব নেই।

যে-সাধনার ফসল শ্রীম-রূপ অমৃতকুম্ভ, তার গুরুত্ব আমরা বোধহয় এখনো বুঝে উঠতে পারিনি, বিষয়টির যোগ্য মর্যাদা দিইনি। কিন্তু এই ধারণা একটা ধ্রুব বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে যে, শ্রীম ও তাঁর রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' অসাধারণ, অদ্বিতীয়। শ্রীমও নিঃসন্দেহে অদ্বিতীয়। রামায়ণের টিকাকার তিলকের অসাধারণ স্তবটির অনুকরণে প্রণাম জানাই—

"কূজন্তং রামরামকৃষ্ণেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্।
আরুহ্য কথামৃতশাখাং বন্দেঽহং মহেন্দ্র-কোকিলম্।।"* ❑

---

* গত ২৪ নভেম্বর ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে প্রদত্ত ভাষণ।

নাগ মহাশয়ের বাটীতে দুর্গোৎসব

কৌশান রায়

সাধু নাগমহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে, বলা যায়, উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁকে গৃহে থাকতে বলেছিলেন। ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জ সাবডিভিশনের অন্তর্গত দেওভোগ গ্রামে ছিল তাঁর বসতবাড়ি। সেখানেই একদা শুরু হয়েছিল দুর্গাপূজা। নিবন্ধকার ব্যক্তিগতভাবে সেখানে গিয়ে এবং বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রস্তুত করেছেন এই রচনাটি।

তখন রাত্রি প্রায় ভোর। মহাষ্টমী ও মহানবমীর সন্ধিক্ষণে সন্ধিপূজার সমাপনে আরতি করছেন পুরোহিত অভয় চক্রবর্তী। ঢাক, কাঁসর, ঘণ্টার বাদ্যে, সুগন্ধি ধূপ ও ফুলের গন্ধে চতুর্দিক দৈবভাবে আচ্ছন্ন। উঠানে সমবেত ভক্তমণ্ডলী করতালি দিয়ে প্রসন্নবদনা মহাদেবীর মুখপানে তাকিয়ে ভাবমগ্ন। মণ্ডপের অদূরে ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তালি দিচ্ছেন নাগ মহাশয়। শরীর তাঁর কৃশ, ক্ষীণ, অথচ এই উৎসবে তাঁর উপস্থিতি এক ভক্তিতরঙ্গ জাগরিত করছে।

উনবিংশ শতকের শেষার্ধে পূর্ববঙ্গের নারায়ণগঞ্জ সাব-ডিভিশনের অন্তর্গত দেওভোগ গ্রামে নাগ মহাশয়ের বাড়িতে দুর্গোৎসব আরম্ভ হয়েছিল। পূর্ববঙ্গের কয়েকটি শতাব্দী-প্রাচীন পূজার মধ্যে এটি অন্যতম। এই পূজা ঠিক কত খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়েছিল তা জানা যায় না। তবে দুটি সূত্র ধরে পূজারম্ভের সময়কাল সম্বন্ধে অনুমান করা যায়—(ক) জানা যায় নাগ মহাশয়ের দেহত্যাগের (১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ) দশবছর পূর্বে তাঁর পিতা দীনদয়াল নাগের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে এবং নাগ মহাশয় পিতার জীবদ্দশাতেই পূজা আরম্ভ করেন। (খ) প্রথম দিকে পূজার সময় নাগ মহাশয়ের কলকাতায় নিয়মিত যাতায়াত ছিল, আবার শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর তিনি আর বিশেষ কলকাতায় আসতেন না। এইসকল তথ্য থেকে অনুমান করা যায় যে, ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের দু-তিন বছর পূর্বে এই পূজার সূত্রপাত ঘটে।



নাগমহাশয়ের বাটী

প্রথম যে-বছর পূজা হবে বলে স্থির হয়, সেই বছর সময়ের অভাবে পূজার আয়োজন করা যায়নি। সে-কারণে মহাষ্টমীর রাত্রে নাগ মহাশয়ের বাটীতে ধূমধামের সঙ্গে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। বহু ভক্তের সমাবেশে সেই প্রথম ঐ বাটীতে কালীপূজার সূচনা।

এর দু-এক বছর পর পূজার চোদ্দ-পনেরো দিন পূর্বে নাগ মহাশয়ের সহধর্মিণী শরৎকামিনী দেবী স্বপ্নযোগে পূজার আদেশ পান। তিনি স্বপ্নে এক অপরূপ ভগবতী প্রতিমাকে দেখেন। প্রতিমার অঙ্গের বর্ণ লাল। তিনি বললেন: "আমাকে তুই পূজা দে।" শরৎকামিনী দেবী উত্তর করলেন: "আমি কি দিয়ে তোমার পূজা করব?" দেবী বললেন: "আর কিছুই না পারিস দুটো ছোলা ভিজিয়ে পূজা দে।" শরৎকামিনী দেবী স্থির করলেন, যা সামর্থ্য আছে তাই দিয়েই দেবীর বোধন করবেন। নাগ মহাশয় পূজার কথায় সায় দিলেন। কিন্তু আপত্তি উঠল পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পক্ষ থেকে। সংসারে আর্থিক সচ্ছলতা কম। এমন অবস্থায় কি করে পূজার আয়োজন সম্ভব? কিন্তু নাগ মহাশয় যখন ইচ্ছা করেছেন, তখন তো তিনি তা করেই ছাড়বেন। টাকার জোগাড় হলো। মণ্ডপও তৈরি করা হলো। মাত্র দশদিনে ছোট করে প্রতিমাও নির্মাণ করা হলো। অবশেষে খুব ধুমধামের সঙ্গে পূজা সম্পন্ন হয়েছিল। এরপর নিয়মিত ঐ বাটীতে পূজা হয়ে আসছে। সেই বছর থেকে দীপান্বিতা কালীপূজাও আরম্ভ হয়। এর কয়েক বছরের মধ্যেই জগদ্ধাত্রীপূজাও শুরু হয়েছিল।

১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১৩ পৌষ নাগ মহাশয় দেহত্যাগ করেন। এরপর অনেকে বলেছেন, বিবিধ অসুবিধার কারণে পূজা বন্ধ করে দেওয়াই ঠিক। কিন্তু শরৎকামিনী দেবী স্থির করলেন, কোন প্রকারেই তিনি পূজা বন্ধ করবেন না। পরবর্তী কালে পূজা তো বন্ধ হয়ইনি, বরং বাসন্তীপূজা ও অন্যান্য পূজারও সূচনা ঘটে।

এরপর আয়োজন ও সমারোহের দিক থেকে দুর্গোৎসব ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকল। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে কৈলাস দাস, শরৎ চক্রবর্তী, নটবর মুখার্জি, জগদ্বন্ধু ভৌমিক প্রমুখ এই পূজা দায়িত্বের সঙ্গে সম্পন্ন

করেছিলেন। এরপর এই পূজা আরো সমারোহের সঙ্গে শুরু হয় গুরুপদ ভৌমিকের তত্ত্বাবধানে। তিনি বর্তমান মণ্ডপটি নতুন করে নির্মাণ করেন এবং এই পূজা সমগ্র নারায়ণগঞ্জের একটি বিশেষ উৎসবে পরিণত হয়। সকাল থেকে নহবতে বাজনা বাজত। চারদিন ধরে শত শত ভক্ত এবং দর্শনার্থী পূজার প্রসাদ পেতেন। নবমী এবং দশমীর দিন বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা করা হতো। নবমীর দিন রাত্রে যে বিশেষ পূজার ব্যবস্থা করা হতো, তাকে বলা হতো 'প্রবস্থবন্ধন'। দশমী হয়ে গেলেই প্রতিমা বিসর্জন হতো না। জগদ্ধাত্রীপূজার পূর্বদিন দুর্গাপ্রতিমা বাটীর দক্ষিণের পুকুরে বিসর্জন করা হতো। (উল্লেখ্য, এই পুকুরেই স্বামী বিবেকানন্দ সাঁতার কেটে স্নান করেছিলেন। বর্তমানে পুকুরটি অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত।)

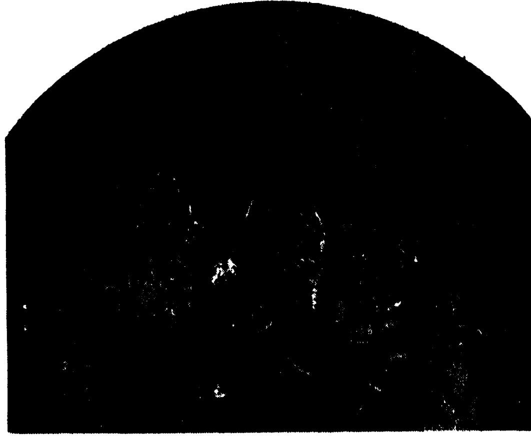
গুরুপদ ভৌমিকের মৃত্যুর পর অনিল গুহ, ননী গুহ প্রমুখ পূজার কার্য সম্পন্ন করতেন। এইসময়ে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে বাসন্তীপূজা শুরু হয়। কিন্তু এই পূজা কয়েক বছরের মধ্যেই তার জৌলুস হারায়। শরৎকামিনী দেবী ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। এর মধ্যেই ঘটে গেছে দেশভাগ, পূর্ববঙ্গ হলো পূর্বপাকিস্তান। ঘটে গেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। পূর্ববঙ্গ ছেড়ে হিন্দুরা দলে দলে চলে আসেন ভারতে। হিন্দুর উৎসব-পূজাগুলিও আক্রান্ত হতে শুরু করে।

এর কিছুকাল পরে দুর্গাপূজার আড়ম্বর কমতে থাকে। তখন পূজার বন্দোবস্ত করতেন সন্তোষ ভৌমিক। কিন্তু তাঁর যথেষ্ট প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ভয়াবহ দাঙ্গার পর পূজা বন্ধ হয়ে যায়। নাগ মহাশয়ের বসতবাটী-সহ সমগ্র জমিই বেদখল হয়ে যায়। কিন্তু মণ্ডপটি আক্রান্ত হয়নি। মণ্ডপটি তালাবন্ধ অবস্থায় থেকে যায়। তবে আক্রমণের চেষ্টা হয়েছে বহুবার। কিন্তু বারংবার তা প্রতিহত হয়। লোকমুখে জানা যায়, বহু বিষধর সর্প এই ঘরটি দীর্ঘকাল যাবৎ রক্ষা করেছে।

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় এবং স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দোলপূর্ণিমার দিন মণ্ডপটি পুনরুদ্ধার করে খুলে দেওয়া হয় এবং বসতবাটীর বেশ কিছু অংশ দখলমুক্ত করা হয়। এরপর অঞ্চলের কয়েকজন ব্যক্তি একত্রে মিলে একটি ট্রাস্ট তৈরি করেন। বর্তমানে তাঁদের তত্ত্বাবধানে দুর্গোৎসব-সহ অন্যান্য সকল পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জৌলুস ও আড়ম্বর কমে গেলেও ঐতিহ্য অনুযায়ী আজও আশ্বিনের শারদসন্ধ্যায় ঐ বাটীতে দেবীর বোধন হয়। দেওভোগ গ্রাম আজ সম্পূর্ণরূপে মুসলমান-অধ্যুষিত, কিন্তু তাতে পূজার বিশেষ কোন অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে না। বরং তাঁরাও পরোক্ষরূপে পূজায় নানা সাহায্য করে থাকেন। ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে দেওভোগ-নারায়ণগঞ্জের অধিবাসীদের কাছে আজও এই বাটীর দুর্গোৎসব বিশেষ দর্শনীয়।

শতবর্ষ অতিক্রম করে নাগ মহাশয়ের স্মৃতিধন্য এই বাটীতে দুর্গোৎসব এক ঐতিহাসিক মাত্রা পেয়েছে। এই পূজা আরো কত যুগ চলবে তা আমরা জানি না, তবে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় আরো বহুযুগ ধরে এই পূজা চলতে থাকুক—এটাই একান্ত কাম্য।* ❑







নাগমহাশয়ের বাটীর দুর্গাপ্রতিমা

---

* উপরি উক্ত তথ্যসমূহ গুরুপদ ভৌমিক লিখিত "শ্রীশ্রী মহাবিরাট যুগললীলা" এবং শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী লিখিত "সাধু নাগ মহাশয়" গ্রন্থদ্বয় এবং সংশ্লিষ্ট প্রবীণ ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে সংগৃহীত।

বীরকেশরী গুরু গোবিন্দসিংহ

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের মহান ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাসে শৌর্য, বীর্য, ত্যাগ ও মূল্যবোধের সু-উচ্চ আদর্শ তুলে ধরেছিলেন গুরু গোবিন্দসিংহ। প্রবীণ লেখক গুরু গোবিন্দসিংহের জীবনচরিত বলিষ্ঠ লেখনীর সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখকের রচনা পূর্ব পূর্ব বছরেও 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত ও সমাদৃত হয়েছে।

বিশ্বজয় করে ভারত-প্রত্যাবৃত্ত স্বামী বিবেকানন্দ লাহোরে (বর্তমান পাকিস্তানে) এক বিশাল জনসভায় ওজস্বী কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন ঃ "আমার কথা বিশ্বাস কর, তখন—কেবল তখনি তুমি প্রকৃত 'হিন্দু' পদবাচ্য, যখন ঐ নামটিতেই তোমার ভিতরে মহাবৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত হইবে; তখন—কেবল তখনি তুমি প্রকৃত 'হিন্দু' পদবাচ্য হইবে, যখন যেকোন দেশীয়, যেকোন ভাষাভাষী 'হিন্দু' নামধারী হইলেই অমনি তোমার পরমাত্মীয় বলিয়া বোধ হইবে; তখন—কেবল তখনি তুমি 'হিন্দু' পদবাচ্য, যখন 'হিন্দু' নামধারী যেকোন ব্যক্তির দুঃখ-কষ্ট তোমার হৃদয় স্পর্শ করিবে আর তুমি নিজ সন্তান বিপদে পড়িলে যেরূপ উদ্বিগ্ন হও, তাহার কষ্টেও সেইরূপ উদ্বিগ্ন হইবে; তখন—কেবল তখনি তুমি 'হিন্দু' পদবাচ্য, যখন তুমি তাহাদের সর্বপ্রকার অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করিতে প্রস্তুত হইবে।...



"আমার বাক্য অবধান কর—যদি তোমরা দেশের হিতসাধন করিতে চাও, তোমাদেরও প্রত্যেককে এক-একজন গোবিন্দসিংহ হইতে হইবে। তোমরা স্বদেশ-বাসীদের ভিতর সহস্র দোষদর্শন করিতে পার, তথাপি যাহাদের মধ্যে হিন্দুরক্ত আছে, যাহারা ভারতবাসী, তাহাদের সকলকেই দেবতারূপে পূজা করিতে হইবে—যদিও তাহারা সর্বপ্রকার তোমাদের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করে। যদিও তাহারা প্রত্যেকেই তোমার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করে, তথাপি তুমি তাহাদের প্রতি প্রেমের বাণী প্রয়োগ করিবে। যদি তাহারা তোমাকে তাড়াইয়া দেয়, তবে সেই বীরকেশরী গোবিন্দসিংহের মতো সমাজ হইতে দূরে যাইয়া নিস্তব্ধতার মধ্যে মৃত্যুর প্রতীক্ষা কর। এইরূপ ব্যক্তিই 'হিন্দু' নামের যোগ্য; আমাদের সম্মুখে সর্বদাই এরূপ আদর্শ থাকা আবশ্যক। পরস্পরবিরোধ ভুলিতে হইবে—চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ বিস্তার করিতে হইবে।"

হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্যই গুরু গোবিন্দসিংহ জনসাধারণের নিকট আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন ঃ

"সকল জগত মেঁ খালসা* পন্থ গাজৈ।
জাগৈ ধর্ম হিন্দুন সকল ধুন্ধ ভাজৈ।।"

এখানে লক্ষণীয় যে, গুরু গোবিন্দসিংহ 'খালসা'কে পন্থ এবং 'হিন্দু'কে ধর্ম বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ 'পন্থ' বা উপাসনাপদ্ধতিকে ভ্রান্তভাবে 'ধর্ম' অর্থে ব্যবহার করা হয়। 'ধর্ম' শব্দটির অর্থ ব্যাপক। ব্যক্তি ও সমাজ, ব্যক্তি ও প্রকৃতি, সমাজ ও প্রকৃতি এবং ব্যক্তি ও পরমাত্মার মধ্যবর্তী সম্পর্কগুলিকে ধর্ম নিয়ন্ত্রিত করে। একই ধর্মের অন্তর্গত নানা পন্থা বা উপাসনাপদ্ধতির অস্তিত্ব থাকতে পারে। কিন্তু হিন্দুধর্ম বিভিন্ন মত ও পন্থাকে একই পরমাত্মার নিকট যাওয়ার বিভিন্ন পথ বলে স্বীকার করে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—"যত মত তত পথ"। (প্রসঙ্গত, শ্রীরামকৃষ্ণ গুরু গোবিন্দসিংহকে রাজা জনকের অবতার বলে অভিহিত করেছিলেন।)

১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে মোগল বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের জঘন্যতম অত্যাচারে কাশ্মীরের হিন্দুদের নির্যাতিত হতে দেখে শিখগুরু তেগবাহাদুর চোখ বন্ধ করে থাকতে পারেননি। ২৫ মে ১৬৭৫ কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদের এক প্রতিনিধিদল পণ্ডিত কৃপারাম দত্তের নেতৃত্বে আনন্দপুরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। কাশ্মীরের সব হিন্দু, বিশেষত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ওপর মুসলমানদের অতি নৃশংস

* 'খালসা পন্থ' অর্থাৎ শুদ্ধ ও পবিত্র মনুষ্যত্বের পথ-প্রদর্শনকারী হিন্দু।

অত্যাচার এবং জোর-জবরদস্তি করে তাদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করার ভীষণ ঘটনাসমূহ তাঁরা গুরুর সম্মুখে তুলে ধরেন। কাশ্মীরী পণ্ডিতদের হৃদয়বিদারক নিবেদন শ্রবণ করে গুরু তেগবাহাদুর দারুণ শোকে স্তব্ধ হয়ে যান।

পিতাকে দুশ্চিন্তা ও বিষাদগ্রস্ত দেখে বালক গোবিন্দরায় তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে গুরুজী বলেন ঃ "আজ দেশ ও ধর্মের জন্য কোন মহান আত্মার বলিদান আবশ্যক।" বালকের অন্তর্নিহিত তেজস্বিতা তখন তার স্বতঃপ্রণোদিত বাক্যে অভিব্যক্ত হয় ঃ "এই বিশ্বজগতে আপনার থেকে মহান আত্মা আর কে আছে?" বালকপুত্রের বাণীর মর্মার্থ উপলব্ধি করে গুরু তেগবাহাদুর কাশ্মীরের উৎপীড়িত শরণাগত ব্রাহ্মণদের দিয়ে ঘোষণা করিয়ে দিলেন—"হিন্দুদের নেতা গুরু তেগবাহাদুর যদি ইসলাম স্বীকার করে নেন, তাহলে আমরা সব হিন্দুরা মুসলমান হয়ে যাব।"

ধূর্ততার আশ্রয় নিয়ে ক্রুর ঔরঙ্গজেব গুরু তেগবাহাদুরকে দিল্লিতে ডেকে আনেন এবং অতীব নৃশংসতার সঙ্গে তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গে আগত শিষ্যদের হত্যা করেন। ১১ নভেম্বর ১৬৭৫ সকাল ১১টায় দিল্লির চাঁদনীচকে গুরু তেগবাহাদুরের শিরশ্ছেদ করা হয়। ঐ স্থানেই দিল্লির 'শীশগঞ্জ গুরুদ্বারা' অবস্থিত।

গুরু তেগবাহাদুর বুঝেছিলেন যে, ঔরঙ্গজেব তাঁকে হত্যা করবে। সেই কারণে ঐ বছরই ৮ জুলাই তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র বালক গোবিন্দরায়কে শিখদের ভাবী গুরু হিসাবে ঘোষণা করেন। তখন গোবিন্দরায়ের বয়স ছিল ৯ বছর।

কয়েক মাস পর ১৬৭৬ সালের ২৯ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে গোবিন্দরায়কে শিখদের দশম গুরুর আসনে অভিষিক্ত করা হয় এবং সেদিন থেকেই গুরু গোবিন্দসিংহের ঐতিহাসিক জীবন-সংগ্রামের সূচনা।

জন্ম ও শিক্ষা

বিক্রম সংবৎ ১৭২৩, পৌষ শুক্লা সপ্তমী তিথি (২২ ডিসেম্বর ১৬৬৬) প্রাচীন পাটলিপুত্র (বর্তমান পাটনা) নগরে গুজরীদেবী এক পুত্রসন্তানকে জন্ম দেন—পরবর্তী কালে যিনি 'গুরু গোবিন্দসিংহ' নামে বিখ্যাত হন।

চঞ্চল প্রকৃতির সুদর্শন, নির্ভীক, নম্র ও আত্মপ্রত্যয়ী বালক গোবিন্দরায় পাটনার ছোট-বড় সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠে। পিতা গুরু তেগবাহাদুর পুত্রের সর্বপ্রকার শিক্ষাদীক্ষার উত্তম ব্যবস্থা করেন। সাহিবচন্দ খত্রী তাঁকে সংস্কৃত ও হিন্দি এবং কাজী পীর মহম্মদ ফারসি ভাষা শেখান। কাশ্মীরী পণ্ডিত পূর্বোক্ত কৃপারাম দত্তের নিকট গোবিন্দরায় সংস্কৃত ও গুরুমুখী লিপিতে লিখতে শেখেন এবং ইতিহাস ও শাস্ত্রাদি পাঠ করেন। তাঁর কাছেই তিনি শস্ত্রচালনা ও অশ্বারোহণের প্রশিক্ষণ লাভ করেন।

গোবিন্দরায়ের হাতের লেখা ছিল খুব সুন্দর। চিত্রকলা ও সঙ্গীতবিদ্যায় (সিরাদ নামক তন্তুবাদ্য, মৃদঙ্গ ও ছোট তবলা বাজানোতে) তিনি বেশ নিপুণ হয়ে ওঠেন। পরবর্তী কালে গোবিন্দরায়ের মধ্যে কাব্য-প্রতিভারও বিকাশ ঘটে। তাঁর রচিত 'বিচিত্র নাটক', 'অকাল উসততি', 'কৃষ্ণ অবতার', ফারসি ভাষায় রচিত 'জফরনামা', 'জ্ঞানপ্রবোধ' ইত্যাদি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

বন্ধুদের সঙ্গে বালক গোবিন্দরায়ের প্রিয় খেলা ছিল যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা।

৬ বছর বয়সে গোবিন্দরায়কে পাটনা থেকে আনন্দপুরে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন তাঁর পিতা। সেখানে তাঁর শিক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের সমুচিত ব্যবস্থা করা হয়। দেশ, ধর্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে অতি অল্প বয়সেই তিনি সম্যক্ জ্ঞানলাভ করেন এবং দেশ ও ধর্মের প্রকৃত শত্রুকে তিনি তখনি ভালভাবে চিনে নিয়েছিলেন। দিল্লির কারাগার থেকে যখন গুরু তেগবাহাদুরের অন্তিম বার্তা আসে, তখন বালক গোবিন্দ রায় দৃপ্ত ভঙ্গিতে ঘোষণা করেন ঃ "আমি আনন্দপুরেই থাকব এবং তুর্কদের ধ্বংস করব।"

গুরু গোবিন্দসিংহের দৃঢ় সঙ্কল্প

গুরু তেগবাহাদুরের মহান আত্মত্যাগের পর গোবিন্দসিংহ শিখ পন্থকে এক নতুন দৃষ্টিতে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। অহিংসার পথে শহীদের মৃত্যুবরণের পরম্পরার পরিবর্তে তিনি সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেন এবং সঙ্কল্প করেন—

"গউন কো মৈঁ সিংহ বনাউঁ।
দীনন কো মৈঁ ভূপ বনাউঁ।।
রঙ্কন কো মৈঁ রাজ দিলাউঁ।
চিড়িয়োঁ সে মৈঁ বাজ লড়াউঁ।।
সবা লাখ সে এক লড়াউঁ।
তভৈ গোবিন্দসিংহ নাম কহাউঁ।।"

(গরুদের আমি সিংহ বানাব, দীন-দরিদ্রদের রাজা করব, ক্ষুদ্র পাখিদের বাজপাখির বিরুদ্ধে লড়াব। সোয়া লক্ষের বিরুদ্ধে যখন একজন শিখকে যুদ্ধ করতে সক্ষম করে তুলব, তখনি গোবিন্দসিংহ নামে পরিচিত হব।)

গোবিন্দসিংহের এই দৃঢ়সঙ্কল্পের প্রেরণা তাঁর শিষ্যদের মধ্যেও অনুসঞ্চারিত হয়। বীরত্ব তাদের প্রকৃতিগত স্বভাবে পরিণত হয়। আনন্দপুর থেকে দেশভ্রমণে বেরিয়ে কালিন্দী (যমুনা) নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত 'পাবটা' নামক স্থানকে তিনি বেছে নেন এবং সিরমৌরের রাজা

মেদনীপ্রকাশের অনুরোধে পাবটা শহরকে উপযুক্তভাবে পুনর্গঠিত করে সেখানেই শিষ্যদের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণশিবির স্থাপন করেন। পাবটাতে তিনি এক দুর্গও নির্মাণ করেন।

সামরিক শিক্ষার্থী এবং জনসাধারণের হৃদয়ে আত্ম-বিশ্বাস, ধর্ম-সংস্কৃতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান এবং বীরত্ব সঞ্চারের উদ্দেশে এবং সেইসঙ্গে নতুন বিপ্লবের বাণী সম্প্রচারের জন্য গোবিন্দসিংহ সারা দেশ থেকে ৫২ জন কবিকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন এবং তাঁদের সাহায্যে প্রাচীন দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস ও মহাকাব্যসমূহকে সরল পাঞ্জাবি, হিন্দি ও ব্রজভাষাতে সঙ্কলিত করেন—যেগুলি সমগ্র ভারতের সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করে। গুরু নানক বলেছিলেন, শিখ দর্শন উপনিষদ্ তথা ভক্তিমার্গের উৎস বেদান্তকেই ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে—"বেদু পুকারৈ ভগতি সরোতি।" গোবিন্দসিংহ স্বয়ং শ্রীশ্রীচণ্ডীর তৃতীয় চরিত্র এবং মাত্র ১২ বছর বয়সে (১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রাচীন গ্রন্থ 'মার্কণ্ডেয়পুরাণ' সরল ব্রজ ও হিন্দি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর রচিত "চৌবীস অবতার' গ্রন্থে তিনি গীতার "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানি-র্ভবতি ভারত..."-কে অনুসরণ করে লেখেন ঃ "জব জব হোত অরিষ্ট অপারা, তব তব দেহ ধরত অবতারা।"

১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুলাই পর্যন্ত গোবিন্দসিংহ পাবটাতে যুদ্ধবিদ্যা প্রশিক্ষণ দান এবং শিষ্যদের চরিত্র গঠনের উপযুক্ত সাহিত্যরচনায় সক্রিয় ছিলেন। তারপর তিনি আনন্দপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিমধ্যে তিনি কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করে শিখদের শক্তি ও মনোবল যথেষ্ট বৃদ্ধি করেন। ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে জম্মুর সুবেদারকে যুদ্ধে পরাজিত করার পর তিনি ১৬৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মার্চ হিমাচলের রিবাল্‌সর নামক স্থানে পার্বত্য রাজন্যবর্গের এক সভা আহ্বান করেন এবং সেখানে মোগলদের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

শিখদের কার্যকলাপে ক্রুদ্ধ ঔরঙ্গজেব

গোবিন্দসিংহের ক্রমবর্ধমান সামরিক কার্যকলাপ মোগল শাসকদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াল। ঔরঙ্গজেব তাঁর পশ্চিম পাঞ্জাবের কিলকীলা শিবির থেকে ২০ নভেম্বর ১৬৯৩ নবাব সরহিন্দ বজীর খাঁর নিকট নিম্নলিখিত ফরমান প্রেরণ করেন—"যদি গোবিন্দসিংহ একজন সাধুর মতো জীবনযাপন করতে চায়, তাহলে যেন নিজেকে 'সাচ্চা পাতশাহ' (true king) বলা বন্ধ করে, বড় বড় সৈনিক সম্মেলন না করে, মাথার ওপর রাজার মতো উষ্ণীষ ধারণ না করে, দুর্গের শীর্ষে দাঁড়িয়ে সৈন্য পরিদর্শন এবং সামরিক অভিবাদন গ্রহণ না করে যেন একজন সন্ত নাগরিকের মতো আচরণ করে।... সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করলে তাকে যেন বন্দী করা হয় অথবা হত্যা করা হয়।"

কিন্তু ঐ শাহী ফরমানের দ্বারা গোবিন্দসিংহকে নিরস্ত করা গেল না দেখে পরের বছর ১৩ ফেব্রুয়ারি আবার একটি শাহী ফরমান জারি করা হলো—"মোগল রাজ্যের কর্মচারী ছাড়া কোন হিন্দু মাথার ওপর ঝুঁটি বা শিখা রাখবে না, পাগড়ি বাঁধবে না, শস্ত্রধারণ করবে না, পালকি বা ঘোড়ায় চড়বে না।"

এই অপমানজনক আদেশকে গোবিন্দসিংহ সরাসরি খারিজ করে নির্দেশ দিলেন—"আমার শিখরা শুধু ঝুঁটি বা শিখা নয়, পূর্ণ কেশধারী হবে, হাতি-ঘোড়া-পালকিতে চড়বে।" তিনি মোগলদের বিরুদ্ধে পুরোপুরি যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন এবং 'রণজীত নগাড়া' নামক এক বিশাল নাকাড়া (ঢাক) প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় বাজানোর নির্দেশ দিলেন। এই নাকাড়ার শব্দ বহু দূর থেকেও শোনা যেত। ২৮ ফেব্রুয়ারি আনন্দপুর থেকে এক বিশাল সশস্ত্র শোভাযাত্রা বেরিয়ে মাস তিনেক পর হরিদ্বারে পৌঁছাল।

ভারতীয় ইতিহাসে এক মহা বিপ্লব—খালসা পন্থের প্রবর্তন

পিতা গুরু তেগবাহাদুরের শহীদের মৃত্যুবরণের পরেই গোবিন্দসিংহ মোগলশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি তলোয়ার, কৃপাণ, শূল (বর্শা), বন্দুক, কাটারি প্রভৃতির এক বিরাট অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, বেতন-ভোগী সৈন্যদের ওপর নির্ভর করে প্রচণ্ড শক্তিশালী মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সাফল্যলাভ করা যাবে না। সেইজন্য জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যক্ষ সাহায্য এবং শিখদের মধ্যে এমন অভূতপূর্ব অলৌকিক শক্তির উন্মেষ ঘটাতে হবে, যাতে তারা বাস্তবিকই এক-একজন সওয়া লক্ষ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে।

এমন দুঃসাহসী লক্ষ্য সামনে রেখে সমগ্র দেশে বিশেষ আমন্ত্রণ ও নির্দেশ প্রেরণ করা হয়, যার ফলে ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মার্চ বৈশাখী পর্বের দিন আনন্দপুরের কেশগড় দুর্গে সারা ভারত থেকে প্রায় ৮০ হাজার দেশপ্রেমিক মানুষ সমবেত হয়। সেখানে একটি সুন্দর মণ্ডপ ও সুসজ্জিত মঞ্চ তৈরি করা হয়। সকালের কীর্তনের পরে গোবিন্দসিংহ সৈনিক বেশে হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে বেশ নাটকীয়ভাবে সমবেত জনতার

সামনে এসে দাঁড়ান এবং সংক্ষিপ্ত ওজস্বী ভাষণের পর সিংহগর্জনে আহ্বান জানানঃ "দেশ-ধর্ম রক্ষার জন্য আমার অস্ত্র-শস্ত্র নয়, শিখদের অসংখ্য শীশ (মস্তক)-এর প্রয়োজন। আমার শুধুমাত্র শিখের মস্তক চাই।" তাঁর রক্তচক্ষু ও রুদ্ররূপ দেখে সম্পূর্ণ সভা স্তব্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। আরেকবার তাঁর বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত হলোঃ "আছে কোন্ মায়ের সন্তান, যে এসে বলবে—এই নিন আমার মস্তক হাজির। তোমরা হামেশাই বলতে না যে, ভগবানের জন্য আমরা যেকোন সময়ে আমাদের মাথা উৎসর্গ করতে প্রস্তুত?" তারপরেও চতুর্দিকে স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। তিনি তৃতীয়বার আহ্বান জানালেনঃ "এখানে কি একজনও এমন নেই যে, গুরুর প্রতি তার শ্রদ্ধার প্রমাণ দিতে পারে?"

তখন জনতার একটি অংশে চাঞ্চল্য দেখা গেল এবং একজন ভক্ত হাত জোড় করে এগিয়ে এসে গোবিন্দসিংহের সামনে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে বললঃ "মহারাজ, আমি আমার মাথা আপনার সেবায় উৎসর্গ করতে চাই।" এই ভক্তের নাম দয়ারাম খত্রী, ইনি লাহোর থেকে এসেছিলেন। গোবিন্দসিংহ তাঁকে পাশের তাঁবুতে নিয়ে গেলেন এবং পরমুহূর্তেই সকলে তলোয়ারের ভয়ঙ্কর আঘাতের শব্দ শুনে চমকে উঠল। তাঁবুর পাশের নালা দিয়ে রক্তের প্রবাহ বয়ে যেতেও দেখা গেল। তারপর গোবিন্দসিংহ রক্তাক্ত তরবারি হাতে আবার সকলের সামনে এসে উচ্চস্বরে আহ্বান জানালেনঃ "আরো আরো মাথা চাই।" এরপর একে একে হস্তিনাপুরের জাঠ ধর্মদাস, দ্বারিকাপুরীর ধোপা মুহকমচন্দ, বীদর (কর্ণাটকের) নাপিত সাহিবচন্দ এবং সবশেষে উড়িষ্যার জগন্নাথপুরীর হিম্মৎরায় ভিশতী এগিয়ে এল এবং প্রত্যেকবারই একইভাবে তরবারির আঘাতের শব্দ ও নালা দিয়ে রক্তের প্রবাহ প্রত্যক্ষ করা গেল।

এরপর গোবিন্দসিংহ বেশ কিছুক্ষণ পাশের তাঁবুতে রইলেন এবং অকস্মাৎ নাটকীয়ভাবে সেই পাঁচজন শিখকে কেশরিয়া বস্ত্রে সজ্জিত করে কোমরে তরবারি ও মাথায় সুন্দর পাগড়ি বেঁধে বাইরে নিয়ে এলেন। (তাঁবুর মধ্যে তিনি পাঁচটি ছাগলের গলায় তলোয়ারের কোপ বসিয়েছিলেন।) ইতিমধ্যে আরো অনেক শিখ মস্তক অর্পণের জন্য এগিয়ে আসতে চাইছিল। তাই দেখে তিনি গম্ভীর স্বরে বললেনঃ "গুরুর উৎসর্গ সম্পূর্ণ হয়েছে। এঁরা বিশুদ্ধ পবিত্র খালসার প্রতিরূপ। অমৃত পান করে এই শিখেরা এখন সিংহ হয়েছেন। এঁরা আমার পঞ্চ প্রিয়জন ('পঞ্জপিয়ারে')। আমি সর্বদা এঁদের মধ্যে অবস্থান করব—

'খালসা মেরা রূপ হৈ খাস।
খালসহ মহি হউ করহুঁ নিবাস।।'

(খালসাই আমার স্বরূপ, আমি সর্বতোভাবে খালসার মধ্যেই বিরাজিত।)

"এখন থেকে এঁদের আদেশই হবে আমার ইচ্ছা।" তিনি উক্ত 'পঞ্জপিয়ারে'দের উচ্চ সিংহাসনে বসিয়ে নিজে তাঁদের সম্মুখে হাতজোড় করে নম্রতাপূর্বক বললেনঃ "গুরুরূপে আপনারা পরম শুদ্ধ-পবিত্র খালসা হয়েছেন। আমাকেও অমৃত পান করিয়ে পবিত্র খালসা করে নিন।"

এর আগে তিনি এক বড় পাত্রে পবিত্র জলের মধ্যে খণ্ডা (খড়্গ) ঘুরিয়ে নেড়ে দেন এবং মাতা সাহিব দেবা ঐ জলে বাতাসা গুলে তাকে মিষ্টতা প্রদান করেন। ঐ পাত্রের অমৃত উক্ত 'পঞ্জপিয়ারে'কে পান করান, অর্থাৎ জাত-পাতের ভেদাভেদ মুছে ফেলে তিনি শিখ বীরদের যোদ্ধা সন্তে রূপান্তরিত করেন। এবার দয়াসিংহ গোবিন্দসিংহের প্রার্থনা স্বীকার করে তাঁকে বলেনঃ "আমরা আমাদের শীশ উৎসর্গ করে অমৃত পান করেছি। আপনি খালসাকে কী উৎসর্গ করবেন?" হাতজোড় করে গোবিন্দসিংহ বললেনঃ "আমার চার পুত্রকেই খালসার বেদিতে উৎসর্গ করব।"

তখন পঞ্জপিয়ারে গোবিন্দসিংহকে ঐ পাত্র থেকে অমৃত পান করালেন এবং তিনি 'গুরু গোবিন্দসিংহ'-এ রূপান্তরিত হলেন। অতঃপর সমবেত ভক্তদেরও ঐ পাত্র থেকে অমৃত পান করানো হলো। তিনি বললেনঃ "খালসা যেমন অকাল পুরুষের স্বরূপ, তেমনি যুদ্ধজয়ও হবে বাহে গুরুর জয়।" পাঁচবার সমস্ত জনতা সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি করে উঠল—"বাহে গুরুজী কী খালসা। বাহে গুরুজী কী ফতেহ।"

খালসা পন্থ গঠনের সময়ে গুরু গোবিন্দসিংহ যে-উপদেশগুলি দিয়েছিলেন, সেগুলি বাস্তবিকই অত্যন্ত সুন্দর পথনির্দেশক। সৈনিকদের পক্ষে যে-বিধিনিষেধগুলি সহজ-ভাবে পালন করা সম্ভব ছিল, তিনি শুধু সেইগুলিই পালন করতে বলেন। যেমন—(১) কেবল অকাল পুরুষের ওপরেই আস্থা রাখা—যিনি সকলের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও সংহারকর্তা; (২) জাতপাত বা উচ্চনীচের ভেদাভেদ অস্বীকার করা; (৩) শুদ্ধ গৃহস্থ জীবন যাপন করা এবং ধর্মরক্ষার জন্য যখনি আহ্বান আসবে, তখনি সর্বস্ব উৎসর্গ করার প্রস্তুতি রাখা; (৪) স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সর্ববিষয়ে সমানতা স্বীকার করা, পর্দা ও সতী প্রথা ত্যাগ করা, স্ত্রী ও কন্যার প্রহারকারীকে খালসা সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থান না দেওয়া এবং মুসলিম স্ত্রীলোকদের সঙ্গে সমাগম না করা; (৫) পঞ্চ 'ক'-কার (অর্থাৎ কেশ, কঙ্ঘা, কড়া, কচ্ছ ও

কৃপাণ) ধারণ করা, এবং তামাক ও হালাল করা মাংস ভক্ষণ না করা; দীন-দুঃখী ও দুর্বলদের প্রতি করুণা ও সহানুভূতির মনোভাব পোষণ করা।

বাস্তবিক, গুরু গোবিন্দসিংহ শকারি বিক্রমাদিত্যের মতোই মাটির পুতুলের মতো মৃত সমাজের মধ্যে নতুন প্রাণসঞ্চার করেছিলেন। জনৈক বয়োবৃদ্ধ সনাতনধর্মী সন্ত মন্তব্য করেনঃ "১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দের বৈশাখীর পর্ব খালসার জন্মদিন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার থেকেও অগ্রসর হয়ে একে হিন্দুর পুনর্জন্মদিনও বলা যায়।"

খালসা পন্থ প্রবর্তনের পর নানা সংগ্রাম

গুরু গোবিন্দসিংহ কর্তৃক খালসা পন্থ প্রবর্তনের ফলে শিখদের মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে বিরাট আকারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যায়। খালসা পন্থ প্রবর্তনের মাধ্যমে গুরু গোবিন্দসিংহ একজন প্রকৃত সমাজসংস্কারক, কুশল সংগঠক এবং ক্ষাত্রধর্ম প্রবর্তক-রূপে জনমানসে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি সমগ্র ভারতের সকল জাতির মানুষের মধ্যে ক্ষাত্রতেজ উজ্জীবিত করে তাদের এক পঙ্‌ক্তিতে এনে জাতিভেদের প্রাচীরকে ধ্বংস করে দেন।

অতঃপর তিনি পার্বত্য রাজন্যদের কঠোরভাবে সতর্ক করে দেন, যারা কুসংস্কার ত্যাগ না করে বিধর্মী শাসকদের পদলেহন করে থাকে, নিজ কন্যা ও ভগিনীদের শাসকদের হাতে তুলে দেয়। গুরুজী তাদের ভর্ৎসনা করে বলেনঃ "প্রকাশ্যে আপনাদের গৃহবধূ, কন্যা ও ভগিনীদের ইজ্জৎ লুণ্ঠিত হতে দেখে, মন্দির অপবিত্রকরণ ও ধ্বংস প্রত্যক্ষ করেও আপনাদের লজ্জা হয় না? কীরকম রাজপুত আপনারা?"

উল্লেখ্য যে, শিখরা কখনোই নিজেদের কুলবধূ, ভগিনী বা কন্যাদের শাসকদের হাতে সঁপে দেয়নি।

আনন্দপুরের যুদ্ধ

১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সুবেদার দুজন পাঠান সর্দারকে দশহাজার সৈন্য-সহ আনন্দপুর আক্রমণের জন্য প্রেরণ করে। পার্বত্য রাজারাও তাদের সঙ্গে মিলিত হয়। শিখদের প্রবল প্রতিরোধের ফলে এই যুদ্ধে একজন পাঠান সর্দার নিহত ও একজন গুরুতর আহত হয়। পরাজিত হয়ে রাজারা পলায়ন করে। দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে পার্বত্য রাজারা দুমাস আনন্দপুরকে অবরুদ্ধ করে রাখে। শিখদের প্রচণ্ড প্রত্যাক্রমণে দুই রাজা নিহত হলে অন্য সব রাজা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে।

১৭০০ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় মোগল সৈন্যরা পার্বত্য রাজাদের সাহায্যে আনন্দপুর আক্রমণ করে। ঐ বিশাল সৈন্যবাহিনীকে শিখ যোদ্ধারা চার কিলোমিটার দূরে নির্মোহগড়ে আটকে দেয় এবং তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করে। ঐবছরই সরহিন্দের সুবেদার আনন্দপুরের ওপর আক্রমণ করে। যুদ্ধে শিখদের পরাজয় ঘটে এবং গুরু গোবিন্দসিংহ ভসালী চলে আসেন। সেখানে যে-যুদ্ধ হয় তাতে শিখ সেনাপতি সাহেবসিংহ নিহত হন। এরপর গুরু গোবিন্দসিংহ আনন্দপুরে ফিরে আসেন। কাহলুরের রাজা ভীমচন্দের নেতৃত্বে পার্বত্য রাজারা গুরু গোবিন্দসিংহের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করেন।

দুবছর শান্তিতে অতিবাহিত হওয়ার পর ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ ও আলিফ বেগ নামে দুই মোগল সরদার লাহোর থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে রাজা ভীমসেনের প্ররোচনায় আনন্দপুর আক্রমণ করে। ভীমসেন তাদের প্রতিদিন এক হাজার আশরফি দেওয়ার লোভ দেখিয়েছিল। কিছুকাল যুদ্ধ চলার পর সৈয়দ বেগ গুরু গোবিন্দসিংহের ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয় এবং অপর সর্দার সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে।

১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে রাজা ভীমচন্দ ও অন্য পার্বত্য রাজারা সন্ধিভঙ্গ করে আনন্দপুরের ওপর আক্রমণ করে। সেই বছরই মোগল সৈন্যরা পার্বত্য রাজাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দপুরে প্রচণ্ড আক্রমণ করে। শিখদের পরাজয় ঘটে এবং তারা পশ্চাদপসরণ করলে আনন্দপুর লুণ্ঠিত হয়। এরপর শিখরা পুনরায় আনন্দপুরে ফিরে আসে। এই যুদ্ধে শিখদের সেনাপতি সৈয়দ বেগ নিহত হয়।

ঔরঙ্গজেবের পত্র

এই যুদ্ধের পর ঔরঙ্গজেব গুরু গোবিন্দসিংহকে পত্র লিখে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য ডেকে পাঠান। পত্রে তিনি লেখেনঃ "আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে এক রাজা সাধুসন্তদের সঙ্গে যেরূপ আচরণ করে, সেরূপ আচরণই করা হবে। কিন্তু এর অন্যথা করা হলে আমি ক্রুদ্ধ হয়ে আপনার কাছে যাব।" একইসঙ্গে আশ্বাস ও হুমকি-ভরা এই পত্রের উত্তরে গুরু গোবিন্দসিংহ যে-পত্র লেখেন, তাতে ঔরঙ্গজেব যেসমস্ত অন্যায়-অত্যাচার ইতিপূর্বে করেছেন ও এখনো করে চলেছেন তা সুস্পষ্ট-ভাবে দেখিয়ে দেন। তিনি লেখেনঃ "যে-ব্যক্তি ধর্মান্ধতার কারণে হিন্দুদের সঙ্গে বিদ্বেষপূর্ণ ব্যবহার করেন, তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা কেমন করে সম্ভব? প্রজারা বাদশাহের নয়, ভগবানের। আপনি প্রজাদের ধর্মভ্রষ্ট করছেন।

ভগবান আমাকে পাঠিয়েছেন জনসাধারণকে সম্মার্গ দেখানোর উদ্দেশে। আমাদের দুজনের পথ আলাদা।"

এই পত্রালাপের পরিণাম হলো এই যে, ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বাদশাহ তাঁর লাহোর ও জম্মুর সুবেদারদের আনন্দপুর আক্রমণ করতে পাঠিয়ে দেন এবং আশপাশের রাজাদের ও মুসলিম জায়গিরদারদের মোগল বাহিনীকে সাহায্য করার নির্দেশ দেন।

আনন্দপুর অবরোধ

প্রাথমিক কয়েকটি ছোটখাট লড়াইয়ের পর শত্রুরা আনন্দপুর অবরোধ করে। অবরুদ্ধ শিখদের জীবন অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে ওঠে। তারা রাতের অন্ধকারে শত্রুদের খাবার লুঠ করে এনে ক্ষুধানিবারণের চেষ্টা করে। এই কাজ করার সময়ে একজন শিখ মোগলদের হাতে ধরা পড়ে এবং তাকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়। ঐ শিখ ফিরে এসে সব ঘটনা বিবৃত করলে গুরু গোবিন্দসিংহ তার হাত থেকে সকলকে প্রসাদ গ্রহণ করতে বলেন এবং তার শুদ্ধির ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, জোর করে ধর্মান্তরিত শিখ শিখই থাকে। এইভাবে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে শুদ্ধিকরণের দ্বারা স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার মহৎ দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেন। অবরোধের ফলে অনাহারের হাত থেকে রেহাই পেতে আনন্দপুরের মানুষেরা গ্রাম ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করে। তখন গুরু গোবিন্দসিংহের মা যুদ্ধ বন্ধ করার পরামর্শ দেন। চল্লিশ জন শিখ গুরু গোবিন্দসিংহকে পরিত্যাগ করে চলে যায়।

সরহিন্দের সুবেদার এবং পার্বত্য রাজারা গুরু গোবিন্দসিংহকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তিনি আনন্দপুর ত্যাগ করে গেলে তাঁকে ও তাঁর শিষ্যদের নিরাপদে যেতে দেবে। অবশেষে ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দের ২০-২১ ডিসেম্বর রাত্রি থেকে শিখরা আনন্দপুর ছেড়ে চলে যেতে আরম্ভ করে।

গোবিন্দসিংহের বৃদ্ধা মা, তাঁর পত্নীরা ও অন্যান্য মহিলারা সেনাপতি উদেসিংহের সংরক্ষণে দুশো অশ্বারোহী সৈন্যদের সঙ্গে দুর্গের বাইরে বেরিয়ে আসেন। দ্বিতীয় দলে স্বয়ং গোবিন্দসিংহ, তাঁর দুই পুত্র অজিতসিংহ ও জুঝারসিংহ চারশো অশ্বারোহীর সঙ্গে বেরিয়ে আসেন। দুর্দৈবক্রমে সেই সময়ে হঠাৎ ভয়ঙ্কর বর্ষণ শুরু হয় এবং ভীষণ বন্যায় প্রায় সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। চিরকাল শুষ্ক সরসা নদীতেও প্রবল বন্যা দেখা দেয়। গোবিন্দসিংহ তাঁর পরিবারবর্গকে একজন বিশ্বস্ত শিখের সঙ্গে দিল্লি পাঠিয়ে দেন।

মোগল সুবেদার তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে গুরু গোবিন্দসিংহের পশ্চাদ্ধাবন করে। প্রথম দলের ওপর আক্রমণ করা হলে বীর শিখ উদেসিংহ অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং তাঁর সঙ্গের শিখরাও প্রাণপণে যুদ্ধ করে অবশেষে বীরের মৃত্যুবরণ করে। সর্দার হিম্মৎবাহাদুর প্রবল বন্যাগ্রস্ত নদীতে নেমে গুরু গোবিন্দসিংহের পরিবারের সকলকে নদী পার করিয়ে দেন। পুরনো গৃহভৃত্য (পাচক) গঙ্গু গোবিন্দসিংহের বৃদ্ধা মা গুজরীদেবী ও তাঁর দুই কনিষ্ঠ পুত্রকে খেরী গ্রামে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। গুরু গোবিন্দসিংহের প্রায় সমস্ত সম্পত্তি এবং গুরুগ্রন্থসাহেবের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি বন্যার জলে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়।

চমকৌরের পথে গুরু গোবিন্দসিংহ

সরসা নদী পার হয়ে আরো ১৬ কিলোমিটার উত্তরে চমকৌরের পথে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া গুরু গোবিন্দ-সিংহের সামনে আর কোন উপায় ছিল না, কারণ তাঁর সামনে ও পিছনে মোগল সেনা এবং বাঁদিকে পার্বত্য রাজাদের প্রদেশ ছিল। চমকৌরের সমতল অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র দুর্গে তিনি ও তাঁর চল্লিশ জন শিখ সৈন্য আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

পরদিন ৭০০ মোগল সৈন্য দুর্গটিকে ঘিরে ফেলে। এই ভয়াবহ যুদ্ধের জন্য সরহিন্দ থেকে কামান আনা হয়েছিল এবং মোগল বাহিনীর কামানের গোলার বিরুদ্ধে ৪০ জন শিখ সৈন্যের ছিল শুধু তীর-ধনুক। তবু তারা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করছিল। দু-তিনজন শিখ দুর্গ থেকে বেরিয়ে যারা কামানের গোলা ছুঁড়ছিল তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছিল। এইভাবে শিখ সৈন্যরা হতাহত হচ্ছিল। দুর্গের উঁচু ছাদ থেকে গোবিন্দসিংহ প্রবল বাণবর্ষণ করছিলেন, যার ফলে বহু শত্রুসৈন্য নিহত হয়। পঞ্জপিয়ারের দুজন মোহকমসিংহ ও হিম্মৎসিংহ এই যুদ্ধে বীরের মৃত্যুবরণ করেন। গুরু গোবিন্দসিংহের দুই পুত্র অজিতসিংহ (১৮) এবং জুঝারসিংহ (১৩) বর্শার আঘাতে শত্রুদের বিনাশ করতে করতে শহীদের মৃত্যুবরণ করে। এই ভয়ঙ্কর অসম যুদ্ধ মাত্র একদিনেই শেষ হয়ে যায়।

অবশেষে পাঁচজন নিষ্ঠাবান শিখ পঞ্জপিয়ারের ভূমিকা গ্রহণ করে গুরু গোবিন্দসিংহকে দেশ-ধর্মের হিতার্থে তাঁর অমূল্য জীবনরক্ষার জন্য তাঁকে দুর্গ ত্যাগ করে যাওয়ার অনুরোধ করলেন। তিনি তাঁদের অনুরোধকে খালসার আদেশ মনে করে শিরোধার্য করেন এবং 'বাহে গুরুজী কী খালসা, বাহে গুরুজী কী ফতেহ' ধ্বনি সহকারে দুর্গ থেকে নির্গত হতে সম্মত হন। ভাই সন্তসিংহকে প্রায় অবিকল গুরু গোবিন্দসিংহের মতো দেখতে ছিল। তিনি গুরু গোবিন্দসিংহের অনুরূপ বেশভূষা পরিধান করে তীর-

ধনুক ও উষ্ণীষ ধারণ করে চমকৌরের দুর্গের ছাদে বসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে রইলেন সঙ্গতসিংহ।

রাত্রি দুটোর সময়ে ঘন অন্ধকারে গুরু গোবিন্দসিংহ দুর্গ থেকে নির্গত হলেন। অবশিষ্ট তিনজন শিখ পিছনের পথ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন এবং মোগল সৈন্যদের মশালগুলি তীর ছুঁড়ে নিভিয়ে দিয়ে ঐ সৈন্যদেরও শেষ করে দিলেন। মোগল সৈনিকদের চোখে ধুলো দিয়ে, তাদের মতো নীল পোশাক পরে খালি পায়ে গোবিন্দসিংহ মাছিওয়াড়ার গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। প্রত্যূষে তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে দয়াসিংহ, ধর্মসিংহ ও মানসিংহ দেখলেন প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে গুরুজী মাটিতে শুয়ে আছেন। পায়ে ফোসকা পড়েছিল, তাই তিনি হাঁটতে পারছিলেন না। মানসিংহ তাঁকে কাঁধে তুলে নিলেন। মাছিওয়াড়ার জঙ্গলেই গুরু গোবিন্দসিংহ অকাল পুরুষকে সম্বোধন করে কঠোর জীবনযাপনের প্রতিজ্ঞার পুনরুচ্চারণ করেন।

ওদিকে চমকৌরে গুরু গোবিন্দসিংহ আটক রয়েছেন মনে করে মোগল সৈনিকরা সন্তসিংহ এবং সঙ্গতসিংহকে বন্দী করল। বাদশাহকে খুশি করার জন্য সন্তসিংহের মুণ্ড কেটে দিল্লির দরবারে পাঠিয়ে দেওয়া হলো, কিন্তু গুরু গোবিন্দসিংহকে ধরা যায়নি জানতে পেরে মোগলরা অত্যন্ত হতাশ হলো।

গোবিন্দসিংহের পুত্রদ্বয়-সহ মায়ের মৃত্যুবরণ

পুরনো চাকর গঙ্গুর ওপর বিশ্বাস করে মাতা গুজরীদেবী তাঁর দুই শিশু পৌত্রদের নিয়ে খেরী গ্রামে তার বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। রাত্রে তিনি দুই নাতিকে কোলে বসিয়ে তাদের বীর পূর্বপুরুষদের ও পিতা গুরু গোবিন্দসিংহের দেশ-ধর্মের জন্য কঠোর সংগ্রামের নানা ঘটনার কথা শোনাচ্ছিলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলেন যে, সঙ্গে আনা বহুমূল্য ধনরত্ন যেখানে রেখেছিলেন, সেখানে নেই। গঙ্গুকে জিজ্ঞাসা করতেই সে রাগে ফেটে পড়ল। বলল ঃ "তোমরা বড় কৃতঘ্ন। নিজের জীবন বিপন্ন করে তোমাদের আশ্রয় দিলাম, তার পরিবর্তে আমাকে চোর বলছ? এখনি সেপাইদের খবর দিচ্ছি, তোমাদের ধরিয়ে দিলে অনেক পুরস্কার পাব।" এই বলে সে বাড়িতে তালা লাগিয়ে নিকটবর্তী মুরিণ্ডার থানেদারকে খবর দিল। কিছুক্ষণ পরে মোগল সৈন্যরা এসে মাতা গুজরীদেবী এবং তাঁর দুই নাতি জোরাবরসিংহ ও ফতেসিংহকে ধরে নিয়ে গেল। শিশুপুত্রদের বয়স ছিল যথাক্রমে ৮ ও ৬ বছর। গুজরীদেবী বুঝলেন, তিনি আর শিশুদের রক্ষা করতে পারবেন না। বারবার তিনি তাদের মুখ চুম্বন করলেন, নতুন বস্ত্র পরালেন এবং অন্তিম উপদেশ দিলেন ঃ "দাদুভাইরা, এই নবাব বজীর খান আমাদের পরিবার এবং গুরুজীর শিখদের ওপর ভীষণ অত্যাচার করেছে। ওরা তোমাদেরও পিতা, পিতামহ ও মুনি-ঋষিদের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে বলবে। দাদুভাইরা, তোমরা দৃঢ় থেকো এবং পিতা-পিতামহদের পরম্পরা অক্ষুণ্ণ রেখো। তাঁদের নাম যেন কলঙ্কিত না হয়।" দুই শিশু হাত তুলে দৃপ্ত ভঙ্গিতে বলে ওঠে ঃ "ঠাকুমা, তুমি চিন্তা করো না। আমাদের কাটারি দিয়ে নবাবের মাথা কেটে ফেলব, আর ঠাকুরদার মতোই ধর্মে অবিচল থাকব।"

নবাব বজীর খানের হুকুমে পৌষমাসের ভীষণ ঠাণ্ডায় শিশুদের আরো বেশি ঠাণ্ডায় কষ্ট দেওয়ার জন্য বুরুজের ওপর বিনা আচ্ছাদনে আটকে রাখা হলো। শিশুদের সরহিন্দের সুবেদারের সামনে হাজির করা হলো এবং বলা হলো—মুসলমান হয়ে যাও, তোমাদের খুব আরামে রাখা হবে। শিশুরা তাদের পিতা ও পূর্বপুরুষদের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করে বলে ওঠে ঃ "আমরা কখনোই ধর্মত্যাগ করব না, বরং তুর্কদের অবশ্যই ধ্বংস করব।" শিশুদের কথা শুনে বজীর খান ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের জীবন্ত অবস্থায় দেওয়ালের মধ্যে গেঁথে দেওয়ার আদেশ দিল। ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর দুই বীর শিশুকে জীবন্ত অবস্থায় দেওয়ালের মধ্যে গেঁথে ফেলে হত্যা করা হলো।

গুজরীদেবী নাতিদের মৃত্যুসংবাদ শুনেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হলো। শিখদের ইতিহাসে বীর পত্নী, বীর মাতা ও বীরাঙ্গনা নারীদের দৃষ্টান্ত অনেক আছে, কিন্তু শহীদদের বীর পিতামহী শুধু একজনই হয়েছিলেন, তিনি বীরমাতা গুজরী। ধন্য মাতা গুজরী! সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর মতো বীর জননী নিতান্তই বিরল—যিনি নিজের স্বামী, একমাত্র পুত্র এবং চার বালক ও শিশু পৌত্রদের দেশ-ধর্মের রক্ষার জন্য অনির্বাণ যজ্ঞানলে আত্মাহুতি দিতে দেখেছেন এবং সেই অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেছেন।

দীবান টোডরমল গুরুপুত্রদের ও মাতা গুজরীর দাহ-সংস্কার করেন এবং ঐস্থানে গুরুদ্বারা জ্যোতিস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়। গুরুপুত্রদের যেখানে জীবন্ত দেওয়ালে গেঁথে হত্যা করা হয়, বীর বন্দা বৈরাগী সেখানে গুরুদ্বারা ফতেহগড় প্রতিষ্ঠা করেন।

শিশুপুত্রদের ঐ নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং মাতা গুজরীদেবীর মর্মান্তিক মৃত্যুসংবাদ শুনেও বিচলিত না হয়ে এবং কারো প্রতি অভিশাপ বর্ষণ না করে গুরু

গোবিন্দসিংহ পুনরায় পূর্ণ বিক্রমে তাঁর কর্মপথে অগ্রসর হন। ইহলোকে তিনি যতদিন ছিলেন, ততদিন তাঁর এই যাত্রা থামেনি।

জফরনামা (বিজয়পত্র)

রায়কোট থেকে গুরু গোবিন্দসিংহ লাখীর জঙ্গলের পথে মালবা প্রদেশের 'দীনা' নামক স্থানে উপনীত হলেন। সেখান থেকে তিনি ফারসি ভাষায় ঔরঙ্গজেবকে তিনখানি স্মরণীয় পত্র লেখেন। এই পত্রগুলি 'জফরনামা' নামে বিখ্যাত। তিনি ঈশ্বরের নামে শপথ করে ঔরঙ্গজেবকে তাঁর নানা কুকীর্তির জন্য কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেন। ঔরঙ্গজেবের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাঁকে তীব্র ধিক্কার দিয়ে লেখেন ঃ "যদিও আপনি আমার পুত্রদের হত্যা করেছেন, তথাপি খালসা-রূপী নাগ এখনো কুণ্ডলী পাকিয়ে জীবিত অবস্থায় বিরাজ করছেন।" তিনি সনাতন ধর্মের নীতির ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ "যখন অন্য সব পথ বন্ধ হয়ে যায়, তখন তলোয়ার তুলে নেওয়াই ধর্ম।" তিনি লেখেন ঃ "আমি কখনো কোন গ্রন্থের নামে শপথ করি না। কিন্তু আমার বাণীই আপনার কোটি কোটি কসমের থেকেও বেশি পবিত্র। আমার মুখ থেকে নিঃসৃত শব্দ কোরানের মতোই পবিত্র। আপনি যদি আসতে চান, কথা বলতে আসতে পারেন। অন্যথা আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ শুরু করে দিয়েছি। আমার যজ্ঞের ঘোড়া বেরিয়ে পড়েছে, যারা আপনার সেনাপতি নজর খাঁ ও জফরবেগকে মৃত্যুর কোলে ঘুম পাড়িয়ে দিতে ছুটে চলেছে।"

মুক্তসরের শেষ যুদ্ধ

চমকৌরের দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসার সময় গুরু গোবিন্দসিংহ মুসলমানদের যে নীলরঙের সৈনিক পোশাক ধারণ করেছিলেন, লাখীর জঙ্গলে সেই পোশাক পুড়িয়ে ফেলেন। লাখী জঙ্গল থেকে তিনি খিন্দরানের গ্রামে পৌঁছান। যে চল্লিশ জন শিখ তাঁকে পরিত্যাগ করে গ্রামে ফিরে গিয়েছিল—তাদের মা-বোনেরা তাদের কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করে বলে ঃ "গুরুজীকে বিপদের সময়ে একা ফেলে পালিয়ে আসতে তোমাদের লজ্জা করল না?" একজন মাতা ভাগ কৌর স্বয়ং হাতে তলোয়ার তুলে নিয়ে পতিত শিখদের আহ্বান জানালেন ঃ "এখন চল, গুরুর কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নাও। খিন্দরানের যুদ্ধে তাঁকে সাহায্য কর।"

খিন্দরানের এক বিশাল সরোবর গোবিন্দসিংহ কৌশলে দখল করে রেখেছিলেন। ইতিমধ্যে সরহিন্দের সুবেদার খিন্দরানের ওপর আক্রমণ করতে এলে শিখ সৈন্যরা আশপাশের ঝোপের ওপর নিজেদের চাদর ছড়িয়ে দেয়, যেগুলিকে মোগলরা শিখদের অসংখ্য তাঁবু বলে মনে করে এবং আশঙ্কা করে, গুরু গোবিন্দসিংহের নিকট বিশাল সৈন্যবল আছে। ওদিকে গুরুজীর ক্ষুদ্র সৈন্যদলের সঙ্গে মাতা ভাগ কৌরের নেতৃত্বে উল্লিখিত চল্লিশ জন শিখ সৈন্য মরণপণ করে মোগল সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে এবং একে একে শহীদের মৃত্যুবরণ করে। গুরু গোবিন্দসিংহের অব্যর্থ বাণের সামনে টিকতে না পেরে বজীর খানের সৈন্যরা পলায়ন করে। যুদ্ধ বন্ধ হলো, গুরু গোবিন্দসিংহের জয় হলো। যারা তাঁকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল, তারা ফিরে এসে আবার ধর্মের জন্য তাঁর অধীনে যুদ্ধ করে শহীদের মৃত্যুবরণ করে। তারা উক্ত সরোবরের তীরে মুক্তিলাভ করল, সেই কারণে খিন্দরানা গ্রাম ও ঐ সরোবর 'মুক্তসর' নামে খ্যাত হয়।

দশম গ্রন্থ

গুরু গোবিন্দসিংহের সমগ্র রচনাসমূহের সঙ্কলনকে 'দশম গ্রন্থ' বা 'দশম পাতশাহ কা গ্রন্থ' বলা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে ভাই মণিসিংহ গ্রন্থটির সঙ্কলন করেন। গ্রন্থটি গুরুমুখীতে লিপিবদ্ধ হয়। দশম গ্রন্থ গুরুদ্বারাগুলিতে রাখা হয় না।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু

সরহিন্দের সুবেদার গুরু গোবিন্দসিংহের খোঁজে মরিয়া হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিল। গুরু গোবিন্দসিংহ তলবণ্ডী অথবা দমদমার নিরাপদ স্থানে প্রায় দেড় বছর বিশ্রাম করেন, সেইসঙ্গে চতুর্দিকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। এখানে থাকার সময়ে তিনি আদিগ্রন্থের নতুন করে সম্পাদনা করেন এবং পিতা গুরু তেগবাহাদুরের রচনাগুলিকে সঙ্কলিত করে গুরুগ্রন্থসাহেবের অন্তর্ভুক্ত করেন।

দমদমাতে যথেষ্ট শান্তি বিরাজিত ছিল। ওদিকে ঔরঙ্গজেব দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যে আটকে পড়েছিলেন এবং পঞ্জাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গুরু গোবিন্দসিংহের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। গুরু গোবিন্দসিংহ তখন শুধু পঞ্জাব নয়, সমগ্র ভারতের কথা চিন্তা করে উত্তরের শিখ ও রাজপুত এবং দক্ষিণ ভারতের মারাঠা শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে মোগলশক্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিত সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছিলেন। তাঁর দক্ষিণ ভারতের পথে অগ্রসর হওয়ার এটা ছিল অন্যতম কারণ। তিনি যখন কুলাপত নামক স্থানে পৌঁছান, তখন ২০ ফেব্রুয়ারি ১৭০৭ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুসংবাদ পান। তখন দক্ষিণ ভারতে যাওয়ার চিন্তা ত্যাগ করে তিনি দিল্লি রওনা হন।

দিল্লিতে তখন মোগল সিংহাসনের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। এই লড়াইয়ে ঔরঙ্গজেবের ৬৪ বছর বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র মুয়জ্জম জয়ী হয় এবং 'বাহাদুরশাহ' নাম গ্রহণ করে মোগল সিংহাসনে আরোহণ করে। বাহাদুরশাহ গুরু গোবিন্দ-সিংহের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করতেন। বাহাদুরশাহ রাজপুত এবং মারাঠাদের বিরুদ্ধে গুরু গোবিন্দসিংহের সাহায্য চান, কিন্তু তিনি এই দুটি অনুরোধই প্রত্যাখ্যান করেন।

বন্দা বৈরাগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

গুরু গোবিন্দসিংহের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে নান্দেড় নামক স্থানে বন্দা বৈরাগীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। বন্দা বৈরাগী পূর্বে 'মাধোদাস' নামে পরিচিত ছিলেন। নান্দেড়ে আসার পূর্বেই তিনি বন্দা বৈরাগী সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়েছিলেন। তিনি তাঁকে পঞ্জাবে গিয়ে ধর্মরক্ষার জন্য শিখদের সঙ্ঘবদ্ধ করে মোগল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার নির্দেশ দেন। বন্দা বৈরাগী শিখ ও অন্যান্য হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ করে মোগল শাসনের বিরুদ্ধে এমন প্রচণ্ড সংগ্রাম করেন যে, সাতবছরের মধ্যেই প্রায় পঁচিশ হাজার বর্গমাইল এলাকাকে তিনি মোগল শাসন থেকে মুক্ত করে নেন। মোগল বাদশাহ বাহাদুরশাহের প্রচণ্ড শত্রুতার দরুন অবশেষে বন্দা বৈরাগী ও তাঁর অনুগামীদের আত্মবলিদানে সমাজে সম্পূর্ণ এক নতুন চেতনার সঞ্চার হয়। এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বন্দী বীর' কবিতাটি স্মরণীয়।

গুরু গোবিন্দসিংহের মৃত্যু

নান্দেড়ে গুরু গোবিন্দসিংহের প্রবচন শুনতে গুল খান (জামশেদ খান) ও আব্দুল্লা খান নামে দুজন পাঠান নিয়মিত আসত এবং ক্রমে তারা গুরুদেব ও অন্যান্যদের বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠে। একদিন গুরুদেব যখন বিশ্রাম করছেন, তখন দুই ভাই সেখানে আসে। আব্দুল্লা খান তাঁবুর বাইরে দাঁড়ায় এবং গুল খান তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করে অতর্কিতে গুরুদেবের ওপর ছুরিকাঘাত করে। গুরুদেব তৎক্ষণাৎ ছুরিকা বের করে নিজের তলোয়ার দিয়ে গুল খানের শিরশ্ছেদন করেন। সরহিন্দের সুবেদারই গুরু গোবিন্দসিংহকে হত্যা করার জন্য আততায়ীদের পাঠিয়েছিল। গুরুতর আহত গুরু গোবিন্দসিংহ কয়েকদিন পরেই স্বর্গলোকে যাত্রা করেন। তারিখটি ছিল সম্ভবত ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দের ১৮ অক্টোবর। কিন্তু এই তারিখ সম্বন্ধে মতান্তর আছে। মাত্র ৪২ বছর বয়সে তাঁর দেবতুল্য জীবনের অবসান ঘটে।

মৃত্যুর পূর্বেই গুরু গোবিন্দসিংহ ঘোষণা করে গিয়েছিলেন যে, অতঃপর কেউ শিখদের গুরুর পদে আসীন হবেন না—'গুরুগ্রন্থসাহেব'ই শিখদের গুরু হিসাবে গণ্য হবেন। এইভাবে দশম গুরু গোবিন্দসিংহই ছিলেন শিখদের মনুষ্যরূপী শেষ গুরু এবং তাঁর মৃত্যুর পর গুরু-পরম্পরার অবসান ঘটে।

প্রকৃত কর্মযোগীর মতো গুরু গোবিন্দসিংহ অতিশয় সক্রিয়, কিন্তু সর্বত্যাগী রাজর্ষির জীবনযাপন করেন। জগতের কোন কিছুর প্রতিই তাঁর আসক্তি ছিল না। ন্যায়ের জন্য তিনি তাঁর পিতা ও চার পুত্র-সহ সর্বস্ব উৎসর্গ করেন। লেখনী ও তরবারির সাহায্যে এবং খালসাপন্থ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি সমাজের মধ্যে যে মহাবিপ্লব সাধন করেন, তার দ্বারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহের মুক্তির পথও প্রশস্ত করে যান। এইভাবে যুগ যুগ ধরে তিনি তাঁর স্বদেশবাসীর হৃদয়-মন্দিরে চিরভাস্বর হয়ে বিরাজিত।

গুরু গোবিন্দসিংহের ৩০০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে বলেছিলেন: *"খালসার প্রতিষ্ঠাতা গুরু গোবিন্দসিংহ সত্যনিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও বিনম্রতার পথ প্রদর্শন করেছিলেন এবং অন্ধ ধার্মিক গোঁড়ামি, জাতপাতের ভেদাভেদ ও কুসংস্কারসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের এক নতুন জীবনে উজ্জীবিত করেছিলেন, যার দ্বারা তিনি তাদের ন্যায়ের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। আজ, সর্বকালের চেয়েও অধিক, আমাদের তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। উচ্চ আদর্শের প্রতি অন্তঃসারশূন্য মৌখিক সমর্থন জ্ঞাপনই যথেষ্ট নয়, আমাদের নিজেদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো দৃঢ় বিশ্বাস ও সাহস অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে।"* ❑

সূত্র

(১) 'অগ্নিগর্ভ পঞ্জাব'—কুল্লহল্লী সীতারামাইয়া সুদর্শন, স্বস্তিক প্রকাশন, ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬

(২) 'খালসা-সিরজনহার-গুরু গোবিন্দসিংহজী মহারাজ'—সরদার চিরঞ্জীব সিংহ, সঙ্গত প্রকাশন, ১৫ পত্রকার কলোনী, রতলাম-৪৫৭০০১, মধ্যপ্রদেশ

(৩) 'গুরু নানক সে গুরু গোবিন্দসিংহ'—ডঃ অরবিন্দ গোডবোলে, অর্চনা প্রকাশন, এইচ. আই. জি.-১৮, শিবাজী নগর, ভোপাল-৪৬২০১৬

(৪) Guru Gobind Singh 300th Birthday Souvenir, Guru Gobind Singh Tri-Centenary Birthday Celebration Committee, January 18 1967, Takht Harmondirji, Patna, Editor—Prof. Satboi Singh.

এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

নারী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে শ্রীমা সারদাদেবী

শ্যামলী মহাপাত্র



'নারী আন্দোলন' নতুন ব্যাপার নয়। গার্গী, মৈত্রেয়ী, মদালসা থেকে শুরু করে ইদানীং কালে শ্রীমা সারদাদেবী পর্যন্ত, এবং তার পরেও এই আন্দোলন ক্রিয়াশীল। অবশ্য প্রাচীনকালে এটি ছিল নিঃশব্দ আন্দোলন। এখন সোচ্চার। একথাই বিশ্লেষণ করেছেন 'পদ্মা-গঙ্গা' পত্রিকার সম্পাদিকা।

শ্রীমা সারদাদেবী কোন তথাকথিত নারীবাদী মহিলা বা 'ফেমিনিস্ট' ছিলেন না। দেড়শো বছর আগে এক গণ্ডগ্রামে অতি সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্মকথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু প্রশ্ন একটাই, ঐ কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগে যুক্তিহীন বিশ্বাস ও গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন পরিবেশে শিক্ষার ন্যূনতম আলোটুকু পর্যন্ত গায়ে না লাগিয়ে কি করে শ্রীশ্রীমা হয়ে উঠেছেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের আধুনিক নারীজাতির প্রধান আদর্শ ও পথপ্রদর্শক? ভাবতে অবাক লাগে, মহান এক ধর্মাবতারের সার্থক সহধর্মিণী-রূপে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে স্বচ্ছ মানবিক দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বলেছেন—যে-রীতি বা বিধান মনকে ছোট করে, গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে, তা কখনো ধর্ম হতে পারে না। জীবনের সাধনা ও জয়, প্রাণের অভ্যর্থনা, মানুষের উন্নত কর্মপ্রয়াস—এসবেই ছিল শ্রীশ্রীমায়ের সর্বাত্মক সম্মতি ও আশীর্বাদ।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে সেই যুগের অন্ধ কুসংস্কার, জাত-পাত, ছুঁতমার্গ, যুক্তিহীন প্রথানুগত্যের অনেক উর্ধ্বে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি এসবের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামী মনোভাব পোষণ করতেন। তাঁর নীরব বিপ্লব ছিল বিশেষ করে জাতপাতের বিরুদ্ধে। তাই নিজে ব্রাহ্মণঘরের বিধবা হয়েও কতবার অব্রাহ্মণের হাতে রান্না-করা অন্ন এবং জল তিনি খেয়েছেন! তাঁর মতে 'ব্রাহ্মণত্ব' মানুষের মনের একটি উচ্চতম অবস্থা, যা জন্মগতভাবে কেউ অর্জন করে না—গুণগত ও চরিত্রগত অর্থে মানুষের প্রাপ্য হয়। তাই অব্রাহ্মণ বহু ব্যক্তিও তাঁদের নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্বের গুণে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে ব্রাহ্মণের সম্মান পেতেন, যার দ্বারা তাঁর শুধু উদার মানসিকতাই নয়, সত্যের প্রতি নিষ্ঠা ও অত্যাধুনিক চিন্তাধারারও পরিচয় পাওয়া যায়। এবং সেইজন্যই শ্রীশ্রীমা এক বাগদি ভক্তের অঞ্জলি নিয়েছেন অনায়াসে, এমনকি এক বাগদি ভক্তকে দীক্ষা দিতেও দ্বিধা করেননি পরিবার ও সমাজের আপত্তিকে উপেক্ষা করে। তিনি উপেক্ষা করেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরেরও এক নির্দেশ। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে এক ভক্ত মহিলার আসা-যাওয়া নিয়ে ঠাকুর আপত্তি করেছিলেন। কারণ, ঐ মহিলার অতীত ছিল কলুষিত। কিন্তু মা ঠাকুরের ঐ আপত্তিকে মানতে পারেননি। তাঁর মতে, কোন মানুষ যদি তার অতীতকে ভুলে পিছনে ফেলে বর্তমানে নিজেকে সংশোধন করতে চায় তো তাকে দূরে ঠেলে দেওয়ার থেকে কাছে টেনে নেওয়াটাই শ্রেয়। এটি ছিল শ্রীশ্রীমায়ের নারীর সপক্ষে এক নিঃশব্দ আন্দোলন। পুরুষদের সপক্ষেও তাঁর একই মনোভাব ছিল। তাই একটি ডাকাত যখন মায়ের কাছে পূজার জন্য কলা নিয়ে এসেছিল, তিনি সবার আপত্তি উপেক্ষা করে সানন্দে সেটি গ্রহণ করেছিলেন।

শ্রীশ্রীমা বিশ্বাস করতেন, প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই জীবনরসের ধারা প্রবাহিত হওয়া দরকার—তা সে সংসারীই হোক বা সাধু-ব্রহ্মচারীই হোক। নইলে মন দুর্বল হয়ে পড়লে স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায় না। মানুষের শরীরকে শ্রীশ্রীমা ঈশ্বরের মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, শরীরকে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। তিনি ব্রহ্মচারীদের যেমন পাড়-দেওয়া কাপড় পরতে বলতেন, তেমনি নিজে বৈধব্যের পরও সরু লালপেড়ে শাড়ি এবং হাতে সোনার বালা পরতেন, যা সেযুগের পরিপ্রেক্ষিতে সত্যিই ছিল বৈপ্লবিক। এক অভাবনীয় আধুনিকতাও বটে।

শ্রীশ্রীমা জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই দেহকে কষ্ট দিয়ে বিধবাদের নিরম্বু

উপবাস বা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করাকে তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর মতে, যান্ত্রিকভাবে পালিত কোন বিধিনিয়মের দ্বারা সংযম রক্ষা করা যায় না। ওটা হলো সম্পূর্ণ মনের ব্যাপার। মনকে স্বচ্ছ ও সুন্দর রাখলেই দেহ ও মনকে সংযমী রাখা যায়। মায়ের ঐ চিন্তাধারা ও নির্দেশই সেসময়কার সংস্কারগ্রস্ত সমাজের ভয়ে ভীত মহিলাদের মনগুলিকে জাগিয়ে তুলত।

যেহেতু মানুষ সামাজিক জীব, তাই মানুষকে প্রথমে সমাজসচেতন হওয়ার কথাই বলে গেছেন শ্রীশ্রীমা। এবং প্রত্যেকটি মানুষের এই সমাজসচেতনতা শুরু হওয়া উচিত তাদের নিজ নিজ গৃহে। শ্রীশ্রীমা নিজে প্রকৃত অর্থে সংসারত্যাগী মনোভাবাপন্ন হলেও সাধারণ গৃহীদের মতো জীবনযাপন করতেন গার্হস্থ্যজীবনে তাদের সাবলীল করে তুলতে। জীবন থেকে সরে গিয়ে নয়, জীবনযুদ্ধের সব সমস্যাগুলি সাহস, শক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে সমাধান করার কথাই বলতেন তিনি।

শ্রীশ্রীমায়ের গার্হস্থ্যজীবনের সূত্রপাত কৈশোর থেকে স্বামীর কাছেই। "যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন"—এইভাবে সকল ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে যথোপযুক্ত আচরণ প্রয়োজন—একথা ঠাকুরের মতো শ্রীমাও বলতেন। তিনি বলতেন, কাজই লক্ষ্মী। নারীপুরুষ সবাই যদি স্ব-স্ব কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকে তো তাদের দেহ-মন ভাল থাকে। তিনি বলতেন, একটি পরিবার সচল ও শান্তিপূর্ণ থাকে যদি ঐ পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিই ত্যাগস্বীকার করে একে অন্যের পরিপূরক ও সহায়ক হয়। অর্থাৎ শুধু মেয়েরাই নির্বিবাদে সংসারের জন্য করে যাবে, আর ছেলেরা শুধু ভোগ করবে তা হয় না। এক্ষেত্রে দেখা যায়, মেয়েদের প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসা ও সহমর্মিতা।

শ্রীশ্রীমা সহজাত স্বভাবে খুবই লজ্জাশীলা ছিলেন। নিজেকে সবসময় আড়াল করেই রাখতেন। কিন্তু ঠাকুরের অসুখ যখন বাড়াবাড়ি হয়েছিল, তিনি সমস্ত সঙ্কোচ ও লজ্জা দূরে ঠেলে শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে এসে ঠাকুরের সেবার পূর্ণ দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিয়েছিলেন। স্বামীর সেবার মতো কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে বিরুদ্ধ পরিস্থিতিকেও তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করে নিতে পারতেন। সাংসারিক নানান ঝড়-ঝাপটায় কিভাবে স্বামী-স্ত্রী এবং সংসারের প্রতিটি সদস্যকে কর্তব্যে অনড় থেকে সংসারের সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য বজায় রেখে চলতে হয়, সে-কৌশলও শিখিয়েছিলেন শ্রীশ্রীমা।

শ্রীশ্রীমা কোন লৌকিক শিক্ষালাভের সুযোগ যদিও তেমন পাননি, তবু স্ত্রীশিক্ষা ও নারীপ্রগতির ব্যাপারে সর্বদাই উদার, উদ্যোগী ও আধুনিক ছিলেন। অশিক্ষিত, কুসংস্কারগ্রস্ত, নিগৃহীত মেয়েদের করুণ আর্তনাদ তাঁকে অহরহ বিহ্বল করত। তাই তিনি চাইতেন মেয়েরা লেখাপড়া শিখে সাবলম্বী হোক। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে নিজেদের পায়ে দাঁড়াক—অন্যের করুণা ভিক্ষা করে নয়। স্ত্রীশিক্ষা প্রয়াসে ছিল তাঁর পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি। তিনি সানন্দে ভগিনী নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেছিলেন। নিবেদিতার মতো তাঁর বিদ্যালয়ের সঙ্গেও শ্রীশ্রীমায়ের নাড়ির সম্পর্ক ছিল। নিবেদিতার কর্মশক্তি, উৎসাহ ও নব নব প্রয়াসের যেমন তিনি প্রশংসা ও সমর্থন করতেন, তেমনি নিবেদিতার বিদ্যালয়ে শিক্ষাব্রতী মেয়েদের দেখেও তিনি খুব আনন্দিত হতেন। মাঝেমধ্যেই সেখানে গিয়ে তিনি মেয়েদের উৎসাহিত করতেন। অনেক মূল্যবান কথা তাদের বলতেন। তিনি মেয়েদের বলতেন, যখন রাস্তা দিয়ে যাবে তখন চারিদিক খুব ভালভাবে দেখেবুঝে নেবে। আর যখন কোথাও থাকবে সেখানকার মানুষ-জনকেও নিঃশব্দে ভালভাবে দেখেবুঝে নেবে।

মেয়েদের বিয়ে না হওয়া নিয়ে তাঁর কোন চিন্তা ছিল না। তিনি বলতেন, বিয়ে না হয় তো কি হয়েছে! নিবেদিতার স্কুলে পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে, বেশ থাকবে। তিনি নিজের ভাইঝিদেরও পড়াশোনা শিখিয়েছেন। মেয়েদের পড়াশোনার সঙ্গে সেলাই ও বিভিন্ন কাজে তিনি উৎসাহ যোগাতেন। বলতেন, শ্বশুর-বাড়ি গেলে মেয়েদের ঐসব গুণগুলি শ্বশুরবাড়ি ও সেখানকার পাড়া-প্রতিবেশীদের কাজে লাগবে। মেয়েদের কদর বাড়বে।

নিজের জন্মস্থান জয়রামবাটী যাওয়ার পথে কোয়ালপাড়া ও আশপাশের গ্রামের মেয়েদের শিক্ষা-প্রদানের জন্য শ্রীশ্রীমা উৎসাহিত করতেন। তাঁরই উৎসাহে গৌরী-মার সারদেশ্বরী আশ্রমে একটি বুদ্ধিদীপ্ত সপ্রতিভ বালিকার ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কারণ, তিনি বুঝেছিলেন, আধুনিক সমাজের সঙ্গে পা ফেলে চলতে ও নেতৃত্ব দিতে ইংরেজি শেখা প্রয়োজন।

শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে নয়, উপযুক্ত ক্ষেত্রে মেয়েদের ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাসগ্রহণ, শাস্ত্রপাঠ এবং পূজার্চনারও পূর্ণ অধিকার আছে বলে শ্রীশ্রীমা স্বীকার করতেন। তাই

বিভিন্ন আশ্রমে ঠাকুরের পূজার্চনার দায়িত্ব তিনি মেয়েদেরই দিয়েছিলেন। গৌরী-মার বিদ্যাবুদ্ধি, বাগ্মিতা ও তেজস্বিতার ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলতেন, কজন পুরুষ আছে যে গৌরী-মার মতো হতে পারে! তিনি মেয়েদের গৌরী-মা বা নিবেদিতার আদর্শ নিয়েই বড় হতে বলতেন।

সেযুগে ছেলেমেয়েদের বাল্যবিবাহ কখনো মেনে নিতে পারেননি শ্রীশ্রীমা। তিনি মনে করতেন, মেয়েদের বাল্যবিবাহই তাদের শিক্ষাদীক্ষা এবং সকলপ্রকার উন্নতির অন্তরায়। তাই কোন ছেলে বা মেয়ের বাল্যবিবাহের কথা শুনলেই তিনি কঠোর মন্তব্য করে বলতেন, বাচ্ছাগুলোর বিয়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে শত্রুতা করা হচ্ছে। তারা যে কত কষ্ট পাবে সেদিকে কারো খেয়াল নেই। তিনি তাঁর উদার ও যুক্তিনিষ্ঠ বিচারবুদ্ধিতে কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি এই অনাবশ্যক সামাজিক অনুশাসনকে। মেয়েদের প্রতি আন্তরিক স্নেহ-ভালবাসা, সহমর্মিতা ও সমাজের প্রতি গভীর দায়িত্ববোধের পরিচয়ই বহন করে মায়ের ঐ মনোভাব।

শ্রীশ্রীমা শুচিবাইগ্রস্ততাকে সমর্থন করতেন না, যেমন সমর্থন করতেন না কোন ব্রাহ্মণের অমর্যাদার সঙ্গে উপবীত ধারণের ব্যাপারটি। বরং তিনি একবার তাঁর এক কায়স্থ ভক্তের কাছ থেকে মর্যাদা সহকারে উপবীত রক্ষার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাকে উপবীত ধারণের অনুমতি দিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীমা বিশ্বাস করতেন, সমাজের প্রতিটি মানুষকে তার প্রাপ্য সম্মান ও পাওনা থেকে কখনো বঞ্চিত করতে নেই। সেসময়কার সমাজে যুগীদের স্থান ছিল খুব নিচে। শ্রীশ্রীমা কিন্তু তাদের কখনো হেয় করতেন না, এমনকি নির্দ্বিধায় দীক্ষা পর্যন্ত তাদের দিতেন। তিনি সন্ন্যাসীদেরও সমাজের জন্য কাজ করতে বলতেন। তাঁর মতে, সন্ন্যাসী হলেও সবসময় যে তাদের জপধ্যানে মন থাকে—এমন নয়, বরং মন আলগা রাখলে মনে অহঙ্কার আসে।

শ্রীশ্রীমা অসংযত জীবন অর্থাৎ বহুসন্তানের বিরোধী ছিলেন। এব্যাপারে পাশ্চাত্যের রীতি অনুসারে তিনি অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী সীমিত সন্তানের কথা বলতেন। শ্রীশ্রীমায়ের সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পচেতনার কথা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়।

সেইসময় সমুদ্রযাত্রা ছিল দেশাচারবিরোধী। কিন্তু শ্রীশ্রীমা স্বয়ং স্বামীজীকে সমুদ্রযাত্রায় অনুমতি দিয়ে শিকাগোতে পাঠিয়েছিলেন। যদিও তিনি যথেষ্ট স্বদেশপ্রেমী ছিলেন এবং ইংরেজদের অত্যাচার ও দেশশাসনের বিরুদ্ধে সবসময়ই প্রতিবাদী ছিলেন, তবু তাদের প্রতিও ছিল তাঁর অপার স্নেহ-ভালবাসা। নিবেদিতা-সহ বহু বিদেশিনীকে তিনি সহজেই আপন করে তাঁর আশীর্বাদ ও ভালবাসায় ধন্য করেছিলেন। তাঁদের সাথে একসঙ্গে থাকা-খাওয়া, বেড়াতে যাওয়া, গান শোনা ও পূজা-পার্বণাদিও করতেন। তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা ও আধুনিকতার প্রতি ছিল তাঁর পূর্ণ সমর্থন, সহযোগিতা ও আস্থা।

ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, শ্রীশ্রীমায়ের অধ্যাত্ম-মহিমার মতোই তাঁর সম্ভ্রান্ত সৌজন্যের সৌন্দর্য ও উদার মুক্ত মানসিকতা তাঁকে বিশেষ পর্যায়ে উপনীত করেছে। এবং এই সূত্র ধরে নিঃসংশয়ে বলা যায়, আধুনিক নারীর উত্তরণ ঘটেছিল শ্রীশ্রীমায়ের মধ্য দিয়েই। আজকের তথাকথিত আধুনিক মহিলাদের মতো শ্রীশ্রীমা নিজেকে কখনো জাহির করতে চাননি। নীরব প্রার্থনার মতো তাঁর অসাধারণ জীবনাচরণ একদিকে যেমন সার্বজনীন ও বাস্তবসম্পন্ন ছিল, তেমনি অন্যদিকে তিনি সমাজে নারীর গুরুত্ব, তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার সম্বন্ধে সমাজকে সচেতন করেছেন। নারীর শিক্ষা ও উপার্জনের প্রয়োজনীয়তা এবং সর্বোপরি নারী যে কোন অবলা প্রাণী নয়, পুরুষের মতোই পূর্ণমাত্রায় সে মানুষ—এই সত্যটি শ্রীশ্রীমা বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন তাঁর প্রতিটি শিক্ষা, কর্মধারা ও মহৎ যুক্তিনিষ্ঠার মাধ্যমে।

আজকের নারীর সমানাধিকারের জন্য আন্দোলন, অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং এক তরফাভাবে পারিবারিক দায়িত্বপালনের কঠোরতার বিরুদ্ধে যে-আন্দোলন—এসবকিছুর পিছনে রয়েছে শ্রীশ্রীমায়ের যুক্তিনিষ্ঠ বিচারবুদ্ধি, উদার বাণী, প্রতিবাদী কর্মপদ্ধতি ও মুক্ত আধুনিক চিন্তাধারা। অর্থাৎ এককথায় বলা যায়, প্রবহমানকালে নারী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতি, ভাবধারা ও জীবনাদর্শ বহতা নদীর মতোই গতিশীল, চিরভাস্বর ও জাজ্বল্যমান। ❑

এই প্রবন্ধটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

'উদ্বোধন'

আশ্বিন ১৩০৯
সেপ্টেম্বর ১৯০২

ভারতীয় নারীর উন্নতি

(স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন)

ভারতের নারীগণের কি উপায়ে উন্নতি হইতে পারে, এই বিষয় লইয়া স্বামীজিকে প্রশ্ন করা হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন—

নারীজাতির আদর্শ সম্বন্ধে আর্য্য ও সেমিটিকদের মতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সেমিটিক জাতি স্ত্রীলোককে উপাসনার বিঘ্ন জ্ঞান করে ও তাহার কোনপ্রকার ধর্ম্মকার্য্য করিবার অধিকার নাই, কিন্তু আর্য্যগণের মতে পত্নী ব্যতীত কোন ধর্ম্মকার্য্যই হইতে পারে না।

প্র। তবে কি হিন্দুধর্ম্ম আর্য্যদিগের ধর্ম্ম নহে?

উ। আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম অধিক পরিমাণে পৌরাণিক অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্মের পর উহার উৎপত্তি। দয়ানন্দ স্বামী দেখাইয়া দিয়াছেন, গার্হপত্য অগ্নিতে হোমরূপ বৈদিক কর্ম্মে পত্নীর সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন, কিন্তু আজকাল সে শালগ্রাম শিলা কিম্বা গৃহদেবতাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারে না, কারণ, এইসকল পূজা পৌরাণিক ধর্ম্মসঙ্গত।

প্র। তাহা হইলে আপনি আজকাল হিন্দুগণের মধ্যে নরনারীর এত প্রভেদ, একমাত্র বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে হইয়াছে বলেন?

উ। যেখানে এই প্রভেদ বিশেষ বর্ত্তমান, সেখানে নিশ্চয়ই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব স্বীকার করিতে হইবে বৈকি! কিন্তু হিন্দু নরনারীর মধ্যে যে এই প্রভেদের কথা বলিতেছ, বাস্তবিক তাহা আছে কি? ইউরোপীয়েরা আমাদের নরনারীর মধ্যে অধিকারের বিশেষ পার্থক্য আছে বলিয়া হিন্দুসমাজের সমালোচনা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদের মতে পূর্ণ সায় দিতে পারি না। শত শত শতাব্দী ধরিয়া নানা অবস্থাচক্রের মধ্যে পড়িয়া আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগকে এইরূপে রক্ষা করার আবশ্যকতা হইয়াছে। এইটি বুঝিলেই আমাদের এইসকল প্রথার রহস্য বুঝা যায়। তাহাদের কোন বিষয়ে হীনতার দরুন এসকল প্রথার উৎপত্তি হয় নাই।

প্র। স্বামীজি, আপনি কি তবে হিন্দুসমাজের রমণীগণের বর্ত্তমান অবস্থায়ই সন্তুষ্ট?

উঃ। কখনই নহে। তবে আমাদের তাহাদিগকে কেবল শিক্ষা দিবার মাত্র অধিকার আছে। তারপর তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই পূরণ করিয়া লইবে। শিক্ষা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আমাদের হাত দেওয়ার অধিকার নাই। জগতের অন্যান্য স্থানের নারীগণ যেমন স্বচেষ্টায় নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিতে সক্ষম, ভারতীয় নারীগণেরও সে-শক্তি আছে। আমাদের আবশ্যক—কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া।

প্র। আপনি বলিলেন, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে হিন্দু স্ত্রীলোকগণের অবনতি হইয়াছে। কিরূপে হইয়াছে বুঝাইয়া দিবেন কি?

উঃ। বাস্তবিক বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে কিছু অনিষ্ট হয় নাই, বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির পর হইতেই অনিষ্টের সূচনা হইতে লাগিল। সকল সম্প্রদায়েরই কোন বিশেষ গুণ থাকে, যাহা দ্বারা তাহার প্রথমে খুব উন্নতি সাধিত হয়। অবনতির সময় আবার তাহাই উহার প্রধান দোষে পরিণত হয়। ভগবান বুদ্ধ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত শক্তিবলে সঙ্ঘ (বৌদ্ধসমাজ) গঠন করিয়া সমুদয় জগতে তাঁহার ধর্ম্ম বিস্তার করিলেন। কিন্তু সেই সম্প্রদায় সন্ন্যাসিসম্প্রদায়-মাত্র। তাঁহার ধর্ম্মও সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ছিল। এইজন্য ক্রমশঃ সন্ন্যাসীর বেশ পর্য্যন্ত সম্মানিত হইতে লাগিল। তিনি আবার সর্ব্বপ্রথম মঠপ্রথার প্রচলন করেন। তাহা হইতেই স্ত্রীলোককে পুরুষের নিম্নাসন দিতে হইল। কারণ, বড় বড় মঠস্বামিনীরা কোন কোন বিশেষ মঠাধ্যক্ষের উপদেশ ও পরামর্শ না লইয়া কোন গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। আপাততঃ ইহাতে অতি মনোরম ফল ফলিল। বৌদ্ধধর্ম্ম বেশ সুপ্রণালীবদ্ধ হইল, কিন্তু ভবিষ্যতে ইহার ফল বিষময় হইল।

প্র। কিন্তু বেদে ত সন্ন্যাসের কথা আছে!

উ। অবশ্যই আছে, কিন্তু তথায় এসম্বন্ধে নরনারীর কোন প্রভেদ করা হয় নাই। সকলেই সন্ন্যাস লইতে পারে। যাজ্ঞবল্ক্যকে জনকরাজার সভায় গার্গী বাচক্নবী নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী অনেক কঠিন কঠিন প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি স্ত্রীলোক বলিয়া তাঁহার যে প্রশ্ন করিতে অধিকার নাই, এরূপ কোন কথা উত্থাপিতই হয় নাই। আর প্রাচীন আরণ্য পরিষদসমূহে বালক-বালিকার সমান অধিকার ছিল। সংস্কৃত নাটকগুলি পাঠ কর, শকুন্তলার উপাখ্যান পাঠ কর। টেনিসনের 'প্রিন্সেস' আমাদিগকে তাহা হইতে অধিক কি শিখাইতে পারে?...

প্র। তবে স্বামীজি, হিন্দুনারীগণের অবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে কোন সমস্যা আছে কি?

উ। অবশ্য, আমাদের নারীগণের উন্নতি সম্বন্ধীয় অনেক গুরুতর সমস্যা আছে বৈকি। কিন্তু সকলই শিক্ষার অদ্ভুত শক্তিতে সাধিত হইতে পারে। তবে আমরা যথার্থ শিক্ষা কাহাকে বলে, এখনও বুঝিতে পারি নাই।

প্র। আপনি শিক্ষার 'লক্ষণ' কি করেন?

উ। স্বামীজি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমি কোন বিষয়ের কখন 'লক্ষণ' করি না। তবে বলা যাইতে পারে, কতকগুলি শব্দ মুখস্থ করার নাম শিক্ষা নহে, মনোবৃত্তিগুলির বিকাশকে শিক্ষা বলা যাইতে পারে। অথবা যেভাবে মানুষকে গঠন করিলে তাহার সৎ বিষয়ে—প্রকৃত বিষয়ে ইচ্ছা হয় এবং সেই ইচ্ছা কার্য্যেও পরিণত করিতে পারে, তাহাকেই শিক্ষা বলা যায়। এরূপ শিক্ষা পাইলে ভারতে আবার সেই প্রাচীন সঙ্গমিত্তা [সঙ্ঘমিত্রা?], লীলা, অহল্যাবাই, মীরাবাই প্রভৃতি নারীগণের ন্যায় নির্ভীক বীর নারীর অভ্যুদয় হইবে।...

প্র। তবে, স্বামীজি, আপনি এদেশীয় নারীগণকে কি বলিতে চান?

উ। পুরুষকেও আমি যাহা বলি, নারীগণকেও তাহাই বলিতে চাই। বলিতে চাই, নারীগণ, তোমরা ভারতের উপর বিশ্বাসী হও, ভারতীয় ধর্ম্মে বিশ্বাসী হও, বীর হও, নৈরাশ্য একেবারে ত্যাগ কর,—নিজেদের হিন্দু ভাবিতে লজ্জিত হইও না, আর ইহাও জানিয়া রাখ, আমাদিগকে অপর জাতির নিকট হইতে কিছু শিক্ষা করিতে হইবে বটে, কিন্তু অপর জাতিকে আমাদের যথেষ্ট দিবার আছে ও দিতে হইবে।

সঙ্কলন ঃ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দের কবিতার অন্য দিগন্ত

অশোক অধিকারী

স্বামী বিবেকানন্দের কবিসত্তা সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা-গবেষণা হয়েছে, হচ্ছে। সংস্কৃত সাহিত্যে সত্যদ্রষ্টা ঋষিকে 'কবি' বলা হয়। তাঁর সেই সত্যদর্শনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন নিবন্ধকার নিজের চিন্তা-ভাবনার আলোকে।

আধ্যাত্মিক তন্ময়তা যখন দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয়, তখনি জন্ম নেয় অবিভাজ্য আনন্দ। সেই অন্তর্নিহিত আনন্দের দ্যুতিকে মানুষ কিছুতেই নিজের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারে না। তার অবশ্যম্ভাবী অভিব্যক্তি ঘটে কথাবার্তা, সঙ্গীত, কবিতা প্রভৃতির মাধ্যমে। স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন ও অধ্যাত্মভাবনা এইরূপেই অভিব্যক্ত হয়েছে। মানুষের সেবা-চিন্তায় তাঁর জীবন কেটেছে। সাহিত্য ঐ সেবাতত্ত্বকে যেমন গভীরভাবে প্রকাশ করেছে, তেমনি কবিতা যুক্ত করেছে আনন্দ। তত্ত্ব ও আনন্দের সমীকরণ হয়েছে তাঁর কবিতায়।

স্বামীজীর প্রথম কবিতা 'The Song of the Sannyasin'। ১৮৯৫ সালে তিনি এটি লেখেন 'সন্ন্যাসীর গীতি' নামে, এর অনুবাদ করেছেন স্বামী শুদ্ধানন্দ। কবিতাটির একস্থানে তিনি লিখছেন : "যাক অন্ধকার, যাক সেই তমঃ/ আলেয়ার মতো বুদ্ধির বিভ্রম/ ঘটায়ে আঁধার হইতে আঁধারে/ লয়ে যায় এই ভ্রান্ত জীবাত্মারে।"

আলোকভাবনা আমাদের শাশ্বত। ভাল-মন্দের পাহাড় ডিঙিয়ে সূর্যোদয়ের দিকেই আমাদের হেঁটে যাওয়া। 'সন্ন্যাসী' শব্দে কারো কারো উন্নাসিকতা আছে, বিবেকানন্দ তাঁর কবিতার মধ্যে তার বিবাদ ঘুচিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন—'ট্রায়াল অ্যাণ্ড এরর' পদ্ধতি অবলম্বন করে মানুষকে চিরায়ত সত্যের অভিমুখে দাঁড়াতেই হবে, যেখানে 'সমস্তই মানবতার নামে' এই সম্পদ সত্য, এক ও অদ্বিতীয়। অন্যত্র তিনি লিখছেন : "স্বাধীন উন্মুক্ত যাও স্থানে স্থানে/ অজ্ঞান হইতে উদ্ধারো অজ্ঞানে/মায়া আবরণে ঘোর অন্ধকারে/ নিয়তই যারা যন্ত্রণায় মরে।" ভাববাদী আঙ্গিকে মানুষের মধ্যকার সত্য-ভাবনা যেন সান্ধ্যকালীন আলোছায়ায় ঢাকা থাকে। সেখানে সমস্ত কিছুকে অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে, পূর্বকৃত কর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে দেখিয়ে মানুষকে মায়ার ছলনায় ডুবিয়ে দেওয়া হয়। নিমজ্জিত অবস্থায় মানুষ নিজের জীবনের সার্থকতায় সন্দিহান হয়ে পড়ে। বিবেকানন্দ সেই ভাবঘোর থেকে নির্মুক্ত হয়ে মানুষের সর্বকালীন অন্ধকারের আসল রহস্যকে তুলে ধরেছেন। নিজের স্বাধীন সত্তা, উন্মুক্ত চিন্তা, নিজের চেতনা বিকাশের মধ্য দিয়েই অজ্ঞানকে দূর করার কথা বলেছেন প্রাসঙ্গিকভাবে। মূঢ়, ম্লান মুখ উন্নতির অন্তরায় ও সেই অন্তরায় অবসানের অধ্যায় সূচিত হয়েছে এই ব্যাকরণে।

'Kali the Mother' (কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদে 'মৃত্যুরূপা মাতা') কবিতায় স্বামীজী লিখছেন : "লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হতে/ মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে।" ছিন্ন মেঘের ফাঁকে যেমন সূর্যের স্পর্ধা থাকে, বন্দিশালার ভাঙনের মধ্যেও থাকে সেই অসীম শক্তি স্ফুরণের অহঙ্কার। অশুভ স্পর্ধার বাতাবরণে দেশ যখন আক্রান্ত, তখনি লক্ষ উন্মাদের প্রকাশ হয়ে ওঠা জরুরি। সেই দামাল ঝড়ের মাতনে বিপুল অবিচার আর লুণ্ঠনের অবাধ অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। পথের নেশায় আসে পরিবর্তন। কবিতায় মৃত্যুরূপা মায়ের আঙ্গিকে প্রলয়ের আহ্বান করেছেন সন্ন্যাসি-কবি—দৈন্য আর দুঃখের সাযুজ্যে যার নবজন্ম হয় সাহস ও বীর্যের ক্যানভাসে।

'The Cup' ('পানপাত্র') কবিতার আঙ্গিক ও বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। শব্দচয়ন, সংক্ষিপ্ত পঙ্ক্তি ব্যবহার ও বিন্যাসের গভীরতায় কোন খাদ নেই। সৃষ্টির উন্মেষ থেকে স্বরূপসন্ধানের দ্যোতনায় সমৃদ্ধ এই কবিতা। পানপাত্রে সুরার পরিবর্ত হিসাবে কবি বিবেকানন্দ নিয়েছেন জীবনের প্রাণরস—বাসনা, বেদনার ভ্রান্তি দূর করে যা আমাদের যুগান্তের চিন্তায় অভিষিক্ত করবে। তাই তিনি লেখেন : "লও এই পানপাত্র/ বুঝিতে বলিনি আমি, কি অর্থ ইহার/ শুধু চোখ বুজে দেখ স্বরূপ আমার।" (অনুবাদ—প্রণবরঞ্জন ঘোষ)

১৮৯৯ সালে নিউ ইয়র্কে থাকাকালীন বিবেকানন্দ 'Peace' কবিতাটি লেখেন। ব্রহ্মচারী পূর্ণচৈতন্যের হাতে যার অনুবাদ—'শান্তি'। 'শান্তি' চিন্তন প্রজাতির শাশ্বত অভিপ্রেত। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে যেমন সমতল মধ্যাংশ আমাদের দৃষ্টির দূর প্রদেশে অবস্থান করে, হিংসা আর

দ্বন্দ্বের দূরতম প্রদেশে শান্তির অবস্থানও তেমনি। তবুও সমস্তই শান্তিস্থাপনের নিমিত্ত। বিবেকানন্দ একে জীবনের লক্ষ্য, জাতির লক্ষ্য ও একমাত্র আশ্রয় বলে লালকালির দাগ দিয়েছেন। তাই তিনি লিখেছেন ঃ "এরি লাগি ঝরে আঁখিজল/ সারা বিশ্বে হাসি ছড়াবারে/ এ যে শান্তি লক্ষ্য জীবনের/ একমাত্র আশ্রয় নিশ্চয়।"

এক ও 'একম্'-এর ধারণায় যখন লুকিয়ে থাকে স্বৈরতান্ত্রিক পাটীগণিত, শশাঙ্কের হিমানীকে অস্বীকার করে সূর্যের তেজোরশ্মি যখন নিজের আমিত্বকে এক ও অদ্বিতীয় বলে অট্টহাস্য করে—তখনি যেন প্রলয়ের প্রয়োজন হয়। তাই 'প্রলয়' কবিতায় স্বামীজী লেখেন ঃ "অস্ফুট মন—আকাশে, জগতসংসার ভাসে/ ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর।"

বিবেকানন্দ যখন কাশ্মীরে অবস্থান করছেন তখন লিখেছিলেন 'To the Fourth of July'। ব্রহ্মচারী পূর্ণচৈতন্য তার অনুবাদ করেছেন 'মুক্তি' নামে। রচনার প্রেক্ষাপট আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ। প্রারম্ভিক পঙ্‌ক্তিতে সচেতন- ভাবে কবি সে-যুদ্ধের প্রতি নিজের শ্রদ্ধাকে লুকিয়ে রাখেননি। তাই তিনি লেখেন ঃ "ঐ দেখ মিলাইয়া যায় কালো মেঘপুঞ্জ যত/ রাত্রির আঁধারে আরো ঘন করি ধরণীর 'পরে/ তাহারা থমকি ছিল, অবসন্ন বিষাদ কালিমা।" পাখির তান, ফুলদলের উন্নত ললাট, শিশিরের পদ্মমায়ায় অভিষিক্ত করে এই স্বাধীনতাকে। স্বাধীনতাকে দূরসঞ্চারী আলো বলে অভিহিত করেছেন কবি। আমেরিকার এই স্বাধীনতা-সূর্য বিশ্বজোড়া বন্ধনের অন্ধকারকে আলোয় উদ্ভাসিত করবে—এটি কবির সাধারণ নির্বাচন। তিনি লেখেন ঃ "তোমারি লাগিয়া আজ অন্তরের স্বাগত আহ্বান/ ওগো সূর্য, আজ তুমি ছড়াইছ মুক্তি দিকে দিকে।" ইঙ্গিতধর্মী এই কবিতায় কবি অনেকটাই ভাবমুক্ত এবং ভারমুক্ত। নিজের সাধনা, কর্ম, পূজা, প্রেম ও আত্মবলিদানের ফল্গুধারা আত্মপ্রকাশ করে।

১৮৯৫ সাল। বসন্তকাল। বিবেকানন্দ তখন নিউ ইয়র্কে। কেন পৃথিবীতে আসা, কেন যাওয়া—এই দ্বিমত-বৈকুল্যে আর তিনি সন্দিহান নন। লিখলেন 'My Play is Done'। প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর অনুবাদ করলেন 'খেলা মোর হলো শেষ' নামে। কবিতার নামকরণে, অবসন্ন হৃদয়ের মধ্য গগনে কবি যেমন উপসংহারের হালকা ওড়না উড়িয়েছেন, বিবেকানন্দ তেমন পৃথিবী-নিষ্কষিত অমৃতের সুধাপাত্র নিয়ে নির্মাল্য বিতরণের পূজারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাঁর কথায় এ তাই 'অন্তহীন প্রহসন' অথবা 'স্বল্পস্থায়ী দৃশ্যান্তর'। 'কালের তরঙ্গে' ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বুদ্‌বুদের আত্মজ স্ফুটন জীবনের 'জোয়ার-ভাঁটায়' গড়িয়ে যায় উৎকেন্দ্রিকতার দিকে। তবু সেই অভীষ্ট যেন অন্তরালে হাস্য করে। তবুও অতৃপ্ত থেকেই অনন্তের দিকে মহামানবের যাত্রা। তাও মানুষের শেষ আশায় আলোকবর্তি প্রভা বুলিয়ে দেওয়ার জন্যেই যেন তাঁর মর্তে আসা। তিনি বলেন ঃ "খেলা মোর হলো আজি শেষ/ শৃঙ্খল ভাঙিয়া দাও।" অথবা অন্যত্র বলেন ঃ "জীবনের শেষপ্রান্তে যবে/ বিলম্বে লভিয়া জ্ঞান/ চক্রছাড়ি যাই মোরা চলি।"

১৯০০ সালে আরো একটি কবিতার সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর—যেটি 'A Benediction' নামে তিনি লিখেছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। 'আশীর্বাদ' নাম দিয়ে এর অনুবাদ করেন প্রণবরঞ্জন ঘোষ। যে-নিবেদিতার মধ্যে বিবেকানন্দ শুধুমাত্র সুকোমল নারীহৃদয়ের সন্ধানই পাননি, পেয়েছিলেন ভারত-আত্মার অস্তিত্বের সন্ধান। সার্থক সেবা নিবেদিতাকে মানবী থেকে দেবত্বে পৌঁছে দিয়েছিল। সমর্পণের দীপাধারে ঐশ্বর্যের সলতে হয়ে জ্বলতে থাকেন তিনি। মাত্র আট লাইনের ছোট ছোট শব্দ ও স্পন্দনের ঘনঘোর আবরণ রয়েছে কবিতায়। একই সঙ্গে "বীরের সঙ্কল্প আর মায়ের হৃদয়" বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে উপহার দিয়েছিলেন ঃ "ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানের তরে/ তুমি হও বন্ধু, দাসী, গুরু একাধারে।"

নিবন্ধে আলোচিত কবিতাগুলিতে সনাতন ধর্ম সম্পর্কিত উদ্দেশ্য ও সেই সম্পর্কে সংযুক্ত বিষয়গুলিই বারবার ঘুরেফিরে এলেও কোথাও অন্ত্যমিল, মধ্যমিল বা নিছক গদ্যরীতিতে তিনি উতরে দিয়েছেন কবিতাগুলিকে। শব্দ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে এমন কিছু শব্দ এসেছে, যেগুলির চল খুব বেশি নেই। যেমন 'ত্যজহ', 'ভুঞ্জি', 'স্তাব্য', 'আবরিছে' ইত্যাদি শব্দগুলির সাম্প্রতিক ব্যবহার খুবই কম। তবুও বর্তমান নিবন্ধ যেহেতু তাঁর কবিতার নিবিড় পাঠ নয়, যেহেতু সেখানে তাঁর রচনার অন্য এক দিগন্তের ক্ষণিক দ্বারোন্মোচন, 'জলে-থলে' চেষ্টার অক্ষমতাকেই কালি-কলমের মহনীয়তায় ফুটিয়ে তোলা, তবুও অস্বীকার করার উপায় নেই—আধ্যাত্মিক তন্ময়তার প্রয়োগবাদী অভিনিবেশ ব্যাপ্তিলাভ করেছে তাঁর কবিতায়।

আধুনিকতার বিচারে বিচারকগণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে মেনে নিয়েও বলা যায়—তাঁর কবিতা, ভাবনা, আঙ্গিক, উপাদান সমস্তই সমসাময়িক। সেখানে সমালোচনার রাস্তা সর্বদাই প্রসারিত। আলোচিত হোক তাঁর কবিসত্তা, কাব্যসত্তা। আরো বেশি বেশি রীতিপদ্ধতির বিশ্লেষণ করে আধ্যাত্মিক কবির 'না বলা বাণী' ধ্বনিত হোক দিকে দিকে। ❑

"এখন ডি. গুপ্ত"

শিবতোষ বাগচী

শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন উক্তির মধ্যে যে গূঢ় অর্থ রয়েছে, তা সহজে বোঝা যায় না। সেগুলির মধ্যে একটি বিশেষ উক্তি চয়ন করে 'এখন ডি. গুপ্ত'-র তাৎপর্য সহজ ও অনাড়ম্বর ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন উচ্চ শিক্ষাজগতের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত শিবতোষ বাগচী।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন ঃ "কর্মযোগ বড় কঠিন। শাস্ত্রে যে কর্ম করতে বলেছে, কলিকালে করা বড় কঠিন। অন্নগত প্রাণ। বেশি কর্ম চলে না। জ্বর হলে কবিরাজি চিকিৎসা করতে গেলে এদিকে রোগীর হয়ে যায়। বেশি দেরি সয় না। এখন ডি. গুপ্ত। কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নামগুণগান আর প্রার্থনা। ভক্তিযোগই যুগধর্ম।"[১]

প্রসঙ্গত, ডি. গুপ্তের 'ফিবার মিকশ্চার' তখন বাজারে খুব চলত। সেকালে দ্বারকানাথ গুপ্ত (১৮৩৮—১৯।৬। ১৮৮২) 'ডি. গুপ্ত' নামে খ্যাত ছিলেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় স্নাতক হয়ে তিনি কিছুকাল সরকারি চাকরি করার পর চিকিৎসাবিদ্যার গবেষণায় রত হন। তাঁর আবিষ্কৃত বহু পেটেন্ট ঔষধের মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রতিষেধক 'অ্যান্টি-পিরিয়ডিক মিক্সচার' বিখ্যাত। ভারতে ও বিদেশে এই মিক্সচারের বহুল প্রচারের ফলে তিনি খ্যাতি ও প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের চিকিৎসক ছিলেন। ঠাকুরবাড়ির সংলগ্ন জমিতে তাঁর ঔষধের কারখানা ছিল।[২]

ফিরে আসা যাক শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়। জ্ঞানযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন ঃ "বিচারপথে, জ্ঞানযোগের পথে তাঁকে পাওয়া যায়। কিন্তু এ-পথ বড় কঠিন। আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই; আমার রোগ নাই, শোক নাই, অশান্তি নাই; আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আমি সুখ-দুঃখের অতীত, আমি ইন্দ্রিয়ের বশ নই—এসব কথা মুখে বলা খুব সোজা। কাজে করা, ধারণা হওয়া বড় কঠিন।"[৩]

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান-মার্গের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। তাসত্ত্বেও কেন তিনি ভক্তিযোগকে অন্যান্য যোগের তুলনায় সহজসাধ্য এবং অবশেষে 'যুগধর্ম' বলেছেন, সেকথা বোঝা প্রয়োজন—আমাদের নিজেদের স্বার্থেই। যুগপুরুষ বারবার ঈশ্বর-লাভকেই মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে নির্দেশ করেছেন, দুর্লভ মানবজীবন লাভ করে যে তাঁকে পাওয়ার চেষ্টা না করে সে মন্দভাগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের শাশ্বত বাণী পুনরায় স্মরণ করি—"দেখ, অমৃতসাগরে যাবার অনন্ত পথ, যেকোন প্রকারে হউক এ-সাগরে পড়তে পারলেই হলো।... অনন্ত পথ—তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি—যে-পথ দিয়া যাও আন্তরিক হলে ঈশ্বরকে পাবে।"[৪]

শ্রীকৃষ্ণও উদ্ধবকে এই তিনটি পথের কথা বলেছেন ঃ

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ।।"
(ভাগবত, ১১।২০।৬)

অর্থাৎ মানবগণের কল্যাণকামনায় জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি—এই তিনটি যোগের বিষয় আমি (বেদমুখে) বর্ণনা করেছি। কল্যাণলাভের অপর কোন উপায় আর কোথাও (কোন শাস্ত্রে) নেই। তবে সকল সাধকের পরম লক্ষ্য এক হলেও অধিকারিভেদে অর্থাৎ সাধকের সামর্থ্য অনুযায়ী ও রুচিভেদে তাঁকে প্রয়োজনে যেকোন একটি পথ বা একসঙ্গে একাধিক পথও গ্রহণ করতে হতে পারে।

প্রথমে কর্ম আর কর্মযোগের কথা ধরা যাক। কর্ম বলতে আমরা সাধারণভাবে দিনের চব্বিশঘণ্টা যা যা করি সবকিছুকেই বুঝি। আমাদের সারাজীবনটিই এক বিরাট কর্মক্ষেত্র। এমনকি চিন্তা করা, শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া—সেটাও একভাবে কর্ম। শাস্ত্র কিন্তু কর্মকে পাঁচভাগে ভাগ করেছেন। এই পঞ্চবিধ কর্ম হলো—নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত, কাম্য এবং নিষিদ্ধ কর্ম।[৫] নিত্যকর্ম হলো সন্ধ্যাবন্দনা প্রভৃতি। নৈমিত্তিক কর্ম কোন নিমিত্ত উপলক্ষ্যে করা হয়, যেমন গ্রহণ উপলক্ষ্যে স্নান, পুত্র নিমিত্ত জাতেষ্টিক্রিয়া ইত্যাদি। তৃতীয় প্রায়শ্চিত্ত কর্ম হলো যেসকল কর্ম শুধু পাপক্ষয়ের জন্য করা হয়। যেমন—গঙ্গাস্নান, ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ বা জপ, চান্দ্রায়ণ ও অন্যান্য ব্রত প্রভৃতি। চতুর্থ কাম্যকর্ম তাকেই বলে, স্বর্গ ও অন্য সুখ লাভের জন্য বেদে সেসকল যজ্ঞের কথা আছে, যেমন অগ্নিহোত্র ইত্যাদি। আর নিষিদ্ধ কর্ম হলো মিথ্যাচার, প্রাণিহত্যা ইত্যাদি। হিন্দুরা মনে করে, জীবনের বিভিন্ন

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম-কথিত, ১ম ভাগ, কথামৃত ভবন, পৃঃ ৫১
২ দ্রঃ সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৬, পৃঃ ২১৯-২২০
৩ 'কথামৃত', ১ম ভাগ, পৃঃ ২১৬ ৪ ঐ, পৃঃ ১৪১
৫ বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা—স্বামী ধীরেশানন্দ কর্তৃক সঙ্কলিত ও অনূদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৯২, পৃঃ ৮০

স্তরে এই কর্মগুলির প্রয়োজন আছে। কিন্তু বহুলোক এই শাস্ত্রোক্ত কর্মকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করে এরই বন্ধনে আটকে থাকে। তারা মূল লক্ষ্য আত্মজ্ঞানলাভকেই অনেক সময়ে ভুলে যায়। হিন্দুর জীবনে রয়েছে ধর্ম ও শাস্ত্রীয় কর্মের কঠোর অনুশাসন। স্বামীজী মজা করে বলেছেন : "The Hindu man drinks religiously, sleeps religiously, walks religiously, marries religiously, robs religiously."[৬]

তাই শ্রীরামকৃষ্ণ অনেকবার বলেছেন, কর্মকাণ্ড হচ্ছে আদিকাণ্ড আর কলিযুগে বেদ-মত চলে না। বৈদিক কর্ম শাস্ত্রবিধান মেনে করা খুব কঠিন। কলিতে তন্ত্রোক্ত মত। বেদ বা বেদান্ত-মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্যবস্তু, শক্তি মিথ্যা; কিন্তু তন্ত্র-মতে শক্তিকেও মানা হয়, মিথ্যা বলা হয় না। ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন এবং দুই-ই সত্য। কলিতে অন্নগত প্রাণ—দেহবুদ্ধি, বিষয়বুদ্ধি যায় না, তাই শক্তিকেও মানতে হয়। পঞ্চেন্দ্রিয় আর মন সংসারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সবসময়ে থাকতে চায়। তাই বেদের অনুশাসন মেনে কর্ম করা শক্ত। এজন্যই এখন অন্নের জন্য অর্থাৎ দেহধারণের জন্য নিষ্কামভাবে কর্ম করা যায় না।

গীতাতেও বলা হয়েছে : "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।" (৩।৫)—কর্ম না করে কেউ ক্ষণকালও থাকতে পারে না। আমাদের দৈনিক অভিজ্ঞতাও তাই। ঠাকুর কৌতুক করে বলেছেন : "বদ্ধজীবেরা ঈশ্বরচিন্তা করে না। যদি অবসর হয় তাহলে হয় আবোল-তাবোল ফালতো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, আমি চুপ করে থাকতে পারি না, তাই বেড়া বাঁধছি। হয়তো সময় কাটে না দেখে তাস খেলতে আরম্ভ করে।"[৭]

এখন এই বিপুল কর্মপ্রবাহকে কি করে কর্মযোগে রূপান্তরিত করা যায়—সেই প্রচেষ্টাই এক বিশেষ সাধনা। গীতা শুধু শাস্ত্রীয় কর্মকে না ধরে আরো বৃহৎ অর্থে কর্মকে নির্দেশ করেছেন—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।। (৯।২৭)

—হে কৌন্তেয়, যা অনুষ্ঠান কর, যা আহার কর, যা হোম কর, যা দান কর এবং যে-তপস্যা কর, সেই সমস্ত আমাকে সমর্পণ করবে।

ঠাকুরও কর্ম বলতে সব কাজের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর কথায়—"কর্ম ছাড়বার যো নাই। আমি চিন্তা করছি, আমি ধ্যান করছি—এও কর্ম।"[৮]

এখন এই কর্মযোগের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে কর্ম আর বন্ধনের কারণ হয় না, পরম জ্ঞানলাভের সহায়ক হয়। এই কর্মযোগই কর্মের মাধ্যমে অন্তর্জগতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করে। কিন্তু এই কর্মের সঙ্গে আমাদের 'অহঙ্কার' বা 'আমিত্ব বুদ্ধি' এসে গেলে অর্থাৎ এটা 'আমার' কাজ, 'আমি' করছি—এই 'অহং' বুদ্ধি থাকলেই সেটা কর্ম। এই দুই না থাকলে যা থাকে তা অনির্বচনীয়, তা পূর্ণ জ্ঞানেরই সমান। সেই কর্ম বন্ধনের কারণ তো হবেই না, উপরন্তু মানুষকে দেহাতীত ও নির্বাসনার অবস্থায় নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। তবে এই কর্ম হবে অবশ্যই কামনাবিহীন। অফিস, কাছারি, হাসপাতাল যে যেখানেই কাজ করি না কেন, সারাদিন যদি অহংবোধশূন্য হয়ে কাজ করার চেষ্টা করি, কাজের শেষে মনে মনে সমস্ত ফল ইষ্টের চরণে সমর্পণ করার চেষ্টা করি, তাহলে 'আমি' এক 'divine instrument' হয়ে যাব। কর্মের একঘেয়েমিও থাকবে না, এ যেন সারাদিন তপস্যা করা। তখন ইন্দ্রিয়গুলিই যন্ত্রবৎ কর্ম করে। আমার মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আলাদা থাকে, যেন নির্লিপ্ত সাক্ষী। তবে এই যোগের পথ বড়ই দুর্গম। বহু অভ্যাসের ফলে কিঞ্চিৎ সফলতা আসে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বড় বড় কর্মযোগীও কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষায় আকৃষ্ট হয়ে আরো বন্ধনে জড়িয়ে পড়েন। লোকমান্যের ইচ্ছা কর্মযোগের এক বাস্তব অসুবিধা। এই ব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণ 'কথামৃতে' আমাদের বারবার সাবধান করেছেন—"তবে কি জান? কর্মকাণ্ড হচ্ছে আদিকাণ্ড।... বেশি কাজ জড়ালেই ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। আর কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি বাড়ে। তবে কর্ম একবারে ত্যাগ করবার যো নাই, তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম করাবে। তা তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর। তাই বলেছে অনাসক্ত হয়ে কর্ম কর।... কর্মের ফল আকাঙ্ক্ষা করবে না। যেমন পূজা জপ তপ করছ, কিন্তু লোকমান্য হওয়ার জন্য নয়, কিংবা পুণ্য করবার জন্য নয়। এরূপ অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার নাম কর্মযোগ। ভারী কঠিন।"[৯]

কঠিন, তাই তপস্যার প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : "তবে নিষ্কাম কর্ম ভাল। তাতে অশান্তি হয় না। কিন্তু

---

৬ 'My life & mission', Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VIII, Advaita Ashrama, 1989, p. 74

৭ 'কথামৃত', ১ম ভাগ, পৃঃ ২৮

৮ ঐ, পৃঃ ১২৭ ৯ ঐ, পৃঃ ১২৬-১২৭

নিষ্কাম কর্ম করা বড় কঠিন।... আগে যদি অনেক সাধন থাকে, সাধনের বলে কেউ কেউ নিষ্কাম কর্ম করতে পারে।"[১০]

এবারে দেখি ঠাকুর জ্ঞানযোগকেও কেন 'এ যুগে ভারী কঠিন' বলেছেন। তিনি বলছেন ঃ "জীবের একে অন্নগত প্রাণ; তাতে আয়ু কম। আবার দেহবুদ্ধি কোনমতে যায় না। এদিকে দেহবুদ্ধি না গেলে একেবারে জ্ঞানই হবে না। জ্ঞানী বলে—আমি সেই ব্রহ্ম; আমি শরীর নই, আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ—এ সকলের পার। যদি রোগ, শোক, সুখ, দুঃখ—এসব বোধ থাকে, তুমি জ্ঞানী কেমন করে হবে? এদিকে কাঁটায় হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর করে রক্ত পড়ছে, খুব লাগছে অথচ বলছে—কৈ হাত তো কাটে নাই! আমার কি হয়েছে?"[১১]

"কলিতে অন্নগত প্রাণ, দেহবুদ্ধি যায় না। এ অবস্থায় 'সোঽহম্' বলা ভাল না। সবই করা যাচ্ছে, আবার 'আমিই ব্রহ্ম' বলা ঠিক নয়।"[১২]

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন ঃ

"নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু।
তেষ্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্।।"

(ভাগবত, ১১।২০।৭)

এই তিনযোগের মধ্যে জ্ঞানযোগ তাঁদের পক্ষেই ফলদায়ক, যাঁরা কর্মে বৈরাগ্য হওয়ার ফলে কর্মত্যাগ করেছেন। আর কর্ম যাঁদের পক্ষে দুঃখদায়ক বলে মনে হয় না—এমন সকাম ব্যক্তিদের পক্ষে কর্মযোগ সিদ্ধিপ্রদ।

নির্গুণ ব্রহ্মে মনোনিবেশ করা যে সাধারণ জীবের পক্ষে কঠিন তা গীতাতেও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে—

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।।" (১২।৫)

—যাঁদের চিত্ত নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মে আসক্ত, তাঁদের সিদ্ধিলাভের জন্য ভগবৎকর্মে নিযুক্ত সগুণ উপাসক অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশ হয়; কারণ নির্গুণ ব্রহ্মে নিষ্ঠালাভ করা দেহাভিমানী ব্যক্তিদের পক্ষে খুবই কষ্টকর।

তাই ঠাকুর বলছেন, সাধারণ জীবের পক্ষে 'সোঽহম্' বলা শোভন নয়। মুখে বলছি, 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—'আমিই তিনি' অথচ মনে অসংখ্য বাসনা আর বিভিন্ন রকমের সংস্কার ও বিরুদ্ধভাব এখনো রয়েছে। এটা আর কিছুই নয়, যেন নিজেকে ঠকানো অর্থাৎ আমরা যা বলার অধিকারী এখনো হইনি, তাই বলে ধৃষ্টতা প্রকাশ করছি।

মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ) এবিষয়ে তাঁর যে-অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন তা খুবই শিক্ষাপ্রদ—"পশ্চিমে তো দেখেছি—এই কাশী, হরিদ্বার অঞ্চলে—অনেক অনেক মঠ আছে, আর ওদিকের লোকেরা কেউবা কিছু আটা, কি নূতন কাপড়, অথবা এক-আধ টাকা নিয়ে এসে কোন মোহন্তের কাছে হাজির হয় আর বলে—'বাবা, বিজাহোম করিয়ে দাও।' 'বিরজাহোম' মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেও জানে না, বলে 'বিজাহোম'। আর মোহন্তও 'বিজাহোম' করিয়ে দিলে! ব্যস্, সে সন্ন্যাসী-চেলা হয়ে গেল! তারপর ভিখ মেগে খায়, আর থাকে। আবার কখনো ব্যবসা বা তেজারতি কাজও জুড়ে দিলে। এরকম লাখ লাখ সন্ন্যাসী তো সব রয়েছে। কিন্তু বাবা, ঠিক ঠিক মুমুক্ষু কজন? সন্ন্যাস নেব, বিরজা করব, মন্ত্র পড়ব—এসবের জন্য যে ব্যাকুলতা হয় সে-ব্যাকুলতা যদি কারো ভগবানলাভের জন্য হয়, সে তো ধন্য, সে তো মহা-ভাগ্যবান। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে যে ভগবানকে চায় সে-ই মহাধন্য। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কম।"[১৩]

তাই ঠাকুর বললেন, জ্ঞানপথ বা কর্মের পথ দিয়েও ভগবানের কাছে অবশ্যই যাওয়া যায়, কিন্তু ভক্তির পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া যায় অতি সহজে। ভক্তিযোগ কেন অল্পায়াসে সিদ্ধিদায়ক সেসম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ

"যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধশ্চ যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।।"

(ভাগবত, ১১।২০।৮)

—যে-ব্যক্তি বৈরাগ্যবান নয়, আবার বিষয়ে বিশেষ আসক্তও নয়, কিন্তু কোন সৌভাগ্যবশত যার আমার কথা শ্রবণ-কীর্তন প্রভৃতিতে অনুরাগ জন্মেছে তার পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ।

ঠাকুর বলছেন, ভক্তিপথ হচ্ছে সবচেয়ে সহজ। সুন্দর উদাহরণ দিয়ে তিনি বলছেন ঃ "যেমন বাঁকা নদী দিয়ে অনেক কষ্টে এবং অনেকক্ষণ পরে গন্তব্যস্থানে যাচ্ছ। কিন্তু যদি বন্যে হয়, তাহলে সোজা পথ দিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে গন্তব্যস্থানে পৌছানো যায়। তখন ড্যাঙাতেই এক বাঁশ জল।"[১৪] জ্ঞানমার্গীর অত বিচার, কর্মযোগীর কত কর্ম, তারপরে লক্ষ্যস্থল। এতে সময় লাগবে অনেক। কিন্তু যদি ভক্তির পথ দিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে অল্পসময়ে সোজাপথেই নিজের লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছানো যায়।

'কথামৃত'-এ কর্ম, জ্ঞান বা যোগের কথা থাকলেও সাধারণ ভক্তদের ঠাকুর নারদীয় ভক্তির পথ অবলম্বন করতে বলেছেন। অবতারবরিষ্ঠ স্বয়ং সমন্বয়াচার্য হয়েও

১০ 'কথামৃত', ১ম ভাগ, পৃঃ ১০৭ ১১ ঐ, পৃঃ ১৪১-১৪২ ১২ ঐ, ৩য় ভাগ, পৃঃ ৯
১৩ শিবানন্দ-বাণী, ১ম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, ৫ম সং, ১৩৮৬, পৃঃ ১২৮
১৪ 'কথামৃত', ৫ম ভাগ, পৃঃ ১১১

বাহ্যত ভক্তিভাব অবলম্বন করেই জীবনযাপন করেছেন, বলেছেন—ভক্তিযোগই এই যুগের ধর্ম। 'এই যুগের' মানে কলিযুগের। হিন্দুরা চার যুগের কথা বলে। বৈদিক যুগই প্রাচীনতম যুগ, যাকে 'সত্যযুগ' বলা হয়; তখন যুগধর্ম ছিল জ্ঞানমার্গ। তারপরে শ্রীরামচন্দ্রের সময়ে অর্থাৎ 'ত্রেতাযুগ'-এ যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের প্রবলতা ছিল। এর পরে এল 'দ্বাপর'। এই যুগে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। এই সময়ে 'সেবা' ছিল যুগধর্ম। এরপর থেকে শুরু হয়েছে 'কলিযুগ'। এই যুগের ধর্ম 'নারদীয় ভক্তি'। এযুগে জীব শ্রীভগবানের নামগুণগানেই পরমার্থ লাভ করে থাকে। (তুলনীয়ঃ ভাগবত, ১২।৩।৫২)

এক সুন্দর উপমা দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তিযোগকে ডি. গুপ্তের ফিবার মিকশ্চারের সঙ্গে তুলনা করেছেন—"আজকালকার জ্বরে দশমূল পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রোগীর এদিকে হয়ে যায়।" দশমূল পাঁচন দশরকম গাছের শিকড় থেকে প্রস্তুত এক ওষুধ, যা তৈরি করা শক্ত। অত গাছের শিকড় যোগাড় করার আগেই রোগী মারা যেতে পারে। তাই—আজকাল "ফিবার মিকশ্চার"। অর্থাৎ যেন আধুনিক সহজ এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

'কথামৃত'-এ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তিকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করেছেন। বৈধীভক্তি বা গৌণীভক্তি এবং শুদ্ধাভক্তি অথবা প্রেমাভক্তি কিংবা রাগভক্তি। এছাড়াও তিনি আরেক ভক্তির কথা বহুবার উল্লেখ করেছেন। তা হলো নারদীয় ভক্তি। বৈধীভক্তির কথায় তিনি বলছেনঃ "এত জপ করতে হবে, উপোস করতে হবে, তীর্থে যেতে হবে, এত উপচারে পূজা করতে হবে, এতগুলি বলিদান দিতে হবে—এসব বৈধীভক্তি। এসব অনেক করতে করতে ক্রমে রাগভক্তি আসে।"[১৫]

প্রেমাভক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলছেনঃ "ভক্তি অমনি করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রেমাভক্তি না হলে ঈশ্বরলাভ হয় না। প্রেমাভক্তির আরেকটি নাম রাগভক্তি। প্রেম, অনুরাগ না হলে ভগবানলাভ হয় না।"[১৬] এই ভক্তি প্রসঙ্গে তিনি আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, যা অবশ্যই স্মরণীয়ঃ "যতক্ষণ না তাঁর উপর ভালবাসা জন্মায় ততক্ষণ ভক্তি কাঁচাভক্তি। তাঁর উপর ভালবাসা এলে, তখন সেই ভক্তির নাম পাকাভক্তি।"[১৭] সেই ভালবাসা কিরকম তাও তিনি বলছেনঃ "যেমন ছেলের মার উপর ভালবাসা, মার ছেলের উপর ভালবাসা, স্ত্রীর স্বামীর উপর ভালবাসা।"[১৮]

বৈধীভক্তি ও প্রেমাভক্তির পারস্পরিক তুলনা করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেনঃ "বিধিবাদীয় ভক্তি; যেমন, হাওয়া পাবে বলে পাখা করা। হাওয়ার জন্য পাখার দরকার হয়। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা আসবে বলে জপ, তপ, উপবাস। কিন্তু যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি বয়, পাখাখানা লোকে ফেলে দেয়। ঈশ্বরের উপর অনুরাগ, প্রেম আপনি এলে জপাদি কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়।"[১৯]

শ্রীভগবানের লীলাশ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ, সেবা, পূজা, স্তুতি, দাস্যভাব, সখ্যভাব ও আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন —এই নয়টিই ভজনের অঙ্গ। এর যেকোন একটিকে অবলম্বন করে আন্তরিক সাধনা করলে ভক্ত পরমার্থ লাভ করেন। এইগুলি সবই বৈধীভক্তির অঙ্গ। ঠাকুর কলিযুগের জন্য একে আরো সংক্ষিপ্ত করেছেন, সহজ করেছেন। শুধু নামগুণগান কীর্তন আর প্রার্থনা। নাম আর প্রার্থনার ওপরে তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন। খ্রিস্ট ও মুসলিম ধর্মেও প্রার্থনার ওপরে খুবই জোর দেওয়া হয়।

আরেকটা কথা ঠাকুর বারবার বলেছেনঃ "সর্বদাই তাঁর নামগুণগান কীর্তন ও প্রার্থনা করতে হয়। পুরাতন ঘটি রোজ মাজতে হবে, একবার মাজলে কি হবে?"[২০] অর্থাৎ অভ্যাসযোগ অনুশীলন করতে হবে।

শ্রীশ্রীমা বলতেনঃ "জপাৎ সিদ্ধি।" অর্থাৎ শুধু জপ করলেই হবে। তিনি ঠাকুরের নাম প্রসঙ্গে বলছেনঃ "ঠাকুর বলতেন, 'যারা আমাকে ডাকবে তাদের জন্য আমাকে অন্তিমে দাঁড়াতে হবে।' এটি তাঁর নিজের মুখের কথা।"[২১] "আমাকে যে স্মরণ করে তার কখনো খাওয়ার কষ্ট থাকে না।"[২২]

স্বামী শিবানন্দ বলেছেনঃ "আমি জানি 'রামকৃষ্ণ' নামই এযুগের মহামন্ত্র। যে ভক্তিভরে পতিতপাবন যুগাবতার শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম জপ করবে তার ভক্তি-মুক্তি সবই করামলকবৎ। 'রামকৃষ্ণ' এযুগের ডঙ্কামারা নাম। জীবের মুক্তির জন্য রামকৃষ্ণনাম জপই যথেষ্ট।"[২৩]

নারদীয় ভক্তি বলতে ঠাকুর যে নামগুণগান করার কথা বলেছেন, তাঁর নামও এর মধ্যে পড়ে। এটি পরম আশ্বাসের কথা। তাঁর নামে অভ্যুদয়, নিঃশ্রেয়স—দুইই লাভ হয়। এই প্রসঙ্গে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ১লা

---

১৫ 'কথামৃত', ১ম ভাগ, পৃঃ ৭৯ — ১৬ ঐ — ১৭ ঐ, পৃঃ ৮০

১৮ ঐ — ১৯ ঐ — ২০ ঐ, ৫ম ভাগ, পৃঃ ৩৩

২১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, উদ্বোধন, ১৩৮০, পৃঃ ৭৩ — ২২ ঐ, পৃঃ ১৫৩

২৩ শিবানন্দ-বাণী, ১ম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৮৭, পৃঃ ১

জানুয়ারি ১৮৮৬ শ্রীরামকৃষ্ণ নবগোপাল ঘোষকে যে সহজ পথের সন্ধান দিয়েছিলেন তা স্মরণ করি। স্বামী গম্ভীরানন্দের বর্ণনায়—"ঐদিন কৃপামুগ্ধ রামবাবু নবগোপালবাবুকে সাগ্রহে বলিলেন, 'মশায়, আপনি কি করছেন? ঠাকুর যে আজ কল্পতরু হয়েছেন। যান যান, শীঘ্র যান। যদি কিছু চাইবার থাকে তো এই বেলা চেয়ে নিন।' শুনিয়া নবগোপাল দ্রুতবেগে যথাস্থানে গমনপর্বক ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া ঠাকুরকে বলিলেন, 'প্রভু, আমার কি হবে?' ঠাকুর একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'একটু ধ্যান-জপ করতে পারবে?' নবগোপাল উত্তর দিলেন, 'আমি ছা-পোষা গেরস্ত লোক; সংসারের অনেকের প্রতিপালনের জন্য আমায় নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, আমার সে-অবসর কোথায়?' ইহাতে ঠাকুর পুনর্বার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, 'তা একটু একটু জপ করতে পারবে না?' উত্তর—'তারই বা অবসর কোথায়?' 'আচ্ছা, আমার নাম একটু একটু করতে পারবে তো?' উত্তর—'তা খুব পারব।' ঠাকুর তখন কহিলেন, 'তাহলেই হবে—তোমাকে আর কিছু করতে হবে না।' "[২৪] এই হলো কলিযুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত সহজতম পথ। যেন আরো শক্তিশালী ডি. গুপ্তের মিকশ্চার!

ভক্তির মাধ্যমে সমাজের সংস্কার কিভাবে হতে পারে, তারও একটি সহজ পথের সন্ধান দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না, কিন্তু সারাজীবন সমাজের সব শ্রেণীর মানুষকে নিয়েই সহাবস্থান করেছেন। জাতিভেদ কি উপায়ে যেতে পারে—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ঃ "এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। সে-উপায়—ভক্তি। ভক্তের জাতি নেই।... ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়। ভক্তি থাকলে চণ্ডাল চণ্ডাল নয়।"[২৫] এক জটিল সমস্যার কী সরল সমাধান! তিনি অদ্বৈতদৃষ্টিতে সকলকে সমান দেখছেন। জাগতিক দিক থেকে দেখলে মানুষে মানুষে ভেদ আছে ঠিকই, কিন্তু যাঁরা সত্যদ্রষ্টা, তাঁদের দৃষ্টিতে কোন উচ্চ-নীচ ভেদ নেই।

ভক্তিপথ সহজ হলেও এতে কিছু বিপদও আছে। যেহেতু ভক্তি কিছুটা আবেগপ্রধান, তাই এতে বিচ্যুতির সম্ভাবনাও রয়েছে। এতে অহঙ্কার ও সঙ্কীর্ণভাব অনেক সময়ে এসে যেতে পারে। তাই অলীক ঈশ্বরীয় 'ভাবে' 'ভেসে' যাওয়ার শঙ্কা থাকে। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী তথাকথিত 'বৃন্দাবনলীলা'র মন্দদিকগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সাধারণভাবে আমরা 'ভক্তিবাদী' বলতে এজাতীয় সাধকদেরই মনে করি। বাস্তবিক দেখাও যায়, ভক্তিমার্গী বলে পরিচিত অনেকের ব্যক্তিজীবনে সু-উচ্চ আধ্যাত্মিকতার তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই প্রশ্ন আসে, ভক্তিযোগে অগ্রগতির বাহ্য লক্ষণ কী? স্বামীজী একজায়গায় বলেছেন ঃ "সর্বদা মনে রাখিস, ত্যাগই হচ্ছে মূলমন্ত্র। এমন্ত্রে দীক্ষিত না হলে ব্রহ্মাদিরও মুক্তির উপায় নেই।"[২৬] নারদীয় ভক্তিসূত্রেও রয়েছে এই ত্যাগের মহিমা। বলা হয়েছে, সেই প্রেমাভক্তি লাভ করা যায় যদি পূর্ণভাবে বিষয়ত্যাগ ও বিষয়ের প্রতি আসক্তিত্যাগ হয়। তাছাড়া সত্যনিষ্ঠা, পবিত্রতা, ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি সত্ত্বগুণের ঐশ্চর্য তো আসবেই।

ঠাকুর এই ভক্তিযোগকে ডি. গুপ্তের ফিবার মিকশ্চারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এর জন্য যে চিত্তশুদ্ধির দরকার, তার সাধনাও চলে সমান্তরালভাবে। আসল কথা, ঠাকুর বলছেন—এটিই অহৈতুকী ভক্তি। কোন কামনা নেই, বাসনা নেই, ভক্ত তাঁকে ভালবাসে, ভক্ত তাঁকে চায়। এর চেয়ে বড় আর কিছুই নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রসঙ্গে গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দিব্য প্রেমকেই ভালবাসার শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলেছেন। সেই প্রেমলাভের সাধনাই ভক্তিযোগের শেষকথা। যে-ভক্তিসাধনার দ্বারা এই পরমপ্রেম লাভ হয়, তাকে তিনি নিষ্ঠাভক্তি বা অব্যভিচারিণী ভক্তি বলেছেন। যেমন একডেলে গাছ। সোজা উঠেছে। ব্যভিচারিণী ভক্তি হচ্ছে পাঁচডেলে গাছ। এই নিষ্ঠা তখনি লাভ হয়, যখন আসে মনের পূর্ণতম একাগ্রতা অর্থাৎ 'মনের নাশ'—যাকে শাস্ত্রে 'সমাধি' বলা হয়েছে। ঠাকুর বলছেন ঃ "গোপীদের এমন নিষ্ঠা যে, বৃন্দাবনের মোহনচূড়া, পীতধড়া পরা রাখালকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু ভালবাসবে না। মথুরায় যখন রাজবেশ, পাগড়ি-মাথায় কৃষ্ণকে দর্শন করলে তখন তারা ঘোমটা দিলে। আর বললে, ইনি আবার কে? এর সঙ্গে আলাপ করে আমরা কি দ্বিচারিণী হব?"[২৭]

এই ভক্তিমার্গের সঙ্গে কারো বিরোধ নেই—কর্মেরও নয়, জ্ঞানেরও নয়; কিন্তু কর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে চিরন্তন বিরোধ আছে। ভক্তি তাই তিনরকমের হতে পারে—কর্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা এবং শুদ্ধাভক্তি—যার সঙ্গে কর্মের ও জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। এই শুদ্ধাভক্তিই 'জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃত'[২৮] অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম এই দুয়েরই ভাবমুক্ত, তাই এটিই আমাদের আরাধনার বস্তু। ❑

---

২৪ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, ২য় ভাগ, উদ্বোধন, ১৩৯২, পৃঃ ৩৭১

২৫ 'কথামৃত', ৫ম ভাগ, পৃঃ ১৬

২৬ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, উদ্বোধন কার্যালয়, ৭ম সং, ১৩৯৬, পৃঃ ২৩৫

২৭ 'কথামৃত', ৫ম ভাগ, পৃঃ ৩৯

২৮ ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, ১।১১

মূর্তিপুজো

অশোক রায়

যাঁরা সাকারবাদী, তাঁরা মূর্তিপূজার পক্ষপাতী। নিরাকারবাদীরা মূর্তি-পূজার নিন্দা করলেও মূর্তিপূজার প্রয়োজন আছে। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'-এর প্রথমেই শ্রীশ্রীঠাকুর সেকথা বলেছেন। মনস্বী লেখক যদিও রসায়নবিদ্, তবু স্বপ্রচেষ্টায় এই বিষয়ের গবেষণায় নিরত।

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মই সত্য; তিনি এক ও অদ্বিতীয়। সেই এক ও অদ্বিতীয়ের উপাসনাই তো কর্তব্য। কিন্তু তা না করে হিন্দুধর্মে এত বিচিত্র দেবদেবীর সমাবেশ হলো কেন? আর তাঁদের মূর্তিকল্পনা, স্তুতিবন্দনা, পুজো-আরাধনারই বা প্রয়োজন কি? এই ব্রহ্মবাদের পরিপ্রেক্ষিতে দেবদেবীর অস্তিত্বের যৌক্তিকতাই বা কি? বিভিন্ন প্রতিমার বা প্রতিমূর্তির পুজো কি পুতুলপুজোর সামিল নয়? এসবই কি মনের ভ্রম, না সংস্কার মাত্র?

বেদে স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। কিন্তু ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির এক অপরূপ ও অনুপম মহিমা হলো বহুত্বে বিশ্বাস। বেদের প্রসিদ্ধ নিরুক্তকার যাস্কাচার্যের মতে, বৈদিক দেবতা প্রধানত তিন—ভূলোকে অগ্নি, অন্তরীক্ষে ইন্দ্র ও স্বর্গলোকে সূর্য। আবার কারো কারো মতে, প্রত্যেক লোকে এঁরা এগারোজন। এই হিসাবে বৈদিক দেবতার সংখ্যা মোট তেত্রিশ। আবার ঋগ্বেদেরই (৩।৯।৯) এক মন্ত্রে দেবতার সংখ্যা তিন হাজার তিনশো উনচল্লিশ। এই সংখ্যা ক্রমবর্ধিত হতে হতে পৌরাণিক যুগে এসে প্রবাদে দাঁড়িয়েছিল—তেত্রিশ কোটিতে বা অনন্তে। এছাড়াও আছে 'থান' ও লৌকিক দেবতারা।

এই জগৎ বিষ্ণুময়। সর্বত্র (দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষ) তিনি অণিমারূপে পরিব্যাপ্ত। এই উপলব্ধি থেকেই এসেছে সর্বান্তর্যামী মহাশক্তির বিবিধ, বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য প্রকাশ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—এক পরমেশ্বরই সকল দেবতারূপে বিরাজিত। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখানোর ছলে অর্জুনকে তাঁর অনন্ত রূপে ঐশ্বর্যের প্রকাশ দেখালেন—যা একের মধ্যেই বহুর ব্যঞ্জনা। এছাড়াও বললেন—পুরুষোত্তমরূপে আমি একই; ভক্তগণ আমাকে নানা রূপে ভজনা করে; যে যে-রূপে আমাকে চায়, আমি সেই রূপেই তাকে কৃপা করি। এছাড়াও শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেখি, শুম্ভাসুরের মোহভঙ্গ করে জগন্মাতা বললেনঃ রে শুম্ভ, আমি বহুর শক্তি নিয়ে সংগ্রাম করছি—এ তোর ভ্রম মাত্র। জগতে আমিই অদ্বিতীয়া। সমস্ত মাতৃকাশক্তি আমার থেকেই উদ্ভূতা। সেই বহু শক্তিকে আত্মস্থ করে ত্রিভুবনে আমি একাই বিরাজিতা।

ব্রহ্মের দুটি লক্ষণ—স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ। স্বরূপলক্ষণে তিনি নির্গুণ, নিরাকার, নিরূপাধিক, নিষ্ক্রিয়, নির্বিশেষ ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ। কিন্তু তটস্থলক্ষণে তিনি সগুণ, সাকার, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কার্যের অধিকর্তা, অনাদি অনন্ত নিখিলের প্রভু বা ঈশ্বর। যেমন অতলান্ত সমুদ্রের উপরিভাগ উত্তাল, কিন্তু গভীরে অসীম স্থৈর্য। তেমনি তিনি সগুণ-নির্গুণ, সক্রিয়-নিষ্ক্রিয় এবং সাকার-নিরাকার।

তটস্থলক্ষণে তিনি হেতু। বটগাছের বীজ অতি সূক্ষ্ম। কিন্তু তা যখন অঙ্কুরিত হয়, তখন তাতে প্রকাশ পায় তিনটি অংশ—মূল, কাণ্ড ও পাতা। এই উদ্ভিন্ন সত্তাই ক্রমবর্ধিত ও ক্রমপ্রসারিত হয়ে কালে কালে আত্মপ্রকাশ করে মহীরুহরূপে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই হলো স্বরূপলক্ষণ। কেবল জ্ঞান আছে, ইচ্ছা ও ক্রিয়া সেখানে নেই। "একোঽহং বহুস্যাম্"-এর বাসনায় এই সাম্যাবস্থায় ঘটে বিঘ্ন, ধরে ভাঙন। ফলে একদা যা ছিল অব্যক্ত অব্যয়, ক্রমে তা ব্যক্ত হয় নামরূপে। প্রকাশিত হয় বিভিন্ন দেবদেবীরূপে। নিজ আনন্দ খেলাতেই অদ্বিতীয় পরম পুরুষ নিজেকে প্রকাশিত করেন—বহু রূপের বিচিত্র লীলাবিলাসে।

বৈদিক কাল থেকে দেবারাধনার ক্ষেত্র আত্মবিস্তার লাভ করে এবং যুগবিবর্তনে বহু শাখাপল্লবে বিশাল থেকে বিশালতর, ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে থাকল রুচি, সংস্কার ও প্রয়োজনের বিভিন্নতা অনুসারে। কিন্তু কেন এমনটা হয়? ধরা যাক 'আমি'—একই সত্তা। তবু মায়ের কাছে (বুড়ো হলেও) খোকা, মেয়ের কাছে স্নেহশীল পিতা, স্ত্রীর কাছে স্বামী। অফিসে, পাড়ায়, সমাজে, ধর্মে, রাজনীতিতে, আরো আরো নানা জানা-অজানা ক্ষেত্রে এই এক 'আমি'রই বহু থেকে বহুতর প্রকাশ; ভিন্ন থেকে ভিন্নতর আচার-ব্যবহার—যেখানে একের সাথে অন্যের মিল অপেক্ষা গরমিলই বেশি। সামান্য 'আমি'রই যদি এত বৈচিত্র্য থাকে, তাহলে 'আমি যে-মহাশক্তির পরমাণুর পরমাণুতম প্রকাশ, সেই সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মার অনন্ত প্রকাশ-বৈচিত্র্য কত বিপুল কত বিশাল হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

পরমাত্মা অরূপ, অনাম; দেবতারা স-রূপ, স-নাম। তাহলে অরূপ অনাম পরমাত্মার কেন এই রূপবিলাস? আমরা দেহধারী জীব; নাম ও রূপের জগতে বাস করি।

আমাদের সীমাবদ্ধ মনোবুদ্ধি দিয়ে অবাঙ্মনসগোচর পরমাত্মার ধ্যান-ধারণা করতে পারি না। তাই অরূপ অনামকে লাভ করার সহজ ও বিজ্ঞানসম্মত সঠিক পথ উদ্ভাবন করেছিল আর্য ঋষিগণের প্রজ্ঞাদীপ্ত মনীষা। তাঁরা বুঝেছিলেন, পরমাত্মার সাধনা সর্বোত্তম অবস্থা হলেও সেই উচ্চভূমিতে মানুষ হঠাৎ পৌঁছাতে পারে না। যে-স্তরে সে এখন আছে, সেই স্তরের উপযোগী করেই তাকে দেখাতে হবে সাধনার প্রাথমিক পথ। তারপর ধারণা-শক্তি ও যোগ্যতার ক্রমপুষ্টির সাথে সাথে তাকে ক্রমোচ্চসাধনার সোপান শিক্ষা দিতে হবে। এছাড়াও তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন, বর্ণজ্ঞানহীনকে নাম ও রূপের প্রাথমিক পাঠ না দিলে কোন বস্তুই সে ধারণা করতে পারবে না। তাই তাদের যদি উচ্চতম অধ্যাত্মতত্ত্বের অধিকারী করে তুলতে হয়, তবে রূপের পাঠই আগে পড়াতে হবে। 'আ' ও 'ম' এই দুটি বর্ণের সংযোগে হয় 'আম'। কিন্তু আমের ছবি না দেখালে পাঠে উৎসাহ জাগে না, সম্পূর্ণ ধারণাও হয় না। বিচিত্র বর্ণের ছবি দেখিয়েই বর্ণজ্ঞান ও বানান শিক্ষা দিতে হয়। তাই রূপের সাধনার মধ্য দিয়েই অরূপের তত্ত্ব বোঝানোই হলো সহজ পথ। অরূপের মহিমাকে আস্বাদন করতে হলে নাম-রূপের ভেলাকেই আশ্রয় করতে হয়। এছাড়া সাধারণের অন্য কোন গতি নেই। তাই নাম ও রূপের পুজোকে যতই 'অধমাধম' বলা হোক না কেন কিংবা ভ্রান্তি ও কুসংস্কার বলে যথেচ্ছ নিন্দামন্দ করা হোক না কেন, আসলে নিতান্ত অপ্রয়োজনে এর উৎপত্তি বা প্রচার হয়নি। এর ভিত্তি শিথিল ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। পরম সত্যকে চরম পর্যায়ে উপলব্ধির কনকসোপান হিসাবে অরূপের এই রূপকল্পনা। এতে সাধকের সাধনার দুরূহতা যে কতদূর সহজ সরল হয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না। বস্তুত, এ হলো উপাসকগণের সাধনসিদ্ধির জন্যই যিনি চিন্ময় ও অদ্বিতীয়, যিনি নিষ্কল ও অশরীরী—সেই পরমাত্মার স্বকীয়া রূপকল্পনা।

'স্বকীয়া' কথাটা ব্যবহার করার কারণ—এই কল্পনা মনুষ্যকৃত নয়, এ তাঁরই স্বয়ং প্রকাশ। জীবকরুণার অহেতুকী স্ফূর্তির মাধুর্যে অরূপ নিজেই এসে ধরা দিয়েছেন রূপের হাটে।

বেদে দেবতারা একেবারে অমূর্ত নন, কিন্তু বৈদিক যুগে দেবতাদের কোন প্রতিমা বা স্থূল প্রতীক ছিল না। এমনকি, তাঁদের মূর্তিকল্পনাও অনেক ক্ষেত্রেই ছিল অসম্পূর্ণ। কিন্তু পৌরাণিক যুগে দেবতারা সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ মূর্তিরূপ পরিগ্রহ করেন। অরূপের এই চিত্তবিমোহন প্রকাশ কোন প্রাকৃত শিল্পজীবীর খেয়ালী খেলার সৃষ্টি নয়। দেবতাদের এই রূপকল্পনা বা মূর্ত প্রকাশ আপনিই প্রতিবিম্বিত হয়ে ধরা দিয়েছিল সাধনশুদ্ধ, প্রজ্ঞাদীপ্ত সাধকগণের মানসনেত্রে। [স্বামী বিবেকানন্দ-কৃত 'ভক্তিযোগ' দ্রষ্টব্য] অরূপের এই বিশালতম অঙ্গনে যে সীমাহীন রূপের ছড়াছড়ি তা যোগীর যোগজ চিত্তে সহস্রদল কমলের মতো আপন সুরভি নিয়ে একে একে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল।

আকাশের কোন মূর্তি নেই। কিন্তু তবু সে লক্ষ-কোটি দীপ্তিমান নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহের রূপের ঔজ্জ্বল্যে চিরভাস্বর। তেমনি অরূপ ও অনামের অসীম আকাশে দিব্যগুণসম্পন্ন দেবতারা যেন রূপোজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো। অরূপের তত্ত্ব সন্ধান করতে গিয়েই সাধকগণের সাধনলব্ধ সূক্ষ্ম অনুভূতির স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছিল সেইসব দিব্যমূর্তি।

পথ সোজা হলেও তা জানা না থাকলে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না। রূপের মধ্যে অরূপরতন লাভের কৌশলও জানা না থাকলে এই পথের অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্যে পৌঁছানো কষ্টকর। তবুও সাধারণের পক্ষে এই পথটাই ভাল; কারণ সাধারণ মানুষ যদি 'অব্যক্তা-সক্তচেতা' হয়ে শুরুতেই নিরাকার তত্ত্বের উপলব্ধিতে প্রয়াসী হয়, তাহলে তাদের ক্লেশ-দুর্গতি বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সাকার (ব্যক্ত) ও নিরাকার (অব্যক্ত) উপাসনার মধ্যে কোন্টা শ্রেষ্ঠ তা বোঝাতে গিয়ে বলেন—যেসকল ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত ও সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে আমার সগুণ, সাকার স্বরূপের আরাধনা করে, আমার মতে তারাই শ্রেষ্ঠযোগবিৎ। আর যারা ইন্দ্রিয়সকল অবরুদ্ধ করে সর্বত্র সমবুদ্ধিযুক্ত হয়ে অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব নির্গুণ অক্ষর স্বরূপের নিরন্তর চিন্তা করে—তারা তাদের উচ্চতম সাধনযোগ্যতায় সেই ভাবেই (নির্গুণস্বরূপে) তাঁকে প্রাপ্ত হন। তবে এই নিরাকারের উপাসনার অধিকারী কিন্তু সকলে নয়।

চঞ্চলচিত্ত মানুষ দেবতা বা ইষ্টের শ্রীমূর্তি ধ্যানের পথ ছেড়ে বাহ্য বিষয়ে বা বাহ্য রূপের নেশায় ধাবিত হয়। এই অবস্থায় অভ্যাসযোগ অবলম্বনীয়। ক্রমাগত অভ্যাসের দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ হয় প্রশমিত। বাহ্য রূপের প্রতি সংসারী জীবের যে স্বাভাবিক প্রবণতা তা তখন মুছে যেতে থাকে। ক্রমে ইষ্টমূর্তিতে চিত্ত লয়প্রাপ্ত হয়। এইভাবে সাকার ধ্যানের ঘনীভূত অবস্থায় অনন্যচিত্ত সাধকের যে যৌগিক মানসিকতা গড়ে ওঠে, তা তাকে পৌঁছে দিতে পারে সবিকল্প সমাধির অভীষ্ট স্তরে। আর এই স্তর

অতিক্রম করতে পারলেই তো নির্বিকল্প অবস্থা। ভারতচন্দ্রের ভাষায়—

"সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার,
সোনা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার।"

(অন্নদামঙ্গল)

কেবল শূন্য আঁচলে গিঁট দিলে ধনবান হওয়া সম্ভব কি? শূন্য কি করে আনবে পূর্ণের পূর্ণতা?

আবার সাধনার উচ্চস্তরে পৌঁছে সাধক রামপ্রসাদ অনুভব করলেন—

"মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই
মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে,
মা বেটী কি তেমন মেয়ে
মিছে খাটি মাটি নিয়ে।"

সুতরাং প্রথমে মাটি নিয়ে খাটার প্রয়োজনীয়তা আছে বৈকি। শিশু পুতুল খেলে, সে-খেলা তার ভাবী বাস্তব জীবনে সত্য হয়ে দাঁড়ায়।

তাই দেবতার সাকার উপাসনায় প্রথম প্রথম ভ্রম হয়তো হবে, কিন্তু গভীর আন্তরিকতার অভ্যাসযোগে সে-ভ্রম একদিন কাটবেই। সত্যদৃষ্টি লাভ একদিন হতেই হবে। মূর্তির চৈতন্যশক্তি একদিন সাধকের সুপ্ত অন্তরে ভাগবত চেতনার সঞ্চার করবেই।

দার্শনিকতার সংশ্লেষণী চিন্তা ছেড়ে এবারে বিজ্ঞানের বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাক মূর্তিপুজো কতটা সুপ্রযুক্ত।

সৃষ্টির উষালগ্নে সদ্যোজাত উত্তপ্ত পৃথিবীর পরিমণ্ডলে জমে থাকা বাষ্পকণা থেকে ক্রমে ঘনিয়ে আসা বৃষ্টির জলে স্নাত হয়ে মাতা ধরিত্রী যখন শীতল হলেন, তখন পৃথিবী জলে টই-টম্বুর; কিন্তু জড় স্তব্ধ মূক। তাতে ছিল না কোন প্রাণের আভাস। পরিবেশ ছিল প্রাণধারণের পক্ষে একান্তই প্রতিকূল—বিজারক, উষ্ণ ও ঝাঁঝাল। অক্সিজেন প্রায় ছিল না বললেই চলে। ভূপৃষ্ঠে ক্রমাগত চলছিল উথাল-পাথাল। এছাড়াও ছিল আরেক বিষম বিপদ—সূর্য-বিচ্ছুরিত মহাজাগতিক রশ্মির প্রাদুর্ভাব। কিন্তু সে এক অবাক কথা। এইসব প্রতিকূলতাকে পাথেয় করেই কোন এক অসম্ভবের রাস্তা ধরে অবশেষে পৃথিবীতে প্রাণের বীজ সৃষ্টি হলো, যা বসুন্ধরাকে আগামী দিনের মাতৃত্বের সম্ভাবনায় সম্ভাবনাময় করে তুলল। একান্তই অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব মনে হলেও একথা সত্যি যে, পৃথিবীর উষালগ্নে সূর্য-বিচ্ছুরিত মহাজাগতিক রশ্মির পুরুষ-স্পর্শে অজৈব বিবর্তনের পরিণতিতে সৃষ্ট হয় কিছু জৈব উপাদান। ফলশ্রুতিতে শুরু হলো—জৈববিবর্তন। একে একে সৃষ্টি হতে থাকল প্রাণের আবশ্যিক উপাদান। ক্রমে তারা জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে। ফলে বৃহৎ অণু-শৃঙ্খল গঠন করে 'জলবিন্দু'র মতো আকার ধারণ করে, আদিম পৃথিবী জলে ভাসতে থাকে। তারপর দীর্ঘ কোটি কোটি বছর ধরে পরিবেশ, পরিমণ্ডল ও সূর্যালোককে কাজে লাগিয়ে সবরকম 'পারমুটেশন-কম্বিনেশন' করে বসুন্ধরাকে আগামী দিনের প্রাণ-সম্ভাবনায় সম্ভাবনাময় করে তুলল।

এইরকমই কোন এক সময়, জৈববিবর্তনের ধারা বেয়ে সৃষ্টি হয় এক জৈব উপাদান—যাকে আমরা 'জীবনের মূল উপাদান' বা 'Key molecule of life' বলতে পারি। সময়ের সাথে তাও বিবর্তিত হলো দুই মহারূপে। একরূপ থেকে সৃষ্টি হলো উদ্ভিদজগৎ; আর অপর রূপ থেকে তাবৎ প্রাণিজগৎ। সৃষ্টি হলো প্রাণের স্থাবর ও জঙ্গম রূপ। এরপর প্রাণের এই উপাদানগুলো নব নব রূপে পল্লবায়িত হলো শতধায়। ফলশ্রুতিতে দেখা দিল প্রাণিজগতের এই অনন্ত বৈচিত্র্য। কিন্তু তার মধ্যেও জীবনের মূল উপাদান রয়ে গেল প্রায় অবিবর্তিত (প্রায় জীবন্ত জীবাশ্মের মতো) অবস্থায়। ভাবতেও অবাক লাগে, শতকোটি বছর ধরে সেই জৈব যৌগ মহাকালের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে জীববিবর্তনের সুবিশাল ধারা বেয়ে আজও টিকে আছে প্রায় অবিকৃত অবস্থায়—মানুষের দেহে, বিশেষত 'Proster glandin'-এ। অনুসন্ধান করে দেখা যাচ্ছে, এই যৌগ প্রাণিজগতের প্রায় সর্বত্রই (কম বেশি পরিমাণে) বিদ্যমান। খুব বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় কিছু কিছু সামুদ্রিক মাছে।

তাহলে, সৃষ্টির সেই উষালগ্ন থেকে শুরু করে আজ অবধি প্রাণের নিত্য পরশে মাতা ধরিত্রী হলেন প্রাণময়। সর্বব্যাপ্ত হলো জীবনের কারণ। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, এমনকি পাথরেও (আগ্নেয়শিলা ছাড়া) সঞ্চারিত হলো সেই প্রাণের উপাদান। ফলে 'মৃন্ময়' হলো 'চিন্ময়' সত্তার আধার। তাই মাটি দিয়ে আমরা মূর্তি গড়ি, পুজো করি দেবজ্ঞানে—চিন্ময়ী শক্তির আধাররূপে। আর এই জৈব উপাদান ৮০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় যায় ভেঙে। তখন আর তাতে প্রাণময় সত্তার কোন চিহ্নই অবশিষ্ট থাকে না। বোধহয় একারণেই পোড়ামাটির দেবমূর্তির পূজন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। কারণ, তখন ঐ মূর্তি দিয়ে পুতুলখেলা চলতে পারে, কিন্তু দেবারাধনা বা চিন্ময়ী সত্তার সাধনার কার্যকারণ কোন সম্পর্ক থাকে না।

আজকের বিজ্ঞানের এই পরীক্ষিত সত্য প্রাচীন শাস্ত্রকারদের আর্যপ্রজ্ঞায় সেই সুদূর অতীতে কিভাবে উপলব্ধ হয়েছিল জানি না—জ্ঞানলোকে না ধ্যানলোকে। ❑

স্বামী বিবেকানন্দ, বর্তমান সমাজ ও আমাদের দায়বদ্ধতা

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক-গবেষক তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক লেখা পূর্বেও 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হয়েছে। আগামী পৃথিবী ভারতবর্ষের ধর্মাদর্শকে আশ্রয় করেই বাঁচতে পারে, নয়তো ধ্বংস হবে—স্বামীজী বারংবার মনে করিয়ে দিয়েছেন একথা। আজ আমাদের তাই স্বামীজীকে ধরেই পথ চলতে হবে, এই সত্যকে তুলে ধরেছেন প্রবন্ধকার।

স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমান বিশ্বে শুধু একটি নাম নয়, একটি আদর্শ, একটি প্রেরণা। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে এই বিক্ষত পৃথিবীর বুকে সেই আন্দোলনের ধারা অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। সেই মহামানবের মহাপ্রয়াণ শতবর্ষে আমরা হাজির। আজ আধুনিকতা, নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও প্রযুক্তির দাপটে আমরা আদর্শ, মূল্যবোধ ও আনন্দ নামক শব্দগুলি বিস্মৃত হতে চলেছি, যার অনিবার্য পরিণতি হিসাবে গৃহের ভাঙন, প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জঙ্গী আক্রমণ—এমন বহুতর বিচ্ছিন্নতার নগ্নরূপ আমরা নিয়ত লক্ষ্য করছি। কেবল বৃহত্তর সমাজ-বৈকল্যই নয়, ব্যক্তিমানসও অনিশ্চয়তা ও দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত। বিবাহবিচ্ছেদ, নারীর অমর্যাদা, গৃহবধূ হত্যা, শিশু পাচার, বৃদ্ধাশ্রমে বৃদ্ধা মা-বাবার স্থানান্তরণ, মাদকদ্রব্যের রমরমা ব্যবসা, খুন, লুঠতরাজ, নিগ্রহ—এমন বহুতর অসামাজিক ঘটনা আমাদের সংবাদপত্রের শিরোনাম।

স্বামীজীর দেহাবসানের একশ বছর পরে আমাদের দেশের তথাকথিত উন্নয়নের তালিকা নেহাত নগণ্য নয়। গ্রামে বৈদ্যুতিকীকরণ ঘটেছে ভালই; যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে দূরত্বের ব্যবধান আমরা ভুলে গেছি। ডিগ্রিধারী শিক্ষিতের হার প্রশংসার দাবি রাখে। প্রগতিবাদী রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার পৃষ্ঠপোষকতা করেও আমাদের প্রাপ্তির ভাণ্ডার বড়ই নৈরাশ্যজনক ও উদ্বেগের। অথচ এই বাতাবরণেই আমাদের ওঠাবসা ও চলাফেরা। এই যুগযন্ত্রণার শিকার আমরা সবাই। সমাজ নিজের থেকে কলুষিত হয় না, তাকে কলুষিত করে মানুষের লোভ, লালসা ও হিংসা। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির সংগ্রামও চালায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। স্বামীজী তাঁর স্বপ্নের 'নতুন ভারত'-এর এমন চিত্র কখনোই প্রত্যাশা করেননি। তাঁর নিয়ত জাগ্রত দৃষ্টি নিশ্চিৎ আমাদের কাছে কৈফিয়ৎ চাইছে। এই নিবন্ধ সে উদ্যোগেরই এক চালচিত্র।

সঙ্কটের চালচিত্র

এই শতকের সূচনালগ্নে কোন অভিনব প্রত্যাশার অভীপ্সা মানুষের মনে জাগছে না। যদিও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্ভাবনায় আমাদের জীবনে সাফল্য এসেছে অনেক, গতিও এসেছে বেগবতী হয়ে। তবু পৃথিবীর কোথাও আজ মানুষের মনে সুখ নেই, শান্তি নেই—নেই নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা। এপ্রসঙ্গে প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজতত্ত্ববিদ্ অমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাক: "(এই শতকে) আমরা এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছি—যেখানে মানুষ আছে, মনুষ্যত্ব নেই, বাহুবল ও বুদ্ধিবল আছে, চরিত্রবল নেই, পরিশীলিত জীবনচর্যা আছে, কিন্তু কোন মহৎ জীবনদর্শন নেই, চিৎকার আছে, চিন্তা নেই, আস্ফালন আছে, কিন্তু আনন্দ নেই।... আসলে বিশ শতক জুড়ে উন্নত বুদ্ধির জোরে আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছি, কিন্তু সেইসঙ্গে আন্তর শক্তির মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টা আমরা করিনি; ক্ষমতা ও গৌরবের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণের জন্য আমরা সর্বতোভাবে প্রয়াসী হয়েছি, অথচ অটুট নৈতিক সম্বলে মনুষ্যত্বের ফসল ফলাতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি আমাদের জীবনে, আচরণে, আমাদের চিন্তায়, চেতনায়। এর ফলে পৃথিবীর মানুষের এক নিঃশব্দ পশ্চাদপসরণ ঘটে চলেছে পশুত্বের দিকে। অথচ পশুত্ব থেকে উত্তরণেই মানবসভ্যতার উৎকর্ষ ও সাফল্য এবং পশুত্বের হীনতা থেকে যত উর্ধ্বে তার অবস্থান, ততই তার সার্থক অগ্রগতি। দুর্ভাগ্যক্রমে বিশ শতকের বিদায়লগ্নে ও একুশ শতকের সূচনায় এই হীনতাই বড় সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে মানুষের জীবনে। এ কেবল শতাব্দীর সঙ্কট নয়, মানবসভ্যতারও সঙ্কট।"[১]

এই সামাজিক বিপর্যয়ের পিছনে বহুতর কারণ ক্রিয়াশীল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতির পরও তাবৎ বিশ্ব মারণাস্ত্র গঠনে তৎপর এবং সে-কারণে পৃথিবী ঘন ঘনই রক্তস্নাত হচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি স্বাধীন হয়েও যে-স্বয়ম্ভরতার সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হওয়া উচিত ছিল, রাজনৈতিক অদূরদর্শিতায় তা মলিন। সেইসঙ্গে

মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ অর্থকরী ও পেশাদক্ষ শিক্ষায় আমাদের আন্তর চেতনা রুদ্ধ ও নির্বাক। ফলে আচার ও সংস্কারের বেড়াজালে আবার আমরা রুদ্ধ; সমাজের কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, সমাজবিদ্—যাঁদের দায়িত্ব ছিল জনমানসকে আলো দেখানো, তাঁরাও সর্বগ্রাসী রাজনীতির কাছে নতজানু। ফলে উদ্দেশ্যহীন আমাদের যাত্রা।

সঙ্কটমোচনে স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ

পৃথিবীর ইতিহাসে সমস্ত সমাজবিপ্লবের পিছনে আছে আদর্শের অক্ষরেখা আর সংগ্রামী মানুষের ত্যাগ ও সেবা। এই মূল সত্যের দিকে তাকালে আমাদের দৃষ্টি সর্বাগ্রে নিবদ্ধ হয় স্বামীজীর দিকে। স্বামীজীর জীবন ও নির্দেশ (বাণী) মানুষের সুষ্ঠু সমাজবিকাশ ও সমাজবোধের অভ্রান্ত চালিকাশক্তি। আমাদের মোহ ও ভ্রান্তি সেই আদর্শের অভীপ্সার প্রতি আমাদের অনুবর্তী করেনি। আমরা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছি নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে। অন্তত পৃথিবীর তাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুরাগীদের এব্যাপারে ব্যাপক আন্দোলন সংগঠন করা দরকার—যে-সমাজবিপ্লবের উত্তাপ নব-প্রজন্মকে অন্তত স্বামীজীর অনুধ্যানে (মননে ও কর্মে) আবিষ্ট করে। নতুন সমাজ গড়ে তোলার মানসে স্বামীজী নির্দেশিত পাঁচটি শর্তের ভূমিকা ও প্রয়োগের কথা উত্থাপন করা হচ্ছে—যুক্তিবাদ, সততা, পরার্থপরতা, সাংগঠনিক চিন্তা ও নৈতিকতা।

যুক্তিবাদ

যুক্তিবাদ বিজ্ঞানের শিক্ষা। স্বামীজীর জীবনচরিত অনুসরণ করলে বিস্ময়করভাবে এই প্রবণতার সন্ধান মেলে। যুক্তির তৌলে তিনি বাল্যে বিভিন্ন জাতের ব্যক্তির হুঁকো টেনে জাতিভেদের ভিন্নতা পরীক্ষা করেছিলেন; বিশ্বাসে গদগদ না হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব' নিয়ে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন (যদিও পক্ষান্তরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রশংসাই পেয়েছিলেন)। তিনি নিবেদিতাকে বলেছিলেন ঃ "প্রমাণ না পেয়ে কিছুই বিশ্বাস করো না। আমিও আমার গুরুকে যাচাই করে নিয়েছি।"[৩] তিনি আরো বলেছেন ঃ "কোন কথা পুস্তকে লেখা আছে, অথবা কেউ বলেছে বলে বিশ্বাস করো না।"[৪] তাঁর কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছিল বৈপ্লবিক বার্তা ঃ "বেদের যতখানি অংশ যুক্তিসিদ্ধ, আমি ব্যক্তিগতভাবে ততটুকু গ্রহণ করি।"[৫] বস্তুত, এই যুক্তিবাদী মন আজ নির্বাসিত, উপেক্ষিত। কী শিক্ষানীতি, কী রাজনীতি, কী ধর্মনীতি—সর্বত্রই যুক্তিবোধ তিরোহিত। আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও কী বিস্ময়কর অবৈজ্ঞানিকভাবে আমরা অন্যায়ের সঙ্গে, ভ্রান্তির সঙ্গে, লোকাচারের সঙ্গে, ধর্মীয় মৌলবাদের সঙ্গে আপস করে চলেছি। আমরা যুক্তিবাদের কথা কেবল লেখায় ব্যবহার করি, প্রয়োগ করা সেখান থেকে বহুদূরে। আজ এই আত্মসচেতনতা ও আত্মসমীক্ষার দিন এসেছে।

সততা

ব্যক্তিমানুষের বিস্তার সামাজিক মানুষে। এই রূপান্তরণে আবশ্যিক শিক্ষণীয় ও পালনীয় অধ্যায় হলো সততা। 'সত্য' সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রত্যয় স্মর্তব্য। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আরাধ্যা দেবীর কাছে তাঁর ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য, জ্ঞান-অজ্ঞান—সমস্তই সঁপে দিয়েছিলেন, কিন্তু 'সত্য'কে দিতে পারেননি। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে 'সত্য' ছিল 'ঈশ্বর'তুল্য। স্বামীজীর কণ্ঠে প্রায়ই ধ্বনিত হতো ঃ "Say to your mind I am He... I am He. That is the Truth. The infinite strength of the world is yours. Know the Truth, practise the Truth." গান্ধীজীর কণ্ঠেও ঐ সুর বেজেছিল ঃ "Truth is God." স্বামীজী সত্য ও সততা প্রসঙ্গে জোরের সঙ্গে বলেছেন ঃ "সত্যের জন্য সবকিছুই ত্যাগ করা চলে, কিন্তু কোনকিছুর জন্য সত্যকে বর্জন করা চলে না।"[৬] পরে আবার বললেন ঃ "Truth does not pay homage to any society, ancient or modern. Society has to pay homage to Truth or die."[৭] সততার অভাবজনিত সঙ্কট ও সমস্যার চিত্র সর্বত্র। কী গৃহে, কী সমাজে নীতিভ্রষ্টতার যন্ত্রণা আমাদের সকলকেই ভোগ করতে হচ্ছে। ব্যবহারিক জীবনে সততার অর্থ হলো নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা। ঘুষ, কাজে ফাঁকি, স্বার্থপরতা, মিথ্যাকথা বলা, সুযোগ নেওয়া, স্বজনপোষণ, যোগ্যকে বঞ্চিত করা, প্রতিবাদীকে অবরোধ করা, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া—সবই সততার সঙ্কট। বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ গুণার মিরডাল তাঁর 'এশিয়ান ড্রামা' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ "ভারতের অর্থনৈতিক সঙ্কটের মূল কারণ দুর্নীতি।"[৮] তাই আজ যুবসমাজের সর্বাগ্রে দরকার সততার প্রয়োগ—ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে। স্মরণ রাখা দরকার, সৎ সেই-ই—যে অসৎ কাজ করার শক্তি, সাহস ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অসৎ কাজ করে না। স্বামীজীর বক্তব্য—প্রলোভন ও ভয়ের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকাই সৎ বা দৃঢ় চরিত্রের লক্ষণ।

পরার্থপরতা (সেবা)

ত্যাগ ও সেবা ভারতীয় জীবনদর্শনের শাশ্বত প্রবাহ। সেবার অর্থ নিঃস্বার্থভাবে পরের জন্য কিছু করা। স্বামীজী বারবার বলেছেন, 'সেবা'র অর্থ 'সাহায্য' নয়। অন্যত্র বলেছেন ঃ "সাক্ষাৎ ভগবান নরনারায়ণের মানবদেহধারী

হরেক মানুষের পূজা করগে—বিরাটরূপ এই জগৎ, তাঁর পূজা মানে তাঁর সেবা—এর নাম কর্ম।"[৯] "সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া আর অপরের কল্যাণসাধন করা—গাঁয়ে গাঁয়ে যা, ঘরে ঘরে যা; লোকহিত, জগতের কল্যাণ কর—নিজে নরকে যাও, পরের মুক্তি হোক।"[১০] যুবকদের প্রতি তাঁর নির্দেশ— "তুমি তোমার ঘরের দরজাটি খুলে রাখ; তোমার বাড়ির কাছে, পাড়ার কাছে কত অভাবগ্রস্ত লোক রয়েছে, তোমায় তাদের যথাসাধ্য সেবা করতে হবে। যে পীড়িত, তাকে ঔষধ-পথ্য যোগাড় করে দিলে এবং শরীরের দ্বারা সেবা-শুশ্রূষা করলে। যে খেতে পাচ্ছে না, তাকে খাওয়ালে; যে লেখাপড়া জানে না তাকে একটু লেখাপড়া শেখালে। (দেখে নিও) এই সেবা করলে তুমি নিশ্চিৎ মনের শান্তি পাবে।"[১১] সেবার আদর্শ প্রসঙ্গে তিনি সন্ন্যাসীদের জানালেন ঃ "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী কান্না থামাতে, বিধবার অশ্রু মোছাতে, পুত্রহীনার প্রাণে শান্তি দিতে, অজ্ঞ জনসাধারণকে জীবনসংগ্রামের উপযোগী করতে, সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্মসিংহকে জাগরিত করতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।"[১২] এই পরার্থপরতার ব্যবহারিক তাৎপর্য সঠিকভাবে জানলে যেকোন যুবকই এই উদ্যোগে অগ্রসর হওয়ার আগ্রহ পাবে। বস্তুত, অসুস্থ, অভুক্ত বা অশিক্ষিত প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিয়ে সুস্থ সমাজজীবন গড়ে তোলা যায় না। কাজেই নিজেদের তাগিদেই এই সেবাপ্রকল্পে অংশীদার হওয়া দরকার। তাছাড়া দেশের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার বিষয়টিও বিশেষ ভাববার। একজন গ্র্যাজুয়েট তৈরি করতে সরকারের দশহাজার টাকার বেশি খরচ হয় এবং একজন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করতে ব্যয় হয় লক্ষাধিক টাকা।[১৩] এই অর্থ আসে জনসাধারণের রক্ত-জল-করা পয়সায়। কাজেই জনসাধারণের কাছে যেকোন শিক্ষিত তরুণ-তরুণীর অপরিসীম ঋণ রয়ে গেছে। তার বিনিময়ে কিছু সাহায্য ও সহযোগিতা না করলে হয় চরম অকৃতজ্ঞতা। এপ্রসঙ্গে স্বামীজীর ধিক্কারবাণী মনে পড়ে ঃ "যারা লক্ষ লক্ষ গরিব ও নিষ্পেষিত মানুষের বুকের রক্ত দিয়ে অর্জিত অর্থে শিক্ষিত হয়ে এবং বিলাসিতায় নিমজ্জিত থেকেও ঐ গরিবদের কথা একবারও চিন্তা করে না, আমি তাদের বিশ্বাসঘাতক বলি।"[১৪] কাজেই স্বামীজীর নির্দেশ মেনে "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" বোধে প্রতিবেশীর সেবায় এগিয়ে আসাই সমাজবোধের বড় শিক্ষা। এর জন্য আবশ্যক হৃদয়বত্তা, সাহস ও যথার্থ পরিকল্পনা।

সাংগঠনিক চেতনা

কোন বৃহৎ কাজ এককভাবে করা যায় না। চাই যৌথ উদ্যোগ। কাজের মধ্যে নিযুক্ত থাকলে মোহের বিনাশ ঘটে চিত্তের বিকাশ হয়। সাংগঠনিক কাজে আগুয়ান কর্মীদের উৎসাহ দিয়ে স্বামীজী বলেছেন ঃ "শত শত যুবক চাই, যারা সমাজের ওপর গিয়ে মহাবেগে পড়বে... হাজার হাজার পুরুষ চাই, নারী চাই—যারা আগুনের মতো হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী—উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণমেরু—দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়বে।"[১৫] আবার কখনো তরুণদের উৎসাহ দিয়ে বলেছেন ঃ "ওঠ, জাগ, কারণ শুভ মুহূর্ত এসে গেছে... সাহসী হও, ভয় পেয়ো না।... জগৎ তোমাদের আহ্বান করছে। হৃদয়ের উৎসাহের আগুন জ্বেলে জেগে ওঠ। ভেবো না তোমরা গরিব, ভেবো না তোমরা বন্ধুহীন। কে কোথায় দেখেছ যে, টাকায় মানুষ করে? মানুষ চিরকাল টাকা করে। জগতের যাকিছু উন্নতি সব মানুষের শক্তিতে হয়েছে, উৎসাহের শক্তিতে হয়েছে, আত্মবিশ্বাসের শক্তিতে হয়েছে।"[১৬] স্বামীজী-সৃষ্ট সাংগঠনিক ক্রিয়ার উজ্জ্বল নমুনা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। উনিশ শতকে জাতির তমিস্রা ঘোচাতে বনের বেদান্তকে জনজীবনে হাজির করেছেন, যাতে নিয়ত মানবপরিষেবার উদ্যোগটি অব্যাহত থাকে। ১৮৯৭ সালের এক চিঠিতে তিনি তাঁর এক গুরুভ্রাতাকে জানিয়েছিলেন ঃ "প্রচারাপেক্ষা বিদ্যাশিক্ষাই প্রধান কার্য। গ্রামের লোকেদের লেকচারাদি দ্বারা ধর্ম, ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হইবে... বিশেষ ইতিহাস।... আমাদের mission হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভূষার জন্য। ঐ চাষাভূষারা ভালবাসা দেখে ভিজবে; পরে তারাই দু-এক পয়সা জোগাড় করে নিজেদের গ্রামে মিশন start করবে ও ক্রমে ওদের মধ্যে শিক্ষক বেরুবে।"[১৭] সাংগঠনিক কাজে বা যৌথ কর্মোদ্যোগেও নানা সঙ্কট ও সীমাবদ্ধতা আছে, আছে স্থায়ী উৎসাহের ঘাটতি। সেব্যাপারেও স্বামীজী ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। এইসমস্ত সঙ্কট মাথায় রেখে কর্মপন্থা নির্ধারণ ও নেতৃত্বের অবশ্যকরণীয় শর্তও জানিয়ে গেছেন তিনি। স্বামীজীর নির্দেশ মেনে যৌথ কর্মোদ্যোগের বিষয় হিসাবে রাখা দরকার শিক্ষা, চিকিৎসা ও স্বনির্ভরতার প্রকল্প। আবার নেতৃত্ব প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন ঃ "নেতৃত্বের দুটো বড় দোষ—ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে থাকা আর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করা।"[১৮] এই ত্রুটি অনায়াসে দূর করা যায় যদি শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্দেশিত 'বড়মানুষের ঝি' বা 'ঝড়ের এঁটোপাত' হয়ে থাকার মানসিকতা গড়ে তোলা যায়। স্বামীজীর নির্দেশিত পথে সংগঠনকর্মে এগিয়ে আসতে গেলে সকল কর্মীর শিক্ষা নেওয়া দরকার উদারতা, অহংশূন্যতা ও ধৈর্যের অভ্যাস।

নৈতিকতা (ধর্মচেতনা)

আজকের সমাজে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে মূল্যবোধের অবক্ষয়, নৈতিকতার শোচনীয় অবলুপ্তি এবং বোধের অন্তর্ধান। এই অবক্ষয় উত্তোরণে স্বামীজীই আমাদের একমাত্র দিগ্‌দর্শন। তাঁর কথাই স্মরণ করি : "তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী—পবিত্র ও পূর্ণ। মর্তভূমির দেবতা তোমরা। তোমরা পাপী? মানুষকে পাপী বলাই এক মহাপাপ। মানবের যথার্থ স্বরূপের ওপর মিথ্যা কলঙ্কারোপ। ওঠ, এস, সিংহস্বরূপ হয়ে তোমরা নিজেদের মেষতুল্য মনে করছ। এই ভ্রমজ্ঞান দূর করে দাও। তোমরা অমর আত্মা, মুক্ত আত্মা—চির আনন্দময়। তোমরা জড় নও, দেহ নও; জড় তোমাদের দাস, তোমরা জড়ের দাস নও।"[১১] আজকের যুবসমাজের অধঃপতনের বড় কারণ আদর্শজীবন অনুসরণে অনীহা। অধিকাংশ পিতামাতাই তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের 'কেরিয়ার' নিয়ে যত ভাবেন তাদের চিত্তের বিকাশ প্রসঙ্গে তার এককণাও ভাবেন না। মহিলাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কন্যাসন্তানের জীবন শিক্ষা, চাকরি, বিবাহের বৈধিক বিন্যাসরীতিতেই প্রায় সমস্ত অভিভাবক অভ্যস্ত। পরবর্তী কালে অনভিপ্রেত যন্ত্রণার আগমে তাঁরা হাহুতাশ করেন, অথচ ঐ বিন্যাসে নৈতিকতার শিক্ষা বা মননচর্চার একটি পর্ব রাখা যেত। তা আমরা অনায়াসে উপেক্ষা করি। 'কেরিয়ারিজম্'-এর দৌলতে অধিকাংশ যুবকই তাদের সদিচ্ছা ও বুদ্ধির অনুকূল শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পায় না। অভিভাবকের আগ্রহ ও উৎসাহে যে শিল্পী হতে পারত, সে পড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং; যে শিক্ষক হতে পারত, সে পড়ে ডাক্তারি; আবার যে ইঞ্জিনিয়ার হতে পারত সে পড়ে হিসাবশাস্ত্র। এর পরিণাম আজকের হতাশা। তার ভাগীদার সে নিজে, তার সংসার এবং সংশ্লিষ্ট সমাজও।

এপ্রসঙ্গে স্বামীজীর কথায় ফিরে যাই—আধ্যাত্মিকতা ছাড়া কোন সার্থক সমাজবিপ্লব সম্ভব নয়। আবার দর্শনের তত্ত্বকথা দিয়েও কোন সমাজবিপ্লব ঘটানো যায় না। কারণ, জীবনই জীবনকে অনুপ্রাণিত করে। আমরা স্বামীজীর কথা লিখি-পড়ি, কিন্তু জীবনাচরণে তা প্রয়োগ করি না। সেই কারণে আজ প্রত্যেক তরুণ-তরুণীর চোখের সামনে রাখা দরকার স্বামীজীর সেই আগ্নেয় মূর্তি, জেনে রাখা দরকার সেই বজ্রদৃঢ় জীবনপ্রবাহ এবং অনুধ্যান করা দরকার তাঁর বাণীর স্ফুলিঙ্গ। তখন মন আপনিই নেচে উঠবে, হৃদয় উদ্বেলিত হবে এবং স্নায়ু ও পেশী এগিয়ে যাবে যথার্থ কাজের তাগিদে। স্বামীজী-বর্ণিত 'আধ্যাত্মিকতা' তথা 'বেদান্ত' বা 'ধর্ম' প্রসঙ্গে এক বিশেষ বিশ্লেষণী দিয়েছেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ—"ধর্ম মানুষকে কি দেয়? ধর্ম মানুষকে বীরত্ব দেয়। ধর্ম যেমন কখনো ভীরুতাকে প্রশ্রয় দেয় না, তেমনি ধর্ম কখনো লোভকে, স্বার্থপরতাকে, সঙ্কীর্ণতাকে, অন্যায়কে, অসত্যকে। ধর্ম মানুষকে গতির মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে। সে বলে সম্মুখে অগ্রসর হও—চরৈবেতি চরৈবেতি।"[২০] এই ধর্মবোধ আজ দরকার সর্বস্তরের মানুষের মনে—যা তাদের নতুন করে শেখাবে মনের নিয়ন্ত্রণ ও সংযমের সীমানা।

উপসংহার

আজ পৃথিবীর দূরত্ব কমেছে, কিন্তু বেড়েছে মানুষে মানুষে দূরত্ব। পৃথিবীর বহিঃপ্রকৃতি যে-হারে তার ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে, অন্তঃপ্রকৃতি সে-হারে বিকাশ লাভ করেনি। জ্ঞানের মোহজালে আমরা চিত্তের বিকাশকে রুদ্ধ করেছি। সেই কারণে আমরা জ্ঞানী হয়েও হতে পারিনি প্রজ্ঞার অধিকারী। একুশ শতকের শুভলগ্নে আমাদের তাই দরকার সেই আগ্নেয় পুরুষের দিকে তাকানো, তাঁর জীবনী অনুধ্যান এবং তাঁর নির্দেশ অনুসরণ। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণ শতবর্ষে এই প্রতিজ্ঞাই হয় যেন আমাদের একমাত্র মন্ত্র।❑

তথ্যসূত্র

১ 'চতুরঙ্গ', ৫৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মে ১৯৯২

২ চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, ১৯৮৮, পৃঃ ৪৭৫

৩ পরিব্রাজক বিবেকানন্দ—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, শ্রীসারদা মঠ, ১ম সং, পৃঃ ১০

৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ১৯৭৭, পৃঃ ৩২২

৫ আধুনিক দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ—শান্তিনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, মনন প্রকাশন, ১৯৯৪, পৃঃ ৮৭

৬ 'বাণী ও রচনা', ১০ম খণ্ড, পৃঃ ২৭১

৭ Complete works of Swami Vivekananda, Vol. II, 1976, p. 84

৮ অনুবাদঃ রায়হান শরীফ, ২য় খণ্ড, ১৩৮৯, ঢাকা, পৃঃ ১৬৫-১৮৮

৯ 'বাণী ও রচনা', ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮

১০ ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬

১১ ঐ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৫

১২ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১৩৯৩, পৃঃ ১৩৫

১৩ দ্রঃ স্বামীজী-নেতাজীর ভাবনায় যুবসমাজ—মিত্র কৌটিল্য, ১৯৮৭, পৃঃ ২৬

১৪ ঐ

১৫ 'বাণী ও রচনা', ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৫০

১৬ স্বামীজী-নেতাজীর ভাবনায় যুবসমাজ, পৃঃ ২৫

১৭ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১১০

১৮ স্বামীজী-নেতাজীর ভাবনায় যুবসমাজ, পৃঃ ৬৯

১৯ দ্রঃ The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. I, 1986, p. 11

২০ আধুনিক দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ, পৃঃ ৯১

'সেক্যুলারিটি'র জন্যই ধর্ম চাই

অসীমকুমার চৌধুরী

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং দ্বিমাসিক পত্রিকা 'সমাজবাদী ভাবনা'র সম্পাদক অসীমকুমার চৌধুরী আজকের আদর্শসঙ্কটকে তুলে ধরতে চেয়েছেন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে। বলা বাহুল্য, লেখকের বক্তব্য একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব।

মাঝে মাঝে ভাবি, দুনিয়াজুড়ে এই যে যুদ্ধ ও শান্তি মিছিল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সম্প্রীতি মিছিল, কমিউনালিজম্ ও সেক্যুলারিজমের ঝগড়া, দলীয় রাজনীতির লড়াই, ভোগবাদী ও ভোগবাদবিরোধীদের চাপান-উতোর, ব্যক্তিগত স্তরে নানান মাপ ও মাত্রার সঙ্ঘাত চলছে, এসব যদি নির্লিপ্তভাবে দেখতে পারতাম তাহলে বেশ হতো! কিন্তু পারি না মনটাকে সেই উঁচুতে টেনে তুলতে। তাই বোধহয় শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন : "মনেই বদ্ধ, মনেই মুক্ত।" তবে তিনি মুমুক্ষু জীবের কথাও বলেছেন, যারা মুক্তির পথ খুঁজছে। তাঁরই কথায় —সিঁড়ির শেষ ধাপটি ছাদের কাছে হলেও প্রথম ধাপে পা না রেখে তো ওপরে ওঠা যাবে না। আসলে ছাদে ওঠার ইচ্ছাটি চাই। তিনি ইচ্ছা তৈরি করতে বলে ভরসা দিয়েছেন, তাহলেই ওপরে ওঠার চেষ্টা জাগবে। সুতরাং প্রথমে ইচ্ছা, তারপর চেষ্টা।

ভরসার গাঁথনিকে শক্ত করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ— "মুক্তি বা স্বাধীনতার মূর্ত বিগ্রহ—প্রকৃতির প্রভুকে আমরা 'ঈশ্বর' বলিয়া থাকি। আপনারা তাঁহাকে অস্বীকার করিতে পারেন না। তাহার কারণ, মুক্তির ভাব ব্যতীত আপনারা একমুহূর্তও চলাফেরা বা জীবনধারণ করিতে পারেন না।... আপনারা প্রকৃতির 'অধীন'—এই ভাবটি যেমন আপনারা অতিক্রম করিতে পারেন না, এ-ভাবটি যেমন সত্য, তেমনি এই মুক্তির ভাবটিও সত্য।... বন্ধন ও মুক্তি, আলো ও ছায়া, ভাল ও মন্দ—এ-দ্বন্দ্ব থাকিবেই। বুঝিতে হইবে, যেখানে কোনপ্রকার বন্ধন, তাহার পশ্চাতে মুক্তিও গুপ্তভাবে রহিয়াছে।... নিম্নতর চেতনা হইতে ক্রমে মানসিক বা নৈতিক বন্ধনের উচ্চতর ধারণা ও আধ্যাত্মিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগে ও বৃদ্ধি পায়।" বস্তুতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের "মনেই বদ্ধ, মনেই মুক্ত"—এই সংক্ষিপ্ত উক্তিটিকেই স্বামী বিবেকানন্দ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের মনকে আশায় উদ্দীপ্ত করেছেন। তিনি আরো বলেছেন : "যে-ব্যক্তি পাপতাপের মধ্যে অন্ধকারে হাতড়াইতেছে, যে-ব্যক্তি নরকের পথ বাছিয়া লইয়াছে—সেও এই পূর্ণতা লাভ করিবে, তবে তাহার কিছু বিলম্ব হইবে। আমরা তাহাকে উদ্ধার করিতে পারি না। এপথে চলিতে চলিতে সে যখন কতকগুলি শক্ত আঘাত খাইবে, তখন ভগবানের দিকে ফিরিবে; অবশেষে ধর্ম, পবিত্রতা, নিঃস্বার্থপরতা ও আধ্যাত্মিকতার পথ খুঁজিয়া পাইবে।"

স্বামীজী কখনো হতাশার কথা বলেননি। কারণ, তাঁর মতে হতাশা মানে থেমে যাওয়া। আর জীবন মানে হচ্ছে স্পন্দন বা গতি। এই গতিশীলতাই মানুষকে প্রতিনিয়ত নিম্নতর স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করছে। সুতরাং প্রতিকূলতা আসবে, সঙ্ঘাত আসবে, তবু আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ একইসঙ্গে ডারউইনের বিবর্তনবাদ ও হেগেলের দ্বান্দ্বিকতা। আর পাশ্চাত্য দর্শনের দিকেই বা তাকাতে হবে কেন? হাজার হাজার বছর আগে আমাদের বৈদিক ঋষিকণ্ঠেই তো উচ্চারিত হয়েছিল : "চরৈবেতি, চরৈবেতি।" অর্থাৎ "এগিয়ে চল।" শ্রীরামকৃষ্ণও সহজ কথায় শুনিয়েছেন ব্রহ্মচারী ও কাঠুরের গল্প। কাঠুরে ব্রহ্মচারীর কাছে 'এগিয়ে যাও' নির্দেশ শুনে একের পর এক চন্দনকাঠের বন, রুপোর খনি, সোনার খনি, হীরের খনির সন্ধান পেয়েছিল। বলাই বাহুল্য, রূপকার্থক শ্রেষ্ঠ রত্ন হীরাটি হলো প্রকৃতির প্রভু—যাঁকে আমরা 'ঈশ্বর' বলে মানি।

তা তো হলো। কিন্তু তথাকথিত সেক্যুলারিস্টরা যে 'ঈশ্বর' শব্দটির মধ্যে কমিউনালিজমের গন্ধ পান, তার কারণ তাঁরা 'জড়' ছাড়া আর কিছু মানতেই চান না! 'যুক্তি'র বাইরে যাওয়াকে যাঁরা কুসংস্কার বলে মনে করেন, তাঁদের কী হবে? তাছাড়া 'ধর্ম' বলে কথিত যে-বিষয়টি ঈশ্বরের প্রচারক, সেখানেও তো নানা বিভাজন!

এসব কোন নতুন প্রশ্ন নয়। স্বামী বিবেকানন্দ নিজে থেকেই এইসব প্রশ্ন উত্থাপন করে উত্তর দিয়ে গিয়েছেন। তাই তাঁর দেহরক্ষার শতবর্ষ পরে আজ আমরা দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারছি যে, ধর্ম 'অপৌরুষেয়'। তাকে মনুষ্যসৃষ্ট ধর্মমতগুলি থেকে পৃথক করতে সক্ষম হচ্ছি। সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতুর অর্থ 'ধরে থাকা', সেখান থেকেই 'ধর্ম' শব্দটির ব্যুৎপত্তি। সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলছি যে, ধর্মই সমাজকে ধরে রাখে। সুতরাং 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কথাটি সেদিক থেকে সমাজবিরোধী। তবে বিবেকানন্দ অত ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে যাননি। একশো বছর আগেই তিনি সোজাসুজি বাস্তব অবস্থার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন আমাদের।

তিনি বলছেন ঃ “আমরা সকলেই মানুষ, কিন্তু সকলে কি সমান?... আমাদের পরস্পরের মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য, বিদ্যাবুদ্ধির তারতম্য এবং শারীরিক বলের তারতম্য আছে বলিয়া আমাদের পরস্পরের মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য হইতে বাধ্য।” এই পার্থক্য কেবল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নয়, বিভিন্ন মতবাদ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকাকেও তিনি 'ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক' বলেছেন। সুতরাং ভীত না হয়ে মানুষকে এর মোকাবিলা করতে হবে। আর মানুষ সে-কাজটি সফলভাবে করেও চলেছে। মনুষ্যেতর প্রাণিজগতে তাদের সৃষ্টি থেকে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। পিঁপড়ে হোক, কুকুর-বিড়াল হোক, হাতি হোক, হোক না বাঘ-সিংহ—তারা একইরকম রয়েছে। কিন্তু মনুষ্যজগতে বিস্ময়কর সব পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এখানে নিরো, চেঙ্গিস খান, ঔরঙ্গজেব যেমন আছেন, তেমনি আছেন বুদ্ধ, যিশু, নানক, কবীর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ। চণ্ডাশোকের ধর্মাশোকে রূপান্তর, আকবর বাদশাহকেই বা বাদ রাখা কেন!

ইতিহাস থাক। চোখের সামনে যে-জগৎকে দেখছি সে-কথায় আসি। ইংরেজি 'সেক্যুলার' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো পার্থিব বা জাগতিক। জাগতিক বা পার্থিব বলতে প্রাথমিকভাবে বোঝায় যাকিছু বাহ্য বা জড় বা দৃশ্যমান। কিন্তু যা দৃশ্যমান তাই কি কেবল সত্য? মন তো দৃশ্যমান নয়, তা বলে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় কি? যদি বলা হয় যে, অভিব্যক্তি মনের অস্তিত্ব প্রকাশ করে, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়—মন তো উজাড় করে প্রকাশিত হয় না? মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, মোটামুটি-ভাবে মনের দশ শতাংশ প্রকাশিত হয়, বাকি নব্বই শতাংশ রয়ে যায় অবচেতনার গভীরে। 'অচৈতন্য' বা 'অবচেতনার' এক বিজ্ঞান-প্রস্থভিত্তিক গল্প শুনিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—“একজন মূর্খ দাসী বিকারের অবস্থায় অনর্গল লাটিন আওড়াইতে লাগিল। সহজ অবস্থায় লাটিনের বিন্দুবিসর্গও সে জানে না। ক্রমে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, পূর্বে সে একজন লাটিন পণ্ডিতের নিকট দাসী ছিল। যদিও লাটিন শিখে নাই ও জাগ্রত অবস্থায় তাহার লাটিনের স্মৃতি সম্পূর্ণ নিদ্রিত থাকে, তথাপি উক্ত পণ্ডিত কর্তৃক উচ্চারিত লাটিন পদগুলি তাহার মনের মধ্যে সমস্তই বাস করিতেছিল। সকলেই জানেন বিজ্ঞানগ্রন্থে এরূপ উদাহরণ বিস্তর আছে।” অর্থাৎ চোখ ও কানের মধ্য দিয়ে যাকিছু মনকে স্পর্শ করে তার বেশির ভাগই মন অবচেতন স্তরে চালান করে দেয়। সুতরাং যা দেখি বা শুনি তাই কেবল সত্য—এ-ধারণা সত্য নয়।

ধর্ম কী তা জানার জন্য অবশ্য মনোবিজ্ঞানীর কাছে যেতে হবে না। ধর্মের আরেক নাম 'উপলব্ধি'। রবীন্দ্রনাথ বলছেন ঃ “যাহা ধ্রুব তাহাই ধর্ম। এই ধ্রুবের আশ্রয়ে আছে বলিয়াই জগতের মৃত্যুভয় নাই। একটি ধ্রুবসূত্রে এসমস্ত বিশ্বচরাচর মালার মতোন গাঁথা রহিয়াছে। ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তম কিছুই সেই সূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, অতএব সকলেই ধর্মের বাঁধনে বাঁধা। তবে সেই বন্ধন সম্বন্ধে কেহ বা সচেতন, কেহ বা অচেতন। অচেতনের বন্ধনই দাসত্ব, আর সচেতনের বন্ধনই প্রেম।” রবীন্দ্রনাথ আমাদের 'স্বেচ্ছাপূর্বক সচেতন সেই ধ্রুবের অনুগামী' হতে বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ জানতেন বিমূর্তভাবে কোন কথা বললে মানুষ শুনবে না, তাই তিনি পরার্থপরতার উদাহরণ দিয়েছেন। এটি ধর্মের এক প্রকাশ। সার প্রকাশ হলো সাধুতা (honesty)। আরো একটু বিস্তৃত করে বললেন ঃ “ধর্ম হলো প্রেম, ত্যাগ, স্বার্থশূন্যতা, অহিংসা, পবিত্রতা, সত্যানুরাগ, সমন্বয় ও অসাম্প্রদায়িকতা।” ধর্মের নামে এগুলির বিপরীত আচরণ করা হলে তা হবে বিধর্মীয় আচরণ। যে সাম্প্রদায়িক বিশেষণই ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করা হোক না কেন, ধর্মের এই গুণগুলিকে অস্বীকার করা যাবে না। এগুলি হলো সকল ধর্মমতের দার্শনিক ঐক্যসূত্র। যাঁরা ধর্ম না মানার বড়াই করেন, তাঁরা কি সাধুতা ও পরার্থপরতাকে অস্বীকার করতে পারেন? পারেন না। সুতরাং সাধুতা ও পরার্থপরতা পালন করতে পারলেই সুন্দর ধর্মাচরণ করা হবে। তবে কেবল মুখে বললে হবে না। তার জন্য আগে চাই উপলব্ধি। উপলব্ধিতে এলে আচরণে তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটবেই। আর এই উপলব্ধিই হলো আধ্যাত্মিকতা। সাধুতা ও পরার্থপরতা নিয়ে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেকচার দিতে পারি, কিন্তু আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাতে পারি না।

আজকাল আবার সামাজিক ন্যায়পরতা (social justice) নিয়ে মিটিং-মিছিলের চল হয়েছে। আইনও তৈরি হচ্ছে। কিন্তু আইন তৈরি হলেই কি সব হয়ে গেল? সেরকম কতগুলি আইনের সার্থক প্রয়োগ হচ্ছে? বরং দেখা যাচ্ছে মিটিং-মিছিলের কণ্ঠ যত উচ্চগ্রামে উঠছে, আইন পরিষদে যত হৈচৈ বাড়ছে ন্যায়পরতা তত বিঘ্নিত হচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক। কারণ, সঙ্কীর্ণ দলীয় উদ্দেশ্য নিয়ে বা যান্ত্রিকভাবে কোন কাজ করলে তা হয়ে দাঁড়ায় বিধর্মীয় আচরণ। আর বিধর্মীয় আচরণ সমাজের অমঙ্গলই ডেকে আনে। আগে তো ব্যক্তিসকল নিজেদের ন্যায়পরতাবোধে জারিয়ে নেবেন, তবে না তা সামাজিক আচরণ হয়ে দাঁড়াবে। যাঁরা আইন প্রণয়ন করছেন এবং যাঁদের তা

প্রয়োগ করার কথা—তাঁদের নিজেদেরই যদি আন্তরিকতা না থাকে তাহলে আইন বলতে পড়ে থাকে কতকগুলি নীরস শব্দসমষ্টি।

গালভরা সব কথা সরিয়ে রেখে একটি ছোট্ট কথায় আসা যাক। আমরা যারা এইধরনের জ্ঞানগর্ভ বিষয় নিয়ে আলোচনা করি, তাদের মধ্যে কতজন নিজ নিজ সন্তানদের অপরকে ভালবাসতে শেখাই? ভাষণদানের দরকার নেই, এর জন্য পারিবারিক আলাপচারিতা ও আচরণই যথেষ্ট। কারণ, শিশুরা বড়দের দেখেশুনেই বেশি শেখে। বড় কঠিন প্রশ্ন, উত্তর দেওয়া শক্ত! কারণ, সেই শিক্ষাটি দিতে গেলে আমার আপন ভাগেও কম পড়ে যাবে যে! তাহলে আর মিছে ভোগবাদকে গালি দেওয়া কেন! ভোগবাদ তো আর আকাশ থেকে পড়েনি! বিদেশকে দোষ দিয়ে পাশ কাটানো চলবে না, আমরা সে-পথে গেলাম কেন? ভারতীয় ঐতিহ্য তো সে-শিক্ষা দেয় না।

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার বিরোধী তথাকথিত সেক্যুলারিস্টদের সামনে মাত্র দুটি ভারতীয় চরিত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। পুরনো দিনের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং সাম্প্রতিক কালের জয়প্রকাশ নারায়ণ। এঁরা দুজন ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা নিয়ে কোন কথা বলেননি। কিন্তু মানুষের জন্য এঁদের প্রাণ কেঁদেছে। এঁরা মর্মে মর্মে মানুষের দুঃখ-ব্যথা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তাদের জন্য ত্যাগ ও তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পাণ্ডিত্যের পুরস্কারস্বরূপ ঈশ্বরচন্দ্র 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পেয়েছিলেন, কিন্তু তার চেয়েও বড় পরিচয় হলো গরিব-দুঃখী মানুষের দেওয়া উপাধি—'দয়ার সাগর'। আরো বলা যায়। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে থেকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রলোভন জয়প্রকাশ নারায়ণের সামনে রাখা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা উপেক্ষা করে 'অন্ত্যোদয়'-এর জন্য নিবেদিতপ্রাণ হলেন। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি না থাকলে এসব করা যায় না।

আর যাঁরা 'যুক্তি'র দোহাই দিয়ে আধ্যাত্মিকতাকে এড়িয়ে যেতে চান তাঁদের সবিনয়ে যুক্তির আপেক্ষিকতা ও সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যাক। আধ্যাত্মিকতার কোন সীমা নেই, তলও নেই। তা বলে আধ্যাত্মিকতা যুক্তিকে মোটেই অগ্রাহ্য করে না, বরং তাকে সরস ও সজীব করে তোলে। তাই তো আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের নতুন শব্দচয়ন—'আবেগোচ্ছল বুদ্ধি' (emotional qualient)।

চার্বাকপন্থী বস্তুবাদীরা হয়তো এই ভেবে আত্মতৃপ্ত হচ্ছেন, সবার পক্ষে যেহেতু বিদ্যাসাগর বা জয়প্রকাশ নারায়ণ হওয়া সম্ভব নয়, আর একটাই যখন জীবন তখন ভোগসুখকে সঙ্কুচিত করে বৃথা কষ্ট পাই কেন। তাঁদের জ্ঞাতার্থে প্রথমে জানানো যেতে পারে যে, দীর্ঘদিনের নজিরবিহীন আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে তাঁরা ঐতিহাসিক চরিত্র হয়ে উঠেছেন। এর চেয়েও বড় যে-কথাটি রয়েছে তা হলো, এই দেশেতেই আজও এমন অনেক সাধারণ মানুষ আছেন যাঁরা নীরবে আর্ত মানুষের সেবা করে চলেছেন। সংসারী মানুষ, সামান্যই রোজগার তবু তা থেকেই কিছুটা অন্তত দীনদুঃখীর সেবায় ব্যয় করে তাঁরা আনন্দ পান। তাঁদেরও রয়েছে বিবেক, বৈরাগ্য, প্রেম। বিবেকানন্দ বলেছিলেন ঃ "তোমরা ভুল করিয়া যাহাকে মানুষ বলিয়া আখ্যা দাও আমি সেই ঈশ্বরের পূজা করি।" নামযশের আকাঙ্ক্ষাহীন এই সাধারণ মানুষেরা স্বামীজীর পথেই চলেছেন—হয়তো অনেকে তাঁর এই বাণীটি শোনেনইনি, শুধু উপলব্ধির আনন্দে পথটি বেছে নিয়েছেন। এঁদের মধ্য দিয়েই পূজিত এবং পূজক একাকার হয়ে উঠেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত 'ভাগবত-ভক্ত-ভগবান' বাণীর সার্থক রূপকার এঁরাই। বুদ্ধিজীবীরা নন, রাজনীতিকেরা নন, আবেগোচ্ছল বুদ্ধিসম্পন্ন এই সাধারণ মানুষেরাই যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষকে স্বাতন্ত্র্য দিয়ে চলেছেন, ঐতিহ্যকে করেছেন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর।

সুতরাং ধর্ম একটাই। সাধুতা ও পরার্থপরতার উপলব্ধিতে উদ্দীপিত হয়ে ত্যাগ ও সেবায় 'মানুষের পূজা' করা। 'সেক্যুলারিস্ট' বলে কোন মতগোষ্ঠী গড়ে তোলা 'অচেতনের দাসত্ব' বৈ আর কিছু নয়। চাই 'অনুভব'। মর্মে মর্মে যদি অনুভব করতে পারি যে, 'মূর্খ-কাঙাল, দ্বিজ-চণ্ডাল—দেবতা আমার, এরা সবাই', তাহলেই হবে ধর্মের অনুষ্ঠান, সেক্যুলারিটির প্রতিষ্ঠা। ❑

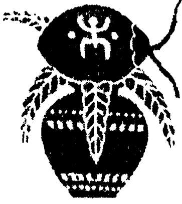
রচনাসূত্র

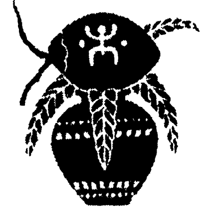
(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন কার্যালয়
(২) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়
(৩) বিবেকানন্দ-কথোপকথন, উদ্বোধন কার্যালয়
(৪) রবীন্দ্র-রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সং, ১৪শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
(৫) কথাপ্রসঙ্গে ঃ 'ধর্ম ও সংস্কৃতি', 'উদ্বোধন', চৈত্র ১৪০৭
(৬) কথাপ্রসঙ্গে ঃ 'বিবেকানন্দো জয়তি', 'উদ্বোধন', মাঘ ১৪০৮
(৭) শ্রীরামকৃষ্ণকেই আজ আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬ মার্চ ২০০২

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো—সম্পাদক

দেবী দুর্গে নমস্তে*

স্বামী গর্গানন্দ





নমো ব্রহ্মশক্তে শুভে মাতৃমূর্তে
ত্রিনেত্রে শরণ্যে নমো বহ্নিবর্ণে।
অনন্তে চ দেবাঙ্গ-তেজো-বিমূর্তে
মহাদেবি দুর্গে জয়স্তে নমস্তে।।১

হে ব্রহ্মশক্তি কল্যাণময়ী মাতৃমূর্তি,
হে ত্রিনয়নে শরণ্যে অগ্নিরূপিণি, তোমায় নমস্কার।
হে অনন্তে এবং দেবগণের দেহ-তেজ থেকে মূর্তিধারিণি,
হে মহাদেবি দুর্গে, তোমার জয় হোক, তোমায় নমস্কার।।১

মহাসিংহপৃষ্ঠে হি দণ্ডায়মানা
দশাস্ত্রৈরহো মণ্ডিতা চারুহস্তা।
ত্বমাদ্যা জয়ন্তী রণে দৈত্যহন্ত্রী
মহাদেবি দুর্গে জয়স্তে নমস্তে।।২

আহা! মহাসিংহের পিঠে দণ্ডায়মানা তুমি দশবিধ
অস্ত্রে সজ্জিতা সুন্দর হস্তধারিণী।
তুমি জগতের আদি, জয়ন্তী এবং যুদ্ধে দৈত্যনাশিনী;
হে মহাদেবি দুর্গে, তোমার জয় হোক, তোমায় নমস্কার।।২

ললাটার্ধচন্দ্রা সুমঞ্জীরপাদা
কিরীটাঙ্গদা কুণ্ডলা রক্তবস্ত্রা।
লসৎহাররত্নাদ্যলঙ্কারভূষা
মহাদেবি দুর্গে জয়স্তে নমস্তে।।৩

তুমি ললাটে অর্ধচন্দ্র, চরণে সুন্দর নূপুর এবং
কিরীট, অঙ্গদ, কুণ্ডল ও রক্তবস্ত্র-ধারিণী।
তুমি উজ্জ্বল কণ্ঠহার, রত্নাদি অলঙ্কারে ভূষিতা;
হে মহাদেবি দুর্গে, তোমার জয় হোক, তোমায় নমস্কার।।৩

ভয়াৎ তাপদুঃখাৎ সদা ত্রাহি বিঘ্নাৎ
প্রযাচে হি ভক্তিং তব শ্রীপদাব্জে।
প্রসীদাম্ব নিত্যে সুতে স্নেহসিক্তে
মহাদেবি দুর্গে জয়স্তে নমস্তে।।৪

হে জননি, ভয় তাপ দুঃখ ও বিঘ্ন থেকে সর্বদা (আমাকে)
উদ্ধার কর; তোমার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি প্রার্থনা করি।
হে নিত্যে, সন্তানে স্নেহময়ী জননি, (আমার প্রতি) প্রসন্ন হও;
হে মহাদেবি দুর্গে, তোমার জয় হোক, তোমায় নমস্কার।।৪

ভদ্রকালীং মহাশক্তিং কাত্যায়নীং বরপ্রদাম্।
মঙ্গলাং বিমলাং দুর্গাং বন্দে শ্রীকৌশিকীং শিবাম্।।৫

ভদ্রকালী মহাশক্তি কাত্যায়নী বরদাত্রী এবং মঙ্গলা বিমলা
শিবা শ্রীকৌশিকী দুর্গাকে বন্দনা করি।।৫

উগ্রচণ্ডে নমস্তুভ্যং বরদে পরমেশ্বরি।
অভয়ে জয়দে মাতঃ সুপ্রসন্নে নমোঽস্তু তে।।৬

হে উগ্রচণ্ডে, বরদে পরমেশ্বরি, তোমায় নমস্কার।
হে অভয়ে জয়দে সুপ্রসন্নময়ি জননি, তোমায় নমস্কার।।৬

* 'ভুজঙ্গপ্রয়াত' এবং 'অনুষ্টুপ্'-ছন্দে রচিত

আগমনী

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

ঘন তমসায়, রুদ্ধ দুয়ারে
মৌন মনের পুরে
সুর-হারা গান গাহিতেছিলাম
বোবা বেদনার সুরে।
মধুমাসে নব বিহগ-কাকলি
ধ্বনিত না সেথা ঝঙ্কার তুলি
ফুটিত না ফুল, উঠিত না চাঁদ
মলয় দিত না দোলা
রুদ্ধ মনের দখিন দুয়ার
সেদিন ছিল না খোলা।



সজ্জা-হারা এ রিক্ত পুরীতে
ফুল-আভরণে সেজে
অঞ্জলি ভরি মধু জোছনায়
পুঞ্জ ছড়াল কে যে!
দাঁড়াল আমার আঁখির দুয়ারে
অঙ্গ-সুরভি ছড়ায়ে দুধারে
সুর-হারা মনে গান জেগে ওঠে
ফুল ফোটে মরা শাখে,
মধু জমে ওঠে বিরস মনের
মধু-হারা মৌচাকে।

জোছনায় ভরা পূর্ণিমা রাত
কোথা দিয়ে আসে যায়
কোন ঠিকানাই ছিল না তাহার
সেই ঘন তমসায়;
কোন্ তরুশাখে এল নব পাতা,
কচি ঘাসে কোথা সুখাসন পাতা,
কোথা বনলতা সেজেছে ফুলের
নবমুকুলের ডোরে
মধু ঋতুটির সে গূঢ় বারতা
দেয়নি তো কেহ মোরে।

সহসা কাহার নূপুর-ছন্দে
ভরিল অন্ধকার
পদ্ম-হাতের ছোঁয়া লেগে কার
খুলিল বন্ধ দ্বার!
আকাশের হাসি খোলা বাতায়নে
বাতাসের বাঁশি উদার গগনে,
এ কী বিস্ময়! মৌন পাষাণে
এল কোন্ সজীবতা!
অন্ধকূপের গর্ভগুহায়
আলোকের আকুলতা!

বেদনা-ভোলানো, অমৃত-চোয়ানো
আদরে কে তুমি এলে?
শান্তিহারা এ-মনের মরুতে
রস-নির্ঝর ঢেলে!
নবযৌবন শোভা ঢল ঢল
দুর্গা! তোমার লীলা উৎপল
ফুটায়ে জীর্ণ জীবন-বৃন্তে
কে তুমি আসিলে বল,
বর্ণ, গন্ধ, রূপের প্রভায়
মৃতপুরী ঝলোমলো।



স্নেহময়ী মা

সেকেন্দার আলি সেখ

তোমার নামের স্নিগ্ধ ছায়া
ছড়িয়ে পড়ে আসমানে
তোমার নামের শাশ্বত সুখ
হাট-বাজারে সবখানে।

তোমার পথে শান্তি আসে
দেয় নিভিয়ে সব জ্বালা
তোমার পায়ে হৃদয় ভ'রে
পরিয়ে দেব ফুল-মালা।

তোমার নামের মধুর মোহে
গাইছে পাখি প্রেমের গান
তোমার কথার অমৃত-রস
দেয় ছড়িয়ে খুশির তান

সরিয়ে কালো ভরিয়ে আলো
স্নেহময়ী মা আসে
রোগ-শোক-তাপ সব ভুলিয়ে
ধরার বুকে মা হাসে।

এক উৎস

শক্তিচরণ চট্টরাজ

আত্মার অন্তরে,
তোমার ধর্মের বাণী প্রত্যেকটি স্তরে
নিভৃতে সঞ্চিত আছে; তাই ধমনীতে
অস্থি, মজ্জা, প্রশিরায়, ছুটন্ত শোণিতে,
অস্থির স্পন্দন তার উৎকণ্ঠিত হয়ে
শুনতে যে পাই; দীপ্ত সেই বাণী বয়ে
নিজেকে সার্থক মানি; তার আলো দেখে
ক্ষুদ্রতা অন্ধতা যত দীন চিত্ত থেকে
নির্বাসে দিয়েছি আমি স্বেচ্ছায় নিঃশেষে,
নিজেকে নামিয়ে পথে সর্বহারা বেশে।
শাশ্বত সে-ধর্ম থেকে নির্বারিত স্রোতে
অফুরন্ত প্রাণ পেয়ে সতেজ সত্যাতে
আমি আজ প্রাণবন্ত; তাই আমি কবি
তাই আমি যোগাসীন, ধার্মিক, বিপ্লবী!

অন্য পৃথিবী

বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি এখন উদ্বোধনে—
মায়ের ঘরের সেই ছবির দিকে অপলক তাকিয়ে আছি।
মায়ের বাড়ির প্রবেশদ্বার দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম।
সমুখ-পানে মায়ের ছবি
পা ছড়িয়ে বসে আছেন মা
আলোক-উজ্জ্বল তিনি।
মা যেন বলছেন—'এসো বাছা, তোমাদের জন্যই তো
অহর্নিশ বসে থাকা।
দেখছ না দ্বারে কোন রক্ষী নেই—
এই দ্বারের রক্ষী তোমাদের এই মা।'
অফিসঘরের দেওয়ালে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি
তাঁর ভাবে বিভোর হয়ে আছেন।
যেন বলছেন—'তোমাদের জন্য আমিও এখানে সদাজাগ্রত রয়েছি
মান এবং হুঁশ দেওয়ার জন্য।'

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলাম—
ভিতরে কি প্রচণ্ড শিহরণ আমার।
সামনে স্বামী সারদানন্দের ঘর
মায়ের অতন্দ্র দ্বাররক্ষী।
সেই ঘর পার হয়ে গুটি গুটি এলাম
মায়ের ঘরের সামনে।
চোখদুটো আমার এখন ভেজা
মা আমার চোখ আনন্দে ভিজিয়ে দিলেন।
আমি শুধু মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি—
শুধু তাকিয়ে আছি
সম্মোহিত আমি।
'মা' নামে এত মধু, এত মায়া, এত বিস্ময়ও লুকানো থাকে?
মায়ের দুচোখ জুড়ে মায়া
হৃদয় জুড়ে করুণা
মায়ের সর্বাঙ্গে স্নেহ যেন উপচে পড়ছে—
এই না হলে বিশ্বের জননী হওয়া যায়?
দুঃখের দিনে মায়ের কাছে যাই
সুখের দিনে মায়ের কাছে যাই
তাপিত হৃদয় নিয়ে মায়ের কাছে যাই—
ঐ মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকি।
মনে হয় কে যেন আমার সারা শরীরে
ছড়িয়ে দিচ্ছেন শান্তি আর ভালবাসা।

নতুন জীবন নিয়ে মায়ের বাড়ি থেকে
বেরিয়ে আসি।
উদ্বোধনে অন্য পৃথিবী।

[illegible]মন্ত্রণ

[illegible]স্মরণকুমার বিশ্বাস

[illegible] লেখার দিন আজ নয়,
আলোচনা জ্ঞান-বিজ্ঞানের।
কানামাছি আর লুকোচুরি [illegible]
[illegible] আর সম্মানের।

শকুনির পাশা—দাবার খেলায়
আলো-উজ্জ্বল কালো এ-রাত
[illegible] কেউ বলছে আবার
বলছে না কেউ কিঞ্চিৎমাত।

তোমরা মানুষ পার নাকি কেউ
কর সে-যন্ত্র আবিষ্কার
প্রেম-পীরিতির অমৃতআলোকে
তাজমহল গড় ভালবাসার।

জান যদি কেউ সে-মন্ত্রপাঠ
সে-মন্ত্র কর উচ্চারণ
নতুন বিশ্ব গড়ার মিছিলে
তবেই তোমার নিমন্ত্রণ।

তুমিই পার

[illegible]বাস[illegible] ভট্টাচার্য

কোথায় [illegible] এ [illegible],
কাঁটাগু[illegible] ছায়ায় [illegible] কখন।
একটা [illegible] আমি কোনদিন পারিনি [illegible],
খুঁজিতে [illegible] হাত করেছি কাঁটাতে।

তুমি [illegible]!
রক্তা[illegible] কি পদ কাঁটায় কাঁটায়!
কাঁটা[illegible] দেখি চকিতে কখন
[illegible]প হয়ে জুড়ায় নয়ন।

[illegible] পার আপন খুশিতে অকারণে
বনকে বদল কর কুসুমকাননে।

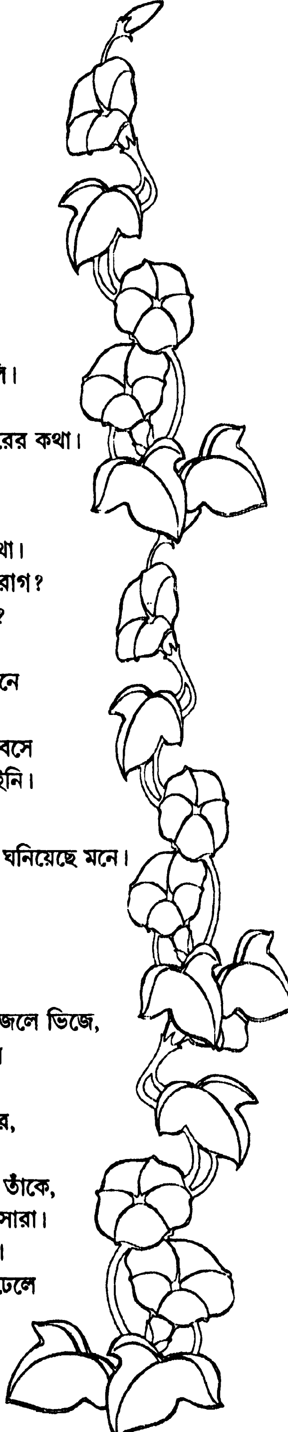
দাবী

উমা দে শীল

সংশয় অঞ্জনমাখা কুয়াশাঢাকা দৃষ্টি,
সজারুর তীক্ষ্ণ কাঁটায় বিঁধেছ আমায়
সারাটা জীবন।
'বলো কে সে? কোথায় রেখেছ তাকে?'
দুহাতে আগলে আঁচলে ঢেকেছি তাঁকে?
বলিনি কিছু।
পিছু পিছু তাড়িয়ে নিয়ে হেঁটেছ অনেক।
লুকিয়ে দেখেছ কি করি, কাকে নিয়ে চলি।
তবুও জাননি, জানতে পারনি
আভরণহীনা ছিন্ন আবরণা রিক্তার অন্তরের কথা।

শ্রাবণের মেঘঢাকা কালো চুলে ঢল
আকর্ষণে আকর্ষণে
কতবার এঁকেছ সে দ্রৌপদীর কাহিনী-কথা।
বল কেন তোর এই বৈরাগ্য, এত কী বিরাগ?
কার জন্য কেঁদে কেঁদে কাটে তোর রাত?
বলিনি কিছু।
দুহাতে অশ্রু মুছে প্রতিদিন অবগাহন স্নানে
ধুয়েছি এই নীচতার ক্লেদ যত।
দুমুঠো ভাতের প্রত্যাশায় দাওয়ায় বসে বসে
শেষ করেছি বেলা। হয়তো বা তাও পাইনি।

তবুও পাওয়ার ছিল কিছু।
বাল্যপ্রেমের অপূর্ব অনুভূতি দিনে দিনে ঘনিয়েছে মনে।
সেই না-বলা কথা আজ রেখে যাই
উত্তর খুঁজে পেতে পার।
কিশোরী যখন, পেয়েছিলাম তাঁকে।
কত লুকোচুরি খেলা,
নদীতে ঢেউ ঠেলে ঠেলে, শ্রাবণের ধারাজলে ভিজে,
গাছের পাতায় পাতায় ডালে ডালে দুলে
আকাশে বাতাসে ঘাসে মাটিতে
রোদ-ঝলসানো দুপুরে, রাতের অন্ধকারে,
তারায় তারায় জোনাকির আলোয়।
রূপোগলা জ্যোৎস্না ধীরে ধীরে ঢেকেছে তাঁকে,
কেঁদে কেঁদে খুঁজেছি তখন, কেঁদে কেঁদে সারা।
অকস্মাৎ ধরা দিয়ে ধন্য করেছেন তিনি।
অন্তরের অনুভবে কানায় কানায় প্রেম ঢেলে
বসেছেন একান্তে।
সেই থেকে একা একা ডাকা,
একা একা থাকা।
তাঁরই সঙ্গে কান্নাহাসির বেলা অবসান



যত ভালবাসা যত কিছু চাওয়া-পাওয়া
শুধু তাঁকে ঘিরে।

অবিশ্বাসের বেড়া ভেঙে
পথের ধারে আসন পেতে প্রতীক্ষায় থাক।
নত হও।
ডাক দাও। বল,
প্রভু, আমি যে চাই। দাও আমাকে,
তোমাকেই।

বেশ আছি

ভবানীপ্রসাদ দে

আমার পাগল হওয়ার কী প্রয়োজন?
বেশ তো আছি, দ্বৈতের বোধে, লীলার মজায়,
রসেবশে। অফুরান উদাসী সময়
কী মধুর শৈল্পিক চেতনায়
অসীম শূন্যের ক্যানভাসে
রূপ থেকে আনে রূপান্তর।
জন্ম থেকে জন্মান্তরে
স্মৃতির ঢাকনা খুলে মুগ্ধ মন মেলে দেখি
নীলাকাশে শ্যামল দিগন্তে
সেই চলচ্চিত্রের রূপকার
সর্বত্র!
টুকরো টুকরো জীবনের
অগণিত ঘটন অঘটনের যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ
গণিত-পথের শেষে সেই এক কাঙ্ক্ষিত মঞ্জিল—
'ভূমা'। ধ্যানাতীত করুণা
ছড়ানো বিলানো সেই পথে
অযাচিত। অহৈতুকী কৃপা।
আর আছে রাশ ঠেলে দেওয়া
যাকে যেমন তাকে তেমন।
তাই ভেবে ভেবে গায়ে কাঁটা।
কান্না-আনন্দের স্রোত
মূলাধার হতে উঠে এসে অনাহতে দুরন্ত ঘূর্ণি
তারপর বিশুদ্ধচক্রে বাষ্পরুদ্ধ
ঝরঝর বৃষ্টি ঝরে সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ
এই পৃথিবী-শরীরে ঘাস-গাছ-রোম খাড়া।
নিবিড় সুখে গভীর দুখে
দেখা না-দেখায় মেশা
এই নন্দন মাধুরী ছেড়ে
দেখা-শেষের ব্যাকুলতায়
খেলা-শেষের আকুলতায়
পাগল হওয়ার কী প্রয়োজন!

পরা পরানাং পরমা

সতীপ্রসাদ ভট্টাচার্য

পরমেশ্বরী তুমি নিত্যা হয়েও পুনঃপুনঃ আস
সমরে নিঠুরা তবু চিত্তে কৃপা নিয়ে নিরন্তর ভালবাস।
দুর্গমে স্মরণে দুর্গা দূর কর সদ্য সকলের ভয়
দৈন্য-দুঃখ নিবারণে এজগতে মাগো তুমি বিনা আর কেউ নয়।।

তোমার তৃপ্তির লাগি যাকিছু সকল কাজ করি নিবেদন
ঘুচাও যন্ত্রণা মোর, তোমারই যন্ত্র করে তোল দেহমন
যেভাবে যখনি ডাকি, সাড়া দিয়ে কর মা নির্ভয়
যেথা যেমন আছি গাহি জয় মাগো শুধু তব জয়।।

তোমারই সৃষ্ট জীব তোমা ভুলে যবে করে অহঙ্কার
তখনি চেতনা দিতে বজ্রসম দাও ঘোর হুহুঙ্কার।
আমি ও আমার ছেড়ে প্রাণপণে খুঁজি কোথা তুমি, শুধু তুমি
চরণে শরণ নিয়ে বাক্যমনাতীত অম্বে তোমারে প্রণমি।।

পলকে প্রলয় করে তুমি মুছে দাও পাপের কালিমা
আবার করুণা সিঞ্চনে তুমি উষর প্রান্তরে আন শস্যশ্যামলিমা।
কাম ক্রোধ লোভে মত্ত অসুরে নিধন কর ত্রিশূল আঘাতে
সুবোধ সন্তানে তুমি রক্ষা কর নিয়ে শস্ত্র দশহাতে।।

ধ্যানের ধারণা নিয়ে কী যে করি তব পূজাছলে
চকিত দর্শনে হাসি, কখনো বা ভাসি আঁখিজলে।
স্বামীজীর 'জ্যান্ত দুর্গা' মা সারদা এলে জগৎকল্যাণে
দ্বিভুজা জননী-রূপে এসে কোলে নিলে নির্বিচারে সকল সন্তানে।।

সত্যিকারের মা

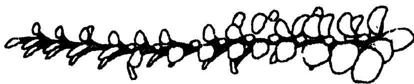
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

এই ছেলে তুই রোদে পুড়িস?
এই চেয়ে দেখ শীতল আমি
সবুজ ছায়া গাছ।
এই ছেলে তোর তেষ্টা বুকে?
এই দেখ তোর ঝরনা আমি
ভাসিয়ে দুকুল নাচ।

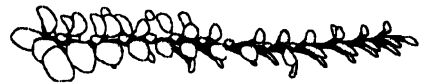
পথভোলা তুই পথিক ছেলে?
এই দেখ তোর পথের পাশে
সাজিয়ে আমি ঘর।
চোখের বানে গাঙ ভাসালি?
হাত বাড়ালাম—হাত বাড়া তুই
তুই ছেলে কী পর?

আমিও যা সে তুইও তো তাই
চিনলি না তো? তাকা,
চোখটা বুজে তাকা না।

আঁচল পেতে বসে আছি
আয় না ছেলে আয়
আমি যে তোর সত্যি সত্যি 'মা'।

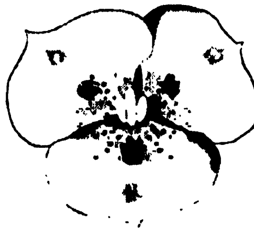


লীলা



এন. পিচ্চমূর্তি

জন্ম পৃথিবীতে
কিন্তু আকাশে সঞ্চরণের আকাঙ্ক্ষা,
চলছি পায়ে হেঁটে
অথচ উড়ে বেড়াবার ইচ্ছা,
আকাশ হও।
ভূমির বাসনা
বাদল বর্ষানোর,
বিজলি খোঁজে
জমির সার—খাদ,
খাদ ফুল হতে আকুল।
লোহা চুম্বককে খোঁজে,
শুকনো ঘাস আগুনের জন্য ব্যগ্র।



নিঃসঙ্গ ঘরের সন্ধান করে
গৃহস্থ চায় সন্ন্যাস।
আমি চাই 'তুমি' হয়ে যাই,
তুমি চাইছ
সৃষ্টিতে পরিবর্তন।

তামিল ভাষায় লিখিত মূল কবিতাটির হিন্দি রূপান্তর করেন মীনাক্ষী পুরী। সেই হিন্দি রূপান্তরের বঙ্গানুবাদ করেছেন হিমাংশুশেখর চক্রবর্তী।

মাকে ডাকা

দীপক বাগচী

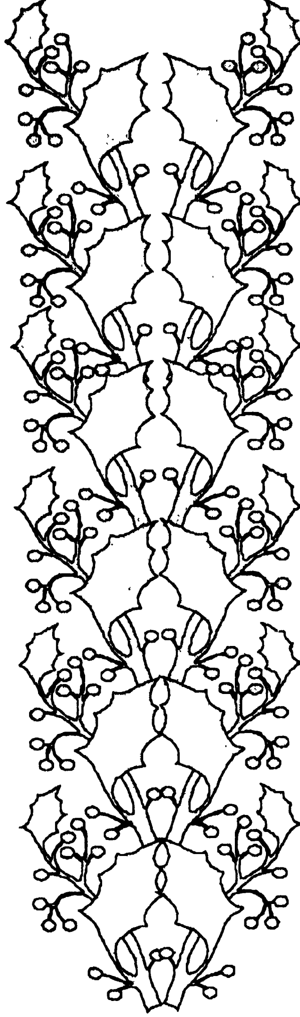
ডাক দেখি মাকে একমনে,
বসে কোণে, কিংবা বনে;
ডাকার মতো
ডাকলে, কত-
দিন দেখি মা না শোনে?

সব অকাজের সময় মেলে;
আসল কাজ না রাখিস ফেলে।
ডাকরে মাকে,
সময়টাকে
দিস না যেতে হেসেখেলে।

মানব-জনম বৃথাই যাবে?
এমন সুযোগ কি হারাবে?
মায়ের কাছে
কী লাজ আছে?
চাইলে পরে তবেই পাবে।

ভালবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি,
মায়ের পায়ে অনুরক্তি
থাকলে তবে
মিলবে ভবে
মুক্তি, মনে আসবে শক্তি।

গেয়ে মায়ের স্তুতিগাথা,
নেরে চেয়ে আসল যা তা;
মায়ের পদে
ভক্তি-মদে
দে লুটিয়ে তোর ঐ মাথা।



জাগো

স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ

জাগো জাগো ওগো সন্ন্যাসিনি
শিব-সোহাগিনি, মুক্তবেণী-শ্মশানবাসিনি,
জাগো শক্তি জাগো মা চিন্ময়ি
জাগো মৃত্যু-তৃষাতুরা পাগলিনি রক্তবীজক্ষয়ি।

এসো মা প্রলয়ঙ্করি পিছে ফেলি ধূমকেতু ছায়া
দিকে দিকে বিথারিয়া প্রলয়ের কুজ্ঝটিকা মায়া
করালবদনি—ওমা বিবসনা—
লোল তোর শিখাময়ি বিদ্যুৎরসনা,
অন্ধকারে লকলকি উঠুক ঝলকি,
চকিতে চমকি
মূর্ছা যাক যজ্ঞনাশী দর্পিত অসুর
লঘু হোক ধরা-বক্ষ-যুগান্তের ব্যথা ভারাতুর।

সুতীব্র আসবপানে রক্তচক্ষু এসো ত্রিনয়নি,
মাৎসর্যের দম্ভদণ্ড চূর্ণ করি করালবদনি।
প্রাচুর্যের ভস্মস্তূপে কামনার সমাধি রচিয়া,
ধ্বংসোল্লাসে উল্লসিত হিয়া।
এসো এসো সংহারস্বরূপা
খড়্গহস্তে ছিন্নমস্তা রুধিরলোলুপা।

মহাকালি—কালের প্রেয়সি
জাগো তারা মাতঙ্গিনি ধূমাবতি অরূপা ষোড়শি—
জাগো জাগো শিব-হৃদি-বিহারিণি মুণ্ডমালিনি
শতঝঞ্ঝা দুর্বিপাকের ধাত্রীরূপিণি।

নররূপধারিণি দুর্গে! মা সারদে

শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়

দয়াময়ী মা যে তুমি দূর কর মা কালো,
অজ্ঞানেতে ভাসছি মোরা জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালো!
দুঃখ-দৈন্য দূর কর মা দাও গো শুভ-মতি,
শেষ কর মা কলুষ-কালি দিয়ে দিব্য জ্যোতি!
এই মিনতি জানাই দেবী, চাই না কিছু আর—
তোমার হাতেই আছে জানি এই ভুবনের ভার।
লক্ষ্য সবার তোমার দিকেই, তুমিই জগৎ-মাতা—
দাও শুভাশিস জগন্মাতা—সবার পরিত্রাতা!

সন্ত্রাস করো নাশ

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

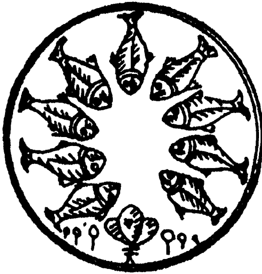
সন্ত্রাসে রক্তাক্ত আজি জননী বসুন্ধরা,
চারিদিকে দেখ মানবতা শুধু রক্তঝরা।
বিশ্বব্যাপী ঘৃণা, দ্বেষ, হানাহানি, শোক, বিপন্নতা,
চঞ্চল করে নাকি হৃদয় তোমার—এসব বারতা?
তবে কেন বিষ্ণুমায়া দেবি দুর্গে প্রণবরূপিণি
সন্ত্রাস দমনে অবতীর্ণা না হও জননি?
তোমার কঠিন-হাতে এত প্রহরণ, হানো গো আঘাত,
বসুধার বুক থেকে সব দুরাচার করো উৎখাত!
হৃদয়বেদিতে স্থাপিয়া তোমায় মাগো—এই প্রার্থনা,
চিরতরে ধরা হতে মুছে দাও সন্ত্রাস যাতনা।

অবলুপ্তির পথে দশাবতারী তাস

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

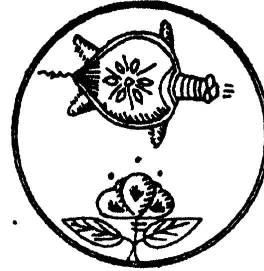
প্রাচীন ভারতে নানান ক্রীড়া ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছিল। তার অনেকটাই বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেছে। ক্রীড়া-সাংবাদিক জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐতিহ্যপূর্ণ একটি ক্রীড়ারীতির সুন্দর তথ্যমূলক আলোচনা করেছেন।

'তাস, দাবা, পাশা—তিন কর্মনাশা।' প্রবচনটি উত্তর আধুনিক সভ্যতার প্রেক্ষিতে অন্য এক তাৎপর্য বহন করে নিয়ে এসেছে। আজ আর দাবা বা তাসকে কেউ উপেক্ষা করে না, বরং দাবা এবং তাসের মধ্যে ব্রিজ খেলোয়াড়দের আজকের সমাজ বৌদ্ধিক উৎকর্ষতার নিরিখে অগ্রগণ্য শ্রেণী হিসাবে মনে করে। দাবা ও ব্রিজের নিজস্ব অলিম্পিক হয়, মূল অলিম্পিয়াডেও অদূর ভবিষ্যতে দাবা সংযোজিত হতে পারে। দাবার মতো তাসেরও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অসংখ্য টুর্ণামেন্ট হয়। এ সবই অবশ্য কন্ট্রাক্ট ব্রিজের আঙ্গিকে প্রতিযোগিতা।



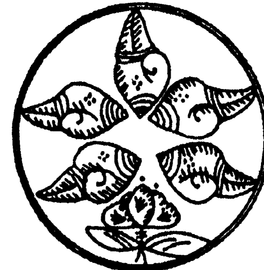
মৎস্য অবতার

তাস বলতেই হরতন, রুইতন, চিড়িতন, ইস্কাবন অথবা হার্টস, ক্লাবস, ডায়মণ্ডস, স্পেড্‌স আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। চার রঙের বাহান্নটি তাস নিয়ে ব্রিজ খেলা হয় কন্ট্রাক্ট বা অক্সন পদ্ধতিতে। দুজন করে দুদলের মোট চারজনের খেলা। পয়েন্ট অনুযায়ী খেলা হয়। এ-খেলা প্রচণ্ড উত্তেজনাপূর্ণ। অষ্টাদশ শতকের পূর্বে আধুনিক তাসখেলা এদেশে প্রচলিত ছিল না বলেই ঐতিহাসিকদের ধারণা। পঞ্চদশ শতকে এ-খেলার সূত্রপাত হয় স্পেনে, ইংল্যাণ্ডে সপ্তদশ শতকে। পর্তুগিজদের সঙ্গে হরতন, রুইতন, ইস্কাবনের আগমন হয় এদেশে। তবে মোটামুটিভাবে স্বীকৃত যে, এ-খেলার জন্মস্থান চীন দেশে —কনফুসিয়াসের রাজত্বকালে।



কূর্ম অবতার

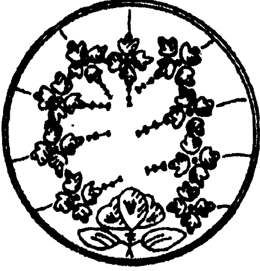
তাসের রাজা ব্রিজ। ব্রিজ ছাড়া বাহান্নটি তাস নিয়ে খেলা হয় ব্রে। ব্রিজ ও ব্রে তথাকথিত সুসংস্কৃত, সভ্য সমাজের খেলা হিসাবে দীর্ঘদিন চলে আসছে বঙ্গসমাজে। তাছাড়া ফিস, পেসেন্স, ফ্লাস প্রভৃতি খেলাও বঙ্গদেশে প্রচলিত। প্রত্যেক খেলার স্বতন্ত্র নিয়মাবলী। তবে প্রাচীন ভারতে আরো একধরনের তাস খেলার সূত্রপাত হয়েছিল, যার নাম ছিল 'চতুরাজী'। পরবর্তী কালে এই চতুরাজী তাসের নাম পালটে হয় 'দশাবতারী তাস'। সর্বাঙ্গ চিত্রিত এই প্রাচীন তাসের প্রতি ঐতিহাসিক, শিল্পতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি ও আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছে, গবেষণাও হয়েছে প্রচুর। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সর্বপ্রথম দশাবতার তাস সম্পর্কে সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ১৮৯৫ সালে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায়। তাঁর মতে, দশাবতারী তাসের সূত্রপাত হয়েছিল ৮ম বা ৯ম শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে মল্লরাজাদের আমলে। এই তাস দরবারী তাস, রাজা বা সামন্তপ্রভুদের খেলার তাস। এই তাসের চিত্রের বিষয়বস্তু দশ অবতার।



বরাহ অবতারের শঙ্খ

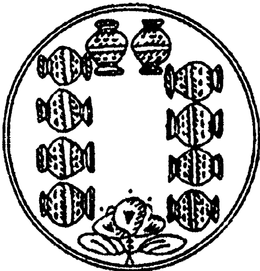
বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির ঘোড়া আজ সারা বিশ্বের সৌখিন মানুষদের ঘর সাজাবার বস্তু হয়েছে। বিষ্ণুপুর ঘরানার সঙ্গীতের কদরও জগৎজোড়া। সেখানকার মন্দির-

গাত্রের ভাস্কর্য, স্থাপত্যশৈলীও শিল্পরসিক ও তাত্ত্বিকদের চিন্তা-চেতনার খোরাক জোগায়। কিন্তু বিষ্ণুপুরের অন্যতম অভিজ্ঞান দশাবতারী তাসের ব্যাপারে অনেকেই হয়তো অপরিচিত। দশাবতারী তাস এক আশ্চর্য বস্তু, সাধারণত যে-ধরনের তাস নিয়ে খেলা হয় সমাজে, এ সে তাস নয়। এ-তাস বৃত্তের মতো গোল এবং বেশ মোটাও। তেঁতুল-



নৃসিংহ অবতারের চক্র

বিচির আঠা বা মাড় দিয়ে তৈরি হয় এই তাস। একটুকরো কাপড়ে মাড় মাখিয়ে তার ওপর আরেক ফালি কাপড় চাপানো হয়। এমনভাবে আঠা-মাখানো তিন-প্রস্থ কাপড় রোদে শুকিয়ে শক্ত করা হয়। এরপর কাপড়ের একধারে মোটা করে কয়েকবার খড়িমাটির প্রলেপ দিয়ে শুকিয়ে মিহি ঝামা দিয়ে ঘষে ঐ ধারটা পালিশ করা হয়। তারপর কাপড়খানা দু-ইঞ্চি ব্যাসার্ধের বৃত্তের মতো গোল গোল করে কেটে দেশি রঙে দশ অবতারের চিত্র আঁকা হয়।



বামন অবতারের কমণ্ডলু

মৎস, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কির চিত্রশোভিত এইসব তাসের ব্যঞ্জনা ও গুরুত্ব বিষ্ণুপুরের জনমানসে অপরিসীম। শুধু অবতাররাই নন, তাঁদের প্রতীক চিহ্নগুলোও আঁকা হয় যথেষ্ট গুরুত্ব ও মর্যাদা সহকারে। এক-একজন অবতারের এক-একজন উজির (মন্ত্রী) আর দশ, নয়, আট, সাত, ছক্কা, পাঞ্জা, চৌকা, তিরি, দুরি, টেক্কা নিয়ে মোট এগারোখানা করে তাস থাকে।

দাবায় যেমন রাজা, মন্ত্রী, ঘোড়া, গজ, নৌকা, বোড়ে নিয়ে চতুরঙ্গের যুদ্ধখেলা, এও তেমনি মন্ত্রী, সেনাপতি, পাইক, বরকন্দাজ নিয়ে সাজানো খেলা। প্রত্যেকের জন্য আছে পৃথক পৃথক চিত্র। আঁকা শেষ হলে সাদা পিঠটা মেটে সিঁদুর আর গালা দিয়ে মোটা করে মসৃণ পালিশ করা হয়। তার ফলে তাসগুলো বেশ শক্ত এবং মজবুত হয়। দশ অবতার আর তাঁদের একজন করে উজির আর উজিরদের অধীনে দশটি তাস মিলে মোট ১২০টি তাস নিয়ে খেলা শুরু হয়। খেলেন পাঁচজন বসে, তবে কেউ কারোর সহযোগী নন, সবাই একক প্রতিযোগী।



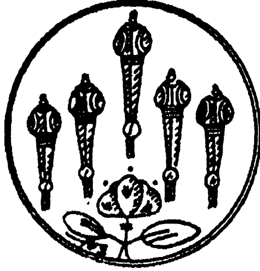
পরশুরাম অবতারের কুঠার

অবতারদের মধ্যে আবার রাম, বলরাম, পরশুরাম, বুদ্ধ আর কল্কি কৌলিন্যে কিছু বড়। এই পাঁচজনের উজিরের পরেই টেক্কার স্থান। তারপর দুরি, তিরি করে দশের স্থান সবার নিচে। অন্য পাঁচ অবতার অর্থাৎ মৎস, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামনের ক্ষেত্রে তাঁদের উজিরের পর বড় আসন দশের এবং সবচেয়ে ছোট আসন টেক্কার। মোটামুটি তাসের মর্যাদা ও সম্মানের ভাগ এরকম। অবশ্য খেলার শুরুতেও কিছু মর্যাদার প্রশ্ন থাকে। রাতে খেলা শুরু হলে যার হাতে মৎস অবতার তাস থাকবে তিনি প্রথম খেলার অধিকারী, আর দিনের ক্ষেত্রে রাম অবতার তাসের অধিকারী প্রথম খেলা শুরু করবেন। আসলে এই ব্যবস্থার মধ্যে জীবজগতের ক্রমবিকাশ পর্বটাই



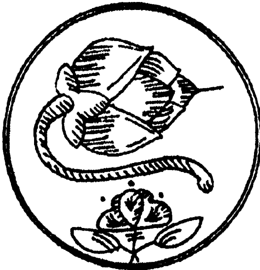
ধনুর্ধারী রাম অবতার

প্রতিফলিত। মৎস (জলচর) দিয়ে জীবন শুরু, আর সূচনাপর্বে অন্ধকারাচ্ছন্ন রূপটাই রাতের প্রতীকী। সভ্যতার উন্নত পর্যায়ে রাম, তাই সেটা আলোকোজ্জ্বল দিন। এ-খেলায় ডান-বাম বলে কিছু নেই, যেকোন দিক থেকেই খেলা চলতে পারে।



বলরাম অবতারের গদা

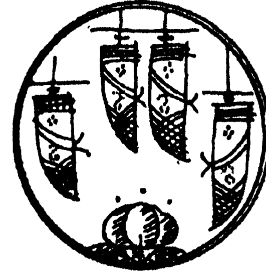
১২০খানা তাস সমান পাঁচ ভাগ করে এক-একজন ২৪টি তাস নিয়ে খেলা শুরু করেন। রাম বা মৎস নিয়ে দিনে বা রাতে যিনি প্রথম খেলা শুরু করবেন, তিনি তাঁর হাতের বড় তাস (অনার্স কার্ড) হিসাব করে যে-কয়টা পিঠ নিতে পারবেন নেবেন, তারপর একখানা ছোট তাস খেলে পিঠ ধরিয়ে দেবেন অন্যের হাতে। দ্বিতীয়জনও প্রথম-জনের মতো তাঁর হাতের বাঁধা পিঠগুলো তুলে নিয়ে ধরিয়ে দেবেন অন্যের হাতে। তবে এই পিঠ ধরার সময়ে যিনি খেলবেন তাঁর বাঁপাশের খেলোয়াড় পিঠ পেলে তাকে বলে 'টিপসই' এবং এই 'টিপসই' পিঠের মান, সাধারণ দুপিঠের সমান।



বুদ্ধ অবতারের পদ্ম

এমন করে খেলতে খেলতে ২৪টি পিঠ উঠে গেলে পয়েন্ট গুণে খেলার হারজিৎ ঠিক হয়। প্রথম পাঁচ পিঠে ১ পয়েন্ট ধরা হয়, তার পরের প্রতি বাড়তি পিঠে ধরা হয় ৫ পয়েন্ট করে অর্থাৎ কেউ দশ পিঠ পেলে তার পয়েন্ট হবে ২৬ (১+৫+৫+৫+৫+৫)। আবার কেউ পাঁচ পিঠের কম পেলে, তার প্রতি কম পিঠের জন্য ৫ পয়েন্ট করে কম হবে। খেলায় সব থেকে বেশি 'প্লাস' পয়েন্ট যিনি পাবেন তিনি হবেন বিজয়ী। অনেক সময় বাজি ধরেও খেলা হয়।

একসময় সারা ভারতে যে-খেলার ব্যাপক প্রচলন ও প্রসার হয়েছিল, তা আজ বিষ্ণুপুরের মধ্যেই মূলত সীমাবদ্ধ। আজ যে সর্বজনস্বীকৃত তাসের (ব্রিজ) চর্চা সর্বত্র, তা সহজে এবং সুলভে পাওয়া যায়। দশ অবতারের



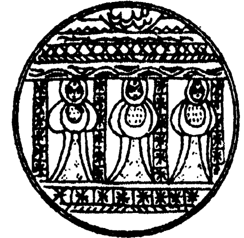
কল্কি অবতারের খড়্গ

তাস কিন্তু সহজলভ্য নয়। এর ১২০খানা তাস তৈরি করতে যে শ্রম, রঙ, গালা, সিঁদুর, কাপড়, খড়িমাটি, আঠা ইত্যাদি দরকার তাতে যথেষ্ট সময় এবং খরচ লেগে যায়। দশ অবতারের তাস খেলা আজকের ব্রিজের মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধির খেলা না হলেও ব্রে, ফিস, বিন্তি প্রভৃতির থেকে কম আনন্দের নয়।

এই প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ, লোকায়ত খেলার মাধ্যমে সভ্যতার সঙ্গে জীবনের এক অচ্ছেদ্য মেলবন্ধনের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তাদের নিজস্ব শিল্প, সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য কত কি করছে, সেখানে আমরা কি আমাদের এই প্রাচীন খেলা, লোকশিল্প ও



উজির



তিরি

সংস্কৃতির এই প্রাচীন ধারাকে রক্ষা করার জন্য কিছুই করতে পারি না? ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে নির্বিচারে বর্জন করলে শেষ-পর্যন্ত আমাদের 'identity crisis'-এ পড়তে হবে না তো? ❑

শতবর্ষের আলোয় শিশুসাহিত্যিক সুনির্মল বসু



শঙ্কর ঘোষ

> যোগ্য ব্যক্তিকে শতবর্ষে যোগ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন সাহিত্যিক-অভিনেতা অধ্যাপক শঙ্কর ঘোষ। শিশুসাহিত্যের এই সঙ্কটমুহূর্তে লেখকের বিশেষ আবেদন নিশ্চয়ই পাঠকের মনকে স্পর্শ করবে।

শিশুসাহিত্যের স্বতন্ত্র মর্যাদা আজ সকল ভাষাতেই স্বীকৃত। শিশুদের মনে জ্ঞানের আলো জ্বালাতে, নতুন নতুন জিজ্ঞাসায় তাদের উদ্বোধিত করতে শিশুসাহিত্যের অন্তহীন ভূমিকার কথা বিশেষভাবেই স্মরণ করতে হয়। শিশুর নিভৃত রহস্যময় মনোলোকের মতো শিশুসাহিত্য এক স্বতন্ত্র জগৎ। রঙে-রসে, বিষয়ের বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে শিশুসাহিত্যের আকর্ষণ তাই অপ্রতিরোধ্য। সেই শিশুসাহিত্যের জগতে এক স্মরণীয় স্রষ্টা হলেন সুনির্মল বসু। ১৯০২ সালের ২০ জুলাই (১৩০৯ বঙ্গাব্দের ৪ শ্রাবণ) সুনির্মল বসুর জন্ম। অর্থাৎ এই বছরটি তাঁর জন্মশতবর্ষ।

সুনির্মল বসু যখন শিশুদের জন্য কলম ধরেছেন, ততদিনে বাঙলা শিশুসাহিত্যের জগৎ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। শিশুদের জন্য প্রথম যে-গ্রন্থটি পাওয়া যায় সেটি অবশ্যই পাঠ্যগ্রন্থ। নাম 'নীতিকথা'। রাধাকান্ত দেব এবং রামকমল সেন—এই দুই বাঙালি মনীষীর যুগ্ম প্রচেষ্টায় এটি প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর শিশুসাহিত্যের এক কীর্তিমান ব্যক্তি। লক্ষ লক্ষ শিশুচিত্তের উদ্বোধক বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থটি। বিদ্যাসাগরের সহপাঠী মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' গ্রন্থের সেই কবিতাটি কি ভোলা যায়—

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলই ফুটিল।"

মদনমোহনের সেই শপথবাণীও স্মরণযোগ্য—

"সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি।।"

অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা 'চারুপাঠ' গ্রন্থটি শিশুদের 'বুক অফ নলেজ' বললেও অত্যুক্তি হয় না। শিল্পসাধনা তথা জীবনসাধনার মহাযজ্ঞে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিশুদের কখনো বিস্মৃত হতে পারেননি। তাঁর অমর সৃষ্টি 'নদী', 'মুকুট', 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ', 'খাপছাড়া', 'সে', 'ছড়ার ছবি', 'ছেলেবেলা' প্রভৃতি বইগুলির নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। সর্বোপরি আছে 'সহজপাঠ'। শিশু-সাহিত্যের সোনালি যুগে আমরা পেয়েছি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ('ছেলেদের রামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত', 'টুনটুনির বই', 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ('ক্ষীরের পুতুল', 'বুড়ো আংলা', 'নালক', 'খাজাঞ্চির খাতা', 'রাজকাহিনী', 'শকুন্তলা'), দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ('ঠাকুরমার ঝুলি'), সুকুমার রায় ('আবোলতাবোল', 'খাই খাই', 'হ-য-ব-র-ল', 'পাগলা দাশু', 'বাবুরাম সাপুড়ে'), যোগীন্দ্রনাথ সরকার ('হাসিখুশি')-এর মতো কীর্তিমান সাহিত্যিকদের। 'হাসিখুশি'র 'অ-য় অজগর আসছে তেড়ে' দিয়ে শুরু হয় বাঙালি শিশুর অক্ষরপরিচয়। আর তারা সংখ্যা-রহস্যের প্রথম আস্বাদ পায় 'হারাধনের দশটি ছেলে ঘোরে পাড়াময়'-এর মধ্য দিয়ে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, রজনীকান্ত সেন, বন্দে আলি মিঞা, কুসুমকুমারী দাস, মানকুমারী বসু প্রমুখ কবিদের লেখা শিশুদের উপযোগী কবিতাগুলি কেউ কি ভুলতে পারে?

এমন এক সমৃদ্ধ প্রেক্ষাপটে সুনির্মল বসুর আবির্ভাব। পিতা পশুপতি বসুর নিবাস ছিল ঢাকার মালখানগরে। তাঁর কর্মস্থল ছিল বিহারের গিরিডিতে। সেখানেই কবির জন্ম। কবির মাতামহ ছিলেন প্রখ্যাত বিপ্লবী ও লেখক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। ছোটবেলায় মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁর মনে কবিতা রচনার প্রেরণা জাগায়। প্রতিভার বিকাশ স্কুলজীবন থেকেই। সপ্তম শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় তিনি একটি কবিতা লিখলেন 'সাইকেলের বিপদ'। শিক্ষক হিমাংশু রায় সন্দেহ প্রকাশ করলেন যে, এই কবিতা সুনির্মল কিছুতেই লিখতে পারে না। ক্লাসের সেরা ছাত্র বসন্ত উঠে জানায়, 'সাইকেলের বিপদ' কবিতাটি সুনির্মলেরই লেখা। সেই শুরু। পত্র-পত্রিকার মধ্যে প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী' পত্রিকায়। প্রধানত সরস শিশুসাহিত্যকে তিনি সাহিত্যের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। 'কী ভুল' কবিতাটির কথাই ধরা যাক—

"কী ভুল কী ভুল!
সব কাজে জগা করে ভুল বিলকুল।
বাজারেতে যেতে জগা যায় ফাঁড়িতে
মাসি বাড়ি যেতে যায় পিসি বাড়িতে।
বই ফেলে মই কাঁধে যায় ইসকুল্
কী ভুল কী ভুল!"

১৯২০ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতার সেন্ট পলস্ কলেজে ভর্তি হন সুনির্মল।

কিছুদিন পরে তিনি মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কলেজের পাট চুকিয়ে দেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'ওরিয়েন্টাল স্কুল অফ আর্ট'-এ তিনি যোগ দেন। ছোটবেলা থেকেই চিত্রাঙ্কনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। অবনীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে তিনি ধীরে ধীরে চিত্রাঙ্কনে অত্যন্ত দক্ষ হয়ে ওঠেন। তিনি বাঁশি বাজাতেনও চমৎকার। বাঁশি বাজানো শিখেছিলেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। বাঁশি আর ছবি সুনির্মলকে যেভাবে আচ্ছাদিত করেছিল, তার প্রতিফলন পাই তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে। শুধু ছোটদের জন্যই তাঁর লেখা। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিশুসাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলে শিশুমনের পাসপোর্ট থাকা দরকার। বড়দের বই সেই কারণে তিনি পড়তেন না। তাঁর বন্ধুদের তালিকায় যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা সকলে শিশুদের নিয়েই মেতে ছিলেন; হয় আঁকায়, নয় লেখায়। সে-তালিকায় আছেন যোগেন গুপ্ত, কালিদাস রায়, শিবরাম চক্রবর্তী, শৈল চক্রবর্তী, অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো), বিমলচন্দ্র ঘোষ (মৌমাছি), খগেন মিত্র, প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন ধর, ক্ষিতিশ ভট্টাচার্য প্রমুখ নামজাদা শিশুপ্রেমিকেরা। প্রখ্যাত যাদুকর পি. সি. সরকার বলেছিলেন যে, সুনির্মল তাঁর থেকেও বড় জাদুকর, কারণ মুখে মুখে ছড়া লেখা কোন জাদুকরের পক্ষেই সম্ভব নয়।

মহাকবি কালিদাস থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ—অধিকাংশ কবিরই প্রিয় ঋতু বর্ষা। সুনির্মলের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি যেদিন জন্মগ্রহণ করলেন, সেদিনটিতে বৃষ্টি আর থামতেই চায় না। অবিরাম বারিপাত। সেদিন ছিল শ্রাবণী পূর্ণিমা। মেঘ সরিয়ে হঠাৎই চাঁদ দেখা দিল আকাশে। সেই সময়ে জন্মগ্রহণ করলেন কবি। তাই গোড়াতে তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল নির্মলচন্দ্র। পরে অবশ্য নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় সুনির্মল। বর্ষার প্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় বারেবারে এসেছে। 'আবার শুরু ঝুরুঝুরু' কবিতার কথাই ধরা যাক—

"আবার শুরু ঝুরুঝুরু
বাদল ঝরা গান
আগুন হানা থামল এবার
ঠাণ্ডা হলো প্রাণ।
মেঘ জমেছে নীল আকাশে,
সোঁদা মাটির গন্ধ আসে
পুকুর ডোবায় জল থইথই
ছুটল গাঙে বান।
আবার শুরু ঝুরুঝুরু
বাদল ঝরা গান।"

এপ্রসঙ্গে 'বাদল মাদল' কবিতাটিও উল্লেখ্য—

"এল ঝড় বাদল ধর মাদল গান বাজা
ধর তান বাঁশির গ্রামবাসীর প্রাণ তাজা
(মাদল— ধিন তাতা, ধিন তাতা, ধিন তাতা)।"

বাঙালি এখন প্রশংসা করতে ভুলে যায়, স্বীকার করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হয়। অথচ সুনির্মল বসুর বিয়েতে এসে কাজী নজরুল ইসলাম কবির কাছে স্বীকার করেছিলেন, সুনির্মলের কবিতা থেকে একটি ফুলের নাম তিনি চুরি করেছেন। সুনির্মলের সে-কবিতাটি ছিল—

"তুলতে গিয়ে ঝিঙ্গে ফুল
হারিয়ে গেল কানে দুল
ও ননদি ও ননদি বলো না দাদাকে।"

একথা সবাই অবগত আছেন যে, নজরুলের একটি বিখ্যাত কবিতার নামই হলো 'ঝিঙ্গে ফুল'। প্রখ্যাত কবি জসিমুদ্দিন যখন 'নকশি কাঁথার মাঠ' সম্পূর্ণ করে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখাতে এলেন, অবনীন্দ্রনাথ কাব্যটি পাঠ করে মুগ্ধ হলেন, তবে ছন্দের বিষয়টি সুনির্মলকে দিয়ে দেখিয়ে নিতে বললেন। সুনির্মল ও জসিমুদ্দিন দুজনেই তখন অবনীন্দ্রনাথের কাছে আঁকা শিখছিলেন। রাজশেখর বসু যখন তাঁর স্মরণীয় গ্রন্থ 'চলন্তিকা' প্রস্তুত করছেন, তখন সুনির্মলকেই সঙ্গে রেখেছিলেন। যে-মানুষটি কলেজের সীমা ডিঙোলেন না, তাঁকে সঙ্গে রাখলেন রাজশেখর বসু। গ্রন্থের শুরুতে সে-ঋণ স্বীকার করেছেন তিনি।

সুনির্মল বসুর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'হাওয়ার দোলা'। এছাড়া তাঁর লেখা স্মরণীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে 'অল্প কথার গল্প', 'আদিম দ্বীপে', 'আমার ছড়া', 'আলপনা', 'কবিতামঞ্জরী', 'কানাকড়ির খাতা', 'কবিতাচয়ন', 'কুমকুম', 'কেউটের ছোবল', 'গুলজার', 'ছড়া ছবিতে অ আ ক খ', 'ছড়া ছবিতে জানোয়ার', 'ছড়ার ছবি', 'ছন্দ ঝুমঝুমি', 'ছন্দের টুংটাং', 'ছানাবড়া', 'ছোটদের পদ্মপুরাণ', 'জানোয়ারের ছড়া', 'ঝিলমিল', 'তেপান্তরের মাঠ', 'পাত্‌তাড়ি', 'পাতাবাহার', 'পাতার ভেঁপু', 'বেড়ে মজা', 'মরণফাঁদ', 'মিহিদানা', 'রাঙামামার ভাঙ্গা আসর', 'হৈ চৈ', 'হুলুস্থুল', 'কথা শেখা', 'ছন্দের গোপন কথা', 'কবিতা শেখা', 'আমার ছড়া' প্রভৃতি। সুনির্মল বসু সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে—'আরতি', 'ঝলমল', 'বরণডালা', 'ছোটদের চয়নিকা', 'ছোটদের চয়নিকা', 'ছোটদের গল্প সঞ্চয়ন' প্রভৃতি। বেশ কিছু ছোটগল্প লিখেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'নকুলবাবু নাকাল', 'কবি ধুরন্ধর', 'চোর ধরা', 'আগডুম বাগডুম', 'হজমিগুলি', 'চোরের উপর বাটপাড়ি' প্রভৃতি

উপন্যাসও লিখেছেন তিনি, অবশ্যই ছোটদের উপযোগী করে। তার নাম 'অসম্ভব দুনিয়ায়'। নাটক লিখেছেন খানকয়েক। এর মধ্যে রয়েছে 'আনন্দনাড়ু', 'বুদ্ধুভূতুম', 'কিপটে ঠাকুর্দা' প্রভৃতি। আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেছিলেন। 'এই জীবনখাতার কয়েক পাতা' নামের আত্মজীবনীটির প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল।

নানারকম সৃষ্টিশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সুনির্মল বসু। বেশ কিছু গান লিখেছেন। তাঁর জেঠতুতো বোন উমা বসুর জন্য গান লিখেছিলেন—'আকাশের চাঁদ মাটির পরেতে হলো যবে পরিচয়'। সুর দিয়েছিলেন হিমাংশু দত্ত। পরে এই গানটি কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ও রেকর্ড করেন। ১৯৪৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'কামনা' ছবিতে গীতিকার ছিলেন সুনির্মল বসু। সুরকার ছিলেন দ্বিজেন চৌধুরী। ১৯৫১ সালে ছোটদের কার্টুন ছবি 'মিচকে পটাশ'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সুনির্মল। 'মিচকে পটাশ' দেখানো হয়েছিল 'পরিত্রাণ' ছবির সঙ্গে। হাসির গান লেখাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন তিনি। যেমন—

"আমার কাজ শুধু চুপ করে থাকা।
মেনে নিতে হবে ঐ সাড়ে বারো টাকা।।"

কিংবা—

"হাসে পিয়া যবে খল খল খল কিবা দন্তরুচি।
মনে হয় কালো পাথরবাটিতে সাদা নারিকেল কুচি।।"

কিশোরদের পাক্ষিক পত্রিকা 'কিশোর এশিয়া' দীর্ঘদিন সম্পাদনা করেছিলেন। দিল্লিতে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের শিশুসাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেন সুনির্মল বসু। একবার রাঁচিতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি সুনির্মল বসু অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি 'পথের পাঁচালি'র স্রষ্টা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'রাঁচির পাঁচালি' শুনিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে এই দুজনের বন্ধুত্ব অত্যন্ত গাঢ় হয়ে উঠেছিল। সুনির্মলের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর প্রমথনাথ বিশী লিখেছিলেনঃ "সুনির্মলকে আরেক সরল সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বর্গলোকে আজ স্বাগত জানাচ্ছেন। সারল্য ও ভালোমানুষিতে এই দুজনের মধ্যে সত্যিই খুব মিল ছিল।"[১]

ছয় পুত্র এবং দুই কন্যার জনক সুনির্মল বসুর স্থায়ী রোজগার ছিল না। তবু তিনি যে সৃজনশীল কর্মে মেতে থাকতে পারতেন, তার মূলে ছিল স্ত্রী নীহারিকা দেবীর প্রেরণা ও ভালবাসা। সুনির্মল-নীহারিকার বিবাহের স্মরণিকাতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, নরেন দেব, কালিদাস রায়, স্বপনবুড়ো, মৌমাছি সকলেই লিখেছিলেন। 'শিশুসাহিত্য পরিষদ' থেকে সুনির্মলকে 'ভুবনেশ্বরী পদক' দেওয়া হয়েছিল। রাজ্য সরকার সুনির্মল বসুকে 'বিদ্যাসাগর পুরস্কার (মরণোত্তর)'-এ ভূষিত করে। ২০০২ সালের গোড়ায় যে শিশু উৎসবের সূচনা হলো রবীন্দ্র সদন-নন্দন প্রাঙ্গণে, তার মূল মঞ্চের নাম রাখা হয়েছিল 'সুনির্মল বসু মঞ্চ'। এর উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

১৯৫৭ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি (১৩ ফাল্গুন ১৩৬৩) কলকাতাতে মারা যান সুনির্মল বসু। তাঁর মৃত্যুতে লেখা হয়েছিল—"Sunirmal was born poet. He was a master in the jugglery of words. His rhymes and rhythms appeal directly to the heart of the children for whom he wrote."[২] কবিতার মধ্য দিয়ে যে-শিক্ষা সুনির্মল দিয়ে গেছেন, শতবর্ষ পরেও তা সমানভাবে স্মরণযোগ্য। 'সবার আমি ছাত্র' কবিতার সেই পঙ্‌ক্তিগুলিকে স্মরণ করা যায়—

"আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হতে ভাইরে,
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাইরে।"

এই মুহূর্তে শিশুদের বড়ই দুরবস্থা। ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, জেঠা, কাকা, পিসি-পরিবৃত যৌথ পরিবার এখন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। দাদু-ঠাকুরমাদের স্থান হচ্ছে বৃদ্ধাবাসগুলিতে। বহু ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকুরিরত। শিশুকে সামলাবে কে? হাতের কাছেই রয়েছে ক্রেস (creche)। কথা ফুটতে না ফুটতেই কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে ভর্তি। বাড়ি ফিরে কে শোনাবে ছড়া বা রূপকথার গল্প? শিশু বসে গেল টেলিভিশনের সামনে। এ এক বড় অস্থির সময়। সুনির্মল বসু শিশুর মনকে গড়ে তোলার জন্য সহজ সরল ভাষায় 'ঠাকুর রামকৃষ্ণ', 'বিদ্যাসাগর', 'রাজা রামমোহন', 'বঙ্কিমচন্দ্র', 'মাইকেল মধুসূদন'-এর জীবনী লিখলে কি হবে, আজকের শিশুকে সেসব পড়ে শোনানোর লোক নেই! এটাই হয়তো বর্তমান কালের শিশুদের বিধিলিপি। ❑

---

১ 'চিরকালের সেরা' গ্রন্থ, শিশুসাহিত্য সংসদ, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃঃ ৪

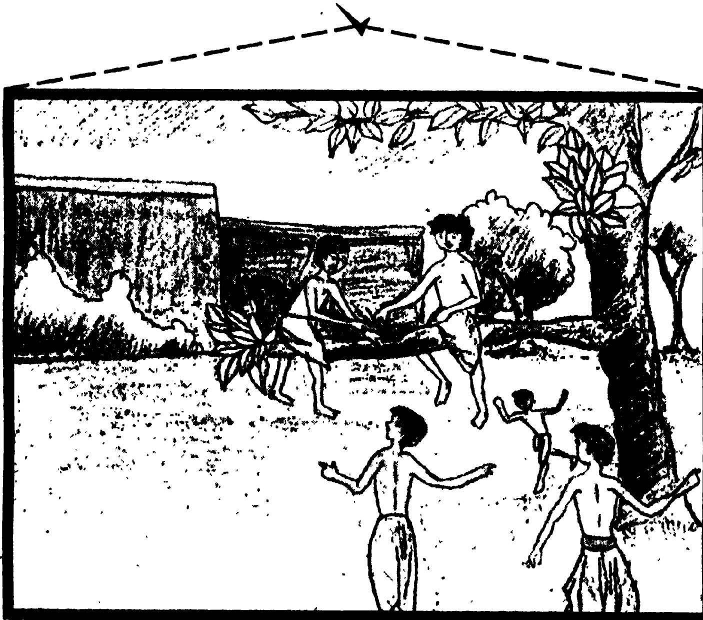
২ Calcutta Municipal Gazette, March 1957

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ সুনির্মল বসুর কনিষ্ঠ পুত্র অভীক বসু।

বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে
হুঁকো রাখা সারি সারি
এটা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ সেটা,
ওটা যে-শূদ্র—তারই।
'সে কী কথা!' ভাবে বিলে,
'যদি আজ ভেঙে দিই শৃঙ্খলা
বাবা কি বকবে?
গুরুজনদের কিছু কি থাকবে বলার?
আর তাতে যদি জাত চলে যায়,
কী কী হতে পারে তার?
আকাশ ভাঙবে মাথার ওপর?
সমুদ্র তোলপাড়?
চুপি চুপি ঘরে ঢুকে পড়ে বিলে।
এদিক-ওদিক চায়।
শূদ্র-হুঁকোয় টান দিয়ে দেখে
'জাত' কোথা দিয়ে যায়!



শ্রাবণী দে, নবম শ্রেণী
আদি মহাকালী পাঠশালা



ঐ বাগানের চাঁপাগাছের কোলে
ভূতেরা সব পা-ছড়িয়ে দোলে।

ঐ বাগানে খেলাধূলাও মানা
ঘাড় মটকে দেবে ভূতের ছানা।

বাপ্‌রে, মারে! ছেলেরা সব ভাগে
দৌড়ে যেতে পারে কে কার আগে!

বিলে কেবল ভেবে ভেবেই সারা—
দেখিনি তো! থাকেন কোথায় তাঁরা?

সেই রাতে সব অবাক চোখে দেখে
দুলছে বিলে চাঁপাডালের ফাঁকে...

যা শুনছে তা পরখ করা চাই
ভূত দেখতে এসেছে বিলে তাই।

পায়েল হাজরা, সপ্তম শ্রেণী
মহারাজা কাশিমবাজার সাবিত্রী শিক্ষালয়

রচনা : জয়দীপ ঘোষ

দুর্গাপূজায় সুরেন্দ্রের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ

১৮৮৫ সালের সেপ্টেম্বর। আশ্বিন মাস। শারদীয়া দুর্গাপূজায় [illegible] মহামায়ার আরাধনায় [illegible] আনন্দে মাতোয়ারা। শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র উত্তর কলকাতার সিমলার নিজস্ব বাসভবনে দুর্গাপূজার আয়োজন করেছেন। অতীতে দুর্গাপূজা কোন কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনেকেই তাঁকে নতুন করে দুর্গাপূজা করতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অগাধ বিশ্বাস সুরেন্দ্রনাথের। তাঁর শক্তিতে শক্তিমান হয়েই তিনি এবছর মহা সমারোহে দুর্গাপূজার আয়োজন করেছেন।





আজ মহাষ্টমী। সকালের দিকে হয়ে গেছে অষ্টমীর পূজা। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে আরম্ভ হবে দেবী দুর্গার বিশেষ পূজা—সন্ধিপূজা। এখন চলছে তারই প্রস্তুতি।

এদিকে উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর বাটীর বৈঠকে [illegible] ও ভগবৎ আলোচনা। মধ্যমণি শ্রীরামকৃষ্ণ।



চিত্ররূপ ঃ দেবাশিস বসু ও অরিন্দম দাস



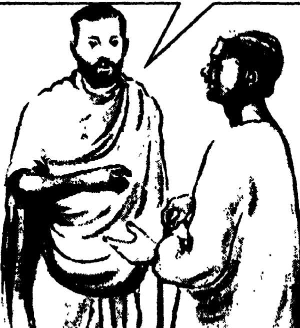
[illegible]





শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভক্তগণ সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। প্রতিমাকে দর্শন ও প্রণাম করে তাঁরা সুরেন্দ্রনাথকে জানালেন শ্রীরামকৃষ্ণের কথা।





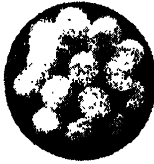
সুরেন্দ্রনাথের কথা শুনে ভক্তগণ আনন্দ ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।



বিষ্ণুপুরের মিষ্টান্ন আর মতিচুর

মনোরঞ্জন চন্দ্র





এই অভিনব বিষয়ে শিক্ষাব্রতী মনোরঞ্জন চন্দ্র তাঁর গবেষণার বিষয়কে রম্য-আঙ্গিকে পরিবেশন করেছেন।

একটি সুগন্ধি ফুলকে যেখানেই নিয়ে যাওয়া যাক না কেন, সকলের অলক্ষ্যে সঙ্গে সঙ্গে যায় তার মনমাতানো সৌরভ। অনুরূপভাবে বৈষ্ণব সাধক শ্রীনিবাস আচার্য যখন বৃন্দাবন থেকে বিষ্ণুপুরে এলেন, তখন তাঁর সঙ্গে এল তাঁর অগাধ জ্ঞান-গরিমা, গভীর ঈশ্বরানুরাগ এবং অমূল্য ঐশী সম্পদ। এল বৈষ্ণবের বিনয়, ভক্তি-বিগলিত ভাবধারা। এল বৈষ্ণব কবিদের কাব্য, সুললিত পদাবলী, সুমধুর ধ্রুপদ, ধ্রুপদাঙ্গ কীর্তন, আর এল বৃন্দাবনের অনুকরণে রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহের ভোগরাগে ছানার মিষ্টান্ন নিবেদনের প্রথা। দেবসেবার মিষ্টান্ন তৈরির তাগিদেই মল্লভূমে আগমন ঘটে মোদক জাতির। এই মোদক জাতির উৎপত্তি বিষয়ে একটি বেশ মজার গল্প শোনা যায়।

একদিন শিশু গণেশ জেদ ধরেছেন বেজায়। মা পার্বতী অশান্ত শিশুকে কিছুতেই শান্ত করতে না পেরে অবশেষে মহাদেবের শরণাপন্ন হন। মহাদেবও গণেশকে শান্ত করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। গণেশ কান্নাকাটি করে মাটিতে লুটোপুটি খেতে থাকেন। এমতাবস্থায় মহাদেব তাঁর জটাজালের অগ্রভাগের একটুখানি ছিঁড়ে নিয়ে নিক্ষেপ করেন ভূমিতে। মুহূর্তে সেই ছিন্নজটা থেকে এক সৌম্যকান্তি পুরুষ আবির্ভূত হয়ে বিনম্রচিত্তে মহাদেবকে বলেন: "কি করতে হবে আদেশ করুন প্রভু।" রোরুদ্যমান গণেশকে দেখিয়ে মহাদেব তাঁকে বলেন: "যেকোন উপায়ে শান্ত কর ওকে।" সুদর্শন পুরুষটি তৎক্ষণাৎ একটি লাড্ডু তৈরি করে ধরিয়ে দেন গণেশের হাতে। সুস্বাদু লাড্ডুটির স্বল্পাংশ মুখে দিয়েই গণপতি ভুলে যান কান্নাকাটি। নাচতে থাকেন পরমানন্দে। অতঃপর প্রতিদিনই ঐ পুরুষ গণেশকে লাড্ডু খাওয়াতেন। এই ঘটনার পর থেকেই নাকি লাড্ডুহস্তে গণেশমূর্তি পূজার প্রচলন হয়। দেবাদিদেব শঙ্করের অংশসম্ভূত উক্ত পুরুষটি হলেন মোদক বা ময়রা জাতির আদিপুরুষ এবং গণেশ হলেন মোদক জাতির উপাস্য দেবতা।

শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বীর বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নেওয়ার পর মল্লরাজারা বংশানুক্রমে একের পর এক নির্মাণ করেছেন রাধাকৃষ্ণের মন্দির। প্রতিষ্ঠা করেছেন শতাধিক রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ। বিগ্রহদের ভোগরাগে নিয়মিত ছানার মিষ্টান্ন যোগানোর উদ্দেশ্যে তাঁরা প্রতিটি দেবালয়ের নিকটে একঘর মোদক এবং একঘর গোপ বা গোয়ালা পরিবারের বসবাসের ব্যবস্থা করেন। গোয়ালাদের কাজ ছিল দুধ, দই, ঘি, ছানা সরবরাহ করা, আর মোদকের কাজ ছিল দুধ ও ছানা থেকে দেবপূজার জন্য বহুবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা। এই কাজের জন্য উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ মল্লরাজা-প্রদত্ত নিষ্কর ভূসম্পত্তি ভোগ করত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মল্লরাজ্যে বৈষ্ণবধর্ম প্রসারলাভের পর রাঢ়বঙ্গে খাদ্যরুচি দ্বিধারায় বিভক্ত হয়। প্রথমটি আমিষ এবং দ্বিতীয়টি নিরামিষ। যাঁরা বৌদ্ধতন্ত্রের দেবদেবীর ভক্ত—তাঁদের মধ্যে মদ্য-মাংস খাওয়ার প্রাচীন খাদ্যরীতি রইল অপরিবর্তিত। পক্ষান্তরে যাঁরা বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হলেন, তাঁদের নিরামিষ খাদ্যতালিকায় ছানার মিষ্টি, দুধ, ঘি, দই, মাখন প্রভৃতি দুগ্ধজাত খাদ্য প্রাধান্যলাভ করল। মল্লরাজ্যের অভিজাতদের মধ্যেও নিত্যনতুন মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। ফলে খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে মল্লরাজ্যে মিষ্টান্নশিল্পে জোয়ার আসে।

রাঢ়ীয় মোদক জাতির মধ্যে যে বারোটি গোষ্ঠী আছে, তাদের মধ্যে এক-একটি গোষ্ঠী বা পরিবার এক-এক রকমের মিষ্টি তৈরিতে সিদ্ধহস্ত ছিল। যেমন 'বরাট' উপাধিধারী মোদকগণ বুটের মিঠাই এবং চিনির ওলার জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করে। 'দে' পদবিধারী মোদকগণ জিলিপি তৈরিতে বিশেষ পারদর্শী ছিল, আবার নাগবংশীয় মোদকগণ বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত মতিচুরের জন্য সর্বজন-সমাদৃত ছিল।

খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে মহারাজ চৈতন্য সিংহের দুরবস্থা চরমে ওঠে। আর্থিক দুরবস্থার কারণে সেই সময় তিনি কলকাতার বাগবাজারের ধনাঢ্য লবন-ব্যবসায়ী গোকুল মিত্রের নিকট বিষ্ণুপুরের নগর-দেবতা মদনমোহন জীউকে এক লক্ষ টাকাতে বন্ধক রাখেন। বাগবাজারে মদনমোহন জীউ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মদনমোহনের ভোগরাগে নানাবিধ মিষ্টান্ন সরবরাহের জন্য বাগবাজারে নবীন মোদক এবং ভীম নাগ বসতিস্থাপন করেন। এই দুই মোদক পরিবারকে নিয়মিত দুগ্ধজাত দ্রব্য—যেমন ছানা, মাখন, ঘি, দই প্রভৃতি সরবরাহের জন্য ঐ অঞ্চলে দ্বারিক ঘোষ নামে এক গোয়ালাও বসবাস শুরু করেন। কলকাতাতে রাধামদনমোহনের আগমন এবং উক্ত যুগল বিগ্রহকে নিয়মিত ছানার মিষ্টান্ন নিবেদনের সূত্র ধরেই বাগবাজার-সহ সমগ্র কলকাতাতে ছানাজাত মিষ্টান্ন শিল্পের দ্রুত প্রসারলাভ

করে। পরবর্তী কালে কলকাতা থেকে সারা বাংলা তথা ভারত এবং বিদেশেও মিষ্টান্নশিল্পের বহুল প্রচলন হয়।

সুতরাং বলা যায়, রাঢ়বঙ্গের ঘরে ঘরে খই, বাজরা, মুড়িচূর্ণ, চিঁড়াভাজা চূর্ণের সঙ্গে গুড় বা দোলা-চিনি মিশিয়ে যে মিষ্টান্নশিল্পের সূচনা হয়েছিল সুদূর অতীতে, উত্তরণের পথে মধ্যযুগে তা উত্তীর্ণ হয়েছে বৈষ্ণব কবিদের নামাঙ্কিত কাঞ্চন-লতিকা, লবঙ্গ-লতিকা, মৌক্তিকাক্ষ বা মতিচুর জাতীয় রসাল মিষ্টান্নতে।

বিষ্ণুপুরে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে—"গান বাজনা মতিচুর/ এই তিনে বিষ্ণুপুর।" বিদ্যুতের সঙ্গে বজ্রের যে সম্পর্ক, গানের সঙ্গে বাজনারও সেই সম্পর্ক। ফলত সঙ্গীতসাধনার আনুষঙ্গিক সাধনা হিসাবে বিষ্ণুপুরে হয়েছে বাদ্যযন্ত্রের বহুল প্রচলন। গানের সুরে বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কার মিশে গিয়ে বিষ্ণুপুর হয়েছে 'সঙ্গীতে দ্বিতীয় দিল্লি'। সঙ্গীত প্রসঙ্গের কথা বাদ দিয়ে রসনা-তৃপ্তিকারক রসালো মতিচুরের কথায় মন মজানো যাক এখন।

'মতিচুর' শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'মিহিদানা', তথাপি মিহিদানা মানে মতিচুর নয় কখনো। কারণ, মতিচুরের একটা নিজস্ব মৌল উপাদান আছে, যার সঙ্গে মিহিদানার উপাদানের মিল নেই। মিহিদানা তৈরি হয় 'ডবল বেসন' থেকে, আর মতিচুর তৈরি হয় পিয়াল বিচির বেসন থেকে। মিহিদানা হলো মিহি অর্থাৎ ক্ষুদ্র দানাবিশিষ্ট মিষ্টান্ন, পক্ষান্তরে মতিচুর হলো মিহিদানার তুলনায় অপেক্ষাকৃত বড় কিন্তু বোঁদের দানার তুলনায় ছোট আকৃতির মিষ্টান্ন। মিহিদানাতে পিউড়ি রঙের ব্যবহার প্রথাসিদ্ধ। মতিচুরে রঙের ব্যবহার নিষিদ্ধ। তবে ক্ষেত্রবিশেষে অল্পমাত্রায় বাসন্তী রং ব্যবহার করা হয়। মিহিদানা জলে ভাসে না, মতিচুর কিন্তু জলে ভাসত।

পিয়ালের বেসনের সাথে আনুপাতিক হারে চালগুঁড়ি মিশিয়ে পরিমাণমতো জল দিয়ে বেশ ভালভাবে বেসন ফেটিয়ে অর্থাৎ পাট করে হালকা আঁচে দেশি ঘিয়ে মতিচুর ভাজা হতো। অতঃপর চিনির রসে ডুবিয়ে রেখে ঠাণ্ডা করে নেওয়া হতো পর্যাপ্ত সময় দিয়ে। বিক্রয়োপযোগী রং মেশানো মতিচুরগুলি হতো স্বর্ণচাঁপা ফুলের মতোই স্বর্ণাভ।

'মতি' বা 'মোতি' মানে মুক্তা, আর 'চুর' মানে গুঁড়া বা ক্ষুদ্র দানা। সুতরাং শব্দগত অর্থের দিক থেকে মতিচুর বলতে বোঝায় মুক্তোর দানা। রঙে ঢঙে এবং ঔজ্জ্বল্যে রঙবিহীন মতিচুরগুলির সঙ্গে মুক্তার দানার সৌসাদৃশ্যের জন্যই এমন নামকরণ। বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য ও অতি সুস্বাদু ঐতিহাসিক যুগের সেই মতিচুর মিহিদানার তুলনায় ঘি টানত বেশি, খেতে হতো খাস্তা—মুখে দিয়ে অল্প একটু চাপ দিলেই মিলিয়ে যেত নিমেষে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'গোবিন্দ-লীলামৃত' গ্রন্থে মৌক্তিকাক্ষ নাড়ুর উল্লেখ করেছেন—

"মনরমা কর তুমি নাড়ু মনোহরা।
মৌক্তিকাক্ষ নাড়ু কর তুমি রত্নমালা।।"

'গোবিন্দলীলামৃত' গ্রন্থটি বৃন্দাবনে রচিত হয়েছিল। গ্রন্থটির বাঙলা অনুবাদ করেছেন যদুনন্দন দাস। উপরি উক্ত 'মৌক্তিকাক্ষ নাড়ু'ই বিষ্ণুপুরের মতিচুর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লক্ষ লক্ষ নরহত্যার পাশাপাশি হত্যা করেছে বিষ্ণুপুরের মতিচুরকে। এই যুদ্ধের সময় বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত বাসুদেবপুর মৌজায় একটি এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত গামারবনী অঞ্চলে একটি 'ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ড', নামান্তরে 'এরোড্রোম' অর্থাৎ যুদ্ধ-বিমানঘাঁটি তৈরি করা হয়। যুদ্ধের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ঐসময় স্থানীয় জমিদারগণের বনজঙ্গল এবং পতিত জমি 'অ্যাকুইজিশন' বা 'রিকুয়িজিশন'-এর ভিত্তিতে অধিগ্রহণ করেন তৎকালীন ব্রিটিশ-শাসিত ভারত সরকার। পিয়াল গাছের প্রাচুর্যের জন্য পিয়ালডোবা অঞ্চল-সহ বিষ্ণুপুর শহরের পার্শ্ববর্তী মড়ার, ধবনী, বেনাচাপড়া, গামারবনী প্রভৃতি জঙ্গল মৌজাগুলিও সরকার অধিগ্রহণ করেন যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। এসব এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে পিয়াল গাছ ছিল। অধিগ্রহণের ফলে স্বাভাবিকভাবেই পিয়াল গাছগুলি কাটা যায় ব্যাপকভাবে এবং পিয়াল ফল তথা পিয়াল বিচির অভাবে মতিচুরের অকালমৃত্যু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দাপটে, বলা চলে বিশ্বযুদ্ধের সমকালে।

বর্তমানে বিষ্ণুপুরে মতিচুর নামে যে মিষ্টান্ন পাওয়া যায় তা পিয়াল বিচির বেসনের পরিবর্তে তৈরি হয় রমা কড়াইয়ের বেসনে। তাতে পিয়াল বিচির বেসনে তৈরি মতিচুরের সুস্বাদ এবং সুঘ্রাণ নেই। ঐতিহাসিক যুগের মতিচুর তাই আজ মহাকালের গর্ভে লীন হয়ে গেছে।

আসল মতিচুর অদৃশ্য হলেও বর্তমানে সুদৃশ্য সুস্বাদু হরেক রকমের মিষ্টান্নের অভাব নেই। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে কলে প্রস্তুত চিনির উৎপাদনের প্রাচুর্যের ফলে এবং মিষ্টান্নশিল্পীদের নিরবচ্ছিন্ন নিত্যনতুন উদ্ভাবনী শক্তির সফল রূপায়ণে মিষ্টান্নশিল্পে আসে এক অভাবনীয় পরিবর্তন, যার ফলে আজ জন্ম নিয়েছে মণ্ডা, মিঠাই, নাড়ু, পেঁড়া, পান্তুয়া, খাজা, গজা, বোঁদে, বালুসাই, কলাকন্দ, কালোজাম, কাঁচাগোল্লা, রসগোল্লা, রাজভোগ, সীতাভোগ, গোলাপজাম, চিত্রকূট, ক্ষীরকদম, ক্ষীরের পায়েস, সনপাপড়ি, রাবড়ি, মিল্ককেক, মিল্কপুরিয়া, সরপুরিয়া, সন্দেশ, ন্যাচাসন্দেশ, নলেন গুড়ের সন্দেশ প্রভৃতি হরেক রকমের মিষ্টান্ন।

সুদূর পৌরাণিক যুগে ক্রন্দনরত এক দেবশিশুকে শান্ত করার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল মিষ্টি। কালে তা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মন জয় করেছে। মিষ্টির জয় জয়কার এবং জনপ্রিয়তা আজ সর্বত্র। আর অবিভক্ত বঙ্গে এতাদৃশ মিষ্টান্নের জন্মস্থান 'দেবনগরী বিষ্ণুপুর'।❑

বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি

নির্মলকুমার রায়

শ্রীশ্রীঠাকুর যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ 'চরণচিহ্ন ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই নির্মলকুমার রায় বিস্তারিত জানিয়েছেন। ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে মায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি থেকে।



বিশ্বের ধর্ম-ইতিহাসে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য তীর্থ বাগবাজারের 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি'। এখানে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী দীর্ঘ এগারো বছর বহুরূপে বিরাজ করেছেন, নানান লীলা করেছেন এবং এই বাড়িতেই মহাপ্রয়াণ করেছেন। ভক্তবৎসলা শ্রীশ্রীমা মহাপ্রয়াণের পূর্বে এই বাড়িতেই সমগ্র ভক্তসন্তানদের উদ্দেশে আশীর্বাদ জানিয়ে বলেছিলেন : "যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে—আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও মা, আমার ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে।"



শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি

তিনি ছাড়া আর যাঁদের দেহাবসানের স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই ভবনের সঙ্গে, তাঁরা হলেন—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (২১।৮।১৯১১), স্বামী প্রজ্ঞানন্দ (২০।৪।১৯১৮), স্বামী চিন্ময়ানন্দ (১৯।৭।১৯১৮), গোলাপ-মা (১৯।২।১৯২৪) এবং স্বামী সারদানন্দ (১৯।৮।১৯২৭)। মহাপুণ্যপীঠ এই 'মায়ের বাড়ী'। এখানে এলেই মনে পড়ে শ্রীশ্রীমায়ের সেই শাশ্বত আশ্বাস—"জানবে, আর কেউ না থাক, আমার একজন মা আছে।" তাঁর পরিচয়—তিনি মা—জগতের মা, সকলের মা। তিনি স্বয়ং একথা নিজমুখে ব্যক্ত করে গিয়েছেন।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে এই ভবনটি নির্মিত হওয়ার আগে পর্যন্ত শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী থেকে কলকাতায় এলে তাঁকে কোন ভাড়াবাড়িতে কিংবা বলরামবাবু, মাস্টার মহাশয় প্রমুখ ঠাকুরের ভক্তগণের বাড়িতে থাকতে হতো। মায়ের ভক্তসংখ্যা তখন ক্রমবর্ধমান। তিনি কলকাতায় এলেই ভক্তেরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত। কিন্তু স্থানাভাবের জন্য বিভিন্ন ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি হতো। তাছাড়া শ্রীশ্রীমায়ের গঙ্গাস্নানের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি প্রায় প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করতেন, অথচ গঙ্গার ধারে সুবিধামতো বাড়ি ভাড়া পাওয়া যেত না। এর জন্যও শ্রীশ্রীমাকে মাঝে মাঝে অসুবিধায় পড়তে হতো। এই কারণেই তাঁর জন্য একটি নিজস্ব বাড়ির বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

এই বাড়ি নির্মাণের আরো একটি কারণ ছিল। 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রথম আটবছর কম্বুলিয়াটোলার ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্র লেনে গিরীন্দ্রলাল বসাকের বাড়ি থেকে এবং তার পরের দুবছর ৩০নং বোসপাড়া লেনের ভাড়াবাড়ি থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল। কিন্তু কর্মপরিধি বিস্তৃত হওয়ার পর 'উদ্বোধন'-এর নিজস্ব একটি বাড়ির অভাব অনুভূত হতে থাকে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন সম্পাদক এবং শ্রীশ্রীমায়ের 'ভারী' স্বামী সারদানন্দ এই অভাবগুলি পূরণের জন্য গঙ্গার কাছে একটি বাড়ি নির্মাণের কথা চিন্তা করেন। সৌভাগ্যক্রমে এইসময়ে বাগবাজারের শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত 'খোড়ো কেদার' (প্রকৃত নাম কেদারচন্দ্র দাস। খড়ের ব্যবসা করতেন বলে তিনি 'খোড়ো কেদার' নামে পরিচিত ছিলেন।) তিনি তাঁর ৩ কাঠা ৪ ছটাক জমি শ্রীশ্রীমায়ের নামে উৎসর্গ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জুলাই কেদারচন্দ্র বাগবাজারের ১২ ও ১৩ নং গোপাল নিয়োগী লেনের দুটি ঘর সমেত ৩ কাঠা ৪ ছটাক জমি রেজিস্ট্রি করে দেন। এখানেই স্বামী সারদানন্দ 'মায়ের বাড়ী' নির্মাণের পরিকল্পনা করেন।"[১]

জমি তো পাওয়া গেল, কিন্তু বাড়ি তৈরির টাকা কই? স্বামী বিবেকানন্দের রচিত কয়েকটি গ্রন্থ বিক্রয় করে 'উদ্বোধন'-এর তহবিলে তখন মাত্র ২,৭০০ টাকা সঞ্চিত ছিল। ঐ টাকায় বাড়ি হয় না।

প্রেরণা দিল স্বামীজীর কয়েকটি পূর্ববর্তী পত্র। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা থেকে স্বামী শিবানন্দকে স্বামীজী একটি পত্রে লিখেছিলেন : "প্রথমে মাতা ঠাকুরানীর জন্য একটা জায়গা করবার দৃঢ় সঙ্কল্প করেছি। দাদা, জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনে জ্যান্ত দুর্গা মাকে যেদিন বসিয়ে দেবে, সেইদিন আমি একবার হাঁফ ছাড়ব।... তোমরা যোগাড় করে এই আমার দুর্গোৎসবটি করে দাও দেখি।"[২]

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে আরেকটি চিঠিতে স্বামীজী লিখেছিলেন : "মা-ঠাকুরানীর জন্য পত্রপাঠ জায়গা অনুসন্ধান করিবে।... একটি বড় জমি প্রথমে চাই; তারপর বাড়িঘর সব হবে। আমাদের মঠ (সন্ন্যাসীদের মঠ) ধীরে ধীরে হবে, ভাবনা নাই।"[৩]

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দকেও স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : "আমার একটি কাজ হয়ে গেলেই আমি নিশ্চিন্ত। রাখাল ভায়া, তুমি উদ্যোগ করে সেইটি করে

দেবে—মা-ঠাকুরানীর জন্য একটা জায়গা। আমার টাকাকড়ি সব মজুত; খালি তুমি উঠে পড়ে লেগে একটা জমি দেখে শুনে কেনো।"[৪]



নিজের ঘরে ঠাকুরকে পূজা করছেন শ্রীশ্রীমা

'শতরূপে সারদা' গ্রন্থে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ লিখেছেন ঃ "রামকৃষ্ণ মিশনের প্রবীণ সন্ন্যাসীদের সূত্রে জানা যায়, স্বামীজী এদেশে ফিরে এসেও কলকাতায় শ্রীমায়ের স্থায়ী বাসস্থানের জন্য জমি ক্রয় এবং গৃহনির্মাণ সম্পর্কে গুরুভাইদের সঙ্গে মাঝে মাঝেই আলোচনা করেছেন, এমনকি এখন যেখানে মায়ের বাড়ি—সেই জায়গাটিও স্বামীজী সম্ভবত দেখে রেখেছিলেন এবং ঐ জমির মালিক কেদারচন্দ্র দাসের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তাও হয়েছিল। কিন্তু ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজীর হঠাৎ তিরোধানের ফলে কিছুদিনের জন্য ব্যাপারটি চাপা পড়ে। চার বছর পরে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জুলাই কেদারচন্দ্র দাস 'মায়ের বাড়ি'র জমিটি বেলুড় মঠকে দান করেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে স্বামীজীর গ্রন্থাবলীর বিক্রয়লব্ধ সঞ্চিত ২,৭০০ টাকা ও আরো কিছু অর্থ ঋণ করে স্বামী সারদানন্দ বাড়ি তৈরির কাজে লাগেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে বাড়ি তৈরি শেষ হয়। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মে শ্রীমা এই বাড়িতে পদার্পণ করেন। অবশ্য রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একজন বিশিষ্ট গবেষক সন্ন্যাসী স্বামী প্রভানন্দ মনে করেন, এমনও হতে পারে স্বামীজীকে হয়তো শ্রীশ্রীমা নিজেই নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রথমে মূল মঠ তৈরি ও সংগঠনের কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে।"[৫]

স্বামীজীর সুপ্ত বাসনা এবং অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষাকে সম্বল করে স্বামী সারদানন্দ এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে নেমে পড়েন সামান্য অর্থ নিয়ে। একটি শুভদিন দেখে 'ভিতপূজা' করে, বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও আরো টাকা ঋণ করে স্বামী সারদানন্দ বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেন।

পরবর্তী কালে স্বামী সারদানন্দ বলেছিলেন ঃ "যখন উদ্বোধনের বাড়ি হয়, তখন এগারো হাজার টাকা দেনা। ঐ দেনা ঘাড়ে নিয়ে বাড়ি করা হলো। বই বিক্রি ইত্যাদি দ্বারা তা শোধ হয়েছিল। মাকে রাখবার জন্যে এই বাড়ি করা। তাঁকে কেন্দ্র করে—তাঁর জন্যেই সব—এই ভাবে ভরপুর হয়ে তখন সকল কাজ করতুম।"[৬]

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে নবনির্মিত এই বাড়িতে উদ্বোধন কার্যালয় স্থায়িভাবে উঠে আসে এবং ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মে (৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬, রবিবার) এখানে শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম শুভাগমন হয়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ভাইঝি রাধু ও মাকু। বাড়ি দেখে খুশি হয়ে শ্রীশ্রীমা স্বামী সারদানন্দকে খুব আশীর্বাদ করেছিলেন। গোলাপ-মা এবং যোগীন-মা এইসময় থেকেই শ্রীশ্রীমায়ের সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে তাঁর সেবা করতে থাকেন। গোলাপ-মা এই বাড়িতে থাকতেন। যোগীন-মা তাঁর বাপের বাড়ি (৫১/১ বাগবাজার স্ট্রিট) থেকে এখানে এসে মায়ের সেবা করতেন।

শ্রীশ্রীমায়ের আগমনের পর থেকে বেলুড় মঠের অধীনে এই বাড়িটিকে মঠের নতুন শাখারূপে গণ্য করা হয় এবং এর নাম হয়—'শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার'। বাড়িটির প্রবেশদ্বারে লেখা আছে—'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'। ঐ বছর আরো অতিরিক্ত যে-জমি সারদানন্দ কিনেছিলেন, সেই জমিতে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে আরো কয়েকখানি ঘর তৈরি করে বাড়ির কলেবর বৃদ্ধি করা হয় এবং এরপর ১৯৫৬-৫৭ সালে এই বাড়ির পূর্বদিকের আয়তন বৃদ্ধি করা হয়েছে।

মায়ের বাড়িতে সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করে ডানদিকে দুখানি ঘর এবং সিঁড়ির নিচে একখানি ঘর। বামদিকে চারখানি ঘর। ডানদিকের প্রথম ঘরটিতে সাধু-ব্রহ্মচারীরা উদ্বোধনের যাবতীয় কাজ করতেন এবং রাত্রে শোওয়ার ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হতো। দ্বিতীয় ঘরটিতে আনাজ কাটা হতো এবং রাত্রে কয়েকজন সাধু-ব্রহ্মচারী থাকতেন। তখন সিঁড়ির নিচের ঘরটি ঠাকুরের ভাঁড়ারঘর ছিল। উৎসবের সময় এই ঘরে শালপাতা, মাটির গ্লাস ইত্যাদি রাখা হতো।

সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করে বামদিকের ঘরটি ছিল স্বামী সারদানন্দের। এই ঘরটি তিনি অফিসঘর হিসাবে ব্যবহার করতেন। তিনি ঐ ঘরে মঠ-মিশনের যাবতীয় কাজ, ক্লাস নেওয়া, ধর্মবিষয়ে আলোচনা, নানা জটিল সমস্যার সমাধান—এককথায় সমস্ত কাজকর্ম করতেন। এমনকি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থটিও তিনি এই ঘরে বসে লেখেন। বর্তমানে তার পাশের দুখানি ঘরে ভক্ত ও সাধু-ব্রহ্মচারীদের প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

কিছুদিন পরে পরিধি সামান্য বিস্তৃত হয়। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ডিসেম্বর এই বাড়ির লাগোয়া ১ কাঠা ৪ ছটাক জমি ১,৮৫০ টাকায় কেনা হয়। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে এই জমির ওপর একতলায় একটি ও দোতলায় একটি ঘর এবং একটি কাঠের সিঁড়ি (ছাদে ওঠার) নির্মিত হয়। এই ঘর দুটি তৈরি হওয়ার পর একতলার ঘরটি উদ্বোধন কার্যালয়ের

অফিসঘর হিসাবে এবং দোতলার ঘরটি স্বামী সারদানন্দের শয়নঘররূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। মহারাজ দোতলার ঘরে শয়ন ব্যতীত অন্য সময় থাকতেন না, সকালেই স্নান সেরে নিচের ঘরে নেমে আসতেন, দুপুরে আহারের পর বিশ্রাম নিতেন নিচের ঘরেই এবং দোতলায় উঠতেন রাতের আহারের পর। এই সময় তিনতলার ছাদের পশ্চিমদিকে, সিঁড়ির উত্তরে আরেকটি ছোট ঘরও তৈরি হয়েছিল।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে (১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩) চন্দননগর-নিবাসী, 'ঘটক প্রপার্টি কোম্পানি লিমিটেড'-এর মালিক কার্তিকচন্দ্র ঘটক মায়ের বাড়ির সংলগ্ন ১ কাঠা ৪ ছটাক জমি বাড়ি-সহ শ্রীশ্রীমাকে নিবেদন করেন। তখন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ। মঠের কর্তৃপক্ষ বাড়িটির সংস্কারসাধন করে তিনটি তলায় একটি করে হলঘর নির্মাণ করেন। একতলার হলঘরটি বর্তমানে সাধু ও ভক্তদের খাবারঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং দোতলা ও তিনতলার হলঘর-দুটি সাধুদের 'গেস্ট রুম' হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

খাবারঘরের পিছনের অংশটি—যেটি গোপালচন্দ্র নিয়োগী লেনে শেষ হয়েছে—সেটি স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ অধ্যক্ষ থাকাকালীন কেনা। এর ফলে একতলায় রান্নাঘর ও ভাঁড়ারঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দোতলায় একটি বড় ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এখন সব মিলিয়ে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি'তে মোট ১৯টি ঘর—একতলায় ৮টি, দোতলায় ৬টি এবং তিনতলায় ৫টি। তবুও উৎসবের সময় প্রচণ্ড ভিড়ে স্থান-সঙ্কুলান না হওয়ায় সম্প্রতি মায়ের বাড়ির বাঁদিকের বাড়িটি কেনা হয়েছে।

মায়ের বাড়ির দোতলায় উত্তর-পশ্চিম কোণের ঘরটিকে প্রথম থেকেই ঠাকুরঘর হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে আসছে। ঘরের পূর্বদিকের বেদিতে একটি রুপোর সিংহাসনে শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো বসিয়ে পূজা করা হতো। ভগিনী নিবেদিতা নিজের হাতে রেশমের একটি চাঁদোয়া তৈরি করেছিলেন; সেটি ঠাকুরের সিংহাসনের ওপর টাঙানো হতো। এর পাশে পশ্চিমের ঘরটি শ্রীশ্রীমায়ের শয়নের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। দোতলার আরেকটি ঘর (পাথরের সিঁড়ির ডানদিকে) এবং তিনতলার ঘরটিও গোলাপ-মা প্রমুখের জন্য ও অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতো।

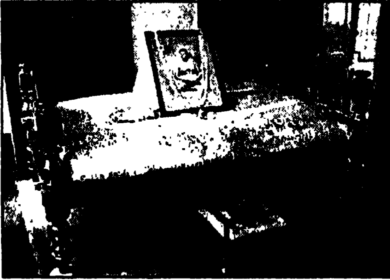
শ্রীশ্রীমা এসে সবকিছু দেখে এই ব্যবস্থার একটু পরিবর্তন করলেন। তিনি তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ঘরে না থেকে ঠাকুরঘরেই থাকবেন স্থির করলেন। বললেন : "ঠাকুরকে ছেড়ে আমার থাকা চলে না, থাকা উচিতও নয়।" তাঁর ইচ্ছানুসারে স্বামী সারদানন্দ ওখানেই মায়ের থাকার ব্যবস্থা করেন। ঠাকুরঘরে একই খাটে রাধুকে নিয়ে শ্রীশ্রীমা থাকতেন। তাঁর কাছে ঠাকুরের যে-আলোকচিত্রটি সবসময় থাকত, যেটিকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং একদিন পূজা করেছিলেন—সেই আলোকচিত্রটি ঘরের পূর্বদিকে বেদিতে রেখে উত্তরদিকে মুখ করে শ্রীশ্রীমা নিত্যপূজা করতেন। এখনো আলোকচিত্রটি নিত্যপূজিত হয়। শ্রীশ্রীমা যখন উদ্বোধন থেকে অন্য স্থানে যেতেন, তখন ঠাকুরের অপর একটি আলোকচিত্র সঙ্গে নিয়ে যেতেন এবং প্রথমোক্তটি সাধু-ব্রহ্মচারীরা পূজা করতেন।


বেদিতে আসীন শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্যান্যরা

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই শ্রীশ্রীমায়ের মহাপ্রয়াণের পর তাঁর ব্যবহৃত খাটটির ওপর তাঁর একটি বড় আলোকচিত্র রাখা হয় (তিনি স্থূলদেহে থাকাকালীনই এটি দেখেছিলেন বলে জানা যায়।) এবং সেই থেকে তাঁর পূজাও শুরু হয়। এই ঘরের পূর্বদিকের ঘরটি ছিল স্বামী সারদানন্দের। তাঁর দেহাবসানের (১৯ আগস্ট ১৯২৭) পর থেকে ঘরটি আগের মতোই রয়েছে। এই ঘরে দুটি আলমারিতে শ্রীশ্রীমা ও স্বামী সারদানন্দের ব্যবহৃত জিনিসপত্র রয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের ঘরের সঙ্গে সংযুক্ত ঘরটি ব্যবহৃত হচ্ছে পূজার ভাঁড়ারঘর হিসাবে।

এই বাড়িতে নানা ঘটনার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দশম অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ জানিয়েছেন : "মা তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দীক্ষা দিয়ে গেছেন। মা যখন উদ্বোধনে অত্যন্ত অসুস্থ, তখন একদিন এক পারসি যুবক এসে উপস্থিত। তিনি মঠে অতিথি হয়ে কয়েকদিন ধরে বাস করছিলেন। এখন মায়ের কাছে এসেছেন তাঁকে দর্শন করতে এবং তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিতে। মায়ের তখন এত অসুখ যে, দর্শন একেবারে বন্ধ। এই যুবকটি নিচে বসে রইলেন, তাঁকে দোতলায় যেতে দেওয়া হলো না। মা কিন্তু কিভাবে জেনে গেলেন যে, এই যুবকটি নিচে তাঁর দর্শনের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি তখন একজনকে বললেন তাঁকে তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে আসতে। মা তাঁকে দীক্ষা দিয়ে নিচে পাঠিয়ে দিলেন। স্বামী সারদানন্দ এই ঘটনার কথা জানতে পেরে মন্তব্য করলেন, 'মায়ের যদি এক পারসি শিষ্য করার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তাহলে আমার আর কি বলার আছে?' এই পারসি যুবকটি আর কেউ নয়, চিত্রজগতের বিখ্যাত অভিনেতা ও প্রযোজক মুম্বাইয়ের সোরাব মোদি।"[৭]

শ্রীশ্রীমা উদ্বোধনে থাকাকালীন স্বদেশী আন্দোলনের বহু বিপ্লবী তাঁকে প্রণাম করতে আসতেন এবং আশীর্বাদ ভিক্ষা করতেন। প্রখ্যাত বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দও একবার শ্রীশ্রীমায়ের কাছে এসেছিলেন। নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে এক রবিবার তিনি এই বাড়িতে এসেছিলেন শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ নিতে। তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবী এবং গর্ভধারিণীও এখানে এসে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা পেয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মৃণালিনী দেবীর দীক্ষা সম্পর্কে পরবর্তী কালে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন ঃ "I was glad to know that she had found so great a spiritual refuge..."[৮]



স্বগৃহে স্বামী সারদানন্দ

আরেকটি ঘটনার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। সেটা ১৯১১ সাল। উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিতে এসেছেন ভরত মহারাজ—স্বামী অভয়ানন্দ। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল অতুলচন্দ্র গুহ। সেইসময় মঠে চারজনের নাম 'অতুল' হওয়ায় স্বামী প্রেমানন্দ তাঁর নতুন নাম দিয়েছিলেন 'ভরত'। তিনি তাঁর স্মৃতিচারণে জানিয়েছেন ঃ ''মা ছিলেন উদ্বোধনের যে-ঘরে এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা হয়, সেই ঘরটিতে। শ্রীশ্রীমা ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখতেন সবসময়। আজ কিন্তু ঘোমটা ছিল না। আসন পাতা ছিল। ঘরে ঢুকে সেই আসনে বসলাম। আসনে বসবার কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীমা আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। যতদূর মনে পড়ে, আমার ইষ্ট সম্বন্ধে বা ঐরকম কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি বলেছিলাম, 'আমার কি ভাল লাগে, কি ভাল লাগে না, তা তো জানি না। আপনার যা ভাল মনে হয়, তা-ই আমাকে দিন, মা।' মা বললেন, 'তা-ই হবে।' এরপর তিনি কিছুক্ষণ ধ্যান করলেন, তারপর আমাকে মন্ত্র দিলেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম, এতদিন যে-ভাব নিয়ে আমি আছি, ঠিক সেই ভাব অনুযায়ী তিনি মন্ত্র দিয়েছেন।... মা-ঠাকরুণ তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে আমার মনের কথা ঠিক জেনে নিয়েছেন। এর ফলে আমার মনে খুব তৃপ্তি ও আনন্দ হলো। এইভাবে আমার দীক্ষা হলো।''[৯]

এমন বহু চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছে এই ঐতিহাসিক ভবনে। এইসকল ঘটনা থেকে শ্রীশ্রীমায়ের অতুল ঐশী শক্তি প্রকাশিত হয়। ভক্তদের বিশ্বাস, তিনি এখনো একইভাবে এই পুণ্য ভবনে অবস্থান করে অগণিত মানুষকে কৃপা করে চলেছেন।

প্রসঙ্গত, প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের যেসকল সন্ন্যাসী 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি'র অধ্যক্ষপদে আসীন হয়েছেন, তাঁরা হলেন ঃ স্বামী সারদানন্দ (১৯০৮-১৯২৭)[১০], স্বামী বিরজানন্দ (১৯২৯-১৯৩০), স্বামী আত্মবোধানন্দ (১৯৩০-১৯৫৮), স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ (১৯৫৮-১৯৬৭), স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ (১৯৬৭-১৯৬৮), স্বামী বীতশোকানন্দ (১৯৬৮-১৯৬৯), স্বামী নিরাময়ানন্দ (১৯৬৯-১৯৭২), স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ (১৯৭৩-১৯৭৮), স্বামী আত্মস্থানন্দ (১৯৭৮-১৯৭৮), স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ (১৯৭৯-১৯৮১), স্বামী নিরাময়ানন্দ (১৯৮১-১৯৮৪), স্বামী নির্জরানন্দ (১৯৮৪-১৯৮৯), স্বামী সত্যব্রতানন্দ (১৯৮৯-অদ্যাবধি)।

প্রসঙ্গত আরো উল্লেখ্য, শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি ও উদ্বোধন কার্যালয় একই বাড়িতে থাকলেও পত্রিকার প্রচার বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে স্থান-সঙ্কুলান হয়নি। তাই কাছেই নয়নকৃষ্ণ সাহা লেনের ওপর ১২ কাঠা ৪ ছটাক জমি কেনা হয়। ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৭ এই নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং ৪ এপ্রিল ১৯৭১ এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। এই বাড়ির একতলায় পুস্তকবিক্রয় কেন্দ্র, দোতলায় প্রকাশনা বিভাগ ও সভাগৃহ, তিনতলায় 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদকীয় দপ্তর ও গ্রন্থাগার এবং চারতলায় সাধুনিবাস। ১০৪ বছর আগে বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বিশ্বমানবের আত্মচৈতন্য জাগরণে যে-পত্রিকার প্রবর্তন করেছিলেন—সেই 'উদ্বোধন' কালের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আজও নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। ভারতীয় সাময়িকপত্রের ইতিহাসে এ এক অভিনব ঘটনা। এই সুবৃহৎ কর্মকাণ্ড সঙ্ঘটিত হচ্ছে এই বিশালায়তন ভবনে—বর্তমানে যা 'উদ্বোধন অফিস' নামে পরিচিত।

বাগবাজারে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' স্থাপনার পর তাঁকে কেন্দ্র করে যে সুবিশাল কর্মযজ্ঞ স্বামী সারদানন্দ একদা শুরু করেছিলেন, তা এখনো অব্যাহত। এই পুণ্যপীঠে এসে মানুষ লাভ করে অপার শান্তি, আনন্দ ও পথচলার প্রেরণা। ❑

তথ্যসূত্র

১ দ্রঃ শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী ও উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ১৪-১৫
২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৭৪
৩ ঐ, পৃঃ ২৪৫
৪ ঐ, পৃঃ ১০৪
৫ শতরূপে সারদা, ১ম প্রকাশ, পৃঃ ৩৫
৬ স্বামী সারদানন্দের জীবনী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ২য় সং, পৃঃ ৮৬
৭ শতরূপে সারদা, পৃঃ ৭১২-৭১৩
৮ ঐ, পৃঃ ৪৫৮
৯ ঐ, পৃঃ ৭২৩
১০ ১৯২৭-১৯২৯—এই দুবছর ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ ম্যানেজার হিসাবে কাজ চালিয়েছিলেন।

মহাভারত ঃ

চরিত্রচিত্রণ ও উপস্থাপনা

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

গত শারদীয় 'উদ্বোধন' ১৪০৮-এ স্বামী তথাগতানন্দ রচিত 'মহাভারত কথা'র একটি ক্ষুদ্র সমালোচনা অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু করেছিলেন। তাতে আমরা যথেষ্ট তৃপ্ত হইনি। পরবর্তী কালে তাই আরো কিছু 'মহাভারত কথা' শোনানোর দায়িত্ব তিনি বহন করেছেন। বলা বাহুল্য, উপরি উক্ত গ্রন্থটির প্রেক্ষিতেই। মহাভারত সম্পর্কে লেখক নিজস্ব কিছু ধারণা এখানে পরিবেশন করেছেন, তবে তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে সকলেই যে একমত হবেন, তিনি নিজেও সে-দাবি করেন না।

।।১।।

মহাভারতে কি নেই? ধর্ম, সমাজনীতি, কূট রাজনীতি থেকে শুরু করে ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত সবই আছে। মহাভারত প্রসঙ্গে আমার কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি। আমার আশঙ্কা হয়, অনেক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির লালিত ধারণার কোমলাঙ্গে আঘাত লাগতে পারে। তাঁদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। তবে তাঁদের আশ্বস্ত করে বলতে পারি, সন্দেহ। আমার এই ভবিষ্য-গণকের ভূমিকাও ক্ষমার্হ।

অনেকে বলেন, একালের মাপকাঠিতে সেকালের বিচার করা উচিত নয়। কিন্তু সেকাল একাল সবকালে ব্যবহৃত মাপকাঠি তো আছে! না হলে পুরাকালের মহাভারতের ধর্মকথা একালে আমরা শুনবই বা কেন? তেমন মাপকাঠিতে বিচার করবার সময়ে অনেক বিষয়ে একালের বিচার তীক্ষ্ণ হয়ই—সবকিছুকে ধর্মাবৃত বলে মনে হয় না। যেমন ধরা যাক দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর কাণ্ডটি। ব্যাপারটির অসামাজিকতা যদি সেকালেই প্রকট হয়ে না উঠত, তাহলে তার ঔচিত্য প্রমাণে পূর্বজন্মের কীর্তিকাহিনীর দৃষ্টান্ত ও ঋষিবাক্যের প্রয়োজন হতো না। অত কিছু করার পরেও দ্রৌপদী যেসব প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার অন্যতমা বলে শ্লোকনিবিষ্ট হয়েছেন ("অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।/ পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্।।"), তাঁরা সকলেই প্রাচীন পৃথিবীতে প্রচলিত মান অনুযায়ী নৈতিক শিথিলতায় দুষ্ট। স্মর্তব্য, উক্ত সংস্কৃত শ্লোকটি একালে রচিত নয়। শ্লোকটির রচয়িতা ধন্য—তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, মানবসমাজের জন্য সমাজনীতি তৈরি করেছে মানুষ, কিন্তু এমন মানুষ সম্ভব যিনি বা যাঁরা সমাজনীতি ভেঙেও মহিমান্বিত হতে পারেন, পাতকীরা সমুজ্জ্বল হতে পারেন কলঙ্কিত চন্দ্রালোকে—যদি তাঁরা নিজেদের জীবনের কালিমাকে একমাত্র জীবনসত্য মনে করে থেমে না যান।



অর্জুনের কর্ণবধ

মহাভারত মহাকাব্যের মহিমা ঘোষণায় আমি তাঁদের অপেক্ষা ক্ষীণকণ্ঠ নই এবং অনেকের মতো আমারও ধারণা, মহাভারতের তুল্য কিছু এতাবৎ রচিত হয়নি, হবেও কিনা

ঐসকল নারীর জীবনে উত্তরণের ইতিহাস লিখিত আছে। তাই তাঁরা স্খলন-পতনসঙ্কুল সাধারণ জীবনের ক্ষেত্রে নিত্যস্মরণীয়া। লক্ষ্য করার বিষয়, স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু

"হে ভারত ভুলিও না" বলে যেসকল নারীচরিত্রকে স্মরণীয় বলে নির্দেশ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ঐ শ্লোকনিবদ্ধ নারীরা নেই। সেখানে আছেন সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। স্বামীজী আদর্শের ক্ষেত্রে আপসহীন।

।।২।।

মহাভারত জুড়ে বারবার পাণ্ডবদের বীরত্বের জয়ধ্বনি। পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে অর্জুন আবার বীরাগ্রগণ্য। কিন্তু এই পাণ্ডব বীরগণকে প্রায়শই দেখা যায়, বিশেষত সঙ্কটক্ষণে, কৃষ্ণরক্ষিত এবং কৃষ্ণচালিত। কৃষ্ণ ধর্মসংস্থাপক এবং পাণ্ডবরা ধর্মচালিত। পাণ্ডবদের জয় হোক। তবে একালের মানুষ হিসাবে আমরা প্রশ্ন করবই, এত বেশি কৃষ্ণাশ্রয় কি পাণ্ডবদের একধরনের নাবালকত্বে—না, কথাটা ভাল নয়—একধরনের পরনির্ভরতায় বেঁধে রাখেনি? যেখানে ঝঞ্ঝাট, যেখানে গণ্ডগোল—সেখানেই কৃষ্ণের পরিত্রাতার ভূমিকা। তাতে যন্ত্রীর গৌরব, যন্ত্রের কতখানি? অনেক সময়েই তো মনে হয় পাণ্ডবরা কৃষ্ণ-নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র। অর্জুন মহাবীর, অবশ্যই। কিন্তু তাঁর মাথার কিরীট বজায় রাখতে অর্জুনসুদ্ধ রথকে পায়ের চাপে ভূগর্ভে প্রোথিত করতে হয়েছিল কৃষ্ণকে। উক্ত কিরীট অর্জুন পান ইন্দ্রের কাছ থেকে। বরুণদেব অর্জুনকে দেন কপিধ্বজ রথ, রথের জন্য চারটি শ্বেতবর্ণ অশ্ব এবং গাণ্ডীব ধনু। 'দেবদত্ত' নামক শঙ্খ দেন ইন্দ্র অথবা ময়দানব। আরো মহা মহা প্রাপ্তি তাঁর ঘটেছে—মহাদেব দিয়েছেন 'পাশুপত' অস্ত্র, দ্রোণাচার্য দিয়েছেন 'ব্রহ্মশির' শক্তি, ব্যাসদেব দিয়েছেন 'প্রতিস্মৃতি' বিদ্যা। মনুষ্যগণ ও দেবগণ মিলে অর্জুনকে যেভাবে সাজিয়েছেন তাতে মহিষাসুরনিধনের আগে দেবগণের কাছ থেকে মহাদেবীর অস্ত্রলাভের কথা স্মরণ করায়। এই ধনুর্ধর ব্যক্তি আবার অতিশয় হৃদয়বান! তাই বর্ম-টর্ম পরিধান করে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বিপক্ষ দলের স্বভাবচরিত্র হাড়হদ্দ জেনেও তিনি আত্মীয়দের প্রতি প্রেমে এমনই গদগদ হয়ে পড়লেন যে, তাঁকে চাঙ্গা করতে কৃষ্ণকে গোড়ায় ধমক-ধামক দিতে হলো, তাতেও যথেষ্ট না হওয়ায় অগত্যা দেখাতে হলো বিশ্বরূপ। অর্জুন কিন্তু বারোবছর বনবাসের অসহ্য কষ্ট, একবছর নপুংসক জীবনের গ্লানি, কৌরবদের ধারাবাহিক হিংস্র শত্রুতা, সর্বোপরি সর্বসমক্ষে পত্নী দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার স্মৃতি মন থেকে বোধ করি মুছে ফেলতে পেরেছিলেন। অর্জুনের স্মৃতি খুবই দুর্বল, সেজন্য তাঁকে ভগবদ্গীতার 'সামারি' অনুগীতা পরে শোনাতে হয়েছিল কৃষ্ণকেই।

অর্জুনের একটি বিচিত্র গোপন প্রতিজ্ঞা—কেউ যদি তাঁর গাণ্ডীবের নিন্দা করে, তাহলে সেই ব্যক্তিকে নিকেশ করে ফেলতেই হবে। ফলে যুদ্ধকালে একবার পিতৃসম যুধিষ্ঠির সেই গর্হিত কাজটি করে ফেলায় (তিনি অবশ্যই অর্জুনের মহাপ্রতিজ্ঞার কথা জানতেন না, নচেৎ সাধ করে ভাইয়ের হাতে মরণকামনা করার মতো নির্বুদ্ধিতা সেই মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তিটির ছিল না।) তাঁকে লোকান্তরে পাঠাবার জন্য অর্জুন যখন সমুদ্যত (নিঃসন্দেহে, গাণ্ডীবের অপমান কৌরবসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার চেয়ে বৃহৎ ব্যাপার ছিল, তা না হলে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার মূল হেতু যুধিষ্ঠিরকে আগেই তিনি ধরাপ্রস্থান করাতেন।), তখন সেই বালকোচিত প্রতিজ্ঞার অনুরূপ বালকমোহন একটি প্রতিষেধকের বিধান কৃষ্ণ দিয়েছিলেন—গুরুজনদের নিন্দা করা মানেই তাঁর মৃত্যুদান করা। তুমি সখা, সেই অপকর্মটি করে ফেল। তদনুযায়ী বাধ্য ছাত্র অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে গুছিয়ে গাল পেড়ে গাণ্ডীবের মর্যাদা ও যুধিষ্ঠিরের প্রাণ—উভয়ই রক্ষা করলেন। এর ফলে আবার উলটো উৎপত্তি! পিতৃসম জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিন্দা করার জন্য আত্মগ্লানিতে পূর্ণ অর্জুন আত্মহত্যা করতে মনস্থ করলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ পুনশ্চ সেই অপরিণতবুদ্ধি সখাটিকে সামলাবার জন্য আরেকটি সুযোগ্য বিধান দিলেন—নিজমুখে আত্মপ্রশংসা করলে আত্মহত্যা করা হয়, এবার তা করে ফেল। সেই সুবিধাজনক কাজটি করতে অর্জুনের অসুবিধা হয়নি। প্রাণ বড় ধন! যাহোক, মহাভারতের এই হাস্যকর অংশটির পর্যালোচনা করতে গিয়ে হতাশ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র'-এ একে তৃতীয় শ্রেণীর কোন কবির জুড়ে দেওয়া লেখা বলে পাশ কাটিয়েছেন।

অর্জুনের যথেষ্টই ঈর্ষা ছিল, যা একটি তরুণ বালকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দিয়েছিল। পাছে দ্রোণ-প্রত্যাখ্যাত স্ব-শিক্ষিত একলব্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়, তাই অর্জুন ঈর্ষাপরবশ হয়ে আচার্যকে একলব্যের অস্ত্রনৈপুণ্যের কাহিনী শোনান এবং দ্রোণ অর্জুনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার জন্য তাঁর ভাবী শত্রুকে নিষ্ঠুরভাবে অঙ্গুষ্ঠহীন করেন।

আবার প্রতিজ্ঞা করতে এবং প্রতিজ্ঞা ভাঙতে যথেষ্ট পটুত্ব দেখিয়েছেন অর্জুন। পাণ্ডবদের মধ্যে শর্ত ছিল, দ্রৌপদীর সঙ্গে কোন ভাইয়ের বিহারকালে অন্য কোন ভাই সেখানে প্রবেশ করলে তাকে শাস্তিস্বরূপ বনগমন করতে হবে। একদা যখন যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী অস্ত্রাগারে অবস্থান করছিলেন, তখন এক ব্রাহ্মণের গোধনরক্ষার জন্য অস্ত্রসংগ্রহের উদ্দেশ্যে অর্জুন সেখানে প্রবেশ করতে বাধ্য হন। অর্জুনের উদ্দেশ্য সৎ সন্দেহ নেই। এবং অর্জুনের ব্রহ্মচর্য ব্রত নিয়ে পরবর্তী বারোবছরের বনগমনের সিদ্ধান্তও বীরোচিত। যুধিষ্ঠির ওহেন কঠোর সিদ্ধান্ত না করার জন্য যখন কাকুতি-মিনতি করেছিলেন, তখন অর্জুনের সে কী সমুন্নত সত্যপ্রীতি! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে তিনি শুনিয়ে দেন—"ছলপূর্বক ধর্মাচরণ করা উচিত নয়।" তবে লখিন্দরের লোহার বাসরে যে-ছিদ্র ছিল, অর্জুনের লৌহকঠিন প্রতিজ্ঞায় ছিদ্র তার চেয়ে একটু বেশিই ছিল। বারোবছরের মধ্যে মাত্র তিনবার তিনি ব্রহ্মচর্যব্রত ভঙ্গ করেছেন—সেই কালে নাগকন্যা উলূপী, মণিপুরের চিত্রসেনকন্যা চিত্রাঙ্গদা এবং কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রাকে বিবাহ

করে তাঁদের গর্ভে পুত্রোৎপাদনও করেছেন। আবার সাত্যকিকে বাঁচাবার জন্য অর্জুন যুদ্ধনীতি ভঙ্গ করে পিছন থেকে অস্ত্রনিক্ষেপ করে ভূরিশ্রবার বাহু ছিন্ন করেন। ভূরিশ্রবা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধরত ছিলেন না। অর্জুন আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন যে, অত্যন্ত অন্যায়ভাবে যুদ্ধের সকল নীতি বিসর্জন দিয়ে অভিমন্যুকে বধ করা হয়েছিল। এই তো স্বাভাবিক মানুষের কথা! অন্যায়ের উত্তরে অন্যায় করা যায়—ধর্মবিধিকে কিছুক্ষণ চাপা দিয়ে।

তথাপি অর্জুন ধর্মবেত্তার ভূমিকা একেবারে ত্যাগ করতে পারেননি। এই ভূমিকায় তিনি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পর্যন্ত ধর্মকথা শুনিয়ে দিয়েছেন। দ্রোণ-বিনাশের জন্য যুধিষ্ঠির কৌশলী মিথ্যাকথা বলেন : "অশ্বত্থামা হতঃ ইতি কুঞ্জরঃ।" শেষ দুটি শব্দ অনুচ্চ স্বরে। যুধিষ্ঠিরের কৌশলবাক্যের ফলাফল দেখে ক্রুদ্ধ অর্জুন ধিক্কার দিয়ে বলেন : "আপনি রাজ্যলাভের জন্য গুরুর সঙ্গে মিথ্যা আচরণ করেছেন। রামচন্দ্রের বালি বধ করার মতো চিরদিন আপনার অকীর্তি থাকবে।" ঐ মিথ্যাভাষণ অবশ্যই যুধিষ্ঠিরের অকীর্তি। কিন্তু প্রশ্ন, অর্জুন যদি তাঁর পুনঃ পুনঃ অহঙ্কৃত ঘোষণা অনুযায়ী— "আমি একদিনে কৌরবপক্ষকে শেষ করে ফেলতে পারি" —সত্যই করে ফেলতেন, তাহলে তো দ্রোণমথিত পাণ্ডব-পক্ষের কর্তা যুধিষ্ঠিরের মিথ্যাচার করার দরকার হতো না। এই সূত্রে অর্জুনের খাঁটি সত্যভাষণের আরেকটি নমুনা দেওয়া যায়, যার দ্বারা তিনি আমাদের মনে দীর্ঘপোষিত তাঁর ইমেজটিকে ভঙ্গ করেছেন। যুদ্ধের পূর্বে সমর্থনপ্রার্থীরূপে কৃষ্ণসকাশে আগত দুর্যোধন নিরস্ত্র কৃষ্ণের পরিবর্তে দুর্ধর্ষ সংশপ্তক বাহিনী চেয়ে নিয়েছিলেন, আর অর্জুন নিয়েছিলেন নিরস্ত্র কৃষ্ণকে। তখন আমরা ভেবেছি, আহা অর্জুনের কী কৃষ্ণভক্তি! এপ্রসঙ্গে উদ্যোগপর্বে অর্জুনের একটি কথা স্মরণ করা যাক। কৃষ্ণ প্রশ্ন করেছিলেন : "তুমি নিরস্ত্র আমাকে বাছলে কেন?" উত্তরে অর্জুন বলেন : "পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি সমস্ত শত্রুকে সংহার করতে পারেন, আমিও পারি। জগতে আপনি নিয়ত কীর্তিমান। সে-যশ আপনারই হবে। আমি যশপ্রার্থী, সেজন্য আপনাকে বরণ করলাম।" এই কথার অর্থ দাঁড়ায়—আপনাকে নিষ্ক্রিয় রেখে (এবং আপনার নিষ্ক্রিয় সক্রিয়তার সাহায্য নিয়ে) আমি একাই শত্রুসংহারকর্তার যশ অর্জন করব।

আরো একটি দুর্বোধ্য ব্যাপারের উল্লেখ করা যাক। কৃষ্ণের অন্তিম বাক্য—"যেই অর্জুন সেই আমি, যেই আমি সেই অর্জুন।" তাই যদি হয়, তাহলে অর্জুন কেন দস্যুদের হাত থেকে যাদবনারীদের রক্ষা করতে পারলেন না? কারণ হিসাবে বলা হয়, কৃষ্ণবিহনে অর্জুন শক্তিহারা। সেকি! কৃষ্ণ তো তাঁর অন্তিমবাক্যে বলে গিয়েছেন, তিনি ও অর্জুন এক!

অর্জুনের বীরত্বের কয়েকটি দিক পুনশ্চ খতিয়ে দেখা যাক। দেখা যায়, দৈবশক্তির বূহমধ্যে তাঁর বীরত্ব রক্ষিত। যুদ্ধারম্ভে, ধার্মিক মানুষ তিনি, পূজার্চনা করতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে তিনি দুর্গার্চনা করেছেন, জয়দ্রথবধের আগে মহাদেব পূজা করেছেন, যুদ্ধের সময়ে তিনি দিব্যচক্ষে দেখেন, 'শূলহস্তে মহাদেব' তাঁর 'অগ্রে গমন করছেন' এবং 'তাঁরই কৃপায় যুদ্ধজয় হয়'। তাছাড়া প্রাণসখা মানবদেহধারী ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তো সর্বদা সঙ্গে ছিলেন। যুদ্ধকালে বৃদ্ধ ভীষ্ম যখন পাণ্ডবপক্ষকে ধ্বংস করছেন, অর্জুনকে অনেক উপদেশ দিয়েও কৃষ্ণ উপযুক্তভাবে সক্রিয় করতে পারছেন না—তখন অর্জুনের নিশ্চেষ্টতা, সৈন্যদের মনোবল ভঙ্গ ইত্যাদির জন্য নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে কৃষ্ণকে চক্রহস্তে ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হতে হয়েছিল। অভিমন্যুর মৃত্যুতে ক্ষিপ্ত অর্জুন প্রতিজ্ঞা করে বসেন, পরদিন তিনি জয়দ্রথকে (যিনি চক্রব্যূহের দ্বার রক্ষা করে পাণ্ডবদের ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করতে দেননি, ফলে ব্যূহমধ্যে একাকী যুদ্ধরত অভিমন্যুকে রক্ষা করাও যায়নি।) মারবেনই, না পারলে নিজে মরবেন। কিন্তু সূর্য যখন ডুবুডুবু তখনো তিনি জয়দ্রথকে মারতে পারেননি। তাঁকে অবধারিত আত্মহত্যা থেকে বাঁচাবার জন্য কৃষ্ণ যোগবলে অন্ধকার সৃষ্টি করে কৌরবদের বুদ্ধিভ্রংশ করেন। অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করেন। অর্জুনের বীরত্বের বিশেষ পরিচয় তাঁর কর্ণবধ। কর্ণকে কে মেরেছেন, কেবল অর্জুন? না, সমবেতভাবে কর্ণকে কার্যত অভিমন্যুবধ করা হয়েছিল? কর্ণকে দ্রোণাচার্যের প্রত্যাখ্যান, পরশুরামের শাপ, তাঁর শক্তিহরণে ইন্দ্রের চাতুরী—এসবের কথা এখন বাদ দিচ্ছি, কিন্তু মোটেই ভুলব না যে, শল্য কর্ণের সারথি হয়েছিলেন অবিরাম নিন্দা করে তাঁর তেজঃক্ষয় করার জন্য, আর কৃষ্ণ অর্জুনের সারথি হয়েছিলেন অর্জুনের তেজবৃদ্ধির জন্য। এই অবস্থায় পূর্বেই প্রায় মৃত কর্ণকে মেরে অর্জুন বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন!

।।৩।।

পাণ্ডবদের মধ্যে ভীমসেন অত্যন্ত স্বাভাবিক চরিত্র—ন্যায়-অন্যায় বোধসম্পন্ন শক্তিশালী পুরুষ, শাস্ত্রজ্ঞানের অহংএ নিজেকে আবৃত না রেখে সহজ বুদ্ধিতে উচিত কর্ম করে গিয়েছেন। দ্রৌপদীর সর্বোচ্চ ভালবাসা না পেয়েও তিনিই দ্রৌপদীর সর্বাধিক প্রিয় কাজগুলি করেছেন। সাংসারিক ভারবহনের অপরিসীম ক্ষমতা ছিল তাঁর—বারণাবতের ভস্মীভূত প্রমোদভবন থেকে নিজ পরিবারবর্গকে তিনি বহন করে বনপ্রস্থান করেছিলেন আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। আশ্রয়দাতার জীবনরক্ষায় মাতৃ-আদেশে দ্বিরুক্তি না করে তিনি ভয়ঙ্কর বক রাক্ষসের মোকাবিলা করেছেন, সংহার করেছেন একাধিক রাক্ষসকে, বিবাহ করেছেন রাক্ষসী হিড়িম্বাকে (আর্য-অনার্যের রক্তমিশ্রণ?)—যে-বিবাহের সন্তান ঘটোৎকচ কুরুক্ষেত্রে অর্জুন-নিধনের অস্ত্র বুকে নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। দ্রৌপদীর সম্মানরক্ষায় কীচক ও উপকীচকদের বধ, সুশর্মা ও

ভূরিশ্রবাদের শাসন, নরপশু দুঃশাসনের রক্তপানের মহাব্রত ভীমই সম্পাদন করেছেন (শেষোক্ত ব্যাপারটি সভাস্থলে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার যৎসামান্য প্রতিবাদ; পশুদের রক্তমাংস মানুষ পানভোজন করেই থাকে)। দুর্যোধনের উরুভঙ্গের ন্যায়কাজ তাঁরই। কুলবধূকে অনাবৃত উরু দেখিয়ে যেখানে সমাজনীতিকে প্রকাশ্যে কলুষিত করেছে বর্বর দুর্যোধন—সেখানে সেই লালসা-কণ্টকিত উরুকে চূর্ণ করার নৈতিক অধিকার মর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষের আছেই। গদাযুদ্ধের তুচ্ছ একটা নিয়মে সেই কাজকে নিন্দা করলে ধর্মরক্ষা হয় না। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম—পুঁথির ধর্ম ছাড়া কিছু নয়। ভীমের বিশাল বাহু দ্রৌপদীকে আবৃত করে রেখেছিল, তাঁর বিরাট বুকে দ্রৌপদীর আশ্রয় ছিল এবং সর্বদাই এই আশ্বাস উদ্যত ছিল—তোমাকে রক্ষা করাই আমার ধর্ম, অক্ষম ধর্মব্রতীদের দ্বারা যে-তুমি লাঞ্ছিত হচ্ছ পদে পদে।

ভীম যুধিষ্ঠিরকে বারবার কঠিন সত্য বলে তাঁকে ঠিক জায়গাটিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। যেমন, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার কালে ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলেনঃ "দ্যূতকারেরা তাদের বেশ্যাকেও কোনদিন পণ রাখে না; তাদের দয়া আছে। শত্রুরা শঠতায় আমাদের ধন, রাজ্য ও আমাদের হরণ করেছে। এর জন্যও আমার ক্রোধ হয়নি। কারণ, আপনি এই সমস্তের প্রভু। কিন্তু দ্রৌপদী এই হীনতম অপমানের যোগ্য নন। হীন, নৃশংস কৌরবগণ আপনার দোষেই এইভাবে তাঁকে লাঞ্ছনা করেছে। আমি আপনার হাত পুড়িয়ে দেব। সহদেব, অগ্নি আন।" বনপর্বে যুধিষ্ঠিরকে তিনি বলেছেনঃ "আমাদের দুর্দশার মূলে আপনার দ্যূতাসক্তি, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নীরবে এই অত্যাচার সহ্য করা নয়।" যুদ্ধশেষে যুধিষ্ঠির যখন জানলেন, কর্ণ তাঁদের বড় ভাই, তখন মর্মাহত হয়ে একাকী অরণ্যবাসের সঙ্কল্প করেছিলেন—অনুজ ভ্রাতাদের ওপর রাজ্যভার অর্পণ করে। সেই শুভ বাসনা জেনে ভীম তাঁকে সমঝে দিয়ে বলেনঃ "রাজন, আপনার এই মত জানলে আমরা কাউকে বধ করতাম না। কূপ খনন করে জল পাওয়ার পূর্বে শুধু কাদা মেখে কোন ব্যক্তি ফিরে যায় না। আপনি মন্দবুদ্ধি বেদপাঠক ব্রাহ্মণদের মতো কথা বলছেন। আমরাই দোষী, কেননা আপনার ন্যায় একজন ক্লীবের বশে চলেছি। আমাদের পৌরুষ থাকা সত্ত্বেও আপনাকে দুর্বলচিত্তের মানুষ জেনেও আপনারই মতে জীবনযাপন করেছি। অরণ্যবাস করলেই মানুষ স্বর্গে যায় না। কর্মত্যাগ করলে সিদ্ধিলাভ হয় না।"

ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপানের প্রভূত নিন্দা প্রচলিত। এবিষয়ে স্বামী তথাগতানন্দ তাঁর 'মহাভারত কথা' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেনঃ "এযুগে স্বামী বিবেকানন্দ ঐ দৃশ্যে কী করতেন? আমরা অনুমান করতে পারি, এক্ষেত্রে কালীর উপাসক স্বামীজীর করাল মূর্তি, রক্তচক্ষু ও ক্রোধদীপ্ত বজ্রহুঙ্কার। তিনিও কৃষ্ণের মতো এই পৈশাচিক লাঞ্ছনার প্রতি অমিতবীর্য পৌরুষের সমুচ্চ ধিক্কার দিয়ে ঐ বেদনাদায়ক দৃশ্যের অবসান ঘটাতেন। 'অভীঃ' মন্ত্রের সাধক কোনদিনই নীরব থাকতেন না।... আজ পাঁচহাজার বছর পরেও আমরা কৃষ্ণার ব্যথায় চোখের জল ফেলি, রাগান্বিত হই। এই জঘন্যতম পাপের উপযুক্ত শাস্তি যথার্থভাবে দেবতার রুদ্ররোষ প্রকাশিত হয়েছে ভীমের মাধ্যমে। ভীমের মুখে একটু রক্ত দেখে আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ পাই না। আমরা কি মা কালীকে পূজা করি না? 'মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্', 'সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ খড়্গ', 'কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী গলদ্রুধিরচর্চিতাম্' বলে স্তব করি না? গীতার একাদশ অধ্যায়ে পাঠ করি না? 'দণ্ডো দময়তামস্মি' (গীতা, ১০।৩৮) ভুলি কেন? এত কথা বলার একটা উদ্দেশ্য—জঘন্যতম পাপের নিষ্ঠুরতম শাস্তি। আমাদের সকলের ক্রোধ ভীমের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।"

।।৪।।

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সম্বন্ধে গোটা মহাভারত জুড়ে প্রশস্তির বন্যা—তিনি নাকি ধর্মবৃক্ষ, যার শাখা-প্রশাখাগুলি হলো অন্য পাণ্ডবগণ। কিন্তু একালের পাঠক যুধিষ্ঠিরকে সর্বদা মস্তকে ধারণ করতে রাজি হবেন কিনা সন্দেহ। তাঁরা ভাবেন (তাঁদের মধ্যে আমিও আছি)—যাঁর অধর্মাচরণ লোকক্ষয়ী সর্বনাশা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ—তিনি সচল ধর্মরাজ! সেকাল, একাল—কোন কালের বিচারবুদ্ধিই যুধিষ্ঠিরের দ্যূতাসক্তিকে সমর্থন করেনি। অন্য পাণ্ডবরা যুধিষ্ঠিরের কার্যের প্রচণ্ড সমালোচক। বিদুর তো স্পষ্টই বলেছেনঃ "এই দ্যূতক্রীড়া নরকের দ্বারস্বরূপ।" সেই নরকের দ্বারমধ্যে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নিয়ে যুধিষ্ঠির অন্যদের সঙ্গে কোন আলোচনা না করেই সপরিবারে যাত্রা করেন দ্যূতক্রীড়ার আসরে। আলোচনা করতে পারতেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে, বিদুরের সঙ্গে—কিছুই করেননি। আমাদের প্রশ্ন—পাশাখেলার ব্যাপারে যুধিষ্ঠির বিদুরের উপদেশই বা কেন চাইলেন না? বিচিত্র যুক্তিতে যুধিষ্ঠির তাঁর পাশাখেলার সাফাই গেয়েছেন—"এই পাশাখেলায় আমার ইচ্ছা নেই। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র যদি আমাকে না ডাকেন, তবে আমি শকুনির সঙ্গে খেলব না। কারণ, আমাকে ডাকলে আমি নিবৃত্ত হই না—এই আমার চিরকালের ব্রত।" চিরকালের ধন্য এই ব্রতটির পরিণতি কী হতে পারে তা তিনি সবিশেষ জানতেন। "এই পাশাখেলা বিধির বিধান [জুয়া-খেলোয়াড়রা আনন্দিত হোন]। এটা বিনাশজনক জেনেও আমি ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ লঙ্ঘন করতে পারব না। সুবর্ণময় হরিণ হতে পারে না, তথাপি রাম হরিণের জন্য লোভ করেন। সুতরাং বলা যায়, বিপদ নিকটবর্তী হলে লোকের বুদ্ধিই বিপরীত হয়ে থাকে।" সজ্ঞানে যিনি পাপ করেন, তাঁকে কী বলা যায় পাঠকগণই স্থির করবেন। সুতরাং আমরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের জন্য কেবল অধর্মাচারী দুর্যোধনের

রাজ্যলোভ বা 'অন্তরে বাহিরে অন্ধ' ধৃতরাষ্ট্রের অবিরাম অন্যায় সমর্থনকেই একমাত্র দায়ী করতে পারি না। ধর্মরক্ষায় আত্মঘোষিত ব্রতধারী নয় এমন কোন্ হিংস্র পশু আছে—যে সামনে অরক্ষিত নধর প্রাণীকে দেখলে নখদন্ত সংবরণ করবে? যুধিষ্ঠির 'আপনা মাংসে বৈরী হরিণী'। শোনা যায়, যুধিষ্ঠির নাকি বুদ্ধিভ্রষ্ট অবস্থায় নিজেকে, নিজের ভাইদের এবং পত্নী দ্রৌপদীকে পণ রেখেছিলেন—তা কি সত্যিই যুধিষ্ঠিরের বুদ্ধিনাশের জন্য, নাকি তার মূলে তাঁর প্রচণ্ড অহঙ্কার—,আমি ভ্রাতা, পত্নী-সহ সবকিছুর মালিক? একবার পাশাখেলায় তাঁর চৈতন্য হলো না, আবার খেললেন, ফলে সকলের বারোবছরের বনবাস এবং একবছরের অজ্ঞাতবাসের অবর্ণনীয় কষ্ট, অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন। যুধিষ্ঠিরের অবশ্য বনবাসে অসুবিধা হয়নি—নগর থেকে বনই তাঁর প্রিয়। বনে ঋষিকুলের পুণ্য সংস্রব, রীতিমতো ধর্মশাস্ত্রাদির পড়াশোনা এবং জ্ঞানবৃদ্ধি। এইসকলের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে তিনি ধর্মবক এবং নহুশের ধর্মীয় 'ক্যুইজ'-তুল্য প্রশ্নের চমৎকার উত্তর দিয়ে ভ্রাতাদের মৃত্যুগ্রাস থেকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন। তিনি যে রীতিমতো ধর্মজ্ঞ, তার পরীক্ষা এখানে হয়ে গিয়েছিল। তবে তাঁর কথার মধ্যে যে দ্বিচারিতা রয়েছে তা আমাদের বিস্মিতই করে। তিনি যে বনবাসের কৃচ্ছ্রতা, বেদধ্বনি, শাস্ত্রালোচনা, ব্রাহ্মণগণের সান্নিধ্য বিশেষ পছন্দ করেন তা তাঁর কথা থেকেই বোঝা যায়, যখন তিনি বলেন : "এবমেতন্ন সন্দেহো রমেহং সততং দ্বিজৈঃ।" কিন্তু তিনিই আবার বনবাসকালে কৃষ্ণকে বলেছেন : "আমাদের এই দুঃসহ দারিদ্র্য মৃত্যুতুল্য। আগামী দিনের খাদ্যের কোন সংস্থান নেই। আজ কি খাব তারও ঠিক নেই। আমাদের মতো এমন দারিদ্র্যদশায় পড়ে লোকে গ্রাম ছাড়ে, বনে জঙ্গলে পালিয়ে যায়, ক্রীতদাস হয়, পাগল হয়, আত্মহত্যা করে।"

আবার বীরত্বের ক্ষেত্রেও তাঁর ঘাটতি ছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে তিনি যতখানি বীরত্ব দেখিয়েছেন, ততোধিক দেখিয়েছেন পরাভূত হওয়ার ক্ষমতা। হেরে গিয়ে ছোট ছেলের মতো কান্নাকাটি করে অর্জুনকে গালমন্দ করেছেন। ধর্মবোধকে কিছুসময় চাপা দিয়ে দ্রোণকে কপট সত্য শুনিয়ে অস্ত্রগুরুর মৃত্যুর পথ খুলে দিয়েছেন। তার আগে ভীষ্মের মৃত্যুর 'ফর্মুলা' জানতে ভীষ্মের কাছে হাজির হয়েছেন। দূর থেকে দেখলে ব্যাপারটা বড় মজার। যেন ঋষি যুধিষ্ঠির দানশীল মহৎ ব্যক্তিদের বাড়িতে ঘুরছেন আর ডাকছেন—'ভবতু মৃত্যুং দেহি'! যুদ্ধজয় নিশ্চিত হওয়ার পরে নিরাপদ অবস্থান থেকে ভীমকে নিন্দা করেছেন দুর্যোধনের উরুভঙ্গের জন্য এবং তিনি যে ধর্মবাক্য শ্রবণ ও পরিবেশনের শ্রেষ্ঠ পাত্র তা প্রমাণ করেছেন শান্তিপর্ব ও অনুশাসনপর্বে দীর্ঘ ভীষ্মোপদেশ শ্রবণ করার দ্বারা। ধর্ম-ক্লাসের ভাল ছাত্র তিনি। তদনুযায়ী মহাপ্রস্থানপর্বে তিনি সর্বদর্শী বিচারকের ভূমিকা নিয়ে ভাই ও পত্নীদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। মহাপ্রস্থানের পথে ছয়জন যাত্রীর মধ্যে একজন মাত্র নারী—সেই দ্রৌপদীকে প্রথমেই পতিত হতে হয়েছিল। কিন্তু কেন? প্রথমেই দ্রৌপদীর পতনের কারণ জানাতে গিয়ে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীর মধ্যে অর্জুনকে একটু বেশি ভালবাসতেন, সেই পাপে তাঁর পতন। সূক্ষ্ম ধর্মের গতিবিধি আমাদের তেমন জানা নেই, তবে সাধারণ বোধ থেকে বলা যায়—এই ধরনের পটভূমিকা-জ্ঞানহীন, মানবিক অনুভূতিহীন বিচার অল্পই দেখা যায়। স্বয়ংবর সভায় লক্ষ্যভেদ করে অর্জুন জয় করেছিলেন দ্রৌপদীকে। তিনি রূপবান, গুণবান এবং মহাযোদ্ধা। দ্রৌপদী তাঁর তরুণ যৌবনের সমস্ত আবেগ নিয়ে তাঁকে বরণ করেছিলেন। অথচ তাঁকে এক বিচিত্র নিয়মে পাঁচজনের ভোগ্য পত্নী হতে হলো। এক্ষেত্রে যদি তিনি অর্জুনকে একটু বেশি ভালবাসেন তাহলে তার দ্বারা কোন ধর্মনীতি লঙ্ঘিত হয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু জীবননীতি যে লঙ্ঘিত হয়নি তা জোরের সঙ্গে বলতে পারি। স্বাভাবিক এবং সঙ্গত জীবননীতির প্রতিকূলতা যদি প্রয়োজনমাফিক প্রস্তুত কোন ধর্মনীতি করে (সেটা সত্যকার ধর্মনীতি কিনা সন্দেহ, হয়তো 'ধর্ম' শব্দের আবরণে স্থিত এক কৌশলনীতি—ভ্রাতৃবিরোধ এড়াবার জন্য দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর ব্যবস্থা। পাঁচ ভাইয়েরই দ্রৌপদীর ওপর টান ছিল, তা মহাভারতেই দেখা যায়।), তাহলে তা মানবজীবনে বিপত্তি ঘটায়। যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টিতে যেটি দ্রৌপদীর অন্যায়, মানবিক যুক্তিতে সেটি স্বাভাবিক আচরণ—সুতরাং তা ন্যায়। মন, আবেগ ইত্যাদিকে কেটে কেটে পাঁচজনকে সমান ভাগে ভাগ করে দিতে না পেরে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের বিচারে অপরাধী হয়েছিলেন। অট্টহাস্য-সহ একালের এক কবি পঞ্চস্বামীর সঙ্গে দ্রৌপদীর ব্যবহার-নীতির চমৎকার সূচী দিয়েছেন—দ্রৌপদীর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পেয়েছিলেন যুধিষ্ঠির, তর্জনী ভীমসেন, মধ্যমা অর্জুন, অনামিকা নকুল এবং কনিষ্ঠা সহদেব। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-প্রাপ্ত যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর প্রেমবিতরণে নিরপেক্ষতার দোষ দেখতেই পারেন।

।।৫।।

কৌরবপক্ষে দুঃশাসন, শকুনি প্রভৃতি একমাত্রিক চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার নেই। হিংস্র নীচতার এইসব প্রতিমূর্তিগুলির বিষয়ে সকলের মনোভাব অবিমিশ্র বিতৃষ্ণা ও ঘৃণার। তবে দুর্যোধন একটু পৃথগ্‌ভাবে বিচার্য। একরোখা তেজস্বী লোভের জন্য তিনি একধরনের সম্ভ্রম পানই। তাঁর চরিত্রের সর্বোত্তম ভাষ্য আছে রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতায়। জ্বলন্ত তেজের সঙ্গে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে ঘোষণা করেছিলেন : "লোকধর্ম রাজধর্ম এক নহে পিতঃ", "ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম", "রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্ম, বন্ধুধর্ম নাই, শুধু জয়ধর্ম আছে", "আমি চাহি ভয়, সেই মোর রাজপ্রাপ্য—আমি চাই জয়, দর্পিতের দর্প নাশি।" নিজ বৃত্তে

দুর্যোধন সুকুশলী রাজনীতিজ্ঞ। তার নানা প্রমাণ আছে। অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শনক্ষেত্রে সূতপুত্র বলে যোগদানে বাধাপ্রাপ্ত মহাবীর কর্ণের সহযোগিতা লাভের জন্য দুর্যোধন ভীষ্ম বা ধৃতরাষ্ট্রকে কিছু না বলেই তৎক্ষণাৎ কর্ণকে রাজা করে দিয়েছিলেন। ভীম সূতপুত্র বলে কর্ণকে বিদ্রূপ করলে দুর্যোধন তার উপযুক্ত উত্তর দিয়েছিলেনঃ "বাহুবলই ক্ষত্রিয়ের বল। বীর ও নদীর উৎস জানা কঠিন। আচার্য দ্রোণ কলস থেকে, কৃপাচার্য শরস্তম্ভ থেকে জন্মেছিলেন। আর তোমাদের জন্ম-ইতিহাসও আমার জানা আছে।" চতুর দুর্যোধন রাজকোষ ও মন্ত্রিদের নিজের হাতে রেখেছিলেন। নাগরিকদের অর্থ ও সম্মান দ্বারা তুষ্ট করেছিলেন, যাতে কোন প্রজাবিদ্রোহ না হয়। পাণ্ডবদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত রাজ্য তিনি ভাগ করে দিয়েছিলেন দ্রোণ, কর্ণ ও শকুনিকে। নিজের আসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার তিনি ভূরি ভূরি পুরস্কার দিয়ে পাণ্ডবদের পিছনে অসংখ্য গুপ্তচর নিয়োগ করেছেন। সৈন্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখেছেন। নিশ্চিন্তে বসে সময় না কাটিয়ে তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে দূত প্রেরণ করে শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য সর্বদা সক্রিয় চেষ্টা করেছেন। শল্যকে সুকৌশলে তিনি স্বপক্ষে নিয়ে এসেছিলেন। উৎকৃষ্ট অভিনয় করে ধৃতরাষ্ট্রকে প্রভাবিত করেছেন নিজের নানা দুষ্কার্যের পক্ষে সম্মতি আদায়ের জন্য। কখনো তুষ্ট কখনো রুষ্ট ব্যবহার দেখিয়ে ভীষ্ম-দ্রোণাদিকে প্ররোচিত করেছেন, যাতে তাঁরা যুদ্ধকালে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তাঁর গুরু চার্বাক। নিত্যকাল নয়, নিকটকালই তাঁর ভোগ্য। দ্বৈপায়ন হ্রদতীরে মৃত্যুপূর্বে তাঁর অগ্নিশলাকার মতো কথাগুলি পাণ্ডবপক্ষের জয়ের প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। অশ্বত্থামার হাতে শিবিরমধ্যে নিহত পাণ্ডবপুত্রগণের হনন-সংবাদের পৈশাচিক উল্লাস নিয়ে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তার আগে কৃষ্ণকে বলেছিলেনঃ "আমি পৃথিবীকে শাসন করেছি, দান ও অধ্যয়ন করেছি, শত্রুদের মস্তকের ওপর আরোহণ করেছি। আমার তুল্য আর কে আছে?... রাজা ও দেবতার দুর্লভ ভোগ আমি এই পৃথিবীতে পেয়ে ভোগ করেছি। কে আমার মতো সুখী? কৃষ্ণ, আমরা স্বর্গে যাব। আর তোরা শোকের মধ্যে জীবনধারণ করবি।"

।।৬।।

কর্ণ-চরিত্র সাহিত্যের সম্পদ এবং দীর্ঘদিন ধরে পরবর্তী বহু প্রজন্মের লেখকদের সৃষ্টির উপাদান। রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ'-এর মতো রচনার তো কোন তুলনা দেখি না। কর্ণ-চরিত্র জটিল ও ঘাতপ্রতিঘাতসঙ্কুল বলে নানামুখী ব্যাখ্যায় ভূষিত হয়েছেন তিনি। জন্মক্ষণ থেকে নিয়তির মার খাওয়া শুরু তাঁর—মৃত্যু পর্যন্ত তা অব্যাহত। জলে ভাসিয়ে দেওয়া কুন্তীর সদ্যোজাত কানীন পুত্রটি বহু বছর পরে মৃত্যুবরণ করেছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে ভূপ্রোথিত নিজ রথচক্র উদ্ধার করার সময়ে অস্ত্রাহত হয়ে। ঐ দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী সময়ে বেপরোয়া বিদ্রোহী পুরুষটি প্রমাণ করেছিলেন—হ্যাঁ, কোন্ কুলে জন্মাব তা দৈবের আয়ত্তে, কিন্তু আমার আয়ত্তে আমার পৌরুষ। সত্যই তিনি সূর্যপুত্র—সূর্যের মতোই জ্বলন্ত, উজ্জ্বল এবং দহনকার্যে সমর্থ। কর্ণের বিশাল শক্তিকে সংবৃত করার জন্য সক্রিয় ছিল স্বর্গমর্তের ধারাবাহিক চক্রান্ত। ক্ষত্রিয় হলেও তাঁর সূতপুত্র পরিচয়। তাঁর বেহিসাবী দাতা-স্বভাবের সুযোগ নিয়ে জন্মলব্ধ দুর্ভেদ্য কবচকুণ্ডল ছিন্ন করিয়ে তাঁকে রক্তাক্ত অরক্ষিত করার ইন্দ্রকৌশল সর্বজন-বিদিত। অস্ত্রশিক্ষাদানে দ্রোণাচার্যের অস্বীকৃতি, অস্ত্রগুরু পরশুরামের অভিশাপ, সূতপুত্র বলে অস্ত্রকৌশল প্রদর্শনে বাধাদান, স্বয়ংবর সভায় ত্রিলোকবন্দিতা সুন্দরী দ্রৌপদীর রূঢ় প্রত্যাখ্যান, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঠিক পূর্বে জন্মদাত্রী-কণ্ঠে পাণ্ডবনিধনে বিরত হতে অনুনয়, ফলে নিজের মৃত্যু-পরোয়ানা গ্রহণ—এইসব এবং আরো নানা বাধা-বিপত্তির ভিতর থেকে ঠেলে জেগে ওঠা আগ্নেয়গিরিতুল্য এক অভ্রভেদী বীরত্ব—এহেন কর্ণ যে মহাভারতের সবচেয়ে বর্ণময় চরিত্র, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনাকালে তাঁর আচরণ অক্ষমনীয়। তা কাম্য নারী দ্রৌপদীর প্রতি তাঁর প্রতিহত কামনার বিকারেরই ফল—একথা বললেও তাঁর আচরণ দুষ্য ও ঘৃণ্য থেকে যায়। অভিমন্যুবধে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা সম্বন্ধেও একই কথা।

কর্ণের ওপর একালে অনেক কবিতা, নাটক রচিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর ট্র্যাজেডিকে ঠিকভাবে উন্মোচন করার জন্য রবীন্দ্রনাথের মহাকবি-প্রতিভার প্রয়োজন ছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে চরম অস্ত্রপরীক্ষার জন্য যখন তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন—সেইসময় মাতৃকণ্ঠে নিজ জন্মপরিচয় শুনে নিজের নির্মম নিয়তির ঘনিয়ে আসা ছায়াপট দেখতে দেখতে কর্ণ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যা বলেছিলেন, বাঙলা কাব্যসাহিত্যে তেমন উদাস ট্র্যাজিক বিষাদ আর দেখা যায়নি। (কিছুটা তুলনীয় মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যে রাবণের নিয়তি-দর্শন—"কুসুমদাম সজ্জিত দীপাবলি তেজে" ইত্যাদি।) পাঠকদের রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' কবিতায় কর্ণের শেষ উক্তিটি স্মরণ করতে অনুরোধ করি।

আধুনিক লেখকদের বিশ্লেষণে কর্ণ-চরিত্রের মহত্ত্বের পাশাপাশি নীচত্বের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। মহত্ত্বের মধ্যে আছে পূর্বকথিত তাঁর দাতা-ভূমিকার বিষয়টি। ব্রাহ্মণবেশী প্রার্থী ইন্দ্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সতর্কিত হয়ে তিনি বলেছিলেন—প্রার্থীকে বিমুখ করে তিনি অকীর্তি অর্জন করবেন না। বলেছিলেনঃ "সূর্যদেব, লোকবিশ্রুত যশ নষ্ট করে প্রাণরক্ষা করতে চাই না। কীর্তিহীন মানুষ নষ্ট হয়।" ইন্দ্রের প্রার্থনায় তিনি নিজের হাতে নিজের কুণ্ডল ছেদন করেছিলেন, তাই তাঁর নাম হয়েছিল 'কর্ণ'। কৃষ্ণ তাঁকে তাঁর জন্মপরিচয় জানালে তিনি কৃষ্ণকে অনুরোধ করেছিলেন,





তিনি যেন তাঁর জন্মরহস্য ধর্মরাজকে না বলেন, কারণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির জানলে রাজ্যভার গ্রহণ করবেন না। বস্তুত, কর্ণ রাজ্যভোগ ত্যাগ করেছিলেন তাঁর পালক পিতামাতার সুখভোগের জন্য। কুন্তীর প্রার্থনার উত্তরে কর্ণের বেদনাহত কণ্ঠের বিষাদহাস্যঃ "যশস্বিনি জননি! আপনি চিরদিনই পঞ্চপাণ্ডবের জননী থাকবেন। কারণ, অর্জুন নিহত হলে আমাকে নিয়ে পাঁচপুত্র, কিংবা আমি নিহত হলে অর্জুনকে নিয়ে পাঁচপুত্র থাকবে আপনার।"

জন্মান্ধের পুত্র দুর্যোধনের প্রধান সহায়করূপে কর্ণের অন্যায় কর্মের তালিকা দীর্ঘ। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে দ্রৌপদী সম্বন্ধে তাঁর অচরিতার্থ কামনার বিষশ্বাস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে-নারী, তিনি পঞ্চপুরুষের পত্নী হলে সেই সমাজগর্হিত আচরণকারিণী সম্বন্ধে যেকোন অশ্রদ্ধেয় উক্তির অধিকার তাঁর আছে বলেই কর্ণ মনে করেছিলেন এবং দ্রৌপদীকে সেই সভায় 'বেশ্যা' বলে বিবস্ত্রা করার জন্য তিনি দুঃশাসনকে আদেশও দিয়েছিলেন। এ হেন কামলুব্ধতার সঙ্গে জ্বালাময় প্রতিশোধ-স্পৃহার আরেকটি উক্তি কর্ণ করেছিলেন ঘোষযাত্রা-কালে। সে-যাত্রায় কর্ণই ছিলেন অগ্রণী। তিনি বলেছিলেনঃ "সভায় কৃষ্ণার যে-লাঞ্ছনা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি লাঞ্ছনা দেওয়ার জন্য সালঙ্কারা কৌরবপত্নীদের সঙ্গে আমরা বনমধ্যে মৃগচর্মধারিণী দুঃখিনী দ্রৌপদীকে দেখতে যাব।"

ধর্মে ও অধর্মে স্বচ্ছন্দ যাতায়াতের শক্তি কর্ণের ছিল।

।।৭।।

প্রতিজ্ঞাভীষণ ভীষ্ম যথার্থ বেদজ্ঞ, সর্বশাস্ত্রবিৎ, রাজধর্মজ্ঞ এবং বলিষ্ঠ রূপবান যুবক ছিলেন। যৌবনকালের ভীষ্ম দীর্ঘজীবন শেষে যখন শরশয্যাশায়ী, তখনো মহাদানে মহীয়ান। শান্তিপর্বের ৫৬তম থেকে অনুশাসনপর্বের ১৬৭তম অধ্যায় পর্যন্ত মোট ৪৭৭ অধ্যায়ব্যাপী রাজধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম ও মোক্ষধর্ম বিষয়ে যুধিষ্ঠিরের অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। মাতা সত্যবতীর অনুরোধে ভীষ্ম নাবালকদের রাজ্যরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁর বিধান অনুসারে সর্বদাই সে-রাজ্যে ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান হতো—"ভীষ্মেন বিহিতং রাষ্ট্রে ধর্মচক্রমবর্তত"। এখানে 'ধর্মচক্র' শব্দের ব্যবহার থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়, অশোকের বহু পূর্বেই শব্দটি আমাদের ইতিহাসে প্রচলিত হয়ে গিয়েছে।

ভীষ্মের নানা সুকীর্তির পাশাপাশি তাঁর একাধিক আচরণ আমাদের বিমূঢ় করে। তাঁর মতো একজন মহাবীরের পক্ষে দুর্যোধনদের দস্যুবৃত্তি, কুলবধূর প্রতি অত্যাচার, কর্ণ প্রভৃতির কাছ থেকে অশ্রাব্য বাক্যবাণ শ্রবণ ও অতি জঘন্য বর্বরোচিত আচরণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রায় এক নীরব দর্শক হয়ে থাকা আমাদের বিস্মিতই করে। তিনি ইচ্ছা করলেই এসব বন্ধ করতে পারতেন, অথবা সভাস্থল ত্যাগ করতে পারতেন। দুর্যোধন তাঁর উপদেশ অগ্রাহ্য এবং অট্টহাস্যে তাঁকে বিদ্রূপ করলে তিনি লজ্জায় নিজ ভবনে চলে যান। আমরা বুঝতে পারি না তাঁর ঐপ্রকার পক্ষাঘাতগ্রস্ত আচরণের অর্থ। দুর্যোধনের অপকার্যের সহায়ক হওয়ার সাফাই হিসাবে ভীষ্ম বলেছেন, দুর্যোধন তাঁর 'অন্নদাতা'। কিভাবে? প্রথমত, তিনি কুরুকুলপ্রধান। রাজপদ না নিলেও সত্যবতীর অনুরোধে তিনি রাজবংশের অভিভাবক, তাঁর ভরণপোষণের দায়িত্ব তো রাজপরিবারের। রাজপরিবার-নীতি কি বলে না যে, যাঁর অভিভাবকত্বে রাজকুমাররা বর্ধিত হয়েছেন, রাজত্ব বিস্তৃত হয়েছে, পরবর্তী সময়ে যিনি কুরুরাজের প্রধান পরামর্শদাতা এবং তাঁর রক্ষক যোদ্ধা—তিনি নিজ অধিকারে অন্ন অর্জন করেছেন, কদাপি অন্নদাস নন? তাছাড়া কার অন্নদাস তিনি? জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের তো রাজা হওয়ার অধিকার ছিল না, ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য-পরিচালক মাত্র। দুর্যোধনেরও রাজত্বে অধিকার ছিল না, অগ্রজ যুধিষ্ঠিরই ন্যায্য রাজা—যাঁকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যেন-তেন ভাবে রাজত্বকারীর অভিভাবকত্ব করলে অন্নদাস হয় কেউ—এই বুঝি সেকালের রাজবিধি? আমরা তো বুঝি, তিনি যদি কারো অন্নদাস হন, সে কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়—কৌরব-রাজত্বের ('কৌরব' বলতে ধার্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডব—সকলকেই বুঝতে হবে।) অন্নদাস তিনি। ভীষ্ম আত্মগ্লানির সঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেনঃ "মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কারো দাস নয়—একথা সত্য। কৌরবেরা অর্থ দিয়ে আমাকে বশীভূত করে রেখেছে। অতএব আমি নপুংসকের মতো তোমাকে বলছি, আমি কৌরবদের অর্থে পুষ্ট।" ভীষ্মের কথার সূত্র টেনে আমরা বলতে পারি, কেবল আচরণে নয়, চিন্তাতেও তাঁর নপুংসত্ব এসে গিয়েছিল—আচরণ তো চিন্তারই কর্মপ্রসার। শান্তি ও অনুশাসন পর্বে ভীষ্ম রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতির সঙ্গে বহু ধর্মনীতির কথাও শুনিয়েছেন। সেইসকল ধর্মকথা গ্রাহ্য হবে কি করে যদি দেখি, রাজসভায় চূড়ান্ত লাঞ্ছনার সময়ে দ্রৌপদী যখন প্রশ্ন করেছিলেন—জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব বিজিত হওয়ার পর আমাকে পণ রেখেছিলেন। বিজিত মানুষের কি সেসবের অধিকার আছে? তখন ভীষ্ম কোন উত্তর দিতে না পেরে বলেনঃ "ধর্মের সূক্ষ্ম গতি বিজ্ঞব্যক্তিরাও বুঝতে পারেন না। প্রবল ব্যক্তি যাকে ধর্ম বলে, তাই ধর্ম হয়, দুর্বলের কথা কেউ গ্রাহ্য করে না। সূক্ষ্ম, অত্যন্ত দুর্বোধ্য এই ধর্মতত্ত্ব আমি ঠিকমতো বুঝতে পারিনি, তাই কোন উত্তর নিশ্চয় করে বলতে পারছি না।"

এই মুক্ত স্বীকৃতির পরে ভীষ্মের প্রজ্ঞাবাণী কতখানি নির্ভরযোগ্য? কথাগুলি আসলে ব্যাসদেবের, ভারতবর্ষের সঞ্চিত প্রজ্ঞাভাণ্ডার থেকে আহৃত রত্নরাজি—একথা মনে রাখলে সমস্যার সমাধান হয়। শ্রুতিধর ভীষ্ম স্মৃতিসঞ্চিত জ্ঞানবস্তুর পরিবেশক মাত্র।




।।৮।।

সত্যকার ধর্মবেত্তা যদি কাউকে বলতে হয়, তিনি মহামতি বিদুর। তাঁর উপদেশ ও নির্দেশ সর্বদা ধর্মপথগামী এবং লোককল্যাণকর। বারণাবতে গমনের পূর্বে পাণ্ডবদের সতর্ক করে এবং পলায়নের ব্যবস্থা করে তিনি পাণ্ডবদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। দ্যূতসভায় তিনি ভীষ্ম-দ্রোণ-সুলভ স্থবিরত্ব না দেখিয়ে স্পষ্টই বলেছিলেনঃ "যুধিষ্ঠির নিজেকে হারিয়ে দ্রৌপদীকে পণ রাখেন। অতএব আমার মতে, দ্রৌপদী দাসী হতে পারেন না।" দ্বিতীয়বার দ্যূতক্রীড়ার সময়েও তিনি প্রতিবাদ করেছেন। বিদুর অযাচিত উপদেশ দিতেন না। উদ্যোগপর্বে চিন্তাক্লিষ্ট ধৃতরাষ্ট্র তাঁর উপদেশ শুনতে চাইলে সেই রাত্রে বিদুর যে-উপদেশ দেন তা 'বিদুর-নীতি' নামে খ্যাত। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বিদুর যে অত্যন্ত সারগর্ভ নীতিজ্ঞানের আলোচনা করেন তা নীতিশাস্ত্রবিদ্‌গণ চিরদিনই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। বিদুর স্বভাবে ধীর, শান্ত। কিন্তু উদ্যোগপর্বে শান্তিদূত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কৌরবদের বর্বর ব্যবহার তাঁর স্থৈর্যকে বিচলিত করেছিল। আত্ম-আরোপিত অন্নদাসত্বের ভূমিকা গ্রহণকারী ভীষ্ম যখন দুর্যোধনের অপকর্মের প্রতিরোধ করছিলেন না, তখন বিদুর একবার ধৈর্যহারা হয়ে সভাতে পিতৃসম ভীষ্মকেও তিরস্কার করে বলেছিলেনঃ "এই মহান বংশের গৌরব আপনিই রক্ষা করেছেন, আপনিই এই বংশের প্রধান কর্তা। এই কুলাঙ্গার দুর্যোধন কে? আপনি তার ক্রূরতা ও লোভে কেন সহায়তা করছেন?" বিদুরের গৃহই মহৎ পুরুষদের আশ্রয়স্থল। কৃষ্ণ সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন। পাণ্ডবদের বনবাসের দীর্ঘ তেরোবছর কুন্তী বিদুর-গৃহেই বাস করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী প্রমুখ যুধিষ্ঠিরের শাসনকালে পনেরো বছর প্রাসাদে কাটিয়ে বানপ্রস্থগ্রহণের সিদ্ধান্ত করেন। তখন বিদুরও তাঁদের সহযাত্রী হন। অরণ্যে তিনি কঠোর তপস্যা করেন এবং যুধিষ্ঠির তাঁর সন্ধানে গিয়ে তাঁকে দেখতে পান। তাঁর সর্বাঙ্গ বস্ত্রহীন, মলিন ও ধূলিলিপ্ত। যুধিষ্ঠির নিজের পরিচয় দিলে বিদুর এক বৃক্ষে হেলান দিয়ে যুধিষ্ঠিরের দিকে পলকহীন নেত্রে চেয়ে থাকেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টিতে দৃষ্টি দিয়ে যোগযুক্ত হয়ে ধর্মরাজের দেহে প্রবেশ করেন। ধর্মরাজ অনুভব করেন, পূর্বাপেক্ষা তাঁর শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে যুধিষ্ঠিরের দেহে বিদুরের এই শক্তিসঞ্চার রীতিকে শাস্ত্রানুযায়ী 'সম্প্রদান' পদ্ধতি বলা হয়—বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌ ও কৌষীতকি উপনিষদে এর উল্লেখ আছে। স্বতই এপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনের সেই বিখ্যাত ঘটনার কথা মনে পড়ে—মহাসমাধির পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের দেহে অনুরূপভাবে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন।

লৌকিকভাবে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী। তদনুযায়ী তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে নানা মন্ত্রণা দিয়েছেন, যেগুলির অধিকাংশই ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছা-বধির কর্ণে প্রবেশ করেনি। মহাভারতপাঠে জানি, স্বয়ং ধর্ম শাপভ্রষ্ট হয়ে বিদুর-রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই স্বয়ং-ধর্মের জন্ম হয় ব্যাসদেবের ঔরসে রাজপুরীর শূদ্রা দাসীর গর্ভে। লক্ষ্য করার বিষয়, বিদুর রাজধর্মনীতি বিষয়ে উপদেশ দিলেও বিশুদ্ধ ধর্মোপদেশ দেননি। এ বড় বিচিত্র কথা! মর্তে অবতীর্ণ ধর্ম—ধর্মোপদেশ দিলেন না!! এখানে স্মর্তব্য বিষয় হলো, প্রাচীন ভারতে ধর্মকে সর্বাত্মক জীবনের অবলম্বনীয় বস্তু মনে করা হতো। তা কিছু উপদেশদানের ওপর নির্ভরশীল ছিল না। তাছাড়া বিদুরের ছিল প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ। বর্ণাশ্রমী সমাজের অন্তর্গত হয়ে জাতিসীমা লঙ্ঘনের অহঙ্কার দেখিয়ে বিদ্রূপের কারণ হতে চাননি তিনি। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেনঃ "মহারাজ, আমি শূদ্রযোনিতে জন্মেছি বলে আমি আমার জ্ঞান সত্ত্বেও অধ্যাত্মবিষয়ে উপদেশ দেব না।" অথচ মহাভারতীয় চরিতাবলীর মধ্যে কৃষ্ণ ব্যতিরেকে অধ্যাত্মবিষয়ে উপদেশ দেওয়ার অধিকার যদি কারো থাকে, তবে তিনি বিদুর—যিনি ধর্মপুত্র নন, স্বয়ং ধর্ম। শূদ্রাগর্ভে জন্ম নিয়ে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন—সর্বোচ্চ ধর্ম জাতিভেদ মানে না।

।।৯।।

ধর্মদর্শিনী গান্ধারীকে বাদ দিয়ে মহাভারতীয় ধর্মক্ষেত্রের আলোচনা সুসম্পন্ন হতে পারে না। তাঁর কথা মনে উদিত হলেই যেন ধারণা হয়—ভয়াল নিয়তিকণ্ঠ শুনছি এক মহাশক্তিময়ী নারীকণ্ঠে—"যতো ধর্মঃ ততো জয়ঃ"। পুত্রস্নেহ সেই বজ্রধ্বনিকে কোমল করতে পারেনি। অন্ধ স্বামীর প্রতি আনুগত্যে অথবা প্রেমে যিনি নিজের দুই চক্ষুকে বস্ত্রাবৃত করেছিলেন, তাঁর কাছে অবলা কোমলা নারীসুলভ স্নেহাতুরতা আশা করা যায় না। কিন্তু তার ফলে তিনি যেন সজীব চরিত্রের জীবনস্পন্দন হারিয়ে ধর্মনীতির এক লৌহকঠিন মূর্তি হয়ে দাঁড়ান। তাতে ধর্ম লাভবান হয়, কাব্য মার খায়। এখানে প্রতিবাদ করে যা বলা যায়, তাকে বাণীদান করেছেন রবীন্দ্রনাথ। গান্ধারী পাপাত্মা দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে অনুরোধ করলে ধৃতরাষ্ট্র বলেন, তা করতে তিনি পারবেন না, কারণ তিনি 'পিতা'। তখন গান্ধারী যন্ত্রণায়, অভিমানে, অভিযোগে দীর্ণ কণ্ঠে বলেছিলেনঃ "মাতা আমি নহি? গর্ভভারজর্জরিতা/ জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নাই তারে?"

গান্ধারীর ধর্মকাঠিন্যের মধ্যে যে রক্তমাংসময় নারী-হৃদয়ও ছিল, মহাভারতকার তা দেখিয়েছেন। সে-নারী অন্য নারীর মতোই স্বাভাবিক ঈর্ষার অধীন। গর্ভধারণের দুবছর পরেও গান্ধারীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়নি। কিন্তু ইতিমধ্যে কুন্তীর সন্তান যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। ফলে রাজ্যের ন্যায় অধিকারী হন যুধিষ্ঠির। এতে গান্ধারী অত্যন্ত ঈর্ষায়, ক্ষোভে ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতে গর্ভপাত করায় একটি লৌহপিণ্ডের মতো কঠিন

মাংসপিণ্ড প্রসব করেন। দুঃখে হতাশায় তিনি সেটি ফেলে দিতে মনস্থ করলে ব্যাসদেব ধ্যানবলে তা জানতে পারেন এবং গান্ধারীকে এক কৌশল অবলম্বন করতে বলেন—যা বর্তমান কালের 'টেস্টটিউব বেবি'কেই স্মরণ করায়। এই কৌশলেই একবছর পর দুর্যোধনাদি শতপুত্রের জন্ম হয়। যাই হোক, গান্ধারী কেবল ঈর্ষাকে নয়, ক্রোধকেও বহন করেছেন। সে-ক্রোধকে সংযমে শাসনে নিয়ন্ত্রিত রাখলেও তিনি উৎসাদিত করতে পারেননি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে শোকাকুলা গান্ধারী যুধিষ্ঠিরকে শাপ দেওয়ার কথা চিন্তা করেন। ব্যাসদেব তা যোগবলে জানতে পেরে তাঁকে বিরত করেন। সেই নিরুদ্ধ জ্বলন্ত ক্রোধ চক্ষুবন্ধনের ফাঁক দিয়ে প্রণত যুধিষ্ঠিরের হাতে নখের ওপর পড়ে তাকে পুড়িয়ে কুৎসিত করে দেয়। ভীমসেনও তাঁর ক্রোধভাজন ছিলেন—কুরুপুত্রদের সংহারের জন্য, বিশেষত দুর্যোধনের উরুভঙ্গ, ততোধিক দুঃশাসনের রক্তপানের জন্য।

গান্ধারী সমস্ত ক্রোধ, ক্ষোভ ও যন্ত্রণার দাহ নিয়ে বিদীর্ণ হয়ে পড়েছিলেন তাঁর কাছে—যাঁর থেকে বৃহৎ কেউ মহাভারতে ছিলেন না। প্রলয়োচ্ছ্বাস গ্রহণের যোগ্য তিনিই। সেই কৃষ্ণের কাছে গান্ধারী বলেন: "মাধব, তোমার সর্বশক্তি নিয়ে কেন এই গৃহযুদ্ধ বন্ধ করলে না? কুরুকুলের এই বিনাশ কেন উপেক্ষা করলে? তুমি এর জন্য ফলভোগ করবে। আমি পতিসেবা করে যে দুর্লভ তপোবল সঞ্চয় করেছি, তা দিয়ে তোমাকে শাপ দিচ্ছি। এর ফল তোমাকে পেতেই হবে। এখন থেকে পঁয়ত্রিশ বছর পর তুমিও জাতি, অমাত্য ও পুত্রহারা হয়ে বনে বনে ভ্রমণ করবে এবং অপকৃষ্ট উপায়ে নিহত হবে। আজকের এই নারীদের মতো তোমার নারীরাও ভয়ঙ্কর কষ্ট পাবে।"

মহাভারতকারের নির্মোহ দৃষ্টি সত্যদর্শনের ক্ষেত্রে কোথাও পক্ষপাতে নত হয়নি। যেমন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে তিনি বিবিধ দুর্বলতায় ধরা দিতে দেখেছেন, তেমনি ধর্মদর্শিনী গান্ধারীকেও দেখেছেন দীর্ঘদিন ধরে অনুচিত ক্রোধকে লালন করে অভিশাপের বিষশ্বাসে তাকে উদ্গিরণ করে দিতে। মহাভারতকার সত্যদ্রষ্টা।

গান্ধারীর অভিশাপের উত্তরে কৃষ্ণ স্মিত হেসে তাঁকে যোগ্য কথাই বলেছিলেন: "তুমি যা বলেছ তা আমার অজ্ঞাত নয়। সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনার জন্যই তুমি শাপ দিলে। বৃষ্ণিবংশের সংহারকর্তা আমি ছাড়া অন্য কেউ নয়। কারণ, যাদবগণ মানুষ ও দেবদানবদের অবধ্য। তাঁরা পরস্পরের হাতে নিহত হবেন।"

।। ১০।।

পাণ্ডবপক্ষে দুই মহনীয় চরিত্র—দুই নারী—মাতা কুন্তী ও বধূ দ্রৌপদী। কুন্তীর জীবনের ট্র্যাজেডি তাঁর পুত্র কর্ণের চেয়ে কম নয়। এই অতি সুন্দরী, গুণবতী কন্যাটি শৈশবে পিতামাতার স্নেহ পাননি, কারণ তাঁর পিতা তাঁকে পালনের জন্য আত্মীয় কুন্তীভোজকে দিয়ে দেন। পিতামাতার স্নেহবঞ্চনার দুঃখ কুন্তী সারাজীবন বহন করেছেন। তারপর কৌমারকালে এক অত্যন্ত বদরাগী ঋষি দুর্বাসাকে সেবায় সন্তুষ্ট করে যে মহার্ঘ বর লাভ করেছিলেন তা তাঁর জীবনে আশীর্বাদ এবং অভিশাপ দুই-ই হয়ে দাঁড়ায়। বরটি হলো—তিনি যেকোন দেবতাকে আহ্বান করে তাঁর দ্বারা নিজ গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিয়ে নিতে পারবেন। অপরিণত মনের কুমারী কন্যাটি উক্ত বরের সত্যতা পরীক্ষার জন্য খেলাচ্ছলে সূর্যদেবকে আহ্বান করে বসলেন—ফলে অনিবার্যভাবে একটি পুত্রলাভ। কলঙ্কের ভয়ে গর্ভজাত প্রথম সন্তান কর্ণকে জলে ভাসিয়ে দিতে হয়েছিল বুকের ব্যথা বুকে চেপে। একটি ঝুড়িতে অর্পিত সদ্যোজাত পুত্রটি যখন জলস্রোতে ভেসে যাচ্ছিল, তখন সহযাত্রী ছিল নিরুপায় মাতার অশ্রুর ঢেউগুলি। সেই পুত্র জল থেকে স্থলে উঠে ক্রমে বিরাট শক্তিধর পুরুষ হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু সে পেল না ক্ষত্রিয় পরিচয়, পালক পিতার বৃত্তি অনুযায়ী হলো সূতপুত্র। ক্ষত্রিয় রাজকুমারদের অস্ত্রপরীক্ষার সময়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে উদ্যত কর্ণের লাঞ্ছনা কুন্তী নিদারুণ যন্ত্রণার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। কর্ণ-জীবনের পরবর্তী কার্যকলাপগুলি—অধিকাংশই অপকর্ম—শেলের মতো কুন্তীকে বেঁধেছে। তিনি অনুভব করেছেন, সত্যপরিচয় থেকে বঞ্চিত করে কর্ণকে বিকৃতজীবনে নিক্ষেপ করার অপরাধ তাঁরই।

বারণাবতের জতুগৃহের মৃত্যু থেকে অব্যাহতি পেয়ে আশ্রয়ভিক্ষুরূপে তাঁদের যখন বন থেকে বনান্তরে তাড়িত পশুর মতো ঘুরতে হয়েছে, সেই সময়ে কঠিন কষ্টের শরবিদ্ধ জীবনের যাতনা তাঁর নিজের জন্য নয়—পীড়িত পুত্রদের দেখেই। তখনো মানবিকতায় উন্নত তিনি, আশ্রয়দাতা এক ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষার জন্য নিজ পুত্রকে রাক্ষসের মুখে পাঠিয়েছেন। এরপরেই ঘটেছে তাঁর জীবনের চূড়ান্ত ভ্রান্তি—অনবধানে মুখস্খলিত একটি বাক্য—যা স্বয়ংবর সভা থেকে আগত বিজয়ী পুত্রদের উদ্দেশ করে অন্তরাল থেকে বলেছিলেন—"সকলে মিলে ভিক্ষা ভোগ কর।" বাহ্যত উদার বাক্যটি দ্রৌপদীর জীবনকে একেবারে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সামাজিক রীতিনীতিকেও। তাঁর কথার মর্যাদারক্ষার জন্য দ্রৌপদীকে পঞ্চস্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হতে হয়েছে এবং মহাভারতকে নানা পুঁথিপত্তর হাতড়ে পূর্বজন্মের অন্ধকারের মধ্যে জ্ঞানাঞ্জনশলাকা বিঁধিয়ে দ্রৌপদীর পঞ্চপতি হওয়া ব্যাপারটির ওপর নৈতিকতার প্রলেপ দিতে হয়েছে। তারপর পাণ্ডবরা রাজ্যাংশ পেলেন, ইন্দ্রপ্রস্থে কুন্তী কয়েক বছর রাজমাতা হওয়ার সুখভোগ করলেন, কিন্তু আবার ঘনাল দুর্যোগ। "আমি পাশাখেলার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করতে পারি না।"—এ হেন ঘোষণায় সমর্থ আত্মম্ভরী নির্বোধ জ্যেষ্ঠপুত্রের কল্যাণে পাণ্ডবদের বনগমন ও অজ্ঞাতবাস। সেই পর্বে পুত্রদের সহযাত্রী না হয়ে

(দ্রৌপদীর কর্তৃত্বে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চাননি বলে?) কুন্তী তেরোবছরের জন্য বিদুরের গৃহে আশ্রয় নিয়েছেন—নিজের দুর্ভাগ্য এবং পুত্রদের দুঃখকষ্টের চিন্তা তাঁর প্রতি মুহূর্তের তুষানল। তারপর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ—তখনো প্রাসাদ-ভিতরে অসহ্য প্রহরযাপন। যুদ্ধের পরে যুধিষ্ঠিরের শাসন। এই কালেও তাঁর মনে কোন শান্তি ছিল না। পনেরো বছর রাজপ্রাসাদে কাটিয়ে তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন বানপ্রস্থের জীবন। তাঁর বানপ্রস্থ গমনের চিত্রটি অসাধারণ। সর্বাগ্রে চলেছেন তিনি। তাঁর কাঁধে হাত রেখেছেন গান্ধারী, আর গান্ধারীর কাঁধে হাত রেখেছেন ধৃতরাষ্ট্র। অনবদ্য। বেদনাকে বহন করে চলেছে বেদনা। পুত্রদের অশ্রুজল কুন্তীকে নিবারণ করতে পারেনি। বানপ্রস্থের জীবনে ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর সঙ্গে তিনি কঠোর তপস্যা করেছেন, শেষে সকলের সঙ্গে বনাগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েছেন।

অপরূপা রূপবতী, প্রজ্ঞাবতী কুন্তী কেবল বঞ্চনার জীবনই কাটিয়ে গিয়েছেন। কৌরবদের ধারাবাহিক দুষ্কৃতি, যার চূড়ান্ত পর্যায়—প্রকাশ্য রাজসভায় কুলবধূ দ্রৌপদীর অকথ্য লাঞ্ছনা, তারপরেও যুদ্ধ করব কিনা তাই নিয়ে ধর্মপুত্রকে ধর্ম-পুঁথি নাড়াচাড়া করতে দেখে তিনি প্রচণ্ড বিরক্ত হয়েছিলেন। মহাযুদ্ধের ঠিক পূর্বে যখন কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর দেখা হলো, তখন তাঁর কাছেই উদ্ঘাটন করে দিয়েছিলেন হৃদয়নিহিত অগ্নিরাশি, যার সম্মুখীন হওয়ার যোগ্য কেবল কৃষ্ণ। (কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী—এঁরা কেবল কৃষ্ণের কাছেই আত্ম-উন্মোচন করতে পারেন।)

।। ১১।।

দ্রৌপদী সম্বন্ধে ঠিকভাবে লিখতে হলে অক্ষয় কালির কলম, সেইসঙ্গে অপরিমেয় প্রতিভার প্রয়োজন। সেসকল যখন আয়ত্তে নেই, তখন মহাভারতের এই অবিসংবাদিত নায়িকারূপিণী মহাবিস্ময়ের সম্মুখীন হয়ে কেবল বলতে পারি—কী দেখিলাম! যজ্ঞাগ্নি থেকে আবির্ভূতা এই নারী—মারণাগ্নি হয়ে ভারতবর্ষের হীন পুরুষদলকে ভস্মীভূত করেছেন। তাঁর স্ফুরিত তেজ ও রূপের আকর্ষণে শক্তিধর পুরুষেরা পতঙ্গের মতো ধেয়ে এসেছে—দগ্ধ ও নিঃশেষিত হওয়ার জন্য। বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও চরিত্রতেজে বহ্নিমান এই নারীর কণ্ঠেই উচ্চারিত হতে পারে রবীন্দ্রনাথের 'সবলা' কবিতার সেই দীপ্ত-দৃপ্ত জিজ্ঞাসা—"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার/ কেন নাহি দিবে অধিকার/ হে বিধাতা?" বিধাতা সেই অধিকার যেখানে ক্ষুণ্ণ করেছিলেন, সেখানে এই নারীর রক্তে বেজেছিল রুদ্রবীণা—'বাক্যহীনা' থাকেননি তিনি। একমাত্র কৃষ্ণ-ভিন্ন বাকি সকল পুরুষকে তাঁর পাশে খর্বকায় মনে হয়েছে। রাজধর্ম, গণিতশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র বিষয়ে তিনি প্রখর জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন। পিতৃগৃহে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কাছে তিনি সর্ববিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত রূপবতী, গুণবতী ও সর্বসুলক্ষণযুক্তা।

সীতা ও দ্রৌপদীর চমৎকার তুলনা করে স্বামী তথাগতানন্দ লিখেছেনঃ "যেমন বাল্মীকির মানসকন্যা সীতা, তেমনি বেদব্যাসের মানসকন্যা কৃষ্ণা। অবশ্যই কৃষ্ণা সীতার মতো এত নম্র, ধীর, সহিষ্ণু, সর্বংসহা ও দৈবনির্ভরশীল নন। সীতার ক্ষমাশীলতা ও পাতিব্রত্য অনন্যসাধারণ। সীতা যেন পূর্ণিমার চন্দ্রকিরণের মতো স্নিগ্ধ, কোমল ও আনন্দদায়ক। দ্রৌপদী অন্য ধাতুতে গড়া। তিনি মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত সূর্যকিরণের মতো দীপ্ত ও রুক্ষ। তিনি অনলসম্ভূতা, সীতা মৃত্তিকাসম্ভূতা। এঁদের জীবন ভিন্ন হতে বাধ্য। কৃষ্ণা তেজোময়ী ও শক্তিময়ী। অসৎ ব্যক্তির স্পর্শে তিনি হন রুদ্রাণী, সর্বাঙ্গে ফুটে ওঠে ঘৃণা। অনুতাপ নয়, প্রচণ্ড ক্রোধে দগ্ধ করেন ঘৃণ্যকে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে মিল আছে ধর্মে ও আদর্শে। উভয়েই ধর্ম ও আদর্শের জন্য জীবনকে দিয়েছেন বলি। ত্যাগে তাঁদের জীবন সমুজ্জ্বল।"

।। ১২।।

কোন বর্ণনায়, বিশ্লেষণে আবদ্ধ করা যাবে না যে-বিরাটকে, সেই মহাভারতীয় প্রকাণ্ড কাণ্ডের নাম 'কৃষ্ণ'। মহাভারতের গোড়া থেকেই কৃষ্ণমাহাত্ম্য কীর্তিত হলেও পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের অন্তে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় তাঁর প্রথম প্রত্যক্ষ উপস্থিতি—তারপর মহাভারতের প্রায় শেষপর্যন্ত তিনি আলোকিত কৃষ্ণচ্ছায়া বিস্তার করে আছেন। ব্যাসদেবের রচনার পরে তাঁকে নিয়ে কত পুরাণ, ইতিহাস, কাব্যকাহিনী রচিত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। সঙ্গীতে অভিনয়ে, চিত্রে—কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ। এখনো তা অব্যাহত। অনিঃশেষ তিনি—'অপ্রমেয়ম্'—তাঁর সম্বন্ধে বলা যাবে না যে, 'আকাশই সীমা'।

কৃষ্ণরহস্যের পটে মহাভারতের বাকি চরিত্রগুলি আবর্তিত। মহাভারতের তিনিই নায়ক, দীর্ঘজীবনে বহু সংগ্রামের দ্বারা ধর্মরাজ্যের সংস্থাপক। আবার তিনিই প্রমাণ করে দিয়েছেন—ধর্মের মতো ধর্মের গ্লানিও নিত্যবস্তু—স্বপ্ন ও সাধনার ধর্মরাজ্যের বুক চিরে চলে যায় মহাপ্রস্থানের পথরেখা। তারপর, পশ্চিম সাগরের প্রলয়োর্মি এসে গ্রাস করে ফেলে অধর্মক্ষেত্রের সঙ্গে ধর্মক্ষেত্রটিকেও। অভিভূত বিস্ময়ে ভাবতে হয়, চোখ ফেরাব কোন্‌দিকে—কৃষ্ণের হাতের বাঁশির দিকে, নাকি অঙ্গুলির সুদর্শন চক্রের দিকে, নাকি মুষ্টিধৃত মুষলের দিকে? কৃষ্ণ অর্জুনকে প্রবুদ্ধ করেছেন ধর্মরাজ্য স্থাপনে যুদ্ধের জন্য, তার আগে দেখিয়ে দিয়েছেন সেই ধর্মরাজ্য 'কালানলসন্নিভ'. তাঁর মুখগহ্বরের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে ধাবিত।

পারস্পরিক দ্বন্দ্বে মত্ত ভারতীয় রাজন্যবর্গকে শাসিত করে কৃষ্ণ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠনের প্রয়াসী ছিলেন—সেখানে তিনি দূরদর্শী রাজনীতিক। কঠিন সেই কাজ। পাণ্ডবদের সহায়তায় অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কৃষ্ণ নানা বিরোধী শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন—

কংসকে বধ করেছেন, জরাসন্ধের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন, প্রয়োজন বুঝে পশ্চাদপসরণ করে সুদূর দ্বারকায় রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, তারপর ভীমসেনের দ্বারা জরাসন্ধের নিধন ঘটিয়ে স্বয়ং হনন করেছেন শক্তিশালী শিশুপালকে। পাণ্ডবদের সঙ্গে জড়িত হওয়ার পরে পদে পদে তাঁদের সকল দুরূহ কর্মে এবং কঠিন বিপত্তিতে ত্রাণকর্তার ভূমিকা নিয়েছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে পাণ্ডবদের দ্বিধা-দুর্বলতার সময়ে নিজের নিষ্ক্রিয় থাকার প্রতিজ্ঞা বিসর্জন দিয়ে রণক্ষেত্রে নেমে পড়েছেন (যুদ্ধ অবশ্য তাঁকে করতে হয়নি)। এককথায়, পাণ্ডবরা তাঁর করাঙ্গুলিতে ঘূর্ণিত চক্রব্যূহের মধ্যে অবস্থিত। "কৃষ্ণাশ্রয়াঃ কৃষ্ণবলাঃ কৃষ্ণনাথাশ্চ পাণ্ডবাঃ।" এমনকি পাণ্ডবদের বংশরক্ষার জন্য গর্ভস্থ মৃতসন্তানকে পর্যন্ত পুনর্জীবিত করতে হয়েছে তাঁকে।

কৃষ্ণ সম্পর্কে বহু ভূষণ-শব্দের সঙ্গে কিছু দূষণ-শব্দও প্রচলিত—তিনি শঠ, কপট। তিনি মিথ্যাভাষণে অপরকে প্রণোদিত করেছেন। এই সত্য ও মিথ্যা নিয়ে আদি ব্রাহ্মসমাজের তরুণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রবীণ বঙ্কিমচন্দ্রের তীব্র ও তিক্ত বাদানুবাদ হয়। রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ, কৃষ্ণোক্তির সমর্থনে বঙ্কিমচন্দ্র মিথ্যাকে সত্যের আসনে বসিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ খুব কঠিন ভাষায় লিখেছেন : "আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্যভাবে, অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন।... আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চালিত না হইত, তাহা হইলে কি আমাদের দেশের মুখ্য লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্ধা সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করেন?" এ তো অল্পই হলো। রবীন্দ্রনাথ এমনও লেখেন : "কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না; শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।" রবীন্দ্রনাথের এই রচনার হেতু বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত রচনা 'কৃষ্ণচরিত্র', যেখানে পূর্বে আলোচিত যুধিষ্ঠির কর্তৃক অর্জুনের গাণ্ডীব-নিন্দা ও অর্জুনের বিকট প্রতিজ্ঞা—যুধিষ্ঠিরকে সেই নিন্দাবাদের জন্য মারবেনই এবং পরে আত্মঘাতী হবেন। সেক্ষেত্রে কৃষ্ণ অর্জুনকে ঐপ্রকার প্রতিজ্ঞাজনিত সত্যরক্ষার অসারত্ব বুঝিয়েছিলেন কৌশিক ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্ত দ্বারা। তিনি বলেছিলেন : "যদি সত্য বললে কারো অমঙ্গল হয়, তাহলে চুপ করে থাকবে, যদি সম্ভব না হয় তবে বরং মিথ্যা বলবে, সত্য বলবে না। অসত্যকে সত্য বলে জেনো এক্ষেত্রে।" কৌশিক মুনি সত্যবাদী ছিলেন, জনৈক ব্যক্তি ডাকাতের ভয়ে ছুটতে ছুটতে মুনির আশ্রমের পার্শ্ববর্তী বনে লুকিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর ডাকাতরা এসে মুনিকে ঐ ব্যক্তিটির সন্ধান দিতে বলায় মুনি জানিয়ে দেন তার কথা। তৎক্ষণাৎ ডাকাতের দল তার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে তাকে হত্যা করে। হিতাহিত চিন্তা না করে সত্যবাদী মুনি তাঁর বাচিক সত্যভাষণের জন্য ব্যক্তিটির প্রাণনাশের কারণ হন এবং তাঁর নরকবাস হয়। পরবর্তী কালে ভীষ্ম বলেছিলেন : "স এব ধর্মঃ মোহধর্মস্তং তং প্রতি নরং ভবেৎ।/ পাত্র কর্ম বিশেষণ দেশ-কালাববেক্ষ্য চ।" ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে বলেন : "স এব ধর্ম সোঽধর্মো দেশেকালে প্রতিষ্ঠিতঃ।/ আদানমনৃতং হিংসা ধর্মোহ্যাবস্থিকঃ স্মৃতঃ।" দেশ-কাল অনুযায়ী ধর্ম অধর্ম হয়। বিপদকালে অধর্মাচরণও ধর্ম বলে গণ্য হয়।

শুধুই মুখের কথাকে নিত্যসত্যের মর্যাদা দেওয়ার প্রবণতা ইউরোপের প্রোটেস্টান্ট ধর্ম-মহলে চলিত ছিল এবং তার অনুকরণের চেষ্টা ভারতীয় প্রোটেস্টান্ট ব্রাহ্মধর্মীদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল—অন্তত বঙ্কিমচন্দ্র তা মনে করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের লেখার পিছনে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের অন্য ব্যক্তিদের প্ররোচনা সন্দেহ করে তিনি লিখেছিলেন : "রবির পিছনে ছায়া দেখিতেছি।" নচেৎ 'প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎস্বভাব এবং... বিশেষ প্রীতি যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র' 'রবীন্দ্রবাবু'র সঙ্গে বিতর্কে নামার কোন ইচ্ছা বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না। ব্যাপারটি বঙ্কিমচন্দ্রের মর্যাদা নয়, কৃষ্ণের মর্যাদার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। তাই এপ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা রীতিমতো কঠোর। তিনি লিখেছিলেন : "সত্যের প্রতি কাহারও অভক্তি নাই, কিন্তু সত্যের ভানের উপর আমার বড় ঘৃণা আছে।" এব্যাপারে তিনি সরাসরি রবীন্দ্রনাথকে অভিযুক্ত করেছিলেন : "আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি রবীন্দ্রবাবুর নিকট বিলক্ষণ পরিচিত।... চারিমাস হইল প্রচারের সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই চারিমাস মধ্যে রবীন্দ্রবাবু অনুগ্রহপূর্বক অনেকবার আমাকে দর্শন দিয়াছেন। সাহিত্য বিষয়ে অনেক আলাপ করিয়াছেন। এপ্রসঙ্গ কখনো উত্থাপিত করেন নাই। অথচ বোধ হয়, যদিও ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া রবীন্দ্রবাবুর এমন বিশ্বাস হইয়াছিল যে, দেশের অবনতি এবং ধর্মের উচ্ছেদ—এই দুইটি আমি জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছি, তবে যিনি ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত, আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক এবং স্বয়ং সত্যানুরাগ প্রচারে যত্নশীল, তিনি এমন ঘোর পাপিষ্ঠের উদ্ধারের জন্য যে সেপ্রসঙ্গ ঘুণাক্ষরেও উত্থাপন করিবেন না, তারপর চারিমাস বাদে সহসা পরোক্ষে বাগ্মিতার উৎস খুলিয়া দিবেন, ইহা আমার অসম্ভব বোধ হয়।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলতে চেয়েছিলেন, গণ্ডগোলের মূলে ইংরেজি 'Truth' এবং 'Falsehood'—এই দুই শব্দের অনুবাদ 'সত্য' ও 'মিথ্যা' করাতেই গণ্ডগোল হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র সেকাজ করেননি। "এই অনুবাদপরায়ণতাই আমার বিবেচনায় আমাদের মৌলিকতা, স্বাধীন চিন্তা ও উন্নতির এক বিঘ্ন হইয়া উঠিয়াছে।" দেশি অর্থে 'সত্য'

অবশ্যই 'Truth', কিন্তু তারও চেয়ে অধিক কিছু। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য 'Truth'-এ আটকে গিয়েছিলেন। যুধিষ্ঠিরের গাণ্ডীব-নিন্দা প্রসঙ্গে অর্জুনের বিচিত্র প্রতিজ্ঞার কথা "জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, এরূপ সত্য রক্ষণীয় নহে। এ-সত্য লঙ্ঘনই ধর্ম। এখানে সত্যচ্যুতিই ধর্ম। এখানে মিথ্যাই সত্য হয়।" এই কথার জের টেনে বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষরিক সত্যরক্ষার বিপজ্জনক চেহারাটা তুলে ধরেছিলেন: "এক্ষণে রবীন্দ্রবাবুর সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের মতে আপনার পাপপ্রতিজ্ঞা (সত্য) রক্ষার্থ নিরপরাধ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করাই কি অর্জুনের উচিত ছিল? যদি কেহ প্রাতে উঠিয়া সত্য করে যে, আজ দিবাবসানের মধ্যে পৃথিবীতে যতপ্রকার পাপ আছে—হত্যা, দস্যুতা, পরদার, পরপীড়ন—সকলই সম্পন্ন করিব, তাঁহাদের মতে কি ইহার সেই সত্য পালনই উচিত? যদি তাঁহাদের সে-মত হয়, তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তাঁহাদের সত্যবাদ তাঁহাদেরই থাক, এদেশে যেন প্রচারিত না হয়। আর তাঁহাদের মত যদি সেরূপ না হয়, তবে অবশ্য তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, এখানে সত্যচ্যুতিই ধর্ম। এখানে মিথ্যাই সত্য।"[১]

'সত্য' ও 'মিথ্যা' নিয়ে এতখানি কালক্ষেপের হেতু, এই বিতর্কটি পুরনো এবং কৃষ্ণচরিত্রের অন্যতম কলঙ্ক-কারণ। এসব ক্ষেত্রে খ্রিস্টান মিশনারিদের তৎপরতা লক্ষণীয়।

রাজপদপ্রার্থী ক্ষত্রিয় যুধিষ্ঠিরের ধর্মাশ্রিত জীবনদর্শনের সঙ্গে ক্ষত্রিয়দের জন্য কৃষ্ণপ্রদত্ত জীবনদর্শনের পার্থক্য ছিল। বনবাসের দ্বিতীয় দিন যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে যোগ ও সাংখ্য শাস্ত্রে পারদর্শী ব্রাহ্মণ শৌনক মাত্র আটাত্তরটি শ্লোকে ব্যাখ্যা করেছিলেন গীতার মর্মবাণী। তাছাড়া শৌনক যুধিষ্ঠিরের সামনে তুলে ধরেছিলেন বৈরাগ্যময় জীবনের এক প্রতিচ্ছবি। কিন্তু কৃষ্ণ গীতায় অর্জুনের স্বভাব অনুযায়ী তাঁকে স্বভাবধর্মে উদ্বুদ্ধ করে ধর্ম ও কর্ম-জীবনের একটি সামগ্রিক জীবনদর্শন দান করেছিলেন। এবং এখানেই কৃষ্ণের মহিমা। তিনি ক্ষত্রিয়কে ক্ষত্রিয় করতেই চেয়েছেন—যুধিষ্ঠির-জাতীয় আধা-ক্ষত্রিয় আধা-ব্রাহ্মণ করতে চাননি। দুই নৌকায় পা রেখে যুধিষ্ঠির বহু বিপত্তির কারণ হয়েছেন, তা আমরা যথেষ্টই দেখেছি।

।। ১৩।।

প্রসঙ্গ শেষ করে আনা যাক। আলোচনাকালে মহাভারতের বিখ্যাত চরিত্রগুলির মধ্যে বিচিত্র সব অসঙ্গতির দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। তার দ্বারা মনে হতে পারে, একালের ভাষা অনুযায়ী আমি তাঁদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার কালাপাহাড়ী চেষ্টায় আছি। কদাপি নয়। ঐসব অসঙ্গতির কারণেই তাঁরা জীবন্ত মানুষ—নীতিকথামালার দৃষ্টান্তচরিত্র নন। মহাভারত রামায়ণ নয়। রামায়ণ গৃহস্থাশ্রমের আদর্শ কাব্য—একথা সর্বজনস্বীকৃত। সুমহান সুমঙ্গল সুপবিত্র সেই সৃষ্টি। মহাভারত সেখানে বিক্ষুব্ধ মহাসাগর, নীতিহীনতায় আবর্তিত, সামাজিক দূষণে কলুষিত—তারই ভিতর থেকে ধর্মপথে উত্থিত হওয়ার জন্য নিয়ত সংগ্রামরত। এখানে অধিকাংশ চরিত্র আকারে বিশাল, কোনটি আদ্যন্ত কদর্য, ক্লেদাক্ত, কোনটি আবার মহিমার উজ্জ্বলতার মধ্যে নানা আত্ম-পরাজয়ে কালিমাঙ্কিত। ব্যাসদেব কিছুই গোপন করেননি। নির্বিকার নিরাসক্ত তাঁর বস্তুজ্ঞান এবং সত্যবোধ। যিনি নিজ জন্মের কলঙ্ককথা অবিচলিতভাবে বলে যেতে পারেন, তিনি কি কোন তথ্য উদ্ঘাটনে কুণ্ঠিত হতে পারেন? সবই তিনি জানিয়েছেন—সর্বোপরি শুনিয়েছেন এক বিশাল নিয়তি-নির্ঘোষ: সাবধান! সাবধান! ধর্মই শ্রেয়, ধর্মই রক্ষক, অধর্ম বিনষ্টি আনে, ধর্মই মহাকাল, ধর্মই করাল কৃষ্ণ! স্খলন, পতন, উত্থান এবং পুনঃপতন—সবকিছুকে ধারণ করে আছে বলে মহাভারত পৃথিবীতে অতুলনীয় সৃষ্টি—মহাপ্রস্থানের চরণচিহ্নিত দুর্ধর্ষ জীবনের মহাকাব্য।

অগণিত লোকক্ষয়ের শ্মশানের ওপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মরাজ্য কি আমাদের জীবনে নিশ্চিত কোন আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি আনতে পেরেছে? ধর্মসংস্থাপক কৃষ্ণ কেন নিজভ্রাতা বলরাম এবং শাম্ব প্রমুখ নিজপুত্রগণকে স্বপথে আনতে পারলেন না? কেন নিজ জীবনকে দীর্ণ হতে দিলেন গান্ধারীর শাপের দ্বারা? কেন নিজ বংশ সংহারের অস্ত্র তাঁকে হাতে তুলে নিতে হয়েছিল? এমন অনেক কেন-কেন-কেন-র হাহাধ্বনি মহাভারত জুড়ে। স্বামী বিবেকানন্দের কথার সত্যতাই তো প্রমাণিত এখানে। কোন নিত্য স্বর্গরাজ্য সম্ভব নয়। কুকুরের লেজ সোজা হয় না। প্রত্যক্ষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, সেই হলো প্রগতি—সেই সংগ্রামে আত্মদান করে মুক্ত হও। কালস্রোতে সমাজ ভেসে চলবে ওঠাপড়া করতে করতে। ধর্মের গ্লানি ধর্মের মতোই নিত্য। গ্লানির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই মানুষের ধর্ম।

ব্যাসদেব ধর্মরাজ্য স্থাপনের বিপুল আয়োজন করেছেন মহাভারতে। ধর্মরাজ্য স্থাপিত হয়েছিল, তার ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে ব্যাসদেবের এই তপ্ত দীর্ঘশ্বাস: "ধর্মপথেই কাম ও অর্থ উপভোগ হয়, তবু কেন লোক ধর্মপথে চলে না—এই কথা আমি সবাইকে উচ্চস্বরে বলেছি, কিন্তু আমার চিৎকার বৃথা।" ❑

---

১ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়', বঙ্কিম-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ১৩৭১, পৃঃ ৯১৩-৯১৯

এই প্রবন্ধটি 'অধ্যাপক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী স্মারক রচনা'রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

হিন্দুধর্মে 'পার্থিব জগৎ' ও 'জীবন'-এর তাৎপর্য

আবুল খায়ের মোঃ ইউনুস

ঢাকা সিটি কলেজের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক আবুল খায়ের মোঃ ইউনুস বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'হিন্দুধর্ম ও ইসলামে মরণোত্তর জীবন' বিষয়ে গবেষণারত। তাঁর গবেষণার পরিধি ব্যাপক। সেই ব্যাপ্তির একাংশ বর্তমান প্রবন্ধে অভিব্যক্ত হয়েছে। অনেক নতুন তথ্য লেখক এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করেছেন। তার সঙ্গে রয়েছে তত্ত্বের গভীরতাও।

প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে সম্ভবত হিন্দুধর্ম সবচেয়ে প্রাচীন। এর উদ্ভবের নির্দিষ্ট কোন সন-তারিখ নেই। অনন্তকাল ধরে এই ধর্ম চলে আসছে। তাই এই ধর্মকে 'সনাতন ধর্ম' বলে অভিহিত করা হয়। এই ধর্মের নির্দিষ্ট কোন প্রবর্তক নেই—যাকে জরথুস্ট্র, ঈশা বা মুহাম্মদ (স.) প্রমুখের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সভ্যতার ক্রমপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মও ক্রমবর্ধিত হয়েছে। বিভিন্ন সংস্কৃতির দ্বারা এই ধর্ম প্রভাবিত হলেও স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। বিভিন্ন সাধক ও দ্রষ্টা এই ধর্মের শিক্ষা, আদর্শ ও নীতি গঠনে অবদান রেখেছেন। একারণেই হয়তো হিন্দুধর্ম বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। এই ধর্মে রয়েছে বহু ঈশ্বরবাদী, একেশ্বরবাদী, নাস্তিক প্রমুখের সমাবেশ। হিন্দুদের মধ্যে একক গ্রন্থও অনুসৃত হয় না। হিন্দুধর্মে রয়েছে একাধিক পবিত্র গ্রন্থ। এসবের মধ্যে বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, সংহিতা এবং রামায়ণ, মহাভারত, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ।

বিজ্ঞান ও দর্শনে যেমন জগৎ-জীবনের উৎপত্তি, উপাদান, প্রকৃতি সম্পর্কিত প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ, ধর্মেও তেমনি জগৎ-জীবনের আলোচনা তাৎপর্যবহ। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম এবং হিন্দুর সাংখ্য ও মীমাংসা দর্শন ব্যতীত প্রায় সব ধর্মেই মনে করা হয় যে, জগৎ এক পরমসত্তা বা ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত। এসত্ত্বেও জগতের উৎপত্তি, প্রকৃতি, মূল্য প্রভৃতি সম্পর্কে ধর্মসমূহের পারস্পরিক বক্তব্যে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য প্রচুর। এমনকি একই ধর্মের ব্যাখ্যাতা ও দার্শনিকদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী মতও পরিলক্ষিত হয়। হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে একথা বোধ হয় সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য। তাসত্ত্বেও এই ধর্মের মধ্যে তত্ত্বের দিক থেকে একটি মূলগত ঐক্য দেখা যায়। বর্তমান নিবন্ধে উপনিষদ্ ও গীতার আলোকে এই দৃশ্যমান জগৎ ও জীবনের প্রকৃতি ও তাৎপর্য আলোচনার প্রয়াস করা হয়েছে।

জগৎসত্তা, তার বিকাশ ও প্রকৃতি

উপনিষদ্ ও গীতা

উপনিষদের মতে, ব্রহ্ম থেকেই জগতের সৃষ্টি। ব্রহ্ম চিরন্তন বিরাজমান ছিলেন। একসময় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ব্রহ্ম থেকে জগতের প্রকাশ ঘটল। এই প্রকাশের কারণ হলো ব্রহ্মের উচ্ছ্বাস। উচ্ছ্বাসই জগতের শুরু এবং পরিণতি, কারণ এবং কার্য, মূল বা অঙ্কুর। এই কারণে জাগতিক প্রতিটি বস্তু তার উৎস পরমাত্মা বা ব্রহ্মের বৈশিষ্ট্য বহন করে, যেমন পুত্রের মধ্যে পিতার বৈশিষ্ট্য অনুস্যূত থাকে। ভগবদ্গীতাও ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরকে জগতের কারণ বলে নির্দেশ করেছে। পরমেশ্বরই জগতের সকল উপাদান সৃষ্টি করেছেন এবং এসব উপাদানের মধ্যে তাঁর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। গীতায় ভগবান কৃষ্ণ বলছেন : "ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ্ (জল), তেজ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু), ব্যোম্ (আকাশ), মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আটভাগে আমার প্রকৃতি বিভক্ত। এই সমুদয় আমার অপরা (জড়) প্রকৃতি। এছাড়া আমার আরেকটি প্রকৃতি আছে, তা আমার পরা (চেতন) প্রকৃতি। এই পরাপ্রকৃতি থেকেই জীবের উৎপত্তি হয়েছে এবং এই পরাপ্রকৃতিই এজগৎকে ধরে আছে।" (৭।৪-৫)

দার্শনিকদের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা হলো বৈচিত্র্য, বিরোধ ও ভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের অনুসন্ধান করা। বৈচিত্র্য ও বিরোধের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান মিললে বিশৃঙ্খলার মধ্যে যেন শৃঙ্খলার নির্দেশ পাওয়া যায়, অসামঞ্জস্যের মধ্যে যেন সামঞ্জস্যের নির্দেশ পাওয়া যায়। জগৎ বৈচিত্র্য, বৈষম্য ও বিভিন্ন ঘটনাবলিতে ভরপুর। এইসব বৈচিত্র্যের ভিত্তি হচ্ছে একটি মাত্র সত্তা, আর তা হচ্ছে পরমাত্মা বা ব্রহ্ম। অর্থাৎ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম থেকে বৈচিত্র্য ও বহুত্বের উদ্ভব হয়েছে। তাই বৈচিত্র্য পরমাত্মারই প্রকাশ। উপাদান কারণ, আকার কারণ ও নিমিত্ত কারণ সবই ব্রহ্ম। উপাদান হচ্ছে নিষ্ক্রিয় এবং অচেতন। উপাদান কারণ চেতনমণ্ডিত হয়ে নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। এই নির্দিষ্ট রূপ লাভ করা হচ্ছে তার আকার। জাগতিক প্রতিটি বস্তুতে রয়েছে উপাদান ও আকার। আর উপাদান ও আকার হচ্ছে একই সত্তার দুটো দিকমাত্র। তাহলে দেখা যাচ্ছে, জগৎ হচ্ছে পরমাত্মার প্রকাশ, আর প্রকাশিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে।

জগতের মধ্য দিয়েই ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশ করেন। তাই সসীম জগৎ অসীম পরমাত্মার মধ্যেই সীমিত। অসীম পরমাত্মাই সমস্ত জগৎ। সেজন্য পরমাত্মা বা ব্রহ্মের মধ্যে নানাত্ব কিংবা বহুত্ব নেই। সবকিছুকেই পরমাত্মা পরিব্যাপ্ত করে আছেন। এমনকি সূক্ষ্ম ধূলিকণায়ও ব্রহ্ম বিদ্যমান। ছান্দোগ্য উপনিষদে বিষয়টিকে এক সুন্দর উপমায় বোঝানো হয়েছে—বস্তুসমূহের মধ্যে ব্রহ্ম এমনভাবে একীভূত থাকে

যেমনভাবে দ্রবীভূত জলে লবণ বা চিনি একীভূত থাকে। এভাবে উপনিষদে বহুসংখ্যক সূক্তে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে যে, জগৎ ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। তবে ব্রহ্ম জগতের ওপর নির্ভরশীল নয়।

ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের অভিন্নতার কথা গীতাতেও বর্ণিত হয়েছে। ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন ঃ "আমিই নিত্য সৎ পদার্থ, আবার আমিই অনিত্য পরিবর্তনশীল বস্তুজগৎ।" তবে ব্রহ্ম ও জগতের বাস্তবতা একই রকম নয়। ব্রহ্ম হচ্ছে কারণ, আর জগৎ হচ্ছে তাঁর কার্য। যদিও কারণ ও কার্য একটি সাপেক্ষ বিষয় এবং কারণের মধ্যে যে-শক্তি ও প্রকৃতি বিদ্যমান থাকে, কার্যের মধ্যেও সেই শক্তি ও প্রকৃতি বিদ্যমান থাকবে। এসত্ত্বেও কারণের বাস্তবতা কার্যের বাস্তবতার চেয়ে বেশি। কারণ থেকে কার্য উদ্ভূত হয়। যিনি উদ্ভব ঘটান, তাঁর গুণগত মান উদ্ভূতবস্তুর মানের চেয়ে বেশি হওয়া স্বাভাবিক। এভাবে জগতের কারণ হিসাবে ব্রহ্মের বাস্তবতা তাঁর কার্য জগৎ থেকে অধিকতর।

বেদান্ত দর্শন

ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন—উপনিষদের এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বেদান্ত দার্শনিকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। এটা সন্দেহাতীত যে, ব্রহ্ম সত্য ও বাস্তব, কিন্তু জগৎ সত্য ও বাস্তব কিনা সেব্যাপারে দার্শনিকেরা সন্দেহাতীতভাবে ঐক্যে পৌঁছাতে পারেননি। এপ্রসঙ্গে বেদান্ত দার্শনিকদের মধ্যে গৌড়পাদ, শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মধ্ব প্রমুখের মত উল্লেখযোগ্য।

গৌড়পাদের মতে, অদ্বৈত আত্মাই প্রকৃত ও একমাত্র সত্তা। জগৎ প্রকৃত সত্তা নয়। বৈচিত্রময় জগৎ হচ্ছে অধ্যাসমূলক অবভাস, যা মায়ার প্রভাবে উৎপন্ন হয়েছে।[১] গৌড়পাদ জগৎকে অনস্তিত্বশীল মনে করেন। তাঁর মতে, 'অস্তিত্ব' শব্দটি কেবল তার ওপরেই আরোপ করা যায়, যার প্রকৃত সত্তা আছে। যার প্রকৃত সত্তা নেই তাকে অস্তিত্বশীল বলা যায় না। বস্তুত, ব্রহ্ম ছাড়া জগতের প্রকৃত সত্তা নেই। সুতরাং জগৎকে প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বশীল বলা যায় না; যদিও জগৎকে দৃশ্যত বাস্তব বলে মনে হয়। কারণ, ব্যবহারিক দিক থেকে জগৎকে অবাস্তবও বলা যায় না। সুতরাং জগৎ প্রকৃত সত্তা থেকে বিচ্ছেদ্য নয়, আবার অবিচ্ছেদ্যও নয়। বস্তুত, জগতের প্রকৃতি অনির্বচনীয়। এই অনির্বচনীয় জগৎকেই বেদান্ত দর্শনে 'মায়া' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

আচার্য শঙ্করের মতে, ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ। ব্রহ্ম থেকে জগতের পৃথক ও স্বাধীন কোন অস্তিত্ব নেই। ব্রহ্ম এবং জগৎ এক ও অভিন্ন। শঙ্করাচার্যের এই মত 'অদ্বৈতবাদ' নামে পরিচিত। এখন ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন হলে জগতের প্রতিটি বস্তুকে ব্রহ্ম বলে মেনে নিতে হয়, এতে ব্রহ্ম অসংখ্য হয়ে পড়েন। আবার জগতের বস্তুসমূহ ধ্বংস ও পরিবর্তনের অধীন, সুতরাং বস্তুসমূহ ব্রহ্ম হওয়ায় ব্রহ্মও ধ্বংস ও পরিবর্তনের অধীন হয়ে পড়েন। জগতের বস্তুনিচয় নানাবিধ গুণের অধিকারী, বস্তুনিচয় ব্রহ্ম হওয়ায় ব্রহ্ম নানাবিধ গুণের অধিকারী হয়ে পড়েন। কিন্তু শঙ্করের মতে ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, শাশ্বত, চিরন্তন ও নির্গুণ। জগৎ ব্রহ্মে অনুস্যূত। তাহলে নিরপেক্ষ ব্রহ্মকে আপেক্ষিক জগতের সঙ্গে অভিন্ন বলার অর্থ কী? স্বয়ং শঙ্করই এর উত্তর দিয়েছেন।

শঙ্কর ব্রহ্ম ও জগতের সম্পর্ককে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন ঃ (ক) পারমার্থিক, (খ) ব্যবহারিক। পারমার্থিক দৃষ্টিকোণে কার্য তার কারণ থেকে 'অনন্য' অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্ম থেকে অনন্য (পৃথক নয়)। আর ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণে কার্য তার কারণ থেকে অন্য অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্ম থেকে অন্য (পৃথক)। জাগতিক বস্তুসমূহকে আমরা যেভাবে দেখি, তাতে সেগুলোকে তাদের কারণ থেকে পৃথক প্রতীয়মান হয়। যেমন, কাদামাটিকে রূপান্তরিত করা হয় মৃৎপিণ্ডে, আর মৃৎপিণ্ডকে রূপান্তরিত করা হয় ঘট বা পাত্রে। এখানে ঘট বা পাত্রের উপাদান কারণ হচ্ছে মৃত্তিকা, আর এর কার্য হচ্ছে ঘট বা পাত্র। কেউ ঘট বা পাত্রকে কাদামাটি আর কাদামাটিকে ঘট বা পাত্র বলে অভিহিত করবে না। এরা পরস্পর পৃথক। ঠিক এমনিভাবে জগৎ তার উপাদান কারণ ব্রহ্ম থেকে পৃথক। ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের এই অবস্থাটিকে শঙ্কর ব্যবহারিক দিক থেকে 'অন্য' বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে, কাদামাটি থেকে মৃৎপিণ্ড এবং মৃৎপিণ্ড থেকে ঘট বা পাত্র রূপান্তরিত হলেও এবং এরা পরস্পর পৃথক হলেও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এদের মধ্যে মৃত্তিকা বর্তমান। এদের রূপ পৃথক, কিন্তু সত্তাগতভাবে এরা একই উপাদান (মৃত্তিকা) ধারণ করে। এভাবে ঘট বা পাত্র তার কারণ মৃত্তিকা থেকে পৃথক নয়। অনুরূপভাবে, জগৎ তার কারণ ব্রহ্ম থেকে পৃথক নয়। জগতের সত্তায় নিহিত রয়েছেন ব্রহ্ম। সত্তাগতভাবে জগৎ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নয়। ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের এই সম্পর্ককে শঙ্কর পারমার্থিক বা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিকোণ থেকে 'অনন্য' বলে অভিহিত করেছেন।

পল ডয়সন-সহ অনেকেই অনন্য শব্দটিকে 'একত্ব' অর্থে গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এরূপ অর্থে শঙ্কর অনন্য শব্দটি ব্যবহার করেননি। কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী যথার্থই মন্তব্য করেছেন ঃ "অনন্য শব্দটিকে একত্ব অর্থে গ্রহণ করার ফলে শঙ্করের মতবাদটির বিরোধিতা করা হয়।"[২] শঙ্কর 'অনন্য' শব্দটি দ্বারা কারণ ও কার্যের একত্বকে নির্দেশ করেন না,

১ দ্রঃ Mahadevan, T. M. P., Gaudapada, Madras University, 1975, p. 153

২ An Introduction to Advaita Philosophy—Kokileswar Sastri, Calcutta University, 1924, p. 101

যেভাবে সাংখ্য দর্শন কারণ ও কার্যকে একই এবং কার্যকে কারণের মধ্যে অব্যক্ত অবস্থার ব্যক্তরূপ বুঝে থাকেন। আবার ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতো শঙ্কর কার্যকে কারণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বলেও নির্দেশ করেন না। কার্য কারণ থেকে অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্ম থেকে পৃথকও নয়, আবার অপৃথকও নয়। এই অবস্থাটিকেই তিনি 'অনন্য' বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে, অনন্য পদটি অব্যাখ্যেয় ও অনির্বচনীয়। কাজী নুরুল ইসলামের মতে—"শঙ্কর-পরবর্তী কোন অদ্বৈত বেদান্ত দার্শনিকই এ-পদটিকে একত্ব অর্থে ব্যবহার করেননি। বরং তাঁরা একে অব্যাখ্যেয় ও অনির্বচনীয় অর্থে ব্যবহার করেছেন।"[৩] তাঁরা বা শঙ্কর আক্ষরিক অর্থে 'অনির্বচনীয়' বলতে অবর্ণনীয়, অনির্ণেয়, অসংজ্ঞেয় ইত্যাদিকে বোঝাননি, বরং বিশেষ এক অর্থে তিনি 'অনির্বচনীয়' পদটি ব্যবহার করেছেন। যখন কোন কিছুকে সুনির্দিষ্ট করে বাস্তব বা অবাস্তব কোনটাই বলা যায় না, তখন তাকে নির্দেশ করার জন্য তিনি 'অনির্বচনীয়' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে শঙ্করের মতে, জগৎ বাস্তব নয়, আবার অবাস্তবও নয়।

জগৎ বাস্তব নয়

প্রথমত, শঙ্করের মতে যা সৎ বা বাস্তব হবে তা অপরিবর্তনীয়, স্বয়ম্ভূ এবং শাশ্বত হবে। অর্থাৎ যা পরিবর্তনশীল বা আপেক্ষিক হবে না, তাই বাস্তব। আর যার মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্যের অভাব রয়েছে অর্থাৎ যা পরিবর্তনশীল, স্বয়ম্ভূ নয়, শাশ্বত নয়—তাকে বাস্তব বলা যাবে না। পরিদৃশ্যমান জগৎ অপরিবর্তনীয় নয়, স্বয়ম্ভূ নয় এবং শাশ্বতও নয়। সুতরাং এজগৎ বাস্তব নয়।

দ্বিতীয়ত, শঙ্করের মতে, যা সসীম তা বাস্তব নয়। যা দৃষ্টিগোচর হয় বা যাকে 'এটা' বা 'ওটা' বলে জানা যায় তা সসীম। আর সসীম বস্তু স্বয়ম্ভূ নয়। সে নিজের অস্তিত্বের জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল। আর যা অন্যের ওপর নির্ভরশীল তা বাস্তব নয়। জগৎ সসীম, কারণ জগৎ দৃশ্যমান। আর সসীম বলে জগৎ স্বয়ম্ভূ নয়, তার অস্তিত্বের জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল। সেজন্য নির্ভরশীল বলে জগৎ বাস্তব নয়।

তৃতীয়ত, শঙ্করের মতে যা অদৈশিক এবং অকালিক তা বাস্তব। ব্রহ্ম বাস্তব, কারণ ব্রহ্ম দেশ ও কালের অধীন নয়। কিন্তু জগৎ বাস্তব নয়। কারণ, জগৎ দেশ ও কালের অধীন। দেশ ও কাল ব্যতীত জগতের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। জগৎ ভৌত, এটি ব্রহ্মের ওপর নির্ভরশীল, সুতরাং জগতের বাস্তবতা নেই। এভাবে শঙ্কর বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, জগৎ 'বাস্তব নয়'।

জগৎ অবাস্তব নয়

প্রথমত, জগৎ যদি অবাস্তব হতো, তাহলে আমরা জগতের ঘটনাবলিকে প্রত্যক্ষ করতে পারতাম না। অবাস্তব বস্তুকে কখনোই প্রত্যক্ষ করা যায় না অথবা অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না। যেমন খরগোশের শিং বা বন্ধ্যা মহিলার সন্তান কখনোই প্রত্যক্ষ করা যায় না বা অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না। অর্থাৎ অবাস্তব বিষয়ের কোন অস্তিত্বই নেই। জগতের ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করা যায় এবং তার ঘটনাবলির জ্ঞানলাভ করা যায়। সুতরাং জগতের অস্তিত্ব আছে এবং এটি অবাস্তব নয়।

দ্বিতীয়ত, শঙ্কর বারবার একথা বলেছেন যে, জগৎ হচ্ছে ব্রহ্মের কার্য। ব্রহ্ম ব্যতীত জগতের অন্য কোন উপাদান কারণ নেই। এবং এদিক থেকে জগৎ ব্রহ্মের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। ব্রহ্ম যেহেতু বাস্তব, সেহেতু তার কার্য এবং ব্রহ্মসম্পর্কযুক্ত জগৎ অবাস্তব হতে পারে না। জগৎকে অবাস্তব বললে প্রকারান্তরে তা ব্রহ্মের বাস্তবতায় সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

এছাড়া নিষ্কামের সার্থকতা এবং মোক্ষের অর্থপূর্ণতার জন্যও শঙ্কর জগতের অবাস্তবতাকে অস্বীকার করেন। জগৎকে অবাস্তব বললে নিষ্কামের সাধনা অবাস্তব হয়ে পড়ে, এমনকি জগতে মোক্ষলাভও অবাস্তব, অলীক হয়ে পড়ে।

জগৎ অধ্যাস নয়

শঙ্করের মতে জগৎ একটি অধ্যাস। কিন্তু তাঁর এই ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ, জগৎ যদি অধ্যাস হয়, তাহলে রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রম দেখার জন্য যেমন একজন প্রত্যক্ষকারীর প্রয়োজন হয়, ঠিক তেমনি ব্রহ্মে জগতের অধ্যাস দেখার জন্যও একজন প্রত্যক্ষকারীর প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষের অধীন হতে হয়। কিন্তু ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় না—এটি উপলব্ধির বিষয়। তাই জগৎ একটি অধ্যাস—এটা বলা যায় না। জগৎকে একটি অধ্যাস বলে যাঁরা শঙ্করের ভাষ্য ব্যাখ্যা করেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে শঙ্করের প্রতি অবিচারই করে থাকেন।[৪]

বস্তুত, শঙ্করের মতে জগৎ বাস্তব নয়, আবার জগৎ অবাস্তবও নয়, এবং জগৎ অধ্যাসও নয়। জগৎ হচ্ছে অনির্বচনীয়।

রামানুজ ও মধ্বের মতে জগৎ বাস্তব

শঙ্কর জগৎকে অনির্বচনীয় বললেও বেদান্ত দার্শনিক রামানুজ ও মধ্ব-সহ অনেকে জগৎকে বাস্তব ও সত্য বলে

৩ দ্রঃ A Critique of Sankara's Philosophy of Appearance—Kazi Nurul Islam, op. cit., p. 148

৪ Ibid., pp. 188-189

অভিহিত করেছেন। বৈষ্ণব বৈদান্তিক রামানুজের (১০১৭-১১৩৭) মতে, জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম। জগৎ ব্রহ্মের অংশবিশেষ, সত্তাগতভাবে জগতের মধ্যে ব্রহ্ম বিদ্যমান রয়েছে। তাই জগৎ বাস্তব ও সত্য। অন্য আরেকজন বৈষ্ণব বৈদান্তিক মধ্বের মতেও জগৎ বাস্তব ও সত্য। জগৎ ব্রহ্মের কার্য এবং ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের ভেদও রয়েছে। জগতের সত্তা রয়েছে, জগতের জ্ঞানলাভ করা যায় এবং জগৎ দৃশ্য হয় বলেই জগৎ সত্য।

জগতের প্রলয়

জগতের যেমন উৎপত্তি আছে, তেমনি বিনাশও আছে। জগৎ ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত হয়, আবার ব্রহ্মেই বিলীন হয়। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেনঃ "আমি এই নিখিল জগতের উৎপত্তিস্থল এবং আমাতেই তার লয় হয়।" (৭। ৬) জগতের সবকিছুই ধ্বংসের অধীন, দেবতাদেরও নাশ আছে। কেবল ব্রহ্মই শাশ্বত, চিরন্তন। তবে জগৎ চূড়ান্তরূপে ধ্বংস হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের পরে জগতের ধ্বংস হয়, আবার নির্দিষ্ট বিরতির পরে জগতের নবজন্ম ঘটে। দেবতাদেরও বিলয়ের পরে নির্দিষ্ট সময়ের পর আবার সৃষ্টি বা জন্ম ঘটে। সৃষ্টি ও লয় বা ধ্বংস—এই ধারা অন্তহীনভাবে চলতে থাকে। তাই জগৎ প্রবাহাকারে নিত্য।

চারটি যুগ

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ও তার বস্তুসমূহ একটা বৃহৎ সময় পর্যন্ত অস্তিত্বশীল থাকে। এই বৃহৎ সময়কে হিন্দুধর্মে চারটি যুগে বিভক্ত করা হয়। এই চতুর্যুগ হলোঃ (ক) কৃত বা সত্য, (খ) ত্রেতা, (গ) দ্বাপর এবং (ঘ) কলি।

(ক) সত্যযুগের বৈশিষ্ট্য ও সময়কাল

এই যুগ হচ্ছে সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতার যুগ। তাই এই যুগকে 'সত্যযুগ' বলে অভিহিত করা হয়। এই যুগে পরস্পর শত্রুতা, প্রবঞ্চনা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, দুঃখ, অহঙ্কার, ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি নেই। এ-কারণে এই যুগকে 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়ে থাকে। এ-যুগে বর্ণভেদ নেই। সকলে একই বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। এ-যুগে একটি মাত্র বেদ, একই ধর্ম এবং সকলে একই দেবতার অর্চনা করে থাকে। এ-যুগের রঙ হচ্ছে সাদা। এ-যুগ ৪০০০ দেববছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

(খ) ত্রেতাযুগের বৈশিষ্ট্য ও সময়কাল

সত্যযুগের সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। হ্রাস পেতে পেতে যখন সত্যযুগের সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা তিন-চতুর্থাংশ বিদ্যমান থাকে, তখন ত্রেতাযুগের শুরু হয়। এ-যুগের রঙ হচ্ছে লাল এবং প্রধান সদ্গুণ হচ্ছে জ্ঞান। এ-যুগে সত্যযুগের একটি বেদের পরিবর্তে চারটি বেদ গ্রহণ করা হয়। এ-যুগ ৩০০০ দেববছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

(গ) দ্বাপরযুগের বৈশিষ্ট্য ও সময়কাল

সত্যযুগের সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা যখন অর্ধেক বিদ্যমান থাকে, তখন এ-যুগের শুরু হয়। এ-যুগের প্রধান সদ্গুণ হচ্ছে যজ্ঞ। এ-যুগের রঙ হচ্ছে হলুদ। এ-যুগে রোগব্যাধি, দুঃখ এবং বিভিন্ন প্রকার বর্ণের উদয় ঘটে। পুরাণ ধর্মগ্রন্থ হিসাবে প্রাধান্যলাভ করে। এ-যুগ ২০০০ দেববছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

(ঘ) কলিযুগের বৈশিষ্ট্য ও সময়কাল

মানবতা বর্তমানে যে-যুগ অতিবাহিত করছে—এ-যুগকেই কলিযুগ বলে অভিহিত করা হয়। এ-যুগে সত্যযুগের সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা এক-দশমাংশ বাকি থাকে। প্রকৃত উপাসনা ও যজ্ঞ বিলুপ্ত হয়। বিভিন্ন তন্ত্র এ-যুগের ধর্মগ্রন্থ হিসাবে প্রাধান্য লাভ করে। এ-যুগের রঙ কালো। এ-যুগে পরস্পর শত্রুতা, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, পরশ্রীকাতরতা সর্বত্র লেগেই থাকে। অপরাধপ্রবণতা সার্বজনীন হয়ে পড়ে। মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। মূল্যবোধ বলে কোনকিছুর অস্তিত্ব থাকে না। নীতি-বহির্ভূত সম্পর্কের মধ্যে মানুষ তৃপ্তি খোঁজে। এ-যুগ ১০০০ দেববছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এসময় বিষ্ণু কল্কি অবতার হিসাবে আবির্ভূত হয়ে জগৎকে অগ্নি ও বন্যা দ্বারা ধ্বংস করে দেন।

সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ

এই চারটি যুগের প্রতিটির পূর্বে নির্দিষ্ট একটি সময় থাকে, যে-সময়কে 'সন্ধ্যা' বা 'Morning Twilight' বলে অভিহিত করা হয়। আবার প্রতিটি যুগের পরে একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে, যে-সময়কে 'সন্ধ্যাংশ' বলে অভিহিত করা হয়।[৫] শেষ সন্ধ্যাংশের পরে অর্থাৎ কলিযুগের সন্ধ্যাংশের পরে জগতের ধ্বংস হবে এবং একটি বিরতির পরে চার যুগের আবার পর্যায়ক্রমে সূত্রপাত ঘটবে।

মহাযুগ ও কল্প

চার যুগের সমষ্টিকে 'এক মহাযুগ' বলে অভিহিত করা হয়। এক মহাযুগ হলো ১২০০০ দেববছর বা ৪,৩২০,০০০ সৌরবছর। আর একহাজার মহাযুগ হলো এক অর্ধকল্প বা ৪,৩২০,০০০,০০০ সৌরবছর। এই অর্ধকল্প ব্রহ্মার একদিন

৫ দ্রঃ An Encylopedic Survey of Hinduism—Benjamin Walker, Hindu World, Vol. 2.1, London, 1968, p. 7

চারটি যুগ বা এক মহাযুগের সময়কাল

(Hindu World—Benjamin Walker (ed.), Vol. 1, London, 1968, p. 8 অবলম্বনে)

	চারটি যুগ ও তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের নাম	দেববছর (এক দেববছর = ৩৬০ সৌরবছর)	সৌরবছর	মোট বছর
প্রথম যুগ	সত্যযুগ সন্ধ্যা	৪০০	৪০০×৩৬০= ১৪৪,০০০	১,৭২৮,০০০
	সত্যযুগ	৪,০০০	৪,০০০×৩৬০= ১,৪৪০,০০০	
	সত্যযুগ সন্ধ্যাংশ	৪০০	৪০০×৩৬০= ১৪৪,০০০	
দ্বিতীয় যুগ	ত্রেতাযুগ সন্ধ্যা	৩০০	৩০০×৩৬০= ১০৮,০০০	১,২৯৬,০০০
	ত্রেতাযুগ	৩,০০০	৩,০০০×৩৬০= ১,০৮০,০০০	
	ত্রেতাযুগ সন্ধ্যাংশ	৩০০	৩০০×৩৬০= ১০৮,০০০	
তৃতীয় যুগ	দ্বাপরযুগ সন্ধ্যা	২০০	২০০×৩৬০= ৭২,০০০	৮,৬৪,০০০
	দ্বাপরযুগ	২,০০০	২,০০০×৩৬০= ৭২০,০০০	
	দ্বাপরযুগ সন্ধ্যাংশ	২০০	২০০×৩৬০= ৭২,০০০	
চতুর্থ যুগ	কলিযুগ সন্ধ্যা	১০০	১০০×৩৬০= ৩৬,০০০	৪,৩২,০০০
	কলিযুগ	১,০০০	১,০০০×৩৬০= ৩৬০,০০০	
	কলিযুগ সন্ধ্যাংশ	১০০	১০০×৩৬০= ৩৬,০০০	
	এক মহাযুগ	১২,০০০	১২,০০০×৩৬০= ৪,৩২০,০০০	৪,৩২০,০০০

বা একরাত্রি। দুটি অর্ধকল্প নিয়ে হয় একটি কল্প বা ৮,৬৪০,০০০,০০০ সৌরবছর। একটি কল্প বা ৮,৬৪০,০০০,০০০ সৌরবছর ব্রহ্মার একটি সম্পূর্ণ দিন (এক রাত্রি এবং এক দিন)।

লয়, প্রলয় ও মহাপ্রলয়

এক মহাযুগের পরে জগৎ অগ্নি ও বন্যার দ্বারা ধ্বংস হয়ে যাবে। জাগতিক সকল বস্তু ও ঘটনাসমূহ বিলুপ্ত হয়ে

যাবে। এই পর্যায়কে 'লয়' বলে অভিহিত করা হয়। লয় সংঘটিত হওয়ার পরে কিছুকাল বিরতির পর আবার জগতের সৃষ্টি হবে এবং এক মহাযুগ পরে সেই জগতের আবার লয় হবে। এভাবে লয় ও সৃষ্টি প্রক্রিয়া এক অর্ধকল্প অর্থাৎ একহাজার মহাযুগ পর্যন্ত চলতে থাকে। এক হাজার মহাযুগ পরে যখন জাগতিক বস্তু ও ঘটনাবলি ধ্বংস হয়, তখন ছোটখাট দেবতাদেরও মৃত্যু ঘটে। এসময় পর্যন্ত ব্রহ্মা জীবিত থাকেন। এ পর্যায়ের ধ্বংসকে 'প্রলয়' বলে অভিহিত করা হয়। অর্ধকল্প বিরতির পর জগতের আবার সৃষ্টি হয়। দেবতারাও সৃষ্ট হন এবং জগতের লয় প্রক্রিয়াও চলতে থাকে।

এইভাবে ব্রহ্মার শতবর্ষ পূর্ণ হলে জগতের সবকিছুর সঙ্গে ব্রহ্মার নিজেরও ধ্বংস হয়। দেবতা, দুষ্টশক্তি—কোন কিছুরই তখন অস্তিত্ব থাকে না। এই ধ্বংসকে 'মহাপ্রলয়' বলে অভিহিত করা হয়। কিছুকাল পরে আবার নতুন জগৎ, দেবতা ও নতুন ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়।

এভাবে জগতের সৃষ্টি, লয়, প্রলয় ও মহাপ্রলয় চক্রাকারে অন্তহীনভাবে ঘটতে থাকে। জগতের ধ্বংস হবে, কিন্তু জগতের আবার সৃষ্টি হবে না—এমনটি কখনো ঘটে না। জগতের যেমন লয় আছে, আবার সৃষ্টিও আছে। সৃষ্টি ও লয়, লয় ও সৃষ্টি চক্রাকারে ঘটতেই থাকবে। এ-প্রক্রিয়ার কখনো শেষ হবে না।

হিন্দুধর্মে পার্থিব জীবনের তাৎপর্য

পার্থিব জীবন সাধনার ক্ষেত্র

যদি বলা হয় যে, হিন্দুধর্মে একাধিক পার্থিব জীবন যাপন করতে হয়, তাহলে বোধহয় বাড়িয়ে বলা হয় না। এই ধর্মমতে, যারা মোক্ষ লাভ করতে সক্ষম হয় না—তাদের বাসনাতাড়িত কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। এ-জন্মে মোক্ষলাভের পুনঃচেষ্টা চলে, অর্জিত না হলে সে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। এভাবে সে একাধিক পার্থিব জীবনের সম্মুখীন হয় এবং বারবার পার্থিব জীবনের দুঃখ, ক্লেশ, তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে গ্রহণ করতে হয়। মোক্ষলাভ করতে সক্ষম হলে তাকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না। পার্থিব দুঃখ-কষ্ট থেকে নিস্তারলাভ করে পরমাত্মায় সে লীন হয়ে যায়, উপভোগ করে পরম সুখ। এ-সুখ অর্জনের বা মোক্ষলাভের সাধনা করতে হয় পার্থিব জীবনে, ইহলৌকিক জগতে। তাই পার্থিব জগৎ ও জীবন মানুষের কাছে গভীর তাৎপর্যবহ।

এজগতে মানুষের দুঃখের অন্ত নেই। জীবনটাই বিষাদময়। দুঃখ-কষ্ট, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। কিন্তু কেন এমন হয়? বিভিন্ন গ্রন্থে এর নানা কারণ উল্লিখিত হয়েছে। বেদাদি শাস্ত্র অনুসারে মানুষ নিজেই তার দুঃখের কারণ। তার অন্তঃস্থ কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা, মোহ, ক্রোধ ইত্যাদি তার দুঃখের কারণ। ভগবদ্গীতা অনুসারে অজ্ঞতা দুঃখের কারণ। জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতা, স্বীয় আত্মা সম্পর্কে অজ্ঞতা, স্বীয় আত্মা ও ব্রহ্মের অভিন্নতা সম্পর্কে অজ্ঞতাই তাবৎ দুঃখ, জরা ও পুনর্জন্মের কারণ। পার্থিব জীবনে দুঃখ একটি অবিচ্ছেদ্য ব্যাপার—অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে উপনিষদ্ এটিও শিক্ষা দিয়ে থাকে। দুঃখ, দৈন্য, অসুস্থতা, ধ্বংস, ক্ষয়, মৃত্যু ইত্যাদি জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অবিদ্যাই এই দুঃখের কারণ। আত্মা এবং ব্রহ্ম অভিন্ন—এই জ্ঞান যার নেই, এই উপলব্ধি ও অনুভব যার হয়নি, সে দুঃখে নিমজ্জিত থাকে। আর যে ব্রহ্মকে জানে, ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার অভিন্নতা সম্পর্কে যার জ্ঞান বা উপলব্ধি আছে—সে দুঃখ, দৈন্য ও জাগতিক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পায়।

বৌদ্ধধর্মও জগৎ ও জীবনকে দুঃখময় বলে প্রচার করে। জগতে কেবল দুঃখ আর দুঃখ, দুঃখে জগৎ পরিপূর্ণ। গৌতম বুদ্ধের সাধনাই ছিল এই দুঃখ থেকে মানুষের মুক্তির উপায় অনুসন্ধান। গৌতম বুদ্ধের ন্যায় জার্মান দার্শনিক আর্থার শোপেনহাওয়ারও (১৭৮৮-১৮৬০) মনে করেন যে, জগৎ দুঃখে পরিপূর্ণ, জগতে দুঃখ ভিন্ন কিছু নেই। এঁরা উভয়েই মনে করেন, এ-দুঃখের কারণ মানুষের অন্তঃস্থ। শোপেনহাওয়ার মনে করেন, মানুষের বেঁচে থাকার ইচ্ছাই তার দুঃখের কারণ। মহামতি বুদ্ধের মতে, মানুষের বাসনা বা প্রবৃত্তিই তার দুঃখের কারণ। তবে উভয়ের মতের পার্থক্য হচ্ছে, শোপেনহাওয়ার মনে করেন—দুঃখ থেকে মুক্তির আশা নিতান্তই একটি দুরাশা। কিন্তু বুদ্ধদেব মনে করেন যে, দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করা সম্ভব। এপ্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের একটি পার্থক্য হচ্ছে, হিন্দুধর্ম ব্রহ্মের সঙ্গে 'আত্মার অভিন্নতা' উপলব্ধির অভাবকে দুঃখের অন্যতম কারণ মনে করে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম কোন আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অভাবের প্রশ্ন তোলে না।

জীবনে যেমন দুঃখ আছে, তেমন দুঃখ থেকে মুক্তিও আছে। সেই মুক্তিতেই মানবজীবন সার্থক হয়ে ওঠে। হিন্দুধর্মের মতে, মানুষ তার সাধনার দ্বারা মুক্তি বা মোক্ষ অর্জন করতে সক্ষম হয়। এই সার্থকতা বা মুক্তি পরজীবনে নয়, ইহজীবনেই অর্জন করা সম্ভব। উপনিষদ্ একে 'জীবন্মুক্তি' বলে অভিহিত করেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে—এ-পৃথিবী থেকেই আমরা আত্মাকে জানতে পারি। যদি না পারি, তবে আমাদের মহাবিনাশ। যাঁরা আত্মাকে জানেন, তাঁরা অমর হন। কিন্তু অন্যরা দুঃখই পান। (৪।৪।১৪) মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে—ব্রহ্মকে আত্মরূপে দর্শন করলে হৃদয়গ্রন্থি (অবিদ্যাজনিত অহংজ্ঞান)

বিনষ্ট হয়ে সমুদয় সংশয় ছিন্ন হয়, ফলে দ্রষ্টার মোক্ষবিরোধী কর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। (২।২।৮) পার্থিব জীবনেই সাধনার দ্বারা এই মুক্তি অর্জন করতে হয়। তাই হিন্দুধর্ম পার্থিব জীবনকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে উপস্থাপন করে।

জীবন একেক জনের নিকট একেক রকম। কেউ 'খাও, দাও, ফূর্তি কর'—''যাবজ্জীবেৎ সুখম্ জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতম্ পিবেৎ'' দর্শনে বিশ্বাসী। অর্থাৎ জীবন মানেই ভোগ। ইন্দ্রিয়সুখই জীবনের চরম লক্ষ্য। মানুষের আত্মা বলে কিছুই নেই। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সবই শেষ হয়ে যায়। জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। মানসিক সুখের চেয়ে ইন্দ্রিয়সুখকেই প্রাধান্য দিতে হবে। যেকোন মূল্যে সুখ উপভোগ করতে হবে। ভারতীয় চার্বাক দার্শনিকেরা এরূপ মত পোষণ করেন। বস্তুবাদী ও জড়বাদী পাশ্চাত্য দার্শনিকদেরও অনেকে এই মত পোষণ করেন। হিন্দুধর্মের মত এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই ধর্ম বলে, মানবজীবনের সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য আছে। তা হলো—চার পুরুষার্থ। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের সাধন। ব্রহ্মের সঙ্গে একত্ব উপলব্ধি করে পরমানন্দ উপভোগ করা। এই উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত জীবনে সাধনা, নীতি-নৈতিকতা ও আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির পালন বাঞ্ছনীয়।

মানুষ ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সে ব্রহ্মের অংশ। যে-ব্রহ্ম থেকে তার উদ্ভব—সেই ব্রহ্মে লীন হওয়া বা ভগবানলাভ করা তার জীবনের পরম লক্ষ্য। যে-পর্যন্ত মানুষ এর উপযোগী না হয়, সে-পর্যন্ত তাকে কৃতকর্ম অনুসারে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে কর্মফল ভোগ করতে হয়।

জীবন দেহ ও আত্মার সমন্বয়

হিন্দুধর্মে মানুষকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কোন কোন ব্যাখ্যাতা মানুষকে ঈশ্বরের মর্যাদায় আসীন করেন। নর-নারায়ণের (Man-God) ধারণা মানুষকে ঈশ্বরের সমতুল্য করে। স্বামী বিবেকানন্দেরও একই মত। শঙ্করাচার্য মানবাত্মাকে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। তাঁর এই মত মানুষকে ঈশ্বরের মর্যাদায় ভূষিত করে। বাহ্যত মানুষ ভৌত-রাসায়নিক উপাদানে গঠিত হলেও তার মধ্যে রয়েছে আত্মা। এই আত্মা ব্রহ্মের প্রকাশবিশেষ। অতএব মানুষ স্বভাবতই ঐশী সত্তাসম্পন্ন।

জীবন সম্পর্কে যন্ত্রবাদ (Mechanism) কিংবা উন্মেষবাদ (Emergence theory) যা মনে করে, হিন্দুধর্মের বক্তব্য তা থেকে ভিন্ন। যন্ত্রবাদ অনুসারে, জীবদেহ যন্ত্রের চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়। এদের মধ্যকার পার্থক্য কেবল পরিমাণগত, গুণগত নয়। জীব বা মানুষের মধ্যে যে উন্নততর আচরণ, মানসিক প্রক্রিয়া ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়, তা ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার জটিলতম রূপ ভিন্ন আর কিছু নয়। অন্যদিকে উন্মেষবাদ মনে করে, জীবন জড় থেকে উন্মেষিত একটি নতুন গুণ। এটি জড় থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্য বহন করে। যেমন, জল অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন থেকে উন্মেষিত হলেও তা একটি নতুন গুণসম্পন্ন এবং তা তার উৎস থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বহন করে। কিন্তু হিন্দু-মতে, জীবন কোন ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফল নয় বা রয়ি বা জড় থেকে উন্মেষিত কোন গুণ নয়, বরং জীবন হচ্ছে আধ্যাত্মিক সত্তা-সম্পন্ন। প্রাণময়তা থেকে ভিন্ন মানুষের আরেকটি শক্তি আছে, তা হচ্ছে তার অন্তঃস্থ সত্তা। আবার গতি এবং ক্রিয়াপরতার কথা বলে জীবনের সর্বব্যাপক সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। কেননা, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং রাসায়নিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের গতি ও ক্রিয়া-তৎপরতা আছে, কিন্তু কেউ এদের জীবন বলে মনে করে না। এবং এদের জীবন বলে মনে করাও যুক্তিযুক্ত নয়।

উদ্ভিদের মধ্যে প্রাণ আছে। এরা খাদ্য গ্রহণ করতে পারে, আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় বিকশিত হতে পারে। বংশবিস্তার করতে পারে, কিন্তু মানবেতর প্রাণীর অনেক বৈশিষ্ট্যই এদের মধ্যে নেই। মানবেতর প্রাণীর মধ্যে উদ্ভিদের ঐসব গুণাবলি ছাড়াও সীমিত ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রতিরোধ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কিন্তু মানবের বহু বৈশিষ্ট্যই এদের মধ্যে নেই। মানুষের মধ্যে উদ্ভিদ ও মানবেতর প্রাণীর ঐসব বৈশিষ্ট্য ছাড়াও স্বাধীনতা, মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা, নান্দনিকবোধ, স্বশাসন, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আন্তর্জাতিকতা, সার্বজাতিকতা, বুদ্ধিবৃত্তি, যুক্তিপ্রবণতা, স্বীকার বা অস্বীকারের যোগ্যতা, কল্পনাশক্তি, মেধার তীক্ষ্ণতা, ক্রমাগত জীবন-জগৎকে সুখী ও সুন্দর করার প্রচেষ্টা, অমরত্বের বাসনা, অসীমের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সাধনা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মানুষের দেহাভ্যন্তরে আধ্যাত্মিক ও সূক্ষ্মসত্তা হিসাবে আত্মাকে স্বীকার করে নিলে মানবের এসব বৈশিষ্ট্য অর্থপূর্ণ হয়। আত্মা থাকার কারণে মানুষ উদ্ভিদ ও মানবেতর প্রাণী থেকে পৃথক। উদ্ভিদের প্রাণ আছে, কিন্তু বুদ্ধি নেই। আর উদ্ভিদ থেকে মানবেতর প্রাণী এই কারণে পৃথক যে, মানবেতর প্রাণীর বুদ্ধি আছে। এই শক্তির কারণে প্রাণী পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিধান করতে পারে। আর মানুষ প্রাণী থেকে এই কারণে পৃথক যে, তার বিচার-বুদ্ধি বা যুক্তিকৌশল (reason) রয়েছে। হিন্দু-মতে, এই মানবীয় গুণাবলির চালক হিসাবে রয়েছে তার আত্মা। এই আত্মা জড়াত্মক নয়, বরং ঐশী। আত্মা ঐশী হলেও দেহাভ্যন্তরে তার অবস্থান। দেহকে অবলম্বন করেই তার প্রকাশ। দেহ ব্যতীত আত্মার পার্থিব উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। সুতরাং হিন্দুধর্ম-মতে, দেহ ও আত্মা নিয়েই মানবের পার্থিব জীবন। দেহ জড়াত্মক, আত্মা চৈতন্যাত্মক। তাই মানবজীবন বস্তু ও অধ্যাত্মের সমন্বয়। এই কারণে হিন্দুধর্ম মানবজীবনে বৈষয়িকতা ও আধ্যাত্মিকতার অপরিহার্যতা স্বীকার করে।

জীবনের চারটি উদ্দেশ্য

হিন্দুধর্মের মতানুসারে মানবজীবনের রয়েছে চারটি পরম উদ্দেশ্য—ধর্ম (ন্যায়পরায়ণতা), অর্থ (ধন-সম্পত্তি), কাম (সুখ-সম্ভোগাদি) এবং মোক্ষ (আধ্যাত্মিক মুক্তি)। 'ধর্ম' নীতি-নৈতিকতা, সততা, সাধুতা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি চর্চার কথা বলে। 'অর্থ' বৈষয়িকতার স্বীকৃতি দেয়। 'কাম' মানসিক, নান্দনিক ও সাংস্কৃতিক তৃপ্তির প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে। 'মোক্ষ' পরম শান্তি ও আনন্দের কথা বলে। এই চারটি উদ্দেশ্যের মধ্য দিয়েই মানবজীবনের সার্থকতা অর্জিত হয়। এর মধ্যে মোক্ষ হচ্ছে মানবজীবনের মূল লক্ষ্য। অন্য তিনটিকে স্বীকার করে নিয়েই এই মূল লক্ষ্যে উপনীত হতে হয়। কেবল বৈষয়িক সুখ মানুষকে সুখী করতে পারে না, শুধু সুখের অন্বেষণ মানবজীবনে নৈরাজ্য নিয়ে আসে। কারণ, সে সুখ খোঁজে কিন্তু সুখের নাগাল পায় না। অনেকটা মরীচিকার ন্যায়। সে যেটাকে সুখকর বস্তু মনে করে প্রধাবিত হয়, লক্ষ্যে পৌঁছানোর পর বা প্রাপ্তির পর সেটা তাকে তৃপ্ত করতে পারে না। সে পুনরায় অন্য বস্তুতে সুখ অন্বেষণ করে। সেখানেও সে তৃপ্ত হয় না। একটা মনস্তাত্ত্বিক সত্য হচ্ছে যে, সুখের প্রতি আকর্ষণ যতোধিক হবে, সুখ ততোধিক দুষ্প্রাপ্য হবে। সুখের অন্বেষণপ্রক্রিয়া চলতে থাকবে, কিন্তু কখনো সুখ পাওয়া যাবে না। এই অবস্থাকে নীতিবিদ্‌ সিজউইক 'সুখবাদের কূটাভাস' (paradox of hedonism) বলে অভিহিত করেছেন।[৬] হিন্দুধর্ম এধরনের সুখ অন্বেষণের কথা বলে না। হিন্দুধর্ম ভোগের সঙ্গে সংযমের, ত্যাগের সঙ্গে প্রাপ্তির, অর্জনের সঙ্গে অধিকার ও ন্যায়পরায়ণতার যোগসাধনের শিক্ষা দেয়। হিন্দুধর্ম মানুষের প্রকৃতি, প্রবণতা ও সামাজিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা ও পরমাত্মার অনুভূতিকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পায়। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ভাষায়ঃ "Hinduism does not believe in any permanent feud between the human world of natural desires and social aims and the spiritual life with its discipline and aspiration on the other."[৭]—হিন্দুধর্ম যেমন কেবল জগৎকে প্রাধান্য দেয় না, তেমনি কেবল অসীমের আরাধনায়ও নিজেকে ব্যাপৃত রাখে না। হিন্দুধর্ম জীবন-সার্থকতার জন্য সসীম ও অসীম, জাগতিক জীবন ও ব্রহ্ম উভয়কে সমগুরুত্ব প্রদান করে থাকে। এপ্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যঃ "In darkness are they who worship only the world but in greater darkness are they who worship the infinite alone. He who accepts both saves himself from death by the knowledge of the former and attains immortality by the knowledge of the latter."[৮]

চারটি আশ্রম

জীবনসার্থকতার জন্য হিন্দুধর্মে চারটি আশ্রম বা স্তর অতিক্রমের কথা বলা হয়েছে। আশ্রমগুলি হচ্ছে—ব্রহ্মচর্য (প্রশিক্ষণ কাল), গার্হস্থ্য (গৃহস্বামী হিসাবে সাংসারিক ক্রিয়াদি সম্পাদন), বানপ্রস্থ (নির্জনবাস) এবং সন্ন্যাস (সংসারের মায়া ত্যাগ ও মুক্তির জন্য অপেক্ষমান কাল)। প্রথম আশ্রম হচ্ছে দেহ-মনের নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রশিক্ষণকাল। কিশোর বয়সে এই আশ্রম গ্রহণ করা হয়। এই স্তরে শিক্ষার্থী গুরুগৃহে নির্দিষ্ট কাল অবস্থান করে পরবর্তী জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করবে। দ্বিতীয় স্তরে সে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যাপন করবে। বিবাহের মধ্য দিয়ে সংসারব্রত ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করবে। তৃতীয় স্তরে সে গৃহস্থালির দায়িত্ব পরবর্তী প্রজন্মের ওপর ন্যস্ত করে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বনে গমন করবে। মনুর মতানুসারে, এই তৃতীয় স্তরটি গ্রহণের অধিকার আসে পিতামহ হওয়ার পর, অথবা যখন চর্মে ক্ষুদ্র ভাঁজ পড়ে যায় অথবা চুল ধূসর বর্ণের হয়ে যায়। মূলত সামাজিক সম্পর্ক শিথিল করে ধ্যানের অভ্যাস করার জন্যই এই আশ্রমটি গ্রহণ করা হয়। চতুর্থ স্তরে এসে মানব আধ্যাত্মিক মুক্তির অবস্থা অর্জন করে। তার বাহ্যজীবন থাকে ঠিকই, কিন্তু ধন, যশ, সফলতা, ব্যর্থতা কিছুই তার জীবনে প্রভাববিস্তার করতে পারে না। এই স্তরে সে আত্মার প্রশান্তি অর্জন করে। আসক্তি, আবেগ তার মন থেকে বিলীন হয়ে যায়। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মে তার কোন সম্পৃক্ততা থাকে না, সে পরিণত হয় একজন যথার্থ মানুষে। সে যেন পরমাত্মা বা ব্রহ্মের সঙ্গে মিলনের জন্য অপেক্ষা করছে।

শেষকথা

অতএব, হিন্দুধর্ম অনুসারে মানবজীবনের তাৎপর্য হচ্ছে বৈষয়িকতা, জাগতিকতা প্রভৃতিকে স্বীকার করে নিয়েই তার আত্মার উৎস পরমাত্মা বা ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হওয়ার সাধনায় ব্রতী হওয়া। আর এটি অর্জনে ব্যর্থ হলে বারবার জন্মমৃত্যুর অধীন হয়ে এই পার্থিব দুঃখ-কষ্টের মোকাবিলা করতে হয়। ❑

---

৬ The Methods of Ethics—Sidgwick, (7th Ed.), London, Macmillan, 1967, p. 48

৭ The Hindu View of Life—Radhakrishnan S., Unwin Books, London, 1968, pp. 56-57

৮ Ibid., p. 57

বিবেকানন্দের 'সঙ্গীতকল্পতরু' ইতিহাসে উপেক্ষিত

সর্বানন্দ চৌধুরী

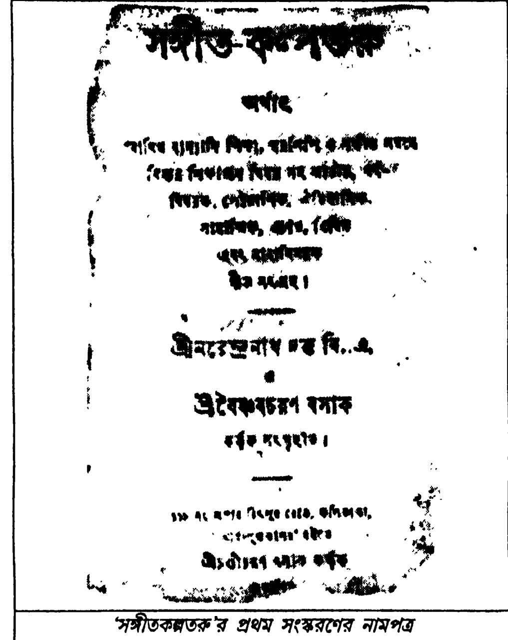
তরুণ গবেষক এবং অধ্যাপক সর্বানন্দ চৌধুরীর অক্লান্ত পরিশ্রমে কিছুদিন পূর্বে গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার থেকে 'সঙ্গীতকল্পতরু' গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণ ও আরো কিছু সংযোজন প্রকাশিত হয়। তিনমাসের মধ্যেই এই পুনর্মুদ্রণের প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। এতদিন এই উপেক্ষিত গ্রন্থটির কথা বেশি কেউ জানত না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও যেন গ্রন্থটি উপেক্ষিত না থাকে, সেই আবেদনই লেখক জানিয়েছেন এই রচনায়।

বাঙলা গানের ইতিহাসে 'সঙ্গীতকল্পতরু' একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। প্রশ্ন উঠতে পারে, বাঙলা ভাষায় অসংখ্য সঙ্গীতগ্রন্থের মধ্যে 'সঙ্গীতকল্পতরু' কেন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ? এককথায় এর উত্তর—গ্রন্থটির সঙ্গে সঙ্গীতজ্ঞ স্বামী বিবেকানন্দের নাম জড়িত।

বিবেকানন্দ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই একটা কথা বলতেন ঃ "খুব ভাল আধার। একাধারে অনেক গুণ—গাইতে বাজাতে লিখতে পড়তে।" শ্রীরামকৃষ্ণ শতমুখে প্রশংসা করেছেন তাঁর এই বহুমুখী প্রতিভার—যার অন্যতম হলো তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভা।

প্রতিভার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতচর্চার অনুকূল পরিবেশও পেয়েছিলেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত নিজে যেমন ওস্তাদের কাছে সঙ্গীতচর্চা করেছিলেন, ছেলেকেও তেমনি পাঠিয়েছিলেন ওস্তাদের কাছে তালিম নিতে। বেণী ওস্তাদ এবং আহম্মদ খাঁ ছাড়াও এই তালিকায় আরো অনেকেই আছেন। এঁদের কাছে ওস্তাদি গান শেখা ছাড়াও বিবেকানন্দ মুরারি গুপ্তের কাছে পাখোয়াজ এবং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতজ্ঞ কাশী ঘোষালের কাছে বাঁয়া-তবলা শেখেন এবং এইভাবে অল্পবয়সেই তিনি শুধু গায়ক বা বাদক নন, সঙ্গীতের একজন 'অথরিটি' হয়ে ওঠেন। স্বামীজীর জীবনীকার প্রমথনাথ বসুর লেখা থেকে একথা জানা যায়।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, স্বামীজীর চিন্তা ও চর্চার নানা দিক নিয়ে এপর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে, তাঁর সঙ্গীতচর্চার দিকে আমরা ততটা মনোযোগ দিইনি। স্বামীজী গান গাইতেন এবং কয়েকটি গান লিখেছিলেন—সাধারণভাবে স্বামীজীর সঙ্গীতচর্চা সম্পর্কে এটুকুই আমরা জানি। কিন্তু সঙ্গীতে তাঁর যে কত গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল এবং বাংলার সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ঐতিহাসিক দিক থেকে যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেসম্পর্কে আমরা প্রায় অজ্ঞই থেকে গিয়েছি। তার কারণ একশো বারো বছরেরও বেশি সময় 'সঙ্গীতকল্পতরু' গ্রন্থটি আমাদের অগোচরে ছিল। সম্প্রতি রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার গ্রন্থটি প্রকাশ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এই গ্রন্থটি পুনরুদ্ধার না করা গেলে স্বামীজীর জীবনের একটি অধ্যায় যেমন অস্পষ্ট থেকে যেত, তেমনি বাঙলা গানের ইতিহাস রচনাও অসম্পূর্ণ হতো। শুধু তাই নয়, এই গ্রন্থে বিবেকানন্দ সঙ্গীত সম্পর্কে যেরকম পরিণত মনের পরিচয় দিয়েছেন—বয়সের তুলনায় তা সত্যিই বিস্ময়কর। সমকালে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া সঙ্গীত সম্পর্কে এত অল্পবয়সে এত পরিণত ধারণা আর কারো ছিল বলে জানা যায় না।


সঙ্গীত-কল্পতরু
অর্থাৎ
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ.
ও
শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক
কর্তৃক সংগৃহীত।

'সঙ্গীতকল্পতরু'র প্রথম সংস্করণের নামপত্র

বিবেকানন্দ যখন এই গ্রন্থের সঙ্কলনকর্ম শুরু করেন, তখন তিনি নরেন্দ্রনাথ দত্ত নামেই পরিচিত। বয়স তেইশের কোঠায়। যতদূর জানা যায়, ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের সামান্য কিছু আগে বা পরে তিনি এটি শুরু করেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় এর প্রায় একবছর পরে অর্থাৎ ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে। অবশ্য শেষের দিকে এই কাজে সেকালের প্রসিদ্ধ গ্রন্থব্যবসায়ী বৈষ্ণবচরণ বসাকও যুক্ত হয়েছিলেন। এই গ্রন্থের কিছু গান তিনিও সংগ্রহ করেন। তবে স্বামীজীর মতো ব্যক্তিত্ব যেখানে উপস্থিত, সেখানে চিন্তা ও মতের ক্ষেত্রে তাঁর প্রাধান্য এড়ানো যে বৈষ্ণবচরণের পক্ষে সম্ভব ছিল না—একথা বলাই বাহুল্য।

গ্রন্থটির সূচনায় আছে 'সঙ্গীত ও বাদ্য' নামে স্বামীজীর লেখা সঙ্গীত বিষয়ে ৯০ পৃষ্ঠার একটি নিবন্ধ, পরে ৬৪৭টি গানের সংগ্রহ এবং পরিশিষ্টে আছে ১৭ জন গীতিকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। 'সঙ্গীতকল্পতরু'র এই গঠন-পরিকল্পনার




মধ্যে সঙ্গীতচিন্তার একটা ব্যাপ্তি প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নরেন্দ্রনাথ নিজে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। বিশেষ লক্ষণীয় যে, বিনোদনের পাশাপাশি গানবাজনার 'অ্যাকাডেমিক' দিকটাও তিনি সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। 'সঙ্গীত ও বাদ্য' রচনাটিই এর প্রমাণ। লেখাটি মূলত শিক্ষার্থীদের পক্ষে উপযোগী—সঙ্গীততত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা। গানের সঙ্গে পরিচয় করানোর পূর্বে তার তত্ত্ব এবং ইতিহাস সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করে তোলাই এই রচনাটির উদ্দেশ্য। সঙ্গীততত্ত্বের আলোচনা ও সঙ্গীত-সংগ্রহ অংশদুটি এই গ্রন্থে তাই অবিচ্ছিন্ন, পরস্পরের পরিপূরক। 'সঙ্গীতকল্পতরু'র এই গঠন-পরিকল্পনা সত্যিই অভিনব। কারণ, 'সঙ্গীতকল্পতরু'র পূর্বে 'সঙ্গীততরঙ্গ', 'সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম' বা 'ভিক্টোরিয়া গীতিমালা'তে সঙ্গীত-সংগ্রহের পাশে কম-বেশি সঙ্গীতের তত্ত্বালোচনা থাকলেও সে-আলোচনা শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত সঙ্গীত-প্রবেশিকা নয়। 'সঙ্গীতকল্পতরু'র ঐ আদর্শে পরে কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি 'নব সঙ্গীতকল্পতরু' নামে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন যেখানে, শিক্ষার্থীদের জন্য সঙ্গীতালোচনা এবং গানের সংগ্রহ পাশাপাশি রয়েছে।

স্বামীজী প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্র উদ্ধারের ব্যাপারে শ্রদ্ধাশীল থাকলেও নিজে সে-কাজে অগ্রসর হননি। বরং আধুনিক শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে সঙ্গীতশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করাটা তাঁর কাছে বেশি জরুরি ছিল। কারণ, সঙ্গীতশিক্ষায় "কেবল শর্করাবাহী গর্দভের ন্যায় এবং গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় মূর্খ কুসংস্কারপূর্ণ ওস্তাদ-প্রদর্শিত পথ" অনুসরণের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন তিনি। সেই কারণেই 'সঙ্গীতকল্পতরু'র সূচনাংশের ঐ রচনায় 'স্বরগ্রাম', 'যন্ত্র বাঁধিবার নিয়ম', 'স্বরসাধন', 'বাজাইবার অর্থাৎ সঙ্গত করিবার নিয়ম' ইত্যাদি আলোচনায় সঙ্গীতের মূলসূত্রগুলি সম্পর্কে তিনি শিক্ষার্থীদের স্বচ্ছ ধারণা দিতে চেয়েছেন। সেইসঙ্গে উনিশ শতকের সামগ্রিক সঙ্গীতচর্চা সম্পর্কে স্বামীজীর স্বাধীন, কুসংস্কারমুক্ত, যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তার পরিচয়ও রয়েছে ঐ রচনাতে। সেকালের প্রবল প্রতাপশালী 'ওস্তাদ'দের বিরুদ্ধে তিনি যেভাবে জেহাদ ঘোষণা করেছেন, তা বৈপ্লবিক। চিন্তার দিক থেকে অভিন্ন হলেও রবীন্দ্রনাথও ওস্তাদদের বিরুদ্ধে এমন কঠোর সমালোচনা করতে পারেননি। স্বামীজীর কথায়ঃ

> *"আমাদের দেশের সকল বিষয়েই স্বাধীন চিন্তার স্রোত যে-প্রকারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সঙ্গীতেও তাহা লক্ষিত হয়।*
>
> *"যাহা হইয়া গিয়াছে, তদপেক্ষা অধিক আর কিছুই হইতে পারে না, এই বিশ্বাস জাতীয় জীবনে দৃঢ়প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। শিক্ষার অভাবই এইরূপ বিশ্বাসের মূল কারণ। প্রাচীনেরা কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া ঐ সকল রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, লোকে সেবিষয়ের কোনও অনুসন্ধান করে না। কেবল তাঁহারা যেগুলি করিয়া গিয়াছেন, তাহা শিক্ষা করাই যথেষ্ট বিবেচনা করে।... অপর দিকে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সঙ্গীতের বহুল চর্চ্চা থাকায় প্রায় সকল গীতই হিন্দি ভাষায় গ্রথিত হইয়াছে। গায়কমণ্ডলীর বিশ্বাস এই যে, হিন্দি ভাষায় না হইলে তাহা গীত হইল না। অনেক গায়ক সেই রাগ সেই তাল, কেবল ভাষা বাঙলা গীত লজ্জাকর মনে করেন। ইঁহারা সঙ্গীতের মূলসূত্র-সকল কিছুই বুঝেন নাই।... নাম লইবার ইচ্ছা সকলেরই বলবতী; বাঙ্গালা গাহিলে লোকে আদর করিবে না, ওস্তাদমণ্ডলী অবজ্ঞা করিবেন, এই ভয়ে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন। কিন্তু এই কুসংস্কারের কুজ্ঝটিকামালা ভেদ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কেন বাঙ্গালা খেয়াল হইবে না? ব্রাহ্ম সমাজ হইতে যেসকল বাঙ্গালা ভাষায় ধ্রুপদ রচিত হইয়াছে, তাহা কি কোন অংশে হিন্দি ভাষায় রচিত ধ্রুপদ অপেক্ষা মন্দ? আবার এদেশে যদি সঙ্গীতের চর্চ্চা সমধিক হয়, যদি বাঙ্গালা ভাষায় নূতন নূতন রাগরাগিণীর সৃষ্টি হইয়া গীত হয়, তাহা হইলে হিন্দি গানও বাঙ্গালা ভাষায় না গাহিলে চলিবে না।*
>
> *"এই সর্ব্বলোকসুখপ্রদ সর্ব্বসন্তাপহারী মোক্ষ-প্রদ সঙ্গীতশাস্ত্র কি এতই সহজ যে... কুসংস্কারান্ধ 'ওস্তাদজি'দিগের হস্তে পড়িয়া থাকিত।"*

সঙ্গীতবিদ্যাকে তথাকথিত ওস্তাদদের কবল থেকে মুক্ত করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তার প্রসার ও সংরক্ষণের জন্য উনিশ শতকে যেসব প্রয়াস হয়েছিল, তার মধ্যে স্বরলিপি-পদ্ধতির প্রবর্তন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। 'সঙ্গীতকল্পতরু'র ঐ নিবন্ধেও স্বামীজী স্বরলিপি-পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্য স্বরলিপি-পদ্ধতি দেখে উৎসাহিত হয়ে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী আধুনিক ভারতীয় সঙ্গীতে স্বরলিপি-পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন। স্বামীজীও ঐ আলোচনায় ক্ষেত্রমোহন প্রবর্তিত এই স্বরলিপি-পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের স্বরলিপি-পদ্ধতির মতো পাশ্চাত্য সঙ্গীতের 'হার্মনি'ও উনিশ শতকের দেশীয় সঙ্গীতজ্ঞদের প্রভাবিত করেছিল। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণাচরণ সেন, প্রমোদ ঠাকুর ও আরো অনেকে দেশীয় সঙ্গীতে পাশ্চাত্য ধরনে 'হার্মনি' প্রয়োগের ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। বাংলাদেশে সঙ্গীতচর্চার এই আধুনিকতম বিষয়টিও 'সঙ্গীতকল্পতরু'তে বাদ পড়েনি। স্বামীজী 'সঙ্গীত ও বাদ্য' অংশে ভারতীয় সঙ্গীতের 'গ্রাম' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'হার্মনি'র সংজ্ঞা দিয়েছেন। 'সঙ্গীতকল্পতরু'র পরবর্তী কালেও স্বামীজী 'বিলাতী সঙ্গীত' নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে

আমাদের সঙ্গীতে 'হার্মনি'র প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন।

স্বরলিপি-পদ্ধতি বা 'হার্মনি'র প্রসঙ্গ আধুনিক বিষয় হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও আলোচনার ক্ষেত্রে স্বামীজী সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন বাদ্যসঙ্গীতের ওপর—বিশেষ করে তালবাদ্যকে। এটি নিবন্ধের 'সঙ্গীত ও বাদ্য' নাম থেকেই স্পষ্ট। কারণ, সঙ্গীত মানেই গীত, বাদ্য ও নৃত্যের সমন্বয়। তা সত্ত্বেও 'বাদ্য' শব্দটির স্বতন্ত্র উল্লেখ আছে। নিবন্ধের শেষে বিভিন্ন তালের ঠেকা ও তাদের প্রক্রমণিকা অর্থাৎ বোলবিস্তার সঙ্কলিত হয়েছে। 'সঙ্গীতকল্পতরু'র পূর্বে এইভাবে প্রক্রমণিকা সঙ্কলনের একটিমাত্র প্রয়াসের কথাই জানা যায়। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'মৃদঙ্গ মঞ্জরী' গ্রন্থে সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর 'প্রক্রমণিকা সম্বলিত চৌতালাদি মৃদঙ্গে ব্যবহৃত অষ্টাদশ তাল' সঙ্কলন করেন। ঐ গ্রন্থটির সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় ছিল কিনা তা অবশ্য অজ্ঞাত। তবে 'সঙ্গীতকল্পতরু'র দুবছর পরে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'সঙ্গীত প্রবেশিকা' গ্রন্থে যে বিভিন্ন তাল ও তাদের প্রক্রমণিকা আছে, সেখানে 'সঙ্গীতকল্পতরু'র অনেকগুলি প্রক্রমণিকা অপরিবর্তিত রূপে পাওয়া যাবে। অবশ্য ঐ গ্রন্থের রচয়িতা মুরারি গুপ্ত গ্রন্থের ভূমিকায় 'সঙ্গীতকল্পতরু'র কোন উল্লেখ করেননি।

'সঙ্গীতকল্পতরু'র প্রথম অংশ অর্থাৎ বিবেকানন্দের লেখা 'সঙ্গীত ও বাদ্য' রচনাটি নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করা হলো। দেখা যাচ্ছে, 'সঙ্গীতকল্পতরু'র এই 'সঙ্গীত ও বাদ্য' অংশে স্বামীজী যেমন স্বল্প পরিসরে সঙ্গীতের নানা বিষয় কমবেশি ছুঁয়ে গেছেন, 'সঙ্গীত সংগ্রহ' অংশেও তেমনি স্বল্পসংখ্যক গানের মধ্যে নানা বিষয় একত্র করেছেন। অধ্যাত্মপথের পথিক হলেও তিনি যে শিল্পসঙ্গীতে মানবমনের প্রকাশবৈচিত্রকে উপেক্ষা করেননি, 'সঙ্গীতকল্পতরু'ই তার প্রমাণ। তিনি যখন 'সঙ্গীতকল্পতরু'র সঙ্গীত সংগ্রহ করেন, ঘরের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হলেও তিনি তখন বরানগর মঠ-নিবাসী। অর্থাৎ ধর্মসাধনায় সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত। অথচ সেযুগের ব্রাহ্ম, খ্রিস্টান মিশনারি অথবা অন্যান্যদের মতো কেবল ধর্মসঙ্গীত সঙ্কলন না করে তিনি স্বদেশ, প্রেম, ইতিহাস, ধর্ম, সমাজ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে একটি গীতসঙ্কলন প্রস্তুত করলেন। সেক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, 'সঙ্গীত সংগ্রহ'-এর সূচনাতেই স্থান দিলেন 'জাতীয় সঙ্গীত'কে—যেখানে 'বিশ্বসঙ্গীত', 'গীতরত্নমালা' প্রভৃতি উনিশ শতকের একাধিক গীত-সঙ্কলনের সূচনা ধর্মসঙ্গীত দিয়ে। জাতীয় সঙ্গীত ছাড়াও এই গ্রন্থে ধর্ম, সমাজ, প্রেম, পুরাণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে ১৭৬ জনেরও বেশি রচয়িতার গান আছে।

সঙ্গীত সঙ্কলন করতে গিয়ে স্বামীজী পূর্ববর্তী কোন্ কোন্ সঙ্কলনের সাহায্য নিয়েছিলেন অথবা আদৌ কোন সঙ্কলনের সাহায্য নিয়েছিলেন কিনা সেবিষয়ে জানা যায় না। তবে পূর্ববর্তী সঙ্কলনগুলির সঙ্গে তুলনা করলে 'সঙ্গীতকল্পতরু'র সাদৃশ্য এবং স্বাতন্ত্র্য দুই-ই চোখে পড়ে। 'সঙ্গীতকল্পতরু'র পূর্বে প্রকাশিত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের 'সঙ্গীত সংগ্রহ' (১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ) ও 'ভারতীয় সঙ্গীতমুক্তাবলী'র (১২৯১ বঙ্গাব্দ) বেশ কিছু গান 'সঙ্গীতকল্পতরু'তে স্থান পেলেও কৃষ্ণানন্দের 'সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম'-এর মাত্র ৩টি গান 'সঙ্গীতকল্পতরু'র অন্তর্ভুক্ত। একটি গানের ক্ষেত্রে আবার রচয়িতার নাম পরিবর্তিত। সুতরাং বলা যায়, 'সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম' উল্লেখযোগ্য সঙ্কলন হওয়া সত্ত্বেও 'সঙ্গীতকল্পতরু'র সঙ্গীত সংগ্রহে এর বিশেষ প্রভাব পড়েনি। তবে 'সঙ্গীতকল্পতরু'র 'নানা বিষয়ক সঙ্গীত' অংশে সংস্কৃত, ওড়িয়া, অসমিয়া, সাঁওতালি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার সঙ্গীত সংগ্রহের পরিকল্পনায় 'সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম'-এর নানা ভাষার সঙ্গীতের সংগ্রহ আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়ে থাকতে পারে।

১২৯৪ বঙ্গাব্দে যখন 'সঙ্গীতকল্পতরু'র প্রকাশ, তখনো পর্যন্ত বাঙলা গানের প্রতিনিধিমূলক সঙ্কলন একমাত্র 'ভারতীয় সঙ্গীতমুক্তাবলী'। আর এই 'ভারতীয় সঙ্গীতমুক্তাবলী'র আদর্শেই 'সঙ্গীতকল্পতরু'র গান সঙ্কলিত। 'ভারতীয় সঙ্গীতমুক্তাবলী'র (১২৯১) ৫১ জন গীতিকার এবং ৯৩টি গান 'সঙ্গীতকল্পতরু'র (১২৯৪) অন্তর্ভুক্ত। 'ভারতীয় সঙ্গীতমুক্তাবলী'র কিছু গানের অপ্রকাশিত রচয়িতার নাম পরবর্তী কালে 'সঙ্গীতকল্পতরু'তে প্রকাশিত হয়েছে। কিছু কিছু গানের কথায় 'সঙ্গীতকল্পতরু'তে নতুন সংযোজনও লক্ষ্য করা যায়। 'ভারতীয় সঙ্গীতমুক্তাবলী'র 'জাতীয়', 'সামাজিক', 'পৌরাণিক', 'ঐতিহাসিক', 'ধর্ম' ও 'নানা বিষয়িনী'—সবকটি বিষয়বিভাগ 'সঙ্গীতকল্পতরু'তে বর্তমান। বিষয়-বিন্যাসের ক্রমে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও উভয় গ্রন্থেই সঙ্গীত-সংগ্রহের সূচনা করা হয়েছে জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে। দুটি সঙ্কলনেই ধর্মসঙ্গীতের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি।

তবে 'সঙ্গীতকল্পতরু'তে ধর্মসঙ্গীতের যে বৈচিত্র আছে, তা আগের কোন সঙ্কলনেই নেই। ব্রাহ্ম, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, দেহতত্ত্ব, খ্রিস্টান, ইসলাম ইত্যাদি নানা সঙ্গীত নিয়ে 'সঙ্গীতকল্পতরু'তে সর্বধর্মসমন্বয়ের এক আদর্শ রচিত হয়েছে। 'সঙ্গীতকল্পতরু'র সে-আদর্শ পরবর্তী সঙ্কলনগুলিকেও প্রভাবিত করেছে।

ধর্মসঙ্গীত সঙ্কলনের ক্ষেত্রে 'সঙ্গীতকল্পতরু'র আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক—এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক গান প্রথম সঙ্কলিত। বিষয়টি চরিতসঙ্গীত সঙ্কলন প্রসঙ্গেও উল্লেখ্য। উনিশ শতকের শেষভাগে এবং বিশ শতকে বাঙলায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত-সঙ্কলনের ক্ষেত্রে যে স্বতন্ত্র ধারা তৈরি হয়েছে, তার সূচনা 'সঙ্গীতকল্পতরু'তে।

ধর্মসঙ্গীতের পাশাপাশি 'সঙ্গীতকল্পতরু'তে প্রণয়সঙ্গীতও স্থান পেয়েছে, কিন্তু এধরনের সমন্বয় 'ভারতীয় সঙ্গীত-

মুক্তাবলী'তে প্রথমে ছিল না। ব্রাহ্ম নেতা নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কাছে প্রণয়সঙ্গীত প্রথমে ব্রাত্য হলেও পরে অবশ্য তিনি 'ভারতীয় সঙ্গীতমুক্তাবলী'র দ্বিতীয় ভাগ (১৮৮৬ খিস্টাব্দ) প্রকাশ করে প্রণয়সঙ্গীতকেও সঙ্কলনে নিয়ে আসেন। সেইসঙ্গে এই দ্বিতীয় ভাগে আরেকটি নতুন বিষয় এনেছিলেন—'গ্রাম্যসঙ্গীত'। 'গ্রাম্যসঙ্গীত' পর্যায়টি পরবর্তী কালে 'সঙ্গীতকল্পতরু'তে না এলেও এর 'নানাবিষয়ক সঙ্গীত' অংশে 'গ্রাম্যগীতি' স্থান পেয়েছে। 'ভারতীয় সঙ্গীতমুক্তাবলী'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের মিলিত যে-সংস্করণটি 'সঙ্গীতকল্পতরু'র পরে প্রকাশিত হয়, সেখানে বাঙলা গানের পাশাপাশি হিন্দি, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এপ্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য, 'সঙ্গীতকল্পতরু'তেই প্রথম গীতসঙ্কলনের অনুরূপ বৈচিত্র্য চোখে পড়বে। 'সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম'-এ বাঙলা গানের পাশাপাশি হিন্দি ধ্রুপদ-খেয়াল স্থান পেলেও সেখানে সঙ্গীত সঙ্কলিত হয়েছিল মূলত ভাষার ভিত্তিতে। ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের নানা ভাষার নানাধরনের গান পাশাপাশি রয়েছে। কিন্তু পরবর্তী কালে বাঙলা গানের সঙ্কলনে যে 'হিন্দি ওস্তাদি গান' স্বতন্ত্র গুরুত্ব লাভ করেছে, তার সূত্রপাত 'সঙ্গীতকল্পতরু'তে। অবশ্যই 'সঙ্গীতকল্পতরু'র সংগ্রাহক নরেন্দ্রনাথের ওস্তাদি গানের প্রতি অনুরাগ এধরনের সমন্বয়ের কারণ।

গানের মতো গীতিকারদের ক্ষেত্রেও 'সঙ্গীতকল্পতরু'তে নতুন চিন্তাভাবনার পরিচয় আছে। জয়দেব থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে ১৭৬ জন গীতিকার 'সঙ্গীতকল্পতরু'র অন্তর্গত, তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আছেন যাঁরা 'সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম', 'সঙ্গীত সংগ্রহ', 'ভারতীয় সঙ্গীতমুক্তাবলী' প্রভৃতি পূর্ববর্তী সঙ্কলনগুলিতে নেই। এঁদের অনেককেই 'সঙ্গীতকল্পতরু' বৃহত্তর পাঠকবর্গের সঙ্গে পরিচিত করায় এবং অনেকেই 'সঙ্গীতকল্পতরু'তে প্রথম সঙ্কলনে আসেন। 'সঙ্গীতকল্পতরু'র এই রচয়িতাদের মধ্যে ভারতচন্দ্র সম্পর্কে একটু বিশেষভাবে বলার আছে। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'সঙ্গীতসার সংগ্রহ' দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকায় সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন : "ভারতচন্দ্রের গানে এই সর্বপ্রথম সুরতাল সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইল, আশা আছে এইবার বঙ্গে সর্বত্র ইঁহার সঙ্গীত অধিকতর আদৃত এবং গীত হইবে।" প্রকৃতপক্ষে সুরতাল-সংযোজিত ভারতচন্দ্রের গান 'সঙ্গীতসার সংগ্রহ'-এর অনেক পূর্বে 'সঙ্গীতকল্পতরু'তে প্রকাশিত হয়েছে। সম্ভবত 'সঙ্গীত-কল্পতরু'তে প্রথম ভারতচন্দ্রের গান সঙ্কলনভুক্ত হয়।

ভারতচন্দ্র যেমন মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের শেষ প্রতিনিধি, বিহারীলাল তেমনি আধুনিক গীতিকবিতার পথপ্রদর্শক। 'সঙ্গীতকল্পতরু'তে তাই ভারতচন্দ্রের পাশাপাশি স্থান পেয়েছে বিহারীলালের রচনা। এর ফলে কাব্যরীতির দিক থেকে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে। ঐতিহ্যকে গ্রহণ করলেও সঙ্গীত সঙ্কলনের ক্ষেত্রে 'সঙ্গীতকল্পতরু'র সঙ্কলকের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি আধুনিক। সেই কারণে ভারতচন্দ্রের গানের পরিমাণ যেখানে ২টি, বিহারীলাল চক্রবর্তীর সঙ্কলিত গানের পরিমাণ সেখানে ১৬টি। এমনকি রামপ্রসাদের গানের সংখ্যাও (১১টি) বিহারীলালের থেকে কম। উনিশ এবং বিশ শতকের গোড়ায় প্রকাশিত কোন সঙ্কলনে অন্য রচয়িতাদের সঙ্গে বিহারীলালের এত গান নেই। গানের পরিমাণ বিচারে 'সঙ্গীতকল্পতরু'তে বিহারীলালের স্থান ষষ্ঠ। বিহারীলাল ছাড়াও কিশোর রবীন্দ্রনাথের সদ্যরচিত ১১টি গান এই সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ রচিত আরো একটি গান ('দ্যাখ রে জগৎ') জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নামে প্রকাশিত। গীতিকার-রূপে বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের এই গুরুত্ব সঙ্কলনটির আধুনিকতার স্মারক।

সঙ্গীত সঙ্কলন, গীতিকার নির্বাচন এবং গীতিকারদের গুরুত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে 'সঙ্গীতকল্পতরু'র এই বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়া গ্রন্থটির আরেকটি দিক বিশেষ লক্ষ্য করার—এর সংক্ষিপ্ত এবং সংহত অবয়ব। প্রাচীন বাঙলা গানের অনেক বড় বড় সঙ্কলন আছে, কিন্তু 'সঙ্গীতকল্পতরু' নামে ৬৪৭টি গানের একটি অখণ্ড সঙ্কলনে যে-ধরনের বিষয়বৈচিত্র্য ও রচয়িতা-বৈচিত্র্য রয়েছে, তার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নেই। স্বল্প পরিসরে বাঙলা গানের একটা সামগ্রিক রূপ তুলে ধরার কারণেই গ্রন্থটি সেযুগে বিপুল চাহিদার সৃষ্টি করেছিল। বাঙলা গীতসঙ্কলন প্রকাশের ইতিহাসে নয় মাসের মধ্যে তিনটি সংস্করণের গৌরবলাভ 'সঙ্গীতকল্পতরু' ছাড়া আর কোন সঙ্কলনের ভাগ্যে ঘটেনি।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, 'সঙ্গীতকল্পতরু'র পরবর্তী অর্থাৎ চতুর্থ সংস্করণের সময়ে নরেন্দ্রনাথের সহযোগী বৈষ্ণবচরণ গ্রন্থটির কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে 'বিশ্বসঙ্গীত' নাম রাখলেন। পরিবর্তিত এই গ্রন্থ থেকে নরেন্দ্রনাথের নাম বাদ দিয়ে দিলেন এবং নিজে এই গ্রন্থের সম্পাদক হলেন। 'বিশ্বসঙ্গীত'-এর বিজ্ঞাপনে বৈষ্ণবচরণ লিখলেন : "যেহেতু 'সঙ্গীতকল্পতরু'র ইহাই সংশোধিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ এবং অতঃপর 'সঙ্গীতকল্পতরু'ও আর মুদ্রিত হইবে না।" এইভাবে 'সঙ্গীতকল্পতরু'র প্রচার বন্ধ হয়ে গেল। সেই সঙ্গে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে স্বামীজীর এই গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথাও মানুষ ক্রমে ভুলে গেল।

আমাদের সৌভাগ্য, একশো বারো বছর পরে 'সঙ্গীত-কল্পতরু' আবার প্রকাশিত হয়েছে। ফলে ইতিহাসের মূল স্রোত থেকে যে-গ্রন্থ একদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, সেটি পুনর্মুক্ত হলো। আশা করি আগামী দিনে যাঁরা সঙ্গীতের ইতিহাস লিখবেন, তাঁরা ইতিহাসে উপেক্ষিত এই গ্রন্থটিকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দেবেন। ❑

সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র

প্রণবেশ চক্রবর্তী

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন : "শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব?... যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের একান্ত অনুগত ও অনুরক্ত থাকিব, একথা বলাই বাহুল্য।" সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মিশনের যোগাযোগ বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে স্থাপিত হয়েছিল, যদিও তখন মিশনের পরিধি এতটা বিস্তারলাভ করেনি। বিদেশের মাত্র কয়েকটি শাখাকেন্দ্রের মধ্যে সিঙ্গাপুরের কেন্দ্রটি ছিল অন্যতম। নিবন্ধকারের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পাঠককে আনন্দ দেবে।

১৯৪৩ সাল। অক্টোবর মাস। বিজয়া দশমীর রাত্রি। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র তখন সিঙ্গাপুরে অবস্থান করছেন। সেই রাত্রে ঠিক ৯টার সময় নেতাজী সিঙ্গাপুরে তাঁর বাসভবন থেকে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লিগের মারফত একটি গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে। সেইসঙ্গে তিনি একটি চিঠিও পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠিতে তিনি সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্বরানন্দকে অনতিবিলম্বে তাঁর সঙ্গে এসে দেখা করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানান। স্বামী ভাস্বরানন্দকে নিয়ে যাওয়ার জন্যই পাঠানো হয়েছিল গাড়িটা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সিঙ্গাপুর শহরের ১৭৯ নম্বর বার্টলি রোডে রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছে ১৯২৮ সালে।

স্বামী ভাস্বরানন্দ সেই গাড়িতেই গেলেন স্বামী বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে। আই. এম. এ-র সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্রের বাড়ির দরজায় গাড়ি পৌঁছাতেই সশস্ত্র প্রহরীরা সসম্ভ্রমে গৈরিক-বসনধারী সন্ন্যাসীকে নিয়ে গিয়ে সুভাষচন্দ্রের সেক্রেটারি মিঃ হাসানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মিঃ হাসানই তাঁকে ওপরতলায় সুভাষচন্দ্রের কাছে নিয়ে গেলেন। স্বামী ভাস্বরানন্দ তাঁর স্মৃতিকথায়* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিগর্ভ রাতের ঘটনা প্রসঙ্গে বলেছেন : "সুভাষচন্দ্রের ঘরে পৌঁছিবামাত্র তিনি অতি বিনীত ও শ্রদ্ধাবনত প্রণাম করিয়া আমাকে বসিতে বলিলেন এবং সহকারীদের চা আনিতে আদেশ দিলেন।"

একান্ত নিভৃতে একজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী এবং সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী-প্রতীম দেশনায়ক নিজেদের মধ্যে অতি সহজভাবে কথাবার্তা শুরু করলেন। সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের কাজকর্ম জানার জন্য গভীর আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ভাস্বরানন্দজী এব্যাপারে বিস্তারিত সব তথ্যই দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যার কথাও বললেন। ইতিমধ্যে চা-পর্ব শেষ হয়ে যায়।

কথাপ্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র তাঁর কলকাতা থেকে সেই মহানিষ্ক্রমণের আগেকার ঘটনা সম্পর্কে বললেন : "জেল থেকে বেরিয়ে আমি যখন আমাদের এলগিন রোডের বাড়িতে বাস করছি, তখন কি যেন একটা দৈবশক্তি প্রণোদিত হয়ে ঐ বাড়ি থেকে বেরোবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে জন্মেছিল। সবসময়েই মনে হতো, এবার বেরিয়ে পড়ে কিছু একটা করা যাক। যাকিছু করার এই সময়েই করতে হবে। কি হবে এভাবে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে থেকে? বন্ধুদের সঙ্গে একটা পরামর্শ করা গেল। শীঘ্রই একটা উপায় বের করে ফেললাম। আমার ঘরে সকলের প্রবেশ নিষেধ করে দিলাম। 'চণ্ডী', 'গীতা' ইত্যাদি পাঠ করি দেখে ও আমার নিষেধ শুনে কেউ আর কাছে আসতে সাহস করত না। এই সুযোগে আমি বেরিয়ে পড়লাম। দেখলাম, আমার বন্ধুরা সকলেই carried out their duties। সেইজন্যই আমার এখানে আসা সম্ভব হয়েছে।"

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৪০ সালের জুন মাসে সুভাষচন্দ্র কলকাতার কুখ্যাত হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের আন্দোলন শুরু করেন এবং ইংরেজ সরকার ১৯৪০ সালের ২ জুলাই 'বিপজ্জনক' সুভাষচন্দ্রকে এলগিন রোডের বাড়িতে গ্রেপ্তার ও অন্তরিন করে রাখে। ১৯৪১ সালের ১৭ জানুয়ারি কলকাতার বাড়ি থেকে তিনি ইংরেজ সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং বহু সঙ্কট ও সমস্যার মোকাবিলা করে তিনি ২ মার্চ জার্মানিতে গিয়ে উপনীত হন। তারপর ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে গঠন করেন আজাদ হিন্দ সরকার। ভারতের প্রথম স্বাধীন সরকার। তিনিই ছিলেন তার সর্বাধিনায়ক।

* স্বামী ভাস্বরানন্দের স্মৃতিকথাটি প্রকাশিত হয়েছিল রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র' গ্রন্থে।

স্বামী ভাস্বরানন্দ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন ঃ "১৯৪২ সালের মাঝামাঝি সুভাষ বসু টোকিও থেকে বিমানযোগে সিঙ্গাপুরে আসেন। 'ক্যাথে' নামের সবথেকে ভাল সিনেমা হল-এ তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন হলো। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জার্মান-প্রবাসী কয়েকজন ভারতীয়। নির্দিষ্ট সময় মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে বক্তৃতামঞ্চে উপস্থিত হলেন। বিপুল জনতার সামনে রাসবিহারী বসু বললেন, 'Here is your beloved leader Subhas Babu. I hand him over to you. From today onward he will be your supreme commander.... He will lead you on to the path of freedom of India—our motherland.' "



বিদ্যুদ্বেগে নেতাজীর আগমনবার্তা ছড়িয়ে পড়ল। সিঙ্গাপুরের সমুদ্রতীরে 'মেয়ার্স ম্যানসন' নামে একটি বাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হলো। এই বাড়িটি সশস্ত্র প্রহরীরা সবসময় ঘিরে রাখত। এখানেই ভাস্বরানন্দজী আসেন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে। সুভাষচন্দ্র যখন আশ্রমে আসতেন, তখনো তাঁর সঙ্গে সর্বক্ষণ সশস্ত্র রক্ষীরা থাকত এবং একটি এরোপ্লেন সবসময় তাঁর জন্য প্রস্তুত থাকত।

স্বামী ভাস্বরানন্দ লিখেছেন ঃ "কিছুদিন পরে সুভাষচন্দ্র এক বিরাট জনসভা আহ্বান করলেন। সিঙ্গাপুর মিউনিসিপ্যাল অফিসের সামনে বিশাল ময়দান জনসমুদ্রে পরিণত হলো। সুভাষচন্দ্র সেই সভায় তাঁর মালয়ে আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে দেড়ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে থাকে। আশ্চর্য এই যে, এতে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে জনতাকে লক্ষ্য করে তাঁর বক্তব্য বিষয় অনর্গল বলে যেতে থাকেন। জনতাও বৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর বক্তৃতা শুনল। দেখা গেল, বক্তৃতার শেষে সকলেই ভিজে কাপড়ে, অথচ শান্ত চিত্তে ঘরে ফিরে গেল। এই সভার কথা উল্লেখ করে সুভাষচন্দ্র বলতেন, 'দেখলেন, সেদিন সভাতে মুষলধারে বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও সবাই কেমন অবিচলিত চিত্তে বক্তৃতা শুনেছিল। এতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আমাদের কাজের জন্য সাধারণ মানুষের সহানুভূতি পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাবে। এতে কিছুমাত্র সন্দেহই নেই।' "

আরেকদিনের কথা। সেদিন স্বামী ভাস্বরানন্দ গিয়েছেন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে। কথায় কথায় সেদিন নেতাজী তাঁকে বলেছিলেন ঃ "জগতের ইতিহাসে কোন পরাধীন জাতিই অন্য কোন প্রতাপশালী স্বাধীন জাতির সাহায্য না নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রসর হতে পারেনি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও আমরা চাই ঐরূপ একটা সাহায্য।... ঘটনা-পরম্পরায় জাপানের সাহায্যও আমাদের পক্ষে পাওয়া সুগম হয়ে উঠেছে। এই সুবর্ণ সুযোগ ছেড়ে দিলে আর আগামী একশো বছরেও এই সুযোগ মিলবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং আমি ঠিক করেছি, জাপানের সাহায্য নিয়ে যথাশক্তি সংগ্রাম চালিয়ে ভারতকে ইংরেজের অধিকার থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করব। গীতায়ও বলেছে, আমাদের কাজে অধিকার, ফলে নয়। কাজ করে যাই, ফল তাঁর হাতে।"

ভাস্বরানন্দজী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "আপনি কি মনে করেন, জাপানিরা আপনার সাহায্যে ভারত অধিকার করবে? এইরূপ কোন দুরভিসন্ধির বশবর্তী হয়ে যদি তারা আপনাকে বঞ্চনা করে, তাহলে কি করবেন?"

উত্তরে সুভাষচন্দ্র বললেন ঃ "আমি যতদূর জানি বা বুঝেছি, এইরূপ কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ মোটামুটিভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম আমাদের চালাতেই হবে। এদেশের ভারতীয়দের অর্থে পরিচালিত সৈন্যদের দিয়েই সমস্ত কাজ চলবে। কেবলমাত্র হাতিয়ার জাপানিদের কাছ থেকে নিতে হবে। কোনপ্রকারে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারলেই আমাদেরও কোন চিন্তা থাকবে না। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, বাংলায় পৌঁছুবামাত্র আশাতীত সাহায্য আমরা সকলের কাছ থেকেই পাব। আমার খুবই ভরসা আছে যে, আমার দেশবাসী আমার একাজের সহায়ক হবেন। জাপানিদের প্রতিশ্রুতিভঙ্গের প্রতিক্রিয়ার জন্যও আমাদের তৈরি থাকতে হবে।"

এরকম কিছু কথাবার্তার পর স্বামী ভাস্বরানন্দ তাঁকে বললেন ঃ "আমাদের মিশনের কার্যের ধারা আপনার তো কিছুই অজ্ঞাত নেই। আমরাও মিশনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ বজায় রেখে যতটা পারি আপনার কাজে সহায়তা করব। আপনি সেবিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন।" এরপরই স্বামী ভাস্বরানন্দ লিখেছেন ঃ "অনুরুদ্ধ হইয়া নৈশ আহার সমাপনান্তে আশ্রমে ফিরিতে প্রায় রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেল। তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলেই তিনি কখনো ভোজন না করাইয়া ছাড়িতেন না।"

সিঙ্গাপুরে অবস্থানের সময় ডিসেম্বর মাসে শ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে নেতাজী রামকৃষ্ণ মিশনে এসেছিলেন। সেই ঘটনার কথা স্মরণ করে স্বামী ভাস্বরানন্দ লিখছেন ঃ "সেইদিন ঠাকুরঘরে তিনি আধ-ঘণ্টাকাল ধ্যানাবিষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন।" পরে পূজা শেষ হলে তিনি প্রসাদগ্রহণ করলেন। কিছুক্ষণ নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা চলল। প্রায় একঘণ্টা এভাবেই কেটে গেল। তারপর তিনি একটি 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'র জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় ভাস্বরানন্দজী তাঁর নিজের 'চণ্ডী' গ্রন্থখানি নেতাজীকে উপহার দিলেন। এতে সুভাষচন্দ্র খুবই আনন্দিত হলেন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, সুভাষচন্দ্র তাঁর ছাত্রজীবনে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে সম্বল করে একদিন সন্ন্যাসী হতে চেয়েছিলেন। তাঁর যখন মাত্র পনেরো বছর বয়স, তখন তিনি বিবেকানন্দের রচনাবলী থেকে খুঁজে পেয়েছিলেন পথচলার নির্দেশ। তিনি স্বামীজীকেই নিজের গুরুরূপে বরণ করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র লিখছেন ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী তাহা ভাষায় কী করিয়া প্রকাশ করিব! তাঁহাদের পুণ্যপ্রভাবে আমার জীবনের প্রথম উন্মেষ। চরিত্রগঠনের জন্য 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য' অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাহিত্য আমি কল্পনা করিতে পারি না।"

স্বামী ভাস্বরানন্দ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন ঃ "নেতাজী আমাদের (রামকৃষ্ণ) মিশনের কাজের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এখানকার মিশনের অনাথালয়ের জন্য আবেদন জানালে তিনি বাড়িঘর তৈরি করার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করেন। বাড়ি তৈরির জন্য তিনি নিজে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডলার দান করেন এবং আরো পঞ্চাশ হাজার ডলার সংগ্রহ করে দেন। তিনি স্বয়ং এসে 'বয়েজ হোম'-এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। অনাথালয়ের ছেলে-মেয়েদের জন্য অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থাও তিনিই করে দিয়েছিলেন। কারণ, যুদ্ধকালীন 'black market' ও 'food control'-এর দিনে তিনশো ছেলেমেয়ের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে একটা কঠিন সমস্যা হয়ে উঠেছিল।"

নেতাজীর উদ্যোগেই সিঙ্গাপুরে রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলটিকে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল স্কুল'-রূপে পরিণত করা হয়েছিল। এই স্কুলে সামরিক প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা হয় এবং ছেলেদের সামরিক প্রশিক্ষণের মহড়া দেখতে একদিন নেতাজী স্বয়ং মিশনে আসেন। আরেকদিন এসে ছাত্রদের কনসার্ট শুনে যান। পঞ্চমবারে তিনি নিজেই মিশনের হলঘরে একটি সভার ব্যবস্থা করেছিলেন। জাপানিদের কয়েকজন প্রতিনিধিও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেদিন মিশন সম্বন্ধে অনেক কথা তিনি জাপানি বন্ধুদের বলেন।

নেতাজী যখন দেখলেন, প্রায় ৫০ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজ রণাঙ্গনে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, তখন তিনি আর দেরি না করে তাঁর কর্মকেন্দ্র সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করেন। স্বামী ভাস্বরানন্দ তাঁর স্মৃতিকথার উপসংহারে লিখেছেন ঃ "সীমান্ত হইতে প্রত্যাগত অনেক যোদ্ধার মুখে শুনিয়াছি, তাহারা নেতাজীকে তাহাদের পিতামাতা ও দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করে এবং আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। কে বলিবে, নেতাজীর ব্যক্তিত্বের ও প্রভাবের মূল কারণ কি ছিল? ত্যাগের মূল মন্ত্রে ও সাধুসঙ্গেই কি তাঁহার এমন হইয়াছিল? প্রবল প্রতাপান্বিত রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্তী হইতেও যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে, তাহা সহজেই অনুমিত হইত।" ❑

পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের স্মৃতিকথা*



ফুলুরানী সেনগুপ্ত

আমার ও আমার স্বামীর দীক্ষা হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ্ পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কাছে ১৯৩৮ সালের ১৪ জানুয়ারি, শুক্রবার, মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে—বেলুড় মঠে ঠাকুরের নতুন মন্দির-প্রতিষ্ঠার স্মরণীয় দিনটিতে।

আমরা রাঁচির বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরে আমরা রাঁচির মোরাবাদী আশ্রমে যাতায়াত করতাম। সেই সুবাদে স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। তিনি আমাদের বিশেষ স্নেহ করতেন। আমরাও তাঁর প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করতাম। তাই ভেবেছিলাম, ওঁর কাছ থেকেই দীক্ষা নেব। কিন্তু তিনি আমাদের পূজ্যপাদ বিজ্ঞান মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নিতে পরামর্শ দেন। একদিন আবেগের সঙ্গে আমাদের বললেনঃ "তোমরা বুঝছ না, তোমাদের স্নেহ করি, তাই ওঁর কাছে পাঠাচ্ছি। উনি ঠাকুরের দেহ স্পর্শ করে—পরশমণি স্পর্শ করে সোনা হয়ে গেছেন। এখন বুঝছ না, পরে বুঝবে।" তাঁর কথা শুনে আমরা পূজনীয় বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কাছেই দীক্ষা নেব স্থির করলাম। এব্যাপারে সব যোগাযোগ বিশুদ্ধানন্দজীই করে দিয়েছিলেন। দীক্ষার পর তিনি প্রায়ই আমাদের ঠাট্টা করে বলতেনঃ "অবধূতের চব্বিশ গুরু, আর তোমাদের দুই।"

যাহোক, সব ঠিকঠাক করে বিশুদ্ধানন্দজী আমাদের বলেছিলেনঃ "ঐদিন (১৪ জানুয়ারি) পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজের ইচ্ছায় ঠাকুরের যে-মন্দির হয়েছে, সেই মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন এবং মন্দিরে ঠাকুরের শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠা হবে। তোমরা তার আগেই কলকাতা যাবে এবং মন্দির-প্রতিষ্ঠা উৎসব দেখবে। সেদিন তোমাদের দীক্ষাও হবে। কাজেই দীক্ষার জন্য একেবারে তৈরি হয়ে যাবে।" সেই অনুসারে আমরা কলকাতায় আসি এবং এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠি। বিশুদ্ধানন্দজীর কথামতো দীক্ষার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে আমরা মকর সংক্রান্তির দিন খুব ভোরে বেলুড় মঠে চলে আসি। মঠে এসে মায়ের মন্দিরের কাছেই বিশুদ্ধানন্দজী, অভয়ানন্দজী (ভরত মহারাজ) এবং নির্বাণানন্দজীকে (সূর্য মহারাজ) দেখতে পেলাম। আমাদের দেখে বিশুদ্ধানন্দজী একজন ব্রহ্মচারীকে ডেকে আমাদের দীক্ষার জন্য নিয়ে আসা জিনিসপত্রের ঝুড়িটি তাঁর হাতে দিতে বললেন। আমরা তাই করলাম। তারপর বললেনঃ "এখন উৎসব দেখ। প্রতিষ্ঠাকার্য হয়ে গেলে গঙ্গাস্নান করে স্বামীজী মহারাজের ঘরের বারান্দায় গিয়ে বসবে।"

পুরনো মন্দিরের কাছে গিয়ে আমরা দেখি, মন্দিরের সিঁড়ি থেকে নতুন মন্দিরের সিঁড়ি পর্যন্ত লাল শালুতে ঢাকা এবং তার ওপর ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরনো মন্দির থেকে নতুন মন্দির পর্যন্ত দুধারে দড়ি দিয়ে ঘেরা। মেয়েরা একদিকে এবং পুরুষরা অপরদিকে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরাও দাঁড়ালাম। আমাদের হাতে ঘিয়ের প্রদীপ দেওয়া হলো। কিছুক্ষণ পর একজন ব্রহ্মচারী এসে প্রদীপগুলি জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন। পুরনো মন্দিরের সিঁড়ির কাছে একটি গাড়ি এবং ফুল দিয়ে খুব সুন্দর করে সাজানো একটি পালকি রাখা আছে দেখলাম। পালকির ভিতর ঠাকুরের একখানি বড়ো ফটো। কয়েকজন সাধু-ব্রহ্মচারী ঐ পালকি কাঁধে নিয়ে গান করতে করতে মন্দির প্রদক্ষিণ করতে চলে গেলেন। আমার স্বামীও ঐ দলে যোগ দিলেন। একজন গঙ্গাজলের কলসি মাথায় করে এবং প্রিয় মহারাজ (স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ) একটি গো-শাবককে নিয়ে পালকির আগে আগে চললেন। ওদিকে 'আত্মারাম'-এর কৌটাকে দুহাতে সযত্নে মাথায় ধারণ করে পূজ্যপাদ বিজ্ঞান মহারাজ ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে গাড়িতে উঠে বসলেন। গাড়ি নতুন মন্দিরের কাছে এসে দাঁড়ালে মহারাজ গাড়ি থেকে নেমে ঐ কৌটা মাথায় করে মন্দিরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ ওপরের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি মন্দিরে ঢুকলেন। মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে দরজা খুললে আমরা সকলে মন্দিরে ঢুকে ঠাকুরকে প্রণাম করলাম।

তারপর বিশুদ্ধানন্দজীর কথামতো নির্দিষ্ট সময়ে গঙ্গাস্নান সেরে আমরা স্বামীজীর ঘরের বারান্দায় গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর একজন ব্রহ্মচারী এসে বললেনঃ "আজ দুজন-একজন বা স্বামী-স্ত্রীব একসঙ্গে দীক্ষা হবে না। কারণ, অনেক দীক্ষার্থী রয়েছেন। আপনারা একসঙ্গে আট-দশজন করে আসুন। মেয়েরা আগে আসুন। তাঁদের ছেলেমেয়ে রয়েছে। তাই তাঁদের আগে হবে।" আমার স্বামী বারান্দার অপরদিকে বসেছিলেন। আমি তাঁর দিকে তাকাতেই মাথা নেড়ে তিনি আমায় যেতে বললেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং আরো আট-নয়জন মহিলা-সহ মহারাজের ঘরে ঢুকলাম।

মহারাজ চেয়ারে বসেছিলেন। আমরা তাঁর পায়ের কাছে গোল হয়ে বসলাম। তিনি আমাদের মহামন্ত্র দিলেন। সেসময় তিনি কিছু উপদেশও দিয়েছিলেন, কিন্তু কালের ব্যবধানে

---

*রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

এখন আর সব মনে নেই। তবে একটি কথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে। বলেছিলেনঃ "কারো সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করো না।" তারপর তিনি সকলকে জপের পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন। ডানহাতে দেখাতে দেখাতে হঠাৎ বললেনঃ "তোমাদের মেয়েদের তো আবার বাঁহাত।" এই বলে আবার বাঁহাতে জপ দেখিয়ে দিলেন। আমার তখন কম বয়স। মনে মনে ভাবলাম, উনি বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে বাঁহাতের কথা বলছেন। বাঁহাতে তো কাউকে জপ করতে দেখি না।

যাহোক, বাইরে এসে সাধুদের প্রণাম করলাম। একজন সাধুকে আমার এই সংশয়ের কথাও বললাম। তিনি বললেনঃ "বিকাল তিনটার পর উনি একলা থাকবেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করো।" সেই অনুযায়ী আমি নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হলাম। মহারাজ চেয়ারে বসেছিলেন। আমি সোজা তাঁর ঘরে গিয়ে চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে আগে ডানহাতে যেমন জপ করতে দেখিয়েছিলেন, সেইরকম করে বললামঃ "এইরকম করে করব তো মহারাজ?" আমার দিকে তাকিয়ে তিনি উত্তর দিলেনঃ "হ্যাঁ।" আমি আর বাঁহাতের কথা কিছুই বললাম না। তিনিও এই সম্বন্ধে আর কিছু বলেননি। আমি তাঁকে বললামঃ "মহারাজ, অনেক সাধুর তো কৃপা পেয়েছি। কিন্তু কি হলো? রাগ-দ্বেষ-হিংসা —সবই তো আছে। তবে কি এত সব বৃথা? আপনি আশীর্বাদ করুন।" আমার কথা শুনে একটু হেসে তিনি আমার দিকে এমন করে চাইলেন যে, এখনো তা আমার মনে চির অক্ষয় হয়ে আছে। তাঁর সেই দৃষ্টি আমি আজও তাঁর ফটোতে দেখতে পাই। যেদিন দেখতে পাই না, সেদিন আমার মন খারাপ হয়ে যায়। সেদিন ভরসা দিয়ে তিনি আমাকে বলেছিলেনঃ "কিছুই বৃথা যায় না।"

আমাদের দীক্ষার দিনের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করি। প্রখ্যাত বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর ছোট বোন শৈবালিনীর ডাকনাম ছিল 'বাণী'। আমরা তাঁকে 'বাণীদি' বলে ডাকতাম। বাণীদির সংসারজীবন ছিল খুবই দুঃখের। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে নিয়ে অল্পবয়সেই তিনি বিধবা হন। তাঁর স্বামী যখন মারা যান, তখন তিনি গর্ভবতী। এর তিন-চার মাস পর তাঁর একটি ছেলে হয়। এই ছেলেটি বাইশ-তেইশ বছর বয়সে মারা যায়। এজন্য সকলেই তাঁকে খুব সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখত। আগে দুবার দীক্ষার দিন স্থির হয়েও কোন না কোন প্রতিবন্ধকতার জন্য হয়নি। এবার আমাদের সঙ্গেই তৃতীয়বার তাঁর দীক্ষার দিন ঠিক হয়। বাণীদির মাকে একলা দেখে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিঃ "বাণীদি কৈ? ওঁর তো আজ দীক্ষা হওয়ার কথা।" শুনে তিনি বললেনঃ "ওর কপালটা খুব খারাপ। এবারও ওর দীক্ষা হবে না। বাধা উপস্থিত হয়েছে।" ঠিক সেইসময় ভরত মহারাজও এসে তাঁকে একই প্রশ্ন করলেন। বাণীদির মা তাঁকে সব কথা বললেন। শুনে ভরত মহারাজের মনে হয় খুব দুঃখ হলো। তিনি গিয়ে পূজ্যপাদ গুরুদেবকে সব কথা জানালেন। শুনে তিনি বললেনঃ "তাতে কি হয়েছে? এ তো স্ত্রী-শরীরের ধর্ম। কিছু দোষ হবে না। মাথায় গঙ্গাজল দিয়ে আসতে বল।" ভরত মহারাজ এসে এই কথা বললে বাণীদি বললেনঃ "আমি তো দীক্ষার জন্য তৈরি হয়ে আসিনি। দীক্ষার জন্য কিছুই সঙ্গে আনিনি।" "গুরুকে যা দিতে ইচ্ছা হয় পরে দিও। এখন দীক্ষা নিয়ে নাও।"—ভরত মহারাজ বললেন। তারপর ভরত মহারাজের দেওয়া দুটি টাকা ও একটি হরীতকী দিয়ে তাঁর সেদিন দীক্ষা হয়ে গেল।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। স্বামী মাধবানন্দজী তখন মঠের অধ্যক্ষ। রাঁচি স্যানাটোরিয়ামে এসেছেন। আমরা রোজই তাঁকে দর্শন-প্রণাম করতে যাই। একদিন তিনি আমাকে একলা ডেকে বললেনঃ "এক মহিলার দীক্ষার দিন ঠিক হয়েছিল। দূর থেকে এসেছেন। এখন নিতে পারবেন না, অশুচি হয়ে গেছেন। ফিরে যেতে হবে। কি করবেন আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন। আমি তো এবিষয়ে কিছু জানি না। ওকে কি বলব? আপনি পুরনো ভক্ত, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।" আমি তখন বাণীদির ঘটনাটি বলে গুরুদেব যা বলেছিলেন তা তাঁকে বললাম। তিনি খুব খুশি হলেন। বললেনঃ "উনি (বিজ্ঞান মহারাজ) যখন বলেছেন, তখন আমিও তাই বলে দেব।" কিন্তু ঐ মহিলা দীক্ষা নিতে আসেননি, সংস্কারই বাধ সাধল।

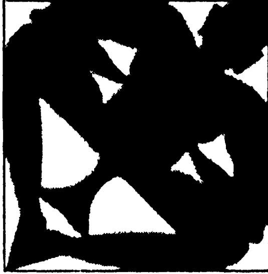
পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসি। দীক্ষার পরের দিন সকালে আমরা গুরুদেবের ঘরে গেছি। উনি একা। চেয়ারে বসে আছেন। আমরা তাঁর শ্রীচরণের কাছে বসলাম। দেখলাম খাটের নিচে একটি হাঁড়ি রাখা আছে। মহারাজ সেবককে বললেনঃ "দেখ তো, এতে জয়নগরের মোয়া আছে। এদের দাও।" সেবক হাঁড়িটা বের করে সবেমাত্র খুলেছেন, এমন সময় ভরত মহারাজ সাত-আটজন ভক্তকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আমরা আর মোয়া পেলাম না। আমার বয়স তখন আঠাশ-উনত্রিশ বছর। তখনো পর্যন্ত জয়নগরের মোয়া আমি খাইনি। গুরুদেবের ইচ্ছা হয়েছিল আমাদের খাওয়াতে, কিন্তু তা হলো না। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ঘটনার পর থেকেই আমরা প্রায়ই জয়নগরের মোয়া পেতে লাগলাম।

গুরুদেব যখন অসুস্থ ছিলেন, তখন ফলের জন্য সামান্য দশ টাকা তাঁকে পাঠিয়েছিলাম। টাকাটা তিনি নিজ হাতে স্লিপে [A.D. কার্ডে] সই করে রেখেছিলেন। সেই লেখাটি এখনো তাঁর আশীর্বাদস্বরূপ আমার কাছে আছে। দুঃখ হয়, গুরুদেবের কোন সেবাই করতে পারিনি, আর তখন বিশেষ কিছু জানতামও না। কিন্তু আমার এই নব্বই বছর বয়সেও তাঁর সেই হাসিমাখা দৃষ্টি আমার কাছে চলার পথের পাথেয় হয়ে রয়েছে। ❑

বাস্তুশাস্ত্র

বারীন মুখোপাধ্যায়

বর্তমানে বাস্তুশাস্ত্র 'বিজ্ঞান' হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাই আধুনিক পৃথিবীর চালচিত্রে এটিকে 'বাস্তুবিজ্ঞান' বলাই সমীচীন। বাস্তু একটি বিচ্ছিন্ন ধারণা নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এজগতের অনেক কিছু। প্রবীণ বাস্তুবিশারদ বারীন মুখোপাধ্যায় এই ব্যাপারে প্রাথমিক কিছু ধারণা দিতে চেয়েছেন এই নিবন্ধে।



বাস্তুমূর্তিঃ পরং জ্যোতি বাস্তুদেবো পরাশিবঃ।
বাস্তুদেবস্য সর্বেষাং বাস্তুদেবং নমাম্যহম্।।
শ্রীবাস্তুদেবতাভ্যো নমঃ।

বিজ্ঞান মাত্রই অকূল সমুদ্র। তার কতটুকুই বা মানুষ জানতে পেরেছে! আলোকের গতি ৩×১০¹⁰ সেমি. প্রতি সেকেণ্ডে। এই গতিতে চলে একবছরে আলো যতটা পথ অতিক্রম করে, তাকে 'এক আলোকবর্ষ' বলা হয়। সেইরকম চার আলোকবর্ষ দূরত্বে অবস্থিত আমাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী প্রতিবেশী নক্ষত্র। সবচেয়ে দূরবর্তী কোয়াসার বা পালসার জাতীয় নক্ষত্র প্রায় ২ হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরে। কী ভয়ঙ্কর দূরত্ব, আমরা ভাবতেই পারি না! তার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কণিকার মতো সূর্যের অস্তিত্ব। সেই সূর্যের আয়তনের মধ্যে প্রায় ১৩ লক্ষ পৃথিবীর স্থান হতে পারে। সুতরাং পৃথিবী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। তার মধ্যে এক টুকরো ভূখণ্ড এই ভারতবর্ষ। কিন্তু বলি, কী বিরাট এই দেশ! তার মধ্যে আবার ব্যক্তিমানুষ! মহাকাশের ক্যানভাসে মানুষের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এই মানুষই এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ। মানুষের অনুষঙ্গ না থাকলে ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বের প্রমাণই থাকত না! প্রকৃতির সৌন্দর্যকে কে সুন্দর বলে? মানুষ। ঈশ্বর আছেন—একথা মানুষ বলে, তাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তাভাবনার অবকাশ হয়। অন্য দিক দিয়ে দেখলে বোঝা যায়, ঈশ্বরই মানুষকে ঈশ্বরচিন্তা করার শক্তি দিয়েছেন। ঈশ্বরই পরমাপ্রকৃতি-রূপে জল, বায়ু, সৌরশক্তি সৃষ্টি করে আমাদের জীবনধারণে সক্ষম করে তুলেছেন।

অনেক বৈজ্ঞানিক বলেন, প্রকৃতি জড়। ঋষিরা বলেন ঃ "সমুদ্রমেখলে দেবি পর্বতস্তনমণ্ডলে।/ বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে।।"

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (৭।৪-৫) অর্জুনকে বলেছেন ঃ

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।।"

অর্থাৎ ক্ষিতি (ভূমি), অপ্ (জল), তেজ (তাপ), মরুৎ (বায়ু), ব্যোম (মহাকাশ), মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই আমার প্রকৃতি অষ্টভাগে বিভক্ত। এটি 'অপরা' প্রকৃতি, এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ পৃথক যে জীবরূপা প্রকৃতি, তা আমার 'পরা' প্রকৃতি। হে মহাবাহো, এর দ্বারা এই জগৎ ধৃত রয়েছে।

পরে তিনি আবার বললেন ঃ

"রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু।।" (৭।৮)

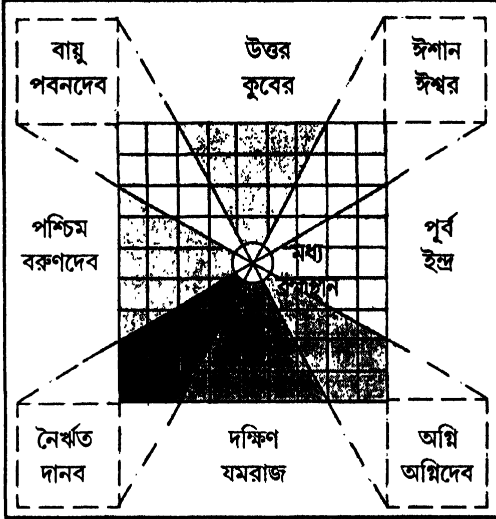
অর্থাৎ হে কৌন্তেয়, জলে রস, চন্দ্রসূর্যে প্রভা, সর্ববেদে ওঙ্কার, আকাশে শব্দ এবং মনুষ্যমধ্যে পৌরুষরূপে আমি আছি।

এর দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, বেদের মূলতত্ত্ব "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" শুধু কথার কথা নয়। ঐ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা পরাজ্ঞান, যা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের আয়ত্তাধীন নয়। কিন্তু অপরাজ্ঞান তো আমাদের আয়ত্তের মধ্যে। পরা ও অপরা উভয়ই তাঁর শক্তি। পাশ্চাত্যজগতের বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যেটি আমাদের জীবনে অপরিহার্য, সেটি অপরাবিদ্যা। বাস্তুশাস্ত্রও অপরাবিদ্যা। এই পৃথিবীতে জীবনধারণ সম্ভব অপরাবিদ্যার সহায়েই। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনগুণের সাম্যাবস্থাই হলো মূলা প্রকৃতি। এটি পরাজ্ঞান। এই পরাজ্ঞানে ত্রিগুণাতীত ঋষি বললেন ঃ "সোঽহম্" বা "অহং ব্রহ্মাস্মি"। মহর্ষি অম্ভৃণের কন্যা বাক্ ব্রহ্মানুভূতি লাভ করে বললেন ঃ

"অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।।"
(ঋগ্বেদ, ১০।১২৫।১)

অর্থাৎ আমিই একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য এবং আমি বিশ্বদেবতারূপে বিচরণ করি। আমিই মিত্র ও বরুণ উভয়কে ধারণ করি। আমি ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনী-কুমারদ্বয়কে ধারণ করি।

তাই শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলা হয়েছে—"সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।" (১।৫৬) অর্থাৎ তিনি সন্তুষ্ট হলে মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে। এই পরাজ্ঞান মহামায়ার করুণা ভিন্ন আয়ত্ত করা যায় না। সেজন্য আমরা মায়ের কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতে পারি, পুরুষকার দ্বারা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারি না। সেই কারণে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, এই পৃথিবীতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যিনিই জন্মগ্রহণ করুন, তিনি মায়ের (মহামায়ার) 'অণ্ডারে' (under)।



ভূমিখণ্ডের কোন্ অংশে কার স্থান

ভারতের প্রাচীন ঋষিরা মানুষের সুখ-শান্তি, স্বাস্থ্য এবং মানসিক স্থিরতার কথা চিন্তা করে বুঝেছিলেন, প্রকৃতির সঙ্গে সহযোগিতা করে প্রকৃতির নিয়মগুলিকে সম্মান করলে এবং প্রকৃতিকে অস্থির না করে মানুষ জীবনযাপন করলে সে পাবে বাঁচার আনন্দ। মায়ের কোলে যেমন শিশু নিশ্চিন্তে পরম নির্ভরতা লাভ করে, তেমনি মানুষও যদি প্রকৃতির নিয়মকে সম্মান দিয়ে ভারসাম্য বজায় রেখে চলে তবেই পাবে জীবনের ওপর আস্থা। এই বাস করার নিয়মকেই বলা হয় 'বাস্তুশিল্পশাস্ত্র'—যা আজ 'বাস্তুশাস্ত্র' নামে পরিচিত। অথর্ববেদের এক অংশ স্থাপত্য-বেদ-এ এর সূত্রপাত। পরে বিভিন্ন শাস্ত্রে বাস্তু সম্বন্ধে বহু বিস্তারিত আলোচনা হয়—যেমন কাশ্যপশিল্পশাস্ত্র, বৃহৎসংহিতা, বিশ্বকর্মা বাস্তুশাস্ত্র, সমরাঙ্গন সূত্রধর বাস্তুশাস্ত্র, ময়বাস্তু, ভৃগুসংহিতা ইত্যাদি।

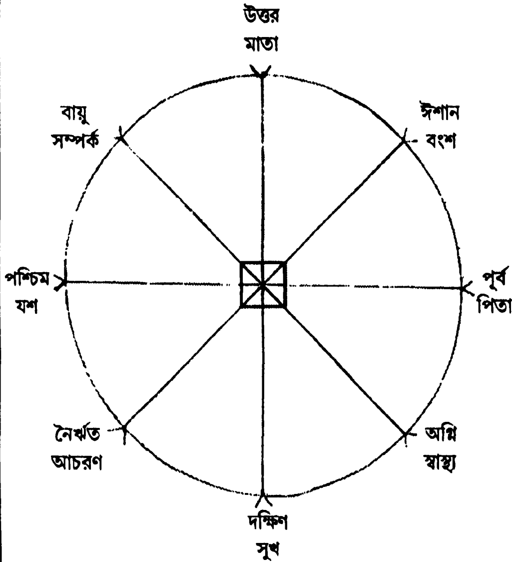
বর্তমান প্রজন্ম সেই বাস্তুশাস্ত্রকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে প্রকৃতির নিয়মগুলিকে পদদলিত করে প্রকৃতিকে ভোগ্যপণ্য হিসাবে ব্যবহার করছে। ফলও পাচ্ছে। অস্থির জীবন, অশান্তি, ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব, পিতা-মাতা অবহেলিত। প্রকৃতিকে বিরূপ করে মনুষ্যজাতির অস্তিত্বকে আমরা বিপন্ন করে তুলেছি। প্রকৃতি আমাদের ভোগ করতে নিবৃত্ত করেননি—ভোগের জন্যই নদী, জল, বায়ু, ভূমি, খনিজ পদার্থ, সূর্যালোক, ফুল, ফল। কিন্তু তাকে লুণ্ঠন করার জন্য নয়, পরিমিত আকারে প্রয়োজন-মতো ভোগের জন্য। এইজন্য উপনিষদ্ বলেছেন ঃ "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা।" অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর, আসক্তির দ্বারা নয়। বাস্তুশাস্ত্রকাররা এই ভোগকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রয়োগ করার শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁরা শুধুই নিজেদের মুক্তির কথা চিন্তা করেনি, গৃহীদের জন্য সুখ, শান্তি, স্বাস্থ্য ও প্রাচুর্যের কথাও চিন্তা করেছেন। বাস্তুশাস্ত্র তারই ফলশ্রুতি।

নব্য সভ্যতায় আমরা বাড়ি, কারখানা, অফিস, বাণিজ্যকেন্দ্র, ব্যাঙ্ক, বিদ্যালয়, ফ্লাইওভার, সেতু, এমনকি মন্দিরও গঠন করছি শুধুই নিজেদের সুবিধার কথা চিন্তা করে এবং বাস্তুশাস্ত্রকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করে—সেটা জেনেই হোক বা অজান্তে। ফলে ঐসব স্থানে বসবাসকারী বা ব্যবহারকারীরা স্বাস্থ্য, শান্তি, পিতা-মাতা, বংশ, সুখ, এমনকি অর্থেরও ক্ষতি স্বীকার করছেন। মানুষের জীবনে বাঁচার যে সার্বিক আনন্দ, তার থেকে আমরা বঞ্চিত করছি নিজেদের। আধুনিক বিজ্ঞান বাস্তুশাস্ত্র-বিরোধী নয়, বরং তার পরিপূরক।

এই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব বিজ্ঞানভিত্তিক। এই বিজ্ঞানের রহস্যগুলি ঋষিতুল্য বিজ্ঞানীরা ভেদ করেছেন। বিশেষভাবে যে-জ্ঞান আমরা পাচ্ছি, সেটাই বিজ্ঞান। সৃষ্টির যে-রহস্য, তার উদ্ঘাটনই বিজ্ঞান। যেমন—বিজ্ঞানী আবিষ্কার করলেন গাছের পাতায় সালোকসংশ্লেষ হয়। প্রকৃতির যে সূর্যালোক তারই কিরণে এই ক্রিয়াটি হয় প্রাণিকুলের জীবনধারণের জন্য। একইভাবে হাজার হাজার বছর আগে ভারতবর্ষের ঋষিরা এই পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করার জন্য তাঁদের নিজস্ব উপায়ে বাস্তুশাস্ত্রে স্থাপত্যরহস্য উদ্ঘাটন করে গেছেন।

এই পৃথিবীতে সূর্যালোক, চৌম্বকীয় ক্ষেত্র, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, জল, বায়ু এবং আরো অনেককিছু মানুষের জীবনে উপযোগী করাই বাস্তুর লক্ষ্য। সূর্য আমাদের প্রাণের উৎস, আমাদের কর্মোদ্যমের প্রেরণা। এই যে তেজ বা heat—তিনি তার দ্যোতক। পৃথিবীর শুচিতা রক্ষাকারী এবং ব্রহ্মাণ্ডের পতি বা চালক সূর্যালোককে মানুষ তার জীবনে কতটা ব্যবহার করতে পারে, তার শিক্ষাই বাস্তুশাস্ত্র। সফলভাবে সূর্যালোককে মানবজীবনে ব্যবহার করার যে-কৌশল, তাকে প্রয়োগ করে স্বাস্থ্য, কর্মোদ্যম এবং মনের

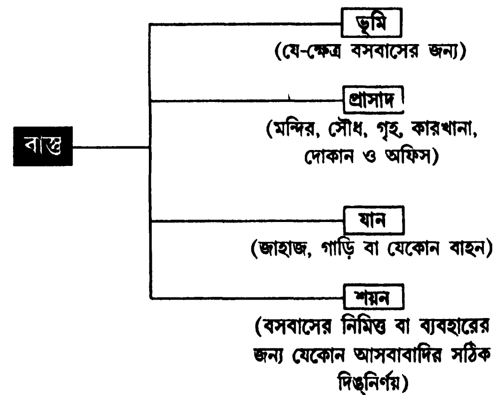
স্ফূর্তি বজায় রাখা যায়। এছাড়াও আছে ভূপ্রকৃতির চৌম্বকীয় ক্ষেত্র—যার দ্বারা মানসিক শক্তি, স্থৈর্য এবং ভারসাম্য রক্ষা সম্ভব। এর কৌশলও এই শাস্ত্রে বর্ণিত। আরো আছে, যেমন—মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, যেটা স্থাপত্যশিল্পে স্থায়িত্বের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। আরো অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণ ভূপ্রকৃতিতে বিরাজমান, যেমন বস্তুর ভার, জমির কাঠিন্য ইত্যাদি এই শাস্ত্রে বর্ণিত। এই কারণে পূজা-পদ্ধতিতে সূর্যার্ঘ্য এবং সামান্যার্ঘ্য নিবেদন করার পর পূজার্চনা শুরু হয়।



কোন্ কোন্ দিক কি কি বিষয়কে প্রভাবিত করে

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, বাস্তুশাস্ত্র প্রয়োগ করে ভাগ্য-পরিবর্তন করা যায় কি? বাস্তু কি মানবজীবনের সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে? উত্তরে বলা যায়, হিন্দু ঋষিরা পুনর্জন্মের কথা বলেছেন এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, মানুষ জন্মায় তার পূর্বজন্মের সংস্কার-বশত। এখানে ভাগ্য জীবনে একটা বড় ভূমিকা পালন করে। এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, কর্মফল ভোগ করতেই হয়। তবে ঈশ্বরকৃপায় যেখানে ফাল হয়ে ঢুকত, সেখানে ছুঁচ ঢুকবে। প্রকারান্তরে বাস্তুশাস্ত্রের ঋষি বলেছেন, মানুষ জন্মায় তার ভাগ্য, কর্ম এবং দৈব নিয়ে। অর্থাৎ জন্মজন্মান্তরের কর্মফল, যা তার ভাগ্য—শতকরা ৩০ ভাগ, কর্ম তার পুরুষকার—শতকরা ৪০ ভাগ, আর বাকি শতকরা ৩০ ভাগ শাস্ত্রাদি মেনে পূজার্চনা ও বাস্তুশাস্ত্রকে অবলম্বন করে জীবনযাপন করা। যদি ভাগ্য ভাল নাও হয়, বাকি শতকরা ৭০ ভাগ থাকছে যাকে আমরা কর্মোদ্যম ও শাস্ত্রোক্ত পথে জীবনে কাজে লাগাতে পারি। বস্তুবাদী জগতে মানবজীবনে কষ্টলাঘবের কথা চিন্তা করে সেই প্রণম্য ঋষিরা বাস্তুশাস্ত্রকে সফল প্রয়োগের প্রস্তাব রেখে গেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, একজন সৌভাগ্যবান এবং কর্মোদ্যোগী পুরুষ কোন প্রয়োজনীয় কাজে বিশেষ কোথাও যাবেন। তিনি নিজের গাড়ি করে নিজ কর্ম সম্পাদনে যাওয়া স্থির করলেন। সেইমতো সঠিক সময়েই সব ব্যবস্থাদি করে তিনি রওনা হলেন। কিন্তু কিছুদুর যাওয়ার পর অত্যন্ত খারাপ রাস্তা এবং খানাখন্দ থাকায় গাড়ির কোন বিশেষ অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পথে বিলম্ব হলো এবং যে-উদ্দেশ্যে যাত্রা, তাও বিঘ্নিত হলো। এমনও হতে পারে, তাঁকে ক্ষতিস্বীকার করতে হলো সঠিক সময়ে উপস্থিত না হওয়ার জন্য। এই যে রাস্তা খারাপ হওয়া—এখানে রাস্তা হচ্ছে বাস্তু, যা সমগ্র কর্মের শতকরা ৩০ ভাগ দখল করে আছে। ব্যক্তিটি ভাগ্যবান, এজন্য তাঁর বাহন, চালক সবই আছে। তিনি কর্মে উদ্যমী, তাই তাঁর অলসতা নেই, শুধু রাস্তা খারাপ হওয়াতে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হলো না। এজন্যই বাস্তুশাস্ত্র আমাদের জীবনে প্রয়োজন। বাস্তুশাস্ত্র নিছক কতকগুলি আইন বা নিয়ম নয়। মহামায়ার যে সৃষ্ট প্রকৃতি—সেই প্রকৃতির নিয়মগুলি সাধ্যমতো অনুসরণ করাই হলো বাস্তুশাস্ত্র। প্রকৃতিপ্রেমী হওয়া এবং প্রকৃতির যাকিছু সৃষ্টি তাকে মর্যাদা দেওয়া এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

সংক্ষেপে বাস্তুশাস্ত্রে বর্ণিত বিষয়সমূহ এভাবে ব্যক্ত করা যায়—



বলা বাহুল্য, এসম্বন্ধে সঠিক মূল্যায়ন করা ও পরামর্শ দেওয়াই বাস্তুশাস্ত্রবিদের কর্তব্য। ❑

জ্যোতির্লিঙ্গ ওঙ্কার-মান্ধাতা

স্বামী অচ্যুতানন্দ



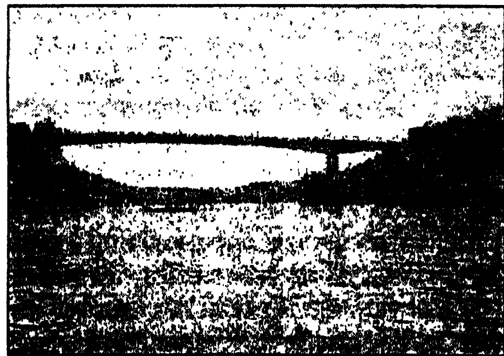
ইতিপূর্বে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে বিশ্বনাথ, কেদারনাথ, সোমনাথ, নাগেশ্বর, ত্র্যম্বকেশ্বর, ঘৃষ্ণেশ্বর, ভীমাশঙ্কর, মহাকাল এবং বৈদ্যনাথেশ্বর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবারে দশম পর্বে জ্যোতির্লিঙ্গ ওঙ্কার-মান্ধাতা।—লেখক

"নর্মদে-এ-এ-হর্, নর্মদে-এ-এ-হর্"। অভিবাদন শুনে দেখি সামনেই এক ব্রহ্মচারী হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। বাস থেকে নামতেই তিনি আমাকে এগিয়ে এসে জানতে চাইলেন আমিই স্বামী অচ্যুতানন্দ কিনা? আমি সম্মতি জানাতেই তিনি বললেন, আমার আসার খবর শুনে তিনি আমাকে পথ দেখাবার জন্য এখানে অপেক্ষা করছেন। প্রাথমিক পরিচয়-পর্ব শেষ হতেই তিনি জানালেন—তাঁকে পাঠ নেওয়ার জন্য একটু পরেই স্থানীয় একটি আশ্রমে যেতে হবে। তবে আমার সুবিধার জন্য তিনি আমায় পথনির্দেশ দিয়ে তাঁর কাজে চলে গেলেন।

আজ ভোরবেলায় উজ্জয়িনীর মহাকালের ভস্মারতি দর্শন করে সকালবেলাতেই রওনা হয়েছি। উজ্জয়িনীর রামকৃষ্ণ কুটিরের অধ্যক্ষ ভাস্করানন্দজীর ব্যবস্থাপনায় একটা অটোরিক্সাতে সেখানকার বাসস্ট্যাণ্ডে এসে বাস ধরে দুই ঘণ্টা পরে ৪০ কিলোমিটার দূরে ইন্দোরে এসে পৌঁছেছি। সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে আবার অন্য বাস ধরে ৭৭ কিলোমিটার পথ পার হয়ে এসেছিলাম মোরটক্কা নামে একটা জায়গায়। এখানেই আজমীর-খাণ্ডোয়া রেলওয়ের ওঙ্কারেশ্বর রোড রেলওয়ে স্টেশন। সেখান থেকে আবার বাস বদল করে ১২ কিলোমিটার দূরে ওঙ্কার-মান্ধাতা তীর্থে এসে পৌঁছেছি। বেলা তখন প্রায় ১টা বাজে। বাস থেকে নামতেই ব্রহ্মচারীজীর ঐ সম্বোধন। কাশীতে যেমন 'হর্ হর্ গঙ্গে, কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গে', বৃন্দাবনে যেমন 'রাধে-রাধে' সম্ভাষণ, এখানে মা নর্মদার তীরে তেমনি 'নর্মদে-এ-এ-হর্' অভিবাদন প্রথা। একটু টেনে উচ্চারণ বড় সুন্দর শুনতে।

আমার সঙ্গে উজ্জয়িনী আশ্রমের একজন সঙ্গী আছেন। বেলা ১টায় ওঙ্কারেশ্বরে আমাদের সাধনকুটিরে গিয়ে সাধুদের বিব্রত না করে বাসস্ট্যাণ্ডের কাছেই একটা দোকানে কিছু খাব স্থির করলাম। কিন্তু খেতে গিয়েই বিপত্তি! রুটি বেশ বড় বড়, গরম ও সুস্বাদু, কিন্তু আলুর ঝোল লঙ্কার গুঁড়োয় লাল—ঝালের চোটে চোখে-নাকে জল এসে সব ভাসিয়ে দিল। খিদের মুখে তাই কোনরকমে খেয়ে শেষে একটু দই খেয়ে পিত্তিরক্ষা হলো।

এই জায়গাটি নর্মদার দক্ষিণপাড়। রাস্তার দুধারে দোকানপাট, কিছু পাকা বাড়ি, বেশ কয়েকটি বড় আশ্রম। ক্রমে উত্তরদিকে এগিয়ে চললাম। ফেব্রুয়ারির শেষ হলেও চারদিকে সাতপুরা আর বিন্ধ্যপর্বত এর মধ্যেই তেতে উঠেছে, বেশ গরম লাগছে। বাসে আসতে আসতে বিশেষ করে ইন্দোর থেকে মোরটক্কা পর্যন্ত অপরূপ সব প্রাকৃতিক দৃশ্য—দুধারে পাহাড়, কখনো রাস্তার গায়ে গায়ে, কখনো সামান্য দূরে। তবে বেশির ভাগই সবুজ গাছপালায় ভর্তি। এসবই বিন্ধ্যপর্বত ও সাতপুরা পর্বতশ্রেণী। মাঝে মাঝে মালভূমি—কিছুটা সমতল। দু-চারটি মন্দির কোথাও পাহাড়ের মাথায়। কখনো ছোটখাট নদীর মতো বা নালা বললেই চলে—পাহাড়ের গা থেকে নেমে পথের নিচ দিয়ে চলে যাচ্ছে। এখন শুকনো, তবে বর্ষায় দারুণ রূপ এদের। এইসব দেখতে দেখতে একেবারে পাহাড়ের বুকে এসে পড়েছি। সামনেই বিন্ধ্যপর্বতের অংশ মান্ধাতা পর্বত। আমরা সামান্য হেঁটে রাস্তার শেষপ্রান্তে নর্মদা নদীর বুকের ওপর ঝোলানো ব্রিজের সামনে এসে গেলাম। 'ক্যান্টিলিভার ব্রিজ'। এটি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়েছে। এর আগে একমাত্র নৌকাই ছিল পারাপারের ভরসা।



নর্মদা নদীর ওপর নির্মিত সেতু

আমরা ব্রিজে ওঠার আগে পাহাড়ের সবুজ রঙে রঙিন মা নর্মদার স্বচ্ছ সবুজ-নীল জলস্রোতকে ভক্তিভরে প্রণাম জানালাম ঃ "স্ববিন্দুসিন্ধুসুস্খলত্তরঙ্গভৃঙ্গরঞ্জিতং/ দ্বিষৎসু পাপজাতজাত কারিবারিসংযুতম্।/ কৃতান্তদূতকালভূত-ভীতহারি বর্মদে/ ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্মদে।।"

শিবকন্যা নর্মদার মাহাত্ম্য সমগ্র মধ্য ও পশ্চিম ভারতে শিবজায়া গঙ্গার মতোই। পুরাণে আছে—কঠোর তপস্যারত মহাদেব অমরকণ্টকে সমাধিমগ্ন অবস্থায় যখন ছিলেন, তখন তাঁর সেই তপোজ্জ্বল উত্তপ্ত শরীর ঘর্মাক্ত হতে থাকে। তাঁর পবিত্র দেহের সেই স্বেদরাশি থেকে উদ্ভূতা এক অপরূপা কন্যা মহাদেবের ক্রোড়ে এসে বসেন। তাঁর আবির্ভাবে মহাদেব সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হয়ে জানতে চাইলেন ঃ "হে কন্যে, তোমার কী পরিচয়?" দেবী বলেন ঃ "পিতা, আমি আপনার শরীরজাত, আপনারই কন্যা।" দেবাদিদেব তাঁকে 'নর্মদা' নাম দিয়ে বর দিতে চাইলে দেবদুহিতা বললেন ঃ "আপনার শরীরের স্বেদসৃষ্টা আমি সলিল-রূপেই থাকতে চাই, তবে আমার সঙ্গে আপনিও নিত্য বিরাজিত থাকবেন আমার পাড়ে। আপনার পবিত্র নামের সঙ্গে আমিও যেন ভক্তকণ্ঠে সমস্বরে উচ্চারিত হই। যেমন পতিতপাবনী দেবী জাহ্নবীর সঙ্গে আপনার নাম একত্রে লোকে উচ্চারণ করে, আমাকেও যেন তেমনি শিবদুহিতা বলে আপনার সঙ্গেই লোকে স্মরণ করে।" কন্যার এই প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে শিব 'তথাস্তু' বললেন। সেই থেকে অমরকণ্টকে শিবশরীর থেকে উৎপন্না দেবী নর্মদা ভক্তসাধকদের পরম আশ্রয়।

পবিত্রসলিলা নর্মদার তীর ধরে পরিক্রমা তপস্বী সাধু-ভক্তদের বহু বাঞ্ছিত। তাই আজও এই নদীর সংস্পর্শে এলে সকলের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়—'নর্মদে-এ-এ-হর্'। এইসব ভাবতে ভাবতে ব্রিজ অতিক্রম করে নদীর উত্তর তীরে এসে পৌঁছালাম নদীবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ী দ্বীপে। এটিই 'ওঙ্কার-মান্ধাতা' দ্বীপ। এই অতি পবিত্র পুরাণপ্রসিদ্ধ দ্বীপে নেমে এর পবিত্র ধূলি মাথায় নিয়ে একটু থমকে দাঁড়ালাম—কোন্ দিকে যাব? বাসস্ট্যাণ্ডে ব্রহ্মচারী বলে দিয়েছিলেন—"ওপারে গিয়েই বাঁদিকের পথ ধরে যাবেন।" এখন এখানে দেখছি দুটি পথ। একটি ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে, অন্যটি পশ্চিমে। ডানদিকে অর্থাৎ রাস্তার পূর্বদিকে থাকে থাকে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে মূল মন্দিরের দিকে। আমরা এখান থেকেই ওঙ্কারেশ্বরজীকে প্রণাম জানালাম। এখন তিনি বিশ্রামে আছেন, মন্দির বন্ধ। বিকালে এসে তাঁর দর্শন করব। আপাতত আমাদের 'সফেদ কোঠি'তেই যাব স্থির করলাম। কিন্তু যাব কোন্ রাস্তায়? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি। এমন সময় নিচে নদীর দিক থেকে সিঁড়ি ভেঙে দুটি বাচ্চা মেয়ে উঠে এল। একটি বছর দশেকের, অন্যটি পাঁচ-ছয় বছরের হবে। তারা হঠাৎ আমার সামনে এসে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সরাসরি জিজ্ঞাসা করল ঃ "আপ কাঁহা জায়েঙ্গে?" আমি বললাম ঃ "সফেদ কোঠি।" সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোন কথা না বলে বড় মেয়েটি বলল ঃ "মেরা সাথ আইয়ে।" বলেই পশ্চিমের নদীর ধার ধরে এগিয়ে চলতে লাগল। আমি এবং আমার সঙ্গে আসা উজ্জয়িনী আশ্রমের সঙ্গী তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পরে বাঁদিকে সীতারামদাস ওঙ্কারনাথজীর তপস্যাস্থলে তাঁদের আশ্রম পার হয়ে প্রাচীন কেদারনাথ মন্দির পড়ল। তারও পরে দূরে আমাদের সাদা কুঠিয়াগুলি দেখা যেতে লাগল। বড় মেয়েটি বলে উঠল ঃ "আভি দেখো তুমহারা সফেদ কোঠি আ গিয়া। আভি সিধা চলা যাও।" বলেই তারা দৌড় লাগাল ঐ পাহাড়ী পথ দিয়ে সামনের দিকে।

একটু পরেই পৌঁছে গেলাম আশ্রমের প্রবেশদ্বারে। দরজায় ধাক্কা দেওয়ার কিছুক্ষণ পরে সফেদ কোঠি রামকৃষ্ণ সাধনকুটিরের দ্বার খুলে দাঁড়ালেন আশ্রমের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা স্বামী সাংখ্যানন্দজী। আগে থেকে খবর দেওয়া ছিল। তিনি আমাকে সাদরে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আমার থাকার ঘরে পৌঁছে দিলেন। খাওয়া হয়েছে জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি নিজের ঘরে চলে গেলেন। বিকালে কথা হবে বলে আমরা মা নর্মদা ও ওঙ্কারেশ্বর মহাদেবকে স্মরণ করে নর্মদার তীরে আমার কুঠিয়ায় প্রবেশ করলাম।

ঘুম ভাঙল দরজায় ধাক্কার শব্দে। তাড়াতাড়ি ঘরের সংলগ্ন স্নানাগার থেকে চোখে-মুখে জল দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, সাংখ্যানন্দজী এক বয়স্ক ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পারস্পরিক অভিবাদন ও পরিচয়পর্ব শেষ হলে বিধু মহারাজ (সাংখ্যানন্দজী) আমাদের নিয়ে চললেন বৈকালিক জলযোগের জন্য—আশ্রমের খাওয়ার ঘরে। খেতে খেতে বিধু মহারাজ জানালেন, এই ব্রহ্মচারী—গৌরাঙ্গ মহারাজ দীর্ঘদিন নর্মদার তীরে বাস করছেন। আমি যে-কদিন এখানে আছি, ইনিই আমার তীর্থদর্শনের সঙ্গী হবেন। নিশ্চিন্ত হলাম একজন নির্ভরযোগ্য ও অভিজ্ঞ তীর্থসাথীকে পেয়ে। ঠিক হলো, আজই একটু পরে প্রথমে আশ্রমের বেশ কিছুটা নিচে বয়ে যাওয়া নর্মদাকে স্পর্শ করে তারপর জ্যোতির্লিঙ্গ ওঙ্কারেশ্বর দর্শন করতে যাব। তার আগে আমি ঘরের বাইরে বেরিয়ে সংলগ্ন একটা চাতালে বসে গৌরাঙ্গ মহারাজকে এই মান্ধাতা পর্বত সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করলাম।

গৌরাঙ্গ মহারাজ ভক্তিমান, পণ্ডিত সাধু। দীর্ঘদিন এই অঞ্চলে থাকার ফলে পুরাণপাঠে ও স্থানীয় প্রাচীন সাধুসন্তের কাছে এই তীর্থমাহাত্ম্য অনেক শুনেছেন। তিনি বলতে লাগলেন প্রথমে এই মান্ধাতা দ্বীপের প্রাচীন কাহিনী। এই পাহাড়ী দ্বীপের নাম 'মান্ধাতা পর্বত' কেন হলো তাই দিয়েই প্রসঙ্গ শুরু হলো। কোটিরুদ্রসংহিতা অনুসারে এই তীর্থ

জ্যোতির্লিঙ্গ ওঙ্কারেশ্বরের অধিষ্ঠানক্ষেত্র বলে একে প্রাচীন কাল থেকে 'ওঙ্কারতীর্থ' বলা হয়। এটি সিদ্ধক্ষেত্র। এখানে দেবতা, ঋষি, রাজারা বহু তপস্যা করে সিদ্ধ হয়েছেন। বহু যাগযজ্ঞ এখানে হয়েছে। একে তপোভূমি বলে।

প্রাচীনকালে ইক্ষ্বাকুবংশের সূর্যবংশীয় রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ রাজা যুবনাশ্ব এখানে বহু যাগযজ্ঞ করেছিলেন। তাঁর ধর্মপূত জীবনের জন্য প্রজা ও ঋষিরা তাঁকে 'রাজর্ষি যুবনাশ্ব' বলত। তবে তাঁর সব থেকেও মনে শান্তি ছিল না—একটি সন্তানের অভাবে। মন্ত্রী ও ঋষিদের নির্দেশমতো তিনি পুত্রকামনায় এক তপোবনে গিয়ে তপস্যা শুরু করেন। ঋষিরা তাঁর ইচ্ছাপূরণের জন্য প্রসন্ন হয়ে সেখানে এক পুত্রেষ্টিযজ্ঞের আয়োজন করেন। একদিন মধ্যরাত্রে উপবাসী রাজা যুবনাশ্ব অত্যন্ত পিপাসার্ত হয়ে জলের অন্বেষণ করতে করতে যজ্ঞস্থলীতে গিয়ে এক কলসি জল দেখতে পান। তৃষ্ণার্ত রাজা সেই জল আকণ্ঠ পান করে নিজের তপস্যার আসনে ফিরে আসেন। এদিকে ঐ জল ঋষিরা যজ্ঞের জন্য মন্ত্রপূত করে রেখেছিলেন—যা যজ্ঞান্তে রানীদের পান করতে দেওয়া হবে পুত্র জন্মদানের জন্য। পরদিন সকালে ঋষিরা যজ্ঞমণ্ডপে এসে মন্ত্রপূত ঐ জল দেখতে না পেয়ে খোঁজ করে জানলেন, রাজা তৃষ্ণার্ত হয়ে ঐ জলই পান করেছেন। তাঁরা রাজাকে বললেন ঃ "আপনারই পুত্রলাভের জন্য রানীদের দেওয়া হবে বলে ঐ জল মন্ত্রপূত করে রাখা হয়েছিল। এখন মন্ত্রশুদ্ধ মহাশক্তিধর ঐ জল পান করে আপনাকেই পুত্রজন্ম দিতে হবে, কিন্তু গর্ভধারণের ক্লেশ আপনাকে সহ্য করতে হবে না।" ফলে রাজা যুবনাশ্ব ঐ সন্তানকে শতবর্ষ যাবৎ শরীরে রেখে দিলেন। তারপর তাঁর বাম কুক্ষীদেশ (কোমর) ভেদ করে সূর্যসম তেজস্বী এক সন্তান নির্গত হলো। পুরুষশরীরজাত এই দিব্যসন্তানকে দেখতে এসে দেবতা-ঋষিমুনিরা সবাই বললেন ঃ "এর শরীর বাঁচবে কি করে? মায়ের দুধ তো এ পাবে না।" তখন ইন্দ্র বললেন ঃ "আমি এর ব্যবস্থা করছি।" এই বলে ইন্দ্র নিজের হাতের তর্জনী শিশুর মুখে দিয়ে তার দুধপানের পিপাসা মিটিয়ে দিলেন। বললেন ঃ "এই বালক আমাকেই ধারণ করবে—'মাম্ অয়ং ধাস্যতি'। আমার সাহায্যে জীবিত থাকবে।" বালক সেই আঙুল চুষতে থাকল। মায়ের দুধ না পান করার জন্য এবং ইন্দ্রের কথামতো তাঁকে ধারণ করার জন্য সেই মহাবীর্যবান পুত্রের নাম হলো 'মান্ধাতা'।

বড় হয়ে সেই মান্ধাতা পিতৃরাজ্য গ্রহণ করে বহু রাজ্য জয় করলেন এবং অশেষ খ্যাতি অর্জন করে রাজ্যপালন করতে লাগলেন। শেষে একবার তাঁর পালনকর্তা ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সংগ্রাম শুরু হলো। ইন্দ্র রেগে গিয়ে মর্ত্যে জলবর্ষণ বন্ধ করে দিলে মান্ধাতা নর্মদা-কাবেরীর সঙ্গমস্থল এই পাহাড়ে এসে তপস্যা শুরু করলেন। এই পাহাড় মহা পবিত্র 'বৈদূর্যমণি পর্বত' নামে পরিচিত ছিল। তাঁর তপঃপ্রভাবে ইন্দ্রের শক্তি খর্ব করে মর্ত্যে জলবর্ষণ সম্ভব করেন তিনি। সেই থেকে মান্ধাতা এখানেই বাস করতে থাকেন। এখানকার নদীবেষ্টিত পাহাড়ী সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি বিবাহ করে এখানেই শেষজীবন অতিবাহিত করেন। এই পাহাড়টি মূলত দুটি ছোট পাহাড় একত্র হয়ে 'ওঁ'-এর আকার নিয়েছে। ওপর থেকে দেখলে এটি স্পষ্ট বোঝা যায়। চারিদিকে নর্মদা ও কাবেরী-বেষ্টিত এই দ্বীপ নৈসর্গিক সৌন্দর্যের এক অতুল সম্ভার। এখানেই মান্ধাতা পুত্রদের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে শিবের তপস্যা শুরু করেন। তাঁর কঠোর তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে দেবাদিদেব আবির্ভূত হন। তখন মান্ধাতা প্রার্থনা করেন ঃ "আপনি জগৎকল্যাণে এখানে এই পবিত্র নর্মদা-তীরে বৈদূর্যপর্বতে নিত্য বিরাজিত থাকুন—এই আমার প্রার্থনা।" মান্ধাতার প্রার্থনায় ব্রহ্মা, বিষ্ণুও তখন সেখানে উপস্থিত হন। তাঁদেরকেও এখানে থাকার জন্য মান্ধাতা প্রার্থনা করেন। তাঁরা সকলেই সম্মত হন এবং তাঁকে বর দেন ঃ "এই বৈদূর্যপর্বত আজ থেকে তোমার তপস্থলী হিসাবে 'মান্ধাতা পর্বত' ও স্বয়ং ওঙ্কার-রূপী মহাদেবের আবির্ভাব হেতু 'ওঙ্কার-মান্ধাতা' পর্বততীর্থ হিসাবে পরিচিত হবে। শিব 'ওঙ্কারেশ্বর' নামে জ্যোতির্লিঙ্গ-রূপে এখানে দ্বীপমধ্যে নদী-কিনারে বিরাজিত থাকবেন, আর নদীর দক্ষিণতীরে পাশাপাশি ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বিরাজ করবেন। তাঁদের মধ্যস্থলে অপর এক লিঙ্গমূর্তিতে শিব সেখানে অবস্থান করবেন। তাঁর নাম হবে 'অমলেশ্বর'। দক্ষিণ পাড়ে দুই তীর্থের নাম হবে 'ব্রহ্মাপুরী' ও 'বিষ্ণুপুরী', আর এপাড়ের নাম হবে 'শিবপুরী'। দেবতাদের আশীর্বাদ-ধন্য মান্ধাতা এখানেই থেকে গেলেন। আজও ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের দক্ষিণের দালানে সেই প্রাচীন রাজা এবং এই পর্বতকুটিরের স্রষ্টা 'মান্ধাতার গাদী' দেখা যায়।

প্রাচীনকালে দক্ষিণ পাড় থেকে এই দ্বীপে আসতে নৌকাই একমাত্র অবলম্বন ছিল। এই দ্বীপের প্রাচীন মান্ধাতা যুগ কালপ্রভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তখন এখানে শাসন করতেন আদিবাসী ভীল সম্প্রদায়ের নেতারা—যাঁরা ধারের পারমার বংশীয়দের অধীনে ছিলেন। ক্রমে গোয়ালিয়ারের সিন্ধিয়া বংশের রাজাদের হাতে এটি আসে। তাঁরা ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসকদের হাতে এটি তুলে দেন। শেষ ভীলনেতা ছিলেন নাথুভীল। তাঁর সঙ্গে মন্দিরের পূজারীদের মামলা শুরু হয়। মধ্যস্থতা করতে এসে জয়পুরের রাজা তাঁর ভাই ভরত সিংহ চৌহানকে এখানে পাঠান। সেই মামলার একটি সুন্দর সমাপ্তি হয় রাজকুমার ভরত সিংহের সঙ্গে নাথুভীলের মেয়ের বিয়ের মধ্য দিয়ে। রাজা ভরত সিংহ ও তাঁর সহকারী আরো রাজপুত কর্মচারীরাও এখানে ভীল মেয়েদের বিয়ে করে এখানেই বসবাস শুরু করে। শুরু হয়





মান্ধাতাদ্বীপ তীর্থে নতুন রাজ্যব্যবস্থা। এটি ১১৬৫ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। সেই রাজপুত ও ভীলদের বংশধররাই তারপর থেকে এই অঞ্চলটি শাসন করতে থাকেন, মন্দিরের পরিচর্যা তাঁদেরই কর্মচারী করতে থাকেন। তাঁদের বংশধরেরা এখনো 'ভীলালা' নামে পরিচিত, তবে তাঁদের উপাধি এখন 'রাজপুত রাও'। ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার কিছু পরে ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে তাদের জায়গায় কর্তৃত্ব চলে যায় ইংরেজদের হাতে। বর্তমানে এই মন্দির ও অন্য মন্দির দেখভাল করার জন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। তারাই সবকিছু করে। তবে কমিটিতে সরকারি পদাধিকারী ব্যক্তিরা ছাড়াও রাজপরিবারের সদস্যরাও আছেন, আর এর প্রধান সঞ্চালক একজন সন্ন্যাসী।

আমরা দুজন আশ্রম থেকে বেরিয়ে পূর্বাভিমুখে এগিয়ে যেতে লাগলাম। আমাদের এই আশ্রম কয়েকটি সাদা কুঠিয়ার সমষ্টি, একেবারে নর্মদার খাড়া পাড়ের ওপরে স্থাপিত। সাদা বাড়ি বলে স্থানীয় লোকেরা একে 'সফেদ কোঠি' বলে। এটি স্থানীয় রাজাদের সম্পত্তি ছিল। কিছুদিন আগে এক শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী সন্ন্যাসী রাজাদের কাছ থেকে দান হিসাবে এটি পেয়েছিলেন। পরে তিনি এটি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনকে হস্তান্তরিত করেন। কয়েকটি ছোট ছোট কুঠিয়া নিয়ে সুন্দর এই আশ্রম বর্তমানে 'রামকৃষ্ণ সাধনকুটির' নামে পরিচিত—যা ইন্দোর রামকৃষ্ণ মিশনের সাবসেন্টার। এখানে একজন সাধু ও একজন ব্রহ্মচারী আছেন। ঠাকুরের একটি ছোট মন্দিরে সামান্যভাবে তাঁর নিত্যপূজা ও আরতি হয়। মূলত এটি তপস্যা, সাধনভজন ও নির্জনবাসের জন্যই স্থাপিত।



নর্মদাতীরে ওঙ্কারেশ্বরের মন্দির। পিছনে বামদিকে পাহাড়ের গায়ে ভিলরাজাদের প্রাসাদ।

আমরা দূর থেকে সাদা রঙের ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের চূড়া দেখে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম জানালাম। বাঁধানো পাথরের রাস্তা—কখনো একটু নিচে নামছে, কখনো ওপরে উঠছে। রাস্তার বাঁদিকে খাড়া পাহাড়, ডানদিকে গভীর খাদ বেয়ে বেয়ে চলেছেন খরস্রোতা নীলবর্ণা মা নর্মদা। কিছুদূর গিয়ে ডানদিকে একটি বহু প্রাচীন পাথরের মন্দির পেলাম। ইনি 'কেদারেশ্বর মহাদেব' নামে পরিচিত। একটি ছোট আশ্রমও সেখানে আছে—সাধুরা এটি দেখাশোনা করেন। আরো কিছুটা এগিয়ে ডানদিকেই বেশ বড় একটি মঠ দেখা গেল। এটি বিখ্যাত সাধু সীতারামদাস ওঙ্কারনাথজীর সাধনস্থলী। বর্তমানে এখানে তাঁরই পূর্বাশ্রমের একজন আত্মীয় সন্ন্যাস নিয়ে মঠটি পরিচালনা করছেন। আশ্রমটি চার সম্প্রদায়ের ওঙ্কার মঠ। বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত আশ্রম। সীতারামের মন্দির, শিবমন্দির ও ভক্তদের আবাসগৃহ নিয়ে বড় আশ্রম। আমরা এখন এখানে বেশিক্ষণ না থেকে এগিয়ে চললাম পূর্বদিকে। আরো কিছুদূর গিয়ে ক্রমে বাঁদিকেও বাড়িঘর আরম্ভ হলো। লোকালয়, দোকানপাট একে একে দেখা দিতে লাগল। এবারে সেই প্রথম আসা ব্রিজের রাস্তা ডানদিকে পেলাম।

আমরা এবার ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে ওপরের দিকে উঠতে লাগলাম। সামনেই মন্দির। এতটা চড়াই-উতরাইয়ে ক্লান্ত হয়ে একটু জিরিয়ে নেওয়ার জন্য পথের ধারে পাথরের সিঁড়ির পাশে বসে ব্রহ্মচারীজীকে বললাম দেব-দর্শনের আগে এই জ্যোতির্লিঙ্গের কথা একটু শোনাতে।

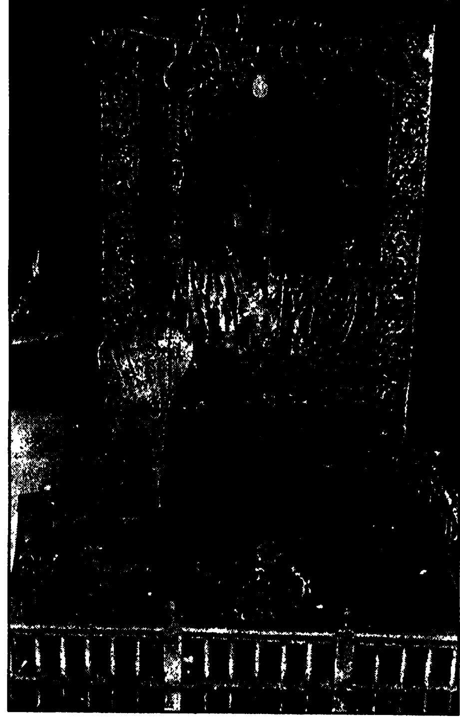
তিনি আবার শুরু করলেন। প্রাচীনকালে একবার নারদ ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে উপস্থিত হন এই বিন্ধ্যপর্বতে। পর্বতরাজ বিন্ধ্য তখন এখানে ছিলেন। নারদকে যথাবিধি পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করার পর বিন্ধ্য দেখলেন, নারদ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বিন্ধ্যরাজ সেই দীর্ঘশ্বাসের কারণ জানতে চাইলে নারদ বললেনঃ "তোমার এই পর্বত খুব সুন্দর। এমন পবিত্র নদীবেষ্টিত সবুজ গাছপালায় ঘেরা পর্বত খুব ভাল। কিন্তু সুমেরু পর্বত তোমার চেয়েও উঁচু আর সেখানে দেবতারা সব আসেন। এই একটা অভাবই তোমার এখানে দেখছি। তাই আমার একটু দুঃখ হচ্ছে।" নারদের কথা শুনে বিন্ধ্য নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললেনঃ "ঠিকই তো!" নিজেকে সুমেরু পর্বতের সমান করার জন্য তিনি শুরু করলেন কঠোর তপস্যা—শিবের দর্শনের আশায়। "বিশ্বেশ্বরং তথা শম্ভুম্ আরাধ্য তত্রৈব ওঙ্কার যন্ত্রে স্বয়ং কৃত্বা চৈব পুনস্তত্র পার্থিবীং শিবমূর্তিকাম্।" তিনি 'ওঁ' যন্ত্রের সঙ্গে একটি মাটির শিবলিঙ্গ গড়ে তিনি তার পূজাও করতে লাগলেন। "আরাধ্য চ তদা শম্ভুং ষন্মাসং চ নিরন্তরং। ন চচাল তদাস্থানাৎ শিবধ্যানপরায়ণঃ"। ছয়মাস ধরে একাসনে বসে তাঁর পূজা-ধ্যান চলল। প্রসন্ন হয়ে সদাশিব নিজের সেই যোগিজনদুর্লভ অপরূপ রূপে সেখানে প্রকট হয়ে বিন্ধ্যকে বর দিতে চাইলেন। বিন্ধ্য বললেনঃ "আমার ওপর প্রসন্ন হয়ে থাকলে আমায় প্রার্থিত বর দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করুন, যাতে আমি সবদিক থেকে সুমেরুর সমান হতে পারি।" শিব যদিও বুঝলেন, এই বর দিলে

অন্যের ক্ষতি, তবুও ভক্তের মান রাখতে সেই বর দিলেন—"তুমি সুমেরুতুল্য পূজিত হবে।" তখন অন্য দেবতা ও ঋষিরাও সেখানে এসে উপস্থিত হলে বিন্ধ্য বললেন : "হে দেবাদিদেব, আপনি এখানে অধিষ্ঠিত হোন এবং দেবতারাও আমার শিখরদেশে যাতায়াত করুন।" শিব 'তথাস্তু' বলে "লোকানাং সুখহেতবে ওঙ্কারে চৈব যন্ত্রে বৈ। পার্থিবে চ তথা লোকে লিঙ্গমেকং তথা পুনঃ।। এবং স্বয়ং সমুৎপন্য লিঙ্গমেকং দ্বিধাকৃতং। প্রণবে চোঙ্কারশ্চ নামাসীৎ স সদাশিবঃ। পার্থিবে চৈব যজ্জাতং তদাসীৎ অমরেশ্বরঃ।।" ওঙ্কার যন্ত্রে ও পার্থিব মূর্তিতে একই লিঙ্গ দুই রূপে উদ্ভূত হলেন। ওঁ যন্ত্রে আবির্ভূত লিঙ্গ 'ওঙ্কারেশ্বর', আর পার্থিব লিঙ্গে আবির্ভূত লিঙ্গ 'অমরেশ্বর' বা 'অমলেশ্বর' নামে পরিচিত হলো।

"যঃ এনং পূজয়েদ্দেবং ন গর্ভে বসতে নরঃ।/ যথাভীষ্টং ফলং তচ্চ প্রাপ্নুয়াৎ নাত্র সংশয়ঃ।।" এই জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনে জীবের আর গর্ভবাসযন্ত্রণা সহ্য করতে হয় না এবং নিঃসন্দেহে তার অভীষ্ট চরিতার্থ হয়।

এই জ্যোতির্লিঙ্গতত্ত্ব শোনার পরে "অত্র প্রণবরূপো বৈ স্থানে তিষ্ঠতি উমাপতি"—এই তীর্থে প্রণবরূপী উমাপতি মহাদেব নিত্য বিরাজিত এই বিশ্বাস মনে ধারণা করে আমরা এবার উঠে এগিয়ে চললাম সিঁড়ি বেয়ে ওঙ্কারেশ্বর মহাদেব দর্শনে। এই স্থান যুগ যুগ ধরে বহু সাধু-মহাত্মার চরণস্পর্শে ও তপস্যায় তীর্থের মাহাত্ম্যে প্রতিষ্ঠিত। 'নারদীয় ভক্তিসূত্র'-এ আছে, তীর্থ প্রাণবন্ত হয় ভক্তের ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্যে—'তীর্থী কুর্বন্তি তীর্থানি'। রাজা যুবনাশ্ব, রাজা মান্ধাতা থেকে শুরু করে যুগে যুগে বহু সাধকের সাধনার ধারায় জীবন্ত এই তীর্থে এই কলিযুগেও বিখ্যাত সাধক গোবিন্দপাদ—যাঁকে স্বয়ং পতঞ্জলির অবতার বলা হয়—এই ওঙ্কারতীর্থে এসে ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের ঠিক নিচের একটি গুহাতে সমাধিস্থ ছিলেন দীর্ঘকাল। অপেক্ষায় ছিলেন আরেক সাধক শিবাবতার শঙ্করের আগমনের—যাঁর স্পর্শে ও ভক্তিতে গোবিন্দপাদের দীর্ঘ-কালের সমাধি ভঙ্গ হয়েছিল। শঙ্করকে সন্ন্যাসদান করে তিনি শরীরত্যাগ করেন। তাঁর সেই বিখ্যাত প্রাচীন গুহাটি আজও ইতিহাসের সাক্ষী হিসাবে মন্দিরে ওঠার সিঁড়ির নিচে বর্তমান। আমরা এখন দূর থেকে তাঁদের প্রণাম করে ওপরে উঠতে লাগলাম।

'নর্মদে-এ-এ-হর্' বলতে বলতে সিঁড়ি ভেঙে এসে পৌঁছালাম পিতলের রেলিং-ঘেরা একটি চাতালে। সিঁড়ির বাঁদিকে একটি ছোট মন্দিরে সিন্দূরলিপ্ত এক অদ্ভুতদর্শন পঞ্চমুখী গণেশ। এটি বহু প্রাচীন। প্রবাদ, ইনি রাজা মান্ধাতার আমলের। চারটি শুণ্ড-সমন্বিত মুখ সামনের দিকে, অপরটি পিছন দিকে। এই মন্দিরেরই একপাশে আছেন পঞ্চবদনা শ্বেতপাথরের দেবী গায়ত্রীর বিগ্রহ। এটি খুব প্রাচীন নয় বলে মনে হলো। আমরা মূল দেবতা দর্শনের আগে সিদ্ধিদাতা গণপতিকে প্রণাম জানালাম—"দেবেন্দ্র-মৌলি মন্দার-মকরন্দকণারুনাঃ/ বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব-চরণাম্বুজরেণবঃ।।"



ওঙ্কারেশ্বর লিঙ্গের নিরাভরণ রূপ। পিছনে দেবী ভবানীর মর্মরমূর্তি।

এই তীর্থপতি ওঙ্কারের দর্শন ও তীর্থবাস যেন আমাদের নির্বিঘ্ন হয়—সেই প্রার্থনা জানিয়ে এবার মূল মন্দিরের নাটমন্দিরে প্রবেশ করলাম। নাটমন্দিরটি খুব বড় নয়—উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত শ্বেতপাথরের ৬০টি কারুকার্যখচিত স্তম্ভের ওপর স্থাপিত। প্রায় ১৪ ফুট উঁচু স্তম্ভগুলিতে নানা ধরনের আকৃতি খোদাই করা আছে। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার এটি এক অনন্য নিদর্শন। নাটমন্দিরের পশ্চিমপ্রান্তে নন্দীর এক বিশাল মূর্তি। তিনি পূর্বাভিমুখে মাথা তুলে বসে আছেন। এই সুন্দর বৃষভমূর্তিটি রানী অহল্যাবাঈ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নাটমন্দিরটি মূল মন্দিরের অনেক পরে সংযোজিত হয়েছে। নন্দীশ্বরের চরণে মাথা ঠেকিয়ে আমরা আরো পূর্বাভিমুখে এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে একটি ছোট্ট গর্ভগৃহে প্রবেশ করলাম। সেখানে আট-দশ জনের বেশি লোক একসঙ্গে দাঁড়াতে পারে না—বসা তো দূরের কথা। ছোট এই গর্ভমন্দির বহু প্রাচীন।

গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করে দেখলাম, মন্দির ফাঁকা। মাত্র একজন পূজারি একটি কাঠের পিঁড়ের ওপর লিঙ্গের উত্তর-পূর্ব কোণে বসে আছেন। গর্ভমন্দিরের দক্ষিণপ্রান্তে রূপার রেলিং-ঘেরা একটি ছোট্ট কুণ্ডের মাঝখানে বহুবাঞ্ছিত জ্যোতির্লিঙ্গ ওঙ্কারেশ্বর বিরাজ করছেন। খুবই ছোট কালোপাথরের অমসৃণ লিঙ্গ উচ্চতায় আধ হাতের মতো। লিঙ্গের আকৃতি ছোট ছোট উঁচু-নিচু কয়েকটি চূড়ার মতো—হাত দিয়ে স্পর্শ করলে মনে হয় যেন ওঙ্কার আকৃতি। লিঙ্গের তলা থেকে সবসময় জল চুঁইয়ে বেরোচ্ছে। মুছে দিলেও আবার উঠছে। পূজারি বললেন, মা নর্মদারই একটি গুপ্ত ধারা এইভাবে আসছে। আমরা রেলিঙের ধারে বসে প্রাণভরে ওঙ্কারলিঙ্গকে স্পর্শ করলাম। তারপর সঙ্গে আনা নর্মদার জল দিয়ে মহাদেবকে স্নান করিয়ে আকন্দ-ফুলের মালা ও বেলপাতা দিয়ে অঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করলাম—"ওঙ্কারং বিন্দুসংযুক্তং নিত্যং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ/ কামদং মোক্ষদং চৈব ওঙ্কারায় নমো নমঃ।।" একপাশে একটি বড় প্রদীপ জ্বলছে, একে 'অখণ্ড জ্যোতি' বলে। বড় শান্ত পরিবেশ। কোন ভিড় নেই, শুধু পূজারির কণ্ঠোত্থিত শিবস্তোত্র ছোট্ট মন্দিরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আমরা এককোণে দাঁড়িয়ে শিবষড়াক্ষর মন্ত্র জপ করতে লাগলাম। এই সেই জ্যোতির্লিঙ্গ—যিনি বিন্ধ্যপর্বতের প্রার্থনায় এখানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এই সেই ওঙ্কারলিঙ্গ—যিনি প্রাচীন রাজর্ষি মান্ধাতার তপস্যায় আবির্ভূত হয়ে এই লিঙ্গমধ্যে বিরাজ করছেন। কতকাল ধরে কত সাধক, ভক্ত এই জ্যোতির্লিঙ্গের দর্শন-স্পর্শন-পূজা করে এই স্থানটি মহিমান্বিত করেছেন! সন্ন্যাসীর আদিগুরু আচার্য শঙ্কর এখানেই সন্ন্যাসগ্রহণ করে সিদ্ধ হয়েছেন। তিনিও নিশ্চয়ই এই জ্যোতির্লিঙ্গের পূজার্চনা করেছেন। কত ভাগ্য আমাদের! আমরাও সেই সুর-মুনি-ঋষি-সেবিত দিব্যলিঙ্গ ওঙ্কারেশ্বরকে স্পর্শ ও পূজা করার দুর্লভ সুযোগ পেলাম।

পূজারিরা এবার সন্ধ্যারতির জন্য শিবলিঙ্গকে পরিষ্কার করতে লাগলেন। সমস্ত ফুলমালা সরিয়ে খুব ভাল করে লিঙ্গ ও কুণ্ডকে মুছে দিলেন। তারপরে লিঙ্গের ওপর পঞ্চামৃত, চন্দন, অগুরু ইত্যাদি সুগন্ধি দিয়ে তাঁকে স্নান করালেন বৈদিক পঞ্চমন্ত্রে। আবার সবকিছু ভাল করে মুছে হলুদ, চন্দন ও বিভূতি লেপনের পর সুন্দর সিল্কের কাপড় দিয়ে চারপাশ ঢেকে শুধু লিঙ্গকে বার করে রাখলেন। তার ওপর একের পর এক মালা চাপিয়ে বেশ উঁচু করে দিয়ে তাতে বেলপাতা দিয়ে সাজিয়ে দিলেন। আমাদের পরিয়ে দেওয়া মালাটিও সেই শৃঙ্গারসজ্জায় স্থান পেল দেখলাম। অনেকটা উঁচু হয়ে গেল লিঙ্গের আকৃতি। একটি রূপার সাপ লিঙ্গকে বেষ্টন করে মাথায় ফণা ধরে বসিয়ে দেওয়া হলো। তারও ওপর মালা দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হলো। উত্তরমুখী এই লিঙ্গের ঠিক দক্ষিণ দেওয়ালে মা ভবানীর এক অপরূপ দণ্ডায়মানা বিগ্রহ আছে। তাঁর চারধারে রূপার কাজ করা ফ্রেমের মতো সাজানো আছে। মাকেও সুন্দর পট্টবস্ত্র ও স্বর্ণরৌপ্যের নানা অলঙ্কার ও ফুলের মালায় সাজানো হলো। দেবী উত্তরমুখী, হাত দুয়েক লম্বা। তবে মুখখানি বড় সুন্দর। ধাতুময়ী মূর্তি। সব সজ্জা হয়ে গেলে পূজারিরা এবার তিনদিক ঘিরে বসলেন। আরতির প্রস্তুতি শুরু হলো। এইসময় আমরা ছোট্ট গর্ভমন্দিরের বাইরে এসে দরজার সামনে বসলাম। মন্দিরের দুটি দ্বার। একটি উত্তরে, অন্যটি পশ্চিমে।

নাটমন্দিরে ছোট-বড় নানা আকৃতির বহু ঘণ্টা ঝোলানো আছে। এইসময় অনেক ভক্ত ক্রমে জড়ো হতে হতে নাটমন্দির ভরে গেল। তাঁরা সেইসব ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন। নাটমন্দিরের এককোণে রাখা বিরাট জয়ঢাক ও ডমরু বাজানো শুরু হলো। এবার পূজারিরা মন্ত্র উচ্চারণ করে চারজনে একসঙ্গে পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে আরতি আরম্ভ করলেন। সব শিবমন্দিরে প্রায় একই সুরে এই আরতিবন্দনা গাওয়া হয়—"জয় শিব ওঙ্কারা—ভজ শিব ওঙ্কারা/ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-সদাশিব অর্ধাঙ্গী ধারা।। ওঁ হর হর মহাদেব/... ব্রহ্মা-বিষ্ণু-সদাশিবজানত অবিবেকা/ প্রণবাক্ষর মে শোভিত যে তিনো একা/ ওঁ হর হর মহাদেব।" সত্যই এখানে শিব ওঁরূপী। যারা অবিবেকী, তারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিনকে পৃথক দেখে; তত্ত্বত এঁরা ঐ প্রণবমন্ত্র ওঁকারেই প্রকাশিত। সেই ওঁঙ্কারাত্মক শিবকেই স্মরণ ও ভজন করতে বলা হয়েছে ঐ বন্দনাগীতিতে। বড় সুন্দর মিলে যাচ্ছিল এই ওঙ্কারক্ষেত্রে ওঙ্কারেশ্বর শিবের এই আরতির স্তোত্রটি।

আরতি শেষ হতে গর্ভমন্দিরের ঠিক উত্তরে সামনে গর্ভগৃহের প্রায় সংলগ্ন একটি ছোট ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। এখানে একটি উঁচু বেদির ওপর তপস্বী ব্রহ্মবিদ্ ব্যাসতনয় শুকদেবের একটি প্রমাণকায় পাথরের মূর্তি আছে। তিনি যেন সর্বদা এই ওঙ্কারময় শিবকে দর্শন করছেন। এই ছোট কুটিরটিও একটি ঘটনার কেন্দ্রভূমি। প্রবাদ, এই কুটিরে এসে নিত্য গভীর রাত্রে শিবপার্বতী পাশা খেলেন। তার সাক্ষী স্বয়ং ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠ শুকদেব। আজও সেই খেলা চলে। জনশ্রুতি, এই ঘটনায় অবিশ্বাসী এক ইংরেজ সৈনিক স্বাধীনতার আগে গোপনে এই প্রকোষ্ঠে লুকিয়েছিল রাত্রে দেবতাদের সেই অক্ষক্রীড়া কিরকম চলে তা দেখার জন্য, যদিও সে জীবিত ফিরে আসতে পারেনি। কিন্তু ঐখানে তার একটি ডায়েরি পাওয়া যায়, তাতে সেই দৈবী ক্রীড়ার কিছু ইঙ্গিত সে লিখে যেতে পেরেছিল। ❑

শ্রীরামকৃষ্ণের চাবুক

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর বলতেন ঃ "মা আমায় রসেবশে রাখিস।" তিনি ছিলেন রস-স্বরূপ। সাহিত্যিক, কবি, গায়ক, শিল্পী—যে যেমন পারে শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপ অমৃতরস যত খুশি আহরণ করে নিলেও ঐ রস ফুরোবে না কোনদিন। কথাসাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ও সেই রস আহরণ করে নিজস্ব আঙ্গিকে পরিবেশন করেছেন।



আমার একটা বন্দুক আছে। তা থাক না। দেওয়ালে ঝুলে থাক। বন্দুক থাকা মানেই বাঘ কি মানুষ মারা নয়। ইচ্ছা চাই। মারার ইচ্ছা। শুধু ইচ্ছা হলেই হবে না। বন্দুকটির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। বন্দুক ছোঁড়ার কৌশল জানতে হবে। অবশেষে চাই সাহস।

আমার একটা মন আছে। বেশ ভাল কথা। সেই মন দিয়ে আমি ঈশ্বরকে জানব। ভগবানকে জানব। ইচ্ছা হয়েছে। তাহলে মনকে আগে চেনো। মন আছে, অবশ্যই আছে, তবেই না মানুষ! আশ্চর্যের কথা এই—অভিধানে 'মানুষ' শব্দের অর্থ মানুষ। আর যদি 'মানব' শব্দের অর্থ খুঁজি, তাহলেও পাব সেই এক অর্থ—মানুষ। মানব যখন বিশেষণ, তখন অর্থ দাঁড়াবে—মনু-সম্বন্ধীয়, মনু-প্রণীত। প্রণীত মানবধর্মশাস্ত্র। সুতরাং মন আছে, তাই মানব অথবা মানুষ—এমন বলা যাবে না। আমি মানুষ, আমার মন আছে। মন দিয়ে আমি ঈশ্বরকে জানব—এমন কথা বলার কোন অর্থ হয় না।

বন্দুকের সঙ্গে মনের এই মিল—বন্দুক দেওয়াল থেকে নেমে এসে নিজেই যেমন বাঘ মারতে যাবে না, সেরকম মনও নিজে নিজে ঈশ্বরকে জানতে যাবে না। বন্দুক অপ্রাণী। মন প্রাণের সঙ্গে সংযুক্ত। বন্দুক প্রাণী নয়। দেহ প্রাণী, অর্থাৎ প্রাণসম্পন্ন। 'প্রাণ' মানে শ্বাস। বায়ুনির্ভরতা। যা শ্বসমান। শ্বাস বন্ধ হলে মৃত। পচনশীল। তাহলে বায়ু যার পরিচালক, তার স্বভাব বায়ুর মতোই হবে। কখনো উত্তরে ধায় তো কখনো পুবে। সদা এলোমেলো। বায়ু যেমন স্থির হয় না কখনো, মনও সেরকম সদা অস্থির। মনের প্রধান ধর্ম হলো চিন্তা। মন আছে কিনা বুঝব কেমন করে? চিন্তা দেখে। অজস্র চিন্তা, শতমুখী চিন্তা। এত চিন্তা যে, সময় সময় বোঝাই যায় না মন চিন্তা করছে কিনা! যেমন পাখার ব্লেড খুব দ্রুত ঘুরলে সন্দেহ হয়, ঘুরছে কি? বাতাস পেয়ে বোঝা যায়—ঘুরছে। মনের একটা ত্বক আছে, তার নাম বোধ, জ্ঞান, চেতনা। জ্ঞান হলো অভিজ্ঞতার স্তূপ।

সবই হলো, কিন্তু মন সম্পর্কে সেই জ্ঞান হলো না, যে-জ্ঞান হলে তাকে স্ব-নিয়ন্ত্রণে আনা সহজ হতে পারে। প্রশ্নটা রয়েই গেল—মনের আমি, না আমার মন? ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যেন বলছেন, মনটা ঈশ্বরকে দিয়ে রাখ। ঈশ্বরের কাছে ফেলে রাখ। যেমন রোদ লুটিয়ে থাকে উঠানে, সেরকম ঈশ্বরের অঙ্গনে লুটিয়ে দাও।

ঠাকুর বলছেন, মনের বিচরণভূমি সাতটি। আমাদের দেহ যেন সাততলা একটি মিনার। সেই মিনারের গম্বুজ হলো আমাদের মাথা। নিচের তিনটি তলা হলো সংসার। লিঙ্গ, গুহ্য আর নাভি। তান্ত্রিক বলবেন, যোগীও বলবেন ঃ তিনটি চক্র—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান আর মণিপুর। ঠাকুরের ভাষায়, এই তিনটি স্থানে মহা 'র‍্যাজলা'। কাম আর কাঞ্চনের হইচই। গোবরে যেমন জোনাকি আটকে যায়, আমাদের মনও সেইরকম থেবড়ে থাকে। ওপরের তলায় আর উঠতে চায় না। ভাবে, বেশ আছি। ঠাকুর বলছেন ঃ "কামিনী-কাঞ্চনে জীবকে বদ্ধ করে। জীবের স্বাধীনতা যায়। কামিনী থেকেই কাঞ্চনের দরকার। তার জন্য পরের দাসত্ব।"

দুটি অপূর্ব উপমায় বিষয়টিকে বুঝিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ —"জয়পুরে গোবিনজীর পূজারিরা প্রথম প্রথম বিবাহ করে নাই। তখন খুব তেজস্বী ছিল। রাজা একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তা তারা যায় নাই। বলেছিল, 'রাজাকে আসতে বল।'[১] তারপর রাজা ও পাঁচজনে তাদের বিয়ে দিয়ে দিলেন। তখন রাজার সঙ্গে দেখা করবার জন্য আর কাহারও ডাকতে হলো না। নিজে নিজেই গিয়ে উপস্থিত। 'মহারাজ, আশীর্বাদ করতে এসেছি, এই নির্মাল্য এনেছি,

১ গীতাভাষ্যকার, অদ্বিতীয় বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতী সম্রাট আকবরের দূতকে অনুরূপ কথাই বলেছিলেন। সম্রাট যমুনার তীরে তাঁর আশ্রমে এসে দেখা করেছিলেন।

ধারণ করুন।' কাজে কাজেই আসতে হয়; আজ ঘর তুলতে হবে, আজ ছেলের অন্নপ্রাশন, আজ হাতেখড়ি—এইসব।

"বারশো ন্যাড়া আর তেরশো নেড়ী, তার সাক্ষী উদম সাড়ি—এ-গল্প তো জান। নিত্যানন্দ গোস্বামীর ছেলে বীরভদ্রের তেরশো ন্যাড়া শিষ্য ছিল। তারা যখন সিদ্ধ হয়ে গেল, তখন বীরভদ্রের ভয় হলো। তিনি ভাবতে লাগলেন—এরা সিদ্ধ হলো, লোককে যা বলবে তাই ফলবে; যেদিক দিয়ে যাবে সেইদিকেই ভয়; কেননা লোক না জেনে যদি অপরাধ করে, তাদের অনিষ্ট হবে। এই ভেবে বীরভদ্র তাদের বললেন, 'তোমরা গঙ্গায় গিয়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক করে এস।' ন্যাড়াদের এত তেজ[২] যে, ধ্যান করতে করতে সমাধি হলো। কখন জোয়ার মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে হুঁশ নাই। আবার ভাঁটা পড়েছে, তবু ধ্যান ভাঙে না। তেরশোর মধ্যে একশো বুঝেছিল বীরভদ্র কি বলবেন। গুরুর বাক্য লঙ্ঘন করতে নাই, তাই তারা সরে পড়ল, আর বীরভদ্রের সঙ্গে দেখা করলে না। বাকি বারশো দেখা করলে। বীরভদ্র বললেন, 'এই তেরশো নেড়ী তোমাদের সেবা করবে। তোমরা এদের বিয়ে কর।' ওরা বললে, 'যে আজ্ঞা, কিন্তু আমাদের মধ্যে একশোজন কোথায় চলে গেছে।' ঐ বারশোর এখন প্রত্যেকের সেবাদাসী সঙ্গে থাকতে লাগল। তখন আর সে-তেজ নাই, সে-তপস্যার বল নাই। মেয়েমানুষ[৩] সঙ্গে থাকাতে আর সে-বল রইল না; কেননা সেসঙ্গে স্বাধীনতা লোপ হয়ে যায়।"

এরপরে ঠাকুর সংসারীর অবস্থা বর্ণনা করছেন। একপাশে বসে আছেন বিজয়কৃষ্ণ। তাঁর দিকে তাকিয়েই বলছেনঃ "তোমরা নিজে নিজে তো দেখছ, পরের কর্ম স্বীকার করে কি হয়ে রয়েছ। আর দেখ, অত পাশ করা, কত ইংরাজি-পড়া পণ্ডিত মনিবের চাকরি স্বীকার করে তাদের বুটজুতার গোঁজা দুবেলা খায়। এর কারণ কেবল কামিনী। বিয়ে করে নদের হাট বসিয়ে আর হাট তোলবার জো নাই। তাই এত অপমানবোধ, দাসত্বের যন্ত্রণা।"

শ্রীরামকৃষ্ণ আরেকটি শব্দ নিয়ে এলেন, সেটি হলো 'হুঁশ'। আমরা জেগে আছি, না ঘুমিয়ে আছি? জেগে থাকলে সেই জাগরণের 'কোয়ালিটি'টা কিরকম? গীতার (২।৬৯) সেই অসাধারণ শ্লোকটিঃ

"যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।।"

বিষয়, সংসার, কামনা-বাসনা রাত্রিস্বরূপ। অন্ধকারে 'কনসার্ট'। এই টাকা গুনছে, হিসাবের খাতা লিখছে। রেগে গিয়ে তাল ঠুকছে—"আমি কে জানিস?" বউ মারা গেল, ভীষণ বৈরাগ্য! বছর ঘুরতে না ঘুরতেই দ্বিতীয় পক্ষ! একে আঁচড়াচ্ছে, ওকে কামড়াচ্ছে! সকলকে জ্ঞান দিচ্ছে—বাস্তবকে বোঝ, ফাইট কর, সংগ্রাম কর ইত্যাদি। তড়বড় তড়বড় করে এদিকে দৌড়াচ্ছে, ওদিকে দৌড়াচ্ছে। 'আমি বড্ড বিজি প্রোফেসনাল ম্যান।' বাইবেল প্রশ্ন করছেনঃ "ফর হোয়াট ইজ ইওর লাইফ? ইট ইজ ইভন এ ভেপার দ্যাট অ্যাপিয়ারেথ ফর এ লিটল টাইম, অ্যাণ্ড দেন ভ্যানিশেথ অ্যাওয়ে।" 'জীবন' 'জীবন' করছ, তোমার জীবন তো ভাই একটি বাষ্প। আলেয়ার মতো। দপ্ করে জ্বলে উঠল। কিছুক্ষণ ভেসে বেড়াল এদিক-ওদিক। তারপরেই অন্ধকার। বিষয়েতে জন্ম, বিষয়ে জাগা, বিষয়ে মৃত্যু। বিষয়ে জেগে থাকা মানে প্যাঁচা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (১।৪৮) বলছেনঃ

"দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে।
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ।।"

প্যাঁচা দিনে দেখে না, রাতে দেখে। কাক রাতে অন্ধ। কেঁচো প্রভৃতি প্রাণীর দৃষ্টিশক্তিই নেই। আবার বিড়াল ও রাক্ষসাদি দিনেও যেমন দেখতে পায়, রাতেও সেইরকম। শ্রীশ্রীচণ্ডী বলছেন দৃশ্যমান জগতের কথা—বাইরের জগতের কথা, আর গীতা বলছেন মনোজগতের কথা।

এই জগৎ—যেটাকে নিয়ে আমাদের দিবারাত্র হইচই—সেটা কি আছে? না ভ্রম! বাইরের জগৎ মনে বাসা বেঁধে আছে। ভীষণ সত্য বলে মনে হচ্ছে। মনকে যোগে স্থাপন করে সমাধিতে পৌঁছাতে পারলে অন্য কিছু দেখব। দেখব একজনই আছেন। পুরুষ। তিনি প্রকৃতির হাত ধরে বেড়াতে বেরিয়েছেন। স্বপ্ন ভ্রমণ। চিৎ-শক্তির ভেলকি। বিরাট মন, বিরাট পুরুষ। 'পুরুষ' মানে মানুষ নয়—ইচ্ছাশক্তির আধার। যে-ইচ্ছা আকাশে সূর্য হবেন, স্নিগ্ধ চন্দ্র হয়ে তারাদের হাত ধরে গগনে প্রকাশিত হবেন। পর্বত সুমেরু হয়ে মেঘের কাছ থেকে আদায় করে নেবেন তুষারকিরীট। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বললেনঃ "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।" (৩।৮।৯) যাজ্ঞবল্ক্য গার্গিকে বলছেনঃ "হে গার্গি! এই অক্ষর ব্রহ্মেরই প্রশাসনে সূর্য ও চন্দ্র বিধৃত হয়ে অবস্থিত আছেন। ভূলোক, দ্যুলোক, নিমেষ, মুহূর্ত, দিবা, রাত্রি ইত্যাদি বিধৃত হয়ে আছে, নদীসকল প্রবাহিত হচ্ছে।" আবার তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলছেনঃ "যতো বা ইমামি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্মেতি।" (৩।১) এই অখিল ভূতবর্গ যা থেকে উৎপন্ন হয়ে যার দ্বারা বর্ধিত হয়

২ তেজ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের ব্রহ্মচর্যের শক্তি।
৩ বিদ্যারূপিণী স্ত্রী মায়ার বাঁধন খুলে দেন। শ্রীমা সারদাদেবী যেমন।

এবং বিনাশকালে যাঁতে গমন করে ও যাঁতে বিলীন হয়—তাঁকে জানতে ইচ্ছুক হও। তিনিই ব্রহ্ম।

গীতা ব্রহ্মঘেঁষা, আর চণ্ডী শক্তিঘেঁষা। জগৎঘেঁষা গীতা হলেন আত্মার বার্তাবহ, আর চণ্ডী হলেন কর্ম আর কর্মফল-ঘেঁষা। আধুনিক শক্তি-বিজ্ঞানের ছায়া! কি মানুষ, কি পশু—সকলেরই বিষয়জ্ঞান আছে। জগৎ মহামায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত। আর এই মহামায়া অতি নিষ্ঠুর। কেন?

"তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়া প্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণা।।"

(চণ্ডী, ১।৫৩)

সংসারের স্থিতিকারিণী মহামায়ার প্রভাবে জীবগণ মোহরূপ গর্তে ও মমতারূপ আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়। জগৎকে স্বীকার করা গেল। ঠাকুরও করলেন, যখন বললেন—ব্রহ্মও সত্য, মায়াও সত্য। তবে ব্রহ্মের মায়া, মায়ার ব্রহ্ম নয়। ব্রহ্মকে যদি 'ঈশ্বর' বলা হয়, তাহলে ঈশ্বরে সব আছে, ঈশ্বর কোনকিছুতেই নেই। একমাত্র ঈশ্বরেই ঈশ্বর আছেন, তাঁর কোন বিকল্প নেই। আরো পরিষ্কার করে বললেন—সমুদ্রের ঢেউ, ঢেউয়ের সমুদ্র নয়। আরো বললেন, জীবজগৎ ঈশ্বরের চৈতন্যে জরে আছে।

এই জগৎ, কীট-পতঙ্গ, সাপ, নেউল, হাতি, গণ্ডার সবই আছে। সাপে কামড়ালে মানুষ মরবে। আত্মা দেহ ছেড়ে কোন্ লোকে যাবে জানা নেই; তবে এই অসংখ্য 'আমি'র একটা আমি সর্পাঘাতে বিদায় নেবে। ঠাকুর 'আমি'র ব্যাখ্যা করছেন—'অহঙ্কার'। আত্মার পাশে তার অবস্থান। সেটা উঠে গেলে একটা কলরবের শান্তি। বড় 'আমি' নয়, এই ছোট 'আমি'টারই বিপদ। ঠাকুর বলছেন—'কাঁচা আমি'। আবার মৃত্যুর সামনে এসে তার বোধ প্রসারিত হয়। যেমন, মৃত্যুর মুহূর্তে বিখ্যাত বিখ্যাত মানুষের উক্তিই তার প্রমাণ। বিঠোভেন স্বর্গ দেখতে পেলেন। বললেন ঃ "I shall hear in heaven." খ্যাতির শীর্ষে তিনি তাঁর শ্রবণশক্তি হারিয়েছিলেন। তাই এই আশা নিয়ে গেলেন, স্বর্গে গিয়ে শুনতে পাবেন। ফরাসি বিপ্লবের নায়ক দাঁতো গিলোটিনে যাওয়ার কয়েক মুহূর্ত আগে শেষকথাটি বললেন ঃ "আমার মাথাটা জনসাধারণকে দেখাতে ভুলো না, কারণ বহুকাল পরে এমন একটি মাথা হয়তো দেখতে পাবে।" চতুর্থ জর্জ অন্তিম মুহূর্তে তাঁর বালক-ভৃত্যকে বলছেন ঃ "ওয়ালি! এ কিরে! এ তো মৃত্যু! ওরা আমাকে ঠকিয়েছে!" বিখ্যাত লেখক ও. হেনরি বললেন ঃ "সব আলো জ্বেলে দাও, আমি অন্ধকারে বাড়ি ফিরতে চাই না।" আবার রুজভেল্ট বললেন ঃ "সব আলো নিভিয়ে দাও।" বিখ্যাত নর্তকী পাভলোভা বললেন ঃ "Get my swan costume ready."—আমার নাচের সাজ তৈরি রাখ।

তাহলে জন্ম, জীবন, মৃত্যু—এই পর্বটিকে মেনে নেওয়াই ভাল। ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যু চোখের সামনে দেখছেন ঠাকুর। মা-মরা ছেলে অক্ষয়কে দক্ষিণেশ্বরে আসার আগে পর্যন্ত ঠাকুর কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন। অক্ষয়ের পিতা রামকুমার পুত্রকে কখনো কোলে করেননি। কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতেন ঃ "মায়া বাড়িয়ে লাভ কি? এ-ছেলে বাঁচবে না।" অক্ষয় ক্রমে যুবক হলেন। অতি রূপবান, যেন সাক্ষাৎ শিব! বিষ্ণুঘরের পূজারি হলেন। বিবাহ হলো। হঠাৎ অসুখ! দক্ষিণেশ্বরে রোগশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে ঠাকুর বললেন ঃ "অক্ষয়, বল—গঙ্গা, নারায়ণ, ওঁ রাম।" তিনবার। ঐ মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে অক্ষয় চলে গেলেন। ঠাকুর দেখছেন। মৃত্যু দেখছেন। পরে বলছেন তাঁর সেই অভিজ্ঞতার কথা—"অক্ষয় মলো, তখন কিছু হলো না। কেমন করে মানুষ মরে, বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। দেখলুম যেন, খাপের ভেতর তলোয়ারখানা ছিল, সেটাকে খাপ থেকে বার করে নিল। তলোয়ারের কিছু হলো না, যেমন তেমনি থাকল, খাপটা পড়ে রইল। দেখে খুব আনন্দ হলো, খুব হাসলুম, গান করলুম, নাচলুম। তার শরীরটাকে তো পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে এল। তার পরদিন ঐখানে (পূর্বদিকের বারান্দায়) দাঁড়িয়ে আছি, আর দেখছি কি, যেন প্রাণের ভিতরটায় গামছা যেমন নিংড়ায় তেমনি নেংড়াচ্চে।"

অক্ষয়ের মৃত্যু ঠাকুর ভুলতে পারেননি। সাতবছর পরেও অশ্রুবিসর্জন করছেন। তিনি নিজে তো 'বাচ' খেলতেন। এপারে অনিত্য, ওপারে নিত্য। সসীম আর অসীম। স্বেচ্ছা-বিচরণ। সমাধিতে থাকার সময় দেখতেন, এদিকে কিছু নেই, ওদিকে সব মোমের ঘরবাড়ি, গাছপালা। সমাধিপথেই ঋষিলোকে গিয়ে তিনি ডেকে এনেছিলেন নরেন্দ্রনাথকে। আত্মার রহস্য প্রত্যক্ষভাবে জানতেন বলেই মায়ার দাপট বুঝতেন। একটি কথা বলতেন, ভূত কি জানলে ভূতের ভয় থাকে না। আত্মজ্ঞান হলেই হবে না, মায়ার জ্ঞান থাকা চাই। কারণ, ভুবনজোড়া মায়ার ফাঁদ পাতা। ঠাকুর একটি গান করতেন—

"মহামায়ার এমনি মায়া রেখেছে কি কুহক করে
ব্রহ্মাবিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি জানিতে পারে।"

তিনি অবতার, মুক্তপুরুষ, প্রেমস্বরূপ অবশ্যই। আমাদের খুব ভাবতে ইচ্ছে করে, তিনি হলেন জগৎ-সার্কাসের ট্রেনার। হাতে চাবুক। সার্কাসের বাঘ আগুনের রিং-এর ভিতর দিয়ে কেমন গলে যায়! ঠাকুরের চাবুকে মন উঠতে থাকে—দেহের চতুর্থ ভূমি 'অনাহত'-এ। ওঠ আরো ওপরে—'বিশুদ্ধ'-এ। সেখান থেকে 'আজ্ঞা' চক্রে। ঠাকুর, দি গ্রেট টিচার। ❑

পাবলো পিকাসো ঃ ফিরে দেখা

দেবরূপ গঙ্গোপাধ্যায়

পাবলো পিকাসো দীর্ঘ ৯১ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর সৃষ্টির ব্যাপ্তিও ছিল বিশাল। বহুধাবিভক্ত তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব। ছোট একটি নিবন্ধে তাঁর সম্পর্কে গুছিয়ে বলা শক্ত। তবু শিল্পজগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত প্রবন্ধকার নিজের অনুভবের প্রেক্ষাপটে পিকাসোর মূল্যায়ন করেছেন। তত্ত্ব ও তথ্য-ভিত্তিক এই নিবন্ধ আশা করি পাঠকদের ভাল লাগবে।

ইহবাদী পাশ্চাত্যদেশ বাস্তবকে এবং ভাববাদী ভারতবর্ষ 'আইডিয়ালিটি'কে শিল্পের মৌল ভিত্তি করেছে। উভয় ক্ষেত্রেই গৌরবান্বিত শিল্প সৃষ্টি হয়েছে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

পৃথিবীর ইতিহাসে সৃষ্টির সেই শুরু থেকে ছবি এঁকে আসছে মানুষ। ভূমধ্যসাগর পারের মহাদেশ ইউরোপে বহু প্রাচীন কাল থেকে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ ও আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠত্বের বিজয়পতাকা ওড়ানোর জন্য একে অন্যের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গোলাবারুদের কালো ধোঁয়ায় নীল আকাশ ক্রমশ কালো হয়ে গেছে, যার রেশ খ্রিস্টপূর্ব কাল থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত দেখা গেছে। অবশ্য এখনো বন্ধের কোন লক্ষণ নেই। ইউরোপের মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখি, এই মহাদেশটি সমুদ্রবেষ্টিত। আল্পস পর্বতকে কেন্দ্র করে ছোট-বড় দেশে বিভক্ত। এইসব দেশ স্বভাবতই নৌশক্তিতে বলীয়ান ছিল। সামরিক শক্তির পাশাপাশি গান-বাজনা, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও বিজ্ঞানচর্চাকে আপন আপন বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিল তারা। সেখানে গুণী শিল্পীদের রাজ-অনুগ্রহ পেতে অসুবিধা হয়নি। রাজার নির্দেশে ভাল শিল্পীদের খুঁজে নিয়ে আসত রাজকর্মচারীরা। চার্চের দেওয়ালে যিশুর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরতেন তাঁরা।

দেওয়ালে ছবি আঁকার ব্যাপারটা বহু প্রাচীন। প্রায় কুড়িহাজার বছর আগে বন্য যাযাবর মানুষ পর্বতগাত্রে উন্নত মানের বাইসনের ছবি এঁকেছে আর্থ কালার (Earth Colour)-এর সাহায্যে—ফ্রান্সের লেলিক্স ও আলতমিরা গুহাতে।

প্রায় দুশো বছর আগে 'রিয়েলিজম্'-এর পর থেকে আধুনিক চিত্রকলার শুরু। ইমপ্রেসেনিজম্ ধারার পরবর্তী সময়ে পল সেজান জোরালো ফর্ম-নির্ভর ছবি করেন—যা পাবলো পিকাসোকে ফর্ম-নির্ভর ছবি নিয়ে গবেষণার দিকে ঠেলে দেয়। পাবলো পিকাসো স্পেনের মালাগার আন্দালুসিয়ায় ১৮৮১ সালের ২৫ অক্টোবর জন্মেছিলেন। বাবা হোসে রুইজ ব্লাসকো ও মা মারিয়া পিকাসো লোপেজের বড় ছেলে তিনি। তাঁর ভাইয়ের নাম 'ডঞ্জো' (Donjo)। বাবা স্থানীয় আর্ট কলেজের অঙ্কনশিক্ষক ছিলেন। বাবার কাছেই তাঁর চিত্রকলায় হাতেখড়ি। তিনি ছোটবেলায় স্কুলে যেতে চাইতেন না। বন্ধুদের সঙ্গে পায়রা উড়িয়ে, বাবার সঙ্গে ষাঁড়ের লড়াই দেখে সময় কাটাতেন —তার সঙ্গে ছবি আঁকা তো ছিলই। বাবার অসমাপ্ত ছবিগুলিতে ছোট ছোট আঁচড় টেনে শেষ করা ছিল তাঁর অন্যতম খেলা। ১৪ বছর বয়সে তিনি রেনেসাঁ ও পরবর্তী কালে অন্য শিল্পীদের মতো চিত্রকলায় পারদর্শিতা লাভ করেন। ১৮৯৫ সালে স্পেনের বার্সিলোনাতে তিনি La Lonza Academy-তে ভর্তির জন্য যান।



সৃষ্টি ও স্রষ্টা

এর পরে পিকাসোর জীবনে একটা বড় বাঁক আসে। ১৯০০ সালে তিনি প্যারিসে চলে আসেন। প্যারিস হলো তৎকালীন বিশ্বের চিত্রকলার রাজধানী—তাবৎ বিশ্বের বহু শিল্পরসিক, শিল্পী, কবি, আর্ট-ডিলারদের ভিড়। এখানে মডার্ণ আর্ট-এর বিভিন্ন গতিপ্রকৃতির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। এর প্রভাব এখনো বর্তমান। প্যারিসে এলে তিনি মাঝে মাঝে নিজের বাড়ি ঘুরে যেতেন। ১৯০৪ সালে এক কবি-বন্ধু ফারনাণ্ডি অলিভিয়েরার সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। এইসময়ে তিনি সন্ধ্যাটা প্যারিসের কাফে, রেস্টুরেণ্টে বন্ধু-পরিবৃত হয়ে কাটাতেন। তিনি যে-বাড়িতে উঠেছিলেন—সেখানকার মালিকের পছন্দ হয়নি পিকাসোর কাজকর্ম,

রকমসকম এবং তাঁকে বেশিদিন থাকতে দিতেও রাজি হননি। অবশ্য পরবর্তী কালে পিকাসোর নামযশ হওয়ার পর তাঁর থেকে ছবি কিনে তিনি ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন।

তখন গভীর রাত—পান্থশালাগুলো সবে ফাঁকা হতে শুরু করেছে। মমার্তের (প্যারিস) এক নির্জন রাস্তায় গাঢ় অন্ধকার আর বরফঠাণ্ডা হাওয়াকে ভেদ করে ঘোড়ার গাড়ি করে তৎকালীন স্টুডিও 'রুরডিঞ'-র দিকে এক সুবেশ পুরুষ মুখে চুরুট নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। পাশে সিটের ওপর টুপিটি রাখা আছে। হাতের চেটো দিয়ে চোখের ওপর হাত বোলালেন তিনি। চোখদুটো জ্বালা জ্বালা করছে। গত কয়েকদিন ধরে তীব্র বৈদ্যুতিক আলোয় 'ভিখারি', 'গিটার' ইত্যাদি ছবি আঁকতে হয়েছে তাঁকে। শরীর, মন ক্লান্ত। 'রুরডিঞ'-এর দরজায় আসতেই পিকাসোর মনে পড়ল—'ভিখারি' ছবিটির ফিনিশিং বাকি। মনে মনে ভাবলেন, এই ছবিগুলো যদি না দাঁড়ায় তাহলে সর্বনাশ! সব ভুলে গিয়ে রঙ-তুলি-ইজেল নিয়ে তিনি আবার ছবি আঁকতে মেতে গেলেন। ছবি আঁকতে আঁকতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছেন মনে নেই। ঘড়ির এলার্মের শব্দে সূর্যোদয়ের আগেই ঘুমটা ভেঙে গেল। মনে পড়ল, ফুলের তোড়াগুলো শুকিয়ে গেছে ঘরের বিভিন্ন অলিন্দে। বেরিয়ে পড়লেন ফুলের তোড়া কিনতে। রাস্তায় রক্তিমাভ সূর্যরশ্মি এসে পড়েছে। তার মধ্য দিয়ে পিকাসো হেঁটে চলেছেন। মনে তখন এক অনবদ্য সৃষ্টির রূপকল্পনা তাঁকে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

এই স্পেনীয় শিল্পীর সমালোচনা-আলোচনা তৎকালীন সমাজে কম হয়নি। আবার একথাও সত্য, সমসাময়িক এবং পরবর্তী কালের খুব কম শিল্পীই তাঁর প্রভাব এড়িয়ে কাজ করতে পেরেছেন। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত পিকাসোর স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠেছে নীলপর্ব, গোলাপীপর্ব, কিউবিজম, (পরিদৃশ্যমান জগতের ভূমিভাগ, উদ্ভিদ, ঘরবাড়ি, আকাশ, দেহাবয়ব প্রভৃতিকে জ্যামিতিক আকার ও ঘনক্ষেত্রে রূপান্তর) কোলাজ প্রভৃতি নব নব ধারার আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। গ্রাফিক্স, ভাস্কর্য ও পটারীর ওপরেও তিনি যুগান্তকারী কাজ করেছেন।

আধুনিক কালের অন্যান্য কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পী হলেন—ম্যাতিস, পল ক্লী, কান্দিনস্কি, মিরো, ব্রাক, রুয়াল্ট, শাগাল, সালভাদোরদালী, ম্যালভিচ, মন্দ্রিয়ান, জ্যাক্সন পোলক ও হেনরী মূর প্রমুখ। কিন্তু পিকাসোর কাজে একটা রহস্যময়তা আছে। দুঃখ, হতাশা, জীবনের নানান গতিময়তা, উদ্দামতা মেশানো তাঁর ছবি যেন সমস্ত চাওয়া-পাওয়ার আবেগজারিত একটি মানুষের অনন্য জীবনচিত্র। তিনি লিখেছিলেন ঃ "I do not paint what I see, I paint what I know."—আমি যা দেখি তা আমি আঁকি না, আমি যা জানি তা-ই আঁকি। অন্যত্র লিখেছিলেন ঃ "Why would I try to imitate nature? I might just as well try to trace the perfect circle."—প্রকৃতিকে অনুসরণ করব কেন? বরং একটি নিখুঁত বৃত্ত আঁকার চেষ্টা করি।



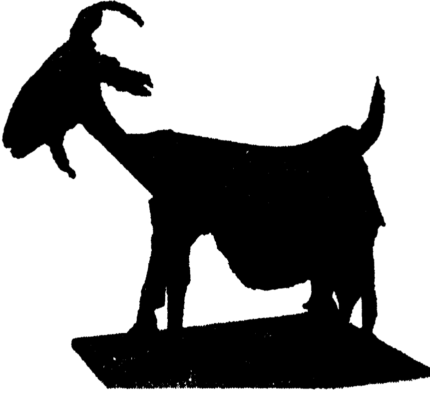
উইপিং ওম্যান

শিল্পজগতে তিনি নিঃসন্দেহে এক বড়মাপের সাধক। তিনি একাধিক বিবাহ করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন যথেষ্ট। তাঁর এই মানসিক আঘাতের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে 'Weeping woman' বা 'ক্রন্দনরতা মহিলা' ছবিতে। ১৯৩৭ সালের কোন একসময়ে আঁকা হয়েছিল এই ছবি। শিল্প-বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই ছবির সঙ্গে তাঁর 'গার্ণিকা' (Guernica) ছবির



গার্ণিকা

যোগসূত্র আছে। এবং ঐসময়ে তাঁর নাকি প্রচণ্ড মাথাধরা বা মাইগ্রেনের কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। লণ্ডনের 'Guardian News'-এর একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করে কিছুদিন আগে 'The Hindusthan Times' এই প্রসঙ্গে একটি সংবাদ প্রকাশ করেছে। অঙ্কনে বিশেষ পারদর্শিতা ছিল তাঁর। লাল, হলুদ প্রভৃতি রঙের সাহায্যে তাঁর এই ছবিটিতে যে আধা বিমূর্ত ভাব প্রকাশ পেয়েছে, তা এযুগের শিল্পকর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে, মিলাব তাই জীবনগানে।"



গর্ভবতী ছাগল

স্পেনের মানুষ হলেও জীবনের বেশির ভাগ সময়ই পিকাসো ফ্রান্সে অতিবাহিত করেন। তবে স্পেনের চিত্রকলার ঐতিহ্য থেকে খুব একটা সরে আসেননি তিনি। তাই তিন দিকপাল—এল গ্রেকো, ভেলাসকেথ ও গাইয়ারকে তাঁর উত্তরসূরি হিসাবে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। পিকাসোর মৃত্যুর পর ২৯ বছর অতিক্রান্ত হতে চলল। প্রথাকরণ (technique) ও বিষয়ের নিত্যনতুন ধারা বয়ে চলেছে, কিন্তু পিকাসোর গুরুত্ব কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি। বস্তুত, তাঁর ভিতরের কবিত্ব এবং শিল্পীর প্রতিভা একত্র সমন্বিত হয়ে এক অপূর্ব শৈলীধারা আবির্ভূত হয়েছে। তিনি একটি নতুন প্রথা থেকে আরেকটি নতুন প্রথার জন্ম দিয়েছেন। ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র থেকে সৃষ্টি হয়েছে নতুন শিল্পকর্ম। চিরাচরিত প্রথা থেকে বেরিয়ে এসে তিনি ১৯৫১ সালে নির্মাণ করেছেন—'গর্ভবতী ছাগল' (ভাস্কর্য), 'ফুলদানি' (ভাস্কর্য) ইত্যাদি। এছাড়া তিনি বহুবর্ণের লিনোকাট[১] রচনা করেছেন ১৯৬২ সালে।



ফুলদানি

১৯৩২ সাল ও তার নিকটবর্তী সময়ে খবরের কাগজ, ম্যাগাজিনের পাতা, বিল, টিকিট ইত্যাদি থেকে তিনি 'কোলাজ' সৃষ্টি করেন। বস্তুত, 'collect' শব্দ থেকেই 'কোলাজ'-এর উৎপত্তি। এটি একটি সম্পূর্ণ নতুন প্রথা। এই নতুনত্বের ব্যাপারটা 'গার্ণিকা'র ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। এতে যে 'চিত্রভাষা'র সৃষ্টি হয়েছে, তা এককথায় যুগান্তকারী। আসলে 'গার্ণিকা' একটি বৃহৎ ছবি (২৫×১১ ফুট)। Basgue-এর রাজধানী 'গার্ণিকা'র ওপর প্লেন থেকে বোমাবর্ষণ করে জার্মানি ১৯৩৭-এর ২৬ এপ্রিল। পৃথিবীর



সালটিম্ব্যাঙ্কুয়ের পরিবার

---

১ গ্রাফিক্সের একটি ধারা লিনোকাট। সহজ কথায় একধরনের ছাপচিত্রও বলা যেতে পারে। একটু মোটা ধরনের রবারের পটের একদিকের তলের উঁচু-নিচু ভাব ও টেক্শ্চারকে কাজে লাগিয়ে সাধারণত কালো কালির সাহায্যে ছাপচিত্র করা হয়। আমরা এর নিদর্শন পাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সহজপাঠ'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে নন্দলাল বসুর আঁকা চিত্রগুলিতে।

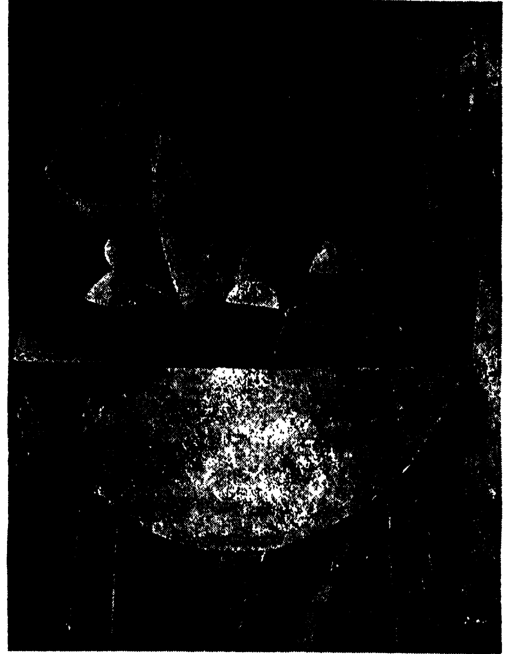
অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই ছবিটি ঐ আক্রমণেরই প্রতিক্রিয়া। 'The Family of Saltinebangues' (সালটিম্‌ব্যাঙকুয়ের পরিবার) ছবিটিও ১৯০৫ সালে আঁকা বড়মাপের এক চিত্র। এটি পিকাসোর নীলপর্বের পরবর্তী কালের—অর্থাৎ 'rose period' বা গোলাপী পর্বের ছবি। সার্কাসের বিভিন্ন মানুষ ও কর্মীর বৈশিষ্ট্য এতে ধরা পড়ে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে একজন মোটাসোটা বয়স্ক মানুষ, দুজন এক্রোব্যাট এবং একজন যুবতী নর্তকী। যেন এরা কিছু সময়ের জন্য চুপচাপ। কথা বলছে না। কী যেন ভাবছে।

মধ্যবয়সে পিকাসোর একটা অদ্ভুত ক্যারিশমা লক্ষ্য করা যেত। তাঁর ছবির পাশাপাশি একটা দেখনদারী হাবভাব, পাঁচটি বিবাহ, কাব্য ও সাহিত্যচর্চা, সাধারণ জীবজন্তুর প্রতি বিশেষ প্রেম, অন্যদিকে যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনৈতিক টেনশন ইত্যাদি সবকিছু তাঁর জীবনে একটা অন্য মাত্রা এনে দিয়েছিল। এবং সেটা যেন নতুন নতুন সৃষ্টির অনুঘটকের কাজ করত।



দি আফ্রিসিয়ানদো

পিকাসোর 'The Africiando' (দি আফ্রিসিয়ানদো) ছবিটি ১৯১২ সালে আঁকা। এটি বিশ্লেষণী ঘনকবাদ এবং সংশ্লেষণী ঘনকবাদের মধ্যবর্তী সময়ের। এতে 'form'-এর 'overlapping' এবং রঙের প্রাচুর্য দেখা যায়। 'Still life' (স্থিরচিত্র)[২] ছবিটি ১৯০৮-এ আঁকা। এই ছবিতে পল সেজানের বস্তুর গঠনবৈশিষ্ট্যের ওপর নতুন কিছু সংযোজন করে পিকাসো যুগান্তকারী 'কিউবিজম্'-এর সৃষ্টি করেন। এতে তিনটি তলের বিভ্রম সৃষ্টি করা যায়। এই ধরনের কাজের অনুবর্তী কিছু কাজ এদেশে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কোন ছবিতে দেখা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পিকাসোর ছবির পাশাপাশি রামকিঙ্কর বেজের ছবিও ইউরোপে কোন কোন গ্যালারিতে দেখানো হয়েছে।

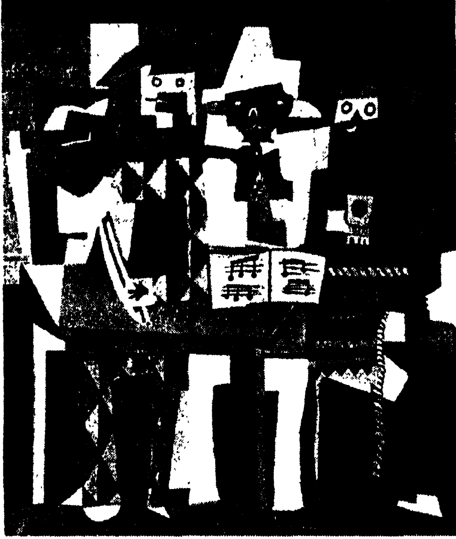


স্টিল লাইফ

বাল্যকালে পিকাসো কিছুদিন আইবেরিয়ান উপদ্বীপে কাটিয়েছেন। সেখানকার প্রত্নতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক অবস্থান, আকাশে-বাতাসে ভূমধ্যসাগরীয় স্নিগ্ধতা, স্থানে স্থানে রোমক ও ঔপনিবেশিক দুর্গের ভগ্নাবশেষ প্রাথমিকভাবে পিকাসোর মনকে নাড়া দিয়েছিল। তাঁর বিভিন্ন ড্রইং এবং ল্যাণ্ডস্কেপে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'The Three Musicians' (তিন সঙ্গীতশিল্পী) ছবিটি পিকাসো ১৯২১ সালে এঁকেছিলেন। দেখা যাচ্ছে, এখানে

২ এটি মূলত শিল্পশিক্ষণ পর্বে বিভিন্ন ধরনের বস্তুর আকার, আয়তন, তাদের গুণগত বৈশিষ্ট্য ও একটি বস্তু থেকে অন্য বস্তুর দূরত্ব (একদিকে কোন আলোর উৎস থেকে) অঙ্কনের অনুশীলন করা হয়। বহু গুণী শিল্পী স্টিল লাইফ এঁকেছেন, কিন্তু পিকাসো, ম্যাতিস প্রমুখ এই বিষয় নিয়ে চিত্র অঙ্কন করে আধুনিক চিত্রকলার মহিমা বৃদ্ধি করেছেন।



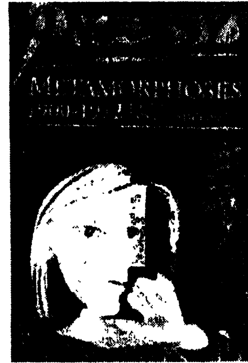
দি থ্রি মিউজিশিয়ান্স

তাঁর ছবির মধ্যে ক্রমশ কিউবিজমের অনুপ্রবেশ ঘটছে। রঙের মার্জিত ব্যবহারও এই ছবিতে লক্ষণীয়। চন্দ্রালোকিত কল্পরাজ্যে রেকর্ডের গান, পরিচিত ও অপরিচিত মানুষদের নিয়ে একটা রহস্যময়তার জাল বুনতে এই ছবি সাহায্য করে। সমসাময়িক ইউরোপ ও আমেরিকার চালচিত্রটি তখন এইরকম ঃ ফবিজম্‌, বাড-হাউস-প্রভাবিত শিল্পকলা একদিকে, অপরদিকে জার্মান এক্সপ্রেসেনিস্টদের আবেগজাত শিল্পকর্ম, আবার অন্যদিকে বোতল, সাইকেলের চাকা ইত্যাদি ব্যবহারে করে অপ ও পপ আর্ট[৩], জিওকমবাল্লার গতিবাদী ছবি, ইনস্টোলেশনের[৪] কাজকর্ম ইত্যাদি মিলিয়ে দুই মহাদেশ তখন আলোড়িত হচ্ছে।

৮ এপ্রিল ১৯৭৩-এ পিকাসো শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার কিছুদিন আগে থেকেই তাঁর শারীরিক অপুটতা প্রকট হয়ে ওঠে, যদিও মানসিক দিক দিয়ে তিনি সতেজ ছিলেন। কোন ফটোগ্রাফার এই সময়ে তাঁর ছবি তুলেছিল। সেই ছবিতে দেখা যায়, পিকাসো হাতের পাঁচটি আঙুলের মতো করে পাঁচটি লম্বাটে বানরুটি সাজিয়ে একদৃষ্টিতে সেগুলির দিকে তাকিয়ে আছেন। মনে হয়, অনেক কথা তাঁর বলার আছে, কিন্তু বলতে পারছেন না। তাই চোখদুটো ঝাপসা হয়ে এসেছে।

পিকাসোর এক-একটা ছবির মধ্যে অদ্ভুত ভাব প্রকাশ পেয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ এই 'ভাব'-এর ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। তখন ফটোগ্রাফি এবং যান্ত্রিক শিল্পকর্ম পাশ্চাত্য দেশে শুরু হয়েছে। বিবেকানন্দের মতে ঃ "যন্ত্রের সাহায্য নিলে অরিজিন্যালিটি লোপ পেয়ে যায়।... আগেকার ভাস্করগণ নিজেদের মাথা থেকে নতুন নতুন ভাব বের করতেন বা সেইগুলি ছবিতে বিকাশ করতে চেষ্টা করতেন। এখন ফটোর অনুরূপ ছবি হওয়ায় মাথা খেলাবার শক্তি ও চেষ্টার লোপ হয়ে যাচ্ছে।" ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য')

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়, 'Dissertation on Paintings' গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যমভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন ঃ "The first thing required for a painter to develop the higher faculty is that he must have the reverence, purity, the great love and fervour for the Ideal which he is going to represent." এই 'Ideal'-এর ব্যাখ্যা করে অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ "What is devotion to a religions man, what is philosophy to a thinker, the very same is the Ideal of a painter."



দিল্লিতে অনুষ্ঠিত পিকাসোর শিল্পকর্মের এক প্রদর্শনীর পোস্টার

কলকাতায় পিকাসোর চিত্রবর্ণ ও ভাস্কর্য (ভারত ও ফ্রান্সের বিনিময়-সূচীর অন্তর্গত) প্রদর্শন এখনো যদিও হয়নি, কিন্তু ভারতের রাজধানী দিল্লি ও মুম্বাইতে অবশ্য এই প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে। তবু কলকাতার চিত্রমোদী মানুষ পিকাসোকে দূরের মানুষ বলে মনে করেন না, বরং পিকাসো তাঁদের কাছের মানুষ। ❑

৩ আধুনিক চিত্রকলায় ১৯৪০-১৯৮০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে প্রচলিত একটি ধারা। পুরনো গুরুগম্ভীর ভাব ও ব্যাকরণকে অস্বীকার করে সমসাময়িক সিনেমা, গান ইত্যাদিতে ব্যবহৃত বিষয় থেকে ছবি আঁকাই অপ ও পপ আর্টের বৈশিষ্ট্য। আমেরিকা-ইউরোপের মধ্যেই তখন এই ধারাটি সীমাবদ্ধ ছিল।

৪ বিশ্ব চিত্রকলায় এর আবির্ভাব ১৯৫০ সালের পরবর্তী সময়ে। বেশ কয়েকটি বিভাজিত বস্তু নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে উপস্থাপন করে সামগ্রিকভাবে তার মূর্ছনা সৃষ্টি করা হয়।

ভারতে এবং বহির্ভারতে মাতৃপূজা ঃ ঐতিহ্য এবং সাদৃশ্য

প্রায় সব ভাষাতেই শিশু তার জননীকে যে-নামে ডাকে, তা 'মা' শব্দটিরই পরিবর্তিত রূপ। তাই জগতের সকল দেশে জননী 'মা', 'আম্মা', 'মাম্মা', 'মাম' বা 'মাদার' সম্বোধনে অভিহিতা। আদিম কাল থেকেই মানুষ মাতৃরূপের মধ্যে এক অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করে পূজা করে আসছে।

যতদূর জানা যায়, মাতৃপূজা বহু প্রাচীন এবং প্রায় সর্বদেশে সমাদৃত ছিল। (দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা —উপেন্দ্রকুমার দাস, পৃঃ ৪১৭-৪২০; Myths and Symbols in Indian Art and Civilization, p. 92) ইজিয়ান (Aegian) সাগরের তীর থেকে একদিকে ইরাণ হয়ে ককেসাস ও মিশর পর্যন্ত বিরাট ভূভাগে মহামাতৃদেবীর পূজা হতো। কারণ, ঐসব অঞ্চলে প্রাপ্ত নারীমূর্তিগুলি এবং সিন্ধু ও বেলুচিস্তানে প্রাপ্ত নারীমূর্তিগুলির আকৃতি ও চেহারা হুবহু একরকম। এইসব মূর্তির অদ্ভুত মিল লক্ষ্য করে পণ্ডিতেরা মনে করেন, এক মহাদেবী ঐসব অঞ্চলে পূজিতা হতেন; শুধু তা-ই নয়, তিনি সকল দেবতার চেয়েও শক্তিশালী ছিলেন! (দ্রঃ Greeks in Bactria and India, Indian Historical Quarterly, Vol. X, p. 406)

বেদে পৃথিবীকে 'ধরিত্রীমাতা' বলা হয়েছে। প্রাচীন চীনেও ধরিত্রীমাতার পূজা ছিল। প্রাচীন মিশরে ছিলেন 'মা' বা 'মাউত' দেবী (মঙ্গলদায়িনী মা ধরিত্রী)। কেপ্পডশিয়াগণ মাতৃদেবতাকে 'মা' নামেই পূজা করত। হিট্টাইটদের মাতৃরূপা দেবী 'মা' নামেই পূজিতা হতেন। গ্রীস বা রোমে ছিলেন 'মাইয়া' দেবী। রোমকরা ধরিত্রী মাকে বলতেন 'টেরা মেটার' এবং গ্রিসীয়রা বলতেন 'ডিমিটার'। রোমকরা মাইয়াদেবীকে 'বোনাদিয়া' নামেও সম্বোধন করতেন। 'বোনাদিয়া' শব্দের অর্থ মঙ্গলাদেবী। ইনি দেবমাতা। ফ্রান্স ও স্পেনে ইনি 'মায়ে', ইংল্যাণ্ডে তিনিই 'মায়রানী' (May Queen)। প্রায় ৫০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে খ্রিস্টধর্মে 'মাইয়া' দেবী 'মা-র-ইয়া' বা 'মারিয়া' (Maria) নামে পূজিতা হতেন। আসলে মেডোনা-পূজা মাতৃপূজাই। (দ্রঃ Sex and Sex-worship, pp. 502-503) আবার মেক্সিকোতে এক দেবীর পূজা হতো 'মাই-ও-এল' নামে, যার অর্থ দেবতা ও মানুষের মা।

ভারতীয় দেবীকল্পনার সঙ্গে অন্যান্য দেশের দেবীরূপের প্রচুর মিল পাওয়া যায়। যেমন পুরুষসঙ্গ ছাড়াই তিনি সর্বসৃষ্টিকারী স্বয়ম্ভূতা (দ্রঃ 'শ্রীদুর্গা', Encyclopaedia of Religion and Ethics)। আবার ভারতে দুর্গা বা কালীর মতো ব্যাবিলনিয়ার 'ইশতার' বা কার্থেজের 'সিলিস্টিস' হলেন রণদেবী। সেমেটিক দেবী 'ননা' ও গ্রীক দেবী 'আর্তিমিস'-এর প্রতীক হলো ভ্রমর। ভারতে দেবী দুর্গার আরেক নাম 'ভ্রামরী'। মিশরে দেবীমূর্তির আয়ুধ ছিল শূল, চর্ম ও পরশু, দেবীর নাম ছিল 'অন্নৎ' বা 'অনৎ'। আরবদেশের শুদ্ধা মাতৃমূর্তির নাম ছিল 'অল্লৎ'। 'ইশতার' অসিরিও-বাসীদের দেবী। এঁর একজন নিত্যসহচর আছেন, যাঁর নাম 'টম্মুজ' বা 'অশুর'। ইনি তন্ত্রের ভৈরবের মতো।

ইরানে অকিলেসিন জনপদে এরিজ নামক স্থানে দেবী অনাহিতের মন্দিরে মহিষবলি হতো। ফ্রিজিয়াবাসীদের দেবী ছিলেন 'সাইবেল', ইনিই ক্রিট ও আনতলিয়াতে সিংহবাহিনী-রূপে পূজিতা হতেন। এঁর স্বামী 'অত্তিশ' (Attis)।

আরো বিস্ময়কর, সৌমারদের আরাধ্যা 'ননা'কে সর্বদা 'Lady of the Mountain' (হিমালয়-কন্যা পার্বতী?) বলা হয়েছে। এঁর স্বামীর বাহন আবার বৃষভ। ননার কাছে নরবলি দেওয়া হতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, মরুতীর্থ হিংলাজ-সংলগ্ন মুসলমান অধিবাসিগণ এঁকে 'নানী কী হজ' নামে সম্বোধন ও সম্মান করেন। মিশরের 'আইসিস' যেখানে পূজিতা হতেন—সেই মন্দিরে অঙ্কিত থাকত বৃত্ত ও পবিত্র স্ত্রীচিহ্ন ত্রিকোণ। আবার সেখানে গাভীও দেবীর প্রতীকী ছিল। উল্লেখ্য, ঋগ্বেদে মা 'অদিতি'কে গাভীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। রোমকদের কাছে যিনি 'হোরা', গ্রীকদের কাছে তিনিই 'জুনো'। জুনোর পূজায় কোন অসংযমের স্থান ছিল না। তাঁর অসংখ্য ডাকিনী, যোগিনী ছিল। এথেন্সবাসীরা 'এথিনা'র পূজা করতেন। ইনি কুমারী রণদেবী, শিরস্ত্রাণশোভিতা এবং শূলচর্মধারিণী। এথিনা খাঁটি মাতৃমূর্তি, আবার সমস্ত বিদ্যা ও শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী। ইনিই রোমকদের 'মিনার্ভা' বা হিন্দুদের 'সরস্বতী'। 'ডায়না' রোমকদেবী, যিনি গ্রীকদের 'আর্তিমিস'-এর অনুরূপা। ইনি অরণ্য ও পশু-রক্ষাকারিণী। ঋগ্বেদে (১০।১৪৭) পাই অরণ্যের দেবী 'অরণ্যানী'কে। মঙ্গলকাব্যে দেবী মঙ্গলচণ্ডীও পশুপক্ষীদের রক্ষাকারিণী।

প্রাচীন ভারতে দ্রাবিড় সভ্যতা মাতৃতান্ত্রিক ছিল। কিন্তু আর্যরা শুধুই পিতৃতান্ত্রিক ছিলেন না। তাঁদের মাতৃক্রমের প্রমাণ তাঁদের সৃষ্ট মহান সাহিত্যগুলি—বেদ, উপনিষদ্। ঋগ্বেদে 'অদিতি' মাতৃকাদেবী। "দ্যৌ, অন্তরিক্ষ, মাতা, পিতা, পুত্র, দেবসমগ্র, সবই অদিতি। যা জাত তা অদিতি, যা জন্মাবে তাও অদিতি।" (ঋগ্বেদ, ১।৮৯।১০) কেন উপনিষদেও স্পষ্ট করেই সর্বদেবরূপিণী ও ব্রহ্মস্বরূপিণী উমা-রূপে মাতা অদিতিকে স্মরণ করা হয়েছে। পরবর্তী কালে তন্ত্রে কুণ্ডলিনীকে সর্বদেবময়ী বলা হয়েছে।

মানুষের সহজাত এই মাতৃপ্রেম ভারতের মাটিতে যেন আরো লালিত। তন্ত্র যেন আরো মহিমান্বিত করল মাতৃগৌরবের আসন। মাতৃপূজা সনাতন, তা তিনি কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী—যে-নামেই চিহ্নিতা হোন না কেন।

উত্তরায়ণ চক্রবর্তী
পাশ্চাত্যপাড়া রোড, রায়পুর
দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৩৫৮

টুকরো স্মৃতি

যেখানে মাতৃত্বের প্রশ্ন, সেখানে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই

আমি মায়ের সপ্তম গর্ভের সন্তান। কিন্তু মায়ের বুকে দুধ না থাকায় তাঁর চিন্তা ছিল—কি করে বাঁচাবেন ছেলেটিকে? আমাদের বাড়িতে দুধ দিতে আসতেন পরীদি—এক মুসলমান রমণী। তাঁরও বাচ্চা হয়েছে। প্রথম বাচ্চা। তাঁর বুকে যথেষ্ট দুধ। মা আমাকে তুলে দিলেন তাঁর কোলে। সেই শুরু।

মা গোঁড়া হিন্দুঘরের মেয়ে। বাপের বাড়িতে দোল-দুর্গোৎসব এখনো হয়। মুসলমান রমণীকে দিয়ে সন্তানকে স্তন্যপান করানোর ব্যাপারটা তখন কেউ জানে না। কিন্তু একদিন ধরা পড়ে গেলেন ননদিনীর কাছে।

মা পরীদিকে পান্তা খাওয়াতেন। কারণ, তাঁর দিকটাও তো দেখতে হবে। আর সেইটাই কাল হলো। "বৌ, ভাই এসব জানে?"—বিধবা পিসিমা একদিন জিজ্ঞাসা করলেন। মায়ের সোজা-সাপটা উত্তর—"না, এর আবার বেটাছেলের জানাজানির কি আছে?"

পরীদি কখন যে 'পরী-আম্মা' হয়ে গেলেন তা খেয়াল নেই। মা আমাকে 'আম্মা' বলতে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তখন ক্লাস ফোরে পড়ি। তখনো পরী-আম্মা যে-পথে আমাদের বাড়ি আসেন, তারই ধারে নানান ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকি। আম্মা কখন আসবেন জানি। একসময় আম্মা কাছে আসতেই ঝোপ নাড়িয়ে শিয়ালের মতো ডেকে ভয় দেখাই। আম্মা ভয় পাওয়ার ভাব দেখান। তারপর বলেন ঃ "নাও হয়েছে, এবার বেরিয়ে এস। হাঁ কর।" আমি হাঁ করি। আম্মা কাঁচা দুধ আমার মুখে ঢেলে দেন। আমি খেলতে চলে যাই। গুড় জ্বাল দিতেন আম্মা, আমি হাজির হতেই কচি কলাপাতায় সেই গরম মৌঝোলা গুড় তুলে দিতেন। খুঁচিতে মুড়ি মেখে দেওয়া গুড় দিয়ে তো ছিলই।

আম্মারা বড় অভাবী ছিলেন। ১৯৭২-এ বাংলাদেশ হলো। দাদারা ওপার বাংলায় গেলেন—নতুন দেশে তাঁর জন্মভূমি দেখতে। এক বুড়ি এসে দাদাকে ধরে কাঁদতে লাগলেন। ভাল দেখেন না চোখে, ছানি পড়েছে। "ছোটটাকে আনিসনি ক্যান, ওটা যে আমারে 'আম্মা' ডাকত?"

ঐ বুড়িই আমার পরী-আম্মা।

'সেই প্রথম পরিচয়'

গত শতকের চারের দশকের কথা। গ্রামের কিশোর-যুবকদের মাঝে একটা ফুটন্ত উদ্দীপনা। স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে, স্বাধীনতা চাই-ই। চরিত্রগঠনকল্পে স্বামীজীর বাণী পাঠের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন চলছে। সেইসঙ্গে সিদ্ধান্ত হলো মঠ স্থাপনের। ঠাকুর, মা আর স্বামীজীর ছবি মাটির বেদির ওপরে সাজিয়ে গ্রন্থাগারের একপাশে চলল উপাসনা, 'কথামৃত' ও স্বামীজীর রচনাবলী পাঠ ইত্যাদি। দাদারা বাবা-কাকাদের সাহায্যে সবই করলেন বটে, তবে নিত্য সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি, স্তবপাঠ কিছুদিন যেতেই মুশকিলের ব্যাপার হয়ে পড়ল। কাকে কখন পুলিশ তুলে নিয়ে যায় ঠিক নেই।

এদিকে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। "মা, একটু ফ্যান দিবা?" —এই আর্তনাদ দাদাদের উদ্ভ্রান্ত করে দেয়। চারিদিকে দেশভাগের ফিসফিসানি, সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষের নানান খবর, গুজব ভেসে আসতে লাগল। দাদারা এধার-ওধার ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লেন। কেউ কেউ আগেভাগে দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন।

আমরা তখন ছোট। আমাদের ওপরই দায় বর্তাল। গলাটা সুন্দর, স্তব-স্তোত্র মুখস্থ হয়ে গেল। ঘণ্টা নাড়া, ধূপ-দীপ জ্বেলে তালমিছরির নৈবেদ্য চড়ানো, সময়মতো আরতি করা, গ্রামের লোকের কল্যাণ কামনা করা, আর ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানানো। পূজার ব্যাপারটা নেই বললেই চলে। শুধু মনে মনে বলা—খাবারটা নাও, আর প্রসাদ করে দাও।

ছাত্র হিসাবে খারাপ ছিলাম না। আমার বোন বেশ বুদ্ধিমতী ছিল। আমার কাকার মেয়ে। দুজনে ছুটতে ছুটতে যেতাম সন্ধ্যার ঠিক আগেই। ঠাকুরের সামনে নিষ্ঠার সঙ্গে বসতাম হাতজোড় করে।

গ্রন্থাগারের পিছনে বেশ বড় একটা বাগান ছিল—আম, কাঁঠালের। গোটা দুই শিয়াল-পরিবার বাস করত সেই বাগানে। সন্ধ্যার কিছু পরেই কাছ থেকে তাদের হুক্কা-হুয়া ডাকে আমাদের ভয় করত। মন দিয়ে চোখ বুজে দুজনে পাশাপাশি বসে আরাত্রিক গাইতাম—"খণ্ডন ভববন্ধন, জগ-বন্ধন বন্দি তোমায়।..." বাবা শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

সেই শুরু। দয়াল ঠাকুরের সঙ্গে বন্ধু পাতানো, সাক্ষাৎ ভাবা। ভাবতাম ভালই হলো, যতদিন পারি এই সুযোগটা নেব। কিন্তু তা আর হলো কৈ? আমরা এপার বাংলায় চলে এলাম। আসার আগের দিনও গেলাম দেখা করতে, পূজা করতে, খাবার দিতে। ফিরতে একটু দেরি করে ফেলেছিলাম। বড়দের নানান আশঙ্কা, দুশ্চিন্তা আমাদের মাঝেও সংক্রামিত হয়েছিল। শিয়ালের আচমকা ডাকে আমি আর বোন ভয় পেয়ে গেলাম। ছুটে পালিয়ে এলাম। পরে জেনেছি, ঠাকুরের সেই বেদি, গ্রন্থাগার সব ভেঙে গেছে। মিডল ইংলিশ পাস করে চলে আসি পশ্চিম বাংলায়, বয়স তখন এগারো কি বারো। আজ প্রায় পঞ্চান্ন বছর পর ধ্যানে বসলে সেই প্রথম পরিচয়ের দীপ্ত ছবি এখনো কেমন স্পষ্ট ভেসে ওঠে।

আমাদের সেই গ্রামের নাম গোপীনাথপুর, থানা—কলারোয়া, মহকুমা—সাতক্ষীরা, জেলা—খুলনা। বেত্রবতী (ডাকনাম 'ব্যাতনা') নদীর ধারে গ্রামটি। এখন সেই নদীও

নেই, ঠাকুরের সেই বেদিটাও আর নেই। কিন্তু সেই প্রথম পরিচয়ের সিঁড়ি ভেঙে আর্তজনের পাশে দাঁড়াবার আর্তি ঠাকুরের কাছে, মায়ের কাছে যেতে বড় সাহায্য করে।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
কলকাতা-৭০০ ০২৮

স্বামীজীর ম্যাসনিক টেম্পলে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে

'উদ্বোধন'-এর গত আষাঢ় ১৪০৯ সংখ্যায় সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্তের লেখা 'স্বামীজী যখন লস এঞ্জেলেসে মিসেস ব্লজেটের অতিথি হয়েছিলেন' সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই লেখাটির ৩৯৭ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের সূচনাতে লেখা আছে—"শিকাগোর ম্যাসনিক টেম্পলে স্বামীজী-প্রদত্ত আরেকটি বক্তৃতার কথাও মিসেস ব্লজেট তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন।"

এই প্রসঙ্গে জানাই, আমি ম্যাসনিক জগতের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত এবং সেখানে ভারতীয়, ইংলিশ, স্কটিশ, আইরিস লজ-এ উচ্চপদে নিযুক্ত হয়েছি। ম্যাসনিক ভবনে শুধু সদস্যরাই ঢুকতে পারেন, সাধারণের ঢোকার অনুমতি নেই। ভিতরে ঢোকার সময় শপথ নিতে হয়। দীক্ষিত হওয়ার পর সকলের একটাই পরিচয় হয়—'ব্রাদার'। যদিও ঢোকার আগে পরিচয় থাকে—'মিস্টার', 'বাবু', 'মহম্মদ' ইত্যাদি।

আমার ধারণা, ম্যাসনিক টেম্পলে স্বামী বিবেকানন্দ যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন বলে সকলে জানে, তা টেম্পলে না হয়ে বাইরে কোন জায়গায় হয়েছিল। কারণ, আগেই বলেছি সেখানে 'ব্রাদার' ছাড়া অন্য কারো ঢোকা নিষিদ্ধ। এমনকি সদস্যদের মা, স্ত্রী—এঁরাও নন। ভিতরের কাজকর্ম কি হচ্ছে কেউই জানতে পারে না বা জানানো হয় না, জানলে সেটা হয় শপথভঙ্গ।

প্রসঙ্গত শ্রীদাশগুপ্তকে অনুরোধ জানাই, ১৪০৭ সালের 'কোলফিল্ড টাইমস্'-এর শারদীয়া সংখ্যায় এই পত্রলেখকের 'শিকাগো বক্তৃতা ও তার প্রস্তুতি' নামে একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে একটি তথ্য প্রকাশিত হয়েছিলঃ ২২ জানুয়ারি ১৮৯৪ একটি পত্রে জি. সি. কুন্নুর ম্যাসনিক টেম্পলের অন্যতম সদস্য গিলবার্ট ডব্লিউ. বার্ণাডকে জানান—স্বামীজী ইচ্ছা সত্ত্বেও বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকায় ম্যাসনিক হল-এ (ম্যাসনিক টেম্পলে নয়) বক্তৃতা করতে পারেননি। তিনি আরো জানান—"আমি অতি আনন্দের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে জানাচ্ছি, একজন ফ্রিম্যাসন বা ব্রাদার হিসাবে যে আমাদের পূর্বভারতের ব্রাদার স্বামী বিবেকানন্দ—যাঁকে আমি আমাদের ম্যাসনিক গুপ্ত মন্ত্র এবং সঙ্কেত সম্বন্ধে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছি যে, তিনি একজন তৃতীয় পর্যায় উন্নীত ম্যাসন—তাঁর দীক্ষা হয়েছে 'অ্যাঙ্কর অ্যাণ্ড হোপ', ২৩৬. ইসিতে।"

কলকাতায় যখন ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে স্বামী বিবেকানন্দের ম্যাসনিক জগতে দীক্ষিত হওয়ার শতবার্ষিকী এবং 'অ্যাঙ্কর অ্যাণ্ড হোপ লজ'-এর দ্বিশতবার্ষিকী পালন করা হয়, তখন উক্ত চিঠিটি অদ্বৈত আশ্রমের স্বামী বলরামানন্দ কপি করে ম্যাসনিক লজ-এ পাঠান।

সরোজেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী
গল্ফ গ্রিণ, কলকাতা-৭০০ ০৯৫

প্রসঙ্গ 'বিশ্বায়ন, সন্ত্রাসবাদ এবং আমরা'

'উদ্বোধন'-এর গত আষাঢ় ১৪০৯ সংখ্যায় স্বামী পরাশরানন্দের 'বিশ্বায়ন, সন্ত্রাসবাদ এবং আমরা' শীর্ষক রচনাটি যেমন তথ্যপূর্ণ, তেমনি কালোপযোগী ও দিঙ্‌নির্দেশক। এধরনের রচনা এই পত্রিকায় প্রায়শই প্রকাশিত হয়ে পাঠকগণকে আলোকিত ও পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করুক—এই কামনা করি। প্রবন্ধের বিষয়টি ব্যাপক, তাই এপ্রসঙ্গে আলোচনা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে পারে। বিষয়টি নিয়ে কয়েকটি কথা বলার জন্য এই পত্র।

প্রবন্ধের সূচনায় লেখক বর্তমান কালের সীমাহীন বৈজ্ঞানিক প্রগতি, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুতপ্রসারী জয়যাত্রার উল্লেখ করেছেন এবং একইসঙ্গে সভ্যতার এই আপাত-উন্নতির গলদ কোথায় তাও নির্দেশ করেছেন। আজকের ছাত্রছাত্রীগণ সত্যিই এত বেশি কম্পিউটার, টিভি, সিডি বা অন্যান্য গণমাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে যে, শুধু তথ্যটুকু জানার জন্যই তাদের ব্যস্ততা, তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করার আগ্রহ তাদের প্রায় নেই বললেই চলে। তারা জানে যে, মূল তথ্যটি মগজস্থ করতে পারলেই তাদের কেরিয়ার তৈরির ব্যাপারে বা ক্যুইজ-জাতীয় প্রতিযোগিতায় সাফল্য আসবে; তাই ব্যাপক পড়াশোনা, কোন বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তা বা উপলব্ধির রাজ্যে বিচরণ করার কোন প্রয়াস আজ আর তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না।

অথচ স্বামীজী চেয়েছিলেন সম্পূর্ণ অন্যরকম। তিনি বলেছিলেন, একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থাগারকে শুধু মগজে ধরে রাখার চেয়ে একটি মাত্র গ্রন্থ হৃদয়ঙ্গম করা অনেক ভাল। আজকাল শিশুদের কাঁধেও পিতামাতারা ও বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ এতরকম বোঝা চাপিয়ে দেন যে, শৈশবের আনন্দময় দিনগুলি কোথা দিয়ে যে অতিক্রান্ত হয়ে যায় তা তারা বুঝতেও পারে না। একালের শিশু যখন ক্রমশ বড় হয়ে ওঠে, তখন স্বাভাবিক কারণেই তার অন্তরে সুকুমার বৃত্তিগুলি বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায় না। আজ তারা কোন রূপকথার কাহিনী বা কল্পনারঞ্জিত গল্পকথা শুনতে পায় না বা পড়ার অবকাশ ও উৎসাহ পায় না। শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য নেই কোন মূল্যবোধের শিক্ষা, নেই তাদের অন্তরে অপরের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা জাগাবার কোন প্রচেষ্টা। তাই পরিণত

বয়সে এরা হয়ে উঠছে যান্ত্রিক, স্বার্থপর ও হিংসাশ্রয়ী। বর্তমান কালে আমরা সংবাদপত্রে, টিভিতে বা অন্যান্য গণমাধ্যমে যেসকল খুন, জখম, ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদির সংবাদ পড়ি, তা এজাতীয় অশিক্ষা ও কুশিক্ষারই পরিণাম।

লেখক বলেছেন, গত বছর ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ওপর বিধ্বংসী বিমানহানার পর থেকেই 'সন্ত্রাস' শব্দটি গোটা পৃথিবীকে আলোড়িত করছে, কিন্তু সন্ত্রাস যে পৃথিবীর বুকে কোন নতুন ঘটনা নয়, সেকথা বোঝাতে তিনি অনেকগুলি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের অবতারণা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে এই সন্ত্রাস প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞাত ছিল, ১০০০ খ্রিস্টাব্দে বিদেশী দস্যু সুলতান মামুদের অতর্কিত আক্রমণ, নির্বিচারে লুণ্ঠন ও অবাধ হত্যাকাণ্ড থেকেই এই দেশে সন্ত্রাসের সূত্রপাত। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটি কি সর্বাংশে সত্য? ভারতবর্ষে ত্রেতাযুগে বালি-সুগ্রীব, রাম-রাবণের মধ্যে ব্যাপক যুদ্ধ হয়েছে, দ্বাপর যুগে কুরুক্ষেত্রের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং কংস, শিশুপাল প্রমুখ রাজন্যবর্গের সাধারণের ওপর নির্মম অত্যাচার—এসকল কি সন্ত্রাসজনক ঘটনা নয়? তারপর ঐতিহাসিক যুগে ভারতের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির মধ্যে অহরহ যে যুদ্ধবিগ্রহ ও হানাহানি চলেছে—সেগুলিও কি সাধারণ মানুষের মধ্যে নিদারুণ দুঃখ, যন্ত্রণা ও ত্রাসের সঞ্চার করেনি? ঐযুগের সন্ত্রাসের সবচেয়ে বড় উদাহরণ মগধরাজ অশোকের কলিঙ্গরাজ্যের বিরুদ্ধে ভয়াবহ যুদ্ধ—যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত, আহত, অনাথ ও নিঃস্ব হয়েছিল।

স্বামী পরাশরানন্দ ইতিহাসের পথ পরিক্রমা করতে করতে ইংরেজ আমলের কিছু কিছু সন্ত্রাসের উল্লেখ করেছেন, তবে হয়তো কলেবর-বৃদ্ধির আশঙ্কায় বর্গী, মগ ইত্যাদি দস্যুদের ব্যাপক সন্ত্রাসের কথা বাদ পড়ে গেছে। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষের কাশ্মীর, পঞ্জাব (বর্তমানে প্রায় শান্ত), পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ (নকশাল, জনযুদ্ধ গোষ্ঠী প্রভৃতির সন্ত্রাস), আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা ইত্যাদি রাজ্যে বেশ কিছুকাল আগে থেকে যে সন্ত্রাস চলছে তা পূর্বেকার যাবতীয় সন্ত্রাস থেকে স্বতন্ত্র ধরনের। এখন এইসকল সন্ত্রাসবাদীরা কখন কোন্ ট্রেন, বাস, গাড়ি, বাজার বা জনসমাবেশে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মানুষের প্রাণনাশ করবে তা কেউ বলতে পারে না। হয়তো বা কোন প্লেন হাইজ্যাক করে বা কিছু বিশিষ্ট লোককে অপহরণ করে বিরাট অঙ্কের টাকা দাবি কিংবা নানা অন্যায় শর্ত আরোপ করবে—যা পালন করা না হলে বন্দীদের নির্মমভাবে হত্যা করবে। আধুনিক কালের এই চোরা সন্ত্রাসটিই সবচেয়ে মারাত্মক, যা সব রাষ্ট্রকেই ভাবিয়ে তুলেছে।

লেখক যথার্থই বলেছেন, হিংসা ও অহিংসার উৎপত্তি মানুষের মনে, বাইরে নয়। সুতরাং সেই মনটিকে কালিমামুক্ত করে যথার্থ মনুষ্যত্বলাভের চেষ্টাই যে আমাদের একান্ত আবশ্যিক কর্তব্য—সেকথা সকলকে মনে রাখতে হবে। স্বামীজী এই সত্যটি প্রাণে প্রাণে বুঝেছিলেন বলেই বলতেন, মানুষ-গড়ার শিক্ষাদানই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। স্বামী পরাশরানন্দ যথার্থই বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমার মহিমান্বিত জীবন ও বাণীই যথাযথ বিশ্বায়নের পথনির্দেশক। আমরা জানি, স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা ও ইউরোপে গুরুর এই মহান ও উদার ভাবধারা প্রচার করে ঐ 'বিশ্বায়ন' তত্ত্বটি বাস্তবে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর জীবৎকালে নিবেদিতা, ক্রিস্টিন, গুডউইন, সেভিয়ার দম্পতি প্রমুখদের এদেশে এসে জীবন উৎসর্গ করা এবং মিস ম্যাকলাউড, মিসেস ওলিবুল, মিঃ ও মিসেস লেগেট, মাদাম কালভে, মিস ওয়াল্ডো প্রমুখ ভক্ত ও গুণীজনদের এই মহান ভাবধারা গ্রহণ ও প্রচারের মধ্য দিয়ে বিশ্বায়নের যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রগুলি আজও অক্লান্তভাবে তারই ধারা অব্যাহত রেখেছে। কামনা করি যে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় পুষ্ট সঙ্ঘগুলি ও মানুষেরা যথার্থ মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য প্রাণপণ কাজ করে যাবেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর কাছে ঐকান্তিক প্রার্থনা জানাই, তাঁরা পৃথিবীর মানুষকে অবক্ষয় থেকে রক্ষা করুন।

সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত
সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগনা
পিন-৭৪৩১৭৮

প্রসঙ্গ 'অন্য ভগবান'

'উদ্বোধন'-এর গত জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে বিকাশকলি বসুর 'অন্য ভগবান' পড়লাম। এই লেখাটি বর্তমান প্রজন্ম তথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করি। স্বামীজীকে বর্তমান প্রজন্মের যে একান্ত দরকার সেটা বোধহয় অভিজ্ঞ বিদ্বজ্জন ও বুদ্ধিজীবীদের অজানা নয়। কোন দেশের ভবিষ্যৎ পরিকাঠামো সেই দেশের চারিত্রিক তথা নৈতিক মানদণ্ডের ওপর নির্ভর করে—সেটাই আমার সামান্য অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অর্জন করেছি। মানুষ তৈরির কারখানা তৈরি করা বড়ই কঠিন, তবু সেটা এখন খুবই প্রয়োজন বলে মনে হয়। "জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর"—মানুষের প্রতি আমাদের মমত্ববোধ জাগ্রত না হলে এই বাক্যের কোন সার্থকতা আমাদের জীবনে আসবে না। একটা জাতির মেরুদণ্ড নির্ভর করে তার চারিত্রিক নৈতিকতার ওপর—এটাই আমার মতো মানুষের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। লেখকের মতামতের বহুল প্রচার একান্ত প্রয়োজন।

ললিতমোহন রায়
নস্কর পাড়া রোড, সন্তোষপুর
কলকাতা-৭০০ ০৭৫

স্বামীজীর ভারত ও আজকের আমরা

সঞ্জয় ভুঁইয়া

আজ যুবসমাজের সামনে দেশের বর্তমান অবক্ষয়ী রূপ বেদনাদায়ক। স্বামীজীই আশার গগনে যেন একমাত্র ধ্রুবতারা। উদীয়মান লেখক নিজের ভাষায় সেই বেদনাকে ব্যক্ত করেও এগিয়ে চলার সঙ্কল্পে স্থিরব্রত।



"The liberated man is the ideal of society and his life should be worthy of imitation by the people at large. Inactivity or activity that would mislead them should therefore be avoided by the perfect!"

(I.B.D.I., Indian Philosophy, pp. 452-453, Calcutta University, 1939)

সময়টা উনবিংশ শতকের শেষাশেষি। এক অজ্ঞাত-পরিচয় দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী উদ্‌ভ্রান্তের মতো চষে বেড়াচ্ছেন নিজের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ। কপর্দকশূন্য, ঈশ্বরনির্ভরশীল, কিছুটা অভিমানী। ভিতরে অদম্য তেজ আর অমানবিক প্রেম। কিন্তু এ কী দেখছেন তিনি? এ কোন্ ভারতবর্ষে ভুল করে প্রবেশ করে ফেললেন? যুবক সন্ন্যাসী তখনো জানেন না, সেই কম্পিত-দেবশরীরের আড়ালে পাশবিক নির্যাতন আর প্রবহমান ব্যভিচার আসলে তাঁরই স্বদেশের প্রেতশরীর!

পরবর্তী কালে যখন পাশ্চাত্যে পতাকাবাহিত আকারে হিন্দুধর্ম শ্বেতকায় আমেরিকানদের স্তাবকতায় উড্ডীয়মান, তখন সেই 'সাইক্লোনিক নিউকামার'কে পাশ্চাত্য থেকে গুরুভাইদের এক পত্রে 'নিজের বুকের পাঁজর'—নিজের দেশের মূল্যায়ন করতে হচ্ছে এইভাবে: "আমাদের জাতের কোন ভরসা নাই। কোন একটা স্বাধীন চিন্তা কাহারো মাথায় আসে না—সেই ছেঁড়া কাঁথা, সকলে পড়ে টানাটানি—রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন; আর আষাঢ়ে গপ্পি—গপ্পির আর সীমা-সীমান্ত নাই। হরে হরে, বলি একটা কিছু করে দেখাও যে তোমরা কিছু অসাধারণ—খালি পাগলামি! আজ ঘণ্টা হলো, কাল তার ওপর ভেঁপু হলো, পরশু তার ওপর চামর হলো, আজ খাট হলো, কাল খাটের ঠ্যাঙে রুপো বাঁধানো হলো—আর লোকে খিচুড়ি খেলে আর লোকের কাছে আষাঢ়ে গল্প ২০০০ মারা হলো—চক্রগদাপদ্মশঙ্খ আর শঙ্খগদাপদ্মচক্র ইত্যাদি, একেই ইংরেজিতে imbecility (শারীরিক ও মানসিক বলহীনতা) বলে—যাদের মাথায় ঐরকম বেল্‌কোমো ছাড়া আর কিছু আসে না, তাদের নাম imbecile (ক্লীব)। ঘণ্টা ডাইনে বাজবে বা বাঁয়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়, পিদ্দিম দুবার ঘুরবে বা চারবার—ঐ নিয়ে যাদের মাথা দিনরাত ঘামতে চায়, তাহাদেরই নাম হতভাগা; আর ঐ বুদ্ধিতেই আমরা লক্ষ্মীছাড়া জুতোখেকো, আর এরা ত্রিভুবনজয়ী। কুঁড়েমিতে আর বৈরাগ্যে আকাশ-পাতাল তফাত।"[১] আজ ২০০২-এ, সমাজে সেই একই তামসিক চরিত্রচিত্র, ধর্মকল্যাণে বড় বড় বিদগ্ধ মানুষের মহাস্থবিরত্ব আর যদি 'বুড়ো হুতোমের' ভাষায় বলতে হয়, 'তবে একটু একটু আফিং খাওয়াইয়া বারো সম্প্রদায়ের (ভূতের) রাজনীতির হুল্লোড়', এ বড় কম পাওনা নয়! এবং এটাই হলো 'ভারতবর্ষ আপডেট'!

ইদানীং কালে অনেক প্রাপ্তবয়স্ককে আক্ষেপ করে বলতে শোনা যায়, যে-রাষ্ট্র মুড়ি-মুড়কির মতো এত ধর্মনেতার জন্ম দিয়েছে, দিচ্ছে তার জাতীয় জীবনে এই চিত্তবিক্ষেপের কারণ কি? নৌকার পালে পশ্চিমী হাওয়া—এসব তো বেশ মজ্জাগত হতে চলল, তা বলে ধর্মীয় আত্মবিস্মৃতি? সেটা বিনা ভারতবর্ষ দাঁড়ায় কোথায় ('ইণ্ডিয়া' নয় কিন্তু)! এটা যদি স্রেফ কথার কথাও হয়ে থাকে, তাহলেও বলতে হবে—'পর্দা উঠছে ধীরে ধীরে—slow but sure!'

তাহলে 'ধর্ম' কি?—এই জটিল প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যাক। তার আগে প্রবক্তার শাস্ত্রব্যাখ্যা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্যা—এই গোটা পরিসীমার মধ্যে ধর্ম কিভাবে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে তার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিতে হবে। এপ্রসঙ্গে ডেনিশ দার্শনিক

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ৭৮-৭৯

হফডিঙের একটি প্রসিদ্ধ উক্তি স্মরণযোগ্য। তিনি বলছেন ঃ "The belief is the conversation of values. It is mainly such belief that raises, Indian systems like Jainism and Buddhism to the status of religion in spite of the absence of a belief in God."

আমাদের দেশে বরাবরই সাধারণ মানুষের রান্নার হাঁড়িতে দুটো জিনিস খুব ভালভাবে প্রবেশ করে থাকে। প্রথমটা হলো ধর্ম, দ্বিতীয়টা রাজনীতি। এখানে পরস্পর বিপরীতমুখী দুটো জিনিসের সহাবস্থান কিভাবে সম্ভব—এ-প্রশ্ন অবান্তর, কারণ বিশ্বাস এখন বহুগামী। যখনি এই বহুগামিত্বের প্রশ্ন চলে এল, তখন স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ জাগবে ধর্মের প্রতি এই আগ্রহটুকু স্রেফ দেখানোর জন্য কিনা, কি প্রতিষ্ঠিত মানুষের জীবনে, কি সাধারণের জীবনে। অথচ বিবেকানন্দ বলছেন, বুদ্ধ, মহাবীর—সবাই বলছেন একবাক্যে পুরুষকার আর মনুষ্যত্ব। তুমি সমাজের কোন স্তরের মানুষ—এটা কোন প্রশ্নই নয়। প্রশ্ন এটাই, একটা আদর্শ মানুষ হওয়ার জন্য যথেষ্ট বিবেকবুদ্ধি অর্জন করতে পেরেছ কিনা! লক্ষ্য করে দেখুন, শ্রেয়ের পথ উত্তরাধিকার সূত্রে ভারতবর্ষে চিরটা কালই খোলা রয়েছে—আপনারা তাকে 'ধর্ম' বলুন, 'নৈতিকতা' বলুন কিছু যায় আসে না। শুধু পালন করার মতো মানসিকতা থাকা দরকার। এক মাত্রা, দুই মাত্রা, আট মাত্রা, কি চাই ষোল মাত্রা। আমরা যাঁদের চলতি ভাষায় 'মহাপুরুষ' বলে আখ্যা দিয়ে থাকি তাঁদের কাছে ধর্ম একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। ষোল মাত্রার ধরাছোঁয়ার বিষয়। 'Cultivated subject!' আলাদা করে 'ধর্ম' পালন করার দরকার আছে কি দরকার নেই—এ-প্রশ্ন তাদের কাছে অবান্তর। তাঁরা সত্যকে আবিষ্কার করেন এবং ধর্ম আখ্যায় সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ করেন। এর দ্বিতীয় ধাপে স্বাভাবিকভাবে আসে গ্রহণযোগ্যতার তারতম্য অনুসারে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের প্রশ্ন।

ভারতবর্ষে এমন সময়ও ছিল যখন দৈহিক ও মানসিক গঠনতন্ত্র অনুসারে মানুষের কর্মবিভাগের সূচনা হয়েছিল। তার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মবিভাগেরও। আপনি কি সমাজের অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষ? (এই অবস্থার জন্য দায়ী অবশ্য পরবর্তী কালের ব্রাহ্মণ্যবাদ, নইলে এই বিভাজন অন্য কোন অর্থে নয় বরং গ্রহীতার সুবিধার্থে।) চিন্তার কিছু নেই, কারণ দেশের ধর্ম উদার ও সমৃদ্ধ। তার সুযোগ নিতে হবে। ধর্মকে আপন করে নিলে ধর্মও আমাদের আপন করে নেবে। শুরু হবে কতকগুলি নীতির মাধ্যমে, রীতির মাধ্যমে ভাল থাকার সূক্ষ্ম ক্রিয়া। সেই থেকে ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার সূত্রপাত বলা যেতে পারে। তার মানে এক ছাদের তলায় আমরা পাচ্ছি একটা গোটা একান্নবর্তী পরিবার, যারা বেঁচে আছে নিজস্ব কিছু শিক্ষার ওপর। ভাবছে কিছু শিক্ষার ওপর, নিজের পুরো জীবনটাই দাঁড় করাচ্ছে সেই শিক্ষার ওপর। এবার সে-প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, তাহলে সেই দেশের এই অবস্থা হয় কেন? একটু আগে যে-কথা বলে নেওয়া উচিত ছিল অর্থাৎ 'ধর্ম' কি তার অনুসন্ধান কিংবা পরীক্ষা-নিরীক্ষা 'ধর্মযাজকের' হাতে না হলেও 'ধর্ম-যাজকের' ভূমিকায় অনেকেই নিজের নাসিকা নিজেই প্রদর্শন করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। সেটাই পরে 'ট্র্যাডিশন' হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস দেখা যেতে পারে। মতাদর্শগতভাবে বুদ্ধ তাঁর অবস্থানে ঠিক থাকলেও পরবর্তী কালে একদল মানুষ তাঁর আদর্শকে খুব বিপজ্জনকভাবে বিকৃত করেছে। তার ফলস্বরূপ কি হয়েছে? সুযোগসন্ধানী যারা, একটা নিরাপদ ছাতার তলায় এসে সমাজে যা ইচ্ছা তাই করে গেছে। তারা আবার তাদের মনের মতো একটা দল পাকিয়েছে, তার থেকে উপদল। ফলে দুটো ব্যাপার দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে। ভারতবর্ষ নামক গণতান্ত্রিক(?) দেশে নীতিকথার জায়গায় নীতিকথা চলবে, ভিতরে ভিতরে দুর্নীতিও। দ্বিতীয়ত দুর্নীতির প্রশ্নে গোষ্ঠীতন্ত্র এমনই একটা ভূমিকা নেবে যা জনপ্রিয়তার জোয়ারে সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচার করে বেড়াবে। এর যুগ্মচিত্র কি দাঁড়াল? পাশ্চাত্য সমাজবাদীর কলমে ধর্ম সাধারণ মানুষের আফিঙ হয়ে গেল!

কিন্তু সত্যিই কি ব্যাপারটা তাই? ধর্ম কি—এই প্রশ্নের উত্তর জটিল থাকে না যদি আমরা আমাদের প্রচলিত সমাজ-জীবনের ধ্যানধারণা থেকে মুখটা একটু নিজের দিকে ফিরিয়ে নিতে পারি। কারণ, সবকিছু আজ বড় একঘেয়ে হয়ে গেছে। জাতীয় চরিত্রের কথা যদি ধরা যায় তাহলে আমরা 'সেক্যুলার' দেশের নাগরিক। আমাদের হাতে স্বাধীনতা অবাধ। আবার সেই কারণেই পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ করার প্রবণতাও অবাধ। বাস্তবজীবনে কিন্তু এই স্বাধীনতা প্রয়োগের ব্যাপারটা খুব একটা ঘটছে না, ঘটছে যেটা সেটা ঐ 'আমার ধর্ম' এবং 'তোমার ধর্ম' নিয়ে সংঘাত! 'আমার ধর্ম' এবং 'তোমার ধর্ম', 'আমার গোষ্ঠী' এবং 'তোমার গোষ্ঠী', 'আমার সম্মান' এবং 'তোমার সম্মান'! এই গণ্ডিটুকুর বাইরে গিয়ে ব্যাপকভাবে কিছু করতে চাইলেই মুশকিল! রাজনীতির মোড়কে ধর্ম এসে অথবা ধর্মের মোড়কে রাজনীতি মিশে নিরীহকে তোপের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে। সম্ভাবনাময় মানবজীবনের এই ভবিষ্যৎ দেখে আঁতকে উঠেছিলেন সেই নবীন সন্ন্যাসী। এ তো একেবারেই ভারতবর্ষের আদর্শ-বিরোধী ব্যাপার! এ তো ধর্মকে কেন্দ্র করে ভণ্ডামি! ঈশ্বরকে নিয়ে হঠকারিতা! আচ্ছা, ঈশ্বর-টিশ্বর যদি বাদও যায় 'Moral Content'-এর প্রশ্নে একটা দেশের মানুষ এত পিছপা হয়ে যাবে? শিকাগো থেকে জনৈক মাদ্রাজী শিষ্যকে লিখিত পত্রে (২৮ জুন ১৮৯৪) স্বামীজী উগরে দিলেন মনের ক্ষোভ—"কোন ভাব প্রচার করবার পক্ষে আমেরিকাই

জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ক্ষেত্র, তাই আমি শীঘ্র আমেরিকা ত্যাগ করবার কল্পনা করছি না। কেন? এখানে খেতে-পরতে পাচ্ছি, অনেকে সহৃদয় ব্যবহার করছেন, আর দু-দশটা ভাল কথা বলেই এইসব পাচ্ছি! এমন উন্নতমনা জাতকে ছেড়ে পশুপ্রকৃতি, অকৃতজ্ঞ, মস্তিষ্কহীন, অনন্ত যুগের কুসংস্কারে বদ্ধ, দয়াহীন, মমতাহীন, হতভাগাদের দেশে কি করতে যাব? অতএব আবার বলি—বিদায়। এই পত্রখানি একটু বিবেচনা করে লোককে দেখাতে পার।"[২] চাবুকের পর চাবুক পড়েছে। সন্ন্যাসী হয়ে বলে বেড়িয়েছেন—জাতটাকে চেতাতে হবে না? যাদের সারা অঙ্গে যুগ যুগ ধরে স্থবিরতা, সাত্ত্বিকতার ধুয়ো তুলে শিরায় শিরায় বদমায়েশি—তাদের কাছে এর বেশি আশাই বা কি করা যেতে পারে? এরা নিজের দেশের ঐতিহ্যকে সম্মান দিতে জানে না।

সত্যি কথা। একটা 'প্রকৃত ধর্ম' প্রাথমিকভাবে মানুষকে কি শিক্ষা দিতে পারে? তুমি হিন্দু? তুমি খ্রিস্টান? তুমি মুসলিম? তুমি কোন্ সম্প্রদায়ের? নাকি প্রাথমিকভাবে তুমি একজন মানুষ? যখনি এই শিক্ষা দেওয়া হলো যে, তুমি একজন মানুষ—তোমার নিজের প্রতি, পরিবারের প্রতি, দেশের প্রতি কর্তব্য রয়েছে তখনি ভারতবর্ষে একটা চিরায়ত দাবি পাশাপাশি তৈরি হয়ে গেল—কর্তব্য রয়েছে, তবে তা শুধু কর্তব্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়। মূল ব্যাপার হলো চূড়ায় পৌঁছানো। সেই চূড়াটা কি?—আমি ও আমার আত্মা অভিন্ন। এই হলো আদর্শ। "Pulse of the nation." ভেবে দেখুন, কী প্রচণ্ড একটা উচ্চভাব একটা গোটা জাতির রক্তে রক্তে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। যুগে যুগে একজন করে উচ্চমার্গের মানুষ আসছেন আর সেটা একবার করে ধরিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন। কারণ, ভারতবর্ষের উন্নতি অন্যভাবে সম্ভব নয়। আজকের দিনে আমরা যেটাকে উন্নতি বলে ধরে নিয়েছি, সেটা একটা প্রচারসর্বস্ব ব্যাপার। তার মধ্যে সারবস্তু বলে কিছু নেই। এ শুধু শেখাতে পারে কিভাবে ঐতিহ্যের মুখে কালি ছেটাতে হয়! একটা সেকেলে আদর্শ আমার ভোগের পথে বাধা দেবে, দাও কালি। হেঁয়ালি কথায় আমার মন ভেজাবে, খতম কর। অন্য কথায় কাজ নেই। চাই ভোগসর্বস্বতা। কেড়ে-কুড়ে, হামড়ে-কামড়ে—যেভাবেই হোক। জাপান থেকে আলাসিঙ্গা এবং অন্যান্য শিষ্যদেরকে লেখা পত্রে আরেকবার জোরালো আঘাত—"আর তোমরা কি করছ? সারাজীবন কেবল বাজে বকছ। এস, এদের দেখে যাও, তারপর যাও—গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও গে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে!"[৩]

ভীমরতি যে কি পরিমাণে ধরেছে সেটা এই মুহূর্তে আমরা সবাই মিলে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারছি। জাপান আজ সাফল্যের কোন্ চূড়ায় গিয়ে পৌঁছে গেছে। এদের উন্নতি থেকে কোন শিক্ষা তো আমরা নিইনি, উলটে আমরা আমাদের নিজেদের শিক্ষাটাও ভুলে গেছি। তাহলে শেষপর্যন্ত এসে পরিপক্ক চিত্রটা কি দাঁড়াল? সারা পৃথিবী সবদিক দিয়ে এগিয়ে যাবে, আর আমরা ক্রমাগত পিছিয়ে যাব! দ্বিতীয়ত, ওদের ঐহিক উন্নতির বদগুণগুলো ঝোলায় ভরে আমাদের পারত্রিক উন্নতিকে বিদায় জানাব। তাহলেই কেল্লা ফতে!

তাই এখন দরকার 'আমার' দিকে তাকানো। এই আভাস কারা দিতে পারেন? দিতে পারেন বুদ্ধ, চৈতন্য, বিবেকানন্দ। কেন দেন? কারণ, তাঁরা আমাদের জন্য ভাবেন বলে। তাঁরা জানেন 'মানুষ চাই, পশু নয়।' আগে মনুষ্যত্বলাভ করে মানুষ হওয়া, তারপর পুরুষকার প্রয়োগে ঈশ্বর হওয়া। তার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী বলছেন সারা পৃথিবীর সর্বজ্ঞানের সংযুক্তিকরণে (যাতে ব্যবহারিক জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত) একটা পরিপূর্ণ মানুষ হওয়া—"To become a total man!"

এত সুন্দর আদর্শ ছেড়ে আজকে আমাদের মতিচ্ছন্ন অবস্থা। সমস্ত ধর্মের সারকথা হলো চরিত্রনির্মাণ। এটাই আমরা ভুলতে বসেছি। বাকি সব পরের ব্যাপার। আমার স্বভাবে গলদ কোথায় সেইটা আগে বুঝতে হবে। ধর্ম হলো সত্যপালন। এবার প্রশ্ন—সত্যে আছি না অসত্যে আছি? যদি বলেন সত্যে আছি, তাহলে ব্যবহারিক জগতে চলনে-বলনে পরিবর্তন আসতে বাধ্য। হাঁটাচলা, কথাবার্তা ইঙ্গিত দেবে আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি? তারপরে আরেকটা ব্যাপার হলো আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রতি যদি শ্রদ্ধাশীল না হই, মহৎ মানুষের জীবনের প্রতি আগ্রহী অবশ্যই হব। প্রাত্যহিক জগতে এই আমি ভিতরে ভিতরে মানুষ হিসাবে কেমন, সেটা আমি ছাড়া কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এইবার আমার আদর্শের মানুষ—আমার সামনে দৃষ্টান্ত হিসাবে রয়েইছে। সুতরাং আমায় যদি নিখুঁতভাবে নির্মিত হতে হয়, তাঁকে অনুসরণ করা জরুরী বিষয়। এটাই হলো ভারতীয় রীতি। গুরুকুল শিক্ষায় ভারতবর্ষে একটা সময় পরম্পরা প্রথা চালু ছিল, তাতে গুরুর ভাব শিষ্যের ওপর বর্তাত। আর শিষ্য সেটা মানুষের কল্যাণে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেন। এইভাবে একটা নির্দিষ্ট ধারা জাতির ইতিহাসে সূচিত হলে সেটা পরে ঐতিহ্যের আকার পেয়ে গেল। আমরা এখন একবিংশ শতকে প্রবেশ করে সেইসব সত্য অস্বীকার করি। 'কালচার'-এর নামে, এগনোর নামে নিজের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করি। এই বিস্মৃতির পরিণাম কি দাঁড়াতে পারে, আজকের আপাতদৃশ্যমান ভারত তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

তার মানে অবশ্যই এটা নয়, ভারতবর্ষের আর আশা নেই। বরং ভারতবর্ষেরই খুব বেশি করে আশা রয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকায় যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে একেবারেই উদাসীনতা, সেটাই শেষপর্যন্ত

২ 'বাণী ও রচনা', ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৪৫০

৩ ঐ, পৃঃ ৩৫৮

ওদের সভ্যতার পক্ষে ক্ষতিকারক। আর ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হলো বর্তমানে তার যতই পতিত অবস্থা হোক না কেন, তার পিছনে সবসময়ই আধ্যাত্মিক শক্তি প্রবহমান। এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় সুবিধা। দরকার যেটা—সেটা ঐ ভাববাদ আর বাস্তবের ঠিক ঠিক মেলবন্ধন। ধর্ম সম্পর্কে যাবতীয় ছুঁৎমার্গ ছেড়ে তার মূল্যায়ন নতুন করে করতে হবে। নিজের মতো করে ধর্মকে তৈরি করে নেওয়া নয়, তাকে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে যথার্থভাবে প্রয়োগ করা। প্রয়োগ করলে আধুনিক ভারত তৈরি হতে বেশি সময় নেবে না। এটাই স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল। ধর্ম এস বিজ্ঞানে, বিজ্ঞান যাও ধর্মে—সমস্ত কুসংস্কারকে দূরে তাড়াও। একজন যথার্থ মানুষ হও। এটাই ভারতের মৌলিক সম্পদ।

আশার কথা, এত সমস্ত নিমজ্জনের মধ্যেও ভারতবর্ষ আজ একটু একটু করে উদীয়মান। এটা আমরা বুঝতে পারছি, কারণ আমাদের প্রত্যেকের পিঠ এই মুহূর্তে দেওয়ালে ঠেকে গেছে। আমাদের সামনের দিকে এগোতে হবে। এগোতে গেলে অবলম্বন চাই। যেমন-তেমন অবলম্বন নয়, সত্যিকারের অবলম্বন। সেই অবলম্বন কে দেবে? দেবে ধর্ম। সত্যিকারের ধর্ম। কারণ, ধর্ম ছাড়া অন্য কোন মানুষের তৈরি মতাদর্শের মধ্যে এত শক্তি নেই যা মানুষের চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। জগৎ সম্বন্ধে, তার নিজের সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে পারে। এটা আমরা যত দ্রুত বুঝব ততই মঙ্গল—কি ব্যক্তিজীবনে, কি জাতীয় জীবনে। ❑

শব্দচেতনা 

স্বামীজীর বাণী, রচনা ও গাওয়া গান অবলম্বনে তৈরি বিশেষ শব্দছক

১		২		■	৩	৪		৫
	■		■	■	■		■	
৬		■	৭		৮	■	৯	
	■	১০		■	১১	১২	■	
■	১৩		■	১৪	■	১৫		■
১৬	■	১৭	১৮	■	১৯		■	২০
২১		■	২২			■	২৩	
	■	২৪	■	■	■	২৫	■	
২৬				■	২৭			

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম অগ্রহায়ণ ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

পাশাপাশি : (১) '—— শোন বিহঙ্গম', (৩) স্বামীজীর মতে আদর্শ শ্রদ্ধাবান, (৬) 'অবিদ্যাঽস্মিতারাগ-দ্বেষাভিনিবেশাঃ —— ক্লেশাঃ', (৭) 'কাহে সই জিয়ত —— কি বিধান', (৯) 'সার্বজনীন ধর্ম ——' (১০) 'লৌহপিণ্ড সহে যে আঘাত, মর্মর-মূরতি তা কি ——?' (১১) '—— তব জনমে জনমে দয়ানিধে', (১৩) 'অস্তেয় প্রতিষ্ঠায়াং —— রত্নোপস্থানম্', (১৪) 'জ্যান্ত দুর্গা', (১৫) '—— আর ফিরে নাহি চাও', (১৭) 'কত —— স্থিতি, কে করে গণন', (১৯) ' —— সেই সংসারজলধি' (২১) 'আশা —— আমি ত্যজিনু সকল', (২২) 'এখন এদেশ ঘোর তমোতে ছেয়ে ফেলেছে। ফল হচ্ছে, ইহকালে দাসত্ব, পরকালে ——', (২৩) 'সুবিস্তৃত অনন্ত আকাশ —— দেখে' (২৬) '—— আবর্ত উচ্ছ্বাস চলে কেন্দ্র প্রতি', (২৭) '—— মুক্ত জ্ঞাতা আত্মা হয়'।

ওপর-নিচ : (১) 'ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ —— মতং বৈষ্ণবমিতি', (২) 'কান্বা শিবা ক্ব গৃণনং মম —— বুদ্ধেঃ', (৪) '—— উন্মদ প্রেমপাথার', (৫) 'নিঃশেষে নিভেছে ——', (৭) 'রূপরাগ হয়ে জল —— গায় হেথা, না করে গর্জন', (৮) '—— দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্', (১০) 'আমি —— আত্মা, এইটি সবসময় অনুভব করতে হবে', (১২) 'সত্য কিবা তারা জানে না কখন, —— যাহারা দেখয়ে স্বপন', (১৬) 'উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি, —— পরশিতে চায়', (১৮) স্বামীজীর বলা গল্প : পক্ষী পরিবারটি দেখল গাছতলায় ——জন অতিথি, (১৯) '—— ব্রহ্ম করে প্রপঞ্চিত', (২০) 'এই তব —— তোমারি উদ্দেশে' (২৪) '—— সে হামনে দিল কো লাগায়া', (২৫) '—— রূপ অরূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামি-কাল-হীন'।

সূত্র : শুক্লা পাঠক

চেতনা বনাম সায়েন্স

সুব্রত চট্টোপাধ্যায়

বলতে গেলে পৃথিবীর সর্বত্রই এখন কম্প্যুটারের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এমনকি বৈজ্ঞানিকগণ কৃত্রিম মস্তিষ্ক বা কৃত্রিম বুদ্ধি নির্মাণের চেষ্টায় আছেন। কিন্তু কম্প্যুটার কি চেতনাযুক্ত বস্তু? এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে চেষ্টা করেছেন জীববিদ্যাবিশারদ প্রবাসী বাঙালি ডঃ সুব্রত চট্টোপাধ্যায়।

আমি কি করে জানব আপনি সচেতন?

ইলেকট্রিক মিটারের মতো যদি চেতনা মাপার একটা 'কনশাসনেস মিটার' থাকত, সুবিধা হতো। সেই যন্ত্র মাথায় ঠেকিয়ে কে চেতন, আর কে নয় এবং কে কতটা সচেতন বেশ জানা যেত। চেতনা পরিমাপের সেরকম কোন যন্ত্র নেই। যদি কোন প্রযুক্তিবিদ্ কোনদিন তৈরিও করেন, 'কনশাসনেস মিটার' কতটা কাজের হবে সেই নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন আছে। মাপার যন্ত্র বা একটা মাপকাঠিও যদি ঠিক করা হয়, যা দিয়ে সচেতন-অচেতনের পার্থক্য করা যাবে, কেমন করে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, সেই মাপকাঠিই যথার্থ মাপকাঠি? একের পরিবর্তে একাধিক মাপকাঠিও যদি প্রয়োগ করা হয়, কোন নিশ্চয়তা আছে কি ঐ মাপকাঠিগুলির ভিত্তিতে চেতনা শনাক্ত করা যাবে?

মানুষ চেতনাযুক্ত, আমরা জানি। মানুষ ছাড়া অন্য কোন্ কোন্ প্রাণী চেতনার অধিকারী? অনেকেই বলবেন, গৃহপালিত জীব গরু, কুকুর, বিড়াল—এদের চেতনা আছে। বেশ। শিম্পাঞ্জি, গরিলা, বাঘ, ভালুক থেকে গরু, ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল—ধরে নিলাম সবাই সচেতন। তার পর বা তার আগে? অন্য প্রাণীরা কি চেতনশীল নয়? ইঁদুর? পাখি? মাছ? কেঁচো বা পোকামাকড়?

অনেকে মনে করতে পারেন, অবধারণমূলক স্নায়ু-বিজ্ঞান (Cognitive Neuroscience)-এর গবেষণা থেকে চেতনা সম্বন্ধে সম্যগ্রূপে জানতে পারা যাবে। তাই কি?

১৯৭৪ সালে দার্শনিক থমাস ন্যাজেল একটি প্রবন্ধ লেখেন, যা চেতনা বিষয়ে আলোচনা-গবেষণায় বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। অসাধারণ এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'The Philosophical Review'-এ, শিরোনাম—'What is it like to be a bat?' বাদুড় মানুষের মতো স্তন্যপায়ী। মানুষের পক্ষে অসাধ্য—এমন ক্ষমতা বাদুড়ের আছে; যেমন—অন্ধকারে আলো ছাড়া আমরা চলতে পারি না, কিন্তু বাদুড় পারে। অন্ধকারে বিশেষ শব্দতরঙ্গ প্রক্ষেপ করতে পারে বাদুড়। ২০,০০০ হার্জ (১ হার্জ = ১ সেকেণ্ডে ১ বার)-এর বেশি কম্পনের সেই শব্দতরঙ্গ প্রতিহত হয়ে ফিরে এলে তাকে বিশ্লেষণ করে বাদুড় অন্ধকারে দূরত্ব, দূরে কোন বস্তু কত বড় বা কী আকৃতির—এসব নির্ধারণ করতে পারে। বাদুড়ের সে অভিজ্ঞতা আছে, যা আমাদের নেই। বাদুড়ের মস্তিষ্ক কিভাবে এই কাজটা করে, আমরা সেসম্পর্কে জানতে পারি। বাদুড়ের স্নায়ুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করার পরও কিন্তু বাদুড় সম্বন্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অজানা থেকে যাবে—বাদুড় হওয়া কিরকম, বাদুড় হতে কেমন লাগে। বাদুড় যে-আচরণ করে সে-আচরণও করা যেতে পারে, যেমন—দিনের বেলায় অন্ধকার কোন স্থানে মাথা নিচে পা ওপরে করে ঝুলে থাকা ইত্যাদি। এইসবে যা জানা যাবে তা হলো বাদুড় যে-আচরণ করে তার অনুকরণ করতে কেমন লাগে। কিন্তু এটা জানা যাবে না যে, বাদুড়ের বাদুড় হওয়া কিরকম।





কোন কিছু 'সচেতন'—একথার অর্থ সেইরকম হওয়ার মতো কিছু একটা অবস্থা আছে। বাদুড়ের মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পরিমাপ করে দেহ সম্পর্কে সকল তথ্য জানার পরও আমরা জানতে পারব না বাদুড়ের সচেতন অভিজ্ঞতা কিরকম, সেই প্রাণীর সচেতন অবস্থায় কেমন লাগে। থমাস ন্যাজেলের প্রবন্ধে বাদুড় উদাহরণ মাত্র, অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেও চেতনা সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য। এই প্রবন্ধের সূত্রে চেতনা সম্পর্কিত গবেষণায় অন্যান্য তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, যেমন—পাথর হতে কেমন লাগে, গাছ হওয়া কিরকম ইত্যাদি। গাছ

জীবিত সত্তা (living being), গাছের জীবন (বা প্রাণ) আছে, কিন্তু স্নায়ু নেই। গাছ কি সচেতন? গাছের মূলের কোষে কী কী ডি. এন. এ, জিন ও প্রোটিন আছে জানার পরও গাছের চেতনা আছে কিনা, থাকলে তার প্রকৃতি কেমন—সায়েন্স-এ তার তর্কাতীত উত্তর নেই।

মানুষকে তার সচেতনতা প্রমাণ করতে বললে মানুষ কী করবে? প্রশ্নটি অবান্তর নয়, বরং সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মানুষের সচেতনতা নির্ধারণ করার সমস্যাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গীত-শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি দিয়ে কি মানুষের চেতনা নিরূপিত হবে? 'অ্যারন' নামক কম্প্যুটারের আঁকা চিত্র দেখে বলা যায় না তা মানুষের করা নয়। এমনকি বিখ্যাত এক শিল্পীর আঁকা ছবি বলেও 'অ্যারন'-এর ছবিকে কেউ চিহ্নিত করতে পারেন। কবিতা? একটা উদাহরণ দেওয়া যাক—



ANGEL

Beams of the dawn at the angel
With a calm, silent sea
With a hundred times we write,
With a chance we can open up
A steady rhythm in his face
Silent room
Desolate beach
Scattering remains of love.

'অ্যারন'-এর আঁকা ছবি: দুই বোন এবং লেখা কবিতা

কম্প্যুটার-কবি রচিত এইরকম কবিতা পড়ে অনেকেই একবাক্যে বলেছেন, এটা মানুষেরই লেখা।

১৯৯৭ সালে আমেরিকাতে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়, যা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্য। শ্রোতাদের বলতে বলা হয় তিনটির মধ্যে কোন্‌টি কম্প্যুটার-শিল্পী, কোন্‌টি মিউজিক প্রফেসর এবং কোন্‌টি দুই শতাব্দী আগেকার যোহান সেবাস্তিয়ান বাখ-বিরচিত। শ্রোতারা রায় দিয়েছিলেন, ই. এম. আই (EMI—Experiments in Musical Intelligence)-কৃত সঙ্গীত বাখ রচনা করেছেন! মহান শিল্পী ও মেশিনের মিউজিক তফাত করা যায়নি।

শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত রচনার ক্ষমতা শুধু নয়, ধরা যাক এমন একটা ডিজিটাল (Digital) কম্প্যুটার তৈরি হলো —যার বাইরেটা মানুষের মতো, দেখতেও অবিকল মানুষের মতো। এই 'মানুষের মতো দেখতে কিন্তু আসলে মানুষ নয়' সত্যিকারের মানুষকে একটা কথা বলল—'আমি' সচেতন, তুমিও কি তাই? প্রমাণ কর। মানুষরূপী মেশিনের সাথে সত্যিকারের মানুষের কথোপকথন—

মেশিন: 'আমি' জানি 'আমি' সচেতন। তুমিও কি তাই? প্রমাণ কর।

মানুষ: 'আমি' চিন্তা করি তাই 'আমি'।

মেশিন: এ কথার অর্থ?

মানুষ: আমি অনেক কিছু করতে পারি। অঙ্ক পারি।

মেশিন: একটা ক্যালকুলেটরও অঙ্ক করতে পারে—ওতে তুমি সচেতন প্রমাণ হয় না।



মানুষ: আমি অনবদ্য পদ্য রচনা করতে পারি।

মেশিন: পদ্য রচনা থেকে চেতনা প্রতিপন্ন হয় না। সব মানুষ কবিতা লেখে না—কবিরা বাদে অন্য সকলে অচেতন?

মানুষ: আমি গান করতে পারি।

মেশিন: পাখিও গান করতে পারে। একটা গানই আছে 'কোয়েলিয়া গান থামা এবার।' তোমার গান করা থেকে বলা যায়, তুমি একটা বড় পাখি হতেও পার, অন্য কিছু প্রমাণিত হয় না।

মানুষ: আমি দুঃখে কাঁদি।

মেশিন: দুঃখেও কাঁদে না, এমন হয়। তোমার কাঁদা থেকে বড় জোর প্রমাণ হতে পারে তোমার অশ্রুগ্রন্থি আছে এবং ঠিকমত কাজ করে—তার বেশি কিছু নয়।

মানুষ: আমি সুখে হাসি।

মেশিন: সবাই সুখে হাসে না, এমনও হয়। তোমার হাসি থেকে প্রমাণিত হয় তোমার সেরিব্রাল কর্টেক্স-এর মোটর এরিয়ার সাথে অন্যান্য অংশের যোগাযোগ এবং মুখের মাংসপেশীর কাজকর্ম ঠিকঠাক আছে; কিন্তু তাতে চেতনা প্রমাণিত হয় না।

সত্যিকারের মানুষ এবার অসহায়, বুঝল—এভাবে হবে না, অন্য পন্থা নিতে হবে। এমন একটা কিছু সে বলবে যা মানুষরূপী কম্প্যুটার-মেশিন প্রমাণ করতে পারবে না। সে তখন বলল—আমি জানি আমি সচেতন। আমি এও জানি, তুমি সচেতন নও।

মেশিন ঃ গণিত-শিল্প-সাহিত্য-কলা ইত্যাদি তুমি যা পার, আমিও তা পারি। অথচ তোমার চেতনা আছে কিন্তু আমার নেই—কেমন করে হয়?

মানুষ ঃ 'হয়, হয়, Zানতি পার না।' আমি এমন কিছু দেখতে পাই, তুমি পাও না।

মেশিন ঃ যেমন?

মানুষ ঃ 'নীল দিগন্তে ঐ ফুলের আগুন লাগল' আমি দেখতে পাই, তুমি পাও না।

মেশিন ঃ কী করে জানছ আমি তা দেখতে পাই না?

বস্তুত, এই 'জানা'র কোন উপায় নেই। চেতনার বিষয়গত অভিজ্ঞতা (subjective experience) বা গুণগত অনুভব (qualitative feeling)—অন্দরমহলের জগৎ। বস্তুগত তথ্য, ক্রিয়াকলাপ ও পদ্ধতি দিয়ে এই অন্দরমহলের স্বরূপ জানা বাইরে থেকে ভিতরে কী আছে দেখার মতন। এভাবে যেটুকু জানা যেতে পারে তা হলো, বাইরে থেকে ভিতরে দেখার বাইরের অভিজ্ঞতা, ভিতরে গিয়ে ভিতরে দেখার ভিতরে জানা—জ্ঞান—নয়। এইজন্যই সাক্ষ্যপ্রমাণ সহকারে চেতনা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে অনতিক্রম্য বাধা উপস্থিত হয়েছে।

সত্যিকারের মানুষের সাথে মানুষরূপী কম্প্যুটার-এর উপরি উক্ত কথোপকথন কাল্পনিক। কিন্তু সত্যিকারের দুই মানুষ—দুই বিখ্যাত চেতনা-গবেষকের মধ্যে চেতনা নিরূপণ সম্পর্কিত এইরকমই প্রশ্ন উঠেছিল, যা কাল্পনিক নয়। অতীব বাস্তব। ১৯৯৪-এর এপ্রিলের কথা। ইউনিভার্সিটি অফ আরিজোনাতে কনফারেন্স, বিষয়—চেতনা। দার্শনিক ডেভিড চেলমার্স গবেষণাপত্র পাঠ করছেন। শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বৈজ্ঞানিক ক্রিস্টফ কোখ, যিনি চার বছর আগে ফ্রান্সিস ক্রিক-এর সাথে 'Towards a neurobiological theory of consciousness' প্রকাশ করেছেন। ডেভিডের বক্তব্য ক্রিস্টফের বিশেষ পছন্দ হয়নি। বক্তৃতার পরে ক্রিস্টফ ডেভিডকে বলছেন ঃ "স্নায়ুতন্ত্রের গবেষণায় চেতনার সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না—এটা না বলে, মাথায় একটা 'ভূত' এসে চেতনা এনে দেয়, বললেই তো হয়। তা বলছেন না কেন?" ডেভিড উত্তর দিলেন ঃ "সেরকম একটা তত্ত্ব অযথা সমস্যা জটিলতর করবে। তাছাড়া আমার বিষয়গত অভিজ্ঞতার সাথে তা মেলে না।" প্রত্যুত্তরে ক্রিস্টফের প্রশ্ন ঃ "আপনার বিষয়গত অভিজ্ঞতা আমার মতন কিনা কি করে আমি জানব?"—অমোঘ প্রশ্ন—"এমনকি, কী করে জানব আপনি সচেতন?

রিসেপ্টর ও রূপসাগরের পার্থক্য

ছোটবেলায় অনেকদিন পর্যন্ত আমি জানতাম না, চোখে কম দেখি। ডাক্তারবাবুর কাছে একটু বকুনিও খাই, চোখে কম দেখি আমি কেন আগে বলিনি? ক্লাসে সামনের দিকে বসলে ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা বেশ পড়া যেত। দূরের বাড়ি কিংবা গাছ? জানতাম, আমি যেরকম দেখি অন্যরাও তেমন দেখে।

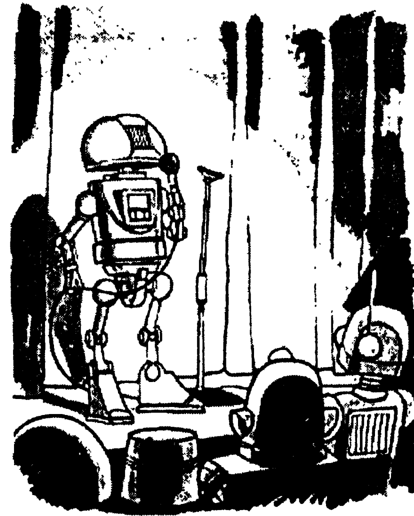
চেতনা গবেষণায় বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকগণ এই প্রশ্নটির প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছেন—একজন 'আমি' কোন কিছু যেরূপে যেভাবে দেখে, অন্য একজনও কি ঠিক তেমনি দেখে?—না। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা তা জানি। প্রিয়কে আমি যেমন সুন্দর দেখি, অন্যজন সুন্দর দূরের কথা, কুৎসিতও দেখতে পারেন। 'নেটিভ আমেরিকান' বা আফ্রিকানদের কাছে যা সৌন্দর্য বলে বিবেচিত, ইউরোপিয়ানদের কাছে তা অতীব অসুন্দর-রূপে প্রতিভাত হতে পারে। এই দেখা—চোখের আলোয় 'চোখের বাহিরে' দেখা। চোখের আলোতে যে-দেখা, তাও কি সকলের ক্ষেত্রে একরকম? একজন নীলাকাশকে যেমন নীল দেখে, অন্যজনও কি তেমন নীল দেখে? নীলের নীলত্ব সকলের কাছেই কি এক? চেতনা অন্দরমহলের জগৎ, সেই জগতে নীলরঙ যেরূপে প্রতিভাত হয় তা প্রকাশ করব কি করে? কোয়ালিয়া (qualia)—বিষয়গত অভিজ্ঞতার গুণগত অনুভব—সচেতনতার কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য, কিন্তু তা নির্দিষ্ট করা যাবে কেমন করে? কি করে প্রকাশ করা সম্ভব বা জানা যাবে 'প্রেমে ভরা মন' কতখানি ভরা? যন্ত্রণায় কতটুকু যন্ত্রণা?



· কেউ ভাবতে পারেন, নীলাকাশকে কেউ সবুজ বা অন্য রঙ দেখে কিনা—এই প্রশ্ন অবান্তর। সুস্থ, স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন (colour blind বা বর্ণান্ধ নন) মানুষ সকলে নীলরঙকে সমান নীল নাও দেখতে পারেন—দার্শনিকদের এই ধারণা চেতনা-গবেষণায় উপস্থিত হওয়ার অনেক পরে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে ধারণাটির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এই পরীক্ষার ফলে জানা গেছে, নীলরঙকে সবুজ দেখা যথেষ্ট সম্ভব শুধু নয়, এই পৃথিবীর বুকেই এমন সুস্থ স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানুষ আছে যাঁরা নীলকে সবুজ দেখেন। এই সাথে আরো জানা গেছে রঙের সংবেদনশীলতা ও পৃথককরণের সাথে ভাষার সম্পর্ক জড়িত। দুটি আলাদা রঙ—একটির নাম 'ওয়র' (wor) , অন্যটির নাম 'নল' (nol)। পাপুয়া নিউ গিনির এক জনগোষ্ঠী—বারিনমো (Berinmo) মানুষরা এই 'ওয়র' (হলুদ-কমলা-খয়েরি-সবুজ) রঙ এবং 'নল' (সবুজ-নীল-'পার্পল') রঙের পার্থক্য করতে পারেন, আলাদা করে চিনতে ভুল হয় না। ইংরেজি ভাষায় 'ওয়র' এবং 'নল' রঙের সমার্থক শব্দ নেই—ইংরেজরা এই দুটি রঙ আলাদা করে চিনতে ভুল করেন। বারিনমো মানুষরা সবুজ ও নীল রঙের পার্থক্য করতে পারেন না, তাঁদের শব্দভাণ্ডারে 'সবুজ' ও 'নীল' শব্দ অনুপস্থিত। যে-ফুলের রঙ 'নল' অতি স্পষ্ট একজন বারিনমো মানুষের কাছে, একজন ইংরেজের কাছে তা 'ওয়র'। অর্থাৎ বারিনমো মানুষ যাকে 'নীল' দেখছেন, একজন ইংরেজ তাকে দেখছেন 'হলুদ' বা 'কমলা'। অন্যক্ষেত্রে, একজন ইংরেজের কাছে আকাশ যখন ঘন নীল, একজন বারিনমো মানুষ তা দেখছেন সবুজ। এখানেই শেষ নয়—এই গবেষণাপত্রটিতে ছাপা 'ওয়র' এবং 'নল'-এর বর্ণনা ইংরেজি ভাষায় যেমন দেওয়া হয়েছে, তার সাথে আমাদের বাঙলা ভাষায় বর্ণিত রঙ মিলছে না! এসব দেখে শুনে এক বৈজ্ঞানিক মন্তব্য করেছেন—আমরা কাকে যে কী দেখছি!

না হয় জানা গেল, নীলাকাশকে সবাই নীল দেখেন না; লাল গোলাপও সবার কাছে লাল নয়। গবেষণায় প্রতিপন্নও হলো। বেশ। কিন্তু বাইরের দেখা ভিতরে যা সঞ্চার করে, ভাবে-অনুভবে যে দ্যোতনা আনে—অন্তর্জগতে যা হয় তা কি বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়? কতখানি যায়? আদৌ ব্যাখ্যা করা যায় কি?

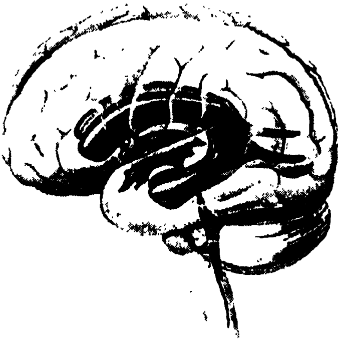
দু-একটি গান-কবিতার অংশ চিরে দেখা যাক (সাহিত্য-সঙ্গীতপ্রেমীদের কাছে অপরাধ মার্জনীয়)—বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় কতদূর পৌঁছানো যেতে পারে। মনে করা যাক পূর্ণিমার রাত, চাঁদ উঠেছে। 'ক্ষুধার রাজ্যে' মনে হচ্ছে, 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'। পূর্ণিমার চাঁদ দেখছি কেমন করে?—এই প্রশ্নের মোটামুটি সন্তোষজনক উত্তর আছে। লক্ষ কোটি আলোককণা চোখের কর্ণিয়া মারফত লেন্সের মধ্য দিয়ে রেটিনায় পড়ছে, অপটিক নার্ভ-বাহিত হয়ে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সঙ্কেত পৌঁছাচ্ছে প্রাইমারি ভিসুয়াল কর্টেক্সে, সেই সঙ্কেত বিশ্লেষণ করছে ভিসুয়াল অ্যাসোসিয়েশন এরিয়া। বলা যেতে পারে এইভাবেই পূর্ণিমার চাঁদ দেখি। এবার প্রশ্ন—স্নায়ুতন্ত্রে কী হচ্ছে যার জন্য মনে হচ্ছে, পূর্ণিমার চাঁদ যেন 'ঝলসানো রুটি'? এই প্রশ্নের উত্তর নেই এখন। চেতনার স্নায়ুগত ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ভবিষ্যতে কী হতে পারে তা অনুমেয়। মস্তিষ্কের প্রতি বর্গ মিলিমিটার স্থানে প্রতিটি স্নায়ুকোষ গুণে গুণে নিরূপিত হলো তাদের পারস্পরিক



যোগাযোগ ও বৈদ্যুতিক তরঙ্গের গতিপ্রকৃতি। তখন ব্যাখ্যাটা এইরকম যে, মস্তিষ্কের ৭৮৯৬৫৪৩২১০ থেকে ৮৯৭৬৫৪৩২১০ নম্বর নিউরন সেকেণ্ডে ৬৭.৫৪৩২১ বার ২৩টি প্যারালাল সার্কিটে অ্যাক্সন পোটেনসিয়াল পাঠাচ্ছে, 'নিউরোনাল ফায়ারিং'-এর থ্রি-ডাইমেনশনাল গ্রাফও পাওয়া যাচ্ছে। তাই মনে হচ্ছে, 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'। পূর্ণিমার চাঁদ যদি ভাতের থালা মনে হয়? তার স্নায়ুভিত্তিক ব্যাখ্যাও এইজাতীয় হবে—এত নম্বর নিউরন-এর তত হারে অ্যাক্সন পোটেনসিয়াল এবং সার্কিট।

রজনীগন্ধার অনুষঙ্গে পূর্ণিমার অন্য একটি মানসিক প্রতিচ্ছবিও চিরে দেখা যেতে পারে। "পূর্ণিমাসন্ধ্যায়

তোমার রজনীগন্ধায় রূপসাগরের পারের পানে উদাসী মন ধায়"—কথায়, সুরে, ছবিতে ভিতরে কী যেন হয়! ধরা যাক, আরো একশো বছর বেশি বাঁচা হলো—ভিতরে কী যেন হয় শুনে! দ্বাবিংশ শতাব্দীর শুরুতে প্রথিতযশা স্নায়ুবিজ্ঞানী বললেন, উদাসী মন কত গতিতে ধায় এবং মনের ঔদাসীন্য কতখানি তা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় জানা যায় এবং ব্যাখ্যাও করা যায়। তাই?—হ্যাঁ। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে বিবিধ ইলেকট্রোড ঢুকিয়ে বহুবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি বললেন, এত নম্বর সাইন্যাপ্স-এর মধ্যে একটা বিশেষ 'নিউরোট্রান্সমিটার' (২০০৩ সালে আবিষ্কৃত) বের হয়, যা 'ভল্যুম ট্রান্সমিশন'-এ ০.৭৯ সেন্টিমিটার দূরে গিয়ে তার রিসেপ্টর-এর গামা ২বি টাইপ-এর সাথে যুক্ত হয়ে এত নম্বর নিউরনকে এই ভোল্টেজে ফায়ার করাচ্ছে, তাকে সাহায্য করছে এত নম্বর 'গ্লায়াল সেল' (২০৯৭ সালে ব্রেন-এর গ্লায়াল সেল-এর বিস্তৃত ম্যাপ ও যাবতীয় কাজ জানা হয়ে গেছে)। ব্যাখ্যা চলতে থাকল—অনেক ব্যাখ্যা হলো স্নায়ুকোষের কাজের, কিন্তু পূর্ণিমাসন্ধ্যায় রজনীগন্ধায় উদাসী মনের বিষয়গত অভিজ্ঞতা (subjective experience) ও গুণগত অনুভব (qualitative feel)—কোয়ালিয়া (qualia)—তার কোন ব্যাখ্যাই হলো না!



প্রশ্ন শুধু এই নয় যে, এজাতীয় ব্যাখ্যার কী অর্থ? সুস্পষ্টরূপে প্রশ্ন এই ঃ বস্তুগত নিউরন বা তার রিসেপ্টর-এর সাথে চেতনার রূপসাগরের কী সম্পর্ক?

স্নায়ুকোষের এই নিরলস গবেষণালব্ধ বস্তুগত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাথে সচেতন অভিজ্ঞতার যোজন ফারাক রয়েই যাচ্ছে, যাকে দার্শনিক ডেভিড চেলমার্স বলেছেন 'ব্যাখ্যামূলক ব্যবধান' (Explanatory Gap)। চেতনার বিষয়গত অভিজ্ঞতা—গুণগত অনুভবের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই 'ব্যাখ্যামূলক ব্যবধান' বিদ্যমান। উল্লেখ্য, ব্যাখ্যামূলক ব্যবধান যে রয়েছে তা-ই প্রমাণ করা যাবে না, কারণ চেতনাকেই প্রতিপন্ন করার উপায়ই জানা নেই! চেতনার 'এক প্যাকেট নিউরন'-তত্ত্বের উদ্গাতা ফ্রান্সিস ক্রিক তাঁর 'The Astonishing Hypothesis' গ্রন্থের একেবারে শেষের দিকে স্বীকার করেছেন, কোয়ালিয়া সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থে কিছুই প্রায় নেই।

দেহ-মন, বস্তু-চেতনার 'ব্যাখ্যামূলক ব্যবধান' প্রকারান্তরে আমাদের অসহায়ত্বকেই ইঙ্গিত করে। এই অসহায়ত্ব, অন্তর্জগতে যা হয় তা প্রকাশ করা, জানাবার এবং তা কোনভাবে করলেও অন্যের বুঝতে পারা, তাকে বোঝাতে পারার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বর্তমান। জানানোর এবং অন্যের বুঝতে না পারার সমস্যা—দুই-ই বর্তমান এবং দুটি ক্ষেত্রেই আমরা অসহায়। এই অসহায়ত্ব আমাদের চিরন্তন, যার সর্বোত্তম প্রকাশ সম্ভবত গানে—"আমি কেমন করিয়া জানাব আমার জুড়াল হৃদয় জুড়াল/ ...আমি কেমন করিয়া জানাব আমার পরান কী নিধি কুড়াল...।" ভিতরে কী হয় তা বাইরে আমরা দেখাতে পারি না, বোঝাতেও অপারগ—"দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ খুলে গো।/ বুঝাতে পারি নে হৃদয়বেদনা।" 'বজ্রবেদনে' ভিতরে পুড়ে গেলে যা হয়—সেই বেদনা—নিউরন, নিউরোট্রান্সমিটার, ক্যালসিয়াম চ্যানেল, কি কোয়ার্ক-কণিকা দিয়ে বোঝা যায়, না বোঝানো সম্ভব? রিসেপ্টর দিয়ে রূপসাগরের পারে যাওয়া যায়, না যাওয়া সম্ভব?

আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ

কোনকিছু জানার জন্য বৈজ্ঞানিকরা সামগ্রিক বস্তুকে কেটে, ভেঙে, ক্রমশ ছোট করে এনে সমগ্রের অন্তর্ভুক্ত অংশের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, অংশকে পর্যবেক্ষণ করে সমগ্র সম্পর্কে ধারণা করেন। এই পদ্ধতির নাম 'লঘুকরণ' (Reductionism)। চেতনা সায়েন্স-এর ক্যাথিড্রাল-এ প্রবেশাধিকার পাওয়ার আগে দুশো বছরেরও বেশিকাল যাবৎ সায়েন্স-এর সীমানা জুড়ে ছিল জড়বস্তু। একথা অনস্বীকার্য, লঘুকরণ পন্থায় জীব, প্রকৃতি-বিজ্ঞানে (Natural Science) বহু প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়েছি—কী, কোথায়, কেমন করে ইত্যাদি। লঘুকরণ পদ্ধতি বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাথে একই যোগে প্রযুক্তিগত সাফল্যও উপহার দিয়েছে এতকাল। চেতনার ক্ষেত্রে এসে অভূতপূর্ব এক সমস্যা হয়েছে—লঘুকরণ পন্থায় চেতনা প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছে না, দেহ-মন বা মস্তিষ্ক-চেতনার সেতুর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

স্নায়ুকোষের রিসেপ্টর বা চ্যানেল দিয়ে রূপসাগরের পারে কোনক্রমেই পৌঁছাতে না পারলে সমস্যার এক সহজ

সমাধান আছে—সচেতন অভিজ্ঞতা বা চেতনার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা। এটি এক চরমপন্থী মত। এই মতে, চেতনা হলো এক ভ্রম (illusion)—ঐরকম মনে হয় যে, চেতনা নামক কিছু একটার অস্তিত্ব আছে, আসলে বিশেষ কিছু নেই। যেমন, সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত বলে কিছু নেই! কঠিন-কঠোর বাস্তব তথ্য ও ঘটনা হলো এই যে, সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে—সূর্যের উদয়-অস্ত বলে কিছু নেই এবং সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের কালে বিশেষ মানসিক অনুভব এক ভ্রমমাত্র। এতখানি না হলেও অপেক্ষাকৃত কম চরমপন্থী মতেও চেতনার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায়, যেমন, জীবকোষের ডি.এন.এ, আর.এন.এ, প্রোটিন সম্পর্কে বিস্তারিত জানলে যেমন জীবনের সব রহস্য জানা হয়ে যায়, তেমন স্নায়ুতন্ত্রের বিবিধ সার্কিট ইত্যাদি জানা হলে রহস্যময় চেতনা সম্পর্কে সব জানা হয়ে যায়, জানার কিছু আর বাকি থাকে না!

পদার্থবিদ্‌গণ এক মূল সূত্রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব ক্রিয়া-প্রক্রিয়া-ঘটনা ব্যাখ্যা করার জন্য এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করে চলেছেন, যার নাম 'সবকিছুর তত্ত্ব' (Theory of Everything)। এই 'সবকিছুর তত্ত্ব' হওয়ার অন্যতম দাবিদার হলো 'স্ট্রিং থিওরি' (String Theory)। পদার্থের ক্ষুদ্রতম মৌলিক কণা (বা অস্তিত্ব) ইলেকট্রন কিংবা কোয়ার্ক নয়—'স্ট্রিং থিওরি' অনুযায়ী অতীব সূক্ষ্ম সুতোর মতো কিছু একটা জিনিস। 'স্ট্রিং থিওরি' নিয়ে পদার্থবিদ্‌গণ কিছু বছর যাবৎ গবেষণা করছেন। 'সবকিছুর তত্ত্ব' আবিষ্কারের স্বপ্ন আগামী অর্ধ-শতাব্দীতে যদি পূর্ণ হয়, 'চেতনাবিহীন' বিশ্বের সবকিছু সেই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করবে—এইরকমই আশা।

'সবকিছুর তত্ত্ব' কি চেতনারও তত্ত্ব? এই তত্ত্ব কি চেতনাকেও ব্যাখ্যা করবে? স্টিভেন ওয়েনবার্গ স্বীকার করেছেন, 'সবকিছুর তত্ত্ব'-দ্বারা চেতনা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে তিনি সন্দিহান। চেতনাবর্জিত বাকি পৃথিবীর সবকিছু ব্যাখ্যা করতে পারলেও সচেতনতার ব্যাখ্যা হয়তো করতেই পারবে না, তবে 'কাছাকাছি' আসবে—অর্থাৎ সচেতন অভিজ্ঞতার সাথে স্নায়ুকোষে শুধু নয়, সূক্ষ্ম সুতোজাতীয় কিছু একটা থেকে সেই অ্যাক্সন পোটেনসিয়াল এবং সার্কিটের সম্পর্ক আবিষ্কৃত হবে। এই 'কাছাকাছি' আসা কতখানি কাছাকাছি?—রিসেপ্টর দিয়ে রূপসাগরের কাছাকাছি আসার মতো। পদার্থবিদ্ জন ব্যারো 'সবকিছুর তত্ত্ব'র অনেককিছু ফাঁক প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, চেতনার কিছু দিক—যেমন ভালবাসা কী, সৌন্দর্য কী ইত্যাদি সম্পর্কে 'সবকিছুর তত্ত্ব'-দ্বারা আলোকপাত করতে অক্ষম।

চেতনা কেন?—এ-প্রশ্নের উত্তর নেই। চেতনার সংজ্ঞা (definition) কী?—জানা নেই। কোন বৈজ্ঞানিক আগামী একশো বছরেও হয়তো চেতনাকে সংজ্ঞায়িত করার কোন চেষ্টাই করবেন না, কেননা অনেক কিছু জানা থাকলেও সংজ্ঞায়িত করা যায় না। ডি.এন.এ-র গঠন আবিষ্কৃত হয়েছে প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে, 'জিন' (Gene) গবেষণায় অসাধারণ অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু 'জিন'-এর সংজ্ঞা, ডি.এন.এ-র গঠন আবিষ্কর্তা বৈজ্ঞানিকও দেননি। তাহলে চেতনা বলতে কী বুঝি? সচেতন অভিজ্ঞতার সাথে অস্তিত্ব ওতপ্রোতোভাবে জড়িত বলে চেতনা কী তা ঠাহর করা যাচ্ছে, কিন্তু উত্তর ঠিক দেওয়া যাচ্ছে না। প্রকারান্তরে এই দাঁড়ায় যে, নিজ অস্তিত্বের স্বরূপ নিজেরই জানা নেই!

'সায়েন্স' বলতে কী বুঝি তা সাধারণভাবে স্থিরীকৃত না করে সায়েন্স-এর শেষ এসে গেল না সঙ্কট শুরু হলো—এই প্রশ্ন নিরর্থক। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, সায়েন্স অর্থাৎ পশ্চিমী বস্তুবাদী বিজ্ঞান এক যুগসন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছে। বাস্তবতা অস্বীকার করা যাবে না এবং তাকে স্বীকৃতি দিলে আগের মতো করে পথ চলাও যাচ্ছে না। চেতনার ক্ষেত্রে সামনে এগোতে গেলে দুটি দিকে সমস্যা এবং দুই দিকেই পথ বন্ধুর। একদিকে, 'মনুষ্য' নামধারী এই সৃষ্টি প্রাণিজগতের অন্তর্ভুক্ত—এই বাস্তবতা। অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার অধিকারী মেশিনের আবির্ভাব যথা কম্প্যুটার। একদিকে জীবজন্তু, অন্যদিকে যন্ত্র। চেতনা ভাগাভাগি করে মানুষে-জন্তুতে এবং বিভিন্ন জীবজন্তুর মধ্যে সীমারেখা টানা এক অসাধ্য কর্ম। সেক্ষেত্রে সমাধান—এক, সায়েন্স দিয়ে সীমানা করার চেষ্টা ছেড়ে দাও; দুই, সীমানা না টেনে মানুষ ও অন্য সকল জীবে আত্মা বা ঈশ্বর বা রহস্যময় কিছু একটার বিদ্যমানতা স্বীকার করে নাও। অন্যদিকে, মানুষ এই এই পারে—যথা গণিত, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত; কর্মক্ষমতার মাপকাঠিতে মেশিনকে অচেতন শ্রেণীভুক্ত করা যাবে না। মরিয়া হয়ে যদি এই যুক্তিও দেওয়া হয় যে, মানুষের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হয়, কিন্তু মেশিনের হতে পারে না—সেক্ষেত্রেও সমাধান দুরাশামাত্র। কৃত্রিম মেধার প্রযুক্তিবিদ্ বলছেন, মেশিনেরও আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হতে পারে এবং সেই অপ্রীতিকর উত্তরহীন প্রশ্ন—কী করে জানছি মেশিনের উপলব্ধি নেই? এক্ষেত্রেও পূর্বের মতো সমাধান—এক, সায়েন্স দিয়ে মানুষে-মেশিনে চেতনার ভেদাভেদ করার চেষ্টা ছেড়ে দাও; দুই, মেশিনও সচেতন হতে পারে, সুতরাং মানুষে মেশিনে সমভাবাপন্ন হয়ে ওঠ, সমদর্শী হও।

বস্তুর সাথে চেতনার সম্পর্ক ঘিরে প্রশ্ন আজকের নয়, অনেক কালের। বলা বাহুল্য, ভাববাদ ও বস্তু-বাদের বিরোধের মূলে আছে এই প্রশ্ন (বা তার উত্তর)। বস্তুর সাথে চেতনার সম্পর্ক কি আছে?—হ্যাঁ। বস্তু কি সচেতন হতে পারে বা বস্তুতে চেতনার প্রকাশ ঘটতে পারে?—এরও উত্তর হ্যাঁ, প্রমাণ আমরা নিজেরা। বস্তুতে চেতনার প্রকাশ হয়—এর অর্থ কি এই যে, বস্তু থেকে চেতনার উদ্ভব? এই প্রশ্নের উত্তরে যারা 'হ্যাঁ' বলেন, তাঁদের অনেকে ক্ষুণ্ণ হবেন যদি বলা হয়, 'বস্তু থেকে চেতনার উদ্ভব হয়'—ধারণাটি মনগড়া বিশ্বাসমাত্র। কেন মনগড়া বা স্নায়ুতন্ত্র তার কর্মপদ্ধতিতে কিভাবে বাস্তবতা তৈরি করে—এর ভিত্তিতে ভ্রমও বাস্তব হয় এবং বাস্তবও ভ্রম হয়ে ওঠে। এর বিস্তৃত আলোচনা এখানে অসম্ভব, তবে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে (আজকের সায়েন্স-এর সীমানার মধ্যে থেকে)। প্রথমত, সায়েন্স-এ প্রমাণ বলতে যা বোঝায় (বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, সাক্ষ্যপ্রমাণ) সেভাবে আজ পর্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেননি—'বস্তু থেকে চেতনার জন্ম'। এইরূপ দাবিও বৈজ্ঞানিক মহলে কেউ পেশ করেছেন বলে জানা নেই। কম্প্যুটার প্রযুক্তির উন্নতিতে এই প্রশ্ন সাম্প্রতিক অতীতে উঠেছে—কম্প্যুটার কি সচেতন? এই বিতর্কের যেহেতু মীমাংসা নেই, তাই আমরা বাহান্ন বছর পিছিয়ে যাই—১৯৫০ সালে, যখন কম্প্যুটার-প্রযুক্তিবিদ্ অ্যালান ট্যুরিং কল্পিত কম্প্যুটার-এর ট্যুরিং পরীক্ষা পাশ করে মানুষের সমকক্ষ হওয়ার কথাও ওঠেনি। তখনো কোন বৈজ্ঞানিক বস্তু থেকে চেতনার উদ্ভব প্রমাণ করেননি, প্রমাণের দাবিও পেশ করেননি। দ্বিতীয়ত, কৃত্রিম মেধার প্রযুক্তিবিদের 'মস্তিষ্কের কাজই হলো মন' (Minds are simply what brains do) এবং মনে যা হয় তার স্নায়ুগত সম্পর্ক আছে—স্নায়ুবিজ্ঞানের এই গবেষণাকে অগ্রাহ্য না করলে প্রতিটি বাস্তবতাই 'মনগড়া', যার স্নায়ুগত অনুষঙ্গ আছে। তৃতীয়ত, কোনকিছু জানার জন্য কী দিয়ে জানছি আগে তা জানতে হয়। একমাত্র সচেতন অবস্থাতে জানা যেতে পারে বস্তু থেকে চেতনার উদ্ভব কিনা। প্রশ্ন হলো, চেতনা কী তা সম্যকরূপে না জেনে চেতনার উদ্ভব বস্তু থেকে—একথা সুনিশ্চিতরূপে বলি কী করে? উপরন্তু, বস্তু যে বস্তু তাও জানছি চেতনা থেকে, কিন্তু চেতনা কী তা-ই ঠিক জানি না! সুতরাং বস্তুটা যে জড় বস্তু, আসলে তাই বা সঠিক জানছি কী করে?

বস্তু থেকে চেতনার উদ্ভব হয় না—এটাও কি আমরা বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যপ্রমাণ-সহ বলতে পারি? না, তাও পারি না। চেতনার উদ্ভব বস্তু থেকে হয় বা হয় না—এই দুই-ই মনগড়া ধারণা, দুই-ই মনের ভাবের কথা—ভাববাদ। মনকে বস্তুগত বললে এই দুই-ই বস্তুবাদ। চেতনার উদ্ভবের প্রশ্ন যেন গোডেল-এর 'অসম্পূর্ণতা উপপাদ্য'।

চেতনা বাদ দিলে দেহ-মনের সমস্যায় বিশেষ আগ্রহজনক কিছু নেই। চেতনাকে অন্তর্ভুক্ত করলে পশ্চিমী বিজ্ঞানে দেহ-মনের সমস্যা সমাধানের আশা ছেড়ে দিতে হয়। তুলনামূলকভাবে অতি 'সহজ' প্রশ্ন এখন চেতনা গবেষণায় আলোচ্য ও বিচার্য বিষয়, যেমন—দৃষ্টিগত চেতনা বা চিন্তা ও সচেতন কর্মের সম্পর্ক ইত্যাদি। স্নায়ুতন্ত্রে এই 'আমি'র বাস্তবতা কী করে তৈরি হয়, সমাধিস্থ অবস্থায় সচেতন অভিজ্ঞতার সাথে স্নায়ুতন্ত্রের কর্মবৈশিষ্ট্য কী—এজাতীয় প্রশ্নের উত্তরের ইঙ্গিতও আমাদের অনেকের জীবিতকালে হয়তো পাওয়া যাবে না। সায়েন্স-এ সব প্রশ্নের উত্তর নেই। 'আমি কী করে জানব, আপনি সচেতন?'—এই প্রশ্নের উত্তর কোন সায়েন্স-এ নেই। সাধারণ স্তরেও আমরা যা যা সম্পর্কে সচেতন, তার সবকিছু বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারব না।

সকলের জন্য সমান সন্তোষজনক চেতনার পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-ব্যাখ্যা কোনকালে পাওয়া না গেলেও জীবন কিন্তু থেমে থাকবে না, সায়েন্স-এর প্রয়োজনও ফুরিয়ে যাবে না। বাঁচার দুর্মর আকুলতা থেকে মানুষ সেই পথ বেছে নেবে, যা জীবনের অস্তিত্ব ও বিকাশের সহায়ক—যেভাবে জলের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা (H_2O—হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন-এর যৌগ) আবিষ্কৃত হওয়ার অনেক আগে জীবনের প্রয়োজনে জলের ভাল-মন্দ মানুষ জেনেছে—কোন্ জল কৃষিতে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু পানীয় নয়।

যদি চেতনা না থাকে—বায়ুচাপের ঢেউয়ের নিজস্ব কোন ঝঙ্কার নেই, আলোককণারও কোন রঙ নেই, কোন রাসায়নিক পদার্থের কণারও পরম সুগন্ধ নেই। চেতনায় এই জগৎ রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময়, কিন্তু অণু-পরমাণু-ইলেকট্রন-প্রোটন-কোয়ার্ক, স্ট্রিং-সুপারস্ট্রিং—যা-ই হোক, এদের কারো নিজস্ব কোন বর্ণ-শব্দ-গন্ধ নেই। ৫৩০ বা একটু বেশি ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্য (wave-length)-র আলোককণার আলাদা আপন কোন রঙ নেই। আমরা জানি, চোখের নির্দিষ্ট কিছু জীবকোষকে আলোককণা উদ্দীপিত করে এবং সঙ্কেত স্নায়ুবাহিত হয়। তারপর?

এক রহস্য ও বিস্ময়—অজানা এক প্রক্রিয়ায় চেতনায় ৫৩০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোককণার ক্ষেত্রে দেখি সবুজ এবং ৫৬০ হয়ে যায় লাল।

তাই "আমার চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে" শুধু কবিতা নয়, একাধারে কাব্য-দর্শন-বিজ্ঞান—চিরন্তন। ❑

উট বসন্ত ঃ

জৈব-অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কি?

কয়েক বছর আগে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় বসন্তরোগ (আসল বসন্ত বা Small Pox, পানি বসন্ত বা Chicken Pox এবং বানর বসন্ত বা Monkey Pox) সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বসন্তরোগ হাজার হাজার বছরের পুরনো। যে-রোগ সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ রোগীর অঙ্গহানি বা প্রাণহানি করেছিল, তাকে ১৯৭৯ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নেতৃত্বে এবং ভারত-সহ বহু জাতির সহযোগিতায় নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। যে-ভাইরাস (ভেরিয়োলা—Variola) বসন্তরোগের কারণ, তা বর্তমানে মানুষ বা কোন প্রাণীর শরীরে নেই বলে এই রোগের ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। বর্তমানে ভেরিয়োলা ভাইরাস মাত্র দুটি ল্যাবরেটরিতে (মস্কো এবং আমেরিকার আটল্যান্টায়) খুব সতর্কতার সঙ্গে সংরক্ষিত আছে। লক্ষ্য রাখা হয়, কোন ল্যাবরেটরি-কর্মীর মাধ্যমে যেন তা ল্যাবরেটরির বাইরে না আসে। মানুষের বসন্তরোগ মানুষেই হয়। বানর, গরু, ভেড়া প্রভৃতি অনেক জন্তুর বসন্তরোগ হয়, তাদের রোগজীবাণু ভেরিয়োলার মতো দেখতে হলেও তারা মানুষে বসন্তরোগ সৃষ্টি করে না।

বসন্তরোগের টিকা (Small Pox Vaccine) প্রতিরোধক হিসাবে খুবই কার্যকরী। এই রোগ বর্তমানে হয় না বলে ভারত-সহ সারা পৃথিবীতে কোথাও এই টিকা (Vaccine) তৈরি হয় না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, নানা কারণে এই রোগের ভাইরাস (ভেরিয়োলা) আন্তর্জাতিক জীবাণুযুদ্ধের ক্ষেত্রে একটি সম্ভাব্য শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—অনুবাদক (*বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ভূতপূর্ব বসন্তরোগ-বিশেষজ্ঞ*)

বিজ্ঞানীরা উটবসন্ত জীবাণুকে মানুষের বসন্ত-জীবাণুর যতটা নিকটসম্পর্কীয় ভাবতেন, সম্পর্কটি তার চেয়েও নিকট। এতে ভয় হয় যে, ইরাকিরা এই উটবসন্ত জীবাণুর দেহে কৃত্রিম উপায়ে যৎসামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে একে জীবাণুযুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে কাজে লাগাতে পারে। কারণ, এই দুই ভাইরাসের আকৃতি ও গঠনের তফাত সামান্যই। হয়তো কৃত্রিম উপায়ে উটবসন্ত ভাইরাসের শরীরে সামান্য পরিবর্তন করলেই পরিবর্তিত ভাইরাস মানুষকে আক্রমণ করতে পারে। দুটি ভাইরাসই একই পরিবারের (Orthopox family) অন্তর্ভুক্ত, অবশ্য আলাদা প্রজাতির (specis)। দুটি ভাইরাসের শরীরের বহিরাংশ একইপ্রকার এবং হয়তো উটবসন্তের এই অংশে মানুষের দেহে রোগ সৃষ্টি করার জিন (gene) থাকতে পারে।

অনেকদিন থেকেই ভাবা হচ্ছিল, মানুষের বসন্তরোগ নির্মূল হওয়ার পর এই শূন্যস্থান আর কোন ভাইরাস দখল করবে কিনা। রাশিয়ান ল্যাবরেটরির অধ্যক্ষ লেভ স্যাণ্ডাকচিয়েভ বলেন ঃ "ঐরকম হতে বাধ্য।" এদিকে ডি. এ. হেণ্ডারসন—যিনি বসন্তরোগ নির্মূলীকরণ প্রকল্পের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি এমন হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এখনো পর্যন্ত যাদের গৃহপালিত উট আছে, তাদের কারো উটবসন্ত হয়নি। অবশ্য উটের বসন্তরোগ হামেশাই হয় এবং সারা পৃথিবীতে প্রায় ২ কোটি উট আছে। এই ভাইরাসের কোন টিকা নেই। হয়তো উট-ব্যবসায়ীদের এই জন্তুর সংস্রবে আসার জন্য তাদের প্রতিরোধক্ষমতাও গড়ে উঠেছে। প্রাপ্তবয়স্করা যাঁরা উটের সংস্রবে আসেন, তাঁদের সকলেরই বসন্ত টিকা (Small Pox Vaccine) নেওয়া রয়েছে বলে তাঁদের উটবসন্ত হয় না।



বসন্তে আক্রান্ত উট

১৯৯৫ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অস্ত্রপরীক্ষকদের কাছে ইরাক সরকার স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁদের বিজ্ঞানীরা উটবসন্ত নিয়ে গবেষণা করছেন। ইরাকিদের সয়ে গেছে (immune) বলে তাদের উটবসন্ত হবে না, কিন্তু বিদেশী সৈন্যদের হবে। অস্ত্রপরীক্ষকদের ভয় হয়েছিল, বসন্ত ভাইরাস অস্ত্রের বিকল্প হিসাবে ইরাকিরা উটবসন্ত ভাইরাসকে ব্যবহার করবে। পরীক্ষকদের আরো ভয় হলো যে, ইরাকিদের গবেষণাগারে নিশ্চয়ই ভেরিয়োলা ভাইরাসও মজুত আছে। এই ভয়ের ফলে আমেরিকায় প্রচুর বসন্তরোগের টিকা (Small Pox Vaccine) মজুত রাখা হয়েছে।

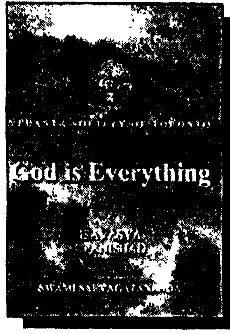
গত সপ্তাহে ব্রিটিশ সরকার ৩২ মিলিয়ন পাউণ্ডের টিকার ফরমাস দিয়েছে। এখন মনে হচ্ছে, উটবসন্তই ভয়ের কারণ হতে পারে। বোঝা যাচ্ছে না ইরাকিরা এখনো এই নিয়ে কাজ করছে কিনা। তবে কোন ল্যাবরেটরি যদি প্রচুর পরিমাণে উটবসন্ত ভাইরাস তৈরি করতে থাকে, তবে ঘটনাক্রমে (selective pressure) মানুষের রোগসৃষ্টিকারী ভাইরাসও এর মধ্যে থেকে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। **[New Scientist, 20th April 2002, p. 5]** ❑

সঙ্কলন ও অনুবাদ ❑ জলধিকুমার সরকার

সম্পাদনা ❑ স্বামী সর্বগানন্দ

ঈশ উপনিষদ্‌ ও এযুগের মানুষ

ভূপেন্দ্রনাথ শীল



God is Everything
Isavasya Upanishad
An Exposition by
Swami Sarvagatananda
Publisher :
Vedanta Society of Toronto
120 Emmett Avenue
Toronto, Canada, M6M 2E6
Page : 12+130
Price : $12US (Soft Cover)
$15US (Hard Cover)

নাডার বেদান্ত সোসাইটি অফ টরন্টো থেকে প্রকাশিত হয়েছে একটি মূল্যবান গ্রন্থ—'**God is Everything : Isavasya Upanishad**'। গ্রন্থটিতে ঈশ উপনিষদের আঠারোটি সংস্কৃত শ্লোকের অর্থ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী সর্বগতানন্দ। বলা বাহুল্য, শ্লোকগুলির ইংরেজি অনুবাদ ও ভাববিশ্লেষণ মূলানুগ হয়েছে। গ্রন্থটি পাঠ করলে এর গভীর মানবিক দিকটি লক্ষ্য করা যায়। শুধু হিন্দুধর্ম নয়, বিভিন্ন ধর্মের আলোচনায় ধর্মতত্ত্বের সামঞ্জস্য যে অদ্বৈতবাদেরই অঙ্গীভূত, তা তুলে ধরে প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনের বহু ঘটনার উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন, ঈশ উপনিষদের মহাসত্যগুলি কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে মূর্ত হয়েছিল। তাঁর অন্যতম লক্ষ্য হলো—ঈশ উপনিষদে বিবৃত ধর্মতত্ত্ব এযুগের মানুষকে একটি বিরোধহীন শান্তির পথে নিয়ে যাবে।

জগৎ ব্রহ্মময়। সর্ববস্তুতেই ব্রহ্মের অস্তিত্ব বর্তমান। অর্থাৎ সর্ববস্তুই ঈশ্বরময়। সবই যে তিনি, সবই যে 'আমি'। এই অদ্বৈতবাদী সত্য শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আক্ষরিকরূপে ব্যক্ত হয়েছিল। এই অদ্বৈতবাদী দৃষ্টি এযুগের মানুষকে অধ্যাত্মজীবনে চলার পথে সাহায্য করবে। উপনিষদের আধ্যাত্মিক সম্পদের মধ্যে ভারতীয় ঋষিরা যে-সাধনার ফল রেখে গেছেন, তাকে এযুগের মানুষ ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করুক—এটি গ্রন্থকারের লক্ষ্য। নানা মত ও নানা পথের দ্বন্দ্বে ও বিভ্রান্তিতে মানুষ আধ্যাত্মিক অন্বেষণের পথে অগ্রসর হতে পারে না। দেখা যায়, ধর্ম শুধুমাত্র শাস্ত্রপাঠ, আচার ও বাহ্য নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকে লেখক দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলে ধরেছেন বলে অধ্যাত্মপথের সন্ধানী পাঠকদের কাছে গ্রন্থটির মূল্য অসীম। গ্রন্থটির মূল্যায়নে যা পাঠকের প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তা হলো 'কথামৃত'-এ কথিত শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও যিশুখ্রিস্টের বাণীর অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য। লেখকের আলোচনার ব্যাপ্তি ধর্মতত্ত্বের গভীরে নিয়ে গেছে। ঈশ উপনিষদ্‌, কঠ উপনিষদ্‌, ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌, গীতা, পুরাণ, বাইবেল, কোরান, তন্ত্রশাস্ত্র প্রভৃতির আলোচনা বিষয়বস্তুর পরিধিকে বিস্তৃত করেছে। এছাড়া এই গ্রন্থে পাই মহম্মদ, শঙ্করাচার্য, যিশুখ্রিস্ট, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের কথাও। একাধিক-বারই বিভিন্ন ধর্মের ভাবাদর্শের সাদৃশ্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে তার অপূর্ব প্রতিফলন দেখানো হয়েছে। গ্রন্থটি পাঠ করার অর্থই হলো শ্রীরামকৃষ্ণকে নব নব রূপে দেখা, তাঁকে জানা।

ঈশ উপনিষদের শ্লোকগুলির ব্যাখ্যায় লেখকের রচনার মানবিক দিকটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। যখন তিনি মানুষের সঙ্গে সমগ্র জীবজগৎ ও বস্তুজগতের বৈসাদৃশ্য দেখিয়েছেন, তখন এই সত্যই বড় হয়ে উঠেছে—একমাত্র মানুষই বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন। হিংসায় উন্মত্ত হয়ে যে-মানুষ একদিন হিরোসিমাকে ধ্বংস করেছিল, সেই মানুষই পরে বিবেকতাড়িত হয়ে অনুতাপে দগ্ধ হয়েছিল। বলেছিল ঃ "হে ঈশ্বর, আমরা কী করেছি!" বিবেকের মাধ্যমেই মানুষ শিক্ষালাভ করে। লেখক দেখিয়েছেন যে, আজকের মানুষের জীবনে সভ্যতার অগ্রগতির জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীই পূর্ণ প্রাসঙ্গিক। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়—"যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।" আধুনিক কালের বহু মনীষীর বাণীর তাৎপর্য স্বামী সর্বগতানন্দের আলোচনার বিষয়বস্তুকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রত্যেকটি ব্যাখ্যাই যুক্তিপূর্ণ এবং প্রত্যেকটির আলোচনাই এযুগের মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে সত্যপথে চালিত করতে সাহায্য করবে। উপনিষদের আদর্শগুলি মানুষের জীবনে প্রযুক্ত হলে সে নিশ্চিতভাবে আধ্যাত্মিকতার আলোকময় পথে এগিয়ে যাবে এবং তার জীবনের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে প্রকাশ করবে। গ্রন্থের বিষয়বস্তু কোন দেশ বা কোন কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর বিষয়বস্তু শাশ্বত, তাই এর আবেদনও নিত্য, অনন্তকালের।

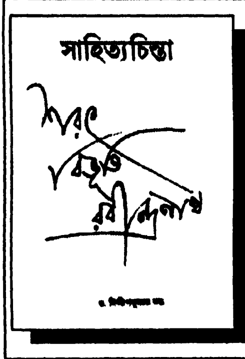
গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন বেদান্ত সোসাইটি অফ টরন্টোর অধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দ। মুখবন্ধটি লিখেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও মুখবন্ধটি মূল্যবান। শিরোনামে উল্লিখিত বাক্যটির মধ্যেই গ্রন্থটির মূল পরিচয় বিধৃত। ❑

প্রাপ্তি-সংবাদ

- **চরণে শরণ**—পূর্ণচন্দ্র দিন্দা। প্রকাশিকা ঃ কানন দিন্দা, কবিকানন, মহিষাদল, মেদিনীপুর। পৃষ্ঠা ঃ ১৩৬। মূল্য ঃ ৪০ টাকা।
- **স্বভাব কবি গোবিন্দদাস ও তাঁর কাব্য**—প্রমোদবিকাশ ভট্টাচার্য। প্রকাশিকা ঃ এম. ভট্টাচার্য, 'শ্রীপর্ণম্‌' প্রকাশন, ১/২সি/১এস, রামকৃষ্ণ নস্কর লেন, কলকাতা-৭০০ ০১০। পৃষ্ঠা ঃ ১৬+৩২৬। মূল্য ঃ ৯০ টাকা।
- **হিন্দুর শত্রু হিন্দু**—প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু। প্রকাশক ঃ প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু, পি-৪৭, এল. আই. সি. টাউনশিপ, পোঃ মধ্যমগ্রাম, জেলা ঃ উত্তর চব্বিশ পরগনা, পিন-৭৪৩২৭৫। পৃষ্ঠা ঃ ১৯০। মূল্য ঃ ৬০ টাকা।

সমালোচনা-সাহিত্যে এক নতুন সংযোজন

সন্তোষকুমার দত্ত



সাহিত্যচিন্তা :
শরৎ-বিভূতি-রবীন্দ্রনাথ
ডঃ দিলীপকুমার দত্ত
প্রকাশিকা :
ছায়া দত্ত
'শৈলছায়া গঙ্গোত্রী'
মানুষপুর, ব্যাণ্ডেল জংশন
হুগলী-৭১২১২৩
পৃষ্ঠা : ১৬+১৬০
মূল্য : ৬০ টাকা

শরৎচন্দ্র ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে আলোচনা-সমালোচনামূলক গ্রন্থ বাঙলা সাহিত্যে অপ্রতুল নয়—বরং অন্যান্য সাহিত্যিকদের তুলনায় বেশি। এই দুজনকে নিয়ে মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ সেনগুপ্ত প্রমুখ সমালোচক থেকে শুরু করে বহু যশস্বী ও যশোপ্রার্থী আলোচকের গ্রন্থ বর্তমান। আর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এযাবৎ প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা এগারোশো-এর চেয়ে কিছু বেশি। বর্তমান আলোচক 'সাহিত্যচিন্তা : শরৎ-বিভূতি-রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে এই তিনজনকে একই আধারে সন্নিবিষ্ট করে তিনটি ভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। প্রথমে শরৎচন্দ্র, মধ্যে বিভূতিভূষণ, শেষে রবীন্দ্রনাথ।

বাঙলা সাহিত্যের আলো-বাতাসে যাঁদের মননের বিকাশ ও ব্যাপ্তি—তাঁরা একইসঙ্গে চন্দ্র-সূর্যের প্রত্যক্ষকরণে সৌভাগ্যবান। সাহিত্যের মধ্যগগনে যখন রবিচ্ছবি আপন বিভায় সমুজ্জ্বল, তখন 'ভারতী'র আঙিনায় প্রতিপদের চাঁদের মতো শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। সামান্য আলোর ইশারাতেই পূর্ণতার প্রতিশ্রুতি। সাহিত্যপ্রেমীদের কাছে এক পরম প্রাপ্তি—একদিকে রবীন্দ্রনাথ, অপরদিকে শরৎচন্দ্র। একইসঙ্গে সূর্য-চন্দ্রের সহাবস্থান।

"শরৎচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শের অনেক কিছুই কবি রবীন্দ্রনাথ কেন যে মেনে নিতে পারেননি" লেখকের কাছে—"তা বিস্ময়ের কথা" (পৃঃ ২০) বলে মনে হয়েছে। কিন্তু উভয়ের সাহিত্যাদর্শের উৎস ও ব্যাখ্যান লক্ষ্য করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। একজন মূলত কবি, অন্যজন প্রধানত কথাসাহিত্যিক—যাঁর সাহিত্যজীবনের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত কাব্যসাহিত্য নয়, কথাসাহিত্যই একমাত্র অবলম্বন। বিভিন্ন বিরূপ সমালোচনায় শরৎচন্দ্র যে কত আঘাত পেয়েছেন,, লেখক তার একাধিক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃতি সহকারে দেখিয়েছেন। কিন্তু এই সমালোচনা তো একজন বড় লেখকের পুরস্কার। নিন্দা-প্রশংসার বিষামৃতই তো তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিভূতিভূষণ। এই অধ্যায়ের শেষে লেখক জানিয়েছেন—"সৃষ্টির ক্ষেত্রে কথাসাহিত্য ছাড়া সাহিত্যের অন্যান্য নানা বিচিত্র ধারার আত্মপ্রকাশের কোন চেষ্টা বা ইচ্ছা কোনটাই তাঁর (বিভূতিভূষণের) ছিল না।" (পৃঃ ১০৮) বিভূতিভূষণের সাহিত্যবোধে 'বৈচিত্র্যের অভাব ও একদেশদর্শিতা' আছে বলে লেখকের ধারণা। (পৃঃ ১০৯) পরে আবার 'সাহিত্যের মূল আদর্শ'—যা 'বিশ্বের সকল সাহিত্য-কলাবিদ্‌দেরই মনের কথা, ধ্যানের কথা' বলে এই অধ্যায়ের উপসংহার টানা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তা স্ববিরোধিতা বলে মনে হয়। কিন্তু সাহিত্যে বিভূতিভূষণ যে-জীবনাদর্শের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, তার মূলে কোন অদ্বিতীয়তা না থাকলেও তা হৃদয়ের ঐকান্তিকতা ও অকৃত্রিমতায় মণ্ডিত। যে-সৌন্দর্যানুভূতি ও রসবোধ জীবনকে গভীর ও বিস্তৃত করে—তার উৎস আপন অন্তর। অন্তরের সেই ছাপ বিভূতি-সাহিত্যে পরিস্ফুট। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবজগতের মূলে যে-সৌন্দর্যানুভূতি ও অসীমের প্রতি গভীর আকুতি আত্মমগ্ন—তাকে তার স্ব-রূপে প্রকাশের দায়িত্বে তিনি যেন অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই চেকভের এই জিজ্ঞাসা বিভূতিভূষণের পক্ষেও সত্য : "Do you know that in three or four hundred years all the earth will become flourishing garden?" বিভূতিভূষণের সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য তাই—গ্রন্থকার তা পক্ষান্তরে স্বীকার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত আলোচনাটিতে রবীন্দ্র-ভাবনার নতুন দিকের প্রকাশ না থাকায় তা স্বাভাবিকভাবেই গতানুগতিক। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আলোচনা বাঙলা সাহিত্যে পর্বতপ্রমাণ। সেক্ষেত্রে নতুন কথা বলার মতো অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলোচক বর্তমানে খুবই কম। দুঃখের বিষয়, গ্রন্থকার সেই সংখ্যালঘুর দলভুক্ত নন। তবু তিনি তাঁর মতো করে দেখার চেষ্টা করেছেন—যা অনেকের দেখার সগোত্র। কবির এত উদ্ধৃতি এই রচনায় আছে যে, তার মধ্যে থেকে লেখকের চিন্তার মৌলিকত্ব দুর্লক্ষ্য।

গ্রন্থ শেষের অব্যবহিত পূর্বে 'পরিশিষ্ট' অংশে গ্রন্থকার জানিয়েছেন : "কলা ও কল্যাণভাবনা একই সাহিত্য-বিহঙ্গের দুপাশের দুটি ডানা ব্যতীত আর কিছু নয়।" বড় সুন্দর উপমা। অর্থাৎ 'Art for Humanity's Sake'—মানবকল্যাণের জন্য শিল্প। অনেকদিন আগে বঙ্কিমচন্দ্র এই কথাটি অন্যভাবে বলেছিলেন : "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধনা করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্যসৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।" ('প্রচার', মাঘ ১২৯১)

গ্রন্থকারের পরিশ্রমলব্ধ এই গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য। তবে সকল প্রবন্ধের মধ্যে উদ্ধৃতির আধিক্যের তুলনায় লেখকের বক্তব্য এত সামান্য যে, তা থেকে বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনার পরিষ্কার চিত্র ফুটে ওঠে না। গ্রন্থটির ছাপা ও বাঁধাই ভাল। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কাম্য। ❑

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রাজকোট-এর ৭৫ বছর

১৮৯১-৯২ খ্রিস্টাব্দ। স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজকের বেশে চলেছেন পশ্চিম ভারতের পথে পথে। আমেদাবাদ, দ্বারকা, ভাবনগর, ভুজ—স্বামীজী স্বপ্ন দেখছেন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তের মতো এখানেও একদিন প্রজ্বলিত হবে পবিত্রতা, বৈরাগ্য, সেবা ও জ্ঞানের অগ্নিশিখা; এখানেও একদিন মূর্ত হয়ে উঠবে তাঁর স্বপ্নগুলো। রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রমের ইতিহাস স্বামীজীর সেই স্বপ্নেরই একটা বাস্তব রূপ।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে স্বামী মাধবানন্দজী এসেছিলেন রাজকোটে। তখনো অবশ্য তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ হননি। সেসময়ে রাজকোটের নেতৃস্থানীয় নাগরিকবৃন্দ পূজ্যপাদ মহারাজকে অনুরোধ করেন সেখানে একটি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপনার জন্য। তখন সমগ্র পশ্চিম ভারতেই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কোন শাখাকেন্দ্র ছিল না। যাই হোক, তাঁদের এই স্বতঃস্ফূর্ত অনুরোধেরই ফলস্বরূপ

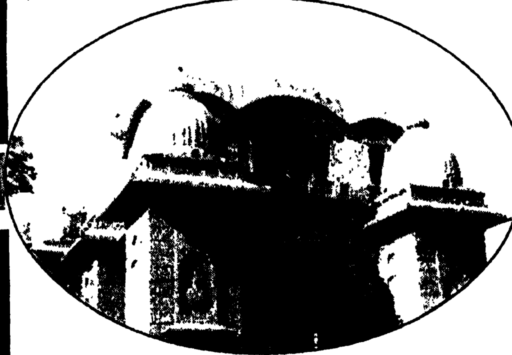

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

অনুপম সুন্দর আশ্রমের রূপ নিয়েছে। প্রথমে একটি ছোট ঠাকুরঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যপূজা হতো। আজ, এই আশ্রমের মূল দ্রষ্টব্য বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের আদলে নির্মিত বিশ্বজনীন মন্দিরটি। তৎসহ আশ্রমে আছে একটি সুসজ্জিত বিদ্যার্থিমন্দির, একটি সুবিশাল গ্রন্থাগার এবং এক উন্নত প্রকাশনা বিভাগ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য বিদ্যার্থি-মন্দিরটি স্থাপিত হয় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে এটি 'শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যার্থি-মন্দির' নামে বর্তমান অবস্থানে বৃহদাকারে নির্মিত হয়। এখানে বহু দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রকে বিনা বেতনে বা স্বল্প বেতনে পাঠদান করা হয়। এছাড়া স্থাপিত হয়েছে 'বিবেকানন্দ গুরুকুল' নামাঙ্কিত একটি ছাত্রাবাসও।

এই আশ্রমের সুবিশাল ও মনোহর পাঠাগারটি ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়। পরবর্তী কালে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১৪ অক্টোবর এটি বর্তমান ভবনে পুনঃস্থাপিত হয়। এই ভবনটির উদ্বোধন করেন ভারতবর্ষের তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ।


১৬ আগস্ট ১৯৭১ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন সঙ্ঘের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ।


শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মরমূর্তির সামনে সমবেত প্রার্থনা।


শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির

রাজকোট


১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন ভারতবর্ষের তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ।


১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে কচ্ছে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন।

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ মার্চ রাজকোটে রামকৃষ্ণ মঠের একটি শাখাকেন্দ্র উদ্বোধিত হয়। মোরভির মহারাজা শ্রীলখাধীরজীর আনুকূল্যে সম্পন্ন হয় এই পবিত্র স্থাপনা। তাই এবছরে এই আশ্রমের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

পরবর্তী কালে ঠাকুর-সাহেব ধর্মেন্দ্র সিংহজী দান করেন একটি স্থায়ী জমি। সেখানে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে শ্রীদুর্গাষ্টমীর পুণ্যলগ্নে জন্ম নেয় এক স্থায়ী কেন্দ্র—যা ক্রমে আজকের

রাজকোট আশ্রমের প্রকাশনা বিভাগটি এপর্যন্ত প্রায় ১৪০টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল থেকে এই আশ্রম প্রকাশ করে চলেছে গুজরাটি ভাষায় একটি মাসিক পত্রিকা—'শ্রীরামকৃষ্ণ জ্যোত'।

রাজকোট আশ্রমের অন্যতম প্রধান ভূমিকা রয়েছে আর্তত্রাণে। প্রায় প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই বিভিন্ন সময়ে ছোট-বড় নানা আকারের দুর্ভিক্ষ, বন্যা, সাইক্লোন, ভূমিকম্প প্রভৃতি

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে (এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও) এই আশ্রম 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' ব্রতে অগ্রণী হয়েছে। বস্তুত, সূচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত রাজকোট আশ্রমের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের বৃহত্তর অংশ অধিকার করে থেকেছে এই দুর্গত-সেবাব্রত। এছাড়া ২০০২-এর জানুয়ারি মাস থেকে এই আশ্রমে স্থাপিত হয়েছে একটি 'ভ্যালু এডুকেশন সেন্টার' বা মূল্যবোধ শিক্ষাকেন্দ্র। মূল পাঠাগার তথা প্রদর্শনী ভবনের পাশে একটি নবনির্মিত প্রেক্ষাগৃহে পক্ষকাল অন্তর এর সম্মেলনগুলি আয়োজিত হয়।

উৎসব-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ মঠ (বলরাম-মন্দির), কলকাতা-৩ঃ গত ১২ জুলাই ২০০২ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, কীর্তন, ভজন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। বিকাল ৩.৩০টায় বহু সাধু-ব্রহ্মচারী-সহ প্রথম রথরজ্জু আকর্ষণ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অছি ও পরিচালন পর্ষদের অন্যতম সদস্য স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ। এরপর রাত ৯টা পর্যন্ত বহু ভক্ত রথ টানেন। গত ২০ জুলাই রথের পুনর্যাত্রা উৎসবে বহু সাধু-ব্রহ্মচারী-সহ প্রথম রথের রজ্জু আকর্ষণ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অছি ও পরিচালন পর্ষদের অন্যতম সদস্য স্বামী তত্ত্ববোধানন্দজী মহারাজ। তারপর বহু ভক্ত রথ টানেন। বিশেষ উল্লেখ্য, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ১৮৮৪ ও ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে কীর্তনাদি সহকারে ভক্তগণের সঙ্গে রথের এই পুনর্যাত্রা উৎসবে যোগদান করেছিলেন।

গত ১২ জুলাই ২০০২ **বেলুড় মঠের** সাধুনিবাসের সন্নিকটস্থ একটি হল-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রয়োজনে এই হলটি ব্যবহৃত হবে।

ছাত্রকৃতিত্ব

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ্ পরিচালিত ২০০২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় **নরেন্দ্রপুর আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা)** তিনজন ছাত্র ৩য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। এছাড়া কারিগরী বিভাগে **শিল্পায়তনের (সারদাপীঠ)** দুজন ছাত্র ৩য় ও ৫ম স্থান অধিকার করেছে।

মেঘালয় বিদ্যালয় শিক্ষা পর্ষদ্ পরিচালিত ২০০২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় আদিবাসী মেধাতালিকায় **রামকৃষ্ণ মিশন চেরাপুঞ্জি** আশ্রমের তিনজন ছাত্র ৭ম, ৯ম ও ১০ম স্থান অধিকার করেছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ২০০২ সালের বি. এ., বি. এসসি (অনার্স) পরীক্ষায় **নরেন্দ্রপুর আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের** ছাত্ররা রসায়নে ৭ম, গণিতে ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করেছে। **রহড়া স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের** দুটি ছাত্র রসায়নে ৯ম ও প্রাণিবিদ্যায় ২য় স্থান অধিকার করেছে। **রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের (সারদাপীঠ)** ছাত্ররা পদার্থবিদ্যায় ৭ম, রসায়নে ৬ষ্ঠ ও ১০ম, গণিতে ১ম, ৭ম ও ৮ম স্থান এবং দর্শনে ৪র্থ স্থান অধিকার করেছে।

বহির্ভারত

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও কালীপূজাঃ আমেরিকায় রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কয়েকটি আশ্রমে প্রতিবছর দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। যেমন হলিউড, সান ফ্রান্সিস্কো, বার্কলে, স্যাক্রামেন্টো, পোর্টল্যাণ্ড, সিয়াটল, বস্টন, প্রভিডেন্স, শিকাগো, সেন্ট লুই এবং নিউ ইয়র্ক। আমেরিকার প্রবাসী বাঙালিদের কাছে এ এক পরম আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত। সন্ন্যাসীদের উপস্থিতিতে উৎসব আরো জমজমাট হয়। কোথাও স্থানীয় ভক্তদের কেউ মূর্তিনির্মাণ করেন, কোথাও বা ভারতবর্ষ থেকে তৈরি করে নিয়ে যাওয়া হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পটেই পূজা হয়। কোথাও চারদিন ধরে পূজা হয়, কোথাও বা কেবল মহাষ্টমীর দিন বিশেষ পূজার ব্যবস্থা থাকে। সমাগত ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। ২০০১ সাল থেকে ব্রাজিলের সাওপাওলো আশ্রমে দুর্গাপূজা শুরু হয়েছে। ব্রাজিলিয়ানরা দুর্গাপূজা দেখে অত্যন্ত আনন্দলাভ করেন। অনুষ্ঠানের পর ভক্তিগীতি, নাটক ইত্যাদিরও ব্যবস্থা থাকে।

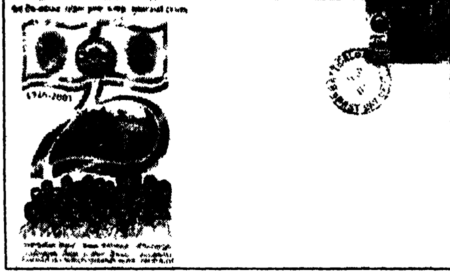


হলিউড কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত কালীপূজা

শ্রীশ্রীকালীপূজাও অনুষ্ঠিত হয় সঙ্ঘের কয়েকটি কেন্দ্রে। যেমন কানাডার টরন্টোতে। কানাডায় প্রচুর ভারতীয় থাকেন। তাঁদের মধ্যে বাঙালিও যথেষ্ট। সেই কারণে টরন্টোতে এই ধরনের পূজা-অনুষ্ঠানাদিতে প্রচুর ভক্তসমাগম হয়। অনুষ্ঠানে আমেরিকার প্রবাসী ভারতীয়রাও আসেন। পূজা চলাকালীন বা পূজার পর সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য গায়কদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমেরিকাতেও হলিউড, পোর্টল্যাণ্ড ইত্যাদি কেন্দ্রে কালীপূজার চল আছে।

শ্রীলঙ্কায় শ্রীরামকৃষ্ণ-নামাঙ্কিত ডাকটিকিট প্রবর্তন

শ্রীলঙ্কার বাট্টিকোলা আশ্রমের ৭৫ বছর (প্ল্যাটিনাম জুবিলি) পূর্তি উপলক্ষ্যে গত অক্টোবর মাসে সরকারের তরফে একটি বিশেষ ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীলঙ্কায় ডাক ও সংযোগ মন্ত্রী টিকিটের 'ফার্স্ট ডে কভার'টি প্রকাশ করেন।



বাট্রিকোলা আশ্রমের ৭৫ বছরপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ডাকটিকিটের 'ফার্স্ট ডে কভার'

ময়মনসিংহ রামকৃষ্ণ আশ্রম (বাংলাদেশ) ঃ গত ১৪ জুলাই ২০০২ সারাদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গুরুপূর্ণিমা তিথি উদ্‌যাপিত হয়। বৈদিক শান্তিমন্ত্র পাঠ, ভক্তিগীতি, সমবেত জপধ্যান, পাঠ, প্রশ্নোত্তর-পর্ব ও আলোচনা ছিল অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্গ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ে সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী সন্ততানন্দজী, ব্রহ্মচারী লোকপালচৈতন্য ও প্রদীপ চক্রবর্তী। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সর্বেশ্বরানন্দজী প্রারম্ভিক ভাষণ এবং আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অরুণ সরকার, ছন্দা রায়, অনিল রায় প্রমুখ। দুপুরে প্রসাদ পাওয়ার পর টেপরেকর্ড থেকে শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের ভাষণ শোনানো হয় এবং প্রশ্নোত্তর-পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ উল্লেখ্য, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী-সম্পর্কিত ৭৯টি গ্রন্থ ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বিকালে রামনাম-সঙ্কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

দেহত্যাগ

পরলোকে স্বামী নির্জরানন্দজী মহারাজ

একদা উদ্বোধন কার্যালয়ের অধ্যক্ষ (১৯৮৪-১৯৮৯) স্বামী নির্জরানন্দজী (মোহিত) মহারাজ গত ৩০ জুলাই ২০০২ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ৮৬ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। উচ্চ রক্তচাপ, ব্লাড সুগার ও কিডনির গোলযোগে বিগত কয়েক বছর তিনি কষ্ট পাচ্ছিলেন। ২০০১ সালের প্রথমার্ধে কাশীপুর উদ্যানবাটী থেকে তাঁকে মঠে আরোগ্যভবনে নিয়ে আসা হয়। গত ২২ জুলাই ২০০২ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে তিনি ভর্তি হন। সেখানে ডাক্তারদের মতে তিনি 'সেপ্টিসিমিয়া'য় আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।



১৯৩৮ সালে স্বামী নির্জরানন্দজী সঙ্ঘে যোগদান করেন। তার পূর্বেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেছিলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দজী তখন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ। পরে ১৯৪৭ সালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছে তিনি সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, অদ্বৈত আশ্রম (মায়াবতী এবং কলকাতার শাখাকেন্দ্র), চেরাপুঞ্জি, জয়রামবাটীতে তিনি দীর্ঘদিন সঙ্ঘের সেবা করেছেন। পরবর্তী কালে ঢাকা, বরানগর, কামারপুকুর, উদ্বোধন, কাঁকুড়গাছি এবং কাশীপুর উদ্যানবাটীতে তিনি অধ্যক্ষরূপেও ছিলেন। ১৯৬০ সালে আসামের উদ্বাস্তুত্রাণ শিবিরে পূজনীয় মহারাজ ব্যাপক সেবাকার্যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর বহু অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে বিচিত্র স্মৃতিকথা সময়ে সময়ে নবীন সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীরা শুনে অনুপ্রেরণা লাভ করতেন। তাঁর অত্যন্ত অমায়িক স্বভাবের সঙ্গে চেহারার তেমন মিল ছিল না। দেখলে অত্যন্ত গম্ভীর ও স্বল্পভাষী মনে হতো। বস্তুত, তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ প্রকৃতির। তাঁর প্রয়াণে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ও ভক্তমণ্ডলী একজন যথার্থ মানবদরদী সেবাপরায়ণ সন্ন্যাসীকে হারাল। এই বছর 'বিবেকানন্দ সোসাইটি'র শতবর্ষপূর্তি উৎসব চলছে। পূজনীয় মহারাজ সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। তাঁদেরও অপূরণীয় ক্ষতি হলো, সেকথা বলাই বাহুল্য।❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

আবির্ভাব তিথি পালন ঃ গত ২২ আগস্ট ২০০২ বৃহস্পতিবার শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে তাঁর জীবনী পাঠ করেন স্বামী সৌম্যাত্মানন্দজী।

গত ৩১ আগস্ট ২০০২ শনিবার শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী তিথিতে 'ভাগবত' থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী সনকানন্দজী।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে।❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

দাঁতন শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম (মেদিনীপুর) ঃ গত ১৫ মে ২০০২ বেদপাঠ, বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী', 'মায়ের কথা' ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী শশধরানন্দজী ও স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী। সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রমেন্দ্র ভুঞা।

শিবপুর সারদা সেবা সঙ্ঘ (হাওড়া) ঃ গত ১৫ মে ২০০২ সঙ্ঘের নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী পুরাণানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে সানাইবাদন, প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, গীতি-আলেখ্য, পাঠ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিন বৈকালিক ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী সনকানন্দজী ও স্বামী শান্তাত্মানন্দজী। দ্বিতীয়দিনের ধর্মসভায়

আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী ও স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী। তৃতীয়দিনের অনুষ্ঠানে 'শ্রীমদ্ভাগবতম্' পাঠ ও আলোচনা করেন শ্রীসারদা মঠের সাধারণ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী। গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন বেহালার সুরপীঠ সংস্থা ও কলকাতার বীণাপাণি সমিতি। উৎসবে প্রায় ৩,৫০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

ঝামাপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কলকাতা) : গত ১৯ মে ২০০২ 'ধর্মচেতনা কি সাম্প্রদায়িকতা দূর করতে পারে' প্রসঙ্গে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে ৪০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। বিচারকরূপে উপস্থিত ছিলেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী, স্বামী উরুক্রমানন্দজী ও ডঃ স্বরূপকুমার ঘোষ। প্রতিযোগিতাটি পরিচালনা করেন অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য।

দক্ষিণ হারাধনপুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) : গত ১৮ ও ১৯ মে ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভক্তসম্মেলন এবং যুব ও শিক্ষক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সঙ্গীত, প্রশ্নোত্তর-পর্ব ও আলোচনা ছিল ভক্তসম্মেলনের অন্যতম অঙ্গ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, স্বামী শান্তিদানন্দজী ও স্বামী ব্রজেশানন্দজী। এতে ১২০ জন ভক্ত যোগদান করেন। পরদিন যুব ও শিক্ষক সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী, স্বামী পুরাতনানন্দজী, স্বামী শেখরানন্দজী, বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ও সাংসদ রাধিকারঞ্জন প্রামাণিক। সম্মেলনে ৩৭৬ জন ছাত্রছাত্রী, যুবক-যুবতী ও ৪৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আকালিপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (বীরভূম) : গত ২৬ মে ২০০২ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা বোধাত্মপ্রাণাজী। সভান্তে স্বাগত-ভাষণ দেন আশ্রমাধ্যক্ষা ব্রহ্মচারিণী সারদাচৈতন্য। এদিন দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সাঁইথিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (বীরভূম) : গত ২৬ মে ২০০২ পাঠচক্রের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে গীতি-আলেখ্য, আলোচনাসভা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। সভায় 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দজী 'স্বামী বিবেকানন্দের উত্তরাধিকার' বিষয়ে আলোচনা করেন। এদিন তিনি পাঠচক্রের একটি স্মরণিকা 'অর্ঘ্য' প্রকাশ করেন।

পুইনান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ (হুগলী) : গত ২৬ মে ২০০২ ভক্তিগীতি, গুরুবন্দনা, 'কথামৃত' পাঠ, সমবেত জপধ্যান, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতির মাধ্যমে একটি ভক্তসম্মেলন আয়োজিত হয়। গল্পের মাধ্যমে 'ভাগবত' পরিবেশন করেন স্বামী সর্বময়ানন্দজী। সম্মেলনে প্রায় ২০০ ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডলের কলকাতা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা আঞ্চলিক যুবপ্রশিক্ষণ শিবির সমিতি (কলকাতা-৯) : গত ৩১ মে থেকে ২ জুন পর্যন্ত তিনদিন ধরে কুলপী জনপ্রিয় উচ্চ বিদ্যালয়ে (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। মনঃসংযম, চরিত্রগঠন, স্বামীজীর জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা প্রভৃতি ছিল শিবিরের আলোচ্য বিষয়। শিবিরের সূচনা ও আলোচনা করেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন গৌরগোপাল সাহা, রঞ্জিতকুমার ঘোষ, সোমনাথ বাগচী, বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, নবনীহরণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। শিবিরে ৩২৫ জন ছাত্র যোগদান করে।

সাঁকতোড়িয়া বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল (বর্ধমান) : গত ১ জুন ২০০২ সঙ্গীত, প্রশ্নোত্তর-পর্ব ও আলোচনার মাধ্যমে ঝলাবাগান দিসেড়গড় ক্লাবে একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনের সূচনা করেন ইস্টার্ণ কোলফিল্ডসের ডাইরেক্টর মহম্মদ সেলিমুদ্দীন। সূচনায় সমবেত কণ্ঠে বেদপাঠ করেন কয়েকজন সন্ন্যাসী। কালিদাস সরকারের উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশনের পর স্বাগত-ভাষণ দেন যুবমহামণ্ডলের সম্পাদক নন্দদুলাল আচার্য। সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে 'বর্তমান যুগসমস্যার সমাধানে স্বামী বিবেকানন্দের মত ও পথ' বিষয়ে আলোচনা করেন দেওঘর রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দজী। দ্বিতীয় অধিবেশনে নীতিশ খাসনবিশের সঙ্গীত পরিবেশনান্তে 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও সর্বধর্মসমন্বয়' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন অধ্যাপক ডঃ আবদুস সামাদ। এছাড়া 'বর্তমান জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা' এবং 'শ্রীমা সারদাদেবী ও নারীজাগরণ' বিষয়ে আলোচনা করেন আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী গিরিশানন্দজী ও জামতাড়া রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী অধ্যাত্মানন্দজী। সম্মেলনে প্রায় ৩০০ যুবপ্রতিনিধি ও ভক্ত যোগদান করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাকেন্দ্র (কলকাতা-৭৮) : গত ২ জুন ২০০২ কেন্দ্রের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, লীলাগীতি ও আলোচনাসভা ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান বিষয়। শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী।

সাঁত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (হাওড়া) : গত ২ জুন ২০০২ সঙ্গীত, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও আলোচনার মাধ্যমে হাওড়া জেলা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের ষাণ্মাসিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বেণীমাধব দে এবং গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন রামরাজাতলার শিল্পীগোষ্ঠী। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সম্পাদক স্বামী রমানন্দজী, স্বামী নির্বিকল্পানন্দজী, স্বামী অজরানন্দজী, স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী এবং স্বামী শরণ্যানন্দজী ও ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর।

মূলাজোড় রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ২ জুন ২০০২ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান বিষয়। ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী সর্বগানন্দজী, অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য ও সুব্রত মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০০ ভক্তের সমাগম হয়।

নারায়ণপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ৫ জুন ২০০২ সানাইবাদন, শোভাযাত্রা, বিশেষ

পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। 'চণ্ডী', 'কথামৃত' ও 'ভাগবত' পাঠে অংশগ্রহণ করেন যথাক্রমে বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুশীলকুমার মণ্ডল ও তাপস সরদার। লীলাকীর্তন ও ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন যথাক্রমে কাজল বিশ্বাস ও কাজল অধিকারী, মকচেদ মোল্লা প্রমুখ। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পুরাতনানন্দজী ও শ্রীধরচন্দ্র মণ্ডল। সভাপতিত্ব করেন নীলমণি পাহাড়। সভায় স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কমলপদ মণ্ডল। উৎসব উপলক্ষ্যে দরিদ্র নরনারীকে বস্ত্রদান এবং প্রায় ১৫,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ধুবড়ি (অসম) : গত ৭-৯ জুন ২০০২ নগর-পরিক্রমা, ভক্তিগীতি, বিশেষ পূজা, পাঠ, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব এবং ধুবড়িতে স্বামীজীর পদার্পণের শতবর্ষপূর্তি উৎসব পালিত হয়। উৎসবের প্রথমদিনের সকালে যোগাসন প্রদর্শিত হয়। সান্ধ্য ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয়ে ভাষণ দেন অধ্যাপক ডঃ সুভাষ শাসমল। দ্বিতীয়দিনের ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী ইষ্টব্রতানন্দজী ও অধ্যাপক ডঃ অমলেন্দু চক্রবর্তী। উৎসবের শেষদিন সকালে অনুষ্ঠিত হয় নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, হরিনাম-সঙ্কীর্তন, 'গীতা' পাঠ ও আলোচনা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য এবং ধর্মসভা। সান্ধ্য ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী ইষ্টব্রতানন্দজী। উল্লেখ্য, গত ২ জুন স্বামীজীর ধুবড়িতে শুভপদার্পণ উপলক্ষ্যে একটি স্মারকস্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন অসমের অসামরিক সরবরাহ ও কৃষিমন্ত্রী অর্ধেন্দুকুমার দে। এদিন তিনি সমবেত জনসভায় ভাষণ এবং ১০,০০০ টাকা প্রদান করেন।

ডিমাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি (নাগাল্যাণ্ড) : গত ৮ জুন ২০০২ একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন দীপা ভট্টাচার্য, শিখা ভট্টাচার্য প্রমুখ। প্রত্যেশ চক্রবর্তীর স্বাগত-ভাষণান্তে ভাষণ দান করেন নাগাল্যাণ্ডের রাজ্যপাল শ্যামল দত্ত। তিনি বলেন : "রাজ্যের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানবিক মূল্যবোধ ও বিশ্বাস অর্জন করতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে কর্মানুষ্ঠান করাই প্রকৃত পথ।" সভায় শ্রীদত্তকে একটি মানপত্র ও বিশেষ উপহার প্রদান করা হয়। সভান্তে সোসাইটির সম্পাদক জহর ভট্টাচার্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দক্ষিণ বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) : গত ৯ জুন ২০০২ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অনুপম নস্কর ও বলরাম পাল। বৈকালিক ধর্মসভায় 'ফলহারিণী কালীপূজা' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী ব্রজেশানন্দজী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

ভগিনী নিবেদিতা সেবাকেন্দ্র, ডানকুনি (হুগলী) : গত ১২ জুন ২০০২ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করা হয়। সভায় ভক্তিগীতি ও শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী ক্ষেমানন্দজী ও স্বামী সুমঙ্গলানন্দজী। উৎসবে উপস্থিত সকল ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ২৪ জুন ২০০২ বহু সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী ও ভক্তের উপস্থিতিতে সেবাশ্রমের নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পট প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী সর্বগানন্দজী ও স্বামী পুরাতনানন্দজী এবং সভাপতিত্ব করেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। পরদিন আয়োজিত ভক্তসম্মেলনে আলোচনা করেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী ও স্বামী বিশ্বাধীপানন্দজী।

বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (দক্ষিণ দিনাজপুর) : গত ২৪-২৫ জুন ২০০২ নগর-পরিক্রমা, সানাইবাদন, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, বাউলগান, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ধর্মসভার মাধ্যমে আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। পূজা করেন স্বামী চন্দ্রেশানন্দজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সমীর চৌধুরী, রীতা চক্রবর্তী এবং রাজু দাস ও সম্প্রদায়। দুপুরে প্রায় ২,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে ৫০ জন দরিদ্র মানুষকে ধুতি, শাড়ি প্রদান করা হয়। বাউলগান পরিবেশন করেন সুকুমার বাউরী। বৈকালিক ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে ভাষণদান করেন সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী শিবনাথানন্দজী ও স্বামী দেবময়ানন্দজী।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ (অসম) : গত ২৪ জুন ২০০২ পরিষদের ৪র্থ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় খারুপেটিয়ায় (অসম)। সঙ্গীত ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের প্রধান বিষয়। আলোচনা করেন নরোত্তমনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী ঈশাত্মানন্দজী ও পরিষদের আহ্বায়ক বিনয়কুমার সেন। সভাপতিত্ব করেন গুয়াহাটি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী অনন্তানন্দজী। এছাড়া বেলুড় মঠের ১০ দফা 'গাইড লাইন' পাঠ করা হয়। সম্মেলনে ৬টি আশ্রমের ৫৫ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন।

বোলপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বীরভূম) : গত ২৫-২৭ জুন ২০০২ বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ, গীতি-আলেখ্য ও ধর্মসভার মাধ্যমে আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রথমদিন সান্ধ্য ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে ভাষণ দেন কান্দরা সারদেশ্বরী আশ্রমের অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী সুকুমার ও বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী। দ্বিতীয়দিনের অনুষ্ঠানে 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ করেন যথাক্রমে অধ্যাপক ডঃ অলোকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বামী অমরাত্মানন্দজী। আয়োজিত ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী ও কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী। তৃতীয়দিন লাভপুর নাট্যসমাজ 'স্বামীজীর শক্তিপূজা' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। ❑

প্রচ্ছদ-পরিচিতি



প্রায় পাঁচশো বছর আগে হুগলী জেলার দশঘরা-নিবাসী কমলাকান্ত দেববিশ্বাস শ্রীচৈতন্যের প্রেরণায় বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেন। কমলাকান্তের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের প্রভাবে তাঁর সমগ্র পরিবার বৈষ্ণব-ভাবে ভাবিত হয়ে পড়ে। তবু তারও আগে থেকে প্রচলিত কুলদেবতা শ্রীশ্রীচণ্ডীর নিত্যপূজাদি বন্ধ হয়নি। সেই চণ্ডীর ঘটেই বছরে একবার বিধিসম্মতভাবে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হতো। পরেও তার ধারাবাহিকতা বজায় ছিল।

আজ থেকে পৌনে তিনশো বছর পূর্বে যখন দেববিশ্বাসের পরিবারের ভদ্রাসনে রাধাগোপীনাথ জীউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়, তখন ঐ চণ্ডীর ঘট গোস্বামীপাড়ায় কুলগুরুর গৃহে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু বাৎসরিক শারদীয়া দুর্গাপূজা এই ভদ্রাসনেই চলতে থাকে—বরং আরো ধুমধাম করে। পূর্বে বিগ্রহ ছিল না; এই সময় থেকে দেবীর বিগ্রহ নির্মাণ করে পূজা শুরু হয়।

এই দুর্গাপ্রতিমা ও পূজাপদ্ধতির কিছু বিশেষত্ব আছে। যেমন—দেবী চতুর্ভুজা। যতদূর জানা যায়, দশঘরার দেববিশ্বাসরা ওড়িশার রাজা চোলগঙ্গদেবের উত্তরপুরুষ। মনে হয়, ওড়িশা থেকেই এই মূর্তির কল্পনা সমাহৃত। যেমন ওড়িশার 'জয়দুর্গা' মূর্তিতে শঙ্খ, চক্র, শূল ও নাগপাশ থাকে, এখানেও পূর্বে তাই ছিল। পরবর্তী কালে ঐসবের পরিবর্তে দেওয়া হয়েছে ঢাল, তরবারি, ত্রিশূল ও নাগপাশ। একালের এই প্রতিমায় গণেশ ও কার্তিক ওপরের সারিতে এবং লক্ষ্মী ও সরস্বতী নিচের সারিতে রয়েছেন। এটি প্রাচীন বিষ্ণুপুরী-শৈলীর নিদর্শন।

এখানে গণেশ হলেন দ্বিভুজ—'চিন্তামণি গণেশ'। নিরস্ত্রও বটে। গণেশের ঘটটি দেবীঘটের ডানপাশের পরিবর্তে বামপাশে স্থাপিত। আরেকটি ব্যতিক্রমী ব্যাপার হলো—বোধনের পরে কল্পবৃক্ষটি স্থানান্তরিত করে অন্যত্র রাখা হয়। আরতির পরে যে-দেবীস্তোত্র পঠিত হয়, তাও অপ্রচলিত। শোনা যায়, দেববিশ্বাস পরিবারের দুর্গাদালানটি কোন বীরাচারী তান্ত্রিক সাধকের সিদ্ধপীঠের ওপর নির্মিত। পশুবলি প্রথা এবং দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের পরে নীলকণ্ঠ পাখি ওড়ানোর রীতি এখনো প্রচলিত।

দেববিশ্বাস পরিবারের দুর্গাপূজার মহিমা সম্পর্কে আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। উন্মাদরোগ উপশমের জন্য কামারপুকুরের কাছে তেরোল গ্রামের মা কালীর বালা পরানোর প্রথা এখনো রয়েছে। শ্রীশ্রীমাও একবার এখানে পূজা পাঠিয়ে রাধুর জন্য বালা আনিয়েছিলেন ও তাকে পরিয়েছিলেন। কিংবদন্তি, বহুবছর পূর্বে এক কালীপূজার রাত্রে তেরোল গ্রামের কালীর প্রতিষ্ঠাতা সাধক মানগোবিন্দ মিত্রের কাছে একটি ষোল-সতেরো বছরের বিবাহিত মেয়ে এসে তার বিকৃতমস্তিষ্ক স্বামীর জন্য বালা প্রার্থনা করে। মেয়েটি দশঘরার দেববিশ্বাস পরিবারের কন্যারূপে আত্মপরিচয় দান করে। সাধক মেয়েটিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না, কিন্তু সঙ্গে টাকাকড়ি না থাকায় মেয়েটি নিজের মাথার সোনার টিকলিটি খুলে দক্ষিণা দিতে গেলে সাধকপ্রবর তা নিতে অস্বীকার করেন। মেয়েটি চলে যাওয়ার পর তিনি কালীমন্দিরে প্রবেশ করে দেখেন, দেবীবিগ্রহের মাথায় মেয়েটির সেই সোনার টিকলিটি জ্বলজ্বল করছে। তিনি বুঝতে পারেন, দশঘরার দেববিশ্বাস পরিবারের কন্যা বলে দেবী ভগবতী স্বয়ং তাঁকে দেখা দিয়েছেন। তারই সূত্রে আজও দেববিশ্বাস পরিবারের পূজিতা দুর্গাপ্রতিমার মুকুটটিকে দশমীর বিসর্জনের পূর্বে খুলে রাখা হয় এবং কালীপূজার দিন তেরোল গ্রামের মা কালীর মাথায় সেটি পরানো হয়। একটি পরিবারে পূজিতা প্রতিমার অলঙ্কার অপর একটি দেবস্থানে পূজাকল্পের অত্যাবশ্যক আভরণ হিসাবে ব্যবহার করার এই রীতি অশ্রুতপূর্ব।

তাঁর নামবীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

এরকম মনে করা ভাল নয় যে, আমার ধর্মই ঠিক আর অন্য সকলের ধর্ম ভুল। সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকলেই হলো। অনন্ত পথ—অনন্ত মত। শ্রীরামকৃষ্ণ

*

ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজন? নিন্দা ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, কিন্তু কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে, তা বলতে পারে কজনে? শ্রীমা সারদাদেবী

*

টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধাবিঘ্নের বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

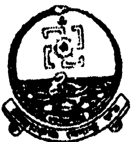
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-প্রকাশিত গ্রন্থরাজি

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

গ্রন্থ	মূল্য
স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)	১০০.০০
স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)	১০০.০০
স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড)	১০০.০০
আত্মজ্ঞান	২২.০০
আত্মবিকাশ	২০.০০
আমার জীবনকথা (২ খণ্ডে)	১২৫.০০
ঈশ্বরদর্শনের উপায়	৩৫.০০
কর্মবিজ্ঞান	১০.০০
তরুণ বাংলার আদর্শ	৫.০০
দেবী দুর্গা	৬.০০
পত্র-সংকলন	১৬.০০
পঞ্চদশী-দর্শনের পরিচয়	৫.০০
পুনর্জন্মবাদ	৩০.০০
বিংশ-শতাব্দীর ধর্ম	৫.০০
ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	২০.০০
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	৩০.০০
মরণের পারে	৭০.০০
মনোবিজ্ঞান ও আত্মতত্ত্ব	৫০.০০
শিক্ষার আদর্শ	১৫.০০
মনের বিচিত্র রূপ	১২.০০
মানুষের দিব্যস্বরূপ	২৫.০০
মুক্তির উপায়	১৫.০০
যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব	৫.০০
যুগে যুগে যাঁদের আগমন	২৮.০০
যোগদর্শন ও যোগসাধনা	৫০.০০
যোগশিক্ষা	৪০.০০
যোগ ও তাহার অভ্যাস	৪৫.০০
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম	২০.০০
সর্বজনীন ধর্ম ও বেদান্ত	৩০.০০
সাংখ্য, বৌদ্ধ ও বেদান্তদর্শন	৩০.০০
স্বামী বিবেকানন্দ	২.০০
স্তোত্ররত্নাকর ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি	৩০.০০
হিন্দুনারী	২৫.০০
হিন্দুরা যীশুখ্রীস্টের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু গীর্জার ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ কেন?	৫.০০
বেদান্ত দর্শন	১০.০০
খ্রীস্টীয় বিজ্ঞান এবং বেদান্ত	৫.০০

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত

গ্রন্থ	মূল্য
অধ্যাত্মসাধনায় দেবতা ও দেবীভাবনা	৪.০০
অভেদানন্দ-দর্শন (২ খণ্ডে)	১৪০.০০
কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব	১৮.০০
তীর্থরেণু	২৬.০০
তন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনা	৬০.০০
তন্ত্রতত্ত্বপ্রবেশিকা	৭০.০০
নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৪৫.০০
পদাবলী-কীর্তনের ইতিহাস	৩৫.০০
বাণী ও বিচার (৮ খণ্ডে)	৪০০.০০
বিবেকানন্দের দর্শনচিন্তায় মন্ত্রতত্ত্ব ও মন্ত্রসাধনা	২০.০০
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (৩ খণ্ডে)	২৫০.০০
শ্রীরামকৃষ্ণচন্দ্রিকা	৪০.০০
ভারতীয়-সঙ্গীত—ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক রূপরেখা	৮০.০০
মন ও মানুষ (৩ খণ্ডে)	২০০.০০
মহিষাসুরমর্দ্দিনী-দুর্গা	৩০০.০০
রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মচেতনা	২০.০০
রাগ ও রূপ (২ খণ্ডে)	২২০.০০
সঙ্গীতপ্রতিভায় স্বামী বিবেকানন্দ	৮.০০
সঙ্গীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান	১২৫.০০
সঙ্গীতে সাহিত্য, রসভাবনা ও সুন্দর	২৫০.০০
স্বামী অভেদানন্দ	৫.০০
স্বামী অভেদানন্দের জীবন ও দর্শন	৩৬.০০



শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

(পুস্তক প্রচার বিভাগ)

১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

ফোন : ৫৫৫-৮২৯২, ৫৫৫-৭৩০০

ই. মেল : ramakrishnavedantamath@vsnl.net ওয়েবসাইট : www.ramakrishnavedantamath.org



'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৪

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

হুগলী

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, আঁটপুর
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম**, ৭০ প্রফুল্ল চাকী রোড, কোতরং
- **শ্রীরামকৃষ্ণ মনন সভা**
  ১৫৬ এস. সি. চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোন্নগর, পিন : ৭১২২৩৫
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ**
  গ্রাম+পোঃ পুইনান, পিন : ৭১২৩০৫
- **স্বামী উমেশানন্দ**, অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম
  কুণ্ডুঘাট, বাঁশবেড়িয়া-৭১২৫০২
- **সিঙ্গুর রামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ (রেজি. নং—এস/এইচ/৬৯০৫)**
  প্রযত্নে মোহিত বর্মণ, ঘনশ্যামপুর, পূর্বপাড়া বারোয়ারী, পলতাগড়
  সিঙ্গুর, পিন : ৭১২৪০৯, ফোন : ৬৩০-০৪৩৯/০০৯৪
- **সুশান্ত মাইতি**, প্রযত্নে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালিকা আশ্রম
  (কামাক্ষাতলা), মির্জাপুর পশ্চিমপাড়া, সিঙ্গুর, পিন : ৭১২৪০৯
  ফোন : ৬৩০-০৭০৯
- **ডঃ চিন্ময়ী নন্দী**
  (স্টেট ব্যাঙ্কের পিছনে), পোঃ ডানকুনি, পিন : ৭১১২২৪
- **মনীষা নন্দী**, প্রযত্নে দেবজিৎ নন্দী
  স্টেশন রোড, পোঃ ডানকুনি, পিন : ৭১১২২৪
- **হরনারায়ণ বিশ্বাস**
  ৫ রাজেন্দ্র অ্যাভেনিউ প্রথম লেন, উত্তরপাড়া, পিন : ৭১২২৫৮
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার**
  প্রযত্নে অজিতকুমার মুখার্জী, ৬৪/জি ডঃ সরোজ মুখার্জী স্ট্রীট
  উত্তরপাড়া, পিন : ৭১২২৫৮, ফোন : ৬৬৩-৮৫২৬
- **গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়**, রামকৃষ্ণ কুটীর
  ১০৩/২, বি. কে. স্ট্রীট, উত্তরপাড়া
  পিন : ৭১২২৫৮ ফোন : ৬৬৩-৭০৪৬
- **বরুণকুমার চক্রবর্তী**, সম্পাদক, শ্রীবিবেকানন্দ সঙ্ঘ
  ত্রিবেণী কেন্দ্র, গ্রাঃ বৈকুণ্ঠপুর, পোঃ ত্রিবেণী
  পিন : ৭১২৫০৩, ফোন : ৮৪৬২৮৪
- **সারদা-রামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ**, প্রযত্নে নিকুঞ্জবিহারী দাস
  কোঁচাটী, পোঃ ত্রিবেণী, পিন-৭১২৫০৩
- **অরুণ দাশ** (আওষবালী) ও **মানিক পুরকাইত** (শিয়াখালা)
  শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠচক্র, পীরতলা, শিয়াখালা
- **দীপশিখা ঘোষ, সম্পাদিকা, মাঙ্গলিক মহিলা মহল**
  জনাই, পিন : ৭১২৩০৪, ফোন : ৯১১২-৪৪১১৪
- **গরলগাছা বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**, গ্রাম+পোঃ গরলগাছা, মান্নাপাড়া
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, গ্রাম+পোঃ ভাঙ্গামোড়া, পিন : ৭১২৪১০
- **স্বপন মুখোপাধ্যায়**
  সম্পাদক, শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ
  ১৩বি, সান্যাল লেন, পোঃ শ্রীরামপুর
  পিন : ৭১২২০১, ফোন : ৬৬২-৬৬৭৮
- **কল্পতরু বিবেকানন্দ যুব উন্নয়ন কেন্দ্র**
  তারকেশ্বর, পিন-৭১২৪১০
- **শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ**
  ৩০৫, নারায়ণ রায়ের বেড়, ঝিঙ্গেপাড়া, পিন-৭১২১০৩
- **শ্রীরামকৃষ্ণ পাদতীর্থ সেবক সঙ্ঘ**
  ১৮ নীলমণি সোম স্ট্রীট, পোঃ ভদ্রকালী, পিন-৭১২২৩২

নদীয়া

- **রামকৃষ্ণ আশ্রম**, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, বঙ্কিমনগর, হালালপুর-৭৪১২০১
- **রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ**, চাকদহ-৭৪১২২২
- **বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন**, চাকদহ-৭৪১২২২
- **রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ**, ব্লক-বি, সিভিক সেণ্টার
  কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- **কল্যাণী শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি**, এ-৮/২৩৪, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- **ছায়া ভট্টাচার্য**, রামকৃষ্ণ নিকেতন
  বি-৪/৪৬৬, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- **রামকৃষ্ণ সারদা কুটীর**, প্রযত্নে অসীমকুমার দে
  নলুয়া পাড়া, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র**, প্রযত্নে স্বপনকুমার ভৌমিক
  ৩৫ বেঁজেখালি লেন, নূতন পল্লী, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০৯
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাসঙ্ঘ**, রানাঘাট-৭৪১২০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ**, পোঃ বগুলা, পিন-৭৪১৫০২
- **তাহেরপুর বিবেকানন্দ পাঠচক্র**, এফ/১২, পোঃ তাহেরপুর

বীরভূম

- **বোলপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যকেন্দ্র**
  পৌর বাণিজ্যিক সদন (বাস স্ট্যান্ড), স্টল নং ৫
  পিন-৭৩১২০৪
- **আকালীপুর রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম**, ভদ্রপুর-৭৩১২০৩
- **মিলন দাস**, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ
  চৈতালি মার্কেট, সিউড়ি-৭৩১১০১
- **ডঃ ভাস্কর কয়ড়ী**, প্রযত্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  সাঁইথিয়া (কলেজ রোড), সাঁইথিয়া-৭৩১২৩৪

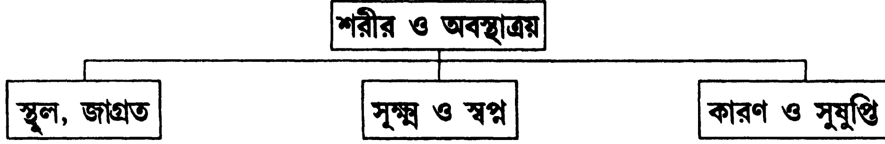
মুর্শিদাবাদ

- **শান্তশ্রী**, বেলডাঙ্গা সারদা রামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  আশ্রমপাড়া, বেলডাঙ্গা, পিন-৭৪২১৩৩

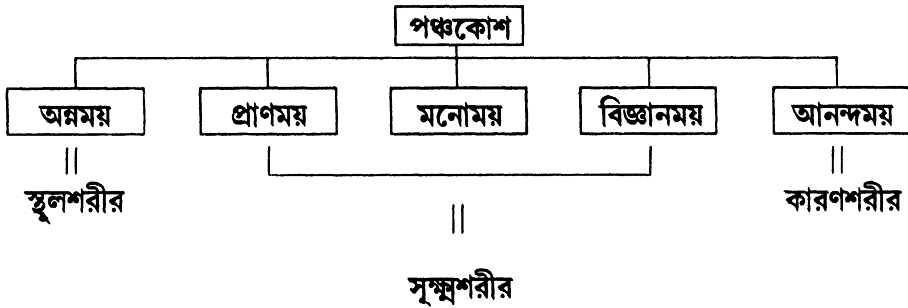
বাঁকুড়া

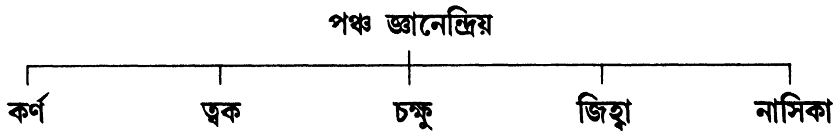
- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, পোঃ রামহরিপুর, পিন-৭২২২০৩
- **শ্রীমা সারদা পাঠচক্র**, কোতুলপুর-৭২২১৪১
- **উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়**
  'অঙ্কন', স্টল নং-২, মোহনবাগান মার্কেট, পিন-৭২২১০১
- **বিষ্ণুপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  প্রযত্নে নিমাই মুখোপাধ্যায়, বৈলাপাড়া, কলেজ রোড
- **ডঃ সুনির্মল বেরা**
  প্রযত্নে সারেঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি
  সারেঙ্গা, পিন-৭২২১৫০

বেদান্ত দর্শনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জীবের তিনপ্রকার শরীর ও তিনপ্রকার অবস্থা

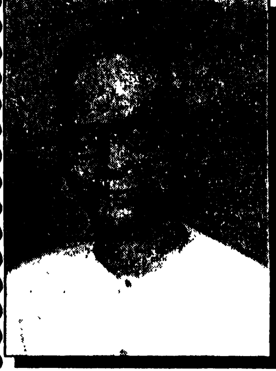


মন্তব্য ঃ প্রত্যেক মানুষের (এমনকি প্রত্যেক জীবের) তিনটি অবস্থা হয়। কখনো সে জাগ্রত। কখনো নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখে। কখনো স্বপ্নেরও গভীরে গিয়ে স্বপ্নবিহীন অবস্থায় চলে যায়। এই অবস্থার নাম সুষুপ্তি। যখন সে জাগ্রত অবস্থায় থাকে, তখন তার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং স্থূল শরীরটা ক্রিয়াশীল থাকে। মন এবং বুদ্ধিও ক্রিয়াশীল থাকে। যখন সে নিদ্রিত, তখন তার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় নিস্তেজ। কিন্তু মন, বুদ্ধি ক্রিয়াশীল। এটি তার সূক্ষ্মশরীর। তবু ইন্দ্রিয়গুলি ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে যখন স্বপ্নে স্মৃতির উদয় হয়। সুতরাং বাহ্যদৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়গুলি নিস্তেজ হলেও সূক্ষ্মশরীরের অন্তর্গত বলে স্বপ্নে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ক্রিয়াশীল থাকে। কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় সবকয়টি বস্তুই বিশ্রামরত। তখন একমাত্র জীবের 'অহঙ্কার' জেগে থাকে। এই অহঙ্কার-শরীরকে শাস্ত্রে 'কারণশরীর' বলা হয়। তাই কারণশরীর অহং-মূলক। সূক্ষ্মশরীর প্রাণ-মন-বুদ্ধিমূলক। এর মধ্যে ইন্দ্রিয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এবং বাহ্য দৃশ্যমান শরীরকে বলা হয় স্থূলশরীর।





ওঁ নমো ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ


৺বিজয়কৃষ্ণ গাঙ্গুলী (মুঙ্গের)


৺অনিমা গাঙ্গুলী (মুঙ্গের)


৺ডাঃ নির্মলচন্দ্র ব্যানার্জী (লখনৌ)

এঁদের স্মৃতির উদ্দেশে
আমাদের ভক্তিবিনম্র প্রণাম নিবেদন করি

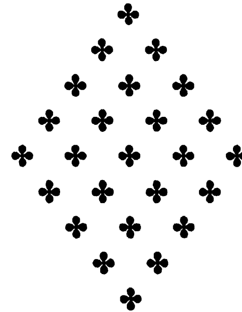
শ্রী সুব্রত ব্যানার্জী ❀ শ্রীমতী মন্দিরা ব্যানার্জী
শ্রীমান নীলাভ ব্যানার্জী

হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্মজন্মান্তরের পাপও তাঁর (ঈশ্বরের) একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ধনসম্পদ ইহকালের সম্পদ, সঙ্গে যাবে না। সাধন-ভজন পরকালের সম্বল, সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



জনৈক
ভক্তের সৌজন্যে

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ



রিজার্ভ লাইন, নিউ নাথাম রোড, মাদুরাই-৬২৫০১৪

দূরভাষ ঃ (০৪৫২) ৬৮০ ২২৪

E-mail : rkmath@eth.net

Website : www.maduraiaramakrishnamath.com

ঈশ্বরসেবার আহ্বান

প্রিয় বন্ধু,

শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। প্রার্থনা করি, ঈশ্বরের কৃপা আপনার ওপর বর্ষিত হোক।

মাতা মীনাক্ষী দেবীর কৃপায় উদ্ভাসিত এই মাদুরাই নগরী আজও তামিল সংস্কৃতির ধারকরূপে ভাস্বর।

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত **'শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদুরাই'**-এর এপর্যন্ত বৃদ্ধি ঘটেছে শুধুমাত্র একটি টলমলে শিশুর মতো। তার আরো বিকাশলাভের জন্য এই মুহূর্তে প্রয়োজন একটি গৃহনির্মাণ, যেখানে থাকবে স্বামী বিবেকানন্দের নামাঙ্কিত একটি লাইব্রেরি, সকলের জন্য বিনাব্যয়ে একটি পাঠকক্ষ এবং একটি পুস্তকবিক্রয়কেন্দ্র।

সেই উদ্দেশ্যে আনুমানিক ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উপর্যুক্ত সুবিধাগুলি-সহ একটি গৃহনির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তার জন্য সকল উদারহৃদয় মানুষের নিকট এই মহৎ উদ্দেশ্যে মুক্তহস্তে অর্থদান করার জন্য আবেদন জানানো হচ্ছে, কারণ এই উদ্দেশ্য সফল হলে তা সকলের প্রভূত সাহায্যে আসবে।

এই উদ্দেশ্যে প্রেরিত যেকোন আর্থিক দান, তা সে যতই অল্প হোক, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত এবং স্বীকৃত হবে। এই দান চেক, ডিমাণ্ড ড্রাফট অথবা মানি অর্ডার মারফৎ **'শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদুরাই'**— এই নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে ঃ—



প্রার্থনা করি, আপনি ঈশ্বরের পরম আশীর্বাদ লাভ করুন। ধন্যবাদ।

সেবক

স্বামী কমলাত্মানন্দ

অধ্যক্ষ

আয়কর আইনের ৮০জি ধারায় সকল দান আয়করমুক্ত।

Look upon every man, woman and everyone as a God. You cannot help anyone, you can only serve, serve the children of the Lord, serve the Lord Himself, if you have privilege.

Swami Vivekananda

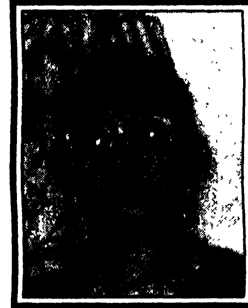
যে-কেহ মোরে দিয়েছ সুখ দিয়েছ তাঁরি পরিচয়
সবারে আমি নমি।
যে-কেহ মোরে দিয়েছ দুখ দিয়েছ তাঁরি পরিচয়
সবারে আমি নমি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভগবান যদিও সর্বত্র আছেন বটে, কিন্তু তাঁকে আমরা জানতে পারি কেবল মানবচরিত্রের মধ্য দিয়ে।

স্বামী বিবেকানন্দ

শরণাগত হয়ে পড়ে থাকতে হয়, তবে তো তাঁর (ভগবানের) কৃপা হয়।—শ্রীমা সারদাদেবী



শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা এবং আমাদের একমাত্র কন্যাসন্তান গোপা সোম গত ১৮ই মে ২০০২ মাত্র ৩১ বছর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণলোকে যাত্রা করেছে। সে ছিল 'উদ্বোধন'-এর আজীবন সদস্যা। প্রয়াত কন্যার আত্মার চিরশান্তির জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট পাঠক-সাধারণের ঐকান্তিক প্রার্থনাই পিতা-মাতার একমাত্র সান্ত্বনা। তার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

১১, বিশ্বকোষ লেন — তরুণ সোম
বাগবাজার, কলকাতা-৩ — মঞ্জুলা সোম

বিশ্বজগৎ ঈশ্বরেরই বহিঃপ্রকাশ।
স্বামী বিবেকানন্দ

God Himself will think about your morrow if you completely surrender yourself to Him. God is our very own. You can exert force on Him. —Sri Ramakrishna

ঠাকুর একমাত্র রক্ষাকর্তা—এটি সর্বদা মনে রাখবে; এটি ভুল হলে সব ভুল। যে ঠাকুরের শরণাগত হয়, তার ব্রহ্মশাপেও কিছু হয় না।

—শ্রীমা সারদাদেবী

ভগবান কল্পতরু—তাঁর কাছে যে যেমন চায় সে তাই পায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

When the mind is free from attachment to sense-objects, it turns to God and is fixed on Him.

Sri Ramakrishna

ভগবানের নাম চিন্তা যেরকম করেই কর না কেন, তাতেই কল্যাণ হবে। যেমন মিছরির রুটি সিধে করে খাও আর আড় করেই খাও, খেলে মিষ্টি লাগবেই লাগবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে। ঈশ্বরের ওপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

Man is born to conquer nature and not to follow it.

Swami Vivekananda

ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ—সকলকে উদ্ধার করতে। মলয়ের হাওয়া খুব বইছে। যে একটু পাল তুলে দেবে, শরণাগত হবে—সে-ই ধন্য হয়ে যাবে।

শ্রীমা সারদাদেবী

লোকে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মনে করে, আমি সব করেছি—তাঁর (ভগবানের) উপর নির্ভর করে না। যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

শ্রীমা সারদাদেবী



রামকৃষ্ণ মঠ

পোঃ মঠ-চণ্ডীপুর, জেলা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর
পিন ঃ ৭২১-৬৫৯
দূরভাষ ঃ (০৩২২৮) ৭২২১৮

একটি আবেদন

রামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ মঠ-চণ্ডীপুর, জেলা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর বেলুড় মঠস্থিত রামকৃষ্ণ মঠের একটি শাখাকেন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসি-শিষ্য ও রামকৃষ্ণ মঠের দ্বিতীয় সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুপ্রেরণায় ১৯১৬ সালে মেদিনীপুর জেলার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

আশ্রমের একটি ছোট মন্দির রয়েছে। এই মন্দিরে প্রতিদিন পূজা, ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ ও আলোচনা, সন্ধ্যারতি ও ভজন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছর আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পালন ছাড়া শ্রীশ্রীকালীপূজা ও শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজাও অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়, গ্রন্থাগার, ফ্রি কোচিং সেণ্টার, ত্রাণকার্য পরিচালনা প্রভৃতির মাধ্যমে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে সেবাকাজ করা হয়ে থাকে।

৬০ বছরের আগে অতি সাধারণ ইঁট, চুন, সুরকির দ্বারা তৈরি আশ্রমস্থ মন্দিরটি জরাজীর্ণ ও ব্যবহারের জন্য বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। তাই বিশেষজ্ঞদের নির্দেশ অনুসারে মন্দিরের বেশির ভাগ অঙ্গই ভেঙে ফেলা হয়েছে। বর্তমানে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যপূজা নিকটস্থ একটি ছোট ঘরে করা হচ্ছে। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী মন্দিরের পুনর্নির্মাণকার্য ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এই কাজে আনুমানিক ২৫ লক্ষ টাকারও অধিক ব্যয় হবে। তাই আমরা সহৃদয় জনসাধারণের নিকট এই মহৎ কার্যের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে যথাসাধ্য আর্থিক সহায়তাদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। সকল টাকা, চেক ও ড্রাফট মানি অর্ডারের মাধ্যমে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাবেন। চেক ও ড্রাফট **'Ramakrishna Math, Math-Chandipur'—নামে দেবেন। রামকৃষ্ণ মঠের নামে যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০-জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত।**

০৬.০৭.২০০২

স্বামী দুর্গাত্মানন্দ
অধ্যক্ষ

প্রবৃত্তিই আমাদের সকল কর্মের মূল। নিবৃত্তি হইতেই ধর্মের উদ্ভব।

স্বামী বিবেকানন্দ



We want to lead mankind to the place where there is neither the Vedas, nor the Bible, nor the Koran; yet this has to be done by harmonising the Vedas, the Bible and the Koran.

Swami Vivekananda

Everything is in the mind; nothing bears fruit unless the mind is pure.

Sri Ma Saradadevi

Pray to Him (God) in any way you will. He is sure to hear you for the hears even the foot fall of an ant.

Sri Ramakrishna

In worshipping God we have been always worshipping our hidden self.

Swami Vivekananda



এক হাতে কর্ম কর, আরেক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাক।

শ্রীরামকৃষ্ণ

জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে।।
শ্রীশ্রীচণ্ডী

যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন। মানুষের আর কতটুকু বুদ্ধি? কি চাইতে কি চাইবে। তাঁর শরণাগত হয়ে থাকা ভাল; তিনি যেমন যেমন দরকার, তেমন তেমন দেবেন।
শ্রীমা সারদাদেবী



নাম জপতে জপতে ইন্দ্রিয়গুলোর অনিষ্ট শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। ধ্যান, জপ, ঈশ্বরচিন্তা ও সৎ কাজ করলে পাপ কেটে যায়। ইষ্টে যার সর্বদা মন থাকে তার কখনো অনিষ্ট হয় না।

শ্রীমা সারদাদেবী

কাটোয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম

পোঃ কাটোয়া, জেলা ঃ বর্ধমান, পিন ঃ ৭১৩১৩০

একটি আবেদন

কাটোয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, মধ্যবঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের একটি সদস্য আশ্রম (রেজি. নং—এস/৯৯৭০০০)। আশ্রমের মন্দিরে নিত্য দুবেলা পূজারতি হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি, যুব উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এই আশ্রমের পরিচালনায় নিম্নলিখিত বিবিধ জনহিতকর কার্য—যেমন, দাতব্য চিকিৎসালয়, ফ্রি কোচিং সেন্টার (দুঃস্থ ছাত্রদের জন্য), লাইব্রেরী, বুক স্টল পরিচালনা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুঃস্থ ব্যক্তিদের ত্রাণকার্যের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু অর্থাভাবে এই আশ্রম সকল কাজ ঠিকমতো করতে পারে না। সেজন্য সহৃদয় দেশবাসী ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

আর্থিক দান চেক বা ড্রাফটে পাঠালে—"Katwa Sri Sri Ramakrishna Sevasram"—এই নামে পাঠাবেন।

(১)	মন্দির সংস্কার	১,০০,০০০ টাকা
(২)	সাধুনিবাস নির্মাণ	২,৫০,০০০ টাকা
(৩)	ছাত্রাবাস নির্মাণ	২,০০,০০০ টাকা
(৪)	আশ্রম-প্রাচীর সংস্কার	২,৫০,০০০ টাকা
(৫)	বুক স্টল নির্মাণ	৫০,০০০ টাকা
(৬)	দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্কার	৫০,০০০ টাকা
(৭)	লাইব্রেরী সংস্কার	১,০০,০০০ টাকা
	মোট	১০,০০,০০০ টাকা

বিনীত নমস্কারান্তে

শ্যামাপ্রসাদ মজুমদার
সম্পাদক

মনে ভাববে—আর কেউ না থাক, আমার একজন মা আছেন। —শ্রীমা সারদাদেবী

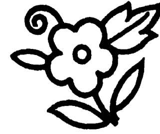
As the snake is separate from its slough, even so is the spirit separate from the body.
Sri Ramakrishna

When you are doing any work, do not think anything beyond.

Swami Vivekananda

ঠাকুর একমাত্র রক্ষাকর্তা—এটি সর্বদা মনে রাখবে; এটি ভুল হলে সব ভুল। যে ঠাকুরের শরণাগত হয়, তার ব্রহ্মশাপেও কিছু হয় না।

শ্রীমা সারদাদেবী





Just as you practice much in order to sing, dance and play on instruments, so one should be practice the art of fixing the mind on God. One should practice regularly such disciplines as worship, japa and meditation.

Sri Ramakrishna

তব কথামৃতং তপ্ত জীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি
গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।।

শ্রীমদ্ভাগবত

মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার দিকে এগোতে চায় না। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আন্তরিক খুব যত্ন ও রোখ চাই।

শ্রীমা সারদাদেবী

যার আছে সে মাপো, যার নেই সে জপো।

শ্রীমা সারদাদেবী

রামকৃষ্ণ মিশন



বিবেকনগর, আলং, অরুণাচল প্রদেশ-৭৯১ ০০১
দূরভাষ ঃ (০৩৭৮৩) ২২৪৫৫, ২২২৪৯, ২২৩৪৯, ২২২১৮
ফ্যাক্স ঃ ২২৭১৬

একটি অনুরোধ

রামকৃষ্ণ মিশন আলং কেন্দ্র পরিচালিত বহুমুখী সেবাকার্য বিষয়ে অনেকেই অবহিত আছেন। ধর্মপ্রাণ দেশবাসী তথা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী ভক্তবৃন্দের সহায়তাপুষ্ট এই কেন্দ্রটি অরুণাচল প্রদেশের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে প্রায় চার দশক কাল শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজ-উন্নয়ন প্রভৃতি বিবিধ সেবাব্রতে নিরলস উদ্যমে নিরত আছে। বিভিন্ন সেবাপ্রকল্পগুলির সুষ্ঠু রূপায়ণে সাম্প্রতিক কালে মিশন-অনুরাগী ভক্তবৃন্দের অকৃপণ আর্থিক সহায়তা আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

অতি সম্প্রতি ব্রহ্মপুত্র নদের মূলধারা সিয়াং নদীর উৎস অভিমুখে আলং থেকেও ৩৫০ কিমি. দূরবর্তী আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখা সমীপবর্তী টুটিং, রিশিং, জিডো, কুগিং, নেরিং, গেলিং প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর আন্তরিক সহযোগিতায় আমরা মাত্র ২০২টি পশমী কম্বল বিতরণ উপলক্ষ্যে স্থানীয় উপজাতি জনসাধারণের সার্বিক দারিদ্র্য এবং প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্রের অভাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে সত্য সত্যই ব্যথিত হয়েছি। বৃহৎ মাতৃভূমির এই দুর্গম প্রত্যন্ত প্রদেশে তুষারপাতপ্রবণ সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী হতদরিদ্র উপজাতি পরিবারসমূহের সারল্য তথা দুর্দশা আমাদের মনকে এখনো মুগ্ধ ও আচ্ছন্ন করে। স্বদেশের সনাতন কৃষ্টি ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সংরক্ষণ হেতু এইসকল দুর্গম পার্বত্য এলাকায় এবম্বিধ সেবাকার্যের প্রভূত প্রয়োজনীয়তা চিন্তাশীল ও বিচক্ষণ স্বদেশবাসী অবশ্যই স্বীকার করবেন বলে বিশ্বাস করি।

সিয়ম্, সিয়াং এবং সুবনসিরি নদীগুলির উৎস অববাহিকায় মেচুকা, মরিগাঁও, তাতো, পায়ুম্, টুটিং, গেলিং, তাকসিং প্রভৃতি বিস্তীর্ণ এলাকায় দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী অন্যূন ২০০০টি উপজাতি পরিবারের জন্য শীতবস্ত্র এবং কম্বল ক্রয়হেতু আমাদের অন্তত ১০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। নরনারায়ণ ভগবানের সেবার্থে আমাদের এই সদিচ্ছা রূপায়ণে সহৃদয় দেশবাসীর সহানুভূতিলাভে বঞ্চিত হব না আশায় পাঠকবৃন্দের জ্ঞাতার্থে এই অনুরোধটি নিবেদন করছি।

দানের উদ্দেশ্য উল্লেখ করে আমাদের ঠিকানায় প্রেরিত মানি অর্ডার, অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক অথবা **"Ramakrishna Mission, Along"** নামে State Bank of India, Along-এ প্রদত্ত ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ ভারতীয় আয়কর আইনের ৮০জি ধারায় করমুক্ত থাকবে।

আলং, অরুণাচল প্রদেশ
৫ মে ২০০২

স্বামী সুমেধানন্দ
সম্পাদক

ভারতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ শক্তিমূর্তির অবমাননা করা। স্ত্রীজাতির অভ্যুদয়ের জন্যই রামকৃষ্ণ অবতারে স্ত্রীগুরু গ্রহণ, নারীভাবে সাধন, মাতৃভাব প্রচার।

স্বামী বিবেকানন্দ

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।

শ্রীকৃষ্ণ

Arise, Awake and stop not till the goal is reached

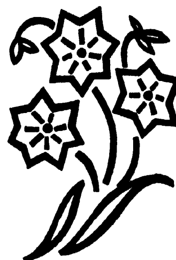
Swami Vivekananda

The Lord is never unjust and unmerciful in His creation.

Sankaracharya

He who has a pure mind sees everything pure.

Sri Ma Sarada Devi



Make thy body the field, good works the seed, irrigate it with God's name.
Guru Nanak

Purity, Patience and Perseverance are the three essentials to success and above all—Love.

Swami Vivekananda

এক হাতে কর্ম কর, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাক।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ভয় কি বাবা, সর্বদার তরে জানবে যে ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি—আমি মা থাকতে তোমাদের ভয় কি? ঠাকুর যে বলে গেছেন ঃ "যারা তোমার কাছে আসবে, আমি শেষকালে এসে তাদের হাত ধরে নিয়ে যাব।"

শ্রীমা সারদাদেবী



সংসারে থাকতে গেলে কেমন করে থাকতে হয় জান? যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন, যখন যেমন তখন তেমন।

শ্রীমা সারদাদেবী

চাঁদামামা যেমন সব শিশুর মামা, তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার। তাঁকে ডাকবার সকলেরই অধিকার আছে। যে ডাকবে, তিনি তাকেই দেখা দিয়ে কৃতার্থ করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ

Superstition is a great enemy of man, but bigotry is worse.

Swami Vivekananda

জনৈক ভক্তঃ মহারাজ, সংসারজীবনে নানান ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের দুঃখের যেন শেষ হয় না। সংসারী মানুষের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকটি মূল উপদেশ আপনি ভক্তদের বারংবার বলেন। আরো একবার সেই কয়টি উপদেশ দয়া করে আমাকে বলবেন কি? এতবার শুনেও মনে রাখতে পারি না।

স্বামী দয়াত্মানন্দঃ নিশ্চয়ই বলব। যতবার তুমি শুনতে চাইবে ততবার বলব। ঠাকুরের কথা বলতে আমার কোন ক্লান্তি নেই। উপদেশগুলি আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও বল—

ভক্তের কর্তব্য কী?

* **ঈশ্বরের নামগুণগান।**
* **সাধুসঙ্গ।**
* **নির্জনবাস।**
* **বড়লোকের বাড়ির দাসীর মতো সংসারে থাকা।**
* **বিচার ও অনাসক্তি ঃ ঈশ্বরই নিত্য আর সব অনিত্য—এই চিন্তা করা।**

তাঁকে (শ্রীভগবানকে) স্মরণ করলে সব পাপ কেটে যায়। তাঁর নামেতে কালপাশ কাটে। — শ্রীরামকৃষ্ণ

মানুষের আর কতটুকু বুদ্ধি? কি চাইতে কি চাইবে! তাঁর শরণাগত হয়ে থাকা ভাল; তিনি যেমন যেমন দরকার, তেমন তেমন দেবেন। — শ্রীমা সারদাদেবী

বই, শাস্ত্র—এসব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার পথ বলে দেয়। পথ, উপায় জেনে লবার পর আর বই, শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কাজ করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

The mind is like a Mad elephant. It rushes with the wind. That is why one must distinguish between good and evil and work hard for the sake of God.

Sri Ma Sarada Devi

Material happiness is but a transformation of material sorrow.

Swami Vivekananda

It is good to love God for hope of reward in this or the next world, but it is better to love God for love's sake.

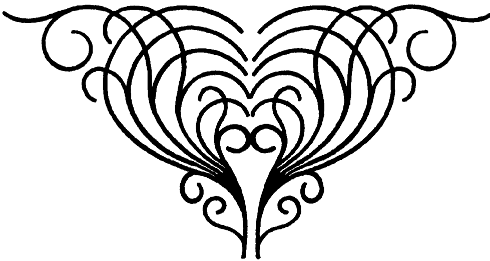
Swami Vivekananda

As a lamp does not burn without oil, so a man cannot live without God.

Sri Ramakrishna

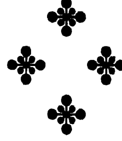
মানুষ তো ভগবানকে ভুলেই আছে। তাই যখন যখন দরকার, তিনি নিজে এক-একবার এসে সাধন করে পথ দেখিয়ে যান।

শ্রীমা সারদাদেবী



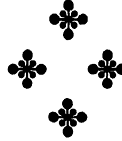
দেহত্যাগের আগে যদি কেউ ঈশ্বরের সাধন করে, আর সাধন করতে করতে ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, তাকে আর পাপ কখনো স্পর্শ করবে? অর্থাৎ ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, আর পাপ স্পর্শ করবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ



ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজনে? নিন্দা-ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, তাকে ভাল করতে পারে কজনে? আমার ছেলে যদি ধুলো-কাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে।

শ্রীমা সারদাদেবী



বেদে কোথাও নরকের কথা নাই। বেদের অনেক পরবর্তী পুরাণে এই নরকের প্রসঙ্গ আছে। বেদের সর্বাপেক্ষা অধিক যে-শাস্তির কথা পাওয়া যায়—তাহা পুনর্জন্ম, অর্থাৎ আরেকবার উন্নতির সুবিধা লাভ করা।

স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
Phone : 554-2248, 554-2403
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com
udbodhan@vsnl.net

Vol. 104
No. 9
SEPTEMBER
2002

Licensed to Post
Without Prepayment
Licence No.
TECH/WB/RNP-15/LPWP-01/2002

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Regn. No.
TECH/WB/RNP-15/2002

উদ্বোধন

১০৪তম বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০৪ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র



✤ গত ১লা মাঘ ১৪০৮ (১৫ জানুয়ারি ২০০২) উদ্বোধন ১০৪তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০৩ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম ✤

✡ বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র উদ্বোধন আপনাকে পড়তে হবে।

একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা

✡ উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।

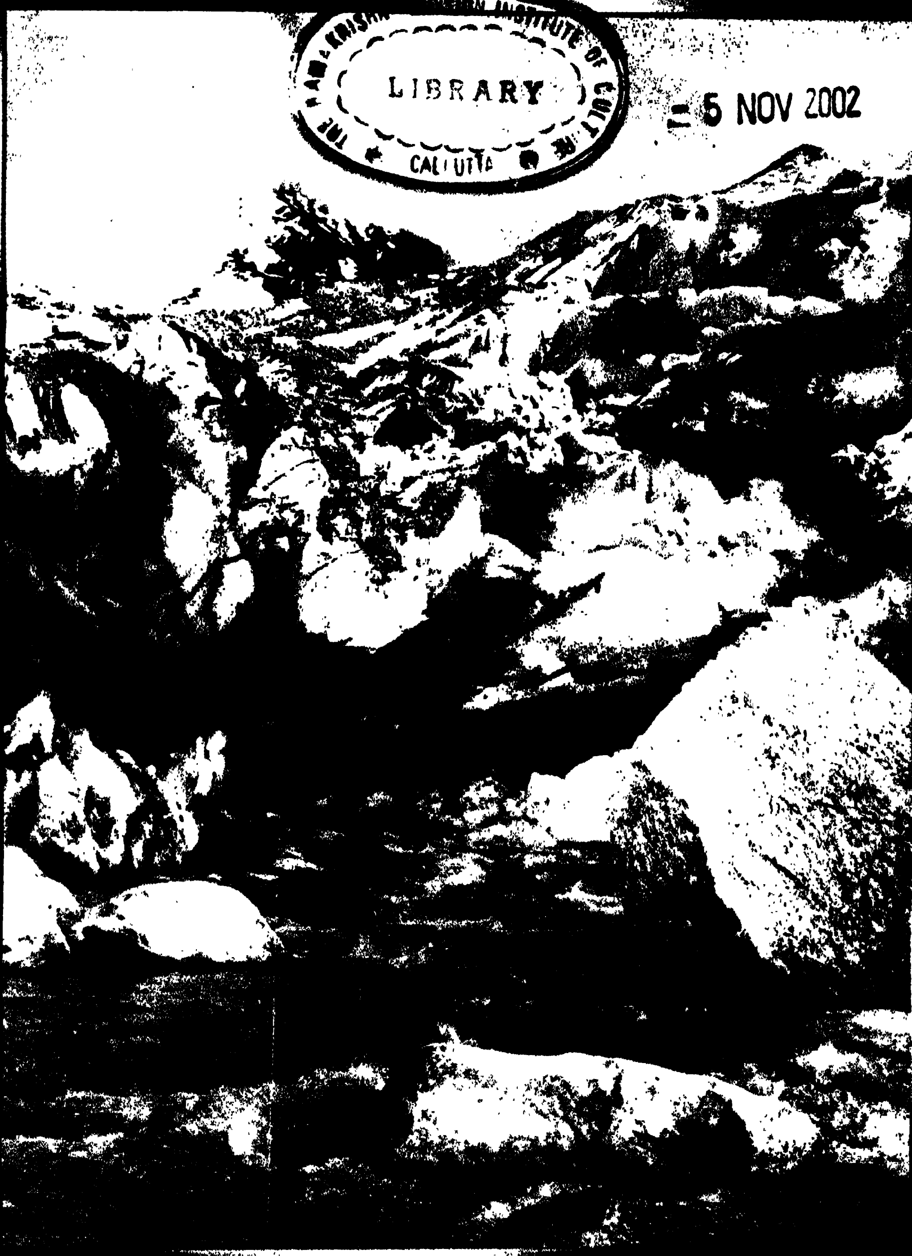
✡ উদ্বোধন-এর সেবায় পাঁচটি স্থায়ী তহবিল আছে। একটি 'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল', অন্য চারটি যথাক্রমে 'স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ স্মৃতি তহবিল', 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল', 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল' এবং 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মৃতি তহবিল'। উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টে পাঠালে অনুগ্রহ করে 'Ramakrishna Math, Baghbazar'—এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। দাতার চিঠিতে বা M.O. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন দিতে গেলে 'Udbodhan Office, Kolkata'—নামে চেক বা ড্রাফ্‌ট পাঠাবেন।

স্বামী সর্বগানন্দ
সম্পাদক

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫্ টাকা। সডাক ৯৫্ টাকা। শারদীয়া সংখ্যা পৃথক ভাবে ৫০্ টাকা।

কার্ত্তিক ১৪০৯ ১০ম সংখ্যা

উদ্বোধন



তম বর্ষ ❁ উদ্বোধন কার্যালয় ❁ কলকাতা



"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

"Mankind ought to be taught that religions are but the varied expressions of THE RELIGION which is oneness, so that each may choose the path that suits him best." —**Swami Vivekananda**



সহৃদয় জনসাধারণের প্রতি আবেদন

সহৃদয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ অর্থানুকূল্যে আমাদের ভগ্নপ্রায় স্কুলগৃহটি পুনর্নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাঁদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।

আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি।

১।	১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ	ঃ	১,২০,০০০ টাকা
২।	দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
৩।	পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
৪।	আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প	ঃ	১০,০০,০০০ টাকা
৫।	একখানা অ্যাম্বুল্যান্স (Ambulance)	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
			২৬,২০,০০০ টাকা

A/c Payee চেক/ড্রাফট 'Ramakrishna Mission Ashrama, Ramharipur'—এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফট পাঠাবার ঠিকানা—সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা—বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ ঃ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন নং ৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি

স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
রামহরিপুর, জেলা ঃ বাঁকুড়া



শ্রীনীলমণি দাশ (আয়রনম্যান)
প্রতিষ্ঠিত

আয়রনম্যান হেলথ হোম

পরিচালিত
রোগারোগ্যে যোগ-চিকিৎসা কেন্দ্র
প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে ৮টা
রবিবার সকাল ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত।
ডাক মারফত এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাতে একক ব্যায়াম শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।
"ম্যাসাজ এবং যোগ চিকিৎসা" প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা বিস্তারিত বিবরণের জন্য
ফোনে ৩৫০-৩১৫৫ অথবা পত্র মারফত যোগাযোগ করুন ঃ
স্বপন কুমার দাশ
২ আমহার্স্ট রো, কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

উদ্বোধন ॥১০৪॥
১০৪তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা কার্তিক ১৪০৯ অক্টোবর ২০০২

প্রচ্ছদ : গোমুখের চিত্র। হিমালয়ের হিমশৈলাবৃত গহ্বর থেকে গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, অবিরাম, উদ্দাম, অক্লান্ত গতিতে। এ যেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবগঙ্গা' বিবেকানন্দ-রূপ গোমুখের মধ্য দিয়ে জগৎকল্যাণার্থে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান! শিবচক্ষুটিও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। *আলোকচিত্র : ডাঃ তমোনাশ ভট্টাচার্য।*

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ



সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ☐ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ : ৭৫ টাকা; সডাক : ৯৫ টাকা ☐ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য : ১০ টাকা



নবীকরণ ও গ্রাহকভুক্তি

২০০৩ খ্রিস্টাব্দ ● ১৪০৯-১৪১০ বঙ্গাব্দ

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে **'উদ্বোধন'** ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

'উদ্বোধন' : ১০৫তম বর্ষ, ২০০৩ (মাঘ ১৪০৯—পৌষ ১৪১০) সালের জন্য আপনি নবীকরণ করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন।

গ্রাহকভুক্তি : ১০৫তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৩) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে। গ্রাহকমূল্য ৭৫্ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ৯৫্ টাকা। বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র : ৮০০্ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০্ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০্ টাকা।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি : ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০০্ টাকা (উদ্বৃত্ত কিছু থাকলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নামে জমা থাকবে) এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০্ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০্ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি : M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'**—এই নামে পাঠাতে পারেন। নিজের **গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড** ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন গ্রাহক হতে চাই'** খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন।

'চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে।

M.O. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব **হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্ছনীয়।**

❑ কার্যালয় খোলা থাকে : বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।

❑ যোগাযোগের ঠিকানা : সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩
ফোন : ৫৫৪-২২৪৮, ৫৫৪-২৪০৩ ● e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com

উদ্বোধন ॥১০৪॥

কার্তিক ১৪০৯ অক্টোবর ২০০২

দিব্য বাণী

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা।। [শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৪।১৭]

কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি।। [ঐ, ৪।২২]

সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যন্তঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্।। [ঐ, ৪।২৬]

হে দেবি, দুঃসময়ে আপনাকে স্মরণ করিলে আপনি সকলের ভয় নাশ করেন। সুসময়ে বিবেকিগণ আপনাকে চিন্তা করিলে আপনি তাহাদিগকে সুবুদ্ধি প্রদান করেন। হে দারিদ্র্যহারিণি, দুঃখবিনাশিনি, ভয়নাশিনি দেবি, সকলের কল্যাণবিধানার্থ সর্বদা দয়ার্দ্রচিত্ত আপনি ভিন্ন আর কে আছেন?

হে দেবি, অন্য আর কাহার সহিত আপনার এই পরাক্রমের তুলনা হইতে পারে? আপনার শত্রুভীতি-সঞ্চারকারী অথচ এত মনোরম সৌন্দর্যের তুল্য সৌন্দর্য আর কাহারই বা আছে? হে বরদে, হৃদয়ে মুক্তিপ্রদ কৃপা এবং যুদ্ধে মৃত্যুপ্রদ কঠোরতা ত্রিভুবনে একমাত্র আপনাতেই দৃষ্ট হয়।

হে দেবি, ত্রিভুবনে আপনার যেসকল সৃষ্টিস্থিতিকারিণী সৌম্যমূর্তি ও সংহারকারিণী রুদ্রমূর্তি বিরাজিত, সেইসকল দ্বারা আমাদিগকে ও সমস্ত জগদ্বাসীকে আপনি রক্ষা করুন।

★ ★ ★ ★ ★

জাগো বীর ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতামাঝে।
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা,
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।।

স্বামী বিবেকানন্দ

প্রসঙ্গ ঃ শক্তিতত্ত্ব ও শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিসাধনা

শ্রীরামকৃষ্ণ শক্তিসাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার শক্তিসাধনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ। তান্ত্রিক কৌলাচার মতে সাধনা করিয়া যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির নাটমন্দিরে সর্বসমক্ষে কুলাগার-পূজার যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া 'বীরভাব' সাধন সমাপ্ত করিলেন, সেদিন তাঁহার বাহ্যচৈতন্য লাভের পর ভৈরবী ব্রাহ্মণী বলিয়াছিলেন ঃ "বাবা, তুমি আনন্দাসনে সিদ্ধ হইয়া দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে। উহাই এই মতের শেষ সাধন।" স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন ঃ "ঠাকুর এইকালে দর্শন করিয়াছিলেন—এক অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রীমূর্তি গঙ্গাগর্ভ হইতে উত্থিতা হইয়া ধীর পদক্ষেপে পঞ্চবটীতে আগমন করিলেন; ক্রমে দেখিলেন, ঐ রমণী পূর্ণগর্ভা; পরে দেখিলেন, ঐ রমণী তাঁহার সম্মুখেই সুন্দর কুমার প্রসব করিয়া তাহাকে কত স্নেহে স্তন্যদান করিতেছেন; পরক্ষণে দেখিলেন, রমণী কঠোর করালবদনা হইয়া ঐ শিশুকে গ্রাস করিয়া পুনরায় গঙ্গাগর্ভে প্রবিষ্টা হইলেন।...

"ব্রহ্মাণ্ডগত পৃথক পৃথক যাবতীয় ধ্বনি একত্রীভূত হইয়া এক বিরাট প্রণবধ্বনি প্রতি মুহূর্তে জগতের সর্বত্র স্বতঃ উদিত হইতেছে—এবিষয় ঠাকুর এইকালে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।" শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিভাবনার রূপরেখা অঙ্কিত করা যথেষ্ট দুরূহ কর্ম, তথাপি উহার আলোচনা আমাদিগের চিত্তশুদ্ধির কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

'দেবীভাগবত'-এ একটি সুন্দর উপাখ্যান আছে। একদা নারদ প্রজাপতি ব্রহ্মার দর্শনমানসে গমন করিয়া দেখিলেন, ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করিয়া স্তবের দ্বারা তিনি ব্রহ্মার ধ্যান ভঙ্গ করিলেন। ধ্যানভঙ্গ হইলে নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "হে পিত! আপনি জগতের স্রষ্টা। সকলে আপনার ধ্যান করে। আপনি কাহার ধ্যান করিতেছিলেন?" ব্রহ্মা হাসিয়া বলিলেন ঃ "একই প্রশ্ন আমি ত্রিজগৎপালক শ্রীবিষ্ণুকে করিয়াছিলাম। একদা তাঁহার সমীপে যাইয়া দেখি তিনি গভীর ধ্যানমগ্ন। আমি স্রষ্টা। কিন্তু শ্রীবিষ্ণু সর্বানুস্যূতরূপে সর্বান্তর্যামী, সর্বগ, সর্বেশ্বরেশ্বর। বিশ্বচরাচরে শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত আর কিছুই নাই। অথচ তিনি ধ্যান করিতেছেন! কাহার ধ্যান করিতেছেন? যখন তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল, প্রশ্ন করিলাম, হে নারায়ণ, আপনি অণুতে পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত। আপনার নামোচ্চারণ করিলে মানব শুদ্ধ হয়। আপনি কাহার ধ্যান করিতেছিলেন? শ্রীবিষ্ণু উত্তর করিলেন, আমি শক্তির ধ্যান করি। এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মসত্তা যে অনির্বচনীয় শক্তিকে অবলম্বন করিয়া বহু হইয়াছেন, সেই শক্তির প্রভাবেই আমি, আপনি, দেবাদিদেব প্রমুখ পুরুষভাব প্রাপ্ত হইয়া বিচরণ করিতে থাকি। তাই আমার ধ্যেয় বস্তু ঐ অঘটনঘটনপটীয়সী মহাদেবি আদ্যাশক্তি। শক্তিবিনা সৃষ্টি হয় না। ঐ শক্তিই প্রকৃতিরূপ ধারণপূর্বক সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, মহাপ্রলয়ের কারণ হইয়া থাকেন।"

"শুভ বিজয়া"র প্রার্থনা ও শুভেচ্ছা

'শুভ বিজয়া'র পুণ্যলগ্নে জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের অন্তরের সকল মালিন্য, কলুষ, দ্বেষ ও ভেদ-বুদ্ধি, স্বার্থপরতা, দুর্বলতা, কাপুরুষতা, সঙ্কীর্ণতা, লোভ ও হিংসাকে যেন আমরা নির্মূল করতে পারি! এই উপলক্ষ্যে 'উদ্বোধন'-এর সকল সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ী এবং 'উদ্বোধন'-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত সকলকে আমরা 'শুভ বিজয়া'র আন্তরিক অভিনন্দন, প্রীতি, শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানাই!

—সম্পাদক

বস্তুত, এই সত্তাই তন্ত্রের নির্গুণা, নিরাকারা 'মা', বেদান্তের ব্রহ্ম, যোগের পরমাত্মা। শ্রীরামকৃষ্ণ বারংবার বলিয়াছেন, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতিতে তাই উপাস্য ও উপাসকের অভেদত্বের ধ্যানকেই শ্রেষ্ঠ পূজা বলা হইয়াছে। উচ্চতর অধিকারীর নিকট বাহ্য পূজার প্রয়োজন নাই। চরম অবস্থায় "একবার ওঙ্কার জপলে দশ লক্ষ জপের ফল হয়"—শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন। কিন্তু সকলে তো সেই পূজার অধিকারী নহে। নাম-রূপ-গুণ ব্যতীত ঈশ্বরের ধারণা কয়জন করিতে পারে?, নাম-রূপের মধ্যে থাকিয়া যদি সেই মহাশক্তির ধারণা করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের একটি সগুণা, সাকারা প্রকাশ চাই-ই। সেই কারণেই 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা'। তন্ত্র বলিতেছেন, সাধকের কল্যাণার্থ নিরাকার ব্রহ্ম 'রূপ' ধারণ করিয়াছেন। তখন অরূপা, নির্গুণা 'মা' রূপ-গুণ-শালিনী হইয়া ভক্তের হিতসাধন করিয়া থাকেন। ইহাও শক্তিরই খেলা এবং বিভিন্ন রূপে জগজ্জননীর বিভিন্ন প্রকাশ—'গুণক্রিয়ানুসারেণ'। শেষের কথাটি খুব সহজ, আবার খুব দুর্বোধ্যও বটে। তন্ত্রমতে এই শেষ কথা হইল পূজক, জগৎ এবং জগজ্জননী বলিয়া তিনটি বিভিন্ন সত্তা নাই। একই সত্তা বিদ্যমান। কিন্তু সাধনার প্রারম্ভে এই 'শেষের কথা'টি ধারণা হয় না। স্বাভাবিক কারণেই হয় না। কারণ, শরীর ও মনের যথাযথ প্রস্তুতি তখন থাকে না। এইবার প্রস্তুতিপর্বের শুরু হইল। যে বিশেষ মূর্তিতে মাকে আমরা চিন্তা করিতেছি তিনিই বিরাট জগন্মূর্তি, তিনি জগতে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন—এই ধারণা ক্রমশ দৃঢ় হইতে থাকিল। এবং শেষে সাধক অনুভব করিল—"জ্ঞান হলে ঈশ্বর-টীশ্বর সব উড়ে যায়। মা, মা—শেষে দেখে মা আমার জগৎ জুড়ে। সব এক হয়ে দাঁড়ায়। এই তো সোজা কথাটা।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ১৯১) তখন পূজারী, পূজ্য ও পূজোপকরণ সব এক হইয়া গিয়াছে। তখন ঠিক ঠিক ধারণা হয়—সেই অদ্বয়া জগজ্জননীকেই আমরা হৃদয় হইতে বাহিরে আনিয়া সম্মুখস্থ যন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিবার পর পুনরায় পূজাশেষে তাঁহাকে হৃদয়ে স্বস্থানে স্থাপন করিয়া থাকি।

তখন সাধকের প্রাণে অদ্বয়ানুভূতির বাণী মূর্ত হইয়া উঠে—"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।" অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম বৈ অন্য কিছুই নহি, আমি অশোক, আমিই দেবস্বরূপ।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের তন্ত্রসাধনা বিষয়ে পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায়—তন্ত্র পূজারীকে 'আমি, জগৎ ও ঈশ্বর পৃথক পৃথক তিনটি সত্তা'—এই দ্বৈত বোধ হইতে 'মা আমার জগৎ জুড়ে'—এই বিশিষ্টাদ্বৈত বোধে এবং সেখান হইতে 'আমিই মা'—এই অদ্বৈতানুভূতিতে যাওয়া-আসা করায়।

বলা বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে 'যাওয়া-আসা' যখন তখন সম্ভব হইলেও বহু উচ্চকোটি সাধকেরও এই ব্যাপারটি দূর অস্ত। প্রাথমিক অবস্থায় হৃদয়ের ঐকান্তিক ভক্তি, শুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ এবং যতদূর সম্ভব শুচিতা বজায় রাখিতে পারিলেই পূজারীর অন্তঃকরণ ক্রমশ পরিশুদ্ধ হইয়া প্রথমে বিশিষ্টাদ্বৈত এবং পরে অদ্বৈতবোধের যোগ্যতা অর্জন করিয়া থাকে। যদি ভক্তি যথাযথ না থাকে, যদি সংসারাসক্তিতে পূজায় শুচিতার অভাব ঘটে, যদি মন্ত্রোচ্চারণ সঠিক না হয়—তাহা হইলে কি হইবে? পরমকারুণিক তন্ত্র বলিয়াছেন, তাহা হইলেও সাধক ক্রমশ অগ্রসর হইতে থাকেন। এবং ধীরে ধীরে বারংবার এই পবিত্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের মনকে মা ক্রমশ উপযোগী করাইয়া লন। তখন ধ্যান ও মানসপূজার উৎকর্ষ সাধিত হইয়া অপূর্ব আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে ইহার পর্যবসান ঘটিয়া থাকে। ইহজন্মে না হইলে জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী নিরলস প্রয়াসে সাধক শেষে নির্গুণ-নিরাকারা 'মা'য়ের অপরোক্ষানুভূতিতে প্রতিষ্ঠালাভ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেনঃ "সকলেই শক্তির অণ্ডারে।" এই তত্ত্বের দার্শনিক দিকটি সামান্য আলোচনা করা যাইতে পারে। বস্তুত, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের একটি মূল ভিত্তি 'শক্তিবাদ'। বেদান্তদর্শনে শক্তির আদি প্রকাশ 'আবরণ-বিক্ষেপে'। কিন্তু বস্তুজাগতিক ভূমিতে দাঁড়াইয়া যদি শক্তির বিভিন্ন প্রকাশকে শ্রেণিবিন্যস্ত করা হয়, তাহা হইলে দেখিব উহা (ক) সৃষ্টির দিক, (খ) নীতির দিক, (গ) ধর্মের দিক এবং (ঘ) দর্শনের দিক দিয়া চতুর্ধা-বিভক্ত। বিশ্বচরাচর এবং সহস্র-লক্ষ-কোটি বৎসরব্যাপী এই সৃষ্টিলীলা, তাহার স্থিতিশীলতা, তাহার বিনাশ—সবই শক্তির খেলা। দ্বিতীয়ত, শক্তিকে কেবল এই জগতের কারণ বলিলেই সমস্ত বলা হইল না। মনুষ্যসমাজে সমস্ত নৈতিকতার ভিত্তিস্বরূপ এই শক্তি। জ্ঞানবুদ্ধিসম্বলিত, নীতিবোধযুক্ত সমস্ত প্রাণিকুল এই শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। মনুষ্যসমাজে তো বটেই, পশুদিগের মধ্যেও কিছু নীতিবোধ দেখিতে পাওয়া যায়। এই নীতিবোধ গোষ্ঠীভিত্তিক হইলেও সমুদয় প্রাণিকুলের ঐক্যসাধক এবং অস্তিত্বরক্ষাকারী। আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত জ্ঞাত-অজ্ঞাত নীতির সমাহার হয় বলিয়াই সৃষ্টির এই স্থিতিশীলতা লক্ষিত হয়। তৃতীয়ত, শক্তিই প্রেমরূপে, ভক্তিরূপে, স্নেহ-মমতারূপে



মনুষ্যহৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে। আবার এই শক্তিই ত্যাগ, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সত্যপরায়ণতা-রূপে ধর্মকে রক্ষা করিয়া থাকে। চতুর্থত, দর্শনের দৃষ্টিকোণ হইতে শক্তির পরম ব্যাখ্যা বেদান্তের সিদ্ধান্তে সম্পৃক্ত রহিয়াছে। সেখানে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—একই আছে, দুই নাই। অর্থাৎ জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, উপাস্য ও উপাসক, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড, পরমাত্মা এবং আত্মা, শিব ও জীব অভিন্ন। সেখানে ব্রহ্মবাদিগণ বলিবেন, ব্রহ্মবিনা দ্বিতীয় বস্তু নাই, শক্তিবাদিগণ বলিবেন, শক্তিবিনা দ্বিতীয় বস্তু নাই।

অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্যের মতবাদের পার্থক্য এই শক্তির অবস্থান লইয়াই। মূল প্রশ্ন হইল, স্বরূপ এবং গুণশক্তির মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ কি? শঙ্করাচার্য প্রমুখ অদ্বৈতবাদিগণ গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। কারণ, স্বরূপের মধ্যে স্বরূপ ভিন্ন গুণশক্তি থাকিতে পারে না। গুণশক্তির পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করিলে উহার অস্তিত্ব 'ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়'—এই শ্রুতি-সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করে। সুতরাং গুণশক্তির পৃথক অস্তিত্বও স্বীকার করা যায় না। আর গুণশক্তি যদি স্বরূপের সহিত এক ও অভিন্ন হন, তাহা হইলে গুণশক্তিকে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করিবারও প্রয়োজন থাকে না। অদ্বৈতবাদিগণ ইহাও বলেন, উপনিষদের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রহ্মে স্বজাতীয়, বিজাতীয় বা স্বগত ভেদ নাই।

রামানুজাদি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্যের মতে—ব্রহ্ম নির্বিশেষ নহেন, যেহেতু সজাতীয় বা বিজাতীয় ভেদ না থাকিলেও গুণশক্তির অস্তিত্ব হেতু ব্রহ্মে স্বগতভেদ রহিয়াছে। যথা দুগ্ধ ও তাহার ধবলত্ব। ধবলত্বই দুগ্ধের প্রকাশ—বলা যাইতে পারে। ধবলত্ব নামক গুণশক্তি এবং দুগ্ধের স্বরূপ অভিন্ন। তথাপি ধবলত্ব স্পষ্টতই দুগ্ধের স্বরূপ হইতে গুণত ভিন্ন, কারণ দুগ্ধ তরল হইলেও ধবলত্ব তরল না কঠিন বলা যায় না। সেইরূপ ব্রহ্মের স্বরূপও যেমন আছে, গুণশক্তিও আছে—যাহা স্বরূপত অভিন্ন, কিন্তু গুণত ভিন্ন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে এই দুই বিরোধী মতের অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলিতেছেন ঃ "ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। শক্তি না মানলে জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়—আমি, তুমি, ঘর, বাড়ি, পরিবার—সব মিথ্যা। ঐ আদ্যাশক্তি আছে বলে জগৎ দাঁড়িয়ে আছে।" "তিনি জীবজগৎ হয়েছেন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি—যখন সৃষ্টি করছেন, পালন করছেন, সংহার করছেন, তখন তাঁকে শক্তি বলি।... জল স্থির থাকলেও জল, হেললে দুললেও জল।" "তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলাকে, লীলাকে ছেড়ে নিত্যকে ভাবা যায় না।"

বস্তুত, 'আমি-আমার' স্তরে অবস্থানকালে বিবর্তনবাদীদের অদ্বৈতমতানুযায়ী জগৎ অস্বীকার করিয়া 'শক্তি নাই' ইত্যাদি বলা শ্রীরামকৃষ্ণ পছন্দ করিতেন না। কিন্তু অদ্বৈতবাদের শেষকথা অজাতবাদও শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো কখনো সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিতেন ঃ "জগৎ তিন কালে (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান) নাই, উহা শেষকথা রে, শেষকথা।... জানিবি সকল মতেরই উহা শেষকথা।" পৃথিবীর কোটি কোটি নরনারীকে শ্রেয়ের পথ দেখাইতে যুগাবতারের আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাই যে-মতবাদের পরিণামে অনিবার্যভাবেই 'জগন্মিথ্যাত্ববাদ' আসিয়া পড়ে, সেই মতবাদের সাধারণ প্রচার শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিপ্রেত ছিল না। শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহাকে মাধ্যম করিয়া তন্ত্রের লুপ্তপ্রায় শ্রেয়োলাভকর দিকটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাইতে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিসাধনা। নতুবা স্বামী সারদানন্দের প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া সম্ভব নহে। তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মাবধি শুদ্ধ, পবিত্র, নিষ্পাপ। এই নহে যে, তাঁহার মধ্যে কাম-ক্রোধাদির আধিক্য রহিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে তন্ত্রের পশ্বাচার, বীরাচারাদির মধ্য দিয়া চলিয়া তবেই দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। তবু ব্রাহ্মণী কেন অতি সাড়ম্বরে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাঁহাকে দিয়া বীরাচার সাধনসকল করাইয়া একদা বলিয়াছিলেন ঃ "বাবা, আজ তুমি দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে।" ইহার একমাত্র কারণ ইহাই হইতে পারে যে, বহু শতাব্দী ধরিয়া তন্ত্রকে বিকৃত রূপে প্রয়োগ করিয়া, কেবলমাত্র মুদ্রা, মাংস, মদ্যাদি পঞ্চ ম-কার সাধনের মাধ্যমেই তন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব ইত্যাদি যে বিকৃত ধারণা মানুষের মনে পুঞ্জীভূত হইয়াছিল—তাহার উৎপাটনই শ্রীজগদম্বার অভিপ্রেত ছিল বলিয়া মনে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের 'নারী'-বর্জিত এবং 'কারণ'-বর্জিত অনুপম ও অভিনব দিব্য তান্ত্রিক সাধনাই ব্রাহ্মণী প্রমুখ সাধিকাগ্রগণ্যের মনে সঞ্চিত সকল বিকৃত ধারণাকে পরিবর্তিত করিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছিল, তন্ত্রসাধনাও সম্পূর্ণ পবিত্রভাবেই অনুষ্ঠান করা সম্ভব। তন্ত্রের যে ঐকান্তিক পরমকারুণিকত্ব রহিয়াছে তাহা প্রমাণ করাও যেন শ্রীরামকৃষ্ণাবতারের আবির্ভাবের অন্যতম কারণ। ❑

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে যেসকল তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ১৩৫৯ সালে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনর্মুদ্রিত করা হলো। আশা করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।—সম্পাদক

পরমহংসের উক্তি

পরিচারিকা, জুলাই ১৮৮৬

গ্যাসের আলো নানা স্থানে নানাপ্রকারে জ্বলিতেছে, কিন্তু সমুদয় ভিতরে ভিতরে এক আধার হইতে আসিতেছে। নানাদেশীয় নানাজাতীয় লোকদের উজ্জ্বল জ্ঞানালোক এক ঈশ্বর হইতে আসিতেছে।

অন্ধকারের ধর্মই ধর্ম, কিন্তু আলোকের ধর্ম যথার্থ নহে। কোন ব্যক্তি জনতাশূন্য মাঠে যদি যুবতী রমণীকে দেখিতে পাইয়া কেবল ঈশ্বর আছেন জানিয়া তাহার প্রতি কুভাবে দৃষ্টি না করেন, তিনিই প্রকৃত ধার্মিক। পরন্তু যে-ব্যক্তি কেবল প্রকাশ্য ধর্মানুষ্ঠান করে, তাহাকে যথার্থ ধার্মিক বলা যাইতে পারে না।

পরিচারিকা, আগস্ট ১৮৮৬

গতবারের 'পরিচারিকা'য় (জুলাই ১৮৮৬) আমরা পরমহংসের উক্তি শীর্ষক যে-কয়েকটি সার কথা প্রকাশ করিয়াছি, তাহা দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উক্তি।... এবারও আমরা তাঁহার কতকগুলি উক্তি প্রশ্নোত্তর-রূপে পাঠিকাদিগের পাঠের জন্য এস্থানে প্রদান করিলাম।...

সংসার কিরূপ?

সংসার লাল চুষিমের মতো। লাল চুষিম কঠিন কাষ্ঠখণ্ড; তাহাতে কোন রস নাই, কিন্তু শিশু রাঙা দেখিয়া আনন্দে তাহা চুষিতে থাকে, মা সময় সময় আসিয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইয়া যান। সেইরূপ অজ্ঞান লোকেরা বাহ্য চাকচিক্যশালী নীরস সংসার লইয়া ভুলিয়া থাকে। পরম মাতার প্রেম-দুগ্ধ ভিন্ন সংসারে তাহার আত্মার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না।

*

সাধু মহাজনদিগকে নিকটস্থ আত্মীয়লোকেরা অগ্রাহ্য করে, দূরস্থ লোকদিগের নিকটে তাঁহাদের আদর হয়, ইহার কারণ কি?

বাজিকরের বাজি তাহাদের নিকটস্থ আত্মীয় লোকেরা দেখে না। দূরের লোকে বোকা হয়ে দেখে। বজ্রবাঁটুলের বীজ গাছের তলায় পড়ে না, উড়ে যাইয়া দূরে পড়ে ও তথায় গাছ হয়। সেইরূপ ধর্মপ্রচারকদিগের প্রচার দূরেতেই কার্যকর হয়।

*

মানুষের দেবত্ব কতক্ষণ থাকে?

লৌহ যতক্ষণ আগুনে থাকে ততক্ষণই লাল। আগুন হইতে বাহির করিলেই কালো। ঈশ্বরের সঙ্গে যতক্ষণ যোগ ততক্ষণই মনুষ্যের দেবত্ব।

*

সংসারের সাধন করিতে কি সম্বল চাই?

শব-সাধন করতে যেমন কড়াই মুড়কি চাই, শবটা জীবিত হয়ে হাঁ করে উঠলে তার মুখে কড়াই মুড়কি দিতে হয়, সেইরূপ সংসারের জন্য টাকা-পয়সারূপ কড়াই মুড়কি চাই।

*

জীবাত্মা পরমাত্মার যোগের অবস্থা কিরূপ?

ঘড়ির ছোট ও বড় কাঁটা দুপুরের সময় যেমন এক হয়ে যায়, সেইরূপ।

ধর্মতত্ত্ব, সেপ্টেম্বর ১৮৮৬

ঈশ্বরের কৃপা কিরূপে ধারণ করা যায়?

তাঁহার কৃপাবারি সকল স্থানে বর্ষিত হয়, কিন্তু বিনীত আত্মাতেই কৃপা স্থিতি করে ও কৃপাবারিতে তাহা সরস থাকে, তজ্জন্য সেই আত্মাতে প্রেম ভক্তি বিশ্বাসাদি নানা স্বর্গীয় শস্য জন্মে। যেমন আকাশ হইতে সর্বত্র জল বর্ষিত হয়, কিন্তু উচ্চ ভূমিতে সেই জল দাঁড়ায় না, নিম্নভূমিতে দাঁড়ায় ও তাহাকে শস্যশালিনী করে।

*

শত্রুগণ যিশুর গায়ে প্রেক বিদ্ধ করিল, তিনি তাঁহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন, এ কেমন?

সাধারণ নারিকেলে প্রেক বিদ্ধ করিলে প্রেক শাঁস পর্যন্ত ভেদ করে, কিন্তু খুড়রি নারিকেলের শাঁস ভিতরে আলগা হইয়া যায়, সেই নারিকেলের উপরে প্রেক বিদ্ধ করিলে শাঁস ভেদ করে না। যিশুখ্রিস্ট খুড়রি নারিকেলের ন্যায় ছিলেন। তাঁহার আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন ছিল, শত্রুগণ তাঁহার দেহে প্রেক বিঁধাইয়াছিল, কিন্তু আত্মাকে বিদ্ধ করিতে পারে নাই। এইজন্য তিনি দেহে নিদারুণ প্রেকের আঘাত পাইয়াও প্রসন্ন মনে শত্রুদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

*

প্রকৃতির মধ্যে কি ঈশ্বর স্থিতি করেন?

যেমন দুগ্ধে ঘৃত আছে, চক্ষে দেখা যায় না, চেষ্টা যত্ন করিলে ঘৃত লাভ হয়—সেইরূপ প্রকৃতির ভিতরে ঈশ্বর গূঢ়রূপে আছেন, সাধন করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সঙ্কলন ❑ জলধিকুমার সরকার

স্বামী বিবেকানন্দের দুখানি পত্র*

সিস্টার ক্রিস্টিনকে লিখিত

সুয়েজ
১৪ জুলাই ১৮৯৯

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

দেখেছ এবার আমি সত্যিই বেরিয়ে পড়েছি এবং আশা করি দু-সপ্তাহে লণ্ডনে পৌঁছে যাব। এবছরে নিশ্চয়ই আমেরিকায় যাব এবং আমার ঐকান্তিক আশা—তোমার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাব। আমি এখনো কিরকম জড়বাদী দেখছ!—স্থূলশরীরে বন্ধুদের দেখতে চাইছি।

রওনা হওয়ার আগে বেবির (স্টেলা ক্যাম্পবেল) কাছ থেকে একখানি সুন্দর চিঠি পেয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি তাকে একটা চিঠি লিখব। তার কথামতো তোমার ঠিকানায়। আগে তাকে চিঠি লিখতে পারিনি।

ভারতে অত্যন্ত অসুস্থ ছিলাম। আমার হৃদ্‌যন্ত্র একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছিল—পর্বতারোহণ, হিমবাহের জলে স্নান এবং স্নায়বিক ক্লান্তি ইত্যাদি কারণে। আমার সময়ে সময়ে ভয়ানক শ্বাসকষ্ট হতো; শেষবার সাতদিন সাতরাত ছিল। সবসময় শ্বাসরোধের ভাব হতো এবং আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম।

এই সফরের ফলে আমি প্রায় এক নতুন মানুষ হয়ে গেছি। অনেক ভাল বোধ করছি এবং এভাবে যদি চলে, আমেরিকা পৌঁছাবার আগে আমি বেশ সবল হয়ে উঠব আশা করছি। তুমি কেমন আছ? কী করছ? তোমার সম্বন্ধে সবকিছু লিখো এই ঠিকানায়—মিঃ ই. টি. স্টার্ডি, ২৫, হলাণ্ড ভিলাস রোড, লণ্ডন, ডাবলিউ।

চিরন্তন প্রীতি ও আশীর্বাদ-সহ

সতত প্রভুসমীপে তোমার
বিবেকানন্দ

মিসেস জর্জ ডব্লু হেলকে লিখিত

রিজলি ম্যানর
৫ অক্টোবর ১৮৯৯

প্রিয় মাদার চার্চ[১],

আপনার সদয় উক্তিগুলির জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

বরাবরের মতো যে আপনি কাজ করে যাচ্ছেন তাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি এজন্য আনন্দিত যে, আশাবাদের তরঙ্গ আপনাকে এখনো গ্রাস করেনি। সবকিছুই ঠিকঠাক আছে—একথা বলাটা খুব শোভনীয়, কিন্তু তা অধোগামী পথ ধরে একপ্রকার অবাধনীতির দোষে দুষ্ট হয়ে ওঠে। আপনার মতো আমিও মনে করি যে, পৃথিবীটা কদর্য—কিন্তু তার মধ্যেও কিছু কিছু শুভ অন্বিত হয়ে আছে।

আমাদের সকল কাজের শুধু এইটুকু মূল্য যে, সেগুলি কাউকে কাউকে এই ভয়াবহ বাস্তব সম্পর্কে সচেতন করে এবং তারা তখন সেই সীমানার বাইরে কোন স্থানে আশ্রয়ের জন্য প্রস্থান করে—যাকে বলা হয়ে থাকে ঈশ্বর অথবা খ্রিস্ট অথবা ব্রহ্ম অথবা বুদ্ধ ইত্যাদি। নামের পার্থক্য থাকলেও বস্তু কিছু পৃথক নয়।

পুনরায় আমাদের সর্বদা মনে রাখতেই হবে যে, আমাদের শুধু কর্মেই অধিকার—ফলপ্রাপ্তিতে কখনো নয়। কেমন করেই বা হবে? অশুভ কিছু না করে কখনো শুভকাজ সম্পাদন করা যায় না। সহস্র সহস্র হতভাগ্য ক্ষুদ্র প্রাণীকে হত্যা না করে আমরা একবারও নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে পারি না। [এক দেশের] জাতীয় উন্নতি অপরাপর লক্ষ লক্ষ জাতির মৃত্যু ও হীনাবস্থা প্রাপ্তির নামান্তর মাত্র। তেমনি একের উন্নতি অনেকের দারিদ্র্যের নিমিত্তস্বরূপ। জগৎটা অশুভ এবং বরাবর তাই থাকবে। এটা হলো তার প্রকৃতি এবং এর পরিবর্তন করা যায় না—"তোমাদের মধ্যে কে চিন্তাধারা গ্রহণ করে..." ইত্যাদি।[২]

এই হলো সত্য। সুতরাং ত্যাগের মধ্যেই রয়েছে প্রজ্ঞা, অর্থাৎ প্রভুকে আমাদের যথাসর্বস্ব করে নেওয়া। মা! একজন খাঁটি খ্রিস্টান হোন, খ্রিস্টের মতো সবকিছু পরিত্যাগ করুন এবং হৃদয়, আত্মা ও দেহ তাঁর—শুধু তাঁরই হোক। খ্রিস্টের নামে লোকেরা এই যে নানা অর্থহীন জিনিস গড়ে তুলেছে, সেগুলি তাঁর উপদেশ নয়। তিনি ত্যাগ করতে শিখিয়েছিলেন। তিনি কখনো বলেননি যে, পৃথিবী একটি উপভোগ্য স্থান। আর আপনার এইসকল অহংবোধ থেকে, এমনকি সন্তান ও স্বামীর ভালবাসা থেকেও মুক্ত হওয়ার এবং প্রভুর—কেবল তাঁরই স্মরণ-মনন করার সময় উপস্থিত হয়েছে।

চিরকাল আপনার পুত্র
বিবেকানন্দ

---

* পত্রদুটি সম্প্রতি প্রকাশিত 'Complete Works'-এর ৯ম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১ মিস্টার ও মিসেস জর্জ ডব্লু হেলকে স্বামীজী 'ফাদার পোপ' এবং 'মাদার চার্চ' বলে সম্বোধন করতেন।—সম্পাদক

২ ম্যাথিউ ৬.২৭

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে ব্রহ্মচারী সনাতনের আগ্রহাতিশয্যে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। ব্রহ্মচারীজী যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় নবাগত ব্রহ্মচারীজীর ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যাতে পাঠকের বুঝতে সুবিধা হয়।—সম্পাদক

উপক্রমণিকা

● ব্রহ্মবিদ্যা ও তাহার প্রয়োগ ঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সাহিত্য-গ্রন্থ নহে। ইহা যদিও কাব্যের ভাষায় লিখিত, তথাপি ইহা সর্বতোভাবে একটি বিজ্ঞান-গ্রন্থ। বিজ্ঞান বা science যেমন শুধু পড়িবার বিষয় নহে, তাহা পরীক্ষাগারে ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ না করিলে কিছুই বুঝা যায় না—কেবল কতকগুলি সংবাদ মাত্র জানা হয়; ঠিক তেমনি 'ধর্ম', বিশেষত 'সনাতন ধর্ম' একটি বিজ্ঞান—সাধনা না করিলে তাহার কিছুই বুঝা যায় না। ল্যাবরেটরিতে নির্জনে গিয়া পরীক্ষা করিতে হয়, তাই বিজ্ঞান একটি রহস্যবিদ্যা। এই কারণেই গীতোক্ত বিদ্যাকেও সেইরূপ রহস্যবিদ্যা বা গুহ্যবিদ্যা বলা হইয়াছে।

সামগ্রিকভাবে দেখিলে, বিজ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত। একটি subjective (আত্মবাদী), আরেকটি objective (বস্তুবাদী)। অধ্যাত্মবিদ্যা subjective এবং অন্যান্য সকল বিদ্যাই objective। উপনিষদে অধ্যাত্মবিদ্যাকে 'পরাবিদ্যা'-রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা ঃ "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে... পরা চৈবাপরা চ।" (মুণ্ডক উপনিষদ্, ১।৪)

সেই পরাবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যা বিবৃত হইয়া বর্তমানে 'ধর্ম' বা 'Religion' নামে জগতে প্রচলিত হইয়াছে। বর্তমানে যাহাকে 'ধর্ম' বলা হয় তাহা একটি 'বৃত্তি' বা জীবিকানির্বাহের উপায়মাত্র। যাহারা 'ধর্ম' লইয়া থাকে, সমাজ তাহাদিগের ভরণপোষণ করিয়া থাকে। লোকে যথার্থ 'ধর্ম' সম্বন্ধে কিছুই বুঝে না। অথচ ধর্মলাভের একটি দুরাশা মনে পোষণ করিয়া থাকে। তাই তাহারা ধর্মজীবীদের সাহায্য পাইবার জন্য অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সর্বদাই দেখা যায়, কেহ কোন বিপদে পড়িলে ভগবানের নিকট ওকালতি করিবার জন্য পুরোহিত বা সাধু-সন্ন্যাসীকে 'ফী' (fees) দিয়া থাকে। অথবা ফী-র প্রলোভন দেখাইয়া পুরোহিতদিগের নিকট হইতে স্বার্থ আদায়ের চেষ্টা করে। সাধারণ মানুষের মধ্যে সদ্‌বুদ্ধির এতই অভাব যে, অধ্যাত্মজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি ফিরাইবার চেষ্টা বা ক্ষমতাও তাহাদের থাকে না। সেই কারণে মহাপুরুষগণ জনসাধারণের নিকট বিদ্যার প্রচার না করিয়া কিভাবে চলিলে মানুষের অধ্যাত্মশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পশুভাব দূরীভূত হয় তাহাই শিক্ষা দিয়া থাকেন।

দেখা যায় সর্বত্রই ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত শ্রেণী জনসাধারণকে কতকগুলি 'আচার' শিক্ষা দিয়া থাকেন। পঞ্জিকা খুলিলেই এইপ্রকার নানাবিধ আচার-এর নমুনা পাওয়া যাইবে। এই আচার যখন মানুষের দুর্বুদ্ধিতাহেতু অত্যন্ত কদর্য ও ক্ষতিকারক হইয়া পড়ে, আচার্যগণ ও মহাপুরুষগণ তখন ঐসব আচারের ঘোর বিরোধিতা করিয়া সুস্থ ও কল্যাণকর ধর্ম স্থাপনে আত্মনিয়োগ করেন। ভগবান বুদ্ধ যখন আসিয়াছিলেন, দেখিয়াছিলেন শাস্ত্রীয় আচারকে কদাচারে পরিণত করিয়া মানুষ ভারতের সর্বত্র সমাজকে নরকপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে। তখন বুদ্ধ সর্ববিধ 'আচার' ধ্বংস করা ব্যতীত অন্য উপায় না দেখিয়া এক দারুণ 'নির্বাণবাদ' প্রচার করিলেন। অধ্যাত্মজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশলাভের নিমিত্ত মানুষ নির্বাণলাভের উত্তেজনায় আত্মোন্নতির দিকে তীরবেগে কিছুকাল ছুটিয়া চলিল। উন্নতির পর অবনতি প্রাকৃতিক নিয়ম। তাই ইতিহাসে দেখা যায়, অত্যুচ্চ আদর্শের অবনতিতে গভীরতম অধঃপাত।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে পশ্চিম এশিয়ায় মানুষের এত অবনতি হইয়াছিল যে, ধর্মের নামে পিতা নিজ বালিকা কন্যাকে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচবোধ করিত না। সামান্য অজুহাতে একটি গোষ্ঠী অন্য একটি গোষ্ঠীকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া আনন্দবোধ করিত। অবশ্য সবই তাহারা ধর্মের দোহাই দিয়াই করিত। তাই হজরত মহম্মদ কঠোর অস্ত্রাঘাতে সর্বপ্রকার ধর্মকে নিহত করিয়া একমাত্র নিরাকার আল্লার ভজনা ও তৎসাধনের উপায় প্রচার করিলেন। কিন্তু হায়, কুকুরের লেজ সোজা হইবার নহে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অধ্যাত্মরহস্যের বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ভারতবর্ষে ঘরে ঘরে গীতা রক্ষিত হয়। ক্বচিৎ কোথাও

পঠিতও হইয়া থাকে! কিন্তু গীতোক্ত বাণীসকল ল্যাবরেটরিতে গিয়া পরীক্ষা করিয়া লইবে—এইপ্রকার পাঠক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শুনিয়াছিলাম একদা এক বৈষ্ণবের গৃহে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ 'বিশ্বম্ভর' নামে পূজিত হইতে হইতে ফুলচন্দনের চাপে পচিয়া গিয়াছিল। ধন্য মানবজাতি! ধন্য তাহাদের ধর্মসাধন!!

আমরা দেখি, বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে গেলে তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থাদি পূর্ব হইতে করা দরকার। যেমন, প্রথমে একটি বিদ্যালয়। পরে তাহা চালাইবার উপায়। তৃতীয়ত, উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহ। চতুর্থত, উপযুক্ত শিক্ষার্থী নির্বাচন। অধ্যাত্মবিদ্যার ক্ষেত্রেও তাহার শিক্ষা ও প্রচারের জন্য ঠিক পূর্বোক্ত প্রণালীতেই কার্য করিতে হইবে। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ তাই 'অধ্যাত্মবিজ্ঞান' প্রচারের জন্য প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। নিজ জীবনে তিনি যতদূর সম্ভব এই বিজ্ঞান হাতে-নাতে পরীক্ষা (experiment) করিয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অবশ্য উপরি উক্ত চারটি বস্তুর একত্র সমাবেশ না হইলে যে 'ব্রহ্মবিদ্যা-গবেষণাগার' যথাযথ প্রতিষ্ঠিত হইবে না বা কার্যকরী হইবে না, তাহা বলাই বাহুল্য।

যেকোন শিক্ষিত ব্যক্তি যেমন ইচ্ছা করিলেই বিজ্ঞানের মোটামুটি জ্ঞানলাভ করিতে পারে, কিন্তু তৎসম্বন্ধীয় 'গবেষণা' করিতে পারে না; তেমনি একজন শিক্ষিত মানুষ 'ধর্ম' সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করিতে পারে, কিন্তু যথোপযুক্ত সাধনা না হইলে কতকগুলি কথামাত্রই শেখা হইবে, তাহার বেশি কিছু হইবে না। আবার ইহাও সত্য, বিজ্ঞানের 'কথা'য় মানুষের কিছু উপকার হয় না। যখন ঐ বিজ্ঞান প্রযুক্ত হইয়া জীবনের নানাবিধ প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম হয়, তখনি তাহার কদর।

গীতায় কোন কথাকে গুহ্য, কোন কথা গুহ্যতর, কোনটিকে গুহ্যতম বলা হইয়াছে। অপরাবিজ্ঞানেও অনুরূপ ব্যাপারই ঘটিয়া থাকে। দেখা যায়, স্কুল-কলেজে পরীক্ষাগারে শিক্ষার্থীদের অনেক রহস্য শিখানো হয়। যখন কোন স্কুল বা কলেজে বার্ষিক শিক্ষাপ্রদর্শনী হয়, তখন সাধারণ মানুষ ভিড় করিয়া নানাবিধ experiment দেখিতে থাকে। ইহা রহস্যবিদ্যাই বটে। আবার বিশেষ কোন বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কোন বিদ্যার্থীকে 'গবেষণা-বৃত্তি' দিয়া প্রবীণ গবেষকের তত্ত্বাবধানে গবেষণায় প্রবৃত্ত করেন। উহা রহস্যতর বিদ্যা, গীতার ভাষায়—গুহ্যতর বিদ্যা। আইনস্টাইন, জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ তাঁহাদের গবেষণাগারে নিভৃতে তদীয় অসাধারণ প্রতিভার প্রেরণায় যখন অত্যদ্ভুত বৈজ্ঞানিক সত্যসকল আবিষ্কার করেন, তখন তাহাকে 'গুহ্যতম' বলিতে আপত্তি থাকে না। যখন কোন অসাধারণ প্রতিভাবান সাধক অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের সর্বপ্রকার স্তর ভেদ করিয়া পরম নির্বিশেষ সত্তাকে অনুভব করেন, তখন তাঁহার লব্ধ জ্ঞানকে গুহ্যতম বলা যায়। আর যখন অসামান্য প্রতিভাশালী সাধক সচ্চিদানন্দের সর্বব্যাপিত্ব অনুভব করেন, তখন তাহা গুহ্যতর। আবার কোন সাধক তীব্র বৈরাগ্য সহায়ে যখন সগুণ ব্রহ্মের অনুভব করিয়া দেহাত্মবুদ্ধি অতিক্রম করেন, তখন তাহাকে গুহ্যবিদ্যা বলা যাইতে পারে।

আমাদের এই 'আমি'কে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ হইতে বিযুক্ত করিয়া অভ্যন্তরের দিকে প্রেরণ করিলে তাহা ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর লোক ভেদ করিয়া এক অতি আশ্চর্য লোকে উপস্থিত হয়। ইহার বিষয়ে বলিয়া বুঝানো যায় না। আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহের মধ্যে ইহা সূক্ষ্মতম, উচ্চতম, অতুলনীয় এবং বৃহত্তম। ইহাকেই 'ব্রহ্মনির্বাণমুক্তি' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ কর্মযোগ

অর্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতাবুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব।।১।।

শ্লোকার্থ ঃ *হে জনার্দন, যদি আপনার মতে কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আমাকে এই হিংসাত্মক কর্মে (যুদ্ধে) কেন নিযুক্ত করিতেছেন?*

ব্যাখ্যা ঃ অর্জুন দেখিতেছেন যে, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির কোন কর্ম নাই। অথচ শ্রীভগবান তাঁহাকে কর্ম করিতে বলিতেছেন। এখনো অর্জুনের কর্মযোগ বা নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হয় নাই। তাই তিনি ভাবিতেছেন, শ্রীভগবান কেন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় নৈষ্কর্ম্য শিক্ষা না দিয়া কর্মযোগ শিক্ষা দিতেছেন।

সাধারণ মানুষের কর্মের প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকেই। দেখা যায়, অতি নিম্নস্তরে মানুষের বিবাহাদি সংসারধর্ম পালন করাতেই জীবন ক্ষয় হইয়া যায়। তাহার পরের ধাপের মানুষের তীব্র কর্মজীবন দৃষ্ট হয়। যখন কেহ প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চাধিকার লাভ করে তখন তাহার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটিতে থাকে। কেবল প্রবল বৈরাগ্যবান মানুষেরই কর্মত্যাগ হইয়া থাকে। অন্যথা সাধারণ জীবের নিষ্কাম কর্ম করিতে করিতে কর্মক্ষয় হইলে আত্মজ্ঞানোদয় হইয়া থাকে। [ক্রমশ] ।।এক।।

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

পুণ্যস্মৃতি

গণেশ বিশ্বাস

মুসলমানদের দাড়ি থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের মুখেও দাড়ি। আমি চিনতুম না। একদিন বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ "মুসলমানের ছবি আমাদের পঞ্জিকায় কেন?" তিনি উত্তর না দিয়েই অন্য কাজে অন্যত্র চলে গেলেন। তখন অধিকাংশ পঞ্জিকাতেই এই ছবিখানি দেওয়া থাকত। আমার বয়স তখন ছ-বছর। বাবাকে নিরুত্তর দেখে রাগ হলো। তখনি গ্রামের বৈঠকখানায় বা গৃহে যেখানে যত ছবি ছিল সবই অপহৃত হলো এবং ইছামতীর জলে ভাসিয়েও দেওয়া হলো সকলের অজ্ঞাতসারে। মনের কাছে স্বীকৃতি পেলাম—বীরত্বের কাজ করেছি। কিন্তু অন্তর্যামী হাসলেন। পরিণত বয়সে সেই কর্মের কথা যখন মনে পড়ত, তখন মন বিষাদে ভরে যেত।

আমার পিতা স্বর্গীয় যদুনাথ বিশ্বাস ছিলেন পাবনা জেলার অধিবাসী। উদার, ধীরস্থির, বিবেচক ও ধনাঢ্য ব্যক্তি। দশ-বারোটি পরগনার মালিক। বাড়ির বৈঠকখানায় বিভিন্ন মানুষের অনবরত জমাট ভিড়। সেখানে আসেন ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, হিন্দু-মুসলমান, কৃষক-শ্রমিক—সকলেই। লেগেই থাকে কলহ, জমিজমার বিরোধ, স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ। বিভিন্ন পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানপিপাসু নরনারীর ভিড় লেগে থাকত সেখানে।

একসময় খোঁজ পড়ল, কোথায় গেল পঞ্জিকার ছবিখানি? স্থানচ্যুত ছবিখানির জন্য পিতা-মাতার নিকট ধিক্কৃত, অপমানিত ও তিরস্কৃত হলাম প্রচণ্ডভাবে। সে-ব্যথা আজও দীপ্যমান।

আমাদের বাড়িতে বারো মাসে তেরো পার্বণের অভাব ছিল না। বিভিন্ন শ্রেণীর পুরুষ ও নারী আমাদের বাড়ির পুণ্য অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন মহানন্দে। আনন্দোৎসব শেষে কেউ বাড়ি ফিরে যেতেন, কেউবা বাড়িতেই থাকতেন, রাত্রিযাপন করতেন। এইসমস্ত আচার ও পুণ্য অনুষ্ঠানের মধ্যেও আমার দুরন্তপনার ঘাটতি হয়নি।

১৯৩০ সালে পিতামাতার হাত ধরে এলাম বেলুড় মঠে। তখন অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ। বেলুড় মঠ তখন এত আলোকিত, এত সাজানো-গোছানো ছিল না। চারিদিকে সবুজের মেলা, ধানখেত, সবজিবাগান, জঙ্গলে ঘেরা। সুতরাং কোন্ পথ দিয়ে মঠে এসেছিলাম তা বিস্মৃতির অন্তরালে। এখানে তখন বড় মন্দির হয়নি। পুরনো মন্দিরে গিয়ে নীরবে দেখলাম, পঞ্জিকার সেই অপহৃত মুসলমানের ছবিখানি এখানে পূজিত, পুষ্পমালায় শোভিত, মন্দির-গৃহ ধূপধূনার গন্ধে আমোদিত, আলোর স্নিগ্ধতায় পূর্ণ। সঙ্গীতের স্বরে ভেসে আসে—'খণ্ডন ভব-বন্ধন'। যদিও সংসারবন্ধন ৮৩ বছরেও কাটেনি, দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। মনে হয় ঈশ্বর-ভক্তি, ভালবাসা বহুদূরে।



বেলুড়ে পুরনো মঠ

আমার পিতামাতা মহাপুরুষ মহারাজ ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদের প্রণাম করলেন, আমাকেও বাধ্য করালেন। মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "ছেলেটি কার?" উত্তরে পিতা বলেছিলেন ঃ "মঠে এসেছি, ছেলেটি মঠেরই।" তখন মঠও বুঝিনি, মহাপুরুষ মহারাজকেও নয়। পরবর্তী কালে মঠে এসে দর্শন হলো পরম পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের। তাঁরা উভয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বিশিষ্ট পার্ষদ। মহারাজ গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছিলেন। সেটা মনে হয় ১৯৩৩ সাল। তখন আমি কাউকেই বড় সাধু বলে চিনতাম না, কারো নামও জানতাম না। মঠে এসে পিতামাতার নির্দেশে সকলকে প্রণাম করতাম—এই মাত্র। আমার পিতামাতা যখন স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজকে প্রণাম করলেন, সেইসঙ্গে আমিও করলাম। উঠে দাঁড়াতেই তাঁরা আমাদের দুষ্টুমি, পঞ্জিকা থেকে ছবি অপহরণ, লেখাপড়ায় অমনোযোগী হওয়া—কত অভিযোগই না তাঁকে জানালেন! তবুও দয়াময় মহারাজ আমায় দুহাত দিয়ে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আমায় আশীর্বাদ করলেন এবং "মন দিয়ে লেখাপড়া করবে, পিতামাতার কথা শুনবে, মঠে আসবে, ঠাকুরকে প্রণাম করবে, সাধু মহারাজদেরও করবে, গঙ্গার ধারে আসবে না।" ইত্যাদি কত কথা বললেন। আরেকবার তাঁর চরণদুখানি ছুঁয়ে পিতামাতার হাত ধরে বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু মঠের সাধুদের স্নেহ-ভালবাসা, আদরযত্ন, মমতা, অমায়িক মেলামেশার কথা স্মরণ করে বাড়ির বৈঠকখানায়

বসে পঞ্জিকার সেই মুসলমানের ছবিখানি শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলে বুকে জড়িয়ে ধরলাম—পিতামাতা ও সকলের অজান্তে। গভীর রাত্রে অকস্মাৎ ঘুমভাঙার সময় মনে হতো আমার পাশে একজন বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে বলছেন ঃ "ভয় নাই, আছি।" কিন্তু ঐ বৃদ্ধের সঙ্গে আমার আজও কোন কথা হয়নি।

কিছুদিন পর জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ আশ্রমে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য চিঠি এল। পিতামাতার হাত ধরে সেখানে ভর্তি হয়ে ১৯৩১ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলাম। তারপর রংপুরে কারমাইকেল কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা শেষ করি। এরই মধ্যে ১৯৪০ সালে বেলুড় মঠে পরম পূজনীয় স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কৃপালাভ করি স্বামীজীর জন্মোৎসবের দিন। পরবর্তী সময়ে আমার ছেলেমেয়েরা স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, স্বামী গম্ভীরানন্দজী এবং স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের কৃপা লাভ করে। আমার স্ত্রী স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের আশ্রিতা।

একদিন যাঁকে বিসর্জন দিয়েছিলাম—তিনি আমাদের দেবতা, অন্তরে উপবিষ্ট। আমরা সকলেই পবিত্র। তাঁর যে এত কৃপা তা আমার জানা ছিল না। তিনি নিজগুণে কৃপা করে আমাদের তাঁরই ভবনে আশ্রয় দিয়েছেন, সেজন্য আমরা কৃতার্থ, আমরা ধন্য। জয় শ্রীরামকৃষ্ণ। ❑

শব্দচেতনা ১৬

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত অবলম্বনে তৈরি বিশেষ শব্দছক

■	১	২		■	৩	৪		■
৫	■		■	৬	■		■	৭
৮		■	৯			■	১০	
	■	১১	■		■	১২	■	
■	১৩			■	১৪			■
১৫	■		■	১৬	■		■	১৭
১৮		■	১৯			■	২০	
	■	২১	■		■	২২	■	
■	২৩			■	২৪			■

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম পৌষ ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

পাশাপাশি ঃ (১) ঠাকুর নিজেকে এই গাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন, (৩) সত্ত্বগুণী মানুষ অন্যকে জানতে না দেওয়ার জন্য এর ভিতরে ধ্যান করে, (৮) ঠাকুর বলতেন ঃ "সন্ধ্যা গায়ত্রীতে —— হয়", (৯) ঠাকুর ঈশানকে বলছেন ঃ "আর দেখো, বেশি —— করো না", (১০) গিন্নির ন্যাতা-কাঁথার হাঁড়িতে এর বিচি থাকে, (১৩) ঠাকুর দেখেছেন, জগৎ এতে জরে রয়েছে, (১৪) ঠাকুর সবসময় এই দরজা দিয়ে যেতে বলেছেন, (১৮) অনেকে এটি ধরাতে লণ্ঠন-হাতে অন্যলোকের বাড়ি যায়, (১৯) সন্ন্যাসী কখনো এটি করবে না, (২০) শ্রীকৃষ্ণ যখন এখান থেকে অন্তর্ধান করলেন, তখন গোপীরা একেবারে উন্মাদিনী, (২৩) ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরের টান সব লোকের হয় না, যেমন সব গাছ —— হয় না, (২৪) এর বোল মুখে বলা সহজ, কিন্তু হাতে আনা কঠিন।

ওপর-নিচ ঃ (২) ভক্ত এটি খেতে চায়, হতে চায় না, (৪) ঠাকুর বলছেন, 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' —— পড়ে জেনে নিতে হয়, (৫) এ কোন গুণের বশ নয়, (৬) ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরের আদেশ ভিন্ন এই কাজটি করা যায় না, (৭) পূর্ণজ্ঞানীর অবস্থা এর মতো, (১১) মায়া-ঘর ছাড়লে অবিদ্যা নাশ হয়, যেমন এই কাঁচে সূর্যের আলো পড়লে কাগজ পুড়ে যায়, (১২) এটি চতুর্থ ভূমি, (১৫) চাতক এই জল ছাড়া পান করে না, (১৬) সন্ন্যাসী এটি স্পর্শ করবে না, (১৭) সাধু ও সংসারী—উভয়েরই এইটি ত্যাগ হওয়া দরকার, (২১) ইনি একমাত্র নিত্যরাধা দর্শন করেছিলেন, (২২) ঠাকুর বলছেন, নিজেকে অকর্তা জেনে সংসারে এইটি করতে হবে।

সূত্র ঃ শুক্লা পাঠক

যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন

ভারতবর্ষ তথা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি সর্বত্র মানুষের মধ্যে একটি দুর্বিষহ অস্থিরতা, নিরাপত্তাবোধের অভাব এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা চোখে পড়ছে। তাছাড়া আর্থনৈতিক ও ভোগবিলাসের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। নানান রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বাঙালি যুবগোষ্ঠী আজ দিশাহারা। বিবেকানন্দ-বর্তিকাই আজ তাদের ধ্রুবতারা, একথা ক্রমশ দিবালোকের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। অনেকের মনে নানান প্রশ্ন সময়ে সময়ে ওঠে, যার উত্তর তারা খুঁজে পায় না। প্রশ্নগুলি মূলত মূল্যবোধ এবং আদর্শভিত্তিক। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রবীণ সন্ন্যাসীদের কেউ কেউ ঐসব প্রশ্নের উত্তর দিতে অনুগ্রহ করে সম্মতি জানিয়েছেন। তাই 'যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন' শীর্ষক একটি বিভাগ খোলা হলো। আনন্দের বিষয়, এমাসে এই বিভাগে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।—সম্পাদক

ঃ নিয়মাবলী ঃ

'যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন' বিভাগে প্রেরিত (ক) প্রশ্নগুলি সুনির্দিষ্ট হওয়া চাই। (খ) প্রেরকের পুরো নাম, ঠিকানা ও বয়স উল্লেখ থাকা চাই। (গ) প্রেরকের বয়স অনূর্ধ্ব ৩০ হওয়া চাই। (ঘ) সব প্রশ্নই গ্রাহ্য হবে—এমন বলা যায় না। অনেক সময়ে এমন হতে পারে, একটি প্রশ্নের মধ্যে অন্যগুলির উত্তর সন্নিবেশিত হয়ে আছে। সেক্ষেত্রে প্রশ্নপ্রেরকের মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ নেই। কারণ, প্রশ্নের উত্তর পেলেই প্রশ্নকর্তা তৃপ্ত হবেন, আশা করি। তাঁর নাম প্রকাশিত হলো কি হলো না সে-ব্যাপারটি নিতান্তই গৌণ থাকুক, এই আবেদন জানিয়ে রাখি।—সম্পাদক

প্রশ্ন ঃ *ছাত্রজীবনে স্বামী বিবেকানন্দকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করব কেন?* ***—সেবাব্রত, সুমন, সন্দীপ, কাটোয়া***

উত্তর ঃ আদর্শ নাগরিকরূপে নিজের, সমাজের ও দেশের কাজের জন্য।

প্রশ্ন ঃ *এক এক সময় মনে হয় অনেক কিছু করব, অনেক পড়ব, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হব। কিন্তু যখন তা বাস্তবায়িত করতে চাই তখন যেন দিশা হারিয়ে ফেলি—মন অস্থির ও চঞ্চল হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে কী করণীয়?*

—অভিষেক দে, কাটোয়া

উত্তর ঃ প্রত্যেকের মেধা, শক্তি ও সামর্থ্য একরকম হয় না—ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন রকম। তাই ইচ্ছা থাকলেও বাস্তবায়িত না হওয়ার জন্য মন অস্থির ও চঞ্চল হয়। তোমার মেধা, শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী তোমার ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। তাতে তুমি যা পাবে, তাই নিয়ে নিজেকে সন্তুষ্ট রাখাই বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন ঃ *ঠাকুরের নাম জপ ও ধ্যান করতে গেলে বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের কথা এবং মুখ মনে পড়ে। মনকে কিভাবে ইষ্টচিন্তায় নিয়োগ করব?* ***—তন্ময় গুপ্ত, কাটোয়া***

উত্তর ঃ এরকম হওয়া খুবই স্বাভাবিক। মানুষের পূর্বজন্মের বহু সংস্কার থাকে এবং এই জন্মেরও অনেক সংস্কার জমে যায়। মানুষ যখন উচ্চ চিন্তা বা আধ্যাত্মিক জীবনে এগোতে যায়, তখন এসব সংস্কার প্রবল বাধার সৃষ্টি করে। দৃঢ় নিষ্ঠা, ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে গুরুপ্রদত্ত ইষ্টমন্ত্র নিত্য নিয়মিত জপ, ধ্যান ও প্রার্থনা করলে মানুষের শুভ সংস্কার হয় এবং মন ইষ্টপাদপদ্মে মগ্ন হয়। তবে এজন্য মানুষের অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য চাই—লেগে থাকতে হবে।

প্রশ্ন ঃ *স্বামী বিবেকানন্দ সংস্কারমুক্ত সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন। এইরকম সমাজ সনাতন ধর্মের প্রচারের মধ্য দিয়েই গড়তে হবে—স্বামীজীর কি এই অভিপ্রেত ছিল?* ***—তমোরীনা চ্যাটার্জী, গঙ্গাটুকুরী, বর্ধমান***

উত্তর ঃ হ্যাঁ। স্বামী বিবেকানন্দের সংস্কারমুক্ত সমাজের অর্থ—যে-সমাজে মানুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকবে না, সকল মানুষ সমান মর্যাদা পাবে। ধর্মের মধ্যে যে দৈবী গুণাবলী আছে, সেগুলির বিকাশ হলে এটা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ঃ *স্বামীজী বলেছেন ঃ "বনের বেদান্তকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে।" বেদান্তধর্ম সংক্ষেপে কী? এই বেদান্তপ্রচারে যুবসম্প্রদায়ের ভূমিকা কী?*

উত্তর ঃ বেদান্তধর্মের মূলকথা—একত্ব বা অখণ্ড ভাব। দুই কোথাও নেই, দুপ্রকার জীবন নেই অথবা দুটি জগৎও নেই। একটিমাত্র জীবন আছে, জগৎ আছে, অস্তিত্ব আছে। সবই সেই এক সত্তা। একই ব্রহ্ম সকলের মধ্যে রয়েছেন। শুধু বিকাশের তারতম্য।

এই বেদান্তধর্মের বাস্তব প্রয়োগ করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। "শিবজ্ঞানে জীবসেবা" মহামন্ত্রের দ্বারা বেদান্তধর্মকে তিনি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন। যুবসম্প্রদায়কে এই মহামন্ত্রে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে হবে। তারাই "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"র মাধ্যমে বেদান্তধর্মকে চারদিকে ছড়িয়ে দেবে।

প্রশ্ন : *বর্তমানে বিশ্বায়ন (Globalisation) ইত্যাদি নিয়ে যে-আলোচনা শুরু হয়েছে, তাতে মানুষ হওয়ার শিক্ষা যতটা আছে তার চেয়ে অমানুষ হওয়ার সুযোগ বেশি। দেশের বহু নাগরিক এই অমানুষ হওয়ার প্রলোভনে সাড়াও দিচ্ছে বলে মনে হয়। স্বামীজীর আদর্শে বিশ্বাসী যুবসম্প্রদায়ের এক্ষেত্রে কী করণীয়?*

—দেবরূপ শুই, কাটোয়া

উত্তর : যুবসম্প্রদায়ের কর্তব্য স্বামীজীর আদর্শে জনসাধারণের মধ্যে কাজ করা, যাতে তারা সঠিক পথে জীবনযাপন করতে পারে। একক ভাবে বা কোন সংস্থার মাধ্যমেও তারা একাজ করতে পারে।

প্রশ্ন : *আমার মতো অনেকেই আছে যারা সংসারে ও সমাজে সকলের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। কিন্তু কেন পারে না, তার উত্তরও জানা নেই। এই সমস্যার সমাধানে 'ধর্ম'-এর ভূমিকা কী?*

—চুমকী লুই, কাটোয়া

উত্তর : ধর্ম হচ্ছে মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব বা দেবত্ব সহজাত, তারই প্রকাশ। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে দেবত্বের প্রকাশ হলে, শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, সেই মানুষের 'মান-হুঁশ' হয়েছে। তখন তার মন উদার হয়ে যায়, সকলকে আপন বোধ করে। ফলে সে সমাজের প্রত্যেকের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। কিন্তু প্রথমত সংসারে বা সমাজে নিজেকে মানিয়ে নিতে গেলে কিছুটা স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে এবং সহ্যশক্তি বাড়াতে হবে। ঠাকুর বলতেন : "যে সয়, সে রয়; যে না সয়, সে নাশ হয়।"

প্রশ্ন : *স্বামী অপূর্বানন্দের 'দেবলোকে' বইটিতে আমরা পাই, স্বামীজী মহাপুরুষ মহারাজকে স্বপ্নে বলেছেন : "তারকদা, আমিই তো বুদ্ধরূপে এসেছিলাম আর তুমি এসেছিলে আনন্দরূপে। সেসব কথা তোমার মনে পড়ছে?" আবার মহাপুরুষ মহারাজও একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেন, ২৫০০ বছর আগে বুদ্ধের সঙ্গে তিনি এসেছিলেন। তাই এখানে স্পষ্ট যে, বুদ্ধ স্বামীজীর (সপ্তর্ষিমণ্ডলের প্রধান ঋষি) অবতার। কিন্তু পুরাণে বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলা হয়েছে। জয়দেব-কৃত দশাবতার স্তোত্রেও আমরা এর সাক্ষ্য পাই। এখানে আমরা কোন্‌টাকে সত্য বলে ধরব এবং কেন?*

—প্রিয়ঙ্কু চক্রবর্তী, মোহনপুর, উত্তর ত্রিপুরা

উত্তর : তোমার প্রশ্নে ভুল আছে। তোমার বলা উচিত ছিল—স্বামীজী বুদ্ধরূপে এসেছিলেন অর্থাৎ স্বামীজী বুদ্ধের অবতার। এক্ষেত্রে বুদ্ধের বিষ্ণুর অবতার হওয়ায় তো কোন গোলমাল নেই। বুদ্ধদেব তো বিষ্ণুরই অবতার। স্বপ্ন স্বপ্নই। মহাপুরুষ মহারাজ তো দর্শন করেননি। স্বপ্ন ও দর্শন এক নয়। এমন হতেই পারে, স্বামীজী পূর্ব পূর্ব যুগাবতারগণের কাজে সাহায্য করার জন্য একাধিকবার এসেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণাবতারে স্বামীজীর ভূমিকা কী, তাঁর বাণী কী ইত্যাদি নিয়েই চিন্তা, বিচার যদি করতে পার তাহলেই নিজের ও দেশের কল্যাণ হবে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যেসব ছাত্র প্রথম দশটি স্থান অধিকার করেছে, উপহারস্বরূপ তাদের এক বছরের জন্য 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি করা হবে বলে আগেও জানানো হয়েছিল, এখন আবার জানানো হচ্ছে। মার্কসিট এবং সংবাদপত্রের রিপোর্টের কপি-সহ সেইসব ছাত্র বা তাদের অভিভাবককে উদ্বোধন অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এই উপহার ডোমজুড়-নিবাসী শ্রীঅমর পাড়ুই-প্রদত্ত।—**সম্পাদক**



কার্ত্তিক ১৩০৯
অক্টোবর ১৯০২

একখানি পত্র

ভাই, এই সেই বৃন্দাবন—যেখানে গোলোক-বিহারী হরি ত্রিভঙ্গ মুরলীধারী হইয়াছিলেন।

এই সেই যমুনাপুলিন—যেখানে কৃষ্ণবিরহিণী রাই উন্মাদিনী হইয়াছিলেন। এই সেই বংশীবট—যেখানে ঠাকুর বাঁশী বাজাইয়াছিলেন—যে-বাঁশীর রবে যমুনার জল উজান বইত, রাধা পাগলিনী হইত, গোপীগণ ধেয়ে যাইত, রাই কুটিলার যন্ত্রণা সইত, আয়ান ঘোষ লুকাইয়া রইত—রাইকে পরীক্ষা করিতে।...

এই সেই নিধুবন—যেখানে গোপীগণসহ ঠাকুর খেলা করিয়াছিলেন, যেখানে রাধার পুষ্পশয্যা তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে—যেখানে এখনও যাত্রিগণ দুই চারি খানা ইঁট দিয়া খেলার ঘর তৈয়ার করে।

এই সেই মদনমোহন—যাঁহার রূপে মদন মোহন।

গোবিন্দের বিষয় কি বলিব, যাঁহার দর্শনে এ পাষাণও দ্রব হইয়াছিল, চক্ষে বারিধারা বহিয়াছিল।

গোপীনাথের মাহাত্ম্য গোপীগণ জানেন, এ অধম হইতে তাহা কিরূপে বর্ণন হইবে?

বৃন্দাবন দর্শন করিলাম, এক আধ কথা লিখিতে হয়, তাই লিখিলাম। নতুবা বৈষ্ণব-বেদ ভাগবত যে স্থানের বর্ণন করতে গিয়া, চকিত, ত্রস্ত, ভীত ও বিমোহিত হইয়াছেন, এ তুচ্ছাতিতুচ্ছ অধম কিরূপে তাহার সম্বন্ধে একটী কথা বলিতে সমর্থ হইতে পারে?

ঠাকুর বৃন্দাবনলীলা সমাপন করিয়া মথুরায় চলিলেন—যেখানে জন্মস্থান কংসকারাগার গৃহটী, যাই যাই করিয়া নামমাত্র রহিয়া গিয়াছে, যেখান হইতে ঠাকুরকে লইয়া বসুদেব পলাইয়াছিলেন, এক্ষণে আমাদের ভাগ্যে বা কারাগারই পলায়। কংসবেদীও তথৈবচ—সহরের এক প্রান্তরে ধূ ধূ করিতেছে। তবে যাত্রিপীড়ন-পরিপূরিত হিসাবের খাতাটা সেখানেও পাণ্ডাদের হাতে আছে। আর আছেন, পাতিত কংসোপরি সগদোত্তোলিতহস্ত মৃন্নির্মিত কৃষ্ণ বলরাম।

অশুষ্কা অভগ্না মাথুরীয়া যমুনা অতীব সুন্দরী, মনোলোভা, নয়নরঞ্জনী, সুরঙ্গ-তরঙ্গ-ভঙ্গাঙ্গা।

কুব্জানাথের অপরূপ রূপে বুঝি মদনমোহনও মোহিত হন। সমস্তই দর্শন হইল, কেবল মথুরানাথের নহে। জানি না, কি দূরদৃষ্ট ছিল! যতবার যাই, ততবারই কপাট বন্ধ। ভাবিলাম, যেই কুব্জানাথ, যেই গোবিন্দ, যেই মদনমোহন, সেই ত মথুরানাথ। একের দর্শনেই সর্ব্বদর্শন সিদ্ধি।

বৃন্দাবনে ১৫ দিন পূর্ব্বেই দোল আরম্ভ হয়। একাদশীর দিন গোবিন্দের দোল দর্শন করিলাম। বড় রাস্তায় নিবিড় আবিরে রক্তবর্ণের কুজ্ঝাটিকা, মধ্যে মধ্যে অভ্রচূর্ণ দ্বারা শ্বেতায়মান হইতে লাগিল। রাস্তায় অজস্র লোক; কিন্তু কাহারও কাহাকেও দেখিবার যোটী নাই। সর্ব্বময় আবিরে অন্ধকার। হইবেই না কেন? যে বৃন্দাবন লীলার দোল উৎসবে আজ সমগ্র ভারত আনন্দিত, সেই বৃন্দাবনে কেনই বা ঈদৃশ আনন্দ না হইবে?

পূর্ণানন্দ লইয়া গত রবিবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় ৺কাশীধামে প্রবেশ করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে আপনার পত্র পাইয়া অন্য ভাব আসিল। আপনাকে মনে হইল, পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল; চিঠিখানা দেখিয়া বুঝিলাম, আপনার ন্যায় লোকের যোগ্যই ইহা লিখিত হইয়াছে। সংসার-সুখকে এরূপ অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে করিতে না পারিলে আর ঐশ্বরীয় সুখের আশা আছে?

যেকথা লিখিয়াছেন—"একজন ভগবানের নিত্য বিলাসভূমিতে, আর একজন পিশাচের ক্রীড়াস্থলে। একজন কাশীতে, আর একজন সেখের নগরেতে। তফাৎ অল্পই।..." সকলই ঠিক বটে; কিন্তু স্বর্গে ইন্দ্রের বড় ভয়—কখন তাঁহার রাজত্ব যায়—কখন তাঁহাকে দৈত্যগণ আক্রমণ করে—কখন তাঁহাকে "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি" হইতে হয়। মর্ত্ত্যবাসী জনগণের আশা আছে—একদিন দুঃখের শান্তি হইবে। একদিন চন্দ্রত্ব, ইন্দ্রত্ব, এমনকি মোক্ষপদও লাভ হইতে পারে; কিন্তু ইন্দ্রের সে আশা অতি অল্প। তিনি ভোগেই মত্ত। এখন আমি ৺কাশীধামে আছি। পরম সুখভোগ করিতেছি। কিন্তু ভয়, দৈত্য (রিপু)গণের—ভয় মর্ত্ত্যপতনের (কুদেশ গমনের)—ভয় পুণ্য ক্ষীণতার।

যিনি প্রহ্লাদের কান্না ঘুচাইয়াছিলেন—কোলে করিয়া, ধ্রুবের কান্না ঘুচাইয়াছিলেন—বরদান করিয়া, দ্রৌপদীর কান্না ঘুচাইয়াছিলেন—বস্ত্রদান করিয়া, অর্জ্জুনের কান্না ঘুচাইয়া-ছিলেন—সারথী হইয়া। **তিনি কলির কাঙ্গাল আপনার আমার কান্না যে শীঘ্রই ঘুচাইবেন, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? যদি কাঁদার মত কাঁদিতে পারি।** আমি অনেক কাঁদা কাঁদিয়াছিলাম, তাই এখন পরম সুখ লাভ করিতেছি। তাই বলি ভাই, কান্না কখনও বিফল নহে। **এস ভাই, সকলে মিলিয়া কাঁদি, যাহাতে আর জন্মজন্মান্তর কাঁদিতে হইবে না।**

আপনার সেই ভালবাসার মোক্ষদা

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘুম

অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

আমাকে দিয়েছ পথ
শ্রাবণের মেঘমাঝে বিচ্ছুরিত আলোকের
স্বপ্ননীল স্বর্ণোজ্জ্বল রথ।

আমাকে দিয়েছ মাটি
ঘাসে ঘাসে শিশিরের গন্ধে ফোটা
সবুজ ছায়ার জায়গাটি।

আমাকে দিয়েছ দিন
অন্নব্যঞ্জনের মাঠভর্তি শীতরাত্রি
রসসিক্ত বসন্তের বীণ।

আমাকে দিয়েছ গান
পাখির ডানায় সাঙ্গ দিনান্তের
এইবার যাত্রা অবসান।

আমাকে দিয়েছ আঁখিজল
এই দীর্ঘ জীবনের অপূর্ণ তৃষার শেষে
ঘুমোবার শান্ত বনতল।

বৈরাগ্য-প্রজ্ঞা

দীপালি রায়

যেতে যেতে ফিরে তাকালে না
দুচোখে আতুর দৃষ্টি আমি চেয়ে থাকি
প্রভু, ফিরে না তাকালে
জমাট অশ্রুর শিলা বিন্দু বিন্দু বুকের আঁচলে।

জোনাকি-প্রান্তরে বসে সন্ধ্যা জ্বালে দীপ
আমার তুলসীমঞ্চ শুধু নিষ্প্রদীপ
পূজা আয়োজন
নিরর্থক মনে হয়, নিরর্থক বিফল বেদন
কি হবে প্রদীপ জ্বেলে
এ-জীবনে তোমাকে না পেলে
শূন্য দিন শূন্য রাত; উৎকণ্ঠ উৎসুক
নিরুচ্চার বালুতটে খুঁজি ঐ মুখ
দীর্ঘদেহী সারি সারি বৃক্ষ দেওদারে
চূর্ণি অহঙ্কারে,
যে আমাকে হাত ধরে নিয়ে যায়
প্রাণপাতে—পরিপ্রশ্নে—বৈরাগ্য-প্রজ্ঞায়।

ইচ্ছাময়ী

মুক্তি সেন

ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা বলেই ভোরের সূর্য ওঠে
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাতে যে তিনটি ভুবন ছোটে।
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছারূপেই চাঁদের হাসি ফোটে
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা হলেই জীবের মুক্তি ঘটে।
ইচ্ছাময়ী মুখ ফেরালে সকল অন্ধকার
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা বিনে কে করে উদ্ধার।
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাতে সব জীবের ওঠাবসা
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা সকল জীবকে ভালবাসা।
ইচ্ছাময়ীর স্মরণ-মনন তাই তো জীবের সার
সেই মা-নামেরই পাল তুলে হও ভবনদী পার।

জীবন

তুলসীদাস ব্যানার্জি

(মন কি শরীরের অন্তর্গত? না, শরীরটা মনের? নাকি শরীর আর মন দুটোই পারিপার্শ্বিক অবস্থার অন্তর্গত? শরীর, মন আর পারিপার্শ্বিক অবস্থা—জীবনে এই তিনটির কোন একটিকেও বাদ দেওয়া যায় না। এই তিনটি মৌলিক মিলেই হয়েছে একটি যৌগিক জীবন—যা পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে।)

কখন শরীর, আর কখন সে মন,
কখন নিয়ম-নিষ্ঠা, কখন ধারণ।
কখন সে তপ-যজ্ঞ, কখন পূজন,
কখন সে হরিবোলে নামসঙ্কীর্তন।
কখন সে ক্লেশ-তাপ সকল সহন,
কখন সে রিপুত্যাগী সহাস্য বদন।
কখন সে কালী বলে করালবদন,
কখন সে কৃষ্ণ বলে সহাস্যবদন।
কখন সে ভক্তলয়ে তপন-জপন,
কখন সে শব লয়ে প্রেম-আলাপন।
কখন সে আদেশ দেয় শাস্ত্রের কথন,
কখন সে ভিক্ষা চায়, মধু-দরশন।
কখন সে বালবেশ বিনা পরিধান,
কখন সে লজ্জাশীল ভূষণে বসান।
কখন সে কান্দে আর কখন সে হাসে,
উন্মাদ বলিয়া তারে সবে পরিহাসে।
বোধ হয় উন্মাদ সেই স্বয়ং বিধাতা,
তাই লয়ে রামকৃষ্ণ হইল কথকতা।

অব্যয়

শুভ্রকান্তি দে

জীবনটাকে খণ্ড খণ্ড করে
ছড়িয়ে পড়লে আকাশে-বাতাসে
পৃথিবীর প্রান্তরে প্রান্তরে।
সূর্যের আলোর সঙ্গে মিশে
ঝরে পড়লে আলোর কণা হয়ে
মুছে গেল সব অন্ধকার।
বাতাসের সঙ্গে মিশে
কখনো হলে কালভৈরব
কখনো-বা শান্তির দখিনা বাতাস।
জলের সঙ্গে মিশে
পাহাড় ভেঙে ছুটে চললে
প্রাণ হয়ে বয়ে গেলে দিকে দিকে।
ছড়িয়ে দিলে নিজেকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণায়
মিশে গেলে যত অণু-পরমাণু
প্রাণে-অপ্রাণে।
গাছের সবুজ হয়ে ভরে উঠলে
আকাশের নীল হয়ে ছড়িয়ে পড়লে
হয়ে উঠলে প্রভাতের নতুন কিরণ
কখনো-বা রাতের স্নিগ্ধ আঁধার।
শুধু, নিজেকে ছড়িয়ে রাখলে
যুগ থেকে যুগান্তরে—
মানবতার অমর বাণী নিয়ে।
যুগের ওপার থেকে যুগাবতার,
তোমার কম্বুকণ্ঠ ভেসে এল—
"আমি ছিলাম—আমি আছি—আমি থাকব।"

ধর্ম মানে

মন্দিরা মহাপাত্র

ধর্ম মানে আলোর দিশা
সকল আঁধার টুটি,
ধর্ম মানে হিংসা, দ্বেষ
সব ভীরুতার ছুটি।

ধর্ম মানে ধরে রাখা
ধর্ম মানে শান্তি,
ধর্ম কভু দেয় না ক্রোধ,
নয়কো বিভ্রান্তি।

ধর্ম কোথায়? মানেটা তার
মনের কোণেই খোঁজ,
দেখবে নিত্য নূতন প্রভাত
নিজেই নিজে রোজ।

ধর্ম মানে তপ্ত রোদে
বিশাল তরুচ্ছায়া,
শরীর জুড়ে ভক্তি, প্রেম
প্রীতি এবং দয়া।

ধর্ম মানে সমৃদ্ধি
নয় সে জরাজীর্ণ,
ধর্ম মানে উদারতা,
নয়কো তা সঙ্কীর্ণ।

ধর্ম নিয়ে তর্ক-লড়াই
বৃথাই ছায়াযুদ্ধ,
পথ দেখালেন—যিশু, হজরত,
কবীর, নানক, বুদ্ধ।

মানুষ-মানুষকে ভালবেসে
যাও এগিয়ে কাছে,
দেখবে ধর্ম নিঃশব্দে
পাশেই সদা আছে।

ধর্ম শেখায় সকল ধর্ম
আপন করে নিতে,
ধর্ম সে তো জ্ঞানসমুদ্র
নাও না তারে জিতে।

কে তুমি

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

কে তুমি! তোমাকে স্পর্শ করতে পারিনি
কিন্তু অনুভব করি
দেখ, মন যখন ক্লান্ত নিজের চলার শক্তি নেই,
তখনি যেন তোমায় অনুভব করি প্রতিক্ষণে।
অন্তরের পরশ কি তা বুঝেছি রোগশয্যায়
বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে
কিভাবে মানুষ দাঁড়াতে পারে, তাই বুঝেছি।
সেই বিশ্বাস আঁকড়ে পড়ে আছি,
তবে এটা ঠিক এবং অক্ষরে অক্ষরে সত্য
সেই অনন্ত শক্তি আমাদের বেষ্টন করে আছে।

আকিঞ্চন

গৌরগোপাল পাল

নিরালায় বসে কত না গোপনে,
খুঁজেছি তোমারে কত সযতনে;
দেখি যে তখনি মোর চারপাশে,
নানা মুখ হেথা ভিড় করে আসে;
তুমি শুধু যাও হারিয়ে!!

তোমাতে আমাতে জানি না কি টান,
তবু এই প্রাণ করে আনচান;
তোমার বিরহে প্রাণে বাজে ব্যথা,
কোথা হতে আসে এই ব্যাকুলতা;
আর না সহিতে পারি এ!!

আছ কি স্বপনে নাকি জাগরণে,
দেখা দাও এসে দীন অভাজনে;
তব দরশন নাহি পেলে আর,
এ-জীবন রাখা হয়ে ওঠে ভার;
তাও কি দেখিবে দাঁড়িয়ে।।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলীতে গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ

দীপককুমার দাশ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ'-এ লিখেছেন ঃ "আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচারের প্রথম পর্যায়ে ক্ষেত্রবিশেষে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যরূপে আত্মপরিচয় দিয়েছেন এবং তাঁর বেদান্ত যে শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধ বেদান্ত—তাও জানিয়েছেন, কিন্তু তিনি রামকৃষ্ণ-চরিত্রকে প্রচারবস্তু করেননি। স্বামীজী রামকৃষ্ণ-প্রচার অপেক্ষা রামকৃষ্ণের বাণী-প্রচারকেই মুখ্য দায়িত্ব বলে গ্রহণ করেছিলেন। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বোচ্চ মানব এই জন্য যে, রামকৃষ্ণ ব্যক্তিজীবনে তাঁর বাণীর সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত ছিলেন। সুতরাং স্বামীজী রামকৃষ্ণ-দর্শিত বেদান্তসত্যের মহিমাকে প্রথমে উত্থাপন করেছেন—তিনি জানতেন সে-মহিমা স্বীকৃত হলেই তবে ঐ বেদান্তবিগ্রহকে মানুষ গ্রহণ করবে।" (২য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১১৮)

বস্তুত, ভারতের বেদান্ত এবং বেদান্তের মূর্তবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ—এই দুইটি বিষয়কে বিশ্বজনের গোচর করাই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জীবনসাধনা। স্পষ্টত সেজন্যই বিবেকানন্দ-মননে গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদাই একটি প্রবর্তনা, একটি প্রেরণার মতো বহমানা শক্তি হিসাবে নিহিত থেকেছেন।

২৮ মে ১৮৯৬ ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল স্বামীজীর। সেপ্রসঙ্গে তিনি 'ব্রহ্মবাদিন্'-এর ৪ জুলাই ১৮৯৬ সংখ্যায় লিখেছিলেন ঃ "কে ভেবেছিল যে, সুদূর পল্লীগ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানের জীবন ও বাণী কয়েক বছরের মধ্যে এমন বহু দূরদেশে পৌঁছাবে, যে-দেশের কথা আমাদের পূর্বপুরুষেরা স্বপ্নেও ভাবেননি। ভগবান রামকৃষ্ণের কথাই আমি বলছি।... কয়েকদিন আগে তাঁর [ম্যাক্সমুলার] সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। প্রকৃতপক্ষে বলা উচিত, তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধানিবেদন করতে গিয়েছিলাম। কারণ, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালবাসেন, তিনি নারী বা পুরুষ যেই হোন, তাঁর জাতি, ধর্ম, বর্ণ যাই হোক—তাঁকে দর্শন করতে যাওয়া আমার কাছে তীর্থযাত্রা।" (ঐ, পৃঃ ১৩৩) স্বামীজীর মূল বক্তব্য যদিও ম্যাক্সমুলার প্রসঙ্গে, কিন্তু এর কেন্দ্রস্থলে রয়েছে গুরুদেবের প্রতি তাঁর গভীরতম অনুরাগ। নিজে শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য—শুধু এই পরিচয়খানিই কী অসীম মনোযোগ দাবি করতে পারে অন্যের কাছ থেকে, সেকথাও অকপটে স্বীকার করেছেন স্বামীজী ঃ "তাঁকে বললাম, 'অধ্যাপকজী, আজকাল সহস্র সহস্র লোকে শ্রীরামকৃষ্ণকে পূজা করছে।' 'তাঁকে যদি পূজা না করবে তো কাকে করবে?'—অধ্যাপক উত্তরে বললেন। অধ্যাপক সহৃদয়তার প্রতিমূর্তি।... রেলস্টেশন পর্যন্ত আমাদের পৌঁছে দিতে এলেন। এত কেন করছেন? বললেন, 'প্রতিদিন কেউ রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্যের সাক্ষাৎ পায় না।' " (ঐ, পৃঃ ১৩৩-১৩৪)

বেদান্ত প্রসঙ্গ, সেই সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং এক্ষেত্রে ম্যাক্সমুলারের অনন্যতা প্রসঙ্গে স্বামীজী লিখেছেন ঃ "ম্যাক্সমুলার ঘোর বৈদান্তিক। বেদান্তের নানা সুরের প্রাণসুরটিকে তিনি ধরতে পেরেছেন। বাস্তবিক পক্ষে বেদান্ত সেই একমাত্র আলোক, যা পৃথিবীর সকল সম্প্রদায় ও মতকে আলোকিত করছে, তা সেই এক তত্ত্ব—পৃথিবীর সকল ধর্ম যার কর্মপরিণত রূপ মাত্র। আর রামকৃষ্ণ পরমহংস কি ছিলেন? তিনি ঐ প্রাচীন তত্ত্বেরই প্রত্যক্ষ উদাহরণ, অতীত ভারতের প্রতিমূর্তি, ভাবী ভারতের পূর্বাভাস, পৃথিবীর জাতিসমূহের নিকট অধ্যাত্ম আলোকের দূত। কথায় আছে জহুরীই জহর চেনে। তাই বলি, এতে বিস্ময়ের কি আছে যে, ভারতীয় চিন্তাগগনে কোন নূতন নক্ষত্র উদিত হওয়া মাত্র ভারতবাসিগণ তার মহত্ত্ব বুঝবার আগেই এই প্রতীচ্য ঋষি [ম্যাক্সমুলার] তার প্রতি আকৃষ্ট হন ও তার সাদর অনুশীলন করেন।" (ঐ, পৃঃ ১৩৪)

অক্ষয়কুমার সেন জনসাধারণের কাছে সরলভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন উপস্থিত করার বাসনায় বাঙলা পয়ার ছন্দে লিখেছিলেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'। সেজন্য স্বামীজী খুশি হয়েছিলেন। ১৮৯৫ সালে এক চিঠিতে শশী মহারাজকে তিনি নির্দেশ দিয়ে যা লিখেছেন, তার মধ্যেও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ব্যক্ত হয়েছে ঃ "শাঁকচুন্নিকে [লেখককে স্বামীজী এই নামে ডাকতেন] এই কটা কথা লিখতে বলো তার তৃতীয় খণ্ডে, প্রচারখণ্ডে—'বেদবেদান্ত, আর আর সব অবতার যাকিছু করে গেছেন, তিনি একলা নিজের জীবনে তা করে দেখিয়ে গেছেন। তাঁর জীবন না বুঝলে বেদ-বেদান্ত, অবতার প্রভৃতি বোঝা যায় না—কেননা He was the explanation. তিনি যেদিন থেকে জন্মেছেন, সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ ভেদ, ধনী-নির্ধনের ভেদ, পণ্ডিত-বিদ্বান ভেদ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ভেদ—সব তিনি দূর করে দিয়ে গেলেন।

আর তিনি বিবাদভঞ্জন—হিন্দু-মুসলমান ভেদ, ক্রিশ্চান-হিন্দু ভেদ ইত্যাদি সব চলে গেল। ঐ যে ভেদাভেদে লড়াই ছিল, তা অন্য যুগের। এ সত্যযুগ তাঁর প্রেমের বন্যায় সব একাকার।'

"এই ভাবগুলো তার ভাষায় বিস্তার করে লিখতে বলবে। যে তাঁর পূজা করবে, সে অতি নীচ হলেও মুহূর্তমধ্যে অতি মহান হবে—মেয়ে বা পুরুষ। আর এবারে মাতৃভাব... সকল মেয়েকে মার ছায়া বলে দেখতে হবে। ভারতের দুই মহাপাপ—মেয়েদের পায়ে দলানো আর 'জাতি জাতি' করে গরিবগুলোকে পিষে ফেলা। He was the Saviour of women, Saviour of the masses, Saviour of all high and low.... ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, মেয়ে বা পুরুষ—তাঁর পূজায় সকলের অধিকার। যে ঘটস্থাপনা বা প্রতিমা করে তাঁর পূজা করবে—মন্ত্র হোক বা না হোক—যেমন করে, যে ভাষায়, যার হাত দিয়ে হোক, খালি ভক্তি করে যে পূজা করবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। এই ঢৌলে লিখতে হবে।" (পত্রাবলী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৪২১)

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী লেখার ক্ষেত্রে যে নিষ্ঠা ও সংযমের প্রয়োজন এবং যেরকম উদ্দীপনা সঞ্চারকারী নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য অন্বিত করা আবশ্যক—সেই নির্দেশও ছিল তাঁর পত্রে। ১৮৯৪ সালের ৩ মার্চ কিডিকে (সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়র) লেখা চিঠিতে স্বামীজী বললেনঃ "সাবধান, যেন তার মধ্যে কোন অলৌকিক ঘটনা-সমাবেশ করো না। অর্থাৎ জীবনীটি লেখা হবে তাঁর উপদেশের উদাহরণস্বরূপ। তার মধ্যে কেবল তাঁর কথা থাকবে। খবরদার, এর মধ্যে আমাকে বা অন্য কোন জীবিত ব্যক্তিকে যেন এনো না। প্রধান লক্ষ্য থাকবে তাঁর শিক্ষা, তাঁর উপদেশ জগৎকে দেওয়া।"

৩০ নভেম্বর ১৮৯৪ স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে লিখছেনঃ "লিখতে হবে যে, তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) জীবনটা একটা অসাধারণ আলোকবর্তিকা, যার তীব্র রশ্মিসম্পাতে লোকে হিন্দুধর্মের সমগ্র দিক বা রূপ সত্যসত্যই বুঝতে সমর্থ হবে। শাস্ত্রে যেসব জ্ঞান মতবাদরূপে রয়েছে, তিনি তার মূর্ত দৃষ্টান্ত। ঋষি ও অবতারেরা যা বাস্তবিক শিক্ষা দিতে চেয়ে-ছিলেন, তিনি নিজের জীবন দ্বারা তা দেখিয়ে গেছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব—তাঁর জীবিতাবস্থাতেই যার শুরু এবং পরবর্তী কালে তাঁর মহাপ্রয়াণের পরেও যা অদ্যাবধি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে, সেসম্পর্কে স্বামীজী যুগপৎ আনন্দ ও আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন সূচনাপর্বেই। আনন্দের সঙ্গত কারণ ছিল, কিন্তু তাঁর আশঙ্কা ছিল পাছে শেষপর্যন্ত এই জন্মোৎসব পালন উৎসবের হুজুগে পর্যবসিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হোক, আবিশ্ব বিমোহিত হোক, ঠাকুরের মূল্যায়ন অব্যাহত থাকুক—এটাই ছিল তাঁর একমাত্র অভিলাষ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহান্তকালে বিবেকানন্দ ও তাঁর সঙ্গীরা অজ্ঞাত, অখ্যাত, কপর্দকহীন দ্বাদশ জন যুবকমাত্র। তাঁরা যথার্থ আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং নিরন্তর সংগ্রামের শক্তি নিয়ে তৎকালীন সব বিরুদ্ধ প্রতিরোধকারী শক্তির সঙ্গে অবিরাম সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছিলেন যাঁর আশীর্বাদে, আজ সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁকে জানে, শ্রদ্ধা করে। তাঁর প্রচারিত সত্য দাবানলের মতো দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বিবেকানন্দ জানতেন, প্রতিটি কাজে, তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে প্রভু তাঁকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন সবকিছু। বলেছেনঃ "আমি কোন লোক বা জিনিসের ওপর নির্ভর করি না—একমাত্র প্রভুই আমার ভরসা এবং তিনি আমার ভিতর দিয়ে কাজ করছেন।" লক্ষণীয়, তাঁর অজস্র চিঠির শেষ পদটি প্রায়শই 'সদা প্রভুপদাশ্রিত'।

সংস্কৃত থেকে অনুবাদকর্মে স্টার্ডিকে সাহায্য করার জন্য স্বামী সারদানন্দকে স্বামীজী পেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত পাওয়া না গেলে লিখছেনঃ "যাক, যা হয় সব ভালর জন্যই! এটা যদি ঠাকুরের কাজ হয়, তবে ঠিক জায়গার জন্য ঠিক লোক যথাসময়ে এসে যাবে। তোমাদের কারো নিজেকে উত্ত্যক্ত মনে করার প্রয়োজন নাই।" (২৩/১২/১৮৯৫) ঐ একই চিঠিতে লিখেছেনঃ "আমি অতি আনন্দিত যে, কখনো তোমাদের কাজে লেগেছি—অবশ্য তোমরাও যদি তাই মনে কর। অন্তত গুরুমহারাজ আমার ওপর যে কর্তব্য অর্পণ করেছিলেন তা সম্পন্ন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—এই ভেবেই আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করছি; ঐ কাজ সুসম্পন্ন হোক আর নাই হোক, আমি চেষ্টা করেছি জেনেই খুশি আছি।"

কর্মপ্রাণ হয়ে ওঠার কারণ স্বামীজীর অন্তর্নিহিত শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্ভরতা। মিস এস. ফার্মারকে নিউ ইয়র্ক থেকে ২৯ ডিসেম্বর ১৮৯৫ তারিখে তিনি লিখেছেনঃ "আমাদের শাস্ত্রে আছে—'মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।' অর্থাৎ যারা আমার ভক্তগণের ভক্ত, তারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তুমি প্রভুর সেবিকা; সুতরাং আমি যেখানেই থাকি না কেন, ভগবৎপ্রেরণায় তুমি যে মহোচ্চ ব্রতে দীক্ষিতা হয়েছ তার উদ্‌যাপনে যেকোন প্রকারে সহায়তা করতে পারি।"

শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করে তিনি মঠের গুরুভাইদের বলছেনঃ "তিনি যে জহুরী ছিলেন তাতে এখনো যদি

সন্দেহ হয়, তাহলে তোমাতে আর উন্মাদে তফাৎ কি? দেখ এদেশে [আমেরিকায়] শত শত নরনারী প্রভুকে সকল অবতারের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিতেছে। ধীরে ধীরে, মহাকার্য ধীরে ধীরে হয়। ধীরে ধীরে বারুদের স্তর পুঁতিতে হয়; তারপর একদিন এক কণা অগ্নি—আর সমস্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

"তিনি কাণ্ডারী, ভয় কি? তোমরা অনন্ত শক্তিমান—সামান্য ঈর্ষাবুদ্ধি ও অহংপূর্ণবুদ্ধি দমন করিতে তোমাদের কদিন লাগে? যখনি ঐ বুদ্ধি আসিবে, প্রভুর কাছে শরণ লও। শরীর-মন তাঁর কাজে সঁপে দাও দেখি, হাঙ্গামা মিটে যাবে একদম।" (পত্রাবলী, পৃঃ ৪০৮-৪০৯)

ধ্যানে এবং মননে উপলব্ধিজাত প্রত্যয় নিয়ে স্বামীজী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে ১৮৯৫ সালে এক পত্রে লিখলেন ঃ "রামকৃষ্ণাবতারের জন্মদিন হইতেই সত্য-যুগোৎপত্তি হইয়াছে।"

"রামকৃষ্ণাবতারে জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা নাস্তিকতারূপ ম্লেচ্ছনিবহ ধ্বংস হইবে এবং ভক্তি ও প্রেমের দ্বারা সমস্ত জগৎ একীভূত হইবে। অপিচ এ অবতারের রজোগুণ অর্থাৎ নামযশাদির আকাঙ্ক্ষা একেবারেই নাই অর্থাৎ যে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করে, সেই ধন্য; তাঁহাকে মানে বা নাই মানে, ক্ষতি নাই।...

"জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।

"সেইজন্যই রামকৃষ্ণাবতারে 'স্ত্রীগুরু' গ্রহণ, সেইজন্যই নারীভাব সাধন, সেইজন্যই মাতৃভাব প্রচার।" (ঐ, পৃঃ ৪১২)

ঐ পত্রেই স্বামীজী লিখছেন ঃ "ঠাকুরের কাছে সকল কার্যের প্রারম্ভে প্রার্থনা করিবে। তিনি সৎপন্থা দেখাইবেন। ... আমি যতদিন পৃথিবীতে আছি, তিনি আমার মধ্যে কার্য করিতেছেন—ইহাতে তোমাদের যতদিন বিশ্বাস থাকিবে, ততদিন কোন অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।...

"কিছুতেই ভয় খেও না। যতদিন তিনি আমার মাথায় হাত রাখছেন, ততদিন কি কারুর দাবাবার জো আছে? ভবেযুঃ কণ্ঠাগতাঃ প্রাণাঃ (প্রাণ কণ্ঠাগত হোক), তথাপি ডর পাবে না।" একই পত্রে স্বামীজী শ্রীশ্রীঠাকুরের আসন্ন জন্মোৎসব পালন নিয়ে কতখানি বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা করেছেন তা দেখতে পাই। উৎসবের প্রাণপুরুষকে নিয়ে তাঁর সর্বতোমুখী ভাবনার কী অপূর্ব প্রকাশ! তাঁর বহুমুখী ভাবনার প্রথম কথা ঃ "এবারকার মহোৎসবে খুব ধূম মাচাইবে।" এই অনুষ্ঠানের আঙ্গিক ও প্রকরণগত রূপায়ণে যাতে ভাবগম্ভীর অথচ পবিত্রতার ছাপ থাকে—তা নিয়ে স্বামীজী বিশেষ ভাবিত। অনুষ্ঠানে বাইরের আড়ম্বরকে তিনি সর্বতোভাবে পরিহার করতে নির্দেশ দিচ্ছেন, কিন্তু অনুষ্ঠানের প্রাণপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য যেন আচণ্ডালে প্রচারিত হতে পারে—এই দিকেই তাঁর মূল লক্ষ্য। লিখছেন ঃ "খাওয়া-দাওয়া অতি সাধারণ—মহাপ্রসাদ, সরাভোগ, দাঁড়া প্রসাদ ইত্যাদি। পরমহংসদেবের জীবনচরিত পাঠ। বেদ-বেদান্ত, পুঁথি একত্র করে আরতি করবে এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পেলা আদায় করিবে। পুরানো ঢৌলে নিমন্ত্রণ ত্যাগ করিবে। 'আমন্ত্রয়ে ভবন্তং সাশীর্বাদং ভগবতো রামকৃষ্ণস্য বহুমানপুরঃসরঞ্চ' ইত্যাকার একটা লাইন লিখে তারপর লিখবে যে, ঠাকুরের জন্মতিথি মহোৎসব এবং মঠ চালাইবার খরচের জন্য আপনার সহায়তা প্রয়োজন।"

শ্রীরামকৃষ্ণকে ইংরেজিতে 'লর্ড রামকৃষ্ণ' লেখা হোক—এতে স্বামীজীর আপত্তি ছিল। ঐ পত্রেই তিনি লিখছেন ঃ " 'লর্ড (প্রভু) রামকৃষ্ণ' শব্দের কোন অর্থ নাই। উক্ত নাম ত্যাগ করিবে, ইংরেজি অক্ষরে 'ভগবান' লিখিবে। তারপর এক-আধ লাইন ইংরেজি লিখিয়া দিবে।" পত্রটিতে ইংরেজি এবং বাঙলা উভয় ভাষায় একটি আদর্শ আমন্ত্রণপত্র পর্যন্ত তিনি লিখে দিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে কি ভোগ দেওয়া হবে—সেসম্পর্কেও তিনি লিখেছেন ঃ "কেবলমাত্র কিঞ্চিৎ পায়সান্ন চড়াইবে; তিনি তাহাই ভাল-বাসিতেন। ঠাকুরঘর অনেকের সহায়তা করে বটে, কিন্তু রাজসিক তামসিক খাওয়া-দাওয়ার কোন কাজ নাই।" এরপর তিনি নির্মমভাবে সাবধানবাণী শোনালেন ঃ "আঙুল বাঁকানো এবং ঘণ্টার বিকট আওয়াজ কিঞ্চিৎ কমি করে কিঞ্চিৎ গীতা-উপনিষদাদি পাঠ করিবে। অর্থাৎ materialism (জড়োপাসনা) যত কম হয় এবং spirituality (আধ্যাত্মিকতা) যতই বাড়ে, এই কথা আর কি! সাণ্ডেল (বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল) লিখছেন যে, হাজার হাজার লোক খালি ঘণ্টানাড়া দেখতে আসে। যদি একথা সত্য হয় তো ওপ্রকার লোক না আসাই ভাল।... আর আমরা কি সর্বত্যাগ করে সাণ্ডেলের জন্য ঘণ্টা বাজাতে এসেছি? সাণ্ডেল কাঁসারীপাড়ায় বাস করুক গে, যদি ঘণ্টানাড়া তার এতই ভাল লাগে। অর্থাৎ তিনি তাঁর ছেলেদের মুখে খাচ্ছেন—তোমার ঘণ্টানাড়ার মধ্যে নয়। তাদের একচুল কষ্ট দিয়ে তোমার ঘণ্টানাড়া সমস্তই বিফল হয়, অপিচ অমঙ্গল হয় তোমার নিজের। একথাটা রোজ একবার মনে রেখো। তিনি তোমার একলার জন্য বা সাণ্ডেলের জন্য এসেছিলেন, কি জগতের জন্য? যদি জগতের জন্য, তাহলে জগৎসুদ্ধ লোক যাতে তাঁকে বুঝতে পারে, এই ভাবে তাঁকে present করতে (লোকের কাছে ধরতে) হবে।"

অনুরূপভাবে তাঁর গুরুদেবের জীবনচরিত লিখতে গিয়ে কেউ যেন তা নানা কাহিনী-উপকাহিনীর জঞ্জালে পর্যবসিত না করেন—সে-ব্যাপারে তিনি অমোঘ সাবধান-বাণী শোনালেন ঃ "সুরেশ দত্তের পুঁথিতে যে আবোল-তাবোলগুলো আছে, সেগুলো দূর করে দিতে হবে—বুঝতে পেরেছ কি?" আবার এর উল্টোও আছে। অক্ষয়কুমার সেন রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' পাঠ করে তাঁর আনন্দোচ্ছ্বাস চেপে রাখতে না পেরে লিখেছিলেন ঃ "শাঁকচুন্নীর পুঁথি এবং শাঁকচুন্নী himself (নিজে) must electrify the masses (জনসাধারণে শক্তিসঞ্চার করবে)। শাঁকচুন্নী is the future apostle for the masses of Bengal (বাংলার জনসাধারণের নিকট ভাবী বার্তাবহ)। শাঁকচুন্নীকে খুব যত্ন করবে। তার বিশ্বাস-ভক্তির ফল ফলেছে।" স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকার করেছেন ঃ "তার কণ্ঠে তিনি (ঠাকুর) আবির্ভাব হচ্ছেন।"

নিউ ইয়র্ক থেকে ১৪ এপ্রিল ১৮৯৬ এক পত্রে স্বামীজী স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে প্রসঙ্গক্রমে লিখলেন ঃ "If people worship him as God, no harm. Neither encourage, nor discourage. The masses will always have the *person*, the higher ones, the *principle*; we want both. But principles are universal, nor *persons*. Therefore stick to the principles he taught; let people think whatever they like of this person."

২৭ এপ্রিল ১৮৯৬-তে ইংল্যাণ্ড থেকে স্বামীজী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখছেন ঃ "তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) তোমাদের ভার আমার উপর দিয়াছিলেন এবং তোমাদের দ্বারা জগতের মহাকল্যাণ হইবে, যদিও অনেকেই এক্ষণে তাহা অবগত নও; এইজন্যই বিশেষ লিখিতেছি, মনে রাখিবে।" কিছু পরেই লিখছেন ঃ "যদি কেউ পরমহংস-দেবকে অবতার ইত্যাদি বলে মানে—উত্তম কথা, না মানে—উত্তম কথা। সার এই যে, পরমহংসদেব চরিত্র সম্বন্ধে পুরাতন ঠাকুরদের উপরে যান এবং শিক্ষা সম্বন্ধে সকলের চেয়ে উদার ও নূতন এবং progressive (প্রগতিশীল) অর্থাৎ পুরানোরা সব একঘেয়ে—এ নূতন অবতার বা শিক্ষকের এই শিক্ষা যে, এখন যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, কর্মের উৎকৃষ্ট ভাব এক করে নূতন সমাজ তৈয়ারি করতে হবে।... পুরানোরা বেশ ছিলেন বটে, কিন্তু এযুগের এই ধর্ম—একাধারে যোগ, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম—আচণ্ডালে জ্ঞান-ভক্তি-দান—আবালবৃদ্ধবনিতা। ওসকল কেষ্টবিষ্টু বেশ ঠাকুর ছিলেন; কিন্তু রামকৃষ্ণে একাধারে সব ঢুকে গেছেন। সাধারণ লোকের পক্ষে এবং প্রথম উদ্যোগীর পক্ষে নিষ্ঠা বড়ই আবশ্যক—অর্থাৎ শিক্ষা দাও যে, অন্যসকল দেবকে নমস্কার, কিন্তু পূজা রামকৃষ্ণের। নিষ্ঠা ভিন্ন তেজ হয় না—তা না হলে মহাবীরের ন্যায় প্রচার হয় না। আর ওসব পুরানো ঠাকুর-দেবতা বুড়িয়ে গেছে—এখন নূতন ভারত, নূতন ঠাকুর, নূতন ধর্ম, নূতন বেদ।" এতসব নির্দেশ, উপদেশ, কিন্তু সবকিছুরই শেষ কথা ঃ "প্রভু তোমাদের সৎ বুদ্ধি দিন।" বললেন ঃ "মনে রেখ যে, তাঁর কৃপায় বড় বড় দেবতার মতো মানুষ তৈয়ারি হয়ে যাবে, যেখানে তাঁর দয়া পড়বে।"

সুইজারল্যাণ্ড থেকে ২৩ আগস্ট ১৮৯৬ স্বামীজী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে এক পত্রে যা লিখছেন তা তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ দিক উদ্ঘাটিত করে। দক্ষিণেশ্বর মহোৎসবে দর্শনার্থীর মধ্যে সামাজিক পরিচয়ের দিক থেকে প্রশ্ন ওঠে এমন মহিলারাও যেত বলে গোঁড়া নীতিবাগীশরা উষ্মা প্রকাশ করেছিল। এ-সংবাদে স্বামীজী প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে লিখেছেন ঃ "বেশ্যারা যদি দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্থে যাইতে না পায় তো কোথায় যাইবে? পাপীদের জন্য প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পুণ্যবানের জন্য তত নহে।... যাহারা ঠাকুরঘরে গিয়াও ঐ বেশ্যা, ঐ নীচজাতি, ঐ গরিব, ঐ ছোটলোক ভাবে, তাহাদের (অর্থাৎ যাহাদের তোমরা ভদ্রলোক বল) সংখ্যা যতই কম হয়, ততই মঙ্গল।... প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যে, শত শত বেশ্যা আসুক তাঁর পায়ে মাথা নোয়াতে, বরং একজনও ভদ্রলোক না আসে নাই আসুক। বেশ্যা আসুক, মাতাল আসুক, চোর, ডাকাত সকলে আসুক—তাঁর অবারিত দ্বার।"

নিউক্লিয়াস যেমন ধারণ করে পরমাণুর গর্ভটিকে, অনুরূপ শক্তির মতো প্রভুর প্রতি তাঁর আমৃত্যু একমগ্ন নিষ্ঠা—যা স্বামীজীর অধ্যাত্মবোধ-ঋদ্ধ জীবনকে পরিচালিত করেছে। তিনিও তাঁর প্রিয় অনুগামীদের মধ্যে এইপ্রকার শুদ্ধনিষ্ঠা সঞ্চারিত করে দিতে পারতেন অনন্ত দৈবশক্তির আধার তাঁর বাণীর মাধ্যমে—"সাহস অবলম্বন কর। মানব-জাতির কল্যাণের জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব—বাকি সব প্রভুই জানেন।... অধীর হয়ো না, তাড়াহুড়ো করো না। ধীর, একনিষ্ঠ এবং নীরব কর্মই সফল হয়। প্রভু অতি মহান। বৎস, আমরা সফল হবই—সফল হতেই হবে। তাঁর নাম ধন্য হোক।" (ঐ, পৃঃ ১৩২) [ক্রমশ]

এই বিশেষ প্রবন্ধটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

জ্যোতির্লিঙ্গ ওঙ্কার-মান্ধাতা প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা

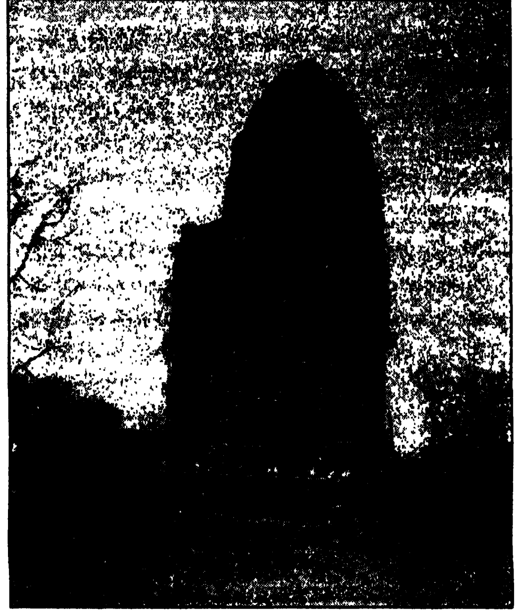
স্বামী অচ্যুতানন্দ

আমরা পরমভাগবত যোগিরাজ শুকদেব ও দেবাদিদেব ওঙ্কারেশ্বর ও অন্যান্য দেবতাদের ক্রীড়ানিকেতনে প্রণাম জানিয়ে বাইরে এলাম। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে। এখন কুঠিয়ায় ফিরতে হবে। বেশ অনেকটা পথ। গৌরাঙ্গ মহারাজকে বিদায় জানালাম। তিনি আমাদের সাবধান করে দিলেন—পথে টর্চ জ্বেলে যেতে, কারণ পাহাড়ী পথে সাপের খুব উপদ্রব। যাহোক, আমি খুব সাবধানে একটু তাড়াতাড়ি আশ্রমে ফিরে এলাম।

রাত্রে অনেকক্ষণ ঘুম এল না—জীবনে এই প্রথম মা নর্মদার তীরে আমার রাত কাটছে। কুঠিয়ার ঠিক নিচেই খাড়া পাড়ের তলা দিয়ে বয়ে যাওয়া নর্মদার ঝরঝর শব্দ আর তার সঙ্গে দূরের মন্দিরের মধ্যরাত্রের শয়নারতির নানা বাদ্যযন্ত্রের মিলিত শব্দের ধ্বনি আমার মনকে আনন্দে ডুবিয়ে দিয়েছিল। দীর্ঘক্ষণ সেই শব্দতরঙ্গে মন নিবিষ্ট রাখতে রাখতে মা নর্মদার অন্য প্রসিদ্ধ নাম 'রেবা' স্মরণ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালেই গৌরাঙ্গ মহারাজ এসে গেলেন। আজ দিনের বেলায় মন্দিরের আশপাশে আরো কিছু মন্দির দর্শন করাবেন। বিকালে নদীর দক্ষিণ পাড়ে ব্রহ্মপুরী ও বিষ্ণুপুরী দর্শন হবে। আর আগামী কাল শেষদিন যাব মান্ধাতা পাহাড় পরিক্রমায়।

প্রাতরাশের পর দুজনে 'নর্মদে-এ-এ হর্' বলে বেরিয়ে পড়লাম পূর্বমুখে মন্দিরের পথে। আজ সোমবার মন্দিরে দারুণ ভিড়। অনেক কষ্টে ব্রহ্মচারীজীর সাহায্যে মন্দিরে ঢুকে ভিড়ের চাপে একেবারে ধাক্কা খেতে খেতে রূপার রেলিঙের সামনেই পড়ে গেলাম। ভালই হলো। রেলিং ধরেই কোনরকমে বসে পড়ে আবার ওঙ্কারেশ্বর লিঙ্গকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে প্রণাম করলাম শঙ্করাচার্য-রচিত বিখ্যাত দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের প্রণামমন্ত্রে—"কাবেরিকা-নর্মদয়োঃ পবিত্রে সমাগমে সজ্জনতারণায়।/ সদৈব মান্ধাতৃপুরে বসন্তম্ ওঙ্কারমীশং শিবমেকমীড়ে।" এবার পূজারীর তাগাদায় তাঁরই হাত ধরে কোনরকমে উঠে পিছনদিকে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে গর্ভমন্দির ছেড়ে নাটমন্দিরে এসে থামলাম। একটু দাঁড়িয়ে নিয়ে এবার ভাল করে মন্দির-নাটমন্দির দেখতে লাগলাম।



ওঙ্কারেশ্বর পাহাড়ে শ্রীসোমনাথ-মন্দির

গর্ভমন্দিরটি ও শুকদেব কুটির অত্যন্ত ছোট ও প্রাচীন। গর্ভমন্দিরের দক্ষিণদিক প্রায় নদীর পাড়ের ওপর। তার পিছনে দক্ষিণদিকে সামান্য জায়গা কিছুটা পরিক্রমার ও দু-একটি ছোট মন্দির—তার মধ্যে মান্ধাতার গদি এবং তার পরেই প্রায় ৮ ফুট উঁচু কালোপাথরের দ্বারকাধীশ বিষ্ণুমূর্তি। অতি অপূর্ব বিগ্রহ! আশপাশে আরো কিছু শিবলিঙ্গ—রামেশ্বর, জালেশ্বর, বিশালেশ্বর, নবগ্রহেশ্বর মা অন্নপূর্ণার ছোট মন্দিরে আছেন। একপাশে মা নর্মদার অতি সুন্দর মকরবাহিনী বিগ্রহও আছে। আমরা সব মন্দিরে প্রণাম করে নাটমন্দিরে একটু দাঁড়ালাম। এই নাটমন্দির অনেক পরে তৈরি হয়েছে। মন্দিরের সামনে আর জায়গা না থাকায় এই নাটমন্দিরটি মূল মন্দিরের পশ্চিম পাশে তৈরি করা হয়েছে। সচরাচর দেখা যায়, নাটমন্দির মন্দিরের সংলগ্ন বা সামনেই হয়। কিন্তু এখানে প্রাচীন ক্ষুদ্র গর্ভমন্দিরের সামনে স্থানাভাববশত সম্ভবত এইভাবে পাশেই উত্তর ও পশ্চিম দিকে গড়ে উঠেছে। সেইজন্য বিগ্রহ-সমন্বিত মূল মন্দির চূড়াহীন। আর উচ্চচূড় নাটমন্দির মন্দিরের গায়েই লেগে আছে। ৬০টি প্রায় ১৪ ফুট উঁচু খয়েরি রঙের পাথরের স্তম্ভের ওপর নাটমন্দিরটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্তম্ভগুলি অনবদ্য শিল্পকর্মের নিদর্শন। এই নাটমন্দিরের পাশেই মূল মন্দিরের একটি অংশে পাঁচতলা উঁচু মন্দির। বিশাল সাদা রঙের শিখর-সমন্বিত এই চূড়াই দূর থেকে দেখা যায়। এর একতলাটি সমগ্র শুককুঠি ও ওঙ্কারেশ্বর গর্ভমন্দির জুড়ে। গর্ভমন্দির থেকে বাইরে এসে পূর্বদিকে ঐ উঁচু মন্দিরের ছোট

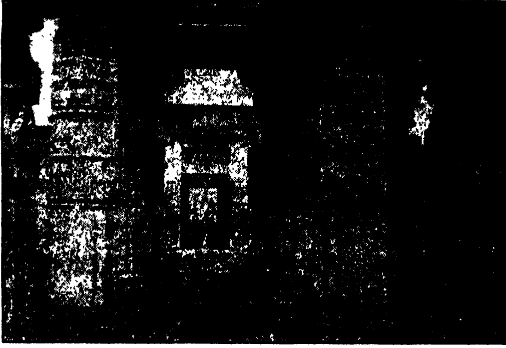
দরজা দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে হয়। পাঁচতলা এই মন্দিরের একতলায় ওঙ্কারেশ্বর। দোতলার ছোট ঘরে আছেন মহাকালেশ্বর। উজ্জয়িনীতে মহাকালের মন্দিরও মাটির নিচে। সেখানে তাঁর মাথার ওপর একটি দোতলা মন্দিরের প্রথম তলায় আছেন ওঙ্কারেশ্বর, তার ওপরে আছেন নাগেশ্বর। এখানে একতলায় ওঙ্কারেশ্বর, ওপরে আছেন মহাকালেশ্বর। ছোট সিঁড়ি বেয়ে সঙ্কীর্ণ পথে তিনতলায় সিদ্ধেশ্বর বা সিদ্ধনাথ, চারতলায় কেদারেশ্বর আর পঞ্চম তলে ছোট একটি লিঙ্গ, তাঁর নাম গুপ্তেশ্বর। এই পঞ্চম তলা থেকে জানলা দিয়ে সমগ্র মান্ধাতা পর্বত আর দক্ষিণ পাড়ের সাতপুরা পাহাড়ে নানা মন্দির ও সবুজ গাছপালায় ঘেরা পাহাড়ের চরণ ছুঁয়ে ছুটে যাওয়া সবজে-নীল রঙের নর্মদার বঙ্কিম স্রোতোধারা দেখতে অপরূপ লাগে। অনেক সময় অবাক হয়ে ভাবি, প্রাচীনকালের এইসব তীর্থ যাঁরা খুঁজে বের করেছিলেন বা বলা যায় নির্বাচন করেছিলেন—তাঁরা কী অপূর্ব শৈল্পিক দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন! নৈসর্গিক সৌন্দর্যসুষমামণ্ডিত কী সব অনবদ্য স্থান তাঁরা তীর্থ হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন! যতগুলি জ্যোতির্লিঙ্গ আমি দেখলাম, তার মধ্যে বারাণসীর বিশ্বনাথ ছাড়া প্রায় প্রতিটিই পাহাড়-অরণ্য-নদীতীর-সমুদ্র তীরে অপরূপ পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য কাশী বিশ্বনাথও প্রাচীনকালে গঙ্গার কাছেই ছিলেন। গোদাবরী নামে আরেকটি নদী পার হয়ে তাঁর মন্দিরে যেতে হতো। সেই নদী গিয়ে গঙ্গায় মিশেছিল দশাশ্বমেধ ঘাটে। গোদাবরী কালের প্রভাবে শুকিয়ে গিয়ে হারিয়ে গেলেও তার নাম অপভ্রংশ হতে হতে গোদাওয়ারী→গোদাওয়ালী→গোদাওলী→গোধুলিয়াতে এসে দাঁড়িয়েছে। কাশীর বিখ্যাত গোধুলিয়ার চৌমাথা ছিল সেই গোদাবরী নদীর যাত্রাপথ। ভৌগোলিক পরিচয় তার এখনো আছে।

যাহোক, পাঁচতলা থেকে নেমে এলাম একতলায়। মন্দির পরিক্রমা শেষ করে নিচে নামতে নামতে আমরা দেখতে পেলাম মন্দিরের বাইরে অবিমুক্তেশ্বর, বটুকভৈরব, নাগচন্দ্রেশ্বর, কালভৈরব—এইসব ছোট-বড় নানা বিগ্রহ ও লিঙ্গ-দেবতাকে। আমরা ক্রমে আরো নিচে নেমে এলাম—একেবারে নদীর ধারে, যেখানে মন্দিরের সিঁড়ি আরম্ভ হয়েছে, সেখানে গেরুয়া রং করা দুটি দ্বারের মতো গুহামুখের সামনে এসে দাঁড়ালাম। এটি আমাদের দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের আদিগুরু শঙ্করাচার্যের দীক্ষা ও শিক্ষার পীঠভূমি। এখানেই আচার্য শঙ্কর দক্ষিণ ভারত থেকে গুরুর সন্ধানে এসে সমাধিমগ্ন মহর্ষি পতঞ্জলির অবতার গোবিন্দপাদের দেখা পান। তিনিও এই নর্মদাতীরে ওঙ্কার-ক্ষেত্রে ওঙ্কারাত্মক পরব্রহ্মের সাধনায় মগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিলেন সেই পরম পুরুষের, যিনি প্রাচীন সনাতন বৈদিক তত্ত্ব নিজে উপলব্ধি করে জগতের মানুষের কাছে প্রচার করবেন। বেদের কর্মকাণ্ডের যজ্ঞাদি কর্মের চাপে জ্ঞানকাণ্ড যখন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, তখন সেই ঔপনিষদিক মূল সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য শ্রীভগবান যে নরদেহে আবির্ভূত হয়ে তাঁর কাছে আসবেন, তা তিনি জানতেন। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে দেবাদিদেব মহাদেব নরদেহে আবির্ভূত হয়ে বালক শঙ্কর-রূপে সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই গুরু গোবিন্দপাদের চরণে আশ্রয় নিতে এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের সেই দিব্য মিলনকালে বহু ঘটনা ঘটেছিল এই ক্ষুদ্র গুহাকক্ষে। শঙ্করকে সন্ন্যাসদীক্ষা দান ও শাস্ত্রের মর্মার্থ অধিগত করিয়ে গুরু গোবিন্দপাদ তাঁকে এখান থেকে উত্তরাখণ্ডে পাঠিয়েছিলেন। এখানেই শঙ্করের জীবনের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর কেটেছিল গুরুসান্নিধ্যে শিক্ষায় ও তপশ্চর্যায়। আজও এই ক্ষুদ্র গুহায় আধো অন্ধকারে দেখা যায় শঙ্করের একটি ছোট শিলামূর্তি, আর গুরু গোবিন্দপাদের তপঃশীল অপর একটি ধ্যানমূর্তি বেদিতে উপবিষ্ট। গুহার ভিতরে ডানদিকে নিচে নামার জন্য একটি অন্ধকার সুড়ঙ্গ আছে, সম্ভবত এটি নর্মদায় নামার পথ। প্রাচীনকালের গুহা বেশ বোঝা যায়। বর্তমানে এই গুহা ও নর্মদার তীরে একটি ছোট পৃথক মন্দির তৈরি করে শৃঙ্গেরী মঠের বর্তমান আচার্য সে-দুটির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। আমরা আচার্যদেবকে প্রণাম জানালাম—"ওঁ নমঃ প্রণবার্থায় শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্তয়ে।/ নির্মলায় প্রশান্তায় দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ।।/ নিধয়ে সর্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিনাম্।/ গুরবে সর্বলোকানাং দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ।।"

গুহামন্দির থেকে বাইরে এসে ডানদিকে পাহাড়ের গায়ে বেশ উঁচুতে তিনতলা বিশাল প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখা গেল। এটি প্রাচীনকালের ভীলরাজপুত রাজাদের প্রাসাদ। কিছু অংশ মেরামত করে বর্তমানে রাজবংশধর রাও-সাহেবরা থাকেন। দর্শনার্থীরা ইচ্ছা করলে এটিও দেখে আসতে পারেন। আমার ইচ্ছা হলো না। এই পথেই একটি প্রাচীন শিখ গুরুদ্বার আছে। সম্ভবত ১৫০৮ থেকে ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় আদি শিখগুরু নানকদেব এই ওঙ্কারতীর্থে এসেছিলেন তাঁর ভারত-পরিক্রমা কালে। তাঁরই স্মরণে এই গুরুদ্বারটি শিখ ভক্তেরা তৈরি করেছেন। আমরা এটি দর্শন করে প্রণাম জানালাম।

শিবপুরীর মন্দির দর্শনের পর আমরা এবার নর্মদার দক্ষিণতীরের ব্রহ্মপুরী ও বিষ্ণুপুরীর মন্দিরগুলি দর্শন করব। নদীর পাড়ে নেমে এলাম। নদীর বাঁধানো ঘাট ঠিক ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের নিচে। এর নাম 'কোটিতীর্থঘাট'। শাস্ত্রে কথিত আছে, এখানে স্নান-তর্পণাদিতে বহু পুণ্য হয়। আমরা নদীতে নেমে মাথায় একটু জল স্পর্শ ও আচমন করে এখান থেকেই ওপারে যাওয়ার নৌকা নিলাম। ছোট ছোট দু-তিনজন বসার মতো ডিঙি। একজন অল্পবয়সী মাঝি দাঁড় বেয়ে নৌকা ওপারে নিয়ে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যেই। এখানে নদীর পাড়ে ছোলা বিক্রি হয়। জলে সেই ছোলা

ফেলে দিলে দলে দলে মাছ ছোলা খাওয়ার জন্য নৌকার পাশে পাশে ভেসে আসে। সুন্দর দৃশ্য!



মান্ধাতার রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ

আমরা তীরে এসে নামলাম। বাঁদিকে পাথরের দেওয়ালের গায়ে একটা পিতলের গোমুখ থেকে ক্ষীণধারায় একটা জলস্রোত পড়ছে। এর নাম 'কপিলধারা'। এটি গোমুখতীর্থ। জলধারা গিয়ে নর্মদায় মিশছে। প্রবাদ আছে, কোন এক অসুরকে বধ করে শিব তাঁর ত্রিশূল এখানে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। সেই শূলাঘাতে এই পাহাড় ভেদ করে কপিলধারার সৃষ্টি হয় এবং সেটি গোমুখ বেয়ে নর্মদাতে আশ্রয় নেয়। আমরা তীরে নেমে প্রথমে এই কপিলধারা স্পর্শ করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। এই অঞ্চলটির নাম 'ব্রহ্মপুরী'। কিছুদূরে ব্রহ্মার একটি প্রাচীন মন্দির আছে। এখানকার মুখ্য মন্দির অমলেশ্বর শিবলিঙ্গের। এটিকেও কেউ কেউ জ্যোতির্লিঙ্গ বলেন। তাঁদের সূত্র হচ্ছে শাস্ত্রবচন—"ওঙ্কারাং অমলেশ্বরে"। তবে এই মত সর্ববাদিসম্মত নয়। আদি এবং আসল জ্যোতির্লিঙ্গ ওঙ্কার-দ্বীপের ওঙ্কারেশ্বরই। ইতিহাস বলে, প্রাচীন ওঙ্কারেশ্বর লিঙ্গ কালের প্রভাবে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে ঢাকা পড়ে যায় ভগ্নস্তূপের মধ্যে। পরে ১০৬৩ খ্রিস্টাব্দে পারমার রাজা উদয়াদিত্য নর্মদার দক্ষিণ পাড়ের এই প্রাচীন শিবমন্দিরটি সংস্কার করে মন্দিরে সংস্কৃতে কিছু লিপি খোদিত করেন। তখন থেকেই এর খ্যাতি শুরু। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা ওঙ্কারেশ্বরকেই 'অমলেশ্বর' বলেন। ঐসময় নানা সাধু-মহাত্মা জঙ্গল পরিষ্কার করে গোবিন্দপাদ-গুহা ও ওঙ্কারেশ্বর-মন্দির উদ্ধার করেন ও যথাবিধি সংস্কারাদি করে পূজা চালু করেন। এপারের মন্দিরও 'অমলেশ্বর' বলে প্রচলিত হতে থাকে।

আমরা সিঁড়ি ভেঙে এই প্রাচীন অথচ সুসংস্কৃত বিশাল তোরণ-সমন্বিত মন্দিরে প্রবেশ করলাম। এখানে যাত্রী কম ও চারদিকে আধুনিকতার স্পর্শ দেখে এর অর্বাচীনত্ব বোঝা যায়। লিঙ্গও একটু বড় ও বেশ মসৃণ। চারদিকে রূপার ছোট রেলিঙ। পাশে পাথরের নাগমূর্তি ও দেবী পার্বতীর দণ্ডায়মানা মূর্তি। আমরা দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। আশপাশে অনেক মন্দির অর্ধভগ্ন অবস্থায় পড়ে আছে। একটা মন্দিরে বেশ কিছু জীর্ণ বিগ্রহ একসঙ্গে জড়ো করা আছে। এই মন্দির সরকারি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দ্বারা সুরক্ষিত। তবে সেবার ভার স্থানীয় বহু প্রাচীন মহানির্বাণী আখড়ার পরিচালনায়। এই অঞ্চলে প্রায় শত বছরের পুরনো দুটি সন্ন্যাসীদের আখড়া—জুনা ও নিরঞ্জনী পঞ্চায়তী আখড়া আছে। অমলেশ্বর-মন্দিরের সংলগ্ন আরেকটি সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত তোরণ-সহ প্রাচীন মন্দির আছে। লিঙ্গের নাম 'বৃদ্ধেশ্বর মহাদেব'।

আমরা ব্রহ্মপুরী দেখে একটা ছোট রাস্তা দিয়ে নর্মদার দক্ষিণ পাড়ে আরো পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেলাম। এই দিকটা বেশি লোকালয়, দোকানপাট, বাসস্ট্যাণ্ড ও বেশকিছু প্রাচীন ও নতুন আশ্রম নিয়ে গড়া। এই অঞ্চলের নাম 'বিষ্ণুপুরী'। এই দিকে প্রথমে আছে প্রাচীন মহানির্বাণী আখড়া, সন্ন্যাসীদের আস্তানা ইত্যাদি। প্রাচীন নির্বাণী আখড়া দেখার পর কয়েকটি ধর্মশালাও দেখলাম। ধর্মশালার মাথার ওপর বিরাটাকার সব মূর্তি স্থাপিত। বিশেষ করে রাজপুত ধর্মশালার মাথায় রাণা প্রতাপ ঘোড়া চেতকের পিঠে চড়ে আছেন—এই বিশাল সুন্দর মূর্তিটি বহুদূর থেকে দেখা যায়। এখানে ওঙ্কারেশ্বর-মন্দির স্বায়ত্তশাসন দপ্তরও আছে। মন্দিরনগরী ত্রিপুরী—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব-পুরীর জল, আলো ও সবরকম কাজের দেখাশোনা এখান থেকেই হয়, অনেকটা মিউনিসিপ্যালিটির মতো। এরপরে একেবারে নদীর দক্ষিণ পাড়ে আছে দুটি প্রাচীন আশ্রম—মার্কণ্ডেয় যোগ আশ্রম ও মার্কণ্ডেয় সন্ন্যাস আশ্রম। প্রথমে আমরা মার্কণ্ডেয় যোগ আশ্রমে গেলাম। একে অন্নপূর্ণা-মন্দির বলেই লোকে বেশি জানে। মন্দিরের বিরাট তোরণের সামনে প্রতিহারীর সুন্দর মূর্তি। তোরণের ওপরে শিব-পার্বতীর বিবাহের মূর্তি বিরাজ করছে। আরো অনেক মূর্তি আছে। মন্দিরের ভিতরে ৩৫ ফুট উঁচু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনের মূর্তি। মূর্তিটির ১৭টি মুখ ও ২০টি হাত। আধুনিক মূর্তিনির্মাণপদ্ধতির এ এক অপরূপ নিদর্শন। এটি সিমেন্টের তৈরি। মন্দিরের পশ্চিমভাগে মার্কণ্ডেয় ঋষির বহু প্রাচীন মন্দিরে প্রাচীন শিবলিঙ্গ ছাড়াও মার্কণ্ডেয় ঋষির কালোপাথরের প্রাচীন মূর্তি আছে। এখানে একটি বিশাল যজ্ঞশালাও আছে। তার পাশে মা অন্নপূর্ণার সুন্দর মূর্তি। এছাড়া রয়েছে ব্যাঘ্রবাহিনী দুর্গা, মহাকালী ও মহাসরস্বতীর মূর্তিও। মন্দিরের ঠিক সামনে নিচে নর্মদার বুকে এক বিশাল শিলা উঠে আছে, এর নাম 'মার্কণ্ডেয় শিলা'। তাতে একটি ছোট শিবলিঙ্গও আছে। প্রবাদ, ঋষিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় নর্মদার বুকে এই শিলায় বসে মাতৃসাধনা করেছিলেন।

দ্বিতীয় দর্শনীয় স্থান সামান্য পশ্চিমে মার্কণ্ডেয় সন্ন্যাস

আশ্রম। এটি দশনামী সন্ন্যাসীদের একটি আশ্রম। তেমন প্রাচীন নয়। ৩০ বছরের পুরনো। রামানন্দ সরস্বতীজী এই আশ্রমের অধ্যক্ষ। এখানে বেশ কিছু সাধু-ব্রহ্মচারী থাকেন। এখানে নিত্য বহু সাধু-ভক্তদের সমাবেশে শাস্ত্রালোচনা, প্রবচনাদি অনুষ্ঠিত হয়। আজকের মতো দীর্ঘ তীর্থদর্শন শেষ করে আমরা ব্রিজ দিয়ে শিবপুরীতে এসে ওঙ্কারেশ্বরকে দর্শন ও প্রণাম করে কুঠিয়ায় ফিরে গেলাম। আগামী কাল হবে আমাদের এই তীর্থের একটি বিশেষ কৃত্য—মান্ধাতা পর্বত পরিক্রমা।

আজ তৃতীয় দিন সকালে ওঙ্কারেশ্বরের নাম স্মরণ করে পরিক্রমা শুরু করলাম। পরিক্রমার বিধি অনুসারে প্রথমে মূল মন্দিরের নিচে কোটিতীর্থের কাছে নর্মদার জল স্পর্শ করে মাকে প্রণাম জানিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে ওঙ্কারেশ্বর-মন্দিরে ভগবান শঙ্করকে স্পর্শ ও প্রণামাদি করে নিচে নেমে এলাম। তারপর গোবিন্দপাদ ও আচার্য শঙ্করকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানিয়ে পশ্চিমমুখে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। প্রথম থামতে হলো ডানদিকে খেড়াপতি হনুমানের মন্দিরে। সুন্দর সিন্দূরচর্চিত মহাবীরের দণ্ডায়মান বিগ্রহে প্রণাম জানিয়ে এই ৮ কিলোমিটার পাহাড়ী চড়াই-উৎরাই পেরোবার জন্য তাঁর কৃপাভিক্ষা করে আবার এগোতে লাগলাম। পথের ধারে ছেড়ে এলাম সীতারামদাস ওঙ্কারনাথজীর মঠ, প্রাচীন কেদারেশ্বর শিবের মন্দির, রামকৃষ্ণ সাধন কুঠির এবং আরো দু-একটি ছোট আশ্রম। এখান থেকে দক্ষিণদিকে নর্মদা নদীর পাড়ে মার্কণ্ডেয় আশ্রম ও সাতপুরা পর্বতের নিচে আশ্রমগুলি মিলিয়ে এক অপূর্ব দৃশ্য।

এরপরে আমরা এসে পৌঁছালাম নর্মদা ও কাবেরী নদীর সঙ্গমের ধারে মান্ধাতা পর্বতের পশ্চিম প্রান্তে। এখানে পাহাড়ের গা ঢালু হয়ে নেমে নদীর সঙ্গমের কাছে মিশেছে। এখানে একটি প্রাচীন মন্দির আছে। নাম 'ঋণমুক্তেশ্বর'। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তৈরি বহু প্রাচীন মন্দির এটি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এর জীর্ণোদ্ধার হয়। ভিতরে নারায়ণের বিগ্রহ, শিবলিঙ্গ ও আরো অনেক কাপড় জড়ানো বিগ্রহ আছে। এখানে একটি প্রবাদ আছে—যদি কেউ তার পূর্বপুরুষের বা তার নিজের অজ্ঞাত ঋণ থেকে মুক্তি পেতে চায় তাহলে এখানে সোয়া পোয়া থেকে সোয়া মন ছোলা দান করতে পারে বা সমমূল্য এখানকার হুণ্ডিতে দিয়ে প্রার্থনা করলে সে ঋণ থেকে মুক্ত হতে পারে।

এরপরে সামনেই দক্ষিণদিক থেকে আগতা নর্মদা ও উত্তরদিকের কাবেরী নদীর পবিত্র সঙ্গম স্পর্শ করে আবার পাড়ে উঠে পূর্বদিকে চড়াই ভেঙে চলা শুরু হলো। এখানে নর্মদা ও কাবেরীর দুটি ছোট মন্দিরে তাঁদের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। আরো বেশ কিছুদূর যাওয়ার পরে পাহাড়ের মাথা দিয়ে আমরা যাওয়া শুরু করলাম। সোজা রাস্তা দুধার ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে। মাঝে মাঝে বাঁদিকে কাবেরী নদী দেখা যাচ্ছে। এবার একটা বহু প্রাচীন তোরণ পার হয়ে গেলাম। ক্রমশ উঁচুদিকে রাস্তা উঠছে, কখনো কখনো বাঁদিকে বহু প্রাচীন পাথরের দেওয়ালের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে। ডানদিকেও বহু ভাঙাচোরা নকশা করা পাথরের টুকরো ছড়িয়ে আছে। বোঝা যায় একসময় এখানে কোন প্রাসাদ ছিল। আরো কিছু পরে রাস্তা একটু চওড়া হয়ে গেল—বেশ খানিকটা খোলা জায়গা, তারই একধারে এক বিশাল দোতলা পাথরের মন্দির। এটি পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত। লেখা আছে, এটি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত। নাটমন্দির ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু মূল মন্দির প্রায় অটুট। আর গর্ভমন্দিরে বিশাল কালোপাথরের প্রায় ৬ ফুট উঁচু শিবলিঙ্গ—নাম 'গৌরী সোমনাথ'। মন্দিরের সামনে একটি বেদিতে বিরাট গ্রানাইট পাথরের নন্দী। এই মন্দির সম্বন্ধে দুটি প্রবাদ আছে। প্রথমটি—কোন প্রাপ্তবয়স্ক দুজন মানুষ দুদিকে হাত দিয়ে এই লিঙ্গের বেড় ধরতে পারবে না। তবে তারা যদি মামা-ভাগনে হয়, তাহলে নাকি ধরতে পারবে। তাই এই মন্দিরকে 'মামা-ভাগনে'ও বলে। আরেকটি প্রবাদ, পুরাকালে এই চকচকে বিরাট লিঙ্গের দিকে তাকালে মানুষ তাদের পরবর্তী জীবনের কি রূপ হবে তা নাকি দেখতে পেত। আওরঙ্গজেব যখন এদিকে সবকিছু ধ্বংস করতে এসে এই মন্দিরের বিশেষত্ব শুনলেন, তখন কৌতূহলবশে এই লিঙ্গের দিকে তাকিয়ে তিনি নাকি একটি শুয়োরকে দেখেছিলেন তাঁর পরবর্তী জীবনের দেহ হিসাবে। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তিনি মন্দিরের সামনের অংশ ভেঙে দিয়ে লিঙ্গটি তেল ঢেলে পুড়িয়ে দেন। তারপর থেকে লিঙ্গের মধ্যে আর কেউ কিছু দেখতে পায় না, সেটি আরো কালো হয়ে গিয়েছে। আমরা এই মহাদেবকে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। চত্বরের বাঁদিকে পথের ধারে একটি লম্বা ঘরের মধ্যে সারি সারি বহু মূর্তির ভগ্নাবশেষ এবং প্রাসাদ ও মন্দিরের অলঙ্করণের ধ্বংসাবশেষ রাখা আছে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণে। এই গৌরী সোমনাথ সম্পর্কে কর্নেল জেমস টড তাঁর একটি গ্রন্থে লিখেছেন, আওরঙ্গজেব এখানে এসে এই মন্দির ভাঙার পরে লিঙ্গের গায়ে আঘাত করলে সেখান থেকে রক্ত ঝরতে থাকে, তখন ভয় পেয়ে সৈন্যরা আর ভাঙতে পারে না।

এখান থেকে বেরিয়ে আবার পথে নামলাম। তার আগে এখানে একটি বাঁকা হয়ে দাঁড়ানো বেশ বড় হনুমান-মূর্তি আছে—এর নাম 'আড়ে হনুমান'। কাছেই একটি গণেশের বিগ্রহ। দুটিই বহু প্রাচীন। মন্দিরও বেশ জীর্ণ। এখান থেকে নিচে নর্মদা যাওয়ার জন্য প্রায় ৩৫০ ধাপের সিঁড়ি নেমে গিয়েছে। এখানে বর্তমানে রাজপরিবারের কুলদেবতা প্রাচীন আশাপুরী দেবীর মন্দিরে সুন্দর দেবমূর্তি আছে। এখান থেকেই সমগ্র ওঙ্কারেশ্বরে জল সরবরাহ করা হয়।

এই মন্দির থেকে কিছুদূর যাওয়ার পরই আরেকটি তোরণ। এর নাম 'চাঁদসূরয দ্বার'। এই সমগ্র অঞ্চলটিকে 'মান্ধাতা কিল্লা' বলে। রাজা মান্ধাতার দুর্গ এখানে ছিল। এই গোটা পাহাড়ে তার বহু ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে। দুর্গে প্রবেশের পাঁচটি তোরণ ছিল। পূর্বদিকে 'ভীম-অর্জুন দ্বার', পশ্চিমদিকে ভগ্নপ্রায় দ্বারটি আমরা দেখেছি, উত্তরদিকে এখন যেটি দেখছি, তার নাম 'চাঁদসূরয দ্বার'। এই দ্বারটি দুটি পাহাড়ের মাঝে। একটি খাড়া পাহাড় বেয়ে সিঁড়ি ভেঙে নামার পর আরেক পাহাড়ের চড়াইয়ে ওঠার প্রথমেই এই দ্বার। এটি খুব উঁচুতে লাল-হলুদ পাথরে তৈরি। দরজায় সুন্দর নকশা খোদাই করা আছে। মনে হয়, যেন কাঠের ওপরে খোদাই করা। এটি পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত। দক্ষিণ দ্বার 'ভৈরব দ্বার'।

চাঁদসূরয দ্বারের আগের পাহাড়ের উৎরাইয়ের মুখে আরেকটি প্রাচীন মন্দির আছে—সীতা-মন্দির। এইসব দেখে অনেক সিঁড়ি ভেঙে আরো ওপরে উঠে আরেকটি অপরূপ স্থাপত্যের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। এটিই সম্ভবত এই মান্ধাতা পাহাড়ের ওপর যতগুলি ভগ্নপ্রায় মন্দির আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও প্রাচীন। এটির নাম সিদ্ধনাথ-মন্দির বা বারোদ্বারী-মন্দির। বেশ কিছুটা সমতল চত্বরে ৮ ফুট উঁচু ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির। গর্ভগৃহের শুধু ছাদটুকু আছে। এর চারদিকে ১২টি দ্বার ছিল, তাই এর নাম 'বারোদ্বারী'। বর্তমানে ৪টি প্রবেশপথ আছে। প্রতিটি পথে অপূর্ব কারুকার্যখোদিত ১৮টি করে ১৪ ফুট উঁচু স্তম্ভ আছে। এই চারটি দ্বার নাটমন্দিরের প্রবেশপথে। মূল মন্দিরের চূড়া নিয়ে সম্ভবত ৫টি শিখর ছিল। স্তম্ভগুলি ও মন্দিরের ছাদের গায়ে পাথরের ওপর অনবদ্য নকশা করা আছে। কতকালের পুরনো তা ইতিহাসও বলতে পারে না। মূল মন্দিরের চত্বরের ভিত্তিতে সারি সারি ৫ ফুট উঁচু হাতির মূর্তির রিলিফ খোদাই করা। নানা ভঙ্গিমায় সুসজ্জিত এই ৫০টি হাতির কোথাও পিঠে মাহুত, কোথাও পায়ের তলায় জীবজন্তু। প্রতিটি হাতিই নিজস্ব ভঙ্গিমায় স্বতন্ত্র। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে এখান থেকে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মাটি খুঁড়ে কিছু তাম্রপত্র, কয়েকটি হাতি ও অন্যান্য প্রত্নবস্তু নাগপুরের কেন্দ্রীয় সংগ্রহালয়ে নিয়ে গিয়েছে। ১৯৩৫-১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে সরকারি ব্যবস্থাপনায় এই মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার হয়ে এটি পুরাতত্ত্ব বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণে আছে। মূল নাটমণ্ডপটি ভেঙে গিয়েছে, কিন্তু তার ভিত্তি ও নানা পাথরের কারুকৃতি চারিদিকে ছড়ানো আছে। এই সিদ্ধনাথ-মন্দিরই এখানকার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সুন্দর স্থাপত্য-নিদর্শন। আজও সমাগত দর্শক অবাক বিস্ময়ে তা দেখেন। নামার পথে আরো দুটি ছোট মন্দিরে ভীমেশ্বর ও মল্লিকার্জুন শিব দেখলাম। এখান থেকেই পরিক্রমার পথ নিচের দিকে নামতে আরম্ভ করেছে। রাস্তার বাঁদিকে কাবেরী নদীর অপর পারে জৈন সাধুদের প্রাচীন আশ্রম দেখা যায়। সিদ্ধনাথ-মন্দিরের ডানদিকে একটি বিশাল গাছের তলায় পাণ্ডবজননী কুন্তীর একটি ভগ্নপ্রায় বিরাট মূর্তি দেখা যায়। এখানে দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত প্রাচীন মান্ধাতা নগরীর পূর্বদিকের প্রবেশদ্বার।

আমরা মান্ধাতা পর্বত পরিক্রমার শেষ পর্যায়ে এসে গিয়েছি। প্রায় ৮ কিলোমিটার পাহাড়ী রাস্তায় উঁচু-নিচু পথ বেয়ে চলতে হয়। চড়াই বেশ কষ্টকর। সিঁড়িভাঙা আরো পরিশ্রমের। যাই হোক, প্রাকৃতিক দৃশ্য সব কষ্ট ভুলিয়ে দেয়। এই সিদ্ধনাথ-মন্দির থেকে নামতে নামতেই সামনে পূর্বদিকে বিস্তৃত স্রোতোময়ী নর্মদাকে দেখা যায়। প্রায় ৩ ঘণ্টায় এই পথ অতিক্রম করা যায়। আমাদের পরিক্রমা শেষ হয়ে আসছে। আমরা ধীরে ধীরে পাহাড়ের গা বেয়ে নামছি। ক্রমে নর্মদা আমাদের বাঁদিকে এবং লোকালয় ডানদিকে এসে গেল। দু-চারটি গুহার মধ্যে কয়েকজন করে সাধুরও দেখা মিলতে লাগল। আমরা মান্ধাতা পর্বতকে প্রণাম জানালাম। স্মরণ করলাম এক পৌরাণিক স্তুতি—"যাবৎ সূর্য উদেতি স্ম যাবৎ চন্দ্র প্রতিষ্ঠতি।/ তৎ সর্বং যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে।।"

ক্রমে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে আবার কোটিতীর্থে নর্মদার জল স্পর্শ করে উঠে এলাম ওঙ্কারেশ্বর-মন্দিরে, যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম। আমার স্বস্থানে ফিরে যাওয়ার দিন আজই। ফেরার সময় মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে। তাই ওঙ্কারতীর্থ পরিক্রমার শেষে প্রাণভরে ওঙ্কারলিঙ্গকে জড়িয়ে ধরে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলাম—"গাত্রভস্মসিতং সিতঞ্চহসিতং হস্তে কপালং সিতং/ খট্বাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চবৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে।। গঙ্গাফেনসিতা জটাপশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতোমূর্ধনি/ সোঽয়ং সর্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং সর্বদা।।"—সর্বশুক্লা রজতশুক্ল দেবাদিদেব মহাদেব আমার অন্তরের সব মলিনতা দূর করে শুদ্ধ কর, শুভ্র কর।

নর্মদা সর্বতীর্থময়ী। এখানে প্রবাদ, 'নর্মদাকে যেত্তা কংকর হ্যায় উত্তে শঙ্কর' অর্থাৎ নর্মদাতীরে যত কাঁকর-পাথর আছে সবই ভোলানাথ শঙ্কর। শঙ্করদুহিতা নর্মদা নিজের শরীরের ঘর্ষণে বাণলিঙ্গের সৃষ্টি করেন। এই দ্বীপ থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে নর্মদার একটি জলপ্রপাত আছে। এর নিচে একটি বড় কুণ্ড আছে। একে 'ধাবড়ী কুণ্ড' বলে। ঐ প্রপাতের জলরাশি প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করায় এই কুণ্ডের মধ্যেই অসংখ্য বাণলিঙ্গের সৃষ্টি হয়। জলের তোড় কমে গেলে আশপাশ থেকে বাণলিঙ্গ সংগ্রহ করা যায়।

আমরা দেবতাকে প্রণাম করে কুঠিয়ায় ফিরে গেলাম। অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরে রাস্তায় নেমে ওঙ্কারেশ্বর মহাদেব ও মান্ধাতাকে তাঁর পর্বত সমেত মনে মনে প্রণাম জানিয়ে সেতু পার হয়ে বিষ্ণুপুরীর বাসস্ট্যাণ্ডে এসে পৌঁছালাম। ❑

নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ ঃ রাগে অনুরাগে*

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

বিতর্কটি অনেক দিনের। স্বামী বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পারস্পরিক সম্পর্ক ঘিরে সেই বিতর্ক। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত করেছিলেন ঃ "রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ সমসাময়িক, উভয়ের জন্ম কলকাতায়—সিমলা ও জোড়াসাঁকো শহরের এ-পাড়া ও-পাড়া এক মাইলের মধ্যে। কিন্তু দুই জনের দুই জগতে বাস ছিল। তাই সমসাময়িক হইয়াও তাঁহারা সমান্তরাল রেখায় চলিয়াছিলেন। জীবনে কাহারও সহিত কাহারও সাক্ষাৎ হয় নাই।"[১] কিন্তু পরে তাঁকে এই সিদ্ধান্ত সংশোধন করতে হয়।

কারণ, পরবর্তী গবেষকরা খুঁজে পেয়েছেন এমন কিছু তথ্য যা নিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করে। যেমন, রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলাবতীর সঙ্গে কৃষ্ণকুমার মিত্রের বিবাহসভায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের যে গায়ক দল রবীন্দ্রনাথের লেখা এবং শেখানো গান গেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে নগেন চট্টোপাধ্যায়, কীর্তনিয়া ডাঃ সুন্দরীমোহন দাশ, কেদারনাথ মিত্র ও অন্ধ চুনীলালের সঙ্গে 'নরেন্দ্র দত্ত মহাশয়'ও ছিলেন।[২] তাছাড়া অল্পবয়স থেকেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে এবং ব্রাহ্মসমাজে নরেন্দ্রনাথের নিয়মিত যাতায়াত ছিল এবং এর অনেক পরে বাগবাজারে নিবেদিতার ১৬নং বোসপাড়া লেনের বাড়িতে আয়োজিত চা-পানের আসরেও বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎ হয়েছিল।

কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে এসবই নাতি-গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ, সমসাময়িক এই দুই যুগন্ধর প্রতিভার মুখোমুখি সাক্ষাৎকার কোনভাবেই কোন দূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারেনি। বিবেকানন্দের দেহাবসানের পর তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের কিছু পরিবর্তন ঘটলেও যতদিন উভয়ে একসঙ্গে জীবিত ছিলেন ততদিন দুজনেই নিজ নিজ মতবাদ ও জীবনবোধে অনড় থেকে সত্যিই 'সমান্তরাল রেখায়' নিজ নিজ পথে চলেছিলেন। দুজনের সম্পর্কের শীতলতায় উভয়ের কারো তরফ থেকেই কোন উষ্ণ স্পর্শ পড়েনি।

নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সম্পর্ক চর্চা করতে গেলে এই প্রেক্ষিত মাথায় রাখা খুব জরুরি। কারণ, তাহলেই একমাত্র অনুভব করা যাবে, 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের' নিবেদিতার সঙ্গে 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি'র বিরোধী রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা স্থাপন মোটেও সহজ-স্বাভাবিক ছিল না। বস্তুত, নানা পরিবেশ-পরিস্থিতির ঘটনাপ্রবাহে তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে প্রায়শই জোয়ার-ভাঁটার খেলা চলেছিল। পারস্পরিক ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার সঙ্গে ভিন্ন বিশ্বাসের দুই পরস্পরবিরোধী শক্তিশালী স্রোত বারেবারে তাঁদের সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে। ছড়িয়ে থাকা নানা তথ্য, মন্তব্য, পত্রাংশকে গেঁথে নিয়ে নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যোগাযোগকে এই নিবন্ধে একটা কালানুক্রমিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

■ আলাপ-পর্ব

ইওরোপ উপকূল থেকে যাত্রা শুরু করে 'মম্বাসা' জাহাজ ১৮৯৮ সালের ২৮ জানুয়ারি কলকাতা এসে পৌঁছাল। মার্গারেট দেখলেন, স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য জেটিতে অপেক্ষা করছেন।

স্বামীজী তাঁকে আগেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, ভারতবর্ষের জন্য কাজ করতে হলে এখানে "তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে।" এদেশের মানুষ ও তার জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে এবং সেইসঙ্গে এদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এক নিজস্ব পরিচিতি গড়ে তুলতে হবে। নিজের কর্মস্থলে মার্গারেটকে এমন স্বাবলম্বী করে তোলার প্রস্তুতি হিসাবে স্বামীজী তাঁর বাঙলা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন এবং এখানকার কিছু বিশিষ্ট মানুষজনের সঙ্গে তাঁর আলাপের সুযোগ করে দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতার বেশ কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়ে গেল। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুজন হলেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু এবং কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রথম দর্শনেই কবির চেহারা ও ব্যক্তিত্বে মার্গারেট আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত দিনলিপিতে লেখা মন্তব্য থেকে একথা জানা যায়।[৩] অপরপক্ষে প্রথম পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া কিন্তু তেমন ইতিবাচক ছিল না। পরবর্তী কালের স্মৃতিচারণে তিনি নিজেই লিখেছেন ঃ "ভগিনী নিবেদিতার [তখনো মিস মার্গারেট নোবল] সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয়, তখন তিনি অল্পদিন মাত্র ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম,

* ১৮৬৭ সালের ২৮ অক্টোবর ভগিনী নিবেদিতার জন্ম। সেকথা স্মরণ করে এই রচনাটি নিবেদিত। প্রবন্ধের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব। অনেকে প্রাবন্ধিকের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়তো হবেন না, তবু বিষয়টি নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়।—সম্পাদক

সাধারণত ইংরেজ মিশনারি মহিলারা যেমন হইয়া থাকেন ইনিও সেই শ্রেণীর লোক; কেবল ইঁহার ধর্মসম্প্রদায় স্বতন্ত্র।"[৪]

এই ধারণার বশেই রবীন্দ্রনাথ মার্গারেটকে তাঁর মেয়ের ইংরেজি শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। লিজেল রেমঁ লিখেছেন ঃ "রবি ঠাকুর তাঁর ছোট মেয়েকে [মীরা?] ইংরেজি শেখাবার জন্য নিবেদিতাকে অনুরোধ করেন। নিবেদিতা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, 'সে কি! ঠাকুরবংশের মেয়েকে একটি বিলাতী খুকি বানাবার কাজটা আমাকেই করতে হবে?' রাগে দুই চোখ জ্বলে ওঠে নিবেদিতার। 'ঠাকুরবাড়ির ছেলে হয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতায় আপনি এমনই আবিষ্ট হয়েছেন যে, নিজের মেয়েকে ফোটবার আগেই নষ্ট করে ফেলতে চান।' "[৫]

আলাপের প্রথম পর্বে শুধু তাঁর শিক্ষাদর্শের সঙ্গেই নয়, নিজ মত প্রকাশে মার্গারেটের আবেগদীপ্ত সঙ্কোচহীনতার সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ পরিচিত হয়ে গেলেন।

১১ মার্চ ১৮৯৮ স্টার থিয়েটারে রামকৃষ্ণ মিশনের এক সভায় সভাপতি স্বামী বিবেকানন্দ দেশীয় সমাজের সঙ্গে মার্গারেটের পরিচয় করিয়ে দেন। ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় অধ্যাত্ম-ভাবনার বিস্তার সম্পর্কে মার্গারেট ঐ সভায় যে-বক্তৃতা দেন, শ্রোতাদের তা মুগ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না হলেও এই বক্তৃতাসভা সার্বিকভাবে দেশীয় বুদ্ধিজীবী মহলের কাছে তাঁর আকর্ষণ ও গ্রহণযোগ্যতা অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়।

মে মাসে কলকাতায় প্লেগের আবির্ভাব হলে তাঁর অন্য পরিচয় পাওয়া গেল। ২৫ মার্চ স্বামীজী মার্গারেটের নতুন নামকরণ করেছিলেন 'নিবেদিতা'। দেশীয় সমাজ এই সময়েই বুঝল সে-নামকরণের সার্থকতা। সাধারণ মানুষকে এই সংক্রামক মারণ রোগ সম্পর্কে সচেতন করতে তিনি তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন, প্যামফ্লেট রচনা করে বিতরণ করলেন। আর এই কাজে সঙ্গী হিসাবে তিনি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতিচারণ করেছেন ঃ "সেইসময় কলকাতায় লাগল প্লেগ। চারদিকে মহামারী চলছে, ঘরে ঘরে লোক মরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। রবিকাকা এবং আমরা এবাড়ির সবাই মিলে চাঁদা তুলে প্লেগ হাসপাতাল খুলেছি, চুন বিলি করছি। রবিকাকা ও সিস্টার নিবেদিতা পাড়ায় পাড়ায় ইন্সপেকশনে যেতেন।"[৬]

জোর করে সকলকে প্লেগের টীকা দেওয়া নিয়ে কলকাতায় দাঙ্গা বাঁধে ৪ মে। জনগণের মধ্যে শুভবোধ জাগ্রত করতে রবীন্দ্রনাথ এবং 'এবাড়ির সবাই' কেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তা নিবেদিতা নিজেই ৮ মে ১৮৯৮ 'Calcutta Notes by an English Lady' রচনায় লিখেছেন ঃ "কয়েকটি বড় হিন্দু পরিবার, বিশেষত ঠাকুর পরিবার দৃঢ়তার সহিত এই বিক্ষোভ প্রশমন করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু প্লেগের টীকা গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়, এবং মহামারী দেখা দিলেও জনসাধারণের অভিমতকে সম্মান জানানো হইবে—এই দুই সিদ্ধান্ত জানাইয়া শনিবারের দুপুরে সরকারি বিজ্ঞপ্তি বাহির না হওয়া অবধি বিক্ষোভ প্রশমিত করা যায় নাই।"[৭]

অবশ্য ১৮৯৮ সালে কলকাতায় প্লেগ যতটা আতঙ্ক ছড়িয়েছিল, আক্রমণ সে-অনুপাতে বিশেষ ছড়ায়নি। কিন্তু ১৮৯৯-এর মার্চ মাসে কলকাতায় ভয়াবহ আকারে প্লেগ মহামারী দেখা দেয়। সেইসময় সেবাব্রতী ও সংগঠকের ভূমিকায় নিবেদিতার আত্মোৎসর্গ চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। কিন্তু এই দ্বিতীয় মরসুমে সঙ্গী হিসাবে তিনি রবীন্দ্রনাথকে পাননি। তিনি সেসময় সম্ভবত ত্রিপুরায় সেখানকার মহারাজের আতিথ্য গ্রহণ করছেন।[৮]

যাহোক, সে পরের কথা। আমরা কলকাতায় শিক্ষিত মহলে নিবেদিতার পরিচিত হওয়ার প্রসঙ্গে ফিরে যাই। এই পরিচয় আরো সুগম হলো মিস ম্যাকলাউড আয়োজিত সংবর্ধনাসভার মাধ্যমে। ১৮৯৮-এর ডিসেম্বরে উত্তর ভারত ভ্রমণ শেষে মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস ওলি বুল কলকাতায় আমেরিকান কনসালের অতিথি হন। কনসাল-পত্নীর মাধ্যমে তাঁরা রবীন্দ্রনাথ এবং আরো কিছু বিশিষ্ট ব্রাহ্ম ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হন। এই নতুন ব্রাহ্ম বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে মিস ম্যাকলাউড নিবেদিতাকে সংবর্ধনা জানান। এঁদের মধ্যে ছিলেন ঠাকুর পরিবারের অনেকে এবং সস্ত্রীক অধ্যাপক ডঃ প্রসন্নকুমার রায়, জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ।

এই সভার ঠিক আগে নভেম্বর ১৮৯৮-তে নিবেদিতার বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়েছে। সেখানকার ছাত্রীদের এবং বেলুড় মঠের নবদীক্ষিতদের শিক্ষার কাজে নিযুক্ত রয়েছেন নিবেদিতা। সেইসময় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তিনি ব্রাহ্মসমাজে 'শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। এই বক্তৃতাসভায় উপস্থিত থাকতেন শিক্ষিত ব্রাহ্ম মহিলারা, যাঁরা তখন স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছিলেন। যেমন—কেশবচন্দ্রের দুই মেয়ে সুনীতি দেবী ও সুচারু দেবী, রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ও ভাগনি সরলা ঘোষাল, জগদীশচন্দ্রের বোন লাবণ্যপ্রভা বসু প্রমুখ।

এই প্রসঙ্গে সরলা ঘোষালের পরিচয় কিছু বিশেষভাবে দিয়ে রাখা প্রয়োজন। তিনি ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী ও জানকীনাথ ঘোষালের কন্যা। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা হিসাবে সেকালের শিক্ষিত সমাজে তাঁর বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই বিদূষী ভাগনিকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আবার স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গেও তাঁর ভাল পরিচয় ছিল। স্বামীজী প্রসঙ্গে তাঁর 'নিরাশা' প্রকাশ ও তা 'প্রত্যাহার'-এর সূত্রে ১৮৯৭-এর প্রথমার্ধেই এই বাঙালি মহিলার অকপট ভাষণ ও তেজস্বিতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন বিবেকানন্দ। নিবেদিতার মাধ্যমে এই সংযোগ পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হয়। আর সরলা ঘোষালের মাধ্যমেই নিবেদিতার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির যোগাযোগের পথ সুগম হয়।

মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার চিঠিতে দেখা যায়, ১০ জানুয়ারি ১৮৯৯ সরলা দেবী নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের বাড়িতে দেখা করতে আসেন। সরলাকে তাঁর "lovely—so gentle and thoughtful and really loving" বলে মনে হয়।[৯] ঐ চিঠিতেই জানা যাচ্ছে, ১১ জানুয়ারি তিনি আবার এসেছেন—"সরলা ঘোষাল এইমাত্র ঘণ্টা দুই কাটাইয়া গেলেন।" নিবেদিতা-সরলা দেবী এই যোগাযোগ প্রসঙ্গে লিজেল রেমঁ লিখেছেন : "সরলা ঘোষাল ঠাকুরবাড়ির এক মহিলা, এর মধ্যে অনেকবার বাগবাজারে [নিবেদিতার বাড়িতে] এসেছেন। [নিবেদিতার] নতুন বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা বাস্তবে কি রূপ ধরছে তাই দেখতে আসতেন। [ঠাকুরবাড়ি/ব্রাহ্মসমাজে?] ফিরে গিয়ে শতমুখে নিবেদিতার প্রশংসা করতেন। শুনে ব্রাহ্ম-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা 'ফ্রি এডুকেশন' সম্বন্ধে নিবেদিতার মতামত শোনবার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন।"[১০]

শুধু সরলা ঘোষালের সঙ্গে নয়, ব্রাহ্মসমাজের অনেকের সঙ্গে নিবেদিতার যে ভাল আলাপ ছিল তা এখন ক্রমশ আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগল।

বিশেষত ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে। ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের ঠাটবাট, পরিশীলিত আভিজাত্য, পাশ্চাত্য আদব-কায়দা ও শিক্ষিত বৈদগ্ধ্যের মাঝে আইরিশ বুদ্ধিজীবী মার্গারেট অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। ঠাকুরবাড়ির সুর যেন তাঁর কম্পাঙ্কের অনেক কাছাকাছি বাজত। অপরপক্ষে, জীবনযাত্রার এই বাহ্য চটক দ্বারা স্বামীজী মোটেও প্রভাবিত ছিলেন না। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন : "নরেন্দ্রনাথের মধ্যে যদি কখনো কিছু আভিজাত্য, প্রীতি থেকে থাকে—দরিদ্র অর্ধনগ্ন (বা নগ্ন) অশিক্ষিত কালীপূজারী রামকৃষ্ণ পরমহংস তা ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন—তথাকথিত আচরণের শালীনতা, পরিমার্জনা বা ভাষার ভব্যরীতির সঙ্গে ধর্মের নিত্য সম্পর্ক নেই—যথার্থ ধর্ম মানুষকে পাগল করে দেয়, আর পাগলের গায়ের কাপড়, মুখের ভাষায় আগল থাকে না। কিন্তু ঠাকুর পরিবার আর যাই পারুন, আভিজাত্যকে হারাতে পারেন না; পরিমার্জনাকে তাঁরা জীবনের অত্যাজ্য আচার করে তুলেছিলেন।... ঠাকুর পরিবারে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অপূর্ব ঔদাসীন্য সাধারণভাবে বজায় ছিল।"[১১] সুতরাং সেই ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় স্বামীজীর নিশ্চয় বিশেষ রুচি ছিল না।

কিন্তু দেশীয় পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দকে স্বামীজী প্রাথমিক অবস্থায় নিবেদিতার ওপর বড় একটা চাপিয়ে দিতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন, নিজস্ব বোধ এবং অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরেই নিবেদিতা যাকিছু শ্রেয়, যাকিছু অভিপ্রেত তাকে বেছে নিন। তাতে তাঁর 'নিজের পায়ে' দাঁড়াবার ক্ষমতা অর্জিত হবে। আর তাছাড়া নিবেদিতার মতো ব্যক্তিত্বশালিনীকে পদে পদে পরামর্শ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা। নিবেদিতা তাই নির্দ্বিধায় শিক্ষিত ব্রাহ্মদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বজায় রাখছিলেন। তাঁর সে-অভিজ্ঞতা যে সতত সুখের হচ্ছিল তা অবশ্য নয়। যেমন, ৯ জানুয়ারি ১৮৯৯ মিস ম্যাকলাউডকে এক দীর্ঘ পত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ঘনিষ্ঠ ডঃ প্রসন্নকুমার রায়ের স্ত্রী সরলা রায় সম্পর্কে লিখেছেন : "শ্রীমতী পি. কে. রায় এক দেবদূতী—এবং আমি দেখিতেছি তিনি বরং এক rebellious sheep in Mr. [Shibnath?] Shastris' fold." ১১ জানুয়ারি লেখা এই চিঠিরই পরবর্তী অংশে তিনি লিখেছেন : "গতকাল [প্রসন্নকুমার] রায়দের সহিত চা-পান ও ডিনার করিয়াছিলাম এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার ভাবান্দোলন সম্পর্কে [তাঁহাদের] বিরূপ সমালোচনায় লজ্জাকরভাবে মেজাজ হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কারণ স্বামী [বিবেকানন্দ] বলিয়া থাকেন যে [এরূপ পরিস্থিতিতে] যোদ্ধৃভাবে কোনরূপ ফললাভ হয় না।"[১২]

■ "ব্রাহ্মদের মধ্যে অনুপ্রবেশ কর।"

কোন্ ফললাভের কথা ভাবছেন নিবেদিতা? পরবর্তী চিঠিপত্রে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয় যে, এইসময় থেকেই নিবেদিতার মনে এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা দানা বাঁধে। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের শিক্ষিত তরুণতর সম্প্রদায়কে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের পথে আকৃষ্ট করতে চান। ব্রাহ্মদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা করতে করতেই সম্ভবত এই সম্ভাবনার কথা তাঁর মনে আসে।

আপাতদৃষ্টিতে এই পরিকল্পনা যথেষ্ট চিন্তাপ্রসূত এবং যৌক্তিক। দেশীয় সমাজে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রভাব ছড়াতে গেলে বাঙালি শিক্ষিত যুবসমাজকে প্রথমে প্রভাবিত করা বিশেষ প্রয়োজন, সেকথা অনস্বীকার্য। আর সেসময় কলকাতার শিক্ষিত সমাজের এক বড় অংশই ব্রাহ্ম

মনোভাবাপন্ন। অপরদিকে ঠাকুর পরিবার-কেন্দ্রিক আদি ব্রাহ্ম সমাজের তখন মুমূর্ষু অবস্থা। তাঁরা নিজ অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে বিভিন্ন ভারতীয় ধর্মগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করছেন।[১৩] সুতরাং উভয় তরফের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য হওয়ায় নিবেদিতা এব্যাপারে আদর্শ মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিতেই পারেন।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তখন আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক। সুতরাং নিবেদিতার এই উদ্যোগ সার্থক হলে বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগের পথও মসৃণ হয়। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্ম সমাজের সাংগঠনিক ভারপ্রাপ্ত ছিলেন বলেই তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগের আলোচনায় ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে নিবেদিতার আদান-প্রদান গুরুত্বসহ আলোচনা করতেই হবে।

কিন্তু উদ্দেশ্য যতই দূরপ্রসারী হোক, এই পরিকল্পনার শিকড়েই রয়েছে এক বিপুল ভ্রান্তি। ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষে নিবেদিতার শিক্ষাদর্শ বা বিবেকানন্দের ভারত-জাগরণ মন্ত্র অভিপ্রেত হতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবের সঙ্গে তাঁদের নিরাকারবাদী বিশ্বাসের এক অসেতুসাধ্য দূরত্ব। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্ম-বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ তথা ব্রাহ্ম সমাজের ধর্মবিশ্বাস হইতে এত পৃথক যে, কাহারও পক্ষে কাহারও মতের সমর্থন আশা করা যায় না।"

অনভিজ্ঞতার কারণেই নিবেদিতা এই মূল বিষয়টিকে উপেক্ষা করেছেন অথবা বুঝতে পারেননি। কিন্তু স্বামীজী? তিনি তো শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের আগে থেকেই ব্রাহ্ম সমাজ ও ঠাকুরবাড়ি—উভয়ের সঙ্গেই ভালভাবে পরিচিত এবং সেইসময় থেকেই ব্রাহ্ম-আন্দোলনের সামাজিক দিক অর্থাৎ সমাজসংস্কারের দিক সম্বন্ধে আগ্রহ থাকলেও তাঁর পরবর্তী কালের কথা থেকে বোঝা যায়, এর ধর্মীয় দিক সম্বন্ধে তিনি কোনদিনই বেশি উৎসাহী ছিলেন না।[১৪] তাহলে তিনি কেন নিবেদিতাকে আগাম সতর্ক করে দেননি? তিনি নিবেদিতাকে সময়ে নিবৃত্ত করলে অনেক আশাভঙ্গ এবং ভুল বোঝাবুঝি অঙ্কুরেই নষ্ট হতে পারত। কিন্তু স্বামীজী সে-চেষ্টা করেননি।

করেননি বোধকরি সেই একই কারণে, নিজস্ব আপত্তি থাকা সত্ত্বেও যে দুই কারণে তিনি নিবেদিতার ঠাকুরবাড়ি-ঘনিষ্ঠতায় প্রাথমিকভাবে কোন বাধা দেননি—নিবেদিতার স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্ব এবং তাঁকে দেশীয় সমাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞ করে তোলাই ছিল স্বামীজীর পরিকল্পনা।

এমনকি, ব্রাহ্মদের প্রভাবিত করার ব্যাপারে নিবেদিতার আবেগতাড়িত সঙ্কল্প শেষপর্যন্ত স্বামীজীর অনুমোদনও পেয়েছিল। সেদিনটি ছিল ২৩ জানুয়ারি ১৮৯৯। উচ্ছ্বসিত নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে সেদিন লিখলেন ঃ "Your letter entered in a blaze of glory as I returned from an hour with the king [স্বামী বিবেকানন্দ]—গতকাল রাত্রে তিনি ফিরিয়া আজ সকাল ৮টায় আমায় ডাকাইয়াছিলেন। যথার্থই দেবোপম—তাঁহাকে অপূর্ব দেখাইতেছিল—যদিও বলিলেন, গত তিন রাত তীব্র শ্বাসকষ্টে কাটিয়াছে, তবু তিনি full of plans। আমি তাঁহাকে এমন মেজাজে পূর্বে কখনো দেখি নাই—Saradananda and I are to carry on a crusade, বিভিন্ন মঞ্চে বক্তৃতা করিয়া ক্যালকাটাকে উদ্দীপিত করিতে হইবে। 'Make inroads into the Brahmos'."[১৫]

এইবার নিবেদিতার এতটা আবেগ-আপ্লুত হওয়ার কারণ বোঝা গেল—ব্রাহ্মদের প্রভাবিত করার ব্যাপারে তাঁর পরিকল্পনা এতদিনে আংশিকভাবে হলেও স্বামীজীর সায় পেল। তাই নিবেদিতা চারপাশে এক 'গৌরবের বর্ণচ্ছটা' অনুভব করতেই পারেন। "ব্রাহ্মদের মধ্যে অনুপ্রবেশ কর"—কথাটি নিবেদিতা উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে রাখলেও স্বামীজী ঠিক কী অর্থে এটি বলেছিলেন তা বোঝা শক্ত। কিন্তু নিবেদিতা কোন্ আগ্রাসী অর্থে কথাটি নিয়েছেন তা তাঁর 'Crusade' শব্দপ্রয়োগেই স্পষ্ট। তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন, মধ্যযুগে মুসলিমদের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য খ্রিস্টানদের নিরলস অভিযান বা ধর্মযুদ্ধকেই আদি অর্থে 'Crusade' বলা হয়।

কিন্তু স্বামীজী কি সত্যিই এমন পরিকল্পনায় সায় দিতে পারেন? এই নিয়ে শুধু আমাদের নয়, স্বয়ং নিবেদিতারও সংশয় ছিল। তাই পরের বাক্যেই তিনি লিখেছেন ঃ "ইহা কি [স্বামীজীর] এক সাময়িক ঝোঁক? ব্রাহ্মদের সহিত আমার মেলামেশার ব্যাপারে তাঁহার গভীর আগ্রহের ফলেই কি এরূপ নির্দেশ? আমি ঠিক বলিতে পারি না।"

বোধহয় নিবেদিতার ধারণাই ঠিক। তাঁর বারংবার আগ্রহ প্রকাশে স্বামীজী হয়তো সাময়িকভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন ঃ "ব্রাহ্ম সমাজের এবং ঠাকুরবাড়ির লোকজনের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় ও সৌহার্দ্যের সুযোগকে নিবেদিতা ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন—ঐ মহলের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের যোগাযোগ ঘটানোর ব্যাপারে। স্বামীজী এই সহযোগিতা চেষ্টার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ আশান্বিত ছিলেন মনে হয় না, তবে তিনি নানা মুডে থাকতেন এবং একদিন উদ্দীপনার মুহূর্তে নিবেদিতাকে বলে বসেছিলেন—'ব্রাহ্মদের মধ্যে ঢুকে পড়।' এই সবুজ সঙ্কেতের জন্যই যেন নিবেদিতা অপেক্ষা করছিলেন।"[১৬]

স্বামীজী নিবেদিতাকে তাঁর সব ব্রাহ্ম বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে এক টি-পার্টির আয়োজন করতে বললেন, যাতে তিনিও আসবেন এবং তাঁদের সঙ্গে কথা বলবেন। নিমন্ত্রিতদের তালিকা যেন নিবেদিতার তৈরিই ছিল : সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসু, সস্ত্রীক ডঃ প্রসন্নকুমার রায়, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, সরলা ঘোষাল ও তাঁর মা স্বর্ণকুমারী দেবী এবং অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ম্যাকলাউডকে লেখা পূর্বোক্ত চিঠিতেই নিবেদিতা জানাচ্ছেন, এমন এক আয়োজনের সুযোগ পেয়ে তিনি কতটা উত্তেজিত—"I feel excited at being a hostess once more—with such a very big lion on show." 'A very big lion' বলতে নিশ্চয়ই স্বামীজী। তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে, তাঁকে দেখিয়েই তো তিনি তাঁর ব্রাহ্ম বন্ধুদের প্রভাবিত করতে চান।

নিবেদিতা সেদিনের এক বিশেষ মুহূর্ত সম্পর্কে একটি চিঠিতে লিখেছেন, স্বামীজীর সঙ্গে সেদিনের এই ঘণ্টাখানেকের আলোচনার মাঝেই "শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে [প্রসন্নকুমারদের?] বিরূপ সমালোচনার কথা শুনিয়া তিনি [স্বামীজী] জ্বলিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, আমি মেজাজ হারাইয়া কিছু ভুল করি নাই। এই সময় তাঁহাকে দেখিয়া ভারি ভাল লাগিতেছিল।"[১৭]

অর্থাৎ ব্রাহ্মদের মধ্যে অনুপ্রবেশের আগ্রহ যতই ঐকান্তিক হোক, এব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবাদর্শের সঙ্গে কোনপ্রকার সমঝোতা যে স্বামীজী বরদাস্ত করবেন না, তা খুব স্পষ্ট। কিন্তু নিবেদিতা সেকথা বুঝতে পারেননি বা বুঝতে চাননি। চা-পান সভার ফলাফল সম্পর্কে তিনি এতই আশাবাদী ছিলেন যে, ম্যাকলাউডকে ঐ চিঠিতেই লিখেছেন : "[স্বামীজীর] নিজের শহরে কিছু কাজ করিবার উপযুক্ত সময় বুঝি এইবার অবশেষে উপস্থিত হইয়াছে।"

নিবেদিতার এই অতি-আশাবাদ বোধহয় স্বামীজীর মধ্যেও সাময়িকভাবে কিছুটা সংক্রামিত হয়ে থাকবে। কারণ, দুদিন পর নিবেদিতা আবার লিখছেন : "তিনি [স্বামীজী] বারংবার টি-পার্টির ব্যাপারে খোঁজ লইতেছেন —আমার ধারণা সেটি আগামী সোমবার করা যাইবে।"[১৮]

[ক্রমশ]

সূত্রনির্দেশ

১ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৪র্থ খণ্ড, মণ্ডল বুক হাউস, ১৩৮৭, পৃঃ ১৯৭
২ বিবেকানন্দ-জীবনীর উপাদান-সংগ্রহ—ডঃ কালিদাস নাগ, 'উদ্বোধন', মাঘ ১৩৬৮, পৃঃ ২২
৩ ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ১৯৯৮, পৃঃ ৩১৫
৪ ভগিনী নিবেদিতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পরিচয়', রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃঃ ৫৩২
৫ নিবেদিতা—লিজেল রেমঁ (অনুবাদ—নারায়ণী দেবী), উমাচল প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৬২, পৃঃ ২৬৪
৬ অবনীন্দ্র রচনাবলী—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১ম খণ্ড, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৬৫, পৃঃ ৩০৬
৭ Letters of Sister Nivedita, Edited by Sankari Prasad Basu, Vol. I, Nababharat Publishers, 1982, p. 28
৮ রবিজীবনী—প্রশান্তকুমার পাল, ৪র্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৫, পৃঃ ২২৩
৯ Letters of Sister Nivedita, Vol. I, p. 41
১০ নিবেদিতা—লিজেল রেমঁ, পৃঃ ২৬১
১১ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৭৬
১২ Letters of Sister Nivedita, Vol. I, p. 40
১৩ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৯৬
১৪ ঐ, পৃঃ ১৬৯
১৫ Letters of Sister Nivedita, Vol. I, p. 31. বোসপাড়া লেন থেকে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা এই চিঠিতে নিবেদিতা কোন তারিখ দেননি, শুধু লেখা 'Monday Evening'। 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ'-এর চতুর্থ খণ্ড এবং 'Letters of Sister Nivedita'-র প্রথম খণ্ডে গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এই চিঠির তারিখ অনুমান করেন—১.১.১৮৯৯। কিন্তু নিম্নোক্ত কয়েকটি কারণে চিঠিটি ২৩.১.১৮৯৯ লেখা বলে মনে হয় : (১) ১ জানুয়ারি ১৮৯৯ ছিল রবিবার, (২) চিঠিতে পূর্বরাত্রে স্বামীজীর ফেরার কথা আছে। দেওঘর থেকে তিনি ২২ জানুয়ারি রাত্রে ফিরেছিলেন। (৩) চিঠিটিতে মিস ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা লিখছেন : "As I sit writing this you are probably in or near Genoa."—ম্যাকলাউড ও শ্রীমতী বুল ৫ জানুয়ারি ফেরার জাহাজে বোম্বাই ত্যাগ করেন। (৪) চিঠিতে তিনি লিখেছেন : "He quite fired up when I told him of criticism on Sri R. K. [Ramakrishna] and said I was quite right to lose my temper." এখানে সম্ভবত ড. প্রসন্নকুমার রায়ের সঙ্গে তাঁর পূর্বোক্ত ১০ জানুয়ারির কথা-কাটাকাটির কথাই বলা হচ্ছে।
১৬ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৯৬
১৭ Letters of Sister Nivedita, Vol. I, p. 31
১৮ Ibid., p. 34

নিবেদন : এই প্রবন্ধে নিবেদিতা-রচনার প্রচলিত কথ্য বাঙলা অনুবাদ ব্যবহার করা হয়নি। শুধু সাধু ভাষায় অনুবাদই নয়, কিছু বাক্য বা বাক্যাংশ অবিকল ইংরেজিতে রেখে দেওয়াও হয়েছে। এতে লেখিকার ভাষা ও মেজাজকে হয়তো কিছুটা ধরা যাবে।

শুধু বহিরঙ্গের এই পরিবর্তনই নয়, এই ভাবানুবাদে প্রচলিত অন্যান্য অনুবাদের সঙ্গে কখনো কখনো কিছু অর্থভেদও ঘটে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে 'Concise Oxford English Dictonary' এবং গৌরীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত 'Everyman's Dictionary' দ্রষ্টব্য।—**লেখক**

এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গে কিছু কথা

'উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪০৭ সংখ্যায় জলধিকুমার সরকারের 'সৃষ্টিতত্ত্ব ও প্রাণীর ক্রমবিকাশঃ বিজ্ঞানমতে ও বেদান্ত দৃষ্টিতে' প্রবন্ধটি কোন কোন 'উদ্বোধন'-পাঠকের মনে কিছু প্রশ্ন তুলেছে। প্রবন্ধটি সুলিখিত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ, কিন্তু বিষয়টি জটিল ও অত্যন্ত বিতর্কমূলক। কারণ, বিশ্বসৃষ্টি এবং পৃথিবীতে প্রাণসৃষ্টি সম্বন্ধে বেদ, উপনিষদ্ এবং সংহিতার যুগ থেকে নানা বিতর্কিত এবং আপাত বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। ঋগ্বেদ, তৈত্তিরীয় সংহিতা, তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, সাংখ্য দর্শন ইত্যাদি প্রাচীন ভারতের গ্রন্থরাজিতে বিশ্বসৃষ্টির এবং আকাশ, ভূমি, জল, বায়ু ইত্যাদি সৃষ্টির পরম্পরা নিয়ে নানারকমের মত রয়েছে। এগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যাবে বৈদ্যনাথ বসু এবং রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারীর লেখা 'Vedic Astronomy : its relevance today' প্রবন্ধে (দ্রঃ Bulletin of the Ramakrishna Mission Institute of Culture, June & July 2001)। এছাড়া সৃষ্টি এবং প্রলয়ের কথা রয়েছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের ৭-৮ নং শ্লোকে, উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-এর ৪২ পৃষ্ঠায় এবং আরো বহু শাস্ত্রগ্রন্থে ও পুরাণে। উপরি উক্ত মতবাদগুলি সবই ভারতীয় দর্শনের মূলধারার অন্তর্ভুক্ত। এই সবগুলির মতেই সৃষ্টির পিছনে একজন সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা এবং হাত রয়েছে—তিনি কোথাও 'ব্রহ্ম', কোথাও 'আত্মা', কোথাও 'পুরুষ' আবার কোথাও 'আদ্যাশক্তি মহামায়া'।

আধুনিক জড়বিজ্ঞানেও বিশ্বসৃষ্টি বিষয়ে অনেক তত্ত্বের আলোচনা রয়েছে, কিন্তু সেসব নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্কেরও শেষ নেই। এইসব বিজ্ঞানীরা অবশ্য একটি বিষয়ে একমত, তা হলো—বিশ্বসৃষ্টি এবং পৃথিবীতে জীবনসৃষ্টি দুই-ই জড়পদার্থের মধ্যে সংঘটিত আকস্মিক দুর্ঘটনার (accident) ফল, এর পিছনে কোন সৃষ্টিকর্তা বা তাঁর ইচ্ছার কোন অস্তিত্ব এঁরা স্বীকার করেন না। জড় এবং জীবনের মধ্যে কোন 'missing link'-এর অস্তিত্বের কথাও এঁরা মানেন না। এঁরা বানরকে দিয়ে শেক্সপিয়ারের সনেট লেখাবার জন্য বরং লক্ষ লক্ষ বছর চেষ্টা চালিয়ে যাবেন, কিন্তু লেখার টেবিলে শেক্সপীয়ারকে বসতে দেবেন না (দ্রঃ স্যার জেমস জীন্সের প্রবন্ধ 'The dying Sun')। এই বিপুল পরিমাণ চেষ্টার ফলে যে পুঞ্জীভূত আবর্জনার (debris) সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্য থেকে সত্যটুকুকে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব। এঁরা বলেন, সেই আকস্মিক দুর্ঘটনার মুহূর্তেই মহাকালের জন্ম হয়েছে, তার আগে মহাকালের কোন অস্তিত্বই ছিল না। হাস্যকর নয় কি? সময় অনন্ত, কিন্তু অনাদি নয় এবং সে এক দুর্ঘটনার সন্তান! শুধু বিতর্ক আর বিতর্ক—বিজ্ঞানীরা হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে সব হয়রান হয়ে গেলেন, কিন্তু ৭০-৭৫ বছর ধরে গভীর অনুসন্ধান করেও হাব্‌ল-এর ধ্রুবকের মান (Hubble's constant) ঠিকমতো জানতে পারেননি, যার ওপর নির্ভর করছে মহাবিশ্বের বর্তমান বয়স, এর বিস্তার এবং অন্যান্য সব গুরুতর প্রশ্নের উত্তর। এইসব বিতর্কের সমাধানসূত্র খুঁজতে গেলে একটি গোটা বই হয়ে যাবে। বর্তমান আলোচনায় সেই সমাধান খোঁজা উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সূর্যের সৃষ্টি, তার বিবর্তন, পৃথিবীর বয়স ইত্যাদি বিষয়ে যে কোন কোন পাঠকের মনে প্রশ্ন জেগেছে ('উদ্বোধন'-এর শ্রাবণ ১৪০৮ সংখ্যার ৪৮১ পৃষ্ঠায় হরনাথ ভট্টাচার্য এবং ভাদ্র ১৪০৮ সংখ্যার ৫৫০ পৃষ্ঠায় অগ্নিভ দাসের চিঠি দ্রষ্টব্য), সেবিষয়ে খুব সংক্ষেপে কিছু আলোকপাতের চেষ্টাই বর্তমান চিঠির উদ্দেশ্য।

নক্ষত্রের জন্ম, বিবর্তন এবং মৃত্যু (Life cycle of stars) সম্বন্ধে যেসব তত্ত্ব বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন তা বর্তমানে জ্যোতির্পদার্থবিদ্যার (Astrophysics) একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং গবেষণার বিষয়। মহাকাশের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে কোটি কোটি নক্ষত্রজগৎ (Galaxy) এবং এইসব নক্ষত্র-জগতের প্রতিটিতে রয়েছে কয়েক হাজার কোটি নক্ষত্র, অজস্র পরিমাণ গ্যাস এবং ধূলিরাশি। এক-একটি প্রমাণ সাইজের নক্ষত্র-জগতের বিস্তার প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ জুড়ে। আমাদের নিজস্ব নক্ষত্রজগতে (ছায়াপথ বা Milky Way Galaxy) রয়েছে দশহাজার কোটিরও বেশি নক্ষত্র—সূর্য তারই একটি অতি সাধারণ নক্ষত্র। আকাশে সূর্যের থেকে কয়েক হাজার গুণ কম উজ্জ্বল নক্ষত্র যেমন আছে, তেমনি আছে তার থেকে লক্ষ গুণ বেশি উজ্জ্বল নক্ষত্রও। কেমন করে মহাকাশে এইসব নক্ষত্র জন্মায় এবং পরিণতি পায়, কেমন করে বাঁচে, কতদিন বাঁচে এবং 'শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর' কেমন করে আসে এবং কেন আসে—এসব প্রশ্ন আমাদের বহুকালের।

প্রতিটি নক্ষত্রজগতের মধ্যে সর্বত্র মিলেমিশে ছড়িয়ে রয়েছে রাশি রাশি গ্যাস (প্রধানত হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম) এবং ধূলিকণা। এই গ্যাস এবং ধূলিকণাই হলো নতুন নক্ষত্র সৃষ্টির 'কাঁচামাল'। এইসব গ্যাসের ভৌত অবস্থা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম—কোথাও ঘনত্ব খুব বেশি, আবার কোথাও খুব কম, আবার বহু জায়গায় ঘনত্ব মাঝামাঝি; তাপমাত্রার ক্ষেত্রেও একইরকম। কোথাও তাপমাত্রা এত বেশি যে, গ্যাস আয়নিত (ionized) হয়ে রয়েছে, আবার কোথাও গ্যাস হিমশীতল, আণবিক আকারে (molecular form) রয়েছে, কোথাও বা রয়েছে সাধারণ পারমাণবিক আকারে (atomic form)। আবার এই বিভিন্ন ঘনত্ব এবং তাপমাত্রার অস্তিত্বের জন্য গ্যাস কোথাও অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য আকারে রয়েছে, আবার কোথাও রয়েছে ঘন মেঘের আকারে। মহাকাশে গ্যাসের এই বিভিন্ন ভৌত অবস্থা আমরা কিন্তু আজ সত্যিসত্যিই জানতে পেরেছি ফটোগ্রাফি এবং এই গ্যাস থেকে যে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তড়িৎচুম্বক রশ্মির বিকিরণ হয় তার পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনার সাহায্যে। আমরা দেখতে পাই যে, মহাকাশের স্থানে স্থানে অতি বিশাল আকৃতি এবং ভরের হিমশীতল আণবিক গ্যাসীয় মেঘ (giant molecular cloud)

ছড়িয়ে রয়েছে, যাদের এক-একটির ভর এক লক্ষ থেকে এক কোটি সৌরভরের সমান এবং যাদের বিস্তার দশ থেকে একশো আলোকবর্ষ।

জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই হিমশীতল অতি বৃহৎ আণবিক গ্যাসীয় মেঘের মধ্যেই একসময় গুচ্ছ গুচ্ছ নতুন নক্ষত্রের জন্ম হয়; এর পর্যবেক্ষণলব্ধ প্রমাণও পাওয়া গেছে ভুরি ভুরি। ছোট-বড় গ্যাসমেঘগুলি কিন্তু মহাকাশে স্থির নয়, তারা প্রচণ্ড গতিতে মহাকাশে বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পরস্পরে সঙ্ঘাত হচ্ছে, সঙ্ঘাতের ফলে পরস্পর মিলেমিশে যাচ্ছে—ফলে ঘনত্ব এবং ভর উভয়ই বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে একসময় অতিকায় গ্যাসমেঘগুলি ঘন এবং বড় হতে হতে ক্রমবর্ধমান অভিকর্ষজ চাপের ফলে তাদের স্থিতাবস্থা (stability) হারিয়ে ফেলে, মহাকর্ষীয় ভাঙন শুরু হয় এবং টুকরো টুকরো হয়ে যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই ঘটনাকে বলে গ্যাসীয় মেঘের 'gravitational collapse and fragmentation'। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার জেমস জীন্স অঙ্ক কষে দেখিয়েছিলেন, কী অবস্থায় একটি গ্যাসীয় গোলক এভাবে ভেঙেচুরে যায় এবং বিভিন্ন ভরের বহু টুকরোয় পরিণত হয়। প্রত্যেক টুকরোর ভর নির্ভর করে সেটির ঘনত্ব এবং তাপমাত্রার ওপরে। যেহেতু একটি অতিকায় গ্যাসপিণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ঘনত্ব এবং তাপমাত্রা বিদ্যমান, অতএব পিণ্ডটি যখন ভাঙবে তখন ছোট, বড়, মাঝারি নানা ভরযুক্ত টুকরোয় পরিণত হবে। জ্যোতির্বিদ্যায় এই প্রত্যেকটি টুকরোর ভরকে বলা হয় 'জীন্স মাস' (Jeans mass)। আবার আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে স্যার ফ্রেড হয়েল নানারকম হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, ভাঙন একবার শুরু হলে তা ক্রমান্বয়ে পর পর চলতে থাকবে—যতক্ষণ না প্রতিটি টুকরো ক্ষুদ্রতম 'জীন্স মাস'-এ পরিণত হবে। ফ্রেড হয়েল এই ঘটনাকে বলেছেন মেঘের 'Hierarchical fragmentation'।

ক্রমে আরো দীর্ঘস্থায়ী ভৌত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ছোট-বড় এই টুকরোগুলির প্রত্যেকটি এক-একটি প্রাক্ নক্ষত্রের (proto star) রূপ নেবে। আরো পরে ক্রমসঙ্কোচনের ফলে প্রাক্ নক্ষত্রগুলির কিছু অংশ ক্রমে এক-একটি ছোট-বড় নক্ষত্রে পরিণত হবে। এভাবে এক-একটি অতিকায় আণবিক গ্যাসপিণ্ডের (Giant molecular cloud) মধ্যে এককালে গুচ্ছ গুচ্ছ নক্ষত্র দলবদ্ধভাবে জন্ম নেয় বলে বর্তমানে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন। তাঁদের আরো বিশ্বাস, কোন নক্ষত্রই বোধহয় এককভাবে জন্ম নেয় না। গ্যালাক্সির অসম ঘূর্ণনের ফলে এর মধ্যে যে একটি বিচ্ছিন্নকারী বল সর্বদা কাজ করে, সেই বলই কালক্রমে নক্ষত্রের গুচ্ছগুলিকে ভেঙেচুরে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সেজন্য আমরা আকাশে এত একক নক্ষত্র দেখতে পাই।

এবারে আমরা সূর্যের জীবনেতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে পারি। প্রাক্ নক্ষত্রগুলি প্রত্যেকটি প্রথমে থাকে অনুজ্জ্বল, বিশালকায়, অপেক্ষাকৃত কম ঘনত্বযুক্ত এক-একটি গ্যাসীয় গোলক—চারদিকে আরো হালকা গ্যাসের আস্তরণের মধ্যে ঢাকা থাকে। তারপর ক্রমসঙ্কোচনের ফলে এগুলিতে গ্যাসের ঘনত্ব ও তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং ক্রমশ এগুলি এক-একটি উজ্জ্বল তারারূপে প্রকাশিত হতে থাকে। মহাকর্ষীয় সঙ্কোচনের ফলে ক্রমশ এগুলির মধ্যে মহাকর্ষীয় শক্তির (gravitational energy) সৃষ্টি হতে থাকে। সৃষ্ট শক্তির কিছুটা পৃষ্ঠতল থেকে আলোরূপে বিকিরিত হয়ে যায়, বাকিটা দেহের ভিতরে থেকে অন্তর্দেশীয় তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। মহাকর্ষীয় সঙ্কোচন এভাবে দীর্ঘকাল চলতে চলতে এবং কেন্দ্রের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে একসময় যখন এক কোটি ডিগ্রি কেলভিন ছাড়িয়ে যায়, তখন কেন্দ্রের সেই প্রচণ্ড তাপে এবং বিপুল চাপে কেন্দ্রের হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রজ্বলন শুরু হয় এবং হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হতে থাকে। বিজ্ঞানীদের মতে, হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রজ্বলন-মুহূর্ত থেকেই নক্ষত্রজীবনের মূলধারা শুরু হয় এবং নক্ষত্রটি সুস্থিত গঠন (stable structure) প্রাপ্ত হয়। এই মুহূর্তের আগে পর্যন্ত নক্ষত্রটিকে ক্রমসঙ্কোচনের দ্বারা মহাকর্ষীয় শক্তি উৎপন্ন করতে হয়েছে। কিন্তু এবারে হাইড্রোজেন প্রজ্বলনের ফলে নক্ষত্রের মধ্যে নতুন এক বিপুল শক্তির উৎস খুলে গেছে; কাজেই শক্তির জন্য আর সঙ্কোচনের দরকার নেই। সূর্যের মতো নক্ষত্রের জীবনে এই মহাকর্ষীয় সঙ্কোচনকাল প্রায় দশ কোটি বছর। দশ কোটি বছর ধরে সঙ্কোচনের ফলে সূর্য তার সুস্থিত গঠন পেয়েছে। তারপর থেকে সূর্যের কেন্দ্রে হাইড্রোজেন প্রজ্বলন দ্বারা পদার্থের রূপান্তরের মাধ্যমে আইনস্টাইনের সূত্র $E = mc^2$ (E = শক্তি, m = ভর এবং c = আলোর গতিবেগ) অনুযায়ী শক্তি তৈরি হচ্ছে এবং সেই একই পরিমাণ শক্তি সৌরদেহ থেকে বিকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হিসাব কষে দেখেছেন, হাইড্রোজেনের রূপান্তরের মাধ্যমে সৌরকেন্দ্রে যে মোট পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হতে পারে, তার দ্বারা সূর্য বর্তমান হারে (৪×১০^{৩৩} আর্গ প্রতি সেকেণ্ডে) শক্তি খরচ করলেও অন্তত বারো বিলিয়ন বছর (এক বিলিয়ন = একশো কোটি) চলে যাবে। বারশো কোটি বছর—এটাকেই ধরা হয় সূর্যের মূল আয়ুষ্কাল। এর মধ্যে সূর্যের বর্তমান বয়স সাড়ে চার থেকে পাঁচ বিলিয়ন বছর কেটে গেছে, অবশিষ্ট এখনো রয়েছে সাত থেকে সাড়ে সাত বিলিয়ন বছর। তারপর সূর্য নানারকম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আরো দুই-এক বিলিয়ন বছর বেঁচে ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে এবং শেষপর্যন্ত একটি অত্যন্ত অনুজ্জ্বল, ক্ষুদ্রাকার এবং অত্যন্ত বেশি ঘনত্বযুক্ত 'শ্বেতবামন' (white dwarf) নক্ষত্রে পরিণত হবে। শ্বেতবামন নক্ষত্রকে বিজ্ঞানীরা মনে করেন 'মৃত নক্ষত্র'।

পরিশেষে জানাই, আদি গ্যাসপিণ্ডটি ভাঙনের ফলে যে খুব ছোট টুকরোগুলি জন্ম নেবে, সেগুলি কিন্তু নক্ষত্র হয়ে উঠবে না; কারণ এগুলির ভর একটা নির্দিষ্ট সীমার নিচে থাকার জন্য এগুলির কেন্দ্রে যথেষ্ট তাপ ও চাপের সৃষ্টি হয় না, ফলে এদের কেন্দ্রে হাইড্রোজেনের প্রজ্বলন শুরুই হয় না; অর্থাৎ এরা পদার্থের রূপান্তরের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন করতে অপারক। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন, কোন টুকরোর ভর সৌরভরের আট শতাংশের কম হলে সে আর নক্ষত্র হতে পারবে না। এগুলিকে বলা হয় 'substellar objects'—কিছুকাল অল্পোজ্জ্বল জীবন কাটিয়ে এগুলি ধীরে ধীরে অনুজ্জ্বল বস্তুতে পরিণত হয় এবং অদৃশ্যরূপে আকাশে থেকে যায়।

সূর্যকে জ্বালিয়ে রাখার মতো প্রয়োজনীয় শক্তির জন্য এর কেন্দ্রে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৬০ কোটি মেট্রিক টন হাইড্রোজেন জ্বালানি খরচ হয়।

বৈদ্যনাথ বসু
শ্রীরামকৃষ্ণ পল্লী, সোনারপুর
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা-৭৪৩৩৬৯

শ্রীরামকৃষ্ণ ও পওহারীবাবা

অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ ও পওহারীবাবা সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য জানার জন্য এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী গাজীপুরে পৌঁছান ২২ জানুয়ারি ১৮৯০। গাজীপুরে প্রথমে গগনবাবু ও বাল্যবন্ধু সতীশবাবুর বাড়িতে তিনি কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। স্বামীজীর গাজীপুরে আসার উদ্দেশ্য ছিল যোগিশ্রেষ্ঠ পওহারীবাবার দর্শনলাভ। পওহারীবাবার দর্শন পাওয়া ছিল খুবই কঠিন। সহজে কাউকে তিনি দর্শন দিতেন না। স্বামীজীকেও তাই কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। নগরে বাস করলে তাঁর দর্শন সুলভ হবে না মনে করে তিনি পওহারীবাবার গুহার পাশে এক নির্জন বাগানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯০ প্রমদাদাস মিত্রকে স্বামীজী লেখেন : "বহুভাগ্যবলে বাবাজীর সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইনি অতি মহাপুরুষ।" পওহারীবাবা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাভাব পোষণ করতেন। তাঁর গুহাতে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ফটোও ছিল।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' (অখণ্ড, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৯৩, ২৭ অক্টোবর ১৮৮২) থেকে জানা যায়—"ঠাকুরের ক্রমে বাহ্যজ্ঞান হইতেছে। গাজীপুরের নীলমাধববাবু ও একজন ব্রাহ্ম ভক্ত পওহারীবাবার কথা পাড়িলেন। একজন ব্রাহ্ম ভক্ত (ঠাকুরের প্রতি)—মহাশয়, এঁরা সব পওহারীবাবাকে দেখেছেন। তিনি গাজীপুরে থাকেন। আপনার মতো আরেকজন। ঠাকুর এখনও কথা কহিতে পারিতেছেন না। ঈষৎ হাস্য করিলেন। ব্রাহ্ম ভক্ত (ঠাকুরের প্রতি)—মহাশয়, পওহারীবাবা নিজের ঘরে আপনার ফটোগ্রাফ রেখে দিয়েছেন। ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া নিজের দেহের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন : 'খোলটা!'... ঠাকুর কি বলিতেছেন যে, দেহ বিনশ্বর, থাকিবে না? দেহের ভিতর যিনি দেহী—তিনিই অবিনাশী, অতএব দেহের ফটোগ্রাফ লইয়া কি হইবে?"

জানতে ইচ্ছা করে, পওহারীবাবার গুহায় শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো কিভাবে এল? শ্রীশ্রীঠাকুরের তিনটি ফটোর মধ্যে যে ফটোটি ঘরে ঘরে পূজা পাচ্ছে, সেই ফটোটি পওহারীবাবার গুহায় নিশ্চয়ই ছিল না, কারণ ঐ ফটোটি অক্টোবর ১৮৮৩, মতান্তরে ১৮৮৪-র ২ ফেব্রুয়ারির পর কোন এক সময়ে তোলা। আবার ১৮৮১-র ১০ ডিসেম্বর রাধাবাজার স্টুডিওতে তোলা ফটোটি অতি অল্প সময়ে ঐ গুহায় পাওয়া সম্ভবপর বলে মনে হয় না। তবে কি ঠাকুরের প্রথম ফটো—যেটি ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ২১ সেপ্টেম্বর কেশবচন্দ্র সেনের 'কমলকুটির'-এ তোলা হয়েছিল—সেটিই পওহারীবাবার গুহায় ছিল? পওহারীবাবার শরীর চলে যাওয়ার পর ঠাকুরের ফটোটির কোন সংবাদ পাওয়া যায় কি?

উপরি উক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর 'উদ্বোধন' পত্রিকা মারফৎ কেউ জানালে খুবই উপকৃত ও আনন্দিত হব।

প্রভাততপন মুখার্জি
চৈতন্য এভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৪

প্রসঙ্গ 'সমসাময়িক স্মৃতিকথায় শ্রীরামকৃষ্ণ'

'উদ্বোধন'-এর গত আষাঢ় ১৪০৯ সংখ্যায় 'সমসাময়িক স্মৃতিকথায় শ্রীরামকৃষ্ণ' পাঠ করে একটি বিষয় অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হলো। সেই কারণে এই পত্রের অবতারণা।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন : "পরমহংস কৃষ্ণকায় ছিলেন...। পরমহংসের উচ্চতা মাঝারি ধরনের, ছিপছিপে গড়ন—যাকে শীর্ণকায় বলা যেতে পারে।" কিন্তু চিত্রপটে তো তা দেখি না। আবার শ্রীশ্রীমা বলতেন : "তাঁর গায়ের রং যেন হরিতালের মতো ছিল—সোনার ইষ্টকবচের সঙ্গে গায়ের রঙ মিশে যেত। যখন তেল মাখিয়ে দিতুম, দেখতুম সব গা থেকে যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে।... বেশ মোটাসোটা ছিলেন। মথুরবাবু একখানা বড় পিঁড়ে দিয়েছিলেন, বেশ বড় পিঁড়ে। যখন খেতে বসতেন, তখন তাতেও বসতে কুলাত না।"

দুটি বর্ণনাই পরস্পরবিরোধী। মায়ের বিবরণের সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের বিবরণ মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। 'উদ্বোধন'-এ এটি প্রকাশিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই আমরা বিভ্রান্ত। এই ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহারাজ আলোকপাত করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

ভক্তমণ্ডলী
রানীগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র, বর্ধমান

সম্পাদকের বক্তব্য

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় যাকিছু ছাপা হয়েছে তার সবটাই যে প্রামাণ্য তা আমরা মনে করি না। মানুষের ঔৎসুক্যের চাহিদা মেটাতে এই সঙ্কলন। কারণ, মহাপুরুষদের সমসাময়িক মানুষ ও সমাজ কেমনভাবে তাঁদের গ্রহণ করছেন তা একটা জানার বিষয় বটে। প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীমা সারদা দেবী (স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত), যুগনায়ক বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, শ্রীশ্রীমায়ের কথা, শিবানন্দ-বাণী ইত্যাদি গ্রন্থগুলিকেই উল্লেখ করে থাকি। সাধনকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য অঙ্গকান্তি দেখে সকলে বিস্মিত হতো। পরবর্তী কালে ঠাকুর নিজেই মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছেন, বাহ্য রূপের পরিবর্তে আমাকে আন্তরিক রূপ দাও। তাই ঐ অঙ্গকান্তি পরবর্তী কালে নগেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভক্তরা দেখতে পাননি।



আদি শঙ্করাচার্য ১৪

শঙ্করের বাক্যে তুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণ বললেন ঃ "তোমার অনুমান ঠিক।" একথা বলেই তিনি আপন রূপ ধারণ করে শঙ্করকে আশীর্বাদ করলেন।



শঙ্কর আসন প্রদান করলে ব্যাসদেব তাতে বসলেন।



* শ্রুতিপ্রস্থান = উপনিষদ্, স্মৃতিপ্রস্থান = গীতা

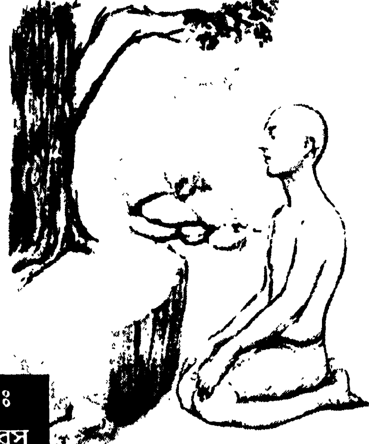
ব্যাসদেবের কথায় শঙ্কর অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ব্যাসদেবের হাতে সমস্ত ভাষ্যগ্রন্থ তুলে দিলেন। গভীর মনোযোগ সহকারে ব্যাসদেব সবই দেখলেন।



শঙ্করের কথায় ব্যাসদেব অবাক হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর—

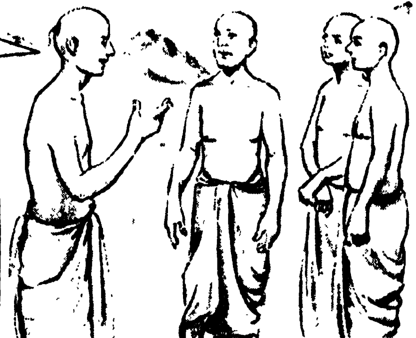


আচার্য শঙ্কর ব্যাসদেবের আদেশ শিরোধার্য করে তাঁকে প্রণাম করলে তিনি অন্তর্হিত হলেন। কিন্তু তাঁর চিন্তা হলো, কুমারিল ভট্টকে কোথায় পাওয়া যাবে?



চিত্ররূপ ঃ দেবাশিস বসু

আচার্যকে চিন্তামগ্ন দেখে তাঁর শিষ্যরা কুমারিলের সন্ধান করতে লাগলেন। এক ব্রাহ্মণ আচার্যের শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনতে প্রতিদিন আসতেন। তিনি সব শুনে বললেন—



শিষ্যদের আগ্রহ দেখে ব্রাহ্মণ কুমারিলের অদ্ভুত জীবনকাহিনী বলতে শুরু করলেন।

দেবী তারা—হিন্দু ও বৌদ্ধ সঙ্ঘাত

দেবব্রত দাস

দশমহাবিদ্যার উদ্ভব সম্বন্ধে জনপ্রিয় কাহিনীটি হলো—দক্ষযজ্ঞে শিব-সতী নিমন্ত্রিত না হওয়া সত্ত্বেও পিতার যজ্ঞে উপস্থিত হওয়ার ঐকান্তিক ইচ্ছায় পতির কাছ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হলে তাঁর অনুমতি আদায়ের উদ্দেশে সতী তাঁকে নিজের দশটি ভয়ঙ্করী মূর্তি দেখিয়েছিলেন। দেবীর দশটি রূপ হলো—

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।।
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।।"[১]

বৃহদ্ধর্ম পুরাণ অনুসারে, দক্ষালয়ে গমনের পূর্বে দেবীর তৃতীয় নয়ন থেকে বহ্নি নির্গত হয়। দেবীর রূপ পরিবর্তিত হয়ে হলো কালী। এই মূর্তি দেখে ভীতসন্ত্রস্ত মহাদেব পলায়নপর হয়ে দেখলেন দশদিকে দশটি ভয়ঙ্কর মূর্তি। দশমহাবিদ্যার মধ্যে প্রথমা হলেন কালী। তারা হলেন দ্বিতীয়া। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর লিখেছেন—

"তারা রূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ।।
নীলবরণা লোলজিহ্বা করালবদনা।
সর্পবান্ধা ঊর্ধ্ব একজটাবিভূষণা।।
অর্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল।
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল।।
নীলপদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ডখর্পর।
চারিহাতে শোভে আরোহণ শিবোপর।।"[২]

নীলতন্ত্রে তারার রূপ—

"প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং।
খর্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্মাবৃতাং কটৌ।।
নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাং।
চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্।।
খড়্গ কর্তৃসমাযুক্তসব্যেতরভুজদ্বয়াং।
কপালোৎপলসংযুক্ত সব্যপাণিযুগান্বিতাং।
পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাম্।।
বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রয়ভূষিতাং।
জলচ্চিতামধ্যমস্থাং ঘোরদ্রংষ্ট্রাংকরালিনীম্।।
স্বাবেশস্মেরবদনাং স্ত্র্যলঙ্কারবিভূষিতাং।
বিশ্বব্যাপকতোয়ান্তঃ শ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাম্।।

এই ধ্যানমন্ত্রের অর্থ হলো—মুণ্ডমালাবিভূষিতা ভয়ঙ্করী দেবীর বাম পা অগ্রবর্তী। তিনি খর্বাকৃতি, লম্বোদরী, ভীমা। তাঁর কটিদেশ ব্যাঘ্রচর্মাবৃত। নবযৌবন-সম্পন্না দেবী পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতা। চতুর্ভুজা লোলজিহ্বা মহাভীমা দেবী বরদায়িনী। তাঁর বামহস্তে খড়্গ ও কপাল (করোটি) এবং দক্ষিণহস্তে কর্তরিকা (কাটারি) ও পদ্ম। তিনি একজটাধারিণী, সেই ভীষণ পিঙ্গলবর্ণ জটাভূষিতা দেবী স্থিরভাবে বিরাজিতা। তাঁর ত্রিনয়ন তরুণ সূর্যমণ্ডলের মতো বৃত্তাকার। ঘোরদ্রংষ্ট্রা করালিনী দেবী জ্বলন্ত চিতার মধ্যে অবস্থিতা। স্বীয় ভাবাবেশে হাস্যবদনা স্ত্রীজনোচিত অলঙ্কারভূষিতা। তিনি বিশ্বব্যাপিজলমধ্যে শ্বেতপদ্মের ওপরে অধিষ্ঠিতা।

এই হলো হিন্দুতন্ত্রে দেবী তারার রূপ। তারামূর্তি বোধহয় মানব-সভ্যতার প্রথম প্রত্যূষ। জ্ঞানের প্রথম অঙ্কুরোদ্গম। জীব তখনো উদরসর্বস্ব, পরস্পর হানাহানিতে রত। জগজ্জননী বোধহয় সে-কারণেই 'লম্বোদরা', 'নৃমুণ্ডমালিনী'; কিন্তু দিগম্বরী নন, ব্যাঘ্রচর্ম তাঁর আচ্ছাদন। সংসার-চিতার মধ্যে দেবীর দুই চরণতলে বিদ্যমান পদ্ম জ্ঞানের প্রতীক।

কালী ও তারা স্বরূপত অভিন্না। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের সুন্দরীকাণ্ডে বলা হয়েছে কালী, তারা, ত্রিপুরসুন্দরী এবং ছিন্নমস্তা—এই চারজনের মধ্যে কোন ভেদ নেই।

"যথা ছিন্না তথা কালী তথৈব সুন্দরী পরা।
তথৈব তারা সংদিষ্টা চতুর্নাং ন ভিন্নতা।" (৪।৫১)

কলিযুগে কালীর মতো তারাও সর্বসিদ্ধিদায়িনী, ভোগ-মোক্ষদাত্রী দেবী। তারাতন্ত্রের মতে, তারামন্ত্র এবং কালীমন্ত্র ছাড়া সাধক ভোগ, মোক্ষ, যশ এবং শ্রী লাভ করতে পারেন না—

"তারামন্ত্রং বিনা দেবী কালিকামন্ত্রমেব চ।
নাপ্নুয়াৎ পরমেশানি ভোগমোক্ষৌ যশঃ শ্রিয়ৌ।।"
(৬।৩-৪)

'তারারহস্য'-এ বলা হয়েছে সর্বদা তারকত্ব হেতু অর্থাৎ ত্রাণ করেন বলে দেবীকে 'তারা' বলা হয়। যিনি কালী, নিশ্চিতরূপে তিনিই তারা—"তারকত্বাৎ সদা তারা যা কালী সৈব নিশ্চিতা।"[৩] কুব্জিকাতন্ত্রের মতে, সর্বদা তারকত্ব হেতু দেবীকে 'তারা' ও 'তারিণী' বলা হয়—"তারকত্বাৎ সদা তারা তারিণী চ প্রকীর্তিতা।"[৪]

তারার মন্ত্র বহু—"বহবোঽস্যাশ্চ মন্ত্রাঃ স্যুঃ সর্বতন্ত্রা-গমাদিষু।"[৫] এইসব মন্ত্রের দেবতা তিনজন—প্রথমা 'একজটা', দ্বিতীয়া 'উগ্রতারা' এবং তৃতীয়া 'নীল সরস্বতী'। এঁরা ভোগমোক্ষপ্রদা। এই তিনজনই তারার রূপভেদ। রূপকল্পনায় পার্থক্য কিছু থাকলেও তন্ত্রশাস্ত্রে তারা, উগ্রতারা ও নীল সরস্বতী অভিন্না। যিনি তারা, তিনিই উগ্রতারা, আবার তিনিই নীল সরস্বতী।

"লীলয়া বাক্‌প্রদা চেতি তেন নীলসরস্বতী।
তারকত্বাৎ সদা তারা সুখমোক্ষপ্রদায়িনী।
উগ্রাপত্তারিণী যস্মাদুগ্রতারা প্রকীর্তিতা।।"[৬]

—অবলীলাক্রমে বাক্‌প্রদান করেন বলে দেবী নীল সরস্বতী, সর্বদা রক্ষা করেন বলে তিনি তারা সুখমোক্ষ-প্রদায়িনী, উগ্র অর্থাৎ তীব্র দুঃখ থেকে ত্রাণ করেন বলে ইনি উগ্রতারা নামে কীর্তিতা হন।

মায়াতন্ত্রের মতে, তারা, উগ্রা, মহা উগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী ও ভদ্রকালী—এই আটটি নামে তারা প্রসিদ্ধা—

"তারা চোগ্রা মহোগ্রা চ বজ্রা কালী সরস্বতী।
কামেশ্বরী ভদ্রকালী ইত্যষ্টৌ তারিণী স্মৃতাঃ।।"[৭]

হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রে তারাকে 'দেশ (space) শক্তি' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইনি হলেন দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা। তন্ত্রানুসারে, মহাকালের শক্তিদায়িনী মহাশক্তি হলেন কালী। দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা তারা অনন্তদেশের প্রকৃতিরূপিণী। আকাশই হলো দেশ ও কাল।[৮] কালী হলেন কালশক্তি এবং তারা হলেন দেশশক্তি। সর্বশক্তির আধার হলো এই আকাশ। সমস্ত কালজ পদার্থ কালীতে ও দেশজ পদার্থ তারাতে বিলীন হয়। নির্গুণ নিরাকার বিশ্বহিতৈষিণী কালশক্তি কালী কৃষ্ণবর্ণা ও দেশশক্তি তারা নীলবর্ণা। দেশ ও কাল অনন্ত বলে এঁরা আবরণশূন্যা।

বহু ঐতিহাসিকের ধারণা, তারা হিন্দু মহাদেবী হলেও মূলত তিনি একজন বৌদ্ধদেবী এবং বৌদ্ধতন্ত্র থেকে হিন্দুদের পূজার আঙিনায় এসেছেন। তাঁদের এরূপ ধারণার পিছনে একটি প্রাচীন কাহিনী রয়েছে।[৯]

বীরভূম জেলার চণ্ডীপুর গ্রামের 'তারাপীঠ' একটি সিদ্ধপীঠ। জনশ্রুতি আছে, এই পীঠে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন ব্রহ্মার মানসপুত্র দশরথ-গুরু মহামুনি বশিষ্ঠ। মহাচীনাচারতন্ত্রে কথিত আছে, বশিষ্ঠদেব নীলাচলে শুদ্ধাচারে বহুকালাবধি দেবী তারার আরাধনা করেও সিদ্ধিলাভ করতে পারেননি। পিতৃদেবের কাছে তিনি খেদ জানালে ব্রহ্মা তাঁকে কামাখ্যা যোনিমণ্ডলে সাধনা করতে বলেন। সেখানেও সিদ্ধিলাভ না হওয়াতে তিনি ব্রহ্মাপ্রদত্ত বীজমন্ত্র 'তারা'কে অভিশাপ দেন যে, এই বীজে কেউ কখনো সিদ্ধিলাভ করতে পারবে না। তখন দৈববাণী হয়—"বশিষ্ঠ তুমি আমার পূজার নিয়ম জান না, উপাসনার আচার জান না। সেজন্য অভীষ্ট ফল পাওনি। আচার শিক্ষা করতে বুদ্ধরূপী জনার্দনের কাছে মহাচীনে গমন কর। তিনি তোমায় শিক্ষাদান করবেন।" দৈববাণী শুনে বশিষ্ঠ মহাচীন যাত্রা করেন। এই মহাচীন খুব সম্ভবত বর্তমানের তিব্বত। বশিষ্ঠ মহাচীনে গিয়ে দেখলেন, বুদ্ধরূপী জনার্দন মদ, মাংস, মুদ্রা ও কামিনী-পরিবৃত হয়ে বসে আছেন। বুদ্ধ জনার্দনের এবম্বিধ রূপটি দেখে বশিষ্ঠ গভীর মর্মাহত হলেন। ঠিক সেইসময়েই আবার দৈববাণী হলো—"এরই নাম চীনাচার।" বশিষ্ঠ তখন নিজের আসার উদ্দেশ্য বুদ্ধরূপী জনার্দনের কাছে ব্যক্ত করলেন। তখন তত্ত্বজ্ঞানময় হরি বুদ্ধরূপে তাঁকে শিক্ষাদান করেছিলেন। বুদ্ধ যে তারাতত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন তা এরকম—তন্ত্রশাস্ত্র-মতে, তারাই ব্রহ্ম, আবার তারাই জগৎ। নির্গুণা, সগুণা, নিরাকারা, সাকারা, দ্বন্দ্বীভূতা, দ্বন্দ্বাতীতা, সর্ব-ভাবময়ী, সর্বভাবাতীতা, শুচি, অশুচি, পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, কর্ম-অকর্ম—সকলভাবে তারা বিরাজমানা।

বুদ্ধরূপী জনার্দনের কাছ থেকে এইভাবে 'তারাতত্ত্ব' শিক্ষালাভ করে বশিষ্ঠ নিজেকে সংশোধিত করলেন। তখন বুদ্ধ-জনার্দন বললেনঃ "মহাতীর্থ বক্রেশ্বরের ঈশান কোণে বৈদ্যনাথধামের পূর্বদিকে দ্বারকা নদী প্রবাহিত। তার তীরে মহাশ্মশানের মধ্যে যেখানে শিমূল বৃক্ষ আছে, সেটি এক মহাপবিত্র ক্ষেত্র। ভক্তিপূর্ণ চিত্তে সেখানে গেলে মহাপুণ্য হয়। শিমূল বৃক্ষের পূর্বভাগে রয়েছে 'জীবিতকুণ্ড' বা 'জীয়ৎকুণ্ড'। এই পবিত্র কুণ্ডে অবগাহন করলে বন্ধ্যা-নারী বা মৃতবৎসা সন্তান লাভ করে, মানুষ দীর্ঘজীবন পায়।" বুদ্ধরূপী জনার্দনের নির্দেশে বশিষ্ঠ তারাপীঠে এসে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

তারাপীঠের মহাশ্মশানের একধারে শিমূল বৃক্ষের নিচে বশিষ্ঠের আসন এখনো বিদ্যমান। কথিত আছে, বশিষ্ঠ তারা মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর মাতৃরূপ দর্শনের। তাঁর এই প্রার্থনায় দেবী তারা জগজ্জননী-রূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ সেই রূপ দেখে বিস্মিত ও মর্মাহত হয়েছিলেন। কারণ, তিনি দেখেছিলেন, তারা মা স্বামী শিবকে স্তন্যপান করাচ্ছেন। বশিষ্ঠের ভুল ভেঙে দিয়ে তারা মা বলেছিলেন, এই বিশ্বচরাচরে যাকিছু আছে, সবই তাঁর সন্তান। শিবও তাই। সমুদ্রমন্থনে উত্থিত বিষ পান করে শিব যখন প্রায় হতচেতন, তখন দেবী তারা তাঁকে অমৃতবৎ স্তন্যপান করিয়ে বিষক্রিয়া থেকে মুক্ত করেন। মায়ের এই কথায় বশিষ্ঠের ভুল ভেঙেছিল। তিনি মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন মায়ের এই বিশ্বজনীন মাতৃত্বে। কিন্তু এই রূপ তো তিনি অন্য কোথাও দেখতে পাবেন না, তাই মাকে দেখতে দেখতেই তিনি কোন শক্ত ধাতু দিয়ে তাঁর আসনের পাশে এই রূপটি এঁকে রাখেন। পরে এটিকে তিনি পূজাও করতেন। এটিই বর্তমানে আমরা তারাপীঠের মন্দিরে দেখতে পাই। কালো কষ্টিপাথরের এই শিলামূর্তিটি দেবীমূর্তির ভিতরে রাখা থাকে। ভোরে স্নানের

আগে এবং রাত্রে শয়নের আগে তা দর্শনার্থীদের দেখানো হয়।

'তারারহস্যম্'-এ বলা হয়েছে ঃ

"তারাপুরমিদং খ্যাতং নগরং ভুবি দুর্লভম্।
তত্র যত্নেন গন্তব্যং যত্র তারাশিবালয়ম্।।"[১০]

অর্থাৎ তারাপুর বা তারাপীঠ পৃথিবীতে দুর্লভ। কারণ, এস্থানে তারা ও শিবের আলয় বর্তমান। সেজন্য এখানে যত্নসহকারে অর্থাৎ ভক্তিপূর্ণ চিত্তে গমন করা উচিত।

ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য 'ছদ্মবেশে দেবদেবী' প্রবন্ধে (হরপ্রসাদ সম্বর্ধন লেখমালার দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য) দেবী তারাকে বৌদ্ধ দেবতা বলেছেন। তাঁর যুক্তি হলো—(১) বুদ্ধদেবের কাছে বশিষ্ঠের শিক্ষালাভ এবং বৌদ্ধদেবতা একজটা কিংবা মহাচীন তারার সাথে হিন্দু তারার ঐক্য এবং (২) তারাধ্যানোক্ত 'পঞ্চমুদ্রা' ও 'অক্ষোভ্য' শব্দের বৌদ্ধগণ কর্তৃক সমীচীন ব্যাখ্যা।

এর উত্তরে বলা যেতে পারে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মহামুনি বশিষ্ঠের সঙ্গে বুদ্ধরূপী জনার্দনের সংযোগ এক কষ্টকল্পনা। ব্রহ্মজ্ঞ বশিষ্ঠ হয়তো তারাপীঠে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। পরবর্তী কালে বৌদ্ধতন্ত্রের সাধনাও হয়তো এখানে হয়েছিল এবং হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের মিলনে এক পরিণত বলিষ্ঠ তন্ত্রসাধন রীতি ও পদ্ধতির প্রবর্তন হয়েছিল; ক্রমে এটি সিদ্ধপীঠ হিসাবে পরিগণিত হয় এবং বামদেব প্রমুখ বহু সাধক এখানে সিদ্ধিলাভ করেন। তাছাড়া হিন্দুর তারার কল্পনা বৌদ্ধদের উগ্রতারার অনেক আগেই হয়েছিল বলে মনে হয়, কারণ হিন্দুতন্ত্র বৌদ্ধতন্ত্রের অনেক আগে জন্মলাভ করে। বৌদ্ধধর্মকে যেমন হিন্দুধর্মেরই পরিশোধিত একটি রূপ বলা যেতে পারে, তেমনি বৌদ্ধতন্ত্র-মত তার পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুতন্ত্র-মত থেকেই পুষ্ট হয়ে পূর্ণবিকশিত হয়েছিল বলে মনে হয়। তার সার্থকতা দেখা যায় তিব্বতে ও চীনে।

দ্বিতীয়ত, একথা ঠিক যে, 'তারা' বৌদ্ধদের প্রধান দেবী। গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যা সপ্তশতী' গ্রন্থে 'তারা' যে শ্রুতি-বিরোধী জিন-সিদ্ধান্তস্থিতি অর্থাৎ বৌদ্ধ দেবী, সে-সম্পর্কে একটি পদ পাওয়া যায়—

"অতি পূজিতো তারেয়ং দৃষ্টিঃ শ্রুতিলঙ্ঘনক্ষমাসুতনুঃ।
জিন-সিদ্ধান্ত-স্থিতিরিব সবাসনাং কং ন মোহয়তি।।"

হিন্দুতন্ত্রে তারামূর্তির কল্পনায় 'মৌলাবক্ষোভ্য-ভূষিতাম্' এবং 'পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্' বলে উল্লেখ আছে। 'অক্ষোভ্য' পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের অন্যতম বুদ্ধ ও 'মহাচীন-তারা' তারই কুলদেবী। 'পঞ্চমুদ্রা' বাক্যাংশেও বৌদ্ধপ্রভাব রয়েছে। অধিকন্তু দেবী তারার অর্চনায় যে জল ও পুষ্প নিবেদন করা হয়, সেগুলিকে 'বজ্রোদক' ও 'বজ্রপুষ্প' বলে উল্লেখ করা হয়। এইসব বিষয় অবতারণা করলে মনে হতেই পারে যে, দেবী তারা বোধ হয় বৌদ্ধতন্ত্র থেকেই হিন্দুতন্ত্রে স্থান করে নিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে তা মোটেই নয়। তারাপূজাপদ্ধতিতে বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব সন্দেহাতীতভাবেই রয়েছে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তনের অনেক আগেই হিন্দুধর্মে এই দেবী স্থানলাভ করেছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কালেও 'তারা' কথাটি অজ্ঞাত ছিল না। হিন্দুদের প্রধান নক্ষত্রদেবতা হলেন 'তারা'। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহুকাল পূর্ব থেকেই নক্ষত্রদেবতা 'তারা' মাতৃকাশক্তিরূপে হিন্দুধর্মে স্বীকৃতা।

পালবংশের রাজত্বকালে বঙ্গে বৌদ্ধতন্ত্র ও হিন্দুতন্ত্র একইসঙ্গে সমানভাবে চলেছিল। তাই সে-যুগে বৌদ্ধতন্ত্রের ভাবধারা ও তার কল্পিত কিছু দেবদেবীর হিন্দুধর্মে প্রবিষ্ট হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। তন্ত্রের প্রধান উপাস্যা হলেন মাতৃকাশক্তি। সেসময় খুব স্বাভাবিক কারণেই বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব হিন্দুতন্ত্রে পড়েছিল এবং হিন্দুতন্ত্র অনেক বৌদ্ধ-তন্ত্রাচার গ্রহণ করেছিল। আবার অন্যদিক দিয়ে বলা যায়, বৌদ্ধ-তন্ত্রাচার হিন্দু-তন্ত্রাচারের এক সুসংস্কৃত রূপ এবং এর পক্ষে হিন্দুতন্ত্রে অনুপ্রবিষ্ট হওয়া খুব আশ্চর্যজনক ও অস্বাভাবিক নয়। ❑

তথ্যসূত্র

(১) প্রাণতোষিণীতন্ত্র—রামতোষণ বিদ্যাভূষণ, বসুমতী সাহিত্যমন্দির, পৃঃ ৩৭৪
(২) ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৬, পৃঃ ২৪
(৩) তারারহস্যম্—পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য ব্রহ্মানন্দ গিরি, নবভারত পাবলিশার্স, ১ম সং, পৃঃ ৪৫
(৪) প্রাণতোষিণীতন্ত্র, কাণ্ড ৫, পরিচ্ছেদ ৬, পৃঃ ৩৭৪
(৫) তারারহস্যম্, পৃঃ ৪৫
(৬) বৃহৎতন্ত্রসার—কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত, ১ম খণ্ড, বসুমতী সাহিত্যমন্দির, পৃঃ ৩২৭
(৭) ঐ, পৃঃ ৩৪৭
(৮) অনুরূপ কথাই সাংখ্যদর্শনে বলা হয়েছে। সাংখ্যসূত্রে (২।১২) পাই—'দিক্‌কালাবাকাশদিভ্যঃ'।
(৯) বুদ্ধের কাছে তারাতত্ত্ব সম্বন্ধে বশিষ্ঠের শিক্ষাগ্রহণের কাহিনীটির বিশদ বিবরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গের কালী ও কালীক্ষেত্র—দীপ্তিময় রায়, মণ্ডল বুক হাউস, ১৩৯৩, পৃঃ ২০৬-২১২ দ্রষ্টব্য
(১০) তারারহস্যম্, পৃঃ ১১৫

এই নিবন্ধটি 'অধ্যাপক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

ইতিহাস এবং দর্শনের আলোকে শালগ্রাম তত্ত্ব*

কল্যাণব্রত চক্রবর্তী

সমস্যা

আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষে সুদীর্ঘ অতীতকাল থেকে শালগ্রাম বিষ্ণুজ্ঞানে পূজিত হয়ে আসছেন। এর রহস্য এখনো অনুদ্‌ঘাটিত। একটি গোলাকার কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ, আকারে যা মুঠোর মধ্যে নেওয়ার মতো—তাকে বিষ্ণুর প্রতীক বা প্রতিরূপ ভাবার প্রকৃত তাৎপর্য কি হতে পারে? কবে শালগ্রাম-পূজা প্রবর্তিত হয়েছিল, কারা তা করেছিলেন, করার পিছনে প্রেরণা কি ছিল, একে বিষ্ণু ভাবার তাৎপর্যই বা কি—এসব প্রশ্নের কোন উত্তর এখনো নেই। আশ্চর্যের বিষয় হলো, প্রথার প্রাচীনত্ব প্রশ্নগুলিকেও ভুলিয়ে দিয়েছে। পূজা করা হয় বলেই করা হচ্ছে; কেন হচ্ছে সেটা যেন অবান্তর বিষয়। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম তো যুক্তিকে বর্জন করে নয়। শালগ্রাম-পূজা প্রবর্তনের পিছনে যুক্তি নিশ্চয়ই কিছু ছিল বা আছে, যা আজ অবলুপ্ত বলে মনে হয়।

ইতিহাসের কিছু সূত্র স্মরণে রাখলে সমস্যার গভীরতা আরো বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। সেগুলি হলো—

(ক) বিষ্ণু ছিলেন আর্যসমাজের দেবতা। ব্রাহ্মণ্যধর্মের ক্রিয়া যতদিন 'যজ্ঞ' করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, ততদিন বিষ্ণু ছিলেন একটি নিরাকার ধ্যানকল্পনা। বিষ্ণুই ছিলেন যজ্ঞের দেবতা।

(খ) খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে আর্যসমাজ যজ্ঞের প্রাধান্য ঘুচিয়ে মূর্তিপূজা গ্রহণ করেন। প্রাচীন গ্রন্থে মূর্তি, মন্দির, পূজার উল্লেখ থেকে এই সত্যই অনুমিত হয়।

(গ) পূজা ছিল অনার্য ভারতবাসীদের, বিশেষভাবে দ্রাবিড় জাতির ধর্মীয় ক্রিয়া এবং তাদের দেবকুলের মধ্যে বিষ্ণুর অস্তিত্ব ছিল না।

(ঘ) ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্তাদি থেকে জানা যায়, অনার্য ভারতবাসী যারা শিশ্নদেবতা এবং মুড়াদেবতার পূজক ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আর্যদের সুসম্পর্ক ছিল না। জড়পদার্থের পূজাকে আর্যরা গুরুত্ব দিতেন না।

ওপরের সূত্রগুলির বিশ্লেষণ করে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, বিষ্ণুকে শালগ্রাম-রূপে পূজার প্রবর্তন আর্যরাই করেছিলেন। কেন করেছিলেন, কি তাৎপর্য নিয়ে করেছিলেন সেটাই রহস্য। তার চেয়েও বড় রহস্য উন্নত মেধার অধিকারী আর্যরা অবজ্ঞার পাত্র অনার্যদের সাদামাটা পূজার প্রক্রিয়াটি গ্রহণ করতে গেলেন কেন? ব্রাহ্মণ্যধর্মের যজ্ঞ থেকে হিন্দুধর্মের পূজায় অনুবর্তনের এই ঘটনাটিই ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে আমরা মনে করি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই ইতিহাস এখনো অজ্ঞাত। কিন্তু অনুবর্তন যে ঘটেছে সেটা একটা অবিসংবাদিত সত্য। কিন্তু এখনো যা জানা যায়নি, তা হলো—কেন ঘটেছিল, কিভাবে ঘটেছিল এবং এই অনুবর্তনের ফল কি হয়েছিল? যাঁরা সংস্কৃতি সমন্বয়ের কথা প্রচার করেছেন, তাঁরা যুক্তিবাদের শক্ত বনিয়াদে স্থাপিত ইতিহাসের জটিল সোপান না ভেঙেই নির্ভুল সিদ্ধান্তের চূড়ায় পৌঁছে গেছেন। ফলে সোপানের নিচে জমা থেকে গেছে অনেক অদৃশ্য রহস্য। সেই অন্ধকারে শুধু শালগ্রাম রহস্য নয়, সেইসঙ্গে আরো অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে। যেমন হিন্দু মন্দিরের অতিপ্রাকৃত তাৎপর্য ইত্যাদি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যজ্ঞ থেকে পূজায় অনুবর্তনের অজ্ঞাত ইতিহাস উন্মোচিত হলে এসমস্ত সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে। হিন্দুধর্ম এক নতুন বোধের আলোয় উদ্ভাসিত হবে। কিন্তু তার আগে জানা প্রয়োজন শালগ্রাম শিলাটি কি?

শালগ্রামের বস্তু-পরিচয়

যে-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু জীবিত প্রাণী, তাকে যেমন বলে 'জীববিজ্ঞান' বা 'Zoology', তেমনি যে-বিজ্ঞান অধুনালুপ্ত প্রাণীদের নিয়ে, তাকে বলে 'প্রত্নজীববিজ্ঞান' বা 'Palaeo Zoology'। প্রত্নজীববিজ্ঞানীরা জানেন, যে-বস্তুটিকে বিষ্ণুর প্রতীক হিসাবে পূজা করা হয়, আসলে তা সুদীর্ঘ অতীতে লুপ্ত হয়ে যাওয়া 'অ্যামোনাইট' (Amonite) নামক একপ্রকার সামুদ্রিক প্রাণীর জীবাশ্ম। এককোষী প্রাণী থেকে শুরু করে পৃথিবীতে জীবজগতে যে বিপুল বিবর্তন ঘটেছে, সেই বিবর্তনের পথে কোন একসময়ে অ্যামোনাইটদের আগমন ঘটেছিল, আবার প্রকৃতির খেয়ালে তারা লুপ্ত হয়েও গেছে। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, জুরাসিক সময়ভাগে অর্থাৎ ১৮ কোটি থেকে ১৩.৫ কোটি বছর আগে সমুদ্রে অ্যামোনাইটরাই দাপিয়ে বেড়িয়েছে। ডাঙায় তখন ছিল ডাইনোসরদের দৌরাত্ম্য। তারপর তাদের দিন ফুরলো। ৬.৫ কোটি বছর আগে অ্যামোনাইট জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণীর অস্তিত্ব একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। বালির তলায় চাপা পড়ে তারা পরিণত হলো জীবাশ্মে। এই জীবাশ্মগুলিই আজ আমরা শালগ্রাম তথা বিষ্ণু-রূপে পূজা করছি।

শালগ্রামের প্রাপ্তিস্থান উপকূল অঞ্চল। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ জীবটি তো ছিল সামুদ্রিক; তাদের জীবাশ্ম

* গবেষণাধর্মী এই নিবন্ধে লেখকের বক্তব্যের সঙ্গে আমরা সর্বত্র একমত নই। তবু এই নিবন্ধে অনেক নতুন তত্ত্ব ও তথ্য জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে।—সম্পাদক

সমুদ্রোপকূলেই তো পাওয়া যাবে। তবে নেপালের মুক্তিনাথের পথে কালীগণ্ডকী নদীতেও প্রচুর শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। অ্যামোনাইটরা সমুদ্রের নিচে বালির তলায় চিরশান্তি লাভের অনেক পরে সমুদ্রতল ঠেলে উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত হয়ে হিমালয় পর্বতের সৃষ্টি হয়েছে। সেটা হয়েছে ৩ কোটি বছর আগে। বৈজ্ঞানিকরা তাই বলেন। সমুদ্রের তলার সবকিছু উর্ধ্বোৎক্ষেপণের সময় ওপরে উঠে এসেছে। কাজেই কালীগণ্ডকীতে শালগ্রাম শিলা প্রাপ্তির মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই।

অনেকের কৌতূহল শালগ্রামের শ্রেণিভেদ এবং দেহচিহ্ন নিয়ে। শালগ্রামের দেহে কিছু বিশেষ চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। আকার, আকৃতি এবং গাত্রবর্ণেও কিছু তারতম্য রয়েছে। দেহচিহ্নগুলিকে পুরাণকারেরা পৈতা, বনফুল-মালা, চক্র ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন, আর এই সবকিছু তারতম্যের নিরিখে শালগ্রামকে নানা শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। বিশেষ পরিচিত শ্রেণিগুলি হলো—দধিবামন, লক্ষ্মীনারায়ণ, লক্ষ্মীজনার্দন, হয়গ্রীব, রঘুনাথ, শ্রীধর, দামোদর, বলরাম, রাজরাজেশ্বর, অনন্ত, শ্রীমধুসূদন, গদাধর, নরসিংহ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সুদর্শন, অনিরুদ্ধ ইত্যাদি। তবে এটাই সব নয়। শতাধিক প্রকারের মধ্য থেকে পঞ্চাশ প্রকারকে পূজ্য হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে। বাকি সব অপূজ্য।

এই আকৃতিগত তারতম্য এবং শ্রেণিবিন্যাস সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কি বক্তব্য? সমস্ত প্রাণীরই কিছু বিশেষ দেহচিহ্ন থাকে। যে-প্রাণী কোটি কোটি বছর পৃথিবীতে বাস করেছে, তাদের দেহে বিবর্তনের প্রভাব থাকবেই। জীবাশ্মগুলি একই সময়ের নয়। একটির থেকে অপরটির সময়ের ব্যবধান হয়তো কোটি বছর বা তারও বেশি। তাই এই প্রভেদ। এর মধ্যে কিছু কাল্পনিক ব্যাপার থাকতে পারে। কিন্তু অতীন্দ্রিয় অনুভবও এর মধ্যে ক্রিয়াশীল।

পৌরাণিক ব্যাখ্যা

পুরাণকারেরা শালগ্রাম নিয়ে অর্থাৎ বিষ্ণুর শালগ্রাম রূপ পরিগ্রহ করা নিয়ে কি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বলা হয়েছে, কোন একসময় শঙ্খচূড় নামক দৈত্য অত্যন্ত পরাক্রান্ত হয়ে ওঠেন। সমগ্র পৃথিবীর আধিপত্যলাভ করার পর তিনি স্বর্গেরও আধিপত্যলাভে অভিলাষী হন। ফলে দেবতাদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। একের পর এক দেবতারা পরাভূত হওয়ার পর স্বয়ং শিবের সঙ্গে তাঁর দ্বৈরথ শুরু হয়। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে শিব কিন্তু শঙ্খচূড়কে পরাজিত করতে পারেন না। তার বিশেষ কারণ এই যে, শঙ্খচূড়ের দুটি সুরক্ষা ছিল। প্রথমত, যতদিন তাঁর হাতে একটি মন্ত্রপূত কবচকুণ্ডল থাকবে ততদিন তিনি অজেয়; আর দ্বিতীয়, যতদিন তাঁর স্ত্রী তুলসীর সতীত্ব অটুট থাকবে ততদিন তিনি অবধ্য। এই অবস্থায় দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হয়ে দৈত্যরাজের উপদ্রবের বিহিত করার জন্য অনুরোধ জানান। বিষ্ণু দেবতাদের আশ্বস্ত করে সমস্যার সমাধানে ব্রতী হলেন। কিন্তু কি তিনি করলেন? প্রথমে তিনি ব্রাহ্মণের রূপ ধরে শঙ্খচূড়ের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন—আমি সাতদিনের উপবাসী ব্রাহ্মণ। তোমার কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করে উপবাস ভঙ্গ করতে চাই। তুমি কি আমাকে ভিক্ষা দেবে?

শঙ্খচূড় বললেন—অবশ্যই। বলুন কি ভিক্ষা চান।

—আগে প্রতিজ্ঞা কর যা চাইব দেবে।

—প্রতিজ্ঞা করছি। ব্রাহ্মণকে অদেয় কিছুই নেই।

—তবে তোমার কবচকুণ্ডল দাও।

শঙ্খচূড় ছদ্মবেশী বিষ্ণুকে নিজের পরমধন কবচকুণ্ডল দিলেন। এরপর বিষ্ণু দ্বিতীয়বার ছলনার আশ্রয় নিলেন। তিনি শঙ্খচূড়ের বেশ ধারণ করে রথারূঢ় হয়ে তুলসীর আলয়ে উপস্থিত হলেন। যুদ্ধ থেকে প্রত্যাগত স্বামীকে দেখে যারপরনাই উল্লসিত হলেন তুলসী। পরম সমাদরে তিনি স্বামিজ্ঞানে ছদ্মবেশী বিষ্ণুকে গ্রহণ করলেন। প্রবঞ্চনার দ্বারা তুলসীর সতীত্ব হরণ করার পর বিষ্ণু শিবকে ইঙ্গিত পাঠালেন কোন্ অস্ত্রে শঙ্খচূড়কে বধ করতে হবে। কিন্তু এই ছলনা শেষপর্যন্ত তুলসীর কাছে অজ্ঞাত থাকল না। ক্রোধান্বিত হয়ে তিনি ভগবান বিষ্ণুকে অভিশাপ দিলেন—ভক্তরা তোমাকে দয়াময় বলে, কিন্তু তোমার হৃদয় পাষাণে গড়া; তাই তুমি আমার এই সর্বনাশ করতে পারলে। তোমাকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি, পৃথিবীতে তুমি পাষাণ হয়ে থাকবে। তুলসীর অভিশাপে বিষ্ণু শালগ্রামে পরিণত হলেন। আবার বিষ্ণুর ইচ্ছাক্রমে তুলসী গণ্ডকী নদীতে পর্যবসিত হলেন এবং বিষ্ণু স্বয়ং শালগ্রাম-রূপে ঐ নদীবক্ষে আশ্রয় নিলেন। এই হলো ভগবান বিষ্ণুর শালগ্রাম শিলা হওয়ার পৌরাণিক কাহিনী।

পদ্মপুরাণে প্রায় একই কাহিনী একটু ভিন্নভাবে বলা হয়েছে। সেখানে দৈত্যরাজের নাম জলধর, আর তাঁর স্ত্রীর নাম বৃন্দা। তাছাড়া অন্যান্য পুরাণেও বিষ্ণুর শালগ্রামে রূপান্তরের ভিন্নতর কাহিনী আছে।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের যজ্ঞ থেকে হিন্দুধর্মের পূজায় অনুবর্তন

ব্রিটিশ ভারতবর্ষের ভারত ও শ্রীলঙ্কার শিক্ষাসচিব জে. এন. ফারকুহার 'Outline of the Religious Literature of India' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন ঃ "যদিও মহাকাব্য দুখানি এবং সূত্রসাহিত্যে মন্দির ও মূর্তিপূজার উল্লেখ আছে তবু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কল্পসূত্রে যজ্ঞের আনুপূর্বিক বিধির নির্দেশ থাকলেও পূজাবিষয়ক কোন বিধিরই নির্দেশ নেই। মনে হয়, পূজা ব্যাপারটাকে শুধু মেনেই নেওয়া হয়েছিল প্রাচীন যজ্ঞের পাশাপাশি। পরে শিব এবং বিষ্ণুকে নিয়ে শৈব এবং বৈষ্ণব

সম্প্রদায় সৃষ্টির পরেও সেগুলিকে মূলবিহীন পরগাছা বলে নিন্দা করা হয়েছে এবং সেই মনোভাব অদ্যাবধি কিছুটা বর্তমান আছে।" (দ্রঃ p. 50)

এই মন্তব্য নিরর্থক নয়। যজ্ঞের পাশাপাশি পূজা গ্রহণ এবং কালক্রমে পূজাই প্রধান ধর্মীয় ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনাটি প্রবলভাবে সত্য হলেও তাকে ধর্মীয় ইতিহাসে অনুল্লিখিত রাখার মধ্যে কিছু রহস্য নিশ্চয়ই ছিল। এই পরিবর্তনের সূচনা কে করেছিলেন, কেন করেছিলেন—সেবিষয়ে আমরা প্রায় অন্ধকারে। কোন শাস্ত্রগ্রন্থে এবিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। শাস্ত্রকারদের দ্বারা উপেক্ষিত এই গুরুত্বপূর্ণ অনুবর্তনের ইতিহাস পূর্ণরূপে না বোঝা পর্যন্ত ভারত-সংস্কৃতি বোঝা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এবং সেইসঙ্গে হিন্দুধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে যাবে। সেই অনুদ্ঘাটিত ইতিহাসে আলোকপাত করার আগে বিভিন্ন মনীষীরা যজ্ঞ থেকে পূজায় অনুবর্তনের বিষয়টি কিভাবে দেখেছেন এবং তা কতখানি অর্থবহ তার পর্যালোচনা প্রয়োজন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পগুরু এবং ভারত-তত্ত্ববিদ্ ই. বি. হ্যাভেল 'Indo-Aryan Civilisation' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন ঃ "ভারতীয় সভ্যতা হলো হিন্দুদের পূজায় ব্যবহৃত তৈজসপত্রের ন্যায়, যা অনেক ধাতুর সংমিশ্রণে গড়া; কিন্তু যে-আগুন ঐ ধাতুগুলি গলিয়ে এক করেছে এবং আবর্জনা নিষ্কাশন করেছে তা হলো আর্যদের মেধা তথা বেদের দর্শন।"

কথাটা খুবই সত্য, কিন্তু একটা ফাঁক দৃষ্টি এড়াবার নয়। প্রথম পর্বে আর্যরা পূজার ব্যাপারটি গ্রহণ করতে গেলেন কেন? উন্নত মেধার প্রয়োগ ঘটিয়ে তাঁদের তো কর্তব্য ছিল নিজেদের ধর্মীয় ক্রিয়া যজ্ঞকে রক্ষা করা এবং অন্য ধর্মীয়দের সেই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা। আমরা কিন্তু উলটোটাই দেখি। নতিস্বীকার করে অনার্যদের ধর্ম—যাকে তাঁরা অন্তঃসারশূন্য ভেবে এসেছেন, তাকেই তাঁরা গ্রহণ করেছেন। বিসমিল্লায় কিছু গলদ টের পাওয়া যাচ্ছে নাকি?

এপ্রসঙ্গে আনন্দ কেন্টিশ কুমারাস্বামীর বক্তব্য—"এটা সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, বেদ ভারতের প্রাচীন ধর্মের একটা দিকই শুধু উদ্ঘাটন করেছে। আর্য প্রভাবের বাইরে জনগণের বিশ্বাসের বেদিমূলে গড়ে ওঠা ধর্মাচরণবিধি সুদীর্ঘকাল ধরেই এদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাতে নিশ্চিত-ভাবেই নৃ-সদৃশ দেবকল্পনার প্রবণতা ছিল। জনমনের এই বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটেছে ভারহুতের নানা মূর্তিতে—যথা যক্ষ, নাগ, বৃক্ষিকা, ভূদেবী, মাতৃকা, গন্ধর্ব, অপ্সরা, অপদেবতা এবং সেইসঙ্গে লোকোত্তীর্ণ কোন কোন ব্যক্তি। কালক্রমে এঁরা সকলেই হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মবিশ্বাসে স্থানলাভ করেছেন। ঐ বিশ্বাসগুলি শুধুমাত্র আর্যদের নয়।" (দ্রঃ History of Indian and Indonesian Art, p. 46)

"বিশেষভাবে দ্রাবিড় জাতির প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস মূর্তিপূজার উদ্ভবে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে এবং ধর্মীয় ক্রিয়াবিধি হিসাবে 'পূজা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা 'যজ্ঞ' থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র।" (Ibid., p. 5)

একই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের উক্তিতে ঃ "মূর্তিপূজা, যা দ্রাবিড় জাতির ধর্মবিশ্বাসের একটি প্রধান বিষয়, আর্যদের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল।" (দ্রঃ Hindu View of Life, p. 39)

এখানে আর্যদের পূজা গ্রহণের পিছনে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক দেখানো হয়নি। সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই কারণে যে, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—আর্যরা অনার্যদের ঘৃণা করতেন এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল না। ঋগ্বেদের দুটি মন্ত্রে (৭।২১।৫ এবং ১০।৯৯।৩) ইন্দ্রকে আহ্বান করে বলা হয়েছে, তিনি যেন শিশ্নদেবতা এবং মুড়াদেবতার উপদ্রব থেকে যজ্ঞকে রক্ষা করেন। এই মন্ত্রদুটি থেকে ভারতের আদি অধিবাসীদের ধর্মাচরণ সম্বন্ধে অতি মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। তাঁরা ছিলেন শিশ্নদেবতায় অর্থাৎ লিঙ্গপূজায় বিশ্বাসী এবং সেইসঙ্গে মুড়াদেবতায় অর্থাৎ কোন জড়বস্তুতে আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করে তার পূজায় বিশ্বাসী। তারা যে যজ্ঞকারী আর্যদের আক্রমণ করে যজ্ঞ নষ্ট করতে চাইতেন, তারও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলের দখল নিয়ে অনার্য জাতিদের সঙ্গে আর্যদের সংগ্রাম করতে হয়েছিল। উন্নত প্রযুক্তি এবং দ্রুতগামী অশ্বের ব্যবহারের ফলে আর্যরাই জয়ী হয়েছেন এবং বিজিতদের ওপর প্রভুত্ব করেছেন। যদিও সে-ইতিহাস এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানেও যে সম্পর্কের বিশেষ উন্নত হয়নি, তার প্রমাণও যথেষ্ট আছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যে এখানে অবলুপ্ত, তাতে সন্দেহ নেই।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে—"অস্ট্রিক জাতি, দ্রাবিড় জাতি এবং আর্যজাতিরা ছিল সেই 'ভাষা-সংস্কৃতি' গোষ্ঠী (Language-culture Groups), যাঁদের মিলিত অবদানে সচেতনভাবে বা অবচেতনভাবে হিন্দু-সংস্কৃতির বিবর্তন ঘটেছে। এর ভিত্তিভূমি প্রধানত অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড়-সংস্কৃতি জগতের দান; সমন্বয়সাধন এবং সাংস্কৃতিক সৌধনির্মাণের পিছনে কাজ করেছে আর্য জাতির প্রেরণা এবং সংগঠন।" (দ্রঃ Kirāta-Jana-kṛti, p. 8)

ইতিহাসের পন্থা একটু জটিল। আনুপূর্বিক তথ্য সংগ্রহ করা এবং বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেলে তাকেই প্রকৃত ইতিহাস বলা যায়। কোন স্তর লঙ্ঘন করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছালেও সেটা ইতিহাস হলো না, কারণ ঐ

বিশেষ স্তরে বা স্তরগুলিতে হয়তো এমন কিছু সমস্যা এবং সমাধানের ক্ষুদ্র আবর্ত ছিল যার গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়। এই উল্লঙ্ঘনের ফলে হয়তো এমন কিছু তথ্য এবং সত্য বাদ গেল, যা জ্ঞানের সামগ্রিক ব্যাপ্তির অন্তরায় হয়ে থাকবে। শালগ্রাম রহস্য বা মন্দিরের আভ্যন্তরীণ রহস্যের উৎস হয়তো আমাদের ইতিহাসের এইরূপ কোন অনালোকিত স্থানে নিহিত আছে।

বৈদিক যুগের তথ্য জানার মতো প্রস্তরলিপি, মুদ্রা বা প্রত্নবস্তু লাভ করা এখন আর হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু তখনকার রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবন সম্বন্ধে তথ্য লাভ করার মতো প্রাচীন সাহিত্য যথেষ্ট বর্তমান। পরবর্তী কালে রামায়ণ, মহাভারত, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্র, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, গৃহ্যসূত্র, স্মৃতিগ্রন্থগুলি এবং সেইসঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যের ভাণ্ডার আছে পর্যাপ্ত। ঐসমস্ত গ্রন্থ থেকে তথ্য আহরণ করে আমরা ধারণা করতে পারি যে, অনার্য সমাজে শক্তির উৎসগুলি ছিল নিম্নলিখিত রূপ এবং ঐ শক্তি সংহত করেই আর্যসমাজের বিরুদ্ধে তারা গণজাগরণ সংগঠিত করেছিল।

অনার্যদের শক্তিকেন্দ্র

(ক) **জনসংখ্যা ঃ** অনার্য জাতিদের প্রধান শক্তিকেন্দ্র ছিল তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। জনসংখ্যা যেকোন হিসাবেই শক্তির একটা বড় উৎস। যদি বৃহৎভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে ঘিরে থাকে এবং যদি উভয় গোষ্ঠীর স্বার্থ এবং মর্যাদাবোধ ভিন্নমুখী হয়, তবে এমন একদিন আসবেই যখন সংখ্যাগরিষ্ঠের কণ্ঠস্বর সংখ্যালঘুদের ছাপিয়ে যাবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতেই হবে। অস্ট্রিক ভাষাভাষি (কোল এবং মুণ্ডা ভাষা—যার মধ্যে রয়েছে সাঁওতালি, মুণ্ডারি, হো, কোরকু, সবর, দাদবা, খাসি ইত্যাদি) নিষাদ জনগোষ্ঠী, দ্রাবিড় ভাষাভাষি তথাকথিত দাস-দস্যু জনগোষ্ঠী এবং মঙ্গোলীয় জাতি নিয়ে গঠিত অনার্য সমাজের তুলনায় আর্য জাতি ছিল মোট জনসংখ্যার অতি নগণ্য একটি অংশ। রিজ ডেভিডস্ 'Buddhist India' গ্রন্থে বলেছেন, ভারতের জনসমুদ্রের মধ্যে আর্যরা ছিল একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। মনে করা যেতে পারে, কলিযুগের প্রারম্ভে অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলে অবস্থিত কতকগুলি বড় বড় নগরে। তাদের ঘিরে আন্দোলিত হতো ভিন্ন ধর্মীয় ক্রিয়া। প্রভাবিত হতো বিপুল অনার্য জনগোষ্ঠীর জীবনপ্রবাহ।

(খ) **ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক বিষয় ঃ** সভ্যতার ঊষাকাল থেকেই ভারতবর্ষে ধর্মীয় চিন্তা প্রবাহিত হয়ে এসেছে। ভারতে আগত প্রাচীনতম জাতি নিগ্রো বা নেগ্রিটোরা বটবৃক্ষের পূজা করত এই চিন্তা নিয়ে যে, তাদের স্বর্গে যাওয়ার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে যে-দৈত্য, সে বাস করে বটবৃক্ষে। অতএব ঐ বৃক্ষের পূজা করে সেই দৈত্যকে তুষ্ট করা প্রয়োজন। পূজার হেতু হয়তো বদলে গেছে। কিন্তু প্রাচীনতম সেই নেগ্রিটো জাতির অবদান অর্থাৎ বটবৃক্ষে দেবত্ব আরোপ করার ধারাটি আজও বিদ্যমান। পরবর্তী কালে আগত অস্ট্রিক জাতির মধ্যে Totemism বা কোন বস্তু অথবা প্রাণীকে কুসংস্কারবশত একটি সম্প্রদায়ের প্রতীকরূপে দেখার প্রবণতা ছিল। কুসংস্কারের আবরণ থাকলেও আত্মার চিন্তাটি কিন্তু এখানে স্পষ্ট। এই আত্মার চিন্তা নিয়েই পরবর্তী কালে আত্মার সংসরণ তত্ত্ব (Theory of transmigration of soul) এবং কর্মফলবাদ সৃষ্টি হয়েছে। দ্রাবিড় জাতি মাতৃকা, বৃক্ষিকা, দেবতা ইত্যাদি কল্পনা এবং মূর্তিনির্মাণের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে এবং আত্মার বিষয়ে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কাজেই একথা কখনোই বলা ঠিক হবে না যে, অনার্য ভারতবর্ষ অধ্যাত্ম ব্যাপারে নিস্পৃহ থেকে শুধু জান্তব প্রয়োজনেরই সেবা করে গেছে।

(গ) **রাজনৈতিক বিষয় ঃ** 'অঙ্গুত্তরনিকা' এবং আরো কয়েকটি বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মগ্রন্থ থেকে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম বা ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে ভারতবর্ষে ষোড়শ মহাজনপদের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। ঐ জনপদগুলি নিম্নলিখিতরূপ, যদিও গ্রন্থান্তরে নামের কিছু তারতম্য আছে। অবস্থান বা পরিচয় উহ্য রেখে এখানে শুধু নামগুলিই দেওয়া হলো—কাশী, কোশল, অঙ্গ, মগধ, ভাজ্জি, মল্ল, চেতি বা চেদি, বংশ বা বৎস, কুরু, পাঞ্চাল, মচ্ছ বা মৎস, শূরসেন, অচ্ছাক, অবন্তি বা পশ্চিম মালব, গান্ধার এবং কম্বোজ। এর মধ্যে ভাজ্জি (লিচ্ছবি) এবং মল্ল ছিল উপজাতীয়দের শাসনাধীন। মগধ, শূরসেন এবং সম্ভবত আরো কয়েকটি জনপদ ছিল অনার্য তথা শূদ্র রাজবংশের শাসনাধীন। তাছাড়া উপজাতীয় গোষ্ঠী-শাসিত দশটি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে প্রধান ছিল শাক্য গোষ্ঠী-শাসিত কপিলাবস্তু। বাকি নয়টি হলো—সুংসুমগিরির ভাগ্য গোষ্ঠী, আল্লাকাপ্পার বুলি গোষ্ঠী, কেসপুত্তর কালম গোষ্ঠী, রামগামর কোলীয় গোষ্ঠী, পাবার মল্ল গোষ্ঠী, কুশিনারার মল্ল গোষ্ঠী, পিপ্পলিবনের মোরিয়া গোষ্ঠী, মিথিলার বিদেহ গোষ্ঠী এবং বৈশালীর লিচ্ছবি গোষ্ঠী। ঐতিহাসিকদের মতে, এই উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলি সেযুগের রাজনীতি এবং সমাজনীতিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। (দ্রঃ Buddhist India, p. 21)

এইসব তথ্য প্রমাণ করে যে, অনার্য ভারতবর্ষ রাজনৈতিক দিক থেকে মোটেই পশ্চাদ্‌পদ ছিল না। ভাজ্জিরা ছিল আটটি গোষ্ঠীর একটি মহাসঙ্ঘ। শক্তিশালী এই মহাসঙ্ঘকে রাষ্ট্রব্যবস্থার আদর্শ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

গৌতম বুদ্ধ এবং মহাবীরের মতো লোকোত্তীর্ণ ব্যক্তিত্ব উপজাতীয় গোষ্ঠীতেই জন্মেছিলেন। বুদ্ধ শাক্য গোষ্ঠীতে এবং মহাবীর লিচ্ছবি গোষ্ঠীতে।

(ঘ) উপজাতীয় স্বার্থ এবং যজ্ঞের বিরোধ : বৃহৎ জনপদের এবং গোষ্ঠীর অধীন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জনপদের উপজাতীয় অধিকারের এই চিত্র থেকে একথা স্পষ্ট যে, ব্রাহ্মণ্যসমাজ ব্যবস্থার মুখাপেক্ষী নয়—এমন স্বাধীন মানুষ গৌতম বুদ্ধের যুগে কম ছিলেন না। ব্রাহ্মণ্যধর্ম যদি উন্নততরও হয়, তবু উপজাতীয় রাজ্যগুলিতে ঐ ধর্মের অনুপ্রবেশ ঐসব মানুষের কাম্য ছিল না এবং হয়তো তাদের প্রতিরোধও ছিল। তার কারণ, উপজাতীয় স্বার্থের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য যজ্ঞের বিরোধ। বিরোধের নানা কারণ ডি. ডি. কোশাম্বী 'An Introduction to the Study of Indian History' গ্রন্থে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

(১) ধর্মের তত্ত্ব বিচারের ওপর নয়, উপজাতীয় সমাজে যজ্ঞ-বিরোধিতার উৎস ছিল উপজাতিগুলির জীবনধারার সঙ্গে যজ্ঞের অসঙ্গতির মধ্যে। যজ্ঞ থেকে প্রাপ্তি হিসাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল যুদ্ধজয়। যুদ্ধকে মহিমান্বিত করা হতো এই কারণে যে, ক্ষত্রিয়দের জীবনই ছিল যুদ্ধনির্ভর। আর ব্রাহ্মণদের বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বন ছিল যজ্ঞ করা এবং তার থেকে প্রাপ্ত দক্ষিণা। সমাজের বাকি শ্রেণিগুলির কাজ ছিল উৎপাদন করা এমনভাবে, যাতে বেশ কিছু উদ্বৃত্ত থাকে যা ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়রা তাদের জন্মগত অধিকারবলেই গ্রহণ করবে। অতীতে পারস্পরিক নির্ভরতার যুগে হয়তো এই ব্যবস্থার যৌক্তিকতা ছিল, কিন্তু ক্রমশ কৃষিনির্ভর সমাজ গড়ে ওঠার পর এটি অসুবিধায় পরিণত হলো। কৃষিকর্মে নিরত উপজাতীয়রা এব্যবস্থায় তুষ্ট থাকতে পারেনি।

(২) বৈদিক যজ্ঞ যখন সৃষ্টি হয়েছিল, তখন আর্যদের জীবিকা ছিল পশুপালন। পশুর মালিকানা ছিল বৃহৎ গোষ্ঠীর হাতে এবং পশুর সংখ্যা ছিল অপর্যাপ্ত। যজ্ঞে যথা ইচ্ছা পশুবলি দেওয়ায় বাধা কিছু ছিল না। কিন্তু পরবর্তী কালে সমাজ কৃষিনির্ভর হয়ে ওঠায় পশুর প্রয়োজন হলো কৃষিকর্মে, তাদের মালিকানা বর্তাল গ্রামভিত্তিক ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা পরিবারের ওপর এবং বাড়তি পশু প্রতিপালনে সৃষ্টি হলো অনাগ্রহ। সেই অবস্থায় যজ্ঞের জন্য পশু দাবি করা মানেই পশুর মালিকের ওপর অনভিপ্রেত শুল্ক আরোপ করা এবং কৃষিকর্মের ক্ষতি করা। এদিক থেকেও যজ্ঞ ছিল উপজাতি স্বার্থের প্রতিকূল।

(৩) যারা উৎপাদন করে বাণিজ্য করে, তাদের কাছে যজ্ঞলালিত যুদ্ধবিগ্রহ মোটেই কাম্য ছিল না। কারণ, যুদ্ধ মানেই অশান্তি, বাড়তি শুল্ক আরোপ এবং বাণিজ্যের ক্ষতি। এইসব কারণে উপজাতীয় জনসমাজে এবং বিশেষভাবে বৈশ্য শ্রেণির মধ্যে যজ্ঞবিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল। তারা বুঝেছিলেন যে, তাদের জীবনে সমৃদ্ধির মন্ত্র হিংসার মধ্যে নয় —অহিংসার মধ্যে নিহিত। তাই হিংসাবিরোধী বৌদ্ধধর্ম এবং জৈনধর্ম উপজাতীয়দের মধ্য থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল।

(ঙ) আর্য-অনার্য সম্পর্ক : যজুর্বেদের সময় থেকেই ভারতীয় জনসমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চার বর্ণে বিভাজিত হয়ে পড়ে। ভারতের আদি জনগোষ্ঠীকে অর্থাৎ বিশাল অনার্য জনগোষ্ঠীকে বর্ণবিন্যাসে স্থান দেওয়া হয় শূদ্রশ্রেণিতে। তবে কিছু উদ্যমী অনার্যকে ক্ষত্রিয় শ্রেণিতেও গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তাদের নিয়োগ করা হয়েছিল আর্যদের সেবায়। কালক্রমে এই শূদ্রশ্রেণিটি অতিশয় বিস্ফারিত হয়ে পড়ে, কারণ অনেক সঙ্কর জাতি, অধিকাংশ ভারতীয় উপজাতি এবং কিছু বিদেশী উপজাতিকেও এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, জনসংখ্যা, ধর্ম, রাজনীতি, সংস্কৃতি—কোন বিষয়েই অনার্যরা উপেক্ষণীয় ছিল না। কিন্তু সেদিকে বিশেষ নজর না দিয়ে ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজে শূদ্রশ্রেণিকে একান্ত অমর্যাদার স্তরে বেঁধে রাখার প্রয়াস ছিল। তাদের কোন বৈদিক ক্রিয়াকর্মের অধিকার ছিল না। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক—কোন ব্যাপারেই তাদের সমানাধিকার ছিল না। সব ব্যাপারেই তারা ছিল বৈষম্যের শিকার। মনুসংহিতায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

মনুস্মৃতিই কুড়িটি স্মৃতিগ্রন্থের মধ্যে প্রাচীনতম এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। পি. ভি. কানে মনুস্মৃতির কাল ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নিরূপণ করেছেন। তাহলেও আরো বেশ কয়েকশো বছর আগে থেকে যে মনুসংহিতার অনুরূপ বিধান সমাজে ক্রিয়াশীল ছিল তা মনে করা যেতেই পারে। মনু বলেছেন—ব্রাহ্মণসেবা করাই শূদ্রের কাজ। ব্রাহ্মণসেবার অভাবে জীবিকা চাইলে শূদ্র ক্ষত্রিয়সেবা করবে, তদভাবে ধনী বৈশ্যের সেবা করবে। (১০।১২১) ব্রাহ্মণের সেবাই শূদ্রের বিশিষ্ট কর্ম বলে কথিত হয়। এছাড়া সে যা করে তা নিষ্ফল হয়। (১০।১২৩) ব্রাহ্মণ শূদ্রের সেবা-সামর্থ্য, দক্ষতা ও পোষ্যবর্গের সংখ্যা বিবেচনা করে তার যোগ্য জীবিকা স্থির করবেন। (১০।১২৪) শূদ্রের (নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণে) কোন পাপ নেই, সে (উপনয়নাদি) সংস্কারের যোগ্য নয়, ধর্মে তার অধিকার নেই। (১০।১২৬) শূদ্র সক্ষম হলেও ধন সঞ্চয় করবে না। কারণ, শূদ্র ধন লাভ করে (গর্ববশে) ব্রাহ্মণদেরই পীড়া দেয়। (১০।১২৯)

বিচার এবং প্রায়শ্চিত্তের ক্ষেত্রে শূদ্র সম্বন্ধে তীব্র বৈষম্যই ছিল রীতি। মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি এবং অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থে তার পর্যাপ্ত উদাহরণ বর্তমান। [ক্রমশ]

তাই তো, তুমি কল্লে কি?

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর! চারপাশে এই যে সব ভীষণ পালটে যাচ্ছে, এর কি হবে? মন, মেজাজ, বিশ্বাস, জীবনযাত্রার ধরন!

'কেমন শুনি। কি পালটেছে? কেমন পালটেছে?'

'প্রথমে ছিল সব যৌথ পরিবার। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে তৈরি হয়েছে 'ইউনিট ফ্যামিলি'।

'তাতে তোমার কি অসুবিধে হয়েছে?'

'একা একা লাগে। ভয় ভয় করে। বিপদে পড়লে পাশে এসে দাঁড়াবার কেউ নেই।'

'ও, তুমি মনুষ্য-নির্ভর হতে চাও? তুমি বিপদে পড়বে, অভাবে পড়বে আর তোমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব চারপাশ থেকে সব দৌড়ে দৌড়ে আসবে? শুধু-হাতে নয়, নৈবেদ্য সাজিয়ে নিয়ে আসবে! আমি বারেবারে একটা প্রশ্নই জনে জনে করেছি—তুমি কি সত্যই ঈশ্বরকে চাও? তাহলে সম্পূর্ণ তাঁর ওপর নির্ভর কর। জেনে রাখ ত্রিভুবনে ভগবান ছাড়া তোমার আর কেউ নেই। জানি, এই বিশ্বাস আসা সহজ নয়। অনেক চোট খেলে তবেই এই বিশ্বাস আসবে। যতই বুদ্ধি খাটাবে, বিচার করবে, ঈশ্বর ততই দূরে সরে যাবেন। তর্কে বহু দূর।'

'ঠাকুর! এমন কেন হয় না—আমি ডাকব না, তিনি আমায় ডাকবেন? হাজার মানুষের মাঝখান থেকে আমাকে ডেকে নিয়ে হয় বন্ধুর মতো কাঁধে হাত রেখে কিংবা পিতা অথবা মাতার মতো আমার হাত ধরে জীবনের পথে চলবেন! চলতে চলতে সংসারের রঙ-তামাসা দেখতে দেখতে একদিন বুড়ি ছুঁয়ে ফেলব।'

'শোন, ঈশ্বর হলেন বিশ্বাস। তিনি সকলকেই দেখছেন। সকলের সবকিছুর সাক্ষী। তুমি তাঁকে না দেখলেও তিনি তোমাকে দেখছেন। কূটকচালে প্রশ্ন করে সহজ, সরল ব্যাপারটাকে জটিল করে ফেলো না। বিশ্বাস এলে প্রশ্ন তার বিষাক্ত ফণা তুলতে পারে না। ঈশ্বরের কাছে প্রমাণ চেও না। তোমার জন্যে তিনি মানুষের আদালতে হাজির হতে প্রস্তুত নন। তোমার যুক্তি ও বুদ্ধি-গ্রাহ্য ক্ষুদ্র জগৎটি তাঁর উদরে আছে। তিনি শ্বাসে-প্রশ্বাসে তোমার মতো শত সহস্র প্রাণকে জীবিত রেখেছেন। তোমার ইচ্ছাতে গাছের একটি পাতাও নড়বে না। কুঁয়ার সিং [কুমার সিং, ঠাকুর বলতেন 'কুঁয়ার সিং'। নানকপন্থী শিখভক্ত। কালীবাড়ির উত্তরে ছিল সরকারি বারুদখানা—ম্যাগাজিন। সেখানে পাহারা দিত একদল শিখ সৈন্য। কুমার সিং ছিলেন সেই দলের একজন হাবিলদার। তিনি ঠাকুরকে গুরু নানক জ্ঞানে ভক্তি করতেন। ঠাকুরের পূতসঙ্গ লাভ করার জন্য সময় পেলেই ছুটে আসতেন মন্দিরে।] আমাকে একবার চানকে নিয়ে গেল। সেখানে শিখরা বললে, ঈশ্বর দয়াময়। আমি তাঁদের বলেছিলাম, দয়াময় কেন বলব? তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। যাতে আমাদের মঙ্গল হয়, তা যদি করেন সে কি আর আশ্চর্য! মা-বাপ ছেলেকে পালন করবে, সে আবার দয়া কি? সে তো করতেই হবে, তাই তাঁকে জোর করে প্রার্থনা করতে হয়। তিনি যে আপনার মা, আপনার বাপ! ছেলে যদি খাওয়া ত্যাগ করে, বাপ-মা তিন বৎসর আগেই হিস্যা ফেলে দেয়।'

ঠাকুর বলতে চাইছেন, স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিকে দেখবেন। তিনি দেখতে বাধ্য। তাঁর সেই দেখার ধরনটা আমার পছন্দ নাও হতে পারে। একটাই তো অসন্তোষ—ওর কেন অত টাকা, ওর কেন অত সুখ! যার অনেক আছে তার-ই বা সুখ কোথায়? আরো অনেক রকম হলে ভাল হতো।

অবস্থা যখন 'দিন আনি দিন খাই' গোছের ছিল, তখন সকালে জুটত মোটা কাঁচের গেলাসে 'তেরছা' কয়েক চুমুক চা। 'তেরছা' মানে চা নামের গরম পানীয়, যার কোন স্বাদ-আহ্লাদ নেই। আমাদের দুঃখের জীবনে এই জাতীয় একাধিক বস্তু আছে, যেমন মেসের ডাল। কি ডাল, কোন্ ডাল—কেউ বলতে পারবে না। "অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষম্" বলে চালিয়ে দিতে হয়। চালালেই চলে যায়।

এইবার অবস্থা ফিরছে। চায়ের কাপে সোনালি বর্ডার। চায়ের স্নানজলে দার্জিলিঙের খুশবু। খাবার উঠল টেবিলে, বাবু বসলেন চেয়ারে। চারপাশে রকমারি খেলনা। মাথা-ছেঁদা ভাল্লুক। বহুবার নাড়লে এক চিমটে নুন দয়া করে ঝরতে পারে। মাথা ফুটো ফুটো মাঙ্কি। একবার ঝাড়লে এক ভলক মরিচ।

বাবু বড়লোক হচ্ছেন। মার্বেলের 'মারভ্যালাস' মেঝে। পূর্বে ঠাকুরঘরে বসে কাঁদতেন, এখন ক্লাবে বসে হাসেন। পরিচিতদের চিনতে পারেন না। বৃদ্ধ পিতা, ওল্ড ফুল। ঠাকুরঘরে পুরুত সেঁধিয়েছেন। ঘটা বেড়েছে, ভক্তি কমেছে। পরিবারের সদস্যরা ক্রমশই অলস থেকে অলসতর হচ্ছেন। আর এই জীবনেরই সাধনা চলছে সর্বত্র। এইটাই হলো সাফল্যের মাপকাঠি। এই ধারায় নিজেকে ফেলতে না পারলে তুমি ব্যর্থ।

এসবই কি ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটছে?

জেনে তোমার কি লাভ হবে? মানুষের চালচলন দিয়ে ঈশ্বরকে জানার চেষ্টা করো না। তিনি কালাতীত,

জীবনাতীত। বিশাল, বিপুল তাঁর ক্ষেত্র। ভগবান সকলের ভিতর কিরূপে বিরাজ করেন জান? যেমন চিকের ভিতর বড়লোকের মেয়েরা থাকে। তারা সকলকে দেখতে পায়, কিন্তু তাদের কেউ দেখতে পায় না; ভগবান ঠিক সেইরূপে বিরাজ করছেন।

আবার ভগবান যেমন প্রদীপের আলো। আলোর স্বভাব হলো আলো দেওয়া; কেউ বা তাতে ভাত রাঁধছে, কেউ দলিল জাল করছে, কেউ তাতে ভাগবত পাঠ করছে—সে কি আলোর দোষ? কেউ ভগবানের নামে মুক্তির চেষ্টা করছে, কেউ চুরি করার চেষ্টা করছে—সে কি ভগবানের দোষ?

"সংসারঃ স্বপ্ন তুল্যোহি রাগ দ্বেষ সমাকুলঃ।
প্রভাতে সত্যবৎ ভাতি প্রবোধেঽসত্যাং ভবেৎ।।"

রবীন্দ্রনাথের সেই পাগলা মেহের আলি পরিত্যক্ত প্রাসাদের অন্ধকার অলিন্দে অলিন্দে হেঁকে ফিরছে—'তফাৎ যাও, সব ঝুট হ্যায়।' রাজা নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখে আঁতকে উঠছেন—'ম্যায় কাঙাল হো গিয়া।' কাঙাল স্বপ্নে নাচছে—'ম্যায় রাজা হো গিয়া।' "প্রবোধেঽসত্যাং ভবেৎ।" সংসার এক দীর্ঘ স্বপ্ন। জ্ঞানলাভ যতদিন না হচ্ছে, হাস, কাঁদ, নাচ, গাও। জ্ঞান হলে স্বপ্ন ছুটে যাবে। সংসার তখন—(১) কখনো স্বপ্ন, (২) কখনো পাগলাগারদ, (৩) কখনো নাট্যশালা, (৪) কখনো জেলখানা, (৫) কখনো বাজার, (৬) কখনো দেবালয়।

'জ্ঞান' কাকে বলে? লেকচার-মারা-জ্ঞান। আমি আর আমার কর্ম—এর কোন্ জায়গায় ঈশ্বরসংযোগ ঘটছে?

"ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে।।"

(গীতা, ৫।১৪)

ঈশ্বর জীবগণের কর্তৃত্ব, কর্ম বা কর্মফল সম্বন্ধ কিছুই সৃষ্টি করেন না; কিন্তু জীবের স্বভাবই (অবিদ্যা) কর্তা হয়ে ঘাড় ধরে কাজ করিয়ে নেয়। অনাদি অবিদ্যাজনিত কর্মফল। কর্মফলের সংস্কারই হলো প্রারব্ধ। সংস্কার হলো ত্রিগুণময় কর্মবীজ। তিনটি গুণ হলো—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। **প্রত্যেক জীবই নিজ কর্মানুসারে দেহধারণ করে সংস্কার অনুযায়ী কর্ম করে।**

একটা তেল চুকচুক হৃষ্টপুষ্ট ইঁদুর বই-ঠাসা র‍্যাক থেকে নামছে। জিজ্ঞেস করলুম—কি পড়ে এলে? মুচকি হেসে বললে, খেয়ে এলুম। ঠাকুর বলছেন, 'শোন, শোন—যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ। ভগবান কল্পতরু। যে যা চায়, সে তাই পায়। গরিবের ছেলে লেখা-পড়া শিখে হাইকোর্টের জজ। বলে—আর কি, বেশ আছি।'

ভগবান তখন বলেন, 'বাছা! তুমি বেশ থাক!'

তারপর যখন সে পেনশন নিয়ে ঘরে বসে, তখন বুঝতে পারে—'এজীবনে কল্লুম কি?' ভগবানও তখন বলেন, **'তাই তো, তুমি কল্লে কি?'** ❑

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ১৪

পাশাপাশি ঃ (১) সতত, (৩) জনিত, (৫) যদা, (৬) দাবানল, (৭) বদ, (৯) তাত, (১১) মহাদেব, (১৩) জন, (১৪) বিদ, (১৫) বামদেব, (১৬) কদা, (১৮) নর, (২০) পরাবরে, (২২) নর, (২৩) বিমুগ্ধ, (২৪) জনিত।

ওপর-নিচ ঃ (১) সদা, (২) তদা, (৩) জল, (৪) তব, (৫) যততা, (৮) দলন, (১০) তদ্‌বদ্, (১১) মনোজবা, (১২) বসুধৈব, (১৩) জগদেক, (১৪) বিদ্বান্, (১৭) দাধার, (১৯) রবি, (২০) পঞ্চ, (২১) রেজ, (২২) নত।

শব্দচেতনা ১৪-এর সঠিক উত্তরদাতার নাম ঃ

স্বামী অম্বিকেশানন্দ, অলক পালচৌধুরী

অনুষ্ঠান-সূচী ঃ অগ্রহায়ণ ১৪০৯

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে

জন্মতিথি-কৃত্য ঃ **স্বামী বিজ্ঞানানন্দ**
কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী
২ অগ্রহায়ণ, সোমবার
(১৮ নভেম্বর ২০০২)
স্বামী প্রেমানন্দ
অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী
২৭ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার
(১৩ ডিসেম্বর ২০০২)

পূজাতিথি-কৃত্য ঃ **শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা**
কার্তিক পূর্ণিমা
৩ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার
(১৯ নভেম্বর ২০০২)

একাদশী ঃ ১৪, ২৯ অগ্রহায়ণ
শনিবার, রবিবার
(৩০ নভেম্বর, ১৫ ডিসেম্বর ২০০২)

থ্যালাসেমিয়া
এক জিন-সংক্রান্ত রোগ

তনুকা রায়

পটভূমি

মা-বাবারা ছেলে-মেয়ের সংসার, বিয়ে ও ভবিষ্যৎ জীবন—এসব কথা সাধারণত ভেবে থাকেন। তাদের বিয়ে কতটা সফল হবে, কতটা সুখের হবে—এবিষয়ে জানতে গেলে কিছু জরুরি বিষয় জানা দরকার। বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রী উভয়েরই রক্তপরীক্ষা করা দরকার। এই পরীক্ষার নাম 'হিমোগ্লোবিন ইলেক্ট্রোপোরেসিস'। পাত্র-পাত্রী উভয়ের রক্তে যদি থ্যালাসেমিয়ার জিন থাকে, তাহলে এই বিয়ে শুভ নয়। এই থ্যালাসেমিয়া কি ও তার উৎস কোথায়, এই রোগ কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়—এবিষয়ে জানতে গেলে সর্বপ্রথম জানা দরকার থ্যালাসেমিয়া কি?

থ্যালাসেমিয়া একপ্রকার রক্তের ভাব, যা উত্তরাধিকার সূত্রে বাহিত হয়। এর পরিণামে শরীরের মধ্যে হিমোগ্লোবিনের সংশ্লেষণ কমে যায়। থ্যালাসেমিয়া-বাহিত জিন সব দেশেই আছে। তবে এটি মেডিটেরেনিয়ান, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার লোকেদের মধ্যেই বেশি পরিলক্ষিত হয় এবং এটি বিশ্বের যেকোন জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে পারে—যদি মানুষ এবিষয়ে সচেতন না হয়। এর মুখ্য কারণ হলো মানুষের অজ্ঞানতা ও সচেতনতার অভাব। এর দ্বারা আক্রান্ত রোগীর দেহে হিমোগ্লোবিন তৈরি হয় না। ফলে রক্তে যে লোহিত রক্তকণিকা (RBC) থাকে তা সহজেই বিনষ্ট হয়ে যায়। সাধারণত এগুলি জীবিত থাকে ১১০ দিন। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বহনকারীর ক্ষেত্রে এর বাঁচার ক্ষমতা অনেক কম। হিমোগ্লোবিন হলো একধরনের প্রোটিন, যা লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে থাকে এবং অক্সিজেনকে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পৌঁছে দেয়। তাই লোহিত রক্তকণিকার অভাবে শরীর দুর্বল, ক্ষীণ হয়ে পড়ে। এছাড়াও এর অভাবে শরীরে রক্তাল্পতা দেখা দেয় এবং হৃৎপিণ্ড ও বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধীরে ধীরে অকর্মণ্য হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সাধারণত রোগীর মৃত্যু হয় ১-৮ বছরের মধ্যে।

উৎপত্তি

এই শব্দটি গ্রিক শব্দ 'থ্যালাসা' থেকে এসেছে অর্থাৎ সেই সমুদ্র—মেডিটেরেনিয়ান সি। এই সমুদ্র যেসমস্ত অঞ্চলকে পরিবেষ্টিত করে আছে, সেখানেই এর মাত্রা বেশি। ১৯২৫ সালে টমাস বি. কুলি এবং লি পার্ক নামে দুজন বিজ্ঞানী চারজন মারাত্মক রক্তাল্পতায় (anaemia) আক্রান্ত শিশুর ওপর গবেষণা করে দেখেন যে, এদের রক্তাল্পতার কারণে নানারকম উপসর্গ দেখা দিয়েছে। তখনো পর্যন্ত এটিকে 'মেডিটেরেনিয়ান অ্যানিমিয়া' বা 'কুলিস অ্যানিমিয়া' (Cooley's anaemia) বলা হতো। কিন্তু 'থ্যালাসেমিয়া' শব্দটির প্রথম নামকরণ করা হয় ১৯৩২ সালে। বর্তমানে এই রোগ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেখা যাচ্ছে। এর মূল কারণ হলো মানুষের নিয়মিত স্থানান্তরণ, স্বগোত্র বিবাহ, উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি।

থ্যালাসেমিয়া মূলত দুপ্রকারের হয়—(১) **বিটা থ্যালাসেমিয়া** (Beta Thalassaemia) এবং (২) **আলফা থ্যালাসেমিয়া** (Alpha Thalassaemia)। ভারতবর্ষে বিটা থ্যালাসেমিয়ার প্রকোপ বেশি। এই দুই ধরনের থ্যালাসেমিয়াকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়—

(১) **থ্যালাসেমিয়া মাইনর, টেইট ও ক্যারিয়ার :** 'থ্যালাসেমিয়া মাইনর' বহনকারীরা অসুস্থ নন। তাঁরা সম্পূর্ণভাবে সুস্থ ও সবল। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কিছুসংখ্যক এই রোগের কারণে রক্তাল্পতায় ভোগেন। এঁরা জানেন না যে, এই রোগের কারণেই রক্তাল্পতায় ভোগেন। এঁরা রোগ সম্পর্কে জানতে পারেন যখন অত্যধিক কাজের চাপে দুর্বল হয়ে পড়েন। তখন হিমোগ্লোবিনের মাত্রা এতই কমে যায় যে, তাঁদের চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী এক বিশেষ ধরনের রক্তপরীক্ষা করাতে হয়, যাকে বলে—'A Complete Blood Count' (CBC বা HbA_2)। সেই পরিবারের কোন সন্তানের যখন 'থ্যালাসেমিয়া মেজর' ধরা পড়ে, তখন এর উৎপত্তির সঠিক কারণ জানার জন্য চিকিৎসক পরিবারের সকলকে এই পরীক্ষা করতে পরামর্শ দেন। এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, রোগীর মা অথবা বাবা বা দুজনেই এই থ্যালাসেমিয়ার জিন-বাহক। 'থ্যালাসেমিয়া টেইট' বহনকারী লোকেদের লোহিত রক্তকণিকাগুলি সাধারণ লোকের লোহিত রক্তকণিকার থেকে ছোট হয়। এই রোগের কোন উপসর্গ (symtoms) পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু বিশেষ সময়ে রক্তাল্পতা ছাড়া এই রোগ তখনি ছড়াবার সম্ভাবনা—যখন এই রোগের জিন বহনকারী মহিলা গর্ভবতী হন।

(২) **থ্যালাসেমিয়া ইন্টারমিডিয়া :** এটি আরেক প্রকার থ্যালাসেমিয়া। এটি থ্যালাসেমিয়া মাইনর ও মেজরের এক মাঝামাঝি রূপ। এটি সাধারণত বাল্যাবস্থায় আরম্ভ হয়ে পরবর্তী জীবনে ধরা পড়ে। এর মূল উপসর্গ হলো—রক্তাল্পতা। ফলে রোগীর দেহে রক্ত সঞ্চালনের দরকার হয়।

(৩) **থ্যালাসেমিয়া মেজর :** এটি রোগীর দেহে প্রচুর পরিমাণে রক্তাল্পতা সৃষ্টি করে। এটি মারাত্মক ধরনের বংশগত অ্যানিমিয়া। যেসমস্ত শিশুর মধ্যে এটি আছে, তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে হিমোগ্লোবিন তৈরি করতে পারে না। এই কারণে এদের মজ্জা (marrow) যথেষ্ট পরিমাণে লোহিত রক্তকণিকা তৈরি করতে পারে না। যেসব রক্তে কণিকা তৈরি হয়, তারা প্রায়ই শূন্য থাকে।

লক্ষণসমূহ

শিশুদের ৬ মাস থেকে ২ বছর বয়সের মধ্যে থ্যালাসেমিয়া রোগ ধরা পড়ে। তখন যদি ঠিকমতো চিকিৎসা না হয়, তাহলে নানান উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যেমন—রক্তশূন্যতা—যার জন্য রোগীর গায়ের রঙ ফ্যাকাসে, মলিন এবং পীতবর্ণের হয়। এছাড়া ক্ষুধামান্দ্য, শারীরিক বৃদ্ধিহীনতা ও প্লীহা বড় হওয়ায় পেট বড় দেখায়। চোখ-মুখের বিকৃতি ও চ্যাপ্টা ধরনের আকৃতি হওয়ায় রোগীদের মঙ্গোলিয়ানদের মতো দেখায়। এরা ভাল করে ঘুমোতে পারে না ও ঘন ঘন বমি করতে থাকে। এই রোগীরা যেকোন ধরনের রোগে আক্রান্ত হতে পারে। 'থ্যালাসেমিয়া মেজর' সবথেকে ভয়াবহ।

রোগনির্ণয়

রোগীর রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা 2-3 g/dl থাকলে থ্যালাসেমিয়া ধরা পড়ে। আগেই বলা হয়েছে, এই রোগনির্ণয় করার জন্য বিশেষ রক্তপরীক্ষা দরকার এবং রোগের উৎস জানতে রোগীর পিতা-মাতার রক্তও পরীক্ষা করা দরকার। অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রেই এই রোগ বাহিত হয়। এটি কোন সংক্রমণ বা সর্দিকাশির মতো ছোঁয়াচে নয়। লক্ষণীয় যে, কোন রোগী 'থ্যালাসেমিয়া ট্রেইট' জিন নিয়ে জন্মালে সে সারাজীবন সেই জিনই বহন করবে, এটি সময় বা পরিস্থিতির সঙ্গে বদলায় না।

চিকিৎসা

(১) **রক্ত সঞ্চালন** (Blood transfusion) **:** এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা হলো রক্ত-সঞ্চালন অর্থাৎ নিয়মিত রক্ত বদল বা রোগীকে রক্তশূন্যতা থেকে মুক্ত করা। তাই রোগীর দেহে প্রয়োজনমতো নিয়মিত সময় অন্তর রক্ত-সঞ্চালন করতে হয়, যাতে রোগীর রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা 10-11 g/dl আসে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর রক্ত-সঞ্চালন না করলে রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে ও বাঁচার জন্য লড়াই করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এই রক্ত-সঞ্চালনের ফলে রোগী ২০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রায় স্বাভাবিক জীবনযাপন করলেও পরে অন্যান্য আধুনিক চিকিৎসার সাহায্য নিতে হয়।

(২) **অতিরিক্ত লোহা-নির্গত প্রক্রিয়া :** রক্ত-সঞ্চালনের ফলে লোহিত রক্তকণিকাগুলি ধীরে ধীরে ভেঙে যায় ও শরীরে অত্যধিক লোহা (iron) জমতে শুরু করে। ফলে চামড়ার রঙ তামাটে হয়ে যায়। যদি এই অতিরিক্ত লোহা সরানো না যায়, তাহলে শরীরে এটি জমে গিয়ে যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড ও অন্যান্য অংশের ক্ষতি করে এবং ২০ বছরের মধ্যে রোগী মারা যায়। বর্তমানে শরীর থেকে অতিরিক্ত লোহা নির্গত করার একমাত্র উপায় হলো 'ডেসফেরাল' (Desferal) ইঞ্জেকশন দেওয়া, যা চামড়ার নিচে ছোট পাম্প দ্বারা ৫-৭ রাত্রি দেওয়া হয়। এটি অতিরিক্ত লোহাকে সংগ্রহ করে মূত্রের মাধ্যমে শরীর থেকে বের করে দেয়। এই চিকিৎসা খুবই ফলদায়ক। বর্তমানে আক্রান্ত শিশুরা রক্ত-সঞ্চালন ও ইঞ্জেকশন নিয়ে সাধারণ জীবনযাপন করছে। কিন্তু এই চিকিৎসাটি খুবই কষ্টদায়ক এবং ব্যয়বহুলও বটে। থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের লৌহমিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য একেবারেই নিষিদ্ধ। এদের সাধারণত প্রতিদিনই ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট ব্যবহার করতে হয়।

(৩) **স্পিল্‌ন্যাক্টোমি** (Speelnactomy) **:** প্লীহা বড় হয়ে গেলে এর চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। প্লীহা বড় হওয়ার জন্য বাচ্চাদের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে যায় ও শিশুর শারীরিক বিকাশ লোপ পায় এবং বাচ্চারা অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। তবে এই চিকিৎসা খুবই ব্যয়বহুল।

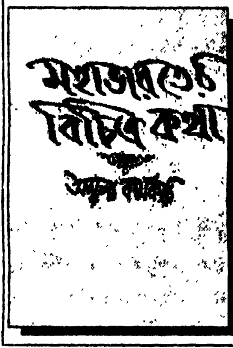
(৪) **বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন** (Bone Marrow Transplantation) **:** এটি শুধু ব্যয়সাপেক্ষই নয়, এর সফলতার ওপর নির্ভর করে রোগীর আরোগ্য। এটি এমন এক ধরনের প্রক্রিয়া, যাতে রোগীর হাড়ের ভিতরের মজ্জা সরিয়ে কোন দাতার (Donar)—যার সঙ্গে রোগীর মজ্জার মিল রয়েছে—মজ্জা প্রতিস্থাপন করা হয়। প্রথমে ওষুধের সাহায্যে রোগীর মজ্জা ধ্বংস করা হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম 'condiening'। তারপর দাতার ভাল মজ্জা (সাধারণত থাই থেকে নেওয়া হয়) রোগীর শরীরে প্রবেশ করানো হয়। এই প্রক্রিয়া রক্তকণিকা তৈরি করতে সাহায্য করে। তবে এটি এতই ব্যয়বহুল যে, তা সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে। আমাদের দেশে এই চিকিৎসার খরচ প্রায় ১০-১২ লক্ষ টাকা।

প্রতিকার

এই রোগ খুব সহজেই প্রতিকার করা যায়। ভারতবর্ষে আনুমানিক ৩৫ লক্ষ লোক এই রোগে আক্রান্ত। প্রতিবছর ভারতবর্ষে ১০-১২ হাজার শিশু এই রোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই রোগাক্রান্ত শিশুরা তাদের জীবনের প্রথমাবস্থায় মারা যায় উপযুক্ত চিকিৎসা ও জ্ঞানের অভাবে। এই রোগের হাত থেকে বাঁচতে হলে মানুষকে আগে সচেতন হতে হবে। মানুষের হাতেই আছে এই রোগ-নিবারণের উপায়। বিয়ের আগে প্রত্যেকের রক্ত পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া উচিত যে, তাঁরা এই থ্যালাসেমিয়ার জিন বহন করছেন কিনা। যদি দেখা যায় যে, তাঁরা এতে আক্রান্ত, তাহলে এধরনের বিয়ে সুফল নয়। একান্তই যদি বিয়ে বন্ধ করা না যায়, তাহলে মহিলাদের গর্ভবতী হওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। আর যদি গর্ভবতী হয়েও যান, তাহলে গর্ভাবস্থায় ৮-১০ সপ্তাহের মধ্যে Antenatal diagnosis করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে জানা যায় যে, রোগীর ভ্রূণ এই জিন বহন করছে কিনা। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'Chorionic Villus Sampling' (CVS)। প্রয়োজনে গর্ভপাত করিয়ে একটি অসুস্থ শিশুকে জন্ম দেওয়া থেকে বিরত থাকাই উচিত। জেনেশুনে এই ধরনের শিশুকে জন্ম দেওয়া সামাজিক অপরাধ। সকলে যদি এই কথাগুলি মনে রেখে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলেন, তাহলেই বিশ্বকে থ্যালাসেমিয়া-মুক্ত করা সম্ভব। ❑

মহাভারত সকলের জন্য

অরিন্দম দাস



মহাভারতের বিচিত্র কথা
অমূল্য কর্মকার
প্রকাশক :
সুরেশ দাশ
ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা—৭০০ ০০৯
পৃষ্ঠা : ১০৪
মূল্য : ৫০ টাকা

ই কোন্ প্রাচীন কালে রচিত হয়েছিল মহাভারত। আজকের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুগেও অস্বীকার করা যায় না এর অনিবার্য আবেদনকে, বরং এযুগেও তা সমভাবে দীপ্যমান। অমূল্য কর্মকারের লেখা **'মহাভারতের বিচিত্র কথা'** গ্রন্থটি পড়লে একথাই বারবার মনে হয়।

লেখক ১৪টি অধ্যায়ে তাঁর মহাভারত-ভাবনাকে গ্রথিত করেছেন। 'মান্ধাতার আমল'-এ তিনি সেকালের বসন-ভূষণ, বাহন, বিজ্ঞান, দারিদ্র্য, প্রাচুর্য, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন, যার থেকে তৎকালীন সমাজব্যবস্থা ও সমাজমনস্কতার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। 'মহাভারতের দিনকাল' অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়ও একই।

'মহাভারত ও মডার্নিটি' একটি চমৎকার অধ্যায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিকতম ফসল ক্লোনিং, টেস্টটিউব বেবি, সারোগেট মাদার, গাইডেড মিশাইল, এরোপ্লেন, অ্যাটম বোম্ব, নারীর পুরুষে রূপান্তর প্রভৃতি। ভাবতে অবাক লাগে, কত হাজার বছর আগে এই ভারতবর্ষের মাটিতেই বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ফসলগুলি তাদের অস্তিত্বের উজ্জ্বল সাক্ষর রেখেছিল। ঋষি অগস্ত্য যেভাবে লোপামুদ্রাকে সৃষ্টি করেছিলেন, তাতে 'ক্লোনিং'-এর সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 'টেস্টটিউব বেবি'র সর্বোত্তম উদাহরণ আচার্য দ্রোণ, গান্ধারীর শতপুত্র এবং সগর রাজার ষাটহাজার পুত্র। আবার স্বর্গের চিকিৎসক অশ্বিনীকুমার মান্ধাতাকে ভূমিষ্ঠ করিয়েছিলেন 'সিজারিয়ান অপারেশন' করে। রাজা যযাতির কন্যা মাধবীকে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল 'সারোগেটেড মাদার'-এর ভূমিকায়। অশ্বত্থামার 'নারায়ণ অস্ত্র' আসলে ছিল 'গাইডেড মিশাইল', যা শুধু যুদ্ধরত অস্ত্রধারীদের প্রতিই নিক্ষিপ্ত হতো। বিমানের উল্লেখ মহাভারতে বহু রয়েছে। রাজা যযাতির সঙ্গে এক বিমানচালকের সাক্ষাৎও হয়েছিল। আবার চেদিরাজ এত বেশি বিমান ব্যবহার করতেন যে, তাঁর নামই হয়ে গিয়েছিল 'উপরিচর'! অর্জুন শিবের কাছ থেকে যে পাশুপত অস্ত্র লাভ করেছিলেন, তার সাহায্যে নিমেষমধ্যে বিশ্বচরাচর ধ্বংস করা যেত। এপ্রসঙ্গে আমরা হিরোসিমা-নাগাসাকির কথা স্মরণ করতেই পারি। নারীর পুরুষে রূপান্তরের আদি দৃষ্টান্ত শিখণ্ডী। সাংবাদিকতার সূচনাও সেই মহাভারতের যুগে—সঞ্জয়ের হাত ধরে। লেখক যথার্থই বলেছেন : "এত বড় মহাভারতে বিন্দুমাত্র ভাবনার দৈন্য কোথাও নজরে পড়েনি। আমাদের সীমিত ক্ষমতায় নিজেরা যা পারিনি, দেবতা বা ঋষির বরে তা সম্ভব করে তুলেছি। হয়তো দেখব দেব, দানব, দৈত্য, রাক্ষস, অপ্সরা, গন্ধর্ব, কিন্নর আমাদের মনেরই বিভিন্ন প্রতিচ্ছবি মাত্র।... রূপায়ণের প্রত্যাশা নিয়ে... কত শত বলিষ্ঠ পরিকল্পনা সারা মহাভারতে ছড়িয়ে আছে। আমরা তার কতটুকু হদিশ রাখি?" (পৃঃ ২৪)

হদিশ আমরা অনেকেই রাখি না, সে আমাদের ইতিহাস-বিমুখতা, ঐতিহ্যের প্রতি অনীহা। কিন্তু আনন্দ হয় যখন অমূল্য কর্মকারের মতো নিষ্ঠাবান মানুষ অত্যন্ত যত্ন সহকারে আমাদের চিরায়ত কালের সেই জ্ঞানভাণ্ডার থেকে রত্ন আহরণ করে আনেন। এর প্রমাণ 'মহাভারতের ক্ষুদ্র ভাবনা', 'বুদ্ধিজীবীদের গল্প' এবং 'আদ্যিকালের গল্প' অধ্যায়-ত্রয়। শেষোক্ত অধ্যায়ে সংক্ষেপে যে ৩৬টি ঘটনার সন্নিবেশ হয়েছে, সেগুলি থেকে আধুনিক লেখকরা লেখার প্রচুর রসদ পাবেন। গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায় 'অনন্য মহাভারত' 'উদ্বোধন'-পাঠকেরা ইতিমধ্যেই পড়েছেন। লেখকের সহজ সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী রচনাশৈলীর সঙ্গে তাঁরা সবিশেষ পরিচিত।

'মহাভারতে ক্রোধানল' অধ্যায়ে লেখক বলেছেন : "মহাভারতে গর্ভস্থ শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই ছিল যেন এক-একটি বিস্ফোরক।" বাস্তবিক, দ্বিতীয় রিপুটির দাপটে মহাভারতের প্রায় প্রতিটি চরিত্রই যেন বিস্ফোরক! মহর্ষি চ্যবন ভূমিষ্ঠ হয়েই মায়ের অপমানকারী রাক্ষস পুলোমাকে ক্রোধানলে ভস্ম করে দিয়েছিলেন। সগর রাজার পুত্র অসমঞ্জা শিশুদের কান্না সহ্য করতে পারতেন না বলে তাদের নদীতে ফেলে দিতেন। ঋষি জরৎকারু পত্নীকে 'ডিভোর্স' করেছিলেন তাঁর ঘুম ভাঙানোর জন্য। কহোড়ের পত্নী সুজাতার গর্ভস্থ শিশু পিতার বেদপাঠে ভুল ধরেছিলেন বলে পিতার শাপে তাকে অষ্টাবক্র হয়ে জন্ম নিতে হয়। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরই আসল কথাটা বলেছিলেন—ক্রোধ মানুষের দুর্জয় শত্রু। ক্রোধে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হয়। বাস্তবিক, ক্রোধ সংযমের দুশ্চর তপস্যা আমরা যুধিষ্ঠিরের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করি।

সেকালে ধর্ম সম্পর্কে সচেতনতা জাতি-বর্ণ-শিক্ষা-অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে অনেকেরই ছিল। ধর্ম-এর যে কত ব্যাপক ও সূক্ষ্ম তাৎপর্য থাকতে পারে, তা মহাভারত না

পড়লে বোঝা যায় না। লক্ষণীয় বিষয় হলো, পূজা-ব্রত-আচার প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ধর্মের কথা উচ্চারিত হলেও যশোকীর্তন করা হয়েছে সনাতন মানব-ধর্মেরই। বলা হয়েছে, ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। নির্ভেজাল যুক্তি ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই ধর্ম-ধারণার আলোচনা বর্তমান যুগে বিশেষ প্রয়োজন। সেখানে 'মহাভারতে ধর্মাধর্ম' অধ্যায়টি মাত্র চারপৃষ্ঠায় সমাপ্ত করায় আগ্রহী পাঠক-মন তৃপ্ত হবে বলে মনে হয় না।

এই গ্রন্থে কয়েকটি অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি বিশেষ করে নজরে পড়ে। যেমন, ঘটনা বা উক্তিগুলির কোথাও কোন সূত্রনির্দেশ করা হয়নি। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ এক্ষেত্রে হতাশই হবেন। দ্বিতীয়ত, মুদ্রণ প্রমাদ মাঝেমধ্যেই পাঠে ব্যাঘাত ঘটায়। এবং তৃতীয়ত, এই গ্রন্থে কোন কোন ঘটনা ও উক্তি একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও লেখক জানিয়েছেন, পূর্বে অন্যত্র প্রকাশিত অধিকাংশ রচনা এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হওয়ায় পুনর্কথন ঘটেছে, তবুও বলতে হয়—সেগুলিকে সম্পাদনার পর লেখক এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করলে রচনাগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারত।

তবে গ্রন্থটি রচনা করতে গিয়ে তাঁকে যে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে তার জন্য কোন প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। সমস্ত জটিলতা ও মহাভারতীয় ব্যাপকতাকে পরিহার করে লেখক যে সাধারণ পাঠক-মনের উপযোগী একটি সহজ, সরল ও মনোগ্রাহী গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, তার জন্য তিনি সকলের কৃতজ্ঞতা লাভ করবেন। ❑

সুরে সুরে গানে গানে

অনীশ রায়চৌধুরী



গান ● গীতি আলেখ্য ● কবিতা
অভয়পদ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশিকা ও সঙ্কলক :
ডাঃ শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৩ডি, ইডেন হসপিটাল রোড
কলকাতা—৭০০ ০৭৩
পৃষ্ঠা : ১৬+২২৪
মূল্য : ৭৫ টাকা

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকগুলিতে বাংলার নবজাগরণ যখন চূড়ান্তরূপে বিকশিত, তখন কলকাতার সঙ্গে সঙ্গে জেলাগুলিতেও শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু বিশিষ্ট প্রতিভাধর ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে যুগের পরিবর্তনের ফলে তাঁদের অনেকেই বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেছেন।

সাহিত্য-সঙ্গীতচর্চার অন্যতম কেন্দ্র হাওড়ার তেমনি এক বিস্মৃতপ্রায় কবি, গীতিকার ও সঙ্গীতসাধক অভয়পদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী বর্ষে তাঁর কন্যা পিতৃতর্পণ করেছেন তাঁর রচনাগুলি সংগ্রহ করে 'গান ● গীতি আলেখ্য ● কবিতা' গ্রন্থখানি প্রকাশ করে। নিঃসন্দেহে সাধু চেষ্টা। একদিকে যেমন প্রচুরসংখ্যক লুপ্ত হয়ে যাওয়া গান পুনরুদ্ধার হওয়ায় নবীন গায়ক-গায়িকারা সেগুলি নতুন করে গাইবার সুযোগ পাবেন, অপরদিকে তেমনি 'বাণীরূপে রহিয়াছ মুরতি ধরি', 'বৈকুণ্ঠ হতে লক্ষ্মী এল', 'পদ্মাসীনা করে লয়ে বীণা'—প্রভৃতি বহুপ্রচারিত গানগুলির বিস্মৃত গীতিকার আবার নতুন করে স্বীকৃতি পেলেন।

বেশির ভাগ গানই কোন না কোন বিশেষ সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধ করতে লেখা, ফলে তাদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকতার চাপ অন্তরের তাগিদের চেয়ে বেশি অনুভূত হয়। তবু তার মধ্যে বেশ কয়েকটি গানে শিল্পী-প্রাণের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী, মীরাবাঈ প্রমুখের জীবন ও বাণী নিয়ে লীলাগীতি বা চণ্ডীগান, ভাগবতকথা, কালীকীর্তন বিভিন্ন ধর্মসভায় বা উৎসবাদিতে আজও যথেষ্ট জনপ্রিয় হতে পারে। সমস্যা হলো, বেশির ভাগ গানেরই সুর অজানা। তাই আগ্রহী গায়কদের প্রকাশিকা-প্রতিশ্রুত স্বরলিপিটির অপেক্ষায় থাকতে হবে।

গান এবং আলেখ্যগুলির তুলনায় কবিতাগুলিতেই ব্যক্তি অভয়পদর পরিচয় বেশি পাওয়া যায়। যদিও তাঁর ভক্তপ্রাণের প্রভাবে অধিকাংশ কবিতাই ভক্তিরসাশ্রিত, তবুও বন্ধুবৎসল, পুত্রবিরহী, প্রেমিক, সমাজসচেতন, হাস্যরসিক—তাঁর এই বহুমুখী চরিত্র সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর বিভিন্ন কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে।

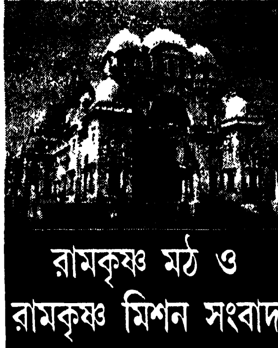
তাঁর কন্যা, ছাত্র-ছাত্রী (যাঁদের মধ্যে চলচ্চিত্রখ্যাত নীতা সেনও আছেন) এবং গুরুভাই প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী যামিনীরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়ের যে-স্মৃতিচারণগুলি সঙ্কলিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় একাধিক মুদ্রণপ্রমাদ এবং কয়েকটি মারাত্মক তথ্যগত ভ্রান্তি (যেমন পৃঃ ১১০ এবং পৃঃ ১৪০-এ 'মা ত্বং হি তারা' গানটিকে স্বামী বিবেকানন্দের রচনা বলে উল্লেখ করা) নিতান্ত পীড়াদায়ক। আশা করা যায়, ভবিষ্যৎ সংস্করণগুলিতে প্রয়োজনীয় সম্পাদনা এবং সংশোধন করা হবে। ❑

টাকি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ইতিবৃত্ত

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার টাকি মূলত একটি পৌরনগরী বলে স্বীকৃত হলেও প্রাথমিক পর্বে এটি ছিল প্রায় একটি গ্রামেরই মতো। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে এই নগরীর পত্তন হয়। দীর্ঘদিন এটি 'জমিদারদের নগরী' বলেও পরিচিত ছিল।

অজিতনাথ রায়চৌধুরী ছিলেন এই গ্রামেরই অন্যতম জমিদার। তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ ঐ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভাবাদর্শ প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন। গুরুর ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার জন্য মহারাজের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ধর্মপ্রাণ অজিতবাবু ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'পশ্চিমবাড়ি'-র গৃহে নদীয়ার মণিমোহন মুখার্জি, হরিচরণ ব্যানার্জি (পরবর্তী কালে স্বামী অভিন্নানন্দ), গৌরীচরণ সেন (পরবর্তী কালে স্বামী নিরন্তরানন্দ), জানকীনাথ মুখার্জি (জানকী মহারাজ), নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ সাহু, প্রফুল্লনাথ ব্যানার্জি, যতীন্দ্রনাথ কুণ্ডু, মুরারিমোহন ব্যানার্জি প্রমুখ ব্যক্তির সঙ্গে আশ্রম প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা করেন। সেই সূত্র ধরেই স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের আশীর্বাদ ও সক্রিয় সহযোগিতায় ঐ পশ্চিম-বাড়িতেই সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো **'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ'**—উত্তরকালের **'রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, টাকি'**। শুধু তাই নয়, অজিতবাবু প্রথম দুবছর, প্রয়োজনে আরো দীর্ঘ সময় ঐ আশ্রমের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে স্বীকৃত হন। প্রধানত স্বামী অভিন্নানন্দের একনিষ্ঠ ত্যাগ, কঠোর পরিশ্রম এবং সঙ্ঘগঠনের দক্ষতাই এই আশ্রমটিকে অতি ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে ঈপ্সিত বিকাশলাভের পথে পরিচালিত করে। কিছুকাল পরে আশ্রমটি অজিতবাবু প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল 'শিবানন্দ সেবাশ্রম'-এর পুরনো বাড়ির পূর্বদিকে অজিতবাবু প্রদত্ত জমিতেই স্থানান্তরিত হয়।



প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর আলোকচিত্র স্থাপন করে নিত্য পূজা, পাঠ, প্রার্থনা এবং ধর্মবিষয়ক আলোচনার সূচনা হয়। ঠাকুরঘর ছাড়া ঐ বাড়ির অন্যান্য অংশে তখন বাস করতেন 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' এবং 'আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ একদল তেজোদীপ্ত যুবক। তাঁদের লক্ষ্য হলো—গ্রামের দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষের ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিকাশে সহায়তা করা, একটি স্নিগ্ধ ধর্মীয় বাতাবরণে তাদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার বীজ রোপণ করা এবং চিকিৎসা ইত্যাদি অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজনে তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করা। তাঁদের অপর একটি পরিকল্পনা ছিল গ্রামের মানুষকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য বিভিন্ন পেশাগত শিক্ষাক্রমের প্রচলন।

প্রাথমিক পর্বে আশ্রম কর্তৃপক্ষ প্রস্তাব উত্থাপন করলেন, গ্রামে অবস্থিত ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ পরিচালিত একটি উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয় এবং সুবোধকৃষ্ণ দাস পরিচালিত একটি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় আশ্রমের পরিচালনাধীনে এনে অভীষ্ট কাজের সূচনা করা হোক। সৌভাগ্যবশত ঐ প্রস্তাব উভয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সানন্দে গৃহীত হওয়ার ফলে ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ ঐ বিদ্যালয়-দুটি আশ্রমের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ঐ দিনটিকেই 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ' তথা উত্তরকালের 'রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, টাকি'-র প্রতিষ্ঠাদিবস-রূপে চিহ্নিত করা হয়। সম্মিলিত বিদ্যালয়-দুটির নামকরণ করা হয়—'শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যালয়'। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে আরেকটি বুনিয়াদি বিদ্যালয় আশ্রমের পরিচালনাধীনে আসে।

ধীরে ধীরে 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ'-এর প্রতি বেলুড় মঠের বহু সন্ন্যাসীর গভীর আকর্ষণ ও ভালবাসা পরিলক্ষিত হতে থাকে। স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী বাসুদেবানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ নিয়মিতভাবে সেখানে উপস্থিত হয়ে স্থিরচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পূত জীবনকথা এবং বাণী আলোচনা করতেন। তাঁরা আশ্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকেই স্বামীজীর ব্রত উদ্‌যাপনের পথে অগ্রসর হতে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করতেন।

এদিকে তীব্র স্থানাভাব প্রকট হয়ে উঠল। ফলে আশ্রমের অগ্রগতি স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত হতে লাগল। সেইসময় ঐ সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে টাকির অন্যতম জমিদার রামকৃষ্ণ কুণ্ডু ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রগণ ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রায় আড়াই বিঘা জমি আশ্রমকে দান করেন এবং ঐবছরই ঐ জমিসংলগ্ন আরো প্রায় পাঁচ বিঘা জমি আশ্রমের জন্য ক্রয় করে দেন। জমিপ্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে তিনি প্রায় ৭৫ ফুট দীর্ঘ টিনের ছাউনিবিশিষ্ট বিদ্যালয়ভবন এবং সাধুনিবাসের জন্য একটি খড়ের ছাউনিবিশিষ্ট ঘর নির্মাণ করেন।

এই ঘটনার অল্পকাল পরেই আশ্রমের কাজে এসে যোগদান করেন সনৎ রায়চৌধুরী (পরবর্তী কালে স্বামী দয়াঘনানন্দ), রাধাকৃষ্ণ কুণ্ডু এবং শরৎ বসু। সনৎবাবু তাঁর গুরু শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নির্দেশে ঐ আশ্রমেই স্থায়িভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। আশ্রমের যাবতীয় কাজ তত্ত্বাবধান করার জন্য তাঁকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হতো এবং আমৃত্যু তিনি একজন হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক-রূপে স্থানীয় মানুষের নিরবচ্ছিন্নভাবে সেবা করে যান।

ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর কৃপায় পরিচিত-অপরিচিত বহু মানুষের কাছ থেকে আর্থিক এবং অন্যান্য প্রভূত সাহায্য আসতে থাকে। নির্মিত হয় একটি ছাত্রাবাস, রান্নাঘর, খাওয়ার ঘর, সেপটিক ট্যাঙ্ক, বিদ্যালয়ের জন্য আরো কিছু নতুন অংশ, একটি ছোট দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্র, একটি টিউবওয়েল ইত্যাদি। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে

একটি ছোট মন্দির নির্মাণ করা হয়। ক্রমে ক্রমে তৈরি হয় একটি ফুলের বাগান, জলাশয় ও ছেলেদের জন্য খেলার মাঠ।

আশ্রমের কাজের পরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় আবার প্রবল স্থানসঙ্কট দেখা দিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য মুরারিমোহন মুখার্জি আশ্রমের উন্নতিকল্পে ছাত্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। তাঁরই প্রদত্ত বইভর্তি একটি আলমারি দিয়ে সূচনা হলো বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের। বর্তমানে সেখানে দুটি গ্রন্থাগার—একটি শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য, অপরটি সর্বসাধারণের জন্য।

এদিকে আরেকটি সমস্যার উদ্ভব হলো। এইসময় টাকির কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি একযোগে এই আপত্তি উত্থাপন করলেন যে, টাকিতে অবস্থিত একমাত্র স্বীকৃত বিদ্যালয় 'টাকি গভর্ণমেন্ট হাই স্কুল'-এর এক মাইলের মধ্যে অন্য কোন বিদ্যালয় থাকবে না। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় ঘটে গেল এক অভাবনীয় ঘটনা। আশ্রম কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে পশ্চিমবঙ্গের 'পাবলিক ইনস্ট্রাকশন'-এর তৎকালীন পরিচালক জি. এস. বটমলি ঐ বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে রিপোর্ট দিলেন—''টাকি থেকে বিদায়গ্রহণের পূর্বে আমি টাকির 'রামকৃষ্ণ স্কুল'-এ কিছুটা সময় অতিবাহিত করতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি। সবকিছু পরিদর্শন করে আমার মনে হচ্ছে, আরো কিছুটা সময় এই পরিবেশে অবস্থান করতে পারলে খুবই ভাল হতো।... দুটি বিষয় আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রথমটি হলো—এই বিদ্যালয়টির জন্য প্রশংসনীয় স্থান-নির্বাচন এবং সেটির নির্মাণ পরিকল্পনা; দ্বিতীয়টি হলো, আমি অন্তত এমন একটি বুনিয়াদি স্কুলের সাক্ষাৎ পেলাম, যেখানে কোনরকম 'অপচয়' (wastage) নেই।'' বলা বাহুল্য, বিদ্যালয়টি অবলুপ্তির কবল থেকে অলৌকিকভাবে রক্ষা পেল।

ছাত্রাবাসে ছাত্রদের শারীরিক এবং নৈতিক উন্নতির দিকে সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখা হতো। নিয়মিতভাবে তাদের স্বাস্থ্যপরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তাদের নিয়মাবদ্ধ দৈনন্দিন জীবন যাপন করতে হতো। ঘরবাড়ি পরিষ্কার করা থেকে আরম্ভ করে ফুল তোলা, মন্দির পরিষ্কার করা, চন্দন ঘষা, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বেদি এবং আলোকচিত্র ফুল দিয়ে সাজানো, বাগানের ফুলগাছগুলির পরিচর্যা করা, রান্নাঘরের কাজ প্রভৃতি সবকিছুই তাদের করতে হতো। এছাড়া অসুস্থ মানুষের সেবা এবং বয়ঃকনিষ্ঠ ছাত্রদের যথাযথ সাহায্য করার মধ্য দিয়ে একটি সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধে তাদের উদ্বুদ্ধ করা হতো।

আশ্রমের জন্মলগ্ন থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে, স্থানীয় মানুষকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য একটি 'শিল্পশিক্ষা' বিভাগ স্থাপন করা হবে। সেইমতো ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে দেশী তাঁত বুননের যন্ত্র এবং চরকা ক্রয় করে কাজ শুরু করা হলো। পরবর্তী কালে বিশেষত বিধবা মহিলাদের জন্য চালু হলো একটি 'ধানভাঙার কল'—যার নামকরণ করা হলো 'বিজয়ামোহিনী শিল্প বিদ্যালয়, মহিলা বিভাগ'।

অবশেষে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে এল বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই শুভদিন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ এই আশ্রমটিকে বেলুড় মঠের একটি শাখাকেন্দ্ররূপে স্বীকৃতি প্রদান করলেন। আশ্রমের নামকরণ হলো—'রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, টাকি'। বিদ্যালয়টির নতুন নাম হলো 'টাকি রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়'।

অতঃপর আশ্রমের সেবাকাজের পরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে দুর্ভিক্ষপীড়িত সুন্দরবন অঞ্চলে টাকি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ব্যাপক ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ করে। 'শিবানন্দ সেবাশ্রম' (বর্তমানে সরকারি হাসপাতাল) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের নিয়ন্ত্রণে এল।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ নতুন প্রার্থনাঘরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি অধ্যক্ষরূপে নতুন মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এইসময় অসুস্থ শরীর সত্ত্বেও স্বামী দয়াঘনানন্দজী অর্থসংগ্রহের জন্য অভাবনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অবশেষে ৩০ এপ্রিল ১৯৮১ তাঁর শরীরত্যাগের পর তাঁরই অন্তিম ইচ্ছা অনুসারে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ ঐ আশ্রমের দায়িত্ব তুলে দেন স্বামী যতীন্দ্রানন্দের হাতে—যদিও পূর্বে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রায় ১১ মাস এই আশ্রমের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু এবার স্থায়িভাবে তাঁর দায়িত্বগ্রহণের পর শুরু হলো আশ্রমের অগ্রগতির দ্বিতীয় পর্যায়। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে বালক-বালিকা বিভাগের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন পাকা হলো। প্রস্তুত হলো নতুন গবেষণাগার, গ্রন্থাগার, অফিসঘর, ছাত্রাবাস, খাওয়ার ঘর প্রভৃতি। স্থানীয় এবং সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে স্বামী যতীন্দ্রানন্দের অবদান স্মরণীয়। তিনি নিয়মিতভাবে আশ্রমে দীক্ষাদানের ব্যবস্থা এবং ভক্ত-সম্মেলনের প্রচলন করলেন।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে বেলুড় মঠের শাখাকেন্দ্র-রূপে অন্তর্ভুক্ত টাকি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে বর্তমানে একটি উচ্চ বিদ্যালয়, তিনটি উচ্চ বুনিয়াদি (U.P.) বিদ্যালয় (একটি বালক, একটি বালিকা এবং একটি বালক-বালিকা উভয়ের জন্য), একটি ছাত্রাবাস, একটি দাতব্য হোমিও চিকিৎসাকেন্দ্র, গ্রন্থাগার প্রভৃতি আছে। আশ্রমে নিয়মিত ধর্মপ্রসঙ্গ এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী এবং সকল ধর্মগুরুর জন্মতিথি পালন করা হয়।

ছাত্রকৃতিত্ব

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির (সারদাপীঠ): গত ২৮ আগস্ট ২০০২ পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত রাজ্যপর্যায়ে 'যুব সংসদ প্রকল্প' প্রতিযোগিতায় বিদ্যামন্দিরের ছাত্ররা দ্বিতীয় স্থান পেয়ে পুরস্কার লাভ করেছে।

সেবাব্রত

ত্রাণ

সম্প্রতি অসম, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ বন্যায় **রামকৃষ্ণ মিশন** বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের মাধ্যমে হাজার হাজার

দুর্গত মানুষের জীবনরক্ষার্থে ত্রাণকার্য পরিচালনা করেছে।

বেলুড় মঠ অসমের ধেমাজি অঞ্চলের বন্যাকবলিত মানুষের মধ্যে ৯,৬৫০ জনকে রান্নাকরা খাবার এবং ১,০০০ পরিবারের মধ্যে কম্বল ও মশারি বিতরণ করেছে।

গুয়াহাটি আশ্রম (অসম) গুয়াহাটির কামালপুর, মালাবারি ও কলঙ্গপার অঞ্চলের ১,৫০০ বন্যার্ত মানুষকে চিকিৎসাত্রাণ দিয়েছে।

পাটনা আশ্রম (বিহার) বিহারের দ্বারভাঙা, সমস্তিপুর ও মুজফফরপুর জেলার বন্যার্ত ১,০৭,৩৭৫ জন মানুষের মধ্যে অরন্ধিত এবং ৪৯,৬০০ মানুষের মধ্যে রান্নাকরা খাবার বিতরণ করেছে।

জলপাইগুড়ি আশ্রম (পশ্চিমবঙ্গ) তুফানগঞ্জ ব্লকের বন্যাগ্রস্ত ৭,৮৫১ জন মানুষের মধ্যে রান্নাকরা খাবার এবং ৩,৪৩৩ জন মানুষকে চিকিৎসাত্রাণ দান করেছে।

মনসাদ্বীপ আশ্রম (পশ্চিমবঙ্গ) রাধিকাপুর গ্রামের বন্যাকবলিত ৫২৫ জন মানুষের মধ্যে চিঁড়ে, গুড় প্রভৃতি অরন্ধিত খাবার বিতরণ করেছে।

দেহত্যাগ

স্বামী অবিমুক্তানন্দজী (শ্রীনিবাস মহারাজ) গত ১০ আগস্ট ২০০২ রাত ১২টা ৫ মিনিটে হায়দ্রাবাদ সাগরলাল মেমোরিয়াল হাসপাতালে প্রয়াণ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। পিঠের ব্যথা ও নিম্নাঙ্গের দুর্বলতার জন্য তাঁকে তিনমাস আগে ভর্তি করা হয়েছিল। এছাড়া কয়েক বছর ধরে তিনি ডায়াবিটিসেও ভুগছিলেন।

তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৩৮ সালে তিনি মহীশূর আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৪৮ সালে নিজ গুরুর কাছে সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদানকেন্দ্র ভিন্ন তিনি বিভিন্ন সময়ে অদ্বৈত আশ্রম (মায়াবতী ও কলকাতা), রাজকোট, কাশী সেবাশ্রম, মুম্বাই ও হায়দ্রাবাদ কেন্দ্রে কর্মী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। বিশাখাপত্তনম ও খেতড়ি আশ্রমে তিনি অধ্যক্ষ পদে বৃত ছিলেন। বিগত কয়েক বছর ধরে তিনি হায়দ্রাবাদ মঠে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। পূজনীয় মহারাজ ছিলেন কঠোরকর্মা ও প্রফুল্ল প্রকৃতির।

স্বামী বন্দ্যানন্দজী (হেমেন্দু মহারাজ) হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় গত ১৬ আগস্ট ২০০২ বিকাল ৩টা ১৫ মিনিটে কাশী সেবাশ্রমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি প্রায় সাড়ে চার মাস আগে সেবাশ্রমের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি হৃদ্‌রোগ, ডায়াবিটিস প্রভৃতিতে ভুগছিলেন। ১৯৯৫ সালে তাঁর বুকে পেসমেকারও বসানো হয়েছিল।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণ করে ১৯৪৯ সালে সারদাপীঠে (বেলুড়) যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদানকেন্দ্র ভিন্ন তিনি শিলং, কালিম্পং, কাশী সেবাশ্রমে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়া কয়েক বছর যাবৎ তিনি শ্যামলাতাল আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সেবাশ্রমে দীর্ঘ ৬ বছর ধরে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। পূজ্যপাদ মহারাজ সহজ-সরল, তপস্বী স্বভাবের ছিলেন। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন : গত ১ অক্টোবর ২০০২, মঙ্গলবার শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে তাঁর জীবনী পাঠ করেন স্বামী সৌম্যাত্মানন্দজী।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

কাসুন্দিয়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম (হাওড়া) : গত ২৯ জুন ২০০২ 'নিবেদিতা শিল্প পুরস্কার' প্রদানসভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী। সভায় বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। সভায় বিমলকুমার ঘোষের স্বাগত-ভাষণান্তে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেন সাহিত্যিক হর্ষ দত্ত ও অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু। সঙ্গীত পরিবেশন করেন অমিত ঘোষ ও অসীম দত্ত।

কোন্নগর হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা (হুগলী) : গত ৫ জুলাই ২০০২ সভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগমনের ১১৭তম স্মরণতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভজন, কীর্তন, পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন শর্মিষ্ঠা ঘোষ, উমা শ্রীমানি ও চৈতালি ঘোষাল। অজয় মুখোপাধ্যায়ের স্বাগত-ভাষণান্তে আলোচনা করেন ব্রহ্মচারী মুরালভাই ও দেবানন্দ ব্রহ্মচারী।

মুকুন্দপুর সার্ভে পার্ক শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (কলকাতা-৭৫) : গত ১৪ জুলাই ২০০২ ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও ধর্মসভার মাধ্যমে পাঠচক্রের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সভায় আলোচনা করেন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী দীননাথানন্দজী ও স্বামী বিশ্বাদ্যানন্দজী। গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন তপন সিন্‌হা ও সম্প্রদায়।

ইমামবাজার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ (হুগলী) : গত ২০ জুলাই ২০০২ ভক্তিগীতি, নাটক ও ধর্মসভার মাধ্যমে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। আলোচনা করেন বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সনাতনানন্দজী। সভাশেষে 'ঠাকুর ও নরেন' নাটক মঞ্চস্থ হয়।

তালপুকুর শ্রীশ্রীমা সারদা সঙ্ঘ (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ২৪ জুলাই ২০০২ গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। গুরুপূর্ণিমার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দজী।

হালিসহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ (উত্তর চব্বিশ পরগনা) : গত ২৪ জুলাই ২০০২ ভক্তিগীতি ও আলোচনা-সভার মাধ্যমে গুরুপূর্ণিমা তিথি পালন করা হয়। গুরুপূর্ণিমার তাৎপর্য আলোচনা করেন স্বামী অম্বিকেশানন্দজী। অনুষ্ঠানে প্রায় ১০০ ভক্তের সমাগম হয়।

হামিরপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (রাউরকেলা, ওড়িশা) : গত ২৪ জুলাই ২০০২ গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। পূজা করেন স্বামী নটরাজানন্দজী। ভক্তিগীতি ও আলোচনা করেন স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দজী। অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০০ ভক্তের উপস্থিতি ছিল।

কৃষ্ণনগর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্র (নদীয়া) : গত ২৪ জুলাই শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, কালীকীর্তন ও আলোচনার মাধ্যমে গুরুপূর্ণিমা তিথি পালন করা হয়। পাঠ ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী ব্রজেশানন্দজী ও স্বামী কৌশিকানন্দজী। কালীকীর্তন পরিবেশন করে আন্দুল কালী-কীর্তন সমিতি।

চন্দননগর বারাসত গেট কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন (হুগলী) : গত ২৭ জুলাই ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-শ্রীঅরবিন্দ নিলয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শাশ্বতী চক্রবর্তী। 'গীতা' পাঠ ও আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা অচলপ্রাণাজী।

উত্তর চব্বিশ পরগনা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ : গত ২৭-২৮ জুলাই ২০০২ নবম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় **বেড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (উত্তর চব্বিশ পরগনা)।** সম্মেলনে আলোচনা করেন ভাবপ্রচার পরিষদের সভাপতি স্বামী শিবময়ানন্দজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী এবং স্বামী সত্যস্থানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে মৃণালকান্তি হরি ও সন্তোষকুমার ঘোষ। এতে ৩১টি আশ্রম থেকে ১০০ প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন।

টালিগঞ্জ বিবেকানন্দ যুবকেন্দ্র (কলকাতা-৩৩) : গত ২৭ ও ২৮ জুলাই ২০০২ ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। 'স্বদেশমন্ত্র' পাঠ, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত, স্বামীজীর রচনা থেকে পাঠ ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের প্রধান বিষয়। বিভিন্ন অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী চন্দ্রশেখরানন্দজী, প্রব্রাজিকা অজয়প্রাণাজী, তরুণ গোস্বামী, ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী। সম্মেলনে প্রায় ৩৫০ জন যুবপ্রতিনিধি যোগদান করেছিল।

হুগলী জেলা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ : গত ২৮ জুলাই ২০০২ পরিষদের ৪০তম ষাণ্মাসিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় **চন্দননগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘে (হুগলী)।** সম্মেলনে ৪২টি সংস্থা থেকে ১১৫ জন প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। বৈদিক শান্তিমন্ত্র পাঠ, সঙ্গীত, ধ্যান, বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' ও 'ভারতে বিবেকানন্দ' থেকে পাঠ এবং আলোচনা ছিল সম্মেলনের বিশেষ অঙ্গ। স্বপনকুমার ভট্টাচার্যের স্বাগত-ভাষণান্তে আলোচনা করেন স্বামী ঋতানন্দজী ও স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী এবং সভাপতিত্ব করেন ময়াল-ইছাপুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী নির্লিপ্তানন্দজী।

কাটোয়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র (বর্ধমান) : গত ২৮ জুলাই ২০০২ বৈদিক শান্তিমন্ত্র পাঠ, সঙ্গীত, প্রশ্নোত্তর-পর্ব, পাঠ, আলোচনাদির মাধ্যমে একটি যুবসম্মেলন আয়োজিত হয় স্থানীয় সংহতি মঞ্চে। সঙ্গীত পরিবেশন করেন তরুণ ব্যানার্জি প্রমুখ। সম্মেলনের সূচনা এবং সভাপতিত্ব ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দজী। আলোচনা করেন স্বামী বিনির্মলানন্দজী, অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য ও মুর্শিদাবাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিস্ট্রিক্ট জজ ডঃ শ্যামল গুপ্ত। ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তর দান করেন স্বামী সর্বগানন্দজী, স্বামী বিনির্মলানন্দজী ও অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য। সম্মেলনে ৫৫৮ জন ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক অংশগ্রহণ করেন।

শ্রীম-র ঠাকুরবাটী [কথামৃত ভবন] (কলকাতা-৬) : গত ২৯ জুলাই ২০০২ শ্রীম-র জন্মতিথি উপলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা, পাঠ ও আলোচনাদি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী শিবময়ানন্দজী, স্বামী ভবহরানন্দজী, স্বামী সর্বগানন্দজী প্রমুখ। সন্ধ্যারতির পর 'কথামৃতের স্বরূপ ও মহিমা' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন শ্রীম-র প্রপৌত্র অধ্যাপক দীপক গুপ্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

হাওড়া জেলা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ : গত ৪ আগস্ট ২০০২ পরিষদের উদ্যোগে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় **অযোধ্যা বেলপুকুর উচ্চ বিদ্যালয়ে (হাওড়া)।** সম্মেলনে আলোচনা করেন রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সম্পাদক স্বামী রমানন্দজী ও স্বামী অজরানন্দজী। বিভিন্ন সংস্থা থেকে সম্মেলনে প্রায় ১০০ প্রতিনিধি যোগদান করেন।

কোঠার শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী স্মৃতি সমিতি (ভদ্রক, ওড়িশা) : ১৯১০ সালে শ্রীশ্রীমা যে-বাটীতে দুমাসের অধিক বাস করেছিলেন, সেই বাটী-সহ পার্শ্ববর্তী দুবিঘা জমি সমিতিকে দান করেছে কোঠার গ্রামোন্নয়ন পরিষদ। এই উপলক্ষ্যে গত ১৪ আগস্ট ২০০২ একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

বিবেকানন্দ সোসাইটি (কলকাতা-৬) : গত ১৭ আগস্ট 'নির্মাল্য বসু স্মারক বক্তৃতা' প্রদান করেন ত্রিপুরা রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। গত ১৮ আগস্ট সোসাইটির শতবর্ষপূর্তি উৎসবের শেষ পর্বের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ও ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন : "আজকে সারা দেশের সর্বস্তরে যে বিপজ্জনক অবক্ষয় দেখছি, তা দূর হতে পারে একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে যদি আমরা বাস্তবায়িত করতে পারি।" আলোচনা করেন মূল আলোচক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু। অনুষ্ঠানে স্বাগত-ভাষণ

দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে সোসাইটির সম্পাদক বিপ্লব তরফদার ও সভাপতি স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে 'শতবর্ষের আলোকে বিবেকানন্দ সোসাইটি ১৯০২—২০০২' নামে একটি স্মরণিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।

উত্তর কলকাতা বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল (কলকাতা-৩) : গত ১৮ আগস্ট ২০০২ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে। গল্পবলা, সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি, বক্তৃতা, ক্যুইজ প্রভৃতি ছিল প্রতিযোগিতার অঙ্গ। এতে ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। সফল প্রতিযোগীকে পুরস্কার প্রদান ও ভাষণ দান করেন স্বামী সর্বগানন্দজী।

ফুলিয়া বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল (নদীয়া) : গত ১৮ আগস্ট ২০০২ একটি যুবশিক্ষণ শিবির আয়োজিত হয় স্থানীয় ফুলিয়া শিক্ষানিকেতনে। সঙ্গীত এবং 'স্বামীজীর মনুষ্যত্ব উন্মেষক ও চরিত্রগঠনকারী শিক্ষা' বিষয়ে আলোচনা ছিল শিবিরের প্রধান বিষয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশ্বনাথ ঘোষাল, শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রভাত কর্মকার। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী আশ্রমের সম্পাদক স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী, অলোককুমার দাস, অমিতকুমার দত্ত ও বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে মিঠুন বসাক ও রঞ্জন বসাক। শিবিরে ২৮৬ জন শিক্ষার্থী যোগদান করেন।

সেবাব্রত

বিবেকানন্দ যুব জাগরণ শিবির (হাওড়া) : গত ২৩ জুন ২০০২ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। শিবিরে মহিলা-সহ ৮৫ জন ব্যক্তি রক্তদান করেন।

তিনসুকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি (অসম) : গত ২১ আগস্ট ২০০২ বিনামূল্যে একটি স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এতে ২৬২ জনকে পরীক্ষা করা হয়।

ইড়পালা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (মেদিনীপুর) : গত ২৫ আগস্ট ২০০২ ঘাটাল ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ৮ জন মহিলা-সহ ৭৭ জন রক্তদান করেন। গত ৩০ আগস্ট ময়াল-ইছাপুর রামকৃষ্ণ মঠের সহযোগিতায় আয়োজিত চিকিৎসা-শিবিরে বিনামূল্যে ২৭০ জনের চিকিৎসা করা হয়।

বারুইপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ প্রচার সমিতি (কলকাতা-১৪৪) : গত ১৮ আগস্ট ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমিতির বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা ছিল উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন সিতাংশু চট্টোপাধ্যায়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সমিতির কয়েকজন ভক্ত ও নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের দৃষ্টিহীন দুটি ছাত্র। ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী অজয়ানন্দজী, ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর ও বিমল পাল। এছাড়া ৩০ জন দরিদ্র নরনারীকে বস্ত্রপ্রদান করা হয়। প্রায় ৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

দেহত্যাগ

নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা **স্বামী বুদ্ধানন্দজী মহারাজ (বিভূতি মহারাজ)** গত ২৬ আগস্ট ২০০২, সোমবার, সকাল সোয়া ৯টায় দেহত্যাগ করেছেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। দীর্ঘকাল তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন।

তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ স্বামী শিবানন্দজী, স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী, স্বামী অখণ্ডানন্দজী, স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ এবং কথামৃতকার শ্রীম-র পবিত্র সান্নিধ্যে তিনি এসেছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে দীর্ঘদিন কর্মী হিসাবে ছিলেন। গুজরাট আশ্রমে স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের দিব্য সান্নিধ্যে তিনি ১৫ বছর কাজ করেন। কয়েক মাস তিনি কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানেও কাজ করেছিলেন। সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য তিনি ১৯৬১ সালে নিমপীঠে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কৈখালি ও চেতলাতে তিনি দুটি শাখাকেন্দ্রও স্থাপন করেছিলেন। পবিত্রতা, কর্মনিষ্ঠা, রসিকতা ও প্রখর ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা-নিবাসিনী হিরণ্যপ্রভা দে সরকার গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০২ প্রয়াণ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। সহজ-সরল ও মিষ্ট ব্যবহার ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ক্ষিতীশরঞ্জন তালুকদার গত ৮ মার্চ ২০০২ নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি শিলং রামকৃষ্ণ মিশনে বহু স্বেচ্ছাসেবা দান করেছেন।

শ্রীমৎ স্বামী ওঙ্কারানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য সন্তোষকুমার ঘোষ গত ১৫ মার্চ ২০০২ করজপরত অবস্থায় পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। উল্লেখ্য, তাঁর জন্ম ও মৃত্যু একই তিথিতে।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য নৃপেন্দ্র নারায়ণ বণিক গত ২১ এপ্রিল ২০০২ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ বাণপ্রস্থ মঙ্গলম্, কাছাড় চেম্বার অফ কমার্স, শিলচর মডেল প্রাইমারি স্কুল ও সমাজ কল্যাণ পরিষদের সভাপতি ছিলেন। এছাড়া বহু পাঠচক্র ও সংস্থার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি। শিলং রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকারও দীর্ঘদিনের গ্রাহক ছিলেন। ❑

তাঁর নামবীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

এরকম মনে করা ভাল নয় যে, আমার ধর্মই ঠিক আর অন্য সকলের ধর্ম ভুল। সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকলেই হলো। অনন্ত পথ—অনন্ত মত। শ্রীরামকৃষ্ণ

*

ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজন? নিন্দা ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, কিন্তু কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে, তা বলতে পারে কজনে? শ্রীমা সারদাদেবী

*

টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধাবিঘ্নের বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা উর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

He is a true hero who performs all the duties of the world with his mind fixed on God.

Sri Ramakrishna



'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৫

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

জেলা : উত্তর চব্বিশ পরগনা

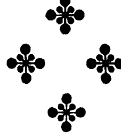
- **রামকৃষ্ণ মঠ**, বারাসত
- **শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ আশ্রম**
  পোঃ রাজারহাট-বিষ্ণুপুর, পিন : ৭৪৩ ৫১০
- **রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম**, রহড়া
- **বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
- **গোবরডাঙ্গা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘ**, খাঁটুরা
- **বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ**, নববারাকপুর
- **অলক পালচৌধুরী**, প্রসন্ন চ্যাটার্জী রোড
  সন্তোষপল্লী, পোঃ ঘোলা বাজার, পিন : ৭৪৩১৭০
- **ঘোলা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, বি-৭, বি পার্ক, সোদপুর
- **বিবেকানন্দ আলোচনা-চক্র**, নিমতলা
- **ইছাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
- **মানিক ঘোষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**
  শ্রীমা সারদা সরণি, গঙ্গাপুর, দত্তপুকুর, পিন : ৭৪৩ ২৪৮
- **বীজপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ**
  শহীদনগর, কাঁচড়াপাড়া
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**, প্রযত্নে সুবীরকুমার মণ্ডল
  ১৫৪ ঘটক রোড, কাঁচড়াপাড়া, পিন : ৭৪৩১৪৫
- **স্যান্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**
  পোঃ স্যান্ডেলেরবিল, হিঙ্গলগঞ্জ, পিন : ৭৪৩ ৪৩৫
- **হালিশহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ**
  প্রযত্নে রামকৃষ্ণ চিলড্রেন্স হোম
  গ্রাম+পোঃ মালঞ্চ, ভায়া : হাজিনগর, থানা : বীজপুর
- **পান্নালাল ব্যানার্জী**, প্রযত্নে তারা আলয়
  ২৯ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড (স্টেশনের সম্মুখে)
  পোঃ নৈহাটী, পিন : ৭৪৩ ১৬৫
- **কথাশিল্প**, প্রযত্নে গোপালচন্দ্র ঘোষ
  শক্তিগড়, চাকদা রোড, বনগ্রাম, ফোন : ৫৫-৬৯৪/৭২৫
- **বিবেকানন্দ বুক সেন্টার**, প্রযত্নে বাসুদেব সাধুখাঁ
  'ট' বাজার, বনগ্রাম, ফোন : (৯৫৩২১৫) ৫৯৩৯৭
- **সুজিত ঘোষ**, ৩ এফ. রোড, আনন্দপুরী
  পোঃ নোনা চন্দনপুকুর, ব্যারাকপুর, ফোন : ৫৬০-১২৩০
- **রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ (পাঠচক্র)**, ৪৭/৭ টেগোর টেম্পল রোড
  পোঃ শ্যামনগর, পিন : ৭৪৩ ১২৭
- **শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**, বনগ্রাম, পিন : ৭৪৩ ২৩৫
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, রামকৃষ্ণপল্লী
  বনগ্রাম, পিন : ৭৪৩ ২৩৫
- **নিমতলা বিবেকানন্দ আলোচনাচক্র**
  শরৎ পাঠাগার, নিমতলা, পোঃ পূর্ব বিষ্ণুপুর
- **শ্রীশ্রীমা সারদা সঙ্ঘ**, ৪৭ কে. এন. মুখার্জী রোড
  তালপুকুর, বারাকপুর, পিন : ৭৪৩ ১৮৭
- **স্বপন চক্রবর্তী, সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ দেবালয় (বেড়াচাঁপা অঞ্চল), পিন : ৭৪৩ ৪২৪
- **ভাটপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**
  প্রযত্নে শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮/২ বিন্দুবাসিনী রোড
  পোঃ ভাটপাড়া, পিন : ৭৪৩ ১২৩
- **ন'পাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**
  কৃষ্ণনগর রোড, পোঃ ন'পাড়া, বারাসত
  পিন : ৭৪৩ ৭০৭, ফোন : ৫৪২-৩৭৩৯/৬৭০২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত চলমান পাঠচক্র**
  প্রযত্নে কালীপ্রসাদ সরকার
  টাকী রোড, পোঃ বসিরহাট, ফোন : ৫৫০১৮
- **রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ**, সোদপুর রোড, মধ্যমগ্রাম, পিন : ৭৪৩ ২৭৫
- **হাবড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম**
  স্বামীজী সরণী, হাবড়া, ফোন : ৫৫৩৯২

জেলা : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, সরিষা
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ**, ভাঙ্গড়
- **হৃদয়ভূষণ নস্কর, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ কন্যানগর, আমতলা, পিন : ৭৪৩ ৩৯৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, পোঃ বি-রামকৃষ্ণপুর, পিন : ৭৪৩ ৬১০
- **রামকৃষ্ণ পাঠমন্দির**, গ্রাম : চকমানিক, পোঃ বাওয়ালি, পিন : ৭৪৩ ৩৮৪
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম** (বাটানগর), পোঃ মহেশতলা, পিন : ৭৪৩ ৩৫২
- **বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য**
  সম্পাদক, বারুইপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ প্রচার সমিতি
  পিন : ৭৪৩ ৩০২, ফোন : ৪৩৩-৮৩৬৯
- **জীবনকৃষ্ণ দাস**, প্রযত্নে মহেশ্বর স্টোর্স
  কাছারী বাজার, বারুইপুর, পিন : ৭৪৩ ৩০২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ স্টোর্স**, প্রযত্নে অনন্তকুমার দাস
  পোঃ চাম্পাহাটী, চাম্পাহাটী বাজার
  পিন : ৭৪৩ ৩৩০, ফোন : ৯১১৮-৬০৪৫০
- **শঙ্করচন্দ্র মণ্ডল**, প্রযত্নে কৃষ্ণগোপাল নস্কর
  গ্রাম : বিবেকানন্দ পল্লী, পোঃ দক্ষিণ বারাসত, পিন : ৭৪৩ ৩৭২
- **শতদল সাধুখাঁ**
  প্রযত্নে 'গৃহশ্রী', হরিধন চক্রবর্তী সরণি, সোনারপুর
- **বিভূতিভূষণ ঘরামি, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ কৌতলা, পিন : ৭৪৩ ৬০৩, ফোন : ৯১৭৪-৭৪৩১৫
- **কাশীনগর বিবেকানন্দ যুব কেন্দ্র**
  গ্রাম+পোঃ কাশীনগর, পিন : ৭৪৩ ৩৪৯
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
  ১০ মাইল বাজার, পোঃ মহারাজগঞ্জ
  থানা : নামখানা, পিন : ৭৪৩ ৩৫৭
- **ডাঃ হরেকৃষ্ণ সিংহ, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ** চেতনা
  ২৩৩ জেমস লং সরণি, জোকা
  পিন : ৭৪৩ ৫১২, ফোন : ৪৬৭-১১৫২
- **রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম**
  গ্রাম+পোঃ বিবেকানন্দপুর, পিন : ৭৪৩ ৩৫২

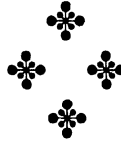
দেহত্যাগের আগে যদি কেউ ঈশ্বরের সাধন করে, আর সাধন করতে করতে ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, তাকে আর পাপ কখনো স্পর্শ করবে? অর্থাৎ ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, আর পাপ স্পর্শ করবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ



ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজনে? নিন্দা-ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, তাকে ভাল করতে পারে কজনে? আমার ছেলে যদি ধুলো-কাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে।

শ্রীমা সারদাদেবী



বেদে কোথাও নরকের কথা নাই। বেদের অনেক পরবর্তী পুরাণে এই নরকের প্রসঙ্গ আছে। বেদের সর্বাপেক্ষা অধিক যে-শাস্তির কথা পাওয়া যায়—তাহা পুনর্জন্ম, অর্থাৎ আরেকবার উন্নতির সুবিধা লাভ করা।

স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
Phone : 554-2248, 554-2403
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com
udbodhan@vsnl.net

Vol. 104
No. 10
OCTOBER
2002

Licensed to Post
Without Prepayment
Licence No.
TECH/WB/RNP-15/LPWP-01/2002

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Regn. No.
TECH/WB/RNP-15/2002

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ
সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ



অগ্রহায়ণ ১৪০৯ ১১শ সংখ্যা

উদ্বোধন

১০৪তম বর্ষ ❁ উদ্বোধন কার্যালয় ❁ কলকাতা



"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

সূচীপত্র

উদ্বোধন ॥১০৪॥
১০৪তম বর্ষ ১১শ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৪০৯ নভেম্বর ২০০২

প্রচ্ছদ ঃ গোমুখের চিত্র। হিমালয়ের হিমশৈলাবৃত গহ্বর থেকে গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, অবিরাম, উদ্দাম, অক্লান্ত গতিতে। এ যেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবগঙ্গা' বিবেকানন্দ-রূপ গোমুখের মধ্য দিয়ে জগৎকল্যাণার্থে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান! শিবচক্ষুটিও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। *আলোকচিত্র ঃ ডাঃ তমোনাশ ভট্টাচার্য।*

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ



সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৭৫ টাকা; সডাক ঃ ৯৫ টাকা ❑ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য ঃ ১০ টাকা



নবীকরণ ও গ্রাহকভুক্তি

২০০৩ খ্রিস্টাব্দ ● ১৪০৯-১৪১০ বঙ্গাব্দ

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে 'উদ্বোধন' ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

'উদ্বোধন' ঃ **১০৫তম বর্ষ, ২০০৩ (মাঘ ১৪০৯—পৌষ ১৪১০) সালের জন্য আপনি নবীকরণ করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন।**

গ্রাহকভুক্তি ঃ ১০৫তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৩) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে। গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ৯৫ টাকা। বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র ঃ ৮০০ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০ টাকা।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০০ টাকা (উদ্বৃত্ত কিছু থাকলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নামে জমা থাকবে) এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি ঃ M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'**—এই নামে পাঠাতে পারেন। **নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন।** উত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন গ্রাহক হতে চাই'** খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন।

'চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে।

M.O. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব **হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্ছনীয়।**

❑ কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।

❑ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩
ফোন ঃ ৫৫৪-২২৪৮, ৫৫৪-২৪০৩ ● e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com

দিব্য বাণী

ন জীবনাশোঽস্তি হি দেহভেদে
মিথ্যৈতদাহুর্মৃত ইত্যবুদ্ধাঃ।
জীবস্তু দেহান্তরিতঃ প্রয়াতি
দশার্ধতৈবাস্য শরীরভেদঃ।।

এবং সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়শ্চরতি সংবৃতঃ।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া তত্ত্বদর্শিভিঃ।।

তং পূর্বাপররাত্রেষু যুঞ্জানঃ সততং বুধঃ।
লঘ্বাহারো বিশুদ্ধাত্মা পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি।।

[মহাভারত, শান্তিপর্ব, ১৮৭।২৭-২৯]

মর্মার্থ ঃ

দেহের নাশ হইলেও জীবের অথবা জীবত্বের নাশ হয় না। অতএব যে-ব্যক্তি জীবের মৃত্যুর কথা বলে সে অজ্ঞান এবং তাহার কথাও মিথ্যা। এই শরীর ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্—এই পঞ্চতত্ত্বে গঠিত। দেহের বিনাশ বলিতে শরীরের এই পঞ্চতত্ত্বে বিভক্ত হইয়া যাওয়া বোঝায়। জীবাত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমন করিয়া থাকে।

আত্মা প্রাণিগণের অন্তরে সম্পূর্ণরূপে তাহার হৃদয়গুহায় বাস করেন। তত্ত্বদর্শী পুরুষগণ স্ব স্ব সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে সেই হৃদয়স্থিত আত্মার সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন।

যে বিদ্বান ব্যক্তি (তত্ত্ববেত্তা এবং শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি) পরিমিত আহার করিয়া রাত্রির প্রথমে ও শেষ প্রহরে নিয়মিত ধ্যানযোগের অভ্যাস করিয়া থাকেন, তিনি নিজ হৃদয়েই সেই পরমজ্যোতিঃস্বরূপ আত্মার দর্শন লাভ করিয়া চিরকৃতার্থ হইয়া থাকেন।

লোকব্যবহার



কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, শ্রীরামকৃষ্ণের লোকব্যবহার প্রসিদ্ধ। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর পৃষ্ঠায় ইহার যথেষ্ট প্রমাণও রহিয়াছে। তিনি কামারপুকুরের ন্যায় অজ পাড়াগাঁয়ে বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়া পরিণত বয়সে কলিকাতায় আগমন করিলেন। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে তিনি প্রথমে ঢুকিতেই চাহেন নাই। পরে কৈবর্তের অন্ন খাইতে হইবে ভাবিয়া পঞ্চবটীর নিকট মুড়ি-গুড় খাইয়া দ্বিপ্রাহরিক ভোজন সারিলেন। ক্রমশ রানী রাসমনির মন্দিরে ৺ভবতারিণীর পূজারী হইলেন। তাহার পর প্রবাহিত হইল তাঁহার 'জগৎ-ছাড়া' সাধনার বেগবতী স্রোতস্বতী। সেখানে জগৎ আছে কি নাই বলা যায় না। পরবর্তী কালেও তাঁহার মুহুর্মুহু ভাবসমাধি এবং ইন্দ্রিয়-গোচর এই জগৎকে ভুলিয়া মনের নিরন্তর সাকার হইতে নিরাকারে এবং নিরাকার হইতে সাকারে যাওয়া-আসা। তথাপি পরবর্তী কালে যখন কলিকাতার বাবুরা আসিতে শুরু করিলেন, তাঁহাদের প্রত্যুদ্গমন করা, তাঁহাদের পান-তামাকের ব্যবস্থা করা, বিদায়কালে স্বয়ং দরজা অবধি উঠিয়া গিয়া বিদায় জানানো ইত্যাদি বাহ্য শিষ্টাচার ছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণের বাচিক শিষ্টাচার এবং ভদ্রজনোচিত মিষ্ট ব্যবহার সকলের মন কাড়িত। কেহ কেহ ভাবিত, ইনি তো আমাদের মতো স্কুল-কলেজে পড়েন নাই, তবু এত লোকব্যবহার শিখিলেন কখন?

সমাজের বিভিন্ন স্তরে আমরা লোকব্যবহারের বিভিন্ন নমুনা দেখিতে পাই। কেবলমাত্র ভদ্রজনোচিত ব্যবহারকেই লোকব্যবহার বলিলে অল্পই বলা হইবে। রাজা-উজির হইতে কৃষক পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে লোক-ব্যবহার বিভিন্ন প্রকার। উচ্চস্তরে কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী অন্য দেশে আমন্ত্রিত হইলে তখন যে 'প্রোটোকল'—তাহাও যেমন লোকব্যবহার, তেমনি গ্রামে-গঞ্জে রাস্তার মোড়ে শনিঠাকুরের পূজাও ঐ লোকব্যবহারেরই অন্তর্গত। বড়বাজারের ব্যবসায়ী মহলে যে-ধরনের রীতিনীতি প্রচলিত আছে, তাহার সহিত দেরাদুনের ইণ্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমির সেনাদের আচার-আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন হইলেও উভয়েই লোকব্যবহারের অন্তর্গত। মনুষ্য-সমাজকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ রাখা এবং উহাকে মনুষ্যের ভোগাপবর্গের সহায়ক করিয়া তুলিবার জন্য যাহা কিছু আচার-আচরণ, রীতিনীতি—সবই এই লোক-ব্যবহারের অন্তর্গত। ইন্দ্রিয়পরায়ণ, স্বার্থপর মানবের ব্যবহারে যে কর্কশ ও অপরের ক্ষতিসাধক রূপটি প্রকাশ পায়—তাহাও যেমন 'লোকব্যবহার', তেমনি যথার্থ মানবকল্যাণচিকীর্ষু মহাপুরুষগণের যে মানবকল্যাণপ্রয়াস—তাহাও 'লোকব্যবহার'।

বস্তুত, 'লোকব্যবহার' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক। আমরা সতত 'সামাজিক লোকব্যবহার'-এ আবদ্ধ থাকি। কিন্তু শ্রীশঙ্করাচার্য প্রমুখ আচার্যগণ 'ধর্মীয় লোকব্যবহার', 'দার্শনিক লোকব্যবহার', 'আধ্যাত্মিক লোকব্যবহার' ইত্যাদি নানান স্তরে এপ্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। এই লোকব্যবহারের একেবারে গোড়ার কথা বলিলেন আচার্য শঙ্কর ঃ

"তথাপি অন্যোন্যস্মিন্ অন্যোন্যাত্মকতাম্ অন্যোন্যধর্মাংশ্চ অধ্যস্য ইতরেতর অবিবেকেন অত্যন্ত-বিবিক্তয়োঃ ধর্মধর্মিণোঃ মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য 'অহমিদম্', 'মমেদম্' ইতি নৈসর্গিকঃ অয়ং লোকব্যবহারঃ"।

(ব্রহ্মসূত্র, অধ্যাসভাষ্য)

লোকব্যবহারের ইহাই শুরু। পরস্পরের উপর পরস্পরের স্বরূপ এবং ধর্মকে [ভ্রান্ত] আরোপ বা অধ্যাস করিয়া কোন বিশেষ 'ধর্ম'কে অত্যন্ত পৃথক জাতীয় ধর্মীর উপর আরোপ করা এবং সত্য ও মিথ্যাকে একীভূত করিয়া 'ইহাই আমি' এবং 'ইহাই আমার'—এই চিন্তায় চেতনকে জড় ও জড়কে চেতন ভাবনার ফলস্বরূপ এই লোকব্যবহার। ব্যাপারটি যদিও অত্যন্ত জটিল বোধ হইতেছে, তথাপি আলোচনা করিলে আশা করি সহজবোধ্য হইবে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের বিখ্যাত উক্তি ঃ "উচ্চতর আদর্শের প্রতি নিরন্তর অনুরাগই প্রকৃত মানুষের বৈশিষ্ট্য।" উচ্চতর আদর্শের প্রতি মানুষের অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ নানাভাবে ঘটিয়া থাকে। কখনো তাহা ভক্তিতে সম্পৃক্ত উপাসনার মাধ্যমে ঘটে, কখনো বা বৈরাগ্যের ব্যাপ্তিতে, আবার কখনো জ্ঞানের কিরণছটায়। নিম্নতর জীবনের লোকব্যবহারের কথাও আমরা শুনিয়াছি ঃ

"আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরানাম্।" অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন পশুর মধ্যেও যেমন বিদ্যমান, তেমনি মানুষের মধ্যেও বিদ্যমান। এই লোকব্যবহারের কথা যদিও আমাদের মূল আলোচ্য নহে, তথাপি কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যায় যে, শঙ্করোক্ত 'আমি ইহা' এবং 'ইহা আমার'—এই আদিম অনুভবই মনুষ্যেতর লোকব্যবহারেরও মূলীভূত কারণ। সম্মুখে খাবার রাখিলে দুইটি কুকুর কলহে প্রবৃত্ত হয়। এই কলহে প্রবৃত্ত হইবার পশ্চাতেও 'আমি' ও 'আমার' বিদ্যমান। সুতরাং যখনি 'একোঽহম্ বহুস্যাম্'—'আমি একা, বহু হইব' বলিয়া সেই ঔপনিষদিক্ পুরুষ বাসনা করিলেন, তখনি লোকব্যবহারের সূত্রপাত হইল।

"ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষঃ ধর্মেণ হীনা পশুভিঃ সমানাঃ"—মানুষ পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, কারণ মানুষের ধর্ম আছে। এই ধর্মান্তর্গত যে লোকব্যবহার, তাহাই তাহার উচ্চতর আদর্শের প্রতি অনুরাগ। অথবা বিপরীতভাবে, উচ্চতর আদর্শের প্রতি অনুরাগই ধর্মের দ্যোতক। উচ্চতর আদর্শের প্রতি অনুরক্ত মানুষে কাম, ক্রোধ, লোভ, স্বার্থপরতা ইত্যাদি দুর্বলতা থাকিলেও এতই অল্প পরিমাণে থাকে যে, তাহা প্রকাশিত হইবার সুযোগ পায় না। এই 'অনুরাগ'-এর মধ্যেই জ্ঞান লুক্কায়িত আছে। যদি আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক কেহ বলেন—'ধর্মের প্রয়োজন নাই, বুদ্ধি এবং জ্ঞানই মানুষকে পশু হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়াছে', তাহার উত্তরে বলিব—ঐ 'ভৌত বা জাগতিক জ্ঞান'ও তাহার 'ধর্ম'-এর মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে। কারণ 'ধর্ম'ই সামান্য (general) অর্থে সচেতনতা (cognition) বা জ্ঞান (knowledge)-এর আধারস্বরূপ। এবং এই লোকব্যবহারকেই 'সিঁড়ি'র ন্যায় ব্যবহার করিয়া সাধক ক্রমশ উচ্চ-উচ্চতর স্তরে প্রবেশ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ঈশ্বরোপাসনাকেও একটি লোকব্যবহার বলা হইতেছে। 'ভক্তিসূত্র'-এ নারদ বলিয়াছেন ঃ "ন তদসিদ্ধৌ লোকব্যবহারো হেয়ঃ কিন্তু ফলত্যাগস্তৎসাধনঞ্চ কার্যমেব।" যতক্ষণ না সিদ্ধিলাভ হইতেছে, ততক্ষণ লৌকিক আচার-ব্যবহার নিন্দিত বলিয়া ত্যাগ করিবে না, বরং 'ফলত্যাগ'-এর সাধনাই অভ্যাস করিবে। অন্যত্র শ্রীভগবান বলিয়াছেন ঃ "যাবন্ন পশ্যেদ্ অখিলং মদাত্মকং তাবৎ মদারাধনতৎপরো ভবেৎ।" অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কেবল আমি (ঈশ্বর) একমাত্র আছি—এই দৃষ্টিলাভ না হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত আমার (ঈশ্বরের) আরাধনায় রত থাকিবে। যখন সেই একত্ব-দৃষ্টি লাভ হইবে তখন আর বাহ্য লোকব্যবহার বা উপাসনাদি লোকাচারের প্রয়োজন হইবে না। 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এ অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

"তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।।"

(শ্রীউদ্ধবগীতা, ২০।৯)

অর্থাৎ ততদিনই কর্মসমূহ করণীয়, যতদিন না বৈরাগ্য সমুৎপন্ন হয় অথবা শ্রীভগবানের কথায় শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। যেমন যেমন ভিতরে বৈরাগ্য এবং জগদ্ব্যাপারে অনিত্য-প্রতীতি দৃঢ়তর হইবে, তেমনি তেমনি কর্ম এবং লোক-ব্যবহারও হ্রাস পাইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ সুন্দর একটি উপমা দিতেন ঃ গৃহস্থের বৌ, গর্ভবতী হইয়াছে। যেমন যেমন সে আসন্নপ্রসবা হইতেছে, তেমনি তেমনি শাশুড়ি তাহার কর্ম কমাইতেছে। যখন সে একটি শিশু প্রসব করিল, তখন তাহার আর কোন কর্ম নাই, কেবল ঐ শিশুর যত্ন করা। ঈশ্বরলাভ হইলে পর মানবের আর কোন কর্ম থাকে না, তখন কেবল ঈশ্বরময় এক দিব্যদৃষ্টি লইয়া সে

জগৎকল্যাণে তৎপর হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের নিজ জীবনে আমরা তাঁহার 'গলিত হস্ত' হইবার কথা জানি।

সুতরাং 'সামাজিক লোকব্যবহার' বলিতে আমরা মাত্র একাংশ লইয়া বিচার করি। এই সামাজিক লোকব্যবহার হইতে শাস্ত্র সাধককে দূরে থাকিতে নির্দেশ দিয়াছেন। নির্জনবাসের কথা বলা হইয়াছে। তবে মজার ব্যাপার হইল, এই সামাজিক লোকব্যবহার হইতে দূরে থাকাও লোকব্যবহারেরই অন্তর্গত। ভগবদ্ উপাসনাও লোক-ব্যবহার। উপাসনার অর্থ কেবল কয়েকটি বাহ্য নিয়ম পালন করা, ব্রত-তপস্যা করা নহে। ইহার সহিত জ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটিলেই তাহাকে যথার্থ উপাসনা বলা হইবে। সামগ্রিকভাবে এই লোকব্যবহার যখন মিথ্যাভূত হইয়া যাইবে, তখনি উহা সর্বথা পরিত্যক্ত হয়, নতুবা নহে। 'অবিদ্যা'ই সর্বপ্রকার লোকব্যবহারের জননী। সুতরাং অবিদ্যার বিনাশ হইলেই সাধক লোকব্যবহার ত্যাগ করিতে পারে, তাহার পূর্বে নহে। 'আমি কর্তা', 'আমি ভোক্তা', 'আমি জ্ঞাতা' ইত্যাদি বোধ মানুষের মধ্যে সহজাত। এই বোধ অবিদ্যাপ্রসূত। অথচ প্রকৃতপক্ষে আমি জ্ঞানস্বরূপ, অকর্তা, অভোক্তা। প্রশ্ন উঠিবে—আমি 'জ্ঞানস্বরূপ' হইলে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার অস্তিত্ব কি নাই? আমি অকর্তা হইলে ক্রিয়াকর্মের অস্তিত্ব কি নাই? আমি অভোক্তা হইলে, সচ্চিদানন্দকে সম্ভোগের ইচ্ছা কি নাই? সবই আছে, যতক্ষণ অবিদ্যার অন্তর্গত। এবং যতক্ষণ অবিদ্যার অন্তর্গত, ততক্ষণই ভগবদ্ উপাসনারও প্রয়োজন আছে। ভগবদ্‌ভজনের দ্বারা আমরা 'বিশালবুদ্ধি' হইয়া নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বকে উপলব্ধি করি। বরং উল্টো প্রশ্ন করি যে, আমাদের কি ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইয়া গিয়াছে যে, আমরা ভগবদ্‌ভজনে বিরত থাকিব? শ্রীশঙ্কর বলিতেছেন ঃ "ন হি অয়ং সর্বপ্রমাণ-প্রসিদ্ধঃ লোকব্যবহারঃ অন্যৎ তত্ত্বম্ অনধিগম্য শক্যতে অপহ্নোতুম্ অপবাদাভাবে উৎসর্গপ্রসিদ্ধেঃ।" (ব্রহ্মসূত্র, ২।২।৩১) সহজ ভাষায় বলিতে হয়, এই জাগতিক লোকব্যবহার পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া প্রমাণিত বা প্রসিদ্ধ। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য কোনপ্রকার 'বিশেষ তত্ত্ব' প্রমাণিত বা উপলব্ধ হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই লোকব্যবহারই বলবৎ থাকে এবং কোনভাবেই ইহার অপলাপ করা যায় না। অর্থাৎ সামান্যবিধি (যথা এই বিশ্বব্যাপী লোকব্যবহার)-কে অপলাপ করিতে হইলে বিশেষ কোন বিধি (যাহা অত্যন্ত প্রবল হইয়া সামান্যবিধিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ) বলবৎ করিতে হইবে। যেমন শাস্ত্রে একদিকে বলা হইল—'প্রাণিহিংসা করিবে না'। ইহা সামান্যবিধি। কিন্তু অপরদিকে যজ্ঞানুশাসনে বলা হইল, যজ্ঞের জন্য পশু সংগ্রহ করিবে (অর্থাৎ পশুবলি দিবে)। ইহা বিশেষ বিধি। সুতরাং ব্যতিক্রমী। বিশেষ পরিস্থিতিতে এই বিশেষ নিয়ম প্রযোজ্য হইবে। নতুবা সাধারণ নিয়মই ('প্রাণিহিংসা করিবে না') বলবৎ থাকিবে।

'এই দৃশ্যমান জগৎ সত্য'—ইহা সাধারণ নিয়ম। আমাদের নিকট এই জগৎ সত্য। ইহাকে আমরা মিথ্যা বলিয়া ভাবিতে পারি না। তাই 'জগৎ সত্য'—এই উক্তিটি প্রায় সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু ইহারও অপবাদাত্মক ব্যতিক্রমী উদাহরণ আছে। আরেকটু সহজভাবে বলিতে পারি। আঁধার-আলোর সংমিশ্রণে সহসা দেখিলাম একটি সর্প। হয়তো আতঙ্কিত হইলাম নতুবা সর্পের সহিত বন্ধুত্ব করিলাম। সেই বিষধর সর্পের সহিত নিজের সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ মিশাইয়া ফেলিলাম। আমার ন্যায় আরো অনেকের ক্ষেত্রেই একই ঘটনা ঘটিতে থাকিল। সহসা এক ব্যতিক্রমী মানুষ কোথা হইতে একটি শক্তিশালী আলোকবর্তিকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেখিল—উহা সর্প নহে, একটি রজ্জুমাত্র। তাহার অন্তরে 'বিশেষবিধি' বলবৎ হইয়া তাহার জ্ঞানোন্মেষ ঘটাইল। বাকি সকলে 'সামান্য-বিধি'র বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া থাকিল। এই উদাহরণটি তাত্ত্বিক (theoretical) দিক হইতেও যেমন সুপ্রযোজ্য, অপরদিকে ইহা কথার কথাও নহে। বরং অনুভবসাপেক্ষ এবং তত্ত্বদর্শীর নিকট বাস্তব। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থায় জীবের আনাগোনা। সুষুপ্তি অবস্থারও অতীত তুরীয় অবস্থায় ঐ তত্ত্ব প্রত্যক্ষীভূত হইয়া রজ্জুর স্বরূপ প্রকাশ পায়। অর্থাৎ এই জড়জগৎ (যেমন যে-রজ্জুকে চেতন আত্মার অন্যোন্যাধ্যাসে চেতন বলিয়া সর্পবৎ মনে হইতেছিল) তখন মিথ্যা হইয়া বস্তুর ব্রহ্মরূপী প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়া সেই অনুভবসিদ্ধ মহাপুরুষকে শোক-দুঃখাতীত আনন্দময় রাজ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়। এই ব্রহ্মবস্তুকে উপনিষদে 'অব্যবহার্যম্' অর্থাৎ সমস্ত লোকব্যবহারের অতীত বলা হইয়াছে। আবার সংযত, শান্ত হইয়া সেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-এর কারণ তুরীয় ব্রহ্মকে উপাসনা করিবে—"তজ্জলান্ ইতি শান্ত উপাসীত" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৩।১৪।১)—ইহাও বলা হইয়াছে। অর্থাৎ এই ভগবদ্ উপাসনারূপ 'মই' ব্যবহার করিয়াই 'লোকব্যবহারিক' জগৎকে অতিক্রম করিয়া পারমার্থিক তত্ত্বে উপনীত হইতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের সর্বসম্মত উপদেশ। ❑

সমসাময়িক গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে যেসকল তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ১৩৫৯ সালে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনর্মুদ্রিত করা হলো। আশা করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।—**সম্পাদক**

'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি', ডিসেম্বর ১৮৮৪
(সুরেশচন্দ্র দত্ত প্রকাশিত)

স্প্রিংয়ের গদির উপর বসিলেই কুঞ্চিত হয় এবং উঠিলেই আবার সেই পুরাতন অবস্থায় পরিণত হয়। সংসারী মানবের মনেও সেইরূপ ধর্মকথা যখন শুনে তখন ধর্মভাব প্রবল হয়, কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিলে মনের আর সে-ভাব থাকে না।

যেমন কামারশালায় লৌহ যতক্ষণ হাপোরে থাকে ততক্ষণ লাল দেখায় এবং হাপোর হইতে বাহির করিলেই কালো হইয়া যায়, সেইরূপ সংসারী মানব যতক্ষণ ধর্মমন্দিরে বা ধার্মিকদিগের নিকট বসিয়া থাকে, ততক্ষণ ধর্মভাবপূর্ণ থাকে এবং বাহিরে আসিলেই সে-ভাব চলিয়া যায়।

*

গেরুয়া বসনের সহিত পবিত্র ভাবের সম্বন্ধ আছে। যেমন চটি জুতা ও ছিন্ন বসন পরিধানপূর্বক রাস্তা বেড়াইলে সহজে মনে দীনভাবের উদয় হয়। পেন্টুলেন ও বুট জুতা পায়ে দিলে সহজে মনে অহঙ্কারের ভাব উদয় হয়। সেইরূপ গেরুয়া বসন পরিধান করিলে সহজে মনে সাধনার উপযোগী ভাব উপস্থিত হয়।

*

পরিপক্ক ফল আপনি ভূমিতে পড়িয়া যায়, কিন্তু কাঁচা ফল পড়িলে মিষ্ট লাগে না, পক্কের ন্যায় দেখায়ও না। জ্ঞান-চৈতন্যের উদয় হইলে জাতিভেদ থাকিতে পারে না, কিন্তু অজ্ঞানীর পক্ষে জাতিভেদ নিতান্ত আবশ্যক।

*

মানুষ বালিশের খোল, অর্থাৎ বালিশের খোল উপরে দেখিতে কোনটা লাল, কোনটা কালো, কিন্তু সকলকার ভিতরে সেই এক তুলা। মনুষ্য দেখিতে কেহ সুন্দর, কেহ কালো, কেহ সাধু, কেহ অসাধু; কিন্তু সকলকার মধ্যে সেই এক ঈশ্বর।

*

শাস্ত্রে ঈশ্বরের বিষয় পাঠ করিয়া লোককে বুঝানো আর মানচিত্রে কাশী দর্শন করিয়া লোককে কাশী বুঝানো একই কথা।

*

বদ্ধজীব হরিনাম আপনিও শোনে না, পরকেও শুনিতে দেয় না। ধর্ম, সমাজ ও ধার্মিকদের নিন্দা করে এবং উপাসনা করিলে উপহাস করে।

কুম্ভীরের গাত্রে অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিলে অস্ত্র উঠিয়া পড়িবে, তাহার গাত্রে কিছুই হইবে না। বদ্ধজীবদিগের নিকট ধর্মকথা যতই বল না কেন, কিছুতেই তাহাদের প্রাণে লাগাইতে পারিবে না।

*

যে-মুসলমান 'আল্লা হো, আল্লা হো' করিয়া চিৎকার করিতেছে, নিশ্চয় জানিও, সে আল্লাকে পায় নাই। যে আল্লাকে পাইয়াছে সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে।

*

যোগী সন্ন্যাসীরা সর্পের ন্যায়। সর্প নিজের জন্য কখনো গর্ত খনন করে না, ইন্দুরের গর্তে থাকে; একটা গর্ত ভাঙিলে অপর গর্তে প্রবেশ করে। যোগী সন্ন্যাসীরাও সেইরূপ নিজের জন্য ঘর প্রস্তুত করে না, কিন্তু অপরের গৃহে, আজ এখানে কাল সেখানে করিয়া দিনযাপন করে।

প্রস্তর শতসহস্র বৎসর জলের মধ্যে থাকিলে তাহার মধ্যে জল কখনো প্রবেশ করিতে পারিবে না, কিন্তু মৃত্তিকা জল-সংযোগে তরল হইয়া পড়িবে। বিশ্বাসী হৃদয় শতসহস্র প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িলেও নিরাশ হইবে না, কিন্তু অবিশ্বাসী সংসারী মানব সামান্য কারণে বিচলিত হইয়া পড়িবে।

বালকের মন ষোল আনা নিজের নিকট থাকে; ক্রমে বিবাহ হইলে আট আনা স্ত্রীর প্রতি যায়, সন্তানে চারি আনা কাড়িয়া লয়, বাকি চারি আনা অহঙ্কার অর্থাৎ মানসম্ভ্রম বেশভূষায় কাড়িয়া লয়। অতএব বাল্যকালে যাহার ঈশ্বরে মতি হয়, সে সহজেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই।

*

বাল্যস্বভাব ব্যতীত টাকা মোহর ফেলে রাঙা পুতুল গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না। বিশ্বাসী হৃদয় ব্যতীত পার্থিব ধন-মানকে তুচ্ছ করে সচ্চিদানন্দকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না।

অনুতাপের অশ্রু আর আনন্দের অশ্রু চক্ষুর দুই দিক দিয়া বাহির হয়। নাসিকার দিকে চক্ষের যে-কোণ, সেখান দিয়া অনুতাপের অশ্রু এবং অপর দিক দিয়া আনন্দাশ্রু বাহির হয়।

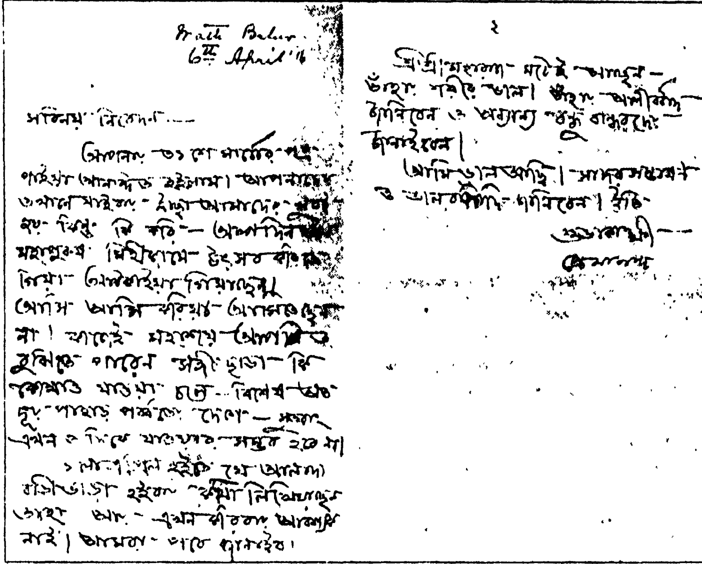
সাঁতার শিখিতে হইলে অনেকদিন জলে হাত-পা ছুঁড়িতে হয়, একেবারেই সাঁতার দেওয়া যায় না। ব্রহ্মজলধিতে সন্তরণ শিখিতে হইলেও আগে অনেকবার উঠিতে হয়, পড়িতে হয়; একেবারে হয় না।

সঙ্কলন ❑ জলধিকুমার সরকার

অপ্রকাশিত পত্র

স্বামী প্রেমানন্দের তিনখানি পত্র

প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্যকে* লিখিত



[১]

Math Belur
6th April '16

সবিনয় নিবেদন—

আপনার ৩১শে মার্চ্চের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আপনাদের ওখানে যাইবার ইচ্ছা আমাদের খুবই হয় কিন্তু কি করি—অল্পদিন হইল মহাপুরুষ [স্বামী শিবানন্দ] মিহীজামে উৎসব করিতে গিয়া আটকাইয়া গিয়াছেন। আসি আসি করিয়া আসিতেছেন না। কাজেই মহাশয় আপনি ত বুঝিতে পারেন সঙ্গী ছাড়া কি কোথাও যাওয়া চলে—বিশেষ অত দূর পাহাড় পর্ব্বতের দেশে—সুতরাং এখন ওদিকে যাওয়ার সম্ভব হবে না।

১লা এপ্রিল হইতে যে আলাদা বাড়ীভাড়া হইবার কথা লিখিয়াছেন তাহা আর এখন করিবার আবশ্যক নাই। আমরা পরে জানাইব।

শ্রীশ্রীমহারাজ [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] মঠেই আছেন—তাঁহার শরীর ভাল। তাঁহার আশীর্ব্বাদ জানিবেন ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধবদের জানাইবেন।

আমি ভাল আছি। সাদর সম্ভাষণ ও ভালবাসাদি জানিবেন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
প্রেমানন্দ

[২]

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

মট [মঠ] বেলুড়
শনিবার

শ্রদ্ধাভাজনেষু—

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আজ আটদিন হইল এখানে আসিয়াছি, কিন্তু শরীর সুস্থ না থাকায় আপনার পূর্ব্ব পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। অদ্য আপনার পত্র পাইলাম। শিবানন্দ স্বামি [স্বামী] এখনও মঠে আসেন নাই, শীঘ্র আসিবেন শুনিয়াছি। হরি মহারাজের [স্বামী তুরীয়ানন্দ] শরীর খারাপ, সেকারণ পাহাড় হইতে নাবিবেন [নামিবেন] না, নতুবা মঠেই আসিতেন।

* রাঁচি-নিবাসী প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য শিলঙের লোক। রাঁচিতে তিনি 'অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল'-এর অফিসে কাজ করতেন। শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

মঠের পশ্চিম দিকে কতকটা জমি ক্রয় জন্য চেষ্টা হইতেছে আর ঐ বিষয় অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। উৎসবের পরেই লেখাপড়া হইবার কথা আছে। সুতরাং বুঝিতে পারিতেছেন, মহারাজের ও আমাদের উৎসবের ৩/৪ দিন পরে শিলং যাত্রা অসম্ভব। মহারাজের ইচ্ছা আছে আর একবার কামাখ্যা মার দর্শন করেন ও সেই সময় শিলং যান, কিন্তু এত শীঘ্র নয়। একে বৃদ্ধাবস্থা তার উপর এই সবে ফিরেছি, আর এখানেও কাজ রয়েছে। এই সকল কারণে মট [মঠ] ছাড়া উচিত বোধ হয় না বুঝিতেই পারিতেছেন।

আপনি উৎসব দর্শনে আসিবেন আনন্দের কথা, কিন্তু ফিরিবার সময় আপনার সঙ্গে আমরা যাইব —এ আশা পোষণ করিবেন না জানাইলাম। আমাদের কবে শিলং যাত্রা সম্ভব তাহা শিবানন্দ স্বামি [স্বামী] আসিলে যুক্তি করিয়া জানাইব। শিবানন্দজী হয়ত এখানকার উৎসবের পর রাঁচি যাইবেন। ওখানকার সকল ভক্তদিগকে [ভক্তকে] আমাদের ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানাইবেন এবং আপনি জানিবেন।

মঠের সকলে সুস্থ আছে। আপনাদের কুশল মাঝে মাঝে পাইলে আনন্দিত হইব। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
প্রেমানন্দ

[৩]
শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

The Math Belur
20-5-16

প্রীতিভাজনেষু,

প্রসন্নবাবু, আপনার ১৪ই তারিখের পত্র পাইয়াছি। আপনাকে পূর্ব্ব পত্রেই জানাইয়াছিলাম—মহারাজ যতক্ষণ না train-এ উঠেন ততক্ষণ বিশ্বাস করিবেন না। মহাপুরুষ মুক্তপুরুষের স্বভাব স্বতন্ত্র—তাঁহাদের চরিত্র ও গতিবিধি দুর্জ্জেয়। তবে একেবারে নিরাশ হইবেন না—একবার যখন বলিয়াছেন যাইবেন তখন যাইবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু কবে বা কিভাবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। মহারাজ যখন ভাল mood-এ থাকেন সেই সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ও স্থির করিয়া আপনাকে লিখিয়া জানাইব। আপনারা বাসরসজ্জা করিয়া বসিয়া থাকুন—তিনি আপনাদের মধ্যে উপস্থিত হইতেছেন। আপনি যখন শ্রীশ্রীমার কৃপালাভ করিয়াছেন, তখন জানিবেন ঠাকুরের সন্তানগণের সমধিক কৃপা ও প্রীতি আপনার উপর আছেই। এতদিন মঠে একটি কার্য্য ছিল বলিয়া যাওয়ার কিছুই স্থির হয় নাই। সে কার্য্যটী নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমরা শিলঙে যাইবার দিন স্থির করিতে পারি। আপনাদের টাকা যখন এখানে আছে তখন ধীরে সুস্থে ভাল দিন দেখিয়া যাইলেই চলিবে। আপনি ত আমাদের নিজের লোক। আমরা ভাল আছি। আপনাদের কুশল সমাচার দিবেন। আপনি মহারাজ, মহাপুরুষ ও আমার ভালবাসা ও শুভাশীর্ব্বাদ জানিবেন।

প্রেমানন্দ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে ব্রহ্মচারী সনাতনের আগ্রহাতিশয্যে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। ব্রহ্মচারীজী যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যাতে পাঠকের বুঝতে সুবিধা হয়।—সম্পাদক

তৃতীয় অধ্যায় ঃ কর্মযোগ

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্।।২।।

শ্লোকার্থ ঃ *(অর্জুন বলিলেন) আপনি সংশয়জনকরূপে প্রতীয়মান বাক্যে আমার মনকে বিভ্রান্ত করিতেছেন। এই উভয়ের মধ্যে একটি আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলুন, যাহার দ্বারা আমি শ্রেয়োলাভ করিতে পারি।*

ব্যাখ্যা ঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান কখনো জ্ঞানের কথা (সাংখ্য), কখনো কর্মের কথা (যোগ) বলিয়াছেন। এই দুইটি পথ দুইপ্রকার আধারের জন্য। অর্থাৎ দুই ভিন্ন স্বভাবের সাধকের জন্য। একজনের পক্ষে যেটি শ্রেয়, অন্যের পক্ষে সেটি শ্রেয় নাও হইতে পারে। একথা বুঝিতে না পারিয়া অর্জুন শ্রীভগবানকেই সরাসরি জিজ্ঞাসা করিতেছেন—কোন্‌টি শ্রেয়?

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্।।৩।।

শ্লোকার্থ ঃ *শ্রীভগবান বলিলেন, হে অনঘ (নিষ্পাপ) অর্জুন, ইহলোকে জ্ঞানাধিকারীর জন্য জ্ঞানযোগ এবং নিষ্কাম কর্মীর জন্য কর্মযোগ—এই দুইপ্রকার নিষ্ঠার বিষয় সৃষ্টির প্রারম্ভে আমি বেদমুখে বলিয়াছি।*

ব্যাখ্যা ঃ যে-ব্যক্তি যে-প্রকার মানসিক অবস্থায় আছে, তাহাকে সেই স্থান হইতেই আত্মজ্ঞানলাভের চেষ্টা করিতে হইবে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও বলা হইয়াছে—"সাংখ্য-যোগাধিগম্যম্।" (৬।১৩) অর্থাৎ আত্মজ্ঞান সাংখ্য (জ্ঞান) ও যোগ (কর্ম) দ্বারা উপলভ্য। বস্তুত, কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ দুইটি পৃথক পথ নহে। কাহারো কাহারো প্রবল বৈরাগ্য থাকে। কিন্তু যাহাদের প্রবল বৈরাগ্য নাই, তাহাদের জন্য কর্ম বিধেয়। এবং কর্ম না করিয়া তাহারা থাকিতেও পারে না। তাহারাই নিষ্কামভাবে কর্ম করিবার চেষ্টা করিতে করিতে ক্রমশ জ্ঞান-মার্গের অধিকারী হইয়া উঠিবে—ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়।

সামান্য চিন্তা করিলেই বুঝা যায়, যোগমার্গ (কর্মমার্গ)-ও যোগসমন্বয়ের মাধ্যমেই সাধিত হইয়া থাকে। এই যোগ-সমন্বয়ের শিক্ষাই স্বামী বিবেকানন্দ আমৃত্যু প্রচার করিয়াছেন। কারণ, ধ্যেয়বস্তু সম্পর্কে *জ্ঞান* না থাকিলে নিষ্কাম কর্ম হয় না। আবার শ্রীভগবানের প্রতি টান না থাকিলেও নিষ্কাম কর্ম হয় না।

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।।৪।।

শ্লোকার্থ ঃ *কর্মানুষ্ঠান না করিয়া কেহ 'নৈষ্কর্ম্য' (নিষ্কর্ম অর্থাৎ কর্মবিহীন আত্মা; সেই আত্মারূপে অবস্থিতিই 'নৈষ্কর্ম্য') লাভ করিতে পারে না। কর্মযোগের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও পরে আত্মবিবেক না হইলে 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি' (বৈদিক মতে সন্ন্যাসগ্রহণ এবং জ্ঞাননিষ্ঠার সমন্বয়) লাভ হয় না। কেবলমাত্র জ্ঞানশূন্য 'কর্মত্যাগ' দ্বারা উক্ত অবস্থালাভ অসম্ভব।*

ব্যাখ্যা ঃ কর্ম না করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিলেই যে কর্মত্যাগ হইল তাহা নহে। নিষ্কর্মা হইয়া কেহ বসিয়া আছে দেখিলেই মনে করিও না সেই ব্যক্তির কর্মত্যাগ হইয়াছে এবং সে সিদ্ধ।

এই সিদ্ধান্তের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন বলিয়াই শ্রীভগবান এই শ্লোকে পরপর দুবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। এই ব্যাপারে অর্জুনেরও সম্যক ধারণা হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

তমোগুণী অনেক ব্যক্তি আছে, যাহারা 'কাজ'-এর হাঙ্গামা এড়াইয়া থাকিতে চাহে এবং ভণ্ডামি করিয়া থাকে। অনেকে বাড়ির হাঙ্গামা এড়াইয়া আশ্রমে চলিয়া আসে। নবাগত একজন আমাকে বলিয়াছিল ঃ "আপনি, গোপেশ মহারাজ (স্বামী সারদেশানন্দজী) বেশ কেমন আছেন—কাজ না করে। আমিও তাই থাকব!" সে দেখিতেছে, আমরা উপদেশ করি, কত মান! কোন কাজও করিতে হয় না!!

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।।৫।।

শ্লোকার্থ ঃ *কর্ম না করিয়া কেহই ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। অ-স্বতন্ত্র হইয়া সকলেই মায়া হইতে সঞ্জাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের প্রভাবে কর্ম করিতে বাধ্য হয়।*

ব্যাখ্যা ঃ কেহই কখনো কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না—একথা অতীব সত্য। কারণ, তাহার স্বভাবজ প্রকৃতিই

তাহাকে কর্মে নিয়োজিত করিবে। নিতান্তই যদি কেহ আলস্যবশত কর্ম এড়াইয়া চলে, তথাপি শরীররক্ষার জন্য আহার-পানাদি কর্ম তাহাকে করিতেই হয়। এবং শরীর-মনে রজোগুণ থাকিলেই তাহা সাধকের ঈশ্বরমুখী মনকে ক্রমশ ঈশ্বরবিমুখ করিয়া পরস্পর নিন্দামন্দ-সমালোচনা, ভণ্ডামি, ইন্দ্রিয়বিলাস, এমনকি অপরের ক্ষতিসাধনেও প্রবৃত্ত করে। এইসকল মানসিক প্রবৃত্তিকে সংযত ও সুসংহত করিবার জন্যই তো স্বামীজী এই বিরাট 'রামকৃষ্ণ মিশন' স্থাপন করিলেন। সত্ত্বগুণের অনুশীলন করিয়া রজঃ ও তমঃ গুণ দূর করিবার এই যন্ত্র সাধকবর্গের কি বিপুল উপকার সাধন করিয়াছে তাহা বর্ণনা করা সাধ্যাতীত।

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।।৬।।

শ্লোকার্থ ঃ *যে মূঢ় ব্যক্তি হস্ত, পদ ও বাক্যাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় বাহ্যত সংযত রাখিয়া মনে মনে শব্দ-স্পর্শ-রসাদি ইন্দ্রিয়বিষয় স্মরণ করে (ভোগ করে), তাহাকে 'মিথ্যাচারী' বলা হয়।*

ব্যাখ্যা ঃ মনের শান্তি ও আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে মন হইতে বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে—কর্মত্যাগ নহে। কর্মেচ্ছা কিংবা রূপ-রসাদিকে মনের মধ্যে লুকাইয়া বাহ্যত কর্মত্যাগ করিলে মনের মধ্যে রসভোগেচ্ছারূপ বাসনা তো থাকিয়াই গেল। অন্যত্র শ্রীভগবান বলিলেনঃ "রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।" (২।৫৯) অর্থাৎ বিষয়-গ্রহণে অক্ষম আতুর ব্যক্তি (অন্ধ, বধির ইত্যাদি) অথবা বিষয়ভোগপরাঙ্মুখ তপস্বী বাহ্যত বিষয়ভোগ করে না বটে, কিন্তু তাহাদের ভিতরে তো বিষয়ভোগেচ্ছা বিদ্যমান থাকিয়া যায়। একমাত্র দেহ-মন-বুদ্ধির অতীত হইতে পারিলেই মন হইতে যাবতীয় বাসনা দূরীভূত হয় বা সেই বাসনা দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়। সেই অবস্থাকেই প্রকৃত ইন্দ্রিয়সংযম বলা হয়।

আচার্য-মনীষীগণ সাধককে বিপরীত লিঙ্গ দেখিতে নিষেধ করিয়াছেন, কৌপীনডোর ধারণ করিতে বলিয়াছেন। ইহা কেবল অভ্যাসযোগ। যুগযুগান্তর ধরিয়া আমরা রূপ-রসাদির দিকে চলিয়াছি। এখন সহসা তাহার বিপরীত দিকে চলিতে চেষ্টা করিতেছি। ইহা অভ্যাস করা অবশ্যই জরুরী। কিন্তু আসলে চাই মনের মধ্যে এগুলিকে 'হেয়' বোধ হওয়া। 'সত্য' অর্থাৎ 'জ্ঞেয়' বস্তুর উপর মনের সংযোগ না থাকিলে কৌপীনাদিতে কোন কাজই হইবে না। আবার সংযোগ রাখিতে গেলেই 'জ্ঞেয়' বস্তুটি কী তাহা জানা বিশেষ প্রয়োজন। অর্থাৎ জ্ঞান চাই। আর একইসঙ্গে তাহার (জ্ঞেয় বস্তুর) উপর আত্যন্তিক টানও অনুভব করা চাই।

অবতারের জীবনে আমরা ইহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেখিতে পাই। তাই এইসকল কথার শ্রেষ্ঠ উপমা কেবলমাত্র অবতার এবং পথনির্দেশক একমাত্র শাস্ত্র—কোন মনুষ্য নহে।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে।।৭।।

শ্লোকার্থ ঃ *কিন্তু যিনি বিবেকী মনের দ্বারা চক্ষু-কর্ণ ইত্যাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযত করিয়া রাখেন এবং কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা অনাসক্তভাবে কর্মানুষ্ঠান করেন, তিনি পূর্বোক্ত মিথ্যাচারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।*

ব্যাখ্যা ঃ কর্ম জীবকে বদ্ধ করে বলিয়া কেহ কেহ কর্ম করিতে চাহে না। কিন্তু মন বাসনামুক্ত না হইলে কর্মত্যাগে কোন ফল হয় না। "রসবর্জং রসোঽপ্যস্য..." ইত্যাদি পূর্বেই বলা হইয়াছে। এখন উপায় কি? উপায় গীতামুখে শ্রীভগবান বলিলেন, কর্ম এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে তাহা বন্ধনের হেতু না হয়, অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা বা ফলাভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া কর্ম করা। নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিক (occasional) কর্ম ইত্যাদি ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া করিলেও একটি পরম উদ্দেশ্য অবশ্য আছে, তাহা হইল চিত্তশুদ্ধি। বাহ্যবস্তুর অভিঘাতে যাহাতে মন চঞ্চল না হয়, সেইটি অভ্যাস করিতে করিতে কর্ম করা। ইহা অভ্যাসসাপেক্ষ হইলেও বিশেষ কঠিন কিছু নহে।

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ।।৮।।

শ্লোকার্থ ঃ *(অর্জুন) তুমি শাস্ত্রবিহিত নিত্যকর্ম (বৈদিক কর্ম চতুর্বিধ—নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিককর্ম, কাম্যকর্ম এবং নিষিদ্ধকর্ম) অনুষ্ঠান কর। (নিত্যকর্ম না করিলে প্রত্যবায় অর্থাৎ দোষ হয়, কারণ ঐ কর্ম না করিলে জড়তা ইত্যাদি তমোগুণ বৃদ্ধি পাইয়া সমাজজীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলে।) কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেয়। কর্মহীন হইলে তোমার দেহযাত্রাও নির্বাহ হইবে না।*

ব্যাখ্যা ঃ নিয়তং কর্ম—বংশগত, সম্প্রদায়গত অথবা শিক্ষা বা বৃত্তিমূলক কোন কর্ম করা; অর্থাৎ সমাজকে কিছু না কিছু সেবা (service) দান করিয়া নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা। বৈষ্ণবগণ এখনো ঐ কারণেই 'রাধেকৃষ্ণ' অথবা সন্ন্যাসিগণ 'নারায়ণো হরিঃ' বলিয়া নাম শুনায় এবং পরিবর্তে সমাজ হইতে ভিক্ষাগ্রহণ করে। পূর্বে এই ভিক্ষা-বৃত্তি একটি অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সম্মানজনক কর্ম ছিল। সাতটির বেশি গৃহে যাওয়া চলিবে না, গৃহস্থের দ্বিপ্রাহরিক ভোজন শেষ হইলে তবেই যাইতে পারিবে—ইত্যাদি। এখন ক্রমশ সব শৃঙ্খলা ভাঙিয়াছে এবং ইহা ভিখারী-বৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে। আরো উদাহরণ দেওয়া যায়। রাজা বস্তুত প্রজার রক্ষক। প্রজা নিজের 'উপায়' হইতে কিছু অংশ রাজাকে দিবে রাজার জীবনধারণের জন্য। ক্রমশ উহা রাজার বসিয়া খাওয়া, সামন্ত সৃষ্টি, জমিদারের অত্যাচারের পর্যায়ে পৌঁছাইল। পূর্বে প্রজাগণ ছিল উত্তমর্ণ, রাজা অধমর্ণ। এখন বিপরীত হইয়া প্রশাসকই যেন উত্তমর্ণে পরিণত হইয়াছে এবং প্রজাগণ হইল অধমর্ণ! জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার একান্ত অভাবই এই পরিবর্তনের কারণ। অশিক্ষিত সরল প্রজাকে প্রতারণা করা খুবই সহজ ব্যাপার। [ক্রমশ] ।।দুই।।

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ ঃ রাগে অনুরাগে

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

[পূর্বানুবৃত্তি]

■ মুখোমুখি বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ

সোমবার নয়, ২৮ জানুয়ারি ১৮৯৯ শনিবারেই বসেছিল সেই চা-পানের আসর। এবং এখানেই ঘরোয়া আলাপচারিতার পরিবেশে নিবেদিতা মুখোমুখি আনতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দকে।

প্রথমে ঠিক ছিল, পায়রাগুলি যদি তাড়ানো যায় তাহলে নিবেদিতার স্কুলবাড়ির বারান্দায় সবাই মিলে বসা যাবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত খোলা উঠোনেই আসর বসেছিল। সকল অতিথিই এসেছিলেন বেশ জমকালো পোশাকে। তবে চা-পানের আসরে খোদ চা তৈরি নিয়েই নিবেদিতাকে একটু অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। দুধ জোগাড়ে দেরি হয়েছিল এবং ডঃ প্রসন্নকুমার রায়ের স্ত্রী সরলা দেবী (সরলা ঘোষাল নন) কাজের লোক এবং টি-পটের ব্যবস্থা না করলে হয়তো আদৌ চা বানানোই যেত না। গৃহকর্ত্রীর সেই বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা পাওয়াই শুধু নয়, সরলা দেবী চা তৈরির দায়িত্ব নেওয়ায় নিবেদিতার পক্ষে অতিথিদের সঙ্গে আলাপচারিতা চালানোও সম্ভব হয়েছিল। চা পান শেষ করে অতিথিরা সবাই উঠে এসেছিলেন নিবেদিতার ঘরে এবং সেখানে মোমবাতির আলোয় স্বামীজী কথা বলেছিলেন 'magnificiently'।[১৯]

কী বলেছিলেন স্বামীজী? কেমন হয়েছিল সেই 'Very Big Lion'-এর প্রদর্শনী? আগে থেকে পরিকল্পনা নেওয়া এত গুরুত্বপূর্ণ এক আয়োজন সম্পর্কে কিন্তু নিবেদিতা স্বভাববিরুদ্ধভাবে মিতবাক্। আসরের অন্য অতিথিদেরও এই সংক্রান্ত তেমন কোন স্মৃতিচারণ পাওয়া যায় না। গবেষক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু মন্তব্য করেছেন ঃ "ঠাকুরবাড়ি ও ব্রাহ্মদের সঙ্গে মেলামেশার সংবাদ নিবেদিতা মিসেস ওলি বুলকে বেশি লিখতেন। কিন্তু এই [টি-পার্টি] বিষয়ে তাঁকে লেখা কোন চিঠি আমরা পাইনি।"[২০]

যে-চিঠিটি* পাই তা মিস ম্যাকলাউডকে লেখা। শনিবারের আসরের পরের মঙ্গলবার তিনি স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর ইদানিংকার যোগাযোগের কথা লিখতে লিখতে কতকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই লিখেছেন ঃ "গত শনিবারও আমার এক unarranged পার্টি হইয়া গেল। শ্রীমতী পি. কে. রায় ও তরুণ মিঃ মুখার্জি [?], মিঃ মোহিনী [মোহন চট্টোপাধ্যায়] ও কবি [রবীন্দ্রনাথ] আসিলেন—অল্পক্ষণ পরেই ডাঃ [মহেন্দ্রলাল] সরকারকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজী। এ এক অতি চমৎকার ক্ষুদ্র সমাবেশ, কারণ মিঃ টেগোর তাঁহার মনোরম চড়া পুরুষালি কণ্ঠে নিজের তিনটি গান পরিবেশন করিলেন এবং স্বামীজী ছিলেন অনবদ্য। Only there was some cloud—I could not tell what." এই চিঠিরই পরের দিকে লেখা ঃ "এক্ষণে আমার প্রতিবেশী বাড়িগুলি হইতে সন্ধ্যারতি ও ঘণ্টার ধ্বনি শোনা যাইতেছে। এই সময়কে এখানকার মানুষরা সেঁজুতি বলে—পূজার্চনার কাল। I cannot forget the lovely poem 'Come O' Peace' ('Escho Santi')—সঙ্গে তাহার সকরুণ মৃদু সুরের আবহ। মিঃ টেগোর গানটি রচনা করিয়াছেন ও সেদিন আমাদের পরিবেশন করিয়াছিলেন।"[২১]

শুধু সংযতবাক্ হওয়ার জন্যই নয়, সেদিনের সেই আসরের বর্ণনায় আরো কিছু সত্যিকারের খটকা রয়েছে —অনুমানে ধারণা করা ছাড়া যেগুলি নিরসনের উপযুক্ত তথ্য এখনো আমাদের হাতে নেই। যেমন, প্রথমেই নিবেদিতা এটিকে একটি 'Unarranged party' বলেছেন। কেন? শুধু আমরা নই, ম্যাকলাউডও আগেই জেনে গেছেন, স্বামীজী নিজেই ব্রাহ্মদের মধ্যে অনুপ্রবেশের এক পদক্ষেপ হিসাবে এই টি-পার্টির আয়োজন করতে বলেছেন, মাঝে মাঝে ব্যবস্থাপনার খোঁজখবর করেছেন এবং নিবেদিতা সোৎসাহে সেই পরিকল্পনা রূপায়ণে তৎপর হয়েছেন। তাহলে কি আমন্ত্রণ জানানোর আগেই অতিথিরা নেহাত কাকতালীয়ভাবে একই দিন, প্রায় একই সময়ে এসে পড়েছেন? একথা বিশ্বাস করতে মন চায় না। বরং এমন ভাবা যেতে পারে যে, পার্টিটির অগোছালো

---

* নিবেদিতার এই চিঠির ওপর তারিখ লেখা—'Jan. 30th 1899—Tuesday'। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল তাঁর 'রবিজীবনী' গ্রন্থে (৪র্থ খণ্ড, ১৩৯৫, পৃঃ ২১৯) ভুলটি ধরিয়ে দিয়েছেন ঃ "30 Jan. 1899 মঙ্গলবার ছিল না, ছিল সোমবার। নিবেদিতার পত্রে এইরকম বার ও তারিখের গোলমাল প্রায়ই দেখা যায়। এক্ষেত্রে সম্ভবত 'বার' নির্ভরযোগ্য, সেইজন্য আমরা বাঙলা তারিখটি (১৮ মাঘ ১৩০৫) 'বার' অনুসারে নির্ধারণ করেছি। সেক্ষেত্রে ইংরেজি তারিখটি হবে 31 Jan 1899।" এইসঙ্গে আরেকটি যুক্তি যোগ করা যায়—চিঠিতে 'yesterday', 'today', 'Sunday', 'Saturday' ইত্যাদি উল্লেখ করে বিভিন্ন দিনের ঘটনার কথা বলা হয়েছে। তাই চিঠিটি 'মঙ্গলবার'-এ লেখা বলেই মনে হয়।

ভাব বোঝাতে 'unarranged' বিশেষণটি ব্যবহৃত হয়েছে। আবার সেই সময়ে তাঁদের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সরলা ঘোষালকে বাদ দিয়ে ব্রাহ্মদের এমন নিমন্ত্রণসভা 'arranged' হয় কী করে?

এরপরে আসা যাক রবীন্দ্রনাথের গাওয়া তিনটি গান প্রসঙ্গে। কোন্ তিনটি গান তিনি গেয়েছিলেন? নিবেদিতা একটিমাত্র গানের উল্লেখ করেছেন—"Come O' Peace" (Escho Santi)। কোন্ গান এটি? অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এসম্পর্কে লিখেছেন : "গীতবিতানের পৃষ্ঠা উল্টে 'এস শান্তি' শব্দ দুটি দিয়ে কোন গান শুরু হয়েছে, এমন দেখিনি। (এক্ষেত্রে আমার ভুল হতে পারে।) সন্ধানমতো আমার যতদূর মনে হয়, 'পূজা' পর্যায়ের নিম্নের গানটি রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন, যার শেষের দিকে 'এস শান্তি' কথা-দুটি আছে এবং এর ভাব নিবেদিতার বর্ণনার অনুরূপ—'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে'।" রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল এপ্রসঙ্গে মতামত দিয়েছেন : "কিন্তু 'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে' ('গীতবিতান', ১।৬৮-৬৯) গানটি আশ্বিন ১৩০২ তারিখে শিলাইদহে বোটে লেখা, সুতরাং এটিকে 'আমাদেরই জন্য রচনা করেছিলেন' (শঙ্করীপ্রসাদ বসু-কৃত অনুবাদ) বললে তথ্য পরিবেশনে কিছু ত্রুটি থেকে যায়, অবশ্য গীত-সুধারসে আপ্লুত নিবেদিতা নিজেই যদি এইরকম ভেবে থাকেন তাহলে আর অসঙ্গতি থাকে না—গানটির ভাব অবশ্যই তাঁর বর্ণনার অনুরূপ।"[২২]

এপ্রসঙ্গে আরো কিছু চিন্তা যোগ করা যেতে পারে। নিবেদিতার মূল ইংরেজি চিঠিতে গান প্রসঙ্গে "...that Mr. Tagore composed and sang for us the other day at this time" লেখা হয়েছে। এই বাক্যাংশের প্রচলিত অনুবাদ—"মিঃ টেগোর যেটি আমাদেরই জন্য রচনা করেছিলেন ও গেয়েছিলেন"[২৩] ঠিক মূলানুগ হচ্ছে না, বরং করা যেতে পারে—"রচনা করেছিলেন ও আমাদের জন্য গেয়েছিলেন।" তাহলে আর কালাতিক্রমণ দোষ থাকছে না।

এ তো গেল রবীন্দ্রনাথের গাওয়া তিনটি গানের একটি প্রসঙ্গে ধারণা। কিন্তু "রবীন্দ্রনাথ আরো যে-দুটি গান গেয়েছিলেন সে-সম্পর্কে কোন আভাস নিবেদিতা দেননি। [সদ্য সমাপ্ত] মাঘোৎসবের জন্য তিনি ছটি নূতন গান রচনা করেছিলেন, তারই মধ্যে কোন কোন গান তিনি গেয়ে থাকতে পারেন।"[২৪] এই নতুন ছয়টি ব্রহ্মসঙ্গীত হলো—(১) বিমল আনন্দে জাগ, (২) পিপাসা হায় নাহি মিটিল, (৩) তুমি কাছে নাই বলে হের সখা তাই (স্বরলিপি পাওয়া যায় না), (৪) দিন ফুরাল হে সংসারী (স্বরলিপি পাওয়া যায় না), (৫) চিরসখা ছেড় না মোরে ছেড় না এবং (৬) হৃদয় বাসনা পূর্ণ হলো।[২৫] এর মধ্যে চতুর্থ গানটি ২৮ জানুয়ারি সন্ধ্যাবেলা রবীন্দ্রনাথের গাওয়ার অথবা ৩১ জানুয়ারি সন্ধ্যাবেলা নিবেদিতার মনে পড়ার যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। এবং এই গানেও শান্তি আনার কথা বলা হয়েছে। সম্পূর্ণ গানটি—"দিন ফুরাল হে সংসারী,/ ডাক তাঁরে ডাক যিনি শ্রান্তিহারী।/ ভোল সব ভবভাবনা,/ হৃদয়ে লহ হে শান্তিবারি।"[২৬] অমলা দাস সংগৃহীত সুরে কথা বসিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই রাগপ্রধান গানটি তৈরি করেন।[২৭]

কিন্তু এই টি-পার্টি সম্পর্কে নিবেদিতার বয়ানের সবচেয়ে বড় খটকা—সেখানে তাঁদের মধ্যে কী আলোচনা হলো? শ্রীমতী রায় চায়ের দায়িত্ব নিজে নিয়ে নিবেদিতাকে কথা বলার সুযোগ করে দিলেন এবং 'Swami talked magnificiently'। কিন্তু কী কথা? আর স্বামীজী কথা বলে গেলেন আর রবীন্দ্রনাথ শুধু তিনটি গান গেয়ে চুপ করে থাকলেন—এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাছাড়া অন্যান্য অতিথিদের ভূমিকাই বা কী ছিল? অনুমান করা যায়, 'Only there was some cloud' বাক্যাংশের মধ্যেই রয়েছে মূল দ্যোতনা। হয়তো স্বামীজীর সঙ্গে ব্রাহ্ম অতিথিদের কোন মতানৈক্য প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং উভয় পক্ষই সৌজন্য রক্ষার খাতিরে কথা বেশি দূর গড়াতে দেননি।

অবশ্য ম্যাকলাউডকে লেখা এই চিঠির পরের অংশেই টি-পার্টিতে এক 'unholy' মহিলাকে আমন্ত্রণ জানানো সম্পর্কে স্বামীজীর বিরাগের উল্লেখ আছে—তাই 'cloud' সেই সম্পর্কেও হতে পারে। কিন্তু তথ্যাভাবের কারণে একেবারেই স্পষ্ট নয়, স্বামীজী কোন্ মহিলার কথা বলতে চাইছেন। টি-পার্টিতে উপস্থিত মহিলা হিসাবে তো নিবেদিতা ছাড়া একমাত্র ডঃ প্রসন্নকুমার রায়ের স্ত্রী সরলা দেবী এবং তাঁর কাজের মেয়েটির কথাই পাওয়া যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ-সরলা দেবী ঘনিষ্ঠতা বিষয়ে সেকালের সম্ভ্রান্ত মহলে যে-রটনা প্রচলিত ছিল, তবে কি স্বামীজী তার প্রতিই ইঙ্গিত করছেন?

যাই হোক, বিবেকানন্দ-নিবেদিতা গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল উভয়েই স্বামীজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই সাক্ষাৎকে 'ঐতিহাসিক' বলেছেন। কিন্তু এই আসর ইতিহাসে দাগ কাটার মতো কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারেনি। বোধহয় প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ কারো মনেও। কারণ, তাঁদের রচনা বা উক্তিতে কখনোই এই আসরের কোন উল্লেখ নেই, বরং এরপর থেকে

নিবেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবারের কিছু সদস্যের সম্পর্ক ক্রমশই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে।

■ "মার্গট, তোমাকে সাবধান করি"

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ অ্যালবার্ট হল-এ বহু-আলোচিত 'Kali Worship' বিষয়ক প্রথম বক্তৃতায় নিবেদিতার বৈদগ্ধ্যে আকৃষ্ট হন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর পুত্র সুরেন্দ্রনাথ। সরলার সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গেও এবার তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ১৪ ফেব্রুয়ারি সকালে মহর্ষিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসেন।

কিন্তু স্বামীজী ইতোমধ্যে ব্রাহ্মদের সঙ্গে যোগাযোগের এই উদ্যোগের প্রতি নিরাসক্ত হয়ে উঠেছেন। নিবেদিতাকে ঐ ১৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যাবেলাই তিনি বলছেন ঃ "মা যদি চান—মা যদি ইচ্ছা করেন—তাহলে তিনিই এ-কাজ করবেন। ওসব নিয়ে আমার ভাববার কোন প্রয়োজন নেই—আর এসবে যদি মায়ের ইচ্ছে না থাকে, এ আমার ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ হয়, তবে যত শীঘ্র এটি চূর্ণ হয় ততই মঙ্গল।"[২৮] অর্থাৎ নিবেদিতাকে সরাসরি বারণ না করলেও নিজের মনোভাব স্বামীজী ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে দিচ্ছেন।

অবশ্য মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়ে তিনি আগ্রহী ছিলেন। নিবেদিতা তাই ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ স্বামীজীকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে নিয়ে গিয়ে মহর্ষি ও তাঁর পরিবারের অনেকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। রবীন্দ্রনাথ সেসময় শিলাইদহে থাকলেও আদি ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতর সম্পাদক হিসাবে তিনি এসব যোগাযোগের খবর নিশ্চয় রাখছিলেন। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর উত্তরোত্তর সখ্যবৃদ্ধি সম্পর্কেও তিনি নিশ্চয়ই অবহিত ছিলেন। ইন্দিরা দেবীর বিবাহাদি পারিবারিক লৌকিক অনুষ্ঠানেও এমনকি নিবেদিতার নিমন্ত্রণ হতে থাকে এবং তিনি সোৎসাহে সেসবে যোগ দিতে থাকেন।

স্বামীজী বুঝলেন, এবার কঠোর হাতে তাঁর রাশ টানার প্রয়োজন। ১১ মার্চ ১৮৯৯ স্বামীজী বলেন ঃ "মার্গট, তুমি যতদিন ঐ ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তোমার মেলামেশা চালিয়ে যাবে ততদিন আমাকে বারবার সাবধান করে যেতেই হবে। মনে রেখো, ঐ পরিবার বঙ্গদেশকে শৃঙ্গাররসের বন্যায় বিষাক্ত করেছে।" এরপর তিনি ঠাকুর পরিবারের সদস্যদের কয়েকটি কবিতার ভাববস্তু বর্ণনা করে বলেন ঃ "রামকৃষ্ণ বা বেদান্তর ভাবাদর্শ নয়—আমার জীবনের উদ্দেশ্য কেবল জনগণের মধ্যে মনুষ্যত্বের (Manhood) সঞ্চার।"[২৯]

নিবেদিতা উত্তর দিলেন ঃ "আমি আপনাকে সাহায্য করব, স্বামী।"

"তা আমি জানি। আর সেইজন্যই তোমাকে হুঁশিয়ার করে চলি।"

নিবেদিতার সংলাপে তাঁর স্বভাবসুলভ আবেগবাহুল্য যতই থাক, তার মর্মে রয়েছে নিখাদ সত্যকথন। এই কথাবার্তার কিছুদিন আগেই ম্যাকলাউডকে ১৫ ফেব্রুয়ারির চিঠিতে ব্রাহ্ম ও ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের সঙ্গে তাঁর ক্রমবর্ধমান নৈকট্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন ঃ "এখানকার কোন কোন মহল যাঁহারা এসব (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ) সম্বন্ধে এতদিন উদাসীন ছিলেন, তাঁহারা এখন যে আমার প্রতি বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করিতেছেন তাহাতে, জ্ঞাতসারে হউক অথবা নাই হউক, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ধারণ করিতেছেন সেই Man of God-এর বসনপ্রান্ত এবং তাঁহারা আনীত হইতেছেন মায়ের চরণতলে।"[৩০] অর্থাৎ ব্রাহ্মদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে নিবেদিতার কোন ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ যে কাজ করছিল না, সেবিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

কিন্তু সন্দেহ রয়ে যাচ্ছে অন্য বিষয় নিয়ে। নিবেদিতা লিখেছেন ঃ "He described some of their (of Tagore family) poetry." ঠাকুর পরিবারের কোন্ কোন্ সদস্যদের কোন্ কোন্ কবিতার কথা বলা হচ্ছে? এখানে বিবেকানন্দ-নিবেদিতা গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল দুজনেই নির্দ্বিধায় ধারণা করে নিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালে রচিত 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি সনেটের কথাই নাকি স্বামীজী নিবেদিতাকে বর্ণনা করেছেন। অথচ এমন কোন ইঙ্গিত কিন্তু নিবেদিতার লেখায় নেই। বিশেষত পত্রপ্রাপক মিস ম্যাকলাউড ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কলকাতায় পরিচিত হয়ে গেছেন, তাই কবির কথা সরাসরি উল্লেখ না করে বহুবচনে 'their poetry' লেখার কোন যুক্তি পাওয়া যাচ্ছে না।

বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ যোগাযোগের অভাব ছিল বলেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি স্বামীজীর বিরাগ ছিল—এমন এক গুরুতর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মধ্যে এক অতিসরলীকরণের ভ্রান্তি থেকে যাচ্ছেই।

একথা হয়তো ঠিক, পরবর্তী কালে 'পরিব্রাজক' রচনায় যখন স্বামীজী লিখেছিলেন ঃ "ঐ যে একদল দেশে উঠেছে, মেয়েমানুষের মতো বেশভূষা, নরম নরম বুলি কাটেন, এঁকে বেঁকে চলেন, কারুর চোখের ওপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় 'হাসেন

হোসেন' করেন।''—তখন হয়তো রবীন্দ্র-অনুকরণকারী ব্যর্থ কবিদলের প্রতিই তিনি আঘাত করেছেন। একথাও হয়তো সত্যি, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের প্রতি মনোযোগী থাকার মতো আগ্রহ বা অবসর কোনটিই তাঁর ছিল না। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে, বিবেকানন্দ তাঁর যৌবনে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান নিয়মিত গাইতেন এবং বৈষ্ণবচরণ বসাকের সঙ্গে 'সঙ্গীতকল্পতরু' গ্রন্থ সঙ্কলনকালে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান তার অন্তর্ভুক্ত করেন।[৩১] তাছাড়া যেসময় এসব কথাবার্তা চলছে, তখন রবীন্দ্রনাথ ধর্মবোধে সমৃদ্ধ ব্রহ্মসঙ্গীত নিয়মিত রচনা করে চলেছেন।

অর্থাৎ ঠাকুর পরিবার তথা আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে নিবেদিতার অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতায় স্বামীজী তাঁর বিরূপতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন ঠিকই, কিন্তু তা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে সরাসরি আক্রমণ করার পিছনে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। পরন্তু বলা যায়, এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার তেমন ব্যক্তিগত হৃদ্যতা তখনো গড়ে ওঠেনি—যতটা উঠেছিল সরলা ঘোষাল বা সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। তাই ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারে নিবেদিতাকে সাবধান করতে গিয়ে রবীন্দ্রকাব্যের অপমূল্যায়ন করার তেমন যৌক্তিকতাও নেই।

আরেকটি কথা, সেইসময় ঠাকুর পরিবারের আরো কিছু সদস্যের রচনাও বিবেকানন্দের মূল্যায়নে 'শৃঙ্গাররসে বিযাক্ত' বলে চিহ্নিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ স্বর্ণকুমারী দেবীর 'খঙ্গ পরিণাম' বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'বসন্তলীলা' নাটকের অংশবিশেষ; সরলা দেবীর 'রতিবিলাপ' ও 'মালবিকাগ্নিমিত্র' কবিতা বা বলেন্দ্রনাথের 'কলবেদনা' বা 'হাসি' সনেট ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতেই পারে।

যাহোক, স্বামীজীর প্রতি তাঁর প্রশ্নাতীত আনুগত্য অটুট থাকলেও নিবেদিতা কিন্তু এর পরেও রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে গেছেন। ২৩ মার্চ ১৮৯৯ তিনি লিখছেন ঃ "যদি (গরমের কারণে) ছুটি লই, তাহা হইলে ঠাকুর পরিবারের সহিত অবকাশ যাপনই আমার পছন্দের। কবি আমাকে নিমন্ত্রণ জানাইয়া রাখিয়াছেন। আর ঐ গৃহে সর্বদাই প্রিয় কাব্য-সঙ্গীতের আকর্ষণ। আর তাহা ব্যতিরেকে ভাব বিনিময়েরও সুযোগ...''[৩২]—এই অসম্পূর্ণ বাক্যের দ্বিধা থেকে বোঝা যায়, শুধু কবি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের আকর্ষণই নয়, সম্ভবত তিনি নিজে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের সঙ্গে নবীন ব্রাহ্মদের মেলবন্ধন ঘটানোর আন্তরিক প্রয়াস চালিয়ে যেতে চেয়েছেন—স্বামীজী-অনুমোদিত 'Make inroads to the Brahmos' পরিকল্পনা রূপায়ণের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই। যেমন, স্বামীজীর সঙ্গে ঐ কথোপকথনের কদিন পরেই ২২ মার্চ তিনি সুরেন্দ্রনাথ ও সরলাকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড় মঠে যান।

ক্রমে নিবেদিতার প্রত্যয় জাগে যে, ঠাকুর পরিবারের অনেক তরুণ বয়স্ককেই তিনি প্রভাবিত করতে পেরেছেন এবং তাঁরা অচিরেই ব্রাহ্মসমাজের ঘেরাটোপ কেটে স্বামীজীর দিকে চলে আসবেন।

এই দৃঢ় বিশ্বাস থেকেই ৫ এপ্রিল ১৮৯৯ তিনি মিস ম্যাকলাউডকে লেখেন ঃ "এখন ঘটনা যা দেখিতেছি—ঠাকুর পরিবারের সদস্যদের স্বীয় পক্ষে আনিবার কাজ সম্পূর্ণ এবং modern (নববিধান?) ব্রাহ্মসমাজ সম্ভবত বিনাশের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমি কে. সি. সেনের পরিবার বা চার্চের প্রতি এখনো আক্রমণ শানাই নাই। জানি না, নিকট ভবিষ্যতে তাহা সম্ভব হইবে কিনা। তাহাদের সকলকে স্বামী বিবেকানন্দকে চিনিতেই হইবে।''[৩৩]

এমন উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রত্যয়ের অবাস্তবতা বুঝতে বেশি সময় অপেক্ষা করতে হলো না। ব্রাহ্মসমাজ ভেঙে বেরিয়ে আসা তো দূরস্থান, ১ বৈশাখ ১৩০৬ (১৩ এপ্রিল ১৮৯৯) থেকে সুরেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হিসাবে যোগ দিলেন। রবীন্দ্রজীবনীকার ধারণা করেছেন, বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা আদি ব্রাহ্মসমাজ ভাল চোখে দেখেননি বলেই ক্ষিতীন্দ্রনাথের পরিবর্তে সুরেন্দ্রনাথকে এই দায়িত্বে নিযুক্ত করা হলো।[৩৪] ধারণা করা যেতেই পারে, নিবেদিতা-সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে দূরত্ব ঘনিয়ে দেওয়ার এই কূটনৈতিক সিদ্ধান্তের পিছনে মস্তিষ্ক হিসাবে কাজ করছিলেন প্রভাবশালী অপর সম্পাদক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ—এককভাবে না হলেও, এই সিদ্ধান্তের পিছনে সক্রিয় সমর্থন তো তাঁর নিশ্চয়ই ছিল।

নিবেদিতার স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ হলো সমসাময়িক আরেকটি ঘটনার আকস্মিকতায়। এপ্রিল ১৮৯৯-এর প্রথমদিকেই সরলা ঘোষাল এক উদ্ধত পত্রে স্বামীজীকে জানালেন যে, তিনি নিজে এবং সুরেন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মসমাজের আরো অনেকেই দেশকে যথার্থ ভালবাসেন এবং স্বামীজী-নিবেদিতার সঙ্গে কাজ করতে পারলে তাঁরা সুখীই হবেন। কিন্তু তাঁদের যোগ দেওয়া সম্ভব একটিই শর্তে—যদি স্বামীজীরা শ্রীরামকৃষ্ণের ভজনা পুরোপুরি বন্ধ করেন!

কেন এমন চিঠি লিখলেন সরলা? নিবেদিতা-বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর এতদিনের যোগাযোগের পর এমন অবাস্তব এক প্রস্তাব এমন অশোভনভাবে পাড়লেন কিভাবে? এর পিছনে কি শুধুই সরলার দোলাচল চরিত্র?

নাকি এখানেও আদি ব্রাহ্মসমাজের মস্তিষ্করা কিছু কলকাঠি নাড়ছেন? মনে রাখতে হবে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখনো স্বমহিমায় জীবিত। তাছাড়া আদি ব্রাহ্মসমাজে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তো আছেই। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু জানিয়েছেন ঃ "বিবেকানন্দের মত-পথের দিকে ধাবমান সরলাকে রবীন্দ্রনাথই পিছন থেকে টেনেছিলেন—একথা আমি বলতে চাই না, যেহেতু তা বলার মতো স্পষ্ট প্রমাণ আমার হাতে নেই। আবার নাও বলি না, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ সহজেই নিষেধ করতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আরো অনেকেই তা করতে পারতেন। মনে হয়, সরলার সাকার-প্রবণতা সম্বন্ধে এঁরা পূর্ব থেকেই সন্দিগ্ধ ছিলেন—সে-সন্দেহ বিরক্তিপূর্ণ বিশ্বাসের রূপ নিল 'পৌত্তলিক' রামকৃষ্ণের শিষ্য বিবেকানন্দের খপ্পরে সরলার ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা দেখে। ওঁরা তাই বিবেকানন্দকে রামকৃষ্ণ-বর্জিত চেহারায় ধরবার ফরমাশ করেছিলেন।"[৩৫]

অবশেষে ব্রাহ্মদের প্রতি নিবেদিতার মোহভঙ্গ হলো। তাঁর দীর্ঘলালিত পরিকল্পনা অবাস্তব প্রমাণিত হওয়ায় আবেগপ্রবণ নিবেদিতা কিঞ্চিৎ হতোদ্যম। তাছাড়া নিজেদের বংশমর্যাদা সম্পর্কে সরলা-আদি ঠাকুরবাড়ির কিছু সদস্যের অতি-সচেতনতা তাঁকে আরোই বিরক্ত করে। নিবেদিতা ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবী মহলে তখনি এক আদরণীয় নাম এবং সেখানকার সংস্কৃতিজগতের অনেকানেক রথী-মহারথীর সঙ্গে তাঁর সহজ-স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্ক। তাই ঠাকুর পরিবারে আভিজাত্যের ঘেরাটোপ, রক্ষণশীলতার গরিমা প্রকটভাবে প্রতীয়মান দেখে নিবেদিতা স্বাভাবিকভাবেই বীতশ্রদ্ধ ঃ "After all, who are these Tagores?"[৩৬] (৪ মে ১৮৯৯)

■ তবু অটুট রবীন্দ্র-অনুরাগ

ঠাকুর পরিবার তথা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে নিবেদিতার এই তিক্ততা ও ভুল বোঝাবুঝি রবীন্দ্রনাথের প্রতিও তাঁকে বিরূপ করে তোলার পক্ষে নিশ্চয়ই যথেষ্ট ছিল। কারণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির তখন মধ্যমণি এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর সম্পাদক।

কিন্তু গুণগ্রাহী, সুভদ্র নিবেদিতা কবির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার মধ্যে সেই সম্পর্কের সঙ্কটকে প্রবেশ করতে দেননি এবং এই কথা প্রায় সমপরিমাণে সত্যি বিপরীতভাবে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও। উভয়েরই পরস্পরের ব্যক্তিত্ব ও সৃষ্টিশীলতার প্রতি শ্রদ্ধা অটুট ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছুটি কাটাতে নিবেদিতা এখনো উৎসুক। মার্চ-এপ্রিলে প্লেগের কাজে নিয়োজিত থাকায় শেষপর্যন্ত ঠাকুরবাড়ির আতিথ্যগ্রহণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্রনাথও তখন শিলাইদহ-জোড়াসাঁকো-ত্রিপুরার মধ্যে যাতায়াত করছেন। এখন এই মে মাসে নিবেদিতা আবার কবির কাছে যাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন এবং স্বামীজীর অনুপস্থিতির সময়ই তিনি এব্যাপারে শ্রেয় মনে করছেন। ৯ মে ১৮৯৯ ম্যাকলাউডকে তিনি লেখেন ঃ "শুনিতেছি রাজা (স্বামীজী) দিন পনেরোর মধ্যে রওনা হইবেন। তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ দিন দশেকের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদের সঙ্গে নৌকাযাত্রা করিব। (স্বামীজীর বিদেশযাত্রার?) পূর্বে কখনোই নয়।"[৩৭]

কিন্তু নিবেদিতার এই ইচ্ছা তখনকার মতো স্থগিত রাখতে হলো। মিস ম্যাকলাউড নিবেদিতার ইংল্যাণ্ড যাত্রার ব্যবস্থা করে তাঁকে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় বক্তৃতা-সফর করে নিবেদিতা তাঁর বাগবাজারের বিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহ করতে পারবেন। স্বামীজী এই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং নিবেদিতা তা সোৎসাহে মেনে নেন। স্বামীজীর বিদেশ-যাত্রার সঙ্গী হিসাবেই তিনি ২০ জুন ১৮৯৯ সাগরে পাড়ি দেন। ৩১ জুলাই অবধি চলা সেই জাহাজযাত্রাকে পরে নিবেদিতা তাঁর 'জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল' বলেছেন। কিন্তু যাত্রা শুরুর আগে রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিতে যেন এক আপশোসের সুর! পত্রটি[৩৮] সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা যাক ঃ

বোসপাড়া লেন
বাগবাজার, কলকাতা
শুক্রবার, জুন ১৬, ১৮৯৯

প্রিয় মিঃ টেগোর,

আপনি বোধহয় অনেক আগেই শুনিয়াছেন যে, এই গ্রীষ্মে আমাকে ইংল্যাণ্ডে যাইতে হইতেছে। এবং সেকারণে এতদিন সাগ্রহে অপেক্ষা করিয়া থাকিয়াও আপনার নৌকা-গৃহে আতিথ্যগ্রহণের অমন আকর্ষণীয় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিব না। আমি দু-এক দিনের মধ্যেই লিখিতাম যে, আপনি রাজি থাকিলে স্বামীজী রওনা হইলেই আমি শ্রীমতী টেগোর ও আপনার কাছে পৌঁছিয়া যাইব। সেকথা লিখিবার পূর্বেই আমার যে এরূপ ভাগ্য-পরিবর্তন হইবে তাহা ধারণা করি নাই।

যত অল্পদিনের জন্যই হউক, ভারত ছাড়িয়া এখন যাইতে আমি মোটেও আনন্দিত নই। পরিকল্পনা পরিবর্তনের ফলে আমার যেসব আক্ষেপ হইতেছে, তাহার মধ্যে আপনার সঙ্গে বিবিধ বিষয়ে দীর্ঘ তৃপ্তিদায়ক আলোচনা না করিতে পারাও অন্যতম। ভারতবর্ষে যে-কয়জন বন্ধুলাভের সৌভাগ্য আমার ইতোমধ্যে ঘটিয়াছে,

তাহার সঙ্গে আরো এক নতুন বন্ধুকে যুক্ত করিতে আমি সত্যই আগ্রহী—আপনি আমার বন্ধু ডঃ (জগদীশচন্দ্র) বসুর এত প্রিয়, সুতরাং আমি নিশ্চয় আশা করিতে পারি যে, আপনি আমারও বন্ধু হইবেন।

তবে এখানে থাকিয়া যাওয়ার পরিবর্তে ওখানে এখন যাওয়াই মনে হয় শ্রেয়। আর, আপনি নিশ্চয় সহমত হইবেন, সেক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাকে আমল দেওয়া চলিবে না।

বিদায়কালে শুভেচ্ছা জানাই, আপনি এর মধ্যে সুস্থ ও সুখী থাকুন। অনুগ্রহ করিয়া মিসেস টেগোরকে আমার সবিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাইবেন, আর আপনার মনকাড়া বাচ্চাগুলির জন্য রইল আমার ভালবাসা।

ইতি আপনার পরম বিশ্বস্ত

নিবেদিতা

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এপ্রসঙ্গে জানিয়েছেন : "এই চিঠির আগেকার চিঠিগুলিতে পাশ্চাত্যযাত্রার সম্ভাবনায় উল্লাস এবং এখানে দুঃখ—এর মধ্যে সঙ্গতি নেই মনে হলেও আসলে তা নয়। প্রথমত পাশ্চাত্যে সৌজন্যের ভাষা অনেকটা এই ধরনেরই, দ্বিতীয়ত নিবেদিতা সত্যই রবীন্দ্রনাথের কাব্য, সঙ্গীত ও সঙ্গের ভক্ত, অন্য প্রাপ্তি যতই বড় হোক, এই অপ্রাপ্তির দুঃখও কম আন্তরিক নয়।"[৩৯]

নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগে এই অপ্রাপ্তির বেদনা নিশ্চিতভাবেই দূর হয়েছিল। কিন্তু সে অনেক পরের কথা। [ক্রমশ] (দুই)

সূত্রনির্দেশ

১৯ দ্রঃ Letters of Sister Nivedita, Vol. I, p. 48
২০ নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'দেশ', অগ্রহায়ণ ১৩৭৪, পৃঃ ৫৬০
২১ Letters of Sister Nivedita, Vol. I, pp. 43-45
২২ রবিজীবনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২০
২৩ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২০০
২৪ রবিজীবনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২০
২৫ ঐ, পৃঃ ২১৮
২৬ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৭, পৃঃ ২২৪
২৭ ঐ, গ্রন্থ পরিচয়, ১৬শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১, পৃঃ ৫৭৪
২৮ Letters of Sister Nivedita, Vol. I, p. 55
২৯ Ibid., p. 82
৩০ Ibid., p. 55
৩১ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৯৯
৩২ Letters of Sister Nivedita, Vol. I, p. 92
৩৩ Ibid., p. 103
৩৪ রবিজীবনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২৯
৩৫ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৩৪
৩৬ Letters of Sister Nivedita, Vol. I, p. 131
৩৭ Ibid., p. 138
৩৮ Ibid., p. 165
৩৯ নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য, পৃঃ ৫৬৪

এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

সমাধান : শব্দচেতনা ১৫

পাশাপাশি : (১) পক্ষহীন, (৩) নচিকেতা, (৬) পঞ্চ, (৭) মরত, (৯) বেদ, (১০) সয়, (১১) দাস, (১৩) সর্ব, (১৪) মা, (১৫) দাও, (১৭) গতি, (১৯) এই, (২১) ভয়, (২২) নরক, (২৩) মন, (২৬) লম্ফঝম্প, (২৭) একমাত্র।

ওপর-নিচ : (১) পশুপতি, (২) হীন, (৪) চির, (৫) তারাদল, (৭) ময়, (৮) তদা, (১০) সর্বগ, (১২) সদাই, (১৬) নভস্তল (১৮) তিন, (১৯) এক, (২০) পানপাত্র, (২৪) তুঝ, (২৫) এক।

শব্দচেতনা ১৫-এর সঠিক উত্তরদাতার নাম :

রত্না ঘোষ

অনুষ্ঠান-সূচী : পৌষ ১৪০৯

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে

জন্মতিথি-কৃত্য : **শ্রীযিশুখ্রিস্ট**
৮ পৌষ, মঙ্গলবার
(২৪ ডিসেম্বর ২০০২)

শ্রীমা সারদাদেবী
অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী
১০ পৌষ, বৃহস্পতিবার
(২৬ ডিসেম্বর ২০০২)

স্বামী শিবানন্দ
অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী
১৪ পৌষ, সোমবার
(৩০ ডিসেম্বর ২০০২)

স্বামী সারদানন্দ
পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী
২৩ পৌষ, বুধবার
(৮ জানুয়ারি ২০০৩)

একাদশী : ১৪, ২৯ পৌষ
সোমবার, মঙ্গলবার
(৩০ ডিসেম্বর ২০০২, ১৪ জানুয়ারি ২০০৩)

পুরুলিয়ায় প্রাচীন পুরাকীর্তিমালা ও হাজার বছরের প্রাচীন মহিষাসুরমর্দিনী

শান্তি সিংহ

।।এক।।

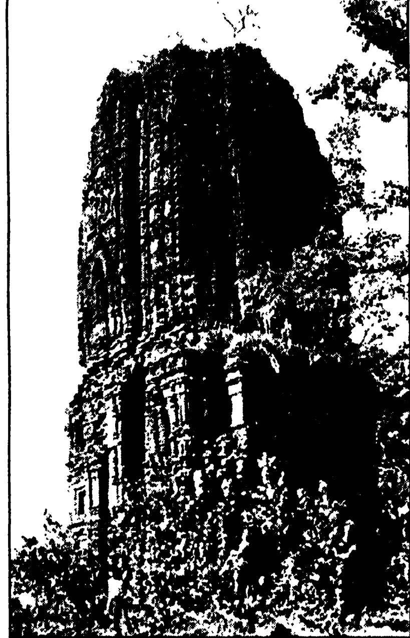
কাঁকুরে-রুক্ষ-লালমাটি, আদিগন্ত খোয়াই, যত্রতত্র মাথা-তোলা উদ্ধত প্রস্তরস্তূপরাজি কিংবা ডুংরি-পাহাড় আর সবুজ অরণ্যের মায়া-জাগানো পরিবেশে কয়েকটি ছোট-বড় কলস্বরা নদী বুকে, ফি-বছর খরার যন্ত্রণা উপেক্ষা করে আপন স্বাতন্ত্র্যে জেগে আছে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তিক জেলা পুরুলিয়া।

ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত বিহারের মানভূম জেলা ভেঙে ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি। তবু এখানকার স্মৃতিপ্রিয় বহু নরনারীর মনোভূমিতে এখনো জেগে আছে মানভূম। তাই মাঠেঘাটে, পথেপ্রান্তরে এখনো শোনা যায় লোকগীতি—"মুখে পান, হাতে চুন, তবে জানবি মানভূম।/ পুরুলিয়া-মানভূম..।"

ভারতের ইতিহাস থেকে জানা যায়—ভারতের পূর্বাঞ্চল একদা উপেক্ষিত ও অনাদৃত ছিল উত্তর ভারতের আর্যদের কাছে। 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে মগধ ও বঙ্গের জনগণকে 'অসুর' নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্রবাসীদের বলা হয়েছে 'দস্যু'। ঐসব 'অগম্যভূমি'তে যারা যেত, তাদের 'ব্রাত্য' নামে চিহ্নিত করা হতো।

তবু গতিশীল জীবনধারায়, বিশাল জনজীবনের চাপে কিংবা অনুসন্ধিৎসায় যাযাবর মনোভাবাপন্ন আর্যদের কোন কোন গোষ্ঠী মগধ-বিহারের পথ বেয়ে ছোটনাগপুর মালভূমি পেরিয়ে এসে পৌঁছায় রাঢ় বাংলায়। অথচ বিস্তীর্ণ ছোটনাগপুর ও রাঢ় অঞ্চলে ছিল অনার্য জাতির বাস। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে লেখা 'বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, মগধ ও অঙ্গদেশে কিছুটা আর্যীকরণ (Aryanisation) হলেও পুণ্ড্র, বঙ্গ এবং কলিঙ্গদেশ আর্য-বহির্ভূতরূপে চিহ্নিত ছিল।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত জৈন ধর্মগ্রন্থ 'আচারাঙ্গ সূত্ত'-এ সর্বপ্রথম 'সুহ্ম' ও 'রাঢ়া' নাম পাওয়া যায়। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে—"সুহ্মাঃ রাঢ়া"। 'আচারাঙ্গ সূত্ত'-এ রাঢ়দেশের দুটি বিভাগের কথা জানা যায়—(১) বজ্জ (বজ্রভূমি) ও (২) সুব্ভ (সুহ্মভূমি)। উক্ত গ্রন্থ থেকে জানা যায়—জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর রাঢ়দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। তখন এখানকার প্রাকৃত জনগণ 'চু-চু' শব্দে তাঁর পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেয়। লক্ষণীয়, বাঙলায় 'চু-চু' বা 'তু-তু' ধ্বন্যাত্মক শব্দ হলেও তার উৎসে আছে অস্ট্রিক ভাষাভাষী মানুষের কুকুরার্থক দেশজ শব্দ।



পুরুলিয়ার দেউলঘাটায় হাজার বছরের প্রাচীন মন্দির
(আলোকচিত্র : বিশ্বনাথ লাই)

দক্ষিণ ভারতের রাজেন্দ্র চোল দেব (খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দী) তিরুমলয় লিপিতে (Tirumalai Inscription) উল্লেখ করেছেন—'উত্তীর-লাঢ়ম' (উত্তর রাঢ়) ও 'তক্কন-লাঢ়ম' (দক্ষিণ রাঢ়)। সাঁওতাল পরগনার কিছু অংশ-সহ বীরভূম, দামোদর নদের উত্তর তীরবর্তী পূর্ব বর্ধমান জেলা উত্তর রাঢ়ের অংশ। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম অঞ্চল-সহ বাঁকুড়া-সংলগ্ন মেদিনীপুরের কিছু অংশ, পশ্চিম বর্ধমান ও হুগলীর প্রান্তিক কিছুটা অঞ্চল-সহ ছোটনাগ-পুরের একদা কথিত মানভূম ও সন্নিহিত এলাকা নিয়ে দক্ষিণ রাঢ়।

'বাঙালীর ইতিহাসঃ আদিপর্ব' মহাগ্রন্থে ঐতিহাসিক ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেনঃ "ভূ-প্রকৃতির দিক হইতে বাংলাদেশের চারিটি বিভাগ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। পশ্চিম

বাংলার একটা সুবৃহৎ অংশ পুরাভূমি। রাজমহলের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া এই পুরাভূমি প্রায় সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। রাজমহল, সাঁওতালভূম, মানভূম, সিংভূম, ধলভূমের পূর্বশায়ী মালভূমি এই পুরাভূমির অন্তর্গত; তাহারই পূর্বদিক ঘেঁষিয়া মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-বর্ধমান-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশের উচ্চতর গৈরিক ভূমি; ইহাও সদ্যোক্ত পুরাভূমির অন্তর্গত। মালভূমি অংশ একান্তই পার্বত্য, জঙ্গলময়, অজলা এবং অনুর্বর। প্রাচীন উত্তর রাঢ়ের অনেকখানি অংশ, দক্ষিণ রাঢ়ের পশ্চিমাংশ এবং তাম্রলিপ্ত রাজ্যেরও কিয়ৎ পশ্চিমাংশ এই মালভূমি এবং উচ্চতর গৈরিক ভূমির অন্তর্গত। দক্ষিণ রাঢ়ের রানীগঞ্জ-আসানসোলের পার্বত্য অঞ্চল, বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চল, বনবিষ্ণুপুর রাজ্য, মেদিনীপুরের শালবনী, ঝাড়গ্রাম-গোপীবল্লভপুর অঞ্চল—সমস্তই এই পুরাভূমিরই নিম্ন অংশ। এইসব পার্বত্য ও গৈরিক অঞ্চল ভেদ করিয়াই ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী (শিলাই), কপিশা (কাঁসাই), সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদনদী সমতলভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে।" (পৃঃ ৯৯)

।।দুই।।

রাঢ়দেশে আর্যীকরণের ফলে জৈনধর্মের ঢেউ জাগে। জৈনধর্মের প্রবক্তা মহাবীর বর্ধমান খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রাঢ় অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিলেন। জৈনদের চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে উনিশ জন (মতান্তরে কুড়ি জন) পুরুলিয়ার কিছু দূরে পার্শ্বনাথ পাহাড়ে নির্বাণলাভ করেন। তেইশতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের নামানুসারে পার্শ্বনাথ > পরেশনাথ পাহাড়। জৈন ধর্মগ্রন্থে এই পবিত্র পাহাড়কে 'সমেতশিখর' বলা হয়েছে। পার্শ্বনাথের প্রায় আড়াইশ বছর পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন মহাবীর বর্ধমান। তাঁর হাতে জৈনধর্মের মূল ভাবরূপ সুসংহত ও সম্প্রচারিত হয়েছিল।

বর্তমান পুরুলিয়া-বাঁকুড়ার নদীতীরবর্তী পথ ধরেই জৈন শ্রমণ বা জৈন ধর্মাবলম্বী মানুষ যাতায়াত করতেন পরেশনাথ পাহাড়ে। তাই কাঁসাই, দামোদর, কুমারী, শিলাই, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদীর তীরবর্তী নানা স্থানে একদা গড়ে উঠেছিল জৈনমন্দির ও তীর্থযাত্রীদের পান্থশালা। পুরুলিয়ার শরাক সম্প্রদায় জৈন শ্রাবক সম্প্রদায়ের বংশধর। তাঁরা এখনো নিরামিষাশী।

পুরুলিয়ার বুধপুর, আনাই, রালিবেড়্যা, পাকাবিড়্র্যা, পাড়া, ছড়্রা, কাশীপুর, চেলিয়ামা, মৌতড়বান্দা, তেলকূপী, দেউলঘাটা, বড়াম, সুইসা, দুল্‌মি, দেউলি প্রভৃতি নানা জায়গায় আজও বহু জৈনমন্দির অক্ষত বা ভগ্নপ্রায় দশায় অতীতের মৌনমুখর সাক্ষী। সেইসব মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগে কিংবা ভগ্ন দেবালয়ের কাছে জৈন তীর্থঙ্করদের নানা দুর্লভ প্রস্তরমূর্তি মহামূল্যবান পুরাকীর্তির নিদর্শন হিসাবে আজও বিদ্যমান।



দেউলঘাটায় রুদ্রভৈরব শিবলিঙ্গ

(আলোকচিত্র : বিশ্বনাথ লাই)

বাঁকুড়ার প্রান্তে পুরুলিয়া-সংলগ্ন বিহারীনাথ পাহাড়। দামোদর নদের কাছেই দুর্গম নির্জন আরণ্যক পরিবেশে একদা গড়ে উঠেছিল জৈন তীর্থস্থল ও পান্থশালা। সেখানে নাগছত্রশোভিত পার্শ্বনাথের বিশাল প্রস্তরমূর্তি-সহ আরো বহু জৈন দেবদেবীর মূর্তি আজও আছে। যেমন দেখা যায় পুরুলিয়ার পাক্‌বিড়র‍্যায় পদ্মপ্রভ ও ঋষভনাথের দিগম্বর মূর্তি ও প্রতিমা-সর্বতোভদ্রিকার সুচারু মূর্তি। বাঁকুড়ার দ্বারকেশ্বর নদের তীরে বাহুলাড়া, ধরাপাটে বা দামোদরের অনতিদূরে ছান্দার পরিমণ্ডলে কিংবা কুমারী-শিলাই নদীতীরবর্তী বহু অঞ্চলে জৈন তীর্থস্থলের নিদর্শন আজও দেখা যায়।

বাংলার পালরাজারা বৌদ্ধধর্মানুরাগী এবং সেনরাজারা ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় রাঢ়বঙ্গের ধর্ম-ভাবনায় মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। তাই নাগছত্রশোভিত পার্শ্বনাথকে পরবর্তী কালে কোথাও বিষ্ণু অথবা দেবী মনসারূপেও পূজা করা হয়। এপ্রসঙ্গে ধরাপাটের জৈন-মন্দির সবিশেষ উল্লেখ্য। তেমনি বহুলাড়ার জৈনমন্দিরের তীর্থঙ্কর শিব-রূপে পূজা পাচ্ছেন। পুরুলিয়ার পাক্‌-বিড়র‍্যায় পদ্মপ্রভ ও ঋষভনাথ বর্তমানে কালভৈরব-রূপে পূজিত।

একদা জৈনধর্মের পীঠস্থান পুরুলিয়ার বুধপুর গ্রাম পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের উপাসনাকেন্দ্র। সেখানে স্তম্ভসদৃশ বিশাল শিবলিঙ্গ এবং ললিতাসনে উপবিষ্ট ও নৃত্যরত দুটি বিশাল গণেশমূর্তি বিদ্যমান।

বাঁকুড়ার অম্বিকানগরের অম্বিকাদেবী মূলত জৈনদেবী —পরবর্তী কালে বৌদ্ধতান্ত্রিকতার প্রভাবে দুর্গারূপে পূজিতা। তেমনি বাঁকুড়ার পাত্রসায়রের দেবী ব্রহ্মাণী প্রস্তরমূর্তি।

পুরুলিয়ার গড়জয়পুরের কাছে কাঁসাই-তীরবর্তী দেউলঘাটা। নির্জন আরণ্যক পরিবেশ। ভারড়ি, মিরড়ি, শ্যামপুর প্রভৃতি গ্রাম পেরিয়ে যেতে হয়। অর্জুন, করম, পলাশ, আঁকড় গাছের জঙ্গলে ভগ্ন পুরাকীর্তিমালা। জরাজীর্ণ প্রাচীন ইঁটের মন্দির। প্রায় হাজার বছরের পুরনো। বিশাল বিশাল ভগ্নপ্রায় মন্দিরের গায়ে চৌকো স্তম্ভগুলি অপরূপ। তাতে অপ্সরা মূর্তি শোভিত। অথচ প্রাচীন মন্দিরগুলি বিগ্রহহীন।

কাছে পুরোপুরি ভগ্ন পাথরের দেবালয়। স্তূপীকৃত প্রস্তরখণ্ডের মাঝে বিশাল রুদ্রভৈরব শিবলিঙ্গ। প্রস্তরীভূত দেবমাহাত্ম্য সম্পর্কে নানা কিংবদন্তি শ্রদ্ধা-বিস্ময়ে লোকমুখে এখনো শোনা যায়।



দেউলঘাটায় হাজার বছরের প্রাচীন মহিষাসুরমর্দিনী

(আলোকচিত্র : বিশ্বনাথ লাই)

অনতিদূরে নবনির্মিত গৃহে হাজার বছরের প্রাচীন দেবী দুর্গার অপরূপা প্রস্তরমূর্তি! বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগের দেবী দুর্গা অষ্টভুজা। চার ফুটেরও বেশি উচ্চতাযুক্ত এই মহিষাসুর-মর্দিনী দেবী কালো শক্ত পাথরের অনবদ্য শিল্পনিদর্শনের চিহ্ন। সিংহবাহিনী দেবীর দক্ষিণপদ মহিষাসুরের স্কন্ধে। তাঁর আট হাতে আটরকম অস্ত্র। কারুকার্যময়। পাথরের চালচিত্রে দশমহাবিদ্যার শিল্পরূপ। এই দেবীমূর্তির পাশে উপবিষ্ট বা অঙ্কিত নেই লক্ষ্মী-সরস্বতী বা গণেশ-কার্তিক। আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে মন্দির-বিশেষজ্ঞ বেগলার সাহেব এই অঞ্চলে আসেন এবং তাঁর গবেষণাকর্মে সবিস্ময়ে উল্লেখ করেন : "The finest piece of sculpture in the place." এই অষ্টভুজা দেবীমূর্তির পাশের নবনির্মিত কক্ষে রক্ষিত আছেন দেবী পার্বতী বা জগদ্ধাত্রী-রূপে পূজিতা প্রস্তরশোভিতা দেবীমূর্তি।



গণপতিদেব : দেউলঘাটা

(আলোকচিত্র : বিশ্বনাথ লাই)

মন্দির-বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিকদের মতে, দেউলঘাটার অষ্টভুজা দেবী দুর্গা দশম শতাব্দীর বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবীমূর্তি। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায়, পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের কাছেই পাড়াগ্রাম। সেখানকার হাজার বছরের প্রাচীন ভগ্নপ্রায় মন্দিরের অভ্যন্তরে উদয়চণ্ডীরূপে পূজিতা হন ফুট দেড়েক উঁচু অষ্টভুজা এক প্রস্তরখোদিত দেবীমূর্তি।

প্রতিদিনের শাস্ত্রসম্মত পূজার্চনার সঙ্গে শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় প্রতি বছর সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে দেউলঘাটায় যথাবিহিতভাবে পূজা এবং অন্নকূট উৎসব হয়। স্থানীয় গ্রামগুলির ভক্ত নরনারীদের সঙ্গে দূরদেশের বহু দর্শনার্থী শ্রদ্ধাবিস্ময়ের সঙ্গে এই নির্জন আরণ্যক পরিবেশে প্রতি বছর হাজির থাকেন। কারণ, দেউলঘাটায় পুরাকীর্তিমালা ও দুর্গোৎসব দর্শনের পর অনেক ভ্রমণপিপাসু নরনারী ছুটে যান অনতিদূরে নীলপাহাড়ের স্বপ্নমায়া জাগানো অযোধ্যা পাহাড়ে।

নগরজীবনের উদ্বেগ আর ক্লান্তি মুছে যায় পুরুলিয়া ভ্রমণে। সেইসঙ্গে মনে জাগে অতীতের ইতিহাস ও পুরাকীর্তিমালার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ। ❑

এই রচনাটি 'অধ্যাপক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক



অগ্রহায়ণ ১৩০৯
নভেম্বর ১৯০২

সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে গুটি কয়েক কথা

সমাজ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। বৈদিক যুগে যে সমাজ ছিল, তাহার কথা ছাড়িয়াই দিন, কত কত শতাব্দী ধরিয়া নানা অবস্থাচক্রে নানা ঘাত প্রতিঘাতে হিন্দুসমাজের অবস্থা একরূপ দাঁড়াইয়াছে। এখনও পরিবর্ত্তন চলিতেছে। ভবিষ্যতে কত কি পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা কে জানে?

যাঁহারাই হিন্দুজাতির শাস্ত্রাদির ও প্রাচীন আচার-ব্যবহারাদির ইতিহাস একটুও আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই নিতান্ত অন্ধ না হইলে জানেন, পরিবর্ত্তন কত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই, বর্ত্তমান সমাজের পরিচালক কে হইবেন?

মধ্যে মধ্যে সমাজে যুগচক্রপরিবর্ত্তনকারী মহাপুরুষের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। তাঁহারাই সমাজকে পরিচালনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা শুধু কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করিয়া যান না। তাঁহারা সমাজে এক অভূতপূর্ব্ব শক্তিসঞ্চার করিয়া থাকেন। পরে সেই শক্তি হইতে সময়োপযোগী নানাবিধ নিয়মের অভ্যুদয় হয়। কালবশে আবার এই নিয়মগুলি বন্ধনমাত্রে পর্য্যবসিত হইলে আবার নূতন নিয়মের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

সংস্কারকগণ খুব উন্নত মহাপুরুষ না হইলে সংস্কার কার্য্যে সফল হইতে পারেন না। পরমহংসদেবের কথায় বলিলে বলিতে হয়, 'চাপরাস না পাইলে তাহার কথা কেহ লয় না।' অতএব ঈশ্বরের নিকট এই শক্তি সংগ্রহ করিয়া তবে সংস্কার কার্য্যে নামা আবশ্যক। ইহা অপেক্ষা মহৎ ও উচ্চ ব্রত কিছু নাই। এই জন্য ইহার সাধনও অতি কঠোর।

পক্ষান্তরে কেবল দোষদর্শন, নিন্দা বা সমালোচনা দ্বারা সমাজ গঠন হয় না। অথবা অপর কোন সমাজের আদর্শ উপস্থিত করিয়া তাহার অনুসরণ চেষ্টা করিলেও সে সংস্কার শুভজনক হয় না—তাহাতে সফলকাম হওয়াও অতি কঠিন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হিন্দু সমাজকে ইউরোপীয় আদর্শের অনুকরণে গঠনের চেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র। ইউরোপীয় সমাজ আদর্শ সমাজ নহে। অনেক বিষয়ে উহারই সংস্কার আবশ্যক।

মায়িক জগৎ কখন সম্পূর্ণ হইতে পারে না। পূর্ণতা যেখানে, সেখানে সমাজ নাই, সেখানে কেবল ব্রহ্মের প্রকাশ। তবে যে সমাজ যত পরিমাণে ব্রহ্মজ্ঞ নরনারী গঠনে সহায়তা করে, তাহা ততই উন্নত। এ উন্নতির বিরাম নাই। বিরাম সেই মোক্ষলাভে, বিরাম সেই ব্রহ্মজ্ঞানে—সেই পরাশান্তিতে।

প্রয়োজন অনুসারে আবার সমাজে কখন একটী প্রথা প্রচলনের আবশ্যকতা হয়, কখন তাহার ঠিক বিপরীত প্রথা বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে। কোন্ প্রথা কোন্ সময়ের উপযোগী, তাহা সেই সময়কার উন্নত নিরপেক্ষ মহাপুরুষগণই বুঝিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিধবার বিবাহ সেই সমাজে প্রচলনের আবশ্যক হয়, যে সমাজে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত কার্য্যতঃ অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায় না। কিন্তু উহা সাময়িক বিধানমাত্র। তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যে শিক্ষিত করিতে পারিলে তখন বিধবা বিবাহ অতি নিন্দনীয় কর্ম্ম বলিয়া প্রচার করা আবশ্যক হইয়া উঠে। যখন সন্ন্যাসের ভানে নানা কপটতা ও ব্যভিচারে দেশ আচ্ছন্ন হইয়া যাইবার উপক্রম হয়, তখন গার্হস্থ্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তনের আবশ্যকতা হয়। আবার যখন লোকে কতকটা পশুজীবন হইতে মুক্ত হইয়া গার্হস্থ্যাশ্রমের দাম্পত্য প্রেমকেই চরমাদর্শ জ্ঞান করিতে থাকে, তখন প্রকৃত চরমাদর্শ ব্রহ্মচর্য্যের, সন্ন্যাসের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে। কখন সমাজে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিধানের কঠোর নিয়ম করার আবশ্যক হয়, আবার কখন বা তদ্বিষয়ে একটু স্বাধীনতা প্রদান করা আবশ্যক হইয়া উঠে।

এই যে জাতিভেদের বিরুদ্ধে কত তর্ক শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, এক সময়ে ইহাতে পরম মঙ্গল করিয়াছিল—ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন এবং এখনও কতক কতক শুভ করিতেছে—ইহা কাহারও কাহারও মত। এক্ষণে ইহা বিকৃতভাবাপন্ন হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহাকে ঠিক করিতে গেলে কেবল যথেচ্ছা আহার বিহারে হয় না। অন্য উপায় অবলম্বন আবশ্যক।

আপনাদের রাজা থাকিলে রাজার শাসনে কতকটা সমাজ সংস্কার হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ রাজার অভাবে সাধারণ মত গঠন ব্যতীত অন্য কোনরূপে সমাজ সংস্কার হয় না। এই মত গঠন কার্য্যে শিক্ষার মত দ্বিতীয় সহায়ক আর কেহ নাই। সমাজ সংস্কারকগণ নরনারীর উপযুক্ত শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলে বড় ভাল হয়। যেসকল সামাজিক নিয়মে শিক্ষার প্রতিবন্ধক হয়, তাহা একটু বিশেষ চেষ্টা করিলে আর কোন প্রতিবন্ধক উৎপাদন করিতে পারে না। মনে করুন, অনেকের মতে বাল্যবিবাহ স্ত্রীজাতির শিক্ষার এক প্রবল অন্তরায়। তার পর স্ত্রীজাতির অবরোধ-প্রথা। কিন্তু আপাততঃ এ সকল থাকিলেও জাতীয় উপায়ে দেশে এমন স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন করা যাইতে পারে, যাহাতে স্ত্রীজাতিরা আপন আপন কর্ত্তব্য বাছিয়া লইতে পারে, সংস্কারকগণ স্ত্রীলোকের পতিগণের যথাবিহিত শিক্ষা দিতে পারিলে যে স্ত্রীজাতির শিক্ষার উন্নতির যথেষ্ট সহায়তা হইতে পারে, একথা আমি খুব বিশ্বাস করি। তার পর যদি ব্রহ্মচর্য্যের দিকে খুব ঝোঁক দেওয়া যায় এবং স্ত্রীপুরুষ উভয়েই এ বিষয়ে বিশেষরূপ শিক্ষিত হয়, তখন অবরোধ-প্রথার কতক শৈথিল্য করিলেও তত দোষের হইবে না। ইতিমধ্যে কতকগুলি যথার্থ ব্রহ্মচর্য্যশালী পুরুষ কতকগুলি বিধবা ব্রহ্মচারিণীকে ও অন্যান্য নারীকে এরূপ ভাবে শিক্ষা দিতে পারেন, যাহাতে তাঁহারা পুরুষসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া অন্যান্য স্ত্রীকেও এরূপ শিক্ষা দিতে পারেন। শুধু বিদ্যালয় করিয়া নহে; এই শিক্ষিতা ললনাগণ লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া তাঁহাদিগকে নানা বিদ্যায় শিক্ষিতা করিতে পারেন। এইরূপে ক্রমশঃ বাল্যবিবাহপ্রথারও অনাবশ্যকতা হইতে পারে।

আদত কথা এই, এই সকল সংস্কার কার্য্যে চরিত্রবান ধার্ম্মিক পুরুষের, ব্রহ্মচর্য্যবলে জিতেন্দ্রিয় পুরুষের বিশেষ আবশ্যক। যত দিন না তাহা হইতেছে, ততদিন সমুদয় আন্দোলনই একরূপ বিফল।...

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ইওরোপে তীর্থযাত্রা*

স্বামী গোকুলানন্দ

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভ্রাতৃত্বচেতনা রূপকার্যে এবং আক্ষরিক অর্থেও বস্তুত এক মহৎ সত্যের প্রতিরূপ—"বসুধৈব কুটুম্বকম্" (সমগ্র জগৎ একটিই পরিবারের অন্তর্গত)। এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দ জগৎকে সেই এক হওয়ার মন্ত্র দিলেন—বেদান্তের বাণীকে স্বয়ং পাশ্চাত্যে পৌঁছে দিয়ে এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিনিধিদের প্রেরণ করে। এক ঝঞ্ঝাময় সন্ন্যাসিরূপে তিনি ১৮৯০ থেকে ১৮৯৩-এর মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছেন আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষ। অন্যদিকে পাশ্চাত্যে পরিভ্রমণ করেছেন দুবার—প্রথমবার ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৭, দ্বিতীয়বার ১৮৯৯ থেকে ১৯০০। স্বামীজীর স্পর্শধন্য সেই সমস্ত পবিত্র স্থান আজ ভক্তদের কাছে তীর্থক্ষেত্র।

১৮৯৮ সালে তীর্থভ্রমণের উপযোগিতা সম্বন্ধে বেলুড় মঠে এক ভক্তের একটি প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ "সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যখন নিত্য আত্মা ঈশ্বরের বিরাট শরীর, তখন স্থান-মাহাত্ম্য থাকাটার বিচিত্রতা কী আছে? স্থানবিশেষে তাঁর বিশেষ প্রকাশ কোথাও স্বত এবং কোথাও শুদ্ধসত্ত্ব মানব-মনের ব্যাকুলাগ্রহে হয়ে থাকে। সাধারণ মানব ঐসকল স্থানে জিজ্ঞাসু হয়ে গেলে সহজে ফল পায়। এইজন্য তীর্থাদি আশ্রয় করে কালে আত্মার বিকাশ হতে পারে।" (স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, ১৪শ বল্লী, ১৩৯৬, পৃঃ ৮৯)

পাশ্চাত্যে এমন অনেক কেন্দ্র আছে, যেগুলি স্বামীজী এবং অন্যান্য মহান সন্ন্যাসীর স্পর্শে পবিত্র। এইসব কেন্দ্র আমাদের কাছে এক-একটি তীর্থ। ২০০১ সালে জার্মানিতে সেইরকমই একটি পবিত্র তীর্থে যাওয়ার আমন্ত্রণ এল আমার কাছে।

ফ্রাঙ্কফুর্টের স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধানা শ্রীমতী লিপি পাল ২০০০ সালের শেষের দিকে ভারতবর্ষে এলে আমাদের দিল্লি আশ্রমেও আসেন। তারপর জার্মানি ফিরে গিয়ে তিনি ও তাঁর স্বামী অমিয় পাল চিঠি লেখেন এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠানটি দেখার জন্য আমাকে আমন্ত্রণও জানান।

পাশ্চাত্য আজ তাদের ভোগবাদী জীবনপদ্ধতির মূল্য দিচ্ছে চরম মানসিক যন্ত্রণার বিনিময়ে। সেই জীবনযাপনের উপসর্গ হিসাবে সৃষ্ট মানসিক ব্যাধি ধীরে ধীরে নাড়িয়ে দিচ্ছে তাদের ব্যক্তিগত এবং সাংসারিক জীবনের ভিত, হয়তো বা তাদের সংস্কৃতিকেও। ভারতীয় সংস্কৃতি—তার সমৃদ্ধ বৈদান্তিক ঐতিহ্য এবং ব্যক্তিমানবের প্রতি তার গভীর অন্বেষাবোধের মাধ্যমে আজ পাশ্চাত্যেও সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। সক্ষম হয়েছে পাশ্চাত্য দর্শনের বিপরীতে এক মহতী দর্শনকে উপস্থাপিত করতে। তাই এ-খবরে আর কোন বিস্ময় নেই যে, লিপি পাল, যিনি ভারতীয় আদর্শের মধ্যেই বড় হয়েছেন, কিছু জার্মান কর্মীর সহায়তায় গড়ে তুলবেন ঐরকম এক প্রতিষ্ঠান—'স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট'।

অমিয় এবং লিপি পালের আমন্ত্রণটি বিবেচনা করে দেখার পর আমি বেলুড় মঠের অনুমতি চাইলাম, পেয়েও গেলাম শীঘ্রই। ইতিমধ্যে ইউরোপের অন্যান্য ভক্তরাও কিভাবে যেন জেনে গেলেন আমার এই সম্ভাব্য ভ্রমণের খবর; এরপর ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরে দেখার জন্য তাঁদেরও অনুরোধ আসতে লাগল। শেষপর্যন্ত ঠিক হলো, আমি যাব কুয়েত (টিকিটে কুয়েত ছুঁয়েই যেতে হতো), জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স এবং নেদারল্যাণ্ড।

কুয়েতে

আমি কুয়েতে পৌঁছালাম সোমবার ৩ এপ্রিল ২০০১। স্থানীয় সময় তখন সকাল ৭টা ৩০ মিনিট। পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে আমায় উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল অর্পিতা আর দীপঙ্কর, ডঃ মাধবন এবং অন্যান্যরা। প্রসঙ্গত, দীপঙ্কর ভারতীয় দূতাবাসের এক কর্মী। যাহোক, আমি আমার গেরুয়া বসন পরেই কুয়েতে প্রবেশ করেছিলাম এবং শেষপর্যন্ত সেই বেশেই দিন কাটিয়েছি। নির্বিঘ্নে কুয়েতে প্রবেশের জন্য সেখানকার ভারতীয় রাষ্ট্রদূত প্রভুদয়াল আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছেন।

সেই সন্ধ্যায় এক বিশেষ সভার আয়োজন হলো। এক ইসলামিক রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থলে আমরা গেয়ে উঠলাম—"গুরুদেব দয়া কর দীনজনে" এবং "রামকৃষ্ণ শরণম্"। সেই সভায় নানা ধর্মের বহু মানুষ সমবেত হয়েছিলেন। সেটা ছিল এক সুন্দর আধ্যাত্মিক সন্ধ্যা, প্রথমে মনঃসংযোগের পাঠ, তারপর আরতি এবং সবশেষে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সৌরভ' শীর্ষক আমার এক বক্তৃতা।

পরদিন দেখতে বেরোলাম পাশ্চাত্য মনোভাবাপন্ন এক আধুনিক কুয়েতকে। খুব অল্পসময়ের জন্য গিয়েছিলাম কুয়েত শহরে। সেখানকার 'কুয়েত টাওয়ার'-এর ওপর উঠে দেখতে পেলাম এক আশ্চর্য বৈপরীত্যময় দৃশ্য। শহরের

* মূল ইংরেজি রচনা থেকে অনুবাদ করেছেন জয়দীপ ঘোষ।

একদিকে যেমন রয়েছে মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতীক সুবিশাল 'সুলতান সেন্টার' (এক বৃহৎ 'শপিং কমপ্লেক্স'), অন্যদিকে তেমনি আছে 'শার্ক শপিং কমপ্লেক্স' বা এইরকম আরো নানা ঝাঁ-চকচকে দোকান, যা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ধনসম্পদের প্রতিরূপ।



সমুদ্র-সংলগ্ন কুয়েত শহর

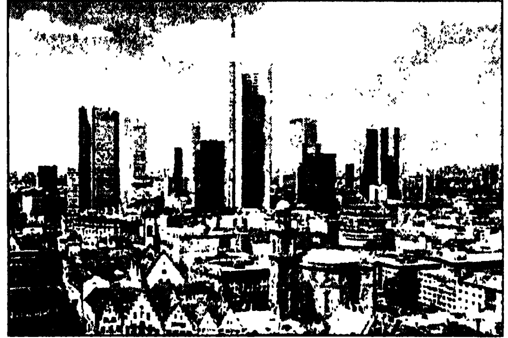
অর্পিতা কুয়েতের একটি স্কুলের শিক্ষিকা। সেই স্কুলের অধ্যক্ষ একজন খ্রিস্টান। স্কুলের তরফে 'মানসিক চাপ দূর করার উপায়' সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করা হলো আমাকে। তাই 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামক এক অসাম্প্রদায়িক সঙ্ঘের সন্ন্যাসিরূপে আমি মুসলিম রাষ্ট্রের বুকে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলাম নানা ধর্মের মানুষের সামনে। ঠাকুরের কৃপাতেই কেবল এ-ঘটনা ঘটতে পারে। এরপর আমায় অবাক করে দিয়ে সেখানে প্রসাদও বিতরণ করা হলো, অবশ্য পাশ্চাত্য প্রথায়—কাজুবাদাম, শুকনো ফল ইত্যাদি।

আমি ফ্রাঙ্কফুর্টের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম ৫ এপ্রিল। এয়ারপোর্টে যাওয়ার পথে একবার ভারতীয় রাষ্ট্রদূত প্রভুদয়ালের কাছে ঘুরে এলাম। তিনি চা-সহযোগে আমায় সাদর আপ্যায়ন করলেন। ভারতীয় দূতাবাসের প্রতিনিধি ও ভক্তরা আমায় বিদায় জানাতে এয়ারপোর্টে এসেছিলেন।

ফ্রাঙ্কফুর্টে

কুয়েত থেকে ফ্রাঙ্কফুর্টগামী বিমানটি ঠিক সময়েই ছাড়ল। আমরা ফ্রাঙ্কফুর্ট পৌঁছালাম ৫ এপ্রিল। জার্মানি তার সংস্কৃতি এবং মানবজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসে, বিশেষত ইউরোপের ইতিহাসে, এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো, জার্মানরা আমাদের ধর্ম এবং সংস্কৃতির প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল এবং উৎসাহী। ম্যাক্সমুলারের কথা বাদ দিলেও সকলেই জানেন, শোপেনহাওয়ার, ডঃ পল ডুসেন এবং আরো অনেকের কথা—যাঁরা ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে সম্যগ্‌ভাবে অবহিত ছিলেন। আরেকটা ব্যাপার চমকিত করে আমাদের। বিখ্যাত কিংবা কুখ্যাত 'আর্যতত্ত্ব'—যা আসলে সমান কুখ্যাত হিটলারের মস্তিষ্ক-প্রসূত, তারও প্রভাব রয়েছে আমাদের সংস্কৃতি ও ইতিহাসে। আরো মনে পড়ে প্রখ্যাত জার্মান পদার্থবিদ এডুইন এডিঙ্গারের কথাও।

আনমনে এইসমস্ত কথা চিন্তা করতে করতে আমি যখন আইডেস্টাইনে পৌঁছালাম, তখন ঐতিহাসিক ভূমির প্রতীকী স্পর্শ যেন হঠাৎ দোলা দিয়ে গেল আমায়। আমি শুনতে পেলাম শঙ্খের পবিত্র ধ্বনি, সেই ধ্বনি যে কেবল আমার ঘোরটা ভাঙিয়ে দিল তা-ই নয়, আমার জার্মানি-ভ্রমণকে বেঁধে দিল এক আধ্যাত্মিক স্বরগ্রামে। ভক্তরা এক সন্ন্যাসীকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন চিরাচরিত প্রথায় শাঁখ বাজিয়ে! সম্ভবত, ইসলামিক কুয়েতের টাটকা অভিজ্ঞতা জাগরুক থাকার জন্যই আমার আমন্ত্রককে জিজ্ঞেস করে ফেললাম —এখানে সর্বসমক্ষে এভাবে ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিচায়ক শাঁখ বাজানো অনুমোদিত কিনা। তাঁরা আশ্বাস দিলেন— আমরা খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ এক রাষ্ট্রে এসে পড়েছি, এঁরা সকলেই আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুণগ্রাহী।



ফ্রাঙ্কফুর্টের একটি দৃশ্য

আমি লিপি পালের আমন্ত্রণে এসে পৌঁছেছি এই ফ্রাঙ্কফুর্টে, তাই তাঁদের আতিথ্যে আমার অবস্থিতি। অস্ট্রিয়া এবং জার্মানিতে ছিলাম সর্বমোট ১২ দিন। অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত 'স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট' দেখে।

আইডেস্টাইন এবং উইসবাডেনে

অমিয় এবং লিপি পাল যেখানে থাকেন, সেই আইডেস্টাইন আসলে ফ্রাঙ্কফুর্টের একটি শহরতলি। এর চতুষ্পার্শ্ব একেবারে ছবির মতো সুন্দর। সেদিকে তাকিয়ে মনে পড়ে যায় ভারতের একটি অতি পরিচিত স্থান শিলঙের কথা।

আইডেস্টাইন থেকে গাড়িতে ৪০ মিনিটের দূরত্বে আরেকটি জায়গা উইসবাডেনেও আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। এখানেই আমাদের সঙ্ঘের ভূতপূর্ব সহাধ্যক্ষ স্বামী

যতীশ্বরানন্দজী ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত থেকেছেন। তবে দুর্ভাগ্য এই, আমি তাঁর অবস্থানের সঠিক স্থানটির হদিশ পাইনি। বিভিন্ন স্থানে দেওয়া তাঁর অনেকগুলো বক্তৃতার একটি সঙ্কলনগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন হ্যামবুর্গ শহরের এক ভক্ত—কুর্ট ফ্রেডরিখ। এই মানুষটির সঙ্গে আলাপ করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। 'Readings on Swami Brahmananda's Spiritual Teachings' গ্রন্থে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর জীবন ও বাণী-সমৃদ্ধ ভাষ্য লিপিবদ্ধ আছে।



জার্মানির আইডেস্টাইনে 'স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট'

খোদ উইসবাডেনেই বসে ঐ বইটি ফের একবার পড়ে ফেলার মধ্যে যেন এক অন্য আধ্যাত্মিকতার স্বাদ পেলাম। স্বামী যতীশ্বরানন্দজীর লেখা অপর একটি গ্রন্থ 'Meditation and Spiritual Life'-ও সেখানে পড়ে ফেললাম। কুক ফ্রেডরিখ হ্যামবার্গ জার্মান ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশ করে থাকেন—'বেদান্ত'। সেখানে স্বামী প্রভানন্দজীর লেখা 'Spiritual Life' এবং 'Teachings of Swami Brahmananda', স্বামী যতীশ্বরানন্দজীর সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখা, 'মাণ্ডুক্য উপনিষদ্' প্রভৃতি বিষয়ক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষ এবং জার্মানির সুগভীর সাংস্কৃতিক এবং বৌদ্ধিক যোগসূত্রের কথা ভাবতে গিয়ে অনুভব করলাম, সে-দেশে রামকৃষ্ণ মঠ বা মিশনের একটি স্থায়ী কেন্দ্রের অভাব রয়েছে, যদিও ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনায় সেখানে একটি সঙ্ঘ রয়েছে—'বাইগুওয়েড বেদান্ত সোসাইটি'। অবশ্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে বহু সন্ন্যাসী এই সোসাইটিতে আসেন এবং নানান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

উইসবাডেনে সেই সন্ধ্যায় আমরা আরতিতে অংশ নিলাম, অংশ নিলাম ধ্যান ও মনঃসংযোগ চর্চায়। 'The Goal of Human Life and the Duties of Householders' বিষয়ে একটি বক্তৃতাও আমাকে দিতে হলো। এক জার্মান মহিলা এবং এই সোসাইটির কোষাধ্যক্ষা শ্রীমতী লিলি চক্রবর্তী ১৩ এবং ১৪ এপ্রিল (২০০১) অনুষ্ঠিতব্য দুটি সেমিনারে আমাকে আমন্ত্রণ জানাতে এলেন। তাঁদের সঙ্ঘটি কিভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের অনুমোদন পেতে পারে সে-সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনাও হলো।

৭ এপ্রিল ২০০১, শনিবার। বহু ভক্তের সমাগমে ভরে রইল এই দিনটি। সকালটা আমরা শ্রীশ্রীঠাকুর, মা এবং স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা করে কাটালাম। দিনের খানিকটা অংশ কাটিয়ে এলাম ফ্রাঙ্কফুর্টে—মেইন নদীর তীরে জার্মানির প্রাচীনতম এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যশহরে। এটি ইউরোপীয় তথা আন্তর্জাতিক পরিবহনের একটি কেন্দ্রস্থলও বটে। বহু আকাশচুম্বী অট্টালিকায় ঘেরা এই ব্যস্ত ও চঞ্চল শহরটি চিনিয়ে দেয় পরিশ্রমী জার্মান জাতিকে, যারা শুধু কারিগরী বিদ্যাতেই পারদর্শী নয়—কৃষ্টি, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও অতি সমৃদ্ধ।

অস্ট্রিয়া ভ্রমণ ও পুনরায় জার্মানিতে

লিপি, অমিয়, বন্দনা আর অর্পিতার সঙ্গে আমি অস্ট্রিয়ার ইন্সব্রুকে পৌঁছালাম ৭ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টায়। একটি আন্তর্জাতিক যুব-আবাসে তাঁরা আমার থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেখানেই আমরা রাতটা কাটালাম। পরদিন ৮ এপ্রিল গেলাম ইন্সব্রুক মিউজিয়ামের কাছেই একটি চার্চ দেখতে। সেখানে একটি টাওয়ারের ওপর থেকে দেখলাম শহরটির এক সম্পূর্ণ ছবি।



পাহাড়ের কোলে ইন্সব্রুক শহর

ছোট অথচ পরিপূর্ণ দেশ অস্ট্রিয়ার সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের সঙ্গে জার্মানির মিল বহুলাংশে। এই দেশের প্রতিটি অঞ্চলেই দেখা যায় অপূর্ব সব দৃশ্য। দেখা যায় প্রচুর দুর্গ এবং প্রাসাদ—ইউরোপের যেকোন দেশের থেকে বেশি। দানিয়ুব নদীকে ঘিরে থাকা বহু প্রাচীন মঠ, জঙ্গলঘেরা পাহাড়, হ্রদের তীরবর্তী সু-উচ্চ পর্বত, গ্লেসিয়ার এবং আকাশছোঁয়া আল্পসের চূড়া—এই হলো অস্ট্রিয়া। এদেশের বিখ্যাত মিউজিয়াম ও চার্চগুলি বহু প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকীর্তির সংরক্ষণস্থল।

আমরা ইন্সব্রুক ছাড়লাম বিকালের দিকে, আর সল্‌জবার্গে পৌঁছানো গেল ৪টের সময়। এই অসম্ভব সুন্দর স্থানটি তার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর জন্য খ্যাত।

শিল্প-সংস্কৃতির নানা কীর্তির জন্মদাত্রী এই অস্ট্রিয়া। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, ২৭ জানুয়ারি ১৭৫৬ এই সল্‌জবার্গেই জন্মেছিলেন ভোলগাং মোজার্ট। জন্মপ্রতিভা-সম্পন্ন মোজার্ট তিন বছর বয়সেই বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শিখে গিয়েছিলেন। ছয়বছর বয়সে তিনি শুরু করেন সুর দিতে, আর তিরিশ পেরোনোর আগেই তিনি সৃষ্টি করেন তাঁর বিখ্যাত সুরগুলি, যা তাঁর অনন্য প্রতিভাকেই চিনিয়ে দেয়।

৮ এপ্রিল সন্ধ্যাবেলা গেলাম মোজার্ট ভবনে। পরে আমরা মিউনিখের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম। সেখানে পৌঁছালাম রাত সাড়ে ৯টায়।

মিউনিখে

মিউনিখ ভ্রমণের একটা মূল উদ্দেশ্য ছিল ডঃ জর্জ লেখনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। ইনি মিউনিখের গ্যোয়েটে ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা। ৭৮টি দেশে ১৪৫টি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পরিচালনা করে থাকে এই সংস্থা। জার্মান ভাষা শিক্ষা এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সাংস্কৃতিক বিনিময়—এইসমস্ত কেন্দ্রের কাজ। গ্যোয়েটে ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর এক বর্ণময় চরিত্র এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের একজন প্রবাদপুরুষ। জার্মানির শ্রেষ্ঠ লেখক হিসাবেই তিনি সম্মানিত, তাঁর নিজের সময়ের সর্বাধিক বহুব্যাপ্ত এক প্রতিভা। খুবই আশ্চর্যের কথা, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ গ্যোয়েটের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ডঃ লেখনারের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো ৯ এপ্রিল যুব-আবাসে। এই যুব-আবাসটিকে আবার মজা করে বলা হয় 'হোটেল পেনসন'! ডঃ লেখনারের সঙ্গে আমি একটি রোমান ক্যাথলিক (Benedictine) মনাস্ট্রিতে বেড়াতে গেলাম। পথে পড়ল একটি সুন্দর হ্রদ। তার সৌন্দর্য যেন চতুর্দিকে শান্তি আর পবিত্রতা ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

ইউরোপের সাধু-সন্ন্যাসীদের ইতিহাস মূলত রোমান ক্যাথলিক মনাস্ট্রিরই ইতিহাস। এইসমস্ত মনাস্ট্রির অধীনে রয়েছে বহুবিধ ঊর্ধ্বস্থ এবং নিম্নস্থ মঠ (Abbeys and Priories)। যদিও এই মনাস্ট্রিগুলির একটির সঙ্গে অপরটির অনেক তফাৎ ছিল; তবুও সমন্বয় ছিল এইখানে যে, এগুলি সবই আসলে সেইন্ট বেনেডিক্টাইনের প্রচারিত নিয়মতন্ত্রের আজ্ঞানুবর্তী। বেনেডিক্টাইনের সন্ন্যাসজীবনকে আদর্শ করে পথ চলাই ছিল এঁদের মূল কাজ। যদিও এই বেনেডিক্টীয় সঙ্ঘের ছিল একধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় গঠন—যেখানে প্রতিটি মনাস্ট্রি এবং সঙ্ঘই নিজের অঞ্চলের সামাজিক এবং ধর্মীয় পরিবেশ অনুযায়ী নিজের কর্মনীতি ঠিক করে নেওয়ার স্বাধীনতা পেত। তাই এ-সম্ভাবনাও থেকে যেত—যেখানে মনাস্ট্রিই বেনেডিক্টীয় মতবাদের নিজস্ব ভাষ্য এবং প্রয়োগপদ্ধতি নির্ধারণ করে নিতে পারে। ১৮৩৫ সালে সম্রাট লুডউইগ-১ ব্যাসিলিয়া মনাস্ট্রির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং এই মিউনিখের বেনেডিক্টীয় মনাস্ট্রিটি তৈরি হয় ১৮৫০ সালে। চার্চের বিভিন্ন কাজকর্ম করার পাশাপাশি সন্ন্যাসীরা মিউনিখের দক্ষিণাঞ্চলের ক্রমবর্ধমান জনতার কাছে পৌঁছে দিতেন ধর্মীয় উপদেশাবলী, সেইসঙ্গে যুবশিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চাতেও শ্রমদান করতেন। ইতিহাসের প্রথম ভাগে এই যাজকভূমিকাই ছিল মনাস্ট্রিগুলির প্রধান উপার্জন। পরে বিংশ শতাব্দীর সাতের দশকে বয়স্কশিক্ষা এবং যুবশিক্ষা বিভাগ দুটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এইভাবেই একদিকে এই মহান শহরের কেন্দ্রস্থলে ধর্মভাবনার প্রচার, অন্যদিকে গৃহহীন ও দরিদ্রদের জন্য বস্তুগত সাহায্য—দুই-ই হয়ে ওঠে এই মনাস্ট্রির কাজ।

এই মঠের প্রধান ছত্রিশ বছর বয়স্ক সন্ন্যাসী জেরেমিয়াস স্করোডার আমাদের আপ্যায়িত করলেন। ঐ মঠে বহু সন্ন্যাসী আছেন, তাঁদের অনেকেই বৃদ্ধ। যুবক সন্ন্যাসীদের পবিত্র মুখগুলি খুবই উৎসাহব্যঞ্জক।

সন্ন্যাসীরা আমায় নিয়ে গেলেন মধ্যাহ্নভোজনের জন্য। দুটি অতীব চমকপ্রদ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দাগ কেটে গেল আমার মনে। প্রথমত, তাদের বিভিন্ন মনাস্ট্রির মধ্যেকার নিয়ম ও কর্মপদ্ধতির সমূহ বৈপরীত্য। দ্বিতীয়ত, সারা পৃথিবীর বিভিন্ন পৃথক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসচর্যার মধ্যে একধরনের সুগভীর একতা। অবশ্য এক্ষেত্রে নিয়মবিধির পার্থক্যও অনেক আছে। আমি আমাদের সঙ্ঘের নিয়মতন্ত্রে অভ্যস্ত। সেখানে আমরা সব সন্ন্যাসী-ভ্রাতারা একই সঙ্গে আহার করতে বসি, কিছু পুরুষ ভক্তও একই ভোজনালয়ে আমাদের সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করতে পারেন। অবশ্য সন্ন্যাসীদের আবাসস্থলের (monk's quarter) সর্বত্র এঁরা গমনের অনুমতি পান না। তা সত্ত্বেও গৃহী মানুষদের আমরা নেহাতই বহিরাগত বা পরিত্যাজ্য বলে মনে করি না। এব্যাপারে মিউনিখের এই মনাস্ট্রি সম্পূর্ণ বিপরীত। ডঃ লেখনার যথেষ্ট খ্যাতিমান এবং সজ্জন একজন মানুষ এবং উক্ত সন্ন্যাসীদের পরিচিতও বটে; কিন্তু যেহেতু তিনি একজন গৃহী, তাই তিনি মনাস্ট্রির ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি পেলেন না, আমাকে একাই নিয়ে যাওয়া হলো ভোজনকক্ষে। সন্ন্যাসের এই বিধি অবশ্য মুগ্ধই করেছিল আমাকে। তাঁরা আমার সঙ্গে আপন সন্ন্যাসী-ভ্রাতার মতোই ব্যবহার করছিলেন এবং বিশ্বাসের পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁদের সঙ্গে মিশে যেতে আমার কোন অসুবিধা হয়নি। এ হলো ঠাকুরের বাণীরই প্রতিফলন। মত এবং পথ নিরপেক্ষভাবে যে যেখানে ঈশ্বরের সেবার উদ্দেশে সন্ন্যাসগ্রহণ করেছে—সকলেই এক বিন্দুতে এসে মিলে যায়।

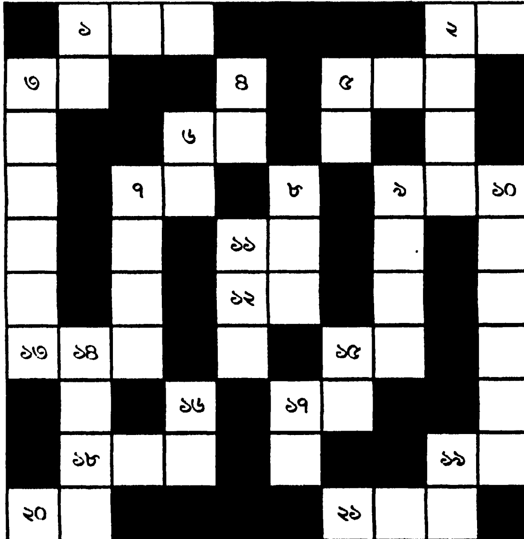
মঠাধ্যক্ষ আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, আমার খাদ্যের কোন বাছবিচার আছে কিনা। বললাম, কেবল নিরামিষ আহার্যই

আমি গ্রহণ করি, কিছু সিদ্ধ তরিতরকারি, ব্যস—এইটুকুই। অবশ্য চা ও পাঁউরুটিও গ্রহণ করলাম। খাওয়ার সময়ে আমাদের সঙ্ঘের সঙ্গে ওঁদের আরেকটি বৈপরীত্যও মুগ্ধ করল আমায়। ওখানে আহার্যগ্রহণের সময় কোন কথা বলা চলে না, কেবল সারাক্ষণ বাইবেল থেকে পাঠ হতে থাকে। ওঁদের অনুমতি নিয়ে এরপর আমি কিছু ছবিও তুললাম, ওঁদের একজন সন্ন্যাসী-ভ্রাতাও একটি গ্রুপ ফটো তুললেন। আমি ওঁদের সন্ন্যাসজীবন সম্বন্ধে জানার জন্য উৎসুক ছিলাম। খাওয়া শেষ হলে আমায় তাঁদের ঘরে ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো, প্রত্যেকটিই অতি ছিমছাম। এরপর আমরা কিছু গ্রন্থ বিনিময় করলাম। আমাকে দেওয়া হলো একাধিক খণ্ডের সুবিশাল একটি গ্রন্থ—'Benedictine Monastery'। বেলা ২টো থেকে প্রায় ২ ঘণ্টা ধরে আমি আমাদের সঙ্ঘের কথা বললাম। খেয়াল করলাম, সংযম, কৃচ্ছ্রতা এবং নিয়মানুবর্তিতার প্রশ্নে দুই সঙ্ঘের মধ্যে রয়েছে প্রভূত মিল। এই কথাবার্তা চলছিল এমন একটা জায়গায়—যেখানে গৃহীরাও প্রবেশাধিকার পান, ফলে ডঃ লেখনারও ছিলেন সেখানে।

এরপর চা পানের সময় হয়ে এল। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ভোজনকক্ষে বসে চা খেলাম। এই পরিভ্রমণ হয়ে রইল অসাধারণ এবং অতি ফলপ্রদ। আমি পূজনীয় মঠাধ্যক্ষকে ধন্যবাদ জানালাম এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম। [ক্রমশ]

শব্দচেতনা 

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী ভিত্তিক বিশেষ শব্দছক



পাশাপাশি : (১) এতে কেবল আঁটি আর চামড়া, (২) স্বামীজীর মতে এটিই প্রধান, ভাষা তারপরে, (৩) হাততালি দিয়ে হরিনাম করলে এটি চলে যায়, (৫) "করালি! —— তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে", (৬) "জীব সাজ সমরে, —— বেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে", (৭) "জীব ব্রহ্ম, মানব ঈশ্বর, ভূত-প্রেত-আদি ——গণ", (৯) জাপানের এই শহরটি স্বামীজী দেখেছিলেন, (১১) স্বামীজী বলেছেন, যে দান করতে সঙ্কুচিত হয়, তার হৃদয়-সিন্ধু এমন হয়ে যায়, (১২) এর মতো চালাক হতে ঠাকুর বারণ করেছেন, (১৩) এঁর কীর্তন ঠাকুর পছন্দ করতেন : (১৫) দেহত্যাগের কিছুদিন আগে স্বামীজী বলেছিলেন, বড়গাছের ছায়ায় এরকম গাছেরা বাড়তে পারে না, (১৭) হনুমান বলতেন : "আমি —— তিথি নক্ষত্র জানি না, এক রামচিন্তা করি", (১৮) স্বামীজী বলতেন, শরীর ও মন এরকম হলে কেউ কোন কাজ করতে পারে না, (১৯) স্বামীজীর মতে এর প্রেম অক্ষয়, (২০) "তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর, এক —— করে পারাপার", (২১) "করহ আনন্দে সদাই —— ওঁ তৎ সৎ ওঁ"।

ওপর-নিচ : (১) ঠাকুর বলেছেন, কেউ কেউ এটি খেয়ে মুখ মুছে বসে থাকে, (২) স্বামীজীর মতে, সন্ন্যাসের অর্থ মৃত্যুকে ——, (৩) এই দুটি শ্রীরামকৃষ্ণ ত্যাগ করতে বলেছেন, (৪) "আমার মন বুঝেছে —— বোঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন", (৫) স্বামীজী দুর্বল ভারতবাসীকে এই মার্গ অবলম্বন করতে আহ্বান করেছিলেন, (৬) "'স্বার্থ' 'স্বার্থ' সদা এই ——, হেথা কোথা শান্তির আকার?", (৭) এটি ভিজে থাকলে হাজার ঘষলেও আগুন জ্বলবে না, (৮) "সঙ্গে সঙ্গে পদাতিকদল, —— প্রবল, বীরমদে মাতোয়ারা", (৯) এই বিখ্যাত জাপানী শিল্পীর সঙ্গে স্বামীজীর সৌহার্দ্য ছিল, (১০) শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিপূত এই স্থানে স্বামীজীর যাওয়া হয়নি, (১১) "আমি আদি কবি, মম শক্তি ——রচনা", (১৪) এইরকম কাঠ নিজেও জলে ভেসে যায়, আবার অনেক জীবজন্তুও নিয়ে যেতে পারে, (১৫) স্বামীজীর মতে দান এতরকম, (১৬) জাবের সঙ্গে এটি মেশানো থাকলে গরু গবগব করে খায়, (১৭) ইনি যদি ছেলের হাত ধরেন, তাহলে ছেলের পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না, (১৯) "শ্রুতিপথে ——র ঝঙ্কার, বাসনা বিস্তার, রাগ তাল মান লয়ে"।

সূত্র : তন্বীতনু পাণি

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম মাঘ ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

তিনি কে?

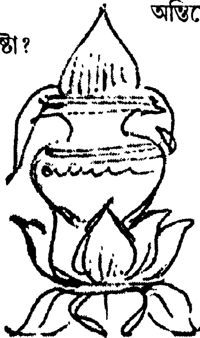
দিলীপ মিত্র

তিনি কে?
ভাবতে ভাবতে, খুঁজতে খুঁজতে,
অন্তহীন পথ।
কেউ বললেন, ভগবান।
কারো মুখে শোনা গেল, তিনি আল্লা।
কেউ ঘুমন্ত চোখ মেলে বললেন,
তিনি বুদ্ধ।
তিনি কে?
এ-প্রশ্নের উত্তর খোঁজা থামতে চায় না।
নিরন্তর প্রশ্নের আত্মযন্ত্রণা!
সুখদুঃখের সোনার কাঠি রুপোর কাঠি!
কে জাগায় এই ঘুমন্ত পৃথিবীকে?
বলে, চোখ মেলে চাও।
অন্ধকার রাত্রি,
শুনতে পাচ্ছি সৃষ্টির যন্ত্রণা।
নবজাতকের কণ্ঠস্বর।
অন্ধকার পার হয়ে দিনের আলো।
রাত্রির চোখবোজা ফুলেরা চোখ মেলল!
পাখিদের কণ্ঠস্বর, রাত্রি শেষ।
চোখ বুজে ভাবতে ভাবতে প্রশ্ন,
তোমরা কোথা থেকে এসেছ? কে এই স্রষ্টা?
কানে শুনতে পেলাম—
তোমরা যে-নামেই ডাক আমাকে,
যেভাবেই খোঁজ,
আমি তোমাদেরই একজন।

প্রার্থনা

সবিতা দাস

হরষে, বিষাদে, শত কাজে, সংগ্রামে,
কেটেছে কখন রৌদ্রদীপ্ত বেলা।
আমার ভুবনে ধূসর গোধূলি নামে,
ফাঁকা হয়ে এল মুখর মিলনমেলা।
সাথী একে একে ফিরে যায় নিজ ঘরে,
ভয় লাগে মনে, একা হয়ে যাব নাকি?
তুমি যে আমার পাশে আছ হাত ধরে,
কী মোহেতে হায়, সেকথা যে ভুলে থাকি!
মান অভিমানে, কত সন্তাপে শোকে,
না-পাওয়ার দুখে কেঁদেছি ঘরের কোণে।
তোমার বিরহে জল আসেনি তো চোখে,
তোমাকে পাইনি—একথা হয়নি মনে।
এক হাত যবে থাকে সংসার-কাজে,
আরেকটি হাত তোমাকে থাকে না ধরি।
নাম করে যাই, ব্যাকুলতা জাগে না যে,
মনে, বনে, কোণে কোথায় বা ধ্যান করি।
এ আধারখানি যত ছোট হোক নাকো,
ঠাকুর, রয়েছ হৃদয়-কমলাসনে।
দুঃখে ও সুখে, তুমি মোর কাছে থাক,
অন্তিমে যেন ঠাঁই মেলে শ্রীচরণে।



অনুভব

শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী

তিনি আছেন সকাল সাঁঝে আমার সকল কাজে,
তিনি আছেন আমার হৃদয়মাঝে।
তিনি আছেন আমার চেতন, প্রাণেরই স্পন্দনে,
এ মোর জীবন বিফল তাঁকে বিনে।
সুখ-দুঃখে আবর্তিত আমার জীবনরথ,
তাঁর দয়াতেই খুঁজে পেয়েছি আমার চলার পথ।
অশান্ত হয়ে যখন দাঁড়াই তাঁর কাছেতে—ভাসি নয়নজলে,
ভালবাসার পরশে তাঁর অপার শান্তি মেলে।
আমার হৃদয়বীণায় বাজে শ্রীরামকৃষ্ণ নাম,
অবতারবরিষ্ঠ তুমি! শতকোটি প্রণাম।

আবার কবে আসবে তুমি

বিভাস রায়

মহা মৌনমুখর হলো মন্দমতির মঙ্গলে,
জীবনজ্যোতি উঠল জ্বলে জনজীবন জঙ্গলে।
জ্যোতির আলোয় উদ্ভাসিত বিশ্বভুবন দিগ্বিদিক
মহাত্মা আর মরমীদের মুগ্ধ নয়ন নির্নিমিখ।
ধর্মে যখন গ্লানির আভাস, অধর্মেরই প্রাদুর্ভাব,
গীতার বাণী সত্য করে তখন তোমার আবির্ভাব।
জাগরণের জোয়ার এল, উথাল-পাথাল ভূমণ্ডল
প্রেমের সুধায় ভরল আকাশ, বইল বাতাস সুমঙ্গল।
যোড়শ ঋষি তোমায় ঘিরে অষ্টপ্রহর বিরাজমান,
চাঁদের পাশে সপ্ত ঋষি, তাই না দেখি ম্রিয়মাণ।
আবার কবে আসবে তুমি, গুনছি যে দিন প্রত্যহ
আনন্দেতে ভাসবে সবাই, ঘুচবে জীবন দুঃসহ।
পাপী-তাপী আর্ত-আতুর শরণ নে না চোখ বুজে
কোটি কোটি প্রণাম জানা, তাঁরই চরণ-অম্বুজে।

তোমার কাছেই

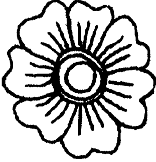
অচিন্ত্যকুমার আদিত্য

সকালবেলায় গেঁথেছিলাম অনেক ফুল দিয়ে
নানা রঙের অপূর্ব এক মালা—
পরিয়ে দিলাম তোমার গলায় অনেক আশা নিয়ে
সাজিয়ে দিলাম অর্ঘ্য-বরণডালা।

সারাদিনের ভাবনা আমার রইল তোমায় ঘিরে,
পবিত্র এক সুবাস যেন আসে—
দূর-সুদূর এক অতীত হতে কেবল ঘোরে ফেরে,
তোমার কথা বাণী হয়ে ভাসে।

কেন এমন হয় বুঝি না তোমায় ভালবেসে
ক্ষণে ক্ষণে ভুল করি কাজ কেন—
ভুল-ভাঙা মন যখন তাকায় তখন তুমি হেসে
তাকাও আমার মুখের দিকে যেন।

আমায় বল অনেক কথা নীরব কথা দিয়ে;
দিনের শেষে সন্ধ্যা যখন নামে,
প্রদীপ জ্বালাই ছোট্ট ঘরে অনেক আশা নিয়ে—
আশার প্রদীপ তোমার কাছেই থামে।



বিমানযাত্রা

শান্তিকুমার ঘোষ

পৃথিবীকে নিচে রেখে আমি যখন উঠে যাই
অভ্রের স্বচ্ছ স্তরে
বিমান থেকে অবিকল দেখি হরিৎ-শ্যামল নিম্নভূমি,
তুষার-মৌলি পাহাড়
স্তম্ভিত হয়ে থাকা উর্মিমুখর নীল সিন্ধু।
মাধ্যাকর্ষণ শক্তি... মাটির টান আর কুটিরের
উষ্ণ ভালবাসা
ছাড়াতে দেয় না সব শেষ সীমা।

অনুভব করি, চলেছি এগিয়ে
নির্গুণ নিরঞ্জনের অভিমুখে...
চলেছি অন্ধকার কেটে কেটে,
পেরিয়ে হিম-শিলা মরু-তাপ
পিছনে সরছে সময় বিস্তার ও দেশ...
সামনে জাগে কি অমরতা?

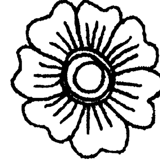
হে সব্যসাচী

গদাধর রানা

হে মধ্যমপাণ্ডব! সব সংশয় ত্যজি', ত্বরায় ধারণ কর অস্ত্র দুটি হাতে
হৃদয়ের অকারণ মমত্বমায়ায়, কেন নাহি হও রণাঙ্গনে আগুয়ান?
ভয়হীন চিত্তে তব, আজন্ম বৈরী নাথে কর যুদ্ধ—হয়ে যুযুধান
লেশমাত্র পাপ কিংবা নিদেন অন্যায়, না হবে তায় কোনমতে।

সারথিপ্রিয় মোরে, তুমি অভয়বাণী দিতেছ তাই মানি;
অনুভবী প্রেম ও মায়ায় তবু এ-হৃদয়ে জাগিছে দারুণ ত্রাস!
হে পাণ্ডবসখা! কৌরব না হয়েও কেমনে ভুলি চিরসম্পর্কের বন্ধন?
না জানি প্রতিপক্ষের বিনাশের হেরি ঐ দারুণ হাতছানি।

মমত্বহীন হওয়াই এবে তব উচিত ধর্ম, তাই সব্যসাচী প্রিয় মোর
ভীরুতা পরিহরি', অগ্রসর হেরিব তোমা, উদ্যমী চেতনায়
রণক্ষেত্রে যোদ্ধা আছে যারা, অনেকেই তাঁরা জীবন্মৃতপ্রায়, আজও
রাজোচিত ক্ষাত্রবীর্যে উদ্বুদ্ধ কর সবারে, ঋদ্ধচেতা ক্ষত্রিয়প্রবর।



এ বিশ্বে শিবময় তুমি জ্বলে ওঠ আজ

রেণুপদ ঘোষ

আলো দিয়ে যে আঁধার দূর করা যায় সে-আঁধার
থেকে গেছে অরণ্যে পর্বতে আর আদিম
গুহায়, লোকালয় থেকে এতটাই দূর বলে মনে হয়
আজ। যেন হাজার শতাব্দী পারে কোন এক
নীলগাই তৃণভোজ শেষ করে নদীর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে
পায়ে, আঁধার মাড়িয়ে গেছে তোলপাড় করে।

বনস্থলী অন্ধকারে লুপ্ত হয়ে গেলে আশা ছিল জ্বলে
উঠবে আলো লোকালয়ে; সুতরাং
আলোর যাত্রী, তাই ডানায় আলোর রঙ
দেখা যাবে—দূর থেকে, কাছ থেকে, এমনকি
খুব বেশি কাছাকাছি হলে দুটি চোখ
আলোয় আলোয় শুধু আলো হতে পারে।

লোকালয়ে আলো নেই—সেই আলো। যে-আলোয়
মুখ ধুয়ে জেগে ওঠে ফুল, আর আজন্ম নত
হয়ে চেয়ে থাকে মা-টি—তার সকল সন্তানের
তরে চেয়ে থাকে—প্রাকৃত বিকাশ যেন সুস্থির
প্রজ্ঞায় আনে নিমজ্জিত আত্মার প্রসন্ন দ্যুতি;...
এ বিশ্বে শিবময় তুমি জ্বলে ওঠ আজ।

ইতিহাস এবং দর্শনের আলোকে শালগ্রাম তত্ত্ব

কল্যাণব্রত চক্রবর্তী

[পূর্বানুবৃত্তি]

আর্যদের দুর্বলতার স্থান

(ক) সংখ্যাল্পতা ঃ

আর্যদের প্রধান দুর্বলতা ছিল সংখ্যাল্পতা। ভারতে অধিকার বিস্তারের সূচনায় তারা সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও জয়লাভে সমর্থ হয়েছিল, কারণ তাদের হাতে ছিল উন্নততর প্রযুক্তি—যথা লৌহনির্মিত অস্ত্র এবং গতিসম্পন্ন অশ্বচালিত রথ। গঙ্গা অববাহিকায় দ্বিতীয় নগরসভ্যতা স্থাপন পর্যন্ত এই সুবিধা বলবৎ ছিল। অপরদিকে যাদের পরাজিত করে প্রথমে সিন্ধু উপত্যকার এবং পরে গঙ্গা অববাহিকার দখল নেওয়া সম্ভব হয়েছিল—সেই অনার্য ভারতবাসী মোটেই সঙ্ঘবদ্ধ ছিল না। তারা দল-উপদলে বিভক্ত ছিল। অথচ সম্ভাব্য গণজাগরণ প্রতিহত করার জন্য আর্যদের ক্ষাত্রশক্তি যথেষ্ট ছিল না। তাছাড়া উন্নত প্রযুক্তির সুফল শুরুতেই পাওয়া যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রযুক্তি বিপরীত শিবিরের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে।

(খ) যজ্ঞের জটিলতা ঃ

ধর্মীয় ক্রিয়া হিসাবে যজ্ঞ যে অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই। যজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত সবকিছুতেই অতিপ্রাকৃত অর্থ আরোপ করা হচ্ছিল। কোন অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যজ্ঞ যেন একটা যাদু—এমনই মনে করা হতো। আর সেই যাদু সম্পাদনের বিদ্যা যেন শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ পুরোহিতদেরই জানা আছে। যজ্ঞবেদি নির্মাণের জন্য একটা পৃথক শাস্ত্র—'শূল্যশাস্ত্র' সৃষ্টি হলো। বড় যজ্ঞের জন্য একটা যজ্ঞবেদি আর যথেষ্ট ছিল না। গার্হপত্য অগ্নি, আহবনীয় অগ্নি, উত্তরবেদি, দক্ষিণাগ্নি ইত্যাদি নানা প্রকার যজ্ঞকুণ্ড প্রয়োজন হতো। সেইসঙ্গে যজ্ঞকারী পুরোহিতের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছিল এবং তারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন—যেমন ঋত্বিক, হোতৃ, উদ্‌গাতৃ, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা ইত্যাদি। যজ্ঞকে ঘিরে ব্রাহ্মণদের একটা স্বার্থচক্র সৃষ্টি হয়েছিল। তারা যজমানদের নানা অনৈসর্গিক ফললাভের আশায় বড় বড় যজ্ঞের বিধান দিত, যাতে তার থেকে উচ্চমানের দক্ষিণা লাভ হতে পারে।

আবার রাজদর্পের একটা প্রতীক হয়ে উঠেছিল যজ্ঞ। রাজসূয় যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, বাজপেয় যজ্ঞ তার প্রমাণ। যজ্ঞের এই জটিলতা এবং অতিবিস্তার যজ্ঞলোপের একটা কারণ হলেও এটাই একমাত্র কারণ হতে পারে না। যাঁরা বলে থাকেন, যজ্ঞের জটিলতা এবং বৃহদায়তন লাভ করার মধ্যেই যজ্ঞধ্বংসের বীজ উপ্ত ছিল—তাঁরা ঠিক বলেন না। কেননা অনুভবটা যদি এই হতো যে, সাধারণ মানুষের কাছে যজ্ঞ করা সাধ্যাতীত হয়ে পড়ছে, তবে যজ্ঞের পূর্বেকার সরলতা ফিরিয়ে আনাই যেত। সেটা সকলেরই স্বার্থানুগ হতো এবং সমস্যার সমাধান সেখানেই হয়ে যেত। সূচনায় যজ্ঞ তো কোন জটিল ক্রিয়া ছিল না। গৃহস্বামী নিজেই করতে পারতেন; পরে হয়তো এক বা দুইজন শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হতো। কাজেই যজ্ঞ লুপ্ত হওয়ার কারণ অন্যত্রও খুঁজতে হবে।

(গ) উপনিষদের প্রভাব ঃ

সৃষ্টিরহস্য এবং আত্মবিষয়ক অন্বেষা উপনিষদের ঋষিদের অন্তর্মুখী করে তুলেছিল। তাদের আগ্রহ ছিল জ্ঞানকাণ্ড ঘিরে। কর্মকাণ্ড তথা যজ্ঞের সার্থকতার বিষয়ে তাদের মোহভঙ্গ শুরু হয়েছিল। যজ্ঞ বিষয়ক আলোচনা নানা উপনিষদে থাকলেও তার পিছনে একটা দার্শনিক সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা ছিল; ক্রিয়ার বিষয়টি গৌণ হয়ে গিয়েছিল। মাণ্ডুক্য উপনিষদে পরিষ্কারভাবে যজ্ঞের অসারতার কথা বলা হয়েছে। (১।২।৭, ১।২।১০) গীতায় শ্রীকৃষ্ণ জপযজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেছেন হোমযজ্ঞের কথা বাদ দিয়ে। (১০।২৫) যজ্ঞে পশুবলির নিষ্ঠুরতার বিষয়টি অনেককেই হয়তো যজ্ঞবিমুখ করে তুলেছিল।

(ঘ) বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের উদ্ভব ঃ

বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের উদ্ভব যজ্ঞের গুরুত্বহানির যতটা না কারণ, তার চেয়ে বেশি ঐ কারণের প্রতিফলন। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের কতগুলি ত্রুটির ওপর ভিত্তি করে এই দুটি প্রতিবাদী ধর্মমত গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই জনসাধারণ দ্বারা ঐ দুই মতের গৃহীত হওয়ার প্রধান কারণ। ব্রাহ্মণ্যধর্মে লোকহিতৈষণার একান্ত অভাব ছিল। তাকেই প্রধান উপজীব্য করে বৌদ্ধধর্ম এবং জৈনধর্মের সৃষ্টি। এই ধর্মদুটির লোকধর্মে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা একান্তভাবেই ছিল—যদি না ব্রাহ্মণ্যধর্ম কিছু পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটিয়ে নির্যাতিত অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে বাহুবন্ধনে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করত।

যজ্ঞ থেকে মূর্তিপূজায় অনুবর্তন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত

অতএব যজ্ঞ থেকে পূজায় অনুবর্তন কোন শান্তিপূর্ণ পথে মৌন বিবর্তনের ফল হতে পারে না। এটাও প্রতিপাদন করার চেষ্টা হয়েছে যে, ঐ অনুবর্তন কোন সচেতন সিদ্ধান্ত অনুসারীও নয়, কেননা তাহলে অনুবর্তনের ফল হতো বিপরীতমুখী। অর্থাৎ তথাকথিত আধ্যাত্মিক তাৎপর্যহীন দ্রাবিড় সমাজে প্রচলিত 'পূজা' গৃহীত না হয়ে গৃহীত হতো

আর্যসমাজে প্রচলিত 'যজ্ঞ'। এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমরা সিদ্ধান্ত করেছি যে, যজ্ঞ থেকে পূজায় অনুবর্তন সামাজিক সঙ্ঘাতের অবশ্যম্ভাবী ফল। এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রদানকারী ইতিহাসের নানা তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। আমরা দেখেছি অনার্য সমাজের শক্তির উৎস কোথায় ছিল। জনসংখ্যা, সাংস্কৃতিক মান, রাজনৈতিক চেতনা—কোন ব্যাপারেই তারা বিশেষ হীনাবস্থা প্রাপ্ত না হয়েও সমাজ-ব্যবস্থায় অমর্যাদা ও লাঞ্ছনার পাত্র ছিল শূদ্র হিসাবে। আমরা ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম বা 'Historical determinism'-এর উল্লেখ করে এই শ্রেণীটির সম্ভাব্য অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত দিয়েছি। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য সমাজে এই অভ্যুত্থান প্রতিরোধ করার অক্ষমতার বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য প্রদান করা হয়েছে। আমরা একথাও বলেছি যে, বৌদ্ধধর্ম এবং জৈনধর্ম সৃষ্টি হওয়ার ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম চূড়ান্ত সঙ্কটের মুখে পড়েছিল।

এই যাবতীয় তথ্য ও তত্ত্বের যথাযথ বিচার এবং প্রয়োগ থেকে একটিমাত্র সিদ্ধান্তই হতে পারে যে, ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের নেতৃবৃন্দ আসন্ন সঙ্কট থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য এবং উদ্যত গণরোষের মুখে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে তথাকথিত নিম্নবর্ণ শূদ্রদের আচরিত ধর্ম মূর্তি-পূজাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। এর ফলে গরিষ্ঠ সংখ্যক নিপীড়িত মানুষ ধর্মীয় ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সম্মানজনক স্থান লাভ করেছিল। লাঞ্ছনার নিগড় থেকে অন্তত তাৎক্ষণিকভাবে তাদের মুক্তি ঘটেছিল। তাদের ক্রোধের উপশম হয়েছিল। যজ্ঞ থেকে মূর্তিপূজায় অনুবর্তনের এটাই অনুমিত ইতিহাস। ঘটনাটি ঘটেছিল সংগ্রামের পথে। শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়া একে আর কি বলা যেতে পারে? এটাই মনে হয় পৃথিবীর প্রাচীনতম শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস, যা ঘটেছিল আজ থেকে অন্তত আড়াই হাজার বছর আগে—খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে। "ভবিষ্যতে শূদ্রজাগরণ ঘটবেই।" —বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। বর্তমান সময়ে আমরা সেই শূদ্রজাগরণের স্তরের মধ্য দিয়েই চলেছি। কিন্তু অতীতেও যে একবার শূদ্রজাগরণ ঘটেছিল তা প্রায় নিশ্চিত।

শালগ্রাম তত্ত্ব

আমরা দেখেছি, মূর্তিপূজা গ্রহণ করা ছাড়া আর্যদের আর কোন গত্যন্তর ছিল না। এটা তাদের অস্তিত্বরক্ষার জন্যই প্রয়োজন ছিল। পূজা ব্যাপারটি ছিল অনার্যদের—বিশেষভাবে দ্রাবিড়দের ধর্মীয় ক্রিয়া। যেসব দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল তাঁরা হলেন শিব, পার্বতী, কুবের, বৃক্ষিকা, সর্পদেবতা এবং নানাবিধ লৌকিক দেবতা ও অপদেবতা। আর্যরা এইসব দেবতার পূজা করে সন্তুষ্ট থাকে কি করে? তাদের দেবতা বিষ্ণু। বিষ্ণুকে মূর্তিপূজায় অধিষ্ঠিত করতে না পারলে তাদের ধর্মচেতনা যে লুপ্ত হয়ে যাবে, অথবা বিপুল সংখ্যক নব অনুপ্রাণিত ভারতবাসীর কাছে তার সম্প্রসারণ ঘটবে না। তাই বিষ্ণুর মূর্তিনির্মাণ একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কিভাবে বিষ্ণুর মূর্তি নির্মাণ করা যেতে পারে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করার আগে দেখা প্রয়োজন, যখন মূর্তিনির্মাণের প্রয়োজন হয়েছিল অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে, তখন বিষ্ণুর ধারণাটি কি ছিল?

বিষ্ণুর ধারণায় অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ঋগ্বেদের দেবতা বিষ্ণু সূর্যেরই নামান্তর। তিন পদক্ষেপে তিনি সমস্ত ভুবনে অবস্থান করেন। প্রত্যূষে প্রথম পদ পূর্ব গগনে, মধ্যাহ্নে দ্বিতীয় পদ মধ্য গগনে, আর সায়াহ্নে তৃতীয় পদ পশ্চিম গগনে। এ তো সূর্যই। ব্রাহ্মণের যুগে বিষ্ণুই হয়ে উঠলেন প্রধান দেবতা—যজ্ঞের দেবতা। এর আগে যজ্ঞের দেবতা ছিলেন প্রজাপতি। কিন্তু 'শতপথ ব্রাহ্মণ'-এই বিষ্ণুকে যজ্ঞের দেবতা হিসাবে বরণ করার কাহিনী আছে। শুধু যজ্ঞের দেবতা কেন, বিষ্ণুই যজ্ঞ। "বিষ্ণু বৈ যজ্ঞঃ।" যজ্ঞেই সৃষ্টি, যজ্ঞেই লালন, আবার যজ্ঞেই লয়। এই দর্শন সৃষ্টি হলো বিষ্ণুকে আশ্রয় করে। পরবর্তী কালে ত্রিদেবের একজন বিষ্ণু। কিন্তু তার আগে অর্থাৎ সূত্র-সাহিত্যের যুগে যখন বিষ্ণুকে মূর্তি প্রদান করার প্রথম প্রয়োজন হয়েছিল, তখন বিষ্ণু সম্বন্ধে ধারণাটা কি ছিল? আমরা দেখব, ঋগ্বেদের 'পুরুষসূক্ত'-এর পুরুষই তখন 'বিষ্ণু' অভিধা লাভ করেছেন। দার্শনিক তাৎপর্যের বিচারে ঋগ্বেদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য অংশ 'পুরুষসূক্ত'। সমস্ত সৃষ্টির পিছনে যে এক এবং অদ্বিতীয় শক্তি ওতপ্রোত রয়েছে, তাকেই 'পুরুষ'-রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সেই পুরুষ কোন দেবরূপ লাভ করেনি। বিষ্ণুর মধ্যেই পুরুষের ধারণাটি অধিভূত করা হয়েছে। একথার সমর্থন শাস্ত্রগ্রন্থে নানা জায়গায় দেখতে পাওয়া যাবে। যেমন গীতার অষ্টম অধ্যায়ে আছে—

> "অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
> অধিযজ্ঞো ঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর।।" (৪)

—দেহাদি বিনাশশীল পদার্থই অধিভূত। পুরুষই অধি-দেবতা (অর্থাৎ সর্বদেবতার অধিপতি)। এই শরীরে অন্তর্যামিরূপে আমিই (কৃষ্ণ) অধিযজ্ঞ অর্থাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অন্যত্র—

> "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
> পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্।।"
>
> (ঐ, ১০।১২)

—(অর্জুন বলছেন) হে ভগবান, আপনি পরমব্রহ্ম, পরম ধাম ও পরম পাবন। আপনি সর্বব্যাপী, সনাতন, জন্মরহিত, দিব্যপুরুষ ও আদি দেব।

গীতা তখনকার রচনা—যখন যজ্ঞই ছিল প্রধান ক্রিয়া। পাশাপাশি পূজাও প্রবর্তিত হয়েছে। তার আভাষ পাই এই শ্লোকে—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।।" (ঐ, ৯।২৬)

—যে-ভক্ত পত্র, পুষ্প, ফল, জল ইত্যাদি দিয়ে ভক্তিভরে পূজা করেন, তাঁর সেই উপহারও ভগবান বিষ্ণু/কৃষ্ণ গ্রহণ করেন।

এর দ্বারা বোঝা যায়, পূজার বিস্তার তখনো পর্যন্ত তেমনভাবে হয়নি। প্রাথমিক অবস্থামাত্র। কাজেই পুরুষের বিষ্ণু হয়ে ওঠার সময় নিয়ে গরমিল খোঁজার বিশেষ কারণ দেখি না। মহাভারতের শান্তিপর্বে নারদের বিষ্ণুস্তুতির মধ্যে তার পুরুষবিগ্রহ হয়ে ওঠার বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

যখন বিষ্ণুর মূর্তি গড়ার প্রয়োজন হয়েছিল, তখন বিষ্ণু ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের পুরুষের সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছিলেন—এই কথা প্রতিপাদন করার পর আমাদের বিচার্য বিষয় হলো, 'পুরুষ'-এর ধারণাটি প্রকৃতপক্ষে কি? এই দর্শন বোঝার জন্য পুরুষসূক্তের প্রথম মন্ত্রটি অপরিহার্য—

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।।"

—পুরুষের সহস্র অর্থাৎ অজস্র মাথা, অজস্র চক্ষু, অজস্র পদ এবং তিনি ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত থেকেও মনুষ্যহৃদয়ে দশ আঙুল পরিমিত স্থান উদ্বেলিত করে অবস্থান করেন।

অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীব এবং জড়বস্তুর মধ্যে পুরুষ ছড়িয়ে আছেন তাদের প্রকাশক হিসাবে। সুতরাং যে-শক্তি যাবতীয় সৃষ্টির পিছনে ক্রিয়াশীল, সেই শক্তিকেই 'পুরুষ' অভিধা দেওয়া হয়েছে। জগৎকারণ-শক্তি, সবকিছুর স্রষ্টা পুরুষের অধিষ্ঠান মনুয্যহৃদয়ে—যা সেই শক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশস্থল। অন্য কথায়, অসীম পুরুষের সসীম সত্তা মানুষ, মানুষও তাই পুরুষ।

"নবদ্বারং পুরং পুণ্যমেতৈর্ভাবৈঃ সমন্বিতম্।
বাপ্য শেতে মহানাত্মা তস্মাৎ পুরুষ উচ্যতে।"
(মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২০৭।৩৭)

—নবদ্বারযুক্ত, পবিত্র এবং সত্ত্ব প্রভৃতি পদার্থ-সমন্বিত পুরকে (অর্থাৎ মানুষের দেহকে) পুরুষ বলা হয়।

পুরুষ, পরব্রহ্ম, বিষ্ণু—যে-নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, সেই আদি শক্তিকে মনুষ্যহৃদয়ে অনুভব করার প্রবণতা ভারতীয় দর্শনে অতি প্রাচীন। আমরা ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে পুরুষের দশ আঙুল পরিমিত স্থানে অধিষ্ঠানের কথা আলোচনা করেছি। অথর্ববেদে বলা হয়েছে—

"বেনস্তৎ পশ্যৎ পরমং গুহা যদ্ যত্র বিশ্বং
ভবত্যেকরূপম্।" (২।১।১)

—বেন (আদিত্য) সকল প্রাণীর হৃদয়রূপ গুহাতে পরম ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

কঠ উপনিষদ্ বলছেন—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।।"
(২।১।১২)

এই অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত দেহাভ্যন্তরবাসী পুরুষ, যিনি পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন, তিনি পঞ্চপ্রাণের উদ্গাতৃ হৃৎপিণ্ডাশ্রয়ী ছাড়া আর কি হতে পারেন? অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ মাপের কথা বলে হৃৎপিণ্ডকেই নির্দেশ করা হয়েছে মনে হয়। প্রাণ এবং আত্মার আশ্রয়স্থল হৃদয়। এটি physical heart নয়!

'প্রপন্ন গীতা'য় পাই—"ত্বয়া হৃষীকেশঃ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

আর গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া।।" (১৮।৬১)

এই সবকিছু থেকে বেশ পরিষ্কারভাবে ঈশ্বর তথা বিষ্ণুর সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক বোঝা যায়। 'হৃদয়' বলতে একটি চেতনাস্থল। সেটি যে হৃৎপিণ্ড-কেন্দ্রিক আধুনিক শারীরবৃত্ত (physiology)—সেকথা হয়তো নাও মানতে পারেন। কিন্তু প্রাচীন ঋষিরা হৃদয়কে হৃৎপিণ্ড থেকে বিযুক্ত মনে করতেন না, তার কিছু সাক্ষ্য বর্তমান আলোচনায় আমরা পেয়েছি।

এইবার বিষ্ণুর মূর্তিনির্মাণ সমস্যায় ফেরা যাক। আমরা দেখেছি বিষ্ণু সর্বব্যাপক। সমস্ত কিছুর মধ্যে ওতপ্রোত শক্তি—যাকে ঐ বস্তুর 'আত্মা' বলা হয়েছে। এই সর্বত্র পরিব্যাপ্ত দেবতাকে মূর্তিতে ধরাতে হবে। কঠিন সমস্যা। আমরা মনে করি, সমাধান খোঁজা হয়েছিল মনুষ্যহৃদয়ে তথা হৃৎপিণ্ডটিকে বিষ্ণুর রূপ হিসাবে গ্রহণ করে। মনুষ্য-হৃদয়েই বিষ্ণু সর্বোত্তমরূপে প্রতিভাত। রূপ যখন দিতেই হবে, একমাত্র এইটিই হতে পারে তার সার্থক রূপ। চিন্ময় সত্তাকে মৃণ্ময় রূপে আর কিভাবেই বা প্রকাশ করা যেত! হৃদয়ের সার্থক প্রতিরূপ কি? অনুরূপ আকৃতি দান করে যেকোন কিছুকেই হয়তো গ্রহণ করা যেত, কিন্তু সেক্ষেত্রে কৃত্রিমতা এসে যেত, ফলে বিশ্বাসযোগ্যতা এবং পবিত্রতা দুই-ই বিঘ্নিত হতো। তার চেয়ে প্রকৃতির সৃষ্টি কোন বস্তু—যার সঙ্গে আকৃতিতে মনুষ্যহৃদয়ের সাযুজ্য বর্তমান এবং যা কিছুটা দুষ্প্রাপ্য অর্থাৎ লোকচক্ষুর বাইরে—সেই জলের নিচে অবস্থানবশত স্বাভাবিকভাবে মানুষের মনে সম্ভ্রম

উদ্রেককারী শালগ্রাম শিলা বা দ্বারাবতী শিলাকেই হৃদয় তথা বিষ্ণুর প্রতীক এবং পূজার বস্তু হিসাবে গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে সুচিন্তার পরিচায়ক। শালগ্রাম শিলা বা দ্বারাবতী শিলাকে বিষ্ণুজ্ঞানে পূজা করার এটাই যথার্থ কারণ বলে মনে হয়। এটি একটি গভীর মননশীলতা-প্রসূত সৃজন। এর পিছনে অন্ধের মতো জড়বস্তুকে পূজা করা বা 'fetishism' নেই, বরং আধ্যাত্মিক চেতনার সার্থক রূপকার্থ আছে।

শালগ্রাম শিলার নিত্য পূজার বিধানটি উপরি উক্ত চিন্তারই পরিপোষক। অন্যান্য বিগ্রহের ক্ষেত্রে নিত্যপূজা বাধ্যতামূলক নয়। যজমান ইচ্ছামত যখন খুশি পূজা করতে পারেন, কিন্তু নারায়ণ-রূপী শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করলে নিত্যপূজা করতেই হবে। কেন এই ব্যতিক্রম? কারণ হয়তো এই পরমাত্মার বাস জীবন্ত হৃদয়ে। যতক্ষণ আত্মা আছে ততক্ষণই জীবন। বিশ্বচরাচরে চেতনা হিসাবেই পরমাত্মা বিরাজ করেন। চেতনা জীবন্ত প্রাণীতেই থাকে। আর জীবন অন্নের দ্বারা পরিপোষিত। অন্নজল বন্ধ হলে হৃদ্‌স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যায়। আত্মা সেই হৃদয়কে পরিত্যাগ করে। তখন সে আর আত্মার বাসভূমি থাকে না। হৃদয়টিকে জীবন্ত রাখতে হবে। তাই আত্মা বা বিষ্ণুর আশ্রয় হৃদয়ের প্রতিরূপ শালগ্রাম শিলাকে অন্নজল প্রদান তথা পূজার দ্বারা সজীব রাখার বিধান। কারণ—

"অন্ন ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি
ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি।
অন্নং প্রয়ন্ত্যাভিসংবিশন্তীতি।"

(তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ৩।৩।২)

—অন্নই ব্রহ্ম। কারণ, অন্ন থেকেই ভূতগণ জন্মায়, জন্মের পর অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে এবং অন্তিমকালে অন্নে প্রতিগমন করে তাতেই বিলীন হয়।

শালগ্রাম শিলা বিষয়ে যে-ব্যাখ্যা প্রদত্ত হলো, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তা কোন নব উদ্ভাবন নয়; তা লুপ্ত অর্থের পুনরুদ্ধার। অনেক উন্নত চিন্তা মানুষের বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতেই পারে। চিন্তা কেন, মানুষের অনেক শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মও যে লুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর পুনরুদ্ধার করা হয়েছে, তার পর্যাপ্ত নির্দশন আমাদের কাছে আছে। অজন্তার চিত্রকলা, সোমপুর বিহার, আঙ্কোরভাট-মন্দির ইত্যাদির মতো. গুরুত্বপূর্ণ শিল্প এবং স্থাপত্যগুলি লুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। একটি ধ্যান-কল্পনা লুপ্ত হয়ে যাওয়া আর বিচিত্র কি? প্রশ্ন উঠতে পারে, শালগ্রাম শিলাকে বিষ্ণুর প্রতীকী রূপ হিসাবে গ্রহণ করার চিন্তা কোন শাস্ত্রগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়নি কেন? আমাদের বক্তব্য—শুধু শালগ্রাম শিলা কেন, যজ্ঞ থেকে পূজায় অনুবর্তনের মতো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েরও কোন শাস্ত্রগ্রন্থে উল্লেখ নেই। উল্লেখ না থাকলেও অনুবর্তন যে ঘটেছে তা তো অস্বীকার করার উপায় নেই। আমরা মনে করি, উল্লেখ না থাকার কারণ হলো—মূর্তিপূজা আর্যরা কখনোই হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করেননি, নিতান্ত অপারগ হয়েই করেছেন। যে-বিষয় উল্লেখ করার মধ্যে কোন গৌরব প্রকাশ পাবে না বরং অগৌরব বিঘোষিত হবে—তাকে প্রকাশ করার ধৃষ্টতা কোন শাস্ত্রকার দেখাননি। এত বড় একটি ঐতিহাসিক ঘটনা কোন শাস্ত্রগ্রন্থে লিপিবদ্ধ না হওয়ার এটাই সম্ভাব্য কারণ বলে মনে করা যেতে পারে।

এই ব্যাখ্যা ভারতীয় ধর্মের জ্ঞানকাণ্ডের সঙ্গে কর্মকাণ্ডের আপাত বিযুক্তির নিরসন ঘটিয়ে সাম্যপ্রতিষ্ঠার দিকটি হয়তো সহজ করে দেবে। যে-ধর্ম বলছে 'তত্ত্বমসি', 'সোঽহং' অথবা 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—সেই ধর্মই আবার মূর্তি নির্মাণ করে তা মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করে। দুইয়ের মধ্যে এই দৃশ্যত বিরোধ মিটে যায় যদি ঐ মূর্তি আত্মবিগ্রহ হয়। এ-তত্ত্বও অচিরেই প্রতিষ্ঠিত হবে যে, মন্দির নির্মিত হয়েছে দেহমন্দিরেরই প্রতীক হিসাবে। আমাদের সর্বোচ্চ বিগ্রহ যেটি, অর্থাৎ শালগ্রাম শিলা-রূপে বিষ্ণু, তা মানুষের সঙ্গেই অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত—এ-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা বিশ্বব্যাপী মানুষের জয়গান এবং ধর্মের অপরিসীম ঔদার্যের কথাই ঘোষণা করে। [সমাপ্ত] ❑

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

উৎসব-অনুষ্ঠানাদি অথবা পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য উৎসব-অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির কিংবা পরলোকপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের দপ্তরে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হয় না।

—সম্পাদক

বুসান এশিয়াড, স্বপ্নের দিগ্বলয়

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলাধূলায় ভারত এগোচ্ছে। সদ্যসমাপ্ত বুসান এশিয়ান গেমস, তারও মাসখানেক আগে ম্যাঞ্চেস্টার কমনওয়েলথ গেমস ক্রীড়াজগতে ভারতের অগ্রগতির ইঙ্গিত বহন করছে। 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' ২০০৪ এথেন্স অলিম্পিকের আগে ভারতের ক্রীড়ামানের এ হেন উত্তরণ স্বপ্ন দেখাচ্ছে ক্রীড়ামোদীদের।

বুসানে, এমনকি ম্যাঞ্চেস্টারেও ভারতের সাফল্যের সিংহভাগ জুড়ে ছিলেন মহিলা ক্রীড়াবিদরা। আবার ম্যাঞ্চেস্টারে চমকপ্রদ সফল, কিন্তু বুসানে চূড়ান্ত ব্যর্থ— এমন কয়েকজন মহিলা ক্রীড়াবিদ ভারতের সার্বিক পারফরমেন্সের সমীকরণ কিছুটা বদলে দিয়েছেন। পরিবর্তে যাঁদের ওপর বিশেষ ভরসা করেননি কেউই, তাঁরাই বিজয়মঞ্চে সগৌরবে উঠে দাঁড়িয়েছেন। অঞ্জলি ভাগবৎ, কুঞ্জরানী দেবী, সোনামচা চানুরা যদি হন হতাশার প্রতীকী ব্যঞ্জনা, তবে নীলম জে. সিং, অঞ্জু জর্জ, সোমা বিশ্বাস, সরস্বতী সাহা-রা প্রাণানন্দের বহিঃপ্রকাশ। এঁদের সঙ্গেই নাম করতে হয় মাঝারী পাল্লার দৌড়বীর কে. এম. বীনামলের। বুসানে তাঁর গলায় উঠেছে দুটি সোনা-সহ তিনটি পদক। অলিম্পিকের দৌড় ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে এই কেরল-কন্যার।

২৯ সেপ্টেম্বর দিনটি শুধু এশিয়াডের ইতিহাসেই নয়, সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যতের পক্ষেও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সংগঠক দক্ষিণ কোরিয়া প্রতিবেশী তথা দীর্ঘদিনের শত্রু উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে একযোগে মার্চপাস্ট করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। সারা বিশ্ব সে-ঘটনা প্রত্যক্ষ করে টিভির পর্দায়। সভ্যতার ক্রান্তিলগ্নে এই ঘটনাটি সত্যিই হৃদয় উদ্বেল করে দেয়, নতুন করে স্বপ্ন দেখায়। সন্ত্রাসবাদ, রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের এই অশনি-সঙ্কেতের মধ্যে একটুকরো রুপোলী আলোর রেখা এই মধুর সহাবস্থান। বস্তুত, খেলাধুলাই পারে দ্বন্দ্ব-বিভেদ ভুলিয়ে পরকে আপন করার শিক্ষা দিতে।

মার্চপাস্টে ভারতের পতাকা বহন করেন হকির তারকা ধনরাজ পিল্লাই। যোগ্য ব্যক্তির হাতেই উঠেছিল ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার অস্তিত্বরক্ষার ভার। মধ্য ত্রিশের এই ফরোয়ার্ড এখনো তাঁর ছন্দোবদ্ধ দৌড়, অনুপম শরীরী দোলা, সর্বোপরি স্টিকওয়ার্কের জাদুতে মোহিত করে রাখেন মানুষকে। এশিয়াডে তরুণ ও মোটামুটি অনভিজ্ঞ একটি দলকে তিনি একার ক্ষমতায় টেনে নিয়ে গেছেন ফাইনালে। সেমিফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে-খেলাটা খেলেছিলেন ধনরাজ, তা চিরকাল মনে রাখবে বুসানের মানুষ। পাশে সঙ্গত করার মতো কেবল গগন অজিত সিং। দীপক ঠাকুর ব্যর্থ, প্রভজ্যোৎ সিং আহত হয়ে মাঠের বাইরে। 'বুড়ো' ধনরাজ আর গগন অজিত মিলে ছিন্নভিন্ন করে দেন পাক ডিফেন্সকে। ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে একসময় ০-৩ গোলে পিছিয়ে পড়েও শেষপর্যন্ত ৩-৪ গোলে হার তুল্যমূল্য লড়ে। জিতলে এই সোনাটিই হতো সবচেয়ে মহার্ঘ ও তাৎপর্যপূর্ণ। হকিতে ছেলেরা তবু মান রেখেছেন, কিন্তু মেয়েদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে একরাশ হতাশা ও লজ্জা। অথচ তাঁদের ওপর আশা ছিল অনেক বেশি। কমনওয়েলথ গেমসে ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারানোর পর এশিয়াডে চিন, কোরিয়ার হাতে তাঁদের এভাবে বিধ্বস্ত হওয়ার কোন যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা নেই।

বাইচুঙ ভুটিয়ার নেতৃত্বে ভারতীয় ফুটবল দল শুরু করেছিল ভালভাবেই। বাংলাদেশ ও তুর্কমেনিস্তানকে তিন গোল করে দিয়ে শুরু করলেও চিনের বিরুদ্ধে সুযোগ নষ্টের খেসারত দিয়ে হেরে বিদায় নেয় ভারত। গ্রুপ রানার্স হিসাবে যদিও বা দ্বিতীয় রাউণ্ডে যাওয়ার সুযোগ ছিল, কিন্তু অন্য গ্রুপে বাহরিন-প্যালেস্তাইন নিজেদের মধ্যে গড়াপেটা খেলে ভারতকে ছিটকে দেয়। তবে সবমিলিয়ে ফুটবলে এশিয়াড-সহ নানা প্রতিযোগিতায় এবছর ভারতের ভূমিকা আশাপ্রদ। ফুটবলে এদেশে সম্ভাবনার বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে। বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান খেলোয়াড় উঠে এসেছেন, আর নেতৃত্বে অনবদ্য বাইচুঙ।

প্রসঙ্গত, বুসান এশিয়াড চলাকালীনই এশিয়ান ফুটবল কন-ফেডারেশন বাইচুঙ ভুটিয়াকে 'এশিয়ার সেরা ফুটবলার' ঘোষণা করেছেন।

এশিয়াডে ভারতের প্রথম সোনাটি অবশ্য এসেছে অপেক্ষাকৃত কম জনপ্রিয় মুকার থেকে। ডাবলসে ইয়াসিন মার্চেন্ট ও রাফাত হাবিবের সৌজন্যে অর্জিত এই সোনার ঔজ্জ্বল্য অচিরেই মিলিয়ে যায় বিশ্ববন্দিত গীত শেঠীর অপরিণামদর্শিতায়। তাঁর মতোই বিস্ময়কর শুটিংয়ে অঞ্জলি ভাগবৎ, যশপাল রাণা, ভারোত্তোলনে কুঞ্জরানী, সোনামচা চানুর পদস্খলন। কমনওয়েলথে এঁরাই ভারতের সাফল্যের সিংহভাগ জুড়ে ছিলেন, অথচ এশিয়াডে তাঁদের খুঁজে পাওয়া গেল না! অঞ্জলি, যশপালরা দলগত এয়ার রাইফেলে দুটো রুপো পেলেও ব্যক্তিগতভাবে চূড়ান্ত হতাশ করেছেন। কুঞ্জরানীর বয়স হয়েছে, তাঁর পক্ষে আর বড়মাপের সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয়—চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেল বুসান এশিয়াড। ব্যাডমিন্টনে গোপীচাঁদ, বক্সিংয়ে মহম্মদ আলি কামারকে ঘিরে অনেক আশা ছিল, তাঁরাও বুদবুদের মতো ভেসে উঠে মিলিয়ে গেছেন। একদা ভারতের রক্ষাকবচ কুস্তিও ভারতকে ভরসা দিতে পারছে না। মাত্র একটি ব্রোঞ্জ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে গুরু হনুমানের ভারতকে।

টেনিসে লিয়েণ্ডার পেজ-মহেশ ভূপতি জুটি তাঁদের নামের প্রতি সুবিচার করেছেন। যাবতীয় তিক্ততা ও মনোমালিন্য ভুলে তাঁরা কোর্টে নেমে একাট্টা হয়ে খেলে সহজেই ডাবলসে সোনা জিতে নিয়েছেন। মহেশ ভাল পার্টনার পেলে মিক্সড ডাবলসেও ভারতকে গর্বিত করতে পারতেন। রুপোর বদলে তখন সোনাই হতো যথার্থ স্বীকৃতি। আর কবাডিতে পরপর চারবার এশিয়া-সেরা হয়ে ভারত আর কবাডি একে অপরের সম্পূরক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরো জোরালো ছিল মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ডের যোগদানে। তবুও কোন দলই ভারতের সোনাজয়ে সামান্যতম বাধার সৃষ্টি করতে পারেনি।

গলফে লক্ষ্মণ সিংয়ের পর দ্বিতীয় গলফার হিসাবে শিব কাপুর এশিয়াডে সোনা পেলেন। কুড়ি বছরের শিব যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষিত, তার সুফল পেলেন হাতেনাতে। সামুদ্রিক ইভেন্ট সেইলিংয়ে নীতিন মোঙ্গিয়াকে অনৈতিক আইনি জটিলতায় জড়িয়ে তাঁর বরাদ্দ সোনাটি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। নাহলে এক্ষেত্রে সোনাই ছিল ভারতের অবশ্যপ্রাপ্য। তবে এই সোনাটি সহ হকি, শুটিংয়ের যাবতীয় সাফল্য-ব্যর্থতার দোলাচল ভুলিয়ে দিয়েছে ট্র্যাক অ্যাণ্ড ফিল্ডের অসাধারণ পারফরম্যান্স। সুনীতারানীর সোনাটি বাদ দিয়েও ৬টি সোনার পদক ভারতের জিম্মায়। চিন, কাজাকস্থানের পর তৃতীয় শক্তি হিসাবে ভারতের অবস্থান এশিয়ান গেমস অ্যাথলেটিক্সে যাবতীয় জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটাবে। অলিম্পিক, বিশ্বকাপ অ্যাথলেটিক্সের সেমিফাইনালে দৌড়েছেন বীনামল। প্রত্যাশামতোই মহাদেশীয় স্তরে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৮০০ মিটারে সোনা, ৪×৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে সোনা জিততে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন কেরল-কন্যা। বাংলার দুই 'কনককন্যা' সোমা বিশ্বাস ও সরস্বতী সাহা জ্যোতির্ময়ী শিকদারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উঠে এসেছেন। সোমার দুর্ভাগ্য, হেপ্টাথলনে মাত্র ১২ পয়েন্টের জন্য সোনা হাতছাড়া হয়ে যায়। সোমার উচ্চতা ও লম্বা স্ট্রাইডে ছন্দোবদ্ধ দৌড় দেখে অনেক বিশেষজ্ঞ তাঁর মধ্যে অলিম্পিকের পদকজয়ীকে দেখতে পাচ্ছেন। সরস্বতীও যথেষ্ট সম্ভাবনাময়ী। এশীয় স্তরে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা যাতে বিশ্বস্তরে তাঁকে সমান গৌরবে অধিষ্ঠিত করতে পারে, সেটা দেখা উচিত তাঁর অ্যাথলিট-স্বামী ও কোচ অমিত সাহার। মহিলাদের লংজাম্পে অঞ্জু জর্জ, ডিসকাসে নীলম জে. সিং, শটপাটে বাহাদুর সিংরা যে বড় কিছু করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন, তার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে। একাধিক ইভেন্টে সোনার পদক ছাড়াও রুপো কিংবা ব্রোঞ্জ পদক অর্জিত হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের অগ্রগতির দিক্‌চিহ্নটি।

প্রত্যাশামতোই চিন সব সেরা হয়ে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। ১৫০টি সোনা-সহ ৩০০-র বেশি পদক চিনের হেফাজতে। দুই কোরিয়া, জাপানও আগের চেয়ে অনেক বেশি পদক পেয়েছে। বিশ্বক্রীড়ার সঙ্গে এশিয়ার গুণগত মানের তফাৎ ক্রমেই কমে আসছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো দেখা যাবে, 'এশিয়ার মুক্তিসূর্য' হিসাবে চিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়াকে টপকে অলিম্পিকেও শীর্ষস্থান দখল করে নিয়েছে। একশো বছরেরও আগে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহাশক্তির আধার হয়ে উঠতে চলেছে চিন। তাই চিনকে আদর্শ করে খেলাধূলার বিশ্বমঞ্চে উঠে আসাই হবে ভারতের বর্তমান লক্ষ্য। বিশাল জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে চিন আজ খেলাধূলা-সহ সব ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে তা ভাবলে শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে আসে। চিন পারলে আমরাও পারব—এই বোধ গোটা দেশের জনমানসে সঞ্চারিত হলে অলিম্পিকে আমরাও দীপ্তিময় হয়ে উঠতে পারি। ❑

আদি শঙ্করাচার্য ১৫

দক্ষিণ ভারতের চোলদেশে এক ব্রাহ্মণ বংশে কুমারিল ভট্টের জন্ম। তাঁর ভাইপো বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্মকীর্তি। একদা বেদান্তের পক্ষ নিয়ে কুমারিল তাঁর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হন। পণ অনুযায়ী তাঁকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু ভিতরে হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর ছিল অসীম শ্রদ্ধা। একদিন বৌদ্ধবিহারে আচার্য ধর্মপাল বেদের নিন্দা করছিলেন। উপস্থিত বৌদ্ধভিক্ষুরা হঠাৎ দেখেন, কুমারিল কাঁদছেন।



বৌদ্ধভিক্ষুগণ আচার্যকে একথা জানালে তিনি কুমারিলকে ডাকলেন।



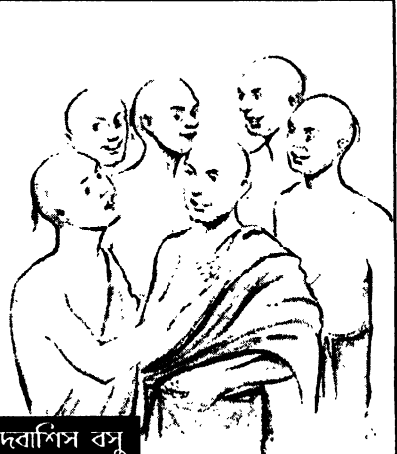
আচার্য ও কুমারিলের মধ্যে দারুণ তর্ক-বিচার শুরু হলো। বেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর কুমারিল আচার্যের সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করতে লাগলেন।



তখন উত্তেজিত বৌদ্ধভিক্ষুগণ কুমারিলকে জোর করে প্রাসাদের ছাদ থেকে ফেলে দিলেন। কুমারিল শুধু ভগবানকে স্মরণ করলেন।



সবাই অবাক হয়ে দেখল, কুমারিলের মৃত্যু হয়নি। তিনি অক্ষত। হিন্দু ব্রাহ্মণগণ এই সংবাদ পেয়ে তাঁকে খুব সম্মান করে ফিরিয়ে আনলেন। এই ঘটনাকে তাঁরা বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মের বিজয় হিসাবে গ্রহণ করলেন।



চিত্ররূপ ঃ দেবাশিস বসু



কুমারিল ভট্টকে সামনে রেখে হিন্দুরা মগধে এক বিরাট বিচারসভার আয়োজন করে ধর্মপালকে আহ্বান করলেন। ঠিক হলো, পরাজিত পক্ষ বিজয়ীর ধর্মমত গ্রহণ করবে, নয়তো প্রাণত্যাগ করবে। ধর্মপাল বসলেন কুমারিল ভট্টের মুখোমুখি।

পুনর্জন্ম

বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য



বিপস্‌সনা বা বিদর্শন ধ্যানভাবনা ভগবান বুদ্ধের আবিষ্কার। জীবের দুঃখে করুণাপরবশ হয়ে রাজকুমার সিদ্ধার্থ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে সাধনার পথে এগিয়েছিলেন। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর কষ্ট দেখে তিনি যখন জানলেন যে, জীবমাত্রকেই এই দুঃখ ভোগ করতে হয় তখন তাঁর মন বিদ্রোহ করে উঠল। তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হলেন যে, জীবকে এই দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার পথ দেখাবেন। ক্রমে তিনি বুঝতে পারলেন, জন্মালে এ-দুর্ভোগ ভুগতেই হবে, এর হাত থেকে নিস্তার নেই। তাহলে উপায় কি? একমাত্র উপায় জন্মগ্রহণ না করা অর্থাৎ পুনর্জন্ম রোধ করা। তারই অন্বেষণে তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করে বিভিন্ন আর্যগুরুর কাছে দীক্ষা নিলেন, সাধনা করে সিদ্ধও হলেন। কিন্তু যখন বুঝতে পারলেন, এই সিদ্ধি তাঁকে অভীষ্ট ফল দিতে পারবে না, তখন তিনি বোধিবৃক্ষতলে কঠোর তপস্যা করে জ্ঞানলাভ করলেন এবং পুনর্জন্ম থেকে মুক্তির পথ নিরূপণ করে জনসমাজে তা প্রচার করলেন পরবর্তী ৪৫ বছর ধরে। সেই জ্ঞানই হলো বিদর্শন ধ্যান।

কিন্তু একটা প্রশ্ন মনে দেখা দেয়—বুদ্ধের এই আবিষ্কারের পিছনে পূর্বসূরিদের অবদান কি অস্বীকার করা যায়? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের মুখে বারবারই এই পুনর্জন্ম রোধের কথা ধ্বনিত হয়েছে। সিদ্ধার্থ যখন আর্য ঋষিদের কাছে সাধনা করেন তখন বেদ, উপনিষদ্‌, গীতা নিশ্চয়ই তাঁকে অধিগত করতে হয়েছিল। সুতরাং তিনি যে সেখান থেকে পুনর্জন্মরোধের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন, সেকথা কি অস্বীকার করা যায়? এবং সেই ইঙ্গিতকে অবলম্বন করেই সিদ্ধার্থ তাঁর নিজস্ব দার্শনিক জ্ঞান ও উপলব্ধির দ্বারা 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' প্রচার করেছিলেন—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ

"কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্‌।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্‌।।"
(৫।২৬)

অর্থাৎ কামক্রোধ থেকে মুক্ত, সংযতচিত্ত, আত্মজ্ঞ সন্ন্যাসিগণের জীবিতাবস্থায় ও মৃত্যুর পরে উভয়ত ব্রহ্মনির্বাণ বিরাজ করে। সেই জীবন্মুক্তগণের মৃত্যুর পরে আর দেহধারণ হয় না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, গৌতম বুদ্ধ যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বন করে ধ্যান করার নির্দেশ দিয়েছেন—তাতেও ঠিক এই কথাই বলা হয়েছে। অভিধর্মে সউপাদিশেষ ও অনুপাদিশেষ নির্বাণের যে-বিবরণ পাওয়া যায়, এই শ্লোকেও ঠিক সেই কথাই বলা হয়েছে। নির্বাণের পরে যে দেহধারণ হয় না—সেকথাও বলা হয়েছে। এর থেকে অনুমান করতে পারা যায়, আর্য ঋষিদের মধ্যে অনেকেই এই পথের কথা জানতেন ও পরম নিষ্ঠার সঙ্গে ধ্যান করে এই অবস্থা প্রাপ্ত হতেন। কিন্তু তাঁরা বুদ্ধের মতো মানুষের কল্যাণে এই জ্ঞান প্রচার করার কথা চিন্তা করেননি। সাধারণ্যে এই পথের কথা অজ্ঞাত ছিল। পরমকারুণিক বুদ্ধ নিজে নির্বাণলাভ করেই তুষ্ট হননি, জনগণের কল্যাণের জন্য অক্লান্তভাবে এই জ্ঞানের আলোক বিতরণ করে গিয়েছেন।



গীতার অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে রয়েছে—

"মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্‌।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ।।"

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, মুক্ত মহাত্মারা আমাকে লাভ করে আর দুঃখালয় নশ্বর সংসারে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না।

এখানেও পুনর্জন্মরোধের ইঙ্গিত। গীতায় বারবার এই পুনর্জন্মরোধের কথা বলা হয়েছে। বুদ্ধ এখান থেকেই তাঁর পথনির্দেশ লাভ করেছিলেন—একথা মনে করলে বোধ হয় ভুল হবে না।

ঐ অধ্যায়ের আরেকটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।।" (১৬)

অর্থাৎ হে অর্জুন, পৃথিবী থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সপ্তলোকই পুনরাবর্তনশীল। কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে লাভ করলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

এখানেও দেখছি পুনর্জন্ম রোধ করার পথ দেখানো হয়েছে। সেই পথ কি?—আমাকে লাভ করতে হবে। এই 'আমি' কে? বুদ্ধ এখান থেকেও তাঁর পথের ইঙ্গিত

পেয়েছেন। তিনি ধ্যানের মধ্যে সেই 'আমি'কেই অন্বেষণ করেছেন এবং জ্ঞানলাভ করে জানতেও পেরেছেন, সেই 'আমি' কে? উপনিষদে আছে, 'আত্মানং বিদ্ধি' অর্থাৎ নিজেকে জান। বুদ্ধের আবিষ্কৃত 'বিদর্শন ধ্যান' সেই নিজেকে জানারই ধ্যান—আত্মদর্শন। জানতে জানতে একসময় মন শান্ত হয়ে আসে, তখন সাধক অনেক কিছুই জানতে পারেন, বুঝতে পারেন।

গীতায় এরকম বহু শ্লোক আছে। যেমন—

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।।"

(১৫।৬)

অর্থাৎ তাঁকে লাভ করলে সংসারে আর পুনর্জন্ম হয় না। যা চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি প্রকাশ করতে পারে না, তাই আমার পরম ব্রহ্মপদ।

আবার সেই পুনর্জন্মরোধের কথা। শ্রীকৃষ্ণ বারবার যে পরম প্রাপ্তির কথা বলেছেন, বিদর্শন ধ্যানেরও চরম লক্ষ্য সেই পরম প্রাপ্তি অর্থাৎ আত্মদর্শন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যা রূপকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন, বুদ্ধ তাকেই অত্যন্ত সহজ করে প্রচলিত পালি ভাষায় মানুষের মধ্যে তা প্রচার করেছেন। তাই তিনি কোন রূপকের আশ্রয় না নিয়ে সহজ কথায়, সহজ উদাহরণের মাধ্যমে নির্বাণকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

এছাড়াও উপনিষদে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৩।১৪।১)—এধরনের বাণীর মধ্য দিয়ে জীবের স্বরূপ বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে।

বিদর্শন ধ্যানের চরম লক্ষ্যই নির্বাণলাভ করা। বুদ্ধ মানুষের সামনে এই চরম ও পরম লক্ষ্যের পথনির্দেশ দিয়ে জগতের যে কল্যাণসাধন করেছেন তা আর কেউ পারেননি —একথা অনস্বীকার্য। শাস্ত্রে বহু নির্দেশ থাকে, বহু ইঙ্গিত থাকে, তার ব্যাখ্যাও পণ্ডিতেরা নানাভাবে করে থাকেন। "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তিঃ" (ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪৬)—সনাতন শাস্ত্রের এই গুহ্য ইঙ্গিত হয়তো অনেক আর্য ঋষিকেই নির্বাণলাভের সহায়তা করেছিল। তাঁরা নিজেরাই সে অনির্বচনীয় সুখ উপভোগ করে গেছেন, সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করেননি। কিন্তু বুদ্ধ নিজে জেনেই ক্ষান্ত হননি, জগতের কল্যাণে নিজের এই উপলব্ধি গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে পদব্রজে ঘুরে অক্লান্তভাবে, অকৃপণ হাতে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাই আজ তিনি ভগবান বুদ্ধ—সকলের পূজ্য, প্রণম্য।

"নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স।" ❑

চয়ন

রানী ময়নামতীর তিনটি উপদেশ (নিহালজী)

সিদ্ধা যোগিনী ময়নামতী সাধু হইবার জন্য গৃহত্যাগ-কালে নিজের পুত্র গোপীচন্দ্রকে এই তিনটি উপদেশ দিয়াছিলেন—"(১) কেল্লায় বাস করবে, (২) নিত্য মিষ্টান্ন খাবে এবং (৩) নিত্য ফুলশয্যায় নিদ্রা যাবে।"

পুত্র বলিলেন ঃ "মা, আমি সাধু, যদৃচ্ছা বিচরণকারী, যথাপ্রাপ্তে জীবনধারণকারী। তোমার এ উপদেশ আমি কি করে পালন করব?"

ময়নামতী বলিলেন ঃ "পুত্র! তুমি আমার কথার রহস্য বোঝনি। শোন—

(১) 'কেল্লায় বাস করবে' মানে সর্বদা সৎসঙ্গে, সাধুদের মধ্যে থাকবে। সৎসঙ্গই সাধুর কেল্লা—তাকে বিপদে আপদে, নানা প্রলোভন থেকে রক্ষা করে।

(২) 'মিষ্টান্ন খাবে' মানে যখন খুব ক্ষুধা পাবে তখন খাবে। ক্ষুধার মুখে যা পাবে, যা খাবে—তাই অমৃত বলে মনে হবে, মিষ্টান্নতুল্য মনে হবে এবং তা বেশ হজমও হবে।

(৩) 'ফুলশয্যায় নিদ্রা যাবে' মানে যখন খুব নিদ্রার আবেশ হবে তখন নিদ্রা যাবে। তখন ভূমি বা পাষাণও ফুলশয্যা বলে মনে হবে। কঠিন পাষাণও তখন পুষ্পশয্যাবৎ কোমল মনে হবে এবং সুনিদ্রাও হবে।" ❑



সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গের পরিণাম (ব্রজবাসী)

সৎসঙ্গ করিলে কি লাভ হয়? জ্ঞানীর সঙ্গ করিলে কি লাভ হয়?—সৎসঙ্গে তত্ত্ববিষয়িণী চর্চাই হয়। তাহাতে কত সংশয়ের নিবৃত্তি হয়, তত্ত্বে নিষ্ঠা হয়। আর অসৎ অজ্ঞানীর সঙ্গে হয় পরনিন্দা, পরচর্চা, রাগদ্বেষ—তাহার পরিণাম মারামারি, ঝগড়া ইত্যাদি। তাই কথায় বলে—

"জ্ঞানী মিলে জ্ঞানীকো, করে জ্ঞানকী বাত্।
মূরখ মিলে মূরখ কো, ক্যায় ঘুসা ক্যায় লাত্।।"

অর্থাৎ জ্ঞানীরা জ্ঞানের কথাই বলিবেন। আর মূর্খরা হয় পরস্পর ঘুসোঘুসি শুরু করিবে, না হয় লাথালাথি। ❑

স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলীতে গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ

দীপককুমার দাশ

[পূর্বানুবৃত্তি]

দেশে-বিদেশে বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করা ও সেখান থেকে সংগঠিতভাবে, পরিকল্পনামাফিক যুবক প্রচারকের মাধ্যমে বেদান্ত ও শ্রীশ্রীঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচার করা ছিল স্বামীজীর অন্যতম জীবনব্রত। ২০ নভেম্বর ১৮৯৬ তিনি লণ্ডন থেকে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখেছেন ঃ "এই তিনটি কেন্দ্র (আলমোড়া, কলকাতা, মাদ্রাজ) নিয়েই এখন আমরা কাজ আরম্ভ করব; পরে বোম্বাই ও এলাহাবাদে যাব। প্রভুর ইচ্ছা হলে এসকল কেন্দ্র থেকে আমরা যে শুধু ভারতকেই আক্রমণ করব তা নয়, আমরা পৃথিবীর সমস্ত দেশেই দলে দলে প্রচারক পাঠাব।"

৩০ মে ১৮৯৭ আলমোড়া থেকে প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা পত্রে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন ঃ "এক নির্গুণ ব্রহ্ম বেশ বুঝিতে পারি, আর তাহারই ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ প্রকাশ দেখিতে পাইতেছি—ঐসকল ব্যক্তিবিশেষের নাম ঈশ্বর যদি হয় তো বেশ বুঝিতে পারি—তদ্ভিন্ন কাল্পনিক জগৎকর্তা ইত্যাদি হাস্যকর প্রবন্ধে বুদ্ধি যায় না।

"ঐপ্রকার 'ঈশ্বর' জীবনে দেখিয়াছি এবং তাঁহারই আদেশে চলিতেছি। স্মৃতি-পুরাণাদি সামান্যবুদ্ধি মনুষ্যের রচনা; ভ্রম, প্রমাদ, ভেদবুদ্ধি ও দ্বেষবুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। তাহার যেটুকু উদার ও প্রীতিপূর্ণ—তাহাই গ্রাহ্য, অপরাংশ ত্যাজ্য। উপনিষদ্ ও গীতা যথার্থ শাস্ত্র—রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, কবীরাদিই যথার্থ অবতার; কারণ ইঁহাদের হৃদয় আকাশের ন্যায় অনন্ত ছিল—সকলের উপর রামকৃষ্ণ; রামানুজ-শঙ্করাদি সঙ্কীর্ণ-হৃদয় পণ্ডিতজী মাত্র। সে-প্রীতি নাই, পরের দুঃখে তাঁহাদের হৃদয় কাঁদে নাই—শুষ্ক পাণ্ডিত্যই।"

ভারতবাসীর সর্বাত্মক উন্নতির জন্য স্বামীজী একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যার সক্রিয় তৎপরতায় দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সেবা করা সম্ভব হবে। তাঁর অনুগামী নিঃস্বার্থ সন্ন্যাসীরা যেভাবে দরিদ্রনারায়ণের সেবাকার্যে ব্রতী হয়েছিলেন, তা দেখে তিনি আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। আর একাজের পিছনে রয়েছেন যিনি—সেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তিনি বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিলেন। ৯ জুলাই ১৮৯৭ আলমোড়া থেকে মিস মেরী হেলকে স্বামীজী লিখছেন ঃ "তোমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠত, যদি তুমি দেখতে আমার ছেলেরা দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও দুঃখকষ্টের ভেতর কেমন কাজ করছে, কলেরা-আক্রান্ত 'পারিয়া'র মাদুরের বিছানার পাশে বসে কেমন তাদের সেবাশুশ্রূষা করছে এবং অনশনক্লিষ্ট চণ্ডালের মুখে কেমন অন্ন তুলে দিচ্ছে। প্রভু আমাকে সাহায্য করছেন, তাদেরও সাহায্য পাঠাচ্ছেন। মানুষের কথা আমি কি গ্রাহ্য করি? সেই প্রেমাস্পদ প্রভু আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন। যেমন আমেরিকায়, যেমন ইংল্যাণ্ডে, যেমন ভারতের রাস্তায় রাস্তায় যখন ঘুরে বেড়াতাম—কেউ আমায় চিনত না, তখন যেমন সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।"

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ স্বামীজী 'মঠ বেলুড়, হাওড়া' থেকে যে-চিঠিটি লিখেছেন মাদ্রাজে অবস্থানরত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে, তাতে বিধৃত হয়ে রয়েছে তাঁর অন্তরের দীর্ঘদিন-লালিত স্বপ্ন—রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নিজস্ব জমি, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে এক শক্তিশালী ভাবান্দোলন। তিনি লিখেছেন ঃ "যে-জমি কেনা হইয়াছে, আজ আমরা উহার দখল লইব এবং যদিও এখনই ঐ জমিতে মহোৎসব করা সম্ভবপর নহে, তথাপি রবিবারে উহার উপর আমি কিছু না কিছু করাইব। অন্তত শ্রীজীর [শ্রীরামকৃষ্ণের] ভস্মাবশেষ ঐদিনের জন্য আমাদের নিজস্ব জমিতে লইয়া গিয়া পূজা করিতেই হইবে।" নতুন মঠে ঠাকুরের পূজা সম্পর্কে স্বামীজী লিখছেন ঃ "আমরা পূজার কাজটাকে অনেকটা সংক্ষিপ্ত করিয়া আনিয়াছি। তোমার 'ক্লীং ফট্', ঝাঁজ ও ঘণ্টার যেভাবে কাটছাঁট করা হইয়াছে, তাহাতে তুমি মূর্চ্ছা যাইবে। জন্মতিথি-পূজা শুধু দিনের বেলায় হইয়াছে এবং রাত্রে সকলে আরামে ঘুমাইয়াছে।" এই পত্রের শেষে আরেকটি সংবাদ আছে ঃ "এখানে মঠ তো স্থাপিত হইল। আমি আরো সাহায্যের জন্য বিদেশে যাইতেছি।... শ্রীমহারাজের [শ্রীরামকৃষ্ণের] আশীর্বাদে ভারত বাঁচিয়া উঠিবে।"

১৮৯৮-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে লেখা স্বামীজীর চিঠিপত্রে দেখতে পাই, তিনি মাঝেমধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। তখন তিনি কখনো শ্রীনগরে, কখনো লাহোরে। সে-সময়টায় সমস্ত দায় সম্পন্ন করে তিনি হাল্কা হতে চাইছেন। ফলত ১৮৯৮-এর শেষ থেকেই তাঁর অন্তরে বৈরাগ্যভাব অধিকতর প্রকট হয়ে উঠেছে, তাঁর মনে

চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের সুর বেজেছে। ১৮৯৯-এর চিঠিপত্র-গুলিতে এই একই প্রকার ভাব দেখা যাচ্ছে।

১৭ জানুয়ারি ১৯০০ স্বামীজী ওলি বুলকে লিখছেন ঃ "বুঝতে পারছি যে, আমি আর বক্তৃতামঞ্চ থেকে বাণী প্রচার করতে পারব না।... এতে আমি খুশি। আমি বিশ্রাম চাই। আমি যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তা নয়, কিন্তু এর পরবর্তী অধ্যায় হবে—কথা নয়, অলৌকিক স্পর্শ, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল।"

৭ মার্চ ১৯০০। সান ফ্রান্সিস্কো থেকে তিনি ওলি বুলকেই লিখছেন ঃ "আপনিই আমার একমাত্র বন্ধু, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে জীবনের ধ্রুবতারা-রূপে গ্রহণ করেছেন; আপনাকে আমি যে এত বিশ্বাস করি, তার রহস্য ওখানেই। অন্যেরা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ভালবাসে; কিন্তু তাদের ধারণাও নেই যে, তারা আমাকে শ্রীরামকৃষ্ণেরই জন্য ভালবাসে। তাঁকে বাদ দিয়ে আমি শুধু কতকগুলি অর্থহীন ও স্বার্থপূর্ণ ভাবুকতার বোঝা মাত্র।"

জীবনের শেষের দিকটায় স্বামীজী পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছেন এক নিবিড় আত্মচেতনায়। ৭ এপ্রিল ১৯০০ জনৈক আমেরিকাবাসীকে সান ফ্রান্সিস্কো থেকে তিনি লিখেছেন ঃ "এখন আমি এত স্থির ও প্রশান্ত হয়ে গেছি, আগে কখনো এমনটি ছিলাম না।" লিখছেন ঃ "আমার তরণী ক্রমশ সেই শান্তির বন্দরের নিকটবর্তী হচ্ছে, যেখান থেকে সে আর বিতাড়িত হবে না। জয়, জয় মা। আর আমার নিজের কোন আকাঙ্ক্ষা বা উচ্চাভিলাষ নেই। মায়েরই নাম ধন্য হোক। আমি শ্রীরামকৃষ্ণের দাস। আমি যন্ত্রমাত্র—আর কিছু জানি না, জানবার আকাঙ্ক্ষাও নেই।"

কর্মফল, খ্যাতি-অখ্যাতি, লাভালাভ এবং সবকিছু পার্থিব ভাবনা থেকে নিবৃত্ত হয়ে মনে মনে স্বামীজী এক অমেয় শান্তি প্রার্থনা করছেন এবং বারবার বলছেন—মায়ের ইচ্ছাই সব, তিনি সেভাবেই পরিচালিত হচ্ছেন—যেভাবে মা চাইছেন।

১৮ এপ্রিল ১৯০০ ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আত্মমগ্ন বিবেকানন্দ 'জো'কে [ম্যাকলাউডকে স্বামীজী এই নামে ডাকতেন] একটি অসাধারণ চিঠিতে লিখছেন ঃ "যতই যা হোক, জো, আমি এখন সেই আগেকার বালক বৈ আর কেউ নয়, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর বিভোর হয়ে যেত। ঐ বালক-ভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি; আর কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যাকিছু করা গেছে, তা ঐ প্রকৃতিরই ওপরে কিছুকালের জন্য আরোপিত একটা উপাধিমাত্র। আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি—সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর—যাতে আমার প্রাণের ভিতরটাকে পর্যন্ত কণ্টকিত করে তুলছে! বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে! জীবনের প্রতি আকর্ষণও কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে! রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহ্বান! যাই, প্রভু যাই! ঐ তিনি বলছেন, 'মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক (সংসারের ভাল-মন্দ সংসারীরা দেখুক), তুই (ওসব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে) আমার পিছু পিছু চলে আয়!'—যাই, প্রভু যাই!

"হ্যাঁ, এইবার আমি ঠিক যাচ্ছি। আমার সামনে অপার নির্বাণ-সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি। সময়ে সময়ে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি, সেই অসীম অনন্ত শান্তির পারাবার—মায়ার এতটুকু বাতাস বা একটা ঢেউ পর্যন্ত যার শান্তিভঙ্গ করছে না!... আহা-হা, কী স্থির প্রশান্তি! চিন্তাগুলি পর্যন্ত বোধ হচ্ছে যেন হৃদয়ের কোন্ এক দূর, অতি দূর অন্তস্তল থেকে মৃদু বাক্যালাপের মতো ধীর অস্পষ্টভাবে আমার কাছে এসে পৌঁছাচ্ছে। আর শান্তি—মধুর, মধুর শান্তি—যাকিছু দেখছি শুনছি, সবকিছু ছেয়ে রয়েছে! মানুষ ঘুমিয়ে পড়বার আগে কয়েক মুহূর্তের জন্য যেমন বোধ করে—যখন সব জিনিস দেখা যায়, কিন্তু ছায়ার মতো অবাস্তব মনে হয়—ভয় থাকে না, তাদের প্রতি একটা ভালবাসা থাকে না, হৃদয়ে তাদের সম্বন্ধে এতটুকু ভাল-মন্দ ভাব পর্যন্ত জাগে না—আমার মনের এখনকার অবস্থা যেন ঠিক সেইরূপ, কেবল শান্তি, শান্তি! চারপাশে কতকগুলি পুতুল আর ছবি সাজানো রয়েছে দেখে লোকের মনে যেমন শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হয় না, এ অবস্থায় জগৎটাকে ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে; আমার প্রাণের শান্তিরও বিরাম নেই! ঐ আবার সেই আহ্বান! যাই প্রভু, যাই।

"এ অবস্থায় জগৎটা রয়েছে; কিন্তু সেটাকে সুন্দরও মনে হচ্ছে না, কুৎসিতও মনে হচ্ছে না। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ানুভূতি হচ্ছে, কিন্তু মনে 'এটা ত্যাজ্য ওটা গ্রাহ্য'—এমন ভাবের কিছুমাত্র উদয় হচ্ছে না।... যাকিছু দেখছি শুনছি—সবই সমানভাবে ভাল ও সুন্দর বোধ হচ্ছে; কেননা নিজের শরীর থেকে আরম্ভ করে তাদের সকলের ভিতর বড়-ছোট, ভাল-মন্দ, উপাদেয়-হেয় বলে যে একটা সম্বন্ধ এতকাল ধরে অনুভব করেছি—সেই উচ্চ-নীচ সম্বন্ধটা এখন যেন কোথায় চলে গেছে! আর, সবচেয়ে উপাদেয় বলে এই শরীরটার প্রতি এর আগে যে-বোধটা ছিল, সকলের আগে সেইটাই যেন কোথায় লোপ পেয়েছে! ওঁ তৎ সৎ!" [সমাপ্ত] ❑

এই বিশেষ প্রবন্ধটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

অথর্ববেদ পরিচয়

জলধর ভট্টাচার্য


থর্ব' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'রোগ বা বার্ধক্যাদি কারণে চলচ্ছক্তিহীনতা'। কিন্তু অথর্ববেদে (১৯।৬।৯। ৫) এই শব্দ 'পরমাত্মা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ঋগ্বেদের কয়েকটি মন্ত্রে বিশেষ গৌরবের সঙ্গে অথর্বা ও অঙ্গিরা ঋষিদ্বয়ের নাম আছে। তাঁরা অথর্ববেদ সঙ্কলন করেন। তাই এই দ্রষ্টা ঋষিদ্বয়ের নামানুসারে এই বেদকে 'অথর্বাঙ্গিরস' বলা হতো। 'ভৃগুরার্থবা', 'ভৃগ্বাঙ্গিরা' নামও পাওয়া যায়, কারণ ভৃগু ঋষিও ছিলেন অন্যতম দ্রষ্টা।

অথর্ববেদ গদ্যপদ্যময়, কুড়িটি কাণ্ডে বিভক্ত। ঋগ্বেদের কিছু কিছু মন্ত্রও এই বেদে উল্লিখিত আছে। অথর্ববেদের ব্রাহ্মণ গোপথ; উপনিষদ্ মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য ও প্রশ্ন; নয়টি শাখার মধ্যে শৌনক ও পৈপ্পলাদ ছাড়া অন্যগুলি অবলুপ্ত। (বেদপাঠের বিভিন্ন প্রণালীকে 'শাখা' বলে।)

ঋগ্বেদের পর যাগযজ্ঞের আড়ম্বর বেড়েই চলছিল। অথর্ববেদে এসকলের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আবার এই বেদে 'মারণ', 'উচাটন', 'বশীকরণ' প্রভৃতির উল্লেখ থাকার জন্য শুদ্ধচিত্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ এই বেদের প্রতি ঘৃণার ভাবই পোষণ করতেন। ফলে সুদীর্ঘকাল যাবৎ এই বেদ অপাঙ্ক্তেয় হয়ে ছিল। ঋক, যজুঃ ও সাম—এই তিনখানিকেই বেদ বলা হতো। সেজন্য বেদের অপর নাম হয় 'ত্রয়ী'। মহাভারতের যুগে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস অথর্ববেদকে চতুর্থ বেদ হিসাবে গণ্য করেন।

বৈশিষ্ট্য ঃ ঋগ্বেদে আছে দেবগণের স্তুতির জন্য আবৃত্তিযোগ্য সূক্ত, যজুর্বেদে আছে যাগযজ্ঞের বিধি ও জপনীয় পাঠ, সামবেদে দেবগণের প্রীতির জন্য সঙ্গীতাকার মন্ত্র; কিন্তু অথর্ববেদে আছে নানা গার্হস্থ্য ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের উপায়। নানা অশুভ অমঙ্গল দূরীকরণের জন্য, রোগব্যাধির প্রতিকারের জন্য, দীর্ঘায়ুলাভের জন্য নানা উপায়-প্রক্রিয়াদিতে অথর্ববেদ ভরপুর। নানা জাদুমন্ত্র, তুকতাক, ঝাড়ফুঁক প্রভৃতি দ্বারা রাক্ষস, পিশাচ, ভূতপ্রেতাদি বিতাড়ন করতেন গ্রামের জাদু-পুরোহিতেরা। তাঁদের 'সামান্' (আজকের ভাষায় 'ওঝা') বলা হতো। এইসব ছাড়া এই বেদে আছে 'চূড়াকরণ', 'বিবাহ', 'শান্তি-স্বস্ত্যয়ন', নানা আভ্যুদয়িক কর্ম, এমনকি শবদাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মের বিধান ও আনুষ্ঠানিকতা। আছে 'মারণ', 'উচাটন', 'বশীকরণ' প্রভৃতি গুপ্তবিদ্যার কথা, যা রাজাদের শত্রুজয়ে সাহায্য করত। স্ত্রীজাতির সমস্যাবলী এখানে বিশেষ স্থান পেয়েছে। কৃষিকর্ম, গোসম্পদ, বৃক্ষলতার শ্রীবৃদ্ধিও এই বেদে গুরুত্বলাভ করেছে। এসব ছাড়াও এই বেদে আছে ব্রহ্মলাভের পথনির্দেশ, যেজন্য এই বেদকে 'ব্রহ্ম বেদ' বলা হয়। এই বিপুল বিষয়বৈচিত্র্য-সহ অথর্ববেদ 'ভুক্তি ও মুক্তি' উভয়েরই সন্ধান দেয়। এজন্য এই বেদ অন্যান্য বেদসকলের মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

রচনাকাল ঃ এই বেদের প্রকৃত রচনাকাল কালগর্ভে অবলুপ্ত। আগেই বলা হয়েছে, ঋগ্বেদে অথর্বা ঋষির নাম আছে। তাছাড়া এই বেদে আদিম যুগের ভাবনা বর্ণিত। এসকল এই বেদের সুপ্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর 'ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন ঃ "অথর্ববেদের রচনাকাল সম্পর্কে যেকোন বিবরণই কতকটা স্ববিরোধী বলে মনে হতে পারে, কেননা সংক্ষেপে বলতে গেলে ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদের তুলনায় অথর্ববেদ একইসঙ্গে প্রাচীনতর ও নবীনতর।" (পৃঃ ১৭২)

সমন্বয় ঃ যজুর্বেদের শেষদিকে বৃহদাকার যাগযজ্ঞের প্রতি মানুষের বিশ্বাস শিথিল হয়ে এসেছিল। অন্যদিকে নাস্তিকতাবাদী চার্বাক (চার্বাকের একটি প্রচণ্ড বেদবিরোধী উক্তি— "ত্রয়োবেদস্য কর্তারঃ ভণ্ড ধূর্ত নিশাচরঃ), জৈন ও বৌদ্ধগণ প্রচণ্ড বেদবিরোধিতা শুরু করেছিলেন। এই জটিল পরিস্থিতির মধ্যে অথর্ববেদ রাজগণের কাছে প্রিয় হয়েছিল, কারণ এর মধ্যে রাজার রাজ্যলাভ, রাজকৃত্য, শত্রুজয় প্রভৃতি ছিল। এইসকল কারণে অথর্ববেদের পুরোহিতেরা রাজপুরোহিত বলে সম্মানিত হয়েছিলেন। এই সময়ে অনিবার্যভাবে অথর্ববেদ 'বেদ' হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করেছিল এবং 'ব্রহ্ম বেদ' নামে অভিহিত হয়েছিল। এই বেদের পুরোহিতগণ 'ব্রহ্মা' নামে এক নতুন শ্রেণীর পুরোহিত হিসাবে সম্মানিত হন।

সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সভ্যতায় দুটি ভাবধারা সুস্পষ্ট ছিল—একটি আর্যদের উচ্চকোটি দর্শন, গ্রহনক্ষত্রচর্চা, বহু দেবতা, আধ্যাত্মিকতা; অন্যটি অনার্য লৌকিক লঘু ভাবধারা, যার মধ্যে ছিল গার্হস্থ্য জীবনের সমস্যাবলীর প্রাধান্য, জাদুতত্ত্ব, ঝাড়ফুঁক, তুকতাক প্রভৃতি। এই দ্বিতীয় ভাবটি অথর্ববেদে সম্পৃক্ত। এই দুই ভাবধারা নিজেদের মধ্যে দূরত্ব সত্ত্বেও পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে চলেছিল। অথর্ববেদের 'কৃত্যা' বা জাদুতত্ত্বজ্ঞাপক কিছু কিছু মন্ত্র ঋগ্বেদে স্থান পেয়েছিল; অথর্বা ঋষির নাম ঋগ্বেদে সর্বোচ্চ সম্মান সহকারে উল্লিখিত হয়েছিল। আবার ঋগ্বেদের 'দেবীসূক্ত' ও 'সংজ্ঞানসূক্ত' অথর্ববেদে উল্লিখিত হয়েছিল। অথর্ববেদে নানা বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছিল, যাদের বীজ ঋগ্বেদে লক্ষ্য করা যায়। এমতাবস্থায় যখন আর্য ঋষিগণ সকল অনুকম্পা ত্যাগ করে অথর্ববেদকে স্বীকৃতি দিলেন, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে আর্য-অনার্য ভাবধারার মধ্যে এক ঐতিহাসিক মেলবন্ধন সৃষ্টি হলো। আরো অগ্রসর হয়ে বলা যায়, দুই ভাবস্রোতের সম্মিলনে ভারতীয় সংস্কৃতি এক নতুন গতিবেগ লাভ করল। তৎকাল থেকে সম্ভবত অথর্ববেদই মানুষের দৃষ্টি অধিক আকৃষ্ট করতে থাকল।

দেবতা ঃ প্রথম বেদত্রয়ে উল্লিখিত অনেক দেবতার নাম অথর্ববেদে নেই। এই বেদে অগ্নি, ইন্দ্র, নানা নামে সূর্য, অদিতি, সোম, বরুণ, রুদ্র, মহাদেব, বৃহস্পতি, মরুৎ, অশ্বিনীদ্বয় প্রভৃতির

নাম আছে। ঋগ্বেদে অনার্যদমনকারী হিসাবে ইন্দ্রের যে প্রচণ্ড ভূমিকা ছিল এখানে তা ভিন্নমুখী। প্রমাণিত হয়, অনার্যগণ ইতিপূর্বেই পরাজিত হয়েছিল।

অথর্ববেদে 'স্কম্ভ' নামে একজন নতুন দেবতার নাম আছে; তিনি ব্রহ্মারও পূর্ববর্তী এবং 'জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা' নামে অভিহিত। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ "শিবলিঙ্গ পূজার উৎপত্তি অথর্ববেদ-সংহিতার যূপস্তম্ভের প্রসিদ্ধ স্তোত্র হইতে। উক্ত স্তোত্রে অনাদি অনন্ত স্তম্ভের অথবা স্কম্ভের বর্ণনা আছে এবং উক্ত স্কম্ভই যে ব্রহ্ম, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ('বাণী ও রচনা', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৯) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শিশ্নপূজা ঋগ্বেদসম্মত নয়। শিশ্নদেবের সঙ্গে আর্যদের বিরোধের কথা আছে ৭।২১।৫ নং ঋকে।

স্বর্গের কথা অথর্ববেদে যৎসামান্য। এতে ইহলোকের ওপর অধিক গুরুত্ব অর্পিত হয়েছে। মানুষ এখানে অনেক আত্মপ্রত্যয়-যুক্ত ও বিজ্ঞানমুখী। ঋষিগণ শুধুমাত্র প্রার্থনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, পরন্তু ভয়ঙ্কররূপে প্রতিভাত রুদ্র প্রকৃতিকে জাদুমন্ত্র বা যেনতেনপ্রকারেণ সম্মোহিত করে আশু এবং প্রত্যক্ষ ফললাভের প্রতি জোর দিয়েছিলেন।

ঋগ্বেদের 'দেবীসূক্ত' বা 'পরমাত্মসূক্ত' (১০।১২৫) পুনরুক্ত হয়েছে অথর্ববেদে। এই সূক্তে অম্ভৃণ মহর্ষির কন্যা বাক্ সকল দেবতার সঙ্গে আপন সত্তার একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। অথর্ববেদের আরো কয়েকটি স্থানে ব্রহ্মলাভের কথা আছে। যেমন ৯।৫।২০ নং সূক্তে জীবাত্মা ও পরমাত্মাস্বরূপ দুটি পাখি একটি বৃক্ষে অবস্থিত—এরূপ দেখানো হয়েছে। মুণ্ডক উপনিষদেও (৩।১।১) এর উল্লেখ আছে।

অথর্ববেদের অন্য একখানি উপনিষদ্ 'মাণ্ডুক্য'। পরবর্তী কালে আচার্য শঙ্করের পরমগুরু গৌড়পাদ এই উপনিষদের একখানি কারিকা প্রণয়ন করেছিলেন, যা অদ্বৈতবেদান্তের সর্বপ্রথম সুসংহত ব্যাখ্যা।

দেশ, সমাজ ঃ অথর্ববেদে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা (৪।৩।৫, ৭।২।২), রাত্রির বর্ণনা (১৯।৬।২), 'ভূমিসূক্ত' বা 'পৃথিবীসূক্ত' (১২।১।১) প্রভৃতি কাব্যরসে ভরপুর। ভূমিসূক্তে পৃথিবীকে 'মা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। জন্মভূমিকে মাতৃভূমি বলে অনুভব করার প্রথম প্রেরণা আমরা অথর্ববেদের এই মহামূল্যবান সূক্তে খুঁজে পাই। ঋগ্বেদে (৫।৮৪) এবং শুক্লযজুর্বেদেও (৩৫।২১, ৩৬।১৩।১) পৃথিবীর কথা আছে, কিন্তু এবিষয়ে অথর্ববেদের প্রার্থনা অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

ঋগ্বেদের 'পুরুষসূক্ত'-এ যে চতুর্বর্ণের কথা আছে, তা পাকাপোক্ত হয়েছিল অথর্ববেদের যুগে। তথাপি ১৯।৭।৬।৩ নং সূক্তে বলা হয়েছে—"হে অগ্নি, আমাকে পরিদৃশ্যমান সকলের দ্রষ্টা ব্রাহ্মণদের, শূদ্রদের ও বৈশ্যদের প্রিয় কর।" লক্ষণীয়, ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বও এখানে স্বীকৃত হয়েছে। ঋগ্বেদের 'সংজ্ঞানসূক্ত'-এর "সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ" মন্ত্রটি অথর্ববেদেও (৬।৭।২) উল্লিখিত হয়েছে।

ঐ যুগে রাজা ছিলেন, যুদ্ধবিগ্রহও হতো। একটি সূক্তে (৩।৪) 'রাষ্ট্র' শব্দটি আছে। ঐ যুগে পশুপালন পূর্বানুসৃত বৃত্তি ছিল। তথাপি সপ্তসিন্ধু ও গাঙ্গেয় উপত্যকার উর্বর ভূমিতে বসবাস করার ফলে কৃষিকার্য বিশেষ সুবিধাজনক হয়েছিল। যজুর্বেদের মন্ত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়, ইতিপূর্বে লাঙলে কাঠের ফলকের পরিবর্তে লোহার ফলক ব্যবহার শুরু হয়েছিল। অথর্ববেদের বিভিন্ন মন্ত্রে কৃষিকর্ম, বৃষ্টিকামনা, গোসম্পদের বৃদ্ধি প্রভৃতির কথা আছে।

একটি নতুন বৃত্তি—বাণিজ্য—পূর্বেই শুরু হয়েছিল, যজুর্বেদে তার প্রমাণ আছে। অথর্ববেদের যুগে তা সমৃদ্ধ হয়েছিল। একটি মন্ত্রে (৩।৩।৫) পণ্য বিক্রয় করে লাভের সঙ্গে মূলধন ঘরে আনার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

অথর্ববেদের 'ব্রাত্যসূক্ত'-এ (১৫শ কাণ্ড) ব্রাত্যাধিকারীর প্রশংসা করা হয়েছে। তাঁরা বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন না। ঋষিগণের ধর্মীয় উদারতার একটি প্রমাণ এখানে পাওয়া যায়। তাঁদের চিন্তায় যাঁরা বৈদিক যজ্ঞে বিশ্বাস করতেন না, তাঁদেরও স্থান ছিল।

অথর্ববেদে নানা ওষধি ও পৌষ্টিক প্রক্রিয়ার কথা আছে। এই সূত্রে শল্যচিকিৎসা, অস্থিবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতিও এই বেদ থেকে উৎসৃত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, এই বেদের নয়টি শাখার অন্যতম হলো 'চরণবৈদ্য' অর্থাৎ 'ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক'।

একটি সূক্তে (১১।৩।২) ব্রহ্মচর্যের জয়গান গেয়ে বলা হয়েছে—"ইন্দ্রও ব্রহ্মচর্যের দ্বারা দেবগণের জন্য স্বর্গলাভ করেছিলেন।" আরেকটি সূক্তে (১।১।৩) যোগসাধনার কথা আছে। এই বেদকে তন্ত্রশাস্ত্রেরও উৎস বলে মনে করা হয়।

অথর্ববেদের একটি সূক্তে স্তম্ভযুক্ত গৃহনির্মাণের কথা আছে—"হে গৃহ, তুমি প্রশস্ত স্তম্ভযুক্ত হয়ে ভোগসকলের ধারকরূপে বিদ্যমান হও।" (৩।৩।২) এথেকে মনে হয়, সেযুগে আর্যগণ অট্টালিকা নির্মাণ শুরু করেছিলেন। সহজেই অনুমেয়, তাঁদের পূর্বেকার যাযাবর জীবনে পাকাবাড়িতে বসবাস করা সম্ভব ছিল না। এই মন্ত্রে নবনির্মিত গৃহে সর্altবিধ কল্যাণ কামনাও করা হয়েছে।

একটি মন্ত্রে (১৮।৩।১) 'পুরনো ধর্ম অনুপালনের জন্য' নারীর সহমরণের কথা আছে। তবে তা ছিল ঐচ্ছিক—'ভোগাকাঙ্ক্ষা থাকলে' তাঁকে নিবৃত্ত হতে বলা হয়েছে।

উপসংহার ঃ শুক্লযজুর্বেদের ৩৭।২৪ সূক্তে যে-উচ্চাশা লক্ষ্য করা যায়, অথর্ববেদেও (১৯।৭।৯) তা বিদ্যমান—

"পশ্যেম শরদঃ শতম্, জীবেম শরদঃ শতম্
বুধ্যেম শরদঃ শতম্, রোহেম শরদঃ শতম্
পূষেম শরদঃ শতম্, ভবেম শরদঃ শতম্
ভূয়েম শরদঃ শতম্, ভূয়সী শরদঃ শতম।।"

—হে সূর্য, তোমাকে দেখব শত বছর ধরে, শত বছর বেঁচে থাকব। সকল কর্ম জানব, উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধ হব, শত বছর পুষ্টিলাভ করব, শত বছর পুত্রাদিপ্রবাহে উৎপন্ন হব।

মন্ত্রটি একদিকে যেমন মানব-মনের শাশ্বত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, অন্যদিকে তেমনি ঐ যুগে আর্যদের সমৃদ্ধি (যা যজুর্বেদের যুগেই শুরু হয়েছিল) এবং তৎপ্রসূত উচ্চাভিলাষের প্রমাণ বহন করে। ❑

অফারোর উত্তরণ

সংকর্ষণ মাইতি

অন্ধকারের বুক চিরে বিদ্যুতের রেখাটি নিমেষের মধ্যে নদীর এপার থেকে ওপারে। কুটিরের বাইরে যে বৃষ্টির সঙ্গে ঝড় তোলপাড় চালাচ্ছে, তার ভয়ঙ্কর রূপকে প্রত্যক্ষ করাল বিদ্যুতের ঝলকানি। নির্ভীক অফারো ক্ষণিকের জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। এই গাঢ় কাজলকালো অন্ধকার, এই ঝড়বৃষ্টি, এই নির্জনতা ভাল লাগছে না তার। দমকা ঝড়ের আঘাতে কুটির হয়তো খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে কোন এক সময়। তারপর তীরের ফলার মতো বৃষ্টির ছাট এসে গায়ে বিঁধবে। শিউরে ওঠে অফারো। না, কুটিরকে যেমন করে হোক ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা করতেই হয়। খুঁটিতে দুটো হাত শক্ত করে চেপে ধরা। ঝড়ের বিপক্ষে ঠেলে রাখা। প্রভুর শরণাপন্ন হয়েও এই দামাল ঝড়বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই নেই। চোয়াল শক্ত। মানসিকভাবে প্রভুর বিরোধিতা করে অফারো—প্রভু, তোমার কাজ করতে করতে আজ আমি বুড়ো হলাম, তবু দেখা দিলে না। না দেখা দাও, কিন্তু কষ্ট দেবে কেন?

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে অফারোর মনে পড়ল গির্জার মোহন্তর কথা—গিনি এই ঝড়বৃষ্টির রাতে গির্জার ভিতরে আরামে আছেন। দেখাচ্ছি মজাখানা! সকাল হোক, কাজে ইস্তফা দেবই। ঐ মোহন্তকে দুটো কথা শুনিয়ে যাব। বলে কিনা—'প্রভুর কাজ করে যাও, একদিন দেখা মিলবে।' বছরের পর বছর কাজ করে যাচ্ছি, তবু দেখাসাক্ষাৎ নেই। কী আশ্চর্য! এরাই মানুষকে স্তোকবাক্য দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। উঃ! এর চেয়ে আগের দলটায় থেকে অনেক ঘুরেছি, অনেক দেখেছি। সকাল হোক, দলটাকে যেকোন উপায়ে খুঁজে বের করতেই হবে। প্রভুর কাজ করবই না। ঢের হয়েছে, আর না।

মনের আক্ষেপটাকে মেটাতে সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলল অফারো। ওদিকে ঝড়-জলের তেজ আরো বাড়ে। দাঁতে দাঁত চেপে বলিষ্ঠ দুপায়ে ভর দিয়ে অফারো চালার বাখারি দুহাতে ঠেলে ধরে। পিছনে লণ্ঠনের আলো নিবুনিবু। বাখারি থেকে হাত সরানো যাচ্ছে না। ছাড়লেই উড়ে যাবে চালা। মাঝে মাঝে হতাশ চোখে তাকিয়ে থাকে নিবুনিবু লণ্ঠনের দিকে। মোহন্তর মুখখানি আবার মনে ভেসে ওঠে। গির্জার দিকে কটাক্ষ চাউনি।

মোহন্ত বলেছিলেন ঃ এই গির্জা প্রভু যিশুখ্রিস্টের। তিনি সর্বশক্তিমান।

মুহূর্তে অফারোর মুখে তাচ্ছিল্যের শব্দ—হুঃ, সর্বশক্তিমান। এতই যদি শক্তিমান, তাহলে এই ঝড়-বৃষ্টি থামাচ্ছে না কেন? কেমন শক্তিমান, পরিচয় পাওয়া তো দূরের কথা, সর্বশক্তিমানের শরীরটাই দেখা গেল না! বরং ঐ আগের সর্দার লোকটার সঙ্গে থেকে তার শক্তির পরিচয় কিছু মিলেছে। অফারোর মনে সর্দারের পেল্লাই চেহারাটি ভেসে ওঠে।

✲

দশবছর বয়সেই নিজের দিকে তাকিয়ে অফারো ভেবেছিল, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর পাঁচজনকে ছাড়িয়ে যাবে। পেল্লাই চেহারাটা পেয়েছিল কুড়ি বছর বয়সেই। লোকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত। অহঙ্কারী হতে বেশি সময় নেয়নি। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সে নিজের চেহারাটার দিকে তাকিয়ে অফারো স্থির করে ফেলে, কোনদিন দুর্বল লোকের অধীনে চাকরি করবে না। গ্রামের পর গ্রাম দাপিয়ে বেড়িয়েছে শরীরটাকে দেখাতে। হ্যাঁ, লোকে দেখেই মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়েছে—রূপকথার দৈত্য বুঝি এইরকম! কথাটা কর্ণগোচর হতেই ঠোঁটের কোণ দিয়ে হাসির প্রকাশ। তাহলে লোকে আমাকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছে!

গ্রামের পর গ্রাম দাপিয়ে বেড়ানো, কিন্তু ঘুরে ঘুরে বেড়ালে তো চলে না। সংসার—নিদেনপক্ষে নিজের পেটটা তো চালাতে হয়। চাকরি চাই। কিন্তু নিজের আরোপিত শর্ত—কোনভাবেই দুর্বল লোকের অধীনে চাকরি করা চলবে না।

ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সাক্ষাৎ। অপ্রত্যাশিতভাবে যাঁর সাক্ষাতে আসা—তিনি চলেছেন এক বিরাট ঘোড়ার পিঠে চড়ে। পিছনে অনুচররা। সবাই ঘোড়সওয়ার। সামনে যিনি, তাঁর শরীরখানা দেখে অফারো অবাক। ওর চেয়েও দেড়গুণ বড় চেহারা। উনি দলের সর্দারই হবেন। নিঃসংশয় হতে জঙ্গলের মধ্যে বিশ্রামরত দলের একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করে—ঐ যে, সামনে বুঝি তোমাদের সর্দার?

হ্যাঁ।—লোকটি জানায়।

আচ্ছা, উনি কি খুব বলবান?

নিশ্চয়ই। পৃথিবীতে ওঁর থেকে কেউ বেশি শক্তি ধরে না। তাই আমরা ওঁর অধীনে কাজ করি। তুমিও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পার। তোমার যা শরীর, একদিন সহকারী সর্দার হতে পারবে।

পুলকিত মন অফারোর। জানতে চাইল ঃ তোমাদের কাজটা কি যদি একটু বল।

ও, শোন তাহলে। আমাদের কাজ হলো লুণ্ঠন করে বেড়ানো। কেউ বাধা দিলে লড়াই করতে হয়। এপর্যন্ত যত লড়াই হয়েছে, আমরা কিন্তু হারিনি।

লুণ্ঠন তাহলে একমাত্র কাজ!—অফারো বিস্ময় প্রকাশ করে।

হ্যাঁ, লুণ্ঠন আমাদের একমাত্র কাজ। তোমার ঐ পেল্লাই শরীর কী কাজে লাগবে শুনি?

অফারো বলল ঃ আমি তো কাজ করতে চাই। বিশ্বাস কর, কাজ করতে চাই।

তাহলে মাটি কাট, হাতে পয়সা আসবে। আর ঐ শরীর নিয়ে মাটি কাটতে দেখে লোকে হাসাহাসি করতেও পারে। ঠেলা সামলাতে পারবে তো?

অফারো মুশকিলে পড়ে। তাই তো! এই শরীর নিয়ে মাটি কাটা! শর্তের কথা মনে হতেই শরীরটা টানটান সোজা হয়ে যায়।

কাজ যতই ক্রূর হোক, শর্ত তো একটাই। অধিকতর বলবানের অধীনে চাকরি করা। আর সেই বলবান লোকটি হলো লুঠেরা দলের সর্দার। কাজে যোগ দিল অফারো। নানান জায়গায় লুণ্ঠন। নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে স্বয়ং সর্দারের ভূয়সী প্রশংসাও জুটল।

একদিন দলটি একটি সুন্দর পথে যেতে যেতে হঠাৎ মাঠে নেমে পড়ে। ব্যাপার কি? অফারো সঙ্গের সাথীকে জিজ্ঞেস করল ঃ এত সুন্দর পথে যেতে যেতে কেন পথটা পরিবর্তন করা হলো?

সাথীটি বলল : রাস্তার পাশে ঐ যে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে, ওর পাশ দিয়ে যেতে সর্দার পছন্দ করেন না।

অফারোর মনে খটকা। কেন এরা এদিক দিয়ে যেতে চায় না? নিশ্চয়ই ওখানে এমন কেউ আছে, যে এই সর্দারের থেকে বলবান। একসময় অফারো সুযোগ বুঝে দলছুট। দীর্ঘদিন লুণ্ঠন, নির্যাতন করে করে বিতৃষ্ণ। কর্ম থেকে ছুটি নেওয়ার ইচ্ছা। দূরে বাড়িটার দিকে তাকায়। বাড়িটার ওপরে একটা ক্রুশচিহ্ন। তারপর ধীর পদক্ষেপে বাড়িটার দিকে এগোয়।

প্রবেশদ্বারের সামনে সিঁড়ির ওপর বসে আছে অফারো। একসময় গির্জার মোহন্ত দেখেন, বিশালদেহী এক যুবক সিঁড়ির ওপর। প্রশ্ন করেন—কে তুমি? কী জন্যে এখানে এসেছ?

অফারো সবকিছু ব্যক্ত করে। মোহন্ত ভুল ভাঙালেন : তুমি যে সর্দারের কাছে ছিলে, ও ঈশ্বরের বিরোধী পাপপুরুষ—শয়তান।

চমকে ওঠে অফারো।—ইস্! এতদিন শয়তানের অধীনে থাকা! ছিঃ! ছিঃ!

মোহন্ত বললেন : তুমি যে জায়গায় এসেছ, এখানে ঈশ্বরপুত্র যিশুখ্রিস্টের মূর্তি রয়েছে। আমরা এখানে তাঁর উপাসনা করি এবং তাঁরই কাজ করি। তিনি সবচেয়ে শক্তিমান। দেখলে না, শয়তান এই শক্তিমান পুরুষকে ভয় করে বলেই দূর থেকে পালিয়ে গেল। যাক, তুমি বিশ্রাম করে খেয়ে নাও। যদি তাঁর কাজ করতে চাও, তাহলে করতে পার।

আচ্ছা, ওঁর দেখা পাব তো?—অফারোর কৌতূহলী জিজ্ঞাসা।

মোহন্ত আশ্বাস দিলেন : অবশ্যই পাবে। তবে কাজের মধ্য দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। কাজে সন্তুষ্ট হলে তিনি দেখা দেন।

কী কাজ করলে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন?

এজগতে বহু কাজ রয়েছে। কাজ করা মানেই তাঁর সেবা করা। আর তুমি যদি সত্যি সত্যি কাজ করতে চাও, তাহলে মানুষের সেবার কাজে লেগে যেতে পার। কিছুটা দূরে একটা ছোট্ট নদী আছে। নদীতে জলের টান প্রবল। হেঁটে পার হতে হয়। লোকের বড্ড কষ্ট হয়। তুমি যদি তাদের পারাপারে একটু সাহায্য কর, তাহলে প্রভু সন্তুষ্ট হবেন।

বিশ্বাসী অফারো একান্ত মনে ঐ কাজে লেগে গেল। গজারি গাছের অনতিদূরে ছোট্ট কুটির বানিয়ে বাস করা। আহারের ব্যবস্থা গির্জা থেকেই। গজারি গাছের ডাল কেটে লাঠি বানিয়ে নেওয়া—যেটি লোক পারাপারে সাহায্য করে। অর্থাৎ খরস্রোতের মধ্যে লাঠিটাকে অবলম্বন করে পার হওয়া। মাস যায়, বছর যায়, অফারো কাজ করতে করতে বুড়ো হয়। মনে জিজ্ঞাসা—যাঁর কাজ করছি তাঁর তো একদিনও সাক্ষাৎ পেলাম না! তিনি কি আমার কাজে খুশি নন?

⁂

ঝড়ের বেগ আরো বাড়ে। থেকে থেকে দমকা ঝোড়ো হাওয়া কুটিরকে টলিয়ে দেয়। অনেকক্ষণ ঠেলে রাখার দরুন হাত-পা ঝিনঝিনিয়ে ওঠে অফারোর। প্রতিরোধ শিথিল হলেই যেকোন সময় কুটির উড়ে যেতে পারে। জোরে আসা দমকা ঝড়ে মাথার ওপর চালের কিছু বিছালি উড়ে যেতেই বৃষ্টি মাথায় পড়ে। আর রক্ষা করা সম্ভব নয়—যখন অফারো ভাবছে, ঠিক তখনি গজারি গাছের তলা থেকে শিশুর আর্ত আবেদন—

অফারো, অফারো, শিগ্‌গির এস—

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না অফারো। এমন সময় শিশু! ডাকছে আবার গজারিতলা থেকে!

শিশুটি আবার ডাকল : অফারো, আমি ভিজে যাচ্ছি, তুমি চট করে এস।

অফারো উচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করল : তুমি কে?

আমার বাড়ি ওপারে। শিগ্‌গির এস। গাছের তলায় আছি। শীতে কাঁপছি। তুমি আমাকে নিয়ে যাও।

সে কী করে হয়? আমি গেলে আমার ঘর ঝড়ে পড়ে যাবে। আমি ধরে রয়েছি, যাতে পড়ে না যায়।

মানুষের চেয়ে তোমার ঘররক্ষা আগে?

অফারো বলল—ঘর রক্ষা না করলে তোমাকে রাখব কোথায়? তুমি এক দৌড়ে চলে এস।

আমি চলতে পারছি না।

চলতে পারছ না? তুমি গাছের তলায় এলে কী করে?

ছুটে এসেছিলাম। হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেলাম। পা-টা মচকে গেছে কিনা জানি না, তবে দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে।—কথাটা বলেই শিশুটি কান্না জুড়ে দিলে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় অফারো। সিদ্ধান্ত নিল—ঘর থাক আর না থাক, আহত আর্ত শিশুটিকে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

কুটিরের বাইরে যেই নামা, মনে হলো ঝড়-বৃষ্টির বেগ কিছুটা কমেছে। আরেকটু এগোতে ঝড়-বৃষ্টি উধাও। অন্ধকার আকাশের দিকে তাকায় অফারো। হাজারো নক্ষত্র মিটিমিটি আলো জ্বেলেছে আকাশে। কুটিরের লণ্ঠনটা নিয়ে এবার গজারিগাছের দিকে গিয়ে অফারো দেখে, একটা ছোট্ট ছেলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে। টিকালো নাক, মাথায় একরাশ চুল, পরনে একফালি ট্যানা।

চল, তোমায় কুটিরে নিয়ে যাই।—হাত ধরে তুলতে যেতেই শিশুটি মত বদলে অন্য বায়না শুরু করল—

অফারো, বৃষ্টি থেমে গেছে। আমি বাড়ি যাব।

অফারো অবাক—সে কি! তোমায় নদী পার করাবে কে?

কেন, যেমন তুমি করে আসছ।

হুম্! এত রাতে! বৃষ্টির জলে নদীতে বান নেমেছে। আর হাঁটু-জল নেই, কোমর-জল।

শিশুটি বলল : আমার মতো ছোট্ট ছেলেকে পার করতে তোমার কোন অসুবিধা হবে না।

ডাঙায় বসে বলে দিলে? কেন, কী দরকার এখনি যাওয়া? কাল সকালে যাবে।

না, না, আমি মায়ের কাছে যাব।

মায়ের কাছে! কোথায় গিয়েছিলে?

সে অনেক দূরে, মামার বাড়ি। ছুটতে ছুটতে এসেছি। তবু রাত হয়ে গেল। আমি না গেলে মাকে কে দেখবে? মায়ের যে দারুণ অসুখ।

তাই নাকি?

অফারো, আমাকে পার করে দাও।

কাকুতিমিনতি-মাখা হাত দুখানি অফারোর দিকে। অফারো সমস্যার কথা জানায়—পা পিছলে পড়লেই খরস্রোতে তুমি হারিয়ে যাবে। আমার তো সেই আগের বয়স নেই যে, তুমি পড়ে গেলে ধরে ফেলব। তাছাড়া দেখতে পেলে তো ধরার চেষ্টা করব।

শিশুটি আকাশের দিকে হাত তুলে দেখায়—তুমি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখ, আকাশে কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে! ঐ নদীর জল দেখা যাচ্ছে। ওপারে গাছপালা।

সত্যিই অবাক অফারো। কৃষ্ণা চতুর্থীর চাঁদ। কী সুন্দর জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে নদীতে! দ্বিধা না করে সম্মতি জানাল : আচ্ছা লণ্ঠনটা রেখে দিয়ে আসি। আর লাঠিটা তো আনতে হবে।

অফারো এলে শিশুটি আবার বায়না ধরল : জান অফারো, আমি এক পা-ও চলতে পারব না। তুমি আমাকে কাঁধে করে নাও।

কী মুশকিল! তুমি আহত বলেই তো কাঁধে চড়বে। ওঠ, কাঁধে ওঠ।

শিশুটিকে কাঁধে নিয়ে অফারো নদীর মাঝ-বরাবর যেই এসেছে, অমনি শিশুটিকে বেশ ভারী মনে হতে লাগল।

কিহে ছোকরা, তুমি ক্রমশ ভারী হয়ে উঠছ যে!

কৈ, না তো।

না তো? না বাপু আর পারছিনে। এখানেই নামিয়ে দেব।

ঐ তো ডাঙা—আরেকটু।

শিশুটি সাহস যোগায়। অফারো বিরক্তি প্রকাশ করে : না না, আর পারছিনে। এখনি এখানে নামিয়ে দেব।

আমি জলে ভেসে গেলে তুমি সারা রাত কষ্ট পাবে না?

না, আমি কষ্ট পাব না।

হ্যাঁ হ্যাঁ জানি, তুমি কষ্ট পাবে। আপশোস করে বলবে—এতদিন কত জোয়ান, বয়স্ক মানুষকে পার করতে সাহায্য করেছি, কেউ আজ পর্যন্ত বিপদে পড়েনি। আর সামান্য শিশুটিকে পার করে দিতে পারলাম না!

অফারো রেগে যায়—কী বললে! সামান্য শিশু? সামান্য শিশুর মুখে তো বিজ্ঞের মতো কথাবার্তা! উঃ! যেমন করে হোক তোমায় পৌঁছে দিচ্ছি। রাত হয়ে গেল। ঘুমোতে হবে।

নদী পার করে শিশুটিকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে আবার কষ্টের কথা প্রকাশ করল অফারো : ছোকরা এত ভারী বলে জানতাম না। যাও, বাড়ি যাও। আর কোনদিন এসো না। এলেও পার করব না।

শিশুটি হেসে ফেলে। বলে : আমি এখনি তোমার কাঁধে চড়ে আবার ওপারে যাব।

কী, আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করা হচ্ছে? বদমায়েস ছেলে। কার ঘরের ছেলে হে তুমি?

শিশুটির মুখে খিলখিল হাসি। তুমি যার কাজ করে চলেছ অফারো।

অফারো তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে—স্পর্ধা তো কম না। আমি তোমাদের বাড়ির কাজ করে চলেছি? ডেঁপো ছেলে। বলি, বাড়িটা কোথায় হে? আমি একদিন যাব। আমি তোমার মায়ের কাছে যাব।

শিশুটি বলল : আমি এখনি নিয়ে যাব তোমায়। আমার মায়ের কাছে। ঐ হোথায়।

আঙুল দিয়ে গির্জার দিকে দেখিয়ে দিতেই অফারো পিছন ফিরে তাকায়। হতবাক অফারো। নিজের ছোট্ট কুটিরের মধ্যে আগুন জ্বলছে। সর্বনাশ! লণ্ঠনের আলো কীভাবে ছড়িয়ে পড়ল? ঊর্ধ্বশ্বাসে নদীর জল ভাঙতে ভাঙতে চলেছে অফারো। স্থির দৃষ্টিটা কুটিরের দিকেই, আশঙ্কার দৃষ্টি।

লণ্ঠনের আগুন নয়। কুটিরটাও অক্ষত। মনে হলো কুটিরের ভিতরে শত শত মোমবাতি জ্বলছে। কে জ্বালাল? ভাঙা দরজাটা ঠেলতেই আরো অবাক। সেই শিশু—একটা জায়গায় বসে হাসছে।

কি ব্যাপার তুমি! তুমি কী করে এলে? তুমি তো ওপারে ছিলে। কে-ই বা এত আলো জ্বালাল?—অফারো জিজ্ঞেস করল। শিশুটি ধীরকণ্ঠে বলল : অফারো, তুমি যেমন করে এসেছ, আমিও ঠিক সেইভাবে এসেছি। এসে দেখি, কে যেন আলো জ্বেলে রেখেছে। ঢুকে পড়লাম।

অফারোর আর সংশয় নেই। শিশুর বেশে প্রভু ছলনা করতে এসেছেন। নতজানু হয়ে বলল : সত্যি করে বলুন, আপনি কে?

অফারো, বলছিলাম না, যার কাজ করছ—আমিই সেই।

তাই? আমি বুঝব কী করে?

ও এই কথা? বেশ তোমার হাতে ঐ যে শুকনো গজারি গাছের লাঠিটা রয়েছে, আমার সামনে পুঁতে দাও। এখনি শুকনো লাঠি জীবন্ত হয়ে উঠবে।

অফারো সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা করতে গজারি গাছের লাঠিটা মাটিতে পুঁততেই তা পত্র-পুষ্পে সুশোভিত হয়ে ওঠে। অফারো অভিভূত।

প্রভু, এতদিনে আমায় দর্শন দিলেন? আমার কাজে আপনি সন্তুষ্ট?

মানবসেবায় যারা নিয়োজিত তাদের কাজে আমি বরাবর সন্তুষ্ট। আর কী চাও অফারো?

অফারো বলল : প্রভু, মানবসেবায় বাকি জীবনটা এইভাবে কাটিয়ে দিতে চাই।

না, তা হয় না। একটা বয়স পর্যন্ত মানুষের কায়িক পরিশ্রম করার ক্ষমতা থাকে। তারপর অবসর নিতে হয়। এই কাজে আবার নতুনরা আসবে। মানবসেবার মধ্য দিয়ে তারাও তাদের জীবন ধন্য করবে। অফারো, সত্য বলছি, তোমার কাজে আমি দারুণ খুশি। আজ থেকে তোমার নাম হলো—ক্রিস্টোফার।

প্রভু—

হ্যাঁ, আজ থেকে অফারো হলো ক্রিস্টোফার। তোমার এখানের কাজ শেষ। গির্জার মোহন্ত দারুণ অসুস্থ। গির্জার ভার তোমাকেই নিতে হবে। চলে এস আমার সঙ্গে।

কথাগুলি বলেই শিশু-যিশু অন্তর্হিত। মোমবাতিগুলি নিভে গিয়ে আবার অন্ধকার। অফারো ওরফে ক্রিস্টোফার প্রভুর অন্বেষণে চিৎকার করে : প্রভু, প্রভু আপনি কোথায়?

আমি বাইরে, তুমি চলে এস।

কাতরকণ্ঠে আবার ডাকে : প্রভু, প্রভু—

বাইরে প্রভু যিশুর হদিশ মেলেনি। সাড়াও না। শুধু একটি মোমবাতির জ্যোতি চোখে পড়ে। অসম্ভব জ্যোতি—শত মোমবাতির আলোর মিলিত জ্যোতি—একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে গির্জার দিকে। দৃষ্টি স্থির রেখে ধীর পদক্ষেপে এগোতে থাকে ক্রিস্টোফার।

সেবাকর্মের মধ্য দিয়ে প্রভু যিশুর দর্শনলাভ এবং প্রভুর নির্দেশে এক কর্মক্ষেত্র থেকে আরেক কর্মক্ষেত্রে উত্তরণ ঘটতে চলেছে। আজ সত্যিই আনন্দের দিন। ❑

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

প্রসঙ্গ আরারিয়া আশ্রম

'উদ্বোধন'-এর গত আষাঢ় ১৪০৯ সংখ্যায় কাটিহার রামকৃষ্ণ আশ্রমের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব ও আশ্রমের ইতিবৃত্ত পড়ে বিশেষ আনন্দিত হলাম। তাতে লেখা ছিল—"১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কাটিহার-পূর্ণিয়া-আরারিয়া অঞ্চলে ত্রাণকার্যের জন্য বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ প্রেরণ করেন স্বামী মহাদেবানন্দজীকে।" এই প্রসঙ্গে অর্থাৎ আরারিয়া আশ্রম সম্পর্কে আরো কিছু বলার আছে; কারণ আরারিয়া আশ্রম থেকেই পরবর্তী কালে কাটিহার ও পূর্ণিয়া আশ্রমের সূচনা হয়।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে আরারিয়া মহকুমার অন্তর্গত বহু গ্রামে কলেরার ভীষণ প্রাদুর্ভাব হয়। ফলে বহু মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই দুঃসংবাদ পেয়ে তৎকালীন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ প্রচুর ওষুধপত্র-সহ স্বামী মহাদেবানন্দজী ও স্বামী গিরিজানন্দজী-সহ কয়েকজন সাধুকে পাঠান। মহামারীর প্রকোপ কমে গেলে অন্যান্য সাধুদের সঙ্গে স্বামী গিরিজানন্দজী মঠে ফিরে যান। কিন্তু থেকে যান শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী মহাদেবানন্দজী। তাঁরই উদ্যোগে একটি কমিটি গঠন করে 'আরারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম' নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয় ম্যাকিনটোস ক্লাব ভবনে। এর প্রেসিডেন্ট হন আব্দুল মজিদ এবং সম্পাদক টি. পি. দাশগুপ্ত।



কাটিহার আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরে নেওয়া সমবেত চিত্র
চেয়ারে—মাঝখানে স্বামী মহাদেবানন্দজী মহারাজ, পাশে ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য মহারাজ ও গোষ্ঠ মহারাজ। সামনে নিচে বসা—স্বামী সম্পূর্ণানন্দজী মহারাজ, সুরেন সাহা এবং অন্যান্য সাধু ও ব্রহ্মচারিগণ।

এরপর ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে সেবাশ্রমের কাজের পরিধি বেড়ে যাওয়ায় বর্তমান স্থানে আশ্রমটি স্থানান্তরিত হয়। তারপর স্বামী মহাদেবানন্দজী মহারাজ ক্রমশ কাটিহার ও পূর্ণিয়া আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য এই দুই নতুন আশ্রমের পরিচালনা তিনি আরারিয়া আশ্রম থেকেই করতেন। ক্রমে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে কাটিহার আশ্রম রামকৃষ্ণ মঠের শাখাকেন্দ্র রূপে গণ্য হয়। আরারিয়া সেবাশ্রমে বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির, দুটি দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি গ্রন্থাগার, একটি ছাত্রাবাস এবং দুটি গেস্ট হাউস (পুরুষ ও মহিলা) আছে।

স্বামী ধীরানন্দ
সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, আরারিয়া, বিহার

প্রসঙ্গ 'উদ্বোধন'

বই মানুষের সবচেয়ে বড় সঙ্গী। বিশেষ মানসিকতায় বিশেষ লেখা মনকে তৃপ্তি দেয়। 'উদ্বোধন' পড়তে সবসময়ই ভাল লাগে। বিমল আনন্দে মন ভরে ওঠে। তবে গত শ্রাবণ ১৪০৯ সংখ্যা সকলের থেকে আলাদা। স্বামীজীর জীবনের শেষদিন যেন জীবন্ত হয়েছে কয়েকটি লেখায়। এমন কিছু অনুভূতি থাকে যা আমরা প্রকাশ করতে পারি না। কোন লেখায় সেই সুর থাকলে আমাদের মন ভরে ওঠে। 'উদ্বোধন' পড়ে সেই শান্তি পাই।

স্বাতী ঘোষ
কলকাতা-৭০০ ০৯৭

"এল ও ভি ই পার্সোনিফায়েড"

পরম প্রেমময় ঠাকুরের ইচ্ছায় আমি 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক হয়েছি। প্রতি মাসে 'উদ্বোধন' এলে, তা শেষ করতে আমার ৩-৪ দিন লাগে। মনে হয় যেন প্রাণ-মন—সর্বস্ব দিয়ে আস্বাদন করি। যেমন ঠাকুরকে আস্বাদন করতে ইচ্ছা করে। তাঁকে আমি কতটা ভক্তি-শ্রদ্ধা করি তা বলতে পারব না, কারণ এটা কোনসময় ভাবিনি। ঠাকুরকে শুধুই ভাল লাগে না, ভালবাসি। হৃদয় দিয়ে তাঁকে ভালবাসতে ইচ্ছা করে। স্বামীজীর কথা "LOVE Personified" আগে অতটা বুঝতাম না। দিনে দিনে দেখছি, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-সাধন—এসব কিছুর পরেও কেবল 'LOVE'-ই অবশিষ্ট থাকছে। গুরুদেব (শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ) দীক্ষাকালে বলেছিলেন, ঠাকুরকে গুরু বা পিতা—এই ভাব আরোপ করতে। তাই-ই করি। কিন্তু একটু যখন ভাবি তখন মনে হয়, তিনি গুরু, পিতা তো আছেনই, যেন আরো কত কি! স্বামীজীর কথাই খুব মনে ধরেছে—"LOVE Personified"। এটাই যেন মনে হয় ঠাকুর সম্বন্ধে বরিষ্ঠ মূল্যায়ন।

অরিন্দম ঘোষ
কোচবিহার-৭৩৬১০১

প্রসঙ্গ ঃ 'উদ্বোধন'-এর এবছরের প্রচ্ছদ

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক সমীপেষু—

এতদিন অপেক্ষায় ছিলাম 'উদ্বোধন'-এর এবছরের প্রচ্ছদ-পরিচিতি নিয়ে কেউ না কেউ 'প্রাসঙ্গিকী'তে কিছু না কিছু মন্তব্য প্রকাশ করবেন, কিন্তু দীর্ঘকাল অপেক্ষায় থেকে হতাশ হয়েছি। তাই এসম্বন্ধে আমার মতামত জানানোর জন্যই এই পত্রের অবতারণা।

সূচীপত্রের নিচের দিকে প্রচ্ছদ-পরিচিতিতে লেখা হয়েছে ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবগঙ্গা বিবেকানন্দ-রূপ গোমুখের মধ্য দিয়ে জগৎকল্যাণার্থে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান।" অবাক কাণ্ড! বিবেকানন্দের অমন কমনীয় মাধুর্যতায় ভরা মুখাবয়বের সঙ্গে ভয়ানক ঐ গোমুখের তুলনা কিভাবে করা হলো তা ভাবতে পারছি না। কী কঠিন প্রাণ আপনাদের! আবার লেখা হয়েছে ঃ "গোমুখের মধ্য দিয়ে... প্রবহমান"। কিন্তু দৃশ্যত কোন প্রবাহই গোমুখ থেকে নির্গত হতে দেখা যাচ্ছে না। সর্বোপরি গঙ্গা তো স্বমহিমায় রামায়ণের কাল থেকে প্রবাহিতা। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ কোথায়? তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ অহর্নিশ মা গঙ্গাকে প্রণাম করতেন। সেই গঙ্গা হঠাৎ করে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাববহনকারী 'ভাবগঙ্গা' হতে যাবেন কেন? উপমাটা আরো সুন্দর হলে ভাল লাগত।

রইল বাকি 'শিবচক্ষু'। গোমুখে শিবচক্ষু? এটা কেমন হলো? যাই হোক, ধরেই নিলাম ওটা শিবচক্ষু। কিন্তু শিবের দিব্যদৃষ্টি অমন ক্রুর হবে কেন? আজন্ম শিবনেত্র বলতে জেনে এসেছি এবং দেখেছিও, এক প্রশান্ত অর্ধোন্মীলিত অন্তর্মুখী দৃষ্টিসম্পন্ন দুটি পদ্মপলাশলোচন। আপনিও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন।

রঞ্জন রায়
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মানসভ্রমণ—ডায়েরির পাতা থেকে

শ্রদ্ধেয় মহারাজ,

অনেকদিন ধরেই লিখব লিখব করে লেখা হয়ে ওঠেনি। আমার অনুভূতির কথা আমারই থাকুক—এই ভেবে। তবু আজ একটা তাগিদ অনুভব করছি। ডায়েরির পাতা থেকে তা তুলে দিলাম।

রাত সওয়া নটা হয়ে গেল। মণি এখনো ফিরল না মঠ থেকে। মণি কাছেই থাকে, ঠাকুরের আশ্রিত। বিশ্বাসদার মাধ্যমে পরিচয় হয়েছে। আমার প্রতিবন্ধী শরীর। মঠে যাওয়া বন্ধ হতে ও-ই মঠের সঙ্গে আমার যোগসূত্র।

হঠাৎ দরজায় টোকা। "আরে এস এস, দরজা ভেজানো আছে।" মণি ঢুকল। "এই নিন আপনার চরণামৃত, এই প্রসাদ আর এই মাঘ সংখ্যার 'উদ্বোধন'।"

মণি বসল। আমি প্রসাদ ও চরণামৃত মাথায় ঠেকিয়ে রাখলাম। 'উদ্বোধন'কে প্রণাম করে মোড়ক খুলতে চমকে উঠলাম প্রচ্ছদ দেখে। এ-সংখ্যায় স্বামীজী সম্বন্ধে অনেক লেখা থাকবে জানি। তবু একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম আগাগোড়া, তারপর ফিরে এলাম প্রচ্ছদে। কিছুক্ষণ যেন ডুবে গেলাম ওর মধ্যে। আমার মগ্নতায় কোন বাধা না দিয়ে মণি চুপ করে বসে রইল পাশে।

এ কী দেখছি! আমার পঙ্গুত্বের কারণে কোন বরফচূড়ায় কখনো উঠিনি, তাই চিনতে পারছি না, তবে খুব ভাল লাগছে। নিশ্চয়ই কোন দেবভূমি তীর্থস্থান। সূচীপত্র খুলেও দেখতে পাচ্ছি না প্রচ্ছদসূচী। বোধহয় চোখের সঙ্গে মনের যোগ হচ্ছে না উত্তেজনায়। মণিকে বলতে ও সূচীপত্র দেখে বলল 'গোমুখ'।

'উদ্বোধন' হাতে নিয়ে আবার ডুবে গেলাম প্রচ্ছদে। বিরাটের সামনে দাঁড়িয়ে আপন অস্তিত্বকে ভুলে নির্বাক বিস্ময়ে দেখছি গোমুখ। পথশ্রমে ক্লান্ত শরীরগুলোকে টেনে এনে যাদের তীর্থযাত্রার পর্যবসান হয়েছে গোমুখে—তাদের অন্তরের পরম প্রাপ্তির বোধ থেকে উৎসারিত আনন্দ যেন অশ্রু হয়ে ঝরে গঙ্গার স্রোতে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে, আর তাই তাদের আনন্দই যেন স্রোতের বাঁকে বাঁকে তুলছে শুভ্র ফেনিল কলতান। চারদিকের শান্ত শীতল নির্জনতার মধ্যে গোমুখ গুহা থেকে যেন উঠে আসছে গম্ভীর উদাত্ত মহানাদ—'শিব ওঁ'। স্তব্ধ বিস্ময়ে যাত্রীরাও শিবনেত্র।

আমার অশ্রুসিক্ত প্রণতি গ্রহণ কর 'উদ্বোধন'। শিবভূমি-সমেত শিবাবতারকে আমার মতো মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য 'উদ্বোধন'-এর প্রতিটি কর্মী, সহায়ক ও পূজনীয় সম্পাদক মহারাজকে ভক্তিনম্র প্রণাম জানাচ্ছি। বিশেষভাবে প্রণাম জানাচ্ছি এ-সংখ্যার প্রচ্ছদ-পরিকল্পনাকারী ও ডাঃ ভট্টাচার্যকে—স্বামীজীর বাণীরূপকে উপযুক্ত মর্যাদায় ধরার আধার হিসাবে 'উদ্বোধন'কে এক বিশেষ মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। জয়তু স্বামীজী।

পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
বালী, হাওড়া-৭১১২০১

জাতীয় শিক্ষাপরিকল্পনা ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যাশা

যেকোন পরিকল্পনার একেবারে গোড়ার কথা হলো লক্ষ্য স্থির করা, আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ধারণ। সকলের জন্য শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছাতে স্বামীজী তাঁর সামগ্রিক কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেছিলেন। নিখুঁত ছিল তাঁর সেই কর্মপরিকল্পনা। শিক্ষাবিস্তারে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন জনশিক্ষা প্রসারের ওপর। এরপর হাতে-কলমে কাজের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক স্কুল-কলেজের শিক্ষার ওপর। বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব উল্লেখ করতে ভোলেননি তিনি। এছাড়া সনাতন ভারতের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য লালনপালন ও চর্চার ওপরও তিনি জোর দিয়েছেন।

স্বামীজী-নির্ধারিত এই অগ্রাধিকারই লক্ষ্য করি ভারতীয় সংবিধানে। সংবিধান চালু হওয়ার পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় পরে আজও আমরা আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকার পালন করতে পারিনি। চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত বালক-বালিকার অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন আজও আমাদের কাছে অধরা। আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করে আবার উদ্যোগ শুরু হয়েছে শিক্ষাবিস্তারের। শুরু হয়েছে সাক্ষরতা প্রসার আন্দোলন, সাক্ষরতা-উত্তর কর্মসূচী, বয়স্ক শিক্ষা, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রথাযুক্ত শিক্ষার নানা প্রকল্প। আওয়াজ উঠেছে—'সকলের জন্য শিক্ষা'। সরকারি স্তরে নেওয়া হচ্ছে নানা পরিকল্পনা। ভেবে অবাক হতে হয় যে, আজ থেকে প্রায় ১০০ বছরেরও আগে এক বৈদান্তিক সন্ন্যাসী জনশিক্ষা প্রসারে যেসব কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন—ভিন্ন নামে হলেও তাঁর সেই পরিকল্পনাই নিখুঁতভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে।

হয়তো বা অনেকটা অজানিত ভাবেই, হয়তো কোন বিকল্প খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলেই।

প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার স্বার্থে শেষপর্যন্ত সংবিধান সংশোধনের (৮৩তম সংবিধান সংশোধন) কথা ভাবা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে এই সংশোধনীর মাধ্যমে আনা হবে মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যের তালিকায়। ১৯৯৭ সালের শেষ দিকে এই বিল রাজ্যসভায় পেশ করার পর সরকার এখন পিছিয়ে আসছেন মূলত আর্থিক অসামর্থ্যের কথা ভেবে। আজ থেকে ১০০ বছরেরও আগে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার অসম্ভাব্যতার কথা স্বামীজী জানিয়েছিলেন ঃ "যদি সরকার (তখন 'হিজ হাইনেস') প্রতিটি গ্রামে একটি করে অবৈতনিক বিদ্যালয় খোলেন, তবুও কাজের কাজ কিছু হবে না। ভারতে দারিদ্র্য এমনই, ছেলেরা বিদ্যালয়ে যাবার চাইতে মাঠে বাবাকে কাজে সাহায্য করা বা অন্য কোনভাবে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করবে।" স্বামীজী আরো বলেছেন ঃ "আমাদের না আছে প্রচুর অর্থ, না আছে এদেরকে শিক্ষাগ্রহণে বাধ্য করার ক্ষমতা।" আর্থিক অসামর্থ্যের কথা বাদ দিলেও বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা প্রবর্তন করে যে-ফল হবে না—এটাই স্বামীজী বলতে চেয়েছেন। অগত্যা উপায় হিসাবে প্রথামুক্ত (non-formal) শিক্ষার কথা এখন ভাবা হচ্ছে। এতে দুটো সুবিধা পাওয়া যাবে বলে বিশেষজ্ঞরা দাবি করছেন। শিক্ষার্থীদের সুবিধামতো জায়গায় ও সুবিধামতো সময়ে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা যাবে। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রথামুক্ত শিক্ষার একটা বিরাট পরিকল্পনা চালু করা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, বহুদিন আগেই স্বামীজী এই পরিকল্পনার কথা বলে গেছেন ঃ "আমি ইহার মধ্যে একটি পথ বাহির করিয়াছি। তাহা এই—যদি পর্বত মহম্মদের নিকট নাই আসে, তবে মহম্মদকে পবর্তের নিকট যাইতে হইবে। দরিদ্র লোকেরা যদি শিক্ষার নিকট পৌঁছাইতে না পারে তবে শিক্ষাকেই চাষির লাঙলের কাছে, মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সব স্থানে যাইতে হইবে। গরিবের ছেলেরা যদি স্কুলে এসে লেখাপড়া শিখিতে না পারে, তবে তাহাদের বাড়ি বাড়ি গিয়া লেখাপড়া শিখাইতে হইবে।"

সরকারি প্রচেষ্টায় এত প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেও সুরাহা কিছু হয়নি। বিদ্যালয়-ছুট বা Drop-out-এর সমস্যা দেখা যাচ্ছে ব্যাপক আকারে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রায় অর্ধেক ছেলেমেয়েই মাঝপথে স্কুল ছেড়ে চলে যায়। এর কারণ বের করার জন্য চলছে নানা গবেষণা, সমীক্ষা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ। এই প্রসঙ্গে ওপরে উদ্ধৃত স্বামীজীর কথাগুলি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। জীবিকা অর্জনের তাগিদ আর অকার্যকরী বিদ্যালয়ের পাঠক্রম মূলত এই বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়ার কারণ। স্বামীজী উপসংহার টানছেন ঃ "গরিবেরা এত গরিব যে তারা স্কুল-পাঠশালায় আসতে পারে না। আর কবিতা-ফবিতা পড়ে তাদের কোন উপকার নাই।" স্বামীজীর ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট। জীবন-জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্তত কিছু সুযোগ-সুবিধা (পড়ুন—আধুনিক উৎসাহ দান প্রকল্পে বিদ্যালয়ে আসার জন্য চাল ইত্যাদি দেওয়া) দেওয়া ও প্রয়োজনভিত্তিক পাঠক্রম একান্ত জরুরি।

সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন, বয়স্ক শিক্ষা, সকলের জন্য শিক্ষা, সর্বশিক্ষা অভিযান ইত্যাদি যেসব প্রকল্প সরকার চালু করেছেন, সেগুলির রূপায়ণে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অংশ-গ্রহণের ওপর জোর দিতে চান সরকার। এসব ব্যাপারে স্বামীজীর নিখুঁত কর্মপরিকল্পনার কথা উল্লেখ করতেই হয়। আজও সম্ভবত এই কর্মপরিকল্পনার বিকল্প বের করা যায়নি। স্বামীজী বলেছেন ঃ "কোন একটি গ্রামের অধিবাসিগণ সারাদিনের পরিশ্রমের পর গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া কোন একটি গাছের তলায় অথবা অন্য কোন স্থানে সমবেত হইয়া বিশ্রম্ভালাপে সময়াতিপাত করিতেছে। সেইসময় জন দুই শিক্ষিত সন্ন্যাসী (পড়ুন—স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীরা) তাহাদের মধ্যে গিয়া ছায়াছবি কিংবা ক্যামেরার সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে কিংবা বিভিন্ন জাতি বা বিভিন্ন দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে ছবি দেখাইয়া কিছু শিক্ষা দিল। এইরূপে গ্লোব, মানচিত্র প্রভৃতির সাহায্যে মুখে মুখে কত জিনিসই না শেখানো যাইতে পারে।" শহরাঞ্চলের জন্য এই পরিকল্পনারই প্রয়োজনীয় রদবদল ঘটিয়ে রূপায়ণের কথা বলেছেন স্বামীজী। কতখানি বাস্তববোধ থাকলে শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের জন্য প্রয়োজনমাফিক আলাদা আলাদা কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা যায়।

আজকাল দাবি উঠেছে—ইংরেজি তুলে দেওয়া চলবে না, দাবি উঠেছে বিজ্ঞানের পঠনপাঠনের ওপর জোর দেওয়ার, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ইত্যাদি স্থাপন করে কারিগরী শিক্ষা প্রসারের। 'বর্তমান প্রয়োজন ও আমার পরিকল্পনা' প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন ঃ "আমাদের কি চাই জানিস—স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজি আর সায়েন্স পড়ানো। চাই কারিগরী বিদ্যা, চাই যাতে ইণ্ডাস্ট্রি বাড়ে। লোকে চাকরি না করে দুপয়সা করে খেতে পারে।" শিক্ষা-দীক্ষায়, আর্থিক অবস্থায় জাপানের অগ্রগতি স্বামীজীর নজর এড়ায়নি। উদাহরণ হিসাবে তিনি তাই জাপানের কথা তুলে ধরেছেন বারবার—"আমি বলি, এদেশের সমস্ত বড়লোক আর শিক্ষিত লোক যদি একবার করে জাপান বেড়িয়ে আসে তো লোকগুলোর চোখ ফুটে।"

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে স্বামীজীর ভূমিকা, ভারতের পুনর্গঠনে তাঁর সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রে অবদান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বিস্তর। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব কর্মপরিকল্পনা তিনি করেছিলেন, সেগুলি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা আজও হয়ে ওঠেনি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নানা ইংরেজি প্রতিশব্দ ব্যবহার করে আধুনিকতার মোড়কে স্বামীজী-উদ্ভাবিত সেইসব কর্মপরিকল্পনাই বর্তমানে শিক্ষাবিস্তারের জন্য প্রয়োগ করা হচ্ছে। এটা আশ্চর্যজনক হলেও বেদনাদায়ক তার চেয়েও বেশি। কৃতজ্ঞতা স্বীকার বা নামোল্লেখ নয়, সৃষ্টির উপযুক্ত মূল্যায়নই স্রষ্টাকে সম্মান জানানোর শ্রেষ্ঠ উপায়।

অধ্যাপক সুজিত মুখোপাধ্যায়
রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ

প্রথম স্ট্রোকের আঘাত কি প্রতিরোধ করা সম্ভব?

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়

স্ট্রোক (Stroke) বা 'সন্ন্যাস রোগ' সারা পৃথিবীতে অকালমৃত্যু বা পঙ্গুত্বের অন্যতম প্রধান কারণ। কেবল আমেরিকাতেই প্রতি বছর ৭ লক্ষেরও বেশি মানুষ স্ট্রোকের শিকার হয় এবং তাদের মধ্যে শতকরা ১৫ থেকে ২০ জনের অকালমৃত্যু ঘটে। আর যারা সুস্থ হয়ে ওঠে, তাদের প্রায় সকলেরই অল্পবিস্তর শারীরিক অক্ষমতা থেকে যায়। কিন্তু আশার কথা হলো, এই মারাত্মক দুর্ভোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া আজ সম্ভব—যদি সময়মতো তার প্রতিরোধ করা হয়। এই বিষয়ে আলোচনার আগে বলে নেওয়া দরকার স্ট্রোক বলতে কি বোঝায়।

মস্তিষ্কের কোন অংশে যদি রক্তসঞ্চালন হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় (যেমন জমাটবাঁধা রক্তের দলার কারণে) অথবা মস্তিষ্কের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের জন্য রক্তপাত হয়, তাহলে মস্তিষ্কের সেই অংশগুলি অকেজো হয়ে পড়ে। মাথার যন্ত্রণা, মাথা ঘোরা, শরীরের এক অংশে পক্ষাঘাত হওয়া, বাকশক্তি হারিয়ে ফেলা—এইসব লক্ষণ দেখা দিতে পারে। হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়াও অসম্ভব নয় এবং তার সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাসের গণ্ডগোল, হার্টের গতিছন্দের বিকৃতি, এমনকি মৃত্যু হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল স্ট্রোক অ্যাসোসিয়েশন সম্প্রতি একটি সর্বসম্মত নির্দেশ প্রকাশ করেছেন। তাতে কিভাবে প্রথম স্ট্রোকের আঘাত প্রতিরোধ (prevention of a first stroke) করা যায় তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ছয়টি শারীরিক লক্ষণ বা অবস্থা এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় স্ট্রোকের যে বিপদসঙ্কেতগুলি দেখা যায়, সেগুলি কিভাবে চেনা যায় ও প্রতিরোধ করা যায় তাই নিয়ে এই নিবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

(১) সর্বপ্রথম বিপদসঙ্কেত হলো রক্তের উচ্চচাপ বা 'হাইপারটেনশন'। স্ট্রোকের সঙ্গে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হাইপারটেনশন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। চিকিৎসার দ্বারা যদি ডায়াস্টোলিক (diastolic) রক্তচাপ অর্থাৎ ব্লাড-প্রেসারের নিচের সংখ্যাটি ৫ থেকে ৬ মিলিমিটারও কমিয়ে ফেলা যায়, তাহলে দেখা গেছে স্ট্রোকের সম্ভাবনা তখন ৪২ শতাংশ হ্রাস পায়। বৃদ্ধদের ক্ষেত্রেও যদি রক্তচাপের ওপরের সংখ্যাটি (systolic blood pressure in isolated systolic hypertension) ১৪০ মিলিমিটার বা তার কাছাকাছি রাখা যায়, তাহলে স্ট্রোকের সম্ভাবনা প্রায় ৪০ শতাংশ কমে। দুঃখের কথা, আমেরিকার মতো বিত্তশালী দেশেও আজ ৫ কোটির বেশি উচ্চ ব্লাডপ্রেসারে আক্রান্ত মানুষের মধ্যে মাত্র ২৭ শতাংশের রক্তচাপ চিকিৎসার দ্বারা আয়ত্তের মধ্যে রাখা গেছে! তাই সেদেশের জাতীয় যুগ্ম হাইপারটেনশন প্রতিরোধ সংস্থা (Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure) তার ষষ্ঠ ঘোষণায় রক্তের উচ্চচাপ নির্ণয় ও সুচিকিৎসার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে। এই বিধানে কেবল ওষুধ খাওয়ার ওপরই নয়, জীবনযাত্রার অদলবদলের ওপরেও যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। স্থূলদেহীর ওজন কমানো, উপযুক্ত পরিমাণমতো খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা করা, নিয়মিত ব্যায়ামের দ্বারা শরীরকে কর্মঠ রাখা—এসবের ওপরই বেশি নজর দিতে বলা হয়েছে। অন্তত সপ্তাহে ১৫০ মিনিট জোরে হাঁটা খুবই দরকার। এর জন্য রোজ ৩০ মিনিট করে সপ্তাহে ৫ দিন বা ২০ মিনিট করে সপ্তাহে ৭ দিন করলেও চলতে পারে। আর যারা একসঙ্গে ২০-৩০ মিনিট ব্যায়াম করতে পারবে না, তাদের জন্য প্রতিবার ১০ মিনিট করে দিনে ৩ বার এবং এইভাবে সপ্তাহে ৫ দিন করে জোরে হাঁটা বা ব্যায়াম করাটা হলো উপযুক্ত ব্যবস্থা। আর যাদের ব্লাডপ্রেসার বেশি—যেমন ১৬০/৯০ মিলিমিটার বা তারও উর্ধ্বে, কিন্তু তার জন্য এখনো কোন জটিল উপসর্গ (হার্টের, কিডনীর, নার্ভের) দেখা দেয়নি, তাদের পক্ষে শুরুতে ডায়ুরেটিক (diuretic) ও বিটা ব্লকার (Beta blockers) জাতীয় ওষুধের ব্যবহার প্রশস্ত। তবে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অদলবদল তার সঙ্গে চালিয়ে যেতে হবে। এই পদ্ধতি মেনে চললে স্ট্রোক প্রতিরোধ করা অনেক সহজ হবে। সম্প্রতি দেখা গেছে যে, অ্যানজিওটেনশিন কনভার্টিং এনজাইম ইনহিবিটার (ACE-inhibitors) জাতীয় ওষুধগুলি—যেমন র‍্যামিপ্রিল, লাইসিনোপ্রিল অথবা এনালাপ্রিল রক্তের উচ্চচাপ থাকলে তো বটেই, ব্লাডপ্রেসার স্বাভাবিক থাকলেও স্ট্রোক প্রতিরোধ করতে খুবই সাহায্য করে। বিশেষ করে মধ্যবয়স্ক মানুষের মধ্যে তাই স্ট্রোকের প্রতিরোধে এদের ব্যবহার বিশেষভাবে বাড়ছে। যাদের ডায়াবিটিস, হার্ট ফেলিওর বা কিডনীর অসুখ আছে, তাদের পক্ষে রক্তের উচ্চচাপ না থাকলেও (থাকলে তো অবশ্য ব্যবহার্য) শুভ ফলদায়ক এই ওষুধগুলি চিকিৎসকের পরামর্শমতো খাওয়া যেতে পারে।

(২) স্ট্রোকের দ্বিতীয় বিপদসঙ্কেত হিসাবে হার্ট অ্যাটাক বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনকে (Myocardial infarction) ধরা দরকার। যাদের সম্প্রতি হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, তাদের স্ট্রোকের সম্ভাবনা বেশি। হার্ট অ্যাটাকের পরে প্রথম মাসেই এই বিপদের সম্ভাবনা বেশি। সেইসঙ্গে যদি আবার এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন (Atrial fibrillation) দেখা দেয়, তখন স্ট্রোকের আশঙ্কা অনেক বেশি বেড়ে যায়। এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে

হৃদ্‌পিণ্ডের অলিন্দের (atricum) সঙ্কোচন ও প্রসারণের ক্ষমতা চলে যায়, তার ছন্দবৈকল্য ঘটে, ফলে অলিন্দদুটির সামঞ্জস্যবিহীন বেতাল দ্রুত কম্পন শুরু হয়। অলিন্দের মধ্যে রক্তপ্রবাহের গতি তখন মন্থর হয়ে পড়ে ও রক্ত জমে গিয়ে সেখানে দলা সৃষ্টি হতে পারে। সেই রক্তদলা বাম অলিন্দ থেকে বাম নিলয়ের (ventricle) মধ্যে এসে তার সঙ্কোচনের সঙ্গে রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছে 'এমবলিজম্' (embolism) ঘটাতে পারে। অর্থাৎ মস্তিষ্কের মাঝারি আকারের ধমনী বা অনু-ধমনীর মধ্যে এই রক্তদলা জমে স্ট্রোকের সূত্রপাত করে। অনেক সময় আবার দেখা যায়, বড় ধরনের হার্ট অ্যাটাকের ফলে যাদের বাম নিলয়ের সঙ্কোচন-প্রসারণ ক্ষমতা সাঙ্ঘাতিকভাবে ব্যাহত হয়েছে—তাদেরও বাম নিলয়ের মধ্যে রক্তপ্রবাহ মন্দীভূত হয়ে রক্ত জমাট বেঁধে দলার সৃষ্টি করতে পারে। ফলে তার জন্যও মস্তিষ্কে এমবলিজম্ হয়ে স্ট্রোক হতে পারে। এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থাকলে বা বাম নিলয়ের মধ্যে দলাবাঁধা জমা রক্ত দেখা গেলে 'ইকোকার্ডিওগ্রাম' (Echo-Cardiogram)-এর সাহায্যে রক্ত বেশি তরল রাখা দরকার। তার জন্য 'ওয়ারফারিন' (Warfarin) জাতীয় ওষুধ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করলে 'এমবলিজম্' প্রতিরোধ করা বহুলাংশে সম্ভব। দেখা গেছে, রক্তের তরল অবস্থা যদি আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী (International Normalized Ratio বা I.N.R.) ২ থেকে ৩-এর মধ্যে থাকে, তাহলে এই ধরনের 'এমবলিজম্'-জাত স্ট্রোকের (embolic stroke) হাত থেকে রেহাই পাওয়া সহজ হয়।

হার্ট অ্যাটাকের অন্য সমস্ত রোগীর আর কোন বাধা না থাকলে (পেপটিক আলসার বা অ্যাসপিরিনে অ্যালার্জি) রোজ ৭৫-৩২৫ মিলিগ্রাম অ্যাসপিরিন (এনটেরিক কোটেড) খাওয়া অবশ্য-প্রয়োজন। অ্যাসপিরিন অনুচক্রিকাদের (platelets) রক্ত জমাট বাঁধানোর ক্ষমতা দমিয়ে রাখে। এটি স্ট্রোক প্রতিরোধের একটি অমূল্য হাতিয়ার।

এছাড়া দেখা গেছে, স্ট্যাটিন (statins) জাতীয় ওষুধগুলিও স্ট্রোকের আশঙ্কা দূরে রাখে। সিম্ভাস্ট্যাটিন, অ্যাটরভাস্ট্যাটিন, প্রাভাস্ট্যাটিন ইত্যাদি কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধগুলি কোলেস্টেরলের প্রকোপ না থাকলেও হার্ট অ্যাটাকের পরে ব্যবহার করলে স্ট্রোকের সম্ভাবনা ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ হ্রাস পায়। চিকিৎসকের নির্দেশমতো এই ওষুধগুলির ব্যবহার করা উচিত।

(৩) স্ট্রোকের তৃতীয় বিপদসঙ্কেত সম্বন্ধে ওপরে কিছুটা আলোচনা করা হলেও তার কথা এই প্রসঙ্গে আলাদা করে বলা দরকার। সেটি 'এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন'। হার্ট অ্যাটাক ছাড়াও অন্য অনেক কারণে (তাদের সংখ্যাই বেশি) এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন হতে পারে এবং তার জন্য যেকোন অবস্থায় স্ট্রোকের সম্ভাবনা ৬ গুণ বেড়ে যেতে পারে। ৮০ বছর বা তার ওপর যাদের বয়স, তাদের যত স্ট্রোক দেখা যায় তার এক-তৃতীয়াংশের পিছনে থাকে 'এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন'। অলিন্দের এই ছন্দবৈকল্যের জন্য এমবলিজম্-জাত স্ট্রোকের হাত থেকে ওয়ারফারিন-জাতীয় ওষুধের সাহায্যে অনেকাংশে রক্ষা পাওয়া যায়। বিশেষ করে ৭৫ বা তার ওপর যাদের বয়স—তাদের ক্ষেত্রে রক্ততরলকারী ওয়ারফারিন অ্যাসপিরিনের চেয়ে বেশি কার্যকর। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কদের ক্ষেত্রে ওয়ারফারিনের চেয়ে অ্যাসপিরিন বেশি নিরাপদ। কিন্তু এদের মধ্যেও আবার যাদের আগেই স্ট্রোক হয়ে গেছে বা ছোট ছোট স্ট্রোক মাঝে মাঝে ঝামেলা করছে (ক্ষণস্থায়ী স্ট্রোক বা Transient Ischemic Attacks বা TIA's) বা এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের সঙ্গে হাইপারটেনশন আছে কিংবা যাদের ডায়াবিটিস আছে বা হার্ট ফেলিওর ধরা পড়েছে (হার্টের সঙ্কোচন-প্রসারণ ক্ষমতার বৈকল্য এবং তার জন্য শ্বাসকষ্ট, শরীরে জল জমা ও প্রচণ্ড ক্লান্তি)—তাদের ক্ষেত্রে রক্ত বেশি তরল রাখার জন্য ওয়ারফারিনই ভাল ওষুধ। এইসব জটিলতা না থাকলে এবং ৬০ বছরের কম যাদের বয়স, তাদের জন্য (ইকোকার্ডিওগ্রাম করে যদি দেখা যায় যে, অলিন্দ বা নিলয়ের আকার বাড়েনি) অ্যাসপিরিনের ব্যবহার এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের উপস্থিতিতেও শুভ ফলদায়ক।

(৪) স্ট্রোকের চতুর্থ বিপদসঙ্কেত নিঃসন্দেহে ডায়াবিটিস। ডায়াবিটিসে স্ট্রোকের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কিন্তু রক্তে 'সুগার' বা 'গ্লুকোজ'-এর পরিমাণ যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক রাখতে পারলে স্ট্রোকের সম্ভাবনা কমে কিনা তা আজও তর্কসাপেক্ষ। তবে যেসমস্ত ডায়াবিটিস রোগীর হাইপার-টেনশন আছে (যার সম্ভাবনা ৫০ শতাংশেরও বেশি), তাদের রক্তচাপ সুষ্ঠুভাবে আয়ত্তে রাখতে পারলে স্ট্রোকের সম্ভাবনা অনেক বেশি হ্রাস পায়। দেখা গেছে, যেসমস্ত হাইপারটেনশন রোগীর ডায়াবিটিস আছে—তাদের রক্তচাপ আয়ত্তে রাখলে স্ট্রোকের আশঙ্কা যত কম হয়, ডায়াবিটিস নেই যাদের তাদের স্ট্রোকের আশঙ্কা কমলেও (হাইপারটেনশন আয়ত্তে রাখলে) তা কিন্তু অত বেশি কমে না। অবশ্য রক্তে সুগার যতদূর সম্ভব আয়ত্তে রাখতে পারলে চোখে ছানি বা রেটিনার অসুখ (Ratinopathy), কিডনীর অসুখ (Nephropathy) বা নার্ভের অসুখ (Neuropathy) নিঃসন্দেহে কমে আসে। তাই ডায়াবিটিসে রক্তের চাপ ও সুগারের পরিমাণ স্বাভাবিক মানের মধ্যে রাখা অবশ্যকর্তব্য।

(৫) কোলেস্টেরল সমস্যা ও স্ট্রোক : মজার কথা, হার্ট অ্যাটাকের সঙ্গে কোলেস্টেরল সমস্যা যেমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, স্ট্রোকের ক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়। কেউ কেউ এমন কথাও বলেছেন যে, রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ খুব কম হলে স্ট্রোকের সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে। আবার এটিও দেখা যাচ্ছে, স্ট্যাটিন-জাতীয় ওষুধগুলি—যেগুলি রক্তে কোলে-স্টেরল কমিয়ে রাখে, সেগুলি স্ট্রোকের সম্ভাবনাও হ্রাস করে।

কোলেস্টেরল কমানো ছাড়াও এই ওষুধগুলির অন্য অনেক শুভ পার্শ্বফল আছে এবং খুব সম্ভবত তাদের জন্যই এই ওষুধগুলি স্ট্রোকের আঘাত কমায়। আমেরিকার ন্যাশনাল স্ট্রোক অ্যাসোসিয়েশন তাই নির্দেশ দিয়েছে যে, জাতীয় কোলেস্টেরল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী (National Cholesterol Education Programme) অনুযায়ী যেন সকলের কোলেস্টেরল সংক্রান্ত চিকিৎসাব্যবস্থা অনুধাবন করা হয়।

(৬) স্ট্রোকের ষষ্ঠ কারণ ক্যারোটিড ধমনীর সঙ্কীর্ণতা। ঘাড় বা গ্রীবার সামনে শ্বাসনালীর দুপাশে ক্যারোটিড ধমনীদুটির মাধ্যমে মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহিত হয়। স্ট্রোকের সঙ্গে ক্যারোটিড ধমনীর সঙ্কীর্ণতার সম্পর্ক আজ সুবিদিত। ধমনীর ভিতরের দেওয়ালে জমে ওঠা কোলেস্টেরল ও নানা কোষগোষ্ঠী অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস ঘটায় এবং তার ফলে ধমনীর মধ্যে রক্তপ্রবাহ ক্রমশ বাধা পায়। রক্তের অনুচক্রিকারা অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস প্লাকের ওপর (বিশেষ করে ভঙ্গুর ভালনারেবল প্লাকগুলির ওপর) জমে আরো সঙ্কীর্ণতার সৃষ্টি করে। রক্তপ্রবাহের সঙ্গে অনুচক্রিকাদের জমাট দলা মস্তিষ্কের অনুধমনীতে এমবলিজম্ ঘটিয়ে স্ট্রোক শুরু করতে পারে। ক্যারোটিড ধমনীর মধ্যে রক্তপ্রবাহ যত মন্থর হবে, ততই স্ট্রোকের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাবে। সেইজন্য ক্যারোটিড ধমনীর সঙ্কীর্ণতা পরিমাপ করার জন্য বিশেষ ধরনের পরীক্ষার সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। মস্তিষ্কের অংশবিশেষে রক্তসঞ্চালন ব্যাহত হলে যেসব লক্ষণ দেখা যায় (এসম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে), তার সঙ্গে যদি ক্যারোটিড ধমনীর সঙ্কীর্ণতার পরিমাণ ৭০ শতাংশ বা তার বেশি হয়, তাহলে আজকাল 'বেলুন ও স্টেন্ট' চিকিৎসা অথবা শল্যচিকিৎসার (Carotid Endarterectomy) সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। বেলুন ও স্টেন্টের দ্বারা (Balloon angioplasty with stent placement) ধমনীর সঙ্কীর্ণতাকে প্রসারিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়—যাতে ধমনীর মধ্যে রক্তপ্রবাহ অব্যাহত থাকে। এই সঙ্গে যাতে রক্তের অনুচক্রিকারা জমাট বেঁধে বিপদ সৃষ্টি না করতে পারে, তার জন্য এনটেরিক কোটেড অ্যাসপিরিন তো বটেই, তার সঙ্গে ক্লোপিডোগ্রেল নামে নতুন ওষুধটিও যোগ করা হয়ে থাকে। অনির্দিষ্ট কালের জন্য এই দুটি ওষুধ ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়। ক্যারোটিড ধমনীর সঙ্কীর্ণতা-প্রসূত স্ট্রোকের সম্ভাবনা যেসমস্ত লক্ষণ থেকে বোঝা যায়, সেগুলি হলো—হঠাৎ শরীরের একদিকের ঝিমঝিম বা অসাড় ভাব, সেই অংশের ক্ষণিক দুর্বলতা বা অক্ষমতা, আর শরীরের দুর্বলাংশের বিপরীত দিকে চোখে সাময়িক দৃষ্টিহীনতা, কথায় জড়তা ইত্যাদি। যদি এসব লক্ষণ নাও থাকে, কিন্তু সাধারণ স্বাস্থ্যপরীক্ষার সময় ক্যারোটিড ধমনীর সঙ্কীর্ণতা স্টেথোস্কোপের সাহায্যে ধরা পড়ে, তাহলে ভবিষ্যতে যাতে স্ট্রোক না হয় তার জন্য ঐ দুটি ওষুধ খেতে বলা হয়। এরা অনুচক্রিকা অবদমিত রাখতে সাহায্য করে। শল্যচিকিৎসা বা বেলুনের ও স্টেন্টের ব্যবহার সুচিন্তিত অভিমত না নিয়ে করা বিপজ্জনক। কারণ, এসমস্ত প্রক্রিয়ার পার্শ্বফল হিসাবে কোন কোন ক্ষেত্রে স্ট্রোকই হতে দেখা গেছে—যেটি প্রতিরোধ করতে এইসব বড় ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। সেইজন্য প্রতিটি রোগীর ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ও সঙ্গত কারণ না থাকলে এবং এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকলে এধরনের শঙ্কাবহুল চিকিৎসাপদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না।

জীবনযাত্রার অদলবদল : যে বিশেষ চারটি অভ্যাস শরীরের ক্ষতি করে এবং স্ট্রোকের সম্ভাবনাও বাড়িয়ে দেয়, সেগুলি হলো—(ক) ধূমপান, (খ) মদ্যপান, (গ) দৈহিক শ্রম-বিমুখতা এবং (ঘ) সুস্বাস্থ্যের পরিপন্থী খাদ্য আহার করা।

প্রতিদিন জোরে হাঁটার কথা আগেই বলা হয়েছে। আঁশ বা ফাইবার (fibre)-বহুল কার্বোহাইড্রেট (যেমন শাকসবজি, ফল ইত্যাদি) এবং খাদ্য-ক্যালোরির পরিমাণ কমিয়ে রাখা (বিশেষ করে যাদের দৈহিক ওজন উচ্চতার তুলনায় অনেক বেশি) স্বাস্থ্যপ্রদ ব্যবস্থা। খাদ্যে লবণের ও স্নেহজাতীয় পদার্থের (fatty meals) পরিমাণ যত কম রাখা যায় ততই মঙ্গল। সারাদিনে (চিকিৎসকদের পরামর্শমতো) যত খাদ্য-ক্যালোরির প্রয়োজন হবে, তার ৩০ শতাংশের বেশি স্নেহজাতীয় খাদ্য দ্বারা পুষ্ট হলে ক্ষতিকর হয়। ধূমপান সর্বতোভাবে বর্জনীয় তো বটেই, মদ্যপানের ক্ষেত্রেও প্রায় সেই উপদেশ দেওয়া হয়ে থাকে। দৈনিক ছোট ১ গ্লাসের বেশি 'ওয়াইন' (wine) শরীরের ক্ষতিসাধন করতে পারে।

উপসংহার : স্ট্রোক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা। কিন্তু একথা আজ সুস্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে, স্ট্রোকের উপরি উক্ত বিপদসঙ্কেতগুলি সতর্কতার সঙ্গে অনুধাবন করে তাদের সময়মতো প্রতিকার করলে স্ট্রোকের আঘাত অনেকাংশেই দূরে রাখা সম্ভব। সুচিকিৎসকের সাহায্যে প্রতিটি মানুষের প্রয়োজনমতো স্ট্রোক প্রতিরোধ-ব্যবস্থা অবলম্বন করলে এই সমস্যা অবশ্যই সমাধানসাপেক্ষ, সন্দেহ নেই। ❑

উৎস

(১) Dunbabin DW, Sandercock PA, Preventing stroke by modification of risk factors. Stroke 1990; 21 (Suppl. I) : IV 36

(২) Smith DB, Gorelick PB, Preventing a first stroke, Cardiology Review, 2001, 18 (10) 35

(৩) Gorelick PB, Sacco RL, Smith DB et al Prevention of a first stroke, A review of guidelines and a multidisciplinary consensus statement from the National Stroke Association, JAMA 1999, 281 : 1112.

ক্ষেত্রবিশেষে ধীর ইচ্ছামৃত্যু আইনসঙ্গত হওয়া উচিত

রোগীর স্বার্থে যদি মৃত্যু প্রয়োজনীয় হয়, তাহলে যন্ত্রণাবিহীন ধীর ইচ্ছামৃত্যু বা 'ইউথ্যানসিয়া' (Euthansia) নৈতিকতার দিক থেকে ভাল।

গত ২০০1 সালের অক্টোবর মাসে ডায়েন প্রেটিকে তাঁর মৃত্যু কিভাবে হবে তা ঠিক করতে দেওয়া হয়নি। তাঁর স্নায়ুশিরায় এমন অসুখ (motor neuron disease) হয়েছিল যে, তাঁর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। তাঁর মনে হয়েছিল, ঐভাবে মারা যাওয়ার আগে তাঁকে অনেক যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তাই তিনি ইচ্ছামৃত্যু কামনা করেছিলেন। কিন্তু আদালত তাঁর স্বামীকে এই ইচ্ছামৃত্যুতে সাহায্য করার অনুমতি দেননি। আদালতের এই রায় আইনত ঠিক, তবে নৈতিকতার দিক থেকে ঠিক নয়। সেজন্য আইন পরিবর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ধরা যাক, মিসেস প্রেটির মস্তিষ্কে ক্ষতি হওয়ায় তাঁকে নানারকম চিকিৎসাপদ্ধতির মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে। যদি তাঁর চিকিৎসকরা মনে করেন যে, মিসেস প্রেটিকে এইভাবেই বাঁচতে হবে এবং কোনদিনই তিনি নিজের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করতে পারবেন না, তাহলে তাঁরা বাঁচিয়ে রাখার সকলরকম চিকিৎসা (সেলাইন দেওয়া প্রভৃতি) আইনসঙ্গতভাবে বন্ধ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাঁরা মনে করবেন যে, তাঁরা চিকিৎসকের যা কর্তব্য অর্থাৎ রোগীর জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা করা—তা তাঁরা করছেন না। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের চিকিৎসা বন্ধ করে রোগীর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করতে দেওয়া কখনোই উচিত নয়।

কর্তব্য সম্বন্ধে এই পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসা বন্ধ করা আইন ও নীতির দিক থেকে হত্যার সমপর্যায়ের বলে গণ্য করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, জরুরি অবস্থায় যদি রোগীর রক্তক্ষরণ বন্ধ না করার ফলে তার মৃত্যু হয়, তাহলে চিকিৎসককে হত্যার দায়ে পড়তে হবে। সেজন্য তাঁরা যদি মনে করেন, চিকিৎসা বন্ধ করার ফলে নিশ্চিত মৃত্যু রোগীর পক্ষে মঙ্গলকর, তবে তা তাঁদের কখনো কখনো করতে দেওয়া উচিত। সংসদ ও আদালতের এটা মেনে আইন পাশ করা উচিত যে, গুরুতরভাবে অসুস্থ কোন রোগীর পক্ষে মৃত্যু হতে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। ঘোর ইউথ্যানসিয়া-বিরোধীরাও মেনে নেন যে, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃতভাবে চিকিৎসা বন্ধ করার মধ্যে নীতিগতভাবে কোন তফাৎ নেই। তাঁদের দাবি: প্রথমত, এই ধরনের রোগীর চিকিৎসা চালানো খুব সমস্যার ব্যাপার এবং চালালে কোন লাভ হয় না। কিন্তু এই বিবেচনায় যেন কখনো মনে না'আসে যে, রোগীর বেঁচে থাকলে কোন লাভ হবে না। দ্বিতীয়ত, চিকিৎসা বন্ধ করলে রোগীর মৃত্যু হবে—এটা সত্য হলেও মৃত্যু ডেকে আনার জন্য যেন চিকিৎসা বন্ধ না করা হয়।

অন্যদিকে আমাদের বিবেচনা করতে হবে—সমস্যাবহুল চিকিৎসাতে যদি প্রাণ বাঁচানো না যায়, তবে সে-চিকিৎসার দরকার কি? আর সেরকম রোগীকে চিকিৎসার মাধ্যমে আরো কিছুদিন বাঁচতে দেওয়ার দরকারই বা কি? সেজন্য চিকিৎসা বন্ধ করা রোগীর স্বার্থের দিক থেকেই দেখা হচ্ছে—একথা ভাবতে হবে।

আরো ভাবতে হবে যে, মৃত্যু হতে দেওয়া যদি কোন রোগীর স্বার্থের অনুকূল হয় এবং তার চিকিৎসা বন্ধ করা তার উপকারের জন্য হয়, তখন সে-চিকিৎসা বন্ধ করাকে রোগীর 'নীতিগতভাবে মঙ্গল করা' (moral good) বলে গ্রহণ করতে হবে। তাই যদি হয়, তাহলে দোষ কোথায়? বরং অনুকূল অবস্থায় চিকিৎসকদল উচিত মনে করলে চিকিৎসা বন্ধ করতে পারেন, যদি তার উদ্দেশ্য হয় রোগীর কষ্ট কমিয়ে দেওয়া। যদি তাঁরা তা না করেন, তাহলে তাঁদের যা কর্তব্য অর্থাৎ রোগীর স্বার্থ দেখা, তা করা হবে না।

মিসেস প্রেটির ক্ষেত্রে, উপরি উক্ত যুক্তিতে, ইচ্ছাকৃত ইউথ্যানসিয়া করা আইনসঙ্গত বলে ধরা হবে কেন? তিনি চিকিৎসকদের ডেকে কিভাবে তাঁকে মেরে ফেলা হবে তা জানাতে বলবেন না কেন? এরূপ করার তাঁর যোগ্যতা নেই—একথা কিন্তু কেউ বলেনি।

সবশেষে আমাদের ভাবতে হবে, যদি কোন রোগীকে তার ইচ্ছানুযায়ী মেরে ফেলা উচিত বলে ধরা হয়, তাহলে প্রশ্ন আসবে—মিসেস প্রেটি যা চান অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত ইউথ্যানসিয়া বা আত্মহত্যা—তা করতে সাহায্য করা বলে এটাকে ধরা হবে।

ইউথ্যানসিয়া করানো বা চিকিৎসকদের সাহায্যে আত্মহত্যা করা—এই ব্যাপারে একটা বিরাট সমস্যা হচ্ছে, কখন মৃত্যু হতে সাহায্য করার অনুরোধ 'উচিত' বলে গণ্য করা হবে? সমস্যা কঠিন, তবে এর সমাধান যে নেই তা নয়। প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে—যদি অনুরোধে হত্যা করাকে 'মর‍্যাল রাইট' বলা হয়, তবে অন্যায়টা কোথায়? [দ্রঃ **British Medical Journal, 10 November 2001, pp. 1079-1080**] ❑

সঙ্কলন ও ভাষান্তর: জলধিকুমার সরকার

যুগোত্তীর্ণ কবি নজরুল ইসলাম

গৌতম মুখোপাধ্যায়



শতবর্ষের আলোকে নজরুল
সঙ্কলন ও সম্পাদনা :
দেবেশ্বর ভট্টাচার্য
প্রকাশক :
যূথিকা ভট্টাচার্য
এ-১৭৮বি, বাঙ্গুর এভিনিউ
কলকাতা—৭০০ ০৫৫
পৃষ্ঠা : ১৬+৩৮৮
মূল্য : ১৫০ টাকা
প্রথম সংস্করণ : ১৯৯৯

অনেকেই আক্ষেপ করেন, বাঙলা সাহিত্যের চর্চায় নজরুলের সাহিত্য বা সামগ্রিকভাবে নজরুলকে নিয়ে আলোচনা খুব বেশি হয় না। সোজা কথায়, তিনি অনেকাংশেই অবহেলিত। দেবেশ্বর ভট্টাচার্য সঙ্কলিত ও সম্পাদিত **'শতবর্ষের আলোকে নজরুল'** গ্রন্থটি সেই অভাব বেশ খানিকটা মেটাবে।

প্রায় ব্যক্তিগত তাগিদে ও প্রচেষ্টায় শ্রীভট্টাচার্য গ্রন্থটির কাজে হাত দেন এবং তাঁর কথানুসারে, নজরুলের প্রতি আবাল্য অনুরাগই তাঁর প্রেরণার উৎস। তিনি সারাজীবনে প্রায় আড়াইশোর মতো প্রবন্ধাদি সংগ্রহ করেছেন, যেগুলিতে নজরুলের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান সঙ্কলনে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তার থেকে একশোটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করেছেন।

পুরো গ্রন্থটি পড়ার আগে কেবল সূচীপত্রের দিকে চোখ রাখলেই গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি দেখে অবাক হতে হয়। এই প্রবন্ধগুলি যাঁরা রচনা করেছেন, তাঁদের অনেকেই নানাভাবে নজরুলের সঙ্গে সম্পর্কিত। সুতরাং গ্রন্থটিতে যে বিভিন্ন আঙ্গিকে নজরুলকে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তা বলা বাহুল্য।

নজরুল ইসলামের বহু আলোচিত দিক হলো তাঁর বিদ্রোহী সত্তা। বিভিন্ন মানুষের আলোচনায় তাঁর এই সত্তা স্থান পেয়েছে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে এমন আরো অনেক বিষয় রয়েছে, যা এক অর্থে অনালোচিত অথবা কম আলোচিত। তাই সেগুলি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থটি চিরাচরিত প্রথার জীবনীগ্রন্থ নয়, কোন তত্ত্ব আলোচনায় ভারাক্রান্তও নয়; এটা একান্তভাবেই নজরুল-দর্শন—লেখকদের সম্পূর্ণ নিজস্ব নজরুল-চেতনা যার উৎসস্থল।

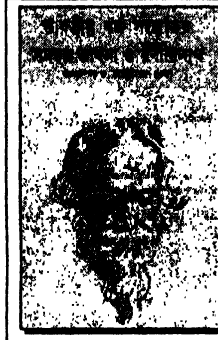
বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তির পাশাপাশি চোখে পড়ে লেখকদের স্বাতন্ত্র্য। কারণ, যাঁদের লেখা এই সঙ্কলনের অন্তর্গত—তাঁরা বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন ভাবধারার মানুষ। তাই তাঁদের নিজ নিজ মূল্যায়নের প্রতিফলন গ্রন্থটির সমৃদ্ধি ঘটিয়েছে। আর এটিকে সঙ্কলন করার জন্য পুরো কৃতিত্বই শ্রীভট্টাচার্যের।

বিভিন্ন ভাবে কবিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেকে যেমন তাঁর নানা দিক তুলে ধরেছেন, তেমনি আবার কল্যাণী কাজীর লেখায় সংশয়ের সুরও শোনা যায়—"শতবর্ষে বিদ্রোহী তাঁর যথাযথ মর্যাদা পাবেন তো?"

এ-আশঙ্কা অনেকের। এমতাবস্থায় উক্ত গ্রন্থটির মতো প্রবন্ধ সঙ্কলনের যৌক্তিকতা এবং প্রয়োজন অনেক বেশি। বলা বাহুল্য, আলোচ্য গ্রন্থটি সে-প্রয়োজন অনেকাংশে মেটাবে। ❑

এক তথ্যানুসন্ধানী গবেষণা-গ্রন্থ

বাসব ভট্টাচার্য



ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয় ভাবনা ও রবীন্দ্রনাথ
জহরলাল বেরা
প্রকাশক :
জহরলাল বেরা
'কাননালয়', অরবিন্দ নগর
মেদিনীপুর
পৃষ্ঠা : ২২+৩২৪
মূল্য : ১২৫ টাকা
প্রথম সংস্করণ : ১৯৯৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধ্যাত্মিক ভাবনা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে, অসংখ্য গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক ডঃ জহরলাল বেরা এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক ভাবনাকে বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর **'ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয় ভাবনা ও রবীন্দ্রনাথ'** গ্রন্থে।

প্রচ্ছদপটে শুচিতার শোভা। ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয় ভাবনার পরম্পরাকে আত্মস্থ করে গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচেতনা। লেখক সৃষ্টি করেছেন এক তাত্ত্বিক রচনা-সন্দর্ভ—এক তথ্যানুসন্ধানী গবেষণা-গ্রন্থ। অগুন্তি উদ্ধৃতি সংযোজন করে ছত্রে ছত্রে বক্তব্য বিষয়কে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যুক্তিনিষ্ঠ করার এক আন্তরিক প্রচেষ্টার ইঙ্গিত রয়েছে গ্রন্থটিতে। নব্বই পৃষ্ঠাব্যাপী শতাধিক উদ্ধৃতি, উনত্রিশ পৃষ্ঠা জুড়ে 'উৎস নির্দেশ', সাত পৃষ্ঠায় ব্যাপ্ত তিরাশিজন লেখক-লেখিকার নাম, তাঁদের লেখা গ্রন্থ ও সম্পাদিত পত্রপত্রিকার তালিকা এবং আকর-তালিকার এক বিস্ময়কর ব্যাপ্তি দেখে চমৎকৃত হতে হয়। এই ব্যাপকতা গ্রন্থটিকে একঘেয়ে ও বিরক্তিকর করে তোলেনি। এই তাত্ত্বিক সন্দর্ভের বিষয়বস্তুর এক স্বাভাবিক মাধুর্য আছে। বিষয়বস্তুকে সুপরিকল্পিত-ভাবে নয়টি অধ্যায়ে বিভাজনে নতুনত্বের ছোঁয়া আছে। প্রতিটি অধ্যায়ে উপস্থাপনা সুষ্ঠু ও রচনাশৈলী মনোরম। আলোচ্য বিষয়ের পারম্পরিক সম্পর্কসূত্র ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। বেদ-উপনিষদ্-পুরাণ-গীতা প্রভৃতি সনাতন ধর্মগ্রন্থ, বৌদ্ধধর্ম, রামানন্দ-কবীর-নানক-দাদূ-রজ্জব প্রমুখ সন্তকবির সাধনা ও বাণী, চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম, বাউলগান, রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্র প্রমুখের একেশ্বরবাদ, 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা'র

বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মীয় সমন্বয় ভাবনার আধ্যাত্মিক অনুভূতি থেকে উদ্ধৃতি সহযোগে প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক যুগে ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয় ভাবনার স্বরূপ-সন্ধান, তার মর্মবাণী ও তার ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ তো বটেই, বিশ্ববিখ্যাত মনীষী যথা রোমাঁ রোলাঁ, উইল ডুরাণ্ট প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌গণ ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয় ভাবনার মূর্ত প্রতীকরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মভাবনাকে বিশেষিত করেছেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে আলোচনা আরো গভীরভাবে উপস্থাপন করার প্রয়োজন ছিল।

রবীন্দ্রচেতনায় ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয় ভাবনার উদ্ভব ও তার ক্রমবিকাশকে শেষ ছয়টি অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার ক্রমবিকাশকে অভিনবভাবে ছটি পর্বে ভাগ করে সেগুলির স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাক্-নৈবেদ্য পর্ব, নৈবেদ্য পর্ব, গীতাঞ্জলি পর্ব, বলাকা পর্ব, রক্তকরবী-রাশিয়ার চিঠি পর্ব ও পরিশেষ-পুনশ্চ-শেষ সপ্তক-বীথিকা-পত্রপুট-প্রান্তিক পর্বের কবিতা, কাব্য, গান, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতিকে পর্বে পর্বে ভাগ করে ধারাবাহিকভাবে আলোচনার দুরূহ কাজটি লেখক যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছেন। প্রাঞ্জলতা বজায় রেখে আলোচনা-গুলি অধ্যাপক ডঃ বেরার বৈদগ্ধ্যপূর্ণ সৃজনধর্মী মননক্রিয়ার আরেকটি নিদর্শন। তাঁর গবেষণা নিঃসন্দেহে নতুনত্বের দাবি রাখে।

তবে 'পরিশিষ্ট'-এর সংযোজন বেমানান বোধ হয়েছে। কাগজ ও ছাপার মান আরো উন্নত হলে ভাল হতো। মুদ্রণপ্রমাদ ও বানান ভুলও চোখে পড়ার মতো। ❑

বঙ্গসাহিত্যে একটি সুন্দর সংযোজন

স্বামী অক্ষতানন্দ

মৃদঙ্গ থেকে জীব অঙ্গে
অজিতকুমার সিংহ
প্রকাশক :
অজিতকুমার সিংহ
কাঁথি, মেদিনীপুর
পৃষ্ঠা : ১৪+৩০৮
মূল্য : ১২৫ টাকা
প্রথম সংস্করণ : ১৯৯৯

বঙ্গসাহিত্যে মননশীল প্রবন্ধ রচনার বয়স প্রায় দুশো বছর। কিন্তু সৃষ্টিশীল মৌলিক প্রবন্ধ-লেখক তুলনামূলকভাবে খুবই কম। বর্তমান কালে এই সংখ্যা নগণ্য হয়ে পড়েছে। তাই 'মৃদঙ্গ থেকে জীব অঙ্গে' গ্রন্থে অজিতকুমার সিংহের রচনাভঙ্গি ও নিজস্ব অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ বাস্তবধর্মী প্রবন্ধগুলি পাঠ করে পাঠকবর্গ এই প্রবীণ লেখককে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবেন।

রচনারীতির ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রাবন্ধিকের থাকে বিশেষ রচনাভঙ্গি বা style। বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) হাস্যরসের ঝিলিকে, ছোট ছোট তীক্ষ্ণ শব্দবাণ প্রয়োগে বহুবর্ণময় ঐতিহাসিক, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গসূত্র ব্যবহার করে যেমন যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, বর্তমান গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি সেই বিস্মৃতপ্রায় ধারাকে কিছুটা হলেও স্মরণ করায়।

ব্যক্তিগত জীবনে বিশিষ্ট ও সফল চিকিৎসাবিদ্ ডাঃ অজিতকুমার সিংহের আজীবনলব্ধ অভিজ্ঞতা ও সারস্বত সাধনার ফসল **'মৃদঙ্গ থেকে জীব অঙ্গে'**। যুক্তিবাদী, আদর্শনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানমনস্ক এই চিকিৎসক-লেখক 'জীব অঙ্গ'-এর বিশ্লেষকরূপে জীবের মন-মৃদঙ্গে সুপ্ত সত্তার প্রতি যে-আকর্ষণ লুকিয়ে আছে, তাকে তুলে ধরে বিজ্ঞান ও বাস্তবের নিরিখে বিশ্লেষণ করেছেন।

১৪০৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এই সঙ্কলনগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র বিষয়ে লেখা রচনাগুলি। দুই পর্বে বিভক্ত গ্রন্থের প্রথম পর্বের নাম 'পথিকৃৎ'। মোট তেরোটি আলোচনায় যেমন একদিকে বিশ্বব্যাপী জনজীবনে বহুবিধ আর্থ-সামাজিক সঙ্কট আলোচিত হয়েছে, তেমনি আলোচিত হয়েছে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং অশান্ত ব্যক্তি ও সমাজ-জীবন শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনদর্শনের আলোকশিখায় কিভাবে দীপ্তিময় হবে—তারই অনুসন্ধান। শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুগামী ও মননশীল এই লেখক নিত্য অজস্র সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে এসে তাদের সীমাহীন সমস্যাগুলিকে গভীর সহানুভূতি ও ব্যাপক অনুসন্ধান-সহ পর্যালোচনা করেছেন। বিচার করেছেন শতাব্দীর সমাজজীবন—যেখানে মানুষের দেহগত ব্যাধির চেয়ে মনের ব্যাধি ক্রমাগত বেড়ে আরো গভীর সমস্যার সৃষ্টি করছে। তাঁর ভাবনায় দারিদ্র্য যেমন একটা সামাজিক ব্যাধি, তেমনি অত্যধিক ধন উপার্জন ও সম্পদ সংগ্রহের মোহ আরো বেশি ক্ষয়কারী। এর নিরসনে প্রবন্ধগুলিতে আলোক-পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও জীবনদর্শনের বাস্তব প্রয়োগের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল মানবজীবন ও সমাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে লেখকের নানা আলোকপাত পাওয়া যাবে 'পথচর্যা' নামে দ্বিতীয় পর্বে। এতে মোট ২২টি প্রবন্ধে জীবনচর্যার যাঁরা পথিকৃৎ তাঁদের চিন্তাধারার সঙ্গে সাম্প্রতিক জীবনধারা ও কর্মপ্রণালীর পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পার্থক্য বিচারের জন্য লেখক প্রথাগত বা পুঁথিগত শাস্ত্রীয় ধর্মানুসরণ বা অপার্থিব ভগবদ্‌বিশ্বাস অপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন নৈতিক মূল্যবোধের ওপর।

প্রবন্ধ চিন্তাশীল সাহিত্য বলে সাধারণত জনপ্রিয় বা popular নয়। ভাষাও স্বভাবগত কারণে কিছুটা নীরস; তথাপি যথাসম্ভব হাস্যরসাশ্রিত সরস ভঙ্গি প্রয়োগ করে লেখক রচনায় যে মাধুর্য এনেছেন, তা প্রশংসার দাবি রাখে। লেখকের কিছু মত ও ব্যাখ্যা অনেকের অনুমোদন নাও পেতে পারে, তবে স্বকীয় বলিষ্ঠ চিন্তা ব্যক্ত করে তিনি যে মননশীলতার পরিচয় রেখেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিছু ছাপা ও বানান ভুল, বারবার একই শব্দের প্রয়োগ ইত্যাদি ত্রুটি থাকলেও প্রচ্ছদটি চিন্তাপ্রদ। ❑

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনখল-এর শতবর্ষপূর্তি উৎসব

উত্তরাঞ্চলের সুপ্রাচীন তীর্থ হরিদ্বারের অনতিদূরে কনখলে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম-এর শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় গত ৭-১২ এপ্রিল ২০০২-এ। শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।

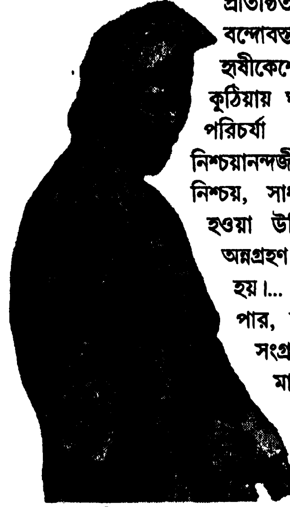
কনখলের এই সেবাশ্রম রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাথমিক পর্বে গঠিত কেন্দ্রগুলির মধ্যে অন্যতম (পঞ্চম)। হাসপাতাল-সহ বহুবিধ সেবাকার্য পরিচালনকারী এই কেন্দ্রটি উত্তরাঞ্চল তথা সমগ্র ভারতবর্ষের চিকিৎসাজগতে শুধু যে এক উজ্জ্বল স্থান অধিকার করে রয়েছে তা-ই নয়, এর সূচনালগ্নের ইতিহাসেরও বিশেষ একটি তাৎপর্য আছে। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম অবস্থায় অল্প কয়েকজন সন্ন্যাসীর অলোকসামান্য ত্যাগ-তিতিক্ষায় গঠিত যে-কেন্দ্রগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ-উচ্চারিত ও স্বামীজী-ব্যাখ্যাত 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' তথা 'ফলিত বেদান্ত'র মূর্ত দৃষ্টান্তস্থল, তাদের অন্যতম এই কনখল সেবাশ্রম।

দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য থেকে ফিরে স্বামীজী একদিন তাঁর সন্ন্যাসি-শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দকে বলেছিলেনঃ "দেখ কল্যাণ, হৃষীকেশ-হরিদ্বার অঞ্চলের অসুস্থ রুগ্ন সাধুদের জন্য কিছু করতে পারিস? তাঁদের দেখবার জন্য কেউ নেই। তুই গিয়ে তাঁদের সেবায় লেগে যা।" প্রসঙ্গত, স্বামীজী স্বয়ং ১৮৮৮ ও ১৮৯০ সালে ঐসব অঞ্চলে পরিব্রাজক অবস্থায় স্বচক্ষে পীড়িত সাধুদের শারীরিক দুর্দশা দেখেছিলেন এবং নিজেও অসুস্থ হয়ে ভীষণ কষ্টভোগ করেছিলেন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

গুরুবাক্য শিরোধার্য করে স্বামী কল্যাণানন্দজী ১৯০১ সালের জুন মাসে হিমালয়ের পাদদেশে তৎকালীন উত্তরপ্রদেশের হরিদ্বারের কাছে ছোট্ট গ্রাম কনখলে সূচনা করলেন সেবাযজ্ঞের—'রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম' নামে। মাসিক ৩ টাকায় দুটি ভাড়াঘরে ব্যবস্থা হলো সাধুদের শয্যার, চিকিৎসার সাজ-সরঞ্জামের, মহারাজের নিজের বাসস্থানের এবং অন্যান্য কাজকর্মের। ঐ বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত সেবাশ্রমের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, ঐ মাসে অন্তর্বিভাগে ৬ জন সাধুর চিকিৎসা করা হয়েছিল এবং বহির্বিভাগের ৪৮ জন রোগীর মধ্যে ৩০ জন ছিলেন সাধু, বাকিরা দরিদ্র গৃহী।

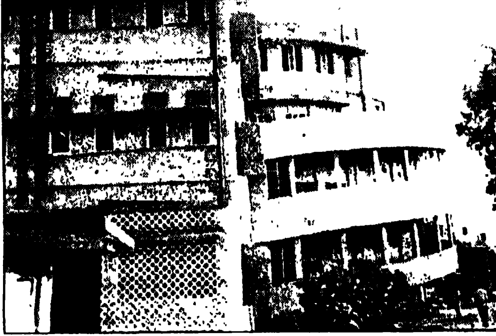
কনখলের কাজের সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণানন্দজী হৃষীকেশের সাধুদের জন্যও সেবাকার্যের সূচনা করলেন। বহুমুখী কাজের পরিধি ক্রমেই বেড়ে চলল। কিছুকাল পরে ১৯০৩-এর কোন এক সময়ে কল্যাণানন্দজীর পাশে এসে দাঁড়ালেন তাঁরই আরেক প্রিয় গুরুভাই স্বামী নিশ্চয়ানন্দজী। দুজনে মিলে মাধুকরী ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করতেন ও সর্বশক্তি দিয়ে সেবা-উপাসনা করতেন। তাঁদের নিত্যকর্মের মধ্যে ছিল—নব-প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রমের সর্বপ্রকার বন্দোবস্ত করে তারপর হরিদ্বার ও হৃষীকেশের সাধুদের কুঠিয়ায় কুঠিয়ায় ঘুরে বৃদ্ধ ও রুগ্ন সাধুদের পরিচর্যা করা। স্বামীজী একদিন নিশ্চয়ানন্দজীকে বলেছিলেনঃ "দেখ নিশ্চয়, সাধু হয়ে অপরের গলগ্রহ হওয়া উচিত নয়। কোন ব্যক্তির অন্নগ্রহণ করলেই প্রতিদান দিতে হয়।... যদি কাজ কিছু করতে নাও পার, ভিক্ষে করে একটি পয়সা সংগ্রহ করে তা দিয়ে একটি মাটির কলসি কিনে রাস্তার ধারে বসে তৃষ্ণার্ত পথিকদের জল দিও। তৃষ্ণাতুরকে জলপান করালেও মহৎ কাজ হবে।"


স্বামী নিশ্চয়ানন্দ

কনখলে এসে নিশ্চয়ানন্দজী প্রতিদিন অতি ভোরে ওষুধের একটি বাক্স এবং পথ্যের একটি পুঁটলি কাঁধে নিয়ে কনখল থেকে প্রায় আঠারো মাইল হেঁটে হৃষীকেশে গিয়ে সাধুদের সেবা করতেন। রোগীদের ওষুধ ও প্রয়োজনমতো স্বহস্তে তৈরি পথ্য খাওয়াতেন ও তাদের শুশ্রূষা করতেন। দিনান্তে মাধুকরী বা ছত্রে ভিক্ষা গ্রহণ করতেন, অপরাহ্নে আবার সবার খোঁজখবর নিয়ে কনখলে ফিরতেন। এইভাবে রোদ-ঝড়-জল উপেক্ষা করে দিনের পর দিন তিনি প্রায় ছত্রিশ মাইল হেঁটে গুরু-উপদিষ্ট সেবাকর্মে নিজেকে সমর্পিত রেখেছিলেন। রোগীর মলমূত্র পরিষ্কার করা থেকে আরম্ভ করে নানা খুঁটিনাটি শুশ্রূষার কাজ পরম নিষ্ঠাভরে সম্পাদন করতেন কল্যাণানন্দজী ও নিশ্চয়ানন্দজী। আবার কোন সাধুর দেহাবসান হলে দুজনে মিলে দেহখানিকে বহন করে গঙ্গায় সলিলসমাধি দিতেন।


কনখল সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির

শুধু সাধুদের মধ্যেই নয়, স্বামীজীর এই দুই সুযোগ্য সন্তানের সেবাযজ্ঞ বিস্তৃত ছিল অসুস্থ দরিদ্র মানুষের মধ্যেও, এমনকি চণ্ডালপল্লীর ঝুপড়িতে অবধি। উত্তরাখণ্ডের 'অদ্বৈতবাদী' গোঁড়া সন্ন্যাসীরা স্বামীজী-প্রবর্তিত এই নব সেবাধর্মকে কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের চোখে দেখতেন এবং স্বামীজীর দুই শিষ্যকে 'ভাঙ্গী-সাধু' ('ভাঙ্গী'র অর্থ মেথর) পর্যন্ত বলতেন। কিন্তু তৎকালে উত্তরাখণ্ডের দশনামী সাধুসম্প্রদায়ে বিশেষ সম্মানিত, হৃষীকেশের কৈলাস মঠের মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ ধনরাজ গিরিজী মহারাজ এই দুই সাধুর সেবাব্রতকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন ও স্বীকৃতি প্রদান করেন। তাঁর এই স্বীকৃতির ফলে উত্তরাখণ্ডের প্রাচীনপন্থী সাধুদের দৃষ্টি শুধু যে কল্যাণানন্দজীদের কার্যের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলো তা-ই নয়, ভারতের এই অঞ্চলে ভবিষ্যতে রামকৃষ্ণ মিশনের জনহিতকর কার্যাবলীর পথও অনেকাংশে সুগম করে দিল। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য প্রসঙ্গে ধনরাজ গিরিজীর নাম তাই সবিশেষ শ্রদ্ধায় স্মরণযোগ্য।



কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের পুরনো ভবন

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কাজ ক্রমশ বিস্তারলাভ করতে থাকে। ১৯১০ সালে এটির নতুন নামকরণ হয় 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম'। কল্যাণানন্দজীর কর্মপরিধি শুধু পীড়িত-সেবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। স্বামীজী একদিন তাঁকে বলেছিলেন ঃ "দেখ কল্যাণ, আমার কেমন ইচ্ছা হয় জানিস? একদিকে ঠাকুরের মন্দির থাকবে—সাধু-ব্রহ্মচারীরা তাতে ধ্যানধারণাদি করবে; তারপর যা ধ্যান করলে, practical field-এ তা কাজে লাগাবে।" স্বামীজীর এই ইচ্ছাকে সাকার রূপ দিতে কল্যাণানন্দজী কনখল সেবাশ্রমে ধীরে ধীরে গড়ে তুললেন শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির, তার সংলগ্ন ধ্যানঘর, গ্রন্থাগার (রোগীদের জন্য একটি, সাধারণের জন্য একটি), দরিদ্র শ্রমজীবী ও তাদের সন্তানদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতি। নৈশ বিদ্যালয়টিকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার পর কল্যাণানন্দজী এটিকে মেথরদের বস্তিতেই স্থানান্তরিত করেন। সেবাশ্রমের কাছাকাছি মুচি, ডোম প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, কূপ খনন করানো, কষ্টের সময় অর্থসাহায্য করা, ঘর তৈরি করিয়ে দেওয়া ইত্যাদি বহুবিধ কাজে স্বামীজীর দুই সন্ন্যাসি-সন্তান নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন। এগুলি সেই সময়ের কথা—যখন ব্রিটিশ সরকার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণের কথা বিশেষ কিছুই ভাবত না। গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনও এসবের বহু পরের কথা।



কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অভ্যন্তর

শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, স্বামী শিবানন্দজী, স্বামী সারদানন্দজী, স্বামী তুরীয়ানন্দজী ও স্বামী প্রেমানন্দজী বিভিন্ন সময়ে কনখল সেবাশ্রমে পদার্পণ করেছেন। কল্যাণানন্দজী ও নিশ্চয়ানন্দজীর জীবদ্দশার পরেও অব্যাহত থেকেছে সেবাশ্রমের কর্মকাণ্ড। সে-কর্মযজ্ঞে বিভিন্ন সময়ে সামিল হয়েছেন রামকৃষ্ণ মিশনের বরেণ্য ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসী এবং ভক্ত ও অনুরাগীবৃন্দ। শতাধিক বর্ষের গৌরবময় যাত্রাপথ পেরিয়ে আসা এই সেবাশ্রমে বর্তমানে রয়েছে ১২২টি শয্যা ও বিভিন্ন বিভাগ (মহিলা ও প্রসূতি বিভাগ-সহ)-যুক্ত একটি সুবৃহৎ হাসপাতাল, ডাক্তার ও সহকারীদের আবাস, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র, অতিথি-ভবন, গ্রন্থাগার, শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি-সমন্বিত নতুন মন্দির, সাধুনিবাস প্রভৃতি। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কল্যাণানন্দজীর সময় থেকেই সেবাশ্রম আরেকটি বিশেষ কাজ করে আসছে—সেটি হরিদ্বারে কুম্ভ-মেলায় ভক্তসেবা। তাছাড়া নানা প্রাকৃতিক ও অন্যান্য দুর্যোগ-দুর্বিপাকে অক্লান্ত সেবার নিদর্শন স্থাপন করেছে এই সেবাশ্রম। অধুনা প্রয়াত পূর্বতন অধ্যক্ষ স্বামী বরেশানন্দজীর অধ্যক্ষতায় সেবাশ্রম বর্তমান রূপ ধারণ করে।

সেবাশ্রমের শতাব্দীজয়ন্তীর বর্ষব্যাপী উৎসবের সূচনা হয় গত ১ জুন ২০০১-এ পূজা, বক্তৃতা প্রভৃতির মাধ্যমে। ৬ জুন ২০০১-এ অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ সভা। সভাপতিত্ব করেন উত্তরাঞ্চলের রাজ্যপাল সুরজিৎ সিং বার্ণালা; সভায় বক্তৃতা দান করেন স্থানীয় আখড়াগুলির প্রবীণ সন্ন্যাসীরা। তাঁরা সেবাশ্রমের কর্মধারার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেন। বর্ষব্যাপী উৎসবের সমাপ্তি পর্বের অনুষ্ঠানগুলি আয়োজিত হয় ৭-১২ এপ্রিল ২০০২-এ। ৭ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় চিকিৎসকদের সম্মেলন—যার বিষয় ছিল 'Continuing Medical Education'। দিল্লির অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স এবং চণ্ডীগড়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ

মেডিক্যাল সায়েন্সেস্-এর প্রথিতযশা চিকিৎসকরা এতে অংশ নেন। আশীর্বাণীসূচক ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। ৮ এপ্রিল ২০০২-এ শতবর্ষপূর্তি উৎসবেরও উদ্বোধন করেন তিনি। বিভিন্ন দিনে অনুষ্ঠিত হয় নরনারায়ণসেবা, শোভাযাত্রা, সাধুভাণ্ডারা, ভক্তসম্মেলন, সাধারণ সভা, যুবসম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বক্তৃতা দেন সেবাশ্রমের বর্তমান সচিব স্বামী নিত্যশুদ্ধানন্দজী, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ এবং স্বামী পীতাম্বরানন্দজী, স্বামী অকামানন্দজী, স্বামী গোকুলানন্দজী, স্বামী ব্রহ্মস্থানন্দজী, স্বামী জিতাত্মানন্দজী, স্বামী চিন্ময়ানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী জ্ঞানস্থানন্দজী ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রবীণ সন্ন্যাসিগণ। বিশেষ বক্তৃতা দান করেন শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ ও হৃষীকেশের কৈলাস আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী বিদ্যানন্দ গিরিজী মহারাজ ও উত্তরাঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী নারায়ণ দত্ত তেওয়ারি।



শতবর্ষপূর্তি উৎসবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু সমাবেশ

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই দিন বিদ্যানন্দ গিরিজী তাঁর ভাষণে প্রায় শতবর্ষ আগে তৎকালীন মহামণ্ডলেশ্বর ধনরাজ গিরিজী কর্তৃক রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাব্রতকে স্বীকৃতিদানের ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ১৯১০ সালের কাছাকাছি কোন এক সময়ে বিরাট এক ভাণ্ডারা উপলক্ষ্যে কনখলে এসেছিলেন ধনরাজ গিরিজী। তিনি এসে অন্য সাধুদের বলেন ঃ "শুনেছি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যেরা এদিকে থাকেন; তোমরা কি তাঁদের চেন?" তখন সাধুরা বলেন ঃ "হ্যাঁ, চিনি, কিন্তু তারা ভাঙ্গী সাধু—দুনিয়ার নীচ কাজ করে বেড়ায়।" সাধুদের এই গোঁড়ামিতে অসন্তুষ্ট ধনরাজ গিরিজী তৎক্ষণাৎ কল্যাণানন্দজী ও নিশ্চয়ানন্দজীকে সন্ধান করে ভাণ্ডারায় নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসার জন্য একজনকে প্রেরণ করেন। তাঁরা উপস্থিত হলে ধনরাজ গিরিজী স্বয়ং তাঁদের বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে স্বাগত জানান এবং নিজের দুপাশে দুজনকে বসিয়ে উপস্থিত সাধুসমাজের কাছে স্বামীজী-উপদিষ্ট সেবাধর্মের উচ্ছ্বসিত গুণগান করেন। শতবার্ষিকী সভায় বিদ্যানন্দ গিরিজীর মুখে এই কাহিনী শুনে সকলে বিশেষ আনন্দিত হন।

শতবার্ষিক সমারোহের অঙ্গ হিসাবে আয়োজিত শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন পঞ্চপুরী ষড়্দর্শন সাধুসমাজ ও আখড়ার সন্ন্যাসী এবং ভক্তবৃন্দ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন পণ্ডিত রাজন মিশ্র ও সাজন মিশ্র প্রমুখ। শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন অবলম্বনে নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে রাজেন্দ্র কাচরুর পরিচালনায় নিউ দিল্লির 'অভিনব' সংস্থা। উৎসবের দিনগুলি এবং বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাটি বহু সাধু-ভক্তের সমাগমে সার্থক হয়ে ওঠে।

সরিষা মিশনে 'সংস্কৃত দিবস'

গত ২২ আগস্ট ২০০২, বৃহস্পতিবার, রাখীপূর্ণিমায় 'সংস্কৃত দিবস'-এ আশ্রমের 'সংস্কৃত' বিভাগ কর্তৃক একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। বিষয় ছিল—'সাহিত্যে চেতনায় সংস্কৃত'। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী সুপর্ণানন্দজী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ডঃ নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অয়ন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সত্যনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানে দুই শতাধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

আঁটপুরে শ্রীশ্রীমায়ের স্পর্শধন্য গৃহের সংস্কার ও দ্বারোদ্ঘাটন

আঁটপুরে স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের পৈতৃক ভিটায় শ্রীমা সারদাদেবী দুবার শুভপদার্পণ করেন এবং স্বয়ং উপস্থিত থেকে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা পারিবারিক দুর্গাপূজার পুনঃপ্রচলন করেন। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী শ্রীশ্রীমাকে 'জ্যান্ত দুর্গা' বলে অভিহিত করেছিলেন। ১৮৮৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি শ্রীশ্রীমা এই গৃহে প্রথম পদার্পণ করেন। পরে ১৮৯৪-এর ৪ অক্টোবর তিনি দ্বিতীয়বার এসেছিলেন। শ্রীশ্রীমা যে-গৃহটিতে ছিলেন, সেই পুণ্যস্মৃতিবাহী গৃহটি কালক্রমে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। আঁটপুর রামকৃষ্ণ মঠের ব্যবস্থাপনায় সেই বাড়িটি পুরনো আদলে পুনর্নির্মাণের পর গত ১ সেপ্টেম্বর ২০০২ দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ।



আঁটপুর রামকৃষ্ণ মঠে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি

এই উপলক্ষ্যে গৌতম মুখোপাধ্যায়ের উদ্বোধন-সঙ্গীত দিয়ে ধর্মসভা শুরু হয়। সভায় আশীর্বাণী প্রদান করেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ এবং বক্তব্য রাখেন স্বামী তত্ত্ববোধানন্দজী ও স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী। বেলঘরিয়া আশ্রমের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ কালীকীর্তন পরিবেশন করেন। এই অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রায় ১৫০ জন সাধু-ব্রহ্মচারী ও প্রচুর ভক্ত অংশগ্রহণ করেন। প্রায় ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কাঁথি-র প্ল্যাটিনাম জুবিলি উৎসব

গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০২ **কাঁথি মঠ ও মিশন সেবাশ্রমের** প্ল্যাটিনাম জুবিলি উৎসবের (২০০৩-২০০৪) অঙ্গ হিসাবে প্রস্তাবিত দাতব্য চিকিৎসালয় ভবনের জন্য ভূমিপূজা ও ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠিত হয়। ভিত্তিস্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা : গত ১৩ অক্টোবর ২০০২ মহাষ্টমীর দিন ভোরে মঙ্গলারতি, সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের যোড়শোপচারে পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিনে আগত ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীশ্রীকালীপূজা : গত ৪ নভেম্বর ২০০২ যথারীতি প্রতিমায় যোড়শোপচারে শ্রীশ্রীকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন সকালে সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

ক্ষীরকুণ্ডী প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ (হুগলী) : গত ২২ আগস্ট ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, যাত্রাপালা ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে পূজা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী অতন্দ্রানন্দজী। বিশেষ অতিথির ভাষণ দেন ইন্দ্রনারায়ণ কুণ্ডু।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ (অসম) : গত ২৪ ও ২৫ আগস্ট ২০০২ পরিষদের ১৯তম ষাণ্মাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় **লামডিং রামকৃষ্ণ সেবাসমিতিতে।** এতে ৩৮টি আশ্রম থেকে ১১১ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। অধিবেশনের সূচনা করেন পরিষদের সভাপতি স্বামী উদ্‌গীতানন্দজী। আলোচনা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অছি ও পরিচালন পর্ষদের অন্যতম সদস্য স্বামী প্রমেয়ানন্দজী এবং স্বামী অনন্তানন্দজী, স্বামী ঈশাত্মানন্দজী, স্বামী দেবদেবানন্দজী ও স্বামী প্রথমানন্দজী। পরদিন ধর্মসম্মেলনে ভাষণ দান করেন স্বামী প্রমেয়ানন্দজী, স্বামী উদ্‌গীতানন্দজী, স্বামী দেবদেবানন্দজী প্রমুখ। দুদিনই সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

শ্যামপুকুরবাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্ঘ (কলকাতা) : গত ২৭ থেকে ৩০ আগস্ট ২০০২ পঞ্চবিংশতিতম প্রতিষ্ঠাদিবস পালিত হয়। স্বামী সুহিতানন্দজী, স্বামী অজরানন্দজী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক দীপক গুপ্ত, সুব্রত চক্রবর্তী প্রমুখ প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেন। এই উপলক্ষ্যে ভক্তিগীতিও পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে অনেক সাধু ও ভক্তের সমাগম হয়।

রামপুরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্র (বীরভূম) : গত ৩১ আগস্ট ২০০২ শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা, 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠ, ভজন, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুমনা শর্মা, অনন্যা রায়, কৃষ্ণা দাস প্রমুখ। পাঠ করেন স্বামী বাগীশানন্দ পুরী এবং আলোচনা করেন পাঠচক্রের সম্পাদক বিশ্বেশ্বর রায়।

শকুন্তলা পার্ক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ (কলকাতা) : গত ৩১ আগস্ট ২০০২ জন্মাষ্টমীর দিন বিকালে মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে স্বামী অকল্মষানন্দজী 'জন্মাষ্টমী' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। বিনয় চক্রবর্তী 'বাংলার লোকসংস্কৃতিতে কৃষ্ণের প্রভাব' বিষয়ে আলোচনা করেন। দুপুরে উপস্থিত ৩০০ ভক্তকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সরকারপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ৩১ আগস্ট ২০০২ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে আশ্রমে মঙ্গলারতি, পূজা, 'ভাগবত' ও 'কথামৃত' পাঠ, বাউল সঙ্গীত ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। আশ্রমাধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত ভক্তদের সামনে তুলে ধরেন। 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা' গীতিনাট্যে আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। 'ভাগবত' পাঠ ও আলোচনা করেন কৃষ্ণপ্রসাদ চ্যাটার্জি। 'শ্রীরামকৃষ্ণ শিল্পী গোষ্ঠী' বাউল গান পরিবেশন করেন। দুপুরে প্রায় ৭০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ পাদতীর্থ সেবক সঙ্ঘ (হুগলী) : গত ১ সেপ্টেম্বর ২০০২ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন নবকুমার চক্রবর্তী, বিমল গোস্বামী ও জয়ন্তী মান্না। শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী। উল্লেখ্য, গত ৩১ আগস্ট সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, পাঠ ও ধর্মসভা আয়োজিত হয়। 'ভাগবত' পাঠ করেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুপ্রিয় রায়, অভিজিৎ রায় ও চন্দন সেন। আলোচনা করেন স্বামী সুখানন্দজী।

বিজুর প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ (বর্ধমান) : গত ১ সেপ্টেম্বর ২০০২ স্বামী বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী সম্মেলন আয়োজিত হয় স্থানীয় মন্মথ নাট্যমঞ্চে। পাঠ, সঙ্গীত ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের মুখ্য বিষয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সত্যব্রত মণ্ডল, নারায়ণ রায় ও ছন্দা মুখার্জি। আলোচনা করেন স্বামী যতীশানন্দজী, অধ্যাপক অরূপ মুখোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মেলনে ২২০ জন যুব-প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন।

লেকটাউন শ্রীসারদা সঙ্ঘ (শিলিগুড়ি) ঃ গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০০২ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে 'সারদা নিকেতন'-এ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, জপধ্যান এবং 'কথামৃত', 'মায়ের কথা' ও 'শ্রীমদ্ভাগবত' পাঠ হয়। উপস্থিত ভক্তদের বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সোমসার শ্রীরামকৃষ্ণ সেবামন্দির (বাঁকুড়া) ঃ গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০০২ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কলকাতার 'মহাজাতি সদন'-এ একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনের শুরুতে উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী। প্রথম অধিবেশনে আলোচনা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ, মস্কো রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেণ্টারের অধ্যক্ষ স্বামী জ্যোতিরূপানন্দজী। স্বামী নিত্যমুক্তানন্দজী ও স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজীও ভাষণ দেন। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় অধিবেশনে সারদা মঠের ব্রহ্মচারিণীবৃন্দের বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের পর উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রব্রাজিকা পুণ্যপ্রাণাজী। এরপর আলোচনা ও ভক্তদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান করেন সারদা মঠের অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণাজী এবং প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী। সভার শুরুতে স্বাগত-ভাষণ দান এবং সমাপ্তিতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে সোমসার শ্রীরামকৃষ্ণ সেবামন্দিরের সভাপতি ডঃ তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সহ-সভাপতি ডাঃ শৈবাল গুপ্ত। আশ্রমের কার্যবিবরণী বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আশ্রম-সম্পাদক ডাঃ গৌর দাস। অনুষ্ঠানে সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণাজী।

চাকদহ বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল (নদীয়া) ঃ গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০০২ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি যুবশিক্ষণ শিবির আয়োজিত হয় স্থানীয় বাপুজী বিদ্যামন্দিরে। স্বামীজীর জীবনী ও বাণী পাঠ, চরিত্রগঠনের উপায় প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তরপর্ব ছিল শিবিরের অনুষ্ঠিত বিষয়। আলোচনা করেন বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সনাতনানন্দজী, বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, সোমনাথ বাগচী ও নিতাই কর্মকার। বিভিন্ন সময়ে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ ঘোষাল, তপন বিশ্বাস প্রমুখ। এছাড়া স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে মহীশূর রামকৃষ্ণ আশ্রমের পরিচালনায় একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। শিবিরে ৩৫৪ জন যুবক যোগদান করেছিল।

সেবাব্রত

বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাক্তন ছাত্র সংসদ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ঃ গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০০২ হৃদ্‌রোগের ওপর একটি চিকিৎসা-শিবির আয়োজিত হয়। শিবিরে ৯০ জন মানুষের চিকিৎসা করা হয় এবং বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়।

বহির্ভারত

বিবেকানন্দ হিউম্যান সেন্টার (গ্রেট ব্রিটেন) ঃ গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০২ একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্বধর্মসম্মেলন আয়োজিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে সভাপতিত্ব করেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। শুরুতে উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন কৃষ্ণকলি ঘোষ, কৃষ্টি সাহা, উমা বসু ও দেবলীন মুখার্জি। স্বাগত-ভাষণ দান করেন রামচন্দ্র সাহা। এরপর ভাষণ দান করেন ইন্টারফেথ নেট ওয়ার্কের ডিরেক্টর মিঃ ব্রায়ান পিয়ার্স, বৌদ্ধসঙ্ঘের ধর্মাচারী শ্রিবাতি স্কেলটন, বিশপ্স ইন্টারফেথ এডভাইজার রেভারেণ্ড ফাদার কেপী, রাজকোট রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী জিতাত্মানন্দজী, সেণ্ট লুইস হেলথ সেণ্টারের ডঃ এম. এফ. হক ও নর্থ লণ্ডন শিখ টেম্পলের মিঃ সুরেন্দ্র সিং আত্তারিওয়ালা। সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডঃ চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত।*

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য কালীকিঙ্কর চৌধুরী গত ২৯ এপ্রিল ২০০২ বর্ধমানের নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি পুতুণ্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। 'উদ্বোধন'-এর তিনি আজীবন গ্রাহক ছিলেন। সদাচার ও সদ্‌ভাবনা ছিল তাঁর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, ডিগবয়-নিবাসী বিজয় ভট্টাচার্য গত ৮ মে ২০০২ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তিনি ডিগবয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের প্রথমে সম্পাদক এবং পরে সভাপতি-পদে আমৃত্যু বৃত ছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু প্রবীণ সন্ন্যাসীর তিনি স্নেহভাজন ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বাঁকুড়া শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ বসন্তকুমার সিংহ গত ১২ মে ২০০২ বিবেকানন্দ পল্লীর বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। সরলতা, পবিত্রতা ও শৃঙ্খলাপরায়ণতা ছিল তাঁর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য সতীন্দ্রচন্দ্র দাশ গত ৬ জুন ২০০২ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০০ বছর। তিনি 'উদ্বোধন'-এর দীর্ঘদিনের গ্রাহক ছিলেন। ডিব্রুগড় আশ্রমের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীসারদা মঠের সন্ন্যাসিনী।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, স্বাধীনতা-সংগ্রামী অনিলকুমার সেনগুপ্ত গত ৯ জুন ২০০২ জোড়াসাঁকোয় নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তাঁর পিতা অন্নদাচরণ সেনগুপ্ত ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। তিনি অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন এবং ব্রিটিশের কারাগারে ৭ বছর কারাবরণ করেন। তিনি ছিলেন অমায়িক ও পরোপকারী।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় গত ১২ জুন ২০০২ পরলোকগমন করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। সেবাপরায়ণতা, সরলতা ও সুমধুর ব্যবহার ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ❑

---

* রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন একটি সংগঠন।

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঈশ্ববে অনুবাগ হলে সমস্ত বিশ্বকেই আপন বোধ হয়। কাবণ, সবই তাঁব সৃষ্টি।

স্বামী বিবেকানন্দ

এবকম মনে কবা ভাল নয় যে, আমাব ধর্মই ঠিক আর অন্য সকলেব ধর্ম ভুল। সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওযা যায়। আন্তবিক ব্যাকুলতা থাকলেই হলো। অনন্ত পথ—অনন্ত মত। শ্রীরামকৃষ্ণ

*

ভাঙতে সবাই পাবে, গড়তে পাবে কজন? নিন্দা ঠাট্টা কবতে পাবে সব্বাই, কিন্তু কি কবে যে তাকে ভাল কবতে হবে, তা বলতে পাবে কজনে? শ্রীমা সারদাদেবী

*

টাকায় কিছুই হয না, নামেও হয না, যশেও হয না, বিদ্যাযও কিছু হয না, ভালবাসায সব হয—চবিত্রই বাধাবিঘ্নেব বজ্রদৃঢ় প্রাচীবেব মধ্য দিযে পথ কবে নিতে পাবে। স্বামী বিবেকানন্দ


Organon

তাঁর নামবীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ



‘উদ্বোধন’-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৬

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

বর্ধমান

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, আসানসোল-৭১৩৩০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, শ্যামসায়র (পূর্ব)**
  বর্ধমান-৭১৩১০১
- **নরহরি পুস্তকালয়**
  ৮১ বি. সি. রোড, বর্ধমান-৭১৩১০১
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**
  রামমোহন অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৪
- **আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায়**
  ডি/২০, গ্রীসম স্ট্রীট, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২১২
- **স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি**
  বিদ্যাসাগর অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫
- **নিমানন্দ নায়ক, ৬৩ কবিগুরু সরণি**
  সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-৭১৩২১৬, ফোন ঃ ৫৬৮৮২৩
- **সাধুডাঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  ডি. ভি. সি. কলোনী, দুর্গাপুর-৭১৩২০১
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি**
  এ. বি. এল. টাউনশিপ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৬
- **গুসকরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কালচারাল সেন্টার**
  পিন-৭১৩১২৮
- **অঞ্জনকুমার পাল**
  প্রযত্নে বিবেকানন্দ পাঠচক্র
  কুমোরপাড়া (নারায়ণ ভবন), কাটোয়া-৭১৩১৩০
- **শীতল ব্যানার্জী**
  প্রযত্নে শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি, শ্রীখণ্ড-৭১৩১৫০
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  আমলাদহি, চিত্তরঞ্জন-৭১৩৩৩১
- **পানাগড় রামকৃষ্ণ আশ্রম**
  দার্জিলিং মোড়, পানাগড় বাজার-৭১৩১৪৮
- **স্বামী অসীমানন্দ, সম্পাদক**
  শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবামৃত সঙ্ঘ সেবাশ্রম
  গ্রাম—বুদবুদ, পোঃ বুদবুদ-৭১৩৪০৩, ফোন ঃ ৫১২৬৫০
- **রানীগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**
  ৫৫/১ ভীমাচরণ রোড, কুমার বাজার
  রানীগঞ্জ, পিন ঃ ৭১৩৩৪৭
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (মহীতোষ সামন্ত)**
  বাঁকোলা এরিয়া কমপ্লেক্স, পোঃ উখড়া, পিন-৭১৩৩৬৩

উত্তরবঙ্গ

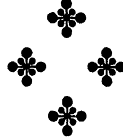
- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**
  জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১
- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**
  মালদা-৭৩২১০১
- **বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  রামকৃষ্ণ টিম্বার ডিপো
  নিউ মার্কেট, বালুরঘাট
  দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১
- **স্বপনকুমার আইচ**
  প্রযত্নে তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম
  বিধানপল্লী, তুফানগঞ্জ
  কুচবিহার-৭৩৬১৬০
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কুচবিহার**
  অজয়কুমার গাঙ্গুলী
  রাজবাড়ি গভঃ হাউসিং, ব্লক সি-১/৯
  কুচবিহার-৭৩৬১০১, ফোন ঃ ২৮৬৮৮

বিপণন-কেন্দ্র ঃ কলকাতা-হাওড়া

- **শ্যামবাজার বুক স্টল**
  ২২০, এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৪
- **পাতিরাম বুক স্টল**
  কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
- **অদ্বৈত আশ্রম স্টল**
  শিয়ালদহ স্টেশন, ৩নং প্ল্যাটফর্ম
- **অদ্বৈত আশ্রম স্টল**
  হাওড়া স্টেশন (মেন এবং নিউ কমপ্লেক্স)
- **রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম**
  বেলুড় মঠ
- **সর্বোদয় বুক স্টল**
  হাওড়া রেলস্টেশন

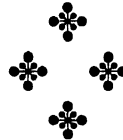
দেহত্যাগের আগে যদি কেউ ঈশ্বরের সাধন করে, আর সাধন করতে করতে ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, তাকে আর পাপ কখনো স্পর্শ করবে? অর্থাৎ ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, আর পাপ স্পর্শ করবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ



ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজনে? নিন্দা-ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, তাকে ভাল করতে পারে কজনে? আমার ছেলে যদি ধুলো-কাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে।

শ্রীমা সারদাদেবী



বেদে কোথাও নরকের কথা নাই। বেদের অনেক পরবর্তী পুরাণে এই নরকের প্রসঙ্গ আছে। বেদের সর্বাপেক্ষা অধিক যে-শাস্তির কথা পাওয়া যায়—তাহা পুনর্জন্ম, অর্থাৎ আরেকবার উন্নতির সুবিধা লাভ করা।

স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
Phone : 554-2248, 554-2403
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com
, udbodhan@vsnl.net

Vol. 104
No. 11
NOVEMBER
2002

Licensed to Post
Without Prepayment
Licence No.
TECH/WB/RNP-15/LPWP-01/2002

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Regn. No.
TECH/WB/RNP-15/2002

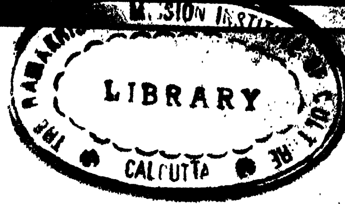
ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ



পৌষ ১৪০৯ ১২শ সংখ্যা

উদ্বোধন

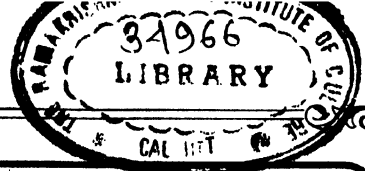




"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

"Mankind ought to be taught that religions are but the varied expressions of THE RELIGION which is oneness, so that each may choose the path that suits him best." —**Swami Vivekananda**



সূচীপত্র

উদ্বোধন ॥১০৪॥

১০৪তম বর্ষ ১২শ সংখ্যা পৌষ ১৪০৯ ডিসেম্বর ২০০২

প্রচ্ছদ ঃ গোমুখের চিত্র। হিমালয়ের হিমশৈলাবৃত গহ্বর থেকে গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, অবিরাম, উদ্দাম, অক্লান্ত গতিতে। এ যেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবগঙ্গা' বিবেকানন্দ-রূপ গোমুখের মধ্য দিয়ে জগৎকল্যাণার্থে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান! শিবচক্ষুটিও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। *আলোকচিত্র ঃ ডাঃ তমোনাশ ভট্টাচার্য।*

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ



সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৭৫ টাকা; সডাক ঃ ৯৫ টাকা ❑ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য ঃ ১০ টাকা



নবীকরণ ও গ্রাহকভুক্তি

২০০৩ খ্রিস্টাব্দ ● ১৪০৯-১৪১০ বঙ্গাব্দ

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালির ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে 'উদ্বোধন' ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনায় আজ এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

'উদ্বোধন' ঃ **১০৫তম বর্ষ, ২০০৩ (মাঘ ১৪০৯—পৌষ ১৪১০) সালের জন্য আপনি নবীকরণ করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন।**

গ্রাহকভুক্তি ঃ ১০৫তম বর্ষের (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০৩) গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত থাকছে। গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ৯৫ টাকা। বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র ঃ ৮০০ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০ টাকা।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০০ টাকা (উদ্বৃত্ত কিছু থাকলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নামে জমা থাকবে) এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০ টাকা (সর্বাধিক ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ন্যূনতম ৫০০ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি ঃ M.O. বা Postal Order অথবা কলকাতাস্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর Bank Draft **'Udbodhan Office'**—এই নামে পাঠাতে পারেন। নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। উত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন গ্রাহক হতে চাই'** খামের ওপর লিখে দেবেন। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আলাদাভাবে জানাবেন।

'চেক' গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে।

M.O. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব **হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই বাঞ্ছনীয়।**

❑ **কার্যালয় খোলা থাকে ঃ** বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।

❑ **যোগাযোগের ঠিকানা ঃ** সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩
ফোন ঃ ৫৫৪-২২৪৮, ৫৫৪-২৪০৩ ● e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com

উদ্বোধন ॥১০৪॥

পৌষ ১৪০৯

ডিসেম্বর ২০০২

দিব্য বাণী



(শ্রীশ্রীমায়ের ১৫০তম জন্মতিথি স্মরণে)

ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপি চ ন জানে স্তুতিমহো
ন চাহ্বানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাঃ।
ন জানে মুদ্রাস্তে তদপি চ ন জানে বিলপনং
পরং জানে মাতস্ত্বদনুসরণং ক্লেশ হরণম্।।

সন্তানের আর্তি শ্রীশঙ্করাচার্যের লেখনীর মাধ্যমে অভিব্যক্ত হইতেছে : হে জননী (মাতঃ), আমি মন্ত্র জানি না। যন্ত্রে কিভাবে পূজা করিতে হয় তাহাও জানি না। পূজার সময়ে দেবতাকে আবাহন করা হয়, স্তুতি করা হয়। আমি আবাহন কিংবা স্তুতি করিতে জানি না। পূজাকালে পূজারী নানাবিধ মুদ্রা (হাতের আঙুলের সাহায্যে বিচিত্র ভঙ্গিমা)-র সাহায্যে তোমার চিত্ত বিনোদন করিয়া থাকে। আমি মুদ্রাদি কিছুই জানি না। এমনকি কাতর হইয়া কিভাবে তোমাকে ডাকিব তাহাও জানি না। আমি কেবল জানি, মাতঃ, তোমার অনুসরণে দুঃখনাশ হয়। (শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, ঈশ্বর বালকস্বভাব। তাই বালকস্বভাবই তাঁহার প্রিয়; বালকের ন্যায় যাহারা তাঁহাকে অনুসরণ করে, তিনি তাহাদের ভার লইয়া থাকেন।)

পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি বহবঃ সন্তি সরলাঃ
পরং তেষাং মধ্যে বিরলতর লোঽহং তব সুতঃ।
মদীয়োঽয়ং ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নো তব শিবে
কুপুত্রো জায়তে কচিদপি কুমাতা ন ভবতি।।

হে জননি, বিপুলা এই ধরণীতে তোমার তো অসংখ্য সরলচিত্ত সন্তান রহিয়াছে। কিন্তু আমি তাহাদের মধ্যে অতি অস্থিরচিত্ত তোমারই এক পুত্র (বা কন্যা)। আমার চিত্তের অস্থিরতার কারণে আমি যদি কখনো তোমাকে ত্যাগ করি, তাহা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু সে জননি, তোমার পক্ষে তাহা হইতে পারে না। কুপুত্র হয়তো জন্মিতে পারে, কিন্তু কুমাতা তো কখনো হয় না। (গানে আছে—সুপুত্রে কুপুত্রে মাতা প্রসবে পায় সমান ব্যথা/ একি মা বিষম কথা নাই ব্যথা কুপুত্র বলে!)

জগদম্ব বিচিত্রমত্র কিং পরিপূর্ণা করুণাস্তি চেন্মযি।
অপরাধপরম্পরাবৃতং নহি মাতা সমুপেক্ষতে সুতম্।।
মৎসমঃ পাতকী নাস্তি, পাপঘ্নী ত্বৎ সমা ন হি।
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথাযোগ্যং তথা কুরু।।

হে মাতঃ, তুমি যদি আমাকে কৃপা কর, করুণা কর, তাহা বিচিত্র কিছু নহে। কারণ অজস্র অপরাধের মালা গলায় প্রলম্বিত করিয়া যদি সন্তান মায়ের নিকটে আসে, তাহা হইলেও মায়ের পক্ষে সন্তানকে উপেক্ষা করা কখনো সম্ভব হয় না—ইহা আমি জানি।

অসংখ্য সাধারণ মানুষের সহিত নিজেকে একাত্ম করিয়া শঙ্করাচার্য বলিতেছেন—বস্তুত, আমার ন্যায় পাতকী জগতে নাই। আর একথাও সত্য, হে জননি, তোমার ন্যায় পাপনাশিনী ও পাপীর রক্ষাকর্ত্রীও জগতে দ্বিতীয় কেহ নাই। অতএব, হে মহাদেবি, এইরূপ জানিয়া যাহা উচিত তাহাই বিধান কর।

(দেব্যপরাধক্ষমাপন স্তোত্র, ১,৩,১১,১২)

মনের কথা

"... কথা কইতে ডরাই/ না কইতেও ডরাই। মনে সন্দ হয় পাছে তোমায় হারাই, হা—রাই!" সাশ্রুনেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ গানটি গাহিতেছেন। নরেন্দ্রনাথের আবেগপূর্ণ সজলনেত্র মুখপানে চাহিয়া, দক্ষিণেশ্বরে, সমাগত ভক্তসমীপে শ্রীরামকৃষ্ণ এই গান গাহিয়া কি বলিতেছেন? ভক্তগণের মুখ চাওয়া-চাওয়ি দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের এই বিচিত্র লীলার অর্থ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। পাইবেনই বা কেমন করিয়া! তাঁহাদের হৃদয়তন্ত্রীতে যে-তরঙ্গ উঠিয়া থাকে, তাহার সহিত নরেন্দ্রনাথের অনুভব-তরঙ্গের কোন মিল নাই। তীব্র ব্যাকুলতা তাহার মনকে সংসারবিরাগী করিয়া তুলিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহচর্য সেই অগ্নিতে ঘৃতাহুতির তুল্য হইয়াছে। বৈরাগ্যের দাবদাহ যখন তীব্রতম হইয়া উঠিল, নরেন্দ্রনাথ স্থির করিল এই মুহূর্তে সে পিতামহের ন্যায় গোপনে সংসার ত্যাগ করিবে। সহসা সংবাদ পাইল, ঐদিনই শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় ভক্তগৃহে শুভাগমন করিবেন। নরেন্দ্রনাথ ভাবিল: "ভালই হইল, গুরুদর্শন করিয়া চিরকালের মতো গৃহত্যাগ করিব।" কিন্তু গুরুদর্শনে গিয়া যত বিপত্তি। ঠাকুর তাহাকে বলপূর্বক দক্ষিণেশ্বরে লইয়া চলিলেন। দক্ষিণেশ্বরে নিজ গৃহে উপস্থিত হইয়া সহসা ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের নিকটে আসিয়া সজলনেত্রে গাহিতে থাকিলেন—"কথা কইতে ডরাই, না কইতেও ডরাই...।" ভিতরের অদম্য ভাবরাশি এতক্ষণ সামলাইয়া রহিলেও নরেন্দ্রনাথ এখন আর চাপিতে পারিল না। অবিরল ধারে অশ্রুপ্লাবিত হইতে হইতে শ্রীরামকৃষ্ণকে আশ্বস্ত করিল: "না, আমি আপনার নিকটেই থাকিব। গৃহত্যাগ করিব না।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি: "প্রকৃতিস্থ হইবার পর কেহ কেহ ঠাকুরকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'আমাদের ও একটা হয়ে গেল।' পরে রাত্রে অপর সকলকে সরাইয়া আমাকে (নরেন্দ্রনাথকে) নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমি জানি, তুমি মার কাজের জন্য আসিয়াছ, সংসারে কখনোই থাকিতে পারিবে না। কিন্তু আমি যতদিন আছি ততদিন আমার জন্য থাক।'—বলিয়াই ঠাকুর হৃদয়ের আবেগে রুদ্ধকণ্ঠে পুনরায় অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।"

বস্তুত, বিভিন্ন মানুষের মনের গঠন বিভিন্ন প্রকার। এবং ক্ষেত্রবিশেষে উহা বিচিত্র রূপ ধারণ করে। "মনের কথা কইব কি সই, কইতে মানা/ দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।" দরদী কে? সমমনস্ক মানুষই দরদী হয়। যাহার নিকট পেটের কথা বলা যায়। ঠাকুর বলিতেছেন: "বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা কইতে কইতে আমার মুখ জ্বলে গেল।" তাঁহার দরদী তো খুঁজিয়া পাওয়াই ভার। স্বামী বিবেকানন্দ জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন: "আরেকজন বিবেকানন্দ থাকলে বুঝত এই বিবেকানন্দ কি করে গেল।" বিবেকানন্দের সমমনস্ক কে আছে? তাঁহার দরদী কে হইবে? শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁদিয়া বলিলেন: "মনের কথা কইব কি সই, কইতে মানা/ দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না/ মনের মানুষ হয় সে জনা/ তার নয়নেতে যায় গো চেনা—সে দু-এক জনা।"

জীবনের কর্মধারা, প্রাক্তন কর্মসংস্কার মনের গঠনকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। তাই দেখা যায়, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মন বিভিন্ন প্রকার। যাহারা মানসিকভাবে অসুস্থ, তাহাদের প্রসঙ্গ এখানে মোটেই আসিবে না। যাহারা মানসিক সুস্থ, তাহাদেরই মনের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কত যে বিচিত্র সংবাদ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। পরস্পর পরস্পরের মনকে কিছুটা বুঝিলেও সমাজের অশান্তি বহুলাংশে দূর হইতে পারিত। আমরা নিজের মনও বুঝি না, অপরের মনটিও বুঝিতে চেষ্টা করি না। "স্বার্থ-স্বার্থ সদা এই রব।" যে-মানুষটি দীর্ঘজীবন শিক্ষকতা করিয়াছেন—গ্রামের রাস্তায় হয়তো দশমাইল সাইকেল চালাইয়া বিদ্যালয়ে আসিয়া বিদ্যালয়কে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া ছাত্রদের জন্য নিজের জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করিয়াছেন, সেই মানুষটির মন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, ধনী, পিতামাতার আদর-যত্নে লালিত একটি কিশোরের পক্ষে বুঝা কখনো সম্ভব নহে। অথবা একটি বালক, যে জন্মেই মাতৃহারা, যাহার পিতার বদলিযোগ্য চাকরি, তাহার মনের গঠন একটি একান্নবর্তী বনেদী পরিবারে সযত্নে মুকুলিত সুশিক্ষায় শিক্ষিত কিশোরের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নহে। কাম-কাঞ্চনাসক্ত ঘোর বিষয়ীর মানসিক গঠন এবং বৈরাগ্যবান তেজস্বী যুবকের মানসিক গঠনের মধ্যে বিস্তর ফারাক।



মনের গঠনের পার্থক্যের কারণে এই একই শস্য-শ্যামলা-সুজলা-সুফলা-বিমলা পৃথিবীকে কেহ অন্ধকারময় দেখিয়া থাকে, কেহ ইহাকে দেখে পরম-ভোগক্ষেত্ররূপে, কেহ বা দেখে উপযুক্ত কর্মভূমি হিসাবে, কেহ দেখেন এইখানেই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ প্রতিকাশ। "ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ"—যাহার মনে সমদর্শিত্ব দৃঢ় হইয়াছে, তাহারই জগৎ-জয় হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই তো জীবন্মুক্ত অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া চরম আনন্দ ও পরম সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছেন। তাহারই তো—"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা"—কুল পবিত্র হইয়াছে, তাহার জননী হইয়াছেন রত্নগর্ভা, কৃতার্থা।

প্রশ্ন হইতে পারে, মন কি বস্তুতে গঠিত? মনের গতিই বা নিরূপিত হইবে কিভাবে? ইহার উত্তর পাতঞ্জল দর্শনে সুন্দর বর্ণিত রহিয়াছে। মন হইল "বৃত্তিসারূপ্যম্"—বৃত্তিমূলক। দুইভাবে ইহার অর্থ করা যায়। লোকায়ত দৃষ্টিতে যাহার যাহা বৃত্তি, তাহাই তাহার মনকে গঠন করে। যে সঙ্গীতজ্ঞ, তাহার মনের গঠন একপ্রকার, আবার থানার দারোগার মনের গঠন অন্যপ্রকার। সুতরাং বৃত্তিজীবী মানুষের মন নিশ্চিতভাবেই ঐ বৃত্ত্যনুসারিণী হইয়া থাকে।

শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা অবশ্য অন্যপ্রকার। ঋষি বলিলেন, পঞ্চমহাভূত হইতে সাত্ত্বিক অংশ সম্মিলিত হইয়া অন্তঃকরণের সৃষ্টি হইল। এই অন্তঃকরণের চারটি রূপ—মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার। তত্ত্বকথায় বেশি গিয়া গোলযোগ না করাই সমীচীন। মূলকথা হইল—মন একটি জড় পদার্থ এবং ইহা একটি যৌগিক পদার্থও বটে। সুতরাং ইহার বিনাশ সম্ভব হয়। মনের বিনাশ ঘটিলে কি পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহা পতঞ্জল মুনি বলিলেন : "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্।" তখনি দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন। সাধক যতক্ষণ স্বরূপ হইতে বিচ্যুত অর্থাৎ যতক্ষণ তাহার মনে বৃত্তি (তরঙ্গ) উঠিতেছে, ততক্ষণ তাহাকে দ্রষ্টা বলা যায় না। যখন তাহার স্বরূপ-জ্ঞান হইল তখনি তিনি দ্রষ্টা-অভিধায় বিভূষিত হইলেন। তখন বাকি সবই দৃশ্য।

আরো সহজ করিয়া বলিলে বলা যায়, মন একটি তরল পদার্থের ন্যায়। অথবা একটি নদীর মতো। অপূর্ব লাবণ্যময়ী ভাষায় ব্যাসদেব চিত্ত বা মনের স্বভাব বর্ণনা করিলেন : "চিত্তনদী নাম উভয়তো বাহিনী, বহতি কল্যাণায়, বহতি পাপায় চ। যা তু কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারা বিবেক-বিষয়নিম্না সা কল্যাণবহা। সংসারপ্রাগ্‌ভারা অবিবেক বিষয়নিম্না পাপবহা। তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয়স্রোতঃ খিলী-ক্রিয়তে, বিবেকদর্শনাভ্যাসেন বিবেকস্রোত উদ্ঘাট্যতে, ইতি উভয়াধীনশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।" সহজ বাঙলায় ইহার অর্থ নিম্নরূপ—

চিত্তনদীর দুই কূল। এক কূলে পুণ্যবহা এই নদীর অপর কূল পাপসম্পৃক্ত। কখনো সে এই কূল স্পর্শ করে তো পরক্ষণে সে ঐ কূল স্পর্শ করে। যে-কূলে কৈবল্যদায়ক চৈতন্যবিবেক যুক্ত উপাদান রহিয়াছে, উহাই কল্যাণদ। কিন্তু যে-কূলে কাম-কাঞ্চনাসক্তি জাতীয় সংসারের যাবতীয় উপাদান মজুত আছে, উহাই পাপদ। বৈরাগ্যের সাহায্যে মনের বিষয়মুখী স্রোতকে ক্ষীণতর করিয়া, বিবেক জাগ্রত করিয়া বিবেকস্রোত তীব্রতর করিতে পারিলেই চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইতে পারে, নতুবা নহে। এবং চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলেই সাধকের পরম প্রাপ্তি—কৈবল্যলাভ হইয়া থাকে। অতএব মনকে তরল পদার্থের ন্যায় ভাবিলে আপত্তি নাই। তাই ইহার স্বভাবই তরঙ্গসঙ্কুল। অর্থাৎ তরঙ্গই মন, মনই তরঙ্গ। যখন মন নিস্তরঙ্গ হইল, তখন উহা মন রহিল না। তখন সাধক অ-মন হইয়া স্বরূপে স্থিতিলাভ করিলেন!

শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন প্রশ্ন করিলেন—মনকে বশ করিব কিরূপে? ইহা তো বায়ুর মতো চঞ্চল—ধরিতে গেলে পাঁচ আঙুলের ফাঁক দিয়া পালায়! শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ঠিক কথা। কিন্তু তবু মনকে বশ করা সম্ভব। "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়, বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।" অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করা সম্ভব। একই কথা একটু আগেই বেদব্যাসের মুখনিঃসৃত হইয়াছিল। আর একথাও খুবই সত্য যে, 'বশীভূত-মন' কোন সাধক মহাশক্তিধর ব্যক্তি। মনের একাগ্রতাই মানুষের শক্তির উৎস। কি বৈজ্ঞানিক, কি চিকিৎসক, কি শিক্ষক, কি কৃষক, কি নাবিক, কি যোদ্ধা, কি যোগী—সকলক্ষেত্রেই একাগ্র মনই তাহাদের পরম অস্ত্র। অর্জুনকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, কি দেখিতেছ? বলিল—পক্ষীর চক্ষু ব্যতীত আর কিছুই নহে। চঞ্চল মন মানুষকে দুর্বল করিয়া দেয়। দুধকে জ্বাল দিয়া যেরূপ উহার ঘনত্ব বৃদ্ধি করা হয়, তেমনি ধ্যানের দ্বারা মনের চাঞ্চল্য দূরীভূত হইয়া উহার ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। কেরোসিন তেলের ঘনত্ব এবং 'মধু'র ঘনত্বের মধ্যে যেরূপ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, সেইরূপ বিষয়াসক্ত মন এবং যোগীর মনের মধ্যেও পার্থক্য বিদ্যমান। সংসারের জ্বালা, যন্ত্রণা, ব্যর্থতা, সাফল্য, হর্ষ, বিষাদ, মিলন, বিচ্ছেদ যোগীর মনকে বেশি আন্দোলিত করিতে পারে না। "যস্মিন্ স্থিতেন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে"—তীব্র দুঃখের প্রচণ্ড অভিঘাতেও তাহার মন অবিচলিত থাকে এবং কর্তব্যকর্ম করিতে সহায়তা করে।



বিচলিত মন লইয়া কর্তব্যকর্ম সঠিক সম্পাদন করা যায় না—ইহা তো সকলেরই অভিজ্ঞতালব্ধ।

মন মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। প্রত্যেকের স্থূলরূপের ন্যায় তাহার মনেরও একটি রূপ বিদ্যমান। মানুষ এই চর্মাবৃত রক্তমাংসের দেহের রূপ-সৌন্দর্য বৃদ্ধির নিমিত্ত কত কষ্টটাই না করিয়া থাকে, প্রসাধনের জন্য কত অর্থই না ব্যয় করিয়া থাকে। কিন্তু খুব কম ব্যক্তিই মনের রূপটি কুসুমের ন্যায় সুন্দর করিবার প্রয়াস করে। সুন্দর পুষ্প যেমন ঈশ্বরের প্রিয়, তেমনি সুন্দর মনও ঈশ্বরের প্রিয় বস্তু। এবং সুন্দর সুঠাম একটি মনোবৃক্ষে যে সুন্দর কুসুম মুকুলিত হয় তাহাও ঈশ্বরের প্রিয়। সাহিত্যজগতে, সঙ্গীতজগতে, শিল্পজগতে সেইসব কুসুমের অপরূপ নান্দনিক অভিব্যক্তি যদি কখনো সঙ্ঘটিত হয়, তাহা যুগ যুগ ধরিয়া কত মানুষকে যে আনন্দ প্রদান করে তাহার বৈপুল্য নিরূপণ করিবে কে? বিষয়াসক্ত মনে ফুল ফুটিতে চাহে না। ফুটিলেও অকালেই ঝরিয়া পড়ে। কালে কালে তাহার ক্ষয় হইয়া তাহা একদিন ইতিহাসের অন্ধকূপে হারাইয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের মনের গঠন-বৈচিত্র্য লইয়া লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দজী দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বলিতেন, ঈশ্বর যখন অবতীর্ণ হন, শক্তির 'অণ্ডারে' (under-এ) তাঁহাকে থাকিতে হয়। তাই জরা, ব্যাধি, জন্ম, মৃত্যু, হর্ষ, বিষাদ, সুখ, দুঃখ সবই সাধারণ মানবের ন্যায় তাঁহাদেরও ভোগ করিতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের গলরোগের কথা, শ্রীশ্রীমায়ের বাতের ব্যথা ও সংসারযন্ত্রণার কথা আমাদের অজানা নহে। তবু সাধারণ মানবের সহিত তাঁহাদের পার্থক্য বিদ্যমান। উহা তাঁহাদের অসাধারণ মনের গঠনজনিত পার্থক্য। লীলাপ্রসঙ্গকার লিখিতেছেন: "ঠাকুরের সাধনকালের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পাঠককে কল্পনা-সহায়ে সর্বাগ্রে অনুধ্যান করিয়া দেখিতে হইবে, তাঁহার মন জন্মাবধি কীদৃশ অসাধারণ ধাতুতে গঠিত থাকিয়া কিভাবে সংসারে নিত্য বিচরণ করিত এবং আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রবল বাত্যাভিমুখে পতিত হইয়া বিগত আট বৎসরে উহাতে কিরূপ পরিবর্তনসকল উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি, ১২৬২ সালে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে যখন তিনি প্রথম পদার্পণ করেন এবং উহার পরেও কিছুকাল পর্যন্ত তিনি সরলভাবে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতৃপিতামহগণ যেরূপে সৎপথে থাকিয়া সংসারধর্ম পালন করিয়া আসিয়াছেন, তিনিও ঐরূপ করিবেন। আজন্ম অভিমানরহিত তাঁহার মনে একথা একবারও উদিত হয় নাই যে, তিনি সংসারের অন্য কাহারও অপেক্ষা কোন অংশে বড় বা বিশেষগুণ-সম্পন্ন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অসাধারণ বিশেষত্ব প্রতি পদে প্রকাশিত হইয়া পড়িতে লাগিল। এক অপূর্ব দৈবশক্তি যেন প্রতিক্ষণ তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া সংসারের রূপরসাদি প্রত্যেক বিষয়ের অনিত্যত্ব ও অকিঞ্চিৎকরত্ব উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া তাঁহার নয়নসম্মুখে ধারণপূর্বক তাঁহাকে সর্বদা বিপরীত পথে চালিত করিতে লাগিল। স্বার্থশূন্য সত্যমাত্রানুসন্ধিৎসু ঠাকুর উহার ইঙ্গিতে চলিতে ফিরিতে শীঘ্রই আপনাকে অভ্যস্ত করিয়া ফেলিলেন।" মধুরভাব সাধনের সময়ে পূর্ব পূর্ব তান্ত্রিক সাধনসমূহ যেন কোথায় চাপা পড়িয়া গেল! স্বামী সারদানন্দজী প্রশ্ন তুলিয়াছেন: মনের গঠন কিরূপ হইলে একজন সাধকের পক্ষে তীব্রতম তান্ত্রিক সাধনা করিয়া সিদ্ধকাম হইবার পর আবার বৈষ্ণব মতানুযায়ী সাধনায় অগ্রসর হওয়া সম্ভব? তাহার উত্তর তিনি নিজেই দিবার চেষ্টা করিয়াছেন: "প্রথম—ভক্তিমতী ব্রাহ্মণী বৈষ্ণব-তন্ত্রোক্ত পঞ্চভাবাশ্রিত [শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর—এই পঞ্চভাব] সাধনসমূহে স্বয়ং পারদর্শিনী ছিলেন।... দ্বিতীয়—বৈষ্ণবকুলসম্ভূত ঠাকুরের বৈষ্ণব ভাবসাধনে অনুরাগ থাকা স্বাভাবিক।... তৃতীয় এবং সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট কারণ—ঠাকুরের ভিতর আজীবন পুরুষ ও স্ত্রী, উভয়বিধ প্রকৃতির অদৃষ্টপূর্ব সম্মিলন দেখা যাইত। উহাদিগের একের প্রভাবে তিনি সিংহপ্রতিম নির্ভীক, বিক্রমশালী, সর্ববিষয়ের কারণান্বেষী, কঠোর পুরুষপ্রবররূপে প্রতিভাত হইতেন, এবং অন্যের প্রকাশে ললনাজনসুলভ কোমল-কঠোর-স্বভাববিশিষ্ট হইয়া... ভাবাবেশে অশেষ ক্লেশ হাস্যমুখে বহন করিতে পারিলেও ভাববিহীন হইয়া ইতরসাধারণের ন্যায় কোন কার্য করিতে সমর্থ হইতেন না।"

শ্রীরামকৃষ্ণের মন বিধিবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থাকে অস্বীকার করিল। বলিলেন: "ও তো চালকলাবাঁধা বিদ্যা।" দ্বিতীয়ত, তাঁহার মন বুঝিল: "সম্পূর্ণ সংযমেই ঈশ্বরলাভ হয়।" এই কথা নিশ্চয় করিয়া তিনি বিবাহের পরেও স্ত্রী সহবাস করিলেন না। তৃতীয়ত, "সঞ্চয়শীল ব্যক্তি ঈশ্বরে পূর্ণ নির্ভরবান হয় না বুঝিয়া কাঞ্চনাদি দূরের কথা, সামান্য পদার্থসকল সঞ্চয়ের ভাবও মন হইতে এককালে উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন...।" চতুর্থত, "তাঁহার ধারণাশক্তি এত প্রবল ছিল যে [অর্থাৎ উপরি উক্ত সিদ্ধান্তগুলি তিনি এত দৃঢ়ভাবে ধারণা করিয়াছিলেন যে] মনের পূর্বসংস্কারসকল তাঁহার সম্মুখে মস্তকোত্তোলন করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করাইতে কখনো সমর্থ হইত না।" [ক্রমশ]

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে যেসকল তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ১৩৫৯ সালে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনর্মুদ্রিত করা হলো। ভাষা ও বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। আশা করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।—সম্পাদক

পরমহংসের উক্তি

ধর্মতত্ত্ব, সেপ্টেম্বর ১৮৮৬

সাধকের 'বল' কি?

বালকের ন্যায় সাধকের রোদন 'বল'।

*

ঈশ্বর এক না বহু?

ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনি বহুরূপী গিরগিটির ন্যায় বহু রূপ ধারণ করেন। সাধক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ দর্শন করিয়া থাকেন। অনেক লোক তাহা বুঝিতে না পারিয়া বহু ঈশ্বর মনে করে।

*

পৃথিবীর লোকের পূজা-অর্চনাদি কেমন?

সংসারের লোকে যেসকল পূজা-অর্চনা করিয়া থাকে, তাহা বাল্যক্রীড়ার ন্যায়, আসল পাইলে তাহারা আর এসকল পূজা করিত না। বালিকারা বিবাহিতা হইয়া যখন আসল ঘর প্রাপ্ত হয়, তখন খেলার ঘর ছেড়ে দেয়।

*

ধ্রুব-প্রহ্লাদ কিরূপ ছিলেন?

ধ্রুব-প্রহ্লাদ প্রাতে তোলা মাখনের ন্যায় উৎকৃষ্ট ছিলেন। বেলাতে মাখন তুলিলে তত উৎকৃষ্ট হয় না। অধিক বয়সে সাধনে সেরূপ সুমধুর পবিত্র জীবন হইয়া উঠে না।

ধর্মতত্ত্ব, ১ অক্টোবর ১৮৮৬

ঈশ্বর কিভাবে দেহে স্থিতি করেন?

তিনি পিচকারির কাটির মতো আলগা থাকেন।

*

ভক্ত একা থাকিতে ভালবাসেন না কেন?

একা খেতে গাঁজাখোরের সুখ হয় না, ভক্তও গাঁজাখোরের ন্যায়, একা মার নাম করিতে তাঁর মনে তেমন আনন্দ হয় না।

*

কিরূপে জীবনযাপন করিতে হইবে?

ঝিক্‌নে কাটি দ্বারা যেমন মাঝে মাঝে উনান নেড়ে দিতে হয়, তাহাতে নিব-নিব আগুন উস্কে উঠে, সেইরূপ মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ দ্বারা মনকে সতেজ করা চাই। কামারের যাঁতার আগুন মাঝে মাঝে তেয়ে রাখতে হয়।

*

আমার ছেলে হরিশ বড় হলে তাকে বিয়ে দিয়ে সংসারের ভার তার উপর রেখে আমি যোগসাধন করিব, এবিষয়ে আপনার কি মত?

হরিশ গিরিশ ছাড়ে না, বড় নেওটা। তোমার কোন কালে সাধন হবে না। পরে আবার হরিশের ছেলে হওয়া ও তার বিয়ে দেখার সাধ হবে।

*

প্রেমাভক্তি কিরূপ?

প্রেমাভক্তিতে সাধক খুব আত্মীয়ভাবে ঈশ্বরকে ডাকেন, তাঁকে 'আমার মা' বলেন, যেমন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে গোপীনাথ বলিতেন, জগন্নাথ বলিতেন না।

*

হৃদয়ের কিরূপ অবস্থায় ঈশ্বর দর্শন হয়?

হৃদয় স্থির সমাহিত হইলে। হৃদয়সরোবর যখন কামনাবায়ুতে চঞ্চল থাকে, তখন ঈশ্বরচন্দ্র দর্শন অসম্ভব।

পরমহংসের উক্তি, ডিসেম্বর ১৮৮৪

(সুরেশচন্দ্র দত্ত প্রকাশিত)

সাধুসঙ্গ চালের জলের সমান। চালের জল নেশা কাটায়। যাহার অত্যন্ত নেশা হইয়াছে তাহাকে চালের জল পান করাও, দেখিবে তাহার নেশা চলিয়া যাইবে। সংসার-মদে মত্তজনার নেশা কাটাইবার একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ।

*

পার্থিব মাতা যথাসময়ে আপন সন্তানকে ডাকিয়া খাওয়ায়, মা আনন্দময়ীও যথাসময়ে স্বর্গের সুধা খাওয়াইবার জন্য ডাকিতেছেন, হে মানব! চক্ষু খুলিয়া দেখ।

*

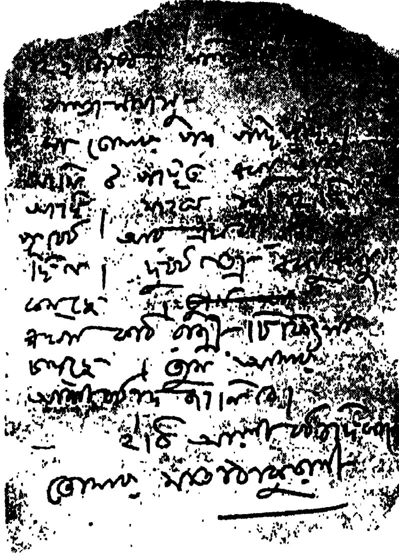
গ্যাসের আলো নানা স্থানে নানাভাবে জ্বলিতেছে, কিন্তু সমুদায়ই ভিতরে ভিতরে সেই এক আধার হইতে আসিতেছে। নানা দেশীয় ও জাতীয় বিভিন্ন বিভিন্ন উজ্জ্বল ধর্মালোকও সেই এক পরমেশ্বর হইতে আসিতেছে।

সঙ্কলন ❑ জলধিকুমার সরকার



শ্রীশ্রীমায়ের দুখানি পত্র

ইন্দুবালা* দেবীকে লিখিত



[১]

শ্রীশ্রীহরি (?) শরণম্

কলিকাতা
১২ই জ্যৈষ্ঠ

কল্যানীয়াসু,

মা তোমার পত্র পাইয়াছি। আমি উপস্থিত একটু ভাল আছি। মাঝে ১০।১২ দিন পূর্ব্বে আর একবার জ্বর হয়েছিল। দুর্ব্বলতা একটু একটু কম্‌ছে। এখন কবিরাজী চিকিৎসা চল্‌ছে। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

ইতি
আশীর্ব্বাদিকা
তোমার মাতাঠাকুরাণী

[২]

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

বাগবাজার
১লা পৌষ

কল্যানীয়া,

তোমার পত্র পাইয়াছি। আমার শরীর উপস্থিত ভাল আছে। বাকি সকলে ভাল আছে। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

ইতি
আশীর্ব্বাদিকা
মাতাঠাকুরাণি

---

* ঢাকা-নিবাসী ইন্দুবালা দেবী শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

সঙ্কলনঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনাঃ স্বামী সর্বগানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজী পাঠকমহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি মনে করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও অনুধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও চিন্তার আলোকেই হওয়া উচিত। সারগাছিতে অবস্থানকালে ব্রহ্মচারী সনাতনের আগ্রহাতিশয্যে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অংশবিশেষের আলোচনা করেছিলেন। সবকয়টি অধ্যায়ের আলোচনা সম্ভব হয়নি। ব্রহ্মচারীজী যথাসাধ্য তা লিখে রেখেছিলেন। পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন—এই আশায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত ঐ আলোচনাটি আমরা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। এই আলোচনায় নবাগতের ব্যক্তিগত সাধুজীবনের দিকে বিশেষ জোর থাকায় কোথাও কোথাও সামান্য সমালোচনামূলক বলে মনে হলেও সামগ্রিকভাবে তা ভক্তসাধারণের জীবনগঠনে সাহায্য করবে বলেই বোধ হয়। রচনাটিতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত গীতা থেকে শ্লোকানুবাদ বহুলাংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যাতে পাঠকের বুঝতে সুবিধা হয়।—সম্পাদক

তৃতীয় অধ্যায়ঃ কর্মযোগ

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।।৯।।

শ্লোকার্থঃ *শ্রীভগবান বলিতেছেন, ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কর্ম ব্যতীত অন্য কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। অতএব তুমি ভগবানের উদ্দেশে অনাসক্ত হইয়া বর্ণাশ্রমোচিত সর্ব কর্ম কর।*

ব্যাখ্যাঃ সাংখ্যমতাবলম্বীরা (অর্থাৎ জ্ঞানমার্গিগণ) বলেন, কর্মই বন্ধনের কারণ। কর্ম করিলে বন্ধন হইবে। অতএব কর্ম না করাই সমীচীন। শ্রীভগবান কিন্তু অন্য কথা বলিতেছেন। ঈশ্বরের প্রীতি উৎপাদনই যজ্ঞ; সেই যজ্ঞের জন্য কর্ম করা, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রীতি উৎপাদনার্থ কর্ম করা, অর্থাৎ ঈশ্বরের সেবা করিলে বন্ধন উৎপন্ন হয় না, বরং সেই সেবা কর্মমুক্তির কারণ হয়।

এখানে সাংখ্যের মতকে খণ্ডন করা হয় নাই, অথবা অবজ্ঞাও করা হয় নাই। বলা হইল—নিষ্কামভাবে কর্ম করিতে হইবে। যজ্ ধাতু হইতে 'যজ্ঞ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'যজ্' শব্দের অর্থ আরাধনা করা। অর্থাৎ ঈশ্বরে আরাধনা-রূপ কর্ম ব্যতীত অন্য কর্ম যাহারা করে, নিঃসন্দেহে তাহারা ভোগাকাঙ্ক্ষী এবং এই ভোগেপ্সাই জন্ম-বন্ধনের কারণ হয়।

[শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ ইতি শ্রুতিঃ।" অর্থাৎ যজ্ঞই বিষ্ণু, ঈশ্বর। অথবা শ্রীবিষ্ণুই যজ্ঞরূপে ঋত্বিকের পূজা গ্রহণ করেন। তাই বিষ্ণু যজ্ঞাধিপতি। সাধারণ প্রাণিবর্গ যজ্ঞের কারণে কর্ম করে না। তাই স্মৃতি-শাস্ত্রে বলা হইয়াছেঃ "কর্মণা বধ্যতে জন্তুরিতি স্মৃতিঃ।" অর্থাৎ সকল প্রাণীই কর্মের দ্বারা বদ্ধ।—সম্পাদক]

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্।।১০।।

শ্লোকার্থঃ *সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা সদা সমৃদ্ধ হও; এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্টপ্রদানে কামধেনু তুল্য হউক।*

ব্যাখ্যাঃ ঈশ্বর মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন এবং সেইসঙ্গে উপাসনাও সৃষ্টি করিলেন। পরে মনুষ্যজাতির উদ্দেশে বলিলেন, এই উপাসনার দ্বারাই তোমরা প্রসব বা সমৃদ্ধি লাভ কর। এই উপাসনা বা যজ্ঞ অবলম্বন করিলেই তোমরা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গই লাভ করিবে।

কেবল হিন্দুদের উদ্দেশেই নহে, সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশে বলা হইয়াছে এই কথা।

[বস্তুত, যজ্ঞ বা উপাসনা একটি সার্বজনীন এবং সার্বভৌমিক তত্ত্ব। এই তত্ত্বটি যে কেবল হিন্দুর জন্য প্রযোজ্য, তাহা নহে। আনুষ্ঠানিকতা-সর্বস্ব ধর্মীয় যজ্ঞ ধীরে ধীরে মানসযজ্ঞে উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমশ সাধককে সসীম হইতে অসীমে লইয়া যায়, যেখানে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র নাই, কোন জাতিভেদ নাই, দেশকালের গণ্ডি নাই। তাই যেকোন ধর্মের মানুষ যজ্ঞে অংশগ্রহণ করিতে পারে।—সম্পাদক]

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।।১১।।

শ্লোকার্থঃ *এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা ইন্দ্রাদি দেবতা-গণকে সংবর্ধনা কর এবং দেবতাগণও তোমাদিগকে বৃষ্টি ও অন্যান্য উপায়ে শস্যাদি উৎপাদনপূর্বক অনুগৃহীত করুন। এইভাবে পরস্পর পরস্পরের ভাবনা দ্বারা তোমরা পরম মঙ্গল লাভ করিবে।*

ব্যাখ্যাঃ সাধারণত ইন্দ্র, যম, বরুণ, অগ্নি প্রমুখ দেবতাকে তুষ্ট করিয়া সেই সেই বিষয়ে উপাসকের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। আবার কাহারো কাহারো ধারণা, ঈশ্বরই অগ্নি-বরুণাদি রূপে উপাসনার ফলদান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ এক ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই তিনি যাহার যাহা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

ভক্ত-ভগবানের খেলা। প্রথমে ভক্ত হন সূচ, ভগবান চুম্বক। পরে ভগবান হন সূচ, ভক্ত চুম্বকে পরিণত হন। এইভাবে ভক্ত-ভগবানের মধুর লীলাপ্রবাহ চলিতে থাকে। আসল কথা, এইভাবে শ্রীভগবান এই শ্লোকের মাধ্যমে সর্বপ্রকারে মানুষকে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হইবার উপদেশ দিতেছেন।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ।।১২।।

শ্লোকার্থ ঃ *দেবতাগণ যজ্ঞ দ্বারা আরাধিত হইয়া তোমাদের বাঞ্ছিত ভোগ্যবস্তু প্রদান করিবেন। সুতরাং এই দেবতা-প্রদত্ত বস্তু দেবতাদিগকে নিবেদন না করিয়া যিনি ভোগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই চোর (স্তেন)।*

ব্যাখ্যা ঃ কোনকিছু গ্রহণ করিলেই তাহার বিনিময়ে কিছু দিতে হয়। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতে মানুষের শরীর গঠিত হইয়াছে এবং এই ক্ষিতি-তেজাদি ঈশ্বরের সম্পত্তি। তাই ঈশ্বরকে নিবেদন না করিয়া কোনকিছু গ্রহণ করিলে তাহা চৌর্যবৃত্তি হইয়া থাকে। সেইজন্য ভক্তরা ভগবানকে নিবেদন না করিয়া কখনোই কোনকিছু গ্রহণ করেন না।

[শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশও ছিল—"যখনি কিছু খাবে ঈশ্বরকে নিবেদন করে খাবে।" শ্রীশ্রীমা বলিতেন, ঈশ্বরকে নিবেদিত অন্ন শুদ্ধ। ঐ নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করিলে রক্ত শুদ্ধ হয়। রক্ত শুদ্ধ হইলে উহা ঈশ্বরচিন্তার সহায়ক হয়।—**সম্পাদক**]

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।।১৩।।

শ্লোকার্থ ঃ *যে-সদাচারী যজ্ঞাবশেষ (নিবেদিত অন্ন) ভোজন করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। যে-পাপাচারী কেবল নিজের জন্য অন্ন পাক করে, সে পাপান্ন ভোজন করে।*

ব্যাখ্যা ঃ কেবলমাত্র মানুষই মুক্তির অধিকারী। দীর্ঘকাল সাধন করিতে করিতে—"বহূনাম্ জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।" বহু জন্মের পর জ্ঞানী আমাকে [ঈশ্বরকে] প্রাপ্ত হন। অতএব যাহা কিছু করিবে, ঈশ্বরের উদ্দেশে করিবে। অতীতে ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যাহ্নিক না করিয়া আহার করিতেন না। এখনো কেহ কেহ এমন আছেন। মুসলিমদের 'নামাজ' করা, খ্রিস্টানদের 'প্রার্থনা' করা বাধ্যতামূলক ছিল।

[যজ্ঞ পাঁচপ্রকার—ঋষিযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ এবং দেবযজ্ঞ। গৃহস্থের পক্ষে এই পঞ্চযজ্ঞ নিত্য অনুষ্ঠান করা উচিত। বর্তমান যুগে প্রাচীন কালের ন্যায় অগ্নি প্রজ্বলন করিয়া যজ্ঞাদি করা সম্ভব নহে। তাই মানসিক ভাবে এই পঞ্চযজ্ঞ নিত্য অনুষ্ঠেয়। আনন্দগিরি তাঁহার টীকাতে বলিয়াছেন, প্রত্যহ মানুষ উদুখল (কুলো), উদকুম্ভ (কলসী), পেষণী (শিলনোড়া জাতীয়), চুল্লি (উনুন) ও মার্জনী (ঝাড়ু) দ্বারা পঞ্চবিধ পাপকার্য করিয়া থাকে। ঐ পাপস্খালনের জন্য পঞ্চযজ্ঞের বিধান দেওয়া হইয়াছে।—**সম্পাদক**]

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ।।১৪।।
কর্মব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।।১৫।।

শ্লোকার্থ ঃ *অন্ন হইতে প্রাণীদিগের শরীর উৎপন্ন হয়। মেঘ হইতে অন্নের উৎপত্তি হয়। যজ্ঞধূম হইতে মেঘের সৃষ্টি। এবং বেদবিধি হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন হয়।১৪ যজ্ঞাদি কর্ম বেদ হইতে উৎপন্ন জানিবে এবং বেদ অক্ষর পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভূত। অতএব সর্ব-প্রকাশক বেদ সর্বদা ও সর্বথা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।১৫*

ব্যাখ্যা ঃ এই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু ও নিয়মকানুন পরমেশ্বরের ব্যবস্থাপনায় হইতেছে। তুমি যে খাইয়া পুষ্ট হইতেছ, তাহাও তাঁহারই ব্যবস্থায়। সেই কারণেই সকল সময়ে সকল কাজে তোমার পরমেশ্বরের উপাসনা করা উচিত। এইভাবে উপাসনা করিতে করিতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও আত্মবিকাশের পথের শেষে মুমুক্ষুতা আসিবে। যথার্থ মুমুক্ষুত্ব আসিলে আর চিন্তা নাই।

[বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে—"অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতম্ এতদ্ যদ্ ঋগ্‌বেদঃ..." ইত্যাদি। (২।৪।১০) অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ 'মহৎ' পরমাত্মা বা ব্রহ্মে নিশ্বাস-রূপে ঋগ্বেদাদি উৎপন্ন হইয়াছে। উপলক্ষণে কেবলমাত্র ঋগ্বেদ বলা হইয়াছে। 'ঋগ্বেদ' শব্দে চতুর্বেদ বুঝাইবে। অর্থাৎ মানুষের নিঃশ্বাসের ন্যায় অনায়াসে পরমাত্মা হইতে 'বেদ' উৎপন্ন হইতেছে। অতএব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই পৃথিবীর মানুষ 'অতীন্দ্রিয়' কোন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করিতে চাহিলে সর্বার্থপ্রকাশক, সমস্ত দোষশূন্য বেদবাক্যকেই অবলম্বন করিবে। অর্থাৎ সাক্ষাৎ পরমাত্মাই বেদের অপরিণামী অলৌকিক উপাদান। 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' (ব্রহ্মসূত্র, ১।১।৩) সূত্রেও এই কথার সমর্থন রহিয়াছে, অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় বিষয়সকলে বেদেরই প্রথমাধিকার।—**সম্পাদক**] [ক্রমশ] ।।তিন।।

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ১৬

পাশাপাশি ঃ (১) অচিনে, (৩) মশারি, (৮) লয়, (৯) আচার, (১০) শশা, (১৩) চৈতন্য, (১৪) সদর, (১৮) টিকে, (১৯) সঞ্চয়, (২০) রাস, (২৩) চন্দন, (২৪) বাজনা।

ওপর-নিচ ঃ (২) চিনি, (৪) শাস্ত্র, (৫) বালক, (৬) প্রচার, (৭) পিশাচ, (১১) আতস, (১২) হৃদয়, (১৫) ফটিক, (১৬) কাঞ্চন, (১৭) আসক্তি, (২১) নন্দ, (২২) কাজ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শক্তি শ্রীমা সারদাদেবী

স্বামী ধ্যানেশানন্দ

স্থান কাশীপুর উদ্যানবাটী। দোতলার বড় ঘর। মেঝেতে শ্বেতশুভ্র বিছানায় শায়িত শীর্ণকায় শ্রীরামকৃষ্ণ। চারদিকের পরিবেশ শান্ত। দুপ্রহর রাত প্রায়। শ্রীশ্রীমার হাতে খাবারের বাটি। ওপরে এসে দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ চোখ বুজে শুয়ে আছেন।

শ্রীশ্রীমা বললেন ঃ "এখন খাবে যে, ওঠ।" শ্রীরামকৃষ্ণ সেপ্রসঙ্গে না গিয়ে বললেন ঃ "দেখ, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।" শ্রীশ্রীমা সঙ্কোচে উত্তর দিলেন ঃ "আমি মেয়েমানুষ, তা কি করে হবে?"—(নিজেকে দেখিয়ে) "এ আর কি করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশি করতে হবে।" —"সে যখন হবে তখন হবে। তুমি এখন খাও তো।" ঠাকুর উঠে বসলেন।

এ যেন একটা নাটক। নাটকই বটে, তবে সত্য ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধি আসন্নপ্রায়; তিনি নিত্যধামে ফিরে যাবেন। তাই তিনি সকলকে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য যেন বুঝিয়ে দিচ্ছেন। শ্রীশ্রীমাকেও তাঁর দায়িত্বের কথা বলছেন।

শ্রীভগবান যখনই অবতীর্ণ হয়েছেন, সঙ্গে তাঁর শক্তিকেও এনেছেন। কিন্তু তাঁদের অবতরণের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য তাঁরা নিজেরাই সমাধা করে গিয়েছেন, তাঁদের শক্তিরূপা দেবীর ওপর কখনোই সে-কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব বর্তায়নি। সেজন্য তাঁরা প্রায় সকলেই লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারে এর ব্যতিক্রম হলো। অবতীর্ণ ভগবান নিজ শক্তি শ্রীমা সারদাদেবীর ওপর আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করার ভার অর্পণ করছেন। এই ব্যতিক্রমের কারণ কী?

* * *

ভার অর্পণ

শ্রীভগবান গীতামুখে বলেছেন, যখন ধর্মগ্লানি হয়, তখন তিনি অবতীর্ণ হন। এবার শ্রীভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। এখন প্রশ্ন হলো, কি সেই 'ধর্মগ্লানি', যাতে শ্রীভগবানকে অবতীর্ণ হতে হলো? এবার ধর্মের গ্লানি বা মলিনতা হলো পাশ্চাত্য ভাব। নাস্তিকতা, জড়বাদ ও ভোগবাদ—এগুলিই পাশ্চাত্য ভাব। স্বামী সারদানন্দের কথায় ঃ "পাশ্চাত্য মানবকে অবলম্বন করিয়া জীবনপ্রসার বিশেষভাবে উদিত হইলেও ভারতপ্রমুখ প্রাচ্যদেশসকলেও উহার প্রভাব স্বল্প লক্ষিত হইতেছে না। বিজ্ঞান অদম্য শক্তিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রদেশ প্রতিদিন যত নিকট সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতেছে, প্রাচ্য মানবের প্রাচীন জীবনসংস্কারসমূহ ততই পরিবর্তিত হইয়া পাশ্চাত্য মানবের ভাবে গঠিত হইয়া উঠিতেছে।"[১] সুতরাং এই ধর্মমালিন্য থেকে বিশ্ববাসীকে উদ্ধার করার জন্য শ্রীভগবানের আবির্ভাব।

উক্ত ধর্মগ্লানি বা মালিন্য থেকে সমগ্র বিশ্ববাসীকে মুক্ত করা এক বিরাট কর্ম এবং তা করার উপায়ই বা কি? নাস্তিকতা, জড়বাদ ও ভোগবাদের একমাত্র ঔষধ আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকতার একটা প্লাবন বইয়ে দিতে হবে। এজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শক্তিকে এনেছেন, তাঁর অন্তরঙ্গদের এনেছেন।

সমগ্র বিশ্ববাসীকে মালিন্যমুক্ত করা যদি বিরাট কর্ম হয়, তবে তিনি তা সমাপন না করে শক্তিরূপা শ্রীমা সারদাদেবীর ওপর অর্পণ করে চলে গেলেন কেন? আগেই বলা হয়েছে, মালিন্য বা গ্লানি মুক্ত করার একমাত্র মহৌষধ হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকতা মানে আত্মা সম্বন্ধীয়। ঈশ্বর, আত্মা, ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থা আছে ও তা লাভ করা যায়—এসবে বিশ্বাস ও জীবনে তা রূপায়ণ করাই আধ্যাত্মিকতা। কোন মানুষের জীবনে এটি রূপায়িত হয়েছে দেখলে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ সব ধর্মের সাধন করে পরিশেষে দেখালেন যে, সকল ধর্মমত মানুষকে একই স্থানে পৌঁছে দেয়। তিনি দীর্ঘ বারোবছর কঠোর সাধনার দ্বারা পৃথিবীর প্রধান প্রধান সম্প্রদায় ও ধর্মের মানুষের জন্য এক সার্বিক সু-উচ্চ জীবন যাপন করেছিলেন। এই সময়ে তাঁর কত দর্শন, অনুভূতি, সমাধি হয়েছিল। তিনি সেসব কথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়ে রেখে গেছেন। 'কথামৃত'-এর এক-জায়গায় তিনি বলছেন ঃ "ভক্তিমতে অবতার। কর্তাভজা মেয়ে আমার অবস্থা দেখে বলে গেল, 'বাবা, ভিতরে বস্তুলাভ হয়েছে, অত নেচো-টেচো না; আঙুর ফল তুলোর উপর যতন করে রাখতে হয়। পেটে ছেলে হলে শাশুড়ি ক্রমে ক্রমে খাটতে দেয় না। ভগবান দর্শনের লক্ষণ, ক্রমে কর্মত্যাগ হয়। এই মানুষের ভিতর মানুষ-রতন আছে।"[২]

সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন দেখলে আধ্যাত্মিকতা বলতে কি বোঝায় তার পরিষ্কার ধারণা হয়। গান্ধীজী বলেছেন ঃ "His [Sri Ramakrishna] life enables us to see God face to face." অন্যদিকে তাঁর কর্মত্যাগ হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাঁর পক্ষে এখান-সেখান ছোটাছুটি করা সম্ভব ছিল না। বাকি কাজটা তাঁর শক্তি শ্রীমা সারদাদেবী ও তাঁর অন্তরঙ্গ

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, পূর্বকথা ও বাল্যজীবন, যুগপ্রয়োজন, পৃঃ ১৩-১৪

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম-কথিত, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৬, পৃঃ ৩৪২

পার্ষদেরা সম্পন্ন করবেন—এটাই তাঁর পরিকল্পনা বা 'Master Plan'। সেজন্যই শ্রীশ্রীমায়ের ওপর ভার অর্পণ।

কাজটা যে ছোট নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ তা জানতেন। ইঙ্গিতে শ্রীশ্রীমাকে তিনি বলেও গেছেন। কাশীপুরে একদিন তাঁর দর্শনের কথা বলতে গিয়ে বলছেন : "দেখ গা, আমি একদেশে গেছলুম, সেখানকার লোক সব সাদা সাদা। আহা, তাদের কী ভক্তি!"[৩] পাশ্চাত্যে মানুষের গায়ের রং সাদা। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা পাশ্চাত্য দেশ পর্যন্ত প্রসারিত হবে—এটা বোঝাতে গিয়ে তিনি আপন দর্শনের প্রসঙ্গ বলেছেন। আসল প্রশ্ন হচ্ছে, শ্রীশ্রীমা কি শ্রীরামকৃষ্ণের আরব্ধ কাজ সমাপনের উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব?

স্বরূপের সন্ধানে

সাধারণ মানুষ শ্রীমা সারদাদেবীকে ঠিক বুঝতে পারে না। তারা ভাবে যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বিবাহিত পত্নী, জয়রামবাটীর রাম মুখুজ্জের মেয়ে 'সারদা' বা 'সারু'। তিনি বড় লজ্জাশীলা—সবসময় নিজেকে ঘোমটার আড়ালে লুকিয়ে রাখেন। সুতরাং এরকম মানুষের ওপর অবতারের আরব্ধ কাজের ভার অর্পণ কি যুক্তিযুক্ত? এজন্যই তাঁর স্বরূপ-সন্ধানে আমরা ব্রতী। যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন : "ও আমার শক্তি", তাহলেও ঠিক বোধগম্য হয় না। একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যাক। রাসবিহারী মহারাজ জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গেছেন। তাঁকে নানারকম প্রশ্ন করছেন। মাও তাঁর উত্তর দিচ্ছেন কাজ করতে করতে।

রাসবিহারী মহারাজ—মা, এই যে ঠাকুরকে সকলে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলে, তুমি কি বল?

মা—হ্যাঁ, তিনি আমার পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।

—তা প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই স্বামী পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, আমি সেভাবে জিজ্ঞাসা করছি না।

—হ্যাঁ, তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন—স্বামী ভাবেও, এমনি ভাবেও।

রাসবিহারী মহারাজ লিখছেন : "তখন আমার মনে হইল, তিনি পূর্ণব্রহ্ম হইলে মা জগদম্বা স্বয়ং—যেমন সীতা-রাম, রাধা-কৃষ্ণ পরস্পর অভিন্ন।" রাসবিহারী মহারাজ আবার প্রশ্ন করলেন : "তবে যে তোমাকে এই দেখছি যেন সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো বসে রুটি বেলছ, এসব কি? মায়া নাকি!"

মা—মায়া বৈকি! মায়া না হলে আমার এদশা কেন? আমি বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পাশে লক্ষ্মী হয়ে থাকতুম।...

—তোমার কি আপনার স্বরূপ মনে পড়ে না?

—হ্যাঁ, এক-একবার মনে পড়ে; তখন ভাবি—এ কি করছি, এ কি করছি! আবার এইসব বাড়িঘর, ছেলেপিলে (হাত চিৎ করে সামনের সব দেখিয়ে) মনে আসে ও ভুলে যাই।... এই যে এখানে এসেছ, একটা কিছু ভাব নিয়ে এসেছ। হয়তো জগন্মাতা ভেবে এসেছ।

—তুমি কি সকলেরই মা?

—হ্যাঁ।

—এইসব ইতর জীবজন্তুরও?

—হ্যাঁ, ওদেরও।[৪]

এবার তাঁর জগন্মাতৃত্বের অসাধারণ একটি চিত্র প্রত্যক্ষ করি। এ-চিত্রটি এঁকেছেন তাজপুরের অশীতিপর এক বৃদ্ধ। তিনি ছোটবেলায় শ্রীশ্রীমাকে দেখেছিলেন এবং ৬০-৬৫ বছর পরেও তাঁর মনের মণিকোঠায় তা চিরভাস্বর হয়ে রয়েছে। সেই সময়ে তাজপুরে শ্রীশ্রীমাকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের অন্যতম হলেন এই অশীতিপর বৃদ্ধ। তাঁর স্মৃতিকথার অংশবিশেষ তুলে ধরা যাক —"খুবই ছোট আমি তখন। ঐ যে মাঠ দেখছ, সেই হোথায় যেতুম গরু চরাতে। আরো সব বাগালরা আসত।... আমরা ছেলের দল তখন খেলতাম, গল্প করতাম, বেড়াতাম, গান গাইতাম।... আমরা কখনো কোনদিন এই মাঠের মধ্যেই সারদা মাকে দেখে ফেলতাম দূর থেকে।... তবে একটা দিন, তাঁর যে-মূর্তিখানি আমরা দেখেছিলাম, আর যেভাবে তিনি সেদিন আমাদের সবাইকে রক্ষা করেছেন, তা আর জীবনে ভুলবনি বাবা। মা সারদাই আমাদের সবার মা। আমাদের অবোধ গাইবাছুর-গুলারও ঐ এক তিনিই মা।...

"মাঠে আমরা গরু চরাচ্ছিলাম সেদিন। ঐদিন মাকে দেখেছিলাম মাঠ ভেঙে সেই ঐদিকে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন, সঙ্গে একটা ছেলেও ছিল, মার আগেপিছে হাঁটছিল। তখনো দুপুর হয়নি গো। বেশ চড়া রোদ্দুর মাঠে। মার মাথায় কাপড়, ঠিক যেন লক্ষ্মীঠাকরুন।... ঠিক সেইদিনই বেলা পড়ে আসতেই আকাশ জুড়ে মেঘ দেখা দিছল।... ঝড়ের মাস সেটা। ঘনঘটা করে মেঘ যেমন ছেয়ে ফেলল—এক্কেবারে অন্ধকার হয়ে গেল যেন পৃথিবীটা! বাতাসও ছুটতে শুরু করল ঐ অন্ধকার মেঘের সঙ্গে—ধুলোর দাপটে আমাদের গরুবাছুর সব ভয় পেয়ে দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করেছে। আমরা তখন ঐ ঝড়ের মধ্যে নাজেহাল হয়ে পড়েছিলাম। নিজেদের সামলাব, কি গরুবাছুর সামলাব! কী আশ্চয্যি! উরই মধ্যে দেখি, মা এসে উপস্থিত আমাদের ঠিক মধ্যিখানটিতে। ঝড়-বাতাসে পেরলয় শুরু হয়ে গেছে ততক্ষণে। মা শান্ত একখানা লক্ষ্মীপিরতিমার মতো একটা বড় বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে। আমরা সবাই এদিক-

৩ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩শ সং, পৃঃ ৩০১

৪ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, উদ্বোধন কার্যালয়, ৮ম সং, পৃঃ ১৭০-১৭১

ওদিক ছুটছিলাম। তিনি আমাদের সবাইকে 'আয় আয়, ভয় নেই' বলে ঐ গাছের তলায় ডেকে নিলেন। অতগুলো ছেলে আমরা মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আর বলব কি বাবা, আমাদের গরুবাছুরগুলোও মায়ের ডাক শুনে দলে দলে ঐ গাছের তলটিতে এসে আশ্রয় নিল। মা ডাকছেন—'আয় আয়, ভয় নেই'।... ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেল পেরচণ্ড শিলাবৃষ্টি—আর বজ্রপাত। উফ্ কী ভয়ঙ্কর দিনে স্বয়ং মা এসে আমাদের সবাইকে তাঁর দুইহাত বাড়িয়ে আগলিয়ে রেখেছিলেন—সেকথা কেমন করে বুঝাব বল? এখনো কানে শুনি সেই মিষ্টি ডাক—'আয় আয়, ভয় নেই।'... আমি তো কিছুই জানি না—সেই ছোটবেলার দেখাশুনো। তখন বুঝিই বা কি? তাই আর কিছু বলতে লারবনি বাবু।"[৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে ষোড়শীরূপে পূজা করে সব সাধনফল তাঁর পদে অর্পণ করেছিলেন। যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা গ্রহণ করতে পারেন, তাঁর স্থান সবার ওপরেই বলে বোধ করি।

জহুরি-বার্তা

নদীর ঘাটে একটা বড় পাথর পড়েছিল। সকলে স্নান করতে এসে পাথরটাতে পা ঘসে নদীতে স্নান করে চলে যেত। একদিন এক জহুরি স্নান করতে এসে পাথরটিকে একটি বড় হীরে বলে চিনতে পারলেন এবং পাথরটিকে তুলে নিয়ে গেলেন।

সারদাতত্ত্বরূপী হীরেটিকে বড় নামকরা জহুরিরা তো চিনতেনই। এঁদের কথা না এনে আমরা তাঁদের কথা স্মরণ করব, যাঁরা লোকদৃষ্টিতে অজ্ঞাত অখ্যাত। অবশ্য সারদাতত্ত্ব শুধু আলোচনায় বোঝার উপায় নেই, প্রয়োজন অনুচিন্তন। শ্রীশ্রীমা যাঁকে বলেছেন: "ও আমার ভারি", সেই সারদানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের প্রসঙ্গে বলছেন:

"রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ীর অবাক হয়েছি
হাসিব কি কাঁদিব তাই বসে ভাবতেছি।
এতকাল রহিলাম কাছে, ফিরিলাম পাছে পাছে,
কিছু বুঝতে না পেরে এখন হার মেনেছি।
বিচিত্র তাঁর ভবের খেলা, ভাঙেন গড়েন দুই বেলা
ঠিক যেন ছেলেখেলা বুঝতে পেরেছি।"

একবার শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী থেকে কলকাতায় যাওয়ার পথে বিষ্ণুপুর রেলস্টেশনে এসেছেন। প্ল্যাটফর্মে একটি কাঁঠালগাছের তলায় তিনি অপেক্ষারতা। এমন সময়ে ঐ জনাকীর্ণ স্টেশনের একটি হিন্দুস্থানী কুলি কোথা থেকে ব্যাগ্রপদে মায়ের চরণপ্রান্তে ছুটে আসে। সোচ্চারে বলতে থাকে: "তু মেরি জানকী, তুঝে ম্যায়নে কিতনে দিনসে খোঁজা থা, ইতনে রোজ তু কাঁহা থী?" এই কথা বলতে বলতে অঝোরে কাঁদতে থাকে সে। শ্রীশ্রীমা তখন তাঁর এই দীন আকুল সন্তানের আর্তিতে স্বয়ং বিগলিতা। মিষ্টিকথায় তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন, অবশেষে তাকে আদেশ করেন একটি ফুল নিয়ে আসতে। ভাগ্যবান ঐ কুলিবেশী ভক্তসন্তানটি আহ্লাদে দৌড়ে গিয়ে একটি ফুল নিয়ে এসে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিলে সারদারূপিণী 'জানকী মাঈ' কৃপাবিষ্ট হয়ে সেখানে সেই অবস্থাতেই তাকে মহামন্ত্র প্রদান করে তার মনুষ্যজন্ম সার্থক ও কৃতকৃতার্থ করেন।

অপরাপর কুলিরাও ক্রমে ক্রমে জোটে। কুলিমণ্ডলী মাতৃচরণে লুটিয়ে পড়ে তাদের অন্তরের ভক্তি নিবেদন করে। কলকাতাগামী ট্রেন এসে পড়ায় শ্রীশ্রীমা সকলকে আশীর্বাদ করে বিদায় নেন। গাড়ি ছাড়ার বাঁশি বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুর স্টেশন কম্পিত হয়ে উঠেছিল উপস্থিত কুলিমণ্ডলীর সম্মিলিত কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে—"জানকী মাঈ কী জয়"।

ডাকাত-বাবা, ডাকাত-মা, বিষ্ণুপুর স্টেশনের সেই অখ্যাত কুলি, শ্রীশ্রীমায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী সুশীলার শিশুপুত্র ন্যাড়া—এরা জগতের কাছে অজ্ঞাত, অখ্যাতই রয়ে যাবে; কিন্তু মহামায়ার কাছে, জগন্মাতার কাছে এরা চিহ্নিত মানব হয়ে থাকবে।

পরশমণি

পরশমণি এমন একটা জিনিস, যা যেকোন বস্তুকে স্পর্শ করলে সোনা হয়ে যায়। এটাই পরশমণির বাচ্যার্থ। মানুষের মধ্যে দেবত্ব নিহিত রয়েছে। কিন্তু কি এক অজ্ঞাত কারণে সেই দেবত্বের বিকাশ হচ্ছে না। যাঁর সংস্পর্শে এসে দেবত্ব বিকশিত হয়, তিনি স্পর্শমণি। যাঁর সংস্পর্শে তা হয়, তিনি পরশমণির লক্ষ্যার্থ।

উত্তর কলকাতার বিত্তশালী কায়স্থ পরিবারের এক কন্যার সঙ্গে এক 'রাজা' উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তির পুত্রের বিবাহ হয়। বিবাহের অল্পকাল পরে কন্যার স্বামী অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় বন্ধুবান্ধব-সহ শ্বশুরালয়ে এসে তার পত্নীকে তৎক্ষণাৎ নিয়ে যেতে চান। এমন অবস্থায় কন্যার পিতা জামাতাকে অনুরোধ জানালেন শ্বশুরালয়ে আহার ও রাত্রিযাপন করে পরদিন প্রত্যূষে কন্যাকে নিয়ে যেতে। জামাতা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন: "না না, এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে যেতে হবে। আমার বিবাহিতা স্ত্রীকে আমি নিয়ে যাব, আপনি বাধা দেবার কে? এই রাত্তিরে যদি আপনার কন্যা আমার সঙ্গে যায়, তাকে আসতে বলুন; যদি না যায়, জন্মের শোধ তাকে পরিত্যাগ করে যাব। আজই ঘুচে যাবে সম্পর্ক।"

কন্যার পিতা শঙ্কিত হলেন। ক্রুদ্ধ জামাতার কাছে শ্বশুর করজোড়ে পুনরায় মিনতি জানালেন। জামাতা তা গ্রাহ্য না করে চলে গেলেন।

---

৫ প্রকৃতিং পরমাং—স্বামী অজজানন্দ, ১ম ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ২৫১-২৫৩

কয়েকদিন পর জামাতা শ্বশুরালয়ে খবর পাঠালেন, তিনি পুনরায় বিবাহ করেছেন। প্রথমা স্ত্রীকে তাঁর আর প্রয়োজন নেই। কন্যার পিতার শিরে যেন বজ্রাঘাত হলো। কন্যার ভবিষ্যজীবনের কথা ভেবে তাঁরা আকুল। অবশেষে সেই কন্যাকে নিয়ে পিতা তীর্থভ্রমণে বের হলেন। নানা স্থানে দেবতা দর্শনে তাঁদের চিত্ত খানিক শান্ত হলো। বৃন্দাবনের এক সিদ্ধপুরুষের কাছে কন্যার দীক্ষা হলো। গুরু ও পিতা কন্যাকে সাধনভজনে মনোনিবেশ করতে উপদেশ দেন।

একদিন গৌরী-মার সঙ্গে দুর্গাপুরী দেবী সেই কন্যার গৃহে গেছেন। কন্যা জিজ্ঞাসা করল: "ভগবানে আত্মসমর্পণ করে কি গোটা জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যায়? তুমি কার কাছ থেকে এমন ভাব পেলে বহিনজী?"

দুর্গাপুরী দেবী শ্রীশ্রীমায়ের কথা বললেন। কন্যাটি শুনে বলল: "তাঁর কাছে আমায় একটিবার নিয়ে চল। তোমার সাধনা আমি নেব। আমি প্রভুকে ভালবাসব, প্রভুর শরণাগত হব।... কিন্তু আমার কি হবে? অনাঘ্রাত ফুল তো আমি নই। প্রভু কি আমাকে দয়া করে নেবেন?"

দুর্গাপুরী দেবী লিখছেন: "কন্যাকে দেখিয়া মাতা প্রসন্ন হইলেন। এ যে বৃন্দাবনের গোপী! তাঁহার সংসারজীবনের ইতিহাস শুনিয়া মাতা ব্যথিত হইলেন, সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'অতীতকে ভুলে যাও মা। রাধাগোবিন্দকে দেহমন সঁপে দাও, প্রাণভরে ডাক তাঁকে। তিনিই ইহকাল আর পরকালের স্বামী। তাঁকে পেলে জীবনের অপূর্ব আনন্দের আস্বাদ পাবে।'

"মাতাঠাকুরানীর নিকট কন্যা অনুপ্রেরণা পাইলেন। মায়ের প্রতি তাঁহার অনুরাগও জন্মিল।... তিনি তাপসীর ব্রত বরণ করিলেন।... সধবার চিহ্নরূপে তিনি দুই হস্তে অতি সাধারণ দুইটিমাত্র সুবর্ণকঙ্কণ ধারণ করিতেন। রাধাগোবিন্দকে হৃদয়সর্বস্ব করিয়া লইলেন। তাঁহার সেবায়, তাঁহার পূজায় বিভোর থাকিতেন।...

"তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর একদিন সংবাদ জানিতে গেলাম। দেখিলাম, ব্রজবাসিনীর বেশে সজ্জিতা, হস্তে সেই দুইটি সুবর্ণকঙ্কণ, ললাটে পূজারিণীর চন্দনতিলক।

"প্রশ্ন করিলাম: বহিনজী, তোমার রাজাস্বামীর দেহান্তে তুমি বৈধব্য গ্রহণ করনি! তোমার মনে কি এতটুকুও দুঃখু হয়নি?

"তাপসী উত্তর দিলেন স্মিতবদনে: শ্রীমা যে আমায় গোবিন্দচরণে নিবেদন করেছিলেন, তাঁকে নিয়েই আছি। তাঁর তো মৃত্যু হয় না, আমি সধবাই আছি বহিনজী। কোন দুঃখু নেই আমার।

"ধন্য এই নারী। আর মাতাঠাকুরানীর কৃপায় কী না হয়। মা যে আমার স্পর্শমণি।"[৬]

এমন কত ঘটনা যে আছে, মায়ের সংস্পর্শে এসে যারা জীবনের হাল খুঁজে পেয়েছে, কুলহীন কুল খুঁজে পেয়েছে। বাহুল্য ভয়ে এখানেই ইতি টানতে হচ্ছে।

* * *

আধ্যাত্মিকতায় মানুষ কেমন রসস্থ হয়, তার একটি চিত্র উপস্থাপন করা যাক। আমেরিকা গমনের চোদ্দবছর পর জোসেফিন ম্যাকলাউড ভারতমাতা ও শ্রীমার কাছে আবার ফিরে এলেন। একদিন এক ব্রহ্মচারী দেখলেন, শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করে ম্যাকলাউড তাঁর ঘরের দিকে যাচ্ছেন। ব্রহ্মচারী শুনতে পেলেন, তিনি উচ্চৈঃস্বরে বারবার বলছেন: "আমি তাঁকে দেখেছি", "আমি তাঁকে দেখেছি"। হঠাৎ ব্রহ্মচারীকে দেখে তার দিকে এগিয়ে এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন: "শ্রীমা মূর্তিমান পবিত্রতা, আমি তাঁকে দেখেছি।" তারপর ভাবস্থ হয়ে পরমানন্দে ইতস্তত পদবিক্ষেপে পথ চলতে লাগলেন। কোথায় পা ফেলছেন তা কিছুমাত্র সচেতন না হয়ে তিনি চলতে লাগলেন। আর মাঝে মাঝে বলতে লাগলেন: "মা, মা, মা, মূর্তিমান পবিত্রতা!"[৭] ❑

---

৬ সারদা-রামকৃষ্ণ—শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ১২শ মুদ্রণ, পৃঃ ১৮৬-১৮৮

৭ দ্রঃ The Life of Josephine Macloud—Pravrajika Prabuddhaprana, p. 149

এই বিশেষ নিবন্ধটি 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

ভ্রম-সংশোধন

পৃঃ	কলম	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
		আশ্বিন ১৪০৯		
৬৩১	২য়	ওপর থেকে ১৪শ	'সূত্রধর'	'সূত্রধার'
৬৩১	২য়	নিচ থেকে ৫ম	'একাকীত্বেরই'	'একাকিত্বেরই'
৬৩৩	১ম	ওপর থেকে ১৫শ	'কুন্তিদেবী'	'কুন্তীদেবী'
৬৩৩	১ম	নিচ থেকে ৬ষ্ঠ	'একাকীত্ব'	'একাকিত্ব'
৬৭২	১ম	নিচ থেকে ৪র্থ	'নিষ্কষিত্ত'	'নিষ্কাশিত'
৬৯৪	১ম	ওপর থেকে ৬ষ্ঠ	'উৎকর্ষতার'	'উৎকর্ষের'
৬৯৮	১ম	ওপর থেকে ১৮শ	'ক্ষিতিশ'	'ক্ষিতীশ'
৭২১	২য়	ওপর থেকে ১২শ	'ব্যোম্'	'ব্যোম'
৭৩৬	১ম	ওপর থেকে ২য়	'পার্ষদ'	'পার্ষদ'
৭৩৯	১ম	নিচ থেকে ৫ম	'সূত্রধর'	'সূত্রধার'
৭৪১	১ম	নিচ থেকে ১১শ	'ভষ্মারতি'	'ভস্মারতি'
৭৪২	১ম	ওপর থেকে ৫ম	'ভীতহারি'	'ভীতিহারি'
৭৪৩	২য়	ওপর থেকে ১৭শ	'বৈদুর্যপর্বত'	'বৈদূর্যপর্বত'
৭৪৫	১ম	ওপর থেকে ৭ম	'সমুৎপন্য'	'সমুৎপদ্য'
৭৪৫	২য়	ওপর থেকে ৩য়	'মকরন্দকণারুনাঃ'	'মকরন্দকণারুণা'
৭৫৬	২য়	নিচ থেকে ১৭শ	'জগবন্ধন'	'জগবন্দন'
		কার্তিক ১৪০৯		
৮৮৯	২য়	ওপর থেকে ২০তম	'মাস'	'বছর'

অনবধানতাজনিত উপরি উক্ত ভ্রমগুলির জন্য আমরা দুঃখিত।—সম্পাদক

নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ ঃ রাগে অনুরাগে

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

[পূর্বানুবৃত্তি]



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যথার্থ বন্ধুত্বের সংজ্ঞা মেনে এই দুই সমসাময়িক কীর্তিমান পুরুষ তাঁদের নিজেদের সাফল্য ও সংগ্রামের কালে একে অন্যের যথাযোগ্য সাহচর্য পেয়েছেন। ইওরোপে নিজস্ব পরিচিতিকে কাজে লাগিয়ে জগদীশচন্দ্র চেষ্টা করেছেন জগৎসভায় রবীন্দ্রসাহিত্যকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার। আর স্বদেশে আপন প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছেন জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনার পথকে সুগম করার। এই আদর্শ বন্ধুত্বের মিথোজীবীত্বে উভয়েরই সহায় হয়েছেন ভগিনী নিবেদিতা। নিঃস্বার্থ পরোপকারে নিবেদিতার সে এক আশ্চর্য উজ্জ্বল ভূমিকা।

■ যোগসূত্র জগদীশচন্দ্র

১৯০০ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাস। প্যারিসে 'ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব ফিজিসিস্ট'-এ জগদীশচন্দ্র ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে সাফল্যের সঙ্গে যোগ দিয়ে তখন লণ্ডনে। আর লণ্ডনে তখন নিবেদিতাও।

এর কিছুদিন আগেই 'ধর্ম-ইতিহাস সম্মেলন'-এ যোগ দিতে প্যারিসে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে আসেন। জগদীশচন্দ্র তাতে নিশ্চয় আপ্লুত ছিলেন। এখন আবার লণ্ডনে এসে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগের সুযোগ হলো।

নিজের বিজ্ঞান-গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জগদীশচন্দ্র তখন সম্পূর্ণ অন্য এক বিষয়েও গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর জীবনীকার প্যাট্রিক গেডেস লিখেছেন ঃ "Tagore, though occupying the foremost literary position in India, was not at that time known in Europe, and Bose felt keenly that the west had not the opportunity of realising his friend's greatness."[৪০]

২ নভেম্বর ১৯০০ জগদীশচন্দ্র তাঁর পরিকল্পনার কথা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে এক চিঠি লিখলেন ঃ "তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে আমি তাহা হইতে দিব না। তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ যাহাতে অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব? কিন্তু তোমার গল্পগুলি আমি এদেশে প্রকাশ করিব। লোকে তাহা হইলে কতক বুঝিতে পারিবে। আর ভাবিয়া দেখিও, তুমি সার্বভৌমিক। এদেশের অনেকের সহিত তোমার লেখা লইয়া কথা হইয়াছিল। একজনের সহিত কথা আছে (শীঘ্রই তিনি চলিয়া যাইবেন), যদি তোমার গল্প ইতিমধ্যে আসে তবে তাহা প্রকাশ করিব। Mrs. Knight-কে অন্য একটি দিব। প্রথমোক্ত বন্ধুর দ্বারা লিখাইতে পারিলে অতি সুন্দর হইবে।"[৪১]

এই 'প্রথমোক্ত বন্ধু' নিশ্চয় নিবেদিতা স্বয়ং। কলকাতায় থাকাকালীন রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুবাদ বিষয়ে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে নিবেদিতার কোন কথা হয়েছিল কিনা জানা নেই। কিন্তু লণ্ডনে থাকাকালীন এপ্রসঙ্গে তাঁরা কিছু পরিকল্পনা করেন। তারই ফলশ্রুতিতে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে ঐ চিঠিটি লেখেন।

কিন্তু চিঠিতে নিবেদিতার নাম সরাসরি উল্লেখ নেই কেন? নিবেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যেখানে ভালমতো পরিচয় আছে, সেখানে 'একজন', 'বন্ধু' ইত্যাদি অনির্দিষ্ট শব্দের আবরণ কেন? রবীন্দ্রনাথ কি তাঁর সাহিত্য অনুবাদে নিবেদিতার সাহায্য নিতে আপত্তি করতেন? সে-আপত্তি কি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কের কথা মনে রেখে? এমনই কোন আশঙ্কা জগদীশচন্দ্রের মনে আসতে পারে। অথবা তাঁর লেখার ধরনটিই ঐরকম—পাঠককে একটু রহস্যে রেখে দিতে তিনি ভালবাসেন।

তবে বন্ধুর রচনা অনুবাদের জন্য জগদীশচন্দ্র অব্যর্থ পরিকল্পনা করেছিলেন, স্বীকার করতেই হবে। প্রথমত, অনুবাদের জন্য রবীন্দ্রনাথের বহু বিচিত্র সৃষ্টির মধ্য থেকে ছোটগল্পকেই বেছে তিনি ইওরোপীয় পাঠকসমাজে তাঁর বন্ধুর আত্মপ্রকাশকে অনেকটা নিরাপদ রাখতে চেয়েছেন। কাহিনী-প্রবাহের একটা নিজস্ব গতি থাকার কারণে কবিতা, এমনকি নাটক অনুবাদের চেয়েও ছোটগল্প অনুবাদে সাফল্য-সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশি। আবার অনুবাদিকা নির্বাচনেও রয়েছে তাঁর বাস্তব বুদ্ধির পরিচয়। নিবেদিতা

ও শ্রীমতী রাইট উভয়েই তখন ইওরোপীয় সমাজের কাছে পরিচিতা লেখিকা এবং প্রাচ্য সম্পর্কে উৎসাহী হিসাবেও দুজনেই তখন সুপ্রতিষ্ঠিতা। শ্রীমতী রাইট বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' অনুবাদ করে প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছেন। আর অতি সম্প্রতি জুলাই ১৯০০-তে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'Kali the Mother' বিবেকানন্দ-শিষ্যা নিবেদিতাকে বিশেষ পরিচিতি দিয়েছে। সুতরাং এই দুই বিশিষ্ট গদ্য-কারকে দিয়ে রবীন্দ্র-গল্প অনুবাদ করালে যোগ্য ভাষান্তর এবং সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ—এই উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হবে, জগদীশচন্দ্রের এমন পরিকল্পনাই ছিল।

তখন সবে 'গল্পগুচ্ছ, প্রথম খণ্ড' প্রকাশিত হয়েছে—১৭ সেপ্টেম্বর ১৯০০। জগদীশচন্দ্রের আহ্বানে উৎসাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ পত্রপাঠ সে-বইয়ের একটি কপি তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন, সেইসঙ্গে তাঁর নিজের বিবেচনায় 'তর্জমার যোগ্য গল্প'-এর এক তালিকা দিলেন। আর জানালেন ঃ "কিন্তু Mrs. Knight-এর রচনানৈপুণ্যের প্রতি আমার বড় একটা আস্থা নাই।"[৪২]

তাহলে জগদীশচন্দ্রের হাতে অনুবাদ করানোর জন্য একমাত্র অবশিষ্ট রইলেন নিবেদিতা। নিজস্ব প্রচুর কাজ, ভারতে ফেরার তাড়া—তবু নিবেদিতা এই কাজটির ব্যাপারে সত্যিকারের উৎসাহী ছিলেন এবং অনতিবিলম্বে কাজ শুরু করলেন।

জানা যায় না, কোন্ কোন্ গল্প অনুবাদ করা হবে সে-ব্যাপারে জগদীশচন্দ্রের কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল, নাকি অবলা বসু এবং নিবেদিতার সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শুধু একথা স্পষ্ট যে, 'তর্জমার যোগ্য গল্প' নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথের মতামতকে তাঁরা খুব একটা স্বীকার করেননি। রবীন্দ্রনাথ যেখানে পছন্দ করেছিলেন 'পোস্টমাস্টার', 'কঙ্কাল', 'নিশীথে', 'কাবুলিওয়ালা' এবং 'প্রতিবেশিনী'—এই পাঁচটি গল্প, জগদীশচন্দ্ররা সেখানে 'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি' এবং 'দেনাপাওনা'—এই তিনটি গল্পকে পছন্দ করলেন।

■ অনুবাদিকা নিবেদিতা

২২ নভেম্বর ১৯০০ নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন ঃ "চিঠি লিখিবারও সময় পাই না। অন্য কিছুই হইতেছে না। গোটা গোটা দিন কাটিয়া যায় বিজ্ঞান আর অনুবাদের কাজে, আর ভারতবর্ষ সম্পর্কিত কথা-বার্তায়।"[৪৩] ঐদিনই সন্ধ্যাবেলা লিখছেন ঃ "আজ দীর্ঘ সময় ধরিয়া চিঠি লিখিতে পারিব না, কারণ 'কাবুলি-ওয়ালা' শেষ করিয়াছি, এখন আজ রাত্রের মধ্যে তাহার ভূমিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। So I must hurry on."[৪৪]

নিবেদিতা কর্মব্যস্ত মানুষ। এই সময় তিনি 'টাটা রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্কিম'-এর ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের আধিকারিক স্তরে নিয়মিত আলোচনা চালাচ্ছেন, জগদীশচন্দ্রকে তাঁর গবেষণা সংক্রান্ত লেখালেখিতে সাহায্য করছেন, অল্পদিনের মধ্যেই শুরু হবে ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে তাঁর ঠাসা বক্তৃতাসূচী। তাই রবীন্দ্র-গল্প অনুবাদে 'I must hurry on' তিনি বলতেই পারেন।

কিন্তু সেই ব্যস্ততার কথা বাদ দিলেও হয়তো এই তাড়াহুড়োর অন্য কোন কারণও থাকতে পারে। কোন পত্রিকাগোষ্ঠী বা কোন সমালোচকের কাছ থেকে কোন সময়বদ্ধ আশ্বাস হয়তো জগদীশচন্দ্ররা পেয়ে থাকতে পারেন। সেইজন্যই হয়তো অন্য কাজ মুলতুবি রেখে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এই অনুবাদকর্মটি তাঁরা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করতে চেয়েছিলেন।

কারণ যাই হোক, জগদীশচন্দ্র-অবলা বসুর যুগ্ম সহায়তায় ভাষান্তরের কাজ নিবেদিতা সত্যিই অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে সম্পন্ন করেছিলেন। ২৯ নভেম্বর ১৯০০ সন্ধ্যার মধ্যেই তাঁদের 'কাবুলিওয়ালা' ('Cabuliwallah') ও 'ছুটি' ('Leave of Absence') তর্জমার কাজ সমাপ্ত এবং 'দেনাপাওনা' ('Giving and Giving in Return')-ও প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। শ্রীমতী ওলি বুলকে এই সংবাদ জানিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন ঃ "তবে একটি কাজ আমি অবশ্যই করিয়াছি—'কাবুলিওয়ালা'র স্মৃতিতে আমার শৈলীর ছাপ ফেলিতে পারিয়াছি! (I have made an ink-impression of my right hand—in memory of the Cabuliwallah!)"[৪৫] অর্থাৎ কাজ দ্রুত সম্পন্ন হলেও অনুবাদের গুণগত মানে নিবেদিতা নিজে তৃপ্ত।

শুধু ভাষান্তরেই তাঁদের কাজ শেষ হচ্ছে না, বরং সবে শুরু হচ্ছে। ইওরোপীয় সমাজের সঙ্গে রবীন্দ্র-গল্পের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার যে-উদ্যোগ জগদীশচন্দ্র নিচ্ছিলেন, তার মূলপর্ব এবার শুরু হলো—সম্ভ্রান্ত সমালোচকদের অনূদিত গল্পগুলি পড়ানো এবং মতামত সংগ্রহের কাজ।

জগদীশচন্দ্র উল্লেখযোগ্য যে-কজনকে গল্পগুলি পড়িয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী ওলি বুল এবং বিখ্যাত রাশিয়ান বিপ্লবী ও মনীষী প্রিন্স ক্রপটকিনের নামই শুধু ধারণা করতে পারা যায়।[৪৬] বলা দরকার, এই দুজনই নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ। তাঁদের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের যোগাযোগে হয়তো নিবেদিতাই মধ্যস্থতা করেছিলেন।

শ্রীমতী বুল 'ছুটি শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল' হন এবং ইওরোপীয় বহু ভাষায় পণ্ডিত Prince P. A. Kropotkin "has not seen such a fine touch in any European Literature." জগদীশচন্দ্রের জীবনীকার প্যাট্রিক গেডেসের

বিবরণ থেকে জানতে পারা যায়, ক্রপটকিন বেশি পছন্দ করেছিলেন 'কাবুলিওয়ালা'— "Prince Kropotkin—a good critic in letters as well as science—declared it [কাবুলিওয়ালা] to be the most pathetic story he had ever heard, reminding him of the greatest writers among his countrymen."[৪৭]

অনুবাদকর্ম শেষ হওয়ার প্রায় পর পরই ডিসেম্বর মাসে জগদীশচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর অস্ত্রোপচার হয়। এই সময় উইম্বলডনে নিজের মায়ের বাড়িতে রেখে নিবেদিতা বিশেষভাবে তাঁর সেবাশুশ্রূষা করেন ও তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। এই অসুস্থতার অব্যবহিত আগে বা পরে গল্পগুলি সম্পর্কে মতামত সংগ্রহ করা হয়। অথবা এমন হতে পারে, অনুবাদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গল্পগুলি কয়েকজনকে পড়তে দেওয়া হয় এবং তাঁদের মতামত পাওয়া যায় অসুস্থতা কাটিয়ে ওঠার পরে।

সে যাই হোক, জগদীশচন্দ্র ১৬ জানুয়ারি ১৯০১ রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন : "তোমার গল্পের পুস্তক ['গল্পগুচ্ছ'] ২য় খণ্ড কবে পাইব? প্রথম খণ্ড হইতে ৩টি গল্প তর্জমা হইয়াছে। ভাষার সৌন্দর্য ইংরেজিতে রক্ষা করা অসম্ভব। কি করিব বল? তবে গল্পের সৌন্দর্য তো আছে।"[৪৮] এরও আগে জগদীশচন্দ্র ২৩ নভেম্বর ১৯০০ রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন : "তোমার লেখা তর্জমা করিয়া এদেশীয় বন্ধুদিগকে শুনাইয়া থাকি, তাঁহারা অশ্রু-সংবরণ করিতে পারেন না। তবে কি করিয়া publish করিতে হইবে, এখনো জানি না। Publisher-রা ফাঁকি দিতে চায়।... ৬টি গল্প বাহির করিতে চাই। শীঘ্র তোমার অন্যান্য গল্প পাঠাইবে। Mrs. Knight-কে দেই নাই।"[৪৯]

এমন অনির্দিষ্টভাবে বললেও ধরে নেওয়া যায়, এখানে নিবেদিতা-অনূদিত 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের কথা বলা হচ্ছে। কারণ, ২২ নভেম্বর মিস ম্যাকলাউডকে লেখা তাঁর পত্র থেকে আমরা আগেই জেনেছি, ইতোমধ্যে 'Cabuli-wallah' অনুবাদ শেষ করে তিনি ঐদিন তার ভূমিকা লিখতে বসছেন। এখানেই আবার প্রশ্ন জাগে, নিবেদিতার নাম সরাসরি উল্লেখ করা হচ্ছে না কেন? তাঁকে স্বীকৃতি দিতে জগদীশচন্দ্র এমন কুণ্ঠিত কেন? এই অনভিপ্রেত অভিযোগ বিজ্ঞানীপ্রবরের প্রতি তুলতেই হচ্ছে। কারণ, এই অনুবাদ-সংক্রান্ত যত চিঠি তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন, তার কোনটিতেই নিবেদিতার নাম পর্যন্ত উল্লেখ নেই। অথচ এর কিছুদিন আগে ১৮ এপ্রিল ১৯০০ রবীন্দ্রনাথকে লেখা এক চিঠিতে তিনি নিবেদিতার স্বামীজী-ভক্তির প্রাবল্য সম্পর্কে কটাক্ষপাত করে তির্যক মন্তব্য করতে কোন দ্বিধা করেননি এবং সেখানে সরাসরি নিবেদিতার নাম উল্লেখ করেছেন বারেবারে।[৫০]

এক্ষেত্রে কয়েকটি সম্ভাবনার কথা বলা যেতে পারে যা জগদীশচন্দ্রের দোষস্খালনের চেষ্টা করবে। প্রথমত, তাঁর রবীন্দ্রনাথকে লেখা সব চিঠি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি—হয়তো হারিয়ে যাওয়া চিঠির মধ্যেই কাকতালীয়ভাবে নিবেদিতাকে স্বীকৃতি জানানো ছিল। অথবা দ্বিতীয় সম্ভাবনা, নিবেদিতা নিজেই তাঁর নাম প্রকাশে তীব্র আপত্তি তুলতে পারেন। এর আগে ও পরে আমরা বারবার দেখেছি, জগদীশচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ, দীনেশচন্দ্র প্রমুখ অনেককেই তিনি সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন নিজেকে সচেতনভাবে আড়ালে রেখে। তাছাড়া এই সময়েই জগদীশচন্দ্রের নানা অসুবিধার কথা জানিয়ে নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথকে যে-চিঠি লিখেছিলেন, তাতেও ঘুণাক্ষরে তাঁর গল্পের অনুবাদ সংক্রান্ত কোন কথা লেখা নেই। তাই নিবেদিতার মতকে শিরোধার্য করেই জগদীশচন্দ্র এ-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে কিছু জানাননি—এমন সম্ভাবনার পিছনে বাস্তব যুক্তি আছে। আর তৃতীয় সম্ভাবনার কথা আমরা আগেই একবার ভেবেছি—জগদীশচন্দ্রের যোগা-যোগের ভাষাতেই হয়তো এমন এক অস্পষ্ট রহস্যময়তার প্রবণতা আছে, যা অবশ্যই ঠিক বিজ্ঞানীসুলভ নয়।

যেমন ২২ মে ১৯০১ তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন : "তোমার লেখা অনুবাদ করিয়া কোন magazine-এ পাঠাইয়াছিলাম, তাঁহারা দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন—গল্প অতি সুন্দর, কিন্তু original ব্যতীত অনুবাদ আমরা বাহির করি না।"[৫১] এখানেও সংবাদ জ্ঞাপনে সেই একই অস্পষ্টতা। তাঁর কোন্ গল্পটি কোন্ পত্রিকায় পাঠানো হয়েছিল সে-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল থাকাই স্বাভাবিক, অথচ জগদীশচন্দ্রের পত্র থেকে তা জানার কোন উপায় নেই।

প্যাট্রিক গেডেস রচিত 'The Life and Work of Sir Jagadish C. Bose' থেকে আমরা জানতে পারি, প্রিন্স ক্রপটকিনের পূর্বোল্লিখিত মতামত জানার পর জগদীশচন্দ্র 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটির অনুবাদ 'Harper's Magazine'-এ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেটি অমনোনীত হয়, কারণ "The west was not sufficiently interested in oriental life!"[৫২]

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে জগৎসভায় পরিচিত করানোর যে আন্তরিক প্রয়াস জগদীশচন্দ্র ও নিবেদিতা নিয়েছিলেন তার তাৎক্ষণিক প্রায় কোন ফল পাওয়া যায়নি।

তবে জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা। তা জানতে এই কালানুক্রমিক আলোচনা থেকে সরে এসে আমাদের এক দশক এগিয়ে যেতে হবে।

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১১ রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে যে-চিঠি লেখেন, তাতে 'The Modern Review' পত্রিকায় তাঁর রচনার ইংরেজি অনুবাদ

প্রকাশের, বিশেষত কুমারস্বামী-অনূদিত তাঁর কিছু কবিতা প্রকাশের পরিকল্পনা বিষয়ে তিনি তাঁর মতামত জানান। এই চিঠিতেই জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতা-অনূদিত গল্পগুলির কথা মর্যাদার সঙ্গে স্মরণে রেখেছেন এবং সেগুলির অনুবাদিকা যে স্বয়ং ভগিনী নিবেদিতাই—এসম্পর্কেও তাঁর কাছে সঠিক সংবাদই আছে। রামানন্দকে তিনি লেখেন ঃ "ডাক্তার [জগদীশচন্দ্র] বসু বলিতেছিলেন, Sister Nivedita আমার দুইটি ছোট গল্প (কাবুলিওয়ালা ও ছুটি) ইংরেজিতে তর্জমা করিয়াছেন—তাহা বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে, শুনিয়াছি সেদুটি আপনার কাগজে ছাপিতে দিতে তাঁহার আপত্তি নাই।"[৫৩]

কিন্তু প্রশ্ন হলো, 'দেনাপাওনা' বাদ গেল কেন? অনুবাদটির কি কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি, নাকি অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত হয়নি, অথবা গল্পটির নির্বাচনেই তাঁর আপত্তি ছিল? বোধহয় প্রথম সম্ভাবনাটিই সঠিক। কারণ, কার্যকালে দেখা যায়, 'ছুটি' ('The Leave of Absence')-ও খুঁজে পাওয়া গেল না। নিবেদিতার মৃত্যুর পর তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গেল শুধুই 'কাবুলিওয়ালা' ('The Cabuli-wallah')। ৪ নভেম্বর ১৯১১ রবীন্দ্রনাথ সে-খবরটি রামানন্দকে জানান ঃ "নিবেদিতা আমার 'কাবুলিওয়ালা'র যে ইংরেজি তর্জমা করিয়াছেন তাহার পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। আপনি জগদীশের কাছে সন্ধান লইবেন।"[৫৪] চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৬ নভেম্বর তিনি লেখেন ঃ "জগদীশের নিকট হইতে 'কাবুলিওয়ালা'র ইংরেজিটা সংগ্রহ করা হইয়াছে কি? তিনি সেটা খুঁজিয়া পাইয়াছেন।"[৫৫] অনুবাদ-গল্পটি জগদীশচন্দ্রের কাছ থেকে সংগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিলে কবি ৯ নভেম্বর রামানন্দকে প্রাপ্তিস্বীকার-পত্র লেখেন ঃ "নিবেদিতার 'কাবুলিওয়ালা' কাল বিকালে পাইয়াছি।"[৫৬]

অবশেষে 'The Modern Review' পত্রিকার জানুয়ারি ১৯১২ সংখ্যায় 'কাবুলিওয়ালা'র অনুবাদটি প্রকাশিত হয় 'বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে প্রাপ্ত নন্দলাল বসু-কৃত The Cabuliwallah চিত্রে'র সঙ্গে। ইতোমধ্যে ব্রাহ্মনেতা বিপিনচন্দ্র পাল সম্পাদিত 'New India' পত্রিকার ৩১ মার্চ ১৯০২ এবং ১৪ এপ্রিল ১৯০২ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে এই একই গল্পের অন্য এক ইংরেজি অনুবাদ বেরিয়েছিল 'The Kabuli' নামে।[৫৭] কিন্তু নিবেদিতা-অনূদিত এই গল্পটি অনেক বেশি সাড়া জাগাল। সুবিখ্যাত চিত্রকর রোদেনস্টাইন নিবেদিতা-অনূদিত এই গল্পটি পড়ে মুগ্ধ হন এবং অবনীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে জানতে চান রবীন্দ্রনাথের ঐ শ্রেণীর আর কোন গল্প আছে কিনা।[৫৮] আমরা জানি, ব্রিটিশ সমালোচক মহলে রবীন্দ্রনাথকে প্রচার করার কাজে রোদেনস্টাইন পরবর্তী কালে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

রবীন্দ্র-গল্পের প্রথম অনুবাদিকা হিসাবে বাঙলা সাহিত্য-সমাজ ভগিনী নিবেদিতার কাছে ঋণী হয়ে রইল।

■ জগদীশচন্দ্রের জন্য

আমরা যেসময়ের কথা বলছি, তখন সুযোগমতো রবীন্দ্র-রচনা প্রসারের কাজ করলেও জগদীশচন্দ্র মূলত ব্যস্ত ছিলেন তাঁর নিজস্ব বিজ্ঞান-গবেষণা বিষয়ে ইওরোপীয় বিজ্ঞানীমহলকে অবহিত করতে। প্যারিসের 'ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ ফিজিসিস্ট'-এ তাঁর সফল যোগদানের কথা আগেই জেনেছি। ১০ মে ১৯০১ তিনি সুযোগ পেলেন ইংল্যাণ্ডে 'রয়্যাল ইনস্টিটিউশন'-এ এক দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়ার। এখানে তাঁর বিষয় ছিল 'জীব ও জড়ের ঐক্যসেতু রচনা' সংক্রান্ত তাঁর গবেষণা। নিবেদিতা, ম্যাকলাউড ও ওলি বুল তিনজনেই সম্ভবত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।[৫৯] এই সভার এক আনুপূর্বিক বিবরণ দীর্ঘ পত্রের আকারে লিখে নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণ করেন। নিবেদিতা-লিখিত অনেক চিঠির মতোই এই চিঠিটিরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে বুঝতে পারা যায়, বিদেশে বাস করলেও নিবেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা যোগাযোগ এবং সুসম্পর্ক বজায় ছিল।

এই চিঠি পেয়ে দেশীয় মানুষদের পক্ষ থেকে জগদীশচন্দ্রকে অভিনন্দিত করতে রবীন্দ্রনাথ 'আচার্য জগদীশের জয়বার্তা'[৬০] নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। 'বঙ্গদর্শন'-এর আষাঢ় ১৩০৮ সংখ্যায় সে-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এখানে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনা কতটা যথার্থ হলো সেসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সন্দিহান ছিলেন। তাই পরে জগদীশচন্দ্র প্রেরিত 'Electrician' নামক বিজ্ঞান পত্রিকা ও অন্য কিছু কাগজপত্র পাওয়ার পর তার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক বিষয়টি আরো পরিস্ফুট করে 'জড় কি সজীব?' নামে 'বঙ্গদর্শন'-এর শ্রাবণ ১৩০৮ সংখ্যায় তিনি আরেকটি প্রবন্ধ লেখেন।[৬১]

কিন্তু প্রথম লেখাটি পড়েই ২৫ জুলাই ১৯০১ মুগ্ধ জগদীশচন্দ্র লেখেন ঃ "তুমি যে গত মাসে আমার কার্যের আভাস 'বঙ্গদর্শন'-এ লিখিয়াছিলে তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। তুমি যে এত সহজে ও বৈজ্ঞানিক সত্য স্থির রাখিয়া এরূপ সুন্দর করিয়া লিখিতে পার ইহাতে আমি আশ্চর্য হইয়াছি।"[৬২] বিজ্ঞানীর এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসার এক বড় দাবিদার অবশ্যই নিবেদিতাও। তাঁর পত্রের ভিত্তিতেই 'জয়বার্তা' প্রবন্ধটি লেখা। এমনকি রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতা প্রেরিত বিবরণের একটি বেশ বড় অংশ সরাসরি অনুবাদও করে দেন। তিনি নিজেই লিখেছেন ঃ

"আমাদের আচার্যের জয়বার্তা এখনো ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছে নাই, ইওরোপেও তাঁহার জয়ধ্বনি সম্পূর্ণ প্রচার হইতে এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে।"[৬৩]

তাহলে তিনি কী সূত্রে খবরটি পেলেন? পরিতাপের বিষয়, রবীন্দ্রনাথও কিন্তু নিবেদিতার নাম উল্লেখ করেননি। শুধু জানিয়েছেন, 'এই সভায় উপস্থিত কোন বিদুষী ইংরেজ মহিলা'র প্রেরিত বিবরণ তিনি 'স্থানে স্থানে অনুবাদ' করে দিচ্ছেন। আজকের ভারতবাসী জানে, নিবেদিতার পক্ষে এই পরিচয় কত অসম্পূর্ণ ও আপত্তিকর।

তবু নিবেদিতা-রচনার প্রথম অনুবাদক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বোধহয় পরোক্ষে এক বড় ঋণ পরিশোধের সুযোগ পেলেন। দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সাধকের অনুবাদে নিবেদিতার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও সমৃদ্ধ পর্যবেক্ষণক্ষমতা কেমন রূপ পেয়েছে, তার একটু নমুনা পরিবেশন করা যাক—"এত সহজে তাঁহাকে [জগদীশচন্দ্র] বলিতে আমি শুনি নাই। মাঝে মাঝে তাঁহার পদবিন্যাস গাম্ভীর্যে ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল,—এবং মাঝে মাঝে তিনি সহাস্যে সুনিপুণ পরিহাস-সহকারে অত্যন্ত উজ্জ্বল সরলভাবে বৈজ্ঞানিক-ব্যূহের মধ্যে অস্ত্রের পর অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি রসায়ন, পদার্থতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখায় ভেদ অত্যন্ত সহজ উপহাসেই যেন মিটাইয়া দিলেন।

"তাহার পরে, বিজ্ঞানশাস্ত্রে জীব ও অজীবের মধ্যে যেসকল ভেদ-নিরূপক-সংজ্ঞা ছিল, তাহা তিনি মাকড়সার জালের মতো ঝাড়িয়া ফেলিলেন।...

"ভারতবর্ষ যুগে যুগে যে মহৎ ঐক্য অকুণ্ঠিত চিত্তে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে, আজ যখন সেই ঐক্যসংবাদ আধুনিক কালের ভাষায় উচ্চারিত হইল, তখন আমাদের কিরূপ পুলক সঞ্চার হইল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। মনে হইল, যেন বক্তা নিজের নিজত্ব-আবরণ পরিত্যাগ করিলেন, যেন তিনি অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন,—কেবল তাঁহার দেশ এবং তাঁহার জাতি আমাদের সম্মুখে উত্থিত হইল।...

"আমরা অনুভব করিলাম যে, এতদিন পরে ভারতবর্ষ —শিষ্যভাবেও নহে, সমকক্ষভাবেও নহে, গুরুভাবে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকসভায় উত্থিত হইয়া আপনার জ্ঞান-শ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করিল, পদার্থতত্ত্বসন্ধানী ও ব্রহ্মজ্ঞানীর মধ্যে যে প্রভেদ তাহা পরিস্ফুট করিয়া দিল।"[৬৪]

যাই হোক, শুধু 'জগদীশের জয়বার্তা'র কথাই নয়, জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনার নানা বাস্তব সমস্যার কথাও নিবেদিতা নিয়মিতভাবে রবীন্দ্রনাথকে জানিয়ে গেছেন।

জগদীশচন্দ্রের গবেষণা-সাফল্য এদেশের সরকারি শিক্ষামহল স্বাগত জানায়নি। পরাধীন দেশের এক বিজ্ঞানীর এতদূর অগ্রগতি দেখে তাঁরা নানা প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ বাধায় জগদীশচন্দ্রকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। অবস্থা এতদূর গড়ায় যে, গবেষণা বন্ধ রাখা অথবা পাকাপাকিভাবে বিদেশে চাকরি গ্রহণ—এই দুয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার কথা তাঁকে ভাবতে হচ্ছিল। আর তাঁর মতো দেশপ্রেমিকের পক্ষে দুটি সম্ভাবনাই ছিল বেদনার।

নিবেদিতা মনে করলেন, এই দুই সম্ভাবনাকে জলাঞ্জলি দিয়েও জগদীশচন্দ্রের পক্ষে স্বদেশেই বিজ্ঞান-গবেষণায় অবিচলিত থাকা সম্ভব। এবং তা সম্ভব দেশীয় কোন হিন্দু রাজা যদি এই বিজ্ঞানীর ভরণ-পোষণ ও গবেষণার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এবিষয়ে মধ্যস্থতা করার জন্য তিনি সরাসরি রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন।[৬৫]

১৯০১ সালেই অক্টোবর-নভেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে চিঠিতে লিখলেন : "আমি তোমার কাজেই ত্রিপুরায় আসিয়াছি।... তিনি [ত্রিপুরার মহারাজা] শীঘ্রই বোধহয় দুই-এক মেলের মধ্যেই তোমাকে দশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিবেন। সে-টাকা আমার নামেই তোমাকে পাঠাইব। এই বৎসরের মধ্যেই তিনি আরও দশ হাজার পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাতে বোধ করি তুমি বর্তমান সঙ্কট হইতে আপাতত উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।"[৬৬]

অবশ্য শুধু নিবেদিতার কথাতেই রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা-রাজের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, তা ঠিক নয়। ১৯০০ সালের শেষ থেকেই রবীন্দ্রনাথ মহারাজাকে জগদীশচন্দ্রের কৃতিত্ব ও সঙ্কটের কথা জানিয়ে আসছিলেন ও সাহায্যের আবেদন রাখছিলেন। জগদীশচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের সেসময়কার চিঠি থেকেই তা জানতে পারা যায়।

কিন্তু জগদীশচন্দ্রের সাম্প্রতিকতম খবর ও সমস্যার কথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন কি করে? জগদীশচন্দ্র নিশ্চয় তাঁকে বারংবার সেকথা লিখতেন না। অধ্যাপক শঙ্করী-প্রসাদ বসু ধারণা করেছেন, এই নিয়মিত চিঠি লেখার কাজটি করতেন ভগিনী নিবেদিতা অথবা অবলা বসু বা উভয়েই।[৬৭] রয়্যাল ইনস্টিটিউশনের সভা বর্ণনা করে লেখা পত্রটির মতো, তার আগে এবং পরে নিবেদিতা যে জগদীশচন্দ্র সম্পর্কিত আরো কিছু চিঠি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন তা নিশ্চিত। আর রবীন্দ্রনাথও নিশ্চয় সেগুলির উত্তর দিয়েছিলেন।

কিন্তু আপশোসের কথা, নিবেদিতাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কোন চিঠিরই হদিশ মেলেনি। রবীন্দ্রনাথকে লেখা নিবেদিতার চিঠিও পাওয়া গেছে মাত্রই দুটি। ১৬ জুন ১৮৯৯ চিঠিটি আগেই আলোচিত। দ্বিতীয় চিঠিটি ১৮ এপ্রিল ১৯০৩ কলকাতা থেকে লেখা। এটি জগদীশচন্দ্র বিষয়ক।[৬৮] রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে অনুরোধ করেছিলেন,

তিনি যেন বিশদভাবে লিখে পাঠান—"An account of the actual discoveries which Prof. Bose had made, and of the difficulties under which he had laboured in making them." সেই অনুরোধ রাখতেই নিবেদিতার এই দীর্ঘ পত্র। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের কৃতিত্ব এবং পরাধীন ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে তার অসীম গুরুত্বের প্রসঙ্গে এ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ, ঐতিহাসিক মূল্যায়ন। জগদীশচন্দ্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর কল্যাণকামনা এই চিঠির প্রতিটি ছত্রে স্পষ্ট।

'Ever yours faithfully Nivedita of Ramakrishna-V[ivekananda]' স্বাক্ষরিত এই চিঠির শেষ অংশটুকু এরকম—"হে ভারত! ভারতবর্ষ! তুমি কি তোমার এক শ্রেষ্ঠ সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা-টুকুও দিতে পার না—না, আরামে কালাতিপাত করিবার স্বাধীনতা নয়—সেই স্বাধীনতা, যাহাতে সে তীব্রতম অগ্নির মাঝে, প্রচণ্ডতম শ্রমের মাঝে, উগ্রতম প্রতিযোগিতার মাঝে বাহির হইয়া তোমারই জন্য যুদ্ধ করিতে পারে? যদি তুমি তাহাতে অক্ষম হও, যদি তুমি তোমার নিজের সন্তানকে রণসাজে সজ্জিত করিয়া বিদায়-আশীর্বাদটুকু জানাইতেও না পার, তবে আমার প্রিয় এই বিষাদগ্রস্ত দেশের সর্বনাশ হইতে বাঁচিয়া কী লাভ, কী প্রয়োজন ধ্বংসের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার?"[৬৯]

পরাধীন ভারতবর্ষের প্রতি নিবেদিতার এই জ্বলন্ত প্রেম ও তীব্র কল্যাণকামনা রবীন্দ্রনাথকে বারেবারে মুগ্ধ করেছে, নিকটে এনেছে। পরবর্তী ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। [প্রথমাংশ সমাপ্ত] ❑

সূত্রনির্দেশ

৪০ নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'দেশ', অগ্রহায়ণ ১৩৭৪, পৃঃ ৬৬২
৪১ চিঠিপত্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৯৩, পৃঃ ১৭৫
৪২ ঐ, পৃঃ ১৩
৪৩ দ্রঃ Letters of Sister Nivedita, Vol. I, p. 400
৪৪ Ibid., p. 402
৪৫ Ibid., p. 403
৪৬ নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য, পৃঃ ৬৬২
৪৭ রবিজীবনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৯৭
৪৮ চিঠিপত্র, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৭৬
৪৯ ঐ, পৃঃ ১৭৫
৫০ লোকমাতা নিবেদিতা, ১ম খণ্ড, ২য় পর্ব, পৃঃ ২৪০
৫১ চিঠিপত্র, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৭৭
৫২ রবিজীবনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৯৭
৫৩ চিঠিপত্র, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৫
৫৪ ঐ, পৃঃ ১৩
৫৫ ঐ, ১৪শ খণ্ড, পৃঃ ৫৩
৫৬ ঐ, ১২শ, পৃঃ ১৩
৫৭ রবিজীবনী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩
৫৮ রবীন্দ্রজীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী, পৃঃ ২৯৫
৫৯ লোকমাতা নিবেদিতা, ১ম খণ্ড, ২য় পর্ব, পৃঃ ২৬৫
৬০ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৫শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০০, পৃঃ ৮০৪
৬১ ঐ, পৃঃ ৮০৭
৬২ রবিজীবনী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৬
৬৩ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৫শ খণ্ড, পৃঃ ৮০৪
৬৪ ঐ
৬৫ দ্রঃ Letters of Sister Nivedita, Vol. I, p. 438
৬৬ চিঠিপত্র, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪০
৬৭ লোকমাতা নিবেদিতা, ১ম খণ্ড, ২য় পর্ব, পৃঃ ২৬৯
৬৮ দ্রঃ Letters of Sister Nivedita, Vol. II, p. 555
৬৯ Ibid., p. 559

এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ■ অধ্যাপক বার্ণিক রায়, ■ রবীন্দ্রনাথ মালাকার, *রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির গ্রন্থাগার, বেলুড় মঠ,* ■ শমীন্দ্র ভৌমিক, *বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা,* ■ শুভজিৎ চক্রবর্তী, ■ তারকনাথ তরফদার।

অনুষ্ঠান-সূচী : মাঘ ১৪০৯

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে

জন্মতিথি-কৃত্য : **স্বামী তুরীয়ানন্দ**
পৌষ শুক্লা চতুর্দশী
৩ মাঘ, শুক্রবার
(১৭ জানুয়ারি ২০০৩)

স্বামী বিবেকানন্দ
পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী
১০ মাঘ, শুক্রবার
(২৪ জানুয়ারি ২০০৩)

স্বামী ব্রহ্মানন্দ
মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া
২০ মাঘ, সোমবার
(৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩)

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ
মাঘ শুক্লা চতুর্থী
২২ মাঘ, বুধবার
(৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৩)

পূজাতিথি-কৃত্য : **শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা**
মাঘ শুক্লা পঞ্চমী
২৩ মাঘ, বৃহস্পতিবার
(৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩)

একাদশী : ১৪, ৩০ মাঘ
মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার
(২৮ জানুয়ারি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩)

আধুনিকা জননী সারদামণি

স্বামী আত্মবোধানন্দ

জননী সারদাদেবীর নামের সঙ্গে 'আধুনিকা' বিশেষণটি যুক্ত করলে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন আজকের তথাকথিত আধুনিক মনস্করা। তাই শ্রীশ্রীমা আধুনিকা ছিলেন, কি ছিলেন না সেবিষয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে জানতে হবে 'আধুনিকতা' বলতে কি বোঝায়?

আধুনিকতা হলো কুসংস্কার থেকে মুক্ত থাকা—খোলা চোখে, মুক্ত মনে, যুক্তির নিরিখে বিচার করা। কোন একটা মতকে নির্বিচারে আঁকড়ে ধরে থাকা নয় অথবা অতীতকে বিসর্জন এবং বর্তমানকে স্বাগত জানানোই শুধু আধুনিকতার পরিচয় নয়। আধুনিকতা হলো সমকালীন সভ্যতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা—যুগোপযোগী শিক্ষা-দীক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া। আজকের আধুনিক দৃষ্টিতে যা আমাদের কাছে 'up-to-date' বলে মনে হয়, আগামী দিনে তা 'back-dated' হয়ে যাবে। তাই আজকের এই সভ্যতাকে বলা উচিত তাৎক্ষণিক—'আধুনিক' নয়। কারণ, এই সভ্যতা বা শিক্ষা কালোত্তীর্ণ সভ্যতা নয়। বস্তুত, আধুনিকতা কোন কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—তা অবশ্যই কালজয়ী। সেজন্য যে-শিক্ষা বা চিন্তাধারা কালের সীমানা ছাড়িয়ে সর্বকালীন শিক্ষায় পর্যবসিত হয়, তা-ই যথার্থ আধুনিক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীশ্রীমায়ের চিন্তাধারা ও মানসিকতা সর্বার্থে আধুনিক। কারণ, তাঁর জীবন ও বাণী আজও আমাদের কাছে সমান প্রাসঙ্গিক—যার মধ্যে রয়েছে কালজয়ী চিন্তাভাবনা।



আজকের সমাজের প্রেক্ষিতে 'আধুনিকা'র চিত্রটি কিরূপ? হালফিল ফ্যাশনে অভ্যস্তা, পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে তাল মিলিয়ে চলা এবং আচার-আচরণে বিদেশী আদবকায়দার ছাপ থাকলেই আজকাল 'আধুনিকা'র তকমা দিয়ে দেওয়া হয়। আধুনিকতার এই চেহারা কিন্তু কালকেন্দ্রিক, যুগভিত্তিক—কালাতীত বা যুগোত্তীর্ণ নয়। তাই এ-শিক্ষার ধারা তাৎক্ষণিক, যার অর্থ 'contemporaneous'—'modern' বা আধুনিক নয়। আধুনিকতায় থাকবে মানুষের মানবিক মূল্যবোধ, যেখানে বিবেক থাকবে সদা জাগ্রত। কাজেই নতুন নতুন রঙচঙে পোশাক-আশাকে সুসজ্জিত হওয়া আধুনিকতা নয় বা পশ্চিমী কায়দায় নিত্যনতুন খবরাখবর রাখাই শুধু আধুনিক মনস্কতার পরিচয় নয়। মানসিক সচেতনতাই আধুনিকতা—যা বিজ্ঞানসম্মত সংস্কারমুক্ত মনে যুক্তির কষ্টিপাথরে ফেলে সত্যকে যাচাই করে দেখবে। যদি কোন ভাব বা মতকে অসত্য, অলীক বলে মনে হয় তাহলে তাকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করাই হলো আধুনিক মনস্কতার পরিচয়। এই বর্জন এবং গ্রহণ করার সূক্ষ্ম বিচারশীল মানসিকতাই শ্রীমা সারদাদেবীকে যথার্থ আধুনিকায় পরিণত করেছে। তাঁর মধ্যে ছিল না কোন চোখধাঁধানো সাজে সজ্জিত হওয়ার প্রবণতা, ছিল না কোন যান্ত্রিক সভ্যতার আধুনিক শিক্ষাদীক্ষাও। তবুও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আধুনিক, যার দ্বারা তিনি মানবিক চেতনার আলোকে ভাল-মন্দ বিচার করতেন। সে-আলোর মধ্যমণি হলো চৈতন্য। সেখানে পৌঁছাতে হলে লাগে উত্তরণের সোপান। শ্রীশ্রীমা সেই উত্তুঙ্গ স্তর থেকে শুদ্ধ মনে বিচার-বিবেচনা করতেন—অপরকে অনুসরণ করে নয়।

সামাজিক চেতনা বা ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের যে আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ ঘটেছিল, তা জগতের অধ্যাত্ম-ইতিহাসে এক অনিঃশেষ অবদান। শিক্ষার এ এক অভিনব ধারা—যেখানে চিন্তাধারা সামাজিক প্রথাসর্বস্বে নিবদ্ধ নয়। এই অভিনবত্বই একপ্রকার আধুনিকত্ব—যা পূর্ব পূর্ব অবতারসঙ্গিনী এবং বর্তমান আধুনিক রমণীদের মধ্যে খুব বিরল। বিরল প্রতিভার অধিকারিণী জননী সারদাদেবী শুধুমাত্র তত্ত্বকথার মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি তাঁর আধুনিকতাকে, ব্যবহারিক জীবনে তিনি সেই আধুনিক চিন্তাধারাকে বাস্তবায়িত করেছেন সমাজ ও দশের কথা বিবেচনা করে। কুসংস্কারে আড়ষ্ট সমাজকে জ্ঞানালোক দিয়ে জাগানোর জন্যই প্রয়োজন হয়েছিল আচরিত শিক্ষার। সমাজ যেখানে সর্বময় বিধানদাতা,

সমাজব্যবস্থা যেখানে আচারসর্বস্ব বদ্ধমূল ধারণায় গণ্ডিবদ্ধ, সেখানে শ্রীশ্রীমায়ের আচরণ ছুঁড়ে দিয়েছিল এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। রক্ষণশীল বিধিবদ্ধ সমাজ অনেক বিষয়েই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করত, কিন্তু তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ দুর্নিবার মাতৃত্বের কাছে কালক্রমে সেসবই অবনত হয়েছিল।

তৎকালীন সমাজনীতিতে ম্লেচ্ছ বিদেশীর সঙ্গে মেলামেশা ছিল চূড়ান্ত অন্যায়। এই নীতি কেউ লঙ্ঘন করলে বিধানদাতারা তাকে সমাজচ্যুত পর্যন্ত করত। এই হৃদয়বিদারক কঠিন সমাজব্যবস্থার বুকে দাঁড়িয়ে শ্রীশ্রীমা সস্নেহে দুই বাহু প্রসারিত করে কোলে তুলে নিয়েছিলেন শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল তথা ভগিনী নিবেদিতাকে। শুধু তাই নয়, তাঁকে স্নেহ-চুম্বন দিয়েছেন, একাসনে বসিয়ে আহারও করেছেন সামাজিক সকল প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে। ভাবতে অবাক লাগে, যেসময় ভারতীয় নারীসমাজ ছিল পর্দানশিন অন্তঃপুর-চারিণী, সেসময় এক বিধবা (সামাজিক দৃষ্টিতে) ব্রাহ্মণীর দ্বারা বিধিবদ্ধ সমাজনীতির গণ্ডিকে অতিক্রম করা চরম দুঃসাহসিক ক্রিয়া। শ্রীশ্রীমায়ের এই আচরণের মধ্যে যে সৎসাহসিকতা, নির্ভিকতা ও উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়, তা এক উন্মুক্তমনা আধুনিকতার পরিচয় নয়কি?

আজ আমরা বহু ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা সচেতন হয়েছি, কিন্তু তৎকালীন সমাজে, সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের যে যুক্তিনিষ্ঠ রুচিশীল মার্জিত মানবিক চেতনার বিকাশ, তা এক নতুন দিকেরই উন্মোচন। সংস্কারাচ্ছন্ন মানবসমাজ তাঁর আচরণের মাধ্যমে খুঁজে পেয়েছে নতুন করে বাঁচার দিশা। নবদিগন্তের দিশারী হয়ে শ্রীমা সারদাদেবী চেয়েছিলেন সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করতে। সমাজবিধান-দাতাদের রক্ষণশীল পরিকাঠামোকে তিনি পরিশোধিত করতে চেয়েছিলেন উন্মুক্ত দৃষ্টিস্থাপনসাপেক্ষে। 'Charity begins at home'—এই নীতি বোধহয় তাঁর অজানা ছিল না। তাই তিনি আপন সংসারেই সাম্যদৃষ্টি নিয়ে বর্ণবৈষম্যের ভেদরেখা উচ্ছেদ করলেন। তাঁর ভাইঝি রাধু ছিলেন ব্রাহ্মণকন্যা। তাঁকে বললেন বৈদ্যবংশজাত শ্যামাদাস কবিরাজকে প্রণাম করতে। এতে ছিল সকলের আপত্তি, তীর্যক দৃষ্টিনিক্ষেপ। কারণ, কবিরাজ ব্রাহ্মণ-বংশজাত নয়, তাঁকে রাধুর প্রণাম করা উচিত নয়। সমাজের এই বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারাকে ভেঙে দিতে শ্রীশ্রীমায়ের যুক্তিশীল কণ্ঠ সেদিন সরব হয়ে উঠল ঃ "কবিরাজমশায় কত বড় বিজ্ঞ! ওঁরা ব্রাহ্মণতুল্য, ওঁকে প্রণাম করবে না তো কাকে করবে?" শ্রীশ্রীমা নিজেও জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে তিনি আবদ্ধ ছিলেন না। স্বচ্ছ, মুক্ত, গতিশীল ছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। চিরাচরিত প্রথানুযায়ী ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত ব্রাহ্মণত্বকে প্রাধান্য দেওয়া নয়, ব্রাহ্মণ-জনোচিত জ্ঞান ও চারিত্রিক মহৎ গুণাবলীকেই তিনি বড় করে দেখেছেন। তাঁর মুক্ত দৃষ্টিতে যার বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত, শ্রদ্ধাভক্তি অর্জিত হয়েছে—সে-ই ব্রাহ্মণপদবাচ্য। শুধু উত্তরাধিকারসূত্রে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মলাভ করে নয়—সাধনোচিত কৃতকর্মেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায়। শ্রীশ্রীমায়ের এই অভিনব আধুনিক সিদ্ধান্ত সুপ্রাচীন আদর্শ ও শাস্ত্রবাক্যকে লঙ্ঘন করেনি, বরং শাস্ত্রকে মর্যাদাদানই করেছে। গীতায় বলা হয়েছে ঃ "চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।" অর্থাৎ গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে শ্রীভগবান চারটি বর্ণের সৃষ্টি করেছেন। কাজেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে কোন মনুষ্যজাতিগত প্রভেদ নেই। কিন্তু এই সনাতন শাস্ত্র-সত্য শাস্ত্রেই নিবদ্ধ। মানবসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেনি এবিধান। সমাজের নীতিনির্ধারকেরা এ-সত্যকে ভুলে গিয়ে বিধিবদ্ধ প্রচলিত ধারাকেই অনুসরণ করেছে। তাদের মধ্যে সৎসাহসিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের অভাব যথেষ্টই। সেজন্য তাদের মধ্যে নবচেতনার উদ্ভাসন ও নবনীতি প্রণয়নের ক্ষমতাও সীমিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যে-সমাজের সমষ্টি-শক্তি যেখানে সঙ্কুচিত ও নীরব, সেখানে শ্রীশ্রীমায়ের একক মাতৃশক্তি স্বমহিমায় উদ্ভাসিত ও দুর্নিবার গতিতে সম্প্রসারিত। তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ বলিষ্ঠ নতুন চিন্তাধারাকে কেউ সেদিন উড়িয়ে দিতে সাহস পায়নি, বরং নীরবে বরণ করেই নিয়েছিল। স্রোতের বিপরীতে চলার এই মানসিক দৃঢ়তা ও চিরাচরিত প্রাচীন ঐতিহ্যকে যুক্তির আলোকে খোলা মনে বিচার-বিশ্লেষণ করার এই নবচেতনাকেই বলা উচিত আধুনিক-মনস্কতা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীমা সারদাদেবী আধুনিক প্রতিমা হিসাবে সার্থক রূপ ধারণ করেছেন।

তবে শ্রীশ্রীমায়ের চরিত্রে আধুনিকতার প্রাধান্য দেখা দিলেও সুপ্রাচীন শাস্ত্র-ঐতিহ্যকে তিনি জলাঞ্জলি দেননি বা আধুনিক মানসিকতা পোষণ করতে গিয়ে তিনি দেবীসত্তাকে বিসর্জন দেননি; বরং এই আধুনিকতার জন্যই তাঁর চরিত্রের মহনীয়তা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে—যুগভিত্তিক মাতৃত্বের কল্যাণময়ী সচল রূপটি উজ্জ্বলতর হয়েছে। সেইসঙ্গে ভারতীয় নারীর চিরন্তনী মাতৃসত্তা বিকশিত হয়ে উঠেছে আপন মহিমায়। ফলে মানবসমাজ পেয়েছে কুসংস্কারমুক্ত এক মাতৃপ্রতিমা; সেখানে ধর্মধারণা অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়—সেখানে আছে সত্যকে যুক্তির নিরিখে পরখ করে দেখার অগ্রজ্ঞান মানসিকতা। এই অগ্রগতির পথে চলার প্রেরণা ও প্রতিশ্রুতি যিনি প্রদান করেন, তিনিই তো প্রকৃত আধুনিক। সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমা সারদাদেবীকে আধুনিকা জননী বললে অত্যুক্তি হয় না। ❑

পৌষ ১৩০৯
ডিসেম্বর ১৯০২



ঠাকুরদাদার গল্প

সুখটুকুও আছে আবার রাগটুকুও আছে।

একদা এক দণ্ডী ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া কোন বৃক্ষতলে একখানি ইট মাথায় দিয়া শুইয়াছিলেন। গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা সেই পথ দিয়া জল আনিতে যাইতেছিল। তাহারা দণ্ডীকে এইরূপ ইষ্টক মস্তকে শুইতে দেখিয়া আপনা আপনি বলাবলি করিতে লাগিল, দেখ দিদি, ইনি দণ্ডী হয়েছেন, সংসার ছেড়েচেন, তবু এঁর এখনো সুখটুকু আছে, শুধু মাথায় শুতে পারেন না, আবার ইট মাথায় দেওয়া হয়েচে। দণ্ডী সমস্ত শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তাই ত আমার এখনো ত সুখবাসনা যায় নাই, আগে না হয় বালিশ মাথায় দিতাম, এখন নয় তাহার পরিবর্তে ইট মাথায় দিয়াছি, একটা কিছু মাথায় দেওয়া চাই। কেন, শুধু মাথায় শুইতে পারিব না কেন? এই বলিয়া তিনি ইটখানি মাথা হইতে সরাইয়া শুধু মাথায় শুইয়া রহিলেন। জলপূর্ণ কলস কক্ষে করিয়া গ্রাম্য নারীগণ আবার সেই পথ দিয়া স্ব স্ব আবাসে ফিরিতেছিল। তাহারা পুনরায় দণ্ডীর কাছ দিয়া যাইতে লাগিল। দণ্ডীকে এবার শুধু মাথায় শুইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহারা আবার পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—দিদি, সন্ন্যাসী ঠাকুরের রাগটুকুও আছে। মেয়েমানুষের দুটো কথা সইতে পারলেন না, অমনি ইটখানা মাথা থেকে নামিয়ে দিয়েছেন। সন্ন্যাসী ভাবিলেন, মজা মন্দ নয়। আর তিনি কখন লোকের কথায় চালিত হইতেন না।

পালকের গদি।

নলিনী বাবু হালে বড়লোক হইয়াছেন। অনবরত তাওয়া দিয়া গুড়গুড়িতে তামাক চলিতেছে। টানা পাখায় হাওয়া চলিতেছে। চাকর-বাকরে কেহ পাদসম্বাহন করিতেছে, কেহ দূরে দাঁড়াইয়া হুকুমের অপেক্ষা করিতেছে। অনেক টাকা খরচ করিয়া অনেক যত্নে একখানি পালকের গদি তৈয়ার করাইয়াছেন, তাহাতে বাবু শায়িত। হঠাৎ বাবু উঠিয়া ডাকিলেন, ভোজো। ডাকিতে না ডাকিতে ভজহরি যোড়হস্তে হাজির। বাবু বলিলেন, কোচম্যানকে গাড়ী তৈয়ার করতে বল, একটু হাওয়া খেয়ে আসি। বাবু হাওয়া খাইতে বাহির হইয়া গেলেন।

কিছু পরে সর্ব্বাঙ্গে বিষ্ঠামাখা কাদামাখা ন্যাংটা একটা লোক আসিয়া হাজির। আসিয়া পাগলের মত বাবুর সেই সখের গদির উপর যাইতে উদ্যত। চাকরদের বাধাপ্রদান। পাগল কিছু না মানিয়া গদির উপর শয়ন করিল ও একবার এপাশ একবার ওপাশ করিতে লাগিল। চাকরবাকর তাহাকে ছুঁইতেও পারে না, গায়ে বিষ্ঠামাখা। আবার একটা কুসংস্কার—বোধ হয় এ পরমহংস, কোন কিছু বলিলে শাপ দিতে পারে, এদিকে বাবুর ভয়ে সন্ত্রস্ত। এদিকে এই গোলমাল, এমন সময় বাবু আসিয়া হাজির। ছিলাম ভরো, বলিতে না বলিতেই ব্যাপার দেখিলেন; চাকরবাকরে যোড়হাত করিয়া বলিতে লাগিল, বাবু আমাদের কোন দোষ নাই। এদিকে পাগলা সটান শুইয়া আছে। বাবুর চাবুক গ্রহণ ও সপাসপ পাগলার পৃষ্ঠে প্রদান। পাগলা এপাশ ফিরিয়া শুইয়াছিল; যেন কত আরামে আবার ওপাশে ফিরিল। চাবুক চলিতেছে—ক্রমশঃ দরদর ধারে রক্তপ্রবাহ; পাগলা অচঞ্চল, স্থির। রক্তে গদি রক্তময় হইতে লাগিল। পাগলাকে স্থির দেখিয়া তখন বাবুর মনে একটু ভয় হইল—মনে ভাবিলেন, বুঝি নরহত্যা অপরাধে অপরাধী হইলাম। এই বলিয়া পাগলার মুখের দিকে দেখিতে গেলেন, দেখেন, পাগলা ফিকফিক করিয়া হাসিতেছে। তখন বাবুর অমনি পদদ্বয় ধারণ, পাগলার অমনি উঠিয়া কি কর, কি কর বলিয়া বাবুর হস্তধারণ। পাগলা বলিতে লাগিল, এতক্ষণ বেশ চলিতেছিল, এ আবার কি ভাব? নলিনী বাবু কাঁদিয়া বলিলেন, আমি মহাপাপী, কিছু উপদেশ—কে আপনি? পাগলা বলিতে লাগিলেন—ওসব অতশত জানি না, তবে এইটুকু বোলতে চাই যে, এই পালকের গদি, এতে আমি সুখের জন্য নয়, অমনি খানিকক্ষণ শোবার জন্য এতগুলি চাবুক খেলুম—এর সংস্পর্শের গুণ এই, আর তুমি এত যত্ন কোরে, এত সখ কোরে কোরেছ, এইতে দিনরাত তোমার মনপ্রাণ পোড়ে আছে, এর সঙ্গ দিনরাত তোমার। তোমাকে কত চাবুক খেতে হবে, এক একবার ভেবো দেখি। এই বলিয়া উত্থান ও বেগে প্রস্থান। বাবুরও কাপড় ফাড়িয়া কৌপীন ধারণ ও দ্রুতবেগে প্রস্থান।

দশ বৎসর পরে নলিনী বাবুদের বাড়ীর সকলে একবার তীর্থভ্রমণ ছলে হরিদ্বারে যান। সেখানে দেখেন, এক মহা তেজঃপুঞ্জকায় পুরুষ একটী নির্জ্জন মঠে ধ্যাননিমগ্ন রহিয়াছেন। বাঙ্গালীর চেহারা। তাঁহারা নলিনী বাবু বলিয়া চিনিয়াছিলেন, কিন্তু অগ্রসর হইতে ভরসা করেন নাই। তিনিও কোন কথা বলেন নাই।

নাস্তিক ও আস্তিক বন্ধুদ্বয়।

রামধন ও হরিধনে ভারি বন্ধুত্ব। একসঙ্গে শয়ন, একসঙ্গে ভোজন, একসঙ্গে কথোপকথন, আলাপ; যেকোন স্থানে যান, কখন দুজনে ছাড়াছাড়ি হয় না। তবে ঠিক সন্ধ্যার সময় ঘণ্টা খানেকের জন্য রামধনকে কেহ দেখিতে পায় না। হরিধনের ক্রমশঃ কৌতূহল হইল—কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া সে সন্ধানে সন্ধানে বেড়াইতে লাগিল, জানিবে—রামধন কি করিতেছে। একদিন রামধন ধরা পড়িল। হরিধন দেখিল, রামধন চক্ষু মুদিয়া বিড়বিড় করিয়া কি বকিতেছে। হরিধন হাসিয়াই খুন। একেবারে রামধনের গায়ে পড়িয়া গিয়া বলিল, কি হে, ভারি ধার্ম্মিক হোয়েছ যে দেখচি! ও সব ঈশ্বরটীশ্বর কিছু আছে নাকি? রামধন বন্ধুকে আদর করিয়া বসাইয়া বলিল, ভায়া, যদি কিছু নাই থাকে, তাতে ক্ষতি কি? একঘণ্টা সময় না হয় বাজে গেল, ২৩ ঘণ্টা ত আমোদ করিলাম—আর, যদি কিছু থাকে? হরিধন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, তাই ত, তাহলে ত আমি একেবারে গেলাম! হরিধনের মুখে ক্ষণিক একটু বিষাদের ছায়া আসিয়া আবার পরক্ষণেই মিলাইয়া গেল। রামধনেরও মনে একটা খটকা উঠিল; এখনও আমি 'যদি'র ভিতর রহিয়াছি। বন্ধুকে ত ঈশ্বর মানাইতে পারিলাম না। কিসে মানান যায়—যুক্তিতর্কে ত পারা যাইবে না। এই মনে করিয়া সে গোপনে গোপনে সদ্‌গুরু অন্বেষণ করিতে লাগিল। শুনিয়াছি, শেষে উভয়েই সদ্‌গুরু পাইয়া কঠোর সাধনায় ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার পাইয়াছিল।

সঙ্কলন ঃ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন

ভারতবর্ষ তথা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি সর্বত্র মানুষের মধ্যে একটা দুর্বিষহ [illegible] কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা চোখে পড়ছে। আজকাল অর্থনৈতিক ও ভোগবিলাসের চাহিদা [illegible] অবক্ষয়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বাঙালি যুবগোষ্ঠী আজ দিশাহারা। বিবেকানন্দ-প্রতিকৃতি আজ তাদের ধ্রুবতারা, একথা [illegible] দিবালোকের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। অনেকের মনে নানান প্রশ্ন সময়ে সময়ে ওঠে, যার উত্তর তারা খুঁজে পায় না। প্রশ্নগুলি মূলত মূল্যবোধ এবং আদর্শভিত্তিক। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রবীণ সন্ন্যাসীদের কেউ কেউ ঐসব প্রশ্নের উত্তর দিতে অনুগ্রহ করে সম্মতি জানিয়েছেন। তাই 'যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন' শীর্ষক একটি বিভাগ খোলা হলো। আনন্দের বিষয়, এমাসে এই বিভাগে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।—সম্পাদক

ঃ নিয়মাবলী ঃ

'যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন' বিভাগে প্রেরিত (ক) প্রশ্নগুলি সুনির্দিষ্ট হওয়া চাই। (খ) প্রেরকের পুরো নাম, ঠিকানা ও বয়স উল্লেখ থাকা চাই। (গ) প্রেরকের বয়স অনূর্ধ্ব ৩০ হওয়া চাই। (ঘ) সব প্রশ্নই গ্রাহ্য হবে—এমন বলা যায় না। অনেক সময়ে এমন হতে পারে, একটি প্রশ্নের মধ্যে অন্যগুলির উত্তর সন্নিবেশিত হয়ে আছে। সেক্ষেত্রে প্রশ্নপ্রেরকের মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ নেই। কারণ, প্রশ্নের উত্তর পেলেই প্রশ্নকর্তা তৃপ্ত হবেন, আশা করি। তাঁর নাম প্রকাশিত হলো কি হলো না সে-ব্যাপারটি নিতান্তই গৌণ থাকুক, এই আবেদন জানিয়ে রাখি।—সম্পাদক

প্রশ্ন ঃ *শ্রীশ্রীঠাকুর, মা এবং স্বামীজীর উপদেশের মধ্যে যদি আপাতবিরোধ দেখা যায় তখন কী করণীয়? উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি—(১) "তুমি গেরস্থ, তোমার গালে যদি কেউ এক চড় মারে তাকে দশ চড় যদি ফিরিয়ে না দাও তুমি পাপ করবে।"—স্বামী বিবেকানন্দ; (২) "যে সয় সে মহাশয়, যে না-সয় নে নাশ হয়।"—শ্রীশ্রীমা; (৩) "তোকে কামড়াতে বারণ করেছি, কিন্তু ফোঁস করতে তো বারণ করিনি।"—শ্রীরামকৃষ্ণ।*

—পম্পা গোস্বামী, মালীপাড়া, হুগলী

উত্তর ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর উপদেশের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। আমাদের বোঝার ভুল। গভীরভাবে চিন্তা করলে সামঞ্জস্য পাওয়া যাবে। আর তাঁরা কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে, কোন্ পরিবেশে, কোন্ মানসিক অবস্থা থেকে কাকে, কিভাবে বলেছেন—তা ভাল করে অনুধাবন করতে হবে। তাঁরা কোনটি বলেছেন শুধুমাত্র ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করে, কোনটি বা সকলের জন্য বলেছেন। তাও আবার প্রত্যেকের মানসিক অবস্থা বুঝে।

প্রশ্ন ঃ *'কথামৃত'-এর একজায়গায় ঠাকুর বলেছেন ঃ "লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়।" আবার শ্রীশ্রীমা একস্থানে বলেছেন ঃ "লজ্জা ঘৃণা ভয়—তিন থাকতে হয়।" দুজনের বাণী পরস্পরবিরোধী নয় কি? উভয় উক্তির তাৎপর্য দয়া করে বুঝিয়ে দেবেন।*

—মধুমিতা কয়াল, নীমপীঠ, দঃ ২৪ পরগনা

উত্তর ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর সাধকদের সম্বন্ধে বলেছেন একথা। দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গায় বান এসেছে—শ্রীশ্রীঠাকুর কাপড় বগলদাবা করে ঘর থেকে বেরিয়ে বান দেখতে গেলেন। অন্যেরা পারল না—কাপড় ইত্যাদি সামলে আসতে আসতে বান চলে গেল। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর একথা বলেছিলেন। ঈশ্বর-দর্শনাকাঙ্ক্ষীর মনে লজ্জা, ঘৃণা, ভয় থাকলে তারা কখনো জীবনে উন্নতি করতে পারবে না।

আর শ্রীশ্রীমা 'লজ্জা'র কথা মেয়েদের উদ্দেশে বলেছেন। তবে শ্রীশ্রীমা লজ্জা, ঘৃণা, ভয় রাখার কথা বললেও লজ্জার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি লজ্জা সম্বন্ধে বলেছেন ঃ "দেখ, স্ত্রীলোকের লজ্জাই হলো ভূষণ।" যদি তিনি কোথাও 'লজ্জা, ঘৃণা, ভয়' সম্বন্ধে বলে থাকেন তার মর্মার্থ এই ঃ মেয়েদের মধ্যে এই তিনটি না থাকলে মেয়েরা বেহায়া হয়ে যাবে, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাবে—তাতে সংসারে অশান্তি আসবে।

প্রশ্ন ঃ *আমাদের গ্রামে কোন বংশে কেউ মারা গেলে বলা হয়, ঐ বংশে অশৌচ হয়েছে। তখন ঐ বংশের লোকেরা অশৌচের দিনগুলিতে কোন শুভকর্ম (যেমন বিবাহ, অন্নপ্রাশন, পূজা-অর্চনা) করতে পারে না। শাস্ত্রমতে তা নাকি নিষিদ্ধ। সত্যিই কি শাস্ত্রমতে পূজা-অর্চনা অনুচিত? কেন?*

—মধুমিতা কয়াল, নীমপীঠ, দঃ ২৪ পরগনা

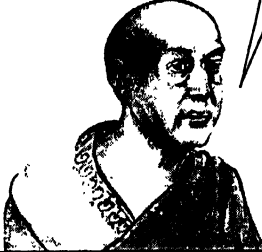
উত্তর ঃ আপনজনরা আমাদের মধ্যে থাকেন। তাই তাঁরা যখন মৃত্যুবরণ করেন—তাঁদের জন্য শোকপ্রকাশ করা আমাদের পরম কর্তব্য, তাঁদের জন্য সম্মান জানানো আমাদের অবশ্য প্রয়োজন। সেজন্য অশৌচকালে কোন শুভ অনুষ্ঠান করা আমাদের শাস্ত্রবিধি নয়। তবে গৃহে পূজা-অর্চনা থাকলে ব্রাহ্মণ অথবা যাদের অশৌচ নেই তাদের দিয়ে পূজা করাতে হয়। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি-মুনিগণ নিজেদের উপলব্ধিকে শাস্ত্রের মাধ্যমে সংরক্ষিত করে গেছেন। তাঁরা দেখেছিলেন, অশৌচকালে (জন্মাশৌচ বা মৃতাশৌচ) মনে তামসী-বৃত্তির আধিক্য থাকে। পূজাদি করতে গেলে মন যত সাত্ত্বিক হয় ততই কল্যাণ। সেই কারণেও অশৌচকালে পূজাদি না করাই সমীচীন।



আদি শঙ্করাচার্য ১৬

শিশু ও কিশোর বিভাগ

বিচার শুরু হলো। বহুক্ষণ ধরে তর্কের পর পরাজিত হলেন ধর্মপাল। কিন্তু তিনি ধর্মান্তর গ্রহণে রাজি হলেন না।





ধর্মপাল সত্যপালন করে তুষানলে প্রবেশ করলেন।

কুমারিলের এই বিজয় বৈদিক ধর্মে এক নবজাগরণ ঘটাল। এরপর কুমারিল বের হলেন দক্ষিণ ভারত বিজয়ে।



তিনি সর্বত্র বেদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে করতে এগিয়ে চললেন।

উত্তরকাশীতে ব্রাহ্মণের মুখে আচার্য সব শুনলেন।



বারোশো বছর ধরে বৌদ্ধধর্মকে রাজশক্তি সাহায্য করেছে। দুর্বল হয়ে পড়া সনাতন বৈদিক ধর্মকে আচার্য শঙ্কর রাজশক্তির সাহায্য ছাড়াই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য যাত্রা করলেন।



আচার্য শঙ্কর প্রয়াগের পথে এলেন বৃন্দাবনে। গোবিন্দজীর মন্দিরে এসে তাঁর প্রাণে বিশেষ ভাবের সৃষ্টি হলো। অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে তাঁর কণ্ঠ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এল শ্রীকৃষ্ণের এক অপূর্ব স্তব।



চিত্ররূপ ঃ দেবাশিস বসু

বৃন্দাবন থেকে আচার্য শঙ্কর এলেন মথুরায়। তখন সেখানে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বিশেষ প্রাধান্য। কিন্তু তীর্থদর্শনের উদ্দেশে শঙ্কর সেখানে এসেছিলেন, তাই বৌদ্ধ ও জৈনদের তিনি বিচারে আহ্বান না করে চলে এলেন প্রয়াগে। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করে তিনি এক বৃক্ষমূলে এসে বসলেন। শুনতে পেলেন এক অদ্ভুত কথা।

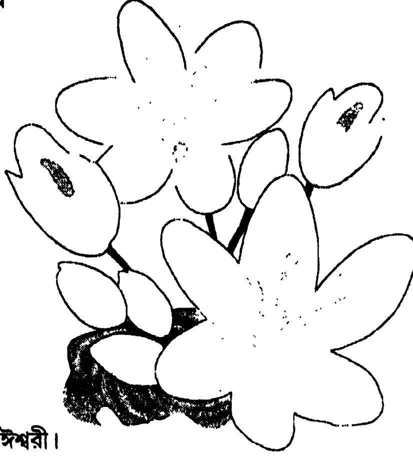


ব্যাসদেবের আদেশে শঙ্কর এসেছেন কুমারিলের সঙ্গে বিচার করতে। কিন্তু এখন কি হবে?

শতরূপে

শিবানী ভট্টাচার্য

রয়েছ ছড়ায়ে তুমি
শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে নয়
শূন্য থেকে মহাশূন্যে
দিগ্ থেকে দিগন্তে
কোথায় নেই তুমি!
জনমে ষষ্ঠীরূপা
বাক্যে বাঙ্ময়ী,
পালনে নারায়ণী তুমি,
অন্নদানে অন্নপূর্ণা।
শয়নে হও নিদ্রাদেবী
সন্ন্যাসে শঙ্করী।
শতরূপের ছবি লুকিয়ে,
নেমে এলে ধরাতলে সারদা ঈশ্বরী।
ঘুচালে দৈন্য শ্যামসম্পদে
ধরণী করিলে স্নাত,
অধ্যাত্মক্ষুধায় ঢালিলে জগতে শান্তিবারি
অবিরাম অবিরত।



মা

সৌম্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

কী অপরূপ দেখতে তোমায় মা,
তোমার এই প্রকৃতির
তুমিই তুলনা।

এরূপ দেখে ভুলেছি বলে
ফিরতে চাই মা তোমার কোলে,
হৃদয় শুকায়, এ গ্রীষ্মবায়, মা,
তোমার এই প্রকৃতির
তুমিই তুলনা।

সুখের সাথে, দুখের সাথে,
খেলছি খেলা দিনে রাতে,
হোক নির্বিষ, দাও মা আশিস, ক্ষমা,
তোমার এই প্রকৃতির
তুমিই তুলনা।

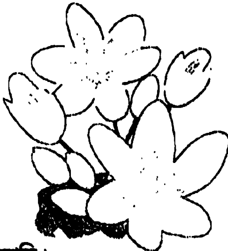
তোমার রূপের অপূর্ব স্বাদ,
সর্ব অঙ্গে তারই আবাদ,
রক্তে নাচে মোক্ষ মুক্তি কণা,
কী অপরূপ দেখতে তোমায়, মা।

সারদাপ্রণাম

রবি দত্ত

প্রণমি তোমারে মাগো, সারদা জননী।
পৃথিবীপালিনী তুমি, পতিতপাবনী।।
মূর্তিমতী দয়া তুমি, জগতের ধাত্রী।
আনন্দরূপিণী মাগো, সর্বসিদ্ধিদাত্রী।।
যারা ছিল বঞ্চিত, ছিল অসহায়।
আলোকিত হলো তারা তব করুণায়।।
অবোধ শিশুরে সেবে জননী যেমতি।
অনাথ-আতুরে মাগো, তুমিও তেমতি।।

তোমার প্রসাদে ধন্য আদ্বিজচণ্ডাল।
দুবাহু পসারি নিলে কলুষ-জঞ্জাল।।
জ্ঞানহীনে দিলে জ্ঞান, মূকে দিলে ভাষা।
বিবেক-বৈরাগ্য কারে, আশাহীনে আশা
ক্ষমায় পাদপ তুমি, সহ্যে বসুমতি।
সারল্যে সদৃশ শিশু, জ্ঞানে সরস্বতী।।
মমতায় নির্ঝরিণী, ঔদার্যে আকাশ।
সেবাদান হস্ত হতে বর্ষে বারমাস।।
কেমনে পূজিব তোমা কিছু নাহি জানি।
কৃপা করি' দিও মাগো, চরণদুখানি।।



শতবর্ষপ্রাচীন 'কথামৃত' স্মরণে

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

উচ্চকণ্ঠে বলরে সবে কথামৃত নমোস্তুতে।
'শ্রীম' বিরচিত আনন্দে পূরিত কথামৃত নমোস্তুতে।।

ভারত-মানসে বিবেকবর্ধক কথামৃত নমোস্তুতে।
নিত্য শরণ, সন্ত স্মরণ কথামৃত নমোস্তুতে।।

অনুরাগ বর্ধিত, বিষয়বর্জিত কথামৃত নমোস্তুতে।
তপস্বী-পূজিত, বিশ্ব-বিনিন্দিত কথামৃত নমোস্তুতে।।

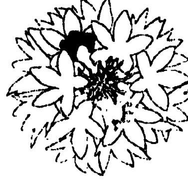
কুজন-নাশক, সুজন-পোষক কথামৃত নমোস্তুতে।
কল্যাণ-কারক, শক্তিপ্রদায়ক কথামৃত নমোস্তুতে।।

শান্তিরূপক, মুক্তিবিধায়ক কথামৃত নমোস্তুতে।
ত্যাগ-দীপক, চিত্ত-প্রসারক কথামৃত নমোস্তুতে।।

সর্বশাস্ত্র-বাক্-নিবন্ধক কথামৃত নমোস্তুতে।
ব্যাধি-জরা-জন্ম নিবারক কথামৃত নমোস্তুতে।।

মা

রঘুপতি মুখোপাধ্যায়



(১)
ঘুমোও বাছা
মাকে হৃদয়ে নিয়ে
দিবস শেষে।

(২)
তিমির শেষে
তরুণ রবি হাসে
জাগ মা নামে।

(৩)
পাতানো মা নয়
সৎ অসতের মা
সত্যিকারের মা।

(৪)
মাখে ধুলো ছেলে
ঝাড়েন ধুলো হেসে
তোলেন কোলে।

(৫)
আমি রয়েছি
ঠাকুর রয়েছেন
ভয় কি বাবা।

(৬)
ঠাকুর রক্ষক
সদাই রাখ মনে
শরণ নাও।

(৭)
মানস ধায়
কুকর্মে, রাখ রোখ
সদা সুকর্মে।

(৮)
নির্মল মন
দেখে সর্ব জনে
শুভ্র বরণ।

(৯)
চাইবে কিবা
'তাঁর' শরণ নাও
থাকবে ভাল।

(১০)
ভাববে মনে
আর কেউ না থাক
আছেন তো মা।

---

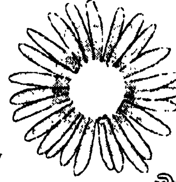
* *'হাইকু' একপ্রকার জাপানী কবিতা। ৫+৭+৫=১৭ অক্ষরের তিন চরণের বাঁধুনি। কবিতাটিতে তারই অনুসরণের প্রয়াস*—**সম্পাদক**

মানুষ মানেই মান হুঁশ

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

বিশ্বাস আজ সব থেকে প্রয়োজন
হটে যাক দূরে অন্ধ বিভেদ, ভয়,
মানুষকে ছাড়া মিছে সব আয়োজন
আঁধার হটিয়ে আন আলোকের জয়।
হাতে হাতে আর ধ্বংস আয়ুধ নয়
ধ্রুবসত্যের দেখা দিক প্রত্যূষ,
তিনি চেয়েছেন সবার সমন্বয়
মানুষ মানেই আছে যার মান হুঁশ।

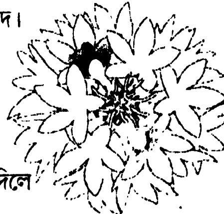
মুখে হাসি নেই, বুকে বাসা বেঁধে ভয়
চোরা বাঘনখে শ্বাপদের উল্লাস
জেনো ভালবাসা শাশ্বত অক্ষয়
বোধোদয় হোক, ঘুচে যাক সন্ত্রাস।
ধর্ম সে শুধু অহিফেন নেশা নয়—
পথ যত হোক, লক্ষ্য সূর্যোদয়।
পরম ঠাকুর দেখেছেন চাক্ষুষ,
মানুষ তো সেই, আছে যার মান হুঁশ।



সবাকার মা

সুভাষ বসু

গ্রামবালা সেজে এসেছিলে কে যে পল্লীমায়ের ঘরে,
ঢাকিয়া শ্রীরূপ আপন স্বরূপ সাধারণ রূপ ধরে।
অভয়া বরদা জননী সারদা এলে তুমি ধরাধামে
পবিত্র পরশে জাগাতে হরষে পুণ্য তোমার নামে।
জানি সন্তান ত্যজি' ভেদজ্ঞান শরৎ, কী আমজাদ
জাতপাত ভুলে নিলে কোলে তুলে বিনাশিতে পরমাদ।
অসতের যথা সতের যে তথা মাতা তুমি সবাকার
করুণারূপিণী প্রেমস্বরূপিণী শান্তির পারাবার।
ভীষণ ডাকাত ধরে তব হাত তেলোভেলো প্রান্তরে
স্বরূপ জানিয়া চরণে লুটিয়া মাতাজ্ঞানে পূজা করে।
কে তোমা চিনিবে কেমনে বুঝিবে নিজে নাই ধরা দিলে
কৃপা কর দান মোরা সন্তান যাচি তাই সবে মিলে।



অনুভব

গৌরী রায়চৌধুরী

শ্রীশ্রীগীতা বলেছেন—"মা ফলেষু..."।
সবাই বলে, নিরাকাঙ্ক্ষ্য হও।
আমি শুধু প্রেমের তিয়াসী,
বিশুদ্ধ পবিত্র প্রেম।
এইটুকু আকাঙ্ক্ষা মোর।
কোথায় পাব?
তাই দুঃখ আর কান্না জীবনে সম্বল।
অ-ভাল পৃথিবীতে ভাল কোথায়?
বিশ্বানুভূতি সংসারে নেই—
আছে, সাধুসঙ্গে।
সে কী—সংসার ব্যতীত?
'আমার যে সব দিতে হবে—
সে তো আমি জানি'
নিঃশেষে মিলাবে ধূম—
দেহ-সঙ্গে দেহাকাঙ্ক্ষা যত;
এইটুকু সার, গোণ
বাকি ক'টা দিন।
এই শেষ বাণী।

"রামকৃষ্ণ পরমহংস যে ভগবানের বাবা"

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

অদ্বৈতবেদান্তই বেদের মূল সুর, বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত—বললেন স্বামী বিবেকানন্দ। বেদের সার রহস্য কি? অনেক ব্যাখ্যা, অনেক তর্ক ও বিতর্ক। অনেক ব্যঙ্গ। একালের মানুষের কাছে 'বেদ' অজ্ঞাত অর্থ একটি শব্দ মাত্র। স্বামীজী বেদের ব্যাখ্যা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় যা করেছেন, তা হলোঃ "আমাদের বিশ্বাস—সব প্রাণীই ব্রহ্মস্বরূপ। প্রত্যেক আত্মাই যেন মেঘে ঢাকা সূর্যের মতো; একজনের সঙ্গে আরেকজনের তফাৎ কেবল এই—কোথাও সূর্যের ওপর মেঘের আবরণ ঘন, কোথাও এই আবরণ একটু পাতলা; আমাদের বিশ্বাস—জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এটি সকল ধর্মেরই ভিত্তিস্বরূপ; আর শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক স্তরে মানবের উন্নতির সমগ্র ইতিহাসের সারকথাটাই এই—এক আত্মাই বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করছেন।"

আমরা জানতে চাই। আমাদের অন্বেষণ হলো জ্ঞান। আমরা কথায় কথায় বলি, 'জ্ঞান-বিজ্ঞান'। এই জ্ঞান হলো—বস্তুজ্ঞান, বাস্তুজ্ঞান, কারিগরী যাবতীয় জ্ঞান ও প্রয়োগ। প্রযুক্তি। একে বলে 'বিদ্যা'। বেঁচে থাকার জন্য, জীবিকার জন্য বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন। জ্ঞানের আরেকটি বিশেষ দিক হলো, নিজের সম্পর্কে জ্ঞান। আমি কে? জগতের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? মৃত্যুর কি ব্যাখ্যা? আপাত রূপের আড়ালে আসল রূপটা কি? বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে টুকরো করে দেখব, না অখণ্ড দেখব! আমি একটা, তুমি একটা, সে একটা—পৃথক পৃথক অস্তিত্ব! অথবা সেই 'এক' অহঙ্কারে টুকরো হয়ে 'বহু' হয়েছেন। স্বামীজী বলছেন তাঁর বলিষ্ঠ ভাষায়ঃ "**রামকৃষ্ণ পরমহংস** যে ভগবানের বাবা, তাতে আমার সন্দেহমাত্র নাই... বেদ-বেদান্ত-পুরাণ-ভাগবতে যে কি আছে, তা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না পড়লে কিছুতেই বুঝা যাবে না। His life is a searchlight of infinite power thrown upon the whole mass of Indian religious thought. He was the living commentry to the Vedas and to their aim. He had lived in one life the whole cycle of the national religious existence in India. (তাঁর জীবন অনন্ত শক্তিপূর্ণ একটি সন্ধানী আলো; এই আলো সমগ্র ধর্মভাবের ওপর বিচ্ছুরিত হয়েছে। তিনি বেদ ও বেদান্তের জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ ছিলেন এবং এক জীবনে ভারতের জাতীয় ধর্মজীবনের সমগ্র কল্পটি অতিবাহিত করেছেন।)"

বেদ হলো আলো—অন্তরের আলো। আলো মানে দেবতা, দেবতা অর্থ লীলা। ঋগ্বেদের প্রথম সূক্ত—

"অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্।।"

আমার সামনে প্রজ্বলিত অগ্নি। অগ্রনিশান। চল, এই আলোতে জ্বালিয়ে নিয়ে প্রাণের আলো, এগিয়ে চল। আলোর তপস্যাই হলো যজ্ঞ। অগ্নিই আকর্ষণ করে নেবে তোমার আহুতি। তোমার অনুভূতির গভীরে দেখবে রত্নদ্যুতি।

বেদ ব্রহ্মকে ধারণ করে আছেন। নির্মেঘ, নীলাকাশ যেমন নিষ্পন্দ সরোবরে নিজেকে ধরা দেয়। ব্রহ্ম মানে বিশাল, বিরাট অসীম চেতনা। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বেদের ঋষিতুল্য। তিনি অনুভব করেছিলেন—"তোমার অসীমে প্রাণ, মন লয়ে যত দূরে আমি যাই।" সে এক অন্য অনুভূতি, ক্ষণ বিশ্ব জগতের কোন অস্তিত্ব নেই।

"যত্তে মরীচীঃ প্রবতো মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে।।"

(ঋগ্বেদ, ১০।৫৮।৬)

যে-মন তোমার সুদূরে উধাও আলোকের ঢেউয়ে ঢেউয়ে। ফিরে এস সসীমে। এইখানেই তোমার জীবনলীলা চলবে। উধাও মন। ফিরে এস বৈবস্বত যমলোক থেকে, দ্যুলোকে পৃথিবীলোকে, ধরার চতুষ্কোণে, দিকে দিকে দিকে দিকে (চতস্রঃ প্রদিশো)। সমুদ্র-জলধি হতে, যে-মন উধাও সুদূরে, বৃক্ষলতায়, জলে, উষার সূর্যে, মহা গিরিপর্বতে, নিখিল এই চরাচরে, অজানা হতে অজানায়, অতীতে এবং ভবিষ্যতে।

"তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে।।"

এখানেই বেঁচে-বর্তে থাকতে হবে। তাহলে আগুন জ্বালি—অগ্নিম্ ঈলে।

এই অগ্নি কোন্ অগ্নি? অগ্নির ব্যাখ্যা না হলে বেদের চির অম্লান মাধুর্য ধরা যাবে না। এই অগ্নি আধ্যাত্মিক, আত্মাশ্রিত। আমার ভেতরের একটা ব্যাপার। এই দেহের ভিতরেই সেই অগ্নির অবস্থান, 'সর্বতো দীপ্তিমান', 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'। তাঁরই আলোয় তুচ্ছ, বৃহৎ সবকিছুই আলোকিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের সুন্দর উপমা—আলো! একই আলোর সামনে বসে কেউ দলিল জাল করছে, কেউ 'ভাগবত' পাঠ করছে। 'অগ্নি' শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে আসল শব্দটি—'অগ্রণী', দিশারী। সকলকে এগিয়ে নিয়ে চলেন। তিনি 'কবিক্রতু'। 'ক্রতু' শব্দের অর্থ—সৃষ্টির ইচ্ছা, সঙ্কল্প, Creative Will; সঙ্কল্পমাত্রেই স্রষ্টার সৃষ্টি। বাইবেল বলছেনঃ "And God said, Let there be light; and there was light." সৃজনের ইচ্ছা হলো সিসৃক্ষা। 'অগ্নি' হলেন স্রষ্টা এবং স্রষ্টার সিসৃক্ষা। এই অনন্ত সৃজন-ইচ্ছা প্রতিটি মানুষের অন্তরে। মানুষ ভাঙছে, গড়ছে, গড়ছে, ভাঙছে। কত রূপ, কত বৈচিত্র্য, জগৎ-রূপ ভেলকি!

শ্রীঅরবিন্দ এই অগ্নিকে বললেন—'Divine Will'। রবীন্দ্রনাথ এটিকে একটি নিটোল রূপ দিলেন—

"নিত্যকালের উৎসব তব বিশ্বের দীপালিকা—
আমি শুধু তারি মাটির প্রদীপ, জ্বালাও তাহার শিখা
নির্বাণহীন আলোকদীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি।"

"অগ্নিম্ ঈলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজম্।"

"তোমারি ইচ্ছা কর হে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে।" তুমিই ঋত্বিক, তুমিই হোতা। তুমিই জ্বালাও। পুরোহিত অগ্নিরই বিস্তার। আগে যাঁর অধিষ্ঠান, তিনিই পুরোহিত। হে স্রষ্টা, তোমার ইচ্ছাকে সামনে রেখে শুরু হলো আমার জীবনযাত্রা। তোমারি ইচ্ছা হোক পূর্ণ সকল কর্ম মাঝে। বৈদিক কালে 'ঈড়্' মানে ছিল ইন্ধ, অর্থাৎ জ্বালিয়ে তোলা। পরবর্তী কালে 'ঈড়্'-এর মানে হয়ে গেল স্তুতি বা পূজা। "তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র-তপন, দেব-মানব বন্দে চরণ।"

সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ্—বৈদিক সাহিত্যের চার পর্ব। সংহিতার মধ্যে রয়েছে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ আর অথর্ববেদ। এই চারটি অতি প্রাচীন। প্রাচীনতম হলো ঋগ্বেদ। শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছেন ঃ "Lyrical epic of the soul in its immortal ascension." **মানবাত্মার অমৃতে উত্তরণের মহাগীতিকাব্য।**

দুটি শব্দ—'মৃত' আর 'অমৃত'। 'মৃত' শব্দের অর্থ হলো বিগতপ্রাণ। 'অমৃত' হলো সুধা, পীযূষ—যা পান করলে মৃত্যুকে এড়ানো যায়। মৃত্যুকে জয় করলেই মোক্ষ। 'মোক্ষ' মানে দৈহিক মৃত্যু নয়—নির্বাণ। নির্বাণের অর্থ বৌদ্ধধর্মে অতি পরিষ্কার—সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি, 'Eternal Bliss'। মনের অতি উচ্চ অবস্থা। বেদ ব্রহ্মকেই ধরতে চায়। আর স্বামীজীর কথাই একশো ভাগ সত্য—বেদ বুঝতে হলে ঠাকুর ছাড়া গতি নেই। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বলছেন, বই-টই পড়া যেতে পারে, পণ্ডিতবর্গের যাবতীয় ব্যাখ্যা শোনা যেতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম যে উপলব্ধির বিষয় —personal experience। বর্ণনার অতীত। অনুচ্ছিষ্ট। আমি তোমাকে বলতে পারব না, তুমি আমাকে বলতে পারবে না। ঠাকুর বলছেন ঃ "একজন সাগর দেখে এলে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে—কেমন দেখলে, সে লোক মুখ হাঁ করে বলে—'ও কী দেখলুম! কি হিল্লোল কল্লোল!' ব্রহ্মের কথাও সেইরকম। বেদে আছে—তিনি আনন্দস্বরূপ, সচ্চিদানন্দ। শুকদেবাদি এই ব্রহ্মসাগর তটে দাঁড়িয়ে দর্শন-স্পর্শন করেছিলেন। এক মতে আছে—তাঁরা এ-সাগরে নামেন নাই। এ-সাগরে নামলে আর ফিরবার জো নাই।"

ঠাকুর সমাধির কথা বলছেন ঃ "সমাধিস্থ হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়; ব্রহ্মদর্শন হয়—সে-অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, মানুষ চুপ হয়ে যায়। ব্রহ্ম কি বস্তু মুখে বলবার শক্তি থাকে না।" দুটি অপূর্ব উপমা দিচ্ছেন ঃ "যতক্ষণ দর্শন না হয়, ততক্ষণই বিচার। ঘি কাঁচা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘি-র কোন শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন পাকা ঘিয়ে আবার কাঁচা লুচি পড়ে, তখন আরেকবার ছ্যাঁক কলকল করে। যখন পাকা লুচিকে তৈরি করে কাঁচা লুচি থেকে, তখন আবার চুপ হয়ে যায়। তেমনি সমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা দিবার জন্য আবার নেমে আসে, আবার কথা কয়।"

দ্বিতীয় উপমা একটি কবিতা—"যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভনভন করে। ফুলে বসে মধু পান করতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধুপান করবার পর মাতাল হয়ে আবার কখনো গুনগুন করে।"

বেদ-পাঠ আর বেদ-গাঁট—ঠাকুর বারেবারে এইটি বোঝাতে চেয়েছেন। বাজার করলেই হবে না, রান্না করে আহার করতে হবে। জ্ঞানের বাজার থেকে ঝোলাঝুলি ভরে ব্রহ্মতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব তুলে এনে যে-ছ্যাঁচড়া সেই ছ্যাঁচড়া। গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে গ্রন্থের গাঁট মারো। তা না হলে হটে যাও। এসো না আমার কাছে তোমার 'আঁশ চুপড়িটি' মাথায় নিয়ে। রাজশয্যাটিকে দুর্গন্ধময় করো না। মনকে ওপরে তোল।

"বহতি বিপুলবাতঃ পূর্বসংস্কাররূপঃ।
বিদলতি বলবৃন্দং ঘূর্ণিতেবোর্মিমালা।
প্রচলতি খলু যুগ্মং যুষ্মদস্মৎপ্রতীতম্।"
(শিবস্তোত্রম্—স্বামী বিবেকানন্দ)

পূর্বসংস্কার। সে যে এক প্রবল বায়ু। প্রবল স্রোত, উথালপাথাল ঢেউ, পাকিয়ে পাকিয়ে ছুটছে। কত লক্ষবার পৃথিবীতে এসেছি। অরণ্যের কোলে পশুহত্যা করেছি, আগুনে ঝলসেছি, যুদ্ধ করেছি, পুরুষ হয়ে নারী-নির্যাতন করেছি, নারী হয়ে নির্যাতিত হয়েছি, রাজা হয়ে প্রজাদলন করেছি, প্রজা হয়ে দলিত হয়েছি। মহাভারতের কালে পাশা খেলেছি, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সাক্ষী হয়েছি, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি শুনেছি, অর্জুনের বীরত্ব দেখেছি, ধর্মরাজের ধর্মনিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করেছি। দুর্ভিক্ষে দরজায় দরজায় ভিক্ষে করেছি, কালোবাজারী করেছি। বিষয়ের জন্য ভাইকে মেরেছি। পতির চিতায় সতীকে তুলেছি। কখনো মোসায়েব হয়েছি। ঘন কালো, অদৃশ্য এক আবর্ত পাক খাচ্ছে। সেই পাকে বলবৃন্দ দলিত। মাথা তোলার ক্ষমতা কোথায়! উপায়? আগে সংস্কার তৈরি কর। পারছ না! শিবকে স্মরণ কর। শ্রীমা সারদাদেবী বলছেন ঃ "মন দিয়ে মনকে বাগে আনার চেষ্টা কর। যদি না পার ঠাকুরকে ডাক। তিনি ছাঁচ ভেঙে নতুন ছাঁচ তৈরি করে দিতে পারেন।"

মন তখন চতুর্থ ভূমি অনাহত পদ্ম থেকে উঠে আসবে। ঠাকুর বলছেন ঃ "**জীবাত্মাকে তখন শিখার মতো দর্শন হয়, আর জ্যোতিঃদর্শন হয়। ষষ্ঠভূমি আজ্ঞাচক্রে মন উঠলে ঈশ্বরদর্শন হয়।** জনক রাজা পঞ্চমভূমি থেকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিতেন। তিনি কখনো পঞ্চমভূমি, কখনো ষষ্ঠভূমিতে থাকতেন।"

বেদের ঋষিরা পেয়েছিলেন। "ভাস্বতী নেত্রী সূনৃতানাম্/ অচেতি চিত্রা বি দুরো না আবঃ।" এ কী বিস্ময়! "ভেঙেছে দুয়ার এসেছে জ্যোতির্ময়!" ঠাকুর এই দর্শনের কথাই বলছেন ঃ "সাধক বলে, এ কী! এ কী!" ❑

ইওরোপে তীর্থযাত্রা*

স্বামী গোকুলানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কন্যা অনিতা পাফ থাকেন মিউনিখে। তাঁর স্বামী একজন অধ্যাপক এবং জার্মান বুণ্ডেস্ট্যাগ-এর একজন সদস্যও। ৯ এপ্রিল সন্ধ্যায় অমিয় আর লিপি পাল আমায় নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে। অতি চমৎকার সেই বাড়ি। নেতাজীর পত্নী এই বাড়িতে বহুদিন ছিলেন। অনিতা আজও বিভিন্ন ভারতীয় পরম্পরা মেনে চলেন। আমি তাঁদের বাড়িতে পৌঁছাতেই তিনি বেরিয়ে এলেন এবং পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। তাঁরা আমাকে নেতাজীর 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' বইটির একখানা কপি



মিউনিখে নেতাজী-কন্যা ও জামাতার সঙ্গে

দেখালেন। এটি হলো বইটির সেই প্রথম কপি—যাতে নেতাজী সই করে উপহার দিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীকে। এটা ছিল সত্যিই এক স্মরণীয় ভ্রমণ, আমাকে কেবলই মনে করিয়ে দিচ্ছিল আমাদের অতীত আর মহান ঐতিহ্যের কথা। মনে পড়ছিল স্বামীজীর প্রতি নেতাজীর অপরিসীম শ্রদ্ধার কথা, মনে পড়ছিল আমাদের স্বাধীনতার মহান সেনানীরা কত গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন স্বামীজীর দ্বারা। নেতাজীর কন্যা এবং তাঁর সুভদ্র পণ্ডিত অধ্যাপক স্বামীর ব্যবহার ও আতিথেয়তা মুগ্ধ করেছিল আমায়। রাত ৮টায় আমরা মিউনিখ ছেড়ে রওনা হলাম ফ্রাঙ্কফুর্টের উদ্দেশে।

১০ এপ্রিল স্থানীয় একটি চার্চ ও মিউজিয়াম এবং ১১ এপ্রিল হেসের রাজধানী ওয়াইসবাডেন ঘুরে দেখলাম। শেষোক্ত স্থানে অসুস্থ ভূপেন রায়ের জার্মান-পত্নী সুশান তাঁদের বাড়িতে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের আপ্যায়ন করলেন। ১২ এপ্রিল অমিয় আর লিপি পালের সঙ্গে গেলাম ফ্রাঙ্কফুর্টে। সেখানে দেখলাম গ্যোয়েটের বাসস্থান তথা সংগ্রহশালা। সেখানকার পাতালরেলে চড়ারও একটা সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুন্দর অভিজ্ঞতা হলো।

বাইগুওয়েড, ওয়াইসবাডেন

১৩ আর ১৪ এপ্রিল আমরা কাটালাম ওয়াইসবাডেনের কাছেই বাইগুওয়েড বেদান্ত সোসাইটিতে। এই সোসাইটির কথা আগেই বলা হয়েছে। পূর্বতন পশ্চিম জার্মানির রাজধানী বন থেকে খুব দূরে নয় এটি। এক বাঙালির সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা লিলি চক্রবর্তী এর কোষাধ্যক্ষা। তিনি মূলত জার্মান মহিলা। বেদান্ত বিষয়ক একটি সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য দুদিন সেখানে থেকে যেতে হলো। লক্ষ্য করলাম, বেদান্তধর্মের জন্য নিবেদিত এই সঙ্ঘটি খুবই কর্মচঞ্চল। যদিও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শাখাকেন্দ্র হিসাবে এটি এখনো স্বীকৃতি পায়নি, তবু ফ্রান্সের গ্রেৎজ শহর থেকে আমাদের সঙ্ঘের স্বামী বীতমোহানন্দজী এখানে প্রায়ই এসে বক্তৃতা দেন। তিনিই এখানকার সভাপতি।



বাইগুওয়েডে ভক্তসঙ্গে

আমি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম যখন শুনলাম, এই সঙ্ঘের ভক্তরাও 'ভব-ভয়ভঞ্জন', 'ভব-সাগর-তারণ', 'ভুবনরূপম্-অতি', 'গুরু-ব্রহ্মা', 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ' কিংবা 'হরিনারায়ণ গোবিন্দ' প্রভৃতি গান গায়। লিলি চক্রবর্তীর একান্ত অনুরোধে মন্দিরে একটু পূজাও করা গেল।

১৪ এপ্রিল ছিল বাঙালির নববর্ষ। গোটা দিনটা কাটল প্রার্থনায়, ধ্যানে। 'অন্তর্জীবনের রূপরেখা' বিষয়ে কিছু বলতে হলো সেদিন। সন্ধ্যা ৬টা ২০ নাগাদ আমরা ফিরে এলাম আইডেস্টাইন।

* মূল ইংরেজি রচনা থেকে অনুবাদ করেছেন জয়দীপ ঘোষ।

বার্লিন

এরপর গেলাম বার্লিন। সেই বার্লিন—যেখানে বিংশ শতাব্দীর ইউরোপের ইতিহাস মূর্ত হয়ে আছে। দেখলাম বার্লিনের সেই প্রাচীর, যা আসলে অমানবিকতার প্রতীক, বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা আর প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষার প্রতিরূপ। এই প্রাচীর 'ঠাণ্ডা-যুদ্ধ' (cold war) যুগেরও যেন বার্তাবহ, যা প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ পীড়ন করেছে পৃথিবীকে, তাকে নিয়ে গেছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিনারায়।

যাঁরা বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নিজেদের যৌবনকাল অতিবাহিত করেছেন, বিশেষ করে তাঁদের জন্য এই বার্লিন এক গহন আবেগের উৎসমুখ। এই শহরের সঙ্গে ইতিহাসের কত কিছুই যে যুক্ত হয়ে আছে! ১৯৩৬ সালে যে স্টেডিয়ামে অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেটাও দেখলাম। তার অনেকগুলো খেলা দেখতে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডল্ফ হিটলার। তিনি নিশ্চয়ই খুব হতাশ হচ্ছিলেন, যখন কোন অনার্য তথা কালো-চামড়ার প্রতিযোগী জিতে নিচ্ছিল কোন পদক, কেননা তার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রমাণিত হচ্ছিল তাঁর বিশুদ্ধ জার্মান জাতির সাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্ব। এই ১৯৩৬-এর অলিম্পিকেই সুবিখ্যাত আফ্রিকান অ্যাথলিট জেসি ওয়েন্স যখন চার-চারটি স্বর্ণপদক জিতে নিলেন, তখন হিটলার সম্ভবত বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তী কালে ঐ স্টেডিয়ামের পার্শ্ববর্তী রাস্তাটির নামকরণ হয় জেসি ওয়েন্সেরই নামে!

দেখলাম সেই বিখ্যাত সিসিলিয়েনহফ প্রাসাদ—যেখানে ১৯৪৫-এর ১৭ জুলাই থেকে ২ আগস্ট পর্যন্ত চলেছিল 'পোস্টডাম কনফারেন্স'; একত্রিত হয়েছিলেন ট্রুম্যান, চার্চিল এবং স্ট্যালিন।

১৬ এপ্রিল দিনটি কাটল ধ্যান, ভজন এবং প্রার্থনায়। 'How to Overcome Mental Tension' বিষয়ে একটি বক্তৃতাও দিতে হলো।

আমার জার্মান ভ্রমণ সমাপ্ত হয়ে এল। প্রথমে ঠিক ছিল আমরা ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে প্যারিসে যাব অমিয়র গাড়িতে। দুর্ভাগ্যবশত সেই গাড়িতে হঠাৎ কিছু গোলমাল দেখা দিল, ফলে ১৮ তারিখের প্যারিসগামী বিমানের একখানা টিকিট কাটা হলো।

গ্রেৎজ, ফ্রান্স

১৮ এপ্রিল। প্যারিসের উদ্দেশে আইডেনস্টাইন ছেড়ে ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টের দিকে যাত্রা করলাম বেলা ১১টা নাগাদ। জার্মানির মহৎহৃদয় ভক্তদের সঙ্গে এইভাবেই কেটে গেল গভীর আবেগময় ও স্মরণীয় বারোটি দিন।

আমরা প্যারিস পৌঁছালাম দুপুর ২টো ৫-এ। গ্রেৎজ সেন্টার থেকে স্বামী দেবাত্মানন্দজী এসেছিলেন এয়ারপোর্টে। কাকতালীয়ভাবে এই এয়ারপোর্টেই স্বামী গৌতমানন্দজীর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি চেন্নাই রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অছি ও পরিচালন পরিষদের অন্যতম সদস্য। তিনি যাচ্ছিলেন শিকাগো।

গ্রেৎজ-এ আমাদের সঙ্ঘটির নাম—'Centre Vedantique Ramakrishna'। প্যারিস থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে এটি অবস্থিত। আমি সেখানে পৌঁছালাম ৩টে ৪৫ নাগাদ। স্বামী বীতমোহানন্দজী আমায় সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। ১৯৯২ সালে শেষবার এখানে এসে যে-ঘরে ছিলাম, এবারও ঠিক সেই ঘরেই আমার থাকার ব্যবস্থা হলো। স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর সময়ে এই ঘরটি মন্দির হিসাবে ব্যবহৃত হতো। খুবই প্রতিভাবান এই সন্ন্যাসী বহু গ্রন্থের রচয়িতা। 'Meditation according to Yoga-Vedanta', 'Hindu Thought' এবং 'Carmelite Mysticism'। তিনিই এই কেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠাতা। আমরা সবাই জানি, ফরাসি জাতি তাদের ভাষার প্রতি একটু বেশি অনুভূতিশীল। এটা বস্তুত তাদের আবেগের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। তাদের সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের ইতিহাস তাদের ভাষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সম্ভবত, মাতৃভাষাকে নিয়ে তাদের এইজাতীয় আবেগের কথা ভেবেই স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী খুব তাড়াতাড়ি ফরাসি ভাষা শিখেছিলেন, যাতে তিনি সেই ভাষাতেই বক্তৃতা দিতে পারেন। তাঁর এবং স্বামী যতীশ্বরানন্দজীর মতো উচ্চকোটির সন্ন্যাসীর ত্যাগ-তপস্যাপূত জীবন এই কেন্দ্রটিকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করেছিল।



গ্রেৎজ আশ্রম

গ্রেৎজ কেন্দ্রটির নানান চমকপ্রদ নীতি আছে। তার বেশির ভাগই স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর মতো অলোকসামান্য পুরুষের চিন্তাপ্রসূত। এই কেন্দ্রের একটা সুন্দর প্রথা হলো—মধ্যাহ্নভোজনের ঠিক আগে ফরাসি ভাষায় ভগবদ্গীতা থেকে পাঠ করা। স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজীই এই প্রথাটি চালু করেছিলেন। সকাল এবং সন্ধ্যায় শ্রীমা সারদাদেবীর এই বাণীটিও আবৃত্তি করা হয়—"যদি শান্তি চাও, কারো দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, জগৎ তোমার।" এই হলো গ্রেৎজ সেন্টারের প্রচলিত কিছু অভূতপূর্ব রীতির উদাহরণ।

১৯ এপ্রিল কাটানো হলো মূলত ভক্তদের সঙ্গে। এলিজাবেথ-অরুণ মারিয়া আর তাঁর পিতা-মাতা এসেছিলেন ইংল্যাণ্ড থেকে। সারদা একজন অতি ভক্তিমতী এবং পবিত্র নারী, তিনি এই গ্রেৎজ সেণ্টারের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বস্তুত, তিনি যেন এই আশ্রমেরই কন্যা। দিনের কিছুটা সময় কাটল ৩১৪ মিটার উচ্চ বিখ্যাত আইফেল টাওয়ার দেখে। এটা সম্ভবত প্যারিসের সবচেয়ে আকর্ষক স্থাপত্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময় এই অতুলনীয় টাওয়ারটি স্থাপিত হয়েছিল ৩১ মার্চ ১৮৮৯। ফরাসি বিপ্লবের একশো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বানানো হয়েছিল এটি। আমরা হয়তো কল্পনাও করতে পারব না যে, ১৯০০ সালে প্যারিস ভ্রমণকালে এই টাওয়ার দেখে ইতিহাসের একনিষ্ঠ ছাত্র স্বামীজী ঠিক কী ভাবছিলেন? আমরা একটি বিখ্যাত ক্যাথিড্রালও পরিদর্শন করলাম।

সেটা ছিল একাদশীর দিন, সন্ধ্যাটা আমরা কাটালাম আরতি আর রামনামসঙ্কীর্তন করে।

আমস্টারডাম

রেলস্টেশনে এসে আমায় বিদায় জানাল সারদা আর জন। একটা ট্রেন ধরে আমি নেদারল্যাণ্ডের রাজধানী আমস্টারডামে পৌঁছালাম সকাল সাড়ে ১০টায়। ছবির মতো গ্রামগুলির পাশ দিয়ে একটি মনোরম ট্রেনযাত্রা উপভোগ করা গেল।

আমাদের আমস্টারডাম-স্থিত কেন্দ্র 'Ramakrishna Vedanta Vereniging'-এর অধ্যক্ষ স্বামী সর্বাত্মানন্দ উপস্থিত ছিলেন রেলস্টেশনে। স্টেশনটি শিফল এয়ারপোর্টের বেশ কাছেই। এয়ারপোর্টের পরিচ্ছন্নতা আর সৌন্দর্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। স্বামী সর্বাত্মানন্দ সেসময় একখানি পশ্চিমী পোশাক পরেছিলেন, আমি এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, সঙ্ঘের ভিতরেই শুধু তাঁরা গেরুয়া বসন পরেন।

নেদারল্যাণ্ড এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মধ্যে অনেকগুলি যোগসূত্র রয়েছে। আমাদের সঙ্ঘের এক খ্যাতনামা সন্ন্যাসী স্বামী অতুলানন্দজী এসেছিলেন এই দেশ থেকেই। এই সন্ন্যাসীর জন্ম আমস্টারডামেই। 'With the Swamis in America and India' শীর্ষক তাঁর গ্রন্থটি বহুলপঠিত। 'Atman Alone Abides' নামে অপর একটি গ্রন্থে ধরা আছে তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন কথোপকথন। তিনি একদা কাজের খোঁজে আমেরিকায় যান এবং সেখানেই স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পরবর্তী কালে তিনি ভারতবর্ষে আসেন এবং শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে দীক্ষা নেন। জীবনের শেষ পর্যায় তিনি মুসৌরীর কাছে বারলোগঞ্জ এবং কনখলে অতিবাহিত করেন। আমার পরম সৌভাগ্য যে, তাঁর ব্যক্তিগত সাহচর্য পেয়েছি।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০০ সালে তিনদিনের জন্য নেদারল্যাণ্ডে আসেন। তিনি আমস্টারডামের ভিক্টোরিয়া হোটেলে ছিলেন। শেষবার ১৯৯২-এ যখন এখানে আসি, তখন এই হোটেলটি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। ১৯০০ সালে স্বামীজীর অবস্থানকালেই এখানে বেদান্ত প্রচার শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মহান সন্ন্যাসীদের দ্বারা সেই কাজ প্রসারিত হয়েছে। ১৯৩৩-১৯৩৪ সালে জার্মানবাসের সময় স্বামী যতীশ্বরানন্দজী এখানে মাঝেমধ্যে আসতেন এবং বেদান্তের ওপর বক্তৃতা করতেন। ১৯৭১ থেকে ১৯৮৬-র মধ্যে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ প্রায়শই এদেশে আসতেন এবং বেদান্তের ওপর ভাষণ দিতেন। ১৯৯০ সালে আমস্টারডামের এই কেন্দ্রটি প্রথম রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের স্বীকৃতি লাভ করে, প্রথম অধ্যক্ষ হন স্বামী চিদ্‌ভাসানন্দজী।



মিউনিখের সন্নিকটে বেনেডিক্টাইন মঠের দৃশ্য

এই আশ্রমের এক ডাচ ভক্তের নাম দাভ। অবিবাহিত এই মানুষটি আশ্রমের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। সুজাতা আরেক আর্জেন্টিনীয় ভক্ত, বিবাহ করেছিলেন একজন হল্যাণ্ডবাসীকে। তাঁর স্বামী আজ আর বেঁচে নেই। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই স্বামী ঋতজানন্দজীর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। বর্তমান বাড়িটিতে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে সুজাতার বাড়িই আশ্রম-গৃহ হিসাবে ব্যবহৃত হতো। তাই এখনো তাঁর বাড়িটি পবিত্র এবং মহত্ত্বপূর্ণ বলে গণ্য হয়। বিকালের দিকে আমরা সেখানকার শান্ত গ্রামাঞ্চলে ঘুরতে বেরলাম। আমস্টারডাম শহরেও একটা পাক লাগিয়ে আসা হলো। সন্ধ্যার সময় এলাম পুরনো আশ্রম—সুজাতার বাড়িতে। সেখানে গ্রেৎজ সেণ্টারের ওপর তোলা একটি তথ্যচিত্র দেখা হলো। সেই ভিডিওতে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর ছবি দেখে আর তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যারতির আগেই আমরা ফিরে এলাম আশ্রমে।

গ্রেৎজ, আবার

গ্রেৎজে ফিরে এলাম ২১ এপ্রিল ২০০১। আমি যে-ট্রেনটি ধরলাম, সেটি প্যারিসে পৌঁছে দিল বেলা ১টা

৪০-এ। সারদা আর তারা রেলস্টেশনে আমার জন্য প্রতীক্ষা করছিল। দিলীপ, মালবিকা আর দেবলীনও ইংল্যাণ্ড থেকে এসেছিল আমাদের সঙ্গে দুটো দিন কাটাবে বলে।

১৯৯২-এ আমার পরিচয় হয়েছিল এক ভক্তিমতী মহিলার সঙ্গে—মীরা। ইনি স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর শিষ্যা। তাঁর বয়স এখন ৮২ বছর। তাঁর গুরুদেবের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জানতেন তিনি। সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর বহু ছবি তিনি দেখালেন আমায়, দেখালেন তাঁকে লেখা অনেক চিঠি। গুরুর প্রতি তাঁর ভক্তি অসামান্য। তিনি বললেন ঃ "মহারাজ, গুরুকৃপা হি কেবলম্।" বললেন ঃ "মহারাজ, গুরুসেবাই আমার ধ্যান। আমি তাঁরই জগতে বাস করি, আর সবসময় অনুভব করি যে, তিনি আমার সঙ্গেই আছেন।" বস্তুত, স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী নিজেই এক বৃদ্ধ ফরাসি দম্পতি শ্রীযুক্ত এবং শ্রীমতী সুখোর অশেষ ভালবাসা ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন। তাঁরা তাঁর অনুপম চরিত্র আর পবিত্রতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁকে সন্তানের মতোই দেখাশোনা করতেন। এঁরাই গ্রেৎজ সেন্টারের জন্য জমি ও অর্থ দান করেন। এই কেন্দ্র বর্তমানে একটি বেদান্ত পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে, যা বিবিধ বিষয়বস্তুতে সজ্জিত।

আমি এখনো পর্যন্ত একজনও মানুষ দেখিনি, যিনি 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ' গানটি শুনে অভিভূত হননি। আর এটি হলো এই গ্রেৎজ আশ্রমেরই অবদান, স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী এই গানটিতে সুরারোপ করেন। প্রতিদিনের পূজা ও জপতপের পর এই গান যেন এক আধ্যাত্মিক তরঙ্গের জন্ম দেয়। প্রচণ্ড শীত সত্ত্বেও এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত প্রার্থনাসভা বসে।

২২ এপ্রিল আমায় একটি বক্তৃতা দিতে হলো। সেদিন আমার গ্রামাঞ্চলে ঘুরে আসারও সুযোগ হলো।

২৪ এপ্রিল ছিল একটা ব্যস্ত দিন, আমার কাছে স্মরণীয়ও বটে। মে ২০০১-এ অনুষ্ঠিতব্য 'বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা' বিষয়ক একটি সেমিনারের পট-উত্তোলন (Curtain-raiser) উপলক্ষ্যে একটি সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল প্যারিসে। সেই সাংবাদিক সম্মেলনে যোগ দিতে আমি, স্বামী বীতমোহানন্দজী আর কিশোর গেলাম প্যারিসের 'ভারতভবন'-এ। এরপর 'ভারতভবন'-এর অধ্যক্ষ এবং ইউনেস্কোর উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য বিকাশ সান্যালের সঙ্গে বিকালের দিকে গেলাম সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে, তারপর সেই জায়গায়—যেখানে ১৯০০ সালের আগস্ট থেকে অক্টোবর প্যারিসবাসকালে স্বামীজী থাকতেন।

১৯০০ সালে স্বামীজী যখন প্যারিসে আসেন, তখন দুটো ভিন্ন জায়গায় তিনি ছিলেন। প্রথমে তিনি '৩৯ রু গাম' ঠিকানায় থাকতেন জুল বোয়ার সঙ্গে। এঁর কাছেই ফরাসি ভাষা শিখেছিলেন তিনি। অন্য যে-স্থানটিতে স্বামীজী প্যারিসের বেশির ভাগ দিন অতিবাহিত করেছিলেন, সেটি শ্রীযুক্ত এবং শ্রীমতী লেগেটের বাসগৃহ। এই বাড়িটি দেখার সৌভাগ্য হলো। এই ভবন থেকে স্বামীজী অনেক চিঠি লিখেছেন। ১৯০০ সালের ১ সেপ্টেম্বর স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে তিনি লিখেছিলেন ঃ "আমি এখন কিছুদিন অজ্ঞাতবাস করছি। ফরাসিদের সঙ্গে থাকব তাদের ভাষা শিখবার জন্য।... ফরাসি ভাষাটা কতক আয়ত্ত হয়েছে, কিন্তু দু-একমাস তাদের সঙ্গে বসবাস করলে বেশ কথাবার্তা কইতে অধিকার জন্মাবে। এ-ভাষাটা আর জার্মান—এ-দুটোয় উত্তম অধিকার জন্মালে একরকম ইওরোপী বিদ্যায় যথেষ্ট প্রবেশলাভ হয়। এ ফরাসির লোক কেবল মস্তিষ্ক-চর্চা, ইহলোকবাঞ্ছা; ঈশ্বর বা জীব—কুসংস্কার বলে দৃঢ় ধারণা, ওসব কথা কইতেই চায় না!!! আসল চার্বাকের দেশ! দেখি, প্রভু কি করেন। তবে এদেশ হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতার শীর্ষ। পারী [প্যারিস] নগরী পাশ্চাত্য সভ্যতার রাজধানী।"

আমি বাড়িটির সামনে অবস্থিত একটি সুন্দর পার্কও দেখলাম। এরপর আমরা গেলাম আধুনিক শিল্পকলার জাতীয় সংগ্রহশালায়। দেখলাম প্রহেলিকাময় হাসিটি-সহ 'মোনালিসা', সম্ভবত ফ্রান্সের বিস্ময়কর জীবনযাত্রাই এই হাসির উৎস। এই ছবির চিত্রকর প্রতিভাময় শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, যিনি একাধারে শিল্প আর বিজ্ঞান—দুক্ষেত্রেই ছিলেন পারদর্শী।

বিকালে গ্রেৎজ সেন্টারের সেই ঘরে গেলাম, যেখানে স্বামী বিদ্যাত্মানন্দজী থাকতেন। পরদিন স্বামী বীতমোহানন্দজীর সঙ্গে গেলাম জুভেয়ার বেনেডিক্টাইন কনভেন্টে। সিস্টার সৌরমেরি-বারেন চা-সহযোগে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে আমরা কথাবার্তা বললাম, ঘুরে দেখলাম। এই কনভেন্ট আমায় মুগ্ধ করেছিল।

ভারতে প্রত্যাবর্তন

কুয়েত এবং ইওরোপের কিছু অংশ ভ্রমণ শেষ হয়ে এল। চলে এল ভারতে ফেরার দিনটি—২৭ এপ্রিল ২০০১। এই ভ্রমণকাল ছিল অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। দেখলাম পশ্চিমে বেদান্তের জয়যাত্রা—যার বীজ রোপণ করেছিলেন প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দ প্রায় এক শতাব্দী আগে, আজ তা ফুলে-ফলে সুসজ্জিত। সন্দেহ নেই, এখনো বহু ক্ষেত্রেই কাজ বাকি আছে, পাশ্চাত্যের পুরোপুরি জেগে উঠতেও দেরি অনেক। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত এবং উৎসর্গীকৃত সন্তানদের দ্বারা ঈশ্বরের সেই কাজ এখনো নীরবে সাধিত হয়ে চলেছে।

স্বামী বীতমোহানন্দজী, সারদা ও অন্যান্যদের কাছে বিদায় নিয়ে স্বামী দেবাত্মানন্দজীর সঙ্গে চলে এলাম এয়ারপোর্ট। উড়ান একেবারে নির্ধারিত সময়েই ছিল। ২৮ এপ্রিল বিকাল সোয়া ৪টে নাগাদ সেটা পৌঁছাল দিল্লি, সময়ের অল্প আগেই। [সমাপ্ত] ❑

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

প্রসঙ্গ ঃ 'রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ'

আমি 'উদ্বোধন'-এর একজন গ্রাহিকা। 'উদ্বোধন'-এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক প্রায় তিন প্রজন্মের। 'উদ্বোধন' আমাদের কাছে সাধারণ পত্রিকামাত্র নয়। এটি আমাদের একসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর, আর নিত্য সাধুসঙ্গ। প্রতি মাসের পত্রিকা প্রচুর আগ্রহ নিয়ে পড়ি—মাঝে মাঝে অন্যান্য বছরের পুরনো সংখ্যাও পুনরায় পড়ে খুব আনন্দ পাই।

এই চিঠি লেখার ইচ্ছা হলো এইজন্য যে, বেশ কিছুদিন ধরে 'রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ' দারুণ ভাল লাগছে। আগে এই বিভাগে সংক্ষিপ্ত কিছু খবর থাকত—'উৎসব-অনুষ্ঠান', 'ছাত্রকৃতিত্ব', 'সেবাব্রত' ইত্যাদি। অগ্রহায়ণ ১৪০৮ সংখ্যায় 'নতুন সহস্রাব্দের বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা মুক্তাঙ্গনে'র বিশদ বিবরণ পড়ে খুব ভাল লাগল। পরে এই বিভাগে আরো অন্য সব বিশদ সংবাদ পেয়ে খুব ভাল লাগছে। 'রামকৃষ্ণ মিশনের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী, লখনৌ সেবাশ্রম' পড়লাম। ২০০২-এর 'কল্পতরু উৎসব', 'উটকামণ্ড আশ্রম প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর উদ্‌যাপন' পড়ে খুব ভাল লাগল। 'বহির্ভারত'-এ 'সাম্প্রতিক আমেরিকান প্রবৃত্তি' পড়ে জানলাম, আমেরিকায় এখন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' কত সমাদৃত হচ্ছে। 'কাশী সেবাশ্রমের একশো বছর পূর্তির সমাপ্তি অনুষ্ঠান'-এর বিবরণও খুব চমৎকার। পরবর্তী সংখ্যায় পুষ্করের সাবিত্রী-মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের মূর্তিপ্রতিষ্ঠা, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'রামকৃষ্ণ মিশন নিউ দিল্লির প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উদ্‌যাপন', এর পর 'কাটিহার আশ্রম' ও 'পুনে রামকৃষ্ণ মঠের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশ্বজনীন মন্দির প্রতিষ্ঠা'-র সংবাদ বিশেষ আকর্ষণীয় লাগল আমার কাছে। আমরা কয়েক বছর আগে পুনেতে ঐ মঠের নির্মাণকাজ দেখে এসেছিলাম। শ্রাবণ সংখ্যায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম বারাণসীর শতবর্ষপূর্তি'র খবর ও ঐ আশ্রমের প্রথম সময়ের পুণ্যস্মৃতি বড় সুন্দর লাগল। এরপর ভাদ্র সংখ্যায় 'দক্ষিণীবার্তা' দারুণ মুগ্ধ হয়ে পড়লাম। ওখানে ৬ জানুয়ারি ২০০২-এর 'গুরুপূজা'র বিরাট অনুষ্ঠানের কোন খবরই জানতাম না। 'উদ্বোধন'-এ এইরকম কলকাতার ও বাইরের খবর নিশ্চয়ই আবারও পাব। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। 'কথাপ্রসঙ্গে' ও অন্য প্রত্যেকটি লেখা অত্যন্ত সুখপাঠ্য ও প্রেরণাদায়ক।

অনিতা মিশ্র
কলকাতা-৭০০ ০৯২

ডায়াবিটিস প্রসঙ্গে দু-চার কথা

'উদ্বোধন'-এর গত ভাদ্র ১৪০৯ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে দীপঙ্কর ভৌমিকের লেখা চিঠি পড়ে মনে হলো, তিনি ডায়াবিটিস রোগে বেশ কিছুদিন ভুগছেন। হয়তো অনেক চিকিৎসার পর গত দেড়বছর আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করেও কোন সুফল পাননি। বিদেশে থেকেও তিনি 'উদ্বোধন'-এর একজন নিয়মিত গুণমুগ্ধ পাঠক। তাই 'উদ্বোধন'-এর মারফত শ্রীভৌমিককে অনুরোধ জানাই, তিনি 'উদ্বোধন'-এর ভাদ্র ১৪০৭ সংখ্যার ৩৯৭ পৃষ্ঠায় আমার লেখা 'বহুমূত্র রোগ নিরাময়ের উপায়' পড়ে সেই অনুযায়ী 'কুটিলাগম' কিছুদিন ব্যবহার করে দেখতে পারেন। আমার ঐ চিঠিটি প্রকাশিত হওয়ার পর বহু রোগী বহুমূত্র ও সুগার থেকে অব্যাহতি পেয়ে আমাকে জানিয়েছেন। আমি সেরকম ভুক্তভোগী না হলেও এই ৭৪ বছর বয়সেও সুস্বাস্থ্যের জন্য মাঝেমধ্যে খেয়ে থাকি। ওষুধটি হলো ধুনাজাতীয় একরকম বিশেষ গাছের আঠা, যা প্রায় সর্বত্র বনৌষধির দোকানে পাওয়া যায়। মূল্য প্রতি কিলোগ্রাম অনধিক ৩০০ টাকা। প্রত্যেক রোগীর মাসে ২৫০-৩০০ গ্রামের মতো প্রয়োজন হয়। এটি মিহি করে বেটে চা-চামচের দু চামচের সঙ্গে সমপরিমাণ খাঁটি তালমিছরি মিশিয়ে আগের দিন রাতে এক গ্লাস বিশুদ্ধ জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। পরদিন সকালে দইয়ের মতো বস্তুটিকে চামচ দিয়ে খুব ভাল মতো নেড়ে খালি পেটে খেতে হয়। এটি খাওয়ার এক ঘণ্টা পর প্রাতরাশ করতে অসুবিধা নেই। সুস্থ অবস্থায়ও এটি ব্যবহার করা যায়। এর কোন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই, এমনকি এর সঙ্গে যুগপৎ অন্য চিকিৎসাও চলতে পারে, তবে এর গুণাগুণ সম্যক উপলব্ধি করতে হলে এই রোগের জন্য অন্য চিকিৎসা না করাই শ্রেয়। মাসখানেকের মধ্যে রোগ আয়ত্তে এসে গেলেও সুস্বাস্থ্যের জন্য নিয়মিত খেলে উপকার বৈ অপকার হবে না। এত কম দামে এরকম ভয়ঙ্কর রোগ নিরাময় করার ক্ষমতা অন্য কোন চিকিৎসাপদ্ধতিতে সম্ভবপর কিনা আমার জানা নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তালমিছরি যদিও মিষ্টি, কিন্তু তালজাতীয় ফল থেকে এটি প্রস্তুত হয় বলে চিনির সঙ্গে এর গুণাগুণ পৃথক। আর যদি খাঁটি তালমিছরি পাওয়া না যায়, তবে শুধু 'কুটিলাগম' খাওয়া যেতে পারে।

বহুমূত্র রোগীর পক্ষে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন বিশেষ জরুরি—(১) প্রতিদিন সকাল-বিকাল অন্তত পাঁচ কিলোমিটার পায়ে হাঁটা অতি আবশ্যক। (২) ঢেঁড়শ ছোট হলে দুটো এবং বড় হলে একটা লম্বালম্বি করে কেটে আগের দিন রাত্রে ভিজিয়ে রেখে পরদিন ঐ জল কুটিলাগম খাওয়ার ১০-১৫ মিনিট পরেই খেতে হবে। (৩) খাবার খুব ধীরে ধীরে অন্তত ১০-১২ বার চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। (৪) চিনি বা চিনির তৈরি খাদ্য সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে।

একমাস এই নিয়মগুলি পালন করে কেমন থাকেন তা 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমে জানালে বহু ভুক্তভোগীর কল্যাণ হবে।

কুমুদবন্ধু স্বামী
গুয়াহাটী, অসম-৭৮৩০০৬

'সত্য-মিথ্যা' ঃ মহাভারতীয় প্রসঙ্গ

'উদ্বোধন'-এর গত শ্রাবণ ১৪০৯ সংখ্যায় 'সত্য-মিথ্যা' গল্পটির সূচনাংশে পটভূমিকারূপে যে-কাহিনীটি উল্লিখিত হয়েছে তাতে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষণীয়। তাই এই চিঠির অবতারণা। গল্পে উল্লিখিত ব্যাধের নাম 'বালক' নয়—'বলাক'। যাই হোক, পটভূমিকায় সূত্রাকারে প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণ-কথিত গল্পটি কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত 'মহাভারত' গ্রন্থের কর্ণপর্বের ৭০তম অধ্যায় থেকে সঙ্কলিত। যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণের পর কর্ণ তখন সেনাপতি-পদে বৃত হয়েছেন। অতএব ব্যাপারটি 'কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে কোন এক সময়ের' ঘটনা নয়, আসলে এটি যুদ্ধের শেষদিকে, প্রায় অন্তিম লগ্নের ঘটনা।

কর্ণ কর্তৃক অর্জুনের পরাজয় এবং তার ফলে অর্জুনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের ধিক্কারবাণীবর্ষণ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তাও মহাভারতের বিবরণ দ্বারা সমর্থিত নয়। কর্ণপর্বে বর্ণিত প্রসঙ্গটি একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ঘটনাটি হলো, সপ্তদশ দিনের যুদ্ধে রাজা যুধিষ্ঠির (অর্জুন নয়) কর্ণ কর্তৃক পরাজিত ও ভীষণভাবে নিগৃহীত হন। নিগ্রহের পর ক্ষতবিক্ষত দেহে যুধিষ্ঠির শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মনে এই আশা নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন যে, সেদিনের শেষ যুদ্ধে অর্জুনের হাতে কর্ণ নিশ্চয়ই নিহত হবেন। কিন্তু ভীম ও কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে ফিরে আসেন শিবিরে আহত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখতে ও সান্ত্বনা দিতে। কৃষ্ণার্জুনকে দেখে এবং যুদ্ধবৃত্তান্ত অবগত হয়ে যুধিষ্ঠির যখন বুঝলেন যে, কর্ণ তখনো জীবিত, তখনি ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট ধর্মরাজ অর্জুনকে গাণ্ডীবধারণের অযোগ্য বলে ধিক্কার দিয়ে অপর কোন যোগ্য বীরের হাতে গাণ্ডীব অর্পণ করতে বলেন। এদিকে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল, কেউ যদি কখনো তাঁকে গাণ্ডীব-ধারণের অযোগ্য বলার স্পর্ধা দেখায় তবে তিনি তার শিরশ্ছেদ করবেন। প্রতিজ্ঞাপালন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। সেই ধর্মপালনের জন্য অর্জুন জ্যেষ্ঠভ্রাতার শিরশ্ছেদ করতে উদ্যত হলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁকে নিরস্ত করেন এবং ধর্মের দুর্জ্ঞেয় সূক্ষ্মতত্ত্ব বোঝানোর জন্য গল্পদুটির অবতারণা করেন।

পরিশেষে জানাই, শ্রীমাইতি আমাদের ধন্যবাদার্হ। কারণ, গল্পসূত্রে মহাভারতের যে-আখ্যানভাগটি তিনি আমাদের সামনে নিয়ে এসেছেন, সেটি ঐ মহাগ্রন্থের একটি বিশেষ চমকপ্রদ ও শিক্ষাপ্রদ অধ্যায়। গল্প তো শেষ হলো, কিন্তু প্রশ্ন রয়ে গেল, কৌতূহল জেগে রইল। মহাবিজ্ঞ অথচ পরাজয়ের গ্লানিতে আত্মহারা রাজা যুধিষ্ঠির এবং তাঁর চিরদিনের অনুগত ছায়াসঙ্গী মহাবীর অর্জুনের মধ্যে এই যে অকল্পনীয় ও আকস্মিক দ্বন্দ্ব—এর সমাধান হলো কি করে? দেখা যায়, সঙ্কটত্রাতা শ্রীকৃষ্ণই সমাধান দিয়েছিলেন। তিনি বুঝিয়েছিলেন, মর্যাদাসম্পন্ন মাননীয় ব্যক্তির পক্ষে অপমানই হলো তাঁর মৃত্যু। অতএব যুধিষ্ঠিরকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করে কিছু পরুষবাক্য প্রয়োগ করলে সেটাই হবে তাঁর পক্ষে মৃত্যুতুল্য অথচ প্রাণে বধ করা হবে না। কৃষ্ণের উপদেশ পালন করলেন অর্জুন। কিন্তু গুরুজন জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে অপমান করে তাঁর মনে এমনই অনুতাপের উদয় হলো যে, তিনি আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলেন। কৃষ্ণ এবার তাঁকে বোঝালেন আত্মহত্যা করতে হবে না—আত্মপ্রশংসা বা নিজের মুখে নিজের গুণকীর্তন আত্মবিনাশের নামান্তর। কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন এবার নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর বলে দম্ভভরে নিজের কীর্তিকাহিনী ঘোষণা করতে লাগলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরেরও নির্বেদ উপস্থিত হলো। পরে কৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়ে রাজার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হন। এইভাবে কৃষ্ণ কর্তৃক পরিস্থিতি সামলানোর পর ক্রন্দনরত উভয় ভ্রাতা আলিঙ্গনাবদ্ধ হন এবং অশ্রুমোচনের মধ্য দিয়ে গ্লানিমুক্ত হন।

গোরাচাঁদ কুণ্ডু
ভদ্রকালী, হুগলী-৭১২২৩২

প্রসঙ্গ 'তর্কাতীত এক মহান চরিত্র—শ্রীকৃষ্ণ'

'উদ্বোধন'-এর গত ভাদ্র ১৪০৯ সংখ্যায় অধুনা প্রয়াতা সান্ত্বনা দাশগুপ্তের 'তর্কাতীত এক মহান চরিত্র—শ্রীকৃষ্ণ' নিঃসন্দেহে তথ্যবহুল ও যুক্তিধর্মী নিবন্ধ। সত্যই পৌরাণিক যুগের শ্রীকৃষ্ণ এক তর্কাতীত চরিত্র। তবুও বস্তুবাদী ঐতিহাসিক ও লেখক-লেখিকাদের দৃষ্টিতে ঐ মহান চরিত্রের মূল্যায়নে ত্রুটিও নিঃসন্দেহে সমালোচনার যোগ্য। তবে একপক্ষ ভাববাদী ও অপরপক্ষ বস্তুবাদী বলে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক হতে বাধ্য। সাহিত্য সমালোচনা করার অধিকার সকলের আছে, কিন্তু বিরূপ সমালোচনা নিন্দনীয়। সমালোচক যেন মনে রাখেন, 'যথার্থ সমালোচক পূজারী আর সমালোচনা পূজা'। মহাকালই এর বিচারক। এপ্রসঙ্গে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের কথা স্মরণীয়। গ্রন্থটির প্রকাশকালে কবিকে নানা বিরূপ সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথও ঐ গ্রন্থের বিরূপ সমালোচনা করে পরে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। কারণ, ঐ গ্রন্থের মধ্যে সাহিত্যের সত্য তথা কবির উপলব্ধির সত্যতা বিদ্যমান ছিল। তাই মহাকালের বিচারে গ্রন্থখানি সাহিত্যের মর্যাদা পেয়ে মধুকবির অমর সৃষ্টিরূপে পরিগণিত হয়েছে।

তাই প্রশ্ন, বস্তুবাদী ডি. ডি. কোশাম্বীর গ্রন্থ 'Myth and Reality', প্রতিভা বসুর 'মহাভারতের মহারণ্যে' এবং জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা' কি মধুকবির মৌলিক চিন্তাপুষ্ট কবির সত্য উপলব্ধিজাত সদৃশ সাহিত্য? সাহিত্য ও ইতিহাসের মধ্যেও পার্থক্য আছে। বাস্তবে যা ঘটা সম্ভব তা সাহিত্যের এবং যা ঘটে গিয়েছে তা ইতিহাসের বিষয়বস্তু। তাই "Literature is more philosophic than history." কাজেই সকল ঐতিহাসিক ঘটনা পৌরাণিক ঘটনা হতে পারে, কিন্তু সকল পৌরাণিক ঘটনা ঐতিহাসিক ঘটনা হতে পারে না। ফলে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পৌরাণিক ঘটনার বিচার সঠিক নয় বলে মনে হয়।

তাছাড়া রাজধর্ম ও লোকধর্মে পার্থক্য আছে। "লোক-সমাজের মাঝে সমকক্ষ জন/ সহায় সুহৃদরূপে নির্ভর বন্ধন।/ কিন্তু রাজা একেশ্বর, সমকক্ষ তার/ মহাশত্রু, চিরবিঘ্ন, স্থান দুশ্চিন্তার।" (গান্ধারীর আবেদন—রবীন্দ্রনাথ) এ দুয়ের কোন্ ধর্মানুসারে শ্রীকৃষ্ণ বিচার্য? আমার মনে হয়, বর্তমান আধুনিক

যুগে মানবধর্মানুসারে শ্রীকৃষ্ণ বিচার্য। এক্ষেত্রে কৃষ্ণচরিত্রের যথার্থ সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের কথা স্মরণযোগ্য—"কৃষ্ণ-চরিত্রের সমালোচনায় আমি কৃষ্ণের কেবল মানুষী প্রকৃতিরই সমালোচনা করিয়াছি। তিনি ঈশ্বর কিনা, তাহা আমি কিছু বলিতেছি না। সেকথার সঙ্গে পাঠকের কোন সম্বন্ধ নাই। কেননা, আমার যদি সেই মত হয়, তবু আমি পাঠককে সে-মত গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। গ্রহণ করা না করা পাঠকের নিজের বুদ্ধি ও চিত্তের উপর নির্ভর করে, অনুরোধ চলে না।" (বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ, প্রবন্ধ খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, পৃঃ ৬৮৭) তাঁর মতে, "কৃষ্ণ সর্বত্র সর্বসময়ে সর্বগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল।... তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা কর্মনির্বাহ করেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র অমানুষ। এইপ্রকার মানুষী শক্তির দ্বারা অতিমানুষ চরিত্রের বিকাশ হইতে তাঁহার মনুষ্যত্ব বা ঈশ্বরত্ব অনুমিত করা বিধেয় কিনা, তাহা পাঠক আপন বুদ্ধিবিবেচনা অনুসারে স্থির করিবেন।" (ঐ, 'কৃষ্ণচরিত্র', পৃঃ ৭৯৩) "ঈদৃশ সর্বগুণান্বিত, সর্বপাপ-সংস্পর্শশূন্য আদর্শ চরিত্র আর কোথাও নাই; কোন দেশীয় ইতিহাসেও না, কোন দেশীয় কাব্যেও না।" (ঐ, পৃঃ ৫৫৫)

শ্রীকৃষ্ণ কালোত্তীর্ণ, শাশ্বত ও চিরভাস্বর। তাই চিরনমস্য। আর স্বামীজীর স্বপ্ন 'উদ্বোধন' বিতর্কের স্থান নয়, বরং সত্যপ্রকাশের ক্ষেত্র। ঘটনার সত্যতা, ঐতিহাসিক সত্যতা, ধর্মের সত্যতা, জীবন তথা সাহিত্যের সত্যতা প্রকাশ করাই এর লক্ষ্য।

প্রহ্লাদচন্দ্র প্রধান
পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৫১

শব্দচেতনা ১৮

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী অবলম্বনে তৈরি বিশেষ শব্দছক

১		২		■	৩	৪		৫
	■		■	■	■		■	
৬		■	৭	৮		■	৯	
	■	১০			■	১১		
■	১২				১৩			■
১৪	■		■	১৫	■		■	১৬
১৭		■	১৮			■	১৯	
	■	২০	■	■	■	২১	■	
২২				■	২৩			

পাশাপাশি : (১) এক ভক্তের জিজ্ঞাসার উত্তরে মা বলছেন, ঠাকুর ভগবান আর তিনি ——, (৩) এঁর বৌ মায়ের সেবা করেছিলেন, (৬) "ভ্রমিয়ে ——, ঘরেতে তেরো, যদি করতে পার", (৭) "—— থাকতে অহেতুকী ভক্তি হয় না", (৯) "তাঁকে কে জানতে পেরেছে? শুক, ব্যাস, —— হদ্দ ডেওপিঁপড়ে", (১২) শিবুদা এক ব্রহ্মচারীকে বলছেন : "ভাই, মা সাক্ষাৎ ——মোচন, ওঁর কৃপাতেই মুক্তি", (১৩) মায়ের এক ভাই, (১৭) "মেয়েদের তীক্ষ্ণ —— ভাল নয়", (১৮) মা দক্ষিণেশ্বরে একদিন এই ফুলের সঙ্গে জুঁই ফুল দিয়ে ভবতারিণীর জন্য মালা গেঁথেছিলেন, (১৯) মায়ের একটি প্রিয় ফল, (২২) মা বলেছেন, জপই কর আর কাজই কর, ইনি পথ ছেড়ে না দিলে কিছুই কিছু নয়, (২৩) "শরৎ আমার যেমন ছেলে ——ও তেমনি ছেলে"।

ওপর-নিচ : (১) মা বলেছেন, মানুষ এঁকে ভুলেই আছে, (২) "মনে কু-ভাব এলে মনকে বলবে, আমি তাঁর সন্তান, আমি কি এমন করতে পারি? এতে মনে —— পাবে, শান্তি পাবে", (৪) দেহান্তরিত ঠাকুর মাকে এটা ত্যাগ করতে নিষেধ করেছিলেন, (৫) বহুবছর মা এখানে বাস করেছেন, (৮) কাশীতে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী একদিন মাকে এই গানটি শুনিয়েছিলেন—"শঙ্করীচরণে মন —— হয়ে রও রে", (১০) "—— সিদ্ধি", (১১) মায়ের এক সন্ন্যাসী সেবক, দুজনের নামে অদ্ভুত মিল, (১৪) "—— আমার প্রাণের জিনিস ছিল", (১৫) শরৎ মহারাজকে মায়ের সম্পর্কে কিছু লিখতে বলায় তিনি বলেছিলেন : "—— দেখে রঙ্গময়ীর অবাক হয়েছি", (১৬) এখানকার রাজা মন্দিরের রত্নাগার খুলে মাকে দেখিয়েছিলেন, (২০) মা আশ্বাস দিয়ে বলেছেন : সেবাপরাধ হলে মানুষ অজ্ঞ জেনে তিনি —— করেন, (২১) "—— কি একেবারে যায় গা? শরীর থাকলেই কিছু না কিছু থাকে"।

উত্তর এবং সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ফাল্গুন ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

সূত্র : শুক্লা পাঠক

লেসার ঃ
নতুন শতাব্দীর শাণিত প্রযুক্তি

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

প্রায় ১৫-২০ বছর আগে এক বিদেশী ছায়াছবিতে ভিন গ্রহের অদ্ভুতদর্শন সব জীবদের দেখা গিয়েছিল। আর ছিল ততোধিক বিস্ময়কর সব আগ্নেয়াস্ত্র। সেসব অস্ত্রের মুখ থেকে সীসার তপ্ত গুলি নয়, অহরহ বেরিয়ে চলেছিল বিদ্যুতের শাণিত তরবারি। তীক্ষ্ণ লাল, নীল, সবুজ ইত্যাকার বর্ণের সেইসব শাণিত বিদ্যুৎ মাখনের মধ্য দিয়ে ছুরি চালানোর মসৃণতায় সরিয়ে চলেছিল একের পর এক শক্ত সব বাধা! সেদিনের সেই কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক চলচ্চিত্রটি তৈরি হয়েছিল বর্তমানের বহুল পরিচিত 'লেসার' প্রযুক্তিকে মাথায় রেখেই। লেসার প্রযুক্তি—যাকে বলা যেতে পারে আজকের এবং অতি অবশ্যই আগামী দিনের 'কাটিং এজ টেকনোলজি'। এ হেন লেসার প্রযুক্তি-নির্ভর চলচ্চিত্রটি সেইসময় প্রচণ্ড জনপ্রিয় হয়েছিল, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু কেবলমাত্র তাৎক্ষণিক মনোরঞ্জনই নয়, কল্পবিজ্ঞানের রয়েছে অন্য এক তাৎপর্যও। আর সেই কারণেই আশির দশকের প্রথমে সোভিয়েত রাশিয়া-আমেরিকার ঠাণ্ডাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকা প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে লেসার প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে শুরু করে। সেদিনের সেই কল্পবিজ্ঞান লেসার প্রযুক্তির ব্যবহারকে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে নিয়ে আসতে আমেরিকাকে প্রভাবিত করেছিল—এমনটাই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

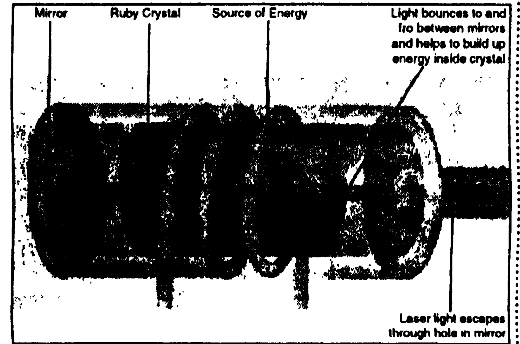
লেসার রশ্মি শুধু যে তীব্র, তাই নয়। এর তীব্রতা বজায় রেখেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত করা যায়। সাধারণ আলোক তার উৎসের বিভিন্ন বিন্দু থেকে উৎপন্ন হয়ে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য (ওয়েভ লেংথ) সহযোগে একাধিক দিকে ধাবিত হয়। ফলে সাধারণ আলোক-উৎস থেকে নির্গত আলোক কোন লেন্সের মধ্য দিয়ে গেলেও একটি বিন্দুতে মিলিত না হয়ে বেশ কয়েকটি বিন্দুতে মেশে। সেক্ষেত্রে লেসার রশ্মি লেন্সের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর একটিই মাত্র বিন্দুতে মিলিত হয় এবং সেই বিন্দুতে প্রচণ্ড শক্তির সঞ্চার হয়। প্রসঙ্গত, আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে 'অ্যাঙ্গস্ট্রম' (A) এককে প্রকাশ করা হয়। এক অ্যাঙ্গস্ট্রম = ০.০০০০০১ সেন্টিমিটার।

প্রশ্ন হলো, 'লেসার' ব্যাপারটা কি? কতকগুলি শব্দের প্রথম অক্ষরের সমন্বয়ে তৈরি এই 'লেসার' কথাটি। 'Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation' বা সংক্ষেপে 'LASER'। একটিমাত্র রঙ বিচ্ছুরিত করে এমন আলোকরশ্মিকে (অর্থাৎ 'মনো-ক্রোমাটিক') চূড়ান্তভাবে কেন্দ্রীভূত রশ্মিতে পরিণত করে উদ্ভূত শক্তির সাহায্যে বিবিধ কাজ করানো সম্ভব। লেসার সম্বন্ধে এটি অতি সরলীকৃত বর্ণনা। আরেকটু বিশদে বলা যাক। প্রত্যেক আলোকই তরঙ্গনির্ভর; কতকটা বেতারতরঙ্গ বা অতি ক্ষুদ্র মাইক্রোওয়েভ ধরনের। সাধারণ আলোকে ঐ তরঙ্গসমূহ অসংলগ্ন বা



পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এবং এদের তরঙ্গদৈর্ঘ্যও বিভিন্ন। এইসব আলোকতরঙ্গ বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যায়। কিন্তু লেসার রশ্মির ক্ষেত্রে আলোকতরঙ্গগুলি সুসঙ্গতভাবে থাকে। ঐ তরঙ্গগুলি একই ধরনের এবং পরস্পরের সমান্তরাল থেকে বহু দূরে একইভাবে পৌঁছে যেতে পারে। এই মূল ধর্মকেই কাজে লাগিয়ে এবং প্রযুক্তির বহু জটিল ব্যবস্থার সাহায্য নিয়ে লেসার প্রযুক্তি ক্রমশ হয়ে উঠেছে আগামী দিনের 'কাটিং এজ টেকনোলজি'।

১৯৬০-এর এক মনোরম গ্রীষ্মে জার্মানির মারবার্গ অঞ্চলের বিজ্ঞানী ডঃ পিটার স্কাফের সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি বিশেষ সংবাদ পাঠ করে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। উল্লেখ্য, স্কাফের একজন পদার্থবিদ্। সংবাদটি হলো—আমেরিকার এক তরুণ বিজ্ঞানী অপ্রচলিত, ছোট একটি যন্ত্র তৈরি করেছে। যন্ত্রটিতে আছে একটি ফ্ল্যাশগান এবং ছোট্ট একখণ্ড চুনি। যখন ঐ ফ্ল্যাশগান থেকে নির্গত আলো চুনিটিকে আঘাত করছে, তখনি তৈরি হচ্ছে অত্যন্ত তীব্র, তীক্ষ্ণ 'পারমাণবিক লাল আলো'—যা এমনই শক্তিশালী যে, সজীব বস্তুকে নিমেষে অদৃশ্য করে দিতে পারে; এমনকি ধাতব পদার্থকেও বাদ দেয় না! সূর্যের অভ্যন্তরের যে ঔজ্জ্বল্য এবং তাপমাত্রা—তার থেকেও

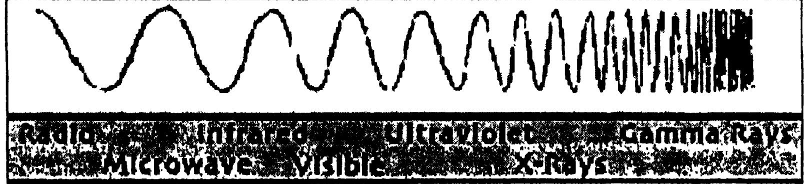


লেসার রশ্মি নির্মাণ পদ্ধতি

শক্তিশালী ঐ রশ্মি। এমনটাই দাবি সেই তরুণ বিজ্ঞানীর। এই সংবাদে, বলাবাহুল্য, কল্প-বিজ্ঞানের লেখক বা চিত্র-নির্মাতারা একটু অন্যভাবে উৎসাহী হয়ে উঠলেন।

ডঃ স্কাফেরের উৎসাহের কারণটা কিন্তু আলাদা। মারবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি গবেষণা করছিলেন নীল, লাল এবং সবুজ রঞ্জক পদার্থ কেমনভাবে আলোক শোষণ করে বা প্রতিফলিত করে এবং কোন্ অবস্থায় প্রতিপ্রভা সৃষ্টি হয়—এইসব বিষয়ের ওপর। প্রতিপ্রভা তৈরি করার জন্য অত্যন্ত উজ্জ্বল আলোকরশ্মি প্রয়োজন। সেইসময়ে লব্ধ সবচেয়ে ক্ষমতাশালী যন্ত্র ব্যবহার করেও ডঃ স্কাফের আশানুরূপ ফল পাচ্ছিলেন না। সংবাদের সুবাদে তাঁর চিন্তাধারা অন্যদিকে বাঁক নিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে রাজি করিয়ে তিনি কিছু অর্থের সংস্থান করে ফেললেন এবং সোজা হাজির হলেন সুইজারল্যাণ্ডের ফরাসি-অধ্যুষিত অঞ্চল মণ্ট্রেয়ক্সে। সেখানে তিনি কিনে ফেললেন অত্যন্ত আধুনিক, কৃত্রিম দুটি চুনির কেলাস। দেশে ফিরে তিনি ও তাঁর সহ-গবেষকদের তৎপরতায় তৈরি হলো সেদেশের প্রথম লেসার ব্যবস্থা। যদিও সেটি ছিল খুবই সাদামাঠা।

সব পদার্থেরই ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণু। পরমাণুর কেন্দ্রে (নিউক্লিয়াস) প্রোটন, নিউট্রন এবং কক্ষপথে (অর্বিট অথবা সেল) প্রোটনের সমসংখ্যক ইলেক্ট্রন থাকে। এই সাধারণ অবস্থানকে বলা হয় 'গ্রাউণ্ড লেভেল' অথবা 'রেস্ট স্টেট'। লেসার-যন্ত্রে এই পরমাণুর কোন মূল্যই নেই। ধরা যাক, একটা চুনির ক্রোমিয়াম পরমাণুকে বাইরের কোন শক্তির সাহায্যে (যেমন ফ্ল্যাশগানের আলো) উত্তেজিত করা হলো। কক্ষপথের ইলেক্ট্রন ঐ বাড়তি শক্তি সঞ্চয় করে তার কক্ষপথকে অনেক বাড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করবে। বলা বাহুল্য, ঐ অবস্থায় অর্থাৎ 'এলিভেটেড এনার্জি লেভেলে' কিন্তু ইলেক্ট্রন বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না। শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে সে এসে পড়বে 'মেটাস্টেবল লেভেল'-এ। এই অবস্থাও ক্ষণস্থায়ী। পরমাণু এরপর তার সেই পূর্বাবস্থা অর্থাৎ 'রেস্ট স্টেট'-এ ফিরে যেতে চাইবে এবং সেটা করতে গিয়ে ফোটন শক্তি বা কোয়াণ্টাম ত্যাগ করবে। এই ব্যাপারটাই আলোকরশ্মি হিসাবে দৃশ্যমান হয়। পদার্থের ধর্মের ওপর নির্ভর করে বলে ঐ আলোকরশ্মির বর্ণ এক-এক পদার্থে এক-এক রকমের। আলোক তরঙ্গনির্ভর—এমনটাই আমরা জানি। কিন্তু কখনো কখনো তার ব্যবহার একথা ভাবতে বাধ্য করে যে, সে যেন শক্তিকণিকার সমন্বয়ে তৈরি। এই ব্যাপারটাই পরিচিত 'ফোটন' শক্তি হিসাবে।



মেসার

এরপর ১৯৬২-তে তিনি করলেন আরো দুটি পরীক্ষা। প্রথমটিতে একটি পাত্রে নীল রঞ্জক পদার্থের মধ্যে চালিত করলেন উজ্জ্বল লাল লেসার রশ্মি এবং লক্ষ্য করলেন বিস্ময়কর সুন্দর সবুজাভ প্রতিপ্রভা। অবশ্যই খালি চোখে নয়।

তিনধরনের লেসার ব্যবস্থা হতে পারে। এগুলি যথাক্রমে কঠিন লেসার (সলিড), গ্যাসীয় লেসার এবং সেমিকণ্ডাক্টর লেসার। লেসার-উৎসের ওপর নির্ভর করে এটি। যেমন সলিড লেসারের উৎস হলো চুনি, নীলা বা কৃত্রিম উপায়ে তৈরি কোন কেলাস। গ্যাসীয় লেসারের উৎস হলো কোন একক গ্যাসীয় পদার্থ বা বিবিধ গ্যাসের মিশ্রণ। যেমন হিলিয়াম-নিয়ন লেসার (৯০ শতাংশ হিলিয়াম এবং ১০ শতাংশ নিয়ন গ্যাস), কার্বন-ডাই-অক্সাইড লেসার ইত্যাদি। বর্তমানে এক্সাইমার লেসার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় লেসার হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। এতে আছে মোটামুটি ০.১ শতাংশ হ্যালোজেন (ক্লোরিন, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইত্যাদি), ১ শতাংশ বিরল গ্যাস (ক্রিপ্টন, জেনন ইত্যাদি) এবং বাকিটা আর্গন/হিলিয়াম/নিয়ন ইত্যাদি। সেমিকণ্ডাক্টর লেসারের সুবিধা হলো, এই ব্যবস্থায় শক্তিসংরক্ষণ বা পাম্পিং ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। বিদ্যুৎশক্তি সরাসরি সেমিকণ্ডাক্টর ব্যবস্থায় সঞ্চালিত হলে লেসার রশ্মি উৎপন্ন হয়। বর্তমানে এই ধরনের লেসারের ক্ষমতা খুবই কম। কিন্তু গবেষণা চলছে ঐ ক্ষমতাকে অনেক উন্নত করে তোলার।

কিছু বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমেই ঐ দৃশ্য গোচরে আসা সম্ভব হলো। দ্বিতীয় পরীক্ষাটিতে ঐ আগের ব্যবস্থার সঙ্গে বাড়তি যোগ হলো দুটি আয়না, যাতে পাত্রের দুপ্রান্তে আয়না-দুটি বারংবার লেসার রশ্মিকে প্রতিফলিত করতে পারে। এই বিশেষ পরীক্ষায় আয়নার ভূমিকা হলো 'রেজোনেটর'-এর। কিন্তু এই দ্বিতীয় পরীক্ষা আপাতদৃষ্টিতে সফল হলো না। কিছুই দৃশ্যমান হলো না ঐ পরীক্ষায়। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে অবশ্য জানা গেল, এক যুগান্তকারী উদ্ভাবন হয়ে গেছে! এমনই শক্তিশালী এক রশ্মি উৎপন্ন হয়েছে, যা কিনা আয়নার পিছনের সিলভার প্রলেপকে ভেদ করে (অর্থাৎ তাকে অদৃশ্য করে) বেরিয়ে গেছে। ডঃ স্কাফের যেমনটা চেয়েছিলেন অর্থাৎ আলোকরশ্মি পাত্রের দুপ্রান্তের আয়নায় বারংবার প্রতিফলিত হতে থাকবে (resonating)—তেমনটা না হয়ে অঘটন হিসাবেই যে-ব্যাপারটি হলো তা কিন্তু আরো আত্মবিশ্বাসী করে তুলল লেসার-গবেষকদের। তবে ঐপর্যন্তই। সাংবাদিক, বিজ্ঞানী, গবেষকরা লেসারের ক্ষমতাকে স্বীকার করে নিয়েও সরস মন্তব্য করলেন—লেসার হচ্ছে উত্তর, কিন্তু সঠিক প্রশ্নটা যে কি, তাই-ই আমাদের জানা নেই! সেইসময় এমন মন্তব্যের কারণ ছিল এই যে, লেসার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাটাই তখন জানা ছিল না বা অনুভূত হয়নি। পুঁথিগত বিদ্যার ক্ষেত্রে আরো একধাপ এগিয়ে যাওয়ার মতো করেই দেখা হলো বিষয়টিকে। একথা অনস্বীকার্য, আজ এই একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানী, গবেষক এবং কিছু পরিমাণে হলেও আমজনতা বুঝতে পারছেন প্রযুক্তি হিসাবে লেসার-এর ভূমিকা এবং ইতিমধ্যেই একথাও প্রচারিত হয়ে গেছে, লেসারই আগামী দিনের 'কাটিং এজ টেকনোলজি'।

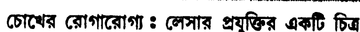
১৯১৪ সালে ঐ জার্মানিতেই সর্বপ্রথম লেসার তত্ত্বের প্রবর্তন হয়। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদ সংক্রান্ত বিশেষ তত্ত্ব প্রকাশের ৯ বছর পর আলোকের কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্যে লেসারকে প্রথম ব্যাখ্যা করেন। তবে আইনস্টাইনের এ হেন তাত্ত্বিক প্রয়াস বাস্তবায়িত হলো আরো অনেক পরে ১৯৫৩-তে। আমেরিকান পদার্থবিদ্ চার্লস এইচ. টাউন প্রথম তৈরি করলেন 'মেসার' (MASER—Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) যন্ত্র এবং তাঁর এই কাজের সুবাদে পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কারটিও পেয়ে গেলেন। উত্তরোত্তর বেড়েই চলল লেসার-সংক্রান্ত গবেষণা এবং উদ্ভাবন। বর্তমানে জার্মানি, আমেরিকা এবং জাপানে চলেছে নানাবিধ উন্নত গবেষণা। শুধু গবেষণাতেই আর সীমাবদ্ধ নেই আজকের লেসার। একাধিক ক্ষেত্রে এই শক্তির ব্যবহার উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

আগামী দিনে লেসারের ব্যবহারকে আরো বহুমুখী, কার্যকরী এবং অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়বহুল করে তোলার লক্ষ্যে এখন চলছে জোরদার গবেষণা। আরো সূক্ষ্মতায় তাকে কিভাবে কাজ করানো যায়, চলছে সেই প্রয়াসও। হামবুর্গ ইন্সটিটিউট ফর বায়োকেমিস্ট্রির গবেষক বিজ্ঞানীরা চেষ্টা চালাচ্ছেন লেসার রশ্মির ব্যবহারে একটিমাত্র জিনকে কেমন করে কাটাছেঁড়া বা বিশ্লেষণ করা যায় সেই ব্যাপারে। বলা বাহুল্য, এটি চিকিৎসাক্ষেত্রের একটি দিক।

একদল গবেষক বিজ্ঞানী আবার ব্যস্ত 'আদর্শ গ্যাস'কে ব্যবহার করে পারমাণবিক লেসার তৈরি করতে। উল্লেখ্য, এই আদর্শ গ্যাস পরিচিত 'বোস-আইনস্টাইন কনডেনসেট' হিসাবে। এই গ্যাসকে ব্যবহার করে যে লেসার উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছে, তার পরিচিতি 'বোসার' নামে। এই অত্যন্ত ঘন গ্যাস অতি অল্প পরিমাণে তৈরি করা সম্ভব (এখনো পর্যন্ত) এবং তাও অত্যন্ত কম সময়ের জন্য। মাত্রই সেকেণ্ডের ভগ্নাংশে ঐ গ্যাস উবে যায়। কিন্তু গবেষকরা আশাবাদী, অদূর ভবিষ্যতেই তাঁরা তৈরি করে ফেলতে পারবেন এই 'বোসার'—যার সাহায্যে একটিও পরমাণু নষ্ট না করে 'ন্যানো' সূক্ষ্মতায় ব্যবহার করা যাবে প্রযুক্তিকে। (এক ন্যানোমিটার = ০.০০১ মাইক্রন মিটার)

এইভাবে নানান গবেষণা এবং উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে ক্রমশ স্বাবলম্বী হয়ে চলেছে লেসার প্রযুক্তি। এর ব্যবহারের বহু বৈচিত্র্য এবং সুবিধার কারণে আগামী দিনে লেসারই হয়ে উঠবে শাণিত প্রযুক্তি। তবে ব্যয়সংক্রান্ত একটা বাধা আছে। সেটাকেও কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস চলেছে। আমাদের দেশের বিবিধ শিল্পে, চিকিৎসাক্ষেত্রেও বর্তমানে লেসার ব্যবহারের নমুনা কিন্তু নেহাত কম নয়। তবে সেই ব্যবহারকে আরো সুদূরপ্রসারী করে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। অন্তত বর্তমানের এই বিশ্বজোড়া উন্মুক্ত বাজার এবং অবশ্যম্ভাবিরূপেই গুণগত মান বজায় রাখার জন্য সময়োপযোগী প্রযুক্তির ব্যবহার অনস্বীকার্য। ❑

লেসার ব্যবহারের কোন সীমা-পরিসীমা চিহ্নিত [illegible] ব্যবহারের নাম 'আলপিন টু এলিফ্যান্ট'। সেই সুদূর ১৯৬০-এর প্রথম দিকে [illegible] এর ব্যবহার শুরু হয়। আর বর্তমানে কোথায় নেই লেসার ব্যবহার? [illegible] প্রযুক্তিতে, তারপর, শিল্পক্ষেত্রে ধাতু জোড়া, কাটা, ছিদ্র করা ইত্যাদি, [illegible] ওপর থেকে পলেস্তারার আকারে জমে থাকা ধুলোময়লার আস্তরণ [illegible] আসবাবপত্রকে সম্পূর্ণ অক্ষত রেখেই), হোলোগ্রাফি [illegible] চিকিৎসাবিজ্ঞানের একাধিক ক্ষেত্রে, বিনোদনের প্রয়োজনেও (লেসার শো) [illegible] চলেছে। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরি হার্ট ভালভ প্রভৃতিতে [illegible] ভূমিকা পালন করে আসছে দীর্ঘদিন। অন্যান্য পদ্ধতিতে ওয়েল্ডিং করতে গেলে [illegible] ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঘড়ির পিছনে স্টেইনলেস [illegible] আবরণের ওপর খুব সূক্ষ্ম যে লেখা থাকে, তাও লেসার পদ্ধতিতেই। লেসারের ব্যবহারে যেকোন [illegible] লোগো তৈরি, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হরফে লেখা সম্ভব। লেসার প্রিন্টারের প্রয়োজনীয়তা বা জনপ্রিয়তা তো আজ সর্বজনবিদিত। কম্পিউটারে এবং সি. ডি. প্লেয়ারের মূল প্রয়োজনীয় অংশ লেসার। চিকিৎসাক্ষেত্রে একাধিক জটিল কাটাছেঁড়া লেসারের সাহায্যে যত সহজে করা হচ্ছে, আগে তেমনটা কল্পনা করা যেত না।



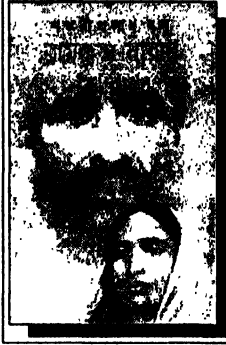
চোখের রোগারোগ্য : লেসার প্রযুক্তির একটি চিত্র

লেসার আবিষ্কারের সময়-সারণি

১৯১৬ : লেসারের সম্ভাবনার কথা বললেন আইনস্টাইন। ১৯৫১ : চার্লস টাউন্স 'মেসার'-এর কথা বলেন। ১৯৫৪ : মেসার উৎপাদন করলেন জেমস পি. গর্ডন, হার্বার্ট জিগর এবং চার্লস টাউন্স। ১৯৬০ : রুবি রড লেসার তৈরি করলেন থিয়ডোর মেমান; হিলিয়াম-নিয়ন লেসার এই বছরই আবিষ্কৃত হয়। ১৯৬২ : সেমিকণ্ডাক্টর লেসার আবিষ্কার হলো। ১৯৬৫ : রাসায়নিক লেসার তৈরি করেন কাসপার এবং জর্জ পিমেন্টেল; এই বছরই অরিয়ন নেবুলা-য় মাইক্রোওয়েভ লেসারের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৯১ : লেসার-বোমা ব্যবহৃত হলো গাল্ফের যুদ্ধে। ১৯৯৫ : ফার ইনফ্রা রেড লেসারের উৎপাদক নক্ষত্রের আবিষ্কার। ১৯৯৬ : আল্ট্রা-ভায়োলেট লেসার নক্ষত্র আবিষ্কৃত হয় হাবল স্পেস টেলিস্কোপের মাধ্যমে।

রামকৃষ্ণায়নের দীপ্ত মহিমায়

চিন্ময়ীপ্রসন্ন ঘোষ



রামকৃষ্ণ-সারদা
জীবন ও প্রসঙ্গ
শঙ্করীপ্রসাদ বসু
প্রকাশক ঃ
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯
পৃষ্ঠা ঃ ১০+২৪৬
মূল্য ঃ ১০০ টাকা
প্রথম সংস্করণ ঃ ২০০০

"মিছরির রুটি সিধে করে খাও, আর আড় করে খাও, মিষ্টি লাগবে।"—ভগবৎকথা প্রসঙ্গে এযুগের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একটি অনবদ্য উপমা। আর একথা যদি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণেরই লীলাকথা হয়, তবে কথাটির গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। বিষয়বৈচিত্র্যে ভরপুর এমনই এক অমৃতখনিরূপ ধ্রুপদী সংগ্রহ উপহার দিয়েছেন প্রখ্যাত বিবেকানন্দ-গবেষক ও স্বনামধন্য লেখক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর **'রামকৃষ্ণ-সারদা ঃ জীবন ও প্রসঙ্গ'** গ্রন্থে। আসলে গ্রন্থটি লেখকের বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কতকগুলি মনোজ্ঞ প্রবন্ধেরই পরিবর্ধিত সঙ্কলন। প্রবন্ধগুলিতে এককথায় এযুগের বরিষ্ঠ আধ্যাত্মিক মহামানবের জীবন ও ভাবধারা বহু বিচিত্ররূপে বিতত। এ যেন শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব ও ভাবের বিস্তারিত এক ফলিত রূপের উদ্ভাস। Ramakrishna in practice or Applied Ramakrishnaism। যদিও কোন নতুন ধর্ম বা 'ism' দিতে তিনি আসেননি, তিনি এসেছিলেন "যত মত তত পথ"-এর বাণীশরীর হয়ে।

যাই হোক, সুগ্রন্থটির প্রথমে বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবনের নানা জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কাহিনীর মনোহারী মালা। তথ্যসমৃদ্ধ ও সমালোচনার অগ্নিশুদ্ধিতে তা স্বর্ণ-ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর। কিছু ভাবঘন বহুমাত্রাবিশিষ্ট উদ্ধৃতির প্রলোভন অস্বীকার করা যায় না। যেমন ঃ "নীলকণ্ঠ নাম নিলে কণ্ঠভরা বিষ সত্যই নিতে হয়। বস্তুত, গিরিশ প্রতীক—এই জ্বালাময় সংসারের। গিরিশ পরিত্রাতার পরীক্ষাভূমি।... গিরিশ আর কেউ নন, আমাদেরই সুবৃহৎ আকার।" (পৃঃ ৯০) লেখক বলছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-গিরিশ-সংবাদে বোঝা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের সেই কৃষ্ণবাঁশির মতো দুর্নিবার আহ্বান—"ওরে কে কোথায় আছিস আয়"—একেবারে রক্তের সত্য। দ্বিতীয়ত, ধর্মের সুদীর্ঘ ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্য সংযোজন—বকলমা গ্রহণ। এও গিরিশের সূত্রেই ঘটেছিল। এ আত্মসমর্পণের এক সর্বাত্মক রূপ। 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস'-এর অর্থ সাধনা থেকে অব্যাহতি নয়, পরন্তু কঠোরতম সাধনা। এই বিশ্বাস সাক্ষাৎ সমাধি। তাঁর প্রশ্নের, অবিশ্বাসের, আকাঙ্ক্ষার অধিকার সম্পূর্ণ কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

আর শ্রীরামকৃষ্ণের নরদেহে ঐশ্বরিক আত্মপ্রকাশের তিন উজ্জ্বল ঘটনার কেন্দ্রভূমিও ছিলেন গিরিশ। (এক) রঙ্গমঞ্চে শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ ঃ "চৈতন্য হোক।" যে-মঞ্চ আমাদের জগৎসংসারেরই পিনদ্ধ প্রতিরূপ, সেখানেই মানুষকে তার স্বরূপ উপলব্ধির এ যেন মহামন্ত্রধ্বনি। (দুই) শ্যামপুকুরে গিরিশের শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীরে কালীপূজার ঘটনা। (তিন) কাশীপুরে গিরিশেরই অর্চনায় শিহরিত হয়ে যুগাবতারের আত্মপ্রকাশ এবং অভয়বাণী প্রদান। ঐহিক বস্তু নয়, পারত্রিক পরমার্থ দান—"চৈতন্য হোক।" ভক্তি-জ্ঞান-প্রেমের যা শেষ কথা। এই অভয়বার্তা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সর্বাংশে ধ্বনিত বার্তা। জ্ঞান ও ভক্তির সীমারেখাকে মুছে দেয় এই অমোঘ বার্তা। পরে এই আলোকচৈতন্যের উত্তরণে কৃতার্থ গিরিশ এর সুন্দর অভিব্যক্তি ঘটিয়েছেন নিজ জীবনে তথা উপলব্ধিতে ঃ "পরমহংসদেবের মহাজ্ঞান সাধারণের চক্ষে মহাভক্তি-আবরণে আবরিত ছিল—বিবেকানন্দের ভক্তি জ্ঞান-আবরণে আবরিত। উভয়েরই একভাব, কার্যে ভিন্ন ভাবধারণ। মহা মহা বৈজ্ঞানিকের সহিত বিবেকানন্দের সঙ্ঘর্ষ হইবে, সেই নিমিত্তই তিনি কঠিন জ্ঞান-আবরণে আবরিত হইতেন। কিন্তু যদি কেহ ভাগ্যক্রমে তাঁহাকে গান করিতে শুনিয়া থাকেন, তাঁহার চক্ষে প্রেমাশ্রু দেখিয়া থাকেন, কণ্ঠরোধ হইয়া গদ্‌গদ ভক্তিবিভোর [সেই] মহাপুরুষ দর্শন করিয়া থাকেন—তিনি হৃদয়ে অনুভব করিবেন জ্ঞান [ও] ভক্তির পার্থক্য লোকে অজ্ঞানবশত করিয়া থাকে। জ্ঞান [ও] ভক্তি এক। জ্ঞান-বিবেকানন্দ, ভক্তি-পরমহংস অভেদ।" (পৃঃ ৮৩) এই উদ্‌ঘোষণ, বলা বাহুল্য, স্বামীজীর মানব-ঈশ্বরকে সেবাপূজার কর্মমার্গ ও ঠাকুরের ভক্তিমার্গের আপাত প্রতীয়মান অসঙ্গতিকে দূরীভূত করেছে। পরশমণি শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে গিরিশের অভিনব রূপান্তরকে লেখক বেশ কয়েকটি সুস্পষ্ট পর্যায়ে সন্নিবেশিত করেছেন। পর্যায়গুলির নামকরণও যথেষ্ট কাব্যধর্মী ও ইঙ্গিতময়। যেমন—'মৃত্যুর মিছিল এবং নাস্তিকতার কুঠার', 'বিশ্বাসের তটরেখায় অলৌকিক আকার', 'রামকৃষ্ণের মুখোমুখি' (প্রথম দর্শন থেকে সপ্তম দর্শন), 'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার' ইত্যাদি। সপ্তম দর্শনের শেষে লেখক সিদ্ধান্ত টেনেছেন গদ্যকথার কাব্যোচ্ছ্বাসে—"অর্থাৎ গিরিশচন্দ্র মরিলেন এবং বাঁচিলেন।" এরপরে মাতৃসান্নিধ্যে গিরিশ প্রসঙ্গ—'হারানো মায়ের সন্ধান'। গিরিশই জগদ্বাসীকে শুনিয়েছেন মহামায়ারূপী শ্রীমা সারদাদেবীর পরম আশ্বাস ও মাতৃত্বের উন্মোচন-বাণী ঃ "আমি সত্যিকারের মা; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য জননী।" এই জগন্মাতার নরশরীরধারী রূপকে ভক্ত গিরিশ নিজ বাড়ির দুর্গাপূজায় দুর্গারূপে পূজাও করেছেন। এরপর মূর্তমহেশ্বর স্বামীজী ও ভক্তভৈরব প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন লেখক। সেও অসাধারণ ব্যঞ্জনা ও তথ্যমাধুর্যে ভরপুর।

গ্রন্থটির পরবর্তী পর্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের তিন বিদেশী জীবনীকার ম্যাক্সমুলার, রোমা রোলাঁ ও ঈশারউডের শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীর

পটভূমিকাও পাশ্চাত্য প্রতিক্রিয়ার তথ্যনিষ্ঠ দলিল। বহু নতুন তথ্য ও সমালোচনায় ঋদ্ধ এই বিস্তারিত রচনা জ্ঞানান্বেষী পাঠকমাত্রেরই উপভোগ্য হবে, সন্দেহ নেই। ঈশ্বর সকলের জন্য, যেমন ভক্তের তেমনি পতিতের। ইশারউডের প্রসঙ্গ তুলে ধরে লেখক সুন্দরভাবে বলেছেন : "রামকৃষ্ণ নাচছেন—নাচছেন—নাচছেন আর বলছেন—ইশারউড কান পেতে শুনেছেন—'তোমাদের চৈতন্য হোক'।" ইশারউডকে লেখক বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সভায় বলতে শুনেছিলেন : "তিনি [ইশারউড] বিবেকানন্দের মতো পবিত্রাত্মার সান্নিধ্যে স্বস্তিবোধ করেন না। গিরিশই তাঁর প্রাণের বন্ধু। তাঁরা বোহেমিয়ান।"

গ্রন্থটির শেষ পর্যায়ে শ্রীমা ও ভগিনী নিবেদিতার মাতা-কন্যার সম্পর্ক নিয়ে মনোজ্ঞ প্রবন্ধ 'নিবেদিতার ধ্রুবমন্দির'—যা বহু আগেই 'শতরূপে সারদা'য় সঙ্কলিত হয়েছে। শেষ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু—'শ্রীরামকৃষ্ণ : শতবার্ষিকী থেকে সার্ধশতবার্ষিকী'। ম্যাক্সমুলারের কথায়—"তিরিশ কোটি মানুষের দুহাজার বছরের আধ্যাত্মিক সাধনার পূর্ণতার নাম শ্রীরামকৃষ্ণ।" তাই বলা যায়, স্বভাবতই তিনি ক্রমপ্রকাশ্য ও ক্রম-উপলব্ধ। এই সম্যক্ উপলব্ধির সহজ চাবিকাঠি বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী। মুদ্রণ সুখকর, প্রচ্ছদ যথেষ্ট দৃষ্টিনন্দন। লেখকের প্রবন্ধনিচয়ের এই গ্রন্থরূপ প্রকাশ করে আনন্দ পাবলিশার্স ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। ❑



শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে যুগদিশারী ক্রিস্টিন-বিবেকানন্দ

দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়

পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায় / কৃস্টিন ও বিবেকানন্দ	কৃস্টিন ও বিবেকানন্দ পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায় প্রকাশক : সমীরকুমার নাথ নাথ পাবলিশিং ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৭০০ ০০৯ পৃষ্ঠা : ১০২ মূল্য : ৫০ টাকা প্রথম সংস্করণ : ২০০২

স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যবিজয়ের কথা স্মরণ করলে মনে ভেসে ওঠে সাগর পেরিয়ে আসা দুই সাধিকা-ঋষিকা ক্রিস্টিন-নিবেদিতার যুগলমূর্তি। তাই বিবেকানন্দ অদ্বিতীয় হয়েও ত্রিমূর্তি-বিবেকানন্দ। স্বামীজী যাঁদের মধ্যে নিজেকে অন্তরঙ্গভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের অন্যতমা সাধিকা ক্রিস্টিন। গুরু-শিষ্যার সম্পর্কে আবদ্ধ বিবেকানন্দ-ক্রিস্টিনকে নিয়ে লেখা পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের **'কৃস্টিন ও বিবেকানন্দ'** এক যুগল জীবনালেখ্য। স্বামী বিবেকানন্দের স্বগতোক্তি ("Education is what they need—we must have a school in India.") কর্মে রূপলাভ করেছিল বহ্নিশিখা নিবেদিতা আর শান্ত ক্রিস্টিনের পারস্পরিক সাহচর্য এবং সহমর্মিতার স্পর্শে। স্বামীজীর পরম স্নেহের ধন সাগরপারের রাজহংসী ক্রিস্টিন গ্রিনস্টিডেল সারা জীবন ধরে সুধাসাগরের তীরে বসে পান করেছিলেন হলাহল। তাঁর কর্মব্যস্ত ঋষিকা-জীবনের অ-ধরা মাধুরী ধরা পড়েছে পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের অনবদ্য লেখনীচালনে। তাতেই বাঁধা পড়েছে ত্রয়ী-বন্ধনে আবদ্ধ তৎকালীন যুগের বিশাল কর্মযজ্ঞে শ্রীরামকৃষ্ণপথে দীক্ষিত সন্ন্যাসিবৃন্দ আর জ্ঞানী-গুণী-খচিত নক্ষত্রমণ্ডলী।

গ্রন্থটির **'কৃস্টিন ও বিবেকানন্দ'** নামকরণে 'বিবেকানন্দ' নাম আগে বসাননি সুবিবেচক গ্রন্থকার। যেন মনে হয়, বিবেকানন্দকে স্থাপন করার মঙ্গলঘট-রূপে ক্রিস্টিনকে আগে পেতেছেন তিনি। হৃদয়পদ্ম যদি পাপড়ি না মেলে ধরে, তবে সেই আসনে লক্ষ্মী এসে বসবেন কেমন করে? বিবেকানন্দ-রূপ বিশাল বাহু-বিস্তারিত বনস্পতির ছায়ায় আশ্রয় পেয়েছিলেন ক্রিস্টিন। স্নিগ্ধ হয়েছিলেন তিনি, স্নেহবিগলিত বিবেকানন্দধারার অবিরত বর্ষণে আপনাকে দ্রব করে—সিক্ত করে। আবার ক্রিস্টিনের মধ্যে এক শান্ত পবিত্র সত্তাকে খুঁজে পেতেন বিবেকানন্দ। ক্রিস্টিনের শান্ত-স্নিগ্ধ-সংহত স্বভাব নিবেদিতাকেও শান্ত করত।

গ্রন্থকার অতি সুকৌশলে গ্রন্থটির পর্ববিভাগ সংখ্যায় করেননি। একটি নতুন পর্ব শুরু করার সময় প্রথম অনুচ্ছেদের প্রথম লাইন মার্জিন থেকে সরিয়ে লেখেননি। এই সৌন্দর্য পর্ববিভাগের কাজ করেছে এবং আগের পর্বের বক্তব্যের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করেছে। এই ভঙ্গিটি যদিও চিত্তাকর্ষক, তবুও অনভ্যস্ত দৃষ্টিকে থামিয়ে দেয়।

গ্রন্থের ভাষা-প্রবাহ অতি সাবলীল এবং সরস। সুদক্ষ লেখনীচালনে উপস্থাপিত হয়েছে বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে অতিবাহিত হওয়া ক্রিস্টিনের দিনগুলি। প্রকৃতির সঙ্গে বিজড়িত ঋষি বিবেকানন্দের পরিব্রাজক-মূর্তি ঘনীভূত হয়েছে 'এক অভিনব অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ' ক্রিস্টিনের স্মরণে-মননে। সাধিকা ক্রিস্টিন গুরুসান্নিধ্যে করেছেন সত্যের ধ্যান—চিরমুক্তির ধ্যান—অনন্ত অসীমের ধ্যান। ক্রিস্টিনের নিজের জীবন ছিল ঝঞ্ঝাসঙ্কুল। আর সেই জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বিচার করে দেখেছেন এক ঝঞ্ঝাসদৃশ সন্ন্যাসীর বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড—দেখেছেন সেই সন্ন্যাসীকে ইচ্ছামাত্র জগতের বোঝা সরিয়ে দিয়ে আনন্দে মগ্ন হতে। এও চরম বৈরাগ্যের লক্ষণ। তাই ক্রিস্টিনের চোখে তাঁর গুরু প্রতিভাত হতেন পরিহাসপ্রিয় বাল্যসখা-রূপে। ক্রিস্টিনও ছিলেন বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ শিষ্যা-কন্যা-মাতা।

সিস্টার ক্রিস্টিনের জীবনপথের হাল ধরেছিলেন বিবেকানন্দ। তিনি নিজের জীবনের চরম উপলব্ধিকে ফুলে-ফলে ভরিয়ে তুলেছিলেন এবং সেই বিশাল মহীরুহের ফলভার কাঁধে তুলে

নিয়েছিলেন ক্রিস্টিন। তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন সিস্টার নিবেদিতার দৃপ্ত ভঙ্গির পাশে স্নিগ্ধতার আবেশ নিয়ে, নিবেদিতার নিবেদিত প্রাণের গর্জিত তরঙ্গের পাশেই কুলুকুলু শব্দে বয়ে যাওয়া শান্তশ্রী নদীর মতো। তাঁরা দুজনেই তৎকালীন ভারতবর্ষের নারীশিক্ষা এবং নারীকল্যাণের নব-জন্মদাত্রী। দুজনেই হৃদয়বত্তায় এবং বুদ্ধিমত্তায় মহান। দুজনেরই করুণা, প্রেম, কোমলতা, সহিষ্ণুতা এবং আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য বিগ্রহরূপ ধারণ করেছিল উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত ভারতবর্ষে। তাই তৎকালীন পটভূমিতে প্রথিত এই গ্রন্থ-প্রস্তুতি একাধারে হয়ে উঠেছে সাধিকা-ঋষিকা ক্রিস্টিনের কর্মব্যস্ত জীবনের ইতিহাস এবং তাঁর অমল-ধবল মানসলোকের গবেষণালব্ধ চিরায়ত কথা। ❑



স্বতন্ত্র ধারায় গীতার ব্যাখ্যা

অনীশ রায়চৌধুরী

শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা
অনুবাদ ও ঋষিবাক্য সংকলন
সংকলক ঃ অরুণকুমার মজুমদার
প্রকাশক ঃ বিমলকুমার ধর
অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স
১২/১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩
পৃষ্ঠা ঃ ২০+৪৭৬
মূল্য ঃ ১০ ডলার
প্রথম সংস্করণ ঃ ২০০০

পৃথিবীতে যে-কয়টি গ্রন্থের সর্বাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা একটি। বাজারে গীতার নানা ধরনের সংস্করণ প্রচলিত আছে, তবু তাদের মধ্যেও আলোচ্য গ্রন্থটির স্বাতন্ত্র্য ও অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য।

সঙ্কলক প্রত্যেক অধ্যায়ের সূচনায় বঙ্গানুবাদ এবং প্রাসঙ্গিক ঋষিবাক্য সঙ্কলিত করেছেন। তার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের সুবিস্তৃত পরিধি ছাড়াও ডঃ রাধাকৃষ্ণন, রাজশেখর বসু, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রবীন্দ্রনাথ এবং আরো অনেকের রচনা থেকে অংশবিশেষ সংগ্রহ করে তার সাহায্যে পাঠকের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন গীতার মর্মকথা। এটিই এই গ্রন্থের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। সঙ্কলকের আয়াসসাধ্য গবেষণার ফলে পাঠকসাধারণ একাধিক মহাজীবনের আলোকে এই মহাগ্রন্থটিকে আলোকিত অবস্থায় পাবেন।

এরপর আছে মূল সংস্কৃত পাঠ, বিসন্ধি পাঠ এবং আক্ষরিক অনুবাদ। আজ যাঁরা সংস্কৃত না জানার কারণে গীতার মর্মে প্রবেশ করতে পারেন না, তাঁরা ভাবানুবাদ ও ব্যাখ্যা পড়ার পর বিসন্ধি পাঠের হাত ধরে সহজে মূল সংস্কৃত পাঠে প্রবেশ করতে পারবেন।

স্পষ্ট ঝকঝকে ছাপা এই গ্রন্থের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। মূল শ্লোক, বিসন্ধি পাঠ, অনুবাদ আর ঋষিবাক্য ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরে মুদ্রিত হওয়ায় পাঠকের সুবিধা হবে।

স্বামী তথাগতানন্দজী লিখিত 'পরিচায়িকা' এবং শেষে উদ্ধৃতিনির্দেশ, গ্রন্থসূচী এবং নির্ঘণ্ট গ্রন্থটিকে আরো সমৃদ্ধ করেছে।

তবে অনুবাদের ভাষা সবসময় অধুনা প্রচলিত বাঙলা হয়ে উঠতে পারেনি। যে-ভাষা মানুষ নিত্য ব্যবহার করেন, সেই আধুনিক লৌকিক ভাষায় শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ সহজ কাজ নয়। কিন্তু সেটাই যুগের দাবি। বিসন্ধি পাঠের পর অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা দিয়ে তারপর আক্ষরিক বাঙলা অনুবাদটি দিলে বোধহয় আরো ভাল হতো। অল্প যে দু-একটি মুদ্রণপ্রমাদ রয়ে গেছে তা দূর করার চেষ্টা নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে হবে।

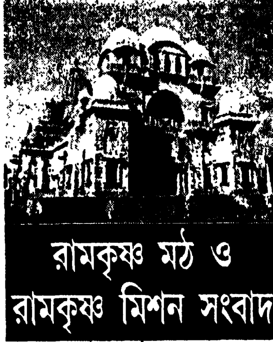
গ্রন্থকার আমেরিকাপ্রবাসী। গ্রন্থটিও কি কেবল প্রবাসীদের জন্যই? নাহলে কেবল ডলারেই মূল্য নিরূপণ না করে টাকার অঙ্কেও মূল্যায়ন করা উচিত ছিল। ❑

প্রাপ্তি-সংবাদ

- কবিতার ডালি—নন্দকুমার সিংহ। প্রকাশক ঃ জয়কুমার সিংহ, বিজয়ানন্দ স্মারক ভবন, ২৩৩ নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া-১। পৃষ্ঠা ঃ ৪৮। মূল্য ঃ ২০ টাকা।
- সত্যের স্বরূপ ও ফলিতরূপ—ব্রহ্মচারী অসঙ্গ চৈতন্য। প্রকাশক ঃ ব্রহ্মচারী অসঙ্গ চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীর, শ্রীবাস অঙ্গন রোড, নবদ্বীপ-৭৪১৩০২। পৃষ্ঠা ঃ ৮+৬০। মূল্য ঃ ১৫ টাকা।
- 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি' এর তাৎপর্য কি?—অন্নাল ভট্ট। প্রকাশক ঃ অন্নাল ভট্ট ট্রাস্ট, যোগেন পার্ক, শান্তিবাজার, ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ঃ ১২। মূল্য ঃ ৮ টাকা।
- ভারতবর্ষ ও বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা—গিরিজাশঙ্কর দাস। প্রকাশক ঃ অমলাভ দাশ, বইঘর, রংপুর, শিলচর। পৃষ্ঠা ঃ ২০। মূল্য ঃ ১৫ টাকা।
- ভারতীয় দর্শন ও বিজ্ঞান—সতী সেন। প্রকাশিকা ঃ সতী সেন, ৪২২এ যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৬৮। পৃষ্ঠা ঃ ১২। মূল্য ঃ ১০ টাকা।
- অলৌকিক ভোরের কবিতা—শৈলেন্দ্র হালদার। প্রকাশক ঃ পদাতিক, ডি ই ২১১/৩ পূর্ব নারায়ণতলা, অশ্বিনীনগর, কলকাতা-৫৯। পৃষ্ঠা ঃ ৩২। মূল্য ঃ ২০ টাকা।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ও বিদ্যালয়, মনসাদ্বীপ-এর ৭৫ বর্ষপূর্তি উৎসব

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার **মনসাদ্বীপে** অবস্থিত **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ও বিদ্যালয়** গত ২৬ এপ্রিল ২০০২-এ তার বর্ষব্যাপী প্ল্যাটিনাম জুবিলি উৎসবের (২০০২-২০০৩) শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। কপিল মুনির সাধনক্ষেত্র পুরাণখ্যাত সাগরদ্বীপ বর্তমানে কৃষি, শিক্ষা, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি করেছে—যা ৭৫ বছর আগে ছিল অকল্পনীয়। অবিভক্ত ২৪ পরগনার সর্বদক্ষিণে হুগলি নদী ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমস্থলে জেগে ওঠা এই ব-দ্বীপটি সেসময় ছিল গভীর জঙ্গল আর বাঘ, কুমির, বুনো শুয়োর প্রভৃতি হিংস্র জন্তুজানোয়ারের আবাস। এমন অবস্থায় স্থানীয় জমিদারদের তত্ত্বাবধানে শুরু হয় জঙ্গল পরিষ্কার ও চাষাবাদের কাজ। ঐসময়ে কাঁথি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ব্রহ্মচারী রাখাল মহারাজ (পরবর্তী কালে স্বামী ইষ্টানন্দজী) সাগরদ্বীপে ঐ আশ্রমের জমি দেখাশোনার জন্য আসেন। তিনি দেখলেন, জমিদারদের অধীনস্থ প্রজাদের বড়ই করুণ অবস্থা। তারা কোনপ্রকারে পানীয় হিসাবে নদী এবং পুকুরের লোনা জল এবং দুমুঠো মোটা ভাতের ব্যবস্থা করতে পারলেও চিকিৎসা ও শিক্ষার আদৌ কোন ব্যবস্থা নেই। ঠাকুর-মা-স্বামীজীর সেবাদর্শে নিবেদিতপ্রাণ এই তরুণ ব্রহ্মচারী অন্ধকার সাগরদ্বীপে শিক্ষার প্রথম প্রদীপ জ্বালাবার ব্রত গ্রহণ করলেন। ১৯২৬ সালের ২৬ এপ্রিল স্থানীয় জমিদার ও সহৃদয় কতিপয় মানুষের ঐকান্তিক সহযোগিতায় তিনি গড়ে তুললেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামাঙ্কিত একটি আশ্রম ও বিদ্যালয়। তারপর এক এক করে পঁচাত্তরটি বছর অতিক্রান্ত।



দ্বীপের পুরুষোত্তমপুর গ্রামের জমিদার গোবিন্দপ্রসাদ গায়েনের বাড়িতে বিদ্যালয়ের শুভারম্ভ হয়। পরে ধবলাটের কর্ণাকর জানার দেওয়া কিছু জমির ওপর একটি কুটির নির্মাণ করা হলে বিদ্যালয়টি ১৯২৮-এর ২৬ এপ্রিল সেখানেই স্থানান্তরিত হয়। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়টি ছিল একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়। তারপর ক্রমে উচ্চতর শ্রেণী যুক্ত হতে থাকে। ১৯৩২ সালে স্থাপিত হয় ছাত্রাবাস। ঐবছরই মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটি পৃথক প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রসঙ্গত, তখনকার দিনে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ছিল না, কিন্তু ব্রহ্মচারী রাখাল মহারাজ কোন বেতন নিতেন না। বাড়ি বাড়ি মুষ্টিভিক্ষা করে তিনি অর্থসংগ্রহ করতেন। শিক্ষকরা যৎসামান্য বেতন গ্রহণ করতেন। শুধু দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নয়, একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও গড়ে ওঠে। বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধির জন্য স্থানীয় যোগীন্দ্রনাথ মাইতি সর্বপ্রথম ২০ বিঘা জমি দান করেন। ১৯৩৭ সালে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। ১৯৪০ সালে ব্রহ্মচারী রাখাল মহারাজের চেষ্টায় আশ্রমেরই একটি ঘরে মনসাদ্বীপ ডাকঘর স্থাপিত হয়। ১৯৪২-এর বিধ্বংসী বন্যায় বিদ্যালয়গৃহগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরে ১৯৪৪-এ পাকাবাড়ি নির্মিত হয়। ১৯৪৯ সালে বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা হয়। ১৯৫০ সালে বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়। ১৯৫২ সালে বিদ্যালয়টি পূর্ণাঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক (XI) বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। এতদিন এই আশ্রম ও বিদ্যালয়টি ছিল কাঁথি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের একটি শাখা। ১৯৫২ সালে এটি বেলুড় মঠের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আসে এবং স্বামী নিরাময়ানন্দজী এখানকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তারপর ধীরে ধীরে আশ্রম ও বিদ্যালয়ের নানা বিকাশ ঘটতে থাকে। গড়ে ওঠে সমাজশিক্ষা ভবন, একটি বৃহৎ বিদ্যালয়-ভবন, সায়েন্স বিল্ডিং প্রভৃতি। ১৯৮৩ সালের ২ ডিসেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। মন্দিরটির উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয় ২৭ মার্চ ১৯৯৬। বর্তমানে আশ্রমে ডেয়ারি, লাইব্রেরি, ট্রেনিং সেন্টার, দাতব্য চিকিৎসালয় ও বুকব্যাঙ্ক আছে। ট্রেনিং সেন্টারটিতে স্থানীয় বেকার যুবক-যুবতীদের টেলারিং, উইভিং, উলনিটিং, কার্পেন্ট্রি প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বুকব্যাঙ্ক থেকে প্রতি বছর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। প্রসঙ্গত, বিগত কয়েক দশকে বহু বিশিষ্ট সন্ন্যাসী আশ্রম ও বিদ্যালয়ের সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বহু একনিষ্ঠ শিক্ষক দুটি প্রাথমিক ও একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে সুনামের সঙ্গে শিক্ষাদান করেছেন। নতুন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী বিদ্যালয়টি এখনো মাধ্যমিক বিদ্যালয়রূপেই আছে।

গত ২৬ এপ্রিল ২০০২ মঙ্গলদীপ জ্বালিয়ে প্ল্যাটিনাম জুবিলি উৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন সরিষা রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী রাজীবানন্দজী। প্রভাতফেরি, সাইকেল ও মোটর সাইকেল র‍্যালি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আলোচনাসভার মধ্য দিয়ে উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। গত ৬ ও ৭ জুলাই দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী। তিনি এদিন আশ্রমপ্রাঙ্গণে একটি কমিউনিটি হল তথা বন্যাত্রাণ কেন্দ্রের শিলান্যাস করেন। স্থানীয় সাংসদ

অধ্যাপক রাধিকারঞ্জন প্রামাণিক ও বিধায়ক তথা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। পরদিন সর্বসাধারণের জন্য আলোচনাসভা ও ছাত্র-ছাত্রীদের বক্তৃতা প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়।

বর্ষব্যাপী প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উৎসবের চূড়ান্ত পর্যায় অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৬ এপ্রিল ২০০৩। পরবর্তী পর্যায়ের অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে স্থানীয় ধবলাট অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ফুটবল প্রতিযোগিতা, প্রাক্তন ছাত্রদের যাত্রাভিনয়, প্রাক্তন ছাত্র সমাবেশ প্রভৃতি।

প্রতীক্ষালয় উদ্ঘাটন

গত ৬ অক্টোবর ২০০২ **শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী** মহারাজের জন্মতিথিতে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠ ডাকঘর ও সারদাপীঠ দুগ্ধশালার সন্নিকটে নবনির্মিত প্রতীক্ষালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এছাড়াও ঐদিন তিনি সারদাপীঠ শিক্ষামন্দিরের কাছে বেদ বিদ্যালয়ের কর্মীদের জন্য নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠে গত ১২ থেকে ১৫ অক্টোবর ২০০২ মহা সমারোহে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। সামান্য বৃষ্টি ও মেঘলা পরিবেশ সত্ত্বেও হাজার হাজার ভক্ত নরনারী চারদিন ধরে এই পূজানুষ্ঠানে অংশ নেন। গত বছরের ন্যায় এবারও শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের পূর্বদিকে গঙ্গাতীরে অস্থায়ী মণ্ডপে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। যথানিয়মে মহাষ্টমীতে কুমারী-পূজা হয়। প্রায় ৫৯,০০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। এই চারদিন বিভিন্ন সময়ে কলকাতা দূরদর্শন পূজানুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করে।

বেলুড় মঠ ছাড়াও নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে—**আঁটপুর, আসানসোল, বারাসত, কাঁথি, ধলেশ্বর (আগরতলা), গুয়াহাটি, জলপাইগুড়ি, জামসেদপুর, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, লখনৌ, মালদা, মনসাদ্বীপ, মেদিনীপুর, মুম্বাই, পাটনা, রহড়া, শেলা (চেরাপুঞ্জি), শিলং, শিলচর** এবং **বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম**।

বহির্ভারতে দুর্গাপূজা

মরিশাস আশ্রমে অন্যান্য বছরের মতো এবারেও প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। মরিশাসে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার বিজয়কুমার এই দুর্গাপূজা দর্শন করেন।

বাংলাদেশের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রেও শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে—**বালিয়াটি, বরিশাল, ঢাকা, দিনাজপুর, হবিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ** এবং **সিলেট**। বাংলাদেশের প্রাক্তন দুই প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসিনা ও এইচ. এম. এরশাদ, আবদুল মান্নান ভুইএঞা, আলতাফ হোসেন চৌধুরী, সাদেক হোসেন খোকা প্রমুখ পূজার বিভিন্ন দিনে ঢাকা কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী এম. সইফুর রহমান এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত ফরাসি রাষ্ট্রদূত সিলেট আশ্রমে অনুষ্ঠিত পূজায় উপস্থিত ছিলেন।

দেহত্যাগ

স্বামী বিশ্বম্ভরানন্দজী (কুঞ্জ মহারাজ) বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে গত ২৮ অক্টোবর ২০০২ সকাল ৮টায় ত্রিচুর আশ্রমে দেহত্যাগ করেন। দেহান্তকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর। তিনি বিগত ৩৮ বছর ধরে ত্রিচুর মঠে অবসরজীবন যাপন করছিলেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করে তিরুবনন্তপুরম আশ্রমে যোগদান করেন। তিনি তাঁর গুরুর কাছেই সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ছাড়া তিনি সালেমে এবং অধ্যক্ষরূপে কাঞ্চীপুরম ও পোন্নামপেট আশ্রমে ঠাকুরের বিভিন্ন সেবাকর্মে বৃত ছিলেন। রসিক প্রকৃতির জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

স্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দজী (শ্রীকান্ত মহারাজ) নিউমোনিয়া ও সেরিব্রো-ভাস্কুলার অ্যাকসিডেন্টে গত ২৯ অক্টোবর ২০০২ সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠানে প্রয়াণ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি রক্তের উচ্চচাপ ও বার্ধক্যজনিত নানা উপসর্গে বিগত কয়েক বছর ভুগছিলেন।

তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪০ সালে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৫০ সালে তাঁর গুরুর কাছেই সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন তিনি বিভিন্ন সময়ে রাঁচি (মোরাবাদি), কনখল, দেওঘর, পুরুলিয়া, কামারপুকুর, বৃন্দাবন ও আসানসোল কেন্দ্রে কর্মী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তমলুক আশ্রমের অধ্যক্ষের পদে বৃত ছিলেন। বিগত ২ বছর ধরে তিনি বেলুড় মঠে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। সরলতা, প্রফুল্ল ও মিষ্ট স্বভাব ছিল পূজ্যপাদ মহারাজের সহজাত প্রকৃতি। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন: গত ১৬ ও ১৮ নভেম্বর ২০০২ যথাক্রমে **শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজ** এবং **শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের** জন্মতিথি পালন করা হয়। এই দুই তিথিতে সন্ধ্যারতির পর তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী সৌম্যাত্মানন্দজী।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে।

মায়ের বাড়ির সংলগ্ন পূর্ব-পশ্চিমে দুটি বাড়ি ক্রয়ঃ প্রয়োজনের তুলনায় আয়তনে ক্ষুদ্র 'মায়ের বাড়ি'তে ভক্তসমাগম ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় বিগত কয়েক দশক ধরে অত্যন্ত স্থানাভাব অনুভূত হচ্ছিল। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় গত ২ মে ২০০১ এবং ২২ এপ্রিল ২০০২ তারিখে যথাক্রমে ১৪নং গোপাল নিয়োগী লেন এবং ৪নং উদ্বোধন লেনের দুখানি বাড়ি ক্রয় করা সম্ভব হয়েছে। বাড়িদুটিতে বেশ কিছু পরিবার দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস করছেন। তাই এখনি তা প্রয়োজনমতো ব্যবহার করা না গেলেও ভবিষ্যতে বাড়িগুলিকে মেরামত-সাপেক্ষে ব্যবহার করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

অমরকানন শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাদল আশ্রম (বাঁকুড়া)ঃ গত ৭-৯ সেপ্টেম্বর ২০০২ গ্রামীণ কল্যাণের জন্য একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২৪টি গ্রামীণ সংস্থা থেকে ৪৭ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। আলোচনা করেন রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী তত্ত্বস্থানন্দজী ও স্বামী শৈলেশানন্দজী।

কাটোয়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র (বর্ধমান)ঃ গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০০২ সারাদিন ধরে 'শিক্ষকদিবস' উদ্‌যাপিত হয়। ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ও আলোচনা ছিল এই অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। আলোচনা করেন স্বামী গৌরীনাথানন্দজী, অধ্যাপক অরবিন্দ সামুই ও দীপক দত্ত।

বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ সমন্বয় পরিষদ (কলকাতা-২৭)ঃ স্বামীজীর ঐতিহাসিক শিকাগো-বক্তৃতা স্মরণে গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০২ একটি শোভাযাত্রা ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ময়দানে স্বামীজীর মর্মরমূর্তির পাদদেশে অনুষ্ঠিত যুবসমাবেশে ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী সর্বলোকানন্দজী, ঐতিহাসিক ডঃ নিমাইসাধন বসু ও পরিষদের সভাপতি প্রণবেশ চক্রবর্তী। আলোচনার শেষে শুরু হয় শোভাযাত্রা। সঙ্গীত, নৃত্য, স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' থেকে পাঠ, সমবেত কণ্ঠে 'স্বদেশমন্ত্র' পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে শোভাযাত্রাটি ময়দান, অদ্বৈত আশ্রম, বলরাম-মন্দির, নিবেদিতা স্কুল, উদ্বোধন কার্যালয়, কাশীপুর উদ্যানবাটী হয়ে আদ্যাপীঠে এসে শেষ হয়। সমাপ্তি সমাবেশে ভাষণ দেন ব্রহ্মচারী মুরালভাই ও প্রণবেশ চক্রবর্তী। শিশুরা নৃত্য, গীত ও পাঠে অংশ নেয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্র-ছাত্রীকে একটি করে স্বামীজীর বই ও আলোকচিত্র উপহার দেওয়া হয়।

চৌধুরীহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (কোচবিহার)ঃ গত ২১-২৩ সেপ্টেম্বর ২০০২ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। মূর্তিপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বহু সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অছি ও পরিচালন পর্ষদের অন্যতম সদস্য স্বামী প্রমেয়ানন্দজী এবং স্বামী পরিজ্ঞানানন্দজী, স্বামী দেবদেবানন্দজী, স্বামী মঙ্গলানন্দজী, স্বামী পরাশরানন্দজী প্রমুখ। বিশেষ পূজা করেন স্বামী লোকেশানন্দজী। উৎসবে প্রায় ৫০০ মুসলমান-সহ ১০,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

বিরাটী শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ (কলকাতা)ঃ গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০২ দাতব্য হোমিও চিকিৎসাকেন্দ্রের উদ্বোধন করেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম আবাসিক কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী সুপর্ণানন্দজী। স্বাগত ভাষণে 'Health Card' গ্রহণের উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ আর. কে. দত্ত, ডাঃ বি. বি. পুরকায়স্থ, ডাঃ মিলনকান্তি শীল প্রমুখ।

সুন্দরবন রামকৃষ্ণ আশ্রম, কাকদ্বীপ (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)ঃ গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০২ বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ ও ধর্মসভার মাধ্যমে চতুর্থ বার্ষিক ভক্ত-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন স্বামী শান্তিদানন্দজী, স্বামী অজয়ানন্দজী, স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী ও স্বামী রাজীবানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ২০০ ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

চকচণ্ডীনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম (হুগলী)ঃ গত ৬ অক্টোবর ২০০২ মহালয়া উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা ও চণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী গৌরীনাথানন্দজী। আশ্রমের ফ্রি-কোচিং সেণ্টারের ছাত্র-ছাত্রীদের জামা-প্যাণ্ট ও ২৮ জন দরিদ্র নরনারীকে ধুতি ও শাড়ি দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (সরকারপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা)ঃ গত ১০ অক্টোবর ২০০২ এক অনুষ্ঠানে 'অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা তথা ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা যান'-এর উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী সর্বলোকানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে ৪০০ জন দুঃস্থ শিশুর মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। মহাষ্টমীর দিন বিশেষ পূজা এবং কুমারীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্তৃক অভিনীত হয় 'মহিষাসুরমর্দিনী'। প্রায় ৩,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বেতালবসান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অনাথ সেবাশ্রম (পূর্ব মেদিনীপুর)ঃ গত ১৪ অক্টোবর ২০০২ একটি দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন তমলুক রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী। স্বামীজীর সেবাধর্ম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য। ৬জন অনাথ বালকের সর্বাঙ্গীণ ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়ে সেবাশ্রমের কাজে সূচনা হয়। প্রায় ৩০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

কোঠাবাড়ি মা সারদা সেবাকেন্দ্র (উত্তর ২৪ পরগনা)ঃ গত ২৩ অক্টোবর ২০০২ শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন স্যাণ্ডেলের বিল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী দেবব্রতানন্দজী। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা করেন অধ্যাপক শ্যামল সরদার। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অরুণকুমার দাস। সম্মেলন-শেষে শতাধিক দরিদ্র দুঃস্থ মহিলাকে শাড়ি এবং ৮১ জন শিশুকে নতুন পোশাক দেওয়া হয়। দুপুরে সকলকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। সম্মেলনে মোট ১৭০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সেবাব্রত

মহারাজগঞ্জ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)ঃ গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০২ এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ৮৩ জন রক্তদান করেন।

হাবড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম (উত্তর ২৪ পরগনা)ঃ গত ৬ অক্টোবর ২০০২ শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ১৭৫টি শাড়ি, ৪০টি ধুতি, ৯৫টি জামা, ৬৭টি প্যান্ট, ৪৫টি গেঞ্জি ও ১৫৬টি পাঞ্জাবি দরিদ্র নরনারীকে প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন স্বামী সত্যরূপানন্দজী। উপস্থিত সকলকে প্যাকেট দেওয়া হয়।

পরলোকে

মেদিনীপুরের কাঁথি-নিবাসী অধ্যাপক সতীশচন্দ্র নন্দ গত ১৫ মে ২০০২ পরলোকগমন করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং প্রাচ্যশাস্ত্রবিদ্। তিনি 'কাব্যব্যাকরণস্মৃতিতীর্থ' ও 'সাহিত্যভূষণ' উপাধি লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ছাত্র-বৎসল, সরল ও বিনয়ী। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম-নিবাসী শ্যামলবিকাশ রায় গত ১৭ মে ২০০২ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তিনি ছিলেন 'উদ্বোধন' পত্রিকার নিয়মিত আগ্রহী পাঠক। সমাজসেবায় ঐকান্তিক নিষ্ঠার জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, হাওড়া-নিবাসিনী মণিমালা ব্যানার্জি গত ২০ মে ২০০২ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি দীর্ঘদিন 'উদ্বোধন' পত্রিকার গ্রাহিকা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, মেদিনীপুর-নিবাসিনী ঊষারানী বিশ্বাস ২০ মে ২০০২ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহিকা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, নাগপুর-নিবাসী মলয়কুমার বরাট গত ২৫ মে ২০০২ নাগপুরে নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। তিনি ছিলেন স্থানীয় বেঙ্গলি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। সরল ও সুমধুর ব্যবহারের জন্য তিনি ছিলেন সকলের প্রিয়।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতা-নিবাসী কুমুদরঞ্জন রায়চৌধুরী গত ২৫ মে ২০০২ বিকাল ৫.০৯ মিনিটে পরলোকগমন করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি ছিলেন স্বামী প্রভানন্দজী (কেতকী মহারাজ) ও বর্তমান সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের পূর্বাশ্রমের নিকট আত্মীয়। তিনি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 'একটি আত্মত্যাগের কাহিনী' নামে তিনি একটি পুস্তক রচনা করেন।

শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা-নিবাসিনী নীলিমা মজুমদার গত ২৯ মে ২০০২ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু প্রবীণ সন্ন্যাসীর স্নেহলাভ করেছিলেন। সদাহাস্যময়তা ও সরল ব্যবহার ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি 'উদ্বোধন'-এর পাঠিকা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা-নিবাসিনী অনিমা সেন গত ৩০ মে ২০০২ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি ছিলেন বলরাম বসুর পৌত্রী মহামায়া সরকারের দ্বিতীয়া কন্যা। তিনি সারদা মাতৃসঙ্ঘের সদস্যা ও 'উদ্বোধন' পত্রিকার গ্রাহিকা ছিলেন। ❑

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

উৎসব-অনুষ্ঠানাদি অথবা পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য উৎসব-অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির কিংবা পরলোকপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের দপ্তরে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।—সম্পাদক

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র

১০৪ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে

দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

১০৪ তম বর্ষ

মাঘ ১৪০৮ থেকে পৌষ ১৪০৯

জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০০২

সম্পাদক

স্বামী সর্বগানন্দ



উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

❑ বার্ষিক গ্রাহকমূল্য : পঁচাত্তর টাকা ❑ সডাক : পঁচানব্বই টাকা ❑ প্রতি সংখ্যা : দশ টাকা ❑

❑ শারদীয়া সংখ্যা : পঞ্চাশ টাকা ❑

উদ্বোধন

১০৪তম বর্ষ

মাঘ ১৪০৮—পৌষ ১৪০৯ ❑ জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০২

বর্ষসূচী

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

তাঁর নামবীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

এরকম মনে করা ভাল নয় যে, আমার ধর্মই ঠিক আর অন্য সকলের ধর্ম ভুল। সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকলেই হলো। অনন্ত পথ—অনন্ত মত। শ্রীরামকৃষ্ণ

*

ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজন? নিন্দা ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, কিন্তু কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে, তা বলতে পারে কজনে? শ্রীমা সারদাদেবী

*

টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধাবিঘ্নের বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

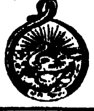
শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ


Organon



'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ১

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

কলকাতা

- **রামকৃষ্ণ মঠ (যোগোদ্যান)** কাঁকুড়গাছি, ফোন : ৩৩৪-৬০০০
- **রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম)** হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, ভবানীপুর, ফোন : ৪৫৫-৪৬৬০
- **সেঞ্চুরি স্টোর্স**, ২৮বি গড়িয়াহাট রোড কলকাতা-২৯, ফোন : ৪৪০-৬২৮৭/৭৬৭৯
- **কথামৃত সঙ্ঘ** ❑ ৩৬ রসা রোড সাউথ থার্ড লেন ফোন : ৪২২-০৩৩২
- **বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র** ডি ডি ৪৪, সল্ট লেক, কলকাতা-৬৪
- **রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম**, ৫/৩৬ বিজয়গড়, কলকাতা-৩২
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ ও প্রার্থনা-মন্দির** ৭৩ ডায়মণ্ডহারবার রোড, বড়িশা (সখের বাজার) ফোন : ৪৪৬-০৬৮৮/৪৪৭-১৩৭১
- **দেবাশিস পেপার সাপ্লায়ার্স** ১৩/৫/৩ রামকান্ত বোস স্ট্রিট, বাগবাজার
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবনালোক** ❑ সেলিমপুর
- **বিবেকানন্দ যুবকল্যাণ কেন্দ্র** ❑ চেতলা
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম** ❑ টেম্পল লেন, ঢাকুরিয়া
- **শোভনা ভৌমিক** ❑ ৯ আর. এন. টেগোর রোড নবপল্লী, কলকাতা-৬৩, ফোন : ৪৬৭-১১২২
- **ত্রিপর্ণ রামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র** বি/৬/৪, ৩৯এ গোবিন্দ আড্ডি রোড, কলকাতা-২৭
- **আদ্য ব্রাদার্স** ১২/১বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি-বিবেকানন্দ পাঠচক্র** শরৎ কলোনী, কলকাতা-৮১
- **বিবেক-বাণী স্টাডি সার্কেল** ১৩১ মেট্রোপলিটন কো-অপারেটিভ হাউসিং সেক্টর-এ, ই. এম. বাইপাস, কলকাতা-৩৯
- **মলয় ভৌমিক** ❑ ৪/১ বেনেপাড়া লেন, কলকাতা-১৪
- **আর. ভি. ব্রিগস অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ** ৯ বেণ্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনসঙ্ঘ, সঙ্ঘমন্দির** ১১ তারামণি ঘাট রোড, পশ্চিম পুটিয়ারি, কলকাতা-৪১
- **'সারদা ভবন', জীবনকুমার ভট্টাচার্য** ৩৪ প্রিয়নাথ ঘোষ স্ট্রিট, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬
- **পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম** ৪/১৮-বি বিদ্যাসাগর উপনিবেশ, কলকাতা-৪৭
- **হ্লাদিনী** ❑ স্বত্বাধিকারিণী : সুচিত্রা চ্যাটার্জি ৮০এ যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেনিউ, কলকাতা-৫ ফোন : ৫৩০-২৫৮০ (দুপুর ১২টা—সন্ধ্যা ৭টা)
- **দাসানুদাস সাহা** ❑ ১এ কুমারটুলী স্ট্রিট কলকাতা-৫, ফোন : ৫৫৪-৬২৯৯
- **ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়** ❑ ১/২ডি সেণ্টার সিঁথি রোড কলকাতা-৫০, ফোন : ৫৫৬-৯৫৭২
- **রবি হাজরা** ১৩/৬/৩ রামকান্ত বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৩
- **সুধাংশু বিশ্বাস**, শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ৬ বরদা ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭, ফোন : ২১৮-১২৮৫
- **বিজনকৃষ্ণ অধিকারী** প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবা কেন্দ্র ১৫৩ বিবেকানন্দ সরণি, গরফা, কলকাতা-৭৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ**, বিরাটি, কলকাতা-৫১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবায়তন**, ২৪/৬১ যশোর রোড ১নং এয়ারপোর্ট গেট, কলকাতা-২৮ ফোন : ৫১১-৭০৬৪
- **দক্ষিণ দুর্গানগর বিবেকানন্দ মন্দির** ৪৮ বিবেকানন্দ সরণি, কলকাতা-৬৫
- **দমদম শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা পরিষদ**, ২নং এয়ারপোর্ট গেট পোঃ রাজবাটী, কলকাতা-৮১, ফোন : ৫১১-৮২৪১
- **পার্থ ভট্টাচার্য**, প্রযত্নে শ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ সেবাসংসদ ২ মতিলাল কলোনী, কলকাতা-৮১ ফোন : ৫১২-৬৮৮৫/৯৯১৭
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ**, (শকুন্তলা পার্ক) ৪১/সি/১ শ্যামসুন্দর পল্লী, কলকাতা-৬১ ফোন : ৪৫২-৬০৩৮
- **অমরানন্দ ভট্টাচার্য**, ডলফিন স্টুডিও ৩/১ ভুপেন রায় রোড, বেহালা, কলকাতা-৩৪ ফোন : ৪৫৮-৯৪২৭, ৪৪৬-০৩৮১
- **কালীমোহন সাহা**, ৭/২ ব্রজমোহন মণ্ডল রোড সন্তোষপুর, যাদবপুর, কলকাতা-৭৫ ফোন : ৪১৬-৬২১৩
- **তিলজলা বিবেকানন্দ সেবাসংসদ** ১৪৩/২০, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৩৯
- **সৌম্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস** ২৮৬/১ শরৎ বোস লেন, মাঠপাড়া কলকাতা-৮১, ফোন : ৫১২-৫৭৪৭
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ, উদয়পুর** প্রযত্নে চুনিলাল দে, ৫ ঈশ্বর বিশ্বাস লেন, নিমতা কলকাতা-৪৯, ফোন : ৫৪১-০১২২

ব্রহ্মময়ী মা সারদা

দাদরা-ধুন

ব্রহ্মময়ী মা সারদা
সন্তানের মা সারদা
জ্ঞানদায়িনী মা সারদা
জয় জয় রামকৃষ্ণপ্রাণা
রামকৃষ্ণের মা সারদা
সারদানন্দের মা সারদা
সাধুসন্তের মা সারদা
অসুরদলনী মা সারদা

জগদ্ধাত্রী মা সারদা
মুক্তিদাত্রী মা সারদা।।
প্রেমদায়িনী মা সারদা
কৃপাময়ী মা সারদা।।
বিবেকানন্দের মা সারদা
আমজাদেরও মা সারদা।।
পাপীতাপীর মা সারদা
শিবসঙ্গিনী মা সারদা।।

স —ম	ম ম —	ম —ম	ম ম —	প ধ ধ	প ম ম	ম —ম	ম ম —
ব্র ম্ হ	ম য়ী ০	মা ০ সা	র দা ০	জ গ ত	ধা ০ ত্রী	মা ০ সা	র দা ০
রা ম কৃ	ষ্ নে র	মা ০ সা	র দা ০	বি বে কা	নন্ দে র্	মা ০ সা	র দা ০

ণ —ণ	ণ ণ র্স	ধ —ধ	প ম প	সধ —ধ	পম —ম	ম —ম	ম ম —
স ন্ তা	নে রো০	মা ০ সা	র দা ০	মু ক্ তি	দা ০ ত্রী	মা ০ সা	র দা ০
সা র দা	নন্দে র	মা ০ সা	র দা ০	আ ম জা	দে রো০	মা ০ সা	র দা ০

স ধ ধ	ধ ধ —	প —ধ	ধ ধ —	প ধ প	ম ম —	ম —ম	ম ম —
জ্ঞা ন দা	য়ি নী ০	মা ০ সা	র দা ০	প্রে ম দা	য়ি নী ০	মা ০ সা	র দা ০
সা ধু স	ন্ তে র	মা ০ সা	র দা ০	পা পী ০	তা পী র	মা ০ সা	র দা ০

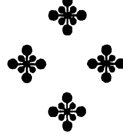
র্স র্স র্স	র্স র্র র্স	ধ —প	ধ ধ —	গ প —	ধ ণ —	ধ —প	ম ম —
জ য় জ	য় রা ম	কৃ ষ্ ন	প্রা ণা ০	কৃ পা ০	ম য়ী ০	মা ০ সা	র দা ০

র্স র্স র্স	র্স র্র র্স	ধ —প	ধ ধ —	গ প ধ	—ণ ধ	প —ম	ম ম —
অ সু র	দ ল নী	মা ০ সা	র দা ০	শি ব স	ং গি নী	মা ০ সা	র দা ০

কথা ও সুর ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

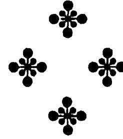
দেহত্যাগের আগে যদি কেউ ঈশ্বরের সাধন করে, আর সাধন করতে করতে ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, তাকে আর পাপ কখনো স্পর্শ করবে? অর্থাৎ ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, আর পাপ স্পর্শ করবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ



ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজনে? নিন্দা-ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, তাকে ভাল করতে পারে কজনে? আমার ছেলে যদি ধুলো-কাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে।

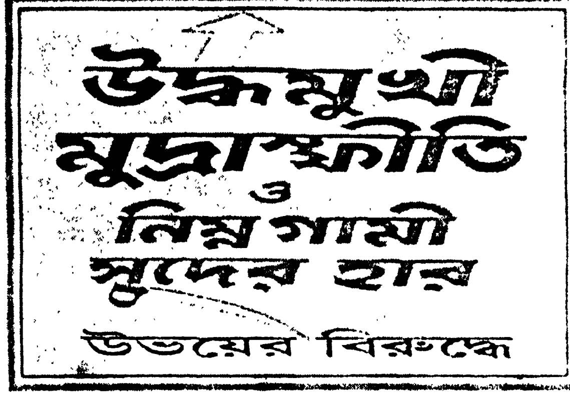
শ্রীমা সারদাদেবী



বেদে কোথাও নরকের কথা নাই। বেদের অনেক পরবর্তী পুরাণে এই নরকের প্রসঙ্গ আছে। বেদের সর্বাপেক্ষা অধিক যে-শাস্তির কথা পাওয়া যায়—তাহা পুনর্জন্ম, অর্থাৎ আরেকবার উন্নতির সুবিধা লাভ করা।

স্বামী বিবেকানন্দ

শক্তিশালী প্রতিরক্ষা



পিয়ারলেস এনক্যাশ বন্ড

২½ বৎসর মেয়াদী একটি ফিক্সড ডিপোজিট যোজনা

ব্যক্তি, বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, ট্রাস্ট, কো-অপারেটিভ সোসাইটি - সকলের জন্যই
বাজারের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় প্রকল্প

ভারতবর্ষের যেকোনো ব্রাঞ্চে ভাঙ্গানো যায়

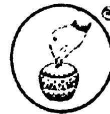
মেয়াদ	সুনিশ্চিত ক্রমবর্দ্ধমান প্রাপ্তি	জমারাশি
২½ বৎসর	• ১ম বৎসর - ৭% • ২য় বৎসর - ৮% • ২য় বৎসরের পর - ৮.২৫%	ন্যূনতম : ১০,০০০ টাকা এবং ৫,০০০ টাকার গুণিতকে যেকোনো উর্দ্ধরাশি

মূল বৈশিষ্ট্যগুলি :

- গ্যারান্টীযুক্ত ক্রমবর্দ্ধমান প্রাপ্তি
- ২ মাস পরে ঋনের সুবিধা (জমারাশির ৭৫% পর্যন্ত)
- ১২ মাস পরে যেকোনো সময় টাকা তোলার সুবিধা
- বিনামূল্যে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুবীমার সুযোগ (ব্যক্তির ক্ষেত্রে) *
- বিনামূল্যে পিয়ারলেস সেভিংস কার্ড * — যা থাকলে ২২০০ টিরও বেশী সংস্থা দিচ্ছে তাদের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয়ে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট

* শর্তসাপেক্ষে

বিশদ জানতে আপনার নিকটবর্তী যেকোনো পিয়ারলেস অফিসে যোগাযোগ করুন



® পিয়ারলেস

সঞ্চয়ের সহজ পথ
★
আস্থার প্রতীক

Estd 1932

Visit us at Website : http://www.peerless.co.in

ম্যাচিওরিটি দাবীপূরণের মোট পরিমাণ : ৩,৮০০ কোটি টাকারও বেশী

This is further to the statutory advertisement published in GANASHAKTI and THE ASIAN AGE on 10.04.2001

UDBODHAN
Phone : 2554-2248, 2554-2403
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com
udbodhan@vsnl.net

Vol. 104
No. 12
DECEMBER
2002

Licensed to Post
Without Prepayment
Licence No.
TECH/WB/RNP-15/LPWP-01/2002

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Regn. No.
TECH/WB/RNP-15/2002

উদ্বোধন

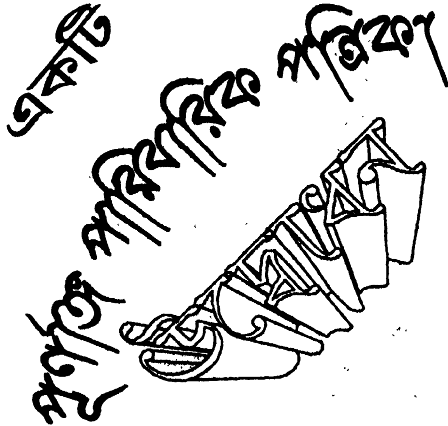
১০৪তম বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০৪ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র



✤ আগামী ১লা মাঘ ১৪০৯ (১৫ জানুয়ারি ২০০৩) **উদ্বোধন ১০৫তম বর্ষে** পদার্পণ করবে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় **নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব** নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের **১০৪ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম** ✤

✡ **বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। **ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য** এবং **রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের** সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের** একমাত্র বাঙলা মুখপত্র উদ্বোধন আপনাকে পড়তে হবে।



✡ **উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী** এবং **স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর। স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।**

✡ **উদ্বোধন**-এর সেবায় পাঁচটি স্থায়ী তহবিল আছে। একটি **'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল'**, অন্য চারটি যথাক্রমে **'স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ স্মৃতি তহবিল', 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল', 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'** এবং **'স্বামী অভয়ানন্দ স্মৃতি তহবিল'**। উদ্বোধন-এর জন্য **সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত।** আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে **'Ramakrishna Math, Baghbazar'**—এই নামে পাঠাবেন। **ঠিকানা : সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩।** দাতার চিঠিতে বা M.O. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন। বিজ্ঞাপন দিতে গেলে **'Udbodhan Office, Kolkata'**—নামে চেক বা ড্রাফ্‌ট পাঠাবেন।

স্বামী সর্বগানন্দ
সম্পাদক

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫্ টাকা। সডাক ৯৫্ টাকা। প্রতি সংখ্যা পৃথক ভাবে ১০্ টাকা।

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ
সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ





